বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন সেন

"আজকাল প্রাণ
রাখতেই প্রাণান্ত।"
Bournvita

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

"ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন" ব্যোমকেশের তিনটি অসাধারণ গোয়েন্দা-কাহিনীর সংগ্রহ। দুটি ছোট উপন্যাস "চোরাবালি" ও "অর্থমনর্থম্" এবং একটি বড়-গল্প "অদ্বিতীয়" এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের এবং তার কাহিনীগুলির নতুন করে পরিচয় দিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র: কারণ, তাঁদের মধ্যে বাস্তবিকই এমন কেউ আছেন কিনা সন্দেহ, যিনি কখনও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শোনেননি বা তার কোনও রহস্যকাহিনী পড়েননি, এবং পড়ে বিমুগ্ধ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গোয়েন্দা-কাহিনী

ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন

ও অভিভূত হননি। সুতরাং সে চেষ্টায় বিরত হয়ে শুধু এইটুকু বললে বোধ হয় যথেষ্ট যে, এ কাহিনী তিনটিও রহস্যের জটিলতায় ব্যোমকেশের আগের কাহিনীগুলির মতই পাঠকদের রোমাঞ্চিত করবে এবং শ্বাসরুদ্ধ করে রাখবে।

• এই লেখকের •

শজারুর কাঁটা ৪·০০ তুঙ্গভদ্রার তীরে ৬·০০ শঙ্খকঙ্কণ ২·৫০
কহেন কবি কালিদাস ৩·০০ ধরণী যখন তরুণী ছিল ৪·০০
বহু যুগের ওপার হতে ৩·০০

ব্যক্তি হিসেবে প্রায় আদর্শ ছিল সমীর—ছাত্রজীবনে ব্রিলিয়াণ্ট, স্বভাবচরিত্রে নিষ্কলঙ্ক, আচারব্যবহারে অনুকরণীয়, কর্মজীবনেও সম্মানিত—আই. এ. এস., জেলাশাসক। তার বাগ্‌দত্তা সুমনাকেও বিধাতা দিতে কিছু কার্পণ্য করেন নি। পিতার অকৃপণ স্নেহ, আর্থিক ও মানসিক ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যবোধ, শিল্পানুরাগ; এবং, সর্বোপরি, রূপ।

কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র বস্তু—অঙ্কের মত সোজা ও সরল নয় বুঝি তার হিসেব। দুই আর দুইয়ে সব সময়ে এখানে চিরসত্যের মত চার হয় না। যেটিকে প্রথম দর্শনে অতীব সরল বলে প্রতীয়মান হয়, সেটিই দেখা যায় হয়তো সবচেয়ে জটিল; যেটিকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়, সেটিই শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে দেখা

প্রতিভা বসুর

অসামান্য উপন্যাস

দ্বিতীয় দর্পণ

দেয়। তা না হলে দেবীপ্রতিমা সুমনাকে—যার সুন্দর জীবনের একেবারে শেষটুকু পর্যন্ত যেন কষা অঙ্কের শেষ ধাপটির মত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল—তাকে হঠাৎ প্রাসাদ ছেড়ে নোংরা বস্তিতে এসে উঠতে হয় কেন, সম্মানিত জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে ধর্ষক পুরুষদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে ক্ষতবিক্ষতই বা হতে হয় কেন, কুমারী জননীর অসম্মান মাথায় বয়ে বেড়াতেই বা হয় কেন?...প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস "দ্বিতীয় দর্পণ" এক দুর্বলচিত্ত পুরুষ এবং বিপর্যস্ত দুর্ভাগা এক নারীর বিশুদ্ধ জীবনায়নের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী।

• এই লেখিকার •

রাঙা ভাঙা চাঁদ ৪·০০

প্রকাশিত হল

দাম ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ অফিস : ৫ [illegible]
বিক্রয়-কেন্দ্র : [illegible]

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১
শনিবার, ১৬ কার্তিক, ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫·০০
ষাণ্মাসিক	...	১২·৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬·২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০·০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮·০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০·০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮·০০

ভারতের বাহিরে
(সাধারণ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৪২·০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	২১·০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১০·০০

[illegible]
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	[illegible]
ষাণ্মাসিক	...	[illegible]
ত্রৈমাসিক	...	[illegible]

দাম ৫০ পয়সা
[illegible]

DESH
Saturday, Nov. 2, 1968.

আমাদের নববর্ষ

দেশ পত্রিকার আরও একটি বছর শেষ হল, পঁয়ত্রিশ বর্ষ থেকে দেশ এখন ছত্রিশ বর্ষে পড়ল। নতুন বছর শুরুর আগে আমরা আমাদের পাঠক, লেখক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুরাগীবৃন্দের সহানুভূতি, প্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, বর্তমান বর্ষে এই পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিল, ইতিপূর্বে যা আর ঘটেনি। বন্ধের কারণ ঃ দৈনিক পত্রিকার অসাংবাদিক ধর্মঘট। পুজোর মুখে দুটি মাস আমাদের পত্রিকা প্রকাশ না হওয়ার নানা দিক থেকে আমাদের যে সব অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে লাভ নেই; পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছি, দেশ পত্রিকার পাঠক ও অনুরাগীদের এতে বিশেষ অসুবিধে হয়েছে। আমাদের অনুরোধ এই যে, অবস্থা বিবেচনায় তাঁরা আমাদের অক্ষমতা অনুধাবন করে মার্জনা করবেন। প্রসঙ্গত বলতে হয়, বর্তমান বছরে 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ না পাওয়ায় বহু পাঠক নানাভাবে আমাদের কাছে তাঁদের নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ না হওয়ার কারণ আমরা পাঠকদের জানিয়েছি, আবারও বলি : সম্ভব হলে আমরা পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করতাম; দুঃখের বিষয়—সে সুযোগ আমাদের ছিল না। তবু এই অভাব পূরণের কিছু কিছু চেষ্টা আমরা করছি, বিশেষত আগামী বড়দিনের সময় আমাদের যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে তা অন্যান্য বছরের তুলনায় পৃষ্ঠাসংখ্যায় বর্ধিত হবে ও রচনা-পরিবেশনে অধিক আকর্ষণীয় হবে। সংখ্যাটি পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে—এমন আশা করতে পারি।

দেশ পত্রিকার পাঠক ও অনুরাগীরা জানেন, আমাদের একটি নীতি আছে। সে-নীতি এই যে, আমরা যথাসম্ভব সর্ববিষয়ে একটি সহিষ্ণু ও উদার মনোভাব অবলম্বনের চেষ্টা করে থাকি। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাঙালীর জীবনের নানা সমস্যা—সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদিকে যতটা সম্ভব সহিষ্ণু মনোভাব ও সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দেশ পত্রিকা স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিতে চায়, অথবা নীতির নাম করে বিশেষ কোনো মতবাদ বা এক ধরনের সাংস্কৃতিক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়। আমরা জ্ঞানত সে চেষ্টা করি না। দেশ পত্রিকায় এমন একাধিক রচনা ইদানীংকালে প্রকাশিত হয়েছে, যা কখনও সাহিত্য-বিষয়ে কখনও সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। আবার এও সত্য যে, আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন রুচির মানুষ ও পাঠককে মতবিনিময়ের জন্যে নানা প্রসঙ্গে টেনে এনেছি। এর দ্বারা আমরা শুধু কর্তব্য পালন করিনি, আমাদের অধিকাংশের মনোভাব ও চিন্তার প্রকৃতি বুঝতে পেরেছি। উপকৃত হয়েছি।

বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য অস্বীকার করার মতন নয়। বরং তার সম্পদ যথেষ্ট। ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের কালেই শুধু নয়, পরবর্তী কালে প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' এবং তারও পরে 'কল্লোল' 'কালিকলম' সুধীন্দ্রদত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাংলা পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসে যে ভূমিকা পালন করে গেছে—আমাদের সঙ্গে তার যোগসূত্র একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বরং সেকালে পত্রিকা-পাঠকের সংখ্যা ছিল পরিমিত, এবং মানুষের রুচি এত ভিন্ন ও মতভেদ বোধ করি এত প্রবল ছিল না। একালে পাঠকসংখ্যা পূর্বের তুলনায় বহু গুণে বেড়েছে, তাঁদের রুচি নানা কারণে ভিন্ন প্রকার ও জটিল হয়েছে, মতভেদ প্রবল হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে পত্রিকার মাধ্যমে সকলের রুচি, মত ও প্রত্যাশা পূরণ করা সহজসাধ্য নয়। তবু যথাসাধ্য সে চেষ্টা করছি। আমাদের ত্রুটি ঘটে না—এমন দাবি বা অহঙ্কার নিশ্চয় করব না, তথাপি আশা করব, পাঠক ও অনুরাগীরা আমাদের সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন।

ভারত
কাশ্মীরকে ভারত ইউনিয়নের ভিতরে রেখেই শেখ আবদুল্লার সঙ্গে জয়প্রকাশ মীমাংসা করতে চান।
কিন্তু এই ফাঁপানো বেলুনের গায়ে ছুঁচ না বিঁধিয়ে ভিতরে আনবেন কি করে!
রাজ্যের উপর কেন্দ্রের ক্ষমতা নিয়ে বিতর্ক চলছে চলবে।
দাবা খেলায় বিরামহীন প্রতিযোগিতা।
চ্যবন
ই-এম-এস

রঞ্জন

সাংবাদিকতার যে কোনো ক্ষেত্রেই সরোজ আচার্যের "বদলী" হওয়া এক বিশাল আদেশ। "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে— পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে"। আমার এই স্বভাববহির্ভূত বিনয় অন্তত অংশত অকৃত্রিম কেননা অন্তত দশ বছর আগেও সরোজবাবু ছিলেন একান্তই গৃহমুখীন, প্রায় ঘরকুনো; তবু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল এবং সংবাদ সংগ্রহ-পরায়ণতা ছিল একাধারে গভীর আর ব্যাপক। বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় পূর্বে সংগৃহীত ধারণার সামান্যই পরিবর্তন সাধন করেছিল। কুষ্ঠিয়া আর কলকাতার সরোজ আচার্য ক্যালিফর্নিয়া বা নিউ ইয়র্কে এমন কি মস্কোতে মূর্ছা যান নি কখনো। গুরুগম্ভীর ভাষায় যাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তার পর্যালোচনায় সরোজ আচার্য আনতেন একটি একান্তই ঘরোয়া দৃষ্টিভঙ্গী। প্রারম্ভে এই সরোজ-প্রশস্তির তাৎপর্য প্রবন্ধান্তের পূর্বেই আত্মপ্রকাশ লাভ করবে বলে বিশ্বাস করি।

আমার দেশই গোটা পৃথিবী, এর বাইরে কিছু নেই, থাকলে তা বর্বর: এমন ধারণা কয়েক হাজার বছর আগেও সর্বজাতিক ছিল। গ্রীক ভাষায় "বর্বর" কথাটার আদি অর্থ "বিদেশী", যে আমার ভাষা বলে না। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অন্যান্য গবেষণার ফলে এই আত্মপ্রীতি অধুনা কিছু আঘাত পেয়েছে। বোধ হয় চীনেও, যেখানে সম্রাট একদা যে কোনো আগন্তুককে প্রবাসী প্রজা বলে গণ্য করতেন। ভারতের সঙ্গে অন্যান্য বহু দেশের রাজনীতিক; বাণিজ্যের সম্পর্ক নিশ্চয়ই আজকের নয়। কিন্তু একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা ভারতে বোধহয় বজায় ছিল বহু শতাব্দী ধরে, সহস্র আভ্যন্তর বিভেদ সত্ত্বেও। সতের বা সাত হাজার ঘোড়ায় চড়ে একেবারে ঘাড়ে এসে না চাপলে বিদেশীদের খবর নেবার প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি নেহরুজী যখন এশীয় সম্মেলন ডাকলেন নয়াদিল্লিতে তখনো গান্ধীজী অসঙ্কোচে স্বীকার করলেন যে বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ একান্তই পরিমিত; এ-বিষয়ে নেহরুই তাঁর গৃহশিক্ষক। পার্ট-টাইম।

নানা ঐতিহাসিক আভ্যন্তর দুর্বলতার জন্য রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও ভারতবাসীর বিশ্বচেতনা বিলম্বিত হয়েছিল। প্রথম উন্মেষ উৎসাহ পায় নি গান্ধীবাদী স্বাদেশিকতার উগ্রতা থেকে। অতি তরুণ বাঙালীদের জানবার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা এই সেদিনও এই বাঙলা দেশে কী রকম অশ্রদ্ধেয় ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের শিবিরেও ছিলেন একজন একলব্য; দ্রোণ তাঁর বিশ্বভারতীতে।

কংগ্রেসের মতো বটতলাশাসিত পঞ্চায়েতী সংস্থায়ও নেহরু আনলেন বাইরের অশান্ত হাওয়া। স্বাধীনতার আগেও সৃষ্ট হলো কংগ্রেসের বহির্বিষয়ক সচিবালয়। গাছ অনড়, কিন্তু পাতা নড়ল এখানে-ওখানে।

রাজনীতিক অর্থে আমাদের আধুনিক বিশ্বচেতনার জনক নিঃসন্দেহে নেহরু, যদিও এ ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের একান্তই বিভিন্ন এবং কখনো বিরোধী অবদানের পরিমাণ আজো সঠিক ওজন করা হয়নি। স্বাধীনতার আগেও একটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল, পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট বা আর কোনো নামে। ওদের কারবার ছিল প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বা মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে। বাকি সব ছিল লণ্ডনের হেফাজতে। এই অর্ধসুপ্ত কেরাণীকুল থেকে সহসা উদ্ভূত হলো স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি। পুরোধা স্বয়ং জওহরলাল নেহরু। বাবুগিরির ঐতিহ্য কিছুটা রয়েই গেল ওই "এক্সটার্নাল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রি" নামে; কিন্তু ধুতির লাথি বিষম লাথি। বেত্রহস্ত কাশ্মিরী সারা বিশ্বের অবাধ্য ছাত্রদের জানিয়ে দিলেন কার কী হোম টাস্ক করতে হবে। ঠিক একই সময়ে বিশ্বশিক্ষক তাঁর গৃহকর্তব্যে অবহেলা করছিলেন কিনা সে প্রশ্নের উত্থাপন আজ অনর্থক, কেননা, একদা কমলারই মতো, নেহরু আজ "No More"। পিছনে তবু রয়ে গেল বিশাল এক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর বিলীয়মান এক পররাষ্ট্রনীতি। এই নীতিসৌধের তাজমহলের অর্থাৎ 'মুজিয়ামে'র রক্ষয়িত্রী আজ নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। কোনো ভারতসন্তানের উপায় নেই অন্তত অংশত জগৎকে সেই চোখে না দেখে। Visibility Poor. সরোজ আচার্য মশাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন বই আর খবরের কাগজের উপর। ফলত পাঠকরা পেতেন সংবদ্ধ বিশ্লেষণ। অনচ্ছ কাগজের মহিমা অপার।

নেহরুর জীবদ্দশায়ই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে ঘুন ধরেছিল; তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বও যে এই নীতি তাঁর ঋজু স্কন্ধে ধারণ করতে অস্বীকার করছিল তার সাম্প্রতিক সাক্ষ্য ক্রমবর্ধমান। তিনি অন্তর্হিত হলে সেই গোটা তাসের ঘর যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল সে খবর সারা পৃথিবী নিমেষে জেনে গেল; জানলাম না শুধু আমরা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ষষ্ঠীর কৃপা (এর নতুন নাম নাকি পার্কিনসনস 'ল!) বর্ষিত হোলো অঝোরে। নানা ক্ষুদ্র আর অসংশ্লিষ্ট দেশে সৃষ্ট হোলো অসংখ্য ভারতীয় মিশন; ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের সদস্যদের জন্য আসন চাই তো। প্রতি বৎসর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের জন্যও চাই ঢালোয়া ডেলিগেশন। তা নইলে বাইরে মান থাকে না, আর পার্লামেণ্টের ঘরে বাড়ে অভিমান। আকাশবাণী আর অন্যতম প্রচারযন্ত্রের কণ্ঠস্বরও উচ্চতর হওয়া প্রয়োজন। হোলোও। শুধু একবারও ভেবে দেখা হয়নি যে সারা বিশ্ব এখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একান্তই উদাসীন—যদি না রবিশংকর তাঁর সেতার বাজান বা ইন্দিরা যান কোনো বিদেশী নায়ে তাঁর সকরুণ বেণু বাজায়ে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে কোনো সংকটের সন্ধান নিলে জানা যাবে ভারতের অপরিমেয় অপ্রাসঙ্গিকতা। রোডিশিয়া? উইলসন দেখবে, ভারত ভোট দিয়ে খালাস। ভিয়েৎনাম: মার্কিনী বোমাগুলি ঠিক রসগোল্লা সদৃশ মনে হচ্ছে না কিন্তু ওগুলি পড়ছে এমন লোকদের উপর যারা, এমন বেয়াড়া, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের মর্যাদা বোঝে না। কাশ্মীর: না, না, সে তো ঘরোয়া ব্যাপার। ঘোরালো কিন্তু ঘরোয়া। চেকোশ্লোভাকিয়া? ব্যাপারটা ভালো করেনি; তবে "আসে যদি রুশিয়া তাড়াইব ঘুষিয়া" এমন মনোভাবও ভালো নয়। তাছাড়া ঘুষ যে চাই মস্কো থেকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যেমন চাই—অন্ততঃ একজন মোটামুটি পোষমানা ন্যাশনালিস্ট মুসলমান, তেমনি রাষ্ট্রসংঘে চাই কিছু মুশ্লিম সমর্থক না হলেও নিরপেক্ষ সদস্য। নিপাত যাক ইস্রায়েল। আফ্রিকা সম্বন্ধে মৃদু য়ুরোপবিরোধিতা বজায় রাখলে বন্ধুবৃদ্ধি না ঘটলেও বিশেষ কোনো শত্রুতাবৃদ্ধির আসন্ন আতংক নেই। আপাততঃ ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির কাঠামো এই যে, শক্তিমানদের লাথি নীরবে হজম করাই ভালো: দুর্বলদের দু একটা লাথি খেলে এ জগতে ক্ষতি হবে কোথা কার?

এমন বিশ্বদৃষ্টিতে সাহায্যের পরিমাণ পরিমিত। আমি বলি কি, এই নেহরুগ্রস্ত মাহাত্ম্যের মোহই হয়েছে সমগ্র ভারতীয় বিদেশী নীতির কাল। নেহরু-পরিপুষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্তহীন সম্প্রসারণ নিশ্চয়ই একাধিক পরিবারের আশাতীত সমৃদ্ধির কারণ হয়েছে; এই সমৃদ্ধিই এই সত্য সমগ্র দেশবাসী থেকে অবলোকিত করে রেখেছে যে, এই সম্প্রসারণের লগ্নেই ঘটেছে

৯.

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বৃহত্তম সংকোচন। প্রভাব হোলো ক্ষীণতর আর প্রচার হোলো উচ্চস্বর : কেউ যে কর্ণপাত করছে না সে কথা দিল্লী শুনবে কেন? মুরিটানিয়াতে একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি না পাঠালে সে যাবে কোথায়?

ভারত নিশ্চয়ই বহির্জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারে না। "বৈদেশিকী" বিভাগ তাই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এর নিয়মিত রচয়িতাকে অতি বিচক্ষণ হতে হবে। জানতে হবে উত্তরাবর্তের দাক্ষিণ্য মানে (South Block) কতটা বরদাস্ত করবে। সরোজবাবু পরোয়া করতেন, এমন বলিনে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ইদানীন্তন অকিঞ্চনতা আমাকে এমন নিরাশ করেছে যে তার নিষ্ফল তবু নিয়মিত পর্যালোচনায় উৎসাহ সাত দিনেই অবসন্ন। আশা আছে, সরোজ আচার্য আমাকে ক্ষমা করতেন। এমন লেখক নিশ্চয়ই আছেন যিনি আমার নিঃসীম নৈরাশ্যের অংশীদার নন। তাঁর টীকা পড়ব: তাঁকে ঈর্ষা করব না। ঘরে ঝামেলা আর জঞ্জালের অন্ত নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা একটু বদলে বলি, না: "বৈদেশিকী"-বিলাস আমাকে আর সাজে না। আগামী সপ্তাহে সমাপ্য না বর্তমান সপ্তাহে সমাপ্ত তা ভেবে দেখতে হবে॥

দেশ দর্পণ

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এর্ণাকুলামে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পার্টি কংগ্রেস বসবে। কম্যুনিস্ট পঞ্জিকার হিসেব অনুসারে এটা অষ্টম কংগ্রেস, যদি অবশ্য অবিভক্ত ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিকে ধরা হয়। কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হবার পর এটা দ্বিতীয় কংগ্রেস। প্রথম কংগ্রেস বসেছিল কলকাতায় পার্টি ভাগ হ'য়ে যাবার ঠিক পরেই। কলকাতায় পার্টি কংগ্রেস বসেছিল অন্ধ্রপ্রদেশে তেনালীতে পার্টি "রেবেল"-দের কনভেনশনের কিছু পরে। তেনালী কনভেনশনই ছিল বর্তমান মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম বে-সরকারী অধিবেশন।

তেনালী কনভেনশন ডাকা হয়েছিল প্রধানতঃ ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ডাঙ্গে নেতৃত্বকে অস্বীকার ক'রে নূতন পথে এ দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসু, রণজিত বসু, রণদিভে, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সুন্দরাইয়া, বাসবপুন্নিয়া ইত্যাদি। এঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল ভারতের ডাঙ্গে নেতৃত্ব সোভিয়েত মতাদর্শকে অনুসরণ ক'রে আন্দোলনকে শোধনবাদের দিকে পরিচালিত করছে। তাই প্রয়োজন হয় বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিয়ে নূতন ভাবে পার্টিকে সংগঠিত করা। নূতন ভাবে পার্টিকে সংগঠন করার মূল কথা ছিল নূতন কর্মপন্থা গ্রহণ ক'রে অর্থনৈতিক সংকটকে শ্রমিক-কৃষকের সম্মিলিত বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা।

তখন এই কথাটাই বলা হ'য়েছিল যে, ডাঙ্গে নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্ট পার্টি নয়; প্রকৃত কম্যুনিস্ট পার্টি যাদের আওতায় থাকবে তারা তেনালী কনভেনশনের অংশীদার। কনভেনশনের প্রধান কথা ছিল আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বকে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই কারণে তেনালী কনভেনশনের আলোচনা যেখানে হ'য়েছিল সেখানে মাও-সে-তুং-এর প্রতিকৃতি সামনে রাখা হ'য়েছিল। চীনের মাও আদর্শকে স্বীকৃতি দিয়েই কর্মসূচী রচনা হয়েছিল এবং এই কর্মসূচীই পরে কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী আলোচনার সময় একটা বিতর্ক উঠেছিল শ্লোগান নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছিল, যে-শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবকে সফল করতে হবে তার হাতিয়ার তৈরী হবে কোন পন্থায়? হাতিয়ার হিসাবে স্থির করা হয়েছিল 'পিপলস্ ফ্রন্ট' সংগঠন ক'রেই শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবকে সফল করতে হবে। এই 'পিপলস্ ফ্রন্ট'-এর অংশীদার যারা হবে, তাদের শ্রেণী বিন্যাসও নির্ধারিত করা হ'য়েছিল। এই শ্রেণী বিন্যাস স্থির করতে গিয়েই বিতর্ক উঠেছিল এবং তর্কটা তুলেছিলেন প্রধানত শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ। এই বিতর্কে কেন্দ্রস্থল ছিল ছোটখাট বা খুদে বুর্জোয়াদের পিপলস্ ফ্রন্টে সংগঠিত করা উচিত কিনা। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'য়েছিল কোনরকম বুর্জোয়া পন্থ রাখা চলবে না।

সেই শ্লোগানকে সামনে রেখেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি গত চার বছর পার্টিকে সংগঠিত করার চেষ্টা ক'রেছে। কলকাতা কংগ্রেসের কর্মসূচী যে-রাজনৈতিক অবস্থায় গৃহীত হ'য়েছিল সে অবস্থায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক আন্দোলনে সোভিয়েত নেতৃত্বকে অস্বীকার করা হ'য়েছিল বলেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি। এই অভিনন্দনের জের টানা হয়েছিল বেশ কয়েক বছর—১৯৬৭ সালের চতুর্থ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত। তখনও পর্যন্ত পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরাইয়া সম্প্রতি কলকাতায় বলেছেন, ১৯৬৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলেছিল। তারপর থেকে আলাপ-আলোচনা চালাবার মত আর কোন সুযোগ ঘটেনি; কারণ চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির কাছ থেকে আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচনের পর পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের অংশীদার হবার পর থেকেই চীনের দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়। স্পষ্টভাবে চীন থেকে নির্দেশ এসেছিল নেতৃত্বের বিরোধিতা করার, বর্তমান নেতৃত্বকে অপসারিত করার। কারণ পিকিং রেডিওর মন্তব্য অনুসারে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব নয়া সংশোধনবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সংশোধনবাদ বা নয়া-সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে চীনের এই লড়াইটা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সামনে রাখা হ'য়েছে। প্রত্যক্ষভাবে এই লড়াইটা আন্তর্জাতিক আন্দোলনে সোভিয়েত নেতৃত্বকে কম্যুনিস্ট ক্যাম্প থেকে বহিষ্কার করার প্রচেষ্টা। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির মতে সোভিয়েত নেতৃত্ব বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে মদত জোগাতে অসমর্থ; কারণ যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হবার সুযোগ খুঁজছিল তা নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। সোভিয়েত নেতৃত্ব, চীনের মতে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রকে দু ভাগে পাশাপাশি রাখবার চেষ্টা করছে। ফলে, সোভিয়েত নেতৃত্বে সোশ্যালিস্ট ক্যাম্প পরিষ্কারভাবে মার্ক্সবাদকে সংশোধন ক'রে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার কাজে ব্যবহার করছে। চীনের রাগটা এই কারণেই।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মতেও সোভিয়েত নেতৃত্ব সংশোধনবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পার্টির চার বছরের ইতিহাসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে

গেল। প্রথম ঘটনা চতুর্থ নির্বাচন। ১৯৬২ সালের নির্বাচন পর্যন্ত অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে নির্বাচনে কিছু সংখ্যক আসন দখল ক'রে কংগ্রেস শাসনের বিরোধী ভূমিকাকে জোরদার করাই ছিল প্রধান ও মুখ্য রাজনৈতিক কর্তব্য। সে-নির্বাচনে শাসনব্যবস্থা দায়িত্ব গ্রহণের কোন প্রশ্ন জড়িত ছিল না। তাছাড়া ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রতি নির্বাচনে কম্যুনিস্ট প্রার্থীদের সাফল্য নূতন রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছে। এনে দিয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা। ফলে, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে যখন কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা থেকে অপসারিত হ'ল, তখন দুটো কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে পার্টির নেতৃত্ব সংসদীয় গণতন্ত্রের দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। এই প্রস্তুতির অবস্থাকে সামনে রেখেই রচিত হ'য়েছিল দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মাদুরাই দলিলের আবির্ভাব। এই দলিলের একটা অংশ যুক্ত ফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে। সে-ক্ষেত্রে বলা হ'য়েছে যে, জনসাধারণকে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে কংগ্রেসের চক্রান্তকে বানচাল ক'রে দিতে হবে এবং যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই দলিলের পর থেকেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয় প্রত্যক্ষভাবে।

এই দলিল প্রকাশিত হবার পর থেকেই চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। শ্রীসুন্দরাইয়া জানিয়েছেন, বর্তমানে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মাত্র চারটি দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির যোগাযোগ আছে। এই চারটি দেশ হ'ল— জাপান, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম এবং রুমানিয়া। যোগাযোগের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির স্বীকৃতি চারটি দেশের পার্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, বাকী ৮৬টি পার্টির কাছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কোন স্বীকৃতি নেই। মোটামুটিভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি একঘরে হ'য়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিক বিচারে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে এটা চরম সংকটের সামিল। একদিকে অন্ধ্র এবং অন্যান্য প্রদেশে পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে, যার ফলে, শ্রীসুন্দরাইয়ার মতে প্রায় হাজার দশেক সভ্য পার্টি ছেড়ে চলে গিয়েছে বা বহিষ্কৃত হ'য়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একঘরে হওয়ার বাস্তবকে মেনে নিতে হ'য়েছে। এই দুটো অবস্থাকে সামনে রেখেই এর্ণাকুলামে আগামী পার্টি কংগ্রেসের জন্য খসড়া রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট এবং প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটিকে রচনা করতে হ'য়েছে। খসড়া রচনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি কলকাতায় মিলিত হ'য়েছিল। সে-আলোচনার পর খসড়াগুলো প্রকাশ করা হ'য়েছে।

খসড়া প্রস্তাবগুলো সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দুটো বক্তব্য সামনে রাখতে হয়। প্রথম বক্তব্য, পার্টির ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রতিহত করা; এবং দ্বিতীয় বক্তব্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা বা স্বীকৃতির পথ প্রশস্ত করা। প্রথম বক্তব্যই এর্ণাকুলামের পার্টি কংগ্রেসের প্রধান বিচার্য বিষয়। কারণ, বর্ধমান প্লেনামে যখন মাদুরাই দলিলের বিরোধিতা তীব্র আকারে দেখা দিল, তখন পার্টির কোন কোন নেতা বলেছিলেন এই অতি-বিপ্লবীরা যত তাড়াতাড়ি পার্টি ছেড়ে চলে যায়, ততই মঙ্গল। বর্ধমান প্লেনামের পর শ্রীসুন্দরাইয়া আশা করেছিলেন যে, পার্টির সমালোচকরা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং তাদের পথ শুধরে নেবে। তা অবশ্য হয়নি এবং অন্ধ্র প্রদেশে পার্টির মধ্যে বিরাট ফাটল বেরিয়ে এল। শ্রীসুন্দরাইয়া মনে করেন, যারা বেরিয়ে গিয়েছে তারা আবার ফিরে আসবেন এবং অনেকে ফিরেও এসেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, পার্টি কংগ্রেসের মূল আলোচ্য বিষয় থাকবে, কেন এই ভাঙ্গন দেখা দিল? তার উত্তর দিতে গিয়ে খসড়া প্রস্তাবে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে যে-প্রদেশে আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ ক'রেছিল সেই প্রদেশেই ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে সবচাইতে বেশী। কারণ হিসাবে দেখান হ'য়েছে যে, কৃষক আন্দোলন সমগ্রভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যাবার সুযোগ পায়নি বলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে, প্রকৃত আদর্শগত প্রশ্নগুলো সদস্যদের মন থেকে মুছে গিয়েছে। প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব ছিল বলেই আন্দোলনের চেতনা ব্যাপকতর করা সম্ভব হয়নি। তাই শ্লোগান দেওয়া হয়েছে সমগ্রভাবে 'ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্ট' সংগঠন করতে হবে; পার্টির সদস্যদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। উগ্রপন্থীদের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

নিঃশব্দে "পিপলস ফ্রন্ট"-কে 'ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্ট'-এর শ্লোগানে পরিবর্তন করা হয়েছে। শ্রীসুন্দরাইয়া বলেছেন, ডেমক্র্যাটিক (গণতান্ত্রিক) ফ্রন্ট সংগঠিত হলেই 'পিপলস' ফ্রন্ট হ'য়ে যাবে। হয়ত হবে, কিম্বা হয়ত অন্য কোন শ্লোগান উঠবে; কিন্তু আপাততঃ দেখা যাচ্ছে পাটনায় অনুষ্ঠিত ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে যে ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্টের শ্লোগান দেওয়া হ'য়েছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কব্জা করার জন্য, মার্ক্সিস্ট পার্টিও সেই শ্লোগানের অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী হবার সুযোগ খুঁজছে। কারণ, দুটো কম্যুনিস্ট পার্টির মতে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সেই প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান হবে 'ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্ট'। রাজনৈতিক বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, যে-সংসদীয় গণতন্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য 'কংগ্রেসকে আগামী নির্বাচনে খতম কর' শ্লোগান দেওয়া হ'য়েছে সেই দায়িত্ব গ্রহণে বুনিয়াদ হিসাবেই 'ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্ট'-এর শ্লোগানকে সামনে রাখা হয়েছে। ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্টের অপর নাম নিঃসন্দেহে যুক্ত ফ্রন্ট।

দ্বিতীয় বক্তব্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একঘরে হবার দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাবার উপায় হিসাবে রাখা হ'য়েছে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে আজ তাই "স্বাধীন" পার্টি হিসাবে পরিচালনা করার কথা উঠেছে। সেটা উঠেছে বলেই, চীনের সমালোচনা করা হ'য়েছে কয়েকটি মূলগত প্রশ্নে। এক, সোভিয়েত পার্টি এখনও সোশ্যালিস্ট ক্যাম্পের অংশীদার, যদিও পার্টি নেতৃত্ব সংশোধনবাদের ঝোঁকে নিমজ্জিত। দুই, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার ভিয়েৎনাম যুদ্ধে সোভিয়েতের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী না হয়ে চীন মহা ভুল করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলেছে তাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। তিন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত হস্তক্ষেপকে নিন্দা ক'রে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিবিপ্লবের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছে।

তিনটি কথাই যদি চীনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তাহ'লে এই প্রশ্নটাই সামনে দেখা দেবে যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি তার মূল বিরোধের মত ও পথ পরিবর্তন করবে কিনা। এই মূল বিরোধ বর্তমান ক্ষেত্রে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে। কিন্তু সে বিরোধের কথা অনেক চাপা পড়ে গিয়েছে আগামী পার্টি কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাবে। এমন কি, শ্রীসুন্দরাইয়া ক্ষোভ জানিয়েছিলেন যে, বিহার, উত্তর প্রদেশে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্ট করছে না। তাহ'লে কি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে নূতন কোন সমঝোতা সম্ভব?

যদি এই খসড়া প্রস্তাবে সে-ইঙ্গিতই থেকে থাকে, তাহ'লে নিশ্চয়ই বলতে হবে এর্ণাকুলাম পার্টি কংগ্রেসের মূলে কথা থাকবে ঐক্য। সে ঐক্যের প্রশ্ন নিশ্চয় একঘরে হবার বাস্তবকে অস্বীকার করে উঠবে না।

ত্রিধারা

অমিয় চক্রবর্তী

দুই স্রোত মিশে মিশে যায়—

এক সেই অন্তহারা ধারাজল ধরণীর
জীবলোকে প্রাণে আসা বাঁচার প্রবাহে;
অস্তিত্বের সেই কালে সুদূর আগ্রহ
প্রত্যক্ষের রূপে রূপে অদৃশ্য আবার;
সূর্য হয়ে. রক্ত হয়ে চক্ষের মাধুরী বক্ষে জাগা
প্রেম হয়ে পূজা হয়ে তৃণ-বৃক্ষ গিরি-পুষ্প-মেঘে
প্রাত্যহিক রত্নমণি আবর্তিত কাঁপে
মঙ্গলিকা. চলা-ফেরা এই দিনে ঘেরা:
তারি মধ্যে খেয়া-ঘাট হাটে বসে সনাতন মেলা.
বাঁশি বাজে. সন্ধ্যা হয় মহামৃত্যু জাগে ধ্রুবতারা,
রোদনও নীরব হয়ে খোঁজে আরো অন্তিম সঙ্গম
নিত্য অশ্রু মন্দাকিনী. নিত্য সমুদ্রের—

অন্য স্রোত একাত্মিক : প্রাণে প্রেমে বাহুর বন্ধনে
হঠাৎ যমুনা গঙ্গা তৃপ্তি আর কান্নার ছায়ায়
আপ্লুত অগাধ বোধ একান্ত সান্নিধ্যে তবু জানা
সংসারে মিলন নেই চিরদিন উজান পবন
কখন মুহূর্তে আনে ভরা ডুবি অথচ সংশয়ে
একটুও অধ্রুব কেউ মানে না হৃদয়জোড়া ধন.
আরোই আকাঙ্ক্ষা-বিদ্ধ নির্ভরতা পরম জনের
মর্তের ক্ষুধায় জাগে অভিন্ন সংসারে;
সেই চিরন্তন অর্ঘ্য বওয়া—

যখন এ দুই স্রোত চেতনায় ধরি দৈবযোগে
বিশ্বের বেদনা আর তন্ময় বুকের বাসনায়
ঘিরে আসে চারিদিক দিগন্তে সমুদ্রে একই কালে
হারায় অবধি প্রাণ. আন্দোলিত মৃত্যুর ওপারে
তবু ক্ষণ-দেখা দেয় প্রেমতীর—

আরো অন্য ধারা দ্রুত স্রোতে
এ কী অন্ধকার রোল তোলে দেশে দেশে—
বিমূঢ় যান্ত্রিক-বীর দলে দলে জ্বালায় প্রলাপ.
লক্ষ গৃহহীন ছোটে. শিকারী পুরুষ বায়ু হতে
হানে আরো অগ্নি-বিষ, মাটি গাছ পশু পাখি জীব
ধ্বংসের বারুদে ঘেরে রণ-জাহাজের মৃত্যু-শেল:
শ্মশান-বিলাসী রাষ্ট্র ছড়ায় পৃথিবীজোড়া জালে
কৌশলী ঐশ্বর্য তন্ত্র—অন্য পক্ষ যোদ্ধা রাষ্ট্রদল
সমকক্ষ হতে চায় আত্মঘাতী এদের বিক্রমে
অপৌরুষ সংঘর্ষ মত্ততায় :
আর্ত নরনারী দেখে নেমে আসে ইতিহাস
পূর্ণতম তীব্রতম গ্রাসে-

সেই ত্রয়ী ক্ষণে শেষ যাবার মুহূর্তে অভিযোগ
হে বন্ধু বিধাতা,
রক্ষা করো এ সংসার তীব্র অনিশ্চয় স্রোতোমুখে
তোমার প্রসন্ন তটে, চেনার অঙ্কুরে ধরণীর
যে-তরু জাগালে ঊর্ধ্বে যুগ্ম অর্চনার প্রেমালোকে
তারি শ্যামাশ্রয়ে;

পারি যেন জীবনের উত্তমাকে
অভিমানে দিয়ে যেতে তোমারি আশ্বাস প্রাণে-দেয়া—
দু'জনার একটি ফুল অচেনা প্রলয় সন্ধ্যাকূলে॥

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৮

সাহিত্য ক্ষেত্রে যশ বিক্রয়

'যশং দেহি'

"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশং দেহি'—সর্বজনীন পুজোর মণ্ডপ থেকে পুরোহিতের প্রার্থনা অ্যামপ্লিফায়ারে নিনাদিত হচ্ছিল।

প্রার্থনা কেবল পুরোহিতেরই নয়—প্রতিটি চাঁদাদাতার, প্রত্যেক উদ্যোক্তার, প্রত্যেক শ্রোতা-শ্রোত্রীরও নিশ্চয়ই। আধখানা চণ্ডী জুড়েই তো শুধু 'দেহি দেহি' রব। আর—ধর্মপ্রাণেরা চটবেন না—সংস্কৃত গল্পেটল্পে প্রায়ই দেখি চণ্ডী দেবীর কাছে মানুষ এমন সব বস্তু কামনা করে থাকে—যেগুলো নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে আদৌ

চলচ্চিত্রে পর্দার থেকে লাফ দেয় জানি,
যশ হয় নায়িকার

সমর্থনযোগ্য নয়—অন্য কোনো দেবতার কাছে যে-সব পাপ-বাসনা মনে আনাও অসম্ভব। প্রাচীনকালে এই দেবীটির ভূমিকা যে কী ছিল—

[illegible]
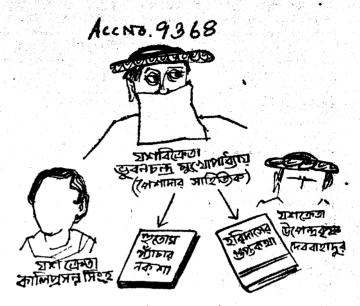
...বার কিছু নেই। কিন্তু মুশকিল হল, চাইলেই বা দিচ্ছে কে? রূপের জন্যে যতই চেঁচিয়ে মরি—গায়ের পাকা রঙটি একটুও ফ্যাকাশে হয় না—টাকে একটিও চুল গজায় না। টাকা আর যশের কথা না বলাই ভালো. জীবন-যুদ্ধে জয়লাভের মতো গুরুতর ব্যাপার দূরে থাক—কোনোমতে টিঁকে থাকতে পারলেই খুশি হই।

টাকা না থাকার দুঃখ তো সয়েই গেছে, কন্দর্পকান্তি না হলেও স্ত্রী তুষ্টা থাকলেই চলে যায়—কিন্তু যশ? না—না, খ্যাতি-কীর্তির কথা বলছি না, সে-সব সুদূর দ্রাক্ষার কথা ভেবে কী করব. মানে দশ জনে একটু ভালো-টালো বলে—এমন কি শ্যালিকার একটি কমপ্লিমেন্টে যদি জানা যায় যে 'সুনন্দদা বেশ রসিক লোক' (এখানে ব্র্যাকেটে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হল, কারণ স্ত্রীই আমার একতমা শ্যালিকা)—তা হলেই জীবনটাকে আর একটু রমণীয় বোধ হতে থাকে।

সুতরাং যশ—সে যত ছোট মাপেরই হোক—ওটির লোভ ছাড়া মুশকিল। কবে যেন একটি সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলুম—তার বাণীটা মনে নেই, তবে অর্থটা বোধ হয় এই রকম : "আমি আমার অর্থহরণকারীকে ক্ষমা করতে পারি, কান্তাপহারীও ক্ষমার অযোগ্য নয়; কিন্তু আমার যশ যে হরণ করে—তাকে ক্ষমা? উঁহু, নৈব নৈব চ।

কে যশ চায় না? অনেকা 'কালিদাসী' তার প্রভুর কাছে নালিশ জানিয়ে বলছে :
"নীলকণ্ঠ হয়েছি যে তোমার সেবার তরে,
নীল কালিমার তীর হসে কণ্ঠ আমার ভরে।
তারাই তোমার কীর্তিপথে রেখার পত্র রেখে,
আমার নামটা কোনো খাতায়
কোথাও রয়না লেখা।"

টীকা অনাবশ্যক, তবু এই চমৎকার কবিতাটি যদি কারো স্মরণে না থাকে, তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে এই 'কালিদাসী' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কলম; এবং এই কলমটি যদি কবি হত তা হলে তার মর্মবেদনা কিভাবে প্রকাশ পেতো রবীন্দ্রনাথের আর্দ্র হৃদয় সেটা অনুভব করেছে।

এই যে যশ—কলম, কালি, কাগজ পর্যন্ত যার জন্যে দাপাদাপি করতে থাকে, তার মোহ কে ত্যাগ করতে পারে মহামানব ছাড়া? শ্রীমৎ মহেশ যোগীরও পাবলিসিটি দরকার হয়—মাত্র সাইকিক ফোর্সেই তিনি ভক্তদের আকর্ষণ করতে পারেন না। বাঙালী বঙ্কিম-চন্দ্র অবশ্য 'সন্ধ্যা সংগীত'-এর কবির গলায় নিজের মালাটি পরিয়ে দিতে পারেন, কারণ পশ্চিমের চন্দ্র উদয়-সূর্যকে ঠিকই চিনে-ছিলেন; আর পারেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য—রঘুনাথ শিরোমণির প্রেস্টিজ বাঁচাতে (এটা সম্ভবত মনোহর গল্প, ইতিহাসের নজীরে মেনে নেওয়া শক্ত) নিজের বই ভাসিয়ে দিতে পারেন গঙ্গার জলে।

আর অবশ্য একটি ক্ষেত্রে বলা যায় : 'খ্যাতি মিথ্যা, বীর্য মিথ্যা, আজ বুঝিয়াছি।' সে প্রেম। তার জন্যে সব বিসর্জন দেওয়া চলে—এমনকি সম্রাটের সিংহাসন পর্যন্ত। কিন্তু অন্য সান্ত্বনা আছে সেখানে। 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট।'

কিন্তু তা যদি না হয়? যদি অকৃপণ ঔদার্যেই কেউ বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেন, 'আমার অপূর্ব সাহিত্যকীর্তি অথবা অতুলনীয় গবেষণা নিজের নামে প্রকাশ করে অসীম যশের অধিকারী হোন?' তখন শুধু চমকে উঠতেই হয় না, চোখ কচলে নিজেকে সাধু-ভাষায় প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে হয় : 'অহো—কিমিদং? আমি জাগ্রত আছি, না ঘোর নিদ্রাবশে ঈদৃশ স্বপ্ন-সন্দর্শন করিতেছি?'

এইজাতীয় একটি বিজ্ঞপ্তি কিছুকাল আগে পাঠ করে—এতদিন পর্যন্ত আমি হত-চকিত ছিলুম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বড়-বাজারে' যশের জন্যে যে মূল্য ধার্য করা ছিল—তা দেখে কমলাকান্ত চক্রবর্তী পর্যন্ত চম্পট দিয়েছিলেন—আমার তো আতঙ্কে শ্বাসরোধ হয়ে গিয়েছিল। সেই যশ এতই সহজলভ্য?

কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে—অবশ্যই। পুজোর বাজারে পকেটের অবস্থা অত সঙ্গীন না হলে—অসীম না হোক, কিঞ্চিত সসীম যশ—খণ্ডাংশ গ্রাম একশো গ্রামেও আপত্তি ছিল না—পাওয়ার জন্যে আমিও লাইন দিতুম। তারপরে উত্তরবঙ্গের বন্যা একেবারে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিমূঢ় আর বিধ্বস্ত করল। এখন ভাবছি, তখন যদি অন্তত পোয়াটাক (নাকি আড়াই শো' গ্রাম?) যশও মওকা বুঝে কিনে ফেলা যেত—তা হলে আজ একটু চড়া দরে, বিক্রি করে

হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে উদ্বোধকের খ্যাতি কেনেন ধনীরা

(ক্রেতা জুটত নিশ্চয়ই) ভাঙা ঘরের এক-আধটা পাঁচিলও তুলে ফেলতে পারতুম এই সময়।

নিশ্চিত জানি, বিজ্ঞাপিত উক্ত 'অক্ষয় যশ' এতদিনে কাড়াকাড়ি করে বিক্রি হয়ে গেছে—হয়তো এর মধ্যেই কেউ যশোমাল্য গলায় পরবার জন্যে রেডি হয়েছেন, হয়তো বা কোনো পাইকার সবটাই কিনে নিয়েছেন, হয়তো কোনো বাঘব বোয়াল পুরো কমোডিটিটাই লুকিয়ে ফেলেছেন কালো-বাজারে। মোদ্দা—এখন তার ছিটেফোঁটাও আমার নাগালের বাইরে। আপাতত কেবল ক্লান্ত পুরোহিতের চণ্ডীপাঠের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাতর স্বরে বলতে পারি : 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশং দেহি—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমি ভাবছি তাঁরই কথা—যিনি তাঁর অনন্য কীর্তি, অত্যাশ্চর্য গবেষণা—চিরযশের ভাণ্ডার এমন অবলীলায় বিলিয়ে দিতে পারলেন। টাকা? সে তো নশ্বর জিনিস—শুধু প্রথা মাফিক একটা প্রণামী মাত্র। এ হল অতি-মানবিক দান—আত্ম-ত্যাগের চূড়ান্ত, এ-কালেও যে মহামানবেরাও জন্ম নিতে পারেন, এ তারই এক মহোজ্জ্বল উদাহরণ।

[illegible] ঝরিনি আমরা—আমারি নিজে ঘর করি।' কারা? বাঙালীরা। 'বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন—' কিসে? 'বাঙালীর গৌরবে।' [illegible] দিন আগেও সত্যেন্দ্র দত্তের এই কবিতা পড়লে রোমাঞ্চ হত। কিন্তু এই বিজ্ঞাপন পড়বার পরে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি [illegible] বাঙালী ছাড়া কে আর এমন [illegible] হতে পারত?

কিন্তু আমি [illegible] নই। [illegible]

গল্পটা খুব চালু। কাদের এক বউ রাত্রিবেলা বাঘিনীর মূর্তি ধরে জঙ্গলে ঢুকত। ইচ্ছাসুখে বিচরণ করে ফিরে আসত, এসে ভালমানুষ বউটি হয়ে যেমন-কে-তেমন আবার বরের কোলের মধ্যে। সকালবেলা চোখ মুছতে মুছতে আর দশটা গৃহস্থ-বউয়ের মতোই ঘর থেকে বেরোয়। নিত্যিদিন এই চলছে। এবং চিরদিনই চলত, ঘুণাক্ষরে কারো টের পাবার কথা নয়। কিন্তু শিকারীর বন্দুকে গড়বড় করে দিল। পা জখম হয়ে বউ শেষরাত্রে ঘরে ফিরে এলো।

শাশুড়ী পর দিন জিজ্ঞাসা করলেন: খোঁড়াচ্ছ কেন বউমা?

বউ সজল চোখে বলল, রাত্রে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম মা।

দেখি, দেখি, আহা রে—

বন্দুকের গুলির ক্ষত ছেঁদো কৈফিয়তে চাপা পড়ল না, বাঘিনী-বউয়ের বৃত্তান্ত জনারণ্যে চাউর হয়ে গেল।

একালেও আছে, অনেক কুলবধূই গোপনে বাঘিনী হয়। (সুবুদ্ধি পাঠক সজাগ হয়ে ঘুমোবেন, পাশে যিনি ঘুমোচ্ছেন কড়া নজর রাখবেন তাঁর উপর। সকালে উঠে একবার না-হয় পরখ করেই নিচ্ছেন, ভদ্রমহিলা খুঁড়িয়ে হাঁটছেন কিনা।) একটি যেমন হালদার-বাড়ির বউ কাঞ্চন। এমনি ভিজে-বিড়ালটি, ভাজা-মাছখানা উল্টে খেতে জানে না। নিশিরাত্রে ভিন্ন মূর্তি। উনিই যে দিনমানের সেই বউটি, ভাবতে পারবেন না।

শঙ্খনদীর এপারে-ওপারে দুই গ্রাম—খড়কেডাঙা আর দত্তগাঁতি। খড়কেডাঙার হালদাররা ডাকসাইটে ঘর। এবং দত্তগাঁতির দত্তরাও বটে। হালদারদের মতিলালের সঙ্গে কাঞ্চনের বিয়ে হয়েছে। বরটি ঘোরতর দুর্দান্ত, তল্লাটের মানুষ জানে। লাঠি-শড়কিতে ওস্তাদ—উঁহু, বড্ড কম বলা হল, ওস্তাদের ওস্তাদ। দেড়া-বয়স দুনো বয়সের মানুষও গুরুমান্য দিয়ে মতির কাছে লাঠি-শড়কি শেখে। ভয় জানে না, ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। কথার পৃষ্ঠে কথা—কিন্তু কথার লড়াইয়ে মতি বেশিক্ষণ সুখ পায় না. প্রচণ্ড চাপড় প্রতিপক্ষের মুখে। ব্যস. লেগে গেল। স্ফূর্তির চোটে মতিলাল তখন তুড়িলাফ দিতে থাকে।

মা জয়মণি তো ভয়ে কাঁপেন। চোট গিয়ে পড়ে কর্তার উপরে: তোমারই জন্যে—

মহাদেব আকাশ থেকে পড়েন: আমি কি করলাম গো?

কিছুই করো না, ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে আছ। তাই এত আস্পর্ধা। এবারে গোবিন্দ দত্তকে ঠেঙাবে, বলে বেড়াচ্ছে।

ওপারে দত্তগাঁতির মধ্যে প্রধান পুরুষ গোবিন্দ। মহাদেব আঁতকে উঠলেন: আজই এসপার-ওসপার হবে। মতি!

শঙ্খনদীর জলতল থেকে নতুন চর বেরিয়েছে। ছোট্ট চর, তিরিশ বিঘের মতন। শঙ্খ হঠাৎ চর তুলে ধরলেন—কার জন্যে? মতিলাল বুকে থাবা মেরে বলে, আমার—আমার জন্যে। পাটক্ষেত, আউসক্ষেত বসত-বাড়ি সমস্ত এই নতুন-চরের লাগোয়া। ঘেরির বাঁধ হাত কয়েক বড় করে টেনে দিলেই হল। হবে তাই সামনের শীতকালে।

অপর দাবিদার গোবিন্দ দত্ত। তার যুক্তিটা হল, গাঙ মাত্রেই গঙ্গা।—সেইহেতু গাঙেদের টনটনে ধর্মজ্ঞান। দত্তদের শ-খানেক বিঘে মায় কালীমণ্ডপ বাগবাগিচা গয়রহ গত বর্ষায় শঙ্খনদী গ্রাস করে নিয়ে এবার থেকে ধীরেসুস্থে আবার উগরাতে লেগেছেন। আপাতত তিরিশ বিঘে—বাকি সত্তর বিঘেও কিস্তিতে কিস্তিতে ছাড়বেন ক্রমশ. মেরে দেবেন না। নতুন-চরের মালিকানা নিঃসন্দেহ অতএব গোবিন্দ দত্তর।

দাবি এবং পাল্টা দাবি নিয়ে গণ্ডগোল পেকে উঠছে। লাগে-লাগে এমনি অবস্থা: কী প্রণালীর মীমাংসা এবং অকুস্থল কোনখানে—হাকিমের এজলাসে না সরেজমিনে নতুন-চরেরই উপর—এ নিয়েও কথাবার্তা উঠেছিল। হতে হতে চাপা পড়ে আছে বস্তু যৎসামান্য বলেই। মাত্র তিরিশটা বিঘের জন্য হাঙ্গামা [illegible] না। উভয় পক্ষই সম্ভবত অপেক্ষা করছে—গাঙের যা দেবার, সম্পূর্ণ দেওয়া হয়ে যাক, কোমর বেঁধে তখন ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে। তাড়াও নেই আপাতত—নতুন চরে শুধুমাত্র বালি আর বালি, চাষের অবস্থা আসতে চার-পাঁচটা বছর অন্তত। হেন অবস্থায় স্থূলবুদ্ধির মানুষ গোঁয়ারগোবিন্দ মতিটা তাতিয়ে দিচ্ছে, মান-অপমানের কথা উঠে যাচ্ছে। চাষবাস সারা হবার পূর্বেই ধুন্দুমার না লেগে যায়। হালদারদেরই তাতে অসুবিধা।

মহাক্রোধে মহাদেব হুঙ্কার ছাড়লেন: মতে!

চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছেন। রাগ দেখে মতিলাল গা-ঢাকা দিয়েছে। সাড়া মেলে না।

স্বামীর প্রতাপে জয়মণি অতিশয় প্রসন্ন। মহাদেব বললেন, সর্বনেশে রাগ আমার।

ঘুমিয়ে গেছে। জোয়ার এলো শংখনদীতে —ছলাৎ-ছলাৎ জলের তফরা কানে আসে। হাওয়া দিয়েছে, নতুন-চরের বালি উড়ছে ফুরফুর করে কামিনী ফুল ঝরার মতন। পিছনের ছোট্ট দরজা, তার পরেই আউস-ক্ষেত পাটক্ষেত চর। দৈত্যসম বরের কাছে ভীতু বৈষ্ণবকন্যা কী বিষম অপরাধ করে বসেছে—করেই আত্মরক্ষার দায়ে বীর হনুমান হয়ে লম্ফের পর লম্ফ দিচ্ছে। চৌকাঠ থেকে এক লম্ফে ভূমিতলে—আউস-ক্ষেতের আলের উপর। দ্বিতীয় লম্ফে পাট-বনের ভিতরে। কোমর-সমান পাট-চারা—আপনি, আমি পারব না—তার ভিতর দিয়ে এ'কে বেঁকে দিব্যি কেমন ছুটে পালায়। ছুটছে, কিম্বা উড়ছে—পাট-চারার ছোঁয়া লাগে না যেন গায়ে। ছুটতে ছুটতে ক্ষেত পার হয়ে—এর পরে আর ভাবা ছিল না—ফাঁকার মধ্যে নতুন-চরের উপর। সামনে গাঙ। এদিকে যায়, ওদিকে যায়—কাঞ্চন-বউ দিশা করতে পারে না।

আর মতিলাল তাড়া করে একেবারে পিছনে এসে পড়েছে। অবলা নারীর অসহায় দশা দেখে খল খল করে হাসে : থামলে কেন? জল তাতে কি—ভেসে পড়ো। ডাঙার পাল্লা হল, জলেই বা হবে না কেন?

নিশিরাত্রে সাঁতারে কাঞ্চনের মতি নেই। মুখখানা মলিন করে বলে, হার মানছি।

জোয়ারের জল কলকল করে বাড়ছে। বটের শিকড়ের সঙ্গে ডিঙি বাঁধা। এদেরই ডিঙি—জলের তোড়ে মাথা দোলাচ্ছে। কাছি খুলে দিলে উনিই বরঞ্চ ভেসে দেখতেন।

উহু-হু—করে হঠাৎ কাঞ্চন বসে পড়ল। পা চেপে ধরে কান্নার সুরে বলছে, শামুক ফুটল আমার পায়ে। শামুক গেঁথে রয়েছে. উহু-হু—

ঝুঁকে পড়ে মতিলাল দেখতে গেছে—কোথায় কি! বজ্জাত বউ পাকসাট মেরে উঠে পড়ল। দৌড়, দৌড়—মতিলাল হেন বীরকে বেকুব বানিয়ে, আস্পর্ধা বুঝুন, দৌড়ে তাকে পরাস্ত করে আগেভাগে ঘরে উঠে উনি দরজায় খিল আঁটবেন। একদিন যেমন হয়েছিল। আর মতিলাল বাইরে থেকে 'দুয়োর খোল' 'দুয়োর খোল' বলে পথের কুকুরের মতো কেঁউ-কেঁউ করবে।

রণে নেমে আজকে মতি অতি-সতর্ক—আদাড়-আঁস্তাকুড় দৃকপাত নেই। ছাচ-তলায় গিয়ে টুক করে দাওয়ায় উঠে বসেছে। আমতলা ঐখানটা, অন্ধকার। কাঞ্চন ঠাহর পায় নি—সে ভাবছে পিছনে মতি কোন মুলুকে পড়ে আছে। জয়ের উল্লাসে পৈঠা দিয়ে উঠছে, উঠছে, উঠছে—দু-খানা বাহু সাপের মতন অন্ধকারে বেড় দিয়ে ধরল। নাগপাশ যাকে বলে। এবং অট্টহাস্য : বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—

কাঞ্চন বলে, হার মানলাম।

এক দফা একটু আগেই তো মেনেছিলে। হার মানতেও তোমার জুড়ি নেই। কত দিন কত সহস্রবার মেনেছ। একটু পরে বে-কবুল : ওমা, কবে?

এবারে সত্যি। গা ছুঁয়ে বলছি তোমার। হার, হার, হার—তিন সত্যর করলাম দেখ। ঘরে চলো, শুই গে—

তবু সন্ধিস্থাপনা হয় না। ঘরে নয়, বাইরে চলল মতি ভুটিয়া-কম্বলের মতো বউকে কাঁধের উপর ফেলে। আঁকুপাঁকু করছে বউ ছাড় পাবার জন্যে, পারে কখনো! ভয় দেখাচ্ছে : চেঁচাব কিন্তু। মেয়েমানুষ ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছ, হই-হই করে লোক ছুটে আসবে।

কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে উল্টে মতিলালই চেঁচিয়ে উঠল। অলক্ষ্য জনমণ্ডলের উদ্দেশ করে বলে, ঘরের বউ ছুটে ছুটে বেড়ায়—এমন দেখিনি রে বাবা! ধরতে হিমসিম হয়ে যাই—

আর শশব্যস্তে কাঞ্চনই মুখে হাত চাপা দিয়ে আটকায় : চুপ চুপ—দুখানি পায়ে পড়ি তোমার।—চুপ করো।

মতিলাল কঠোর কণ্ঠে বলল, তুমিও একেবারে চুপ থাকবে—টুঁ শব্দটি নয়।

নিঃসাড় তখন কাঞ্চন-বউ। মানুষটা এই রকম—যখন-তখন শাসন করবে। এই জন্যেই তো দু-চোখ পেড়ে দেখতে পারি নে।

কম্বল হয়ে কাঁধের উপর পড়ে ছিল। ওস্তাদের ওস্তাদ মানুষটির হাত নিশপিশ করে উঠল—কম্বল থেকে বল। আস্ত মেয়েটাকে তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল আকাশে, লুফে ধরে আবার। ছুঁড়ছে আর ধরে নিচ্ছে। হাত ফসকে একবার পড়ে গেলেই তো চিত্তির—পড়ে না অবিশ্যি। যত ভয়ই হোক, মুখে রা করবার উপায় নেই, চুক্তিভঙ্গ হলে চেঁচাবে। অতএব দু-হাতে মুঠি করে ধরেছে মতিলালের বাবরি চুল, আর কাকুতিমিনতি করছে : ঘুম ধরেছে বড্ড, ফিরে চলো—

মতিলাল বলল, মেয়েমানুষে যা বলে আমি তার ঠিক উল্টোটা করি।

কাঞ্চন তৎক্ষণাৎ কথা পালটে নিল : ঘুম আসছে না, কোথায় নিয়ে যাবে চলো।

যাচ্ছি তো তাই—

হেঁটে যাচ্ছিল, জোর বাড়িয়ে দৌড়চ্ছে এবার মতি। গদগদ হয়ে বলে, বউয়ের কথা আমি বড্ড শুনি। নইলে আর ভালবাসা কিসের?

মন্ত্র পড়ে দিল একটা কাঞ্চনের কানে কানে। ছটফটানির মুহূর্তে অবসান। ঘুম-টুম উড়ে গেল, চোখের তারা কৌতুকে ঝিকমিক করছে। নামাল গিয়ে শংখনদীর কিনারে বটের শিকড়ের উপর।

কাঞ্চন ঘট হয়ে বসে পড়ল—শান্তশিষ্ট লক্ষ্মীঠাকরুনটি। মানুষটা এইরকম—মজাদার সব মতলব মাথায় ঘোরে। এই জন্যেই তো এত ভাল লাগে—একটা দিন ছেড়ে থাকলে মন কেমন করে।

গোয়ালের আড়ার উপর দাঁড়-বোঠে-লগি এবং মাছ-ধরা ছিপ চারো [illegible] থাকে। তাল দেখে দুটো বোঠে নিয়ে [illegible] ডিঙিতে উঠল। কাণ্ডারে মতিলাল [illegible] হয়ে বসেছে, বউ বোঠে বাইছে [illegible]। সেই বোঠে বাওয়া স্বচক্ষে যদি দেখতেন—বৈষ্ণববাড়ির নির্বোধ কন্যাটি এত সব পারে, [illegible] গতি করে [illegible] জয়মণি [illegible] পাবেন না। [illegible] জ্যোৎস্না, দু-পারে [illegible] [illegible]।

জোয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ডিঙি ছুটেছে।

বাপের বাড়ির গ্রাম—চেনা ঘাট। স্নান করেছে কত এখানে, সাঁতার কেটেছে। এই ঘাটেই এই তো সেদিন কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ির পানসিতে উঠে বসল।

ডিঙি বেঁধে মতিলালের আদেশ : কাঁধে ওঠো আমার—

মা-বাপের গ্রাম, জোরের জায়গা—বরকে এখন কেয়ার করে নাকি? সতেজে কাঞ্চন ঘাড় নাড়ল : না, হেঁটে যাবো।

বুঝেসুঝে মতিলালও এখন খুব নরম। বুঝিয়ে বলে, তোমাদের মেয়েমানুষের হাঁটনা —পৌঁছুতেই রাত কাবার করবে। কথা শোন—কাঁধে উঠে মজা করে পা ঝুলিয়ে বস। ছুটে গিয়ে একনজর দেখেই ফিরে আসব—কাকপক্ষী টের পাবে না।

কাঞ্চন বলে, গায়ে পা লেগে যাবে, পাপ হবে যে আমার।

তারও জানোও বিধান আছে। মতিলাল বলল, বাড়ি ফিরে নতুন-চরের ধুলোবালি হাঁটুভর পায়ে মেখে দাঁড়াব—যত খুশি গায়ে মাথায় দিও। পাপ সব খণ্ডে যাবে।

ঘাট থেকে বাড়ি নিতান্ত কম দূর নয়—মতিলাল ছুটেতে ছুটেতে নিমেষের মধ্যে নিয়ে হাজির করল। ওস্তাদ বলে মানুষে এমনি-এমনি মান্য দেয় না।

এবারে কি হবে?

মাকে দেখতে ইচ্ছে করে—কাছে-পিঠে বাপের বাড়ি, একটিবার চোখের দেখা দেখে এলে কেমন হয়? ঝোঁকের মাথায় কাঞ্চন কবে একদিন কথাটা বলেছিল—মতিলাল ঠিক তাই মনে গেঁথে রেখেছে। অসংখ্য বজ্জাতি সত্ত্বেও এইজন্যেই তো ভালবাসি ওকে পাগল হয়ে।

বাড়ির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে ঘরে বাপ-মা, অনেক উঁচুতে তার জানলা। কাঁধে বসেও কাঞ্চন দেখতে পায় না। কি হবে তা হলে?

মতিলাল বলে, দুই কাঁধে দুই পা রেখে দেয়াল ধরে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়।

যাঃ—

মতিলাল বলে, মা-কালী দাঁড়িয়ে নেই শিবের উপর? ডজন দুই মুণ্ড গেঁথে গলায় ঝুলিয়েছেন, তারও ওজন কম-সে-কম আধ মণ। দাঁড়িয়েছেন বুকের মাঝখানটায় —দম বন্ধ হয়ে তো অক্কা পাবার কথা, মৃত্যুঞ্জয় শিব বলেই হচ্ছে না। অত বড় দেবী হয়ে পেরেছেন, আর একফোঁটা পুঁচকে ছুঁড়ি তুমি—বুকেও নয়, কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়াতে তোমার ভয়?

মতির কাঁধে দাঁড়িয়ে চুপিসারে কাঞ্চন মা আর বাবাকে দেখল। কচি শিশুর মতন দুজনে ঘুমে বিভোর। মা-ষষ্ঠীও নাকি ঘুমন্ত বাচ্চাদের দেখতে রাত্রিবেলা এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে বেড়ান। এদের তাই হল।

মতিলালকে ইতিমধ্যে আবার এক বজ্জাতিতে পেয়ে গেল : দেখি দেখি, তোমার ও-হাতের বালা কি হল?

হাত ঘুরিয়ে কাঞ্চন বালা দেখাচ্ছে—একটানে খুলে নিয়ে মতিলাল জানলা দিয়ে ভিতরে ছুঁড়ে দিল। ডিঙি নিয়ে ছুটোছুটি করে এলাম—এমন একটা কীর্তিকর্মের নিশানা থাকবে না? ভূতও ঘাড় থেকে নামবার সময় ডাল ভেঙে চলে যায়।

কে, কে?

মা জেগে পড়েছেন। কর্তার গা ঝাঁকিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বলেন, ওঠো দিকি। চোর বুঝি ঢিল ছুঁড়ে মারল জানলা দিয়ে। গায়ে এসে পড়েছে। হাঁক দাও, মানুষজন উঠে পড়ুক—

চোর, চোর—হৈ-হৈ পড়ে গেছে। জোড়া-চোর ধরে না ফেলে। ছুটতে ছুটতে ডিঙিতে উঠে পড়ল। মারো বোঠে—জোরে মারো—আরও জোরে—

মা কিন্তু ঠিক ধরেছেন। শ্বশুরবাড়িরা ভুল করুক, ভালই সেটা—তাঁর বুঝতে একটুও আটকায় না। এবং জামাইয়ের গুণাগুণ তো সর্বজনার জানা। বাবা একদিন কুটুম্ববাড়ি এলেন। মেয়ের হাতে

বালা গঞ্জে দিয়ে চুপি চুপি ভর্ৎসনা করেন: বউ হয়ে এসেছিস—, এখনো? ছিঃ ছিঃ!

গোবিন্দ দত্ত ঘোর কালী-ভক্ত। টাকা-কড়ি ভূসম্পত্তি সমস্ত মায়ের করুণায়। শঙ্খনদী কালীমণ্ডপ ভেঙে দিয়েছিলেন—যেহেতু দত্তদের বসবাস পাকাবাড়িতে, মায়ের জন্য টিনের চালা। অপরাধ বুঝতে পেরে গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে পাকা-মন্দির বানালেন—প্রতি অমাবস্যায় পুজো।

এবারের পুজোয় যেন বেশি বেশি আয়োজন—ঢাকই ছ'টা, তদনুপাতে কাঁসি। গাঙের ধারে ঢাকীরা সারবন্দি হয়ে বাজাচ্ছে—ওপারের খড়কেডাঙা অবধি কানে তালা ধরানোর জোগাড়। মতলব ধরতে দেরি হল না। ঘড়েল গোবিন্দ দত্তও কম নয়—খবর রাখে, হালদাররা চাষবাসে বিরত। চাষ অন্তে জনতা জোগাড় করে ফেলবে, হঠানো অসম্ভব তখন।

খড়কেডাঙায় দূত চলে গেল: নতুন-চর বেওয়ারিশ ফেলে রাখা যাবে না। কোন পথে মীমাংসা, ঠিক করে ফেল। যা করতে হয় তড়িঘড়ি। আদালতে যদি মামলা করতে হয়—

গোবিন্দ দত্তর অর্থবল প্রচুর, ঝোঁকটা অতএব মামলার দিকেই। হালদাররা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে: মামলা লড়ে বেওয়ামানুষে, গায়ে-গতরে শক্তিসামর্থ্য যাদের নেই। ধিকিধিকি তুষের আগুন, দু-বছর পাঁচ বছর ধরে চলল—ও-জিনিসে মরদমানুষের পোষায় না। মরদে কাজিয়া করে—একবেলার মধ্যে যাব মীমাংসা। এককোপে পাঁঠা কাটার মতন।

মাতব্বরদের পরামর্শ নেওয়ার বিধি। সবাই মোটামুটি কাজিয়ার পক্ষে। দেওয়ানী মামলা—যার মোদ্দা কথাটা হল দেও আনি, এনে এনে দিয়ে যাও। ধানচাল আওলাত-পশার ঘটি-বাটি বেচে নিয়ে এসো। হার-জিত সম্পূর্ণ অদৃষ্টনির্ভর। বাদী হোন প্রতিবাদী হোন, উকিল বলে দেবেন জয় আপনার পক্ষেই নির্ঘাৎ। মিছা বলছেন না তিনি, আইন সেইরকম—মানে এরকম হয়, ও-রকমও হয়। চলুক মামলা ধীরে সুস্থে—আপনার কাজ, ডাইনে-বাঁয়ে দেদার পান খাইয়ে যাওয়া। সবাই দেবতা-গোঁসাই এবং ইতু-মাকাল-ঘণ্টাকর্ণের মতো হেলাফেলার দেবতাও নন। নতুন লোক হলে চমক লাগবে, আদালতের দেয়ালে বাচ্চা-কুমীর হাঁটে কেন? আজ্ঞে না, আসলে টিকটিকি—পানের সিটেটা আলটা বা গিলেছে, তারই ফলে এই বিবর্তন। টিকটিকি থেকে কুমীর। অবশেষে কোন একদিন রায় দেবার সত্যি সত্যি সময় এলো—হাকিমের মনমরজি তখন আইনের কোন ব্যাখ্যাটা ধরবে, খোদায় মালুম। কাজিয়ার ব্যাপারেও হুবহু এমনি—প্রচুর মানুষ এবং ঝকঝকে হাতিয়ার সত্ত্বেও হেরে ভূত হলেন কপালের ফেরে। তা হলেও এই সুবিধা, দু-বছর দশ বছর লাগছে না—একটি বেলার মধ্যেই কর্ম ফতে। কাজিয়া অন্তে সন্ধ্যাবেলা চরের উপর সদলবলে ফুর্তিফার্তি জমিয়েছি, আর নয়তো লাস হয়ে ভাসছি গাঙের জলে।

কাজিয়াই হোক তবে। লোকের মতিগতি বুঝে গোবিন্দ অগত্যা রাজি। অর্থবল আছে যখন, লোক জোটাতে কতক্ষণ! ভাল ভাল লোক আছে এখনো বাদা অঞ্চলে, সরকারী লাইসেন্সের পরোয়া করে না তারা। জঙ্গলে ঢুকে হরিণ শিকার করে, কাঠ কাটে, মধু ভাঙে। গাঙ-খাল ধুরে নৌকো মেরে বেড়ায়। আছে সেসব লোক এখনো—ডাঙা অঞ্চলের মতন ভদ্রলোক অথবা মেয়েলোক হয়ে যায়নি। টাকায় তাদের পাওয়া যাবে।

ইষ্টদেবী মা-কালী। এবং আঠাশে শ্রাবণ ঘোর অমাবস্যা। তারিখ অতএব আঠাশেই, দুপুরবেলা—সূর্য যখন ঠিক ঠিক মাথার উপরে চড়বেন।

কোন তরফে কী হচ্ছে সম্পূর্ণ গোপন। গোবিন্দ দত্তর পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি—পাঁচিলের দরজায় হুড়কো পড়ে গেছে কাজের আগের দিন থেকে। আজেবাজে মানুষের প্রবেশ মানা। ভিতরে খুব একটা ব্যস্ততার ভাব। কানাঘুসো শোনা

ধায়, অর্জুন সর্দার এসেছে দলপতি হয়ে—যার হুঙ্কারে বাঘে কাঁপতে কাঁপতে হরিণের সঙ্গে একঘাটে গিয়ে চুকচুক করে জল খায়।

কাজিয়া বাবদে খড়কেডাঙার বিশেষ সুবিধা। পাড়া ধরেই লেঠেল, শড়কিবাজ—তার উপরে মতিলালের হাতে-ধরে শেখানো বাছাই-করা পৃথক দল একটা রয়েছে। গোবিন্দ দত্তর দরজায় খিল, আর হালদাররা পাড়ার মোড়ে মোড়ে ছোঁড়াদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—মানুষ দূরস্থান, বাইরের কুকুর-বিড়ালও না ঢুকতে পারে। কাজের মুখে মানুষ খেপে খেপে বেরুবে—কিন্তু ভাণ্ডারে মোটমাট কত, কাজিয়া খতম হবার আগে পর্যন্ত হিসাব পাবে না। দত্তগাঁতির এ জিনিস নয়, হাজার চক্ষুর সামনে দিয়ে শঙ্খনদী পার হবে তাদের লোক। ফরমায়েসি লম্বা ধাঁচের নৌকো—বাইচের জন্য বিশেষভাবে তৈরি—দত্তগাঁতির ঘাটে সেই নৌকো বিস্তর এনে মজুত করেছে।

ঘটা করে কালীপুজো এপারে-ওপারে উভয় পক্ষে। আর গোবিন্দ দত্ত ভোরবেলা থেকে পড়েই তো আছে কালীমন্দিরে—'মা' 'মা' বলে নয়নজলে ভাসছে। নদীতে স্নান সেরে লেঠেলরা প্রসাদী সিঁদুর-ফোঁটা

নিল, স্নানে জবাফুল গঙ্গাজল। ভিতর-উঠানে ফ্যানসাভাত খেতে বসেছে সারবন্দি হয়ে। এর পরে লাঠিতে তেল মাখাবে, নতুন হাঁড়ি উপুড় করে শড়কির ফলা তার উপর ঘষে চকচকে করবে, বালিধারায় রামদা ঘষে ঘষে ধার তুলবে—

বিধি এই প্রকার। কিন্তু শুরুতেই গণ্ডগোল—পাতা ছেড়ে অর্জুন সর্দার তড়াক করে উঠে পড়ল : কোথা গেল গোবিন্দ দত্ত, তার মুণ্ডু আগে চাই। তার রক্তেই মায়ের পূজো। এত বড় আস্পর্ধা!

সর্দার-আলা উঠল তো সমস্ত লেঠেল উঠে পড়েছে। রামদা ঘোরাচ্ছে, আর 'গোবিন্দর মুণ্ডু চাই' বলে হাঁক পাড়ছে। গোবিন্দর বউ আর বোনেরা রান্নাঘরে ছিল, দুড়দাড় করে তারা ছাতের উপর। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ইটপাটকেল গাদা করা ছাতের উপর—বিপত্তিকালের অস্ত্র, দু-হাতে চালায় মেয়েরা। আজকেও হয়তো বা সেই অবস্থা ঘটে যায়।

কাজিয়ার সময় পুলিসে গা-ঢাকা দেয়, মাতব্বরদের বড় খাতির। হাঁকডাক শুনে কয়েকজনে ছুটে এলো : হল কি সর্দার, শত্রুর হাসাচ্ছ কেন? অন্যায় হয়ে থাকে, আগে কাজটা তুলে দাও—আলবত বিহিত হবে। গোবিন্দ দত্ত টাকার মানুষ বলে রেহাই পাবে না।

খানিক খোশামোদ খানিকটা বা নরমে-গরমে চালানোর পর অর্জুন সর্দার ঠাণ্ডা হল। এবং সাঙাতরাও। অপরাধ গুরুতর বটে। ফ্যানসাভাতের সঙ্গে গব্যঘৃত দিয়েছে, আর দিয়েছে কাঁচকলা-ভাতে। কলাতেই গণ্ডগোল—দাঙ্গা-কাজিয়ার ব্যাপারে কলা বড় অলক্ষুণে। অসম্মানের বস্তুও বটে। যাবার মুখে কলা খেয়ে যাচ্ছে, ফিরেও আসবে কলা খেয়ে—ভাবখানা যেন এই।

মেজাজ হারিয়ে তাই অর্জুন সর্দার মারমার কাট-কাট করেছে। শুনতে পেয়ে গোবিন্দ দত্ত ছুটে এসে পড়ল। গেঞ্জি খুলে বুক আলগা করে দমাদম কিল হানছে। বলে, মারো শড়কি মারো বল্লম, গলায় কোপ ঝেড়ে দাও—অপমানের পোড়া-প্রাণ আমি রাখব না।

তখন আবার গোবিন্দ দত্তকে টেনে সরিয়ে নিতে হয়। মাতব্বরা বলে, কাণ্ডখানা নির্বোধ মেয়েছেলেরা করে বসেছে, বারো-হাত কাপড়ে যারা কাছা দেয় না। দত্তমশায় শিখিয়ে দিয়েছেন নাকি যে ও'র উপর হাঁকডাক করলে? অন্যায় কাজ করেছ সর্দার। ভাতে-কলায় ছোঁয়াছুঁয়ি—ভাত ফেলে দিয়ে নতুন আবার রান্না করে দেবে।

সময় হয়ে গেল। বর্ষাকাল হলেও মায়ের করুণায় বৃষ্টিবাদলার নামগন্ধ নেই। পাঁচিলের দরজা খুলে 'কালী' 'কালী' জকার দিয়ে মাঠে চলেছে মরদ-জোয়ানেরা, হেঁটে নয় লাফিয়ে লাফিয়ে—এক এক লাফে পাঁচ-সাত হাত গিয়ে পড়ে। বাঁ-হাতে রামদা কিম্বা গেছো-দা, এবং বেতের ঢাল। ডান হাতে শড়কি বা বল্লম। আর আছে উড়ো—নিরামিষ অস্ত্র, লোহা-ইস্পাতের কণিকামাত্র নেই, সুপারিগাছ ফেড়ে একমুখ পরিপাটি রূপে সুচাল করা। সাংঘাতিক অস্ত্র।

খড়কেডাঙার কূলে ছুঁতে না ছুঁতে মরদেরা লাফিয়ে পড়ল, কাত হয়ে নৌকোর জল উঠে যায়। নতুন-চরে গিয়ে দাঁড়াল। কা কস্য পরিবেদনা, ও-দলের দেখা নেই। হাঁক পাড়ছে, কুৎসিত গালিগালাজ করছে : বেরোস না যে এখন—পাড়ার মধ্যে লেজ-গুটিয়ে আছিস? দত্তমশায়, শাড়ি-শাঁখা চেয়ে আনো মেয়েদের কাছ থেকে—পাড়ার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে আসি। মতি হালদার এবার থেকে শাঁখা-শাড়ি পরে বেড়াবে।

চেঁচাচ্ছে ফক্কোড় ছোঁড়াগুলো, অর্জুন সর্দার খেঁকিয়ে উঠল : চুপ! পাটবন নড়ছে। সর্দারের অভিজ্ঞ চোখ ভুল দেখে না—পাটগাছের ভিতর দিয়ে ঢাল সামনে ধরে গুটিসুটি হয়ে এগোচ্ছে মতি হালদারের দল। হাত তিন-চারের ভিতর এসে গেছে। আর অবাক কাণ্ড—মেয়েলোকও বেরিয়েছে।

হাতে তাদের বিচিত্র হাতিয়ার—বাঁশের চোঙা।

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল—একেবারে মুখোমুখি। 'কালী' 'কালী' রব তুলে শড়কি মারে এ-পক্ষ ও-পক্ষ। আর বাঁশের চোঙা ঐ যে দেখলেন—ভিতরে উনুনের ছাই অথবা চরের বালি। পুবের হাওয়া জোর আসছে গাঙের দিক থেকে, দত্তগাতির দল পশ্চিমে—ছাই-বালি চোখে-মুখে পড়ছে, ঠিকমতো তারা নজর ফেলতে পারে না। চোখে ছাই পড়ে অর্জুন সর্দার হেন ওস্তাদেরও তাক ফসকাচ্ছে বারম্বার। মতি হালদার বেড়ে কৌশল নিয়েছে।

গোবিন্দ দত্ত চেঁচিয়ে উঠল : চলে এসো ভাইসব, নৌকোয় ওঠোসে। নারী-শিশু সামনে ঠেলে দিয়েছে—কাপুরুষদের সঙ্গে আমরা কাজিয়া করিনে।

বিশাল জনতা দূর-দূরান্তর থেকে এসেছে—কাজিয়া বন্ধ হলে তারা ছাড়বে কেন? দত্তদের নৌকোগুলো হিড়হিড় করে ডাঙায় তুলে ফেলব, হালদারপাড়ায় আগুন দেব—কেমন সব ফেরত চলে যায় দেখি।

মাতব্বররা ছুটে এলো : না মতিলাল, এটা ঠিক হচ্ছে না। হোঁৎকাগোঁৎকা সরাও—নিয়মদস্তুর কাজিয়া চলুক।

তর্কাতর্কি, বচসা। কোন আইনে আছে, কাজিয়ায় মেয়েলোক বাদ? তাগত নেই, তাই আসে না। খড়কেডাঙার মেয়েলোক ভিন্ন ধাতের—তারা কেন বঞ্চিত হয়ে থাকবে?

মাতব্বররা বোঝাচ্ছে : আদালতের মতন লিখিত আইন না থাকুক, দেশাচারে মান্য। মেয়েলোক ঘরের মধ্যে কি পাড়ার মধ্যে ঝগড়াঝাটি চুলোচুলি ঘুসোঘুসি করুক, সম্পূর্ণ তাদের এক্তিয়ারেরও ভিতর। কিন্তু প্রকাশ্য কাজিয়ায় নামা ভূভারতে কেউ শোনেনি। জেদ কোরো না মতিলাল, হতে দাও জিনিসটা।

মুখ চুন করে মেয়েলোক ও বাচ্চা ক'টি পাড়ায় ঢুকল। বিরতি ছিল এতক্ষণ—দেখতে দেখতে জোর জমে উঠল। হলে কি হবে, পাকা পাকা খেলোয়াড় উভয় পক্ষেই—বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে চলল, জয় বা পরাজয়ের লক্ষণ নেই। শড়কি মারলেই ঢালে ঠেকায়। আস্তবেতের ঢাল, শড়কি ঢালে বিঁধে থাকে—ঢাল ভেদ করে গা অবধি পৌঁছয় না। আর শড়কিদারও অচল পুত্তলিকাবৎ—শড়কি ছেড়ে শূন্য হাতে কোন ভরসায় এগোবে? রামদার কাজ এইবারে—ঝেড়ে কোপ মারে ঢালের উপর, বেত কেটে শড়কি বেরিয়ে আসে। কিন্তু এমনিভাবে একটা বেলা কেন—একটা বছর ধরে শড়কি চালিয়েও তো মীমাংসা হবে না।

অতএব উড়ো। সকল হাতে চলে না, কিন্তু অর্জুন সর্দারের হাতে পাশুপাত অস্ত্র। মানুষ কোনখানটা আছে নজর বুলিয়ে নিন—ছুঁড়বেন কিন্তু আকাশে তাক করে। সোঁ-ও-ও—করে হাউই-এর মতন উঠে যাবে খানিক উঁচুতে, তারপরে তীক্ষ্ণ-মুখ ঘুরে গিয়ে প্রবলবেগে নিচে পড়বে। ঢালের বাপের সাধ্য নেই এ জিনিস ঠেকাবে। মাটিতে পড়ল তো বিঘতখানেক বসে গিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘাড়ে বা মাথায় পড়লেও অবিকল তাই। গোটা চার-পাঁচ উড়ো এদিক-সেদিক পড়ে একটা একেবারে মতিলালের মাথায়। ব্রহ্মতালু ভেদ করে গেঁথে গেল। টেনে তুলে ফেলতে ভলকে ভলকে রক্ত।

হালদারের দল লণ্ডভণ্ড—যে যেদিকে পারে ছুটছে। জয়মণি আর্তনাদ করে এসে পড়লেন। এই দাঙ্গা-কাজিয়ার মধ্যে কাঞ্চন নেই। ভক্ত বৈষ্ণবের বাড়ির মেয়ে, তায় বয়সে ছোট—বাড়ির মধ্যে ছোটবউ। গণ্ডগোলের মধ্যে সে কেমন যেতে যাবে, দেখেই বা কেন তাকে যেতে, জায়ের মেয়েটা কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল, উঠানে তুমুল কান্না। সচকিত হয়ে কান পাতল সে, ঘুমন্ত মেয়ে কোল থেকে নামিয়ে শুইয়ে দিল। দত্তগাতির জয়ধ্বনিতে আকাশ চৌচির। উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে অনতিস্ফুট কণ্ঠে কাঞ্চন বলছে, হেরে গেলাম?

ধরাধরি করে মতিলালকে উঠোনের আমতলায় এনেছে। মা আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছেন মৃতদেহের পাশে। হালদারপাড়ার পুরুষ-মেয়ে আসতে কারো বাকি নেই। হায়-হায় করে বুক চাপড়াচ্ছে পুরুষেরা, মেয়েরা কুক ছেড়ে কাঁদছে। কিছুই যেন কাঞ্চনের কানে যায় না, চোখ তাকাল না আমতলার দিকে। একটা দম-দেওয়া নিশ্চেতন মূর্তি থপথপ করে যেন চলেছে। ঠোঁট নড়ছে মৃদু মৃদু : হেরে গেলাম আমরা, হেরে গেলাম?

অলক্ষ্যে কে যেন বলল, মর্ হতচ্ছাড়ী! মতির এই দশা—বৌটি এখন হার-জিত কপচাচ্ছে!

কটূক্তি কাঞ্চনের কানে যায় না। কালী-পুজো হয়ে গেছে—বলির রক্ত-মাখানো মেলতুক বিগ্রহের পাশে। সেই মেলতুক তুলে ধরতে কী যেন ঘটে গেল মুহূর্তে—শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-শিহরণ। কাঞ্চন যেন আর এক মানুষ। 'জয় মা কালী'—তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে লজ্জাশরম ছিন্নবস্ত্রের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেমানুষ বউ ছুটে বেরুল। শোকে বুঝি পাগল হয়ে গেছে, মেলতুক বুঝি বা নিজের গলাতেই বসিয়ে দেয়!

ধরে ফেল বউকে, ঘরে নিয়ে যাও—

কোথায় কে? বিকালে আজ চুল-বাঁধা হয় নি—চুলের বিপুল বোঝা হাঁটু ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। নতুন-চরে বিজয়ী দল উল্লাসে মাতামাতি করছে, মেলতুক ঘুরিয়ে ছুটতে ছুটতে তাদের মাঝখানে চলে যায়।

উল্লাস স্তব্ধ। চরের উপর অগণ্য জ্বলন্ত মশাল পুঁতে পুঁতে দিয়েছে—আলো পড়ে জ্বলছে চরের বালু। মেলতুকের এপিঠ-ওপিঠের চোখ দুটো জীবন্ত হয়ে যেন পলক ফেলছে। জ্যোতির্ময়ী কাঞ্চনলতা, সামান্য মানবী, হালদারদের ছোটবউ নয়—কৃপাণ হাতে নিয়ে মহাদেবী রণরঙ্গে নেমে পড়েছেন।

কালীভক্ত গোবিন্দ হাতজোড় করে কাতর হয়ে মা-মা করছে। সর্দারগণ ও সৈন্যসামন্তরা কে কার ঘাড়ে পড়ে—হুড়মুড় করে নৌকোয় উঠে ওপারে মুখো ভেসে পড়ল। মহাদেব হালদার ছুটে এসে ধরলেন। বধূর হাত ধরে বলেন, ওরে মা, শান্ত হ—কাঁদ্ তুই একবার—

তারপরেই যেন কাঞ্চনের সম্বিত ফিরল, ভিন্ন-লোক থেকে ফিরে এলো নিজের ঘরবাড়িতে। আছড়ে পড়ল মতিলালের উপর, দু-চোখে আকুল জলধারা—শঙ্খ-নদীতে কতই বা জল আছে!

*

নতুন-চরের নাম বদল হয়ে কালীর চর হয়েছিল। চর এখন নেই। শঙ্খনদী যেমন তুলে ধরেছিল, তেমনি আবার গ্রাস করে নিল এক বর্ষায়। যেখানটা চর ছিল, বড় বড় নৌকোর অবাধ চলাচল সেখান দিয়ে। স্টিমারও বোধহয় যেতে পারে—কেউ অবশ্য চালিয়ে দেখেনি।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া স্মরণে

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কে জাগে এই মহীতলে — এই শারদোৎফুল্ল রজনী, সুন্দরী পৃথিবী আলোঝলমল রাতে কে জাগে— তাকে যে বর দেবেন দেবী, আলোকের ঝর্ণা-ধারায় যিনি নেমেছেন—লক্ষ্মী শ্রী কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মাক্ষী পদ্মসুন্দরী

নিশীথে বরদা লক্ষ্মী :
কোজাগর্তীতিভাষিণী
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি
অক্ষৈ ক্রীড়াং করোতি যঃ

এমনি এক কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নাস্নাত ব্রহ্মপুত্রের চরে একশো বছর আগে তখনকার এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী (এক্সট্রা অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার) দীননাথ বেজবরুয়ার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। উপরে আকাশের উদার আতিথ্য, নিম্নে কলস্বনা নদীর আকুল কুলকুলধ্বনি, সাগরপারে সে ছুটেছে নিজেকে সমর্পণ করবে বলে। মহাপ্রকৃতির এই পরিবেশেই কবি লক্ষ্মীনাথের জন্ম। পিতা নৌকা করে সপরিবারে ব্রহ্মপুত্র বেয়ে কর্মস্থলে চলেছিলেন, এমন সময় প্রসববেদনা হলো মাতার —ব্রহ্মপুত্রের চরে নৌকো হলো ভিড়োনো— আসামের তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হলো সেই বালুবেলায় লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাত্রে। যোগাযোগটা একটু চমকপ্রদ বটে।

এই কবির বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে যেমন আর পাঁচজন ছেলেমেয়ের কাটে, বিশেষ করে ভাইবোনে তাঁরা উনিশটি। পড়াশুনায় আগ্রহ থাকুক না থাকুক ১৮৮৬ সালে কুড়ি টাকার জলপানি পেয়ে লক্ষ্মীনাথ এলেন কলকাতায় পড়তে, প্রথমে রিপন কলেজে, তারপর সিটি কলেজে, পাশ করলেন এফ-এ, সেখান থেকে। যথা সময়ে বি-এ পাশ করে এম-এ ও 'ল' ক্লাসে ভর্তি হলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক, হল না পড়া, হল না ল' পাশ করা। আশ্চর্য, পুরোনো রেকর্ড খুঁজলে দেখা যাবে যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের বিদ্রোহী ছাত্র সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন লক্ষ্মীনাথ। তিনি সেকালে ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা রুজু করলেন যে, আইন পরীক্ষায় যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে তা সিলেবাসের বাইরে, অতএব যে সব ছাত্র বি-এল পরীক্ষার অকৃতকার্য হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। তাঁর মাতা ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি অনন্ত কন্দলীর বংশের সন্তান ও শেষ অহমরাজ পুরন্দর সিংহের ভিষকরাজ।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য যে, কলিকাতায় থাকাকালে

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন এবং ১৮৯১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি সাধারণত থাকতেন হাওড়ায়, কাঠের ব্যবসায় ছিল তাঁর, বাংলা জানতেন ভালো, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তবু তাঁর চিন্তা, আগ্রহ প্রকাশ সবই স্বদেশকে ঘিরে নিজের মাতৃভাষায়। 'অ মোর আপোনার দেশ' জাতীয় সঙ্গীত তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। ভাবতেও ভালো লাগে যে, তাঁর সাহিত্য সেবার সূচনা এই শহরের ৫৩ নং কলেজ স্ট্রীটের একটি মেসে, সেখানে আসতেন অসমীয়া সাহিত্যে সুপরিচিত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা। 'জোনাকী', মাসিকপত্রের শুরু ১৮৮৯ খৃঃ অঃ জানুয়ারীতে। 'লিতিকাই' (প্রহসন) নামে প্রহসন দিয়েই আরম্ভ তাঁর সাহিত্যের হাতেখড়ি। 'বাহি' বলে এক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন এই সময়ে ২ নং লালবাজার স্ট্রীট থেকে। অবশ্য এর পূর্বেও কবিতা বা প্রহসন লেখেন নি তা নয়, তবে তাঁর সাহিত্যিক প্রকাশের শুরু এই যুগেই। তারপর সারা জীবন ধরে কাঠের গোলার এই মানুষটি লিখে চলেছেন তাঁর সোনার স্বপনের দেশের কথা হাওড়ার কানাগলিতে বসে। তিনি একাধারে কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, রসসাহিত্যিক, স্বদেশ হিতপ্রাণ। তাহার উপর শঙ্করদেব-মাধবদেবের বৈষ্ণবী কৃষ্টিকে নূতনভাবে সাজিয়ে তিনি অসমীয়া-দের মনে এক ভাবগঙ্গার ভগীরথ হলেন। নামঘোষার

ভজ ভাই মাধবক স্মর ভাই মাধবক
গাব ভাই মাধবর গুণ কে

তিনি একেশ্বরবাদের মহিমায় পরিণত করলেন, নূতন করে বিশ্লেষণ করলেন শঙ্করদেবের মূলে প্রতিপাদ্য বিষয়কে। তাঁর ডিকেন্সের অনুকরণে (পিকউইক্ পেপার) 'কৃপাবর বরুয়ার ওভতনি' একটি রসরচনা —চলতি রায়াভরণে ইতি চুলি, গো কলতাত্রঃ গোফ : ইতি দুগ্ধবোধঃ—বোস্টন শহরে দাড়ীনিবারণী সভা স্থাপিত হচ্ছে—মেয়েদের প্রতিজ্ঞা যে 'তেওঁর স্বামীকা হয় নিদড়ীয়া করিব না হয় তেওঁকে পরিত্যাগ করিব'। তাঁর 'অসমীয়া জাতি ডাঙ্গর জাতি' আর একটি রসরচনা। কবি সখেদে বলিতেছেন—

'আমার নাই কি? উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয় সাগরের দল আছে, শিবসাগরের দল আছে, ব্রহ্মপুত্র আছে, দীখৌ আছে, অসমীয়া শেক্সপিয়ের আছে, অসমীয়া শেলী আছে, অসমীয়া পপ্ অব বম্ আছে, অসমীয়া মার্টিন লুথার আছে। অসমীয়ার কলকারখানা বা নাই?

কুঁহিয়ার পেরা কলর পরা এম্দুর মরা কললৈকে, বাড়ীয়কে ধারে অসমীয়ার কলর অন্ত নাই। বিলাতত টেমচ্ আমার দিখৌ, বিলাতত জাহাজ আমার খেলনাও... মোমাই তামুলী বরবরুয়া, নরকাসুর ভগদত্ত, নরনারায়ণ বজা...অনন্ত কন্দলী, মনিরাম দেবান, শঙ্কর দেব...আউর ক্যা মাংতা হেয়, অসমত পাকা ঘর নাই—সেইবারে পাহরে যে অসমত ভূঁইকপ আছে। আকো কয় অসমীয়ার টকা নাই...অসমীয়ার মানহ মৌন মূর্খ হোবা নাই যে টকা উপার্জন করি চিন্তাচর্চা বঢাই অনর্থর গটি সিঁচলিব কারণ অথমনর্থং ভাবয় নিত্যং"।

এই ধরণের ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত হলেও লক্ষ্মীনাথ আসলে উঁচুদরের লিরিক্ কবি। রবীন্দ্রনাথের 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা' আমরা পড়েছি। যেন তার পরের কথা কবি লক্ষ্মীনাথের মনে ছবি জেগে উঠছে—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, দূরে তার নূপুর ধ্বনি 'ঝিলি নূপুরের রুণ ধরি বাজে পার রুণু জুনু করি' 'জোনাকি পরুবা সাতসরি জ্বলিছে ডিঙ্গিত শারীশারী জিলিকিন ধরর চকুত'— ঝিল্লীঝঙ্কৃত জোনাকীমণ্ডিত সন্ধ্যার একটি

'অপূর্ব ছবি এঁকেছেন কবি। আকাশে ধ্রুবমণ্ডল সপ্তর্ষির উদয়, দেবালয়ে আরতি, হরিধ্বনিতে মন পবিত্র, মৃদঙ্গ গোমুখ করতাল মুখরিত অঙ্গন'।

আবার "মরমে মরমে মরম নিগড়
বান্ধনী বোলে মিছাই"
বা 'সুগোল সুঠাম সবাল বলিত বাহু
জঙ্ঘা উরু কর
বা কি কাম দীঘল মেঘ বরণীয়া
সাগরর ঢউ চুলি
প্রেম পগলার হৃদয় তরণী
বুরি পায় গই তীল
মৃণাল দুবাহু কি কাম সাধিব
মত্ত প্রণয়ীর ভোল
মিহি মউমাত বিয়াধর বাঁহী
বাঁখি করি মুঠ ভোল'

প্রভৃতি রসস্নিগ্ধতায় বৈষ্ণব কবিদেরই স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁর 'পাণ্ডনাথের ফল', 'সাধনা', 'চিন্তাহরণের সংসার চিত্র' 'বুঢ়ি আইর সাধু' 'পাচনি' 'কদমকলি' প্রভৃতি পুস্তকগুলি আজও অবিস্মরণীয়। 'পদমকুমারী' উপন্যাস হিসাবে সার্থক না হলেও তখনকার দিনের বাংলা উপন্যাসের ধারাতেই লিখিত।

তাঁর গোহাটির বর্ণনা শুনুন:

'প্রকৃতির কামাকানন গগনভেদী পর্বত-মালারে পরিবেষ্টিত পবিত্র সলিল ব্রহ্মপুত্র নদর পবিত্র জলেরে বিধৌত, অসংখ্য তীর্থস্থানের সমাকীর্ণ যার প্রাগজ্যোতির নাম ভুবনবিদিত, যার রজা ষোল হাজার কন্যার অধিপতি পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর আর মহাভারতের যুদ্ধর বিখ্যাত হস্তী রথারোহী মহাবীর বৃদ্ধ ভগদত্ত, যি গুবাহাটির নিলাচল পর্বতত মহামায়া ভগবতীর প্রধান পীঠস্থান কামাখ্যা বর্তমান, ...যি গুবাহাটির সন্ধ্যাচল পর্বতত ত্রিসন্ধ্যা-পরিপূত হৃদয় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম...যি গুবাহাটির বেলতলা নামেরে স্থান ষষ্ঠি-সহস্র শিষ্য পরিবেষ্টিত মহামুনি গাল্ববর অমৃত নিষ্যান্দনী বেদধ্বনিরে প্রতিধ্বনিত হৈছিল, পুজনীয় গোকর্ণ ঋষির সামবেদ গীতত যে গুবাহাটি হাজো নামক হয়গ্রীব-মাধবর পুণ্যভূমির কর্ণ আপ্লুতে......"

একটু চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে, এই ভাষা প্রায় বাংলা ও সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষার অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নিজস্ব আহোম ভাষা আজকের বর্তমান বা প্রাচীন অসমীয়া ভাষা নয়। কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে, যেমন বুরুঞ্জীর ভাষায়। কিন্তু 'অসমীয়া' বলতে প্রাচীন কামরূপীয় অর্ধমাগধীর অপভ্রংশকেই বোঝায়। কারণ এই শান্ জাতীয় অহমদের আসবার বহু পূর্বেই অন্তত সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আর্য সভ্যতা ও কৃষ্টি কামরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অনার্য ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতিকে যেমন প্রভাবান্বিত করেছিল তেমনই অনার্য আদিবাসী ও আগন্তুকদেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। আর্যরা আসার পূর্বে যে অস্ট্রিক নিগ্রোবটু, বোডো, তিব্বতীয় ভোটচীন প্রভৃতি। ঐতিহাসিকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, আসাম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কোনো সন্তোষ-জনক মীমাংসা হয়নি। গ্রিয়ারসন ব্রহ্মদেশীয় শান কথার সঙ্গেই আসামকে জড়িত করেছেন। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী শানকে মনখমের শিলালিপির শিনশ্যামের সঙ্গে যুক্ত করেন। থাই ভাষার চাম বলতে পরাজয় বোঝাতো। আচাম অপরাজেয় অর্থ করা যায়। স্যর এডওয়ার্ড গেটও peerless এই অর্থে গ্রহণ করেছেন। রবিনসনও আসামকে বলেছেন অসম বা Unequalled or Unrivalled। ডাঃ সুর্যকুমার ভুইঞার মত—আসামের কথা ভাষা প্রায় একশ কুড়িটি। অস্ট্রিক ভোটচীন দ্রাবিড় ও আর্যশাখার ভাষা। প্রত্যেকটিই জীবন্ত। অনার্য বিজেতারা ক্রমশই বিজিত-দের সংস্কৃতির প্রভাবে এসেছিল এবং তারই ফলে একটি মিশ্র সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যাকে আর্য রক্ষণ-শীলতা ও অনার্য অগোঁড়ামীর মিশ্রণ বলা যেতে পারে। আসামের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ বাণীকণ্ঠ কাকতি আসামের নামকরণকে phonetic vagary বলে অভিহিত করেছেন। মোট কথা অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার মতই মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ এবং বর্তমানে অসমীয়া সাহিত্য বলতে আমরা ঐ ভাষায় লিখিত সাহিত্যকেই বুঝি।

অসমীয়া সাহিত্যের এক সন্ধিক্ষণে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া নিজের বৈশিষ্ট্যে ও সহজ সরল সরলতায় ভারতবর্ষের এক সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূচনা করলেন এই ত্রিধারাকে আশ্রয় করে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার এই মহৎ কীর্তি আসামের বাইরে ভারতবর্ষের গৌরবের কথা, তাই তাঁর শতবার্ষিকী স্মরণে আমরা তাঁকে শুধু সুপ্রসিদ্ধ অসমীয়া কবি সাহিত্যিক বলেই গ্রহণ করব না, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের একজন রূপদর্শী চিন্তানায়ক বলেও গ্রহণ করব। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে 'অ মোর আপোনার দেশ' বদরিকা থেকে কুমারিকা, দ্বারকা থেকে কামাখ্যা। গীতি-যুগ, মন্ত্র ও ভক্তিতার যুগ, শঙ্করী যুগ পার হয়ে আমরা আজ বিস্তারের যুগে পড়েছি। বোহাগবিহু, কাতিবিহু, মাঘ-বিহুর গান আজ সারা ভারতবর্ষকে উজল করুক। বেজবরুয়ার কাব্যে তারই প্রথম প্রকাশ আমরা পেয়েছি। তাঁর কাব্যপ্রিয়ার দন্তরুচি কৌমুদীর মধ্যেই শুভ্র নিটোল মুক্তামালার খোঁজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ আসামের মধ্যেই তিনি ভারতলক্ষ্মীকে দর্শন করেছেন, কাব্যে দর্শনে চিন্তায় চেতনায়।

নরক থেকে রিলিফ

সমরেশ মজুমদার

দূর থেকে চোখে পড়েছিল গাছের ওপরে সাদা পতাকা দুলছে। তীব্র বেগে ট্রাকটা ছুটে চলেছিল আমাদের নিয়ে। গোটা পনের বস্তায় বোঝাই করা রুটি, দুই ডেকচি আটা খিচুড়ি আর কুড়ি থেকে চল্লিশের কোঠায় পা দেওয়া চা বাগানের পনের জনের উৎসাহী রিলিফ পার্টিকে নিয়ে ট্রাকটা ছুটেছিল। ময়নাগুড়িতে ঢোকার মুখে আমাদের গতিরুদ্ধ হলো। এরপর আর গাড়ি যাবে না। ট্রাক থেকে নামতেই সেই [illegible] নজরে পড়লো। সাদা পতাকাটা ক্রমশ বড় হয়ে দলা পাকিয়ে একটি সাদা রঙের বাছুরকে পরিণত হয়ে গেছে এতক্ষণে। চোখ থেকে পায়ে বিদ্যুৎ চোকা মেরে গেল যেন। বাছুরটি যেখানে গাছের ডালে দুলছে মাটি থেকে তার দূরত্ব পনের ফিট। জল উঠেছিল। এই পথ দিয়ে আশৈশব আমি গিয়েছি— পায়ের তলায় কুড়ি ফুট নীচে যে সরু নিরীহ নদীটি বইছে সে অত ওপরে উঠে তিস্তার সঙ্গে সখ্যতা পাতাবে কখনই, না কল্পনা ভাবিনি। এবং এখান থেকেই সেই [illegible] এল। বীভৎস বললে ভুল বলা হবে—বর্ণনাতিরিক্ত শরীরগোলানো পচা মাংসের গন্ধ রুমালেও আটকাচ্ছিল না। [illegible] নরক বর্ণনা পড়েছি আমি। পনের কুড়ি মাইল জোড়া এই গলিত মর্গ-এর পরিবেশন তার কাছে হার মেনেছে।

ময়নাগুড়ি বাজার থেকে যে রাস্তাটা দোমহনী রোড স্টেশন হয়ে জলপাইগুড়ি শহরের দিকে বাঁক নিয়েছে সেই রাস্তায় পা দিতেই চোখের ভিতরে ভূমিকম্প শুরু হলো। পাঁচদিন আগে সেই ভয়ঙ্কর জল উঠেছিল তিস্তা থেকে। রাস্তা ছুঁয়ে বাড়িগুলো ডিঙিয়ে গাছের পাতায় তার ছাপ রেখে গেছে চৌঠা অক্টোবরের নিশুতি রাতে। দু পাশে প্রাচীরগুলো নেই অয়েল-মিলের। রাস্তার পিচ কে যেন সযত্নে তুলে নিয়ে গেছে। অজস্র মানুষ, পরাজিত, নিঃস্ব, সর্বহারার মিছিল চলেছে সড়কে। এক কাপড়ে সব পালিয়ে আসছে শহর থেকে। হায় আমেরিকা, ভিয়েৎনামে তুমি কি এমন বেশী করেছ!

এই পথেই শুরু হলো মৃত গরুর মিছিল। সার দিয়ে শুয়ে আছে সব। যেন একটু আগেই ওরা এখানে ঘাস খেয়েছে, মুখ তুলে ছুটন্ত গাড়ি দেখেছে। আমরা রিলিফ পার্টির দল ওদের ডিঙিয়ে কখনো পাশে ফেলে ভাঙ্গা রাস্তার পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছি। বীভৎস গন্ধের প্রতিষেধক হিসেবে রুমাল বেঁধেছিলাম নাকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিশ্বাস নিতে রুমাল খুলতেই সেই গন্ধ। মানুষগুলো আসছে মাথা নীচু করে। হাঁটার শক্তি নেই। বোধ হয় জল পড়েনি পেটে এ কদিন। একজন প্রৌঢ়া এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। তাঁর পরনের দামী শাড়ির পাড়। চুল বিবর্ণ, সারামুখে মৃত্যুর স্তব্ধতা। 'কি আছে বাবা ?' আমরা অস্বস্তিতে পড়লাম। এ খাবার নিয়ে চলেছি দোমহনীতে। যাঁরা বেরুতে পারছে না ঘরের ছাদ থেকে। খবর এসেছে। আজকের মধ্যে ওদের খাবার দরকার। খাবার এভাবে পথে বিলোবার জন্যে নয়। ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে তবু বললাম, 'রুটি আছে, নেবেন ?' 'জল নেই ?' প্রৌঢ়ার ঠোঁট দুটো কাঁপলো একটু। 'না।' আমার কথা ফুরোবার আগেই যন্ত্রের মত মহিলা অবসন্ন পা টেনে টেনে এগোলেন

ময়নাগর্ড়ির দিকে। খাবারে তাঁর প্রয়োজন নেই। জল চাই শ্বধ্ব।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। এবার নামতে হলো ধান ক্ষেতে। সামনের পলে ভাঙা। নদীর নাম ধরলা। চোখেই পড়েনি কোনদিন। এখন সে ভরাট। বুক জোড়া মরা মানুষ আর গরু নিয়ে সে অহংকারী রাক্ষুসীর মত সুন্দর। মাঠের পর মাঠ জোড়া সবুজ ধানের চিহ্ন নেই কোথাও। থই থই ঘোলা জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলছে বাঁশ ঝাড়ে। এক হাঁটু কোথাও বা কোমর জল আর পলি ভেঙে ভাঙা ধানগাছ-গ্বলোকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে সেই গাছটার গা বেয়ে আমরা এগোলাম। যে গাছে মানুষটা তখনো এই পৃথিবীর আলো বাতাস মাখছে শরীরে। জোরালো হাওয়ায় যে দুলছে ঘড়ির কাঁটার মত। গলার দড়িটা মাংস কেটে হাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। ওকে ওখান থেকে নামাবার লোক নেই কেউ। ঘন বসতিপূর্ণ একটা পল্লী ছিল এটা। এখন মাইল তিনেকের মধ্যে মানুষ নেই। আমাদের মত রিলিফ পার্টি, যারা পুজোর চাঁদা বাঁচিয়ে ভিক্ষে করে টাকা তুলে খাবার নিয়ে চলেছি আর যারা শহর থেকে আতঙ্কে ছুটে আসছে তারা কেউ তাকাচ্ছে না ওর দিকে। খবর পেলাম একটু এগিয়ে। বন্যার জল আসার সময় লোকটা রঙ দেখে জলের স্বরূপ বুঝেছিল। তড়িতে কলাগাছ কেটে দড়ি বেঁধে ভেলা করে বাড়ির নয়জন মানুষকে বড় রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল এক এক করে। ও রাস্তায় কোনদিন জল ওঠেনি। সরল বিশ্বাসে ভেলা নিয়ে ফিরে গিয়েছিল ডুবন্ত বাড়ি থেকে যদি কিছু জিনিস আনা যায় এই আশায়। ফিরেও এসেছিল সে। তখন বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। যাদের বাঁচাবার জন্যে এত চেষ্টা তাদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। রাস্তার পাশে গাছে যারা কোনরকমে ঝুলেছিল তারা দেখেছে মানুষটা বুক চাপড়ে কেঁদেছিল। ঝড়ে সে কান্না চাপা পড়েছে। আর বিদ্যুতের ঝলকে ঝলকে তারা দেখেছে লোকটা ভেলার দড়ি খুলে গাছে উঠেছে। এ সংসারে বাঁচার মত কোন আলো লোকটা দেখতে পায়নি আর। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সে ভেলার দড়ি গলায় দিয়ে।

এবার আমাদের নামতে হবে। ময়না-গুড়ির সড়ক ছেড়ে ধান ক্ষেত দিয়ে দোমহনীর রাস্তায়। বাঁধের গা বেয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু কয়েক মাইল হেঁটে কাঁধের বস্তা আরো ভারী লাগছে এখন। অনভ্যাসে শরীর এখনই ক্লান্ত। পলি আর জল ভেঙে প্রলয় দেখতে দেখতে চলেছি। কে যেন বললো এখানে একদিন বাড়ি ছিল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ধানক্ষেতের পাশে। হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা সুন্দর ফর্সা হাত উঁকি মারছে ডুবন্ত চালার ফাঁক দিয়ে। ধরাধরি করে খড়ের চালাটা সরাতেই আমরা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বছর বাইশের নতুন বউ। সর্বাঙ্গে গহনা। সুন্দর শাড়িটিতে এখনো কুঁচি দেওয়া। শুয়ে আছে কাত হয়ে। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে মুকুটের মত। পায়ে আলতা। যেন ঘুমিয়ে আছে, স্বপন দেখছে স্বামীর কোন দুষ্টুমির। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, খোঁপাটা অবধি অটুট আছে, তাতে রুপোর ঝুমকো দুল। এখানে মানুষ নেই। ভীষণ একা এই মেয়েটিকে পেছনে ফেলে আমরা এগোলাম।

আরো একটু এগোতেই সেই ছোট ব্রীজটার নীচে চোখ পড়লো। ভাঙা ব্রীজের নীচে দোমহনীর এই পথে শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধ তাঁর ছেলেকে জড়িয়ে। পাশেই তিনটি কিশোরী পরস্পরকে জড়িয়ে যেন কানে কানে কিছু বলছে। আমাদের সাড়া পেয়ে ওরা কোনদিনই চমকে উঠবে না। মায়ের কোল ছেড়ে পাঁচমাসের শিশুটি কোনদিন হারাবে না। আমরা পনেরজন দ্রুত পা চালাতে চেষ্টা করছি। রেল কলোনী ধ্বংস। একদম শেষ প্রান্তে অনেক হাত মাড়িয়ে যেখানে দাঁড়ালাম সেখান থেকে চীৎকার শুনতে পেলাম। দূরে কান্না যেন হাত নাড়ছে, জান্তব চীৎকার কানে এল। দৌড়ে চলেছি আমরা। তারপর আর যাওয়া গেল না। এখানে অনেক জল। ধীরে একটা স্রোত বইছে বাড়িটাকে ঘিরে। একটা দেওয়াল ধ্বসে গেছে জলে। তিন দেওয়ালের ওপর যে চিলতে ছাদ তার ওপর আটক হয়ে আছেন জন পঁচিশেক স্ত্রীপুরুষ। আমাদের দেখে তাদের কি চীৎকার। পাঁচদিন পর তারা মানুষের মুখ দেখছে যারা তাদের বাঁচাবে। ওরা নামতে পারছে না ছাদ থেকে। আর আমাদের কোন উপায় নেই ওদের কাছে যাবার। সাঁতার অসম্ভব। এই মরা গরু মানুষ পচা জলে কারো পক্ষে ঝাঁপ

সম্ভব নয়। ফিট ত্রিশেক দূরে আমরা দাঁড়িয়ে এই অসহায় মানুষগুলোকে দেখলাম। ওরা সমানে চীৎকার করছে 'বাঁচান বাঁচান।' চকচকে চোখের শীর্ণ মানুষগুলো। ওপরে এইমাত্র একটা হেলিকোপটার উড়ে গেল। ওরা হাঁ হয়ে দেখলো সেটাকে। আমরা স্থির করলাম যাওয়া যখন ওদের কাছে যাবে না তখন এখান থেকে রুটির প্যাকেট ছোড়া যাক। সে দৃশ্য আমার স্মৃতিতে চিরকাল আঁকা হয়ে থাকবে। আমরা রুটি ছুঁড়ে দিচ্ছি। ত্রিশ ফুট পেরিয়ে সেগুলো দেওয়ালে লেগে জলে পড়ছে একটার পর একটা। জোরে ছুঁড়লাম। ছাদ ডিঙিয়ে ওপারের জলে পড়লো। মানুষগুলো রুটি লুফতে হাত বাড়াচ্ছে। নাগালের বাইরে যেতেই হতাশা। আমাদের লক্ষ্য স্থির নয় বলে গালাগাল চলছে সমানে। ক্রমশ আমরা ভয় পেলাম। যেভাবে লোকগুলো ফসকে যাওয়া রুটির জন্য পাগল হয়ে উঠেছে তাতে ছাদ ভেঙে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তেই। রুটির অপচয় আর করা চলে না। দলপতির নির্দেশে কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে রুটির বস্তা বেঁধে ওপরের স্রোত থেকে ঠেলে দিলাম জলে। ভাসতে ভাসতে এগোচ্ছে কাঠের গুঁড়ি। লোকগুলো নিস্তব্ধ হয়ে চকচকে চোখে দেখছে। আমাদের বুকে গুরুগুরু। যদি কাঠের গুঁড়িটা বেরিয়ে যায় পাশ দিয়ে। দম বন্ধ করা কয়েকটা মুহূর্ত। ঈশ্বর তার অস্তিত্বের প্রমাণ রেখে শেষ পর্যন্ত বাড়ির দেওয়ালে কাঠের গুঁড়ির নোঙর করলেন। আর সেই মুহূর্তেই যে চীৎকার তার সঙ্গে ডুবন্ত জাহাজের মানুষ যখন রেস্কু জাহাজ দেখে উল্লাসিত হয়ে ওঠে তার তুলনা করা যেতে পারে। একটি গ্রাম্য কিশোর দেওয়াল বেয়ে ঝুপ করে গুঁড়িটার ওপর নামলো।

দুপুর গড়িয়ে আসছে। ফিরতে হবে অনেক পথ। কিছুদূর হাঁটতেই জটলা দেখতে পেলাম। ক্ষুধার্ত মানুষের দল সর্বহারা হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে চীৎকার গালাগালি। কেন আমরা এতদিন আসিনি! বোঝালাম, আমরা সরকারী রিলিফ পার্টি নই। মুহূর্তেই আমাদের ভাণ্ডার শেষ।

এবার ফেরার পালা। সেই অবরুদ্ধ বাড়িটির পাশ দিয়ে ফেরার সময় দেখলাম কাঠের গুঁড়ির রুটি ওপরে উঠে গেছে। শুধু যে কিশোরটি নেমেছিল সে উঠতে পারেনি। কাঠের গুঁড়িতে বসে রুটি চিবোচ্ছে সে। চীৎকার এলো, 'দাদা আমাদের এখান থেকে নিয়ে যান, বাঁচান।' বাঁচান-বাঁচান-বাঁচান—সর্বত্র এই চীৎকার।

ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে ছুটে চলেছি জল কাদা ভেঙে। সন্ধ্যের আগে ময়নাগুড়ি ফিরতে হবে। এই নরক থেকে উদ্ধার পেতেই হবে। তীব্র পচা চামড়ার গন্ধে শরীরে পাক দিচ্ছে। রিলিফ পাওয়া দরকার।

আমার চোখ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই খড়ের চালাটার পাশে এসে যে দৃশ্য দেখলাম আমার সমস্ত শরীর যেন আর্তনাদ করে উঠল। সেই নতুন বৌটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আমাদের দেখে একটি শকুন সরে গিয়ে চালাটার ওপরে বসলো। মেয়েটির শরীরে একটিও গহনা নেই, সর্বাঙ্গে কোথাও কাপড় নেই। উলঙ্গ শরীরটা শকুনের ঠোঁটের আঘাতে বিক্ষত। কি ভয়ঙ্কর লাগছে শরীরটা। রোদ লেগে ফুলে উঠেছে শরীর। চোখ বন্ধ করে দাঁড়ালাম। চোরের মত পালিয়ে আসার সময় দেখলাম, মেয়েটির ঠোঁটের কোণে সম্রাজ্ঞীর হাসিটি তখনো লেগে আছে। আর পায়ে সুন্দর করে পরানো আলতা তখনো উজ্জ্বল। বন্যা তার জীবন নিয়েছে, মানুষ তাকে নিরাভরণ নিরাবরণ করেছে, শকুন তার শরীর থেকে মাংস নিচ্ছে ঠুকরে, কিন্তু তার হাসি আর আলতার দাগ কেউ মুছে দিতে পারেনি।

একটু এগোতেই দেখলাম একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। চমকে উঠলাম। বৃদ্ধের পরনে মেয়েটির শাড়ি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়েটিকে কে এরকম করলো জানো।' বৃদ্ধ অম্লান বদনে জবাব দিল, 'গয়না কে নিছে জানি না বাবু, শাড়িটা আমি পরছি, ন্যাংটা হইয়া থাকুম কেমন কইর্যা।' পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই উদ্বাস্তু বৃদ্ধকে আমরা কিছু বলতে পারিনি

বিকেল গড়িয়ে আসছে। আমরা প্রায় ছুটে চলেছি। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালানো দরকার। এই বীভৎস গন্ধ আর গলিত শবের রাজত্ব থেকে আমরা রিলিফ পার্টির দল প্রায় প্রাণ ভয়ে রিলিফের জন্যে ময়নাগুড়ির দিকে ছুটছি। চোখ বন্ধ করতে ভয় হয়, জানি, চোখ বন্ধ করলেই সেই নতুন বউ-এর ঠোঁটের কোণার হাসিটা আমাকে ব্যঙ্গ করবে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫

সুভদ্র সেন লেখার টেবিলে এসে বসেছিলেন। যথারীতি চেয়েছিলেন হলদে বাড়িটার দিকে। টেবিলের উপর খোলা ছিল সেই খাতাটা যার নাম 'মেঘ'। 'মেঘ'-এর প্রথম কয়েকটা পাতায় নানা ছাঁদের অক্ষরে 'মেঘ' 'মেঘ' 'মেঘ' লেখা ছিল খালি, কয়েকটা পাতা সাদাও ছিল। যখন মাথায় কিছু আসত না, তখন মাঝে মাঝে নানা অক্ষরে 'মেঘ' শব্দটাকেই লিখতেন তিনি। সেদিন কিন্তু তাও লিখছিলেন না। চেয়েছিলেন হলদে বাড়িটার দিকে। হ্যাঁ বাড়িটা সরে সরে গেছে। কাছে এসেছিল, সরে গেছে। শুধু তাই নয়, অভিমানও করেছে। লিখতে আরম্ভ করলেন—

"হলদে বাড়িটা অভিমানই করেছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। কাল রাত্রে মহুয়া আমার মাথায় অডিকোলন দিয়ে ঝুঁকে যখন বাতাস করছিল, যখন আমি চোখ খোলবার চেষ্টা করছিলাম, তখন আঙুল দিয়ে আমার চোখ বুজিয়ে দিয়ে যখন বলছিল—আবার তুমি দুষ্টুমি করছ দাদু—তখন তার চোখের ভিতর দিয়ে আমি আর একজনের ঈর্ষাতুর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিলাম — মিসেস পূর্ণেন্দুর। সে যেন বাঘিনীর মতো চেয়েছিল। মহুয়ার চোখের ভিতর দিয়েই সে দেখছিল আমাকে। আজ দেখছি বাড়িটা সরে গেছে। অভিমান—হ্যাঁ অভিমানই করেছে বাড়িটা। আর একটা অভিমানের ছবি মনে পড়ছে। অনেক দিন আগে আমি সিংঘিবাগানে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। চারতলা বাড়ি। সে বাড়ির ছাদের উপর সারি সারি জলের ট্যাংক বসানো থাকত। একটা ট্যাংকের তলাটা ছ্যাঁদা ছিল, জল পড়ত ঝর ঝর করে। মনে হত ছোট্ট একটা ঝরনা যেন। তার তলায় ছোট ছোট পাখিরা এসে স্নান করত রোজ মহানন্দে। ট্যাংকটা ভাবত এটা বুঝি তারই কৃতিত্ব। একটা খুশীর আভা ফুটে উঠত তার সর্বাঙ্গে। তারপর একদিন মিস্ত্রি এল—সারিয়ে দিলে ট্যাংকটা। ঝরনা লোপ পেয়ে গেল (নায়গ্রাও এমনি করে হয়তো একদিন লোপ পাবে!) চড়াইরা শালিকরা আর স্নান করতে আসে না। কিছুদিন পরে আর একটা ট্যাংকের তলায় ছ্যাঁদা হল। সেখানে আবার ঝরনা ঝরতে লাগল। সেখানেও আবার এল স্নানার্থী চড়াই-শালিকের দল। তখন ওই প্রথম ট্যাংকটার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঈর্ষা বিচ্ছুরিত হত। অভিমান ভরে সে চাইত ওই পাখিগুলোর দিকে। পাখিরা বুঝত না, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম। হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে আজ সেই ট্যাংকটার কথা মনে পড়ছে। মিসেস পূর্ণেন্দুর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত সেই হাতটার কথাও মনে পড়ছে। বলেছিল রহস্যও না কি ওখানে আছে। রহসকে ঘিরে যে রহস্য সেটাও আছে কি? সিম্বী-নগর থেকে একটা কাঠবেড়ালী বেরিয়ে অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছে কেন। রহস্যটার কথা ও জানে না কি! ওর চোখে একটা উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে, যেন রহস্যটা ওর কাছ থেকে আমি ছিনিয়ে কেড়ে নেব। টপ করে লুকিয়ে পড়ল আবার। কা কা করে দুটো কাক উড়ে গেল ঈশান কোণ লক্ষ্য করে। এ সবের অর্থ কি? এর অর্থ, রহস্য আছে—চিরকাল থাকবে। রহসটাকে ঘিরে যে রহস্য তা-ও থাকবে চিরকাল। তার রং বদলাবে খালি, চেহারাও বদলাবে। তার ফোটো তুলে কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা যাবে না তাকে কোনদিন। চুল পুড়ে গিয়েছিল সেটাও সত্য। কাল তার যে বেণী-রূপ দেখলাম তা-ও তো মিথ্যে নয়। রহস্য কাল তার মুখ দেখাতে চায়নি, যে ওজুহাত দেখাল আমি জানি সেটা ঠিক নয়। তার মুখ পুড়েছিল কিন্তু তার পোড়ামুখ আর নেই, আবার নূতন মুখ হয়েছে তার। কিন্তু সে মুখ দেখাতে চায় না। লাল রুমালটা দেখাল খালি। অভিমান। দুর্জয় অভিমান। মনে পড়ল বাল্যসঙ্গিনী টিপুকে। প্রায়ই তার সঙ্গে ঝগড়া হত। প্রায়ই সে থুতনির উপর বুড়ো আঙুল তিনবার ঘষে মাথা নেড়ে নেড়ে বলত তোর সঙ্গে আড়ি আড়ি, আড়ি। তারপর ঝাঁকড়া-চুল-ভরা মাথা নেড়ে ছুটে চলে যেত। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারত না দূরে। একটু পরেই আবার এসে আমার কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করত। আমি ছুটে গিয়ে তখন ধরে ফেলতুম তাকে। তার মুখের কাছে মুখ এনে বলতাম—বল তো ভাই ভাব। সে মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলত—ভাব। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতুম—তোর সঙ্গে ভাব। আর ভাব হয়ে যেত। আজকাল অত সহজে হয় না। আজকাল সব যেন কেমন—" লেখা থামিয়ে চুপ করে বসে রইলেন সুভদ্র সেন। এর পর কি লিখবেন, কি লিখলে তাঁর মনের ভাবটা ঠিক ফুটবে তা তিনি ভেবে পেলেন না। মনে হল বাস্তব-কল্পনা-ভাব-অভাব-প্রেম-অপ্রেম সমস্ত জট পাকিয়ে গেছে যেন। অনড় করে

দিয়েছে তাঁর মনকে। পরস্পরবিরোধী দুটো উপমা মনে জাগল। একবার মনে হল লোহার জ্যাকেট পরে একটা লোহার ঘরে বন্দী হয়ে আছেন তিনি। তারপর মনে হল, না, বিরাট একটা তাসের প্রাসাদের মাঝ-খানে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে তাঁকে। একটু নড়লেই সব হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। খানিকক্ষণ বসে রইলেন অন্যমনস্ক হয়ে। তারপর সাদা পাতায় 'মেঘ' কথাটাকে লিখতে লাগলেন। 'মে'-টাকে লিখলেন খুব বড় অক্ষরে। তার পেটের পুটুলিটার উপর দুটো চোখ আঁকলেন। অদ্ভুত দেখাতে লাগল। তারপর 'ঘ'টা লিখলেন খুব ছোট করে। মনে হতে লাগল 'ঘ' যেন 'ম'-য়ের কাঁধের উপর উঠে বসেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন লেখাটার দিকে। মুচকি হাসির আভা ফুটল ঠোঁটে. কবিতাও জাগল মনে।

'ঘ'-এর ভারে ক্লান্ত 'ম' আর্তনাদ ছাড়ে দ্বীপের সেই বৃদ্ধ যেন সিন্দাবাদ-ঘাড়ে ভাবছিলেন আরও খানিকটা লিখবেন, মনে হচ্ছিল কল্পনার আবীরে মেঘ যেন রাঙা হয়ে উঠছে কিন্তু হল না। শব্দের আবীর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, সুরের আবীর। মহুয়া ডাক দিল।

"দাদু আঙুরের পায়েস হয়ে গেছে। তুমি এসো—" আবীরে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলেন সুভদ্র সেন। অতীত থেকে হঠাৎ ভেসে এল একটা রঙের দিন। বহু পিচ-কিরির মুখ থেকে ছুটে এল রঙের ফোয়ারা, একটা শাড়ির চওড়া লাল পাড় আর একটা এলো-মেলো আবীর-রাঙা বেণীও চকিতে এল. আর মিলিয়ে গেল। তারপর উচ্চকণ্ঠের এক বলিষ্ঠ হাসি—'ধরেছি, ধরেছি—এই-বার?' ইন্দ্রের হাসি। 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে'—চীৎকার করছে অহল্যা। ইন্দ্র-অহল্যা? না, শেখর-রহস্য? না—না—না—না—মানব না একথা। মানব না, মানব না—মানব না। সুভদ্র সেনের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল। শেষ হয়ে গেল রঙের খেলা। সন্দেহের কালো জগদ্দল পাথরটা এর পর মূর্ত হল সামনে। দু হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলেন সেটাকে সুভদ্র সেন। না না, মানব না, কিছুতেই মানব না তোমাকে। সরে যাও—সরে—যাও। অজানা প্রেক্ষাগৃহে আবার হাততালি দিয়ে উঠল অসংখ্য লোক। কে যেন আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করছে আংকোর—আংকোর—আংকোর—। "আচ্ছা দাদু—কি কাণ্ড তোমার—মঙ্গলময় তোমার জন্যে বসে আছে যে—চল—চল—"

"ও মঙ্গলময় এসেছে বুঝি। তাই আঙুরের পায়েস! বুঝেছি—"

"মঙ্গলময় মোটেই পায়েস ভালো-বাসে না—"

"মঙ্গলময় কি ভালোবাসে কাকে ভালো-বাসে সব জানি। কতটুকু বাসে তা-ও অজানা নয়। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি—"

"কি ভাবছ—"

"গ্যাঁদা ফুলের মালা হয়তো বাঁশের ডগায় মানাতো। কিন্তু ভায়োলেট ফুলের গোছা কি মানাবে, লোকটা বড্ড বেশী লম্বা। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিসনি—"

"আমি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিনি। ওঠ তুমি।"

মহুয়ার কণ্ঠে ধমকের সুর ফুটে উঠল। সুভদ্র সেনের মনে হল ধমক নয় গমক।

"সত্যি বলছিস?"

কাঙালের মতো চাইলেন তার দিকে।

"কি করছ দাদু, ওঠ না—"

হাত ধরে টেনে তুলল তাঁকে মহুয়া।

সুভদ্র সেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন হলদে বাড়িটার দিকে। দেখতে পেলেন দোতলার জানলা ফাঁক করে কে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি সে দিকে চাইতেই জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার কে যেন তাঁর কানে কানে বলে গেল, "কথাটা কাউকে যেন বোলো না—"। দেওয়াল ঘেঁষে যে করবী গাছটা দাঁড়িয়েছিল, তাতে একটা সাড়া জাগল কি? করবী ফুলগুলো পরস্পরের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে কেন। হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল। একেবারে অন্য কথা।

"পায়েসে কোকোর ফ্লেভার দিয়েছিস তো!"

"দিয়েছি। মঙ্গলময় খেজুর গুড়ের ফ্লেভার পছন্দ করে। কিন্তু তোমাকে তো চিনি, কোকোই দিয়েছি—"

"আমাকে ভালবাসিস তাহলে?"

মহুয়া নাক-মুখ কুঁচকে চাইলে তার দিকে। তার নীচের পুরু কালো ঠোঁটটা দেখে একটা নূতন উপমা মনে হল সুভদ্র সেনের। টুসটুসে পাকা কালো জাম যেন।

ঠিক এই সময় একটা খঞ্জন পাখি এসে বসল সামনের দেওয়ালে। তার পুচ্ছ আন্দোলনের ছন্দে সুভদ্র সেনের ভবিষ্যৎ যেন কাঁপতে লাগল। খেতে বসে কিন্তু ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর। পায়েসে তো কোকোর ফ্লেভার নেই এতো খেজুরে গুড়ের পায়েস। মঙ্গলময় কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—বাঃ কোকোর ফ্লেভার তো চমৎকার হয়েছে। আগে কখনও খাইনি।' মহুয়া মুচকি মুচকি হাসতে গালল।

৬

আমরা সর্বদা কত কথা বলছি কত লোকে। কথার হরির লুঠ দিতে দিতে চলেছি যেন আমরা সারাজীবন। কোন কথা কাকে বললাম, কখন বললাম, কেন বললাম তা আমাদের মনে থাকে না। গাছ অজস্র বীজ ছড়িয়ে দেয়, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। কোন বীজ কোথায় অঙ্কুরিত হল তার সে খবর রাখে না। মঙ্গলময়ই একদিন মহুয়াকে ব্রাহ্মমুহূর্তের কথা বলেছিল। বলেছিল, 'পরম সত্য ভিড়ের মধ্যেও আছে নির্জনতার মধ্যেও আছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাকে চেনা যায় না, অনেক ছদ্মবেশী সত্য তাকে আড়াল করে থাকে। কিন্তু নির্জনতার মধ্যে ভিড়ের গোলমাল নেই। তুমি যদি নিজের ছদ্মবেশটা খুলতে পার তাহলেই পরম সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারবে।'

'পরম সত্য কি'—প্রশ্ন করেছিল মহুয়া।

'সেটা তো তুমিই জান, দেখলেই চিনতে পারবে'

'তাই না কি—'

স্বপ্ন নেমে এসেছিল মহুয়ার চোখে।

'কিন্তু নির্জনতা কোথায় পাব?'

"তার জন্যে শ্মশানে, অরণ্যে বা পাহাড়ে যেতে হবে না। তা তোমার শোবার ঘরেই পাবে ব্রাহ্মমুহূর্তে। রাত্র দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত নির্জনতা রোজ তোমার অপেক্ষায় বসে থাকে। সে সময় উঠতে পারলেই পাবে" কথাটা মঙ্গলময় শেষ করতে পারেনি। কারণ ঠিক সেই সময়ই ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল সে ক্লাসে। তারপর ভুলে গিয়েছিল সব। মহুয়ার তখন ক্লাস ছিল না, সে একা বসেছিল কমন রুমে। সাগর পারে অজানা দেশের খবর পেয়ে কলম্বাসের মনে যে রঙীন উত্তেজনা জেগেছিল, ভাস্কো-ডা-গামা যে উত্তেজনা নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন অজানা মহাসমুদ্রে সেই ধরনের উত্তেজনার 'ডায়নামো' হয়ে সেদিন বসেছিল মহুয়া। ঠিক সেই সময় সেদিন মোহিত সামন্ত এসেছিল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি। মহুয়ার ছাত্র। এসে কুণ্ঠিত মুখে বলেছিল —'মহুয়াদি, আজও একটা কবিতা লিখে এনেছি। একটু দেখে দেবেন? সময় হবে কি?"

"দাও—"

হাত বাড়িয়ে কবিতাটা নিয়েছিল মহুয়া। পড়বার আগেই সে জানত কি লেখা আছে ওতে। জানত ওর কবিতায় অনন্যতা নেই, ছন্দ নেই, কিন্তু যা আছে তা-ও তুচ্ছ করবার মতো নয়। আছে পূজা, আছে অর্ঘ্য। মোহিত সোম তার পূজারী। তার পূজায় কোনও ফাঁকি নেই। সেদিন কিন্তু সে যে কবিতাটা লিখে এনেছিল তার গোড়াটা পড়েই চমকে উঠেছিল মহুয়া।

নির্জন নিঃশব্দতা মোর মনে কহে কথা
অবাঙময়ী হল বাগদেবী,
নির্দল হল শতদল
অন্ধকার সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে দেখি
আলো-হংস করে ঝলমল

রোমাঞ্চিত হয়ে বসেছিল সে খানিকক্ষণ। হয়তো তার বাহ্যজ্ঞান—যে জ্ঞানের জোরে আমরা লৌকিকতা করি—লোপ পেয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। কারণ সে যখন বলল, 'চমৎকার হয়েছে' তখন মোহিত সেখানে ছিল না। অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছিল সে। চলে গিয়েছিল, কিন্তু নির্জনতার খবরটা রেখে গিয়েছিল। নির্জনতার মোহ দুর্নিবার আকর্ষণে সেই দিন থেকেই টেনেছিল তাকে। সেই দিন রাত্রেই ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুয়েছিল সে। সেই দিনই তার মনে পড়েছিল যে, পাশের বাড়ির শরীর-সর্বস্ব মিস্টার চ্যাটার্জি—যাঁর মনোযোগের গুলতি থেকে প্রায়ই দু' একটা গুলি আঘাত করে মহুয়াকে এসে—কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁর উপর মহুয়া রাগ করতে পারেনি—(অমন একটা বলিষ্ঠ সুপুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টির নীরব অথচ মুখর, প্রচ্ছন্ন অথচ স্পষ্ট, পাশব অথচ লোভনীয় নিবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনি মহুয়া, সত্যিই পারেনি এ জন্য নিজেকে সে ধিক্কার দিয়েছে, তবু পারেনি)—এই মিস্টার চ্যাটার্জিও তাকে নির্জনতার কথা বলেছিলেন একদিন। বলেছিলেন—'চলুন না মহুয়া দেবী একটু বেড়িয়ে আসা যাক। কি যে রোজ কলেজ থেকে ফিরে ঘুচ করে ঢুকে পড়েন—'। অবাক মহুয়া প্রশ্ন করেছিল—'কোথা যাবেন?' 'মাঠে যাই চলুন। নির্জনে আপনাকে দুটো কথা বলব।' মহুয়া যায়নি। না, মহুয়া বাইরে কোনরকম প্রশ্রয় দেয়নি তাঁকে। কিন্তু মন থেকেও মুছে ফেলতে পারেনি। অনিন্দ্যকান্তি পশুটা মাঝে মাঝে সত্যিই প্রলুব্ধ করে তাকে। হ্যাঁ, মনে পড়ল, মিস্টার চ্যাটার্জিও নির্জনতার কথা বলেছিলেন একদিন।

প্রথম যেদিন অ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে উঠেছিল, প্রথম যেদিন ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছিল মহুয়া, সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে আগে অ্যালার্মটি বন্ধ করে দিয়েছিল সে, মনে হয়েছিল ঘড়িটা খুনী, নির্জনতাকে খুন করছে সে। ঘড়ির শব্দ যখন থেমে গেল তখন নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর শুনতে পেল নির্জনতার ডাক। 'আমি বাইরে আছি, বাইরে এস, এস অন্ধকারের সুনিশ্চয়তার মধ্যে, এসো তারা-ভরা আকাশের তলায়।' প্রথম দিনই বেরিয়ে সে দেখতে পেয়েছিল ওই আঁকা-বাঁকা পথটা যেটা সাপের মতো এঁকে-বেঁকে চলে গেছে নদীর ঘাটের দিকে। সেই দিনই দেখতে পেয়েছিল দূরের মাঠে সেই ঝোপটা, আর তার পাশে একটু আলো। কিন্তু সেখানে সে আজও পৌঁছতে পারেনি। মনে হয় যেন জন্ম-জন্মান্তর হাঁটছে কিন্তু পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু শালিম? শালিমের জন্যে সে তো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ও যে একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল সে দিন!

নিজের চারদিকে কংক্রীটের দেওয়াল তুলেছে মহুয়া। কারাগারে বন্দী করেছে নিজেকে। মঙ্গলময়ের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। আমল দেয়নি মোহিত সোমকে। সেদিন মিস্টার চ্যাটার্জি ছোট্ট একটু শিস

দিয়েছিলেন, সেদিকে ফিরে তাকায়নি। এলার্ম দেয়নি ঘড়িতে। সুভদ্র সেন রসিকতা করেছিলেন—'তোর নাম মহুয়া না হয়ে মোয়া হলে বেশী মানাত। তুই মিষ্টি কিন্তু মোয়ার মতো শক্ত। দাঁত বসাতে পারছি না। মহুয়ার কোমলতা তোর নেই।' কোন জবাব দেয়নি সে। কংক্রিটের দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। এক-নায়কত্বের কঠিন আইন জারি করেছিল নিজের উপর। সেকালের যে বিবেক মরেও মরে না, সেই বিবেক হঠাৎ ডিকটেটার হয়ে উঠেছিল তার জীবনে। ঠিক করেছিল স্বপ্নকে আর সে প্রশ্রয় দেবে না। সেকালের আদর্শকে মেনে নিয়ে ভালোভাবে চলবে সে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল মহুয়া। ঘড়িতে এলার্ম দেয়নি, তবু ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল ঠিক কাটায় কাটায় দুটো। বাইরে থম থম করছে নীরব নির্জনতা। কি একটা নিশ্চল যেন সচল হবার চেষ্টা করছে।

"এসো, এসো, বাইরে এসো। তোমার জন্য কতদিন থেকে অপেক্ষা করছি। আমাকে এসে আবিষ্কার কর তুমি। তোমার আলো

এসে আমার অন্ধকারে-ঢাকা পদ্মকে প্রস্ফুটিত করুক। এসো, এসো, এসো—"

মহুয়া আর থাকতে পারল না। বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে দেখল শালিম দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার আকাশের নীচে গাঢ়তর অন্ধকারের স্তম্ভ যেন একটা।

মহুয়া যখন তার পাশে এসে দাঁড়াল তখনও স্তম্ভ স্তম্ভিত হয়েই রইল। কোন কথা বলল না। কিন্তু তারপর যা হল তা যেন সত্যি নয়। গল্প।

তিরি নদী বইছে। বিরাট নদী। কালো জলে অসংখ্য ঢেউ। ছোট ছোট ঢেউ। রোমাঞ্চিত হয়ে আছে তিরি, কেন কে জানে মনে হল অকারণেই। রোমাঞ্চিত হওয়াই যেন ওর স্বভাব। দুই তীরে শাল গাছের গভীর জঙ্গল। লেবাং বন। বনে একটা মর্মর ধ্বনি কাঁপছে। হঠাৎ বোঝা গেল তিরি নদী রোমাঞ্চিত কেন। প্রকাণ্ড একটা বাঘ সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছে। তার পিছনে ভেসে উঠেছে একটা কুমীর। বাঘ প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে, কিন্তু তিরি নদী প্রকাণ্ড তাড়াতাড়ি পার হওয়া যাবে না। কুমীর নিঃশব্দ সুনিশ্চিত গতিতে অনুসরণ করছে তার শিকারকে। সে জানে ধরবেই ওকে, যদি না—। কিন্তু সেই 'যদি না'—টাই হয়ে গেল। শাল গাছের ফাঁকে দেখা গেল ঝাঁকড়া-চুলো মেয়েটাকে সে বাঘ আর কুমীরের দিকে চেয়েই তরতর করে উঠে গেল একটা শাল গাছে। একটু পরেই একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার বিদীর্ণ করে দিল নিশ অন্ধকারকে। কুমীর আর বাঘ দুজনেই যেন তাদের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল এই চীৎকার শুনে। একটু পরেই শালবনের ভিতর থেকে বেরুল শিরস্ত্রাণধারী অসংখ্য বলিষ্ঠ পুরুষ। প্রত্যেকেরই হাতে তীর ধনুক। ধারা-বর্ষণের মতো অসংখ্য তীর বর্ষিত হতে লাগল বাঘ আর কুমীরের উপর। গর্জন করে উঠল বাঘটা। জলের তলায় আত্মগোপন করল কুমীর। তীরের ধারা-বর্ষণ সমানে চলতে লাগল তবু। আবার সেই গগন-ভেদী চীৎকার শোনা গেল, তারপর ঝপাং করে একটা শব্দ। তীরের ধারা-বর্ষণ থেমে গেল, জ্বলে উঠলো অসংখ্য মশাল। মশালের আলোয় দেখা গেল, মরা বাঘটা ভাসছে, আর সেটাকে ধরে ভাসছে সেই মেয়েটা। তার একটা হাত জলে ডোবানো। একটু পরেই সে তীরে উঠল। কয়েকটি পুরুষ এগিয়ে এসে টেনে তুলল বাঘটাকে। দেখা গেল মেয়েটির যে হাতটা জলে-ডোবানো ছিল সেই হাতে সে ধরে আছে কুমীরের ল্যাজটা। কুমীরটাকে ডাঙায় টেনে তুলল সে। তখনও মরেনি সেটা। বিরাট হাঁ করে তেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত মশাল তার মুখে পুরে দিলে একজন। আরও অনেক লোক বেরুল শাল-বনের ভিতর থেকে। তারা দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল কুমীরটাকে আর বাঘটাকে। তখন মেয়েটা হাসিমুখে হাত তুলে দেখাল। যে হাত দিয়ে সে কুমীরের ল্যাজটা ধরেছিল দেখা গেল সেটা রক্তাক্ত। অনেকগুলো মাথা ঝুঁকে এগিয়ে এল, প্রত্যেকের কপালে রক্ত মাখিয়ে দিতে লাগল মেয়েটা। তারপর উঠল একটা তুমুল জয়ধ্বনি। মিলিয়ে গেল তিরি নদী, মিলিয়ে গেল লেবাং বন। কেবল লেবাং বনের মর্মর ধ্বনিতে কাঁপতে লাগল নিবিড় অন্ধকার। ক্রমশ তাও থেমে গেল।

মহুয়ার মনে হল, স্বপ্ন দেখলাম না কি!' সামনের আকাশে জ্বল জ্বল করছিল শুকতারা। সেই অজানা ফুলের গন্ধটা—যা তার পিয়াল ফুলের গন্ধ বলে মনে হয়েছিল সেদিন—আবার ভেসে এল কোথা থেকে। বলে গেল, তুমি অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলে, তাই শালিম চলে গেছে। বলে গেছে আবার আসবে, বারবার আসবে।'

মহুয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঘন অন্ধকারের যে স্তম্ভটা তার পাশে মূর্ত হয়েছিল, সেটা আর নেই। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ সে দূরের মাঠটা দেখতে পেল আবার। দেখল সেখানে সেই ঝোপটাও রয়েছে। তার আড়ালে আলোও জ্বলছে একটা। কিসের ঝোপ? কিসের আলো? এ প্রশ্ন বারবার জেগেছে তার মনে। উত্তরও পেয়েছে—সেইটেই তো দেখতে হবে। আবার চলতে লাগল মহুয়া। চলতেই লাগল। ক্রমাগত চলতে লাগল। আশপাশে উড়তে লাগল জোনাকির দল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। শুকতারা নেই। একটা কালো মেঘে ঢাকা পড়েছিল সেটা। কিন্তু এ কথাটা জানতে চাইল না তার মন। তার মনে হল ওই জোনাকি-গুলোই শুকতারা। শতরূপে নেমে এসেছে তার কাছে। তাকে পথ দেখাচ্ছে। পথ—হ্যাঁ পথ—তারই স্বপ্ন-সত্তা যেন—বিস্তৃত হয়ে আছে পথরূপে—তার প্রান্তে একটা ঝোপ, ঝোপের পাশে একটু আলো—সেটাকে ঘিরে আছে অন্ধকার আর কুয়াশার অনিশ্চয়তা। ওখানে কি সে পৌঁছতে পারবে? কিন্তু পৌঁছতে হবেই যে।

মহুয়া দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগল।

"মহুয়াদি, আমার হাতটা একটু ধর। বড্ড ভয় করছে—" সেই বাচ্চা ছেলে বাবুলটা তার সঙ্গ নিয়েছে নাকি! ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মহুয়া—কেউ নেই। কিন্তু চলা বন্ধ হয়ে গেল তার। মনে হল রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড যে খাদটা আছে সেখানে পড়ে গেল না তো ছেলেটা! ফিরে এল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে খাদটার পাশে। অনেক দিন আগে ওই খাদটার ভিতর একটা ভাঙা লাল কাচের টুকরো দেখেছিল সে দিনের বেলায়। তাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভুত একটা লাল রঙের ফোয়ারা উঠেছিল আকাশের দিকে। এই অন্ধকারে সেই ফোয়ারাটা আবার দেখতে পেল মহুয়া। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল সে দিকে। কোন আগ্নেয়গিরির আগুন ওটা? কোন রক্তের ফোয়ারা? বাবুলের সঙ্গে কি ওর...তীক্ষ্ণ শব্দে চীৎকার করে উড়ে গেল একটা পেঁচা। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তন্দ্রা, সুর কেটে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অন্ধকারের মোহ। ভয় ভাবনা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভিড় করে এল নির্জনতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল সে এক পা-ও চলেনি। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক ঝাঁক জোনাকি কেবল তাকে ঘিরে উৎসবে মেতেছে। অন্ধকার তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে। সে স্বপ্নের লীলা-উল্লাসে সে এতক্ষণ দুলেছিল, যাকে গতি বলে ভুল করছিল তা বাইরে নেই। হঠাৎ তার শীত করতে লাগল। গরমের কাপড় পরে আসেনি। ফিরতে হল বাড়ির দিকে। সেই আঁকা-বাঁকা পথটি আবার দেখতে পেল, গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেছে। সাপের মতো। কিন্তু সাপ নয়। পথ। স্বপ্ন-সরণি নয়, সত্যিকার বাস্তব পথ, ওই পথ গঙ্গার ঘাটের দিকে গেছে। প্রত্যহ কত লোক ওই পথ দিয়ে আনা-গোনা করে। কেউ যায় স্নান করতে, কেউ যায় পার হতে। খেয়া-পারাপারের নৌকোও আছে ওখানে একটা। কিন্তু সাগরের সন্ধানে কেউ যায় কি ওখানে? মহুয়ার মনে হল গঙ্গাই তো সাগরে গিয়ে মিশেছে এ সম্বন্ধে কেউ কি সচেতন? হঠাৎ মনে হল তিরি নদীর খবর কি গঙ্গা জানে? লেবাং বনের? সেই গন্ধটা—যাকে তার পিয়াল ফুলের গন্ধ বলে মনে হয়েছিল—সেই গন্ধটা ভেসে এল আবার। বলল, জানে জানে জানে। গঙ্গা সব জানে।

একসঙ্গে ডেকে উঠল অনেকগুলো পাখি। রাত্রির শেষ যামে ঘুম ভেঙেছে তাদের।

(ক্রমশ)

॥ ২ ॥

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মহাশূন্যচারী পোতের প্রয়োজন মত গতিদিক পরিবর্তন করা এবং সেটিকে ফিরিয়ে আনা এই দুটি কর্তব্যের মহড়া হয়ে গেল জণ্ড-৫-এর সাহায্যে। পৃথিবী থেকে পরিচালন নিয়ন্ত্রণ করা এবং বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে যানটির গতিপথ নির্ণয় ও নির্ধারিত করার চেষ্টাও সেই সঙ্গে সফল হল। কোন মহাকাশ-যানকে চাঁদ বা কোন গ্রহের রাজ্য থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ, সেটি দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগে আবহমণ্ডলে প্রবেশ করলে আবহমণ্ডলের একটি স্তরের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে যে সংঘাত তরঙ্গ (shock wave) যানের সামনের আকাশে দেখা দেবে সেটি এবং যানটির মধ্যবর্তী আবহ স্তরে সেই তরঙ্গ ১২।১৩ হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রা সৃষ্টি করবে (প্রথম মহাজাগতিক বেগের ক্ষেত্রে সেই মাত্রা প্রায় ৮০০০ ডিগ্রী) এবং বিকিরণের দরুণ যে শক্তি স্রোত প্রবাহিত হবে তার তাপাংক উঠে যাবে চতুর্থ মাত্রায়। এইখানে পৃথিবীর এবং আমাদের বর্ম যা রক্ষাকবচ সম্পর্কে ২।৪ কথা বলবার সুযোগ আছে। অক্সিজেন-প্রধান আবহ-বর্মে এত অক্সিজেন আছে যা দ্রবীভূত করলে তা সারা পৃথিবীকে ২·২ মিটার মোটা তরল অক্সিজেন দিয়ে ছেয়ে দেবে। মারাত্মক মহাজাগতিক ও অতিবেগুনী রশ্মির অনিষ্টকর অংশ বন্দী ও অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে এবং বহু উল্কা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আবহমণ্ডল আমাদের নিরাপদে রাখে। আবহমণ্ডলের দৌলতেই শব্দের উৎপত্তি হয়, আমরা পরস্পরের কথাবার্তা শুনতে পাই। পৃথিবীর গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষকে অক্সিজেন জোগায় এই আবহমণ্ডল। এ ছাড়াও তার বহু কল্যাণকর দিক আছে। কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে এত উপকারী হয়েও আবহমণ্ডল মহাকাশ-যানের যাত্রারম্ভে পক্ষে বিশেষ করে প্রত্যাবর্তনের সময় বহু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। সুতরাং আবহমণ্ডল যখন শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তখন সে কোথায় অজেয়, কোথায় দুর্ভেদ্য এবং কোনখানে তার 'কর্ণের কুণ্ডল', রাবণের মৃত্যুবাণ বা লক্ষ্মণের শক্তিশেলের মত দুর্বল জায়গা,

(১) সূর্যের অবস্থান অনুসারে যানটির ইচ্ছামত দিকে মোড় ফেরাবার যন্ত্র-সিলিণ্ডার। (২) টেলিভিশন যন্ত্র। (৩) তাপ নিয়ামক রেডিয়েটার। (৪) রেডিও মিটার। (৫) বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের কামরা। (৬) রাসায়নিক ব্যাটারী। (৭) দিক পরিবর্তনের অপ্টিক্যাল ব্লক। (৮) এরিয়্যাল। (৯) দিক সংক্রান্ত অবস্থান নির্ণায়ক ইলেকট্রনিক ব্লক। (১০) নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। (১১) গতিদিক সংশোধনের বেগ-সংশোধন যন্ত্র

সেটা আগে জানা না থাকলে মানুষ পৃথিবীর রাজ্যের বাইরে যেতে গেলেই মারা যেতে পারে বা ফেরবার সময় ইয়েগরভের মত পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। এ পর্যন্ত যে সব আবহমণ্ডলীয় প্রতিবন্ধকের খবর পাওয়া গিয়েছে সেগুলি জয় করে উপযোগী করেই মহাকাশ-যানের মডেল তৈরি করা হয়। যত উঁচুতে ওঠা যাবে ততই আবহমণ্ডলের ঘনত্ব কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত সে আবহ বহির্ভূত মহাশূন্যের হাতে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ব্যবধান রেখা নেই। এমনিতে ১৫০ কিলোমিটার উপরে গেলে মনে হবে সেখানে আবহমণ্ডল নেই। কিন্তু সেই ধারণা ঠিক নয়, কারণ সেখানেও প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১০০০০ কোটি বায়ুর অণু আছে। হাজার হাজার কিলোমিটার উপরে গেলেও দেখা যাবে সে সেখানে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে মাত্র কয়েক শত এমন কি শতেরও কম বায়ুর অণু পরমাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মাত্র ১৫ কিলোমিটার উঠেই এমন কি তালিম-পাওয়া লোকও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন মাত্র ১০-১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে বিমান-

কোন একটি বিশাল উল্কা বা ধূমকেতুর পতনের ফলে চাঁদে 'আইচো' নামে যে ৯০ কিলোমিটার লম্বা ও ২৩ কিলোমিটার চওড়া এই গহ্বরের সৃষ্টি হয়। চারদিকে উৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডগুলি দেখা যাচ্ছে। এই ফটোটি সার্ভেয়ার-৭ কর্তৃক গৃহীত। গহ্বরটির উঁচু কানা দেখা যাচ্ছে পিছন দিকে

বিখ্যাত রুশ 'টেস্ট্ পাইলট' মিঃ কোজি নাকি তাঁর অসাধারণ ও অটুট স্বাস্থ্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতার জোরে এরোপ্লেনে ১৪·৫ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।

উচ্চতা বৃদ্ধির অনুপাতে আবহমণ্ডলের ঘনত্ব যত কমতে থাকে সেই অনুপাতে মহাকাশযান তার ঊর্ধ্বগতি পথে কম বাধার সম্মুখীন হয়। তেমনি সেটি পৃথিবীতে ফেরার সময় যত নিচে আসে ততই আবহমণ্ডলের ঘনত্ব বেড়ে গতিরোধকের brake) কাজ করে এবং প্রচণ্ড ঘর্ষণের ফলে তাপাংক বাড়তে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের গঠন সব অংশে ও স্তরে একরকম নয়। তাই কোন মহাশূন্যযাত্রী রকেটকে আবহমণ্ডলের ঐসব ভিন্ন গঠনের অংশ পার হয়ে যেতে হয়, যেমন পৃথিবীতে হিমাদ্রি শিখরের অভিযাত্রীদের নানারকম আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ভূমণ্ডলের সংলগ্ন আবহস্তরের নাম 'ট্রোপোস্ফিয়ার' যার উচ্চতা ৭ থেকে ১৮ কিলোমিটার পর্যন্ত। ঋতু ও দ্রাঘিমা অনুসারে ঐ উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধি হয় (মেরু অঞ্চলে উচ্চতা কম, বিষুবরৈখিক অঞ্চলে বেশি)। এইখানেই উদ্ভব হয় জলবায়ুর অর্থাৎ বৃষ্টি, বাতাস, কুয়াশা ইত্যাদির। এর পরে খুব সংকীর্ণ একটি স্তরের (Tropopause) পরেই 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার' যেখানে আজকাল জঙ্গী বিমান আমাদের অলক্ষ্যে যাতায়াত করে। এইরকম এক-জাতীয় আমেরিক্যান বিমানের নাম "স্ট্র্যাটো-ক্রুইজার"। ২০০ কিলোমিটার উচ্চতায় তাপাংক দাঁড়ায় +৩০০ ডিগ্রী পর্যন্ত এবং ১০০০—১১০০ কিলোমিটারে ৪০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তো বটেই অধিকন্তু অনেকের মতে অযুত অযুত ডিগ্রীও হতে পারে। তাহলে বলতে হয় যে গ্রহান্তরের বা চাঁদের যাত্রীকে বেশ কয়েক শো কিলোমিটার ইস্পাত কারখানায় উন্মুক্ত চুল্লীর মত তাপ সহ্য করে যেতে হবে নয়কি? কিন্তু বস্তুত তা হয় না। কারণ সেখানে বায়ু এত বিরল যে অতি অল্পসংখ্যক বায়ুর অণু রকেটের গায়ে আঘাত করবে। ফলে তাপমাত্রা বাড়বে নিশ্চয়ই কিন্তু সেই সঙ্গে রকেটের বহিরাবরণ থেকে বিকিরণের মাধ্যমে অনেকখানি তাপ মুক্ত হয়ে চারপাশের মহাকাশে ছড়িয়ে যাবে। ফলে যাত্রীর বিশেষ গরম বোধ হবে না অবশ্য যদি প্রখর সৌরকিরণ না থাকে। আর তা থাকলে তাপাংক ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠতে পারে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উচ্চতা ৮০ কিলোমিটারের মত এবং সেখানে বায়ু প্রবাহের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হলেও বায়ুর অতিবিরলতার জন্য সেই বেগ মাথায় একগাছি চুলও নড়াতে অক্ষম। সেই বায়ু সবসময় পূর্বদিকে বয়—এই নিয়ম মহাকাশযানের প্রত্যাবর্তনের সময় বেগ-নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে ব্যবহার করা যায় এবং তা যে করা হয়েছে জণ্ড্-৫-এর ক্ষেত্রে তার প্রমাণ মহাকাশযানটির পূর্ব অক্ষরেখায় অবতরণ। ৮০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে গেলেই আয়নমণ্ডল যেখানে তড়িতাবিষ্ট অণু-পরমাণুর প্রাধান্য, যেগুলি আয়ন নামে পরিচিত। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির ক্রিয়া বায়ুর অণুগুলি থেকে ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সেখানে আয়ন সৃষ্টি করে অর্থাৎ বায়ুকে তড়িতাবিষ্ট করে। এই জন্যই সেখানে তাপাংক বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব থাকে না। এই আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন তরঙ্গের বেতারবার্তা ও চিত্র আদান-প্রদান হয় শুধু পৃথিবীতে নয়, পৃথিবী ও মহাকাশযানের মধ্যে অতিহ্রস্ব তরঙ্গে (১ সেণ্টিমেটার থেকে ২০ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত)। কিন্তু এটা ঠিক যে মহাকাশযানের গ্রহান্তরে যাত্রার পথে আবহমণ্ডল এক প্রচণ্ড বাধা হওয়া সত্ত্বেও, কিছুটা সুবিধাও করে দিতে পারে। পৃথিবী থেকে যাত্রার সময় বায়বিক-বিক্রিয়া চালিত মোটরের পরিচালনায় আবহমণ্ডল সহায় হতে পারে এবং সেইভাবে ইন্ধনের খরচ কমাতে পারে। তেমনি মহাকাশযানের পৃথিবীতে ফেরার সময় ইন্ধন খরচ না করেও আবহমণ্ডলের প্রতিরোধকে বেগ কমাবার উপায় হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুইরকমের গহ্বর ও পাথর

জণ্ড্-৫ মহাকাশযানের চাঁদের রাজ্যে যাতায়াতের আগেই চাঁদের জমির চরিত্র সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন লুনা ও সার্ভেয়ারের কল্যাণে। চাঁদের উপর "ধূলিস্তর" আছে, তার জমি "তান্তব শৈবাল-নিভ" (fibrous moss), "ঝামার মত ছিদ্র বহুল" পাথরে আবৃত, "কঠিন প্রস্তরাকীর্ণ"—এইসব অনুমান যে ষোল আনা সঠিক নয় তা আজ প্রমাণিত। চাঁদের জমির উপরের স্তর আসলে চূর্ণ দানাদার পদার্থে পরিপূর্ণ। সেই চূর্ণ খণ্ডগুলির ব্যাস ৩০ মাইক্রন থেকে কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত। আবার ছোট ছোট কণাগুলি একসঙ্গে তাল পাকিয়ে ১০ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত আয়তনের এক একটি খণ্ড তৈরি করেছে। যেগুলি মোটেই আঁটসাঁট বা মজবুত নয়। এ ছাড়া আরো একরকমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা আছে যেগুলিকে বালি না বলে চূর্ণিত শিলা বললেই ভাল হয়। চাঁদের জমির এই আলগা চরিত্রের ফলে ঠিক তার নিচে যদি কোন ফাঁকা জায়গা, ফাটল বা গহ্বর সৃষ্টি হয়, তাহলে উপরের কণাগুলি ঝুর ঝুর করে চোরাবালির ভিতরে ধ্বসে পড়ে বলে শেষে বাইরেও গহ্বর বা গর্তের উৎপত্তি হয়। সেগুলি কিন্তু উল্কাঘাতজাত গহ্বরের মত নয়। একটি মহাকাশযান ঐরকম একটি গর্তের, চাঁদের উপর নেমেছিল যার দৈর্ঘ্য,

ছিল ১২½ মিটার, প্রস্থ ৮½ মিটার এবং গভীরতা ১½ মিটার। সেখানে পাশাপাশি সারি বেঁধে অনেকগুলি গর্ত ছিল। কিন্তু উল্কাপাতজাত গহ্বরের কানা একটু উঁচু হয় এবং তার চারিদিকে পাথরের টুকরো ছড়ানো থাকে। উল্কার আঘাতে পাথর ভেঙে সেগুলির উৎপত্তি ও বিক্ষেপ। চাঁদের জমির ভঙ্গুর ও খণ্ডিত উপরের স্তর ৫ মিটার পর্যন্ত পুরু। আলফা রশ্মি বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়েছে যে চাঁদের জমির উপাদান অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, কার্বন ও আরো কয়েকটি পদার্থ। ঐ ধরণের সিলিকেট-ঘটিত শিলা পৃথিবীতে প্রচুর আছে। কিন্তু পৃথিবীতে ঐ ধরণের গহ্বরের মধ্যে বা ঢালুতে যে কোণ-বিশিষ্ট ফিকা রঙের পাথর পাওয়া যায়, চাঁদে তা দুষ্প্রাপ্য। তবে পার্থিব মহাকাশপোতগুলি যেসব গহ্বর পরীক্ষা করেছে সেগুলির বয়েস বেশি নয়। এটা বোঝা যায় যে, মহাকালের গতির সঙ্গে সঙ্গে পাথরের অক্ষয় ও গাঢ় রং হওয়া স্বাভাবিক।

বিশেষ একটি পাত্রে আবদ্ধ জণ্ড-৫কে বিমানে করে মস্কো পাঠাবার জন্য বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নামানো হচ্ছে

মানুষ কবে চাঁদের রাজ্যে যাবে

নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে, "জণ্ড্-৫-কে পৃথিবী থেকে পাঠিয়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এক অবিশ্বাস্য যান্ত্রিক কৃতিত্বের নিদর্শন। মনে হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে এখন এমন মহাকাশযান আছে যার রকেট-শক্তি ও পরিবহন ক্ষমতা মানুষকে জণ্ড্-৫-এর মত চাঁদের চারিদিকে ঘুরিয়ে ফেরত নিয়ে আসতে পারে।" পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন শহরের কৃত্রিম উপগ্রহের গতি পর্যবেক্ষণাগারের অধ্যক্ষ আচার্য মানফ্রেড ও স্লেণ্ডার, বহিরাকাশ বিজয়ের প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত আমেরিকাকে পিছনে ফেলে গিয়েছে—এই কথা বলে মন্তব্য করেন যে, এই নতুন সাফল্য মানুষের চন্দ্র-বিজয় অভিযানের ইতিহাসে এক নতুন ক্রোশচিহ্ন স্বরূপ।

এঁরা যা বলেছেন সবই মানি। কিন্তু মানুষকে কি এখনই বা অল্পকালের মধ্যে চাঁদের এলাকায় পাঠানো যাবে? প্রশ্নটা তো শুধু যন্ত্রবল আর রকেটের নয়। সোভিয়েট রকেট তৃতীয় মহাজাগতিক বেগে উড়ে সৌরলোকের সীমানা অতিক্রম করে যেতে পারে এখনই। কিন্তু মানুষ পাঠানো অন্য বহু সমস্যার সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া আগে জীবজন্তু না পাঠিয়ে মানুষ পাঠানো হবে কিনা সন্দেহ। বলতে পারেন স্বয়ংক্রিয় লেবরেটরী যখন এত খবর আনছে তখন মানুষ পাঠাবার ঝুঁকি নেবার দরকার কি?

প্রথম কথা মানুষের ষোল আনা বিকল্প হতে পারে এমন কোন "ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক" তৈরি করা সুদূরপরাহত, তাতে হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে ইলেকট্রনিক ভাল্ভ থাকুক বা না থাকুক। যন্ত্রের কি চিন্তা করার শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি আছে? যন্ত্র অনুবাদ করতে পারে, কিন্তু নিজে কবিতা বা গল্প লিখতে পারে কি, কিম্বা তাকে যা গাণিতিক প্রোগ্রাম দেওয়া হয় তার বাইরে কিছু অংক কষতে বা হিসাব করতে পারে কি কোনটাই পারে না এখনো পর্যন্ত। যন্ত্র মানুষের হুকুম তামিল করে মাত্র। মানুষ ফর্মুলা তৈরি করে, যন্ত্র সেই ফর্মুলা অনুসারে কাজ করে কিন্তু নিজে ফর্মুলা রচনা করবার বুদ্ধি তার নেই। মানুষকে মহাকাশযানের একটি সচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে পাঠালে সেই হয় মহাকাশ-যানের মস্তিষ্ক স্বরূপ যা নিজে পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও বার্তা প্রেরণ করতে পারে, বিপদে পড়লে সামলে নিতে পারে এবং দরকার মত ঘটনাবলীর উপর হস্তক্ষেপ করে অপ্রত্যাশিত জটিল সমস্যার যুক্তি-সঙ্গত সীমাংসা করবার শক্তি রাখে। তবে ইলেকট্রনিক মেশিনের মত অত তাড়াতাড়ি সে হিসাব করতে বা অংক কষতে পারে না এবং তার শরীরও যন্ত্রের মত মজবুত নয়। এ পর্যন্ত যে কটি মানুষবাহী মহাশূন্য পোত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে সেগুলি দীর্ঘমেয়াদী যাত্রায় মানুষের জীবনধারণের উপযোগী হবে না। সোজা কথায় জাহাজের ক্যাবিনে জীবনধারণের একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যবস্থা চাই যাতে যাত্রী খেতে, পান করতে, নিঃশ্বাস নিতে ও প্রশ্বাস ছাড়তে এবং শরীরের আবর্জনা ত্যাগ করতে পারে। এইসবের জন্য এত জিনিসপত্র চাই, যার ওজন হবে শত শত টন। কিন্তু অত ভার নিয়ে জাহাজ যাবে কি করে? তাছাড়া ছোট্ট একটি কামরার মধ্যে এই পূর্ণ জীবন-চক্র চালু রাখা সহজ কথা নয়। তার উপর যাত্রীদের নিজেদের মধ্যে স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে মিল থাকে না বলে যে জীবনচক্র একজনের উপযোগী তা অন্যজনের পক্ষে অনুপযোগী হতে পারে। তারপর মহা-জাগতিক রশ্মির বিপদ আছে যা অল্পকাল

স্থায়ী গগনচারণায় বিশেষ ক্ষতি না করলেও দীর্ঘমেয়াদী যাত্রায় স্বাস্থ্যের অনিষ্ট করে। আবার তার চেয়েও মারাত্মক হচ্ছে সূর্যের বহির্মণ্ডল তীব্রোজ্জ্বল অগ্নি-শিখা জাত তড়িতাবিষ্ট কণিকা প্রবাহ। আসলে কখন, কোন্ অবস্থায় কেন সূর্যে ঐ ব্যাপার ঘটে তার জবাব আজও পাওয়া যায়নি বলে সেটির কোন পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়—এক সপ্তাহ আগেও নয়। এই সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার উপায় নিয়ে গবেষণা চলছে যাতে মহাকাশযানের বহিরা-বরণ ঐ সব কণিকা শোষণ করে নিতে পারে, কিম্বা জাহাজের মধ্যে এমন একটি নিরাপদ প্রকোষ্ঠ রাখা যায় সূর্যের অগ্ন্যুদ্গারের (flare) সময় অতিশক্তি সম্পন্ন কণিকা স্রোত বইলে, সেই প্রকোষ্ঠে গিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। আয়নিক বিকিরণ সহ্য করার শক্তি বাড়াবার জন্য নানা ঔষধ নিয়ে গবেষণা চলছে। তারপর মহাজাগতিক রশ্মির কবল যাতে যাত্রী পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে তার জন্য মহাকাশযানের চারিদিকে তড়িচ্চৌম্বক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সন্নিবেশ করা নিয়ে চেষ্টা-চরিত্র চলছে যেমন আছে পৃথিবীর ক্ষেত্রে তার তড়িচ্চৌম্বক ক্ষেত্র।

মহাকাশযানের চারিপাশের তড়িচ্চৌম্বক ক্ষেত্র যদি মহাজাগতিক রশ্মির বা অন্য সব বিপজ্জনক বিকিরণের কণিকাগুলির মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিতে বা শোষণ করে নিতে পারে তাহলে এই গুরুতর সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে।

দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশ পরিক্রমার আর একটি বিপদ আসে মহাকর্ষের দিক থেকে। ঐ বিপদ দুই রকমের—শরীরের উপর ভারশূন্যতার প্রভাব এবং মহাকাশযানের গতিবেগ বাড়ানো বা কমানোর সময় শরীরের উপর ধকল। ভারশূন্যতা—যাকে আমরা অতি গুরু ভারের আয়নায় প্রতিফলন বলতে পারি—মানুষের শরীরে কিছু কিছু প্রকারান্তর ও পুনঃ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে যদিও কারো কারো মতে সেটা স্রেফ নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য মারাত্মক কোন ব্যাপার নয়। আমাদের দেশে কথায় বলে, "শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।" কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। তবু এটা ঠিক ভারশূন্য দুনিয়ায়, শরীরের যান্ত্রিক ভারের চাপ না থাকার দরুণ মানুষের চেষ্টীয় অঙ্গসঞ্চালন ক্ষমতা দুর্বল হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে জেমিনী-৭ মহাকাশযানের যাত্রীরা দুই সপ্তাহ কক্ষপথে থাকার পর যখন ফিরে আসেন তখন তাঁদের পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, চেষ্টীয় অঙ্গসঞ্চালন ব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রকারণ ঘটেছে যেমন : অস্থির টিস্যুগুলির ঘনত্ব কমে গিয়েছে, পেশীর টিস্যুর মাত্রা আগের চেয়ে কম হয়েছে এবং ভারশূন্য অবস্থায় একনাগাড়ে এতদিন থাকার ফলে শিরা ও ধমনীতে উপস্থিত রক্ত স্তম্ভের চাপ জয় করার প্রয়োজন না থাকায় হৃদয় সমেত সমগ্র রক্তবহা নাড়ীতন্ত্রে অনেক কিছু রদবদল হয়েছে। তারপর ভারশূন্যতার পরে মহাকাশযানের গতি পরিবর্তন ও অবতরণের সময় যখন বেগ কমানো হয় তখন আবার এসে পড়ে অতি গুরু চাপ বা ভার যা আরোপিত হয় এক প্রতিকূল অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে। ফলে মহাকাশযাত্রীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কিন্তু তাহলে উপায়? উপায় হচ্ছে মহাকাশযানের কামরার ভিতরে কৃত্রিম কৌশলে মহাকর্ষ সৃষ্টি করা। এই ব্যাপার নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে।

এ ছাড়াও বৈজ্ঞানিকরা শরীরতত্ত্বের সাহায্যে মানুষের শরীরের অভিযোজন ক্ষমতার প্রতিকূল দিকগুলি করায়ত্ত করে, মানুষকে অপ্রত্যাশিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখছেন। তারপর কৃত্রিম উপায়ে মহাকর্ষের সমতুল্য ভার নকল করা যায় কিনা সে বিষয়ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই প্রশ্নটি বিপরীত দিক থেকেও বিবেচনা করা যেতে পারে অর্থাৎ পৃথিবীতে নেমে আসার সময় পর্যন্ত, মহাকাশযানের ত্বরণের দরুণ শরীরের উপরে গুরুভারের ফলে যা ধকল গিয়েছে তার কুফলগুলি দূর করার পাল্টা কি ব্যবস্থা করা যায় না যায়, বিজ্ঞানীরা তাই নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন।

সুতরাং আমরা দেখছি যে চাঁদের রাজ্যে মানুষের প্রবেশ ও পর্যবেক্ষণের পর নিরাপদে প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করার কর্তব্যের এখনো বহু কিছু বাকি আছে। আমার মনে হয় না যে কয়েক মাসের মধ্যে কোন মহাকাশযান মানুষ নিয়ে চন্দ্রলোকে যাত্রা করবে। তবে এটা ঠিক যে সেই যাত্রা পথের দ্বারোদ্ঘাটন করেছে জন্ড্-৫।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

২৫ জুলাই '৬৮

এখন ইউরোপে বিপ্লবের সময়। কোথাও বাদ নেই। মাদ্রিদ, রোম, প্যারিস, বারলিন, প্রাগ। সর্বত্রই এক ডাক। বাঁধ ভেঙে দাও। সমাজের বাঁধ ভেঙে দাও, আইনের বাঁধ ভেঙে দাও, পুরাতন রীতি-নীতির বাঁধ ভেঙে দাও, জীর্ণ রাজনীতির বাঁধ ভেঙে দাও। যা কিছু পুরাতন তার সবকিছুকে বরবাদ করে দাও। নতুনকে ডেকে আনো। আমরা চাই অন্য এক নতুন সমাজ, নতুন ব্যবস্থা, নতুন রাজনীতি, নতুন চিন্তা রাজ্যে অন্য বিশ্বাস, অন্য জীবনবোধ। সেই অন্য বিশ্বাস যে কি, অন্য জীবনদর্শন যে কি—সেই সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের ধারণা এখনো সঠিক ভিত্তি খুঁজে পায়নি। সার্ত্রে মারকুসে ক্রাস্তো বা শি গুয়েভারার (Che Guevara) ছবি আর বাণী হয়ত সামনে—চীনের রেড গারডের মতই হয়ত এদের সামনেও একই লক্ষ্য স্থল পুরাতনকে বিসর্জন দাও, বিপ্লবকে ডাক দাও—সবকিছুকে অচল করে দাও। আমরা কোন কিছুকেই মানি না। না-মানার মধ্যেই রয়েছে আমাদের মানা। শৃঙ্খলাকে ভেঙে দেবার মধ্যেই রয়েছে আমাদের শৃঙ্খলাবোধ, সবকিছুকে অস্বীকার করার মধ্যেই রয়েছে আমাদের স্বীকারোক্তি, আমাদের শপথ গ্রহণ। সবকিছুতেই অনাস্থা প্রকাশ—সমাজ, সংস্কৃতি আর ধর্মের সমস্ত বিষয়েই প্রশ্ন তোলা—কেন মানবো? বিপ্লবীদের কেশগুচ্ছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, সাজ সজ্জায়, চরণযুগলে যা শোভা পায়, তার সমর্থনে একই পাল্টা প্রশ্ন—কেন নয়? কেন নয় প্রশ্নের সাথে রাজনীতির প্রশ্ন, রাজনীতির সমর্থনে তাদের কর্মপ্রয়োগের প্রশ্ন। তার থেকে আসছে আজ এখানকার স্কুলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক উপাচার্য ঘেরাও, কোন কোন ফ্যাকালটি আর ইনস্টিটিউট খুদে গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় সম্পূর্ণ দখল, সেই সব বাড়িতে লাল পতাকা উত্তোলন—যদিও তাঁদের না ধনতন্ত্রে, না সমাজতন্ত্রে পুরোপুরি বিশ্বাস। সেইজন্যে বর্তমানে ইউরোপের ছাত্রদের সামনে রয়েছে দুই রাজধানীর আদর্শ—একদিকে প্যারিসে ছাত্রদের বিপ্লব ধনতন্ত্র, বুর্জোয়াতন্ত্র আর দ্য গল-তন্ত্রের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে চেকো-শ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে চলেছে এক

'বার্লিনার স্বর্ণ ভল্লুক' পুরস্কার-প্রাপ্ত সুইডেনের ছবি 'Obe dole doff'

নতুন বিপ্লবের সূচনা। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরী যা পারেনি, ১২ বৎসর পর চেকোস্লোভাকিয়া চাইছে সেই বিপ্লবকে সার্থক করতে। সমাজতন্ত্রের রূপান্তর? সমাজতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্র, আরো গণতন্ত্র, ব্যাপক গণতন্ত্র। অতি বিপ্লবীদের পোয়াবারো। ওদের সামনে এখন এক ব্যাপক স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাই সারা ইউরোপের অতি বিপ্লবী যুবসমাজ একবার ছুটছে প্যারিসের দিকে, আর একবার চলেছে প্রাগে।

এখন গ্রীষ্মের ছুটি। সর্বত্রই ঝাঁপবন্ধ। এ সময়টা বেরিয়ে পড়ার ডাক। যাঁরা গায়ের চামড়া বাদামী করতে ইচ্ছুক তাঁরা চলেছেন দক্ষিণে বা উত্তরে সমুদ্রের ধারে। আর যাঁরা বিপ্লব সন্ধানী, তাঁরা গিয়ে বর্তমানে জড়ো হচ্ছেন প্রাগে, চেকোস্লোভাকিয়ার বিভিন্ন শহরে শহরে। যদি হাঙ্গেরীর মত একটা বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ সেই রক্তাক্ত বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতেও প্রস্তুত। গ্রীষ্মটা ওখানেই কাটাবে ঠিক করেছে। আমার বন্ধুবান্ধব যাঁরা, তাঁদের জিজ্ঞেস করলে, তাঁরা সবাই বলে—"ভাই প্রাগে যাচ্ছি, দেখে আসি, গণতন্ত্রীকরণের কাজ সেখানে কতদূর এগোলো। প্রাগের পথেঘাটে এখন কেবল রাজনীতি নিয়ে আলোচনা।" জার্মানদের একটা সম্মিলিত অভিযোগ আছে। ছুটিতে কোন জর্মনই চায় না, তাঁর গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলিতে সেই স্থানে অন্য কোন জর্মনের উপস্থিতি অবস্থিতি। অথচ ছুটি আর ভ্রমণ উপভোগ করার ব্যাপারে জর্মনরা এত ক্ষুধাপীড়িত, এঁরা বলেন—আরে মশাই ছুটিতে যাবো কোথায়? উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুতে একা ছুটি উপভোগ করতে গিয়েও দেখলেন, সেখানে ইতিমধ্যে অন্য জর্মান এসে বসে আছে। এবার ঠিক করেছি, এই শহরেই বনে গিয়ে বসে থাকবো।..." তাই ওঁদের যখন ব্যঙ্গ সুরে বলি ""ছুটিতে দেশ ছেড়ে যাচ্ছো, অন্য দেশ, অন্য মানুষ, অন্য ভাষা শোনবার জন্যে। আর তোমরা দলে দলে চলেছো প্রাগে, সেখানে এখানকার পরিচিত মুখ দেখবার আর নিজের ভাষায় কথাবার্তা শোনবার জন্যে। ধরতে গেলে, গোটা জর্মানটাই ত এখন চেকোস্লো-ভাকিয়ায় গিয়ে বসে আছে!" ওঁরা বলে—"কি আর করবো। এমন বিপ্লবের আবহাওয়া এত কাছে, প্রতি বছর ত আর পাওয়া যায় না।" কথাটা ঠিক। রাজনীতি আবহাওয়া জর্মানীতে বড্ড একঘেয়ে। যতদিন Springer-Press আর দুই বৃহৎ রাজনৈতিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আর সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি জরাসন্ধ হয়ে এক হয়ে আছে—ততদিন জর্মানি ফ্রান্স আর চেকোস্লোভাকিয়ার মাঝখানে থেকেও নাকে তেল দিয়ে কুম্ভ-কর্ণের মত ঘুমিয়ে নিতে পারে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তার ঘুম ভাঙাবার মত বিরোধীদল বর্তমানে জর্মানিতে নেই। তাই এখানকার রাজনীতি-আন্দোলনের গন্ধ পেলে যারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তাদের দলে দলে প্যারিস বা প্রাগে না গিয়ে উপায় কি!

এমনি চারিদিকের রাজনৈতিক আব-হাওয়ার মধ্যেও যথারীতি এ বছরও বার্লিনের ফিল্ম ফাস্টিভ্যাল উদযাপিত হয়ে গেল। অনেকেই ভেবেছিলেন, ফ্রাস্

ফিল্ম ফ্যাসটিভ্যালের মত হয়ত বার্লিন ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালের মধ্যে একদল বিদ্রোহী দেখা দেবে, যাঁরা কান-এর উৎসবে গদার থেকে আরম্ভ করে অনেক দেশী বিদেশী চিত্র পরিচালকদের মতই চলচ্চিত্র শিল্প জগতের বহু অভিযোগ আর প্রতিবাদের ঝড়ো হাওয়া নিয়ে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল বার্লিনের ফিল্ম উৎসব তার পুরনো প্রথামাফিক একই ধারায়, একই সুরে, একই আবহাওয়ায় উদ্যাপিত হল। কোন বাদ প্রতিবাদ নেই, কোন নতুন প্রস্তাব নেই, কোন নতুন আন্দোলন নেই। সেই এক বাড়ি ইউরোপ সেণ্টার, সেই এক লোক ডঃ বাওয়ার ও তাঁর "সহকর্মীদল, সেই এক প্রেক্ষাগৃহ Zoo-Palast, আর প্রায় সেই একই আগন্তুকের দল—যাঁদের চোখেমুখে কোন কিছুই নতুন নেই। ব্যতিক্রম যে দু'একজন নেই তা নয়।

সুইডেনের Jan Troell কাছ থেকে আমরা পেয়েছি একটি অতি সময়োপযোগী সমস্যামূলক ছবি "Ole dole doff" (Get out of Here)—যা'র মধ্যে দিয়ে এই তরুণ চিত্র পরিচালক বর্তমান পৃথিবীর স্কুল কলেজের ছাত্রসমাজের একটা বিশেষ সমস্যার দিক তুলে ধরেছেন। তার জন্যে তিনি তাঁর ছবির জন্যে সর্বোচ্চ

স্পেনের 'Peppermint Frappe' ছবির নায়িকা জেরালডিন চ্যাপলিন

পুরস্কার "বার্লিনার স্বর্ণ ভল্লুক" জয় করে নেবার মধ্যে দিয়ে অভিনন্দিতও হয়েছেন। তাঁর ছবির মধ্যে পাওয়া যায় একটা গভীর চিন্তা আর সযত্ন পরিচালনা, যা এবারের বহু ছবিতেই দেখা যায়নি। ভুলে গেলে চলবে না, পৃথিবীর বহু দেশের মত সুইডেনেও চলেছে বহুকাল ধরে ছাত্র-সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিক্ষোভ। একদিকে ছাত্রদের মধ্যে অতিমাত্রায় রাজনৈতিক সচেতনতা, অন্যদিকে অতিমাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, যা স্কুলের নিয়মকানুনের মধ্যে কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব নয়। উত্তর ইউরোপে জর্মানি ও স্কানদিনেভিয়ান দেশ-গুলিতে অতি প্রাচুর্য একদিকে দেশের যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে দিচ্ছে, অন্যদিকে পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করার তীব্র ব্যাকুলতার মধ্যে রয়েছে এইসব বিদ্রোহের আগুন। অবশ্য অনেক সমাজতত্ত্ববিদের ধারণা, পৃথিবীর যুবসমাজ জীবনদর্শন ও নীতিবোধের দিক থেকে এক নতুন চৈতন্যবোধের স্তরে উপনীত হতে যাচ্ছে। এখন রূপান্তরের কাল। তাই দেখা যাচ্ছে, জার্মানি ও সুইডেনের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্রা ছাত্রদের বহু দাবিদাওয়াকে মেনে নিচ্ছেন। কিছুদিন পূর্বে জর্মানির দু' একটা প্রদেশে তাঁদের শিক্ষা পরিচালনায় ছাত্রদের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্রসমাজ ও তার ধ্যানধারণা সমস্যা সবকিছু যথাযথ সেই শিক্ষা পরিচালনায় প্রতিফলিত হতে পারে। জর্মান শিক্ষা জগতে একে এক বিরাট পরিবর্তন বলা চলে। এ'রা আশা করেন,

এতে শিক্ষাজগত শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনি সুইডেনের শিক্ষা জগতেও এসেছে এক বিরাট বিপ্লব। আগামী বছর থেকে সুইডেনে বাৎসরিক পরীক্ষা বা ফাইন্যাল পরীক্ষা বলে স্কুল কলেজে আর কিছু থাকবে না। এমন কি স্কুলের জীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার পূর্বে যে আবিটুর (আমাদের দেশের প্রায় B A, B sc-র সমান) পরীক্ষা, সে পর্যন্ত তুলো দেওয়া হচ্ছে। শুধু থাকবে স্কুলের কাজ, বাড়ির কাজ, মাঝে মধ্যে ক্লাস পরীক্ষা আর ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিদিনের স্কুল কলেজের জীবনে। এখানকার সমাজ-তত্ত্ববিদ ও শিক্ষাবিদ্‌রা এর স্বপক্ষে বলছেন —শিক্ষা সংস্কারের ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যে একটা আতঙ্কভাব, ঘৃণার ভাব, পরস্পরকে এড়িয়ে চলবার ভাব এবং পরীক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের যে সারা ছাত্র-জীবনব্যাপী একটা ঘোর আতঙ্ক—সে সব ভাব দূর হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি, তাতে হয়ত আমাদের দেশের পরি-স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এ রকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু আগামী কালের শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ত এমনি একটা শিক্ষা পদ্ধতিতে এগিয়ে যাবে, সে ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতের গুরু-শিষ্যের শিক্ষা সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সুইডেনের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যে দিনে দিনেই কি রকম বেপরোয়া হয়ে উঠছিল, তার কিছুটা আগুনের উত্তাপ পাওয়া যায় Jan Troell-এর ছবিতে।

Ole Dole Doff-এর কাহিনী মোটা-মুটি এ রকম : কোন এক স্কুলের শিক্ষক মারটেনসন-এর সামনে রয়েছে দুই বিভী-ষিকা। এক—রাত্রিবেলা ঘুমের সময় পরদিন ক্লাসের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কি করা যেতে পারে, তা নিয়ে ঘোর চিন্তা, দুই—পরের দিন সকালে আবার একটা স্কুল জীবনের দিন শুরু হল, সেই ভাবনা! ক্লাস ভর্তি কেবল অবাধ্য ছেলেমেয়ের দল—বহুদিন হল যাদের ওপর মারটেনসন-এর ক্ষমতা একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। তাঁর ধারণা, ছেলেমেয়েদের মা-বাবারা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন নন, শিক্ষা পরিচালকেরা তাঁদের স্কুলের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য যথাযথ প্রয়োগ করেন না। ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা। এই সবকিছুর বিরুদ্ধে মরটেনসন নিজের মধ্যে এক বিদ্রোহ অনুভব করেন। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে কিছুতেই বোঝা-পড়া করতে পারেন না। নিজেকে অনুভব করেন একা। এমন কি তাঁর বিবাহের ব্যাপারটাও বেশ জটিল হয়ে ওঠে এই

ফ্রান্সের ছবি The Friends-এ ন্ডেকান অস্ত্রী ও জ্যাকেলি সাসার্দ

সঙ্গতিহীনতার জন্যে। কিছুদিনের জন্যে আনেমারী নামে একজন শিক্ষিকা তাঁকে অবশ্য আশা ভরসা আর সান্ত্বনাও দিয়ে আসছে এ ব্যাপারে। কিন্তু মরটেনসন দিনে দিনেই তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে থাকেন—কোথায়ও কোন মিল খুঁজে না পেয়ে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা দিনে দিনেই বাড়তে থাকে। সে চেষ্টা করে ছাত্রছাত্রীদের অভি-ভাবকদের সঙ্গে কথা বলে একটা বোঝা-পড়ায় আসার জন্যে। ফল হয় না কিছুই। জীবনে সাফল্যমণ্ডিত কোন এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলে, মরটেনসন বুঝতে পারে, তাঁর জীবনে কতটা ব্যর্থতা। ...এ ভাবে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে দিন কাটতে থাকে। কোন এক সুন্দর গ্রীষ্মের দিনে স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি যান সমুদ্রে স্নান করতে। তিনি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এমনি সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন যে, তিনি দেখতে পান না তাঁর ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে কিভাবে শত্রুর মত দেখে। ছবির করুণ সমাপ্তি। মারটেনসন যখন সমুদ্রের জলে নামেন। তখন সেই সব ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। ছবিটা সর্বোচ্চ পুরস্কার ছাড়াও প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক চার্চের তরফ থেকে তাঁদের পুরস্কার লাভ করে।

সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকের জন্যে "বার্লিনার রৌপ্য ভল্লুক" পুরস্কার লাভ করেন স্পেনের Carlos Saura। তাঁর বই-এর নাম "Peppermint Frappe।" ছবিটি কান-এ প্রদর্শিত হবার কথা ছিল। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন, প্যারিসের রণক্ষেত্রের ঢেউ এবার কান-এর চলচ্চিত্র উৎসব প্রাঙ্গণেও গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। অসময়ে উৎসব বিদ্রোহীদের হাতে মার খাওয়াতে স্পেনের এই ছবিটি গা বাঁচিয়ে কোন প্রকারে বার্লিনের উৎসবে এসে উপস্থিত হতে পেরেছিল। জেরাল্‌ডিন চ্যাপলিন এই বইতে খুবই সুন্দর অভিনয় করেন। ছবিটির পুরস্কার প্রাপ্তিতে কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তবে বার্লিন ফিল্ম ফ্যাসটিভ্যালের এ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করার কারণ থাকতে পারে। কান-এর উৎসব মণ্ডপে আগুন না লাগলে এই সুন্দর ছবিগুলি হয়ত বার্লিনে এসে পৌঁছুতে পারত না।
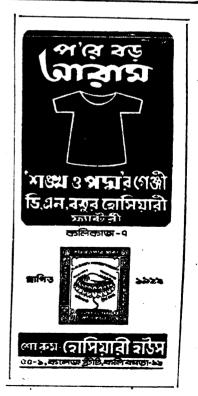
সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কারে অভিনন্দিত হন ফ্রানসের Les Biches (The Friends) ছবির অভিনেত্রী Stephane Audran এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারে ভূষিত হন ফ্রান্সের দু'খানি ছবিতে L'homme que ment (The man Lies) ও The Friendsতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্যে Jean Louis Trintignant। এখানে তাই ফরাসী ছবি Claude Chabrol পরিচালিত Les Biches-এর ওপর একটু না লিখে থাকতে পারছি না। চলচ্চিত্র শিল্পের দিক থেকে ছবিটার হয়ত প্রথম পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। ধরতে গেলে ছবিটিতে মাত্র তিনটি চরিত্র। পল টমাস-এর ভূমিকায় জাঁ লুইস 'হোয়াই'-এর ভূমিকায় জাকুলিন সাসার্দ আর ফ্রেদেরিক এর ভূমিকায় স্তেফান অঁদ্রা। তিনজনেই যেন তিন টুকরো ফরাসি কবিতা। আর সমগ্রভাবে ছবিখানি যেন সত্যি একখানি গীতিকাব্য। কাহিনী, অভিনয়, সংলাপ, দৃশ্য দৃশ্যান্তর চিত্রকল্প আর চিত্র পরিচালনায় ছবিখানি মনকে ডুবিয়ে রাখে যেন জীবনানন্দের কবিতার কোন এক গভীরে।

প্যারিসের ফুটপাতে আপন মনে ছবি আঁকে ষোড়শী রূপসী মেয়ে 'হোয়াই'। সে এখনো কুমারী—কোন পুরুষ তাঁর জীবনে এখনো আসেনি। একটু বয়স্কা, অতি ধনীকন্যা ফ্রেদেরিক পথে যেচে আলাপ করে তাঁর সঙ্গে। নিয়ে যায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত দূরে Saint Tropes-এর বাড়িতে। জাহাজের ব্যবসায়ী পিতার সম্পত্তিতে সে সাম্রাজ্ঞী—তাঁর কিছু ছেলে বন্ধু তাঁর বাড়িতে আসে আড্ডা মারতে, তাস খেলতে বা শীতের দিনে দীর্ঘরাত্রির স্বপ্নজাল বিস্তৃত পার্টিতে। সেখানে হোয়াই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে সমস্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে। কিন্তু সে দেখে, সে ফ্রেদেরিক-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। একদিন পার্টিতে আরকিটেকট্ পল-এর সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় জমে যায়। পলকে ফ্রেদারিক চায়। সে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। পল ও হোয়াই-এর মধ্যে যখন প্রেমের সূত্রপাত, তখন ফ্রেদেরিক আর নিজেকে সরিয়ে রাখতে না পেরে, নানান কলাকৌশল ও তাঁর ঐশ্বর্য প্রয়োগ করে সুন্দরভাবে পলকে সরিয়ে নেয় হোয়াইএর কাছ থেকে। পল ও ফ্রেদেরিক-এর মধ্যে এবার এক দাম্পত্য প্রেম জমে ওঠে। ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়ে হোয়াই এ ব্যাপারে গভীর আঘাত পায়। কিন্তু হোয়াই ইতিমধ্যে ও'দের জীবনে জড়িয়ে পড়ে, তাই সেখান থেকে চলে আসতে পারে না। এদিকে পল আর ফ্রেদেরিক-এর মধ্যে প্রেম যতই জমতে থাকে এবং ও'দের সুখী হতে দেখে হোয়াই ততই যেন দিনে দিনে নিজেকে একটা তিক্ত জটিল আশাহীন অবস্থার মধ্যে জট পাকিয়ে ফেলতে থাকে।

ইতিমধ্যে পল-এর কাজে ও'দের দ্'জনকে প্যারিস-এ আসতে হয় কয়েক সপ্তাহের জন্যে। হোয়াই থেকে যায় Saint Tropez-এ। কয়েকদিন কেটে যাবার পর হোয়াই আর, থাকতে পারে না। চলে আসে প্যারিসে পলদের কাছে। হোয়াই যখন এসে উপস্থিত, ঠিক সেই সময় পল ফোন করে ফ্রেদারিককে বাইরে কোথাও মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে। সেজেগুজে যখন বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত, ঠিক সেই সময় হোয়াইকে দেখে ফ্রেদেরিক অবাক হয়ে যায়। হোয়াই স্বীকার করে—সে পলকে ভালবাসে এবং ও'দের না দেখে, ও'দের ছাড়া সে আর থাকতে পারে না। ফ্রেদেরিক চটে যায় এবং ওকে চলে যেতে বলে চিরদিনের জন্যে। হোয়াই নির্বিকার, নিষ্কম্প। তার মৃদ্ সোহাগপূর্ণ কণ্ঠস্বর, পেছন থেকে বান্ধবীকে আদর করে যখন কানে কানে বলতে থাকে—হ্যাঁ, আমাদের বিচ্ছেদই ভাল, সে সময় ধীরে ধীরে ও'র কাছে লুক্কায়িত সুন্দর ছুরিটা ফ্রেদেরিক-এর দেহে আমূল সুন্দরভাবে বসিয়ে দেয়। ফ্রেদেরিক-এর দেহ হোয়াই-এর আলিঙ্গন থেকে ঝরা ফুলের পাপড়ির মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সর্বশেষ দৃশ্য ঃ হোয়াই-এর পোশাকে ফ্রেদেরিক রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে আছে, আর ফ্রেদেরিকের সুন্দর পোশাকে সজ্জিত গরবিনী হোয়াই বিছানায় শুয়ে। পল আবার ফোন করতেই ফ্রেদারিক-এর ভঙ্গীতে আবদারের সুরে কথা বলে হোয়াই—ও'কে এসে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে। পল এল—আস্তে আস্তে ও'দের ভিলার বাইরের ঘরের দরজা খুলে সে তখন ঢুকছে।

বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করে আরো দুখানি ছবিকে। ইতালীর Come l'amore (Something like Love) আর যুগোশ্লোভাকিয়ার **Nevinost bez Zastite (unprotected innocence)** ছবিকে। যুগোস্লাভিয়ার ছবি কি করে যে পুরস্কার পায়, তা ভাববার বিষয়। এই ধরণের ফিল্ম ফ্যাসটিভ্যালগুলির উদ্দেশ্য যতটা না শিল্প, তার চাইতে বেশী লক্ষ্য রাজনীতির দিকে। পশ্চিম জার্মানি কিছু-কাল ধরে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী। রুমেনিয়া, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সে সম্পর্ক স্থাপন হতে চলেছে। পরবর্তী লক্ষ্য প্রাগ। এতদিন আদর্শগতভাবে পূর্ব ইউ-রোপের কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ বার্লিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কোন ছবি পাঠায় নি। যুগোস্লাভিয়াকে দিয়ে গত বছর থেকে সে বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে। গত বছর যুগোস্লাভিয়া শ্রেষ্ঠ পরি-চালনার জন্যে পুরস্কার পেয়েছে, এ বছর বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। প্রাগ ইতিমধ্যে জানিয়েছে আগামী বছর তারা

আমেরিকার "Charly" ছবির পরিচালক Ralph Nelson ও সংগীত পরিচালক ভারতের রবিশঙ্কর

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি পাঠাচ্ছে। একদিকে আমাদের যেমন হতাশ করেছে জাঁ-লুক গদারের উইকেণ্ড ছবিটি, অন্যদিকে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি প্রথমত আমেরিকার চার্লি বইটা কোন পুরস্কার না পাওয়ায় সেখানে কেবল ছবি আর অভিনয় হিসাবে নয়, সেই সঙ্গে রবিশংকরের অনবদ্য আবহ সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েও বইটা একটা পুরস্কার পাবার দাবী রাখতে পারত। দ্বিতীয়ত এবারেও ভারতের তরফ থেকে কোন কাহিনী চিত্র না থাকাতে অবাক হয়ে যেতে হয়। যে বার্লিন ফিল্ম ফ্যাসটিভ্যাল সত্যজিৎ রায়ের ছবি পেয়ে পর পর তিন বৎসর ধন্য হয়েছে, সেই বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে গত দুই বছর ধরে ভারতের কোন কাহিনী ছবি নেই—৫০০ মিলিয়নের যে বিরাট দেশ চলচ্চিত্র উৎপাদনে এখনো পৃথিবীতে ২য় কি ৩য় স্থান অধি-কার করে আছে।

ভারতের তরফ থেকে একখানি বড় "ইণ্ডিয়া ১৯৬৭" আর একখানি ছোট "গবেষণা" ডকুমেণ্টারি ছবি প্রদর্শিত হয়। ডক্যুমেণ্টারী ছবি হিসাবে 'ইণ্ডিয়া ১৯৬৭' খুবই ভাল হয়েছে, কিন্তু কাহিনী ছবির মধ্যে একে ঢোকাবার কি অর্থ থাকতে পারে? যদিও এই ছবিটির আলোচনা করতে গিয়ে এদেশের কয়েকটা পত্র পত্রিকা কালীঘাটের মরা পোড়ান আর আরো দুর্ভিক্ষের ছবি দেখানো হল না কেন জাতীয় অসভ্য প্রশ্ন তুলেছে। ছবিটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে, খুবই সময়োপযোগী এবং শিল্পসম্পন্ন ছবি।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়—ভারত থেকে

কোন কাহিনী চিত্র এল না কেন? কে তার জন্যে দায়ী? ভারত সরকার না এখানকার ফিল্ম কমিটি? ভারতের বেতার ও তথ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ খান্না এখানে এলে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন—ভারতের তরফ থেকে ৩খানি ছবি—"পান্না" "মাটির মানুষ" ও কি এক "রাজা" নামের ছবি বার্লিনে সময় মতই পাঠানো হয়। কিন্তু এখানকার নির্বাচন কমিটি সব কয়টা ছবিই বাতিল করে দেয়। "পান্না"র মত ছবি বাতিল হলে হয়ত কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু মৃণাল সেনের মত প্রথম শ্রেণীর একজন চিত্র পরিচালকের ছবি "মাটির মানুষ" বাদ পড়ে কি করে অবাক হয়ে যেতে হয়। এদেশের ফিল্ম কমিটিগুলোর ধারণা সত্যজিৎ রায় ছাড়া ভারতে আর কোন ভাল চিত্র পরিচালক নেই—ভাল ছবিও তৈরী হয় না। খুবই দুঃখের বিষয়, এ'রা ভাবতে পারেন না, সত্যজিৎ রায়ের পরেও আরও দু' একজন ভাল চিত্রপরিচালক ভারতে রয়েছেন, যাঁদের ছবি বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসবে যে কোন ছবির সাথে প্রতি-যোগিতায় নামতে পারে। ছবির প্রযোজক শ্রীশান্তি চৌধুরীর কাছ থেকে জানা গেছে, মৃণাল সেনের "মাটির মানুষ" ছবিটি যাতে নির্বাচিত হয়ে বার্লিনে প্রদর্শিত হতে পারে, তার জন্যে সত্যজিৎবাবু ব্যক্তিগত-ভাবে এখানকার ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালের ডিরেকটর ডঃ বাওয়ারকে পত্র দিয়েছিলেন—যে সত্যজিৎ রায়কে এখানকার চলচ্চিত্র উৎসব তাঁর জুরী কমিটিতে পেলে ধন্য হয়ে যায়, সেই সত্যজিৎ রায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও মৃণাল সেনের ছবি এখানে প্রদর্শিত হবার সুযোগ পায় না।

দু' এক বৎসর পূর্বে জাপানের ছবিও এখানকার নির্বাচন কমিটির তরফ থেকে ফেরত গেলে জাপানের সমগ্র ফিল্ম সংস্থা ঠিক করে বার্লিনে আর কোন জাপানের ছবি পাঠানো হবে না। জাপানের এই দৃঢ় মনোভাবে বার্লিনের ফিল্ম কমিটি বিচলিত হয়ে, জাপানকে আশ্বাস দেয়—জাপানের, যে ছবিই এরপরে আসুক, তাকে গ্রহণ করা হবে। এরপর থেকে, জাপান তার অতি জঘন্য যৌন ছবিও এই চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শন করাতে এতটুকু অসুবিধা ভোগ করছে না। মিঃ খান্নাকে এখানকার ভারতীয়দের তরফ থেকে কেবল এই অনুরোধই জানানো হয়েছে ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনায় পুনরাবৃত্তি ঘটলে, জাপানের মত ভারতও যেন এমনি দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেন। এটা কেবল শিল্পের প্রশ্ন নয়, ভারতের আত্মসম্মানেরও প্রশ্ন। তবে প্রশ্ন হচ্ছে—এ ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবার মত ভারতের বুকের পাটা আছে ত?

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

(চৌত্রিশ)

রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন মহা দুর্দিন। এলোমেলো হাওয়া বইছে, বলা নেই কওয়া নেই বৃষ্টি পড়ছে, কখনও বন্যা কখনও দুর্ভিক্ষ। শকুন উড়ছে—রাজনীতি নিয়ে জুয়োখেলা। নূতনের অভিষেকে জনগণের যে উল্লাস তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল, তারা বুঝতে পারল ধোঁকা খেয়েছে। যে নেতারা নির্বাচনের আগে হাজারো রকম প্রতিশ্রুতির প্রলোভন দেখিয়েছে, গদীতে বসে তার কোনটাই কাজে পরিণত করতে পারল না। তখনও বক্তৃতা—বক্তৃতা নিজেদের অক্ষমতাকে চাপা দেওয়ার জন্যে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার অছিলা। স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ এতগুলো বছর এদেশের লোক শুধু বক্তৃতাই শুনেছে, আর কত শুনবে। ভেবেছিল নেতৃত্ব বদলের ফলে হয়ত কিছুটা ভাল ফল পাওয়া যাবে, অথচ দেখা গেল কিছুই হল না। ইংরাজ আমলের অভিশপ্ত আমলাতন্ত্র স্বাধীনতার ইতিহাস কলঙ্কিত করে ঠিক আগের মতই আজও বয়ে চলেছে, আরও কতদিন চলবে কে জানে। কালান্তক লালফিতে, অচল ফাইলের পাহাড়, কর্মবিমুখ সরকারী কর্মচারী, চুরি, ঘুষ, কালোবাজার, ক্রম-বর্ধমান জীবনযাত্রা, অসহায় বেকার জীবন, মুমূর্ষু নাগরিক, অক্ষম কর্পোরেশন, রাস্তার আবর্জনা, দুর্নীতিগ্রস্ত হাসপাতাল, বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ, সর্বহারা জনতা। সবই আগের মত রইল, কিছুই বদলালো না, মানুষের মন হতাশায় ভরে গেল। এ সমাজের অবক্ষয় কে রোধ করবে? চারদিকে দম বন্ধ করা অন্ধকার, ক্রমশ নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

জনপ্রতিনিধিদের চিনে নিতে আর দেরী হল না, গদীতে বসার জন্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেল, খাওয়াখাওয়ি, মারামারি, দল ভাঙাভাঙি। ভুঁইফোঁড় নেতাদের সৃষ্টি, যে যত এম, এল, এ, পুষতে পারবে তার তত কদর, মেয়েমানুষ আর মদের হররা ছুটল।

এই নোংরামির কারবারে জিতল শশধর বোসের মত লোকেরা। ক'দিন আগেও এরা ছিল সম্পূর্ণ গাঁইয়া, কলকাতায় আসতে ভয় পেত। চৌরঙ্গী অঞ্চলে যেতে হলে সঙ্গে লোক নিত, সেই মানুষটা এই ক'মাসের মধ্যে লায়েক হয়ে উঠেছে। গ্রামে বড় একটা যায় না বললেই হয়, কলকাতায় বালিগঞ্জ স্টেশনের হোটেলে তার পাকাপোক্ত আস্তানা। হাতে সিগারেটের টিন, সবসময় গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রে ভেট পায় মদের বোতল। ক'দিন আগে মেয়েমানুষ জোটাতে শশধর বোসকে লম্বুর কাছে ধর্না দিতে হয়েছিল, লম্বু পর্দা ঢাকা স্টেশন ওয়াগন করে এই জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে যায় একটি কলেজের সামনে। দূরে গাছের তলায় হাতে বই খাতা নিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল লম্বুর ইশারায় সুড় সুড় করে গাড়িতে উঠে পড়ল, বসল শশধর বোসের পাশে। উত্তেজনায় শশধরের তখন বুক ধড়ফড় করছে, ভাল করে মেয়েটার দিকে তাকাতে সংকোচ বোধ করল, কত বয়েস, সত্যি কলেজের মেয়ে কিনা জানবার চেষ্টাও করল না।

মেয়েটার কিন্তু কোন লজ্জা নেই এবং শশধরের হাবভাব দেখে হাসল, বলল কই, কথা বলবেন না।

শশধর হাঁফাতে থাকে, বলব বইকি, মানে তাই তো ভাবছি—আপনার নাম?

—নাম জেনে কি হবে?

—না মানে কি বলে ডাকব?

—নাইবা ডাকলেন। দূরে কেন, কাছে আসুন।

লম্বু তখন গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, কান কিন্তু খাড়া, পেছনের প্রেমালাপ শুনছে। মনে মনে হাসছে শশধরের বোকামী দেখে, একেবারে বাজারের মেয়ের হাতে দুখানা বই ধরিয়ে দিয়ে কেমন কলেজ গার্ল বলে চালিয়েছে, তা না হলে কি পদীর জন্যে কেউ এতগুলো টাকা দেয়!

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পর হোটেলের ঘরে ফিরে এসে শশধর বোস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর এসব ঝামেলার মধ্যে যাবে না, কোথায় কে দেখে ফেলবে, তখন কি কেলেঙ্কারী হবে কে বলতে পারে। কিন্তু শশধর বোস এ প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি, মেয়েমানুষের নেশা মদের চেয়েও কড়া। ক'দিন বাদেই আবার সে ছোঁকছোঁক করতে শুরু করেছে। লম্বু এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, বলল, লজ্জা যখন ভেঙে গেছে আর কোন চিন্তা নেই স্যার, এ হল কলকাতার শহর, কোন

জাতের মেয়ে চান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, পাঞ্জাবী, বাঙালী, ফিল্মস্টার, যেমন যেমন খরচা করবেন। আর গাড়ি করে ঘুরতে হবে না, তাদের আস্তানায় নিয়ে যাব। কেউ কিছু জানতে পারবে না, আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই।

—সত্যি বলছ লম্বু! যদি কোন বিপদ হয়!

—আরে তার জন্যে তো আমি আছি।

সে সন্ধ্যায় লম্বু শশধর বোসকে নিয়ে গিয়েছিল এক চীনে রেস্তরাঁয়। কেবিনের মধ্যে ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মদ খাওয়াল, বুঝল নেশা যখন বেশ জমাট হয়েছে সাজিয়ে গুজিয়ে মতিকে এনে বসিয়ে দিল তার পাশে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এর নাম মতি বিবি, এককালে থিয়েটারে খুব নাম ছিল।

শশধর-এর তখন নেশা ধরেছে, বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতবার আমি ওকে স্টেজে নাচতে দেখেছি।

মতি না হেসে পারে না, শুধু নাচ দেখেছ, কেন আমার গান শোনানি?

—নিশ্চয় শুনেছি কিন্তু ঠিক ঠাওর করতে পারছি না।

ঠাওর করবার উপায়ও ছিল না শশধর বোসের, মতিকে সে যে দেখেছিল সরস্বতী পুজোর হাঙ্গামায় ফটিকদের পাড়ায় নিখোঁজ পুলিস খুঁজতে গিয়ে তা সে বেমালুম ভুলে গেছে। নেশার ঘোরে মুখখানা আবছা ভেসে উঠছে, কিন্তু আর কিছুই মনে পড়ছে না।

চটুলা মতি চট করে জিজ্ঞেস করল, আমার সেই গানটা মনে নেই? গুন গুন করে গাইলো, ছেলে ধরার ভয় ধরেছে বেরিও না রাস্তায়—

মাতাল শশধর বোস বাহবা দেয়, বাঃ বাঃ, তোফা গান, আবার গাও।

—শুধু গানই শুনবে, নাচ দেখবে না?

শশধরের কথা জড়িয়ে যায়, বেশ, তাহলে নাচো, গাও—,

—এখানে কোথায় নাচব, আমার বাসায় চল।

—তাই চল, লক্ষ্মু আমাকে নিয়ে চল।

লক্ষ্মু মৃদু স্বরে মতিকে ভর্ৎসনা করে তুই একেবারে বোকা, তোর ঐ বস্তির ঘরে ঢুকলে এ মালের নেশা ছুটে যাবে।

মতিও চোপা দেয়, আমি তোর মত বোকা নই, নবপল্লির বাড়ির চাবি জোগাড় করে এনেছি, ব্যাগের মধ্যে আছে।

লক্ষ্মুর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, গলা আরও নামিয়ে বলে, তাহলে তো এ শালাকে বিদেয় করে ঐ ঘরেই দুজনে রাত কাটাতে পারব।

মতি চোখ মেরে সায় দেয়।

এই নবপল্লির বাড়িগুলোর কিছু ইতিহাস আছে। দেশ ভাগের পর কলকাতার অনেকগুলো বাড়ি ফাঁকা হয়ে যায় কারণ মালিকরা চলে যায় বিদেশে। যাদের ওপর এ বাড়িগুলোর দেখাশুনো করার ভার থাকে তারা কিন্তু খলিফা লোক। বাড়ির বেশির ভাগ অংশটাই কম ভাড়ায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ভাড়া দিয়ে দেয়, কিন্তু দু'একখানা ঘর নিজেদের তাঁবে রাখে। ভাড়াটেদের সঙ্গে কড়ার থাকে তারা ঐ ঘরগুলোর দিকে নজর দেবে না, কে আসছে কে যাচ্ছে তা নিয়ে যেন তারা মাথা না ঘামায়। ভাড়াটেদেরও হাবাকালা সেজে থাকতে আপত্তি নেই, কারণ তারা যে কম টাকায় বাসা পেয়েছে। ঐ বিশেষ ঘরগুলো ঘণ্টা বা রাত হিসেবে ভাড়া পাওয়া যায়, টাকা জমা দিয়ে ঘরের চাবি নিয়ে আসতে হয় যেমন আজ মতি নিয়ে এসেছে। সাধারণত ঘরে একটা খাটপাতা থাকে, একটা আলনা, মুখ দেখার আয়না, কোথাও বা ড্রেসিং টেবিল, জলের কুঁজো গেলাস, আর দু' একটা টুকিটাকি জিনিস। বলাই বাহুল্য, এর সঙ্গে লাগোয়া কলঘর থাকে। এ ঘরগুলো থেকে আয় হয় প্রচুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন খদ্দের। হয় ছেলেরা মেয়ে নিয়ে আসে, নয়তো মেয়েরা ছেলে। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনেও এ ঘরগুলোর প্রয়োজন হয়। তখন ভাড়া যোগায় পার্টি। হঠাৎ কোন কর্মী বা নেতাকে গা ঢাকা দিতে হলে এইসব ঘরে আশ্রয় নিতে হয়, দিনের পর দিন ঘরের মধ্যে তারা বন্ধ থাকে, পার্টির লোক এসে খাবার দিয়ে যায়, কিন্তু কাকপক্ষীও কোন খবর পায় না, হয়ত তাদের জন্যে পুলিস হন্যে হয়ে ঘুরছে, কাগজ তোলপাড় করছে, তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে এইসব ঘরের খাটে শুয়ে ঘুমোয়। আবার প্রয়োজন হলে এদের বর্ডার পার করে দেওয়া হয় যাতে অন্য দেশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। এইসব কারণেই যাদের হাতে এইসব বাড়িগুলি দেখাশোনা করার ভার আজকের সমাজে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

শশধর বোস অবশ্য যখন মতির সঙ্গে নবপল্লির বাড়ির ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল তখন আর তার বিশেষ হুঁশ নেই, অনেক কষ্টে চোখ দুটো টেনে খুলে রেখেছে, কিভাবে কোন রাস্তা দিয়ে যে ও বাড়িতে পৌঁছল তার খেয়াল রাখতে পারেনি। কোনরকমে খাটের ওপর বসে পড়ে জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করে, বাঃ, এত খাসা বাড়ি, এটা কি তোমার?

—তবে আর কার?

—আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আসব।

—যখন খুশি আসবে।

—আজ বোধ হয় বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি, শরীরটা ভাল লাগছে না।

—কোন ভয় নেই, তুমি জুতো খুলে খাটের ওপরে শোও, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

শশধর ছটফট করে, না, আমি হোটেলে ফিরে যাই, কষ্ট হচ্ছে। আমার জামার পকেটে টাকা আছে, তোমার যা ইচ্ছে নিয়ে

নাও। লম্বু কোথায় গেল, আমায় একটা ট্যাক্সী করে নিয়ে চলুক।

লম্বু ঘরের কোণ থেকে সাড়া দিল, আমি এখুনি ট্যাক্সী ডেকে আনছি শশধরদা, আপনি ঘাবড়াবেন না।

শশধর তখনও বিড়বিড় করে, মতিবিবি, তুমি টাকা তুলে নাও।

মতি অভিনয় করে, তাই কখনও হয়, তোমার শরীর খারাপ আর আমি টাকা নেব?

শশধর বোস নিজেই পাঞ্জাবীর পকেটে হাত চালিয়ে খান কয়েক দশ টাকার নোট বের করে আনে, মতির হাতের মধ্যে গ'ুজে দিয়ে বলে, কমবেশি কি আছে জানি না, এগুলো লক্ষীটি তোমার কাছে রেখে দাও।

মতি এবার আর আপত্তি করে না, নোট-গুলো ব্লাউজের মধ্যে ভরে ফেলে। মুখে বলে, আবার আসবে তো?

শশধর বোসের প্রতিশ্রুতি, নিশ্চয় আসব। তোমাকে ভাল লেগেছে, তোমার বাড়ি ভাল লেগেছে, শুধু শরীরটা কিরকম করছে, এখনও ট্যাক্সী আনছে না কেন?

সে রাত্রে ট্যাক্সীতে বমি করতে করতে আর সর্দারজীর গালাগাল শুনতে শুনতে শশধর বোস কোনরকমে বালিগঞ্জ স্টেশনের হোটেলে এসে পে'ছিয়। মিটারের ভাড়ার ওপর করকরে দশ টাকার নোট দণ্ড হিসেবে দিতে হয়।

ঠিক এইভাবে শহর কলকাতার মাইফেলী-বাবুদের মত শশধর বোস যখন ক্রমশ লায়েক হয়ে উঠছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে দল ভাঙ্গা-ভাঙ্গির হুজুগ পড়ল। শশধরের মত নির্দলীয় এম. এল. এ.দের পোয়া বারো। নানা দল থেকে, নানারকম প্রস্তাব আসছে—মন্ত্রিত্ব, টাকা, মেয়েমানুষ যা চায় তাই পাবে, শুধু তাদের দলে নাম লেখাতে হবে, ভোটের সময় সরকারকে চিতপাত করে দিতে হবে। অনেকেই অনেক দলে ঢুকে পড়ল, কিন্তু শশধর বোসকে কেউ ভেড়াতে পারল না। এই ক'মাসে বুদ্ধু লোকটা শেয়ালের মত চতুর হয়ে পড়েছে, চালাক মেয়েরা যেমন কুমারী থেকে বহু পুরুষের কাছ থেকে প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ উপহার আদায় করে তেমনি শশধর বোস নির্দলীয় থেকে সব পার্টির কাছ থেকেই ডালি আদায় করতে থাকল। এ ডালি শুধু ফল, তরকারি, মাছ, মাংস, মদের নয়, তার সঙ্গে টাকার খামও আসত। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে শশধর বোস ফে'পে ফুলে উঠল। সাজে শৌখিনতা এল। গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচান ধুতি। যে সে সিগারেট নয়, একেবারে ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ; আর বাজারের ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট ট্যাক্সি; আর শ্বশুরবাড়ি নয়, মেয়েদের আনতে লাগল তার হোটেলে।

শহর কলকাতায় মেয়েছেলে পাওয়া যে এত সহজ শশধর বোস কিন্তু একথা আগে কল্পনাও করতে পারেনি। যে পার্টির দালালরাই তাকে ভজাতে আসে, দরদস্তুর সেরে যাবার সময় নীচু গলায় মেয়েমানুষের লোভ দেখাতে ভোলে না। এ তাদের মিথ্যে বড়াই নয়, সত্যি এ ক'দিনের মধ্যে অনেক মেয়ে শশধর বোস দেখল। বিবাহিতা, অবিবাহিতা. ষোড়শী, বিংশোত্তরী, আবার চল্লিশের উপর বয়সীও, নানা জাতের, নানা ভাষার. নানা রূপের।

আজ যাকে নিয়ে শশধর বোস ঘরের আলো কমিয়ে বিছানায় শুয়েছিল সে কিন্তু ফিল্ম স্টার। বয়েস কম, মাথায় হাল ফ্যাশানের চুড়ো করে বাঁধা খোঁপা। প্রসাধনে পটু, প'চিশটা মেয়ের মধ্যে সহজেই সে পুরুষ মানুষের চোখে পড়বে।

বিগলিত শশধর বোস চোখ দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে এই সুন্দরীকে দেখে, জিজ্ঞেস করে, আপনার কোন্ ছবি দেখেছি বলুন তো?

মেয়েটির সপ্রতিভ উত্তর, এখনও দেখেননি, তবে দেখবেন। যে দুটো ছবিতে কাজ করছি, তার এখন আউটডোরের শুটিং চলছে। শেষ হতে দেরী আছে।

এতটুকু বয়েসে এ লাইনে গেছেন বাড়িতে কেউ আপত্তি করেনি?

মেয়েটি হাসল, বাঃ, আপত্তি করবে কেন? আমি তো রোজগার করছি।

শশধর বোস নেশা জমাবার জন্যে গ্লাসের পানীয় এক চুমুকে শেষ করে দেয়, বলে, তা সত্যি, তবে এ লাইনটা শুনেছি—

মেয়েটির পাল্টা প্রশ্ন, ভাল নয়, এই তো? তা মেয়েদের পক্ষে কোন লাইনটা ভাল শুনি? বাড়ির থেকে বেরলেই আমাদের বাইরের শিকার হতে হয়। রোজগার করতে গেলেই শুতে হয় কারুর না কারুর সঙ্গে, ছবির জগতে ডিরেক্টার, হিরো, প্রোডাকশন ম্যানেজার, তা ছাড়া প্রডিউসার তো আছেই। আমাদের মত এক্সট্রাদের কেউই রেহাই দেয় না। তাদের খুশী রাখতে না পারলে আমাদের ছবি উঠবে কেন? তবে হ্যাঁ, একবার যদি এ লাইনে নাম হয়ে যায়, তখন এই লোকগুলোই চাকরের মত আমাদের বাড়িতে বসে থাকবে।

—আপনার মনে হয় আপনি এরকম নাম করতে পারবেন?

মেয়েটির দৃঢ় উত্তর, তা না হলে এ লাইনে এসেছি কেন? আজকের দিনে বড় হওয়াটাই আসল কথা, কিভাবে বড় হলাম তার খবর কেউ রাখতে চায় না। এই ধরুন আজ আপনার সঙ্গে শুচ্ছি, কদিন বাদেই শুনছি আপনি নাকি মন্ত্রি হবেন তখন—

শশধর বোস আনন্দে ডগমগ করে, এ খবর আপনাকে কে বলল?

—সব খবর নিয়ে তবে এসেছি। বলেছি টাকাও নেব না। আপনি শুধু কথা দিন যদি মন্ত্রী হন আমাকে দেখবেন।

মাতাল শশধর মেয়েটিকে কাছে টেনে নেয়, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, নিশ্চয় দেখব, যেমন আজ দেখছি তেমনি দেখব। তোমাকে আমি হিরোইন বানাব, তোমাকে গাড়ি কিনে দেব, বাড়ি কিনে দেব, তোমার আমি—

উচ্ছ্বাস শেষ হতে পেল না, দরজায় কে টোকা মারছে। প্রথমটা শশধর শুনতে পায়নি, কিন্তু মেয়েটি সজাগ ছিল, বলল, কে যেন দরজায় ধাক্কা মারছে।

শশধর বিরক্ত হয়, কোন শালা আবার অসময়ে জ্বালাতন করতে এল।

গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কে?

দরজার বাইরে থেকে চাপা গলায় উত্তর এল, আমি লম্বু।

—এখন দেখা হবে না, কাল সকালে এস।

—খুব জরুরী দরকার স্যার, শিগগীর একবার বাইরে আসুন।

—কেন, কি হয়েছে?

—পুলিস, বাড়ি ঘেরাও করেছে।

পুলিস শব্দটা যেন ইলেকট্রিক ছুঁচো-বাজীর মত শোঁ শব্দ করে ঘরের মধ্যে চক্কোর কেটে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি বিহ্বল হয়ে পড়ে, তাহলে কি হবে, শিগগীর বাইরে যান। পুলিসকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

মেয়েটি ততক্ষণে জামা কাপড় পরতে শুরু করেছে।

শশধর বোস কোনরকমে টলতে টলতে দরজা খুলে বাইরে আসে, এসব কি ব্যাপার, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

লম্বু মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দেয়, আর বোঝাবুঝির কিছু নেই, এখন পুলিস এসে যদি ঐ মেয়েটির সঙ্গে আপনাকে হাতে-নাতে ধরতে পারে, ব্যাস, ক্যারিয়ার ফিনিশড, জেল তো বটেই, কাগজের নোংরা মন্তব্য, তা ছাড়া লোকে থুথু দেবে যে?

—তাহলে কি করি লম্বু?

—এ ইচ্ছে করে কেউ আপনার সর্বনাশ করেছে। যারা আপনার কাছে মেয়ে পাঠিয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে পুলিসেও খবর দিয়েছে, ওই ওরা এল বলে, নীচের ঘরে ঢুকে খানাতল্লাশ করছে, আমি পালাই। বলেই লম্বু হাওয়া।

বিভ্রান্ত শশধর বোস কি করবে বুঝতে পারে না, একে নেশার ঘোর তার উপর এই রহস্যময় উত্তেজনা, ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। কিন্তু মেয়েটিও তখন কান্নাকাটি শুরু করেছে, দোহাই আপনার আমাকে রক্ষে করুন, আমি ফিল্ম লাইনের মেয়ে, আপনার চেয়েও বেশি লোক আমাকে চেনে, এখন থানা পুলিস করতে হলে লজ্জায় কোথাও মুখ দেখাতে পারব না।

—কি যে করি, কি যে করি, শশধর প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থায় লম্বুকে খুঁজতে আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এবার লম্বুর বদলে যাকে দেখতে পেল সে স্বয়ং বাস্তু ঘুঘু। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে শশধর ডুকরে কাঁদে, আমাকে রক্ষে করুন দাদা, মান ইজ্জত সব গেল।

বাস্তুঘুঘু কিন্তু অচঞ্চল, খাদের গলায় বলল, অত ঘাবড়াবেন না, বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, আমি লম্বুর কাছে সব শুনেছি। চলুন, ঘরের মধ্যে যাই।

ঘরে ঢুকে বাস্তুঘুঘু একটা স্যুটকেস টেবিলের উপর রাখল, এটা সে সঙ্গে করেই এনেছিল। শশধর বোস জিজ্ঞেস করল, ওতে কি আছে।

—শাড়ি, ব্লাউজ, মেয়েদের জামা কাপড়, কাঁটা ফিতে চিরুনি, সিঁদুরকোটো—।

—কেন?

—পুলিস যদি এ ঘরে ঢোকে বুঝিয়ে দেবেন মেয়েটি আপনার স্ত্রী, তাহলেই ঝামেলা চুকে যাবে।

মেয়েটি কিন্তু শিউরে ওঠে, এ কি বলছেন?

বাস্তুঘুঘুর শান্ত উত্তর, ঠিকই বলছি মা, সিঁদুরকোটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে লাগিয়ে নাও, একটা টিপও পরতে পার, এ সব মেক আপ নেওয়া তো তোমাদের অভ্যেস আছে। তবে আমি বাইরে থাকছি চেষ্টা করব যাতে পুলিস এ ঘরে না ঢোকে।

বিগলিত শশধর বোস বাস্তুঘুঘুর হাত দুটি ধরে সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে, তা যদি পারেন আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। ভাগ্যিস আপনি এ সময় এসে পড়েছিলেন!

বাস্তুঘুঘুর সহজ উত্তর, এ হোটেলটা আমারই বেনামে আছে, কেউ বিপদে ফেলার জন্যে পুলিস পাঠিয়েছে, তবে সামলে নিতে পারব, ঘুষের টাকা সঙ্গে রেখেছি, আর রেখেছি এই চিঠিটা, নীচে সই করে দিন—

—কিসের চিঠি?

—আপনার স্বীকৃতি, আমার দলে যোগ দিলেন বলে।

শশধর বোস অবাক হয়ে চিঠিটা দেখল, তাকাল মেয়েটির দিকে, লক্ষ করল বাস্তুঘুঘুর গম্ভীর মুখ, শুনল বাইরে পুলিসের বুটের আওয়াজ। আর কথা না বাড়িয়ে সই করে দিল চিঠির তলায়।

রাজনীতির হাড়িকাঠে বলি হল শশধর বোস, নির্দলীয় এম, এল, এ।

(ক্রমশ)

পণ্য তৈরির পণ্য
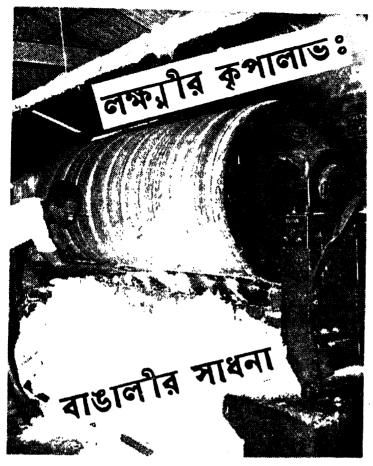
পঞ্চত্বপ্রাপ্তি শব্দটা পশুদের বেলায় কোনো দিনও খাটে নি, আজও খাটে না। আমরা স্বার্থপর মানুষ গরু মোষ ভেড়া-ছাগলের মতো নিরীহ পশুদের যে কেবল কেটে মাংসটি খেয়ে ফেলেই ক্ষান্ত হই তাই-ই নয়, তাদের অস্থিচর্ম-শৃঙ্গনখ-অন্ত্রদন্তকেও অসংখ্য কাজে লাগাই। প্রকাণ্ড হাতি ছোট ব্যাঙ কিছুই রেহাই পায় না আমাদের লোভ থেকে। জামাজুতো থেকে ঘর সাজাবার জিনিস তৈরি করা ছাড়াও জীবজন্তুর অন্ত্রের তৈরি বেহালা-সারেঙ্গীর তারে ঘোড়ার লেজের ছড়ি ও ছড় ঘষে সুরের ঢেউ তুলি, আর চামড়ায় ছাওয়া তবলা-মৃদঙ্গ ঢাকঢোল খোল বাজিয়ে সুরের সঙ্গে তালের সমন্বয় ঘটাই।

এমনি করে মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল পশুদেহের অনেক অংশই লয় পায় না—পঞ্চভূতে বিলীন হয় না।

এই ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করলাম 'ক্যালকাটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড মিনারাল্‌স কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড'—এর (বড্ড বড়ো নাম) কারখানায় গিয়ে।

CICM ফ্যাক্টরীটি কলকাতার পূর্বাঞ্চল ট্যাংরায় অবস্থিত।

কারখানায় ঢুকেই বাঁহাতি একটা চালার নীচে কালো আর পাঁশুটে রঙের কটুগন্ধ কি যেন কতকগুলি আবর্জনা দেখলাম। প্রশ্ন করে জানলাম যে, ওগুলো raw hide fleshings (র-হাইড ফ্লেশিংস), অর্থাৎ জীবজন্তুর দেহাবশেষ। পায়ের খুর, মাথার শিঙ, চামড়ার টুকরো, পুচ্ছের গুচ্ছটুকুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পচতে না দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে; যথাসময়ে কাজে লাগানো হবে।

এই সব হচ্ছে সিরিশ অর্থাৎ glue-র র-মেটিরিয়াল আসে ট্যানিং কারখানা থেকে। ন্যাশন্যাল ট্যানারি, বাটা কোম্পানীরা সবাই জন্তুর চামড়াটা উদ্ধারের পর অবশেষ যা থাকে তাকে 'কিউবিক মেজার' অর্থাৎ ঘনফুট হিসেবে বিক্রি করে দেন। সেই থেকেই CICM কিছুটা কিনে সিরিশের আঠার শত শত টুকরো আর কাপড়-কাচা 'লাক্স' সাবানের মতো ফ্লেক্‌স্‌ তৈরি করেন তাদের এই ত্রিশ বছরের পুরনো কারখানাতে।

জল ও বাষ্পের মাধ্যমে এবং রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জারিত ও পিষ্ট হতে হতে সেই জান্তব দেহাবশেষ রূপ নেয় সিরিশ নামক পদার্থের।

কত কাজেই না লাগে এই সিরিশ বস্তুটি! আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের দেশলাই তার অন্যতম। (ছেলেবেলায় ঘুড়ির সুতোর মাঞ্জাতেও আমরা সিরিশের ব্যবহার করতাম। বড়োরা যদিও সেটাকে কাজের জিনিস বলবেন না, কিন্তু ভালো মাঞ্জায় লাগে কাচের গুঁড়োর সঙ্গে সিরিশ, আর জ্যেষ্ঠরা যা-ই বলুন না কেন, কনিষ্ঠদের পক্ষে সেটা দেশলাইয়ের চেয়েও ঢের বেশি কাজের জিনিস)। দেশলাই বাদে আছে প্রিন্টিং মেসিনের রোলার কম্পোজিশন ও সিরিশ কাগজ তৈরিতে, পেপার মিলে, আর্টিফিশিয়াল সিল্ক কারখানায়, রাবার শিল্পে, রঙের কারখানায়, যেখানে এই সিরিশ ছাড়া চলবে না।

কিন্তু সিরিশ উৎপাদন বর্তমান কর্মক্রমের প্রধান একটি অঙ্গ হলেও CICM-এর জন্মের সময়ে তার কোনো স্থান ছিল না।

CICM-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবসন্তলাল দাস এবং তাঁর অগ্রজ, দাস কোং অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'-এর (এঁরা দেখছি লম্বা লম্বা নামকরণ পছন্দ করেন) ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমাণিকলাল দাস মহাশয়রা ১৯৩১ সালে যখন ৫০০ টাকার মূলধন নিয়ে কাজে নামেন তখন তাঁদের একমাত্র ব্যবসা ছিল ছোট একটি দেশী গ্রাইণ্ডিং মেসিনে কাচ, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি পিষে তার পাউডার অর্থাৎ চূর্ণ কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা। নামী খরিদ্দারদের মধ্যে তখন ছিলেন প্রসিদ্ধ Wimco দেশলাইয়ের কারখানা, 'ক্যালকাটা ম্যাচ ফ্যাক্টরী' প্রভৃতি।

মাণিকবাবু ও বসন্তবাবুর বাবা স্বর্গত আশুতোষ দাস ব্যবহারজীবী ছিলেন। ধনী না হলেও তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ পিতা। ছেলেদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছিলেন। ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে চাকরির চেষ্টাতেও বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তার ঠিক আগে ১৯২৯-৩০ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রকোপে চাকরির বাজারেও সংকট দেখা দিয়েছিল।

বসন্তলাল আমাকে বললেন যে, সৌভাগ্যক্রমে চাকরি তিনি পেলেন না, দাদাও পান নি। অগত্যা ওই ৫০০ টাকার পুঁজি নিয়ে উত্তর কলকাতায় ছোট্ট একটি জায়গায় তাঁদের মিনারাল ক্রশিং শিল্প প্রচেষ্টায় নামলেন।

পাঠকদের একটা কথা বলছি (পাঠিকারা নিজগুণে ক্ষমা করবেন), স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল,

আমার মতো কাঁচা নন; কিন্তু পুরুষসা-ভাগ্যের বিচিত্র চক্র আমাকে সারাজীবন মুগ্ধ করেছে, আবার বিমূঢ়ও করেছে। মুগ্ধ হয়েছি, সামান্য দোকানদার বা বিল-ক্লার্ককে ৭৫ পারসেণ্ট luck এবং ২৫ পারসেণ্ট pluck-এর দৌলতে ক্রোড়পতিত্বে উপনীত হতে দেখে, আর স্তম্ভিত হয়েছি ভাগ্যহত অর্বুদপতির হিরন্ময় প্রাসাদ ধূলিসাৎ হতে দেখে।

এই রকম এক পড়ে যাওয়া মাল্‌টি-মিলিঅনেয়ারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি ছিলেন কলকাতার এক বিশিষ্ট মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী। তাঁর পতনের ঘটনাটা আন্দাজ বছর চল্লিশেক আগেকার। পাট, শেয়ার সব কিছুতেই অতুল ধন লাভের পর সে ভদ্রলোকের বাণিজ্য থেকে শিল্পোদ্যোগে ক্ষেত্র প্রসারের বাসনা হলো। কোনো ইংরেজ এজেন্সী হাউস একটি প্রকাণ্ড কটন মিল বিক্রি করবেন শুনে তিনি সেদিকেই এগোলেন। সে যুগের লোকের মুখে শুনে-ছিলাম যে তিনি পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি টাকার একটি চেক লিখে সেই মিলটি কিনে-ছিলেন—সেকালের ৫০ লক্ষ ষোলো-আনার টাকা, অর তুলনায় আজকের টাকার ক্রয়শক্তি তিন আনারও কম। শেঠজীর নাম ছিল কেশোরাম পোদ্দার। নিজের নামে মিলটির নাম রেখেছিলেন কেশোরাম কটন মিলস। বিড়লাদের পরিচালিত আজকের কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ তারই বংশধর। শিল্পপতি হবার পরেও তিনি তাঁর নানা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপরে একদিন চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করলেন; তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য কর্পূরের মতো উবে গেল। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে আমার সঙ্গে কেশোরামজী পোদ্দারের দু-একবার আলাপ হয়েছিল। তিনি বজ্রপাতেও ভেঙে পড়েন নি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছোট ছোট কারবারে জড়িত ছিলেন।

আমার প্রথম যৌবনে এইরকম আর একটি ইন্দ্রপাত ঘটেছিল। হুকুমচাঁদ জুট মিল, ইনসিওরেন্স প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ কেশোরামবাবুর চেয়েও ধনী হয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কের তুলোর বাজারে এককালে তিনি যেদিকে আঙুল হেলাতেন বাজার দর-ও সেই দিকেই চলতো। তাঁর একটা রেকর্ড বোধহয় বিশ্বের কোনো বণিকই আজও ভাঙতে পারেন নি। সেটা হলো, একই দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিউ ইয়র্কের তুলোর ফাটকায় হুকুমচাঁদজীর ১৫ কোটি টাকা লাভ করার ঐতিহাসিক কীর্তি।

সেই শেঠজীরও শুনেছি পরে প্রায় কেশোরামজীর মতোই দুঃসময়ের কবলে পড়তে হয়েছিল।

দু' সপ্তাহ আগে যে গ্রীক ধনকুবেরটি স্বর্গীয় প্রেসিডেণ্ট কেনেডির বিধবা জ্যাকেলিন কেনেডির পাণিগ্রহণ করলেন সেই অ্যারিস্টটল সোক্রাটিস ওনাসিস মশায়ের জীবনকাহিনীও অদ্ভুত। সামান্য অবস্থা থেকে শুরু করে কয়েক বছর আগে তাঁর নিজস্ব বাণিজ্যপোতের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়ে-ছিল পাঁচশোটার মতো। শুনেছি যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জুয়ার আড্ডা মণ্টি-কার্লোর অধিকাংশেরই এখন মালিক হচ্ছেন এই ওনাসিস। তাঁর নিজের ভূসম্পত্তির মধ্যে আর একটি হলো গ্রীসের কাছে স্করপিঅস দ্বীপ। জ্যাকেলিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সেই দ্বীপেই অনুষ্ঠিত হলো। ঐতিহাসিক গ্রীক রাজা ক্রেসাসের নামের অনুকরণে ওনাসিসের নাম ক্রেসাস হওয়া উচিত ছিল। গ্রীক দার্শনিক সোক্রাটিস এবং তাঁর প্রশিষ্য জ্ঞানী অ্যারিস্টটল ধনসম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। যা হোক, অ্যারিস্টটল সোক্রাটিস ওনাসিসের বিরাটত্বের মূলেও আছে ভাগ্যের বিচিত্র খেলা।

এগুলি কেনো উপমা নয়। এই সব দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে পুরুষের ভাগ্য বিষয়ে ওই শ্লোকটার ব্যাখ্যা করলাম মাত্র। গল্প নিয়ে যে কথাটা বলতে চাই তা হলো যে মানুষের জীবনে নিয়তির লীলাই সার কথা। মাণিকলাল ও বসন্তলাল দাস মশায়দের অদৃষ্টে যদি কলেজ ছাড়ার পর চাকরি পাওয়ার যোগটা থাকতো তবে তাঁদের এই প্রশংসনীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রয়াসের সাফল্যের কাহিনীটি আজ পাঠকমহলে উপস্থিত করতে পারতাম না।

১৯৩১ সালে যাত্রা শুরু করে দাস মশায়দের বাণিজ্যরথ দ্রুত এগিয়ে চললো। ১৯৩৮ সালে পৌঁছে দুই ভাই একটু দম নিলেন। সেই সময়ে তাঁরা তাঁদের দায়িত্বের দুটো ভাগ করে নিলেন। জ্যেষ্ঠ মাণিকলাল রইলেন কেবল ট্রেডিং নিয়ে। এই বিভাগের নাম হলো পূর্ববর্ণিত দাস কোং ইত্যাদি। বসন্ত-লাল নিলেন উৎপাদনের ভার। তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নাম হলো CICM।

কাজ বেড়েই চললো, গ্রাহকদের তালিকা লম্বা হতে লাগলো। আদি গ্রাহকদের নাম আগেই বলেছি। এখন যাঁরা আছেন তাদের কারো কারো নাম এবং তাঁরা C I C M-এর কাছ থেকে যা কেনেন তার ছোট একটি তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ করলে অগ্রগতির রূপটা বেশ বোঝা যাবে।

(১) গ্লাস-পাউডার কেনেন উইমকো, আসাম ম্যাচ, এস্যাভি ইণ্ডিয়া প্রভৃতি দেশলাই নির্মাতারা, (২) ম্যাঙ্গানীজ-পাউডার নেন সুর এনামেল, বেঙ্গল এনামেল, উত্তরপ্রদেশের হিন্দ ল্যাম্প, শ্রীদুর্গা গ্লাস প্রভৃতি, (৩) ফ্যাকটিস (রাবার তৈরিতে অপরিহার্য কাঁচামাল) কেনেন NRM-কলকাতা, স্বস্তিক রাবার—পুনা প্রভৃতি, (৪) ধাতব স্টিয়ারেটস ও ন্যাফথেটস-এর গ্রাহক অনেক; নামীদের মধ্যে আছেন ব্রিটিশ পেইণ্টস, জেনসন নিকলসন, ডানলপ, Esso, বম্বে বুফিং, জলন্ধরের কোটা রাবার, দিল্লীর বাজাজ রাবার ইত্যাদি, (৫) প্লু-ফ্লেকস বা সিরিশের খরিদ্দারদের মধ্যে বাটা শু কোং এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল উল্লেখযোগ্য।

অনেক লম্বা লিস্ট; সব নাম দেওয়া সম্ভব নয়। আমার লেখার ধারা বদলে এবারে এই ফর্দটি এই জন্যে দিলাম যে, এঁদের উৎপন্ন জিনিসগুলি হলো পণ্য গড়ার পণ্য, অর্থাৎ কাঁচামাল। এই সমস্ত জিনিস দিয়ে যাঁরা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করেন তাঁরা ছাড়া সাধারণ লোকের কাছে ব্যাপারটা নীরস ঠেকবে। তবে গ্রাহকদের নাম থেকে এই পণ্য-গুলির প্রয়োজনীয়তা নিরূপিত হবে বলেই লিস্টটা তুলে দিলাম। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বাঙালী রসায়ন-পণ্ডিতরা জটিল প্রণালীতে এর উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছেন এক বাঙালী প্রতিষ্ঠানে।

ফলিত রসায়নে এম এস সি, স্বর্ণ পদক বিভূষিত শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি এখন এই প্রতিষ্ঠানের চীফ কেমিস্ট। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এখানকার উচ্চমানের দ্রব্যগুলি তৈরি হচ্ছে। ম্যানেজার শ্রীজ্ঞান দত্ত C I C M-এর প্রাচীন কর্মচারী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবসন্তলাল দাস সকালের দিকটা ধর্মতলার হেড অফিসে কাটান আর বিকেলে কারখানাতে বসেন।

দুই শিফ্‌টে ভোর ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কারখানা পুরোদমে চলে। যত ফ্যাক্টরী এযাবত দেখেছি (সংখ্যায় নেহাত কম নয়) তার মধ্যে এই একটি দেখলাম যেটি নির্বিবাদে চলছে, যেটাতে শ্রমিক মালিক বিরোধের কোনো খবর পেলাম না। যা উৎপাদন হচ্ছে তার চারগুণ বাড়ালেও বাজারে মাল পড়তে পাবে না, এমনি নাকি চাহিদা; কিন্তু বসন্তবাবু কাজ আর বাড়াতে চান না। জমিটা বসন্তবাবুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। শুধু জমি কেন সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিই তাই, কারণ মাণিকবাবু, বসন্তবাবু আর তাঁদের ভগ্নীপতি শ্রীগোপালকৃষ্ণ বসু মহাশয়রাই এর প্রায় সম্পূর্ণ শেয়ারেরই অধিকারী। গোপালবাবু ত্রিশ দশকের শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি CICM এবং দাস কোম্পানীর সক্রিয় ডিরেক্টর।

আরও দু'-একজন শেয়ারহোলডার আছেন যাঁদের আমরা সকলেই চিনি। যেমন, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়। তিনি অবশ্য সামান্য কয়েকটা শেয়ারের মালিক; নামেই আছেন, কোনো দিন ডিরেক্টর হন নি। কিন্তু শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় পঞ্চাশ দশকে কয়েক বছর CICM-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রফুল্ল-বাবু, ভূপতিবাবু, স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (অতীতে তিনি কংগ্রেসের চীফ হুইপ ছিলেন) এঁরা সকলে মাণিকবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাণিকবাবু রাজনীতিতে কোনো দিন সক্রিয় অংশ নেন নি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা বেশবাসে সেকালের কংগ্রেসী বর্ণ ও গন্ধ এখনো বজায় আছে। মাণিকবাবু এককালে বন্ধু ধীরেন্দ্রনারায়ণের হুগলি ব্যাংকের ডিরেক্টর ছিলেন, আর দাস ভ্রাতাদের এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির মূলে ছিল ধীরেন্দ্রনারায়ণের সর্বাঙ্গীন সহায়তা। বস্তুত হুগলি ব্যাংকই দাস কোম্পানী ও CICMকে আজকের এই উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছিল। CICM-এর বিক্রয়ের ক্রমিক উন্নতির পরিচায়ক কয়েকটি অঙ্ক এখানে পেশ করছি :—

সাল	বিক্রয়
১৯৩৮	৮৩৫০০ টাকা
১৯৪৭	১৮০০০০ টাকা
১৯৫৭	৬০৮০০০ টাকা
১৯৬২	১০৩৭০০০ টাকা
১৯৬৭	১৫৭২০০০ টাকা

প্রতিষ্ঠানের ১১৪ জন কর্মীর বার্ষিক উপার্জন পৌনে তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু এঁদের মধ্যে শতকরা মাত্র চল্লিশজন বাঙালী। তার কারণটি হলো এঁদের সিরিশের উৎপাদন। গোড়াতেই সিরিশ এবং তার উৎস র-হাইড ফ্লেশিংস-এর কথা বলেছি। সেই মরা চামড়া আর হাড়গোড় ঘাঁটার কাজে শ্রমিকরা আসেন প্রধানত বিহার থেকে। বাঙালী শ্রমিকরা এখনও এই কাজে হাত লাগাতে অনিচ্ছুক ও অপারগ।

মজঃফরপুর জেলার শ্রীহরিচরণ রাম আমাদের খাদ্যমন্ত্রী জগজীবনজীর স্বজাতি ও দেশের লোক। ত্রিশ দশক থেকে হরিচরণ CICM-এ কাজ করছেন। পঞ্চাশোর্ধ বয়সেও তাঁর শরীরের গাঁথুনি শক্ত আর মুখের ভাবে শিশুর সরলতা। তাঁকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল গুরু রামানন্দের শিষ্য রবিদাসের কথা, যে-অন্ত্যজ রবিদাস চামারের শিষ্যা হয়েছিলেন চিতোরের রাণী ঝালি। 'প্রেমের সোনার কাঙালিনী' রাজরাণী ঝালি সামাজিক আচারের অর্থহারা বাঁধন ছিঁড়ে হরিপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছিলেন রবিদাস চামারের কাছে। হয়তো আজকের হরিচরণ রাম সেই মহাত্মা রবিদাসেরই বংশধর! কে জানে?

বসন্তবাবুরা সিরিশ তৈরির যন্ত্রপাতি বসিয়েছিলেন চল্লিশ শতকের মাঝামাঝি। শ্রীইসরারুল হক নামে ত্রিপুরা জেলার এক বাঙালী মুসলমান দাস মহাশয়ের সিরিশ সাপ্লাই করতেন। CICM মধ্যবর্তী হয়ে সেই সিরিশ বাজারে ছাড়তেন। ইসরারুলের তৈরী সিরিশের বাজারে খুব নাম হলো। বসন্তবাবু তাঁকে CICM-এই ভর্তি করে নিলেন; আর তখন থেকে ইসরারুলের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের প্রধান পণ্য গ্লু-ফ্লেকসের উৎপাদন CICM-এর নিজ কারখানাতেই শুরু হলো। ইসরারুল হক এখন পাকিস্তানে চলে গেছেন, কিন্তু যাবার আগে এই প্রতিষ্ঠানের তৈরী সিরিশের সুনাম ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন সারা ভারত-বর্ষের বাজারে।

অভিধানে দেখছি যে 'সিরিশ' বা 'সিরেশ' ফার্সি শব্দ থেকেই বাংলা শব্দ 'সিরিশ'-এর উৎপত্তি। হাজার হাজার বছর আগে বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্রের প্রচারক আরব দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে যখন ভারতের বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের আদান-প্রদান চলেছিল তখন পথিমধ্যে পারস্য দেশের সঙ্গেও ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক মিতালি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আমার নিজের একটা ভুল ধারণা ছিল যে, শিরীষ গাছের বাকল থেকে যে আঠা হয় অথবা গাব গাছের ফল থেকে যে 'গাম অ্যারাবিক' হয় তার সঙ্গে 'সিরিশ'-এর আঠার কোনো সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এখন দেখছি তা নয়—আগেরগুলি বনস্পতিজাত এবং শেষেরটি পুরোপুরি জান্তব আঠা।

CICM-এর হেড অফিসের প্রাচীন কর্মীদের অন্যতম শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জানলাম যে তাঁরা মাসে ১০ টন ক'রে

সিরিশ তৈরি করেন। কলকাতায় কিন্তু সিরিশের প্রধান কারবারী হলেন শ-ওয়ালেস কোম্পানী। শ-ওয়ালেসের মান্দ্রাজ ফ্যাক্টরীতে মাসে অনেক বেশি মাল তৈরি হয়।

১ টন সিরিশ তৈরি করতে ৮০০০০ গ্যালন জল খরচ হয়, ন্যাফথেনিক অ্যাসিডের আমদানি হয় রুমানিয়া থেকে আর সেই অ্যাসিডকে ভিত্তি করেই ন্যাফথানেট তৈরি হয়, অথবা বাদাম তেল আর তামাকবীজের তেল থেকে ফ্যাকটিস নামক উপাদানটি গড়া হয়—এই সমস্ত রাসায়নিক আলোচনার চেয়ে যাঁরা এগুলির উৎপাদন ও বিপণন করেন তাঁদের বিষয়ে রসালাপটা আমার কাছে বেশি লোভনীয় মনে হয়।

সুদর্শন অমরনাথ চ্যাটার্জি যৌবনে ভালো খেলোয়াড় ছিলেন; ব্যাডমিনটনে বড়ো বড়ো ম্যাচ খেলতেন। আর খেলাধুলোর সঙ্গে তাঁর আর একটি নেশা ছিল। সেটা হলো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা। ছেলেবেলাটা মোটের ওপর তাঁর ভালোই কেটেছিল। এখনো কনট্রাক্ট-ব্রীজ খেলা নিয়ে আনন্দেই আছেন; শিগগীরই নিজের টীম নিয়ে দিল্লী যাচ্ছেন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। তবে মধ্যের কয়েকটা বছর তাঁর পারিবারিক বিপর্যয়ে কেটেছিল। গান-বাজনা ছেড়ে CICM-এ চাকরি নিয়েছিলেন ১৯৪০ নাগাদ। সেই থেকে এখানেই আছেন। দাস মশায়দের নিজের লোক হয়ে গেছেন।

অমরনাথ বললেন যে, বছরে ১৫।১৬ লক্ষ টাকার মাল তৈরি করতে তাঁদের যা কাঁচামাল লাগে তার মধ্যে মাত্র ৮০।৯০ হাজার টাকার উপাদান বিদেশ থেকে আমদানি করলেই বেশ কাজ চলে যায়। অন্যরা হলে অনেক বেশি ইমপোর্ট করতে বাধ্য হতেন; কিন্তু বসন্তলাল গোড়া থেকেই বিদেশী উপাদান বা বিলিতী মেশিন দিয়ে কাজ করার বিপক্ষে। তাঁর এই দৃঢ়তা এবং তাঁর এঞ্জিনীয়ারিং-এর মাথা এই import substitution করে এসেছে প্রতিষ্ঠানের আদিকাল থেকে। তিনি নিজে এবং তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনায় CICM-এর দক্ষ কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় মেশিনের ডিজাইন করে এখানে সেসব তৈরি করিয়েছেন। অবশ্য সামান্য দু-একটা বিদেশী মেশিন যে ব্যবহার করেন না তা নয়। স্বদেশের একটা বড়ো উপকার করছেন এঁরা বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ রেখে।

মোরারজী ভাইয়ের নজর তো কেবল বড়োদের দিকেই নিবদ্ধ—এইসব নীরব কর্মীদের কথা কি তাঁর কানে পৌঁছয়? মোরারজীর মরাল রেটনিং আর ইকনমিকসের লেকচারগুলিতে যদি এইসব উদাহরণ সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেন তবে এখন সেই বক্তৃতাগুলো শুনতে আর পড়তে যত খারাপ লাগে ততোটা নিশ্চয়ই লাগবে না।

বাঙালী শিল্পোৎসাহীদের জ্ঞাতার্থে আর একটি কথা—বসন্তলালের একটি প্রস্তাব—বলে প্রবন্ধ শেষ করি। বসন্তলাল নিজের প্রতিষ্ঠানকে আর বাড়াতে চান না; অথচ তাঁদের উৎপন্ন জিনিসের এখনো প্রকাণ্ড চাহিদা আছে। তাই তিনি বলছেন CICM টেকনিক্যাল নো-হাউ, উৎপাদন পরিকল্পনা এবং মার্কেটিং-এর আতিঘাত সব বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করে উদ্যোগী বাঙালীকে এই ব্যবসাতে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এ পর্যন্ত বাঙালী অবাঙালী কোনো শিল্পপতির কাছ থেকে এমন একটি প্রস্তাব আমি অন্তত শুনিনি—এমন সহৃদয়তা, সংবেদনশীলতার ভাষা এই স্বার্থপরতার যুগে শুনতে এতো মধুর লাগে।

বিশ্বকর্মা

দশ

'কী হল—', পারলে বুলু জোরে কেঁদে উঠত। এক একদিন মনে হয়, এত চাপে বুকের পলকা হাড়গুলো 'মড় মড় করে ভেঙে যাবে। অথচ তখন খেয়াল থাকে না।

'ঠিক করেছি—', খোকনের পা বুলুর পেটের ওপর পড়ল।

নাকে অনেকটা বাতাস ভরে বুলু অন্ধকারে শুয়ে শুয়েই হাসল। খুকখুকের বদলে একটা বড় উ' ধরনের আওয়াজ হল। বুলুর কুবেরের ওপর খুব রাগ। বউ কষ্ট পাবে—চাই কি কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে মরেও যেতে পারে—সেজন্য এমন পুতুপুতু হয়ে চলবে?

'মনে নেই? খোকনের বেলায় মর মর হয়েছিলে—'

'তা বলে রোজ ফেলে দেবে?' বুলুর মাথায় আগুন ধরে যাওয়ার জোগাড়। হিসেব মত আজ বোধহয় জোড় দিন ছিল। তারও প্রায় হয়ে এসেছিল—অথচ এমন সময়—

অন্ধকার। আয়না থাকলেও মুখ দেখা যাবে না। মশারিতে কে আর আয়না রাখে। একটু আগে বুলুর শেকড়-বাকড় সুদ্ধ কুবের মোটা ভারি শাবল দিয়ে খুঁড়ছিল। এক এক খোঁচায় বুলু ডালপালা সমেত ওপরে উঠে যাচ্ছিল—আবার নীচেও পড়ছিল। এসব সময় কুবেরকে তার এত নিজের—এত জোরালো, ভর দিয়ে দাঁড়ানোর মত লাগে। পিঠ, পিঠের হাড়, হাত দুখানা ছুঁতে সবচেয়ে আরাম। এক একদিন কিন্তু সে আগে ফুরিয়ে যায়—তখনও কুবের খুঁড়ে চলে। সেসব সময় নিজেকে একটা কাঠামো মনে হয়, একেবারে কাঠের—কুবের আরও বড় কাঠামো—তখন খুঁড়লেও শরীরের ভেতরের শক্ত জিনিসপত্রে শুধু গুঁতো লাগে।

কুবের মুখ খুললো না। এসব কথার জবাব আসে না তার। কত কাজ বাকি। ধনরাজের টাকাটা নিয়ে চটিরামের জমি বায়নার কথাই বুলু জানে। বায়নার টাকা ফেরত নেওয়ার কথা জানে না। কীভাবে বলবে। সেদিন সারা দিনের ওই টানা-পোড়েনের পর এখন কিভাবে বলবে বুলুকে।

বুলু কুবেরকে খোঁচালো না।

কুবের মনে মনে পুজো প্যান্ডেলের ধারায় বাঁশের কাঠামোর মত পর পর তার প্ল্যান সাজিয়ে দেখল—এখনও অনেক কাজ বাকি। ন্যাড়া করণীয়গুলো মাথা ঠেলে শুধু বাইরে বেরিয়ে আছে।

সস্তায় খানিকটা জায়গা ধরতে হবে। তারপর সে-জমিতে মাটি ফেলে উঁচু করার ব্যাপার আছে। মাটি বসতে বছর দুই—তারপর ভিত্ খোঁড়ার পালা। ভিতের আগে অবশ্য প্ল্যান—ক' তলা বাড়ি হবে তাও ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে। ধনরাজ তো বার-বার দেবে না। এই অবস্থায় আবার যদি বুলুর পেট ফুলে ওঠে—সে এক দুশ্চিন্তা।

'তোমার তো কোন চিন্তা নেই—হলেই হল।'

বুলু ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায়। ফোঁস করে উঠল, 'তোমার জমিজমা কবে শেষ হবে বলতে পার?'

'হয়ে এসেছে—'

'চটিরামের জায়গাটুকু কিনে স্থির হয়ে জিরোও কিছু দিন—এই যে সারাদিন চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছ—কোন্ দিন আবার রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে না পড়ে যাও।'

একবার জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে-ছিল কুবের। বছরখানেক আগে। সকালবেলা খিদের মুখে পাঁচখানা আটার রুটি গিলে বেরিয়েছিল। হজম না হয়ে শেষে কি যন্ত্রণা

উঃ! লাগে না? ছাড়ো বলছি—'

বুকের ভেতর। প্রায় দৌড়ে বাড়ি ফিরছিল। ট্রাম-বাস বোঝাই, ট্যাক্সিগুলো হাত তুললে থামে না—বড় রাস্তার মোড়ে ঘুরে পড়ে গিয়েছিল।

অজান্তে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের গাঁট গায়ে ঘসে দেখলো কুবের। জায়গাটা শুধু কালোই হয়নি—কেমন খসখসে হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার দেখাতে হবে।

'চটিরামের জায়গা কেনা হবে না।' অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। এই সময় কঠিন কাজ খুব সোজা হয়ে যায়।

'কেন?'

কুবের সব বলল। খানিকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না বুলু। সারা দিন শুধু রোদে পোড়ার ব্যাপারটা ঘুরেফিরে মনে পড়তে থাকল। ঠিকই করে ফেলেছিল, রাস্তার দিকে ফুলবাগান করবে। দোতলার ছাদে জ্যোৎস্না উঠলে খোকনকে তোলা বিছানায় উপুড় করে ঘুম পাড়াবে।

কোন সাড়া না পেয়ে কুবের বলল, 'অন্য কয়েক জায়গা দেখেছি। দর অনেক কম—তবে স্টেশন থেকে খানিকটা দূরও বটে। দেখো, ঠিক কিনে ফেলব।'

'কেনাকাটা বন্ধ করে চল কোথাও ঘুরে আসি।'

'বাঃ! এতদিন পরে একথা বলছ কেন?' কুবের আরও জানতে চাইতে পারে। যেমন, আমিই তো সে কথা বলেছিলাম গোড়ায়। কিন্তু তুমি বলেছিলে, না, আগে জায়গা কেনো—তারপর ঠিক বাড়ি হয়ে যাবে।

'বিয়ের পর কোথাও আমরা যাই নি কিন্তু—'

কুবের কিছু বলতে পারল না। কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি ওদের। টাইম অফিসের রামকৃষ্ণভক্ত সাধু প্যাটার্নের অমৃতদের বাড়ি ত্রিবেণীতে একবার গিয়েছিল দু'জনে। দারুণ যত্নআদর হয়েছিল। তখনও খোকন হয়নি। আর একবার কেষ্টনগরে মামশ্বশুরে বাড়ি গিয়েছিল। সারাটা দুপুর ট্রেনে গরমে কাটলো। উকিলপাড়ায় দাদাশ্বশুরের দোতলা মামাশ্বশুর টাকার অভাবে কলি ফেরাতে পারেননি। ভাঙা ছাদের বিপদ জানান দেবার জন্যে কার্ণিশের কোলে একটা তিন পা চেয়ার উলটে রাখা রয়েছে। খুব যত্ন পেয়েছিল কুবের—উঠোনের ইদারার জল খেয়ে অম্বলভাবটা কেটে গিয়েছিল কয়েক ঘণ্টায়।

কিন্তু এসব ত কাছেপিঠের জার্নি। বুলু কতদিন বলেছে, 'চলো না যশিডি ঘুরে আসি।'

মধুপুরে কুবের একটা বিনে ভাড়ায় বাড়িও পেয়েছিল। অথচ শেষ অব্দি যাওয়া হল না।

ফার্স্ট ক্লাসে কতকগুলো টাকা শুধু শুধু গচ্চা। থার্ড ক্লাসে স্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করে জানলায় পর পর দুটো সিটে বিছানা পেতে দু'জনে নাগপুর নয়ত দিল্লি যাবে—বাইরে বৃষ্টি হবে, খোকন অবেলায় ঘুমিয়ে ফুলো ফুলো মুখে উঠে বসে জানলা দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে—তখন কুবেরদের মেলট্রেন ফুলস্পীডে একটা স্টেশন মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক কষ্টে স্টেশনের নামটা পড়া যাবে—রাজনন্দ গাঁও।

কিন্তু এখন কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। চার-পাঁচ জায়গায় কুবের চোখ ফেলেছে। চিনের মোড়ে কাটাখালের মুখোমুখি একটা প্লট দেখেছে। সব ভাল—শুধু স্টেশনে পৌঁছতে হাঁটতে হবে অনেকটা।

'রাজগীর যাবে? হট্ স্প্রিংয়ে চান করবে—'

'কেন? আমার কি বাত হয়েছে?'

'হুঁ। হয়েছে—মাথায় হয়েছে—', বলে কুবের অন্ধকারেই বুলুর মাথাটা ধরে ঘোরাতে গেল। রেডিওর নব্ নয়। ফলে ঘোরানো গেল না।

'উঃ! লাগে না? ছাড়ো বলছি—'

বুলুর গলা চিরে গেল। আজকাল কুবের রোজ এত মোটা হয়ে যাচ্ছে—ঘাড় ঘামে, হয়ত সেখানে কিছু দিন পরে খানিকটা থলথলে মাংস গজাবে।

চলন্ত মোটর, চলন্ত ট্রেন, চলন্ত রিকশায় বুলুর পাশে বসে হাওয়া কেটে এগোতে এত ভাল লাগে।

বুলু মাথা ঘুরিয়ে মশারি ফেলে ঘুমোনো শুরু করে এবার।

আঙুলের খসখসে জায়গাটা অজান্তে আর একটা আঙুলে একটু ছুঁয়েই থেমে গেল কুবের। সেদিন কতদিন পরে দেখা হল সনতের সঙ্গে। এই সনতের সঙ্গে একদিন দুপুরে ক্লাস এইটে রিকশা চড়ে ঘোলাডাঙায় গিয়েছিল।

সেদিন তখন দুপুর ছিল। লরি লরি সোলজার কুকুর-মানুষ সব চাপা দিয়ে হুহু করে চলে যেত। ফৌজদারি উকিল জ্ঞান ঘোষের খারাপ মেয়েমানুষ পাড়ার পেছনে আমবাগানে একখানা বাড়ি ভাড়া করে থাকত। তার মেয়ে সেবার সন্ধেবেলা একদিন বিষ খেল। হরি ডাক্তার শেফালিকে বমি করানোর জন্যে সেদিন রাত আটটা নাগাদ তাদের বাড়ি ডিম চাইতে এসেছিল—কাঁচা ডিম খাইয়ে দিলে এই অবস্থায় নাকি হড হড করে বমি হয়ে যায়। পরে শুনেছিল শেফালি লজ্জা ঢাকার জন্যে মরতে গিয়েছিল। জ্ঞান ঘোষের বড় ছেলে ধীরেন নাকি প্রায়ই দুপুরে শেফালিদের বাড়ি যেত। এর সামান্য কিছু জেনে আর অনেক বেশি শুনে কুবের তখন টুকরো ব্যাপারগুলো জায়গা মত সাজিয়ে গরম হয়ে উঠত। তখন সবে তার গলা ভাঙতে আরম্ভ হয়েছে। কণ্ঠমণি দিনকে-দিন চামড়ার চাদর ঠেলে জেগে উঠছিল।

একদিন ত মফঃস্বল শহরের একেবারে দুপুরে দুই আমেরিকান সোলজার স্রেফ জাঙিয়া পরে জলে নেমে গেল। সঙ্গে ঘোলাডাঙার দুই মেয়েলোক। তাদেরও সাঁতার কাটতে হচ্ছে। পুকুরের চারপাশে শহরের ভিড় ভেঙে পড়েছে। বোমার ভয়ে সালকে ছেড়ে কুবেররা তখন ওই শহরে ভাড়া বাড়িতে থাকে।

ক্রমশ

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা আদৌ রূপায়িত হবে কি ?

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাবার পর তিনটি বছর পেরিয়ে যাচ্ছে; চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা এখনও তৈরি হয় নি। গত মে মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে অধ্যাপক গ্যাডগিল চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আশা করা গিয়েছিল, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পরিকল্পনাটির খসড়া তৈরি হয় নি। যতদূর জানা গেছে, পরিকল্পনাটি তৈরি করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা বিদেশী সাহায্যের অনিশ্চয়তা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য কিছু পরিমাণে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস যে বৈদেশিক সাহায্য বিল অনুমোদন করেছে তার ফলে অনগ্রসর দেশগুলিতে মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমে যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বৈদেশিক সাহায্য দিতে শুরু করেছিল, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত এত কম সাহায্য কোন বছরের জন্যই অনুমোদিত হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের আরও সাহায্য পাবার প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। যে পরিকল্পনা গোড়া থেকেই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল সেই সাহায্য যদি সুনিশ্চিত না থাকে, তবে পরিকল্পনার কাজ এগোবে কি করে ?

একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে তার বিভিন্ন প্রয়োজন এবং আর্থিক সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য। ভারতের প্রয়োজনের দিক দিয়ে যদি চিন্তা করি তবে দেখতে পাই, প্রয়োজনের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে আমাদের খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হবে, সেজন্য চাই দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প এবং সে প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ; অনিশ্চিত রপ্তানি বাজারের উপর নির্ভর না করে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী হিসাবে আমাদের তৈরি করতে হবে আমদানির বিকল্প সামগ্রী আর ফলে ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কমে যাবে; শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতির যে ভিত্তি দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছিল তাকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে; বেকারসমস্যায় সমাধানও যত দ্রুত অর্জন করতে হবে; সবশেষে প্রয়োজন জিনিসপত্রের দামের স্থিতিশীলতা। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আর্থিক সংগতি কতটুকু আছে ? বৈদেশিক সাহায্য আশানুরূপ পাওয়া যাবে না। তার ফলে যে জিনিসগুলি আমদানি না করলে আমাদের পক্ষে আমদানির বিকল্প জিনিসগুলি তৈরি করা সম্ভব নয়, সেই জিনিসগুলি আমদানি করার মত বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান হবে না। কর ব্যবস্থা থেকে আর রাজস্ব বাড়ানোও সম্ভব নয়; কারণ, আমাদের দেশে যা জনপ্রতি আয় তার ভিত্তিতে করের বোঝা আর বাড়ানো সম্ভব নয়। সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অর্থমন্ত্রী আরও ঘাটতি অর্থসংস্থান করার প্রতিকূলে যুক্তি দেখিয়েছেন। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে উৎপাদন লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানর মত প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় চতুর্থ পাঁচসালা আদৌ রূপায়িত হবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এজন্য কি পরিকল্পনা বন্ধ থাকবে ? বিগত বাৎসরিক পরিকল্পনা কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। অধ্যাপক গ্যাডগিল চান কৃষিক্ষেত্রে যে উদ্বৃত্ত আয় অর্জিত হয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে। আমাদের মনে হয় সীমিত সংগতির মধ্যে থেকেও চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করা যেতে পারে অবশ্য যদি পরিকল্পনার আকৃতি একটু ছোট হয়। তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনায় (চলতি বছরের পরিকল্পনা সহ) গড়ে ২২০০ কোটি টাকা করে প্রতি বছর খরচ হয়েছে, এই হিসাবের ভিত্তিতে পাঁচ বৎসরের মোট খরচ দাঁড়ায় ১১০০০ কোটি টাকা। যদি ১৫০০০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকে সীমিত করা হয় এবং খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও দ্রুত মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা অর্জন—প্রভৃতি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচিত হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য কমে গেলেও চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করা অসম্ভব বলে আমরা মনে করি না। অধ্যাপক গ্যাডগিল রাজনৈতিক প্রভাব-মুক্ত বাস্তববাদী অর্থনীতিবিদ; আশা করব, তিনি সীমিত সংগতির মধ্যেই একান্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে উপযুক্ত অগ্রাধিকারসূচী অনুযায়ী চতুর্থ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী

অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ১৯৭১ সালের পর খাদ্যসামগ্রী বিশেষ আমদানি করতে হবে না। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ১৯৭০-৭১ সালের পর পি এল ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী আমদানি করতে হবে না। পরিকল্পনা দলের সমীক্ষায় লোহ আকরিকের রপ্তানি বাড়বে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন গত বছর থেকে রপ্তানি শতকরা ২০ ভাগ বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করা যত সহজ, তা সফল করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা তত সহজ নয়। আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির কাঠামো সুদৃঢ় করা, এবং এজন্য কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সীমিত সংগতির মধ্যেই চতুর্থ পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত।

সুব্রত গুপ্ত

প্রাচ্য ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতা

কাজ্বও আজ্বমা ও অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর পর আবার এসিয়াবাসী একজন সাহিত্যিক সাহিত্য-রচনায় নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। প্রাচ্যের অধিবাসী জাপানী লেখক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার এই সম্মানে সমগ্র এসিয়াবাসী আজ আনন্দিত।

দিনলিপি রচনার মধ্যে দিয়েই বোধ করি অসচেতনভাবে কাওয়াবাতার সাহিত্যকর্মের সূত্রপাত। ষোল বছর বয়সে ঘরের নিভৃতে বসে যে গভীর শোক ও অনুভূতিগুলি একদিন আপন মনে ডায়রির পৃষ্ঠায় বাণীরূপ দিয়েছিলেন, আপাতত সেই লেখাগুলিকেই কাওয়াবাতার প্রথম রচনা বলে স্বীকার করে নিতে হয়। ১৮৯৯এ জন্মগ্রহণের পর তিন বছরের মধ্যে পিতার মৃত্যু হয়, মাও পরের বছর অসুস্থ হয়ে মারা যান। তখন কাওয়াবাতা ঠাকুমা ও ঠাকুরদার আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানে থেকেই বড় হতে থাকেন। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই কাওয়াবাতা আবার নিঃসঙ্গ হলেন। আট বছর বয়সের সময় ঠাকুমা মারা গেলেন, তারপর একদিন তাঁর প্রিয় পিতামহও তাঁকে একলা ফেলে রেখে চলে গেলেন। পিতামহের মৃত্যুর সময় কাওয়াবাতার বয়স পনের। অল্প বয়সেই কাওয়াবাতাকে অনেকগুলি কঠিন মৃত্যু দৃশ্য সহ্য করতে হয়। প্রিয় পিতামহের মৃত্যুর বেদনাই বালক কাওয়াবাতার মনকে সবচেয়ে বেশি বিষণ্ণ করেছিল। ষোল বছরের বালক দিনের পর দিন পিতামহের শয্যার পাশে বসে লক্ষ্য করলেন একটি বৃদ্ধ কেমন করে ক্রমেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তারপর দেখলেন একদিন সব পথ শেষ হয়ে গেছে। পিতামহের মৃত্যুর ঠিক পূর্বের দিনগুলিতে বালক কাওয়াবাতা ডায়রির পাতায় যে করুণ অনুভূতিগুলি কথায় প্রকাশ করেছিলেন, তাই প্রকাশিত হয়েছিল এগার বছর পর ১৯২৫ সালে 'যুরোকুসাইনোনিক্কি' অর্থাৎ 'ষোল বছরের বালকের ডায়রি' নাম দিয়ে 'বুংগেইসুনজু' পত্রিকায়।

আঠেরো বছর বয়সে কাওয়াবাতা বিদ্যালয়ের পড়াশুনো শেষ করে কলেজ জীবনে প্রবেশ করেন। এই কলেজ জীবনে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশী-বিদেশী বহু সাহিত্যগ্রন্থ মনের আনন্দে পাঠ করে চললেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর কৌতূহল ও আগ্রহ তখন থেকেই বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ সালে কাওয়াবাতা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন, কিন্তু তার পরের বছরই ইংরেজি থেকে জাপানী সাহিত্যে তাঁর বিষয় পরিবর্তন করে নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি তাঁর সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে একটি সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদন করেন, যার নাম হল 'সিনুসিচো', অর্থাৎ 'নূতন ভাবস্রোত'। পত্রিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে যুগের সাহিত্যিক মহলে কাওয়াবাতা ও তাঁর সম্পাদকগোষ্ঠী বিশেষভাবে অভিনন্দিত হন। এই পত্রিকায় তাঁর ছোট গল্পগুলিও পাঠকদের প্রশংসা অর্জন করতে থাকে। সে সময় তিনি জাপানে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রপত্রিকাতেও লিখতে শুরু করেছেন। সাহিত্য চর্চার উত্তেজনার মধ্যেই এক সময় তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি লাভ করলেন। সেটা তখন ১৯২৪ সাল। মার্চ মাসে স্নাতক হলেন আর সেপ্টেম্বরেই তাঁর হাতে নতুন আর একটি সাহিত্য পত্রিকার জন্ম হল—'বুংগেইজিডাই' (শিল্প-সাহিত্য-সময়), যা জাপানী লেখকদের কাছে নতুন চিন্তা প্রকাশের পথকে সহজ করে
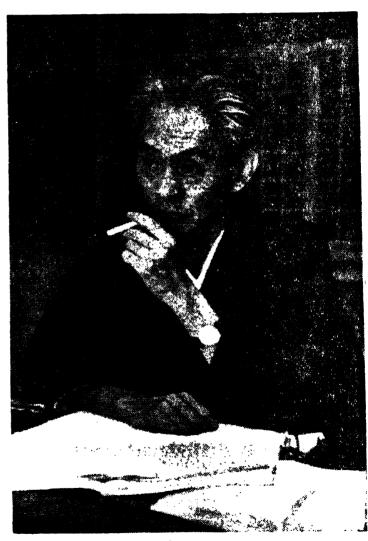
ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা

তুলল। এই পত্রিকায় কাওয়াবাতার বিখ্যাত উপন্যাস 'ইজু-নো-ওদোরিকো' (ইজু এলাকার নর্তকী) প্রকাশিত হয়। সেই দিন থেকেই ছাব্বিশ বছর বয়সের ইয়াসুনোরি কাওয়াবাতা জাপানের সাহিত্য সমাজে একজন অতি জনপ্রিয় শক্তিশালী কথা-শিল্পী।

কাওয়াবাতার প্রথম গ্রন্থ 'কান্জো-শোসোকু' (অনুভূতির অলংকার) প্রকাশিত হয় লেখকের সাতাশ বছর বয়সে ১৯২৬ সালের জুন মাসের গোড়ায়। ইতিপূর্বে রচিত তাঁর পঁয়ত্রিশটি গল্পের সংকলন এই গ্রন্থ। এর পরের বছরই জাপানের একটি দৈনিক পত্রিকায় তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'য়ুমিনোহিমাত্সুরি' (সমুদ্রে আগুনের খেলা) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়।

'সিন্‌সিচো' পত্রিকা সম্পাদনে সম্পাদক হিসেবে এবং শক্তিশালী গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করার কাওয়াবাতা ১৯৩০-এর মধ্যে জাপানের বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠী ও পরিচালকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং এই বছরই তিনি জাপানের সম্মানিত মানুষ হিসেবে জাপানের সাংস্কৃতিক বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন।
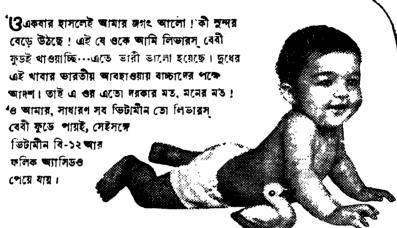
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'য়ুকি-গুনি' (বরফের দেশ) ১৯৩৫এ প্রথমে একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৭এ। এই উপন্যাস প্রকাশের পর সমগ্র দেশে কাওয়াবাতার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। জাপানের একটি প্রধান সাহিত্য সংস্থা থেকে সেই সময়ই তিনি এই গ্রন্থ রচনার জন্য সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করেন। জাপানের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক য়ুকিও-মিসিমা, যিনি কিছুকাল পূর্বে ভারতে এসেছিলেন, তিনি 'য়ুকিগুনি' গ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ উপন্যাস হল এক প্রকার অনুভূতির কাব্য। বাস্তব দৃষ্টিতে যা কলঙ্ক বা গ্লানি, শিল্পীর দৃষ্টি তার মধ্যেই সৌন্দর্য আবিষ্কারের সূত্র পায়। দৈহিক বাসনা সর্বস্বতার ঊর্ধ্বে এক সার্থক সংযত বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টিই 'য়ুকিগুনি'র রচয়িতার প্রধান উদ্দেশ্য। জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক অধ্যাপক কেনকিচি ইয়ামামোটো 'জাপানী সাহিত্য গ্রন্থমালা-৩০' খণ্ডে কাওয়াবাতার রচনা সংকলন করেন ও ভূমিকায় ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। 'য়ুকিগুনি' উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কাওয়াবাতার আশ্চর্য কৃতিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পার্থিব জগৎ ও নারী—এই উভয়ের মধ্যে থেকে শিল্প সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন কাওয়াবাতা। পার্থিব ভোগ-সর্বস্ব জগৎ অপেক্ষা অনুভূতির জগৎ তাঁর কাছে অনেক বেশি বরণীয়।

আনুমানিক 'য়ুকিগুনি' রচনা কালেকাওয়াবাতা। সাহিত্য রচনার অবসরে প্রিয় সঙ্গী জাপানের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রিইচি য়োকোমিতসুর (১৮৯৮-১৯৪৭) সঙ্গে দাবা খেলছেন

শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, সাহিত্য শিল্প সমালোচনার প্রতিও তাঁর মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। কাওয়াবাতার রচিত চিন্তাপূর্ণ বহু মৌলিক নিবন্ধ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। শিশু সাহিত্যের প্রতিও তাঁর কৌতূহল ও আগ্রহের অভাব ছিল না।

জাপানের একটি বিখ্যাত সাহিত্য পুরস্কার হল 'কানকিকুচি পুরস্কার'। ১৯৪৪ সালে কাওয়াবাতা জাপানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রচয়িতা হিসেবে এই পুরস্কার লাভ করেন।

কাওয়াবাতার দুটি বিখ্যাত উ· 'সেম্বাজুরু' (সহস্র বলাকা) ও 'ইয়া-মানোওতো' (পাহাড়ের কথা) ১৯৪৯-এ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে দুটি একত্রে সংকলিত হয়ে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস দুটি রচনার জন্য কাওয়াবাতা জাপানের শিল্প সাহিত্য আকাদেমির কাছ থেকে সে দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৯-এ জার্মানী থেকে তাঁকে 'গয়টে পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

কাওয়াবাতার প্রকাশিত গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলীর তালিকা এখানে সংকলিত হল :

'কানজোশোসোকু' (অনুভূতির অলঙ্কার)—১৯২৬।

'ইজুনোওদোরিকো' (ইজু এলাকার নর্তকী)—১৯২৭।

'নবীন লেখক সাহিত্য গ্রন্থমালা'র এক খণ্ডে কাওয়াবাতার রচনা সংকলিত হয়—১৯৩০।

'বোকুনোহিওহোঙ্ সিতসু' (আমার রচনা সংগ্রহ)—১৯৩০।

'হানাআরুস্যাসিন্' (ছবিতে ফুলের ডালি)—১৯৩০।

'আধুনিক জাপানি সাহিত্য গ্রন্থমালা'র এক খণ্ডে কাওয়াবাতার রচনা সংকলিত হয়।—১৯৩১।

মেইজি ঠাইসো কালের সাহিত্য গ্রন্থমালা'র এক খণ্ডে কাওয়াবাতার রচনা সংকলিত হয়—১৯৩২।

'খেসোওতোকুচিহুয়ে' (প্রসাধন ও শিল্পের শব্দ)—১৯৩৩।

'সুইসোগেনসো' (উদ্ভট স্ফটিক কাহিনী)—১৯৩৪।

'জুনসিনোকোয়ে' (পবিত্র কণ্ঠস্বর)—১৯৩৬।

'হানানোওয়ারতসু' (ফুলের নৃত্য)—১৯৩৬।

'য়ুকিগুনি' (বরফের দেশ)—১৯৩৭।

'মুসুমেগোকোরো' (কিশোরী কন্যার মন)—১৯৩৭।

'ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার নির্বাচিত রচনাবলী' নয় খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১৯৩৮—১৯৩৯।

'নতুন জাপানি সাহিত্য গ্রন্থমালা'র এক খণ্ডে কাওয়াবাতার রচনা সংকলিত হয়। ১৯৪০।

'আইসুরুহিতোতাচি' (প্রেমিক মানুষ)—১৯৪১।

'বুনসো' (কথা)—১৯৪২।

'ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা রচনাবলী' এক খণ্ডে সংকলিত। ১৯৪২।

'ক্যোগেন্' (মালভূমি)—১৯৪২।

'আসাগুমো' (সকালের মেঘ)—১৯৪৬।

'কাওয়াবাতার সমগ্র রচনাবলী' ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত। ১৯৪৮—১৯৫৪।

'য়ুকিগুনি' (বরফের দেশ) পূর্ণ সংশোধিত সংস্করণ। ১৯৪৮ ডিসেম্বর।

'আইসু' (শোক)—১৯৪৯।

'সেম্বাজুরু' (সহস্র বলাকা)—১৯৫২।

'স্যোয়াকালের সাহিত্য গ্রন্থমালা'র এক খণ্ডে কাওয়াবাতার রচনা সংকলিত হয়। ১৯৫৩।

'টৌকিওনোহিতো' (টৌকিওর মানুষ) ৪ খণ্ডে প্রকাশিত। ১৯৫৫।

'আধুনিক জাপানি সাহিত্য গ্রন্থমালা'র এক খণ্ডে কাওয়াবাতার রচনা সংকলিত হয়। ১৯৫৫।

'কাওয়াবাতার নির্বাচিত রচনাবলী' ১০ খণ্ডে প্রকাশিত। ১৯৫৬।

'অননাদেআরুকোতো' (মেয়েরা যেমন হয়)—১৯৫৬।

'জাপানি সাহিত্য গ্রন্থমালা'র এক খণ্ডে কাওয়াবাতার রচনা সংকলিত হয়। ১৯৫৯।

সংবাদে প্রকাশ মাদ্রাজ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন : কোন অ-হরিজন যদি হরিজনকে বিবাহ করেন তবে তাঁহাকে একটি সোনার মেডেল দেওয়া হবে।—

"মেডেলটা ১৪ ক্যারেট না হলে রাজী আছি।" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শেখ আবদুল্লা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি কাশ্মীরে সত্যাগ্রহ করিবেন না এবং কাহাকেও করিতে দিবেন না। বিশুখুড়ো জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার মুখে রামনাম শুনে না আমরা আশ্চর্য হই।"

একটি সংবাদ-শিরোনামা—'অনেক কাঠ খড় পুড়ল, বৈঠক হল, তবু পলতার পাল আজও সরল না।' শ্যামলাল বলিল—"এ যে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পলি-টেকনিক, সড়গড় না হলে কিছুতে কোন কিছু করা যায় না।"

দিল্লীতে মুক্ত অঙ্গন রবীন্দ্র রঙ্গশালার উদ্বোধন হইয়া গেল। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"আশা করব এটা শুধু একটা রঙ্গতামাশার অঙ্গন হবে না।"

শ্রীকে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি নাকি বলিয়াছেন, সব রাজনীতিক পাপী। শ্যামলাল বলিল—"এত দিনে বোঝা গেল রাজনীতিক-দের শ্বারা কোন পক্ষেরই কোন স্বার্থ কেন রক্ষিত হয় না এবং কেন তাঁরা পরস্পর খেয়োখেয়ি করেন।"

ভারত মহাসাগরে ভারত কোন কর্তৃত্ব করিবে না—বলিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বিশু-খুড়ো বলিলেন—"এই মাগগিগণ্ডার বাজারে অন্তত মাছ ধরার অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা না হলে ভাতে মরার প্রশ্নটা নেহাত গৌণ থাকবে না!!"

জেকেলিন কেনেডির সঙ্গে অ্যারিস্টটল ওনাসিসের বিবাহ সম্বন্ধে অনেকেই নানা আলোচনা এবং প্রশ্ন করিতেছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরাও বিশেষ কিছু জানিনে। তবে যে ক'টি কথা মনে হল তার একটি হল প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, এখানে যুক্তি নেই। অন্যটি হল নাম-মাহাত্ম্য, অ্যারিস্টটল নামের মধ্যে জ্যাকেলিন হয়ত একটা উচ্চ দার্শনিক মতবাদের স্বাদ পেয়েছেন, তারপরে যা রইল তা আপনার আমার সকলের কাছেই জল গ্রীক।"

এক সংবাদে প্রকাশ, ক্যানসারের আতঙ্কে প্রায় এক লক্ষ মার্কিন ডাক্তার নাকি ধূমপান ত্যাগ করিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"এঁরা আবার ডাক্তার!

বেপরোয়া ধূমপান করে যাবো, ডাক্তার ওষুধে ইনজেকশনে ক্যানসার রুখবে, তবে না ডাক্তার! এ যে দেখছি একেবারে তেন ত্যক্তেন নীতি!"

মেকসিকোতে অক্সিজেনের স্বল্পতা সম্পর্কিত সংবাদ পাঠ করিলাম।—"তা সংবাদ না পড়েও বুঝতে পারছি, ভারতীয় হকি দলকে টিকিয়ে রাখার জন্য একমাত্র ওষুধ ছিল অক্সিজেন, তা স্বল্প বলেই এই হাল"—বলেন সহযাত্রী।

এই প্রসঙ্গের জের টেনে অন্য এক সহযাত্রী গম্ভীর হয়ে বললেন—"তা নয়, আমার মনে হয় সিং (সিংহ) ভেড়ার বাছুরের দলে ভেড়াতে না পারলে ধ্যানচাঁদের হকিবৃন্দ ধ্যানেই সীমাবদ্ধ থাকবে।"

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করিয়াছেন, এখন হইতে সমস্ত শিক্ষার মাধ্যম হইবে হিন্দী। খুড়ো বলিলেন—"লখনৌটা নবাব-বাদশার শহর অ্যাণ্ড নবাব-বাদশা ক্যান ডু নো রং!!"

নিউইয়র্ক টাইমস-এর [illegible] প্রতিনিধি মিঃ [illegible] কলিকাতার [illegible] একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই [illegible]

ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর [illegible] সময় শ্রী ঘোষ নাকি বলিয়াছেন : [illegible] ইঁদুরের মত বেঁচে আছি। [illegible] বলিল—'রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর [illegible] ওপর কোন কথা চলে না, তবু [illegible] বলব, তিনি বলতে পারেন, আমরা [illegible] ইঁদুরের সঙ্গে সহাবস্থান করছি, [illegible] হিমালয়জাত মুক্তির গোটাকয় [illegible] জলে চুবিয়ে মারতে পারিনি!"

সংবাদে প্রকাশ [illegible] গুরু [illegible] ফিরাইয়া আনা হইবে না এবং [illegible] গবেষণাগারও হইবে না। [illegible] বলিলেন—'কারেক্ট, আমরা তো [illegible] রোগীকে বিষ দিয়ে [illegible] পারিনে!"

সর্বশেষ সংবাদে [illegible] কেন্দ্রবিরোধী বলেই [illegible] বিশুখুড়ো বলিলেন—"এই ব্যাপারে আমাদের বলবার কিছু নেই, আমরা তো শুধু ব্যালট বক্সে ভোট ফেলে দেওয়ার মালিক। তবু বলি, [illegible] কেন্দ্রবিরোধী না হলে [illegible] শুদ্ধ করলে ভালো হত, [illegible] নিষ্ঠ করে রাখা আর [illegible] সংযোগ করা যেত।"

পা[illegible] সহযাত্রী একটি [illegible] যাত্রা চলছে। [illegible] বর্ষায় [illegible] গেছে। সেই [illegible] লাগসই নাম। [illegible] ধরেছেন এমন [illegible] জনৈক ভদ্রলোক [illegible] বস, তুমি [illegible] বদলে এই চারটি [illegible] দিয়ে যাও।"

কলকাতার হালখাতা

মুখবন্ধ

আমি লোকটা একটু অলসমত। ঘোরাঘুরি, কাজটাজ করা, পড়াশুনো বা ফুটবল খেলা আমার ঠিক পোষায় না। তার চেয়ে বরঞ্চ আমার কাছে অনেক ভালো প্রস্তাব এই ঘরে বসে থাকা; আমার ঘরে একটা টেবিল, একটা ইজিচেয়ার আর একটা খাট আছে, জায়গা বদলে বদলে এইখানে আমার বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়। আমার চারপাশের দেয়ালে বিস্তর দাগ। উনিশশো পঞ্চাশের পর দেয়ালে চুণলেপন হয়নি আমি জানি। সেইসব দাগ থেকে উঠে আসে বহু বিচিত্র সব ঘটনাবহুল চিত্র—কোথাও রোমান গ্ল্যাডিয়েটর সিংহের টুঁটি চেপে ধরেছে, কোথাও তেনশিং হিলারির হিমালয়ের মাথায় উঠে হাতাহাতি লেগে গেল, ডানদিকে রকেট মেঘ ফুঁড়ে চাঁদের দিকে সাঁ সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা দিতে দিতে আমাকে একটু হাত নেড়ে দিলেন, এই রকম অন্তত পাঁচ হাজার ছবি আমার চতুর্দিকে এই ঘরে। ঘরের যে জানালা তার বাইরে তাকালে দেখা যায় দূরে হাওড়া ব্রিজ, বাড়ির নিচেই দোকানপাট, লোকজন, বাসট্রাম: কত বিচিত্র দৃশ্য না চোখে পড়ে জানালা দিয়ে।—এই শহরেই আমার জন্ম, এই শহরের বাইরে কোনোদিন থাকিনি, কলকাতার প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি গলি, বড় রাস্তা, আমার কাছে প্রাণবন্ত। আমি গ্রাম-টাম যাইনি বিশেষ—আমার মাটি অ্যাসফল্টের রাস্তা, আকাশ শহরের মাথায় এই ধোঁয়াটে চাঁদোয়া, গাছ ধুলোধুসর এই বৃক্ষরাজি। এই শহরের প্রতিটি গন্ধ আমি চিনি, প্রত্যেক ঋতুতে শহরের গন্ধ বদলে যায়—শুধু বাইরে নয়, আমার এই এঁদো ঘরেও প্রতি ঋতুতে কি তুলকালাম পরিবর্তন ভাবা যায় না। কলকাতার সন্তান আমি, আজ সেই শহর বিষয়ে লিখতে গিয়ে, এই আজগুবি-উদ্ভট-কাণ্ডজ্ঞানহীন-তুলনাহীন শহর বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি বড় অসহায় বোধ করছি—এর বিষয়ে লিখবার কি কোনো শেষ আছে? রাজনীতিবিদ, লেখক, প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, এই শহরের বহুবিধ সমস্যা, বহু আকর্ষণীয় তথ্য, আপনাদের বলতে পারবেন, কিন্তু আমি জানি বড় অল্প, পারিও কম, ওসব আমাকে ঠিক মানায়ও না, আমি বরঞ্চ খুদকুঁড়ো খুঁটে খাবার মত, কিংবা খাজাঞ্চির হিসেবের মত, এই শহরবাসীর দৈনন্দিন খুঁটিনাটি, এটা-সেটার তালিকা প্রস্তুত করতে মনোনিয়োগ করি।

শ্যামাপোকার আগমন, ব্যস্ত টিকটিকি, কলকাতায় শীত

লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা, কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর। এরকম কলকাতার যদি কোনো বাহন আমাদের ঠিক করতে হয় তাহলে তা যে টিকটিকি এ বিষয়ে কোনো বিজ্ঞ সন্তান দ্বিমত হবেন না। এই কলকাতার প্রতিটি গৃহের দেয়াল এই প্রাণীটি ঘটনাবহুল করে রেখেছে; এর নীরব ধৈর্য ও অধ্যবসায়, অবিমিশ্র নগর-প্রেম, নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠতা, গৃহস্থের প্রতি সত্যনিষ্ঠা, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে কোনো হালখাতাই রচিত হতে পারে না। এই জীবটিকে আমি কলকাতার বলেই দাবি করব কারণ এর প্রভাব এই শহরে যত প্রকট পৃথিবীর আর কোনো শহরে ততটা নয়। আমি বিলেত ফিলেত নিজে যাইনি তবে ওসব দেশ থেকে আগত বহুজনকে জিজ্ঞেস করেছি ওখানে টিকটিকি চোখে পড়েছে কিনা, অনেকে প্রথমেই 'না' বলে দিয়েছেন, দু'একজন বহুক্ষণ ভেবেচিন্তে একটা দুটোর কথা মনে করতে পারলেও একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি যে তাদের প্রভাব ন্যুইয়র্ক বা প্যারিসের জীবনে প্রায় নেই বললেই চলে। আমি একবার আরো ভালোভাবে নিশ্চিত হবার জন্য এক সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলাম এই বিষয়ে, সে ব্যাপারটা রসিকতা ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিল। শুনেছি অবশ্য সাংহাইতে প্রচুর টিকটিকি আছে, তবে সেখানকার জনসাধারণ টিকটিকি দেখতে পারে না। চীন দেশেও অনেকটা তাই, মাওয়ের আদেশে নাকি সবাই টিকটিকি খেয়ে ফেলছে খবরে প্রকাশ। ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে অবশ্য টিকটিকি বিরলদৃশ্য নয় তবে বোম্বাইবাসী, দিল্লিবাসীরা আমার কাছে কবুল করেছে যে, টিকটিকি বম্বে বা দিল্লির পক্ষে অপরিহার্য না কারণ খুব সহজেই স্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষে এক টিকটিকিহীন দিল্লী বা বোম্বাই কল্পনা করা সম্ভব। কিন্তু কলকাতা কলকাতাই থাকবে না যদি না সন্ধ্যার পর প্রতিটি গৃহের দেয়ালে নাদুসনুদুস উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এই শীতল সরীসৃপ বিচরণ না করে। কলকাতার নাড়ি যেন এই জন্তুটির হৃৎস্পন্দনে শোনা যায়।

কোনো টিকটিকি দেয়ালে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলে সত্যিই এই শহরের অনেক চারিত্রলক্ষণ এই জীবটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। টিকটিকি আপাতদৃষ্টিতে এত শান্ত, কিন্তু কিছুক্ষণ তাকালেই লক্ষ করা যায় এর থেমে থাকার মধ্যে কী ভয়ানক এক গতিময়তা রয়েছে। সমস্ত শরীর তার টানটান, দৃষ্টি লক্ষ্যের দিকে অস্বাভাবিক স্থির, যেন এক ধনুকের ছিলা তীর ছোঁড়ার আগে তীরন্দাজ শেষ বিন্দুতে টেনে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়েছেন, এক মুহূর্তের মধ্যে এই স্তব্ধ-স্থিরতা টুকরো ক'রে তীর ছুটে যাবে। এই গতিহীন স্তব্ধতা যেন গতিরই নামান্তর। জেট-প্লেন ওঠার আগে, অর্থাৎ শেষ দৌড়ের আগে একবার সেকেন্ডের জন্য সম্পূর্ণ থেমে যায়, এরোপ্লেনের সমস্ত শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপতে থাকে, তারপর হঠাৎ একটা মহাপ্রলয়ের মত শব্দ হয়, হঠাৎ আমরা দেখি তলার পৃথিবীটা ওলট-পালট হয়ে গেল—টিকটিকির দেয়ালে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা

জেট প্লেনের মাঝের কয়েক সেকেণ্ড থেমে থাকার মত, পৃথিবীর সমস্ত গতি যেন একটা বিন্দুতে মুহূর্তে স্থির হয়েছে। এটা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, এই শহরের মধ্যেও যেন এই উচাটনভাব বিধৃত, স্বাভাবিক ছন্দে শহর চলছে, রোদ উঠছে বৃষ্টি পড়ছে, লোকেরা আপিস গেল বাড়ি এল, কিন্তু প্রতিটি মৃত ইঁট বা ধূলিকনার মধ্যেও যেন সর্বদা ফেটে পড়ার একটা ভয়ংকর সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। অনবরত কোনো ঘটনার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, যে কোনো মুহূর্তে কিছু একটা হয়ে যাবে। বোধ হয় এই টেনশনই কলকাতার প্রধান আকর্ষণ; আমরা যারা এই শহরে জন্মেছি, বড় হয়েছি, বুড়ো হব, তারা অন্য কোথাও টিকতে পারে না বোধ হয় এই কারণেই, ধনুকের ছিলা যে শহরের ছিঁড়ে যাবার মত টান না সেখানে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়! পৌর পিতারা বোধ হয় কলকাতার এই আকর্ষণীয় চরিত্রলক্ষণ ট্যুরিস্টদের কাছে বিজ্ঞাপিত করবার জন্যই রোজ সকালে ভোঁ করে কিছুক্ষণ সাইরেন বাজিয়ে দেন।

টিকটিকির কথায় ফিরে আসি (বড় বিপজ্জনকভাবে আমি কিছুটা দর্শনের দিকে চলে গিয়েছিলাম)। উনসত্তরের শীত পড়ে এল, আমার ঠোঁট ফেটে গেছে, এর-মধ্যেই স্নানটান সপ্তাহে তিনবারের বেশী করা যাচ্ছে না। কলকাতা ঠিক এ মুহূর্তটায় ভয়ানক রকম ঘটনাবহুল, প্রতি গৃহস্থের বাড়ি বীভৎসভাবে আক্রান্ত. কলকাতার বাহন টিকটিকি বীরবদনে নগর রক্ষায় বদ্ধপরিকর। শ্যামা পোকার সবুজ সেনাদল ক্রমশ লক্ষ করছি সাদা দেয়াল ছেয়ে ফেলছে, সন্ধ্যার আলোকে ঘিরে তারা নেচে-নেচে ওড়ে, সুযোগ পেলে আমার গেঞ্জির মধ্যে ঢুকে কামড়ায়। আমার ঘরে চারজন টিকটিকি আছে—একটা সাদা লম্বাটে-গোছের, একটা লেজকাটা গুণ্ডা প্রকৃতির, একটা কালো, সারা শরীরে বসন্তের দাগ তার, আর চতুর্থটির চেহারা ভারি সুন্দর, সুগঠিত শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী, টিকটিকি-জগতে নিশ্চয় সে কোনো সায়রাবানু বা মীনাকুমারী। এই চারজনের মধ্যে লক্ষ করেছি গুণ্ডাপ্রকৃতির লেজকাটাটা সবচেয়ে তেজিয়ান, মাঝে মাঝেই বসন্তের দাগওয়ালাটা বা অন্য সাদাটাকে সে উত্তম-মধ্যম দেয়, তবে সে যখন নায়িকাটির কাছে আসে কি মোলায়েম প্রেমাস্পদ তার ব্যবহার। নায়িকাও তার শৌর্য বীর্যে মুগ্ধ বুঝতে পারি কারণ লেজকাটার অবর্তমানে যখন বসন্তের দাগওয়ালা বা অন্য সাদাটা একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে তার সঙ্গে, তখন এমন উদাসীনভাবে সে সরে যায় যে আমারও এই সূত্রে নিজের ছোটোখাট দু'একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। আমি এই সময়ই উপলব্ধি করি যে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয় সমগ্র জীব জগতেই বড় অসাম্য।

গত কয়েকমাস এই চারজনকে বড় মনমরা দেখেছি, ইতস্তত ছড়িয়ে থাকত, সারা সন্ধ্যায় দশটা করেও পোকা জুটত না, কিন্তু এরা আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে অবশ্য এরা কিছুটা দিশাহারা, চীনেদের মতই পিলপিল করে দেয়াল ছেয়ে ফেলছে শ্যামা পোকা, ডাইনে মারলে বাঁয়ে হাজার হাজার দাঁড়িয়ে যায়। টিকটিকিদেরও দোষ আছে, ওরা দেখলুম অবস্থা বুঝে ব্যবহার করে না, সর্বদাই একরকম। আগস্ট মাসে আমার দেয়ালে গড়পড়তা দিনে সতেরোটা পোকা বসত, তখন টিকটিকিদের একটা মিস হলেও বিরাট ক্ষতি—যেখানে আটাশটা পোকা ওদের একটা জল খাবারের জন্য প্রয়োজন হয়; অতএব একটাকে ধরতে সে সময় ওরা দশ মিনিট তাক করলেও আমি রাগ করতুম না, কিন্তু এখন যেখানে পোকার সমুদ্র, হেঁটে গেলে আপসে মুখে দেড় ডজন চলে আসে, সেখানে যখন এরা একটার দিকে তাকিয়ে চার মিনিট থাপ পাতে তখন বিরক্ত লাগে। আসলে দেখলুম টিকটিকিরা বড় থিয়োরিতে চলে, সেন্স অফ হিউমারটাও ওদের কম, বড্ড বেশী সিরিয়াস। মনে হয় মুশ্‌টা ওদের অনেকটাই পুঁথিপড়া বিদ্যে, যা শিখেছে ঠিক সেইমত চলতে হবে। কাল সন্ধেবেলা ওদের এই ব্যবহার দেখে আমি ওদের বোকা বানাবার জন্য কিছুটা কাগজ খাইয়ে দিলাম; এক টুকরো কাগজ দাঁতে চিবিয়ে গুলির মত করে দেয়ালে ছুঁড়ে দিতেই ওটা আটকে গেল, আর অমনি গুণ্ডাটা এসে চার মিনিট তাক করে খপাৎ করে গিলে ফেলল কাগজ। অনেক নরম মনের মেয়ে টিকটিকি প্রজাপতি খেয়ে ফেলে বলে রাগ করে, কিন্তু আমি তাতে কোনো অপরাধ দেখি না। দোষ যদি ওদের কিছু থাকে তা শুধু ওই সেন্স অব হিউমারের অভাব।

এ সমস্ত তো গেল সমালোচনার কথা, আসলে যা ঘটছে তা কলকাতাবাসীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; ভেবে দেখুন এ মুহূর্তে কলকাতার ষাট লক্ষ বাড়ির প্রতি দেয়ালে কী ভয়ংকর সংগ্রাম চলেছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্যামা পোকা প্রতিদিন জন্মাচ্ছে, প্রত্যেক সন্ধেতে এরা কলকাতার সব বাড়ি, দোকান, ল্যাম্পপোস্ট আক্রমণ করে চলেছে, এবং একমাত্র টিকটিকিরা স্থির-কেন্দ্রে থেকে, অপরিসীম ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুঝে চলেছে আমার, আপনার, কলকাতার প্রতিটি মানুষের পক্ষ হয়ে। এই শান্তিপ্রিয়, বীর, কলকাতা-প্রেমিক, গৃহস্থ সরীসৃপকে আমাদের কর্পোরেশনের পারলে কোনো খেতাব, পদ্মশ্রী-টম্মশ্রীর মত, দেওয়া উচিত নয়কি? শখের গোয়েন্দাদের সত্যান্বেষণের আকাঙ্ক্ষার জন্যই না আমরা তাদের টিকটিকি বলি।

পুরাকালে প্রতিটি মহাকাব্য, দীর্ঘকাব্য, নাটক বা ইতিহাস রচিত হত প্রশস্তি দিয়ে, কারুর কাছে কৃতজ্ঞতা, কাউকে উৎসর্গ করে —এই রচনাগুলির প্রারম্ভে টিকটিকি বিষয়ে লিখলাম বোধ হয় একই কারণে; নগর বিষয়ে রচনা সর্বাপেক্ষা শান্তিপূর্ণ নাগরিককেই নিবেদিত হওয়া উচিত, এবং টিকটিকির চেয়ে মহৎ নাগরিক কে আর কোনকালে চিনেছে।

মৌলিনাথ

হাশা-নাশা গুণ্ডা

সে এক পুরো দস্তুর নাটকীয় ব্যাপার। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা।

চেম্বারলেন-দালাদিয়ের'র কৃপায় হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার একখানা ঠ্যাং কেটে নিয়ে চিবিয়ে দেখলেন, খাসা, বেড়ে, উত্তম। বাসনা গেল, বাকি পাঁঠাটিও উদরস্থাৎ করবেন।

চেক সীমান্তে সৈন্যসামন্ত, বিশেষ করে ট্যাঙ্ক সাঁজোয়াগাড়ি জড়ো করবার হুকুম দিলেন। চেক দেশের ভিতর যে-সব নাৎসি গুপ্তচর, তাদের তাড়াটে মীরজাফর-গোষ্ঠী হেথাহোথা ঘাপটি মেরে বসে ছিল তাদের প্রতি গোপন নির্দেশ গেল, তারা যেন সাবোতাজ 'জিন্দাবাদ' ইত্যাকার নানাবিধ আন্দোলন আরম্ভ করে দেয়।

চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাগে বসে প্রমাদ গুনলেন। বৃদ্ধ হাশা ভাবলেন, চেম্বারলেনের শরণাপন্ন হবেন; খবর পেলেন চেম্বারলেন নাকে তেল, কানে ক্লোরফরম ঢেলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছেন। হিটলারের কাছ থেকে তিনি 'এ-যুগের মত শান্তি'-র অভয়বাণী পেয়ে ইংলন্ডের সমৃদ্ধি সৌভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। চেকোস্লোভাকিয়ার কপালে কি আছে, না আছে সে নিয়ে তাঁর কোনো শিরঃপীড়া নেই। দেশবাসীদের নাকি একাধিকবার বলেছেনও, কোথায়, মশাই, চেকোস্লোভাকিয়া, কোথায় সে ধেড়ে ধেড়ে গোবিন্দপুর, আর কোথায় আমরা! ওদের চেনেই বা কে, জানেই বা কেভা? ওদের জন্য লড়াই লড়ে খেদারে খামোখা আমরা রক্তক্ষয় করতে যাবো কোন্ দুঃখে!"

দেশের ভবিষ্যৎ বাবদে শঙ্কিত, ভগ্নস্বাস্থ্য, বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট হাশা তখন ভাবলেন, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনা করে যদি বোঝানো যায় যে, চেকোস্লোভাকিয়ার যেটুকু তখনো স্বাধীন আছে তার স্বাধীনতা বজায় রাখলে হিটলারের পক্ষেও মঙ্গল, এবং চেকোস্লোভাকিয়া সর্বাবস্থাতেই জরমনিকে সাহায্য করবে, তবে হয়তো বা হিটলার চেকোস্লোভাকিয়াকে রেহাই দিলে দিতেও পারেন।

হায় রে দুরাশা।

কম্যানীতে প্রবাদ: লাপেতিত স্য কোয়া আঁ মাঁজা—অ্যাপেটিট্ গ্রোজ অ্যাজ ইউ ঈট—যেমন যেমন খাবে, তেমন তেমন খিদে বাড়বে। হিটলার এতক্ষণে সবে শেষ করেছেন উত্তম ভাল ঘণ্ট। এবারে গোটা চেকোস্লোভাকিয়া নামক মাংসের বাটি।

হাশা চাইলেন হিটলারের দর্শন।

অনেকে বলেন, হাশা ভুল করেছিলেন।

মোটেই না। হাশা দর্শন কামনা না করলে হিটলারই তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। এবং সে হুকুম তামিল না করার মত তাগত তাঁর ছিল না। মহামান্য ইংলনডেশ্বরের অভিজাত্য প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন মাত্র ছ' মাস পূর্বে যার চাবেক ওড়াওড়ি করেছেন লাঞ্ছন মুনিকের আকাশমার্গে—হিটলার তাঁর থালা চেটে নড়োলি একটি বারও। আর আজ বৃদ্ধ ভাতী হাশা কারসী পড়বে!

হাশা বার্লিন এলেন।

*

এই ইনটারভ্যুর বর্ণনা অনেকেই দিয়েছেন। এদের হিটলারের খাস এ্যারোপ্লেন-পাইলট বাউর। সর্বোত্তম বর্ণনা দিয়েছেন জনৈক করেন আপিসের দোভাষী শিমট্। ইনি রিপোর্ট লেখার জন্য আদ্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

খাসাইপাখাই ত্রা করেই হ্যার হিটলার বললেন, তিনি চেকোস্লোভাকিয়া দেশটিকে তাঁর 'আশ্রয়ে' নিতে চান। তার পর হিটলার যখন, দলে দলে তার বয়ান দিতে লাগলেন তখন হাশার কাছে প্রসন্ন দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাসিত হল যে, তাঁর দেশটি মাত্র কুড়িটি বৎসর স্বাধীনতা উপভোগ করার পর সে-স্বাধীনতা হারাতে চলেছে, তাঁর দেশটি 'বৃহত্তর জরমনির' অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।

হাশা কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলেন অত্যল্পই।

বৃদ্ধ যখন অতি কষ্টে স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলেছেন, তখন হিটলার হঠাৎ বাধা দিয়ে জরমন বিমানবহরের সর্বেশ্বরকে ডাকলেন,

'গ্যোরিঙ!'

গ্যোরিঙ মিলিটারি কায়দায় সেলুট ঠুকে বললেন,

'মাইন ফ্যুরার" (আমার প্রভু!)

'প্রাগ শহরকে ভস্মস্তূপে পরিণত করার জন্য তোমার কি পরিমাণ বোমারু বিমান আছে?'

'প্রাগের উপরকার আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে!'

তারপর হিটলার জরমন জঙ্গীলাটকে ডাকলেন,

'কাইটেল!'

কাইটেল রাইডিং বুটের হিল্-এ হিল-এ ক্লিক্ করে বললেন,

'মাইন ফ্যুরার!'

'চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার বা/এবং বিনষ্ট করার জন্য তোমার কাছে কি পরিমাণ সৈন্যবল অস্ত্রশস্ত্র আছে?'

কাইটেল সৈন্যবল, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়াগাড়ি প্রভৃতির সংখ্যা দফে দফে বলে যেতে লাগলেন।

হাশা চেয়ারে বসে ঘামছেন আর কাঁপছেন। গ্যোরিঙ এবং কাইটেল যে-সব সংখ্যা শোনালেন তার দু'আনি পরিমাণও চেকোস্লোভাকিয়ার নেই; কিন্তু হাশার কল্পনাশক্তি ছিল।

এ ইনটারভ্যুর ঠিক ছ' মাস পরে হিটলার পোল্যানডের ওয়ারসো নগর কী নির্মমভাবে বোমারু বিমান দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটা যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। আরো দেখতে পেলেন, ঠিক এক বৎসর পূর্বে হিটলার কিভাবে অসট্রিয়া দখল করেন, এবং ঐ দেশের প্রধানমন্ত্রী শুশনিক তোড়জোড় করেছিলেন বলে আজ কিভাবে কনসানট্রেশন ক্যাম্পে 'জীবনযাপন' করছেন।

চেম্বারলেন তখন লনডনে সুখনিদ্রায়। দালাদিয়ে প্যারিসে তদ্বৎ।

টাইপ-করা 'একরারনামা' হাশার সম্মুখে রাখা হল ডটেড লাইনের উপর দস্তখত (এ জাতীয় দস্তখত-কে বিদ্যেসাগর মশাই 'দস্তক্ষত'—যে সই করতে হাত জখম হয়!—নাম দিয়েছিলেন) করার জন্য।

এ দলিলে চেকোশ্লোভাকিয়া 'আমন্ত্রণ' জানাচ্ছে, হিটলারকে, তাকে তাঁর 'স্নেহময়' ক্রোড়ে তুলে নেবার জন্য। তার পর ফের দফে দফে লেখা হয়েছে, কি কি শর্ত তাকে মেনে নিতে হবে।

সব কটা শর্ত হাশার আর পড়া হয়ে ওঠেনি।

তিনি শব্দার্থে বাক্যার্থে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছেন।

হিটলার বিরক্তির সঙ্গে আদেশ দিলেন, 'হাশাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। মরেল-কে ডাকো।'

মরেল সেই হাতুড়ে ডাক্তার। হিটলারকে ওষুধের নামে কত বিষ খাইয়েছিলেন তার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি। লোকটা ছিল মোটা, বারো মাস ঘামে ভিজে নোংরা এবং ট্রেভার-রোপার লিখেছেন, উইদ হাইজীনিক হ্যাবিট্‌স্ অব এ পিগ—শরীর রক্ষণ বাবদে শুয়োরটার আচরণ মেনে চলে। অথচ এর এলেমের প্রতি হিটলারের ছিল অচলা ভক্তি।

মরেল ইনজেকশন দিলেন।

হাশা চাঙা হলেন। দেশের সর্বাগ্রে সর্বনাশের কথা, অগণিত নরনারীর জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার চিন্তা করে নিরুপায় হাশা সই করে দিলেন।

ঘটনা সমাপ্তির পর গোয়রিঙ কাইটেলাদি আমির-ওমরাহ আপন আপন কৃতিত্বের বয়ান করে ক্রেডিট নিতে লাগলেন। হিটলার বললেন, 'হাশা ভিরমি যাওয়াতে আমি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বুড়ো যদি মরে যায়, তবে কুল্লে দুনিয়ায় রটে যেত, ব্যাটা হিটলার হাশাকে খুন করেছে।'

চাটুকারস্য চাটুকার মরেল হাত কচলাতে কচলাতে মুচকি মুচকি হেসে বললে, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আমার ইনজেকশনেই তো—'

হুঙ্কার দিয়ে হিটলার বললেন, 'জাহান্নমে যাক তোমার ঐ ইনজেকশন। বুড়ো এত বেশী চাঙা হয়ে উঠলো যে, আমি তো ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলুম, শেষটায় বুঝি সই না-ই বা করে!'

*

সেই সন্ধ্যায়ই হিটলার ট্রেনে চেপে চেক সীমান্তে পেঁৗছে সেখান থেকে মোটরে করে প্রাগ পৌঁছলেন। বিখ্যাত হাড্‌জিন প্রাসাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সগর্বে বললেন, 'প্রাগ জরমন নগর। চিরকাল জরমন্ থাকবে।'

তা—পুরা ছ' বছরও থাকেনি।

বঙ্গভারতী সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গান গাইছেন। হারমোনিয়ম নিয়ে শ্রীজ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র, অধ্যক্ষ

কয়েকটি গানের ইস্কুলের কথা। প্রধানত বাঙলা গান শেখার বিদ্যালয়, রবীন্দ্র সংগীতের তো বটেই। যে চারটি বিদ্যালয়ের কথা বলবো তাদের তিনটিতে শেখান হয় শুধু রবীন্দ্র সংগীত, অর্থাৎ রবীন্দ্রগীত।

প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে সরস্বতী যদি ভর করতেন, একশোবার করতাম। কিন্তু এই চারটি সংস্থাই প্রশংসনীয় উদ্যমে কাজ করছেন। তাদের ভালমন্দ একান্তভাবে নির্ভর করে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের নিষ্ঠার উপর।

প্রথম বলতে চাই বঙ্গভারতী ইনস্টিটিউট অব মিউজিক নামক সংস্থাটির কথা। যদিও এটি স্থাপিত হয়েছে মাত্র ১৯৬৫ সনে, এটিই একমাত্র বাঙালী পরিচালিত সংস্থা যেখানে সংগীতকে সামগ্রিকভাবে নেওয়া হয়েছে এবং বাঙলা দেশের গান শেখানোর জন্যে একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রকরণ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এটির পরিচালনায় আছেন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, কিন্তু আসল ব্যক্তিটি হলেন সংগীতজ্ঞ-কবি জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র, দিল্লিবাসীদের "বটুকদা"। তিনি হলেন সংস্থাটির অধ্যক্ষ।

সংস্থাটির অধুনা দুটো শিক্ষণ কেন্দ্র। একটি হোল ৭-এ এলাকার শিশুভারতী বিদ্যালয়ে, বিকেলে, অন্যটি বিনয়নগর বেঙ্গলী স্কুলে। সপ্তাহে তিনদিন করে গানের ক্লাস। শিক্ষণে আছেন তিনজন এখন: অধ্যক্ষ মহাশয় নিজে, আছেন বরুণ সেনগুপ্ত এবং সব্যসাচী গুপ্ত। বিদ্যালয়ে আছে তিন বৎসরের কোর্স যার শেষে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অনেকটা কলকাতার রবীন্দ্র ভারতীর প্রকরণ অনুযায়ী কোর্স করা হয়েছে।

এই তিন বৎসরের কোর্সে আছে চারটি বিষয়: রবীন্দ্র সংগীত, শাস্ত্রীয় সংগীত (উত্তর ভারতীয়), শ্যামা সংগীত-টপ্পা-ব্রহ্ম সংগীত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুলের গান এবং চতুর্থতে কীর্তন। পরিষ্কার সিলেবাস করা আছে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষণ চলে।

(ইদানীং এঁরা কিশোর-কিশোরীদের জন্যেও ঐ দুই কেন্দ্রে শিক্ষণ আরম্ভ করেছেন। প্রয়োজন, অল্প বয়স্কদের জন্যে তৈরি করা নতুন ধরনের সিলেবাস, যা তাদের সাহায্য করবে উন্নত ধরনের সংগীত জগতে প্রবেশ করায়। হয়তো তাঁরা করবেন শীঘ্রই।)

এই সংগীত সংস্থার মূলনীতির সঙ্গে আমি একমত। কিনা, যদি রবীন্দ্রগীত কি অন্যান্য বাঙালী গীতিকারের গান শিখতে হয় (ভালভাবে), তাহলে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত শিখতেই হবে, কারণ অন্যথায় গলায় সুর বসবে না। জন্মগত কয়েকজনকে বাদ দিলে অন্যান্য সকলের বেলাতেই এই নীতি প্রযোজ্য। তাঁরা অত্যন্ত ভ্রান্ত যাঁরা মনে করেন যে, হারমোনিয়মের বেলো টেনে সুকণ্ঠে একবার "চিনিগো চিনিগো চিনি তোমায়" গাইতে পারলেই সংগীতের পরাকাষ্ঠা পর্যায়ে আসা যাবে, তাঁরা অত্যন্ত ভুল করবেন। গলা তাঁদের হয়তো থাকবে, কিন্তু সুরদেবী তাঁদের ফাঁকি দিয়ে যাবেন খুব শীঘ্র। ভিত না গেঁথে গৃহ-নির্মাণ হয় না। এবং সুরজগতের ভিত্তি হোল শাস্ত্রীয় সংগীত, বিশেষত যাঁরা ভালভাবে গাইতে চান রবীন্দ্রগীত ও অন্যান্য বাঙালী গীতিকারদের গীত। ভেবেই পাই না যে, যদি কেউ (অসাধারণদের বাদ দিয়ে) গলায় সরগম না বসাতে পারে, সে কী করে গাইতে পারে নজরুলের গজল? কিম্বা অতুল-প্রসাদের গান?

বঙ্গভারতীর এই উদ্যম তাই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আর কেউ এই প্রচেষ্টায় এখনো আসেননি, কিন্তু আসা উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় যদি বঙ্গভারতী তার উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হতে চান, তাহলে প্রয়োজন তাঁদের আরো বেশি শিক্ষকের, যাঁরা বাঙলা গানের নানা শাখায় বিশেষজ্ঞ। অবশ্য টাকার কথা আছে। প্রধানত সাহায্য এঁরা পেয়ে আসছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে (অন্যরা কেন পায় না, তার কারণ আমার জানা নেই)। হয় টাকার বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজন, তা না হলে যে অর্থ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের হাতে দেওয়া হয় সেটা আরো সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা আবশ্যক। বিশদভাবে জানাতে গেলে আরো অনেক লিখতে হয়।

কিন্তু একটি কথা জানানোর প্রয়োজন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনকে। কিনা, যাঁরা

সঙ্গীতজ্ঞ নন, তাঁরা যেন না-আসেন সংগীত সংস্থার কাজে ও শিক্ষণে মাথা গলাতে। তাতে গলানো (গলিত নয়!) মাথার কেশ নষ্ট হতে পারে, কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষণ কাজ এগুবে না। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ মহাশয়কে পুরোপুরি ক্ষমতা দেওয়া উচিত এবং আমার বিশ্বাস তাঁরা দিয়েছেনও।

শুনলাম বঙ্গভারতী আরো কয়েকটা কেন্দ্র খুলবেন, যেমন হাউস খাসে। রাজধানীর নিয়মটা অন্যরকমের : এখানে ছাত্রছাত্রীরা কষ্ট করে স্কুলে যায় না; স্কুলরা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। মানে গানবাজনায় রুচি একটু কমের দিকে—কেউ কেউ বিবাহার্থ, কেউ কেউ অবসর-যাপনার্থ। কেউ কিশোরী কেউ গিন্নি। এবং তাঁদের সঙ্গেই সমাধী সঙ্গীতের!

বঙ্গভারতীর অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনেক গুণ আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তার পরিচয় পেয়ে যেন ধন্য হন, কিন্তু তার জন্যেও প্রয়োজন পারদর্শিতা। উনি কবি, কবিতায় দিতে পারেন ও দেন সুর। তাঁর নিজস্ব দেওয়া আছে বহু ভাওয়াইয়া গান, আছে অনেক সুর-দেওয়া ব্যালে ও সিনেমায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁকে এখনো মূল্য দিতে পারলাম না। এই সেদিন জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র কবিতা তৈরি করে সুর দিলেন উত্তরবঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের গানে, টাকা পয়সা তুলতে। 'কী চমৎকার চোখে-জল-আনা গান, আর তা শুনে কতো দিল্লি-বাসী এগিয়ে এল সাহায্য দিতে'। তিনি আমাদের নমস্য।

আরেকটি বিদ্যালয় রবীন্দ্রগীতিকা। এটির পরিচালনায় আছেন সুধীর চন্দ যাঁর কথা পাঠকরা আগেও শুনেছেন। ইনি ক্লাস করেন শুধু রবীন্দ্রগীতির, ২০ নম্বর ফ্ল্যাটে শংকর মার্কেটে। ছাত্রছাত্রী এখন প্রায় পঞ্চাশজন। ছাত্রীই বেশি। (এই একটা অদ্ভুত দিক। সব বিদ্যালয়েই গান শেখে মেয়েরাই বেশি, কিন্তু কেন! ছেলেরা কেন শিখবে না! প্রায় প্রত্যেকটি কেন্দ্রে দেখেছি যে ছেলেদের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু কেন?) তা হোক। এঁর কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত ও একক গান অনেকবার শুনেছি এবং আমার সন্দেহ নেই যে সুধীর চন্দ মহাশয় নিজে সৃষ্টি করেছেন নিজের একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত ঐতিহ্য।

উনি বললেন : আমার ইচ্ছা আরো কেন্দ্র বাড়াই এবং একটা ক্লাস করি কিশোর-কিশোরীদের জন্যে। পুরুষেরা আরো এলে ভাল হয়। কেননা সমবেত সঙ্গীতে প্রয়োজন একটা স্বর-সামঞ্জস্য, স্বর-ভারসাম্য। কিন্তু ছেলেরা গান শিখতে আসে না। বড়জোর গীটার নিয়ে একটু টুংটাং, কিন্তু গান? বাপস্! অতো পরিশ্রম কে করে?

(আমার তো ইচ্ছা হয় ঘোষণা করি আসুন! যতোজন পারেন আসুন! গান শিখুন, বাজনা বাজান, আনন্দ করুন, কিন্তু আসুন সঙ্গীত জগতে। বয়েস? প্লিজ, ওটার ধার ধারবেন না, মনের বয়েসটা দেখুন। যে কোনো বয়সে সঙ্গীত জগতের সভ্য হওয়া যায়।)

*

আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ-একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় যার নাম "সুর ভারতী"। এর পরিচালক হলেন সমীর সরকার মহাশয়, যাঁর ছাত্র-ছাত্রী-গীত "মহালয়া" রাজধানীর বাঙালী মহলে সুখ্যাত। (এই বছরের পুজোতেও তাঁর দল গেয়েছে দুদিনে পাঁচটি পুজামণ্ডপে এবং পেয়েছে অনেক প্রশংসা। গানে ও চণ্ডিপাঠে। প্রকরণ, আকাশবাণীর "মহালয়া" অনুযায়ী, কিন্তু সমীরবাবুর উদ্যম অনেক বেশি, তাঁর সহায়তা অনেক কম।

তাঁর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী হলেন গৃহিণী, [illegible]। কিন্তু গান দিয়ে তাঁরাও কম যান না রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। শিক্ষণ কেন্দ্র দুটো : একটি নিউ রাজেন্দ্র-নগরে আর-৪৮৮ নম্বর বাড়িতে, অন্যটি ইস্ট প্যাটেল নগরে ডক্টর ঘোষের বাড়িতে (২৬।২৫ প্যাটেল নগর)। সপ্তাহে দুদিন : নিউ রাজেন্দ্র নগরে শনিবার ও রবিবার এবং প্যাটেল নগরে মঙ্গল ও শুক্রবার। সুরভারতী চিন্তা করছে কিশোর-কিশোরী-দের জন্যে শিক্ষাকেন্দ্র খোলার।

চতুর্থ বিদ্যালয় হোল "গীতিবীতান"। শেষে এলেও এর গুরুত্ব কোনো কম নয়। এটিই একমাত্র সংস্থা যেটি পেয়ে আসছে আর্থিক সহায়তা সংগীত-নাটক আকাদেমি থেকে। এটির প্রধান পরিচালিকা হলেন শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য, যাঁর নাম অনেকেই জানেন।

গীতিবীতানের অনেকগুলো কেন্দ্র। যথা : কৈলাশ কলোনি (এল-২৮); হাউস খাস (এ-২৮); লোদি রোড (১৭ ব্লক ৯৪২ নম্বর বাড়ি); এণ্ড্রুজ গঞ্জ, মাতা সুন্দরী রোড, দেবনগর, লক্ষ্মীবাঈ নগর, ও রামকৃষ্ণ-পুরমে। একুনে প্রায় ৯০ জন ছাত্রছাত্রী। শিক্ষা-ক্রম পাঁচ বছরের, যার পর দেওয়া হয় ডিপ্লোমা। যাঁরা শেখান তাঁদের মধ্যে আছেন সুকেশ জানা (অধ্যক্ষ), অনিমা দাশগুপ্তা, অমল বসাক, অর্ধেন্দু হালদার, প্রদোষ মল্লিক ও দিব্য সরকার।

সকলেরই উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু একটি আছে সমালোচনার বিষয় সকলের ক্ষেত্রে। এঁরা কেউ শেখান না স্বরলিপি, গীতিবিতান ছাড়া। গীতিবিতান তৃতীয়বর্ষ থেকে শেখায় স্বরলিপি পড়ার ও স্বরলিপি থেকে গান শেখা ও লেখা। এটা খুব ভাল কথা। বুঝি না, অন্যান্য সংস্থারা কেন শেখান না। স্বরলিপি না-জেনে গান শেখা মানে ক-খ না জেনে লেখাপড়া শেখা। ইউরোপে কোনো লোক ভাবতেও পারে না যে নোটেশন না জেনে গান-বাজনা কী করে শেখা যায়।

ধরুন রবীন্দ্র সঙ্গীত। আপনি মুখে মুখে যেমন হোক শেখালেন "ঝরাপাতা গো আমি তোমারি দলে।" ঠিক। আমি কী করে জানবো আপনি শেখালেন ঠিক শুদ্ধ সুরে, যে সুরে গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ? শেখালেন মুখে মুখে। আমি আবার শেখালাম অন্যকে মুখে মুখে এবং ভবিষ্যতে সুরের অনেক জায়গায় হয়ে গেল অদল বদল।

বিশেষত রবীন্দ্রগীতির অলংকার ও মিড়ের জায়গায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে যে, মাস্টারমশাইরা যে কোনো সুবিধে-মতো জায়গায় বসান মিড়। এবং যে কোনো স্থানে অলংকার। স্বরলিপি না-শেখানো শুধু গাফিলতি নয়, সঙ্গীত জগতে অপরাধ।

আশা করি তাঁরা সকলেই সঙ্গীতের সম্মান রক্ষা করবেন।

খগেন দে সরকার

আলোয় কালোয়

গত ৫ই অক্টোবর সংখ্যায় ত্রিশঙ্কুর লেখার বিষয়টি নতুন। যেসব বাঙালী অবাঙালী বিয়ে করে চিরদিনের মত নি র্বা সি ত—তাঁদের মনের গোপন অভিমানের কথা ভেবে হয়তো অনেক বাঙালী পাঠক ত্রিশঙ্কুর সংগে সংগে মনে দুঃখ পেয়েছেন।

ত্রিশংকুর লেখা আমার ভালো লাগে-- সেজন্য তিনি যাঁদের জন্য দুঃখ করেছেন এবং যাঁদের মাছের ঝোল-ভাত খাবার অসুবিধে এবং বাংলায় কাঁদবার অসুবিধার সংগে এত সহানুভূতি জানিয়েছেন, তাঁদের তরফ থেকে দু' এক লাইন না লিখে পারলাম না। ত্রিশংকুর সংবেদনশীলতা প্রশংসনীয় —কিন্তু আমার আশংকা হয়, এই দুঃখবোধ একটু অপ্রয়োজনীয় বা অপাত্রে অর্পিত। তিনি যদি হেনা পেটেল বা কৃষ্ণা চোপড়া সম্বন্ধে আর একটু খোঁজ করে দেখেন তা হলে খুব সম্ভব জানতে পারবেন যে, তাঁরা কেউই বাংলা দেশে মানুষ নন। এবং বাংলা ভাষা, বাংলা গান, বাংলা কৃষ্টি ও মাছের ঝোল সম্বন্ধে নস্টালজিয়া হয়ত তাঁদের কাছে ত্রিশংকুর মত তীব্র নয়। যেসব বাংলাভাষী মেয়ে অবাঙালী বিয়ে করেন তাঁদের একটা বড় পার্সেণ্টেজই বাংলা দেশের বাইরে মানুষ। বাংলা দেশের বাঙালী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বড়-হওয়া বাঙালীর মধ্যে বিশেষ মনোগত পার্থক্য আছে--এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। এই সাংস্কৃতিক ব্যবধানটা এত গভীর যে, এ নিয়ে কথনও যথেষ্ট আলোচনা হয় না কেন সেটা আমার আশ্চর্য মনে হয়।

আমার মত নিশ্চয় কয়েক লক্ষ বাঙালী ভারতবর্ষের চারিদিকে ছড়িয়ে আছেন, যাঁরা একাধিক জেনারেশন থেকে অন্য প্রদেশের বাসিন্দা। যদিও এইসব বাঙালী বাংলা বই পড়েন, পুজো সংখ্যা কেনেন, বাংলা সিনেমা এলে দেখতে ছাড়েন না এবং বাংলা গানও গুনগুন করে থাকেন, তবুও তাঁদের কাছে বাংলা ও হিন্দী অথবা একাধিক কোন ভাষা মাতৃভাষার সামিল। ছোটবেলা থেকেই অবাঙালী বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, পরিবেশ এবং স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কখনোই এ বিশ্বাসটা গড়ে উঠতে পারে না (যে ভাবটা বাংলা দেশের বাঙালীর কাছে অত্যন্ত প্রকট) যে, বাংলা সংস্কৃতিই একমাত্র সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষের অন্য সব কিছুই অন্ত্যজ। এই উদার মনোভাব ভালো কি মন্দ বলতে পারি না। ত্রিশঙ্কুর মতে অবশ্য "সর্বভারতীয় ঐক্যবোধ একটি বিশুদ্ধ বাঙালিনী সর্বনাশ করেছে।" হতেও পারে। কিন্তু যে বাঙালিনী নিজের সর্বনাশ নিয়েই খুশী, তাঁদের জন্য অকারণ দুঃখ করে কি লাভ বলুন?

ত্রিশংকুর লেখা পড়ে মনে হয়, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে দিল্লি প্রবাসী। তাঁর কাছে বাংলা দেশ সম্বন্ধে সেণ্টিমেণ্ট যত প্রবল—যে মেয়ে জন্মাবধি দিল্লি বা এলাহাবাদ বা বম্বেতে মানুষ, তার কাছে ততটা না হওয়াই সম্ভব, এবং ত্রিশংকুর পক্ষে তাঁর নিজের মন নিয়ে এ'দের সুখ-দুঃখ বিচার করা (বিশেষত যখন সে বিচার এক সন্ধ্যার সামাজিক কথোপকথনের উপর নির্ভরশীল) একটু হঠকারিতা নয় কি?

নজরুলের গানের যেমন হিন্দী হয় না, তেমন মীরার অনেক ভজন বা গালিবের গজলেরও বাংলা হয় না—অথচ এসব গানও অনেক সময় গায়িকারই মনের ভাব প্রকাশ করে। এ নিয়ে ভাবপ্রবণতা বা দুঃখবিলাস করে কি কোন ফল আছে? "আমরা এই-সব মেয়েকে অবহেলা করেছি বলে তারা অবাঙালী বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে"—এরকম ধরনের ভেবে ত্রিশংকু যদি কোন আনন্দ পান তা হলে অবশ্য সেই আনন্দ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করাটা অন্যায় হবে—কিন্তু আসল ব্যাপারটা সব সময় তা নয়। বাঙালী ছেলে বিয়ে করলেই যে তাদের সুখের পাত্র পূর্ণ হত, হয়ত তা ঠিক নয়। সত্য অনেক সময় অপ্রিয়, তবে দেশ পত্রিকা এই হেরোস ছাপতে রাজী হবেন কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে।

সুজাতা পুনেকর
পুনা—৪

কাউড্রের ক্রিকেট রেকর্ড

গত ৫ই অক্টোবর ১৯৬৮ সালের দেশ পত্রিকার ক্রীড়াকীর্তি বিভাগে কাউড্রে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'মুকুল' কিছু ক্রিকেট রেকর্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসংগে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমত, মুকুল লিখেছেন, কাউড্রের খেলা ১০১টি টেস্ট একটি নতুন রেকর্ড। কিন্তু, যত দূর মনে হয়, এই ১০১টি টেস্টের মধ্যে অনেকগুলিই হলো বেসরকারী টেস্ট। বিশেষ করে যেগুলি তিনি খেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে, অতএব এই ১০১টি টেস্টকে নতুন রেকর্ড বলা হয় না। এই ব্যাপারে রেকর্ডের দাবি করতে পারেন ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব উইকেট কিপার জি ইভান্স।

এর পরে মুকুল লিখেছেন, টেস্ট রানে ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ৭২৪৯ রান। এটি সম্পূর্ণ ভুল। যত দূর জানি, টেস্ট ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হলো ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেন ওয়ালি হ্যামণ্ডের। এই রেকর্ড ইনি করেছিলেন ৮৫টি টেস্ট খেলে। ব্র্যাডম্যান তাঁর জীবনে ৫২টি টেস্টে ৮০টি ইনিংস খেলে করেছিলেন ৬৯৯৬ রান। ক্রীড়া-জীবনের শেষ টেস্ট খেলায় মাত্র ৪টি রান করতে পারলে শুধু যে ব্র্যাডম্যানের ৭০০০ রান পূর্ণ হতো তাই নয়, তাঁর টেস্টে গড় রানের সংখ্যা দাঁড়াত ১০০তে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৪৮ সালের ওভাল মাঠে শেষ টেস্ট খেলাতে দর্শকদের অভিনন্দনে অভিভূত ব্র্যাডম্যান আউট হয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় বলে কোন রান না করেই। ব্র্যাডম্যানের জীবনের এই দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের কথা ক্রীড়া-সাংবাদিকের না জানার কথা নয়।

পরিশেষে আর একটি কথা, ১০১টি টেস্টে কাউড্রে যদি ৪২টি সেঞ্চুরী করে থাকেন তবে ব্র্যাডম্যানের ২৯টি সেঞ্চুরীর রেকর্ড ভাঙতে তাঁর আরও ৯টি সেঞ্চুরীর দরকার হয় কি করে?

লেখক অবশ্য যদি ৪২টি সেঞ্চুরী প্রথম শ্রেণীর খেলায় এই বোঝাতে চেয়ে থাকেন, তবে জানাতে হয় প্রথম শ্রেণীর খেলায় ৪২টির বেশী সেঞ্চুরী বহু খেলোয়াড় করেছেন। জ্যাক হবস করেছেন ১৯৭টি, ব্র্যাডম্যান ১১৭টি ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই ৪২টি সেঞ্চুরী কোন রেকর্ড নয়।

গৌতম মিত্র
কলকাতা-১৪

"আধুনিক কাব্য-সংগীত"

দেশ ১৮ই আশ্বিন সংখ্যার 'রঙ্গজগৎ' বিভাগে এবারের পুজো-রেকর্ড সমালোচনা পড়লাম। শুরুতে সমালোচক গানের কাব্য-মূল্য প্রসংগে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত, গত কয়েক বছর যাবৎ দুঃখের সংগে লক্ষ করছি, আধুনিক বাংলা গান ক্রমশ এত চটুল ও অন্তঃসার-শূন্য হয়ে উঠছে যে, রুচিবান বিদগ্ধ শ্রোতার কাছে তা পীড়াদায়ক মনে হয়। যাঁরা এইসব গান (?) শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপহার দেন, তাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন কিনা জানি না; কিন্তু এটা বোধ হয় সত্য যে, আমার মতো আরও অসংখ্য নিরুপায় শ্রোতা তাঁদের এই উপহারের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করেন।

বাংলা কাব্য-সংগীতের শরীরে এই অবক্ষয়ের কারণ বহুবিধ। যে কারণগুলো আমি প্রধান মনে করি, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করতে চাই। প্রথমত, মুষ্টিমেয় কয়েকজন গীতিকার যাবতীয় গান রচনা করে থাকেন। তাঁদের প্রতিভা আছে এ কথা অনস্বীকার্য এবং তাঁরা বহু ভালো গান আমাদের উপহার দিয়েছেন

এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও কুণ্ঠিত নই। তাঁদের প্রতিভার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেই এ কথা বলা প্রয়োজন যে, বাংলা গানের কাব্যিক সম্পদ ও মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য তাঁরা আর তেমন যত্নবান নন অথবা "পাইকারী হারে যোগান" দিতে গিয়ে তাঁদের শক্তি নিঃশেষিত। এই প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা ভালো যে, আমাদের সামাজিক চরিত্রে যে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে, তার প্রতিফলন সাংস্কৃতিক জীবনেও অবশ্যম্ভাবী কিছুটা, তাই বলে আমাদের নিরাশ হওয়ার এখনই কোন কারণ ঘটেনি।

একটি জিনিস আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, বাংলা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রখ্যাত আধুনিক কবি যাঁরা, তাঁরা গান রচনার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। গীতি-কবিতা রচনায় তাঁদের এই [illegible] উদাসীনতা এবং অনীহার কারণ কি তা আমি ভেবে পাইনি। তাঁরা এ বিষয়ে কি ভাবেন জানতে ইচ্ছা হয়।

আমার বিশ্বাস, আধুনিক কবিরা যদি গান রচনা করেন, তা হলে তা সমাদৃত হবেই এবং বাংলা কাব্য সংগীতের গতি-প্রবাহে নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে। আশা করি, আমার এ আবেদন তাঁরা এবং বাংলা দেশের সমস্ত প্রতিভাবান কবি বাংলা গানের ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে বিবেচনা করে দেখবেন। আজকের যাঁরা প্রখ্যাত গীতিকার তাঁরা প্রায় সকলেই গান রচনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, বিপুলসংখ্যায় গান রচনা তাঁদের কাছে বাধ্যতামূলক। ফলে, তাঁদের অধিকাংশ রচনাই এক জোড়াতালি। তার মধ্যে সারবস্তু আশা করাই বৃথা। কাজেই হাজারে হাজারে অন্তঃসারশূন্য কথার মালা গানের নামে উপহার হিসেবে আমরা বছরের পর বছর লাভ করছি এবং তার ভারে আমাদের মাথা নুয়ে পড়ছে!

শুধুমাত্র সমালোচনায় এর কোন সুরাহা হবে, এমন আশা আমি করি না। যাঁদের মধ্যে প্রকৃতই কবিত্বশক্তি আছে এবং অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ যাঁদের আয়ত্তে তাঁরা যদি উদ্যোগী না হন, তা হলে প্রকৃত কোন কাজ হবে না।

বাংলা দেশে সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকা, প্রতিভাবান কবি, অভিজ্ঞ সুরকার ও কলা-কুশলী এবং সংগীত-রসিক-শ্রোতা—সবই আছে। তবু বাংলা কাব্য-সংগীত রুচিবান মানুষের কাছে অফুরন্ত আনন্দের উৎস না হয়ে পীড়াদায়ক, অরুচিকর, চটুল বলে নিন্দিত ও অবহেলিত হবে এ কথা ভাবতেও দুঃখবোধ হয়।

[illegible] রায়চৌধুরী
[illegible]

ভোটমঙ্গল

গত ৫০ সংখ্যা 'দেশে' স্বনামখ্যাত লেখক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী "ভোটমঙ্গল" সেকালের বাঙালীর ভোট ইলেকশন প্রবন্ধে লিখেছেন 'খানকা' হতে 'খানকী' কথাটি আসিয়াছে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত। পীর-ফকীরগণ ইসলাম বা স্বধর্মীয় আদর্শ প্রচার ও সম্প্রসারিত করার বাসনায় জনাকীর্ণ স্থানে 'আস্তানা' বা 'খানকা' প্রতিষ্ঠা করে বাস করতেন। এবং এই সকল খানকায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবারই প্রবেশের অধিকার ছিল। তাহার ফলে খানকা ও আস্তানাগুলো এখনও সর্বজাতি, সব শ্রেণী ও সব ধর্মাবলম্বীর পুণ্য-তীর্থে পরিণত হয়ে রয়েছে। যেমন—[illegible] 'খান্‌কা' শরীফ। তাছাড়া 'খানকা' আরবী (খানক্‌) শব্দ; আর 'খানকী' ফারসী (খানগী) শব্দ; অদ্যাবধি বাংলাদেশে, পল্লীগ্রামে মেয়েলী গালিতে ব্যবহৃত হয়।

সুফী আবদুল আল্লাম
দুর্গাপুর-৫

প্যারিসের চিঠি

'দেশ' ৪০ সংখ্যায় (২৬-১০-৬৮) প্রকাশিত প্যারিসের চিঠি সম্পর্কে একটি আপত্তি আছে। শ্রীযুক্ত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় পুলিটজার পুরস্কার পান নি, তিনি তাঁর 'গে-নেক' বই-এর জন্য আমেরিকায় নিউ বেরি মেডাল পেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একজনমাত্র ভারতীয় পুলিটজার পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর নাম গগনবিহারী লাল, বিখ্যাত একটি মার্কিন দৈনিকে তিনি বিজ্ঞান প্রসঙ্গ লিখতেন।

অমরেন্দ্রকুমার সেন
কলকাতা-৯

বেণী বা কবরী, তরুণী বা যুবতী —কুন্তল সজ্জায় যাঁরা কৃত্রিম কেশ-পাশ ব্যবহার করেন

১নং চিত্র

সুজাতা গল্প শোনাচ্ছিল। সে লণ্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনে কাজ করে। থাকে লণ্ডন এয়ার পোর্টের কাছে। স্বামীরও কর্মস্থান লণ্ডন। এরকম ভারতীয় সংসার সেখানে অনেক। গল্পের বিষয়টি মজার।

সকাল বেলায় তাড়াহুড়ো করে কাজ সেরে অফিস যেতে হবে। এমন সময় আগন্তুক। হাতে তার মস্ত স্যুটকেশ। বললে কার না থাক বদল করে উঠবে। আগন্তুকের [illegible] কাছ।

২নং চিত্র

চুল যেন নীল-সাগরের ঢেউ। বরন অনুমান করা অসম্ভব। যাক, সুজাতা নিশ্চিন্ত হলো। আগন্তুক অসময়ের আস্ত অতিথি নয়। সে মুহূর্তের [illegible] মিনিট

৩নং চিত্র

সময় প্রার্থনা করে। যায় খরচে [illegible] দেখালো তাতে সুজাতা হতভম্ব। রাশি রাশি চুল। হরেক রকম সাজানো গোছানো পরচুলা। আসলে আগন্তুক এক মার্কিন চুল কোম্পানীর সেলস-

৪নং চিত্র

ম্যান। অনর্গল বলে যেতে লাগলো পরচুলার যাদু-স্পর্শের সব চমক-প্রদ কথা। এই যে সব চিত্রতারকাদের চমৎকার চুল দেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই চুল এই

৫নং চিত্র

কোম্পানীর কারখানা। কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে টেনে নিজের চুল খুলে ফেললো সে। ওমা, এ যে একেবারে চকচকে টাক। তাইতো এত লোক থাকতে এত বড় কোম্পানী এত পয়সা খরচা করে চাকরী দিল! এতো চলমান বিজ্ঞাপন। নীলসাগরের ঢেউই বা কোথায় আর অমন কাঁচা কচি চেহারাই বা কোথায়? একেবারে পেল্লায় টাকওয়ালা মধ্যবয়স্ক লোকটি সামনে দাঁড়িয়ে। সুজাতা আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলো—তা' এত লোক থাকতে তার কাছে কেন আসতে হ'লো এমন মাল চালাতে। মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে আগন্তুক বললেন, আসা যাওয়ার পথে সুজাতার স্বামীকে দেখেছেন। তাঁর জন্যই এ আয়োজন! বিদেশিনীদের বেলায় কি হ'তো জানি না, আমাদের পতিগতপ্রাণ বাঙালী মেয়ের তার স্বামীকে এমন নজর দেবার ব্যাপারটা ভাল লাগেনি। তার উপর পরচুলার যা দাম শোনা গেল তাতে বিং জনবিদের জন্যই এসব থাকা উচিত এ মন্তব্যটিও সেলসম্যান সাহেবকে শুনিয়ে দিল। সাহেবও খদ্দের পটাতে সিদ্ধহস্ত। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বললো, তাতে কি। ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা আছে। চাই কি দামী পরচুলা চড়া হারে বীমা করে ফেলতেও পারা যায়। আর কম দামীগুলো তো মাত্র শ' দুই ডলার। মানে হাজার দেড়েক টাকা মূল্য দিলেই মুহূর্তে বদলে যাবে চেহারা। যে দেখবে সে তো ভুলবেই। নিজেও নূতন রূপের মনোহারিত্বে মশগুল হয়ে যাবে। আসলের চেয়ে নকলের মান বাড়বে।

এত সব সত্ত্বেও সুজাতা সেদিন পরচুলার কাছে পরাভব স্বীকার করেনি। তবে সুজাতা না করুক, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি এই যে স্যর সাহেব তাঁর ব্যবসায় উপলক্ষে প্যারিস্ গিয়ে ফিরে এসে একেবারে ছুঁচোলো মুখো জুতো আর ঘন চুলের রাশি নিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন তার কতটা খাঁটি বলা কঠিন। এদেশে বাস করেও পরচুলা ব্যবহার যে মাত্র থিয়েটারে বা যাত্রার দলে হয় তাও নয়। বরং মানুষের চুল দিয়ে পরচুলা তৈরী আমাদেরই দেশে বিশেষ ব্যবসায় ছিল, আজও আছে। বিদেশে কেশ রপ্তানি করা এখন বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির একটি প্রশস্ত উপায়। বছর কয়েক আগেও আমার মা পরেশবাবুকে তাঁরই ছেলে পচা মনে করে বাবা বাছা করে গায়ে হাত বুলিয়ে বসেছিলেন! পরেশবাবুও অপ্রস্তুত। দায়ী কেউ নয়। একটি পরচুলায় এই প্রচণ্ড বিভ্রম সৃষ্টি হয়।

নানা ধরনের পরচুলা যে মাত্র পুরুষের প্রিয় ছিল তা নয়। নিজেদের চুল দিয়ে 'গুছি' তৈরী করাও তো ঘরে ঘরে রেওয়াজ ছিল। মা মাসিদের সান্ধ্য কেশ চর্চার ব্যবস্থায় বহু ক্ষেত্রে গোছা গোছা গুছি ব্যবহার হতো। পশ্চিমের সুন্দরীরা তো সাজানো টুপির মত করে রচনা করা কুন্তল মধ্যযুগে অহরহ ব্যবহার করতেন। হেয়ার ড্রেসারের কাছে সুন্দর কেশগুচ্ছ কেটে দিয়ে গরীব মেয়ে সামান্য মূল্যে আপন সংসারে অন্য অভাব পূরণ করতে নিয়ে যেতেন। অনেক পয়সা দিয়ে গরবিনী ধনী কন্যা তা হয়তো পরতেন সাজানো কেশে। তারপর এল ছোট চুল, ছাঁটাচুলের যুগ। ছাঁটের চোটে মেয়েপুরুষ চেনা দায়। বর্তমানে এসেছে পরস্পরবিরোধী সব ফ্যাশান। দিনের আলোয় কদম ছাঁট আর বিজলীর জ্যোৎস্নায় আলুলায়িতচিকুর। আজ সে চিকুররাশি ঘনকৃষ্ণ ও তরঙ্গিত, কাল তা আবার সরলরেখায় সাজানো। এত বৈচিত্র্য কি আর স্বাভাবিক চুলে সম্ভব। তাই পশ্চিমের সুন্দরী আবার সেই পরচুলকেই প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত। সেই হাওয়া আবার মৃদু মন্দ গতিতে আমাদের মধ্যেও আসছে।
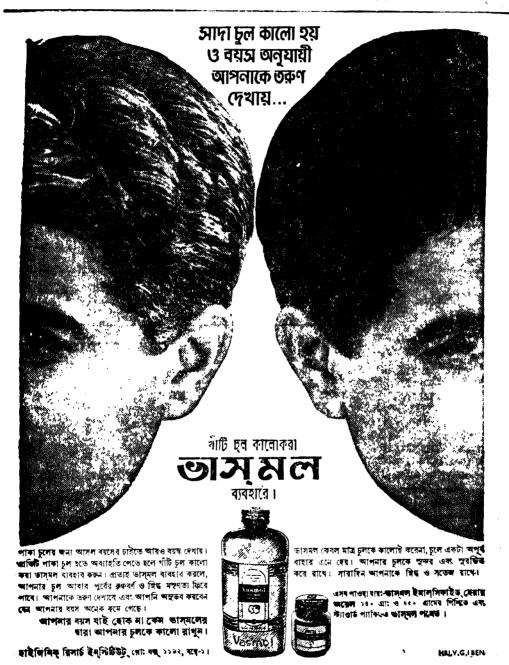
ছাটাচুলের অধিকারিণী খোঁপা বাঁধতে চান মস্ত করে! কৃত্রিম কেশ ভিন্ন গতি কি?

এ তো গেল শখ-শৌখিনতার সব সংবাদ। কখনও বা সামান্য পরিমাণ কৃত্রিম কেশ প্রায় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। চুলের স্বাস্থ্য সবার সমান হয় না। অসুখে বা বেশী বয়সে চুল উঠে গেলে সামান্য কৃত্রিম কেশ সংযোগ মন্দই বা কি? অনেকের সামনের চুল ঘন থাকে অথচ চুলের দীর্ঘতা কমে আসে। তাঁদের বেলায় অতি সহজে গুছি বা অন্য কোনও রকম কৃত্রিম কেশ সহযোগেই সমস্যার সমাধান করে। বিশেষ করে ভারতীয় ধরনের কেশসজ্জা আপন হাতেই রচনা করা যায়। সেই রচনায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ থাকলে নানা বৈচিত্র্য সংযোগ করা কঠিন নয়। এককালে কালো সুতোর লম্বা গুছি, মোজার 'পুর' দিয়ে ফাঁপানো খোঁপা ইত্যাদির বেশ চলন হয়েছিল। এখন এই সব মিশ্রণের স্থান নিয়েছে নাইলন। নাইলন সস্তায় সাধ পূর্ণ করতে পারে। বেণী, গুছি, খোঁপা, বিড়া, বেড়, গদি, তাকিয়া সব পাবেন। মানুষের চুলের মত অত মহার্ঘ্যও নয়। তবে কিনবার সময় একটু ভাল জিনিস কেনা ভাল। সহজে নষ্ট হবে না। হাল্কা দেখে কিনলে কেশসজ্জায় আরাম থাকবে, দেখতেও সহজ ও স্বচ্ছন্দ মনে হবে। রং সম্বন্ধে সাবধান। চুলের সংগে যেন একেবারে মিলে যায়। নজর করে দেখবেন কত শৌখিন সাজে সজ্জিত মহিলা এ বিষয়ে অত সাবধান থাকেন না। কৃত্রিমকেশ আর নিজের চুলে সামান্য মাত্র বর্ণ বৈষম্য নিতান্ত বেমানান দেখায়।

কৃত্রিম কেশের সাহায্যে কেশ রচনা নূতন নূতন বাহার সৃষ্টি করতে পারে। শিল্পীর রুচি, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সবকিছুর সহযোগে যেমন পুষ্প রচনা হয়, তেমন করে যা মানাবে সে রকম রচনাই হতে পারে। "মানাবার" ব্যাপারটায় দর্শকের দৃষ্টির কথা ভেবে নেবেন। আপনি আপনাকে যেমন দেখেন আর পাঁচজন ঠিক তাই দেখবে এমন নয়। এখানে আয়নাও সত্যের সন্ধান না দিতে পারে। সন্ধান দেবে সন্ধানী মন। এই তো সেদিন বিমলার মাকে দেখলাম কাঁচা পাকা সামনের চুল, ইংরাজীতে যাকে বলে salt and pepper —পিছনের খোঁপাটি একেবারে কুচ্‌কুচে কালো! দোকানী ব্যবসায়ীও এঁদের কথা চিন্তা করে চুল তৈরী করেন না। বোধহয়। আরও একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখবেন। যে চুল আপনার নিজের নয় সেটি যেন যথেষ্ট সাবধানে সহযোগ করা হয়। দিদিমণির খোঁপাটি হঠাৎ যদি খসে পড়ে যায় তবে অবস্থাটা শোভন বা সুখকর হবে না ঠিকই।

আজ আমরা যে ক'টি কৃত্রিমকেশ সহযোগে রচনার কথা বলছি তা নমুনামাত্র। বহু হের ফের সম্ভব। ১নং ছবিটি বেণী রচনার। নিজের চুলের সামনে ঠিক করে hair grip দিয়ে বেণী আটকে দিলেই হবে। যেখানে আটকানো হবে সেখানে চুল জড়ো করে বেণীর নীচে আনা দরকার। ২নং ছবিতে কৃত্রিম চুল মাথার চার পাশে ঘিরিয়ে বাঁধা। নিজের চুল তুলে এনে hair grip দিয়ে আটকে দেবেন। তারপর কৃত্রিম চুলকে ঘুরিয়ে এনে hair grip খুলে নিজের চুল ঐ কৃত্রিম চুলের উপরে দিয়ে আটকে দেবেন। তৃতীয় ছবিটি কৃত্রিম চুলের গোড়া শক্ত করে আটকে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছা খোঁপা বাঁধা যায়। রবারের পাতলা বন্ধনী বা ব্যাণ্ড দিয়ে নিজের চুলের গোড়া বেঁধে সেখানে grip দিয়ে কৃত্রিম চুল আটকে দিতে পারেন। ৪নং ছবিটি figure of 8 মানে বাংলা চারের মত। গোড়া আটকে ধরে অন্য হাতে কৃত্রিম চুলের ডগার দিক ধরে মুচড়ে গেলে আপনা থেকেই fig of 8 হবে। তারপর তাকে কাঁটা দিয়ে আটকে, ফুল বা গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিলে সুন্দর দেখাবে। শেষের ছবিটি খোঁপার রকমফের। দু' তিনটি গুচ্ছ ব্যবহার করে এরকম রচনা করতে পারেন। গুচ্ছটি পাক দিয়ে শেষ দিকটা রবারের বন্ধনী দিয়ে আটকে নেবেন।

যাঁরা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করেন তাঁদের মনে রাখতে হবে চুল পরিষ্কার রাখবার কথা। সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে মাঝে মাঝে এই চুল ধুয়ে রাখবেন। যত্ন করে ব্রাশ করবেন। ব্রাশ না করলে জমাট হয়ে যাবে। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নিলেও হয়। তবে ব্রাশ বা চিরুনি যাই ব্যবহার করুন কৃত্রিম চুল ভিজে থাকতে নয়। নাইলনের চুল হাওয়ায় ঝুলিয়ে দিলেই জল ঝরে শুকিয়ে যাবে। ঈষদুষ্ণ জলে ধোবেন ও কচলাবেন না। জল আপনা থেকে ঝরে যাবে। যত্ন করে রাখলে নকল চুল বহু দিন ভাল থাকবে। চুল যদি নাইলনের হয় তবে আগুন সম্বন্ধে সাবধান। নাইলন অত্যন্ত সহজ দাহ্য।

শ্রীমতী

সময় নদীর স্রোত যাতে আমরা মাছ ধরি মাত্র—বলেছেন থেরো

নিবেদিতা ঃ কর্মসাধনার পরিচয়

নিবেদিতা লোকমাতা। প্রথম খণ্ড। শঙ্করীপ্রসাদ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩০.০০।

নিবেদিতা শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের শুভারম্ভ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর। আগামী ২৮শে অক্টোবর তার পরিসমাপ্তি। দেখা যাচ্ছে এই এক বৎসর-কাল আত্মবিস্মৃত ভারতবাসী নিবেদিতার কাছে জাতীয় ঋণের স্বীকৃতি জ্ঞাপনে উদ্যোগী। কিন্তু কি বিপুল সে ঋণের পরিমাণ। জাতীয় জীবনের কত গভীরে নিবেদিতার অনন্য চরিত্রের প্রভাব নিহিত তার যথার্থ পরিমাপ নির্ণয় করবে কে? ভাবালু বাঙালীর জীবনের পালে নিবেদিতা—চিন্তার হাওয়া লেগেছে। তাই শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অজস্র ছোট বড় নানা পুস্তক, প্রবন্ধ ও স্মারক গ্রন্থের প্রকাশ দেখা যায়। তথাপি আকার, আয়তন, উপাদান ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বর্তমান গ্রন্থটি স্বতন্ত্র। লেখক স্বয়ং গ্রন্থটিকে

'আকর গ্রন্থ' বলে অভিহিত করেছেন। একাধিক খণ্ডে ক্রমে ক্রমে নিবেদিতার জীবনের বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত আলোচনা হবে। স্বামিজী নামক বিধাতার হস্তনিক্ষিপ্ত এই নারী-বজ্রটি ভারতের ইতিহাসে কোন আলোর ভূমিকা নিয়েছিল তা দেখানোই বর্তমান গবেষণা-গ্রন্থের উদ্দেশ্য।' অতএব লেখকের মতে নিবেদিতার জীবনের 'বিশাল অধ্যাত্ম রহস্যময় মহাদেশের পট-ভূমিকা'—'তাঁর অন্তর্জীবনের রহস্যরূপ উদ্ঘাটিত করা গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। কারণ, এযাবৎ প্রকাশিত নিবেদিতার গ্রন্থাবলী বা বক্তৃতাবলী এইদিকে 'চকিত আলোকপাত' করেছে মাত্র।

চার পর্বে বিভক্ত গ্রন্থে প্রথম পর্ব 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা', ২৭০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত—অর্থাৎ, মূল গ্রন্থের এক-তৃতীয়াংশ। উপাদান—নিবেদিতার স্বরচিত পুস্তকের অন্তর্গত শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, স্বামিজীর পত্রাবলী এবং সারদানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ পার্ষদগণ বর্ণিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চিত্র। অবশ্য প্রধান উপজীব্য নিবেদিতার পত্রাবলী। কারণ, অন্তরঙ্গ বান্ধবীর কাছে ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমেই কেবল অন্তরের গভীর ভাবরাশি অবাধে ব্যক্ত করা সম্ভব। নিবেদিতার জীবন অবলম্বনে অনুপম ভাব, ভাষা ও ব্যঞ্জনাময় অত্যুৎকৃষ্ট রচনা যে আমরা ইতিপূর্বে পাইনি তা নয়। কিন্তু নিবেদিতা চরিত্র বর্ণনায় একটি অপরিহার্য শর্ত হল শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের সঙ্গে লেখকের সুগভীর ও সশ্রদ্ধ পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পটভূমিকা ব্যতীত নিবেদিতা চরিত্রের যথার্থ অনুধাবন অসম্ভব। লেখক এই পর্বে সে চেষ্টা করেছেন এবং সেখানেই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। আবার অন্যান্য প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজনকেও তিনি উপেক্ষা

করেননি। আনুষঙ্গিকভাবে বিবেকানন্দ জীবনের ওপর গবেষণাও এই পুস্তকের অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিদিন যে বিরাট পুরুষকে তাঁর ঐশ্বরিক মহিমায় নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই দুর্লভ আধ্যাত্মিক অনুভূতি অতি সংগোপনে পত্র মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন স্বামিজীর অন্যতমা দুই পাশ্চাত্ত্য দেশীয়া শিষ্যার নিকট। এ যেন নিরালায় আপন হৃদয়কে উন্মোচন করা—অপরের শ্রবণের জন্য নয়, সরব ঘোষণার জন্য কদাপি নয়। পত্রগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ এবং অপরাপর রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলীর জীবন চিত্রের প্রাসঙ্গিক বিন্যাস প্রয়োজন ছিল। কেবল পত্রগুলির উদ্ধৃতির দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। যদিও নিবেদিতার রচিত এবং পূর্বেই প্রকাশিত পুস্তকের অন্তর্গত নির্বাচিত অংশগুলি বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত হলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। পরিবর্তে নূতন তথ্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পত্রগুলির মূলে ইংরাজী অংশ সন্নিবিষ্ট হলে গবেষণার দিক থেকে অধিক মূল্যবান বলে গৃহীত হত।

এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছেদ নিয়ে যে অনুমান নির্ভর যুক্তিহীন আলোচনা বহুদিন ধরে চলে আসছে, নিবেদিতার আচরণ ও পত্রের সাহায্যে লেখক ঐ বিষয়ে বহুদিনের ইচ্ছাকৃত ও সযত্ন পোষিত অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেছেন। নিবেদিতা ছিলেন আজীবন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' ও স্বামিজী প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যা কিছু করেছেন—বাহিরে তার প্রকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিতা, তাঁর অধীশ্বর, তাঁর রাজ্য, তাঁর আরাধ্য শিবগুরু স্বামী বিবেকানন্দের পূজো ও প্রীতির জন্য। নিবেদিতার অজস্র পত্র মাধ্যমে তারই অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব, মৃত্যুরূপা কালী। প্রায় ১২০ পৃষ্ঠায় কালীতত্ত্বের বিশ্লেষণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কালী-উপাসনা—নিবেদিতা-মানসে তার সঞ্চরণ ও প্রভাব যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে নিবেদিতার কয়েকখানি অতি মূল্যবান পত্রের প্রতিলিপি—লেখকের মতে যেগুলি 'অধ্যাত্মরাজ্যের মহাদলিল'। ঐগুলির মাধ্যমে নিবেদিতা বিবেকানন্দের জীবনে কালী আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা উপলক্ষ করে তৎকালীন সংবাদপত্রের এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কোন কোন মহলে যে আলোড়ন ঘটেছিল তার বিশদ ইতিহাসও এই পর্বে সংযোজিত। ভারতের তদানীন্তন সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর নিবেদিতা কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সংবাদ-পত্রগুলির প্রতিলিপি তার পরিচয় বহন করছে। সেই সঙ্গে বহু অজ্ঞাত তথ্যও লোকলোচনের সম্মুখীন। স্বামিজীর কালীতত্ত্বের অপূর্ব ভাষ্যকার রূপেই নিবেদিতা আবির্ভূত তাঁর ক্ষুদ্র পুস্তক 'Kali the Mother' ও কালী বক্তৃতা-গুলির মধ্যে।

পূর্বজীবন নামে তৃতীয় পর্বে নিবেদিতাকে দেখা যায় স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ও পরে পারিবারিক পরিবেশে। শৈশবকাল থেকেই তাঁর বহু-মুখী প্রতিভা, হৃদয়বত্তা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও মানবপ্রেমের অনির্বচনীয় প্রকাশ দেখা যায়; বোঝা যায় স্বামিজী যোগ্য পাত্রীকেই ঋষির দৃষ্টি দিয়ে তাঁর ভাবপ্রচারের অন্যতম উত্তরাধিকারিণী নির্বাচিত করেন। জননী ও ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি নিঃস্বার্থ সুগভীর স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন নিবেদিতা নির্মমভাবে ছিন্ন করেছিলেন, স্বামিজী অর্পিত দায়ভার নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়ে তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ করতে। তাঁর সে অসাধারণ ত্যাগ হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য পারিবারিক পটভূমিকায় নিবেদিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রয়োজন ছিল। 'লেখিকা নিবেদিতার'ও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত এবং অপ্রকাশিত ১৫টি ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে। জানা যায় "মার্গট যেখানেই যেত সাহিত্য-সংস্থা গজিয়ে উঠত—", "সে শিক্ষকতার সঙ্গে সাংবাদিকতাও করত।" ক্রপটকিনের ভাই রিচমণ্ড ও ভগিনী মিসেস উইলসনের পত্রগুলির প্রতিলিপি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন। ৩রা অক্টোবর ১৯১১—দার্জিলিঙ থেকে বাড়িতে লেখা নিবেদিতার শেষ পত্রে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের ইঙ্গিত আছে—বিদায়ের করুণ রাগিনী অশ্রুত থাকেনি।

চতুর্থ বা শেষ পর্বে 'নিবেদিতা ও ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু' প্রসঙ্গ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ডঃ বসুর বিজ্ঞান গবেষণায় নিবেদিতার অক্লান্ত, অপরিসীম সাহায্য ইতিপূর্বে তাঁর প্রামাণ্য জীবনীতে উল্লিখিত
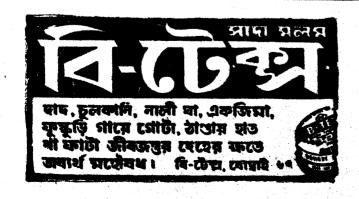
হলেও বর্তমান গ্রন্থে নিবেদিতার পত্রাবলীতে তাঁর চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে ব্যয় করেছিলেন ডঃ বসুর বিজ্ঞান-সাধনা জয়যুক্ত করবার জন্য, তার পরিচয় যথার্থই বিস্ময়কর। সেই সঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য পরাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের জীবনে আর একজন বিদেশিনী মহিলা মিসেস সারা ওলিবুলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর আলোকপাত। মিসেস বুল ছিলেন প্রভূত বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালিনী। তাঁর অপূর্ব মাতৃহৃদয় ডঃ বসুকে সন্তান-স্নেহে গ্রহণ করেছিল। পরিচয়ের পর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডঃ বসুর জীবনের সর্বাপেক্ষা সংকটকালে তিনি অর্থ, সামর্থ্য, সাহচর্য ও স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁকে। বস্টনে তাঁর বাসভবন ছিল ডঃ বসুর পরম আশ্রয়স্থল। লণ্ডনে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মিসেস বুল ও নিবেদিতাই ছিলেন তাঁর রক্ষাকর্ত্রী। এ সব কাহিনীর অধিকাংশ ছিল এ যাবৎ অজ্ঞাত। জগদীশ-চন্দ্র ও মিসেস বুলের পত্রগুলি তাই প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপনের দিক থেকে অমূল্য। বিশেষত নিবেদিতার ভগিনী মিসেস উইলসনকে ২৭-১০-১৬ তারিখে লিখিত ডঃ বসুর পত্রখানির জন্য পাঠক সমাজ লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।...'ইচ্ছা আছে সেণ্ট সারার মৃত্যুদিবসে—মনে হয় তা ১১ই জানুয়ারি ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করব (I intend to formally open the Institute on the anniversary of St. Sara's passing away—I believe about the 11th Janu.). মিসেস বুলের মৃত্যু দিবসে বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের এই আকাঙ্ক্ষা প্রমাণ করে, স্বামিজী যাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছিলেন, ডঃ বসুর বিজ্ঞান সাধনায় সেই উদারহৃদয় মহিলার অবদান কতখানি। আর সেইজন্য তাঁর প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল বৈজ্ঞানিকের হৃদয়! বস্তুত, মিসেস বুলের কাছে স্বামিজী, নিবেদিতা ও ডঃ বসুর কার্যে সাহায্যের অর্থ ভারতের সেবা। সেই সেবার প্রকৃত স্বরূপ এত দিন লোকচক্ষুর অগোচর ছিল।

দ্বিতীয়ত, যে নিবেদিতা ডঃ বসুর জীবনে 'প্রেরণালক্ষ্মী'র ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়কর নীরবতা স্বভাবতই মনে বহু প্রশ্ন উত্থাপন করে। এই পত্রেই তার নিরসন। বিজ্ঞান ভবনের শীর্ষে বজ্র প্রতীক ও দ্বারদেশে জপমালা ও প্রদীপধৃত আলোকবর্তিনী এক নারীমূর্তি স্থাপন করে নিবেদিতার প্রতি ডঃ বসু যে মৌন সম্মান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগের সঙ্গে অকপটভাবে তারই প্রকাশ ঘটেছে এই পত্রখানিতে। "আমরা ১৩ তারিখটি (নিবেদিতার মৃত্যুদিন) উদ্‌যাপন করেছি, কিন্তু আগামী কাল হল (নিবেদিতার) জন্ম-দিন। ঐ দিনটি যখন স্মরণ করব, আমাদের মনে পড়ে যাবে তাঁর আত্মা উত্থিত হয়েছে বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে।...এ বিজ্ঞান মন্দির তাঁরই প্রার্থনা মূর্তি। ১৩ তারিখে চিতাভস্ম একটি আধারে করে পদ্মের ঠিক পাশে স্থাপন করা হয়েছে (We observed the 13th, but to-morrow is the birthday. We will think of that day reminding us that her spirit is risen and is among us .... The Institute is the embodiment of her prayer. On the 13th, the ashes were laid in a receptacle just by the side of the lotus)."

এই কয়েকটি ছত্রে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার সাহায্যে অকুণ্ঠ স্বীকৃতির পরিচয় পাঠক মনকে উদ্বেলিত করে। যদিও রবীন্দ্রনাথ অকপটে বলেছিলেন জগদীশ-চন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য, এ পর্যন্ত ডঃ বসুর জীবন ও বিজ্ঞান সাধনার সংবাদ

যাঁরা বিবৃত করেছেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান ছিল অতি সংক্ষিপ্ত—ফলে বৈজ্ঞানিকের জীবনচরিতও ছিল অসম্পূর্ণ। বস্তুত, 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের এই অধ্যায়টি ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে নূতন ও বিশেষ মূল্যবান। বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান সমাজ উভয়েই যে কত গভীরভাবে নিবেদিতার নিকট ঋণী, অধ্যায়ের ছত্রে ছত্রে তারই স্বাক্ষর। নিজেকে বিলোপ করে প্রিয়জনের কল্যাণ ও সাফল্য কামনায় পরিপূর্ণ আত্মদানের ইতিহাস জগতে দুর্লভ।

'নিবেদিতা লোকমাতা' নামটির মাধ্যমে লেখক নিবেদিতা সম্বন্ধে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। স্বামিজী চেয়েছিলেন ভারতাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিবেদিতা একাধারে ভারতের সেবিকা, বান্ধবী ও জননী হবেন। কোন বিদেশিনীর ওপর এত মহান দায়িত্ব ইতিপূর্বে পরিন্যস্ত হয়নি। নিবেদিতা যে স্বীয় জীবন দিয়ে গুরুর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন তার স্বীকৃতি রয়েছে নিবেদিতাকে রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা' সম্বোধনে। বইখানি মিস ম্যাকলাউডকে উৎসর্গ করে লেখক ভারতবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি জাতীয় ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করেছেন। মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার পত্রগুলি সযত্নে সংরক্ষিত না করলে বলা বাহুল্য, বহু তথ্যই অজ্ঞাত থেকে যেত। নিবেদিতাকে লেখা ম্যাকলাউডের একখানি পত্রের আংশিক প্রতিলিপি গ্রন্থটির শুভ সূচনা করেছে। এই সঙ্গে তাঁর একখানি প্রতিকৃতি যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বলা বাহুল্য গ্রন্থের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রধানত ম্যাকলাউড ও ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার অসংখ্য পত্রসম্ভার। নিবেদিতার ইংরেজী সহজবোধ্য নয়, ফলে স্বভাবতঃই তার অনুবাদ থেকে অর্থবোধও অনেক স্থলে দুরূহ। কোন কোন স্থানে অনুবাদের অর্থ বেশ স্বচ্ছ নয়। অনুমান করা যায়, লেখক অনুবাদকার্যে কী বিপুল শ্রম স্বীকার করেছেন। গবেষণার সুবিধার জন্য আরো অধিকসংখ্যক অতি মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ পত্রগুলির সঙ্গে মূল ইংরেজী পত্র সংযোজিত হলে ভাল হত। কতকগুলি পত্রে উল্লিখিত তারিখ বিভ্রান্তিমূলক। উদাহরণস্বরূপে পত্রের তারিখের সঙ্গে 'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে উল্লিখিত তারিখগুলি মেলে না। অনেক স্থলে পত্ররচনার স্থানটি উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল।

বহু চিত্রশোভিত ৭২২ পৃষ্ঠার পুস্তকখানির আকর্ষণ অসামান্য। ভূমিকায় সবিস্তারে উল্লিখিত বহু বর্ণের প্রথম চিত্রটি গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। অন্যান্য বহু অপ্রকাশিত চিত্র, বিশেষত তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কালীর ব্যঙ্গ চিত্র এবং বোসপাড়া লেনের স্কুলবাড়ির ছাদে নিবেদিতার চিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিবেদিতার জীবন ও সাধনা সম্পর্কীয় যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে—নিঃসন্দেহে তার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থখানি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নিবেদিতার প্রভাব এতই গভীর ও ব্যাপক যে, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি যে-কোন ক্ষেত্রে নবজাগরণের ইতিহাস অথবা ঐ কালের কোন মনীষীর জীবনী রচনায় নিবেদিতার অবদানের উল্লেখ অপরিহার্য। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় উৎসুক গবেষকের কাছেও এই গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম।

শ্রীচিত্তরঞ্জন

শারদ সাহিত্য

চন্দ্রভাগা—সম্পাদক — রমানাথ সিংহ। সিউড়ী, বীরভূম। মূল্য তিন টাকা।

মফস্বল শহরের আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানিতে আছে বেশ কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, রম্য রচনা, একখানা উপন্যাস এবং বহু কবিতা। প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে আছেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত প্রভৃতি। উপন্যাস লিখেছেন রাধা দামোদর মিত্র। কবিতা লেখকদের মধ্যে আছেন কুমারী অমিয়া রায়, আবদুল হামিদ এবং আশাপূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই শারদীয়া সংখ্যাখানি প্রকাশে সুদূর মফস্বল শহরের সাহিত্যিকদের উদ্যম ও উৎসাহ অভিনন্দনযোগ্য।

অধুনা—সম্পাদক — সুধাংশুকুর মুখোপাধ্যায়। হালিসহর ২৪ পরগণা। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকার মফস্বলের এই সংখ্যাখানিতে আছে বহু কবিতা অল্প কয়েকটি গল্প ও আলোচনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, প্রভাত চৌধুরী, আশিষ ঘোষ, বার্ণিক রায় প্রভৃতি। শহরতলির সাহিত্যিকদের এই সাহিত্য সাধনা প্রশংসার্হ।

নব দিশারী—সম্পাদক—শ্যামল সরকার। ৬২।এইচ।৪১ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা—৫৪। মূল্য এক টাকা।

কয়েকটি প্রবন্ধ, ছোট বড় গল্প, একটি রম্যরচনা, একটি রস রচনা, একটি ভ্রমণ কাহিনী এবং অল্প কয়েকটি কবিতা সহযোগে ত্রৈমাসিক পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাখানি প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগণের মধ্যে আছেন নচিকেতা ভরদ্বাজ, কৃষ্ণা সেনগুপ্ত, ভুবন চৌধুরী, শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, কেশব মল্লিক, সুবিমল মিত্র ও ডঃ অশোককুমার দাস প্রভৃতি। আমরা এই সাহিত্য সাধকদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

মহাত্মা গান্ধীর দর্শন। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মনোরঞ্জন গর্গ : মহিষাদল, মেদিনীপুর। মূল্য ৭·৫০।

বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। উজ্জলকুমার মজুমদার। সংস্কৃতি প্রকাশন : ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট : কলিকাতা-১। মূল্য ১২·০০।

Chinese Crisis. Novosti Press Agency Publishing House, Moscow.

Mahajan Report Uncovered. A. R. Antulay. Allied Publishers Pvt. Ltd.: 17 Chittaranjan Avenue, Calcutta-13. Price Rs. 14.00.

Public Sector Industry in Retrospect. Bimal Mukherjee. S. C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd.: 1C College Square, Calcutta-12. Price Rs. 8.00.

অমরত্ব

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একদিন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। দু' তিনজন বন্ধু পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিলেন।

মানুষের দুর্বলতার তো অন্ত নেই। তার মধ্যে একটি বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে, উপস্থিত ব্যক্তিদের তুলনায় নিজেকে জ্ঞানে গুণে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা, অন্তত আর সবার সমান। আমিও সেই দুর্বলতার শিকার। বন্ধুরা নানা প্রসঙ্গ থেকে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন জেমস্ জয়েস প্রসঙ্গে, কথায় কথায় উঠলো ফিনেগানস্ ওয়েক-এর নাম, এক বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, পড়েছিস্ বইটা? মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে টপ্ করে বলে ফেললুম, হ্যাঁ। এই রকম ছোটখাটো মিথ্যে কথা যে কত বলি, তার ঠিক নেই। কত না-পড়া বই সম্পর্কে 'পড়েছি' বলে ফেলি, তারপর আলোচনার মাঝখানে মুখে মৃদু মৃদু হাসি ফুটিয়ে এমন প্রশান্ত গাম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকি যে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পায় না। ফিনেগানস্ ওয়েক সম্পর্কে তবুও তো মাঝে মাঝে ফুট কাটার মতন মাল-মশলা আমার হাতে ছিল। ও-বইখানা কোনোদিন চক্ষে দেখিনি, কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে ও-বইটা সম্পর্কে খান তিনেক গবেষণা গ্রন্থ একবার চোখে পড়েছিল, উল্টেপাল্টে দেখেছিলাম—সুতরাং জানতুম বইটার গল্পের কাঠামো, ভাষার ধুন্ধুমার যুদ্ধ। বইখানার যে আগের নাম ছিল ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস সেটাও কথার ফাঁকে ছুঁড়ে দিই। মোটকথা, মূল বইখানা এক বর্ণও না পড়ে সে সম্পর্কে বেশ আলোচনা চালিয়ে যাই।

তার বেশ কিছুদিন বাদে, পাকেচক্রে বইটা আমার হাতে এসে যায়। তখন বিবেকের কাছে অপরাধী বোধ করি। মিথ্যে কথা বলেছিলুম, এখন বইখানা আমার পড়ে ফেলাই উচিত—এমন মনে হয়। কিন্তু পড়তে হবে লুকিয়ে চুরিয়ে, কেননা, যে-সব বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলুম, তারা কেউ দেখে ফেললে, মোটেই বিশ্বাস করবে না যে নিতান্ত প্রমোদের জন্যই ঐ বই আমি দ্বিতীয়বার পড়ছি।

গোপনে আমি বইটা পড়তে শুরু করি। ওঃ, সে কি কষ্ট, সে কি নরক যন্ত্রণা! বইখানা খুললেই মাথা ঝিমঝিম করে, চেয়ার ছেড়ে খাটে গিয়ে শুতে ইচ্ছে করে, অল্প পরেই ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। কথনো বা তিন চার পাতা জোর করে পড়ে যাবার পর খেয়াল হয়—একটা বর্ণও মাথায় ঢোকেনি, এতক্ষণ আমি অন্য কথা ভাবছিলুম। আমাকে কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না, শুধু মিথ্যে দায়িত্বের জন্য ওরকম বাধ্যতামূলকভাবে ও রকম থান ইঁট মার্কা বই পড়ার মতন কষ্ট আর নেই! কতবার প্রতিজ্ঞা করেছি, না-পড়া বই সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলবো না। কিন্তু অন্যের মুখে আলোচনা শুনতে শুনতে যখন মনে হয়, আমি অমুক বইখানা পড়িনি বা অমুক লেখকের নাম শুনিনি—তার মানে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়, তখন আর লোভ সামলাতে পারি না। পরে, সেই সব বই পড়ে নেবার চেষ্টা করলে প্রায়ই হতাশ হই।

জুল রোম্যাঁর 'দি বডি'স্ রাপচার' বইখানার নাম শুনেছি কতকাল। কত আলোচনায় এই বই-এর উল্লেখ দেখেছি, আঁদ্রে জিদ-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও চোখে পড়েছে। সেই বইখানা অকস্মাৎ আমার হাতে আসে। মনটা খুশী খুশী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রথম চব্বিশ পাতা পর্যন্ত পড়ে আমি একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি। আমার মোটেই ভালো লাগছে না, বিরক্তিকর লাগছে—অথচ এত বিখ্যাত বই, মানুষের শরীর ও শরীর-ভোগের আনন্দকে তিনি পরম পবিত্র স্তরে তুলে এনেছেন—এই রটনা। কিন্তু আগাগোড়াই আমার ছেলেমানুষী বলে মনে হতে লাগলো, এমনকি, বিবাহের পর প্রথম রাত্তিরে নায়ক ও নায়িকার শরীর-দর্শনের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা—তাও তেমন আকর্ষণ করলো না—মনে হতে লাগলো, এত বকবকানি কেন? বইটি শেষ করার পর, এ কথাই মনে হলো, 'দি ওয়ার্ল্ড অব ফ্লেশ'কে লেখক শুধু কথার পিঠে কথা সাজিয়েই বলাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন—ঐ শব্দগুলি এখন আর মর্ম স্পর্শ করে না, হয়তো তাঁর সময়ে ঐ চেষ্টা খুব অভিনব মনে হয়েছিল—কিন্তু এখন ঐ বই না পড়লেও চলে।

রেমো কুইনো'র 'জ্যাজি আ লা মেত্রো' বইখানা পড়ার ইচ্ছে ছিল বহুদিন থেকে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তো সব বই সব সময় জোগাড় করা যায় না। সুররিয়ালিস্ট গল্পকারদের মধ্যে রেমো কুইনো এক সময় দারুণ খ্যাতিমান ছিলেন, 'জ্যাজি আ লা মেত্রো' অনূদিত হয়েছে বহু ভাষায়, ফিল্ম হিসেবেও সার্থক হয়েছিল—এসব শোনা কথা। বইটা পড়তে মন্দ লাগছিল না—ন' বছরের মেয়ে জ্যাজি প্যারিসে প্রথম এসে আবদার ধরেছে যে মাটির তলার ট্রেন মেত্রোতে সে চড়বেই। কিন্তু সেদিন মেত্রো ধর্মঘট। তাকে শহর ঘোরানো হচ্ছে। এদিকে জ্যাজি গ্রাম থেকে দারুণ খারাপ খারাপ সব গালাগালি শিখে এসেছে—সেসব গালাগালির মানে সে জানে না। ন' বছরের মেয়ের পক্ষে জানা সম্ভবও নয়। এক দিকে তার শিক্ষা, সারল্য, অন্য দিকে তার মুখের কথায় কুৎসিত শব্দ—এরই একটা মিশ্রণ। বইটা শেষ করার পরেও মনে হল, মন্দ নয় বলা চলে, কিন্তু এরই জন্য এত হইচই?

বাংলাতেও, আমার জ্ঞানের উন্মেষকাল থেকে আমি জগদীশচন্দ্র গুপ্তের কোনো রচনা পত্র-পত্রিকায় দেখিনি। কিন্তু শুনেছি, তিনি সারাজীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রদূত, অবহেলিত, কিন্তু অসামান্য শক্তিশালী লেখক তিনি। জোগাড় করে জগদীশ গুপ্তের অনেকগুলি বই আমি পড়ে ফেললুম। সত্যি কথা বলতে কি, জগদীশ গুপ্তের রচনাগুলির এখন তেমন কোনো আকর্ষণ নেই। তাঁর সময়ের পক্ষে তিনি অনেক কিছু নতুন ভেবেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কালোত্তীর্ণ হবার গুণ তাঁর লেখায় নেই। সাহিত্যের ছাত্র বা গবেষকরা তাঁর রচনার মূল্য নিরূপণ করবেন, কিন্তু সাধারণ পাঠক তো কোনো দায়িত্ববোধ থেকে বই পড়েন না।

এইসব ব্যাপার থেকেই মনে হল, সাহিত্যে অমরত্ব জিনিসটা কি তাহলে এখনও আছে? ভাষা বড় দ্রুত বদলায়, এবং ভাষার পরিবর্তন অনুযায়ীই পাঠকের রুচি বদলে যায়। বিষয়বস্তু যতই মহৎ হোক, মানুষ তার চেনা ভাষায় সেটা না শুনলে তার দিকে মনোযোগ দেয় না। ধর্মপ্রচারকরা এজন্য ধর্মপ্রচারের জন্য স্থানীয় কথ্য ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন সব সময়। কিন্তু তাই মানুষের চিরকালীন হৃদয়ের ভাষার সামগ্রী হবে—এই রকমই তো কথা ছিল। কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনের বদলে সাহিত্য যেদিন থেকে মানুষের হৃদয়-রহস্যকে অবলম্বন করল—সেদিন থেকেই দেখা গেল—হৃদয়টা বড়ই সাম্প্রতিক জিনিস। ঘটনাবহুল প্রাচীন নাটক উপন্যাস এখনও পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু অতি-প্রাচীন লেখকদের মস্তিষ্ক কিংবা হৃদয়-রহস্য কাহিনী আজ তো হৃদয় বা মস্তিষ্ককে টানে না।

সনাতন পাঠক

দেশ

অরণ্যদেব ★ লী ফক

কীলাউয়িুর সোনাবেলায় রক্ত ঝরছে!
এ কী, ওয়াম্বেসিদের এই ঢাকীকে কে মারল?

হুম, সোনা-মেশানো বালু ওরা পাচার করছে!

চটপট থলি-গুলোকে হেলি-কপটারে তোলো
ওই লোকটাই জাহাজডুবির পর এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল ...ওই এখানকার সোনার খবর পেয়েছে!

হেলিকপটারে আর কত বালি বোঝাই করবে ব্রাউডি?
যতটা আমার খুশি।
ওরা ভাবছে বালি! হাঃ হাঃ! এর এক-একটা থলির দাম হাজারে হাজারে ডলার!

এখন তো হেলিকপটার বোঝাই করে সোনা নিচ্ছি! এর পরে জাহাজে বোঝাই করে নেব।

ব্রাউডি, শুধু বালি দিয়েই যদি হেলিকপটার বোঝাই করো, তাহলে মানুষের জায়গা হবে কী করে?
ওহে পাইলট, গোপন কথাটা তাহলে তোমাকে বলাই যাক। কী জানো, শুধু তুমি আর আর আমি হেলিকপটারে উঠব। বুঝলে?
কথাটা আমি শুনে ফেলেছি!
৩/১০

অর্থাৎ আমাদের এখানে ফেলে
আর তোকে কিছু ফাঁস করতে হবে না।

কী ব্যাপার?
লোকটা বাড়াবাড়ি করছিল। তাই গুলি করেছি। ওহে তোমরা এবার এদিকে এসো।
?!

সবাই সার বেঁধে দাঁড়াও। না না, পাইলট. তুমি আলাদা থাকো।
কী ব্যাপার?
এ কী কাণ্ড?

ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তোমাদের দিয়ে আর আমার কোনো কাজ নেই। তাই···
!!!
লোকটা পাক্কা শয়তান! সবাইকে খুন করবে।

"গড় নাসিমপুর" চিত্রে উত্তমকুমার এবং ডাইনের ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। ছবির মুক্তি এ-সপ্তাহে

কলাকৌশল বড়, না বক্তব্য ?

বৃটেনে প্রথম যে ভারতীয় চলচ্চিত্রকার কাহিনী-চিত্র নির্মাণ করেন, সেই ওয়ারিস হুসেনের বিশ্বাস কলাকৌশলের চমক বাদ দিয়ে সরলভাবে মানুষের কথা নিয়ে অতি উৎকৃষ্ট ছবি তোলা সম্ভব। দুটি চরিত্র একটি টেবিলের মুখোমুখি বসে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে—এই সহজ ভঙ্গিকেই সুন্দর ছবি করা যেতে পারে লে তিনি মনে করেন। উত্তেজনার ব্যাপার তে থাকবে না বটে, সাধারণভাবে এর তও অংশত মন্থরই হবে, সেই হিসাবে কের কাছে ছবিটি "বিরস লাগারও ংকা রয়েছে"—কিন্তু তাই বলে ছবিটির শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে বাধা কোথায় ?

এই সূত্রে চলচ্চিত্রকার হুসেন ইংগেমার থমসনের পারলোনা ছবিটির উল্লেখ ন। এই চিত্রের চরিত্র-সংখ্যা দুই। এক মহিলা অপর একজনকে তাঁর জীবনের গল্প বলে যাচ্ছেন—এই নিয়ে পারলোনা।

হুসেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : "আমি আমার ছবিতে সিনেমা-ট্রিককে কখনও মানুষের উপরে প্রাধান্য দিই না। দর্শনীয় বস্তুকে যদি বক্তব্যবস্তুর চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়, তবে আমি অন্তত সে-রকম প্রয়াসকে সার্থক বলতে পারব না"।

হুসেন সম্প্রতি তাঁর "দি মিলসটোন" ছবির শুটিং শেষ করেছেন। তিনি এখন বৃটেনের অন্যতম প্রধান টি-ভি নাট্য-প্রযোজক।

১৯৪৭ সনে তিনি ইংলনডে আসেন। লখনউয়ে তাঁর জন্ম। বিলাতে হুসেনের প্রথম ছবি **এ প্যাসেজ টু ইনডিয়া** (ফরস্টারের ওই নামের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত)। তাঁর পরবর্তী একটি ছবি **গারলস ইন ইউনিফরম** রসিকজনের বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে। ছবিটিতে তাঁর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় দিল্লীতে ফিল্মস ডিভিসনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য একটি আলাদা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এই বিভাগের নিজস্ব ল্যাবরেটরিও থাকবে। প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণের জন্যই এই কেন্দ্রে ছবি তৈরী হবে।

স্টারে নতুন নাটক "শর্মিলা"

স্টারে নতুন নাটক শুরু হয়েছে। নামঃ "শর্মিলা"। দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকটির রচয়িতা ও পরিচালক। হিন্দু কোড বিলের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘরোয়া গল্প নিয়ে "শর্মিলা"। প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, প্রেমাংশু বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। কালীপদ সেন সংগীত পরিচালক।

বোম্বাইয়ে "চতুরঙ্গ" দলের অভিনয়

বোম্বাই শহরের চেম্বুর অঞ্চল, (যেখানে ভাবা অ্যাটমিক রিসারচ্, দু'দুটো তৈল সংশোধনাগার, থারম্যাল পাওয়ার স্টেশন, সার উৎপাদন কারখানা ও অন্যান্য দেশী-বিদেশী বৃহৎ শিল্পসংস্থার কারখানা স্থাপিত), গত দশ বছরের মধ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের লোকই চাকরী উপলক্ষে এখানে এসে বসবাস করছে। নবাগত বাঙ্গালীদের এক বৃহৎ সংখ্যাও এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। এ'দের প্রতিষ্ঠান "চেম্বুর ক্লাব"-এর উদ্যোগে আয়োজিত নানান অনুষ্ঠান, দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি, রুচি, শৃঙ্খলা ও সৌজন্যের জন্য অন্যান্য স্থানীয় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলতে পারে।
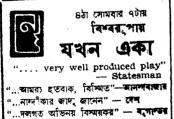
এবার কলকাতার প্রখ্যাত অপেশাদারী থিয়েটার দল, "চতুরঙ্গ", সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' নাটক মঞ্চস্থ করলেন চেম্বুর ক্লাবের কালীপূজা অনুষ্ঠানে, ২২শে অকটোবর। সুসজ্জিত মণ্ডপ ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত চতুরঙ্গের এই নাটক প্রায় চার হাজার দর্শক মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখেন। প্রধান ভূমিকায় পরিচালক বরুণ দাশগুপ্তের অভিনয়, নরেন পালের চরিত্রে মনীশ দাশগুপ্ত, অপর্ণার বেশে ছবি তালুকদারের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

চতুরঙ্গ পরে অম্বরনাথ অরডনানস ফ্যাকটরীর পূজাতেও সমরেশ বসুর "আবর্ত" নাটকের দুইটি "শো" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

স্থানীয় অবাঙ্গালী নাট্যসংস্থা ও স্থানীয় নাট্যসমালোচকদের জন্যও বোমবাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয়-এর উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে, 'ডাউন ট্রেন'-এর একটি বিশেষ অভিনয় হয়, "নাট্যশিল্পীর" উদ্যোগে। চতুরঙ্গ দলের প্রযোজনা উন্নত মারাঠী মঞ্চের প্রতিনিধিদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে।

বেঙ্গল ক্লাবের কালীপূজায় চতুরঙ্গ দলের প্রযোজনা—রসরাজ অমৃতলাল বসুর "বাবু", সেখানকার দুর্ব্যবস্থার জন্য, দর্শকরা তেমন উপভোগ করতে পারেনি।

—বিশেষ প্রতিনিধি

এ-সপ্তাহে "পদ্মাবতী জয়দেব"

সানসাইন পিকচার্স-এর "পদ্মাবতী জয়দেব" এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন দেবনারায়ন গুপ্ত। পরিচালনা করেছেন চিত্রদূত। বিজন পাল সংগীত পরিচালক। গোপীকৃষ্ণকে ছবির নৃত্যদৃশ্যে দেখা যাবে।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

শিকার

ছবির নাম "শিকার" (গুরু দত্ত ফিল্মস)। জন্তু-জানোয়ার শিকার ছবির বিশেষ রোমাঞ্চক আকর্ষণ সন্দেহ নেই। আসলে, ছবিতে মানুষই মানুষের শিকার। "শিকার" রহস্য-উপকরণের ক্রাইম ছবি। নায়ক ধর্মেন্দ্র শেষ পর্যন্ত নায়িকা আশা পারেখকে কীভাবে সকল মুসিবত থেকে রক্ষা করে আসল খুনী ও একজন অপরাধীকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেন তা নিয়েই কাহিনী।

সাসপেনস তৈরির কাজে পরিচালক আত্মারাম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কাহিনী এগোবার কিছুক্ষণ পরেই দর্শক একাধিক ব্যক্তির মধ্যে কে "কাতিল" তা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। শেষ মুহূর্তে জানা যায়, আসলে খুনী কে। যদিও তার খুনের ধরণটি (ফ্লাশব্যাকে দ্রষ্টব্য) এবং উদ্দেশ্য অবিশ্বাস্য। ছবির পটভূমি জঙ্গলে—একটি বিরাট ঘন বনাঞ্চলের ধারে। নিহত ব্যক্তি বনভূমির মালিক। তার বন্ধু ও অফিসের ম্যানেজারই নায়ক ধর্মেন্দ্র। জাংগল পিকচার-এর রোমাঞ্চ এ ছবিতে লভ্য। অনেক জন্তু-জানোয়ার ছবিতে দেখা যায়। ক্ষেপে যাওয়া হাতির দল একবার দুর্বৃত্তদের যেভাবে তাড়া করে ও দুয়েক জনকে পিষে মারে তা দেখবার কালে শরীর শিহরিত হয়। এই দৃশ্যগুলি সুন্দর তোলা হয়েছে। শুরুতেই দেখানো হয়েছে বাঘ-শিকার—নায়ক ধর্মেন্দ্রর গুলিতে বাঘ নিহত।

সব মিলিয়ে "শিকার" ক্রাইম ছবিটি উপভোগ্য। বিশেষ ভূমিকার শিল্পীদের মধ্যে রেহমান ও সঞ্জীবকুমারের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাচ-গানও প্রচুর। শঙ্কর জয়কিষণ সুরারোপিত গানগুলি শুনতেও ভালই লাগে।

বন্যাত্রাণে বি-এফ-জে-এ

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অর্থসংগ্রহ করছেন। বন্যাত্রাণের জন্য তহবিল গড়ার সিদ্ধান্ত সংস্থার গত সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে অনুষ্ঠিত ওই সভায় পৌরোহিত্য করেন সংস্থার সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার।

ওই সভাতেই বি এফ জে এ-র সদস্যরা বন্যাত্রাণের জন্য অর্থদান করেন। সদস্যদের দান পাঁচ হাজার টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সভ্যদের দান ছাড়াও বি এফ জে এ চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থী। সংস্থার আবেদনে সাড়া দেন বোম্বাইয়ের চিত্র-প্রযোজক শ্রীআত্মারাম। "শিকার" ছবির মুক্তি উপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। শ্রীআত্মারাম সংস্থার সভাপতির হাতে পাঁচ হাজার এক টাকা তুলে দেন। তা-ছাড়া, মুক্তিপ্রতীক্ষিত "অগ্নিযুগের কাহিনী" চিত্রের প্রযোজক বি এফ জে এ-র উদ্যোগে এক বিশেষ সাহায্য-শোর জন্য তাঁর ছবিটি দিতে সম্মত হয়েছেন। রাজশ্রী পিকচার্স অনুরূপ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত "চেম্মিন" ছবিটি দিতে রাজী।

"সাবরমতী" (পরিচালনাঃ হীরেন নাগ) চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী

বিপ্লবী ডিরোজিও

॥ নাটক ॥

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জীবনী নিয়ে নাটক রচনার কাজটি সহজ ছিল না। কঠিনতর কাজ, এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা। বিস্ময় লাগে রঙ্গসভার "বিপ্লবী ডিরোজিও" দেখে। রঙ্গসভা অসাধ্য সাধন করেছেন।

প্রথমে নাট্যকারের প্রশংসা করব মুক্তকণ্ঠে, তারপর নাট্যপরিচালকের। রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের পাশে দাঁড়িয়ে ডিরোজিও তৎকালীন বঙ্গসমাজকে কতখানি নাড়া দিতে পেরেছিলেন তা আবিষ্কার করার জন্য নিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী দৃষ্টির প্রয়োজন। নাট্যকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই নাটকে ডিরোজিওর কবিমন উদ্ঘাটন করেই ক্ষান্ত হননি, তখনকার তরুণ সমাজের চিন্তাধারায় যে বিপ্লব এনেছিলেন ডিরোজিও এবং তাঁদের মনে সংস্কারমুক্তির যে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন, তা এই নাটকে চমৎকারভাবে একটি প্রামাণিক সত্যের রূপ ধারণ করেছে। ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে, ছাত্র ও অনুরাগী হিসাবে, সেই দিনের বাংলা সমাজের ধীমানরা (ইনটেলেক-চুয়াল?) একত্রিত হয়েছিলেন। পুরনো জেনে নয়, অন্তঃসারশূন্য বলে অনেক সংস্কার ও বিশ্বাস তাঁরা বর্জন করতে যে চেয়েছিলেন তার মূলে ছিল ডিরোজিওর বৈপ্লবিক চিন্তানায়কত্ব। ডিরোজিওর অনুগামীরা পরবর্তীকালে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। যৌবনে তাঁরা সৈনিকের মত ডিরোজিওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নতুন ভাবনায় দীক্ষিত এই তরুণ দলের সাহচর্য ডিরোজিওর মনে জাগিয়েছিল গভীর প্রত্যয়। যে প্রচণ্ড আঘাত ডিরোজিও তদানীন্তন তমোগ্রস্ত হিন্দু সমাজের বুকে হেনেছিলেন তা এই নাটকে সুপরিস্ফুট। সংঘাতের রূপটি বিশ্বাসযোগ্য। তবে যে

দুটি প্রায়শ দুর্ভাগ্যবশত এই নাটকেও তা উপস্থিত। আদর্শবাদীর প্রতিপক্ষকে সাধারণত নাটকে ও সিনেমার কাহিনীতে অকারণে বেশী হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এটা বোধ হয় মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব বেশী করে দেখাবার জন্য। রাধাকান্ত দেব (ইনিও ছিলেন, সমাজের শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন—বাংলা সমাজে তাঁর দানও যথেষ্ট) কিংবা রামকমল সেনকে নাটকে এমন নির্মম ও বিবেকহীন করা হল কেন?

তখনকার সমাজের রূপটি যে নাটকাভিনয়ে পেয়েছি তার জন্য পরিচালক পীযূষ বসুকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ দিতে হয়। চরিত্রদের বেশভূষা এবং মঞ্চসজ্জার বৈশিষ্ট্যের (এর মধ্যে বিশেষ 'পরিবর্ত'-এর ছাপটি সুস্পষ্ট) কথা বলেই দিলাম। সমগ্র নাটকটিতে অদ্ভুত এক গতি এনে দিয়েছেন পরিচালক। এই গতিছন্দের মধ্যে ডিরোজিওর নেতৃত্বে জাগরিত উত্তাল তারুণ্যশক্তির স্পন্দন অনুভব করি। জীবনী-নাটকটিতে বাহ্য ঘটনাই সব নয়। অন্তরসংঘাত তথা নাট্য-সংঘর্ষের মুহূর্তও পর্যাপ্ত—যেখানে আবেগের উপকরণ। তবু মনে হয়, (ডিরোজিওর চরিত্রে) সে আভাস ফুটেছে। ট্রাজেডির মুহূর্ত নাটকে আর একটু বেশী থাকলে ভাল হত।

তার জন্য অবশ্য ক্ষোভ নেই। নাট্য-পরিচালক পীযূষ বসুর অভিনয়ে (ডিরোজিওর চরিত্রে) সে আভাস মিটেছে। তিনি ডিরোজিওর আপসহীন মানসিকতা যেমনি দৃপ্ত ভঙ্গিতে অনবলীলায় প্রকাশ করেছেন, তেমনি চরিত্রটির আহত শক্তিমত্তার করুণ মুহূর্তটিও জীবন্ত করে তুলেছেন। বিপ্লবী ডিরোজিওর চরিত্রের অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শ্রী বসুর চরিত্রচিত্রণে মূর্ত।

উঁচু মানের সপ্রাণ অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আরও কয়েকজন শিল্পী। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রশংসনীয় দিলীপ রায় (রাধানাথ শিকদার)। বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির চরিত্রাভিনয়ে মৃণাল মুখোপাধ্যায়, স্বপনকুমার, ভোলা বসু, চন্দন রায়, সুকোমল রায়, তুষার ভৌমিক প্রমুখের অভিনয়ও মনোগ্রাহী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে প্রশান্তকুমার, সৌরিন বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর সরকার, অরুণ দাশগুপ্ত, তাপসকুমার সাহা, পান্না দত্ত, অজিত দত্ত, সুপ্রিয় সরকার প্রভৃতির অভিনয়-ক্ষমতাও লক্ষণীয়।

অ্যামেলিয়ার চরিত্রের জন্য সুস্মিতা সান্যালের মত দক্ষ অভিনেত্রীর প্রয়োজন ছিল না। এই চরিত্রে তিনি কতটুকুই বা অভিনয়ের নৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম। জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্রতিভ প্রাণচঞ্চল অভিনয় বেশ সুন্দর। অপর একটি স্ত্রী-চরিত্রে ডলি ভট্টাচার্য যথাযথ।

আবহ-সংগীত রচনায় অচিন্ত্য মজুমদার সাঁতাকারের রসবোধ ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বাসু ভট্টাচার্যের নতুন ছবি "অনুভব"

অভিনেত্রী তনুজার ফ্ল্যাটে বাসু ভট্টাচার্যের নতুন হিন্দী ছবি "অনুভব"-এর প্রথম পর্যায়ের শুটিং সমাপ্ত। তনুজা ছবির নায়িকা। নায়ক হলেন প্রাণ—যিনি বহু হিন্দী চিত্রে ভিলেন-এর অভিনয় করে যশস্বী। অনুভব-এ প্রাণ সেজেছেন সাংবাদিক। এক বিরাট সংবাদপত্রের সম্পাদক। তনুজা হয়েছেন তাঁর স্ত্রী। বাসু ভট্টাচার্যের নিজের লেখা গল্প। আধুনিক বিবাহিত জীবনের জটিলতাকে কেন্দ্র করে দুটি চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি। ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত থাকবে।

"অনুভব" বাসু ভট্টাচার্যের নতুন এক্সপেরিমেন্টাল ছবি। স্টুডিও নেই, সেট-সেটিং নেই, মেকাপ নেই, উইগ নেই, ছবির জন্য বিশেষভাবে তৈরী পোশাকও নেই—স্বাভাবিক পরিবেশে ও স্বাভাবিক পোশাকেই ছবির শিল্পীদের নিয়ে শুটিং চলে। একটি বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন সদানন্দ। ক্যামেরায় আছেন নন্দ ভট্টাচার্য।

পাভলভ ইনস্টিটিউটের নাটক

পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্য সংস্থার দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আগামী ৩রা নভেম্বর রবিবার বেলা চারটায় সংস্থার কার্যালয় ১৩২।১এ বিধান সরণীতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম সন্ধ্যায় সংস্থার নতুন ধরনের স্যাটায়ার কৃষ্ণকান্ত বিরচিত 'কল্পতরুপাদ' নাটক অভিনীত হবে। উদ্বোধন করবেন সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় 'নাটক ও আধুনিক জীবন' সম্পর্কে আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করবেন নাট্যকার মন্মথ রায়। গত ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় সাফল্যের সঙ্গে সংস্থার নাটকটি মিনার্ভা মঞ্চে অভিনীত হয়। বন্যা ত্রাণ তহবিলে অর্থদানের জন্যই নাটক দুটির আয়োজন।

আজ বসন্ত

"আজ বসন্ত" নামে একটি নতুন বাংলা ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। উত্তমকুমার ছবির পরিচালক। প্রশান্ত দেবের (ইনি সহযোগী পরিচালকও) কাহিনী ও চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। উত্তমকুমার ও তনুজা নায়ক-নায়িকা।

"পান্না-হীরে-চুনী" : সুখেন দাস ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

দার্জিলিংয়ের ধস বন্যের চলচ্চিত্র জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বেশ কয়েকজন নামকরা প্রডিউসার দার্জিলিং অঞ্চলে আউটডোর শ্যুটিং করার সমস্ত আয়োজন করে ফেলেছিলেন। প্লেন-ট্রেনের টিকেট বুক করা হয়ে গিয়েছিল। দার্জিলিং-এ থাকার জন্য হোটেলও বুক করা হয়েছিল। যখন সব ঠিক ঠাক তখন হঠাৎ খবরের কাগজের প্রথম পাতায় উত্তরবঙ্গ ও দার্জিলিংয়ের খবর দেখা গেল। প্রডিউসাররা প্ল্যান করেছিলেন ছবির কতগুলো "ভেরী ইমপরট্যান্ট সিন" দার্জিলিং-এর নৈসর্গিক শোভার মধ্যে চিত্রায়িত করবেন, যেমন, নায়ক নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার এবং পরবর্তী কালের কিছু রোম্যান্টিক দৃশ্য—তারপর এক-আধটা রোমান্টিক ডুয়েট। তাছাড়া নায়ক এবং খলনায়কের চেজিং সিনও করার কথা। কিন্তু ধস বন্যের চিত্রনির্মাতাদের এই সাধে বাদ সাধল। এখন কী করা যায়। নায়ক, নায়িকা, খল নায়ক এই সব সদা-দুর্লভ শিল্পীদের ডেটস তো নষ্ট করা যায় না। সুতরাং দার্জিলিং-এর বদলে কেউ সিমলা, কেউ কুলুভ্যালী আর কেউ কাশ্মীর যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত হলেন। কয়েকজন প্রডিউসার ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছেন—বাকিরা এখনো জোগাড় যন্তরে ব্যস্ত। যাঁরা এখনো রওনা হতে পারেন নি তাঁদের একজনকে নায়িকা বললেন, 'ফরনাথিং কতগুলো ডেট নষ্ট হয়ে গেল', প্রযোজক বললেন, 'তুমি ডেট নষ্ট হওয়ার কথা বলছ—থ্যাঙ্ক ইওর স্টারস যে আমরা দার্জিলিং পৌঁছনোর আগেই এ দুর্ঘটনার খবর আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে নইলে আমরা দার্জিলিং-এ থাকা কালীন যদি এটা হত তাহলে কী হত সেটা একবার ইম্যাজিন করো'। অন্য একজন, মানে এক সহকারী ক্যামেরাম্যান তার সহকর্মীকে খেদের সঙ্গে বলল, 'বুঝলে, আমার কপালটাই খারাপ, কত কাণ্ড করে একটা গরম সুট তৈরী করালাম, ভাবলাম প্রডিউসারের পয়সায় এবার দার্জিলিংটাও দেখা হয়ে যাবে—সেটা আর হল না—অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।' সহকর্মী জবাব দিলে, 'কথাটা ত ঠিক হল না বাছা, তোমার শুভদৃষ্টি লেগে দার্জিলিং-এর পাথর ভাসিয়া গেল—কিন্তু হে বৎস খেদ করিও না—প্রডিউসারের পয়সায় আমরা কাশ্মীর ভ্রমণে যাচ্ছি।'—'আরে দূর, কাশ্মীর আর কতবার যাব—নাইনটীন সিক্সটি থেকে ক্যামেরার ফোকাস করতে শুরু করেছি, এই ক'বছরে এগারোটা ছবিতে কাজ করেছি আর কাশ্মীর গেছি বোধ হয় চোদ্দ-পনের বার'—প্রায় তিতি-বিরক্ত হয়ে বলল সহকারী ক্যামেরাম্যান। যখন প্রডাকশান পরিবেশে এই ধরনের আলোচনা হচ্ছে তখন কয়েকজন অতি উৎসাহী হাফ-সমাজসেবী এসে বলল, 'আমাদের মনে হয় উত্তরবঙ্গের এই দুর্দিনে আমাদের কিছু রিলিফ সংগ্রহ করা উচিত।' আলোচ্য প্রডাকসনের প্রডাকসন-এক্সিকিউটিভ বললেন, 'অতি সাধু প্রস্তাব—আপনাদের প্রচেষ্টায় রিলিফ সংগ্রহ সার্থক হোক। কিন্তু আমাদের কপালে কী আছে কে জানে। উত্তরবঙ্গের বন্যা আমাদেরও আউটডোর শ্যুটিং-এর পুরো প্ল্যান বানের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। এ কথা শুনে অতি উৎসাহী হাফ সমাজসেবীর দল অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে উঠলেন!

✻

তনুজা হয়ত শেষ পর্যন্ত 'তাসখন্দ' চলচ্চিত্র উৎসবে যাচ্ছেন না। তনুজা অভিনীত 'অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী' তাসখন্দে দেখানো হবে। মারাঠী কন্যা 'তনুজা' অনেক হিন্দী ছবিতে কাজ করেছেন কিন্তু স্বীকৃতি পেয়েছেন বাংলা দেশে। এখনো কোন মারাঠী ছবিতে কাজ করেন নি তনুজা। কলকাতায় শ্যুটিং করতে যাবার কথা হলেই তনুজা কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'কলকাতায় কাজ করতে আমার খুবই ভাল লাগে।' শোভনা সমর্থ বললেন, 'জানো প্রথমবার যখন তনুকে

দেশ

।। বিনোদন সংখ্যা ।।

বড়দিনের সময় দেশ-এর এবারকার বিশেষ সংখ্যার নাম "বিনোদন সংখ্যা"।

বড় আকারে, নতুন পরিকল্পনায়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আড়াই শ পৃষ্ঠার এই সংখ্যা প্রকাশিত হবে ২৮ ডিসেম্বর।

এতে থাকবে :

- **রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের মধ্যে সংগীত সম্পর্কে অপ্রকাশিত পত্রাবলী**
- **শংকরের একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস**
- **বুদ্ধদেব বসুর একটি বড় গল্প**

তা ছাড়া

সিনেমা, নাটক, যাত্রা, খেলা-ধুলা, মহিলাদের আধুনিক ফ্যাশান, উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক গানের আসর, বড়দিনের চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি বিষয়ে রম্যরচনা।

এবং

নানা চিত্র, কার্টুন ও অলংকরণ।

মূল্য : দুই টাকা।

নিয়ে কলকাতা গেলাম—তখন ভীষণ ভয় লেগেছিল—এত ভীড়, এত চেঁচামেচি, এত আবর্জনা, এত অভাব, এত অভিযোগ—মনে হয়েছিল এর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে। কিন্তু কয়েকবার যাতায়াতের পরই সব উল্টো হয়ে গেল—কলকাতার মানুষগুলো জীবন্ত। অ্যালাইভ। তারা রীঅ্যাক্ট করে। তারা ইনডিফারেন্ট নয়। ইনসপাইট অব এভরিথীং আই অ্যাডোর ক্যালকাটা—'

সরল শর্মা

রবীন্দ্র সদনে নট্ট কোম্পানীর যাত্রা-উৎসব

রবীন্দ্র সদনে আগামী ৫ থেকে ৮ নবেম্বর এই চারদিন ধরে বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাগানের শ্রেষ্ঠতম দল মাচরং বৈকুণ্ঠ সংগীত-সমাজ বা **নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টি**র চারদিনব্যাপী অভিনয় উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। অভিনয়ারম্ভ প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টায়। প্রথম দিন অভিনীত হবে পালা-সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের নতুন সৃষ্টি 'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর', দ্বিতীয় দিন শিবাজী-ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষের পটে রচিত ইতিহাস কাহিনীর পালা 'সিংহগড়' (মহেন্দ্র গুপ্ত) মঞ্চস্থ হবে। তৃতীয় দিনের আকর্ষণ ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'মহীয়সী কৈকেয়ী'—রামায়ণের এক অশ্রুসজল কাহিনীর পালা-রূপ। সমাপ্তি দিবসে চিরকালের বিদূষক দাদাঠাকুর-এর জীবনীনাট্য, মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'দাদাঠাকুর' পরিবেশিত হবে। প্রথম পালার মাইকেল চরিত্রে, দ্বিতীয় পালার ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায়, তৃতীয় পালায় 'দশরথ' ও চতুর্থ পালার নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন মহেন্দ্র গুপ্ত। পালাগুলির সুরযোজনায় আছেন অনিল বাগচী ও দুর্গা সেন—যাঁরা এই প্রথম যাত্রা পালায় সুরারোপ করেছেন। নট্ট কোম্পানীর শক্তিশালী শিল্পীগোষ্ঠীতে রয়েছেন অরুণ দাশগুপ্ত, শেখর গাঙ্গুলী, মনোজকুমার, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক দাস, গোষ্ঠ পাল, সংগীত বিশারদ গুরুদাস ধাড়া। স্ত্রী চরিত্রে থাকবেন কাঞ্চন, ফণী ভট্টাচার্য, হরিগোপাল ও জনার্দন। নির্দেশনা মহেন্দ্র গুপ্তর।

নট্ট কোম্পানী শতাধিক বৎসর ধরে যাত্রা শিল্পের নিজস্ব ঐতিহ্য বহন ও প্রচার করে চলেছে। পুরোভাগে রয়েছেন সূর্য-কুমার দত্ত। এই দলই প্রথম এককভাবে নিজেদের চারটি নতুন পালা মঞ্চে রূপ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

দৃষ্টিদর্পণ

মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে পরিচালক রঞ্জন মজুমদার গত সপ্তাহে "দৃষ্টিদর্পণ" ছবির কিছু ঘরোয়া দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। দিলীপ দে চৌধুরীর কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি প্রযোজনা করছেন ভাইয়া ঘোষ। শ্যামল মিত্র সংগীত পরিচালক।

"পরিণীতা" চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। অজয় কর পরিচালিত চিত্রলিপির এই ছবির শুটিং প্রায় শেষ ফটো—দেশ

মূকাভিনেতার সংবর্ধনা

সম্প্রতি বিদেশ সফর করে মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত দেশে ফিরে এসেছেন। সোফিয়ায় বিশ্ব যুব উৎসবে তাঁর মূকাভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা হয়। শ্রীদত্তকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রূপদক্ষ সংস্থা গত সপ্তমী পূজার দিন বসুশ্রী সিনেমায় এর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে বলেন, যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়ে ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য বিরাজমান।

ওইদিন শ্রীদত্ত আটটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। বিশেষ করে কলকাতার বাস প্যাসেঞ্জার, চোর, ও আমার দেশের মাটি, সীতা ও হনুমান, জন্ম ও মৃত্যু দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। আলোকসম্পাত, আবহসংগীত ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন যথাক্রমে তাপস সেন, হিমাংশু বিশ্বাস ও সুরেশ দত্ত।

সাহায্য-প্রদর্শনী

দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা "পানচ" উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আগামী ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে এই সাহায্য-অনুষ্ঠানের আসর বসবে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। সভাপতিত্ব করবেন শ্রীসত্যজিৎ রায়।

অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ ফ্যাশন প্রদর্শনী। "পানচ" সংস্থার মহিলা সদস্যারা এতে যোগ দেবেন। দ্বিতীয় অংশ নাট্যাভিনয়। নান্দীকার গোষ্ঠী অভিনয় করবেন তাঁদের বিখ্যাত, জনপ্রিয় নাটক "শের আফগান।"

বাণী বিদ্যাবীথির বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্র-নাথের 'মায়ার খেলা' মঞ্চস্থ হয়। নৃত্য পরিচালনায় বলাই সেন দক্ষতার পরিচয় দেন। আরতি মজুমদার ও কৃষ্ণা বেনি-গালের (যথাক্রমে শান্তা ও প্রমদা) নৃত্য উপভোগ্য নয়। অমর ও অশোক সেজে-ছিলেন যথাক্রমে বলাই সেন ও পরেশ দাস। নেপথ্য গান খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। অশোকের গান দরদের সঙ্গে গেয়ে শোনান চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠশিল্পী অর্ঘ্য সেন, ধারা মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণা মিত্রও উল্লেখযোগ্য। হৃষীকেশ সেন সংগীত পরিচালনা করেন।

বন্যাদুর্গত উত্তরবঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঝটিকা-সফর এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাগডোগরা-জলপাইগুড়ি মেখলিগঞ্জ-কালিমপং-দারজিলিং—উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গত অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঝটিকা-সফর ২৪ অকটোবর বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হয় এবং বিকালে শেষ হয়। হেলিকপটারে, মোটরে, পায়ে হেঁটে তিনি ঘুরেছেন অনেক জায়গায়, স্বচক্ষে দেখেছেন ধ্বংস আর দুর্দশার ছবি এবং প্রচণ্ড উত্তেজনার মুখোমুখি হন জলপাইগুড়ি শহরে। সেখানে জনতার চাপ সামলাতে পুলিস লাঠি চালায়, অনেকে আহত হন। শহর ত্যাগের সময় প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে ইট-পাটকেলও পড়ে। প্রধানমন্ত্রী বোমবাই থেকে বিমানে সোজা আসেন বাগডোগরা, সকাল ১০টায়। সেখান থেকে হেলিকপটারে প্রথমেই যান জলপাইগুড়ি। এখানে শ্রীমতী গান্ধীর দর্শনার্থী এক জনতার উপর পুলিস লাঠি চারজ করলে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিসের লাঠি-চারজ সম্পর্কে নানা অভিযোগ শুনে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং অস্ফুটে তিনি বললেন "পুলিস লাঠি কিঁউ মারা?" শ্রীমতী গান্ধী উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য ২ হাজার ১ শতটি উলের কম্বল, ৩ হাজারটি ছোটদের গরম জামা, কয়েক হাজার সোয়েটার, বেশ কিছু পরিমাণ গুঁড়া দুধ, বেবিফুড এবং ঔষধপত্র রাজ্যপালের হাতে দেন।

দেশী সংবাদ

২১ অকটোবর—আজ কলকাতা তথা সারা রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার রজত-জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। সকালে কলকাতায় একাধিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন বক্তৃতা প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতারূপে ঘোষণা করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২২ অকটোবর—আজ রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ জগন্নাথ ঘাটের হোয়ারফ জেটি ভেঙে পড়ায় অন্ততপক্ষে ২০ জন দর্শনার্থী গঙ্গায় বানের তোড়ে ভেসে যায়। গারডেনরিচ থেকে দক্ষিণেশ্বর দীর্ঘ দশ মাইল গঙ্গার দুধারে তন্ন তন্ন করে খুঁজে একজনেরও হদিস মেলেনি।

পারক স্ট্রীট ডাকঘর থেকে প্রায় চৌদ্দশ গজ দূরে আজ বেলা এগারোটা নাগাদ সদর স্ট্রীটে একটি চলমান ট্যাকসি থেকে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২২৮ টাকা লুঠ হয়। একরঙা কালো রঙের একটি অ্যামবাসেডর গাড়ি এসে ট্যাকসিটির গতিরোধ করে এবং পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ঘটনাটি শেষ হয়।

২৩ অকটোবর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন খাদ্যনীতিতে চালকল এবং উৎপাদক উভয়ের ক্ষেত্রেই লেভি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। চালকলগুলির ক্ষেত্রে লেভির পরিমাণ হবে শতকরা ৫০ ভাগ। তবে উৎপাদকদের ক্ষেত্রে এবার অপেক্ষাকৃত বেশী ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গত পাঁচটি জেলাকে লেভির আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১ নবেমবর থেকে এই নীতি চালু হবে।

কেরলে শিল্পায়ন এবং চাল সরবরাহে কেন্দ্রের উপেক্ষার প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন ফ্রন্টের বড় শরিক মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি আজ কেরল বন্ধ-এর ডাক দিয়েছিলেন। কেন্দ্র-বিরোধী এই আন্দোলনে রাজ্যের কোথাও বিশেষ সাড়া মেলেনি। শ্রমিকরা যথারীতি কাজে গিয়েছেন। স্কুল-কলেজ-অফিস-ব্যবসায় কেন্দ্র—সবই খোলা ছিল।

২৪ অকটোবর—মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতাসীন সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের সামনে যে সংকট দেখা দিয়েছিল, আপাতত তা এড়ানো গিয়েছে। জনসংঘের কেন্দ্রীয় পারলামেনটারী বোরড আজ অধিক রাত অবধি এ বিষয়ে আলোচনার পর জনসংঘের মধ্যপ্রদেশ শাখাকে এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছেন—'সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকার এখন

ত্যাগ করবেন না।"

২৫ অকটোবর—জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বছর পয়লা সেপটেমবর থেকে মাসে ৪৯৯ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা ৬ টাকা থেকে ১১ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সরকারের বছরে ৩০ কোটি টাকা বেশী খরচ হবে।

উত্তরবঙ্গের তিস্তা, জলঢাকা প্রভৃতি নদীতে আবার জল বাড়তে পারে, এ রকম আশংকার সংবাদে স্থানীয় জনসাধারণ আজ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সরকারী কর্তৃপক্ষও সঙ্গে সঙ্গে সাবধেশব সতর্ক। উপনদীগুলির উপরও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। পুলিস প্রহরা বসেছে।

২৬ অকটোবর—প্রাক্তন মুখ্যসচিব শ্রী এস এন রায় তাঁর রিপোরটে বলেছেন, বন্যা সম্পর্কে জলপাইগুড়িকে সময়মত সতর্ক করে দেওয়ার সুযোগ ছিল এবং যথাসময়ে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হলে বহু মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণ বাঁচানো যেতো। জলপাইগুড়িকে সময়মত সতর্ক না করে দেওয়ার জন্য শ্রী রায় স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং সেচ বিভাগ—উভয়কেই দায়ী করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, দুই-পক্ষেরই ভুল হয়েছে এবং অনেকেই কর্তব্যে অবহেলা করেছেন।

২৭ অকটোবর—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ধর্মবীর আজ তিস্তা বাজারে তিস্তা নদী বরাবর রজ্জু সেতুটির উদ্বোধন করেন। দারজিলিং-এর সঙ্গে কালিমপং-এর যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই অস্থায়ী রজ্জু পথটি নির্মিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বন্যায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত পুরাতন সেতুটি থেকে এই নতুন রজ্জু সেতুটির দূরত্ব প্রায় চারশত গজ হবে।

উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর প্রকৃতির রোষ এবার ওড়িশার বিস্তীর্ণ উপকূল ও পশ্চিম অঞ্চলকে তছনছ করে দিয়েছে। যতটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায়, প্রবল- বারিপাত ও ঘূর্ণিঝড়ে পুরী শহরের বহু এলাকা জল-প্লাবিত। বহু বাড়িঘর ভূপাতিত। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-ওয়ালটেয়ার সেকশনে রেলপথ অন্তত চার জায়গায় বিধ্বস্ত। খুরদা রোড থেকে পলাশ রেলপথের দীর্ঘ এলাকা জলমগ্ন।

বিদেশী সংবাদ

২১ অকটোবর—২ বছরেরও বেশী আগে ধৃত চোদ্দজন কম্যুনিসট নাবিককে মুক্তি দেওয়ার জন্য উত্তর ভিয়েৎনামের উপকূল বরাবর ২৪৮ বর্গমাইল এলাকায় ওয়াশিংটন এবং হ্যানয় আজ ৩৬ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

আজ জ্যাকোলিন এবং আরিসটোটল ওনাসিসের বিয়ের আমন্ত্রিতরা স্করপিওস দ্বীপ থেকে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে ফিরে গিয়েছেন। নব-দম্পতি নোঙর করা প্রমোদতরী ক্রিশটিনায় বিশ্রাম নিচ্ছেন।

২২ অকটোবর—মহাকাশে পৃথিবীর চারদিকে দীর্ঘতম পরিক্রমার নতুন রেকরড সৃষ্টি করে তিনজন আমেরিকান মহাকাশচারী—শিরা, আইজলে এবং কানিংহাম আজ পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। নেমেছেন অতলান্তিক মহাসাগরে বারমুদার কাছাকাছি।

২৩ অকটোবর—চীন হাজার হাজার বৈরী নাগাকে তালিম দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছে বলে তাইওয়ান আজ সাধারণ পরিষদে কমিউনিসট চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ উই তাও মিং বলেন, বারমার বিরুদ্ধেও অনুরূপ অন্তর্ঘাতের তোড়জোর চলছে।

২৪ অকটোবর—আমমানে গত পাঁচ দিন ধরে একটি ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "ইহুদি দখলদারদের কবল থেকে প্যালেসটাইন উদ্ধারের একমাত্র পথ—জেহাদ।" অন্য দিকে জেরুসালেম থেকে খবর : অধিকৃত এলাকায় সম্ভাব্য আরব বিক্ষোভের মোকাবিলায় ইস্রায়েলী ছত্রী-বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে।

২৫ অকটোবর—আজ সকালে প্রায় তিনশ' ছাত্র 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস' দখল করে নেন এবং এখনও সেটি তাঁদের দখলেই আছে। আগামী রবিবার এখানে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ-বিরোধী একটি বিপুল বিক্ষোভের উদ্যোগ চলেছে। তাতে যোগ দিতে বাইরে থেকে প্রচুর ছাত্র আসছেন। তাঁদের আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যেই এই বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি ছাত্ররা দখল করেছেন।

২৬ অকটোবর—প্রেসিডেনট আয়ুব খাঁ আজ বলেছেন, পাকিস্তান একটি যুদ্ধ-বর্জন চুক্তি স্বাক্ষর করতে "খুবই আগ্রহী"। তবে এই সঙ্গে আর একটি চুক্তিও করতে হবে, যাতে থাকবে ভারত ও পাকিস্তান তাঁদের বর্তমান সমস্যাগুলি ও ভবিষ্যতে যে-সব সমস্যা দেখা দেবে,সেগুলির কীভাবে সমাধান করতে পারে তার হদিস।

মানব আরোহী নিয়ে একটি রুশ মহাকাশ-যান আজ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। এর একদিন আগে অর্থাৎ শুক্রবার আরোহী-বিহীন একটি মহাকাশ-যানকে পৃথিবীর কক্ষ-পথে স্থাপন করা হয়। ওই দুটি মহাকাশ-যান এখন যুক্ত হয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে।

২৭ অকটোবর—আজ বিকালে গ্রসনোভার স্কোয়ারে মারকিন দূতাবাসের সম্মুখে পুলিসের সঙ্গে মাও-সমর্থক প্রায় দু-হাজার বিক্ষোভকারীর সংঘর্ষ হয়। দূতাবাসের সামনে কড়া পুলিস পাহারা ছিল। জন-পঞ্চাশেক বিক্ষোভকারী পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে স্কোয়ারে ঢুকতে চেষ্টা করলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পুলিস কিছু লোককে গ্রেফতার করে, পরে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে।

এই দেখুন এরা। যাকে বলে আবালবৃদ্ধ বনিতা।
আমার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখেরও বেশী।
রান্নায় আমার যে এত হাতযশ—
এই দেখুন তার চাবিকাঠিটা আমার হাতে।
সানরাইজ
গুঁড়ো মশলা। স্বাদে-গন্ধে এর জুড়ি নেই।
খাঁটি নির্ভেজাল জিনিষ। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী।
প্রকাশ ব্রাদার্স
গুঁড়ো মশলার
আদি প্রতিষ্ঠান।
৭৪/এ, নলিনী শেঠ রোড,
কলিকাতা-৭
PURE POWDER SPICES

সূচিপত্র

সুরুচিপূর্ণ
ফরাসী
স্টাইল
স্নানাগারে বিলাসিতার উদ্দেশ্যে এক দৃঢ় পদক্ষেপ
যা একেবারে নতুন···একেবারে অভিনব···
সম্পূর্ণ ফরাসী ষ্টাইল—তা হোল পরশুরাম
স্যানিটরীওয়্যার। বিখ্যাত স্যানিটরীওয়্যার নির্মাতা
পোর্সীর-ইউরোপ এর কারিগরী দক্ষতার সহযোগি-
তায় ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। এ বিলাসিতা আপনার
আয়ত্বের মধ্যে। চিড় প্রতিরোধক, টেকসই, রন্ধ্রবিহীন
“ভিট্রিঅ্যাস চায়না” বা কাচতুল্য চিনেমাটি থেকে
তৈরী। ঝকঝকে সাদা এবং মনোরম বিভিন্ন রংয়ে
পরশুরাম স্যানিটরীওয়্যার পাওয়া যায় যা দিয়ে
আপনার ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী স্নানাগারের
প্রয়োজন মেটাতে পারেন। পরশুরামের তৈরী
চকচকে কাচের মত টালীও (গ্লেজড্ টাইল)
সাদা এবং বিভিন্ন রংয়ে পাওয়া যায়।
Parshuram
পরশুরাম স্যানিটরীওয়্যার
• ভারতীয় মানকসংস্থার মান অনুযায়ী উৎকর্ষতা বজায় রাখা হয়
• সারা ভারতে স্টকিস্ট ও ডিলার আছে।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য এখানে লিখুন:
পরশুরাম পটারী ওয়ার্কস্ কোং লিঃ মরভি, ভারতবর্ষ।
নিম্নলিখিত স্থানে কারখানা আছে: থানগড়, ওয়াকেনের, ধ্রাংগধ্রা।
বম্বে অফিস: হাউস, করিমভাই রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, বম্বে-১।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীবামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র এইচ এম ভি-ই আপনার পছন্দসই রেকর্ডে আপনাকে মনের মতো গান শোনার সুযোগ এনে দেয়।

এইচএমভি
ফিয়েস্টা
দাম ২৯২.৬০ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা

এইচএম ভি ফিয়েস্টা রেকর্ড প্লেয়ারে আপনার মর্জি ও মেজাজ মাফিক হরেক রকম গানবাজনা শুনতে পাবেন···একেবারে আপনার নিজের পছন্দ করা সংগীত। হালফ্যাশানের রেকর্ড প্লেয়ার এইচএম ভি ফিয়েস্টা সুবহ্ এবং সহজে চালান যায়—এসি ও ব্যাটারী চালিত দু'রকম মডেল। সবরকম সাইজও সবরকম স্পীডের রেকর্ডই এতে বাজে। মজবুত ও ছিমছাম র‍্যাপ অ্যারাউণ্ড ক্যাবিনেট। ফিয়েস্টা এইচএমভি-র তৈরী—যাঁরা ধ্বনি ও সংগীতের শিল্পকর্মে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এইচএমভির সদ্য প্রকাশিত এই কয়েকটি রেকর্ড শুনে আনন্দ পাবেন—

রবীন্দ্রসংগীত : আমায় থাকতে দে না—স্বপন গুপ্ত; আমি কেমন করিয়া জানাবো—চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়; দুই হাতে কালের মন্দিরা যে—পূরবী মুখোপাধ্যায়; তোমার খোলা হাওয়ায়—নমিতা ঘোষাল; গানের ভিতর দিয়ে যখন—ধীরা মুখোপাধ্যায়।
অতুলপ্রসাদী : আজি স্বর্গ আবাস—সুশীল চট্টোপাধ্যায়।
কয়েকটি বিশিষ্ট আধুনিক গানের রেকর্ড : শিল্পী—ভূপেন হাজারিকা, ললিতা ঘোষ, নীতা সেন, চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়।

যে কোন এইচএমভি ডীলারের কাছে আরও হাজার হাজার রেকর্ড থেকে আপনি পছন্দমত বেছে নিতে পারবেন।

চিকিৎসার চাইতে রোগ প্রতিরোধই শ্রেয়ঃ;
বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশী সত্য। কারণ
এই রোগে আক্রান্ত হ'লে সুস্থ হওয়ার পরও
শরীরে বিশ্রী দাগ বা অন্য কোন অসুস্থতা থেকে
যেতে পারে। বর্তমানে বেদনা বিহীন এবং
বিনামূল্যের টিকায় বসন্ত রোগ অতি সহজে
প্রতিরোধ করা যায়। বসন্ত রোগ নির্মূল
করতে সাহায্য করুন—টিকা নিন।
বসন্ত রোগ
প্রতিরোধে
সাহায্য করুন
টিকা নিন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২
শনিবার ২৩ কার্ত্তিক ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৪২.০০
ষাণ্মাসিক „	... ২০.০০
ত্রৈমাসিক „	... ১০.০০

(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩১.০০
ষাণ্মাসিক	... ১১.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
[illegible] বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday, 9 Nov. 1968

দেশত্যাগী বিজ্ঞানী

ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের একটি সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, প্রতি বছর ভারত থেকে হাজার দুয়েক করে বিজ্ঞানী ও কারিগরী বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনে চলে যান। গত পাঁচ বছর, অর্থাৎ '৬২ থেকে '৬৭ সালের মধ্যে হাজার চব্বিশ পঁচিশ ভারতীয় এইভাবে ব্রিটেনে চলে গেছেন। এর মধ্যে অবশ্য সবাই বিজ্ঞানী এমন নয়, নানা বৃত্তিধারী মানুষ রয়েছেন। আছেন, চিকিৎসক, এনজিনিয়ার, শিক্ষক—এই সব গোত্রের মানুষ। প্রধানত এঁদের বিদেশ যাবার কারণ চাকরি, জীবনে উন্নতির সুযোগ-সুবিধের অনুসন্ধান। চাকরির ভাউচার হাতে নিয়েই এঁরা যান, কেননা ওটুকু না হলে যাওয়া যায় না; তারপর ওদেশে গিয়ে বেশির ভাগই চেষ্টা করেন আরও ভাল কোনো সুযোগ-সুবিধে জুটিয়ে নেবার। ধরে নিতে হবে, চাকরি নিয়ে যাঁরা ব্রিটেনে যান তাঁরা অবসর জীবন কাটাবার জন্যে আবার স্বদেশবাসী হবেন না। এমন হবার কারণ বড় নেই। হতে পারে, শেষ বয়সে কেউ কেউ দেশে ফিরতে চান। কিন্তু তাতে এদেশের লাভ কী! এ তো গেল যাঁরা চাকরি নিয়ে ব্রিটেনে যাচ্ছেন তাঁদের কথা। মোট ভারতীয় প্রতি বছর ব্রিটেনে যাচ্ছেন কত? গড় পড়তা হিসেবে নাকি হাজার পঞ্চাশেক, তার মধ্যে আছে ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং নানা ধরনের লোক। ব্রিটেন ছাড়াও যাবার জায়গা আছে, য়ুরোপের নানান দেশ; আমেরিকাতেও ভারতীয়রা কিছু কম ভিড় করে না। বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের মতে, বিদেশে গেলেও এঁরা অবশ্য সেখানে স্থায়ী ভাবে থাকেন না, অধিকাংশই ফিরে আসেন; আসেন না শুধু বিজ্ঞানী ও কারিগরী বিশেষজ্ঞরা। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই সুযোগ সন্ধানের আশায় পড়ে থাকেন।

সামান্য ভাবলেই বোঝা যায়, ভারত ছেড়ে যাঁরা বিদেশে যান তাঁদের এক দলের উদ্দেশ্য চাকরি, নিতান্তই চাকরি। এই চাকরির ভালমন্দ থাকতে পারে, সুযোগ-সুবিধেও থাকতে পারে। স্বদেশে চাকরি না পেয়ে পেটের দায়ে কেউ যদি বিদেশে চাকরি করতে যান তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবার কথা নয়। আর জীবনে সুযোগ-সুবিধে বা উচ্চাশার স্বপ্ন কে বা না দেখে! তাতে দোষই বা কোথায়! নেহাতই চাকরি বা পেট চালাবার আশায় যাঁরা বিদেশে পাড়ি দিতে চান, তাঁদের সম্পর্কে অন্তত আমাদের আপত্তি করার কারণ দেখি না। এদেশে না-খেয়ে মরার চেয়ে বিদেশে গিয়ে অন্ন সংগ্রহ করা দোষাবহ নিশ্চয় নয়। কর্মপ্রার্থী ছাড়াও আর-এক বিশেষ শ্রেণীর দেশত্যাগী থাকেন—যাঁরা নানান রঙীন স্বপ্ন নিয়ে সাগরপারে ছোটেন, ভাবেন, ওখানকার মাটিতে পা দিলে দু চার মুঠো সোনা হয়ত পাওয়া যাবে। এই ধরনের উৎসাহীরা বরাবর ছিল, এখনও থাকবে; কাজেই এদেরও আমাদের চিন্তা থেকে বাদ দেওয়া যায়।

আমাদের দুশ্চিন্তা একমাত্র তাঁদের নিয়ে যাঁরা এ-দেশের পক্ষে নানাদিক থেকে মূল্যবান। এঁরা কেউ উৎসাহী গবেষক, কেউ প্রতিভাবান ছাত্র, কেউ বিজ্ঞান-সাধক, কেউ বা প্রয়োগবিদ্যায় পারঙ্গম। বস্তুত এঁরাই দেশের সম্পদ। এমন কথা মনে করা ভুল যে, বিজ্ঞানের বা ডাক্তারীর একটা ডিগ্রি থাকলেই বিজ্ঞানী বা দক্ষ চিকিৎসক হওয়া যায়। এঁদের দেশত্যাগ আমাদের কাছে সমস্যা হতে পারে না। কিন্তু সমস্যা সেখানে যেখানে যথার্থ প্রতিভাকে আমরা হারাই, যেমন ডঃ খোরানাকে হারিয়েছি। আমরা নোবেল পুরস্কার পাই বা না পাই তাতে বড় কিছু যায় আসে না; আমাদের ক্ষতি তখনই যখন এমন ভারতীয়কে হারাই যাঁরা দেশের সম্পদ, যাঁদের হাতে এদেশের অনেক বাস্তব কল্যাণ সাধিত হতে পারে। দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্যে এঁদের হারানো চলে না, উচিতও নয়। আমাদের আর্থিক সঙ্কট ও অন্যান্য সমস্যার কথা তুলে যদি আমরা ক্রমাগত গবেষক, বিজ্ঞানী, প্রয়োগবিদদের হারাতে শুরু করি তবে এই অনগ্রসতার তিমির দূর হবে না। সব গেঁয়ো যোগীই যোগী নয়, কিন্তু কোনো কোনো গেঁয়ো যোগী নিশ্চয় যোগী—এবং এদেশে নিশ্চয় তাঁদের ভিখ্ পাওয়া প্রয়োজন।

কানু সান্যাল গ্রেপ্তার।
এ-মরসুমের সেরা শিকার।
পাকিস্তান কয়েকটি শর্তে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হবার চুক্তি করতে সম্মত।
কোলাকুলি করা যাক।

রঞ্জন

শুক্রবার সকালে কলকাতায়ও প্রতিভাত হলো যে প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েৎনামে নূতনতর আঘাতের আদেশ দিয়েছেন। পঁচিশ লক্ষ টন বোমা ফেলেও যে অগ্ন্যুৎপাৎ সম্ভব হয়নি গত তিন বছরে, মাত্র একটি বিলম্বিত রাত্রির বেতারভাষণে বিশ্ব চমকিত হয়ে উঠল। শান্তির বোমার বিস্ফোরণক্ষমতার পরিমাপ সম্ভব নয় টি-এন-টির ওজনে। লিন্ডন জনসন সত্যই শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন যে, উত্তর ভিয়েৎনামের উপর সর্বপ্রকার মার্কিনী আক্রমণ আপাতত নিঃশর্তে নিঃশেষিত। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তে কিন্তুর অন্ত ছিল না; তবু স্বীকার না করে উপায় রইল না যে, হোয়াইট হাউস থেকে বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে প্রেসিডেন্ট জনসন ভিয়েৎনামে শান্তির সম্ভাবনার একটি সূত্র অন্তত বিশ্বকে উপহার দিয়ে গেলেন। মার্কিন প্রেমের অপরাধে সোপর্দ হবার ঝুঁকি সত্ত্বেও এই সীমিত স্বীকৃতি ভাষ্যকারের অবশ্য-কর্তব্য।

তবু যদি বিশ্বের অধিকাংশ রাজধানীতে সশংক উল্লাস অবাধ বন্যার বেগ ধারণ না করে থাকে তারও কারণ আছে বইকি। প্রেসিডেন্ট জনসনের বন্ধুজনও কদাচ অস্বীকার করেনি যে রাজনীতির দ্যুত-ক্রীড়ায় তিনি চিরধুরন্ধর। উত্তর ভিয়েৎ-নামের অধিবাসীদের দুর্দশায় সহসা প্রেসিডেন্টের হৃদয় বিগলিত হয়েছে এমন ধারণা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। তবে কি আশু নির্বাচনে উপ-রাষ্ট্রপতির সাফল্যকল্পেই বিশ্বাকাশে এই অলীক রামধনুরচনা? প্রেসিডেন্টের রাজ-নৈতিক অতীত এমন অনাবিল শুভ্র নয় যে সম্ভাবনাটাকে পুরোপুরি সন্দেহসন্তান বলে নির্বাসিত করা চলে। নির্বাচনান্তে ভোটলক্ষ্মী কার স্কন্ধে ভর করে কাকে আগামী চার বছরের জন্য শ্বেতসৌধে অভিষিক্ত করবেন তা ইতিমধ্যে পাঠকের জানা হয়ে গেছে। জানা নেই ভাষ্যকারের। আরও অজানা নির্বাচনের উপর জনসনী ঘোষণার আনুপাতিক প্রভাব। নির্বাচন নিষ্পত্তির শেষেও পাঠক এই অজ্ঞতায় লেখকের শরিক হতে পারেন।

✻

শনিবারের সন্ধ্যায় আরও বহুজনকে অজ্ঞতায় অংশীদার হতে আমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা সামান্যই। উত্তর ভিয়েৎনামে আক্রমণ বন্ধ হয়েছে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে। তারপর? প্যারিসে সমাগত উত্তর ভিয়েৎনামী প্রতি-নিধিবর্গ এই সেদিন ঘোষণা করেছিলেন যে, মার্কিনী উচ্চারণের এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা তাঁদের অভাবিত পরিকল্পনা পেশ করবেন। ঘড়ির কাঁটার প্রতি পরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে হ্যানয় এগারো ঘণ্টা পরে বিশ্বকে যা উপহার দিলেন তা উপহাস্য নিশ্চয়ই নয় কিন্তু তাকে গম্ভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করাও অতি সহজ নয়। বোমা বন্ধ হলে আমেরিকার সঙ্গে কথা বলতে রাজী, কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার যে অস্পৃশ্য; ওর সঙ্গে জলচল কী করে সম্ভব? জাতিভেদ একান্তই ভারতীয় সমস্যা নয়।

সাইগনের প্রত্যুত্তর প্রস্তুত ছিল। হ্যাঁ, হ্যানয়ের সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু কোথা থেকে এলো ওই তথাকথিত ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রনট? সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপবীত নেই ওর। কোন সাহসে ও বসবে আলোচনা বাসরে ব্রাহ্মণের সারিতে? ঔদ্ধত্যের একটা সীমা থাকবে নিশ্চয়ই। বঙ্গীয় পল্লীসমাজে এমন পরিস্থিতি আদৌ অজানিত নয় যেখানে সব চেয়ে সোচ্চার ঠিক সেই ব্রাহ্মণটি যাঁর সম্বল অতি সামান্য আর পৈতের প্রহার সর্বাধিক প্রখর। প্রেসিডেণ্ট থিউর শৌর্যও অতি ভঙ্গুর প্রমাণিত হওয়া সম্ভব। এখানে ওখানে সামান্য শোণিত অতিপ্রত্যাশিত। অতীত অভিজ্ঞতায় এমন আশংকার সমর্থন আছে। প্রেসিডেণ্ট জন-সনের সম্ভবত অনিঃস্বার্থ ঘোষণা সত্ত্বেও ভিয়েৎনামী শান্তি এখনও হাতের পাখি নয়। সে ঝোপের পাখি, আর ঝোপে অনেক সময়ই ঈগলে আর পারাবতে পার্থক্য নির্দেশ অতি দুরূহ।

✻

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নৈরাশ্যের মার নেই। আশাবাদীদের চলেছে দুর্দিন। তবু ভিয়েৎনামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিকষায় অতীত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পরিমিত প্রত্যাশার ভিত্তি এই যে আদর্শবাদ-বহির্ভূত বাস্তবিক সংগ্রামে আমেরিকা আর উত্তর ভিয়েৎনাম এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন যেখানে উভয়েরই অনবমাননায় কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ না হয়ে উপায় নেই। হতে পারে মার্কিনী বোমাবর্ষণে উত্তর ভিয়েৎ-নামের অতি মাত্রায় ক্ষতি হয়নি; আমেরিকার সামরিক বা রাজনীতিক লাভ হয়েছে তার চাইতে অনেক কম। লাভক্ষতির এমন খতিয়ান সর্বথা শিরোধার্য হলে কোনো যুদ্ধ দীর্ঘায়ু হোতো কিনা সন্দেহ। তবু আছে ক্লান্তি, আছে শ্রান্তি, বাজেটদহন লাগে। প্রেসিডেণ্ট জনসনের আন্তরিকতায় অবিশ্বাসী মার্কিন মুলুকেও অসংখ্য। হতে পারে হ্যানয়েরও অন্তহীন সংগ্রামের একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের প্রধান আবাসস্থল লণ্ডনের কোনো পল্লীতে। এহ বাহ্য। কারোই অজানা নেই যে প্যারিসের বর্তমান মুকাভিনয় প্রধানত দু'জনে মুখোমুখি বসিবার।

চতুরঙ্গের অবতারণায় বাধাবিঘ্ন অপরিহার্য ছিল। হতেই পারে না যে ওয়াশিংটন সাইগনের সম্ভাব্য অবাধ্যতা সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিল। মস্কোর অনতিবিজ্ঞাপিত দূতালিতেও হ্যানয়ের বিনীত কিন্তু অপরাস্ত দম্ভের তথ্যও নিশ্চয়ই জানা ছিল। তবু ভরসা আছে কথা হবে। সংঘর্ষের অন্ত না হলেও তার রূপান্তর ঘটবে। ওয়াশিংটন বা হ্যানয় যাই বলুক, বর্তমান অবস্থার সার্থক ও সংগত বিবরণ বোধ হয় হবে শিবরাম চক্রবর্তীর ভাষায়ঃ হ্যাঁ-নয়। ফরাসী ভাষায় চন্দ্রবিন্দু সহজেই আসে।

✻

পরশুরাম পুলকিত হতেন যে তাঁর "না মানেই হ্যাঁ" আজ আন্তর্জাতিক পরি-ভাষায় পরিণত হয়েছে। আমেরিকা, উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আর ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রণ্ট বা ভিয়েৎকং—এই চারের মধ্যে আলোচনা শুরু হবে কিনা লেখার সময় তা জানিনে। জানি যে কথা শুরু হলেও এক পক্ষের 'হ্যাঁ' আর অপর পক্ষের 'না' সাধারণত পরস্পরবিরোধী হবে না। এতে মর্মাহত হবারও কারণ দেখিনে। প্রতিকূল প্রতিবেশীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই কি ভারতের তথাকথিত নীতি নয়?

ভিয়েৎনামে ভারতবর্ষের আপন রাষ্ট্র-স্বার্থ কখনোই অপরিমিত ছিল না। আর্থ-নীতিক সংযোগও সামান্য। রাজনীতিতে ভারত অকারণে জড়িত হয়েছিল ইণ্টার-ন্যাশন্যাল কণ্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে। দিল্লী না জানলেও, সেই মোড়লীর বায়না শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তবু যদি তাঁর অসংখ্য অনাবশ্যক বিবৃতিতে ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে অসংলগ্ন উক্তি করতে অবিরত থাকেন তার ব্যাখ্যা হয়তো বায়োলজিতেঃ পিতার অভ্যাস ছিল প্রগলভ ভাষণে। ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে শ্রীমতী গান্ধী কী বলেন তার আন্তর্জাতিক অবান্তরতা সত্যই অপরিসীম। আকাশবাণী আর কয়েকটি অনুগত সংবাদপত্র অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

আলোচ্য প্রসঙ্গ তবু ভিয়েৎনাম। সেখানে শান্তির আশা কভু ত্যাজ্য নয়। এমন ধারণা অবাস্তব যে মার্কিনী বিদায়েই হবে (যদি কখনো তা ঘটে) শান্তির আবির্ভাব। বর্তমান গৃহযুদ্ধে বহিঃশক্তি ইন্ধন যুগিয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এই বহিঃ-শক্তির সংখ্যা এক নয়। বাইরের সাহায্য ছাড়াও এই গৃহযুদ্ধ তার আপন দীর্ঘ-সঞ্জীবিত চলৎশক্তি না হারাতে পারে। কিন্তু

বাইরের বান্ধবরা বিদায় না নিলে গৃহ-শত্রুতার শেষ হবার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই। মিস্টার জনসন শুধু আপাতত উত্তর ভিয়েৎনামে হানা না দেবার কথা বলেছেন। হতে পারে। "নবাবের অনুমতি, কালি হবে রণ"। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এখনো, মার্কিনী ভাষায়, অতি উন্মুক্ত। আমেরিকা আর ভিয়েৎনাম ছাড়াও অন্তরীক্ষে অপেক্ষমাণ একাধিক অন্যপক্ষ। শুক্রবারের শুভ সূচনা সত্ত্বেও শান্তিকামীদের কিয়ৎকাল অপেক্ষা করতে হবে বলে আশঙ্কা করি।

৩।১১।৬৮

গোয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন বসেছে। বিশেষ এই কারণে যে, সাধারণ রীতি অনুসারে এই অধিবেশন ডাকা হয়নি। ডাকা হয়েছে এমন কিছু সংখ্যক সদস্যর অনুরোধে যাঁদের একান্ত ইচ্ছা যে খোলাখুলিভাবে তাঁরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এঁদের মধ্যে শ্যামনন্দন মিশ্র এবং আরও অনেকে আছেন, যাঁদের সাধারণত কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচক বলে ধরে নেওয়া হয়। যে-কোন দলের নেতৃত্বর সমালোচনা সদস্যরা সব সময়ই করতে পারেন, এবং সে-অধিকারও নিশ্চয়ই সদস্যদের আছে। কারণ, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের পক্ষে আত্মসমালোচনা বা সমস্যা আলোচনার প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট পথ ও মতকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে আলোচনার উপরই দলের রাজনৈতিক কর্ম-ক্ষমতা প্রধানত নির্ভরশীল। সে-কারণে, গোয়া অধিবেশনের গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু অধিবেশনের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয় তখনি, যখন দলের নেতৃত্ব অধিবেশন সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং দলের সামনে যে-সব সমস্যা উপস্থিত হয় সেগুলোকে সকলের সামনে রেখে সদস্যদের সমষ্টিগত মতামত গ্রহণ করা হয়। আগে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন যখন বসত সারা দেশে একটা প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ পেত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা সম্বন্ধে। প্রতি অধিবেশনে আলোচিত হত দেশের প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলো, যে-সব প্রশ্নের সঙ্গে সারা দেশের মানুষের যোগ থাকত। নীতিগতভাবে অথবা আদর্শগত-ভাবে আগেকার অধিবেশনে যে-সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলো দেশের মানুষের মঙ্গল এনেছে কি না, তা ভিন্ন প্রশ্ন। কারণ, বহু অধিবেশন, সাধারণ অথবা বার্ষিক সভায় এমন সব সিদ্ধান্ত আগে নেওয়া হয়েছে যা কোনভাবেই কার্যকর করার চেষ্টা হয়নি। যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে, ভুবনেশ্বর অধিবেশনে সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা' কার্যকর করার জন্য পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটা অধিবেশনে আলোচিত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু সব আলোচনা এবং সবরকম সদিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও ভুবনেশ্বরের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো কাগজের পাতায় আখরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। তবে, বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে সে-প্রশ্নও ভিন্ন প্রসঙ্গ।

গোয়া অধিবেশন প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটাই ওঠে : বিশেষ অধিবেশনের উপযুক্ত আব-হাওয়া বা পরিবেশ কি সৃষ্টি করা হয়েছে? বিশেষ সমস্যা আলোচনার জন্য যদি বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোন্ প্রশ্নকে গোয়া অধিবেশনের সামনে রাখা হয়েছে? দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বা দুরবস্থা? (যদিও বহু আলোচনা এ-সম্বন্ধে হয়ে গিয়েছে এবং বহু সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে)। রাজনৈতিক জটিল কোন প্রশ্ন? আন্তর্জাতিক কোন সংকট? কিম্বা দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি বা কর্মনীতি?

এ-পর্যন্ত যতটুকু প্রকাশে আলোচিত হয়েছে তা-থেকে এরকম কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা সংকটের কথা ওঠেনি। প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে যা গোয়া অধি-বেশনের সামনে রাখা হয়েছে, তা মাদকদ্রব্য বর্জন। মাদকদ্রব্য বর্জন কংগ্রেসের বিভিন্ন কালে নির্ধারিত রীতি ও নীতির একান্ত-গত। হয়ত, বাস্তবকে সামনে রেখে এই রীতি ও নীতি দেশের সর্বত্র সমগ্রভাবে কার্যকর করা হয়নি বা সম্ভব হয়নি। যেমন, পশ্চিম বাংলার কথাই ধরা যাক। এই প্রশ্নটা যখন প্রথম ওঠে, তখন স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মূল নীতি হিসাবে ডাঃ রায়কেও এই প্রশ্নকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ করতে হয়েছিল; কিন্তু বাস্তবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সে-কারণেই, পরিপূর্ণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে তিনি রাজী হননি। বিশেষ করে, বারবার একটা প্রশ্নই মাদকদ্রব্য বর্জন নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেটা উঠেছে রাজ্য সরকারের রাজস্ব সম্বন্ধে।

বর্তমানে যে-অর্থনৈতিক কাঠামোকে দেশের সামনে রাখা হয়েছে, বিচার করলে দেখা যাবে তার মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হবার সুযোগ পেয়েছে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যদি ভিন্ন দলমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে রাজনৈতিক সম্পর্ক যেমন জটিল হতে পারে, তেমনি অর্থনৈতিক অবস্থাও অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে যেতে পারে। গত নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে যখন অ-কংগ্রেসী দলগুলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন এই সমস্যাটা আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। এই অবস্থা যে অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তন হতে পারে সে-ইঙ্গিতই বা কোথায়? তাছাড়া বড় প্রশ্ন রাজস্ব। উন্নয়ন কাজের জন্য হয়ত কেন্দ্র থেকে ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কিছু সাহায্য রাজ্য সরকারকে

(দ)ওয়া হয়; কিন্তু বার্ষিক খরচের মোট (দা)য়িত্ব গ্রহণ করতে হয় রাজ্য সরকারকে। (ফ)লে, ভূমি রাজস্বের মত মাদকদ্রব্য থেকে (প)াওয়া রাজস্বর উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। এই মোটা অংকের রাজস্বকে বাদ দিয়ে কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে আজ আর মাদকদ্রব্য বর্জন নীতিকে বাস্তব কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া, এটাই কংগ্রেসের একমাত্র নীতি নয়, যা কার্যকর করা হয়নি। তা যদি সত্য হয়, তাহলে হঠাৎ এই একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য একটা বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন হল কেন? এর কোন সদুত্তর কংগ্রেসের কোন মহল থেকে পাওয়া যায়নি। অবশ্য এই সঙ্গে আরও একটা আলোচ্য বিষয় জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা হল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। প্রথমতঃ, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এখনও স্পষ্ট কোন রূপ নেয়নি। এর ভূমিকা যেটুকু প্রচার করা হয়েছে তা থেকে পরিকল্পনার একটা আদর্শগত রূপ হয়ত অনুমান করা সম্ভব, কিন্তু বিশেষ আলোচনা সম্ভব না-ও হতে পারে। কারণ, পরিকল্পনার অর্থনৈতিক দিকটা এখনও অত্যন্ত অস্পষ্ট করা হয়নি। তবু, সামগ্রিকভাবে হয়ত কিছু আলোচনা হতে পারে। কিন্তু সে-আলোচনাই কি বিশেষ অধিবেশনের পক্ষে যথেষ্ট?

যথেষ্ট কিনা সেটা হয়ত বোঝা যাবে গোয়া অধিবেশনের সার্থকতার মূল্যায়ন করার সময়। তা যতক্ষণ সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ কয়েকটি বিষয় সামনে রাখলে গোয়া অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য হয়ত চোখে পড়তে পারে। প্রথমেই আলোচনা করতে হয়, এই অধিবেশন সম্বন্ধে কংগ্রেস সদস্যদের ঔৎসুক্য। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য নিশ্চয়ই এই অধিবেশনে যোগদান করবে। কারণ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান করা বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যদের বিশেষ অধিকার এবং বিশেষ সুযোগ। এই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যরা তাদের নিজ প্রদেশের অভিজ্ঞতাকে অধিবেশনের সামনে রেখে মূলে আলোচনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে। (যথার্থই পারে কিনা সেটা অবশ্য অন্য প্রশ্ন। কারণ, কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে দেখা গিয়েছে ওয়ার্কিং কমিটি সম্মিলিতভাবে সদস্যদের আলোচনার আগেই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই সিদ্ধান্তই প্রকাশ্য অধিবেশনে সমর্থিত হয় এবং গৃহীত হয়। সকল প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সবিস্তার আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ নীতি কংগ্রেস অধিবেশনে এখনও গৃহীত বা স্বীকৃত হয়নি।) কিন্তু গোয়ার বর্তমান অধিবেশন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তেমন কোন উৎসাহ দেখান হয়নি।

পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রতি অধিবেশনে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আলোচনায় যোগদান করে। তাছাড়া, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বর অংশীদার বলে, পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিরা প্রতি অধিবেশন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে যোগদান করেছে। এবার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা গোয়া অধিবেশন সম্বন্ধে খুব বেশী উৎসাহ প্রকাশ করেননি। বরং একটা আগ্রহের অভাবই দেখা দিয়েছিল। প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল যে, নভেম্বর মাসে (তখনকার ঘোষণা অনুসারে) মধ্যবর্তী নির্বাচনে সদস্যরা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবে বলে কোন প্রতিনিধির পক্ষে গোয়া অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব হবে না। তারপর সে-নির্বাচন পিছিয়ে গেল আগামী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এই নির্বাচন পিছিয়ে গেল অবশ্যই উত্তর বঙ্গে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের ফলে। এবং এই কারণেই, সমগ্রভাবে পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের গোয়া অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব হল না। কিছু প্রতিনিধি এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষ গোয়া গিয়েছেন; কিন্তু বেশীর ভাগ প্রতিনিধিই যাননি। কারণ, সমগ্রভাবে উত্তর বঙ্গ রিলিফের কাজ করার জন্য কংগ্রেস সদস্যদের আত্মনিয়োগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিনিধিদের পক্ষে গোয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

বাস্তব অবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস প্রতিনিধিদের পক্ষে এই অবস্থায় গোয়া অধিবেশনে যোগদান করা হয়ত অসঙ্গত মনে হত। কিন্তু আরও একটা বাস্তব অবস্থা কংগ্রেসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গোয়া অধিবেশনে এমন কোন কর্মসূচী নেই যা-থেকে বোঝা যায় যে, কংগ্রেস সংগঠনের কোন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হতে পারে এই অধিবেশনে। হায়দ্রাবাদ কংগ্রেসে ছিল ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের নির্বাচন। যে-নির্বাচন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্ততঃপক্ষে কংগ্রেস নেতৃত্বর কাছে। এই নির্বাচন উপলক্ষ্য করে কংগ্রেস নেতৃত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই বিভক্ত নেতৃত্বের একপক্ষ নিশ্চয়ই ছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। তাই হায়দ্রাবাদের নির্বাচন ছিল প্রতিনিধিদের কাছে এবং বিশেষভাবে, নেতৃত্বর একাংশের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সদস্যর ভোটের গুরুত্ব ও প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী। হায়দ্রাবাদের পর হয়েছে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। সে-অধিবেশনও কিছুসংখ্যক সদস্যর অনুরোধে ডাকা হয়েছিল। দিল্লী অধিবেশনে কংগ্রেস সংগঠনকে সুসম্বন্ধ করার কথা যেমন আলোচিত হয়েছিল, তেমনি প্রয়োজন হয়েছিল এই অধিবেশনে বিভিন্ন রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিটির সদস্য নির্বাচন করা। এই নির্বাচনেও কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। তাই বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিটি প্রতিনিধির উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোয়া অধিবেশন সম্বন্ধে এমন কোন প্রয়োজনের কথা শোনা যায়নি। হয়ত সে-কারণেও কোন প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিনিধির উপস্থিতি তেমন প্রয়োজনীয় নয়। হয়ত গোয়ার বিশেষ অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তবু গোয়া অধিবেশনের সূত্রে কংগ্রেস সংগঠনের সামনে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতে পারে। অন্ততপক্ষে প্রকাশ্যে না হলেও অপ্রকাশ্যে এবং অলক্ষ্যে। কারণ, গোয়া অধিবেশনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের একদিনের স্ট্রাইক উপলক্ষে কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। সে-সুযোগ এসেছে, স্ট্রাইকের পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা উপলক্ষ করে। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশ সফরে ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যবস্থার ফলে, বিভিন্ন প্রদেশ এবং বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। সেই প্রতিক্রিয়া মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের অনুকূলে নিশ্চয়ই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী ফিরে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলো ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয় এবং মন্ত্রীসভার সেক্রেটারীর কাছে এমন একটি নোট পাঠান হয়, যার মূলে বক্তব্য এটাই ছিল যে, হয়ত এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি রোধ করা যেত।

স্পষ্টভাবেই এটা প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী নেতৃত্বর প্রতি কটাক্ষ। এই কটাক্ষ এসেছে গোয়া অধিবেশনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। এটা গোয়া অধিবেশনে কোন জটিলতা সৃষ্টি করবে কিনা এখনই বলা সম্ভব নয়: কারণ, গোয়া অধিবেশনে, মহীশূর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের বিশেষ সমস্যা সামনে আনার চেষ্টা হতে পারে। তা যদি হয়, তাহলে কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশও এই কোলাহলের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারে। কোলাহলটা যে প্রত্যক্ষ কোন্দলে পর্যবসিত হবে না এমন কোন আশ্বাস অবশ্য নেই; কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গোয়া অধিবেশনকে আচ্ছন্ন না-ও করতে পারে। সর্ববিচারে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গোয়া অধিবেশনের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

ছড়িয়ে দাও ক্ষমা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ ভোরবেলা উঠে বারবার আমার ক্যানিং স্টেশনের কথা মনে পড়ছিল। কুড়েদের জীবনে দুটি একটি ভোর আসে এইরকম—যার রং ফুরফুরে নীল। মৃতদেহের ওপর সেই সব ফুল ঝরার শব্দ হয়, যারা ক্ষুদ্র লঘু, যাদের রং টগর ফুলের মতন শাদা।

চমকে ভাঙে ঘুম। কারো কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে। কোনো অপরাধের কথা মনে পড়ে না, শুধু নিজের শরীর থেকে অদ্ভুত দুর্গন্ধ বেরোয় এক রকম, মনে হয়, পচা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে কোথাও ঘাসের ওপর বসি।

যেন কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে কোনো গুরুজনের গায়ে পা লেগে গেছে। পায়ের আঙুলে তাই চন্দনের গন্ধ—আমার ভালো লাগে না। অনুশোচনায় পিছল হয়ে যায় মুখ। মাথার ভেতর থেকে অজস্র কীট-পতঙ্গ বেরিয়ে সারা বিছানায় খুঁজে বেড়ায় আক্রমণের চিহ্ন, খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়, ফিরতে পারে না আর।

একটি একটি করে ওদের গুছিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। বলি, দেখ দেখ, কেমন ফুরফুরে নীল এই ভোরবেলা। সন্ধান নয়, এখন ক্ষমা চাইবার সময়। পৃথিবীর সব নিরপরাধ মানুষ এই সময়ে প্রার্থনা করে। বলি, তোমরা আমার সঙ্গে এসো ওই ঠান্ডা ঘাসের ওপর। আমরা নতজানু হয়ে বসি।

অনেক দিন আগে ক্যানিং স্টেশনে যেমন আমরা একদল যুবক প্রার্থনা করেছিলাম, হে মহাদ্যুতি, আমাদের শরীর থেকে রাত্রি মুছিয়ে দাও,—তেমনি আজ আবার করজোড়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, আমাদের প্রসারিত বুকের ওপর ছড়িয়ে দাও ক্ষমা : অজস্র লঘু সাদা নিঃশব্দ টগরফুল।

পরিচিতার সৌজন্যে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

এই তীব্র দিন থেকে যতো নিই, ততো থেকে যায়।
ছোটো সিমলা ঘুরে যায় : সাদা রাস্তা রঙিন বাড়িতে
পোষা কুকুরের মতো গৃহিণীর উঠান নাচায়।
ঠিক বান্ধবী নয় : পরিচিতা : এক যুগ পরে দেখা এই।—
দীর্ঘদেহ স্বামী, আর ফুলের মতন শিশু, সাজানো বাগানে :
তারই জন্যে এত সব ? হ'তে পারে। সমস্ত সময়
এক বাঙালিনী তার উজ্জ্বল হাসিতে ঐ-সমস্ত পাহাড়
নতুন গানের মতো বেঁধে নিতে পেরেছে ব'লে কি
শুধু দিন তীব্র হয়, দ্যুতিখন্ড উজ্জ্বল আবেগ
সোজা প্রসপেক্টে নিয়ে সূর্যের ভেতরে করসায় ?

আমি যতোটুকু পারি, তার বেশী তখনো পারিনি, তবু যেই
দমকা কথার টানে সমস্ত আড়াল একাকার,
পোড়-খাওয়া কলকাতা বুকের ভেতরে নিবে যায়॥

মানচিত্র

সুধেন্দু মল্লিক

জন্মসূত্রে পাওয়া ব্যর্থতা আর একটা পোকায় কাটা মানচিত্র
যার তিন দিকে গাঢ় সমুদ্রের নীল।
তারই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খেলার মাঠ ছেড়েছিলাম।
মানচিত্রে আমার দেশ গোলাপী।
ভেবেছিলাম পরাধীনতার রঙ এতো সুন্দর !

আজো সবুজ গাছের নিচে ভিখারীর গান
বৃষ্টিতে মুছে যায় অশ্রুতরঙ্গের মতো।
কেবল মাকে মনে পড়ে—তিন দিকে নীল সমুদ্র—
গায়ের রঙ বর্ষাভেজা গোলাপ।
সে-ই আমার স্মৃতি স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত আকাঙ্ক্ষা;
মা, আমাকে ক্ষমা করো।
শরীর আমার দুঃখের মতো মহৎ হলো না
যার কাছে মলিন মানচিত্র একদিন হাত বাড়িয়েছলো !

'একটি ঘোর প্যাঁচের ব্যাপার'

পৃথিবীতে এমন বহু ঘটনাই ঘটে থাকে—যার অতীব রহস্যময়, আমাদের বুদ্ধি-বৃদ্ধি যাদের কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। এরাই হল হ্যামলেট-কথিত "মোর থিংগস্"—দুনিয়ার যাবতীয় দর্শন স্বপ্নেও যাদের কখনো কল্পনা করেনি। স্বর্গে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, সে তো অলৌকিকেরই হেড-কোয়ার্টার। কিন্তু মর্ত্যেও মধ্যে মধ্যে আমাদের ঘোরতর চমকে

> **ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ**
>
> **রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে ঢাকা গিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভ্রমণের বহু অজ্ঞাত ও অধুনা-বিস্মৃত কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলীর প্রতিলিপি-সহ আগামী সপ্তাহ থেকে তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হবে।**

দেয় নেপাল বাবা, কলেজ স্কোয়ারের বারোয়ারী লক্ষ্মী পুজোয় অকস্মাৎ দেবীর জীবন্ত বাহনটির আবির্ভাব, নিছক টাকার জন্যে (?) আমেরিকার হৃদয় বিদীর্ণ করে এবং এক বৃদ্ধ "কালো" গ্রীকের (মার্কিনী দৃষ্টিতে গ্রীকরা যে কালা-আদমি জেম্স্ টি ফ্যারেলের লেখা থেকে সে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি) বরমাল্য দিয়ে ভদ্দেশীয়া মুকুটহীনা রানীর আইল্স্ অভ গ্রীসে স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন, লালবাজারের পুলিশী দুর্গ থেকে আসামীর প্রায় পান চিবুতে চিবুতে এবং সম্ভবত হাতে তুড়ি দিয়ে হিন্দী গীত গাইতে গাইতে দিবা-দ্বিপ্রহরে মহা অভিনিষ্ক্রমণ। ভূত-টুতের মতো আরো সব গুরুতর প্রসঙ্গ তো ছেড়েই দিচ্ছি।

সুতরাং মিয়্যাকুল এখনো ঘটে এবং নিয়মিতই ঘটে থাকে। আর সেই কারণেই তিস্তার দুরন্ত জলোচ্ছ্বাস আসছে, আর কয়েক বছর ধরেই বাঁধগুলোর অবস্থা স্বস্তিজনক নয় জেনেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সুখ নিদ্রার জন্যে জলপাইগুড়ি শহরে সর্ষপ তৈলের (নিদ্রার গভীরতা দেখে মনে

যেদিন পুঁটি মাছ কিনি সবাই শুধোয়—'কি মাছ কিনলেন?'

যেদিন ইলিশ কিনি কেউ জানতে চায় না কি মাছ কিনলাম

হয় তেলটা খাঁটি) অভাব হয় না। কিন্তু এ সব আলোচনাও থাক। আমি আপাতত চিন্তাগ্রস্ত আছি অন্য কারণে।

কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তির একটি দামী মোটর গাড়িতে চাপবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমি লাভ করেছিলুম কিছুদিন আগে। শহরতলীর একটি স্ট্যাণ্ডে নিরুদ্দেশ বাসের জন্যে আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় সেই পরিচিত দয়ালু ভদ্রলোক আমাকে একটি "উত্থান" দান করলেন। কৃতজ্ঞ আর পুলকিত প্রাণে সেই গাড়িতে খানিক দূর এগিয়েছি, এমন সময়, যা হয়ে থাকে—গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর রুটিন-ওয়ার্ক মাফিক বনেট খুলে খুটখাট করা হল, ভদ্রলোক গোটাকতক রেঞ্চ আর কী কী নিয়ে বিবিধ প্রয়াস করলেন, আমাকে বার কয়েক স্টার্ট দিতে আর বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন, আমার মরীচিকা জাগিয়ে গাড়ি গোঁ গোঁ করল দু তিনবার, তারপরে একেবারে ঠাণ্ডা। তখন এটি যে কদাপি চলিষ্ণু ছিল, কোনো নিন্দুকও এমন অপবাদ দিতে পারবে না।

একটা রুমালে হাতের তেল-কালি মুছতে মুছতে ঘর্মাক্ত ভদ্রলোক ঠিক নববধূর মতো ব্রীড়াবনত হাসি হাসলেন।

'নাঃ, হবে না।'

হবে না যে সে আমি আগেই জানতুম। কোনোদিনই এ সব হয় না।

আর একবার সেই বধূসুলভ মনোরম হাসি : 'ঠেলেই নিয়ে যেতে হবে একটু।

বিপন্না নারী উদ্ধারের সময় দেখা মেলে না কোন প্রেস ফটোগ্রাফারের

আরে ছী-ছী, না-না, আপনাকে নামতে হবে না, বরং আমি একাই—'

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, গাড়ির মালিকের ওই ভদ্রতাটুকু করতে হয় আর "উত্থিত"জনের তৎক্ষণাৎ সুখাসন থেকে নেমে গাড়ি ঠেলবার মহৎ কাজে আত্মদান করতে হয়। অতএব তিনি এক হাতে স্টিয়ারিং সামলে আর এক হাতে সামনের দিকে ঠেলতে লাগলেন আর আমি পেছন থেকে সেই জগদ্দলকে চালু করবার দুঃসাধ্য সাধনায় তৎপর হলুম।

এইবারে সেই রহস্যময় ঘটনার পালা।

অর্থাৎ অন্য সময় না চাইতেও যাদের দর্শন মেলে, সেই রকম একটি মাত্র কুলিকেও আমাদের ত্রিসীমায় দেখা গেল না। এবং দ্বিতীয় বিস্ময় এই যে, যাদের দর্শন কদাচিৎ মেলে—জীবনে যাদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে বলে মনে হয়নি—এই সময়টিতেই ঠিক বেছে বেছে তাদেরই আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এর সঙ্গে তৃতীয় অ্যাপেনডিক্সটি এইভাবে জুড়ে দেওয়া যায় : বেশ একটি ভালো গাড়িতে চাপবার সময় এবং রাজকীয় ভঙ্গিতে তাতে যাত্রা-কালে পৃথিবীশুদ্ধ লোক যেন চোখ বুজে থাকে—কিন্তু ঠেলবার মহালগ্ন এলেই তারা পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মুগ্ধভাবে সন্দর্শন করে।

সুতরাং কুলিহীন সেই প্রাণান্ত প্রয়াসের ভেতর, পথের দুধারে জনগণকে পুলকিত করে যেতে যেতে অকস্মাৎ :

'সুনন্দবাবু না।?'

চেয়ে দেখি, নৈহাটির এক ভদ্রলোক। এখানে তাঁর আবির্ভূত হওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

'আপনি এখানে?'—পুনরপি তাঁর কৌতূহল।

ও প্রশ্নটা আমিও করতে পারতুম। কিন্তু তার বদলে দন্তবিকাশ করে বললুম, 'এই আর কি!'

'কিরে—সুনন্দ না?'

এইবার প্রায় লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল আমার, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল দেবভাষা : 'অহহ কিমিদং?' এ যাত্রা যিনি আমাকে সম্ভাষণ করছেন, তিনি আমার ছেলেবেলার ভূপেনদা—অর্থাৎ সেই সুদূর অতীতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং মুখে প্রথম গুম্ফোদ্গমের পর যাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি এবং যিনি এখন হনোলুলু কিংবা থানাতে থাকলেও আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হতুম না।

ভূপেনদা আবার বললেন, 'কেমন আছিস?'

সংক্ষেপে বললুম, 'গাড়ি ঠেলছি।'

এই রহস্যগুলোই আমাকে কাতর করে। যে ট্রেনটা বরাবর পাংচুয়্যাল—আমার দরকারের দিনে সেইটিই লেট করবে অনিবার্যভাবে। যেদিন ছাতা ভুলে বেরুব, সেইদিনই বৃষ্টি নামবে অবধারিত নিয়মে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার রিলে শোনবার জন্যে যখন বসে আছি, ঠিক তখনই

বান্ধবী সহ সিনেমা দেখে ফেরার পথেই দেখা হয় কাবুলীওয়ালার সঙ্গে

বিগড়ে যাবে রেডিয়োটা। যেদিন দাড়ি না কামিয়ে লুঙ্গি পরে বাজারে বেরিয়েছি, সেইদিনই শোনা যাবে কোনো শোভনার ললিত কণ্ঠ : 'ভালো আছেন?' থলেটা না হয় চট করে লুকোতে পারি, কিন্তু দাড়ি-লুঙ্গি যাবে কোথায়?

ঠিক এই অবস্থায়ই দেখলুম বালীগঞ্জের কশ্চিৎ সুজয়কে।

গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে বেরিয়েছে, হাতে একটি শালপাতা জাতীয় ঠোঙায় কিঞ্চিৎ তরল গুড়। চকিতে তার সামনে এক সুদর্শনার মধুবর্ষী ভাষণ : 'এই যে সুজয়—কেমন আছো?'

বিদ্যুৎগতিতে গুড়ের ঠোঙা নেপথ্যে প্রস্থান করল। কলকণ্ঠী আর থামেন না। —একটির পর একটি প্রশ্ন করে যাচ্ছেন—আত্মকথা শোনাচ্ছেন। আর ঠোঙার ফাঁক দিয়ে সেই তরল গুড় গড়িয়ে সুজয়ের কটিদেশ এবং ইংরেজিতে যাকে 'সীট অভ ট্রাউজার' বলে—সেটি বিরঞ্জিত হয়ে—

কিন্তু এই করুণ চিত্রটা এই পর্যন্তই থাক।

আসলে মিরাক্ল ঘটে যাচ্ছে, ঘটেই যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের—অর্থাৎ এই সুজয়দের বিব্রত করবার জন্যেই এটা কেন ঘটে—সেই প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া শক্ত॥

বিমল মিত্র

পেছন থেকে কাঁধে হাত লাগাতেই ফিরে দাঁড়াতে হলো। ঠিক চিনতে পারলে না লোকটাকে।

লোকটা বললে—আরে, তুই চিনতে পারিস ?

ভূধর বললে—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো ভাই ঠিক চিনতে পারছি না।

—আরে, আমাদের এত বন্ধুত্ব, সব ভুলে মেরে দিলি ? ছোট বেলা থেকে একসঙ্গে এক ইস্কুলে পড়ে এলাম, আর এরই মধ্যে ভুলে গেলি ? তোর তো স্মৃতিশক্তি এত উইক ছিল না ব্রাদার।

তারপর ভূধরকে আর ভাবতে সময় না দিয়ে হাত ধরে টানলে। বললে—আয় আয়, কতদিন পরে দেখা, কোথাও বসে একটু গল্প করি; এখন তোর কোনও কাজ নেই তো ?

ভূধর কেমন অবাক হয়ে গেল।

চলতে চলতে বললে—কোথায় ছিলি তুই, এ্যাদ্দিন ?

লোকটা বললে—সে অনেক কথা ভাই, আমার মরবার সময় নেই। এমন এক চাকরি নিয়েছি যে ঘুরে ঘুরে জান হয়রান হয়ে গেল। এখনও আরো কতদিন ঘুরতে হবে কে জানে। এই তো সবে আমেরিকা থেকে আসছি—

—আমেরিকা ?

ভূধর সান্যাল যেন বিশ্বাস করতে পারলে না।

—আমেরিকায় কী করতে গিয়েছিলি ? অফিসের কাজে ?

লোকটা বললে—সে আর বলিস নি। অফিস

আমার নাকে দড়ি দিয়ে খাটায়ে নিচ্ছে ভাই কেবল। অথচ কোথাও যে একটু দু দণ্ড চুপ করে বসবো তার যো নেই।

বলে টানতে টানতে সামনের দিকে নিয়ে চললো।

লোকটা বললে—এখন কী করছিস বল্—

ভূধর বললে—কিছু না—

—কিছু না, মানে? একটা কিছু না করলে তোর চলছে কী করে?

ভূধর বললে—ওই মাঝে মাঝে কাজ পাই, আবার মাঝে মাঝে পাই না। এইবার ভোট আসছে, এই সময়ে কয়েক শো টাকা কামিয়ে নেব। কিন্তু শুনছি নাকি ভোটটা আবার পেছিয়ে যাবে!

—ভোটে কি তোরা টাকা পাস?

—পাবো না? টাকা না দিলে খাটবো কেন?

লোকটা অবাক হয়ে গেল মনে হলো। বললে—কী রকম টাকা পাস?

—তা অনেক হয়, তবে খাটুনিও আছে খুব। সকাল থেকে রাত একটা-দুটো পর্যন্ত খাটুনি। আড্ডাও দিই, আর খাটি। সঙ্গে খাওয়া-টাওয়া মেলে। কোনও দায়িত্ব নেই। বড় বড় নেতারা তখন আমাদের একটু খাতির করে। অন্য সময়ে তো তারা আমাদের চিনতে পারবে না। ওই ভোটের সময়েই যা একটু খাতির যত্ন করে আমাদের। গাড়ি চড়ে বেড়াই। তারপর ভোট ফুরিয়ে গেলে আবার সেই রকে বসে আড্ডা—

লোকটা ভূধরকে নিয়ে একটা হোটেলের মধ্যে ঢুকলো।

*

ভূধর সান্যালকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে বেশ আছে সে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা। হাতে জ্বলন্ত সিগ্রেটও থাকে। তারপর একটা টেরিলিনের সার্ট আর টেরিকটের ট্রাউজার। কথায় কথায় তর্ক করে রোয়াক ফাটিয়ে দেয়।

কিন্তু মনে মনে জ্বলন্ত আগুন।

বলে—তোরা দেখবি, এ পৃথিবী এ-রকম থাকবে না। বদলাতে বাধ্য! সব বোগাস।

যখন কাজ থাকে না, তখন নানা রকম মতলোব ঘোরে ভূধরের মাথায়। একবার ইচ্ছে হয়েছিল একটা থিয়েটারের ক্লাব করে। ছেলেমেয়েদের দিয়ে থিয়েটার করে টাকা উপায় করে। আজকাল ও-লাইনে বেশ টাকা আছে। নামও হয়, টাকাও আসে। তারপর খবরের কাগজের লোকদের হাত করে কিছু খাইয়ে দিলেই হলো। খুব ফলাও করে পাবলিসিটি পেলে তখন গভর্মেণ্টই টাকা দেবে। তখন আর কেউ বলবে না ছেলেগুলো বখে গেল। বলবে সংস্কৃতি করছে—

—সংস্কৃতি মানে কী করে ভোঁদা?

ভোঁদা হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করেছিল। বললে—সংস্কৃতি মানে আনন্দের নেশা—

—আনন্দের নেশা? তার মানে?

ভোঁদা বললে—দ্যাখ, রবিঠাকুর আনন্দের নেশায় কবিতা লিখতো। লিখতো তো? তাই সেটা হলো সংস্কৃতি। এই রকম শিশির ভাদুড়ি, গোষ্ঠ পাল, নজরুল ইসলাম সবাই সংস্কৃতি করেছে—

আসলে কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত হয়নি। দুর্গাপুজো কালীপুজো, ওতেও সংস্কৃতি হয়।

শেষকালে বললে—আয়, এবার একটা কিছু পুজো-টুজো করি—

মতলোবটা দুজনেই ভেবে দেখলে। মন্দ নয়। পাড়ায় পাড়ায় সব লোকের কাছে যদি চাঁদা আদায় করা যায় তো হাজার দুয়েক উঠতে পারে। তারপর যদি কোনও এম-এল-এ টেম-এল-এ-কে দিয়ে উদ্বোধন করানো যায় তো জিনিসটা বেশ জোরালো মতন সংস্কৃতি হয়ে ওঠে।

প্রথম বারের পুজোতে টাকা উঠেছিল খুব। কিন্তু পোলাও-মাংস খেতেই সব ফুরিয়ে গেল। হাতে কিছু এল না।

তারপর ও-পথ আর মাড়ালো না ওরা। টাকা উপায়ের আর কী উপায় আছে মতলোব ভাঁজতে লাগলো ভূধররা। কিন্তু কোনওটাই তেমন জমে না। নতুন পথ কোথায় পাবো? সব শালারা আগে-ভাগে জায়গাগুলো জুড়ে বসে আছে। সবাই আগে থেকে সব পুজোর জায়গাগুলো দখল করে রেখে দিয়েছে।

তখন থেকে আর কোনও কাজ নেই ভূধরদের। আস্তে আস্তে বয়েস হতে লাগলো। একটা পয়সা নেই হাতে যে উড়োয়। দোকানে বসে যে এক কাপ চা খাবে তারও উপায় নেই। এক কাপ চায়ের দামই আজকাল কুড়ি পয়সা। দোকানের দরজার ধারে একটা চেয়ারে বসে বসে রাস্তার লোকদের দেখা যায়। তারপর যখন হোক বাড়ি গেলেই হলো।

ভূধর বলে—বাড়িটাই হয়েছে সবচেয়ে জ্বালা, জানিস—

একটা কিছু কাজ-কর্ম পেলেই ভূধরদের দলের সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। কিন্তু মাথা গোঁজবার একটা জায়গাও তো চাই। সার্ট-প্যাণ্ট-জুতোর দামটাও তো দরকার। সেটা কে দেবে? বাড়ি থেকে সেগুলো জোর-জবরদস্তি করে আদায় করতে হয়। বাবা রেগে গালাগালি দেয়, মা বকাবকি করে।

ভোঁদা বলে—আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি রে—

ভূধর বলে—তা বললে তো চলবে না। যখন জন্ম দিয়েছ তখন খাওয়াতে-পরাতে তোমরা বাধ্য!

এক-একদিন সুবলও এসে জোটে।

বলে—একটা সিগ্রেট দে ভাই—

ভুধর জিজ্ঞেস করে—এ্যাদ্দিন কী হয়েছিল রে? কোথায় ছিলিস্?

সিগ্রেট খেতে খেতে সুবল বলে—বহরমপুরে গিয়েছিলুম একটা চাকরির চেষ্টায়, হলো না।

ভোঁদা বললে—চাকরি কখনও এমনি হয় রে, মিছিমিছি গা ঘামালি। সুপারিশ না থাকলে চাকরি হয় না—

ভুধর বলে—একটা যুদ্ধ বাধলে ভাল হয় ভাই। আবার সেই সিভিক্-গার্ড হবে, এ-আর-পি হবে, শুনেছি সেবারের যুদ্ধে হয়েছিল—

এমনি করে কথা বলতে বলতে দুপুর গড়িয়ে যায়। তখন ক্ষিধে পায় সকলের। তখন বাড়ির কথা মনে পড়ে। আর তখন সবাই ওঠে।

সেদিন পাড়ার পার্কে খুব ভিড় হয়েছে। বেশ আলো জ্বালিয়ে মীটিং চলছে। কয়েক শো লোক জমেছে সেখানে।

—ওখানে কী হচ্ছে রে?

দূর থেকে লেকচারবাজি কানে আসতে লাগলো। খুব ভারি গলা। দেশের যুব-সম্প্রদায়দের লক্ষ্য করে বক্তৃতা। বক্তা বলছে—আপনারাই হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের আপনারা নাগরিক। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা লেখা-পড়া শিখে বেকার হয়ে বসে আছেন। দেড়শো টাকার একটা চাকরি খালি হলে তিরিশ হাজার দরখাস্ত পড়ে আজ। এই যে যুবশক্তির অবক্ষয় এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী কংগ্রেস সরকার। সরকার ইচ্ছে করলে সব পারে। যদি অব্যবস্থা না থাকে, যদি সুষ্ঠু শাসন থাকে, যদি কল-কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই লে-অফ্ না হয়, যদি মন্ত্রীদের গদির লোভ না থাকে, তাহলে দেশের লোক আবার পেট ভরে খেতে পাবে, দেশের যুবশক্তি আবার জেগে উঠবে—যেমন করে জেগে উঠেছিল রাশিয়ায় আর......

—ওরে, আমাদের জ্ঞান দিচ্ছে রে।

ভোঁদা বললে—না রে, এ ইলেকশানের মীটিং—

উপদেশ শুনতে কার ভাল লাগে! ও-সব ওরা শুনুক। যাদের পকেটে পয়সা আছে, যাদের ভোট আছে। আমাদের কিছুই নেই। আমাদের অন্য অনেক কাজ আছে ইয়ার। রাস্তার মোড়ে আড্ডা দিতে দিতে মানুষ দেখলে অনেক কাজ হবে।

ভোঁদা একদিন বললে—একটা বোমা তৈরি করি আয়—

ভুধর বললে—বোমা তৈরি করে কী করবি?

ভোঁদা বললে—আমাদের এই পাড়াটাকে উড়িয়ে দেব। গাঙ্গুলীদের অত বড় বাড়িটা বেশ গুঁড়িয়ে যাবে। আর আমরা এখানে বসে বসে দেখবো—

—দূর শালা, সঙ্গে সঙ্গে তো আমরাও গুঁড়িয়ে যাবো রে। তোর মাথায় কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। তার চেয়ে একটা ডাকাতির দল করলে হয়। এখান দিয়ে রোজ পোস্টাফিসের ক্যাশ-ভ্যান যায়। একদিন ডাকাতি করে পালিয়ে যাবো।

এমনি নানান কল্পনা মাথায় আসে দু'জনের। নানান মতলোব। সমস্ত পৃথিবীতে নানান ঘটনা ঘটে যায়। কেউ চাঁদে গিয়ে ওড়ে, কেউ শেয়ার-মার্কেটে হাজার হাজার টাকা বাজি জিতে বড় লোক হয়, আবার ইলেকশানে জিতে কেউ বা মন্ত্রী হয়, কেউ আবার এই রাস্তা দিয়েই মানুষের কাঁধে চড়ে শুয়ে শুয়ে শ্মশানের দিকে যায়। এক কথায় সারা পৃথিবী জুড়ে একটা-না-একটা কিছু ঘটে চলেছে রোজই। কিন্তু মধু দাস রায় লেনের দু'জন বাসিন্দার জীবনে কিছুই ঘটে না। দিন আসে দিন যায়। রাত আসে ভোর হয়। আর একদিন-একদিন করে বছর পেরিয়ে যায়। শুধু বয়েস বেড়ে যায় ভুধর আর ভোঁদার—

কিন্তু সেদিন পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই যেন একটা কিছু নতুনত্ব ঘটলো।

লোকটা জিজ্ঞেস করলে—আর কিছু খাবি?

ভুধর বললে—পেট খুব ভরে গেছে ভাই।

তারপর গেলাসটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নজর দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলে—এটার নাম কী রে?

লোকটা বললে—মদ, হুইস্কি। বাজারের বেস্ট্ হুইস্কি—

—বোতলটার দাম কত?

—একশো কুড়ি টাকা। আসল বিলিতি মাল। দুশো টাকা পড়লো আমার। এ জিনিস সকলকে দেয় না। তা কী রকম লাগছে এখন? আর খাবি?

ভুধর বললে—দে ভাই আর একটু। আহা মাইরি ভোঁদাটা খেতে পেলে না, ভোঁদার জন্যে দুঃখ হচ্ছে—

লোকটা বললে—নিজে পাচ্ছিস নিজে খেয়ে নে। দুনিয়ায় কেউ কারো নয়।

ভুধর বললে—কিন্তু দু'জনে আমরা 'খুব বন্ধু ভাই। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকি না, আমাদের পাড়ার আর সব লোকগুলো বদমাইস্। দিনরাত কেবল মতলোব ভাঁজছে। কী করে কার গলা কাটবো তাই শুধু ভাবছে—

লোকটা বললে—কিন্তু সময় কাউকে ক্ষমা করবে না—অ জেনে রাখিস—

—সময়। সময় মানে?

লোকটা বললে—আমাদের আগে ঠিক

আমাদের মতই কত লোক এসেছিল বল্ তো, তারা সব কোথায় গেল? আমাদের মত তারাও এ-ওর গলা কেটেছে, তোর মত বন্ধুদের ভালবেসেছে, তারা সব গেল কোথায়? কেউ তারা টি‍ঁকেছে? তোর বাবার বাবা, ঠাকুর্দার বাবার বাবা, তাদের কথা ভাবতো। তারাও একদিন ভেবেছিল দুনিয়াটাকে বুড়ো আঙুল দেখাবে, কই, তারা রইল?

ভুধরের তখন আরো নেশা হয়ে গেছে। বললে—তা তো ভাবিনি ভাই—

লোকটা বললে—ভাববি। এ-সব কথা ভাববি; ভাবলেই দেখবি তখন আর কারোর ওপর রাগ হচ্ছে না। তখন সবাইকে ভালবাসাতে ইচ্ছে করছে।

গরম গরম কাটলেট-চপ সব এসে গেছে তখন। লোকটা দু'হাতে খরচ করছে ভুধরের জন্যে। পকেটে গাদা গাদা টাকা রয়েছে লোকটার। তাড়া তাড়া নোট বার করছে।

পৃথিবীটা যে এত ভাল তা আগে কখনও এমন করে ভুধরের মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে বেঁচে থেকে এখানে সুখ আছে খুব। বাবা ভাল, মা ভালো; মধু দাস রায় লেনের মানুষগুলোও সবাই ভালো। মোড়ের মাথায় সরকারী গোডাউনটাও যেন ছবির মত দেখাচ্ছে। তার ভেতরে হাজার-হাজার টন চাল-গম আছে, সেগুলো চুরি করা পাপ।

—কী ভাবছিস?

ভুধর বললে—ভাবছি তোর সঙ্গে এতদিন দেখা হয়নি কেন? তুই এত বড়লোক।—

লোকটা বললে—দূর, বড়লোক-গরীব-লোক, ও-সব তো বাইরের রে, ভেতরটাই হলো আসল। সেখানে আমরা সবাই সমান। তোদের পাড়ায় গাঙ্গুলীদের একটা বিরাট বাড়ি আছে বলছিলি না?

ভুধর বললে—হ্যাঁ ভাই, ভীষণ বড়লোক। একদিন ভোঁদা বলেছিল, বোমা মেরে বাড়িটাকে উড়িয়ে দেবে।

লোকটা বললে—সেটাও তো বাইরের রে। যদি কোনওদিন রাত্তিরে বাড়ির ভেতরে ঢুকিস তাহলে দেখবি বাড়ির কর্তার চোখে ঘুম নেই—

—তাহলে তুই? তুইও তো বড়লোক। তোরও ঘুম আসে না?

লোকটা বললে—আমার কথা ছেড়ে দে। আমার কাজের ঠেলায় আমি মারা যাচ্ছি, কোম্পানী আমায় খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলছে, আমি একেবারে দম নেবার পর্যন্ত সময় পাই না। এই তো এসেছি ইণ্ডিয়াতে, আবার কবে ডাক পড়বে মস্কোতে তার ঠিক নেই, সেখান থেকে ভিয়েতনামে, তারপর......

—ভিয়েতনামে? সেখানে তো যুদ্ধ হচ্ছে। সেখানে যাবি কী করতে?

লোকটা বললে—আর বলিস নি। জীবনটা এই খেটে-খেটেই গেল। আমি না হলে যে কোম্পানী চলে না রে—

ভুধরের কেমন যেন একটা অন্যায় কৌতূহল হলো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তুই কত মাইনে পাস রে?

লোকটা বললে—কোনও ঠিক নেই, কোনও মাসে পনেরো হাজার, কোনও মাসে কুড়ি হাজারও হয়—

ভুধর চম্‌কে উঠেছে। বললে—মাসে না বছরে?

—মাসে, টি-এ ফি-এ মিলিয়ে। কিন্তু হলে কী হবে, ট্যাক্স দিতে দিতেই সব বেরিয়ে যায়।

ভুধরের তখন ভক্তি আরো বেড়ে গেছে। টাকার মানুষদের বরাবর ভক্তি করে ভুধররা। ভক্তিও করে আবার ঘেন্নাও করে। যাদের টাকা আছে তাদের ওপরই যত রাগ-ভক্তি-ঘেন্না ভুধরদের। কিন্তু এবার কুড়ি হাজার

টাকা মাইনে শুনে ভূধর শুধু ভক্তিতেই গদগদ হয়ে উঠলো। সেই টাকাওয়ালা লোক তাকে ডেকে খাতির করে খাওয়াচ্ছে, তার সঙ্গে গল্প করছে। তার সঙ্গে একদিন এক ক্লাশে পড়েছে। এটা ভাবতেও আনন্দ।

ভূধর নেশার ঘোরে বলতে লাগলো—জানিস ভাই, আমরা রাগের জ্বালায় অনেক ট্রাম-বাস পুড়িয়েছি, টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছি, সোডার বোতল ছুঁড়েছি, বোমা মেরিছি, মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করে সিটি দিয়েছি, আমি আর ভোঁদা দুজনেই—

--তারপর?

ভূধর বললে— কোনও শালা আমাদের ভালোবাসেনি, তাই আমরাও কাউকে ভালবাসিনি--কিন্তু তোকে আমি খুব ভালবাসছি ভাই, তোকে দেখে আমার এখন খুব ভাল লাগছে, পুরোন বন্ধুকে তুই মনে রেখেছিস---

লোকটা বললে---সময় পাই না তাই, নইলে দেখতিস সকলের সঙ্গে দেখা করতুম। এত কাজ পড়েছে যে নাইবার-খাবার সময় পর্যন্ত পাই না। তা আর খাবি?

ভূধর বললে—খাওয়া। তোর পয়সা খরচ হচ্ছে এই যা। এ-সব বিলিতি জিনিস তো কখনও খাইনি। কিন্তু ভাই, ভাবছি বাড়ি যাবো কী করে?

লোকটা বললে—বাড়ি তোকে যেতে হবে না, আমার হোটেলে গিয়ে শুবি চল—

--তোর হোটেলে? কিন্তু বাড়িতে যে সবাই ভাববে?

লোকটা বললে—আজকাল কেউ কারো জন্যে ভাবে না তা জানিস? কারো জন্যে ভাবা সবাই ছেড়ে দিয়েছে, যে বলে ভাবছে সে ব্লাফ্ দেয়। আজকাল কারো কথা ভাবলে চলে না। তুই কিছু ভাবিস নি। আমার ওখানে খুব আরামে থাকবি চল---

ভূধর তখন টলছে খুব। আবার খুব ভালোও লাগছে তার। লোকটা তাকে ধরে নিয়ে তার গাড়িতে তুলে নিলে। বেশ নতুন ঝক্‌ঝকে গাড়ি। উর্দি পরা ড্রাইভার। ভূধরকে আবার গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে একটা সেলাম করলে।

তারপর দু'জনে উঠে বসতেই গাড়িটা হুস্-স্ করে স্টার্ট দিলে।

ওদিকে মধু দাস রায় লেনের পার্কে তখন খুব জোরে মীটিং চলছে। লাউড-স্পীকার লাগিয়ে পার্টি মীটিং হচ্ছে ঘটা করে। বক্তা বকে চলেছে—প্রাণই হচ্ছে যুবশক্তি। যুবশক্তিরা যদি বুঝতে পারে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় তাহলে আমাদের এত কষ্ট করে আর বক্তৃতা দিতে আসতে হয় না। বামপন্থী-সরকার যে কী বস্তু তা আপনাদের দেখা আছে। দেশকে রক্ষা করতে হলে, দেশের ওপর নিজের দেশের ওপর সামান্যতম মায়ামমতা থাকলে আপনারা বামপন্থীদের ভোট না দিয়ে আমাদের ভোট দিন, আমরা এই ভোটে জিতলে দেশের যুবশক্তির অপচয় রোধ করবো, প্রত্যেককে চাকরি দেব, প্রত্যেককে পেট ভরে খেতে দেব; আমরা...

ভোঁদা ক'দিন থেকেই ঘুরছিল। ভূধরটা কোথায় গেল ঠিক নেই। তারপর বিকেল বেলাও আবার বেরিয়েছিল ভূধরের খোঁজে। বাড়িতে গিয়েও তার কোনও পাত্তা মেলেনি। ভূধরের মা বেরিয়ে এসে বলেছিল—ক'দিন ধরে ভূধর বাড়ি আসছে না বাবা, কোথায় যে সে গেল, আমি ভেবে ভেবে মরছি—

কী আর করবে ভোঁদা। ভূধর না থাকলে যেন সব তেতো লাগে ভোঁদার। চা খেয়েও তেতো লাগে, সিগ্রেট খেয়েও তেতো লাগে। সব যেন ক'দিন কেমন বিস্বাদ ঠেকছে। সন্ধ্যেবেলা রাস্তায় রাস্তায় একলা টহল দিয়ে বেড়ায়। মোড়ের মাথায় সরকারী গোডাউনটার সামনে লরির ভিড় লেগে আছে রোজকার মত। হাজার-হাজার টন্ চাল-গমের আমদানি-রপ্তানি চলছে। তার পাশেই গাঙ্গুলীদের বিরাট উঁচু বাড়িটা। ঘরে-ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। যেদিন বোমা মেরে সব উড়িয়ে দেবে সেদিন টের পাবে বাবুয়ানি।

হঠাৎ আর একটু এগিয়ে যেতেই কানে এল লাউড-স্পীকারের আওয়াজ। আবার মীটিং হচ্ছে সেদিনকার মত। এবার অন্য পার্টি।

—দেশের প্রাণই হচ্ছে যুবশক্তি, এই যুবশক্তির অপচয় আমরা রোধ করবো, প্রত্যেককে আমরা চাকরি দেব, প্রত্যেক নাগরিককে আমরা পেট পুরে খেতে দেব। আপনারা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না, দেশের যদি উন্নতি......

ভোঁদা আর দাঁড়ালো না সেখানে। আবার জ্ঞান দিচ্ছে এরা। সবাই মিলে জ্ঞানই দিচ্ছে কেবল—আমরা যেন শালা অজ্ঞান, আমাদের বোকা-পাঁঠা পেয়েছে—

আর ভুধর তখন চারদিকে অবাক চেয়ে-চেয়ে দেখছে। লোকটা এ কোথায় নিয়ে এসেছে তাকে। এই হোটেলে থাকে নাকি! নেশার মধ্যেও বেশ টনটনে জ্ঞান রয়েছে ভুধরের।

—কী হলো? এদিকে এসো?

মুখ ফিরিয়ে দেখতেই ভুধর অবাক হয়ে গেছে। যাকে বলে সুন্দরী। সুন্দরী রূপসী একটা মেয়ে। মানে যেমন মেয়েরা গাড়িতে চড়ে বেড়ায় তেমনি দেখতে। হোটেলের ঘরের কখন দরজা বন্ধ

জ্বলে গেছে তার খেয়াল নেই। যদি জোড়া জোড়া খাট ফুলদানি। অথচ লোকটা কোথায় গেল।

মনে পড়তে লাগলো সে বলেছিল—তুই কিচ্ছু জানিস নি, এ-যুগে কেউ কারোর কথা ভাবে না—

ভুধর জিজ্ঞেস করলে—আমার সেই বন্ধু কোথায় গেল, যে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল?

মেয়েটা খিল্‌-খিল্‌ করে হাসতে লাগলো। কিন্তু কথার জবাব দিলে না।

ভুধর জিজ্ঞেস করলে—হাসছো কেন?

মেয়েটা বললে—তোমাকে দেখে—

ভুধর নিজের সার্ট-প্যান্টের দিকে চেয়ে দেখলে। বড় ময়লা লাগলো নিজের চোখেই।

বললে—আমি ঠিক এখানে আসবো জানতুম না তো।

—না, সে জন্যে বলছি না। আমার দিকে ভালো করে চাইছো না কেন? আমি কি খারাপ দেখতে?

এতক্ষণে ভালো করে চেয়ে দেখলে ভুধর।

—ভালো লাগছে তো?

হঠাৎ একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছে মেয়েটা।

—আরে, আমি তোমাকে খেয়ে ফেলবো না। ইচ্ছে করলে বরং তুমিই আমাকে খেয়ে ফেলতে পারো।

বলে আবার খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। ভুধর ততক্ষণে বেশ সামলে নিয়েছে অবস্থাটা।

বললে—কিন্তু, আমার কাছে তো টাকা-কড়ি কিছু নেই—

মেয়েটা বললে—টাকা-কড়ির কথা তোমার বন্ধু বুঝবে, যাবার আগে তোমার বন্ধু আমার কাছে অনেক টাকা দিয়ে গেছে—

—আমার জন্যে সে টাকা দিতে গেল কেন?

মেয়েটা বললে—সে বলেছে তুমি তার ক্লাশ-ফ্রেনড, তোমার সুবিধে-অসুবিধে দেখবার জন্যেই তো আমাকে সে এখানে নিয়ে এল—

—আমার জন্যে তোমাকে এখানে নিয়ে এল? তুমি তার কে?

—কে আবার, কেউ না।

—আচ্ছা, ও কি সকলের জন্যেই এই রকম করে? আগে আর কারও জন্যে তোমাকে এখানে ডেকে এনেছে?

মেয়েটা বললে—না। তোমার জন্যেই তার যত কিছু ভাবনা।

ভুধর অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন বলো তো? আমি তো এমন কেউ নয় তার। আমি কবে এককালে তার সঙ্গে পড়েছিলুম, তা আমারই মনে নেই। আর ও তো বড়লোক, আর আমি গরীব—

—ও সব কথা থাক, কী খাবে বলো?

—এই তো এখুনি খেয়ে এলুম। ক্ষিধে পাচ্ছে না, শুধু ঘুম পাচ্ছে—

—তাহলে এসো দু'জনে ঘুমোই, আমারো ঘুম পাচ্ছে—

বলে জোর করে হাত ধরে টেনে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। দিয়ে নিজেও মুখো-মুখি শুয়ে পড়লো।

ভোঁদা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে ভুধরকে দেখেছিস?

পাড়ারই আড্ডাবাজ ছেলে দুলাল। বললে—কই না—

—কোথায় গেল বল তো শালা? একবার বলে গেল না পর্যন্ত।

বড় একা-একা লাগছিল ভোঁদার। এক-সঙ্গে এতদিনের আড্ডা। সরকারী-গোডাউনটার পাশের রকে বসে বসে ভোঁদা একলা-একলা সিগ্রেট টানে। কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। কোথাও কিছু ঘটে না। চমৎকার মত ঘটনাও ঘটে না কোথাও। একটা লোক গাড়ি চাপা পড়ে না। সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি হয় না। বোমা ফেটে কেউ মরেও না কোথাও। শুধু পার্কে-পার্কে লেকচারবাজি! দিনগুলোও চা-সিগ্রেটের মতন তেতো হয়ে গেছে যেন।

—কী রে ভোঁদা, একলা বসে কেন? হরিহর-আত্মা কোথায় গেল?

—আরে দূর, ভুধর শালা কোথায় পালিয়েছে।

—কেন? পালালো কেন?

—শালার ভীমরতি হয়েছে।

লোকটাও সেদিন বলেছিল—জানিস মানুষের মধ্যে দু'টো করে লোক থাকে।

একটা সে নিজে আর একটা তার ইচ্ছে।

ভূধর বলেছিল—ভোঁদার জন্যে ভাই আমার খুব মন-কেমন করছে, আমি এত ফুর্তি করছি, আর সে সরকারী-গোডাউনের রকে বসে এতক্ষণ ভ্যারেন্ডা ভাজছে—

লোকটা বলেছিল—তোর খেলেই তার খাওয়া হলো, সে ভ্যারেন্ডা ভাজলেই তোর ভ্যারেন্ডা ভাজা হলো—

—এই ভূধর, এই—

ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেছে ভূধরের। ঠিক যেন ভোঁদার গলা। কিন্তু চারদিকে চেয়ে ভুল ভাঙলো। পাশের দিকে চেয়ে দেখলে মেয়েটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সারা শরীরে কাপড়-চোপড়ের বালাই নেই।

গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে লাগলো—ওঠো, ওঠো, ওঠো—

মেয়েটা আড়মোড়া ভাঙলো। বললে—কী হলো? এত সকাল-সকাল তোমার ঘুম ভাঙলো কেন? এসো না আর একবার ঘুমুই, আজকে আর উঠবোই না, আজ সারাদিন বেশ ঘুমোব দুজনে।

—কিন্তু সে যদি এসে পড়ে?

—কে?

—আমার সেই বন্ধু! তার তো এক্ষুনি আসবার কথা।

—এলে আসবে! দরজায় তো লক করা আছে ভেতর থেকে। আসবার আগে কাপড় পরে নেব! এসো আবার ঘুমোই—

বলে ভূধরের গলা জড়িয়ে ধরলে মেয়েটা।

মধু দাস রায় লেনে সেদিন রাত্তে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো। মানে দু' দলে সামান্য কথা-কাটাকাটি থেকে সূত্রপাত।

এ দলের ওয়ার্কাররা হঠাৎ ক্ষেপে গেল। বললে—শালা আমাদের ভোট ভণ্ডাবি?

ও দল বললে—গালাগালি দিলি কেন? আগে বল গালাগালি কেন দিলি?

—বেশ করবো গালাগালি দেব, আলবৎ দেব। ভেবেছিস গভর্মেণ্ট তোদের হাতে আছে বলে ভয় পেয়ে পালাবো?

ও-দল বললে—আয় তাহলে, সামনা-সামনি লড়ে যা, দেখি মাও-সে-তুং তোদের কী করে বাঁচায়?

তারপরে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড। সোডার বোতল থেকে শুরু হয়েছিল। তারপর রাস্তার আলোগুলো পটাপট নিবে গেল। মধু দাস রায় লেন একেবারে অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। মাঝে মাঝে ওধার থেকে এক ঝাঁক ইঁট এসে পড়ে এদিকে, আর এধার থেকে এক ঝাঁক ইঁট ওদিকে গিয়ে পড়ে। তার-পরেই কে যেন কী করে সরকারী-গোডাউনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো পাশের গাঙ্গুলী-বাড়িতে। গাঙ্গুলী বাবুদের বাড়িটার পেছনেই একটা বস্তির মতন। বাতাসটা সেদিকে ঝুঁকতেই একেবারে যাকে বলে লঙ্কাকাণ্ড। হাজার হাজার লোক অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে সব দেখতে লাগলো।

ভোঁদাও একটা ইঁট তুলে নিলে হাতে। সে যে কাদের দলে তার ঠিক নেই। কিন্তু একটা লঙ্কাকাণ্ড যে বেধেছে এতেই খুশী সে। জোরে চিৎকার করতে লাগলো—মার শালা-দের, মার—

গাঙ্গুলীদের বাড়িটা পুড়ছে, সরকারী-গোডাউনটা পুড়ছে। সমস্ত মধু দাস রায় লেনটাই পুড়ছে। ভোঁদাদের নিজেদের বাড়িটাও পুড়ছে। তার বাবা-মা-ভাই-বোনরাও হয়ত পুড়ছে। ভূধরদের বাড়িটাতেও আগুন লেগে গেছে। তা যাক, পুড়ুক। বাড়িওয়ালাদের বাড়ি পুড়ছে বেশ হচ্ছে। অনেক টাকা শালাদের। লোকসান হচ্ছে ভালো হচ্ছে। ভোঁদা খুব খুশী। আর একটা আধলা-ইঁট তুলে ছুঁড়ে মারলে অন্য দলটার দিকে।

চিৎকার করে উঠলো—মার শালাদের, মার—মার—

হঠাৎ একজনের হাত গায়ে লাগলো।

—ভোঁদা!

ভোঁদাও চমকে উঠেছে—কী রে ভূধর, তুই? কোথায় ছিলিস এ্যাদ্দিন?

ভূধর সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এসব কী হচ্ছে রে? আগুন জ্বলছে কেন? কী হয়েছে?

ভোঁদা বললে—তা জানি না।

—তা জানিস না তো কাদের ঢিল মারছিস?

ভোঁদা বললে—তা কে জানে।

—ওরা কারা?

—তাও জানি না। সব আগুন ধরে গেছে, বেশ লাগছে। সরকারী-গোডাউনের সব চাল পুড়ছে, গাঙ্গুলীদের বাড়িটা পুড়ছে, আমাদের বাড়ি পুড়ছে, তোদের বাড়িতেও আগুন ধরেছে—

—এসব কাদের কাণ্ড?

ভোঁদা বললে—তা জানি না। সবাই ইঁট ছুঁড়ছে, আমিও ইঁট ছুঁড়ছি—

হঠাৎ উত্তর দিক থেকে দমকল আসার শব্দ এলো। গাঙ্গুলীবাড়ি থেকে কেউ হয়ত টেলিফোন করে দিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের কালো জাল-ঘেরা ভ্যান। ভ্যানটা এসে পৌঁছোতেই গোটাকতক কনস্টেবল ফটাফট লাঠি নিয়ে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়লো রাস্তায়। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি চার-দিকে। কিন্তু তখনও ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে। একটা ইঁট গিয়ে লাগলো দমকলের লোকে-দের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আর এক ভ্যান পুলিস এল। এবার দুম করে একটা আওয়াজ হলো। টিয়ারগ্যাস ছুঁড়েছে পুলিস। অন্ধকারে ধোঁয়ায় একাকার হয়ে গেল জায়গাটা।

ভূধর বললে—পালিয়ে আয় ভোঁদা, এদিকে পালিয়ে আয়—

ভোঁদাও আর দাঁড়ালো না। মধু দাস রায় লেন দিয়ে বেরিয়ে অন্য একটা গলির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। সেখান থেকে আর একটা গলি। আস্তে আস্তে অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। এখানকার রাস্তার আলোগুলো সব জ্বলছে।

ভোঁদা বললে—আর কতদূর যাবো রে?

ভূধর বললে—চল্ না, আমার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাই—

—তোর বন্ধু?

ভূধর বললে—হ্যাঁ তোরও বন্ধু। আমাদের সঙ্গে ছোটবেলায় এক সঙ্গে পড়েছে। এখন বিরাট বড়লোক। তার কাছেই তো এ্যাদ্দিন ছিলুম। আহা, কদিন কী সুখ যে পেলাম কী বলবো। তোকে নিয়ে যাই সেখানে, চল্—

—কোথায় থাকে সে?

ভূধর বললে—হোটেলে। কিন্তু সে যে-সে হোটেল নয়। কোথায় লাগে শালা স্বর্গ। রবারের বিছানা, চিয়ার, সোফা, গদি। তার সঙ্গে খাঁটি বিলিতি মাল। আমার তো আসতেই ইচ্ছে করছিল না।

ভোঁদা বললে—তোর সঙ্গে কী করে দেখা হলো?

ভূধর বললে—হঠাৎ রাস্তায় দেখা। আমাকে চিনতে পেরেছে ঠিক। তারপর একটা রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে খুব চপ-কাটলেট খাওয়ালে। তারপর নিয়ে গেল তার হোটেলে। রাত্তির বেলা সেখানে শুলুম। একটা সুন্দরী মেয়ে আবার আমার বিছানায় শুলো—

—বলিস কী তুই? আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না ভাই—

ভূধর বললে—এখুনি তোকে দেখাবো। দেখলে তুই বিশ্বাস করবি তো? আর মধু দাস রায় লেনে আসছি না রে, এবার ওকে ধরে একটা চাকরি বাগিয়ে নেব—

—কী নাম তার?

ভূধর বললে—নামটাই তার জানা হলো না ভাই—

—সে কীরে, এতদিন এক সঙ্গে ছিলি নামটা জানতে পারলি না?

ভূধর বললে—এক সঙ্গে আর রইলুম কোথায়? সেই মেয়েটার সঙ্গেই তো বলতে গেলে এ ক'দিন কাটালাম—তাছাড়া প্রথমে এত মদ খাইয়ে দিলে যে আমার নেশা হয়ে গেল, আর কিছুই তখন খেয়াল ছিল না—আজকে গিয়ে চল্, নামটা জেনে নেব—

ঘরের নম্বরটা জানা ছিল। ভূধর ক'দিন সেই ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে গেছে। সামনে সদর দরজায় লাল কার্পেট পাতা। লম্বা একজন শিখ দরোয়ান দাঁড়িয়ে।

ভোঁদা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভূধর বললে—কিছু ভয় নেই, তুই চলে আয় আমার সঙ্গে—

ভূধরের পেছন-পেছন ভোঁদাও ঢুকলো। ভূধর সোজা হন-হন করে এগোচ্ছিল। যেন এ তার নিজের বাড়ি। কাউকে যেন পরোয়া করবারই দরকার নেই এখানে। তারপর লিফট্ বেয়ে ওপরে দু'শো চার নম্বর ঘরে গিয়ে হাজির। বেয়ারাটা দাঁড়িয়েছিল। চেনা বেয়ারা। ঘর পরিষ্কার করতো। তারই আবার ডিউটি পড়েছে তখন।

—কোথা ঢুকছেন বাবু, ও-ঘরে অন্য লোক এসেছে।

ভূধর বললে—সেই মেমসাহেব? সে তো আছে?

বেয়ারা বললে—না, কেউ নেই। আপনার নামে একটা চিঠি দিয়ে গেছে সাহেব, এতে সাহেবের নাম ঠিকানা আছে—

ভূধর তাড়াতাড়ি খামটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললে। খামের ওপরে কারো নাম লেখাই নেই, শুধু খামের ভেতরে একটা সাদা কাগজ। সাদা কাগজটার ওপর বড় বড় হরফে একটা শব্দ লেখা রয়েছে—'সময়'।

ভূধর ভোঁদার দিকে চাইলে। ভোঁদাও ভূধরের দিকে চেয়ে দেখলো। দুজনের কাছেই যেন শব্দটা রহস্যময় বলে মনে হলো। সোজা বাঙলা শব্দটার মানেও যেন তারা ভুলে গেছে।

বেয়ারাটা এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। বললে—আপনার নাম তো ক্ষিতীশ ব্যানার্জি?

ভূধর আকাশ থেকে পড়লো যেন। বললে—সে কী, আমার নাম তো ভূধর সান্যাল—

—তবে দিন, ও আপনার চিঠি নয়—

চিঠিটা বেয়ারার হাতে ফিরিয়ে দিয়েও কিন্তু ভূধর বিভ্রান্ত হয়ে রইল। ভোঁদা জিজ্ঞেস করলে—তুই এই হোটেলেই এসেছিলি? তোর ঠিক মনে আছে তো?

✻

মধু দাস রায় লেন তখন পুড়ছে। সরকারী-গোডাউন পুড়ছে, গাঙুলীদের বিরাট চারতলা বাড়িটাও পুড়ছে। ভূধর আর ভোঁদাদের বাড়িও পুড়ছে। সেই আগুনে হয়ত একদিন শুধু মধু দাস রায় লেন নয়, শুধু কলকাতা নয়, শুধু বাঙলা দেশ নয়, গোটা ভারতবর্ষটাও পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, বাঙলা দেশের দুজন লেখাপড়া জানা স্বাস্থ্যবান ছেলে সেদিন 'সময়' শব্দটার মানে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল। বাঙলা ভাষার সব চেয়ে সহজ শব্দটাই তাদের কাছে পরম এবং চরম দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো।

কেস ! "একটু আলাপ ক'রতে পারি ?"

দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট মোড়, শরৎকালের ঝকঝকে একটি ছুটির সন্ধে, কিশোরীরা সব পথে বেরিয়ে পড়েছে। —আমি সেই পাড়াতেই থাকি, বাড়ির উল্টো দিকে হিন্দুস্থান মার্ট, বাড়ির পাশ দিয়ে লেকে এগুবার রাস্তা, উল্টো ফুটপাথে গুপীর পানের দোকানের সামনে ঘেয়ো কুকুরের মত নিমগাছটার তলায় বাঁকানো চত্বরে ধীরে ধীরে জমা হচ্ছে অঞ্চলের যুবাবৃন্দ।—এরকম রোজ সন্ধেবেলাই আমি ওদের দেখি ওই গাছের নিচে আড্ডা জমাতে; পাশেই নিরালা নামে চায়ের দোকান, সিগেরেটের দোকানও সামনে, বাঁ দিকে একটু গেলেই একটা বস্ত্রালয়ের পর ফুটপাথটা একটু নিরিবিলিও আছে, ওরা বলে এই জায়গাটা হল সমস্ত দিক থেকেই স্ট্র্যাটিজিক পয়েন্ট, 'কেস্' করবার পক্ষে আদর্শ স্থান।—কেস করাটা কি? সেটাই কাহিনীর বিষয় আজকে, এই শহরের প্রণয়-চর্চার নবতম শব্দ "কেস্।"

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে, কত সুন্দর-সুন্দর ফুলের পাপড়ির মত মেয়েদের দেখি—ঝাঁকে-ঝাঁকে চলে যায়, কথা বলে, হাসে, আমার বুক ভরে যায়। কিন্তু এদের কারুর সঙ্গে আমার কখনো চেনা হয় না, এদের রাস্তায় দেখি কিন্তু কোথায় ফিরে গিয়ে এরা বিশ্রাম করে জানার কোনোই উপায় নেই; কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, কত লোকের বাড়িতে গিয়েছি, আশ্চর্য আমার চেনা হলেই লোকেরা সবাই হয় নিঃসন্তান, নয় পুরুষ সন্তানের পিতা, কিংবা নির্ভগিনী হবেই হবে। এইসব সুখ-দুঃখের কথা সেদিন হচ্ছিল পরিমলের সঙ্গে, বলছিলাম, দেখ এ জীবন রাখার কোনো মানেই হয় না। পরিমল চুপ করে শুনছিল আমার কথা আর মৃদু-মৃদু হাসছিল, কথা শেষ করতেই সে বলল, "তোর সমস্যা কলকাতার সব যুবকেরই সমস্যা, তুই একটু ক্যাবলা আছিস বলে তোর হয়তো বেশী, কিন্তু আমাদের মত ছেলেদেরও বেশ অসুবিধেতে পড়তে হয় মাঝে মাঝে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এই শহরে প্রচুর মেশামেশি হচ্ছে, কিন্তু আসলে যুবকযুবতীর আলাপপরিচয় হওয়াটা চট করে বেশ অসুবিধের। তা যাই হোক, হিন্দুস্থান মার্টের সামনে আজ চলে আসিস সন্ধেবেলা, কেস্ করে ফেল দু'-একটা, অনেক ভালো লাগবে।" আমি জিগেস করলাম, কেস্ করাটা কি?—"গুপীর দোকানের সামনে এলেই জানতে পারবি", বলে ভোঁ করে স্কুটার চড়ে পরিমল চলে গেল।

সন্ধে সাতটা নাগাদ জানালা দিয়ে দেখলাম পরিমল, অলোক, অশোক, দিলীপ সবাই জমা হয়েছে গাছতলায়। আমি ওদের দেখে শার্ট গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, পরিমল আমায় দেখেই বলল—"ভালো দিনেই এসেছিস আজ, টপ্-টপ্ পার্টিরা যাচ্ছে।" —আমি অবাক হয়ে বললুম, "টপ্-টপ্ মানে?" পরিমল মৃদু হেসে, "টপ্ টপ্ মানে হাই-হাই সোসাইটির মেয়েরা, গৌতম এর মধ্যেই ফিট হয়ে ঝাড়মুণ্ডির মাঠে চলে গেছে।" ঝাড়মুণ্ডির মাঠ বলতেই রাজশেখর বসুর ভূশণ্ডির মাঠ আমার মনে পড়ে, তার থেকে আদি ভৌতিক একটা অ্যাসোসিয়েশন, ব্রহ্মদৈত্য-ফম্যদৈত্য মিলিয়ে আমি একটু ভয় পেয়ে গেলুম;—অলোক বলল, "হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন, লেকের স্টাফ গ্রাউন্ডকে আজকাল সাউথ ক্যালকাটার ছেলেরা ঝাড়মুণ্ডির মাঠ বলছে।"—অলোকের কথা শেষ হতে না-হতেই অশোক গুলির মত পানের দোকান থেকে এসে বলল, "পার্টি আসছে, মৌলি তুই একটু সরে দাঁড়া, অপারেশনটা দেখ ভালো করে।"

গৌতম, অলোক, অশোক, পরিমল এদের কথা যে বলছি, এরা কিন্তু কেউ রকের বখাটে ছোকরা নয়, প্রত্যেকেই এম-এ, এম-এস-সি পাস, কোম্পানীর ভালো চাকুরে, চেহারাও প্রত্যেকের দারুন স্মার্ট, তা ছাড়া পাত্রী-বাজারে এদের চাহিদা প্রচুর। কিন্তু এরা

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি বহু দিন ছাড়ায় জন্য মেলামেশার সুযোগ তেমন আজকাল হয় না; তা ছাড়া পাড়ার গোলাপ-ফুলদের সঙ্গে যোগাযোগ না হয়ে না হয়ে এরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে, এখন তাই শখের ডিটেক্টিভদের মত এসটাব্লিশমেন্টের সাহায্য বিনাই প্রণয়াদি চালাবার একটা ইউনিট স্থাপন করেছে। প্রতি সন্ধ্যায় "কেস্" করে।

—আমি গাছতলার পাশে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম, দূরে দেখি দুটি কচি মেয়ে, একজনের শাড়ি পরবার বয়স হয়েছে ফ্রক পরেছে, অন্যজনের ফ্রক পরবার বয়স রয়েছে শাড়ি পরেছে, হেঁটে-হেঁটে আসছে। মেয়েরা ষোল-সতেরো বছর বয়সে যুবক দেখলে কপালটা টান করে দেয়, যেন কাউকে দেখতে পায় নি এরকম ভাব করে, নিজেদের মধ্যে গল্পে একটু বেশী মশগুল ভাব দেখিয়ে, ভ্রূক্ষেপহীনভাবে হাঁটার চেষ্টা করে—এরাও দেখলুম সেরকমভাবে হেঁটে হেঁটে আসছে—হিন্দুস্থান মার্টের কাছাকাছি আসার আগে এদের চলা খুবই শ্লথ হয়ে যায় এবং তলচোখে ইতিউতি তাকায়।—অন্যদিকে অশোকরা ছড়িয়ে ছড়িয়ে নিজেদের 'পজিশন' নিয়ে নিয়েছে—অলোক ক্লার্ক গেবলের মত সিগেরেট ধরিয়ে গাছের তলায় "চিন্তিত মানুষ" পোজ দিয়েছে; অলোক একটা পানের অর্ডার দিয়ে কপালের চুলটা তোলার একটা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গী দেয়, পরিমল মেয়েরা যে-দিকে হাঁটছে সেই দিকে পা টেনে টেনে "ক্লান্ত সোবার্স দ্বি-শতাধিক রানের পরে" এরকম স্টাইলে এগুতে থাকে আর দিলীপ আমার পাশে দাঁড়িয়ে "থ্রি-প্রংগড্ অপারেশনটার" একটা ধারাবিবরণী চালিয়ে যায়।

দিলীপ বলল, "পার্টিরা যদি পানের দোকানে না দাঁড়িয়ে সোজা হেঁটে যায় তাহলে পরিমল আমাদের ওপেন করবে, কিন্তু পানের দোকানে থামলে ফার্স্ট ডায়লগ দেবে অশোক, যদি ডায়লগ ফেইল করে তাহলে কনট্রোল সেণ্টার থেকে আমার সাইন পেলে অলোক এগিয়ে যাবে—অলোক হল ওয়ান-ডাউন।" আমি জিগেস করলুম, "ডায়লগ কি রে দিলীপ?"—দিলীপ বলল, "ক্যাবলা, ডায়লগ কাকে বলে তাও জানিস না, তুই আবার কেস্ করবি! ডায়লগ হল... আচ্ছা মৌলি, তুই "মানময়ী গার্লস স্কুল" সিনেমাটা দেখেছিলি, সেখানে উত্তমের একটা ডায়লগ ছিল জোর, সেটা বললেই বুঝবি কি। উত্তম একটা নোটিস-বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে রুটিন টুকছে, সেই সময় ঘাড়ের কাছে এসে অরুন্ধতী, ওই কলেজের ছাত্রী, বইয়ের হিরোয়িন, বললে, "ঘাড়টা একটু সরাবেন?" উত্তরে উত্তম কি বলল জানিস—একেবারে টপ্ ডায়লগ, পেছন দিকে না তাকিয়ে ডাঁটসে বলল, "ঘাড়ের কাজ হয়ে গেলেই ঘাড় সরে যাবে।"—আমি বললুম, "এটা তো অভদ্রতা হল!" অলোক বললে, "ধ্যাৎ, তোর ওইজন্যই তো কিছু হল না, মেয়েদের সঙ্গে সর্বদা একটু টনটিং মুডে কথা বলতে হয়, নিজের গ্রাভিটি নিয়ে টপ্ কেতায় থাকবি পার্টি আপসে উঠে আসবে। —যাই হোক, দেখ পার্টিরা পানের দোকানে থেমেছে উইকেটে স্পিন ধরেছে তাহলে!"

ফ্রক পরা, শাড়ি পরা, পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনল বোধহয়, কিন্তু এমন উদাসীন ভাব যে, অশোক দেখলুম কোনো কথাই বলতে পারল না, বিড়বিড় করছিল, মেয়েদের ভ্রূক্ষেপই নেই। দিলীপ বলল, "অশোকটা এত শোক ওপেনার, ওকে ওই পয়েন্টে রাখাই ভুল হয়েছে, অলোক এগিয়ে যা।" অলোক মেয়েদের পিছু নিল, ওদের সামনে পরিমল হাঁটছে। আমি দিলীপকে জিগেস করলাম, "দিলীপ, অপারেশনে তুই থাকিস না?" দিলীপ বলল, "লেটে নাবি, পার্টি আউট-সুইং করে বেরিয়ে গেলে লেট-কাটটা আমি মারি।"—পরিমল ধীরে ধীরে হাঁটছে, মেয়েরা একটু জোরে ওকে প্রায় পেরিয়ে যায় যায়, আমি আর অলোক দিলীপের সঙ্গে-সঙ্গে পিছনে। মেয়ে দুজন পরিমলের প্রায় পাশে চলে এসেছে, কিছুটা এগিয়ে বস্ত্রালয় পেরিয়ে নিরিবিলি জায়গাটায়। একদিকে রিকশার স্ট্যান্ড অন্য দিকে বাড়ির দেওয়াল একটু অন্ধকার—হঠাৎ এই জায়গায় উদাসীন পরিমল জ্যা-মুক্ত তীরের মত হয়ে গেল। মেয়ে দুটি ঠিক যখন ওকে পেরিয়ে গেছে, সেই সময় পরিমল বললে, "এক্সকিউজ মি"—যেন এরই অপেক্ষায় ছিল দুজন, চট করে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কপাল কুঁচকে বললে, "আমাদের বলছেন?"

—পরিমল, "হ্যাঁ, বলছিলাম কি (মেয়েদের কুঁচকোনো কপালের জন্য একবার ঢোক গিলে), বলছিলাম মানে—একটু আলাপ করতে পারি? (শেষের কথাটা ফস করে বলে ফেলে, হাত দুটোকে নিয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে পরিমল করুণভাবে বন্ধুদের দিকে চায়, ভুরু কাঁপতে থাকে)।

—মেয়েরা (ফ্রক পরা), "মেয়ে দেখলেই আলাপ করতে হবে?"

—দিলীপ (এগিয়ে গিয়ে), "না, হঠাৎ ভালো লাগল কিনা!"

—মেয়েরা (শাড়ি পরা), "ভালো লাগলেই আলাপ করতে হবে?"

—দিলীপ, "মানে, just আলাপ, কোনো খারাপ মোটিভ নেই আমাদের। এই একটু মানে......

—মেয়েরা (ফ্রক পরা), "আলাপ করে কি হবে শুনি?"

—অশোক (একটু অধৈর্য হয়ে), "না, মানে পুজো এসে গেছে কিনা!"

—মেয়েরা, "পুজোতে কী?"

—পরিমল, "একটু লেকে যাবেন?"

—মেয়েরা (শাড়ি পরা), "চল রে দিদি, ভারি অসভ্য।"

আমি ওদের প্রথম কেস্‌টার এমন করুণ অপ-ডাউন দেখে নিজেই একটু লজ্জা পেয়ে গেলুম, কিছু না ভেবে গিয়ে বললাম, "মেয়ে দুটোই পাজি!" দিলীপ বলল, "না, না, অ্যাপ্রোচই ভুল হয়েছে, অশোকটা ছাগলের মত 'পুজো এসে গেছে কিনা!' বলতেই পুরো টিম কোল্যাপ্স করে গেল, আমি ম্যানেজ করে আনছিলুম প্রায়।—যাকগে চল একটা চা খেয়ে নেক্সট ভেঞ্চারে দাঁড়ানো যাক।"—আমি দার্শনিকের মত বললুম, "বারে বারে জ্বালবে বাতি, হয়তো বাতি জ্বলবে না। তা বলে কান্নাকাটি চলবে না।"

—চা খেয়ে পরের কেসের জন্য যখন ওরা পজিশন নিচ্ছে, ডায়লগ ঝালিয়ে একেবারে তৈরি, রাস্তায় দেখা গেছে একটি তরুণী, আমি সুযোগ বুঝে সুট করে কেটে গেলাম। —বান্ধবী আমার এমনিতেও হবে না, ওমনিতেও হবে না, কেস করে মিথ্যে পরিশ্রম না করে যেমন ছিলুম তেমনি দুঃখিত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকাই ভালো।

মৌলিনাথ
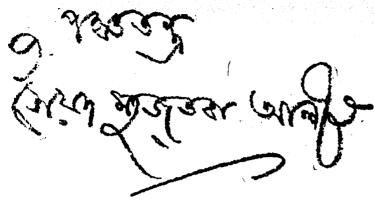
কৈফিয়ৎ

কোনো কোনো পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, আবার দু'একজন পত্র মারফত নালিশ করেছেন, আরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখি না কেন?

এ বাবদ আমার যে কৈফিয়ত সেটি নিবেদন করি।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে চোখের সামনে 'ইতিবৃত্ত কথা' যে পাতার পর পাতা খুলে গেলেন তাতে দেখতে পেলুম, বৃহৎ বৃহৎ ঘটনার পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ হিস্ট্রি ডাজ নট রিপীট ইট্‌সেলফ্‌ কথাটা আংশিকভাবে সত্য। তার পূর্বে একটি ছোট্ট চুট্‌কিলা অতিশয় সংক্ষেপে সারি।

হিটলার জরমানির সর্বেশ্বর, ফ্যুরার হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিন বেরতেন ভিন্ন ভিন্ন সচীবালয় মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করতে —এ বাসনাটা কার না হয়? অবশেষে একদা যখন সব দফতরই শেষ হয়ে গেল, তখন এক রস-রসিক পাগলা-গারদের প্রস্তাব পাড়লে। সেখানে আধ-পাগলারা তালিম মাফিক 'হাইল হিটলার' বলে কেতা-দুরস্ত সেলুট দিলে। কিন্তু হঠাৎ হিটলার দেখেন, দূরে একটা খাঁচার ভিতর একজন বার্থ ডে স্যুট পরা—অর্থাৎ সম্পূর্ণ উলঙ্গ লোক বসে আছে। হিটলার সেখানে পৌঁছলে পর পাগলা টুল ছেড়ে দাঁড়ালো না—সেলুট দূরে থাক। হিটলার তেড়ে বললেন, 'হেই, আমাকে সেলুট করছিস না কেন রে বেয়াদব?'

পাগলা ঠাণ্ডা গলায় শুধোলে, 'তুমি কে বটো?'

'বটে! আমি কে বটি! আমাকে চেন না, আমি জরমানির ফ্যুরার, আমি হিটলার!'

পাগলা এক গাল হেসে বললে—'নিরাশ হয়ো না, ভাই। তোমার ব্যামোটা মোটেই শক্ত নয়। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন আমি ভাবতুম, আমি বুঝি নেপোলিয়ন।'

*

এ গল্পটি বারলিনে যখন প্রথম চালু হয় তখনো হিটলারের ন্যাজ মোটা হয়নি। পোলানড্‌ আক্রমণ দূরে থাক—তিনি তখন তার সঙ্গে দোস্তী করার তালে।

তারপর তিনি পর পর অসট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, ফ্রান্স জয় করলেন। ইংলেনড কোনো গতিকে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরলো।

হিটলার তখন কেন যে চ্যানেল পেরিয়ে ইংলেনডের উপর হামলা চালালেন না সে নিয়ে এখনো বিস্তর আলোচনা গবেষণা তর্কাতর্কি চলছে। হিটলার স্বয়ং পরবর্তী-কালে বলেছেন, তাঁর ভয় ছিল, তিনি চ্যানেল ক্রস করে ইংরেজের সঙ্গে মরণ-আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়লে ওই মোকায় রুশ তাকে পিছন থেকে আক্রমণ করে ঘায়েল করতো।

জরমন কূটনৈতিকরা এ-যুক্তিটি বিশ্বাস করেন না।

তাঁরা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, রাশা তখন আপন সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অস্ত্রবলও তার ওই সময়ে অতিশয় অপর্যাপ্ত।

*

তা সে যাই হোক, যাই থাক্‌, এ-কথা সত্য সেই পাগলা গারদের নেপোলিয়নের কথাটা তাঁর মনে জোর দাগ কেটেছিল। তিনি ভাবলেন, 'আমি হিটলার। সে তো সবাই চোখের জলে নাকের জলে এবং হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছে। কিন্তু হিটলার তো হিটলারই রইল। এতে আর প্যাকম্বরীটা কী! আমি হব নেপোলিয়ন। না, নেপোলিয়ন না। আমি হব তারও বাড়া। সে মুর্খ মস্কো জয় করার পরও যুদ্ধে হেরে যায়। আমি তাবৎ ইয়োরোপীয় রাশা জয় করে সেখানে জরমনদের বসিয়ে কলোনি নির্মাণ করবো।'

কিন্তু হিটলারের কিছু কিছু কুসংস্কারও ছিল। রুশ-অভিযানের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে তাঁর ফোটোগ্রাফার বন্ধু হফমান উদ্বেগ প্রকাশ করলে তিনি হেসে বললেন, 'তুমিও দেখি শত্রুর প্রোপাগানডা-খপ্পরে পড়েছ। নেপোলিয়ন পারে নি, হিটলারও রুশ জয় করতে পারবে না। না, বন্ধু। আমি ইতিহাস শাস্ত্র উত্তমরূপেই অধ্যয়ন করেছি (অর্থাৎ নেপোলিয়ন যে-সব ভুল করেছিলেন হিটলার সেগুলোর কার্‌বন্‌ কপি বানাবেন না)। ও! তুমি ভাবছো নেপোলিয়ন ২২ জুন রুশ আক্রমণ করেছিলেন, আমিও ২২ জুন আক্রমণ করেছি। তা নয়। আমি ভালো করে রিসারচ্‌ করে দেখেছি, নেপোলিয়ন আক্রমণ করেছিলেন ২১ জুন। এবং আমরা আক্রমণ করেছি ২২ জুন।'

নেপোলিয়ন সত্য সত্য কোন্‌ তারিখে রুশ আক্রমণ করেছিলেন সেটা আমি সঠিক বলতে পারবো না। এবং এ-স্থলে সেইটে কিছু মোদ্দা কথা নয়। আসলে তিনি নেপোলিয়নের আক্রমণ দিবসটা অপয়া ভেবে সেদিনটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কুসংস্কার-জনিত সাবধানতা হোক বা বিচারবুদ্ধিজাত সাবধানতাই হোক, দেখা গেল, 'মারেরও সাবধান নেই'—যদ্যপি দশের মুখ বলে

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের অবগতির জন্যে জানাই যে, 'দেশ' পত্রিকার ৩৫ বর্ষ ৫১টি সংখ্যার বদলে ৪৩ সংখ্যায় শেষ করা হয়েছে। নভেম্বর মাস থেকে যথারীতি আমাদের ৩৬ বর্ষ শুরু হয়েছে। সংবাদপত্রে অসাংবাদিক কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে ৩৫ বর্ষে আটটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

'সাবধানের মার নেই।'

*

এবারে যে ইতিহাসের প্যাটারন বোনার কথা নিয়ে লেখাটি আরম্ভ করেছিলুম সেইটায় ফিরে যাই।

হিটলার যখন তাঁর বিজয়াকাশের মধ্যাহ্ন গগনে এবং ভূতলে মস্কোর দেউড়িতে ঘনঘন শস্ত্রাঘাত করছেন, তখন একদা অবসর কাটাবার সময় কতকগুলি ভবিষ্যম্বাণী করেন। তার অন্যতমঃ

সমুদ্রের ওপারে কলোনি বসিয়ে শোষণ করার দিন আর নেই।

এটা ফলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয় প্রায় সবাই আপন আপন কলোনি হারিয়েছে।

হিটলার তাই বললেন, 'সমুদ্রের ওপারে যখন রাজ্যজয় ও শোষণ চালানো যাবে না, তখন উচিত আপন দেশের সংগে লাগোয়া দেশ জয় করে সেখানে কলোনি স্থাপন করা।'

ইতিহাসও বলে বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ মানব-গোষ্ঠী অভিযান চালিয়ে বহু দূর-দূরান্তের দেশে বসতি স্থাপন করে সমৃদ্ধশালী হয়েছে। আর্যরা এইভাবে ভারতে আসেন এবং একাধিক দেশী-বিদেশী পণ্ডিত বলেন অনার্যদের প্রতি নাকি তখন অবিচার করা হয়।

অধম এঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত নয়, কিন্তু এ স্থলে আমার মতামতের কোনো মূল্য আমিই দিই না। এস্থলে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ইতিহাসের প্যাটারন দেখানো।

হিটলার নেপোলিয়ন হতে হতে আর হিটলারও রইলেন না। তিনি মুণ্ডুর ভেতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালালেন।

*

তারপর চললো উল্টোরথ। এবারে রথের উপর স্তালিন। আবার তিনি ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া, এস্টোনিয়া, পোলানডের পূর্বভাগ দখল করলেন এবং পূর্ব জর্মনী, পশ্চিম পোলানড্, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হানগেরি এবং বুলগারিয়ার উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করলেন। (তবে স্মরণ রাখা কর্তব্য, রুজোভেলট ও চার্চিল এদেশগুলো স্তালিনকে ভেট দেন যুদ্ধের সময়, পাছে স্তালিন হিটলারের সংগে আলাদা সন্ধি করে তাকে মারকিন-ইংরেজের পিছনে লেলিয়ে দেন)।

ডীটেলে অবশ্যই তফাত আছে। হিটলার যে-ভাবে রুশদেশে কলোনি বানাতে চেয়েছিলেন আজকের রুশাধিপতিরা ঠিক সে-ভাবে কলোনি নির্মাণ করতে চান না।

তদুপরি কমুনিজম সামনে একটা আদর্শ রেখেছে এবং বিশ্বজনকে সে আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চায়। এ-আদর্শ কাম্য কি না, সে আলোচনা করবেন গুণীজ্ঞানীরা। পক্ষান্তরে হিটলার দৃঢ় কণ্ঠে বলতেন, নাৎসি মতবাদ এক্‌স্‌পরট্‌ করার মাল নয়।

এ-ছাড়া প্যাটারন একই।

এর থেকে আমরা যদি শিক্ষা লাভ করি।

তাই আমি বার বার প্রাগ-মস্কো, জেরুজালেম-কাইরো ঘোরাঘুরি করি। অপরাধ নেবেন না।

শ্রম-কমিশন আসাম সফরে গেলে একটি স্মারকলিপিতে রাজ্য সরকার নাকি প্রস্তাব করেন : জাতীয় বেতননীতি রূপায়ণে সুসংহত সমীক্ষা চালাইতে হইবে। খুড়ো বলিলেন—"যাঁরা বেতন-নীতিকে নস্যাৎ করে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এই সমীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবেন না।"

৪র্থ যোজনার প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব প্রত্যেক রাজ্য সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে, বলিয়াছেন শ্রীগ্যাডগিল। শ্যামলাল বলিল—"ছুটোছুটি খেলায় হারের মুখে পড়লে বুড়ী ছুঁয়ে ফেলাই ভালো!!"

সংবাদে শুনিলাম কলম্বোতে নাকি একটি ভৌতিক ক্লাব স্থাপন করা হইয়াছে; ভূত-প্রেত সম্পর্কে নানা সংবাদ

সংগ্রহ এবং গবেষণাই হইবে এই ক্লাবের লক্ষ্য।—"সম্ভব হলে শাকচুন্নীকে গবেষণার বিষয়বস্তু করতে চেষ্টা করবেন। ভূতকে বরং বাগে আনা যায় কিন্তু শাকচুন্নী নৈব নৈব চ"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলম্বোর অন্য সংবাদে দেখিলাম সেখানে আবার ঘোড়দৌড় চালু হইবে। কর্তৃপক্ষ নাকি চায়ের বিনিময়ে বিদেশ হইতে অশ্ব আমদানি করিবেন। তাঁদের স্লোগান হইল—টি ফর হর্স।—"অবশ্য স্লোগানের দিক থেকে এটি খুব জোরদার নয়, আমরা এ কিংডম ফর এ হর্স-ও শুনেছি"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

অন্ধ্র প্রদেশে প্রচুর হীরা আছে বলিয়া নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শ্রী সি ভি রমন যে বিবৃতি দেন তাহা জাতীয় খনিজ উন্নয়ন কর্পোরেশনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছে এবং কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই হীরা সংগ্রহের জন্য দুইটি হীরা অনুসন্ধানকারী দল পাঠাইয়াছেন।—"চার্লি চ্যাপলিনের অন্য একটি ছবির সম্ভাবনাও হয়ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল, গোল্ডরাশ-এর পর ডায়মণ্ড রাশ"—বলে শ্যামলাল।

গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির জনকের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাইবার উপায় হইল এই বছরে সমষ্টিগত সংযম—বলিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ চন্দ্রশেখর।—"লুপ-ফুপ ছেড়ে ভেবে ভেবে আচ্ছা পথের সন্ধানই তিনি দিলেন। আমরা বলি কি, সংযমে সাধারণের আস্থা নেই সুতরাং সারা বছরটাকে মলমাসী বছর বলে ঘোষণা করলে তবু যদি খানিকটা কাজ দ্যায়"—বলেন সহযাত্রী।

অন্য এক প্রাসঙ্গিক খবরে শুনিলাম, রাজধানীতে নাকি অবিবাহিতের সংখ্যাই বেশি, শতকরা ৫৩ ভাগ। ডঃ চন্দ্রশেখর বলিয়াছেন : যুবক-যুবতীরা পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব মাথায় নিতে ভরসা পাইতেছে না।—"কিন্তু পাবে কী করে, পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনের পথে বাধা যে পরিবার পরিকল্পনা"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

সদর স্ট্রীট ডাকাতির সঙ্গে লিপ্ত বলিয়া অভিযুক্ত জগমোহন পাঠক লালবাজার থানা হইতে জানালার গরাদ

ভাঙিয়া পলাইয়া গিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"এই ব্যাপারে পাঠক লেখক হইয়া লালবাজারের দেয়ালে যা-লিখে গেল, পুলিশ কর্তৃপক্ষ কি তার পাঠোদ্ধার করেছে?"

সংবাদে শুনিলাম রাঁচীতে অবস্থিত প্রবাসী চেকদের কাছে ২১ সংখ্যাটি নাকি অপয়া। যে-কজন পুরুষ এবং মহিলা সন্তানাদি লইয়া রাঁচীতে আছেন তাদের সংখ্যা ২১ কিন্তু তারা বলেন ৪০১।—"কিন্তু মিথ্যে বলার প্রয়োজন কী, হারাধনের দশটি ছেলের দেশে ২১-কে কি নিদেন ২২ করা যায় না"—বলে আমাদের পাঁচ পাঁচটি ছেলেমেয়ের বাবা শ্যামলাল।

সংবাদে শুনিলাম নেপোলিয়নের চুল নাকি চৌদ্দ হাজার টাকায় নিলামে বিক্রয় হইয়াছে—"এতে অন্তত একটা কথা

প্রমাণিত হল যে জীবিতকালে তাঁর মাথার চুল দেনার দায়ে বিকোয় নি, সেখানেই নেপোলিয়ন নেপোলিয়ন এবং আমরা আমরা"—বলেন সহযাত্রী।

"ধন্য হরি" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় অনেক রকম ভয়াবহ মৃত্যুর মুখে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কী করিয়া যে মৃত্যু স্পর্শ করিল না তার আশ্চর্য কাহিনী-উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে।—"কিন্তু আর একটা মস্ত বড় উদাহরণ সে প্রবন্ধে অনুপস্থিত, সেই উদাহরণ আমরা; স্মরণ করুন কবির লেখাটি—মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি"—মন্তব্য করেন খুড়ো।

সহযাত্রী মেক্সিকোতে চারটা চারটা বিবাহের খবর পড়িয়া বলিলেন—"হকিতে হারের জন্য আমার দুঃখ হয়নি কিন্তু তাজমহল আর বাঘের দেশের বরেরা অন্তত একটা বরবর্ণিনী নিয়ে দেশে ফিরতে পারল না এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই!!"

একশ' মিটার বাটার ফ্লাই স্ট্রোকে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী পুরুষ এবং মহিলা দুইজনেই পরাজিত হইয়াছেন। মারক স্পিজ অবশ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্য পদক পাইয়াছেন কিন্তু মহিলা বিভাগে হল্যাণ্ডের আদা কক কোন পদকই পান নাই—"আদা জল খেয়েও না"—বলেন জনৈক সাঁতারু সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম অস্ট্রেলিয়া হকি টিমের রাইট হাফ এবং সেন্টার হাফ দুই জনেরই জন্ম নাগপুরে এবং তাঁরা খেলাও শিখিয়াছেন নাগপুরে। সহযাত্রী বলিয়া উঠিলেন—"তবে? ভারতকে দিয়েই ভারতকে মেরে চালাকি হচ্ছে!!"

৭

হলদে বাড়িটা কাছে সরে এসে আবার দূরে চলে গেল কেন এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সুভদ্র সেন সেদিন ছাতের আলসের উপর দুটি মোহনচূড়া পাখির দিকে প্রত্যাশা ভরে চেয়ে ছিলেন. যেন তারাই সমাধান করে দেবে এই শক্ত সমস্যাটার। মোহনচূড়া পাখির ইংরেজী নাম হুপো, তাদের মাথার চুড়োটি জাপানী পাখার মতো খুলে যায়. উপ্-উপ্-উপ্ ডাকে তারা কথা কয় মাথা নেড়ে নেড়ে, হরিণ আর জেব্রার রং তাদের গায়ে, লম্বা কালো ঠোঁট গাঁইতির মতো. চোখ দুটি যেন ছোট ছোট কালো মুক্তো। আলসের উপর কত ভংগীতেই তারা প্রেম নিবেদন করছে পরস্পরকে। খুব কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে, লাফিয়ে উঠছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, মাথার চূড়াটি বারবার খুলছে আব বধ করছে। নিজেদের নিয়েই মত্ত ওরা। সুভদ্র সেনের সমস্যা ওরা কি ক'রে সমাধান করবে এ যাঁরা ভাবছেন তাঁরা সুভদ্র সেনের কল্পনার দৌড়ের খবর রাখেন না। মোহনচূড়ার ঠোঁট দেখে তাঁর মনে পড়ল রমেন সিংঘিকে। ওই ঠোঁটের মতন নাক ছিল তাঁর। সংগে সংগে আকাশ ছেয়ে পংগপাল এসে ছেয়ে ফেলল তাঁর চেতনার দিগন্ত। মনে পড়ল অসহযোগ আন্দোলনের কথা। তিনিও অসহযোগ আন্দোলনের উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একদিন ওই রমেন সিংঘির পাল্লায় পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর খুব কাছাকাছ এসে পড়েছিলেন একদিন। এখন মহাত্মা গান্ধী কত দূর সরে গেছেন। যারা খুব কাছে আসে, তারাই দূরে সরে যায়—এই বোধ হয় নিয়ম। সুভদ্র সেন দেখলেন মোহনচূড়া পাখি দুটো দূরে সরে গেছে কিন্তু পরস্পরের দিকে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে চলেছে উপ্-উপ্-উপ্, উপ্-উপ্-উপ্। সুভদ্র সেন চাইলেন হলদে বাড়িটার দিকে। ওটাও কিছু বলছে নাকি তাঁকে? বলছে নিশ্চয়, কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল শেখর চাটুজ্জেকে। রহস্যের সমবয়সী ছিল সে। সে-ও কলেজ ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনে। রমেন সিংঘির আমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন বটে, কিন্তু নিজেই নেতা হয়ে উঠেছিলেন পরে। তখন একটা স্কুলে মাস্টারি করতেন। চাকরি ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। কাজ ছিল মদের দোকানে পিকেটিং করা, আর বিলিতী কাপড় পোড়ানো। সহকারী ছিল শেখর চাটুজ্জে।... পংগপাল...পংগপাল...পংগপাল ...ধোঁয়া ... ইনকিলাব জিন্দাবাদ...মহাত্মা গান্ধীর জয়... অম্বর গুপ্ত...উকিল অম্বর গুপ্ত—বন্ধু ছিল তাঁর—বন্ধু? হ্যাঁ, পরিচিত লোককেই তো বন্ধু ব'লে মনে করি আমরা।—বন্ধু? হা-হা-হা, মনের ভিতর অট্টহাস্য ক'রে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু। সুভদ্র সেন হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন—উপ্ উপ্ উপ্—ডেকে চলেছে মোহনচূড়া দুটো—তার সংগে দুলছে হলদে বাড়ির খোলা জানলার কপাট একটা। হাওয়া নেই তবু দুলছে। সুভদ্র সেন বুঝলেন হলদে বাড়িটা তাঁর সংগে কথা কইছে—তার কথা উপ্ উপ্ উপ্ নয়, তার কথা ওই কপাটের দোলন।

অনেকক্ষণ প্রত্যাশা ভরে দেখতে লাগলেন—দুলছে, কেবলই দুলছে কপাটটা। তারপর বুঝতে পারলেন। রহস্যও তো একদিন দুলেছিল সন্দেহ-দোলায় যখন অম্বর গুপ্ত বলেছিল—তোমার বউকেও নামাও এই আন্দোলনে। জওহরলাল নেহরুর মা বউ এই আন্দোলনে নেমেছেন। বাসন্তী দেবী নেমেছেন—তুমিই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? আমার বউ নেই, থাকলে তাকেও নামাতাম আমি। আবার তাঁর মনের মধ্যে শোনা গেল মিসেস পূর্ণেন্দুর অট্টহাসি। তারপর একটি মেয়ের পিছন দিকটা দেখতে পেলেন তিনি। খদ্দরের শাড়ি পরে হাতে একটা খদ্দরের থলি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল।

মিসেস পূর্ণেন্দু? না, রহস্য? দুজনেই তো খদ্দরের শাড়ি পরেছিল। মিস্টার পূর্ণেন্দুই ছিল মিসেস পূর্ণেন্দুর খদ্দরের শাড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল তাকে। আর রহস তো সত্যিকার খদ্দর পরেছিল, তার পরতে খুব কষ্ট হ'ত, তবু তাঁর অনুরোধে (অনুরোধে, না হুকুমে?) পরেছিল সে খুব মোটা একটা খদ্দরের শাড়ি, বাদামী রঙের শাড়িটা লালপাড়। একটুও মানায়নি তবু পরেছিল আর তবু ওই পোশাকই মুগ্ধ করেছিল অনেককে...তিনি যেন দেখতে পেলেন ওই শাড়িটা পরে রহস

(স-৪৯৮৪)

মদের দোকানে পিকেটিং করছে, শেখর চাটুজ্যে তার পেছনে রয়েছে। তাঁর বন্ধু অম্বর গুপ্ত জেলে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন রোজ...হ্যাঁ, তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন অম্বরই রোজ আসত তাঁর কাছে—শহরের সব খবর কুড়িয়ে আনত। তার একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ---"তোমার বউই দেশের অন্ধকার দূরে করবে। দশ দিক আলো করে বেড়াচ্ছে...। উপ্ উপ্ উপ্---উপ্ উপ্ উপ্—শব্দের এক বিচিত্র জাল বুনে চলেছে মোহনচূড়া দুটো। দূরে একটা বাবলাগাছকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে স্বর্ণলতা, তাতে পড়েছে মেঘ-চাপা সূর্যের কিরণ, মনে হচ্ছে বিরাট একটা সোনালী ব্যাঙের ছাতা যেন ছত্রপতি হতে চাইছে। তারপর? তারপর? তারপর? কোনও উত্তর খুঁজে পেলেন না সুভদ্র সেন। ঢেউ, ঢেউ, ঢেউ, ঢেউ-এর পর আবার ঢেউ, তারপর আবার। সব একরকম।

হঠাৎ খাতাটা বার করে লিখলেন:

কোন কিছুর সমাধান কখনও হয় নি, কখনও হবে না। বিধাতা তাঁর বিরাট রহস্য-লোকে অসংখ্য রহস্যই সৃষ্টি করেছেন কেবল। সে রহস্য যখন রূপান্তরিত হয় তখন তাকে সমাধান বলব, না আর একটা রহস্য বলব। সমাধান হলেই তো খেলা শেষ হয়ে গেল। বিধাতা খেলা শেষ করতে চান না। তাই কোনও প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন না। তাঁর পর্বত, তাঁর আকাশ সমুদ্র নির্বাক। ভাবটা যেন, আমি উত্তর দেব কেন, উত্তরটা তুমিই আন্দাজ কর। আন্দাজ? কোটি কোটি বছরের আন্দাজ পাষাণে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, উদ্ভাসিত হয়ে আছে আকাশের লক্ষ লক্ষ সূর্য, নক্ষত্র, লক্ষ লক্ষ লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ অক্ষরের কারাগারে, কিন্তু—। সহসা সেই বেণীটা—যে বেণীটা পুড়েও পোড়ে নি...। সেইটে দেখতে পেলেন যেন সহসা। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা হারিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এল আবার নূতন রূপে।

"দাদু কফি খাবে? আমি খাচ্ছি—"

"খাবো—খাবো—"

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন সুভদ্র সেন। হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। হেঁট হ'য়ে তুলতে গিয়ে দেখলেন তাঁর টেবিলের পায়াতে অদ্ভুত সুন্দর সবুজ ছোট্ট একটি প্রজাপতি চুপ ক'রে বসে আছে। এত গোলমালেও বিচলিত হয়নি। তপস্যা করছে নাকি! কি প্রগাঢ় তপস্যা! মহুয়ার ডাকেও বিচলিত হয় না! "দশ দিক আলো ক'রে বেড়াচ্ছে"—অম্বর গুপ্তের কথাটা আবার শুনতে পেলেন, আবার দেখতে পেলেন তার মুখের ব্যঙ্গ-কুঞ্চিত মুচকি হাসিটা। হঠাৎ মনে হল পুরাকালের শূলে দেওয়া শাস্তিটা যদি এখনও প্রচলিত থাকত আর আমি যদি বিচারক হতাম অম্বর গুপ্তকে আমি শূলে দিতাম। তারপর মনে পড়ল তা অসম্ভব হত, কারণ অম্বর গুপ্ত মারা গেছেন কয়েক বছর আগে।

"দাদু এসো না, কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" ছোট্ট প্রজাপতিটার এইবার তপোভঙ্গ হল। হঠাৎ উড়ল সেটা। সুভদ্র সেন দেখতে পেলেন তার ডানার নীচের দিকটা আশ্চর্য লাল। এই আশ্চর্য লাল রংটাকে এতক্ষণ সবুজের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল ও। তোমার রহস্যও কি রাখেনি? মিসেস পূর্ণেন্দু বলে গেলেন কানে কানে ফিসফিস করে। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন সুভদ্র সেন। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। মহুয়া নিজেই চলে আসছে। হাতে একটা ট্রে আর তার উপর কফির সরঞ্জাম।

"নাও—"

"কফি তো আনলে, কি ফি নিবি—"

"বত্রিশ টাকা।"

"তার মানে! তুই টাকায় ফি নিবি! তুই যে এতো বড় বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী তা তো জানতাম না।"

"আমি নেব না। নেবে ডাক্তার বোস। তাঁকে আমি 'কল' দিয়েছি। মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ব্রোমাইড মিকশ্চার খেয়ে তোমার কিছু হচ্ছে না। পাগলামি আরও দিন দিন বাড়ছে যেন। আমারও কি যেন হয়েছে, ঠিক রাত দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যায়

রোজ। তারপর আর বিছানায় থাকতে পারি না, বাইরে চলে যেতে হয়। তাই ডাক্তার বোসকে ডেকেছি। উনি একজন মেণ্টাল ডিজিজ স্পেশ্যালিস্ট।"

"সর্বনাশ! কিন্তু এই সর্বনাশের মধ্যেও একটু আনন্দের সুর বাজিয়েছিস তুই।"

"সেটা আবার কি?"

"আমার নৌকোয় নিজেকেও তুলেছিস—"

তারপর দু' হাত তুলে মোটা বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলেন—

"ডাক্তার বোস করবে কি আর এসে
এক নৌকায় আমরা দুজন যাব
ভেসে ভেসে।
জনম-জনমান্তরের দেশে।"

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া। ভেঙে পড়ল একটা ঝাড়লণ্ঠন।

"তোমার কবিতা দেখছি আরও জড়-বাদী। বত্রিশ টাকার উল্লেখ শুনেই পট করে বেরিয়ে এল।"

"একটা কথা জানিস? অধিকাংশ কবিরা আর লেখকরা পয়সার জন্যে লেখেন—"

"জানি বই কি।"

"সত্যি ডাক্তার ডেকেছিস?"

"আমার মাথা হয়তো একটু খারাপ হয়েছে, কিন্তু অতটা খারাপ হয়নি। তবে ষোল টাকা খরচ করেছি। তাঁর চেম্বারে গিয়েছিলাম। তোমার কথা, আমার কথা, সব বললাম। তিনি একটা বিদঘুটে নাম বললেন—স্কিজোফ্রেনিয়া। বললেন, এই মানসিক ব্যাধির সূত্রপাত হয়েছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে।"

"তুই কি বললি?"

"আমি একটু মুচকি হেসে চলে এলুম। তবে তোমার কবিতার 'ওই জনম-জনমান্তরের দেশে' লাইনটা শুনে মনে হচ্ছে আমার জনম-জনমান্তরের খবর নিয়ে মাঝে মাঝে কে একজন যেন আসতে আরম্ভ করেছে আমার কাছে—জানি না এটা আমার মাথাখারাপের লক্ষণ কিনা।"

"কে লোক?"

"শালিম।"

"সে আবার কে!"

"লিবাং বনে শালগাছের তলায় জন্ম হয়েছিল তার। আমার যেমন হয়েছিল মহুয়াগাছের তলায়! এই সূত্রে সে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করেছে।"

"কখন আসে সে?"

"আমি যখন রাত দুটোয় উঠে বেরিয়ে পড়ি, তখন মাঠে তার সঙ্গে দেখা হয়—"

"ডাক্তার না ডেকে ওঝা ডাক। তুই কোন ভূত-টুতের পাল্লায় পড়েছিস।"

"কিন্তু আমার ভয় করেনি এক দিনও।"

"ওইটে তো আরও ভয়ের কথা।"

"আমি যখন রোজ রাত দুটোর সময় বেরিয়ে যাই, তখন তুমি বুঝতে পার?"

—'কফি তো আনলি, কি খি নিবি'—

"রোজ। তুই তো আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাস—"

"তোমার বুকের উপর দিয়ে!"

"হ্যাঁ। বাইরের অন্ধকারে আমার সমস্ত বুকটা যে পাতা থাকে।"

"তার মানে!"

"মনে হয় পৃথিবীতে যত অমা-নিশীথিনী এসেছিল তারা কেউ মরেনি, আমার বুকের ভিতর তারা বাসা বেঁধেছে। দিনের বেলা তারা ছোট্ট হয়ে গুটি পাকিয়ে থাকে, কিন্তু রাত্রে অন্ধকার নামলে তারাও সব বেরিয়ে আসে, আর বাইরের অন্ধকারে মিশে যায়। তখন আমার ভিতরের অন্ধকার আর বাইরের অন্ধকার হয়ে যায় একাকার। অন্ধকারের বিরাট একটা অতলান্তিক সমুদ্র আর সেই সমুদ্রের উপর অন্ধকার জাহাজে দুলতে থাকে নি—"

"নি?"

"হ্যাঁ, সুরসপ্তকের নিখাদ।"

"কফিটা খাও। মনে হচ্ছে স্কিজো-ফ্রেনিয়াই হয়েছে তোমার। কেমন হয়েছে কফি?"

"বলব না।"

"কেন?"

"অনির্বচনীয়কে 'চমৎকার' বা 'খাসা' বলে খেলো করতে পারব না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, কফির কাপটা বড় ছোট।"

"আর এক কাপ নাও না। পটে আরও কফি আছে।"

মহুয়া আরও খানিকটা কফি ঢেলে দিলে তাকে।

"বেশী খেও না। এমনিতেই তো তোমার ঘুম হয় না"

"এমনিতেও হবে না। ঘুম বোধ হয়

ডিউটি ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নিজেই ঘুমুচ্ছে। জানিস? ঘুম নামে একটা জায়গা আছে। পৃথিবীর যত ঘুম বোধ হয় সেইখানেই ঘুমুচ্ছে। তোরও তো রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ দুটোর সময় বেরিয়ে পড়িস!"

"তুমি তো আমাকে বারণ করনি এক দিনও—"

"না। আমার মতে মর্নিং ওয়াক করা ভালো।"

"মর্নিং ওয়াক ওকে বল তুমি?"

"ইংরেজী মতে রাত বারোটার পরই মর্নিং হয়। আমাদের মতে ব্রাহ্মমুহূর্তে। সেই সময় অন্ধকার-নিমজ্জিত সমস্ত পৃথিবী দম বন্ধ করে একাগ্র চিত্তে আলোকে ডাকে। সে ডাক শোনা যায় না, তা অনুভব করতে হয়। করেছিস কোন দিন?"

"করেছি। রোজই করি। কিন্তু সেটা কি রকম তা যেন জানতে চেও না।"

"একটুও বলবি না। আভাসে একটু?"

"শুধু বলতে পারি, দূরে একটা মাঠে ছোট্ট একটা ঝোপ দেখা যায় আর তার পাশে একটু আলো। মাঝে মাঝে শালিম দেখা দেয়। আর মনে হয় হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি, ক্রমাগতই হেঁটে চলেছি, কিন্তু ওই ঝোপটার কাছে কিছুতেই পৌঁছতে পারছি না।"

"কোথায় সে ঝোপ?"

"দিনের বেলায় দেখেছি সে মাঠও নেই, ঝোপও নেই।"

"বুঝেছি—"

"কি বুঝেছ?"

"স্কিজোফ্রেনিয়া।"

পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল। দেখা গেল চিঠির ভিতর একটা ফোটো রয়েছে। সুভদ্র সেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে পড়তে লাগলেন চিঠিখানা। তারপর খামে চিঠিখানা পুরে যখন চাইলেন মহুয়ার দিকে, তখন তাঁর দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

"কার চিঠি দাদু?"

"নাম দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ করতে চাই না। নামটা মনেও নেই। চিঠিতেও ও ত নিজের নামের উল্লেখ করেনি। সুতরাং আপাতত ওকে অনামিকা বললে ক্ষতি নেই। চিঠিতে ত এমন একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে, যা আমি ভুলিনি, তাই তাকে চিনতে পারছি, যদিও নামের দ্বারা চিহ্নিত করতে পারছি না। নামটা আত্মগোপন করে আছে। যাক, নামেতে কি এসে যায়। ঘটনাটা কিন্তু ভারি ভালো। এরকম ভালো ভালো ঘটনার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় একটা চানাচুরওলা স্কুলে এসে চানাচুর ফেরি করত। চানাচুর নয়, যেন অমৃত। ওরকম চানাচুর আর খাইনি কখনও। তারও নামটা ভুলে গেছি।

চেহারাটা মনে আছে। রাজপুত্রের মতো। গায়ে পা পর্যন্ত লম্বা ঝুল-ওলা একটা পাঞ্জাবি, মাথায় গোলাপী রঙের পাগড়ি, চোখে নীল চশমা, আর পায়ে নূপুর। রূপকথালোকের জীব। আমাদের স্কুলে আসত মাঝে মাঝে। এ মেয়েটিও রূপকথালোকের। অনেক দিন আগে এসেছিল। রোজ সকালে আমার পায়ে এসে এক আঁজলা ফুল দিত। কোনও দিন যুঁই, কোনও দিন বকুল, কোনও দিন চাঁপা, কোনও দিন বেলি। সেই কথাটাই লিখেছে চিঠিতে। আর লিখেছে, ও কিছু দিন পরে তেহরান চলে যাচ্ছে। ওর এখানকার বাড়িটা খালি পড়ে থাকবে। লিখেছে, আমি গিয়ে ওর বাড়িতে কিছু দিন যদি থাকি তা হলে ও কৃতার্থ হবে। কলকাতার একটা ঠিকানা দিয়েছে, সেখানে খবর দিলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যাবি? বল না, সামনেই তো তোর পুজোর ছুটি।"

"মেয়েটি নিজের ফোটো পাঠিয়েছে নাকি।"

"না। অত বেরসিক সে নয়।"

"তবে কিসের ফোটো ওটা?"

"ওর বাড়ির।"

"দেখি।"

ফোটোখানা দেখেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মহুয়া। এ যে তিরি নদীর পারে সেগুন বন। এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদীটা, আর নদীর ওপারে ঘন বন। নদীর এপারে একটি পাহাড়, পাহাড়ের উপর তাজমহলের মতো বাড়ি। পাহাড়ের তলা থেকে সিঁড়ির সারি উঠে গেছে বাড়ি পর্যন্ত।

"জায়গাটা কোথা দাদু?"

"জানি না। যদি যেতে চাও কলকাতার এই ঠিকানায় খবর দিতে পারি—"

"মেয়েটি কি তোমার ছাত্রী ছিল?"

"দেখ, ওসব খবর জানতে চাসনে। সে কুমারী ছিল, না সধবা ছিল, না বিধবা ছিল, ছাত্রী ছিল, না ছাত্রীর মাসীমা ছিল—ওসব খবর অবান্তর। যেটা আসল খবর সেটা গোড়াতেই বলেছি—"

"চিঠিটা পড়তে পারি?"

"আপত্তি নেই। কিন্তু পারবি কি?"

চিঠিটা খুলে মহুয়া দেখল যে ভাষায় সেটা লেখা সে ভাষা তার জানা নেই।

"উর্দুতে লেখা নাকি?"

"না, ফার্সিতে।"

৮

মহুয়া নিজের ডায়রিতে লিখছে—

এর পর ফাঁক। অনেকখানি ফাঁক। দৃষ্টি কোথাও আটকাচ্ছে না। মনে হচ্ছে দিগন্তও নেই যেন। আকাশ কোথাও নামে নি। সোজা চলে গেছে। হাওয়া বইছে। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ায় কিসের যেন ইঙ্গিত। আর একটা মিষ্টি গন্ধ। দূর্বাদলশ্যাম বিরাট একটা প্রান্তরের মাঝে একা বসে আছি। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছি। কার? তা জানি না। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে হয়তো, তারই অপেক্ষায় বসে আছি। অপেক্ষা করাটাই জীবনের একমাত্র কাজ, অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না সেটা। হাওয়াটা হঠাৎ আমাকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগল।

মনে হল ইঙ্গিতটা অর্থময় হয়ে উঠছে। গন্ধটা তীব্রতর হল। উন্মুখ হয়ে উঠল আমার মন। প্রশ্ন করলাম—কে তুমি, কিছু বলবে আমাকে? নাচের বেগ বেড়ে গেল, গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ কল্পনাকে চিনতে পারলাম। বুঝলাম, সে আজ কথা কইবে না। তার ইঙ্গিতময় গন্ধভরা নৃত্য দিয়ে সে কেবল আকুল করে তুলবে। আজ এই তার খেয়াল।

তারপর দেখতে পেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম। রূপকথালোকের সেই পথটাকে। পথ নয়, যেন জ্যোৎস্নার ফালি, চিকচিক করছে বিরাট একটা কালো নদীর উপর। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন সুভদ্র সেন আর মহুয়া। চলেছেন সেই তাজমহলের মতো বাড়িটার দিকে, যা সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত, অনেক সিঁড়ি পার হয়ে পৌঁছতে হয় সেখানে, যে পাহাড়ের ধার দিয়ে বয়ে গেছে একটা নদী, যে নদীর ওপারে একটা বিরাট বন। আর তাদের পিছু পিছু চলেছে পূর্ণেন্দুবাবুর সেই প্রকাণ্ড পুরোনো হলদে বাড়িটা, হলদে বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে আছে নীল-নয়না একটি মেয়ে।, তার মুখে মৃদু হাসি, চোখে দুষ্টুমি-ভরা চাহনি, সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছে। মিসেস পূর্ণেন্দু। আর একটা জানলায় দাঁড়িয়ে আছে আর একটি ফরসা সুন্দরী মেয়ে, তার মাথায় লম্বা বেণী, তার চোখ কুচকুচে কালো, তার হাতে টকটকে লাল রুমাল। শুধু সুন্দরী নয়, অপূর্ব সুন্দরী। অম্বর গুপ্তের ভাষায় 'দশ দিক আলো-করা' সুন্দরী। রহস্য কিন্তু হাসছে না। বড় বেশী গম্ভীর। আর এই সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করে বাজছে একটি মাত্র চড়া সুর—নি। সে সুর দেখা যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না, তবু বাজছে। পিছনে ভেসে ভেসে চলেছে এক দল রঙীন মেঘ। তার কোনটাতে আছে মঙ্গলময়, কোনটাতে মোহিত সোম, কোনটাতে বাবুল, কোনটাতে মিস্টার চ্যাটার্জি। আর সবার শেষে ছায়ার মতো আসছে শালিম।

দিলদরিয়ায় বান ডেকেছে হঠাৎ।

সুভদ্র সেন ভাবছেন—

কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না।

চারিদিকে মনে হচ্ছে নীল আর কালো মখমল মোড়া। দূরে একটা টিটিভ পাখি কোথায় যেন ডাকছে, কাকে যেন প্রশ্ন করে চলেছে ইংরেজীতে—ডিড্ হি ডু ইট্? ডিড্ হি ডু ইট্? ডিড্ হি ডু ইট্? এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের পটভূমিকায় ঝংকৃত হচ্ছে ঝিল্লিধ্বনি। রাত্রির নীরবতা তবু নষ্ট হয় নি। সে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেন?

সুভদ্র সেন বসে আছেন সিঁড়ির উপর। কয়েক ধাপ নীচে মহুয়াও বসে আছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। তাজমহলের মতো বাড়িটা আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তিলকের মতো। তার চার পাশে ঝলমল করছে কালপুরুষের নক্ষত্রগুলো। আদ্রা আর বানরাজ কিছু বলছে কি আলোর ইশারায়?

সুভদ্র সেন বললেন—"এত সিঁড়ি ভাঙতে হবে তা আন্দাজ করতে পারিনি। এ যে অনেক সিঁড়ি—"

"আমার কেমন মনে হচ্ছে ওখানে আমরা পৌঁছতে পারব না।"

"পেঁাছতেই হবে।......"

"যে ঝোপটার উদ্দেশ্যে প্রতি রাত্রে হাঁটি, যার কাছে কোনও দিন পেঁাছতে পারিনি সেটাও দেখছি ওই বাড়িটার পাশে রয়েছে। তাই মনে হচ্ছে ওখানে পেঁাছতে পারব না।"

"পেঁাছতে হবেই। তোমার জীবনের জট তোমাকেই ছাড়াতে হবে।"

"জট মানে?"

"কৌতূহল। অবশ্য ভাগ্য ভালো হলে বীরেন্দ্র বা রমজান এসে তোমাকে আড়োমারি মাছ খাইয়ে দিতে পারে। কিন্তু সব সময়ে তারা আসে না, তাদের উপর নির্ভর করে বসেও থাকা যায় না—"

"বীরেন্দ্রই বা কে, রমজানই বা কে?"

"তোকে আমি বলিনি গল্পটা? আশ্চর্য তো! আমার ধারণা আমার সব গল্পই তোকে একাধিকবার বলেছি। যৌবনে আমার স্বভাব ছিল গঙ্গার ধারে গিয়ে বসা। তখন আমি একটা গুজব শুনেছিলাম যে, মিসেস পূর্ণেন্দু নাকি গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ছোট ছেলেমেয়ে যেমন অনেক সময় বায়না ধরে, অকারণে ঘ্যানঘ্যান করে আমার কল্পনা তেমনি আমার মনে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল— চলো তুমি গঙ্গার ধারে। ওখানে যখন সন্ধ্যার আলো গঙ্গার জলে পড়বে তখন সেই আলো সাঁতরে মিসেস পূর্ণেন্দু দেখা দেবে তোমাকে—সদ্য স্নানসিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত। তখন গঙ্গার চেহারাও ছিল সিন্ধুর মতোই। তাই বসতাম গিয়ে রোজ গঙ্গার ধারে। একদিন দেখলাম গঙ্গার জলে শিহরন তুলে কি যেন ভেসে আসছে আমার দিকে। কাছে আসতেও বুঝতে পারলাম না কি ওটা। পরে জানতে পারলাম আড়োবারি মাছ। একটা ছোঁড়া সেখানে ছিল, সেই আমাকে জ্ঞানদান করল। সে এও বললে, সাধারণ জালে ও মাছ ধরা পড়ে না। রমজান জেলের কাছে একরকম জাল আছে, সেই জালে ওই মাছ ধরা পড়ে। রমজান জেলে খেয়ালী লোক, কখনও থাকে মুঙ্গেরে, কখনও ভাগলপুরে, আবার কখনও চলে যায় তার শ্বশুরবাড়ি তালঝারি। সে ব্যবসায়ী জেলে নয়, শৌখিন মৎস্যশিকারী। রোজই দেখতে পাই গঙ্গার জলের উপর সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে আড়োবারি মাছের ঝাঁক। তাদের দেহটা দেখা যায় না, দেখা যায় চোখগুলো। মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত, মিসেস পূর্ণেন্দুই বুঝি সহস্র-চক্ষু মেলে খুঁজছে আমাকে। তারপর বন্ধু বীরেন এল হঠাৎ একদিন। দেখি সে-ও গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে বন্দুক। কে যেন তাকে খবর দিয়েছে, গঙ্গায় আজকাল চখা এসেছে। চখার দেখা না পেয়ে আমার দেখা পেয়ে গেল সে। আমি তাকে দেখিয়ে দিলাম আড়োবারি মাছের ঝাঁককে। বললাম—ওরাই হয়তো ছদ্মবেশী চখা। আজকাল সবাই তো ছদ্মবেশী। মাছের ঝাঁকের উদ্দেশে দড়াম দড়াম করে বন্দুক চালিয়ে বসল বীরেন্দ্র। অনেক ছররা যেন ছিনিমিনি খেলে গেল গঙ্গার জলের উপর। একটু পরেই দেখা গেল অনেকগুলো মাছ ভেসে উঠছে। সেই ছোঁড়াটা—যে আমার কাছে ঘুরঘুর করত, যার কাছে আড়োবারি মাছের খবর পেয়েছিলাম—সে লাফিয়ে পড়ল জলে এবং উলঙ্গ হয়ে নিজের কাপড় দিয়ে ছেঁকে অনেকগুলো মাছ তুলে ফেলল। ওরকম সুস্বাদু মাছ অনেক দিন খাইনি। রমজানও একদিন খাইয়েছিল, কিন্তু রমজান বা বীরেন সব সময় আসে না। দৈব অনুগ্রহ করলে আসে। আর একটা কথা না বললেও গল্পটা সব বলা হবে না। আড়োবারি মাছের ঝাল খেতে খেতে মনে হয়েছিল, মিসেস পূর্ণেন্দু যদি সত্যি

নদী সাঁতরে আসত তা হলে এর চেয়ে বেশী আনন্দ দিতে পারত না—"

"তুমি প্রায়ই মিসেস পূর্ণেন্দুর কথা বল. তাঁর যেসব গল্প তোমার কাছে শুনেছি তার কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই কিন্তু—"

"কালীর সঙ্গে দুর্গার বা সরস্বতীর কোন মিল আছে কি? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেরই আলাদা চেহারা, তেত্রিশ কোটি রূপ—অথচ প্রত্যেকেই নাকি পরম ব্রহ্ম, উপনিষদে যাকে নিরাকার নির্গুণ. নিরুপাধি. নির্বিকার বলেছে। মিসেস পূর্ণেন্দুও সেইরকম—একটা আইডিয়া মাত্র—বিদ্রোহের একটা প্রতীক আমার কল্পনা তাকে নানা রঙে নানা ঢঙে সাজিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা কি জানিস. নিজেকে তবু আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না. অর্থাৎ সত্যি কথাটা বলতে বাধছে. সত্যি কথাটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি অথচ বলতে পারছি না।"

এই বলে খানিকক্ষণ চুপ করে গেলেন সুভদ্র সেন। তারপর বললেন—"এইটেই বোধ হয় সত্যের লক্ষণ। সত্যকে অনুভব করা যায়. প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করতে গেলেই তার চেহারা যায় বদলে।"

মহুয়া কোন উত্তর দিল না। সে সবিস্ময়ে নীচের সিঁড়িগুলোর দিকে চেয়ে ছিল। মঙ্গলময় আসছে, তার পিছু পিছু মিস্টার চ্যাটার্জি, স্কুলের ছেলে বাবলুটাও লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে, ও যা মনে মনে বলছে তা-ও যেন মহুয়া শুনতে পেল—'মহুয়াদি, তুমি অত উপরে নাগালের বাইরে চলে গেলে কেন. আমি যে আর সিঁড়ি ভাঙতে পারছি না।' তারপর হঠাৎ নজর পড়ল আকাশের দিকে। চাঁদের ঠিক নীচেই একটা সোনালী মেঘ ভাসছে। তার উপর বসেছে মোহিত সোম। কবিতা আবৃত্তি করছে. কবিতাটাও যেন শুনতে পেল মহুয়া—সিঁড়ি ভেঙে তোমার কাছে যাব না। গেলে পরেও জানি তোমায় পাব না। যেটাকে এতক্ষণ ঝিল্লিধ্বনি মনে হচ্ছিল সেটা যে মোহিত সোমের কণ্ঠস্বর তা এতক্ষণ বুঝতে পারেনি বলে আরও বিস্মিত হল মহুয়া। মনে হল মোহিত সোমকে কতটুকু চিনি আমি। মাঠের মাঝখানে ছায়া-স্তম্ভের মতো শালিমও দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন প্রতীক্ষা করছে। সে যেন জানে মহুয়া তারই কাছে আসবে। নীরবতা দিয়ে যে রূপকথার জাল বুনে চলেছে, সে জালটা যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

"মনে নেই কি মহুয়া, যেদিন দস্যু শার্দুল সরদার তোমাকে লঠ করে নিয়ে গিয়েছিল. তোমাকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করছিল. তারপর তোমাকে নাচতে বাধ্য করেছিল আর একদল উলঙ্গিনী ধর্ষিতার সঙ্গে, যেদিন তোমার আর্ত ক্রন্দনে এবং উদ্দাম নৃত্যে ঝড় উঠেছিল লেবাং বনে, যেদিন তিরি নদীর উত্তাল তরঙ্গমালায় জেগেছিল রুদ্ধ গর্জন, আকাশে বিসর্পিত হয়েছিল বিদ্যুতের অগ্নিরেখা। যাদের আহ্বানে উত্তেজিত হয়ে আমি এসেছিলাম আমার হস্তিযূথ নিয়ে, আমার দলের সেরা হাতি পর্বত শুঁড়ে করে তুলে তোমাকে বসিয়ে দিয়েছিল আমার পাশে—এসব কি মনে পড়ছে না তোমার মহুয়া..."

মহুয়া মনে মনেই উত্তর দিল—"পড়ছে, কিন্তু আমি অসহায়। বর্তমানের দুর্গে নূতন কারাগারে বন্দিনী হয়ে আছি. অতীতে ফিরে যাব কি করে?"

তারপরই চমকে উঠল মহুয়া। লেবাং বনে হাতির ডাক শোনা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্র সেনও যেন তার কথারই উত্তর দিলেন—"যাওয়া যায়। কিন্তু আস্তে আস্তে যেতে হবে—"

"অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব?"

"আমি কি কিছু বললাম নাকি?"—বিস্মিত সুভদ্র সেন প্রশ্ন করলেন।

"বললে তো—"

"তোমাকে বলিনি। রহস্যকে বলেছি। তোমার দিদিমা ওই হলদে বাড়িটার জানলায় দাঁড়িয়ে আমাকে বলছে. আমার কাছে কি ফিরে আসা যায় না? আমি তারই কথার উত্তর দিচ্ছিলাম মনে মনে। সেটা যে কথায় বলে ফেলেছি তা খেয়াল ছিল না। তা এক হিসেবে ভালই হয়েছে. আমার অনেক দিন থেকেই ধারণা, রহস্য তোমার ভিতরই আত্মগোপন করে আছে।"

"ইস—"

তারপরই সুরের তুবড়ি ছুটিয়ে ডেকে উঠল পাপিয়াটা—চোখ গেল. চোখ গেল চোখ গেল।

ভেঙে গেল দিবাস্বপ্ন। লুপ্ত হয়ে গেল সব। প্রখর দিবালোকে আবার ফিরে এল তারা। খালি কফির কাপের সামনে বসে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল দুজনেই।

মহুয়া হেসে বললে—"আমি মনে মনে সত্যিই চলে গিয়েছিলাম তোমার ওই আরব্য-উপন্যাসের বাড়িতে—"

"আমিও। মনে মনে অনেক সিঁড়ি ভেঙেছি—"

"আমিও।"

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া।

"চল না দাদু, সত্যি সত্যি যাই। কলকাতায় খবর দাও।"

"কোথাও যেতে হলে মনে মনে যাওয়াই ভালো। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, কোনও মেহনত নেই. কোনও খরচ নেই। তা ছাড়া মনে মনে দেখলে তার বাস্তব রূপ ছাড়া আর একটা অবাস্তব অতীন্দ্রিয় রূপ দেখা যায়। বাস্তবে গিয়ে দেখবি হয়তো সিঁড়িগুলো ভাঙা. ইট বেরিয়ে রয়েছে. কিংবা দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। মনে মনে দেখলে ওগুলো দেখা যায় না—এইটে একটা মস্ত সুবিধে। তাছাড়া আর একটা কথা কি জানিস—সেইটেই বোধ হয় আসল কথা—"

চুপ করে গেলেন সুভদ্র সেন এক মুহূর্তের জন্য। তারপরে বললেন, "নাঃ, আসল কথাটা আর না-ই বললুম—"

"বলো না—"

আবদারের সঙ্গে ধমক মেশানো অদ্ভুত একটা সুর ফুটল মহুয়ার কণ্ঠে। চোখের দৃষ্টিতেও ফুটল একটা আদুরে ভঙ্গী।

"বললে বিশ্বাস করবি না।"

"তবু বল।"

"হাসতে পাবি না কিন্তু।"

"বেশ হাসব না।"

"ওই প'ড়ো ভাঙা হলদে বাড়িটার প্রেমে পড়েছি আমি। ওইটেকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন আর খেয়াল নানা রঙের ছবি আঁকে দিন রাত। ওকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওই যে ভাঙা জানলাটার পাশ দিয়ে লম্বা ঘাসের গোছা গজিয়েছে মনে হয় ওটা মিসেস পূর্ণেন্দুর চুলের গোছা। যে যাদুমন্ত্রবলে ওটা কালো না হয়ে সবুজ হয়েছে সেই যাদুমন্ত্রটারই সন্ধান করি আমি অহরহ।"

মহুয়া হেসে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর বলল — "স্কিজোফ্রেনিয়া—নির্ভেজাল স্কিজোফ্রেনিয়া—"

ক্রমশঃ

ভারতের গৌরব ?

সব দেশেই এমন কিছু কিছু নেতা ও রাজনীতির পেশাদার পার্টি আছেন ও আছে যাঁরা জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে, বিশেষ কোন নেতৃত্ব দান না করেও আন্দোলন জয়যুক্ত হলে হঠাৎ নেপোর মত ময়দানে আবির্ভূত হয়ে দই মারবার চেষ্টা করেন এমনভাবে যাতে মনে হবে জয়লাভের কৃতিত্ব তাঁদেরই প্রাপ্য। আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়, তখন কিন্তু তাঁরা এই বলে জনসাধারণেরই ঘাড়ে ব্যর্থতার দায়িত্ব চাপান যে : আমরা তো আগেই এই আন্দোলন না করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমরা তো আগেই জানতাম যে এই আন্দোলনের জন্য অবস্থা পরিপক্ক হয়নি। ওরা আমাদের কথা না শুনে আন্দোলনের নামে বলেই এই হাল হোল। কিন্তু কোন বিরাট জনবিক্ষোভে যখন কিছু লোক শহীদ হন তখন ওই সব পার্টি ও নেতা বিক্ষোভের নেতা সেজে শহীদদের দেশপ্রেমের গুণগান করেন ও সরকারী কর্তৃপক্ষকে গালাগালি দেন।

"মা ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্" এই সাধু বাক্য না মেনে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম কেন? করলাম এই জন্য যে এবারকার নোবেল-পুরস্কার বিজয়ী তিনজনের অন্যতম ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার মহামূল্য গবেষণায় কোন সাহায্য উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, আমরা প্রতি পদে পদে আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দ্বারা তাঁর অগ্রগতি ব্যাহত করার চেষ্টা করেছি যার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে গবেষণা করতে বাধ্য হন। তাঁর নোবেল পুরস্কারলাভের জন্য ভারতের কোন কৃতিত্ব নেই এবং সমস্ত কৃতিত্বটা ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রাপ্য কারণ সেখানে তাঁকে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান সাধনার পূর্ণ সুযোগ ও সমর্থন দেওয়া হয়। এগুলো আমার নিজের মন্তব্য নয়, স্বয়ং ডঃ খোরানার বক্তব্য যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশ সম্পর্কে তিনি এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এ জন্য আমাদের আত্মগ্লানি ও লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়া উচিত। তাঁর কৃতিত্বলাভে ভারতের গর্বিত হবার শুধু একটিমাত্র কারণ থাকতে পারে যা হচ্ছে তাঁর ভারতে জন্মগ্রহণ। সেইজন্য তাঁর এই সাফল্য ভারতের সাফল্য নয়, ভারতের মুখ উজ্জ্বল করার দৃষ্টান্তও নয়। তাঁকে অভিনন্দন বাণী নিশ্চয়ই পাঠানো উচিত। কিন্তু সেটা তিনি ভারতের সন্তান বলে নয়,—এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা বলে। অবশ্য ভারতের বিজ্ঞানসাধনার কেন, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এই ধরনের আমলাতন্ত্র ও লালফিতার প্রাধান্য চলে আসছে এবং শ্বেতাঙ্গ জগৎ কাউকে প্রতিভা হিসাবে স্বীকার না করা পর্যন্ত আমরা তাঁকে আমল দিই না, তুচ্ছ করি, তাঁর সম্পর্কে

ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা

উদাসীন থাকি। এমন কি বিদ্রূপ সমালোচনা করি, তাঁর পিছনে লাগি, তাঁকে খেলো করবার চেষ্টা করি। এই দাসসুলভ মনোবৃত্তি আজ ২০ বছর স্বাধীনতার পরেও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য জগদীশচন্দ্রকেও আমরা তাঁদের প্রতিভার মূল্য দিয়েছি পাশ্চাত্যের স্বীকৃতির পরে। আজকের ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই সব অবাঞ্ছিত কলংকজনক ব্যাপার সহ্য করতে না পেরে বহু যুব-বিজ্ঞানী দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এর চেয়ে বড় আফসোস বা অনিষ্টকর ব্যাপার আর কি থাকতে পারে? আইন পাশ করে, বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর না করে তাঁদের দেশত্যাগ বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ভারতের জাতীয় স্বার্থ কোন্ দিক থেকে লাভবান হবে, যদি না সেই সঙ্গে তাঁদের গবেষণার অবাধ সুযোগ ও মানুষের মত জীবনধারণের মত অর্থাগমের ব্যবস্থা করা না যায়? তাতে এবারকার অলিম্পিকে ভারতের হকি টীমের যে হাল হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে, ভারত কোনদিনই বিজ্ঞানে পুরোধা হতে পারবে না, যদি বিজ্ঞান ক্ষেত্রকে আমলাতন্ত্র, দীর্ঘসূত্রতা, 'প্রপার চ্যানেল' ও লাল ফিতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা না হয়। আর বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যাহত হলে জাতীয় অর্থনীতি ও যন্ত্রকৌশলের উন্নতিও স্তব্ধ হতে বাধ্য। এইখানেই হচ্ছে স্বাধীন ভারতের অদৃষ্টের এক সবচেয়ে মারাত্মক অভিশাপ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাথায় যদি আই-সি-এস, আই-এ-এস ডিগ্রীধারীদের প্রশাসক হিসাবে বসানো হয়, যাঁরা বিজ্ঞানের বিন্দুবিসর্গও বোঝেন না, তাহলে এই নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের কোন উপায় নেই তা কাগজেকলমে যতই বিজ্ঞানচর্চার পরিকল্পনা রচনা করা হোক বা ডিগ্রী পাশ করা হোক না কেন। যে টাকা বিজ্ঞানচর্চার জন্য মঞ্জুর হয় তার কতখানি অংশ বিজ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞানীদের জীবনধারণের জন্য খরচ হয়, আর কতটাই বা সাদা হাতী পোষণের জন্য ব্যয় হয় সে বিষয় নিয়েও কেউ মাথা ঘামান না। এত বাধা অসুবিধা সত্ত্বেও আজও যে কিছু কিছু বিজ্ঞানী ভারতে কাজ করে নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করেন এটাই আশ্চর্য। এটা সম্ভব হয় ব্যক্তিবিশেষের নিজ গুণে। তাঁরাই দেশের গৌরব।

ডঃ খোরানার আবিষ্কার জীবশাস্ত্রের

মানুষের দেহকোষে ৪৮টি ক্রোমোজোম থাকে। ডান দিকে সেগুলি জোড়ে জোড়ে দেখান হয়েছে

সুপ্রজননবিদ্যার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ জীবকোষের প্রধানস্থ ফিতার মত ক্রোমোজোমের মধ্যে বংশগতির ধারক ও বাহক জীনগুলির বিন্যাসবিধি (জেনেটিক কোড্) সম্পর্কে। আমরা জানি জীবশাস্ত্রের নিয়মাবলীর বহু রহস্য আজও অনুদ্ঘাটিত বলে জীবশাস্ত্রকে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বা গণিতের মত "এক্জ্যাক্ট সায়েন্সের" স্তরে এখনো উন্নীত করতে পারা যায়নি। বিশেষ করে বংশগতির ধারা সম্পর্কে এখনো অনেক কিছুই অজ্ঞাত। ঠিক এইখানেই হচ্ছে এবারকার তিনজন নোবেল পুরস্কার-বিজয়ীর (শরীরতত্ত্ব ও ভেষজতত্ত্বের ক্ষেত্রে) অবদানের অমূল্য গুরুত্ব। ডঃ খোরানা ছাড়া বাকি দুজনের নাম ডঃ মার্শাল ওয়ারেন নিরেনবের্গ (এঁরা দুজনেই উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন) ও ডঃ রবার্ট হলি (কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের)।

ডঃ খোরানার জন্ম নাগপুরের কাছে রায়পুর শহরে ১৯২২ সালে। পাঞ্জাবের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে তিনি প্রথমে ব্রিস্টল শহরে যান উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ফিরে ভারতে তিনি কোন গবেষণার সুযোগ পাননি। কারণ প্রাণ রসায়নকে সে সময় এখানে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হতো না। তখন তিনি আবার বিলাতে চলে গিয়ে লিভারপুলে ও কেম্ব্রিজে গবেষণা শুরু করেন। সেই সময় তিনি কিছুদিন নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আচার্য টডের সাহচর্যে কাজ করেছিলেন। তারপর কিছুদিন কানাডায় কাটিয়ে তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং উইস্কন্সিন শহরে বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন কাজ করেছিলেন, তখন তিনি চেষ্টায় ছিলেন 'নিক্লিয়োটাইড' নামে এক অতি জটিল, সূক্ষ্ম, আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ সংশ্লেষিত করা। তার আগের ২ বছর তিনি সুইজারল্যান্ডেও সহকারী গবেষক হিসাবে কাজ করেছিলেন (১৯৪৮-৪৯)।

উইস্কন্সিনে গিয়ে আবার গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে তিনি ক্রমশ উন্নতি করতে করতে বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয়োটাইডের সংমিশ্রণ ঘটাতে সক্ষম হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল টেস্টটিউবের মধ্যে এমন সংশ্লেষিত নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপন্ন করা যার মধ্যে নিউক্লিয়োটাইডগুলিকে বৈজ্ঞানিকের ইচ্ছামত আনুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকতে বাধ্য করা যাবে। অর্থাৎ সেগুলি কিভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তা আগেই জানা থাকবে। তাঁর এই অনন্যসাধারণ চেষ্টা সফল হওয়ার পর সেই সংশ্লেষিত নিউক্লিক অ্যাসিডের

এক জোড়া ক্রোমোজোমের সংকরণ
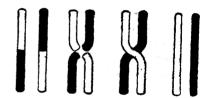
সাহায্যে সমস্ত রকমের ডি এন এর তিনটি ভিত্তি মিলে উৎপন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভিতরকার (২৩ রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে প্রোটিন তৈরি হয়) বংশগতির বিধি বা নিয়মাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার রাস্তা খুলে গিয়েছে। নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে অনেকটা ডি এন এরই সমতুল্য আর-এন-এ রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিয়াসের বাইরে প্রোটিন উৎপাদন করে। বর্তমানে ডঃ খোরানা উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনজাইম ইন্সটিটিউটের একটি বিভাগের অধ্যক্ষ। বছর দুই আগে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ডঃ খোরানার এই আবিষ্কার হয়ত অবাঞ্ছিত জীনগুলি বাদ দিয়ে বংশগতির উন্নতিসাধন করবে।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, ডঃ খোরানার নোবেল পুরস্কার উপলক্ষে সর্বভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ভবনের চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকরা ডঃ খোরানার সাফল্যের তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে এটাও গোপন রাখেন নি যে, কিরকম শ্বাসরোধক প্রতিবেশের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়। ভারতের কর্তৃপক্ষ ডঃ খোরানাকে জাতীয় জীবশাস্ত্রীয় লেবরেটরীতে কোন উচ্চপদে নিয়োগ করতে অস্বীকার করেছিলেন। যখন সারা দুনিয়ার জৈবরাসায়নিক মহল ডঃ খোরানার নিজ কর্মক্ষেত্রে অগ্রনায়কের ভূমিকা স্বীকার

করতে শুরু করেন, তারপরেও তাঁকে জাতীয় বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের সদস্য (ফেলো) নির্বাচিত করা হয়নি। হায়দ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণা লেবরেটরীর ডঃ ভার্গব দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, ভারতে আজকাল কোন নবীন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ওই সম্ভাপদ লাভ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা চলে। আজ সারা দুনিয়ায় জৈবরসায়ন যখন 'বৈপ্লাবিক' পরিবর্তন নিয়ে আসছে, যখন গত ২৫ বছরের অধিকাংশ আবিষ্কারই জৈবরাসায়নিক তখন উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানের হর্তাকর্তারা সেদিকে প্রায় কোন নজরই দিচ্ছেন না। ডঃ খোরানার সঙ্গে আরো যে দুজন মার্কিন নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁরা দুজনেই জৈবরসায়নে (অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি) শিক্ষাপ্রাপ্ত। কিন্তু ভারতে তাঁদের মত জৈব-রাসায়নিক হয়েও ডঃ খোরানার মত বহু বিজ্ঞানীকে প্রাণ-রসায়ন (বায়ো-কেমিস্ট্রি) নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ দেওয়া হয় না। ডঃ ভার্গবের পর সর্বভারতীয় প্রাণ-রসায়ন ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী ডঃ তলোয়ার মন্তব্য করেন যে, ডঃ খোরানার সঙ্গে ৬ বছরের আলাপ পরিচয়ের থেকে তিনি জোর গলায় বলতে পারেন যে, যে-সাফল্য আজ তাঁকে সর্বোচ্চ জয়মাল্যে ভূষিত করছে তা ভারতে কাজ করেও লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো না যদি কাজকর্মের প্রতিবেশ এত প্রতিকূল না হতো। প্রয়োজন মত অর্থ ও সাজসরঞ্জাম ভারতেও চেষ্টাচরিত্র করে সংগ্রহ যে করা যেত না তা নয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা (রেড টেপ) থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। ভারত সফরে এসে আমেরিকার সান্টিয়াগো শহরের সাল্ক ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী ডঃ মেল্ভিন কোহন দিল্লীতে মন্তব্য করেন যে, ডঃ খোরানা যে ভারতে কাজ করে এই গৌরব লাভ করেননি এটা অত্যন্ত আফসোসের কথা। তিনি ডঃ খোরানার বেশ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর কাছে কথা প্রসঙ্গে সপ্তাহখানেক আগে ডঃ খোরানা খেদের সঙ্গে বলেন যে, তিনি ভারতে যে ব্যবহার পেয়েছেন তাতে তিনি হতবাক হয়ে যান। তিনি আরো বলেন যে, ভারতে বিশেষজ্ঞরা অবাধে কাজ করবার সুযোগ পান না। কারণ যে কোন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগের মাথায় যে অধ্যাপক থাকেন উঠতি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের তাঁর ইচ্ছা মত চলতে হয় এবং সেখানে নিজেদের নতুন ধ্যানধারণা প্রকাশের ও সেগুলি নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ-স্বাধীনতা নেই, কোথাও আছে বলে তিনি জানেন না। ডঃ কোহন এই বলে শেষ করেন যে, অন্তত এমন পাঁচজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর কথা তিনি জানেন যাঁরা আমেরিকায় কাজ করছেন এবং তাঁর দৃঢ়-বিশ্বাস যে তাঁদের প্রত্যেকেই একদিন না
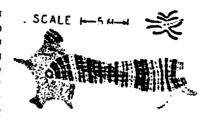
ওয়ানি পোকার দড়ির মত পাকানো ক্রোমোজোম

একদিন নোবেল পুরস্কার লাভ করবেন।

গত ১৭ই অক্টোবর কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডঃ খোরানা ও ডঃ নিরেনবের্গকে এক বিশ্বজন সভায় লুইসা গ্রস হরউইজ পুরস্কার দেওয়া হয় এক মানপত্র সমেত যাতে বলা হয় যে, ডঃ নিরেনবের্গের সাহচর্যে ডঃ খোরানার রাসায়নিক কৌশলে ডি-এন-এ সংশ্লেষিত করা এক অভূতপূর্ব সাফল্যের দৃষ্টান্ত (ডি-এন-এ অর্থাৎ ডাইঅক্সিরি বোনিউক্লিক অ্যাসিড)। এই ডি-এন-এ নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে দেহের প্রতিটি কোষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে বিন্যস্ত থেকে বংশগত চরিত্রগুলির ধারক ও বাহক হয়। তাঁরা দুজনে মিলে এইভাবে সুপ্রজননবিধির খুঁটিনাটি উদ্ঘাটিত করেছেন; জীনের মধ্যে কিভাবে "সাংকেতিক বার্তা" প্রচ্ছন্ন থাকে তা গভীর-ভাবে জানবার ও সেগুলির মর্মোদ্ধার করবার সুযোগ দিয়েছেন। ডিন-এন-এগুলি এমনভাবে সাজানো থাকে, যাতে ক্রোমোজোমগুলি পাকানো দড়ির মই-এর মত দেখায়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগৎ সম্পর্কে তাঁদের এই অমূল্য অবদান ভাবষ্যতে বংশগত বা জন্মগত আধিব্যাধির দ্রৌণিক উৎপত্তি এবং দেহকোষের মারাত্মক রূপান্তর (যা কর্কট বা ক্যান্সার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে) সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যাবার পথে আকাশপ্রদীপের মত জাজ্বল্য-মান থাকবে। ডঃ খোরানা হলেন সুপ্রজননের ইঞ্জিনীয়ার।

ডঃ খোরানা ও ডঃ নিরেনবের্গের হরউইজ পুরস্কারলাভের সংবাদ প্রকাশিত হবার পরদিন তাঁদের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। হরউইজ পুরস্কার হচ্ছে ২৫ হাজার ডলার।

ডঃ খোরানার ভারত সম্পর্কে কঠোর সমালোচনার হয়ত অনেকখানিই সত্য। কিন্তু তবু নিজের জন্মভূমি সম্পর্কে এরকম মনোভাব পোষণ করা, আমি মনে করি প্রশংসনীয় নয়, দেশপ্রেমের পরিচয়ও নয়। তিনি ভারতে যে সব বাধা অসুবিধার সম্মুখীন হন সেগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং সেই সব ত্রুটি সংশোধন করার জন্য উঠে পড়ে না লেগে তিনি বাধা-অসুবিধার কাছে পরাভব স্বীকার করেন এটা কি সৎসাহসের না দেশাত্মবোধের পরিচয়? এই দেশেতেই কি ওই সমস্ত বাধা

ওয়ানি পোকার ক্রোমোজোম। বাঁয়ে স্ত্রী-পোকার ডাইনে পুরুষ পোকার

জয় করে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্ল-চন্দ্রের মত প্রতিভার বিকাশ হয়নি এবং আজও ভারতের নবীন বিজ্ঞানী ওই আমলা-তান্ত্রিক নাগপাশে বাধা থেকেও কত কিছু উদ্ভাবন আবিষ্কার করছেন না? নোবেল পুরস্কার না পেলেও আমি বলব যে তাঁরাই দেশের সুসন্তান, ভবিষ্যৎ আশার প্রতীক।

তাঁরা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমানে লড়ে যাচ্ছেন দেশত্যাগী না হয়ে, হাজারো প্রতিবন্ধক জয় করে দেশের মুখোজ্জ্বল করছেন এটাই তো সৎসাহস ও দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। সেইদিক থেকে আমার মতে এই অল্প বয়সী বিজ্ঞানীদের ডঃ খোরানার চেয়েও বেশি প্রশংসা প্রাপ্য।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

(পঁয়ত্রিশ)

কোলাহল মুখর কলকাতা স্তব্ধ হয় গভীর রাত্রে।

তখন আর গাড়ি ঘোড়া ছোটে না, জনতার কলরব শোনা যায় না, পশু পাখি সকলেই কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বিশ্রাম করে, রেডিও চুপ করে থাকে, বিশেষ কোন আওয়াজও শোনা যায় না।

কিন্তু ক'দিন থেকে অনাদিপ্রসাদ এই স্তব্ধ রাত্রে একটি নারী কণ্ঠের গান শুনতে পাচ্ছেন। প্রথম দু'-এক দিন নিজের মনের ভুল ভেবে উপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিদিন ওই একই সময়ে ওই একই গানের সুর তাঁকে বিস্মিত করল। উনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন, গানের সুরের অনুসরণ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন উপরের ছাদে। ঝলমলে তারা ভরা বিরাট নীল আকাশ, বিশুদ্ধ হাওয়া, বোধ হয় এই দু'-এক ঘণ্টা মাত্র কলকাতা শহরের হাওয়া ধুলো মুক্ত হয়। হাওয়ার তরঙ্গে সেই পরিচিত গানের সুর কাঁপছে। অনাদিপ্রসাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, দেখতে পেলেন পাশের বাড়ির ছাদে একটি ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন ও আর কেউ নয়, আত্মভোলা উন্মত্ত সাধনবাবুর হতভাগিনী মেয়ে মীনা। অন্ধকারে চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে এলো চুল, নিজের মনে সারা ছাদে পায়চারী করছে আর গান করছে। কি গান তাও পরিস্কার শোনা যাচ্ছে না, শুধু একটা সুরের বিলাপ, হয়ত বা দম ফাটা কান্না।

অনাদিপ্রসাদ না থাকতে পেরে ডাকলেন, মীনা, মীনা—

মীনার কাছ থেকে কোন সাড়া পেলেন না, বাইরের জগতের আর বোধ হয় কোন দাম নেই তার কাছে। নিজের মনোজগতে সে বাসা বেঁধেছে, সেইখানেই বোধ হয় নিজেকে নির্বাসন দেবে।

অনাদিপ্রসাদের কাছে এ দৃশ্য অসহ্য, কতটুকু বয়েস থেকে তিনি মীনাকে দেখেছেন। ফুটফুটে মেয়ে ফ্রক পরে স্কুলে যেত, সামনের মাঠে বন্ধুদের সংগে খেলা করত, এক পা তুলে চৌকো চৌকো ঘর কেটে চিল ছুঁড়ে লাফাত, সময়ে অসময়ে সাধনবাবুর মেজাজ গরম দেখলে পালিয়ে আসত অনাদিপ্রসাদের বাড়িতে। রমলা বউদির পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। সেই মীনা বড় হল শাড়ি পরল। ঘন ঘন আসা যাওয়া কমল, সেও চলতে লাগল নিজের পথে। তারপর হঠাৎ একদিন সেই নাটকীয় পরিস্থিতিতে সমীরের সংগে অনাদিপ্রসাদের প্রথম আলাপ যখন তাকে তিনি সাধনবাবুর রোষ দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারপর এই ক' মাসের মধ্যে সবকিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে নিজেরা ঘর বেঁধেও সুখী হতে পারল না। সে সময় অনাদিপ্রসাদ তাদের সংগে জড়িয়ে পড়লেন, বুঝতে পারলেন সাধনবাবুকে খবর দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই. ভেবে ছিলেন পিতার হৃদয় শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় কন্যাকে ক্ষমা করবে, এই চরম বিপদের মুহূর্তে তাকে ভালবেসে কোলে তুলে নেবে।

কিন্তু একি হল। নির্বোধ সাধনবাবু গাড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির হয়ে ছিলেন সমীরদের গড়িয়ার বাসায়। মীনা তখন বিছানায় শুয়ে, সমীর তার পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় ক্ষ্যাপা কুকুরের মত পিতার প্রবেশ। কোনরকম বিবেচনা না করে লোকটা রাগে ফেটে পড়ল, এতদিনে আমি তোমাদের পেয়েছি। ভদ্রলোকের মেয়েকে ফুসলিয়ে বার করে এনে এই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে খুব বেলেল্লাপানা শুরু করেছ. হারামজাদা শুয়োর।

মীনা তখনও বোধ হয় স্বপ্ন রাজ্যেই ছিল, সাধনবাবুর গলা শুনে উঠে বসল, খুশী হয়ে ডাকল, বাবা।

সংগে সংগে তিরস্কার, আমাকে আর বাবা বলে ডেকো না। তুমি আমার মুখে চুনকালী মাখিয়েছ।

সমীর সাবধান করার চেষ্টা করে, ওকে বকবেন না, মীনা খুব অসুস্থ—

—অসুস্থ তো মরলেই পারত, বেঁচে থেকে ঢলাঢলি করার কি দরকার ছিল। তোমার দরদ দেখানো বার করছি। আগে মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে যাই তারপর তোমায়—

সমীর বিরক্ত হয়ে বলে, যা ইচ্ছে করবেন, শুধু মীনাকে কষ্ট দেবেন না।

—কষ্ট দেবেন না, কষ্ট দেবেন না, বলতে বলতে সাধনবাবু এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে এক চড় মারলেন সমীরের গালে, উল্লুক বাঁদর, কচি মেয়েটার দফারফা করে আবার লোক-দেখানো চোখের জল ফেলা হচ্ছে।

তারপরেই মেয়েকে হুকুম করেন, মীনা ওঠ, চল আমার সঙ্গে।

মীনা ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়, জিনিসপত্র—

--কোন জিনিস ছোঁবে না, গাড়িতে গিয়ে বোস।

—আর সমীর?

—তার ব্যবস্থা আমি করছি, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, বেটাচ্ছেলেকে দিয়ে যদি জেলের ঘানি না টানাই তাহলে মিথ্যে আমার এতদিনের নাম প্রতিপত্তি।

মীনা তখনও কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, কিন্তু উনি যে আমার স্বামী—

সাধনবাবু প্রচণ্ড ধমক দেন, তুমি কুমারী মেয়ে, তোমার বিয়ে হয় নি, তা যদি তুমি মানতে না পারো, আমি জানব, তুমি বিধবা।

গড়িয়ার ছোট্ট বাসা নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিয়ে একটা পাখি খাঁচায় পুরে সাধনবাবু বিজয় গর্বে বাড়ি ফিরে এলেন। বাবার সঙ্গে মেয়েকে নামতে দেখে বাড়ির সবাই ছুটে এসেছিল, কিন্তু মীনার অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল, ক্রোধে উন্মত্ত সাধনবাবু বুঝতে না পারলেও অন্যদের বুঝতে বাকি রইল না, মীনা প্রকৃতিস্থ নয়। সে সোজা মার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল, বলল, তুমি আমার বিয়েতে আশীর্বাদ করনি কিনা, তাই এই রকম হল। মায়ের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, কি হোল মীনা?

মীনার অসংলগ্ন উত্তর, কিছু তো হয় নি, কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে। জানো, আমার বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামী আছে, গড়িয়ায় ঘর আছে, কিন্তু বাবা বলছে আমি বিধবা হয়ে গেছি, তবে কি সমীর মরে গেছে? কিন্তু আসবার সময় আমি তো তাকে দেখলাম, সে কি তবে সমীর নয়, তার আত্মা?

আর কোন কথা বলার প্রয়োজন হল না, এই প্রথম সাধনবাবুও ভয় পেলেন, স্ত্রীকে আদেশ করলেন, হাঁ করে কি দেখছ সব, মীনাকে ওপরে ঘরে নিয়ে যাও, আমি এখুনি ডাক্তার ডাকছি।

ডাক্তার এলো, কিন্তু খুব একটা ভরসা কিছু দিতে পারলো না। কতগুলো ঘুমের ওষুধ, নানা রকম বিধি নিষেধ, সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা, এই সবের নির্দেশ দিয়ে গেলেন। কিন্তু মীনা নিজের মনের মধ্যে ক্রমশ যেন তলিয়ে যেতে লাগল, কিছুতেই নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে পারল না। যত বার শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে চায় ততবার মনে হয় পা দুটো অতি দুর্বল, তাকে ফেলে দেবে সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে যায়।

মীনাকে ফিরিয়ে এনে বাড়ির জানালা দরজা খুলে রাখার হুকুম দিয়েছিলেন [illegible] যাতে সবাই দেখতে পায় তার মেয়ে বাড়িতেই রয়েছে। কিন্তু আবার সেগুলো বন্ধ করে রাখার হুকুম দিতে হল। পাড়াপড়শীর কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে অপ্রকৃতিস্থ মীনাকে সরিয়ে রাখা ছাড়া উপায় রইল না। সকলের সজাগ দৃষ্টির পাহারায় মীনা সারা দিন তার ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে, শুধু রাত বাড়লে, যখন পাহারাদারেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে মীনা উঠে আসে ছাদে, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেয়, গভীর আবেগে গান করে, কি কথা বলতে চায় সে-ই শুধু জানে। হয়ত দেখে ওই নীল আকাশ, দেখে ওই তারা, হয়ত খোঁজে সমীরকে, সে বেঁচে আছে না মারা গেছে, এ ধারণাও হয়ত তার কাছে স্পষ্ট নেই।

অন্য ছাদে অনাদিপ্রসাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, এই বাচ্চা মেয়েটার ট্র্যাজেডীর জন্যে দায়ী কে? সমীরকে দোষ দেওয়ার কোন মানে হয় না, সে তো মীনাকে সত্যিই ভালবেসেছিল, ঘর বেঁধেছিল, বেঁচে থাকার জন্যে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না, হেরে গেল। কার কাছে? এই সমাজ ব্যবস্থা, এই সংস্কারের কাছে। চরম স্বার্থপর হলে মানুষ কত নীচে নামতে পারে তারই জলজ্যান্ত উদাহরণ সাধনবাবু। তাঁর ব্যবহারে হিংস্র জন্তুদেরও হার মানিয়েছেন, নিজের মেয়ের চরম সর্বনাশ করেও মানুষটা খাচ্ছে, পরছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোজগার করছে, অন্যদের বকছে, উপদেশ দিচ্ছে। অদ্ভুত দুনিয়া, লোকে আবার তা শুনছেও, কেউ তার বিচার করছে না।

ইতিমধ্যে সমীরও একদিন এসেছিল অনাদিপ্রসাদের কাছে। চোখের তলায় কালি পড়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হঠাৎ দেখলে আগের সে সুশ্রী, সুন্দর সমীর বলে চেনা যায় না। সন্ধ্যের পর অন্ধকারের মধ্যে এসেছিল সে, তাকে দেখে অনাদিপ্রসাদ চমকে উঠেছিলেন, কি ব্যাপার সমীর?

সমীরের বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর, একটু খবর নিতে এসেছিলাম।

—ও বাড়িতে যাও নি?

—গিয়েছিলাম, দেখতে পাই নি। চাকর দিয়ে বার করে দিয়েছে, তাছাড়া এ পাড়ায় ঢোকারও অনেক বিপদ, সাধনবাবু কতকগুলো ছোঁড়াকে লেলিয়ে রেখেছেন, আমাকে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনেই মাথা নাড়েন, বলেন, আমিও মীনার খবর বেশি কিছু দিতে পারব না, তবে শুনেছি খুব ভালো নেই, জানি আমাকেও ঢুকতে দেবেন না. তাই মীনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও করি নি।

সমীর নিজের চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালায়. অসহায়ভাবে বলে, কি যে করি।

—কিছু করবার নেই।

—তাই মনে হচ্ছে, শুধু আমার বোকামীর জন্যে মীনার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কাউকেই আমি বুঝতে পারিনি, মীনাকেও না, তার বাবাকেও না, বোধহয় নিজেকেও না। ছি, ছি, ভাবতেই বড় নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে, এ আমি কি করলাম?

অনাদিপ্রসাদ ভরসা দেবার চেষ্টা করেন, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, মনের জোর কর সমীর।

—ওসব কথা আমাকে বলবেন না, অসম্ভব মনের জোর বলে আজও আমি টিঁকে আছি, অন্য কেউ হলে আত্মহত্যা করত। মেয়েটাকে একবার দেখতে পর্যন্ত দেয় না। একটু থেমে কি যেন ভেবে বলে, হয়ত এতে ওর ভালই হবে, আমিই বোধ হয় ওর জীবনের দুষ্ট গ্রহ।

অনাদিপ্রসাদ সমীরের কাঁধে হাত রাখেন, এখন কোথায় আছ, গাড়িয়াতে?

—মাসের শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে।

—মীনার যদি কোন খবর পাই তোমাকে জানাব।

সমীর ইতস্তত করে বলে, যদি আপনাদের বাড়ি থেকে ওকে একবার দেখতে পেতাম, জানালা দিয়ে, কিংবা ছাদ থেকে, সেই জন্যেই আজ এখানে এসেছি।

—বেশ চল, অনাদিপ্রসাদ সমীরকে নিয়ে ফিরলেন. কিন্তু কোথাও কোন ফাঁক দিয়ে মীনাকে দেখতে পেলেন না, সাধনবাবুর বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ, এমন কি ছাদের দরজাও খোলা নেই।

—না, ভাই, উপায় নেই।

সমীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হতাশ হয়ে বলে. জানি না আর কখনও ওর সঙ্গে দেখা হবে কিনা। মেয়েটাকে না ওরা মেরে ফেলে।

অনাদিপ্রসাদ ভাবেন সেদিন চেষ্টা করেও সমীর মীনার দেখা পায় নি, কিন্তু আজকের এই অবস্থায় দেখলে সমীর কি নিজেকে সামলে রাখতে পারত, ফুলের মত নরম একটা মেয়ে, বাস্তবের সংস্পর্শ পাবার আগেই অফিলিয়ার মত ট্র্যাজেডীর শিকার হল। মীনা হয়ত মনের স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে সুখী না দুঃখী বাইরে থেকে বলা শক্ত। কিন্তু যে বাইরে থেকে তাকে দেখবে, যে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করবে, ভাববে তারই জন্যে মীনার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে সে কি করে আত্মগ্লানির নরক থেকে মুক্তি পাবে।

সমীর যে এ দৃশ্য দেখে নি তার পক্ষে ভালই হয়েছে।

জীবন সন্ধানী লেখক অনাদিপ্রসাদ, নিজের অভিজ্ঞতার উপর যার ক্রমশ বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল কদিন বাদে পার্ক স্ট্রীটের রাস্তায় সমীরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় নিজেকেই আত্মজিজ্ঞাসার সামনে পড়তে হল, কে বলবে এ সেই সমীর। মদ খেয়ে টলতে টলতে বার থেকে বেরিয়ে এসেছে, মুখে জলন্ত সিগারেট, সেটাকেও সামলাতে পারছে না।

অনাদিপ্রসাদের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে, নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে সমীর। বলে, কাকাবাবু আপনি এ পাড়ায়? কোন বারে যাচ্ছেন বুঝি?

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, না। এ রাস্তায় এসেছিলাম চৌরঙ্গী থেকে এক জায়গায় যাবার শর্ট কাট হবে বলে, তা তুমি কেমন আছ?

—দেখতেই তো পাচ্ছেন। ভোলবার চেষ্টা করছি।

—কাকে?

—সবাইকে। মীনা, তার বাবা, তার দুষ্টি—

—চাকরি বাকরি কিছু পেয়েছো?

—কে দেবে?

—তাহলে? খরচা চালাচ্ছ কি করে? এ পাড়ায় মদ খেতে পয়সা অনেক লাগে শুনেছি।

সমীর হাসল, পয়সা আমি দিই নি, আমার এক বড়লোক বন্ধু দিয়েছে, আমার কাজ তাকে 'কম্পানী' দেওয়া, ব্যস্ তাহলেই, যত ইচ্ছে মদ খাওয়ার ঢালাও হুকুম। এতে অনেক ভাল আছি। একেবারে শরৎ চাটুজ্যের 'দেবদাস।'

অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণ অবাক হয়ে সমীরকে

দেখছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কই, মীনার কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলেন না।

—কি হবে জিজ্ঞেস করে, সে তো আমাকে চায় না, আমাকে ভালবাসে না, তার সব কিছু জুড়ে আছে ওই বাপের বাড়ি। তাই ঠিক করেছি এই ভাবে মোসাহেবী করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। আমার বন্ধুটি একের নম্বর বুদ্ধু, কিন্তু খুব দিলদরিয়া মেজাজ। কোন রকম নোংরামি নেই, ক'দিন বেশ ভালই লাগছে, এই জীবনই তো ভাল, কি বলুন? এখন মদ এর পরে বোধ হয় মেয়েমানুষ।— হাঃ হাঃ, হাসবার চেষ্টা করলেও সমীরের গলা জড়িয়ে যায়।

অনাদিপ্রসাদ তাড়াতাড়ি সে জায়গা থেকে সরে যান, বুঝতে পারেন সমীরের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। ছেলেটো মাতাল— ওদিকে মীনা পাগল। ভালই হয়েছে, ওরা কেউ কাউকে দেখতে পায় না, নয়ত পাগল আরও পাগল হত, আর ওই মাতাল হত আরও মাতাল।

একেই বলে ভাগ্য--বিধিলিপি।

অনাদিপ্রসাদের ইচ্ছে ছিল পার্ক স্ট্রীট অতিক্রম করে ময়দানের মধ্যে ঢুকে পড়ার। নির্জন অন্ধকার ময়দানে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে একলা হাঁটতে তবু ভাল লাগে, শহরের এই গ্লানি এই কৃত্রিমতার হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত রেহাই পাওয়া যায়। তার ওপর এই বিরক্তিকর অথচ নিষ্ঠুর সত্য ঘটনাগুলোকেও তো মন থেকে মুছে ফেলা চাই, নয়ত মনের শ্লেট যে হিজি-বিজিতে ভরে যাবে, সেখানে সুস্থ সবল চিন্তার জায়গা থাকবে কোথায়।

কিন্তু অনাদিপ্রসাদ পার্ক স্ট্রীট পেরতে পারলেন না, তার আগেই মনুয়ার সঙ্গে সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল। মেয়েটা আজ নতুন সেজেছে, বুক পিঠ হাত কাটা একটা ঝিকমিকে ব্লাউজ, ততোধিক আধুনিক চক্রা-বক্রা দামী শাড়ি। মাথার চুলটাও ফাঁপিয়ে ফোলান, মুখে অপর্যাপ্ত রং। এ মোহিনী বেশে মনুয়াকে অনাদিপ্রসাদ আগে কখনও দেখেন নি। তাই বোধ হয় কিছুটা বিস্মিত হয়ে থেমে গিয়েছিলেন।

মনুয়া হেসে জিজ্ঞেস করল, কি দেখছেন? অনাদিপ্রসাদের সহজ উত্তর, তোমাকে।

—আপনাদের নিয়ে পারা যায় না, এত বয়েস বাড়ছে কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের দিকে না তাকিয়ে পারেন না।

এ কথা শোনার জন্যে অনাদিপ্রসাদ প্রস্তুত ছিলেন না, বললেন, তা নয়, তোমাকে তো ঠিক এ সাজে আগে কখনও দেখিনি।

—এবার থেকে দেখবেন, বড় হচ্ছি তো, তা কোথায় গিয়েছিলেন? যে ফ্লাওয়ারে আমাকে খুঁজছে?

—কেন?

—বা, আপনি আমার লোকাল গার্জেন, মেয়েটা ঠিক আছে কিনা তার খোঁজ খবর নেবেন না?

অনাদিপ্রসাদ হাসেন, ও, সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তবে তোমার গার্জেন হওয়া আমার সাজে না, বরং তুমি আমার গার্জেন হতে পার।

মনুয়া হাসতে হাসতে বলল, চলুন, আমার ফ্ল্যাটটা আপনাকে দেখিয়ে দি।

—তুমি আজকাল ফ্ল্যাটে থাকো?

—হাঁ, খুব কাছেই। জায়গাটা দেখে রাখুন, ইচ্ছে করলে আসতে পারবেন।

পার্ক স্ট্রীটের খুব কাছেই একটা বাড়ির দোতলায় মনুয়া অনাদিপ্রসাদকে নিয়ে গেল। ব্যাগের থেকে চাবী বার করে দরজা খুলল, খুব বড় না হলেও দুখানা খুব সাজানো ঘর, একটা শোবার আর একটা বসবার। খুব রুচিসম্মত, আসবাবপত্র। অনাদিপ্রসাদ প্রশংসা না করে পারলেন না, চমৎকার জায়গা, তুমি কত দিন এখানে এসেছ?

—দিন পনের।

—এমন সুন্দর জায়গা পেলে কি করে?

মনুয়ার রহস্যময় হাসি, যোগাড় করতে হয়।

অনাদিপ্রসাদ কি যেন ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি একাই থাকো?

—আর কে থাকবে?

—তোমার বাবা মা?

—তাঁদের তো বাড়ি আছেই।

—তা নয় মানে এতটুকু বয়েসে এইরকম জায়গায় একলা থাকা—

—বয় ফ্রেন্ডদের জ্বালায় একলা আর কতক্ষণ থাকতে পারি বলুন, বিরক্ত করে মারে।

—তোমার ভয় করে না?

মনুয়ার চোখে কৌতুক, কিসের ভয়, ভূতের। ছোটবেলায় হয়তো ভয় পেতাম, ঠিক মনে নেই। তবে আজকাল ভূতের সংখ্যা বোধ হয় কমেছে, বড় একটা জ্বালাতন করে না। আর যদি বলেন পুরুষের ভয়, এখন দেখছি তারাই আমাদের ভয় করে। যেমন আপনি, কিরকম আড়ষ্ট হয়ে বসেছেন, কি আমাকে ভয় করছে?

অনাদিপ্রসাদ শব্দ করে হাসলেন, নাঃ তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পেরে উঠব না।

মনুয়া কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না, বলল, শুধু কথা নয়, আমার মত কেউ ভাবেও না। মানে আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের কথা বলছি। আমি বুঝেছি এ জীবনে দাঁড়াতে হবে, টাকা রোজগার করতে হবে, নয়ত চিরকাল অন্য লোকের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে। আমার এক বন্ধু ছিল রবি, কিছুতেই বুঝল না, ফলে এখন কাটা ঘুড়ির মত কোথা থেকে কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মার্জারি, আমাদেরই এক বান্ধবী ভালবাসল একটি বিবাহিত পুরুষকে, তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাল, নিজে বিয়ে করল। কিন্তু কোথায় হিসেবের গোলমাল হয়ে গেল। ওরা সুখী হয়নি।

অনাদিপ্রসাদ বললেন, তোমাকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না তুমি এত কথা ভাবো।

——ছোটবেলা থেকেই ভাবছি, আমার বাবা-মার অসুখী জীবনটা দেখে দেখে কেমন যেন 'পেসিমিস্ট' হয়ে পড়েছিলাম, মনে হত কোথাও সুখ নেই, কিন্তু এখন মনে হয় সুখ দুঃখ সব নিজের ওপরে।

অনাদিপ্রসাদের গম্ভীর প্রশ্ন, তুমি কি সুখী হয়েছ মনুয়া?

ঠিক এই সময় টেলিফোনটা বাজল ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

মনুয়া হাসতে হাসতে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলে, দেখলেন তো, উত্তরটা দিতে দিল না।

—হ্যালো, মনুয়া কথা বলছি, না না, কিছু করছি না বাড়িতেই আছি। এই তো ফিরলাম। আমি তো জানি তুমি আসবে। না একলা নই, আমার সামনে একজন পুরুষ মানুষ বসে আছে, খুব সুন্দর দেখতে, তোমার চেয়ে ছেলেমানুষ, কি হিংসে হচ্ছে? শিগগির ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়। স্যার শেঠিয়ার হাতে আবার তলোয়ার নেচে উঠুক। আমি তোমাদের দুজনকে লড়বার জন্যে উৎসাহ দেব। বাই বাই।

এ ধরনের কথাবার্তায় অনাদিপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করছিলেন, উঠে পড়ে বললেন, আমি তা হলে এখন চলি।

মনুয়া তখনও হাসছে, সে কি, ভয় পেয়ে গেলেন? আপনাকেও একখানা তলোয়ার দেব। মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু, ভুলে যাবেন না আপনি আমার গার্জেন।

অনাদিপ্রসাদ নীচে নেমে এলেন, বার বার দুজনের মুখ চোখের ওপর ভাসতে লাগল —একজন মীনা, আর একজন মনুয়া, দুজনেই প্রায় এক বয়সী অথচ দুজনের জাত একেবারে আলাদা। জীবনযুদ্ধে একজন তলিয়ে গেল, আর একজন নিজেকে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করছে।

(ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন খাদ্যনীতি

নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন খাদ্যনীতি চালু হয়েছে। নতুন খাদ্যনীতি অনুযায়ী চালকল এবং উৎপাদক উভয়ের ক্ষেত্রেই লেভি বজায় রাখা হয়েছে। চালকলগুলির ক্ষেত্রে লেভির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ। বাকি ৫০ ভাগ চালকলগুলির কর্তৃপক্ষ খোলা বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। তবে খাদ্য কর্পোরেশন চালকলগুলিকে ধান কেনার জন্য টাকা অগ্রিম দেবেন এই শর্তে যে, চালকলগুলি ওই ৫০ ভাগের ২৫ ভাগ সরকারী দামে সরকারের কাছে বিক্রি করবে। খোলাবাজার থেকে ধানচাল সংগ্রহ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাইকারী ব্যবসায়ীদের উপরও শতকরা ১০ ভাগ লেভি ধার্য করার ব্যবস্থা হয়েছে। এটা অবশ্য নতুন ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গের বন্যার কবলে যে পাঁচটি জেলা আছে, সেগুলিকে লেভির আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আগামী বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্য ধরা হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ টন; গত বছর যুক্তফ্রন্ট সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্য ধরেছিলেন দশ লক্ষ টন। কিন্তু পরবর্তী কংগ্রেস-পি-ডি-এফ কোয়ালিশন সরকার খাদ্যসংগ্রহের লক্ষ্য সাত লক্ষ টনে নামিয়ে আনেন। এই লক্ষ্য পূরণ করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে বলে ধারণা করা অন্যায় হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে বর্তমান বছরেও চার লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া এই সাড়ে চার লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহের কর্মসূচীর মধ্যে উত্তরবঙ্গের বন্যা দুর্গত জেলাগুলিতে খাদ্য সংগ্রহের কাজ কতটা সফল হবে বলা কঠিন।

লেভি আদায়ের একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে, লেভি আদায়ের রোল প্রস্তুত করা; অর্থাৎ, কার কাছ থেকে কত খাদ্য সংগ্রহ করা হবে তার তালিকা প্রস্তুত করা। সাধারণত ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারগণই এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে দুর্নীতির আবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই কম জমির মালিককে বেশী পরিমাণে লেভির ধান দিতে হয়েছে এবং বেশী জমির মালিককে কম পরিমাণে লেভির ধান দিতে হয়েছে। লেভি আদায়ের পদ্ধতিটি ত্রুটিমুক্ত করা দরকার এবং তা করা হলে খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ আরও বাড়বে আশা করা যায়। লেভি আদায়ের ক্ষেত্রে উৎপাদকদের এবার বেশী ছাড় দেওয়া হয়েছে। সরকারের খাদ্যনীতি সফল হয়েছে কিনা তার মূল্যায়ন না করেও বলা যায়, গত বছর যে সময়ে

চালের দাম কিলো প্রতি চার-পাঁচ টাকা হয়েছিল, সে সময়ে এ বছর চালের দাম ছিল দেড় টাকা থেকে দুই টাকার মধ্যে। এখন চালের দাম কমতির দিকে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গত বছরের অভূতপূর্ব উৎপাদন-বৃদ্ধিই চালের দাম হ্রাসের কারণ। এ বছর যদি আশানুরূপ উৎপাদন বাড়ে, তবে সরকারের দিক থেকে সাড়ে চার লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্য স্থির রেখে খোলাবাজারে সীমায়িত পর্যায়ে খুচরা ও পাইকারী ধান-চাল বিক্রি করার নীতিই বজায় রাখা উচিত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদান নীতি

আমাদের দেশের টাকার বাজারে দুটি ঋতু আছে—একটি হচ্ছে ব্যস্ত ঋতু, যা শুরু হয় নভেম্বর মাসে এবং চলতে থাকে মার্চ মাস পর্যন্ত। আর একটি হচ্ছে মন্দা ঋতু যা শুরু হয় এপ্রিল মাসে এবং শেষ হয় অক্টোবর মাসে। প্রতি বছরই ব্যস্ত ঋতুর প্রাক্কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণদান নীতি ঘোষণা করে থাকে। এ বছর নভেম্বর মাস থেকে ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নতুন কোন নীতির প্রবর্তন করেনি। গত বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদান নীতি অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নতি, রপ্তানি বৃদ্ধি, কৃষি-উন্নয়ন ও খাদ্য সংগ্রহ নীতির সার্থক রূপায়ণের জন্য এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উদারভাবে দাদন করা হয়েছিল। গত বছরের নীতি এ বছরেও অনুসৃত হবে। খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে ঋণ সম্প্রসারণ করা হয়েছে, তা বাদেই মোট ৪২০ কোটি টাকার ঋণ সম্প্রসারণ হতে পারে বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর আশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেদিকেই দৃষ্টি দিয়েছে সেদিকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা আশাব্যঞ্জক হয়েছে। এ বছর ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা বাড়বে বলে আশা করা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানিয়েছে যে, এ বছর তারা কৃষিক্ষেত্রে এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে মোট দাদনের যথাক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ এবং ৩১ ভাগ প্রদান করবে।

গত মার্চ মাসে ব্যাঙ্ক রেট শতকরা ১ ভাগ কমাবার পর থেকেই ব্যাঙ্কগুলির ঋণ প্রদান নীতি যথেষ্ট উদার হয়েছে। ঋণের উপর সর্বোচ্চ সুদের হারও অর্ধ-এক শতাংশ কমানো হয়েছে। আশা করা যায় বর্তমানেও একই ধারা চলতে থাকবে। এতদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু সাধারণ মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য যতটা চেষ্টা করেছে, বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি সম্প্রসারণমূলক নীতি গ্রহণ করার জন্য ততটা আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু গত দু' বছর যাবৎ শিল্পক্ষেত্রে যে মন্দা দেখা যাচ্ছে তার প্রতিরোধ করার জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। বিনিয়োগ বাড়াতে গেলেই ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দরকার। সাম্প্রতিক শিল্পমন্দার মূল কারণ হচ্ছে চাহিদার ঘাটতি এবং শিল্পগুলির অব্যবহৃত অতিরিক্ত উৎপাদনী শক্তি। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমেই চাহিদার ঘাটতি দূর করা যেতে পারে এবং বাড়তি উৎপাদনী শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সম্প্রসারণমূলক ঋণপ্রদান নীতি গ্রহণ করেছে তা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। তবে যে হারে ব্যাঙ্ক ঋণদানের পরিমাণ বাড়াবে সে হারে উৎপাদন বাড়ছে কিনা এবং তা মূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে সহায়ক হচ্ছে কি না সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং পূর্ব পাকিস্তান সহ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের যে বিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চল আছে তার উন্নতির জন্য "Harvard University Centre of Population Studies" একটি ১০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এই বিনিয়োগ করতে হবে ত্রিশ বছরের মেয়াদে এবং তার ফলে উন্নয়ন-হার বাড়বে শতকরা সাড়ে চার ভাগ হারে। সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের এক-তৃতীয়াংশ হবে পাকিস্তানের জন্য এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ হবে ভারতের জন্য। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এ সমীক্ষা চালিয়েছে অধ্যাপক রিভিলি-র নেতৃত্বে। অধ্যাপক রিভিলি ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে পাকিস্তানের সিন্ধু নদের অববাহিকার উপর একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে খনিজ সম্পদ আছে প্রচুর; এখানকার নদী-ব্যবস্থা হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবস্থা। তা ছাড়া এখানে আছে কয়লা এবং বিদ্যুতের বিরাট উৎস। ঠিকভাবে বিনিয়োগের কাজ চললে এ অঞ্চলে উন্নতির সম্ভাবনা খুবই বেশী। এক হাজার কোটি টাকার যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী বিনিয়োগ করা হবে কৃষির সুদূর-প্রসারী উন্নয়ন-কল্পে. অবশিষ্ট বিনিয়োগ ধরা হয়েছে শিল্পোন্নয়ন, শহরাঞ্চলের সম্প্রসারণ, বাড়ি-ঘর ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি আদৌ বাস্তবে রূপায়িত হবে কি না বলা শক্ত। কারণ, ভারত সরকারের পক্ষে এক হাজার কোটি টাকার এরূপ একটি বিনিয়োগ প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে অযাচিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া গেলে হয়ত এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।

সুব্রত গুপ্ত

এগার

একদিন দুপুরে শুক্রবারের দেড় ঘণ্টার টিফিনে সনতের সঙ্গে সাইকেল রিকশায় উঠে বসল। সনৎ নেড়া—সদ্য সদ্য পৈতে হয়েছে, পকেটে বৃত্তিভিক্ষার অনেক টাকা। কুবেরের বুক পকেটে খুচরো নোট মিলিয়ে ওর টাকাকুড়ি। কঙ্কর স্যারের ফেয়ার-ওয়েলের চাঁদা। ডাকবাংলোর মোড়ে স্টেশনারি দোকান থেকে ফাউন্টেনপেন কিনবে। স্যারকে দেওয়া হবে।

ডাকবাংলোর দোকান বন্ধ। রিকশায় বসে ফুর্তি লাগছিল। রেলের মাঠে হিন্দুস্থানী বৌ মত একজন নীচু হয়ে ছাগলের খুঁটো পুঁতছে। সনৎ রিকশাওয়ালাকে বলল, 'স্টেশনের দিকে চল।'

'ফিফথ্ পিরিয়ডে ফিরবি নে?'

'অনেক দেরি—খানিকটা ঘুরে নিই চল—'

স্টেশনে যেতে হাতকাটা রিটায়ার্ড দারোগার 'গাঁজা ও আফিমের' দোকান। তারপরই ঘোলাডাঙার ফেরিঘাট। সনৎ হঠাৎ পয়সা মিটিয়ে দিয়ে কুবেরের হাত ধরে রিকশা থেকে টেনে নামালো, 'যাবি?'

'কেউ যদি দেখে ফেলে—'

'এখন কেউ আসে না। চল—'

বেলা দেড়টা হবে। ঘরে ঘরে জানলা বন্ধ। সন্ধ্যেবেলা এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে কুবের। তখন হারমোনিয়াম বাজে, গান হয়, পেঁয়াজ আর হিঙের গন্ধে গোটা পাড়া ম ম করে।

মোটাসোটা একজন ঘোমটা খুলে ওদের দেখছিল। সবে ভাত খাওয়ার পর পানমুখে জিভটা অনেকখানি বের করে বোঁটা থেকে একদলা চুন মুখে টেনে নিল। টেনে, কুবেরের দিকে ফিক্ করে হেসে ডাকল।

সনতের সঙ্গে খানিক এগিয়ে যেতেই ঘোমটা ফেলে দিয়ে মেয়েলোকটা আবার ডাকল, 'এসোগো। এই দুপুরে?'

এমন সহজে কথা বলছে দেখে কুবেরের হাত-পা আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওরা দুজনে খিড়কি দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল—আগে আগে সনৎ।

ঘোমটা একদম ফেলে দিয়ে মেয়েলোকটা পিচ কাটল। বেশি জলে খুব অল্প খয়েরের রঙ গুললে ফ্যাকাশে লাল হয়। একটা লাল শাড়ি পরা মেয়েকে বারান্দায় বসিয়ে কজনে মাথায় জল ঢালছে।

সনৎ থেমে দাঁড়াল, 'কি কুচ্ছিৎ মাইরি—'

কুবেরের কানের ভেতর দিয়ে তখন ভিমরুল উড়ে যাচ্ছে। কেবল 'কুচ্ছিৎ' কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, 'এই মেয়েটাকে দেখ না—'

সনৎ তাকে আঙুল দিয়ে দেখাতেই বারান্দায় দাঁড়ানো সেই মেয়েলোকটা বলল, 'কেন? খারাপ হয়ে গেছি দাদাবাবু?' তারপর হেসেই বলল, 'ওর তো কাল রাত থেকেই চার ডিগ্রি জ্বর—'

সনৎ কুবেরের হাত ধরে খিড়কিতে বেরিয়ে এসে বলল, 'তবে আমরা চললাম।'

ওরা তখনও পথে পড়েনি। ভেতরের বারান্দা থেকে কাল ওদের আওয়াজ—আর তার সঙ্গে অনেকজনের হাসি একসঙ্গে ওদের পেছনে ছুটে এল।

গনগনে রোদ—ষাঁড়ি বেশ্যারা গরম পিচের রাস্তায় সেদ্ধ ধান মেলে দিয়ে শুকোচ্ছে, মুড়ি হবে, পাড়ায় পাড়ায় কদিন পরেই বিকোতে বেরোবে। লম্বা লাঠি দিয়ে পায়রা তাড়াচ্ছে। টিনের খাপরার চালের ঝাঁপানো ছায়ায় পোষা বেড়াল কোলে একজন কুবেরের চোখে তাকিয়ে গেয়ে উঠল। গানটার এক টিপতে আজও ভোলেনি কুবের—

> 'ওরে কে কে যাবি আর-রা-রে
> বাঁশি বাজে-এ-এ বিপিনে-এ'

হাসতে হাসতে গানটা থামিয়েছিল বুড়ি। পরণে বিধবার থান, একটা প্রমাণ সাইজের তোবড়ানো ঝুনো নারকেল মুখে আঠা লাগানো পাটের কায়দায় কয়েকগাছি পাকা চুল ঝুলে।

সে-ই আঙুল দিয়ে একটা ঝুলবারান্দা দেখিয়ে দিয়েছিল, 'নোতুন এসেছে—জেগে আছে!'

ফিরেই সবে ঠিক করে ফেলেছিল। দু'এক বাড়ি উঁকি দিতে এতক্ষণে যা চোখে পড়েছে তা হল: কেউ সায়া পরে হুমহাম করে ঘর মুছছে—কেউ বা ভেতরের চাতালে রক্তকালী হয়ে কাপড় আছড়াচ্ছে—আর, সব জায়গাতেই প্রায় একই গন্ধ—মাঝে পেঁয়াজ-রসুনে বোধ হয় খুবই পচা কোন মাছ কষেপস করে কড়ায় চাপানো রয়েছে।

এমন সময় সাইকেলে কাকাবিএঙার উদয়। উঃ! ভাবলেও এখন জ্বর আসে কুবেরের। দেখতে পেলে ঠিক বাবাকে গিয়ে লাগাতো। সনৎকে হ্যাঁচকা টানে সেই ঝুলবারান্দার নীচে নিয়ে এল কুবের। তারপর দুজনে মরা ড্রেনের ওপর সরু সিঁড়ি ধরে দেড়তলায় উঠে এল।

কড়া নাড়তে হোল না। দরজা খোলা ছিল। উঁকি দিতেই যে উঠে এল সে ফৌজদারি উকিল জ্ঞান ঘোষের খারাপ মেয়ে-মানুষের মেয়ে শেফালি—কিছুদিন আগে এরই জন্যে হরি ডাক্তার কুবেরদের বাড়ি থেকে কাঁচা ডিম চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

'তুই?'

কুবের বললো, 'কাউকে বলবি নে—মেরে ফেলব তাহলে—'

শেফালি ভয় না পেয়ে হাসল, হেসে পেছন ফিরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সনতকে বলল, 'কিছু খাবেন—?'

সনতের পেছন পেছন কুবেরও ঢুকল। শেফালি ঘরের ভেতর বড় আলোটা জেনলে দিয়ে আপনি আপনি করে কথা বলতে থাকল। যেমন—

'দোরটা বন্ধ করে দিন—'

'একসঙ্গে দুজনের তো একঘরে থাকার নিয়ম নয়—পুলিশ ধরবে—'

'আচ্ছা উঠবেন না—এক কাজ করছি—'

জ্যালজেলে ছাপা শাড়িটা অনেকখানি তুলে নিজেই পালঙ্কে উঠে টানানো নেটের মশারি ফেলে দিল, ফ্যাকাশে মলোর চেয়েও ফকফকে শাদা দুখানা পা, বেশ রোগা, 'আপনাদের একজন ততক্ষণ ঐ চেয়ারটায় বসুন—কেমন ঘরের ভেতর ঘর হয়ে গেল!'

ড্রেসিং টেবিলের পাশে হাতল লাগানো সিংহাসন মার্কা চেয়ারটায় বসে কুবেরের পরিষ্কার মনে হয়েছিল, শেফালি মোটা হয়ে গেছে—ফর্সা। ফ্যানের হাওয়ায় কুবেরের শীত ধরেছিল। ঝুলবারান্দাটা দেখাতে গিয়ে বুড়ির হাত ঠিকই এই দেড়তলার ঘরের দিকে উঠেছিল, কিন্তু ঘোলা দুই চোখ তাকেই দেখছিল। অন্য সময় হলে কুবের দাঁড়িয়ে যেত—ভাব জমিয়ে বুড়ির সঙ্গে কথা বলত। বলতে বলতে বুড়ির চোখের ঘোর ভাল করে দেখে নিত। কিন্তু আর দাঁড়ালে ঠিক কাকামিঞার চোখে পড়ে যেত। পড়ে যায়নি তো?

পুলিশের লোক কাকামিঞা। দিন নেই দুপুর নেই সাইকেলে ঘুরছে কাকামিঞা।

কি খেয়াল হতে কুবের আয়না টেবিলের দেরাজ খুললো। দুখানা ভাজ করা পাঁচ টাকার নোট—কিছু ছোট ছোট ছবি, দেখতেই কুবেরের চোখ ঠেলে উঠল, মুখ হা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। মশারির ঘরের দিকে পেছন ফিরে কুবের ফটোগুলো পকেটে পুরলো, নোট দুখানাও পকেটে ভরে নিল। একটু আগে সনৎ টাকাটা শেফালিকে দিয়েছিল।

সনৎ বেরিয়ে আসতে কুবের মশারিতে ঢুকল। ভেতরে শেফালি, বুনো চুলের গন্ধ ঝুলছে। পা-দুখানা খানিক দূরে অব্দি দেখা যায়। তারপর—ঘরের নীল আলোয় সবই প্রায় অন্ধকার। বর্ষাকালের ভিজে সুকতলার গন্ধের ভেতর নামতে গিয়ে আগেকার সেই আবিষ্কার, গরম-ভাব সব কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল সেদিন। এখন পর পর সাজিয়ে ভাবতে গিয়ে কুবের একটা জিনিস বুঝতে পেরে ভীষণ ভয় পায়। লোকের পাশে লোক থাকে—অথচ কি ভয়ঙ্কর সব জিনিসপত্র নিয়ে মেয়েলোক কেমন চুপচাপ থাকে সর্বদা। বেশিক্ষণ এগোতে হয়নি তাকে—প্রথমটা জ্বলে গিয়েছিল, তারপর মাথার ভেতরের ঘিলুর খানিকটা কে যেন সুড়ুৎ করে চুষে নিল—সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে শব্দ করে হাওয়া পাস করছে যেন আজও।

বাজো

পরদিন খুব ভোরে, বুলু তখনও ঘুমে, চারটে পঞ্চান্নর ট্রেনে কুবের চেপে বসল। সরু পিয়াসলে ট্রেনটা থেমে থাকল। পেটরলের খোঁজে ভারি ভারি ড্রিলিং পাইপ, বোঝাই হয়ে একটা গুডস্ ট্রেন গেল। ইলেকট্রিফিকেশনের ওভারহেড তার পোস্টে টেনে টেনে লাগানো হচ্ছে। যে কোন উপায়ে ইলেকট্রিক ট্রেন চলবার আগেই এদিকে জমি কিনতে হবে কুবেরকে।

ব্রজদা বাড়ি ছিল। ঘুম চোখে চা খেয়ে কুবেরকে বলল, 'চল্ তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। গোটা সাউথ বেঙ্গল—মায় বে অব বেঙ্গলের খানিকটা ভবেন শী বন্ধকী কারবারে কিনে রেখেছে।'

কদমপুর বাজারে ঢুকতে ভবেন শীর দোকান। আদ্দির ফতুয়া টেবিল ফ্যানের হাওয়ায় ঘাড়ে গর্দানে কাঁপছে। সামনে বড় ঘরের এক ফর্সা বুড়ো করজোড়ে বসে। আলাপ করিয়ে দিতে ভবেন বলল, 'কি দরকার আপনার? বাড়ি না জমি?'

কুবেরকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'রাস্তা নেই এমন জমি সরু পিয়াসলে দিতে পারি—ধান হয় এখনও, সাত হাজার টাকা বিঘে। এ-বছর পুকুর কেটে সামনের বছর ভিত বানাতে পারবেন। তৈরি বাড়ি যদি কেনেন—তাও পাবেন। এই তো বাজারের মোড়ে আছে—দোতলা, টিউবয়েল পুকুর দুই-ই আছে—একতলায় তিনখানা ঘর, দোতলায় ভাল চিলেকোঠা—চব্বিশ হাজার, পড়বে. রেজিস্ট্রি খরচ আলাদা।'

'অত টাকাই নেই আমার!'

'তাতে কি? এগ্রিমেন্ট করে নেব। দশ বছরের কিস্তিতে শোধ দেবেন—সাড়ে বারো পারসেন্ট সুদ পড়বে, দলিলখানা মর্টগেজ থাকবে আমার কাছে—শোধ হয়ে গেলে ফেরৎ পাবেন।'

কুবের বোমকে যাওয়ার দাখিল। এমনও হয় নাকি! মুখে বলল, 'তার চেয়ে স্টেশনের ধারাধারি আমায় একটু জায়গা দিন। ছোট্ট বাড়ি করে নেব সুবিধে মত। অফিস ফেরৎ ট্রেন থেকে নেমেই যেন বাড়ির উঠোন চোখে পড়ে—'

'তাই বলুন। যেমন চাইবেন তেমন পাবেন। কাল সকাল সাড়ে ন'টায় আসুন—সংগে লোক দেব—সরু পিয়াসলেই কুড়ি শতক—ধরুণ গিয়ে বারো কাঠা দু'ছটাক জমি আছে। চরণদার লোকটিকে গাড়ি-ভাড়া দেবেন দু'টি টাকা। একবেলা আটকে থাকবে বেচারা।'

বাইরে বেরিয়ে দেখল রুপোর একগাদা গয়না গায়ে এক ঘুঁটেওয়ালি দাঁড়ানো। কোলে একটা শাদা হাঁস। ভবেন শী ভেতর থেকে ডাকলো, 'কইগো—কি এনেছো?'

ব্রজদা কুবেরকে ভেতরে পাঠিয়ে কার সংগে কথা বলছিল। কুবেরকে দেখে এগিয়ে এল, সব শুনে বলল, 'ততক্ষণ আমার ওখানে বসবি চল—'

আভা বৌদি একটা বেঁটে ছাতা মাথায় দিয়ে কোত্থেকে ফিরছে। বাঁ হাতে একটা ব্যাগ, 'খালপাড় থেকে মাছ নিয়ে এলাম—মেছুনিরা রাতে পোলো বসিয়ে রাখে, ভোর ভোর তুলে পাড়ে বসেই যা ধরা পড়ে বেচে দেয়—'

ভোরে ব্রজদার বাড়িতে কুবের খেয়াল করেনি, আভা বৌদি ঘরে নেই। ফ্রিলের ঝালর দেওয়া ব্লাউজের হাতা কনুই ছাড়িয়ে নেমে এসেছে—তারপর লাল রঙের দু'গাছা ভারি কাচের চুড়ি—বালা বললেও দোষ নেই।

সেখ করে আসা সকালে টালির ছাদের নীচে এই চিলতে বারান্দার আলোই আসেনি। কাচের আঁচে এক-একটা আগুন শিখা হয়ে উঠছে—তাতে আভার মুখ, মুখে বসানো হলদে কালো চোখের মণি—সবই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কাল শেষ রাতে বুলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুম ভেঙেছে। ব্রজদা এক থাবলা তেল মাথায় চাপড়ে গামছা কাঁধে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয়ই সেই সেপাইয়েই কোদাল পুকুরে।

'দেখুন তো—এত ঝ্যাস্ত! অনেকক্ষণ ভাজলেও ভেতরে দগদগে রক্ত থাকে—', আভার একটা বেণী ঝপাং করে কুবেরের পিঠে পড়ল, বাসি তেলের গন্ধ মাখানো

আভা বৌদি একটা বেঁটে ছাতা মাথায় দিয়ে কোত্থেকে ফিরছে

মনোরমা টানা চোখে মণি দুটো হলদে হয়ে ঠেলে উঠেছে—কাল রাতে বেমক্কা খোঁচা খায়নি তো?

'বসবেন চলুন—টাটকা পুঁটি মাছ ভেজে দেব—'

ঘরে বসে ব্রজদা যা বলল, তার মর্মার্থ: ভবেন শী সস্তার বাজারে বন্ধকী কারবারে নামমাত্র পয়সায় বিরাট বিরাট সম্পত্তির একেবারে ফালতু মালিক হয়ে বসেছে। বন্ধকী সোনার গয়না মেয়াদ ফুরোতেই গালিয়ে বেচে দিয়েছে। এখন এত টাকা-পয়সা, জমি জায়গা, পুকুর, খামারবাড়ি যেনতেন না ওগরালে বিপদ। বয়েস বাড়ছে—বড় ছেলেটাও নেশাভাঙ ধরেছে, ঘরে গিন্নিরও রোজ পাকি এক পাঁট না হলে সন্ধ্যেই মাটি হয়ে যায়—এই অবস্থায় পুলিশ, ইনকাম ট্যাক্সের লোক সবাই ছোঁক ছোঁক করছে। টাকা দিয়ে কতদিক আর সামলাবে? তবে, লোক ভাল—গরীব হলেও ব্রজ ফকিরকে বিপদে আপদে দেখে।

'যা-ই বল, তোমার এত পিরীতের ভবেন কিন্তু সুবিধের নয়।' বারান্দায় তোলা উনুনে চাপানো কড়ায় মাছগুলো এপিঠ-ওপিঠ ভাজতে ভাজতেই আভা বৌদি বলল।

মুখটা তার ঠিক কপালের ওপরেই। অনেকটা ঝুঁকে পড়ে কথা বলছিল।

আভা হঠাৎ টান টান দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কাল সন্ধ্যে সন্ধ্যে আমি নিজেই খালপাড়ে গিয়েছিলাম—আপনার দাদা ফিরতে নেই রাত দশটা, জ্যোৎস্নায় মধ্যে হিটাহিটে একন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, শেষে একটা পাকুড় গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালুম—'

অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে বুক চিতোনো বোকা পাখির কায়দায় আভা দাঁড়িয়ে। কাল সন্ধ্যেবেলা হাতার তিনথাক ঢেউ তোলা এই ব্লাউজটা গায়েই হয়ত খালপাড়ে গিয়েছিল।

'মেছুনিদের পোলো বসাবার সময়—হাতে পয়সা নিয়ে গিয়েছি, তখন হাতে পেলে ওদের সুবিধে—হাটবাজার করে ফেরে—'

বড় একটা ধান্য পুঁটির পিঠ তুলে কুবের মুখে দিল।

'বৃষ্টি থামতেই পাকুড়তলা থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েছি—বাঁ হাতেই ইট-খোলার মাঠ জ্যোৎস্না পড়ে খাঁ-খাঁ করছে, আমার যেন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে অনেকক্ষণ—ভীষণ জল খাওয়ার ইচ্ছে হল, কোথায় যাই—একবার মনে হল মেছুনিরা পোলো বসিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ, ভুল সময়ে এসে পড়েছি; একেবারে একা-একা. এই মাঠে—কোথায় যাই. আচমকা নস্করদের পোড়ো বাগানে তাকিয়েছি—কী বলব আপনাকে. ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা দুই সারি তাল-গাছের ফাঁকে আকাশের সরু মত গলিটা ধরে চাঁদ একেবারে কদমপুরের মাথার ওপর নেমে এসেছে—'

একবার ইচ্ছে হল থামায় আভাকে। মোড়ায় বসে এক গ্লাস জল খেয়ে একটু জিরোক্। থামানো গেল না। মিড ট্রেনটা হাঁপাতে হাঁপাতে প্লাটফর্ম ছাড়ছে। দু'হাত

মেলে ধরল আভা, 'এই এত বড় চাঁদ, ঠিক এত বড়,' বলতে বলতে আভার হাত দু'খানা প্রায় বাতাস কাটতে শুরু করে দিল, 'কদমপুরের সবাইকে দেখতে নেমে এসেছে অনেকখানি—এত কাছে বলে স্পষ্ট দেখলাম চাঁদখানার ওপর অন্তত দু' ইঞ্চি পুরু করে নরম নীল মাখন মাখানো—' এখানে সামান্য থামল আভা, 'অথচ চিরকাল জেনে এসেছি চাঁদ হলুদ রঙের—'

পাখির মধ্যে ধনেশ নামটা কুবেরের অনেকদিনের পছন্দ। অথচ আজও দেখা হয়নি পাখিটাকে। নামটা এত সজল। নিশ্চয়ই খুব খোলামেলা বড় দুই ডানা থাকে। আভাকে কোনদিন এরকম জানত না কুবের। চাঁদের এতদিনকার রঙ নিয়ে ভাবনায় পড়ে দাঁড়ানো। মেলে ধরা হাত দু'খানা প্রায় বুজিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাকিটুকু আবজে দিল কুবের, তারপর পিঠসুদ্ধ মাথাটা একেবারে তার মুখের নীচে—শেষে ঝটকানো ঠোঁট একটা চুমোতে চেপে ধরল। কতক্ষণ এভাবে ছিল তা বোঝার আগেই আভা তার দুই হাতের ভেতর থেকে গলে গিয়ে বারান্দায় চলে গেছে—একেবারে কড়ার কাছে, হাতে খুন্তি, 'ডিম হয়ে গেছে বুঝলে—'

প্রথমে কিছু কানে গেল না কুবেরের। তারপর 'বুঝলে' কথাটা মনে পড়তেই সামনে তাকিয়ে দেখে একখানা মস্ত পিঠ, জলে ভিজে—তার দু' পাশ দিয়ে দু'খানা হাত উঠছে নামছে। রজ ফকির গা মুছে ভিজে গামছা মেলে দিচ্ছে।

'দিন—প্লেটটা এগিয়ে দিন, শেষের এই মাছগুলো ভাল ভাজা হয়েছে', কুবেরকে দিতে দিতেই আভা বলল, 'তুমি সন্ধ্যে করে পিঁড়েটা টেনে বস—আমার রান্না নেবে যাবে ততখোনে।'

রান্না মানে ঐ ভাজা মাছেই ঝোলের জন্যে জল বাটনা নামিয়ে দিয়ে কয়েক মিনিটে আভা কাটিয়ে ফেলল। রজদাকে ভাত বেড়ে দেওয়ার আগে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল।

'দিন প্লেটটা এগিয়ে দিন'

পৌষ মাসে জমি জায়গা বিক্রি হয় না। অঘ্রাণের শেষাশেষি বলরাম-ভুবনদের জায়গাটুকু হয়ে গেল। মোট এক একর চব্বিশ শতক—তিন বিঘে পনর কাঠা দশ ছটাক জায়গা বলরাম-ভুবনদের বাবা-কাকা-জ্যাঠাবাবুদের খরিদা সম্পত্তি। খাজনা সাত টাকা পাঁচ আনা তিন পাই। বাপকেলে জায়গাটুকুর দাম দলিলে দেখল নব্বই টাকায় কেনা। কুবের দলিল পড়ে অবাক। ইংরেজি সন উনিশশো বিয়াল্লিশের গোড়াই যে কেন ভুতনাথ সরদারদের কাছ থেকে মাত্র ওই টাকায় কেনা সম্পত্তির ভেতর জমির দাম সত্তর আর 'মাঠের খানা' কুড়ি টাকা। ভুতনাথরা আবার উনিশশো দুই সালে জমিদার হরি বাঁড়ুজ্যের খাস জমি থেকে তিন টাকায় ওই লপ্তটুকু কিনেছিল। সবটুকু নিতে কুবেরের মোটমাট বারো হাজার পড়ে গেল। বারো হাজার টাকা জোগাড় করতে কুবেরকে দল বাঁধতে হল। ভুতনাথরা বেঁচে আছে কি না জানা যায়নি। হয়ত কবে মরে হেজে গেছে। বেঁচে থাকলে না হোক আশি পঁচাশি বছর বয়স হত। তাদের এক জীবনের জায়গার দর চার হাজার গুণ বেড়েছে। অথচ সেই লাইন দিয়ে রেলই চলে, একই মাঠগুলো ধানই দিচ্ছে শুধু।

সারদা চাটার্জি লেন থেকে প্রসন্নের শ্বশুর রায়মশায়কে আনতে হল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে দেখে তিনি গামবুট পরেই বাসে উঠলেন। অঘ্রাণের ঠাণ্ডার সঙ্গে ছিটকে বৃষ্টি মিশে একেবারে হাড় অব্দি কাঁপিয়ে দেবার জোগাড়।

জল পড়ে পড়ে সাপের গর্ত বরফ হয়ে উঠেছে। জায়গা মাপার সময় আগাগোড়া একটা সাপ আল বদলে বদলে কুবেরদের দেখল মাথা তুলে। রায়মশায় বললেন, 'এ জন্যেই সব জায়গায় আমি একখানা লোহার গজ কাঠি নিয়ে যাই। লাঠির কাজ হয়ে যায়। আজই আনি নি।'

ভুবন সঙ্গে সঙ্গে সাপটাকে তেড়ে গেল, 'একদম বিষ নেই—এই দেখুন ধরে আনছি।' সত্যিই গেল। সাপটাও ভুবনকে দেখে মাথা একটু উঁচু করেই ছুট। তিন-চার হাত লম্বা তো হবেই। শুধু হাতে ফিরে হাঁপাতে লাগল ভুবন, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ঢ্যামনা!'

বহরিডাঙ্গা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে দুর্গা মুহুরির হাতে বন্দ দলিল লেখা হল। জে এল আর অফিসে নোটিশ পাঠানোর জন্যে দুর্গার সাকরেদ জয়কেষ্ট খাম পোস্টকার্ড সব রেডি করে দিল। বেলাবেলি রেজিস্ট্রি হয়ে যেতে ভুবনদের সঙ্গে বলুকে নিয়ে কালি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বড় বড় রাজভোগের মধ্যে ঢাকাই পরটা ঠেসে ভেঙে খেয়ে ফেলল কুবের। তাহলে এতদিনে জায়গা কেনা হল।

বারো হাজার টাকা জোগাড় করতে বলুর জামাইবাবু বলাই মহাপাত্র, তার বন্ধু রঙ কোম্পানির ধীরেন দাস আর মারোয়াড়ি হাসপাতালের স্টাফ নার্স ঊষাদিকে একত্র করে কুবের জায়গা কিনতে নেমেছিল।

পৌষ মাস কেটে গেল বণ্টননামা তৈরি করতে। হাজারো তকলিফ। ছ' কাঠার কমন প্যাসেজ সুদ্ধ নকশা তৈরি করে দিলেন রায়মশাই। তা ছাপাতে গিয়ে কিলবার্নের অফিসে ঢুকে কুবের অবাক। কত যন্ত্রপাতি, কত ম্যাপ, কত স্কেল। সবই তো জমি জায়গা, ঘরবাড়ি, সেতু-খালের জন্যে। আজকাল ম্যাপ বুঝতে আটকায় না কুবেরের। স্কুলবাড়ি, রাস্তা, ডাঙা জমি, ভদ্রাসন—সব কিছু চিহ্ন দেখে দেখে ম্যাপ থেকে খুঁজে বের করতে পারে।

এক এক মৌজায় কত জমি। এখন সরকার বাহাদুরের খাজনা জমে পড়ে। কিছুকাল আগেও জমিদার কাছারিতে গিয়ে দিয়ে আসতে হত। তখন নীলামে কত লাট হাত বদলাতো। জয়কেষ্ট বলছিল, 'এখন আর কি মামলা দেখছেন! বহরিডাঙ্গা রেজিস্টারি অফিস তো আজকাল শ্মশান। জমিদারি থাকতে চোত মাসে এই আমাদের সেরেস্তাতেই লোকে লোকারণ্য।'

ক্রমশঃ

জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের কালচার বিভাগের ভাইস কনসাল মিস কোমার্স-এর সৌজন্যে তাঁর বাড়িতে শিল্পী সুনীল দাশের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সুনীল দাশ সুপরিচিত। নিয়মিতভাবে নানা মাধ্যম ও আঙ্গিকে কাজ করার জন্য তিনি শিল্প-জগতে সুনাম অর্জন করেছেন। নিমন্ত্রিত শিল্পী ও শিল্পামোদীদের উপস্থিতিতে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে আয়োজিত এই প্রদর্শনী দেখে সকলেই আনন্দ লাভ করেন।

সুনীল দাশ বিমূর্ত শিল্পী। প্রদর্শনী-

ড্রয়িং —সুনীল দাশ

ভুক্ত সাম্প্রতিক কাজে শিল্পীর দুটি বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে তিনি রচনাক্ষেত্রের সমগ্র শূন্য স্থানটুকুর সুব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ হালকা ও সংযত রঙে রচনাক্ষেত্রটি ভরে ফেলে প্রধানত বৃত্ত ও জ্যামিতিক বিভিন্ন ক্ষেত্র সমাকভাবে স্থাপন করে নিজের মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। একটি রচনা অনেকের নজরে পড়ে, যেখানে একটি বৃত্ত ও ছোট ছোট রেখা প্রতীকের মধ্য দিয়ে তিনি একটি মুখমণ্ডলের সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে আবার তিনি রচনাক্ষেত্রের বৃহদংশটুকু শূন্য রেখে স্বল্পপরিসর স্থানটুকু নানা জীবজন্তু ও প্রতীক মাধ্যমে ভরে ফেলেছেন। প্রকৃত-পক্ষে এই জাতীয় কয়েকটি ড্রয়িং-এর নমুনাই তিনি তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সোসাইটি অব কনটেমপোরারী আর্টিস্টস-এর প্রদর্শনীতে পেশ করেছেন। এগুলির মধ্যে অবশ্য প্রাচীন লোকচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে কয়েক স্থলে ক্যানডিনস্কির অঙ্কনরীতি চোখে পড়ে। এই সঙ্গে আরও একখানি রচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাচীন লোকচিত্র অবলম্বনে রচিত একখানি মুখ। লম্বমান রচনাটির ওপরে লাল, কালো ও সবুজ ও দু পাশে সমপরিমাণ স্থান শূন্য রেখে শিল্পী যেন একটি সহজ ও সরল মুখ-মণ্ডলকে স্বাভাবিক রঙের একটি ফ্রেমের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। অথচ এটি বিমূর্ত রচনা নয়। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় আরও কয়েকটি ছবি থাকলে প্রদর্শনীটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠত।

*

কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্রের গ্যালারিতে সম্প্রতি সোসাইটি অব কনটেম-পোরারী আর্টিস্টদের এক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। নিষ্ঠা সহকারে নিজস্ব স্টুডিওতে নিয়মিতভাবে কাজ করা ও মাঝে মাঝে জনসাধারণকে সেই কাজ দেখবার সুযোগদান করে কয়েকজন তরুণ শিল্পী গঠিত এই সংস্থাটি অল্পদিনেই সকলের প্রশংসা লাভ করেছে। প্রদর্শনীতে গণেশ পাইন, সুহাস রায়, শ্যামল দত্ত রায়, সনৎ কর, অনিল সাহা, সুনীল দাশ, শৈলেন মিত্র, মানু পারেখ, লালু শা ও বিকাশ ভট্টাচার্যের মোট ২৯টি রচনা নিদর্শন দেখা যায়। কালি, তেলরঙ ও কোলাজের কয়েকটি কাজ ছাড়া অধিকাংশই গ্রাফিক প্রিন্ট। এদের কয়েকজনের কাজ ইতিপূর্বে অন্য প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। সংস্থার সকলেই প্রগতিবাদী ও আধুনিক রচনারীতির পক্ষপাতী। তবে গ্রাফিক বিভাগে কয়েকটি নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে, সভ্যগণ এ মাধ্যমেরও নিয়মিত চর্চা করে থাকেন—বিশেষ করে সুহাস রায় ও সনৎ করের প্রিন্টে খোদাই কারুকার্যের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। বিকাশ ভট্টাচার্য সাধারণত মনুমেন্টাল রিয়ালিজমের পক্ষপাতী এবং তাঁর সাম্প্রতিক রচনাতেও তার আভাস পাই। তবে কালি ও তেলরঙ মাধ্যমে আঁকা 'নেকেড হাঙ্গার' এক হিসাবে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অনাহারক্লিষ্টা, কংকালসার এক নারী যেন দুটি বিরাট মুষ্টিবদ্ধদান করে সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। এটি সমসাময়িক পটভূমিতে রচিত। তা হলেও অংকনরীতির দিক থেকে নারীর মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে অধিকতর সংগতি থাকলে ছবিখানি সম্ভবত আরও সার্থক হয়ে উঠত। শৈলেন মিত্রের কোলাজে (২৫নং) আলংকারিক রূপটুকু ফুটে উঠেছে। কালি ও ওয়াশ প্রথায় গণেশ পাইন রচনাক্ষেত্রে বিচিত্র কারুকার্য (texture) সৃষ্টি করেন। এই প্রসঙ্গে 'ভয়েজ'

জার্নি (এচিং) —সুহাস রায়

উল্লেখযোগ্য। গ্রাফিকে সুহাস রায়ের প্রিন্ট (জার্নি) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এচিং-এর মধ্য দিয়ে শিল্পী একটি লঘুপক্ষ উড্ডীয়মান পক্ষীর সাবলীল গতিছন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন। রেখামাধ্যমে ইমেজারি সৃষ্টি করা শ্যামল দত্তরায়ের বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, কালি ও ওয়াশ প্রথায় রচিত 'ডিজাস্টারে' তিনি এ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। সনৎ করের একটি প্রিন্ট সকলের চোখে পড়ে—এক্লিপ্‌সড্। খোদাই কার্যে এটি একটি সুন্দর নিদর্শন। অপরাপর শিল্পী সভ্যদের মধ্যে মানু পারেখ (২৭ নং), লালু শা (১১নং) ও অনিল সাহা (১)-র নাম করা যায়।

*

সংকীর্তন —শীতেশ রায়

শিল্পী সতীশ রায় তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন বিড়লা আকাডেমিতে। এটি তাঁর চতুর্থ একক প্রদর্শনী ও এখানে জলরঙ ও টেম্পারায় আঁকা ২১টি নিদর্শন দেখা যায়।

যতদূর মনে পড়ে, ইতিপূর্বে শিল্পীর রচনায় মিনিয়েচার প্রীতির আভাস পেয়েছিলাম। তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। প্রধানত তিনি শিল্পগুরু যামিনী রায়ের অংকনপদ্ধতি অবলম্বন করে স্থূলে ও বলিষ্ঠ তুলিরেখা দ্বারা বিষয়বস্তুর বহিরাকৃতি এঁকেছেন এবং কয়েক স্থলে প্রাচীন যুগের শিল্প নিদর্শন হিসাবে প্রাপ্ত জীবজন্তুর সীলের আকারের সঙ্গে এই অংকনরীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ফলে, দেশের প্রাচীন শিল্পের কোনও বিশিষ্ট ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করলেও এগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পী কোনও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারেন নি। দু একটি ছবিতে মিশরীয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়—যেমন সংকীর্তন। তা হলেও শিল্পীর কয়েকটি রচনা মন্দ লাগে না। উদাহরণ হিসাবে 'ধানভানা', 'গাজনের নাচ' ও 'দুগ্ধদোহন'-এর নাম করা চলে। শিল্পীর একখানি ছবি অনেকেরই চোখে পড়ে—'গৃহলক্ষ্মী'। চতুর্ভুজ অবলম্বনে রচিত এই ছবিখানির মধ্য দিয়ে শিল্পীর কল্পনা ও অংকনশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

*

সম্প্রতি আকাডেমি গ্যালারিতে খ্যাতনামা শিল্পী লক্ষ্মণ পাই-এর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করব। খ্যাতনামা শিল্পী সত্যেন ঘোষালের একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি দিল্লির ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস্ সোসাইটির গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রপ্রিয়

যোজনা ও শিল্পায়ণে বাঙালী

ভারতবর্ষের গ্রামের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার। সরকারী পরিসংখ্যান বলে যে তার মধ্যে এখন কিঞ্চিদূর্ধ্ব ষাট হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। পাঁচ লক্ষ গ্রাম এখনও প্রদীপ ও লণ্ঠনের ম্লান আলোয় নিষ্প্রভ; আর মাঝে মাঝে যখন কেরোসিন আর রেড়ির তেলের অভাব পড়ে—অপবণ্টন ও কালোবাজারীর জন্যে প্রায়ই তাই হয়—তখন গ্রামের ছেলেমেয়েরা সন্ধে হতে না হতেই কুলুঙ্গিতে বইখাতা তুলে রেখে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। অনেক গাঁয়ের ছেলেমেয়ে উদয়াস্ত মাঠে-ঘাটে কাজ করে। তাদের বর্ণপরিচয়ের সময় ওই সন্ধেটুকু। সেই সন্ধেটাও যদি হয় অন্ধকার, তবে তাদের নিরক্ষরতা ঘোচাবার উপায় কী? বিশেষ করে সেই জন্যেই বোধ হয় স্বাধীনতার একুশ বছর পরেও আমাদের এই উন্নতিশীল ভারতবর্ষের শতকরা মাত্র চব্বিশ জনের অক্ষর পরিচয় হয়েছে; ছিয়াত্তর জন থেকে গেছে নিরক্ষর।

নিরক্ষর মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধ থাকতে পারে না। সংখ্যালঘু শিক্ষিত লোক নিজেদের মর্জি মতন যে-পথে নিয়ে যাচ্ছেন সেই পথেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর আর অর্ধশিক্ষিতদের চলতে হচ্ছে। নিরক্ষরতাজনিত বিচারবুদ্ধির অভাবে পীড়িত জনমানসের কাছে ডেমোক্র্যাসি, মার্কসবাদ সব কিছুই ইম্পীরিয়্যালিজমের সামিল। তাঁদের দাসত্ব কোনো দিনও ঘুচবে না— কংগ্রেস রাজত্ব করুন, কি বাম কমিউনিস্ট গদি দখল করুন সকলের সঙ্গেই এই নিঃসহায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্বন্ধ হবে রাজা ও প্রজার।

কুলজিয়ান করপোরেশন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভাষ্যসমৃদ্ধ সুবিন্যস্ত প্রচার গ্রন্থাবলী পড়ে বস্তুতান্ত্রিক আমি প্রায় দার্শনিক হয়ে উঠলাম। কুলজিয়ানের কার্যসূচীতে এ যাবত থার্ম্যাল (তাপ-বিদ্যুৎ) পাওয়ার স্টেশন এবং নিউক্লিয়ার (আণবিক) পাওয়ার স্টেশনের পরিকল্পনায় কনসাল্টিং এঞ্জিনীয়ারের (উপদেষ্টার) দায়িত্ব পালন করাটাই প্রধান স্থান পেয়ে এসেছিল। উনিশ-কুড়িটা থার্মাল এবং দুটি নিউক্লিয়ার প্রকল্প-রূপায়ণের কাজে কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়া গোষ্ঠী দেশের শিল্পোন্নয়নে কতটা সহায়তা করেছেন এবং করছেন কেবল তারই মনোরম বিবরণ ওই লিটারেচারে। কিন্তু তাঁদের পরিকল্পিত এক-একটা শক্তিশালী পাওয়ার স্টেশন কত হাজার গ্রাম আলোকিত করে নিরক্ষরতা মোচনে কতটা সাহায্য করেছেন তার কোনো উল্লেখ নেই। সেটা থাকা উচিত ছিল।

উচ্চমার্গের তত্ত্ব নিয়ে কচকচি করা গেল বেশ খানিকটা। এবারে তথ্যে নেমে আসি। মনোহারিত্বে সে তথ্য রঙিন।

আমেরিকার সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'টাইম'-এর ১০ নভেম্বর, ১৯৬১ সংখ্যার 'Business Abroad' শীর্ষক সংবাদের 'Man to Envy' (ঈর্ষার পাত্র) অনুচ্ছেদের সবটাই আলোচনার যোগ্য।

"বারো বছর আগে (১৯৪৯-এ) ফিলাডেলফিয়ার হ্যারি অ্যাসডার কুলজিয়ানের সঙ্গে সাধনচন্দ্র দত্ত নামে এক উদ্যোগী ভারতীয় তরুণের (বয়স ২৮) পরিচয় হয়েছিল। ছেলেটি বেনারেস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ বি-এস-সি পাশ করার পর অ্যামেরিকায় জেনারাল ইলেকট্রিক কোম্পানীতে উচ্চশিক্ষা নিতে এসেছিলেন। সাধন দত্ত সাহসী যুবক। জি-ই-সিতে ট্রেনিং-এর পরে তিনি বৃদ্ধ কুলজিয়ানকে প্রস্তাব করে বসলেন যে তাঁকে কয়েক বছরের জন্যে ভারতবর্ষে 'কুলজিয়ান করপোরেশন অব ফিলাডেলফিয়ার' প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হোক।" কিন্তু এ কথাটাও হ্যারি কুলজিয়ানকে বুঝতে দিলেন যে তিনি চিরকাল কুলজিয়ান-অ্যামেরিকার তাঁবেতে থাকবেন না; কুলজিয়ানেরই সহায়তায় ও সহযোগিতায় ভারতবর্ষে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। সাধন দত্তের দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব হ্যারি কুলজিয়ানকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি রাজী হলেন।

বছরখানেক ফিলাডেলফিয়া অফিসে কাজ শিখিয়ে ১৯৫০ সালে সাধনচন্দ্রকে কুলজিয়ান-অ্যামেরিকার ভারতীয় শাখার কর্ণধার করে পাঠালেন।

শ্রীসাধন দত্তের পারিবারিক পরিচয়টা এখানে দিয়ে নেওয়া দরকার। ইনি ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় বিধানসভার সহ-সভাপতি এবং সেকালের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র দত্তের দৌহিত্র। গৌহাটি কটন কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ময়মনসিংহ নিবাসী স্বর্গত সুরেশচন্দ্র দত্তের পুত্র। শান্তিনিকেতনের ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় সাধনবাবুর আপন কাকা। ধীরেনবাবুও দর্শন শাস্ত্রে অতীতে অধ্যাপনা করেছেন এবং ভারতীয় ও ভারতের বাইরের দর্শনশাস্ত্রী মহলে সুপরিচিত।

সাধনবাবু বিবাহ করেছেন বসুশ্রী সিনেমার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীফণীভূষণ বসুর কন্যা ভারতী দেবীকে। সুগৃহিণী ও সুশিক্ষিতা ভারতী এবং সাধনচন্দ্রের একটিই সন্তান—কন্যা শান্তা।

ভালো কাজ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধন দত্ত ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এলেন। ধর্মতলার ম্যাডান স্ট্রীটে ছোট একটা এক-কামরার অফিস ভাড়া করে বসলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আশায় ভরপুর মন শূন্য হয়ে গেল। কাজ মেলে না। সাধন দত্ত রোগীর অপেক্ষায় সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা ডাক্তারের মতো নিষ্ফলা দিন গুণে কাটাতে লাগলেন। হ্যারি কুলজিয়ান বলেছিলেন "তুমি আমার ঈর্ষার পাত্র; তুমি নবীন, তোমার নবজাগ্রত দেশও এগোবার পথ খুঁজছে—এমন যোগাযোগ কোথায় মেলে?" কিন্তু সাধনচন্দ্রের অদৃষ্টে সে যোগাযোগ আর ঘটে না যেন। পুরো পাঁচটা বছর সাধনবাবু নতুন কাজের চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে কাটালেন আশাহত মনে।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সুদিন এলো। ১৯৫৬ সালে সাধন দত্ত দুর্গাপুরের ডি ভি সি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কনসালটান্টের কনট্র্যাক্টটি পেলেন। প্রায় ১২ কোটি টাকার প্রকল্প। এ যাবত এই ধরনের বিশাল কাজে উপদেষ্টার পদটি দখল করে বসে থাকতেন বিদেশীরা। সাধনচন্দ্র ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের দেশাত্মবোধে ঘা দিয়ে বললেন

যে দক্ষ ভারতীয় এঞ্জিনীয়াররাই প্রকল্পটির রূপ দিতে চান। সঙ্গে সঙ্গে বিজাতি-পূজারী আমলাতন্ত্রকে অভয় দিয়ে বললেন যে কুলজিয়ানের অ্যামেরিকান বিশেষজ্ঞরাও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, দরকার হলেই তাঁদের সাহায্যও নেওয়া হবে।

সাধন দত্ত সফলতার প্রথম সোপানে পা দিলেন। ছোট্ট এক কামরার অফিস উঠে এলো চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে একটু বড়ো একটা অফিসে। ম্যাডান স্ট্রীটের অফিসে থাকার সময়েই সাধন দত্ত দু'জন কৃতী বাঙালী এঞ্জিনীয়ারকে পাশে টেনে এনে-ছিলেন। প্রথমে এসেছিলেন সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এ পণ্ডিত ডক্টর অসীম মুখোপাধ্যায়। (শিবপুরের কৃতী ছাত্র এবং অ্যামেরিকার মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী ডঃ মুখার্জি এখন কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর)। তারপরে এলেন দক্ষ মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য। ইনি বেনারেস ও কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বর্তমানে ইনিও ডিরেক্টর।

ডি ভি সি দুর্গাপুরের প্রকাণ্ড কাজটির
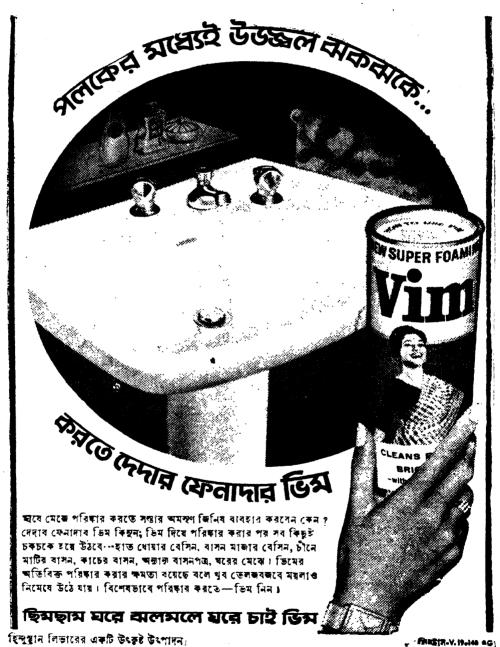
সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্যে এই তিন রথী তখন উঠে পড়ে লাগলেন উপযুক্ত কাজের লোকের সন্ধানে। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁদের পাশে জড়ো হলো সারা ভারতের সেরা এঞ্জিনীয়াররা—প্রায় সবাই নবীন, সবাই তাজা। তাঁদের কেউ বিদ্যুৎ-বিশারদ, কেউ স্থপতি, কেউ যান্ত্রিক, ভূতাত্ত্বিক আর ধাতু-বিদ্যায় পণ্ডিত। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-থেকে তাঁরা এলেন দেশী ও বিদেশী বিদ্যার পসরা নিয়ে। সাধন দত্তের নেতৃত্ব বরণ করে তাঁরা প্রয়োগবিদ্যার এক বিশ্বভারতী গড়ে তুললেন, যেখানে প্রাদেশিকতা আঞ্চলিকতা নেই, আছে কেবল গুণীর আদর।

কোনো পণ্য উৎপাদন বা বিপণনের প্রতিষ্ঠান হলে অবাঙালী নিয়োগ বিষয়ে আমার মন্তব্য যে স্বভাবতই বিরূপ হতো সেটা আমার রচনার নিয়মিত পাঠকের জানা আছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান সে শ্রেণীতে পড়ে না—কুলজিয়ান করপোরেশন একটি Brain Bank। সেখানে আঞ্চলিকতা নেহাত বোকামি ও ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু হতো না। তুলনা করে আমাদের অর্থ-মন্ত্রিত্বের কথা বলা চলে। একুশ বছরের অবিমৃশ্যকারিতা দেখে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীর পদে যদি জার্মেনীর সেই যাদুকর ডক্টর শাখ্‌ট্‌ বা তেমন আর কোনো বিদেশীকে প্রকাণ্ড মাইনে দিয়েও রাখা যেতো তাহলে আজ হয় তো আমাদের অর্থ-নীতির এমন দুর্দশা হতো না।

কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার কাণ্ডারী সাধন দত্ত ছোট পরিসরে সেই নীতির অনুসরণ করেই আজ কৃতকার্য হয়েছেন। তিনি কাশ্মীর থেকে এনেছেন ডক্টর হরিকৃষ্ণ মুখুকে, গুজরাট থেকে শ্রীমতী জ্যোতি দেশাই ও শ্রীপ্রাণশংকর ডাভেকে, দক্ষিণ থেকে শ্রীশুভ-কৃষ্ণকে, যাঁরা কুলজিয়ান আর বাংলা দেশকে ভালোবেসে, আর কুলজিয়ানের পরিচালক-বৃন্দ শ্রীসাধন দত্ত, ডঃ মুখার্জি, শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য এবং শ্রীসুনীল ঘোষ মহাশয়দের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য দিয়ে আজ বাঙালিত্বে আমার মতো কট্টর বাঙালীকেও হার মানিয়েছেন।

১৯৫০ থেকে এগারো বছর কুলজিয়ান করপোরেশন অব ফিলাডেলফিয়ার প্রতি-নিধিত্ব করবার পর শ্রীহ্যারি কুলজিয়ানের অনুমোদনে ১৯৬১ সালে সাধন দত্ত কুলজি-য়ান করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর স্থাপনা করলেন। এক লক্ষ টাকা মূলধনের কোম্পানীর ৫১ পারসেণ্ট শেয়ারের মালিক হলেন সাধন দত্ত, অসীম মুখার্জি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের আদি কর্মীরা, আর ৪৯ পারসেণ্ট-এর অংশীদার রইলেন হ্যারি কুলজিয়ান গোষ্ঠী। কিন্তু এখন থেকে মস্তিষ্ক অর্থাৎ Brain Bank-এর পুরো মূলধনটাই হয়ে গেল বাঙালীর। কুলজিয়ান-অ্যামেরিকা এখন ধীরে ধীরে পটভূমিকা থেকে সরে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তাঁদের ৪৯ পারসেণ্টও সাধনবাবুদের হাতে আসবে। টেকনিক্যাল নো-হাউয়ের ব্যাপারে কিন্তু সাধনবাবুরা এখনো উন্নত নানা দেশের অগ্রগামী কনসালট্যাণ্ট ফার্মের বিজ্ঞানী এবং এঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ রেখেই চলেন। বিজ্ঞান জগতে প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রণালী, নব নব আবিষ্কার হয়ে চলেছে; তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে পারার জন্যে এই সংযোগ অবিচ্ছেদ্য।

অফিস বড়ো হতে লাগলো; চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের অফিসে আর কুলোয় না—তাই এবারে কুলজিয়ান ইণ্ডিয়া ২৪-বি পার্ক স্ট্রীটের মস্ত ম্যানসন বাড়ির ছ' তলাটি দখল করলেন। আরও কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতলাটা ভাড়া নিলেন এবং সব শেষে নিলেন এক তলাটা। একে একে দিল্লী, বোম্বাই আর পাটনাতেও কুলজিয়ানের ব্রাঞ্চ খোলা হলো।

—

কুলজিয়ানের ছ'-তলার অফিসের দরজায় রিসেপশনিস্ট শ্রীমতী বিজলী চক্রবর্তীর (এঁদের দেখছি বিদ্যুতের প্রতি বেজায় দুর্বলতা—অভ্যাগতকে স্বাগত জানাবার জন্যেও বিজলী নামের সুন্দরী মেয়েটিকে রেখেছেন!) ক্ষিপ্র টেলিফোন অপারেশন দেখে আর স্মার্ট ও দ্রুত কথাবার্তা শুনে ভেবেছিলাম যে অফিসের ভেতরেও দেখবো সকলেই দ্রুত লয়ে কাজ করছেন। কিন্তু ঢুকে দেখলাম অনুমানের একটা মিলছে, অন্যটা নয়। নবীনতায় সমস্ত অফিসটা ঝলমল করছে ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন একটা শান্ত, বিলম্বিত ভাব। এক টাইপ-রাইটার মেশিনের খটখট আর মাঝে মাঝে ফোনের আওয়াজ ছাড়া বিশেষ কোনো শব্দ নেই। শুনেছিলাম খাস অ্যামেরিকান প্যাটার্নের অফিস, তাই ধারণা নিয়ে এসে-ছিলাম যে এখানে সবাই হলিউডের ছবির মতন পঞ্চমে গড়ে আলোচনা করেন, ধৈবতে হালকা কথা বলেন, আর হাসেন সপ্তমে। কিন্তু সাধন দত্তের ভাবে ধীরতা, কথা বলার স্বরে মৃদুতা। মনে হয়েছিল যে ভদ্রলোকের খুব আস্তে আস্তে কাজ করা অভ্যেস, কিন্তু তাঁর টেবিলে মিনিট পাঁচেক বসেই বুঝলাম যে he hurries slowly, যেটা হলো নেতৃত্বের সবচেয়ে বড়ো গুণ। আমার সঙ্গে সৌজন্য বজায় রেখে কথা বলা, সেক্রেটারি রমনা ঘোষকে কাজের নির্দেশ দেওয়া আর মাঝে মাঝে টেলিফোন অ্যাটেণ্ড করা, সবেতেই একটা লালিত্য আছে। পরদিনই দিন কয়েকের জন্যে ব্যাংকক যাচ্ছেন থাই-ল্যাণ্ডে একটা দেড় কোটি ডলারের নিউজ-প্রিণ্ট (কাগজের) মিলের পরিকল্পনা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে। তাই

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই হাতের কাজগুলি সারছেন। বললেন, "এটাও এক্স-পোর্টের কাজ, তবে যন্ত্রপাতির নয়— বুদ্ধি পরামর্শের রপ্তানি। এতেও ভালো ফরেন এক্সচেঞ্জ আসে।" (এই প্রবন্ধটি লিখে শেষ করার আগেই সাধন দত্ত ব্যাংকক থেকে খুশি মনে ফিরে এসেছেন। এবারে বললেন যে, কেবল কনসালট্যান্টের সাময়িক কাজই নয়, নিউজ-প্রিন্ট মিলটা গড়ে তোলা এবং চালু হবার পরেও স্থায়ীভাবে তার পরিচালনার ভারও কুলজিয়ান-ইন্ডিয়া পেয়েছেন; অর্থাৎ বিড়লারা যেমন অ্যাবিসিনিয়াতে কটন মিল বসিয়েছেন, সেইরকম। এই সিরিজের প্রবন্ধ লেখা শুরু করার সময়ে আমার বাঙালী পাঠকরা বলতেন যে, বাঙালীর ব্যবসা কোথায় যে তা নিয়ে আমি লিখবো। গোটা ত্রিশেক ব্যবসার হিসেব এই দশ মাসে দেবার পর তাঁরা বলছেন যে, ছোট আর মাঝারি কারবারে থাকলেও বাঙালী 'বিগ বিজনেসে ফেলিওর'। এখন সাগর পাড়ি দিয়ে সাধন দত্ত-অসীম মুখার্জিরা ১১ কোটি টাকার মিল চালাতে যাচ্ছেন শোনার পর আশা করি আমাদের নৈরাশ্যবাদী বাঙালী পাঠকরা তাঁদের মত বদলাবেন)।

এক সুদর্শন যুবক সাধনবাবুর ঘরে ঢুকলেন। আলাপ হলো—ইনি কুলজিয়ানের সেলসের অন্যতম কর্তা ডক্টর হরিকৃষ্ণ মুখেদু। এবারে আমার ভার নিলেন সাধন দত্ত-র এই চৌকস সহকারী।

সোজা কাজের কথায় আসাটাই দেখলাম হরিকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। নিজের চেম্বারে আমাকে নিয়ে গিয়ে বসতে না বসতেই বলতে আরম্ভ করলেন যে, কনসাল্টিং এঞ্জিনীয়ারের এমন কোনো কাজ নেই যা কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়া এই ১২ বছরে করে নি। শেষ যে কাজটা হাতে এসেছে সেটা হলো ১০০০ মেগাওয়াট (মানে, ১০ লক্ষ ওয়াট) বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারের ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুলিয়া-সাঁওতালডিহির 'মহা-থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশন।'

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হরিকৃষ্ণ মুখেদু গড়গড় করে বাংলা বলেন,ব্যাকরণে উচ্চারণে ভুল হলেও পরোয়া করেন না। এটা কিন্তু নতুন ভাষা শেখার ভালো রাস্তা। এর চেয়েও ভালো আর একটা উপায় আছে—যে-ভাষাটি শেখার ইচ্ছে সেটা যার মাতৃভাষা তেমন একটি মেয়েকে বিয়ে করা। তাহলে উচ্চারণ, ব্যাকরণ, ইডিয়াম সব তাড়াতাড়ি রপ্ত হয়ে যায়। তা হরিকৃষ্ণকে আমি এই সব পার্সনাল ও প্রাইভেট কথা প্রথম আলাপেই বলতে কুণ্ঠা বোধ করলাম। তাছাড়া উনি বিবাহিত কিনা তা-ও জিজ্ঞেস করা হয় নি।

সাধন দত্তের সঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচিত একটি কথা হরিকৃষ্ণ রিপিট করলেন : "আই-ডি-বি-আই, আই-এফ-সি প্রভৃতি আমাদের অতিকায় সরকারী বিনিয়োগ সংস্থা আর ভারত সরকার মক্কার দিকেই তাকিয়ে আছেন। পশ্চিম ভারতের শিল্পো-ন্নয়নের জন্যে, যোজনার জন্যে তাঁদের ধন-ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন। পূর্বের আমরা বহু চেষ্টার পেয়েছি দুর্গাপুরে ফার্টিলাইজার, হলদিয়া আর সাঁওতালডিহি প্রকল্প। আগে হুমায়ুন কবীরের টাইমে তাঁর চাপে দুর্গা-পুরে ফার্টিলাইজার আর হলদিয়া পাওয়া গিয়েছিল। এখন পশ্চিম বাংলার জন্যে কথা বলার কেউ যেন নেই সেণ্ট্রাল ক্যাবিনেটে।" হরিকৃষ্ণ বাংলা আর বাঙালীকে আপন করে নিয়েছেন।

ডঃ মুখেদুর নির্দেশে তাঁর পি এ অঞ্জলি চ্যাটার্জি (টানা টানা কালো চোখের শ্রীমতী একটি মেয়ে) ঝকঝকে দামী আর্ট পেপারে ছাপা কুলজিয়ানের একটা প্রচার পুস্তিকা আমাকে দিলেন। এঁদের প্রচার সচিবের কৃতিত্বের নিদর্শন এটা।

কোথায় আসামের নাহারকাটিয়া আর গৌহাটি থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশন, চন্দ্রপুরার ৪নং ইউনিট, বারাউনি, গুজরাটের ধুবেরণ আর মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা (বাংলার দুর্গা-পুর, ব্যাণ্ডেল আর নির্মীয়মান সাঁওতাল-ডিহি তো আছেই) ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার কীর্তি। কুলজিয়ানের ড্রয়িং অফিসে প্রধানত বাঙালী দিগ্গজ ছেলে-মেয়ের হাতে টানা নকশা আর কার্যসূচীর নির্দেশ অনুসরণ করে ভারতবর্ষের ১৯।২০টা থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশনের উৎপত্তি হয়ে চলেছে।

আর হচ্ছে ডিরেক্টর অশোক ভট্টাচার্য এবং 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার'-এর মহাকাণ্ডে বাৎপন্ন কুমিল্লার ছেলে তপব্রত ভরদ্বাজের তত্ত্বাবধানে নির্মীয়মান বোম্বাইয়ের তারাপুরে এবং দক্ষিণের মাদ্রাজ 'অ্যাটমিক পাওয়ার প্রোজেক্ট' দুটি। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

সরকার বাহাদুরকে যতই দোষারোপ করি না কেন অগ্রগতির মন্থরতার জন্যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্রমিক উন্নতির ছবিটা খুব খারাপ নয়। ভারতবর্ষে ইলেকট্রিসিটির ইতিহাসটা প্রাচীন নয়। সংক্ষেপে বলা যায়।

১৮৯১ সালে, অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডনের মাত্র ১৭ বছর পরে ভারতবর্ষে প্রথম বৃহদায়তন থার্ম্যাল জেনারেটিং সেট বসানো হয়েছিল। তার শক্তি ছিল ১০০০ কিলোওয়াট। তার দীর্ঘদিন পর ১৯২৫ সাল অবধি আর উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয় নি। আমরা তখন ইংরেজের জমিদারিতে কৃষক আর বেনে। শিল্প-টিল্প নেই, বিদেশে চা-পাট এই সব রপ্তানি করি। তবুও আস্তে আস্তে অনেকটা বাড়লো। তারপর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়ে আমাদের ভাগে পড়লো আন্দাজ ১৪ লক্ষ কিলো-ওয়াট। প্রথম পাঁচসালা যোজনার গোড়ায় অর্থাৎ ১৯৫১ সালে ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট থেকে দ্বিতীয় যোজনার শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছিল ৫৭ লক্ষতে। সেই জায়গায় বর্তমানে আমাদের শক্তি হয়েছে আন্দাজ ১ কোটি ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট।

এই বিদ্যুৎ শক্তিতেই আমাদের শহরে শহরে আর ৬০।৬৫ হাজার গ্রামে আলো জ্বলছে, ইলেকট্রিক ট্রেন চলছে আর যাবতীয় শিল্প প্রচেষ্টাও শ্লথগতিতে এগোচ্ছে।

ডক্টর মুখেদু ছাড়া ভারতের নানা অঞ্চল থেকে অভ্যাগত আর যে-ক'জন কৃতী এঞ্জি-নীয়ার আছেন তাঁদের মধ্যে আমার অল্পবিস্তর আলাপ হলো ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীমতী জ্যোতি দেশাই, স্ট্রাকচারালে শ্রীপ্রাণশংকর ডাডে এবং শ্রী তি কে কানসাগারা (এঁরা তিনজন গুজরাটী), শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, শ্রীশেষাদ্রি ও শ্রী জি কে সুব্রহ্মনিয়ম (দক্ষিণের), শ্রীরণধীর সিংহ এবং শ্রী জি এল কিষণ (বিহার) প্রমুখ কয়েক-জনের সঙ্গে।

এঁরা সবাই হলেন সাধন দত্তের ঘরের লোক—কুলজিয়ান ইণ্ডিয়ার কর্মী, যাঁরা একবার এই বাঙালী নেতৃত্বকে বরণ করে নিয়ে আর কোনো দিনও স্বেচ্ছায় অন্যত্র যান না, যেতে চান-ও না।

হরিকৃষ্ণের টেবিলে আমার পাশে এসে বসলেন ছত্রিশ বছর বয়স্ক মেটালার্জিস্ট শ্রীবিমলগতি রায় (শিবপুর ও শেফিল্ড)। আলোচনা আরও জমে উঠলো পশ্চিম ঘাটের খোপোলি-তে অবস্থিত 'মাহিন্দ্র-ইউজিন অ্যালয় স্টীল প্ল্যাণ্ট'-এর পরিকল্পনায় কুলজিয়ানের কাজের, 'ওড়িষ্যা ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন'-এর ফেরো-ভ্যানাডিয়াম প্ল্যাণ্ট গঠনে এঁদের উপদেষ্টা পদের কথায়। পরে এই বিষয়ে বিশদভাবে আরও আলোচনা হয়েছিল এঁদের আর এক তরুণ মেটালার্জিস্ট শ্রীঅনিল ব্যানার্জির (লণ্ডনের ডিগ্রিধারী) সঙ্গে, যিনি কাজের পরেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন আর সেসব নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল পত্রপত্রিকায়।

অনিলবাবু এবং তাঁর আরেক সহকর্মী মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীঅসিত চক্রবর্তী (শিবপুর ও ইউ এস এ) শুধু যে তাঁদের ভদ্রতায় মুগ্ধ করলেন তাই নয়, আমাকে দুপুরের খাওয়াটাও সেরে যেতে বাধ্য করলেন। ভোজনবিলাসী আমি নিঃসংশয়ে একটা শংসাপত্র কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার ক্যানটিন-সুপারভাইজার শ্রীরামচন্দ্র রায়কে ইস্যু করতে পারি। তিনি ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন কোম্পানীর সাহায্যে পরিচালিত এই ক্যানটিনে, যেখানে পিওন-ড্রাইভার থেকে ডিরেক্টর পর্যন্ত সকলেই একই রকমের আহার্য ভক্ষণ করে থাকেন।

অসিতবাবুরা বললেন কেমন করে কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার expertise (এক্সপার্টিজের মানে বিশেষজ্ঞের উপদেশ) আদর করে নিয়েছেন দূর প্রাচ্যের প্রকাণ্ড মেকং সিমেণ্ট প্রোজেক্ট আর কেনিয়ার (পূর্ব আফ্রিকা) ২০ কোটি টাকার পেপার-মিলের প্রতিষ্ঠাতাবর্গ। শ্রীবিজন দাশগুপ্ত নামে কুলজিয়ানের এক তরুণ পেপার টেকনো-লজিস্ট প্রধানত দ্বিতীয় কাজটির তত্ত্বাবধান করছেন।

বৈদ্যুতিক বিভাগের কর্তা শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত কোম্পানীর কাজে কলকাতার বাইরে গেছেন। নানা কথার মধ্যে তাঁর তরুণ সহকারী শ্রীআশিস ভৌমিক ব্যাখ্যা করলেন যে কেমন করে সায়ণ্টিফিক (সাম্প্রতিক বিতণ্ডার স্রষ্টা অ্যাকাউণ্টিং যন্ত্র নয়) কমপিউটার যন্ত্রের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ তাঁদের উৎপাদনের উন্নতি করতে পারেন। উপাদানের মান নির্ণয়ে এই যন্ত্রের কতটা কার্যকরতা সেই সব মহা-তত্ত্ব আশিস-বাবু আমার নিরেট মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করলেন।

কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার ড্রয়িং অফিস (যার ছোট একটু অংশের ছবি প্রবন্ধের শিরোনামের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে) দুটির মধ্যে যেটি প্রধান সেটি যেন প্রকাণ্ড একটা পরীক্ষার 'হল'। সেখানে সারি সারি টেবিলে

ট্রেসিং-পেপার, স্কেল আর তুলি-পেনসিল নিয়ে নীরবে কাজ করে চলেছেন প্রায় পঞ্চাশ জন তরুণ ও তরুণী চিত্রকর। চিত্রকর শব্দটাই ব্যবহার করছি, কারণ তাঁরা এ'কে চলেছেন ভারতবর্ষের শিল্পায়নের ছবি। 'মাস্টার মশাই' সদৃশ দু'-একজন প্রৌঢ় এ-টেবিল থেকে সে-টেবিলে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখছেন; আবার কেউ কাজ করছেন হল-ঘরের পাশে কাঁচে ঘেরা ছোট ছোট চেম্বারে।

পরীক্ষার-হল বললাম বটে, কিন্তু শিল্পীরা সবাই উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম পরীক্ষা পাস করেই এখানে এসেছেন। এখানে কিন্তু সরকারী গ্রেড-ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর-এর মতন কিছু নেই যে একজন গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারে বসবেন, আরেকজন বসবেন টুল-এ। যিনি ডক্টরেট-বিভূষিত, নির্বিচারে সকলের সংগে তাঁরও আসন টুল।

এই ভারী ভারী ডিগ্রিধারী 'শিল্পীদের' মধ্যে মেয়েদের কথাটাই আগে বলি। এ'দের দেখলে গর্ব হয়।

দুজন আর্কিটেক্ট (স্থপতি) শ্রীমতী দেববানী মজুমদার (শিবপুর ও ইউ এস এ) এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনগুপ্ত (দিল্লি পলিটেকনিক ও ইউ এস এ), আর দুজন 'ড্রাফট্সম্যান' শ্রীমতী নিলু দত্ত (ইলেকট্রিক্যাল) ও শ্রীমতী প্রণতি গুপ্তর (মেকানিক্যাল) নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী জ্যোতি দেশাইয়ের কথা আগেই বলেছি।

বিশ্বকর্মা হলেও আমি আমার রাইভ্যাল ইন্দ্রপ্রস্থ আর স্বর্ণলংকার স্রষ্টা ময়দানবের অ্যাডমায়ারার। তাই আর্কিটেক্টদের প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। দেববানীর স্বামী আর্কিটেক্ট শ্রীদীপক মজুমদার স্ত্রীর কাছাকাছি আর একটা টেবিলে বসে গভীর মনোযোগে কাজ করছেন। শিবপুরে এ'রা দুজন একসংগে পড়তেন আর পালা করে ফার্স্ট-সেকেন্ড হতেন। দুই আর্কিটেক্ট মিলে নিশ্চয়ই দুর্দান্ত প্ল্যানের একটি ভালো বাসা তৈরি করেছেন বা করবেন নিজেদের জন্যে। কৃষ্ণা আর তাঁর স্বামী, এখানকার প্রাক্তন আর্কিটেক্ট শ্রীসুভাষ সেনগুপ্তর ইতিহাসও খানিকটা একরকমের। তবে তাঁরা দুজনে এখানে কাজ করার সময়েই মন দেওয়া-নেওয়া করেছিলেন বলে শুনলাম।

বিশাল সরকারী প্রকল্পই হোক, আর প্রাইভেট সেক্টরের কোনো বিরাট কারখানাই হোক, প্রচেষ্টার কার্যকরতা (feasibility) বিষয়ে নিঃসংশয় হবার পর রূপায়ণের কুশীলবদের মধ্যে অন্যতম প্রধান অংশে মঞ্চে অবতীর্ণ হন আর্কিটেক্ট আর সিভিল এঞ্জিনীয়াররা। তাঁদের মিলিত প্রয়াসে প্রকল্পের বহিরাঙ্গ গড়ে ওঠে। সরেজমিনে প্রকল্পের পটভূমিকা পরিদর্শনের পর টাউন-প্ল্যানিং আর কলকারখানার পরিকল্পনা নিরূপিত হয়। তাঁদের নকশা-কে ভিত্তি করে সংগে সংগে কাজ শুরু করেন স্ট্রাকচারাল, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারবর্গ। 'দরপত্র' অর্থাৎ টেণ্ডার ডাকা হয়। টেণ্ডার এলে তার থেকে উপযুক্ত টেণ্ডারারকে বাছাই করা হয় এবং পর্যায়-ক্রমে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প বা ফ্যাক্টরীকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে উৎপাদন আরম্ভ করানো হয়। খুব সংক্ষেপে বলা চলে, যে এযুগের কনসাল্টিং এঞ্জিনীয়াররা এই কষ্টসাধ্য কর্ম-সূচীর শুরু থেকে শেষ সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিয়ে মেশিন পর্যন্ত চালু করে মালিকের হাতে তৈরি জিনিসটি তুলে দেন। মালিক চাবিটি ঘোরালেই কারখানা চলতে থাকে বলে এই কার্যসূচীকে আজকাল বলা হয় Turn-key প্রণালী।

আর্কিটেক্টদের মধ্যে আরও দু'একজনের কথা শুনলাম। তাঁরা হলেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী (শিবপুর) এবং শ্রীঅতীন দত্ত (খড়্গপুর আই আই টি ও ফিনল্যাণ্ড)। অতীন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং বিশ্বভারতীর নবনির্মিত বিজ্ঞান-ভবনটির প্ল্যানিং ও নির্মাণের তত্ত্বাবধান তিনিই করেছিলেন কুলজিয়ানের হয়ে।

কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়া বিশ্বভারতীর একাধিক বাড়ি তৈরি করায় উপদেশ দেওয়া ছাড়াও কলকাতার আর্মেনিয়ান কলেজ এবং জয়পুরিয়া কলেজ বিল্ডিং তৈরির ব্যাপারেও উপদেষ্টার কাজ করেছেন। ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন কোম্পানীর নূতন অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটাও কুলজিয়ানের এক মনোরম কীর্তি।

ডিরেক্টর শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য আরও দুজন কৃতি তরুণ বাঙালী এঞ্জিনীয়ারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। পেপারপ্রোজেক্ট ও পাওয়ার-স্টেশন বিশারদ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (শিবপুর) এবং বয়লার ও বাষ্প-বিশারদ শ্রীগণেশচন্দ্র নন্দী। দ্বিজেন্দ্রলাল এক মিনিয়েচার টমাস এডিসন। তাঁর পরিকল্পিত ৬টা যন্ত্রের পেটেন্ট নেওয়া হয়েছে; অথচ ভদ্রলোকের বিলিতী ডিগ্রি নেই—সহজাত যান্ত্রিক মেধার অধিকারী তিনি।

ড্রয়িং অফিসের 'মাস্টার মশাই'দের কথা বলা হয়নি। শ্রীসুহাস রায়চৌধুরী (শিবপুর ও ইংল্যাণ্ড) এবং শ্রীশান্তিভূষণ মজুমদার (শিবপুর ও ইংল্যাণ্ড), যিনি একদা শিবপুর বি-ই কলেজে অধ্যাপনাও করে-ছিলেন, আমাকে কুলজিয়ানের অন্যান্য কাজেরও বিবরণ দিলেন। কানপুরে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস্-এর ৬০ কোটি টাকার কৃষি-সার উৎপাদন প্রকল্প, গুজরাট স্টেট ফার্টিলাইজার কোম্পানী, বিহার স্টেট সিমেন্ট প্রোজেক্টের পরিকল্পনা এই সবের কথা শুনলাম। অনেক অনেক কাজ—যার পূর্ণ বৃত্তান্ত এখানে বলা অসম্ভব—কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়া দুরন্ত বেগে করে চলেছেন।

বয়সে প্রবীণতম দুজন অফিসারের মধ্যে একজন শ্রীঅমিয়বন্ধু বসু অতীতে মাদ্রাজে সরকারী এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। পরে দিল্লি ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর চীফ এঞ্জিনীয়ারের পদে কাজ করে ১৯৬৪তে রিটায়ার করেন। সেই সময় থেকেই তিনি কুলজিয়ানে আছেন। আর একজন প্রবীণ অফিসার-এঞ্জিনীয়ার আছেন—শ্রী এন কে চৌধুরী। তাঁর সংগে আলাপের সৌভাগ্য আমার হয়নি।

সাধনবাবু বলেছিলেন যে, Viability (টি'কে থাকার ক্ষমতা) যে-কাজে নেই কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়া সে-কাজে সরকারী বে-সরকারী সব প্রতিষ্ঠানকেই এগোতে বারণ করেন। সেক্ষেত্রে মোটা পারিশ্রমিকের লোভেও এ'রা কাজটা হাতে নেন না।

একটা কথা বিশেষ করে আমার মনে জাগছে—সাধনবাবুকে একটি অনুরোধ করতে চাই। অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালী পত্রযোগে আমার কাছে 'উপদেশ' চান যে, ৮/১০ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে কোন্ স্বাধীন ব্যবসাতে নামলে তাঁরা পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে পর্যাপ্ত উপার্জন করতে পারেন। কুলজিয়ান বিনা পারিশ্রমিক বা যৎসামান্য নিয়ে এই শিল্পোৎসাহী ক্ষুদ্রশক্তি বাঙালীদের টেকনিক্যাল-নো-হাউ এবং সৎপরামর্শ যোগাবার মতো ছোট একটি বিভাগ খুলুন। সামান্য পুঁজির বাঙালীরা যেন অন্ধের মতো ব্যবসা করতে নেমে মার না-খান।

সাধনচন্দ্রের সংগে আলোচনার উপসংহারে কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার বিরাট প্রচেষ্টাতে কোম্পানীর লাভ, রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "ওই যে আমাদের নবীন ও প্রবীণ কর্মীদের আপনি দেখেছেন, তাঁরাই আমাদের রিজার্ভ ফাণ্ড।"

কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়া ডিভিডেণ্ড দিক বা না দিক, গোত্রপতি সাধন দত্তের নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ভারতবর্ষের ব্রেন-ট্রাস্টের গিল্ট-এজড্ রিজার্ভ—কুবেরের ভাণ্ডার যার কাছে হার মানে। পরিবেশ অনুকূল হলে এই প্রতিভার ভাণ্ডার দেশের কোটি কোটি লোকের আত্মিক ও আর্থিক উন্নয়নে অর্বুদ মেগাওয়াটের শক্তি সঞ্চার করাতে পারবে। এমন এক ডেমোক্র্যাসি, এমন এক করপোরেট ইকনমি ভারতে গড়ে তুলতে পারবে যা দেখে বিশ্বনিন্দুকেরাও স্তব্ধ হয়ে যাবেন।

বিশ্বকর্মা

ডঃ নারা ও শ্রীমতী ইয়ামাদার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন লেখক

জি জ্ঞাসাবাদ সূত্রে আমার পালা এসে পড়ল। উদ্দেশ্য পরিচয় প্রদান, বলতে হবে নাম এবং ধাম। বললাম, অধমের নাম। এবারে ধাম? বলতে গিয়ে সেই কোন্ রসিক জনের গল্পটা মনে পড়ে গেল। রেডিওতে ব্যায়াম-শিক্ষা হচ্ছে। কোথাকার কোন্ রেডিও এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। ঘোষক বলছেন—"সোজা হয়ে দাঁড়ান, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন; আচ্ছা এবারে বাঁ-হাত তুলুন। ডান হাত তুলুন! বাঁ-পা তুলুন ডান-পা তুলুন। তুলেছেন? শূন্যে ঝুলুন।" টোকিওর ছোট্ট একটা ঘরোয়া বৈঠকে সেদিন উপস্থিত ছিলেন পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের জন কয়েক বাঙালী, সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন জাপানবাসী। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, বাংলা দেশ ছেড়ে এই সুদূর টোকিওতে এঁদের উদ্দেশ্য ছিল, সকলে মিলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কিছু আলোচনা। সেই বৈঠকী আলোচনায় সকলেই নিজের নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন। অতএব 'ধাম' বলতে গিয়ে গল্পটা বলে বসলাম। পারিপার্শ্বিক চাপে ভগবান আছেন কি নেই এমন চিন্তা করবার মতন মানসিক অবস্থাও আমরা হারাতে বসেছি। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা আছেন, বেশ ঘটা করেই বিরাজমান। তাঁর "সেই অধৈর্যে্য ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে..." আর সবুর সইল না; নূতন সৃষ্টিকে আবাহন করতে গিয়ে পুরাতন যে করলেন বিধ্বস্ত। তারই বলি প্রদত্ত সেই সব 'মা' যাঁরা হারালেন সন্তান, সেই সব স্ত্রী যাঁরা হারালেন স্বামী, সেই সব ছেলেমেয়ে যাঁরা পিতামাতা দুই-ই হারাল, আর সম্পূর্ণভাবে যাঁরা ভিটেমাটি হারিয়ে হলেন সর্বহারা, তাঁদেরই ডাক দিয়ে শেখাতে হল "দেশকে" ভালবাস। হায়—বাঙালীর জীবনে সে কি পরিহাস! এই যূপকাষ্ঠে ব্যায়াম শিক্ষার্থীর মত "শূন্যে-ঝুলুন" অবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষ হাওয়ায় ভেসে চলল। পুরোনো দিনে বর্শাফলকে শত্রুপক্ষের ছিন্ন মস্তক যেমন হতো খেলার সামগ্রী, অগণিত ভাগ্য তেমনই বহন করে চলল, তাদের না জানা অপরাধের বিরামহীন সাজা, ভাগ্য বিধাতার খেলার সামগ্রী। ১৯৪৭ সালে বাংলা আর পাঞ্জাব হল দ্বিখণ্ডিত। সেই দিন থেকেই অন্যে যখন বলে Independence, তখন এঁরা দুই প্রদেশবাসী যোগ করে "partition."

২৮শে জুন, ১৯৬৮। প্রবাস জীবনে আমার একটা সার্থকতম দিবস। প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা আমাদের সকলের। সেদিন সান্ধ্যকালীন ঝিরঝির বৃষ্টি মাথায় করেও জনাকয়েক দুই বাংলার বাঙালী এক জায়গায় হয়েছিলেন।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা এমন কোন জটিল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ধারায় তাঁদের কেউই এখানে উপস্থিত হননি; উপস্থিত হয়েছিলেন শুধু "বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে দুই বাংলার একটা "ভাব-বিনিময়ের" ক্ষেত্র কিভাবে প্রসার লাভ করতে পারে, তারই একটি সঠিক পথ যদি খুঁজে বার করা যায় এমনই একটা উদ্দেশ্য সাধনের আশায়। উদ্দেশ্য আরও একটি ছিল। পেট সর্বস্ব বাঙালী এক জায়গায় মিলে একসঙ্গে দুটো ডাল-ভাত পেটে দিয়ে ঢেঁকুর তোলা।

এ বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই আনুষঙ্গিক কিছু ভূমিকা এসে পড়ে। জাপানে কিছু জাপানবাসী আছেন, যাঁরা বাংলা ভাষা সম্পর্কে খুবই উৎসাহী এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের তুলনায় অনেক বেশী ওয়াকিফহাল। বেশ কিছুদিন আগে এমনই একজনের কথা 'দেশ'-এ বলেছিলাম। ভদ্রলোকের নাম ডঃ নারা। আর একজনকে পাওয়া গেছে। শ্রীমতী ইয়ামাদা। সব থেকে বড় কথা উনি ভারত বা পূর্ব পাকিস্তান কোথাও না থেকে এমনকি না দেখেও বাংলা ভাষাটা বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করেছেন। এঁর নাম আমি আগেই জেনেছিলাম, তবে কার্যসূত্রে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। এবারে যখন আমি দেশ থেকে ফিরে আসি, তখন শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা (শ্রীমতী নীলা মুখার্জি) বললেন যে, সুনীতিবাবু নিজের নাম লিখে কয়েকখানা বই শ্রীমতী ইয়ামাদার উদ্দেশ্যে পাঠাতে চান্। সূত্র আমার সেই।

শ্রীমতী ইয়ামাদাকে একদিন কথায় কথায় আমার বাড়িতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আমার বড় অদ্ভুত লাগে, এই ভেবে যে, আপনি বাংলা দেশে না গিয়েও কেমন করে এমনভাবে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। জাপানে তো দেখি বেশীর ভাগ মানুষই পাশ্চাত্ত্য ভাষার প্রতি বেশী উৎসাহী।" একটু হেসে বেশ শুদ্ধ বাংলায় যা বললেন, তার মর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথম উনি কোন কারণে হিন্দী ভাষা শেখেন। ইতিমধ্যে স্বর্গীয় রাধাবিনোদ পাল মহাশয়ের জগত-খ্যাত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই দেশ-দ্রোহী(?) মামলার রায় বার হল। সমস্ত জাপানবাসীর সঙ্গে শ্রীমতী ইয়ামাদাও স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন সেদিনের সেই দুর্জয় সাহস ভরা নিঃসঙ্গ বাণী। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমি এই একজন মহিলার সংস্পর্শে এসেছি, যিনি সেদিনের সেই বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় তথা বাঙালী রাধাবিনোদ পাল মহাশয়কে অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা উজাড় করে, ভালবেসে ফেলেছিলেন, সেই সঙ্গে বাঙালীকে, বাংলা ভাষাকেও। এই তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি প্রথম সঠিক আন্তরিকতা। লেগে গেলেন নিজের চেষ্টায় বাংলা ভাষা শিখতে। হিন্দীটা আগেই রপ্ত করে ফেলেছিলেন। তারই মাধ্যমে পড়তে শুরু করলেন, বাংলা-গল্প কথা, যা হিন্দীতে তর্জমা হয়ে গেছে। বাংলা কথাসরিৎসাগরে ডুব দিয়ে তিনি ভীষণভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সব থেকে বেশী তাঁর মনকে নাড়া দিল শরৎচন্দ্রের বাস্তবধর্মী কথা ও কাহিনী। বাংলা ভাষা শিক্ষায় আরও মনোনিবেশ করলেন। তাঁর মনে হতে লাগল ভাষার সত্যকারের রস গ্রহণ করতে হলে, সর্বপ্রথম প্রয়োজন বাংলা ভাষাকে ভালভাবে রপ্ত করা। আজ তিনি বাংলা লিখতে পড়তে এবং বলতে পারেন।

হাতের লেখা আমার তো বটেই, যে-কোনো ভাল হাতের লেখাওয়ালা বাঙ্গালীকে হার মানাবে। এখন উনি হিন্দী "শরৎ-সাহিত্য-মালা" থেকে এবং নানাভাবে শরৎ সাহিত্যের গল্প অনুবাদ এবং সাহিত্যের গবেষণায় ব্যস্ত। এর চাইতে বড় সংবাদ জাপান থেকে বাংলা-সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে আর কি-ই বা হতে পারে?

উনি যুক্ত আছেন জাপান রেডিও NHKতে। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। বলা বাহুল্য, NHKতে একটা বাংলা বিভাগ আছে। হিন্দী এবং উর্দু বহুদিন থেকেই এখানে বহাল আছে। বাংলা বিভাগের শুরু ১৯৬৩তে। অবশ্য জাপানের রেডিও কর্তৃপক্ষ কেন বাংলা ভাষাকে স্থান দিলেন,

সেটা ভাবতে বসে যদি সবটাই ভারতকে ভেবে বসি, তাহলে ভুল হবে। বাংলা ভারতের একটি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হলেও, বাংলা ভাষা অপরপক্ষে আজ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং পাকিস্তান জনসাধারণের ৫৬ ভাগ মানুষের মুখের এবং প্রাণের ভাষা। কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান হিসাবেই বাংলা ভাষা মুখ্যত NHK

থেকে প্রচারিত হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে দেখতে গেলে ওখানে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ছেলে যুক্ত আছেন। যদিও অবশ্যই কাগজে কলমে এ ধরনের কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই বা লোক মনোনয়নের সময় সকলেই উপস্থিত হতে পারেন। ওই বিভাগের সর্বময় কর্তাব্যক্তি মিঃ হারাইকে কলকাতার ছেলে বললে অত্যুক্তি হয় না। উনি কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে লেখাপড়া করেছেন। জন্মেছেন বোম্বাই শহরে। সব মিলিয়ে ভারতে থাকা কুড়ি বছরের উপর। চমৎকার বাংলা বলেন। প্রথম যখন বাংলা বিভাগ শুরুর কথা হয়, তখন নাকি NHK থেকে জানান হয়, এই ভাষা যে রাষ্ট্রের, সেই রাষ্ট্রের স্বয়ং রাষ্ট্রদূত-এর কাছ থেকে কোন সরকারী অনুরোধ এলে তবেই এ বিষয়ে তাঁদের পক্ষে বিবেচনা করা সম্ভব হবে। তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাস থেকে এ বিষয়ে নাকি সরাসরি অনুরোধ করা হয়। অবশ্য ভারতীয় দূতাবাস থেকেও সমর্থন জানান হয় বলেই শুনেছি। এইভাবেই সৃষ্টি হয় বাংলা ভাষা প্রচারের ব্যবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় নাকি কয়েকজন ভারতীয় এতে যোগদান করেন। পরে তাঁদের ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্যই ছেড়ে দিয়েছেন বলে শুনেছি। এ ছাড়া গাণিতিক সংখ্যা নির্ণয়ে বা দুই রাষ্ট্রের ভাগবাটোয়ারায় সুবিধা এবং সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গীয় সন্তানের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের সন্তানের চাইতে অনেক বেশী। সেদিক থেকেও একটা অসুবিধে। আপাতত দুইজন পূর্ববঙ্গীয় ছেলে শ্রীযুক্ত হিরাই এবং শ্রীমতী ইয়ামাদার তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ থেকে বাংলা সংবাদ-কণিকা এবং নানা ধরনের আলোচনা প্রচার করে দিয়ে বললেন, "......আমরা শুনেছি মনে পড়ে গেল। এর আগে এঁদেরকে দেখেছি অনেক নামী-গুণী ব্যক্তিদের অভিমত এই বিভাগে প্রচার করেন। হঠাৎ সেদিন কথায় কথায় শ্রীমতী ইয়ামাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনারা তো দেখেছি স্বর্গীয় রাধাবিনোদ পাল মহাশয় প্রমুখ অনেক বাঙালী গুণীজনের নিজস্ব উক্তি প্রচার করে থাকেন। এখানে আমাদের নূতন রাষ্ট্রদূত এসেছেন শ্রীযুক্ত এস কে ব্যানার্জি মহাশয়, ওঁর কাছ থেকেও আপনারা ইচ্ছা করলে বাঙলায় প্রচারের জন্য কিছু বক্তব্য পেতে পারেন হয়ত।" উনি আমায় অবাক করে দিয়ে বললেন, "......আমরা শুনেছি আপনাদের রাষ্ট্রদূত মহাশয় নামে বাঙালী হলেও, বাংলা বলতে পারেন না......।" আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। কে এমন বাংলার শুভানুধ্যায়ী বিদেশে এমন একটি কথা ভেবে নিজেই শুধু আত্মতৃপ্তি অনুভব করেননি—সেটিকে জায়গা মত প্রকাশ করে এমন একটি স্বার্থসিদ্ধিতে উদ্যোগী

Institute for the study of Foreign Language & Culture -এর উদ্যোগে বাংলা ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠ নিচ্ছেন কয়েকজন জাপানের ছাত্রছাত্রী

হয়েছেন ? ভাষা নিয়ে আমাদের কোঁদল তো সর্বজনবিদিত। এমনকি বিদেশেও দেখছি—যে কয়েকজন বিদেশী, অবশ্যই সকলে নন, যাঁরা বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কিছু ভাষা কিছুটা সম্যক উপলব্ধি করেছেন, তাঁরাও বাংলার প্রতি কেমন একটু বাঁকা সুরে কথা বলেন। যাই হোক, শ্রীমতী ইয়ামাদার কথার চট্ করে কোন উত্তর আমি দিতে পারলাম না। কারণ আমাদের রাষ্ট্রদূতকে দু-একবার দূরে থেকে চাক্ষুষ দেখা ছাড়া আমার মতন ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে এখনও এমন কোন কারণ ঘটবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়নি, যেখানে ওঁর কোন প্রকার মৌখিক ভাষা শোনা সম্ভবপর। তবুও আমার মনে বিশ্বাস বেশ শক্ত করেই তুলে ধরলাম। বললাম, "আপনারা কি চেষ্টা করেছেন ?" উনি জানালেন, "না, তেমন কোন অনুরোধ ওঁদের তরফ থেকে তাঁকে জানান হয়নি।" আমি আবার বললাম, "আপনারা অনুরোধ জানালে নিশ্চয়ই উনি ওঁর কিছু বক্তব্য আপনাদের দেবেন এবং বাংলা বিভাগের জন্য তা অবশ্যই বাংলা ভাষায়। কারণ ভাস্কর রবিশংকর যেদিন আমার বাড়ি এসেছিলেন, তার আগের দিনই রাষ্ট্রদূত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান; বার্লিন থেকেই ওঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল। কথায় কথায় যতটা মনে পড়ে উনি বোধ হয় আমায় রাষ্ট্রদূত মহাশয় বাংলা জানেন বলেই জানিয়েছিলেন।" জানি না, আজও শ্রীমতী ইয়ামাদার বাংলা বিভাগ থেকে কোন অনুরোধ তাঁর কাছে গেছে কিনা তবে অনুরোধ জানাবেন বলে আমায় জানিয়েছিলেন।

প্রতি সপ্তাহে তিনদিন; সোম-বুধ এবং শুক্র Short-wave 31 meter ব্যাণ্ডে রাত্রি ৮-৪৫ মিঃ থেকে ৯-৫ মিঃ পর্যন্ত শুনতে পাবেন। কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে Bengalee - Division, International Broadcasting Department. Tokyo, Japan এই ঠিকানায় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। সময় মত উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে।

কি কথাতে কি কথা এসে পড়ল। আসল আলোচনায় আসা যাক। শ্রীমতী ইয়ামাদার বাংলা সাহিত্যের প্রতি উৎসাহের সূত্র ধরেই আমি একদিন ওঁকে বলে বসলাম, "আচ্ছা আমরা যে কয়েকজন উৎসাহী বাঙালী এবং জাপানী আছি একদিন একটা আলোচনা বৈঠক বসালে কেমন হয়।" উনি কথাটা শুনেই বেশ উৎসাহ বোধ করলেন। উনিও এমন একটা কথা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন, কিন্তু উৎসাহ এবং সঠিক পথ ধরতে

পারছিলেন না। আমার অবশ্য উনি এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ আয়োজন করতে বলেছিলেন। আমার একটু কিন্তু কিন্তু ভাব দেখে হেসে বললেন, "ওঃ, বুঝতে পেরেছি; ঠিক আছে চিন্তা করবেন না, আমি সকলকে এ বিষয়ে বলব, আপনি শুধু একটু সাহায্য করবেন, তাহলেই হবে।" সত্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি এ ধরনের ব্যাপারে সরাসরি মাথা গলাতে একটু ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ একটা প্রবাদ আছে, "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।" প্রথম প্রথম এখানে এসে বেশ একটু বাঙ্গালী-সুলভ ভাবাবেগ নিয়েই ১লা বৈশাখে কিছু বাঙ্গালীকে একত্রিত করেছিলাম। হঠাৎ কয়েকজন পরবর্তীকালে এমনই সমাবেশে কেমন গা-বাঁচিয়ে চলতে চাইলেন। শোনা গেল এই ধরনের একত্রিত হওয়াতে নাকি কোন কোন মহল প্রাদেশিকতার গন্ধ পেয়েছেন, এমন কি কেউ কেউ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, 'বাঙালী ক্লাব' হচ্ছে টোকিওতে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করতে গিয়েও এমন একটা অবস্থায় পড়েছিলাম। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে বিদেশে আমাদের পরিচয় সব আগে ভারতীয়। কিন্তু নিজের চিন্তাধারায় সংস্কৃতিতে আমার বাঙ্গালীত্বকে আমি ভুলি কি করে? আর তা প্রকাশ করলে অন্যায় কোথায়? ভেবে দিশা পাইনি। কিন্তু আমি বিদেশে এসেছি পেটের ধান্ধায়, দুটো রুজি রোজগারের আশায়। অতএব যতটা পারলাম গা-ঢাকা দিলাম।

কথাবার্তা মাঝে মধ্যে চলছিল। হঠাৎ এই সবের মাঝে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে গেল। শংকর হঠাৎ জাপানে এসে পড়লেন। হানেদা থেকে আসতে আসতে ট্যাক্সিতেই বললেন, "দেখ ভাই—আমি কিন্তু পূর্ব বাংলা দেখতে বার হয়েছি।" কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সে আবার কেমন কথা। বললেন, "পূর্ব-বাংলার যে কয়েকজন ছেলে আছেন এখানে, তাঁদের সঙ্গে যতটা সম্ভব আলাপ করতে চাই।"

বেশ উৎসাহ বোধ করেছিলাম সেদিন কিছু নুতনত্বের আশায়। আমি আমার পরিচিত বন্ধু-স্থানীয় পূর্ববঙ্গের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। NHK থেকে একটা কথিকাও ওঁকে বলবার জন্য অনুরোধ জানান হল। এরই মাঝে আমাদের পূর্বের আলোচনাটা আবার শ্রীমতী ইয়ামাদার মাধ্যমে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। কিছুদিন পর হাতে এসে পড়ল দেশ পত্রিকায় শংকরের লেখা "এপারে বাংলা ওপারে বাংলা", লাফিয়ে উঠলাম। এ লেখা দুই বাংলার যে-কোন উগ্রপন্থীকেও বিচলিত করবে।

একদিন পূর্ববঙ্গের এক উৎসাহী বাঙ্গালী ছেলেকে পাকড়াও করলাম। বাড়ি ধরে এনে বেশ করে খাইয়ে জোর করেই পড়ালাম, "এপারে বাংলা ওপারে বাংলা", পড়তে পড়তে সে আমার মতনই লাফিয়ে উঠল। বুঝলাম ওষুধ ধরেছে। পড়ছে আর বলছে "দেখেছেন—দেখেছেন মশায়, এ কথা যে আমি কতবার ভেবেছি বলবার নয়, শুধু বলতে পারছি না।" অতএব তাহলে আমার কাছ থেকে ছেলেটি বইটা নিয়ে গেল কয়েকটা Photostat Copy করবে আর ওর পরিচিতজনদের যতটা পারবে পড়াবে।

শ্রীমতী ইয়ামাদাকে জানালাম এবারে আমরা একটা সূত্র পেয়েছি। যদিও কিছুদিন হয়েছে উনি "দেশ" পত্রিকা রাখছেন এবং আমি বাড়িতে চিঠি লেখায় আমার বাবা এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে উনি আমায় দাম দিতে চাইলেন। সডাক জাহাজের দাম বললাম। উনি তো অবাক্। বললেন, আপনি ভুল করছেন না তো। মোটে এই দাম। সত্যই তো আজকের জাপান ভাবতেই পারে না বাংলা-সাহিত্যের এমন একটা পত্রিকার বাৎসরিক মূল্য এত সামান্য। বলতে পারলাম না আমাদের অনেকেরই এই সামান্য সামর্থ্যটুকুও নেই। তখনও শ্রীমতী ইয়ামাদার 'দেশ' পৌঁছয় নি। শ্রীমতী ইয়ামাদাকে জানালাম যে এবারে আমরা একটা সূত্র পেয়েছি, অতএব আপনি সকলকে এক জায়গায় করুন। উনি তো এক পায়েই খাড়া। অতএব প্রাথমিক পর্যায়ে ডাক পড়ল স্বল্প কয়েকজনের যাঁরা সত্যই এ বিষয়ে একটু বেশী উৎসাহী। দেখা যাক কি হয়।

সেই সূত্রেই একত্রিত হলেন সেদিন দুই বাংলার জনকয়েক বাঙ্গালী? সেদিন আবার ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছিল। তার

মাঝেই একে একে সকলে হাজির হলেন। জাপানে আবার খাওয়া-দাওয়া সন্ধ্যায়। আগে সন্ধ্যা লাগতেই খেয়ে নাও তারপর ফুর্তি-গল্প-গুজব যা হয় কর। উপস্থিত সকলেই জাপানে থাকাকালীন প্রায় এই পদ্ধতিটা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। গায়ে পিঠের জল ঝাড়তে ঝাড়তে সকলেই একবার পেট পুজোর তাগাদা দিলেন। সেখানে বাঙালী মাত্রেই এক। তারপর একসঙ্গে মিলে মিশে সকলে ভাগ করে নিলেন যা ছিল সব। পূর্ববঙ্গের সদ্য আগত একজন প্রথমেই জানান দিয়ে রেখেছিলেন, "ভাত যেন কম না পড়ে দাদা, আমি একটু বেশীই খাই, সবে দেশ ছেড়েছি। এখানের এই এক প্লেটে তেমন জমে না। রোজই চক্ষুলজ্জা ছেড়ে আরও কয়েকবার চাইতে হয়।"

তারপর শুরু হল আমাদের প্রধান কার্যসূচী। প্রথমেই জানান হল এর প্রধান উদ্দেশ্য; বিদেশে বিদেশী যাঁরা বাংলা-ভাষা-সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণ এবং সঠিকভাবে জানতে চান, প্রথমত তাঁদের প্রয়োজনে আজকের দুই বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের মাধ্যমে 'বাংলা'র একটা রূপ বিদেশীদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা। নয়ত যে কোন একক চেষ্টা কোন ক্রমেই ফলপ্রসূ হতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে ভালবেসে, দুই বাংলার ভাষা-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মাঝে একটা ভাব বিনিময়ের পথ তৈরি করে, দুই বাংলাকে সমানভাবে জেনে বিদেশীর সামনে এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাংলা ভাষা যাতে একটা মহীয়সী রূপ নিতে পারে এমনই এক মহৎ উদ্দেশ্যেই শ্রীমতী ইয়ামাদা ডাক দিয়েছেন সকলকে। স্তব্ধ হয়ে শুনলেন সকলে এই উদ্দেশ্য, বাংলা ছাড়া সুদূর বিদেশে গুটি কয়েক বাঙালী, যাঁরা নিজেরা নিজেদের দেশে পদার্পণ করতে পারে না। কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

আমাদের এই উৎসাহে আরও একজন সাড়া দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি ডঃ নারা। সেদিন সন্ধ্যায় এক বিশেষ কাজে আটকে যাওয়ায় তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করবেন জানিয়েছেন।

প্রথমে জনৈক পূর্ববঙ্গের অধ্যাপক একটি ছোট গল্প দিয়ে আসরের আলোচনা শুরু করলেন। জানালেন গল্পটা যদিও তাঁর কোন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শোনা তবুও কথাগুলি তাঁর মনে দাগ কেটেছে। সেদিন ছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। ভাষা-আন্দোলনে গর্জে উঠেছিল সমস্ত পূর্ববঙ্গ। দলে দলে মানুষ ছুটে এসে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল নিজের রক্ত দিয়ে নিজের মাতৃভাষাকে বাঁচাতে। ঢাকা সেদিন থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সারা আকাশে লাল রঙ ছড়িয়েছিল, ঢাকার রাস্তা বরকত্-সালামের খুনে যেন আবীর মেখেছিল। রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে বন্দনা করেছিল, তাতেই হয়েছিল প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। বাংলা সেদিন তাঁদের রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছিল। কলকাতা তথা সারা পশ্চিম বাংলা সেদিন স্তম্ভিত হয়ে শুনেছিল, শিরায় শিরায় বুঝেছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করেছিল। শিরদাঁড়া ভাঙা দেহটা সোজা করে আর একবার প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করেছিল। শুকনো ঠোঁটের কোণে অস্ফুট-ধ্বনি উচ্চারিত হতে চেয়েছিল "সাবাস্"। মন বলেছিল, তাদের বুকে জড়িয়ে ধরি—কিন্তু হায়! সেদিন বৈকাল। কলকাতার কোন এক পার্কে। সান্ধ্য-আসরে রোজকার মতন একত্রিত হয়েছেন জনকয়েক বৃদ্ধ। হয়ত কর্মজীবনের অবসর কাটাচ্ছেন—আর নূতনের দিকে তাকিয়ে কোন দিশা পাচ্ছেন না। তাঁদেরই একজন বললেন, "শুনেছ ঢাকার খবর?" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সকলে। শুনেছেন সকলেই। একজন তাঁদের মাঝেই দু-হাত কপালে ছোঁয়ালেন, তাঁদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে, যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, যাঁদের রক্তের বিনিময়ে বেঁচে রইলো তাঁদের মধ্যে আর প্রাণের ভাষা—"বাংলা"। অধ্যাপক ভদ্রলোক বললেন, "সেইটুকুই আমাদের চরম পাওয়া। নাইবা চিনলাম, নাইবা দেখলাম মুখ, প্রাণের স্পর্শ আর আশীর্বাদ তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তবুও দেখতে ইচ্ছা করে, চিনতে যে মন চায়। দেওয়াল আছে থাক-না! তাকে অত উঁচু করে একে অপরকে চোখের বাইরে করবার কি দরকার। আসুন সেই দেওয়াল আমরা আরও নীচু করি, যাতে আমরা স্বচ্ছ

ভাবে দেখতে পারব একে অপরকে: আমরা আরই মাঝের বন্ধ দুয়ার খুলে দেব, প্রয়োজনে একে অপরকে কাছে পেয়ে অন্তত কিছুক্ষণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচব—জানব—চিনব।”

এরপর পড়ে সোনান হল 'শংকর'-এর লেখা “এপারে বাংলা ওপারে বাংলা।” পূর্ববঙ্গের জনৈক ছাত্র এর কয়েকটা ফোটোস্টাট কপি আগেই করে এনেছিলেন। জমায়েত সকলের মাঝে সেই কয়েকটা কাগজ ভাগ করে দেওয়া হল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে লেখা থেকে কিছু বাদ দিয়ে পড়া হবে, এখানকার পরিবেশে এবং সময়ের কথা বিবেচনা করে। কিন্তু দেখা গেল, প্রায় সকলেই সম্পূর্ণটা শুনতে চাইছেন। অতএব সবটাই পড়া হল। সকলে শুধু শুনলেন না, স্বাভাবিকভাবেই কিছু ভাবাবেগ প্রকাশ করে ফেললেন। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব জগতে নানাবিধ পারি-পার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিশেষ সীমা রেখা আছে। কারোর বেশী কারোর কম। সেইভাবেই সকলে সকলের মতামত তুলে ধরলেন। তবে একটা কথায় সকলেই একমত যে এ-কথাগুলো তাদের

মনের কথা। আর মন যে এত কথাও বলতে চাইছিল, সেটা এই "এপারে বাংলা ওপারে বাংলা" পড়বার আগে জানা ছিল না।

একজন পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন সেদিনের আলোচনা সভায়। তিনি দেশে ফিরবার সময় জনৈক বঙ্গের অধ্যাপক তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন কলকাতায় যে সব বৈজ্ঞানিক পরিভাষার নূতন নূতন সংস্করণ বার হচ্ছে, তারই কয়েকখানা যদি সঙ্গে করে আনতে পারেন, তাহলে খুবই উপকার হয়। উনি তা এনে দিয়েছেন। এইসূত্রে কয়েকজন প্রকাশককে অনুরোধ করেছিলেন ভারতীয় রাজনীতি বা ও'র নিজস্ব অধ্যাপনার সুবিধার জন্য যে সব আধুনিক বই ভারত থেকে প্রকাশ হয়, যা উনি বিদেশ থেকে আনাচ্ছেন অনেক বেশী দামে সেই সব বই-এর নাম পৃথিবীর যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিষয়ক পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে, সেই সব জায়গায় সময় সময় যদি পাঠান হয় তাহলে অধ্যাপকদের খুবই সুবিধা হয়। কিন্তু উত্তর পেয়েছেন—"আমাদের নিয়ম নেই।" এ প্রশ্নের মীমাংসা প্রকাশকগণ করবেন, আমি নই। উনি সেই পূর্ব-পাকিস্তানের অধ্যাপককে বই এনে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু চাওয়া এবং পাওয়ার কোন সুরাহা এতে হয়নি। সকলের সামনে সেই প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে কি করে এই চাওয়া এবং পাওয়া সম্পূর্ণ হতে পারে?

এখানে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা দপ্তরের গ্রন্থাগারে দুই বাংলা থেকেই বই আনানো হয়। এ'রা অনুরোধ জানিয়েছেন যে, দুই বাংলার প্রকাশকবৃন্দ যদি তাঁদের নূতন গ্রন্থের তালিকা পাঠিয়ে দেন, তাহলে এ'রা এখানে সেই সব তালিকা দেখে বই মনোনীত করতে পারেন। এ বিষয়ে আমাদের এখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের দুই বাংলার তরফ থেকে উদ্যোগী হতে হবে এবং নিজেদের ক্ষুদ্র পরিচয়ের গণ্ডী ধরেই এগোতে হবে।

শ্রীমতী ইয়ামাদাকে আমরা অনুরোধ করলাম ও'দের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুই বাংলার বাংলা বই আছে, সেগুলো যেন সাধারণ উৎসাহী টোকিওবাসী বাঙ্গালী কোন বিশেষ নিয়মকানুনের মাধ্যমে সদস্যভুক্ত হয়ে পড়বার সুযোগ পান। তাতে করে দুই বাংলার মানুষই একে অপরের ভাবধারা, পরিবর্তন এবং আধুনিক সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কিছু জানবার সুযোগ পাবে। শ্রীমতী ইয়ামাদা এ বিষয়ে সচেষ্ট হবেন এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের সকলকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া আমাদের সকলের কাছে যে সব পত্র-পত্রিকা বা বাংলা বই বা কিছু থাকবে আমরা গ্রন্থাগারকে উপহার হিসাবে দিয়ে যাব। দুই বাংলা থেকে যদি কেউ উপহার হিসাবে এই গ্রন্থাগারের জন্য বই পাঠাতে চান, সেগুলোও ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

দুই বাংলার মানুষই দুই বাংলার কোন মাসিক বা দৈনিক পত্রিকায় নির্ভয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন, সে বিষয়ে ভবিষ্যতে চেষ্টা করা হবে। আমি যেমন "দেশ" পত্রিকাতে কিছুটা তুলে ধরলাম, কথা হয়েছে পূর্ববাংলার কোন পত্রিকাতেও এমনভাবেই আমাদের চেষ্টা তুলে ধরা হবে। এইভাবেই একে অপরের ভুল-ভ্রান্তিকে অনুধাবন করে শুধু গুমরে মরার হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে।

প্রতি দুই মাসে একবার আমরা সকলে এক জায়গায় হব। সেখানে সকলেই নিজস্ব জিজ্ঞাসা, নিজস্ব বক্তব্য লেখা বা মুখে সকলের মাঝে পেশ করতে পারবেন এবং সেটা নিয়ে আলোচনাও করা হবে। অবশ্যই এই ধরনের আলোচনা বাংলা ভাষা-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মাঝেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকবে। কেউ যদি ইতিমধ্যে কোন ছোট নাটক বা গল্প কথা Tape করে আনতে পারেন সেগুলো শোনান হবে। কবিতা বা গল্পও পরে শোনাতে পারেন। খালি গলায় গান অবশ্যই এখানে প্রযোজ্য। আর দুই বাংলা থেকে যে সব চিঠিপত্র আসবে সেগুলোও পড়ে শোনান হবে।

উপস্থিত ছিলেন বহু পুরনো দিনের বাঙ্গালী, শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বোস এবং নেতাজীর জনৈক সহকর্মী। বললেন, "আমাদের ছোট বেলায় ঘটি-বাঙাল ঝগড়াটা বেশ ছিল কিন্তু। কিন্তু তার মাঝে একটা যেন মধুর সম্পর্ক ছিল, একটা কেমন হালকা রসিকতার মাঝে আনন্দের স্রোত ছিল..." কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে পূর্ববঙ্গের জনৈক অধ্যাপক বললেন, "আসুন আমরা আবার দুই বাংলার মাঝে তেমনই একটা নূতন রসিকতা গড়ে তুলি।"

সব শেষে শ্রীমতী ইয়ামাদা বললেন, "বহুদিন থেকেই আমি ভাবছিলাম একটা কথা। পড়েছি কিছু বই দুই বাংলার। দুই বাংলায় যেতে পাসপোর্ট ভিসাও দরকার হয় জানি। কাগজ-পত্রে দেখি অনেক তফাত। তবুও কেমন জানি দুই বাংলার মানুষের সঙ্গে কথা বললেই মনে হতো—এ'দের কোথায় যেন একটা অমোঘ বন্ধন আছে যা অচ্ছেদ্য। আজ সেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। অদূর ভবিষ্যতে আরও সত্য এবং সুন্দর হয়ে দেখা দেবে এই আমার বিশ্বাস..."

যদি আমাদের কেউ পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর কোন কৌতূহল বা কোন কিছু জানতে চান, তাহলে নীচের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন। এখান থেকে সাধ্যমত খবর কুড়িয়ে 'দেশ' এর মাধ্যমে প্রয়োজনে সরাসরি খবর পাঠাবার চেষ্টা করা হবে। এই ঠিকানার প্রত্যেকটা চিঠি আমি শ্রীমতী ইয়ামাদার কাছে পাঠিয়ে দেব। প্রয়োজনে আপনারা সরাসরি শ্রীমতী ইয়ামাদাকেও যোগাযোগ করতে পারেন। তবে অনুরোধ রইলো আপনাদের কৌতূহল যেন সব সময় পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে।

1. Bikash Biswas
Isoda Building,
Block-G. 3rd floor
15-8 Minami Aoyoyama-6 chome
Minato-ku, Tokyo Japan
2. Mrs. K. Yamada
1'50 Toshin-Cho
Idclashi-ku, Tokyo, Japan

সবশেষে সকলের তরফ থেকে আমি আমাদের এই প্রচেষ্টার প্রতি আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

সবশেষে আপনাদের একটা সুখবর জানাচ্ছি। ডাঃ নারার অক্লান্ত চেষ্টায় Institute of the foreign language to culture-এ ২২শে জুলাই থেকে তিন মাসের জন্য "বাংলা" লেখা এবং পড়া শেখান শুরু হয়েছে। সেদিন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রছাত্রীদের সকলেই জানালেন তাঁদের উৎসাহ প্রধানত রবীন্দ্রনাথ এবং পথের-পাঁচালীকে কেন্দ্র করেই। এ ছাড়াও জনৈক ছাত্র জানালেন যে, 'বর্ধমান'-এর ইতিহাস সম্যক জানবার জন্যই তাঁর এই আগ্রহ। কিছু ছাত্র ওসাকা থেকে আসবেন টোকিওতে পড়তে। এ'দের শিক্ষাদানের জন্য প্রধান হিসাবে যুক্ত আছেন ডাঃ নারা, সঙ্গে আছেন শ্রীমতী ইয়ামাদা, সাহায্য করছেন আনোয়ারুল করিম এবং শ্রীমতী মণিমালা বিশ্বাস।

বিকাশ বিশ্বাস

জেনানা কামরা
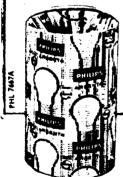
কয়েক বছর আগের কথা। শেঠসাহেবের ভাইপো শোভাচাঁদের বিয়েতে আমরা দল বেঁধে যাচ্ছি সুজনগড়ে। বরাত্ বা বরযাত্রী। সুজনগড় মহকুমা শহর। পূর্বতন বিকানীর রাজ্যের অংশ। বর্তমান চুরু জেলার অন্তর্গত। সুজনগড় থেকে যাবো চুরু। সেখানেই কন্যাপক্ষের আদিনিবাস। শেঠজীর ইচ্ছা আমি চুরু অবধি চলি। অন্যান্য মহিলারা থাকবেন সুজনগড়েই। কন্যাপক্ষের আমন্ত্রণে বরযাত্রী মাত্র পুরুষরাই যান ওঁদের সমাজে। শেঠজী আধুনিক ভাবাপন্ন উদার মনের মানুষ। বালিগঞ্জ থেকে তাঁর অতিথি হয়ে যাচ্ছি বালুকাময় রাজস্থানের সুদূর সীমায়। আমাকে তাই সব কিছুই দেখাতে চান। আমারও উৎসাহ কম নয়।

সুজনগড়ের সৌজন্যে একবেলা কাটিয়ে, মোটরে রওনা হবো। সকালবেলায় বাজরার রুটি, তার সঙ্গে টাটকা মাখন আর এলাচ দিয়ে ফুটিয়ে বানানো প্রচুর দুধ মেশানো প্রায় ঠাণ্ডা চা নিয়ে এলেন প্রতাপ সিং। ইয়া তাঁর গোঁফ, সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারা বন্দুকের কার্তুজ রাখার চামড়ার বন্ধনী সব সময় পোশাকের উপর লাগানো। বিকানীর রাজপলটনের পুরোনো কর্মচারী প্রতাপ সিং প্রভুভক্ত ভৃত্য। শেঠ সংসারের সব দায়িত্বের বোঝা বহন করতে সদা প্রস্তুত। কিন্তু ঐ অতটুকু সময়ে আমায় বুঝিয়ে দিলেন তিনি আসল রাজপুত। বণিকগোষ্ঠী ধনী, কিন্তু তাঁরা রাজস্থানের বেনে। এখন বোম্বাই-কলকাতায় কারবার করা বিত্তবান ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই তাই। কিন্তু এককালে রাজস্থানের মান-মর্যাদার মহান্ ইতিহাস রচনা করেছিল রাজপুত। বিত্ত দিয়ে নয়, বীরত্ব দিয়ে।

বর রওনা হবার আগে মহিলামহলে হই হই কাণ্ড। হীরেতে মোতিতে মেতে উঠলো অন্তঃপুর। বৌ আনতে যাবে ছেলে। তারই সব নানারকম মেয়েলি গীত চললো ঘণ্টাখানেক ধরে। দেখলাম নূতন বৌ সম্বন্ধে আমাদের মায়েদের মত এঁদেরও একটু কোথায় যেন খট্‌কা। কি জানি বৌ কেমন হবে। তার চালচলন যদি ওঁদের তুলনায় একটু বেশী আধুনিক হয়, তবে কি সে মানিয়ে নিতে পারবে। ইনিয়ে বিনিয়ে বানিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা সে সম্বন্ধেও দু'চারটে কথা। একটি গানের যা সামান্য বুঝলাম তা হচ্ছে নববধূর বেণীবন্ধন নিয়ে। বৌ দুটি বেণী দুদিকে দুলিয়ে বেড়াতে গেলেন—"যব সে নিকলী বহুয়া।" তাই কি শেষ? সে বহু আবার বালম, অর্থাৎ পতিকে সঙ্গে নিয়ে "আজ সনিমা যায়।" তার পরের কলি তার সাজসজ্জা ও প্রসাধন নিয়ে—"সফেদি" অর্থাৎ সে পাউডার মাখে প্রত্যেক কলির শেষে আবার সেই সমবেত কণ্ঠে "বহুকো লট্‌কে দো চুটিয়াঁ।" ননদ ঘাবড়ালেন, শাশুড়ী ঘাবড়ালেন। হায় হায় এ কি নির্লজ্জ বধূ! ছেলেকে ডেকে মা বোঝালেন অন্য বৌ আনো বাবা, এমন বৌ চাই না। ছেলে কিন্তু চৌকস। সে জানে মা-বোনের কোথায় বাজে ব্যথা। সে জানে আজকাল মেয়েদের ধরনধারণ পালটেছে। তাই "বেটা মা সমঝায় মইয়া, দুসরীকে লটকে চার চুটিয়াঁ"—মাগো, অন্য বৌ আনলে দেখবে তার ঝুলছে চারটি বেণী!! সেই পুরোনো দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি। বোধ হয় অল্পবিস্তর সব সমাজেই বিদ্যমান!

চারদিকে রাশি রাশি বালি। মাঝে স্বল্পপরিসর আঁকা বাঁকা রাস্তা। পথের ধারে ধারে ছোট কাঁটাগাছের ঝোপ। একমাত্র উটই নাকি ঐ কাঁটা ঝোপের থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। তাই এদিকে বিয়ের শোভাযাত্রাও চলে উটের পিঠে। শেঠজী-দের মোটরগুলি ছিল ব্যতিক্রম। রাস্তায় দেখলাম অন্য বরযাত্রীরা চলেছে উটের শোভাযাত্রা নিয়ে। যার বিত্তের মাত্রা কম, তারও একটি উট চাই। অন্ততঃ বরের জন্য। চুরু পৌঁছোতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমার সঙ্গে সহযাত্রিণী ছিলেন জিমনী বাঈ। জিমনী বাঈ-এর পিত্রালয় চুরুতে। তাই তিনি আমার সঙ্গে এলেন। সামান্য ছলনা। পিত্রালয়ে এসেছেন, বরাতের সঙ্গে নয়। ধর্মশালায় ঢালাও আয়োজন। পুরুষদের জন্য ব্যবস্থা। পরদা নেই। কোন ঝামেলা নেই। লোটা ভরা গরম দুধ, পুরী, হালুয়ার পর্ব। পয়সা থাকলে ভাবনা নেই। আমাকে ওঁরা কিন্তু নিয়ে গেলেন বিয়ে বাড়ির একেবারে অন্দরে। বিরাট ওয়েটিং রুমের মত মস্ত কামরা। পাশাপাশি ঠাসাঠাসি বিছানা। শীতের রাজস্থানের রাত। কাজেই লেপ কম্বল-বহুল বিরাট ঘরটি একেবারে ছিদ্রহীনভাবে বন্ধ। সেই ঘরে বাতের ব্যথায় বৃদ্ধা ককিয়ে কাঁদছেন, শিশু আর কাচকাচা সমানে শৌচাগারের কাজ সেরে নিচ্ছে। কোথাও বা মস্ত বড় থালায় লাড্ডু আর কচৌরি নিয়ে বসে কেউ খেয়ে নিচ্ছে। মালপত্র আর আমি এককোণে রাত কাটালাম কোন রকমে। সকালে এক পেয়ালা চা তো চাই। এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে সন্ধান করছি, যদি মিলে যায় সহৃদয়তার সন্ধান। সবাই ব্যস্ত। কে বা বাঙ্গালিনীর এমন কাঙ্গালের মত চা চাওয়ার খবর নেয়? মেঠাই যেখানে পর্বত প্রমাণ, দুধ যেখানে দরিয়ার মত বয়ে যাচ্ছে, মাখনে মেওয়াতে মাখামাখি, সেখানে চা! ছি, ছি, ছি! শৈলবাসিনী শেঠানীজির বাস সিমলা পাহাড়ে। সেখানে ব্যবসায় সুবাদে আসা-যাওয়া করে যারা তাদের সকালে চা দরকার হয়। অনেক করে বুঝিয়ে এক পেয়ালা দুধে গুটিকয়েক পাতা ফেলে ছটাকের উপর চিনিও তিনি এনে দিলেন। বেলা হতেই জেনানা মহলে চললো মেহেদী আর

আতরের ছড়াছড়ি। বেনারসী আর সোনার তারের রকমারী প্রদর্শনী। বড় শেঠানীজি বলছিলেন, আজকাল তোমাদের সব হাল্‌কা পলকা অলংকার। আমাদের কালে ছিল বটে সোনার গহনা। আধসেরের কম একটিও নয়। খুলে রাখবার নিয়ম ছিল না। গহনার ভারে রাতে পাশ ফিরতে পারতাম না, ঘুম আসতো না। সারা দিনটা এইভাবে কাটানো কঠিন ব্যাপার। তবে, সময় তো বসে থাকে না। সান্ধ্য আসরের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন ভোজবাজির মত আমার সমাদর শুরু হলো। জেনানামহলের গণ্ডী থেকে টেনে আমাকে সদর সভায় মস্ত বড় ফুলদানি দেওয়া টেবিলের সামনে বসানো হলো। সেটা সেদিনের মানীদের hightable. কলেক্টর সাহেব, এস-ডি-ও সাহেব সব সাহেবের মর্যাদায় টেবিলে সাজানো হয়েছে মস্ত মস্ত রূপোর থালা। গোলাপজলের ছিটে আর আতরের সুবাসে ভরপুর এমন অভ্যর্থনায় আমি একমাত্র মহিলা। শেঠজীরা সব আমাকে যত্ন করতে ব্যস্ত। হতবুদ্ধি আমি ভাবলাম বোধ হয় এতক্ষণে ওরা টের পেয়েছেন আমি বরযাত্রী। সবে গরম-

পুরীতে আলুর টুকরো ঠুসেছি, এমন সময় টেবিলের কোণ থেকে উঠে এলেন এক শেঠজী। হাত কচলে কচলে সমাদর করলেন অনেকক্ষণ। ঢোক গিলে বললেন, "আপনার জানবার কথা নয়। কিন্তু আপনার স্বামী আমাদের কেসটা সেবার না করলে..." কিসের কেস? কি বলছেন বুঝতে সময় লাগলো না। সাঁঝের ঝোঁকে এঁরা জানতে পেরেছেন আমার স্বামীর নাম। আর যায় কোথায়? ঐ একই নামে আরেকজন তখন কেন্দ্রে মন্ত্রী। ভুল বোঝাবুঝির পাল্লায় এই সমাদরের সূত্রপাত। বাঙালীবাবুদের যে একই নাম গণ্ডায় গণ্ডায় থাকে কি করেই বা এঁরা বুঝবেন। হাঁ হাঁ করে সবাই আপ্যায়নের পাল্লা দিয়েছেন। অনেক চেষ্টা করে, গলার স্বর চড়িয়ে বললাম, ঐটা আমার স্বামীর নাম বটে তবে তিনি মন্ত্রী নন। ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধ হয় এতগুলো লোক একসঙ্গে এমন হতবাক হয় না। বাদাম-পেস্তার বরফি শুদ্ধ হাত যতটুকু উঠেছিল তত দূরে রয়ে গেল, মুখ যতটা হাঁ হয়েছিল ততটাই ব্যাস রেখা রইল। চোখে মুখে তাদের এমনভাব যেন আমি প্রতারক। ছলনা করে আদর যত্ন আদায় করেছি। মনে মনে কল্পনা করুন আমার অবস্থা। রাগে, ঘৃণায়, অপমানে এতগুলো লোকের প্রতি বিতৃষ্ণায় মনে হলো এ আসর ত্যাগ করলেই হবে না, সোজা রেল স্টেশনে পেঁছে যাবো ফিরে আমাদের কলকাতায়। এর চেয়ে তো সেই জেনানামহলের জঞ্জাল ছিল ভাল। মেয়েরা তো এমন করে মর্যাদার থার্মোমিটার খোঁজে না।

রেল স্টেশনে পেঁছে দেখি ট্রেন আসতে সামান্য বাকি। রিজার্ভ করা নেই। একমাত্র জেনানা সেকেন্ড ক্লাশ ভরসা। তাও ভাল। কোনওরকমে যাত্রীভরা জেনানা কামরায় তো ঢুকলাম। যাত্রিণীরা সব লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। পা-টুকু পর্যন্ত একচুল নাড়াতে প্রস্তুত নন। জলে, ফলের খোসায় একাকার কামরা। অনেক বলাকওয়ার ফলে উপরের বাঙ্ক থেকে নেমে এলেন একটি নিরাটবপু পুরুষপ্রবর। বিষম বিরক্তির ঝটকা মেরে হাই তুলে, তুড়ি মেরে বললেন, নাও এবার হলো তো! আমি তো আবার হতবুদ্ধি হলাম। আশ্চর্য, এমন শেঠনী-সঙ্কুল জেনানা ডাব্বাতে এমন একটি লোক। তাও আবার অন্য মহিলাকে জায়গা দিতে এত আপত্তি! আমার তো এর পর বাঙ্কে উঠে রাতটুকু কাটাবার ইচ্ছাও রইল না। নিজের মানটুকু সামলে, বসে দাঁড়িয়ে দিল্লি পেঁছে, গাড়ি বদল করলেই কলকাতা। গাড়ি কোন স্টেশনে থামলেই শেঠানীরা সোজা সব লম্বা হয়ে যান আবার স্টেশন

আপনার জানবার কোথা নয়...

ছাড়লেই উঠে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্প করেন। ট্রেনের ঝকঝকানির সঙ্গে সমান তালে চলে ওঁদের বকবকানি। কার পীরের বা পিত্রালয়ের কত অগাধ ঐশ্বর্য মোটামুটি হিসাবে তাই মুখ্য আলোচ্য। এ ছাড়াও একটি ব্যাপারে সবার মিল লক্ষ্য করলাম। সবাই ওঁরা ফর্স্ট্ কেলাস অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাশের যাত্রী হতেন। দৈবদোষে টিকিট পাননি। তাই এত কষ্ট করে চলেছেন। হাতে পায়ে মেহেদী, নাকে কানে হীরে, মাঝে মধ্যে ওঁরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখেন, আরামের পরিতৃপ্তি তুলনায় আরও সুখদায়ক হয়ে ওঠে। স্টেশনে গাড়ি থামলে অন্য মূর্তি। আমায় হেঁকে বলেন যেন প্যাসেঞ্জার না উঠতে দি। যাত্রীগাড়িতে এমন ব্যাপার হতে আরও দেখেছি। কিন্তু সেখানে নীতিতে একটু প্রভেদ হয়। যতক্ষণ যাত্রী দরজার বাইরে ততক্ষণ তাকে রোধ করবার প্রবল চেষ্টা। যেই সে ঠাঁই পেল তখন থেকে সে প্রতিরোধ কার্যে সহকারী। সুখ-সুবিধার ছিটে ফোঁটা তখন সে পায়। আমি কিন্তু ওঁদের দলে সেটুকু পাইনি।

ভোর হয়ে আসছে। কখন একটু ঢুলুনি এসেছে জানি না। গাড়ির ধাক্কায় চোখ মেলে দেখি সহযাত্রিণীদের হাবভাব যেন বদলেছে। লক্ষ্যে পেঁছোতে সামান্য মাত্র দেরী। সহযাত্রিণীরা অত্তটুকু সময়ের জন্য যেন করুণাময়ী হয়ে উঠলেন। জল খাবো কিনা, শুতে চাই কিনা—কত মধুর প্রশ্ন। একজন বললেন, আহা তোমার মত বড় ঘরের মেয়ের কতই না কষ্ট গেল। সারা রাত না ঘুমোতে পারার ক্লান্তিতে আর বিরক্তি গোপন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কেমন ঘরের মেয়ে ওঁরা জানলেন কি করে। জবাব দেবার পাত্রী নন কেউ। বললেন, সে তো তোমার মুখের উপর লেখা আছে। অন্য সময় হলে রেল কামরার ময়লা ধোঁয়াটে আয়নাতেই মুখ দেখতাম কিন্তু সে সময় মনটা ছিল তিক্ততায় ভরা। রাত্রে যারা আমার মুখে উঞ্ছবৃত্তির ছাপ দেখে হীরেমোতির দেমাকে ভরে ছিলেন, সকালে তাঁদের কাছে কি পরিবর্তন ধরা দিয়েছে ভাবছি, এমন সময় নজরে পড়লো বাক্সের গায়ে ঝোলানো আমার নাম —মিসেস ইত্যাদি। রাত্রে উলটেছিল। সকালে সোজা হয়ে সবার সামনে প্রকট করেছে নাম মাহাত্ম্য। জেনানা কামরায়ও রেহাই নেই। রাজনীতির মারপ্যাঁচে ওঁরা আগ্রহী নন। কিন্তু সামাজিক পদমর্যাদার মাপকাঠিতে চুরুট [illegible] জেনানা কামরার শেঠ[illegible] মধ্যে [illegible] ভেদ নাই। এ[illegible]র ওদের নিরাশ [illegible]লাম

সব লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন

না। ট্রেন স্টেশনে ঢুকতে আরম্ভ করছে। সেই বাঙ্কে-শোওয়া বাবুটি এসে আমার মালপত্র টেনে নামালেন। মুটেদের স্ট্রাইক। মন্দ কি? আমি শেঠজীকে দিয়ে অবলীলাক্রমে মোট বহন করালাম। কলকাতার গাড়ি পর্যন্ত আমাকে তুলে দিয়ে শেঠজী বিগলিত নমস্কার করে চলে গেলেন। মুটেদের স্ট্রাইকে আমার কষ্ট হয়নি। এটা আমার নিজস্ব স্ট্রাইক। নূতন আদর্শবাদ।

শ্রীমতী

সরোজ আচার্য

গত ৯ই কার্তিক, ১৩৭৫ (ইং ২৬-১০-৬৮) তারিখের "দেশ" পত্রিকায় "স্বজন বিয়োগ" শীর্ষক আপনার লেখাটি ও "স্মরণে" লিখিত "সরোজ আচার্য" বিষয়ক লেখাটি পড়িলাম। আপনি লিখিয়াছেন "কুষ্ঠিয়া হাইস্কুল থেকে ১৯৩২ সালে সরোজবাবু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে চলে আসেন।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কুষ্ঠিয়া স্কুল থেকে ১৯২২ সালে (১৯৩২ সালে নয়) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই তথ্যগত ভুলটি আমি ইংরাজী "Statesman" ও বাংলা "আনন্দবাজার" পত্রিকায়ও লক্ষ করিয়াছি। হয়ত মুদ্রাকরের ভুল বশতই সর্বত্র ১৯২২ স্থলে ১৯৩২ হইয়াছে।

আইন ব্যবসা অবলম্বনের পূর্বে ১৯২০ সালের শেষ দিক হইতে ১৯২২ সালের মার্চ মাস তক প্রায় দুই বৎসরকাল আমি কুষ্ঠিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলাম। আমি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতাম। ওই সময় সরোজ আমার ছাত্র ছিল, তাহার পিতা ৺[illegible] আচার্য মহাশয়ের সংগে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তিনি কুষ্ঠিয়ার একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন ও "জাগরণ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন।

ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে সরোজকে আমি কাজে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই চিনতাম। সে অতি স্বল্পভাষী, সরল, বিনয়ী ও স্নিগ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট ছিল। যতদূর মনে পড়ে সে তখন হইতেই পুরু কাঁচের চশমা ব্যবহার করিত।

ইংরেজী ভাষায় তখন হইতেই তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহার হাতের লেখাটিও তাহার মনের মতই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল।

দীর্ঘ ৪৬ বৎসর পরেও সরোজের সেই বাল্য জীবনের চেহারা আমার মনে সময় সময় ভাসিয়া উঠে। সে সেই শ্রেণীর মানুষ ছিল, যাহাদের সংস্পর্শে একবার আসিলে স্মৃতি অবিস্মরণীয় হইয়া থাকে।

কুষ্ঠিয়া স্কুলে সরোজের সহপাঠী বা সমসাময়িক আরও দুইটি ছাত্র ছিল—যাহাদের কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে—একজন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার, পশ্চিম বাংলার অবসর প্রাপ্ত I G of Police, অপরজন শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী শাস্ত্রের অধ্যাপক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ধানবাদ

দেশ দর্পণ

শনিবার ৯ই কার্তিক প্রকাশিত "দেশ দর্পণ" পড়লাম। পড়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন কোন রাজনৈতিক কাগজের সম্পাদকীয় পড়ছি, যা 'দেশ'-এর মত মূলত একটি সাহিত্য পত্রিকায় আশা করিনি। এখন এই "দেশ-দর্পণ"-এর কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

যেমন ধরুন প্রথম অনুচ্ছেদটি—যেখানে শ্রীসরোজ আচার্য মহাশয়ের শুধু নামটুকুই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কোন চিন্তা বা বক্তব্যের স্থান হয় নি। তবে কি প্রয়োজন ছিল এই অনুচ্ছেদটির?

আবার কয়েকটি অনুচ্ছেদে নকশাল-পন্থীদের মুখপত্রের বক্তব্য তুলে কমিউনিস্ট-দের (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্ক্সিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি উভয়েরই সভ্যগণ) "ধাপ্পাবাজ" প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এতে মনে হয় যে "দেশ"-এর সম্পাদকমণ্ডলী নকশালপন্থীদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। তাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেন এবং নকশালপন্থীদের যেসব বক্তব্য আলোচ্য "দেশ দর্পণ"-এ তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি তাঁদের (দেশ সম্পাদকমণ্ডলী) কাছে সত্য এবং গ্রহণীয় বলে মনে হয়। তা না হলে এটা ভাবা কি ঠিক উচিত হবে যে কোন বক্তব্য বা তথ্য স্বীকার না করে তারই সাহায্যে (অর্থাৎ কোন অস্বীকৃত তথ্যের সাহায্যে) অন্য কোন ঘটনা বা বক্তব্যের বিচার করা সম্ভব। "দেশ"-এর পূর্বে প্রকাশিত সংস্করণগুলি পড়ে কিন্তু কোনও দিন মনে হয় নি যে দেশ সম্পাদকমণ্ডলী নকশাল-পন্থীদের সম্বন্ধে ওরকম কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাই আলোচ্য "দেশ দর্পণ"-এ নকশালপন্থীদের বক্তব্য যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা বিসদৃশ ঠেকেছে।

সবশেষে ধরা যাক দেশ-দর্পণ-এর শেষ দুটি অনুচ্ছেদ যেখানে দেখানো হয়েছে যে ভারতের কমিউনিস্টরা বিদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন, যার ভাবার্থ করা যেতে পারে যে, এখানকার কমিউনিস্টদের ওপর কোন বিদেশী প্রভাব নেই বললেই চলে। আলোচ্য দেশ-দর্পণ-এর এই তথ্য নিয়মিত 'দেশ' পাঠকের কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে।

তাই আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে, কোন বক্তব্য বা প্রবন্ধ রচনা এবং 'দেশ'-এ ছাপাবার সময় যেন পাঠকদের চিন্তাশক্তির কথা একটু ভাবেন, আর 'দেশ'কে যেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করেন।

প্রদীপকুমার রায়
হাওড়া

জর্জ অরওয়েল

উপন্যাস ব্যতীত জর্জ অরওয়েলের অন্যান্য সমস্ত রচনার সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে চার খণ্ডে। এতে আছে, তাঁর চিঠিপত্র, প্রবন্ধাবলী এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর যাবতীয় রচনা।

অরওয়েল উপন্যাস লিখেছেন খান সাতেক, আমাদের কাছে তিনি দুটি উপন্যাসের জন্যই পরিচিত, 'অ্যানিমাল ফার্ম' এবং '১৯৮৪'। কিন্তু ঔপন্যাসিকের চেয়েও সাংবাদিক হিসেবে অরওয়েল অনেক বড়, তার চেয়েও বড় মানুষ হিসেবে। হেজলিট-এর পর, তিনিই প্রধানতম ইংরেজ প্রাবন্ধিক এবং ইংরেজ গদ্যের একজন নিপুণ শিল্পী। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে বিশ্বাসের আন্তরিকতা ও স্পষ্টবাদিতা ঝক্‌ঝক করে এবং সেই সব গুণগুলি তাঁর এইসব রচনাতেই বেশী ফুটে উঠেছে।

জর্জ অরওয়েলের জন্ম হয়েছিল এই বাংলা দেশেই। তাঁর বাবা ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। শৈশবকাল বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে কাটাবার ফলে, এ দেশের প্রতি অরওয়েলের স্বাভাবিক টান ছিল এবং পরবর্তীকালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধিতা করে-ছিলেন। লণ্ডনের পাবলিক স্কুলে লেখা-পড়া শেখার পর তিনি বার্মায় পুলিশ বিভাগে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। এখানে তিনি সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও অস্থির হয়ে চাকরি ছেড়ে ভ্রাম্যমাণ হলেন। এই সময়কার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা তাঁর রচনা "বার্মিজ ডেইজ"।

স্পেনের বিপ্লবের সময় তিনি অন্যান্য বহু লেখক-চিন্তাবিদদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময়ে অরওয়েলের রাজনৈতিক চিন্তা আস্তে আস্তে দানা বাঁধে এবং শ্রেণীহীন স্বাধীন মুক্ত সমাজে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। স্প্যানিশ বিপ্লবেই তিনি গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন।

এর পর থেকে শুরু হয় অরওয়েলের রাজনৈতিক রচনা। রাজনৈতিক রচনাকে তিনি শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ করায় রত নিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক মতের কোনো গোঁড়ামি ছিল না, নিজের ভুল স্বীকার করতেও কখনো কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু তিনি কোনো সময়েই নিরপেক্ষ ছিলেন না। যখন যা বিশ্বাস করতেন, তা বলতেন অত্যন্ত জোর দিয়ে, দরকার হলে তিনি নিজের বন্ধুদেরও কশাঘাত করতে কুণ্ঠিত হন নি। স্প্যানীশ গৃহযুদ্ধের সময় তিনি শ্রেণীহীন সমাজে বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর মনে হয়েছিল যে জার্মানি এবং ইংলণ্ডে যুদ্ধ বাধলে সেটা হবে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ, তাতে সাধারণ মানুষের কোনো পক্ষ নেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসলে ফ্যাসিবাদের বীভৎস রূপ হৃদয়ঙ্গম করে তিনি নাৎসীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। প্রথম দিকে অরওয়েল বিশ্বাস করতেন যে, ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই তার পক্ষে যুদ্ধে জেতা সম্ভব এবং ইংলণ্ডেও বিপ্লব আসন্ন। পরবর্তী-কালে রাশিয়ার টোটালিটারিয়ানইজমের প্রতি তাঁর হতাশা এসে যায়, এবং ১৯৪৪ সালে প্রকাশ করেন তাঁর উপন্যাস, 'অ্যানিমাল ফার্ম'।
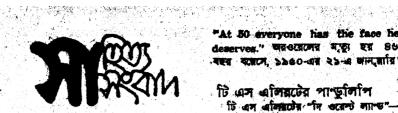
অরওয়েল ছিলেন ইংরেজ জীবন যাত্রার প্রগাঢ় ভক্ত এবং ইংরেজী ভাষার শুদ্ধতার প্রহরী। "রাজনীতি এবং ইংরেজী" সম্পর্কে তিনি ছ'টি নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেন, যার মধ্যে ষষ্ঠটি হচ্ছে, কোনো বর্বর উক্তির চেয়ে যে কোনো নিয়ম যে কোনো সময়েই ভেঙে ফেলা ভালো। একজন সমালোচক বলেছিলেন, অরওয়েল কত বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন, তার প্রমাণ, তিনি "ইন ডিফেন্স অব ইংলিশ কুকিং" লিখতে পেরেছিলেন। ইংরেজী খানার মত অখাদ্যকে সমর্থন করার জন্য কম তেজের প্রয়োজন হয় না! এগারো রকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে কি করে এক কাপ অনবদ্য চা বানানো যায়—এ সম্পর্কেও অরওয়েল তাঁর নিজস্ব গবেষণা প্রকাশ করেছেন।

মাত্র ৪৬ বছর বয়েসেই অরওয়েল টি বি'তে আক্রান্ত হন। সে সময় তিনি ১৯৮৪ নামের উপন্যাসখানি লিখছেন। নিজের পরমায়ু কমে আসছে, এই বিষম উপলব্ধিতে তিনি অনেক কিছু সম্পর্কেই হতাশ হয়ে ওঠেন। সেই হতাশা তিক্ততার ছাপ আছে উপন্যাসটিতে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হয়ে ওঠেন, দুর্বল অশক্ত শরীর, স্যানাটোরিয়ামের বিছানায় শুয়ে তিনি পাতার পর পাতা উপন্যাস টাইপ করেছেন, আর লিখেছেন ডায়েরি। এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছেন, "প্রত্যেক শীতকালেই ক্রমশ আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে উঠছে যে এর পর বসন্ত আসবে। মৃত্যুর আগে তাঁর ডায়েরির শেষ লাইন, "At 50 everyone has the face he deserves." অরওয়েলের মৃত্যু হয় ৪৬ বছর বয়েসে, ১৯৫০-এর ২১-এ জানুয়ারি।

টি এস এলিয়টের পাণ্ডুলিপি

টি এস এলিয়টের "দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড"—কাব্যগ্রন্থের হারানো পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান এতদিন পর পাওয়া গেছে। ১৯২২ সালে এলিয়ট এই পাণ্ডুলিপিখানি নিউইয়র্কে তাঁর এক বন্ধু, জন কুইন-এর কাছে পাঠিয়ে-ছিলেন। তারপর, সেই পাণ্ডুলিপিটি ডাক বিভাগ ঠিক বিলি করেছিল কিনা তাও জানা যায় নি। জন কুইন্‌ একজন প্রসিদ্ধ আইনবিদ এবং অতিশয় শিল্প সাহিত্য রসিক ছিলেন। কুইন তাঁর বিপুল পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ একদা আড়াই লক্ষ ডলারে বিক্রি করেছিলেন, অনেকের ধারণা ছিল কোনো অজ্ঞাত ক্রেতা সেই সময় ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের পাণ্ডুলিপি কিনে তারপর হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু কুইন্‌ ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের পাণ্ডুলিপি বিক্রি করেন নি। সেটা দিয়েছিলেন তাঁর বোনকে। পরে, তাঁর বোনের মেয়ে সেটা উত্তরাধিকার সূত্রে পান এবং কিছুদিন আগে তিনি সেটা নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিকে দান করেছেন। কিন্তু দানের শর্ত ছিল এই, যতদিন না কুইন-এর জীবনী গ্রন্থটি (অধ্যাপক আর এল রীড লিখছিলেন সেই জীবনী) প্রকাশিত হয়, ততদিন ঐ সব পাণ্ডুলিপি সাধারণ্যে প্রদর্শন করা যাবে না। কুইন-এর জীবনীটি প্রকাশিত হচ্ছে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, তাই নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী এখন এলিয়টের পাণ্ডু-লিপিটির কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

বিভিন্ন আলোচনায় এলিয়ট বলেছিলেন যে, তাঁর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' মূল যতখানি লেখা ছিল, তাঁর গুরু এজরা পাউণ্ড তার অর্ধেক কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তার সত্যতা প্রমাণিত হল।

পাণ্ডুলিপিটা কিছুটা হাতের লেখা, কিছুটা টাইপ করা। রচনাকালে, কোনো একদিন এলিয়ট নৌকো চালাতে গিয়ে আঙুলে আঘাত পান বলে কিছু অংশ হাতে লেখার বদলে টাইপ করেছিলেন। এজরা পাউণ্ড খচাখচ কলমের খোঁচায় সেটা যথেষ্ট কেটে দেন, এবং নিজের গোটা গোটা অক্ষরে নতুন শব্দ বসিয়েছেন। তার কয়েকটা আবার এলিয়ট কেটে নিজের খুদে অক্ষরের পাশে লিখেছেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, এজরা পাউণ্ড তাঁর প্রিয় শিষ্য ও বন্ধু এলিয়টের এই কবিতার বইখানি প্রকাশ করার জন্য বন্ধুবান্ধবদের কাছে চাঁদা চেয়ে বেড়িয়ে-ছিলেন।

সনাতন পাঠক

চটপট ! জায়গাটি ঢাকুন

ব্যাণ্ড-এইড*
ব্রাণ্ড
ড্রেসিং!

জীবানু সংক্রমণের ঝুঁকি নেবেন না

ঔষধিযুক্ত
ব্যাণ্ড এইড ড্রেসিং
আপনার ঘা শুখিয়ে উঠতে
সাহায্য করে—জায়গাটি
পরিষ্কার রাখে, সুরক্ষিত রাখে।

চটপট ব্যবহারের জন্যে
ষ্ট্রিপস, স্পটস,
প্যাচেস।

BAND-AID
DRESSINGS

BAND-AID*
Dressings

জনসন অ্যাণ্ড জনসন
অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
৩০, ফরজেট ষ্ট্রীট
বোম্বাই-২৬

*ট্রেডমার্ক
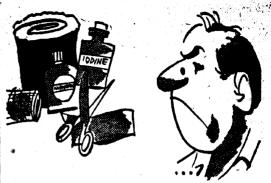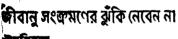
© J & J India 68

প্রাচীন বাংলা কাব্যগ্রন্থ

সম্ভাবশতক। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। সেনহাটী সম্মিলনী, ৫০, সেনহাটী, কলি-৮৪। চার টাকা।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্ভাবশতকের প্রথম সংস্করণের (১৮৬১) ভূমিকায় 'কবিতা পাঠের উপকার' নামক প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন 'বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনার্থ বিজ্ঞান বিদ্যার যেরূপ আবশ্যক, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ বর্দ্ধনার্থ সম্ভাবভূষণা কবিতাকলাপের চর্চাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।' কবি অবশ্য এই মন্তব্য করেছিলেন তদানীন্তন শিক্ষিত পাঠকদের বাংলা কবিতার প্রতি অনাদর ও অবহেলা দেখে। বীটন সোসাইটিতে হরচন্দ্র দত্তের বাংলা কবিতার প্রতি আক্রমণ এবং কৃষ্ণচন্দ্রের অগ্রজ কবি রূপলালের সেই স্মরণীয় প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধটিও হয়ত এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ভাবে কবির স্মরণে থাকতে পারে। কিন্তু এই সরল সংক্ষিপ্ত উক্তিটির মধ্যেই নিহিত আছে কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যাদর্শ, সম্ভাবশতকের অভিপ্রেত লক্ষ্য।

বস্তুত, এক শ' বছরেরও বেশী সম্ভাবশতকের কবিতাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। মূল গ্রন্থের সঙ্গে অনেকের পরিচয় নেই, হয়ত এর নামও অনেকে না জানতে পারেন, কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত এমন একজনও বাঙালী আছেন কিনা সন্দেহ সম্ভাবশতকের কোন কবিতা বা কবিতাংশের সঙ্গে যাঁর নিবিড় আত্মীয়তা নেই।

'অন্তঃকরণের উৎকর্ষ বর্দ্ধনার্থ'-ই যেন নীতিবোধ, চারিত্র্য ধর্ম, স্বদেশ প্রেম, মহত্তর জীবনাদর্শ প্রভৃতি সম্ভাবশতক থেকে আমাদের জাতীয় জীবনে সুদীর্ঘ শতাব্দী কাল ধরে স্বতোৎসারিত। কে অস্বীকার করবে, 'চিরসুখীজন/ভ্রমে কি কখন/ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে', বা 'যে জন দিবসে/মনের হরষে/জ্বালায় মোমের বাতি', অথবা 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে' বা 'প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম'—প্রভৃতি অবিস্মরণীয় পংক্তিগুলির সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছিন্ন মানসিক সম্পর্ক? সংবাদ প্রভাকরের লেখক স্বভাবকবি কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ থেকে বাংলা কবিতা সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে এসেছে। আজ এ কবিতার পরিভাষা মেজাজ, চরিত্র সবই আলাদা। কিন্তু তবুও বাংলা কবিতার অন্তরতম চরিত্রলক্ষণ বাঙালী স্বভাবের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ঐতিহ্যের আলোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার অথবা গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত, নিসর্গ, স্বদেশ, ও ঈশ্বরভাবনা অর্থাৎ যে বিষয়গুলি বাংলা কবিতার ধারাকে বহু দিনব্যাপী পুষ্ট

করেছে সেগুলিই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতার মূল বিষয়।

নিরহঙ্কারী, আত্মতৃপ্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ এই পল্লীকবি বহুবিধ প্রতিকূলতা ও কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও দীর্ঘকাল যাবত বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তাঁর কাব্য রচনা শুরু। 'ঢাকাপ্রকাশ' ও আরও কয়েকটি পত্র পত্রিকার সম্পাদনা সূত্রে কবি বেশ কিছুকাল ঢাকায় অতিবাহিত করেন। সেখানে হরিশচন্দ্র মিত্র ও প্রসন্নকুমার সেনের সঙ্গে 'কবিতা কুসুমাবলী' (১৮৬০) নামে একটি পদ্যপ্রধান মাসিক পত্রও বের করেছিলেন তিনি। এই পত্রিকাটিতেই তাঁর অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয়। 'সম্ভাবশতক' কবির প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং এটি ঢাকা থেকেই ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যশোহরে ফিরে এসে তিনি জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর প্রধান কৃতিত্ব 'দ্বৈভাষিকী' নামে একটি সংস্কৃত বাংলা মাসিক পত্রের প্রকাশ। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিবিধ মূল্যবান রচনাগুলিও স্মরণীয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পরলোকগমন করেন।

সম্ভাবশতকের কবিতার কয়েকটি মাত্র স্কুলপাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীতে খুঁজলে পাওয়া যায়। ইচ্ছে থাকলেও কোন পাঠকের পক্ষে এতদিন কৃষ্ণচন্দ্রের সম্ভাবশতকের সঙ্গে পূর্ণাংগ পরিচয় লাভের সুযোগ ছিল না। কবির প্রতি আমাদের এত দিনের এই অমার্জনীয় অবহেলার নিরসন করেছেন সেনহাটী সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে দুর্লভ বইটির এক কপি যোগাড় করে তারা বহু পরিশ্রম ও নিষ্ঠায়

সঙ্গে আপামর জনসাধারণের প্রিয় এই গ্রন্থটি আমাদের আবার উপহার দিয়েছেন।

শারদ সাহিত্য

জন্মরেণ। সম্পাদক : কল্যাণ বসু। ৬৪/১৩ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ৩·০০।

এবারকার শারদীয়া প্রকাশনগুলির মধ্যে যে কয়খানিকে বিশিষ্টের মর্যাদা দেওয়া যায় তার মধ্যে আলোচ্য সংখ্যাখানি অন্যতম। প্রেমেন্দ্র মিত্র, দেবীপদ ভট্টাচার্যের যথাক্রমে 'দেশসত্তা' ও 'আমাদের মাতৃভাষার ভাবীকাল' সম্পর্কে, আলোচনা চিন্তাশীল পাঠকদের মনের খোরাক জোগাবে। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য পর্যায়ে মহম্মদ মাহফুজুল্লার 'রেনেসাঁ আন্দোলন : পুঁথি ও লোক সাহিত্য', মোস্মেল সিদ্দিকের গল্প ও আবদুস সাত্তার, মোতাহার হোসেনের কবিতা এবং কবিতায় চেকোশ্লোভাকিয়া পর্যায়ে দক্ষিণারঞ্জন বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ ধর অনূদিত বিশিষ্ট চেক কবিদের কবিতা সংখ্যাখানির বিশেষ ঐশ্বর্য। একটি উপন্যাস ও একটি নাটক লিখেছেন যথাক্রমে প্রলয় সেন ও

ভবেন্দু ভট্টাচার্য। গল্প লেখকদের মধ্যে আছেন প্রবোধকুমার সান্যাল, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শান্তিকুমার মিত্র, কুমারেশ ঘোষ প্রভৃতি। কবিতা বিভাগে বিশিষ্টদের মধ্যে আছেন মনীষ ঘটক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলশংকর দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, দিলীপ রায়, দুর্গাদাস সরকার, গোপাল ভৌমিক, জয়ন্তী সেন, আবসুল হক, প্রদীপকুমার রায়চৌধুরী, শান্তনু দাস প্রভৃতি।

বিতান। সম্পাদক : রেবা নন্দী ও নন্দকুমার হালদার। ৩ মদনমোহনতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য ১·০০।

লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক-পাঠিকার মনে ধরবার মতো একটি প্রকাশন আলোচ্য পত্রিকাখানি। লেখক তালিকায় দু'-একজন মাত্র পরিচিত। অধিকাংশই নতুনদের দলে পড়লেও সামগ্রিকভাবে রচনাবলীর মধ্যে একটা মান বজায় আছে। প্রবন্ধ, কবিতা গল্প, নাটিকা ছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আছে। নতুন হলেও পত্রিকাখানির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

মধ্যাহ্ন। সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য। ৭২ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ১·০০।

নতুনভাবে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ লেখকদের রচনা সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানির এই বিশেষ সংখ্যাটি সাহিত্য রসিকদের ভাল লাগবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর লেখকদের মধ্যে আছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আলোক সরকার, সত্য গুহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু ভৌমিক, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, দিলীপ মিত্র। পরিশিষ্টে অচ্যুৎ গোস্বামী রচিত 'বিষাদাত্মক নাটকের ফলশ্রুতি' প্রবন্ধ এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত দুটি একাঙ্কিকা সমেত ক্রোড়পত্র সংখ্যাটিকে মূল্যবান করেছে।

কর্ণফুলী। সম্পাদক : ভূপেশ চৌধুরী। ২৯সি কালিদাস পতিতুণ্ডী লেন, কলিকাতা-২৬। মূল্য ১·৫০।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাসের কবিতা, কবিতা বিষয়ে কালিদাস রায়ের প্রবন্ধ, শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প সংখ্যাখানির মুখ্য আকর্ষণ। বাকি রচনাবলীর অধিকাংশই কাঁচা হাতের। এ ছাড়া সিনেমা, হাস্যকৌতুক, খেলাধুলো ইত্যাদি বিষয়ক রচনাও এতে স্থান পেয়েছে।

শিখা। সম্পাদক : শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়। ৮ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ১·৫০।

নতুন প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকাটির এই প্রথম বিশেষ সংখ্যাখানি রচনার বৈশিষ্ট্যে পাঠকদের খুশী করবে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকেও নজর রাখা হয়েছে। লেখক তালিকায় বিশিষ্টদের মধ্যে আছেন সরোজনাথ ঘোষ, দেবেন্দ্রমোহন বসু, গণেশ লালওয়ানী, রঞ্জন, শিবরাম চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, বিনয় দত্ত, কমল সরকার, সত্যব্রত সেন প্রভৃতি। নন্দলাল বসু ও রামকিঙ্করের শিল্প নিদর্শন সংখ্যাটির সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে।

পালকী। সম্পাদনায় : বাদল দাশগুপ্ত, স্বপনকুমার ঘোষ, রমেন দে, তুলসী দে। ৩৪ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

আঙ্গিকের দিক থেকে আগের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত না হলেও রচনা বৈচিত্র্যে সে-খামতিটা মেটাবার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। লেখকদের মধ্যে আছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, কালিদাস রায়, কবিতা সিংহ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শ্রীপান্থ, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ ও যামিনীমোহন কর।" সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ চলচ্চিত্র বিভাগটি যেখানে লেখক তালিকায় আছেন অরূপ গুহঠাকুরতা, জয়দেব রায়, দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, সুমিত্রা সান্যাল, রুমা গুহঠাকুরতা, স্বরূপ দত্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা বিশ্বাস ও কল্যাণী ঘোষ। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়ের হাস্য কৌতুক উপভোগ্য।

একটি প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হল।

বোম্বাইয়ের মফৎলাল গ্রুপ অব মিলস এবারও দিল্লি ক্লথ মিলস জয় করে পর পর দু বছর বিজয়ীর সম্মান পেল। গতবারের ফাইনালেও তারা জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছিল। এবারে ফাইনালে সেই জলন্ধর লীডারর্স ক্লাবকেই ২-১ গোলে পরাজিত করেছে। তবে এবারের ফাইনাল খেলা নাকি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও আকর্ষণীয় খেলা। লীডার্স ক্লাব পরাজিত হলেও কোন অংশে বিজয়ীর চেয়ে খারাপ খেলেনি। বরং পরাজয়ের মূলে তাঁদের কিছুটা দুর্ভাগ্যও আছে।

এবারকার দিল্লি মিল ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতার দুই শক্তিশালী দলের ব্যর্থতা এবং ইথিওপীয়ান এয়ারলাইনস দলের তৃতীয় স্থান লাভ বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত।

৪ বারের ট্রফি বিজয়ী কলকাতার শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে প্রথম খেলাতেই বিকানীরের আর্মড কনস্টেবলারী দলের কাছে ৩-২ গোলে হার স্বীকার করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে দেরাদুনের গোর্খা ব্রিগেড ২-১ গোলে পরাজিত করেছে, কলকাতার অপর শক্তিশালী দল মহমেডান স্পোর্টিংকে। যদিও এমন পরাজয় অপ্রত্যাশিত নয়। অনেকবারই কলকাতার তথাকথিত শক্তিশালী দলকে বাইরের অখ্যাতনামা দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে তবু আমাদের ধারণা ফুটবলে কলকাতার স্থান সবার উপরে, কলকাতার খেলোয়াড়দের সঙ্গেও কোন রাজ্যের খেলোয়াড়দের তুলনা চলে না। এই আত্মতুষ্টি কলকাতার দলগুলির পরাজয়ের কারণ কিনা ভেবে দেখা দরকার। সত্যি কথা কলকাতা ভারতের প্রধান ফুটবল কেন্দ্র। এখানকার বড় বড় ক্লাবেও সারা ভারতের ফুটবল তারকা সমাগম। তবু মাঝে মাঝে নিতান্ত শক্তিহীন এবং নামহীন দলের কাছেও কলকাতার বড় বড় ক্লাবদের হার স্বীকার করতে হয়। এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, বড় ক্লাবে খেলার ফলে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁদের নৈপুণ্যই আমরা বড় করে দেখি। ছোট ক্লাবেও যে সম্ভাবনাপূর্ণ অনেক খেলোয়াড় আছেন এবং প্রয়োজনে তাঁরা বড় ভূমিকা নিতে পারেন সেটা সহজে আমাদের চোখে পড়ে না।

ইথিওপীয়ান এয়ার লাইনসের কথাই ধরা যাক। একটি ছোট বিমান সংস্থার কর্মীদের ক্লাব। ক'জনই বা কর্মী? আর তাঁদের মধ্যে নাম করা খেলোয়াড়ই বা ক'জন? কিন্তু ইথিওপীয়ান এয়ার লাইনস দলের এই প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে ওঠা এবং সেমিফাইনালে পরাজিত দুটি দলের খেলার গোর্খা ব্রিগেডকে তাঁদের হারিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

*

মেক্সিকো অলিম্পিকে অ্যাথলীট সাঁতারুদের যোগ্যতায় চরম প্রকাশ সম্বন্ধে যাঁরা সন্দিহান ছিলেন তাঁদের ভুল যে ভেঙে গিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাঁতারের কথা পরে আলোচনা করা যাবে। আজ অ্যাথলেটিকসের আলোচনায় আমি দেখাতে চেষ্টা করব নৈপুণ্যের বিচারে মেক্সিকো সবচেয়ে সফল অলিম্পিক। কারণ কোন অলিম্পিকেই এত বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়নি।

একক বিষয়ের হিসেব ধরলে টোকিওতে পুরুষ বিভাগ মাত্র একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন ১০০ মিটার দৌড়ে মার্কিন দৌড়বীর বব হেজ। দলগত বিষয়ে অবশ্য আরও দুটি বিশ্ব রেকর্ড হয়েছিল—৪×১০০ মিটার ও ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে। আর মহিলাদের বিভাগে হয়েছিল ৭টি বিশ্ব রেকর্ড। কিন্তু মেক্সিকোতে পুরুষ বিভাগের একক বিষয়েই হয়েছে ৭টি বিশ্ব রেকর্ড। দলগত রিলেতে আরও দুটি। মহিলা বিভাগে অবশ্য রেকর্ডের সংখ্যা সমানই আছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে অ্যাথলেটিকসে টোকিওতে যেখানে ১০টি বিশ্বরেকর্ড হয়েছিল সেখানে মেক্সিকোতে বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে ১৬টি।

এই প্রসঙ্গে অলিম্পিক আসরে যেসব পুরুষ এর আগে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তাঁদের একটি তালিকাও ছাপা হচ্ছে। তা থেকে দেখা যাবে ১৮৯৬ সালের প্রথম অলিম্পিক থেকে আরম্ভ করে টোকিও পর্যন্ত যাঁরা অলিম্পিক আসরে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তাঁদের সংখ্যা ৪০-এর বেশী নয়। আর মেক্সিকোতেই ১০ জন পুরুষ বিশ্ব রেকর্ডের তালিকায় নিজেদের নাম খোদাই করেছেন।

মেক্সিকোর অ্যাথলেটিকসের বিশ্ব রেকর্ড

পুরুষ

১০০ মিটার দৌড়— জিম হাইনস (আমেরিকা), সময় ৯·৯ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—আর্মিন হ্যারী (জার্মানী), হ্যারী জেরোম (ক্যানাডা), এইচ এস্টিভান (ভেনেজুলা), ই ফিগেরুয়েলা (কিউবা) বব্ হেজ, জিম হাইনস ও চার্লি গ্রীন (আমেরিকা) সময় ১০ সেকেন্ড।

[জিম হাইনস (আমেঃ), রে স্মিথ (আমেঃ) চার্লি গ্রীন (আমেঃ) ও পল ন্যাস (দঃ আফ্রিকা) এর আগে ৯·৯ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়েছেন। কিন্তু সে সময় বিশ্ব রেকর্ডের অনুমোদন পাননি]

২০০ মিটার দৌড়—টমি স্মিথ (আমেরিকা) সময় ১৯·৮ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—টমি স্মিথ, সময় ২০ সেকেন্ড;

[আমেরিকার টমি স্মিথ ও জন কার্লো এর আগে যথাক্রমে ১৯·৮ ও ১৯·৭ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়িয়েছেন, কিন্তু সে রেকর্ডও অনুমোদিত হয়নি]

৪০০ মিটার দৌড়—লী ইভান্স (আমেরিকা), সময় ৪৩·৯ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—টমি স্মিথ (আমেরিকা), সময় ৪৪·৫ সেকেন্ড;

[লী ইভান্স এর আগে ৪৪ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়েছিলেন। সে সময়ও রেকর্ডের স্বীকৃতি পাননি]

৮০০ মিটার দৌড়—রালফ্ ডাউবেল (অস্ট্রেলিয়া), সময় ১ মিঃ ৪৩·৩ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—পিটার স্নেল (নিউজিল্যান্ড) সময় ১ মিঃ ৪৪·৩ সেকেন্ড;

[ডাউবেল মেক্সিকোর আগে ঠিক ১ মিঃ ৪৪·৩ সেকেণ্ডে যে ৮০০ মিটার দৌড়িয়েছিলেন তাও রেকর্ড হিসাবে অনুমোদিত হয়নি]

৪×১০০ মিটার রিলে—আমেরিকা (চার্লি গ্রীন, মেল পেন্ডার, রে স্মিথ ও জিম হাইনস) সময় ৩৮·২ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সময় ৩৮·৬ সেকেন্ড;

৪×৪০০ মিটার রিলে—আমেরিকা (ভি ম্যাথুজ, আর ফ্রিম্যান, লারি জেমস ও লী ইভান্স) সময় ২ মিঃ ৫৬·১ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—২ মিঃ ৫৯·৬ সেকেন্ড;

৪০০ মিটার হার্ডলস—ডেভিড হেমেরি (ব্রিটেন), সময় ৪৮·১ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—আর কাউলে (আমেরিকা) সময় ৪৯·১ সেকেন্ডে;

[এর আগে আমেরিকার জিওফ ভ্যান্ডারস্টক ৪৮·৮ সেকেন্ডে এবং ব্রিটেনের ডেভিড হেমেরি ৪৮·১ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার হার্ডলস অতিক্রম করেছেন। সে রেকর্ডও অনুমোদিত হয়নি]

লং জাম্প—বব্ বীমন (আমেরিকা) দূরত্ব ২৯ ফুট ২½ ইঞ্চি; আগের বিশ্ব রেকর্ড—রালফ বোস্টন (আমেরিকা) ও ভের-ওভানেশিয়ান (রাশিয়া), দূরত্ব ২৭ ফুট ৪¾ ইঞ্চি;

[অলিম্পিক আসরে লং জাম্পে বিশ্ব রেকর্ড হবার এটিই প্রথম ঘটনা। এখনো হাই জাম্প এবং ডিসকাস ছোঁড়ায় অলিম্পিক আসরে বিশ্ব রেকর্ড হয়নি]

পোল ভল্ট—বব্ সীগ্রেন (আমেরিকা), ক্লডিচ চিপ্রোওয়াস্কি (পশ্চিম জার্মানী) উলফগ্যাং নরউইং (পূর্ব জার্মানী), উচ্চতা ১৭ ফুট ৮½ ইঞ্চি; আগের বিশ্ব রেকর্ড—পল উইলসন (আমেরিকা), উচ্চতা ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চি;

হপ স্টেপ ও জাম্প—ভিক্টর সানিভ (রাশিয়া) দূরত্ব ৫৭ ফুট ০¾ ইঞ্চি; আগের বিশ্ব রেকর্ড—জে স্মিড (পোল্যান্ড) দূরত্ব ৫৫ ফুট ১০½ ইঞ্চি;

[ভিক্টর সানিভ অলিম্পিকের ঠিক আগে আর একবার ৫৭ ফুট ¾ ইঞ্চি লাফিয়েছেন]

মহিলা

১০০ মিটার দৌড়—উওমিয়া টাইউস (আমেরিকা), সময় ১১ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—টাইউস ও এম উইলার্ড (অস্ট্রেলিয়া), ই ক্লোবুকোয়াস্কা (পোল্যান্ড), আই কিরজেনস্টিন (পোল্যান্ড) ও বি ফেরেল (আমেরিকা), সময় ১১·১ সেকেন্ড;

২০০ মিটার দৌড়—ইরেনা কিরজেনস্টিন (পোল্যান্ড), সময় ২২·৫ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—কিরজেনস্টিন, সময় ২২·৭ সেকেন্ড;

৮০০ মিটার দৌড়—ম্যাডলিন ম্যানিং (আমেরিকা), সময় ২ মিঃ ০·৯ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—জে পোলক (অস্ট্রেলিয়া) সময় ২ মিঃ ১ সেকেন্ড;

[গত জুন মাসে যুগোস্লাভিয়ার ভি নিকোলিক ২ মিঃ ০·৫ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়েছেন, কিন্তু বিশ্ব রেকর্ডের স্বীকৃতি মেলেনি]

লং জাম্প—ভিওরিকা ভিসকোপোলেনু (রুমানিয়া), দূরত্ব ২২ ফুট ৪½ ইঞ্চি; আগের বিশ্ব রেকর্ড—ম্যারি র‍্যান্ড (ইংলন্ড), দূরত্ব ২২ ফুট ২¼ ইঞ্চি;

৮০ মিটার হার্ডলস—মৌরীন কেয়ার্ড (অস্ট্রেলিয়া), সময় ১০·৩ সেকেন্ড; সম বিশ্ব রেকর্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—ইরিনা প্রেস (রাশিয়া), সময় ১০·৩ সেকেন্ড;

[গত জুন মাসে রাশিয়ার ভি কোরসাকোভা ৮০ মিটার হার্ডলস রেসে সময় করেছেন ১০·২ সেকেন্ড—অনুমোদিত বিশ্ব রেকর্ড নয়]

৪×১০০ মিটার রিলে—আমেরিকা (বি ফেরেল, মার্গারেট বেলস, মিলড্রেড নেটা ও উওমিয়া টাইউস), সময় ৪২·৮ সেকেন্ড; আগের বিশ্ব রেকর্ড—পোল্যান্ড (সিপলা, কিরজেনস্টিন, গোরেক্কা ও ক্লোবুকোয়াস্কা), সময় ৪৩·৬ সেকেন্ড;

লোহার বল ছোঁড়া—মার্গারিটা গামেল (পূর্ব জার্মানী) দূরত্ব ৬৪ ফুট ৪ ইঞ্চি; আগের বিশ্ব রেকর্ড—তামারা প্রেস (রাশিয়া) দূরত্ব ৬১ ফুট;

[গত জুলাই মাসে রাশিয়ার এন চিজকোভা ৬১ ফুট ৩ ইঞ্চি দূরে গোলা ছুঁড়েছিলেন—অননুমোদিত বিশ্ব রেকর্ড ছিল]

অলিম্পিক আগে যাঁরা বিশ্ব রেকর্ড করেছেন

১০০ মিটার দৌড়—এফ জার্ভিস (আমেরিকা—১৯০০), এডি টোলান (আমেরিকা—১৯৩২), বব্ হেজ (আমেরিকা —১৯৬৪);

২০০ মিটার দৌড়—লিভিও বেরুটি (ইতালী—১৯৬০)

৪০০ মিটার দৌড়—ডব্লিউ কার (আমেরিকা—১৯৩২), ওটি ডেভিস (আমেরিকা—১৯৬০)

৮০০ মিটার দৌড়—এম শেফার্ড (আমেরিকা—১৯০৮), জে মেরেডিথ (আমেরিকা—১৯১২), টি হ্যাম্পসন (ব্রিটেন —১৯৩২);

১৫০০ মিটার দৌড়—জে লাভলক (নিউজিল্যান্ড—১৯৩৬); হার্ব ইলিয়ট (অস্ট্রেলিয়া—১৯৬০)

৫ হাজার মিটার দৌড়—এইচ কোলেমেনেন (ফিনল্যান্ড—১৯১২)

১০ হাজার মিটার দৌড়—ভি রিটোলা (ফিনল্যান্ড—১৯২৪)

৩ হাজার মিটার স্টিপলচেজ—পি হজ (ব্রিটেন—১৯২০), ভি রিটোলা (ফিনল্যান্ড —১৯২৪), টি লোকোলা (ফিনল্যান্ড— ১৯২৮), ভি ইসো-হলো (ফিনল্যান্ড— ১৯৩৬), এইচ অ্যাসেনফেল্টার (আমেরিকা —১৯৫২)

১১০ মিটার হার্ডলস—এস স্মিথসন (আমেরিকা—১৯০৮), ই টমসন (ক্যানাডা— ১৯২০)

৪০০ মিটার হার্ডলস—সি বেকন (আমেরিকা—১৯০৮), এফ লুমিস (আমেরিকা—১৯২০), আর টিসডল (আয়ারল্যান্ড—১৯৩২)

[টিসডলের বিশ্ব রেকর্ড অবশ্য বিশ্ব রেকর্ডের স্বীকৃতি পায়নি। কারণ তিনি লাফাবার সময় হার্ডলে আঘাত করে হার্ডল ফেলে দিয়েছিলেন। তখন সেটা বে-আইনী ছিল।]

পোল ভল্ট—এফ কস (আমেরিকা— ১৯২০)

হপ স্টেপ ও জাম্প—টি আহার্ন (ব্রিটেন —১৯০৮), এ ডব্লিউ উইন্টার (অস্ট্রেলিয়া —১৯২৪), সি নাম্বু (জাপান—১৯৩২), এন তাজিমা (জাপান—১৯৩৬), এ এফ ডা'সিলভা (ব্রাজিল—১৯৫২);

লোহার বল ছোঁড়া—আর রোজ (আমেরিকা—১৯০৪), জে কুক (আমেরিকা —১৯২৮)

হাতুড়ি ছোঁড়া—জে সারমাক (হাঙ্গেরী —১৯৫২)

বর্শা ছোঁড়া—ই লেমিং (সুইডেন— ১৯০৮ ও ১৯১২), ই ডেনিয়েলসন (নরওয়ে—১৯৫৬)

ডেকাথলন—জিম থর্প (আমেরিকা— ১৯১২), এইচ ও সবোর্ন (আমেরিকা— ১৯২৪), পি ইরজোলা (ফিনল্যান্ড— ১৯২৮), জে বাউস (আমেরিকা—১৯৩২), জি মোরিস (আমেরিকা—১৯৩৬) ও বব্ ম্যাথিয়াস (আমেরিকা—১৯৫২)।

[অলিম্পিক আসরে এখন পর্যন্ত ডিসকাস নিক্ষেপ ও হাই জাম্পে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়নি। লং জাম্পও বাকি ছিল। মেক্সিকোতে লং জাম্পে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন বব্ বীমন।]

মেক্সিকোর মক্ষিরানী

কার জীবনের ধারা কোন দিকে প্রবাহিত হয় বলা শক্ত। চেকোস্লোভাকিয়ার মেয়ে ভেরা ক্যাস্‌লাভস্কা জিমন্যাস্টিকসকে জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন বলে বিশ্ব জিমন্যাস্টিকসে তাঁর রানীর সম্মান। আবার ওই জিমন্যাস্টিকসের ভুবন ভোলানো ভঙ্গি ও কলা-সৌন্দর্যের গুণে মেক্সিকো অলিম্পিকেরও মক্ষিরানী হিসাবে তিনি হাজার হাজার মানুষকে পাগল করে তুলেছেন।

কিন্তু জিমন্যাস্টিকস পটিয়সী নাও হতে পারতেন ভেরা ক্যাস্‌লাভস্কা। অন্তত তাঁর শিশু জীবনে সে সম্ভাবনাও ছিল না। দীর্ঘপদ পাতলা গড়নের এই মেয়েটির আগ্রহ ছিল আইস স্কেটিং-এর দিকে। ১৯৫২ সালে পায়ে স্কেট পরে যখন প্রাগের স্কেটিং রিঙ্কে মেয়েটি প্রথম স্কেটিং করতে নামে তখনই দেখা যায় ওর গতির মধ্যে একটা সুন্দর ছন্দ। পরে ভেরা ভর্তি হয় ব্যালে নাচের ক্লাবে। ফলে, ছন্দ ও সুরের মধ্যে আসে সামঞ্জস্য। শিল্পীর দক্ষতায়, সুন্দর ছন্দে বরফের উপর পায়ের আলপনা এঁকে অনেকেরই মন জয় করে নেয়।

বয়স যখন চৌদ্দ তখন ভেরা নামে অল্প বয়সী স্কেটারদের এক প্রতিযোগিতায়। ওর স্কেটিং দেখে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন, যদি শুধু ফ্রি-এক্সারসাইজে স্কেটিং করে তবে খুব অল্পদিনের মধ্যে ভেরা ওয়ার্লড ক্লাস স্কেটারে পরিণত হবে।

হয়তো এই স্কেটিংয়ের দক্ষতায় ভেরা বরফেরও রানী হতে পারত। কিন্তু ওই সময়েই তার মত বদলে যায় টেলিভিশনের পর্দায় অলিম্পিকের স্বর্ণ পদক বিজয়িনী এভা বোসাকোভাকে দেখে।

চেকোস্লোভাকিয়ার জিমন্যাস্ট পটিয়সী বোসাকোভা টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠে দেশের অল্প বয়সী মেয়েদের আহ্বান করছেন জিমন্যাস্টিকস শেখার জন্য। ভেরার মন নেচে ওঠে। সুন্দরী মেয়েটি তখনই সাড়া দেয়। সম্ভাবনাপূর্ণ মেয়ে বাছাইয়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় যেয়ে দেখে বোসাকোভার মনের উপর দাগ ফেলার জন্য বহু মেয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করছে। ভেরাও চেষ্টার ত্রুটি করল না। দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বোসাকোভা প্রাথমিকভাবে যে ২০টি মেয়ে বাছলেন ভেরাও তাদের মধ্যে স্থান পেল।

এবার পায়ের স্কেট ঘরের কোণে ফেলে রেখে ভেরা মেতে উঠল জিমন্যাস্টিকসের অনুশীলনে। বোসাকোভা নিজে শিক্ষার তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন এবং মেয়েটি সম্পর্কে একটু বেশী আগ্রহী হয়ে উঠলেন ওর সহজাত শিল্পসত্তায় আঁচ পেয়ে।

ঊনিশ শো আটান্নর মস্কোর বিশ্ব জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠা প্রতিযোগিনী হিসাবে ভেরার অংশ গ্রহণ এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চেক দলের সদস্যা হিসাবে একটি রুপোর মেডেল লাভ। আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিকসে সেই প্রথম এবং মেক্সিকোয় চেক দলের সদস্যা হিসাবে তাঁর শেষ রুপোর মেডেল। কিন্তু প্রথম ও শেষের মাঝখানে ১০ বছর ধরে সোনা রুপোর ছড়াছড়ি।

ঊনিশ শো ষাটে রোম অলিম্পিকে অবশ্য ভেরা ব্যক্তিগতভাবে কোন পদক পান নি। সেখানেও চেক দলের হয়ে একটি রুপোর পদক পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকে পেয়েছিলেন কম্বাইণ্ড, হর্সভল্ট ও বীমে তিনটি সোনার মেডেল, আর টিম হিসাবে একটি রুপোর। এবার মেক্সিকো অলিম্পিকে কম্বাইণ্ড, হর্সভল্ট, আনইভন প্যারালেল বার ও ফ্লোর এক্সারসাইজে ৪টি সোনার এবং বীমে রুপোর মেডেল। দলের সদস্যা হিসাবে বাড়তি আর একটি রুপোর। সুতরাং অলিম্পিক অঙ্গন থেকেই ভেরার সংগ্রহ ৭টি সোনার ও ৪টি রুপোর—মোট ১১টি পদক। তাছাড়া ১৯৬২তে প্রাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে হর্সভল্টে সোনার পদক, আর ১৯৬৬তে ডর্টমাণ্ডের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মানও।

মেক্সিকোর দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন ভেরা ক্যাসলাভস্কা

মেক্সিকোয় ৪টি স্বর্ণ পদক পেয়ে ভেরা ক্যাস্‌লাভস্কা স্বনামধন্যা ডাচ কন্যা ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্সকোয়েনের স মা ন কৃ তি ত্বে র অধিকারিণী হয়েছেন। ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিকে অসাধারণ অ্যাথলীট ফ্যানিও ৪টি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

জিমন্যাস্টিকসের কলা-কৌশলে মেক্সিকোর দর্শকদের মন মাতিয়ে ভেরা জিমন্যাস্টিকস থেকে অবসর নিয়েছেন। মেক্সিকোতেই চেক দূতাবাসে স্বদেশের অ্যাথলীট দূর-পাল্লার দৌড়বীর জোসেফ ওডলোজিলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাই জিমন্যাস্টিকস রানী এখন ওডলোজিলের ঘরনী।

ভেরার জিমন্যাস্টিকসে কলা-কৌশল ছন্দ-বিন্যাস এবং বিভিন্ন ভঙ্গির রূপ মাধুরী পূর্ণ প্রভায় প্রকাশ পেলেও ওর মতে শিক্ষার শেষ নেই এবং দেহ ভঙ্গির মধ্যে আরও উন্নতির অবকাশ আছে। ভেরা বলেছেন, ৪০ বছর আগের জিমন্যাস্টিকসের ছবি দেখলে এখন যেমন আমাদের হাসি পায় তেমন আমার ছবিও একদিন 'সেকেলে' হয়ে যাবে।

চেকোস্লোভাকিয়ার রুশ সৈন্য প্রবেশের মুখে দু' হাজার শব্দ-বিশিষ্ট রুশ বিরোধী প্রচারপত্রে ভেরা নাকি ছিলেন অন্যতমা স্বাক্ষরকারিণী। গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় ওঁরা সব গোপন স্থানে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় সেই গোপন স্থান? কয়লার খনি। কয়লার খনিতে কাজ করে, কয়লা বোঝাইয়ের পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে দেহকে পটু রেখেছেন অলিম্পিকের স্বর্ণপদকের আশায়। এমন আন্তরিকতাই হয়তো মানুষকে তার অভীষ্ট লাভের সুযোগ দেয়।

জিমন্যাস্টিকসে ভেরার প্রদর্শিত কলা-কৌশল কত দিনে সেকেলে হবে, ভবিষ্যতের প্রশ্ন। তবে তাঁর কীর্তি যে চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মুকুল

২ × ২ পপলিনে
গ্রীষ্মে কেমন ঠাণ্ডা রাখে
পরে আরাম, সহজে সুন্দর রাখা যায়—বাটিস্ট
টেরীন আর সুতী মেশানো কাপড়
ভাঁজ পড়ে না এর স্যানফোরাইজড পপলিনে
হাল্কা ইস্ত্রি হ'লেই যথেষ্ট
দাম—সকলের সামর্থ্য অনুযায়ী
ডিজাইন-সকলের নিজের রুচিমত
চোখে পড়বার মত রং, ঠাণ্ডা তৃপ্তিকর রং
আর হাল্কা চাপা রং
চমৎকার ছাপা
চমৎকার কাপড়
TATA Textiles

চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার

আবার বাংলার জয়

এবারেও বাংলার জয়। বাংলার ছবি চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত। **"হাটে বাজারে"** পেয়েছে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন **সত্যজিৎ রায়** (চিড়িয়াখানা ছবির জন্য)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন **উত্তমকুমার** (চিড়িয়াখানা ও এন্টনি ফিরিঙ্গি) ছবিতে অভিনয়ের জন্য।

তপন সিংহ

"হাটে বাজারে" ছবির সর্বোচ্চ পুরস্কার পাবার সংবাদ যেদিন কাগজে বেরোয়, ওইদিনই সন্ধ্যায় শ্রীতপন সিংহ বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফেরেন। বোম্বাইয়ে থাকতেই ট্রাংককলে তিনি খবরটি পেয়েছিলেন, অরুন্ধতী দেবীর কাছ থেকে। সুসংবাদ পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। কলকাতায় ফিরে তিনি দেশ-এর প্রতিনিধিকে বলেন, "পুরস্কারের ব্যবস্থা যদি উৎসাহ-দানের জন্য হয় তবে বলবার কিছু নেই। কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়াটাই যদি মূল উদ্দেশ্য হয় তবে পুরস্কার-প্রদানের রীতি-নীতির পরিবর্তন দরকার।"

"আন্তর্জাতিক উৎসবের কথাই ধরা যাক। সেখানে প্রতিযোগিতার শাখা অল্প। শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নির্বাচন হয়। ভারতের জাতীয় পুরস্কারের যে অনেক বিভাগ, অনেক 'ক্যাটিগরি'। বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ছবির জন্য বিশেষ পুরস্কার।"

শ্রী সিংহ বলেন, "ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন "কনফিউজিং" লাগে। চিত্র-নির্মাতাদেরও এতে বিভ্রান্ত হবার কথা। ভাল ছবি তৈরির চেষ্টা এক জিনিস। আর বিশেষ একটি পুরস্কারের কথা ভেবে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শবাদের দিকে নজর রেখে ছবি তৈরির চেষ্টা অন্য জিনিস। এতে কোয়ালিটির ক্ষতি হয়। গুণের স্বীকৃতির প্রশ্নটিও গৌণ হয়ে পড়ে।"

পুরস্কারের নানা বিভাগ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রী সিংহ বলেন, "আঞ্চলিক ভাষার ছবির জন্য আলাদা পুরস্কার বা প্রাইজ মন্দ নয়। এতে প্রোডিউসাররা উৎসাহ পান নিশ্চয়ই। কিন্তু এই ব্যবস্থায় আর্টের বিচার কতখানি সম্ভব? এবার সাহিত্যগুণের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেখলাম না। অন্যদিকে নতুন বিভাগ বেড়েছে। এবং এক এক বিভাগের পুরস্কারের জন্য এক এক ছবির "এনট্রি"।

"তা-ছাড়া", শ্রী সিংহ আরও বলেন, ছবি বিচারের পর্যায়-ক্রমটিও কেমন যেন গোলমেলে। একবার আঞ্চলিক কমিটি তিনটি অঞ্চলে ছবি বাছাই করবেন, তারপর কেন্দ্রীয় কমিটি। গুণ-বিচারের এত পর্যায়ের প্রয়োজন কি? আন্তর্জাতিক উৎসবে যেমন হয় তেমনভাবে এক সঙ্গে একটি কমিটি দিয়ে কি সব ছবির বিচার চলে না? প্রতিযোগিতা একটিই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।"

সত্যজিৎ রায়

"পুরস্কার এখন কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে। কোন "ফিলিং" আর হয় না"—বললেন সত্যজিৎ রায়। পুরস্কারের **সংবাদ পাবার পর বিশেষ** সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন—" "সরকার পুরস্কার দেন "থীম" দেখে। আদর্শের কথাও থাকা চাই। চিড়িয়াখানা গোল্ড মেডেল পাবে কেন? এতো ক্রাইম। ক্রাইম থীম কখনও প্রাইজ পেতে পারে? (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম খবর এসেছিল "চিড়িয়াখানা" স্বর্ণ-পদক পেয়েছে।)" কথায় কথায় তিনি বলেন, "তবে শ্রেষ্ঠ পরি-চালকের পুরস্কারেই আমি বেশী খুশি। পরিচালকের পক্ষে এটাই বড় স্বীকৃতি।"

১৯৬৭ সনের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় কাহিনীচিত্র হিসাবে চিহ্নিত "হাটে বাজারে" ছবির প্রযোজক শ্রীঅসীম দত্ত। ইনি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক বিজয়ী ছবির নির্মাতা হিসাবে ২০,০০০ টাকা নগদ পুরস্কার পাবেন। ছবির পরিচালক শ্রীতপন সিংহ পাবেন ৫০০০, হাজার টাকা। সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পরিচালনায় পুরস্কার ৫০০০ হাজার টাকা পাবেন শ্রীসত্যজিৎ রায়।

১৯৬৭ সনের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে

উত্তমকুমার

"মাকে যখন আনন্দের খবরটা দিই মা বললেন, "এত আনন্দ করবার কী আছে। বাংলা দেশে তো তোর পুরস্কার বাঁধাই আছে"। বললাম, এবার শুধু বাংলা দেশে নয়।" জাতীয় পুরস্কারের খবর বেরোবার পরই উত্তমকুমার দেশ-এর প্রতিনিধিকে এই কথা বলেন। "জানেন, 'কনফারমড' সংবাদটি যখন পাই, তখন আমি যাত্রার আসরে। অনেকদিন পর পাড়ার পুজোয় গিয়ে আনন্দ করলাম। জগদ্ধাত্রী পুজোমণ্ডপে আরতিও দেখলাম।" বললেন উত্তমকুমার "প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি সুখবরটি। কেমন যেন বুদ্ধু বনে গেলাম। তারপর অভিভূত। সবই তো আপনাদের শুভেচ্ছা।"

পুরস্কৃত শ্রীমতী নারগিস (রাত আওর দিন)। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়কের সম্মান পেয়েছেন যথাক্রমে এম কে মহাদেবন (ছবি : কণ্ডণ করুণাই) এবং মহেন্দ্র কাপুর (ছবি : উপকার)।

অভিনয় ও সংগীত পরিচালনার পুরস্কারের ব্যবস্থা এই বছরেই প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলা ছবি আরোগ্য নিকেতন (পরিচালক : বিজয় বসু) একটি আঞ্চলিক পুরস্কার পেয়েছে। ছবির প্রযোজক-সংস্থা আরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ৫,০০০ টাকা পাবেন, পরিচালক পাবেন একটি রৌপ্য পদক।

সর্বভারতীয় [illegible] দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্র **উপকার।** ছবির প্রযোজক শ্রী আর এন গোস্বামী ৫,০০০ টাকা পাবেন, পরিচালক শ্রীমনোজকুমার একটি রৌপ্য পদক।

শ্রেষ্ঠ ফোটোগ্রাফির (সাদা-কালো) জন্য পুরস্কৃত শ্রীরামচন্দ্র (ছবি : **বোম্বাই রাত-কী বাহোমে**); রঙিন ফোটোগ্রাফির পুরস্কার পাবেন শ্রী এম এন মালহোত্রা **(হামরাজ)।** এ'রা প্রত্যেকেই ৫,০০০ টাকা পাবেন, সেই সঙ্গে একটি ফলক। শ্রী এস ডি পুরম সদানন্দন শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার (ছবি : অগ্নিপুত্রী) জয় করেছেন। তিনিও পাবেন ৫,০০০ টাকা।

অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি

জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সাতটি অল্প দৈর্ঘ্যের প্রামাণিক চিত্রের মধ্যে পাঁচটি ফিল্মস ডিভিশন-প্রযোজিত। এইগুলি হল : 'থ্রু দি আইজ অব এ পেইণ্টার' (পরীক্ষামূলক), 'সন্দেশ' (উন্নয়নমূলক—ব্যবসায়ক্ষেত্রের বাইরে), 'ইণ্ডিয়া, ১৯৬৭' (তথ্যচিত্র; প্রযোজনা : এস সুখদেব), 'আকবর' (শিক্ষামূলক), 'আই অ্যাম টোয়েনটি' (সামাজিক দলিল চিত্র)। এই ছবির প্রযোজক ও পরিচালক যথাক্রমে ৫,০০০ ও ২,০০০ হাজার টাকা পাবেন। এবং একটি মেডেল।

শ্রী সি টি ব্যাপটিশিয়া-কৃত 'ইনকোয়ারি' এবং কৃষ্ণস্বামী অ্যাসোসিয়েটস-কৃত 'ব্রাউন ডায়মণ্ড' যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ কারটুন চিত্র এবং শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন চিত্র (ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে) হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

অন্যান্য আঞ্চলিক পুরস্কার জয়ী (মোট সংখ্যা নয়) ছবির তালিকায় আছে : হামরাজ (হিন্দী), সন্ত বাহাতে কৃষ্ণামাই (মারাঠী), অরুন্ধতী (ওড়িয়া), আলয়ম (তামিল), সুডি গুণ্ডালু (তেলেগু), সুতলেজ দে কানড়ে (পানজাবী)। এই তালিকার প্রতি ছবির প্রযোজক ৫,০০০ টাকা এবং পরিচালক একটি রৌপ্য পদক পাবেন।

কেন্দ্রীয় পুরস্কার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরস্কারগুলি দেওয়া হচ্ছে কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রী আর কে নেহরু।

সুরেশ সংগীত সংসদ

সুরেশ সংগীত সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন রবিবার ১০ নভেম্বর সকাল ৮-৪৫ মিঃ উত্তরা সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হবে। শিল্পীরা হলেন সুচিত্রা মিত্র, রাধিকা মোহন মৈত্র, চিন্ময় লাহিড়ী এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। এই উপলক্ষে সংসদ অর্থসাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। সংগৃহীত অর্থ উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণে ব্যয়িত হবে।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নার্গিস ফটো—দেশ

পরলোকে নির্মল দে

চিত্র পরিচালক শ্রীনির্মল দে গত ২৮ অক্টোবর রাত্রে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪।

কিছুকাল যাবৎ তাঁর শরীর সুস্থ ছিল না। "সমান্তরাল" নামে একটি ছবি তিনি তৈরি করছিলেন। দার্জিলিংয়ে আউটডোর শুটিংয়ের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিত্রনির্মাণের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁর দক্ষতা ছিল। ১৯৩৭ সনে তিনি নিউ

থিয়েটার্সের শিল্প নির্দেশনা বিভাগে যোগ দেন। শ্রীদে পরিচালিত প্রথম ছবি "বসু পরিবার"। কয়েকটি জনপ্রিয় ছবির তিনি পরিচালক। তার মধ্যে সাড়ে চুয়াত্তর, চাঁপা ডাঙার বউ, দুজনার, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, বিয়ের খাতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিমল রায় প্রযোজিত "বিবেকানন্দ" ছবির পরিচালক-চিত্রনাট্যকার ছিলেন শ্রী দে। মৃত্যুকালে শ্রী দে তাঁর পত্নী ও একমাত্র কন্যাকে রেখে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প একজন কৃতী চলচ্চিত্রকারকে হারাল।

প্রজাপতি-নির্বন্ধ

মাধবী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গত সপ্তাহে নির্মলকুমারের সঙ্গে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের এই ছবিটি তোলা হয় ফটো—দেশ

মাধবী মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে হচ্ছে। পাত্র নির্মলকুমার। ও'দের বিয়ে হবে—এই খবর এখন কারো অজানা নয়। কয়েকদিন ধরেই কথাটি শোনা যাচ্ছিল। পাকা খবর পাওয়া গেল গত সপ্তাহে। এখন শুধু আশীর্বাদের দিন স্থির হতে বাকি। "আশীর্বাদের দিন ঠিক করবেন পাত্রপক্ষ। এখনো কিছু জানান নি"—বললেন মাধবী। বিয়ের দিন সম্ভবত ৪ ডিসেম্বর।

রবিবার সন্ধ্যায় মাধবীর সঙ্গে দেখা। মুখে সলজ্জ মিষ্টি হাসি। বললেন, "সেদিন বলি বলি করেও বলতে পারলাম না। পরে ভাবলাম, সব ফাইন্যাল হয়ে গেলেই জানাব। দিনক্ষণ আগে স্থির হোক"। নির্মল-মাধবীর অভিভাবকরা খুব খুশী। এক পক্ষের যেমন পাত্র খুব পছন্দ, অপর পক্ষের তেমনি পাত্রী। ও'রাই অগ্রণী হয়েছেন নির্মল-মাধবীর বিয়ে দিতে। এখন বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। মাধবী নিজেও।

নির্মলকুমারের সঙ্গে মাধবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় বেশী দিনের নয়। খুবই অল্পদিন হল ও'রা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছেন। নাটকের অভিনয় উপলক্ষে। তিনজন শিল্পীর মনে হঠাৎ প্রেরণা এল, তাঁরা মঞ্চে অভিনয় করবেন। শিল্পীরা হলেন নির্মলকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি শিল্পী অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন। একটি নাটকের রিহার্সেলও হল কয়েক সন্ধ্যা ধরে। নাটক মঞ্চে উঠতে এখনও দেরি। প্রেমের অভিনয়ের আর প্রয়োজন হল না। নাটকাভিনয়ের প্রস্তুতির তলে তলে নির্মল-মাধবী পরস্পরকে দেখেছেন কাছে থেকে, একজন অপরকে নিবিড়ভাবে বুঝতে পেরেছেন, জেনেছেন ও'রা সুখী হবেন। "প্রথমে ও'র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলাম। খুব ভদ্র"— বললেন মাধবী। "তারপর?"—আমার প্রশ্ন। "নির্মল খুব ভাল", মাধবীর উত্তর।

পরে একটু থেমে মাধবী বললেন, "হঠাৎই যেন সব কিছু হয়ে গেল।"। "লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট?"—আবার প্রশ্ন। মাধবী মুখোপাধ্যায় খুব হেসে বললেন, "সে যা-ই বলুন।"

বিয়ের পরেও মাধবী ছবিতে অভিনয় করবেন কিনা জানতে চাইলাম। "এখন তো কোন বাধা নেই। অবশ্য নির্মল যদি বারণ করে তবে নিশ্চয়ই করব না।" "একসঙ্গে নাটক অভিনয়ের কী হল?" "করব, বিয়ের পরে", মাধবী জানালেন।

আজীবন অকৃতদার থাকবেন এমন কোন প্রতিজ্ঞা সম্ভবত নির্মলকুমারের ছিল না। তবু মনে হত ও'র বুঝি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। এতদিনে তা ভাঙল। "সত্যি হঠাৎ সব হয়ে গেল।", আমার অভিনন্দনের উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন নির্মলকুমার। "কিন্তু কেমন করে?" প্রশ্নবাণ ফিরিয়ে দিলেন শুধু হাসি দিয়ে। হয়ত নির্মলের মুখে দুটি কথা এসেই সরে গেল। সে কি 'মাধবীর মন'?

—বিশেষ প্রতিনিধি

চিত্র-সমালোচনা

গড় নাসিমপুর

বাংলা অ্যাকশন ছবি বড় বিশেষ একটা হয় না। হয় না যে তার কারণ আছে। বাংলা ছবির প্রকৃতির সঙ্গে অ্যাকশন-এর কোথায় যেন বিরোধ। তাই "গড় নাসিমপুর" (স্যাডো প্রোডাকশন) যতটা প্রেমের ছবি হতে পেরেছে, ততটা অ্যাকশন-এর ছবি হতে পারেনি। অবশ্য মারাত্মক হানাহানি কিংবা রুদ্ধশ্বাস ঘটনা যে একেবারেই নেই তা নয়। বাসুদেব (দেব মুখার্জি) এবং দেবীকান্তের (বিশ্বজিৎ) মধ্যে যে অসিযুদ্ধ দেখানো হয়েছে তা বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণের জন্য দর্শককে এই তরবারি-যুদ্ধ বেশ রোমাঞ্চিত করে রাখে।

প্রকৃত পক্ষে "গড় নাসিমপুর"-এর গতি আবেগের পথে, ইতিহাসের ঘটনাকীর্ণ সড়ক ধরে নয়। "গড় নাসিমপুর" ইতিহাসশ্রয়ী ফিকশ্যন (বারীন্দ্রনাথ দাস কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচয়িতা)। বাংলার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণের পটভূমিতে রচিত। বাংলা তখন শাহ্ সুজার শাসনে। ঔরঙ্গজেবের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সেনাপতি মির জুমলা তখন বাংলায়। ষড়যন্ত্র ও রেষারেষি এবং খণ্ড যুদ্ধের ওই অশান্ত পটভূমিতে কাহিনীর প্রতিষ্ঠা। গল্পের কেন্দ্র গড় নাসিমপুরের রাজা ইন্দ্রনারায়ণের পরিবার। ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, ছলনা, প্রবঞ্চনা এবং অর্থলোভীর (দেওয়ান শিবশঙ্কর এবং তার উচ্চাভিলাষী পুত্র বাসুদেবকে ঘিরেই খলতার বিস্তার) কুচক্রের জালে তখন আবৃত গড় নাসিমপুর। তার মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা এবং স্বর্গত উমাকান্তের পুত্র দেবীকান্তের (পিতার মৃত্যু পর সে পিতৃবধু ইন্দ্রনারায়ণের গৃহে শৈশবে আশ্রিত) প্রেম কখনও বিচ্ছেদ ও কখনও বা বিপদের মধ্য দিয়ে মিলনে পর্যবসিত। গল্পের উপসংহারও সেইখানেই। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত এড়িয়ে দেবীকান্ত যখন উত্তরাকে নিয়ে নৌকোয়

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যে "অগ্নিযুগের কাহিনী"-র এক সাহায্য প্রদর্শনী হিন্দ সিনেমায় রবিবার (১০ অক্টোবর) সকালে আয়োজিত। ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সুখেন দাস

অগ্নিযুগের কাহিনী ছবির সাহায্য প্রদর্শনী

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য বেঙ্গল **ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন** ১০ **নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় হিন্দ** সিনেমায় **মুক্তি প্রতীক্ষিত দেশাত্মবোধক চিত্র** "অগ্নিযুগের **কাহিনী"-র এক বিশেষ** সাহায্য-**প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। ভূপেন** রায় **পরিচালিত এ-ছবির কাহিনী** বাংলার **স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে** রচিত। কাহিনী বীরেন রায়ের। মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি ছবির বিশেষ শিল্পী। গোপেন মল্লিক সুরকার।

এসে উঠেছে তখন অভিশপ্ত গড় নাসিমপুর জ্বলছে।

দেবীকান্ত শৈশবে অভিমান ও দুঃখে **ইন্দ্র**নারায়ণের ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয় এবং (সেই থেকে উত্তরা তার পথ চেয়ে আছে) ডাকাত সর্দার ভুজঙ্গের কাছে আশ্রয় পায়। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা তার ভুজঙ্গের কাছেই। অতএব, ছবিতে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ও যুদ্ধ তথা অ্যাকশন দেখাবার অবকাশ অনেক ছিল। পরিচালক অজিত লাহিড়ী কাহিনীর প্রেমোপাখ্যান ও বক্তব্যের প্রতিই বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। চিত্রনাট্যের পক্ষপাতিত্বও সেই দিকে। সেক্ষেত্রে ত্রিকোণ প্রেমের নাটক (দেবীকান্ত, বাসুদেব ও উত্তরার মধ্যে) আরও জোরালো হতে পারত। এর আভাস অবশ্য ক্লাইম্যাক্সে, যেখানে বাসুদেব নিহত দেবীকান্তের হাতে। দেবীকান্ত বাল্যবন্ধুকে হত্যা করতে চায়নি। ওই মুহূর্তে তার মানসিক যন্ত্রণা বোধগম্য। কিন্তু বিসদৃশ লেগেছে প্রেমের ব্যাপারে তার উদারতার লক্ষণটি দেখে। বাসুদেব উত্তরাকে ভালবেসেছে জানার পরই তা একনিষ্ঠ প্রেমিক দেবীকান্তের কথায় প্রকাশ পেয়েছে। অথচ দুষ্কৃত বাসুদেবের পরিচয় তার অজানা নয়। ওদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের প্রমাণও দুর্লক্ষ্য। তাই এই অধ্যায়ের নাটক তেমন জমেনি। সে যাই হোক, গড় নাসিমপুরের এত দুর্বিপাকের ভিতরেও প্রেমের গল্পটি যে রয়েছে তার জন্য দর্শক খুশি হবেন। খুশি হবেন দেবীকান্তকে দেখে,—সিনবাদের মত বেশ, রবিন হুডের মত তার কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে। যদিও মিরজুমলার সসৈন্য উপস্থিতি এবং ভুজঙ্গের দলকে কেন্দ্র করে ছবিতে বহু উত্তেজক ও রোমহর্ষক ঘটনা এবং সাসপেন্স সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল। প্রসঙ্গত বলা যাক, মিরজুমলার কোন বিশেষ ভূমিকা ছবিতে আছে বলে মনে হল না। রক্তপাত ও সংঘাতের পরিমাণ সামান্য হলেও দর্শককে চমক দেওয়ার মত টুকরো টুকরো ঘটনা ছবিতে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। পরিচালকের সব চাইতে বড় কৃতিত্ব, একটি পিরিয়ড-এর ছাপ ছবিতে তিনি সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। বিশেষ লক্ষণীয় ওই যুগের "অ্যাটমসফিয়ার" বা পরিবেশ। ভুজঙ্গের দলের গতিবিধি (হাতে মশাল নিয়ে) এবং কালী অর্চনার দৃশ্য দৃশ্যগুলিও পরিবেশ রচনার গুণে রোমাঞ্চক। আউটডোরে দৃশ্যগ্রহণ চমৎকার।

ভিন্ন ধরনের সব প্রধান শিল্পীরাই মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই মিরজুমলার বেশে উত্তমকুমারের অসামান্য চরিত্রচিত্রণের উল্লেখ করতে হয়। যদিও অসংবদ্ধ চিত্রনাট্যে ফলপ্রসূ হল না। পর্দায় প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে নর্তকীর গান ও নাচের সঙ্গে (বোম্বাইয়ের মধুমতী এই শিল্পী) তাঁর উর্দু শায়র বলার ঢঙটিও চমৎকার।

বাসুদেব ও দেবীকান্তের চরিত্রে যথাক্রমে দেব মুখার্জি ও বিশ্বজিতের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। কুচক্রী শিবশঙ্করের ভূমিকায় বিকাশ রায় এবং ইন্দ্রনারায়ণের রূপসজ্জায় অসিতবরণ বিশ্বাসযোগ্য।

উত্তরা সেজেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। প্রণয়ের মুহূর্তে তাঁকে ভালই লাগে। বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় ক্ষণেই তাঁর অভিনয় ও অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। যথাযথ অভিনয় সুরতা চট্টোপাধ্যায়ের, উত্তরার সখীর চরিত্রে।।

অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন কমল মিত্র, রমা গুহঠাকুরতা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, তরুণকুমার প্রভৃতি। এঁরা যোগ্যতার সঙ্গে চিত্রনাট্যের শর্ত পালন করেছেন।

ছবিতে গান বেশী। এ ধরনের ছবিতে এত গানের অবকাশ কম। ফলে সব গান সুপ্রযুক্ত হয়নি। অবশ্য গানের সুর সুন্দর। রচনা করেছেন সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র। সুন্দর গেয়েছেন সুরকার নিজে, আরতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে। আবহসুর সুকৌশলে। টাইটেল-মিউজিক বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে সর্বাধিক প্রশংসা পাবেন ফোটোগ্রাফির জন্য বিজয় দে এবং শিল্প নির্দেশনার জন্য সুবোধ দাশ।

আঁখেঁ

চোখ দুটি (আঁখেঁ) জাসুস অর্থাৎ গোয়েন্দার। সরকারী গোয়েন্দা নয়। দেশপ্রেমিক, যে পিতার (একদা নেতাজীর বিশ্বস্ত অনুগামী) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণাশঙ্কার তোয়াক্কা না করে দেশদ্রোহী ভিলেনদের শায়েস্তা করতে উদ্যত। ছবির যেটা ক্রাইম-আখ্যান তা বন্ড-কাহিনীর মত। দেশপ্রেমী গোয়েন্দা-নায়কের (ধর্মেন্দ্র) সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত

থেকে অবলীলায় বেঁচে যাওয়ার ভাগ্য প্রায় জেমস বণ্ডের মতই। তবে সে বণ্ডের মত রমনীর প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্ত নয়। তার কর্তব্যবোধ ও আদর্শবাদ সবকিছুর উপরে।

এই হিন্দীচিত্রে কি তবে প্রেম নেই? সে কি কখনও হয়? নায়িকা (মালা সিংহ) সুনীলকে (নায়ক) প্রেম নিবেদন করেছিল অনেক আগে, টোকিওতে প্রথম সাক্ষাতের পর। টোকিওর পথেই নায়িকা প্রেমাস্পদের মন জয়ের জন্য অঙ্গভঙ্গি সহকারে গান গেয়েছে। সুনীলের পক্ষে তখন মন দেওয়া সম্ভব হয়নি। বোধ হয় দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা স্মরণ করে।

চোখ দুটি (আঁখে) নায়িকা মীনাক্ষীর। সেই থেকে পথ চেয়ে আছে কবে নায়ক ফিরবে, মহত্ত্বের সঙ্গে তাকে 'সিনেমে' তুলে নেবে (প্রত্যাখ্যাতা নায়িকা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল নায়ককে)। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, মীনাক্ষীর বাবা ছিলেন ভারতীয় (নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলেন), মা জাপানী। নায়িকার বাস জাপানে। এবং সে আগে থেকেই সুনীলের বাবার (নাজির হোসেন) কাজে (অর্থাৎ দুর্বৃত্তদের চোখে চোখে রাখা এবং তাদের দমনে চেষ্টা) আত্মনিয়োগ করেছিল।

চোখ দুটি (আঁখে) দুর্বৃত্তের যার দলের লোক নায়কের কাজকর্মের উপর নজর রেখেছে। শত্রুদলের কুকর্ম এবং নৃশংসতাও বণ্ড-ছবির ধারায় প্রকাশ পেয়েছে। রীলের পর রীল দুই পক্ষের সংগ্রাম চলেছে। কখনও বুদ্ধির লড়াই, কখনও অ্যাকশন। এক সময়, ক্লাইম্যাক্সের আগে, সুনীলকে বাঘের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছে। বণ্ডের তা করতে হয়েছে কিনা জানা নেই। যা হোক, দুই পক্ষের কাজকর্মেই সেই 'ট্র্যান্সমিটার' দেখা গেল, এবং শত্রুপক্ষের ডেরায় নানা ধরনের অদ্ভুত যন্ত্রপাতি।

এক কথায়, প্রযোজক-পরিচালক কাহিনীকার রামানন্দ সাগর "আঁখে" চিত্রে বণ্ড-জাতীয় চিত্রের আমোদ, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ পরিবেশন করতে চেয়েছেন। এবং তিনি অনেকখানি সফল। অবশ্য হিন্দীচিত্রের নিয়মমাফিক প্রেম, মেলোড্রামা, কৌতুক (মেহমুদ ও ধুমল ছবিতে আছেন), নাচ-গান, যৌন উপকরণ প্রভৃতি সবই রয়েছে। তার উপর দেশাত্মবোধকে ছবিতে (নেতাজীর ভাবাদর্শের কথা বার বার বলা হয়েছে), প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দেশচেতনার ভিত্তিতে ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত রোমাঞ্চক গোয়েন্দা চিত্র "আঁখে"—যার টেকনিক্যাল কাজও দুই চোখ ভরে দেখবার মত। ছবিটি দেখতে মজাই লাগে, শিহরণের স্বাদও মেলে জায়গায় জায়গায়। প্রধান শিল্পীদের অভিনয়ও যথোচিত। তার উপর সংগীত পরিচালক রবির দেওয়া সুরে মনমাতানো গানও আছে।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পিতা-পুত্র'-র শুটিং এখন শেষ পর্যায়ে—ছবির একটি দৃশ্যে তনুজা ও স্বরূপ দত্ত ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

'ই'হাসে দিল্লি দূরে নহী'—উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ অঞ্চলে বসে অনায়াসেই একথা বলা যায়। আগামী চোদ্দই নভেম্বর পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিনে হয়ত এই গাজিয়াবাদে নতুন এক চলচ্চিত্র নগরীর পত্তন হবে। অজন্তা ফিল্ম করপোরেশনের উদ্যোগে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি শাখা গাজিয়াবাদে নতুন চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের আবাদ শুরু করবে। শুনেছি উত্তর প্রদেশ সরকার নাকি এই প্রয়াসকে সাহায্য করতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ দেবে। ছবি তৈরীর জন্য স্টুডিওর পত্তন ছাড়াও এখানে ভারতের দ্বিতীয় ফিল্ম ইনস্টিটিউটও তৈরী হবে। একদিকে তৈরী হবে 'ফিল্ম' অন্যদিকে তৈরী হবে 'ফিল্ম মেকার্স'। তাছাড়াও আছে আর এক মহান পরিকল্পনা। সেটি হচ্ছে একটি মোম-মিউজিয়ামের। লণ্ডনের বিখ্যাত ডাসেড'স (DUSSAID'S) মিউজিয়ামের ছায়া অবলম্বনে এই মোম-মিউজিয়াম তৈরী হবে এবং মর্তের এই মোম-মিউজিয়ামে ভারতীয় চলচ্চিত্রের স্বর্গীয় তারকারা লাইফ সাইজ মোম মূর্তির মধ্যে প্রায় জীবন্ত দৃশ্য হিসেবে বেঁচে থাকবেন। এইসব পরিকল্পনার উদ্যোক্তা অজন্তা ফিল্ম করপোরেশনের প্রধান কর্ণধার বিখ্যাত চিত্রতারকা শ্রীসুনীল দত্ত-পরিবার। অর্থাৎ সুনীল দত্ত, শ্রীমতী নার্গিস দত্ত, সোম দত্ত। তাছাড়াও আছেন সুরকার নৌসাদ, প্রযোজক প্রেমজী, মন্ত্রী জংগবাহাদুর, প্রযোজক-পরিচালক বিনোদকুমার এবং আর এইচ ওয়াদিয়া। আরো কয়েকজন কর্ণধার আসবেন সরকারের তরফ থেকে মনোনীত হয়ে। অজন্তা ফিল্ম করপোরেশনের এই প্রচেষ্টা উত্তর প্রদেশ সরকারের সহযোগিতায় অবশ্যই কার্যকরী হবে মনে হচ্ছে। এই প্রসংগে বম্বে চলচ্চিত্র ব্যবসায় কিছুটা ক্ষুণ্ণও হয়েছে। কিন্তু কিছু লোক মনে করেন যে বম্বের চলচ্চিত্র ব্যবসায়কে ঠিক পথে আনবার জন্য বাইরে থেকে আঘাত আসা দরকার—মানে কর্মপিটিশন চাই। আশা করা যাচ্ছে গাজিয়াবাদের ফসল বম্বে চলচ্চিত্র ব্যবসায়কে এই সুস্থ প্রতিযোগিতায় নামাবে।

বর্তমানে ইম্পার প্রেসিডেণ্ট, অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক, লেখক-সাংবাদিক শ্রী আই এস জোহর এবার একেবারে হাত গুটিয়ে সরকার এবং সেন্সারের সংগে একটা বোঝাপরা করতে ময়দানে নেমেছেন। কিছুদিন আগে শ্রীজোহর ঘোষণা করেছেন যে তিনি 'কিস' অর্থাৎ 'চুম্বন' নামে একটি ডকুমেণ্টারী ছবি করবেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে শ্রীজোহর বলেছেন যে, "'খাজুরাহো' নিয়ে তোলা তথ্যচিত্র যদি শিল্পসম্মত হয়, জনতাগ্রাহ্য হয় তাহলে আমার 'কিস' কেন হবে না।" 'কিস'কে শ্রীজোহর ডকুমেণ্টারী, অর্থাৎ তথ্যচিত্র হিসেবে অভিহিত করছেন। তথ্যচিত্রের শর্ত সৎভাবে পালন করতে হলে শ্রীজোহরের ক্যামেরাকে পৌঁছোতে হবে বাস্তবের কাছে। 'ইন ডকুমেণ্টারী ফিল্মস রিয়্যালিটি শুড বি ক্যাপচারড—নট ক্রিয়েটেড।'

• সরল শর্মা

উদয়শংকরের আবার আমেরিকা জয়

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখে আমেরিকাবাসীরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। আবার হলেন এখন, শিল্পীর একক নৃত্য দেখে। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে উদয়শঙ্কর প্রায় ত্রিশজন শিল্পীর একটি দল নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নানা শহরে তাঁরা নৃত্য পরিবেশন করেন। ৬৮ বৎসর বয়সে শ্রীউদয়শঙ্কর আবার নাচবেন এটা অনেকেই ভাবতে পারেন নি।

উদয়শঙ্কর

নিউ ইয়র্ক টাইমসের নৃত্য সমালোচক বলেছেন : "গত রাত্রে (৮ অক্টোবর) উদয়শঙ্কর নিজে একটি নৃত্য পরিবেশন করেন। তাঁর সেই বিখ্যাত একক-নৃত্য 'ইন্দ্র'। দেবরাজ অন্য দেবতাদের নৃত্যকলাবিদ্যায় দীক্ষিত করছেন—এই হল নাচের বিষয়বস্তু। সামান্য পরিধির মধ্যেই তিনি নাচলেন। কিন্তু তিনি যে নিজের অধিকারেই একজন শিল্পী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আজও এক্ষেত্রে তিনি গুরু। তাঁর নাচে বাহুর আন্দোলন আর মুখের অভিব্যক্তি প্রধান ছিল, এ-কথা ঠিক। কিন্তু ওই কয়েকটি সূক্ষ্ম মুদ্রাতেই নাচের শক্তি আর লাবণ্য বিকশিত হয়েছে।

দি ওয়াশিংটন পোসট পত্রিকার সমালোচক তাঁর "ইন্দ্র" নৃত্যে "শান্ত মর্যাদার" ছবি দেখেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শ্রীউদয়শঙ্কর পরিচালিত "প্রকৃতি ও আনন্দ" (অবলম্বন : রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা") নৃত্যনাট্যটি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। ভিক্ষু আনন্দকে "অস্পৃশ্য" প্রকৃতির জলদানের দৃশ্যটি দি বসটন গ্লোবের সমালোচককে অভিভূত করেছে। সে-কথা তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। "ওদের সহজ দেহভঙ্গিমায় আর হাতের মুদ্রায় এমন কিছু ছিল যা জলেরই মত সত্য শুভ আর সুন্দর; জলদানেরই মত মঙ্গলকর।" ওই সমালোচক শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ করেছেন তিন জনের নাম : ঝরনা দত্ত (প্রকৃতি), সাধন গুহ (আনন্দ) প্রণতি সেনগুপ্ত (প্রকৃতির মা)।

এছাড়া সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছেন শান্তি বসু, কমলেশ মৈত্র। শ্রী মৈত্রের সরোদ-অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মনে ছাপ কাটে। সেই সঙ্গে তাঁর তবলা-তরঙ্গও। তবলা-তরঙ্গের বিশেষ উল্লেখ করেছেন কানাডার 'দি গেজেট' পত্রিকার সমালোচক।

দলের (নাম : উদয়শঙ্কর হিন্দু ড্যান-সারস অ্যানড মিউজিশিয়ানস) অনুষ্ঠান-সূচীতে লোকনৃত্যও ছিল।

হাজরা পল্লীর বিজয়া সম্মেলন

দক্ষিণ কলকাতার জনপ্রিয় সংস্থা জাতীয় উন্নয়ন সঙ্ঘ সম্প্রতি চারদিনব্যাপী এক আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উপলক্ষ : হাজরা পল্লীর বিজয়া সম্মেলন।

প্রথম দিন রূপকার গোষ্ঠী তাঁদের বিখ্যাত দুটি নাটক "চলচ্চিত্তচঞ্চরী" ও "ব্যাপিকা বিদায়" মঞ্চস্থ করেন। শক্তিশালী অভিনেতা ও পরিচালক সবিতাব্রত দত্ত সহ রূপকারের সকল নিয়মিত শিল্পীই এতে যোগ দেন।

দীনেন গুপ্তের 'নতুন পাতা' ছবিতে অজিত ভঞ্জ ও আরতি গাঙ্গুলি ফটো—দেশ

দ্বিতীয় দিন গানের আসরে রবীন্দ্র-সংগীত, নজরুল গীতি, দ্বিজেন্দ্র গীতি ও অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে শোনালেন সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, ধীরেন বসু, পূরবী দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা। গানে অশোকতরু মুখোপাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে শোনান কাজী সব্যসাচী, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রদীপ ঘোষ।

তৃতীয় দিনের নাট্যানুষ্ঠানে মহিলা শিল্পীমণ্ডল মঞ্চস্থ করেন তারাশঙ্করের "কবি"। অতি পরিচিত নাটকটি অভিনয় গুণে সকলের মন জয় করে।

শেষ দিনের একাঙ্ক নাট্যোৎসবের প্রথম একাঙ্কের নাটক শিল্পীচক্র প্রযোজিত "সারি সারি পাঁচিল"। রচনা শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। নাটকটি শ্রীমনি গাঙ্গুলীর পরিচালনায় পরিবেশিত হয়। অভিনয়ে তরুণ শিল্পীরা দলগত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অভিনয়াংশে কল্যাণ অধিকারী, পৃথ্বীশ গাঙ্গুলী, সুবীর ঘোষ এবং তাপস বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। পরে শোভনিক নাট্য সংস্থা কর্তৃক "পাতা ঝরে যায়" নাটকটি অভিনীত হয়। দুই চরিত্রের এই নাটকটির বিষয়বস্তু, ভাবব্যঞ্জনা ও অভিনয় নৈপুণ্য দর্শকমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে নিমু ভৌমিকের অসাধারণ অভিনয়। স্ত্রীচরিত্রে ছিলেন মমতা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়ও সুন্দর।

ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাব প্রযোজিত ও শ্রীপিকলু নিয়োগী পরিচালিত দুটি নাটক যথাক্রমে "প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ" ও বুদ্বুদ অভিনীত হয় আসরের শেষ অনুষ্ঠান হিসাবে। হালকা মেজাজের নাটক অভিনয় গুণে উপভোগ্য।

অরণ্যদেব লী ফক

বাছারা, তোমাদের উপরে আমার কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। কিন্তু কাজ যখন ফুরিয়েছে, তখন আর তোমাদের বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী?
রাউডি, কী সব বাজে কথা বলছ? এমনিতেই ওরা যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। তার উপরে আবার তুমি ওদের ভয় দেখাচ্ছ কেন?

পাইলট, একমাত্র তোমাকে দিয়ে আমার দরকার। তাই তোমাকে আমি মারব না!

বাঁলাডৈয়ির সোনাবেলায়.....
রাউডি, কাজটা অন্যায় হচ্ছে!
বাছারা, হেলিকপটারে তোমাদের জায়গা হবে না। তা ছাড়া তোমরা বেঁচে থাকলে অনেক-কিছু ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাই.....

অন্ধকারের মধ্যে থেকে হঠাৎ গুলি ছুটে এল.....
আমি তোমাদের মুখ বন্ধ করে দিতে চাই---
আঃ!

অগ্নিকুণ্ডের উপরে কে যেন পাথর ছুঁড়ে মারল... গুন্ডারা পাগলের মতো হাতিয়ার খুঁজতে লাগল.....
কে গুলি চালাল? কে?
বন্দুক! আমার বন্দুক কই? রাউডিকে শেষ করব!
আগুন নিবিয়ে দিল কে?
ঝোপের আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে!

সোনাবেলায় এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হল! গুলি ছুটছে..... লোকজন ছুটে পালাচ্ছে..... আর্তনাদ..... হট্টগোল.....
!!?

ছায়ার মত ছুটে বেড়াচ্ছে একটি মূর্তি! মেয়ালের উপরে হাতুড়ির মত ঘুষি পড়ছে!
আঁঃ
আঁঃ
ওঃ!

তুমিই তো পাইলট, না? আগুন জ্বালাও!
বাকী সবাই চুপ করে বসে থাকো। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই গুলি চালাব!
!?

আগুন জ্বলল! দু হাতে পিস্তল, অরণ্যদেব সামনে এসে দাঁড়ালেন!

উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ বর্তমান সপ্তাহের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, হানয়, দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং ভিয়েতকংদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করার জন্য প্রেসিডেনট জনসন ৩১ অকটোবর রাত্রে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। টেলিভিশনে ওই নাটকীয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেনট জনসন এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, কমিউনিসটরা যদি আমেরিকার যুদ্ধ সীমিত করার সিদ্ধান্তের সুযোগ গ্রহণ করে তা হলে আগামী বুধবার (৬ নবেমবর) প্যারিসে যে নতুন কথা বার্তা আরম্ভ হওয়ার কথা আছে, তা "চলতে পারে না।" সায়গনে মারকিন সামরিক কর্তৃপক্ষ আজ জানিয়েছেন যে, প্রেসিডেনট জনসনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর উত্তর ভিয়েতনামে মারকিন বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর বোমাবর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক তৎপরতা বন্ধ হচ্ছে না। সায়গনের খবরে আরও প্রকাশ, প্রেসিডেনট জনসনের বোমাবর্ষণ বন্ধের নির্দেশ যে কঠোরভাবে পালন করা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রেসিডেনট জনসনের বোমাবর্ষণ বন্ধের কথা ঘোষণার ছাব্বিশ ঘন্টা পর হানয় সরকার বেতার মারফত এই প্রথম জানালেন যে, তাঁরা ভিয়েতনাম ব্যাপারে চতুর্দলীয় সম্মেলনে যোগ দিতে প্রস্তুত। এই চার পক্ষ হলো: উত্তর ভিয়েতনাম, জাতীয় মুক্তি ফ্রনট, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সায়গন সরকার।

দেশী সংবাদ

২৮ অকটোবর—প্রচণ্ড ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যা গনজ্যাম ও পুরী জেলার ১০০ মাইলেরও বেশী এলাকার উপর ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গিয়েছে। গত দু' দিনের এই তাণ্ডবে বাড়ি ধসে একজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঝড়ের সঙ্গে বন্যা মিলে রেল-লাইন এবং ৫নং জাতীয় হাইওয়েসহ সড়কপথে ফাটল সৃষ্টি করেছে। বহু বাড়ির ছাদ উড়ে গিয়েছে, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

সদর স্ট্রীট ডাকাতির অন্যতম আসামী জগমোহন পাঠক আজ সকাল সাড়ে সাতটায় লালবাজারের কনস্টেবলদের শৌচাগারের জানালার গরাদ বেঁকিয়ে পালিয়ে যায়। সামনে রাধাবাজার স্ট্রীট।

২৯ অকটোবর—ওড়িশার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বহরমপুর গত রবিবারের প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত। সর্বশেষ খবর: এই বিপর্যয়কর বর্ষণে শহরটির ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশী। গত দু' দিনে শহরে বৃষ্টি হয়েছে ৩৩ ইনচি, যা এক কথায় অভূতপূর্ব।

উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যরা দীর্ঘকাল ধরে সতর্ক করে আসছিলেন যে, জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর-রংবামালী এলাকার রিস্তা বাঁধ ভাঙার আশংকা আছে। বাঁধ আরও মজবুত করা দরকার। কিন্তু তাঁদের কথা শোনা হয়নি। সম্প্রতি ওই পর্ষদের একজন সদস্য কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রীর কাছে এই অভিযোগ পেশ করেন।

৩০ অকটোবর—যে সব রাস্তার পাশে মসজিদ আছে সেই সব রাস্তার উপর দিয়ে ওড়িশার দুইটি গ্রামের হিন্দুদের উপযুক্ত বাদ্যভাণ্ড সহকারে মিছিল করে যাওয়ার যে অধিকার আছে তার উপর কোন শর্ত চাপিয়ে দেওয়া যায় না বলে ওড়িশা হাইকোরট যে সিদ্ধান্ত করেছেন, গতকাল সুপ্রিম কোরট ওড়িশা হাইকোরটের সেই সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন।

গত রাতে মণিপুর রাইফেলসের লোকজন ইমফল শহরের এক জায়গা (নাম প্রকাশ করা হয়নি) থেকে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করেছেন। কর্তৃপক্ষস্থানীয় মহলের এই খবরে বলা হয়, এই বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে সারা ইমফল শহর উড়িয়ে দেওয়া যেত। বিস্ফোরক পদার্থ তথা এই ডিটোনেটরগুলি সংখ্যায় ছিল বার হাজার।

৩১ অকটোবর—জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল [illegible] শ্রী[illegible] ব্যানার্জি, ডেপুটি

কমিশনার শ্রীসুহৃদ মল্লিক, মহকুমা শাসক, সেচ বিভাগের সুপারিনটেনডেনট-ইনজিনিয়ার প্রমুখ বড় বড় অফিসারদের বদলি করে দেওয়া হচ্ছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে। ওই অফিসারদের এই সিদ্ধান্তের কথা নাকি জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।

বুধবার মাঝ রাতে শুরু করে আজ ভোর পর্যন্ত কলকাতা গোয়েন্দা পুলিসের ঝানু অফিসারের দলটি কমপক্ষে পঁচিশটি জায়গায় তল্লাসি চালিয়ে সদর স্ট্রীটের ডাকাতি সম্পর্কে আরও চারজনকে গ্রেফতার করে। তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসারদের মতে; ওই চারজনকে গ্রেফতার করার সঙ্গে সঙ্গে সদর স্ট্রীটের ডাকাতির রহস্যটা তাঁদের কাছে আয়নার মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১ নবেমবর—মধ্যপ্রদেশের ২০ জন মন্ত্রী আজ পদত্যাগ করেছেন। এঁরা সকলেই কংগ্রেস দলত্যাগী। বর্তমানে লোকসেবক দলের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যপাল শ্রী কে সি রেডডি মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিং রাজ্যপালের কাছে মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের সুযোগদানের পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগপত্রগুলি গ্রহণের সুপারিশ জানিয়েছিলেন।

২ নবেমবর—ভয়াবহ বন্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে সময় মত সতর্ক না করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রাক্তন মুখ্যসচিব শ্রীসত্যেন রায় তাঁর রিপোরটে উত্তরবঙ্গের ডিভিশনাল কমিশনার শ্রীসুনীলকুমার ব্যানারজি, জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার শ্রীসুহৃদ মল্লিক, সেচ দফতরের ওই এলাকার সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রী কে এল মিত্র এবং জলপাইগুড়ির একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার (সেচ) শ্রী কে পি চৌধুরীকে কম বেশী দায়ী করেছেন। ওই সব দায়িত্বশীল পদস্থ অফিসারদের কর্তব্যে অবহেলা না হলে বহু গরীব মানুষ, বিশেষ করে নদীর চরে যাঁরা বাসা বেঁধেছিলেন তাঁরা বন্যার কবল থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারতেন বলে রিপোরটে মন্তব্য করা হয়েছে।

৩ নবেমবর—মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এন সিংহ ও সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেত্রী রাজমাতা শ্রীমতী বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার মধ্যে "শীর্ষ বৈঠক" আজ ব্যর্থ হয়েছে এবং মন্ত্রিসভা থেকে শ্রী সিং দুদিন আগে যাঁদের বাদ দিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন আজ রাজমাতার সঙ্গে দেখা করে একটি পত্র দেন। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের যে অধিকার এঁরা রাজমাতা ও শ্রী সিংকে দিয়েছিলেন এই পত্র মারফত তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

২৮ অকটোবর—"রুশীরা দেশে ফিরে যাও", "অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে পুলিসের বাধা ভেঙে হাজার হাজার তরুণ আজ সকালে মিছিল করে প্রাগ দুর্গের দিকে এগিয়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ করে লাউড স্পীকার মারফত পুলিস হুঁশিয়ারি দেয়—"অশান্তি ডেকে আনবেন না... বাড়ি যান...আপনারা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করছেন।"

২৯ অকটোবর—বারটরানড রাসেল এবং জাঁ পল সারতর সহ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের ১৩ জন সদস্য আজ সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেকভূমি আক্রমণের অভিযোগ করেছেন। তাঁরা চেকভূমি থেকে সোভিয়েট বাহিনী অপসারণ করতে বলেছেন।

৩০ অকটোবর—প্রেসিডেনট নগুয়েন ভ্যান থিউ এবং মারকিন রাষ্ট্রদূত শ্রী এলসওয়ারথ বাংকার উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধের ঘোষণার যুক্ত ইস্তাহারের বয়ান সম্পর্কে গতকাল একমত হতে পেরেছেন বলে আজ নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

৩১ অকটোবর—সায়গন, প্যারিস ও ওয়াশিংটনে যেসব গোপন বৈঠক, আলোচনা চলছে রাজনৈতিক মহল থেকে যেসব ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তর ভিয়েতনামে মারকিন বোমাবর্ষণ বন্ধ হবে। আসন্ন প্রেসিডেনট নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে প্যারিস শান্তি বৈঠকে নতুন মারকিন প্রস্তাবটিই এই ধারণার অন্যতম কারণ।

পাক সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতীয় বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি নিলামের কথা ঘোষণা করেছেন। এইসব সম্পত্তির মধ্যে আছে বড় বড় অট্টালিকা, কারখানা, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি। কয়েকদিন ধরেই নিলাম হবে।

১ নবেমবর—চীন কম্যুনিসট পারটির অষ্টম সেনট্রাল কমিটির ঘোষণায় আজ বলা হয় যে, প্রেসিডেনট লিউ শাও চি-কে তাঁর সমস্ত পদ থেকে অপসারণ করা হবে। বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কমিটি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে অপরাধীর জেল এবং মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও হতে পারে।

২ নবেমবর—গতকাল নিরাপত্তা পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হল। এতদিন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার আধিপত্য বলে যে কথাটা প্রচলিত ছিল এখন বোধ হয় তা যেতে বসল। এই পরিস্থিতির জন্যই আমেরিকাকে ঠেকাবার জন্য রাশিয়াকে ভিটো প্রয়োগ করতে হত। ১ জানুয়ারী (১৯৬৯) থেকে দুই বছরের জন্য সদস্য নির্বাচিত হয়েছে কলমবিয়া, ফিনল্যানড, স্পেন, জাম্বিয়া ও নেপাল।

৩ নবেমবর—দক্ষিণ কোরিয়ার মারকিন সেনারা আজ উত্তর কোরিয়ায় হাজার হাজার রাউনড গোলাগুলি বর্ষণ করেছে বলে উত্তর কোরীয় কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা খবর দিয়েছেন। উত্তরাংশে নাকি সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীও পাঠান হয়েছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯, কাজললতা ৬, তালপাতার পুঁথি ১৫, কিরীটী রায় ১১, ঝড় ১০, অপারেশন ৭৷৷৹ অরণ্য ৬৷৷৹ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭৷৷৹ ধূসর গোধূলি ৫, উত্তর ফাল্গুনী ৭৷৷৹ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৭৷৷৹ কালো ভ্রমর ৫৷৷৹ ঐ ৬, কালোহাত ৬৷৷৹ ঘুম নেই ৫৷৷৹ নীলতারা ৫, ধূপশিখা ৫, নূপুর ৪, নিশিপদ্ম ৫, বেলাভূমি ৮৷৷৹ মধুমিতা ৫৷৷৹ রতিবিলাপ ৪৷৷৹ মুখোশ ৫৷৷৹ মায়ামৃগ ৩, রাতের রজনীগন্ধা ৫, হীরা চুনি পান্না ৫, উল্কা ৩, চক্র ৩, ছিন্নপত্র ৫, বহ্নিমিনতি ১০, পিয়া মুখচন্দা ৪৷৷৹ বহ্নিশিখা ৮,

প্রবোধকুমার সান্যাল

নগরে অনেক রাত ৪৷৷৹ কাঁচকাটা হীরে ৪, মহাপ্রস্থানের পথে ৬, আঁকাবাঁকা ৫৷৷৹ আগ্নেয়গিরি ২৷৷৹ উত্তরকাল ৫, জলকল্লোল ৫৷৷৹ তুচ্ছ ৪৷৷৹ নদ ও নদী ৬, বন্যাসঙ্গিনী ৩৷৷৹ বিবাগী ভ্রমর ৮, বেলোয়ারী ৭, শ্রেষ্ঠগল্প ৫, ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে ৩, উত্তর হিমালয় চরিত ১১, এক চামচ গঙ্গা ৫, মনে রেখো ৮,

প্রমথনাথ বিশী

বিপুলা সদূরে তুমি যে ৭৷৷৹ প্রাচীন পারসীক হইতে ৪৷৷৹ লালকেল্লা ১৪, রবীন্দ্র সরণী ১০, অনেক আগে অনেক দূরে ৪৷৷৹ কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷৹ গল্পপঞ্চাশৎ ৮, নিকৃষ্ট গল্প ৫, মাইকেল মধুসূদন ৪৷৷৹ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (দুই খণ্ড একত্রে) ১০, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫৷৷৹ চিত্রচরিত্র ৬, বিচিত্র উপল ৪, শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬, প্রাচীন আসামী হইতে ৪,

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম—৮, ২য়—৮, অদৃষ্ট রহস্য ৩৷৷৹

প্রশান্ত চৌধুরী

কান পেতে শুনি ৫, নদী থেকে সাগরে ৮, ঘণ্টাফটক ৪, ডাকো নতুন নামে ৪, আলোকের বন্দরে ৪৷৷৹

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫, পূর্বাচল ১১, ইরাবতী ৪৷৷৹ চন্দনবাঈ ৫, তরঙ্গের পর ৫, উপকূল ৩, অন্য দেশ অন্য দাহ ১৫, নায়িকার মন ৪৷৷৹ ক্লান্ত বিহঙ্গী ১১, শহরে বন্দরে ৪৷৷৹

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫৷৷৹ স্বপ্নতনু ৪৷৷৹ অমলতাস ৫, বেনামী বন্দর ২,

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপিগরীয়সী ১ম—৫, ২য়—৫৷৷৹ ৩য়—৬, দোলগোবিন্দের কড়চা ৬, কথাচিত্র ৩, কবি ও অকবি ৩৷৷৹ ক্বণ অন্তঃপুরিকা ২৷৷৹ গল্পপঞ্চাশৎ ৯, নয়ান বৌ ৬, মিলনান্তক ৪৷৷৹ আর এক সাবিত্রী ৫,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী ৬৷৷৹ অপরাজিত ১০, ইছামতী ৮, বিভূতি-বিচিত্রা ১২৷৷৹ আরণ্যক ৬, অভিযাত্রিক ৫৷৷৹ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪৷৷৹ ঐ নাটক ২, উৎকর্ণ ৪, কিন্নর দল ৩, কুশলপাহাড়ী ৫, গল্পপঞ্চাশৎ ৯, দেবযান ৬, মুখোশ ও মুখশ্রী ৩৷৷৹ মেঘমল্লার ৪, যাত্রাবদল ২৷৷৹ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৷৷৹ অরণ্য মর্মর ৭, অশনিসংকেত ৫,

বিমল মিত্র

কলকাতা থেকে বলছি ৬, তিন ছয় নয় ৬৷৷৹ একক দশক শতক ১৪, বেনারসী ৫৷৷৹ কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩০, শ্রেষ্ঠগল্প ৫৷৷৹ সখীসমাচার ৬,

বিমল কর

বাড়ীবদল ৪, সীমারেখা ৪৷৷৹ খোয়াই ৩, পান্থশালা ৩৷৷৹ জীবনায়ন ৫, পরবাস ৪৷৷৹ যাদুকর ৫৷৷৹

মনোজ বসু

বন কেটে বসত ১০, গল্পপঞ্চাশৎ ১০, সাজবদল ৫৷৷৹

মহাশ্বেতা দেবী

সুভগা বসন্ত ৪, বায়স্কোপের বাক্স ৬, সন্ধ্যার কুয়াশা ৫৷৷৹ অজানা ৪৷৷৹ আঁধার মাণিক ১২,

শঙ্কুমহারাজ

নীলদুর্গম ৬৷৷৹ পঞ্চপ্রয়াগ ৫, বিগলিত করুণা জাহ্নবী-যমুনা ৭, গহন গিরি কন্দরে ৬, গিরি কান্তার ৯, উত্তরস্যাং দিশি ১০,

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান শ্রীমতী ৭, নিবেদনমিদং ৭,

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

ASP/ABF-54/67A
"বলতে প্যারো,
আমূলের ভিটামিনগুলো
কিজন্যে ?"
জিজ্ঞেস করল শিশুটি।
"হ্যাঁ,"
সমস্বরে বলে
উঠল ওর ছোট্ট
বন্ধুরা
ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তিকে উজ্জ্বল করে।
ভিটামিন বি১ স্নায়ু সবল করে।
ভিটামিন বি২ মুখ সুস্থ রাখে।
ভিটামিন বি৬ মাংসপেশীর আড়ষ্টতা দূর করে।
ভিটামিন সি রোগসংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
ভিটামিন ডি হাড় মজবুত করে।
নিয়াসিনামাইড ত্বক সুস্থ রাখে।
আমূল দুগ্ধজাত খাদ্য
Amul
MILK FOOD FOR BABIES
আপনার শিশুর প্রয়োজনীয় ৭টি ভিটামিন এতে আছে।

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা
সমাজবিরোধী কার্যকলাপ—	... ২২১
ব্যঙ্গচিত্র—	... ২২২
দেশ দর্পণ—	... ২২৩
বৈদেশিকী—রঞ্জন	... ২২৫
আমেরিকার নতুন প্রেসিডেণ্ট—নীল উপাধ্যায়	... ২২৬
সানন্দর জার্নাল—	... ২২৭
ভারতবর্ষ—শ্রীরমাপদ চৌধুরী	... ২২৯
ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়	... ২৩৭
অর্থাৎ বালকবেলার স্বাধীনতা (কবিতা)—শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়	... ২৪১
গৌরী মেয়েকে (কবিতা)—শ্রীবিনোদ বেরা	... ২৪১
ঐশ্বরিক (কবিতা)—শ্রীমতী বিজয়া মুখোপাধ্যায়	... ২৪১
আর একটু হলে (কবিতা)—শ্রীমতী সঞ্জিতা দাশ	... ২৪১
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী	... ২৪৩
অসংলগ্না—বনফুল	... ২৪৫
আর্থিক ভারত—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	... ২৫১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসন্ধ্যা গাংগুলী

PHILLIPS

কি করে
সেরা জিনিষ
কেনার বিষয়ে
নিশ্চিন্ত
হবেন?
এই ভাবে!

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩
শনিবার ৩০ কার্তিক ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০৫
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক „	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	...	১৩.০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 16 Nov. 1968

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বলে একটি কথা আজকাল সব সময়েই শোনা যায়। সহজ সমাজজীবন যাপন যে সব কাজকর্মের ফলে ব্যাহত হয়—সাধারণভাবে আমরা তাকেই সমাজবিরোধী কাজ বলে থাকি। এদিক থেকে বিচার করলে বাজেটের আগে যে-সব ধূর্ত পানঅলা সিগারেটের দাম বেশি নেয়; যে ব্যবসায়ী লুকিয়ে বেবিফুড বেচে চড়া দরে, যে ছেলেটি মেয়েদের স্কুল যাবার পথে শিস দেয়—এরা তবে কি? সমাজবিরোধী? এক অর্থে বোধ হয় তাই। তবে কিছু কিছু অনুচিত কর্ম সহ্য করতে আমরা ক্রমশই অভ্যস্ত হয়ে উঠছি বলে ওদের প্রতি আমাদের ক্রোধ, বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি যতই হোক না কেন, ওদের জন্যে আমাদের মুখ শুকোয় না, সন্ত্রস্ত হই না। কিন্তু নৃশংস হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক খুনোখুনি, বন্দুক-স্টেনগান বোমার লড়াই, গুণ্ডার আধিপত্য—এ-সব আমাদের নিরীহ জীবনে সহ্য হতে চায় না, আতঙ্ক বোধ করি, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। কলকাতা শহর ও শহরতলি এবং পশ্চিম বাংলার বেশ কিছু মফস্বল শহরে আজকাল এই রকম এক সন্ত্রাসের অবস্থা হয়েছে। খবরের কাগজের পাতায় নিত্যই আমরা এমন কিছু কাহিনী পাঠ করি—যা নির্মম, নৃশংস। হিংস্রতার সে-কাহিনীগুলি আমাদের ভীত ও বিহ্বল করে। মাঝে মাঝে হয়ত এমনও মনে হয়, পাঁচ সাত দশ বছর আগেও তো আমরা এত খুনোখুনি ও সন্ত্রাসের মধ্যে ছিলাম না। তবে এখন এ-রকম কেন হল?

হিংস্রতা এ-যুগের অন্যতম অভিশাপ কি না জানি না, তবে সামাজিক দিক থেকে দেখা যাচ্ছে এর প্রকোপ সর্বত্র বাড়ছে। আমরা অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবো না, নিজেদের কথাই বলব। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের আই জি শ্রীউপানন্দ মুখার্জি সম্প্রতি এ-রাজ্যের সামাজিক অপরাধ ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছেন। কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কয়েকটি অভিমতের একটি বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে, সমাজবিরোধীদের একাংশ রাজনৈতিক দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কথাটি আমাদের কাছে নতুন নয়, বা অপ্রত্যাশিত নয়; তবে এক্ষেত্রে এমন একজন অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল পুলিস-কর্মকর্তা অভিযোগটি এনেছেন যা ছাই চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। যথেষ্ট হাতেনাতে প্রমাণ না পেলে এ-রকম কথা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হত না। কংগ্রেস কমিউনিস্ট বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল—কাউকেই তিনি এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেননি। বরং বেলঘরিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, ওখানে যা ঘটে তার মধ্যে রাজনৈতিক দলের ইন্ধন থাকে প্রায়শ। এমন কি পুলিস যদি সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে মামলা চালায়, উচ্চ মহল—সরকারী মহল সেটা তুলে নেয়। যেমন বেলঘরিয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত অনেকের বিরুদ্ধে মামলা যুক্তফ্রন্ট সরকার তুলে নিয়েছিলেন। শ্রীমুখার্জি যদিও স্পষ্ট করে বলেন নি, তবু অনুমান করা যায়, যে-সরকার যখন গদিতে থাকেন, তখন তাঁর দলীয় চেলাচামুণ্ডাদের আইনের বিচার থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ যিনি রক্ষক, তিনিই হন প্রকারান্তরে ভক্ষক। পুলিসের পক্ষপাতিত্ব নেই বলে শ্রীমুখার্জি যদিও দাবী করেছেন, তবু আমাদের বিশ্বাস, কর্তার ইচ্ছায় কর্মের মতন পুলিসেরও ভূমিকা বহু ক্ষেত্রে ওপর তরফের মুখাপেক্ষী।

পুলিস নিজেকে যতটা সক্রিয় বলে দাবী করে, ততটা সক্রিয় কি না সে-বিষয়ে অনেকের সন্দেহ থাকতে পারে। অন্যের মরজিতে যদি পুলিসকে চলতে হয় তবে এই সমস্যার সমাধান হবে না। পুলিসের সামাজিক ভূমিকা ছাড়াও একটি নীতিগত ভূমিকা আছে। অসহায়, নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ কতক দুষ্টের প্রতাপে সশঙ্কিত হয়ে সমাজজীবন যাপন করবে এর চেয়ে লজ্জার ও অন্যায়ের কিছু নেই। দুষ্টের দমন পুলিসের কর্ম, সাধারণ মানুষের নয়; সে সুযোগও তার নেই। আইন আমাদের এমন প্রশ্রয় দেয় না যাতে আমরা স্বহস্তে দুষ্টকে দমন করতে পারি, কিন্তু এ-ক্ষমতা পুলিসের হাতে দেওয়া আছে। পুলিস যদি হিংসা, অনাচার, স্বেচ্ছাচারিতাকে বাড়তে না দেয় তবে অপরাধপ্রবণতা কমতে বাধ্য।

আর রেখোনা বোতলে
আমায় বেরোতে দাও!
মাদকবর্জন প্রবর্তনের প্রস্তাবটি
৭ বছরের জন্য স্থগিত
রাখা হল—
মাদকবর্জন প্রবর্তনে
আগ্রহীদল
মেচিওর হওয়া
চাই ত!
ভিয়েতকং
জনসন

দেশ দর্পণ
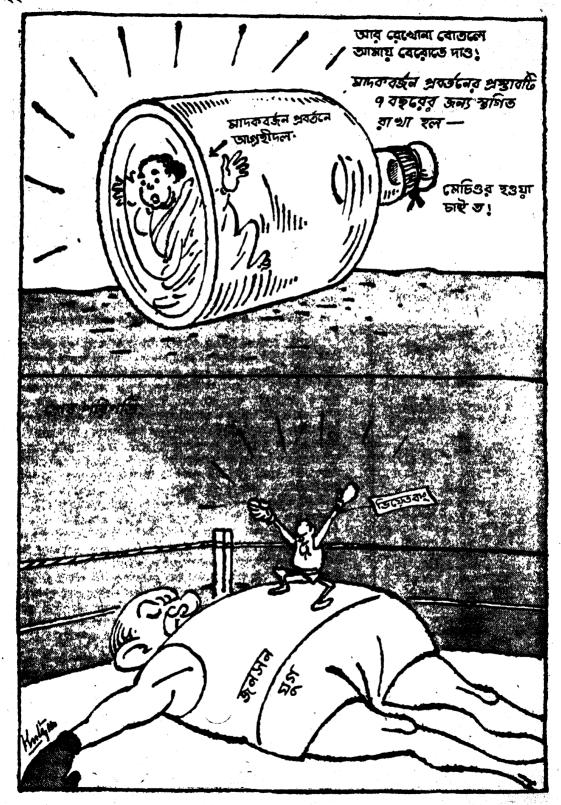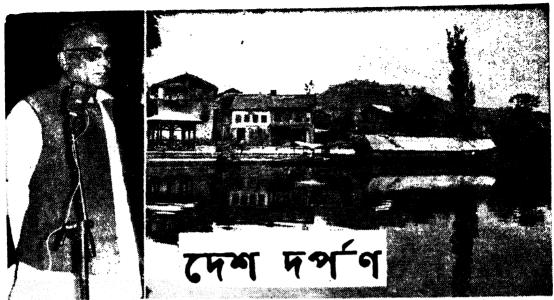
মোল্লা ফারুক বেশ কিছুদিন ধ'রে কাশ্মীর উপত্যকায় তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। যখন হজরত বাল সম্পর্কে কাশ্মীরে বিক্ষোভ দেখা দেয় তখনই তাঁর আবির্ভাব। তখন অবশ্য তাঁর বয়স ছিল খুবই কম, কারণ এখন তিনি ২৪ বছরের যুবক। গত নির্বাচনের পর থেকেই ফারুক মোল্লা তাঁর দল সংগঠন করতে শুরু করেছেন। বর্তমানে, তাঁর দলের মুখপাত্র বলেছেন, আওয়ামী কমিটির বর্তমান সভ্য সংখ্যা প্রায় আশী হাজার হবে। তাঁদের আশা যে, আরও বেশী সংখ্যক সদস্য ফারুক মোল্লার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে দলভুক্ত হ'য়ে যাবে।

ফারুক মোল্লা মনে করেন কাশ্মীরের 'অনিশ্চিত' অবস্থার অবসান করার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে তাঁরই উপর এসে গিয়েছে। সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সচেতন বলেই তাঁর চালে বলনে বেশভূষায় একটা ডেমাগগের ছাপ পড়ে গিয়েছে। কয়েকদিন আগে শ্রীনগরে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এই ধারণাই সাংবাদিকদের হয়েছে যে, তিনি কোনমতেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপর কোন নেতার অস্তিত্ব স্বীকার করতে রজী নন। এমনকি অক্টোবরের জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস কনভেনশনের পরেও না। শেখ আবদুল্লা?—তিনি বলেন, তিনি আবার নেতা নাকি? প্লেবিসিট ফ্রণ্টের নেতা মীর্জা আফজল বেগ?—না, তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জি এম সাদিকের কথাই উঠতে পারে না; কারণ, তিনি ত' ভারতীয় সংবিধানগত শাসন ব্যবস্থার অংশ মাত্র।

তাহলে? প্রশ্নটা শুনেই অনুমান করতে দ্বিধা করেননি ফারুক মোল্লা। তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাই কাশ্মীরের জনসাধারণ একান্তভাবে দাবী করে এবং করবে। ফারুক মোল্লার মতে, কাশ্মীরের জনগণই কাশ্মীরের বর্তমান 'অনিশ্চয়তা'র অবসান করতে পারে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন পন্থায় কাশ্মীরের জনগণ এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম? প্লেবিসিট? না। ফারুক মোল্লা বলেন, না, প্লেবিসিটের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে? যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করা হচ্ছে সে-দাবী পূরণ করা হতে পারে কি উপায়ে? ফারুক মোল্লা সুস্পষ্ট কোন মন্তব্য করতে নারাজ। কাশ্মীরের জনগণকে আত্ম-নিয়ন্ত্রনের অধিকার দিতে হবে, এর বেশী কিছু তিনি এখন বলতে চান না।

শুধু ফারুক মোল্লা নয়। আর দুজন নেতার কাছ থেকেও এর বেশী আর কিছু শোনা যায় না, বা যাচ্ছে না। শেখ আবদুল্লা চান কাশ্মীরের জনসাধারণ মুক্তির জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। সে-মুক্তির প্রকৃতি বা রাজনৈতিক চরিত্র কি হতে পারে তা তিনি বলেন না। মীর্জা আফজল বেগ শুধু দাবী করে যাচ্ছেন প্লেবিসিট চাই; অর্থাৎ কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত কিনা সেটা যাচাই করে নিতে হবে জনসাধারণের রায় নিয়ে। অর্থাৎ? না, এর বেশী আর কিছু মীর্জা আফজল বেগ বলেন না, বা বলতে চান না। বলতে চান না, কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কি না। শুধু বলেন, এমন একটা মীমাংসার সূত্র জনসাধারণের মতামত নিয়ে গ্রহণ করতে হবে যা ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য বা সমর্থনযোগ্য হয়। ফারুক মোল্লারও সেই কথা; জনগণের সিদ্ধান্ত ভারত ও পাকিস্তানের সমর্থন-যোগ্য হওয়া চাই। তাহলে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে, জনগণের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন মীমাংসা-সূত্র স্বীকৃত না হচ্ছে?

প্রশ্নগুলো অনেকটা জেরার মত শোনাবে। কিন্তু অবস্থাটা পরিষ্কার করে বুঝতে হলে প্রশ্নগুলো আসবেই। এটা অবশ্য কাশ্মীরের নেতাদেরও অজানা নেই। তাঁরাও জানেন, নিছক শ্লোগান দিয়ে কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান হবে না; বা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে যথার্থভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানেন, স্পষ্ট কোন মত বা পথ নির্দেশ করতে হলে অনেকগুলো ঝুঁকির দায়িত্ব স্বীকার ক'রে নিতে হবে। প্রধানত এবং মুখ্যত সে-দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই অক্টোবর মাসে জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস কনভেনশন ডাকা হয়েছিল শ্রীনগরে।

এমনি একটা অবস্থা এবং অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় শ্রীনগরের কনভেনসন বসেছিল অক্টোবরের শেষের দিকে। এটা নিশ্চয়ই কনভেনসন উদ্বোধন করার আগে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ কনভেনসন উদ্বোধন করার জন্য যেদিন শ্রীনগরে এলেন সেদিন তিনি তাঁর বক্তৃতার একটি মর্মাংশ শেখ আবদুল্লাকে দেন। সে-মর্মাংশ শেখ আবদুল্লাকে যে খুশী করতে পারেনি তা বোঝা গেল পরবর্তী জনসভায়। শ্রীজয়-প্রকাশ নারায়ণের মূল বক্তব্য ছিল যে, কাশ্মীরের জনসাধারণের সামনে যদি কোন দুরূহ রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে

অথবা যদি ভারতভুক্তি সম্বন্ধে কোন 'অনিশ্চয়তা' কোথাও থেকে থাকে, তাহলে তা দিল্লীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই মীমাংসা করতে হবে। যে-আলোচনা অতি অবশ্যই ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। মোট কথা, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের এটাই বক্তব্য ছিল যে, ভারতভুক্তিকে চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে নিয়েই কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা করতে হবে দিল্লীর নেতাদের সঙ্গে। কনভেনসন উদ্বোধন করার পর যে জনসভা হয়েছিল সেখানেও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই বক্তৃতার প্রত্যুত্তর হিসাবেই শেখ আবদুল্লাও বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই জনসভায়। শেখ আবদুল্লার ভাষাই শুধু তীব্র ছিল না, তাঁর বক্তব্যর মধ্যেও ছিল ক্রোধ এবং হতাশা প্রধানত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে। শেখ আবদুল্লা এটাই বলেছিলেন, কাশ্মীর-বাসীদের মুক্তি আন্দোলন চলছে এবং চলবে। সভার শেষে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ হেসে বলেছিলেন, এতটা কড়া ভাষা ব্যবহার করার বোধহয় প্রয়োজন ছিল না।

হয়ত ছিল না। কিন্তু শেখ আবদুল্লার কাছে সেই মুহূর্তে এ-ছাড়া অন্য কোন ভাষাও বোধহয় ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। কারণ, কাশ্মীরের রাজনৈতিক মহলে এটা আজ আর অবিদিত নেই যে, শেখ আবদুল্লাই কাশ্মীরবাসীদের একমাত্র নেতা নন, শেখ আবদুল্লার রাজনৈতিক 'ইমেজ' বা নেতৃত্বের প্রভাব হয়ত এখনও অক্ষুণ্ণ আছে: তবু 'হয়ত'-র অবকাশও আছে। শেখ আবদুল্লা বিচক্ষণ নেতা নিঃসন্দেহে; কিন্তু বিচক্ষণতার বিচারে এটাও তাঁর কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ফারুক মোল্লা বা মীর্জা আফজল বেগ অথবা অন্য কোন নেতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

শেখ আবদুল্লার রাজনৈতিক বিচার অবশ্যই কনভেনসনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, এই কনভেনসনে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত ছিল। ফলে দেখা গেল যে-সব বক্তারা এই কনভেনসনে তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন, তাঁরা বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাধারা সকলের সামনে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, কনভেনসনের বক্তৃতাগুলোর রাজনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস করলে দেখা যাবে যে, শতকরা ৫০ জনেরও বেশী বক্তা মীর্জা আফজল বেগের 'প্লেবিসিট' মতকে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। বাকী অর্ধেকের মধ্যে বেশ কিছু ছিল ভারতভুক্তিকে সমর্থন করে জম্মু ও কাশ্মীরের 'অটনমি' বা স্বয়ং-শাসনাধিকারকে সমর্থন করে অথবা কাশ্মীরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে। আর দুটি বক্তৃতা ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরকে সংযুক্ত করার দাবী জানিয়ে।

বক্তৃতার এই ধারা থেকে শেখ আবদুল্লার কাছে এটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, অক্টোবরের কনভেনসনে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া রাজনীতির বিচারে বিপজ্জনক হবে। কারণ, মীর্জা আফজল বেগের পক্ষে 'প্লেবিসিট' শ্লোগানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টার কোন অভাব ছিল। অথচ, শেখ আবদুল্লা 'প্লেবিসিট' নীতিকে চরম সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতেও রাজী ছিলেন না। তাছাড়া, আরও একটা প্রশ্ন কনভেনসনের সামনে স্পষ্টভাবে রাখা হয়েছিল, যার যুক্তি সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই প্রশ্নটা তোলা হয়েছিল আধুনিককালের কাশ্মীরী যুবক-দের পক্ষ থেকে। তাদের বক্তব্য বুঝতে হ'লে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কাশ্মীরের আধুনিককালের যুবকরা পুরাতন দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে অনেকটা সরে এসেছে। বর্তমান কালে যুবকরা যত আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে এবং যাদের সংখ্যা স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের কাছে নিছক 'প্লেবিসিট' বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এদের বক্তব্যর প্রতিধ্বনি করে শামিম মহম্মদ কনভেনসনের সামনে কয়েকটা প্রশ্ন রাখেন। শামিম মহম্মদের প্রথম বক্তব্য : কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত নয় একথার আইনগত বা নীতিগত স্বীকৃতি কোথায়। যদি তা কোথাও স্বীকৃত না হয়ে থাকে, তাহলে 'প্লেবিসিটে'র শ্লোগান সমাধান হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা, তা বিচার করার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। দ্বিতীয় বক্তব্য : আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সর্বস্বীকৃত। সে অধিকার কাশ্মীরবাসীদেরও নিশ্চয় আছে। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না থাকলে অধিকারের প্রশ্নটা নিছক অধিকার হিসাবেই স্বীকৃত হবে। কাজেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণ সচেতন হলেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করার এবং আদায় করার যৌক্তিকতা দেখা দেয়। শামিম মহম্মদ বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিছক পাকিস্তান-ভুক্তির জন্য দাবী করা চলে না; কারণ, তাতে জনসাধারণের দুর্গতির অবসান ঘটবে না। এই অধিকার দাবী করার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে 'নয়া কাশ্মীর' সৃষ্টি করা। এই 'নয়া কাশ্মীর' কোন রাজনৈতিক শ্লোগান নয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সে পরি-কল্পনার মূল কথা হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। শামিম মহম্মদের মত অন্যান্য কাশ্মীরী শিক্ষিত যুবকদেরও একই বক্তব্য —কাশ্মীরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা।

আর কাশ্মীরের অ-মুসলমান অধিবাসী-দের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রেমনাথ বাজাজ পরিষ্কার-ভাবে জানিয়েছিলেন যে, কনভেনসনের মূল লক্ষ্য কাশ্মীরের মুসলমান ও অ-মুসলমান-দের "সম্মিলিত সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক মিতালী এবং জাতীয় চরিত্র" অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখা। কনভেনসনে ১৯৩১-১৯৪০ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরের আন্দোলনে যে উদ্দেশ্য সামনে রাখা হয়েছিল তাকে সঞ্জীবিত করে প্রতিষ্ঠিত করা। ১৯৩১-১৯৪৭ পর্যায়ে যে আন্দোলন প্রধানত শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে এবং জওহরলাল নেহরুর সমর্থনে কাশ্মীরে হয়েছিল তারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার করা। এটাই যদি কনভেন-শনের বক্তব্য হয়ে থাকে, অর্থাৎ শ্রীবাজাজের কথা মত, তাহলে এটাই ধরে নিতে হবে যে, শেখ আবদুল্লার পক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষে মত দেওয়া সম্ভব ছিল না।

এ-কথা অজানা নেই যে, মীর্জা আফজল বেগ বা ফারুক মোল্লা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দাবী জানান সত্ত্বেও শেখ আবদুল্লার পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না এই কারণে, আধুনিককালের যুব সম্প্রদায়ের বা শ্রীপ্রেমনাথ বাজাজের পক্ষে তাদের দাবীকে উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া শেখ আবদুল্লার পক্ষে তাঁর নিজস্ব নেতৃত্বকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্ন যদি সামনে রাখা হয়, তাহলে তাঁর দ্বিধা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। একদিকে নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ, অপরদিকে নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তন। এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে শেখ আবদুল্লার পক্ষে একটা সিদ্ধান্তই নেওয়া সম্ভব ছিল। সে-সিদ্ধান্ত কনভেন-সনে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নেওয়া।

সেই মত কনভেনসনে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ কথাই বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে কনভেনসন এই ঘোষণাই করতে চায় যে, একমাত্র কাশ্মীর ও জম্মুর অধিবাসীরাই বর্তমান কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। সে-সমাধান কোনপথে আসতে পারে তা বিচার করা হবে কনভেনসনের পরবর্তী পর্যায়ের অধিবেশনে। শ্রীবাজাজ বলেছেন, পর্যায়ক্রমে আলোচনার মাধ্যমেই আসবে সমাধানের সূত্র। আর শেখ আবদুল্লা বলেছেন, সে-আলোচনার মাধ্যমে গড়ে উঠবে কাশ্মীরে সম্মিলিত এবং সমষ্টিগত নেতৃত্ব। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নূতন নেতৃত্বের কথা ভাবছেন শেখ আবদুল্লা। কেন?

হয়ত এটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এই কনভেনসনে যে, শেখ আবদুল্লা বা ফারুক মোল্লা বা মীর্জা আফজল বেগের ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বর্তমান কাশ্মীরের কাছে অচল হয়ে এসেছে। হয়ত এটাই আরও স্পষ্ট হবে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায়।

রঞ্জন

মার্কিন মুলুকের চতুর্বার্ষিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে স্বভাবতই বাইরের লোকের ভোটের অধিকার নেই। কেনই বা থাকবে? আমেরিকার ঘরের সমস্যা বহু তথা ভয়াবহ। সেখানে বিদেশী কেন আসবে মাথা গলাতে? একান্তই সঙ্গত প্রশ্ন যার মধ্যে তার উত্তরও নিহিত রয়েছে। মুশকিল এই যে, একদা শম্বুকস্বভাব মার্কিন জাতি অধুনা অতি মাত্রায় আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছেন। আগামী রাষ্ট্রপতি নিকসন, হামফ্রে ব ওয়ালেস হবেন তা নিয়ে আমাকে কিছুটা ভাবতেই হয়; কেননা ওই তিনজনের একজন স্থির করবেন—আমি ভাত খাব না রুটি; এমন কি কে জানে, আমার পঞ্চায়েতী প্রতিনিধি রাম হবে, না শ্যাম। আমাকে তাই খবর রাখতে হয় বইকি যে, ওয়াশিংটনের শ্বেত সৌধের বাসিন্দা কোন ব্যক্তি।

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক নির্বাচনই কিছু পরিমাণে মেলার আকার নেয়। আমেরিকায় এই কার্নিভল শুরু হয় ডেমোক্রাট আর রিপাবলিকানদের প্রাইমারি অনুষ্ঠানগুলি থেকেই। সর্বপ্রকার পরস্পরবিরোধী প্রতিশ্রুতির প্রবল বন্যা বইতে থাকে কলোরাডোর স্রোতের মতো। রাজনীতিক বিতর্কে এখন ম্যাডিসন অ্যাভিন্যুর ভূমিকা আদৌ অবজ্ঞেয় নয়। গণতন্ত্রের মন্ত্রতন্ত্র উদ্ভূত হয় বিজ্ঞাপনী কারখানায়। এবারের নির্বাচনেও আগেকার প্রথার পরিবর্তন হয়নি। মেলা অর্থাৎ কনভেনশন হয়েছে ফ্লোরিডায়, হয়েছে শিকাগোয়। শিকাগোয় মেয়র ডেলির প্রস্তুতিতে কিছু সাংবাদিক মার খেয়েছেন, তিনি নিজে খেয়েছেন কিছু গাল। এ সমস্তই ভূমিকা মাত্র। আসল নির্বাচন হলো পাঁচই নভেম্বর আর তাতে জয়ী হলেন রিপাবলিকান দলের প্রার্থী রিচার্ড মিলহাউস নিকসন।

✻

নিকসন অতি সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেছেন, নিকসন তাঁর ঘরের বা বাইরের নীতি কোনোটাই স্পষ্ট করে বলেননি, নিকসন কার কাছ থেকে কী টাকা নিয়ে কোন মামলায় কার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, নিকসনের বিপুল ব্যয়বহুল নির্বাচনের খরচা কে বা কারা যুগিয়েছে, নিকসন অনুগত স্বামী, না অপত্যস্নেহে অন্ধ, নিকসন টেলিভিশনে সুভাষী, না তার বিপরীত—এই সমস্ত প্রশ্নই আজ অবান্তর। একমাত্র সত্য এই যে, আগামী চার বছরের জন্য নিকসন পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকার কর্ণধার। আমাদের কান খাড়া করে তাঁর কথা শুনতেই হবে, কেননা মনুষ্যজাতি আদৌ বেঁচে থাকবে কিনা তা প্রধানত নিকসনের সুবুদ্ধির উপর নির্ভর করবে।

নিকসনী প্রচারের প্রধান বক্তব্যই ছিল এই যে, তিনি অতি সাধারণ ব্যক্তি। মার্কিনী গণতন্ত্রে সাধারণত্বের একটা বিরাট আকর্ষণ আছে। যে আমারই মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত ছাপোষা গৃহস্থ ব্যক্তি তাকে ভোট দেবার লোভ প্রবল। এটা নিন্দনীয়ও নয়। অসাধারণ ব্যক্তি অতি সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে যান, তখন বিদায় নিতে হয় গণতন্ত্রকে। বুদ্ধি সর্বদা নয় শান্তির দোসর। তবু ভাবতে ভয় লাগে, তোমার আমারই মতো যে অতি সাধারণ ব্যক্তি, যে কিনা কোনো সওদাগরী দপ্তরে কেরানী হতে পারতো বা একান্তই ভাগ্যহীন হলে সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাংবাদিক হতে পারতো, তারই স্কন্ধে আজ বর্তাচ্ছে সারা বিশ্বের বোঝা। নিকসনের সাধারণত্বের অতিকৃত অভিনয় তখনই আনে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি। অন্তত তিন কোটি মার্কিন হৃদয়েও যে অনুরূপ অস্বস্তি একেবারে অবর্তমান ছিল না গত সপ্তাহে তার প্রমাণ অস্পষ্ট ছিল না। ওই সংখ্যক লোক নিকসনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

✻

বর্তমান কাল তবু এমনই যে, সামান্য করুণার জন্যও ঊর্ধ্বহস্ত হয়ে ধন্যবাদ দিতে হয়। নিকসনের নির্বাচন যেমন কঠোর সত্য তেমনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে হয় একথা যে, গভর্নর ওয়ালেস সত্যিই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হননি। মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন এই প্রার্থীটি তবু প্রায় এক কোটি ভোট পেয়েছেন এবং এতে মার্কিন জাতির গর্বিত হবার কারণ অতি সামান্যই। একটি নির্লজ্জ বর্ণবিদ্বেষী, হিংসাবিশ্বাসী ব্যক্তি শুধু দক্ষিণীদের দাক্ষিণ্যে এত সমর্থন সংগ্রহ করেছেন এমন ধারণা অশ্রদ্ধেয়। ওয়ালেসী পদ্ধতিতে নিগ্রো শাসন (হ্যাঁ, গাড়ির নিচে ফেললে ক্ষতি কী?) মেসন-ডিকসন লাইনের উত্তরেও সমর্থক দাবি করতে পারে নিশ্চয়ই। এই ঘৃণ্য ওয়ালেসের ভোটের অংশমাত্র হামফ্রে পেলে নির্বাচনের ফলাফল অন্য রূপ হতে পারতো। ওয়ালেসের ভোট-সংখ্যা দেখে মনে হয়, ভাগ্যিস আমি মার্কিন নিগ্রো নই। বাইরের মানুষ হিসাবে তবু বলতে হয়, ভেবে দেখ একবার, হিংস্র ওয়ালেসের হাতে বিশ্বধ্বংসী আণবিক বোমা উদ্গিরণের অন্তিম চাবি! হরি, হরি!

নিকসন ঠিক ততটা উন্মত্ত নন। তিনি হিসেবী। বাঙালী সমাজে এক কালে এক কুলের নাম ছিল "জাতে মাতাল, তালে ঠিক।" বর্ণনাটা প্রশংসাসূচক ছিল না। এই শ্রেণীর সদস্যদের মত্তভাবশত অনির্ভরযোগ্যতার অন্ত ছিল না। অপর পক্ষে, মত্তজনসুলভ ঔদার্যের সামান্যতম চিহ্ন ছিল না এদের চরিত্রে বা ব্যবহারে। ওয়ালেসকে এড়িয়ে নিকসনকে পেয়ে সর্বান্তঃকরণে তাই বাহবা দিতে বাধছে। মার্কিনী নির্বাচনের আন্তর্জাতিক অর্থময়তা অনস্বীকার্য। পিকিং থেকে পেরু পর্যন্ত কারো উপায় নেই এর ফলাফল উপেক্ষা করবার। তবু প্রধানত এটা ঘরোয়া ব্যাপার। শ্বেত সৌধে নিকসন আসীন হলে ঘরে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে মনে করিনে, বিশেষ করে কালোদের ভবিষ্যৎ। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে অভাগাদের সংখ্যা কম নয়। তাদেরও কারণ নেই নিকসনী জয়ে নৃত্য করবার। লোকটির সাধারণত্বের কুশল অভিনয়ও এ সত্য সম্পূর্ণ গোপন করতে পারে না যে, তার ধনীর পদলেহনে পটুত্ব অসাধারণ।

✻

আমাদের মতো বাইরের লোকের হৃদয়ে ডেমক্র্যাটিক পার্টির জন্য কিঞ্চিৎ স্নেহ যেন পূর্বনির্মিত হয়েই আছে, যেমন আছে বিলাতের শ্রমিক দলের জন্য। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই প্রশ্রয়প্রবণতার উৎস সন্ধান করা বৃথা, তবু টোরি রাগ এখনও প্রিয় নয়, যেমন নয় রিপাবলিকান রাগিণী। সদাজিৎ বিতৃষ্ণার সাধারণত সীমা থাকে; আজন্ম আক্রোশ সে যে এমন বট যার মূলোৎপাটন প্রায় অসম্ভব। ভারতে বিলাতের লেবার পার্টি আর আমেরিকার ডেমক্রাটদের প্রতি আজও প্রথম প্রেমে অনড় হয়ে আছি, এটা আমাদের রাজনীতিক আনুগত্যের সাক্ষ্য বইকি। বস্তুত নিশ্চয়ই অন্য প্রসঙ্গ। নেশার ঝোঁকে ওয়ালেস হয়তো আমাকে বা তোমাকে দশ পার্সেন্টের বেশি বকশিশ বা ভিক্ষা দিয়ে দিত; হামফ্রে অন্তত দশ পার্সেন্টের দস্তুর মেনে চলত। নিকসন সম্বন্ধে যে-কোনো ভবিষ্যদ্বাণী বিপজ্জনক।

শ্বেত সৌধের যে-কোনো চার বছুরী ভাড়াটে একটি বোতাম টিপবে আর তৎক্ষণাৎ তুমি আমি সমেত সারা বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা নিশ্চয়ই অতিমাত্রায় আশাব্যঞ্জক নয়। এমন ভয়াবহ অপক্ষমতা ক্রেমলিনেও বর্তমান। হয়তো অন্যত্রও। মার্কিনী নির্বাচনে অনাহূতদের কৌতূহল অতিমাত্রিক বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু, বামপন্থী স্লোগানে, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। নিকসন, হামফ্রে বা ওয়ালেস, কাউকেই ভালোবাসিনে। তবু বেঁচে থাকতে চাই যে

আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট

নীল উপাধ্যায়

নিকসন এবং হামফ্রে, এবারের দুই প্রেসিডেনট পদপ্রার্থীই ছিলেন ১৯৬০ সালে জন কেনেডির প্রতিদ্বন্দ্বী। হামফ্রে দাঁড়িয়েছিলেন ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী মনোনয়ন প্রতিযোগিতায়, হেরে যাবার পর বলেছিলেন, অর্থাভাবে তিনি প্রচারকার্য ভালো ভাবে চালাতে পারেন নি। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিকসন কেনেডির কাছে হেরে গিয়ে তাঁর সমর্থকদের বিমূঢ় করেছিলেন। কেনেডি পরিবারের নামের যাদু তখনও ছড়ায় নি, কেনেডি রোমান ক্যাথলিক যা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হবার পক্ষে অযোগ্যতা বলেই গণ্য ছিল, এবং অত বয়েস কম—তাঁর কাছে হেরে গিয়েছিলেন নিকসন। যিনি চৌকোস, বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ম আইনজীবী, আমেরিকায় শাসন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি যাঁর নখদর্পণে, সর্বোপরি, যিনি আইসেনহাওয়ারের সমর্থনপুষ্ট—সেই নিকসনের পরাজয় সত্যিই বিমূঢ় হবার মতন ঘটনা।

এর থেকেও বেশী আশ্চর্যের ঘটনা ঘটেছিল দু' বছর বাদে। ১৯৬২-তে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিত করেছিলেন নিকসন। যিনি এর আগে দু'বার আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তার পক্ষে এই পদ সামান্যই বলা যায়। সেবারও নিকসন হেরে গেলেন এডমান্ড ব্রউনের কাছে। সব গুণ থাকা সত্ত্বেও এক একজন জীবনে সব জায়গায় পিছিয়ে থাকে, ধরে নেওয়া হলো, নিকসন সেই দলের, তাঁর ডাক নাম হলো লুজার নিকসন। রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে নিকসন আবার ফিরে গেলেন নিউ ইয়রকে আইন ব্যবসায়ে। ১৯৬৪-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিকসনের আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি।

রিচার্ড মিল হাউস নিকসনের জন্ম ১৯১৩ সালের ৯ই জনুয়ারি, ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে। তাঁদের পরিবার কোয়েকার ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত, নিষ্ঠাবান ও সংযমী জীবন যাপন করার জন্য এঁরা প্রসিদ্ধ। নিকসনের জীবনে এই পারিবারিক প্রথার প্রভাব আছে, তিনি ধূমপান করেন না, আনুষ্ঠানিক উৎসব ছাড়া মদ্যপান করেন না, নাচগানের ব্যাপারে বেশী উৎসাহ নেই। কিন্তু নিকসনের রসিকতাজ্ঞান প্রখর, হাসতে ও হাসাতে তিনি সমান পারংগম।

নিকসনের বাবা ছিলেন ছোট ব্যবসায়ী। পড়াশুনোয় নিকসন ছেলেবেলা থেকেই প্রখর। স্কলারশিপ পেয়ে ডিউক ইউনিভার্সিটিতে আইন পড়তে শুরু করেন এবং অনার্স ডিগ্রি পেয়ে পাশ করেন ১৯৩৭ সালে। ক্যালিফোর্নিয়া বার-এর সদস্য হয়ে নিকসন জীবিকা শুরু করলেন। নিজের গ্রামের একটি ছোট থিয়েটারের রিহার্সাল দেখার সময় আলাপ হয় প্যাটরিসিয়া রিয়ানের সংগে, তিনিও কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তখন দিনের স্কুলের শিক্ষিকা, বিয়ে হলো ১৯৪০-এ। ও'দের এখন দুটি মেয়ে।

কেনেডির মতন, নিকসনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৩ মাস তিনি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে লড়াই করেছেন, দুটি পদক অর্জন করেছেন এবং লিউটেনান্ট কমান্ডার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

রাজনীতিতে নিকসনের যোগদানের ব্যাপারটা কিছুটা আকস্মিক। ১৯৪৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার রিপাবলিকান দল একটা সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও ভাঙন এড়াবার জন্য, ঠিক করা হলো যে সম্পূর্ণ নতুন একজন লোককে মনোনয়ন দেওয়া হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো এই মর্মে। বন্ধুবান্ধবরা অনুরোধ করলেন নিকসনকে আবেদন করতে। নিকসন রাজী হয়ে গেলেন। তখন নিকসনের বয়েস ৩৩, উদীয়মান আইনজীবী হিসেবে নাম করেছেন, ভালো বক্তা এবং ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা চেহারায় একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। নিকসন মনোনয়ন পেয়ে গেলেন। এবং তারপরই বিস্ময়কর সার্থকতা, ক্যালিফোর্নিয়ায় ডিমোক্রাট দলের যিনি পর পর পাঁচবার কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, তাঁকে হারিয়ে নিকসন কংগ্রেসে এলেন। কংগ্রেসে এসে নিকসন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়েছেন। মার্শাল প্ল্যানের কার্যসূচি পর্যবেক্ষণের জন্য যে কমিটি হয়েছিল, নিকসন তার সদস্য ছিলেন, টাফ্ট-হারট্লি লেবার রিলেশান্স অ্যাক্ট রচনায় তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৫০-এ নিকসন এলেন সিনেটে, ডেমোক্রাট প্রার্থী শ্রীমতী হেলেন ডগলাসকে হারিয়ে। এ পর্যন্ত তাঁর জয়যাত্রায় কোনো বাধা পড়ে নি, সেইজন্যই ১৯৫২ সালে জেনারেল আইসেনহাওয়ার তাঁকে ভাইস প্রেসিডেনট হিসেবে মনোনীত করলেন। ১৯৫৬তে নিকসন আইকের সংগে আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমেরিকায় নিকসনই সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রেসিডেনটের দৌত্য নিয়ে তিনি বারবার ইওরোপ সফর করেছেন, ক্রুশ্চভের সংগে চালিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আইসেনহাওয়ার বলেছেন, নিকসন ইজ মাই বয়। ক্রুশ্চভ তাঁকে বলেছিলেন, আপনার কথা মেনে নিতে বাধ্য হলুম, স্বীকার করছি, আপনি সত্যিই ভালো আইন জানেন।

১৯৬০ এবং '৬২ সালের পরাজয়ের পর নিকসন এই দু' বছর রাজনৈতিক জীবন থেকে অজ্ঞাতবাস নিয়েছিলেন, এ বছর আবার ফিরে এলেন জয়ী হয়ে।

রাজনীতিতে নিকসন্ 'বাজ পাখি' হিসেবে পরিচিত। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ শেষ করার জন্য দরকার হলে তিনি যুদ্ধ জোরদার করার কথাও বলেছিলেন। অবশ্য সম্মানজনক শর্তে শান্তি চুক্তি আলোচনাতেও তিনি বিমুখ নন্। তাঁর প্রধান বক্তব্য, আমেরিকার ছেলেরা ভিয়েৎনামে গিয়ে বছরের পর বছর প্রাণ দেবে না। বস্তুত দাংগা, লুঠতরাজ, অগ্নিকান্ড বিধ্বস্ত আমেরিকায় তিনি গৃহশান্তি ফিরিয়ে আনবেন—এটাই ছিল তাঁর প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। মস্কোর সংগে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আমেরিকাকে আগে অগ্রবর্তী হতে হবে—তারপর নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা—এই তাঁর বক্তব্য। বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই যে, "কোনো কোনো অনধিকারী দেশের সাহায্য কমিয়ে দিয়ে অন্য দেশের সাহায্য বাড়াতে হবে।" নির্বাচনে জেতার পর, তিনি ইওরোপের লুপ্ত সম্মান ফিরিয়ে আনার কথা ঘোষণা করেছেন। নিকসন যুক্তিবাদী, স্থির মস্তিকের লোক, কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষে নেওয়ার সম্ভাবনা কম।

নিকসনের জয়ের পর প্রাভদা মন্তব্য করেছে, নিকসন আমেরিকায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের প্রিয় ব্যক্তি। আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে জটিল পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরাই নিকসনকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন—কারণ এ দুটিই অবসানের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিকসন আমেরিকায় গৃহ শান্তি আনবেন, তার মানে নিগ্রো আন্দোলন শক্ত হাতে দমন করবেন। প্রাভদার মতে অবশ্য, নিকসন অথবা হামফ্রে দু'জনের কেউই যুদ্ধ অথবা শান্তির ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার সমাধানের ইংগিত দিতে পারেন নি।

'আত্মপরিচয়'

পাশের বাড়িতে নতুন প্রতিবেশীর আবির্ভাব ঘটেছে। একগাদা জিনিস-পত্র নিয়ে তাঁরা অত্যন্ত বিব্রত। স্বভাবতই এ বাড়ির স্বামী-স্ত্রী তাঁদের কিছু সাহায্য করাটাকে নৈতিক দায়িত্ব বলে অনুভব করলেন। তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন তাঁরা, স্বামী লাগলেন চেয়ার-টেবিল টানাটানিতে, স্ত্রী গেলেন নতুন গিন্নীর রান্নাঘর গুছিয়ে দিতে। এই নিঃস্বার্থ হিতৈষণায় তাঁরা কেবল নবাগতদের যে আন্তরিক ধন্যবাদই পেলেন তা নয়, পরদিন ডিনারের আমন্ত্রণও লাভ করলেন।

সেই ডিনারে যাওয়ার দু ঘণ্টা আগে থেকে স্ত্রী বসে গেলেন রূপচর্চায়। শিল্পীর নিপুণতায় ভুরু আঁকলেন, গাল লালিম করলেন, ঠোঁট রাঙালেন এবং আর যা যা করণীয়, সব করলেন। তারপর আরো একঘণ্টা ধরে পোশাক নির্বাচন এবং পরিধান পর্ব শেষ হলে পরিতৃপ্ত মুখে বললেন, 'হুঁ, আজ ওরা দেখতে পাবে, আমার আসল চেহারা কিরকম।'

এটি বিদেশী পত্রিকা থেকে আহরিত একটি হিউমার। মেয়েদের সম্পর্কে একটু কটাক্ষও যে এতে নেই তা নয়।

আমার সন্দেহ হচ্ছে এটা আদৌ হাস্য-রসাত্মক কিনা। আসলে মানুষের কোন্ চেহারাটা স্বাভাবিক আর কোন্‌টা অস্বাভাবিক আমরা কেউ কি তা জোর করে বলতে পারি? তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় একটু গূঢ় অনুপ্রবেশ করলেই দেখতে পাবেন, জৈবিক

যুদ্ধনিপুণ চার্চিল ছিলেন
সুকুমার কলায় দক্ষ

উপাদানে আমরা—আদমের সন্তান-সন্ততিরা সকলেই এক, হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সর্বজনীন ঐক্যে বিধৃত। আদিম মানসিকতাগুলোও একই ছিল। কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল এক হলেও সুনন্দ রায় "মিঃ ইউনিভার্স" নয়—কারণ উক্ত ভদ্রলোক পেশী-চর্চা এবং দেহচর্চা করে এক প্রলয়ঙ্কর বিশালতা লাভ করেছেন। এবং দু এক আউন্স গ্রে-ম্যাটার থাকা সত্ত্বেও সুনন্দ রায়ের ব্রেনের সঙ্গে আইনস্টাইনের যে

কথায় ও জীবনচর্যায় অভিন্ন
শিব্রাম ও ওডহাউস

আকাশ-পাতাল পার্থক্য সেটা অনুমান করা খুবই কঠিন ব্যাপার নয়। মিস্টার ইউনিভার্স আর আলবার্ট আইনস্টাইনের আসল পরিচয় তা হলে কেবল অ্যানাটমির অথবা স্বাভাবিক বৃত্তির সর্বজনীন উত্তরাধিকারে নেই—তাঁরা স্বরূপে ফুটে উঠেছেন দেহচর্চায়, মস্তিষ্কের সাধনায়।

কিন্তু এ-সব দুর্ভাবনা থাক। আরো সহজ কথায় বলা যেতে পারে, মেয়েদের পোশাক আর প্রসাধনও তো সেই উৎকর্ষ সাধনা—সেখানে তারা নিজেদের ইম্প্রুভ করছে—নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় ফুটিয়ে তুলছে। আমার যে ভাগনীর বাড়িতে ডাক নাম 'বুড়ী' এবং আধময়লা শাড়ি পরে যে সকালবেলায় মধ্যবিত্ত সংসারের রান্না ঘরে মাছ কুটছে, সন্ধ্যেবেলায় সে যখন সুতনুকা রীতা চট্টোপাধ্যায় হয়ে মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতালিতে অভিনন্দিত হতে থাকে—তখন কোন পরিচয়টা তার সত্যি? জ্যান্ত ট্যাংরা মাছের কাঁটা খেয়ে যে "বুড়ী" ভবানীপুরের

বাংলার বাঘ রসগোল্লার হাঁড়ি পেলে
আত্মভোলা হয়ে যেতেন

রান্নাঘরে মুখ বাঁকিয়ে বসে আছে, আর যে সুহাসিনীর তানপুরায় হাতের আঙুলে জেগে আছে চাঁপার কলির মতো, গলা থেকে একেবারে মধুবৃষ্টি হচ্ছে যার,—তাদের কাকে আপনি বলবেন বস্তু, কেই-বা মায়া?

তা হলে সেই মেয়েটি আর কী দোষ করেছিল, সেজেগুজে খুশি হয়ে যে বলে-ছিল, "আজ ওরা বুঝতে পারবে আমার আসল চেহারাটা কিরকম?"

আমাদের রাজুদার কথাই ভাবা যাক। তিনি রেল স্টেশনে টিকেট কালেকটার। তাঁর রেল মার্কা কোট-প্যান্ট, তাঁর টুপি, গেটে তাঁর সেই তীক্ষ্ম চোখ এবং প্রসারিত হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকা—ডান হাতে টিকেট নিতে নিতে বাঁ-হাতে কখনো দু'চার আনা পকেটে ফেলে-দেওয়া—এই মূর্তিতেই রাজুদাকে চিরদিন দেখে আসছি। অর্থাৎ রাজুদা মানেই স্টেশন, স্টেশন মানেই রেল গাড়ি আর ঘণ্টির শব্দ, আর ঘণ্টির শব্দ মানেই "সাত নম্বর শান্তিপুর লোক্যাল চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে"—আর চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম মানেই গেট—আর সেই গেটের সামনে কঠিন মুখ, শ্যেনদৃষ্টি, দুটি হাত সমভাবে কর্মতৎপর : আমাদের রাজুদা। টিকেট-কালেক্টর ছাড়া রাজুদার

কোনো এগজিসটেনস্ নেই, স্টেশন ছাড়া রাজুদার কোনো ব্যাক-গ্রাউন্ড নেই।

সেই রাজুদাকে যখন আমি স্টেশন পাড়ার পুজো মন্ডপে মালকোঁচা এঁটে কাপড় পরে, হাতকাটা গেঞ্জী চড়িয়ে দুটো ধুনুচি হাতে নিয়ে তান্ডব তালে নৃত্য করতে দেখলুম, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই আমার অত্যন্ত অবাস্তব বোধ হল। আর অস্বস্তিটা প্রকাশ করতে না করতে জন-কয়েক আমাকে তেড়ে এল—প্রায় মারে আর কি!

'কী বলছেন মশাই আপনি! রাজুদা তো নাচেরই আর্টিস্ট!'

আর্টিস্ট। নিঃসন্দেহ। না-না, ভারত-নাট্যম্, মণিপুরী, কথাকলি, কথক—এসব গোলমেলে ব্যাপারে তিনি নেই। রাজুদা পুজো-নৃত্যের আর্টিস্ট্। দুর্গাপুজোর আরতি-নৃত্য, কালী-পুজোর ভয়াল-নৃত্য, লক্ষ্মীপুজোর কমনীয়-নৃত্য, বিসর্জনের লরীতে হুল্লোহুল্লো-টুইস্ট্-চা-চা আর তান্ডবের সিন্থিটিক নৃত্য—রেলপাড়ায় এই নটরাজরূপেই তিনি বিকশিত। যে রাজুদা টিকিট-কালেক্টার, তিনি আমার কাছে সত্য—যিনি নটনাথ, তিনি রেল-কলোনীতে সত্য। আর যিনি একটা ভাঙা কাপে বুরুশ ডুবিয়ে দাড়ি কামান, ঘুমুলেই যিনি নাক ডাকান, বাজার-ফেরৎ যাঁর থলেতে পালং-শাকের ডগা আর চিংড়ি মাছের শুঁড় দেখা যায়—তিনি একটা বস্তু মাত্র, সত্তা নন।

বাজারের কথায় মনে পড়ল। সেই যে-কালে বালকদের কিছু জ্ঞানদান করার জন্যে আমি অধ্যাপনায় ঢুকেছিলুম এবং অচিরেই ছাত্রদের সুখবর্ধন ও নিজের আয়ুবর্ধনের প্রয়োজনে সেখান থেকে পলায়ন করেছিলুম—সেই যুগে আমাকে লাউয়ের টুকরো আর কুচো চিংড়ি আহরণে বিব্রত দেখে একটি ছাত্র—যাকে বলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। যে অধ্যাপক তার কাছে নিছক বাণীমূর্তি এবং বিবিধ ধ্বনিতে অভিনন্দিত হওয়ার উপকরণ মাত্র, সে যে লাউ খায়—কুচো চিংড়ির প্রতি তার যে আকর্ষণ থাকতে পারে—এইটে হৃদয়ঙ্গম করতে নিরীহ ছাত্রটির মুখ প্রাজ্ঞ বায়সের মতো বিবৃত হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং কোন্ আমি সত্য? কোন্টা আমার রিয়্যাল সেল্ফ্?

দেখলুম আমার চেনা অ্যাড্ভোকেট জ্যোতির্ময়বাবুকে। এবংবিধ আত্মজিজ্ঞাসার চমৎকার সমাধান করে ফেলেছেন।

তাঁর স্ত্রী বলছিলেন, 'মেয়ের বিয়ে দেবার কোনো গরজ তোমার নেই দেখছি। বেশ, তোমায় কিছু করতে হবে না—বিয়ে আমিই ঠিক করব।'

আইনের বই থেকে উগ্র চোখ তুলে জ্যোতির্ময়বাবু বললেন, 'তুমি বিয়ে দেবে মানে? তোমার একার রাইট? মেয়ে জয়েন্ট প্রপার্টি। তোমার অংশে যদি কিছু করতে চাও, তাহলে আগে লীগ্যাল পার্টিশ্যান করে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রিয়্যাল্ সেল্ফ। একেবারে পরিপূর্ণ সমন্বয় যাকে বলে!

ফৌজী সংকেতে নাম ছিল বি এফ থ্রি থার্টিটু। BF332। সেটা আদপে কোন স্টেশনই ছিল না, না প্লাটফর্ম, না টিকিটঘর। শুধু একদিন দেখা গেল ঝকঝকে নতুন কাঁটাতার দিয়ে রেললাইনের ধারটুকু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বাস্, এটুকুই। সারাদিনে আপ ডাউনের একটা ট্রেনও থামতো না। থামতো, শুধু একটি বিশেষ ট্রেন হঠাৎ এক একদিন সকাল-বেলায় এসে থামতো। কবে কখন সেটা থামবে, তা শুধু আমরাই আগে থেকে জানতে পেতাম, বেহারী কুক ভগোতী-লালকে নিয়ে আমরা পাঁচজন।

স্টেশন ছিল না, ট্রেন থামতো না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছিল। তা থেকে আমরাও বলতাম 'আণ্ডাহল্ট'।

আণ্ডা মানে ডিম, আণ্ডাহল্টের কাছ ঘেঁষে দুটো বেঁটে-খাটো পাহাড়ী টিলার পায়ের নীচে একটা মাহাতোদের গ্রাম ছিল, গ্রামে-ঘরে মুর্গী চরে বেড়াতো। দূরে অনেক দূরে ভুর-কুণ্ডার শনিচারী হাটে সেই মুর্গী কিংবা মুর্গীর ডিম বেচতেও যেত মাহাতোরা। কখনো সাধের মোরগ বগলে চেপে মোরগ-লড়াই খেলতে যেত। কিন্তু সেজন্যে বি এফ থ্রি থার্টিটুর নাম আণ্ডাহল্ট হয়ে যায়নি।

আসলে মাহাতো গাঁয়ের ডিমের ওপর আমাদের কোন লোভই ছিল না।

আমাদের ঠিকাদারের সঙ্গে রেলওয়ের ব্যবস্থা ছিল, একটা ঠেলা-ট্রলীও ছিল তার, লাল শালু উড়িয়ে সেটা রেলের ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে এসে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে যেত। নামিয়ে দিয়ে যেত রাশি রাশি ডিম। বেহারী কুক ভগোতী-লাল আগের রাত্রে সেগুলো সেদ্ধ করে রাখতো।

কিন্তু সেজন্যেও নাম আণ্ডাহল্ট্ হয়নি। হয়েছিল ফুল-বয়েল্‌ড্ ডিমের খোসা কাঁটাতারের ওপারে ক্রমশ স্তূপীকৃত

হয়ে জন্মছিল বলে। ডিমের খোসা দিনে দিনে পাহাড় হচ্ছিল বলে।

ফৌজী ভাষায় বি এফ থ্রি থার্টিটুর প্রথমেই যে দুটো অ্যালফাবেট, আমাদের ধারণা ছিল তা কোন সংকেত নয়, ব্রেক-ফাস্ট কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ।

রামগড়ে তখন পি ও ডবলু ক্যাম্প, ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা সেখানে বেয়নেটে আর কাঁটাতারে ঘেরা। তাদেরই মাঝে মাঝে একটা ট্রেনে বোঝাই করে এ-পথ দিয়ে কোথায় যেন চালান করে দিত। কেন এবং কোথায় আমরা কেউ জানতাম না।

শুধু আমরা খবর পেতাম ভোরবেলায় একটা ট্রেন এসে থামবে।

ঠিকাদারের চিঠি পড়ে আগের দিন ডিমের ঝুড়িগুলো দেখিয়ে কুক ভগোতীলালকে বলতাম, তিনশো তিশ ব্রেকফাস্ট।

ভগোতীলাল গুণে গুণে ছ' শো ষাট আর গোটা প'চিশ ফাউ বের করে নিত। যদি পচা বের হয়। তারপর সেগুলো জলে ফুটিয়ে শক্ত ইঁট হয়ে গেলে তিনটে সার্ভার কুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোসা ছাড়াতো।

কাঁটাতারের ওপারে সেগুলোই দিনে দিনে স্তূপীকৃত হতো।

সকাল বেলায় ট্রেন এসে থামতো, আর সঙ্গে সঙ্গে কামরা থেকে ট্রেনের দুপাশে ঝুপঝাপ নেমে পড়তো মিলিটারী গার্ড। সঙ্গীন উঁচু করা রাইফেল নিয়ে তারা যুদ্ধবন্দীদের পাহারা দিত।

ডোরাকাটা পোশাকের বিদেশী বন্দীরা একে একে কামরা থেকে নেমে আসতো বড়সড়ো মগ আর এনামেলের থালা হাতে।

দুটো বড় বড় ড্রাম উল্টে রেখে সে দুটোকেই টেবিল বানিয়ে সার্ভার কুলি তিনজন দাঁড়াতো। আর ওরা লাইন দিয়ে একে একে এগিয়ে এসে ব্রেকফাস্ট নিতো।

একজন কফি ঢেলে দিত মগে, একজন দুপীস করে পাঁউরুটি দিত, আরেকজন দিত দুটো করে ডিম।

ব্যস্, তারপর ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠতো। কাঁধে আই-ই, খাকি বুশ-সার্ট পরা গার্ড হুইস্‌ল্ দিত, ফ্ল্যাগ নাড়তো, ট্রেন চলে যেত।

মাহাতোরা কেউ কাছে আসতো না, দূরে দূরে ক্ষেতিতে জনারের বীজ রুইতে রুইতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে দেখতো।

ট্রেন চলে যাওয়ার পরে ভগোতীলালের জিম্মায় টেন্ট রেখে আমরা কোন কোনদিন মাহাতোদের গ্রামের দিকে চলে যেতাম সব্জীর খোঁজে। পাহাড়ের ঢালুতে পাথুরে জমিতে ওরা সর্ষে বুনতো, বেগুন আর ঝিঙেও।

আশ্ডাহল্ট একদিন হল্ট-স্টেশন হয়ে গেল রাতারাতি। মোরম ফেলে লাইনের ধারে কাঁটাতারে ঘেরা জায়গাটুকু উঁচু করা হলো প্ল্যাটফর্মের মত।

তখন আর শুধু পি ও ডবলু নয়, মাঝে মাঝে মিলিটারী স্পেশালও এসে দাঁড়াত। গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট-পরা হিপ-পকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল। মিলিটারী পুলিস ট্রেন থেকে নেমে পায়চারী করতো, দু' একটা ঠাট্টাও ছুঁড়তো, আর সৈনিকের দল তেমনি সারি দিয়ে মগ আর থালা হাতে একে একে এসে রুটি নিত, ডিম নিত, মগ ভর্তি কফি। তারপর যে-যার কামরায় গিয়ে আবার উঠতো, খাকি বুশ-সার্টের গার্ড হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ফ্ল্যাগ নাড়তো, আমি ছুটে গিয়ে সাপ্লাই ফর্মে মেজরকে দিয়ে ও-কে করাতাম।

ট্রেন চলে যেত, কোথায় কোনদিকে আমরা কেউ জানতে পারতাম না।

সেদিনও এমনি আমেরিকান সোলজারদের ট্রেন এসে দাঁড়াল। সার্ভার কুলি তিনটে ডিম রুটি কফি সার্ভ করছিল। ভগোতীলাল নজর রাখছিল কেউ ডিম পচা কিংবা রুটি স্লাইস-এন্ড বলে ছুঁড়ে দেয় কিনা।

ঠিক সেই সময় আমার হঠাৎ চোখ গেল কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে।

কাঁটাতার থেকে আরো খানিক দূরে নেংটি-পরা মাহাতোদের একটা ছেলে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে দেখছে। কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা ছেলেটাকে একটা বাচ্চা মোষের পিঠে বসে যেতে দেখেছি একদিন।

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল ট্রেনটা। কিংবা রাঙামুখ আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল।

একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ 'হেই' বলে চিৎকার করলো, আর

সঙ্গে সঙ্গে নেংটি-পরা ছেলেটা পাঁই পাঁই করে ছুটে পালালো। মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে। কয়েকটা আমেরিকান সৈনিক তখন হা হা করে হাসছে।

ভেবেছিলাম ছেলেটা আর কোনদিন আসবে না।

মাহাতোরা কেউ আসতো না, কেউ না। ক্ষেতিতে কাজ করতে করতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা শুধু অবাক অবাক চোখ মেলে দূরে থেকে দেখতো।

কিন্তু তারপর আবার যেদিন ট্রেন এলো, ট্রেন থামলো, সেদিন আবার দেখি কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা কাঁটাতারের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আরেকটা ছেলে, তার চেয়ে আরেকটু বেশী বয়েস। গলায় লাল সুতোয় ঝুলোনো দস্তার তাবিজ, ভুরকুন্ডার হাটে একদিন গিয়েছিলাম, রাশি রাশি বিক্রী হয় মাটিতে ঢেলে, রাশি রাশি সিঁদুর, তাবিজ তামার পিতলের দস্তার, বাঁশে ঝোলানো থাকে রাঙন সুতোর, পুঁতির মালা। একটা ফেরিওলাকে দেখেছি কখনো কখনো এক হাঁটু ধুলো নিয়ে কাঁধে অগুন্তি পুঁতির ছড়, দূরে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে যায়।

ছেলে দুটো অবাক-অবাক চোখ মেলে কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল। প্রথম দিনের বাচ্চাটার চোখে একটু ভয়, হাঁটু তৈরী, কেউ চোখে একটু ধমক মাখালেই সে চট্ করে হরিণ হয়ে যাবে।

আমি হাতে ফর্ম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম, সুযোগ পেলে হেসে হেসে মেজরকে তোয়াজ করছিলাম। একজন সৈনিক তার কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে ছেলে দুটোকে দেখে পাশের জি আইকে বললে, অফুল!

আমার এতদিন মনে হয়নি। ওরা তো দিব্যি ক্ষেতেখামারে কাজ করে, গুলতি নয়তো তীরধনুক নিয়ে খাটাস মারে, নটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মত কখনো টানটান হয়ে রুখে দাঁড়ায়। নেংটি পরা সরু শরীর, কালো, রুক্ষ। কিন্তু ব্যাটা জি আই-এর 'অফুল' কথাটা যেন আমাকে খোঁচা দিল। ছেলে দুটোর ওপর আমার খুব রাগ হলো।

সৈনিকদের কে একজন গলা ছেড়ে এক কলি গান গাইলো, দু' একজন হা হা করে হাসছিল, একজন চট্পট কফির মগে চুমুক দিয়ে সার্ভার কুলিটাকে চোখ মেরে আবার ভর্তি করে দিতে বললে। গার্ড এগিয়ে দেখতে এলো আর কত দেরী। পাঞ্জাবী গার্ড, কিন্তু দিব্যি চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বললে মেজরের সঙ্গে।

তারপর হুইস্‌ল বাজলো, ফ্ল্যাগ নড়লো, সবাই চটপট উঠে পড়লো ট্রেনে, হাতে

চওড়া লাল ফিতে বাঁধা মিলিটারী পুলিসরাও।

ট্রেন চলে গেলে আবার সেই শূন্যতা, ধূ ধূ বালির মধ্যে ফণিমনসার গাছের মত শুধু সেই কাঁটাতারের বেড়া।

দিনকয়েক পরেই আবার একটা ট্রেন এলো। এবার পি ও ডবলু গাড়ি, ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা রামগড় থেকে আবার কোথাও চালান হচ্ছে। কোথায় আমরা জানতাম না, জানতে চাইতাম না।

ওদের পরনে স্ট্রাইপ দেওয়া অন্য পোশাক, মুখে হাসি নেই, রাইফেল উঁচিয়ে সারাক্ষণ ওদের ট্রেনটা চারদিক থেকে গার্ড দেওয়া হ'তো। আমাদেরও একটু ভয়-ভয় করতো। ভুরকুণ্ডায় গল্প শুনে এসেছিলাম, একজন নাকি ধুতি পাঞ্জাবী পরে পালাবার চেষ্টা করেছিল, পারে নি। বাঙালী বলেই আমার আরো ভয় ভয় করতো।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম কাঁটাতারের ওপারে শুধু সেই বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, খাটো কাপড়ের একটা বছর পনেরোর মেয়ে, দুটো পুরুষ ক্ষেতের কাজ ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন চলে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলো, হাসলো, কলকল করতে করতে ঝর্নার জলের মত মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

একজন, দু'জন, পাঁচজন—সেদিন দেখি জন দশেক মাহাতো-গাঁয়ের লোক ট্রেন আসতে দেখেই মাঠ থেকে দৌড়তে শুরু করেছে। ট্রেনের জানালায় জানালায় খাকি রঙ দেখেই বোধহয় ওরা বুঝতে পারতো। দিনে দু'খানা প্যাসেঞ্জার মেল ট্রেনের মত হুস্ করে বেরিয়ে যেত, দু' একখানা গুড্স্ ট্রেন ঠংঠং করতে করতে। তখন তো কই থামবে ভেবে মাহাতো গাঁয়ের লোক আসতো না ভিড় করে।

একদিন গিয়ে বলেছিলাম মাহাতো বুড়োকে, লোক পাঠিয়ে আমাদের আণ্ডাহল্টের তাঁবুতে বেচে আসতে সব্জী আর চিংড়ি, সরপুঁটি, মৌরলা।

বুড়ো হেসে বলেছিল—ক্ষেতির কাজ ছেড়ে যাবো নাই।

তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কালো কালো নেংটি পরা লোকগুলোকে, খাটো শাড়ির মেয়েগুলোকে। শুধু খালি-গা মাহাতো বুড়োর পায়ে একটা টাঙি জুতো, গেঁয়ো মুধার কাছে বানানো টাঙি জুতো, এসে সারি দিয়ে ওরা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে দাঁড়ালো।

ট্রেন ততক্ষণে এসে গেছে। ঝুপঝাপ নেমে পড়ে আমেরিকান সৈনিকের দল সারি দিয়ে চলেছে মগ আর থালি হাতে।

দু'শো আঠারো ব্রেকফাস্ট তখন রেডি বি এফ থ্রিথার্টিটুতে। বি এফ থ্রিথার্টিটু মানে আণ্ডাহল্ট।

তখন একটু শীত শীত পড়তে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়ে কুয়াশার মাফলার জড়ানো। গাছগাছালি শিশির ধোয়া সবুজ। একজন সৈনিক ইয়াঙ্কি গলায় মুগ্ধতা প্রকাশ করলো।

আরেকজন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁটা-তারের ওপারের রিক্ততার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কফির মগটা ট্রেনের পা-দানিতে রেখে সে হিপ-পকেটে হাত দিলো। ব্যাগ থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে ছুঁড়ে দিলো মাহাতোদের দিকে। ওরা অবাক হয়ে সৈনিকটার দিকে তাকালো, কাঁটাতারের ভিতরে মোরমের ওপর পড়ে থাকা চকচকে আধুলিটার দিকে তাকালো, নিজেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-

প্রণাম করলো, তারপর অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই রইলো।

ট্রেনটা চলে যাবার পর ওরা নিঃশব্দে ফিরে চলে যাচ্ছিল দেখে আমি বললাম, সাহেব বখশিস্ দিয়েছে, বখশিস, তুলে নে।

সবাই সকলের মুখের দিকে তাকালো, কেউ এগিয়ে এলো না।

আমি আধুলিটা তুলে মাহাতো বুড়োর হাতে দিলাম। সে বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর সবাই নিঃশব্দে চলে গেল। কারো মুখে কোন কথা নেই।

আমার এই ঠিকাদারের তাঁবেদারি একটুও ভাল লাগতো না। জনমনুষ্য নেই, একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায় না, তাঁবুতে ভগোতীলাল আর তিনটে কুলি। নির্জন নির্জন। মাটি রুক্ষ, দুপুরের আকাশ রুক্ষ, আমার মন।

মাহাতো গাঁয়ের লোকরাও কাছ ঘেঁষতো না। মাঝে মাঝে গিয়ে সবজী কিংবা চুনো মাছ কিনে আনতাম। ওরা বেচতে আসতো না, কিন্তু ভুরকুণ্ডার হাটে যেত তিন ক্রোশ পথ হেঁটে।

দিনকয়েক কোন ট্রেনের খবর ছিল না। চুপচাপ, চুপচাপ।

তারপর সেই কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা একদিন এসে জিগ্যেস করলে, টিরেন আসবে না বাবু?

হেসে ফেলে বললাম, আসবে আসবে।

ছেলেটার আর দোষ কি, হেঁটে হেঁটে পাহাড় রুক্ষ জমি, একটা দেহাতী ভিড়ের বড় দেখতে হলেও দু'ক্রোশ হেঁটে যেতে হয় শালের গাছের ঝোপের মধ্যে দিয়ে। সকালে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন একটুও দাঁড়িয়ে না থেমে হুস করে বেরিয়ে যেত, বিকেলের ডাউন ট্রেনটাও থামতো না, তবু কয়েক মুহূর্ত জানালায় জানালায় ঝাপসা মুখ দেখার জন্যে আমরা তাঁবুর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতাম। মানুষ না দেখে, নতুন মুখ না দেখে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম।

তাই আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল ট্রেন আসছে শুনলে যেমন বিরক্ত বোধ করতাম তেমনি আবার স্বস্তিও ছিল।

দিনকয়েক পরেই প্রথমে এলো খবর, তার পরদিন মিলিটারি স্পেশাল। ঝুপঝাপ করে জি আইরা নামলো, সারি দিয়ে সব ডিম রুটি মগ ভর্তি কফি নিলো।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে মাহাতো গাঁয়ের ভিড় ভেঙে পড়েছে। বিশ হতে পারে, তিরিশ হতে পারে, হাঁটু-সমান বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কত কে জানে। খাটো শাড়ির মেয়েগুলোও বোকা বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল। ওদের দেখে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। ভগোতীলাল কিংবা সাঙাৎ কুলি তিনটে মাহাতো গাঁয়ের দিকে যেতে চাইলে আমার বড় ভয়-ভয় করতো।

প্লাটফর্ম তো ছিল না, শুধু উঠতে-নামতে সুবিধের জন্যে লাইনের ধারটুকু মোরাম ফেলে উঁচু করা হয়েছিল।

আমেরিকান সৈনিকরা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে পায়চারী করছিল। দু'একজন স্থির দৃষ্টিতে মাহাতো গাঁয়ের কালো কালো মানুষগুলোকে দেখছিল।

হঠাৎ একজন ভগোতীলালের দিকে

এগিয়ে গিয়ে হিপ পকেট থেকে ব্যাগ বের করলো, ব্যাগ থেকে একখানা দু' টাকার নোট, তারপর জিগ্যেস করলে, কয়েন্‌স্‌ আছে? নোট-ভাঙানো খুচরো সৈনিকরা কেউ রাখতেই চাইতো না, পয়সা ফেরত না নিয়ে দোকানী কিংবা ফেরীওয়ালা কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাঁচিতে গিয়ে কয়েকবার দেখেছি।

এক আনি, দুআনি আর সিকি মিলিয়ে ভগোতীলাল ভাঙিয়ে দিচ্ছিলো, হঠাৎ দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে ভিড়ের ভিতর থেকে কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা সেই ছেলেটা হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে কি চাইছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভগোতীলালের কাছ থেকে সেই খুচরো আনি দুআনিগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে সেই আমেরিকান সৈনিক মাহাতোদের দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমার তখন সাপ্লাই ফর্ম ও-কে করানো হয়ে গেছে, গার্ড হুইস্‌ল দিয়েছে।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে, অমনি মাহাতোদের দিকে ফিরে তাকালাম।

ওরা তখনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, তাকিয়ে ছিল। তারপর হঠাৎ, লাল মোরমের ওপর, ছড়ানো পয়সাগুলোর ওপর কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা, আর গলায় লাল সুতলিতে দস্তার তাবিজ বাঁধা ছেলেটা।

সেই মুহূর্তে টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো ধমক দিয়ে বলে উঠলো, খবর্দার! এমন জোরে চিৎকার করলো যে আমি নিজেও চমকে উঠেছিলাম।

কিন্তু বাচ্চা দুটো ওর কথা শুনলো না। তারা দু'জনে তখন যে-যত পেরেছে আনি দু'আনি কুড়িয়ে নিয়েছে। মুখ খোসা ছাড়ানো কচি ভুট্টার মত হাসছে। মেয়ে পুরুষের সমস্ত ভিড় হাসছে।

টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো রেগে গিয়ে তাদের ভাষায় অনর্গল কি সব বলে গেল। মেয়েপুরুষের ভিড় হাসলো।

মাহাতো বুড়ো রাগে গজগজ করতে করতে গাঁয়ের দিকে চলে গেল একাই। মাহাতো গাঁয়ের লোকগুলোও চলে গেল কলকল কথা বলতে বলতে, খলখল হাসতে হাসতে।

ওরা চলে যেতেই আণ্ডাহল্ট আবার নির্জন নিস্তব্ধ শূন্যতা! আমার এক এক সময় ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেত। দূরে দূরে পাহাড়, মহুয়ার বন, খয়েরের ঝোপ পার হয়ে একটা ছোট্ট জল চোঁয়ানো ঝর্ণা, মাহাতো গাঁয়ের সবুজ ক্ষেত। চোখ জুড়িয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায়। তার মধ্যে কালো কালো নেংটি পরা মানুষ।

এদিকে মাঝে মাঝেই আমেরিকান সোলজারদের ট্রেন আসে, থামে, ডিম রুটি মগ ভর্তি কফি খেয়ে চলে যায়। মাহাতো গাঁয়ের লোক ভিড় করে আসে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সারি দিয়ে দাঁড়ায়—

—সাব বখশিস, সাব বখশিস!

একসঙ্গে অনেকগুলো দেহাতী গলা চিৎকার করে উঠলো।

মেজরের কাছে ফর্ম ও-কে করাতে গিয়ে আমি চমকে ফিরে তাকালাম।

দেখলাম, শুধু বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, কয়েকটা জোয়ান পুরুষও হাত বাড়িয়েছে। খাটো শাড়ির একটা তুখোড় শরীরের মেয়েও।

একদিন সব্জী কিনতে গিয়েছিলাম, ঐ মেয়েটা হেসে হেসে জিগ্যেস করেছিল, টিরেন কবে আসবে।

এক একদিন অকারণেই ওরা দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো, অপেক্ষা করে করে চলে যেত।

কাঁধে স্ট্রাইপ তিন চারটে আমেরিকান ততক্ষণে হিপ পকেট থেকে মুঠো মুঠো আনি দু'আনি বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করে নি, ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো পয়সাগুলোর ওপর। হুড়োহুড়িতে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হাত পা ছড়ে গেল কারো, কারো বা নেংটির কাপড় ফেঁসে গেল।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম ওদের। মনে হলো মাহাতো গাঁয়ের আধখানাই এসে জড়ো হয়েছে। সবারই মুখে ফুর্তির হাসি, সবাই কিছু না কিছু পেয়েছে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই টাঙি-জুতোর মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেলাম না। মাহাতো বুড়ো আসে নি। সেদিন ওর আপত্তি, ওর ধমক শুনেও পয়সাগুলো ফেলে দেয় নি ছেলে দুটো। তাই বোধ হয় রেগে গিয়ে আর আসে নি।

আমার ভাবতে ভাল লাগলো, বুড়োটা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একা একা মাটি কোপাচ্ছে।

আমাদের দিন, কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমাদের পাঁচজনের দিন, আণ্ডাহল্টের তাঁবুর মধ্যে কোন রকমে কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এক একদিন সৈনিক বোঝাই ট্রেন আসছিল, থামছিল, চলে যাচ্ছিল। মাহাতো গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসে কাঁটাতারের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াতো, হাত বাড়িয়ে সবাই 'সাব বখশিস সাব বখশিস' চাঁচাতো।

হঠাৎ এক একদিন মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেতাম। কোনদিন ক্ষেতের কাজ ফেলে দু' হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হনহন করে এগিয়ে আসতো, রেগে গিয়ে ধমক দিতো সকলকে। ওর কথা শুনছে না বলে কখনো বা অসহায় প্রতিবাদের চোখে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। সৈনিকরা হিপ-পকেটে হাত দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে মুঠো ভর্তি পয়সা ছুঁড়ে দিত। মাহাতো গাঁয়ের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়তো সেই পয়সাগুলোর ওপর, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ঝগড়া বাধাতো। তা দেখে সৈনিকরা হা হা করে হাসতো।

শেষে পর পর কয়েকদিনই লক্ষ্য করলাম টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো আর আসে না। মাহাতো বুড়ো ওদের দেখে রেগে যেত বলে, মাহাতো বুড়ো আর আসতো না বলে আমার এক ধরনের গর্ব হত। কারণ এক একসময় ঐ লোকগুলোর ব্যবহারে আমরা—আমি আর ভগোতীলাল খুব বিরক্তি বোধ করতাম। ভিতরে ভিতরে লজ্জা পেতাম। ওদের কালোকুলো দীন-দরিদ্র বেশ দেখে সৈনিকের দল নিশ্চয় ওদের ভিখিরি ভাবতো। ভাবতো বলেই আমার খুব খারাপ লাগতো।

সেদিন কাঁটাতারের ওপার থেকে ওরা 'বখশিস বখশিস' বলে চিৎকার করছে, কাঁধে আই-ই খাকি বুশ সার্টের গার্ড জানকীনাথের সঙ্গে আমি গল্প করছি, আমাদের পাশ দিয়ে একজন অফিসার মচমচ করে যেতে যেতে ওদের চিৎকার শুনে থমকে

রেলের মত গলায় বলে উঠলো, ব্লাডি বেগার্স।

আমি আর জানকীনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আমাদের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। শুধু অক্ষম রাগে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলাম।

ব্লাডি বেগার্স, ব্লাডি বেগার্স।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মাহাতোদের ওপর। ট্রেন চলে যেতেই আমি ভগোতীলালকে সঙ্গে নিয়ে ওদের তাড়া করে গেলাম। ওরা কুড়োনো পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে হাসতে হাসতে পালালো।

তবু ওদের জন্যে সমস্ত লজ্জা আমি একটা অহংকারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে সেই অহংকারটা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো মাহাতো বুড়োর চেহারা নিয়ে।

কিন্তু সেদিন আমার বুকের মধ্যের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ভুড়কুণ্ডায় ঠিকদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই খবর পেয়েছিলাম।

সাভার দুজন কুলি তখন টেবিল বানানো ড্রাম দুটোকে পায়ে ঠেলে ঠেলে আণ্ডাহল্টের কাঁটাতারের ওপারে সরিয়ে নিচ্ছিল। তাঁবুর দড়ি খুলছিল আরেকজন। ভগোতীলাল ড্রামটার গায়ে একটা জোর লাথি মেরে বললে, খেল খতম, খেল খতম।

হঠাৎ হই হল্লা শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি মাহাতো গাঁয়ের লোক ছুটতে ছুটতে আসছে।

আমরা অবাক হয়ে তাকালাম তাদের দিকে। ভগোতীলাল কি জানি কেন হেসে উঠলো।

ততক্ষণে কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হুইসল্ শুনতে পেলাম। ট্রেনের শব্দ কানে এলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনটা বাঁক নিয়ে আণ্ডাহল্টের দিকেই আসছে, জানালায় জানালায় খাকি পোশাক।

আমরা বিরক্ত বোধ করলাম আমরা অবাক হলাম। তা হলে কি খবর পাঠাতেই ভুলে গেছে ভুরকুণ্ডার আপিস? না, যে খবর শুনে এসেছি সেটাই ভুল?

ট্রেনটা যত এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত গম গম আওয়াজ আসছে। আওয়াজ নয়, গান। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সমস্ত ট্রেন, ট্রেন ভর্তি সৈনিকের দল পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, গলা ছেড়ে গান গাইছে।

বিভ্রান্তের মত আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়লো সেই মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে 'সাব বখশিস, সাব বখশিস!'

উন্মাদের মত, ভিক্ষুকের মত তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো।

কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্যদিনের মত এবারে আর আণ্ডাহল্টে এসে থামলো না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতই আণ্ডাহল্টকে উপেক্ষা করে হুস্ করে চলে গেল।

আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না।

ট্রেনটা চলে গেল, কিন্তু মাহাতো গাঁয়ের সবাই ভিখিরি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব—সব ভিখিরি হয়ে গেল।

(১)

১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন জগন্নাথ হল, মুসলিম হল ও ঢাকা হল নামে তিনটা হল বা ছাত্রাবাস ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ ও এম এ পড়ান হত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই, এমন কি অধ্যাপকদেরও ঐ তিনটা হলের একটা না একটার সঙ্গে যুক্ত হতেই হত। আজও অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা আছে।

প্রত্যেক হলেরই একটা করে স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন বা ছাত্রসভা ছিল। এই ছাত্রসভাগুলো নিজ নিজ হলে গ্রন্থাগার পরিচালনা, নাটক অভিনয়, বিতর্ক সভা, খেলাধূলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করত। জগন্নাথ হলের ছাত্রসভার এসব ছাড়াও একটা সোস্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেণ্ট বা লোকসেবা বিভাগ ছিল। এই বিভাগটির দ্বারা এরা নিরক্ষরদের মধ্যে আক্ষরিক শিক্ষা দেবার জন্য একটা নৈশ বিদ্যালয় চালাত এবং দুঃস্থ, দুর্গত ও বন্যার্তদের সাহায্যের কাজও করত।

১৯২৫/২৬ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট অর্থাৎ দেখাশুনো করার সর্বময় কর্তা বা পরিচালক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ঐ সময় জগন্নাথ হলের ছাত্রসভার সভ্যরা একদিন রমেশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করে যে তাদের ছাত্রসভার লোকসেবা বিভাগটি দেখাবার জন্য শ্রীনিকেতনের কালীমোহন ঘোষকে আমন্ত্রণ করে আনবে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের নিকটে সুরুলে শ্রীনিকেতন স্থাপন করে সেখানে যে কুটীরশিল্প ও গ্রাম-সেবার কাজের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই কাজে তাঁর অন্যতম প্রধান সহায় ছিলেন এই কালীমোহনবাবু।

ছাত্ররা এইরূপ স্থির করলে, তখন হলের প্রোভোস্ট হিসাবে রমেশবাবু কালীমোহনবাবুকে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানালেন।

কালীমোহনবাবু এইভাবে আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীনিকেতনের দু একজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে জগন্নাথ হলের লোকসেবা বিভাগটি দেখতে যান। অবশ্য কালীমোহনবাবু যাবার আগে রবীন্দ্রনাথকে ঐ আমন্ত্রণের কথা জানিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়েই ঢাকায় গিয়েছিলেন।

কালীমোহনবাবু ঢাকায় গেলে রমেশবাবু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি এক সময় কালীমোহনবাবুকে বলেন—রবীন্দ্রনাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবার জন্য আমন্ত্রণ করলে, তিনি এখানে আসবেন কি?

উত্তরে কালীমোহনবাবু বলেন, কেন আসবেন না? এখানে গুরুদেবের না আসার ত কোন কারণ আমি দেখি না।

তখন রমেশবাবু প্রভৃতি বলেন—তাহলে আপনি ফিরে গিয়ে আমাদের এই প্রস্তাবের কথা কবিকে বলবেন। আর তিনি এলে কোন্ সময়ে আসতে পারেন, আমাদের তা চিঠি লিখে জানাবেন। আমরা তাহলে ভাইস্-চ্যান্সলারকে বলে তাঁকে দিয়ে যথাসময়ে যথারীতি কবিকে আমন্ত্রণ জানাব। তবে আপনার মারফত আগে থেকেই আমরা কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম।

কালীমোহনবাবু ঢাকা থেকে ফিরে এসে ঢাকার অধ্যাপকদের ঐ প্রস্তাবের কথা রবীন্দ্রনাথকে বলেন। এছাড়া ওখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রদের আন্তরিকতার কথাও রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনবাবুর মুখে শুনলেন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসাবে অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিসাবে রমেশবাবুকে এবং বিখ্যাত দার্শনিক হিসাবে হরিদাসবাবুকেও রবীন্দ্রনাথ আগে থেকে জানতেন। এমন কি এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অল্প-স্বল্প পরিচয়ও ছিল।

এই চারুবাবু, রমেশবাবু ও হরিদাসবাবু ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস্-চ্যান্সলার মিঃ হার্টগকেও একজন বড় শিক্ষাবিদ্ বলে রবীন্দ্রনাথ খুবই মান্য করতেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এই হার্টগই সর্বপ্রথম এর ভাইস্-চ্যান্সলার নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল রেজিস্ট্রার ছিলেন। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইনকানুন করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন হলে এই হার্টগ সেই কমিশনের একজন সদস্যও ছিলেন।

কালীমোহনবাবু ঢাকায় গিয়ে শুনে এসেছিলেন, মিঃ হার্টগ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষেই অথবা ১৯২৬ এর জানুয়ারিতেই তাঁর ভাইস্চ্যান্সলারের কাজ থেকে অবসর নেবেন।

কালীমোহনবাবু রবীন্দ্রনাথকে ঢাকার অধ্যাপকদের প্রস্তাবের কথা শোনাবার সময় হার্টগের অবসর নেওয়ার কথাও বলেছিলেন।

এইসব শুনে রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনবাবুকে বলেন, তুমি রমেশবাবু প্রভৃতিকে লিখে দাও, আমি যেতে রাজি আছি। তবে ঐ হার্টগ থাকতে থাকতেই যেতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের কথা অনুযায়ী কালীমোহনবাবু তখন রমেশবাবুকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

১৬-১২-২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও অধ্যাপকগণের সহৃদয়তা ও আতিথেয়তায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। বিশেষতঃ আপনি নিজে যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন

তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমাদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের আন্তরিকতার কথা অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে বিলাত যাওয়ার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি রাজি হইয়াছেন। ৭ই পৌষ উৎসবের পরই তিনি ঢাকা যাইতে চাহেন। তাঁহার ইচ্ছা যে Mr Hartog ঢাকা থাকিতেই তিনি তথায় যান। কারণ Mr Hartog সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল ধারণা।

কবে গেলে আপনাদের সুবিধা হয় পত্র পাঠ অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

ঢাকার ছেলেদের সরল অমায়িক ব্যবহার ও আপনার উদারতার ফলে আমাদের প্রাণের সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটি গভীর যোগ অনুভব করিতেছি, তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

ইতি—
বিনীত
শ্রীকালীমোহন ঘোষ

রমেশবাবুকে এই চিঠি দেবার দুদিন পরে কালীমোহনবাবু ডঃ হরিদাস ভট্টাচার্যকে আবার এই চিঠিটি লিখে-ছিলেন—

১৬-১২-২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গুরুদেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শুনে অত্যন্ত সুখী হয়েছেন। তিনি বললেন যে, ৭ই পৌষের পর ১৫ দিন সময় আছে, এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ ঘুরে আসতে পারেন। নতুবা আর কখন হবে না।

বিশেষতঃ Mr Hartogকে তিনি খুব ভালবাসেন। তিনি ঢাকা থাকতে তিনি যেতে চান। অতএব আজ সকালে আমাকে বললেন, লিখে দিতে যে, ২৭শে ডিসেম্বর রওনা হবেন। Goalondo হতে Launch এতে ঢাকা যাবেন। বোধ হয়, তথা হতে Mymensing যেতে পারেন।

তিনি বিশেষ করে আপনাকে লিখতে বললেন, আপনি Mr Hartogকে দিয়ে গুরুদেবকে telegram করাবেন।

Prof Formichiকেও নিমন্ত্রণ করলে ভাল হয়। পত্র পাঠ উত্তর দিলে ভাল হয়। আমি Mr Majumderকে পরশু পত্র দিয়েছি।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

সেবক
কালীমোহন

কালীমোহনবাবু ঢাকায় গেলে রমেশবাবু, হরিদাসবাবু প্রভৃতি যখন তাঁর কাছে শান্তি-নিকেতনের সংবাদ শুনতে চেয়েছিলেন, তখন কালীমোহনবাবু শান্তিনিকেতনে ঐ সময়ে অবস্থানকারী ইতালীয় অধ্যাপক ফর্মিকি ও টুচির কথাও তাঁদের সবিস্তারে শুনিয়ে ছিলেন।

মিঃ হার্টগ, রমেশবাবু ও হরিদাসবাবুর কাছে লেখা কালীমোহনবাবুর চিঠিতে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার কথা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং ভাবেন কবির শান্তিনিকেতনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগেই একদিন তাঁর দেখে আসা উচিত ছিল। এই ভেবে তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানান যে, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ঢাকায় আসার আগেই তিনি (হার্টগ) শান্তিনিকেতনে যাবেন এবং নিজে গিয়ে কবিকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আসবেন।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কালীমোহনবাবু রমেশবাবু ও হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন যে, কবি ডিসেম্বরের শেষ দিকে ঢাকায় যাবেন। কিন্তু হার্টগ শান্তিনিকেতনে আসছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ মত বদলান। তিনি তখন নিজেই রমেশবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

ঢাকায় যাওয়া স্থির করেছি। ভেবে-ছিলুম এই বৎসরেই যাব, হার্টগ সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তিনি আসবেন শান্তিনিকেতনে, অতএব তাড়া নেই। ইতি-মধ্যে তোমাদের ছুটি। ছুটি শেষ হোক, জানুয়ারির শেষ ভাগে যাওয়া স্থির করেছি। কথায় অন্যথা হবে না। যদি তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফর্মিকি ও টুচিকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, তাহলে আমরা এক সঙ্গে যেতে পারি। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ে খুশি হবে।

ইতি— রবিবার
তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতিমধ্যে বড়দিনের ছুটি পড়ে গেল এবং কিছুদিন পরে মিঃ হার্টগও অবসর গ্রহণ করলেন; তখন নতুন ভাইস্-চ্যান্সলার হলেন মিঃ জি এইচ ল্যাংলি।

মিঃ ল্যাংলি ভাইস চ্যান্সলার হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আবার নতুন করে আহ্বান জানালেন। ঐ সঙ্গে তিনি মিঃ ফর্মিকি ও মিঃ টুচিকেও পৃথক নিমন্ত্রণ করলেন।

কবি মিঃ ল্যাংলির আমন্ত্রণের উত্তরে জানালেন যে, ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন। তার আগের দিন তিনি সদলে ঢাকায় গিয়ে পৌঁছবেন।

রবীন্দ্রনাথ সদলে আসবেন স্থির হলে, তখন মিঃ ল্যাংলি একদিন রমেশবাবুকে ডেকে বললেন—ভাইস্-চ্যান্সলার হিসাবে আমার বাড়িতেই ডঃ টেগোরকে সম্মানিত অতিথি করে রাখা উচিত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমরা ইউরোপীয়নর। ঠিক আপনাদের মতন করে কি ডঃ টেগোরকে আদর আপ্যায়ন করতে পারব? আর আমাদের বাড়িতে থেকে তিনিও হয়ত অসুবিধা বোধ করবেন। তার চেয়ে আপনি এক কাজ করুন, ডঃ টেগোরকে আপনার বাড়িতে রাখুন। আপনার স্ত্রী আছেন, তিনি কবির সেবাযত্ন করতে পারবেন।

রমেশবাবু ল্যাংলির কথায় সানন্দে রাজি হলেন এবং পরে এই কথা তিনি এক চিঠিতে কবিকে জানিয়ে দিলেন। কবি নিজে স্থির করেছিলেন, ঢাকায় গিয়ে তাঁর সম্পর্কীয় এক নাতনীর বাড়িতে থাকবেন। কিন্তু রমেশবাবুর চিঠি পেয়ে তখন তিনি রমেশবাবুকে জানালেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তাহলে এই কথাই পাকা রইল, তোমার ওখানেই আশ্রয় নেব। নাতনীর অভিসারে যদি কখনো কখনো যাত্রা করি আশা করি তাহলে কোনো কথা উঠবে না। চিঠিতে জানিয়েছি যে ৩রা ফেব্রুয়ারি থেকে তোমাদের ওখানে আমাদের কাজের পালা। তার এক আধদিন আগে পৌঁছতেও পারি। অনিশ্চয়তার কারণ জলপথে যাত্রা। কল-কাতা থেকে সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচ যোগে যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়। রেলপথের আন্দোলন ক্লান্তিকর। সিউড়িতে ২৩শে জানুয়ারি তারিখে আমি আবদ্ধ, ২৪শে পর্যন্ত বন্ধন। ২৫শে আশ্রমে ফিরব। ২৬শে কলকাতায় যাব। ২৭শে জাহাজে উঠব। জাহাজে কতদিন লাগে জানিনে। আন্দাজ করছি ৩রার পূর্বে পৌঁছতে বাধা ঘটবে না। যদি সে আশঙ্কা থাকে আমাকে জানালে ২৪শে তারিখে সিউড়ি থেকে কল-কাতায় গিয়ে ২৫শে অথবা ২৬শে জাহাজে উঠতে পারি। যদি বিঘ্নের সম্ভাবনা বুঝি তাহলে ১লা তারিখে রেলপথেই বেরিয়ে পড়ব। আমার অভ্যর্থনার জন্যে বিরাট

SANTI NIKETAN
BENGAL. INDIA

কল্যাণীয়েষু

সেইদিন এই কথাই স্থির হল, তোমার ওখানেই আশ্রয় নেব। বাল্মীকি প্রতিভার যদি কোনো কোনো অংশ করি আশা করি সেইদিনে কোনো কথা উঠবেনা। চিঠিতে জানিয়েছিলে ওর বেণু-বাবু থেকে তোমাদের ওখানে অনেকের ভাবের অভাব। তবু এক আধদিন আমি টিঁকতেও পারি। অবিশ্যি অনেক জলপথে যাত্রা। কলকাতা থেকে সুন্দরবন স্টীমার যোগে যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়—রেলপথের সম্ভাবনা কল্পনীয়। সিউড়িতে ২৩শে জানুয়ারি তারিখে আমি যাবই, ২৪শে পর্যন্ত থাকব। ২৫শে আশ্রমে ফিরব। ২৬শে কলকাতায় যাব। ২৭শে জাহাজে উঠব। জাহাজে কতদিন লাগে জানিনে। আমার বরাত ওরা দৃষ্টি টিঁকতে যদি ঘটবেনা। যদি সে আপত্তি থাকে আমাকে জানালে ২৪শে তারিখে সিউড়ি থেকে কলকাতায় গিয়ে ২৫শে অথবা ২৬শে জাহাজে উঠতে পারি। যদি বিশ্বের সম্মাননা তুমি তাহলে ১লা তারিখে রেলপথেই বেরিয়ে পড়ব। আমার অভ্যর্থনার জন্যে বিরাট আয়োজন কোরোনা। জনতার পরিমাণ দিয়ে আমি আমার সম্মানের ওজন যাচাই করিনে। বাহ্য কৌতূহলের চেয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। পূর্ববঙ্গের চিত্ত সরল ও সহজেই শ্রদ্ধাবান এই ভরসাতেই সেখানে যাবার প্রস্তাবে আনন্দ বোধ করচি। ইতি
১২ পৌষ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আয়োজন কোরো না। জনতার পরিমাণ দিয়ে আমি আমার সম্মানের ওজন যাচাই করিনে। বাহ্য কৌতূহলের চেয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। পূর্ববঙ্গের চিত্ত সরল ও সহজেই শ্রদ্ধাবান, এই ভরসাতেই সেখানে যাবার প্রস্তাবে আনন্দ বোধ করছি। ইতি ১২ পৌষ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিতে কবি সিউড়িতে যাবার যে কথা বলেছেন, সে কথা অনুযায়ী তিনি কিন্তু সিউড়িতে যেতে পারেন নি। সিউড়িতে ঐ সময় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হবার কথা ছিল। কবি কোন অসুবিধাবশতঃ যেতে পারবেন না, এ কথা আগেই সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের জানালে, তাঁরা তখন কবির সুবিধামত কবি যাতে সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন, সেজন্য এপ্রিল মাসে ইস্টারের ছুটিতে সম্মেলন করবেন বলে স্থির করেন। কবি কিন্তু সেবারও সিউড়িতে যেতে পারেন নি। অবশেষে তিনি তাঁর লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ রমেশবাবুকে এই চিঠি লেখার দিন কয়েক পরেই লক্ষ্ণৌ থেকে সেখানে সংগীত সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য কবির কাছে আহবান এল। কবি লক্ষ্ণৌ সংগীত সম্মেলনে যাবেন বলে স্থির করলেন। এই স্থির করে তিনি ঢাকা যাওয়া দু এক দিন পিছিয়ে দিলেন এবং রমেশ-বাবুকে তখন আবার লিখলেন।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

লক্ষ্ণৌ থেকে আহবান এসেছে—সেখানে যাচ্ছি। পাঞ্জাবে সিরমুরে নিমন্ত্রণ আছে এই সুযোগে সেটাও সেরে আসব। তাই ঠিক ৩রা তারিখে পাছে এসে পৌঁছতে না পারি, এই ভেবে আরো দুটো দিন পিছিয়ে দিতে চাই। পাঁচই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পৌঁছিয়ে ৬ই তারিখ থেকে কাজে লাগব—এই সংকল্প করেছি। আশাকরি অসুবিধা হবে না। জাহাজে করে যাবার খেয়াল ছেড়ে দিয়েছি। সঙ্গে কে কে যাবেন তার পুরো তালিকা যথা সময়ে পাবে। আপাতত এইটুকু বলে রাখছি আমাদের চিত্রকলাকুশল নন্দলাল বসুকে নিয়ে যাব, কালীমোহন ঘোষও যাবেন। আমার পুত্র রথীরও যাবার কথা আছে, কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারচি নে।

এখনি শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। সেখান থেকে ১৩।১৪ই নাগাদ লক্ষ্ণৌ রওনা হব। ইতি ১০ জানুয়ারি ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির সঙ্গে কে কে যাবেন, তাঁর পুরো তালিকা, কবির নির্দেশে পরে যথাসময়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর রমেশবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবি যে বলেছিলেন, নন্দ-লাল বসু সঙ্গে যাবেন ইনি কিন্তু যেতে পারেন নি।

এখানে কবির এই চিঠির তারিখটায় একটা মজার জিনিস লক্ষ করার এই যে, তখন ১৯২৬ খৃীষ্টাব্দ বা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ চললেও, ভাবুক কবি কিন্তু চিঠি শেষ করার পর তারিখ লেখার সময় অত খেয়াল না করে খৃীষ্টাব্দ বঙ্গাব্দ দুটোয় মিশিয়ে লিখেছিলেন ১৩২৬।

কবি রমেশবাবুকে যে লিখেছিলেন ৫ই ঢাকায় যাবেন, সে কথাও তিনি রাখতে পারেন নি। আবার তিনি দিন পিছিয়ে দিয়ে জানিয়েছিলেন ১০ই তারিখে বক্তৃতা দেবেন। ঐ ১০ই তারিখেই ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রথম বক্তৃতা দেবেন এই কথা পাকা করে পরে তিনি রমেশবাবুকে আবার লেখেন—

কল্যাণীয়েষু

পূর্বে যে দিন স্থির করা হয়েছে তাই পাকা রইল। অর্থাৎ ১০ই তারিখে কলা-বিদ্যা সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তৃতা:

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ইতালীয় অধ্যাপকদের জন্যে কি কিছু আর্থিক ব্যবস্থা করেছ?

লক্ষ্ণৌ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি, মনটাও অত্যন্ত অবসন্ন। ইতি ১১ই মাঘ ১৩৩২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের মন অবসন্ন হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, লক্ষ্ণৌয়ে থাকার সময়েই ১৯শে জানুয়ারি তারিখে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে বসেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই মৃত্যু সংবাদ শুনেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে ইতালীয় অধ্যাপকদের জন্য অর্থের যে কথা আছে, এ সম্বন্ধে জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফর্মিকি ও টুচি এঁদের দুজনকেই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অর্থ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। (ক্রমশ)
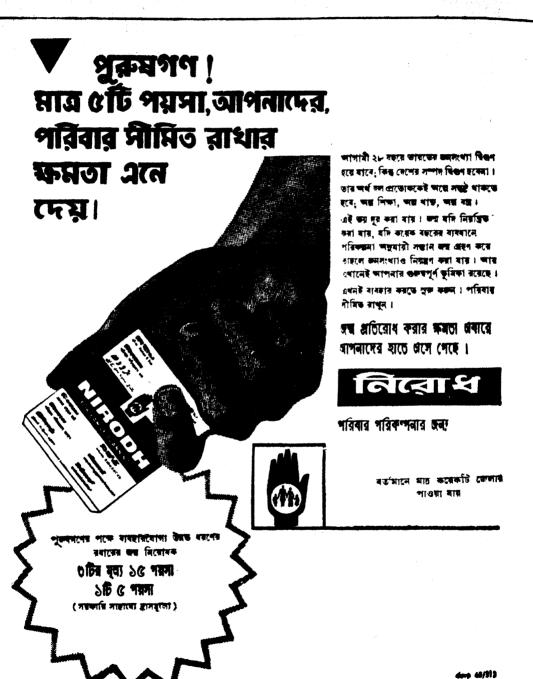
অর্থাৎ বালকবেলার স্বাধীনতা

শংকর চট্টোপাধ্যায়

তোমার কাছে আমার যাওয়া হয় না কিছুতে
লক্ষ করো, অমনি শৌখিন খাঁচা খুলে পাখিটি উড়ে গেল
তরঙ্গের দিকে
অর্থাৎ সেই বিপর্যয়ের দিকে, দেবতাও যেখানে পা রাখতে ভয়
পান।

ভাঙা নৌকোয় সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার কৌশল শেখা হত
বালকবেলায়
তখন ঘুম ছিল শস্যের সুগন্ধে ভরা
তখন সফলতা ছিল পৃথিবীতে
তখন কুয়োর জলে পড়শীদের মেজো বউ না-বিয়ানো সন্তানের
দুঃখ ভুলতে আসত
তখন শিটি বাজিয়ে ট্রেন ছাড়ত ইস্টিশানে
অর্থাৎ যাওয়া আসার কোনো বিধিনিষেধ ছিল না।
তখন খুব সহজেই তোমার দরজায় কড়া নাড়া যেত'
হেঁকে বলা যেত, 'শাস্তি দাও, মারো আমাকে।'

তোমার কাছে আমার যাওয়া হয় না এখন কিছুতে
লক্ষ করো, অমনি শৌখিন খাঁচা খুলে কিশোর পাখিটি
উড়ে গেল তরঙ্গের দিকে
অর্থাৎ সেই বিপর্যয়ের দিকে
দেবতা বা নিষিদ্ধ মানুষ যেখানে পা রাখতে এখন ভয় পান।

আর একটু হলে

সঙ্গীতা দাশ

আরেকটু হলেই
দিয়েছিলাম বেড়া তুলে নির্বোধের মত।
ভুলতে বসেছিলাম,—
আকাশ আরো কালো বিদ্যুতের ঝলক গেলেই।
ভুলতে বসেছিল
শঙ্খচূড় মন
সর্পনগরীর বাসিন্দা কখনও মানুষের ঘরে মানায় না।
কে আর দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষবে?

আরেকটু হলেই পা বাড়িয়ে নেমে যেতাম
ফুল-সাজানো বাগানে,—
কাদা নিয়ে কেউ কখনও যায় সেখানে?

আরেকটু হলেই ভেবে বসতাম আমিও মানুষ॥

গৌরী মেয়েকে

বিনোদ বেরা

খড়ি শর কাশ হোগলার ঘন বনে
ওঠে থেকে থেকে বাতাসের কলরোল—
কি ভাবনা ভাবো গৌরী আপন মনে
আলো ক'রে বসে অশথগাছের কোল!

সামনে জলায় কুমুদ ফুটেছে কতো
সেদিকে মেয়ের মনোযোগ নেই কোনো-
বিজনে একলা মুগ্ধ ছবির মতো
গৌরী আমার কি স্বপন তুমি বোনো!

কাশফুলে মেখে লাল জরি রৌদ্রের
নীল নভ হ'তে সুর ও সুষমা ঝরে—
গৌরী ভরছো গাগরী দেহ মনের
অশথপাতার মসৃণ মর্মরে!

কেউ শিস্ দেয় কেউ করে ডাকাডাকি
দ্রোণফুলে ছাওয়া পোড়ো জমিটির 'পরে
সবুজ হলুদ ধূসর অনেক পাখি—
গৌরীর মনে ফুল ফোটে ফুল ঝরে॥

ঐশ্বরিক

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বর,
আমাকে অগ্নি দাও
আমি ক্রন্দনহন্তারক পুত্র চাই।

ঈশ্বর প্রথমে হাসলেন,
তারপর তাঁর নিরুপায় চোখ থেকে
বিশাল অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

প্রমথ চৌধুরী—সবুজপত্র

বীরবলের নাম ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি।
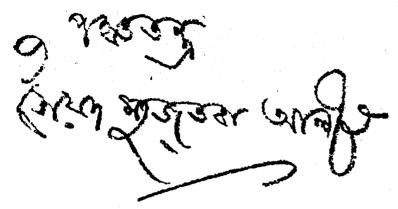
তিনি যখন 'সবুজ পত্র' নাম দিয়ে মাসিক-পত্র বের করলেন তখন আমার মত বালকও প্রশ্ন শুধিয়েছিল, এ-পত্রিকা চলবে কত দিন? বিজ্ঞাপন নেই, সাধারণ পাঠক যে কাগজকে ঠাসা উগ্র 'মুখরোচক' চাট খেতে ভালোবাসে তার সন্ধান নেই, (যে ধরনের লেখা আমি সচরাচর লিখে থাকি), 'শিশু বিভাগ' 'মহিলামহল' 'সঞ্চয়ন' ইত্যাদি দিয়ে তৈরি একই মহলের পাঁচটা খিড়কির দরজা নেই—যে পাঁচমেশালির প্রলোভন থেকে সে-যুগের উৎকৃষ্টতম মাসিক ও তার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজেদের সামলাতে পারেন নি—এক কথায় যা যা থাকলে কাগজের কাটতি বাড়ে তার কিছুই নেই।

শোনা কথা,—একদা অতিশয় ধর্মশীল কুয়েকার সম্প্রদায় স্থির করলেন যে, ব্যবসাতে যে দর কষাকষি হয় সেটা তাঁরা আর করবেন না। কারণ, একবার কোনো জিনিসের দাম পাঁচ শিলিং বলার পর সেটাকে চার শিলিঙে বিক্রি করা মিথ্যা আচরণ। তাঁরা তাই 'ফিক্সড প্রাইস'—'এক দরে বিক্রি'—নামক এক অভিনব সৃষ্টি-ছাড়া প্রথা প্রবর্তন করলেন। শত্রু মিত্র সবাই বললে, ব্যবসা তা হলে লাটে উঠবে, এবং কুয়েকাররা স্বয়ং জানতেন এই পন্থায় অপমৃত্যু অনিবার্য। কারণ তখনকার দিনে ইয়োরোপের ভদ্রতম দোকানে যা দর কষাকষি হত তার সামনে আজকের দিনের আমাদের পাড়া গাঁয়ের মাছের হাটে যা দর কষাকষি হয় সেটা একেবারে এমেচারি মোহাড়া বলে মনে হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটলো সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। কুয়েকারদের দোকানে খদ্দেরের এমনই ভিড় লেগে গেল যে বুকের হাড় আর হাতের পেশী জোরদার না থাকলে সেখানে ঢোকে কার সাধ্য! কারণ অনুসন্ধান করে গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ পেল: ইংলণ্ডের অসংখ্য লোক দর কষাকষির বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে বলছে, বরঞ্চ টুপেন্স্ হে পেনি বেশী দেব, তবু এই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবো তো! পরে অবশ্য দেখা গেল কুয়েকাররা ন্যায্য মূল্যেই দেয় এবং এই করে করে বিলেতের সর্বত্র ফিক্সড্ প্রাইসের রেওয়াজ চালু হয়ে গেল।

প্রমথ চৌধুরী তথা সবুজ পত্রের লেখক সম্প্রদায় কুয়েকারদের মত ধর্মশীল ছিলেন কি না বলা কঠিন কিন্তু তাঁরা ছিলেন—এই গণতন্ত্রের যুগে বলতে গেলে রীতিমত প্রাণটি হাতে নিয়ে বলতে হয়—তাঁরা ছিলেন 'খানদানী'। অর্থাৎ যা সর্বোৎকৃষ্ট তাই আমি চাই, তাই আমি দেব। প্রমথ চৌধুরীর অনুকরণে বলি, 'শ্যাম্পেন নিজে খাব, তোমাকেও দেব—তুমি খেতে না চাও সে তোমার রুচি, তোমার মর্জি; কিন্তু দেনো আমি খাব না, তোমাকেও দেব না।'১ যায় যাক্ আমার 'কারবার' দেউলে হয়ে।

কিন্তু কুয়েকাররা যে-রকম জেনে শুনে আগ্রহভরে সংকল্প করা সত্ত্বেও যমরূপী ক্রেতা তাঁদের লক্ষ্মী লাভ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'সবুজপত্রের' বেলা হ'ল উল্টোটা। 'সবুজপত্র'-এর প্রদীপ বিশ্বসাহিত্য-দেয়ালির অঙ্গন থেকে বিদায় নিল।

কিন্তু এটা অপমৃত্যু নয়, অকাল মৃত্যুও নয়। হয়তো বলতে পারেন, পূর্ণ যৌবনাবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছিল। তাতেই বা কী! অমর হয়ে কোনো গতিকে টিঁকে থাকতেই হবে এ-মাথার দিব্যি দিলে কে? শরৎ চাটুয্যেও বলেছেন, অতিকায় প্রাণীরা সব লোপ পেয়েছে, আরশুলোটা এখনো টিঁকে আছে—সো হোয়াট্? শঙ্করাচার্য বিবেকানন্দও দীর্ঘজীবী হন নি—সো হোয়াট? তাঁরা যা দিয়ে গিয়েছেন, তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ সাধারণ জনের দীর্ঘজীবনের 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের 'গ্লানির' কি তুলনা হয়!

ঠিক এই কথা হচ্ছে। 'সবুজপত্র' শতায়ু হয়নি। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটি বৎসরে বাঙলা সাহিত্যের যে সেবা করে গিয়েছে, বঙ্গ-ভাণ্ডারে যে অমূল্য নিধি দিয়ে গিয়েছে সেটি

'মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অ ন ন্তে র অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রানীর স্বয়ম্বর-বরমাল্য সাথে—'

মফস্বলবাসীর পক্ষে 'সবুজপত্রের' ফাইল যোগাড় করা অসম্ভব। তাই ঝাপসা স্মৃতির 'কেমনে কাটাবো কুহেলিকার এই বাধা রে—?' কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা, দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখার যেমন আপন আপন মূল্য আছে, ঠিক তেমনি খোলা চোখে দেখারও একটা নিজস্ব মূল্য ধরে। তদুপরি পুরনো ফাইলের বনে ঢুকলে হয়তো শুধু গাছ-গুলোই দেখতে পাবো—গোটা বনটার তাবৎ দৃশ্য দেখবার পরিপ্রেক্ষিতটি হারিয়ে যাবে। স্মৃতি যে-টুকু এখনো আঁকড়ে ধরে আছে তারই বা কি কদর-কিম্মৎ কম? অবশ্য এ কথাও সত্য, সবুজপত্রে প্রকাশিত পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর বহু রচনা আমার হাতের কাছে রয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, প্রথম চৌধুরী দিতে চেয়েছিলেন সরেসের সরেস মাল। কিন্তু সরেস মালই যে কঠিন হবে এমন কোনো আপ্ত-সূত্র নেই। সেই শ্যামপেনের তুলনায় ফিরে যাই। শ্যাম্পেনের তুলনায় খাঁটি ধান্যেশ্বরী ঢের ঢের কড়া। আমার জানা মতে শ্যামপেনে থাকে মাত্র ১০ থেকে ১৪ পারসেনট এলকহল (এই বস্তুই নেশা আনে; বাদ বাকি ৯০ থেকে ৮৬ পারসেনট প্রধানতঃ

(১) '—কি বল্লি? শ্যাম্পেনের মত? ...বিলিতি নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস আর বেফাঁস বকছিস। বেটা খাঁটির (অর্থাৎ ধেনোর—লেখক) খদ্দের, শ্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস!' ফরমায়েসী গল্প।

জল আর শর্করা); পক্ষান্তরে খাঁটি দিশী চোলাই কালী মার্কা মালে থাকে কত পারসেনট এলকহল সেটা জানেন মা কালী—শনুেছি ৩০ থেকে আরম্ভ করে ৫০ এবং তার উপরেও উঠতে পারে।

প্রমথ চৌধুরী চাইতেন সাহিত্যরসের শ্যামপেন পরিবেশন করতে। সাহিত্যরস নেশা। কিন্তু সে নেশায় যেন 'খাঁটির' বাড়াবাড়ি না থাকে, আবার সেটা যেন রসকষহীন পানসে জল না হয়। তাই ইরান দেশের আলংকারিক বলেছেন 'আদর্শ' সাহিত্য রস তখনই সৃষ্ট হয় যখন লেখক সনাক্ত করতে পারেন (শনাখ্তন্) রচনার সীমা (হদ্দ্) কোথায়।'—শনাখতন-ই-হদ্দ-ই-হর চীজ (হর্চীজ=প্রত্যেক বস্তু)।

সদ্যোচ্ছ্বাসিত ঝরনার জলে যে রকম বুদ্বুদ থাকে ঠিক তেমনি শ্যামপেনে থাকে বুদ্বুদ; তাই শ্যামপেনকে ইংরিজিতে 'বাব্লি'ও বলা হয়, অর্থাৎ যাতে বাব্ল বা বুদ্বুদ আছে। প্রমথ চৌধুরীর লেখা স্তিমিত নিদ্রিত কূপোদক নয়। তার আছে চাঞ্চল্য এবং উচ্ছ্বাস। এমন কি যেখানে তিনি খাঁটি বুদ্ধি বিবেচনাত্মক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন সেখানেও বুদ্বুদ থাকে—অবশ্য রস রচনার তুলনায় কম মেকদারে। এই বুদ্বুদ থাকলেই কঠিন রচনা পাঠকের কাছে সরল হয় সহজ হয়।

সবুজপত্রের তাবৎ লেখকই যে বাব্লি লেখা রচনা করতেন তা নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমথর কাছে একাধিকবার তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন, কিন্তু কবিগুরুর রচনা সর্বাবস্থাতেই তার আপন ধারায় আপন শাখা প্রশাখায় বয়ে চলেছে। অবশ্য এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে সবুজপত্র প্রকাশিত হওয়াতে তিনি 'সাধু ভাষা' ত্যাগ করে 'বাবলি' চলতি ভাষাতে এবং তদনুযায়ী বৈশিষ্ট্যে অনায়াসে সুইচ্ অভার্ করতে পেরেছিলেন। বাদবাকি লেখকরা প্রমথর মত শৈলী ও ভাষা সব সময় ব্যবহার করতেন না বা পারতেন না কিন্তু প্রমথ সবুজপত্রকে যে বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা প্রায় সব লেখকই করতেন। এমন কি সবুজপত্রের এই বিশিষ্টতা ক্রমে ক্রমে তৎকালীন অন্যান্য পত্র পত্রিকায়ও আংশিকভাবে সঞ্চারিত হয়। চারু বন্দ্যো, মণি গাঙ্গুলী, সত্যেন দত্ত ইত্যাদির উপর প্রমথ তথা সবুজপত্রের প্রচুর প্রভাব পড়েছিল।

আজ যদি কারণে অকারণে এ-ধরা থেকে সবুজপত্রের ফাইল এমন কি প্রমথর তাবৎ লেখা লোপ পায় তবু বাঙলা সাহিত্যের উপর তাঁরা যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাকে যে বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য দিয়েছিলেন সেগুলো কিছুতেই লোপ পাবে না।

শুনেছি পাঠান-মোগল স্থাপত্যে, সেরামিকে, চিত্রে এমন সব মালমশলা ব্যবহার করা হয়েছিল যেগুলো তাদের প্রয়োজনীয় কর্ম সমাধান করার পর সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। কিন্তু ওগুলো ব্যবহার না করলে—বিশেষ করে রঙের বেলায়—সেদিন তারা পরিপূর্ণতা পেত না, সেদিনকার ব্যবহৃত বর্ণ প্রতিদিন উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হত না।

মনীষী প্রমথ চৌধুরীর জন্ম : ৭ আগাস্ট ১৮৬৮ খৃঃ; মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ খৃঃ।

(৯)

ফাসীতে লেখা চিঠিটা আবার পড়-ছিলেন সুভদ্র সেন। মহুয়াকে তিনি বলেননি সবটা খুলে। ফাসী দেখে মহুয়া ভেবেছিল মেয়েটি মুসলমান। কিন্তু কবিতা হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে। তাঁর ছাত্রী ছিল। ওঁর কাছেই সংস্কৃত শিখে সংস্কৃতে এম-এ পাস করে। তারপর তার ইচ্ছা হল ফাসী পড়বার। সুভদ্র সেনই একজন মৌলবীর সংগে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তার। সবিতা ফাসী শিখছে দেখে তাঁরও ফাসী শেখবার জেদ হয়েছিল। পাছে ছাত্রী তাঁকে হারিয়ে দেয়—কাজ নেই। এই মনোভাব নিয়ে ফাসী শিখেছিলেন তিনি। এই কথাই তিনি নিজের বিবেকের কাছে এবং সকলের কাছে বলেছিলেন, কিন্তু আসল সত্যটা এতদিন যেন একটা গুটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে কোথায় ছিল তাঁর মনের মধ্যে। সহসা গুটি কেটে রঙিন প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল সেটা তাঁর চোখের সামনে। না, তিনি কখনও প্রেম-নিবেদন করেননি সবিতাকে। বরাবর ছাত্রীর মতোই ব্যবহার করেছেন তার সংগে, সংযত শুদ্ধ ভদ্র আচরণের শক্ত খামে মুড়ে রেখেছিলেন নিজেকে। মনের ভিতর রঙিন বাসনাটা কিন্তু গুটি বেঁধে ছিল এতদিন, হঠাৎ রঙিন প্রজাপতি হয়ে আজ উড়ে গেল সেটা। কত গুটিই যে রঙিন প্রজাপতি হয়ে আজ উড়ে গেছে তাঁর জীবনে। সামনে একটা সবুজ মাঠ দেখতে পেলেন। তার উপর দিয়ে অসংখ্য প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে...। আবার চিঠিখানি পড়লেন। লিখেছে, "তেহ-রানের বাজারে এই ছবিটি দেখলাম। এ ছবি যেন আপনারই প্রতীক। নদী বয়ে চলেছে, তার এক তীরে গভীর অরণ্য, অন্য তীরে প্রকাণ্ড পাহাড়। সেই উঁচু পাহাড়ের উপর সুন্দর একটি 'মনজিল'। তাজমহলের মতো দেখতে। মনে হল এ যেন আপনার প্রতীক। আপনি সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সকলের নাগালের ওপারে, নিজের স্বপ্নলোকে মশগুল হয়ে আছেন, আপনার সংগী সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রও নয়, তারাও আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না, আপনি নিজেকে নিয়েই মহাশূন্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করছেন। ছবিতে দেখছি পাহাড়ের গায়ে অনেক সিঁড়ি আছে, ওই সিঁড়ি বেয়ে হয়তো পর্বতচূড়াবলম্বী ওই স্বপ্নমহলে পৌঁছনো যায়, আপনার কাছে যাওয়ারও অনেক পথ আছে, তার কোনও একটা ধরে আপনার কাছে যাওয়াও অসম্ভব নয়—কিন্তু আমি জানি তা হবার নয়। ওই স্বপ্নমহল চিরকাল সবার নাগালের বাইরে থাকবে। কেউ ওখানে পৌঁছতে পারবে না। আপনার কাছেও না। আমার কথা কিছু লিখলাম না। আমি নিজেকে 'ফেরি' করছি এই বিদেশের বাজারে। আমি আর মানুষ নেই, পণ্য হয়ে গেছি। পণ্য-জীবনের একঘেয়ে কাহিনী আপনাকে শোনাব না। আমার প্রণাম নেবেন। হঠাৎ একটা মুক্তোর মালা ছিঁড়ে মুক্তোগুলো যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম যখন চিঠিখানা পড়েছিলেন তখন মনে হয়েছিল একটা সুন্দর ফুলকে কে যেন নর্দমায় ফেলে দিল। এখন আবার অন্যরকম উপমা একটা মনে এল। মনে হল এই উপমাটা আরও ভালো। নর্দমার ফুল মরে যায়, পচে যায়। মুক্তো পচে না। হয়তো কোনও জহুরী ওগুলো সংগ্রহ করে নূতন মালা গাঁথবে...।

কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল একটা নীল-কণ্ঠ।

সুভদ্র সেন চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন একটা থিয়েটার হচ্ছে। হলদে আলখাল্লা পরা একটা বুড়ো লোক হাত পা নেড়ে কি যেন বলছে। হলদে বাড়িটা নেই। সামনে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে লাল রুমাল। আর একজনের নীল চোখ। হলদে আলখাল্লা পরা লোকটা কে? হঠাৎ বুঝতে পারলেন। হলদে বাড়িটাই ওই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আলখাল্লা পরা লোকটা বলে উঠল—তোমরা বেরিয়ে যাও। আমি যতক্ষণ বাড়ি ছিলাম, ততক্ষণ আমাকে তোমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করেছ, আমি আর বাড়ি নই, আমি মানুষ হয়েছি, আর আমার মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা ক'রো না তোমরা।

মিসেস পূর্ণেন্দু। আমরা মানুষ হলে তাড়াতে পারতে কিন্তু আমরা মানুষ নই, আমরা কল্পনা, তুমিও কল্পনা, বাড়ি কখনও মানুষ হতে পারে না। সুভদ্র সেনের উদ্ভট কল্পনা আমরা। ঝগড়া না করে এসো আমরা নাচি, ভদ্রলোক তা হলে হয়তো আনন্দ পাবেন একটু। সবিতাকে ভুলতে পারবেন খানিকক্ষণের জন্য।

রহস্য। আমি কখনও নাচ শিখিনি, তবু নাচব। কিন্তু তার আগে বিচার চাই। জজ সাহেবকে ডাকো, অম্বর গুপ্তকে ডাকো, আর ডাকো শেখরকে।

আলখাল্লা পরা লোকটা। আমি যদি জজ হই তোমার আপত্তি আছে?

রহস্য। কিছুমাত্র না। কিন্তু সুবিচার চাই। আগে অম্বর গুপ্তকে ডাকো।

সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল অম্বর গুপ্ত।

রহস্য। এইবার ওঁকে জিজ্ঞেস করুন আমার স্বামীর সঙ্গে উনি যখন জেলে দেখা করতে যেতেন, কি বলতেন আমার সম্বন্ধে—

আলখাল্লা পরা লোকটা। [অম্বর গুপ্তের দিকে চেয়ে] প্রশ্ন তো শুনলেন। এবার উত্তর দিন। সত্য কথা বলবেন

অম্বর গুপ্ত। রহস্য দেবী আর শেখর সেন একসঙ্গে বাজারে পিকেটিং করতেন এ নিয়ে সুভদ্র সেনের বন্ধুরা নানারকম টিটকারি দিতেন, অনেক অশ্রাব্য ইঙ্গিতও করতেন। তাই আমি সুভদ্র সেনকে গিয়ে বলেছিলাম তোমার বউকে নিয়ে নানারকম গুজব উঠছে, তুমি তোমার বউকে মানা করে দাও আর যেন ও পিকেটিং করতে না বেরোয়।

রহস্য। ওকে জিজ্ঞেস করুন উনিই আমার স্বামীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিনা তোমার বউকেও আন্দোলনে নামাও। তা হলে সবাই তোমাকে বাহবা বাহবা করবে।

অম্বর গুপ্ত। দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন ভাবিনি যে, উনি শেখর সেনের সঙ্গে অমন বিশ্রীরকম মাথামাথি করবেন।

রহস্য। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন উনি নিজেই মাথামাখি করবার জন্যে আমার পিছনে রোজ ছুটোছুটি করতেন কি না।

অম্বর গুপ্ত চুপ করে রইলেন।

আলখাল্লা পরা লোকটা। [ধমকের সুরে] জবাব দিন।

অম্বর গুপ্ত। রহস্য দেবী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। ও'র সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সবাই ব্যগ্র হতেন, আমিও হতাম, কিন্তু ও'র সঙ্গে মাথামাখি করবার চেষ্টা করেছিলাম একথা আমি অস্বীকার করছি।

রহস্য। উনি যে আমাকে তিনখানা লম্বা চিঠি লিখেছিলেন, সে কথাও কি উনি অস্বীকার করছেন? সে চিঠিগুলো যদিও কাউকে দেখাইনি, কিন্তু সেগুলো আমার বাক্সে আছে এখনও।

অম্বর গুপ্ত। দেখাননি কেন?

রহস্য। আমার স্বামীকেই দেখাব ভেবে-ছিলাম, কিন্তু সময় পেলাম না। আপনার কথায় বিশ্বাস করে আমার স্বামী যখন কুৎসিতভাবে শেখর সেনের সঙ্গে আমার সম্মান জড়াতে ইতস্তত করলেন না, যখন উনি ভুলে গেলেন যে ও'রই কথায় আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আন্দোলনে নেমেছিলাম ও'র মান রক্ষা করবার জন্যে তখন ওই কাদা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে প্রবৃত্তি হল না।

অম্বর গুপ্ত। [আলখাল্লা পরা লোকটাকে] ওঁকে জিজ্ঞেস করুন শেখর সেনের সম্বন্ধে ও'র কি কোন দুর্বলতা ছিল না?

রহস্য। ছিল। কিন্তু সে দুর্বলতা কি রকম তা শেখর সেন নিজেই এসে বলুক—ডাকুন তাকে।

ডাকতে হল না, নিজেই এল শেখর সেন। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, উসকো-খুসকো চুল সুশ্রী যুবক একটি।

শেখর সেন। (কোন প্রশ্ন করবার আগেই) ও'কে আমি মা বলতাম। উনি আমাকে

আগুনের শিখাটা সাপের মত নাচতে লাগল ম্যান্ডোলিনের তালে তালে

ছেলের মতো স্নেহ করতেন। কিন্তু যেদিন শুনলাম—ওফ—

দু হাতে মুখ ঢেকে বেরিয়ে গেল শেখর সেন। তারপর দেখা গেল একটা আড়কাঠা থেকে ঝুলছে তার দেহটা। গলায় দড়ি দিয়েছে শেখর সেন।

রহস্য। মরবার আগে শেখর আমাকে ওই চিঠিটা লিখেছিল—

আঙুল তুলে সে আকাশের দিকে দেখাল। আগুনের অক্ষরে জ্বলজ্বল করে উঠল এই কথাগুলো—'মা, এ পাপ পৃথিবী ছেড়ে চললাম। প্রণাম।'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু। "পাপ, পাপ, পাপ, পাপ বা-প রে বাপ!"

আলখাল্লা পরা লোকটা। অম্বর গুপ্তর চিঠিগুলো দেখাতে পার?

রহস্য। সেগুলো মর্তের এলাকায়, আমার তোরঙ্গের মধ্যে আছে। সেগুলো আমার নাগালের বাইরে এখন। দেখাতে পারব না।

আলখাল্লা পরা লোকটা। তোমার হাতের ওই লাল রুমালটা কার?

রহস্য। এটা আমার স্বামীর বাক্সে ছিল, একটা সুগন্ধি খামের ভিতর। খামের উপর লেখা ছিল 'নি'। শেখরের চিঠিটা আর এই রুমালটা আমি সঙ্গে এনেছিলাম।

আলখাল্লা পরা লোকটা। আমার বিচারে তুমি দোষী।

রহস্য। দোষী?

আলখাল্লা পরা লোকটা। হ্যাঁ, খুনের দায়ে।

রহস্য। কাকে খুন করেছি আমি?

আলখাল্লা পরা লোকটা। নিজেকে।

আবার হো হো করে হেসে উঠল মিসেস পূর্ণেন্দু।

মিসেস পূর্ণেন্দু। ওরে বাউল, নিজেকে কি খুন করা যায়? থাকবার বাসাটা বদলানো যায়, পুরোনো কাপড়টা ছাড়া যায়, নিজেকে খুন করা যায় না। আমরা কেউ মরিনি, কেবল বদলেছি। তুই ছিলি ভাঙা একটা বাড়ি, হয়েছিস বাউল। আয় আমরা নাচি, সুভদ্র সেন দেখুক। যে সবিতা-ঘাস ওর নাগালের বাইরে তাই খাওয়ার জন্য ওর মন-গরু জিব বাড়াচ্ছে, সে গরুকে অন্যমনস্ক করতে হবে। আমরা থাকতে ও অন্যের কথা ভাববে কেন, আমরা ভাবতে দেবই বা কেন?

রহস্য। [অভিমান ভরে] কিন্তু আমার সুবিচার না হলে আমি নাচব না।

আলখাল্লা পরা বাউলটা এর পর অদ্ভুত কাণ্ড করল। হঠাৎ দু হাত তুলে কবিতা আবৃত্তি করল একটা।

ওগো নারী, করিও না রোষ
সদাই নিষ্পাপ তুমি সদাই নির্দোষ
আনন্দ-দায়িনী, মনোলোভা
যা করিবে পাবে তাই শোভা

অম্বর গুপ্ত। [মুচকি হেসে] আমি তবে চললাম। [প্রস্থান]

বাউল নাচ শুরু করে দিল।

মিসেস পূর্ণেন্দু। দাঁড়াও দাঁড়াও, বাজনা আসুক। নি ম্যান্ডোলিন বাজাবে। নি—নি—নি, শিগগির এসো—।

নি বেরিয়ে এল। আগুনের শিখা যেন সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াল। মুখ দেখা যায় না। টকটকে লাল ওড়নায় সব ঢাকা। বেজে উঠল ম্যান্ডোলিন। শুরু হয়ে গেল নাচ। আগুনের শিখাটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে নাচতে লাগল ম্যান্ডোলিনের তালে তালে। তারপর ছড়িয়ে

পড়ল আগুন। ঘিরে ধরল রহস্যকে। তারপর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সেটা। নাচের ভঙ্গিতেই জ্বলতে লাগল। সুভদ্র সেনের একটা ছবির কথা মনে পড়ল, সীতার অগ্নিপরীক্ষা। চারিদিকে অগ্নিশিখা, তার মাঝখানে ধ্যানমগ্না সীতা হাত জোড় করে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল সুভদ্র সেনের। সীতাকে পোড়াবার সময় কি তার শাড়িতে কেরোসিন তেল ঢালা হয়েছিল? ধোঁয়ায় ভরে গেল চারিদিক। আকাশ কালো হয়ে গেল। কিছু দেখা যায় না। তবু উদ্দাম নাচের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর ঝড় উঠল। বিরাট ঝড়। ধোঁয়াকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এক টুকরো ধোঁয়া কিন্তু উড়ল না। লম্বা কালো একটা টুকরো দুলতে লাগল আকাশ-পটে।

"ওই তো রহস্যের বেণী, বেণীটা পোড়েনি, বেণীটা পোড়েনি—"

চীৎকার করে উঠলো সুভদ্র সেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নীলকণ্ঠ। সুভদ্র সেন দেখলেন, একটা নয়, হলদে বাড়ির আলসেতে চারটে নীলকণ্ঠ। একটা চীৎকার করতে করতে আকাশে উড়ে গেল, তারপর সোঁ করে নেমে এল। নীল রঙের বহ্ন্যুৎসব হয়ে গেল যেন। সুভদ্র সেন দেখলেন বেণীটা এখনও আকাশে ঝুলছে। সেইটেকে ঘিরেই নীলকণ্ঠটা যেন মাতামাতি করছে।

হঠাৎ সুভদ্র সেন উঠে দাঁড়িয়ে অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বললেন—"রহস্য, একবার ফিরে দাঁড়াও, তোমাকে দেখি, আমি জানি তুমি বেঁচে আছ—"

বেণী অন্তর্হিত হল। হলদে বাড়ির জানলায় দেখা গেল মিসেস পূর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। তার পিছনে মনে হল রহস্য দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে 'নি'।

(১০)

সেদিনও মহুয়া অন্ধকারে হাঁটছিল রাত দুটোর পর। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিতে হয়নি, আপনিই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হাঁটছিল, কিন্তু এগোচ্ছিল না। গঙ্গার ঘাটের দিকে যে পথটা এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছিল আসলে সেইখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে। কল্পনা করছিল। কল্পনাতেই হাঁটছিল সে। সেদিন মুখ তুলে সে অবাক হয়ে গেল। ঝোপটা নেই। আড়াল ঘুচে গেছে। মুক্ত প্রান্তরে জ্যোৎস্নালোকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সুভদ্র সেন, মজুমদার মোহিত সোম, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল— সবাইকে তার ভাল লাগে। কিন্তু পুরোপুরি লাগে না। তার ভালো-লাগার জ্যোৎস্না কাউকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেনি। সবারই গায়ে খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার। দূরে দাঁড়িয়ে আছে শাজিম। কোন সুদূরে পূর্বজন্মের, কোন বিস্মৃত

আদিম সমাজের প্রণয়ী ও? কোন মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এল সজীব হয়ে? তার সঙ্গে সত্যি কি কোন যোগ ছিল মহুয়ার? এখন কি যোগ হওয়া সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল যেন অনেক। দূরে অনেকগুলো। মিল থেকে যেন বাঁশি বেজে উঠল। চীৎকার করে উঠল মহুয়া। সুভদ্র সেন, মঙ্গলময়, মোহিত সোম, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল, শালিম—সবাই যেন কাছাকাছি সরে এসে মিশে যাচ্ছে, তাদের গা থেকে অন্ধকারের টুকরো-গুলো খসে পড়ছে, থাকছে শুধু আলোকিত অংশগুলো, সেগুলো সব এক হয়ে গেল। যোগফল যা হল তা অপূর্ব, আশ্চর্য, জ্যোতির্ময় এক পুরুষ। অতীত ও বর্তমান মিলে নিখুঁত ভবিষ্যৎ আবির্ভূত হল। হাসি মুখে এগিয়ে আসতে লাগল মহুয়ার দিকে। শাঁখ বাজছে, মিলের বাঁশি-গুলো বাজছে, চাঁদের আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। মহুয়ার হঠাৎ ভয় হল—সে দু হাত বাড়িয়ে বলে উঠল—না, না, তুমি এস না। তুমি নিখুঁত, তুমি ভয়ংকর, তুমি স্বপ্নের মহাকাশচারী, আলিঙ্গনে তোমাকে বাঁধা যাবে না। তুমি এস না, এস না এস না।

তবু কিন্তু সে আসতে লাগল।

মহুয়া বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সে আসছে, একবারও থামেনি। অনিবার্য গতিতে এগিয়ে আসছে সে। তার ভয় করছে কেন, বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল কিন্তু ভয় ঘুচল না। তার মনে হল আমি তো নিখুঁত নই, আমার মধ্যেই যে অনেক পঙ্ক, অনেক গ্লানি, আমি ওর সঙ্গিনী হবার যোগ্য কি? ও যে নির্মল, ও যে সুন্দর, ও যে পবিত্র...ছুটতে লাগল মহুয়া। বাড়ির থেকে বেশী দূরে সে যায়নি, কিন্তু তবু মনে হল বাড়ি পৌঁছতে পারছে না সে। বাড়িটাও যেন নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন পৌঁছল তখন শুনতে পেল সুভদ্র সেন চীৎকার করছেন—"রহস্য, রহস্য, তুমি ফিরে দাঁড়াও। আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ, সেইখানেই তুমি আমাকে, আমার স্বরূপকে দেখতে পাবে। ফিরে দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও—দোহাই তোমার, একবার ফিরে দাঁড়াও, শোন, আমার কথা শোন—"

ঠিক এই সময়েই প্রচণ্ড গর্জন করে বিরাট এরোপ্লেনটা নেমে এল। বিরাট একটা কাঁড়ওয়ের মতো থামল এসে তাদের বাড়ির সামনে। তার সর্বাঙ্গে স্বর্ণদ্যুতি। মানব-মনীষার শেষ কীর্তি যেন। মানুষের মতো কথা কইল সে।

"তোমার ডাক শুনে আমি নেমে এসেছি মহাকাশ থেকে। তুমি যা চাইছ তা এখানে নেই। তোমাদের কবি বহুকাল আগে বলে গেছেন—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে'। সেইখানে চল যাই—উঠে এস—।"

সুভদ্র সেন বেরিয়ে এলেন।

"কে তুমি? মিসেস পূর্ণেন্দু? রহস্য? নি? না, মহুয়া?"

"আমি মহাকাশের মহাতৃষ্ণা। যেখানে শাশ্বত আলোর কমল ফুটে আছে সেই-খানেই আমি বিহার করি। তুমি যাদের কথা বললে তারা সবাই সেখানে আছে—অথচ নেই। সেই আছে-অথচ-নেই-লোকের দ্বিধার কম্পনকে আলোকিত করছে আলোর কমল। হয়তো সে দ্বিধা একদিন বিশ্বাসে পরিণত হবে। কিন্তু এখনও হয়নি। মানুষের সব জ্ঞান এখনও অজ্ঞান-ভ্রূণে নিহিত। জানার সব নদী বারবার অজানা সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। সে সমুদ্রের কূল-কিনারা এখনও পাওয়া যায়নি। আলোর কমল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে খালি। এস, নিজের চোখেই দেখবে সব।"

সুভদ্র সেন এরোপ্লেনে উঠে বসলেন। বিরাট গর্জন করে প্লেন উড়ে গেল। ভন-ভন ভনভন ভনভন—কোটি কোটি ভ্রমর যেন চীৎকার করতে করতে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মহুয়া।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সুভদ্র সেন। তিনি ভিতরে যেন ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন। দু হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন মহুয়াকে, যেন সে ছোট একটা শিশু। সুভদ্র সেন নিজেও জানতেন না যে, তাঁর গায়ে এখনও এত শক্তি আছে। শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অদ্ভুত একটা আনন্দ হল তাঁর। নিজেকে হঠাৎ যেন ফিরে পেলেন। এতদিন কোন মিথ্যা স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে তিনি দুর্বল রোগী ভাবছিলেন? এই তো মহুয়াকে একটা পালকের মতো কুড়িয়ে নিলেন। তাকে দু বাহুর উপর তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। মহুয়ার মাথায় এলো-খোঁপা করা ছিল। সেটা আরও এলিয়ে পড়ল। অজস্র কালো চুলের প্রপাত নামল তাঁর বাহু বেয়ে। এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল মহুয়ার বুকের কাপড়ও। কিন্তু এসব সুভদ্র সেনের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। যে শিশু-মহুয়াকে একদা তিনি মহুয়া গাছের তলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, মনে পড়ল তাকে। যে মহুয়াকে শ্যামলী মানুষ করেছিল নিজের মেয়ের মতো মনে পড়ল তাকে। যে মহুয়াকে দোলায় দোল দিতেন তিনি, মনে পড়ল তাকে। সেই ছোট্ট শিশুটা যেন এই অসংবৃত-বাসা বিস্রস্ত-কেশা পীবর-স্তনী যুবতীকে আড়াল করে ফেলল নিমেষে, ফিক করে হাসল তাঁর দিকে চেয়ে, ফোকলা

দাঁতের মিষ্টি হাসি, যা তাঁকে বহুকাল আগে অভিভূত করত সেই হাসিটাই তিনি যেন দেখতে পেলেন আবার, নীচের মাড়িতে ছোট ছোট আলোচালের মতো দুটি দাঁতও। হঠাৎ লক্ষ করলেন মহুয়ার নিশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন তাকে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। একটু পরে চোখ খুলল মহুয়া। সবিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বলল—"দাদু, ফিরে এলে কখন?"

"আমি কোথাও তো যাইনি।"

"হ্যাঁ, গেছলে তো। আকাশ থেকে যে সোনার এরোপ্লেনটা নেমে এসেছিল তাতে করে—"

"সোনার এরোপ্লেন?"

"হ্যাঁ, সে বললে, আমি মহাকাশের মহা-ভৃঙ্গ, আলোর কমল যেখানে ফুটেছে, সেইখানে আমি বিহার করি, আরও সব কি বললে ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি তার সঙ্গে চলে গেলে..."

আবার চোখ বুজল মহুয়া। অনেকক্ষণ বুজেই রইল। ভ্রূকুঞ্চিত করে হাওয়া করতে লাগলেন সুভদ্র সেন। মহুয়া কথা কইল আবার।

"সে-ও এসেছিল—"

"কে?"

"যোগফল। তোমাদের সকলের যোগ-ফল। কিন্তু সে এত সুন্দর, এত চমৎকার, এত নিখুঁত যে, আমি ভয়ে পালিয়ে এলাম। সে এখনও বোধ হয় আসছে আমার দিকে, চিরকাল বোধ হয় আসবে।"

"Stop that nonsense"

হঠাৎ পরুষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন সুভদ্র সেন। নিজের স্বর শুনে নিজেই চমকে উঠলেন তিনি। অতীতের বাস্তববাদী বলিষ্ঠ সুভদ্র সেন সহসা আবির্ভূত হলেন যেন স্বপ্নের খোলস ছিঁড়ে। যে সুভদ্র সেন একদা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছিলেন, জেলে অনশন করে-ছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদে, যে সুভদ্র সেন ছাত্রজীবনে গুণ্ডার সঙ্গে লড়েছিলেন একটি অপহৃতা বালিকাকে উদ্ধার করবার জন্যে, যে সুভদ্র সেন রূঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন রহস্যাকে, 'তুমি আর শেখরের সঙ্গে মিশবে না'—সেই সুভদ্র সেন অতীতের ভগ্নস্তূপ থেকে যেন বেরিয়ে এলেন সতেজ সবুজ চারার মতো।

"আমাকে তুমি বকছ দাদু?"

মহুয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করল।

সুভদ্র সেন লক্ষ করলেন তার নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে।

"বেশী বকবক ক'রো না। ঘুমোও—"

মহুয়া চুপ করে রইল।

তারপর আবার শুরু করল—"আমি—"

"—একটি কথা ব'লো না। চুপ কর। আমরা আর এখানে থাকব না।"

"কোথা যাবে—"

"কোথা তা জানি না। কিন্তু এই ভূতুড়ে পরিবেশ ছেড়ে চলে যাব। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে—"

মহুয়া সবিস্ময়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

"কোথায়?"

"ওপারে। এপারে আর ভালো লাগছে না।"

এরোপ্লেন বলছিল—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

"চুপ কর"। বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন সুভদ্র সেন।

(ক্রমশ)

আর্থিক ভারত

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা চক্র

নভেম্বর মাসের দুই তারিখ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রচার বিভাগ এবং ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম-এর কলকাতা শাখার যৌথ উদ্যোগে "চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপ" সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং সভাপতির পদ গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর ভবতোষ দত্ত।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে যে আলোচনা হয়, তা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে যে আলোচনা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য, চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের গতি-প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, বর্তমানে যে শিল্প-মন্দা দেখা যাচ্ছে তাতে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনী শক্তির সদ্ব্যবহার বা পূর্ণ ব্যবহার কীভাবে করা যেতে পারে, বহির্বাণিজ্য লেনদেন ব্যালান্সে যে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে শিল্পোন্নয়ন পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানো যায়, আঞ্চলিক ভিত্তিতে দেশে কীভাবে সুষম শিল্পোন্নয়ন করা যেতে পারে, শিল্প কাঠামোর মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ-প্রয়াসের আপেক্ষিক ভূমিকা কী হওয়া উচিত প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার ফল হচ্ছে কয়েকটি সুপারিশ, যা পাঠানো হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশনের কাছে—এই আশা নিয়ে যে এগুলি যথাযথভাবে বিবেচিত হবে।

আলোচনায় যোগদানকারী সবাই এ বিষয়ে একমত হন যে, কতিপয় নির্বাচিত ক্ষেত্রে আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনের নীতি আরও জোরদার করা উচিত। শুধু স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আমদানির বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করলে চলবে না; আগামী দিনের সুসংহত শিল্প-কাঠামোর ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য এবং দেশকে শিল্পক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরশীল করার প্রস্তুতি হিসাবে এখন থেকেই সুদূর-প্রসারী আমদানির বিকল্প সামগ্রী উৎপাদন করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। তার সঙ্গে চাই রপ্তানি বৃদ্ধি। রপ্তানি বাড়াবার জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে (শতকরা ৭ ভাগ রপ্তানিবৃদ্ধির কর্মসূচী) তা সফল হবে কিনা সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। বিশেষ করে, শতকরা ৭ ভাগ রপ্তানিবৃদ্ধি, শতকরা ৫ ভাগ কৃষি-উৎপাদন, শতকরা ৬ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ১২ ভাগ সঞ্চয় প্রভৃতি সব লক্ষ্যের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য আছে কিনা, অথবা সবগুলি লক্ষ্যে একই সাথে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে কিনা এ বিষয়েও আলোচনা হয়। আলোচনা-চক্রের প্রথম দিনেই অধ্যাপক অম্লান দত্ত জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ১২ ভাগ সঞ্চয় যাতে করা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেসরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকার মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কর্মসূচী কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে যে আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পি কে সেন। কৃষিক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে অর্থ-সংস্থানের সমস্যা। এ বিষয়ে সবাই একমত হন যে, সমবায়ের ভিত্তিতেই কৃষি-মূলধন সরবরাহের কাজ জোরদার করতে হবে। অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে রাষ্ট্র, বাণিজ্যমূলক ব্যাংক, স্থানীয় আমানত এবং ঋণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় সংস্থাসমূহ, জমি-বন্ধকী ব্যাংক এবং বণ্টন-ব্যবস্থার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে জামানত আদায়ের সমস্যা। কৃষকদের বর্তমান সম্পদের ভিত্তিতে এবং এ-জাতীয় জামানতের বিপক্ষে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা বজায় রাখা উচিত—এই মর্মে সুপারিশ করা হয়েছে। উৎপাদিত সামগ্রী মজুত রাখা এবং বিক্রয়-করণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, উৎপাদনক্ষেত্রে যৌথ খামারের উপর আরও দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রের উচিত সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির মধ্যে সংহতি এবং যোগসূত্র বজায় রাখা। উন্নত ধরনের কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির সাথে কৃষকগণ যাতে সহজে পরিচিত হতে পারে এবং তা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য কৃষকদের সামাজিক শিক্ষা এবং ব্যাপক ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এবং মূল সভাপতি ডক্টর ভবতোষ দত্ত জোর দিয়ে বলেন যে, কৃষকগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না আধুনিক পদ্ধতির সাথে পরিচিত হচ্ছে অথবা উৎপাদন বাড়াবার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করবার যৌক্তিকতা বুঝতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে না।

সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে সম্পর্ক এখন বজায় আছে তা এভাবেই রাখা উচিত। তিনি আরও বলেন, জাতীয় সঞ্চয়ের একটি নির্দিষ্ট শতকরা অংশ সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের সম্প্রসারণ করার জন্য আলাদা করে রাখা উচিত। কিন্তু এটা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। সমাজ-কল্যাণের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের খুব সতর্কতার সাথে কাজে নিযুক্ত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যাদের অভাব বেশী, তাদের আগে কল্যাণ-মূলক ক্রিয়াকলাপের সুফলে অংশীদার করা উচিত।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে অনেক আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। অধ্যাপক গাডগিল কিছুদিন আগে 'চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপ' সম্পর্কে একটি দলিল প্রস্তুত করেছেন। তার ভিত্তিতেই আলোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোচনার ভিত্তিতেই বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

আমরা পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি, সঙ্গতির মধ্যেই চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকে সীমায়িত রাখতে হবে। বৈদেশিক মূলধন প্রাপ্তির আশাকে বড় করে দেখা যে আর উচিত হবে না, পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ

তা বুঝতে পেরেছেন। কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত—চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই বিশেষ দিকটির উপর সবারই দৃষ্টি নিবদ্ধ। আলোচনা-চক্রে অধ্যাপক রাখাল দত্ত খাদ্যসামগ্রীর বর্তমান মূল্যস্তর বজায় রাখার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন, এবং এই আশা ব্যক্ত করেন যে, শতকরা ৫ ভাগ কৃষি-উৎপাদন বাড়ানো ভারতের পক্ষে অসম্ভব নয়। শিল্প-ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নসূচী এমনভাবে নির্ধারিত করা দরকার, যাতে সব শিল্পেরই উৎপাদনীশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয়। রপ্তানি থেকে আয় আরও বাড়াবার জন্য শ্রমিকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণা যোগাবার মত কোন আর্থিক পুরস্কার অথবা বোনাস দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়টিও আলোচনা-চক্রে উত্থাপিত হয়েছে।

যে সুপারিশগুলি এই আলোচনা-চক্র থেকে প্ল্যানিং কমিশনে পাঠানো হচ্ছে সেগুলি প্ল্যানিং কমিশন গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন এবং গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখবো।
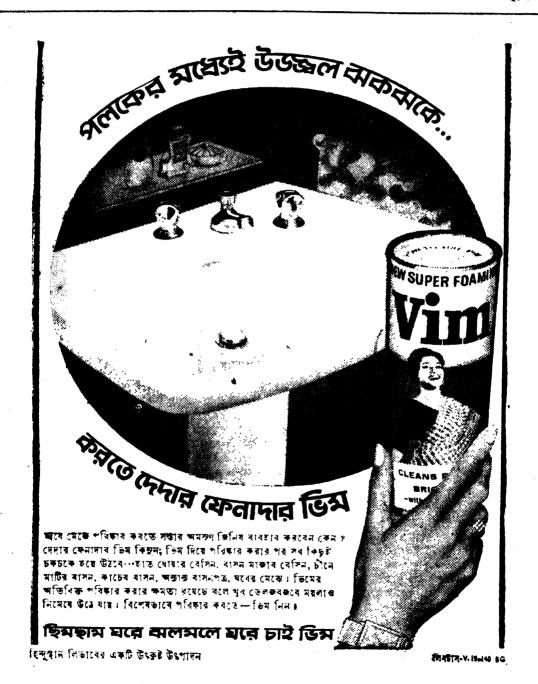
সুব্রত গুপ্ত

তেরো

ট্রেনের জানলায় বসে, স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে যত জায়গাজমি দেখা যায়—তার হিসেব নিকেশ কড়ায়গণ্ডায় সরকার বাহাদুরের খাতায় লেখা থাকে। কোন জায়গা কার ছিল, কার হাতে গেল—সব লেখা থাকে। কথা হচ্ছিল সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে বসে।

কুবেরের জায়গা কেনা থামেনি। বরং বেড়েছে। এদানী বুলাও বিরক্ত। অফিসে প্রায়ই কামাই। সে বলতে বসলে সাত কাহন।

পাকাবয়সী কানুনগো আরও অনেক কথা শোনাল। বহরিডাঙা, মেদনমল্ল, কোলা, ধোকাদিঘা, নাটাগাছি—এসব মৌজার সেটেলমেন্ট ক্যাম্প এই চাকুরিয়ায়। অফিসারের বসে কথা হচ্ছিল। সামনেই দেবপথ বাড়ির পাশ দিয়ে খোয়া ওঠা রাস্তা, দুধারে অনেক সব নারকেল গাছ। শহরের মধ্যে আর এমন দেখা যায় দমদম নয়ত উল্টো-ডাঙার কিংবা হাওড়ার গা দিয়ে যেসব বসতি উঠেছে গত বিশ ত্রিশ বছরে সেসব পাড়ায়। এই রাস্তা আর বাঁকুড়ার কেন্দুয়াডিহির ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে যে শালবন দেখা যায়—সব সরকারী খাতার হিসেবে তোলা আছে। ভাবতেই কুবেরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হরির পুকুর, রামের ডাঙা, পালানের উদ্বাসন সব মেপে মেপে নকশা করে রাখতে হয়েছে।

কানুনগো বললেন, মোগল আমলের আগে থেকেই আমাদের দেশে এই মাপজোক শুরু হয়ে গিয়েছে। ভূমিরাজস্ব একটা দারুণ সায়েন্টিফিক ব্যাপার।'

কুবের একটা জমির ইতিহাস জানতে এসেছিল। জমির পরিমাণ খুব বেশি নয়। কাঠা পনর হবে। পাঁচজন শরিক। স্বামী মারা যেতে নতুন হিন্দু আইনে বিধবার কপালে একভাগ পড়েছে। বাকি চার ভাগের তিন ভাগ তিন মেয়ে আর বাকিটুকু ছেলে হরেকেষ্টর ভাগে বর্তেছে। চার ভাগ কেনা হতেন। বাকি শুধু হরেকেষ্টর অংশ। সেই অংশ নিয়েই ঝামেলা আছে কিছু, বছর দুই আগে হরেকেষ্ট তার নতুন বৌকে

কেন্দুয়াডিহির ফাঁকে মাঠে দাঁড়িয়ে যে শালবন দেখা যায়

কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরে জেলে গিয়েছে। জেল থেকে বেরোলেই আর ওজায়গা কেনা যাবে না। তখন খেয়াল খুশি মত হরেকেষ্ট কুবেরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। অথচ হরেকেষ্টর ভাগটুকু না হলে নয়।

কানুনগোর কথাগুলো শুনে একদম ঘোরের মাথায় কুবের বেরিয়ে পড়ল। এখন নয়ান বাড়ি নেই। ব্রজদাও তার বাবার আত্ম-জীবনী বাঁধাইখানায় আনতে গেছে হয়ত। বহুদিনের পরিশ্রমের পর বইখানা বাজারে বেরোচ্ছে। এই ফাঁকে একবার কদমপুর ঘুরে আসবে।

দুপুরের ট্রেন ফাঁকা। প্রায় দুলকি চালে লাইনের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটছে। কুবের এখন জানে সরু পিয়াশঙা পেরুলেই একটা খাল পড়ে—তার ওপর দিয়ে ট্রেন আস্তে যায়। সেখান থেকে খানিক এগিয়ে একতলা একটা বাড়ি ডানদিকে, গোয়ালের ছাদে বীজ রাখার একটা ঢাউস লাউ ছাতকুড়ো পড়ে কালচে হয়ে উঠেছে।

লেভেলক্রসিংয়ে গেট খোলেনি। কলকাতা যাওয়ার ট্রেন আসছে উল্টোদিক থেকে। কুবের লাইন পেরোবার মুখে একখানা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে দেখল। ড্রাইভারের পাশের সিটের দরজা খোলা। সেখানে গগলস্ চোখে তাগড়াই মত একজন ঘন ঘন কব্জির ঘড়ি দেখছিল। কুবেরকে দেখে বলল, 'এখানে ডাব কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'এখন তো বাজার বন্ধ। ভোরের ট্রেনে ডাব, মাছ সব কলকাতায় চলে যায়—'

'আমাদের সঙ্গে একজন বিদেশী আছেন। হঠাৎ খুব শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা দেশের লোক। গরমে কাহিল হয়ে পড়েছেন।'

দুজন ব্যাপারী বোধহয় বিকেলের ট্রেনের জন্যে বেশ আগেই এসে পড়ছে। রিকশা-ভ্যান বোঝাই দিয়ে স্টেশনের দিকে আসছিল। কুবের তাদের থামিয়ে চারটে ডাব কিনে দিল দরাদরি করে। পাশের চায়ের দোকান থেকে একটা বড় কাচের গ্লাসও জোগাড় করে দিল।

গাড়ির গায়ে লেখা গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া। পাশে ইংরাজি হরফে লেখা ও এন জি সি। পেটরল খোঁজার দল। কলকাতার ট্রেন চলে গেল। স্টেশন ওয়া-গনের ভেতর গরমে কাহিল সাহেব নানা-ভাবে ধন্যবাদ জানালো কুবেরকে।

'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

'সোঁদালিয়া ক্যাম্প।'

গাড়ি ধোঁয়া তুলে বেরিয়ে গেল। মাইল সাত আটের মধ্যে তেল খুঁজে দেখা হচ্ছে। এদের গাড়ি আরও দু' চারবার কুবেরের চোখে পড়েছে। বড় পাকুড়তলার বিক্রির জন্যে বাঁশ কিনে কিনে জমা করেছে কে। বিশাল গাছটার গায়ে হেলানো বাঁশের গোছা একটা দৃশ্য হয়ে আছে। পাশেই ধানকলে বটবট আওয়াজ। বিকেল হওয়ার আগেই খালপাড়ে এসে হাজির হল কুবের। এখানেই আভা বৌদি মাছ কিনতে আসে ভোর ভোর—নয়ত সন্ধ্যের ঘোরে।

মাঠ দেখে কোন জমিটা কতদূর বোঝার উপায় নেই। উত্তরে খেজুর গাছ ছিল আগেকার সীমানা। ভুবনদের জায়গা কেনার পর কুবের সাধুখাঁ বহরিডাঙা সব রেজিস্ট্রি

অফিসে আরও অনেকবার গেছে। ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হতে আর দেরি নেই। কদমপুরের বাজারে নতুন নতুন দোকান হচ্ছে। স্টেশন রোডে ঘরভাড়া এখন চড়া।

বিকেলে একখানা ছায়ার সতরঞ্চি সারা মাঠে একেবারে মাপসই হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ছায়ার শেষে শেষে পড়ন্ত রোদ্দুর ঝলক তুলে দাঁড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে কুবের আর পলক ফেলতে পারে না। ছায়াবন্দী এই বিশাল চৌকো মত জায়গাটুকু কিনতে পারলে ভেতর দিয়ে কয়েকটা রাস্তা বের করে দিলেই হবে। তারপর রাস্তার দুধারে প্লট কেটে কেটে নগর বসানো।

ছায়ার শেষ অবধি একবার ঘুরে আসার জন্যে কুবের মাঠে নেমে পড়ল। শীতের শেষ দিককার মাঠ। হলুদ ঘাসের মধ্যে পাম্পসু পায়ের চাপে ডুবে যাচ্ছে। এই মাঠ, মাঠের শেষ দিককার গাব গাছের মাথা-চাড়া-দিয়ে-ওঠা ভঙ্গী, সরল রেখার ধারায় একটি খাল—এসবের মাঝখানে কুবের যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে তাজা শরীরে হাঁটতে শুরু করেছে। এখানে তার হাঁটাচলা আটকাবার কেউ নেই। কেউ বলবে না, আর এগিও না—বাস এই পর্যন্ত। পাম্পসুর ওপর

শুকনো ধুলোর গুঁড়ো ঘিয়ে রঙের পাউডার হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এক ঝলক রক্ত উঠে এল বুকে। কুবের ঝোঁক সামলে থমকে দাঁড়ালো। ঘাসের মধ্যে অবলীলায় একটা সাপ একেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে—একটু মাথা তুলল, তারপর যেমন যাচ্ছিল চলে গেল।

কুবের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, সাপটা [illegible]গাছের গোড়ায় একটা গর্তে একটু একটু করে ঢুকে গেল। শেষে লেজটুকুও ভেতরে নিয়ে গেল।

ধাক্কা খেয়ে চমক ভাঙল কুবেরের।

'সেই থেকে আপনাকে ডাকছি। কোন সাড়া নেই। কি ব্যাপার?'

লোকটাকে কোনদিন দেখেনি কুবের। ডোবড়ানো মুখে খুব বুঝসমঝ করে কথা বলার ভাব। তখনও কুবের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, সাপটা একেবেঁকে কুঁচকে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা এই হাতের মুঠোর মত। ঘাড় ফিরিয়ে কুবেরকে দেখছিল—গলায় বোধহয় খড়মের ছাপ। গায়ে চর্বি হয়েছে বেশ—সাপটা অনেকদিনের পুরনো।

'সাপ মানুষকে দেখে?'

'তা দেখে বৈকি। এই দিনমানে আবার সাপ দেখলেন কোথায়। এখন তো ওনাদের বেরোবার সময় নয়।' একটু থেমে বলল, নয়ানের আমি জ্ঞাতি কাকা। আপনাকে আমার কথা বলেনি নয়ান? আপনি তো সালকের কুবের সাধুখাঁ। তাই না?'

মনে করতে পারল না কুবের। আন্দাজে মাথা নাড়ল।

'শুনলাম সর্দারদের জায়গাটুকু কিনবেন। বড় বেগ দিচ্ছে ওরা। তাই যেচেই এগিয়ে এলাম।'

এবার ভাল করে লোকটাকে দেখল কুবের। শীত চলে গেলেও ঠান্ডা যায়নি। খয়েরি রঙের র‍্যাপার একখানা গায়ে। বগলে টিনের একটা নল। ভেতরে কি আছে জানে কুবের। মৌজা ম্যাপ। দাগওয়ারি জায়গার চেহারা, রাস্তা, খানা, খাল-খন্দের নিশানা সবই আঁকা আছে। সারা পৃথিবীটা কালি করে খাতায় হিসেবপত্তর তোলা সারা।

'আপনি ভদ্রেশ্বরের নাম শোনেননি? আমি সেই ভদ্রেশ্বর।'

খুব শুনেছে কুবের। এখানকার জমি-জায়গার জট ছাড়ানোর জন্যে ভদ্রেশ্বরের কাছে প্রায় সবাই যায়। নয়ানদের কর্তা-বাবারা ছিলেন তিন ভাই। সেই তিন বুড়োর সংসার ডাল পালায় এখন কদম-পুরের আধখানা জুড়ে আছে। তাদেরই কারও ছেলে ভদ্রেশ্বর।

'এখন তো সাপ বেরোয় না। সে সেই মাঝরাতে। তখন আহারে বেরোতে হয় ওনাদের।'

তারপর ভদ্রেশ্বর বলল, সাপ যা-কিছু

অবলীলায় একটা সাপ এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল

ওই বাঁশবাগানের ওখানে আছে। এদিককার সব সাপ ইটের লরির আওয়াজে পালিয়ে গেছে।

তা বটে। কুবেরের কেনা জায়গার এখানে ওখানে বাড়ি উঠতে শুরু করেছে।

'এ তল্লাটে আগে মানুষ আসত না। বাংলা তিরিশ সন থেকে জলে ডুবে ছিল। সবাই বলত ভাসার লাট। আর কি মাছ! সে খেয়েছি বটে—'

এসব কথা অনেকবার শোনা কুবেরের। রায়মশাই বলেছিলেন, এখানে আগে সমুদ্র ছিল। পুকুর কাটতে গিয়ে কুবেরের ভায়রা ভাই বলাই মহাপাত্র পেল্লাই এক গাছের গুঁড়ি পেয়েছে। তিনটে লোকেও বেড় পায় না তার। দশ ফুট নীচে মাটি কি কালো। হাত দিলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। আগুনে জ্বলে। আগে হয়ত জঙ্গল ছিল। কিংবা নদীর খাঁড়ি। গেঁয়োর জঙ্গল মাথা তুলে দাঁড়াতেই কোনদিন বোধহয় পাড় ধসানো বানে সব ভেঙে চুরে মাটি চাপা পড়েছিল।

বিকেলবেলা এসব ভাবলে মন বড় খারাপ হয়। ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে খালপাড় ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠল।

সর্দারদের জায়গার ইতিহাস সব কণ্ঠস্থ ভদ্রেশ্বরের। সর্দারদের বড় বুড়ো কোটিরাম নস্করের চাকর ছিল। কোটিরাম বুড়োকালে কাশীবাসী হওয়ার আগে ষোলটা টাকা ধার করেছিল চাকরের কাছে। তার বদলে জায়গাটুকু লিখিয়ে নিয়েছিল সর্দারদের বড় বুড়ো। কে জানত সে-জায়গার দর আজ এমন হবে। তা হোক—তাতে কুবেরের আপত্তি নেই। জায়গার দর বলে কিছু আবার আছে নাকি। এ হল এক খেয়াল। কিংবা ঝোঁক! ওই জায়গাটা আমার চাই-ই—নাহলে সাইজে আসছে না। এইসব ভেবেই তো লোকে জায়গা কেনে। নাহলে কুবেরের কাছ থেকে লোকে এত জায়গা কিনছে কেন?

জানা গেল, সর্দারদের বড় ভাই মেয়ের বিয়ে দেবে। টাকা দরকার। তার অংশটা কিনে অবিভক্ত সম্পত্তির ভাগীদার হয়ে এখন চুপচাপ বসে থাকতে হবে। তাহলে বাকি শরিকরা অন্য জায়গায় কোবালার কথা

পাড়তে পারবে না। তখন মানে মানে করে সবটুকু কুবেরকেই দিতে হবে।

কত জায়গা যে কুবেরের দরকার! শুরু হয়েছিল সামান্য জায়গা নিয়ে। এখন কুবের কয়েক বিঘার মালিক। এই অবস্থায় আসতে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অনেক ঝুঁকি মাথায় নিতে হয়েছে।

রাতে বিছানায় বলু বলে, তুমি যে বেশি দামে জমি দিচ্ছ শেষে কোন কথা হবে না তো?

কুবেরও যে এসব একদম জানেনি—তা নয়। নিজেকে বুঝিয়েছে, এর নাম ব্যবসা! জমি তো লোকে কম দামে কিনে বেশি দামে ছাড়ে। সবাই তাই করে। এতে আর দোষ কি।

এমন সব যুক্তি নিজের মনের মধ্যে অনেকবার ভেজেও কেমন দুর্বল লাগে কুবেরের মাঝে মাঝে। ব্যাপারটার নাম ব্যবসা দিয়ে, সে তাই চাঙ্গা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আর তাছাড়া, জায়গাটার উন্নতির জন্যে সে-ও তো কম করছে না।

এক এক সময় মনে হয়—উনিশ শো দশ কিংবা তারও আগে হরগঙ্গাপ্রোর সময় জঙ্গালে কত সুবিধে ছিল। অল্প টাকায়

দনান্দন মৌজার পর মৌজা কিনে ফেলত কুবের। তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে বাজার দরে ছাড়ত। আজ অবশ্য সে বুড়ো হয়ে যেত—কিন্তু কত নিশ্চিন্ত হতে পারত। তখন পৃথিবীতে এত লোকও ছিল না।

আবার মনে হয়, এই পৃথিবীতে এক-একদল লোক এসে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বাগান, ফুলগাছ সব বানায়। কত লোক পলেস্তারার সময় পঙ্খের কাজ করায়, ছাদের আলসেতে সিমেন্টের পরি বসায়, পুকুরঘাটে বেঞ্চ দেয়—অথচ শেষে সব একদিন রাবিশ হয়ে ঠিকেদারের লরিতে ওঠে, জঙ্গলে ঢাকা পড়ে—নতুন লোক জায়গা বদলে আর এক জায়গায় গিয়ে বসতি বানায়।

'এই খাল দেখছেন—এখানে আগে কত দূর দেশের নৌকো আসত।'

'অনেক দূরের?'

'আবাদের ধানের নৌকো এই খাল দিয়ে চেতলার হাটে গিয়ে আঢ্যিদের ঘাটে নোঙর ফেলত। বেশি কি বলব—শ্রীহট্টের কমলালেবুর চালান এই পথ দিয়ে নৌকোয় কলকাতা যেত। নদী মজে গিয়েই সব গেল।'

কুবেরের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এ আমি কোথায় আছি এখন। সালকের বাড়িতে মা চোখে চশমা দিয়ে লাল বারান্দায় মাদুর পেতে বই পড়ে এসময়। বাবার সুঁড়তোলা গেঞ্জি পরা হয়ে গেছে। এবার গরম শার্ট চাপিয়ে চৌরাস্তা অব্দি হেঁটে আসবে। বুলুর তিনমাস। খোকন হয়েছিল বছর চারেক আগে। ফার্নেসে বিকেলের সিফট শুরু হয়ে গেছে। অ্যাপ্রেণ্টিসরা কেউ লম্বা লোহার রড দিয়ে গলন্ত ইস্পাত ঘেঁটে দেখছে। এ আমি কোথায় আছি। ধানকাটা মাঠের হলুদ রঙ পড়ন্ত রোদের আলো বেয়ে অনেকখানি উঠে এসেছে। তার মাঝখানে এক একটা তালগাছ সিধে দাঁড়ানো। দূরে দূরে এক এক পরতে এক একটা আবাদ। প্রথমে কেষ্টবাবুর আবাদ, তারপর নবীনবাবুর—শেষে তার মৈত্রী আবাদ, ডাক্তারবাবুর আবাদ।

'নদীও গেল। আমরাও ম'লাম—'

জ্ঞানেশ্বর এমনভাবে বলছে, চোখের জায়গায় আয়না বসানো থাকলে তিরিশ বছর আগের ঘোলানো ভরা নদীর সুদূর ছায়া তাতে পড়ত।

'রেলের পুল দেখছেন ওই যে—এখন তো ওর নীচে নদীর বুকে চাষ হচ্ছে। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে রেলে গেছি ওখান দিয়ে—গাড়ির বেগ কমে যেত, লোকে পয়সা ফেলত। তেমন তেমন বর্ষায় সাহেবরা পাথর ফেলত—ঢেউয়ের কোমর ভেঙে দিতে।'

'নদী মরে যাওয়ার পর সেসব পাথর পাওয়া গেছে?'

'অঢেল! মোটা মোটা কাছি বেঁধে মোষ জুতে তবে সেসব পাথর সরিয়েছে চাষীরা। আরও কত পড়ে আছে ধারে ধারে।'

খালের ওপারেই ননী বোসের পুরনো ইটখোলার ধ্যাড়ধেড়ে কঙ্কালটা পড়ে আছে। মাটি মাখানোর দু' দুটো পগ্‌মিল জং পড়ে কোমর সমান উঁচু ঘাসের মধ্যে কোনরকমে জেগে আছে। ইট করার পর বাতিল বিরাট বিরাট গর্ত এখন জলে ভর্তি। ননীর সেই মহা ফোক্কড় ছেলেটা বিকাশ এখন তাতে মাছ চাষ করে। লগনসার জন্যে বড় বড় মাছ তুলে বাড়ির গায়ের থানায় ছেড়ে দিচ্ছে। বিয়ের মরসুমে ঝাড়বে। মাটি এতোও দেয়!

না-দিলে কুবের আজ কারখানার নাগা হওয়ার তোয়াক্কা না রেখে কদমপুরে আকাশের নীচে ফাঁকা মাঠে এসে ঘুরে বেড়াতো না। কোল কোম্পানির হীরেন নেবে আট কাঠা জায়গা। দু' হাজার টাকা আগাম দিয়েছে। দলিলপত্র তৈরি হলে রেজিস্ট্রির দিন বাকিটা দেবে। গত ক'দিনে আরও যেন কে কে টাকা দিয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর ডাইরি খুলে নামের পাশে টাকার অঙ্ক লিখে তারিখ দিতে হবে। নয়ত কত টাকার হিসেব যে গুলিয়ে যাবে শেষে। নানান দিকে খরচও হচ্ছে টাকা। সরকারী অনুমতি জোগাড় হয়েছে। এখন খালপাড় ঘসে মেজে অ্যাভিনুার চেহারা পাবে। কি নাম দেওয়া যায় রাস্তার? কুবের সাধুখাঁ অ্যাভিনু? না! কুবের রোড। বেঁচে থাকতে সে বড় বিচ্ছিরি হবে। (ক্রমশ)

বিশ্ব বিজ্ঞান

চন্দ্রলোকে যাত্রার পাল্লা ছুটে আমেরিকার নতুন পদক্ষেপ

মনীষীরা বলে গিয়েছেন যে বিপ্লব হচ্ছে ইতিহাসের রথচক্রকে নতুন যুগের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেবার রেল ইঞ্জিন (লোকোমোটিভ্)। বিপ্লব শব্দটি আমি শুধু রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করছি না। মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক অগ্রগতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবস্থা পরিপক্ক হলে বৈপ্লবিক বা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। বিজ্ঞান বলুন, যন্ত্রকৌশল বলুন, সর্বক্ষেত্রেই এ যুগে প্রতি ২০।২৫ বছরের মধ্যে এমন সব আবিষ্কার হচ্ছে যেগুলি অচল করে দিচ্ছে পুরাতন ধ্যানধারণা, অনুমিতি। সেটাই তো এক রকমের বিপ্লব। ধরুন স্পুৎনিক, সেলে-নোলজি, রেডিও-জীবশাস্ত্র—এইসব শব্দ আগেকার দিনের অভিধানে পাওয়া যাবে না। সেলেনোলজি হচ্ছে চন্দ্রতত্ত্ব, সেলেনোগ্রাফি হচ্ছে চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত বিদ্যা। যেমন ভূমণ্ডল সম্পর্কে আমরা জিওগ্রাফি বা ভূগোল শব্দ ব্যবহার করি। জিওগ্রাফির বাংলা যদি ভূগোল হয়, তাহলে সেলেনোগ্রাফিই বা চন্দ্রগোল হবে না কেন? যাই হোক, যা বলছিলাম। মানুষ আজ দৃঢ় সংকল্প করেছে যে সে গ্রহ গ্রহান্তরে যাবেই যাবে এবং সেই পথে তার প্রথম স্টেশন হবে চাঁদ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে দুনিয়ার দুটি সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে। এটা ঠিক যে রাশিয়াই সবচেয়ে প্রথমে স্পুৎনিক উৎক্ষেপ করে চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহে যাবার রাস্তা খুলে দেয়।

বিজ্ঞান কোন জাতীয় সীমানার ধার ধারে না। সুতরাং তার রাজ্যে যেতে 'পাস্‌পোর্ট', ভিসা,' মুদ্রা বিনিময় প্রভৃতি সমস্যার ঝামেলা নেই, কাস্টমের (শুল্ক বিভাগ) বাধাও নেই।

আমরা মানুষের চন্দ্রলোকে যাত্রার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। আসলে গোড়ায় আমেরিকার যে 'হ্যাণ্ডি-ক্যাপ্' ছিল তা সে কাটিয়ে উঠে রাশিয়াকে প্রায় ধরে ফেলেছে। একবার এ একটা রেকর্ড করে। তারপরেই ও করে আর একটি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা এখন প্রায় সমানে সমানে বলা চলে। জেমিনি-৫ মহাকাশযান বিশ্ব রেকর্ড করার পরেই অ্যাপোলো-৭-এর এই বিরাট সাফল্য। এত দীর্ঘকাল কোন মহাকাশযাত্রী মহাশূন্য পরিক্রমা এর আগে আর করেননি। তারপরেই এল বেরেগো-ভয়ের সোয়ুজ-৩ মহাকাশযানের, সোয়ুজ-২ মহাকাশযানের কাছাকাছি আসা (অনেকটা আগেনা রকেটের সঙ্গে মার্কিন মহাকাশের সাক্ষাতের মত) এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন। সোয়ুজ-৩-এর উপযোগিতা পরীক্ষা করাই বোধ হয় এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল। পরে আরো খবর পাওয়া গেল যে সোয়ুজ-৩ মহাকাশযান নাকি ১২।১৩জন যাত্রী বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এটা নিশ্চয়ই নতুন রেকর্ড কারণ এর আগে রাশিয়া বা আমে-রিকা কেউই তিনজনের বেশি যাত্রীবহনক্ষম মহাব্যোমযান মহাশূন্যে পাঠায়নি। চাঁদে যাবার পক্ষে এই ধরনের বিশাল মহাকাশযান এবং মহাশূন্যে দুটি যানের দেখা সাক্ষাৎ, সংযোজন-বিয়োজন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা না বললেও চলে কারণ এমনও তো হতে পারে যে পথে কোন ভূপ্রদক্ষিণকারী 'স্টেশনে' নেমে সেটি থেকে অন্য রকেটের ঘাতে অন্য একটি মহাকাশযান সেই যাত্রীদের নিয়ে চাঁদে যাবে যার সঙ্গে লাগানো থাকবে আর একটি ক্ষুদ্রতর মহাকাশযান যেটি চন্দ্র-কেন্দ্রিক কক্ষপথে পৌঁছবার পর রকেট থেকে বিয়োজিত হয়ে মানুষ নিয়ে চাঁদে নামবে এবং তারপর আবার সেই যান চালিয়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী মহাকাশযানের সঙ্গে গিয়ে সংযোজিত হবে এবং দুটিতে মিলে প্রথমে এসে থামবে মহাশূন্য স্টেশনে এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবে। অবশ্য সোজাসুজিও চাঁদে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব আগেকার হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি বলে জানা গিয়েছে। ১৯৬২ সালেও বৈজ্ঞানিক-দের হিসাবে পৃথিবী ও চাঁদের ব্যবধান ছিল প্রায় ৪ লক্ষ কিলোমিটার। আজ দেখা যাচ্ছে যে আসলে ওই ব্যবধান অনেক কম। ক্যালিফর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেক্‌নো-

আমেরিকার প্রথম রকেট উদ্ভাবক ডঃ রবার্ট গডার্ড তাঁর প্রথম রকেট পরীক্ষা করছেন

জেমিনী-৪ থেকে সুয়েজ খাল

লজির জেট-প্রচালনা গবেষণাগারের দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ জে ডেরাল মুল্, হোল্যাণ্ড এবং উইলিয়াম সিয়োগ্রেন জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাকাশযাত্রালব্ধ চাঁদের ভর মান সম্পর্কিত তথ্যগুলির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব সব সময় ৪ লক্ষ কিলোমিটার থাকে না কারণ চাঁদের কক্ষপথ কিছুটা ডিম্বাকার বলে ওই দূরত্ব মাসের মধ্যে বাড়ে ও কমে। যখন সবচেয়ে কমে তখন দাঁড়ায় ৩৬০০০ কিলোমিটার। ওই বিজ্ঞানীদের মতে তাঁদের এই হিসাবে বড়জোর ৫০ ফুট এদিক ওদিক হতে পারে, তার বেশি নয়। তারপর ধরুন ১৯৬০ সালে চাঁদকে মৃত জগৎ বলে মনে করা হোত। কিন্তু ১৯৬২ সালে রুশ বিজ্ঞানাচার্য ফজিরেফ লেনিনগ্রাদের বিশ্ব-বিখ্যাত মানমন্দিরের প্রকাণ্ড দূরবীনের সাহায্যে দেখতে পান যে অ্যাল্‌ফন্সাস গহ্বর থেকে বাষ্প উদ্গীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং তারপর থেকে চাঁদকে আর মৃত জগৎ বলা যাচ্ছে না। এই রকম আগেকার বহু ধারণা আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন না যে চাঁদের গর্ভে কোন জৈববস্তু থাকতে পারেই না। এইসব সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সালা মানুষ চাঁদে না যাওয়া পর্যন্ত হবে না এবং স্বয়ং-

পৃথিবী থেকে (ক্যালিফোর্নিয়ার লিক্ গ্রহদর্শনাগার) গৃহীত চাঁদের এই ছবির মাঝখানে রয়েছে কোপার্নিকাস আগ্নেয় গহ্বর যার ব্যাস ৬০ কিলোমিটার। কিছু নিচে যে জোড়া গহ্বরটি দেখা যাচ্ছে তার নাম ফাউথ।... (স্প্যান পত্রিকার সৌজন্যে)
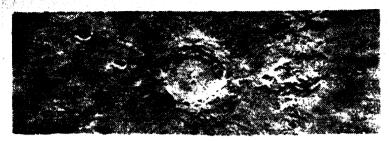
ক্রিয় যন্ত্র বা রবটের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং চাঁদে যেতে হবে শুধু চাঁদের চরিত্র পরীক্ষার জন্য নয়, পৃথিবীর আদিমকালের চেহারা ও চরিত্র কি রকম ছিল সেটাও জানার জন্য। চাঁদে আবহমণ্ডল নেই, ঝড়-বৃষ্টি নেই। আছে একমাত্র উল্কাপাত। সেই জন্য চাঁদের বাইরের চেহারা গোড়ায় যা ছিল, উল্কাপাতজনিত গহ্বরগুলি বাদ দিলে, এখনো তাই আছে, কোন অদল বদল হয়নি। সেইজন্য পৃথিবীর এই উপগ্রহটির অপরিবর্তিত চেহারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পৃথিবীরও আদিম চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে কারণ সৌর রাজ্যের এই সব দুনিয়া একই সময়ে গঠিত হয়েছিল। এই দিক থেকে চন্দ্রলোকে যাত্রার সার্থকতা আছে বইকি।

রাশিয়ার চন্দ্রলোকে যাত্রার কার্যসূচীর কোন উল্লেখ করা হয়নি। সেটি গোপনই আছে। কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে তা নয়। আমেরিকার চাঁদে যাবার ধাপগুলি আমরা জানি কারণ আমেরিকা নিজেই সেগুলি আমাদের জানিয়েছে। সেই ধাপগুলি অনুশীলনে বোঝা যাবে যে চন্দ্রবিজয় মোটামুটি-ভাবে এভারেস্ট বিজয়ের সমতুল্য। দুটিই দুঃসাধ্য কাজ যাতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। অবশ্য চন্দ্রলোকের যাত্রীর সামনে নানা নতুন ধরনের অলৌকিক বিপদ দেখা দিতে পারে যেগুলি এভারেস্টের ক্ষেত্রে ঘটবার সম্ভবনা নেই যেমন মহাজাগতিক রশ্মির বিপদ। অতিদ্রুত বেগে ধাবমান উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে যানের সংঘর্ষের বিপদ ইত্যাদি। তাছাড়া চাঁদে আরো কত কি বিপদ ওৎ পেতে আছে তা কে জানে? তবু দুর্লংঘ্যকে লংঘন করার, দুর্জয়কে জয় করার সাহস, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা মানুষের চিরকালের। কোন অজ্ঞাত বিপদই মানুষের চাঁদে যাওয়া ঠেকাতে পারবে না কারণ মানুষ কোন বিপদের পরোয়া করে না যখন সে অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়।

আজ জ্যোতির্বিজ্ঞান উন্নতির যে শিখরে আরোহন করেছে তার তুলনায় গ্যালিলিওর নিজের হাতে গড়া দূরবীনটি নেহাতই তুচ্ছ। সেটি ৩০ শক্তির একটি দূরবীন মাত্র অর্থাৎ তাতে দূরের জিনিসগুলি ৩০ গুণ কাছে দেখায় এবং মনে হয় "সাদা চোখে সেগুলিকে এত বড় দেখায় তার হাজার হাজার গুণ বড়।" কিন্তু গ্যালিলিও সেই দূরবীন দিয়েই চাঁদে সর্বপ্রথম কতকগুলি কলংক (স্পট্) দেখতে পান যা তাঁর আগে কেউ দেখতে পান নি। গ্যালিলিও লিখেছেন : "বারম্বার চাঁদ পর্যবেক্ষণের পর আমার এই ধারণা হয়েছে যে চাঁদের জমি পুরোপুরি সমতল বা মসৃণ নয় এবং সর্বত্র একই চরিত্রের নয় এবং চাঁদ যেন আদৌ গোলাকার নয়। চাঁদের জমি অসমান বন্ধুর, তার মধ্যে বহু গর্ত আছে, আছে পাহাড়ের মত সব উঁচু জায়গা, ঠিক যেমন রয়েছে আমাদের পৃথিবীতে।..."

বিজ্ঞান-সেনানী গ্যালিলিওকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করে হত্যা করে সেকালের রক্ষণশীল ধর্মান্ধেরা সে আজ বহু যুগ হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর কীর্তি ও চন্দ্র সম্পর্কে বক্তব্য চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাকবে কারণ তাঁর বক্তব্যগুলি পরীক্ষিত সত্য। আজ যাঁরা

চাঁদ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, সেখানে উড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন গ্যালিলিওর অনুগামী ও উত্তর সাধক। তাঁরা এমন ক্যামেরা হাতে পেয়েছেন যার টেলিফোটো লেন্সে চাঁদ এত বড় দেখায় যেন সে মাত্র ৫০০ মাইল উঁচুতে রয়েছে এবং প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত চন্দ্রে পদার্থগুলির আলোকচিত্রে চিহ্নিত হবে।

১৯৫৭ সালে প্রথম স্পুৎনিকের আবির্ভাব চন্দ্র বিজয়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার সূচনা দেয়। চাঁদকে ভালবাসে না এমন কেউ দুনিয়ায় আছে কি? সরকারী কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে, প্রেমিক-প্রেমিকা কবি ও বিজ্ঞানী পর্যন্ত সকলের কাছেই চাঁদ চিত্তাকর্ষক ও কৌতুহলোদ্দীপক। চাঁদের রূপালী রাজ্যে কে না যেতে চায়? কিন্তু মানুষের চন্দ্র বিজয়ের অভিযানে নামার আগে বিভিন্ন স্কাউট পাঠিয়ে জানা দরকার যে যাবার রাস্তাটা কি রকম, সেখানে যাত্রীরা কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন এবং চাঁদের পরিবেশের চরিত্র কি। চাঁদ জয় করা তো যুদ্ধের সামিল। তাই আক্রমণের আগে স্কাউট, 'স্যাপার', 'মাইনার' ইত্যাদি পাঠানো একটা আবশ্যক কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনের জন্যই আমেরিকা ও রাশিয়া থেকে অনেক শো স্পুটনিকের অনেক বৃহত্তর সংস্করণ। কজমস্, জণ্ড, লুনিক রেঞ্জার, সার্ভেয়ার, অর্বিটার প্রভৃতি স্বয়ংচালিত স্কাউট মহাশূন্যে পাঠানো হয়, চাঁদের চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ানো হয় ছবি তোলবার এবং সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের
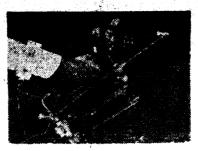
মহাশূন্যে ফটো তোলার ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে মহাশূন্যে ভাসমান হোয়াইটের ছবি তুলছেন ম্যাকডিভিট

জন্য। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে রাশিয়ার লুনিক প্রায় ২৫ হাজার মাইল দূরে থেকে চাঁদের চিত্রমালা তুলে পাঠায় দুই পিঠেরই। তারপর ১৯৬৪ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ওই ব্যাপারে আর নতুন কিছু ঘটেনি। তখন গ্যালিলিওর সাফল্যের পর প্রায় সাড়ে তিন শো বছর কেটে গিয়েছে।

রেঞ্জার—আমেরিকার চন্দ্র অভিযানের প্রথম সূচনা হয় ১৯৫৮ সালের ১১ই আগস্ট। সেদিন মহাশূন্যে যে প্রথম রেঞ্জার জাতীয় মহাকাশযান উড়ে যায়, মাত্র ৭৭ সেকেন্ড পরে তার রকেটটি ফেটে যায় এবং রেঞ্জারের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী ৬ বছরে আমেরিকা চন্দ্র পরীক্ষার জন্য আরো ১১টি স্বয়ংচালিত যান মহাশূন্যে উৎক্ষেপ করে। সবগুলিই যে সাফল্যে উত্তীর্ণ হয় তা নয় তবে কতকগুলি থেকে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা গিয়েছিল। যেগুলি ফটো তোলার জন্য পাঠানো হয় সেগুলিও কর্তব্য পালন করতে পারেনি। তবে রেঞ্জার-৭ মহাকাশযানের কার্যসূচী পালনে সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এটিই ছিল আমেরিকার পঞ্চম চন্দ্রগামী মহাকাশযান। রেঞ্জারগুলির চেহারা অনেকটা ডানা মোড়া পতঙ্গের মত। মহাশূন্যে গিয়ে সেই ১৫ ফুটের মত ডানা জোড়া মেলে যায় এবং তার ভিতরকার সৌর-কোষ প্যানেলগুলি উন্মীলিত হয়। অ্যান্টিনা (শুঁড়) সমেত রেঞ্জারের মোট দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ৩ ইঞ্চি, ফটো তোলার সাজ-সরঞ্জাম সমেত (৩৮১·৫ পাউন্ড) গোটা যানটির ওজন ৮০৬·৪৯ পাউন্ড। রেঞ্জারগুলিকে মহাশূন্যে নিয়ে যায় অ্যাট্‌লাস্-আগেনা দুই পর্যায়ের রকেট। রেঞ্জার ও রকেট মিলে দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১০০ ফুট, ওজন ৩ লক্ষ পাউন্ড। সেগুলিকে বছরের যে কোন সময় চাঁদের দিকে পাঠানো যায় না। যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠানো যায় তাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন "উৎক্ষেপণের জানালা।" রেঞ্জারের কর্তব্য যদি হয় চাঁদের দৃশ্যে দিকের ছবি তোলা তাহলে ছবি তোলার সময় চাঁদে সূর্যের আলো পড়া চাই। তার মানে অমাবস্যার সময় পাঠালে রেঞ্জার ছবি তুলতে পারবে না। পারবে না মানে পৃথিবীর দিকে চাঁদের যে পিঠ সেটির ছবি তুলতে পারবে না। কিন্তু কোন মহাকাশযান যদি চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে তা হলে অমাবস্যার দিনে চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তুলতে পারবে। কিন্তু তাই বলে এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে পূর্ণিমার দিন হচ্ছে উপযুক্ত সময় কারণ তখন চাঁদের পিঠের ছায়া ঢাকা জায়গাগুলি ছবিতে ঠিক মত উঠবে না এবং সব জায়গা সমানভাবে আলোকিত হয় বলে ছবিগুলিতে চাঁদের উঁচু নিচু জায়গাগুলির স্পষ্টছাপ পড়বে না বলে ছবিগুলি যাকে বলে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। তাই বিজ্ঞানীদের মতে অষ্টমী নাগাদ সূর্যের আলোয় যখন চাঁদের পূব দিকের ও পশ্চিম দিকের অর্ধাংশ আলোকিত হয় তখনই ছবি তোলার মহেন্দ্রক্ষণ। মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে চাঁদের পশ্চিম ভাগই মানুষের অবতরণের পক্ষে সুবিধাজনক। সেইদিক থেকে তাঁরা চান্দ্র মাসের তৃতীয় চতুর্থাংশের ছবি তোলার উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন কারণ ওই সময়ে চাঁদের পশ্চিমার্ধ আলোকিত থাকে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি মাসে চন্দ্রলোকে যাত্রার "জানালা" খোলা থাকে সপ্তাহ খানেকের মত। তাও কিন্তু ওই সাত দিনের যে কোন সময়ে যাওয়ার সুবিধা হবে না। পৃথিবীর আহ্নিক গতি বিচার করে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ওই সাতদিনের যে কোন দিনে নির্দিষ্ট ২।৩ ঘণ্টার বেশি ওই "জানালা"

সার্ভেয়ার ১-এর তোলা এই চাঁদের ফটোর যে পাথরটি দেখা যাচ্ছে সেটি আধ ফুট উঁচু

খোলা থাকে না বলে সেই ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই চন্দ্রমুখীযান উৎক্ষেপ করা চাই। তারপর আরো একটি বাধা হচ্ছে আমেরিকার আবিষ্কৃত "ভ্যান্ অ্যালেন্ বিকিরণ বলয়" যা ভূমণ্ডলকে মেখলার মত ঘিরে রেখেছে। সেটি যান ও যাত্রীর পক্ষে এক বিপজ্জনক অন্তরায়। এই বিষয়ে আমি গাগারিনের শিক্ষাগুরু জেনারেল কামানিনের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম আমাদের এই শহরে, শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনে যাবার পথে জাহাজে বসে। তিনি বললেন : "হ্যাঁ ভ্যান্ অ্যালেন্ বলয় এক বিপজ্জনক অন্তরায় সন্দেহ নেই। কিন্তু আইনের মধ্যে যেমন ফাঁক (লুপ হোল) থাকে তেমনি ফাঁক ওই বলয়ের মধ্যে আছে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মাথার উপর ওই বলয়ের ঘনত্ব এত সামান্য যে, সেই দুটিকে বলয়ের মধ্যেকার দুটি জানালা বলা যায়। মহাকাশযাত্রীরা চাঁদ বা অন্য গ্রহে যাবার সময় সেই দুটি খোলা জানালা দিয়ে বার হয়ে যেতে পারবেন।"
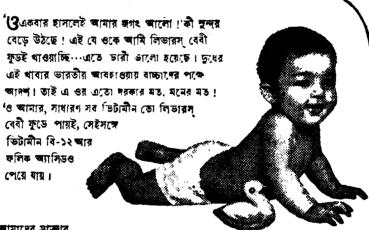
আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

(ছত্রিশ)
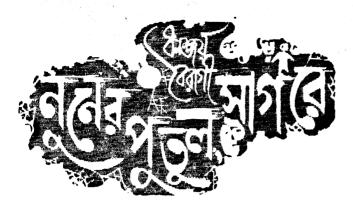
মনয়া আর মীনার প্রায় সমবয়সী অন্য মেয়েটি কবিতা। এরও সমাজ আলাদা, অবস্থা আলাদা, জাত আলাদা।

অনেকদিন বাদে অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে আবার কবিতার দেখা হল অশোক জানার প্রেসে। মেয়েটা এক কোণে একটা বিজ্ঞাপনের কাপ কম্পোজ করছিল, অনাদিপ্রসাদকে দেখে শুকনো হাসল, আসুন, বসুন, বাবু বাইরে গেছেন।

অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, অনেক দিন তোমায় দেখিনি কবিতা।

—ক'দিন ছুটি নিয়েছিলাম।

—লিখছ?

—না।

—কেন?

—ও আমাদের হবে না। যাদের পেটের ভাবনা নেই তারাই লিখতে পারে। আগে তবু দু' একটা গান-টান বাঁধতাম, আজকাল তাও পারি না, এখন শুধু অন্যের লেখা কম্পোজ করি।

কথা বলার কিছু ছিল না, তবু অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, ছুটি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

কবিতা হাসল, নবদ্বীপে। ভেবেছিলাম যদি বোষ্টুমী হওয়া যায়, তাও দেখলাম বেশ কঠিন, তাই ফিরে এসেছি। আজকাল কোথাও গিয়ে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। আপনি ওখানে গেলে কিন্তু অনেক কিছু লিখতে পারতেন।

নিজের মনেই কবিতা বক বক করে যায়, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কেন এরকম বলুন তো? যারা কিছু পেলো না, সারা জীবনই তাদের ফাঁকি পড়তে হবে। আমাদের কিছু আশা করাও অন্যায়, কোন রকম ইচ্ছে থাকা পাপ।

কবিতার কথাবার্তা শুনে অনাদিপ্রসাদ বুঝতে পারলেন মেয়েটা আগের চেয়ে অনেক শক্ত হয়েছে, জীবনের কড়া ইস্কুল তাকে শিখিয়েছে সেণ্টিমেণ্ট ছেঁটে ফেলে দিতে। বুঝিয়েছে স্বপ্ন দেখার কোন দাম নেই। আগে আগে অনাদিপ্রসাদকে দেখলে কবিতা এসে ভক্তি ভরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত, কথা বলত অনেক সমীহ করে, কিন্তু আজ সে আলাপ করছে সমান তালে।

—এখানকার কাজে তুমি আনন্দ পাও না?

—হয়ত পেতাম যদি পেট ভরতি থাকত, অথচ উপায় নেই। কোন না কোন কাজ তো করতেই হবে। এমন একটা যাঁতাকলের মধ্যে আমরা পড়েছি যার থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।

অনাদিপ্রসাদ মনে মনে কবিতার সঙ্গে তুলনা করতে লাগলেন মীনার, মেয়েটার সমস্যা একেবারে অন্যরকম। তেল, নুন, লকড়ির চিন্তা তাকে করতে হয়নি, তার ওপর পেল একটা পুরুষ মানুষের ভালবাসা, তবু নিজেকে সামলাতে পারল না, জীবন-যুদ্ধে কোথায় তলিয়ে গেল। ওদিকে মনুয়া মুখে রুপোর চামচে নিয়ে যে জন্মেছে সমাজের বিরুদ্ধে তারও কি প্রচণ্ড বিক্ষোভ। বাপ-মাকে ছেড়ে অন্য একজনের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠে পড়েছে, কোনরকম স্তুতি-নিন্দাকে সে ভয় করে না। নিজের স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে সে বেঁচে থাকতে চায়, জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়।

কবিতা বলল, আমার বন্ধু মিতার কথা আপনার মনে আছে? আমরা একসঙ্গে একই ট্রেনে রানাঘাট থেকে আসতাম, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত হলধরবাবুর রক্ষিতা হয়েছিল, সে গল্প আপনাকে বলেছি। নবদ্বীপ থেকে ফিরে মেয়েটার খবর নিতে গিয়েছিলাম। হলধরবাবুর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, কিন্তু রাজাবাজারের ঘরটা সে ছাড়েনি, দখল করে বসে আছে। বুঝলাম অনেক বাবুরাই আসা যাওয়া করে। ভালই রোজগার, দিব্যি আছে।

—তার মানে?

—মিতা পুরোপুরি বেশ্যা হয়ে গেছে।

তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই, যে হতে পারে হোক না, তার রুচিতে না বাধলে আমার আপত্তি করার কি আছে। কিন্তু মেয়েটা কি সুখী হয়েছে? ঠিক বিশ্বাস হয় না।

অনাদিপ্রসাদ না বলে পারলেন না, আমি কিন্তু তোমার বয়সী আরও দুটি মেয়েকে জানি, তারাও সুখী নয়।

কবিতা শব্দ করে হাসল, এই বোধ হয় আমাদের সান্ত্বনা, কেউই আমরা সুখী নই। যাক গে, থাক, কি হবে ওসব ভেবে। পকেটে টাকা থাকে তো দিন, কষা মাংস আর রুটি কিনে আনি, খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

অনাদিপ্রসাদ পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে দিলেন।

—এ তো অনেক টাকা, অত খাবার কে খাবে! অবশ্য—

কবিতাকে থেমে যেতে দেখে অনাদি-প্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, কি হল?

—যদি আপনার আপত্তি না থাকে এই টাকায় নিরঞ্জনকেও খাইয়ে দিই। মানুষটা

প্রায়ই আমাকে খাওয়ায়, পয়সার অভাবে আমি তো খাওয়াতে পারি না।

অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণে নিরঞ্জনকে লক্ষ করলেন, লোকটা মেশিন চালাচ্ছে, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে দেখছে কবিতাকে, চোখে চিরকেলে পুরুষমানুষের দৃষ্টি। এইটুকুই হয়ত এদের দেওয়া নেওয়া, কাজের অবসরে পাশাপাশি বসা, গল্প করা, সমস্যাভরা জীবনে কিছুটা সহানুভূতি, এর পরিণতি কিছু আছে কিনা বলা শক্ত। দিনের পর দিন কবিতা অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে কম্পোজ করে যাবে, আর নিরঞ্জন মেশিন চালিয়ে সাদা কাগজের ওপর অক্ষর ফোটাবে। এই যে দুজনের প্রতি দুজনের আকর্ষণ তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই প্রেসে এদের আসতে হবে, পাশাপাশি বসে কাজ করতে হবে, কিন্তু তারপর!

একটা বিরাট হাতুড়ি অনাদিপ্রসাদের মাথার উপর যেন আঘাত করল, একটা নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসা, এরা মেশিন হয়ে যাবে না তো?

অনাদিপ্রসাদ চমক ভেঙে উঠলেন, বললেন, না, না, তোমরা খাবার আমিয়ে আনন্দ করে খাও, অলোককে বলো আমি এসেছিলাম।

—আপনি খেয়ে যাবেন না?

—আজ নয়, বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

অনাদিপ্রসাদ আর কথা না বাড়িয়ে প্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন, চোখের সামনে ভাসছে তিনটে মুখ—তিনটে মেয়ে—তিনটে জীবন।

অনাদিপ্রসাদ যখন বাড়িতে ফিরলেন তখন ওপরের ড্রইং রুমে সরব আলোচনা চলেছে। বক্তা প্রকাশক সুনীল রায়, শ্রোতা রমলা বউদি আর তার দুই ছেলে। অনাদি-প্রসাদ ইচ্ছে করে সে ঘরে ঢুকলেন না, বারান্দা পেরিয়ে চলে গেলেন অন্ধকার শোবার ঘরে, কিন্তু সেখান থেকেও ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সুনীল রায় যেন তৃতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উৎসাহী ক্যানভাসার। গলায় সেই একঘেয়ে সুর, খেয়ে দেখুন, চেখে দেখুন, এমন আজব গুলি আর পাবেন না। এগুলি যে দেখে তার চোখের ব্যথা আরাম পায়, এগুলি যে খায় সে লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারে, পেট এ'টে গেলে এগুলি দাস্ত পরিস্কার করিয়ে দেয়। বেশী পায়খানা হলে এ অব্যর্থ গুলি থামিয়ে দেবে। কলেরা বসন্ত মহামারী, এমন কি ক্যানসারেও এ গুলি আশ্চর্য ফল দেয়, খেতে না পারলে প্রলেপ করে গায়ে লাগিয়ে দিন, তাতেও আপত্তি থাকলে মাদুলির মধ্যে ভরে দেহে ধারণ করুন, কোন গ্রহ-উপগ্রহ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না, চোর বাড়িতে ঢুকতে ভয় পাবে, পাড়ার ছেলেরা চাঁদা চাইতে আসবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি, আরও কত গুণ, অথচ এক শিশির দাম মাত্র দেড় টাকা।

ট্রেনে আর কিছু করার না থাকলে অনেকেই এদের বকবকানি শোনে, কিছুটা কৌতুকও বোধ করে, কিন্তু রমলা, বড় খোকা, ছোট খোকা, এদেরও কি আর কোন কাজ নেই? কি করে ধৈর্য ধরে সুনীল রায়ের আত্মপ্রচার শুনছে। কত লেখককে সে দাঁড় করিয়েছে, মুহুর্মুহু যে তাদের বই-এর সংস্করণ শেষ হয়ে যাচ্ছে তারও কৃতিত্ব নাকি সুনীল রায়ের। বই-এর কভার, বিজ্ঞাপনের চমক, তাই দিয়ে বাজারে সে ভেল্কি খেলিয়ে দিয়েছে। যখন যাকে খুশি রাজহাঁস বানিয়ে সে নাকি সোনার ডিম পাড়াতে পারে।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই, অনাদিপ্রসাদও সোনার ডিম পাড়ুন, নতুন উপন্যাস লিখুন, আর তা না হলে অন্য লেখক সুনীল রায়কে তৈরি করতে হবে, ব্যবসা তো এভাবে ফেলে রাখলে চলবে না। শেষ পর্যন্ত তার অনুরোধ, বউদি আপনারা ভাল করে বোঝান, জোর করে ওঁকে দিয়ে লেখান। নয়ত নষ্ট হয়ে যাবে।

রমলা বউদির উত্তর, আমি তো বলি, শোনেন কই?

ছেলেদের গর্জন, না, না, আর এভাবে ছেড়ে দিলে চলবে না। কাকাবাবু ঠিক বলেছেন, বাবাকে দিয়ে লেখাতেই হবে।

সুনীল রায় খুশী হন, এই তো চাই, তোমরা একটু চেষ্টা করলে সব ঠিক হবে। একটা উপন্যাস লিখতে অনাদিপ্রসাদের ক'দিন লাগবে, এক সপ্তাহ, দশদিন, বড় জোর এক মাস, অনেকদিন লিখছেন না তাই হাতটা সড়গড় করতে একটু সময় লাগবে।

দুই ছেলেই প্রতিশ্রুতি দেয়, ঠিক আছে, আমরা এবার উঠে পড়ে লাগছি।

সুনীল রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে, তা হলে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি। এই চেকটা রেখে গেলাম, আগের বই-এর সংস্করণের দরুন অনাদিপ্রসাদের পাওনা হয়েছে।

এর পর অনাদিপ্রসাদ অনেকক্ষণ কিছু শুনতে পেলেন না। বোধ হয় সুনীল রায় চলে গেল, ছেলেরাও ভদ্রতার খাতিরে ওর সঙ্গে নীচে নামল, রমলা নিশ্চয় চেকটা যত্ন করে কোথাও রাখছে। অনাদিপ্রসাদ মন দিলেন মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামের দিকে। আঁকছেন বুদবুদ কাটছে, যে কাঁচের বাটিটার কেঁচো দেওয়া হয়েছিল শূন্যগর্ভ হওয়া সত্ত্বেও মাছগুলো তাকে ঠোকরাচ্ছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ অনাদিপ্রসাদ একলা থাকার সুযোগ পেলেন না। রমলা বউদি ও দুই ছেলে তাঁকে আবিষ্কার করে ফেলল। গলায় তাদের বিস্ময়, আরে, তুমি কখন এলে?

—এলাম কিছুক্ষণ আগে।

—সুনীলকাকা এসেছিল।

অনাদিপ্রসাদ শুকনো হাসেন, সেই ভয়ে তো তোমাদের ড্রইং রুমে ঢুকিনি।

—সুনীলকাকা বলছিল—

—আমাকে জেলে ভরে জোর-জবরদস্তি করে লেখাতে এই তো?

—কেন, তুমি এমনিতে লিখবে না?

—কি লিখব?

—যা তোমার ইচ্ছে।

—যদি লিখি ঐ সুনীল রায়ের মত ব্যবসাদারের জন্যে তার রাজহাঁসের শুধু পচা ডিম পাড়ছে যার ফলে পাঠকরা বদহজমে ভুগছে আর বাংলা সাহিত্য যাচ্ছে রসাতলে; যদি লিখি যারা একদিন সত্যিকারের লেখক

ছিল তারা নতুন করে লিখতে গিয়ে নিজেদের পুরোনো লেখা থেকে চুরি করছে; যদি লিখি এতদিন ধরে যেসব কথা শুনে আসছি, প্রেম স্নেহ মহত্ত্ব একনিষ্ঠতা গুরুভক্তি অধ্যবসায় এসব ফাঁকা বুলি, অন্যকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা; যদি লিখি যত আমরা সভ্যতার বড়াই করছি ততই মুখোশ এ'টে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমরা নিজের চেহারা দেখতে ভয় পাই, কারণ তা হলেই মুখোশের তলা থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বীভৎস জন্তু-গুলো বেরিয়ে পড়বে; যদি লিখি—

রমলা বউদি হাঁফিয়ে ওঠে, বলে, তাই না-হয় লেখ, তবু তো—

অনাদিপ্রসাদ হা হা করে হাসেন, তবু তো হাতটা সড়গড় হবে, তাই না?

ছেলেরা ধুয়ো তোলে, শুধু তাই কেন, বই ছেপে বার হবে।

—তাহলেই টাকা রোজগার হবে, চেক আসবে।

সকলের আবদার, তাহলেও তুমি লেখ।

—লেখবার কিছু না থাকলেও লিখতে হবে?

হ্যাঁ তবু।

অনাদিপ্রসাদ অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে কে'চো শূন্য কাঁচের পাত্রটা দেখিয়ে বলেন, আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক ঐ রকম, দেবার কিছু নেই, তবু মাছেরা ঠোকরাচ্ছে, দিতে হবে, লিখতে হবে, কারণ প্রয়োজনটা তাদের।

ছেলেরা এবার বিরক্ত হয়, আমরা বলছি তোমার ভালর জন্যেই।

অনাদিপ্রসাদ আবার হাসলেন, কেউ কারুর ভালো করতে পারে না। দেখ তোমাদের তো আমি বিরক্ত করি না, নিজেদের মতই তোমরা আছ, আমাকে সেইভাবে নিজের মত থাকতে দিচ্ছ না কেন? যদি লেখবার জন্যে ভেতর থেকে কোন তাগিদ পাই তাহলে হয়ত আবার লিখব, নয়ত আর জোর করে কলম চালাব না। এখন শুধু দেখছি আর ভাবছি, বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু একদিন যদি তাও একঘেয়ে মনে হয় তখন অন্য কিছু করব, বাগানে ফুল ফোটাব, নিজের হাতে রান্না করব, কলেজের ছেলে পড়াব। আমার জন্যে তোমরা ভেবো না। যে যার নিজের চরকায় তেল দাও।

এ কথা শুনে ছেলেদের স্থির বিশ্বাস হল, বাবাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।

রমলা বউদির খালি মনে হতে লাগল, সদ্য পাওয়া চেকটার কথা। পুরোনো বই ভাঙিয়ে আর কতদিন এই ধরনের ধড় অঙ্কের চেক পাওয়া যাবে।

অনাদিপ্রসাদ তখন জানালার গারদের ফাঁক দিয়ে আকাশের গায়ে জমাট মেঘের ল্যাণ্ডস্কেপ দেখছেন, ফিকে নীল, নীল, ঘন নীল রঙের কি বিচিত্র সমাবেশ! কোন নিপুণ শিল্পীর অজ্ঞাত অভিজ্ঞতায় নিখুঁত প্রকাশ।

অনাদিপ্রসাদ হাত জোড় করে প্রণাম করলেন কার উদ্দেশে তা তিনিই জানেন।

পরের দিন শহর পরিক্রমায় বার হয়ে অনাদিপ্রসাদ পরিচিত গণ্ডির মধ্যে থামলেন না। এগিয়ে চললেন ক্রমশ উত্তরে—আরও উত্তরে—দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে হাজির হলেন সাধুজীর আশ্রমে। আশ্রমের চেয়ে একে কুটির বলাই উচিত, গঙ্গার পাড়ে অল্প কিছুটা জমির ওপর ছোট একখানি পাকা ঘর, কোন ভক্ত নিশ্চয় বাঁধিয়ে দিয়েছে। পাশে একটা বিরাট বটগাছ অনেকখানি ছায়া করে আছে। কয়েকটা গেরুয়া কাপড় শুকোচ্ছে, বাঁশের বেড়া, আগল খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়। অনাদিপ্রসাদ যখন পৌঁছলেন ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন সাধুজী নিবিষ্ট মনে বই পড়ছেন। কোন দিকে তাঁর খেয়াল নেই। বেশ অনেকক্ষণ পরে বই থেকে চোখ তুলতে অনাদিপ্রসাদকে দেখতে পেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কে?

অনাদিপ্রসাদ উত্তর দিলেন, আপনার সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম।

—যদিও এ সময় আমি কারুর সংগে দেখা করি না তবু যখন এসে পড়েছ, ভেতরে এস। দরজা খোলা আছে।

বাইরে জুতো খুলে অনাদিপ্রসাদ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, হাত তুলে নমস্কার করলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে কেমন যেন সংকোচ হল। সাধুজী বসেছিলেন কম্বলের ওপর, অনাদিপ্রসাদ তাঁর সামনে মেঝের ওপরে বসে পড়লেন। ঘরটি শীতল, ভারী হাওয়া, ধূপের গন্ধে ভরপুর।

সাধুজী হেসে বললেন, আমি জানতাম তুমি আসবে।

অনাদিপ্রসাদের বিস্ময়, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

—পারব না! তোমার সংগে গংগার ঘাটে দেখা হয়েছিল, জোর করে ডুব দেওয়ালাম, দেশসুদ্ধ লোকের কথা ভেবে ভেবে তোমার কপাল কুঁচকে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এর আগেই তুমি আসবে।

অনাদিপ্রসাদ বললেন, আমি কিন্তু এখানে আসব বলে বাড়ি থেকে বার হইনি, কিন্তু কে যেন এখানে টেনে নিয়ে এল।

সাধুজী শব্দ করে হাসলেন, খবরদার এমন কথা স্বীকার করে ফেলো না, তাহলে বুদ্ধিজীবীরা তোমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে, ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাবে।

—এখন আমার সেই অবস্থাই হয়েছে, বাড়ির লোকেরাও ভাবছে মাথার গোলমালে ভুগছি।

—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই বাবা, যে মানুষটাই ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে চলে না তাকেই অন্যরা ভাবে সৃষ্টিছাড়া। শিল্পী, ডাক্তার, লেখক, এমন কি সাধু সন্ন্যাসী, এদেরও জীবনের একটা ছক আছে, তার মধ্যে যারা চলাফেরা করে, জীবনে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে শিল্পী নাওয়া খাওয়া ভুলে সৃষ্টির রহস্য খোঁজার চেষ্টা করে, যে ডাক্তার প্রতিনিয়ত রোগের সংগে লড়াই করে, শুধু দুটো প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকে না, যে লেখক বা শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না বলে অক্ষমতার যাতনায় ভেঙে পড়ে এদের বাইরের লোক বুঝবে কি করে? তোমাকে প্রথমদিন দেখেই তাই বলেছিলাম যে জীবন তুমি দেখতে চাইছ তা নাইবা দেখলে। এর তো কোন শেষ নেই। বলেছিলাম বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করার চেষ্টা ক'রো, নয়তো নিজেকে হারিয়ে ফেলবে, বিভ্রান্ত হবে, তখন আর সুতোর খেই খুঁজে পাবে না, মিছিমিছি জট পাকিয়ে ফেলবে।

অনাদিপ্রসাদ অকপটে স্বীকার করলেন, আমারও ঠিক তাই হয়েছে সাধুজী। যত ঘুরছি, যত দেখছি, ততই যেন মনে হচ্ছে এ একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা। কত মানুষ দেখলাম, কতরকমের জীবন, কিন্তু কি লাভ হল তাতে? বুঝতে পারছি আমরা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকব, যত চিন্তা করছি তত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি সমাজ থেকে, কারুর সংগেই ঠিকমত মিশতে পারছি না। কি করব, কারুর সংগেই যে মিল নেই! ভেবেছিলাম ভাল করে জীবনটাকে দেখে তারপর লিখব, কিন্তু এখন এমন হয়েছে, কি লিখব তাই বুঝতে পারছি না। কত কথা লেখবার আছে, অথচ লিখেই বা হবে কি?

সাধুজী এক দৃষ্টে অনাদিপ্রসাদকে লক্ষ করছিলেন, ঠিক যেন ভবিষ্যৎবাণী করলেন, এইবার তুমি লিখতে পারবে।

—কি করে বুঝলেন?

—তোমার সময় হয়েছে।

—কিসের?

সাধুজী কিন্তু এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিলেন না, বললেন, আমরা বিশ্বাস করি সময় না এলে কিছুই করা যায় না। সেই পরম লগন তোমার জীবনে আসছে, নিজেকে প্রস্তুত কর, যা আসছে তা যেন নিতে পার। একটা বিরাট কিছু আসছে, কোন দিক দিয়ে তা ঠিক বুঝতে পারছি না—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি পারবে। বোধ হয় মনে আছে, সেদিন গংগার ঘাটে দাঁড়িয়ে তোমাকে রামায়ণের কথা বলেছিলাম। আজ বলছি ভাল করে মহাভারতটা পড। জান তো কথায় বলে, 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে'। মহাভারতে সবকিছু পাবে, বিশেষ করে দেশের দিকটা খুব মন দিয়ে পড়ো। কখনও কি ভেবে দেখেছ কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল, কেন তাকে আমরা বলি ধর্মযুদ্ধ, যেখানে ভাই ভাইকে মেরে ফেলছে সেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কি করে এক পক্ষে যোগ দিলেন, নিজে পার্থসারথি হলেন? কেন? কেন?

অনাদিপ্রসাদ বললেন, তখন যে রাজা অন্ধ, রাজসভায় পাপাচার, দেশে দুঃশাসন, মানুষের হাহাকার।

—তবে, সেই দুঃসময় কি আজ আবার আসেনি? মানুষের অবস্থা দেখে তোমার
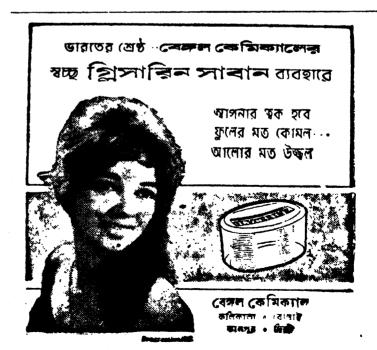
চোখে জল আসছে না? দুর্যোধনদের দেখে তুমি শিউরে উঠছ না, লক্ষ করছ না দুঃশাসনের কি বিষময় ফল? তবে বাবা লিখছ না কেন? ভগবান যদি তোমায় লেখবার শক্তি দিয়ে থাকেন, প্রাণ ভরে লেখ। জেনো, অসির চেয়ে মসীর দরকারই এখন সবচেয়ে বেশী।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনেই অস্ফুট উচ্চারণ করেন, কুরুক্ষেত্র!

সাধুজী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, তাতে ভয় কি। ভুলে যেও না ঐ কুরুক্ষেত্রেই গীতার জন্ম।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনাদিপ্রসাদের মনে হল ঘরের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল, কি দারুণ আওয়াজ! ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল, ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে সাধুজীকে দেখা যাচ্ছে না। রথের চাকার ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, মুমূর্ষু সৈনিকের কান্না, ঘন ঘন শর নিক্ষেপের শব্দ, তীব্র শঙ্খধ্বনি, এ কি পাঞ্চজন্যের আহ্বান—না, এ সেই পরমপুরুষের অমোঘ নির্দেশ। নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচী।

অনাদিপ্রসাদ নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন। (ক্রমশ)

বিজলী পাখার ফ্যাক্টরী

মস্ত বড়ো বিজ্ঞাপনটার বয়ান ছিলঃ

"Announcing ! Announcing !
Announcing !
First Ever Air-Circulators
Made In India
By Calcutta Fan Works Pvt.
Limited".

[illegible] কাগজে কাগজে ছবিওয়ালা ওই [illegible] 'ফ্ল্যাশ' করতে না করতেই [illegible]কাটা ফ্যান'-এর দুই কর্তা পত্রাঘাতে [illegible] হবার উপক্রম। চিঠির পর চিঠি [illegible] লাগলো—"আপনাদের 'অ্যানাউনসিং' [illegible] মাপজোক দরদাম এবং ডেলিভারির [illegible] জানিয়ে অতিসত্বর জবাব দিন।" এই-[illegible] কয়েকটা চিঠি পেয়ে তরুণ ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৌরেন চক্রবর্তী আর তাঁর [illegible], অর্থাৎ ডিরেক্টর শান্তিময় গঙ্গো-[illegible], হাসবেন না কাঁদবেন, ভেবে পেলেন [illegible] বিজ্ঞাপনের 'কপিতে' কোনো ভুল আছে [illegible] না-তো!

[illegible] আর এমন কি—ইংরেজী তো [illegible] মাতৃভাষা নয়! অ্যানাউনসিং-[illegible] মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হওয়া [illegible] এখনো কতজনের মুখে শুনি [illegible]রেশন' (মানে, কোলাবোরেশন)।

[illegible] জানি, এই স্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্ট-টা [illegible] রসিকতা হয়ে গেল কি না! আমার [illegible] যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। লেখার [illegible] 'ছটোফোটা দু' একটা রসিকতা করি [illegible] কেউ কেউ আমার রুচি বিষয়ে কটু-[illegible] করেছেন। উপরন্তু, আমার নাকি [illegible]টিভ রিপোর্টিং' করা উচিত, যাতে [illegible] জাতের ব্যবসাতে কত বিভিন্ন বাঙালী প্র[illegible] গড়ে উঠেছে সেটা এইসব প্রবন্ধে সবিস্তার লেখা হয়। বিশেষ একটির কথা লিখলে কেবল তারই 'বিজ্ঞাপন' হয় (কোন কৃতী বাঙালী প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের কথা জনসাধারণকে জানালে যে বিজ্ঞাপন করা হয় সেটা আমি জানতাম না)। এই ইংরেজী সূত্রে মাকুলো ৩৬টি 'সাবজেকটিভ রিপোর্টিং' করার পর চঠাৎ আজ গোধূলি-বেলায় এসব কথা কেন যে উঠছে তা আমার মোটা মাথায় ঢুকছে না। যাঁদের কথা লিখে চলেছি তাঁদের একজনও আমার মাসতুতো পিসতুতো ভাই-বোন বা শালা-সম্বন্ধী নন। প্রায় কাউকেই ব্যক্তিগতভাবে চিনতামই না কোনোদিনও।

'অবজেকটিভ রিপোর্টিং'-এর রাজ্যে বিচরণ করতে গেলে আজ লেখা চলতে না যে, ক্যালকাটা ফ্যানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীসৌরেন চক্রবর্তীর সন্তরণপটীয়সী সহ-ধর্মিণী আরতি দেবী বি এ পাস করা মেয়ে বনানীর বাঙালী-মা হয়েও এখনো সাঁতরে গঙ্গা পার হতে পারেন; লেখা চলে না যে তাঁর বড়ো ছেলে অভিজিৎ বি-কম পড়তে পড়তে বাবার অফিসে কনিষ্ঠ কেরানীর আসনে বসে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং নিচ্ছেন, আর ছোট ছেলে কুনাল বছর সতেরো বয়সেই 'যুদো' পণ্ডিত হয়ে পাঁচ ছ'জন গুণ্ডাকে ঘায়েল করতে পারেন, আর সৌরেনবাবুর বিদুষী ভগিনী ডাক্তার অজিতা চক্রবর্তী সিকায়েট্রি-তে বিলিতী ডিগ্রি নিয়ে এসে এখন পি জি হাসপাতালে মনোরোগচিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিতা।

অথবা, এই কোম্পানীর আর একমাত্র ডিরেক্টর শান্তিবাবুর পিতা শ্রীবিমলামোহন গঙ্গোপাধ্যায় মশায় যে এককালে অনুশীলন সমিতির ঢাকা শাখার কর্মী ছিলেন, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের পোলিটিক্যাল সেক্রেটারি ছিলেন এবং পরবর্তীকালে আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সারকুলেশন ম্যানেজারের পদ থেকে অবসর নিয়ে আজ ৭৫।৭৬ বছর বয়সেও কর্মঠ রয়েছেন—বিড়লাদের জুটমিল বিভাগে শ্রম-উপদেষ্টারূপে আর শান্তিবাবুর একমাত্র সন্তান ইন্দ্রাণী যাদবপুরে বি-এ পড়ে সেসব কথাও লেখা চলতো না।

কিন্তু এইসব ইন্টারেস্টিং কথা ছেড়ে ওই ধোঁয়াটে 'অবজেকটিভ' রিপোর্টিং-টিপোর্টিং আমাকে দিয়ে হবে না। আমি সোজা কথা দিয়েই যতটা পারি এগোই।

সৌরেন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় ক্ষীরোদ-বিহারী চক্রবর্তীর নিবাস ছিল নারায়ণগঞ্জের নদীর ওপারের গ্রাম 'বন্দর'-এ। বারো তেরো বছর বয়সে তিনি জলপাইগুড়িতে তাঁর দিদির কাছে চলে যান। এনট্রান্স পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে এক বিশেষ প্রাইজ নিতে গিয়ে দেখেন সভায় পুরস্কার বিতরণ করছেন ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ক্ষীরোদবিহারী ইতিপূর্বেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন; কাজেই ইংরেজ জেলা-শাসকের কাছ থেকে প্রাইজ না-নিয়ে তিনি সটান বাড়ি ফিরে এলেন। পরে তিনি কল-

কাতায় এসে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি-এ পাস করেন। গোয়েন্দা পুলিস এমন করে পেছনে লেগে থাকতো যে ক্ষীরোদ-বিহারী কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে পালানো ঠিক করলেন। পালালেন এক জাহাজে পে-মাস্টার বা পার্সার-এর কাজ নিয়ে। সেটা ছিল কার্গো-বোট। ক্ষীরোদ-বাবু কাজ বাদে অবসর সময়টা বই পড়ে কাটাতেন; বন্দরে জাহাজ ভিড়লেও নামতেন না দেখে ক্যাপ্টেন ঠাট্টা করে তাঁকে বলতেন জাহাজের চাকরি ছেড়ে মাস্টারি করতে। ঘটনাচক্রে হয়েও দাঁড়ালো তাই। দেশে ফিরে তিনি স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডুর বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের কাজ পেলেন। সরোজিনী দেবীর মেয়ে আমাদের প্রাক্তন রাজ্যপালিকা পদ্মজা-ও বোধ হয় ক্ষীরোদবিহারীর ছাত্রী ছিলেন বলে সৌরেনবাবু আমাকে বললেন।

কিছুদিন সেই কাজ করার পর ক্ষীরোদ চক্রবর্তী কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্সে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব নিলেন। তখন তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন সরকার এবং পরবর্তীকালে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় জে সি দাশ। তাছাড়া মুরারিপুকুরে ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়) স্থাপনার সময়ে তার সঙ্গেও ক্ষীরোদবাবু অল্পবিস্তর জড়িত ছিলেন।

এর মধ্যে এক সময়ে তাঁর মাথায় ঢুকলো স্বাধীন ব্যবসা করার বুদ্ধি। কলকাতার 'এলিট' সিনেমার সামনে হলদে রঙের যে প্রকাণ্ড বাড়িটা আছে সেটা তখন হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স তৈরি করাচ্ছেন। সুরেন ঠাকুর মশায়ের অনুমতি নিয়ে ক্ষীরোদবিহারী সেই 'সমবায় ম্যানশন'-এর ইলেকট্রিক wiring-এর কাজটি নিলেন।

সেই কাজ থেকে যে প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি হলো তার নাম 'ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড'। সেটা ছিল ১৯১৮ সাল।

মোটা মূলধন নিয়ে ডিরেক্টর হলেন ময়মনসিং-গৌরীপুরের মহারাজা ব্রজেন্দ্র-কিশোর, পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কুমার অরুণ সিংহ একাই এতে ৭ লক্ষ টাকা যুগিয়েছিলেন। এই ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং থেকেই বেরোলো ভারতে তৈরী প্রথম ফ্যান—ক্লাইড ফ্যান।

সমবায় ম্যানশনেই এই প্রতিষ্ঠানের অফিস এবং ওয়ার্কশপ হলো আর বকুল-বাগানের একটা দোতলা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হলো ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং-এর অ্যাপ্রেণ্টিস ট্রেনিং স্কুল। প্রথমে অ্যাপ্রেনটিস নেওয়া হলো ছেলেদের। তাঁদের কেউ কেউ পরে নিজের কারখানাও করেছিলেন; আর দুজন—শ্রীপ্রবীর গুপ্ত আছেন আমাদের শচীন দত্ত মশায়ের ভারত ইলেকট্রিক্যালস্-এর (ট্রপিক্যাল ফ্যান) ফ্যাক্টরীতে, আর শ্রীরমণী চক্রবর্তী আছেন ক্যালকাটা ফ্যানেই। সঙ্গে সঙ্গে আর্মেচার-ওয়াইণ্ডিং-এর সন্ধ্যা কাজে মেয়ে শিক্ষার্থিনী নেওয়া হলো। একই বাড়ির একতলা দোতলায় ছেলে আর মেয়েদের কর্মস্থল হলে যা-হবার তাই-ই হলো। নীচের তলার ছেলেদের মন কাজের মধ্যে মধ্যে উচাটন হয়ে যেতো—দোতলার দিকে তাকিয়ে তাঁদের দীর্ঘশ্বাস পড়তো।

ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং-এর তখন ব্যবসাতে, যাকে বলে রমরমা। দিনে ৪০,০০০ টাকার বিক্রিও হতো ফ্যানের সীজনে। বাঙালীর ক্লাইড ফ্যানের যুগ সেটা। কল্লোল গোষ্ঠীর স্বর্গীয় দীনেশ দাস তখন কোম্পানীর সেলস্ ম্যানেজার। শো-রুম ছিল নিউ মার্কেটের দক্ষিণে লিণ্ডসে স্ট্রীটে। (এখনো সেখানেই আছে, কিন্তু মালিকানা বদল হয়ে গেছে বহুদিন আগে। এখন ক্লাইড ফ্যানের কর্তা হচ্ছেন বসুশ্রী সিনেমার মালিক বসু মহাশয়রা)।

ত্রিশ দশকের প্রচণ্ড মন্দায় ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং লিকুইডেশনে গেল। অরুণ সিংহ মশায় নানা কারণে আগেই ব্যক্তিগত ইনসলভেন্সি নিয়েছিলেন। ক্লাইড-এর লিকুইডেশনের সময়ে ক্ষীরোদবিহারী যখন হিসেবপত্র নিয়ে কুমার সাহেবের কাছে গেলেন তখন অরুণ সিংহ বললেন, "বড়ো-বাবু (ক্ষীরোদবাবুকে ওই বলেই তিনি সম্বোধন করতেন), যুদ্ধে হেরে গেছি, কী হবে হিসেব দেখে!"

ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং-এর পতনে ক্ষীরোদবাবু কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। তিনি সুদিনে কিছু জমি কিনেছিলেন। এখন যেখানে বাটা কোম্পানীর গড়িয়াহাটের দোকান আর ইউনাইটেড ব্যাংকের প্রকাণ্ড বাড়ি সেখানে তাঁর প্রায় ১১ বিঘা জমি ছিল পুকুর সমেত। পুকুরটা ছিল বাটার দোকানের জমিটাতে; লোকে সেখানে মাছ ধরতো। ক্ষীরোদবিহারী তাঁর জমির অধিকাংশই বিক্রি করে ৭নং হিন্দুস্থান পার্কে বসালেন নতুন এক ফ্যানের কারখানা, আর আবার একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল। কারখানার নামকরণ হলো 'ক্যালকাটা ফ্যান' আর স্কুলের 'চক্রবর্তী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল'। এটা হলো ১৯৩২ সালের কথা।

ক্ষীরোদ চক্রবর্তীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা এবং পরে অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'ভারত'-এর মাখনলাল সেন, প্রথিতযশা সাংবাদিক স্বর্গীয় সত্যেন মজুমদার এবং আজকের দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সেই সূত্রেই ক্ষীরোদবাবুর তিন ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সমরেন্দ্র খুব অল্প-বয়সেই আনন্দবাজার পত্রিকায় ঢুকেছিলেন।

কনিষ্ঠ সৌরেন্দ্র তখন প্রায় বালক। (মধ্যম শংকর ১৯৪০ সালে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোহাটে প্রাণ হারিয়েছিলেন এক এয়ার ক্র্যাশে।) হঠাৎ একদিন জানা গেল, যে সমরেন্দ্র নিরুদ্দেশ। ব্যবসায়ীজীবনে ক্ষীরোদবিহারী বড়ো ধাক্কা খেয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে এটাই প্রথম। ক্যালকাটা ফ্যান-এর ব্যবসাতে ঢিলে পড়তে

পড়তে প্রায় সর্বনাশ ডেকে আনলো শংকরের অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ। তখন ক্ষীরোদ-বিহারীর জীবন থেকে রূপরস সবই বিদায় নিলো।

বিমলামোহনের ছেলে শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অতীতের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' (সুভাষচন্দ্রের বি-ভি) পার্টির কর্মী। কৈশোর থেকেই কারাগার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ঘরবাড়ি। ১৯৩১-এ ম্যাট্রিক পাস করার পরেই কারাবাস; বেরিয়ে আই-এ পাস করেই আবার দীর্ঘ বন্দী-জীবন। শান্তিময় ডেটেনিউ হিসেবে জেল থেকে বি-এ এবং পরের কিস্তিতে সেই জেল থেকেই ১৯৪৪-এ এম-এ পাস করে-ছিলেন ইংরেজীতে। তখন তাঁর বাবা বিমলা-মোহনও কংগ্রেসকর্মী হিসেবে বন্দী ছিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কাবুলের পথে সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের পর আফগানিস্থানে অবস্থিত জার্মান ও ইটালিয়ান ভারতবন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য পার্টি থেকে ১৯৪১-এই তরুণ শান্তিময়কে গোপনে কাবুল পাঠানো হয়েছিল।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি তথ্য পরিবেশনের যোগ্য। মাস কয়েক আগে বারুইপুরের রাস্তায় রাজপুরে 'বিপ্লবী নিকেতন' নামে যে ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে এবং যার প্রধান হোতা হলেন জলপাইগুড়ির বিখ্যাত চা-কর শ্রীভক্ত ঘোষ, সেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে শান্তিময় ও সৌরেন্দ্রর অংশও নগণ্য নয়। এর অফিস হয়েছে ক্যালকাটা ফ্যানের অফিসের এক অংশে। এর প্রেসিডেণ্ট ময়মনসিংহের শ্রীনগেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় এবং সেক্রেটারি হয়েছেন শ্রীশৈলেন নিয়োগী। এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি হয়েছেন ভক্ত ঘোষ এবং নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত। এখন বিপ্লবী নিকেতনে ন' জন বৃদ্ধ এবং অতি-বৃদ্ধ পরম শ্রদ্ধাভাজন বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন। প্রফেসর জ্যোতিষ ঘোষ (মাস্টার মহাশয়), রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি-র সুহৃদ 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র, শ্রীনির্বাণ স্বামী এবং যুগান্তর পার্টির শ্রীযুগল দত্ত প্রমুখ অগ্নিযুগের অলাতখণ্ডরা এখন সেখানে আছেন।

বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সে শান্তিময়ের রেক্রুটদের অন্যতম ছিলেন শ্রীসৌরেন চক্রবর্তী। বিয়াল্লিশ সালে সৌরেনবাবুকেও পুলিস গ্রেপ্তার করলো। আট ন' মাস রাজবন্দী থাকার পর ছাড়া পেয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে তখন দৈনন্দিন বাজার খরচও চলে না এমনি দুরবস্থা। ক্ষীরোদবিহারী একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

সৌরেন চক্রবর্তী বাবার হাত থেকে রথের রশি নিজে টেনে নিলেন। যুদ্ধের বাজার—এক পল্টনের প্রয়োজনেই ফ্যানের প্রচুর চাহিদা ছিল। প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে হবে, পরিবারকে রক্ষা করতে হবে বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৌরেন চক্রবর্তী বৃটিশ পল্টনকে 'ফ্যান' সাপ্লাই আরম্ভ করলেন। বছর দুয়েকের মধ্যেই ক্যালকাটা ফ্যান-এর লক্ষ্মীশ্রীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো বটে, কিন্তু

ইতিমধ্যে ১৯৪৪-এ ক্ষীরোদবিহারীর মৃত্যু হলো।

সুন্দরকান্তি সৌরেন্দ্রের মধ্যে আমি রসিক এক পুরুষকে খুঁজে পেলাম, যিনি জীবনটা রঙ্গমঞ্চের পর্যায়ে ফেলে দুঃখকেও বিলাস বলে ধরে নিতে পেরেছেন। কথায় কথায় হাসেন, হেঁয়ালি করেন বাক্যালাপে, আর এইসবের মাঝে মাঝেও ব্যবসা সংক্রান্ত দামী দামী কথা বলেন দু'চারটে। বয়স মাত্র ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ কিন্তু তাঁর চেহারায় একটা ক্লান্তি। এটা কেন হলো তা আমি জানি না, কারণ তিনি তো কৃতকাম শিল্পপতি।

সম্ভবত তিনি কর্মীদের ব্যবহারে হতাশ্বাস। যতটা কাজ করে ক্যালকাটা ফ্যানের কর্মীরা এই বাঙালী প্রতিষ্ঠানটিকে বৃহত্তের দিকে আরও ঠেলে দিতে পারেন তা তাঁরা করেন না। ১৯৬৫ সাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠান ভ্রান্ত শ্রমিক আন্দোলনের বলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উগ্র-বামপন্থী শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দিতে হয়েছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর শান্তি গাঙ্গুলি ও সৌরেন চক্রবর্তীকে। পরবর্তীতে 'গো-স্লো' (মন্থর উৎপাদন) নামক দুর্নীতির

বিষ ছড়াতে ছড়াতে সাতষট্টিতে ইউ-এফ সরকারের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্রাইক হলো। ইউনিয়নের নেতা তখন হয়েছেন শ্রমমন্ত্রী, অতএব স্ট্রাইকে সরকারী সহায়তার ভরসা ছিল। দেড় মাস পরে স্ট্রাইক শেষ হলো বটে, কিন্তু ছড়ানো বিষটা থেকেই গেল। আজও উৎপাদনের গতি মন্থর। মাসে যেখানে হাজার বারশো বা তারও বেশি ফ্যান তৈরি হতে পারে, সেখানে এখন হচ্ছে পাঁচ ছ'শো। ক্যালকাটা ফ্যানের কারখানায় কর্মিসংখ্যা আন্দাজ ১৬৫।

ফ্যান বলতে আমাদের প্রথমেই মনে হয় ঘরের সিলিং-এ ঝুলন্ত অথবা টেবিলে বসানো যন্ত্রটির কথা যার স্নিগ্ধ বাতাসে আমাদের নিদাঘপীড়িত দেহ শীতল হয়। কিন্তু ক্যালকাটা ফ্যানের কার্যক্রমে সেই সাধারণ ফ্যানের স্থান এখন গৌণ।

শান্তি গাঙ্গুলি চুয়াল্লিশ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিড়লা ব্রাদার্সে একটা চাকরি পেয়েছিলেন। মাঝে মাঝে সৌরেনের সঙ্গে দেখা হতো পথে ঘাটে; দুই পোলিটিক্যাল ফ্রেণ্ডের আড্ডাও জমতো কখনো সখনো। সৌরেন শান্তিময়কে প্রায়ই বলতেন চাকরি ছেড়ে ক্যালকাটা ফ্যানে যোগ দিতে। অবশেষে ১৯৪৮-এ শান্তিময় এখানে যোগ দিলেন। তিনি নিলেন অফিসের ভার, আর সৌরেন রইলেন উৎপাদন নিয়ে। (আজও তাই আছে। সৌরেন অন্দর মহলে থাকতেই ভালোবাসেন, মিটিং কনফারেন্স ভালোবাসেন না। তাই সেদিকটা শান্তিময়ই দেখাশোনা করেন। শান্তি গঙ্গোপাধ্যায় মশায় এখন এঞ্জিনীয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলে আছেন, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার এবং ফ্যানমেকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়াতে আছেন, আর আছেন এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য পদে)।

সৌরেনের মাথার ওপরে তো ঘুরতোই, মাথার মধ্যেও সর্বক্ষণ পাখা ঘুরতো। সিলিং আর টেবিল ফ্যানের মতো আটপৌরে জিনিসে তাঁর আর রুচি ছিল না। উপরন্তু তার বাজারও বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বিপণন কেন্দ্র কলকাতার এজরা স্ট্রীটের ব্যবসায়ীরা বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়েও 'ক্যালকাটা ফ্যান' ছুঁতে চাইতেন না। সৌরেন্দ্র-শান্তিময় দেখা করতে গেলে তাঁরা তাচ্ছিল্যই করতেন।

এক সন্ধ্যায় চৌরঙ্গী ওয়াই-এম-সি-এর সামনে দিয়ে যাবার সময়ে সৌরেনবাবু হঠাৎ গাড়ি থামালেন। পাশে শান্তিময়। শিকাগো রেডিও'র জানালার সৌরেন একটা অ্যামেরিকান এয়ার-সারকুলেটার কদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন। গাড়ি থেকে দুজনে নেমে ঢুকে গেলেন ওয়াই-এম-সি-এর নীচের তলায় শিকাগো রেডিওর দোকানে। পাখাটাকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলেন। দাম জিগ্যেস করে জানলেন ১১০০ টাকা। অতো টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই। দোকানের ইন-চার্জকে ইতস্তত করে বললেন, "পাখার একটা স্পেয়ার ব্লেড বিক্রি করবেন?" ইন-চার্জ অবাক হলেন, কিন্তু মুখে বললেন, "দিতে পারি অমন একটা ব্লেড, কিন্তু দাম পড়বে ৭৫ টাকা।" সৌরেন চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ ব্লেডটি কিনে বগলে পুরে শান্তিবাবুকে টানতে টানতে গাড়িতে উঠলেন। তাঁর ভাবখানা যেন মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী হাতের মুঠোয় পেয়েছেন।

এর পরের ঘটনা দ্রুত। ক্যালকাটা ফ্যানের চণ্ডী মিস্তিরি আর সৌরেনবাবুদের শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর (ত্রিশ দশকে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসকে যে চারজন বাঙালী শিল্পী অলংকৃত করেছিলেন সুধাংশুবাবু তাঁদের একজন) সঙ্গে বসে সৌরেন্দ্র ভারতের প্রথম এয়ার-সারকুলেটারের ডিজাইন করে ফেললেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ওই 'অ্যানাউনসিং' ফ্যানের জন্ম হলো। বিদেশী পাখার একটি ডানা থেকে এক ইতিহাসের সৃষ্টি হলো।

ক্যালকাটার এয়ার-সারকুলেটার—ভারতে তৈরি প্রথম এয়ার-সারকুলেটার—সারা ভারতের ঘরে ঘরে হোটেলে ক্লাবে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে আরম্ভ করলো। সেটা হলো ১৯৫১।৫২ সালের কথা।

এজরা স্ট্রীটের ব্যাপারীরা এবারে ঘন ঘন সৌরেন্দ্র-শান্তিময়ের কুশল জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলেন, আর অনির্দিষ্ট ডেলিভারির সময় সত্ত্বেও অগ্রিম টাকা জমার লোভ দেখিয়ে এয়ার-সারকুলেটার চাইতে লাগলেন। ক্যালকাটা ফ্যানের কর্তারা সে পথ না মাড়িয়ে গেলেন প্রাচীন বাঙালী প্রতিষ্ঠান এন সেন ব্রাদার্সের বিভূতি সেন ও কমল সেন মশায়দের কাছে। তাঁরা এবং সি সি সাহার চণ্ডী সাহা মশায় (হিন্দুস্থান রেকর্ড-এর মালিক) ক্যালকাটা ফ্যানের এয়ার-সারকুলেটারের সুষ্ঠু মার্কেটিং-এর ভার নিলেন।

সৌরেন্দ্রের মাথার মধ্যে কিন্তু পাখা ঘুরেই চলেছে। আরও নতুন নতুন জিনিস তৈরি করতে হবে। বিদেশ থেকে যেসব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যানের আমদানি হয় সেই সমস্তই দেশে তৈরি করার পরিকল্পনায় সৌরেন্দ্রের মন তখন অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সৌরেন্দ্র শান্তিময় কারুরই টেকনিক্যাল বিদ্যা বলতে কিছু নেই।

এমন সময়ে ১৯৫৫।৫৬ সালে ডক্টর জ্যোৎস্নাকুমার চৌধুরী নামে যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের এক কৃতী অধ্যাপকের সঙ্গে এঁদের

আলাপ হলো। পরিচয়টা হয়েছিল প্রসিদ্ধ 'গেস্ট কীন উইলিয়ামস' কোম্পানীর বর্তমান সেক্রেটারি শ্রীসুখেন্দু রায়ের মাধ্যমে। সুখেন্দু রায় এ'দের কমন ফ্রেণ্ড।

ডঃ চৌধুরীর তখন মাত্র ৩৫।৩৬ বছর বয়স। সেই বয়সেই তাঁর উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বেশ কয়েকটা পেটেণ্ট কিনেছেন বিলাতের কয়েকটা কোম্পানী। আমরা বিদেশ থেকে টেকনিক্যাল-নো-হাউ আনি অজস্র অর্থ ব্যয়ে, এদিকে আমাদের দেশের পণ্ডিত বিজ্ঞানীদের 'নো-হাউ' বিকোয় বিদেশে। আমরা ভালো করে তার খবরই করি না।

মাস্টার মশায় (সৌরেন্দ্র থেকে ক্যালকাটা ফ্যানের সবাই ডঃ চৌধুরীকে এই সম্বোধনই করেন) কলকাতা আর ম্যাঞ্চেস্টারের ছাত্র। একান্নো সাল থেকে যাদবপুরে পড়াচ্ছেন। মাঝে কেবল একটা বছর সাতাশ্নোতে ক্যালকাটা ফ্যানেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু যাদবপুর কর্তৃপক্ষের নির্বন্ধাতিশয্যে পরের বছর আবার অধ্যাপনায় ফিরে যান। কিন্তু বাকী সময়টা তিনি কাটান ক্যালকাটা ফ্যানের নব নব উৎপাদন পরিকল্পনায়।

বিজলী বাতি আবিষ্কারের ইতিহাসটি যতটা পরিষ্কার, পাখার ইতিহাস ঠিক ততটাই তমসাচ্ছন্ন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে অনুসন্ধান করাতে ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান চিত্ত ব্যানার্জি মশায় বেশ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে আমাকে জানালেন যে, যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, ডক্টর হুইলার নামে এক অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী ১৮৮২ সালে ছোট একটা প্রপেলারের সঙ্গে মোটর জুড়ে বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলন বা প্রবর্তন করেন। আর এক সূত্রে শুনলাম, যে স্বর্গীয় স্যার রাসবিহারী ঘোষের উৎসাহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক স্বর্গীয় ফনীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের উপদেশে জার্মেনির সিমেন্স কোম্পানী সিলিং ও টেবিল ফ্যানের যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। জ্যোৎস্নাকুমারও বললেন, যে তাঁর ছাত্র জীবনে এই পাখা-বিজ্ঞানে দেশে বা বিদেশে অধ্যাপক ঘোষের মতো কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে তিনি দেখেননি। বিড়লা মিউজিয়মে আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি; জানি না সেখানে কোনো তথ্য পাওয়া যেতো কিনা।

'ফ্যান' যন্ত্রটি পরিবেশকে কেবল ঠাণ্ডা করার কাজেই যে লাগানো হয় তা নয়, শীতপ্রধান দেশে সেন্ট্রাল হীটিং-এও ফ্যান ছাড়া চলে না। এমন কি বরফ জমে রাস্তাঘাট ঢেকে গেলেও নাকি এখন শক্তিশালী ফ্যানের ব্যবহার করা হয় বরফ গলানোর কাজে। মোটরকার তো আছেই আবার ঘর সাফা করার ভ্যাকুয়াম-ক্লীনারেও ছোট ফ্যান লাগে। নানা যন্ত্র নানা প্রণালীর আবিষ্কার হয়ে ফ্যান-শাস্ত্রটিও হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক সংহিতা।

উপদেষ্টা জ্যোৎস্নাকুমারের প্রেরণাতেই ক্যালকাটা ফ্যানের কার্যসূচীতে গৃহসজ্জার পাখার চাইতেও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পাখা বেশী প্রাধান্য পেলো। এগোতে এগোতে আজ তাঁরা ১১৫ রকমের পাখা তৈরি করছেন। সাধারণ Exhaust Fan ছাড়া, Roof Extractor, Mancooler প্রভৃতি অনেক রকম পাখা তো আছেই, উপরন্তু এই ১৯৬৮ সালে ক্যালকাটা ফ্যান 'Kalair' নাম দিয়ে একটি বিশেষ ধরনের ফ্যান তৈরি করেছেন যার কাজ হলো বন্ধ ঘর থেকে দূষিত হাওয়া বের করে সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধ হাওয়ায় ঘর ভরে দেওয়া। হাসপাতাল, ল্যাবোরেটরি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরের পক্ষেও এর অসাধারণ উপযোগিতা আছে বলে শুনলাম। এয়ার-সারকুলেটারের মতন এটিও এঁরাই ভারতে প্রথম চালু করলেন।

বিরাট থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশনের গরম হাওয়া বের করে দেওয়ার, খনির বিষাক্ত হাওয়া টেনে বাইরে আনার, জাহাজের এঞ্জিন রুমের প্রচণ্ড গরম হাওয়া exhaust করে দেওয়ার উপযোগী ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড সব বিচিত্র আকারের পাখা তৈরি দেখে এলাম ক্যালকাটা ফ্যানের তিলজলায় অবস্থিত মনোরম ফ্যাক্টরীতে। বার্মিজ প্যাগোডার চুড়োর আকারের একটি ফ্রেমে যে বিরাট পাখাটি লাগানো আছে তার কাজ হলো প্রকাণ্ড (দু চারশো ফুট দৈর্ঘ্য প্রস্থের) বন্ধ ঘরের ছাদের ওপর থেকে গরম হাওয়াকে টেনে বের করে ফেলা, যে কাজটি দেয়ালে লাগানো একজস্ট-ফ্যান ভালো করে পারে না।

বেশ লাগছিল সব দেখতে। হঠাৎ মেজাজটা খিঁচড়ে গেল একটি যন্ত্র দেখে। এ'দের তৈরি সাইরেন—এইগুলিই রোজ সকাল ন'টায় কর্কশ চীৎকার করে কলকাতা-বাসীর পটহ ভেদ করে মনে করিয়ে দেয় যে আমরা সততই মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।

কারখানার ভেতরটা কী সুন্দর! উচ্চতায় দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে কর্তারা এটিকে গড়েছেন শ্রমিকের স্বচ্ছন্দে কাজ করার পক্ষে আদর্শ যন্ত্রশালা। দামী দামী লেদ ড্রিল ইত্যাদি সযত্নে লালিত। টেস্টিং ডিপার্টমেন্টের সরঞ্জামেও একটা বনেদীয়ানা আছে। এর মধ্যে অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই এ'দের টেকনিশিয়ানদের সংকলিত—অবশ্য ডক্টর চৌধুরীর নির্দেশে।

একাধারে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার ও সেক্রেটারি শ্রীসুধীন বসু নীরব কর্মী। কথাবার্তা কম বলেন, কিন্তু কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ। ক্যালকাটা ফ্যানে আছেন ১৯৫০ সাল থেকে।

শ্রীশচীন গোস্বামী নামে সপ্রতিভ যুবকটি হলেন Wodehouse-এর গল্পের Psmith-এর মতো—সকল কাজের কাজী। ইনিও প্রায় ১৮।১৯ বছর এখানে আছেন।

ক্যালকাটা ফ্যানের সাজ-সরঞ্জামের ক্রেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি সংস্থার নাম না-করলে এ'দের এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যানের প্রয়োজনীয়তা ঠিক বোঝাতে পারবো না। থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশনের মধ্যে আছে দুর্গাপুর ১, ২ এবং ৩নং ইউনিট, বারাউনি, ব্যাণ্ডেল, ধুবরন, অমরকণ্টক, মহারাষ্ট্রের ভুসওয়াল, মাদ্রাজের বেসিন ব্রিজ, দিল্লী ইলেকট্রিক প্রভৃতি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়মের হীরাকুড ও আল্লুপুরম ফ্যাক্টরী, জে-কে'র অ্যালুমিনিয়ম করপোরেশন, কলকাতার ন্যাশনাল রাবার ও ইনচেক টায়ার প্রভৃতি।

এখানে আর একটু পরিসংখ্যান দেওয়া দরকার—সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এই শিল্পের উন্নতি বা অবনতির ছোট্ট একটু ইতিহাসও। যুদ্ধোত্তর যুগের কিছুকাল পরেও পশ্চিম বাংলায় বাঙালীর প্রায় ৭০টি ফ্যানের কারখানা ছিল। এখন কমতে কমতে বাঙালীর কারখানার সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে গুটি চারেকে-ক্লাইড, ক্যালকাটা,—ভারত (ট্রপিক্যাল) এবং জি-টি-আর। তার মধ্যে সিলিং ও টেবল-ফ্যান উৎপাদনে ট্রপিক্যাল সবার আগে; তাঁদের মাসিক উৎপাদন ১২।১৪০০ পাখা। ক্যালকাটা মাসে ৬।৮০০ পাখা করে, কিন্তু এর অধিকাংশই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পাখা। ক্লাইডের উৎপাদন এখন মাসে মাত্র ২।০০০। জি-টি-আর-এর বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে পারলাম না। উপর্যুক্ত তথ্য শান্তি গাঙ্গুলি মহাশয়ের সৌজন্যেই পাওয়া গেল।

মন্দার বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে সৌরেনবাবু ও মাস্টার মশায় সমস্বরে বলে উঠলেন যে, এই শিল্পে 'রিসেশন' তো নেই-ই, উপরন্তু উৎপাদন পাঁচগুণ বাড়ালেও গুদামে পড়ে মরচে ধরবে না। অথচ উৎপাদনটা বাড়বে কেমন করে? কাজ করে যাঁরা নিজেদের এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করবেন তাঁরাই তো শুনলাম শ্রমবিমুখ।

নইলে যে শিল্পে মন্দা নেই তার বিক্রির অংক বাড়তে বাড়তে এমন করে নেমে আসবে কেন?

সাল	উৎপাদন (পাখার সংখ্যা)	বিক্রয় মূল্য
১৯৬২	১১৬৯	৩৪ লক্ষ টাকা
১৯৬৪	১১৮৭৩	৪৩ লক্ষ টাকা
১৯৬৭	৬৪৯৬	৩০ লক্ষ টাকা

৪ লক্ষ টাকা মূলধন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর পক্ষে ৩৫।৪০ লক্ষ টাকার উৎপাদন তো মহা কৃতিত্বের কথা! কর্তা ও কর্মীর যুক্ত প্রয়াসেই যার গতি ছিল শিখরের দিকে তা এখন আবার সানুদেশের অভিমুখে মোড় ফেরানো তো বাঙালীর অগৌরবের কথা!

কোয়ালিটির অবনতির জন্যে এটা ঘটে থাকলে এক কথা ছিল। ক্রেতাদের নামধামে তো ক্যালকাটা ফ্যানের উৎকর্ষই প্রমাণিত হয়।

মাস্টারমশায় ও সৌরেনবাবুর সঙ্গে ফ্যাক্টরীর চকচকে ঝকঝকে দোতলা অফিস-বাড়িটা থেকে বেরোবার সময়ে শান্তিবাবু এবিষয়ে গর্বের সঙ্গে বললেন, "আমাদের ফ্যানের কোয়ালিটি? "We may be out-talked, out-priced, out manoeuvred, but shall never be beaten in quality."

বিশ্বকর্মা

শাঙ্গর্দেব

কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত সঙ্গীত শিক্ষার বৃত্তি

ভারত সরকার সংগীতশিক্ষা ও সাধনার জন্য প্রতি বৎসর যে বৃত্তি প্রদান করে থাকেন সে সম্বন্ধে আমরা কিছু আগ্রহ পোষণ করি। এর প্রধান কারণ এই প্রতিযোগিতা থেকে সাধারণভাবে উত্তর ভারতে কিভাবে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগীতচর্চা অগ্রসর হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় বললে সত্যভাষণ হবে না। কারণ, গোটা উত্তর ভারতে বহু শিক্ষার্থী আছেন যাঁদের মান বেশ যথেষ্ট উন্নত কিন্তু তাঁদের বৃত্তির প্রয়োজনীয়তা নেই। আবার আরও এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী আছেন যাঁরা রীতিমত গুণী অথচ কোনও পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে অনিচ্ছুক। এছাড়া বহু কৃতী শিক্ষার্থী আছেন যাঁরা এই বৃত্তির কোনও খোঁজ খবরই রাখেন না। এই তিনটি শ্রেণী বাদ গেলে ভাল গাইয়ে বাজিয়ের একটা বড় অংশই বাদ পড়ে কিন্তু তথাপি যাঁরা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন তাঁদের অনুষ্ঠান শুনেও মোটামুটি ধারণা করা যায় বৈকি। এরও কিছু মূল্য আছে।

এবারকার নির্বাচন ব্যাপারে একটা প্রশ্ন উঠেছিল, এই বৃত্তি কাদের দেওয়া উচিত। অনেকের মতে যাদের সামর্থ্য অল্প এই বৃত্তির জন্য তাদের দাবীই সর্বাধিক। অতএব অর্থবান সম্প্রদায়কে এর সুযোগ না দেওয়াই সঙ্গত। ব্যক্তিগতভাবে লেখক এর সমর্থক নন কারণ এই বৃত্তিকে "ন্যাশনাল স্কলারশিপ" হিসাবে গণ্য করা হয়। গুণপনা বা যোগ্যতাই এই বৃত্তি অর্জনের মাপকাঠি। সমগ্র জাতির কাছে যদি এই বৃত্তির সুযোগ উন্মুক্ত থাকে তাহলে ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয় না এবং সেটা উচিতও নয়। সকলেই এর জন্য আবেদন করতে পারেন এবং গুণের বিচার করে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এই বৃত্তি প্রদান করা উচিত। প্রকৃত গুণীকে বেছে নেওয়াই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এর পরিধিকে সংকীর্ণতর করাটা আদৌ সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। আসলে ধনী পরিবার থেকে যে খুব বেশী একটা আবেদন পড়ে এমন নয়, অধিকাংশ আবেদন আসে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের শ্রীসুধাংশু সাহা এবারে দুঃখ করে বললেন যে, এই বৃত্তির যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। কিছু সংখ্যক বৃত্তিধারী বৃত্তির নির্দিষ্টকাল অতিবাহিত হলে চাকরির খোঁজ করেন এবং যে কোনও চাকরি পেলেই গানবাজনা জলাঞ্জলি দিয়ে চাকরির উন্নতিসাধনে তৎপর হন। এতে সরকারের আশাভঙ্গের কারণ ঘটে। তাঁরা শিক্ষার্থীদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন না। ইণ্টারভিউ দিতে এসে যাঁরা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান তাঁরা শেষ পর্যন্ত যদি সংগীতকেই ভুলে যান তাহলে সাধনার মর্যাদা রইল কোথায়। বাধা, বিপত্তি, অর্থকষ্ট এসব তো আসবেই, জানা কথা, কিন্তু ধৈর্য হারালে তো চলবে না। যাঁদের এই ধৈর্য নেই তাঁরা এই বৃত্তির প্রতি ন্যায়পরায়ণ নন। এইরকম দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে বৃত্তির জন্য আবেদন না করাই ভাল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা নিয়েও যাঁরা সাধনা থেকে বিরত হবেন না তাঁরাই এই বৃত্তির যোগ্য ব্যক্তি।

এবারে যন্ত্রসংগীত এবং তবলা পাখোয়াজের অনুষ্ঠান গতবারের তুলনায় বেশী ছিল। কয়েকজনের বাজনা ভালও লেগেছে। তবু মান আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য করা যায়। অনেকেই একাদিক্রমে দশ বারো বৎসর শিখছেন। সময়টা নেহাৎ কম নয়—এবং শিক্ষিতপটুত্ব অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট। মোটামুটিভাবে আমাদের বাঙালী ছেলেমেয়েরাই পরীক্ষায় বেশী অংশগ্রহণ করেছেন এবং অধিকতর কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। কলকাতা রবীন্দ্রভারতীর কয়েকজন ছাত্রীর অনুষ্ঠান প্রশংসনীয়। আশা করি এই বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পী তৈরির ব্যাপারে আরও সাফল্য অর্জন করবেন। বাইরেকার শিক্ষার্থীদের অনেকের অনুষ্ঠানও মন্দ নয়। একটি বাঙালী মেয়ের ধ্রুপদ-গানে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তরুণ ছাত্র পাখোয়াজে প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা দেখিয়েছেন। এবারকার প্রতিযোগিতায় প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র একজন প্রতিযোগীর সঙ্গে বাজালেন। অল্পক্ষণের জন্য হলেও তাঁর বাজনা উপভোগ করা গেল। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন পুণার পটুবর্ধন। তাঁর প্রশ্নগুলি আমার খুব সমীচীন মনে হচ্ছিল। তিনি প্রকৃত প্রয়োগবিদ্যার যাচাই করছিলেন। কোনও প্রতিযোগীর তানপুরা বেঁধেও তিনি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন কোথায় শ্রুতির ত্রুটি ঘটেছে। তবলার বিচারে প্রথিতযশা তবলিয়া শ্রীনিখিল ঘোষও কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন যাতে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ করা যায়। নিখিলবাবু সম্প্রতি সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছেন। বোম্বাইয়ে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর হলে শিক্ষার্থীদের উপকার হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংগীতবোধ জাগ্রত করবার জন্য তিনি যথেষ্ট চিন্তা করছেন। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় যাঁরা নানা কাজের মধ্যে সংগীতসাধনার জন্য কম সময় দিতে পারেন তাঁরাও বেশ উপকৃত হচ্ছেন বলে জানা গেল।

শিক্ষার্থীদের যে প্রধান ত্রুটি লক্ষ করা গেল সেটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণের অভাব। তাঁদের প্রত্যেককেই দশ বারো মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে সংগীত সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য কর্তব্যগুলি দেখাবার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু খুব কম শিক্ষার্থীই সংক্ষেপে এই সময়ের মধ্যে একটি নিটোল সংগীত পরিবেশন করতে পেরেছেন। এই যে পরিমাপ অনুযায়ী একটির পর একটি কাজ করে যাওয়া এটি কিন্তু খুব পরিমার্জিত শিক্ষার ফল। একজন নিপুণ শিল্পীর পক্ষে দশ মিনিটও বড় কম সময় নয়। সংগীতের মধ্যে যদি সমতা থাকে এবং প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে তাহলে সেই অনুষ্ঠান শ্রোতাকে সহজেই আকৃষ্ট করে। শিক্ষার্থীর কাছ থেকে যে খুব একটা দুরূহ তান বা কণ্টসাধ্য বিস্তার আশা করা হয় এমন নয়, কিন্তু তাঁদের অনুষ্ঠান এমন হওয়া

শিল্পশিক্ষার্থী, ইচ্ছা থাকলেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন না সংস্থা তাঁদের এ বিষয়ে সর্বপ্রকার সুবিধা করে দেন। সুতরাং সংস্থার উদ্দেশ্য যে মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, সংস্থার সভ্যগণ মাঝে মাঝে সমসাময়িক চিত্রকলা বিষয়ে নানা আলোচনা করে থাকেন এবং সভ্য ও শিল্পরসিকদের জন্য সংস্থা 'চারুকলা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশই শিল্পশিক্ষার্থী, যদিও শিল্পীও আছেন।

প্রদর্শনী দেখে বোঝা যায় যে, অংকন-রীতি ও মাধ্যম মিশ্র। কয়েকটি কাজ শিক্ষার্থীসুলভ। তাহলেও ক্ষতি ছিল না যদি মনোনয়ন ব্যাপারে সংস্থা অধিকতর সচেতন হতেন। কারণ, তাহলে প্রদর্শনীর মান ঈষৎ উন্নত হত। শিল্পীদের মধ্যে জহর সাহা পোদ্দার, অসীম বসু, বিপ্লব রায়, সজল রায় ও ভগবৎ সিং হাজের-এর কাজে নিষ্ঠা ও প্রতিভার স্বাক্ষর দেখা যায়। এ'রা প্রায় সকলেই প্রগতিবাদী ও বর্তমান মানবসমাজের নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের জীবনের বিভিন্ন রূপই এ'রা নানাভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। জহর পোদ্দারের রচনায় নিখিল বিশ্বাসের প্রভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে (বিদ্রোহী শ্রমিকেরা)। অসীম বসুর ভিয়েতনাম সমসাময়িক পটভূমিকায় রচিত। বিপ্লব রায়ের বন্দী উল্লেখযোগ্য, যদিও এটি দেখে নীরদ মজুমদারে ছবির কথা মনে পড়ে যায়। সজল রায়ের "জীবনের উত্তাপ" অনেকের চোখে পড়ে থাকবে। ভগবৎ সিং হাজের-এর ভাস্কর্য রীতিপ্রধান রচনা মা ও ছেলে প্রশংসা দাবি করতে পারে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বিমল দাসের জলরঙের দু' একটি বহির্দৃশ্য স্টাডির নাম করা যায়।

স্কেচ —স্যালভাটোর ফ্রিজাকিয়া

*

ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস হলে মিঃ স্যালভাটোর ফ্রিজক্রিয়া সম্প্রতি তাঁর ড্রয়িং ও স্কেচের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিল্পী তরুণ, নিউইয়র্কের বাসিন্দা। কয়েক মাসের জন্য তিনি ভারতে এসেছেন ও শ্রীনগর, দিল্লী, আগ্রা, বুদ্ধগয়া, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে কয়েকদিন যাবৎ বসবাস করেছেন। অংকনবিদ্যা বিষয়ে শিল্পী কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেননি তবে এ বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। অতএব বিভিন্ন স্থানে থাকাকালীন যে সব দৃশ্য বা বিষয়বস্তু তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে তিনি কালি ও রঙ মাধ্যমে সেগুলির স্কেচ করেছেন। এগুলি মিনিয়েচার জাতীয় —অধিকাংশ স্থলেই দিয়াশালাই বাক্সের আকারের মত। সুতরাং এগুলিকে ইমপ্রেশন বা নিছক স্কেচ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। সুদূর ও উন্নত আমেরিকার মত দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে যে এখানকার বিভিন্ন জাতির নরনারীর নানা পেশা ও বিচিত্র বেশভূষা, মন্দির তথা মসজিদ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিপথে পড়বে সেটা স্বাভাবিক। তাই প্রদর্শনীতে ভারতের সাধু ও ফকির, নদী ও পাহাড়, মন্দিরে নরনারীর সমাবেশ বা শহরের কলরব-মুখরিত রাস্তার একাংশ—এই জাতীয় নানা স্কেচ দেখা যায়। কয়েকটি রঙীন। শিল্পীর কাজে নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় এবং কয়েকটি, বিশেষ করে বারাণসীর, কাশ্মীরের ও রাস্তার দৃশ্যগুলির স্কেচ অনেকের চোখে পড়ে।

চিত্রপ্রিয়

যদিদং হৃদয়ং...
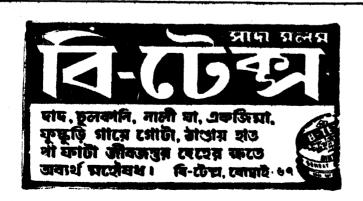
হৃদয় নিয়ে সারা দুনিয়ায় হইহই ব্যাপার। হৃদয় পালটে মানুষকে নূতন জীবন দেওয়া যায় কিনা সেই গবেষণা আর পরীক্ষার সন্ধিক্ষণ আজ। কঠিন হৃদয় মানুষটার কলেবরে কোমল হৃদয় ভরে দিয়ে বুকেপুকে কাঁরিয়ে দিলেই হলো। টেকনো-সেনট্রিক পাশ্চাত্ত্য দুনিয়া আর দশটা যন্ত্রের মত হৃদয়কে অদল বদল করার বেমালুম ব্যবস্থা করছেন। সম্প্রতি বোম্বাইতে বাঙ্গালী শল্যচিকিৎসকও হৃদয় বদল করে-ছিলেন। তবু বিবাহের মন্ত্র থেকে নিয়ে সকাল বিকেলের সাধারণ কথায় সর্বদা আমরা হৃদয়কেই মানুষের সত্তা, অস্তিত্ব বা বিদ্য-মানতা বলে উল্লেখ করি। অদলবদল কাণ্ড বাদ দিয়ে হৃদয় দেওয়ার রোমাঞ্চ বা রোমান্স না ভেবে একটি সত্তা কিন্তু প্রায় সত্তার মতই সুস্পষ্ট। হৃদয় দেহ কমপ্লেকসের সব চেয়ে বড় আয়োজন। হৃদয়কে তাই বন্ধ করার যত উপদেশ। কিন্তু উপদেশের এলাকার যারা বাইরে তাদের হৃদয় সবচেয়ে জোরালো। সম্প্রতি ভারতবর্ষের সব প্রদেশের heart attack-এর যে খতিয়ান খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আন্দামান নিকোবরে ছিল ১৯, লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় ৫, দাদরা ও নগর হাভেলী এবং নাগাল্যাণ্ডে একটিও নয়। দিল্লির মত ছোট্ট এলাকায় সেক্ষেত্রে ১৭৭৪।

জীবনযাত্রার গতিবেগ যত বেশী, স্বভাব, মানসিক উত্তেজনা যত বেশী, হৃদয় ততই হাঁপিয়ে যায়। এই একই কারণে এতদিন যে বিশেষজ্ঞরা বলতেন মেয়েদের হৃদরোগ কম হয় সে কথাও ততটা জোরালো থাকেনি। জীবনের শতরঞ্জ খেলায় দাবাবোড়ে মন্ত্রী সর্বত্রই মেয়েরা আছেন আজ। ঘরের জীবন, বাইরের উত্তেজনা তাঁদের হৃদয়কেও কি আর পূর্বকালের মত শান্ত, স্থির রেখেছে? নিজেদের হৃদয় তো আছেই, তা বাদে পরিবারের প্রত্যেকটি হৃদয়ের দায়িত্বই বলতে গেলে তাঁদের হাতে। অনেকটা মানসিক শান্তি অশান্তির কারণ তাঁরা তো হতেই পারেন, রান্নাঘরের উপর হৃদরোগের যতটা নির্ভর ততটা তো পুরোপুরির তাঁদের। নিজেদের মেদবাহুল্য থেকে শুরু করে রান্না-বান্নায় ক্ষতিকর পরিবেশনে তাঁরা দৃষ্টি দিলে আধুনিক সভ্যতার এই দারুণ রোগটিকে কাবু করা যায়।

প্রথমেই মেদবাহুল্যের কথা বলি। ডাক্তাররা বলেন সাধারণ সব সামান্য উপসর্গ থেকে নিয়ে বাত, পিঠে ব্যথা, গল ব্লাডারের অসুখ, হৃদরোগ সবই মেদবাহুল্য থেকে হতে পারে। গল ব্লাডার সম্বন্ধে নাকি কথাই আছে যে fat, forty ও fair femaleদের বেশী হয়। এই চার F-এর মধ্যে একমাত্র fat বা মেদবাহুল্য আমাদের সাবধানতার সীমায় আছে। পুরুষের বেলায়ও খাওয়া সম্বন্ধে সতর্কতার ঘরের গৃহিণীর দায়িত্ব যথেষ্ট।

মেদ বৃদ্ধির যে অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের চার-পাশে মেদ জমা হতে আরম্ভ হয় সে অবস্থা বিপদের সূত্রপাত। ডাক্তাররা বলেন, এই অবস্থার একটি লক্ষণ নাড়ির গতি দ্রুত হয়। মিনিটে ৭০—৮০ নাড়ির স্বাভাবিক স্পন্দন। হঠাৎ বেড়ে গেলে মেদ বৃদ্ধিই যদি কারণ হয় তবে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে, নিয়মিত কিছু দৈহিক পরিশ্রমের ব্যবস্থা করতে হবে, উপযুক্ত বিশ্রাম, মানসিক প্রফুল্লতার কথা মনে রাখতে হবে, প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। মেয়ে হন বা পুরুষ হন, ৩০ বছরের ওদিকে ওজন বাড়াকে কোনোমতেই প্রশ্রয় দেবেন না। মেয়েদের সাধারণত একটু বয়স বাড়লে বা সন্তান জন্মের পর ওজন বাড়ার সম্ভাবনা হয়। অল্প বয়সে অত সহজে ওজন বাড়ে না এবং অল্প বয়সের মেদ বৃদ্ধিকে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে দমনও করা যায়। মেদের সাংঘাতিক ফলও বেশী বয়সেই চট করে হয়।

বিদেশে রোগা হবার জন্য অন্যান্য উপায়ের মধ্যে "স্লিমিং" পিল মেয়ে মহলের একটি মহা জনপ্রিয় জিনিস। কোন কোন স্থানে এ পিলের পরম বিষময় ফল হওয়াতে সরকারী আইন করা পর্যন্ত হয়েছে। তবে ডাক্তারবাবুর হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে সুন্দরীরা স্লিমিং পিল সংগ্রহ করার প্রেসক্রিপশন যোগাড় করেন। ডাক্তারবাবু যদি লিখে দেন তবে আর বাধা নেই। কাজেই এই পথ। পিলের আসল কাজ হচ্ছে খাবার ইচ্ছে, ক্ষুধার উদ্রেক দমন করা। ডায়েটিং অথবা খাবার সম্বন্ধে সতর্কতা সহজ হয়। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করার ফলে নানা রোগ দেখা দেয় বলেই পিলের উপর নিয়ম-কানুন। আমাদের দেশে চিকিৎসকরাও তাই মনে করেন। অবাঞ্ছনীয় উপসর্গের সম্ভাবনা থাকে বলে তাঁরাও পিল ইত্যাদি মানা করেন।

হৃদযন্ত্রের গোলমাল আশংকা করলে কঠিন পরিশ্রম না করাই ডাক্তাররা উপদেশ দেন। তার মধ্যে হাঁটা সম্ভবত সবচেয়ে সহজ ও উপযোগী। তবে যতটা হাঁটলে শরীরের মেদক্ষয় হয় ততটা সব ক্ষেত্রে উচিত না হতে পারে। এমন কি বেশী হাঁটাহাঁটি করলে যে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেই মত খাওয়া-দাওয়া করলে শেষ পর্যন্ত মেদ বৃদ্ধিও হতে পারে। মোটামুটি হিসাবে দুই স্লাইস মাখন লাগানো পাঁউরুটির খাদ্যমূল্য ৩০০ ক্যালরি। ৩০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য পুড়িয়ে দিয়ে শরীরের মেদক্ষয় করতে অন্ততঃ পাঁচ মাইল হাঁটা দরকার। কাজেই খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দিয়েই মেদক্ষয় করতে হবে। আলু, মিষ্টি, কেক বিস্কুট, রুটি, ভাত ইত্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে চর্বিবিহীন মাংস, মাছ, ডিম, ফল, কাঁচা শাকসব্জি বেশী করে খাওয়া যায়। অবশ্য এমন লোক যথেষ্ট আছেন যাঁরা বেশ ভাল-ভাবে খাওয়া দাওয়া করেন অথচ শরীরে মেদ জমা হয় না। তাঁদের ভাগ্য ভাল। এঁদের দৈহিক গঠন আর শরীরের কলকব্জা একটু বিচিত্র ধরনের। চর্বি জমে না। শরীর তাড়াতাড়ি চর্বি পুড়িয়ে ফেলে।

হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার জন্য খাদ্য-তেল ব্যবহার সম্বন্ধে এখন নানা মতভেদ উঠছে। এমন কি খাঁটি ঘি খেতে পাওয়া এক সময় যে পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ মনে করা হতো, সেই খাঁটি ঘিও প্রায় আসামী সনাক্ত হতে চলেছে। বছর কয়েক আগেও প্রচুর ঘি গৃহস্থ সংসারে ব্যবহার হতো। ধনী ঘরের তো কথাই নেই। অনেক জায়গায় বিশুদ্ধ ঘি পান করাও নাকি স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করা হতো। মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলাম আমার পিতৃবান্ধব বাবু সচ্চিদানন্দকে সকাল বেলায় রোজ আধপোয়া থেকে এক পোয়া ঘি খেতে। কখনও তাঁর হৃদরোগের কথা শুনিনি। সম্ভবত সেদিনের পরিবেশে এহেন ক্যালরিবহুল খাদ্য হৃদয় স্পর্শ করতো না। বর্তমান সভ্যতার গতিবেগ সামলাতেই সব হৃদয়গুলি ভারাক্রান্ত, কাজেই তার ব্যবস্থা বিধিও আলাদা। শিক্ষিত, বুদ্ধি-জীবি মহলে রক্তে কোলেস্টেরল কথাটি রীতি-মত ঘরোয়া হয়ে উঠেছে। এই নাকি আসল খুনী আসামী। করোনারি থ্রম্বোসিসের কারণ। তবে সুখের বিষয় এই যে, কোলেস্টেরল প্রবণতা সৃষ্টি করায় সরষের তেল অন্যান্য খাদ্য তেলের মত পটু নয়।

জমানো বা hydrogenated fat বা ঘিয়ের চেয়ে সরষের তেল ব্যবহার করা প্রশস্ত। প্রায় যুগান্তরকারী কথা—তাই নয় কি? তেল ব্যবহার ব্যাপারটা একটু কম হাতে করাই অবশ্য মঙ্গল, তা সে যে তেলই হক।

সম্প্রতি আরও একটি সত্যের সন্ধান মিলেছে ডাঃ মরিস-এর গবেষণায়। তিনি WHO-র একজন বিশেষজ্ঞ। করোনারি রোগ থেকে সাবধান থাকতে হলে কিছু কায়িক পরিশ্রম দরকার। করোনারি উপসর্গ হ'লে তবে নয়, তার আগে দেখা গেছে কায়িক পরিশ্রম করোনারি অ্যাটাক থেকে রক্ষা করে। ডাঃ মরিস এজন্য লণ্ডনের ডবল ডেকার বাসের ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টারদের মধ্যে একটি হিসাব নেন। কণ্ডাক্টরকে ঘোরাঘুরি বেশী করতে হয়, বলতে গেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার কর্মজীবন কাটে। ড্রাইভাররা যদিও যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ কাজ সামলান কিন্তু বসেই তাঁরা থাকেন বেশী সময়। দেখা গেল করোনারি উপসর্গ ড্রাইভারদের মধ্যে অনেক বেশী। তাদের চিন্তা বেশী, কায়িক পরিশ্রম কম। ডাঃ মরিস বলেন, সভ্যতার আধুনিক অধ্যায়ে ধনীদের মধ্যেই তাই করোনারি দুর্বলতা মহামারীর মত দেখা দিয়েছে। তাই যাঁদের কায়িক শ্রমের কষ্ট করে অন্ন সংস্থান করতে হয় না তাঁরা আজকাল "Do it yourself" বা "নিজে কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে নানা সখ ও hobby চালু করতে চলেছেন। মেয়েদের বেলায় তো অন্য হবির প্রশ্ন ওঠে না যদি ঘরের কাজে যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। সেটা মস্ত 'হবি' এবং তাতে পারিবারিক সুখ কানায় কানায় ভরা থাকে। ইংলণ্ডে মরিস সাহেব ১৫০০০ সরকারী কর্মচারীর মধ্যে পরীক্ষা চালিয়েও দেখেছেন যাঁরা হবিই হ'ক আর বাধ্য হ'য়েই হ'ক কায়িক শ্রম কিছু করেন তাঁরা করোনারি কষ্ট থেকে অনেকটা বেঁচে যান। বয়স এঁদের ৪০-এর উপর। মহিলাও আছেন, পুরুষও আছেন। কেউ বা কাজের শেষে ঘরে ফিরে খেলাধুলো করেন বা কায়িক শ্রমের হবি নিয়ে থাকেন অথবা ঘরের কাজ করেন, কেউ বা বসে বইপত্র ম্যাগাজিন ঘেঁটে আর টেলিভিশন দেখে সন্ধ্যা কাটান। দীর্ঘদিনের শেষে ফল দেখা দেয়। দুই দলের মধ্যে বসে থাকা মানুষগুলি ভুগতে থাকেন নানা উপসর্গে। আমাদের মধ্যেও তাই ধনীগৃহিণীদের বসে থাকা শরীরে সহজে রোগ ধরে। নিজের জন্য তো বটেই, পরিবারে সকলের স্বাস্থ্যের জন্য কায়িক শ্রমের শখ, যেমন ধরুন বাগান করা, সুবিধা হ'লে বাইরে বেড়ানো ইত্যাদিতে আগ্রহ জন্মানো দরকার। ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েরাও তাহ'লে ঘুরে ফিরে, হাসি আমোদে জীবন কাটাতে শিখবে।

শ্রীমতী

আমোদ-প্রমোদ কলকাতা

প্রত্যেক ঋতুতেই এমন এক-একটা দিন হয় যে দিনগুলো অন্যান্য দিনের থেকে আলাদা। একটু ছন্নছাড়া, এলোমেলো—অগোছালো বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া, কখনো রোদ, কখনো মেঘ—কিছুতেই আগে থেকে বলা যায় না দিনটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে। এ রকম দিনে আমাদের সকলেরই মনে হয় দৈনন্দিন জীবন থেকে সরে এসে একটু আলাদাভাবে সময় কাটাতে হবে—কোথাও একটু বেড়িয়ে আসার, কোথাও একটু যাওয়ার, বড়ই ইচ্ছে হয়—এ রকম দিনে বিলেত-ফেরতদের স্বভাবতঃ একটু হোম-সিক্ লাগে, তারা পরস্পর পরস্পরকে মনে করিয়ে দেন ঈদৃশ দিনে লণ্ডন-নিউইয়র্কে হ'লে কোথায় কোথায় তাঁরা যেতে পারতেন, কেমন-কেমন মজা ক'রে কী কী খেতেন, এবং তার থেকে চলে যান সাধারণ এক আলোচনায় যার মূলে বক্তব্য এই যে কলকাতা শহরে আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থাই নেই, জীবন এখানে শুষ্ক, ফিরে আসাই ভুল হয়েছে, কীভাবে এমন 'আউটলেট্‌হীন' (এই শব্দটি এঁরা খুব ব্যবহার করেন) জীবনযাপন সম্ভব তাঁরা একদম বুঝতে পারেন না।—আমি সাধারণত আমার বন্ধুদের এইসব আলোচনা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে থাকি, সেদিনও শুনছিলাম—আমরা তিন বন্ধু কিছু একটা করা যাক এরকম এক উদ্দেশ্য নিয়ে খবরের কাগজের সিনেমা-পৃষ্ঠা খুলে ধরেছি সামনে, আমার দুই সদ্য বিদেশ থেকে প্রত্যাগত বন্ধু আমাকে ভার দিয়েছে প্রোগ্রাম ঠিক করবার। আমি কাগজ হাতে নিয়ে নানান অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণীয় হাতছানিতে বিমোহিত। •

প্রথমেই আমার চোখে পড়ে ভারতী অপেরার চিত্তাকর্ষক যাত্রার বিজ্ঞাপনে—"জোয়ান ছেলে (সাজাহান) পান্না চক্রবর্তীর চোখের সামনে ৫৫ বৎসরেও যুবতী (নূরজাহান) চিত্রা মল্লিকের সর্বগ্রাসী প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে আত্মভোলা (জাহাঙ্গীর) গোপাল চট্টোপাধ্যায় কেমন ডুবছে আর উঠছে আর ডুবছে: তাঁকে তুলে ধরতে অনেক স্বনামধন্য গুণীজনের বহু চেষ্টার বিফলে তৈরী হয়েছে—ব্রজেন দে রচিত "পাপের ফসল"।—আমি 'পাপের ফসল' দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি, আত্মভোলা গোপাল কেমন ডুবছে আর উঠছে, উঠছে আর ডুবছে, এই দৃশ্য দেখার জন্য আমার মন উন্মন হয়ে ওঠে।—'পাপের ফসল' ছাড়াও অনেক যাত্রা হচ্ছে শহরে—নট্ট-কোম্পানির যাত্রা পার্টি রবীন্দ্র-সদনের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রঙিন প্রেক্ষাগৃহে "মহীয়সী কৈকেয়ী", "করুণাসিন্ধু বিদ্যা-সাগর", "সিংহগড়" প্রভৃতি মঞ্চস্থ করছেন। প্রতি শীতেই যাত্রার বিজ্ঞাপনে রবিবারের কাগজ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তবে সম্প্রতি লক্ষ করছি যাত্রায় কলকাতার তরুণ বুদ্ধিজীবীরা নতুন ক'রে উৎসাহ নিচ্ছেন। মার্কিন দেশে ফোক্‌-লোর বিভাগগুলি নানাদেশের লোকশিল্প বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান সব গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করার ফলে সারা পৃথিবীতেই লোকশিল্পের প্রতি সচেতনতা এসেছে; সম্প্রতি ব্রেখ্‌ট, এপিক্ থিয়েটার, থিয়েটার অফ্ দি অ্যাবসার্ড নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা যাত্রা বিষয়েও খুব উৎসাহিত এখন।

যাত্রার পর আমি চোখ ফেরাই কী কী সিনেমা চলছে সেই দিকে। প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনই চিত্তাকর্ষক— কোনোটির "নারীর জন্য নারীর আত্মত্যাগের জ্বলন্ত মর্মস্পর্শী কাহিনী", কোনোটির বাণী "যে আগুন দহন করে সে আগুনেই প্রদীপ হয়ে জ্বলে" এবং প্রশ্ন "তবু আপনার চোখে জল কেন?" অতঃপর আছে "অজস্র অর্থ ব্যয়ে এবং অভূতপূর্ব শিল্পী সমাবেশে প্রতি-হিংসার এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-আলেখ্য", আছে "দেশ-প্রেমের মহান আদর্শে গুপ্তচর-বৃত্তির রোমহর্ষক চিত্র", আছে এমন বায়স্কোপ যা "সারা শহরকে নাচে গানে মাতিয়ে তুলছে", আছে এমন পালা যা "ভক্তি আর গানে সকলের মন জয় করছে",

এবং অন্যদিকে প্রগতিশীল "আন্দামানে জীবন গড়ার সংগ্রাম" দেখানো হচ্ছে—দেখানো হচ্ছে "নীল কমল", "সংঘষ", "মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ৫৫", "কাল জোগিরা হ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা"।

সিনেমা থেকে আমি চোখ ফেরাই "গুণিজন-সংবর্ধনা ও বিচিত্রানুষ্ঠানে"র দিকে। অ্যাম্বুলেন্স তহবিলের সাহায্যার্থে উত্তমকুমার গান গাইবেন (যারীন ধরের সৌজন্যে), তবে একা—কিন্তু অন্য আরেক জায়গায় প্রোগ্রাম আরো আকর্ষণীয় কেননা সেখানে উত্তম সুচিত্রার সঙ্গে মিলিত হয়ে গাছপালা, লতাপাতা, প্রেম বিষয়ে গৌরী-প্রসন্নের সুললিত সংগীতরাজি অনুপম কণ্ঠে দর্শকবৃন্দের কর্ণে পৌঁছে দেবেন।—অন্য এক জায়গায় গুণিজন-সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে মাধবী মুখোপাধ্যায়কে, তাঁকে আবার সংবর্ধনা দেবেন তনুজা নাম্নী বম্বাই তন্বী—সংবর্ধনার পর গান হবে হেমন্তকুমার, শ্যামল ও সবিতাব্রতর এবং নাচ হবে বোন রত্নাকি ও বন্দনাকির। অন্য এক সংস্থা রবীন্দ্রসদনে "সংগীতময় অভূতপূর্ব কুমার সমাবেশ" আয়োজন করেছেন—বাংলার তিন কুমার হেমন্ত, উত্তম ও কিশোর কেউ

[illegible] কেউ বা অন্য কিছু করবেন। সর্বনিম্ন [illegible] দশ টাকা।—বিচিত্রানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই সার্কাসের কথা এসে পড়ে, [illegible] রোমহর্ষক—"আমেরিকা, ইংলণ্ড, চীন, রাশিয়া, মহারাষ্ট্র, বাংলা প্রভৃতি দেশের (বাংলা এবং মহারাষ্ট্রকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে স্বীকার লক্ষণীয়) [illegible] শিল্পীদের সমাবেশ। ভারতের দ্রামা-[illegible] সুবৃহৎ পশুশালা ও চমকপ্রদ মনো-[illegible] খেলার বিরাট প্রদর্শনী। বিশেষ আকর্ষণ: ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ান রানা [illegible] বাহাদুরের নানাবিধ ভারোত্তোলন! [illegible] নারায়ণীর বক্ষে হস্তী উত্তোলন।"

—[illegible] সার্কাসের বিজ্ঞাপন পড়েই [illegible] বন্ধুকে বলল কি ঠিক [illegible] —আমি বললাম [illegible] সার্কাস দেখাতে [illegible] সার্কাস কী [illegible] আমি [illegible] না, [illegible] চুপ করে [illegible] নারায়ণীও [illegible] উঠাতে [illegible]

ডাকাত ডাকাত

[illegible] ডাকাতি সদর স্ট্রীটের [illegible] চুরি, [illegible] সমকালিকায় চুরি, [illegible] সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিষয়ে [illegible] ছিল, কিন্তু পুলিসদের কথা [illegible] আমি অসন্তোষজনক কথা বলে [illegible] এবং পুলিসদের [illegible] ভয় পাই—অতএব কলকাতার [illegible] বড় রাহাজানি বিষয়ে একদম চুপ [illegible] ভালো। আমি এইভাবে বলি যে, [illegible] আমাদের কোনোভাবেই দরকারি [illegible] নয়, যথেষ্ট সমবেদনার সঙ্গে [illegible] বিষয়ে কথা বলা প্রয়োজন।—[illegible] ডাকাত! তোমাদের কি সব [illegible] এমন ভাবেই করতে হবে? [illegible] তোমাদের ধরতে পারে না—[illegible] কেন এমন নৃশংসভাবে ওদের [illegible] পাশাপাশি পাড়ায় এক [illegible] মধ্যে দুবার অমন উদ্ধতভাবে [illegible] টাকা নিয়ে চলে গেলে; কোন [illegible] অন্য কোনো পাড়ায় রাতের [illegible], আরো কিছু দিন পরে ডাকাতি না [illegible] কি চলত না? পুলিস তো [illegible] কোনো ক্ষতি করে না, তাদের [illegible] ভিড়ের চাপে খেলার মাঠের মধ্যে [illegible] হয়েছে —ওরা কি কিছুই পারে না? এত অকৃতজ্ঞ হব আমরা! বেশী দিন আগে কোথায়, এই তো বছর দুয়েক আগে ক্রিকেট খেলার মাঠে একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব লোক ভীড়ের চাপে খেলার মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল—মাঠে ঢোকা ছিল বে-আইনী—এই আইন অমান্যের জন্য কী তৎপরতার সঙ্গে তোমরা তার শাস্তির ব্যবস্থা করলে, মাঠের মাঝে নিয়ে পনেরোজনে মিলে লাঠি দিয়ে মেরে হাত-পা ভেঙে দিয়েছিল; যা নিয়ম ন তা করলেই পুলিস মারে, সতীশ দাসকে কতই না মারা হয়েছিল। লোকেরা কি খবরের কাগজও পড়েন না? জানেন, পুলিস কী চতুর উপায়ে গোপন গুদোম থেকে গাঁজা উদ্ধার করে, রাস্তা দিয়ে একজন ছিনতাইকে পাঁচজনে মিলে নিয়ে যায়, লোকে গরু চরলে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে গরুদের ফাইন করে এবং রাতে মাতালের ন্যায় সামাজিক দিক থেকে বিপজ্জনক ব্যক্তিকে এরা পেট-পাম্প, মারধোর করতে কতই না তৎপর।—ডাকাতরা দুর্বৃত্ত, ওরা ধরেন্ধরে, ওদের গায়ে অনেক জোর, ওদের সঙ্গে কূটবুদ্ধিতে কুটিল লোকও পেরে উঠবে না, সেখানে পুলিসদের মত সরল যাদের মন এবং ধীর যাদের গতি তাদের পেরে ওঠা সম্ভব নয়।— এ ব্যাপারে পুলিসকে আলাদাভাবে দোষ দেবার কোনো মানেই হয় না। ওরা তো চেষ্টা করছেন; জামাজোড়ার দেখলেই লালবাজারে নিয়ে আসে লালবাজারে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গবেষণা চলে, রক্ত দেখলেই পরীক্ষা করা হয়, সন্দেহ হলেই (এমনকি যদি অমূলকও হয়) গ্রেপ্তার করা হয়, কথা বের করবার জন্য চেষ্টাও কি কম নাকি!—শ্রী পাঠকের মত ব্যক্তিরা অবিশ্বাসী, সরল বিশ্বাসে প্রাতঃকৃত্য করব বলে ঢুকে শিক বাঁকিয়ে পালানো তার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে (জেলখানার শিক রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ওর সেটা বাঁকানোর কী অধিকার আছে!)। পুলিস বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, এ-দেশে অধিকাংশ লোকেরই কোষ্ঠকাঠিন্য, পুলিস সেই ভেবেই আধঘণ্টার মধ্যেও সে না বেরুনোয় বিশেষ সন্দেহাকুল হয়নি। ডাকাত বলে কি তার কোষ্ঠকাঠিন্যও থাকতে পারে না?—এ ব্যাপারে পুলিসকে অনেকে হাসিঠাট্টা করে, আমার এই সমস্ত ব্যাপারটাই একদম পছন্দ হয় না।

পুলিস চেষ্টার পর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—সারাদিন তারা পার্ক স্ট্রীট সদর স্ট্রীট প্রিন্সেস স্ট্রীটে ঘোরাঘুরি করে, লালবাজারের সামনে সব লোকের দিকেই তাদের কড়া দৃষ্টি। কিন্তু দুর্বৃত্তেরা ভীষণ পাজি, পাজির পা-ঝাড়া, তারা সেই পাড়াতে সমকালিকায় আবার চুরি করল। পুলিসের জন্য আমার চোখে জল এসে যায়, এ-ভাবে একটি সরল বিশ্বাসী সংস্থাকে লাজে-গোবরে করবার কোনো মানে হয়?

মৌলিনাথ

জমকালো স্যাটিনে...
আপনাকে
আরও
সুন্দর
দেখাবে

জাতীয় সংহতি সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং উপপ্রধান-মন্ত্রী খুব জোরদার বক্তৃতা করিয়াছেন এবং অধিকন্তু হিসাবে উপপ্রধানমন্ত্রী "হিন্দু রাষ্ট্রের" তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।—"হিন্দী রাষ্ট্রের কথাটা অবশ্য উহ্যই থেকে গেল"—বলেন বিশু খুড়ো।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রতি-যোগিতায় রিচার্ড নিকসন জয়ী হইয়াছেন।—"যে-কোন একটা রদবদলেই শেয়ার বাজারে টালমাটাল দেখা যায়। কিন্তু

[illegible]কারের বাজারীদের খবর হল—এই জয়ে কচো চিংড়ি না ইলিশ কোনটারই দর এদিক সেদিক হয়নি তাঁরা বলেন—ইথে কী হইল কে নবেদর পিসির"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

পাক সরকার নাকি পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি নিলাম করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।—"অর্থাৎ স্যাকরার ঠাকুস ঠুকুসের বদলে একবারে কামারের এক ঘা বসালেন। অবশ্য পরের ধনে পোদ্দারি করতে গেলে এ হয়েই থাকে—নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন নিজের পাতে ঝোল টানা"—বলেন সহযাত্রী।

চিনের লু শাও চি-এর ভাগ্য সম্পর্কে অনেকেই অনেক প্রশ্ন করিতেছেন। বিশু খুড়োও বলিলেন—"দেবাঃ ন জানন্তি। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে, লু লেগে

যাওয়া অসম্ভব নয় এবং সেটাও বেশ মারাত্মক।"

সংবাদে প্রকাশ, সারা পৃথিবীতে নাকি অচিরেই হংকং ফ্লু ছড়াইয়া পড়িতে পারে। সহযাত্রী মুখখানি বিকৃত করিয়া বলিলেন—"বরাবর দেখে আসছি, রপ্তানি বাণিজ্যে আমরা চিরকাল পিছনে পড়ে আছি!!"

বোম্বাইতে শুনিলাম একটি যন্ত্র-গণক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যন্ত্র-গণক কি কি করিতে পারে তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, কৃষিক্ষেত্রে নবীন প্রাণের সঞ্চার, উন্নত ধরনের বীজ সৃষ্টি হইতে আবহাওয়ার অগ্রিম নিশানা, পশু প্রজননের রহস্য ভেদ, জন-গণনা, ভোট গণনা সমস্তই মায়া বলে যন্ত্র-গণকের দৌলতে পলকে ঘটিয়া যায়।—"ভোট গণনা হয়ত পলকেই ঘটে কিন্তু ভোট সংগ্রহ ওতে হয় না, আবহাওয়ার নিশানা সে দিতে পারে, কিন্তু পথ-মিছিলের নিশানা সম্পর্কে যন্ত্র-গণক নিতান্তই যন্ত্র"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পুলিশ সুন্দরবনে গাঁজার চাষ আবিষ্কার করিয়াছে।—"চাষীদের তারিফ করব। তারা আবিষ্কার করেছে

গাঁজাটা মধুর চেয়ে মধুরতর।" অতঃপর শ্যামলাল—"এক ছিলিমে যেমন তেমন দুই ছিলিমে তাজা, তিন ছিলিমে উজীর নাজির, চার ছিলিমে রাজা" গান শুনাইয়া মন্তব্য শেষ করিল।

মাটি ছাড়াই ধানের বীজ বপনের একটি অভিনব পন্থার কথা শুনিলাম। সহযাত্রী বলিলেন—"পন্থাটা খুব নূতন নয়, অনেক ধানের বীজ হাওয়াতে রোপণের কথাও যে মাঝে মাঝে না শুনেছি এমন নয়!!"

স্বর্গত ডঃ বি সি রায়ের গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরা প্রকল্পে সরকার আবার হাত লাগাইবেন বলিয়া নাকি চিন্তা করিতেছেন।—"এই সঙ্গে সর্ষপ তেলের যৎকিঞ্চিৎ মূল্য হ্রাস সম্পর্কেও চিন্তা করুন, আমরা গভীর জলে মাছের পুচ্ছ তাড়না দেখি এবং তপ্ত কটাহে তৈল নিক্ষেপ সড়গড় করি"—বলেন সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ, পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাত্রদের জন্য পিকিং হইতে উপহার হিসাবে নাকি কিছু কাপড় পাঠানো হইয়াছে। উপহারের শর্ত হইল : এই কাপড় দিয়া মাও কোট বানাইতে হইবে।—"শুনলাম পেশোয়ারি অভ্যাগত ছাত্ররা নাকি 'টান' কোট' হতে রাজি হননি। ভাবছি পরবর্তী উপহার হয়ত লুঙ্গি, ধোলাইটা ওদের আসে ভালো"—বলে শ্যামলাল।

একটি সরকারী ঘোষণা : ১ নবেম্বর হইতে বোতলে দুধ মিলিবে। সেকেন্ড চাইল্ডহুড বয়সী খুড়ো আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"বোধ হয় ফিডিং বটল!!"

উজ্জয়িনী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, একদল ছাত্র জোর করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করায় নিখিল ভারত কালিদাস জয়ন্তী সমারোহের তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান পণ্ড হয়।—"কালিদাস ঋতু সংহার-ই রচনা করে-ছিলেন, তখন কালিদাস-সংহারের কথা ভাবেন নি"—বলেন সহযাত্রী।

মাদক দ্রব্য বর্জনের প্রশ্নে ওয়ার্কিং কমিটির সাত বছরী মেয়াদে খুশি হইতে না পারিয়া ডঃ সুশীলা নায়ার নাকি পদত্যাগ করিয়াছেন।—"ডঃ নায়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের এক ঢিলে দুই পাখী মারার কথাটা ধরতে পারেননি। সাত বা ষাট বছর পরে কোন্ দেবতা কোন পাটে বসেন তার ঠিক নেই। তেমন দিন এলে তখন কার মদ কে খায় তার হিসেব কে রাখে"—বলেন সহযাত্রী।

এই প্রসঙ্গে সহযাত্রী একটি গল্প শুনাইলেন : "বহু বছর আগে ধাঙড়দের এক সভায় গান্ধীজী জনৈক অথর্ব বুড়ো এক ধাঙড়কে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—আরে ভাই, তুম শরাব কিঁউ পিতে হো। বৃদ্ধ প্রশ্ন শুনে হাসতে হাসতে বলল—আরে বাপুজী, আপকো ক্যায়া মালুম হ্যায়, বড়ি মজাদার চীজ হ্যায়, কথা শুনে গান্ধীজী হো হো করে হাসতে লাগলেন। ডঃ সুশীলা নায়ার হয়ত এ গল্প শোনেন নি।

চলচ্চিত্র পুরস্কারে বাংলার তিনটি স্বর্ণপদক লাভ প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো বলিলেন—"আগামী অলিম্পিকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর কোন ব্যবস্থা হলে ভারত হয়ত অন্তত একটি সোনার মেডেল পেয়ে যাবে!!"

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?

আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না।

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বোঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড্ দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ তিনমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট D-Z. পোস্টবক্স ৭২৭, বোম্বাই-১।

সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

APE-Aiyars S. 1 BEN

শারদ সাহিত্য : একটি সমীক্ষা

শুভ আচার্য

শারদীয় সংখ্যা কেমন হল, কি পেলুম, কি পেলুম না; সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে—এইসব বুঝবার জন্য মোটামুটি একটি আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। ভূমিকা ছাড়াই প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

সাংবাদিক কর্মচারীদের প্রায় দু' মাস-ব্যাপী ধর্মঘটের ফলে এবার শারদীয় সংখ্যা 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ হতে পারেনি। শারদীয় সাহিত্যের সেজন্য পাঠকের কাছে এই ঘটনা শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, বেদনা-[illegible] বটে। পুজোর মরসুমে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় আজকাল এবং [illegible] প্রতিটি কাগজই নিজেদের সংখ্যাকে নানা উপাচারে সাজিয়ে পাঠকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তথাপি, এই দুটি পত্রিকার অনুপস্থিতি বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা গেছে। কারণ দুটি। প্রথমত, বাংলা সাহিত্যকে বাঙালীর শ্রেষ্ঠতম উৎসবের অন্যতম উপলক্ষ করে তোলার [illegible] আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর হাতে, এঁরাই বাংলা দেশের প্রথম শারদীয় সংখ্যার প্রকাশক। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিনের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, নিছক অর্থোপার্জনের [illegible] হিসেবে শারদীয় সংখ্যাকে [illegible] না করে 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রায় সংসাহিত্য পরিবেশনের চেষ্টা করেন; শারদ উপলক্ষের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রচনা মোটামুটিভাবে এই দুটি পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। আনন্দবাজার ও দেশ অপ্রকাশিত থাকায় আক্ষেপ, সুতরাং, লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষেরই সমান; এবং এই আক্ষেপ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকেনি।

এই প্রধানের অনুপস্থিতি অন্যান্য পত্রিকাগুলিকে দৃষ্টি আকর্ষণের ও অধিক সংখ্যায় প্রচারের যে সুযোগ এনে দিয়েছিল, তার কতোটা সদ্ব্যবহার হয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। অবশ্য এটা ঠিক, ইদানীং অধিকাংশ পত্রিকাই শারদীয় সংখ্যা পরিকল্পনা করেন ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে নজর রেখে, জনপ্রিয় লেখকের নাম ও উপন্যাসের সংখ্যাধিক্যের উপর বাজি ধরে। দেখে মনে হয়, সাহিত্য মানেই যে উপন্যাস—ছোটগল্প নয়, ব্যক্তিগত বা তত্ত্বমূলক নিবন্ধ নয়, নাটক নয় এবং নিশ্চয় কবিতা নয়, এরকম একটি আজগুবী তথ্যকে প্রায় জোর করে পাঠকদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা চলছে। এই উপলক্ষে কবিতা বাতিল হয়েছে অনেক দিন আগেই, প্রবন্ধ ও নাটকের অবস্থাও অনুরূপ, রুচিশীল পত্রিকা ভিন্ন আর কেউই এখন এদের আমল দেন না। দু-এক বছর আগে পর্যন্তও ছোটগল্পের তবু কিছুটা কদর ছিল; এ বছর শারদীয়ায় ছোটগল্পকেও দেখছি প্রায় পতিতের দলে। পরিবর্তে উপন্যাসের ছড়াছড়ি। কেউ সাতটি, কেউ আটটি, কেউ ন'টি পর্যন্ত উপন্যাস ছেপেছেন (দৃষ্টান্ত : 'প্রসাদ', 'সিনেমা জগৎ' প্রভৃতি); তিনটি বা চারটি উপন্যাস তো প্রায় সব কাগজেই আছে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় এগুলি সব নামী লেখকের দামী লেখা; উত্তেজক শ্বাসরোধকারী, চাঞ্চল্যকর ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত। কিন্তু, প্রশ্ন, পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন, ষাট, বড় জোর বাহাত্তর পৃষ্ঠার এইসব রচনা কি সত্যিই উপন্যাস? প্রকৃত উপন্যাস পাঠের তৃপ্তি কি পাঠক পাচ্ছেন এর মধ্যে? বলা বাহুল্য, বাহাত্তর কি আশি পৃষ্ঠা পর্যন্ত এগুলি প্রায়ই পৌঁছতে পারছে না; যত সংক্ষিপ্ত সম্ভব পরিসরে তথাকথিত উপন্যাসগুলিকে যদি শ্বাসরোধ করে না রাখা যায়, তা হলে ছ'টা, সাতটা, আটটা, ন'টা উপন্যাসকে জায়গা দেওয়াও অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন পত্রিকায় আবার কুড়ি থেকে তিরিশ পৃষ্ঠার মধ্যেই 'উপন্যাস' শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর, উপন্যাসই যদি এত কম পরিসর দাবি করে, তা হলে 'নভেলেট' নামে বিজ্ঞাপিত বস্তুটির দশ কি পনেরো পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ায় অসুবিধা কি! (জলসা পত্রিকায় প্রকাশিত সমরেশ বসুর নভেলেট 'ইতি', পৃষ্ঠাসংখ্যা, ছবি ও বিজ্ঞাপন নিয়ে সাকুল্যে এগারো; আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নভেলেট 'রমা মিত্র এবং মালবী মিত্র', পৃষ্ঠাসংখ্যা সাকুল্যে তেরো)। বলা বাহুল্য, এর পর বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ-সম্পদ বলে খ্যাত ছোটগল্পের জন্য কোন বরাদ্দই আশা করা যায় না; ছোটগল্প তাই অপাঙক্তেয়, উপন্যাস, নভেলেট ইত্যাদিকে জায়গা দিয়ে যদি কিছু পাতা পড়ে থাকে, তবেই আসছে ছোটগল্প।

এই অবিমৃষ্যকারিতার দায়িত্ব কে নেবেন—প্রকাশক? লেখক? বা, পাঠক? পাঠককে টেনে এনে লাভ নেই। ধরেই নেওয়া যায়, পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে তাঁরা পক্ষপাতহীন, একই সময়ে অসহায় ও অন্ধ, নিতান্তই কপাল ঠুকে কিনে ফেলেন। চালে কাঁকর, তেলে ভেজাল, বেবি-ফুডে কারচুপি মেনে নেওয়ার মতো সাহিত্যের বাজারেও তাঁরা অভ্যস্ত, নিরুপায় ক্রেতা। এই পাঠক বা ক্রেতার সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে যে-কোন কাগজেরই প্রচারসংখ্যা। পুজোর সময় আনন্দবাজার বা দেশ-এর মতো কিছু কাগজের আপেক্ষিক মনোপলি সত্ত্বেও পাঠকসংখ্যা ও ক্রয়ক্ষমতার গড়-পড়তা হিসেবে যে অতিরিক্ত চাহিদা থেকে যায়, সেই চাহিদা পূরণের জন্য দরকার আরও অন্তত সাত লক্ষ ইউনিট কাগজ, মিলিয়ে মিশিয়ে যা অন্তত পনেরো থেকে কুড়িটি কাগজের সম্মিলিত প্রচারসংখ্যা।

এই সংখ্যায় নজর দিলেই পত্রিকা প্রকাশক মহলের প্রতিযোগিতার চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসল প্রতিযোগিতার লক্ষ্য, কে কত বেশীসংখ্যক পাঠক-ক্রেতাকে নিজেদের কাগজ গছাতে পারবেন; এবং সেইজন্যেই তথাকথিত উপন্যাসের সংখ্যাবৃদ্ধি, তথা আনুষঙ্গিক অন্যান্য সস্তা বিষয়ের প্রলোভন উত্থাপন। সাহিত্যানুরাগ, রুচি, নীতি ইত্যাদি বর্জিত প্রতিযোগিতার ম্যারাথন দৌড় যে আরও কত 'আবর্জনা' তুলে আনছে, তার আর একটি প্রমাণ গত দু' বছরে 'যৌন' নামাঙ্কিত অত্যন্ত সস্তা ধরনের, চলতি কথায় রগরগে ও ফাজিল, পত্রিকার অধিক সংখ্যায় প্রকাশ। অবদমিত যৌন চেতনায় সুড়সুড়ি দিয়ে পাঠককে কাবু করার এই অসাহিত্যিক তথা অশারদীয় রীতিটি যে ফলপ্রদ হয়েছে, পত্রিকার স্টলগুলি ঘুরলেই তার সাক্ষ্য মিলবে। খ্যাতনামা লেখকের উত্তেজক উপন্যাসের পাশাপাশিই এতে থাকছে রতি-ক্রীড়ার সচিত্র বিবরণ, পতিতার আত্ম-জীবনী ধরনের লবণগন্ধী রচনা, তথা যৌনকাতরদের জন্য নানা স্নায়ুশোষক বিষয়। এর প্রতিষেধক নেই; কারণ, নতুন যাঁরা পাঠক, পাঁচ, সাত, কি দশ বছর আগে শারদীয় সংখ্যা কেমন ছিল, কি বিরাট এক-একটি বিস্ফোরণ ঘটত সেইসব দিনে, কতটা পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও যত্ন ব্যয় হত সংকলন প্রস্তুত করতে—সেসবের কোন স্মৃতিই নেই তাঁদের মনে।

প্রকাশকদের লক্ষ্য যেখানে যে-কোন উপায়ে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন, সেখানে

লেখকদের ভূমিকা কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কথিত, এ ক্ষেত্রে প্রধানের ভূমিকা প্রকাশকদের এবং তাঁদের ফরমায়েশ মেটাতে অসম্ভব চাপ পড়ে লেখকদের উপর। শুনেছি, এখন নাম-করা তথা পাঠক-প্রিয় লেখকদের পর্যাপ্ত নগদ মূল্যে দিতে পত্রিকা ব্যবসায়ীরা মোটেই কার্পণ্য করেন না; প্রায় ক্ষেত্রেই এই নগদ মূল্যের অংক এতই স্ফীত যে, তা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয় না। বিপুল অর্থের বিনিময়ে পত্রিকা-গুলির দাবি পূরণ করতে শুধু পুজোর মরসুমেই কোন কোন লেখককে লিখতে হচ্ছে পাঁচ-সাতটি উপন্যাস, প্রচুর গল্প ইত্যাদি। এই অবস্থায় লেখার মান পড়ে যেতে বাধ্য এবং হচ্ছেও তাই। পেশা হিসেবে সাহিত্যকে গ্রহণের অসুবিধা এইখানে, বিশেষত জনপ্রিয় লেখকদের পক্ষে; কলম না চললেও লিখতে হবে। ভয় হয়, এইভাবে হাওয়া বুঝে ফরমায়েশী লেখার রেওয়াজ কায়েম হলে অদূরভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় সাহিত্য নামে আর কিছু থাকবে না। এই সূত্রেই বলা যায়, পুজোর মরসুমের উল্লেখযোগ্যতা বর্তমানে আর উন্নত মানের সাহিত্যপাঠের জন্য নয় এবং এই আশা নিয়ে যদি কেউ শারদীয় সাহিত্যে অভিনিবেশ করেন, সর্বত্র ও লেখক-নির্বিশেষে না হলেও প্রায়ই তাঁকে হতাশ হতে হবে।

তবু, শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। আরও পাঁচটি উৎসবের মতো এই উপলক্ষও মিশে গেছে বাঙালীর রক্তে। পুজো হল, অথচ শারদীয় সংখ্যা বেরুল না, এটা আজ আর কেউ কল্পনায় আনতে পারবেন না; ঘটনা হিসেবেও তা হবে রবিবারহীন সপ্তাহের মতো অবিশ্বাস্য। বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি কি প্রবল, এই একটি উপলক্ষেই তার প্রমাণ মেলে। এত দৈন্য ও অনটন, রাজনৈতিক গোলযোগ, ক্রয়ক্ষমতায় টান ও বাজারে খাদ্যের হা-হুতাশ, তবু, ছোট-বড় নানা পত্রিকায় স্তূপীকৃত স্টলগুলি তো দিব্যি খালি হয়ে যায়। আর, অন্তত পরবর্তী এক দেড় মাস ধরে প্রকাশিত পত্রিকা ও রচনা-সমূহের নিন্দা বা স্তুতি ঘুরে ফেরে মুখে মুখে। তা ছাড়া, ইদানীংকার শারদীয় সাহিত্য নিয়ে যতই অপবাদের জিগির তুলি না কেন, নেই নেই করেও এরই মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি কিছু কিছু ভাল লেখা, আগ্রহ সৃষ্টি করার মতো লেখা। মজা এই, এক পত্রিকায় যে লেখক বিরক্তির সঞ্চার করছেন মনে, আর এক পত্রিকায় তিনিই আবার চমকে দিচ্ছেন। অনেক মন্দের মধ্যে কিছু ভাল, এর মূল্যই বা কম কি! এ বছরে প্রকাশিত রচনা-গুলি সম্পর্কে মোটামুটি একটা হিসেব-নিকেশ করলেই সে ধারণা স্পষ্ট হবে।

এখানে কবুল করা ভাল, বেশ কয়েকটি পত্রিকা পাঠের সুযোগ হলেও, কোন কোন পত্রিকা বর্তমান নিবন্ধকারের অগোচরেই থেকে গেছে। কিছু কিছু লেখাও থেকে গেছে অপঠিত। খুবই সম্ভব একই কারণে অনেক উল্লেখযোগ্য রচনা পাঠের সুযোগ হয় নি। এই ধরনের আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য; কোন কোন ক্ষেত্রে অংশত, কোথাও বা সম্পূর্ণ, মতের মিল হবে না। সেটা স্বাভাবিক। সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী আলোচনায় 'যৌন' চিহ্নিত কোন পত্রিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

কোন লেখক এবার সবচেয়ে বেশী লিখেছেন? সম্ভবত সমরেশ বসু; নিন্দা, প্রশংসা জড়িয়ে বর্তমানে যিনি বাংলা ভাষার সবচেয়ে বিতর্কিত লেখক। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর পাঁচটি উপন্যাস আমারই চোখে পড়েছে, এর বাইরেও হয়তো আছে, গল্পও তিনি লিখেছেন অনেকগুলি। 'অমৃতে' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'পাতক' পূর্ববর্তী 'বিবর' ও 'প্রজাপতি'র পর্যান্তর। এই রচনাটি হয়তো বা তাঁর সম্পর্কে আর এক দফা বিতর্কের সৃষ্টি করবে। আশাপূর্ণা দেবীর রচনার পরিমাণও কম নয়। তুলনায়, বাংলা ভাষার প্রবীণ লেখকগণ: তারাশংকর, বনফুল, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, মনোজ বসু, গজেন্দ্র-কুমার মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতির রচনাসংখ্যা অনেক কম। বুদ্ধদেব বসুর মাত্র একটি উপন্যাস ও দুটি গল্প আমার পড়বার সুযোগ হয়েছে। সম্প্রতি নাটক নিয়ে নতুন পরীক্ষা করছেন তিনি, কিন্তু এবার পুজোয় তাঁর কোন নাটক প্রকাশিত হয় নি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদাশংকর রায় বরাবরই কম লেখেন, এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা আলাদা করে বলতে হয়। রহস্য-কাহিনী রচনায় তিনি যে অধিক উৎসাহী, এবারের অন্তত দুটি উপন্যাসে তার প্রমাণ মিলবে। রহস্য ছাড়া অন্য কোন পটভূমি-নির্ভর তাঁর কোন রচনা দেখিনি। বিমল মিত্র লিখেছেন একটি মাত্র উল্লেখ-যোগ্য উপন্যাস, 'প্রসাদ' পত্রিকায়। তাঁর গল্পের সংখ্যাও কম। সুবোধ ঘোষ লিখেছেন তিনটি উপন্যাস। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার কম লিখেছেন। বেতার জগতে প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বড়গল্প 'দ্বৈরথ' একটি কুশলী রচনা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখেছেন তিনটি উপন্যাস ও বেশ কয়েকটি গল্প; এর মধ্যে দুটি উপন্যাস মনে রাখার মত। রমাপদ চৌধুরী ও শংকর দুই জনপ্রিয় লেখক, কিন্তু দুজনের কেউই এবার বিশেষ লেখেন নি। রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন মাত্র দুটি গল্প, 'সাজঘর' ও 'ঘরণী' পত্রিকায়। 'উল্টোরথ' ও 'জলসা'য় প্রকাশিত শংকরের দুটি রচনাই ভ্রমণ-বৃত্তান্তনির্ভর রম্য কাহিনী। এঁদের তুলনায়, অনেক দিন পরে সন্তোষকুমার ঘোষ বেশ কিছুসংখ্যক রচনা প্রকাশ করেছেন, এর মধ্যে উপন্যাসই তিনটি। এই বছরেই পাওয়া গেছে সন্তোষকুমারের প্রথম নাটক 'অজাতক বা প্রতিদিনের মৃত্যু', একটি নতুন ধরনের রচনা, প্রকাশিত হয়েছে 'ধর্নি' পত্রিকায়। বিমল করের রচনার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস ও দু' তিনটি গল্প। এর মধ্যে 'জলসা'য় প্রকাশিত তাঁর 'কুশীলব' উপন্যাসটি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

উপরোক্ত বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে, বাংলা ভাষার খ্যাতিমান লেখকদের অধিকাংশই গল্পের চেয়ে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করছেন বেশী, অন্তত এ বছর তাই করেছেন। এমন কি ছোটগল্পেই যাদের প্রসিদ্ধি তাঁরাও উপন্যাসের দিকে ঝুঁকেছেন। প্রকাশিত উপন্যাসসমূহের অনেকগুলিই পাঠকপাঠিকার ভাল লাগতে পারে; কিন্তু, যে-কোন কারণেই হোক, এবারের গল্প সম্পর্কে জোর করে এ কথা বলা যায় না।

আপাতত বিভিন্ন শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত বিশিষ্ট কয়েকটি উপন্যাসের উল্লেখ করা যেতে পারে:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বর তুমি বলো (উল্টোরথ), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—কুমারসম্ভবের কবি (সিনেমা জগৎ), বনফুল—অধিকলাল (নবকল্লোল), প্রেমেন্দ্র মিত্র—পরাশর এবার জহুরী (অমৃত), মনোজ বসু—প্রেমিক (যুগান্তর), বুদ্ধদেব বসু—শ্রীপতি ও আরতি (প্রসাদ), সুবোধ ঘোষ—এক পথিক (দীপান্বিতা), বিমল মিত্র—কুমারী রত (প্রসাদ), সুশীল রায়—[illegible] (সাপ্তাহিক বসুমতী), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—সর্পিল (সিনেমা জগৎ), প্রতিভা বসু—স্ফুলিঙ্গ (রূপম), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—যার যেথা ঘর (বেতার জগৎ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—ত্রিনয়ন (সাপ্তাহিক বসুমতী), দীপক চৌধুরী—খোঁয়াড় (ঘরণী), সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—ক্রীড়াভূমি (শ্রীমতী), সন্তোষকুমার ঘোষ—সকাল থেকে সকালে (প্রসাদ), বিমল কর—কুশীলব (জলসা), সঙ্গিনী (দীপান্বিতা) সমরেশ বসু—পাতক (অমৃত)।

রচনাগুলির বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এদের ভাল বা মন্দ বলা হয় নি, বলা হয়েছে 'বিশিষ্ট', শুধু এই কারণে যে, কেউ যদি এই রচনাগুলি পড়েন, তা হলে সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবেন।

তরুণ লেখকদের মধ্যে এবার সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় লিখেছেন সমরেশ

গঙ্গোপাধ্যায় এবং দিব্যেন্দু পালিত। [illegible] প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও প্রসাদ পত্রিকায় দিব্যেন্দু পালিতের 'রিপুদহন' দুটি ভিন্নধর্মী উপন্যাস, পূর্ববর্তীদের চিন্তাধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। একই সময়ে উল্লেখ্য অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কিংবদন্তীর সূর্য' (এক্ষণ)। [illegible] প্রকাশিত 'যুদ্ধ' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি সুদীর্ঘ কাহিনী। নরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাস চোখে পড়েনি, কিন্তু বিভিন্ন রসের অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। তিনটি গল্পে পুরোপুরি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন দেবেশ রায়। উপযুক্তদের তুলনায় মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখে লক্ষণীয়ভাবে নীরব। এঁদের প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা [illegible] একটির বেশী নয়। পৃথক পৃথকভাবে [illegible] আলোচনায় না গিয়েও এবারের [illegible] একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ [illegible] পারে, তা হল তরুণ লেখকদের [illegible] বেশী রচনার প্রকাশ। অন্তত পত্রিকা [illegible] যে তরুণদের অপরিহার্য মনে [illegible] এবং ব্যবসায়িক শর্ত পূরণে তাঁদের [illegible] স্বীকার করে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন, [illegible]। উপরোক্তগণ ছাড়াও কবিতা সিংহ, [illegible] সিরাজ, শংকর চট্টোপাধ্যায়, [illegible] উপন্যাস প্রকাশিত [illegible] পত্রিকায়। একসঙ্গে একজন [illegible] উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া নিশ্চয় [illegible] নয়।

[illegible] তরুণ লেখকের নাম [illegible] মোটামুটি তাঁদের সকলেই [illegible] গত দশ বছর কি এক যুগ ধরে। বয়সের বিচার ছাড়া এঁদের আর তরুণ বা নবীন বলা যাবে কিনা ভাববার বিষয়। আমার প্রশ্ন, এঁদের পরবর্তী জেনারেশন কোথায়? শারদীয় সংখ্যাগুলি খুললেই চোখে পড়ে বহু পুরনো ও পরিচিত নাম: এমন কি, এমন অনেক নাম, যাঁদের রচনা [illegible] আমাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে না। [illegible], অনেকেরা নতুন লেখক, টাটকা, [illegible] দেবার মত লেখা নেই। নিছক [illegible] প্রবৃত্তির উর্ধ্বে সাহিত্যকে যত [illegible] স্থান দেওয়া হবে, আশঙ্কা হয়, [illegible] নবীন তরুণ, শক্তিমান লেখকরা থাকবেন অবহেলিত। এটা পরিতাপের বিষয়।

শারদীয় কথাসাহিত্যের আর একটি প্রবণতার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি। বিশেষ বিশেষ ব্যতিক্রম বাদ দিলে, অধিকাংশ লেখকরাই চেয়েছেন সহজ পথে পাঠকের মন ভোলাতে। ফলে, অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমদানি হয়েছে সেইসব বিষয়ের, যেগুলি কোনক্রমেই সং অনুসন্ধিৎসাপ্রসূত নয়। দেশ-কাল-সমাজ-মানুষ ও ইতিহাসসম্পৃক্ত যে অভিজ্ঞতা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক সে অভিজ্ঞতার চিহ্ন এবারের শারদীয় কথা-সাহিত্যে প্রায় বিরল। বা, থাকলেও, আছে অন্যভাবে, চোলাই হয়ে। বৈচিত্র্য? হ্যাঁ, আছে; কিন্তু প্রায়ই সেটা কল্পনানির্ভর-অপ্রয়োজনীয় চমকসৃষ্টির তাগিদে রচিত এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই একটি বছরেই দেখা গেল ঠাণ্ডা ঘরের শান্তিতে বসে কিছু লেখক চমৎকারভাবে আধুনিক ও ইওরোপীয় হয়ে উঠছেন; হেনরী মিলার, কামু, সার্ত বা জাঁ জেনে পাঠের অন্ধ উদ্গার ছড়িয়ে দিচ্ছেন যত্রতত্র। অনাবশ্যক যৌন বর্ণনা সাজিয়ে পাঠকের মন ভেজানো—অন্তত পঞ্চাশ ভাগ লেখকই এর শিকার। কোনরকমে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিলেই হল, অতঃপর লেখকের যাবতীয় প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে কালবিলম্ব না করে উভয়কে কি করে বিছানায় টেনে আনা যায়, সেদিকে: অপ্রাসঙ্গিক ও কাকতালীয় হলেও, সেদিকে। এই ধরনের রমণপ্রবণতা অনেক সম্ভাবনাময় কাহিনীর বিকাশ ঘটতে দেয় নি। সাহিত্যের প্রয়োজনে সেক্স কে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এইসব লেখকরা তা জানেন না। যাঁদের প্রয়োজন নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যেহেতো না ব্যবসায়িক হলে, রচনার মধ্য থেকে যা ফুটে বেরোচ্ছে তা জটিল নয়, রচয়িতার পতনশীল রুগ্ণ বিবংসু মন।

শারদীয় সংখ্যার ক্রমবর্ধমান রূপপ্রবণতা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কি অন্তরায় সৃষ্টি করছে এবং কিভাবে, উপরে তার আভাস দেওয়া হল মাত্র। আর একটি দুর্লক্ষণও এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যক্তি ও প্রকাশক পাঠকদের চোখে ধুলো দিয়ে কিছু মুনাফা লুটে নিচ্ছেন—যাঁদের কাজ খ্যাতনামা, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পুরনো এবং পূর্ব-প্রকাশিত রচনা উপযুক্ত স্বীকৃতি ছাড়াই পুনরায় প্রকাশ করা। এই কারচুপি আবিষ্কার করা পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। শারদীয় সংখ্যা হিসেবে এইরকম ক'টি পত্রিকা বেরিয়েছে তা বলা কঠিন। তবে, 'মৌসুমী' নামে একটি পত্রিকা দেখবার সুযোগ হল, যাতে প্রকাশিত হয়েছে নরেন্দ্র-নাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত সহ আরো অনেক সুপরিচিত লেখকের গল্প ইত্যাদি, যেগুলি অন্যত্র ও পূর্বপ্রকাশিত রচনা। সাহিত্যকে ব্যবসার স্তরে নামানোর অধিকার হয়তো কোন কোন প্রকাশকের এক্তিয়ারভুক্ত, কিন্তু, উপরোক্ত ধরনের প্রতারণা ক্ষমার্হ কিনা, পাঠকগণ তা বিচার করে দেখবেন।

মিল্কমেড আপনার প্রতিদিন জীবনের অঙ্গ

CONDENSED MILK
MILKMAID BRAND
SWEETENED

আপনার বাচ্চাকে প্রথম তিন মাস মিল্কমেড সুমিষ্ট কনডেন্সড মিল্ক খাওয়ান। মিল্কমেড সম্পূর্ণ খাঁটি, পুষ্টিকর আর হজম করাও সহজ। ক্ষীরের মত ঘন ও মোলায়েম। খাঁটি পরিশুদ্ধ চিনি মিশিয়ে সুমিষ্ট করা—আপনার বাচ্চার খুবই ভালো লাগবে। ☐ শুধু বাচ্চাদের নয়—মিল্কমেড বাড়ীর সকলেরই মুখে লেগে থাকবে। এবার কয়েক টিন কিনতে ভুলবেন না। দেখবেন, মিল্কমেড দিয়ে কত নতুন ধরণের খাবার তৈরীর কথা আপনার মনে আসে। মিল্কমেড ক্ষীরের মত সুধ—খাঁটি, টাটকা, উপাদেয়।

মিষ্টান্ন আরও মুখরোচক হয়

ফল বা পুডিং এর ওপর মাখিয়ে খেতে চমৎকার
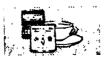
চা আর কফিতে এনে দেয় মনোরম মালাইদার আস্বাদ

মিল্কমেড সুমিষ্ট কনডেন্সড মিল্ক—জানা কথা সেরা জিনিস, কেননা নেস্‌লের তৈরী।

NPM 7400

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

গত ২ নবেম্বর দেশে আসামের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া স্মরণে পড়ে সুখী হলাম। শ্রীযুত সুধাংশুবাবু অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে তাঁর সাহিত্য ও কবি মানসের ওপর আলোকপাত করেছেন। উনি অসমীয়া ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নিজস্ব আহোম ভাষা আজকের বর্তমান বা প্রাচীন অসমীয়া ভাষা নয়। কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে, যেমন বুরঞ্জীর ভাষায়।" "নিজস্ব ভাষা" বলে যদি উনি লক্ষ্মীনাথের নিজস্ব ভাষা আহোম ভাষা এই অর্থ করেছেন তাহলে সেটা সঠিক নয়। প্রথমত লক্ষ্মীনাথ আহোম ছিলেন না। উনি আর্য ব্রাহ্মণ। বেজবরুয়া তাদের আহোম রাজার দেওয়া উপাধি। দ্বিতীয়ত আহোম ভাষা কোনদিনই আসামের ভাষা ছিলো না। দূরদর্শী আহোম রাজারা এই দেশে এসেই এখানকার ভাষা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের এই ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া হত। সুতরাং আহোম রাজ-দরবারে যে বুরঞ্জী রচিত হয়েছিলো তাতে আসামের কথিত ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছিল। এইখানে আর একটি কথা বলা দরকার। আসামের আর অন্যান্য ভাষার মতই আহোম ভাষাও অসমীয়া ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এমন কি কতকগুলো স্থানের আর নদীর নাম আহোম ভাষা অনুসারে হয়েছে।

বিনোদ শর্মা
কলকাতা-৯

ডঃ খোরানা

'দেশে' (৯ই নভেম্বর ১৯৬৮) প্রকাশিত 'বিশ্ববিজ্ঞান' নিবন্ধটি সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

নিবন্ধকার শ্রীচট্টোপাধ্যায় ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার কাজের অসামান্য গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত হয়েও তাঁকে দেশপ্রেমের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচারের প্রয়াস পেয়েছেন। অপরাধ তাঁর ভারত-ত্যাগ। কিন্তু এই সামান্য (অসামান্য?) কথাটা কেন তিনি বিস্মৃত হচ্ছেন যে, খোরানা ভারত-ত্যাগ করেছেন লালফিতে-তন্ত্রের অভদ্র উৎপীড়নে বীতশ্রদ্ধ হয়ে—তার আগে নয়; আমেরিকার নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার Creature comforts-এর মোহেই যে তিনি দেশত্যাগ করেননি, এ কথা তো সর্বজনবিদিত। তাঁর দেশত্যাগের মূলে ব্যক্তিগত উন্নতি স্পৃহার প্রেরণা গৌণতম। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, একমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেই মানুষ সার্বজনীন; সে সার্বজনীনতা দেশে থেকেও অর্জন করা যায়, বিদেশে গিয়েও করা যায়। সেখানে একমাত্র deciding factor হচ্ছে সুযোগের পর্যাপ্ততা। দেশপ্রেম অতি উত্তম বস্তু, কিন্তু তারই কড়া নেশায় মেতে অন্ধ থাকলে, ক্ষতিটা স্বদেশের—তথা সারা পৃথিবীর। ডঃ খোরানা যে ধরনের কাজ করতে চেয়েছিলেন, তার সুযোগ এখানে নেই বললে খুব বেশী অত্যুক্তি হয় না; আর সে সুযোগ করে নেবার জন্য যে পরিমাণ সময় ও শক্তির অপচয় হত, তার থেকে, যথার্থ সদ্ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানলক্ষ্মী যেখানে দু-হাতে ভরা সাজি নিয়ে অপেক্ষমানা, সেখানেই গমন কি বহুগুণে শ্রেয় নয়?

লেখক রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি বরেণ্যদের প্রসঙ্গ তুলেছেন। সাহিত্যে কীর্তিটা যতখানি প্রেরণানির্ভর, ততটা সচেতন-প্রজ্ঞা প্রসূত নয়। কাজেই সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ কোনো বিশেষ লেবরেটরিতে গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গটা এখানে আমার অবান্তর মনে হচ্ছে। আর জগদীশচন্দ্র? তাঁকে লেখা তাঁর সুহৃত্তম রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে: 'তোমাকে বারংবার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারত-বর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর......'

যে তরুণ বিজ্ঞানীরা 'সম্মানে লড়ে যাচ্ছেন দেশত্যাগী না হয়ে', তাঁদের সংগ্রাম-স্পৃহা সত্যিই শ্লাঘা-উদ্রেককারী! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই শক্তিক্ষয়ের ফলে, যাঁদের কাছে আশা করা যাচ্ছিল পর্বত, তাঁরা প্রসব করেন মূষিক। এই আমাদের ট্রাজেডি।

আশীষকুমার লাহিড়ী
কলিকাতা-৩৭

লক্ষ্মীর কৃপালাভ

গত ৫ই অক্টোবরের দেশ পত্রিকায় লক্ষ্মীর কৃপালাভ শিরোনামায় প্রকাশিত "আর্য বেকারী" শীর্ষক নিবন্ধে প্রকাশিত একটি তথ্যগত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিবন্ধের শেষাংশে ভুল-ক্রমে শ্রীপ্রেমাংশু দত্তের নাম মর্ডান বেকারিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মর্ডান বেকারিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, শ্রী আই, মহাদেবন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে মর্ডান বেকারিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ-এর কলিকাতা শাখার শীঘ্রই উদ্বোধন হচ্ছে।

এস কে গুপ্ত
জেনারেল ম্যানেজার
মর্ডান বেকারিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ
দিল্লী শাখা

(২)

২রা কার্তিক 'দেশ' পত্রিকায় "লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙ্গালীর সাধনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ১৭১৩—১৭১৪ পাতায় আমাদেরকে রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে।

ঐ তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের সহিত আমাদের কোনও রূপ আত্মীয়তা বা সম্পর্ক নাই।

আমরা কৃষ্ণনগর মহেশগঞ্জের পাল-চৌধুরী। "আদি বাড়ি" নটুদহ, চুয়াডাঙ্গা মহাকুমার অন্তর্গত। বর্তমানে ইহা পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্ঠিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ইলা পালচৌধুরী
কলিকাতা-২৯

উত্তর বঙ্গে প্রলয়

গত ১৯শে অক্টোবর 'দেশে' প্রকাশিত আপনার লেখা সম্পাদকীয়টি ভাল করে পড়লাম।

সারা উত্তরবঙ্গব্যাপী যে, এত ব্যাপক তাণ্ডবলীলা ঘটে গেল, তা এখানকার কাগজে বা টেলিভিসনে আপনাদের মত বিরাট আকারে প্রকাশ করেনি। তাই আমাদের ধারণা ছিলো খুবই সীমিত, আজ জানতে পারলাম, এই ভয়াবহ ক্ষতির পরিমাণ অপূরণীয়।

সরকারী শাসকবর্গের কর্তব্য হীনতার কথা এর আগেও বহুবার আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভাবতে অবাক

আগে, যাঁদের উপর হাজার হাজার মানুষের দায়-দায়িত্বের ভার অর্পিত, তাঁরা কীভাবে ঘুমিয়ে থাকেন? তাই আপনার রচনাতেই আপনি এই "নির্লজ্জ সরকারী কর্মচারীদের" যে ভাবে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তবু আমি মানে করি, আমরা যারা প্রবাসে আছি, আমাদেরও কিছু করার আছে। উত্তরবঙ্গের ওই বন্যার্ত মানুষেরা আমাদেরই প্রতিবেশী নিকট আত্মীয়, তাই তাঁদের বিপদের দিনে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত। পঃ ইউরোপ-আমেরিকা ও ক্যানাডায় বহু বাঙালী জীবিকা অর্জন করেন। তাঁদের সবার নিকট আমার ব্যক্তিগত আবেদন, তাঁরা তাঁদের মাসিক আয়ের ৩-৫% যেন এই বন্যার্ত মানুষের জন্য দান করেন। এবং এই সঙ্গে আপনাকে অনুরোধ, অচিরেই লণ্ডনস্থ কার্যালয়ে এ বিষয়ে একটা ফাণ্ড কার্যকরী করে তোলার যেখানে সবাই টাকা পাঠাতে পারেন।

আর এন সরকার
পঃ বার্লিন
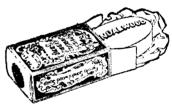
কি করে শত্রু তৈরী করতে হয়

কে আর লিখবেন ঐ নামে আত্মজীবনী, একজন কবি ছাড়া? রোনাল্ড ডানকানের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড সদ্য প্রকাশিত হয়েছে, নাম 'হাউ টু মেক এনিমিজ'।

ডানকান নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি। কবি ও নাট্যকার হিসেবে এক সময় তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, এখন অনেকটা বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে আছেন। থাকেন ইংলণ্ডের এক গণ্ড গ্রামে, যেখানে রেল স্টেশন পর্যন্ত নেই, বয়েস ৫৯, কিন্তু যুবার মতন কর্মক্ষম, তামাকের চাষ করেন, একমাত্র কৌতুক ঘোড়া চালানো। খ্যাতি কিংবা সার্থকতার প্রশ্ন তাঁর কাছে নিষ্প্রভার মতন ভেতো। তাঁর কয়েকটি নাটক, "কবরের পথ এইদিকে" কিংবা "ন্যাড়া মাথাওয়ালা ঈগল" এক সময় যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল ও মঞ্চে সফল হয়েছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে রটে যায় যে ডানকান আসলে গোঁড়া ধার্মিক কবি, ফলে তাঁর লেখার চাহিদা কমে যায়। এমনকি যে রয়াল কোর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা, সেই রয়াল কোর্ট থেকেই তাঁর একটা নাটক ফেরৎ দেওয়া হয়। সেই ঘটনাটা ডানকান খুব বিষাক্ত ঠাট্টার সঙ্গে বলতে ভালোবাসেন। নাটকটা ফেরৎ দেবার সময় রয়াল কোর্টের পরিচালক মন্তব্য করেছিলেন, "পৃথিবীর অর্ধেক লোক যে অনাহারে রয়েছে ডানকান যেন সে-কথা জানেনই না।" এই সঙ্গে ডানকানের নিজের মন্তব্য : 'ওরাও অবশ্য জানে না, আমি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ভারতবর্ষে কিছুদিন কাজ করেছি।'

ডানকানের মা ছিলেন ইংরেজ মহিলা, বাবা, ডানকানের নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ীই, ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার রুডলফের এক অবৈধ সন্তান। ডানকান ইংলণ্ডেই পড়াশুনো করে ইংরেজি সাহিত্যে দীক্ষা নিয়েছেন। জনপ্রিয়তা জিনিসটা—ডানকান নিজে এক সময় পেলেও—কোনদিনই তিনি ওর মূল্য দেন নি। লেখক হিসেবে তিনি নিজেকে মনে করেন অ্যারিস্টোক্র্যাট, সবাই যে জিনিস পড়বে, তা তিনি যেমন লিখতেও চান না—সবাই পড়ুক, তাও তিনি চান না। "আমি মনে করি শিল্পীকে সংস্কার মুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু এখনকার লেখকরা তা বিশ্বাস করেন না—তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যে কোনো রাজনৈতিক লেখাই লেখেন। আমি ট্র্যাডিশানে বিশ্বাসী, অন্য লেখকরা যে-কোনো পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তনের পক্ষপাতী। আমি বিশ্বাস করি শিল্পকর্মের নিখুঁত রূপদানে, অন্যরা ভাবেন, শুধু আন্তরিকতাই যথেষ্ট। সুতরাং বোঝাই যায়, আমার সঙ্গে অন্য লেখকের ভাষারই তফাৎ।"

তাঁর সমগ্র জীবনকে যদি একটি মাত্র কথায় বর্ণনা করতে বলা হয়, তা হলে ডানকান বলবেন, 'ব্যর্থতা'। সত্যিকারের মহৎ শিল্পী একদিন না একদিন ঠিকই জনসমাদার পাবেন—এই ধারণাটাকে ডানকান বলেন অতি বাজে। আমি আপনাদের এমন সব মহৎ লেখকের নাম শোনাতে পারি, যাঁরা কোনোদিনই জনসমাদর পান নি। নামগুলো বলে অবশ্য লাভ নেই, কারণ কেউ চিনতে পারবে না। সেটাই আমার পয়েন্ট।

ডানকান এক সময় একটা পত্রিকা বার করতেন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'টাউনস্‌-ম্যান'। পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা ছিল একশো, এর বেশী ডানকান বিক্রী করতেও রাজী ছিলেন না। পত্রিকাটির তিনি সম্পাদক, তিনি নিজেই সেটা স্টেনসিল করতেন এবং নিজেই খামে ভরে আঠা লাগিয়ে ডাকে ফেলতেন। পত্রিকাটির লেখকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন টি এস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড প্রভৃতি প্রখ্যাত কবিরা। ২৬টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এখন আমেরিকায় সেই ছাব্বিশটা দুর্লভ সংখ্যাই আবার বই হিসেবে বাঁধিয়ে বার করছেন এক প্রকাশক।

সার্থকতা সম্পর্কে ডানকানের ধারণা কি? "ব্যর্থ হওয়ার জন্য ভাগ্যের কাছে ধন্যবাদ জানানো উচিত। পাঠকদের অবহেলার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। অবহেলিত হলেই অনেক অকিঞ্চিৎকর, সাময়িক ব্যাপার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কারণ, এই পৃথিবীতে যাকে সার্থকতা বলে—তার মানে বাণিজ্যিক, বহু পাঠককে আকর্ষণ করা অর্থাৎ কত লোক আমার বই কেনে, কত লোক আমার নাটক দেখে ইত্যাদি। যদি অনেকে হয়, তবেই আমার লেখাটা সার্থক। যদি তা না হয়, তবে ব্যর্থ। অথচ আমি ভালোভাবেই জানি, জনগনেশের স্বীকৃতির কোনো অর্থই নেই।"

ডানকান অবহেলিত হলেও পুরোপুরি বিস্মৃত নন। সম্প্রতি তাঁর একটি নাটক ফিল্ম হয়েছে, নাম, "গার্ল অন এ মোটর সাইকেল।" একটি মেয়ে মোটর সাইকেলে চেপে তার প্রেমিক ও স্বামীর সঙ্গে যুগপৎ সংযোগ রেখে যাচ্ছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী যৌন আনন্দ সে পায় ঐ মোটর সাইকেলটার কাছ থেকে—এই হলো বিষয়। তাঁর "বিদ্রোহী" নামে একটি নাটক বি বি সি গ্রহণ করেছে, সেটিও আগামী বছরে ফিল্ম হিসেবে তৈরী হবে। কিন্তু এসব তৈরী হলে—ওগুলোর নিন্দে সবচেয়ে বেশী করেন ডানকান নিজে।

তাঁর জীবনীর প্রথম খণ্ডের নাম "অল মেন আর আয়ল্যান্ডস্‌।" দ্বিতীয় অংশে তিনি তাঁর সমসাময়িক লেখক, অভিনেতা ও বন্ধুদের প্রাণ ভরে গলাগালি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন, রবারট্‌ গ্রেভস্‌, জাঁ ককতো, লরেন্স অলিভিয়েব, পিটার বুক প্রভৃতি।

গত দু' বছর ধরে ডানকান একটি কবিতা লিখছেন, কবিতাটির নাম "মানুষ"। কবিতাটি এখনই প্যারাডাইজ লস্ট-এর চেয়ে লম্বা, এবং এটি শেষ করতে নাকি আরও দশ বছর লাগবে। শেষ পর্যন্ত এটা ছাপা হবে কিনা তিনি জানেন না, গ্রাহ্যও করেন না—তার মতে, "এটা এমন একটা লেখা যা না লিখে আমার উপায় নেই।"

সনাতন পাঠক

চিন্ত ঘোষ, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, মলিনীকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি।

সময়। সম্পাদক ঃ উৎপলকুমার গুপ্ত। ৩, গোয়ালপাড়া লেন, বহরমপুর। এক টাকা।

বহরমপুর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা শারদ সংকলন রূপে প্রকাশিত। পত্রিকা প্রসঙ্গে সম্পাদক জানিয়েছেন, বহরমপুরে ভালো সাহিত্যপত্র নেই, এই কথা মনে ভেবেই সময়-এর জন্ম। প্রথম সংখ্যার লেখাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও সম্পাদকের উদ্যম প্রশংসনীয়। স্থানীয় লেখকদের পাশাপাশি কলকাতার নামী লেখকদের রচনাও স্থান পেয়েছে। পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

নান্দী পাঠ। বার্ষিক সংকলন। সম্পাদক ঃ শিশির মজুমদার। মূল্য এক টাকা।

রায়গঞ্জ কলেজ বাঙলা পাঠচক্র কর্তৃক প্রকাশিত এই পত্রিকাটি স্থানীয় লেখকদের মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন কলেজের পাঠচক্রের পত্রিকা হিসেবে সংকলনটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি লেখার মধ্যে হাল আমলের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে লেখকদের গভীর যোগাযোগের পরিচয় আছে।

উষা। সম্পাদিকা : বাণী চট্টোপাধ্যায়। ৩৩/বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট কলি-৯। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

উষার শারদীয় সংখ্যাটির একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ করা যায়। লেখকদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতনামাদের কোন ভিড় নেই। পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত চেহারার এই পত্রিকাটিতে একটি উপন্যাস লিখেছেন শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায়। গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার দে, সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পাপড়ি রায়চৌধুরী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুজন রায়চৌধুরী প্রভৃতি। প্রবন্ধ লিখেছেন কৃষ্ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী, অশোককুমার দে, বিশ্বেশ্বর নন্দী, সুনীল চক্রবর্তী প্রভৃতি। কয়েকটি ইংরেজী কবিতা অনুবাদ করেছেন সুধীর গুপ্ত।

নরনারী। সম্পাদক : সুবোধ মিত্র। ৬ডি জাস্টিস বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৩·০০।

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটিকার সমাবেশে এ বছরকার এই বিশেষ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন অন্নদাশংকর রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অদিতা ওহদেদার, প্রভাতকুমার গোস্বামী, ডাঃ মদন বাগ, ডাঃ এ কে রায়চৌধুরী ও সমরকান্তি বসু। সংখ্যাটির বিশেষ সম্পদ পাঁচটি গল্প। রচয়িতা হচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও শিশির লাহিড়ী। একটি নাটিকা লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, যজ্ঞেশ্বর রায়ের লেখা উপন্যাসটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে পত্রিকাখানি নির্দিষ্ট কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

পলি। সম্পাদক : ব্রজেন সরকার, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। সি ডি/৩এ/বি এঞ্জিনীয়ারিং কলোনী, পোঃ আদ্রা, জেলা পুরুলিয়া। ৫০ পয়সা।

মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত কবিতা সংকলনের পুস্তিকা। এতে কবিতা লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, নবনীতা সেন, কামাখ্যা সরকার, মৃণাল মজুমদার, বেলা দত্ত, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, রজতকান্তি ভট্টাচার্য, সুরেশ বিশ্বাস, দীপককুমার ঘোষ, ব্রজেন সরকার, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ছন্দিতা। সম্পাদক : অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, গৌরগোপাল দাশ। বি ৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮। চল্লিশ পয়সা।

শারদীয়া লিটল ম্যাগাজিন ধরনের পত্রিকা। লেখকদের মধ্যে অনেকেই অখ্যাতনামা হলেও মোটামুটি পত্রিকাটির একটি নির্দিষ্ট মান আছে। তবে যে বিশেষ চরিত্রের জন্য এ ধরনের পত্রিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল সাহিত্যের বিশেষ একটি কি দুটি শাখা সম্পর্কে গভীর কৌতূহল ও অনুসন্ধান। ছন্দিতা সে পথে না গিয়ে প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা, কবিতা, ফিচার, রসরচনা, খেলাধুলো ও সিনেমার পাঁচমেশালি পসরা সাজিয়ে অন্য দশটা বাজার চলতি পত্রিকার মত হয়েছে।

এর লেখক তালিকায় আছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, জয়ন্তী সেন, সমরেশ বসু, নির্মলেন্দু গৌতম, রজত রায়চৌধুরী, উষা ভট্টাচার্য, মিহির রায়চৌধুরী, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, কাজল ঘোষ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, শান্তনু দাস প্রভৃতি।

জয়শ্রী। শারদীয় : ১৩৭৫। তিন টাকা।

জয়শ্রী আলোচ্য সংখ্যাটি লীলা রায় জন্মবার্ষিকী সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতী রায় জয়শ্রী'র সম্পাদিকা; কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও রাজনীতি ও সামাজিক জগতে তিনি সুপরিচিতা। বর্তমানে তিনি তাঁর ঘটনাবহুল কর্মজীবনের উপান্তে, রোগগ্রস্ত। জয়শ্রীর বর্তমান সংখ্যাটি এই মহিয়সী মহিলাকে জানার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। খ্যাতনামা লেখক লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্যাকেট্‌। সম্পাদক—শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্তী। স্যাকেট্‌ কার্যালয় মহিষাদল, মেদিনীপুর। মূল্য ১·০০ এক টাকা।

সুদূর মফস্বলের আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি বহু কবিতা একটি নাটিকা, প্রবন্ধ ও গল্প সহযোগে আত্মপ্রকাশ করেছে। লেখকগণের মধ্যে রয়েছেন শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকিংকর দাস, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ দাস, হাফিজ ইব্রাহিম প্রভৃতি। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর।

বন্দে মাতরম। সম্পাদক ভূতনাথ মণি। ৪৫, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, কলিকাতা-২৫। মূল্য ১ টাকা ২৫ পয়সা।

আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানিতে আছে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মনের অপ্রকাশিত রচনা, অনন্ত নাগ রচিত একখানা সম্পূর্ণ উপন্যাস, কয়েকটি গল্প এবং কবিতা। লেখকগণের মধ্যে রয়েছেন—বিমলচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাশংকর রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি। সংখ্যাখানি মোটের উপর সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রচ্ছদপট সাধারণ।

অশ্বচিত্র। সম্পাদক অধীর মুখোপাধ্যায়। ৬২/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলিকাতা-৩২। মূল্য ৭৫ পয়সা।

এই শারদীয়া সংখ্যাখানিতে যে-সব রচনা স্থানলাভ করেছে, তার অর্ধেকের বেশীই কবিতা। বাকী সব ছোট গল্প। প্রত্যেক রচনার মধ্যে নবাগত লেখকদের কাঁচা হাতের ছাপ রয়েছে। তা সত্ত্বেও মোটের উপর আলোচ্য সংখ্যাখানি পাঠযোগ্য হয়েছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

রোগের ভাষা। ডাঃ এস এন হাজরা। শ্রীঅশোককুমার হাজরা : ৩৮৮ জি টি রোড, বেতাইতলা, হাওড়া। মূল্য : ৩·০০।

শ্রীশ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনাম - স্তোত্রম্‌। শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। ডঃ শিবনারায়ণ চক্রবর্তী : কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া। মূল্য : ০·৫০।

রবীন্দ্রস্মৃতি। বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য : ৩·৫০।

গোপালদেবের স্বপ্ন। বনফুল। ডি এম লাইব্রেরী : ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য : ৬·০০।

বাঘা যতীন। মণি বাগচি। শিক্ষা ভারতী : ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৪·৫০।

দেবরাজ্যে দুর্নীতি। শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদার। শ্রীশৈবালরঞ্জন মজুমদার : ৮২/১৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া। মূল্য : ৩·০০।

পারুলদিদির গল্প। জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত। এস সরকার : ৬৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ১·৬০।

বাংলা পদাবলীর ছন্দ। শ্রীআনন্দমোহন বসু। প্রমিতা প্রকাশন : কলেজ রোড, বোলপুর, বীরভূম। মূল্য : ২২·০০।

Introduction to Shankara. Rash-vihary Das. K. L. Mukhopadhyay: 6-1-A Bancharam Akrur Lane, Calcutta-12. Price 15.00.

The Bengali Novel. Humayun Kabir. K. L. Mukhopadhyay: 6-1-A Bancharam Akrur Lane, Calcutta-12. Price 10.00.

অকৃতজ্ঞ পৃথিবী। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। ভাবীযুগ প্রকাশালয় : ৪৪ কালীকুমার মুখার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ৯·০০।

নীলানুভিকা। নির্মল আচার্য। উত্তর

সাধক প্রকাশনী : ৬৬/১ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ১·৫০।

বুদ্‌বুদ্‌। শ্রীহৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস। শ্রীমতী শিপ্রা বিশ্বাস : ১৬এফ কে পি রায় লেন, কলিকাতা-৩১। মূল্য ২·০০।

ইতিহাসের গল্পসল্প। সলিল সরকার। মুরারিমোহন শীল : ২২/৩/১ রামচরণ শেঠ রোড, হাওড়া-৪। মূল্য ২·৭০।

রামকৃষ্ণ-সারদামৃত। স্বামী নির্লেপানন্দ। করুণা প্রকাশনী : ১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৭·৫০।

মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। শিশির দাশ। ৩৫ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ১২·৫০।

বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ। ডঃ আশা দাশ। ৩ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

মনের মন মুকুর। সমীরকান্ত গুপ্ত। মানিক চিত্র : ১৬২/২৮-এ লেক গার্ডেনস, কলিকাতা-৪৫। মূল্য ৩·৫০।

তাসের রাজা ব্রিজ। কার্তিকচন্দ্র মল্লিক। শিলা প্রেস : ২৭/১এফ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১০·০০।

প্রীতি সম্মেলন : (উপরে বাঁয়ে) উত্তমকুমারকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সুপ্রিয়া দেবী, (ডাইনে) সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে উত্তম (নীচে বাঁয়ে) উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (ডাইনে) অঞ্জনা ভৌমিক ও ডি এন ভট্টাচার্য—অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী

ফটো : দেশ

পুরস্কার বিজয়ীদের সংবর্ধনা
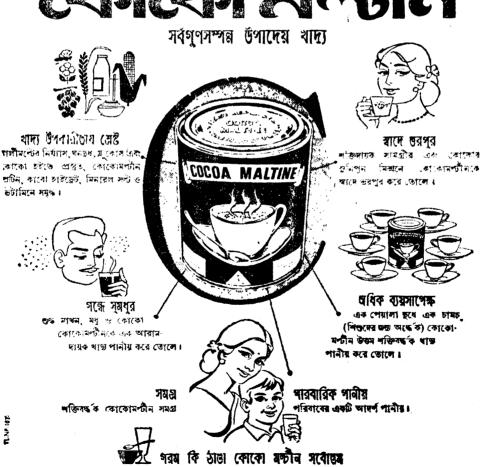
শিল্পী সংসদের মিলনোৎসব

নবগঠিত শিল্পী-সংসদ তাঁদের প্রথম মিলনোৎসবে (৪ নভেম্বর) সংস্থার সভাপতি শ্রীউত্তমকুমারকে সংবর্ধনা জানান। শিল্পী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন বলেই এই সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীজহর গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন বক্তা শ্রীউত্তমকুমারের অভিনয়-প্রতিভা ও ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্যের কথা বলেন। কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে এবং পশ্চিম বাংলার আই জি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিল্পীকে সময়োচিত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। তাঁরা শ্রীউত্তম-কুমারের জয়লাভকে বাংলা দেশের জয় বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের পৌরসংবর্ধনা দেবার প্রস্তাব ওঠে। মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীঅসিত চৌধুরী, শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ, শ্রীঅজিত বসু প্রমুখ শ্রীউত্তমকুমারের অভিনয় প্রতিভা এবং বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের কথা উল্লেখ করেন। পরে সংগীতানুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীউত্তম-কুমারের গান দিয়ে, সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। পরে গান শোনান শ্রীমতী ইলা বসু, শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র, শ্রীঅলোক বাগচী প্রমুখ শিল্পীরা। শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সংগীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পী সংসদ সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে অনুষ্ঠান

জাতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের সম্মানার্থে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির কর্তৃপক্ষ, কলা-কুশলী ও কর্মীরা গত বুধবার (৬ নভেম্বর) এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শ্রীতপন সিংহ, শ্রীউত্তমকুমার, শ্রীবিজয় বসু এবং শ্রীপ্রফুল্ল সেনগুপ্ত এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন। শ্রীসত্যজিৎ রায় উপস্থিত হতে পারেন নি। মানপত্র পাঠের পর পুরস্কার বিজয়ীরা দু-চারটি কথা বলেন। শ্রীতপন সিংহ এবং শ্রীউত্তমকুমার উভয়েই বলেন, সকলের সমবেত চেষ্টাতেই সাফল্য আসে। একা কারোর কৃতিত্বে নয়। শ্রীবিজয় বসু (আরোগ্য নিকেতন-এর পরিচালক) এবং প্রফুল্ল সেনগুপ্ত ("অরুন্ধতী" ওড়িশী ছবির পরিচালক) সকলকে ধন্যবাদ দেন। তাঁদের ছবি আঞ্চলিক পুরস্কার পেয়েছে।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে আয়োজিত পুরস্কার-বিজয়ীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তপন সিংহ, উত্তমকুমার, বিজয় বসু ও প্রফুল্ল সেনগুপ্ত ফটো: দেশ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্রীবিজয় বসুর "ভগিনী নিবেদিতা" রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছিল, এবং শ্রীপ্রফুল্ল সেনগুপ্তের ছবি এ নিয়ে তিনবার আঞ্চলিক পুরস্কার পায়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীদেবকী-কুমার বসু। তিনি তাঁর বক্তৃতায় সফল শিল্পী ও চলচ্চিত্রকারদের শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, মানবতার ছবি তৈরির প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। শ্রীঅসিত চৌধুরীও বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, বাংলা দেশের এই সাফল্যে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প আবার আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পাবে।

প্রীতি সম্মেলন

শ্রীউত্তমকুমারের সম্মানার্থে শ্রীমতী

অরোরা ফিল্ম স্টুডিওতে শিল্পীসংসদের অনুষ্ঠানে উত্তমকুমারকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন জহর গাঙ্গুলি ফটো: দেশ

সুপ্রিয়া দেবী গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে কলকাতার চলচ্চিত্রলোকের বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিল্পী ও কলাকুশলী এবং শহরের অনেক মান্য-গণ্য ব্যক্তি ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীউত্তমকুমারকে সকলেই আন্তরিক অভিনন্দন জানান। পুরস্কার-বিজয়ীদের মধ্যে শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীতপন সিংহ এবং চলচ্চিত্রশিল্পের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও ছিলেন। আই জি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পুলিস কমিশনার শ্রী পি কে সেন শিল্পীকে অভিনন্দন জানাবার জন্য উপস্থিত হন। সম্প্রতি চলচ্চিত্রজগতে এমন উদ্দীপনপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখা যায় নি। শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী সকলকে ব্যক্তিগত-ভাবে অভ্যর্থনা জানান।

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের "মাল্যদান"

'ছুটি'-তে অভিনয় করার পর নন্দিনী মালিয়াকে আর ছবিতে দেখা যাবে কিনা এ-নিয়ে দর্শকমহলে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। সংবাদ রটেছিল, 'ছুটি'-ই শ্রীমতী মালিয়ার প্রথম ও শেষ ছবি। বলা বাহুল্য, দর্শকরা এতে নিরাশই হয়েছিলেন।

জানা গেল, নন্দিনী আবার অভিনয় করবেন। ছবির নাম 'মাল্যদান'। রবীন্দ্রনাথের এই কাহিনীর চিত্ররূপ দেবেন চিত্রলিপি ফিল্মস। পরিচালনা করবেন অজয় কর। মাল্যদান-এর করুণীর ভূমিকায় তিনি আত্ম-প্রকাশ করবেন। ছবির নায়ক হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চিত্রলিপির "পরিণীতা"-র শুটিং শেষ।

রঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ-'দৃষ্টিদর্পণ' ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো : দেশ

চিত্র-সমালোচনা

পদ্মাবতী-জয়দেব

দক্ষিণ ভারতের ছবি বাংলায় 'ডাব' করে এর আগেও এখানে পরিবেশিত হয়েছে। বাংলায় যারা কথা বলছে তারা যে বাঙালী নয় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তা-ছাড়া ওষ্ঠ-সঞ্চালন এবং সংলাপ-উচ্চারণের বৈসাদৃশ্য তো থাকেই। 'পদ্মাবতী জয়দেব' মূলত তেলেগু চিত্র। ছবিতেও আছে। এবং এই ছবি নিয়ে আরও মুশকিল এই, বাংলার জয়দেবকে নিয়ে যেহেতু এই ছবি, তাই এর পাত্র-পাত্রীদের বেশ-ভূষা, অঙ্গ-সজ্জা ও অঙ্গ-সঞ্চালন এবং চেহারা কেমন যেন আরও বিসদৃশ লাগে। অবশ্য দর্শকেরা এই অস্বাভাবিকতা মেনে নিতে পারবেন সহজেই একথা ভেবে যে চিত্রটি দক্ষিণ-ভারতে তৈরি এবং ওখানকার দর্শকদের জন্য। তা-ছাড়া নাম-ভূমিকায় নাগেশ্বর রাও ও অঞ্জলি দেবী বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই অভিনয় করেছেন। কিন্তু এত অলৌকিক ঘটনা কেন ছবিতে? এটা তো পৌরাণিক চিত্র নয় যে ঈশ্বরীয় লীলা দেখাতে গিয়ে যতদূর সম্ভব কল্পনা খেলালেই হল। তার উপর আবার 'ভিলেন'। এ না হলে বুঝি লীলা জমে না। যাক এসব কথা।

সংগীতবহুল এই ছবিতে যা প্রধানত আশা করা স্বাভাবিক তা ষোলকলায় পূর্ণ। জয়দেবের মূল রচনা এতে সুরারোপিত। তার ফলে ছবিতে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়েছে। তা-বাদে সংগীত পরিচালক বিজন পালের দেওয়া সুরে মোট বারোটি গান, এবং একটি সংস্কৃত পদ (রতি সুখ সারে) এতে সংযুক্ত। অধিকাংশ গান রাগাশ্রয়ী। সুররচনায় শ্রীপাল পাণ্ডিত্য ও রসবোধ দুয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরাও গেয়েছেন চমৎকার। সব কয়টি গানই মনমাতানো। শংকরা ও মল্লার রাগে (গেয়েছেন যথাক্রমে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে) প্রতিযোগিতার আসরে পর পর দুটি গান (জয় মল্লারের) খুবই চিত্তাকর্ষক। এবং গানের সুর এমন সাচেতনতার সঙ্গে রচিত যে তা শিল্পীদের লিপ মুভমেণ্ট-এর সঙ্গে বেমানান নয়। এক্ষেত্রে গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কৃতিত্ব আছে।

ছবির কাহিনী নাটকীয় ধারায় রচিত। যদিও ভক্তিভাব সঞ্চারের মত কিছু মুহূর্তও এতে আছে।

এ-সপ্তাহে গৌরী

শিবাজী ফিল্মসের হিন্দী সামাজিক চিত্র 'গৌরী' এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। শিবাজী গণেশন ছবির প্রযোজক: চিত্র-পরিচালনা করেছেন ভীম সিং। নূতন ও সুনীল দত্ত ছবির দুই প্রধান শিল্পী। বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন মমতাজ, সঞ্জীবকুমার, ওমপ্রকাশ প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবি।

রবীন্দ্র সদনে নতুন পরিকল্পনার রূপায়ণ

রবীন্দ্র সদনের বর্তমান পরিচালক সমিতির কার্যকাল প্রকৃতপক্ষে গত মার্চ মাস থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে শিক্ষা সচিব সমিতির সভাপতি হিসাবে রয়েছেন। শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী ঐ সময় হতে রবীন্দ্র সদনের প্রশাসন আধিকারিক এবং পরিচালক সমিতির সম্পাদক। এই সময় থেকেই রবীন্দ্র সদনের মঞ্চ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে ভাড়া দেওয়া ছাড়াও সদনের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে অগ্রণী।

গত ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে প্রভাতী অনুষ্ঠানে শিল্পী সাহিত্যিক ও জনসাধারণ যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তা উল্লেখযোগ্য।

পরিচালক সমিতির একটি বিশেষ পরিকল্পনা নভেম্বর মাসে শুরু হয়েছে।

'গৌরী' হিন্দীচিত্রে মমতাজ ও সুনীল দত্ত—ছবির মুক্তি এ-সপ্তাহে

অজিত গাঙ্গুলি পরিচালিত "প্রতিদান" চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও কাজল গুপ্ত

বোম্বাই বিচিত্রা

[illegible] সওদাগর-এর স্বপ্নকন্যা [illegible] নামিয়ে যা ঘটল এমনটি [illegible] কম নায়িকার জীবনে ঘটেছে। [illegible] সেন্সার হল 'সপনোকা [illegible] ছবি। রিলিজ হতে এখনো অন্তত [illegible] মাস বাকি। অর্থাৎ জনরুচির কষ্টি-[illegible] হেমা মালিনীর সার্থকতার সোনা [illegible] যাচাই হয়নি। তবু প্রতি সপ্তাহে [illegible] মহলে হেমার দর চড়ছে। প্রায় [illegible] নামকরা নায়কের সঙ্গে কাজ [illegible] হয়েছেন হেমা মালিনী। [illegible] অতি-প্রতিষ্ঠিত নায়িকার [illegible] ছুটোছুটি করছে।

[illegible] মালিনীকে চলচ্চিত্রের আকাশে [illegible] একটি উজ্জ্বল তারকা হিসেবে যিনি [illegible] করালেন সেই মিষ্টভাষী শ্রীঅনন্ত-স্বামীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শ্রীঅনন্তস্বামী [illegible] একজন নামকরা ব্যবসায়ী এবং [illegible] নির্মাতা। উনিশ 'শ সাতান্নয় চিত্রজগতে প্রবেশ করেন এবং উনিশ'শ সাতান্ন থেকে উনিশ'শ পঁয়ষট্টির মধ্যে পঁয়ত্রিশটি ছবি [illegible]। ভদ্রলোক দুঃখ করছিলেন, 'মাদ্রাজে [illegible] আট বছরে পঁয়ত্রিশটা ছবি বানালাম [illegible] এখানে একটা ছবি বানাতে প্রায় চার বছর লেগে গেল। আলোচনাটা [illegible] উঠেছে এমন সময় এক [illegible] লেটেস্ট মডেলের আমেরিকান গাড়ি এসে থামলো এবং সেই গাড়ি থেকে যিনি নামলেন তিনি বম্বের এমন একজন চিত্র-নির্মাতা যাঁর খাতির খাতির প্রায় সবাই করেন। ভদ্রলোক প্রায়বিগলিত হয়ে প্রবেশ করলেন শ্রীঅনন্তস্বামীর বসবার ঘরে। এবং বসলেন। তাঁর নতুন ছবির জন্য হেমা মালিনীকে সাইন করতে চান ভদ্রলোক। (এখানে বলে রাখা দরকার যে, হেমা শ্রীঅনন্ত স্বামীর পরামর্শ ছাড়া কোন ছবিতে কাজ করেন না। সুতরাং যাঁরা হেমা মালিনীকে ছবিতে নিতে চান তাঁরা প্রথমেই শ্রীঅনন্ত স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন।) শ্রীঅনন্ত স্বামী জানালেন, 'এতো খুব সুখের কথা, কিন্তু হেমা বর্তমানে অনেক-গুলি ছবিতে কাজ করছে আর আমিও কিছুদিনের মধ্যেই নতুন ছবি শুরু করব—' শ্রীঅনন্ত স্বামীকে শেষ করতে দিলেন না আগন্তুক, তিনি বললেন, 'ডোন্ট ওরী ফর দ্য ডেটস্, আই উইল অ্যাডজাস্ট'। অনন্ত স্বামী বললেন, 'আপনি যদি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন তাহলে ত ঠিকই আছে। হেমার যদি গল্প এবং রোল পছন্দ হয় তাহলে সে কাজ করবে আপনার ছবিতে।' আগন্তুক বললেন, 'হ্যাঁ তা'ত বটেই, গল্প এবং রোল যে পছন্দ হবেই তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই—এখন হেমাকে কত দিতে হবে সেটা বলুন—সেটা যদি আমার পছন্দ হয় তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে"। হেমার প্রাইস সম্বন্ধে যেই শ্রীঅনন্ত স্বামী কিছু বলতে যাবেন, অমনি আগন্তুক বললেন "বিফোর ইউ কোট হার প্রাইস, আপনাকে শুধু একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দেব সেটা হচ্ছে যে, হেমা যদি আমার ব্যানরে আমার আনডারে কাজ করে তাহলে—" এবার অনন্ত স্বামী বাধা দিলেন, "ঠিক তাই আমি সেই কথা স্মরণ রেখেই যা বলার বলছি" বলে শ্রীঅনন্ত স্বামী জানালেন যে, "কিছুদিন আগে হেমা যে ছবিটি সাইন করেছে তাতে সে যা নিয়েছে আপনি তার থেকে আরো কিছু বেশী দেবেন।" শ্রীঅনন্ত স্বামীর কথা শুনেও আগন্তুকের চক্ষু স্থির। তিনি বললেন, 'বলেন কি মশাই, আমার ছবিতে বম্বের প্রত্যেক নামকরা স্টার বাজার দরের চেয়ে অনেক কম পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকেন, কারণ আমার ব্যানারে কাজ করা মানে একটা এক্সট্রা প্রেসটিজ। আপনি ভেবে দেখুন, হেমা যদি আমার ছবিতে কাজ করে ইট উইল মীন সামথীং টু হার!" উত্তর দেবার পরিবর্তে শ্রীঅনন্ত স্বামী একটু হাসলেন এবং বললেন, "আপনার ব্যানার প্রতিষ্ঠিত, তারও পর আপনি স্বনামধন্য, সুতরাং আপনার ছবিতে যখন কোন স্টার কাজ করে তখন আপনার ছবির দামও সাধারণ প্রযোজকের ছবির থেকে দাম বেশী পায় পরিবেশকদের কাছ থেকে। সুতরাং আপনার ছবিতে যারাই কাজ করবে তাদের সকলের পারিশ্রমিক সাধারণ বাজার দরের চেয়ে কমের পরিবর্তে বেশীই হওয়া উচিত —তাই নয়?" এবার রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন আগন্তুক। বললেন, 'দেখুন মিস্টার অনন্ত স্বামী, ইফ হেমা ওয়ার্কস ইন মাই ফিল্ম ইট উইল মীন সামথীং টু হার—সো থীংক অ্যাবউট দ্যাট'— 'আই উইল' বললেন শ্রীঅনন্ত স্বামী, 'আপনার ছবিতে কাজ করলে যেদিন হেমার জীবনে বিপ্লব ঘটবে সেদিন হেমাই আপনার দরজায় যাবে স্যার এবং আপনি যে দাম দেবেন সেই দামেই কাজ করবে আপনার সঙ্গে। আপাতত আপনার হেমাকে দরকার এবং ইউ আর কেপব্ল অব পেয়িং হার প্রাইস " অনন্ত স্বামীর কথা শেষ হল না। আগন্তুক যত-খানি হাসি মুখে এসেছিলেন ততোধিক গোসা করে বেরিয়ে গেলেন। এবার অনন্ত স্বামী কফির অর্ডার দিলেন। আমি বললাম, "এত বড় একজন প্রডিউসারকে চটানো ঠিক হ'ল কী? অনন্ত স্বামী আবার হাসলেন, বললেন, "মশাই যার প্রেসটিজ আছে সে ইগোর প্লেটে করে প্রেসটিজ বেচতে আসে না—এই ভদ্রলোককে যা বললাম তাতো শুনলেন, এবার শুনুন সত্যজিৎ রায়কে কি বলেছি, নিজে থেকে সেধে বলেছি উনি হেমাকে নিয়ে কাজ করার কোন ইচ্ছা প্রকাশ না করা সত্ত্বেও বলেছি" জিগ্যেস করলাম, 'কি বলেছেন?'। ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'বলেছি যে যখন চাইবেন নিজের ছবির জন্য হেমাকে তখনই পাবেন, আপনার ছবিতে হেমা বিনে পয়সায় কাজ করবে—" কথাটা শেষ হবার আগেই গরম কফি এলো। কফিতে চুমুক দিয়ে যখন চোখা

চোখ হ'ল তখন আবার হাসলেন শ্রীঅনন্ত স্বামী॥

সরল শর্মা

রেকর্ড সমালোচনা

অল্পকাল আগে গ্রামোফোন কোম্পানি রবীন্দ্রসংগীত এবং আধুনিক বাংলা গানের কয়েকটি রেকর্ড বের করেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের একটি ঈ-পি রেকর্ড আছে, যা ইতিমধ্যেই হয়ত জনপ্রিয়। রেকর্ডে চারটি গান পরিবেশিত। একদিকে বনানী ঘোষের গাওয়া দুটি গান (ও দেখা দিয়ে চলে গেল এবং ওগো শোন কে বাজায়), অপরদিকের তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আমি তারেই খুঁজে বেড়াই এবং আবার মোরে পাগল করে দিবে কে)। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসাবে বনানী ঘোষের নাম রসিকজনের কাছে সুপরিচিত। শ্রোতার মন দোলা দেবার মত মাধুর্য তাঁর কণ্ঠে আছে। এই দুটি গানে তা যেন আরও বেশী পরিস্ফুট। নিখুঁত গায়কির দিক থেকেও গান দুটি বিশিষ্ট। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল যাবত রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন। আলোচ্য দুটি গানের মধ্য দিয়ে শিল্পীর রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

তরুণ শিল্পী চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড (এই শ্রাবণের বুকের ভিতর এবং আমি কেমন করিয়া জানাব তোমায়) সম্ভবত এই প্রথম বেরোল। রবীন্দ্রনাথের গানের অনুরাগীরা খুশি হবেন গান দুটি (৭৮ আর-পি-এম রেকর্ডে) শুনে। শিল্পীর উচ্চারণ পরিশীলিত, কণ্ঠস্বরে দরদ। তাঁর সুরের কাজও বেশ ভাল। রেকর্ডটি আদরণীয় হবে।

আরতি মুখোপাধ্যায়ের চারটি গানের ঈ-পি রেকর্ডে দুটি রাগাশ্রয়ী (সুরকার: সাগিরউদ্দিন খান), দুটি আধুনিক (রবীন্দ্র প্রশান্ত সুরারোপিত) গান। রাগভিত্তিক দুটি গান (অঙ্গে জাগে সুরতরঙ্গ এবং নয়নে নয়ন রেখে) চমৎকার মেজাজে গাওয়া, বেশী মুগ্ধ করে শিল্পীর সূক্ষ্ম অলঙ্করণ। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় যে ক্ল্যাসিক্যাল গানেও সমান পারদর্শিনী এ দুটি গানেই তার প্রমাণ। আধুনিক গান দুটি (বহু পথ ভেঙে এবং ও দরদীয়া) আগেই ৭৮ আর-পি-এম রেকর্ডে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। রাগাশ্রয়ী দুটি গান সুন্দর লিখেছেন সুবীর হাজরা। আধুনিক গানে একটির কথা (বহু পথ ভেঙে) শ্রীহাজরার, অপরটি সুরকারের।

অরণ্যদেব ✲ লী ফক

সোনা-বেলায়·····
কে ··· কে তুমি ?
এই বেলাভূমি পবিত্র। অনধিকার-প্রবেশের দণ্ড হিসেবে তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
আমি তো আগেই বলেছিলুম·····

নাবিককে কে মেরেছে?
যে মেরেছে, তাকে ওরা রাউডি বলে। সে-ই ওদের সর্দার।

পাইলট, এদের সঙ্গে নিয়ে তুমি হেলিকপটারে যাও। থলে থেকে যা তুলেছ, তা আবার বেলাভূমিতে ছড়িয়ে দাও।

রাউডি তোমাদের কাজে লাগিয়েছে; কাজ ফুরলেই সে তোমাদের হত্যা করত, যাতে এখানকার রহস্যের হদিশ আর কেউ না পায়।
রহস্যটা কী?

সব বস্তা থলে নামিয়ে দিয়েছ। এখন তোমরা হেলিকপটারে গিয়ে ওঠো। শুধু রাউডি এখানে থাকবে।
এখানকার কথা ভুলে যাও। এখানে ফিরে এলে কিছুই পাবে না — শুধু মৃত্যু ছাড়া।

পাইলট, ব্যাপার কী বলো তো?
এ কি শুধুই গন্ধক?
গন্ধকই হোক আর যা-ই হোক, চটপট এখান থেকে পালাতে হবে। আর কখনো ফিরবনা।

কীলাউয়ি আবার নির্জন; তার রহস্য আবার চাপা পড়ল অন্ধকারে। নিরাপদ রইল তার সোনা।
আগামী সপ্তাহে: নতুন কাহিনী ১৭

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৬ নবেম্বর (বুধবার) সরকারীভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। রিচার্ড

নিকসন এদিন আমেরিকার ৩৭তম প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এই নির্বাচনের ফলে আট বছরের ডেমোক্র্যাট শাসনের অবসান হয়ে গেল। তার আগে রিপাবলিকান পার্টি গদিতে ছিল আট বছর। ষাটের নির্বাচনে কেনেডির কাছে নিকসন হেরে গিয়েছিলেন। এবার জোর লড়াই করেই নিকসনকে জিততে হয়েছে। অন্য দুই প্রার্থী ছিলেন হামফ্রে এবং ওয়ালেস। তৃতীয় প্রার্থী ওয়ালেসের স্থান অনেক পিছিয়ে। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ রিপাবলিকানরা লাভ করলেও কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়ে গেল। নিকসন ঘোষণা করেন : মারকিন জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করাই হবে আমার প্রশাসনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। তা ছাড়া মারকিন প্রশাসনে বড়-রকমের রদবদল হবে বলে নিকসন যে ইঙ্গিত করেছেন—তার ফলে দলীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা অনেকেই প্রধান পদগুলি থেকে সসম্মানে সরে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত। ২০ জানুয়ারি কার্যভার গ্রহণের আগে নিকসন মিত্র-শক্তির নেতৃবর্গের সংগে আলোচনার জন্য ইউরোপ সফর করে আসবার কথা ভাবছেন। দেশ গণতান্ত্রিক পথেই নতুন প্রেসিডেন্টকে বরণ করে নিতে পেরেছে।

দেশী সংবাদ

৪ নবেম্বর—শনিবার অথবা রবিবার রাত্রে জিনডসে স্ট্রীটের সমবায়িকার গ্রিল কেটে চোর প্রায় পনের হাজার টাকার মাল নিয়ে চম্পট দিয়েছে। শনিবার দুপুরে সমবায়িকা বন্ধ করে যাওয়ার পর সোমবার বেলা পোনে দশটা নাগাদ কর্মীরা বন্ধ দরজা খুলে এই চুরি আবিষ্কার করেন। পুলিস আসে। প্রাথমিক তদন্ত হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

ওড়িশার ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০। কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ ও পূর্ত দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণ হবে ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকার মত। তিনি আরও জানান, দুর্গতদের মধ্যে জরুরী ত্রাণব্যবস্থা ও জাতীয় সড়ক (৫নং) মেরামতের জন্য ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে ৫০ লাখ টাকা 'এড হক' সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

৫ নবেম্বর—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে আজ মদ্যবর্জন প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ২ অক্টোবর (গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরের সমাপ্তি) থেকে সাত বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মদ্যবর্জন নীতি কার্যকরী করার জন্য প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে কংগ্রেসী মুখ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্মসূচী তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মাত্র তিন জন সদস্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

ভারতের পরমাণুশক্তি সংস্থা কলকাতার লবণ হ্রদ অঞ্চলে একটি মাঝারি ধরনের 'ভেরিএবল এনার্জি সাইক্লোট্রন যন্ত্র' স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ৬০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোলট ক্ষমতাসম্পন্ন এই ধরনের অতি আধুনিক যন্ত্র ভারতে এই প্রথম।

৬ নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে ১৯৪৮ সালে বিড়লা ভবনে আততায়ীর গুলিতে মহাত্মাজী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এই ভবনটিকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রূপান্তরিত করার দাবি জানিয়ে শ্রী এস এন মিশ্র আজ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এনেছিলেন শেষ পর্যন্ত তা ২২—৩৪ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

দুই বাঙলার একীকরণ এবং অখণ্ড ভারতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনসংঘ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নামছে। জনসংঘ মনে করে, "বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সকল সমস্যার মূলে দেশ বিভাগজনিত অভিশাপ।"

৭ নবেম্বর—উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণের কাজ

কিভাবে চলছে, সেই কাজকর্মে কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত কি কাজ হয়েছে, তা জানার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্রী এস কে ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে এ সম্পর্কে জরুরি চিঠি দিয়েছেন।

খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য ভারত আমেরিকাকে দ্রুত ২৩ লক্ষ টন গম পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে। গত সোমবার (৪ নবেম্বর) প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতকে মারকিন বাজার থেকে এই গম কেনার অনুমতি দিয়েছেন।

৮ নবেম্বর—ভারত ও জাপানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের পাঁচ দিনব্যাপী বৈঠক আজ শেষ হয়েছে। বৈঠকের শেষে এক যুক্ত ইশতাহারে ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যাপক বাণিজ্যিক লেনদেনের কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে যুগ্ম প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য বিস্তারের কথাও বলা হয়েছে।

ট্রাম ও বাসের ভাড়া বাড়ানো হবে কিনা, আজ সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বলেন, "ট্রাম-বাসের ভাড়া বাড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।" রাজ্যপাল বলেন কংগ্রেস এবং যুক্ত ফ্রন্ট কর্তৃক নিযুক্ত দুটি কমিটিই এরূপ সুপারিশ করেছেন, 'ট্রাম-বাসের ভাড়া বাড়ানো ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

৯ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দুইজন গেজেটেড অফিসার সহ গত কয়েক দিনে প্রায় ৩২ জন কর্মচারীকে কোন-না-কোন গুরুতর অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিক্ষোভকারী ছাত্রদের হাতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক আজ লাঞ্ছিত হন এবং ছাত্ররা আরটন ফ্যাকালটি ভবন লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকলে প্রায় তিন শ' সশস্ত্র পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে।

১০ নবেম্বর—স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক সমিতি সংঘের এশীয় আঞ্চলিক সম্পাদক শ্রী বি এস মাথুর আজ সাংবাদিকদের বলেন : অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলিতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন জারি করতে চলেছেন, সংঘ তার বিরোধী।

বিদেশী সংবাদ

৪ নবেম্বর—শ্রীমতী নওয়েন থি বিন মসকো থেকে প্যারিসে উড়ে এসেই আজ জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের প্রতিনিধি দলের নেতৃ হিসাবে বলেছেন—সায়গনে আমেরিকার পুতুল সরকার যতদিন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতকংদের লড়াইও ততদিন চলবে। মহিলার বয়স একচল্লিশ।

৫ নবেম্বর—বোমাবর্ষণ বন্ধের পর ভিয়েতনাম আলোচনার নির্দিষ্ট প্রথম বৈঠক বর্তমানে এখনও অনড় রয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে আজ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আগামীকালের শান্তি বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না।

৬ নবেম্বর—চতুর্দলীয় শান্তি বৈঠকের প্রতিশ্রুতি ভংগ করার জন্য উত্তর ভিয়েতনাম সরকার, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আজ অভিযোগ করেছেন। এই আলোচনা বৈঠক আজ প্যারিসে হওয়ার কথা ছিল।

৭ নবেম্বর—নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকসন এক বিবৃতিতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, মারকিন প্রশাসনে বড় রকমের রদবদলে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি চান, প্রধান পদগুলিতে সজীব ভাবধারার নতুন নতুন লোক। পরমাণুশক্তির ক্ষেত্রে রাশিয়ার উপর আমেরিকার নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব। স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে ন্যায়-সংযোগ।

আজ দেশ বিপ্লব বার্ষিকীর দিনে প্রায় হাজার হাজার ছাত্র সকাল থেকে চারলস বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন। ছাত্ররা বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই থাকব, কিন্তু আজ কোন পড়াশোনা হবে না। অধিকাংশ অধ্যাপক আমাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

৮ নবেম্বর—পুলিশ ও প্রায় তিন হাজার বিক্ষোভকারী ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষের পর পাকিস্তান সরকার রাওয়ালপিণ্ডি, করাচি ও হায়দ্রাবাদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন। করাচির এক সংবাদে বলা হয়েছে, বিরোধী নেতা ও ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডিতে আসলে গতকাল যে দাঙ্গা হয়, তাতে অন্ততপক্ষে দুজন ছাত্র নিহত ও চারজন পুলিশ আহত হয়েছে।

৯ নবেম্বর—মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট শ্রীনিকসনের এক উপদেষ্টা আজ বলেন যে, শ্রীনিকসন ভিয়েতনাম সম্পর্কে কিছু করার আগে প্রেসিডেন্ট জনসনের সংগে পরামর্শ করবেন। ভিয়েতনাম নিয়ে শীঘ্রই নিকসন-জনসন বৈঠক হতে পারে।

১০ নবেম্বর—মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবি প্রেসিডেন্ট শ্রীরিচার্ড নিকসনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ব্রুকলিন পুলিশ জৈনেক ইয়েমেনী আরব ও তার ২০ বছর বয়স্ক পুত্রকে গ্রেফতার করেছেন।

আজ সকালে পেশোয়ারের এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে লক্ষ্য করে একজন যুবক তিরিশ গজ দূরে থেকে একটি পিসতল তুলে দুবার গুলি ছোঁড়ে। অল্পের জন্য পাক নেতার প্রাণরক্ষা পেয়েছে। যুবকটিকে গ্রেফতার করে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই দেখুন ওরা। যাকে বলে আবালবৃদ্ধ বনিতা।
আমার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখেরও বেশী।
রান্নায় আমার যে এত হাতযশ—
এই দেখুন তার চাবিকাঠিটা আমার হাতে।
সানরাইজ
গুঁড়ো মশলা। স্বাদে-গন্ধে এর জুড়ি নেই।
খাঁটি নির্ভেজাল জিনিষ। ভাবে তৈরী।
প্রকাশ ব্রাদার্স
গুঁড়ো মশলার
আদি প্রতিষ্ঠান।
৭৪/এ, নলিনী শেঠ রোড,
কলিকাতা-৭
PURE POWDER SPICES

সূচিপত্র

কি ভাই, আরেকটা নতুন শাড়ী মনে হচ্ছে! তুমি আছ বেশ! সংসারের খরচ কুলিয়ে এতসব কর কি করে? আমার স্বামীকে শাড়ীর কথা বললেই সর্ষে-ফুল দেখেন!
স্বামীর ওপর ভরসা না ক'রে নিজেই কেননা। আমিও তাই কিনেছি। প্রেস্টিজে রান্না ক'রে—সংসারের খরচ কমিয়ে।
Prestige
Prestige
প্রেস্টিজ'-এর সাহায্যে আমিষ ও নিরামিষ সব খাবারই রান্না করা যায়।
প্রেস্টিজ প্রেসার কুকারে রান্না করলে জ্বালানীর খরচ বাঁচবে ৮০ %, সময়ও অর্দ্ধেক লাগবে। খাবারের পুষ্টিগুণও বেশী থাকবে। স্টীমে-রান্না খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।
আজই একটি প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার কিনুন।
ছোট-বড় সবরকম পরিবারের উপযোগী ৫টি মডেল পাবেন।
তৈরী করেন:
টি.টি. (প্রাইভেট) লিমিটেড
বাঙ্গালোর—১৭
PREETT প্রীত-এর সরঞ্জাম রান্নাঘরের পরম সম্পদ।

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীমতী শিপ্রা আদিত্য

ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো

আপনার চায়ের আসর মুখরোচক গ্ল্যাক্সো বিস্কুট সহযোগে উপভোগ্য হ'য়ে উঠবে। ব্রিটানিয়ার গ্ল্যাক্সো বিস্কুট জলখাবার হিসেবে যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর—শিশু ও বয়স্কের কাছে সমান উপাদেয়। চা, কফি কিংবা শীতল পানীয়ের সঙ্গে গ্ল্যাক্সো বিস্কুট দিন।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

IS:1011 ISI

FBMI FEDERATION OF BISCUIT MANUFACTURERS OF INDIA

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

নয়নজুড়ানো
সৌন্দর্যে!
নৌকর্জী জেহান
সিকোবা-র
রাজকুমারী
পরিহিতা
হাজার হাজার লোকের প্রশংসিত। সিকোবার
সুচারু শ্রেষ্ঠতম এমব্রয়ডারী। "রাজকুমারী"
চিরকালীন সৌন্দর্যকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
স্বচ্ছ নাইলনের ওপর অপরিমিত রূপোলী
এমব্রয়ডারী থেকে ইচ্ছেমত পছন্দ করে নিন।
সুতীর, কেম্ব্রিকের, সাটিনের ও নাইলন
জর্জেটের ওপর। সিকোবা এমব্রয়ডারী করা
অনুপম—রাজকীয় সম্বর্ধনার জন্য।
সিকোবা
এমব্রয়ডারী করা কাপড়
প্রস্তুতকারক:
কান্তিলাল এমব্রয়ডারী ইউনিট
নিম্নলিখিত আপনিয়ন্ত্রিত শো-রুমে পাওয়া যায়:
স্টকিস্টস: থ্যাকারসি ছগনলাল, রাজদা চাওল, সেকেণ্ড
ওল্ড হনুমান ক্রস লেন, বোম্বাই-২। খুচরা বিক্রেতা:

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪
শনিবার ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক „	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষান্মাসিক „	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	... ১০.০০

আকাশ পথে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৬১.০০
ষান্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 23 Nov. 1968.

উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠন

বন্যা ও ধসে উত্তরবঙ্গে যে প্রলয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে আজ আর তা আমাদের কাছে নিত্যকার নতুন সংবাদ নয়। মাস দেড়েক হতে চলল এই বিপর্যয় ঘটেছে। ইতিমধ্যে আমরা অনেক শুনেছি, সরকারী বেসরকারী তরফের বিবৃতি পাঠ করেছি, ভুক্তভোগীর কাহিনী দেখেছি। হয়ত, দরজে—নিরাপদে বসে আছি বলে অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদের চমক এবং আঘাতটাও এখন সয়ে আসছে। কিন্তু তফাতে বসে আমরা যা মনে করছি উত্তরবঙ্গের মানুষ তা মনে করে না। করা সম্ভবও নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারও হাত ধরা নয়, ছোটখাটো তেমন দুর্যোগ তো লেগেই আছে; সে-রকম অল্পস্বল্প ক্ষয়ক্ষতি মানুষ সহ্য করে নেয়। উত্তরবঙ্গের এবারের বিপর্যয় প্রকৃতপক্ষেই প্রলয়; মৃতের সংখ্যা, ধনসম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ, জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা—সব দিক দিয়েই এই সর্ব-নাশের চেহারাটি ভয়াবহ। যেখানে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন, অন্নের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী, রুজি রোজগারের পথ করতে পারছে না—সেখানে এই দুর্ভাগ্যকে সহজে ভুলে যাওয়া যায় না।

এই দেড় মাসে সরকার উত্তরবঙ্গের জন্যে কি করেছেন সেটাই আপাতত আমাদের প্রশ্ন। বন্যার পর সরকারী মহলের বড় তরফ যে ঝটিতি একটা উড়োন-সফর সেরে যান তা আমরা হামেশাই দেখে থাকি। এক্ষেত্রেও দিল্লির কর্তারা সফর সারতে গাফিলতি দেখান নি এবং সেই সঙ্গে নানান প্রতিশ্রুতি দিতেও। এদিকে রাজ্য সরকার একদিকে রিলিফের, অন্যদিকে নিজস্ব কিছু সমস্যা নিয়ে বিব্রত। লাভের মধ্যে এই হয়েছে যে, রিলিফের কাজ মোটেই আশাপ্রদ হচ্ছে না। শ্রীঅতুল্য ঘোষমশাই বলেছেন, উত্তরবঙ্গে এখনও বিভীষিকার রাজত্ব চলছে। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদেরও অভিমত কম বেশি একই রকম, সরকারী রিলিফের ব্যাপারে সকলেই অপ্রসন্ন-বদন।

উত্তরবঙ্গের জীবনকে আবার স্বাভাবিকভাবে চালু করতে হলে কিছু সরকারী খয়রাতি, চাল আটা বা দশ বিশ জোড়া কম্বলে কুলোবে না। পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে ক্রমে ক্রমে যে সব জনপদ গড়ে উঠেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন হয়েছিল, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা যা নিয়ে জেগে উঠেছিল আজ তার সবই জলের স্রোতে ধুয়ে গেছে। বলতে গেলে, জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে একটি এমন উপনিবেশ ক্রমে গড়ে উঠছিল যা উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র হত, সেই উপনিবেশ আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। একে আবার গড়ে তুলতে হবে। দু এক বছরে এটা হবার কথা নয়, সময়সাপেক্ষ। বোধ করি তাই কথা উঠেছে, উত্তরবঙ্গকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আবার।

উত্তরবঙ্গকে আবার গড়ে তোলা হোক—সেটা ভাল কথা। কিন্তু একাজ চট করে হবার নয়। তার আগে বরং দেখা যাক, দশ বারো লক্ষ বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের আপাতত পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা হয়েছে? দুঃখের বিষয়, কিছুই হয়নি। নেতারা অভিযোগ তুলেছেন, এ-ব্যাপারে সরকার যে কিছু চিন্তা শুরু করেছেন তাও মনে করা যাচ্ছে না। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছেন, উত্তরবঙ্গের কোনো বিশেষ পরি-কল্পনা নিয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্য সরকার টাকা চেয়েছেন বলেও তিনি জানেন না। অথচ শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি উদার হস্তে অর্থসাহায্য দিতে রাজী। যদি তাই হয়, তবে রাজ্য সরকার যে কেন এখনও কাজে হাত দিতে গড়িমসি করছেন আমরা জানি না।

সাধারণ সরকারী নিয়মে এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সুষ্ঠুভাবে চলা মুশকিল। লাল ফিতার ফাঁস বড় মারাত্মক। আমরা মনে করি, দ্রুত কাজের জন্যে একটি বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এমন একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হোক, উত্তরবঙ্গের আশু কাজগুলি যাঁরা দ্রুত সম্পাদন করাতে পারবেন। দীর্ঘমেয়াদী কাজগুলির জন্যে বিলম্ব করা যায়, কিন্তু জরুরী কাজগুলির জন্যে আর সময় নষ্ট করা চলে না।

নিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে অভিযোগ
আনার জন্য হনুমনথায়ার উপর
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

হনুমানের
ল্যাজে আগুন!

দেশ দর্পণ

দায়িত্বটা কার? মূল প্রশ্নটা বোধ হয় এটাই। কিন্তু সে-প্রশ্ন বিচার করার আগে কয়েকটি তথ্য সামনে রাখা প্রয়োজন। সে-তথ্যগুলো সামনে না থাকলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্প্রতি উত্তর বাংলার বন্যাবিপর্যস্ত মানুষ সম্বন্ধে যে-বিবৃতি দিয়েছেন তার গুরুত্বটা অনেক খাটো হয়ে যায়। তথ্যগুলো সাজিয়ে দিলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়: ৪ অক্টোবর উত্তর বাংলার জেলাগুলো এবং বিশেষ করে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি তিস্তা এবং অন্যান্য নদীর প্লাবনে বা পাহাড়ী ধসে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়। কত লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং গবাদি পশু বিনষ্ট হয়েছে সেটা এখনও অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা ৪ অক্টোবরের বিপর্যয়ের ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক (সরকারী মতে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সকলের ক্ষতি একই ধরনের নয়, এবং যে-ক্ষেত্রে এত ব্যাপকভাবে ধ্বংসলীলা দেখা দেয় সেখানে ক্ষতির পরিমান অনুমান করাও সম্ভব নয়। তবু সরকারী হিসাব অনুসারে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে এর মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ লোক এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যাদের মাথা গুঁজবার চালা বা গৃহ নেই, অথবা চাষের যোগ্য জমি নেই, কিম্বা যাদের ছোটখাট দোকানপাট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে রাখা দরকার। সেটা এই যে, প্লাবন ও ধস নেমেছে ৪ অক্টোবর এবং তারপর ছয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত। কিন্তু এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে উত্তর বাংলার বিপন্ন মানুষগুলো পেয়েছে কি? সরকারী সাহায্য? পেয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু? অপর্যাপ্ত সহানুভূতি সরকারী কর্মচারী অথবা সারা দেশের কাছ থেকে? প্রশ্নগুলোর উত্তর নিশ্চয়ই; কিন্তু সে-উত্তরগুলোর মধ্যে হয়ত বেশ কিছুটা তিক্ততা থেকে যাবে। সেই তিক্ততারই হয়ত আভাস দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে। কারণ তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে, মানুষের ক্ষোভ এবং অভিযোগগুলো তিনি তুলে ধরছেন মাত্র।

এই ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এই কারণে যে, প্রথম থেকেই প্লাবিত অঞ্চলের মানুষগুলো যাদের কাছ থেকে প্রধানত সাহায্য আসা উচিত ছিল তাদের কাছ থেকে তা পায়নি। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় কিছু কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা হয়ত হয়েছে; কিন্তু শ্রীঅতুল্য ঘোষ স্পষ্টই একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, কোন বে-সরকারী সংস্থার প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত হতে পারে না। কারণ প্রায় ১১ হাজার বর্গমাইল বিধ্বস্ত হয়েছে এবং ৫০ লক্ষ লোক বিপর্যস্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্রীঅতুল্য ঘোষ মনে করেন, এমন কি পশ্চিম বাংলা সরকারের পক্ষেও এককভাবে এই বিরাট অঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই উত্তর বাংলায় ছুটে এসেছিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এবং তার কিছুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, তাঁদের সেই উত্তর বাংলা সফর বিপন্ন মানুষদের খুশী করতে পারেনি। তবু দিল্লীর এই নেতাদের আসা প্রয়োজন ছিল, বিপন্ন মানুষের প্রয়োজনটা এবং তাগিদটা উপলব্ধি করার জন্য।

হয়ত সে-কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের নেতারা সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের মানুষদের। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিম বাংলা সরকারকে দেওয়া হয়ত হয়েছে এক কোটি টাকা অ্যাড হক সাহায্য হিসাবে ত্রাণকার্যের জন্য। সেই টাকা কতটা কাজে লাগান হয়েছে অথবা কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে তা অবশ্য জানা নেই; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখা গিয়েছে, ত্রাণকার্য [illegible] হয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গের মানুষেরা খুশী হতে পারেনি। উত্তরবঙ্গের মানুষেরা দেখেছে ত্রাণকার্যের জন্য সরকারী অফিসার জীপ ছুটিয়েছে রাত দিন; তাতে ধুলো উড়েছে অজস্র, কিন্তু সাহায্যের অংশটুকু ছিল 'কণিকামাত্র'। ফলে তিক্ততা বেড়েছে।

তবু এই তিক্ততার অভিজ্ঞতা নিয়ে সরকারী মহলে সাড়া জাগেনি উত্তরবঙ্গের প্লাবনোত্তর সমস্যা সম্বন্ধে। কলকাতা বা দিল্লী কোন সরকারী মহলেই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়নি। একটা প্রচলিত নিয়ম আছে যে, ত্রাণকার্যের খরচ খুব বেশী হলে কেন্দ্রীয় সরকার তার একটা মোটা অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে-দায়িত্বের অংশ স্থির করারও একটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে নিজস্ব কর্মচারীদের পাঠাতে হয় সমস্যার যথাযথ পরিমাপ করতে। এই অনুসন্ধানের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রের দায়িত্ব নির্ধারিত হয়।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কারণ, প্রধানমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী দুজনেই সরেজমিনে তদন্ত করে গিয়েছিলেন। অবশ্য খুঁটিয়ে দেখার অবসর তাঁদের ছিল না। কারণ, তাঁদের হাতে সময় ছিল খুবই কম। কিন্তু দায়িত্ব সম্বন্ধে আরও একটু বেশী সচেতন হওয়া হয়ত সম্ভব ছিল। কেন্দ্রীয় নেতারা যদি যথেষ্ট সচেতন হতেন উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে যে সরকারী তদন্ত ব্যবস্থা করা হয় সে-ব্যবস্থাটা আরও ত্বরান্বিত করতে পারতেন এবং সেই তদন্ত সাপেক্ষে আর কিছু দায়িত্ব ইতিমধ্যে গ্রহণ করতে পারতেন।

এ-দুয়ের কোন ব্যবস্থাই কেন্দ্রীয় নেতারা গ্রহণ করেননি। দেখা গেল যে-কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত টিম বিপর্যয়ের সময় মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে সকল সমস্যার তদন্ত ও বিচার করতে পারত সেই তদন্ত টিম পশ্চিম বাংলায় এল বিপর্যয়ের ছয় সপ্তাহ পর। এই তদন্ত টিমের সদস্যারা উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করে দিল্লী ফিরে যাবেন এবং তারপর তাঁরা যে রিপোর্ট দাখিল করবেন, তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁদের স্থির দায়িত্ব সম্বন্ধে। সরকারী কাজ যে-ভাবে পরিচালিত হয় এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে কোন ব্যতিক্রম করা হবে না। ফলে, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, উত্তর বাংলার সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত নিতে আরও বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। এবং তারপর প্রশ্ন উঠবে সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা।

সময়টা অবশ্যই বসে থাকে না। এ কথাটা শ্রীঅতুল্য ঘোষ উত্তরবঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন বলেই সম্প্রতি কলকাতায় তিনি একটু চড়া সুরে কথা বলেছেন। তিনি ত্রাণকার্যকে উপেক্ষা করেন না; কিন্তু এটাও স্পষ্ট অনুভব করেছেন যে, উত্তরবঙ্গের এতগুলো মানুষকে সরকারী খয়রাতের দাক্ষিণ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিনটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে এবং মাস দেড়েকের মধ্যেই আবার শুরু হয়ে যাবে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী মহড়া। সেই রাজনৈতিক লড়াই শুরু হবার আগেই উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষগুলোকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কর্তব্য; অন্তত ফিরে আসার পথগুলো প্রশস্ত করে দেওয়া। তা ছাড়া মানবতার বিচারেও উত্তরবঙ্গের এতগুলো মানুষকে সরকারী দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল করে রাখা সম্ভব নয়, সমীচিনও নয়।

হয়ত এ কারণেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ পুনর্বাসনের প্রশ্নটা সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করে কয়েকটা বিশিষ্ট উদাহরণ তিনি উল্লেখ করেছেন। জলপাইগুড়ির কাছে কাঠামবাড়ী-দোমোহনি এলাকার একটা বিশেষ অঞ্চলে তিস্তার স্রোতে কয়েকটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেই সব গ্রামের প্রায় ১৩,৫০০ মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় দিনযাপন করছে। শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রশ্ন তুলেছেন, এরা কি সরকারী দাক্ষিণ্য নিয়েই বেঁচে থাকবে? এটা একটা উদাহরণ মাত্র। এমনি বিপন্ন মানুষ আছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায়।

আরও কয়েকটি আশু প্রশ্ন জড়িয়ে আছে পুনর্বাসনের সঙ্গে। যেমন চাষের এবং বাসস্থানের জমির প্রশ্ন। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় বহু ক্ষেত্রে বাড়ি যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, তেমনি তলিয়ে গিয়েছে চাষের জমি পলিমাটির নীচে। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুরে হয়ত এই সব জমি আবার চাষের কাজে লাগান সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য জেলায় এমন অনেক জমি আছে যেগুলো পলি, বালি, পাথরে ঢেকে গিয়েছে। সেগুলো উদ্ধার সম্ভব নয়। যাদের এই সব জমি ছিল, তারা কি নিয়ে বাঁচবে? এ ছাড়াও আছে ছোটখাট দোকানঘর, ছোট ছোট ব্যবসা যেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক এই বিপর্যয় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো রেহাই পাবে কি করে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করেছিল এই সব ছোটখাট ব্যবসা বাণিজ্যকে পুনরায় চালু করার জন্য। সে ব্যবস্থা এখনও কতটা কার্যকরী হয়েছে, অথবা কতটুকু দুর্গত মানুষের কাজে লেগেছে জানা যায়নি। তাহলে?

প্রশ্নটা অবশ্য এখানেই সমাপ্ত নয়। পরের কথাটাই বড় কথা। এই সব মানুষের সামনে ভবিষ্যৎ কোথায়? এরা কি তাহলে দাক্ষিণ্যের দুয়ারেই মাথা খুঁড়ে মরবে। যাতে না মরে সে-কারণেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁর বক্তব্য রেখেছেন সকলের সামনে। তাঁর বক্তব্য খুব পরিষ্কার, পুনর্বাসনের জন্য কোন পরিকল্পনা এখনও তৈরী হয়নি। পশ্চিম বাংলা সরকারের কোন প্রস্তুতিও আছে বলে তিনি জানেন না। শ্রীঅতুল্য ঘোষ মনে করেন যে, এ কাজটা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। অবশ্যই না হওয়ার জন্য হয়ত তিনি দুঃখিত। কিন্তু যে কথাটা তিনি বলতে চেয়েছেন সেটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে এটাই মেনে নিতে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এমন কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে রাখা হয়নি যাতে বোঝা যায় যে, পুনর্বাসন সম্বন্ধে এই সরকারের কোন দায়দায়িত্ব আছে। এটা তিনি বলেছেন, নিঃসন্দেহে উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষের কথা চিন্তা করে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও হয়ত তিনি অস্পষ্ট রেখে গেছেন যে, এর মধ্যে কংগ্রেসের এবং বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান রাজনীতির কিছুটা যোগ হয়ত আছে।

অবস্থাটা বোঝা যায় যদি এটা বিচার করা যায় যে, বর্তমানে পশ্চিবঙ্গের শাসন ব্যবস্থা কার হাতে? এ কথা অজানা নেই যে, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গের সকল দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির তথা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এই দায়দায়িত্ব প্রধানত পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি। এবং সে নীতি প্রধানত এবং মুখ্যত রূপায়িত করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন। যদি উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষের জন্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কোনও সরকারের উপর থেকে থাকে তাহলে তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই; কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী প্রধানত এবং মুখ্যত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এটা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আর্থিক বছরের বাজেট লোকসভায় পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। তাঁরই বাজেট লোকসভায় গৃহীত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে রাজ্যপাল সেটা কার্যকরী করছেন।

এটা যদি মনে রাখা যায় তাহলে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা রাজ্যপালের উপর সকল দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে পুনর্বাসনের কথাটাকে রাজনৈতিক কাঠামোতে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। সেটা সম্ভব নয় বলেই শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিবৃতিতে এই সন্দেহ উঠতে পারে যে, পুনর্বাসনের কথাটা বহুলাংশে রাজনৈতিক দাবার সঙ্গে হয়ত অনেকটা জড়িত। হয়ত তা নয়। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ যে আছে সেটা অনস্বীকার্য।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের কথা মনে রাখলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে শ্রীঅতুল্য ঘোষের এই হঠাৎ আক্রমণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এটাও অসুবিধা হয় না যখন দেখা যায়, যে-নকশালপন্থী কমিউনিস্টরা যুক্তফ্রন্টের নেতাদের কংগ্রেসের দালাল বলে অভিহিত করে অভিযোগ করেন, ওই নেতারাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে জনতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন জলপাইগুড়ি শহরে। এটাও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নিখিল ভারত কংগ্রেসের গোয়া অধিবেশনে যখন মাদকদ্রব্য বর্জন ছাড়া অন্য কোন আলোচনা হয়নি, তখন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীঅতুল্য ঘোষের অভিযোগের সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ অসম্ভব নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে হবে শ্রীঅতুল্য ঘোষের অভিযোগ যেমন একদিকে নির্মম সত্য তেমনি অপর দিকে রাজনৈতিক বিচারে অত্যন্ত বাস্তব। উত্তরবঙ্গের এটাই প্রকৃত অবস্থা যে, বারো লক্ষ মানুষের পুনর্বাসন কোন অজুহাতেই আর ফেলে রাখা উচিত নয়।

রঞ্জন

বোধ হয় চেস্টারটন বলেছিলেন যে, দশ মিনিট সময় দিলে তিনি নিশ্চয় গাড়ি ধরতে পারেন কিন্তু দশ দিন সময় দিলে ট্রেন ফেল অবশ্যম্ভাবী। ভৌগোলিক দূরত্বের বেলায়ও হয়তো অনুরূপ অনুজ্ঞা প্রযোজ্য। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হপ্তা তিনেক বিদেশ ঘুরে ল্যাটিন আমেরিকায় শুধু ডজনখানেক ভারতের দোস্ত নয় প্রায় সমসংখ্যক গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র আবিষ্কার করতে পারেন সহজেই। ল্যাটিন আমেরিকা আর ক্যারিবীয়ান অঞ্চলের ভ্রামণিক=আকর্ষক রঙীন সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রত্যক্ষ করলে, কার না লোভ হয় প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্পিত বিপ্লব দ্বারা উত্তেজিত হতে? এই উত্তেজনার বশেই হয়তো উদাসীন হওয়া চলে নিকটতম প্রতিবেশীর প্রতি। আমরা সবাই সুদূরের প্রয়াসী যে।

তবু পাকিস্তান সম্বন্ধে বৈরাগ্য অথবা কৃত্রিম ঔদাসীন্য একাধারে অযৌক্তিক ও অবাস্তব। ঘরের পাশের ও-দেশ থেকে খবর পাওয়াই ভার। যে খবর মেলে তাতে মুখ ভার না হয়ে উপায় নেই। আয়ুব খানের সামান্য ও বোধ হয় সাময়িক অস্বস্তি থেকে অপার শক্তি আহরণ করবার প্রলোভন বহু দিন পূর্বেই সংযত হওয়া সঙ্গত ছিল। জুলফিকর আলি ভুট্টো একদা প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে প্রগাঢ় ভক্তি ও আনুগত্যের সঙ্গেই সেবা করেছিলেন। আমেরিকার তাঁবেদার গোষ্ঠীগুলিতে যোগ দিয়ে পাকিস্তান যেন তার স্বকীয় সত্তাই হারিয়ে ফেলেছিল। ভুট্টো পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলে পাকিস্তান যেন নিজের ব্যক্তিত্ব আবার ফিরে পেল। আয়ুব খান তাঁর গ্রন্থে এই নীতি নিয়ে গর্ব করেছেন। গর্বটা আদৌ অমূলক নয়। এই নীতির যিনি ধারক না হলেও বাহক ছিলেন, সেই ভুট্টোই কিনা আজ জেলে?

*

একান্ত ঐতিহাসিক কারণেই পাকিস্তানের সকল ঘরোয়া আর বিদেশী নীতির মূলাধার ভারতবিরোধিতা হতে বাধ্য। পাকিস্তানের এই পরিমিত ভারতপ্রীতির প্রতিচ্ছবি ভারতে একেবারেই নেই এমন ধারণা অসত্য। অনুরাগ না থাক, কিন্তু দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক আজ যেন অপরিচয়ের। একে অন্যের খবর রাখে না, প্রায় রাখতে চায় না। পাঠকদের বিশ্বাস করতে বলি, এমন লৌহ-যবনিকা য়ুরোপেও নেই। এমন কি বিভক্ত জার্মানিতেও নেই। চেকোস্লোভাকিয়ায় আজ রুশ উপস্থিতি অতি সত্য। তবু সে দেশ নাকি বিশ্ব থেকে এমন বিচ্ছিন্ন নয় যেমন বিচ্ছেদ আজ ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে। এই মূঢ়তার জন্য মাত্র এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

কে কবে ভাবতে পারত যে কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে হলে একদিন কাঠমাণ্ডু বা ব্যাংকক হয়ে যেতে হবে? কূটনীতিক সম্পর্ক একটা রকমের আছে। ব্যস, আর কিছু নেই। অথচ পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে একমাত্র কূটনীতিক সম্পর্ক ছাড়া প্রায় আর সব সম্পর্কই বর্তমান। প্রাচীর সত্ত্বেও। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কিন্তু মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। রাওয়ালপিণ্ডি নিশ্চয়ই চায় না যে, বাঙালী মন এক হোক আর বাঙালীর প্রাণ এক হোক। আমার বক্তব্য এই যে, এক না হলেও অন্তত একটা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যাকুলতা কলকাতা বা ঢাকায়ও অনুপস্থিত বা বিলীয়মান। দেশ বিভাগ সত্যই মন বিভাগে পরিণত হয়েছে। দুয়ের জোড়া চাইনে। তুমুল কাণ্ড, যেমন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, না হলে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু পারস্পরিক প্রয়োজনে জড়ো হতে বাধা কী?

একটি বিরাট বাধা ছিলেন শ্রীজুলফিকর আলি ভুট্টো, যিনি আজ আয়ুব খানের সমালোচক তথা প্রতিদ্বন্দ্বী। এ দুয়ের মাঝে তবু আছে কোনো মিল। যথা ভারত-বিদ্বেষ।

*

প্রয়োজন নেই আয়ুবস্তুতির। প্রয়োজন নেই বন্দী ভুট্টোর জন্য অশ্রুবিসর্জনের। আগেই ইঙ্গিত করেছি, সবচেয়ে অপ্রাসঙ্গিক আয়ুবের সাময়িক অস্বস্তিতে বা ভুট্টোর কারাবাসে উল্লসিত হওয়া। সবল পাকিস্তান ভারতের শত্রু হতে পারে বইকি, ইতিমধ্যেই হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু দুর্বল, অসংহত পাকিস্তান হবে শত্রুর বাড়া। পাকিস্তানে অরাজকতা এলে তা সীমান্তে এসে থেমে যাবে না, যেমন দুই দেশে প্রবহমানা নদী-গুলির বন্যা মানে না দুই দেশের সীমানা। প্রতিকূল প্রতিবেশীর আভ্যন্তর অরাজকতার সুযোগ গ্রহণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অসংখ্য। কিন্তু তার জন্য যে কূটনীতিক ও রণনীতিক কুশলতা আবশ্যক দিল্লিতে তার আতিশয্য নেই। বেশী চতুর হতে গেলে শুধু আমন্ত্রণ জানানো হবে বাইরের অরাজকতাকে ভিতরের প্রচ্ছন্ন অনিশ্চিতির সক্রিয় সঙ্গী হবার।

পাকিস্তানে গণতন্ত্র কবরস্থ হয়েছে সেটা ভারতে সীমায়িত শোকের বিষয় হতে পারে বইকি। এই সেদিন তো চোখ ভাসিয়েছি সুদূর চেকোস্লোভাকিয়ার জন্যও। সরকারীভাবে ভারতের কারবার শুধু পাকিস্তানের সরকারের সঙ্গে এবং পরের দেশে সেই সরকারই সঙ্গত সরকার যা প্রতিষ্ঠিত, যাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মতো বিরোধী শক্তি সেদেশে আপাতত অবর্তমান। পাকিস্তানে গণতন্ত্র থাকবে কি থাকবে না, থাকলে তা কী রূপ নেবে, এ সবই পাকিস্তানীদের ভাববার কথা। পাকিস্তানই একমাত্র স্বৈরাচারী দেশ নয় যে ভারত সরকারের স্বীকৃতিধন্য।

*

পাকিস্তানের সঙ্গে আবেগবিরহিত এবং সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক একটা সম্পর্ক স্থাপনে ভারত অধিকতর প্রয়াসী হলে ব্যর্থতাই অবশ্যম্ভাবী ফল না হতেও পারতো। পাকিস্তানের কাছ থেকে সামান্যতম উৎসাহ আসেনি, সত্য। কিন্তু অবন্ধুর সঙ্গেও কার্যকর আদান-প্রদানের সম্পর্ক একাধারে সম্ভব এবং উভয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। পাকিস্তানের উপর রাগ করে আমরা শুধুই মাটিতে ভাত খেয়েছি মাছ বিনে।

বন্ধুত্ব ছাড়াও সংযোগ স্থাপন সম্পর্কে আরেকটি কথা সভয়ে উল্লেখ করতেই হবে। পাকিস্তানী পররাষ্ট্রনীতির চেহারা ও গতি-প্রকৃতিই বদলে গেল চীনের সঙ্গে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপনের সঙ্গে। এই নব বন্ধুত্বের ভিত্তি নিশ্চয়ই ভারতের প্রতি উভয়ের অনুরূপ বিরাগ। কঠোর সত্য। তাই বলেই কি ভারতের কূটনীতির আর কোনো কাজ নেই খানাপিনা করা ছাড়া? সবায়ের হয়তো জানা নেই, চরম শত্রুতার সময়ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে হ্যানয় ও পিকিং-এর সম্পর্ক কখনোই এত সুদূর ছিল না যেমন আজ রয়েছে ঢাকা আর কলকাতায়, দিল্লি আর পিকিং-এ। বৈরিতা বুঝি। অক্ষমণীয় মনে হয় অকর্মণ্যতা।

কবিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

১

বীণকার স্পর্শবিদ্ধ তার স্তব্ধ বীণার উপরে
বাজনা চলুক তবু যেমন চলেছে
এত শীঘ্র এবং সহসা নয় নীরবতা

প্রত্যেকে মরণশীল, অপরাধী
আমরা দেখেছি রাত্রি উত্তোলিত তার দু বাহুতে
ঘনীভূত হয়েছিল অনন্ত সময়

২

দেবতারা সাক্ষী, ভালো লেগেছিল তোমাকে সেদিন
ভালবেসে চাইনি নতুন করে দুঃখ পেতে
তবু একবার ফুলে উঠেছিল বর্ণাঢ্য প্রহর

চেনা দৃশ্যভূমি ঃ পথ কেটে গেছে যুগল হৃদয়
এখনো গরিমা তার, ফেরানো মুখের আশা
বজ্র ও বিদ্যুৎ হানা সমুদ্রের বুকে

৩

কুশলী সাঁতারু তোমার এক পা উষ্ণ জলে
অন্য পা প্রোথিত শীতল প্রবাহে
কেন বাড়ালে খোদাই-করা বাহু আমার শূন্যের দিকে

এখানে কেবল আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুঃখ পাওয়া
নিষ্কলঙ্ক উচ্চতায় যৌবন প্রৌঢ়তা হয়
যকৃতের ভোজে নামে ঈগলের পাল

কুশলী সাঁতারু, জলরাশি থেকে দূরত্ব আমার যায় বেড়ে যায়
দুই প্রান্ত দশ প্রান্ত ছাপি শরীরে ঘরায় নামে একটানা রাত্রি
অন্ধকার দেবতার নাম ধরে আর্তনাদ করি—ফেরে প্রতিধ্বনি

নির্জন রাত্রির স্বপ্নে

সুচেতা ভট্টাচার্য

নির্জন রাত্রির স্বপ্নে বাঁধ ভেঙে দিয়ে গেছে ওরা
গুপ্তঘাতকের দল—রাত্রিশেষে খবর পেলাম।

জলাধার-উৎস থেকে বড়ো পরিচিত এক মুখ
আমার উত্তরকাল, মাটি ভিজে গেছে লোনা জলে
দুই হাতে ঈশ্বরের অভিশাপ, রক্তের তিলক
কলঙ্কের মতো জ্বলে ক্ষয় হ'য়ে গেছে ইতিহাস।

নির্জন রাত্রির স্বপ্নে কে যেন আশ্বাস দিয়েছিল
কে যেন কানের কাছে নিঃশব্দে পরম স্নেহভরে
উচ্চারণ করেছিল ভালোবাসা—বড়ো প্রিয় নাম।
আমার দক্ষিণ বাহু আন্দোলিত অস্থির শয্যায়।

করণিক

তুষার রায়

কিছুই আসলে করতে পারি না আমরা
খোলা ছাড়িয়ে কাঁচকলাটাও এমন কি
হ'ল না যে সেদ্ধ,
এবং সেই বধ্য লোকটাও দেখ ঘুরেছে
কলাটা দেখিয়ে।

ভালো লাগে না ঢাকা কেবিনে দু মিনিটের প্রেম,
কাছে আসতেও ভালো লাগে না দূরে যাওয়ার মতো,
হাত পা ছেড়ে তাই আজকাল দপ্তরে দপ্তর থাকি
ফাইলে ফাইল,—
এক আধ মাইল লাফ না দিয়ে চুপটি বেড়াল,
টাইপ রাইটার লাল রিসিভার তুমিও আছো
আমোও তো আছি

হিসেব কষার মেশিনও আছে, প্রস্রাবেরও বেসিন।

'যশং এবং তারপর'

আপনারা যাঁরা খুব সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন, তাঁরা আমাকে মার্জনা করবেন। আমি সেই মহাপ্রাজ্ঞ স্বর্গীয় গোপাল ভাঁড়ের একটি সুপরিচিত গল্প পুনরুদ্ধৃত করব।

বলা অনাবশ্যক, গল্পটা স্থূল। কিন্তু লোকচরিত্রবিশারদ সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিটির এসব গল্প কিঞ্চিৎ 'ক্রুড্' হলেও এদের ভেতরে যেসব গভীর জ্ঞান নিহিত আছে—আশা করি সেগুলির গুরুত্ব আজও আপনারা অস্বীকার করবেন না।

কোনো চাষীর একটি গোরু হারিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন খুঁজে গোরুটার সন্ধান পাওয়া গেল না, সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে

শ্রান্ত-ক্লান্ত লোকটি ধপ করে বসে পড়ল ঘরের দাওয়ায়। তারপর ছেলেকে ডেকে বললে, 'একঘটি জল দে ভাই!'

শুনে তার স্ত্রী বললে, 'তোমার মাথা খারাপ হল? ভাই বলছ নিজের ছেলেকে?'

উত্তরে আরো হতাশ—আরো উদ্‌ভ্রান্ত একটি স্বর শোনা গেল: 'মা গো, গোরু হারালে এমনিই হয়।'

গল্পটি স্মরণ করবার কারণ, কিছু দিন পূর্বে প্রকাশিত একটি জার্নাল: 'যশং দেহি।'

লেখাটি পড়ে অতি বিমর্ষ মুখে আমার এক বন্ধু আবির্ভূত হলেন। বললেন, 'আপনি যশং লিখেছেন?'

বললুম, 'নিঃসন্দেহে।'
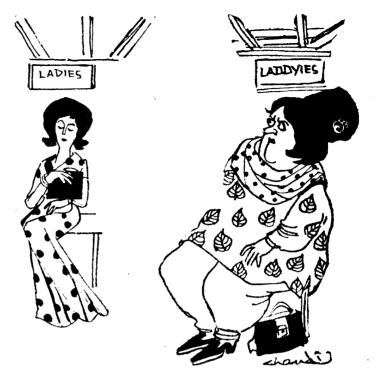
'ওটা কি যশো দেহি নয়?'

বললুম, 'হতে পারে, না-ও হতে পারে।'

'না-ও হতে পারে?'—তাঁর বদন ব্যাদিত হল: 'তার মানে?'

বললুম, 'আমার ইচ্ছে ছিল স্বিষং জহিও লিখব। কিন্তু ফসকে স্বিষো বেরিয়ে গেছে।'

'স্বিষং?'—বন্ধু এবার বিষম খেলেন। তারপর এমন মুখ করে উঠে গেলেন যে আমার সন্দেহ হল, রাস্তায় বেরিয়ে—ব্যাকরণ-ধর্ষণের এই যন্ত্রণায় তিনি কেঁদেই ফেলবেন।

যশং নয়—যশং হতে পারে না, আলবত 'যশো দেহি।' কিন্তু ওই গোপাল ভাঁড়ের গল্প। গোরু হারালে কারুর মাথা ঠিক থাকতে পারে না।

না—আমার গোরু হারায়নি, তা হলে তো নিজেই হারাতুম। কিন্তু কল্পনা করুন—যদি বাড়ির চারদিকে চারটি অ্যাম্‌প্লিফায়ারে এক সঙ্গে যাত্রার পালা এবং 'বুড়ো মিল গয়া', চণ্ডীপাঠ এবং 'আর একটু কাছে এসো জি বোসো না' জাতীয় রম্যগীতি এক সঙ্গে বাজতে থাকে—তা হলে সেই ধ্বনি সংঘাতে মাথার ভেতরে যে বিপ্লব বাধে তাতে নামের আগে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত চলে আসতে চায়, দু-একটা বাড়তি অনুস্বার তো যৎকিঞ্চিৎ!

ধরুন—'যশং দেহি, পড়ে উত্তেজিত হয়ে

একজন আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি যে ক্ষত অন্তঃসারশূন্য—এবার সেটা তিনি ধরে ফেলেছেন। (এতদিন পরে? নিজের ওপর শ্রদ্ধা হচ্ছে—তা হলে তো বহুকাল আত্ম-গোপন করতে পেরেছি?) কিন্তু চারটে মাইকের আঘাতে যদি আমি 'যশং' লিখেই থাকি—তা হলে এক জার্নালের খোঁচাতেই উক্ত পত্রদাতার লাইন পাঁচেক চিঠি থেকে বেরিয়েছে—'সমীপেসু', 'উচিৎ' এবং 'Superfaccal'! একেই বলে গোরু হারানো! এর পরেও কি আমি অবধ্য নই?

তবু 'যশং দেহি' লিখে আমার যে দারুণ 'অপযশং' হয়ে গেল, তাতে আর সন্দেহ নেই। যশঃ আমার আর জুটবে না (কবেই বা সে দুরাশা ছিল!), চণ্ডী যশোদা হয়ে আমাকে আর যশস্বী করবেন না—কোনো যশস্কর কীর্তির দ্বারা আমি যে দ্বিতীয় যশোধর্মদেব বা যশোবন্ত সিংহ হয়ে যশঃ-শৈলে যশস্বানরূপে বিদ্যমান থাকব, সে প্রসপেকটও গেল।

আমি অবশ্য তর্ক তুলতে পারি। বানান-ব্যাকরণ যা বলুন—কোনোটাই কি স্ট্যাটিক থাকা উচিত? লোক-ব্যবহারে তাদের পরিবর্তন ঘটে, সেইটেই জীবনধর্ম। ছেলে-বেলায় ইংরেজী 'প্রোগ্রাম' বানানের দুটো 'এম' আর 'ই' সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকতে হত —'লেফটেন্যান্ট'-কে মনে রাখতে হত: 'মিথ্যা তুমি দশ পিপীলিকা'র সাহায্যে। এখন একটা 'এম'-ই প্রোগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট —শুনেছি 'এল-ই এফ' দিয়েই লেফটেন্যান্টরা যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। তা ছাড়া 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'র পরে কোন্‌টা ভালো শোনায়—'যশং' না 'যশো'? সুশ্রাব্যতাও তো ভাষার একটা আকর্ষণ?

আমি যদি নিতান্ত কমনম্যান সুনন্দ না হয়ে কোনো মহামানব হতুম—তা হলে এই 'যশং'-ই আর্ষপ্রয়োগরূপে সিদ্ধিলাভ করত। তা হলে মহাকবি কালিদাস ইত্যাদির মতো আমার সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সস্নেহে বলতেন: 'নিরঙ্কুশ হি কবয়ঃ!' গীতার আর্ষপ্রয়োগগুলো শ্রীভগবান কথিত এবং শ্রীবেদব্যাস কর্তৃক অনুলিখিত হয়ে সগৌরবে বিদ্যমান রইল—কোন্ যাস্ক, কোন্ ব্যোপদেব, কোন্ পাণিনি তাদের তুচ্ছ করবেন?

চণ্ডীপাঠ নামক চ্যাঁচানি শুনলে বাপের নামটাই ভুল হয়ে যায়, মশাই

এখনকার কথা জানি না, আমাদের ছেলে-বেলায় আমরা সবাই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "পাখিসব করে রব" দিয়ে প্রথম কাব্যপাঠ আরম্ভ করতুম। তার একটি লাইন: "পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।" বৈয়াকরণ না হয়েও যে-কোনো বঙ্গভাষাবিদ্‌ই জানেন—'পরিমল' মানে আর যা-ই হোক, ফুলের গন্ধ নয়। জনশ্রুতি আছে, শব্দটি ওখানে বসিয়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। মদনমোহন আপত্তি তুললে সহাস্যে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'কবিতা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের, পরিমল লিখল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বাংলা ভাষার ঠিক চলে যাবে।'

চলে নিশ্চয় গেল, রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে লিখতে পারলেন: 'যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে।' শুধু ওইখানেই কবিগুরু থামলেন না—তিনি 'মনোসাধে' লিখলেন, 'বাতায়ন' অর্থে 'জালায়ন' ব্যবহার করলেন, 'ক্ষিতি সৌরভের সঙ্গে 'রভসে' চালালেন, দিকে দিকে আর্তনাদ শুনেও 'দিকে দিকে কাঁদিছে ক্রন্দসী'কে স্থানচ্যুত করলেন না। আর ইংরিজী যাঁরা পড়েন—তাঁরা যদি শেক্‌সপীয়রের ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামাতেন—

কিন্তু অহো—আমি বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ শেক্‌সপীয়র নই। নিতান্তই সুনন্দ—অলং অপযশং!

শুধু চুপি চুপি একটা কথা। যে 'যশ' বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরের কাগজের মারফত বিক্রি হয়, সেটা 'যশঃ' না 'যশং'—সুধী-ব্যক্তিরা সেটাও বিবেচনা করবেন।

সুলতার বিয়ে

প্রমথনাথ বিশী

অনির্বাণ একজন বনেদী লেখক। তার লেখা সম্পাদকগণ চেয়ে নিয়ে আগ্রহ সহকারে ছাপে; প্রকাশকরা এবেলা-ওবেলা তার বইয়ের সংস্করণ ছাপতে ব্যস্ত; ছাপার কালি শুকোতে সময় পায় না, গ্রাহকে এসে লুফে নিয়ে যায়। সর্বোপরি তার লেখা না থাকলে পূজা সংখ্যার পত্রিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার লেখা এসে পৌঁছবার আশায় পত্রিকা-প্রকাশ বন্ধ থাকে, যেমন মন্ত্রীরা এসে না চাপা অবধি রেলগাড়ি ছাড়ে না। কাজেই অনির্বাণ রায়কে বনেদী লেখক না বলবো কেন!

এ হেন অনির্বাণ সম্প্রতি পূজা সংখ্যার জন্য লেখায় ব্যস্ত, বাঙালী লেখক মাত্রেই এখন ব্যস্ত, অনির্বাণ কিছু বেশী ব্যস্ত। গত ১৫ দিনে সে একান্নটি গল্প নামিয়েছে, আর একটি হলেই গল্পের বাহান্ন পীঠ সম্পূর্ণ হয়ে এবারের মতো পূজা সংখ্যার কাজ শেষ হয়। সেই শেষ লেখাটি এখন তার হাতে। এই পনেরো দিনে লেখার মেজাজে গিন্নীর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে, গিন্নী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। পর পর তিনটি চাকর তাড়া খেয়ে চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা কেউ ধমক কেউ কিল চড় খেয়েছে। পাড়ার লোকে নিশ্বাস রোধ করে গম্ভীর। অনির্বাণ রায় পূজা সংখ্যার রচনায় ব্যস্ত।

সন্ধ্যাবেলায় সে বাহান্নতম গল্পটির গোড়াপত্তন করেছে। এমন সময়ে কয়েকজন বন্ধু এসে টেবিলের চারপাশে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসল। অনির্বাণ মনে মনে তাদের মুণ্ডপাত করল, কিন্তু বন্ধুরা উঠল না, গল্প আর বেশী দূর অগ্রসর হল না। রাত্রি এগারোটা নাগাদ আহারান্তে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, লেখার ঘরেই এখন শোয়ার ব্যবস্থা, ভাবলো একটু ঘুমিয়ে নিই, শেষ রাতে উঠে শেষ করলেই হবে। অসমাপ্ত রচনা টেবিলের উপরেই পড়ে রইল। অনির্বাণ নিদ্রিত।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল চেয়ারগুলো শূন্য নয়, লোক বসায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এরা কারা, কেমন করে এলো, কেন এলো শুধাবেন না, গল্প শুনবেন শুনুন, আর তা ছাড়া আপনারা যতটা জানেন আমি যে তার চেয়ে বেশী জানি তা নয়। আটখানি চেয়ারে আটজন ব্যক্তি। আর এঁদের লোক বলা চলে না, কারণ চেহারায় ও পোশাকে এঁরা বিশিষ্ট তাই লোক নয় ব্যক্তি। এঁদের নাম বলতে পারবো না, তবে চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দিতে পারি। একজন বাদে সকলেই প্রৌঢ়,

বৃদ্ধ বলাই উচিত, কিন্তু বৃদ্ধকে বৃদ্ধ বলা অন্যায়।

চেয়ার সারির প্রথমখানিতে যিনি উপবিষ্ট, তাঁর গোঁফ দাড়ি কামানো, মাথায় চারদিকটাও কামানো, মাঝখানে সাদা কালো চুল, যেন একটা চুলের টুপি। গায়ে মোটা চাদর, পরনে মোটা ধুতি, পায়ে শুঁড় তোলা চটি। দ্বিতীয় ব্যক্তিরও মুখমণ্ডল গুম্ফ শ্মশ্রুরহিত, বর্ণ গৌর, মাথায় শালের পাগড়ি, গায়ে আচকান, পরনে ইজার, নাকে মুখে চোখে খড়্গের ধার, ওষ্ঠাধরে সর্বদা যেন একটা চাপা হাসির আভাস। এঁদের তুলনায় তৃতীয় ব্যক্তির বয়স অনেক কম, ত্রিশ পার হয়েছে কিনা সন্দেহ। তিনি যুবক হলেও চেহারায় ছেলেমানুষী ভাব; দিব্যি ফরসা, গোলগাল বিয়ের বরের মতো মুখ; গায়ে শাদা উড়ুনী। চতুর্থ ব্যক্তির চেহারা একটা রাজবদুন্নত ধনীর ভাব, যেন হিমালয়ের মহাগিরিশৃঙ্গ মালার মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মুখে গুম্ফ শ্মশ্রু, মাথায় দীর্ঘ পক্ককেশ, গায়ে আগুলফ লম্বিত জোব্বা। পঞ্চম ব্যক্তির রঙ তেমন ফর্সা নয়, দেহ কিছু স্থূলে, চিবুকে এক গুচ্ছ দাড়ি, যাকে ফ্রেঞ্চ কাট বলা হয়, গায়ে কোট, কোটের উপরে পাটকরা চাদর। ষষ্ঠ ব্যক্তি গৌরবর্ণ হাস্যোজ্জ্বল মুখ, দাড়ি গোঁফ কামানো চেহারা। সপ্তম ব্যক্তি গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, সুপুরুষ, দাড়ি নাই তবে বেশ পুষ্ট গুম্ফ আছে, মুখে-চোখে কৌতুক ও কৌতূহল মিশ্রিত। অষ্টম ব্যক্তির রঙটা গৌর নয়, মাথার চুল এলোমেলো, কপাল চওড়া, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবি, হাতে বাবুলাঠি।

প্রথমে সেই মাথার চারদিক কামানো ব্যক্তি কথা বললেন, আহা বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, টেবিলের উপরে কাগজপত্তর দেখছি, এগজামিনের পড়া বোধ করি। আমার বন্ধু প্যারী সরকার আর হেয়ার সাহেবে মিলে কী প্রথাই না সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

তাঁর কথা শুনে জোব্বাধারী ব্যক্তি বললেন, এ ব্যক্তি পরীক্ষার পোড়ো নয়, আজকালকার ছেলেরা পরীক্ষার জন্য ভাবে না, তার সহজ ব্যবস্থা তারা করে নিয়েছে। এ লোকটা একজন লেখক, পুজোর লেখা লিখতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

পূর্বোক্ত ব্যক্তি শুধালেন পুজোর লেখা কিরকম। অন্য সময়ে কি লেখে না?

এবার শালের পাগড়ি উত্তর দিলেন, ওসব আপনি বুঝবেন না, আমাদের সময়ে ও উপদ্রব ছিল না। তখন পত্রিকার সংখ্যা মাসে মাসে বের হতো না, অনেকে গ্রাহকের টাকা নিয়ে কোন সংখ্যাই বের করতো না, আবার অনেক গ্রাহক বিনামূল্যে বছরের পর বছর পত্রিকা আদায় করে নিত। তখন সাহিত্য ছিল শখ, এখন ব্যবসা। এখন নিয়মিত সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করতে হয়, পুজো সংখ্যায় বিশেষ ব্যবস্থা।

উনি যা বললেন তার সাক্ষী আমি। ব্যবসার যুগে শখ করে কাগজ বের করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। সকলে দেখলো বক্তা গুম্ফবান ষষ্ঠ ব্যক্তি।

এবারে শুঁড় তোলা চটিধারী প্রথমোক্ত ব্যক্তি বললেন, বুঝলাম সবই। বেচারাকে সাহায্য করা যায় না।

যায় বইকি, ওর অসমাপ্ত লেখাটা সবাই মিলে শেষ করে দিলেই হয়।

বেশতো তুমি দাও না, উপন্যাস লিখে তুমি তো খুব নাম করেছ।

কেন, আপনার সীতার বনবাসখানাও তো উত্তম উপন্যাস।

পরিহাস করছ।

কি সর্বনাশ, আপনার সঙ্গে! আপনার লেখা পড়েই বাঙালী লিখতে শিখেছে।

বটে! আলালের ঘরের দুলাল পড়ে নয়।

শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়ায় দেখে জোব্বাধারী ব্যক্তি বললেন, এক কাজ করা যাক। আমরা সবাই অল্পবিস্তর লিখতে পারি। সবাই মিলে বারোয়ারি প্রথায় বেচারার লেখাটা শেষ করে দিই না কেন!

এ অতি উত্তম প্রস্তাব সকলে বলে উঠলেন।

চটিধারী ব্যক্তি বললেন, তার আগে জানা আবশ্যক ছোকরা কতদূর কি লিখেছে।

সে তো জানতেই হবে। আচ্ছা তুমি পড়ো তো। বলে টেবিলের উপর থেকে লেখা কাগজগুলি নিয়ে জোব্বাধারী ব্যক্তি ষষ্ঠ ব্যক্তির হাতে দিলেন।

তবে শুরু করি বলে তিনি আরম্ভ করলেন,

গোড়াতেই লিখে রেখেছে অনির্বাণ রায়, তবে বুঝতে পারছি না গল্পের নাম না গল্প লেখকের নাম! মোদ্দা কথা ঐ শব্দ

তিনি কাগজ টেনে নিয়ে মাথা নীচু করে মিনিট পনেরো লিখলেন

দুটির উপরে লেখকের ভরসা সবচেয়ে বেশি। যাক এবারে শুনুন;—

"সুলেতার স্বামী আজ প্রায় বারো বছর নিরুদ্দেশ। বিয়ের পরেই অনিমেষ যুদ্ধে যায়। প্রথমে গিয়েছিল বর্মায়, তারপরে সিঙ্গাপুরে, তারপরে আর কিছু জানা যায়নি। হঠাৎ একদিন সামরিক কর্তৃপক্ষ সময়োচিত দুঃখ সহকারে জানিয়ে দিল যে, অনিমেষ চৌধুরী missing, কিনা নিরুদ্দেশ। সে আজ প্রায় বারো বছর হতে চলল। তখন সুলতার বয়স ছিল ষোল, এখন আটাশ, তখন সে ছিল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, এখন এম-এ। এখন চাকুরি করে এক কলেজে, থাকে বাপের বাড়িতেই, শ্বশুরের অবস্থা তেমন ভালো নয়। সুখে দুঃখে এক রকম চলে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে সুলতার পিতার মনে হল মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়া উচিত। স্ত্রীকে রাজী করতে কিছু বেগ পেতে হল। অবশেষে সুলতার মা যখন রাজী হলেন প্রস্তাব শুনে সুলতা একেবারে বেঁকে বসল। না, না, না, কিছুতেই সে বিয়ে করবে না। হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ কি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বিনোদিনী কি বিয়ে করেছিল?"

সপ্তম ব্যক্তি জোব্বাধারীর দিকে তাকাল।

জোব্বাধারী বললেন, কেন দামিনী?

শুনুন, "কেন রমা কি বিয়ে করেছিল?"

সকলে সপ্তম ব্যক্তির দিকে তাকাল।

তিনি বললেন, কেন কখন?

"সুলতা ভাবলো কুন্দনন্দিনীর দ্বিতীয়-বার বিবাহ করবার কি বিষময় ফল।"

কুন্দনন্দিনীর কৃতকার্যের জন্য কি আমি দায়ী! সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? বক্তা শালের পাগড়ীধারী ব্যক্তি।

আলবত বিবাহ হবে, এক শ' বার বিবাহ হবে, কারণ শাস্ত্রেই আছে নষ্টে মৃতে প্রব্রাজিতে। আইন পাশ হয়েছে, আমার ভাই শম্ভু বিধবা বিবাহ করেছে, আমার ছেলে নারায়ণ বিধবা বিবাহ করেছে, আরও শত শত হিন্দু বিধবার বিবাহ হয়েছে, সুলতারও হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি, সেই যার বরের মতো চেহারা সে বলল, আচ্ছা ওসব তর্ক পরে শুনবো, এখন পড়ুন, আর কি লিখেছে শুনি।

আর কিছু লেখেনি, এই পর্যন্তই লিখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শালের পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তি বললেন, তবে নিন আপনি ওর পর থেকে শুরু করুন।

আমাকেই আগে লিখতে হবে, আচ্ছা তবে তাই হোক—এই বলে তিনি কাগজ-খানা টেনে নিলেন। এ তোমাদের কলের কলমে আমার সুবিধা হয় না।

খাগের কলম আর কোথায় পাবেন, যুগটাই কলের, ওতেই যা হয় করুন।

তখন তিনি মুঠ কলমে ফাউণ্টেন পেন ধরে খস্ খস্ করে লিখতে লাগলেন। মিনিট দশেক লিখে মাথা তুললেন, বললেন নাও হয়েছে, আর মাথায় কিছু আসছে না, পড়ে দেখো প্রাণ্ধ কতদূর গড়িয়েছে।

ওটাও আপনি সারুন, আপনিই পড়ুন।

আমাকেই পড়তে হবে, আচ্ছা। তিনি পড়তে শুরু করলেন—

"সুলতার পিতা কহিলেন, বৎসে, তুমি

আমাদের নয়নের মণি, আদরের ধন। তোমার দুর্ভাগ্যে আমাদের দুঃখের অবধি নাই। যতকাল আমি ও তোমার মাতা জীবলোকে আছি সেই সন্তাপে দগ্ধ হইতে থাকিব, কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মৃত্যুর পরেও তোমার দুঃখে আমাদের হৃদয় সন্তাপিত হইতে থাকিবে। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, পিতামাতাকে এই দুঃখানল হইতে উদ্ধার করা তোমার কর্তব্য কি না।

সুলতা বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, পিতঃ, আপনি ও জননী ঠাকুরানী আমার কাছে ভগবান ও ভগবতী, আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য! কিন্তু এরূপ অশাস্ত্রীয় আদেশ করিবেন না। কে না জানে যে হিন্দু বিধবার পক্ষে পুনরায় স্বামী গ্রহণ স্বামী হত্যার তুল্য।

পিতা কহিলেন উত্তম, যখন শাস্ত্রের কথাই তুলিয়াছ, তখন সেই বিচার হউক। দেখ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-বারিধি মন্থন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন স্বামী যদি মৃত হয়, সন্তানোৎপাদনে অক্ষম হয় এবং প্রব্রজিত অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয় তবে রমণীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত।

সুলতা বিনীতভাবে কহিল, পিতঃ ক্ষমা করিবেন। আপনার শ্রীচরণ তলে বসিয়া কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ঐ যে প্রব্রজিত শব্দের অর্থ করিলেন নিরুদ্দেশ, তাহা কি শাস্ত্রসম্মত? তিনি তো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই।

পিতা বিগলিত আনন্দাশ্রু লোচনে কহিলেন, ধন্য, ধন্য পুত্রী। তোমার মতো বিদুষী কন্যার পিতা হইয়া সৌভাগ্যবান হইয়াছি। সত্যই প্রব্রজিত শব্দের অর্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ, কিন্তু তাহা প্রাথমিক অর্থমাত্র। পরবর্তীকালে অর্থব্যাপ্তিতে নিরুদ্দেশ দাঁড়াইয়াছে, কাজেই উহাও শাস্ত্রসম্মত।

সুলতা কহিল, পিতা আপনার তুলনায় আমি কীটাণুকীট, আপনার সঙ্গে শাস্ত্র ব্যাখ্যায় পারিয়া উঠিব সাধ্য কি! শাস্ত্র যদি সম্মত হয়, তবু মন যে সম্মতি দান করে না। ঐ যে বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তিনি তো শুধু পণ্ডিত নন, তিনি দয়ার সাগরও বটে।

বৎসে দয়ার সাগর বলিয়াই তিনি হিন্দু বিধবার দুঃখে গলদশ্রু হইয়াছিলেন। বলেন, অকাল বৈধব্য অশেষ দোষের আকর। কুলত্যাগ, ভ্রূণহত্যা কত না মহাপাতক ঐ আকর হইতে সৃষ্টি হইতেছে। শাস্ত্র-সম্মতভাবে পত্যন্তর গ্রহণ উহার একমাত্র প্রতিকার। আর যদি শাস্ত্রানুশাসনে মন না সাড়া দেয় তবে ইহাকে পিতার আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবে। স্মরণ রাখিও যে পিতার আদেশে রামচন্দ্র বনবাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। পিতৃ আদেশ সুসন্তানের পক্ষে অলঙ্ঘ্য।

সুলতা উত্তর দিল না, নতমুখী হইয়া উপবিষ্টা রহিল।

তখন পিতা কহিলেন, বৎসে, অনেক বেলা হইয়াছে, মার্তণ্ডদেব মধ্যগগনারূঢ় হইয়াছেন, ক্ষুৎকৃষ্ণায় তোমার মন এখন বিকল, যাও এখন স্নানাহার সমাপন কর, পরে পুনরায় আলোচনায় বসিব।

তখন সুলতা বিনীতভাবে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া ধীর পদে স্নান গৃহে প্রবিষ্টা হইল।"

পাঠ শেষে লেখক মাথা তুলে বললেন, ওঃ অনেকটা লিখে ফেলেছি, নাও, এখন তোমার হাতে খাতা পড়ুক—এই বলে তিনি কাগজখানা শালের পাগড়ীধারী ব্যক্তির দিকে অগ্রসর করে দিলেন।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি, লিখিত অংশ পাঠ সমাপ্ত করে শুধালেন, কেমন লাগল।

সেই [illegible] ব্যক্তি বললেন, আহা কি [illegible]—এই বলে লেখক সেই [illegible] অপর ব্যক্তির দিকে তাকালেন।

[illegible] ছেড়েছেন স্যার, জুতিয়ে ছেড়েছেন।

প্রথম লেখক বললেন, তার মানে? কে কাকে জুতো মারলে?

[illegible] কার এমন সাহস আছে।

কিছুটা [illegible] হয়ে বললেন, কাকে [illegible]?

পাঠক সমাজকে। আমাদের রচনায় বাপ যদি এমনভাবে বিধবা বিবাহের পক্ষে ওকালতি করতো তবে পাঠক ক্ষেপে উঠত, বই বিক্রি বন্ধ হতো, প্রকাশক আর বই ছাপত না।

আজকাল অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে নাকি?

তা ছাড়া আর কি বলবো স্যার। দেখলেন না, রোহিণী, বিনোদিনী, ননীবালা, রাজলক্ষ্মী, রমা, সাবিত্রী কারো এমন বুকের পাটা হলো না যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে।

তার মানে লেখকদের সাহসের অভাব।

ও একটা কথা হল, বক্তা সেই ষণ্ঠ ব্যক্তি যার নাকি পুষ্ট গুম্ফ ও প্রশস্ত ললাট।

জোব্বাপরিহিত ব্যক্তি এবারে বললেন, আগে গল্পটা শেষ হয়ে যাক, তারপরে আলোচনা, ডাক্তারের পালা শেষ হলে উকীলের সওয়াল। নিন আপনি।

শালের পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তি বললেন, তবে আমাকেই এখন লিখতে হবে। তিনি

না আসে। এদিকে ভোট ফরের গাজনে নগের দল হরিবোল রব শুনে ভাবলো ওরা বুঝি আর একজনের জন্য ভোট ফর হাঁকছে। তখন তারা 'দশদিন চোরের একদিন সেঠের বলে তাড়া করল। তাই না দেখে হরিবোলের দল ঐ রে মাতালে তাড়া করছে, কামড়ে দেবে বলে মরা ফেলে চোঁ চাঁ বাড়ির পানে ছুটল। ইতিমধ্যে ভোট-ফরেরা এসে দেখল এক বেটা শুয়ে আছে। তারা দাবী করল বেটা বল্ আমাদের দলকে ভোট দিবি কিনা। উত্তর না পেয়ে একজন বলল দেখোনা বেটা মরার ভান ক'রে রয়েছে। তখন সকলে মিসে বলল বেটার রকম সকম দেখো, মরার ভান ক'রে প'ড়ে রয়েছে, দে বেটার কান ধরে তুলে। কান ধরে টানতেই মড়া খানিকটা উঠে ধপাস ক'রে প'ড়ে গেল। ওরে এ যে সত্যি মড়া! বেটো ভোট দিয়ে না হয় মরতিস। একজন বলল ভাই মড়া ছুয়েঁছিস হরিনাম কর নয়তো ঘাড়ে চাপবে। তখন সকলে ভয় পেয়ে হরিবোল রব করতে করতে ছুটল।

এদিকে বিরহিণী সুলতা জানালার কাছে বসে সব শুনছিল, কতক দেখছিল। মড়ার কাণ্ডটি ঘটল তার জানলার নীচেই। সে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, আচ্ছা আমার মৃত্যু হয় না। তখনি মনে পড়ল মা বলেছিল কালকে আমচুর দিয়ে অড়র ডাল রাঁধবে। ভাবল মৃত্যুটা যেন তার পরেই হয়। মৃত্যুকে যে ওয়াদা করে তার মরণ শীঘ্র হয় না।

পড়া শেষ ক'রে লেখক শুধালেন কেমন হল?

শালের পাগড়ী বললেন, এ হুতোমকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, একেবারে কালপেঁচার নক্সা।

জোব্বাধারী বললেন, বাংলা ভাষার যে এত তোড় কে জানতো। বাদবিচার না ক'রে ভালমন্দ সমস্ত শব্দকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

এবারে তো আপনাকে লিখতে হয় বললেন অষ্টম ব্যক্তি।

জোব্বাধারী ব্যক্তি কিছু না বলে কাগজগুলো নিয়ে পঞ্চম ব্যক্তির হাতে দিলেন, সেই যার রঙটা কালো চিবুকে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির গুচ্ছ।

বেশ, বলে তিনি কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখ ষষ্ঠ ব্যক্তি বললেন, দেখা যাক কি হয় নব কথা না ষোড়শী।

তাঁর লেখা শেষ হ'তেই সকলে মিলে বলে উঠল, পড়ুন পড়ুন।

"শ্যামবাজারে আদ্যনাথ বসুর গলির একটি বাটীর দ্বিতল কক্ষে এক যুবক ঘন ঘন পায়চারি করিতেছিল। যুবক বলিষ্ঠ, দোহারা চেহারা, রঙ শ্যামবর্ণ, বয়ঃক্রম অনুমান দ্বিত্রাংশৎ বৎসর। এক দিকে আর একটি যুবক চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল, তাহার গায়ে কোটের উপরে উড়ুনি।

সেই যুবকটি বলিল, অনিমেষ একবার সব দিক চিন্তা করিয়া দেখ, একবার হঠকারিতা করিলে পশ্চাত্তাপ অনুভব করিবে।

অনিমেষ বলিল কেন?

পূর্বোক্ত যুবক বলিল, একবার আমাদের পরামর্শ না শুনিয়া হঠকারিতায় যুদ্ধে গমন করিলে এখন অনুতাপ করিতেছ।

অনুতাপ করিতেছি এই জন্যে যে আমার মৃত্যু হয় নাই।

ফলই বা কি হইয়াছে? দ্বাদশ বৎসর বনবাসান্তে বাড়িতে ফিরিলে। ইতিমধ্যে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, পত্নী পিতৃগৃহ নিবাসিনী ও জীবন্মৃত। কোথায় তুমি সোজা তাহার কাছে যাইবে, না নানারূপ বাহানা তুলিতেছ।

বাহানা কি অকারণে তুলিতেছি। কেমন করিয়া জানিব যে সে ইতিমধ্যে দ্বিচারিণী হয় নাই।

আজকাল তো দ্বিচারিণী হইবার
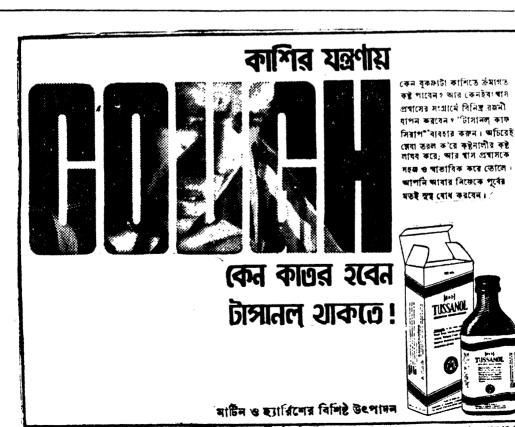
প্রয়োজন নাই, যেমন আইন হইয়াছে স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতে পারিত।

আজ শ্বশুর মহাশয়ের কাছে হইতে মাতৃদেবীর কাছে যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে তো তাহার বিবাহেরই আভাস আছে।

তাহাতেই তোমার বোঝা উচিত যে, সে দ্বিচারিণীও নয় আর বিবাহও করে নাই।

এবারে করিবে।

দ্বিতীয় যুবক রাগতভাবে বলিল, অনেক আগেই করা উচিত ছিল। স্বামী বারো বছর নিরুদ্দেশ, মৃত বলিয়াই গণ্য, সে যুবতী, রূপসী ও বিদুষী এমন অবস্থাতেও যে সে বিবাহ করে নাই তাহাকে ধন্য ধন্য বলিতে হইবে।

বেশ ভাই তোমার কথাই স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার আগে তাহাকে একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

কি, অগ্নিপরীক্ষা করিবে নাকি! তাহা হইলে যে তোমাকে রামচন্দ্র হইতে হয়।

এত দুঃখেও অনিমেষের হাস্যরসবোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। সে বলিল, কেন, আমি কি রামচন্দ্রের মতো যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়াছি না।

তবে আইস রামচন্দ্রের মতো কুল পুরোহিত বশিষ্ঠের সঙ্গে পরামর্শ করো।

তখন দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ সারিয়া লই।

অনিমেষ ১৯৪০ সালে যুদ্ধে যায়। প্রথমে যায় বর্মায়, সেখান থেকে মালয়ে। তারপরে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন এক ক্ষুদ্র দ্বীপে। এ মহাসমুদ্রে যে-সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, যাহাদের উল্লেখ কোন মানচিত্রে নাই, সেই রকম একটি দ্বীপে সে প্রেরিত হয়। জাপানীদের সঙ্গে সেখানে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। যথাকালে সমস্ত জাপানী মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গেলেও সেখানে সে থাকিতে বাধ্য হয়; কারণ, তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার কথা কাহারো মনে পড়ে না। অবশেষে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল তবু তাহারা সেখানে রহিল। জাপানী নিঃশেষ হইয়া গেলে তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল, কেননা বীরত্ব একবার মাথায় চাপিয়া গেলে সহজে নামিতে চায় না। ইতিমধ্যে অনিমেষের বাড়িতে সংবাদ আসিল সে নিখোঁজ—ওটার সহজ অর্থ মারা গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া সুলতা বাপের বাড়ি চলিয়া আসিল। তাহার পরবর্তী ইতিহাস আগেই বলা হইয়াছে। এবারে আবার অনিমেষ ও তাহার বন্ধু রমেশের কাছে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে।

অনিমেষ কহিল, রমেশ তুমি এক কাজ কর না কেন। গুরুচরণবাবুদের বাড়িতে যাও, সেখানে তোমাকে কেহ চেনে না। তুমি গিয়া গুরুচরণবাবুকে বল যে, শুনিলাম আপনার কন্যার আবার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমার হাতে সর্বগুণোপেত এক পাত্র আছে। দেখো, তাহারা কি বলেন। অবশ্যই তাঁহারা সুলতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাদের মুখে সুলতার মনের কথা জানিতে পারিবে। সুলতা যদি এখনো আমার প্রতি অনুরক্ত থাকে তবে অবশ্যই বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবে।

রমেশ কহিল, তুমি মন্দ বলো নাই কিন্তু মুশকিল এই যে, সুলতার বাবা প্রবী লোক তাঁহার সঙ্গে ছলনা করিতে মন চা না।

তাহার প্রয়োজন হইবে না। গুরুচরণ বাবু অদ্য মাকে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছে

যে, তিনি কয়েক দিনের জন্য কাশী চলিলেন। কাজেই তুমি গিয়া দেখা পাইবে সুবীরের, সে সুলতার ভাই। তাহার সংগে সদুদ্দেশ্যে এই ছলনাটুকু করিতে বাধা নাই।

না তাহা নাই। তবে সেই কথাই রহিল, আমি সেখানে চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়া ফলাফল তোমাকে অবগত করাইব।

এই পর্যন্ত লিখিয়া তিনি পাঠ সাংগ করিলেন কহিলেন, নিন এবারে কে লিখিবেন আসুন।

তখন সপ্তম ব্যক্তি সেই যার প্রশস্ত ললাট ও পুরুষ্ট গুম্ফ বললেন, আমাকে দিন। আমি আবার আপনাদের মত গল্প বুঝতে পারি না। আমি যে দু'চারটে গল্প লিখেছি তা গল্পে প্রবন্ধে মিলন একপ্রকার বস্তু। এই বলে কাগজ টেনে নিয়ে তিনি কিছুটা লিখে পাঠ করলেন।

"ওদের দেশে মানে সুয়েজখালের পশ্চিমে লোকে বিবাহ করে, আমাদের দেশে বিবাহ হয়, বিবাহে ওরা সক্রিয়, আমরা নিষ্ক্রিয়। ওদের বিবাহে আছে লজিক, আমাদের ম্যাজিক। তবে ব্যুৎপত্তিগত বিচারে আমাদের বিবাহটাই সার্থক। বি পূর্বক বহ্ ধাতুর উত্তরে সঙ এই হল বিবাহ। অর্থাৎ বিশেষভাবে বহন করা। আমরা বলদের মত পিঠে বোঝা বহন করি, বোঝায় চিনি আছে কি তুলো আছে কি কয়লা আছে আমরাই সবচেয়ে কম জানি। আমাদের কাছে বিবাহ আর্ট, আট প্রকার বাঁধনে আমাদের বাঁধে, ওদের কাছে বিবাহ সায়ান্স, ওদের সারা জীবন ছেয়ে আছে বিবাহের রস। আমাদের বিবাহ পারিবারিক, পরিবারের মধ্যে এনে নামাই পুঁটুলির মত বধূকে সেই সংগে টাকার পুঁটুলি, ওদের বিবাহ ব্যক্তিগত, ব্যক্তি সেখানে ব্যক্তিকে লাভ করে। আমাদের বিবাহ ক্লাসিক, কিনা সংক্ষিপ্ত আর সরল, ওদের বিবাহ রোমান্টিক, রোমে রোমে তার আনন্দ। তবে অনিমেষের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ আছে তাতে লেগেছে রোমান্সের রস। অদৃষ্ট ছিনিমিনি খেলেছিল তার ভাগ্য নিয়ে এবারে সে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত তার বধূকে।"

নিন এবারে কে নেবেন।

দিন তো দেখি কতদূর কি করতে পারি, আমিও ওঁরই মত একজন কৃষ্ণনাগরিক, গল্প বুঝতে তেমন জানি না, লিখিনি কখনো। তবে খানকতক নাটক লিখেছি, সহজেই কিছু ডায়োলগ ছাড়তে পারবো, বললেন সেই ষষ্ঠ ব্যক্তি যাঁর মুণ্ডিত গুম্ফ শ্মশ্রু হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল।

"রমেশের প্রস্তাব সুবীর ধীরভাবে শুনিল, তারপরে বলিল, আপনি যে পাত্রের কথা বলিলেন, এমন পাত্র অবশ্যই কাম্য। কিন্তু হাঁ, না, উত্তর দিবার অধিকার আমার পিতার। তিনি শীঘ্রই কাশীধাম হইতে ফিরিবেন, আপনাকে কষ্ট করিয়া তখন একবার আসিতে হইবে।

তবে আজ আমি উঠিতে পারি? জিজ্ঞাসা করিল রমেন।

আর একটু অপেক্ষা করুন। আরও কিছু বাধা আছে। মনে করুন এই বিবাহ হইয়া যাইবার পরে অনিমেষ আসিয়া উপস্থিত হইল, এমন কখনো কখনো হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, আপনিও শুনিয়া থাকিবেন।

রমেন বলিল, তখন হয় ওসমান নয় জগৎ সিংহ।

আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পরিলাম না, ইহার মধ্যে ওসমান ও জগৎ সিংহ আসিল কোথা হইতে।

আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি তবে বাংলা সাহিত্য আপনার তেমন পড়া নেই মনে হইতেছে। একটু অপেক্ষা করুন বুঝাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া ছাতাটিকে তলোয়ারের মতো উঁচাইয়া অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান করিয়া বলিল, হয় ওসমান নয় জগৎ সিংহ। এক সংগে আমাদের দু'জনের বাঁচিবার অধিকার নয়। কি তরবারি না বর্শা! তরবারি আচ্ছা তবে তাই হউক।

সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল— তবে শোনো জগৎ সিংহ! এই নারী রমণীকুল রত্ন, দুনিয়ায় সে অদ্বিতীয়, সে আসমানের নক্ষত্র, বেহেস্তের পরী, দরিয়ার অপ্সরী, ফুলের মধ্যে সে সজিনা রোগে ভোগে অপরিহার্য, ফলের মধ্যে সে ল্যাংড়া আম রসে রূপে গন্ধে স্বাদে অনবদ্য, শকটের মধ্যে সে পুরাতন মডেলের অস্টিন, ভাঙিয়াও ভাঙেনা, ভাঙিলেও চলিতে থাকে; রেল গাড়ীর মধ্যে সে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার, একদিনের পথ তিনদিনে যায়, সমান ভাড়াতে অধিকক্ষণ চেপে থাকা যায়, সে আমার বেলোয়ারি কাঁচের সুরাপাত্র, সে আমার রোশনাইএর ঝাড়লণ্ঠন, সে আমার কলিজার কলিজা, দিলের দিল, সে অরেঞ্জ পিকো চা, জল ছাড়া সবচেয়ে সুলভ পানীয়।"

রমেশের ভাবভংগী ও ভাষায় শংকিত হইয়া সুবীর বলিল, আপনার বোধহয় আজ শরীরটা ভালো নাই, আজ থাক পিতা ফিরিলে আসিবেন।

রমেশ বলিয়া উঠিল শরীর দিব্য আছে, নাড়ী দেখোতো কাত্যায়ন। নাঃ কেউ নেই, কাত্যায়ন গেল কোথায়? বোধকরি পাণিনি অধ্যয়ন কচ্ছে। —জানো জগৎ সিংহ আমি কে? জানো না, তবে শোনো। আমি ঝঞ্ঝা, আমি ধূমকেতু, আমি কালবৈশাখীর অকাল প্রলয়, আমি গঙ্গায় কোটালের বন্যা, সমুদ্রের টাইফুন, ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাত, আমি হাওড়ার পুল, জলে ভেসে যাওয়া কলকাতার রাজপথ, আমি, আমি—

শংকিত সুবীর বলিল, আপনার পরিচয় বুঝিতে পারিয়াছি, পিতা প্রত্যাবর্তন করিলে দয়া করিয়া আসিবেন।

বেশ তাই আসিব, সংবাদ দিতে ভুলিবেন না। তারপরে বলিল, আমার উক্তি প্রত্যুক্তি শুনিয়া বোধহয় আশঙ্কা করিয়াছেন আমার মাথা খারাপ! না, মহাশয়, আমার মাথা আপনার ও আর দশ জনের মতোই ঠিক আছে। তবে কেন এমন বলিলাম! আসল কথা কি জানেন, কোন একটা কঠিন সমস্যা বুঝাইতে হইলে এই ভাবেই বুঝাইতে হয়। নয়তো লোকে বুঝিবে কেন? আর বুঝিলেও সমস্যাটা যে কঠিন সে বোধ হইবে কি প্রকারে! বিশ্বাস না হয় বাংলা নাটক পড়িয়া দেখিবেন। আচ্ছা আজ আসি, নমস্কার, খবর দিতে ভুলিবেন না।"

লেখক পাঠ সাংগ করতেই অনেকে এক যোগে বলে উঠল, এবারে তো আপনাকে লিখতে হবে।

তখন সেই জোব্বাধারী ব্যক্তি বললেন, আচ্ছা, দেখা যাক কতদূর কি হয়, আমার শরীরটা আজ আবার অপটু। এই বলে কাগজ টেনে নিয়ে উদাত্ত স্বরে গলা খাঁকারি দিয়ে লিখতে শুরু করলেন।

"সুলতা শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে অতল বেদনা ঘনাইয়া উঠিতেছিল, পাশে ঝাউ-গাছটিতে হাওয়ার হাহাকার অনাদিকালের

দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল আর আকাশের তারাগুলি চিরন্তন অশ্রু অক্ষরে কী লিখিয়া রাখিয়াছিল তাহা এক দৃষ্টিতে পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল সুলতা। এমন সময়ে কোথায় রাতজাগা একটা বিরহিনীর বিহঙ্গিনী আর্তরব করিয়া উঠিল, সে যেন চরাচরের বিরহ বেদনার একমাত্র প্রতিনিধি। সুলতা ভাবিল ঐ পাখীটা তাহাকে সমাধানের ইঙ্গিত করিল। না, কিছুতেই সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেনা। সদ্য কাশী হইতে ফিরিয়া আসা পিতার অনুরোধেও তাহা সম্ভব নয়। রাত্রির প্রহরগুলি নিঃশব্দ পায়ে চলিয়াছে, পা নিঃশব্দ বটে, কিন্তু ঝিল্লিধ্বনির নূপুর তো নিশঃব্দ নয়। তাহার মনের মধ্যে সেই নূপুরের ধ্বনি গুমরিয়া গুমরিয়া বাজিতে লাগিল। আর তাহারই তালে অনিমেষের স্মৃতি গুঞ্জরিত হইতে থাকিল। আজ যেন সেই দূরের মানুষ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ, তাহার ছোটখাটো কথাগুলি। অনুল্লিখিত কথাগুলি দিব্য মূর্তি ধরিয়া তাহার চোখের উপরে নাচিতে লাগিল। না, না কিছুতেই পত্যন্তর গ্রহণ তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কখন যে রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে সে বুঝিতে পারে নাই, সহসা ভোরের আলোর প্রথম আভাসে তারাগুলি একে একে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, একটা শীতল হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। শয্যা ত্যাগ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। কর্তব্য তাহার স্থির হইয়া গিয়াছে।

ভোর সকালেই রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। আগেই তাহাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিল সুধীর যে কাশী হইতে পিতা ফিরিয়াছেন। রমেশ সুলতার পিতাকে প্রণাম করিয়া তাহার আগমনের কারণ নিবেদন করিল। তিনি বলিলেন, আপনি বসুন, আমি সুলতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি—এই বলিয়া তিনি পাশের ঘরে গেলেন।

মা, কি উত্তর দেব বলো।

প্রথমে কিছুক্ষণ সুলতা কথা বলিতে পারিল না, অবশেষে নিরুদ্ধ আবেগে চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, বাবা, আমি কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছি না, আমাকে ক্ষমা করুন। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পাশের ঘরেই পিতা ও কন্যার কথা হইতেছিল রমেশ সমস্তই শুনিতে পাইল। সে আর অপেক্ষা করিল না ছুটিয়া চলিয়া গিয়া অনিমেষকে সমস্ত জানাইল। সুলতার পিতা আসিয়া দেখিলেন যে রমেশ নাই।"

—দিন আমার শেষ হয়েছে। সকলের অনুরোধে পড়া শেষ করিয়া বলিলেন, নাও এবার তোমার উপরেই শেষ ক'রে ফেলবার ভার।

কেহ কেহ বলিল, দেখা যাক এবারে শেষের পরিচয়টা কি রকম পওয়া যায়।

অষ্টম ব্যক্তি সেই যাঁর এলোমেলো চুল তিনি আরম্ভ করিলেন।

"কিছুক্ষণের মধ্যে অনিমেষ প্রবেশ করিল, তখনো সুলতার পিতা সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সুলতা মা শীগ্‌গীর এসো, দেখো কে এসেছে। সুলতা ঘরে ঢুকিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চোখে আঁচল চাপিয়া গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু পারিল না মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অনিমেষ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের বাড়ীতে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিল।"

সকলে শুনে বলল, বঃ শেষ প্রশ্নের চমৎকার সমাধান।

প্রথম ব্যক্তি বললেন, একদিকে বিধবা বিবাহ সমর্থন করা হল অথচ বিবাহ দিতে হল না, শ্যাম ও কুল দুই বজায় থাকলো। চমৎকার! এ আমাদের সমাজেরই যোগ্য বটে।

শালের পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তি বললেন, চলুন এবারে যাওয়া যাক, ভোর হয়ে এসেছে, এখনি লেখক জেগে উঠবে।

মূর্তিগুলি মিলাইয়া গেল।

অনির্বাণ তাড়াতাড়ি জেগে উঠল, ওঃ এখনি লেখাটা শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু একি, সে এক পাতা মাত্র লিখেছিল, এতগুলো পাতা লেখা হল কি করে? কে লিখলো? অবশ্যই সে লিখেছে, রাতে ঘুমের ঘোরে লিখে ফেলেছে, এখন খেয়াল হচ্ছে না। এমন মাঝে মাঝে হয়ে থাকে বলে সে শুনেছে। কোলরীজের কুবলাই খাঁ কবিতা রচনারই ইতিহাস তার মনে পড়লো। গল্পটা আগাগোড়া প'ড়ে তার ভালোই লাগলো। আর কারো হাত দিয়ে এ জিনিস বের হ'ত না।

গল্পটি সে সম্পাদকের দপ্তরে দাখিল করল এবং যথা সময়ে পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

গল্পটি পাঠ ক'রে পাঠক সমাজ একবাক্যে স্বীকার করল, এটি এবারকার পুজোসংখ্যা সমূহের শ্রেষ্ঠ রচনা। বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ বললো, না হবে কেন, পড়তে পড়তে মনে হয় বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র অবধি যেন একযোগে কলম ধরেছেন।

শ্রীমতী প্রমীলা লাল
প্রসিদ্ধ পাক-প্রণালী বিশেষজ্ঞার একটি সুস্বাদু বিশেষ খাবার তৈরীর নির্দেশনা :

আপনি কখনো চকো মুস খেয়ে দেখেছেন ব্রাউন এণ্ড পলসন

কাস্টর্ড পাউডার-দিয়ে ?

মোলায়েম আর হাল্কা, চমৎকার সুগন্ধে ভরা !

ব্রাউন এণ্ড পলসন কাস্টার্ড পাউডার যেমন মোলায়েম, তেমনি পুষ্টিকর আর ক্রীমে ভরা। সহজে পুডিং এবং ফিরনী, আইসক্রীম, ট্রিফল প্রভৃতি নানানরকম ডেসার্ট তৈরীর জন্য ঘরে সব সময় ব্রাউন এণ্ড পলসন কাস্টার্ড পাউডার মজুত রাখুন। জেলী আর ফলের স্যালাডের সঙ্গেও জমবে চমৎকার ! সেরা সেরা উপকরণ দিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরী। তাই ব্রাউন এণ্ড পলসন-ই হোল সবচেয়ে সেরা কাস্টর্ড পাউডার।

উপকরণ :

- ২ টেবিল চামচের ব্রাউন এণ্ড পলসন কাস্টর্ড পাউডার (প্লেইন)
- ২ টেবিল চামচের কোকো
- ১/২ লিটার দুধ
- ৪ টেবিল-চামচের চিনি বা যতটা প্রয়োজন মনে করেন।
- কয়েক ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স
- ২৫ গ্রা: জেভিস জিলেটিন
- ১২৫ লিকুইড গ্রা: ক্রীম

তৈরীর নিয়ম : ১. ব্রাউন এণ্ড পলসন কাস্টর্ড পাউডার আর কোকো ১/২ কাপ দুধে মিশিয়ে নিন; বাকি দুধটা জ্বাল দিয়ে নিন।
২. এবার জ্বাল দেওয়া দুধটা কাস্টর্ড পাউডার মিশ্রণের ওপর ঢেলে বেশ ক'রে নেড়ে নিন।
৩. এরপর আবার সসপ্যানে ঢেলে কয়েক মিনিট ধরে গরম করুন এবং সমানে নাড়তে থাকুন।
৪. চিনি আর এসেন্স দিয়ে দিন আর অল্প ঠাণ্ডা ক'রে নিন।
৫. ৩ টেবিল চামচের গরম জলে গালিয়ে নিয়ে এবার জিলেটিনটা দিয়ে দিন।
৬. ঘন না হ'য়ে ওঠা পর্যন্ত ক্রীমটা সমানে ফেটিয়ে যান এবং পরে মিশ্রণে ঢেলে দিন।
৭. এরপর-বেশ পরিষ্কার ক'রে ছাঁচটা ধুয়ে নিয়ে-তাতে মিশ্রণটা ঢেলে দিয়ে জমতে দিন।

আমাকে অনুগ্রহ ক'রে বিনামূল্যে রন্ধনপ্রণালীর একটি সেট পাঠাবেন—ইংরাজীতে/হিন্দীতে/বাঙলায়/তামিলে/তেলেগুতে/মালয়ালমে/গুজরাটীতে/মারাঠীতে/কানাড়ীতে।

নাম ——————————

——————————

ঠিকানা ——————————

——————————

এই কুপনটি ভ'রে নীচের ঠিকানায় পাঠান : কর্ণ প্রডাক্টস কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীনিবাস হাউস, আউডবী রোড, বোম্বাই-১, বি. আর।

DE-2

খাসা জিনিসে খাসা হয় যে খাবার, রান্না আপনার সেই ত' সেরা সবার!

আপনার পরিবারের সবার মনেরমত এরকম আরও নানান খাবারের জন্য এই পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখুন।

কর্ণ প্রডাক্টস কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড শ্রীনিবাস হাউস, আউডবী রোড, বোম্বাই-১, বি. আর।

Bensons/1072 Ben

(২)

রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ঢাকায় আসছেন, এই কথা লোক মুখে প্রচারিত হলে তখন ঢাকার অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষও এই সুযোগে তাঁদের প্রতিষ্ঠান সমূহেও কবিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। এঁদের পক্ষ থেকে কবিকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য যথাসময়ে লোক এবং চিঠিও শান্তিনিকেতনে কবির কাছে গেল।

কবির ঢাকা আগমন উপলক্ষে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতিও গঠিত হ'ল।

ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ ল্যাংলির ইচ্ছা ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এসে সব কদিনই রমেশবাবুর বাড়িতে থাকবেন। এতে অভ্যর্থনা সমিতির অনেকেরই মত থাকলেও কয়েকজনের কিন্তু ঘোর আপত্তি ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন, কবি যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসছেন, তখন তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের বাড়িতে না থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের ব্যবস্থাধীনে সাধারণের কোন এক স্থানে থাকবেন। আর অভ্যর্থনা সমিতির লোকজনই তাঁর দেখাশুনা করবেন। এঁরা ঠিক করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ রমেশবাবুর বাড়িতে না থেকে বুড়ীগঙ্গা নদীর উপরে ঢাকার নবাবদের হাউসবোট 'তুরাগে' এসে থাকবেন।

এই আপত্তিকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, অপূর্বকুমার চন্দ ও মনোরঞ্জন চৌধুরী। অপূর্ববাবু ছিলেন তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং ঢাকার বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সম্পাদক। মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন ঢাকার একটা বইয়ের দোকানের মালিক। ইনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ঢাকায় এসে ইনি এই বইয়ের দোকানটি করেন। ইনিই ঢাকায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে কোথায় থাকবেন, তখন এই নিয়ে যেসব আলোচনা, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের মধ্যে যে দলাদলি প্রভৃতি হয়েছিল তখনকার চিঠিপত্র থেকে এখানে তার কিছু নমুনা দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের ঢাকা যাওয়া সম্পর্কে ডঃ কালিদাস নাগ ঐ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হরিদাস ভট্টাচার্যকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ কোথায় গিয়ে থাকলে ভাল হয় তার উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের ঢাকা যাওয়া সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাবে বলে ডঃ নাগের চিঠিটা সবই এখানে উদ্ধৃত করছি—

91 Upper Circular Road,
21 Jany., 1926.

My dear Haridas,

Your letter reached me duly but I had to wait till I could have a talk with Rathi, who went to Lucknow in company with the Poet. The sudden death of Dwijendranath Tagore upset the poet to a certain extent, but we hope that he would rally and that the party would reach Dacca by the 5th Feb. as settled before hand. I read your letter to Rathi and he agrees with you and Dr. Majumdar that it would be far better for the poet to remain under Majumdar's care than to be left at the mercy of chance volunteers. So there is status quo so far as housing affair is concerned—and we are thankful to you all for taking so much care. I think Formichi and Tucci would be more comfortable if you can shove them as guests to some European professor (Langly perhaps ?). Otherwise there would be too much congestion in one place. Or if you can find a separate house

in Ramna, under direct supervision of Dr. Majumdar & his friends, you can engage it if Majumdar's house proves too small for the whole party.

Now regarding the remuneration business so far as I could gather. I may suggest that it should not be mentioned (as it has unfortunately been mentioned in Bengali papers) that Tagore is taking money for his lecture! The poet never accept money except as contributions to the Visva Bharati, which you may or if you have some funds to spare! But Formichi and Tucci should get something and they need money for they can travel here only if they earn a little by way of extra lectures. You know our visiting professors Levi & Winternitz got something that way from the Calcutta University. So if you can divide the sum voted and offer something to each by way of Readership or extention lectures that would be splendid and our Italian colleagues would return home with golden opinion about you! So Rathi & myself beg to leave the matter to you, to Majumdar & to other august members of the court. Please remember that you may divide the voted Rs. 1000/- (In Tagore a/c) partly to cover T.A. (in case separate allowance for the same is not made) and partly to pay the two Italian professors rated at: Formichi 60% and Tucci 40% as you please! Now I have disposed off "the delicate matter" and I hope that you would find our suggestions useful for your guidance. At any rate please consult with Majumdar & let me know what you decide. Now that you have voted Rs. 1000/- it is a matter of detail as to what would be count in which we should thank you.

Mrs. sends her friendly greetings to you and your family—please always write to Modern Review office address given above.

Your affly.,
KALIDAS.

কবির টাকা যাওয়া নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কবির হিসাবে (in Tagore a/c) এক হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। এত অল্প টাকা এইজন্য যে, তখন স্থির হয়েছিল, কার্জন হলের ডিনার ভাইস্-চ্যান্সেলার নিজের খরচে দেবেন, বিভিন্ন ছাত্রাবাসের (হলের) সভার ব্যয় সেই সেই ছাত্রাবাসের অধ্যাপক ও ছাত্ররা বহন করবেন, আর কবি ও তাঁর সঙ্গীরা অন্যদের খরচে তাঁদের অতিথি হিসাবে থাকবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রথমে স্থির করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ঐ বরাদ্দ হাজার টাকার মধ্য থেকে পাঁচ শ' টাকা দেবেন। বাকি টাকা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের পথ খরচ প্রভৃতি বাবদে খরচ করবেন। কিন্তু হিরণ্দাসবাবুকে লেখা ডঃ কালিদাস নাগের চিঠি থেকে তাঁরা যখন জানতে পারলেন রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অর্থ নেন না, তবে বিশ্বভারতীকে দান বা চাঁদা হিসাবে কেউ অর্থ দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন, তখন কেউ কেউ বললেন, তবে বিশ্বভারতীকে দান হিসাবেই ঐ পাঁচ শ' টাকা দেওয়া হোক।

এতে কিন্তু দু'একজন সদস্য আপত্তি করে বললেন—বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পাঁচ শ' টাকার জায়গায় পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর মত কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে দান বা চাঁদা হিসাবে অর্থ দিতে পারে কি? আমাদের মনে হয়, অডিটে এটা আটকাবে। অর্থাৎ আমাদের হিসাব-পরীক্ষক হিসাব পরীক্ষার সময় এই ব্যয় হয়ত সমর্থন করবেন না।

এইরূপ কথা হতে থাকলে, তখন রমেশবাবু সকলকে বললেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবিকে যে পাঁচ শ' টাকা দেবার কথা হয়েছিল, সেই টাকাটা আমিই ডোনেশন হিসাবে বিশ্বভারতীকে দিয়ে দেব। এ নিয়ে আপনাদের আর ভাবতে হবে না।

রমেশবাবুর এই কথায় সকলেই খুশি হলেন। তখন তাঁরা কবির হিসাবের ঐ হাজার টাকা থেকে টি এ (T. A.) অর্থাৎ পথ খরচ বাবত কিছু টাকা বাদ দিয়ে বাকি

সমস্ত টাকাটা কার্তিক ও টুচিকে তাঁদের বক্তৃতার জন্য দেবার ব্যবস্থা করলেন।

রমেশবাবু তাঁর ঐ পাঁচ শ টাকা পরে ডঃ কালিদাস নাগ মারফৎ বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দেন। এদিকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি, ঢাকার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকার বিশ্বভারতী সম্মিলনী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ঐ সময় কয়েকজন শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁরা এসে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা যাওয়ার তারিখ এবং ঢাকায় গিয়ে বুড়ীগঙ্গায় বোটে তাঁর থাকার কথাও বলেন। তাঁরা এই নিয়ে, বিশেষ করে থাকার কথা নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আলোচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে ১২ই পৌষ (১৩৩২) তারিখে রমেশবাবুকে লেখা এক চিঠিতে পাকা কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর বাড়িতেই থাকবেন। এখন আবার এই আমন্ত্রণকারীদের পক্ষ থেকে অন্যত্র থাকার কথা শুনে একটু মুশকিলে পড়লেন। তাই তিনি উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই রমেশবাবুকে তখন এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য দূত এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়েছি। ৬ই তারিখে রাত্রে রওনা হয়ে গোয়ালন্দ থেকে তাঁদেরই জলযানে ভেসে পড়ব। ১০ই তারিখ পর্যন্ত তাঁদের আতিথ্য ভোগ করে কর্তব্য অন্তে তোমার আশ্রমে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ পালন করব। নইলে আমাকে দীর্ঘকাল ঢাকায় থাকতে হয়। আমার সময় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতিরে ঢাকার লোকের নিমন্ত্রণ কোনোমতেই উপেক্ষা করা উচিত বোধ করিনে। তাই দুই নিমন্ত্রণ ক্ষেত্রে আমার সময়কে বিভক্ত করে দিলুম। যে কয়দিন তোমাদের দেব স্থির করেছিলুম সে কয়দিন সম্পূর্ণ রইল। ইতি ১৬ মাঘ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রমেশবাবুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের থাকা নিয়ে কারও কারও আপত্তি থাকাতেই রবীন্দ্রনাথ যে এই ব্যবস্থা করেছেন, রমেশবাবু তা বুঝতে পেরে তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে এই টেলিগ্রামটি করেছিলেন—

Your decision to remain public guest till tenth a painful surprise to me. Posted letter yesterday describing how that proposal emanated not from public but from interested individuals for humiliating me. My earnest prayer that you select one residence for the whole period of stay. If you prefer remain in town

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করবার জন্যে দূত এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়েছি। ৬ই তারিখে রাত্রে রওনা হয়ে গোয়ালন্দ থেকে তাঁদেরই জলযানে ভেসে পড়ব। ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত তাঁদের আতিথ্য ভোগ করে কর্ত্তব্য অন্তে তোমার আশ্রমে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ পালন করব। নইলে আমাকে দীর্ঘকাল ঢাকায় থাকতে হয়, আমার সময় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতিরে ঢাকার লোকের নিমন্ত্রণ কোনোমতেই উপেক্ষা করা উচিত বোধ করিনে। তাই দুই নিমন্ত্রণক্ষেত্রে আমার সময়কে বিভক্ত করে দিলুম। যে কয়দিন তোমাদের দেব স্থির করেছিলুম সে কয়দিন সম্পূর্ণই রইল। ইতি ১৬ মাঘ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

as public guest. I release you from obligations becoming my guest. Please wire decision.

রমেশবাবুর টেলিগ্রাম পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন ১-২-২৬ তারিখে রমেশবাবুকে যে টেলিগ্রামটি করেছিলেন, তা এই—

Not the least change in programme of stay in your house, only extra three days promised to public letter follows.

RABINDRANATH.

রবীন্দ্রনাথ এই টেলিগ্রাম করে রমেশবাবুকে সংগে সংগে এই চিঠিটি দিয়েছিলেন,

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার ওখানে যে কয়দিন থাকা স্থির করেছিলুম তার থেকে একদিনো বাদ দিই নি। যখন সাধারণের তরফ থেকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ এল তখন অসুবিধা সত্ত্বেও আরো তিনদিন বাড়িয়ে দিয়ে নৌকায় থাকার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলুম। এতে তোমার মনঃক্ষোভের কোনো কারণ ঘটতে পারে এ আমি কল্পনা করিনি। ১০ই তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণের মেয়াদ আরম্ভ। আমি ত তোমাদের পূর্বেই সে কথা জানিয়েছি। তার আগে যদি অন্য নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অন্যত্র যাই তাতে কি তোমাদের উপেক্ষা করা হল মনে করতে পার? এই দুই নিমন্ত্রণও কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়? আমার মনে লেশমাত্র সংশয় জন্মেনি বলেই আমি ঢাকা জনসাধারণের তরফ থেকে নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে অসম্মতি দিতে পারিনি। সময়ের অসুবিধার জন্যই প্রথমটা আপত্তি করেছিলেম। তোমার টেলিগ্রামের ভাবে বোধ হচ্ছে তোমার মতে ঢাকার সর্বসাধারণের কাছ থেকে আমার কাছে বিশেষ নিমন্ত্রণ একেবারেই আসেনি। দূতরূপে যাঁরা আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস করেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। যদি প্রতারিত হয়ে থাকি তবে ঢাকায় পৌঁছিয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিটিতে তারিখ দেন নি, এবং নিজের নাম সইও করেন নি। হয় ভুলে গিয়েছিলেন, নয়ত চিঠির ভাষাটা একটু চড়া ছিল বলে ইচ্ছা করেই নাম সই করেন নি।

রমেশবাবু রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির কোন উত্তর দেন নি। তবে ১-২-২৬ তারিখে রমেশবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম গেলে, তা দেখে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐদিনই রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

কাল সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশন হয়ে গেল। আমি উপস্থিত ছিলাম। কবিগুরুকে রমেশবাবুর বাসায় public guest রূপেই রাখা হবে এই ধারণাই সমস্ত public-এর ছিল দেখলাম। রমেশবাবুর বাসায় কবীন্দ্র থাকলে কারো আপত্তি এখনো নেই বোঝা গেল। কেবল public নামের দোহাই দিয়ে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সম্পাদক অপূর্ব ও মনোরঞ্জন আপত্তি করলেন। আপনি মনোরঞ্জনের কথায় গুরুদেবের অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা অনুমোদন করে ইউনিভারসিটির ছাত্রদের নিতান্ত নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম করে দিয়েছেন।

রথীবাবুকে লেখা চারুবাবুর এই চিঠি রবীন্দ্রনাথও দেখেন। এই চিঠি পড়ে তিনি আবার চিন্তিত হলেন। এবার তিনি আর চিঠি লেখালেখির মধ্য দিয়ে না গিয়ে, সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে আসবার জন্য শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে ঢাকায় পাঠান স্থির করলেন। রবীন্দ্রনাথ এই স্থির করলে, তখন রথীবাবু রমেশবাবুকে এই টেলিগ্রামটি করেন।

Father sending Nepal Chandra Roy to settle all details.

Rathindra Nath Tagore.

নেপালবাবু ঢাকায় গিয়ে সব দেখে শুনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন—ঢাকায় গিয়ে আগাগোড়াই রমেশবাবুর অতিথি হিসাবে আপনার থাকাই ভাল। তবে ইচ্ছা করলে আপনি মাঝে দু' এক দিন নৌকোয় থাকতে পারেন। কিন্তু তখনও আপনাকে রমেশবাবুর অতিথি হিসাবেই থাকতে হবে এবং ঐ নৌকোতেও তিনিই আপনার দেখাশুনো করবেন।

রবীন্দ্রনাথ নেপালবাবুর কথাই মেনে নিলেন। এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সকালে সদলে কলকাতা থেকে চিটাগং মেলে ঢাকা রওনা হলেন। কবির এই দলে ছিলেন —রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীমোহন ঘোষ, হিরজিভাই পেস্তোনজি মরিস, ফর্মিকি ও তুচ্চি। মরিস ছিলেন একজন পারসী যুবক, ইনি ফরাসী ভাষাবিদ্ ছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। এই মরিসই ছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী। রবীন্দ্রনাথ একে মরীচি বলে ডাকতেন।

কবি দুপুরে গোয়ালন্দে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখান থেকে স্টীমারে নারায়ণগঞ্জে যান। নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ থেকে বেশী দূরে নয়, তাই বেলা তিনটা নাগাদ কবি সদলে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে পৌঁছলেন।

কবি নারায়ণগঞ্জ গিয়ে পৌঁছলে সেখানে অপেক্ষমান এক বিরাট জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ঢাকার কবীন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির কিছু সদস্যও নারায়ণগঞ্জে এসেছিলেন। রমেশবাবুর বাড়িতে কবির থাকা স্থির হয়েছিল বলে রমেশবাবু তাঁর মোটর এনেছিলেন কবিকে তাতে করে নিয়ে যাবার জন্য। কবি রমেশবাবুর সংগে তাঁর গাড়িতে এবং কবির দলের অন্যান্যরা অন্য অন্য গাড়িতে করে ঢাকায় এলেন।

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে মাইল দশেকের পথ। রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আসার তারিখ ও সময় আগে থেকেই প্রচারিত হওয়ার ফলে সেদিন ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ এই পথের দুধারে প্রায় সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য ও অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বহু লোক সমবেত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঢাকা শহরের সীমান্তে এসে পৌঁছলে, সেখানে স্কাউট দল ও স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁকে স্বগত জানাল এবং তারা সেখান থেকে শোভাযাত্রা সহকারে কবি ও তাঁর সংগীদের ঢাকার রমনা পল্লীতে রমেশবাবুর বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। পরে কবির সংগীদের মধ্যে ফর্মিকি ও তুচ্চি ভাইস্ চান্সলার মিঃ ল্যাংলির বাড়িতে এবং রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অপর সকলে অপূর্বচন্দরের বাড়িতে গেলেন। কারণ ঐ দুই জায়গায় এঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সদলে ৭ই ফেব্রুয়ারী বিকাল থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এসে কবে কোথায় কোথায় কোন কোন সভায় যোগ দেবেন এবং ফর্মিকি ও তুচ্চিই বা কবে বক্তৃতা দেবেন, অভ্যর্থনা সমিতি আগে থেকেই তার একটা তালিকা ছেপেছিলেন।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, কবি নির্ধারিত তালিকার দু-এক স্থানে মাত্র স্বাস্থ্যের জন্য যাওয়া বাদ দিলেও, তালিকা বহির্ভূত আরও অনেকগুলি সভাতেই তাঁকে যোগ দিতে হয়েছিল।

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি দিনের এই কর্মসূচীর একটা পূর্ণ তালিকা রমেশবাবুর কাছে দেখেছি। সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি। এটা দেখলে বুঝা যাবে যে, ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের কিরূপ ঠাসা কর্মসূচী ছিল।

রমেশবাবুর কাছে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ঢাকার সেই কর্মসূচীটা এই—

Dr. Rabindranath Tagore's Programme at Dacca.

7th : Arrival—Municipal and Peoples' Association address at the Northbrook Hall at 4 p.m.
Public reception at 5 p.m. at Coronation Park.
Public address, Rate-payers' address.

8th : Morning—Interview at poet's residence.
4 p.m.-6 p.m.—Moslem gentlemens' Tea party.
6-30 p.m.—Dipali Lecture (for Ladies only).

9th : Morning—Interviews—Ladies.
4 p.m.-6 p.m.—Viswa Bharati.
6-30 p.m.—Public lecture in Town, Jagannath Intermediate College.

10th : Morning—Brahmo Samaj.
4 p.m.—6 p.m.—Moslem Hall.
6-30 p.m.—Curzon Hall.
Supper at Dr. Roy's house.

11th : 4 p.m.—6 p.m.—Jagannath Hall.
6-30 p.m.—Formichi's lecture.
Vice-Chancellor's dinner—8.15 p.m. Curzon Hall.

12th : Morning—Interviews.
2-45 p.m.—3-20 p.m.—University Library.
3-30 p.m.—4 p.m.—Eden Girls' College.
4 p.m.—4-30 p.m.—Tea at girls' school.
4-30 p.m.—6 p.m.—Sahitya Parisad Party and address.
6-30 p.m.—7-30 p.m.—Tucci's lecture.
Vice-Chancellor's dinner.

13th : Morning—Students' union address.
3 p.m.—4 p.m.—Laboratories.
4 p.m.—6 p.m.—Vice-Chancellors' party.
6-30 p.m.—Lecture—Curzon Hall.

14th : Depressed class meeting.
4-30 p.m.—Viswa Bharati Sammilani.
4 p.m.—6 p.m.—Educational Institution Party.
6 p.m.—Performance Chirakumar Sabha.
8 p.m.—10 p.m.—Dacca Hall Dinner.

15th : Departure—11-30 a.m.

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

পূর্ব প্রকাশিতের পর

[দ্বিতীয় পর্ব]

সসীম বাস্তবলোক ও অসীম স্বপ্নলোকের সন্ধিস্থলে এবার আমাদের কাহিনী চলে গেল। বাস্তবলোকের সীমানা সিমেন্ট-কংক্রিটের একটি চওড়া বারান্দা। বাস্তবলোক থেকে কয়েকটি সিঁড়ি উঠে এসে বারান্দার দক্ষিণ দিকে শেষ হয়েছে। এই সিঁড়িগুলি দিয়ে নিম্নস্থ মর্ত্যলোক থেকে বাস্তবলোকের সীমান্ত-বারান্দায় পৌঁছানো যায়। বারান্দাটির মাঝখানে একটি বড় দরজা। সেই দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্বপ্নলোকের আভাস। প্রথমেই মনে হবে একটা নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্র বুঝি অসীমে গিয়ে দিশাহারা হয়েছে। কিন্তু খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেই ভুল ভাঙবে। বোঝা যাবে ওটা নীল সমুদ্র নয়, ওটা পটভূমিকা মাত্র। ওই পটভূমিকায় মাঝে মাঝে সমুদ্র যে মূর্ত না হতে পারে তা নয়, সব রকম স্বপ্নই রূপ পরিগ্রহ করতে পারে ওই অসীমের পটভূমিকায়। এখন শুধু পটভূমিকাটা দেখা যাচ্ছে। মর্ত্যে যে সব স্বপ্ন বন্দী হয়ে থাকে মুক্তি পেলে তারাও এইখানে আসে ওই সিঁড়িগুলো বেয়ে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই দেখা গেল প্রতিহারীর পোশাক-পরা একটি লোক বারান্দার উপর উঠে এসেছেন। তাঁর বগলে দুটি খাতা রয়েছে। ইনি বাস্তবলোক ও স্বপ্নলোকের মধ্যে সেতুর কাজ করেন। এঁর নামও সেতু। ইনি এসেই পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন।

"মর্ত্যলোকে শ্রীযুক্ত সুভদ্র সেন এবং শ্রীমতী মহুয়া দেবী মারা গেছেন। তাঁদের মৃত্যু রহস্যময়। তাঁদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ডাক্তাররা ঠিক করতে পারেন নি। সকালে দেখা গেল শ্রীমতী মহুয়া বিছানায় এবং শ্রীযুক্ত সুভদ্র সেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। এঁদের দুজনের মস্তিষ্ক-কোটরে অনেকগুলি স্বপ্ন বন্দী অবস্থায় ছিল। তারা এবার ছাড়া পেয়েছে। মর্ত্যের শাসন কর্তাদের মতে এ স্বপ্নগুলি বিপজ্জনক। তাই তাদের স্বপ্নলোকে চালান করে দিয়েছেন তাঁরা। স্বপ্নরা নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাদের অনুমতি পেলেই তাঁরা উপরে উঠে আসবেন।"

দেখা গেল নীল পটভূমিকায় একটি রূপালী স্রোতস্বিনী মূর্ত হয়েছে। তার উপর সোনালী পানসি বাইতে বাইতে এসেছেন একটি তরুণ যুবক। তাঁর গায়ে রামধনু রঙের পোশাক। মাথায় সবুজ শিরস্ত্রাণ। দেখতে দেখতে পানসি এসে ভিড়ল দরজার সামনে। তরুণ যুবক কংক্রিটের বারান্দার উপর উঠে এসে অভিবাদন করলেন মর্ত্যের সেতুকে। বললেন—"আমাদের দেশে কোনও স্বপ্নই বিপজ্জনক নয়। স্বপ্ন হলেই আমরা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নেব। কিন্তু সেটা আমাদের দেশে।"

সেতু। কোনটা আসল কোনটা মেকী তা যাচাই করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

তরুণ যুবক। আমাদেরও ছিল না। সম্প্রতি মহাকাল আমাদের সহায় হয়েছেন। বলেছেন তিনি নিজে এসে নির্বাচন করে দেবেন। তাঁর কিন্তু একটি কঠোর শর্ত আছে।

সেতু। কি সেটা?

তরুণ যুবক। মেকী স্বপ্নদের তিনি ধ্বংস করে ফেলবেন। এই শর্তে কি ওঁরা রাজী আছেন?

সেতু। ওঁদের রাজী থাকা না থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওঁদের আমরা ফিরিয়েও নিতে চাই না। ওঁদের নিয়ে আপনারা যা খুশী করতে পারেন।

তরুণ যুবক। ওঁদের কোন পরিচয় আপনি দেবেন না?

সেতু। ওঁদের পরিচয় তো আমি জানি না। সুভদ্রবাবুর ঘরে এই খাতাটা পাওয়া গেছে। খাতাটার উপরে লেখা আছে 'মেঘ'। শ্রীমতী মহুয়ারও একটা ডায়েরি পেয়েছি আমরা। সেই দুটো এনেছি। এ দুটোতে ওই স্বপ্নদের কিছু খবর পাবেন। এই নিন। আমি চললাম।

[তরুণ যুবকের হাতে খাতা দুটি দিয়ে তিনি চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু তরুণ যুবক বাধা দিলেন]

তরুণ যুবক। শুনুন। আমার মনে হয়
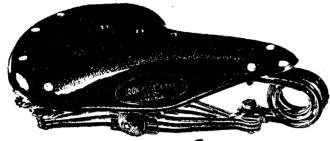
মহাকালের শর্তের কথাটা ওদের আগে থাকতে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

সেতু। তাতে লাভ কি হবে? ওদের মধ্যে ভয় পেয়ে কেউ যদি আসতে না চায় তাদের তো আমরা ফিরিয়ে নেব না। বাস্তবলোক থেকে ওদের দূর করে দেওয়া হয়েছে, গেট বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা শুনলে ওরা কেবল হইচই করবে।

তরুণ যুবক। তবু বলুন, সব জেনে শুনে মহাকালের সম্মুখীন হওয়াই ভালো।

সেতু। কিন্তু ওরা যদি না আসতে চায়, সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে যদি হল্লা করে—

তরুণ যুবক। তা করুক। ওরা স্বেচ্ছায় না এলে ওদের অভ্যর্থনা করব কি করে? স্বপ্নলোকে স্বেচ্ছায় আসতে হবে।

সেতু। বেশ।

[সেতু চলে গেলেন। একটু পরেই সিঁড়ির নীচে গোলমাল শোনা গেল। দু-একজন আর্তনাদ করে উঠলেন মনে হল। তরুণ যুবক অপেক্ষা করে রইলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি। তারপর দরজার কাছে গিয়ে দরজার দিকে চেয়ে কাকে যেন বললেন—'ওদের বসবার জায়গা করে দাও। অলংকৃত আসন নিয়ে এস কয়েকটা। আর স্ফটিকের সেই বৃহৎ পাত্রটিও আন।' সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে অপরূপ বেশে সজ্জিত কয়েকজন কিঙ্কর-কিঙ্করী প্রবেশ করল। আসন পাতা হল। স্ফটিকের সুদৃশ্য একটি পান-পাত্রও এক ধারে রেখে চলে গেল তারা। পান-পাত্রটি বেশ বড়। একটি মানুষ অনায়াসে তার ভিতর ঢুকে যেতে পারে। কিঙ্কর-কিঙ্করীরা চলে যাওয়ার পর তরুণ যুবকটি পান-পাত্রের দিকে এগিয়ে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল।]

তরুণ যুবক। [পান-পাত্রকে] আপনার স্বরূপ প্রকাশ করুন। আপনি সুস্থ আছেন তো? মহাকালের বিচার-সভা এখনি বসবে।

[শ্বেত স্ফটিকের পান-পাত্রটি দেখতে দেখতে রক্তবর্ণ ধারণ করল। মনে হল তার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল। তরুণ যুবক করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে আগুনের দীপ্তি নিবে এল ক্রমশ। স্ফটিক পাত্রের শুভ্র রূপ ফিরে এল আবার। তরুণ যুবক তখন দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন —'নন্দী ভৃঙ্গী। এবার তোমরা এসো।' নীল পটভূমিকার উপর দুটি বিরাট দৈত্য আবির্ভূত হয়ে এগিয়ে এল দরজার কাছে।]

তরুণ যুবক। তোমরা দু'জনে বাস্তবলোকের ওই সিঁড়ির দু' পাশে স্তম্ভের আকারে দাঁড়িয়ে থাক। আর তোমাদের দু'-জনের মধ্যে মায়াজাল প্রসারিত কর।

[সিঁড়ির দু' পাশে নন্দী-ভৃঙ্গী কষ্টি-পাথরের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের দু'জনের মাঝখানে প্রসারিত হল সবুজ আলোর ঝালরি দিয়ে তৈরী একটি সুদৃশ্য

তরুণ যুবক। [গেটের দিকে চেয়ে] আসতে দাও।

[গেট খুলে গেল]

আসতে দিও না—

[গেট বন্ধ হয়ে গেল]

ঠিক আছে।

[এরপর প্রবেশ করলেন স্বপ্নলোকের কোটাল। সুকান্তি, সুবেশ, রুচিবান লোক। তাঁর হাতে একটি সুন্দর সাঁড়াশি রয়েছে।]

তরুণ যুবক। আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

কোটাল। তাই তো আসতে হল। আপনার ভাবা মানেই আহ্বান। সংগে সংগে খবর পেয়েছি। মহাকালও পেয়েছেন। তিনি কিন্তু সশরীরে সব সময়ে এখানে উপস্থিত থাকবেন না। নেপথ্যে থাকবেন। আড়াল থেকেই সব শুনবেন বললেন। শুনে তারপর নির্দেশ দেবেন আমাকে। আমিও মশাই আড়ালে থাকতে চাই। কারও সংগে দৈহিক সংঘর্ষে আসবার প্রবৃত্তি নেই। আমার হয়ে এই সাঁড়াশিটি কাজ করবে। এটিকে এই দরজার পাশে লাগিয়ে দিচ্ছি। মহাকাল যাকে ধ্বংস করতে বলবেন এই সাঁড়াশি তাকে ধরে ওই স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দেবে। ওর মধ্যে যে অগ্নি আর জারক রস আছে বাকি কাজটা তারাই করবে।

তরুণ যুবক। ওটি তো বড় ছোট মনে হচ্ছে।

কোটাল। প্রয়োজন মতো ও নিজের শরীরকে বড় করতে পারবে। বাঁকাতেও পারবে। এ অদ্ভুত সাঁড়াশি।

তরুণ যুবক [সবিস্ময়ে] আশ্চর্য তো! কোথায় পেলেন এটি?

কোটাল। এটিও একটি স্বপ্ন। ভবিষ্যতে রাজনীতি যা হবে তারই স্বপ্ন। এ আমার সৃষ্টি। অনুমতি করেন তো লাগিয়ে দিই এই দরজার পাশে।

তরুণ যুবক। দিন।

[কোটাল সাঁড়াশিটিকে দরজার উপর লাগিয়ে দিলেন।]

কোটাল। এইবার এই সুতোটি বেঁধে দিতে হবে এর গায়ে।

তরুণ যুবক। সুতো?

কোটাল। হ্যাঁ—এটিকে ধরে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো। আমার ইচ্ছা সঞ্চারিত হবে এই সুতোর ভিতর দিয়ে, চালিত করবে সাঁড়াশিকে। আচ্ছা, দেখাচ্ছি।

[কোটাল একটি রঙীন সুতো বেঁধে দিলেন সাঁড়াশির গায়ে। সুতোটি বেশ লম্বা। সেটি ঝুলতে লাগল সাঁড়াশি থেকে। তারপর তিনি সুতোটি ডান হাতে ধরে বললেন—'লম্বা হও।' সংগে সংগে সাঁড়াশি লম্বা হয়ে গেল, যখন বললেন—'ডান দিকে বেঁক'—ডান দিকে বেঁকল, যখন বললেন—বাঁ দিকে বেঁক'—বাঁ দিকে বেঁকল। সুতোটি ছেড়ে দিতেই সাঁড়াশি আবার পূর্ববৎ ছোট হয়ে দরজার উপর লেগে রইল।]

তরুণ যুবক। বাঃ, বেশ চমৎকার তো! আপনি তা হলে বাইরে থাকছেন?

কোটাল। হ্যাঁ। এই সুতোটি ধরে থাকব কেবল। মহাকালের আদেশ আপনারা শুনতে পাবেন। তাঁর আদেশ অনুসারে আমার সাঁড়াশি কাজ করবে।

[রঙীন সুতোটি ধরে তিনি বাইরে চলে গেলেন। তরুণ যুবক একটি আসনে বসে খাতা দুটি উলটে উলটে দেখতে লাগলেন। একটু পরে গেটের কাছে মঙ্গলময়কে দেখা গেল। তিনি গেট ঠেলতে লাগলেন, গেট খুলল না]

তরুণ যুবক। আপনি স্বেচ্ছায় আসছেন তো?

মঙ্গলময়। হ্যাঁ।

তরুণ যুবক। সব শুনেছেন?

মঙ্গলময়। শুনেছি

তরুণ যুবক। [গেটের দিকে চেয়ে] নন্দী-ভৃঙ্গী, ওঁকে আসতে দাও।

[গেট খুলে গেল। মঙ্গলময় এসে প্রবেশ করলেন।]

তরুণ যুবক। আসুন, বসুন। [একটি আসন দেখিয়ে দিলেন]

মঙ্গলময়। [উপবেশনান্তে] আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?

তরুণ যুবক। আমার বিশেষ কোন পরিচয় নেই। আমি স্বপ্নলোকের অধিবাসী। আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্বপ্নমহেশ্বর আজ আমাকে নিযুক্ত করেছেন। আপনি কে?

মঙ্গলময়। আমিও স্বপ্ন। মহুয়া দেবীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি অধ্যাপক মঙ্গলময়ের সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখতেন আমি সেই স্বপ্ন।

তরুণ যুবক। আপনার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু আছে কি?

মঙ্গলময়। অভিনবত্ব? আমার মধ্যে? মনে হয় না আছে। আমি মহুয়া দেবীর মনের কামনা মাত্র। পুরুষকে ঘিরে নারীর যে কামনা চিরকাল পুষ্পিত হয়েছে আমি তার চেয়ে বেশী কিছু নই। অভিনবত্বের দাবি আমি করব কি করে?

তরুণ যুবক। স্বপ্নলোকে এসেছেন কেন?

মঙ্গলময়। আমি তো আসতে চাই নি। দেখলাম বাস্তবলোকে আমার স্থান নেই। তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে স্থান পেলে—

[দ্বারপথে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সংগে সংগে সাঁড়াশিটি লম্বা হয়ে মঙ্গলময়ের গলা চেপে ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল, তারপর নিক্ষেপ করল স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর। স্ফটিক পাত্রটি রক্তবর্ণ ধারণ করল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর তার শুভ্রতা আবার ফিরে এল। তরুণ যুবক আবার খাতা দুটিতে মন দিলেন। একটু পরে

গেটে মিস্টার চ্যাটার্জিকে দেখা গেল। বলিষ্ঠ কমনীয়-কান্তি চ্যাটার্জি এসে হাঁক দিলেন—কপাট খুলুন। পা দিয়ে লাথি মারলেন গেটে।]

স্তম্ভরূপী নন্দী। [স-হুঙ্কারে] ভদ্র হোন।

স্তম্ভরূপী ভৃঙ্গী। [ধমক দিয়ে] কি চান আপনি?

মিস্টার চ্যাটার্জি। ভিতরে ঢুকতে চাই।

ভৃঙ্গী। লাথি মারবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে?

নন্দী। যা করেছেন তার জন্যে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

[মিস্টার চ্যাটার্জি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন তারপর হাতের আস্তিন গুটিয়ে চোখ পাকিয়ে একটু তেরিয়া ভঙ্গীতে চাইলেন নন্দীর দিকে।]

মিস্টার চ্যাটার্জি। যদি না করি কি করবেন?

নন্দী। ছাতু করে ফেলব।

[তরুণ যুবক এতক্ষণে সচেতন হলেন আর একজন এসেছে। সুভদ্র সেনের 'মেঘ' তাঁকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।]

তরুণ যুবক। কি হয়েছে?

ভৃঙ্গী। লোকটি অভদ্র। মায়াজালে লাথি মেরেছে।

তরুণ যুবক। [মিস্টার চ্যাটার্জিকে] আপনারা এক হিসাবে উদ্বাস্তু। তাই আপনাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করব না। আপনি কি স্বেচ্ছায় এখানে আসতে চান? সব শুনেছেন তো?

মিস্টার চ্যাটার্জি। সব শুনেছি, ওসব ভয় আমার নেই। আমি মুষ্টি যোদ্ধা।

তরুণ যুবক। আসুন, ভিতরে আসুন। ওঁকে আসতে দাও।

[গেট খুলে গেল। মিস্টার চ্যাটার্জি প্রবেশ করলেন।]

এই আসনে বসুন। বসে আপনার পরিচয়টা দিন।

[মিস্টার চ্যাটার্জি উপবেশন করলেন। গোঁফে তা দিলেন একবার।]

মিস্টার চ্যাটার্জি। আমার পরিচয়? আমার নানারকম পরিচয় আছে। কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয় আমি কুমারী মহুয়া দেবীর ফ্যানিস নয়। তিনি অনেক দিন আগেই মনে মনে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, আমাকে ঘিরে অনেক আরতি করেছে তাঁর মন।

তরুণ যুবক। সংক্ষেপে আপনি তাঁর স্বপ্ন?

মিস্টার চ্যাটার্জি। স্বপ্ন কিনা তা জানি না। কারণ আমার মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া আবছা-আবছা কিছু নেই! আমি স্ট্রেট, আমি সলিড আমি মাসকিউলার, অর্থাৎ আমি ক্লীব নই, সবল সুস্থ। হয়তো আমার এই পৌরুষই শ্রীমতী মহুয়ার মনে স্বপ্ন জাগিয়েছে—হ্যাঁ স্বপ্নই বলতে পারেন তাকে—কিন্তু আসলে তা—

[মিস্টার চ্যাটার্জি থেমে গেলেন।]

তরুণ যুবক। শেষ করুন কথাটা।

মিস্টার চ্যাটার্জি। [মরিয়া হয়ে] কোদালকে কোদাল বলাই ভালো। আসলে তা কাম। ডিজায়ার, লিবিডো।

[নেপথ্যে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সাঁড়াশি লম্বা হয়ে এগিয়ে এল, চ্যাটার্জির গলা ধরে তাকে শূন্যে তুলে স্ফটিকপাত্রে নিক্ষেপ করল। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল স্ফটিকের পাত্র। মিস্টার চ্যাটার্জি নিঃশেষ হয়ে গেলেন। তরুণ যুবক আবার খাতা দুটিতে মন দিলেন। একটু পরেই সিঁড়ির ওপার থেকে কান্না ভেসে এল।]

তরুণ যুবক। কে কাঁদছে?

নন্দী। একটি বালক আর একটি যুবক। ওরা এখানে আসতে ভয় পাচ্ছে।

তরুণ যুবক। কে ওরা, কি নাম ওদের?

[শালিমকে গেটের কাছে দেখা গেল। সে গেটের ওপার থেকেই কথা কইল।]

শালিম। আমাকে ভুলে যাও নি আশা করি। আমি তো স্বপ্নলোকের পুরাতন অধিবাসী।

সাঁড়াশি লম্বা হয়ে এগিয়ে এল। চ্যাটার্জির গলা ধরে শূন্যে তুলে তাকে স্ফটিকের পানপাত্রে নিক্ষেপ করল

তরুণ যুবক। হ্যাঁ তোমাকে তো চিনি: তুমি পূর্বজন্মের স্বপ্ন। তুমি বাস্তবলোকে কোথায় গিয়েছিলে?

শালিম। মহুয়ার অবচেতনলোকে।

তরুণ যুবক। ফিরে আসবে এখানে?

শালিম। কোথায় আর যাবো!

তরুণ যুবক। এসো। [নন্দী-ভৃঙ্গীকে] ওকে আসতে দাও।

[শালিম প্রবেশ করলেন।]

তরুণ যুবক। নীচে কাঁদছে কে?

শালিম। বাবুল, মোহিত সেন।

তরুণ যুবক। কে ওরা?

শালিম। মহুয়ার দুর্বলতা।

তরুণ যুবক। ওরা যদি এমনভাবে কাঁদে তা হলে তো—

শালিম। কুয়াশার স্বপ্নকে ডাকো। সে ওদের অবলুপ্ত করে দিক।

তরুণ যুবক। তুমি গিয়ে পাঠিয়ে দাও তা হলে—দাঁড়াও।

[নেপথ্যের দিকে চেয়ে] মহাকাল, ইনি

স্বপ্নলোকের পুরাতন অধিবাসী একজন। এঁকে প্রবেশ করবার অনুমতি দিচ্ছি।

[দ্বারপথে মহাকালের আদেশ ভেসে এল—'দাও'। শালিম ভিতরে চলে গেল। একটু পরে কুয়াশার স্বপ্ন প্রবেশ করল। তুহিনশুভ্র বোরকায় ঢাকা নারী-মূর্তি। মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে চলে গেল গেট পার হয়ে। বাবুল আর মোহিত সোমের কান্না ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে থেমে গেল। তরুণ যুবক আবার খাতায় মনোনিবেশ করলেন। একটু পরেই মিসেস পূর্ণেন্দু এসে দাঁড়ালেন গেটের কাছে। খাঁটি মেমসাহেব। নীল চোখ, কটা চুল 'বব' করে ছাঁটা, গায়ের রং লাল, ঘাঘরা-পরা। পায়ে হাই-হিল জুতো]

মিসেস পূর্ণেন্দু। ভিতরে আসতে পারি?

[তরুণ যুবক উঠে গেলেন]

তরুণ যুবক। কে আপনি?

মিসেস পূর্ণেন্দু। আমি মিসেস পূর্ণেন্দু রায়।

তরুণ যুবক। আপনি স্বপ্ন?

মিসেস পূর্ণেন্দু। সুভদ্র সেন বলে এক পাগল অধ্যাপক আমাকে নিয়ে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন। আমাকে তিনি দেখেন নি কখনও, আমার গল্প শুনেছিলেন নানারকম। লোকটি কবি, নানারকম রং চড়িয়ে আমার নানা ছবি এঁকেছিলেন তিনি মনে মনে। প্রথম যে ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি আমি। আসল মিসেস রায় মরণের অন্ধকারে কবে হারিয়ে গেছে। আমি সুভদ্র সেনের স্বপ্ন, প্রথম স্বপ্ন।

তরুণ যুবক। আপনি স্বপ্নলোকে আসতে চান?

মিসেস পূর্ণেন্দু। তা ছাড়া আর কোথায় যাব!

তরুণ যুবক। সব শুনেছেন তো?

মিসেস পূর্ণেন্দু। শুনেছি। আমাকে যদি আপনাদের পছন্দ না হয় তা হলে আমাকে নিঃশেষ করে দেবেন—এই তো? আমার যিনি স্রষ্টা সেই সুভদ্র সেনও যখন নিঃশেষ হয়ে গেছেন, তখন আমারও নিঃশেষ হতে আপত্তি নেই।

তরুণ যুবক। আসুন তা হলে। ওই আসনে বসুন—

[মিসেস পূর্ণেন্দু একটি আসনে এসে বসলেন।]

আপনাকে দু'-একটি প্রশ্ন করতে পারি?

মিসেস পূর্ণেন্দু। করুন।

তরুণ যুবক। আপনি যখন স্বপ্ন ছিলেন না তখন কি ছিলেন আপনি?

মিসেস পূর্ণেন্দু। প্রথমে আমি ছিলাম লণ্ডন শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। নাম ছিল মার্থা গ্রীন। একটা চায়ের দোকানে চাকরি করতাম। সেইখানেই মিস্টার রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বড়লোকের ছেলে ছিলেন, প্রবল যৌবনস্থ ছিল তাঁর। আমি ছিলাম হ্যাংলা গরীবের মেয়ে, তাঁর সহচরী হয়ে গেলাম মাস খানেকের মধ্যে। তারপর যা যা ঘটল তা অশ্রাব্য। বলতে চাই না। ভালোর মধ্যে শুধু এই, শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করতে পেরেছিলাম। বিয়ে করে যখন ভারতবর্ষে এলাম তখন তাঁর স্বরূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠল আমার কাছে। দেখলাম তিনি একটা বর্বর কামুক। একদিন একটা মেথরানীর সঙ্গে হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। আমিও ছাড়লাম না, প্রতিশোধ নিলাম। আমাদের একটা বাবুর্চি ছিল তার সঙ্গে জুটে গেলাম আমি—

[দ্বারপথে মহাকালের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—ধ্বংস কর। সাঁড়াশি এগিয়ে এসে ধরল মিসেস পূর্ণেন্দুকে—তারপর নিক্ষেপ করল তাকে স্ফটিক পান-পাত্রে। আগুন জ্বলে উঠল তার ভিতর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গেটের প্রান্তে দেখা গেল নি এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে টকটকে লাল শাড়ি। মাথার খোঁপায় বেলফুলের মালা। চোখে মুখে অপরূপ হাসি।]

নি। [সহাস্যে] আমাকেও শেষ করে দিন, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন?

তরুণ যুবক। কে আপনি?

নি। আমি সুভদ্র সেনের নি।

তরুণ যুবক। আসুন ভিতরে। ওঁকে আসতে দাও।

[গেট খুলে গেল। নি এসে ঢুকল। ঢুকে বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ফটিক পান-পাত্রটার দিকে চেয়ে রইল।]

নি। ওটা কি?

তরুণ যুবক। স্ফটিকের পান-পাত্র।

নি। পানীয় আছে নাকি কিছু?

[এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল]

ওরে বাবা! নীলমতন কি রয়েছে খানিকটা। খুব গরম। কড়া মদ নাকি? কি মদ বলুন না! নীল রঙের মদ তো কখনও দেখি নি।

তরুণ যুবক। আমি ঠিক জানি না। আপনার পরিচয় কি বলুন?

নি। আমার পরিচয়? দেখতেই তো পাচ্ছেন আমি নি। আমি নারী, আমি মোহিনী। আমি জীবনকে উপভোগ করেছি—এই আমার পরিচয়। আইনের দেওয়াল বারবার ডিঙিয়ে গেছি কল্পনার প্রেরণায়। অফুরন্ত আনন্দ পেয়েছি জীবনে, এই আমার পরিচয়।

তরুণ যুবক। আপনি কি স্বপ্নলোকে আসতে চান?

নি। না, বাস্তব নিয়ে আমার কারবার। বাস্তবলোকে আর ফিরে যাওয়া যায় না?

তরুণ যুবক। স্বপ্নলোক আর বাস্তবলোকের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল আছে একটা। সেটা লঙ্ঘন করবেন কি করে?

নি। [মুচকি হেসে] অনেক দেওয়াল তো লঙ্ঘন করেছি। আপনি কি স্বপ্ন?

তরুণ যুবক। হ্যাঁ।

নি। আপনার স্পর্শ পেলে আমি হয়তো অসাধ্যসাধন করতে পারব। আপনি তো সুন্দরও দেখছি। একটু সাহায্য করুন।

তরুণ যুবক। [সবিস্ময়ে] আমি সাহায্য করব? কিরকম সাহায্য—

[নি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে তরুণ যুবকের সামনে দাঁড়াল মুখ তুলে।]

নি। আমাকে আদর করুন একটু।

[বিস্মিত তরুণ যুবক কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে এগিয়ে এলেন। তারপর তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত রাখলেন।]

না—ওরকম নয়—এই রকম—

[সহসা তাকে জাপটে ধরে চুম্বন করল আবেগভরে। এর পর আশ্চর্য কাণ্ড হল একটা। নি রূপান্তরিত হয়ে গেল একটা রঙীন আলেয়ায়। ভাসতে ভাসতে চলে গেল গেটের দিকে—তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

বাস্তবলোকেই ফিরে চললাম। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর এবার পার হতে পারব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিশ্ব বিজ্ঞান

চন্দ্রলোকে যাত্রার পাল্লাছুটে আমেরিকার নতুন পদক্ষেপ (২)

১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে রেঞ্জার-৭ চাঁদের উষর 'জলদসাগরে' অবতরণের পর বহু মূল্যবান টেলিভিশন চিত্র ও বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠাতে থাকে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম রেঞ্জারের মধ্যে একটি করে ক্যামেরা ও চাঁদের ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্র ছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম রেঞ্জারের কার্যসূচী প্রধানত চাঁদের পশ্চিম দিকের ক্ষেত্র তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং সেই জন্য সেই দুটিতে আধ ডজন করে টেলিভিশন ক্যামেরা সন্নিবিষ্ট করা হয়।

রেঞ্জার-৭ থেকে যে ৪৩১৬টি টেলিভিশন চিত্র আসে সেগুলি পরীক্ষা করে, আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক, রেঞ্জারের অন্যতম নির্মাতা ও প্রয়োগকর্তা ডঃ জেরার্ড কুইপরের আনন্দবিহ্বল হয়ে বলে ওঠেন যে কি অদ্ভুত সুন্দর সব ছবি—ঠিক যেন ফটোগ্রাফের মত। প্রতিটি ছবিতে নির্ভুলভাবে 'ফোকাস' করা হয়েছে।" তাছাড়া ডঃ কুইপরের আরো বলেন যে ছবিগুলি চাঁদের পিঠের প্রকৃত চেহারা ১০ গুণ বা ১০০ গুণ বড় করে দেখায়নি, দেখিয়েছে হাজার গুণ বড় করে। তার ফলে ১৬ ইঞ্চির মত চওড়া এবং ১০ ইঞ্চির মত গভীর গর্তগুলি পর্যন্ত ছবিতে ধরা পড়েছে। ছবিগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর যেগুলি রেঞ্জারের চাঁদে গিয়ে পড়ার ঠিক মুখে তোলা, ডঃ কুইপরের ও তাঁর সহকর্মী ভূতত্ত্ববিদ ইউজিন শুমেকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে চাঁদের নির্জলা ও নির্বায়ু সমতলগুলি মানুষের নামবার উপযোগী। অবশ্য সেখানে যে কোন অজ্ঞাত বিপদ থাকতে পারে না এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে নারাজ। তবে ক্ষুদ্রাকার গর্তগুলির উঁচু তোলা চেহারা থেকে এটুকু অন্তত ভরসা করা যায় যে সেখানকার ধুলোর মত গুঁড়ো মাটি চোরাবালির মত মানুষের পা ভিতর দিকে টেনে নিতে পারবে না। এই দুজন বৈজ্ঞানিকই মনে করেন যে রেঞ্জার-৭ যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানকার জমি মানুষের ভার সইবার মত মজবুত। তবে সেখানে হাঁটা অনেকটা বরফের চাদরের উপর দিয়ে হাঁটার সামিল হবে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ডঃ কুইপরের আমাদের কালের একজন বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ইউরেনাস ও নেপচুনের উপগ্রহগুলি তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং প্লুটো গ্রহের আয়তন নির্ধারণের ব্যাপারেও তিনিই প্রথম। সুতরাং তাঁর অভিমত যে সযত্নে প্রণিধানযোগ্য সে কথা না বললেও চলে। তাছাড়া তিনি নিজেও খুব সতর্ক। খুব ভাল করে বিচার বিবেচনা না করে তিনি কোন বিষয়েই কোন মন্তব্য করতে নারাজ। বিজ্ঞানী মাত্রেরই এই গুণটি থাকা বাঞ্ছনীয়।
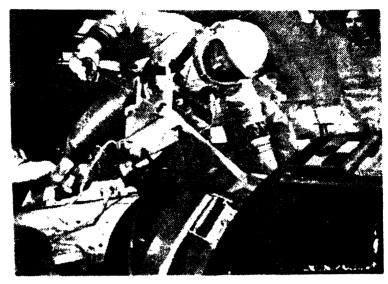
ভার শূন্য অবস্থায় কাজ করার মহড়া

রেঞ্জার-৭ আচার্য শুমেকার ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের এই অনুমানের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে যে, চাঁদে দু' রকমের গর্ত বা গহ্বর আছে। যেগুলির উৎপত্তি হয় উল্কাপাত থেকে। সেগুলিকে বলা হয় মুখ্য এবং গৌণ। কোন উল্কাপিণ্ড যখন প্রচণ্ড মহাজাগতিক বেগে চাঁদের উপরে গিয়ে আঘাত করে (চাঁদে আবহমণ্ডল না থাকার দরুণ পৃথিবীর তুলনায় সেখানে অনেক বেশি উল্কপাত হয়। পৃথিবীকে উল্কার প্রচণ্ড আঘাত থেকে আগলে রাখে আবহমণ্ডলের বর্ম।) তখনই তৈরি হয় মুখ্য গহ্বর। 'প্রাথমিক'ও বলতে পারা যায়। তারপর উল্কার ওই প্রচণ্ড আঘাতের ধাক্কায় মাটির খণ্ডগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দেখা দেয় গৌণ গর্তগুলি। প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে কোন উল্কাপিণ্ড যখন সেকেণ্ডে ১৫ মাইল বেগে ছুটে এসে আঘাত করে তখনই তৈরি হয় মুখ্য গহ্বর। আর সেই গতিবেগ যদি সেকেণ্ডে আধ মাইলের মত হয় তাহলে দেখা দেয় ওই গৌণ গর্ত। মুখ্য গহ্বরগুলির পরিষ্কার চাঁচাছোলা কিনারা কিছুটা বেড়ার মত উঁচু। সেই গর্তগুলি অপেক্ষাকৃত গভীর। কিন্তু গৌণ গর্তগুলি গভীরতায় কম এবং সেগুলির চেহারা কিছুটা এবড়ো-খেবড়ো। রেঞ্জার-৭ যে ৮৫ মাইল এলাকার ছবি তোলে তার মধ্যে এক জায়গায় এক থোলো গৌণ গহ্বর পাওয়া গিয়েছে। এই এলাকায় অনেকখানি সমতল ভূমিতে জেলদ
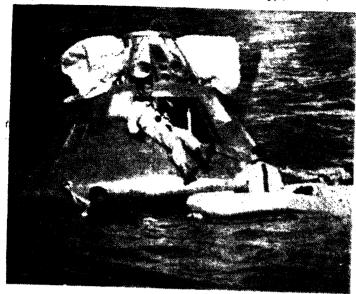
মেক্সিকো উপসাগরে অ্যাপোলোর ভাবী যাত্রীরা মহাশূন্য পরিক্রমার পরে সমুদ্রে এসে কি করতে হবে না হবে সে সম্পর্কে তালিম নিচ্ছেন

সাগর') যেন সাদা রঙের পাউডার ছড়ানো আছে। ডঃ কুপিয়েরের মতে ওই এলাকা মহাজাগতিক যাত্রীর পক্ষে বিষতুল্য। যে কোপার্নিকাস গহ্বরের কথা আগে বলেছি সেটি চাঁদের বৃহত্তম গহ্বরগুলির অন্যতম। সেটি ৫৬ মাইল চওড়া।

কিন্তু "জলদ সাগরের" বিষতুল্য হওয়াটা নিয়ম নয় ব্যতিক্রম। অন্য সব চন্দ্র সাগরে ওই রকম বিপদ নেই বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা এবং তাঁদের মতে অ্যাপোলো মহাকাশযানের যাত্রীরা ওই সব সাগরে নিরাপদে নামতে পারবেন, দরকার হলে তাঁদের পরিবহণ যন্ত্রটি এদিকে বা ওদিকে বিপজ্জনক এলাকা থেকে ২।১ মাইল দূরে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে।

চাঁদের সাগরগুলিতে কোন অপ্রত্যাশিত ফাটল বা খাত যাত্রীদের পথে অন্তরায় হবে বলে মনে হয়না। যেরকম ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটে খরার সময়ে জমিতে। ডঃ কুপিয়েরের ধারণা ৪৫০ কোটি বছর আগে চাঁদের যখন জন্ম হয় তখন থেকেই বায়ু-বিহীন ক্রমাগত মহাজাগতিক ধূলিকণার আঘাত সইতে সইতে চাঁদের জমির চরিত্র এরকম দাঁড়িয়েছে। অন্য কোন ক্ষয়কারী বস্তুর বর্ষণ হলে চাঁদের জমির এতকালে প্রচণ্ড অবক্ষয় হয়ে যেত।

রেঞ্জার শেষবার ছবি তোলে চাঁদের তিন মাইল উপর থেকে যখন ক্যামেরার পাল্লার মধ্যে আসে ৩০০০ গজের মত জায়গা। সেখানে এক বিশাল গহ্বর আবিষ্কৃত হয় যা উত্তর থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত ৭০০ ফুট এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ৪০০ ফুট চওড়া। তার ভিতরে পড়ে আছে একটি এবড়ো-খেবড়ো ১০০ মিটার লম্বা পাথরের টুকরা। অনেকের মতে উল্কার আঘাতে যখন কোপার্নিকাস গহ্বরের জন্ম হয় তখনই ওই পাথরটি ছিটকে বার হয়ে ওই গহ্বরে গিয়ে পড়ে। কিন্তু অন্যেরা প্রশ্ন করেন যে, তাই যদি হবে তাহলে অন্য গৌণ গহ্বরগুলিতে ওই রকম কোন পাথর নেই কেন? ফলে আবার নতুন করে বাগযুদ্ধ বেধেছে

গ্যালিলিওর আবিষ্কারোত্তর কালের মত। তা মন্দ কি? চিন্তা ও ধারণার লড়াই—তর্কবিতর্ক-বাদানুবাদ ছাড়া আসল সত্যে পৌছানো অসম্ভব।

রেঞ্জার-৭-এর পরে আরো দুটি রেঞ্জার চন্দ্রলোকে পাঠানো হয় স্কাউট হিসাবে। শুমেকার কোপার্নিকাস গহ্বরের অভ্যন্তরীণ চিত্র দেখতে চান কারণ সেই ছবি থেকে চাঁদের ভিতর দিকের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধ্যানধারণা করা হয়ত সম্ভব হবে।

সার্ভেয়ার—রেঞ্জারের পরে পালা এল সার্ভেয়ার মডেলের চন্দ্রগামী স্বয়ংচালিত মহাকাশযানের। সেগুলিরও লক্ষ্য ছিল চাঁদ। সেগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে চাঁদে প্রচণ্ড বেগে না পড়ে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে সেখানে ভূমিস্পর্শ করতে পারে। পৃথিবীকেন্দ্রিক কক্ষপথে থেকে চাঁদে যাত্রা করার সময় সার্ভেয়ার যানের ওজন ছিল ২১০০ পাউণ্ডের মত যেক্ষেত্রে রেঞ্জারের ছিল মাত্র ৮০০ পাউণ্ড। তা ছাড়া সার্ভেয়ারের টেলিভিশন ক্যামেরা চাঁদে নামার পর এক মাস ধরে সমানে ছবি পাঠাবার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। এ ছাড়া আরো ছিল তাপমাত্রা, সৌর বিকিরণ, উল্কাকণার আঘাত ইত্যাদি নিধারণের সাজসরঞ্জাম এবং এমন একটি ছোট্ট মাটি বিশ্লেষণের লেবরেটরী যেটি চাঁদে পৌছে সেখানকার মাটির একটু নমুনা নিয়ে বর্ণচ্ছত্র-পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে সেই মাটির রাসায়নিক চরিত্র বিশ্লেষণের পর লব্ধ তত্ত্ব বেতারে পৃথিবীতে পাঠাতে সক্ষম। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে রেঞ্জার মহাকাশযানগুলি ১৭০০০ চাঁদের ছবি পাঠিয়েছিল।

অর্বিটার—১৯৬৬ সালে সার্ভেয়ার মহাকাশযানগুলি যখন একের পর এক মহাশূন্যে চাঁদের দিকে পাঠানো হচ্ছিল তখনই রচনা করা হচ্ছিল পরবর্তী অর্বিটার মডেলের মহাকাশযানের নকশা ও কার্যসূচী। অর্বিটারগুলির কার্যসূচীর মধ্যে ছিল চাঁদের ৮০ মাইল উপর থেকে টেলিভিশনে উপগ্রহটির বেশ কিছুকাল ধরে ছবি পাঠিয়ে যাওয়া। সোজা কথায় সেগুলিকে চাঁদের প্রাকৃতিক মানচিত্র আঁকবার সহায় কৃত্রিম উপগ্রহ বলা চলতে পারে। ১৯৬৬ সালে লুনা-৯ চাঁদের বিস্তারিত ছবি পাঠবার পরেই সার্ভেয়ার-১ থেকে আরো কিছু ছবি আসে। পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে আমেরিকার ১ম, ২য় ও ৩য় অর্বিটার থেকে আরো কয়েক শো' ফটো পৃথিবীতে এসে পৌছায়। এই সব ছবিতে চাঁদের জমির উপরকার ১ মিলিমিটারের চেয়েও ছোট পাথরের কণাগুলি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল।

অ্যাপোলো—এই গেল মানুষের চন্দ্রলোকে অভিযানের আগেকার কতকগুলি মার্কিন স্কাউটের কথা যেগুলি পরিচালিত ও

বাঁদিক থেকে : শিরা, আইজেল ও কানিংহ্যাম এসেক্স রণতরীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন। অতলান্তিক মহাসাগর থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে তাঁরা জাহাজে গিয়ে ওঠেন

নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-কৌশলের দ্বারা। এই স্কাউটগুলি থেকে যেসব তথ্য ও পূর্বাভাস পাওয়া যায় সেগুলি বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অ্যাপোলো মিশনের কার্যক্রম নির্ধারিত হয় যার লক্ষ্য হচ্ছে ১৯৭০ সালের মধ্যে মানুষকে চাঁদে নামানো এবং নিরাপদে ফিরিয়ে আনা। কোন্ কোন্ জায়গা মানুষের নামার পক্ষে উপযুক্ত ও নিরাপদ সেটা ওই স্কাউটগুলির প্রেরিত ছবি ও তথ্য থেকে আন্দাজ করা হয়েছে। নিউজউইক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, আমেরিকান বিজ্ঞানীরা চাঁদে যাওয়ার জন্য যে পথ বেছে নিয়েছেন তা হচ্ছে চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে দুটি একত্র সংলগ্ন যানের একটি আলাদা হয়ে গিয়ে মানুষ নিয়ে চাঁদে নামবে। সেই সময়ে অন্য যানটি চন্দ্র-প্রদক্ষিণ করে চলবে। তারপর যাত্রী সম্ভবত সার্ভিস ইঞ্জিনের সাহায্যে তার যানটি নিয়ে আবার কক্ষপথে উঠে গিয়ে অন্য যানটির সঙ্গে মিলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। অ্যাপোলো প্রোগ্রামের প্রথম বারের অপ্রত্যাশিত শোচনীয় পরিণামের ফলে যে হতাশা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল অ্যাপোলো-৭-এর ১৮ আনা সাফল্যলাভ সেই হতাশা ও উদ্বেগ অনেকখানি লাঘব করবে তাতে সন্দেহ নেই। অগণিত মানুষ অ্যাপোলো-৭-এর যাত্রী তিনজনের জাহাজে ফিরে আসার দৃশ্য টেলিভিশনে দেখতে পেয়েছেন।

১০ দিন ২১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ১৬৪ বার ভূ-প্রদক্ষিণ করে শুধু যে আসছে ডিসেম্বরে অন্য তিনজন যাত্রীসহ অ্যাপোলো-৮ মহাব্যোমযানের চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে গিয়ে পৌছাবার সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে মানুষের মহাকাশ পরিক্রমার মোট সময়ের ক্ষেত্রেও নতুন কীর্তিস্থাপন করেছে। রাশিয়া এখনো মহাকাশে মোট 'মানব-ঘণ্টার' (ম্যান্ আওয়ার্স) দিক থেকে আমেরিকার সমকক্ষ হতে পারেনি।

আগামী বড় দিনের সময় অ্যাপোলো-৮ মহাব্যোমযানকে ঠেলে নিয়ে যাবে 'স্যাটার্ন-৫' রকেট এবং মহাকাশযানের অধিনায়কতা করবেন ফ্র্যাংক বর্ম্যান। বাকি ২ জনের নাম আগেই বলা হয়েছে।

মার্কিন মহাকাশবিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছেন যে, অ্যাপোলো-৭-এর সাগরে অবতরণ প্রথম জেমিনী মিশনের তুলনায় বেশি সঠিক হয়েছে অর্থাৎ সে পূর্ব পরিকল্পিত অবতরণ-স্থানের আরো বেশি কাছে নেমেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এটাও স্বীকার করছেন যে পরবর্তী জেমিনী মহাকাশগুলির তুলনায় অ্যাপোলো-৭-এর অবতরণ ততটা নিখুঁত হয়নি। জেমিনীগুলি পূর্বনির্দিষ্ট নামবার জায়গার ২।৩ কিলোমিটারের মধ্যে নামে যার ফলে সেগুলিকে অপেক্ষমান জাহাজগুলি থেকে নেমে আসতে (প্যারাসুটের সাহায্যে) দেখা গিয়েছিল।

এবারে আমরা দেখি মহাকাশযান অ্যাপোলো-৭ কী কার্যসূচী পালনে কৃতকার্য হয়েছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে অ্যাপোলো কার্যসূচীর অধ্যক্ষ জেনারেল স্যামুয়েল ফিলিপ্স বলেছেন :

অ্যাপোলো-৭-এর ১১ দিনব্যাপী ভূ-প্রদক্ষিণের সময় যাত্রী তিনজনে সেটি নিজেরা পরিচালনা করেছেন। তাঁদের নায়ক ছিলেন শিরা। পৃথিবী থেকে যাত্রা করে চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে পৌছবার পর সেখান থেকে অন্য একটি পোতের সাহায্যে চাঁদে নেমে সেখানকার পরিবেশ পরীক্ষা করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে সপ্তাহখানেকের বেশি লাগার কথা নয়। যাত্রীসহ

অ্যাপোলো-৭-এর ১১ দিন মহাশূন্যে কাটানো এবং সেই সঙ্গে যানটি চালানো ও অন্যান্য কর্তব্য সমাধা করায় যাত্রীদের আশাতীত সাফল্য থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে মানুষযাত্রী চাঁদের যাবার জন্য যতটা সময় দরকার তার চেয়েও বেশি সময় মহাশূন্যে থাকতে ও কাজ করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত এটা প্রমাণিত হল যে অ্যাপোলো জাতীয় মহাকাশযান যাত্রীদের সুস্থ, সবল ও কর্মঠ রাখতে পারবে, কেবিনের ভিতরের পরিবেশ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করবার সুযোগ তাঁদের দিতে পারবে এবং সেই সঙ্গে দেবে টেলিমেট্রির সাহায্যে পৃথিবীতে তথ্য ও নিয়মিত টেলিভিশন চিত্র প্রেরণের সুযোগ।

জেনারেল ফিলিপসের মতে অ্যাপোলো-৭-এর পূর্বে পরিকল্পিত কার্যসূচীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যগুলি হল : মহাশূন্যে স্যাটার্ন রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়টি কর্তব্য শেষ করে যেমন খসে আলাদা হয়ে গিয়ে ভূ-প্রদক্ষিণ করতে থাকবে তখন অ্যাপোলো-৭কে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে পৃথিবী থেকে যাত্রা করার পরের দিন। তারপর পরিকল্পনায় রেট্রো-রকেটের বদলে যে সার্ভিস প্রোপালশান ইঞ্জিন লাগানো আছে সেটি পরিক্রমার নির্দিষ্ট পর্যায়ে ১১ দিনে ৮ বার চালু করে যানের গতিদিক পরিবর্তন বা সংশোধন করা যা চন্দ্রলোকে যাতায়াতের পথে করতে হবেই। ইঞ্জিনটি অষ্টমবার চালু করে অ্যাপোলো-৭কে কক্ষচ্যুত করার পর কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কৌশলে সেটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়। অ্যাপোলো-৭ নিভুর্লভাবে এই কর্তব্যগুলিতে কৃতকার্য হয় :—

এক দফা মহাকাশযাত্রার ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন (২৬০ ঘণ্টা ৩০ মিনিট)। অধিকন্তু মহাকাশ পরিক্রমার মেয়াদের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার কারণ ১৯৬৫ সালে জেমিনী-৭ যাত্রীসহ ১৪ দিন মহাকাশ পরিক্রমা করেছিল। দ্বিতীয়ত অ্যাপোলো-৭ আমেরিকার ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী অ্যাপোলো কার্যসূচী প্রথম বাস্তবে রূপায়িত করল। তৃতীয়ত একসঙ্গে তিনজন যাত্রী নিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত আমেরিকার ক্ষেত্রে প্রথম। শেষত এর আগে কোন মার্কিন মহাকাশযান থেকে টেলিভিশন চলচ্চিত্র ৭ বার পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি। অ্যাপোলো-৭-এর সাফল্য ১৬ লক্ষ পাউণ্ড ঘাতশক্তি সম্পন্ন স্যাটার্ন-১বি রকেটেরও উপযোগিতা প্রমাণ করেছে।

অ্যাপোলো-৮ এখন যাত্রার জন্য তৈরি। স্যাটার্ন-৫ রকেটসহ তার উচ্চতা মোট ৩৬৩ ফুট। কিন্তু তার মধ্যে চাঁদে নামবার কোন আলাদা যান থাকবে না কারণ কোন মানুষকে ঐ যাত্রায় চাঁদে নামানোর পরিকল্পনা করা হয়নি। অ্যাপোলো-৮-এর গতিপথ ঠিক কি রকম হবে তা এখনো সম্পূর্ণ নির্ধারিত হয়নি। একটি মত হচ্ছে অ্যাপোলো-৭-এর কার্যসূচী অ্যাপোলো-৮-এর সাহায্যে আর একবার পুনরাবৃত্তি করে যাত্রীর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবে মানুষকে চাঁদের দিকে পাঠানো উচিত। দ্বিতীয় মত হচ্ছে অ্যাপোলো-৭ যখন আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে তখন অ্যাপোলো-৮কে যাত্রীসহ সরাসরি চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে যাতে যানটি পৃথিবী ও চাঁদ দুটিকেই এক সঙ্গে প্রদক্ষিণ করে আসতে পারে। তৃতীয় মত হচ্ছে অ্যাপোলো-৮কে চাঁদের চারিদিকে বার বার ঘোরানো। কোনটি করা হবে তা এ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ঠিক করা হবে। বর্ম্যানের অধিনায়কত্বে অ্যাপোলো-৮ জেমস লাভেল ও উইলিয়াম স্যান্ডার্সকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

অ্যাপোলো-৯—স্যাটার্ন-৫ রকেটের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অ্যাপোলো-৯ আগামী ফেব্রুয়ারী মার্চ নাগাদ চাঁদে অবতরণের যান (মডিউল) ও তিনজন যাত্রী নিয়ে ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে যাবে। অ্যাপোলো-৯-এর মডিউল সহ ওজন হবে ১ লক্ষ পাউণ্ড। যাত্রী হিসাবে যাবেন ম্যাকডিভিট রাসেল ও শোয়াইকার্ট এবং মডিউলে থাকবেন ডেভিড স্কট। কক্ষপথে মডিউল থেকে অ্যাপোলো-৯ আলাদা হয়ে যাবার পর ৫।৬ ঘণ্টা ধরে অ্যাপোলো-৯ ও মডিওলের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ও সংযোজনের মহড়া চলবে।

অ্যাপোলো-১০—যাত্রাকাল আগামী এপ্রিল বা মে। অ্যাপোলো-১০-এর ভূপ্রদক্ষিণের কক্ষপথ পৃথিবী থেকে আরো বেশি উঁচুতে হবে কিন্তু জেনারেল ফিলিপসের মতে সেটি চাঁদের দিকে যাত্রা করবে কিনা সন্দেহ। সেটি বোধ হয় ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে থেকেই চাঁদে অবতরণের সমস্ত ধাপের মহড়া দেবে। তবে অ্যাপোলো-৯ যদি খুব ভাল ফলাফলের পরিচয় দিতে পারে তাহলে অ্যাপোলো-৯কে চাঁদের দিকে পাঠানোর কথা চিন্তা করা হবে।

অ্যাপোলো-১১—১৯৬৯ সালের শরৎকালে বা শীতকালে অ্যাপোলো-১১ যাত্রীসহ চন্দ্রলোকে যাত্রা করবে যদি আগেকার মিশনগুলি বোল আনা সাফল্য লাভ করে। ঐ যান থেকে দুজন যাত্রীর চাঁদে অবতরণের কথা। অ্যাপোলো-১১কে ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড ঘাতের দ্বারা স্যাটার্ন-৫ রকেট প্রথমে পৃথিবী থেকে ১১৫ মাইল উর্ধ্বে কক্ষপথে পৌঁছে দেবে মিনিট বারোর মধ্যে। সেখানে যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে সম্ভবত দ্বিতীয় বার ভূপ্রদক্ষিণের সময় রকেটের নির্দিষ্ট পর্যায়টি আবার চালু করে অ্যাপোলো-১১ প্রথম মহাজাগতিক বেগ (ঘণ্টায় ১৭৫০০ মাইল) থেকে দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগে (ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল) ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথ ত্যাগ করে চাঁদের দিকে চলে যাবে এবং চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছাতে তার লাগবে ৬০ ঘণ্টার মত। কাছাকাছি বলতে চাঁদ থেকে ৪০ হাজার মাইলের মধ্যে যেখানে চাঁদের অভিকর্ষ ক্ষেত্রের সীমানা। তখন সেই অভিকর্ষের ফলে অ্যাপোলোর বেগ বাড়বে। তখন রেট্রোরকেট কিম্বা সার্ভিস ইঞ্জিনের সাহায্য অ্যাপোলো-১১র বেগ সংযত করে ঘণ্টায় ৩৬০০ মাইলে নামিয়ে আনা হলে চাঁদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অভিকর্ষ ক্ষেত্রে সেটিকে চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে টেনে নিয়ে যাবে। মহাকাশযানের তৃতীয় অংশটি চাঁদ থেকে ৭০ মাইল উপরে ঘুরতে থাকবে। সেই সময় দুজন যাত্রী মডিউলটি আলাদা করে নিয়ে গতি বেগ ঘণ্টায় ৭০ মাইলে নামিয়ে চাঁদ থেকে যখন ৫০০ ফুটের মধ্যে আসবে তখন তাঁরা নামবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বার করবেন। বার করার পর আরো নেমে চাঁদ থেকে ৬৫ ফুট উঁচুতে পৌঁছে মডিউলটি মন্দগতিতে চাঁদে নামানো হবে। মডিউলের পায়া ভূমিস্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন যাত্রীরা চাঁদে নেমে সেখানে বড় জোর ২৬ ঘণ্টা থাকবেন এবং সেখানকার মাটির নমুনা নিয়ে আবার অন্য একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে অ্যাপোলো-১১তে ফিরে যাবেন। তারপর সাড়ে তিনদিনে তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এই হচ্ছে মোটামুটি পরিকল্পনা। অ্যাপোলো-১১ যদি সব কাজ ঠিকমত করতে না পারে তাহলে আর একটি অ্যাপোলো অর্থাৎ অ্যাপোলো-১২ পাঠানো হবে।

সমাপ্ত

(সাঁইত্রিশ)

অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে সাধুজীর দেখা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অনাদিপ্রসাদ নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু দিক নির্ণয় করতে পারছিলেন না। এলোমেলো হাওয়ার মধ্যে কিভাবে পাল তুলবেন, কোন পথে ধরে চলবেন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। সাধুজী সেই নিশানা দেখিয়ে দিলেন। কুরুক্ষেত্র।

ছেলেবেলা থেকে অনাদিপ্রসাদ রামায়ণের চেয়ে মহাভারত পড়তে ভাল বাসতেন, কারণ মহাভারতের চরিত্রগুলোকে অনেক কাছের মানুষ বলে মনে হত। হাতের কাছে কাশীরাম দাসের সংস্করণ পেলেই উনি প্রথমেই উল্টে দেখতেন সেই লাল রং-এর ছবিটা, যেখানে ভীমসেন দুঃশাসনের রক্তপান করছে, কি বীভৎস, অথচ বীরশ্রেষ্ঠ মধ্যম পান্ডবের জন্য বাহবায় মন ভরে যেত, কারণ, সে নরপিশাচ দুঃশাসনকে উচিত শাস্তি দিয়েছে।

কিন্তু কোথায় আজ সেই ভীমসেন? দুঃশাসনে মানুষ যখন জর্জরিত, বেঁচে থাকার অর্থ কেউ খুঁজে পাচ্ছে না, নিরাপত্তার সংজ্ঞা যখন লোপ পেয়েছে, সতীর লাঞ্ছনা যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটনা—কোথায় সেই দেব ঔরসজাত পবননন্দন? কেন আজ সে পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছে না। কেন আবার দুঃশাসনের বুকচিরে রক্তপান করছে না?

সেই দিন থেকে অনাদিপ্রসাদ বাড়ি ফিরে নতুন করে মহাভারত পড়া শুরু করলেন। সকাল, দুপুর, বিকেল, কখনও বা আলো জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজীতে মহাভারতের শ্লোক আর ব্যাখ্যা পাঠ করছেন। যে মানুষটা গত ক'মাস ধরে শুধু বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে, বাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কই রাখেনি সেই লোকটা দিনের পর দিন স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে রইল পড়ার ঘরে।

রমলা বৌদির এ আর এক অস্বস্তি। জিজ্ঞাস করল, এত মন দিয়ে কি পড়াশুনো করছ?

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, মহাভারত।

—সারাদিন বাড়িতে বসে থাক,, একবারও বাইরে বার হও না, দেখ শরীর খারাপ না হয়।

অনাদিপ্রসাদ হাসেন, আমাকে নিয়েই তোমার যত ভাবনা, তাই না রমি? বাইরে বেরলে দুশ্চিন্তা, আবার বাড়িতে বসে থাকলেও চিন্তার অন্ত নেই।

—তা নয়, তোমার সব কিছুই হঠাৎ হঠাৎ কিনা, তাই ঠিক বুঝতে পারি না। এমন আদাছোলা খেয়ে মহাভারত পড়তে শুরু করেছ যেন এ-বই আর আগে কখনও পড়নি।

—পড়েছি বৈকি, তুমিও তো পড়েছ। আচ্ছা বলত দ্রৌপদীকে তোমার সতী মনে হয় কিনা? পাঁচজন স্বামী নিয়ে কেমন সুখে ঘরকন্না করে গেল।

রমলা বৌদি সত্যি কথা বলে, কেন যে দ্রৌপদীকে সতী বলে আমি বুঝি না।

—তাহলে কে সতী, কুন্তী? কুমারী অবস্থায় তার ছেলে হল কর্ণ, লোকলজ্জার ভয়ে তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যদিও বা রেহাই পেল, বিয়ে হল এমন এক স্বামীর সঙ্গে যে সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম। ফলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে তিন দেবতার পুজো করল, তাঁদের ঔরসে তিন পান্ডবের জন্ম হল। তুমি কি বল? কুন্তী একজন সতী?

—আগেকার দিনে কত কি হত ভাবতে গেলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়।

আনদিপ্রসাদ এবার চোখের চশমাটা খুলে অল্প হেসে বললেন, অথচ গান্ধারী যে মহাসতী তা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে, অন্ধ স্বামীকে নিয়ে যে সারাজীবন কাটিয়েছে?

রমলা বৌদি বলে, নিশ্চয়।

—কিন্তু সেই সতী গান্ধারী এমন একশ'টি সন্তানের জন্ম দিল যাদের প্রধান হল দুর্যোধন, দুঃশাসন। যাদের অত্যাচারে সারা দেশ শিউরে উঠল, যাদের পাপে কুরুদের রাজ্য টলমল করে উঠল, শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হল। তাহলেই বোঝ, কে সতী আর কে অসতী বাইরের আবরণ দেখে বোঝা যায় না। বোঝা যায় ফল থেকে। সেদিন একজনের কাছে শুনছিলাম, সে যেত কোন একটি মেয়ের কাছে, অল্পবয়সী, তাকে উপভোগ করতে। পঁচিশ টাকা করে দক্ষিণা দিত। একদিন সে মেয়েটির শরীর খারাপ হল। লোকটি সেখান থেকে ফিরে আসছিল, মেয়েটির মা কিন্তু তাকে যেতে দিল না। কোন অছিলায় মেয়েকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে এই প্রস্তাব রাখল, আপনি যে পঁচিশ টাকা করে দেন, তাতে আমাদের সংসারে অনেক সাশ্রয় হয়, মেয়ের অসুখ বলে ফিরে যাবেন কেন, আমি তো আছি। ভদ্রলোক সে সন্ধ্যায় মেয়ের বদলে মাকে নিয়ে শুলে, যথারীতি পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে।

রমলা বৌদি শিউরে ওঠে, ছি ছি, কি অসভ্য!

—কিন্তু এ সত্য, এ বাস্তব।

—না, না, আমি বিশ্বাস করি না।

—এই হল অবক্ষয়ের চিত্র. এইভাবেই এক একটা সমাজ ভেঙেগ পড়ে. সভ্যতার সঙ্কট দেখা দেয়—ক্রমশ পচ ধরে দুর্গন্ধ পাঁজে ভরে যায়।

—তখন উপায়?

—হয় সে অঙগটাকে কেটে ফেলে দিতে হবে, আর যদি সেটা ফোঁড়ার আকার নেয় কাটিয়ে দিতে হবে, পুলটিশ দিয়ে চেপে রাখলে চলেব না, তাতে বিষ ক্রমশ সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়বে, যেখানে সেখানে বিষ ফোঁড়া বেরুবে। সমাজের যখন এই অবস্থা হয় তখনই আসে বিপ্লব।

রমলা বৌদি ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করে, বি-প্ল-ব।

—এতে ভয় পাবার কিছু নেই, রক্তপাত হবে হোক. তাতে বদরক্ত বেরিয়ে যাবে, সুস্থ সবল সমাজ বেঁচে থাকবে। সেই-জন্যেই তো কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল. অন্ধ রাজার রাজত্বে, দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। এত ধর্ন-

যুদ্ধ। আমি বলছি তোমায়, আর বেশি দেরি নেই। কোন সভ্যতা, কোন সমাজ বেশিদিন মুখ বুজে এই নির্মম অত্যাচার সহ্য করে না। তুমি কি মনে কর এইভাবে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে? তুমি কি মনে কর যুব সমাজ নিজেদের যন্ত্রণায় এই রকম নিষ্ফল মাথা কুটে মরবে? চোরেরা সমাজের মাথায় বসে বাহাদুরি নেবে, সৎ মানুষ এইভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করবে, অসতীরা সতীত্বের ঢাক পিটিয়ে জয়মালা পরে বেড়াবে। আর গৃহস্থ বধূকে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে নিজের লজ্জা বিক্রী করতে হবে। যুগে যুগে সভ্যতার এই সংকট মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু বেশিদিন সে টেঁকে না, বিপ্লবের মুগুরে তার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়. সব দেশে তাই হয়েছে। ইওরোপ, আমেরিকা, কোথাও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদেশেই বা তা হবে না কেন? তাছাড়া এ বিপ্লব যে এদেশে আগেও ঘটেছে—পাণ্ডব ও কুরুর যুদ্ধ, সুর ও অসুরের লড়াই, ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব।

কমলা বৌদি স্বামীকে ক্রমশ উত্তেজিত হতে দেখে কথা না বাড়িয়ে বলে, আজ অনেক রাত হয়েছে, শুতে চল।

—তুমি শুয়ে পড়, আমি যাচ্ছি।

—এখন কি করবে?

—মুষল পর্বটা পড়ে নিই, বড় অদ্ভুত ঘটনা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যদু বংশ ধ্বংস হওয়ার কাহিনী। মুনির অভিশাপে যে ছেলেটি মুষল প্রসব করেছিল, সেই মুষলই যদু বংশ ধ্বংসের কারণ। বয়োজ্যেষ্ঠরা উপদেশ দিয়েছিলেন, মুষলটাকে ঘষে ঘষে শেষ করে ফেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পারেনি, একটা ছোট অংশ রয়ে গিয়েছিল, যার ফলে যদু বংশ আত্মকলহে শেষ হয়ে গেল. কিন্তু সেই ছোট্ট অংশটা গেল কোথায়? হাজার হাজার বছর পেরিয়ে গেছে. কিন্তু সেই মুষলের অবশিষ্ট অংশটুকু নিশ্চয় কোথাও রয়ে গেছে। আমি সেইটেই খুঁজছি।

কমলা বৌদি কি বলবে ভেবে পায় না।

—বলছি তো, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। ঘণ্টাখানেক বাদেই আমি ঘরে যাচ্ছি।

—তাই এস।

সে রাত্রে অনাদিপ্রসাদ কিন্তু একেবারেই বিছানায় শুতে যাননি। সারারাত পড়ার ঘরে কাটিয়েছেন, কখনও বই পড়ে, কখনও আধঘুমন্ত অবস্থায়, কখনও বা জেগে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন, না অতীতের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক। পর্দার ওপর একটার পর একটা ছবি ফুটে উঠেছে, এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

অনাদিপ্রসাদ দেখতে পেলেন যদু বংশ ধ্বংসকারী মুষলের অবশিষ্ট অংশ মাটির কবর ফুঁড়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠল, সন্তর্পণেই চারদিক দেখে নিয়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল, ঠিক যেন কার্টুন চিত্রের কোন এক সচল জড়পদার্থ, যার হাতপা গজিয়েছে, যে আর চলৎশক্তিহীন নয়, যার মুখে অভিব্যক্তির প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, সেই মুষল জল ঝড়ের মধ্যে দিয়ে তার অপ্রতিহত অভিযান চালিয়ে আয়তনে আরও ছোট হয়ে পৌঁছল এসে আজকের সমাজে। ঐতিহাসিকদের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে রাতারাতি নাম পাল্টে ফেলল —এখন আর সে মুষল নয়—তার নাম কালো টাকা।

অনাদিপ্রসাদ ধড়মড় করে উঠে বসলেন, মনে হল এই গভীর রাত্রে বাইরে অনেকগুলো কাক ডাকছে. গর্দভের চীৎকার, নানারকম অশুভ ধ্বনি, বোধ হয় এই রকমই শোনা গিয়েছিল দুর্যোধনের জন্মলগনে।

যদিও নাম তার কালো টাকা কিন্তু রং কালো নয়। রুপোলী চকচকে ঠিক অন্য টাকার মতই, তফাৎ শুধু এ টাকার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয় না. এ টাকা সহজে চলে ফিরে বেড়ায় না. বেশির ভাগই ঢুকে থাকে সিন্দুকে। এরই লেনদেনের জন্যে কালো বাজারকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে। সমাজের সব স্তরে কালো টাকা ঢুকছে—অভিশপ্ত মুষল তার কাজ করে যাচ্ছে ঠিকই, সকলের অজান্তে আস্তে আস্তে সে সমাজকে পঙ্গু করে ফেলবে।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ ব্যাকে ছবি ফুটে উঠছে সেই পার্কে আলাপ হওয়া ময়লা রং ডুরে-চুলের আফিম মিত্তির, খনখনে গলায় হাসছে, বলছে, সেদিন বাজারে এক মেছো এক জোড়া ইলিশের দাম হাঁকলো তিরিশ টাকা, আমি শুনে হাসলাম, এত দাম দিয়ে কে মাছ কিনবে। ওমা, কিছুক্ষণ বাদে দেখি এক ভদ্রলোক করকরে তিনখানা দশ টাকার নোট দিয়ে দুটো মাছ নিয়ে চলে গেল। তবেই বুঝুন, টাকাওয়ালা লোক নিশ্চয় আছে।

আফিম মিত্তির সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু যা সে বোঝেনি এ হোল কালো টাকার খেলা—যে টাকা খরচা করতে অত মায়া হয় না, এরই যাদু স্পর্শে তরি-তরকারী মাছ মাংস, সব কিছুর দাম হুহু করে বাড়ছে। স্বচ্ছন্দে বাজার করছে তারাই যাদের পকেটে কালো টাকা আছে। যাদের নেই তারা থলি হাতে মুখ শুকিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাড়ি ফিরছে বিনা পয়সায় করেক কিলো ঈর্ষা কিনে।

মনে পড়ছে সংবাদপত্রের শিরোনামা— পুলিশ কালো টাকার সন্ধানে বাড়িতে বাড়িতে অনুসন্ধান করছে। কোন ব্যবসায়ীর লেপের ভেতর থেকে টাকা বেরিয়েছে, কোন ডাক্তারখানায় প্যাকিং বাক্সর মধ্যে ভরা কালো টাকা। কোন ফিল্ম স্টারের বাথরুমে পাওয়া গেছে কয়েক লক্ষ টাকার নোট। পুলিশের চেয়ে বুদ্ধিমান কালো টাকা, মুষলের অভিজ্ঞতার সে উত্তরাধিকারী, আর সে চুপচাপ ধনীর সিন্দুকে বসে রইল না, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কালো টাকা ঢুকে পড়ল জমিতে। সঙ্গে সঙ্গে জমির দাম ফেঁপে ফুলে উঠল, হাজার টাকার জমি বিকোলো দশ হাজারে, সাধারণ লোককে সাধারণ রোজগার নিয়ে আর জমি কিনতে হল না। রাতারাতি কালো টাকা বড় বড় শহরের সব জমি দখল করে নিল। কিন্তু এতেও তার শান্তি নেই, ধাপে ধাপে উঠতে লাগল বাড়ি, একতলা দোতলা ছাড়িয়ে ক্রমে তেরো-চোদ্দ তলা. জমি কিনতে যে বাড়তি কালো টাকা দিতে হয়েছে তা উশুল করার জন্যে জমির ওপরের শূন্য স্থান যতখানি উঁচু সম্ভব দখল করা শুরু হল, তার জন্যে তো আর নতুন করে টাকা দিতে হবে না। অতএব উঁচু বাড়ি, অনেক ফ্ল্যাট, যথেষ্ট ভাড়া, তার উপর পাগড়ীর টাকা অর্থাৎ সেলামী কালো টাকা একজনের পকেট থেকে আর এক জনের পকেটে চলে গেল। উঠিয়ে দেওয়া হল বস্তী, ভাঙা হল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একতলা আর দোতলা বাড়ি, উঠল স্কাইস্ক্রেপার। অগণিত মানুষের চাপা দীর্ঘশ্বাস কিন্তু উঁচু তলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কোনরকম অস্বস্তির কারণ হবে না।

আর একটা ছবি ফুটে উঠল—ফিল্ম ডিরেক্টার সৌরভ সেন, তখনও তার এরকম পড়তি অবস্থা হয়নি, ছবির জন্যে কিনতে এসেছিল অনাদিপ্রসাদের একটা বই। মুখ শুকিয়ে বললে, গল্পটা কিনে রাখছি, তবে ছবি তুলতে পারব কিনা জানি না। অনাদিপ্রসাদের বিস্মিত প্রশ্ন, কেন?

—কালো টাকা ঢুকে ফিল্ম ইনডাস্ট্রি সর্বনাশ করে দিয়েছে। স্টারদের দাম চড়েছে আশী হাজার, এক লাখ, তার বেশির ভাগ কালো টাকা দিতে হবে, কারণ ট্যাক্সের ভয়ে তারা সই দেবে না। যদি স্টার না নিয়ে ছবি করি সিনেমার মালিকরা দেখাবে না, তারা কালো টাকা চেয়ে বসবে। ফলে হয় স্টারদের, নয় সিনেমা মালিকদের কালো টাকা দিতে হবে। অতএব এমন প্রযোজক চাই, যার কালো টাকা আছে। এখন তাদের খেলা চলছে, আমাদের মত ছাপোষা মানুষের এ লাইনে বেঁচে থাকার কোন উপায় দেখছি না।

সৌরভ সেন সেদিন মিথ্যে কথা বলেনি। অনাদিপ্রসাদের সেই গল্পের চিত্ররূপ আজও ওঠেনি, খবর নিয়ে জেনেছেন সেদিনের নামকরা পরিচালক সৌরভ সেন হারিয়ে গেছে, লজ্জায় ঘৃণায় ক্রমশ তলিয়ে গেছে দিশী মদের স্রোতে।

অনাদিপ্রসাদ উঠে পায়চারী করতে লাগলেন, এ-ঘর থেকে ও-ঘর, বাইরের বারান্দা, ওপরের ছাদ। রমলারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছে, পাশের বাড়ির পাগলটা গান করছে, দূরে একটা প্রেসে মেশিন চলার ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে, দুটো বেশি পয়সা পাবার জন্যে তারা রাত জেগে কাজ করছে। প্রেসের কথা থেকে মনে পড়ল লেখার কথা, সেই সঙ্গে ভেসে উঠল প্রকাশক সুনীল রায়ের মুখ। অন্ধকার আকাশে স্কন্ধ কাটার মত জীবনে সার্থক সুনীল রায়ের বিরল কেশ মুখখানা হাসছে, যেন বলছে, আরে ভাই আজকের দিনে শুধু ব্যবসা করে কিছু চলে না। কত রকম ট্যাক্সের ফন্দী বার করেছে, যা রোজগার করব সব গভর্নমেণ্ট কেড়ে নেবে, সেই জন্যে ঠিক করেছি বেশি বই আর ছাপাবো না।

অনাদিপ্রসাদের প্রশ্ন, তাহলে কি করবেন?

—শোনেন নি আমি বারাসাতের দিকে প্রায় প'চাত্তর বিঘে ধানজমি কিনেছি।

—আপনি চাষ করবেন?

—তাছাড়া গভর্নমেণ্ট শস্য ফলাবার জন্যে ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছে, আরে ভাই শস্য হোক আর নাই হোক কাগজে কলমে দেখিয়ে দাও, এত ধান হল এত পাট হল, বিক্রী করে এত টাকা হল। দিব্যি আমার কালো টাকা সাদা হয়ে ঘরে আসবে অথচ ট্যাক্স দিতে হবে না।

অনাদিপ্রসাদ এ খবর জানতেন না, সত্যিই আশ্চর্য হন, বলেন কি সুনীলবাবু, আজকাল এইসব চলছে?

সুনীল রায় মুরুব্বী চালে হাসে, এর চেয়েও বেশি লাভ পোলট্রিতে, মুরগীর চাষ করুন, তাতেও ট্যাক্স লাগবে না। বেশি জমিরও দরকার নেই, খান কয়েক বড় বড় খাঁচা, কতগুলো মোরগ আর মুরগী, ক্রমান্বয়ে তারা ডিম পাড়বে আর বাচ্চা দেবে। ডিম বিক্রী করুন, মুরগী বিক্রী করুন, আর কিছু নাই বিক্রী করুন, আপনার কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আরে মশাই, কাগজে পত্রে মুরগী ডিম পাড়ুক, হিসেবের খাতায় বিক্রী হোক, আসলে মুরগী নাই বা রইল, জানেন রাজস্থানে এখন পোলট্রি ফার্ম সবচেয়ে বেশি! সবই কাগজের মুরগী, কাগজের ডিম—কালো টাকা সাদা বানাবার আজব কল।

অনাদিপ্রসাদ আপত্তি করেন, তাই কখনও হয়, সরকার এ সবের খবর রাখে না? ইনেস্পেক্টার পাঠিয়ে তো খোঁজ নিলে পারে।

—খোঁজ ঠিকই নেয় তবে ইনেস্পেক্টার না বলে কয়ে গিয়ে হাজির হয় না, যেদিন গিয়ে পৌঁছয়, তার আগের দিন কিছু পালক ছড়িয়ে রাখা হয় খাঁচাগুলোর মধ্যে, বোঝান হয় দু'দিন আগে 'রানীক্ষেত জ্বরে' পাখিগুলো সব একসঙ্গে মরে গেছে। তবে এসব কথা আপনাকে বলে তো লাভ নেই, আপনি নিজেই যখন সোনার ডিম পাড়তে পারেন, তবে আর কাগজের মুরগী, কাগজের ডিম নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন?

সুনীল রায়ের মুখটা ফেড্ আউট করে গেল। ঠান্ডার মধ্যেও অনাদিপ্রসাদ ঘামতে লাগলেন, কোথায় আমরা নেমেছি. শুধু মিথ্যে আর মিথ্যে! কাগজে কলমে ধান ফলছে, পাট হচ্ছে, মুরগীরা ডিম পাড়ছে, শুধু ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া, সবাই যদি ট্যাক্স ফাঁকি দেবে তাহলে গভর্নমেণ্ট চলবে কি করে?

বিরাট গম্বুজের মধ্য কে যেন চীৎকার করে বলল, চলছে না, চলছে না।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল দূরে বহু দূরে হাওয়ার তরঙ্গে ক্রমশঃ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, চলছে না, চলছে না।

অনাদিপ্রসাদ ছাদ থেকে নীচে নেমে এলেন, আবার কতগুলো কাগজের হেড লাইন—'টাকার অভাবে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ অচল।' 'ভারতে উৎপন্ন স্টীলের চাহিদা বাইরে তত নেই তাই কম দামে বিক্রী করে রপ্তানী বাড়াতে হচ্ছে'। 'চিনি আমরা খেতে পাচ্ছি না কিন্তু অর্ধেক দামে বাইরে পাঠানো হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার জন্যে।'

অনাদিপ্রসাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে যদি লোকে ট্যাক্স না দেয়, যদি কালো টাকার অঙ্ক বেড়েই চলে, কিন্তু এ থেকে তো রেহাই পাবার কোন উপায় নেই, সেই অভিশপ্ত মুষল যে সমাজের সব স্তরে ঢুকে পড়েছে, ক্রমশঃ তা সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে দেবে। কোন মানুষের শরীরের সব জায়গায় যদি চর্বি বাড়ে ততে দেহের তত ক্ষতি হয় না কিন্তু ঐ চর্বি যদি জমা হয় হার্টের ওপর

কিংবা ব্রেনে মানুষটাকে সুস্থ থাকতে দেয় না। টাকার সারকুলেশান যত হয় তত দেশের পক্ষে মঙ্গল, কিন্তু কালো টাকা যে হার্টের ওপরে জমা চর্বির মত সমাজের হৃৎপিণ্ডকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে, মুমূর্ষু সমাজ কত দিন যুঝতে পারবে!

মনোকষ্টে, হতাশায় ভোরের দিকে অনাদিপ্রসাদ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। যদি আর কিছুক্ষণ জেগে থাকতেন দেখতে পেতেন সেই সচল মুষল গুটি গুটি পায়ে কার্টুন-চিত্রের যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলে ঢুকছে রেস-কোর্সে।

ঘোড়ার বাজী খেলার রীতি আজকের নয়, বহুদিনের প্রচলিত প্রথা। পুরাকালে ঘোড়ার সংগে রথ ছুটত, সারথিরা বাহাদুরি দেখাত। এখন শুধু ঘোড়ারাই দৌড়য়, কেরামত দেখায় জকিরা। হাজার হাজার টাকার বাজী ধরা হয়, কেউ জেতে কেউ হারে, পাওয়া না পাওয়ার একটা উত্তেজনা, সব রকম অবস্থার মানুষই ঘোড় দৌড়ের মাঠে যায়, বাজী ধরে কপাল যাচাই করে। এ এক ধরনের জুয়োখেলা, তার সংগে কিছুটা রোমাঞ্চ আছে।

কিন্তু এখানে কালো টাকা ঢোকার পর থেকে বাজী ধরার পদ্ধতিটা বদলে গেছে। সেদিনের রেসে ছ'টা ঘোড়া দৌড়বার কথা। মনুয়া হাতে বই নিয়ে ঘুরছে, ভাবছে তিন নম্বর ঘোড়াটার নামে 'উইন' খেলবে কিনা, এমন সময় এক পরিচিত ভদ্রলোকের সংগে দেখা হয়ে গেল। লোকটা শান্ত চোখে হাসল, হ্যালো মনুয়া, কেমন হচ্ছে আজ, কিছু জিতেছ?

মনুয়া বলল, সুবিধে করতে পারছি না, বলুন না এই রেসে কি খেলব?

—আমি তো সব ক'টা ঘোড়ার নামেই পাঁচশো টাকা করে লাগিয়ে দিয়েছি।

মনুয়া চমকে ওঠে, সে কি? তিন হাজার টাকা খেলেছেন?

—হাঁ, যদি কোন 'ফেবারিট' ঘোড়া না জেতে আমি তিন হাজারেরও অনেক বেশি পাব, আর 'ফেবারিট' জিতলেও হাজার দুই নিশ্চয়। হয় কিছু লোকসান, না-হয় অনেক লাভ, তাছাড়া এই সুযোগে আমার তিন হাজার কালো টাকা ট্যাক্স-ফ্রি সাদা টাকা হয়ে ফিরে আসবে। কিছু মন্দ করেছি?

মনুয়া সব কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তাই শেঠিয়ার সঙ্গে দেখা হতে ঐ প্রসঙ্গই তুলেছিল। শেঠিয়া বলল, আজকালকার খেলা ঐরকমই হয়েছে, কালো টাকা সাদা বানাবার জন্যেই এত বড়লোকের ভিড়। তারপর কি খবর, মোহনচাঁদজী আজ আসবেন না?

—বললেন শরীর ভাল নেই, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

—বুড়ো খুব সেয়ানা, বুঝেছে তুমি একলা থাকলে আমার মন বেশি ভেজাতে পারবে, তাই নিজে আসেনি।

মনুয়া বায়না ধরল। যাই হোক স্যার শেঠিয়া, আজ আমাকে জেতা জ্যাক্‌পটের টিকিট কিনিয়ে দিতেই হবে, নয়ত মোহনচাঁদজীর কাছে মুখ দেখাতে পারব না!

শেঠিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, দু' তিন দিন ধরে চেষ্টা তো খুব করেছি, কিন্তু শালা দালালগুলো ঈগল পাখীর মত বসে থাকে, রেজাল্ট বেরতে না বেরতে ছোঁ মেরে টিকিটগুলো তুলে নেয়।

—সে আমি জানি না, আজকে আমার চাই।

—দেখি কি হয়।

বরাত ভাল ছিল মনুয়ার, শেঠিয়াও চারদিকে চর ছেড়ে রেখেছিল তাই আজকের জ্যাকপটের টিকিট সে বেহাত হতে দেয়নি, পঁচাশি হাজারের টিকিট নব্বই হাজারে কেনার ব্যবস্থা করে দিল। মনুয়া সংগে সংগে মোহনচাঁদকে খবর দিল। বুড়োর প্রচণ্ড উল্লাস, খুব ভাল সওদা করেছ মিস্ লাহিড়ী, মাত্র পাঁচ হাজার প্রিমিয়ামে পঁচাশি হাজার কালো টাকা সাদা করে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। আমি খাতায় দেখিয়ে দেব দশ টাকার টিকিট কিনে এত টাকা পেয়েছি, কেউ ধরতে পারবে না। আজ থেকে তোমার দু শো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম।

মনুয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, আমার মাইনে তা হলে হল সাত শো টাকা?

কিন্তু মনুয়ার উচ্ছ্বাস টিকল না, অদূরে দেখতে পেল স্বরূপ লাহিড়ী দাঁড়িয়ে। দৃঢ় পদক্ষেপে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। গম্ভীর গলায় ডাকল, এদিকে এস।

এ আদেশ মনুয়া উপেক্ষা করতে পারল না।

(ক্রমশ)

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

প্রতিলিপি-মুদ্রণ যন্ত্রের ফ্যাক্টরী

গৌরকিশোর ঘোষ ৪ নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'যন্ত্র-গণক' বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের সমাপ্তিতে তিনি বলছেন: বিজ্ঞানের দানকে অগ্রাহ্য করার অর্থ আলো থেকে অন্ধকারের দিকে উল্টোরথের যাত্রা।

ভ্রম সংশোধন

৩৬ বর্ষ ২য় সংখ্যার দেশ-এ 'কুলজিয়ান করপোরেশন' বিষয়ক প্রবন্ধের ১৭৩ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে অনবধানতাবশত ১000 মেগাওয়াট-কে ১০ লক্ষ ওয়াট বলা হয়েছে। সেটা ১০ লক্ষ কিলো-ওয়াট হবে। ওই পৃষ্ঠারই দ্বিতীয় কলামের নবম লাইনে তপব্রত-র বদলে তপোব্রত হবে এবং তৃতীয় কলামের ষষ্ঠ লাইনের 'পরিকল্পনার' শব্দটি হবে 'পরিকল্পনায়'।

—বিশ্বকর্মা

গৌরকিশোরের এই উপসংহারে নিহিত আছে এক চিন্তাশীল মানুষের ক্ষোভ। বামপন্থী নেতৃত্বের প্ররোচনায়, বলতে গেলে রাজনৈতিক কারণেই, ভারতীয় জনসাধারণের একাংশ আজ ইলেকট্রনিক যন্ত্র-গণকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আমাদের কর্মব্যস্ত নেতারা কিন্তু সময় বাঁচাবার জন্যে জেট-প্লেনে করে দেশেবিদেশে যাতায়াত করেন এবং ইলেকট্রনিকসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান অটোম্যাটিক টেলিফোন ব্যবহার করেন দিনে বিশ পঞ্চাশ একশো বার। অথচ তাঁদেরই বক্তব্য হলো যে, ভারত যদি এখন কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে আরও অগ্রসর হয় তা হলে বেকার সমস্যাও বেড়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বেকার সমস্যা কি এই যন্ত্র-গণক এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের জন্যেই বাড়ছে? না হলে কি বাড়তো না? আমার তো তা মনে হয় না। বরঞ্চ, নতুন নতুন যন্ত্রের নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্যে নতুন কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হয়েই চলেছে।

নেতৃবৃন্দের কথা বাদ দিয়ে আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষের কথাতেই আসি। আমরা আজকাল ইলেকট্রিক ট্রেনে যাতায়াত করতে পারলে স্টীম-এঞ্জিন টানা সেকেলে ট্রেনে চড়তে চাই কী? ইলেকট্রিক ও ডীজেল এঞ্জিনের প্রবর্তনে ফায়ারম্যানের পদটি বিলুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু মোট কর্মসংস্থানে কি কোনো বাধা হয়েছে তাতে? আর আমরা কি ইলেকট্রিক ও ডীজেল ট্রেন বন্ধ করে স্টীম এঞ্জিনের যুগে ফিরে যেতে চাই, তারপর স্টীম-এঞ্জিনকেও বাদ দিয়ে 'গরুর গাড়ি আর কিস্তির নৌকো' সভ্যতায় ফিরে যেতে চাই—অনেক গাড়োয়ান, অনেক মাঝি আর অসংখ্য দাঁড়ির কর্মসংস্থান হবে বলে? নিশ্চয়ই নয়।

কাজেই বিশ্বের অষ্টপ্রহরব্যাপী সংকীর্তনে পশ্চিমী মূলগায়েনদের দোহারকি ভারতকে করতেই হবে; অনেক দেরিতে হলেও আধুনিকতম যন্ত্রের ব্যবহার আমাদের দেশেও চালু করতে হবেই।

আজ কয়েকটি যন্ত্র ও সরঞ্জামের কথা বলবো। এইসব যন্ত্রের সাহায্যেই আজকের যান্ত্রিকরা ও বিজ্ঞানীরা সামান্য সাইকেল থেকে আরম্ভ করে চন্দ্র-অভিযানের রকেট পর্যন্ত সমস্ত কিছুরই পরিকল্পনা করছেন নকশার পর নকশা এঁকে।

দেরির কথা বলছিলাম—তা অনেক দেরি করেই 'ময়েস্ট ডায়াজো' (Moist Diazo) মেশিন এবং সেনজিটাইজড্ (sensitized) কাগজের সুপরিকল্পিত উৎপাদন ভারতে আরম্ভ হলো। এর সূচনা হয়েছিল সাঁইত্রিশ বছর আগে হল্যাণ্ডের ভেনলো শহরে। ১৯২৬ সালে সেই শহরের ডক্টর কার্ল ও ডক্টর লুইস ভ্যাণ্ডারগ্রিনটেন নতুন পদ্ধতিতে নকশার প্রতিলিপি (চলতি ভাষায় যাকে বলে ব্লু-প্রিন্ট) তোলার মেশিন এবং সেই মেশিনে ব্যবহার্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কাগজ তৈরির উদ্ভাবন করেছিলেন। মাত্র সেদিন ১৯৬৩ সালে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাশ নামে এক বাঙালী ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে সেই দুটিরই উৎপাদন আরম্ভ করলেন।

ডঃ কার্ল ও ডঃ লুইসের গবেষণার ফলে এখন তাঁদের সেই আবিষ্কার আধুনিকতম রূপ পেয়েছে। অবশ্য 'ময়েস্ট ডায়াজো'র পরেও আবিষ্কৃত হয়েছে electrostatic প্রণালী এবং তা-ও এখন দেশে দেশে প্রচলিত হয়েছে। Diazotherm নামে সর্বাধুনিক আরও একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু ইয়োরোপেও তার প্রচলন এখনো ভালো করে হয়নি। আমেরিকান আবিষ্কার জেরক্স (xerox) প্রণালীও বেশ কয়েক বছর ধরেই চালু হয়েছে, কিন্তু সেই কাজের জন্য নাকি মেশিন কিনতে পাওয়া যায় না; টেলিপ্রিন্টার বা টেলেক্স মেশিনের মতো ভাড়া নিতে হয়।

এইসব আবিষ্কারের আগে ছিল সূর্যের আলোয় করা ফেরো-প্রিন্ট এবং হস্তচালিত যন্ত্রে অ্যামোনিয়া-প্রিন্টিং প্রণালী। ভারতবর্ষে তারও অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন নাট্যাচার্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার ভাদুড়ির আত্মীয় ভাদুড়ি মহাশয়দের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল মিসেলিনি'।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস অবশ্য ভ্যাণ্ডারগ্রিনটেনের লাইসেন্সী (licensee) হওয়ার আগে জার্মেনির ডুসেলডর্ফ শহরের A M Zimmermann কোম্পানীর সহযোগিতায় অ্যামোনিয়া-প্রিন্টার এবং আরও কয়েকটি যন্ত্র ভারতে নির্মাণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু

সেটা ছিল অনেক ক্ষুদ্রতর প্রচেষ্টা। কেমন করে গৌরাঙ্গসুন্দর এইসব কাজে নামলেন এবারে সেই কাহিনীটা বলা যাক।

বর্তমান পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার গৌরাঙ্গসুন্দর দাস কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এসসি পাস করার পর গত মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯৪১ সালে) ডি জি এম পি দপ্তরে একটি সাধারণ চাকরি পেলেন। নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে লড়াই থামার আগেই তিনি গেজেটেড অফিসার পদে উন্নীত হলেন। ব্যক্তিগত কারণে ১৯৪৬ সালে কিন্তু গৌরাঙ্গবাবু সরকারী চাকরিটি ছেড়ে দিলেন।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, এমন কিছু সম্পত্তি নেই যে নিজে একটা কিছু গড়ে তুলবেন—তাই এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি ফার্নিচারের ব্যবসাতে নামলেন। শরিকে শরিকে বনিবনা না হওয়াতে কিছু দিনের মধ্যেই সে ব্যবসা গুটোতে হলো।

তারপরে গৌরাঙ্গবাবু নিলেন কমিশন এজেন্সীর কাজ। সাবানের এজেন্সী, কিন্তু তাতে বেশ ভালো রোজগার হচ্ছিল। মন পড়ে আছে নিজের একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার, তাই কিছু টাকা জমিয়ে গৌরাঙ্গসুন্দর এবারে একাই বৌবাজার অঞ্চলে একটি ফার্নিচারের দোকান খুললেন। কিন্তু জিনিসটা বোধ হয় তাঁর ধাতে সয় না, তাই এই একক ব্যবসাতেও লোকসান হয়ে গেল। এইভাবে স্বাধীন ব্যবসার পথে তাঁর প্রতি পদক্ষেপেই বাধা পড়তে লাগলো।

তখন তিনি পরিচিত এক ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর ব্রাঞ্চ অফিসের চার্জ নিয়ে চট্টগ্রাম চলে গেলেন। এটা হলো ১৯৪৮ সালের কথা। সে সময়ে ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে পাকিস্তান যাতায়াতে কোনো অসুবিধে ছিল না, কারণ তখনও পাসপোর্ট ভিসার প্রবর্তন হয়নি। আট বছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার পর ১৯৫৬ সালে তিনি সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিলেন।

এই আট বছরে বেতন ও কমিশনের টাকা থেকে গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ কিছুটা সঞ্চয় করেছিলেন। চাকরি ছেড়ে ছাপান্ন সালেই তিনি ইয়োরোপ সফরে বেরোলেন। মনে মনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, কোনো উন্নত দেশ থেকে খোঁজখবর নিয়ে নতুন কোনো শিল্প-প্রচেষ্টাতে তিনি নামবেন। এমন কোনো কাজে নামবেন যাতে প্রতিযোগিতা কম।

জার্মেনির হানোভার শহরে তখন বিরাট শিল্পমেলা বসেছিল। ঘুরতে ঘুরতে গৌরাঙ্গসুন্দর সেই প্রদর্শনীতে পৌঁছলেন। তখনো কিন্তু তিনি কেবল দেখেই বেড়াচ্ছেন আর ভাবছেন। পাকাপাকি কিছুই ঠিক করতে পারছেন না যথার্থ যোগাযোগের অভাবে।

যোগাযোগ ব্যাপারটা বড়ো অদ্ভুত। শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টাতে কত যে বিচিত্র যোগাযোগ হয়ে মানুষকে কেমন করে সফলতার পথরে টেনে উঠিয়েছে তার কিছু উদাহরণ আমার পূর্বরচিত প্রবন্ধমালায় আমি গল্পবন্ধ করেছি।

একটা ব্যক্তিগত যোগাযোগের কাহিনী মনে পড়ে গেল। একটি ডাঁস পেয়ারা কেমন করে এক ব্যক্তির জীবনে চিরস্থায়ী যোগাযোগ ঘটিয়েছিল এটা তারই উপাখ্যান।

কলকাতার কিছু দূরে এক শহরের একটি উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয়ে ঘটনাটি ঘটেছিল। এক অপরাহ্নে সেখানকার কলেজের দুই সহপাঠী কিশোর সেই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের বড়ো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পথের ধারে একটা পেয়ারা গাছ। ছেলে দুটি সেই গাছের কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই কোথা থেকে যেন একটা ডাঁসা পেয়ারা বুলেটের মতো একটি ছেলের বুকের পাঁজরে সজোরে আঘাত করলো। অতর্কিতে লাগাতে ব্যথাটা যেন বেশীই মনে হলো ছেলেটির। দুই বন্ধুতে আততায়ীর সন্ধানে গাছের কাছে গেল। পেয়ারাগাছের শাখাপ্রশাখা এমন নয় যে তার আচ্ছাদনে একটি মনুষ্যদেহ পুরো-পুরি লুকনো যায়। আততায়ীর মুখ দেখা গেল না বটে, কিন্তু পুষ্ট দুটি পায়ের পাতা স্পষ্ট দেখা গেল। তা দেখেই অন্য ছেলেটি হাসতে হাসতে আহত কিশোরকে বললো, "আমার ছোট বোন, এখানকার নীচের ক্লাসে পড়ে, ছুটির পরে সারা দিন গাছেই থাকে; আমার গায়ে ছুঁড়তে গিয়ে তোমাকেই জখম করে বসেছে। নেমে আয়!" অপরাধিনী এবারে পাতার আড়াল থেকে মুখ বের করলো। অশ্রুতে ভরা ডাগর দুটি চোখ আহত ছেলেটির ওপর পড়ে একটু যেন অপ্রস্তুত হলো। পেয়ারার আঘাতের বেদনাটা মধুর হয়ে উঠলো ছেলেটির পক্ষে, আর সে বেদনা তার অন্তরের অন্তঃস্থলে বাসা বাঁধলো। যোগাযোগটা দিনে দিনে দানা বেঁধে এমন হলো যে, কয়েক বছরের মধ্যেই সেই মেয়ে চেলি আর কনেচন্দন পরে ছেলেটির গলায় বরমাল্য পরালো। ওই ডাঁসা পেয়ারার চোটটি না খেলে ছেলেটির পক্ষে এই যোগাযোগ হয়তো হতোই না।

গৌরাঙ্গসুন্দরের যোগাযোগটাও অতর্কিতেই ঘটে গেল। তিনি আজীবন নিরামিষাশী। একদিন শুয়োরখোর জার্মান-দের দেশের শিল্পমেলার রেস্তোরাঁ-তে নিরামিষ খাবারের অর্ডার দিতে তাঁর খুব অসুবিধা হচ্ছিল। 'বয়'-টি জার্মান ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। এমন সময়ে পাশের টেবিল থেকে এক শ্বেতকায় ব্যক্তি উঠে এসে বিনয়ে গৌরাঙ্গবাবুকে বললেন, "ক্যান আই হেলপ্ ইউ?"

এই ভদ্রলোক এ. এম. জিমারম্যান কোম্পানীর মালিকের জামাতা। এঁর সঙ্গে সেদিন থেকে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো সেই সূত্রেই গৌরাঙ্গসুন্দর জিমারম্যান-এর অ্যামোনিয়া-প্রিন্টার এবং সাজসরঞ্জামের লাইসেন্সী হয়ে দেশে ফিরলেন।

ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করতে প্রচুর সময় লাগবে। সেই সময়টা চুপ করে বসে না থেকে গৌরাঙ্গসুন্দর হাওড়াতে একটা Forging (যন্ত্রচালিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতুড়ি দিয়ে লোহা আর ইস্পাত পিটিয়ে আরও শক্ত করা মানে ফোর্জিং) ওয়ার্কশপ খুলে ফেললেন। সেই প্রতিষ্ঠানের নাম হলো 'এ. এস. দাস অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড'। সেটা এখনো পুরো-দমেই চলছে, কিন্তু আজকের কাহিনীতে তার অংশ গৌণ।

'দাস জিমারম্যান প্রাইভেট লিমিটেড'-এর লাইসেন্স ভারত সরকারের অনুমোদন পেলো ১ নভেম্বর, ১৯৫৮ থেকে জিমারম্যানের সঙ্গে এগ্রিমেন্টের স্থায়িত্ব হলো ১০ বছরের। (কয়েকদিন আগে ১ নভেম্বর ১৯৬৮ থেকে দাস-জিমারম্যান পুরোপুরি বাঙালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে)। ঢাকুরিয়া—যোধপুর পার্কে একটি ১২৫ টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাট নিয়ে গৌরাঙ্গবাবু এবং তাঁর ছোট ভাই শ্রীসুনীলকুমার দাস হস্তচালিত 'জিমকো' (Zimco) অ্যামোনিয়া-প্রিন্টার প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্রপাতির উৎপাদন আরম্ভ করলেন ১৯৬০ সনে।

'লাইসেন্সী' শব্দটির মানে যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে টীকা করে দিচ্ছি। সব দেশের ছোট বড়ো প্রায় সব মেশিনের এবং যন্ত্রে-উৎপন্ন কোনো কোনো পণ্যেরও 'পেটেন্ট' নেওয়া থাকে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি অনুসারে মূল উৎপাদকের বিনা অনুমতিতে সেগুলির হুবহু নকল করে অন্য দেশের লোকেও সে জিনিস তৈরি করতে পারে না। এই অনুমতির সংজ্ঞা হলো license এবং যে সেটা নেয় তাকে বলা হয় licensee। স্বভাবতই লাইসেন্সী হতে গেলে 'রয়্যালটি' অর্থাৎ নাম ও নকশা ব্যবহারের কমবেশী ভাড়া লাইসেন্সী licensorকে দিয়ে থাকে। চুক্তি যেটা হয় তারও মেয়াদ থাকে। সেই মেয়াদের সময় পার হয়ে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাইসেন্সী কোনো রয়্যালটি না দিয়েও বিদেশী উৎপাদকের প্রণালী তো ব্যবহার করতে থাকেই, নামটাও ব্যবহার করে যায়।

ডঃ কার্ল ভ্যান্ডারগ্রিনটেনের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস মহাশয়ের পরিচয়ের ইতিহাসটাও অসাধারণ। ভ্যান্ডারগ্রিনটেনের মতো বিরাট প্রতিষ্ঠানের ইংল্যান্ডের লাইসেন্সী হলেন বিশ্ববিখ্যাত 'ইলফোর্ড'

সংস্থা। সেই ভ্যান্ডারগ্রিনটেন-এর ভারতীয় লাইসেন্সটি গৌরাঙ্গবাবুর মতো (তৎকালে) সামান্য লোক পেয়ে গেলেন ডক্টর কার্ল-এর স্নেহের নিদর্শন হিসেবে।

দুজনের আলাপ হয়েছিল ১৯৬১-র হানোভার শিল্পমেলাতে। গৌরাঙ্গ দাস কার্লকে বললেন যে, পরিচয়টুকুই যথেষ্ট; আর কিছু তো সম্ভব নয়, কারণ তাঁর ছোট্ট ইণ্ডিয়ান কনসার্ন কার্ল-এর প্রকাণ্ড সংস্থার লাইসেন্সী হবার দুরাশা পোষণ করতে পারে না। বৃদ্ধ ডক্টর কার্ল সস্নেহে যুবককে বললেন, "ব'সো, এক পেয়ালা কফি খাও। তুমি ও-কথা বলছো কেন? ছোটরা কি বড়ো হতে পারে না, মিঃ দাস? আমরা দুই ভাই-ও তো ভেনলো-র এক ছোট্ট ফার্মেসি-র এক কোণে বসে কাজ শুরু করেছিলাম।"

এই যোগাযোগের ফলে ভ্যান্ডারগ্রিনটেনের প্রতিনিধি কলকাতায় এলেন। তখন যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাট ছেড়ে দাস ভ্রাতারা প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের এক অল্প ভাড়ার দোতলা বাড়িতে উঠে এসেছেন। দোতলায় দুজনে থাকেন আর একতলায় দাস-[illegible] ছোট কারখানা। যে ওলন্দাজ যান্ত্রিককে কার্ল সাহেব পাঠিয়েছিলেন তিনি

সেই কুটিরশিল্প দেখবার পরেও যে সেই মহামূল্য লাইসেন্স দেওয়াটা অনুমোদন করবেন, গৌরাঙ্গবাবু দুঃস্বপ্নেও তা ভাবেন নি। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, সেই পরিদর্শকও গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা বুঝতে পারলেন। ১৯৬২ সালে নতুন কোম্পানী গঠিত হলো। নামকরণ হলো 'দাস রিপ্রোগ্রাফিকস্ প্রাইভেট লিমিটেড'।

ভারতবর্ষের শিল্পযোজনা তখন পুরোদমে চলেছে—তাই উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই দাস-রিপ্রোগ্রাফিকসের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির দারুণ চাহিদা হলো। এঁদের তৈরী OCE ডায়াজো মেশিন মিনিটে ৩০ ফুট কাগজের ওপর প্রতিলিপি ছেপে বের করতে পারে। চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের কপি রাখার ছোট যন্ত্রটিও দেখতে হলো ভারী সুন্দর। বিক্রি বেড়েই চললো।

আর একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও গৌরাঙ্গসুন্দরের বাণিজ্য ও শিল্প প্রচেষ্টার প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়ালেন। ন্যাশান্যাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক। গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রথম যখন টাকার খুব টান তখন সেই ব্যাংক তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য করাতেই তিনি কাজ চালাতে পেরেছিলেন। সেই সাহায্য না পেলে তিনি কি করতেন তা বলা যায় না।

তা ছাড়াও উত্তরকালে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছেন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্সিয়াল করপোরেশন'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅমল রায়।

গৌরাঙ্গসুন্দর তেষট্টি সালে বেহালার ১২।১০, তারাতলা রোডে সাড়ে চার বিঘা জমির দীর্ঘমেয়াদী লীজ নিলেন পোর্ট কমিশনের কাছে। সেখানে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে নতুন ফ্যাক্টরী ও অফিস-বাড়ি তৈরি করালেন।

এইরকম ছবির মতো সুন্দর পরিবেশে অফিস ও কারখানা আমি খুব কমই দেখেছি। ভিতরটা হয়তো সুন্দর কিন্তু বাইরেটা অপরিচ্ছন্ন—এমন কারখানা অবশ্য এর আগে দেখেছি, কিন্তু দাস-জিমারম্যান এবং দাস-রিপ্রোগ্রাফিকসের ভিতর বাহির দুইই সমান। সুপরিকল্পিত তারাতলা পল্লীতে গেলে মনে হয় পাশ্চাত্য কোনো দেশে ঢুকলাম।

নতুন লোকের মনে ছাপ রাখার পক্ষে ফ্যাক্টরীর 'পেপার সেনসিটাইজিং' বিভাগটি সবচেয়ে ভালো। লম্বা একটা মেশিন, কিন্তু কী ছিমছাম! সমস্ত ফ্যাক্টরীর মধ্যে অবশ্য এই একটি মেশিনই হল্যান্ড থেকে ইমপোর্টেড; আর সবই প্রায় দেশী। সেইসব মেশিনও দেখতে খুব সুন্দর, আর সবচেয়ে সুদৃশ্য হলো এঁদের নিজেদের তৈরী OCE মেশিনগুলি—যাকে বলে স্ট্রীমলাইনড্।

হল্যান্ডের মেশিনটায় দু' তিন মিনিটের মধ্যে সেনসিটাইজড কাগজ তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসছে। এত দ্রুত তার গতি, আসা মাত্রই সেই কাগজকে এয়ার-কন্ডিশন করা গুদাম ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যতটা মনে পড়ছে এই বিভাগের সবটাই শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। কারণ, সেনসিটাইজড্ কাগজকে অসূর্যম্পশ্যা, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া বড়ো ঘরের তন্বীর মতো আদর করে, খাতির করে রাখতে হয়।

এই রাজকন্যার পরিচর্যায় আছেন প্রিয়দর্শন এক যুবক, মানে তরুণ শ্রীঅমিতাভ ঘোষাল এই সেনসিটাইজিং বিভাগের কর্তা। ফ্যাক্টরী চালু করার সময়ে সাহায্য করতে যে দু-একজন ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞ হল্যান্ড থেকে এসেছিলেন অমিতাভবাবু তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেই এখন অনায়াসে এটার তত্ত্বাবধান করছেন।

গৌরাঙ্গসুন্দর বললেন যে, এই অমিতাভ এবং ডেভেলপমেণ্ট ও প্রোডাকশন বিভাগের ইন-চার্জ শ্রীঅচ্যুতানন্দ হালদার ও শ্রীসমীর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ কর্মঠ যুবকদের ওপরেই তিনি ফ্যাক্টরী চালাবার ভার দিয়ে রেখেছেন। তাঁদের মমত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতাই দাস-জিমারম্যান এবং রিপ্রোগ্রাফিকসের সফলতার ভিত্তি।

গৌরাঙ্গবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ভাই সুনীলবাবু বহু দিনের শিক্ষানবিসিতে পাকা হয়ে মাত্র কয়েক মাস আগে ডিরেক্টর পদে উন্নীত হয়েছেন। (গৌরাঙ্গসুন্দররা পাঁচ ভাই। বড়ো এক ভাই ডক্টর সুধীররঞ্জন দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নবিদ্যার অধ্যাপক।) গৌরাঙ্গবাবু চান যে, সুনীলকুমারের মতো অমিতাভ, অচ্যুতানন্দ এবং সমীরকেও তিনি যেন কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। পারিবারিক উত্তরাধিকারে তিনি বিশ্বাস করেন না।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মোট কর্মি সংখ্যা আন্দাজ ২০০। তার মধ্যে কয়েকটি নারেয়ান ছাড়া আর সবাই বাঙালী এবং তাঁদের মধ্যে বাঙালী মুসলমানও আছেন ১৫।১৬ জন।

আর একটি ৭৩ বছর বয়স্ক তরুণকে দেখে মুগ্ধ হলাম। তিনি হলেন এঁদের চীফ অ্যাকাউন্টাণ্ট শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু। দূর থেকে দেখলে এই পককেশ সুদর্শন ভদ্রলোককে শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ইনি সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা আটটা পর্যন্ত কাজ করেন। আমাকে দুই কোম্পানীর মোট বিক্রয়ের অঙ্ক বিষয়ে অবহিত করার সময়ে বীরেনবাবু বললেন, "সেই গোড়া থেকেই ওঁদের সঙ্গে আছি।" (খুইলনে জেলার লোক আর কি!)

বিক্রয়ের অঙ্ক

সাল	মোট বিক্রি
১৯৬২	১২,২৮,০০০ টাকা
১৯৬৪	১৯,১৬,০০০ টাকা
১৯৬৭	২৭,৭৯,০০০ টাকা

আর একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাঙালী প্রতিষ্ঠান সি সি কোম্পানী এঁদের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের ডিস্ট্রিবিউটর। (কন্টিনেন্টাল কমার্শিয়াল কোম্পানী এবং তার কর্তা শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাও যথাসময়ে লিখবো বলে ভেবে রেখেছি।)

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস শিল্পায়নে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর গতিবেগও প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর একটি উদ্যোগ করছেন: সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি 'ইনস্টিটিউট অব রিপ্রোগ্রাফি' গঠনের চেষ্টায় আছেন। তার প্রয়োজনীয়তা অসীম, কারণ যোজনা ও শিল্পায়নের মূলে হলো পরিকল্পনা, আর পরিকল্পনা অসম্ভব হতো ব্লু-প্রিণ্ট না থাকলে। দাস-জিমারম্যান এবং দাস-রিপ্রোগ্রাফিকস্-এর প্রয়াসে তারই পথ প্রশস্ত হচ্ছে। দেশী মেশিনে, দেশী কাগজে মিনিটে ত্রিশ ফুট করে ছাপার ব্যবস্থা করেছেন গৌরাঙ্গসুন্দর—ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন, তিন রঙেরই প্রিণ্ট।

বিশ্বকর্মা

কলকাতার হালখাতা

গরম-গরম হরেকরকম

ডালহৌসি স্কোয়ারে একটা কাজে গিয়েছিলাম, কাজটা সেরে রাস্তায় বেরিয়ে আমার খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে উঠল। আমার বাড়ি ডালহৌসি থেকে অনেক দূরে, মনে হচ্ছিল যদি খালি পেটে একঘণ্টা বাস-জার্নি করি তাহলে আমার ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরবার কোনোই আশা নেই—খিদেতে আমি রাস্তাতেই মরে যাব। এদিকে আমার পকেটে এমন পয়সা নেই যে রেস্টুরেন্টে যাব; রাস্তায় যা পাওয়া যায় তার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করতে হবে। আমি কী খাওয়া যায় সেই প্রশ্নে মনোনিয়োগ করে এদিকে ওদিকে দৃষ্টি ফেলি।

তখন 'লাঞ্চ-টাইম', অফিস থেকে পিলপিল করে বেরুচ্ছে সব লোক, রাস্তা ভীড়াক্রান্ত। আমি লক্ষ্য করলুম ঠিক এই সময়টায় বহু খাবার বিক্রেতা রাস্তার পাশে এসে জমা হয়; প্রতি এক ফুট দেড় ফুট অন্তর অন্তর এক একজন হাঁড়ি, ডেকচি, খাবারের পসরা নিয়ে বসছে, তাদের ঘিরে ঘিরে অফিস কর্মীরা। এই দৃশ্য ডালহৌসির কোনো বিশেষ অংশে কেন্দ্রীভূত নয়, সমগ্র অঞ্চলটা একটা-দেড়টা নাগাদ এক হরেকরকমী দাঁড়ানো রেস্তোরা।

আমি আগে ভাবতুম অফিস কর্মীরা ওই পাড়ায় অল্প পয়সায় পুষ্টিকর এবং পেট ভরবার মত খাবার একেবারেই পান না; বড় সাহেবরা অ্যাম্বারে যান, সাধারণ আমাদের মত লোকের বোধ হয় চিনেবাদাম খেয়ে গলা শুকোতে হয়—কিন্তু সে ধারণা যে একেবারেই অমূলক একটু ঘুরেই বুঝতে পারি। কী খাবার চাই? গরম গরম টোস্ট, কলা, ডিম সেদ্ধ পছন্দ হয়? নাকি সেটা বড্ডই প্রাতরাশের মত, একটু ভিজে খাবার চান। তাহলে রয়েছে লুচি আলুদ্দম ঘুগনি। রেফিউজি মহিলারা ডেকচি ভরে নিয়ে আসেন ঝাল আলুদ্দম, নরম ময়দার লুচি—চারটে লুচি, চারটে আলু, এক শাল পাতার দাম মাত্র পঁচিশ নয়া পয়সা। লুচি সবার পছন্দ হয় না বলে পুরিও আছে, আছে ডালপুরি, বাড়িতে তৈরি রাধাবল্লভি। অনেকের ঘুগনি পছন্দ হয়, তাদের জন্য মাংসের ঘুগনির বিক্রেতাও আছে; একজন দেখলুম লুচির সঙ্গে এঁচোড়ের ডালনাও দিচ্ছে, আরেক মহিলা মোচার ঘণ্ট।

বাঙালী মিষ্টি ভালোবাসে, টপাটপ দুটো রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়ে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ বড়ই স্নিগ্ধ ভোজ। একটা দিকে দেখলুম হাঁড়ি ভর্তি গরম রসগোল্লা নিয়ে এক মহিলা বসেছেন, প্রতি রসগোল্লা দশ নয়া পয়সা, তাকে ঘিরে এক বিরাট ভিড়। রসগোল্লা যারা খাচ্ছে তাদের সবারই ধুতি পাঞ্জাবি পরনে এবং বয়স চল্লিশের ওপর—আমি মনে মনে ভাবলুম "মিডিল জেনারেশনটা" সাধারণভাবে মিষ্টির লাইনেই আছে। আমি আরেকটু এগিয়ে আরো বড় একটা ভিড় দেখলাম, বিক্রেতা বালকটি চিৎকার করে বলছে, "আর নেই বাবু, ফুরিয়ে গেছে, সত্যি বলছি, আর নেই..." কিন্তু অধৈর্য জনতার সমবেত দাবী "পেছনের হাঁড়িটা দেখাতেই হবে"। আমি একজনকে জিগেস করলুম "কী বিক্রি হচ্ছে?" ভদ্রলোক রুদ্ধশ্বাসে বলে ফেললেন, "পাটি-সাপটা এনেছিল, বলছে ফুরিয়ে গেছে, পেছনের একটা ছোট হাঁড়িতে আমি দেখেছি কয়েকটা আছে", এতটা বলে ভদ্রলোক উন্মত্ত ষাঁড়ের মত ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন, আমি তাঁর গলার আওয়াজ শুনলুম, অনেকের মধ্যে "দে মধু দে, তোকে পঁচিশ পয়সা করে দেব, আমাদের ক্ষিরের আরেকটা করে পাটিশাপটা দে!"—আমার পাটিশাপটা খাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নীতির দিক থেকে আমি ব্ল্যাকে কিনবার চেষ্টা করলুম না।

অনেকের ধারণা কিছুটা আঙুর আপেল খেয়ে নিলেই শরীরে খুব রক্ত হয়, এইসব ব্যক্তির একটু স্বাস্থ্য বাতিক, তারা সকালে একটু ডন-বৈঠক দিয়ে নেয়, খুব ঠাণ্ডা জলে অনেক তেল মেখে খুব গা রগড়ে রগড়ে স্নান করে, সর্বদাই বলে থাকে "যাই করি, নিজের স্বাস্থ্যটা তো দেখতে হবে"; এই জাতীয় লোকেরা সাধারণত দেখেছি শ্বশুর-বাড়ির গল্পে খুব মুখর হয় এবং ছেলেপিলেকে বড্ড মারে। স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে এরকম একটি দলের দেখা মিলল ফলওয়ালাকে ঘিরে—একটা দিকে অজস্র ফল বিক্রি হচ্ছে, আঙুর, আপেল, নতুন কমলা, মর্তমান কলা, বাতাবি, যা চাও তাই। এদের থেকে আরেকটু দূরেই অন্য এক ভিড় বেশির ভাগই অবাঙালী, অনেক বাঙালীও আছে, এক শিখ বিক্রেতার "পোর্টেবেল কিচেন"কে ঘিরে। সেখানে বিরাট তাওয়ায় গরম হচ্ছে টিকিয়া, ভাটুরা, চানা, দহি-বড়া একেবারে গরম-গরম হরেকরকম। আমার টিকিয়া দেখে এতো খেতে ইচ্ছে করল, দাঁড়িয়ে তিনচারটে ওইসব খেয়ে ফেললাম, কিন্তু ততক্ষণে অধিক ভোজনে আমার দমবন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়, কারণ যেখানেই দাঁড়াচ্ছিলাম, বলা হয়নি, সেখানেই আমি কিছুটা খেয়ে ফেলেছি লোভে পড়ে। আমি লুচিও খেয়েছি,

ডালপুরিও খেয়েছি, একটা টোস্ট আর ডিমও চলে গেছে, একটা আপেলও একটা পরে, দুটো রসগোল্লা, তারপর টিকিয়া. একেবারে আঁইঢাই, যাই আর কি। বড় তেষ্টা পাচ্ছিল, ভাবলুম কোকাকোলা খাই, কিন্তু পানের দোকান আবার কে খুঁজে বের করে, এই তো সামনে খালি ডাবের পাহাড়, ডাবের দোকানের সারি, এক একটা জায়েণ্ট সাইজ ডাব চার আনা। জল খেয়ে মুক্তি নেই ওরা আবার মুহূর্তে শাঁসটা পরিবেশন করে দেয়।

—আমি ট্রামে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বাড়ি ফিরে আবার ঘুম, আমাকে রাত্রে খেতে ডাকলে আমি বললুম, "একটা সোডা, ভীষণ বেশী খাওয়া হয়ে গেছে দুপুরে, ভুরি ভোজ"। সবাই জিগেস করল কোথায় খেলি "পিপিং না ওয়ালডর্ফ?" আমি বললুম পিপিংও না, ওয়ালডর্ফও না, অপিস পাড়ায়, ডালহৌসি স্কোয়ারে।

কাম্পানিস অর্ডার

কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কাণ্ড-কারখানায় এই শহরের অধিবাসীরা সম্প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। স্ট্রাইক ইত্যাদির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই,

অনেক আগে থেকেই এই প্রতিষ্ঠান যেরকম-ভাবে এই শহরের লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করছে যে এবার বোধ হয় আমাদের একটা সমবেত প্রতিবাদ জানানো দরকার। সম্প্রতি বাঙলাদেশের এক প্রবীণ সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম. তাঁকে কীভাবে ইলেকট্রিক কোম্পানী সম্প্রতি নাজেহাল করেছে সেই কাহিনীটি এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে।

মাস কয়েক আগে সকালবেলা ভদ্রলোক কাজে বসেছেন, বাড়িতে কেউ নেই. এমন সময় দরজায় ঘণ্টা. বাড়ির কাজ করেন মহিলা দরজা খুলে দেখলেন, খাকি হাফ-প্যান্ট পরিহিত, মাথায় ওভারশিয়ারি টুপি, বিশালকায় এক ব্যক্তি মিটার দেখতে চাইছেন—তার ভাষা এই জাতীয় "এই মিটার কোথায়?" অনেকটা পুলিসের মত। দেখেছে মিটার, বাড়ির বাইরে, তালা খুলে দেওয়া হল। কৌতূহলবশতঃ পরিচারিকা লোকটির পেছন পেছন গিয়ে দেখে তার কাটছে, সে দৌড়ে এসে কর্তাকে খবর দেয়। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ব্যাপার কি জিগেস করাতে অত্যন্ত রুক্ষ ভাষায় পুলিসের স্টাইলে সে জানায় যে গত মাসের নাকি একটা বিল বাকি পড়েছে, বিলের টাকা দিয়ে দিলে তার কাটবে না। লেখক ভদ্রলোক বিস্মিত কারণ বিলের টাকা তাঁর হিসেবে বাকি থাকার কোনো কথাই নেই, তাছাড়া গত মাসের বিল কোনো রিমাইন্ডার আসেনি, তাছাড়া এক বিল দেওয়া হয়ে গেল, আর মাস পরে হঠাৎ তার কাটতে আসার কী অর্থ? যাই হোক লেখক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি চেক লিখে দিয়ে দিলেন—বিলের সংখ্যা যা ছিল তার ডবল প্রায়। যে লোকটি তার কাটতে এসেছিল তার ব্যবহার এবং রূঢ়, এবং মেজাজ দেখিয়ে কথা বলছিল. ব্যাপারটা চুকে যাবার পর ভদ্রলোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়. কাজ করা হয় না।

এর ঠিক সাতদিন পরে আরেক সকাল-বেলায় গেট খুলে দরজায় কড়া না নেড়ে সোজা "কে আছেন?" বলে সেই লোকটি ঘরে ঢুকে আসে। বসার ঘরে সাহিত্যিকের ছেলে দুই বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল. এরকম একজন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে জিগেস করে "আপনি কে?" লোকটি ততক্ষণে সোফায় আসীন, ভ্রূক্ষেপ-হীনভাবে ফরমাস করে এক গ্লাস জল আনার এবং কপাল কুঁচকে গ্রেফতারি ভঙ্গিতে বলে "বাবাকে ডাকো, কে কি বিভ্রান্ত বলছি সব।" সাহিত্যিক ভদ্রলোক একে দেখেই শঙ্কিত হয়ে পড়েন "কি ব্যাপার, আপনি আবার তার কাটতে এসেছেন নাকি?" জবাবে লোকটি বলে, "যান আগের বিলের রসিদটা আনুন, তারপর দেখা যাবে"।

লেখক ভদ্রলোকের এই সুরে কথা শুনে অভ্যেস নেই, যে কোনো পুলিসী ঢঙই ঘৃণা করেন, এই লোকটির অহেতুক অভদ্রতায় তিনি বিস্মিত, তিনি রসিদটা আনেন এবং জানান যে, ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোকেদের কড়া না নেড়ে বিনা অনুমতিতে যখন তখন লোকের বাড়ির অন্দরে ঢুকে যাবার অধিকার আছে কিনা—অধিকার আছে কিনা গ্রেফতারি ঢঙে প্রশ্ন করার, অভদ্রভাবে কথা বলবার, লোকের কাজের সময় বিরক্ত করবার। কোনো কারণ বিনা যখন তখন ঢুকে পড়ে রসিদ দেখতে চাইলেই রসিদ দেখাতে হবে, এরই বা কি মানে! এই লোকটি এইসব কথা শুনে উঠে দাঁড়ায়, বলে মিটার দেখব। মিটারের ঘরে ঢুকে সে তার কেটে দিয়ে যখন চলে যাচ্ছে, সাহিত্যিক উত্তেজিত হয়ে জিগেস করেন, "কী অধিকারে, কার নির্দেশে, কী কারণে তার কাটলেন, আমাকে অন্তত সেটা বলুন" লোকটি সাইকেল নিয়ে দম্ভভঙ্গিতে চলে যায়, "কাম্পানিস অর্ডার"।

তার কেটে দিলে জল বন্ধ, আলো বন্ধ, পাখা বন্ধ শহর থেকে বহু দূরে বাড়ি, জীবনযাত্রা অচল। ভদ্রলোক কাজকর্ম ফেলে ট্যাক্সি নিয়ে ছোটেন ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিসে, তারা জানালে, আজ শনিবার কিচ্ছু হবে না, সোমবার আসবেন। ভদ্রলোক দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে গেলে লোকটি কাউন্টার চাপড়ে বলে, "I said it would not be possible"। এই অভিযোগ নিয়ে শুনলাম তখন অনেকেই এসেছে, লেখকটি একা নয়। যাই হক অবশেষে এক অফিসারকে নামটাম বলাতে সে নিজে গেল ভেতরে, কী ব্যাপার যখন তিনি খোঁজ-খবর করছেন, পেয়াদা ততক্ষণে সাইকেল নিয়ে পৌঁচেছে। কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপহীন, লেখক ভদ্রলোক আর তাঁর ছেলেকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে সারা আপিসের প্রতিটি লোককে বলছে, সে নাকি মৃদুকণ্ঠে মিটার দেখতে চেয়েছিল, তাকে যাহাতাহা গালা-গালি করে বের করে দেওয়া হয়। নাকি সাহিত্যিকের পুত্র তাকে বলেছে "তোমার মত নিচু শ্রেণীর লোকের এ বসার ঘরের সোফায় বসার অধিকার নেই।" আপিসময় কলরোল; গৃহে যে হিটলারি পুলিস ছিল, কর্মস্থলে সে বিরাট মার্কসিস্ট নেতা। আপিসময় মৃদু গুঞ্জন, অফিসাররা ভীত।

—এক বড় সাহেব সাহিত্যিকটির ছাত্র

ছিলেন এক সময়, তার কৃপায় জানা গেল গত জুলাইয়ের একটা বিল নাকি বাকি ছিল, নতুন হিসেবে বেরিয়েছে, সেটা দিতে হবে; ভদ্রলোক নিজেই বললেন, আজকাল মাঝে মাঝেই গোলমাল হয়, বিল অনেক সময় যায়ও না। সব মিটিয়ে বেরুতে-বেরুতে ওঁদের তিনটে বেজে গেল, স্নান নেই, খাওয়া নেই, সমস্ত দিনের কাজকর্ম নষ্ট, অপমানের একশেষ। সাহিত্যিকটি বললেন এ বিষয়ে তিনি লিখিত একটি অভিযোগ পত্র পাঠিয়েছিলেন, দুমাস হয়ে গেল তার কোনো উত্তর আসেনি।

ইলেকট্রিক কোম্পানী একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, আমরা তার ক্রেতা বা খদ্দের, কিন্তু মোনোপলির ফলে এই প্রতিষ্ঠান শহরের লোকের পক্ষে অপরিহার্য এই বস্তু নিয়ে অযথা হয়রানি করে চলেছে, এ বিষয়ে আমাদের সবার বোধ হয় আরো সচেতন এবং প্রতিবাদমুখর হওয়া উচিত। আমাদের দেশে একটা জিনিসের পুনরাবৃত্তি সর্বত্র দেখা যায়, প্রতিটি সংগঠনই আমাদের সেবায় ক্ষমতাসীন হয়ে আমাদের ওপরই উৎপীড়ন চালাচ্ছে।

মৌলিনাথ

চৌদ্দ

প্রবোধিনীকে আমি চিরকালই ভালবাসিয়াছি। ঢেঁকি শাক দুই প্রকার। এক প্রকার মাটিতে হয়—অন্য প্রকার বৃক্ষশাখায়। শেষোক্ত শাকের ডগা বড় নরম। এই শাক আমাকে সবিশেষ প্রযত্নে জোগাড় করিতে হইয়াছে। প্রবোধিনীর বড় প্রিয় জিনিস। জীবনটাকে লইয়া কত প্রকারে ছানিয়াছি। ভালবাসিবার এবং ঘৃণা করিবার এত জিনিস জীবনে আছে আগে জানিতাম না। ব্রজ কোলে আসিতে প্রবোধিনী আমার কুরূপ চেহারা যেন সুরূপ হইয়াছে—এই ভঙ্গীতে দেখিতে লাগিল। বালক ব্রজ এখন আমাদের সংসারের প্রধান আকর্ষণ। বড় ইচ্ছা, সে বড় হইয়া যেন একজন মানবদরদী চিকিৎসক হয়। আজ রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিপ্লবীরা ঢুকিয়া সাহেবদের গুলি করিয়াছে। কলিকাতা তোলপাড়। এই ডামাডোলে বাজারে অনেক ইলিশ আসিয়াছিল। কিনিবার খরিদ্দার নাই। চওড়া পেটি দেখিয়া আমি একটি কিনিলাম। জীবন কত দ্রুত বদলাইতেছে।'

বুলু আরও পড়তে পারত। পেছন থেকে কুবের জড়িয়ে ধরতে চমকে উঠল, 'দিনের বেলা এসব কি?'

ঠোঁট ও চোখ কোঁচকালে বুলুর বয়স দশ বছর বেড়ে যায়। অনেকবার কুবের ভুরু কোঁচকাতে বারন করেছে বুলুকে। পেঁয়াজ খেতেও নিষেধ। চুমু খাওয়ার সময় মনে হবে এঁটো কলাই বাসনের গন্ধ দিচ্ছে।

'তোমার জন্যে—',

'আবার শাড়ি এনেছ? নিজের একটা গরম সুট করাবে করাবে বলছ আজ কতদিন। অথচ করলে না—'

'হবে 'খন। পরে দ্যাখোতো—'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ এখুনি—'

'পাগল! মা রয়েছেন—সবাই কি বলবে—'

'পরে এসো। দেখব।'

'না। কত দাম নিল?'

'বলোতো?'

'আটান্নো উনষাট—'

'পঁচাশি—'

'কি আরম্ভ করেছ? টাকাগুলো নয়ছয় করছ এ ভাবে—আজ অফিসে গিয়েছিলে?'

না। কত দাম নিল?

'নাঃ! কি হবে গিয়ে।' কি মনে হতে কুবের বলল, 'কি বই পড়ছো দেখি।'

'তোমার ব্রজদার বাবার আত্মজীবনী।'

বইখানা হাতে নিল কুবের।

রজনী দত্তর জীবন ও বাণী। লেখক ব্রজ দত্ত।

'আজই ডাকে এসেছে।'

কয়েক লাইনের ভূমিকা।

'রজনী দত্ত আমার পিতৃদেব ছিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে না-হোক নব্বই একানব্বই বছর বয়স হইত। যতখানি দেখিয়াছি জানিয়াছি তিনি সৎ থাকিবার চেষ্টা করিতেন। আমাকে লইয়া তাঁহার অনেক আশা ছিল। কিছুই পূরণ করিতে পারি নাই। নানাভাবে শুধু সৎ হইবার চেষ্টা করিতেছি। পুত্র হিসাবে তাঁহাকে জানাইবার দায়িত্ব আমারই। এই গ্রন্থ পাঠে কাহারও কোন কাজ হইলে বুঝিব আমার পরিশ্রম সার্থক।'

'খাঁটি গ্রন্থকার বনে গেছে ব্রজদা! রিয়ালি!'

তাকিয়ে দেখল বুলু উঠে গেছে।

ব্রজ দত্ত এখন ফকিরের আলখাল্লা পরে। দশ বারো বছর আগেও পুরো দস্তুর সাহেব ছিল। প্রথম আলাপ কলেজে। কলেজ সোস্যালে ম্যাজিসিয়ান ব্রজ দত্ত ম্যাজিক দেখাতে এসেছিল। কালো কোট প্যান্ট পরে স্টেজে নেমেছিল, হাতে ম্যাজিক ওয়াণ্ড। পায়রা ওড়ালো সবার সামনে—আবার হাওয়া করে দিল।

সেই প্রথম দেখা। দ্বিতীয় দর্শন বই পাড়ায়। ক্লাস এইটের র‍্যাপিড রিডারের একখানা নোট বই বেরিয়েছে। নোটমেকারের নাম বি দত্ত—ব্রজ দত্ত। খুব অবাক হয়েছিল কুবের, 'তুমি এতোও জানো ব্রজদা—'

'জানতে হয়রে। আমাদের একটা ট্র্যাডিশন আছে রে। আমাদের স্কুল থেকে আমাদের ব্যাচেই ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিল কুমুদ রায়। তার সঙ্গে সকাল সন্ধ্যে আমার ওঠাবসা ছিল। সেই থেকেই আমি স্কলার—'

'কোন্ ডিভিশনে বেরিয়েছিলে?'

'রয়াল অবশ্য। তাতে কি? সঙ্গ গুণ বলে কিছু আছে না?'

কি করে লিখতে হয় জানলে, কুবের একখানা বই লিখত। বইয়ের নাম দিত ব্রজ দত্তর জীবন ও সময়।

পাঁচটি সন্তান ও একটি বাড়ি সমেত এক বিধবার সঙ্গে ব্রজদার প্রথম বিয়ে। মহিলার গর্ভে ব্রজ দত্তর প্রথম সন্তান জন্মায়। ছেলেটির বছর দুই বয়সের সময় কুবের

ব্রজদাকে ফুটপাথ থেকে দর করে পাঁচসিকের মাজা বারো আনায় কিনতে একদা সাহায্য করেছে। তখন ব্রজ দত্তর বড় দুঃসময়। ফিল্ম লাইনে হবু ডিরেক্টর। পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে সারাদিনের শেষে মাল খেয়ে বাড়ি ফিরত। কুবের আর সেই মহিলা ধরাধরি করে ব্রজ দত্তকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিত।

সে সময় কুবের একবার বড় বিপাকে পড়েছিল। হঠাৎ সিনেমার সর্বভারতীয় চালু সাপ্তাহিকে খবর বেরোলো—মালটি মিলিয়ান রূপিজ কালার ফিল্ম ভেনচার। হিরো নিউ ফাইন্ড কুবের সাধুখাঁ—হিরোইন সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারকা সুরাইয়া। ডিরেক্টর ব্রজ দত্ত। জানাশোনা মহলে তোলপাড়। মুখ দেখানো যায় না। পুরো ব্যাপারটাই ব্রজ দত্তর একটা বৃহৎ গুল। নিজের ব্যানারে ছবি তোলার জন্যে এমন দু'চারটে গুল প্রেস কনফারেন্স করে মারতেই হয়। নাহলে ফাইনানস্ আসবে কোত্থেকে? তখন কুবের কনফার্মড্ বেকার। মেকানিকাল ইনজিনিয়ার থেকে রেডিওর তেলেগু ট্রান্সলেটর—সব চাকুরিতেই এলো-পাথাড়ি অ্যাপলিকেশন ছাড়ছে। কোনোটা লাগে না। রোগা হতে হতে ওজন প্রায় একশো পাউন্ড। এক রেসুড়ে বন্ধু তো কুবেরকে পেয়ে যেন স্বর্গ পেয়েছে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল রাস্তায়। তর কি আদর! তুই মাইরি আদর্শ জকি হতে পারবি। চল তোকে একজন ওনারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।' কুবেরকে নিয়ে প্রায় টানাটানি।

বকুল চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই একটা হর্ন শোনা গেল।

কুবের বলল, 'ওই যাঃ। ভুলে গেছি—'

'কি? আবার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছ নীচে—তুমি যা হয়েছ একখানা!'

'না হয়ে উপায় কি বকুল?' বড় ক্লান্তে শোনাল কুবেরের গলা। এ-মাসে না হোক জনা ছয়েক জমি কিনেছে কুবেরের কাছ থেকে। কত কি বলতে হয় কুবেরের, 'জায়গার আমার ত্রুটি অনেক। সুবিধে শুধু নিরিবিলি, আর দক্ষিণের হাওয়া। যে যার বাড়িটুকু করে নিলেই কোন খুঁত থাকে না আর।'

দাম? দাম বলে কিছু আছে নাকি আর! এখন কুবেরের মুখ দিয়ে যা বেরোয়—তাই-ই প্রায় দাম। কত লোক যে জমি চায় তার ইয়ত্তা নেই। ভাবতে গেলে তার মাথা ঘুরে আসে। এক একটা প্লটের দাম তার এক বছরের মাইনের চেয়েও বেশী।

আবার হর্ন। 'তাড়াতাড়ি কর। শো আরম্ভ হতে দেরি নেই।'

'বলা কওয়া নেই—এখন সিনেমায় যাবো কি করে? খোকনও ফেরেনি পার্ক থেকে।'

'মা দেখবে। চলো তো। নতুন শাড়ি পরেই চল।'

বাস্তায় বেরিয়ে কুবের স্পষ্ট বুঝলো রও আগে বেরোলে ভাল হত। তার ন্যে পৃথিবী প্রায় শেষ হয়ে আসছে। গারেটের বিজ্ঞাপনগুলো যা হয়েছে জকাল—শুধু দপদপ করে। কি বাহার! াক্সিতে বুলু বলল, 'এভাবে টাকা নষ্ট রো না। ক'দিন পরে খোকনেরও একজন লুড়ে জুটবে—তখন অনেক টাকা লাগবে।' 'আজ একটা সাপ দেখলাম বুলু। মাকেও দেখছিল।'

'শেষ রাতে তো। আমিও দেখেছি। পের স্বপ্নে বংশবৃদ্ধি!'

'শেষ রাতে নয়। আজই বিকেলে খলাম—', হঠাৎ থেমে গিয়ে কুবের লল, 'দাঁত পড়ার স্বপ্ন দেখলে কি হয় জান?'

বুলু চুপ করে ছিল। কলকাতা মাড়িয়ে ট্যাক্সি ছুটছে, 'সন্তানশোক—'

'চুপ করবে?' তারপর বুলু বলল, 'তুমি কাল আর আভা বউদিদের বাড়ি যাও না।'

'যাওয়ার উপায় নেই বুলু।'

তাকিয়ে আছে দেখে ফিরে বলল কুবের, 'আমার যেতে মন্দ লাগে না। কিন্তু লপুরের সবাই এমন চোখে দেখে আমাকে, কি বলব—কেউ ভাবে স্পাই, কেউ ভাবে লম্পট, নয়নরা মনে করে ভগবানের মে জায়গা দখলের তালে আছে—তাই মি আর মিশতে পারি না। অথচ ব্রজদা বাপ—এ কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি না। ভাল? তাই বা বলি কি করে!'

শিলা শব্দ হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারের ধো জায়গা খুঁজে নিয়ে বসতে বসতে কুবেরের মনে হল, কোথায় যেন কি করা কি রয়েছে—কি যেন ভুল করে ফেলে এসেছে। আজকাল সব সময় মনে হয়, মাথায় যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। একটা বড় গাঁট পড়েছে আন্ডারঅয়ারের দড়িতে। সেটা কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না।

'আর জন্যে আমার বড় কষ্ট হয় বুলু।'

'এখন সিনেমা দেখো তো। পরে শুনব।'

কুবের দেখল, একটা উজ্জ্বল দৃশ্যের আলো পর্দা থেকে ছিটকে দর্শকদের মুখে পড়েছে। সবাইকে দেখা যাচ্ছে। বুলুর এ মুখেই সুদৃশ্য। টিকলো নাক, টানা চোখ, ছোট কপালের ওপর ঘন বুনোটের দুই থাক কালো চুলের মাঝখান দিয়ে একটা সাদা উগড়গে সিঁথি। এই মেয়েলোকটি ত তার বৌ। ইদানীং বুলুর নাক মুখ চোখ সব লাবণ্যতে ঢলঢল করে। অথচ বুলুর সঙ্গে বিয়ের আগে আলাপের সময় হাত ধরেই কেমন খিঁচিয়ে উঠেছিল।

এই আলোতে নিজের হাত দু'খানা মেলে ধরেই কেমন পাথরের মত হয়ে উঠল। খুব ফরসা দেখাচ্ছে। আমি কুবের সাধুখাঁ। আমাদের চার পুরুষ আগে লবণের গোলা ছিল। আমার মা ঘাড় ফেরালে চিবুকের নীচে আজও নীল নীল শিরা দেখা যায়। আমার হাতের আঙুলে কালো কালো ছোপ পড়েছে। কনুইতেও কালো ছোপ। কুবের স্পষ্ট বুঝলো এবারে তার গা আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাবে। বহরিডাঙ্গা রেজিস্ট্রি অফিসে সারাগায়ে এমন কালচে ছ্যাতলা পড়া একটা লোক পয়সা চেয়ে বেড়ায় সবার কাছে। গায়ে গা লেগে যাবার ভয়ে সবাই তাকে পয়সা দেয়। লোকটাও চাইবার আগে একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। বিমল ডাক্তারকে আজকাল আর দেখা যায় না। বদলি হয়ে যায়নি তো।

অথচ তার হাত পায়ের আঙুলের

গাঁটে কালো ছোপ পড়ার কথা নয়। সেদিন যদি সনতের সঙ্গে শেফালির ঘরে গিয়ে না বসত! সেইসব কথা মনে পড়লেই একটা ভয়ঙ্কর ওজনের পাথর কিংবা লোহার দরজা তাকে একেবারে মাটিতে চেপে ধরে। নিঃশ্বাস ফেলা যায় না।

শেফালির ঘর থেকে ফেরার পর বেশ কিছুদিন ভয়ে ভয়ে ছিল কুবের। কেউ যদি দেখে থাকে। কদিন পরে এমন শরীর খারাপ হল। এমনিতেই মনে মনে কুবের মরে ছিল। বীরেন লস্কর স্যার বদলি হয়ে গেছেন। সারা স্কুল কেমন শুকনো লাগে। রাস্তাঘাট মায়া মমতাহীন। কণ্ঠমণি ঠেলে উঠে একটা বেয়াড়া আওয়াজ গলা দিয়ে বের হয়।

শেষে ডাক্তার ডাকতে হল। তখন কুবেরের পুঁজ বেরোতে শুরু করেছে। কি লজ্জা। কোথাও যাওয়া যায় না। কাউকে বলা যায় না। বিষ খাবার পর শেফালিকে বাঁচিয়েছিল হরি ডাক্তার। সেই হরি ডাক্তার এসেই দরোজা বন্ধ করে দিল। তারপর মার সামনে কুবেরকে সব বলতে হল। ডাক্তার একটা লম্বা লেকচার দিল। কুবেরের কানে কিছু যায়নি। তখন পেনিসিলিন যুদ্ধের সাহেবদের জন্যেই শুধু বিলেত থেকে

আসে। ভয়ংকর দাম। অনেক মিকশ্চার, ইনজেকসন, ট্যাবলেট চলল। মার আদেশে কুবের রোজ ঘুম থেকে উঠে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পড়ে। কালীর ফটোর সামনে দম আটকে ব্লেড দিয়ে বুকের ঠিক মাঝখানটায় একটু চিরে কুবের রোজ ভোরে ফটোর ফ্রেমে খানিক রক্ত লাগাতো। লাগানোর পর আটকানো নিঃশ্বাস ছেড়ে দিত। অসুখ থেকে ওঠার পর নিয়মে থাকতে থাকতে কুবেরের গায়ে সবরি কলার ঘিয়ে রং ধরল। সব সময় ভয় হত, তর বয়সী বন্ধুদের সঙ্গে মেশার সময় মা এমনভাবে তাকাতো যেন সব সময় চোখ দিয়ে বলছে, কুবের তুমি ওদের সঙ্গে মিশছো, কিন্তু ওরা তো জানে না তুমি কি করে বসে আছ। মার চোখের সামনে একেবারে মাটিতে মিশে যেত কুবের। কাচের পিচকিরিতে গরম জলের সঙ্গে একটা হলুদ ওষুধ মিশিয়ে মা ধারা করে পুঁজের জায়গায় দিত। একদিন সন্ধ্যেবেলা জ্যোৎস্নার মধ্যে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে পাদ খেলছিল। মা ডেকে পাতা মোড়ানো একখানা মাসিকপত্রিকা হাতে দিল, 'এই লেখাটা পড়ো।'

লেখার নাম 'হীনমন্যতা ও তার প্রতিকার।'

পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে মাকে এত কঠিন লেগেছিল কুবেরের। একটাও পড়েনি সে। পড়ে কি হবে। ভালো হবার জন্যে অসুখ সেরে ইস্তক কত কি করে চলেছে সে। দেওয়ালে রুটিন। পড়ার বই সব খালি কাগজ দিয়ে মোড়া, টেবিলে টাইমপিস, তার পাশেই গীতা চণ্ডী—উপরন্তু ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ব্যায়াম।

মাঝখান থেকে ফল হল, তার চেহারাটা ফিরে গেল। পাড়ার মেয়েরা টাল্‌সে টুলুস বেলায়। কলেজের মেয়েদের সঙ্গে আগে ভোররাতে বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথতো। তাদের দু'একজন আড়ালে পেলে আদর করে গাল টেপে। আর দিনকে দিন ভালো হবার জন্যে, নির্দোষ দেখাবার জন্যে, নিষ্পাপ কুসুম হওয়ার লোভে সে অজান্তে নিজের মুখে একটা প্রশান্ত, ভাবলেশহীন ছায় পাকাপাকি ঝুলিয়ে দিল। বিয়ের পর বুলুই বলেছিল, 'তোমার চোখ গরুর চেয়েও শান্ত তাকাও এমনভাবে, যেন কিছুই জানো না।'

সিনেমায় এমন সময় নায়িকা দোতলায় ঝুলবারান্দায় একটা আবেগের গান জুড়ে দিল। অন্তরায় তল রাখার জন্যে দুই কলির ফাঁকে নায়িকা দু'বার বড় বড় দুটো দীর্ঘশ্বাস মিউজিক বুকে ছড়ল। বুলুও আবেগ দিয়ে কুবেরের দিকে তাকাল। এইসব বুলুর খুব ভাল লাগে, 'কি ভাবছ?'

'পোর্টফোলিও ব্যাগটা খাটের ওপর ফেলে এসেছি—'

'টাকা ছিল?'

'সাত হাজার।'

'আমি আন্দাজে তোষকের নীচে গুঁজে রেখে এসেছি।'

'তার মধ্যে ডায়েরিতে একটা ফোন নাম্বার ছিল, মনে পড়ছে না—'

'নাম মনে আছে?'

'রেফ্রিজারেটর কোম্পানির ইঞ্জিনীয়ার এস কে বসু। এগারো কাঠা জায়গা নেবেন। হাজারের দর। সিনেমা থেকে বেরিয়ে গাইড দেখে ফোন করতে হবে আবার—'

'হাজার-টাকা কাঠা! শেষে জানাজানি হলে—'

'জানাজানির কি আছে? জায়গার দাম এমনই হয়। এসপ্ল্যানেডে আগে কত দাম

তুমি তখন খারাপ কথা বল শুধু—

ছিল? খুব সস্তা ছিল নিশ্চয়—না হলে মোহনদাসবাবু গরুদের জল খাওয়ার জন্যে চৌবাচ্চা কাটাতে পারতেন?'

'সে তো অনেক আগের দিনের কথা। তখন হয়ত রাস্তা ছিল না, আলো ছিল না, লোক ছিল না—'

'আমরাও তো আগে কিনেছি। রাস্তা বানাবে, আলো আনাবো—'

'এখন সিনেমা দেখো। শুধু জায়গা-জমির চিন্তা! কি হচ্ছে যাচ্ছো তুমি—'

আজকাল কলকাতার রাস্তায় ফাঁকা জায়গার দেখা পাওয়া কঠিন। কলকাতার বাইরে বেরোলেই এন্তার ফাঁকা জায়গা। কোথাও কচুরিপানা হয়ে আছে, কোথাও সুপুরি নারকেলের বাগান—একটু ভেবে-চিন্তে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে সেসব জায়গায় দিব্যি বাড়ি হয়, পাড়া হয়, সন্ধ্যে হলে শঙ্খ বাজানো যায়।

হাত দু'খানা মুঠো করে ফেলল কুবের। বিমল ডাক্তারের কথামত ট্রপিকালে গিয়ে দরজা থেকে ফিরে এসেছে। লাইনে হরেক অসুখের মানুষ। বোধহয় তার সেসব অসুখ আর নেই। থাকলে খোকন নিশ্চয় অন্যরকম হত। অবিশ্যি এসব অসুখে প্রথমটা সব চিহ্ন লোপ পায়। পরে আস্তে আস্তে দেখা দেয়। তখন আর সারানো যায় না। তার মেরুদণ্ডের হাড়ের ভেতর আজকাল, কুবেরের সন্দেহ, সবকিছু বুঝি শুকিয়ে যাচ্ছে। কাৎ হয়ে শুলে মটমট করে ওঠে। খোকনের ঠোঁট খুব লাল। চোখে আলো বেরোয়, হাসলে দাঁতের ঘসাঘসিতে মিছরি চিবোনোর মিষ্টি গন্ধ মেশানো মুড়মুড়ে শব্দ হয়।

অথচ সন্ৎ দিব্যি আজও সেসব জায়গায় যায়। এখন কুবেরের কাছে দিনকে দিন একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠছে। বুলু, মা, খোকন, তার এবং আর পাঁচটা মানুষের শরীর কিছু মাংস, হাড়, বাতাস, রক্ত, চর্বি, শিম্নি, শ্লেষ্মা এসব জিনিস দিয়ে বানানো। তারই মধ্যে সব জিনিসেরই এক একটা মাত্রা আছে। এর ভেতর একটু এদিক ওদিক হলেই গণ্ডগোল। নয়ত যন্তটা ভালো মেকের। কত সামান্যের জন্যে আজ বিকেলে বেঁচে গেছে কুবের। সাপটা মাথা তুলে দেখছিল তাকে। কি চাই? এখানে কেন বাবু? ভাগ্যিস থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভদ্রেশ্বর ডাকছে, শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু উত্তর দেবার উপায় নেই। তার গলার আওয়াজে যদি তেড়ে আসে। দৌড়েও কুল পাবে না।

হিরোর চেস্ট চমৎকার। আজ কুড়ি বছর এক চেহারা নিয়ে হাসছে, গাইছে, টাকা কামাচ্ছে। একই লোক দিয়ে টুথপেস্ট আর ব্লেডের বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে হোসিয়ারি কোমপানি হিরোর গায়ের-ছেলে-মার্কা ছবি দিয়ে গেঞ্জি অ্যাডভারটাইজ করতে পারে। কলো চুল দেখিয়ে তেল কোমপানি আর স্যুট পরা ছবি দেখিয়ে ভালো পাড়ার দর্জিও খদ্দের টানতে পারে। ভোগ্য পণ্যের এমন মালটি-পারপাস জ্যান্ত পুতুল তখন হিরোইনকে

জড়িয়ে ধরে বিবেকের রোলে কথাবার্তা বলছে।

বুলু বলল, 'অমন পারবে?'

'রোজই তো করি—'

'উহু! তুমি তখন খারাপ খারাপ কথা বলো শুধু—'

তা কুবেরকে বলতে হয়। শরীরটা এমন বেয়াড়া। ইদানীং না চাবকালে চলতেই চায় না! অথচ সে মোটেই বেতো ঘোড়া নয়। আসলে চাংগা হওয়ার কায়দা রোজ ভুলে যাচ্ছে। গান জানে না, জানলে গাইত। সেদিন বুলুর অ্যাকাউনটে একটা লম্বা টাকার চেক জমা দিয়ে ফেরার পথে বার বার মনে হচ্ছিল, ব্যাংক পাড়ার এই এলাহি মনোরম সব রাস্তায়, সারি সারি ঝকঝকে বাড়ির ছায়ায় হঠাৎ মোটর থামিয়ে কুবের খুব ভাবালু একটা গান ধরবে, গাইতে গাইতে স্টিয়ারিং-এ মুখ রাখবে, তন্ময় দুপুরবেলা, গাছের ছায়া নিয়ে হাওয়া নিঃশব্দে যাতায়াত করবে—বুলু শুনতে শুনতে তাতানো পথের শুকনো বকুল তুলতে খুট করে দরজা খুলে নেমে পড়বে।

এসব এত ফানি! এখন আর তাকে মানায় না। (ক্রমশ)

স্টকহলমের চিঠি

সুইডেনের জনসংখ্যা নিতান্তই কম হওয়া সত্ত্বেও, তাদের বহুমুখী প্রতিভা নানা ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠেছে। সুইডিশ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, গায়ক-গায়িকারা দেশে দেশে সুপরিচিত। অবশ্য এ'দের কর্মক্ষেত্রগুলি এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে বাঁধা যে, সাধারণ মানুষের হয়ত সাহিত্য বা বিজ্ঞান-চর্চা ইত্যাদিতে বিশেষ অনুরাগ না থাকলে, সুইডেনের মত ছোট দেশের বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের কথা শোনার অবকাশ নাও হতে পারে। তবে একটি বিষয়ে সুইডিশদের কথা নিশ্চয়ই সকলে কোনও না কোনও সময়ে অবশ্যই শুনেছেন এবং সে বিষয়টি হল সুইডিশ সিনেমা।

সুইডিশ চিত্রতারকারাই এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশ্ববন্দিতা হয়েছেন। তার একমাত্র কারণ যে বহু সুইডিশ চিত্রাভিনেত্রী স্বদেশে তাদের প্রতিভা প্রকাশ করার সুবিধা না পাওয়ায়, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমেরিকায় গিয়ে সেখানের চলচ্চিত্র জগতে সুপরিচিতা হয়ে উঠতেন। এ সংক্রান্তে অন্যান্য সকলের মধ্যে স্বনামধন্যা গ্রেটা গার্বো, ইনগ্রীড বার্গমান, মায় জেতারলিং বা অনিতা একবার্গের কথা অনায়াসেই মনে আসে। গ্রেটা গার্বো যদিও বহু পুরোন কালের অভিনেত্রী এবং তাঁর প্রতিভাবিকাশের ক্ষেত্র যদিও বিশেষ সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও তাঁর অভিনয় দেখার সৌভাগ্য যাঁদের কোনও কালে ঘটেছে, তাঁরা গ্রেটা গার্বোর সম্ভ্রান্ত সৌন্দর্য ও সুনিপুণ অভিনয়ে, সমান মুগ্ধ হয়ে থাকবেন—এবং সেই জন্যেই গ্রেটা গার্বো ও তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভা চিত্রজগতে চিরস্মরণীয়। বর্তমানে এখানে অনেকের মত যে ১৯২০-৩০ সালের সিনেমা জগতে, গ্রেটা গার্বো তার প্রতিভার পরিচয় দেবার সুবিধা বিশেষ মোটেই পাননি। তখনও চলচ্চিত্রের বিশেষ উন্নতি হয়নি এবং প্রায় সব ফিল্মেই গ্রেটা গার্বো প্রায় এক ধরনের অভিনয় করারই সুযোগ পেয়েছেন। তাহলেও সে সময়ে স্টকহলমের এই সাধারণ মেয়ে, যে এককালে স্টকহলমের এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পোশাক বিক্রী করত এবং যার ভবিষ্যৎ হয়ত নেহাতই অনুজ্জ্বল ছিল, চিত্রজগতে চিত্র-তারকার রূপে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যদিও আজ সেই প্রতিভাময়ী নারী, জীবিতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় বিস্মৃতা।

শিশু চলচ্চিত্র 'Hngo and Jose phine'-এর চিত্তাকর্ষক দৃশ্য

সে হিসাবে ইনগ্রীড বার্গমান জেতারলিং বা অনিতা একবার্গ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সিনেমায় রূপদান করে, বর্তমান সমাজে জনপ্রিয় হয়েছেন। স্বদেশের সিনেমায় কিন্তু এ'দের মধ্যে কেউই নাম করতে পারেননি, বা পারার অবকাশ পর্যন্ত পাননি, যদিও আজ সুইডিশ সিনেমা খুবই উন্নত। ইনগ্রীড বার্গমান মাঝে মাঝে সুইডেনে বাস করলেও, মার্কিন সিনেমা ও থিয়েটার জগতেই প্রসিদ্ধ। অনিতা একবার্গকে সুইডিশরা তাদের একজন বলে মনে করে না। কারণ তিনি নাকি নিজেকে আমেরিকান বলেই গণ্য করেন এবং আমেরিকা যাবার প্রায় ৬ মাস পর থেকেই তাঁর মাতৃভাষা বিস্মৃত হয়েছেন। কাজেই তাঁর এদেশে কোনই স্থান নেই। মায় জেতারলিং চিত্রতারকা হিসাবে তেমন নাম কোনওদিনই করেননি। এখন সুইডিশ চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনায় হাত দিয়েছেন।

বর্তমানে অবশ্য আত্মপ্রকাশ করার জন্যে সুইডিশ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আর অতলান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে হয় না। সুইডেনের চিত্রজগৎ এখন বিদেশে সুপ্রসিদ্ধ। গত ২০ বছর যাবত সুইডিশ সিনেমা দৃঢ় পদে অগ্রসর হয়েছে এবং আজকের সুইডিশ সিনেমা কেবল সমাজে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই তৈরি হয় না। বরং ইদানিং পাশ্চাত্য সমাজের নানা জটিল সমস্যা সমাধা করার জন্যে, এই কৃত্রিম সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রূপেই দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজ, যার পরাকাষ্ঠা হয়ত বা সুইডেনেই পাওয়া যায়,

আজ নানা কুৎসিত রোগে জর্জরিত। ঐ সমাজে অর্থনৈতিক বা পার্থিব নিরাপত্তা যতটা অগ্রসর, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ঠিক সেই পরিমাণেই অপূর্ণতা ধরা দিয়েছে। কাজেই আর সব দিক দিয়ে নিরাপত্তা বজায় থাকলেও মানসিক সুখ সন্তুষ্টি বা পরিপূর্ণতা ভোগ করতে এরা দিনে দিনে আরও যেন অক্ষম হয়ে উঠছে। জীবনে কোন স্থায়ী সুখ এদের দৃষ্টি-গোচর হয় না। এত সুন্দর সমাজ গঠন হওয়া সত্ত্বেও, মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি কেন? কেন তারা সব পেয়েও গঞ্জিকা-সেবন করে বা মদ্যপান করে। আপন অস্তিত্বকে বিলিয়ে দিতে চায়? কত যে বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এইভাবে তাদের জীবন নষ্ট করছে তার ইয়ত্তা নেই। কত আত্মহত্যা ও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটছে, কত ঘর উজাড় হয়ে যাচ্ছে, কত যে অবৈধ শিশু প্রতিদিন ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, যাদের আপন বলতে কেউ নেই। লোকে কাজেকর্মে নিজেদের যতদিন ও যতক্ষণ বিলিয়ে দিতে পারে, ততক্ষণই তারা নিশ্চিন্ত। কাজ না থাকলেই যেন হাঁপিয়ে ওঠে—জীবনের যেন সব অস্তিত্বই ঐ কার্যমুহূর্তগুলির মধ্যে বন্ধ। শুধু যে ধনসম্পদ অর্জন করার জন্যেই লোকে কাজ করতে যায়, তা ঠিক নয়, অনেক সময়ে একাকিত্ব ঘোচাবার জন্যেই, ও সেই একাকিত্ব জড়িত নানা সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই কাজকর্মের খোঁজে মানুষে হন্যে হয়ে ঘোরে। পরিবার পরিজন থাকলেও, না থাকারই সামিল। কেউ কারো জন্যে কিছু করতে রাজী নয়, কোনও রকম সাহায্য বা সহানুভূতি দেবার মত কারো অবকাশ নেই, সে আপন মা-বাবা ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, যেই হোক না কেন। শিশুরা জন্মে অবধি সাধারণত কোনও শিশু প্রতিষ্ঠানে মানুষ হয়, তার পরই স্কুল-কলেজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা সবই সরকারের হাতে, মা-বাবার কাছে কোনওরূপেই তারা ঋণী না। কেনই বা তারা অকারণে মা-বাবার জীবনে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেবে? আজকালকার পাশ্চাত্ত্য যুবক-যুবতীরা বয়স্কদের বিরুদ্ধে মেতে উঠেছে। এক নতুন দলের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নোংরা জামা-কাপড় পরে থাকা। অধৌত শরীর, খালি পায়ে জটপাকান দাড়ি গোঁফ ও লম্বা চুল রেখে নিজেদের বিদ্রোহীভাব প্রকট করা। সমাজের সব রীতি রেওয়াজকে অবহেলা করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মাতাল ও মত্ত হয়ে এরা রাস্তায় বসে থাকে। হয়ত বা বিদ্রোহমূলক গান গেয়ে বা ছবি এঁকে সময় যাপন করে। জীবনে তাদের কোনও অর্থ নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই।

এই সাফল্যমণ্ডিত, সুসজ্জিত সমাজে কোথায় যেন একটা গলদ আছে, এক বিরাট শূন্যতা সর্বদাই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। জনসাধারণকে সেই অপূর্ণতার সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া এবং সমাজভুক্ত নানা জটিল কুটিল সমস্যা থেকে মানুষকে উদ্ধার করাই এখন সুইডিশ সিনেমার একরকম চরম উদ্দেশ্যের সামিল হয়েছে। প্রায় সব দেশেই এখন সেই চিরাচরিত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা ধার্মিক চিত্রগুলি, ধীরে ধীরে দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতা হারাচ্ছে। বর্তমান সমাজের বাস্তবিক রূপ ও সমস্যা ইত্যাদিই বিশেষ ভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমাদের দেশে যৌথ পরিবার ভঙ্গের পর যে নানা সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, মহিলারা নবলব্ধ বহির্জীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বা যুবক-যুবতীদের মনে যে ব্যর্থতার ভাব আবির্ভূত হচ্ছে সে সব বিষয়েই বর্তমানে বেশী চলচ্চিত্র দেখা দিচ্ছে। আমেরিকায় এখন যে জাতি বা বর্ণ বিদ্বেষ সংক্রান্ত সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে সমাজে, সে বিষয়ে বহু সিনেমাই দেখান হয়েছে সম্প্রতি। সুইডেনে উপরোক্ত কোনও সমস্যাই নেই। আছে মানুষের আপন মনে নানা জটিল সমস্যা ও সংঘর্ষ—মানুষের একের অন্যের সঙ্গে অর্থহীন অকার্যকর সম্পর্ক এবং জীবনে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীনতা।

এই সমস্যাগুলি অত্যন্ত দুরূহ এবং এই দুরূহতা দেখা দেয় বর্তমান সুইডিশ সিনেমা জগতে। সুইডিশ চলচ্চিত্রগুলিতে যে বিমূর্তনের আবির্ভাব হয়েছে তা অধিকাংশ লোকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। তা ছাড়া যে নিছক সুইডিশ সমস্যাগুলির নেহাত নগ্নরূপে সুইডিশ রূপালী পর্দায় পরিবেশিত হয়ে থাকে, তার অদ্ভুত অশ্লীলতা বিদেশে সাধারণত সেনসারের হাতে পড়ার পর বিদেশী

দর্শকদের কাছে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হতে পারে না। এই কারণেই নানা চলচ্চিত্র উৎসবে বহু নামকরা সুইডিশ ছবি পরিবেশিত হবার সম্মতি লাভ করেনি।

এ বছর গ্রীষ্মকালে স্টকহলমে পর্যটকদের আকর্ষণ করার এক অভিনব উপায় ছিল নানা সুইডিশ ফিল্ম, ইংরাজী সাবটাইটেল দিয়ে প্রদর্শিত করা। যারা স্বদেশে সুইডিশ সিনেমা দেখতে পায় না এবং সুইডেন ভ্রমণকালেও সুইডিশ ভাষা না জানায় হয়ত দেখার সুযোগ পায় না, তাদের এই সুযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। কেউ সুইডিশ সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত থাক আর না থাক, সুইডিশ ফিল্ম দেখার পর মনে অবশ্যই একটা বিষন্নতা নিয়ে ঘরে ফিরেছে—আর সেটাই হচ্ছে সুইডিশ সিনেমার প্রধান উদ্দেশ্য। সুইডিশ সিনেমা দেখার পর নানা প্রশ্নই মনে জাগে এবং সেই বিষয়ে জনসাধারণকে ভাবিয়ে তোলাই সিনেমাগুলির লক্ষ্য। সিনেমায় পরিবেশিত নানা সমস্যার বিষয়ে সচেতন হলে স্বভাবতই এই বিদ্রোহভাব দেখা দেয় এবং তারই মাধ্যমে তাদের সমাজকে সমস্যামুক্ত করতে পারবেন, এই হল সুইডিশ চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালকদের একান্ত আশা।

সুইডিশ সিনেমার পরিচালনায় এই নব শিল্পকৌশল যার হাতে পরিণতি লাভ করেছে, তিনি বিশ্বের সিনেমা জগতে আজ সুবিখ্যাত স্বনামধন্য সুইডিশ পরিচালক ইংমার বার্গমান। বার্গমান এমন চতুর পরিচালক, যিনি তাঁর দর্শকদের ঠকানও না এবং দর্শকদের ব্যয় করা অর্থের মূল্যও পরিপূর্ণ করেন। তার উদ্দেশ্য যে তিনি একই সঙ্গে তাঁর দর্শকদের প্রসন্ন ও দুঃখিত, অভিভূত ও আহত করবেন। ঠিক

মাই জেতারলিং পরিচালিত 'দি গার্লস' ছবিতে প্রসিদ্ধ তিন সুইডিশ অভিনেত্রীঃ গুনেল লিন্দব্লম, বিবি এন্ডারসন এবং হ্যারিয়েট এন্ডারসন

এই জন্যেই দর্শকমণ্ডলে তিনি কারো কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছেন, আবার অনেকের মধ্যে ঠিক সেই অনুপাতেই অপ্রিয় হয়েছেন। বহু সুইডিশরা বার্গমানের সাফল্যকে একেবারেই অস্বীকার করে, কারণ বার্গমান যে সমাজে মানুষ হয়েছেন, সে সমাজকেই তাঁর ফিল্মগুলিতে অবহেলা ও উপেক্ষা করেন। বার্গমানের পিতা ছিলেন সুইডিশ চার্চের এক প্রাচীনপন্থী ধর্মযাজক —যাঁর কঠিন অনুশাসনে বার্গমানের ছেলে-বেলা কেটেছিল। সেই ছেলেবেলাতেই তাঁর মনে চার্চের এবং প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘর্ষের বীজ অংকুরিত হয়েছিল। তাঁর ফিল্মগুলিতে বার্গমান স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের গুরুত্ব প্রদান করেন, সমাজকে নয়। তাই এই ছবিগুলিতে ব্যক্তিত্বের সার্বভৌমিকতা সদাই চোখে পড়ে এবং নির্দয়, নির্মম, অনুভূতিশূন্য সমাজকেই সর্বদা দোষী ও অপরাধী বলে যিনি প্রমাণিত করেন। তাঁর ফিল্মের নায়ক নায়িকারা সমাজের পরিত্যক্ত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তি এবং বার্গমান যদিও কোনও বিশেষ ধার্মিক মতবাদকে তাঁর ছবিগুলিতে স্থান দেন না, তবু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য

করেন না। বার্গমানের ফিল্মগুলি সাধারণ দর্শকদের বোধগম্য হওয়া বেশ দুঃসাধ্য, কারণ তার মধ্যে যে মানসিক অশান্তি ও ঝড় ঝঞ্ঝার প্রদর্শন হয়ে থাকে, তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত। তবু বার্গমানের ফিল্মগুলি এতই বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও অভিনব যে নানা কঠিন সমালোচনার মুখে পড়লেও তাঁর প্রতিটি ছবি সিনেমা জগতে বিশেষ আলোড়ন সঞ্চার করে থাকে। বার্গমানের যে কোনও ফিল্মের মুক্তি লাভ তাই এক বিশেষ ঘটনা।

বার্গমান প্রথম ফিল্ম পরিচালনা করেন ১৯৪৫ সালে, এবং সে ফিল্মের নাম 'ক্রাইসিস'। সে সময়ে বার্গমানের নাম কারো কাছেই পরিচিত ছিল না এবং বলা বাহুল্য সে সময়ে তাঁর কাজে পরিণতির ছাপও ছিল না। ১৯৪৬ সালে ইট রেইনস অন আওয়ার লাভ এবং ১৯৪৭ সালে এ শিপ বাউন্ড ফর ইণ্ডিয়া ও মিউজিক ইন ডার্কনেস মুক্তি লাভ করে। শেষোক্ত ছবিটিতে হীনতা বোধের সাক্ষ্য খানিকটা পাওয়া যায়, যা তাঁর পরবর্তী অধিক পরিণত ফিল্মগুলিতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে তৈরী "পোর্ট অব
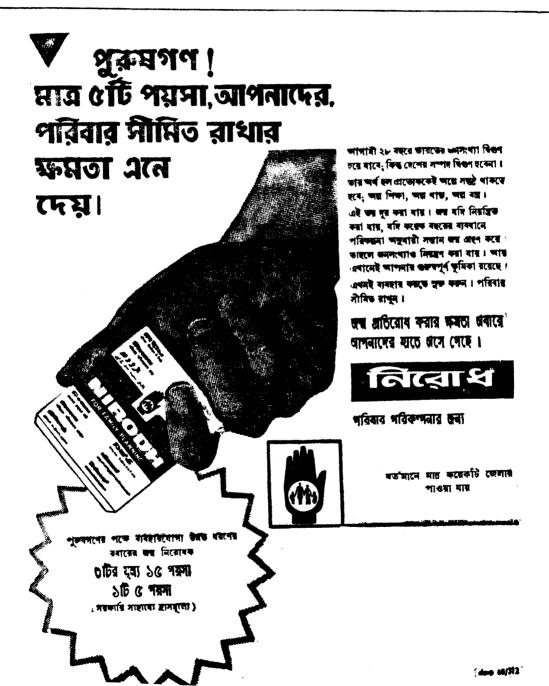
ফর্ম ও "সাইলেন্স" তৈরী হওয়ার মাঝে প্রায় ১৫ বছরের ব্যবধান। ১৯৪৮ সালে বার্গমানের বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর। এবং ১৯৪৮ সালের পরে পনের বছরের মধ্যে বার্গমানের চিন্তাধারায় নানা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। "পোর্ট অব কল"-এ যেমন জীবনের দৃঢ় ও স্থির প্রতিজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় ঠিক তার উল্টোটাই পাওয়া যায় "সাইলেন্স"-এ অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরাশা ও নিঃসহায়তা। এই ২টি ছবির মাঝে তৈরী নানা ছবি সুনাম অর্জন করেছে। "ওয়েটিং ওয়োমেন" (১৯৫২), "জার্নি ইনটু অটম" (১৯৫৫) ও "সো ক্লোজ টু লাইফ" (১৯৫৭)-এ বার্গমান তাঁর সমস্ত মনোযোগ অর্পণ করেছেন নারী জাতির স্বভাব ও আচরণের ওপর, বা বলতে গেলে নারী জাতির আশা ও স্বপ্নের মধ্যে। বার্গমানের পরবর্তী ফিল্মগুলির মধ্যে "দি সেভেন্থ সীল" (১৯৫৬), "ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি" (১৯৫৭), "দি ফেস" (১৯৫৮), "দি ভারজিন স্প্রিং" (১৯৫৯) ও "থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি" (১৯৬১) বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। তারপরই ১৯৬২ সালে মুক্তিলাভ করে বার্গমানের বিশেষ বিতর্কমূলক ছবি "সাইলেন্স"। উপরোক্ত প্রতি ফিল্মেই বার্গমান অতি-প্রাকৃতিক ঘটনাচক্রকেই বিশেষ স্থান দিয়েছেন। সাধারণ দর্শকদের পক্ষে এই বিমূর্তনির্ভর ঘটনা-চক্র বোধগম্য হওয়া প্রায় অসাধ্য তবু কোথায় ফিল্মগুলির আকর্ষণ লুকিয়ে আছে। "দি ফেস"-এ আছে বিচারবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, "দি ভারজিন স্প্রিং"-এ খ্রীষ্টধর্ম ও অনীশ্বরতার দ্বন্দ্ব ও "সাইলেন্স"-এ এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা ঝড় ঝঞ্ঝার রূপ লাভ করে শরীর ও বুদ্ধির মধ্যে। দৈহিক প্রবৃত্তি ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি, সংযম ও শিথিলতা, শরীর ও মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধীতার পরিচয় "সাইলেন্স"-এ। ফিল্মটি দেখার পর দর্শকদের মনে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতার চিহ্ন রেখে যায়।

এ সব ফিল্ম দেখার পর সত্যি মনে হতে পারে যে বার্গমানের মধ্যে রসিকতা একেবারেই নেই। কিন্তু "স্মাইলস অব এ সামার নাইট", দেখলে সে মনোভাব দূর হয়ে যায়। অদ্ভুত হাল্কা এ ছবি, দেখলে শুধু নিছক আনন্দই উপভোগ করা যায়। মনে হয় বার্গমানের বিষণ্ণ ফিল্মগুলির মধ্যেও রসিকতার হয়তো স্থান আছে। তাঁর নতুন ছবিগুলির মধ্যে 'পেরসনা' (১৯৬৬) ও 'আওয়ার অফ দি উল্‌ফ' (১৯৬৭) সুপরিচিত। ১৯৬৮ সালের তৈরী 'দি ডিজনার', সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে।

যদিও ইংমার বার্গমানের প্রযোজক-পরিচালক রূপ সুইডিশ চলচ্চিত্র জগতকে প্রায় আচ্ছন্ন করে আছে, তবু তারই মধ্যে নানা সফলকাম প্রযোজক ও পরিচালকদের নাম সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। এঁদের মধ্যে আছেন আল্ফ শোবার্গ। ইনি গ্রেটা গার্বোর সমসাময়িক। একই সঙ্গে এঁরা ড্রামা স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ইংমার বার্গমানের বহু আগে থেকেই পরিচালক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর পরিচালিত ফিল্মগুলি সাধারণত সুইডিশ সুপরিচিত গল্প বা উপন্যাস নিয়েই তৈরী যার মধ্যে "ওনলি এ মাদার" (১৯৪৯) স্ট্রীন্ডবার্গের 'মিস জুলি' (১৯৫০) ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পের লাগের কুইস্টের 'বারাব্বাস' (১৯৫২) বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে।

বর্তমানে নানা তরুণ ফিল্ম পরিচালক সুইডিশ ফিল্ম জগতে উদিত হয়েছেন, যাঁদের পরিচালনার শিল্পকৌশল চিরাচরিত প্রয়োগ কৌশল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এঁরা সাধারণত সমাজের সাধারণ মানুষদের নিয়ে এক ঘটনা বা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। ফিল্মের গল্প বা ভিত্তি প্রায় কিছুই থাকে না। নানা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দেখিয়ে যেমন নাম করা সমাজসেবী বা রাজনীতিজ্ঞ, এমন কি মন্ত্রীদের সঙ্গেও আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক দেখিয়ে সমাজের আসল রূপ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য। এই শিল্প কৌশল সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন ভিলগট শোমান, যাঁর পরিচালিত 'দি ড্রেস' (১৯৬৪) ও 'মাই সিস্টার, মাই লাভ' (১৯৬৬) সুপরিচিত। ১৯৬৭ সালে তৈরী 'আই অ্যাম কিউরিয়স (ইয়েলো)' ও 'আই অ্যাম কিউরিয়স (ব্লু)' ২টি অত্যন্ত বিতর্কমূলক ছবি।

এই দলের মধ্যে বুথ' ভিদারবার্গের নামও সুপরিচিত। তাঁর পরিচালিত 'দি প্রাম' (১৯৬২) ও 'লাভ' (১৯৬৫) সুইডিশ দর্শকমণ্ডলীতে সকলের চেনা। এই ২টি ফিল্মই মানুষের মনের আবেগকে বিশেষভাবে স্থান দেয় এবং অতি সাহসিকতার সঙ্গে মানসিক সমস্যাগুলিকে প্রদর্শন করে। শিশুদের ফিল্ম পরিচালনায় 'শেল গ্রেদে' সংদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর 'হুগো অ্যাণ্ড জোসেফিন' উল্লেখযোগ্য। জন ডনার একজন ফিনিশ যুবক যিনি সুইডিশ ফিল্ম পরিচালনায় সার্থকতা লাভ করেছেন। তাঁর পরিচালিত 'এ সানডে ইন সেপ্টেম্বর' (১৯৬৩) সুপরিচিত এবং এই ছবিটি ভেনিসে opera prima পুরস্কার পায়। এ ছাড়া মায় জেতারলিংও ফিল্ম পরিচালনা নিয়ে তাঁর ফিল্মগুলির মধ্যে গবেষণারতা। তাঁর ছবিগুলিতে নারী জাতির সমস্যা যন্ত্রণা ইত্যাদির পরিচয়ই সাধারণত পাওয়া যায়। যদিও বার্গমানই এইদিকে দর্শকদের মনোযোগ প্রথম আকর্ষণ করেছিলেন, তবু মায় জেতারলিংই সেই সমস্যাটিকে বলিষ্ঠভাবে স্থাপিত করেছেন, যেখানে পুরুষই নারী জাতির সব সমস্যা যন্ত্রণা ও বিফলতার কারণ। তাঁর পরিচালিত 'লাভিং কাপলস' (১৯৬৪) ও 'নাইট গেমস (১৯৬৬), সুইডিশ চিত্র জগতে যদিও বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, ইতালী ও আমেরিকায় চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের অনুমতি পায়নি। তাঁর যে ছবিটি সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে, তার নাম 'দি গার্লস'। ছবিটি বেশ হাল্কা ও উপভোগ্য।

শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত

[আলোকচিত্রগুলি চিত্রপরিবেশক Saurbrews Films এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

মোরারজীর দাওয়াই

ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই একটি নতুন দাওয়াই দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন। দেশের নৈতিক জীবনের পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি অবিলম্বে মাদক দ্রব্য বর্জনের সুপারিশ করেছেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য সাত বছর সীমা নির্ধারণের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। মাদক দ্রব্য বর্জন না করলে গান্ধীবাদী হওয়া যায় না। শ্রীমোরারজীর মতে দেশের মানুষকে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী হতে হবে। তা না হলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না! মাদক দ্রব্যের বর্জন কিভাবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত তার কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। পৃথিবীর যে দেশগুলি সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বা হতে যাচ্ছে বলে দাবি করছে সে দেশগুলিতে সবাই মদ্য পানের সমর্থক। এর ফলে সে দেশের অধিকাংশের নৈতিক জীবন অধঃপতনের পথে গিয়েছে বলে এমন শুনিনি। মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য সারা দেশে প্রায় ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষয় হবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ২০ কোটি টাকা সরকারী রাজস্ব কমে যাবে। অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশাই যাঁর মতে মজুরি সংকোচনই হোল মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা, তিনি কিন্তু মাদক দ্রব্য বর্জনজনিত যে ঘাটতি রাজ্য সরকারগুলির হবে তা পূরণ করে দেবার ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া মাদক দ্রব্য বর্জন করার প্রস্তাবটি পেশ করা ছাড়া গোয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আর কিছু করার মত কাজ ছিল না। কিন্তু সরকারী নেতারা যেটা ভাল মনে করবেন, তাই দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে হবে এবং বিদেশের কাছে ভারতকে হাস্যাস্পদ করতে হবে। এটা কি গণতন্ত্রসম্মত?

মদ্যপান দোষের তখনই হয় যখন মানুষ সে নেশায় অপ্রকৃতস্থ হয় এবং যা খুশি তাই করে। কিন্তু এটা বন্ধ করার উপায় নিষেধাত্মক ব্যবস্থা নয়। কারণ, আইনের [illegible] রাতের অন্ধকারে যারা ক্লেদাক্ত জীবনযাপন করবেই তাদের সংযত করার ক্ষমতা সরকারের নেই। বরং মাদক দ্রব্যের উপর আরও বেশী করে কর ধার্য করা যেতে পারে। যাঁরা মদ্যপান করবেন তাঁদের চূড়ান্ত হারে এত বেশী কর দিতে বাধ্য করা দরকার যে তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মদ্যপানের পরিমাণ কমে যাবে। অথচ তার ফলে সরকারী রাজস্বের বিশেষ ঘাটতি হবে না। কিন্তু মাদক দ্রব্য বর্জন নীতি গৃহীত হলে বিদেশী যাঁরা আমাদের দেশে বেড়াতে আসবেন, তাঁদের মদ্যপান করতে দিতেই হবে। তার ফলে মাদক দ্রব্যের সরবরাহ সব সময়েই দেশে থাকবে এবং তার পরিণতি হিসাবে চোরা-কারবার চলতে থাকবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যখনই কোন ভোগ-সামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, তখনই নিয়ন্ত্রিত সামগ্রী নিয়ে চোরা-কারবার এবং বে-আইনী ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়েছে। সরকার কি তার প্রতিরোধ করতে পেরেছেন? অনর্থক সরকারী রাজস্বের একটি বিরাট উৎসকে এভাবে নষ্ট করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনে সরকার কিভাবে এগোবেন তা বোঝা যাচ্ছে না। মদ্যপান দোষের স্বীকার করি, যদি তা মানুষকে নীতি বিগর্হিত কাজ করার প্ররোচনা দেয়।

শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মাদক দ্রব্য গ্রহণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মানুষ নিজেই অবহিত হয়। সময়-সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়ে কু-অভ্যাস বর্জন করানো যায় না—এটা শ্রীমোরারজীর বোঝা উচিত ছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনা নিয়ে হতাশা

জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া কোন সরকারী পরিকল্পনার কাজ এগোতে পারে না। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে জনসাধারণের দিক থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পরিকল্পনা নিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে সাধারণ মানুষের মনে পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা ঠিক, যদি জাতীয় আয় শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে ছয় ভাগ পর্যন্ত প্রতি বছর বাড়াতে হয়, তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ১৫০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৭৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় ভারত সরকারের পক্ষে ১২০০০ কোটি টাকার বেশী বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে না বলে মনে হচ্ছে। যদি বিনিয়োগের পরিমাণ কম করা হয়, তবে জাতীয় আয় শতকরা পাঁচ ভাগ করে বাড়ানো সম্ভব হবে না। যতটা জাতীয় আয় বাড়বে, তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভোগজনিত ব্যয়ের রূপ নেবে। কিভাবে যে শেষ পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনা তৈরী হবে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিষদ (National Council for Applied Economic Research) একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বার্ষিক গড়পড়তা হার হবে ৩·১ শতাংশ এবং এর পরবর্তী পাঁচ বছরে এই হার গিয়ে দাঁড়াবে ৪·২ শতাংশে। অর্থনীতির সমৃদ্ধির হার বৃদ্ধি সম্পর্কে পরিষদ বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে বিনিয়োগ করা কঠিন।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলম্বে দূর করা দরকার। অধ্যাপক গ্যাডগিল বলেছেন, যে অবস্থারই সৃষ্টি হোক না কেন, চতুর্থ পরিকল্পনা আসছে বছর ১লা এপ্রিল থেকে চালু হবেই। পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ জানুয়ারী মাসেই দেখা যাবে আশা করা যায়।

আর ইস্পাত কারখানার প্রয়োজন নেই

চতুর্থ যোজনা পর্যন্ত নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন নেই বলে পরিষদ মত প্রকাশ করেছেন। পরিষদের সমীক্ষায় দেখা যায়, বোকারো ইস্পাত কারখানা সমেত অন্যান্য ইস্পাত কারখানায় বর্তমানে যে পরিমাণ ইস্পাত তৈরী হচ্ছে, তা ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত অনুমিত চাহিদা মেটানোর পক্ষে পর্যাপ্ত। পঞ্চম পরিকল্পনায় অন্তত পক্ষে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন হবে। তবে অবিলম্বেই বর্ধিত হারে প্লেট উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। যাঁরা চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে আরও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে চান তাঁদের যুক্তি বর্তমান অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতে তৈরী ইস্পাত যতটা দেশেই ভোগ করা হবে বলে ধরা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। সাম্প্রতিক শিল্প-মন্দা এই চাহিদা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ। তবে গত দুই বছরে ইস্পাতের রপ্তানি থেকে ভারতের আয় বেড়েছে।

আমাদের দেশের রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁরা মনে করেন, শুধু ইস্পাত কারখানা তৈরী করতে পারলেই দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থার অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই ভাবেন না। ভারতের ইস্পাত শিল্পের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে দাম নির্ধারণ সম্পর্কিত। তার উপর নূতন সমস্যা হচ্ছে চাহিদার হ্রাস নিয়ে। এ সমস্যাগুলোর মোকাবিলা না করা পর্যন্ত শুধু ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কর্মসূচী প্রস্তুত করায় কিছু লাভ আছে কি?

সুব্রত গুপ্ত

প্রমথ চৌধুরী—ভাষা ও শৈলী

প্রমথ চৌধুরীর জন্ম পাবনায়। তিনি নিজেকে পদ্মাপারের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি 'বাঙাল'। অথচ তিনিই বলেছেন যে তাঁর কথ্য ভাষা কৃষ্ণনগরের (কেষ্টনগর) নদীয়ার। এটা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে কিন্তু বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—এমন কি অন্যান্য হিন্দু এবং কিছুটা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানও—আপন আপন পরিবারে শিক্ষিত সমাজে যে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন সেটি আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত। বারেন্দ্রভূমি ও তার সংলগ্ন অঞ্চলবাসীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ে যে ভাষা প্রচলিত হয় সেটা পদ্মার এপারে—মুর্শিদাবাদ জেলায়—যে ভাষা বলা হয় তার খুবই কাছাকাছি। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে পদ্মার এপার ওপারে নিত্য দিনকার [illegible] ব্যবসা বাণিজ্য হত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাববিনিময়ও।

বারেন্দ্রভূমির শিক্ষিত সম্প্রদায় আজো যে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন তার জন্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরাই দায়ী। এঁদের অনেকেই প্রচুর বিত্তশালী ছিলেন বলে সঙ্গীত-শিকার ও অন্যান্য ব্যসনেরও প্রচুর চর্চা করেছেন। প্রসিদ্ধ শিকারী কুমুদ চৌধুরী প্রমথর ভ্রাতা। শুনেছি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার নাটোরের প্রখ্যাত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় সঙ্গীতের পারদর্শী (১) 'মানসী ও মর্মবাণী' মাসিকের সম্পাদক ছিলেন) মোগলদের সঙ্গে একদা প্রচুর দহরম মহরম করেছিলেন। তাই বারেন্দ্রদের ভাষায় বেশ-কিছু আরবী-ফারসী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রমথ চৌধুরী সে-সম্বন্ধে অন্য যে-কোনো লেখকের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন ছিলেন। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'বমালসুদ্ধ ধরা পড়িলাম'। আরবীতে 'ব'—সঙ্গে সহিত, সুদ্ধ, with (আর ফারসীতে, বে—without, যেমন 'বেআদব', 'বেপর্দা' ইত্যাদি); তাই আমরা লিখি 'বকলমে কৃষ্ণচন্দ্র', অর্থাৎ কেউ বলে গেছে আর কৃষ্ণচন্দ্র বকলম=কৃষ্ণচন্দ্র with his pen সেটি লিখেছেন। এ স্থলে তার সঙ্গে 'ব'—with যখন রয়েছে তখন 'সুদ্ধ'র কি প্রয়োজন? আমরা তো 'ব-হাল তবিয়ৎ সুদ্ধ আছি' বলি না। তাই হয় হবে, 'বমাল ধরা পড়িলাম' নয় 'মালসুদ্ধ'; 'বমালসুদ্ধ'-এ আমরা withটা দুবার পাচ্ছি। কবিগুরুর বেলা এটি অবশ্যই আর্ষপ্রয়োগ। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী অতি সাবধানে 'বমাল' লিখেই ক্ষান্ত দিতেন, সঙ্গে 'সুদ্ধ' প্রয়োগ করতেন না। (২)

প্রমথর পিতার জমিদারী পাবনাতে ছিল বটে কিন্তু কৃষ্ণনগরের সঙ্গে এ-পরিবারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। আর কৃষ্ণনগরে বারেন্দ্রদের প্রাধান্য আছে—অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। বারেন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরে (তাঁর পিতা সেখানে কৃষ্ণনগর মহারাজের দেওয়ান ছিলেন) এবং তিনি বাঙলা ভাষা নিয়ে কী ভেল্কি বাজি দেখিয়েছেন সে-কথা বাঙলা প্রেমী মাত্রই জানেন। এঁর হাসির গান শ্যামপেনের বুদ্বুদে ভর্তি, স্বতঃস্ফূর্ত, চটুল, সাবলীল—বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতার কোনো চিহ্ন সেখানে নেই। ওদিকে তাঁর দেশ-পূজার গানে কী গাম্ভীর্য, কী দার্ঢ্য, কী চিত্তোন্মাদকতায় পরিপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরী সত্যই কৃষ্ণনগরের ভাষা নিয়ে গর্ব অনুভব করার হক্ক ধরতেন।

ওদিকে প্রমথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজিতে এম এ পরীক্ষায় প্রথম হন। তাঁর ইংরিজি এমারতের বুনিয়াদ তিনি করেন এ-দেশে; বিলেত গিয়ে তার উপর মিনার, গম্বুজ নির্মাণ করেন, দেয়ালে ফ্রেসকো আঁকেন, মেঝেতে রঙ-বেরঙের পাথর দিয়ে মোজাইক।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি মোটেই অবহেলা করেননি; তাই হাল্কা, সলীল চলতি ভাষা লেখার সময় প্রয়োজনমত সংস্কৃতের শব্দ ভাণ্ডার থেকে অনায়াসে—যেন অবহেলা ভরে—শব্দ তুলে নিয়ে যৎপ্রয়োজন তাঁর ভাষাকে দিতেন প্রসাদ গুণ, দার্ঢ্য।

সচেতন চিন্তাশীল বাঙালী লেখক মাত্রই কামনা করে সেই ভানুমতী আয়ত্ত করতে যার প্রসাদাৎ এ-দুয়ের সমন্বয় ঘটে।

*

কিন্তু তাঁর উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য। ফ্রানসে তিনি বেশী দিন বাস করেন নি—মাক্‌স্‌ ম্যুলার ভারতে না এসেও তাঁর যুগের সর্বোৎকৃষ্ট ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ রূপে প্রখ্যাত ছিলেন—তাঁর গভীর ফরাসী জ্ঞান তাঁর আপন স্বাধ্যায়মন্ত্র সাধনালব্ধ। এই বিরাট ভুবনে কত না ভাষা, কত না তার মুদ্রিত পুস্তক। সংখ্যাতে ফরাসী বইয়ের সঙ্গে সক্লেশে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র বটতলা এবং তালতলার ফার্সী উর্দু বই। প্রমথর যুগে ফরেন এক্‌শ্‌চেন্‌জ নামক 'গন্ধবযন্তনা' তথা আজকের দিনের ভয়ালতর 'গন্ধবযন্তনা'—ফরেন বুক সেলার—ছিল না। তাই তাঁর প্রাইভেট লাইব্রেরি বিশ্বভারতীর ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া সাহেবের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল। এ বাবদে তাঁর সহধর্মিনী ছিলেন সত্যই সহধর্মিনী। তিনি উত্তম ফরাসী জানতেন এবং বেনওয়া সাহেব আমাকে বলেন ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের নটেশনের তাঁর যা সঞ্চয়ন সেটি অতুলনীয়। ভাগ্যিস প্রমথ শতায়ু হন নি। নইলে তাঁর এই শতবার্ষিকী বৎসরে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় আত্মহত্যা করতেন—বিদেশী পুস্তকাভাবে। পুস্তক ছিল তাঁর অন্নজল। অন্নাভাবে দুঃখী আত্মহত্যা করলে কোনো কোনো

---

(১) হয়তো নিছক গল্প:—একদা রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে অনুরোধ করলে তিনি লক্ষ্য করলেন জগদিন্দ্রনাথের দিকে বাঁয়া-তবলা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একটু ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে বললেন 'আপনার সঙ্গে আমি পাল্লা দেব কি করে'। মহারাজ একটু মৃদু হাসা করে বলেন, 'আপনি জানেন না মশাই, আমি বেতালসিদ্ধ (বে-তাল সিদ্ধ)।'

(২) 'ব' এবং 'বে' তথা অন্যান্য যাবনিক শব্দের জন্য সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অতি উৎকৃষ্ট কোষ প্রকাশ করেছেন। ডকটর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল (কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক), 'বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ', বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৯৬৭।

সজ্জনের সহৃদয় দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু পুস্তকাভাবে যারা আত্মহত্যা করে বা মরে বা জীবন্মৃত হয়ে থাকে তার খবর নেয় কে? এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মৃত্যুর চেয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকাটা তিক্ততর—

"ডাক্তারেতে বলে যখন 'মরেছে এই লোক'
তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,
কিন্তু যখন বলে 'জীবন্মৃত'
সেটা শোনায় তিতো।"

ইয়োরোপীয় ভাষার উজ্জ্বল নীলমণি ফরাসী ভাষা—ফরাসী গদ্য। বহু মনীষীর দীর্ঘ একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে আজ ফরাসী গদ্য এমন জায়গায় এসেছে যে স্বচ্ছতা, সরলতা, কঠিন বিষয়বস্তু সহজ করে প্রকাশ করার ক্ষমতাতে আজ সে অদ্বিতীয়। ফরাসী আলঙ্কারিকের মুখে সদাই এক বুলি : 'ক্লারতে, ক্লারতে,—তুজুর লা ক্লারতে। এই 'ক্লারতে' কথার অনুবাদ করা বড় কঠিন : সহজ, সরল, আলোকিত, স্বচ্ছ আরো অনেক-কিছু। ইংরিজি কোষকারও হিমসিম খেয়ে লিখেছেন; লাইট, ব্রাইটনেস, সিমপ্লিসিটি, পারসপিক্যুয়িটি, ক্লিয়ারনেস, splendour। ফরাসী গুণীর আদর্শ 'স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা—অলওয়েজ স্বচ্ছতা। জরমনরা ভিন্নধর্মী। নিজেদের নিয়ে তারা নিজেরাই ঠাট্টা করে বলে 'জিনিসটা জটিল করতে পারলে সেটাকে সহজ করতে যাওয়া কেন?

❀

প্রমথ ক্লারতে মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাঙলা ভাষাকে কি করে আরো স্বচ্ছ আরো আলোকিত করা যায়, কি করে তাকে সর্ব জটিলতা থেকে মুক্ত করা যায় সেই ছিল তাঁর আদর্শ।

প্রিয়মুখচন্দ্র দেখার পর বিদ্যাপতি গেয়েছিলেন, 'দশ দিশ নির্দ্বন্দ্ব হল।'

ভাষাকেও নির্দ্বন্দ্ব করে তুলতে হয়—কোনো বাক্য যেন দ্ব্যর্থক না হয়।

ফান্দা বা Knot-এর কাজ
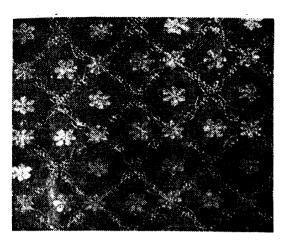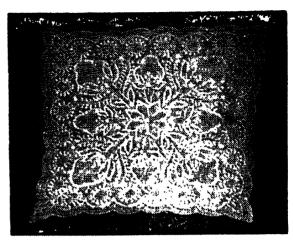
জালি মুররি মিনে হাত কাঠি

সাফিয়া সুলতানার শিল্প

লক্ষ্ণৌ শহরটি রামানুজ লক্ষ্মণের লক্ষ্মণপুরী কিনা তা' নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু ভারতীয় কৃষ্টির ঐতিহ্যতে যে লক্ষ্ণৌ-এর স্থান উচ্চে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে কৃষ্টির অনেকটাই মুসলমান নবাবদের দান। সেই নবাবী আমলের রূপরসবোধের প্রচুর প্রমাণ আজও শহরটির শিরায় শিরায় বয়ে চলে। তার একটি সেখানকার চিকনকারী। কবে কিভাবে এর জন্ম জানি না, যদিও জন্ম নিয়ে গল্প আছে মজার মজার। এক খেয়ালী নবাব নাকি বয়স্যকে ডেকে বলেন, সময়ে বেলা চামেলী তো মৌসুমী আয়োজন আমার চাই বেমৌসুমের বেলা চামেলী? বয়স্য বললেন, 'জী হুজুর, এ আর বেশী কথা কি। হুকুম তামিল করে দেবে তাঁবেদার। দিন কয়েক পরে এসে গেল কুর্তা। নরম মলমলের গায়ে বুটি তোলা বেলা চামেলি শিল্পচাতুর্যে প্রায় আসলের ছবিটির মত। নবাব খুশ হলেন, তাঁবেদার পেল ইনাম আর ঐতিহ্যের পাতায় লেখা হলো নূতন শিল্পের নাম 'চিকনকারী'! গল্পটি বেশ জমজমাট। তবে গল্পই। কতটা সত্য তার সন্ধান মেলেনি। একটি বন্ধু কিন্তু একবার বলেছিলেন, তাঁরই এক পূর্ব পুরুষ সূচনা করেন এই শিল্পের। সেই শিল্পীর নাম ছিল চাক্কান সাহেব। চাক্কান সাহেবের নাম থেকে নাম হলো চিকনকারী। এও গল্পই হয়তো। তবে অনেকেই মনে করেন চিকন কথাটি এসেছে একটি ফার্সী কথা বা শব্দ থেকে। সেই শব্দটির অর্থ হাতের কাজ বা শিল্প। এখন চিকন কথাটি আমাদের আটপৌরে ঘরোয়া শব্দ। লক্ষ্ণৌ-এর নবাব আসিফউদ্দৌলার আমলে, এমন কি তার আগের কোনও নবাবী পৃষ্ঠ-পোষকতায় চিকন শিল্পের সম্ভবত শুরু হয়। রসিক নবাব ওয়াজিদ আলি শার সময় হয়েছিল তার বিশেষ বিকাশ। লক্ষ্ণৌ আর্ট গ্যালারিতে নবাব ওয়াজিদ আলির একটি চিত্র আছে। তাতে পরনে তাঁর অপূর্ব অঙ্গ রাখা। তার উপর সূচি-শিল্পের যে অদ্ভুত অঙ্কন তা চিকনকারী, লক্ষ্ণৌ-এর একান্ত নিজস্ব শিল্প। রহস্যে, রোমাঞ্চে ভরা অতীতের এই এতটুকুই আজ বোঝা যায়, কিন্তু সৃষ্টির পথে তাতে বাধা হয় না। আজও লক্ষ্ণৌ-এর মেয়েরা রচনা করেন নিপুণ হাতে বেলা আর চামেলি। নবাবী অঙ্গরাখার বদলে যায় বিদেশে, আনে সংবাদ কদরদাঁদের। সেই কদরদাঁ বা মর্যাদাদানকারীরা দেয় আজকে আমাদের যার প্রয়োজন "বৈদেশিক মুদ্রা"! দেশেও আসমুদ্র হিমাচলে চলন হ'য়েছে চিকন-কারীর কুর্তা, শাড়ি, মেজপোষ আর রুমালের। ভাবনা কিসের? এও তো সংস্কৃতির আদান প্রদান। এও আমাদের একাকার হবার এক পথ। বৈদ্যবাটির বামুনদিদি আর লক্ষ্ণৌ-এর সাফিয়া সুলতানার মিলও এখানে। বামুনদিদি ভাঙ্গা মাটির হাঁড়িতে ধান সিদ্ধ করতে করতে কাঁথায় যে ফুল তোলেন সেখান থেকে সোজা পথে আমরা সাফিয়া সুলতানার সংসারে চলে যেতে পারি যেখানে কালো বুরখার আড়ালে সেও শিল্পী।

সাফিয়ার কাছে পৌঁছোনো সহজ কিন্তু সাফিয়া সহজে ঘরের কথা বলতে চান না। সাফিয়ার মত আরও অনেক মেয়ে আছেন লক্ষ্ণৌতে। আমার বন্ধু পা' সাহেব তো বলেন কত যে শীসমহলের সুন্দরী আছেন যাঁরা এই শিল্প অবলম্বন করে জীবিকা উপার্জন করেন তার সীমা সংখ্যা নেই। কৌতুহল হলো শীসমহলের সুন্দরীর কথা কেন উল্লেখ করলেন তিনি। —শীসমহল মানে নবাবী খানদানের মেয়েদের কথা বলছি। যাদের স্থান এককালে ছিল শীসমহলের শৌখীন বিলাসে। সাফিয়া সুলতানা অবশ্য গৃহস্থ কন্যা। অনেক অনুনয়ের পর সজল চোখে যা দু কথা বললেন তা গৃহস্থ ঘরের সুখ দুঃখের কাহিনী। কথা বলতে কথা তার বেধে যাচ্ছিল। মুখের উপর
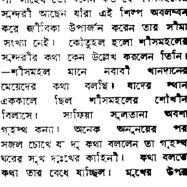
টানা সূক্ষ্ম আবরণ বস্ত্র জলে ভিজে যাচ্ছিল। এই তো সেদিন তার যুবতী কন্যা ইহলোক ত্যাগ করে গেছে। কত কষ্ট করেই না তাকে সাফিয়া মানুষ করেছিল, এই চিকনকারীর একটি একটি ফুলে পাতায় তা লেখা হয়েছে। সপ্তদশী সাফিয়া অনেক আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনেক রঙীন স্বপ্ন নিয়ে সংসারে প্রবেশ করে-ছিল। বছর দুই যেতে না যেতে স্বামী হলেন বিকৃত মস্তিষ্ক। উপার্জনের অন্য পথ নেই। হাতের কাজে আগ্রহ ছিল তার। চিকনকারীর ফুল তুলে দু পয়সা আয়ের সন্ধান করতে হলো। সেই উপার্জনে একমাত্র মেয়েকে মানুষ করেছে। স্বামীর অল্পবিস্তর চিকিৎসা করেছে। যে চিকনকারী বালিকা বয়সে ছিল শখের সাধনা তাই হয়ে উঠলো একমাত্র শান্তি, একমাত্র অবলম্বন আর একমাত্র সান্ত্বনা। ঘরে মা, শ্বাশুড়ী সবাই জানতেন চিকন কাজ। তাঁরাও তালিম দিলেন তাকে। তালিমে আর সাধনায় সেজে উঠলো বকমারী সব শিল্প স্বাক্ষর। তার মেয়েও আট বছর বয়স থেকে চিকনকারীর কাজ শিখেছিল। সেও জানতো এ শিল্পের মর্মকথা; যেমনটি

বাখিয়া বা Shadow Work

মুরির, বাখিয়া জালির কল্কা

জানতেন তার ঠাকুরমা। লক্ষ্ণৌ শহর সাফিয়ার আপন। অন্য পরিবেশ সে জানে না। ভালবাসে লক্ষ্ণৌকে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় আরও দু পয়সা বেশী পেলে বুড়ো বয়সের সাহারা মিলতো। কে যেন বলছিল বোম্বাইতে বেশী পয়সা মেলে। পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে সাফিয়ার. এককালে পয়সার প্রয়োজন জীবনে এত বড় হয়নি, অল্প আয়ে মানুষ বাঁচতে পারতো। এখন সব ভালবাসা, সব আকর্ষণকে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে অর্থের অভাব। সাফিয়া সুলতানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন। ঝর ঝর করে চোখের জল শীর্ণ হাতের উপর গড়িয়ে গেল কয়েক ফোঁটা। একমাত্র সন্তান গেছে, সব গেছে তবু পোড়া পেটের জ্বালা যায়নি।

এককালে সাফিয়ার মত মেয়েরা আরও অনেক কম উপার্জন করতো। অনেকেই পর্দানশীন। কাজেই অন্যের হাতে বাইরে পাঠিয়ে আবার বিক্রির ব্যবস্থা করতে হতো। শীসমহলের মেয়েরা তো এত গোপন রাখতে চাইতেন এই আয়ের পথটুকু; কোথায় যেন তাদের মর্যাদায় বাধতো। তাই ব্যবসায়ীরা বেশ অল্প স্বল্প দিয়েই আদায় করতেন সুন্দর সব হাতের কাজ। তার উপর মহাজনের মামলা তো ছিলই। মূলধন নেই, সুতো কাপড় ইত্যাদি যোগান দিয়ে জমিয়ে বসতো তাদের দল। পারিশ্রমিকের বেলায় তারা অসহায়, অল্প এই মেয়েদের দিত সামানাই। ঠিক এমন করেই পল্লী অঞ্চলে মহাজনদের কেনা আলুবেগুনের ক্ষেত দেখেছি, তাঁতির ঘরে শাড়ি দেখেছি। পয়সা বাজারে যা মিলতো মহাজনের তা ছিল একান্তই মধ্যস্থ বা middleman-এর মুনাফা। এখন সরকারী বিভাগীয় ব্যবস্থার কিছু সুরাহা হ'য়েছে। কখনও বা মেয়েরা নিজেরাই দপ্তরে পৌঁছে কাজের ব্যবস্থা করেন, কখনও বা তাদের কাছে কাজ পৌঁছে দেওয়া হয়। তাতে পয়সার দিকে সুবিধা তো হয়েছেই, অন্যভাবেও মেয়েদের কাজ করা সহজ হ'য়েছে অনেকটা। চিকনকারীর কদর বিদেশে খুব। সাফিয়ার হাতের কাজও প্রচুর গেছে বিদেশে। এত দুঃখের মধ্যেও এই কথা বলতে বলতে সার্থকতায় সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল সাফিয়ার বিষণ্ণ মুখখানা। শত দুঃখেও শিল্পীর মন সৃষ্টির আনন্দ ভোলে না।

চিকনকারীর বিভিন্ন সেলাই-এর মধ্যে মুরির, ফান্দা, জালি, বাখিয়া, হোল ও কাট ওয়ার্ক প্রধান। সাফিয়ার ভাল লাগে সবই। আরও সব সেলাই-এর সে নাম করলে—'হাত কাঠি' 'জালি' ইত্যাদি। সব সেলাই-এর মানে বুঝলাম না। হোল আর কট ওয়ার্ক আধুনিক নামকরণ; এসেছে ইংরাজী hole ও cut work থেকে। জালির কাজই সাফিয়ার সবচেয়ে পছন্দ। তার মতে 'জালি' হচ্ছে চিকনকারীর বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য। রাত দিনের শিল্প সাধনায় সে অনেক নূতন নমুনা সৃষ্টি করেছে। গুণীসমাজে সমাদর পেয়েছে। কোন এক বিশেষ প্রদর্শনীতে তার হাতের "হাথি কি কিস্তি" প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। আমার হিন্দী উর্দু বিদ্যায় 'হাথি কি কিস্তি' ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। হাতীর নমুনা আঁকা কিস্তিও হতে পারে আর হাতীর নকশাও হতে পারে। কিন্তু মনে মনে কল্পনা করলাম অপূর্ব এক শিল্পসৃষ্টি, নাম-না-জানা এক গৃহস্থকন্যা তার রচয়িত্রী।

সাফিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ করে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম আমাদের দেশেও মেয়েদের উপার্জন করার প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে। যে শিল্প, যে কৌশল ও নিপুণতা ঘরের কোণের নিশ্চিন্ত নিভৃতে ছিল, তাকে নূতন প্রকাশের প্রেরণা দেওয়া আজ বড়ই প্রয়োজন। সরকারী ব্যবস্থা বাদেও মেয়েরা যদি নিজেরা একত্র হয়ে মূলধন সংগ্রহ, কাজের বণ্টন আর বিক্রির আয়োজন করতে পারতেন তবে কতই না সুবিধা হতো। কাঁথার কাজ, বড়ি, আচার তৈরি থেকে নিয়ে আলপনা আঁকা পর্যন্ত উপার্জনের পথ হয়ে উঠতো অনায়াসে। বিনামূল্যে পরিশ্রম আমাদের ঘরোয়া শিল্পের ধারা ছিল। সেবার আত্মপ্রসাদ ছিল তার মর্যাদা। এখন যখন প্রয়োজনের তীব্রতা তার চেয়ে বড় হয়েছে তখন মর্যাদার মানও সামাজিক স্বীকৃতিতে পরিবর্তিত হওয়া দরকার। আমার আঙিনায় আলপনা যদি প্রতিবেশী বন্ধু এঁকে দেন তার সামান্য দক্ষিণায় দোষ কি? পাশ্চাত্ত্য সমাজের হৃদয়হীন অর্থভিত্তিক আদান-প্রদান হতে হবে তা বলছি না কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা করে, সৌজন্য বজায় রেখে প্রয়োজনের জন্য সামান্য অদলবদল কি সম্ভব না?

শ্রীমতী

ম্যাক্সম্যুলর ভবনের সৌজন্যে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে সম্প্রতি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর খ্যাতনামা কয়েকজন জার্মান শিল্পীর রচনার প্রতিলিপি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ জন্য জার্মান আর্ট কাউন্সিল জার্মানি, ইংলণ্ড, ইতালি ও আমেরিকার বিভিন্ন চিত্রশালা থেকে ১২ জন স্বনামধন্য শিল্পীর মোট ৪০টি নিদর্শন নির্বাচন করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের অপূর্ব মুদ্রণ কৌশলগুণে এগুলির মধ্যে শিল্পীদের মৌলিক অংকনরীতির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় অবিকলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই প্রদর্শনী থেকে তদানীন্তন জার্মান শিল্পকলার ধারা ও রচনারীতি, বিশেষ করে তাঁর বিষয়বস্তুর সূক্ষ্মতম অংশের প্রতিও শিল্পীদের মনোযোগদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতির ফলে পঞ্চদশ শতকে জার্মানীতে কয়েকটি শহর প্রাধান্য লাভ করে ও সেই সঙ্গে শিল্পপ্রেমিক এক ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কলোন, অগসবুর্গ ও ন্যুরেমবুর্গ শহর চিত্রকলা চর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে, ও তৎকালীন শিল্পীদের মধ্যে লোখনার প্রসিদ্ধিলাভ করেন। জার্মানির তদানীন্তন চিত্রকলা প্রধানত গীর্জাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, এবং প্রদর্শনীতেও বিশেষ করে পবিত্র ম্যাডোনা ও যীশুকে কেন্দ্র করে একাধিক শিল্পীর রচনা দেখা যায়। এগুলির সবই ক্লাসিকধর্মী। বিশেষত, ক্রানাখ, (৪ ও ৭নং), ড্যুরর (৯নং) ও গ্রুণওয়ালিড (১৮নং) তাঁদের আপন আপন রচনার মধ্য দিয়ে এই একই বিষয়বস্তু অপরূপভাবে চিত্রিত করেছেন। ইউরোপের চিত্রকলা ক্ষেত্রে পঞ্চদশ শতক এক যুগসন্ধিক্ষণ, কারণ এই সময়েই রেনেশাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ধর্ম বা গীর্জাকে কেন্দ্র করে একদিন যে শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল এবং যার প্রভাবে এতদিন শিল্পীগণ এক বিশেষ শ্রেণীর রচনা করে চলেছিলেন, এখন তার পরিবর্তে তাঁরা মর্তবাসী মানুষকেই নতুন করে চিনতে শিখলেন ও চিত্ররচনা ক্ষেত্রে তাকেই তাঁরা প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন। এই সময়েই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিকৃতি অংকনের সূত্রপাত হয়।

রাখাল দাসের আঁকা একটি চিত্র নিদর্শন

প্রদর্শনীতে হলবাইন রচিত কয়েকটি অনবদ্য প্রতিকৃতি দেখা যায় (২১, ২২, ২৩, ২৫ ও ২৮নং)। চিন্তাধারা, অংকনপদ্ধতি ও রঙ ব্যবহার প্রণালীর দিক থেকে এগুলি অপরূপ। বস্তুত এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অবান্তর হবে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে অলডোরফার (১নং), হুবার (৩২ নং), উইজ (৪০নং), মিস্টার ডেজ মেরিয়েন লেবেনস বা মাস্টার অব দি লাইফ অব মেরী হিসাবে পরিচিত অজ্ঞাতনামা শিল্পী (৩৯ নং) লোখনার (৩৪নং) ও বাল্ডাং (৩নং)-এর রচনাপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

*

স্খলস্খলন ও বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গবাসীর সাহায্যকল্পে শিল্পী রাখাল দাস চৌরঙ্গীর মোড়ে এক পথপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। রাখাল দাস কলকাতা জাতীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মী—চাকুরিজীবনের দৈনন্দিন কর্তব্যপালনের পরে যেটুকু উদ্বৃত্ত সময় পান সেটুকু তিনি চিত্রচর্চায় নিয়োজিত করেন। শিল্পী ইতিপূর্বেও কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন। তবে উত্তরবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তিনি যে উত্তরবঙ্গবাসীদের দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যমত তাদের সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন সেজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। কলকাতার শিল্পী সমাজের পক্ষ থেকে অনেকেই এই ধরনের কোন প্রচেষ্টার আশা করছিলেন। এক হিসাবে রাখাল দাস তাঁদের মুখরক্ষা করেছেন।

প্রদর্শনীতে রাখাল দাসের প্যাস্টেলে আঁকা কয়েকটি ছবি দেখা যায়। বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রামীন দৃশ্য ছাড়া বন্যাপ্লাবিত দৃশ্যাবিশেষও চোখে পড়ে। দুঃখের বিষয় এগুলি ঘটনাস্থলে রচিত নয়—এগুলি কল্পনাশ্রয়ী। এগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পী বন্যার ধ্বংসলীলা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুই-একটি নিদর্শন ছাড়া এ জাতীয় রচনায় শিল্পী

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেন নি। তবে তাঁর অঙ্কননৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিতে। দু-একটিতে গোপাল ঘোষের প্রভাব থাকলেও শিল্পীর স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য রচনায় এবং মাধ্যম ব্যবহারে তিনি যে সিদ্ধহস্ত তারও প্রমাণ পাওয়া যায়—বিশেষ করে ২৩ ও ২৪নং ছবি দুটিতে। আন্তরিক নিষ্ঠা ও সৎ প্রচেষ্টা সাধারণত জনসাধারণের সমাদর লাভ করে—এ ক্ষেত্রেও করেছে। কলরব মুখরিত রাজপথের বহু পথিক শিল্পীর প্রদর্শনী দেখে মুক্তহস্তে দান করেছেন ও কয়েকজন তাঁর ছবি কিনেওছেন। শিল্পী হিসাবে এটিই রাখাল দাসের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। প্রাপ্ত ও বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই শিল্পী বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। সহৃদয় দেশবাসী হিসাবে দুর্গত দেশবাসীর জন্য এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান।

*

শিল্পী মৃণাল ঘোষ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। উদ্বোধন করেন ফরাসী কৃষ্টি কেন্দ্রের অধিকর্তা মিঃ রবার্ট পিয়ের্ত। মৃণাল ঘোষ তরুণ—টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউটে কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা করে তিনি এখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে কারুশিল্প শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। তাঁর প্রদর্শনীতে চারু ও কারু শিল্পের ৬০টি নিদর্শন দেখা যায়।

মৃণাল ঘোষ যে ঠিক শিল্পী নন সে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। তরুণচিত্তে নানা ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক—তিনি সেগুলিকেই ছবি ও কারুশিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে শিল্পীসুলভ কোনও উচ্চাঙ্গের অবদান প্রত্যাশা করা সমীচীন হবে না। প্রদর্শনী দেখে বোঝা যায় শিল্পীর নিষ্ঠা আছে ও নানাভাবে পরীক্ষা করার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। তবে একটি কথা—অন্তত মনোনয়ন ব্যাপারে তিনি সচেতন হতে পারতেন—অর্থাৎ কয়েকটি নিদর্শন বাদ দিলে প্রদর্শনীটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠত। চিত্রকলা ক্ষেত্রে তেল ও জলরঙ ও প্যাস্টেল ব্যবহার করলেও মনে হয়, তেলরঙ মাধ্যমেই দু-এক স্থলে তিনি রচনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—যেমন ব্যালে (১১ ও ৩৪নং)। দুটিই বিমূর্ত শ্রেণীর। ইমপ্রেশানিস্টিক একটি ছবিও চোখে পড়ে—উই দি থ্রি। পরিকল্পনা ও অংকনরীতির দিক থেকে প্যাস্টেলে আঁকা কম্পোজিশন (৩০নং) উল্লেখযোগ্য। সিরামিক টালি সংস্থাপন পদ্ধতিতে রঙীন ভাঙা টুকরো টুকরো প্লেট বসানো দি সন উইথ মাদার, প্রচেষ্টা হিসাবে মন্দ নয়। তবে এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই বিক্ষিপ্ত নিদর্শন। এগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পীর কর্মস্পৃহা বা শিল্পপ্রেমের পরিচয় পেলেও তাঁর শিক্ষা ও স্থায়ী অথবা ধারা-বাহিক শিল্পচেতনার সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে মৃণাল ঘোষ কারুশিল্পী। নারকোলের উপরাংশ ও বাঁশ মাধ্যমে তৈরি কয়েকটি জিনিস দেখে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি কাজে ভাস্কর্য কুশলতার ছাপ আছে। এই প্রসঙ্গে

অ্যাকেকশন (কাঠ) ও লাভার (কংক্রীট)-এর নাম করা যায়। মুখ্যত তিনি কারুশিল্পী। নতুন মাধ্যম ও পরিকল্পনাগুণে তিনি যে কারুশিল্পের নানা বিচিত্র ও উপযোগী বস্তু তৈরি করতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

আপন আপন রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের জীবদ্দশায় অনেকে নানা বস্তু সংগ্রহ করে থাকেন। কয়েক ক্ষেত্রে এই সংগ্রহণ ব্যাপার অনেকটা নেশার মত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, সামর্থ্য থাকলেই যে সংগ্রহ স্পৃহা জাগে তা নয়, তার জন্য যেটির প্রয়োজন তার নাম রুচিবোধ। পরলোকগত মিঃ টি লেসলি মার্টিনের সামর্থ্য ও রুচি-বোধ দুইই ছিল। জীবদ্দশায় বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি সংগ্রহ করেন পারস্য দেশের নানা বিচিত্র ও মূল্যবান কার্পেট। সম্প্রতি শ্রীমতী রাণু মুখার্জী এই মূল্যবান কার্পেটসম্ভার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর স্থায়ী গ্যালারীতে দান করেন। বলা বাহুল্য, দর্শক সাধারণের সুবিধার জন্য এই জাতীয় ১৯টি কার্পেট পৃথক পৃথকভাবে রুচিসম্মত অধুনিক কাচের আলমারীতে রাখা হয়। শুধু তাই নয়, কার্পেট বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত একটি ক্যাটালগও এই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

সমস্ত কার্পেটই পারস্যের বিভিন্ন বয়নস্থল—অর্থাৎ, শারুক, খোরাসান, বোখারো, ইসফাহান ও মসলাখানে প্রস্তুত। সূক্ষ্ম বয়নপ্রণালী, স্থায়ীত্ব ও প্যাটার্নের ওপরই প্রধানত কার্পেটের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। গ্যালারীতে একটি কার্পেট দেখা যায়, যার প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ স্থানে অন্তত ৬০০ বয়নগ্রন্থি আছে। অধিকাংশ কার্পেটেই কেন্দ্রীভূত পদক জাতীয় নানা কারুকার্য চোখে পড়ে, তবে বোথারার কার্পেটের সমগ্র স্থানেই সূক্ষ্ম বয়ন কারুকার্যে পূর্ণ থাকে। অধিকাংশ প্যাটার্নই প্রাচ্য ধর্মী। একটি কার্পেটের চারিপাশে কল্কার কারুকার্যও দেখা যায়। মসলাখানের কার্পেটে জ্যামিতিক রেখাবৈচিত্র্য চোখে পড়ে। রঙ, প্যাটার্ন ও বয়ন কুশলতার মধ্য দিয়ে পারস্যের কার্পেটে শিল্পীদের ধৈর্য ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে কাসান সিল্কের একটি কার্পেট সকলের চোখে পড়ে। এটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এক প্রান্ত থেকে দেখলে এর একটি রঙ চোখে পড়ে, আবার অন্য প্রান্ত থেকে দেখলে কার্পেটের অন্য একটি রঙ চোখ ও মন মুগ্ধ করে। দর্শক সাধারণকে একত্রে পারস্য দেশের মূল্যবান কার্পেট সম্ভার দেখবার সুযোগ দিয়ে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ তথা শ্রীমতী রাণু মুখার্জি সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

*

অ্যাকাডেমি পরিচালিত স্টুডিওর সভ্যদের (কনিষ্ঠ দল) সম্প্রতি এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় অ্যাকাডেমিরই একটি গ্যালারীতে। কয়েকজন ছেলেমেয়ের কাজ দেখে মনে হয় যে তারা নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চা করে চলেছে। যাদের ছবি উল্লেখ করার মত তাদের মধ্যে শীলা বসু, প্রদীপ চ্যাটার্জি, শোভনা মিত্র, সুমিত্রা নাগ ও কুসুম শিবস্বামীর নাম করা যায়।

*

এই প্রসঙ্গে প্রেস ফটোগ্রাফারস অ্যাসো-সিয়েশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে আয়োজিত প্রদর্শনীও উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বন্যা ও স্খলন-স্খলন বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের নানা স্থানের ছবি তোলেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়। তাহলেও স্থানাভাবে অনেক ছবি ছাপা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ফটোগ্রাফার দল ঘটনাস্থলে ছবি তোলেন এবং স্থলস্খলন ও বন্যার ফলে কি মর্মন্তুদ ও বীভৎস পরিস্থিতির উদ্ভব হয় প্রদর্শনীর বিভিন্ন ফটোগ্রাফ থেকে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য তারক দাস (অমৃত-বাজার পত্রিকা), বিশু রক্ষিত ও অজিত সোম (আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড) মনা চৌধুরী (টাইমস অব ইণ্ডিয়া) ও সুব্রত পত্রনবীশ (স্টেটসম্যান) সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। জানি না ভারতের অন্যান্য স্থান ও বিশেষ করে রাজধানীর বিভিন্ন পত্রিকায় উত্তরবঙ্গে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার কতটুকু অংশ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং প্রেস ফটোগ্রাফারস অ্যাসো-সিয়েশন অবিলম্বে দিল্লীতে এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

—চিত্রপ্রিয়

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু গত ৫ই অক্টোবর সংখ্যা দেশ পত্রিকায় যা লিখেছেন সে কথা ভেবে বাঙালী পাঠকরা আবার ক্ষতে বোঝার ওপর কল্পিত দুঃখের শাকের আঁটি না যোগ করেন সে সম্বন্ধে ২রা নভেম্বর সংখ্যা দেশ পত্রিকায় এক পাঠিকা তাঁর উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন।

ত্রিশঙ্কুর ওপর শ্রীমতী পুনেকরের অভিযোগ, তিনি (ত্রিশঙ্কু) এক সন্ধ্যার সামাজিক কথোপকথনের ওপর নির্ভর করে এবং তাঁর নিজের মন নিয়ে অপর কয়েক-জনের সুখদুঃখের পরিমাপ করতে বসেছেন। আশা করি এই অভিযোগের পর অপরের সুখদুঃখ পরিমাপ করার জন্য ত্রিশঙ্কু অপরের মন ধার নিতে ছুটবেন না। তা ছাড়া শ্রীমতী পুনেকর এই কথাটা হয়তো উপলব্ধি করতে পারেন নি যে ত্রিশঙ্কু তাঁর "আলোয় কালোয়" লেখার মধ্য দিয়ে কোনও গবেষণালব্ধ তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করেন না। সুতরাং তাঁর পর্য-বেক্ষণ পরিসংখ্যান শাস্ত্রের নিয়মগুলি মেনে চলেছে কিনা এসব প্রশ্ন অবান্তর। যে কথোপকথন নিয়ে লেখিকা প্রশ্ন তুলেছেন সেটি বাস্তবে কোনদিন আদৌ না ঘটে শুধুমাত্র লেখকের কল্পনায় ঘটলেও অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ ত্রিশঙ্কুর উদ্দেশ্য সংবাদ পরিবেশন নয়। এমন অনেক ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে যার তুচ্ছতা হয়তো অনেকেরই মনের বদ্ধ জলাশয়ে বিন্দুমাত্রও আলোড়ন তোলে না কিন্তু কারও কারও মনে চিন্তার কল্পনার ঢেউ তোলে। শিল্পীমানসের দুঃখবোধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করে লেখিকা রসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী।

রসভঙ্গের অত্যাচার আরও অনেক জায়গায়। মীরার ভজন বা গালিবের গজলের বাংলা হয় না এ কথাটা দেশ পত্রিকায়

পাঠক-পাঠিকাদের কাছে হেয়েসি নয়। কিন্তু "এ গানের কোনও হিন্দী অনুবাদ হয় না।" এই কথাক'টির মধ্যে শ্রীমতী পুনেকের "দুঃখবিলাস" বা "ভাবপ্রবণতা" কোথায় খুঁজে পেলেন। যতদূর মনে হয় এই অংশে লেখক মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় ভাব প্রকাশের অসুবিধার কথা প্রকাশ করেছেন। মীরার ভজনে বা গালিবের গজলে যার মনের ভাব প্রকাশ পায়, সেই ভাব বাংলা বুলিতে প্রকাশ করতে হলে তার অসহায়ত্ব আমাদের পীড়া দেবে। তার জন্য প্রয়োজন বাংলা ভাষায় বুৎপত্তিসম্পন্ন গালিব বা মীরার। অবশ্য একাধিক ভাষা যাদের মাতৃভাষা তাদের ক্ষমতার কথা আমার অজানা। রবীন্দ্রনাথের দু'টো মাতৃ-ভাষা ছিলো না। সেজন্যই বোধ হয় তাঁর ইংরাজী গীতাঞ্জলি বাংলা গীতাঞ্জলির পাশে উঠতে পারে নি।

"এইসব নির্বাসিত মেয়েদের মনে কি কোনও অভিমান থাকে না?"—ত্রিশঙ্কু তাঁর লেখায় এই প্রশ্ন রেখেছিলেন। সেই নির্বাসিতদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী পুনেকর জবাব দিয়েছেন "না। একটা বড়ো পার্সেন্টেজেরই থাকে না। কারণ বাংলার বাইরে মানুষ হবার ফলে তাঁরা সব রকম বাঙ্গালীত্বের নস্টালজিয়া থেকে মুক্ত।" কিন্তু একটা ছোট পার্সেন্টেজ যে রয়ে গেল? তাঁদের কথা ভেবে ত্রিশঙ্কু যদি মান অভিমানের ভাব প্রকাশ করেন তাহলে ডেমোক্র্যাসির যুগে "মেজরিটি রুল" অনুসরণ করছেন না বলে ত্রিশঙ্কু নিশ্চয়ই বিচারের বিষয় হবেন না। আমাদের মাথা-ব্যথা সেই "একটা বড় পার্সেন্টেজকে" বাদ দিয়েই।

সুমিত রায়
আই আই টি খড়্গপুর

২

বিগত ১৬ই কার্তিক (সংখ্যা ১)তে লেখার আলোচনা করার চেষ্টায় সুজাতা পুনেকরের পরিচয় পেলাম। সমালোচনা করা কেন দরকার ও কিভাবে করা দরকার, নিজে ঠিক কি চাই—তা সম্যক না জেনে সমালোচনার খড়্গ ধ'রতে গিয়ে নিজেদের শূন্যতা প্রকাশ না করাই ভাল মনে করি।

(প্রসবের পর)—নাড়ি কাটা হ'য়ে গেলেও সন্তানের ওপর মায়ের টান কমে না—অনেক সন্তানই আছেন, যাঁরা মায়ের এ স্নেহের টান উপলব্ধি করেন। যাঁরা এটা উপলব্ধি ক'রতে পারেন না তাঁদের কথা আলোয়-কালোয় আসেনি। এসেছে তাঁদের কথা—যাঁরা বাংলা মায়ের সেই স্নেহ উপলব্ধি করেন, কিন্তু মায়ের কোলে যাবার উপায় পান না।

বাঙালী হ'য়ে নিজেকে বাঙালী ব'লে ভাবতে পারছে না যে দুর্বল—তার পক্ষে, নিজেকে একেবারে ভারতীয় ব'লে প্রচার ক'রতে যাওয়া কতটা শক্ত সেটা জিদ না করে সুস্থির হ'য়ে চিন্তা ক'রলেই বোঝা যায়।

"যদিও এইসব বাঙালী বাংলা বই পড়েন, পুজো সংখ্যা কেনেন, বাংলা সিনেমা এলে দেখতে ছাড়েন না এবং বাংলা গানও গুঞ্জন ক'রে থাকেন"-এ সব যদি লেখিকার নিজেরই প্রত্যক্ষীভূত হ'য়ে থাকে—তাহ'লে মনের গোপনে বাংলার প্রতি প্রবাসী বাঙালীর প্রীতির যে সত্যফল্গুধারা ব'য়ে যাচ্ছে—তার সন্ধান পেতে বেশী দেরী নাও থাকতে পারে—ব'লেই মনে হয়।

আড়াই হাজার বছরের অধিককাল ইহুদীদের রাজ্য ছিল না—তবু তাদের মনের শুভ প্রবাহের কল্যাণে আজ ইস্রায়েলের সৃষ্টি হ'য়েছে। কে জানে কোন ভবিষ্যতে বাংলার প্রবাসী (যাঁরা জোর ক'রে নিজেদের বাঙালী পরিচয়টা গোপন রাখতে চান তাঁরা এবং তাঁদের সন্তানরা সহ) সন্তানরা বাইরের প্রভাব দিয়ে কোমল বাংলাকে কত মহৎ ক'রে গড়ে তুলতে পারেন। বাংলার ঐতিহ্য ও বীর্য বহুযুগ বিস্তৃত। ইতিহাস নিজেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুলে ধরে। আমরা জাতি হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবই।

মাইকেল মধুসূদন সাত সাগর পারের দেশ থেকেও ভুলতে পারেন নি—অতুল-প্রসাদের যাদুভরা বাংলার আকর্ষণ। উদাহরণ ত একটি/দুইটি নয়।

আমাদের সমালোচনা, আলোচনা এবং সর্বাধিক কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলার কি ভাল ক'রতে পারি. আমরা—প্রবাসী বাঙালীরা যদি সে চিন্তা ও চেষ্টা করি ত এ ধরনের সমালোচনার চেয়ে তা' বোধ হয় বেশী আদরণীয় হবে—ঘরের এবং বাইরের সকল বাঙালীদেরই কাছে। আত্মবিস্মৃত হ'লে ততটা ক্ষতি নেই। কিন্তু জেগে জেগে ঘুমোতে গেলে বোধ হয় ভাল সময় হাতের মুঠোয় এলেও চলে যেতে পারে।

দুলাল প্রামাণিক
ভদ্রাবতী (মহীশূর)

সংবাদে শুনিলাম, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীম্যাকনামারা কলিকাতার রাস্তা নিজে ঘুরিয়া দেখিবেন।—"ভালো কথা, কিন্তু শ্রীম্যাকনামারা মনে রাখবেন, কলকাতার

রাস্তা বলতে চৌরঙ্গী আর রেড রোডই নয়"—বলেন সহযাত্রী।

খুড়ো বলিলেন,—"পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা সংবাদপত্রে পাঠ করে মনে হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা নিজরাষ্ট্র নীতিটা জনাব ভুট্টোর আসে ভালো, কথাটা জনাব আয়ুব জানতেন না এবং ভুট্টো নিজেও না।"

পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র বিক্ষোভকারীরা ফেমিলি প্ল্যানিং কমিশনের অফিস ঘরটি জ্বালাইয়া দিয়াছে।—"নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ নয়, অন্যক্ষেত্রে যে-বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল এই মওকায় তাই লেলিহান অগ্নিতে পরিণত হল—বুঝ লোক যে জান সন্ধান"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

গঙ্গার জল লইয়া পাকিস্তান যে জল-কেলি শুরু করিয়াছে সেই খবর শুনিয়া আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"পাকিস্তানীদের মুখে গঙ্গা গঙ্গা শুনে 'ইসলাম ইন ডেনজার' জিগির উঠছে না এটাই আশ্চর্য্য।"

সংবাদে শুনিলাম, একটি রুশ মানচিত্রে পাক কাশ্মীরকে ভারতের অংশ বলিয়া দেখান হইয়াছে।—"সুতরাং দেখ বৎস সম্মুখেতে প্রসারিত তব পাকিস্তান মানচিত্র, করহ সেলাম, বলা হবে না—" বলেন অন্য সহযাত্রী।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ তাসখন্দে ছায়া-চিত্র উৎসব অনুষ্ঠান চলিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"পাক-প্রযোজিত ছায়া (চিত্র) উৎসব "তাসখন্দে বহু আগে থেকেই চলে আসছে!!"

শেঠ গোবিন্দ দাসজী ভারতের কতকগুলি অঞ্চলকে হিন্দী ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন।—"বুঝলাম ভাগটা তিনি শিখেছেন ভালো কিন্তু বিয়োগে নিতান্তই কাঁচা; ফলে আমরা কালনেমির ভাগফল প্রাপ্তির কথা মনে না করে পারছিনে এবং সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কা কাণ্ডের কথা"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

বাস ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বলিয়াছেন—এই দুই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে আর ভরতুকি দেওয়া সম্ভব হইতেছে না সুতরাং ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া আর উপায় নেই। সহযাত্রী বলিলেন —"ঠিক বলেছেন; শুনেছি বাসের লক্ষ্মী-লাভ হচ্ছে সেই যাত্রীদের থেকেই ভরতুকিটা আদায় করা ভালো এবং যাত্রীরাও জানেন সরকারার্থে অজ্ঞ উৎসৃজেৎ!!"

সংবাদে শুনিলাম ভারতের ধূপকাঠি রপ্তানির ক্রমোন্নতি হইতেছে!—"সুসংবাদ; তবে এই সঙ্গে ঘৃতদীপ রপ্তানির ব্যবস্থা হলে অর্থ এবং পরমার্থ দুয়েরই উন্নতি হবে বলে মনে করি"—বলে শ্যামলাল।

নেহেরুজীর ৭৯তম জন্মতিথিতে কলি-কাতায় একটি শিশু উদ্যানের শিলান্যাস করিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন।

সহযাত্রী বলিলেন—"উদ্যানটি অদূর ভবিষ্যতে যাতে সাবালক উদ্যানে পরিণত না হয় সে দিকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে অবহিত হতে হবে এবং সেটাই হবে সত্যিকারের শিলান্যাস!!"

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারা সাইকোলজি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ ব্যানারজী বলেন : প্রত্যেক মানুষেরই পুনর্জন্ম আছে।—"বিষয়টি অত্যন্ত জটিল সুতরাং প্রত্যেক মানুষের পুনর্জন্মের খোঁজ খবর রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেকের মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছি, করছি এবং করব"—বলেন সহযাত্রী।

বিদেশী মুদ্রার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত এম, সি সি-এর ভারত সফর বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বিশুখুড়ো

বলিলেন—"বুঝি বলা যায়, এটি সরকারের একটি গুগলি কিন্তু এই বল ছোঁড়াটা কবে থেকে যে তাঁদের সড়গড় হল তা জানতাম না!!"

১লা অগ্রহায়ণ কবে এই লইয়া নাকি পঞ্জিকারকারদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে।—"তা দিক, ওতে আমাদের কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু আগে তিথি এবং এখন তারিখ নিয়ে টানাটানি শুরু হওয়াতেই অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে অনুরোধ করছি, পঞ্জিকাকার ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখটি নিয়ে যেন আর গণনার খেল' না খেলেন, ওটা সাধারণ মাইনের তারিখ কিনা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

বিশুখুড়ো বলিলেন—"আবহাওয়া দফতর কর্তৃক ঘোষিত ঘূর্ণি ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টি এখনও কলকাতায় হয়নি—যা হয়েছে তা শুধু কনকনে হাওয়া আর ঝির ঝিরে বৃষ্টি। তবে সংবাদ নিয়ে জানা গেল প্রাকৃতিক খেয়ালে সেই ঘূর্ণি ঝড়ের গতি নয়াদিল্লির দিকে চলে গিয়েছে এবং তাতে সামান্য বিপর্যস্ত হয়েছে লোকসভা।"

লোকসভা প্রসঙ্গে মনে পড়িল তুমুল হট্টগোল আর চিৎকারের মধ্যে আচার্য কৃপালনী নাকি দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন : চিৎকার করিয়া কোন সরকারকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। শ্যামলাল বলিল—"কথাটা কয়েক যুগ আগে হলে খাটত, এখন চিৎকারটাই হল একমাত্র মোডাস অপারেন্ডি। এটা সড়গড় করা আর এ বয়সে সম্ভব নয় তাই বলি, আচার্যজী, ইতিহাসটাকে আর বাংকাম প্রমাণ করতে নাই বা দিলেন!!

বিলেতে বাংলা পত্রিকা

পত্রিকাটি হাতে নিলে দুটি বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমত, বিলেত থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা, দ্বিতীয়ত এই পত্রিকায় পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রবাসীরা, যাদের মাতৃভাষা বাংলা তাদের মিলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পত্রিকাটির নাম দর্পণ। সম্পাদকের নাম সুলতান।

বিলেতে বাংলা অক্ষর ছাপা সহজ নয়। সুতরাং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পুরো পত্রিকাটিই হাতে লিখে তারপর মিমিওগ্রাফ করা হয়েছে। আমাদের হাতে এর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি এসেছে। এই সংখ্যায় লিখেছেন ডঃ কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, চামীয়েন, আসাদুজ্জামান, অ্যানাম, সি এম সুলতান এবং সিসেকো। এ ছাড়া এতে আছে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার সাময়িক সংবাদ ও ছবি। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, কথাগুলি মনোযোগ যোগ্য : "মাতৃভাষা বাঙালীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য সে গর্বিত। বিশ্বের অন্যতম ভাষাগুলির মধ্যে একটি—এই বাংলা ভাষা—যার বাহক ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিছক রাজনীতি বা ধর্মের অজুহাত দিয়ে যারা এই ভাষাকে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের পথে তাদের সেই কার্যটি অমানবীয় বর্বরতার পরিচয় হিসেবে স্থান পাবে আগামী কালের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। আজ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। যদিও দুই দেশের মানুষের একই মাতৃভাষা...সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অংশ যেন অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মনে হয়। রাজনৈতিক পার্টিশান বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত করে ফেলেছে। দুই অংশের ভাষা দুই রাষ্ট্রীয় অন্য ভাষার প্রভাব মুক্ত নয়। যেমন ভারতীয় অংশ হিন্দীর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ তেমনি পাকিস্তানের অংশ উর্দুর অত্যাচারে জর্জরিত। আজ থেকে বিশ কিংবা চল্লিশ বছর পর দুই অংশের ভাষা দুটি বিকৃত বাংলা ভাষার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুবে বা কথোপকথনের ভাষায় গিয়ে দাঁড়াবে। আজ এই সন্ধিক্ষণে আমি হিন্দু, আমি মুসলমান বা খৃষ্টান, বৌদ্ধ—এই মনোভাব বিসর্জন দিয়ে বাঙালী মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে। বাংলা ভাষা সমস্ত বাঙালীর মাতৃভাষা, কোনো ধর্মান্ধের বা গোষ্ঠীর একার মাতৃভাষা নয়।"

কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদ ব্যতীত অন্যদের রচনার মান খুব উন্নত নয়, এঁরা

উত্তর বাংলার লেখকদের কাছে আবেদন করেছেন, এঁদের লেখা দিয়ে সাহায্য করতে। যোগাযোগের ঠিকানা, সম্পাদক, দর্পণ : Adelaide Villas, Copse Road, St. John's Woking, Surrey, U.K.

আসামের বাংলা পত্রিকা

শিলচর এবং গৌহাটিতে বাংলা সাহিত্যের আঁচ যে যথেষ্ট রয়েছে শুধু তাই নয়, সেখানে একটি নতুন প্রাণ স্পন্দনও টের পাওয়া যায়। ওখানকার বাঙালী যুবক-যুবতীরা অনমনীয় উদ্যোগে কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন, তার মধ্যে দুটি সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে।

একটির নাম 'সময়,' বড় সাইজের পত্রিকা, শক্ত মলাট, সম্পাদিকার নাম সুমিত্রা দাস পুরকায়স্থ। মলাটেই বলা হয়েছে, "আসামের একদল মায়াময়, বিবাগী, ক্রুদ্ধ, হিপি, চঞ্চল, সংবেদনশীল তরুণ তরুণীর দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন ও চাপা আক্রোশের জীবন্ত অভিজ্ঞতার সুরমালা।" মলাট ওল্টালে পৃথক লাইনেই চোখে পড়ে স্পর্ধিত ঘোষণা "এমন দিন আসছে যখন ব্রীজের কণ্ট্রাকটাররা অবধি কবিতা পড়বে।" লেখক পরিচিতি গুলো বেশ মজার, যেমন, একজন কবি, যিনি পেশায় অধ্যাপক, তিনি "ছেলেদের ধর্মঘটে উৎসাহিত করেন পরীক্ষার খাতা দেখার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবেন বলে।" আরেকজন, পেশায় ডাক্তার, 'ওয়ার্ডে পর্নোগ্রাফী পড়ার মত, সংবাদ-কাগজে জড়ানো কবিতার বই পড়েন সতর্ক ভাবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে।" কবিতা ও সাহিত্যের জন্যে একটা প্রাণপণ জেদী ভাব এঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

এই পত্রিকার লেখক-লেখিকারা অনেকেই কলকাতায় অপরিচিত, কিন্তু এঁদের লেখায় আলাদা ধরনের টাটকা স্বাদ আছে। এঁদের মধ্যে একজন, শান্তনু ঘোষ, যিনি কলকাতায় একটি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁর কবিতার কয়েকটি লাইন :

পাহাড়তলী থেকে নেমে আসছে আস্তে
আস্তে নেপালের
রমনীরা—বেত্রবতী,
আমি চাই তুমি হাততালি দাও, দেখাও
অঙ্গুলি
তুমি (বলো) ঐ যে ঐ যে বাজপাখি
সফল কৃষির মাঠে চাষীরা পিঠ থেকে
ঘাম তুলে নেয়,
আমি চাই, তুমি বলো, ঐ তো, ঐ যে
সুন্দর...

'অতন্দ্র' কবিতার পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন ধরে বেরুচ্ছে। সম্পাদক তিনজন : শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, উদয়ন ঘোষ ও বিমল চৌধুরী। বেশ কয়েকটি তীব্র আবেগময় কবিতা ছাড়াও এতে আছে কয়েকজন বিদেশী লেখক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সামান্য অভিমান। "কবিরা অনেক জাতের হয়—কেউ ষাটের কবি কেউ সত্তরের কবি। অনেক বছর ধরে কবিতা লিখে আমরা টের পেয়ে গেছি যে আমরা ষাটেরও নই সত্তরেরও নই, শুধুমাত্র কাছাড়ের কবি। এবং কলকাতা যেহেতু মনে করে রেখেছেন যে সকলেই কবি নয় কেউ কেউ মফস্বলী এবং ওঁহো আমাদের কাছাড়ের পাঠকরাও অতি চটপট কলকাতার কাগজ পড়ে এসব খবর জেনে যান, অতএব কবিতা জাতীয় এতটা কিছু আমরা নিজেরাই লিখি, গাঁটের পয়সা ছাপি এবং নিজেরাই পড়ি।"

সনাতন পাঠক

মজলিসী গল্প

ঝরাপাতার ঝাঁপি। সাগরময় ঘোষ। আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯। ছয় টাকা।

কিছু মজলিশী গল্প, স্মৃতিকথা আর রঙ্গ-রস-রসিকতার তুফানে ভরে উঠেছে লেখকের ঝরাপাতার ঝাঁপি। গল্প নয় অথচ গল্পের স্বাদে ভরা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী এর উপাদান। ঘরোয়া কথার মেজাজেই লেখক তাঁর সাংবাদিক জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাকে কথাসাহিত্যের স্বাদে গভীর করে তুলেছেন। নিভৃত একটি আড্ডার পরিবেশে যেন কথকের ভূমিকায় বসেছেন লেখক, বসে তাঁর শ্রোতাদের শুধু সরস আলাপচারিতার মধ্যেই তিনি ধরে রাখতে চেয়েছেন।

কিছুটা সেই পরিবেশের নেশায় এবং মূলত হালকা মেজাজের গল্পগুজবের স্বাদে তরতর করে বইটি শেষ পর্যন্ত পড়া হয়ে যায়। অথচ এরই মধ্যে সারাক্ষণ হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই মন কখন অজান্তে ভারী হয়ে ওঠে। চকিত দু' একটি মন্তব্যে পরিহাসে তরল বৈঠকী মেজাজের মানুষটি পাকা-জহুরির মতই লোকচরিত্রের অন্তরতম বিষাদের কেন্দ্রটি আবিষ্কার করে দেখাতে পারেন। ভোম্বলদার পানাসক্তি, চালতাতলির লম্বোদর ভট্টাচার্য এবং তস্য পুত্র স্ফীতোদর, বৃকোদর এবং কৃশোদরের ঔদরিকতার বিস্ময়কর উপাখ্যান, অথবা শান্তিনিকেতনের ইংরেজী অধ্যাপকের ফুটবল খেলার বিড়ম্বনা বা মিটিংবাজ সুধাংশুর নিত্য নূতন পরিকল্পনা—এ সবেরই প্রধান আকর্ষণ হয়ত হিউমার। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রের নানা হাস্যকর অসংগতির আড়ালে যে একটি বেদনার উৎস আছে লেখক তা কখনই বিস্মৃত হতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই ঐই মানুষগুলির সঙ্গে তিনি সহানুভূতি ও মমতার সূত্রে বাঁধা পড়ে গেছেন। ফলে যে অধ্যাপককে নিছক জীবিকার ধান্দায় কখনো ফুটবল খেলোয়াড়, কখনো সাঁতার শিক্ষক, কখনো বা রাইডিং মাস্টার সাজবার ফন্দি এ'টে বেড়াতে হয় তাঁর গল্পের মধ্যে স্যাটায়ারিস্ট সাগরময় ঘোষকেও চিনে নেওয়া যায়।

তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের সরস বর্ণনার মধ্যে নিজেকে নিয়েও রঙ্গ ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি লেখক। সেই সব সরল অকপট কৌতুককর মন্তব্যগুলি সহজেই পাঠককে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। যেমন তোলে বিদেশ ভ্রমণের গল্পের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে তাঁর হিপিদের সম্বন্ধে নানা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী। বিশেষত গৌরাঙ্গ-দেবের ছবির পাশে গেরুয়াপরা মার্কিনী যুবকদের ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচ ও নাম সংকীর্তন আমাদের কাছে এক বিচিত্র আমেরিকার খবর দেয়। যে আমেরিকা অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। যে আমেরিকার তরুণী ন্যান্সি পেট্রল দিয়ে তার স্কার্ট ও ব্লাউজ ভিজিয়ে নিয়ে সারা শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এবং তারপর হাতে রামকৃষ্ণদেবের ছবি নিয়ে ধ্যানতন্ময় চোখে সে এক ঐশ্বর্য ও বিলাসে অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়।

কিন্তু ভারী কথা, দার্শনিক সত্য, উপলব্ধি এ বইয়ে থাকলেও তা প্রাসঙ্গিক। আসলে আগাগোড়া যা এ বইয়ের সম্পদ তা অফুরন্ত কৌতুক। ভোম্বলদার গল্প থেকে দু'-একটা নজির দিই : 'ঈশবস ফেবলস-এর বাংলা কী?' —ভোম্বলদার প্রশ্ন। কী হবে, ঈশপের গল্প? না, এর আসল তর্জমা নাকি 'ঈশব গুল।' তাছাড়া গুল শাস্ত্রের ওপর মৌলিক গবেষণা করে জনৈক ভারতীয়ের বিভিন্ন দেশ থেকে নানা উপাধি অর্জনের 'গল্প সমগ্র'-ও কম উপাদেয় নয়। দেবতাগণ কর্তৃক দেবী দশভুজাকে অস্ত্রদানের মতই এই মহামান্য ভারতীয়কে প্যারিস দিলেন—মঁশিয়ে গুল ফ্রাঁস, ইটালী দিলেন—সিনর গুলোলিনী, জার্মানী দিলেন—হের ফন গুলেনবার্গ, রাশিয়া দিলেন—কমরেড গুলেনকভ, পাকিস্তান দিলেন—গুল মহম্মদ আর মাদ্রাজবাসী ভারতীয়েরা দিলেন—অবিনাশী গুললিঙ্গম। কিন্তু কে এই ভারত-সন্তান? মোক্ষম খবরটি দিলেন ভোম্বলদা সবচেয়ে শেষে। 'তবে শোন। ও'র নাম ডক্টর গুলজারিলাল নন্দা।' এবং থীসিসটা ছাপা হয়েছে এই নামে—'ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'। নিছক হাসি তামাশার মধ্যেও হঠাৎ কোথা থেকে যেন শ্লেষ-বিদ্রূপের গুপ্ত ছুরিটি একবার ঝিলিক মেরে ওঠে।

আর এই সমস্ত জায়গায় সাংবাদিক সাগরময় মাঝে মাঝে রীতিমত ডেঞ্জারাস।

১৮৫/৬৮

ছন্দ আলোচনা

ছন্দ সরস্বতী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অলোক রায় সম্পাদিত। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলি-১২। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অনেকটা ফ্যানটাসির আকারে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ সরস্বতী' রচনাটি ছাপা হয়েছিল ভারতী পত্রিকায় আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। বাংলা কাব্যে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ ও পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এবং এ ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব আজ সাহিত্যের ইতিহাসে তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'ছন্দের রাজা' আখ্যা দিয়েছিলেন, ছন্দ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট মতামত এবং বাংলা কাব্যের আদিযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ছন্দের বিবর্তন ও বৈচিত্র্যের নিপুণ বিশ্লেষণরূপে এই রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত এই কারণে যে, এই আলোচনাটিই রবীন্দ্রনাথকে ছন্দচিন্তায় নতুন করে প্রবৃদ্ধ করেছিল বলে অনুমান করা হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থে এই লেখাটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও সাধারণের পক্ষে মূল লেখাটির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ছিল না। প্রকাশক এবং সম্পাদক রচনাটিকে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করে সেই অভাব পূরণ করেছেন।

৪০/৬৮

প্রবন্ধ

ইতিহাস কী ও কেন। মনোরঞ্জন রায়। অন্নপূর্ণা প্রকাশনী : ১/২ জ্যাকসন লেন, কলকাতা-১। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লেনিনের ভাষায় শ্রীমনোরঞ্জন রায় এখানে 'দরজার পেরেকের মতো-ই প্রাণহীন।' হতেই হবে, কেননা তিনি গ্রীক সভ্যতা থেকে শুরু করে স্পেঙ্গলার এমন কি টয়েনবি পর্যন্ত কাউকে রেহাই দেন নি। ফলে কাকে যে তিনি রেহাই দিতে চান তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। আমরা না-হয় পাকাপোক্ত বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল, ইতিহাস বলতে কেবল আকস্মিকতার স্তূপ ও ভাববাদী ব্যাখ্যাই বুঝে থাকি। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তাত্ত্বিক তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, পৃথিবীময় তার বাস্তব চেহারা কী দেখতে পাচ্ছি আমরা? মহান বিপ্লবী দেশ রাশিয়া আজ আমেরিকার সঙ্গে সমানতালে সাম্রাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত। এই অভিযোগ যে করেছে সেই চীনের সঙ্গে রাশিয়ার এখন প্রায় অহি-নকুল সম্পর্ক। ওদিকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ আরেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর নির্দ্বিধায় চড়াও হচ্ছে। এমন কি ভারতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে তিন পায়াওয়ালা সাম্যবাদী দল। তবু মনোরঞ্জনবাবু এসব কথা স্বীকার করবেন না; কেননা যে ভক্তিবাদ ও ব্যক্তিপূজাকে তিনি অন্যত্র ঘৃণা করেন এক্ষেত্রে তিনি তাতেই আচ্ছন্ন। তাছাড়া, লেখকের বাংলা খুব খারাপ। এই ভাষায় ইতিহাস কী ও কেন শেখানো এক বিড়ম্বনা।

১৪৬।৬৭

প্রাপ্তি স্বীকার

রত্নাকরের প্রেম। নিমাইকুমার ঘোষ। মোহন লাইব্রেরী : ৩৫-এ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬·০০।

তুষারে রোদ। জয়ন্তী সেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩·০০।

চিরকুমারী সংসদ। দিব্যেন্দু গুহ। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ : ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

উইকেট থেকে বাউণ্ডারী। দিলীপ দত্ত। বাক সাহিত্য : ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

ধানের রঙ সোনা। বীরেন চক্রবর্তী। মানস প্রকাশনী : ৬৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·০০।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন কথা (কবিতায়)। শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসঙ্গ মিলনী : কলিকাতা-৪৩। মূল্য ২·৬২।

মুরগী পালন ও চিকিৎসা। অহিভূষণ সরকার। আনন্দ এজেন্সী : ৯৮ নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য ৬·০০।

মহিলাদের আন্তর্জাতিক ফিগার স্কেটিং রিচমণ্ড ট্রফিতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী ব্রিটেনের প্যাট্রিশিয়া ডডস-এর ফিগার স্কেটিং-এর ভঙ্গি। খবর—দক্ষিণ কলকাতার মডার্ন হাইস্কুলে একটি স্কেটিং রিঙ্ক খোলা হয়েছে

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই শীত মরসুমে এম সি সি-র ভারত সফর বাতিল বলেই ধরতে হবে। তবে এখনও বলা যায় না, রাজপুরুষের মতিগতি অনেক ক্ষেত্রে দেবতাদেরও অজানা। ক্রিকেটের রাজতক্তে যারা বসে আছেন তাদের মতিগতি সম্পর্কেও একই কথা। বিদেশী মুদ্রার অভাবে উনিশ শ' ছেষট্টির ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরও তো প্রথমে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। পরে কার্যকরী হয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পুত্র হরিকিষণ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। এবারও বিদেশী মুদ্রার অভাবে সরকার সফর বাতিল করে দিয়েছেন। সরকার সফর বাতিল করেছেন বললে ভুল হবে। সরকার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন, এম সি সি-র সফরের জন্য প্রয়োজনীয় ২০ হাজার পাউন্ড নিদারুণ বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের জন্য মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। সুতরাং বোর্ডের পক্ষে সফর বাতিল করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে ক্রিকেট বোর্ড এখনও হাল ছাড়েননি। বোর্ড সভাপতি শ্রী জেড আর ইরানী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুর করে সফর কার্যকরী করার কাতর আবেদন করেছেন। সে আবেদনের উত্তর এখনও জানা যায়নি। ওই আবেদন সরকার নাকচ করলে আবারও যে চেষ্টা হবে না এমন কথাও বলা যায় না। ঠিক এমনই ব্যাপার ঘটেছিল ছেষট্টির ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রাক্কালে।

তবে বর্তমানে সরকারী সিদ্ধান্ত কিছুটা দৃঢ় বলে মনে হচ্ছে। তার কারণ একাধিক। প্রথমত, বিদেশী মুদ্রার নিদারুণ ঘাটতি, অথচ বিদেশী মুদ্রা ছাড়া বিদেশী দলের সফর সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কারণ, দুই দেশের ক্রিকেট দলের সফর ব্যবস্থায় অর্থ লেন-দেনের ভিন্ন ব্যবস্থা। ওরা এলে আমাদের একটা গ্যারান্টি-মানি (যার পরিমাণ কম নয়) দিতেই হবে। অথচ আমাদের বেলায় ওরা দেবে গেট-মানির একটা অংশ মাত্র। তাতে যেমন আমাদের ক্ষতি অনেক, ওদের লাভ তেমন বিপুল। ইংলণ্ডে ভারতের টেস্ট খেলা দেখতে মাঠে তেমন ভিড় জমে না। গেট-মানি সংগ্রহ হয় কম। আর আমাদের দেশ টেস্ট খেলার নামে পাগল। এক-একটি টেস্ট খেলায় যেমন দর্শক সমাগম, তেমন টাকা-পয়সায় সিন্দুক ভরতি। না হলে উনিশ শ' ছেষট্টিতে ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'লঙ্কা-কাণ্ড' টেস্ট থেকেই খরচ-খরচা বাদে লাভ হয় আট নয় লাখ টাকা? গ্যারান্টি-মানি ছাড়া পুরো টাকা আদায়ের উপর থেকেও বিদেশী দলকে অনেক ক্ষেত্রে একটা মোটা ভাগ দিতে হয়। কিন্তু আমাদের বিদেশ সফরে এ সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত। এম সি সি-র সফর সম্পর্কে ভারত সরকারের অনাগ্রহের তৃতীয় কারণ চুপি চুপি বলি।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ব্যর্থ ভূমিকার পর, বিশেষ করে মেক্সিকো অলিম্পিকের প্রায় সামগ্রিক ব্যর্থতার পর, কোন্ সরকার খেলার মেলার জন্যই বা উৎসাহ বোধ করে? এ ধরনের খেলার মেলায় দেশের ক্রীড়ামান যে বাড়ে না, খানিকটা হই-হুল্লোড় হয়, কর্তৃপক্ষের আত্মপ্রচার ও কাজ গুছিয়ে নেবার সুযোগ ঘটে মাত্র—এ কথাটা এখন অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। ভারত সরকারও হয়তো বুঝতে আরম্ভ করেছেন ধীরে ধীরে।

এই শীতে এম সি সি-র ভারত সফরের কোন কথা ছিল না। ইংলণ্ডের কাজ্ঞা

ক্রিকেটার ডলিডেরাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়, ওকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর চলবে না। সেই কারণে এম সি সি-ও এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করে দেয়। বিকল্পে পাক-ভারত সফরেরও প্রস্তাব পাঠায়। এম সি সি-র টোপ গিলতে পাক-ভারত ক্রিকেট বোর্ড একটুও দ্বিধা করে না।

আমার কথা, প্রায় ৩ মাস আগে এম সি সি যখন ভারত সফরের প্রস্তাব পাঠায় তখনই প্রস্তাব গ্রহণ করার কাঙ্গালপনা না দেখিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সব কিছু ভালভাবে খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। গ্যারান্টি-মানির দাবি সূচনা থেকেই ছিল। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ভারত সফরের সরকারী ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক আছে। ভারতে যে বিদেশী মুদ্রার সঙ্কট চলছে এ কথাও বোর্ড কর্মকর্তাদের অজানা নয়। তাঁরা সফরের টোপ গেলার আগে সরকারের সঙ্গে পরামর্শও করতে পারতেন। কিন্তু সে সব কিছু না করে সফর প্রস্তাব গ্রহণ করে বসলেন।

আবার সরকারের মাথার উপর যাঁরা তাঁদেরকেও বলি, সফর ব্যবস্থার সূচনাতেই তো তাঁরা বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুরের অসামর্থ্যের কথা জানিয়ে দিতে পারতেন। তা হলে এমন তিক্ততার সৃষ্টি হত না। এম সি সি-র পক্ষ থেকে ডোনাল্ড কারকেও ব্যবস্থাটি পাকা করার জন্য ভারতে উড়ে আসতে হত না। এবং ভারত সরকারকে হতে হত না ব্রিটিশ সাংবাদিকদের সমালোচনার সম্মুখীন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, সফর বাতিল হওয়ায় ব্রিটিশ সাংবাদিকদের কলমে বেশ কিছুটা বিক্ষোভের ঝাঁকা কথা।

'টাইমস' পত্রিকার মত বিখ্যাত ব্রিটিশ পত্রিকাতেও লেখা হয়েছে, ক্রিকেট সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ এবং শুভেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ এম সি সি দলের ভারত সফর সম্ভব হল না সরকারের খামখেয়ালীপনায়। জন উডকক টাইমসে এ কথাও লিখেছেন, যারা মনে করে অভুক্ত ও অপুষ্টদের জন্য দেশের প্রতিটি টাকাই ব্যয় হওয়া উচিত তাদের কাছে অবশ্য এটা ঠিক সিদ্ধান্ত। তবে আমার সন্দেহ হয় শ্রীমতী গান্ধীর ক্যাবিনেটে বেশী 'ক্রিকেটার' নেই। শেষকালে লেখা হয়েছে, এই সফর বাতিলে ভারতের ক্ষতি হবে, লাভ হবে পাকিস্তানের।

আমরা জানি, ইংরেজরা ক্রিকেট বা ক্রিকেটার কথাটিকে ন্যায়নীতির দ্যোতক বলে জ্ঞান করে। শ্রীমতী গান্ধীর ক্যাবিনেটে বেশী 'ক্রিকেটার' নেই বলে মন্তব্য করার অর্থ ভদ্রভাষায় বড় গালাগালি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ডেলী স্কেচ পত্রিকার লেখক ব্রায়ান স্কোভেল অবশ্য সফর বাতিলকে দেখেছেন অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি লিখেছেন, ভারত সফর বাতিল হয়ে এম সি সি-র সুবিধাই হল! এখন তারা পাকিস্তানের পূর্ণ সফরে টেস্ট খেলার আগে অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ পাবে। এবং টেস্টের বাইরে বাড়তি খেলোয়াড়দেরও শুধু খেলা দেখে কাল কাটাতে হবে না; কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ নেবারও সুযোগ ঘটবে।

এম সি সি-র ভারত সফর বাতিল হওয়ায় এম সি সি বা পাকিস্তানের লাভে আমাদের হিংসে করার কোন কারণ নেই। বরং যে-কোন দেশের লাভে আমরা খুশীই হবো বেশী। কিন্তু আমাদের সরকার বা ক্রিকেট-সরকারকে কেউ দুয়ো দেয় এটা আমরা চাই না। একটু দূরদৃষ্টি থাকলে এই দুয়োর দায়ে আমাদের পড়তে হত না।

এ ব্যাপারেও আমাদের চেয়ে পাকিস্তান যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তার প্রমাণ বেশী গ্যারান্টি-মানির দাবিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যেই আগামী বছর নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাকিস্তান সফর এবং ১৯৭০ সালে অস্ট্রেলিয়ার পাকিস্তান সফর বাতিল করে দিয়েছে। আমাদের এ দূরদৃষ্টি নেই, এটাই দুঃখের।

*

ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৪—১ খেলায় ভারতকে হারিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখীন। এডিলেডে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া শেষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর।

ভারত ও আমেরিকার আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলার ফলাফলের পার্থক্যটা বেশ চওড়া একথা অবশ্য স্বীকার্য; তবে ভারতের পরাজয়কে ছোট নজরে দেখার যুক্তিটাও গ্রহণীয় নয়। কারণ এই খেলার আগে ইদানীংকালের দিকপাল টেনিস যুবক আরথার অ্যাশ, ক্লার্ক গ্রেবনার ও অন্যান্য সহ-খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে যে সু-ধারণার হিমালয় তৈরী করা হয়েছিল তাতে ভয় হয়েছিল ফলাফল ০—৫ না হয়। এবং ভারত একেবারে ব্যর্থতার পরিচয় না দেয়। তা দেয়নি। কারণ, একক প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণন ও প্রেমজিত সময়বিশেষে ওঁদের প্রতিষ্ঠার কাছেই চলে গিয়েছিলেন। শুধু ডাবলসে ভারত জুটি সুবিধা করতে পারেনি। তবুও তাকে পুরোপুরি শৈথিল্য ব্যর্থতা বলে মানতে পারছি না এই কারণে যে, জয়দীপ সুনামের সঙ্গে খেলতে না পারলেও কৃষ্ণনের চেষ্টায় ভাঁটা পড়েনি। ওরা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ডাবলস জুটির মোকাবিলা করতে নেমেছিল তারা ছিল সম্পূর্ণ পোক্ত এবং টেনিসের উঠতি জুটি।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিস কাপের পূর্ব দ্বন্দ্বের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল বিগত '৫৬তে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে। ভারতের পরাজয় হয়েছিল ১—৪ খেলায়। পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব দিল্লীতে। ভারত হেরেছিল ২—৩ খেলায়। আবার বোম্বাইয়ে দেখা হয়েছিল '৬৩তে। সেবার ভারত একটি খেলাও অনুকূলে টানতে পারেনি।

মাঝে ভারত ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ছেষট্টিতে। '৬৭তে তেমন প্রতিশ্রুতি ছিল না। এবারেও গোড়ার দিকে কৃষ্ণন-জয়দীপ-প্রেমজিতের কেউই বাইরের লনে আহামরি ফলাফল রাখতে পারেননি। এশীয় অঞ্চলে জাপানকে হারিয়ে যখন পঃ জার্মানীর মুখোমুখি, তখন অতি বড় সমর্থকও আশায় বুক বাঁধতে পারেনি। তবু জার্মানীকে হারিয়ে ভারত আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে উঠল। অতঃপর পোর্টোরিকোর-সান জুয়ান শহরের হিলটন হোটেলের মাঠে ভারতের টেনিস রথী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামনে।

আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ বিশেষজ্ঞের বিচারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অ্যামেচার। পেশাদার ও অপেশাদারদের
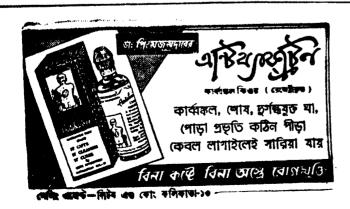
জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে

তরুণ মজুমদারের "রাহগীর" হিন্দীচিত্রে সন্ধ্যা রায় ফটো—দেশ

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে আজ বুঝি আলোর নীচেই অন্ধকার, একদিকে আশা অন্যদিকে আশঙ্কা। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বাংলার জয়বার্তা আবার ঘোষিত। বাঙালী এবং বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পসেবী মাত্রই আনন্দিত। কিন্তু নিয়তির পরিহাস এই, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের আকাশ যখন হতাশা ও অনিশ্চয়তার কালো মেঘে প্রায় আচ্ছন্ন তখনই সারা ভারতে বাংলা ছবির মহিমা আবার প্রতিষ্ঠিত। বাংলার জয়ে আমরা সকলেই আনন্দিত। আনন্দলাভের যুক্তিসঙ্গত অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে। খুশির জোয়ার যে বইছে এবং একটির পর একটি বিজয়-উৎসব বা সংবর্ধনাসভা যে অনুষ্ঠিত হয়েছে তা মোটেই দোষের নয়। কিন্তু উৎসবশেষে যখন আমরা আবার বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছি তখন আমাদের অন্তর ক্ষীণ আশঙ্কায় আবার কেঁপে ওঠেনি কি? উৎসবে-বক্তৃতায় ক্ষণকালের জন্য আমরা যে ভাবনা ভুলে ছিলাম, প্রতিদিনকার পরিচিত কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসে তা আবার ভূতের মত ঘাড়ে চেপে কি বসেনি?

জয়লাভের একটা দায়-দায়িত্ব থাকে। সাফল্য মানুষকে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন করে তোলে। গৌরব অটুট রাখার সংপ্রয়াস যেখানে, বিজয়লাভ সেখানেই সার্থক। বাংলা চলচ্চিত্রের এই যে জয় হল, মহত্তর সার্থকতায় তার উত্তরণ ঘটাতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ, যেখানে অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে চলচ্চিত্রকার ও শিল্পীরা উত্তরোত্তর কৃতিত্বলাভের জন্য সচেষ্ট হবেন। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তেমন অনুকূল কিনা, যেখানে কোন পরিচালক নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্তে কাজ করে যেতে পারেন, তা ভাববার সময় এসেছে।

অনেক প্রশ্ন আজ আমাদের অনেকের মনে। আমাদের সত্যজিৎ রায় আছেন, তপন সিংহ আছেন, উত্তমকুমার আছেন এবং আরও কয়েকজন গুণী চলচ্চিত্রকার ও শিল্পী আছেন। এতে আমরা আশান্বিত, নাকি শুধুই আত্মতুষ্ট? কৃতী ব্যক্তিরা আছেন বলেই আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে না কি? বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অভ্যন্তরে আজ কী দেখছি? একটি যৌথ পরিবার ভেঙে গেলে যেমন হয় অনেকটা তাই। অথচ চলচ্চিত্রশিল্পের মঙ্গল চান সকলেই। যে যা-ই কিছু করছেন তা ভালোর জন্যই। শুধু কিসে ভাল সেটুকুই বুঝি জানা নেই। এখন বাইরে বড় রকম কোন বিক্ষোভ নেই। নতুন কোন সত্যাগ্রহ আন্দোলনও নয়। এখনকার সমস্যাটি আরও গভীর, আরও সূক্ষ্ম। এখন কেমন যেন একটা স্নায়ুযুদ্ধ চলছে, অলক্ষ্যে ও নিঃশব্দে —দলের সঙ্গে দলের, দলগত শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাধীনতার। নীতির সংঘর্ষে কেউ নিশ্চেষ্ট, কারো বা সক্রিয় ভূমিকা। তলে তলে তিলে তিলে এই মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রামের পরিধি বেড়েই চলেছে। শান্তিতে ও স্বস্তিতে যাঁরা কাজ করতে চান তাঁরা স্বভাবতই চিন্তিত। নতুন প্রচেষ্টায় হাত দেওয়ার ইচ্ছা যাঁদের তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। কলাকুশলী ও কর্মীদের অনেকেই হয়ত হতভম্ব। এই ধরনের একটি পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী সে-প্রসঙ্গ মুলতুবী থাক। চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাঁদের তাঁরা জানেন, আজ কোথায় যেন কী ছন্দোপতন ঘটেছে। হয়ত এই অবস্থা সাময়িক, যার অবসান ঘটতে দেরি নেই। নৈরাশ্যের অন্ধকার চিরস্থায়ী হয় না। তবু আজ বাংলা চলচ্চিত্রের জয় নিয়ে গর্ববোধের মুহূর্তে আমরা যেন আত্মসমালোচনার অবসরটুকুও পাই। নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের মধ্যে মহৎ সৃষ্টি যে কদাচ সম্ভব নয়, এই সত্য অনুভবের যেন বিলম্ব না ঘটে।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

নীল কমল

নায়কের নাম রাম, নায়িকার নাম সীতা। বলা বাহুল্য, এই নামকরণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। "নীলকমল"-এর (কল্পনালোক) কাহিনী রামায়ণের রাম-সীতার উপাখ্যানের ছাঁচে ঢালা। নায়িকা সীতা (ওয়াহীদা রেহমান) অগ্নিপরীক্ষার কথাও বলেছে। সে যে কুলটা এ সম্পর্কে সীতার শাশুড়ি (ললিতা পাওয়ার) ও ননদ (শশিকলা) নিঃসন্দেহ। এই ছবির রামের প্রজা নেই, তাই প্রজানু-রঞ্জনের কথা ওঠে না। জননী ও ভগ্নীর মনোরঞ্জনের জন্য যে রাম নিজগৃহ থেকে সীতাকে নির্বাসন দিয়েছে তা নয়। রাম নিজেই ভুল বুঝেছে সীতাকে। এইখানে বুঝি আর রামায়ণ অনুসরণ করা গেল না। হিন্দীচিত্রের নায়কের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। কারণ তাদের অনেক সময় প্রেয়সী কিংবা স্ত্রীকে ভুল বোঝার ক্ষমতা অসম্ভব থেকে যায়। যে-ঘটনা স্ত্রীর সতীত্বের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ হতে পারত, অথবা অন্তত স্বামীর সংশয় অনেকাংশে লাঘব করতে পারত, তা সময় মত নায়ক রাম বিস্মৃত। অথচ এই ঘটনার পরেই সে সীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাক সে-ঘটনা।

আশু মুক্তি প্রতীক্ষিত 'জীবনসংগীত' (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়
ফটো—দেশ

নির্বাসিতা সীতা মাতা বসুন্ধরার কোলে স্থান পায়নি। সে ঝাঁপ দিয়েছে নদীতে। সীতা তখন অন্তঃসত্ত্বা। নদীতীর থেকে অচৈতন্য সীতাকে সন্ন্যাসী বেশী ডেভিডের আশ্রমে নিয়ে আসে মেহমুদ (ছবিতে শশিকলার স্বামী, ঘরজামাই; নিজেকে বলে বজরংবলী তবে যতটা সীতা-ভক্ত ততটা রামভক্ত নয়)। সন্ন্যাসী ডেভিড সীতার শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের কুলগুরু। না, আশ্রমে সীতার যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। তার আগেই সে রামের সঙ্গে মিলিত।

এখন প্রশ্ন এই, সীতার কুলটা অপবাদ সইতে হল কেন? সে এক ভৌতিক ব্যাপার। মহর্ষি বাল্মীকির পক্ষে এমন কল্পনা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। সীতাকে "নীলকমল, নীলকমল" বলে যখন-তখন ডাকে তার পূর্বজন্মের অশরীরী প্রেমিক (দর্শক যদিও তাকে স্থূলদেহে দেখতে পান) রাজকুমার। সীতা রাজকুমারের ডাক ও গান শুনে রাত্রে বেরিয়ে যায়। দরজা আপনিই খুলে যায়। নিশির ডাকে যন্ত্র-চালিতের মত সীতা চলে আসে। রাজকুমারের সঙ্গে তাকে দেখা যায় কখনও লেকের উপর নৌকোয়, অথবা 'ক্ষুধিত পাষাণে'র সেই রহস্যময় ভগ্ন প্রাসাদপুরীর মত এক জীর্ণ পুরনো রাজবাড়িতে। সেখানে ভাস্করের তৈরি অনেক মূর্তি। সীতার পূর্বজন্মের প্রেমিক ছিল ভাস্কর। তার কাহিনীও ছবিতে বিবৃত।

এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীরাম মাহেশ্বরী। চমকিত হবার মত অনেক সুন্দর মুহূর্ত ও টেকনিক্যাল কাজ ছবিতে আছে। ভগ্ন প্রাসাদপুরীতে ওয়াহীদা রেহমানের নাচের দৃশ্যগুলি এই রঙিন ছবিতে চমৎকার গৃহীত। গুলশান নন্দের গল্প (যাতে 'মহল' 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'আনারকলি'র প্রভাবের ত্রিবেণী সঙ্গম) যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, তাতে বেশ কয়েকটি মুহূর্ত আলাদাভাবে বেশ ভাল লাগে। গল্পটি চিত্রোপযোগী করে তুলেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায় এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ফণী মজুমদার। এই দুই গুণী ব্যক্তির দান ছবিতে রয়েছে। তাই হয়ত কিছু পরিস্থিতি এত ভাল। অন্যদিকে ছবির বাইরের গুণ (ফটোগ্রাফি, শট কম্পোজিশান, পরিবেশ রচনা ইত্যাদি) অনেক, ভিতরে অন্তঃসারশূন্য। দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য নাচ-গান এতে অনেক রাখা হয়েছে। ওয়াহীদা রেহমানের অভিনয় ও নাচ সত্যিই সুন্দর। কৌতুক পরিবেশন করেছেন মেহমুদ। সুশ্রাব্য গানের জন্য ধন্যবাদার্হ সংগীতপরিচালক রবি।

'বৌদি' এ সপ্তাহে

পূর্ণেন্দু প্রোডাকশন্সের "বৌদি" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। দিলীপ বসু স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরি-চালনা করেছেন। সন্ধ্যারাণী, কালী বন্দ্যো-পাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, প্রসাদ মুখো-পাধ্যায়, শঙ্কর প্রকৃতি ছবির বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। সংগীত-পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

ফাল্গুনীর 'মেঘদূত'

ভারতীয় রেডক্রসের সাহায্যকল্পে ফাল্গুনী সংস্থা আগামী ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সদনে তাঁদের 'মেঘদূত' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন। 'মেঘদূত'-এর নাট্যরূপ শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত-কৃত। পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। প্রধান দুই নৃত্যশিল্পী : এস এস শঙ্করণ (যক্ষ), ছবি দাশগুপ্ত (যক্ষ প্রিয়া)। সংগীত পরিচালনা করবেন শ্রীঅরুণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাজঘরের "কান্না নয়"

আগামী ২৬ নভেম্বর ১৯৬৮, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতার 'মুক্তাঙ্গন' রঙ্গ-মঞ্চে সাজঘরের 'কান্না নয়' নাটকখানি অভিনীত হবে। খ্যাতনামা নাট্যকার চিত্র-পরিচালক সলিল সেন নাটকটি পরিচালনা করবেন। বিভিন্ন অংশে সাজঘরের শিল্পীবৃন্দ অভিনয় করবেন।

নাট্য-সমালোচনা

শ্রীশমহলে "দ্বিধা"

কোন দ্বিধা না রেখে গোড়াতেই বলা যেতে পারে, নাট্যসুখ যদি দর্শকের কাম্য হয়, তবে "দ্বিধা" নাটকটি (রচনা ও পরিচালনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য) উপেক্ষা করার উপায় নেই। কলকাতা শহর ছেড়ে শালকিয়ায় শ্রীশমহলে যেতে হবে হয়ত দর্শককে। "দ্বিধা"-র আকর্ষণী শক্তি এত বেশী যে, দূরত্ব বাদ সাধবে না।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের আর সব নাটক থেকে "দ্বিধা" পৃথক। এবং এই পার্থক্য মানেই বৈশিষ্ট্য। "দ্বিধা"-র নায়ক-নায়িকার জীবনের জটিলতা সম্পূর্ণ জীবনানুগ বলছি না। নাটকসৃষ্টির জন্য কিছু গতানুগতিক উপকরণ এতে অবশ্যই সংযোজিত। নায়িকা রত্নার স্বামী (দুশ্চরিত্র, সিফিলিস-আক্রান্ত) সেই যে স্ত্রীর কাছে স্বামিত্বের অধিকারে ঘুরে ফিরে বারবার টাকার জন্য আসে এবং ব্ল্যাকমেল করে (রত্না বলে তার বিয়ে অসম্পূর্ণ, স্বামীর সঙ্গে কোন দিন ঘর করেনি), কিংবা নায়ক সাগরের স্ত্রী সেই যে স্বামীকে দেখতে না পেরে মরতে পারে না (ওদের বিয়েও অসম্পূর্ণ, সাগর স্ত্রীকে স্বীকার করে না) নাট্যোপকরণ হিসাবে এই সব নতুন নয়। নায়ক-নায়িকার জীবনের অতীত ঘটনা তাদের জীবনে যেভাবে ছায়াপাত করে অর্থাৎ উভয়ের পরিচয় ও প্রণয়ের পর (ওদের পরিচয় ঘটানোর মধ্যে নাট্যচমক আছে) যে জট সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে জীবনের স্পর্শ অনুভূত।

নাটকটি বিয়োগান্ত। রত্না 'ওয়ার্কিং গার্ল', একটি বড় অফিসের বড় সাহেবের পার্সোনাল স্টেনোগ্রাফার। চাকুরিজীবী মেয়েদের কীভাবে আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে বাবা-মা-ভাইবোনের জন্য অর্থ রোজগার করতে হয় তারও একটি চিত্র নাটকে মেলে। যদিও আজকাল সব মেয়েকেই আত্মসম্মান বিকিয়ে দিয়ে চাকুরি করতে হয়—এ কথা অযৌক্তিক। মেয়েদের চাকুরির ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রতিকূল বা অবমাননাকর নয়। যাই হোক, এই অংশে নাটকের যে বক্তব্য তা নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। এবং রত্নার সুখস্বপ্ন যে সার্থক হয়নি তার মূলেও অর্থহীন আত্মত্যাগ। রত্নার কাছে সাগরকে ভিক্ষা চেয়েছে গুজরাতী মেয়ে সীতা (সে ভাল বাংলা বলে)। সীতা সাগরকে ভালবাসে, সাগর সীতাকে নয়। অপর দিকে সাগর ও রত্না পরস্পরকে চায়, ওদের বিয়ে ঠিক। এমন সময় রত্নার পক্ষে সীতার সুখের জন্য সাগরকে ত্যাগ করা উদারতার নামে মানসিক বিলাস (নাকি রোগ?) ছাড়া কিছু নয়। [illegible]

'দ্বিধা' নাটকে তৃপ্তি মিত্র

অযৌক্তিক কাজ করা অস্বাভাবিক। ব্যাপারটাই "আনরিয়্যাল", যদিও বিয়োগান্ত নাটক রচনার ক্ষেত্রে এই ঘটনা সহায়ক হয়েছে। রত্নার ট্র্যাজেডি দর্শকের চোখে জল আনে সত্যি, নাটকের ক্লাইম্যাক্সে। তখন ভাববার অবকাশ থাকে না কী সত্য আর কী মিথ্যা। এইখানেই নাটক রচনার অন্যতম গুণ। নাটকটি তরতর করে এগিয়ে চলে পরিণতির দিকে। একালের যুগযন্ত্রণার আভাসও মেলে অনেক পরিস্থিতিতে। তা ছাড়া নাটকে শেষের দিকে ছাড়া, কমিক রসও ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে (যদিও একাধিক মুহূর্তে কমিক রস অসমীচীন)। সব চাইতে বেশী প্রশংসনীয় নাট্য পরিকল্পনা—মাত্র দুটি ঘরে পুরো নাটক উপস্থাপিত। মঞ্চের এক দিকে নায়কের ঘর (শ্যামবাজার), অন্য দিকে নায়িকার (টালিগঞ্জ); দু'জনের ঘরেই টেলিফোন। তারই মধ্যে ঘটনার সমাবেশ ও গতি। প্রতিটি দৃশ্য এমনভাবে রচিত যে, দর্শকের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে রাখে। তার উপর বিধায়কবাবুর সুন্দর সংলাপ তো আছেই। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও আধুনিক এই নাটকে কী যেন একটা তাৎক্ষণিক ও সর্বাঙ্গীণ আকর্ষণ আছে, যা মন ভরে তোলে।

অভিনয়ের দান যে এ ক্ষেত্রে অনেকখানি তা বলাই বাহুল্য। নায়িকার চরিত্রে তৃপ্তি মিত্রর (রত্না) অসামান্য চরিত্রচিত্রণ নাটকটিতে অতিরিক্ত 'ডাইমেনশন' এনে দিয়েছে। যা অবিশ্বাস্য তাও শ্রীমতী মিত্রর অভিনয়ের গুণে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। নায়কবেশী অসীমকুমারের সপ্রাণ অভিনয়ও অবাক করে। মঞ্চে তাঁর এমন অভিনয় আগে দেখিনি। রত্নার স্বামীর অসিতবরন একটি টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে হয় তরুণকুমারকেও (রত্নার দাদা) একটি সৎ ও সুন্দর চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার জন্য। সীতা সেজেছেন লতিকা দাশগুপ্ত। প্রেমাস্পদকে পাবার ব্যাকুলতা ও আর্তি তাঁর অভিনয়ের সুন্দর পরিস্ফুট। প্রাণোজ্জ্বল অভিনয়ের জন্য প্রশংসার যোগ্য বনানী ভট্টাচার্য (নায়িকার সঙ্গিনী)। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন ভানু চট্টোপাধ্যায়, মুকুন্দ সরকার, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গাঙ্গুলী, সীতেশ চক্রবর্তী প্রমুখ।

মঞ্চস্থাপত্য বা মঞ্চসজ্জার জন্য (সুরেশ দত্ত-কৃত) নাটকটি বিশিষ্ট। আলোক-সম্পাতও (তাপস সেন) উঁচুদরের।

মাটির ঘর

বিধায়ক ভট্টাচার্যের "মাটির ঘর" নাটকের কদর হয়েছিল এককালে। আজকের দিনের দর্শকের কাছে সত্যপ্রসন্নর সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাওয়ার (লম্পট স্বামীর অত্যাচারে এক মেয়ের বিষ খেয়ে মরা, বড় মেয়ের পাগল হয়ে যাওয়া বড় জামাইয়ের মৃত্যু, সত্যপ্রসন্নর কাঁদবার শক্তি হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি) কাহিনীর মূল্য কতখানি তা অবশ্যই বিচার্য। এক বৃদ্ধ ও তার দুটি মেয়ের জীবন নিয়ে ভাগ্যের ছিনিমিনি খেলার মধ্যে সাজানো ঘটনা ও ট্র্যাজেডি যেমন আছে, তেমনি দর্শককে সাময়িক স্তব্ধ করে রাখার মত নাট্যচমক ও নাট্যমুহূর্তেরও অন্ত নেই। কৃত্রিমতার মধ্যে উপভোগের বস্তু তো একালেও খুঁজে পাই। তাই মাটির ঘর আজকের দিনে একেবারেই উপেক্ষার বস্তু তা বলা যায় না। যদিও এর দুই নায়িকার (তন্দ্রা ও নন্দা) জীবনের দুর্বিপাক (তথা ট্র্যাজেডি) কেমন যেন অসহ্য ও সরলীকৃত।

নাট্যবস্তু যাই হোক, নাটক সুখভোগ্য হয় অভিনয়ের গুণে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে 'প্রতীক' নাট্যসংস্থা সম্প্রতি গঠিত। তাঁরা প্রথম প্রয়াস হিসাবে বিধায়ক ভট্টাচার্যের "মাটির ঘর" অভিনয় করছেন। রঙমহলে গত সপ্তাহে তাঁদের "মাটির ঘর" প্রমাণ করেছে, শক্তিশালী অভিনয়ের গুণে নাটকও শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। চরিত্রাঙ্কণে ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (তন্দ্রা), সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (সত্যপ্রসন্ন), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (কল্যাণ), সর্বেন্দু (অলোক), শমিত ভঞ্জ (উৎপল), তপতী ঘোষ (নন্দা), বাসবী নন্দী (ছন্দা), সন্তোষ ঘোষাল (চঞ্চল) প্রভৃতি। টিম-ওয়ার্ক অসম্ভব ভাল। এঁদের প্রত্যেকের অভিনয়ও উঁচুদরের। সকলের উপরে সাবিত্রী

চট্টোপাধ্যায় যিনি চরিত্রটির সুস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ দুই রূপেই দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এক-একটি চরম মুহূর্তে তাঁর অভিনয়ের পর প্রেক্ষাগৃহে হাততালি শোনা যায়। বাসবী নন্দীর ছন্দার কথা দর্শকের অনেকদিন মনে থাকবে। অদ্ভুত সুন্দর তাঁর অভিনয়। চিত্রাভিনেতা সর্বেন্দ্র মঞ্চাভিনয়েও যে সমান পারদর্শী তা জানা গেল। সজ্জা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, সন্তোষ ঘোষাল ও তপতী ঘোষও অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন। ছোট ভূমিকায় আরতি চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও মনে রাখার মত।

একটি দৃশ্যে শমিত ভঞ্জ ও বাসবী নন্দীর গান বেশ ভাল লাগে। সুরও সুন্দর (সংগীত পরিচালনা ঃ কালীপদ সেন)। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিচালনায় অভিনীত "মাটির ঘর" যাঁরা দেখবেন তাঁরা প্রতীক সংস্থার দীর্ঘায়ু কামনা করবেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

বর্ষা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই আউটডোর মরসুম শুরু হয়। এখন বম্বে চলচ্চিত্র-জগতে সেই আউটডোর মরসুম। প্রায় প্রতি-দিন কোন না কোন প্রডাকশন ইউনিট হয় বম্বের বাইরে যাচ্ছে নয় আসছে। নায়ক, নায়িকা, খলনায়ক কৌতুক অভিনেতারা কাশ্মীর, কুলু, কোডাইকানাল, উটি, বাঙ্গালোর সিমলা প্রভৃতি হিলস্টেশনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক ছবির সুটিং ছেড়ে অন্য ছবির সুটিং-এ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই যাতায়াতের পথে কেউ কেউ এক/আধদিন বম্বের বাড়ি ছুঁয়ে যান। কিছুদিন আগে এক প্রযোজক-পরিচালক কাশ্মীর থেকে ফিরেছেন, নায়ক ধর্মেন্দ্র এবং নায়িকা ববিতাকে নিয়ে তিনি কাশ্মীর সুটিং-এ গিয়েছিলেন। বম্বের চলচ্চিত্রে

ব্রিজ পরিচালিত 'নাইট ইন লণ্ডন' ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মালা সিংহ—ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও একটি অপরিহার্য অংশ। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই কাশ্মীর বম্বে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের দ্বিতীয় ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকাল কিছু দুর্ঘটনাও ঘটতে আরম্ভ করেছে। কাশ্মীরের স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মালিকরা এতদিনে আবিষ্কার করেছেন যে বম্বের ফিলিমওয়ালারা আপেল বাগানে বা ফল বাগানে বা তাদের ডাল লেকের নৌকোয় সুটিং করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায় আর তার বদলে তাদের যা দেয় তা নেহাৎ-ই যৎসামান্য। সুতরাং—! আলোচ্য প্রযোজক-পরিচালক শ্রীনগর থেকে তিরিশ মাইল দূরের এক আপেলবাগানে ধর্মেন্দ্র এবং ববিতাকে নিয়ে সুটিং করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন। সুটিং করা কালীন একজন একজন করে পাঁচজন লোক এসেছে বিভিন্ন সময়ে এবং আগের জনকে মিথ্যেবাদী বলে নিজেকে বাগানের মালিক হিসেবে ঘোষণা করেছে আর প্রযোজক পরিচালকের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে। পাঁচ/সাতজন নকল মালিককে বাগানে সুটিং করার জন্য ভাড়া দিয়ে দিনান্তে যখন প্রযোজক-পরিচালক হোটেলে ফিরেছেন তখন তিনি শুনেছেন যে ঐ আপেল বাগানটি নাকি ঐ হোটেলওয়ালারই। বম্বে ফিরে ভদ্রলোক এই গল্পটি অনেককেই বলেছেন। শ্রোতাদের একজন, যিনি উক্ত প্রযোজক-পরিচালকের ইয়ারদোস্ত তিনি এ গল্প শুনে মন্তব্য করেছেন, 'এতে তো তোমার আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ছবির প্রযোজক একজন অথচ টাকা অন্য লোকের, ফিল্মের জগতে তো তা নতুন কিছু নয়।'

সরল শর্মা

রবীন্দ্র সদনে যাত্রা-উৎসব

দাদাঠাকুর ফটো—দেশ

কলকাতা শহরে এক অভাবনীয় ব্যাপার। শোভাবাজার রাজবাড়ির আসরে যার প্রথম নাগরিক প্রতিষ্ঠা, পরে এই শহরের ছোট বড় মঞ্চের পাদপ্রদীপে কদাচিত যাকে নববধূর মতো মনে হত, সেই যাত্রাগান একালের সর্বাধুনিক মঞ্চে সম্পূর্ণভাবে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এমন আলোড়ন তুলবে ভাবা যায় নি। হ্যাঁ, রবীন্দ্র সদনের কথাই বলছি, যেখানে শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্যবাহী (তাঁদের মতে ভারতীয় নাট্যকলার মূল রূপ) যাত্রাদল **মাচরং বৈকুণ্ঠ সংগীত সমাজ বা নট্ট কোম্পানী** গত ৫ থেকে ৮ নবেম্বর এই চারদিন ধরে চারটি নতুন পালাভিনয় করে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করলেন। দুই পালাকারের চার সৃষ্টি : ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর' ও 'মহীয়সী কৈকেয়ী' এবং মহেন্দ্র গুপ্তের (তাঁর প্রথম পালা রচনা) 'সিংহগড়' ও 'দাদাঠাকুর'। রসের বৈচিত্র্য নিশ্চয়, কিন্তু তারই সঙ্গে বিষয়বস্তু, বক্তব্য এবং পরিবেশনের এমন শিল্পসুলভ সংমিশ্রণ আমরা কি সচরাচর দেখি?

এক সময় ছিল, যখন 'যাত্রা' এই কথার মধ্যে জড়িয়ে ছিল গ্রাম্যগন্ধ। কিন্তু আজ? রবীন্দ্র সদনের বিশাল মঞ্চে হুবহু যাত্রাগানের চিত্রকল্পের মাধ্যমে আজ যে যাত্রা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, উপভোগ ও উপলব্ধি করেছি—তা কি সে কালের সেই লোককলা? তাকে কি এই অত্যাধুনিক নাটকের যুগে অভিনন্দন জানাবার মতন নয়? তফাত যেটুকু তা শুধু স্বতন্ত্র পরিবেশ রচনার ও আঙ্গিকের। তা নইলে এ কালের যে-কোনো শ্রেষ্ঠতম নাটকের, নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করলে, এই যাত্রাকলার গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়। যাত্রাগানের ক্ষেত্রে সেই গুরুত্ব সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করার গৌরব সম্পূর্ণভাবে নট্ট কোম্পানী যাত্রাদলের।

ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্র সদনে এ ক'দিন যাত্রার আসরে, প্রেক্ষাগৃহে অথবা টিকিট কাউনটারে কাদের দেখেছি। একটা দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা অথবা চিন্তার চর্চায় বা প্রাত্যহিক জীবনে যাঁদের দান অপরিসীম তাঁরা সবাই কী একসঙ্গে এর আগে কোন আসরে বা অনুষ্ঠানে এসেছেন? বা বলা যেতে পারে তাঁদের সবাইকে নিয়ে কী কোনো আসর ইতিপূর্বে এত সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে? হয়নি। তাই এমন আসরে যাঁরা ছিলেন বাঙলার নাট্যকলার সেই সব ভক্ত-পূজারীর দল প্রত্যক্ষ করেছেন একাধিক যুগ-পুরুষকে। প্রথম দিনের পালা বিদ্যাসাগরের কথাই ধরা যাক। করুণায় যিনি সিন্ধু, দয়ার যিনি সাগর তাঁর চরিত্রস্পর্শ আমরা কী কখনো এভাবে পেয়েছি? অথবা উপলব্ধি করেছি মাইকেল মধুসূদনের দুঃসহ অন্তর্জ্বালা যা তাঁকে একদিকে সৃষ্টির অসীম প্রেরণা জুগিয়েও কঠিন দারিদ্র্যের দহনে তিলে তিলে নিঃস্ব করেছিল। সমকালীন জীবনে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, ভগবতীদেবী অথবা কর্তব্যনিষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত এ যুগে কে আর এমনভাবে অনুভবের অবকাশ পেয়েছে? পাননি অনেকেই। তাই অভিনয় বাসরে নট্ট কোম্পানীর শিল্পীরা প্রত্যেকে সপ্রাণ। মুগ্ধ দর্শকের আঁখি অশ্রু আপ্লুত। সে অশ্রু আনন্দাশ্রু। দ্বিতীয় পালা **সিংহগড়**। শিবাজী-ঔরঙ্গজেবের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্যে এর সবটুকু নাট্যরস বিধৃত। অথচ অভিনয়ক্ষণে আজকের কথা কী আমরা একবারও ভাবিনি? শত্রু আক্রান্ত মুহূর্তে নিজের মধ্যেও কী রক্তের উত্তাপ অনুভব করিনি? এটাই বোধহয় দেশপ্রেম। এর অনুরক্তরাই বোধ হয় দেশপ্রেমিক। নট্টর কৃতী শিল্পীদের আন্তরিকতার এটাই যেন সবচেয়ে বড় দান।

মহীয়সী কৈকেয়ী ছিল তৃতীয় দিনের পালা। মহাকাব্যের এ চরিত্রটি যুগ নিন্দিত। কিন্তু নট্ট কোম্পানীর এ পালায় কী তাঁকে আমরা তাবৎ সঞ্চিত কালিমায় নিন্দিত করতে পেরেছি? পারিনি। কারণ, কৈকেয়ী এখানে মহীয়সী। তাই রামের বনগমন দৃশ্যে যেমন হতবাক হয়েছি তেমনি কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর আচরণের যুক্তিকেও অগ্রাহ্য করতে পারিনি। আসলে চরিত্র বিশ্লেষণের অপূর্ব যাদুতে এ পালা ব্যঞ্জনাময়। কৈকেয়ী এখানে কুচক্রী নয়। পৌরাণিক কাহিনীর এ নবতর বিচার-বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যেও নতুন।

শেষ দিনের পালা **দাদাঠাকুর**। সমসাময়িক কালের এ মানুষটিকে ঘিরে যে অপূর্ব নাট্য-সৃষ্টি সম্ভব শত শত দর্শকেরই সেটা জিজ্ঞাস্য ছিল। নিজের মনকে বার বার প্রশ্ন করেছি এ কি সম্ভব? চিরাচরিত নীতিকে লঙ্ঘন করে, সাধারণ মানুষকে নিয়ে গল্প উপন্যাস, চলচ্চিত্রসৃষ্টি হয়তো সম্ভব, কিন্তু পালা রচনা? অথচ এ পালার দর্শক আসনের সব ক'টি সারি থেকে যে মুহুর্মুহু হাসির ঝলক উঠেছে, নাটকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ম অভিব্যক্তি, সর্বসাধারণের যে স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাস তা কি প্রথম শ্রেণীর নাট্যসৃষ্টির নয়? নট্ট কোম্পানীর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব এখানেই যে এমন একটি কঠিন বিষয়বস্তুকেও তাঁরা সর্বসাধারণের উপভোগ্য বস্তুরূপে পরিবেশন করতে পেরেছেন।

পালাগুলি পরিচালনা করেছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। শিল্পীদলে রয়েছেন : মহেন্দ্র গুপ্ত, অরুণ দাশগুপ্ত, শেখর গাঙ্গুলী, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজকুমার, নিরঞ্জন পাল, কার্তিক দাস, গোষ্ঠ পাল, রেবতী দে, ফণী ভট্টাচার্য, হরিগোপাল, জনার্দন নন্দী, কাঞ্চন ও গুরুদাস ধাড়া প্রভৃতি।

পরলোকে শৈলেন গাঙ্গুলি

বাংলা সিনেমার যশস্বী রূপসজ্জাকর শ্রীশৈলেন গাঙ্গুলী গত সোমবার রাত্রে সুখলাল কারনানি হাসপাতালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১। শ্রীগাঙ্গুলী ১৯৩৪ সালে রাধা ফিল্মস সংস্থার মেক-আপ বিভাগে যোগ দেন। সেই থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বহু ছবির পাত্র-পাত্রীর রূপসজ্জার দায়িত্ব নেন। তিনি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তা ছাড়া কিছুকাল যাবৎ সিনেমায় ছোটখাট টাইপ চরিত্রেও তিনি অভিনয় করেন। মঞ্চাভিনেতা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। শৌভনিক সংস্থার "শেষ রক্ষা"

পানচ-এর উৎসবে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর ও সংস্থার সভানেত্রী পূর্ণিমা দত্ত   ফটো—দেশ

নাটকে তিনি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেন।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রলোকের বহু বিশিষ্ট শিল্পী মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে ও শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হন। বিভিন্ন স্টুডিওতে এবং দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে তাঁর পুষ্পশোভিত মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। শৌভনিক নাট্য সংস্থা শ্রীগাঙ্গুলীর মৃত্যুতে গত শনিবার অভিনয় বন্ধ রাখেন। মধুর ব্যবহারের জন্য শ্রীগাঙ্গুলী চলচ্চিত্রলোকের সকলের প্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র রেখে যান।

বন্যাত্রাণে মহিলা সংস্থা 'পানচ'

বন্যার্তদের সাহায্যে মহিলাদের সুখ্যাত সংস্থা "পানচ" গত ১০ নভেম্বর রবীন্দ্র-সদনে এক নাটকাভিনয় ও ফ্যাশান প্যারেডের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব ছিল ফ্যাশান প্যারেড, যাতে সুন্দরীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রমণীর বেশে উপস্থিত হন। ফ্যাশান প্যারেডের পর নান্দীকারের বিখ্যাত নাটক "শের আফগান" অভিনীত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। প্রারম্ভে পানচ-এর সভানেত্রী শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁদের সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

অরণ্যদেব ✿ লী ফক

রাজা আর টমটম—
তর্ক কিসের? ব্যাপার কী?
অসম্ভব! সত্যি বলছি!
দূর পাগলা! কে পাগলা? ওঁকে জিজ্ঞেস কর!

টমটম বলছে, তোমার বয়েস নাকি চার শো বছর! নিশ্চয়ই ও ভুল বলছে!
তা ভুলই বটে! অরণ্যদেবের বয়স সত্যিই চার শো নয়, তার চাইতেও বেশী, চার শো পঁয়ত্রিশ বছর।

?

অন্যদিকে অদূরে, গভীর অরণ্য। সেখানে আজও
৩/৩১

অরণ্য যেখানে গভীর, সেইখানে গুহার মধ্যে থাকেন অরণ্যদেব ——

বাইরের লোকেরা সেখানে বিনা অনুমতিতে

অরণ্যদেবের স্বর্গদ্বীপও গোপন জায়গা, হরিণ আর সিংহ সেখানে পাশাপাশি ঘুরে বেড়ায়—

সবই তো গোপন, কিন্তু সবচাইতে গোপন হল উষ্ণ লাভার রহস্যময় নদীর ধারে সেই জায়গাটি—

—ক্ষুদে মানুষরা যেখানে বসবাস করে——
মেলোডি!
শুরু হল : ক্ষুদে মানুষের গল্প ১

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। পশ্চিম পাকিস্তানের আটটি শহরে ১২ নবেমবর থেকে সরকার বিরোধী হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের গভরনর মহম্মদ মুসা বলেছেন দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে দরকারী যে-কোন ব্যবস্থা নিতে সরকার দ্বিধা করবেন না। তিনি আরও বলেছেন যে, পাকিস্তানে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার পিছনে বিদেশী শক্তির হাত আছে। কোন্ শক্তি সেকথা তিনি বলেন নি। ওদিকে লাহোরে শ্রীভুট্টো বলেছেন, সরকার বিরোধী আন্দোলন বন্ধ হবে না। 'ছাত্রদের হাঙ্গামা বন্ধ করতে আমি বলব না।' ১৩ নবেমবর সকালে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ থেকে অকস্মাৎ ১৫জন বিরোধী নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন পাকিস্তানের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো এবং জাতীয় আওয়ামি পারটির প্রেসিডেনট, খান আবদুল গফুর খানের পুত্র, খান আবদুল ওয়ালি খান। এই গ্রেফতারের কথা জানাজানি হওয়ার পরেই পশ্চিম পাকিস্তানের গভরনর জেনারেল মহম্মদ মুসা এক বেতার ভাষণে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টার অভিযোগ করেন। পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, ১৫ নবেমবর পেশোয়ার, লাহোর, কোহাট, করাচি ও মুলতানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এদিন পর্যন্ত পুলিস ভুট্টো সমর্থক দু' শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন।

দেশী সংবাদ

১১ নবেমবর—মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবই আজ লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রস্তাব উত্থাপনকালে বিরোধী দলের মুখপাত্রগণ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারিদের গত ১৯ সেপটেমবরের ধর্মঘটের ব্যাপারে সরকারের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। বামপন্থী দলগুলি ও সরকারের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। এই ব্যাপারে সাড়ে পাঁচঘণ্টা আলোচনাকালে মাঝে মাঝেই চেঁচামেচি হয়। আরও দু'দিন আলোচনা চলবে।

শিয়ালদহ স্টেশনে আজ সকালে চাল পাচারের অভিযোগে ধৃত একজন স্ত্রীলোককে পুলিসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলে জনতা-পুলিস প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনার জের হিসাবে এরপর আরও কয়েকটি অঞ্চলে হাঙ্গামা চলে। পুলিস বেশ কয়েকবার লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে।

১২ নবেমবর—লোকসভায় আজ সরকারী অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই রকম অসংযত হই-হট্টগোল ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। প্রস্তাবের পক্ষে ৮৫ ও বিপক্ষে ২২০ ভোট পড়ে। স্বতন্ত্র সদস্যগণ ভোটদানে অংশ গ্রহণ করেননি। গোলমালের সময় তাঁরা নিরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আজ অমৃতসরে পুলিস-ছাত্র সংঘর্ষ হয়। সেখানকার ডি এ ভি কলেজের সামনে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস মৃদু লাঠি চালায়। ছাত্ররা পুলিসের উপর ইঁট ছোড়ে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৪ নবেমবর—বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নটি বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ একটি কমিটি গঠন করেছেন। হাইকোরটের একজন বিচারপতি এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিয়ে ওই কমিটি গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন আজ লোকসভায় উপরোক্ত তথ্য জানান।

বিভিন্ন বেতন-বোরডের সুপারিশসমূহ চালু করার বিষয়টি মালিক পক্ষের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর ছেড়ে না দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আজ লোকসভায় কয়েকজন বিরোধী সদস্য দাবি জানায়।

১৫ নবেমবর—পঞ্চম অর্থ কমিশনের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন অনুসারে কেন্দ্রীয় করের পশ্চিম বাংলার অংশ আসছে বছর ৩৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা থেকে ৫১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বাড়বে। কর বণ্টন নীতির আমূল পরিবর্তন এর কারণ নয়। এই রাজ্যের জন্য কমিশনের ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা অনুদানের সুপারিশই করের অংশ বাড়ার কারণ।

কলকাতা ট্রাম কোম্পানি ট্রাম ভাড়া বাড়ানো স্থির করেছেন। এবার টিকিট ধার্য হতে পারে মাত্র দুটি স্টেপের জন্য। তিন মাইলের নীচে যে কোন জায়গার জন্য এক ভাড়া এবং তিন মাইলের উপরে ছয় মাইল পর্যন্ত পথের জন্য আর এক ভাড়া। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট যথাক্রমে ১২ ও ১৫ পয়সা এবং প্রথম শ্রেণীর টিকিট যথাক্রমে ১৫ ও ২০ পয়সা করার কথা হয়েছে।

১৬ নবেমবর—গত রাত্রে হাওড়া থেকে ৫৫০ কিলোমিটার দূরে পূর্ব রেলওয়ের গ্র্যানড করড শাখার শোননগর স্টেশনে একটি যাত্রী-বাহী ট্রেনের সঙ্গে একটি বিদ্যুৎচালিত মাল-গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় ১১ জন নিহত ও ৪৭ জন আহত হয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। আশঙ্কা ধ্বংস স্তূপের নীচে আরও মৃতদেহ রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি খাদ্য বিভাগের ৯ জন গেজেটেড অফিসারকে বরখাস্ত করেছেন। কর্মী ও অফিসার মিলিয়ে সাজা পেয়েছেন মোট ৪২ জন। সাজার মধ্যে বরখাস্ত করা ছাড়াও আছে পদাবনতি, একাধিক বছরের বাৎসরিক ইনক্রিমেনট বন্ধ, সাসপেনড ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও ৫৬ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

১৭ নবেমবর—সাতদিন ধরে ভারত সফরের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লিতে আগত বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেনট শ্রীরবারট ম্যাকনামারা সাংবাদিকদের কাছে এ আশা করেন যে, ভারত নিজস্ব পথে তার সমস্যা সমাধানের জন্য রচিত যোজনাসমূহে ব্যাংক কিভাবে সাহায্য করতে পারে তার পথ ও পন্থা তিনি বের করতে পারবেন।

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রচার শুরু করায় শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন বিদ্যায়তনে এখন শতকরা ৭০টি কনসেশন ফরমই ভাঙানো হচ্ছে। আগে মাত্র শতকরা ১৫টি কনসেশন ফরম ভাঙানো হতো।

বিদেশী সংবাদ

১১ নবেমবর—গতকাল সন্ধ্যায় পুলিস রাওয়ালপিনডির ১২৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নওসেরায় বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালালে একজন ছাত্র নিহত ও একজন আহত হন। সরকারীভাবে এ-খবর জানানো হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সৈন্য তলব করতে হয়।

১২ নবেমবর—যে কোন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে সামরিক হস্তক্ষেপের এখতিয়ার সোভিয়েট রাশিয়ার আছে—ওয়ারশয় পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ারকারস পারটির পঞ্চম কংগ্রেসে এই কথা ঘোষণা করেছেন সোভিয়েট কমিউনিসট পারটির সেক্রেটারী লিওনিড ব্রেজনেভ। খবরটি দিয়েছে 'তাস'।

১৪ নবেমবর—স্লোভাক কমিউনিসট পারটির ফারসট সেক্রেটারী গুস্তাভ হুসাক আজ বলেন, চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্ত বড় বড় শহরের সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তিগুলি তাদের বেআইনী সংস্থা গ্রূপে গঠন করেছে। চেকোস্লোভাক কমিউনিসট পারটির সেনট্রাল কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের প্রাক্কালে শ্রমিক সমাবেশে শ্রীহুসাক এই বক্তৃতা করেন।

১৫ নবেমবর—এই বছরের জুন থেকে আগসট মাসের মধ্যে তিব্বতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহী তিব্বতীদের হাতে ১ হাজারেরও বেশী কমিউনিসট সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবক প্রাণ হারিয়েছে।

১৬ নবেমবর—কমিউনিসটদের নিয়ে গঠিত কোন কোয়ালিশন সরকার জোর করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কায়েম করা হবে না—ওয়াশিংটনে এই প্রতিশ্রুতি দিলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম নাকি সম্প্রসারিত শান্তি বৈঠকে যোগ দিতে পারে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের পাঁচটি প্রদেশে কমিউনিসটদের সোভিয়েট ধাঁচের সরকার গঠিত হয়েছে। এ ছাড়া এক হাজারেরও বেশী গ্রামে এই সরকারের অস্তিত্ব বর্তমান।

১৮ নবেমবর—পাকিস্তান একশ'টি 'এম ৪৭ মারকিন ট্যাঙ্ক' শীঘ্রই পাচ্ছে। তবে একেবারে সরাসরি নয়। তুরস্কের মাধ্যমে। কারণ ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক সংঘর্ষের পর মারকিন সরকার ভারত পাকিস্তানকে সরাসরি ভারী অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। 'ওয়াশিংটন পোসট'-এ এই খবর বেরিয়েছে।

পরে ভোগাতে পারে

চটপট! জায়গাটি ঢাকুন

ব্যাণ্ড-এইড*
ব্রান্ড

ড্রেসিং!

ঔষধিযুক্ত
ব্যাণ্ড এইড ড্রেসিং
আপনার ঘা শুখিয়ে উঠতে
সাহায্য করে—জায়গাটি
পরিষ্কার রাখে, সুরক্ষিত রাখে।

চটপট ব্যবহারের জন্যে
ষ্ট্রিপস, স্পটস,
প্যাচেস

জনসন অ্যাণ্ড জনসন
অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
৩০, ফরজেট ষ্ট্রীট
বোম্বাই-২৬

ভারতের প্রথম ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিষ্টার
দ্বৈত এরিয়েল এবং
ফাইন টিউনিং ইণ্ডিকেটর সংযোজিত
ON — OFF
VOLUME
M S
Murphy mig 2
মিগ ২
মূল্য ২২০্ টাকা
ব্যাটারীর মূল্য পৃথক।
মারফি মিগ-২ এর্
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :
■ ফাইন টিউনিং ইণ্ডিকেটর – যার জন্য নিকটস্থ বা দূরের যে কোনও কেন্দ্র একেবারে সঠিকভাবে ধরা যায়- অনেকগুলি কেন্দ্রের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া যায় না।
■ দ্বৈত এরিয়েল ব্যবস্থা—দিনের বেলাতেও দুর্বল বেতার কেন্দ্র গুলিকে পাওয়ার জন্য 'ফেরাইট রড' এবং 'লুপ' লাগান হইয়াছে।
■ তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন স্পীকার—থাকার দরুণ জোরে এবং পরিষ্কার ভাবে-বিশুদ্ধ স্বরধ্বনির পুনরুৎপাদন সম্ভব।
■ আধুনিক সার্কিউটারী—যাহাতে ঘরের ভেতর বা বাইরে যে কোনও জায়গায় বছরের পর বছর নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ চালিয়ে যায়।
মিগ ২ এর জন্য
আপনার নিকটতম
মারফি বিক্রেতার নিকট যান।
murphy মারফি গৃহকে আনন্দমুখর রাখে!

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		-	৪৮৭
কুবেরের বিষয়-আশয়—শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়		-	৪৮৯
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব		-	৪৯৫
আলোচনা—		-	৪৯৭
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী		-	৫০১
সাহিত্য-সংবাদ—সনাতন পাঠক		-	৫০৩
পুস্তক পরিচয়—		-	৫০৫
খেলার মাঠে—একলব্য		-	৫০৯
ক্রীড়াকীর্তি—মুকুল		-	৫১২
রংগজগৎ—		-	৫১৩
অরণ্যদেব—		-	৫১৯
সাপ্তাহিক সংবাদ—		-	৫২০

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপেশ রায়

১৫টি ভাষা ৪০ জন এজেন্ট ২৪০টি সাময়িকপত্রে প্রচার
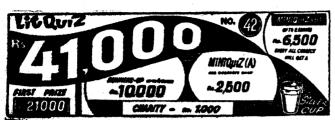
প্রধান বৈশিষ্ট্য

লিটকুইজ প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ও ইহাতে দক্ষতার প্রয়োজন আছে। লিটকুইজের উত্তরগুলি নির্দিষ্ট। আমাদের সংকলকও ঐগুলি নির্ধারিত করেন না। তিনি তাহা পরিবর্তন করিতেও পারেন না। ঐগুলি নির্ধারণ করিবার জন্য কোনো বিচারকমণ্ডলীও নাই। প্রতি উদ্ধৃতি সূত্রের একমাত্র সঠিক উত্তর হইল লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত কথাটি। অতএব লিটকুইজে সাফল্য ভাগ্য বা দৈবের উপর নির্ভর করে না। আপনার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করুন, আপনি কৃতকার্য হইবেন।

বন্ধের শেষ তারিখ বুধবার, ৪-১২-৬৮ লিটকুইজ সাপ্তাহিকে সমাধান ৮-১২-৬৮ তারিখে প্রকাশিত হবে। প্রাইজ লিস্ট ২২-১২-৬৮ তারিখে।

৪২ লিটকুইজের সরকারী ভর্তি ফরম

ADDRESS :—LITQUIZ NO. 42 ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7

বন্ধের নির্দিষ্ট শেষ তারিখ : বুধবার ৪-১২-৬৮

রুলিং :—(১) প্রত্যেক কলমে আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি সব কয়টি কুপন না পাঠান, তা হলে বাকী কুপনগুলি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে প্রবেশমূল্য পাঠান, তা হলে এই এন্ট্রি ফরমের সঙ্গে ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এন্ট্রি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিট্‌কুইজ নং ৪২—বোম্বাই—৭-এর অনুকূলে টাকা পাঠান।

	1	Re. 1		2	Re. 1		3	Re. 1		4	Re. 1
1	CHANGE	CHOICE	1	CHANGE	CHOICE	1	CHANGE	CHOICE	1	CHANGE	CHOICE
2	CREDIBLE	CREDITABLE	2	CREDIBLE	CREDITABLE	2	CREDIBLE	CREDITABLE	2	CREDIBLE	CREDITABLE
3	DIVINE	HUMANE	3	DIVINE	HUMANE	3	DIVINE	HUMANE	3	DIVINE	HUMANE
4	EFFECTS	FIGURES	4	EFFECTS	FIGURES	4	EFFECTS	FIGURES	4	EFFECTS	FIGURES
5	ENDEAVOUR	ENTHUSIASM	5	ENDEAVOUR	ENTHUSIASM	5	ENDEAVOUR	ENTHUSIASM	5	ENDEAVOUR	ENTHUSIASM
6	EXISTENCE	EXPERIENCE	6	EXISTENCE	EXPERIENCE	6	EXISTENCE	EXPERIENCE	6	EXISTENCE	EXPERIENCE
7	FAILINGS	FRAILTIES	7	FAILINGS	FRAILTIES	7	FAILINGS	FRAILTIES	7	FAILINGS	FRAILTIES
8	GODS	GOODS	8	GODS	GOODS	8	GODS	GOODS	8	GODS	GOODS
9	GREATNESS	ONENESS	9	GREATNESS	ONENESS	9	GREATNESS	ONENESS	9	GREATNESS	ONENESS
10	HUMANITY	MORALITY	10	HUMANITY	MORALITY	10	HUMANITY	MORALITY	10	HUMANITY	MORALITY
11	PERFECT	PURE	11	PERFECT	PURE	11	PERFECT	PURE	11	PERFECT	PURE
12	PRACTICES	PREJUDICES	12	PRACTICES	PREJUDICES	12	PRACTICES	PREJUDICES	12	PRACTICES	PREJUDICES
13	PRAGMATIC	SCIENTIFIC	13	PRAGMATIC	SCIENTIFIC	13	PRAGMATIC	SCIENTIFIC	13	PRAGMATIC	SCIENTIFIC
14	REFLECTED	ROOTED	14	REFLECTED	ROOTED	14	REFLECTED	ROOTED	14	REFLECTED	ROOTED
15	SENSIBILITY	STABILITY	15	SENSIBILITY	STABILITY	15	SENSIBILITY	STABILITY	15	SENSIBILITY	STABILITY
16	SERVICE	TOLERANCE	16	SERVICE	TOLERANCE	16	SERVICE	TOLERANCE	16	SERVICE	TOLERANCE
17	SERVILITY	STUPIDITY	17	SERVILITY	STUPIDITY	17	SERVILITY	STUPIDITY	17	SERVILITY	STUPIDITY
18	UNEMOTIONAL	UNNATURAL	18	UNEMOTIONAL	UNNATURAL	18	UNEMOTIONAL	UNNATURAL	18	UNEMOTIONAL	UNNATURAL

SEND FIRST TWO COUPONS & ENTER MINIQuiZ (A) FREE — NO. 42 — SEND FOUR COUPONS & ENTER BOTH MINIQuiZ (A & B) FREE

MiniQuiZ (A) — 6 CLUES FREE COUPON

CHANGE	CHOICE
CREDIBLE	CREDITABLE
DIVINE	HUMANE
EFFECTS	FIGURES
ENDEAVOUR	ENTHUSIASM
EXISTENCE	EXPERIENCE

MiniQuiZ (B) — 12 CLUES FREE COUPON

FAILINGS	FRAILTIES	PRAGMATIC	SCIENTIFIC
GODS	GOODS	REFLECTED	ROOTED
GREATNESS	ONENESS	SENSIBILITY	STABILITY
HUMANITY	MORALITY	SERVICE	TOLERANCE
PERFECT	PURE	SERVILITY	STUPIDITY
PRACTICES	PREJUDICES	UNEMOTIONAL	UNNATURAL

৪২ DESH

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও শর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য প্রবেশমূল্য : ১৲ টাকা। সম্পূর্ণ ফরমটির (৪টি কুপন) প্রবেশ মূল্য ৪৲ টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিট্‌কুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর..................পাঠালাম।

CAPITAL LETTERS IN ENGLISH

NAME ....

ADDRESS ....

....

৪০নং বিরাট দেওয়ালী খেলায় সম্পূর্ণ নির্ভুল এনট্রি পাওয়া যায়নি। একটি ভুল করেছেন, এমন ১১ জন বিজয়ীর মধ্যে ২৫,০০০, টাকা বণ্টন করা হয়েছে, প্রত্যেকে পেয়েছেন ২,২৭৩, টাকা। মিনিকুইজে বিজয়ী ৩ জন। প্রত্যেকে পেয়েছেন ১,০০০, টাকা, তদুপরি ৬০৫, টাকা দামের একটি রূপোর ডিশ।

- ২, টাকা পাঠালে লিটকুইজ সাপ্তাহিকের ৮টি সংখ্যা পাবেন
- স্বনাম ঠিকানা লেখা ১০ পয়সা দামের পোস্ট কার্ড পাঠালে অবিলম্বে সমাধান জানানো হবে।
- ৩৭নং লিটকুইজের সকল পুরস্কার পাঠানো হয়েছে।

18 CLUES NO. 42

(1) He who does anything because it is the custom, makes no **CHANGE|CHOICE**.

(2) Probably no philosophy can be **CREDIBLE|CREDITABLE** which does not recognize and explain the possibility of love and creativity as important and real phenomena.

(3) We are full of **DIVINE|HUMANE** instincts, but adrift and rudderless.

(4) Facts without **EFFECTS|FIGURES** are no longer the be-all and end-all of knowledge.

(5) Nothing great was ever achieved without **ENDEAVOUR|ENTHUSIASM**.

(6) The sense of time and perception of change are inextricably linked in human **EXISTENCE|EXPERIENCE**.

(7) Men love to see themselves in the false looking-glass of other men's **FAILINGS|FRAILTIES**.

(8) There is so much frustration in the world because we have relied on **GODS|GOODS** rather than God.

(9) Moral education is impossible apart from the habitual vision of **GREATNESS|ONENESS**.

(10) If **HUMANITY|MORALITY** is not a love of goodness it is nothing.

(11) Nothing is permanent or **PERFECT|PURE** in nature and every stage in the course of evolution has within its womb the germs of its own destruction.

(12) Social service is the way to salvation, and traditional religious **PRACTICES|PREJUDICES** are but mass ignorance.

(13) Man must take a **PRAGMATIC|SCIENTIFIC** look at his values, at his ethics, at his art and esthetics, at his social and economic organization, and at his religion.

(14) Rational faith is **REFLECTED|ROOTED** in productive intellectual and emotional activity.

(15) Without the collaboration of these two characteristics, **SENSIBILITY|STABILITY** and elasticity, life as we know it could not proceed: neither could art.

(16) Justice, love, and the spirit of **SERVICE|TOLERANCE** are the foundation of true prosperity and peace.

(17) Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious **SERVILITY|STUPIDITY**.

(18) Art becomes sterile and the joy of life withers when they become **UNEMOTIONAL|UNNATURAL**.

১। এইটে প্রথা, এই কারণে যিনি কোন কিছু করেন তিনি কোন **পরিবর্তন/নির্বাচন** করেন না।

২। বোধ হয় কোন দর্শনই **বিশ্বসনীয়/প্রশংসনীয়** হতে পারে না, যা গুরুত্বপূর্ণ ও সত্যিকারের সত্তা হিসেবে প্রেম ও সৃজনশীলতার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে না ও ব্যাখ্যা করে না।

৩। আমরা **দৈব/দয়ালু** সহজ প্রেরণায় ভরপুর, কিন্তু ভাসমান এবং দাঁড়হীন।

৪। **ফল/অঙ্ক** বিনা সত্যতথ্য এখন আর জ্ঞানের সর্বস্ব নয়।

৫। **প্রযত্ন/উৎসাহ** বিনা মহান কিছুই কখনও সিদ্ধ হয়নি।

৬। সময়ের জ্ঞান ও পরিবর্তনের বোধ মানবিক **অস্তিত্বে/অভিজ্ঞতায়** অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

৭। অন্য লোকেদের **দোষত্রুটির/দুর্বলতার** মিথ্যা আয়নায় মানুষ নিজেকে দেখতে ভালবাসে।

৮। দুনিয়ায় এত বেশী ব্যর্থতা কেন না ঈশ্বরের চাইতে বরং **দেবতাদের/বস্তুসমূহের** ওপর আমরা নির্ভর করেছি।

৯। **মহত্ত্বের/একত্বের** অভ্যস্ত দৃষ্টি ভিন্ন নৈতিক শিক্ষা অসম্ভব।

১০। যদি **মানবতা/নৈতিকতা** ভাল-র প্রতি প্রেম না হয় তবে তা কিছুই নয়।

১১। প্রকৃতিতে কিছুই স্থায়ী বা **পূর্ণ/শুদ্ধ** নয় এবং বিবর্তনের ধারার প্রতি পর্যায়ের গর্ভে নিজের বিনাশের বীজাণু রয়েছে।

১২। সমাজসেবা মোক্ষের পথ, এবং পরম্পরাগত **ধর্মীয় আচার/বিদ্বেষ** শুধু ব্যাপক অজ্ঞান।

১৩। মানুষের তার মূল্যসমূহ, তার নীতিবিজ্ঞান, তার কলা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন এবং তার ধর্মের ওপর **ব্যবহারমূলক/বৈজ্ঞানিক** দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চাই।

১৪। যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস সৃজনশীল বুদ্ধিগত ও ভাবাবেগমূলক ক্রিয়ায় **প্রতিফলিত/মূলবদ্ধ**।

১৫। জীবন (আমরা যেভাবে তাকে জানি) **সংবেদনা/স্থিরতা** ও নমনীয়তা, এই দুই বৈশিষ্ট্যের সহযোগিতা ভিন্ন অগ্রসর হতে পারে না, এবং কলাও তা পারে না।

১৬। ন্যায়, প্রেম ও **সেবার/সহনশীলতার** প্রেরণা সত্যিকারের সম্পদ ও শান্তির ভিত্তি।

১৭। সারা দুনিয়ায় অকপট অজ্ঞানতা ও বিবেকপূর্ণ **দাসভাবের/মূর্খতার** চাইতে বিপজ্জনক আর কিছুই নয়।

১৮। কলা বন্ধ্যা হয়ে পড়ে এবং জীবনের আনন্দ শুকিয়ে যায় যখন এগুলি **ভাবাবেগহীন/অস্বাভাবিক** হয়ে পড়ে।

দ্রষ্টব্য:—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবক্তাদের নাম ও তাঁদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিট্‌কুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

প্রকাশিত হল

দাম ৩·০০

চতুর্থ নির্বাচনের পর একটি জিনিস বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বর্তমান সময়ে ভারত এক অদ্ভুত মানসিক অস্থিরতার সম্মুখীন। নানা মতবাদের নানারকম কৌশলী ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক দলগুলির আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানারকম অপপ্রচার হেতু বিভ্রান্তিই এই অস্থিরতার কারণ। এর ফল হয়েছে এই যে, দেশ এবং জাতির উন্নতি ও প্রগতির দিকটি থেকে মানুষের দৃষ্টি এবং মনোযোগ অন্য দিকে অপসৃত হয়ে পড়েছে। যার অর্থ—আরও পেছিয়ে যাওয়া, সংকটকে উত্তীর্ণ না হয়ে তাকে আরও ঘনিয়ে নিয়ে আসা।

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের—যার সামনে হাজার রকমের সমস্যা—কর্তব্য হচ্ছে কোনরকম অস্থিরতার প্রশ্রয় না দিয়ে ধীরস্থির বুদ্ধি নিয়ে উন্নতি ও প্রগতির

অম্লান দত্তের

মননশীল প্রবন্ধ-সংকলন

প্রগতির পথ

পথটি আবিষ্কার এবং তা অনুসরণের চেষ্টা করা। এবং যে-কোনও আবিষ্কারের এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগের প্রাথমিক কৃত্যটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নির্মোহভাবে সে সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনা। আমাদের দেশে প্রগতি ও উন্নতির মূল শর্তগুলি নিয়ে সেরকম সতর্ক আলোচনা আজও তেমনভাবে শুরু হয়নি। সেরকম তর্ক ও আলোচনা যাতে বিস্তৃতি লাভ করে সে উদ্দেশ্যেই বর্তমান গ্রন্থান্তর্ভূত প্রবন্ধগুলি রচিত।

● এই লেখকের ●

গণবুগ ও গণতন্ত্র ৩·০০

ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন

শরদিন্দু বন্দ্যোঃ ॥ গোয়েন্দা-কাহিনী ॥ ৪·০০

নিবেদিতা লোকমাতা · প্রথম খণ্ড

শংকরীপ্রসাদ বসু ॥ জীবনচরিত ॥ ৩০·০০

দ্বিতীয় দর্পণ

প্রতিভা বসু ॥ উপন্যাস ॥ ৮·০০

ভালোবাসার অনেক নাম

শিবরাম চক্রবর্তী ॥ হাসির গল্প ॥ ৬·০০

নগ্ন নির্জন

বুদ্ধদেব গুহ ॥ উপন্যাস ॥ ৪·০০

সন্ধ্যারাগ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ গল্প-সংকলন ॥ ৫·০০

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

বিমল কর ॥ গল্প-সংকলন ॥ ৪·৫০

কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ

বুদ্ধদেব বসু ॥ নাটক ॥ ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৩৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫
শনিবার ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদীপ্তাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
৫৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫·০০
ষাণ্মাসিক	... ১২·৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬·২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০·০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক ,,	... ৮·০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০·০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক ,,	... ৮·০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৪২·০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ২১·০০
ত্রৈমাসিক ,,	... ১০·০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩১·০০
ষাণ্মাসিক	... ১৯·৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০·০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ২ পয়সা

DESH

Saturday 30 Nov. 1968.

শহর কলকাতার উন্নয়ন

বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। শখের সফর সারতে তিনি আসেন নি, এসেছিলেন এই বিখ্যাত শহরটির মৃতপ্রায় অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে। আমরাই তাঁকে স্বার্থবশে আমন্ত্রণ করেছিলাম, আমাদেরই একতরফা স্বার্থ—বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থ-সাহায্য যদি পাওয়া যায়, নতুবা কলকাতা আর বাঁচে না। শ্রীম্যাকনামারার আগমন কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের তেমন পছন্দ হয় নি। কেন হয় নি সেটা একরকম অবান্তর প্রশ্ন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভিয়েতনাম ইত্যাদি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে, সচরাচর যা হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে কিছু বিক্ষোভ, ট্রাম বাস পোড়ানো, পুলিসের সঙ্গে পাথর ও পটকা ছোঁড়াছুঁড়িও হয়ে গেল, অর্থাৎ আবার কিছু শক্তির উত্তেজনা জাগানো হল। এ উত্তেজনাও শান্ত হয়ে এসেছে।

শ্রীম্যাকনামারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন তার কতটা কি হল সেটা বোধ হয় এখন জানা দরকার। প্রথমত বলে নেওয়া ভাল, কলকাতায় আসার আগেই ভদ্রলোক এই শহরের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং এখানের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন, সে-ব্যবস্থা আগেভাগেই করা হয়েছিল। এখানে এসে তিনি দফায় দফায় সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, এঁদের বক্তব্য শুনেছেন, আর নিজেও প্রায় গোপনে সারা শহর টহল মেরে গেছেন। কি দেখেছেন ভদ্রলোক? দেখেছেন, এমন একটি শহর সবদিক দিয়েই যা ধুঁকছে, এর না আছে স্বাস্থ্য না সামর্থ্য, এই শহরের কোনো অভিভাবক নেই, কারও গরজ নেই, মাথা ব্যথা নেই শহরটিকে বাঁচাবার। এখানে দুঃসহ দারিদ্র্য, লক্ষ লক্ষ মানুষ অমানবিক একটা অবস্থার মধ্যে বাস করে। শোনা যায়, অবস্থা দেখে নাকি শ্রীম্যাকনামারা বলেছেন, এই শহরের মানুষকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে প্রতি মুহূর্তে এত রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যে অন্য কোনো বড় শহরে এ-রকম হলে সেগুলি বিক্ষোভের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কথাটা খুব খাঁটি, ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করবেন। এখানে ছাই ওড়ে না এমন নয়, তবে আমাদের সহ্যশক্তি তারিফ করবার মতন।

শ্রীম্যাকনামারা সত্যিই বিস্মিত হয়েছেন, এত সমস্যা নিয়ে কলকাতা কি করে এখনও বেঁচে আছে? কোন সমস্যা এখানে নেই? জনসংখ্যা এখানে স্ফীত হতে হতে ফেটে পড়ার উপক্রম, দারিদ্র্য এখানে চূড়ান্ত, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা, বর্ষায় শীতে রাস্তায় পড়ে দিন কাটায়, এখানে বস্তির সংখ্যা শুধু অপরিমিত নয়, তার আবহাওয়া নরককেও লজ্জা দেয়। এখানে সমস্যা পানীয় জলের, সমস্যা পথঘাটের, যানবাহনের, বন্দরের, স্বাস্থ্যের এবং আরও কত কিসের। এতগুলি ভীতিকর সমস্যার মধ্যে পড়ে শ্রীম্যাকনামারা বিস্মিত হয়েছেন কতটা জানি না, তবে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তিনি নাকি স্পষ্টই বলেছেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পর এই শহরের জন্যে কিছু করা হয় নি, করার চেষ্টাও হয় নি।

কলকাতার ওপর কারও নজর নেই অথচ মুখে একটা হইচই দেখানো হয়। শ্রীম্যাকনামারার চোখে এটাও বোধ হয় ধরা পড়েছে। এখানকার শিল্পপতিদের তিনি খোলাখুলি জিজ্ঞেস করেছেন, আপনারা এখান থেকে টাকা নেন অথচ এই শহরের জন্যে কিছু করেন না কেন? জবাবে শিল্পপতিরা কি বলেছেন জানি না, নিশ্চয় একটা অজুহাত দেখিয়েছেন।

যাই হোক, শ্রীম্যাকনামারা এখনও আশা রাখেন এবং এই শহরকে বাঁচাবার জন্যে করণীয় কিছু কিছু কাজের কথাও তিনি বলেছেন। সি এম পি ও-র তিনি প্রশংসাই করেছেন; এদের হাত দিয়ে কাজ হতে পারে বলেই তাঁর ধারণা। তার অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে তিনি আশ্বাসও দিয়েছেন। আমরা অবশ্য মনে করি অর্থই সব নয়, দক্ষতা এবং কর্মোদ্যোগ ভিন্ন বড় কিছু হবে না। আমাদের প্রথম ব্যাপারে অক্ষমতা এবং দ্বিতীয় ব্যাপারে আলস্য প্রচুর।

ম্যাকনামারা
কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা
দেবদূত কি শিশুটিকে আশীর্বাদ করে গেলেন?
আলী আয়ুব-বিরোধী
যোগ দিয়েছেন।
হ্যালো! জনসন তুরন্ত কিছু ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাও। কি? না, না! এটা নিজের ঘর সামলাবার জন্য প্রয়োজন...

দেশ দর্পণ
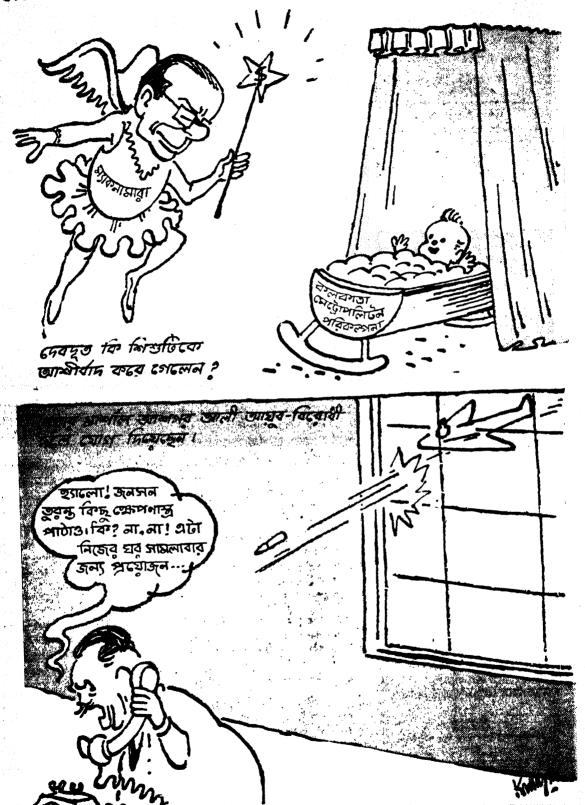
কলকাতায় এসেছিলেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যাকনামারা। ছিলেন এই শহরে সর্বসাকুল্যে এক চল্লিশ ঘণ্টা। এই একচল্লিশ ঘণ্টার বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন রাজভবনে, যেখানে তিনি পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে বেশীর ভাগ সময় রাজভবনেই কাটাতে হয়েছে এই সহজ কারণে যে, বাইরের প্রকাশ্য রাস্তায় স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা করা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক ছিল।

বিপদের ঝুঁকি নিতে অবশ্য মিঃ ম্যাকনামারা পেছপা নন। জীবনে বহু ঝুঁকি তিনি বহুবার নিয়েছেন। যুদ্ধের সময় তিনি বিমানবাহিনীর প্লেন চালিয়েছেন। যুদ্ধের পর তিনি আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রীও ছিলেন। কাজেই ঝুঁকির কথা মিঃ ম্যাকনামারার কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা কলকাতা শহরের আইন ও শৃঙ্খলা। বড় কথা মিঃ ম্যাকনামারার কলকাতার অভিজ্ঞতা। নিশ্চয়ই সহজে ভুলতে পারবেন না। কারণ, তিনি যেদিন কলকাতায় আসেন এবং তারপর যেদিন চলে যান তার মধ্যে শহরের রাস্তায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ট্রাম গাড়ি, স্টেট বাস আর মিঃ ম্যাকনামারার কুশপুত্তলিকা। এসপ্ল্যানেডে চৌরঙ্গীর উপর মার্কিন দূতাবাসের সংবাদ সরবরাহ অফিসের সামনে বার বার জনতা শোভাযাত্রা করে এসেছে ভিয়েৎনামে নীতির প্রতিবাদ জানাতে। বার বার পুলিসকে ছুঁড়তে হয়েছে কাঁদানে গ্যাস, বেপরোয়াভাবে চালাতে হয়েছে লাঠি।

সময়টা শহর প্রদক্ষিণের জন্য উপযুক্ত ছিল না। যেটুকু সময়ের জন্য তিনি রাজভবনের বাইরে এসেছিলেন সেই সময়টা কোনমতেই সংবর্ধ আন্দোলনের উপযুক্ত সময় ছিল না। তাই মিঃ ম্যাকনামারার কলকাতায় অবস্থানটা বন্দীজীবনের সামিল হয়ে উঠেছিল। এই বন্দীজীবনকে মিঃ ম্যাকনামারা স্বেচ্ছায় বেছে নেননি, পুলিস বেছে নেবার কোন সুযোগ দেয়নি। পুলিসের পক্ষে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না; কারণ মিঃ ম্যাকনামারা প্রধানত ছিলেন ভারত সরকারের অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি। রাজ্য সরকারের কাছে এবং পুলিসের কাছে বিশেষভাবে এ-কথা অজানা ছিল না যে, মিঃ ম্যাকনামারার কলকাতায় আসার ফলে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য দেখা দিতে পারে। সে-চাঞ্চল্য যে-কোন সময় আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিতে পারে। ফলে, রাজ্য সরকারকে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যাতে মিঃ ম্যাকনামার প্রতি সরকারী সৌজন্যের কোন ত্রুটি না প্রকাশ পায় এবং সেই সঙ্গে পুলিসের পক্ষে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রচেষ্টার সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে নিতে হয়েছিল বিমানবাহিনীর সাহায্য। স্থির হয়েছিল মিঃ ম্যাকনামারাকে এমন কোন পথে বিমানবন্দর থেকে রাজভবনে আনা হবে না যাতে রাজনৈতিক বিক্ষোভের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়। তাই ব্যবস্থা হয়েছিল দমদম বিমান বন্দর থেকে রাজভবনের হেলিকপ্টার করে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে আসা। তিনি যখন দমদম এসে পৌঁছোন, তখন বিমানবন্দরের বাইরে ছাত্ররা চীৎকার করে মিঃ ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছিল। সেই বিক্ষোভকারী ছাত্রদের মুখে ধ্বনি উঠছিল : "ভিয়েৎনামের যুদ্ধাপরাধী ম্যাকনামারা ফিরে যাও।" "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি ম্যাকনামারা ফিরে যাও।" এই ধিক্কার ধ্বনিকে পাশে রেখে মিঃ ম্যাকনামারাকে নিয়ে হেলিকপ্টার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে উড়ে আসে এবং সেখান থেকে ঢাকা গাড়িতে তিনি চলে আসেন রাজভবনে। ফিরে যাবার সময় তিনি ব্যবহার করেছিলেন হেলিকপ্টার বিমান বন্দর পর্যন্ত এবং যাবার সময় সঙ্গে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন কলকাতার কাগজে তাঁর একচল্লিশ ঘণ্টা অবস্থানের সময় রাজপথে বিক্ষোভের যে-সব সংবাদ বেরিয়েছে তার টুকরোগুলো।

এই বিক্ষোভের দুটো দিক ছিল। একটা ছাত্রদের এবং বিভিন্ন বামপন্থী দলের সম্মিলিত বিক্ষোভ এবং অন্যদিকে উগ্রপন্থী কম্যুনিস্টদের নিজস্ব অভিযান মিঃ ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে। এছাড়া পাঁচটি ছাত্র সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী" দিবসের বিক্ষোভ। তবু সমগ্রভাবে এই বিক্ষোভকে বিচার করলে দেখা যাবে মিঃ ম্যাকনামারাকে ভিয়েৎনামে আমেরিকার যুদ্ধনীতির প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করেই এই আন্দোলনকে চালু করা হয়েছিল। যতগুলো বিক্ষোভ মিছিল কলকাতায় এ-সম্পর্কে হয়েছে এবং যখন মিঃ ম্যাকনামারার কুশপুত্তলিকা এসপ্ল্যানেডে পুড়িয়ে ফেলা হয় তখন প্রধান ধ্বনি ছিল আমেরিকার ভিয়েৎনাম-নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজনৈতিক বিচারে এটাই হয়ত এই বিক্ষোভ বা মিঃ ম্যাকনামারার কলকাতায় আসার সম্পূর্ণ পটভূমিকা নয়।

এটা ঠিক যে, আমেরিকা যখন ভিয়েৎনাম যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন মিঃ ম্যাকনামারা ছিলেন তাঁর দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এটাও হয়ত সত্য যে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সঙ্গে। মিঃ ম্যাকনামার যোগসূত্র অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিল। এটাও ঠিক যে, মিঃ ম্যাকনামারা যখন ভিয়েৎনাম সফরে যান, তখন বেশ কয়েকবার তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভিয়েৎনামের কম্যুনিস্ট গেরিলাদের কাছে ম্যাকনামারা এবং এ দেশের কম্যুনিস্ট মহলের কাছেও সে-কারণে ম্যাকনামারা একটি ঘৃণিত নাম। সেটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কম্যুনিস্টদের পত্র

পত্রিকায়। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের মুখপত্রে লেখা হয়েছে: "ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে নারকীয় ধ্বংস যজ্ঞের হোতা মার্কিন যুদ্ধবাজ রবার্ট ম্যাকনামারা বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি।" উগ্রপন্থী কম্যুনিস্টদের মুখপত্রে লেখা হয়েছে: "বিশ্ব জনগণের নিকৃষ্টতম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি রবার্ট ম্যাকনামারা বর্তমানে বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান।"

কম্যুনিস্ট মহলের কাছে মিঃ ম্যাকনামারা হয়ত এমনি এক শত্রু। কিন্তু কেবলমাত্র ভিয়েৎনাম যুদ্ধকে সামনে রাখলে দেখা যাবে এই যুদ্ধনীতি বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মিঃ ম্যাকনামারার হাতে ছিল না। এমনকি উত্তর ভিয়েৎনামে যখন মার্কিন বোমারু বিমান বোমা ফেলতে শুরু করে তখনও এ-সিদ্ধান্তের দায়িত্ব মিঃ ম্যাকনামারার হাতে ছিল না। সেটা যে তাঁর হাতে ছিল না তা তিনি নিজেই প্রকাশ করেছিলেন প্রতিরক্ষা দফতরের দায়িত্ব ছেড়ে দেবার আগে দেওয়া এক বক্তৃতায়। যে-বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন কানাডায় এবং তারপরই তিনি সরকারী দফতরের ভার ছেড়ে দেন। যে-বক্তৃতা দেবার বেশ কিছুদিন পরে তিনি বিশ্ব ব্যাঙ্কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাই ভিয়েৎনামের যুদ্ধবাজ ম্যাকনামারা বলে শ্লোগান তুললে হয়ত রাজনীতির সবটুকু বলা হয় না। বর্তমানের রাজনীতিতে বর্তমানের কথাটাই সামনে রাখা উচিত। সেই বর্তমানের কথাটা সামনে রাখলে দেখা যাবে মিঃ ম্যাকনামারার কলকাতার সমস্যা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করার সঙ্গে একদিকে আমেরিকা এবং অন্যদিকে ভারতের রাজনীতির বেশ কিছু যোগাযোগ হয়ত আছে। এ-কথাটা কোন মহলেই অজানা নেই যে, কলকাতা আজ সমগ্র পূর্ব ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের উৎসস্থল হিসাবে গণ্য হয়। কলকাতার যে-সমস্যা, সে-সমস্যা এত তীব্র বলেই কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে তীব্রতর করার বা সম্প্রসারিত করা অনেকটা সহজ। সহজ বলেই কলকাতায় কংগ্রেস-বিরোধী যে-সব আন্দোলন গড়ে ওঠে, বাইরে তা কম্যুনিস্ট আন্দোলন বলে পরিচিত হয়. আর তা হয় বলেই, কলকাতায় যখন আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে তখন একদিকে কংগ্রেস মহলে যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে গোটা পূর্বভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে প্রভাবিত করে। এটাই ছিল তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূল রাজনৈতিক বিচার কলকাতা সম্বন্ধে।

সে কারণে, যখন বাইরে প্রচারিত হল "কলকাতা একটি মৃত শহর", তখন ডাঃ রায় এই কথাটাই কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কলকাতার সমস্যাকে সমগ্র-নৈতিক সমস্যারও কিছু সমাধান সম্ভব। তাঁর প্রচেষ্টা এবং কলকাতার রাজনৈতিক ভূমিকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তখন তেমন আমল পায়নি; কিন্তু তবু ডাঃ রায়ের চেষ্টার ফলেই কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং সংস্থার সৃষ্টি হয় ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায়। এই ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় যখন কলকাতার সমস্যাগুলো একে একে উদ্ঘাটিত হতে থাকে, তখন থেকেই আমেরিকার আগ্রহ প্রকাশ পায় কলকাতা সম্বন্ধে। যদি পূর্ব-ভারতের কেন্দ্রস্থল হয় কলকাতা, তাহলে কলকাতার সমস্যার সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যাকে জুড়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। সেটা সম্ভব বলেই আমেরিকার আগ্রহটা কলকাতার প্রতি প্রকাশ পেতে দেরী হয়নি। এটা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেস্টার বোলস। কয়েকদিন আগেই, তিনি ভারতকে আমেরিকার সাহায্য দেওয়া সম্বন্ধে বলেছেন যে, যারা মনে করে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবান্বিত করার জন্য আমেরিকা ভারতকে সাহায্য দেয় তারা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কথা বলে। ভারতকে সাহায্য দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ডেমক্রেসিকে (গণতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত করে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা কোন কম্যুনিস্ট শাসনে বা একনায়কতন্ত্রে সম্ভব নয়। এই গণতন্ত্র ভিত্তিক সমাজে যেমন থাকবে স্বাধীনতা, তেমনি থাকবে সমৃদ্ধি।

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে: বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্য দেওয়ার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটা কোথায়? হয়ত প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না; কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, আমেরিকার যে অর্থ বিদেশে সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয় উন্নয়নের জন্য, তার মোটা একটা অংশ আসে বিশ্বব্যাঙ্কের মারফৎ। নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক সংস্থা; এবং রাষ্ট্রসংঘের সকল অংশীদারদের সমান অধিকার বিশ্বব্যাঙ্কের উপর; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রের এটাই অভিজ্ঞতা যে, বিশ্বব্যাঙ্কের বৈদেশিক সাহায্য নীতি অনেকাংশে আমেরিকার নীতির পরিপূরক। তাছাড়া, মিঃ ম্যাকনামারার ভারত সফরের ঠিক আগেই যখন মিঃ চেস্টার বোলসের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়, তখন অন্ততঃপক্ষে কম্যুনিস্ট মহলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। এ ছাড়া, আরও একটা বাস্তব অবস্থা এই সঙ্গে এসে পড়ে। সেটা এই যে, মিঃ ম্যাকনামারা যখন কলকাতার রাজভবনে বসে কলকাতার তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যার খুঁটিনাটি জেনে নিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় মার্কিন কংগ্রেসের দুজন প্রতিনিধি (একজন ডেমক্র্যাট, অন্যজন রিপাবলিকান) কলকাতা এসেছিলেন, কল-

[illegible] তাঁরা দেখেছেন

রাজপথে বিক্ষোভ, দেখেছেন মিঃ ম্যাকনামারার কুশপুত্তলিকা দাহ করার দৃশ্য। তাঁরা খোঁজ খবরও নিয়েছেন রাজনৈতিক মহলে; কারণ আমেরিকায় কলকাতা সম্বন্ধে এখন প্রচণ্ড কৌতূহল জেগেছে। হয়ত বা দুশ্চিন্তা।

অন্য আর এক মহলেও দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা। সেটা শিল্পের ক্ষেত্রে। পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রণ্টের নয় মাস শাসন ব্যবস্থার পর, শিল্পের ক্ষেত্রে এসেছে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলার ফলে, শুধু যে শিল্পের শান্তিই ব্যাহত হয়েছে তা নয়, সমগ্রভাবে দেখা দিয়েছে শিল্পোন্নয়নে বিঘ্ন। এই বিঘ্ন এবং বাধা, অনেকাংশে রাজনৈতিক রীতিনীতির উপর যদি নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তা হলে তার মূল সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হবার তাগিদ দেখা দিয়েছে শিল্প মহলে। রাজনৈতিক অরাজকতা যদি দেখা দিয়ে থাকে, তা হলে, বিভিন্ন চেম্বারস্ অব কমার্সের মতে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ আছে কলকাতার বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে। চেম্বার্স অব কমার্সের পক্ষ থেকে বারবার এ কথাটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান হয়েছে যে, কলকাতার সমস্যার আশু সমাধানের কাজ হাতে না নিলে শিল্পে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। সে কারণে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সি এম পি ও রচিত কলকাতা উন্নয়নের প্ল্যানকে শুধু সুপারিশ করাই হয়নি, সুপারিশ করার জন্যও বিশেষভাবে চাপ দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার প্ল্যান সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়ে এসেছে; কিন্তু আজ আর তা সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কলকাতার সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব হচ্ছে না। তারই ফলে, বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে কলকাতার প্ল্যানকে সুপারিশ করা হয়েছে।

সেই সুপারিশের অর্থ যদি আসে তা হলে তা আসতে পারে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকেই। কম্যুনিস্ট মহলের রাজনৈতিক বিচারে সে সাহায্য আসবে প্রধানত কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে। যদি এই চিন্তাধারা কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিকোণে একমাত্র বিচার হয়, তা হলে বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ ম্যাকনামারার কলকাতা সফরকে রাজনৈতিক সফর হিসাবে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা হয়ত আছে। কিন্তু মূল প্রশ্নগুলি থেকেই যায়। সে প্রশ্নগুলো অনেকটা এই রকম: নাগরিক জীবনকে সুস্থ রাখার জন্য কলকাতার সমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজন আছে কিনা; এবং যদি থাকে, তা হলে সেই আশু সমাধানের জন্য অর্থ আমদানির অন্য কোন পথ খোলা আছে কি না? আর বড় প্রশ্ন: বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য ট্রাম বা বাস ধ্বংস করার সার্থকতা কোথায়?

রঞ্জন

নিজের চোখে বিশ্বদর্শন কোনো ভারতীয়ের পক্ষে কখনোই সহজ ছিল না। কালাপানির পর্দা ঘুচেছে তো এই সেদিন। তারপর ইংরেজ এনে দিল এক জোড়া রঙীন চশমা, লণ্ডনে প্রস্তুত। তাই দিয়ে দেখা গেল যে, আফ্রিকা কালো, আমেরিকা অপরিণতমনস্ক, য়ুরোপ সর্ব বিষয়ে চঞ্চল আর গোটা প্রাচ্য অঞ্চল, পরিবর্তনবিমুখ। বছর বিশেক আগে স্বাধীনতা এলে ভারতের কোনো একটা রকম বিদেশী নীতি প্রস্তুত হলো সত্য; কিন্তু বহুকাল তা জমা রয়ে গেল তৎকালীন শীতল যুদ্ধের রেফ্রিজারেটরে। সাময়িক সুযোগ কিছু মিলেছিল বইকি। কমনওয়েলথে থেকে গিয়ে কিছু কর্তামি চলল। (তার মানে, রয়ে গেল লণ্ডনী চশমা।) ওয়াশিংটনে পাওয়া গেল দূরের স্বাগতম। পিকিং-এ তো ভাইয়ের অন্ত নেই। কবেক মিলল মস্কোতেও। তৎকালীন রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্বের প্রয়োজন ছিল একটি ননদিনীর। ভারত পেয়ে গেল সেই ভূমিকা; মনে রাখল না যে, ননদের বিদায় ঘটে স্বামী-স্ত্রীর প্রায় অবশ্যম্ভাবী পুনর্মিলনে। সবই হলো। অজাত রয়ে গেল একটা ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি।

শুধু লণ্ডনী চশমাকে দুষলে চলবে না। চশমা বানাতে জানে ওয়াশিংটন; চশমা বানাতে জানে মস্কো আর পিকিং। রঙ আলাদা, কিন্তু চশমা চশমাই। পরলে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটবেই। ঘটেছেও। একদা আমার আশা ছিল যে, নয়া দিল্লিতে অন্তত কেউ কেউ শিখবেন যে, প্যারিসের আন্তর্জাতিক পদমর্যাদাহ্রাস হলেও ওই রাজধানীতে সংবাদ ও বিশ্লেষণের যে ভাণ্ডার আছে, লণ্ডনে ওয়াশিংটনে বা মস্কোতে তা অপ্রাপ্য। সাম্প্রতিক ঘটনা ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের পতনের আশংকা। স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে জানি জাতীয় মুদ্রার মূল্য বহির্বিশ্বে হেয় গণ্য হলে, যা ভারতীয় টাকার হয়েছে, কোনো ব্যক্তির পক্ষের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা অতীব দুরূহ। রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় সদস্যের বক্তৃতার বাজারদর নির্ধারিত হয় না সুইটজারল্যাণ্ড বা অন্য কোনো অনির্দিষ্ট মূল্যায়নের প্রাঙ্গণে; ভারতীয় টাকার উপায় নেই আন্তর্জাতিক অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ না হয়ে। সেই পরীক্ষায়ই ভারতীয় টাকার অসতীত্ব প্রমাণিত হয়েছিল বছর তিনেক আগে। আজ ফরাসী ফ্রাঙ্কের পতন সারা বিশ্বে যদি ভ্রূযুগল উত্তোলিত না করে থাকে তার কারণ হয়তো এই যে, ফ্রান্স সচরাচর সতী-সাবিত্রীর দেশ বক্ষে আত্মপ্রচার করে না।

✻

ফ্রাঙ্কের পতন তবু আমাকে যৎপরোনাস্তি আঘাত করেছে একাধিক কারণে। এই সেদিন পর্যন্ত ফ্রাঙ্ক মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউণ্ড আর জার্মান মার্ককে বলছিল সমঝে কথা কইতে। আর্থনীতিক আসা-যাওয়া আমি নিয়মিত অনুধাবন করিনে। আমারই অক্ষমতা। কিন্তু জেনরেল দ্য গ্যল দশ বছরে ফ্রান্সকে এমন একটা অবস্থায় উপনীত করেছিলেন যেখানে তিনি ব্রিটেনকে বলতে পারতেন য়ুরোপীয় কমন মার্কেটের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে, আমেরিকাকে বলতে পারতেন নেটোর অফিসের জন্য অন্য আস্তানা খুঁজতে, আর মস্কোকে সামান্য সৌহার্দ্য জানিয়ে নির্ভুল নির্দেশ দিতে পারতেন অলঙ্ঘ্য দূরত্ব নির্ণয় ও পালনের। সন্দেহ করি, ফ্রাঙ্কের মূল্যোহ্রাসে দ্য গলের অতিদীর্ঘ আকৃতি কিঞ্চিৎ খর্ব হয়েছে। আমার বক্তব্য তথাচ এই যে আন্তর্জাতিক ভাষ্যকার হিসাবে প্যারিসের স্থান আজও অপরাজিত। দ্য গালের অদানবীয় স্বৈরতন্ত্রে ফরাসী বিশ্লেষণী প্রতিভার সামান্য ব্যত্যয় ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু অন্যান্য উল্লিখিত চশমার চাইতে ফরাসী চশমা এখনও বোধ হয় অনেক বেশী দৃষ্টিদায়ী। ভিয়েৎনাম ও আফ্রিকায় আমরা অনেক কিছু দেখিনি যা প্যারিস দেখেছে। দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সহায়ক নয় মোহ বা অলীক বিশ্বাস; আর এই দুই বস্তু প্যারিসে দুর্লভ। যেমন পররাষ্ট্রনীতি দপ্তরে তেমন সেইন নদীর দুই তীরের অন্য স্তরের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংযোগস্থলে। অভিনীত, অংশত অবিকৃত, অনুভূতির অন্তরালে কোথায় থাকে একটা শীতল হিসেবিয়ানা এবং একমাত্র এই হতে পারে যে-কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গত ভিত্তি। ফরাসী চিন্তার এই কঠোর বাস্তব ভিত্তি বাঙলা দেশের পেলব ভূমিতে কখনোই মূল গ্রহণ করেনি। একমাত্র ভরসা এই যে, ফ্রাঙ্কের পতন ফরাসী চিন্তার মূল্যায়নে বিপুল কোনো বিকৃতি ঘটাবে না।

বিকৃতি তবু ঘটে। গ্রেহাম গ্রীন তাঁর উপন্যাসে একবার লিখেছিলেন যে, আমরা সবাই এক সময় কোনো সৎ ব্যক্তিকে বলতাম এ ম্যান অব স্টার্লিং ক্যারেকটার। এখন আমাদের বলতে হবে ডলার ক্যারেকটার, অতি বিভিন্ন চরিত্র। মুদ্রা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই সাযুজ্য ভারতীয় টাকা সম্বন্ধে কেউ কখনো আরোপ করেছে বলে জানিনে। ফরাসী মুদ্রাও নয় অসতী। তবু ফ্রাঙ্কের পতনের সঙ্গে কোথাও যেন অমিল আছে জেনরেল দ্য গ্যলের সর্বব্যাপী হুমকির।

✻

অবশ্য তার চাইতে অনেক বেশী বৈসাদৃশ্য বিরাজমান ভারতবর্ষের বিদেশী ভঙ্গীতে আর আভ্যন্তর পঙ্গুতায়। কলকাতা নয় প্যারিস; বারাণসী নয় ভ্যাটিকান। দিল্লির কথা যত কম বলা হয় ততই ভালো।

এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক জটিলতা আমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই এই সামান্য কৃপা দাবি করতে পারে যে, আমি এই বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে অনাবশ্যক দুর্বোধ গদ্যে সরব হব না। শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তি॥

পুনশ্চ: শনিবার রাত্রে, আমার লেখার অনেক পরে, জেনরেল দ্য গ্যল জানিয়ে দিলেন যে ফ্রাঙ্কের মূল্যাবনয়ন হবে না। আমার আঘাত তাই অন্তত আপাতত স্থগিত রইল, বজায় রইল প্যারিসপ্রীতি।

কৃতঘ্ন শব্দের রাশি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরশির করে ওঠে
আঙুলে বা চোখের পাতায়
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা নীরার পদবী ভুলে যাই—
এবং নীরার মুখ!
জলে-ডোবা মানুষের বাতাসের জন্য হাঁকুপাকু—সেই অস্থিরতা
নীরার মুখের ছবি—সোনালি চশমার ফ্রেম, নাকি কালো?
স্তম্ভের ঘড়িকে আমি প্রশ্ন করি, সোনালি? না কালো?
ধনুক কপালে বাঁকা টিপ, ঢাল চুলে বাতাসের খুনসুটি
তবুও নীরার মুখ অস্পষ্ট কুয়াশায়
জালে ঘেরা বকুল গাছকে আমি ডেকে বলি
বলো, বলো, তুমিও তো দেখেছিলে?
নীরার চশমার ফ্রেম সোনালি না কালো?

সিঁড়ির ধাপের মত বিস্মরণ বহু দূর নেমে যায়
ভুলে যাই নীরার নাভির গন্ধ
চোখের কৌতুকময় বিষণ্ণতা
নীরার চিবুকে কোনো তিল ছিল?
এলাচের গন্ধমাখা হাসি যেন বাতাসের মধ্যে উপহাস
বিস্মৃতির মধ্যে শুনি অধঃপতনের গাঢ় শব্দ
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা
সব কিছু ভুলতে ভুলতে আমার অস্তিত্ব
শূন্য কিন্তু মগ্ন হয়ে ওঠে—
ছিঁড়ে যায় নীল পর্দা, ভেঙে পড়ে অসংখ্য দেয়াল
হিজল বনের ছায়া চারিদিকে ঘাসের পাশে খেলা করে
তীব্রভাবে বেজে ওঠে কণ্ঠ। শব্দের রাশি সেই মুহূর্তেই
চোয়াল কঠিন করে হাত তুলি, বজ্র মুঠি, ঝলসে ওঠে
রক্ত মাখা ছুরি!

কবিতার তুলো ওঠে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কবিতার তুলো ওড়ে, সারারাত্রি মনের ভিতরে
হাওয়া লেগে
খেলা-ভোলা শিশু
এক খেলা ফেলে রেখে এ-নতুন উৎক্ষিপ্ত খেলায়
সমর্পণ করে সব—অশ্রু, হাসি, স্বপ্ন, পরিশ্রম......
কবিতার তুলো ওড়ে সরারাত্রি মনের ভিতরে।
শুধু কি ওড়ে না শিশু,
ছুঁয়ে থাকে মাটির বাস্তব?
কিন্তু, তা কী ক'রে হবে?
ও যে নখে বালিশ ছিঁড়েছে!!

ফুটপাথ ছেড়ে হাঁটার জন্য লাইসেন্স ফি ধার্য করুন

'অকট্রয় এবং বিবিধ'

অতএব কলকাতায় 'অকট্রয়' বসছে —বাংলা খবরের কাগজের উচ্চারণ-মাফিক। ইংরিজি মতে উচ্চারণটা খুব সম্ভব অকট্রোয়া—কিন্তু উচ্চারণে কী আসে যায়—যখন 'শালা' এবং 'হালা'র অর্থব্যঞ্জনায় কোনো পার্থক্য নেই, যখন 'খেজুর' 'খাজুর' হলে তার মিষ্টত্বের কিছুমাত্র তারতম্য ঘটে না।

কিন্তু 'অকট্রয়'ই বা কেন? সেই নবাবী আমল থেকে ওর একটি নির্দিষ্ট প্রতি শব্দ আছে যখন: 'চুঙ্গি।' তবে চুঙ্গি'টা বোধ করি ভালো শোনায় না—কারণ খোসাসুদ্ধ আমে দাঁত বসিয়ে ভেতরের রসটি নিঃশেষে শোষণ-প্রক্রিয়াকেও সম্ভবতঃ আঞ্চলিক ভাষায় 'চুঙ্গি দেওয়া' বলে। ব্যঞ্জনাটা ভীতিজনক। হাড় শুদ্ধ শুষে নেওয়ার এই তাৎপর্যটি একটু গুহা-নিহিত গহ্বরেষ্ঠ থাকাই ভালো। তার চাইতে অকট্রয় (বা ট্রোয়া) বেশ প্রাজ্ঞ-গম্ভীর—শেষের 'রয়' বা 'রোয়া'র ভেতরে একটা রাজকীয়তা নিহিত—যাঁরা এটি দিতে বাধ্য হবেন তাঁদেরও এই ধ্বনি-গাম্ভীর্যে একটা চিত্তপ্রসাদ অনুভূত হবে, যেন কোনো সুমহান্ কর্তব্যে দান করছেন এই জাতীয় কিঞ্চিৎ পুলক জেগে ওঠাও আশ্চর্য নয়।

গ্রীষ্মে পুস্কাসের অধিক জল চাইলে ট্যাক্স চান

তবে—'নামে কিবা করে, গোলাপ যে নামে ডাকো'—ই ত্যা কা র ঋষিবাক্য। ট্যাক্সো—চিরদিনই ট্যাক্সো—তার ইম্প্যাক্ট্ হচ্ছে ট্যাক্সেশন, সেটা মোটেই বন্ধুর পয়সায় ট্যাক্সি চড়বার মতো সুখদ ব্যাপার নয়। অতএব 'চুঙ্গি দেওয়া' চলুক —না না, 'অকট্রয়' বসুক—আমরা শূন্য পকেটকে শূন্যতর করে নামসৌন্দর্যে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেতে থাকি। ভারত নাকি পৃথিবীর সর্বাধিক করভারপীড়িত দেশ—এমন কি ব্রিটেনের চাইতেও (সত্যি মিথ্যে জানি নে, জনশ্রুতি বলে)। যদি তাই হয়, তা হলে সগৌরবে বলতে পারি বহন-ক্ষমতায় ঈশ্বরের জগতে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ—আমরাই শ্রীভগবানের জয়-পতাকা বহন করবার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী: "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" এবং শিবরাম চক্রবর্তীকে কোট করে বলা যায়: "যাকে সে শক্তি দাও না, তাকে তোমার পতাকাই দাও না। বোধ হয়, ভালোই করো।"

কিন্তু আসল কথা হল: টাকা চাই। কর্পোরেশনের চাই, রাজ্য সরকারের চাই, কেন্দ্রীয় সরকারেরই কি চাই না? মনে হতেই আবার রবীন্দ্রনাথ গুনগুনিয়ে উঠলেন: "আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি।" তবে তাই হোক—সর্বত্যাগের আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয় জুড়ে উদ্বেল হয়ে উঠুক। বিশেষ করে কর্পোরেশনের অকট্রয়ের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ট্যাক্স বৃদ্ধির সাংপ্রতিক ঘোষণা যখন কানে এল, তখনই জানি ত্যাগের লগ্ন সমাগত: সব দিতে হবে—"আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।" বিত্তের পালা অদূরেই, আপাতত বাণীই নিবেদন করি।

না—এ বাণী প্রতিবাদের নয়, আরাধনার। দেবার সময় যদি এসেই থাকে, তা হলে আর কিসের দ্বিধা? কিন্তু এ-সব ভাবালুতা থাক। আরো সোজা বাংলায় বলি, আমাদের দেবার ক্ষমতা অসীম—

আশা করি, নেবার ক্ষমতাও অসীম নয়। সুতরাং, কর্পোরেশন, রাজ্য-সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার (কার ভাগে কোন্‌টা পড়বে বলতে পারছি না)—প্রত্যেকের সহযোগিতার্থে আমি আরো কিছু সাজেশান দিচ্ছি। আমরা—জনসাধারণ—দানের গৌরবেই চরিতার্থ থাকব, বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ করব না।

প্রস্তাব এক নম্বর:—

মিছিল-নগরী কলকাতায় প্রতিদিন অসংখ্য শ্লোগান শোনা যায়। এই শোভাযাত্রীরা আগে থেকে তাঁদের শ্লোগানগুলো রেজিস্ট্রি করিয়ে নেবেন, ধরুন—পাঁচ টাকা করে প্রত্যেকটি। মিছিলে ট্যাক্স বসানোর কিঞ্চিৎ ঝামেলা আছে—একটু বিপজ্জনকও বোধ হয়—কিন্তু শ্লোগান রেজিস্ট্রি করিয়ে দলগুলো খুশিই হবেন, কারণ 'কপিরাইট' পাকা হবে—একের বাণীমন্ত্র অন্যেরা হরণ করতে পারবেন না।

প্রস্তাব নম্বর দুই:

প্রত্যেকটি বারোয়ারী অ্যাম্‌প্লিফায়ার বাবদ পঞ্চাশ টাকা—সারা রাত চালালে দুশো। (এখনো সরকারী সময়কে বুড়োআঙুল দেখিয়ে প্রায়ই হোল নাইট পার্‌ফর্ম্যান্স চলে) যাঁরা বিসর্জনেই হাজার হাজার টাকা খরচ করেন, আশা করা যায় তাঁরা আপত্তি করবেন না এবং সারা রাত মাইক চালানোর আইনসম্মত কৌলীন্য অনেকেরই খুব লোভজনক মনে হবে।

প্রস্তাব নম্বর তিন:

যাঁদের ওজন একশো ষাট পাউন্ডের বেশি (সুনন্দর ওজন দেড়শো পাউন্ডের মতো) তাঁরা ট্রামে, বাসে এবং ট্রেনে দেড়া ভাড়া দেবেন। দুশো পাউন্ড ছাপিয়ে গেলে ডবল ভাড়াও দাবি করা যেতে পারে। (এটা নিয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্ক হতে পারে, তবে সংশোধনী প্রস্তাবে রফা হয়ে যাবে।) এর আর একটা ভালো দিকও আছে, কারণ বহু ভোজীরাই পৃথুল হন—আমাদের মতো রেশন শীর্ণেরা তাঁদের জন্যে সমবেদনা বোধ করবেন না। তা ছাড়া ট্রাম-বাসের ভাড়া-বৃদ্ধির প্রস্তাবেই যেন একটু কালো মেঘের আভাস পাওয়া যাচ্ছে—সেটাও রোধ করা সম্ভব হবে।

প্রস্তাব নম্বর চার:

প্রত্যেক গৃহস্থ নিজের বাড়িতে বা বাসায় একটি করে ওজন-যন্ত্র নিজ খরচে বসাতে বাধ্য থাকবেন। সেই যন্ত্রে প্রতিদিন তাঁর বাড়ির 'গার্‌বেজ' বা আবর্জনা ওজন করা হবে—যাঁর আবর্জনা এক কিলোর বেশী হবে তাঁকে বাড়তি কিলো প্রতি—ধরুন পঁচিশ পয়সা করে—কনজারভেন্সি

পৌরপিতাদের কোন্দল দর্শন বাবদ প্রমোদ কর থেকেও আয় হতে পারে

ট্যাক্স দিতে হবে। (এতে কলকাতায় ময়লা কম জমবে।)

প্রস্তাব নম্বর পাঁচ:

শহরের যে সব অঞ্চলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ময়লা জমবে—ধরুন দু লরীর বেশি—সে সব অঞ্চলে কর্পোরেশন—পিউনিটিভ, মানে পিটুনি ট্যাক্স বসাবেন। আর ওয়ার্ড কাউন্‌সিলর কম করেও পাঁচশো টাকা ট্যাক্স দিতে বাধ্য থাকবেন। (অর্থাৎ ক্লীনার ক্যালকাটা তর তর করে এগিয়ে যাবে!)

মাপ করবেন, আরো শ'খানেক এই রকম ভালো ভালো প্রস্তাব আমার ছিল, কিন্তু জার্নালের জায়গার কথা ভেবে এই বিন্দুতেই সিন্ধুর আভাস দিতে হল। তা ছাড়া জানলা দিয়ে অদূরেই আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলরের পাকা গোঁফ এবং কালো চশমা-দেখা যাচ্ছে—নিজের বাড়িটা বে-আইনিভাবে একটু বাড়িয়েছি বলে ওই ভদ্রলোককে আপাতত চটাতে চাইছি না।

সরকার এবং কর্পোরেশন প্রয়োজনবোধে গোপনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

দুনিয়ার সবচেয়ে তাজ্জব চিজ—বুঝেছ, এই শুয়োর।" —রেল ইস্টিশনের বাইরে, নোংরা একফালি মাঠের ভেতরে, একটা মাদী শুয়োর কতগুলো ছানাপোনা নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল, সেই দিকে তাকিয়ে—বাঁ চোখটা কুঁচকে আলতোভাবে কথাটা বলেছিল লোকটা।

তা—মানুষটাকে দেখলে কেমন যেন গা শিরশির করে, একটু ভক্তি-টক্তিও হতে চায়। সাদায় কালোয় মাথার চুল, সাদার ভাগটাই বেশি। মোটা মোটা ভুরু দুটোও পাক ধরা, তার নিচে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। মুখে খানিক এবড়ো-খেবড়ো সাদা দাড়ি, দেখলেই বোঝা যায়, দাড়িটা নিয়মিত

রাখে না—খেয়ালমতো কামিয়ে ফেলে মধ্যে মধ্যে। নাকের বাঁ-দিকে একটা শুকনো কাটার দাগ—মনে হয় সাঁওতালী তীর কিংবা বল্লমের ঘা লেগেছিল কোনোকালে।

প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে গা এলিয়ে, পায়ের কাছে গামছার পুঁটলিটা রেখে, আধ ঘণ্টা লেট লোক্যাল ট্রেনটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে, একটু দূরের শুয়োরগুলোকে দেখে, বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে লোকটা বলছিল: শুধু, যা বলেছি। দুনিয়ার সব চেয়ে তাজ্জব চিজ হল এই শুয়োর।'

পাশে বসে ভক্তিমানের মতো শুনছিল জন দুই চাষী গেরস্ত। কয়েক হাত দূরে সুটকেস পেতে বসে আমিও শুনছিলুম, কারণ আধ ঘণ্টা লেট হয়ে যে ট্রেনটা আসছে তাতে আমাকেও যেতে হবে। সামনের ফাঁকা রেলের লাইন, মাথার ওপর রাধাচূড়োর পাতায় হালকা বাতাসের শব্দ, ওদিকের সাইডিঙে খান তিনেক কালো কালো পুরোনো ওয়াগন, মালগুদামের টিনের চালে চোখ ধাঁধানো খানিক রোদের ঝিলিক আর থেকে থেকে কাকের ডাক আমার সারা শরীরে একটা ক্লান্ত ঝিমুনি নিয়ে আসছিল। লোকটার ভরাট আর ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজে আমি নড়ে-চড়ে বসলুম।

ভক্তি সত্ত্বেও একজন চাষী অবাক হল একটু।

'এত জীব থাকতে শুয়োর সব চাইতে তাজ্জব হল কেন?'

'কখনো সুন্দরবনের তল্লাটে যাওয়া হয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'নদীগুলো যেখানে রাক্ষুসে হয়ে সাগরে পড়ে—সে-সব মোহানার খবর জানা আছে কিছু?'

'আজ্ঞে জানব কী করে? যাইনি তো কখনো।'

'সেই সব নোনা গাঙের ভেতর চর জাগল। এলোপাথাড়ি গাছ-গাছলাও গজালো খানিকটা। কিন্তু মানুষ গিয়ে থাকতে পারে না। একে তো নোনা—তার ওপর জোয়ারের সময় সব ডুবে যায়, কিলবিল করে সাপ—একটা পানবোড়া একবার ঠুকে দিলে তো শিবের অসাধ্যি।'

'আজ্ঞে সে তো বটেই।'

'তখন সে চরে সব চে' আগে কে যায় বলোদিকি?'

'জানি নে।'

'যায় শুয়োর।' —লোকটা এবার একটু হাসল, কুঁচকে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল বাঁ চোখটা।

'কোত্থেকে যায়?'

'অন্য চর থেকে, ডাঙা থেকে।'

'কী করে যায়?'

'কেন—সাঁতরে?'

'ওই গহীন গাঙ?'

'গহীন গাঙ বইকি। বাঘের অবধি সাহসে কুলোয় না—কিন্তু যাকে বলে শুয়োরের গোঁ। ওদের সাঁতরাতে দেখেছ কখনো? ঠিক কুকুরের মতো জলের ওপর নাকটা তুলে তুর তুর করে পেরিয়ে যায় দু এক মাইল।'

'তা চরে গিয়ে কী করে শুয়োর?'—আর একজন চাষী একটা বিড়ি ধরাতে গিয়েও ভুলে গেল:

'সেখানে তো কচু-কন্দ নেই, খায় কী?'

'কেন—কাঁকড়া।'

'কাঁকড়া?' —এবার দুটি শ্রোতাই চমকালো এবং সেই সঙ্গে আমিও।

'বললুম না—দুনিয়ায় অমন আজব চীজ আর নেই? নোনা জলের অ্যাই বড়ো বড়ো কাঁকড়া দেখেছ তো? শুয়োর সেগুলো ধরে কড়মড় করে চিবিয়ে খায়।'

'শুয়োরে কাঁকড়া খায়?' একজন তখনো অবিশ্বাসী।

'তেমন তেমন হলে বাঘে ধান খায় শোনোনি?'

'তা হলে পেটের চিন্তা নেই?'

'একেবারে না। আর জোয়ারের জল এসে চর ডুবে গেলে কী করে জানো? বুনো গাছ জাপটে ধরে—মানুষের মতো সোজা হয়ে—জলের ওপর নাক ভাসিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।'

'খুবই তাজ্জব বলতে হবে তা হলে।' প্রথম চাষীটি একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল: 'আপনি এত সব জানলেন কী করে?'

'খুলনা জেলার লোক না আমি?'—এইবারে লোকটি বিষণ্ণ হল একটু: 'চোখেই তো দেখা এ-সব। কিন্তু পাকিস্তান হয়েই—' একটা ছোট নিশ্বাস পড়ল: 'চারদিকে বানের কথা বলছিলে না তোমরা? তাই শুয়োরগুলোকে মনে পড়ছিল আমার।'

বান-বান-বান। গ্রাম ডুবছে, শহর ডুবছে, মানুষ ডুবছে, ফসল ডুবছে। যেন রসাতলে যেতে বসেছে গোটা দেশটাই। সেই যন্ত্রণা আর দুর্ভাবনা সব কটি মুখেই ছড়িয়ে পড়ল এখন, বেলা এগারোটার সময়েও—রাধাচূড়োর হালকা ছায়াটার তলায়, যেন একটুকরো বিষণ্ণ অন্ধকার নামল।

মনে হল, গোটা তিনেক নিশ্বাস পড়ল একসঙ্গে। চুপ করে কাটল কয়েক সেকেন্ড। যে চাষীটি তখন থেকে বিড়িটা হাতে নিয়ে বসেছিল, সে এবার সেটা এগিয়ে দিলে লোকটির দিকে। আমি দূরের চোখ-ধাঁধানো করোগেটেড টিনের চালটার দিকে তাকিয়ে থেকেও দেশলাইয়ের আওয়াজ পেলুম, বুঝতে পারলুম ওরা তিনজনেই তিনটে বিড়ি ধরিয়েছে।

আমাকে ওরা চোখ দিয়ে দেখেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু মন দিয়ে কেউ দেখছিল না। ওরা দূরের সুন্দরবনে ছিল, নোনা গাঙের দেশে ছিল, ওরা গহীন গাঙে সাঁতার কাটতে দেখছিল বুনো শুয়োরকে, কড়মড় করে এই বড়ো বড়ো কাঁকড়া খেতে দেখছিল। আমি সেখানে কেউ নই। ও-সব আমার দেখবার কথা নয়।

একটু সময় কেটে গিয়েছিল, তবু ওদের একজন মনে করে আগের কথারই জের টানল। এই সব সাধারণ মানুষের যেমন করে বলা উচিত, তেমনি বোকা-বোকা ভঙ্গিতে বললে, 'তা বটে। শুয়োরের কথা মনে পড়ে যায় বইকি। মানুষ যদি শুয়োর হত, তা হলে অমন করে বানের তোড়ে তলিয়ে যেত না, নাক উঁচু করে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যেখানে হোক পাড়ি দিত।'

'কিংবা'—যে লোকটাকে দেখলে গা-টা একটু শিউরে শিউরে ওঠে, সাধারণ গেঁয়ো মানুষের কেমন যেন ভক্তি করতে ইচ্ছে যায়, কথা বলতে বলতে যার বাঁ চোখটা কুঁচকে যায় বার বার, একটু মোটা আর ভাঙা যার গলার আওয়াজ, সেই খুলনা জেলার মানুষটা আবার বললে, 'কিংবা হাতের কাছে দু-চারটে বুনো শুয়োর পেলে বেঁচেও যেত কেউ কেউ।'

'বুনো শুয়োর পেলে? সে আবার কি রকম কথা?'

সে আবার কি রকম কথা—আমিও এটা জিজ্ঞেস করতে পারতুম। কারণ—এই সেদিন—উত্তর বাংলার বন্যার সময় আমিও তো ছিলুম এক বন্ধুর বাড়িতে। শেষ রাতে জল এল, হুড়মুড় করে তলিয়ে গেল টিনের ঘর—কে যে কোথাও উধাও হল, আমি জানিও না। লাফিয়ে বেরিয়ে একটা গাছে উঠে পড়েছিলুম, জল নেমে গেলে এক কোমর পলি আর আতঙ্কে জমাট মৃত্যুর জগৎ ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছি, বন্ধু, তার স্ত্রী—তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খবর নেবার সময় ছিল না, উপায়ও ছিল না। দিন সাতেক পরে—অনেক কষ্টে নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যাকে সামনে পেয়েছি—অনেক রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছি তাকে। আমি যদি একটা বুনো শুয়োর হতুম—এর বেশি কী আর করতে পারতুম আমি!

লোকগুলোর আলাপ-আলোচনায় আমার কেমন একটা অস্বস্তি হল, একবার ভাবলুম, আমার পকেটে 'ফ্রেশ-লাভার্স' বলে যে পেপারব্যাকটা আছে, সেটা বরং পড়ি—ট্রেনের তো এখনো চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তবু ওদের কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল, আমি ঠিক শুনতে চাইলুম না—তবু শুনে যেতে লাগলুম—করোগেটেড টিনের চালটা চোখের সামনে ঝকঝক করে চলল।

তারপর সেই লোকটার গলা আরো গভীর হতে থাকল, স্মৃতির ভেতরে ডুবে গিয়ে মানুষ যেমন করে কথা বলে—কখনো স্বপ্ন

দেখে—কখনো জাগে, কখনো বাইরেটাকে অবজ্ঞা করে দেখে—কখনো দেখে না, তেমনি স্পষ্ট অথচ ছায়া ছায়া ভঙ্গিতে ভাঙা মোটা আওয়াজে সে কথা কইতে লাগল। এখন তার স্বরে জোয়ারে কেঁপে ওঠা রায়মঙ্গল নদী গম গম করতে লাগল, নোনা সমুদ্রের হাওয়ায় সুন্দরী হেঁতাল-গোলপাতার মর্মর উঠতে লাগল। আমি এতক্ষণ কোথাও ছিলুম না—এবার ওই লোক দুটো, রেলের লাইন, রোদ-ঝলসানো টিনের চাল, রাধা-চূড়োর ছায়া—সব মিলিয়ে গেল। চারদিকের অন্ধকারের ভেতর শুধু স্মৃতি জড়ানো একটা স্বর জেগে রইল কুয়াশামাখা আলোক-বৃত্তের মতো।

'দেশ-ঘর যখন গেল, তখন বউ আর দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি শেয়ালদা স্টেশনে। তারপর ক্যাম্পে। তারও পরে? বউটা মরল কলেরায়, ছেলেটা ভিক্ষুকের দলে মিশল, মেয়েটা একটু বড়ো হয়েছিল—সেটা যে কোন্ চুলোয় গিয়ে পৌঁছুল বোধ করি ভগবানও তা জানে না।

তা ভাই ছাড়ান দাও এ-সব কথা, এগুলো শুনে শুনে তো তোমাদের কান পচে গেছে। মোদ্দা—বছর না ঘুরতেই আমি হাত-পা ঝেড়ে সাফসুফ হয়ে গেলুম। তখন যেখানে যাই—যেখানেই থাকি, আমার আর কিসের ভাবনা! ঘুরতে ঘুরতে চলে এলুম বাংলা দেশের আর এক মুল্লুকে।

কী না করেছি বছর দুই ধরে। সরকার থেকে লোন দিয়েছিল, ব্যবসা করতে গেলুম—ছ' মাসও টিঁকল না। জাত চাষীর ছেলে, সাত জন্মে করেছি ও-সব, না বুঝি কিছু! আসামের দিকে দল বেঁধে গিয়েছিলুম একবার—পাহাড়ের ঢালে বাস্তু বেঁধে জমিতে চাষ দিয়েছিলুম—বলব কী ভাই, সোনা ফলেছিল। কিন্তু থাকতে দিলে না। প্রথমে এল সরকারী নোটিশ, কিন্তু বন-বাদাড় কেটে এত কষ্টে ফসল করেছি—ছেড়ে যাব? তাতে দিলে হাতি লেলিয়ে। ঘর-দোর ভেঙে, আমাদের বুকের পাঁজরার সঙ্গে ফসল দলে-পিষে উৎখাত করে দিলে—হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিলে এরা পাকিস্তানের চেয়েও সরেস।

ও-সব কথা থাক দাদা—আমাদের ছোট মুখে মানায় না। কাঁদতে কাঁদতে কে যে কোন্ দিকে ছটকে পড়ল বলতে পারিনে, আমি আসাম ছাড়িয়ে আবার বাংলা দেশে এলুম।

পৌঁছেছিলুম একটা ছোট শহরে। জন-মজুর খাটলুম কিছু দিন, কিন্তু চাষীর রক্ত যাবে কোথায়! কারো কাঁধে লাঙল দেখলে, হাওয়ায় ধানের শীষ দুলতে দেখলে, এক পশলা বৃষ্টির পর কচি লাউ-কুমড়ো-পালঙের পাতা সবুজ হয়ে লকলক করতে দেখলে যেন কান্না উছলে উঠত বুকের ভেতর।

সরকার থেকে তখন লোক পাঠাচ্ছিল আন্দামানে, জমি-টমি দেবে। কিন্তু সেই ছাতির পর থেকেই আমার ভয় ধরেছিল, দাদা। সে তো কালাপানির দেশ—সেখানে আবার কী লেলিয়ে দেবে কে জানে! আমার আর কী আছে, মরি তো এই বাংলা দেশেই মরব।

চাষীর ছেলে—একটুখানি জমি চাই আমার। এক বিঘে না হয় দশ কাঠা, দশ কাঠা না জুটলে পাঁচ কাঠা। কিন্তু কে দেবে জমি—কোথায় জমি! এ তো আমাদের দেশ নয় যে বন কেটে আবাদ করব, বাঘ-কুমির-সাপ তাড়িয়ে মাটির দখল নেব।

তবু আবার জমি পেলুম।

শহরের বাইরে এক পাহাড়ী নদী। যত বড়ো নদী, চড়া তার চাইতেও বেশি। এই চড়া বোধ হয় সরকারী সম্পত্তি—কিন্তু তাতে এখন কাশ, শন আর ইকড়ার জঙ্গল! আগে বর্ষায় চড়াটা তলিয়ে যেত, কিন্তু দশ-বারো বছর ধরে তার খানিক জায়গা অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে, আর ডোবে না—সেখানে ঘাস-পাতা পচে বেশ জমি তৈরি হয়ে গেছে।

মানুষজন কেউ থাকে না—কার গরজ পড়েছে ওখানে থাকতে। নদীর খেয়া পেরিয়ে রাত-বিরেতে যারা চর পেরিয়ে আসে, তারা হাওয়ায় ঘাসবনের শাঁই শাঁই শব্দ শুনে মনে মনে রাম নাম জপে। তা ছাড়া ভয় দেখাবার জন্যে দুটো-চারটে আলেয়া তো আছেই।

বিশ্বেস করবে কিনা জানি না, জমির খিদে আমি আর সইতে পারছিলুম না, কিছুতেই থামতে চাইছিল না বুকের কান্না, একটা ধানের ছড়া দেখলে, দুটো শাকের পাতা দেখলে যেন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার। শেষকালে খ্যাপার মতো আমি ওই চরে গিয়ে উঠলুম। হাতে যে দু-চারটে টাকা ছিল, তাই দিয়ে দা কিনলুম, কোদাল কিনলুম, খুঁটিনাটি আরো কিছু কিনলুম। আমার জমি আমিই গড়ব।

একাই? একাই। আমার আর কে আছে—তা ছাড়া আর কেই বা আমার সঙ্গে যাবে ওই ভুতুড়ে চড়ায় জমি গড়তে? কোন্ ফসলটাই বা ফলবে ওখানে? বালি জমি, ধান-পাট কীই বা হবে?

কিন্তু কিছু না হোক, ক'টা শাক তো তুলতে পারব। পটোল হবে নিশ্চয়—দু'-চারটে ফুটি-তরমুজও কি ফলাতে পারব না?

আরো দশ ঘর উদ্বাস্তুর সঙ্গে আমারও একটা হোগলার ঝাঁপ ছিল শহরের এক টেরেয়। সেটা তুলে নিলুম; সবাই অবাক হয়ে বললে, "কোথায় চললে?"

"নদীর চড়ায়।"

"সেখানে কী?"

"জমি গড়ব।"

"মাথা খারাপ? কী জমি হবে ওই কাশ আর শনের জঙ্গলে?"

"জানিনে। চেষ্টা করে দেখব।"

ঠাট্টা করে কী বিশ্বাস করে বলতে পারি নে, একজন বললে, "ওই চড়ায় পেত্নী আছে"

বললুম, "দেশ ছাড়বার পরে মরে তো ভূত হয়ে আছি, পেত্নীতে আমার কী করবে?"

মরুক গে—সব কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যায়। আমি একাই বাস্তু বাঁধলুম নদীর চড়ায়। বয়েস অল্প ছিল, কবজিতে জোর ছিল, মাথার ভেতরে খ্যাপামি ধরে গিয়েছিল। লেগে গেলুম জঙ্গল কাটতে। গোটা কতক সাপ-খোপ মেরে শেষতক বিঘেটাক জমি সাফ হয়ে গেল।

তোমরাও তো চাষী, জানোই তো ভাই—মাটিতে মন থাকলে মাটি তোমায় কক্ষনো ঠকায় না। কিছু সে তোমায় দেবেই। শাক-সব্জী হল, পটোল হল, ফুটি ধরল। তখন দিনের বেলা যারা চেয়েও দেখত না, আর রাত-বিরেতে চড়া পেরিয়ে যাওয়ার সময় রামনাম করত, তারাই দু-একজন করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

"বাঃ, বেশ পটোল হয়েছে তো তোমার।"

"এ মাটিতেও তো শাক-টাক হয় দেখছি।"

এক-আধজন বলত: "এই চড়ায় একলাটি থাকো, তোমার ভয় করে না?"

"কিসের ভয়?"

"মানে—জন-মনিষ্যি নেই, তেনাদের যাওয়া-আসা আছে—"

বলতুম, "তেনাদের তো কখনো দেখিনি। যদি আসেনই, আলাপ করে নেব।"

"তোমার সাহস আছে—বলতে হবে সে-কথা।"

"হুঁ। এখানে—এমন একলাটি থাকা—"

শুধু একজন একবার বলেছিল, "পাহাড়ে নদীর চড়ায় ঘর বাঁধলে হে? সব নদীকে বিশ্বাস করতে নেই। ইচ্ছে মতো খাত বদলায়—একদিন এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়তো।"

"বারো বছর যদি ঝাঁপিয়ে না পড়ে থাকে, আর পড়বে না।"

নদীকে আমার ভয় ছিল না, কিন্তু সত্যি বলতে কি—প্রথম প্রথম রাত্তিরগুলোকে তেমন ইয়ে লাগত না। অন্ধকার থাকলে চারদিকটা কেমন থমথম করত, বাতাসে কাশ-শন-ইকড়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজে কেমন ভুতুড়ে কান্না শোনা যেত একটা। অনেক দূরে একটা শ্মশান ঘাটা—তার চিতার আগুন দেখা যেত—আরো খারাপ লাগত তখন। অদ্ভুত আওয়াজ করে এক-আধটা পোকা ডাকত, অমন শব্দ এর আগে আর কখনো শুনিনি। যেদিন চাঁদ উঠত—সেদিন কেমন সাদা সাদা মড়া আলোয় ভরে যেত সবটা, মনে হত সমস্ত চড়াটা জুড়ে চিতার ধোঁয়ার মতো কী যেন জমাট হয়ে আছে, বাদুড়ের ডানার আওয়াজ শুনলে পর্যন্ত কেমন একটা কাঁপুনি জেগে উঠত বুকের ভেতরে।

কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেল। তারপর এমন হল যে আঁধার রাতে এই চড়ায় আমি একলা মানুষ বসে আছি—এইটে ভাবতেই ভালো লাগত আমার। ভাবতুম—আমি সব পারি—সব বন-বাদাড় কেটে এই ভুতুড়ে চড়ায় সমস্ত জমি উদ্ধার করে আনতে পারি—ফসলে ফসলে ভরে দিতে পারি। এ চর কারো নয়, কেউ এর মালিক নয়—আমি একে দখল করেছি, এ আমার, শুধুই আমার।

তখন চাঁদের আলোরও রঙ বদলাতে লাগল। চিতার ধোঁয়া নয়—জ্যোছনা রাত্তিরে যেন দুধের বান ডেকে যেত। আমি দেখতে পেতুম, সেই আলোয় আমার ফসলগুলো শ্বাসে আর স্বাদে ভরে উঠছে—টিপ টিপ করে ঝরা শিশিরে আরো দুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে ক'টা বেগুন, ক'টি ছাঁচিকুমড়ো। আর তখন আমার মনে হত—এখন যদি বউ থাকত, আমার ক'টা ছেলেমেয়ে থাকত—

এমনি একটা জ্যোছ্নার সন্ধ্যায়, আমার একলা ঘরের দাওয়ায় বসে এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি একদিন ভয়ানক চমকে উঠলুম।

একটু দূরেই ছায়া ফেলে গোল মতো কী একটা দাঁড়িয়ে।

বাছুর? আরে দূর—এখানে কার বাছুর আসতে যাবে? তা ছাড়া অমন চেহারা তার হতে যাবে কোন্ দুঃখে? এ অনেক মোটা, গোল, বেঁটে বেঁটে পা, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, গায়ে খাড়া খাড়া বড়ো বড়ো লোম, মুখের ডগাটা ছুঁচোলো, আর তার ওপরে ওলটানো নখের মতো বাঁকা দাঁত একটা। দেখেই বুক চমকে গেল, প্রকাণ্ড একটা মদ্দা বুনো শুয়োর।

অ্যাদ্দিন আছি এখানে—দেড়-দু বছর হয়ে গেল, এ মক্কেলকে তো এর আগে কখনো দেখিনি। গোটা চড়াটাই আমি ঘুরেছি, বন-বাদাড় ঠেঙিয়েছি, শন কেটে এনে ঘরে ছাউনি দিয়েছি—দু-চারটে খরগোশ ছাড়া আর তো কিছু চোখে পড়েনি এর আগে। সাপ অবিশ্যি আছে, তা যে জন্মাটের মানুষ আমি—সাপ নিয়ে তো

মতো ভাসতে ভাসতে আম এই চরে এসে ঠেকব? আমি কি জানতুম এমন সন্ধ্যাও আমার আসবে যখন গাঁয়ের বিশালাক্ষীর মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ উঠবে না, নিমগাছের ছায়া কাঁপবে না আমাদের উঠোনে, হাওয়ায় উঠবে না বুনো ফুল-গাছগাছালির সঙ্গে ফুটন্ত ভাত কিংবা তপ্ত খেজুর গুড়ের পাকে চিঁড়ের গন্ধ, শোনা যাবে না কীর্তনের গান? আমিও কি ভেবেছিলুম, আমার একলা সন্ধ্যায় কেবল ঘাসবনে শন শন করবে হাওয়া, কেবল অদ্ভুত আওয়াজ তুলে পোকা আর ঝিঁঝি ডাকবে আর অনেক দূরের জ্বলন্ত চিতা থেকে কয়েকটা আগুনের পিণ্ড লাফাতে লাফাতে এসে আলেয়া হয়ে দপদপ করবে এখানে-ওখানে?

তাহলে ওর দশা আমারই মতো। ওরও আলাদা জঙ্গল ছিল, চেনা মাটি ছিল, বুনো ওল ছিল। হয়তো বা শুয়োরদেরও দেশ আলাদা হয়ে গেছে, তাড়া খেয়েছে সেখান থেকে। ও ব্যাটাচ্ছেলেও আমারই দলের—বাস্তুহারা।

বাস্তুহারা কথাটা মনে হতে একটু হাসি পেলো, কিন্তু বেশিক্ষণ হাসিটা থাকল না। বাস্তুহারা হোক আর নাই হোক—আদতে তো বুনো শুয়োর। মানুষের শত্তুর। যখন নিজের তালে আছে, বেশ আছে। কিন্তু যা মেজাজী জানোয়ার, একবার যদি ক্ষেপল তো—

পরদিন থেকে যা হোক একটা দা কিংবা বল্লম সব সময় রাখতুম হাতের কাছে। চলতে-ফিরতে বার বার নজর রাখতে হত চারপাশে। আর বলব কি হে—দেখাও হয়ে যেত শুয়োরটার সঙ্গে।

কিন্তু দেখা হলেই দাঁড়িয়ে যেত ওটা। দিনের বেলায় দেখেছিলুম—রাতে যা ভেবেছি, জানোয়ারটা তার চেয়েও বড়ো। গা ভর্তি ঝাঁটার মতন রোঁয়া—মস্ত দাঁতটা চকচক করছে শাদা, এখানে-ওখানে কাদার চাপড়া লাগানো ইয়া পেল্লায় শরীর। তেড়ে এলে মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। কিন্তু যেই মুখোমুখি হল কিংবা আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বোঁ করে—অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে গেল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। নড়া-চড়া নেই—কিছুই না—খানিকটা কেবল মিটমিট করে চেয়ে রইল, তারপর যেন কিছুই হয়নি—এমনি করে গা দুলিয়ে তুর তুর করে কোন্‌দিকে চলে গেল। অনেকবার ভেবেছি তুলি বল্লম—ধাঁ করে মেরে দিই, কিন্তু কিছুতেই হাত উঠত না। কেবল মনে হত—ও যখন আমায় কিছু বলে না, তখন খামোকা ওকে আমি মারতে চাই কেন!

দিনের বেলা আমার ঘর-দোরের দিকে ওকে কখনো আসতে দেখিনি। আমি ভেবেছিলুম, এই এল শুয়োর—আমার ক্ষেত-টেত খুঁড়ে কিছু আর রাখবে না—যে ক'টা ফুটি হয়েছে খেয়ে একেবারে শেষ করে দেবে।

তা গোড়ার দিকে এক-আধটু খোঁড়াখুঁড়িও করেছিল বইকি, শুয়োরের স্বভাব যাবে কোথায়। একদিন বেশি রাত্তিরে আওয়াজ শুনে বেরিয়ে দেখি—ওই কাণ্ড! কী মনে হল, হাঁক পেড়ে বললুম, "এই মক্কেল, কী হচ্ছে ওটা?" দুড় দুড় করে ছুটে পালালো, তারপর থেকে আর ও-সব করতে দেখিনি।

হতে পারে—দাঁতাল হলেও শুয়োরটা ভীতু, ভালো মেজাজ, হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ পছন্দ করে না। মানুষ তো কত রকমের হয়, জানোয়ারেরই কি রকমফের হতে পারে না? তবু আমার মনে হতে লাগল ওটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেছে। এই নির্জন ভুতুড়ে চড়ায় ও-ও একা, আমিও একা। আমারও এক এক সময় বুকের ভেতরে হু হু করে—মনে হয়, সব ছিল, ঘর ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল; তখন নিজের এই রাজত্ব—এই ক্ষেতটুকু—এই জমি গড়বার সুখ—সব ফাঁকা হয়ে যায়, মনে হয়—আমার কিছুই দরকার নেই, কিছুই না। তেমনি ওই শুয়োরটাও একা—ওরও চেনা জঙ্গলটা কোথায় হারিয়ে গেছে, ওরও আপনার জন ছিল, তারা কেউ নেই—কোথাও নেই। আমি যখন ফাঁকা মন নিয়ে কোনো অন্ধকার রাতে—কোনো জ্যোছ্‌নার ভেতরে দাওয়ার ওপর চুপ করে বসে থাকি—তখন অন্ধকারটা এক জায়গায় আর একটু ঘন হয়, জোছ্‌নায় কখনো একটা ছায়া পড়ে—ওই শুয়োরটা এসে দাঁড়ায়। তখন ওরও একা লাগে—ও-ও সঙ্গ খোঁজে। আলোয় হোক আর আঁধারে হোক—ওর চোখ দুটো চিকচিক করে জ্বলে, ও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। তারপর ফোঁস করে যেন একটা নিশ্বাস ফেলে, ঘোঁৎ করে একটু আওয়াজ হয়, কী একটা বুঝে নিয়ে ভারী শরীরটাকে একটু একটু দোলাতে দোলাতে আবার চলে যায় ঘাসবনের ভেতর।

তোমাদের অবাক লাগবে শুনলে, এর পর থেকে আমার আর ওটাকে ভয় লাগত না। কতদিন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেছে, কতবার দেখেছি কোথায় একটু কাদা জল জমেছে—খুশি হয়ে গড়াগড়ি করছে তার ভেতরে, কোনোদিন দেখেছি মাটি খুঁড়ছে নিজের মনে। আর রাত হলে, যখন চরের ওপর কেবল শাঁই শাঁই করছে হাওয়া, যখন দূরের শ্মশানে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে চিতার আগুন—এমন কি মড়া-পোড়ার গন্ধও ভেসে আসছে এক-আধটু, আর আমি ফাঁকা মন নিয়ে—বুকের ভেতরে একটা কান্না নিয়ে বসে আছি, তখন ও এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে, যেন বলতে চাইছে নিজের কথা, যেন সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

শেষে এমন হল, শুনলে হাসি পাবে তোমাদের, দু-একদিন ওটাকে দেখতে না পেলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। আমি চমকে উঠে ভাবতুম—যেমন নিজের খেয়ালে এসেছিল তেমনি করেই চলে গেল নাকি আবার? আর ভাবলেই আমার ভয় করত। যতদিন একা ছিলুম—বেশ ছিলুম। কিন্তু ওটা আসবার পরে কখন যেন দুজন হয়ে গেছি, ও আমাকে বুঝতে পারে, আমি ওকে বুঝতে পারি। তখন বেরোতুম খুঁজতে। হয়তো দেখতুম, অনেক দূরে, অনেকখানি জঙ্গলের ভেতর কোথাও খানিক জল-কাদার ভেতরে হাত-পা মেলে শুয়ে আছে। তোমরা বলবে, আমাকে পাগলে পেয়েছিল। আমিও কি তা [illegible]? কিন্তু সেই চড়ায় সব অন্যরকম [illegible], একটা আলাদা [illegible] হয়ে [illegible]—আমিও একটা আলাদা [illegible] হয়ে গিয়েছিলুম যেন। ফিসফিস করতুম 'এসেছিস নি কেন?'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ তুলে ছুটে পালাত। যেন লজ্জা পেয়েছে মনে হয়।

বলবে, আমার এ সব মনগড়া। থাকে দলে দলে শুয়োর, বোকা, গোঁয়ার, কচু-বন খুঁজে বেড়ায়, যখন-তখন যাকে ইচ্ছে তাড়া করে—তার বয়ে গেছে তোমার মনের কথা বুঝতে। নিশ্চয়—নিশ্চয়, সব মানি। তবু দেখতুম, সেই রাত্তিরে, কিংবা পরের রাত্তিরেই ওটা এসেছে। আমার দাওয়ার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছোট চোখ দুটো চিকচিক করছে জোনাকির মতো। কিছুক্ষণ থাকত ওইভাবে—যা হোক একটা কিছু বুঝে নিত—তারপর আবার আস্তে আস্তে চলে যেতো নিজের মনে।

শহরের বাজারে তরকারী বেচতে আমি নিজে যেতুম না, অন্য লোক এসে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যেত পাইকারি দরে। তারা আসত হপ্তায় দু'চারদিন, তা ছাড়া একটু দূর দিয়ে খেয়ার লোকজনের যাওয়া-আসা তো ছিলই। তাদেরই কারো চোখে পড়ে থাকবে। একদিন হঠাৎ দেখি, শহর থেকে শোলার টুপি আর হাফপ্যান্ট পরে, কাঁধে বন্দুক নিয়ে তিনজন ভদ্দরলোক এসে হাজির।

প্রথমটা ভেবেছিলুম—চরের ওদিকটায় এ-সময়ে দু-চারটে চখাচখি পড়ে, তাই মারতে এসেছে। কিন্তু চলে এল আমার ঘরের দিকেই।

"তুমি এখানে থাকো?"

"আজ্ঞে।"

"এ-সব তরি-তরকারি তোমার?"

"আজ্ঞে।"

"এ তো খাসমহল জমি। পত্তনি নিয়েছ?"

"আজ্ঞে না।"

"বে-আইনি। একদম বে-আইনি।"

কে জানে, কাকে বলে আইন, কাকে বলে বে-আইন! এই ভূতুড়ে চড়ায় সরকারের নজর তো কোনোকালে ছিল না—আমিই এখানে একা হাতে মাটি গড়েছি, ফসল ফলিয়েছি। কিন্তু আইন বে-আইনের ভাবনা আমি আর ভাবতে পারি না। যেদিন হাতি এনে আসামের পাহাড়ে ফসলের সংগে আমাদের বুকের পাঁজর অবধি দলে দেওয়া হয়েছিল, সেদিন থেকে ও-সব ভাবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বাবুদের একজন ফস করে একটা সিগ্রেট জ্বালালেন। বললেন, "থাক, সে-সব পরে হবে। এই চড়ায় বুনো শুয়োর আছে, তাই নয়?"

ধক্ করে উঠল আমার বুকের ভেতর। আমি তিনটে বন্দুকের দিকে তাকালুম।

"কে বললে আপনাদের?"

"আমরা খবর পেয়েছি।"

তোমরা শুনলে রাগ করবে কিনা জানিনে, আমি দেখেছি, হারামীর দিকে জানোয়ারের চেয়ে মানুষেরই টাঁক বেশি। তক্ষুণি মনে হল, বলি: "যান ওদিক পানে—কাদার মধ্যে বসে আছে দেখেছি একটু আগে, দিন সাবড়ে।" আর তক্ষুণি কে যেন কানে কানে বললে, "ছি ছি হে, তুমি শুয়োরের চাইতেও ছোটলোক হয়ে গেলে। ও তোমায় বিশ্বেস করে, তার এই প্রতিদান!"

বললুম, "বাজে কথা। আড়াই বচ্ছর ধরে আমি আছি এখানে। চরের জঙ্গল ভেঙে চলাফেরা করি। কোনো শুয়োর কখনো আমার চোখে পড়েনি।"

"কিন্তু একজন যে বললে—"

"ভুল বলেছে। শেয়াল-টেয়াল দেখে থাকবে হয়তো।"

"তুমি ঠিক জানো?"

"আজ্ঞে এই চড়ার আমি বাসিন্দে। আমি জানিনে তো অন্য লোকে জানবে?"

বাবুরা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম, "তা খরগোস-টরগোস আছে দু-চারটে। খুঁজে দেখতে পারেন।"

"দূর, খরগোস অযাত্রা। আর সেগুলো খুঁজে কে সময় নষ্ট করবে—কেই বা টোটা খরচ করতে যাবে?"

বাবুদের দুঃখ হয়েছে মনে হল: "বাজে লোকের কাছে উড়ো খবর শুনে হাঁটাহাঁটিই সার হল। চলো হে।"

শুয়োরটা সে রাতে এল না, এল পরের রাতে। বললুম, "তোকে বাঁচিয়েছি, বুঝলি? তিনটে বন্দুক ছিল—কিচ্ছু করতে পারতিস না।"

নিঃসাড়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বললুম, "এবার কাঁটা কচু লাগাব ঠিক করেছি। খুঁড়ে-মুড়ে যেন বরবাদ করে দিসনি তাহলে ঠিক বলে দেব বাবুদের।"

তেমনি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল।

দিন কাটছিল এইভাবে কতদিন কাটত জানি না। কিন্তু সেই সকালে সরকারী পেয়াদা এসে আমাকে নোটিশ দিয়ে গেল। কেন আমি খাসমহলের জমি জবর-দখল করেছি, কেন আইন-মোতাবেক পত্তনি নিইনি, হুজুরে হাজির হয়ে আমায় তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সেই যে তিনবাবু এসেছিল, তারাই কেউ ফিরে গিয়ে এই উপকারটা করেছে আমার।

নোটিশ নিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম ঘরের দাওয়ায়। আগের দিন থেকেই টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, আজ আকাশ আরো ঘোলাটে, আরো অন্ধকার। ওদিকে নদীতে জল বাড়ছে, গোঁ গোঁ করে উঠছে তার ডাক। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে—চারদিকের ঘাসবনে ঢেউ উঠছে।

জল আসছে নদীতে। চরের খানিকটা ডুবে যাবে। কিন্তু আমি যেখানে আছি সেটা ডুববে না—আজ চোদ্দ বছর ধরেও ডোবেনি। নদীর ভাবনা নেই, আমি মানুষের কথা ভাবছিলুম। এমনি একটা মেঘলা দিনেই যখন ধানের ক্ষেতে বাতাস ঢেউ দিয়েছিল, সেইদিনই ওরা হাতি এনে—

পত্তনি নিতে হবে, খাজনা দিতে হবে? কত চাইবে কে জানে? নাকি উচ্ছেদই করে দেবে? ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখলুম বৃষ্টিতে ভিজে চিকচিক করছে পটোলগুলো—হাওয়ার মতন লেগেছে ঢলঢলে লাউয়ের পাতায়। চোখ জ্বালা করতে লাগল। সারাদিন কিচ্ছুটি খেতে ইচ্ছে করল না আমার—ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে রইলুম।

শুয়োরটার ভাগ্যি ভালো আমার চাইতে। ওকে খাজনা দিতে হয় না, পত্তনি নিতে হয় না, ওর উচ্ছেদের ভয় নেই। ভয় নেই? আমি যখন থাকব না—তখন ওরও তো পালা মিটে যাবে। তখন আবার তিনটে বন্দুক আসবে, হয়তো লোকজন নিয়ে ঘেরাও করবে জঙ্গল—তারপর একটা মস্ত দাঁতাল শুয়োর মারবার আনন্দে বাবুরা—

সব বিশ্রী লাগছিল, সব ফাঁকা ঠেকছিল, অনেকদিন পরে বৌ আর ছেলেমেয়ের জন্যে আমার কান্না আসছিল। হাওয়া-বৃষ্টি-দুর্যোগের ভেতরে সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে যে কিভাবে কেটে গেল জানি না। তারপর রাতে ঘুম এল, আর তারো পরে—

জেগে উঠলুম বানের ডাকে। ঝড়-বৃষ্টির প্রায় মহাপ্রলয় তখন। কিন্তু কিছু আর ভাববার সময় ছিল না। চর ভাসিয়ে ছুটে এল পাহাড়ী নদী—মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ঘর, আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম—এক ঝটকায় আমাকে কুটোর মতো তলিয়ে নিয়ে চলল।

ডুবতে ডুবতেও টের পেলুম আমার কাছেই কেমন একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ। তা হলে দুজনেই ভেসেছি—দুজনেই আবার একসঙ্গেই বাস্তুহারা। কী করে কী হল জানি না—আমি দু-হাতে শুয়োরটাকে জাপটে ধরে মাথা জাগিয়ে তুললুম। আর সেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটা—যার স্বজাতেরা সুন্দরবনের গহীন গাঙ পেরিয়ে চলে যায়—যারা সমুদ্দুরের মতো রাক্ষুসে নদীকে ভয় পায় না—বাঘ-হরিণ পৌঁছুবার আগে যারা নতুন জাগা চরে গিয়ে বাস্তু বাঁধে, সে আমাকে টানতে টানতে—জলের ওপর নাক তুলে সাঁতার কাটতে কাটতে, সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল।

আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ক্ষ্যাপা স্রোত মরণ-সাপটে টানছিল। সইতে পারলুম না—আমি জ্ঞান হারালুম।

যখন চোখ চেয়েছি, তখন সকাল। দেখি, জনতিনেক মানুষ আমায় সেঁকতাপ করছে। বললুম, "শুয়োরটা?"

তারা বললে, "কিসের শুয়োর? বানে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ডাঙায় ঠেকে-ছিলে, আমরা তুলে এনেছি তোমায়। কোথাকার লোক হে?"

'শুয়োরটা কোথায় গেল জানি না। হয়তো আমায় কোনোমতে ডাঙায় ঠেলে দিয়ে সে নিজে আর উঠতে পারেনি, ভেসে গেছে। তোমরা হাসবে, পাগল বলবে আমায়—কিন্তু আমি ঠিক জানি, ও যদি বেঁচে থাকত কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ত না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার মতো ওরও তো কোনো দোসর নেই।'

সেই ভাঙা গভীর গলাটা থামল। নিঃশব্দে বসে থাকল দুটি চাষী, আমি করোগেটেড টিনের চালটার দিকে চেয়ে রইলুম, আমার চোখ জ্বলতে লাগল, একটা ক্লান্ত কাক ডেকে চলল রাধাচূড়োর ডালে।

সেই লোকটা আবার বললে, "কখনো শুয়োর মানুষ হয়, বুঝেছ—কখনো আবার মানুষ—"

চমকে আমি উঠে দাঁড়ালুম—আমাকেই বলছে? সুটকেসটা তুলে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম। ট্রেনের সিগন্যাল দিয়ে-ছিল। আমি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী—আমার কামরাটা থাকবে আর একটু ওদিকে। গাড়ী ফাঁকা থাকলে বসে বসে পড়তে পারব "ফ্রেশ-লাভার্স" বইটা; আর তেমন যদি সহযাত্রী পাই তা হলে বেশ রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়ে উত্তর বাংলার বন্যার গল্পও শোনাতে পারব তাদের। রেল-স্টেশনের এই উদ্ভট বাজে গল্পটা ভুলে যেতে আমার সময় লাগবে না তখন।

(৩)
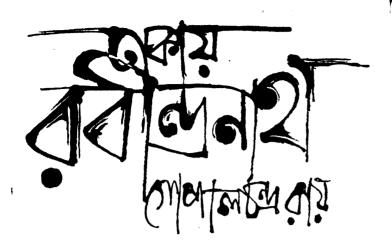
৭ই ফেব্রুয়ারী বিকালে নর্থব্রুক হলে রবীন্দ্রনাথের যে সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল, সেখানে সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"আপনারা আমাকে যে সাদর অভিবাদন করলেন, আমি তার যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদন করতে পারি এমন শক্তির আমার অভাব ঘটেছে। আপনারা বোধ হয় শুনে থাকবেন, আমি দুর্বল ক্লান্ত। ডাক্তারের উপদেশ লঙ্ঘন করেই এসেছি।...ঢাকা শহরে বহু পূর্বে একবার এসেছিলাম। কিন্তু সে না-আসারই মধ্যে। এই আজ প্রথম এসেছি বললেই হয়।...

আজ পৃথিবীব্যাপী দুঃখের দিনে মানুষ বলছে, শান্তি চাই। একদিন ভারতবর্ষ আত্মার মধ্যে শান্তির মন্ত্র শুনেছিল। একদা দেশে বিদেশে সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করে ভারতবর্ষ শান্তিমন্ত্র প্রচার করেছিল। তার সেই সম্পদ কখনো কি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে?...আমি অতিথিবৎসল ভারতবর্ষের নামে তাঁর হয়ে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠার ভার নিয়েছি।...প্রান্তরের প্রান্তে, নিভৃত আশ্রমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মুখের কথায় নয়, কর্মের ভিতর দিয়ে। কিন্তু সে আমার নিজের কথা নয়, তার মধ্যে আমাদের ঋষিদেব কথার প্রতিধ্বনি। সেই জন্যে কেউ কেউ কখনো কখনো যখন আমাকে ঋষি উপাধি দেন, তখন আমার সংকোচের সীমা থাকে না। আমি ঋষিদের বাণী চয়ন করেছি। কিন্তু আমি ত মন্ত্রদ্রষ্টা নই। যে উচ্চপদে যার অধিকার নেই, তাকে সেই পদগৌরব দেওয়ার মত অন্যায় আর হতে পারে না। আমি যাঁদের অন্তরের সহিত সম্মান করি তাঁদের সম্মানের অংশ নিজে হরণ করাকে অধর্ম বলেই জানি। কবি বলে আমাকে যে সম্মান করেন, তা গ্রহণ করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে।...অত্যুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। আমি যতটুকু কাজ যথার্থভাবে করেছি, সেটুকুর জন্যে যদি আপনাদের হৃদয় পাই, তবে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব।"

ঐদিনই সন্ধ্যার পূর্বে করোনেশন পার্কে জনসাধারণের পক্ষ থেকে আবার রবীন্দ্রনাথের যে অভিনন্দন সভা ছিল, তাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁর উদ্দেশে অভিনন্দনপত্র পাঠ করা হয়েছিল। কবি সেইসব অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন—

'বহুকাল পূর্বে আর একবার এই ঢাকা নগরীতে এসেছিলাম, সেদিনকার রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ব্যাপারে নিপুণভাবে যোগ দিতে পারি এমন অভ্যাস ও শক্তি আমার ছিল না—এই অনুষ্ঠানে আমার দ্বারাও যে কাজটুকু হতে পারে আমি কেবলমাত্র তার ভার নিয়ে এসেছিলাম। তখনকার রাষ্ট্রীয় সভাগুলিতে ইংরেজি ভাষাতেই বক্তৃতা হত। যাঁরা বাংলা ভাষার চর্চায় বিরত ছিলেন, যাঁরা এ-ভাষা সভাস্থলে ব্যবহার করতে জানতেন না, তাঁদেরই অনেকে রাষ্ট্রিক আন্দোলন কার্যে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তার ফল হয়েছিল এই যে, জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রিক শিক্ষা বিস্তারের যে একটি মাত্র উদ্যোগ তখন ছিল, ইংরেজি ভাষার চাপে তার উদ্দেশ্যটি মারা গিয়েছিল। দেশের হিত কিসে হয়, তার বাধা কি, সে বাধা দূর হতে পারে কোন্ উপায়ে, দেশের লোককে সেই কথাটি ভাল করে ভাবিয়ে তোলাই দেশহিতের প্রথম ও প্রধান কাজ, কিন্তু এই ভাবনার চর্চা বন্ধ ছিল, ইংরেজি জানা অল্প কয়েকজনের মধ্যেই। এই সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে দেশ-সেবার যে সাধনা বিদেশী ভাষার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়েছিল, তাকে তার আপন ভাষার মধ্যে মুক্তি দেবার জন্যেই

এখানে এসেছিলাম। আমার বিশ্বাস আমার সেদিনকার সে চেষ্টা সফল হয়েছিল; তারপর থেকে প্রদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীতে ইংরেজি ভাষার প্রভুত্ব দূর হয়ে গেছে। মাতৃভাষার প্রতি দেশ সেবকদের উপেক্ষা ঘুচিয়ে দেবার জন্য ঢাকায় তিনদিন-কাল যে চেষ্টা করেছিলাম, সে-স্মৃতি আমার মনে আছে। তখনো আমি রোগে পীড়িত ছিলাম। তাই সেদিন এখানকার পৌর সাধারণের সঙ্গে আমার মিলন হবার সুযোগ হয়নি।...আজ আমার সৌভাগ্য এই যে, আজ প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে পারব। বিশেষ কিছু কাজ করে যেতে পারব এমন শক্তি নেই, আশা নেই।...আজ জীবনপথযাত্রার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি। মাতৃভূমির সকল তীর্থ হতেই বঙ্গজননীর শেষ চরণধূলি নিয়ে যাব সেই প্রত্যাশায় এখানে আমার আসা। আপনারা আমার প্রতি অনুকূল হোন। সমস্ত জীবনে দেশের কাছে আমার যা উৎসর্গ করেছি সেই নৈবেদ্য থেকে নির্মাল্য নিয়ে প্রসন্ন মনে যদি বলতে পারেন 'এ রইল, এ রাখলুম, আমাদের ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, আমাদের কর্ম সংকল্পের মধ্যে' তাহলেই আমার চরিতার্থতা। মনে রাখবেন, আপনাদের কবি একদিন এই সুন্দর সূর্যাস্তকালে এই সুন্দর নদীতীরে আপনাদের সকলের মধ্যে হৃদয় প্রসারিত করেছিল। এই মনোহর সন্ধ্যার আলোকে আলিঙ্গিত কবির চিত্রকেই স্মৃতি পটে রেখে দেবেন। কেননা, এই মর্ত্যকবিরও অস্তের দিন কাছে এসেছে, পশ্চিম সূর্য ঐ যে তার জ্যোতিরশ্মির অঙ্গুলি সংকেতে আমাকে অস্তাচলের পথ নির্দেশ করছে। তাই আজ ঐ সন্ধ্যা সূর্যের শেষ বাণীর দ্বারাই আমার বিদায় অভিনন্দনকে পূর্ণ করে আপনাদের কাছে রেখে দিয়ে গেলাম।'

৮ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ঢাকার মহিলাদের প্রতিষ্ঠান 'দীপালি সংঘে' রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতাটি পরে ১৩৩২ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল।

৯ই তারিখে সন্ধ্যায় জগন্নাথ ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন।

৮ই বিকালে মুসলমান ভদ্রমহোদয়গণ কবিকে যে টি-পার্টি দিয়েছিলেন, সেই টি-পার্টি হয়েছিল ঢাকার নবাব বাড়িতে।

১০ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারীও সন্ধ্যায়, এই দুদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দুদিনই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ ল্যাংলি।

ল্যাংলি ছিলেন খুব সাদাসিধে ভাল মানুষ। ইনি ভাইস-চ্যান্সালার হওয়ার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এই আত্মভোলা দার্শনিক মানুষটির পুরা নাম ছিল—George Harry Langly সংক্ষেপে G. H. Langly. ল্যাংলিকে ভাল মানুষ পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে এঁর নাম দিয়েছিলেন গোলাম হোসেন ল্যাংলি আর হিন্দু ছাত্ররা নাম দিয়েছিলেন গৌরহরি ল্যাংলি।

রবীন্দ্রনাথের ১০ই তারিখের সভায় এই ভাল মানুষ ল্যাংলি এক অভূতপূর্ব কাণ্ড করে ছিলেন। সে কাণ্ডটা হচ্ছে এই—কি কারণে জানি না, সভার নির্দিষ্ট সময় ঠিক সাড়ে ছটায় ল্যাংলি সভায় আসতে

পারেননি। আসতে তাঁর কয়েক মিনিট দেরি হয়ে যায়। তিনি এসেই দেখেন রবীন্দ্রনাথ সহ সকলেই যথাসময়ে এসে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন। ল্যাংলি সভায় এসেই রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করতে উঠলেন বটে, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর ঐ আসতে দেরি হওয়ার কথা চিন্তা করেই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন, তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। শুধু দাঁড়িয়েই রইলেন। এইভাবে তিনচার মিনিট কেটে গেল। এদিকে সভাস্থ সকলেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

এই সময় মিসেস ল্যাংলি বুদ্ধি করে তাঁর আসন থেকে উঠে গিয়ে মিঃ ল্যাংলির কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বলে এলেন। তখন মিঃ ল্যাংলি নিজের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানালেন।

রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিনে The Philosophy of art এবং দ্বিতীয় দিনে The rule of the giant নামে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কবি তাঁর পৃথক বক্তৃতায় আর্ট ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ তা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যাদি এবং সংগীত সম্বন্ধেও আলোচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পের পক্ষপাতী ও সমর্থক কিন্তু এই বিজ্ঞান যখন মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তখনই তাঁর কবিচিত্ত সেই দেখে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কবি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতায় এই নিয়েই তাই বলেছিলেন—মানুষ যন্ত্র তৈরি করে যন্ত্র-দৈত্যের দাস হচ্ছে, যন্ত্রই তাকে চালনা করছে। মানুষ তার সৃষ্ট এই অপদেবতাকে এখন সংহত করবার শক্তি হারাচ্ছে। মহত্ত্বের বেদীতে স্থূলত্বের পূজা হচ্ছে।

১০ই তারিখে বিকালে মুসলিম হলে যে সভাটি হয়েছিল সেই সভার একটু বিশেষত্ব ছিল। ঐ হলের মুসলমান ছাত্ররা সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শুরু থেকে আরম্ভ করে হল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আসার সারা পথটা নানা রকমের সুগন্ধ ফুল দিয়ে ভরে ত রেখে ছিলই, তাছাড়া সমস্ত হলটাও ফুল দিয়ে মুড়ে দেবার মত করে সাজিয়ে ছিল। সভামণ্ডপটিও ফুল দিয়েই ঢাকা ছিল। এরা, হলে আসার পথে এবং হলের মধ্যেও নানা ধরনের লতাপাতা ও ফুল দিয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঞ্জবনের মত করেছিল আর খাঁচার ভিতরে নানা রকমের পাখি রেখে সেই খাঁচাগুলিকে ঐ কুঞ্জবনের লতাপাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। পাখিগুলো কিচির মিচির করে ডাকছিল আর ফুলের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরে গিয়েছিল। কবি হলে আসার সময় এরা তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণও করেছিল।

এরা আরও একটা কাজ করেছিল—সভামণ্ডে মাথার উপর যে কটা ইলেকট্রিক পাখা ছিল, সেই পাখাগুলো না চালিয়ে পাখাগুলোর ব্লেডের উপর নানা সুগন্ধ ফুল স্তূপ করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ সভায় এসে বসলে, এরা তখন ঐ পাখাগুলো চালিয়ে দিয়েছিল। ফলে পাখা চলার সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে ফুল পড়তে শুরু হয়েছিল। মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা সভামণ্ডে আসার সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথের মাথায় ও গায়ের উপর এইভাবে ফুল পড়তে থাকলে, তখন রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে তাঁর পার্শ্বস্থিত রমেশবাবুকে বললেন—দেখ, এতদিন পরে আজ একটা সমস্যার সমাধান করা গেল।

রমেশবাবু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি সমস্যা?

রবীন্দ্রনাথ বললেন—কালিদাসের লেখায় পড়েছিলাম স্বর্গ থেকে ইন্দুমতীর গায়ে ফুল পড়ায় ইন্দুমতীর মৃত্যু হয়েছিল। ফুলের আঘাতে মানুষের কি করে মৃত্যু হতে পারে, তা কিছুতেই বুঝতে পারি নি। সেটা আজ এখন বুঝছি।

ইন্দুমতী ছিলেন রাজা অজের স্ত্রী ও

দশরথের মা। ইন্দুমতী একদিন তাঁর স্বামীর সঙ্গে যখন বাগানে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় নারদ বীণা হাতে আকাশ পথে যাচ্ছিলেন। নারদ যাবার সময় তাঁর বীণা থেকে পারিজাত ফুলের একটি মালা ইন্দুমতীর গায়ে এসে পড়ে। এতে ইন্দুমতী তৎক্ষণাৎ মারা যান এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরা মূর্তি ধরে স্বর্গে প্রস্থান করেন।

ইন্দুমতীর এই অপ্সরা মূর্তি ধারণ করার একটা কাহিনী আছে। সে কাহিনীটা হচ্ছে এই—ইন্দুমতী পূর্বজন্মে হরিণী নামে এক অপ্সরা ছিলেন। তৃনবিন্দু মুনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে, দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হন। ইন্দ্র তখন তৃনবিন্দুর তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য তাঁর কাছে হরিণীকে পাঠান। হরিণী তৃনবিন্দুর তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে মুনির কোপে পড়েন। তৃনবিন্দু হরিণীকে মানুষী হয়ে জন্মাবার জন্য অভিশাপ দেন। হরিণী এই অভিসাপ পেয়ে কান্নাকাটি করতে থাকলে, তখন তৃনবিন্দু বলেন—মানুষী হয়ে জন্মাতেই হবে, তবে সেই মানুষী অবস্থায় স্বর্গীয় ফুল দেখলে শাপমুক্ত হবে।

মুনির এই অভিশাপে হরিণী বিদর্ভ-

রাজের কন্যা হয়ে জন্মে ছিলেন। বিদর্ভ-রাজের ঐ কন্যাই হলেন ইন্দুমতী।

ইন্দুমতীর এই উপাখ্যানটি রমেশবাবুর জানা ছিল। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের পরিহাসটি বুঝতে পেরে হাসতে লাগলেন।

যাই হোক, মুসলিম হলের ছাত্রদের এত ফুল সংগ্রহ ও পুষ্প বৃষ্টির কৌশলটি দেখে রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হয়েছিলেন। তাই তিনি সেদিন তাঁর বক্তৃতায় প্রথমেই এই ফুলের প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন--আগেকার দিনে আমাদের দেশের রাজারা দিগ্বিজয় করে ফিরলে, তাঁদের উপর পুষ্প বৃষ্টি করে তাঁদের অভিনন্দন জানান হ'ত, আমি আমার দেশের জন্য কি তেমনি কিছু জয় করে এনেছি, যার জন্য আমার উপর পুষ্প বৃষ্টি করে আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে?

সেদিন মুসলিম হলের সভার পর মুসলিম হলের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম হলের লাইফ মেম্বারও করে নিয়েছিলেন।

১৩ই তারিখে সকালে রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটির স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের সভায় যোগ দেন। সেখানে স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন পত্রটি দেওয়া হয়েছিল, তা এই—

বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী সংঘ তোমাকে প্রীতি ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। হে বাণীর বরপুত্র বর-ভবন তোমার চরণ ধূলি স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইল।

বঙ্গভাষা-নন্দিনীর ফুটন্ত কোরকটাকে সেদিন তাহার নবীন কবি রবি 'খোলগো আঁখি' বলিয়া অস্ফুট সলজ্জ কণ্ঠে প্রথম প্রেম নিবেদন করিয়াছিল, তাহার পর পঞ্চাশৎ বসন্তের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল নিশিদিন জীবনের সমস্ত রসধারায় সিঞ্চিত করিয়া তুমি তোমার প্রাণের দয়িতার যে অপরূপ রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছ তাহা আজ সমুদয় জগৎ মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে। হে বাঙ্গলার কবি শ্রেষ্ঠ, আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

কিন্তু তুমি ত কেবল বাঙ্গলার নও, তুমি বিশ্বমানবের কবি। অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিশ্বতন্ত্রীর যে রাগিণী গগন ছাপাইয়া উঠিয়াছে এবং হোম শিখার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া অসীমে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—যে অব্যক্ত রাগিণী চিরজন্ম ধরিয়া অশ্রু-হাসিতে জীবন ভরিয়া সহস্ররূপে ফুটিয়াছে তুমি আশা দিয়া, ভাবা দিয়া এবং ভালবাসা দিয়া তাহার মানসী প্রতিমা গড়িয়া বিশ্ব-মানবকে উপহার দিয়াছ। তুমি দ্রষ্টা, তুমি স্রষ্টা। হে ভারতের প্রাচীন ঋষির মূর্ত প্রতিমা, আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

হে বিশ্বমানবের কবি, তুমি তোমার ঐশী দৃষ্টিতে বিশ্বমানবের মুক্তির পথের সন্ধান পাইয়াছ। তাই জাতিতে জাতিতে যখন স্বার্থের সংঘর্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, যখন মদমত্ত দম্ভ গর্বের রক্ত চক্ষু মানবের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই তুমি তোমার অমোঘ সত্য বাণী নির্ভীক ও অবিচলিত কণ্ঠে বিশ্বের সভায় ঘোষণা করিয়াছ। যাহা কিছু অন্যায়, যাহা কিছু অসত্য তুমি চিরদিন অকুণ্ঠ চিত্তে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছ এবং সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রকৃত স্বরূপ অপরূপ ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া উদাত্ত স্বরে প্রচার করিয়াছ। তুমি ভূমার সন্ধান পাইয়াছ—তাই যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু ধ্রুব, তাহারই অনুসরণ করিয়াছ, কখনও স্তুতির মোহে অথবা নিন্দার ভয়ে সত্যপথ হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট হও নাই, এবং জাতীয়তার সংকীর্ণ মোহে আবদ্ধ হইয়া বৃহত্তম জগতের কল্যাণের কথা বিস্মৃত হও নাই—হে অনন্ত অমৃতের অধি-কারী, আমরা পুনরায় তোমাকে প্রণাম করি —তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আমাদের জীবন ধন্য কর।

ঢাকার কারও কারও ইচ্ছা ছিল বলেই, তাঁদের খুশি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে দিন দুই বুড়ী গঙ্গার নবাবদের 'তুরাগ' হাউস বোটে গিয়ে বাস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বোটে গিয়ে থাকলেও রমেশবাবুর বাড়ি থেকেই সেখানে তাঁর খাবার যেত এবং রমেশবাবুকেও তাঁর দেখাশুনা করবার জন্য বোটে গিয়ে থাকতে হয়েছিল।

কবির পুত্র বধূ প্রতিমা দেবী কবির ঠিক মত সেবা যত্ন হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য প্রায়ই রমেশবাবুর বাড়িতে এবং বোটেও যেতেন। প্রতিমা দেবী রমেশবাবুর বাড়িতে গিয়ে রমেশবাবুর স্ত্রীকে বলতেন বাবা মশায়কে আপনাদের বাড়িতে রেখেছেন বটে, কিন্তু সেজন্য আপনাদের খুব কষ্ট ভোগ করতে হবে। উনি বড় খেয়ালী মানুষ। নিজের খেয়ালে উনি কখন যে কি বলবেন ও কি করবেন, তার ফলে আপনাদের অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হবে।

প্রতিমা দেবীর কথার উত্তরে রমেশবাবুর স্ত্রী বলতেন—না, না, কষ্ট হবে কেন! আর কই উনি ত কোনও খেয়ালের ভাব দেখাননি।

রমেশবাবু বলেন—আমার বাড়ির উঠানে একটা বড় আম গাছ ছিল। সেবার সেই গাছটায় প্রচুর মুকুল এসেছিল। কবি আমার বাড়িতে এসে পরদিন সকালে বললেন—ঐ মুকুলভরা আম গাছটার নীচে একটা ইজি চেয়ার পেতে দাও। আমি ঐখানে গিয়ে বসব এবং লোকজন এলে ঐখানেই তাদের সঙ্গে দেখা করব। —এর পর থেকে তিনি যে ক'দিন ছিলেন, প্রতিদিনই সকালে অনেকটা সময় ঐ আম গাছের নীচে বসতেন।

রমেশবাবুর স্ত্রী একদিন দুপুরে আহারের পর পান খেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—দেখ, আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি কেউ পান খেয়ে কখনও গুরুজনদের সামনে যেত না।

কবির এই কথায় রমেশবাবুর স্ত্রী একটু লজ্জা পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে চলে গিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললেন। পরের দিন দুপুরে আহারের পর তিনি আর পান খেলেন না এবং পান না খেয়ে কবির দেখাশুনার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। সেদিন কবি রমেশবাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তোমাকে যেন আজ কেমন কেমন দেখাচ্ছে! আজ পান খাওনি কেন?

রমেশবাবুর স্ত্রী বললেন—আপনি যে বললেন, পান খেয়ে গুরুজনদের সামনে যাওয়া উচিত নয়।

—আরে, সে ত বলেছি, আমাদের ছেলেবেলার আমলে। আজকাল ত আর নয়। তুমি পান খেয়ো। পান খেলে তোমাকে ভালই দেখায়।

কবি প্রথম দিনে রমেশবাবুর বাড়িতে গিয়ে রমেশবাবুর ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র অশোককে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

অশোকবাবুর ডাক নাম রবি। তাই তিনি তাঁর ডাক নামটাই মনে আসায় সেদিন বলেছিলেন—আমার নাম রবি।

শুনে কবি বলেছিলেন তোমাদের বাড়িতে তাহলে ত আমার থাকা চলবে না। দেখছি তুমি আগেই আমার নামটা চুরি করে রেখেছ! এখন ত আমার টাকা পয়সা চুরি করবে!

রমেশবাবু বলেন কবি যে কদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন, সেকদিন আমরা অশোককে তার ডাক নাম ধরে ডাকিনি।

ঢাকা শহরটা অনেক দিনের পুরানো। তাই ঘনবসতির জন্য এই শহরকে একটু ঘিঞ্জি বলেই মনে হয়। মূল শহরের তুলনায় শহরের উপকণ্ঠে রমনা পল্লীতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লোকবসতি ছিল খুবই কম এবং জায়গাটা ছিল খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কেন না ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গ-ভঙ্গ হয়, তখনই এই রমনায় পূর্ববঙ্গের নূতন রাজধানীর জন্য নতুন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, অফিস, আদালত প্রভৃতি হয় এবং জায়গাটায় নতুন শহর হয়ে ওঠে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হলে, এই রাজধানী উঠে যায়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হলে, তখন গবর্নমেণ্ট এইসব নতুন বড় বড় বাড়িগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সব বাড়ি নিয়ে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন।

রমেশবাবু বলেন—কবি প্রথম দিন নর্থব্রুক হল ও করোনেশন পার্কের সভার পর রমনায় আমার বাসার কাছে এসে গাড়ি থেকে নামবার সময় বললেন—যেখান থেকে এলাম ও জায়গাটা ঢাকা, আর তোমার এখানটা ফাঁকা।

১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সকালে কবি যখন রমেশবাবুর বাড়িতে সেই মুকুলভরা আম গাছটার নীচে বসে, সেই সময় রমেশবাবুর ১৩ বৎসর বয়স্কা কন্যা সুষমা (অপর নাম শান্তি) কবির কাছে গিয়ে বললে—আপনি ত কবি?

—হ্যাঁ, সে দুর্নামটা আছে বটে।

—আপনি আমাকে একটা কবিতা লিখে দিন না।

এই কথায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে একটি কবিতা লিখে তাকে দিলেন। সেই কবিতাটি এই—

আয়রে বসন্ত হেথা, কুসুমের সুষমা জাগারে
শান্তিস্নিগ্ধ মুকুলের হৃদয়ের নিস্তব্ধ আগারে।
ফলেরে আনিবে ডেকে
সেই লিপি যাস্ রেখে,
সুবর্ণ তুলিকাখানি পর্ণে পর্ণে যতনে লাগারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ ফাল্গুন
১৩৩২

কবি রমেশবাবুর কন্যার দুটি নামই জানতেন বলে এই কবিতায় সুষমা ও শান্তি দুটো শব্দই ব্যবহার করেছিলেন।

কবি রমেশবাবুর মেয়েকে একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন এই কথা জগন্নাথ হলের ছাত্ররা জানতে পেরে, পরদিন সকালে তারা কবির কাছে এসে বললে আমাদের জগন্নাথ হল থেকে 'বাসন্তিকা' নামে একটা পত্রিকা আমরা নিয়মিত বার করে থাকি। আমাদের সেই বাসন্তিকার জন্য যদি দয়া করে একটা কবিতা লিখে দেন!

কবি ছাত্রদের অনুরোধে তখন এই কবিতাটি লিখে দিয়ে ছিলেন—

বাসন্তিকা

এই কথাটি মনে রেখো,
তোমাদের এই হাসি খেলায়
আমি ত গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে, আপন মনে,
অনাদরে অবহেলায়
আমি ত গান গেয়েছিলেম
জীর্ণপাতা ঝরার বেলায়॥

দিনের পথিক মনে রেখো,—
আমি চলে ছিলেম রাতে
সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেলে ডেকে,
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়,
আমি ত গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

৩ ফাল্গুন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৩২

৩রা ফাল্গুন বা ১৫ই ফেব্রুয়ারী ছিল রবীন্দ্রনাথের ঢাকা বাসের শেষ দিন। এই দিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় তিনি ঢাকা ত্যাগ করে সদলে ময়মনসিংহ রওনা হন। ময়মনসিংহে পৌঁছে সেখানে তিনি সেখানকার জমিদার রাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে গিয়ে পরদিন ১৬ই তারিখে রমেশবাবুর স্ত্রীকে অতিথি সৎকারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কবি যে টেলিগ্রামটি করেছিলেন, তা এই—

Mrs. Ramesh Majumdar,
Dacca Ramna.
Many thanks for hospitality and kindness.
RABINDRANATH TAGORE.

রবীন্দ্রনাথের এই টেলিগ্রামটি থেকে দেখা যায় যে, তিনি প্রধানত ভাবুক কবি হলেও সাংসারিক লৌকিকতা বা সামাজিকতা সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন।

সমাপ্ত

বাসন্তিকা।

এই কথাটি মনে রেখো, —
তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি ত গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে, আপন মনে,
অনাদরে অবহেলায়
আমি ত গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

দিনের পথিক মনে রেখো, —
আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে,
ভেসেছিলেম ভাঁটার ভেলায়,
আমি ত গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ ফাল্গুন
১৩৩২

জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে তাদের 'বাসন্তিকা' নামে পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা। মূল পাণ্ডুলিপি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী আলোচনায় জানা গেল, আসন রফার ধরনে এস এস, পি নাকি আপত্তি জানাইয়াছেন।—"জানাবারই কথা, পিঁড়ি আসন, কুশাসনও

আসন এবং গদি আঁটা চেয়ারও আসন; সেটা ত কথা নয়, কার ভাগে পড়ল সেইটেই বড় কথা।

রাজ্যপাল সম্মেলনে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানান হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম। বৃদ্ধ বিশু খুড়ো বহুদিন বিস্মৃত যাত্রাগানের একটি কলি কাঁপা গলায় সুর করিয়া শুনাইলেন—"ধরে অন্ধের করে সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কেন গমন।"

নেহরু জন্মদিনে আটজন শিশু জাতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছে।—"আট সহস্রাধিক নাবালক হয়ত বেজার হয়ে ভাবলেন,—কী মওকাটাই না ফস্কে গেল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, লবণ হ্রদের জমি কমবেশি বসিয়া যাইবে।—"যাঁরা লবণ হ্রদে 'শুধু একটুকু বাসার' জন্য জমি কিনেছিলেন, তাঁরা 'কমবেশি' নয়, একবারেই বসে পড়েছেন,"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

লবণ হ্রদ সংক্রান্ত অন্য এক সংবাদে শুনিলাম সেখানে পরমাণু গবেষণার নূতন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। সহযাত্রী বলেন,—"এক্ষেত্রে অবশ্য মাটি 'কমবেশি' বসে গেলেও কিছু যাবে আসবে না, কেননা টাকাটা মাটি হবে সরকারের এবং তাতো গা-সহা হয়েই গেছে!!"

চীন পাকিস্তানে কিছু অস্ত্র পাঠাইয়াছিল, বদলে পাকিস্তান চীনকে কিছু আম পাঠাইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"এই আম খাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন পুস্তিকা পাঠানো হইয়াছে কিনা জানিনে। কিংবদন্তী আছে : জনৈক বিদেশ বাদশা এক মৌলবী সাহেবকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন আম নিয়ে যাবার জন্য, কেননা বাদশা

কোনদিন আম খাননি। মৌলবী সাহেব ভারতে এসে নিজেও আম খেলেন এবং বাদশার জন্য কিছু আম সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কিন্তু পথে সমস্ত আম পচে গেল, গন্তব্যস্থলে আর তা নিয়ে যাওয়া হল না। বাদশা খুব আফসোস করাতে মৌলবী সাহেব বললেন, পরোয়া নেই। আমি জনাবকে আমের স্বাদ বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি এক বাটি-ভরতি তেঁতুল গোলা-জলে খানিকটা চিনি মিশিয়ে তাতে নিজের দাড়ি চুবিয়ে বললেন, এইবার আপনি আমার দাড়ি চুষুন তাহলেই আমের স্বাদ পাবেন—একটু টকো, একটু মিষ্টি, একটু আঁশো।"

সংবাদে শুনিলাম জোড়া কচ্ছপ চাঁদ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে।—"চন্দ্রলোক-যাত্রী হিসেবে যখন কচ্ছপের শরণাপন্ন হতে হয়েছে তখন বুঝতে

বেগ পেতে হয় না বিপন্ন ধরণীকে আবার পিঠে ধরে রেখে রক্ষার ব্যবস্থা সমাগত হয়েছে"—বিশু খুড়ো কেশব ধৃত কূর্ম-শরীর গান গাহিয়া মন্তব্য শেষ করিলেন।

ভারত সরকার নাকি জানাইয়া দিয়াছেন গঙ্গার জলে পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই। খুড়ো বলিলেন "খুব অন্যায় কথা। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। পাকিস্তান যদি গঙ্গা যাত্রা অন্তর্জলীর অভিলাষী হয়ে থাকে তবে তাকে বঞ্চিত করা কি ঠিক হবে!!"

অর্থ দফতর সম্পর্কে নানা আলোচনায় শুনিলাম এই দফতর টাকা-কড়ি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক, কিন্তু তবু লাখ লাখ টাকা অপচয়ও হইয়া যাইতেছে নানা ক্ষেত্রে। শ্যামলাল বলিল—"কেন, কী করে টাকা অপচয় হয় তা জানিনে, কিন্তু তাদের অতি সতর্কতা প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প শুনুন : কোন এক স্থানে ইঁদারা থেকে জল তোলার প্রয়োজনে পুরনো দড়ির বদলে নূতন দড়ি কিনে কাজ চালানো হলো। হিসেব পরীক্ষার সময় অডিট 'কোয়েরি' করলেন, নূতন দড়ি ত কিনলেন, কিন্তু পুরনো দড়ির কী হল, সেগুলি কোথায়? উত্তরদাতার ইঙ্গিতটা বরদাস্ত হল না, বললেন, পুরনো দড়ি রেখে দিয়েছি, এখন কলসী পেলেই সেগুলি আপনাদের হাতে তুলে দেবো।"

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে এইবার "বিশ্ব সুন্দরী" আখ্যা লাভ করিয়াছে।—"আমরা তাঁকে অভিনন্দন

জানাই এবং এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি এবং বলি, বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার ছেলেও হকি সুন্দর আখ্যা লাভ করিয়াছে"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লীগ নাকি আবার 'ইসলাম বিপন্ন' জিগির তুলিয়াছে। সহযাত্রী মুখখানা বিকৃত করিয়া মন্তব্য করিলেন—"মরিয়া না মরে রহিম এ কেমন বৈরী!!"

আয়ুবশাহী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভুট্টোর আন্দোলন প্রসঙ্গে জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"জনাব আয়ুব ভুট্টোকে খাইয়েছেন প্রচুর দুধ এবং প্রচুর কলা। কিন্তু ফলং শুধু কদলী দর্শনম!!"

সংবাদে শুনিলাম বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতি শ্রীম্যাকনামারার কলিকাতা সফরের কর্মসূচী কিছুটা রদবদল করা হইয়াছে।—"শ্রীম্যাকনামারা নিশ্চয় বুঝেছেন—এলাম, দেখলাম, চলে গেলাম হলেই কলকাতার উন্নয়ন হয় না, এ গলিমাটিতে গড়া শহর"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[গেট পার হয়ে উড়ে গেল সে। তরুণ যুবক অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি করবেন ভাবছেন এমন সময় দ্বারপথে স্বয়ং মহাকাল প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছু পিছু পবনদেব। পবনদেবের হাতে ছোট্ট একটি থলি। মহাকাল এসে স্মিত মুখে লজ্জিত তরুণ যুবকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মহাকালের চেহারা ধপধপে সাদা। মনে হয় দেহ বুঝি মর্মর-গঠিত।]

মহাকাল। [অপ্রস্তুত তরুণ যুবকের দিকে চেয়ে] খুব বেশী লজ্জিত হয়ো না। আমিও মদনবাণে জর্জরিত হয়েছিলাম একবার। মদনকে কিন্তু রেহাই দিইনি। তোমার রঙিন আলেয়াকেও দিইনি। পবন, কোথায় ছাইগুলো?

পবন। [সসম্ভ্রমে] এই যে। সব এই থলিতে সংগ্রহ করে এনেছি—

মহাকাল। ফেলে দাও ওটা ওই পান-পাত্রের মধ্যে। ফেলে দিয়ে তুমি চলে যাও নিজের কাজে।

[পবন থলিটি স্ফটিকের পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দিতেই সেটি আগের মতো অগ্নিদীপ্ত হয়ে উঠল, তারপর আবার ধারণ করল পূর্বমূর্তি। পবনদেব চলে গেলেন।]

তরুণ যুবক। আমি যে এ কাজের অযোগ্য তা তো প্রমাণিত হয়ে গেল। আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমিও যাই।

মহাকাল। [নির্বিকারভাবে] যাও।

[তরুণ যুবক চলে গেলেন।]

মহাকাল। [নন্দী-ভৃঙ্গীর দিকে চেয়ে] আর কেউ আছে নাকি নীচে? থাকে তো পাঠিয়ে দাও।

নন্দী। একটি মেয়ে আছে কেবল।

মহাকাল। পাঠিয়ে দাও তাকে।

[রহস্য প্রবেশ করল। তার সর্বাঙ্গ পোড়া। হাতে সেই লাল রুমালটি রয়েছে। পিঠের দিকে লম্বা বেণীটা দুলছে। সেটা পোড়েনি। সে এসে ভক্তিভরে মহাকালকে প্রণাম করল।]

মহাকাল। কে তুমি?

রহস্য। আমি সুভদ্র সেনের ধর্মপত্নী রহস্য সেন।

মহাকাল। তোমার সর্বাঙ্গ পোড়া কেন?

রহস্য। আমি সর্বাঙ্গে কেরোসিন তেল দিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলাম।

মহাকাল। কেন?

রহস্য। স্বামীর উপর অভিমান করে। তিনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু কাজটা ভাল করিনি। অনুতাপ হচ্ছে এখন।

মহাকাল। অনুতাপ হচ্ছে কেন? স্বামী ভালো লোক ছিলেন?

[রহস্য চুপ করে রইল।]

উত্তর দিচ্ছ না কেন?

রহস্য। আমি পতি-নিন্দা করব না।

মহাকাল। পতিকে তুমি ভালবাসতে? ভক্তি করতে?

[রহস্য আবার চুপ করে গেল।]

উত্তর দাও।

রহস্য। আমি তাঁকে ভালবাসতে পারিনি। ভক্তি করতেও পারিনি। এটা আমার অক্ষমতা। আমি নিজের রুচি ও পছন্দের ছাঁচে তাঁকে দুমড়ে মুচড়ে ঢোকাতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছি। তাই আমার এত কষ্ট। তাই আমাকে পুড়ে মরতে হল। আমি এতদিনে বুঝেছি কাউকে বিচার করবার অধিকার কারো নেই। প্রত্যেকেই নিজের মতো নিজের স্বভাব অনুযায়ী বিকশিত হয়। আমার ফরমাশে কেউ আমার মতো হবে এটা প্রত্যাশা করা অন্যায়।

মহাকাল। স্বামীর যথেচ্ছাচারকে তাহলে সহ্য করা উচিত—এই তোমার মত?

রহস্য। এখন তো তাই মনে হচ্ছে। দেবতাদের যথেচ্ছাচার, অদৃষ্টের অত্যাচার, সবই তো মুখ বুজে সহ্য করি, স্বামীর বেলায় প্রতিবাদ করে লাভ কি! কোনও লাভ হয় না। স্বামীকে ত্যাগ করে এলে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

মহাকাল। তুমি তোমার স্বামীর কাছে আবার ফিরে যেতে চাও?

রহস্য। যেতে চাইলেও তো পারব না। তিনি তো নেই।

মহাকাল। কি করবে তা হলে?

রহস্য। আমি স্বামীরই স্বপ্ন দেখতে চাই।

মহাকাল। কি রকম স্বপ্ন দেখবে? তোমার কথাবার্তা থেকে যত দূর মনে হচ্ছে তিনি খুব ভালো লোক ছিলেন না। তাঁকে নিয়ে কি রকম স্বপ্ন দেখবে তুমি?

রহস্য। দেবতাদেরও নানা দোষ নানা

দুর্বলতার কথা পুরাণে পড়েছি, নানা ছবিতে নানা মূর্তিতে তাঁদের নানা রকম চেহারা দেখেছি, একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। কিন্তু তবু তাঁদের সম্বন্ধে স্বপ্ন বদলায়নি।

মহাকাল। কোন দেবতার স্বপ্ন দেখ তুমি?

রহস্য। শিবের। ছেলেবেলা থেকে শিবপুজো করেছি। এখনও রোজ শিবের স্তোত্র পাঠ করি, শিব হয়তো শুনতে পান না। কিন্তু আমি—স্বপ্ন দেখি।

মহাকাল। শিবের সম্বন্ধে তোমার স্বপ্নটা কি ধরনের?

রহস্য। তা তো বলতে পারব না। ছেলেবেলায় এক বুড়ো শিবের মন্দিরে পুজো দিতাম। সেখানে শিব শুধু একখানা পাথর, সেই পাথরকেই দয়াময় মনে করতাম। তারপর শিবের নানারকম ছবি দেখেছি। আমার স্বপ্নও বারবার বদলে গেছে। শেষে একবার হিমালয়ে বেড়াতে গেলাম, তখন মনে হল হিমালয়ই শিব। হিমালয়ের যে সব চূড়ো আকাশে উঠে গেছে, যা সাদা বরফ দিয়ে ঢাকা, আমার স্বপ্ন এখন সেইসব চূড়োকে ঘিরে মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। জানি না আমার এ সব স্বপ্ন হয়তো মিথ্যে, আসল শিব হয়তো অন্যরকম। কিন্তু ওই স্বপ্ন দেখেই আমি সুখ পাই। স্বামীর সম্বন্ধেও ওইরকম স্বপ্ন দেখতে চাই আমি, স্বামীকে বিচার করতে চাই না, তাঁর স্বপ্ন দেখতে চাই। [সহসা সানুনয়ে] আপনি তার সুবিধে করে দেবেন একটু?

মহাকাল। এর জন্যে নরকে যেতে রাজি আছ?

রহস্য। আছি। আমি পাপী, আমার তো নরকে যাওয়াই উচিত।

মহাকাল। নরকে কিন্তু নিদারুণ কষ্ট। সে কষ্টের মধ্যে কি তুমি তোমার স্বামীর স্বপ্ন দেখতে পারবে?

রহস্য। চেষ্টা করব। চেষ্টা ছাড়া আর কি করতে পারি বলুন!

মহাকাল। তুমি হাতে ওই লাল রুমালটা নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? কার রুমাল ওটা? তোমার স্বামীর?

রহস্য। বোধ হয় আমার স্বামীর কোন প্রণয়িনীর। স্বামীর বাক্সে রুমালটা পেয়েছিলাম। ছোঁয়া মাত্রই কিন্তু রুমালটা আমার হাতে সেঁটে গেছে। পরশুরামের হাতে যেমন কুড়ুল আটকে গিয়েছিল অনেকটা তেমনি। আমার ঈর্ষার আঠাই সম্ভবত রুমালটাকে আটকে রেখেছে। [সানুনয়ে] এটা খুলে নিতে পারেন?

মহাকাল। এদিকে একটু সরে এস।

[রহস্য সরে আসতেই মহাকাল অনায়াসে তার হাত থেকে রুমালটি খুলে নিলেন। মহাকালের স্পর্শে কিন্তু রহস্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। একটা বিপ্লব ঘটে গেল যেন তার সর্বাঙ্গে।]

[illegible]। কে—কে—কে আপনি?

[মূর্ছিত হয়ে পড়ল। মহাকাল তাকে [illegible] একটি আসনে শুইয়ে দিলেন। তার-পর যা করলেন তা অদ্ভুত। প্রণাম করলেন [illegible] অনেকক্ষণ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর ইঙ্গিতে নন্দীকে ডাকলেন। নন্দী কাছে এলে [illegible]—এঁকে সসম্মানে পার্বতীর কাছে নিয়ে যাও। নন্দী তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে গেল। মহাকাল লাল রুমালটি স্ফটিকের পানপাত্রের ভিতর ফেলে ধ্বংস করে ফেললেন সেটিকে। তারপরই আর্ত [illegible] আর অট্টহাসির অদ্ভুত অশরীরী একটা রূপ ভেসে এল গেটের ওপার থেকে।]

মহাকাল। ভৃঙ্গী, আর কেউ আছে না-কি নীচে?

ভৃঙ্গী। কেউ নেই। বাস্তবলোক থেকে [illegible] ওই চীৎকার।

অশরীরী চীৎকার। আমি সবিতা, আমি [illegible] মরিনি। আমি এখনও তেহেরানের [illegible] রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। পণ্য করেছি দেহকে, সঞ্চয় করেছি অনেক অর্থ, হয়েছে অনেক যশ, পেয়েছি অনেক অর্ঘ্য—কিন্তু তবু তৃপ্তি নেই। সুভদ্র সেন কোথা তুমি, কোথা তুমি—কোথা তুমি, আমার কথা তোমাকে বলতে পারিনি কখনও—

[মহাকাল ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন—হঠাৎ চীৎকারটা থেমে গেল।]

ভৃঙ্গী। চীৎকার থেমে গেল।

মহাকাল। বজ্রাঘাতে এখনই মারা গেল মেয়েটি। ওর কষ্টের অবসান করে দিলাম।

[নন্দীর দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন—'কোটাল, কোটাল'। কোটাল প্রবেশ করলেন এসে।]

তেহেরানের রাস্তায় নীল শাড়ি পরা সবিতা এখনি বজ্রাঘাতে মারা গেছে, তাকে তোমার ওই সাঁড়াশি কি আনতে পারবে এখানে?

কোটাল। নিশ্চয় পারবে।

মহাকাল। নিয়ে এস তাহলে। এনে ওই স্ফটিক পাত্রে নিক্ষেপ কর—সবাই এক-সঙ্গেই থাক।

[কোটাল অন্তর্ধান করলেন। সাঁড়াশি প্রলম্বিত হয়ে গেট পার হয়ে চলে গেল বাস্তবলোকের দিকে। পরক্ষণেই ফিরে এল সবিতাকে নিয়ে। সবিতার মৃত দেহটা শূন্যে ঝুলেছে। মানুষ নয়, নীল শাড়ি পরা একটা ঘুমন্ত পুতুল যেন। স্ফটিক পানপাত্র তাকে গ্রাস করে ফেলল নিমেষে। আগুন জ্বলল, তারপর ঠান্ডা হয়ে গেল সব। দাঁড়িয়ে রইল স্ফটিকের পান-পাত্র স্ফটিক-শুভ্র শোভায়। এর পর প্রবেশ করলেন তরুণ যুবক। তাঁর হাতে সেই দু-খানা খাতা।]

তরুণ যুবক। এই খাতা দুটোর মধ্যে কিছু কিছু স্বপ্নের আভাস আছে। পড়ে শোনাব আপনাকে?

মহাকাল। শোনাও।

তরুণ যুবক। প্রথমে মহুয়ার ডায়েরি থেকে পড়ছি কিছু—

মহাকাল। পড়।

তরুণ যুবক। [পড়তে লাগলেন] চারি-দিকে এত ভিড়, তবু যেন মনে হয় একা আছি। আমার অন্তরতম সত্তা কাঁদছে। প্রগতির যুগে অনেক রকম অসুখের প্রতিকার আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এ কান্না থামবার উপায় কেউ আবিষ্কার করেছে কি? ধর্ম? সে তো কুসংস্কার, মিথ্যে স্তোক-বাক্যে নিজেকে সম্মোহিত করা। সাহিত্য? সাহিত্য কল্পনার কুসুম কানন। কত রকম ফুল ফুটেছে, তাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে ভালো লাগে, কিন্তু বরাবর নয়। খানিকক্ষণ পরেই অন্তরের চিরন্তন হাহা-কার উদ্বেল হয়ে ওঠে আবার, মনে হয় আমি নিঃসঙ্গ, আমি একা। দাদু, মঙ্গল-ময়, মিস্টার চ্যাটার্জি, বাবুল, মোহিত সোম শালিম সবাই ভালো, অথচ সবাই খারাপ। দুমুখো মূর্তির মতো। মুখের আধখানা সুন্দর, আধখানা কুৎসিত, খানিকটা প্রদীপ্ত, খানিকটা অন্ধকার—

মহাকাল। থাক—আর পড়তে হবে না। আর একটাতে কি আছে, পড়—

তরুণ যুবক। নানারকম লিখেছেন ভদ্র-লোক। খাতাটার নাম 'মেঘ'। প্রথম খাতাতেই একটা ধাঁধা এবং তার উত্তর। কে চটে গেলে আর আসে না? উত্তর—ঘুম। এরপর একটা কবিতা—

শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুর্গি
চড়াই শকুন আর কাকেরা
বিহঙ্গ সমাজের এই নবশাখেরা
এবার তুলিবে নাকি বিদ্রোহ-ঝান্ডা
অভিজাত পাখিদের করে দেবে ঠান্ডা
ময়ূর, ফটিক জল, দোয়েল, হলদে পাখি,
মার্কিনে যাবে বলে খুঁজিতেছে ভিসা নাকি
তিতির বটের দল
সবার নয়নে জল
খঞ্জন টিটিভ
ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ
থিরথিরা ছোট পাখি
কাঁপে শুধু থাকি থাকি
কোকিলের কুহু কুহু
মনে হয় উহু উহু
বেদনা আকাশে ফেরে কাঁপিয়া
চোখ গেল চোখ গেল ডেকে ওঠে পাপিয়া।
টুনটুনি বুলবুল
ঘামিতেছে কুল কুল
শুধু কাঠঠোকরার শোনা যায় ঝংকার
বলে যেন—চোপ চোপ চোপ রও।
মাঝে মাঝে চুপে চুপে ডাকে—বউ কথা কও।
দরজী বাবুই আর মুনিয়া
মুচকি মুচকি হাসে শুনিয়া।

এর পর ছোট একটু গদ্য—

আমরা কিছু জানি না এইটেই সবচেয়ে

বড় সত্যি কথা। এক হিসেবে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনাও। জ্ঞানই মানুষকে অসুখী করে, অশান্ত করে। আমাদের কল্পনা নানারকম স্বপ্ন সৃষ্টি করে আমাদের মুগ্ধ করে রাখে খানিকক্ষণ। ভঙ্গুর সে স্বপ্ন ভেঙে যায়, আর একটা স্বপ্ন জেগে ওঠে। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর স্বপ্নের নিত্য পরিবর্তনশীল স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি। শেষে গিয়ে যে মহাকাল-সাগরে আমরা মিশব তার স্বরূপ আমরা জানি না। না জেনে ভালই আছি। জানলে হয়তো ভয় পেতাম।

তারপর আর একটা কবিতা।

কেন জানি না মনে হচ্ছে
অনন্ত আকাশ-পথে চলেছে
পালকির সফর।

সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র
পাখি, ঘুড়ি, ধুলি, ধোঁয়া, গন্ধ—
সব পালকি।

প্রত্যেকেরই মাঝে
আছে বর, আছে বধূ
আর আছে সেই মধু
যার নাম প্রত্যাশা।
সবাই প্রত্যাশা করে আছে।
তাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে

যে দেখাবার।
তারাও পালকি চড়ছে মনে মনে
বাইরে তা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু
মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে
প্রাণের আর্তনাদ শুধু—
হুম রো, হুম রো, হুম রো।
তারা ছুটছে—কেবল ছুটছে—
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে—
গা দিয়ে ঝরছে ঘাম
ঘাম—ঘাম—কালঘাম।
চলেছে পালকির সারি
অগুনতি, অসংখ্য।
এর পর আছে—

মহাকাল। আর পড়তে হবে না। খাতা দুটো ফেলে দাও ওই পান-পাত্রের ভিতর। ওদের মধ্যে যে স্বপ্ন অমর তা মরবে না—

[তরুণ যুবক খাতা দুটি পান-পাত্রের ভিতর ফেলে দিলেন। আগের মতোই প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সেটি খানিকক্ষণের জন্য। তারপর আবার পূর্ববৎ হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটো রঙিন প্রজাপতি বেরিয়ে এল পান-পাত্রের ভিতর থেকে স্বপ্নলোকের দরজা দিয়ে উড়ে চলে গেল।]

মহাকাল। ওরা মরবে না। আর কেউ নেই দোরে?

ভৃঙ্গী। না।

মহাকাল। এইবার তাহলে পানপাত্রটিকে খালি করে নিয়ে এস। আর খবর দাও [illegible] কোন মহাবিদ্যাকে—

[তরুণ যুবক চলে গেলেন। ভৃঙ্গী নিজেই পানপাত্রটিকে মহাকালের সামনে স্থাপিত করে গেটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটি রূপসী যুবতী প্রবেশ করলেন।]

মহাকাল। ও, ষোড়শী এসেছ? এই পানপাত্রটিকে খালি করে দাও, এতে যা আছে তা পান করব।

ষোড়শী। কি আছে এতে?

মহাকাল। বিষ।

[ষোড়শী পানপাত্রটিকে স্পর্শ করতেই সেটি ছোট স্বচ্ছ একটি পানপাত্রে রূপান্তরিত হল। দেখা গেল তাতে নীল বিষ টলমল করছে।]

ষোড়শী। আবার বিষ পান করবেন?

মহাকাল। করতে হবে। এই আমার নিয়তি—

[পানপাত্রটি তুলে সমস্ত বিষ পান করে ফেললেন। তাঁর ঈষৎ নীল দুগ্ধ-ধবল কণ্ঠ আবার ঘোর নীল হয়ে গেল। ষোড়শী ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর চলে গেলেন ধীরে ধীরে। ভৃঙ্গী নীরবে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মহাকালের দিকে।]

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

তারপর অনেক অনেক দিন কেটে গেছে।

পূর্ণেন্দুবাবুর হলদে বাড়িটা ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। ইটও আর দেখা যায় না। তার উপর গজিয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলের গাছ অধিকাংশই অচেনা, চেনা শুধু তাদের সবুজ সতেজ প্রকাশটুকু। চেনা গাছ যে একেবারে নেই তা-ও নয়। আকন্দ, ধুতুরা, বাঘ-নখ, নিম-অশ্বত্থের চারা, শিশু বট, ডুমুর গাছ, আসশ্যাওড়া। আর দুপাশে দুটো দেবদারু গাছ—একটা খুব বড়, আর একটা তার চেয়ে ছোট, ভগ্নস্তূপের দুধারে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে এরা। সকলেরই সবুজ সতেজ প্রাণ-বন্ত ঊর্ধ্বমুখী প্রকাশ। পোকামাকড়, পতঙ্গ - প্রজাপতি, টিকটিকি-গিরগিটিও আছে অনেক। সাপও আছে। আর আছে পাখিরা। সেই পাখিরাই, যারা সুভদ্র সেনকে ভোলাতো একদিন। চড়াই শালিক টুনটুনি বুলবুলি নীলকণ্ঠ ফিঙে ল্যাজঝোলা হলদে পাখি দরজী ঘুঘু মোহনচূড়া বসন্ত-বউরি স্যাকরা পাখি চোর পাখি—সবাই আছে। মাঝে মাঝে ধনেশ পাখিও এসে বসে দেবদারু গাছে। লতাও আছে নানারকম। বিছুটি তেলাকুচা পুনর্নবা গুলঞ্চ নাম-না-জানা আরও কতরকম লতা। তাদের কত-রকম ফুল, কতরকম ফল, কতরকম গন্ধ, কত অভিসারই চতুর্দিকে। নেই কেবল পূর্ণেন্দুবাবুর হলদে বাড়িটা। সুভদ্র সেন আর মহুয়াকেও কেউ মনে করে রাখেনি। সুভদ্র সেনের পুরাতন চাকর মারা গেছে অনেক দিন। তার একমাত্র পৌত্র কলকাতায় রিকশা টানে। সে সুভদ্রবাবুর নাম পর্যন্ত শোনেনি। মানুষের ইতিহাসে সমাজের ইতিহাসে সুভদ্র সেন আর মহুয়া কোথাও নেই। মানুষের স্মৃতি সহজেই অবলুপ্ত হয় বিস্মৃতির অন্ধকারে। তবু কিন্তু মনে হয় ওই বাড়িটার ভগ্নস্তূপ এখনও ভোলেনি ওদের।

গভীর রাত্রে যখন জোনাকিরা আলোকোৎসব করে দেবদারু গাছ দুটিকে ঘিরে, তখন ছোট দেবদারু গাছ থেকে শঙ্কিত কণ্ঠে কে যেন ডাক দেয়—'দাদু'। বড়গাছটা চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর দ্বিধাভরে সেও সাড়া দেয়—'কি'। সব চুপচাপ হয়ে যায় আবার। অসংখ্য জোনাকি জ্বলতে থাকে নীরবে। অনেকক্ষণ পরে আবার শোনা যায় ভীরু সশঙ্কিত ডাক—দাদু। অনেকক্ষণ পরে বড় দেবদারু আবার দ্বিধাভরে উত্তর দেয়—কি।

অনেকে হয়তো বলবেন রাত-জাগা পাখি ওরা। কিন্তু—।

॥ সমাপ্ত ॥

বিশ্ব বিজ্ঞান

উপরে : পশ্চিম জার্মানীর প্রথম পরমাণু শক্তি চালিত জাহাজ "অটো হান" সাগরে ভাসাবার সময় বিজ্ঞানাচার্য অটো হান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিচে : যে টেবিলে যেসব সাজসরঞ্জাম নিয়ে অটো হান পরমাণু বিভাজন গবেষণা করেছিলেন

পরমাণু বিভাজনের অন্যতম আবিষ্কর্তা—বোমার নয়

১৯৩৮ সালে তিনি কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে তাঁর এই যুগান্তকারী প্রাকৃতিক শক্তি আবিষ্কার কোন দেশ বা কোন সরকার যুদ্ধের ও অস্ত্রের মারণ ও ধ্বংস শক্তি গণনাতীত গুণ বাড়িয়ে দেবার স্বার্থে অপব্যবহার করবে? তিনি ছিলেন যাকে বলে 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞানী। রাজনীতি নিয়ে কারবার তিনি কোনদিনই করেন নি। সেজন্যই বোধ হয় এই ভাবী বিপদের কথা তাঁর মাথায় আসেনি এবং না আসারই কথা। কারণ যুদ্ধ এবং তার ব্যবহার্য অস্ত্র কোনদিনই রাজনীতি নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়। সমরবিদ্যার জার্মান রণনীতি বিশারদ ক্লাউসেভিৎস, স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতি পরিচালনার উপায়ান্তর। প্রতিভাবান বিজ্ঞানাচার্য অটো হান শেষ জীবনে এই অপ্রিয় বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলে নিজে পরমাণু বিভাজনের অন্যতম আবিষ্কর্তা হয়েও ১৯৫৭ সালে গটিনজেন আবেদনের তলায় পশ্চিম জার্মানীর ১৮জন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানীর স্বাক্ষরের সঙ্গে নিজের নাম যোগ করে দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। ঐ আবেদনে তাঁরা পরমাণবিক অস্ত্রজনিত সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করেন এবং ঘোষণা করেন যে, তাঁরা কোনদিন কিছুতেই পারমাণবিক অস্ত্র উদ্ভাবন বা উৎপাদনের মত মানববিরোধী দুষ্কার্যে লিপ্ত হবেন না এবং পরমাণু শক্তি নিয়ে এমন কোন রকম গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবেন না যা ওই শক্তিকে হিংসার স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে। তাঁরা পরমাণু শক্তির শুধু সেইক্ষেত্র গুলিতে কাজ করবেন যেগুলি একমাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। এই রাজনৈতিক চেতনা তাঁর গোড়ার দিকে ছিল না তো বটেই বরং আমরা যদি বলি যে প্রথম দিকে তিনি "গজদন্ত-মিনারবাসী" "বিশুদ্ধ" বিজ্ঞানসাধক ছিলেন তাহলে কিছু অন্যায় হবে না। আমাদের যুগে গজদন্তমিনারবাসী বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-সাধক হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব বললে চলে এবং অটো হান তা শেষ জীবনে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন হিরোশিমা ও নাগাসাকির পরে। পরমাণু বিভাজনের স্রষ্টা দেখলেন যে তাঁরই আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকাবাসী কয়েকজন বিজ্ঞানী পরমাণু বোমা নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করলেন। প্রথম দুটি বোমার মারণ শক্তি পরীক্ষা করা হোল হিরোশিমা ও নাগাসাকির বেসামরিক নাগরিকদের গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করে। যে অটো হান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম অধ্যায়ে পদার্থ বিজ্ঞানী ভার্নার হেইসেনবের্গের সঙ্গে মিলে জার্মান ইউরেনিয়াম বোমা তৈরি করার চেষ্টা থেকে নাৎসীদের শেষ পর্যন্ত নিরস্ত করায় কৃতকার্য হন, তাঁকেই শেষ পর্যন্ত সেই বোমার বীভৎসতার সাক্ষ্যদান করতে হলো হিরোশিমা ও নাগাসাকির পর এমন একটা সময়ে যখন জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ অস্ত্রবলের অধিকারী মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন মাঞ্চুকুয়ো বাহিনী (৮ লক্ষ সৈন্যের) পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবার পর জাপান নানা ভাবে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাচ্ছিল। এই থেকে জনমনে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য হিরোশিমা ও নাগাসাকির জনগণের উপর ঐ বোমা ফেলার সমরনৈতিক দিক থেকে কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু কেন ফেলা হোল, এ প্রশ্নটা রাজনীতির ব্যাপার, ভাবাদর্শগত বিরোধের ব্যাপার। তাই আমাদের এই বিজ্ঞানের প্রবন্ধে সেগুলি আলোচনা না করাই ভাল। তাছাড়া আশ্চর্য হবার মত কিছু এখানে নেই। কারণ, বহু কাল আগে

থেকেই বিজ্ঞানের নতুন অবদানগুলির প্রায় সবই যুদ্ধ ও শান্তি, দুয়ের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং পৃথিবীতে দেশে দেশে যতদিন স্বার্থের হানাহানি থাকবে ততদিন বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার বন্ধ হতে পারে না। যাই হোক, মাঝে মাঝে পত্র পত্রিকায় যখন এই মর্মে সংবাদ বার হত যে হিরোশিমার পর অটো হান দারুণ মানসিক অবসাদগ্রস্ত হন, এমনকি আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করতেন, তখনই তিনি ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বলতেন যে ঐসব খবরের কাগজের জল্পনা-কল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এটা ঠিক যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধের স্বার্থে পরমাণুর প্রচণ্ড ধ্বংস শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাই বলে তিনি কোনদিন তাঁর আবিষ্কারকে পরবর্তীকালে যুদ্ধের স্বার্থে ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত করেননি, কারণ সেই ব্যাপারের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে কিছুতেই চাপানো চলে না। স্বয়ং আলফ্রেড নোবেল—যাঁর নামধারী পুরস্কার অটো হান লাভ করেন—তিনিই কি প্রথমে ভাবতে পেরেছিলেন যে তাঁর অবদান যুদ্ধের জন্য, মানুষ মরার জন্য ব্যবহার হবে? কিন্তু পরে যখন তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে সেই অবদানের ধ্বংসাত্মক দিকটির তাৎপর্য বুঝতে পারলেন তখনই তিনি পাপস্খালনের জন্য বিশ্বশান্তির ও জনকল্যাণের স্বার্থে প্রতি বছর যাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু মূল্যবান আবিষ্কার করবেন, তাঁদের পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর হাতের বাইরে চলে যাওয়া সত্ত্বেও কোথাও কোন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করা হলেই অটো হান মুক্ত কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিকের মত রাজনীতির দুই মেরুতে তিনি যাতায়াত করেন নি। ওই ধরনের গতিবিধিকে তিনি সুবিধাবাদী বলে মনে করতেন। অটো হান তাঁর আবিষ্কৃত এই প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তিটি কি ভাবে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে পারমাণবিক যুগের অবতারণা করবে সেই দিকে পথ নির্দেশ করে গিয়েছেন এবং সেই শক্তি যুদ্ধের স্বার্থে ব্যবহার করলে বিশ্বমানব কি রকম সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হবে তাও ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। তাঁকে কেউ "পরমাণু বোমার জনক" বলে অভিহিত করলে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতেন এবং আপত্তি করতেন। তিনি প্রায়ই এই বলে অনুশোচনা করতেন যে, "আমার আবিষ্কারকে এক অভিশাপে দাঁড় করানো হয়েছে।"

১৮৯৭ সালে জার্মানীর ফ্রাংকফুর্ট-অন-মেন্ শহরে অটো হান ভূমিষ্ঠ হন ৮ই মার্চ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে।

মুন্শে (মিউনিক) ও মার্বুর্গ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রের ডিগ্রী নিয়ে অটো হান প্রথমে কারখানা-শিল্পের লাইনে যাবার জন্য ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তাঁর শুভানুধ্যায়ী বিচক্ষণ শিক্ষক মিঃ থিয়োডোর জিন্‌কে তাঁকে বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেই কাজ করে যাবার পরামর্শ দেন। তারপর আচার্য হান লণ্ডনে চলে যন ইংরাজী শিখবার জন্য। তখন বিংশ শতাব্দীর আদি পর্ব। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজী চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাবার সুযোগ পান প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম র‍্যাম্‌সের সোজন্যে। পড়ার দরুণ। অটো হান নিজেই একবার মন্তব্য করেছিলেন, "আমি যেখানেই গেছি বা যে কাজে হাত দিয়েছি, সব সময়ই ভাগ্যলক্ষ্মী আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন।" স্যার র‍্যাম্‌সের সাহচর্য লাভ সেই ভাগ্যলক্ষ্মীরই বরদান। তিনি অটো হানকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ দেন। শুভাদৃষ্টের দৌলতে হান্ ১৯০৫ সালে রেডিয়াম মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম্ আবিষ্কার করেন। অন্যান্য বহু নবীন গবেষক বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেও কোন সার্থক আবিষ্কারের জয়মাল্য লাভ করতে পারেন নি কেন, এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য হান মন্তব্য করেন: "তাঁরা যেসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন সেগুলির সুফল প্রসবের যোগ্যতা নেই, সম্ভাবনাও নেই। যে সব ক্ষেত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও বিরাট সম্ভাবনা আছে সেই রকম একটি ক্ষেত্র বেছে নেওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম—সেটা আমার নিত্যসংগী সৌভাগ্যেরই দৌলতে।"

এর পর একটি সুপারিশ পত্র দিয়ে অটো হানকে কানাডার রাজধানী মন্ট্রিলে পাঠানো হয় ১৯০৫ সালেই আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের এবং তারপরে বার্লিনে এমিল ফিশারের কাছে। স্যার র‍্যাম্‌সে এমিল

ফিশারকে এক পত্রে লেখেন : "ডঃ হানের গবেষণা নৈপুণ্য, সৎসাহস ও অধ্যবসায় আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

অটো হান অতবড় আবিষ্কর্তা হয়েও আত্মপ্রশংসা করতে তাঁর বিন্দুমাত্র বাধত না। একবার হান, তখনকার দিনে পুরোধা রসায়ন বিজ্ঞানী স্যার র্যামসেকে এক নতুন আবিষ্কৃত ব্যাপার দেখান। সেটি দেখে স্যার র্যামসে এত বিস্ময়বিমুগ্ধ হন যে তখনই তিনি ব্যাপারটি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট রয়্যাল সোসাইটির কাছে পেশ করতে চান। কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে হান বললেন, "আরো ভালো করে পরীক্ষা না করে দেখে আগেই রিপোর্ট পাঠানো উচিত হবে না যে আমি নতুন একটি জিনিস আবিষ্কার করেছি।" পরে সত্যিই দেখা গেল যে জিনিসটি ছাদের উপরে জল যাবার যে লোহার পাইপ আছে তারই মর্চে ধরা একটি অংশ। আচার্য হান এই ধরনের সব গল্প করতেন ইচ্ছা করেই যাতে লোকে তাঁকে এক যুগপুরুষ বা অতিমানব বলে না ভাবে। অত অল্প বয়সে বিজ্ঞান গবেষণায় এতখানি সাফল্যের পরিচয় আর কেউ দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তবু তিনি আন্তর্জাতিক প্রখ্যাতি কামনা করেন নি, লোকে তাঁকে জ্যোতিষ্মান বলে ভাবুক এটা তিনি কোনদিনই চান নি। ১৯০৬ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে এবং পরবর্তী ৪০ বছর রসায়ন বিজ্ঞানের মাক্স প্লাংকে (আগেকার কাইজার উইলহেল্ম) ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত থাকার সময় তিনি রেডিও রসায়ন সম্পর্কে বহু পুস্তক রচনা করেন এবং শেষে মাক্স প্লাংক সোসাইটির সভাপতি হন। সেই সময়ে লেখা যে রচনাগুলি তিনি আডলফ বুটেনান্ডকে দিয়ে যান সেগুলি সংকলিত করলে বেশ ভারিক্কি একখানি বই হয়ে যাবে। লিণ্ডাউ শহরে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের প্রতি বছর যে সভা হয় অটো হান তার প্রত্যেকটিতে উপস্থিত থাকতেন। ১৯৪৪ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার সময়ে যুদ্ধ চলছিল বলে তিনি সুইডেনে গিয়ে সম্রাট গুস্তাভ (৫)-এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার সুযোগ পাননি। যুদ্ধের অবসানের পর ১৯৪৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তিনি গিয়ে পুরস্কার নিয়ে আসেন।

ইতালীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মিই সর্বপ্রথমে আন্দাজ করেছিলেন যে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীণের (নিউক্লিয়াস) বিভাজন এবং নিউট্রনগুলির মুক্তিলাভ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাঁর অনুমানকে কার্যের দ্বারা প্রমাণিত করার আগেই অটো হান ও তাঁর সহকর্মী স্ট্রাস্‌মন্‌ মন্থরগতি নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়ামের উপর আঘাত করতে থাকেন। কিন্তু বেরিয়াম আইসোটোপ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ফের্মিরই প্রাপ্য অথচ সেটা কিন্তু, অটো হানের সহকর্মিনী লিসে মেইটনারের মতে, রেডিও রসায়নের এক্তিয়ারে পড়ে, পদার্থ বিজ্ঞানের এক্তিয়ারে নয়।

বিভাজনের ফলে যে বেরিয়াম আইসোটোপগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলি অদৃশ্য এবং সেগুলির ভার নির্ণয় করা এখনো সম্ভব হয়নি। 'গেইগার' নামে এক গণন কৌশল আছে যার দ্বারা সেগুলির গণনা এবং জীবনের অর্ধেক অংশের মেয়াদ মাপা সম্ভব। হান ও স্ট্রাস্‌মান সেগুলি নানা কৌশলে গুণে যখন দেখলেন যে ফলাফল নির্ভুল তখনই তাঁরা সে সম্পর্কে তাঁদের রচনা বিজ্ঞান পত্রিকা ডিয়ে নাতুর্ভিসেন্‌শাফ্‌টেনে প্রকাশ করার জন্য পাঠান।

অটো হান যখন প্রথমে গবেষণায় অবতীর্ণ হন তখন তাঁর সহকর্মিণী ছিলেন লিসে মেইট্‌নার নামে এক মহিলা বিজ্ঞানী। ভদ্রমহিলা জার্মানী ছেড়ে যাবার পর অটো হান ইউরেনিয়ামঘটিত ধাতুর রূপান্তরের রহস্য উদ্ধারে ফ্রিট্‌জ স্ট্রাসমানকে সহকর্মী হিসাবে পান। তাঁর পরমাণু বিভাজনের পরে লোকে তাঁর নাম দেয় পারমাণবিক যুগের "কলম্বাস"। তাঁর এই আবিষ্কারের কথা লিসে মেইট্‌নারকে তিনি লিখে পাঠান এবং পারমাণবিক বিভাজনের পূর্ণ তাৎপর্য মেইটনারই যে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন তা তাঁর ভাইপো অটো ফ্রিট্‌শের কাছ থেকে জানা যায়।

আইনস্টাইন একবার কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, সকলের ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারের প্রভাব কল্যাণকর হয় না, কারণ অনেকেই ঐ পুরস্কার পেয়ে ধরা কে সরা জ্ঞান করেন, তাঁদের মাটিতে আর পা পড়ে না, মাথা যায় বিগড়ে। তাঁর মতে এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছিল মেরী কুরীর ক্ষেত্রে। দু' দুবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেও তিনি অহমিকায় আত্মবিস্মৃত হননি। আজ বেঁচে থাকলে আইনস্টাইন হয়ত অটো হানকেও সেই ব্যতিক্রমের পর্যায়ে ফেলতে পারতেন। কারণ, অটো হান বলতেন যে তিনি যা করেছেন সেটা ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় জন্যই সম্ভব হয়েছে, তাঁর কোন বিশেষ গুণ আছে বলে নয়। যে কোন সুদক্ষ রসায়ন বিজ্ঞানীর পক্ষে তিনি যা করেছেন তা করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁর এই আবিষ্কার নেহাতই একটা আকস্মিক ব্যাপার এবং পারমাণবিক শক্তিকে মুক্ত করার যে ফলাফল কি হবে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। অণুক্রমিক বিক্রিয়া (চেন্‌ রিঅ্যাকশান্‌) ব্যাপারটা তো পদার্থ বিজ্ঞানীদের এক্তিয়ার ভুক্ত। তিনি নিজে তো একজন "সাধারণ রসায়ন শাস্ত্রী" ছাড়া আর কিছু নন।

বিজ্ঞানাচার্য অটো হান গত ২৮শে জুলাই প্রাণত্যাগ করেন। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্র ও সেই অস্ত্রের বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় ধূলিমেঘ যে যুগ যুগ (১০ বছরে এক যুগ) ধরে পার্থিব আবহমণ্ডল বিষিয়ে তুলতে থাকবে এই সতর্কবাণী সুযোগ পেলেই উচ্চারণ করে বলেছেন : "এই সাংঘাতিক অবস্থাকে যেমন করে হোক ঠেকাতেই হবে। সেই জন্য পরমাণু নির্মাণের উপর প্রকৃত আন্তর্জাতিক তদারকির দরকার এবং পূর্ব ও পশ্চিমের ভাবাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য।"

বিজ্ঞানাচার্য হানের আবিষ্কার শান্তিকালে সমাজের উৎপাদন ক্ষেত্রের বহু উপকারে এর মধ্যেই আসছে। কিন্তু সাগরে নিমজ্জিত তুষার শৈলের ছোট্ট একটি পরিদৃশ্যমান কোণের সমতুল্য ওই রকম একটি প্লবমান তুষার শৈলের সঙ্গে
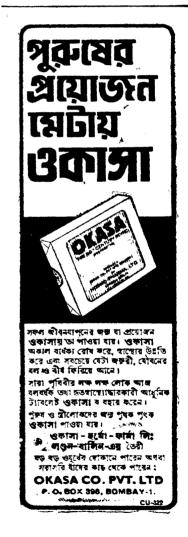
সংঘর্ষে চৌচির হয়ে গিয়েছিল টাইটানিক। যুগে বিজ্ঞানী অটো হানের আবিষ্কারের গর্ভে যে বিশাল ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন রয়েছে এ পর্যন্ত তার সামান্য একটু আভাস পাওয়া গিয়েছে ও তা কাজে লাগানো হয়েছে। ভবিষ্যতে তাই থেকে আরো কত কি করা যাবে তা এখনো কল্পনাতীত।

আর একটি প্রথম (১) প্রসঙ্গ

দেশ পত্রিকার (সংখ্যা ৪২, ১৯ অক্টোবর ১৯৬৮) 'বিশ্ব বিজ্ঞান' বিভাগের রচনায় কয়েকটি ত্রুটি নজরে পড়ল। ১৭০৮ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে লেখা হয়েছে "১৯৬৬ সালেই লুনা-৯ ধীরে ধীরে প্যারাসুটে ঝুলে ভাসতে ভাসতে চাঁদে গিয়ে নামে।" কিন্তু চাঁদে তো মোটেই বায়ু নেই কাজেই আবহ-মণ্ডল বিহীন চাঁদে মহাকাশযান প্যারাস্যুটে ঝুলে ভাসতে ভাসতে নামে কি করে? তাছাড়া প্যারাসুট ব্যবহৃত হয়নি, হয়েছে গতি কমাবার জন্য রেট্রো রকেট। এ থেকে এই ধারণারই প্রশ্রয় দেয় যে চাঁদের বায়ু মণ্ডল আছে।

এছাড়াও ১৭০৭ পাতার দ্বিতীয় কলমে আছে "এবং দশটি স্বয়ংক্রিয় যান লুনা

সার্ভেয়ার প্রভৃতি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে ছবি তুলে পাঠিয়েছে।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সার্ভেয়ার মহাকাশযানের উদ্দেশ্য ছিল চাঁদে ধীরে ধীরে অবতরণ এবং তা করানো হয়েছে। চাঁদের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে "ল্যুনার অরবিটার" নামক মহাব্যোমযান, সার্ভেয়ার নয়। প্রথম কলমে লেখা হয়েছে, "মহাশূন্যে দুটি মহাকাশযানের প্রথম পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া...এতগুলি প্রথমের অধিকারী আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন।" এটা সকলেরই জানা যে আমেরিকার "জেমিনী" প্রকল্পের মনুষ্যচালিত মহাকাশযানগুলিই এ বিষয়ে সফল হয় এবং তার প্রায় ১ বছর বাদে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় মহাশূন্যে মিলন সম্পাদন করে।

সাহিত্য পত্রিকার বিজ্ঞানমূলক রচনা যখন জনপ্রচারের জন্য লেখা হয় তখন লেখকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। ইতি—

প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হুগলী

লেখকের বক্তব্য

শ্রীপ্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি পড়ে বেশ ভালই লাগলো। কারণ, দেশ পত্রিকার পাঠকরা যে সাগ্রহে এবং সমালোচকের দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ পড়েন তার একটি নবতম প্রমাণ প্রবীরবাবুর চিঠি।

তাঁর চিঠিতে প্রবন্ধে যে ক'টি 'ত্রুটি'র কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য:—

(১) চাঁদের আবহমণ্ডল নেই বলে চাঁদে নামবার জন্য প্যারাসুটের প্রয়োজন নেই এটা ঠিক কথা এবং রেট্রো রকেটের সাহায্যে নামতে হবে এটা আগেকার দিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও অ্যাপোলো-৭-এর মহাশূন্যে পরিক্রমার পর ঐ বক্তব্য আর প্রযোজ্য নয়, কারণ ঐ মহাকাশযানে কোন রেট্রো রকেট ছিল না এবং সেই দিক থেকে আমেরিকা আর একটি বিশ্ব রেকর্ড জয় করেছে। অ্যাপোলো-৭-এ রেট্রো রকেটের বদলে ব্যবহার হয়েছে 'সার্ভিস প্রোপাল্শান রকেট।" মার্কিন বিজ্ঞানীরা মনে করেন চন্দ্রলোকের যাত্রীরা চাঁদে নামবার জন্য রেট্রো রকেট ব্যবহার না করে এই নতুন কৌশলটি কাজে লাগাবেন। প্যারাসুট সম্পর্কে প্রবীরবাবুর সমালোচনা আমি সবিনয়ে মেনে নিচ্ছি, যদিও ল্যুনা-১০-এর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে প্যারাসুটের কথা উল্লেখ ছিল। যাই হোক ভুল যা তা ভুলই।

(২) সার্ভেয়ার মহাকাশযানের সম্পর্কে প্রবীরবাবুর সমালোচনা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না বলে দুঃখিত। ল্যুনার অর্বিটার শব্দ দুটি ব্যবহার না করলেও আমি লিখেছি "ল্যুনা সার্ভেয়ার প্রভৃতি। এই প্রভৃতি শব্দটি এই জন্য ব্যবহার করেছি যে 'অর্বিটার' নামটা কিছুতেই মনে এল না অথচ আমার মনে এই ধারণা ছিল যে আমেরিকার চন্দ্রলোকে যাত্রার পরিকল্পনার মধ্যে আর একটি পর্যায় আছে। কিন্তু 'প্রভৃতি' যখন লিখেছি তখন পাঠক নিজেই ধারণা করে নিতে পারবেন যে ল্যুনা ও সার্ভেয়ার ছাড়া আরো পর্যায় আছে। দ্বিতীয় কথা, সার্ভেয়ার পর্যায়ের কর্তব্য ছিল স্বয়ংক্রিয় কৌশলে কোন যাত্রী না নিয়ে চাঁদের প্রকৃতি পরীক্ষা করা। সুতরাং অর্বিটারকে সার্ভেয়ারের উপপর্যায় বললে কি ভুল হবে?

প্রবীরবাবুর তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে যে, মহাকাশে দুটি যানের মিলন বা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হবার ক্ষেত্রে আমেরিকারই স্থান প্রথম, সোভিয়েতের নয়। এখানে তিনি মহাবৈমানিক চালিত ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত —এই দুই মৌলিক পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছেন, যদিও মনুষ্যচালিত ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। আমার বক্তব্য তিনি ধরতে পারেন নি ঠিক মত হয়তো আমার ভাষার প্রকাশভঙ্গীর জন্য। মহাশূন্যে দুটি মার্কিন যানের সাক্ষাৎকারের (রাঁদেভু) প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয় কারণ 'আগেনা' রকেটটি গোড়াতেই বিগড়ে যায়। দ্বিতীয় বার সেই চেষ্টা সফল হয় জেমিনী-৬ ও জেমিনী-৭-এর মধ্যে। জেমিনী-৬-এ ছিলেন শিরা ও স্ট্যাফোর্ড এবং জেমিনী-৭-এ বরম্যান ও লাভেল। কিন্তু সাক্ষাৎকার এবং সংলগ্ন হওয়া এক কথা নয়। প্রথমটি হচ্ছে 'রাঁদেভু', দ্বিতীয়টি ডকিং। দ্বিতীয় চেষ্টায় রাঁদেভু সম্ভব হয়েছিল এবং দুটি যান পরস্পরের কয়েক গজের মধ্যে এসেছিল কিন্তু সে দুটি পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারেনি। পরে অবশ্য রাঁদেভু কেন ডকিং-এও সাফল্য লাভ হয়, কিন্তু প্রতিবারই যানগুলি যাত্রী পরিচালিত ছিল যাতে কাজটা অনেক সহজ সাধ্য হয়। তারপর ১৯৬৬ সালে জেমিনী-১২ মহাকাশযানের চালক অলড্রিন মহাশূন্যে বার হয়ে নিকটবর্তী আগেনা রকেটের অ্যানটেনার সঙ্গে যানটি দড়ি দিয়ে বেঁধে দেন। একে ডকিং বলে না। হালে সোভিয়েতের ২টি কসমস কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীতে বসে স্বয়ংক্রিয় বেতার ইলেক-ট্রনিকস কৌশলে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যাকে স্যার বার্নার্ড লাভেল পর্যন্ত চন্দ্র বিজয়ের পথে এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। এই কাজ আমেরিকা বোধ হয় এখনো করেনি। প্রবীরবাবু হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, সোভিয়েত কোন নতুন একটি কীর্তির পুনরাবৃত্তি করে না এবং প্রায় প্রতিবারই তার কৃতকার্যতা একটি নতুন পদক্ষেপের সামিল। আমার কোন রুশ প্রীতি নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের যখন কোন জাতীয় সীমানা নেই তখন যে দেশের যা প্রাপ্য তা তাকেই দেওয়া উচিত তা সে দেশের চরিত্র যেমনই হোক। সেই জন্যই আমি যা বলতে চেয়েছি ও বলেছি এবং সারা দুনিয়া স্বীকার করেছে যে স্বয়ংচালিত বেতার যন্ত্রকৌশল প্রয়োগের দ্বারা মহাশূন্যে দুটি চালকবিহীন মহাকাশযানকে প্রথমে সংযুক্ত ও পরে বিযুক্ত করার বিশ্ব-রেকর্ড যে সোভিয়েতেরই প্রাপ্য এ কথা মার্কিন বিজ্ঞানী মহলও স্বীকার করেছেন।

যাই হোক আমার প্রথমোক্ত ত্রুটিটি দেখিয়ে দিয়ে প্রবীরবাবু আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন এ কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি। কারণ ব্যাপারটা এত মামুলী এবং সর্বজনবিদিত (আমি সমেত) যে একমাত্র অনবধানতা ও অন্যমনস্কতা ছাড়া অন্য কোন যুক্তি এক্ষেত্রে খাটে না।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

আটত্রিশ
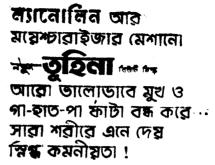
শেষ পর্যন্ত তোমাকে রেস কোর্সে ধরতে হল।

—ধরবার কি কোন দরকার ছিল।

—কোথাও তো আর মুখ দেখাবার উপায় রাখনি, তোমার বিষয় কি না শুনতে হচ্ছে। কত রাত পর্যন্ত হোটেলে, রেস্তোরাঁয় মদ খেয়ে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে মাতলামী করছ, পার্ক স্ট্রীট এখন তোমার ঘরবাড়ি, তার উপর রেসের নেশা ধরেছে, প্রথমটা বিশ্বাস করিনি, তাই নিজের চোখে দেখতে এলাম।

—দেখে খুশী হয়েছো, আর কিছু বলার আছে? আমি এখন যেতে পারি?

—কোথায় থাক আজকাল?

—তা জেনে কি হবে?

—শুনলাম কোন এক অবাঙালীর রক্ষিতা হয়েছ?

—সেইটুকুই বাকি আছে।

—তবে এখন কি, বাজারের বেশ্যা?

—ভাবতেও ঘেন্না হচ্ছে যে-লোক এরকম নোংরা কথা বলে সে আমার বাবা!

—তাতেও আমার সন্দেহ আছে, তোমার মা তো জীবনে কম কেলেংকারি করেনি, জানি না তুমি—

—আঃ চুপ কর।

হঠাৎ শুনলে বোঝা যায় না এ হচ্ছে আধুনিক সমাজের পিতা ও কন্যার কথোপকথন। ভাষা অবশ্য ইংরাজী, রেস কোর্সের সভ্যদের 'ওয়াইট স্ট্যান্ডে'র ওপরের তলার এক কোণে দাঁড়িয়ে স্বরূপ লাহিড়ী আর মনুয়া। মনুয়ার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে, স্বরূপ লাহিড়ীর চোখে মুখে পুঞ্জীভূত ঘৃণা, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না।

মনুয়ার তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, তুমি কি চাও? কেন আমার কাছে এসেছ? মাকে তো সারা জীবন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরেছ, এখন আমার সর্বনাশ না করলে বুঝি তোমার শান্তি হচ্ছে না।

স্বরূপ লাহিড়ীর স্বরে হায়নার আর্তনাদ, তোমার এসব বদনামী আমি সহ্য করব না। এখুনি আমার সঙ্গে বাড়ি চল, তারপর আমি বোঝাপড়া করব।

মনুয়ার কঠিন উত্তর, আমি যাব না।

—এত বড় স্পর্ধা? বেশ আমিও তোমাকে দেখে নেব।

—যা ইচ্ছে তাই কর, তোমাদের নরকে আমি ফিরে যাব না।

আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মনুয়া দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল, মোহনচাঁদ ইতিমধ্যেই তাকে খুঁজছিল, জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে মিস্ লাহিড়ী?

মনুয়া সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

—উনি কে?

মনুয়া স্বরূপ লাহিড়ীর পরিচয় গোপন করে জবাব দিল, আমাদের পরিচিত জন।

—তোমাকে একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে মিস্ লাহিড়ী।

—কই না, চলুন এবার ফেরা যাক।

মোহনচাঁদের সঙ্গে গাড়িতে ওঠবার সময়ও মনুয়া লক্ষ্য করল দূরে থেকে স্বরূপ লাহিড়ী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাদের দেখছে।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসেও মনুয়া নিশ্চিন্ত হতে পারল না, কেন জানা নেই। কোন এক অজানা আশঙ্কায় তার মন বার বার শিউরে উঠল, মনে হল থমথমে আকাশ, হঠাৎ যে কোন সময় ঝড় উঠতে পারে। সে ঝড় কালবৈশাখীর রুদ্র রূপ নেবে কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এ চিন্তার পেছনে এমন একটা অনিশ্চয়তার ঘূর্ণী আছে যাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া কারুর পক্ষেই বোধ হয় সম্ভবপর নয়।

সন্ধ্যেবেলা শেঠিয়া এল টগবগিয়ে আনন্দের ঘোড়া চড়ে, চল ডার্লিং আমরা বাইরে খেতে চাই, বুড়ো মোহনচাঁদ তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে, আজ আমরা সেলিব্রেট করব।

মনুয়া কিন্তু সাড়া দিতে পারল না, বলল, আজ থাক, ভাল লাগছে না।

—কেন?

মনুয়া সংক্ষেপে স্বরূপ লাহিড়ীর কথা বলল। শেঠিয়া কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেয়, দূর দূর, ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করতে আছে, বাবারা চিরকাল ঐরকম বলে।

—তা নয়, আমার মাও তো কখনও সুখী হয়নি, আমিও হয়ত হব না।

—নাঃ, তোমরা বাঙালী মেয়েরা বড় সেন্টিমেন্টাল। তোমার মা, তার মা, কি করে দিন কাটিয়েছে তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? তাদের তো শেঠিয়ার মত বন্ধু ছিল না, মোহনচাঁদের মত মালিকও ছিল না, কি বল?

মনুয়া হাসবার চেষ্টা করল, তবু ভাল লাগছে না, আজ আর বেরব না।

—তাহলে এখানে বসেই ড্রিংক করা যাক। দু' পেগের পর দেখবে তোমার মন ভাল হয়ে গেছে।

—আমি বেশি ড্রিংক করতে পারি না।

—অভ্যেস কর, দেখবে এর চেয়ে ভাল বন্ধু আর কেউ নেই।

ওরা অনেকক্ষণ বসে পান করল। মনুয়ার উচ্ছ্বাস, ফেলে আসা দিনের ছোটখাট নানারকম ঘটনা, বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন, সকলের গল্প। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কান্না ভেজা গলায় আত্মজিজ্ঞাসা, শেঠিয়া, আমি কি কোন অন্যায় করেছি, আমি তো শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।

শেঠিয়া মদত দিয়ে বলে, কুছ পরোয়া নেই, আমি তোমার সঙ্গে আছি, ঢের ঢের স্বরূপ লাহিড়ী দেখেছি, তোমার কোন ভয় নেই।

রাত্রে কিন্তু মনুয়া ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। দুঃস্বপ্ন দেখে বার বার ঘুম ভেঙে গেছে। স্পষ্ট কিছু নয়, তবে দুর্যোগের ছবি। হালভাঙা নৌকোর মত কোথায় যেন সে ভেসে যাচ্ছে, প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে যেন তার প্লেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে। জনাকীর্ণ রাস্তায় তার মোটরের ব্রেক কাজ করছে না। মনুয়া যেন চীৎকার করে কাঁদছে, কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছে না। তার চারদিকে কাচের ঘেরাটোপ, কাচে আঘাত করছে কিন্তু কাচ ভাঙছে না। দুমদুম করে শুধু শব্দ হচ্ছে, কে বলতে পারে এ হয়ত হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ।

অনেক সময় মনের আশংকা যে স্বপ্নে মূর্ত হয়ে ওঠে আর মাঝে মাঝে তা যে ভিত্তিহীন নয় মনুয়া তার প্রমাণ পেল পরদিন সকালে মে ফ্লাওয়ারে গিয়ে। মোহনচাঁদ গম্ভীর হয়ে বসেছিল, মনুয়াকে দেখে আরও গম্ভীর হয়ে বলল, বস মিস্ লাহিড়ী, তোমার সঙ্গে কতগুলো খুব জরুরী কথা আছে।

মনুয়া কথা মত বসল, ভেবেছিল কালকের জ্যাকপটের টিকিট সম্বন্ধে মোহনচাঁদ কোন কথা বলবে। কিন্তু তার বদলে সরাসরি প্রশ্ন করল, কাল রেসকোর্সে তোমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক দেখা করেছিলেন, তিনি তোমার বাবা, এ কথা আমার কাছে গোপন করলে কেন?

মনুয়া অবাক হয়ে মোহনচাঁদের দিকে তাকায়, স্বরূপ লাহিড়ীর প্রসঙ্গ এভাবে উঠবে সে বুঝতে পারেনি।

মোহনচাঁদ স্থির গলায় বলে, উনি কাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি সব শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না মিস্ লাহিড়ী, তুমি আমাকে এতগুলো মিথ্যে কথা বলেছিলে কেন। তোমার বাবা আছেন, মা আছেন—

মনুয়া তেতো গলায় বলে, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

—তাহলে যাকে গার্জেন বলে পরিচয় দিয়েছো তার সঙ্গেই বা তোমার কিসের সম্পর্ক?

মনুয়া চুপ করে যায়।

—তুমি এখন বাড়িতে থাক না? তাহলে আছ কোথায়?

—শেঠিয়ার ফ্ল্যাটে।

—ও গড্, মোহনচাঁদ মাথা চাপড়ায়, আমি তো ভাবতে পারছি না, তোমার মত একটা ছোট্ট মেয়ে ওই লম্পট শেঠিয়াটার সঙ্গে আছ? এ কথা আমাকে বলনি কেন?

—বলার তো কখনও দরকার হয়নি। আপনি মাইনে দেন আমি আপনার হয়ে কাজ করি, কাজ ঠিক করছি কিনা সেইটুকুই আপনি দেখবেন, আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে তো আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

মোহনচাঁদ মাথা নাড়ে, তা হয় না মিস্ লাহিড়ী। তোমার বাবা শাসিয়ে গেছে, যদি না তুমি বাড়ি ফিরে যাও উনি আমাদের নামে কেস করবেন। তুমি নাকি এখনও মাইনর।

মনুয়া প্রতিবাদ করে, না, আমি মেজর।

—সে ফয়সলা তো কোর্টে হবে, কিন্তু মামলা মকদ্দমার মধ্যে পড়ে আমাদের ফার্মের কোন বদনাম হয় এ আমি চাই না।

—তাহলে?

—বাবার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেল।

—তা যদি সম্ভব না হয়?

—আমার কাছে কাজ করতেও তুমি পারবে না। মিস্ লাহিড়ী, আমাকে ভুল বুঝো না, তোমাকে আমি পছন্দ করি, তোমার উন্নতি হয় তাও আমি চাই। কিন্তু আমরা ব্যবসাদার, মিছিমিছি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না। আজ তোমায় ছুটি দিলাম, আশা করব দু'একদিনের মধ্যেই বাবাকে নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে, আবার আগের মত কাজ করবে।

অনাদিপ্রসাদ তখন খুব মন দিয়ে মহাভারত পড়ছিলেন। শান্তিপর্বের কাহিনী। ক'দিন থেকেই বাড়ি থেকে বার হননি, ডায়রীর পাতায় অনেক কিছু লিখে রাখছেন। খাওয়াদাওয়া, কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারী করা, আর বাকি সময়টা গভীর মনোযোগে মহাভারত পাঠ করা।

রমলা বৌদি এসে জানাল, তোমাকে টেলিফোনে ডাকছে।

অনাদিপ্রসাদের সহজ উত্তর, নিশ্চয় কোন প্রকাশক, বলে দাও আমি বাড়ি নেই।

—একটি মেয়ে।

—কি নাম?

—তা বলছে না, তার বিশেষ দরকার তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাদিপ্রসাদ উঠে গিয়ে

টেলিফোন ধরলেন। অন্যদিকে কান্নাভেজা গলা, আমি মনুয়া কথা বলছি, খুব বিপদ হয়েছে, শিগ্‌গীরি একবার আসুন।

—আমি ব্যস্ত আছি।

—তাহলেও একবার আসুন, বড় দরকার। টেলিফোনে সব কথা বলতে পারছি না। আজ আমার পাশে কেউ নেই, কিছু নেই, প্লীজ্‌ আসুন।

শেষ পর্যন্ত অনাদিপ্রসাদকে বলতে হয়, আচ্ছা যাব।

টেলিফোনে মনুয়ার গলা শুনেই অনাদিপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে-কোন কারণেই হোক মেয়েটা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কি এমন ঘটতে পারে? যে মেয়ে বাড়ির গণ্ডী কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর, তার জীবনে কি এমন বিপদ আসতে পারে! অনাদিপ্রসাদ ভেবে কোন কূলকিনারা পেলেন না। মনে মনে ঠিক করলেন সন্ধ্যের সময় গিয়ে মনুয়ার খোঁজ নেবেন।

কথা মত অনাদিপ্রসাদ যখন মনুয়ার ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছলেন তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে। কিন্তু মেয়েটাকে দেখেই মনে হল অত্যন্ত ক্লান্ত, অবসন্ন। অনাদিপ্রসাদকে দেখে দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, যাক্‌, এসেছেন তাহলে। আপনিও তো পুরুষমানুষ, তার ওপর লেখক, নিজের চোখে দেখে যান পুরুষ চালিত এই সমাজে মেয়েদের কি দুরবস্থা।

অনাদিপ্রসাদ সহজ গলায় বলেন, তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ মনুয়া, সব ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও।

—বোঝবার তো কিছু নেই, আমার বাবা এক চরম স্বার্থপর পুরুষমানুষ, ঠিক পাথর যুগের বুনো মানুষদের দলপতির মত নিজের সুখের জন্যে বউ, মেয়ে সকলের সর্বনাশ করে ছাড়ছে। লোকটা চায় না আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকি। সে গিয়ে লাগাল মোহনচাঁদের কাছে। সেও তো পুরুষমানুষ, ফলে আমার চাকরি গেল, এর পরের জীবনটা কি বুঝতে পারছেন?

অনাদিপ্রসাদ চুপ করে থাকেন।

মনুয়া গেলাসে ঢক ঢক করে অনেকখানি হুইস্কি ঢালে, তাতে নামমাত্র সোডা মিশিয়ে পান করে। অনাদিপ্রসাদের সামনে সে আগে কখনও ড্রিঙ্ক করেনি, কিন্তু আজ সে-বিচারবোধ তার নেই। আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলে, এরপরের জীবন এই, মদ খাও, নষ্ট হয়ে যাও, পুরুষমানুষদের খিদে মেটাও। আমি জানি জন্তুগুলো তখন আমার পেছনে লাগবে না, মাথায় তুলে নাচবে।

অনাদিপ্রসাদ বোঝাবার চেষ্টা করেন, এতটা মাথা গরম না করে তোমার বাবার

সঙ্গে একদিন কথা বলতে আপত্তি কি? হয়ত ভাল করে বোঝালে—,

মনুয়া চেঁচিয়ে ওঠে, লোকটা বোঝবার মত মানুষ নয়, সে নিজেই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতেও শান্তি পায়নি। যখন দেখল আমি তাকে গ্রাহ্য করছি না তখন থেকে বোধ হয় ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরছে আমাকে কামড়াবার জন্যে।

নেশা ক্রমশঃ মনুয়াকে জড়িয়ে ধরছিল। বড় সোফার ওপর সে নেতিয়ে পড়ে। নিজের মনেই বলে, যার যা মূলধন সে তাই ভাঙিয়ে খায়, যার টাকা আছে সে ব্যবসা করে, যার বিদ্যে আছে সে ছাত্র পড়ায়, যে চিকিৎসক সে রুগী দেখে রোজগার করে, আমাদের কি আছে, শুধু এই দেহটা। তাই নিয়ে কত বিপদ, কত হাঙ্গামা, তবু যখন কিছুই আর আশা করার থাকে না তখন ওই দেহটাকেই মূলধন করতে হয়?

অনাদিপ্রসাদ ধমক দেন, আঃ, কি বা তা বলছ! তোমার আজ মাথার ঠিক নেই।

—কি করব, আমি যে তখন থেকে বসে বসে মদ খাচ্ছি।

—কেন খাচ্ছ?

মনুয়ার চোখ বুজে আসে, কিছু তো বলবার নেই। বাবু যখন মদ খেত আমি বকতাম, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি ও সে-সময় কত দুঃখ পেয়েছে। ওকেও যে দেহটাকেই মূলধন করতে হয়েছিল। আমাকেও তাই করতে হবে।

—তুমি এখন শুয়ে পড়, আমি কাল সকালে তোমার খবর নেব।

—না আপনি যাবেন না, বসুন।

—কি হবে?

—আমার যে খালি কান্না পাচ্ছে। উঃ, কি গরম বলতে বলতে মনুয়া কোচের ওপরেই পাশ ফিরে শোয়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

অনাদিপ্রসাদ ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হন, এমন সময় বাইরের দরজায় কে টোকা মারে। মনুয়ার দিকে তিনি তাকালেন, সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অগত্যা নিজে গিয়ে দরজা খুলে দেন, দেখলেন নিখুঁত স্যুট-পরা একজন ভদ্রলোক, বোয়ারীভরা গলায় জিজ্ঞেস করল, মনুয়া আছে?

—আছে।

—আমি দেখা করব।

ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, আপনার নাম?

স্বরূপ লাহিড়ী।

অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও ও নামটা তিনি মনুয়ার কাছে এতবার শুনেছেন যে আর তাকে বাধা দেবার দরকার মনে করলেন না। ভদ্রলোক খট খট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল, লক্ষ্য করল মনুয়াকে, দেখল হুইস্কির বোতল আর গেলাস, বুঝল তার মেয়ে মাতাল অবস্থায় পড়ে আছে। ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাটের চারপাশটা দেখে নিল, তারপর এসে অনাদিপ্রসাদের সামনাসামনি দাঁড়াল। বিষ মাখান গলায় প্রশ্ন করল, আপনার নাম?

—অনাদিপ্রসাদ।

—ও, আপনিই বুঝি সেই লেখক, আমার মেয়ের পাতানো গার্জেন? চমৎকার! কতদিন এসব কারবার ধরেছেন?

অনাদিপ্রসাদ বলতে গিয়েছিলেন, আপনি ভুল বুঝেছেন—

—বেশত, সেটা কোর্টে প্রমাণ করবেন।

স্বরূপ লাহিড়ী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে চলে গেল। অনাদিপ্রসাদ বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন, আশ্চর্য মানুষ, একটা কথা বলারও সুযোগ দিল না। মনুয়ার ক্ষতি করতে গিয়ে লোকটা নিজে হাস্যাস্পদ হতেও প্রস্তুত। সাধনবাবুর বিলিতি সংস্করণ। পাশের ঘর থেকে একটা চাদর এনে মনুয়ার গায়ের ওপর বিছিয়ে দিয়ে, বাইরের দরজাটা টেনে লক্ করে অনাদিপ্রসাদ আস্তে আস্তে ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন।

আদালতে মামলার জন্যে আর অপেক্ষা করতে হল না, অচিরে কোন এক সংবাদ সাপ্তাহিকে 'বিখ্যাত লোকের ভীমরতি'—শিরোনামায় অনাদিপ্রসাদের কেচ্ছা কাহিনী ছাপা হয়ে গেল। সত্যি মিথ্যে মেশানো এক আজগুবী গল্পের চাটনী। স্বরূপ লাহিড়ী, মোহনচাঁদ, শেঠিয়া, কারুর আসল নাম প্রকাশ করা না হলেও পরিচিত লোকের বুঝতে বাকি রইল না অনাদিপ্রসাদ আর মনুয়াকে জড়িয়ে একটা নোংরা ইতিবৃত্ত পরিবেশন করা হয়েছে।

অনাদিপ্রসাদ নিজে এ সাপ্তাহিক কখনও পড়তেন না, ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছিলেন 'নর্দমা।' প্রগতির নামে এরা অনবরত মিথ্যে নোংরা সংবাদ কাহিনী প্রচার করে। বহু পত্রিকা থেকে বিতাড়িত সাংবাদিক পরিচালিত এই সাপ্তাহিক নর্দমা। এদের কথা লোকে বিশ্বাস না করলেও পরনিন্দা পরচর্চাপ্রিয় পাঠকরা অনেক সময়ই সরব আলোচনার মেতে ওঠে।

অনাদিপ্রসাদের এই কুৎসাকাহিনীও চাপা রইল না— সমাজের কাকেরা কা কা করে সারা শহরে চেঁচাতে লাগল। পাছে এদের নজর এড়িয়ে যায় তাই অনাদিপ্রসাদ, মনুয়া, স্বরূপ লাহিড়ী সকলের কাছে পত্রিকা অফিস থেকে সরাসরি পোস্টে কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রথমটা অনাদিপ্রসাদ অতটা খেয়াল করেন নি, কিন্তু একে একে টেলিফোন আসতে লাগল, লোক দেখানো শুভানুধ্যায়ীর উদ্বেগ, ছি ছি দেখেছেন, কি যা তা লিখেছে, আপনি কাগজের নামে মানহানির মকদ্দমা করুন, সম্পাদক ব্যাটাকে জেলে দেওয়া উচিত।

আবার কারুর সতর্ক বাণী, খুব সাবধান অনাদিবাবু, মনে হচ্ছে আপনার পেছনে একটা চক্রান্ত চলছে, নিশ্চয় এর মধ্যে অন্য লেখক বা প্রকাশকরা আছে, আপনি মাথা গরম করে ফস করে কিছু করে ফেলবেন না।

আবার সুনীল রায়ের মত লোকের মুরুব্বীয়ানা মন্তব্য, এরকম হবে আমি আগে থেকেই জানতাম। কিছু দিন থেকে মানুষটার সত্যিই ভীমরতি হয়েছে, নয়ত ছেলে বউ ছেড়ে এই বুড়োবয়েসে কেউ ওইটুকু ছুঁড়ির পাল্লায় পড়ে। ওই মেয়েটার কথা কিন্তু আমাকে আগে বলেছিল, ভিক্টোরিয়ার মাঠে দেখা হয়েছিল ওর জন্ম দিনে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত সরব আলোচনা, সে মানুষটা নির্বিকার। পড়ার ঘরে বসে আপনমনে মহাভারতের পাতা উল্টে যাচ্ছে।

ওদিকে মনুয়া কিন্তু এই মিথ্যা কাহিনীকে সহজভাবে নিতে পারেনি। শেঠিয়ার কাছে বলেছে, এই কটা দিনের মধ্যে আমি কত কি শিখলাম জানো? সত্যি মিথ্যে কেউ যাচিয়ে দেখে না, মিথ্যের ঢাক জোরে পেটাতে পারলে সেই মিথ্যেকেই লোকে সত্যি ভাবে। আর কোন সেন্টিমেন্ট আমার নেই। আত্মীয়তার বন্ধন আগে থেকেই কেটে গেছে, সামাজিক বন্ধনও কেটে যাবে। নোঙর আমার ছিঁড়ে গেছে, এখন যেখানে খুশী ভেসে বেড়াব।

শেঠিয়া সমবেদনা জানায়, ভেসে বেড়াবে কোন দুঃখে।

—কি করব? আমার বাড়ি নেই, চাকরি নেই—

—বাড়ি না থাকলেও ফ্ল্যাট তো আছে, এই তো তোমার ফ্ল্যাট, আর চাকরি, খুড়ো মোহনচাঁদের পি এ থাকার দরকার কি, তুমি আমার হয়ে কাজ কর, সমান মাইনে পাবে।

—তারপর? আমার বাবা যখন তোমাকে কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে?

—অত ভয় পেলে চলে না মনুয়া, এর আগেও অনেকবার আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি, বলেই হা হা করে শেঠিয়া হাসে, আমার দিক থেকে ভাবনার কিছু নেই, তুমি ভয় না পেলেই হল।

মনুয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আজ আমিও নির্ভয় শেঠিয়া, মিথ্যে লজ্জার বড়াই আর করব না। চাকরি করতে বল চাকরি করব, রক্ষিতা হয়ে থাকতে বল তাই থাকব কি আসে যায় তাতে! শুধু আমার জন্যে মিছিমিছি অনাদিপ্রসাদের নামটা জড়িয়ে পড়ল, সেইটে ভাবতেই যা খারাপ লাগছে।

এই কুৎসা কাহিনী একজনকে আরও উন্মত্ত করে তুলল সে স্বরূপ লাহিড়ী। কাগজওয়ালাদের অফিসেও সে ধাওয়া করেছিল, শাসিয়ে এসেছিল তাদের নামে কেস করবে বলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় নি। অনেকে ভয় দেখাল এসব করলে কাগজওয়ালারা আরও নোংরা কথা লিখবে, স্বরূপ লাহিড়ীর আরও মানহানি হবে।

অগত্যা সে আপোসের চেষ্টা করল, সাংবাদিকদের টাকা খাওয়াল যাতে আর না কাদা ঘাঁটাঘাঁটি হয়, মনুয়ার কাছে স্ত্রীকে পাঠাল যদি মেয়ে এই দুঃসময় বাড়িতে ফিরে আসে।

মা গিয়ে মেয়ের সামনে দাঁড়াল কিন্তু কথা বলতে পারল না, মনুয়ার চোখে মুখে উপেক্ষার হাসি। জিজ্ঞেস করল, কেমন আছি তাই নিজের চোখে দেখতে এসেছ?

—তোমার বাবা পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যাবার জন্যে।

মনুয়া মাথা নাড়ে, তার দরকার হবে না। বাবাকে বলো, তিনি যা চেয়েছিলেন আমি তাই হয়েছি, একজনের রক্ষিতা। যদি আরও টানাটানি করেন পুরোপুরি বেশ্যা হয়ে যাব, তখন আর কেউ আমার হদিশ পাবে না। মনুয়ার মা মাথা নীচু করে ফিরে আসে।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে মনুয়ার সঙ্গে অনাদিপ্রসাদেরও একদিন আলোচনা হয়েছিল। মনুয়া অনুতাপ করে, আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, কেন মিছিমিছি এর মধ্যে টেনে আনলাম।

অনাদিপ্রসাদের সহজ উত্তর, কিন্তু এসব তো মিথ্যে।

—লোকে কি তা বিশ্বাস করবে?

—লোকে তো অনেক কিছুই বিশ্বাস করে না, তাতে কি যায় আসে। যা সত্য তা চিরকালই সত্য। মিথ্যা কোনদিনই তার জায়গা দখল করতে পারবে না, যদি কোথাও গলদ থাকত তাহলে হয়ত ভয়ের কারণ ছিল।

মনুয়া জিজ্ঞেস করল, আপনাদের সীতার জীবনেও তো কোন গলদ ছিল না, তবে তাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হল কেন?

অনাদিপ্রসাদ উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। এই তাঁর মনে প্রথম সংশয় জাগল, উনি যেভাবে মিথ্যেকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, অন্যরা কি সেভাবে দেয় নি, দেয় নি তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন। দেয়নি তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা, দেয়নি বাড়ির ঝি-চাকর, পাড়াপড়শী। ক'দিন থেকে সন্দেহ হচ্ছিল ফিসফিস করে কারা যেন কথা বলে। কারা কথা বলে, কি বলতে চায় তারা, দেয়ালও কি কান পেতে শোনে? অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছগুলো ড্যাব ড্যাবে চোখে অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকায়, সে চোখেও কি কৌতূহল? এখন মনে হচ্ছে রাস্তা দিয়ে যখন উনি হাঁটেন অনেকেই যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়ত নিজেদের মধ্যে মুখরোচক আলোচনা করে।

মনুয়ার ফ্ল্যাট থেকে বাড়িতে টেলিফোন করতে গিয়ে তিনি আরও বিপদে পড়লেন, 'ক্রশ কানেকসানে' কারা কথা বলছে।

পুরুষ কণ্ঠ, বাড়ির দলিল, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, ইন্সিওরেন্সের পলিসি সব গুছিয়ে রাখ, আমি নিজে একবার দেখে নিতে চাই, এসব বড় বিশ্রী ব্যাপার। মেয়েরা ফাঁদে ফেলে সব কিছু বাগিয়ে নেয়, তা হতে দিলে চলবে না।

এ কণ্ঠস্বর অনাদিপ্রসাদের অতিপরিচিত—তাঁর শ্যালক, ব্যারিস্টার পরেশচন্দ্র, বোনকে বৈষয়িক উপদেশ দিচ্ছে।

বিহ্বল অনাদিপ্রসাদ রিসিভার রেখে দিলেন।

(ক্রমশ)

শয্যাশায়িনী অর্ধাঙ্গিনী বউ যে-আইন খাটাতে পারে না স্বামীর উপর, সেখানে সফল হবে পুলিশ! প্রতি মাতালের সঙ্গে শোবে একটা করে পুলিশ! আর পুলিশ মাত্রই যে বাপের সুপুত্তুর— মদ্য স্পর্শ করেন না—এ তথ্যটাই বা আপনি পেলেন কোথায়? তখন নরক হবে গুলজার। কথায় বলে 'একে মিন্‌ মিন্‌, দুয়ে পাঠ'। এ স্থলে 'একে মিন্‌ মিন্‌, দুয়ে পান'। গুণীজন মাত্রই জানেন, বহু বহু মদ্যপায়ী—এস্তেক পাঁড় মাতাল—কস্মিনকালেও একা বসে বসে গেলে না।

*

সম্প্রতি গোয়াতে মদ্য বর্জন নিয়ে জোর হট্টগোল হয়ে গেল।

কিন্তু বিশেষ করে গোয়াতেই কেন?

একদা ভারতের এই ভূখণ্ডে যেরকম উত্তম উত্তম মদ্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যেত সে রকম জায়গা কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্ত্যে কুত্রাপি ছিল না। এখনো যে যায় না, সে-কথা বলছিনে—তবে মাদ্রাজ ভূমি এখন তার সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। আর রাজপুতানার তো কথাই নেই।

কিন্তু এহ বাহ্য।

মদ্য নিবারণ সম্বন্ধে হাজার হাজার রিপরট এবং গ্রন্থ আছে। তার বিস্তর মাল মনযোগ সহকারে অধম অধ্যয়ন করেছে—কারণ, কি প্রকারে দেশের লোকের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ধর্ষণ না করে মদ্যপান বন্ধ করা যায় কিংবা তারা সীমিত পরিমাণে খায়, সে-বিষয়ে আমার দিলচসপী অসীমিত। যেমন মনে করুন, মার্কিন নীতিবাগীশগণ প্রায় এক যুগ ধরে নিরঙ্কুশ মদ্য-পান-নিবারণ করার চেষ্টা দিয়ে হার

ভিজে-শুকনো-স্যাৎসেঁতে

নিঝঝুম নীরব রাত্রি। ফিস ফিস করে অপরূপ সুন্দরী বউ বললে, 'ওগো, শুনছো। ড্রইংরুমে কিসের যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি দরজা খোলার শব্দ পষ্ট শুনতে পেলুম...ওমা, কি হবে, মা... চোর, নিশ্চয়ই চোর।'

ঘুম-জড়ানো গলায় হরিপদ বললে, 'কী যে বলছো? স্বপ্ন দেখছো।'

'আমি যে পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ওগো ওঠো, লক্ষ্মীটি ওঠো। তোমার কি ঘুম ভাঙে না?—মাগো, ঐ তো কে একটা লোক ...তার টর্চের আলো দেখলুম যে।... ওগো—'

লম্ফ দিয়ে উঠলো হরিপদ। ইস্পাতের মত শক্ত মুঠোতে পাকড়ে ধরলো চোরের গলা। দাঁত কিড়মিড় খেয়ে হিসহিসিয়ে বললে, 'মস্করা পেয়েছ বাছাধন!' বউকে বললে, 'একরত্তি ভয় করো না, লক্ষ্মীটি। ঐ ডানদিকের দেরাজে রয়েছে পিস্তলটা... সব ঠিক আছে...তুমি পিস্তলটা ওর পানে বাগিয়ে ধরো—আমি ততক্ষণে জামা-কাপড় পরে নিই।'

বেচারা চোর। পিস্তলের চোঙার দিকে তাকিয়ে সে ভয়ে কাঁপছে। পালাবার সাধ্য কোথায়? দু' মিনিটের ভিতর হরিপদ জামাকাপড় পরে ফিট।

খাবসুরৎ বউ বললে, 'হয়েছে...এবারে একে নিয়ে যাও তো থানায়...ভালো করে যেন হাজতে তালা মেরে বন্ধ করা হয়... তালা খোলায় ইনি ওস্তাদ!' সুন্দরীর কোকিল-কণ্ঠ ভর্ৎসনামাখা।

হরিপদ চোরের শারটের কলার চেপে ধরে তাকে নিয়ে রাস্তায় নামলো। বীরাঙ্গনা দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুললো, হুড়কো লাগালো।

কিন্তু কী আশ্চর্য। একেবারে অবিশ্বাস্য। তিন পা যেতে না যেতেই এ যে দুই বন্ধু যাচ্ছেন' একে অন্যের গলা জড়িয়ে। 'ট্যাকসি ট্যাকসি!' 'শাবাশ'।

নাইট ক্লাবে ঢুকলেন দুই ইয়ার।

বেয়ারা! দুটো তিন ডবল হুইস্কি।

গলা ভিজিয়ে হরিপদ গদগদ কণ্ঠে বললে, 'ভাই, আজ যা উপকারটা করলি—তোকে দু' হাতে জড়িয়ে চুমো খেতে ইচ্ছে করছে। ওঃ! সমস্ত রাত প্রাণ ভরে খাবো, আর খাবো। কী বললি? বন্ধ হয়ে যাবে ক্লাব! ছোঃ! আমাদের পুরনো আড্ডা—যেখানে রাতভর চলে। ওঃ! তুই বুঝতে পারছিস নারে ছ' মাসের বিয়ের গোলামীর পরে এই প্রথম স্বাধীন মুহূর্ত —আকণ্ঠ পান করার স্বাধীনতা—রাত ভর।'

তবেই দেখুন, মদ্যপান করার জন্য মানুষ কতই না ফন্দি-ফিকির সন্ধি-সড়ক করতে পারে। তার উপর আরেকটি কথা।

মেনে বলেন, "আমরা আইন বেঁধে, ভয় দেখিয়ে মদ্যপান বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলুম বলেই আমাদের পরাজয় হল।" শুধু তাই নয়, যখন দেশবাসী দেখে, খেদোমেদো পর্যন্ত নির্ভয়ে মদ্য নিবারণ আইনকে হরহামেশা, হট্টবিলাসিনীগণসহ, মন্তহট্টে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করছে তখন সরকারের অন্যান্য চরাচরিত ন্যায়ধর্মসম্মত আইন-কানুনের প্রতিও জনগণের শ্রদ্ধা ভক্তি কমতে থাকে। সেই যে এক মহাশয়া একাদশী থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মুসলমান হয়ে পেয়ে গেলেন ত্রিশ দিনের রোজা!

এ আর কি শোনালো মার্কিন মহারাজরা?

মহাভারতের মৌসল পর্বে আছে, বলদেবাদি কুলপতিগণের আদেশে 'ঘোষণা হইল যে, আজ অবধি নগরমধ্যে কোনো ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা হইবে।' অর্থাৎ বলদেবাদি বিচক্ষণ কুলপতিগণও আইনের উপর নির্ভর করেছিলেন।

ফলং? যদুবংশ ধ্বংস হল।

অতএব অন্য পন্থার অনুসন্ধান করতে হবে।

পূর্বেই বলেছি, এ বিষয়ে অগাধ পুস্তক সমুদ্রে—আমার মত নগণ্য লেখকও ডুলুম ডুলুম লিখতে পারে। উপস্থিত শুধু একটি প্রশ্ন তুলি।

'নিখিল ভারত মাদক বর্জন পরিষদ'-এর সভানেত্রী ডাঃ শ্রীযুক্তা সুশীলা নায়ার পদত্যাগ করেছেন। আশা করি যিনি এঁর স্থলে আসবেন তাঁর মদ্য জিনিসটার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। অর্থাৎ তিনি বোঝেন, 'পচাই' (ফারমেনটেড জিনিস) কি, এবং 'চোলাই' (ডেসটিলড জিনিস) কি? বিয়ার, তাড়ি, ভাতের পচাই, হুইস্কি, ব্র্যানডি, রাম্, জিন, ধান্যেশ্বরী তথা ওষুধের ছদ্মবেশ ধরে যে সব টনিক বাজারে বিক্রয় হয়—কবিরাজী এলোপ্যাথি দুই-ই—এ-সব বস্তুতে কি থাকে, সে সম্বন্ধে তাঁর কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। তিনি নিজে খেয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন কি না সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু পরিষদের সদস্যদের ভিতর কিছু লোকের নিতান্ত প্রয়োজন যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মদ খেয়েছেন এবং এদের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

আমি করজোড় হয়ে সবিনয় নিবেদন করছি, আমি পরিষদের সাফল্য কামনা করি বলেই এই প্রস্তাব করছি।

একটি সামান্য উদাহরণ দি। আমার বক্তব্য খোলাসা হবে।

১৮৩০/৪০-এ লনডনে যখন মদ্যপান তার চূড়ান্তে পৌঁছে বেহদ্দবেলেল্লাপানায় পরিণত হয়েছে তখন লনডনের একাধিক মদ্যনিবারণী সভা প্রস্তাব করলে, বিয়ার নামক মদ্য সস্তা করে দাও। যাঁরা মদ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাঁরা আঁৎকে উঠে শুধোবেন, 'সে কি'? বলছি, প্রণিধান করুন।

লনডনের মদ্য নিবারণী সভার সদস্যগণ যৌবনে পান করেছেন, এবং তখনো নিশ্চয়ই অনেক মাত্রা পান করতেন; তাঁরা জানতেন, কড়া আইন করে রাতারাতি মদ্যপান বন্ধ করা অসম্ভব। তাঁরা আরো জানতেন, লনডনের অধিকাংশ মাতালরা পান করে কড়া দুষ্ট 'জিন' নামক মদ। এ খেলে চট করে নেশা চড়চড় করে মগজে চড়ে এবং এই পাজির পা-ঝাড়া নেশা সহজে কাটতে চায় না। এ মদ্যে অন্তত শতকরা ৩৮ ভাগ এলকহল থাকে, পক্ষান্তরে বিয়ারে থাকে শতকরা ৩ থেকে সাড়ে তিন ভাগ। সর্বশেষে তাঁরা আরো জানতেন, বেশীর ভাগ মাতালেরই অর্থাভাব লেগে থাকে। তারা চায় সস্তায় নেশা করতে। ক্রমে ক্রমে 'জিন'-এর বদলে অধিকাংশ লোকই বিয়ার খেতে লাগলো, এবং লনডনের রাস্তায় পাঁড় মাতালের ঢলাঢলি অনেক, অনেকখানি কমে গেল। বলাবাহুল্য নিবারণী সদস্যগণ এখানেই থামেন নি। তাঁরা ধীরে ধীরে একদিকে যেমন নানারকম প্রচারকর্ম, মদহীন কাফে রেস্তরাঁ ক্লাব খুললেন অন্যদিকে নানা প্রকারের মদ্য নিবারণী আইন পাশ করলেন—ধীরে ধীরে, সামলে-সুমলে। এসবের ইতিহাস নিশ্চয়ই আমাদের পরিষদের সদস্যরা জানেন, কিন্তু বিলেতকে অনুকরণ করলেই তো চলবে না। এদেশে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। তাই বার বার বলছি এ-সব মদ্যাদির সঙ্গে কিছুটা পরিচয় রাখেন এমন কিছু লোককে পরিষদের সদস্য করা উচিত। অজ্ঞ লোকই বিয়ার, জিন, রাম্, তাড়ি এক গোয়ালে ঢোকায়।

অবশ্য অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, বিয়ার সস্তা করে দিলে সে বস্তুর নূতন খদ্দের এসে জুটবে।

এবং সেখানে দেখতে হবে, নূতন কনভার্ট যেন কোনো অবস্থাতেই না হয়। একদা আমার আপন প্রদেশ আসামে প্রচুর ভদ্র-ইতর জন আপিঙ খেত। আজ তার সংখ্যা নগণ্য। সেটা সম্ভব হয়েছে, যে-সব এডিকটদের আপিঙ-কারড দেওয়া হল তার অতিরিক্ত নবীনদের আর কারড দেওয়া হত না।

*

আরেকটি নজীর দি। হিটলার জরমানির সর্বেশ্বর হওয়ার পর তাঁর কাছে সমাজসংস্কারকরা নিবেদন করলেন যে রাজধানী বারলিনে বেশ্যাবৃত্তি চরমে পৌঁচেছে; এর একটা ব্যবস্থা করা চাই। হিটলার হুকুম দিলেন ডঃ গ্যোবেলসকে, কুপ্রথাটাকে আয়ত্তে আনতে। ফ্রানস, ইংলনড, এমন কি বহু জরমনও এই রসময় খবরটি শুনে মুচকি মুচকি হেসেছিল। কে না জানতো, গ্যোবল্স্ ছিলেন—একদা দুশ্চরিত্র (পরবর্তীকালে তিনি সামলেসুমলে নিজকে আপন অন্তরঙ্গ সমাজেই সীমাবদ্ধ রাখতেন)? ঠিক ঐ কারণেই তিনি গ্যোবেলসকে বেছে নিয়েছিলেন। পরিপূর্ণ ওকীব-হাল গ্যোবেলস তাঁর প্রভুকে নিরাশ করেননি।

ঈশ্বর রক্ষতু। তুলনাটাকে নিয়ে বেশী টানাটানি করবেন না। তুলনামাত্রই তিন ঠ্যাঙে দাঁড়ায়। টায় টায় মেলে না। আমার শুধু বক্তব্য, সর্ব কর্মেই কিছু বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। এ স্থলেও দুটি চারটির প্রয়োজন। এবং তাঁরা যেন কংগ্রেসের মেমবার না হন। তাহলে তাঁরা আপন অভিজ্ঞতা-প্রসূত মতামত নির্ভয়ে দিতে পারবেন।

পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন

পঞ্চম ফিনান্স কমিশন যে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পেশ করেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় দাক্ষিণ্যের ছিটেফোঁটা থাকলেও উল্লসিত হবার কিছু নেই। পঞ্চম ফিনান্স কমিশন প্রধানত দুইটি করের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যে দুইটি করের ভাগাভাগি সম্পর্কে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, উত্তরাধিকার কর এবং অপরটি হচ্ছে রেলযাত্রীর ভাড়ার উপর কর। রেল যাত্রীর ভাড়ার উপর কর আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে; এই করের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে অনুদান মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। রেল যাত্রী ভাড়ার উপর করের বিকল্প হিসাবে যে অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, শতাংশের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ৬.৪ ভাগ থেকে কমে গিয়ে ৫.৫১ ভাগ হয়েছে। অথচ গত ছয় মাসে একমাত্র পূর্ব রেলওয়েই উদ্বৃত্ত দেখাতে পেরেছে। রেলযাত্রীদের ভাড়া বাবদও পূর্ব রেলওয়ের আয় অন্যান্য রেলওয়ের আয় অপেক্ষা বেশী। পঞ্চম অর্থ কমিশনের কৃপায় পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে তার ন্যায়সঙ্গত অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে একথা ঠিক, পশ্চিমবঙ্গের অনুপাতে অন্যান্য রাজ্যে রেলওয়ের বিস্তার হয়েছে বেশি।

অপর দিকে উত্তরাধিকার করের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এখন যে ৮.০৯ শতাংশ পাচ্ছে সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য বেড়ে ৮.১১ শতাংশ হবে; এ বাড়তি অবশ্য খুবই সামান্য।

শুধু একটি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অর্থ কমিশন কিছু পরিমাণে সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কমিশন রাজ্যগুলিকে আরও ৯০.৯৩ কোটি টাকা দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৭টি রাজ্যকে ৬৭২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার সুপারিশ করেছেন; ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল ৫৮১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত ৯০ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৫ কোটি টাকা কর ও শুল্কের অংশ হিসাবে এবং ৩৬ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার অনুদান জুটেছে। আসছে বছর কেন্দ্রীয় করের পশ্চিমবঙ্গের অংশ হবে ৫১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা; উত্তরপ্রদেশের অংশ হবে ৮৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। এর পর হচ্ছে মহারাষ্ট্রের স্থান। মহারাষ্ট্রের অংশ হল ৫৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ বিগত পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে একটি পয়সাও পায়নি। সমস্যাজর্জরিত এই রাজ্যের প্রতি অবিচারের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন চতুর্থ ফিনান্স কমিশন। পঞ্চম ফিনান্স কমিশন এক বছরের জন্য যে মুষ্টিভিক্ষা দিয়েছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সমাধান কিছুই হবে না। শুধু উত্তরবঙ্গের বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের লোকদের পুনর্বাসনের জন্যই ৫০ কোটি টাকার দরকার; ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই খাতে ৩৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা চেয়েছেন। কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য আসছে পাঁচ বছরের জন্য ৮০ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রতি বছর ১৬ কোটি টাকার প্রয়োজন। অথচ কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামোর দুর্বলতাও বিবেচনা করা যেতে পারে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল; তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে খরচ হয়েছে ৯ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাধীনতার পর একুশ বছর ধরে কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য যতটা সচেষ্ট হওয়া দরকার ছিল, ততটা হওয়া সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব তো সুবিদিত। ৬৬৪ কোটি টাকার একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের জন্য তৈরী করা হচ্ছে। তার মধ্যে যদি বছরে অন্তত ৮০ কোটি থেকে ৯০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলির কিছু সমাধান হতে পারে। দেশ-বিভাগের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। যে দুইটি সামগ্রী রপ্তানি করে (চা ও পাট) ভারত সরকার একটি মোটা পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকেন, তার একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে। অথচ বিগত পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় অনুদানের কোনও অংশ পশ্চিমবঙ্গ পায়নি। আয়করের রাজস্ব সবচেয়ে বেশি আদায় হয় পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু জনসংখ্যার ভিত্তিতে আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের বণ্টনযোগ্য অংশের শতকরা ৮০ ভাগ বণ্টিত হয় বলে পশ্চিমবঙ্গের অংশে খুব কম টাকাই আসে। কেন্দ্রীয় অনুদানের আরও বেশি অংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া উচিত ছিল। কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য যে আর্থিক বরাদ্দ রাজ্যের চতুর্থ পরিকল্পনায় করা হয়েছে, সেই টাকার পুরো অংশটাই কেন্দ্রকে দিতে হবে। এই দাবি শুধু রাজ্য সরকারেরই নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের দাবি।

পঞ্চম ফিনান্স কমিশন কর বণ্টন নীতির কোন আমূল পরিবর্তন সুপারিশ করেন নি। তবে আমাদের মনে হয়, মোট কর-রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় আয় করের ক্ষেত্রে মোট রাজস্বের শতকরা ৮০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা উচিত, এবং সেক্ষেত্রে শতকরা ৭০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ৩০ ভাগ কর আদায়ের ভিত্তিতে রাজস্ব বণ্টন করা উচিত।

ম্যাকনামারার আশার বাণী

বিদেশের কাছ থেকে আশার বাণী শুনতে এবং দেশবাসীকে আশার বাণী শোনাতে আমাদের নেতৃবৃন্দ খুবই অভ্যস্ত। বিশ্বব্যাংকের সভাপতি মিঃ রবার্ট ম্যাকনামারা আশা প্রকাশ করেছেন যে, ভারত নিজস্ব পথে তার সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনা তৈরী করছে বিশ্বব্যাংক তাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে তার পথ ও পন্থা তিনি বের করতে পারবেন। তিনি মনে করেন, ভারতকে উন্নত করতে না পারলে পৃথিবীর অন্য কোথাও উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সফল হবে না। তাই ভারতকে তার নিজস্ব পথে উন্নয়ন সমস্যাগুলির সমাধানে সহায়তা করতে বিশ্ব ব্যাংক সর্বদাই উৎসাহী। মিঃ ম্যাকনামারা বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি পাঁচ বছর আগের তুলনায় চমকপ্রদ এবং বেশ দ্রুত। বহু দুর্দৈব সত্ত্বেও ভারতের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হয়েছে। মিঃ ম্যাকনামারা সাত দিনের সফরে এসে ভারতের অগ্রগতি কতটা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অনুধাবন করতে পেরেছেন বলা কঠিন। তবে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে ভারত সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রেই স্বয়ম্ভরতা অর্জন করবে এই আশার বাণী আমরা গত পনেরো বছর ধরে শুনে এসেছি। কিন্তু গত তিন বছরের মধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রস্তুত করাই সম্ভব হল না। কারণ, বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর স্বীকৃতি হচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে এবং মুদ্রামূল্য হ্রাস সফল হয়নি। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর স্বীকৃতি হচ্ছে, বেকার সমস্যা ও শিল্প-বিরোধের তীব্রতা বেড়েছে, মনোপলি কমিশনের রায় হচ্ছে, দেশে আয় ও ধনের বৈষম্য বেড়েই যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের অনুভূতি হচ্ছে, "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়"!

সুব্রত গুপ্ত

বাস, তুমি নারী?

জর্মান জাত বড়ই যুক্তিবাদী, তাদের ভাষাও তাই অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। ইংরেজরা মনুষ্য জাত ছাড়া আর কারুরই লিঙ্গভেদ স্বীকার করেন না, উদ্যান বাড়ি কিংবা উদ্যানের কুকুরী সবাই তাদের কাছে পদার্থমাত্র। কিন্তু জর্মানরা শুধু প্রাণী-জাতিতেই লিঙ্গভেদে বিশেষ করেন না, শিশি-বোতল, কাঁটা-চামচে, কাগজ পেন্সিল, কালি-দোয়াত, সবই তাদের চোখে হয় পুরুষ নয় নারী। কিন্তু বস্তুরাজ্যে কে নারী কে পুরুষ কীভাবে ঠিক করা হয় প্রশ্ন ওঠে, এই প্রশ্ন আমি এক জর্মান ভাষা-শিক্ষককে জিজ্ঞেস করেছিলাম একবার, তিনি আমাকে যে উত্তর দেন তা ভারী যুক্তিসংগত ও চমৎকার। জর্মান ভাষায় তা-ই স্ত্রীলিঙ্গ যার ভেতর প্রবেশ করা যায়—যেমন কালির দোয়াতে কলম প্রবেশ করে, অতএব দোয়াত স্ত্রীলিঙ্গ, কলম পুংলিঙ্গ; এই যুক্তি অনুসারেই ওই ভাষায় ফুলপ্যাণ্ট স্ত্রীলিঙ্গ, আমার ঠ্যাঙ তার ভেতর ঢুকে যায় বলে—ফুলদানিও তাই, বোতলও তাই।

আমাদের বাংলা ভাষাও একই দোষে দুষ্ট ইংরেজদের মত, আমরাও মনুষ্য ছাড়া আর কারুর লিঙ্গ ভেদ স্বীকার করি না। কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দপ্তর এই এক চোখোমি থেকে বাংলাকে মুক্ত করেছেন। সম্প্রতি আপনার আমার সবারই নিশ্চয় চোখে পড়েছে বাসের নামকরণ, কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি, কী কারণে সব বাসই স্ত্রী পর্যায়ভুক্ত? গত কয়েক দিন এই নিয়ে আমি ভাবছিলুম, আজ সকালে উঠে খেয়াল হয়েছে। বাসের ভেতরে পরিসর, তার মধ্যে মানুষ অবস্থান করে, জার্মান দেশে এই যুক্তি অনুসারেই স্ত্রী পুরুষ ভেদ হয়, অতএব বাস অবশ্যই স্ত্রীলিঙ্গ—পরিবহণ দপ্তর অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবেই এই নামকরণ করেছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা অথবা প্রতিবাদ অবান্তর, আমাদের বরঞ্চ সুনাগরিক হিসেবে এই যুক্তিনির্ভর অবশ্যকৃত্য প্রচেষ্টাকে সুফলমণ্ডিত করবার জন্য পরিবহণ বিভাগকে নাম পাঠানো দরকার। বাসেদের নামহীন অবস্থায় যাত্রীদের কত অসুবিধেতেই না দিন কেটেছে! আমরা কখনো বলতে পারিনি কি বাসে এলাম, কখনো জানতুম না বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, কার জন্য এই তিতিক্ষা—শুধু দাঁড়িয়ে থেকেছি, বোবার মত নামহীনার জন্য দাঁড়িয়ে থেকেছি, কিন্তু এত অপেক্ষার পরেও তার যখন আগমন তখন প্রবেশদ্বারে আমার মত একশ'জন অপেক্ষমাণ, ঝুলন্ত।—আমাদের পরিবহণ দপ্তর অবশেষে এই ছলনাময়ীদের নামকরণ করলেন; এতদিন নম্বর দিয়ে তাদের রাখা হয়েছিল, অবশেষে সুন্দর নাম দিয়ে তাদের ভূষিত করা হল। যে শহরে সরোবরের নাম রবীন্দ্র সরোবর, বাগানের নাম রবীন্দ্র-কানন, ফুটবল খেলবার জায়গার নাম রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, হাওড়া পুলের নাম রবীন্দ্র সেতু, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম রবীন্দ্রভারতী, বেশ্যাপল্লী-পূর্ণ রাস্তার নামও রবীন্দ্র সরণী, সে শহরের বাসের মধুচ্ছন্দা বা মিতজাতী না হলে মানায় নাকি? —শহরের সাধারণ লোক রাতদিন নালিশ করে এই বলে যে, সরকার এই শহরের কথা একদম ভাবেন না, কিছুই করেন না কলকাতার জন্য, অথচ শহর নাকি ডুবতে বসেছে, বর্ষার জল জমে থাকে, নর্দমা আটকে কণ্ঠরোধ হয় পথ, জঞ্জাল পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেই, নেই জন-সাধারণের জন্য শৌচাগার, লোকে অফিস যেতে পারে না, খাবার জল পাওয়া যায় না, যথেষ্ট টিউবওয়েল নেই—রাতদিন নালিশ আর নালিশ। কিন্তু এসব তো বড় স্থূল চাহিদা, সূক্ষ্ম দিকটা তো আগে দেখতে হবে, রবীন্দ্র ঠাকুরের দেশের লোক আমরা, আমাদের নগরের সুষমার কথা কি আগে ভাবা উচিত নয়?—আমাদের সরকার শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, চারুকলা এইসবের দিকে খুবই জোর দিচ্ছেন—সেগুলোই তো সর্বাপেক্ষা আগে প্রয়োজন! আসল কর্তব্য এ শহর বিষয়ে এই মুহূর্তে আরো কিছু স্ট্যাচু নির্মাণ, আরো বেশ কিছু স্তম্ভ নির্মাণ, আরো কিছু রাস্তার নাম বদল, ট্রামেদের নামকরণ, বাসেদের নামকরণ, বাংলার বীর সন্তান

অথবা ভারতবর্ষের মুকুটমণিদের শতবর্ষ, অর্ধ শতবর্ষ, গোল্ডেন জুবিলি, সিলভার জুবিলি উদ্‌যাপন করা। আমাদের সরকার সেসব দিকে জোর কদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, কর্পোরেশন বদলে যাচ্ছেন রাস্তার নাম, এ বিষয়ে শাসকবৃন্দের কাছে আমাদের মাথা নীচু করে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

দীঘার বাসের নাম দীঘাচারী, কলকাতায় চলে মিতযাত্রী মধুচ্ছন্দা, দিগঙ্গনা, সহযাত্রী —মাত্র এ পর্যন্ত কয়েকটি বাসেরই নামকরণ হয়েছে, কিন্তু এমন একদিন কলকাতায় হয়তো আসবে যখন সব বাসেরই নাম থাকবে—শহরে অনেক বাস তো, হয়তো তাই একটু সময় লাগতে পারে, তবে সরকার যত শীঘ্র পারেন তার ব্যবস্থা আশা করা যায় অবশ্যই করবেন—অনেক সংস্কৃত বাংলার ছেলেদের পরিবহণ বিভাগে চাকরি হবে নামকরণের জন্য। কলকাতার যতসংখ্যক বাস সব বাসই যদি মহিলা নামে ভূষিত হয় তা হলে কত বান্ধবীর নামের সঙ্গেই না বাসের নাম কমন পড়ে যাবে; আমি মধুচ্ছন্দাতে চড়ে, মধুচ্ছন্দার হাসির কথা ভাবতে ভাবতে, মধুচ্ছন্দার বাড়ি গিয়ে বলব, "আমি মধুচ্ছন্দায় চড়ে, মধুচ্ছন্দার কথা ভাবতে ভাবতে মধুচ্ছন্দার কাছে চলে এসেছি আজ, তুমি কি এখনো গম্ভীর থাকবে?" সে সব কতই না মজার হবে।—কিন্তু লোকে এসব বোঝে না, খালি বলে, রাস্তা নেই, জল নেই, জঞ্জাল সাফ করা হয় না, বাড়ি পাওয়া যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরকারের এই "বোল্ড" প্রচেষ্টাকে আমি বিনীত জানিয়ে পরিশেষে কয়েকটি বাসের নাম রাখতে চাই—আমি অনেক ভেবে আমার প্রিয় বাসেদের এইসব নাম ভেবেছি। গোলপার্ক থেকে একটি ট্রামের মত দুই বগির বাস আছে, সেটা অলস মারাবিনীর মত লেকের পাশ দিয়ে যায়, ভারী সুন্দর লাগে। সেটার নাম সরকার রেখেছেন সহযাত্রী, কিন্তু ও নামটা ভালো নয়, ওটা বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে। আমি বলি কি, ওটার নাম নিতম্বিনী রাখলে কেমন হয়? পেছনের বগি সামনের বগি নিয়ে ওই নামের কিন্তু তাৎপর্যও থাকে। —আমি এক বন্ধুকে আমার এই প্রস্তাব জানালুম, সে বলল, "আমারও একটা প্রস্তাব আছে, রিসার্ভড বাসের নাম দেওয়া হোক "রক্ষিতা।" এই শুনে আরেক বন্ধু বলল, "তা হলে কি সাধারণ বাসসমূহকে বলা হবে বহু বল্লভা?" আমি বললুম, তা বলা যেতে পারে। এই কথোপকথনের সময় এক মিতভাষী বন্ধু জানান, রাষ্ট্রীয় পরিবহণের নামটাও কেন একটি সুন্দর সংস্কৃত নাম দেওয়া হবে না, অনেক দিক থেকেই প্রযোজ্য এই সংস্থাটিকে লোপামুদ্রা বলে ডাকা হোক না।

মৌলিনাথ

টোকিওর চিঠি

একটি নাম, ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা সূর্যের দীপ্তির মত সমগ্র জাপান, সমগ্র এশিয়া, পৃথিবীর সকল চিন্তাশীল এবং সুধীজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র বিশ্ব প্রাচ্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে বিস্ময়ের সংগে জানল সেই মানুষটির নাম, ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা।

যাঁর নাম এমন সূর্যের প্রখর দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছে, তিনি কিন্তু জোৎস্নার মত স্নিগ্ধ, রজনীগন্ধার সুবাসের মত মনোহর। সাহিত্য জগতে আজ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের অন্যতম।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। কাওয়াবাতাই এশিয়ার সাহিত্য জগতের দ্বিতীয় মানুষ যাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হল দ্বিতীয়বার। নতুন করে মনে করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই যে সমগ্র এশিয়ার সাহিত্য-জগতে সর্বপ্রথম এই সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সম্মানকে সামনে রেখে আমাদের নতুন জনের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। এইটুকু লিখতেই আমি গর্ব অনুভব করছি, ব্যক্তিগতভাবে সেদিন ভারতীয় হিসাবে তথা বাংলা ভাষা এবং 'দেশ' পত্রিকার মুখপাত্র হিসাবে আমিই সর্বপ্রথম কাওয়াবাতাকে তাঁর বাড়িতে একগুচ্ছ গোলাপ হাতে সকলের হয়ে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাতে গিয়েছিলাম।

সেদিন কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল "Novelist Kawabata wins Nobel Prize for 1968..."

সেই সূত্রেই বলা হয়েছে...... It is also worthy of note that only one another Asian the great Indian Poet Dr. Rabindranath Tagore, has ever received this top award in Literature...." অতএব এ-যে আমার কর্তব্য তাঁকে আমাদের সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা উজাড় করে দেবার। তাঁর এই সম্মানের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে... "....the essence of the Japanese mind and for contributing to the spiritual bridge spanning between East & West..."

কোন কিছুতেই আমি বেশীক্ষণ ভাবি না। একটা কিছু হঠাৎ করে বসি। এতে ঠকতেও যেমন হয় আবার অদ্ভুত কিছু এসেও পড়ে। টেলিফোন তুলে নিয়ে 'জাপান টাইমস' দৈনিক পত্রের অফিসের নম্বরটা ঘুরিয়ে দিলাম। কি চাই? কাওয়াবাতা-সান-এর বাড়ির ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর। কে—কেন—কি বৃত্তান্ত, সব কিছু জেনে তবে সে আমায় সব কিছু জানাল। চোখ কান বুজে ডায়েল ঘুরিয়ে ফেললাম। কে কথা বলছে। ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর পেলাম লাইনটা। এক ভদ্রমহিলা ধরলেন। কাওয়াবাতার সংগে একটু কথা বলতে চাইলাম। আবার সেই কে—কেন—কি বৃত্তান্ত...? ভদ্রমহিলা জানালেন ও'র কাছে তখন কয়েকজন বাইরের মানুষ এসেছেন, একটু অপেক্ষা করতে। মিনিটখানেক পরেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল এক মিহি সুন্দর গলার স্বর। জাপানী কায়দাতে ধন্যবাদ জানালাম। ও'র সঙ্গে কবে দেখা হতে পারে জানতে চাইলাম। এটুকু বলতে ভুললাম না যে আমি 'বাংলা ভাষা'র এক পত্রিকা থেকে গুটিকয়েক জিজ্ঞাসা নিয়ে ও'র কাছে যেতে চাই। আমায় বলতে হল না, 'বাংলা ভাষা' কবিগুরুর ভাষা। উনি নিজেই বললেন—"ও, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা, বাংলা ভাষা? আচ্ছা আগামী রবিবার দুপুর ঠিক একটার সময় আসবেন। তবে সময় বেশীক্ষণ পাবেন না। কারণ আড়াইটার সময় প্রধানমন্ত্রী সাতো-সান আসছেন।" একঘণ্টা কেন, একটা মুহূর্তের সান্নিধ্যই যে আমার কাছে অনেক। বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জন অবাক হল, আমিও অবাক মানলাম। বিশ্ব-বিনন্দিত মানুষ আমার সংগে দেখা করবেন? মন বলল, কেন? উত্তর পেলাম তোমার মাতৃভাষা যে 'বাংলা'। বাংলা ভাষার কবি যে ও'রই পূর্বসূরী যিনি একদিন সমগ্র এশিয়াকে একই সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন। আমি সেই ভাষারই এক পত্রিকার প্রতিনিধি। আর একবার মাথা নোয়ালাম কবিগুরুর ঋণের কাছে, সে ঋণ আমরা সর্বক্ষণ গর্বের সংগে বহন করে চলেছি।

কাওয়াবাতার সঙ্গে আমরা কয়েকজন

রবিবার এসে গেল। যেতে হবে কামাকুরা। কামাকুরা টোকিও থেকে মাত্র ৩১ মাইল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ট্রেনে করে পৌঁছে দেবে এক শান্ত সমাহিত সুন্দর পরিবেশে। পাহাড় ঘেরা ছোট্ট শহর। নিষুতি রাতে অনেক দূর থেকেও শোনা যায় সমুদ্রের ঢেউ-এর আকুলি-বিকুলি, পাহাড়ের গায়ে ঘা খেয়ে খেয়ে ফিরে যায়। এমন কিন্তু ছিল না আজ থেকে সাত শ' বছর আগে। এমন সেদিন ছিল, যখন এই কামাকুরা কর্মচঞ্চল মানুষে গিজগিজ করত। ১১৯২ খৃঃ এইখানে পত্তন হয়েছিল দুর্ধর্ষ শাসন Minamoto সম্প্রদায়ের। তারপর থেকে কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত মৃত্যুর কালিমা বহন করেছে এই আজকের কামাকুরা। ১৪৫৪ সালের যুদ্ধে যার সর্বনাশের সূত্রপাত হয়, ১৫২৬ সালের অগ্নিকাণ্ডে সমগ্র কামাকুরা একরকম ভস্মীভূত হয়ে যায়। মনে হয় সমস্ত পাপকে জলাঞ্জলি দিয়ে কামাকুরা আজ ফিরে পেয়েছে এক অপার সৌমারূপ, যার বুকে হাজার হাজার মানুষ আজ যন্ত্রের কোলাহলকে একপাশে রেখে একটু শান্তির খোঁজে অবসর সময়ে রচনা করেছে সুখের নীড়। আর আছে বুদ্ধের এক

বিনাশ প্রতিমূর্তি, যা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য এখানে টেনে আনে। ১২৫২ সালে শিল্পী Ono Goroemon নানান ধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত করেন এই বিয়াল্লিশ ফিট উঁচু আর বিরানব্বই টন ওজনের দেবমূর্তি। সেই কোনদিন থেকে সৌম্য-শান্ত কমনীয় এই বুদ্ধমূর্তি জানিয়ে আসছে এক নীরব আশিস-বাণী। তারই কোলে পৃথিবীর মানুষ নূতন করে আবিষ্কার করল আর এক সৌম্য শান্ত আরেক মানুষকে। ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা। কামাকুরা—আর এক নূতন সম্মান, নূতন গর্ব নিয়ে সে আজ গরবিনী।

কাওয়াবাতার বয়স ৬৯, ১৮৯৯ খৃঃ ওসাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। পৃথিবীর আলো মায়ের কোলেই দেখেছিলেন, কিন্তু সেই মাকে ভাল করে চেনবার আগেই তিনি তাঁকে ছেড়ে চলে যান। মাত্র চার বছর বয়সে কাওয়াবাতা মা ও বাবা উভয়কেই হারান। তারপর তাঁর এক অপরিসীম দুঃখময় জীবন। সমস্ত দুঃখ কষ্টকে দু হাতে সরিয়ে তিনি এসে পৌঁছেছেন আজকের সাহিত্য জগতের বিপুল খ্যাতির শিখরে। এর থেকে বুঝতে কোথাও অসুবিধা নেই—কতখানি মনোবল আর আত্মিক শক্তি তাঁর মাঝে লুক্কায়িত।

রবিবার এসে পড়ল। সকাল সকাল স্নান সেরেই বার হয়ে পড়লাম কামাকুরার পথে। সঙ্গে রইলো দুই জাপানী বন্ধু। তারাও সঙ্গ ছাড়ল না। কারণ এটা তাদের কাছেও আশাতীত। কামাকুরায় নেমেই একজন ট্যাক্সি চালককে নাম বললাম। নাম বলতেই সে এক বাড়ির অদূরে নামিয়ে দিল। বড় রাস্তা থেকে একটু ঢুকে একটা মন্দিরের কোল ঘেঁষে স্যাওলা ঢাকা, পুরনো ইতিহাস জড়ানো নিতান্ত সাধারণ একটি জাপানী বাড়ি। বাড়ির চারদিক কাঠের উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাথা নীচু করে ঢুকবার একটা ছোট দরজা। সেটাকে পাশে ঠেলে তবেই ঢুকতে হবে। সারা জাপানে জাপানী কায়দার চকমিলান বাড়ি অনেক দেখেছি। সেইসবের তুলনায় এই বাড়ি এতই সাধারণ যে পুলিস আর ক্যামেরা হাতে মানুষের ভিড় না দেখলে বিশ্বাসই হত না যে এই বাড়ি বিশ্ববিনিন্দিত কোন মানুষের। কিন্তু আমার সে ভুল ভেঙে গেল মানুষটাকে দেখে। মনে হল প্রকৃতি দেবী যেন মানুষটির কথা ভেবেই সমস্ত পরিবেশ সাজিয়েছেন, তাতে এতটুকু প্রাচুর্য এবং আধুনিকতার স্পর্শ মাত্র নেই।

দরজায় টোকা দিতেই এক জাপানী ভদ্রলোক বার হলেন। বাংলায় সমস্ত ভাব। উদ্দেশ্য বললাম। কাগজ দেখে কপাল কুঁচকে বললেন—"এখানে তোমার নাম নেই!" আমি ভারতীয় দূতাবাসের কেউ কিনা জিজ্ঞাসা করায় বললাম, "না"। লোকটির মুখের ভাব—"তাহলে তুমি নিতান্তই নগণ্য?" আমিও চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমাকে দাঁড় করিয়ে, নামটা সঙ্গে করে চলে গেলেন ভিতরে। ফিরে এলেন, একেবারেই অন্য মূর্তি। খুব খানিকটা অনুনয় বিনয় করে সেও একবার উচ্চারণ করল "আপনারা বাংলা ভাষায় পত্রিকার তরফ থেকে এসেছেন?" আমাদের সকলকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। জাপানী কায়দায় ছোট একটা বাগান পার হয়ে সবুজ ঘাসের খানিকটা যায়গা পাশে রেখে আমরা পৌঁছুলাম বাড়ির দাওয়ায়। তারপর জুতো খুলবার পালা। জুতো বাইরে রেখে আমরা সকলে ঢুকলাম একটি ঘরে। জাপানী কায়দায় ঘর সাজানো। চারদিকে রাশি রাশি গোলাপ। তাতামি (মাদুর) দেওয়া ঘরে নানান কারুকার্য করা এক নীচু জলচৌকি ধরনের জাপানী টেবিল। চারপাশে বসবার ছোট ছোট গদি। আমাদের সকলকে বসতে দেওয়া হল। একটু পরেই কাঠের পাল্লা দু পাশে সরে গিয়ে আবির্ভূত হলেন এক সৌম্য শান্ত মূর্তি।

পাতলা ছোটখাটো মানুষ। মাথা ভর্তি সাদা চুল, টান করে পিছনে আঁচড়ান, অনেকটা জোর করেই। একনজরে দেখলে মনে হবে যেন নিজের ইচ্ছায় প্রকৃতিকে বশ মানাচ্ছেন—প্রশস্ত ললাট। ভাঁজ ভাঁজ চিন্তার রেখা সেখানে স্পষ্ট। যে কোন উপলব্ধিই সেই পেছনে পরিণতি লাভ করতে বাধ্য। আর তার নীচেই সেই অনিন্দ্য-সুন্দর প্রশস্ত বড় বড় চোখের মমতাভরা চাউনি। মনে হয় সমস্ত জটিল

ন যা কপালের ভাঁজে নিষ্পেষিত হচ্ছে, চোখের চাউনি থেকে তাই সহজ-সরল-ন্দর হয়ে বার হয়ে আসছে। ভাবছিলাম সমগ্র এশিয়াতে যে দুজন মানুষকে একই কীর্তির জন্য সম্মানিত করা হয়েছে, াদের কি কোথাও কোন মিল নেই? হঠাৎ পড়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল কবিগুরুর বিতে দেখা সেই চোখ। কারণ চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। মনটা আনন্দে উছলে উঠল। এই তো সেই চোখের চাউনি! অদ্ভুত সুন্দর চোখের চাউনি এই কাওয়াবাতার, জাপানে যা চরাচর দেখা যায় না। কিন্তু একটু ভাল করে দেখলে দেখা যাবে তাঁর সমস্ত চেহারায় ছড়িয়ে আছে একটি ছাপ, "আমি জাপান দেশের জাপানী মানুষ।" একথার এতটুকু ভুল নেই যে, কাওয়াবাতা সম্পূর্ণ-ভাবে জাপানী। জাপানী চলন, জাপানী বলন, জাপানী পোশাক, জাপানী চিন্তা, জাপানী মন, জাপানী চেহারা, সমস্ত কিছু আদর্শে জাপানী ভাবধারাকে সমগ্র বিশ্বের সামনে দাঁড় করাতে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন, করছেন। কোন আপোস সেখানে নেই। সেই কারণে তাঁর সম্মান প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টই স্বীকার করা হয়েছে যে, জাপানী চরিত্রের মাধুর্যকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরাই তাঁর লেখনীর প্রধান অংগ।

নাম পরিচয় শেষ হতেই উনি আমার হাতের 'দেশ' পত্রিকাখানা টেনে নিয়ে বললেন, "টাগোর-এর ভাষা? আমি সংস্কৃত আর বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনেক শুনেছি আমার বন্ধু Dr. Tsujiর কাছে...।" হাসতে হাসতে বললেন, "ডক্টর টেগোর-এর সুবিধা ছিল উনি নিজেই ইংরাজীতে লিখতেন। ওঁর পক্ষে সমগ্র বিশ্বকে ওঁর চিন্তাধারা পৌঁছে দেওয়া অনেক সহজ হয়েছে। সেইখানেই আমার মুশকিল। আমি ইংরাজীতে নিজে লিখি না। তাই আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।..." ওঁর যে বইগুলি অনুবাদ হয়েছে, সেগুলির উল্লেখ করে উনি বার বার একটি কথাই বললেন, "আমার এই সম্মানের অর্ধেক কৃতিত্ব এই বইগুলির অনুবাদ কারকের।" তাঁর মতে এই বইগুলির সঠিক অনুবাদ না হলে সমগ্র বিশ্বের কাছে তাঁর ভাবধারার কোন প্রকাশই সম্ভব হত না।

ওঁর কোন বই খুব একটা বড় নয়। বলতে গেলে বৃহৎ উপন্যাসের তুলনায় বেশ ছোট ছোট। ওঁর যে বই দুটি সর্বত্র বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে তার একটি "য়ুকিগুনি (বরফের দেশ)", দ্বিতীয়টি "সেম্বাজুরু (সহস্র বলাকা)"। এ ছাড়া আরও দুটি বই জাপানে খুবই প্রসিদ্ধ "ইজু নো ওদোরিকো (ইজু এলাকার নর্তকী)" এবং "ইয়ামা না ওতো"।

কাওবাতার বাড়ির সম্মুখ ভাগ। আড়ম্বর হয়ত নেই—শ্রদ্ধা উজাড় করবার পক্ষে যথেষ্ট

এই বইগুলির মাঝে 'য়ুকিগুনিই' একমাত্র বই যেটি 'সুইডিশ' ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ১৯৩৫ সালে তিনি যদিও এই বইটি লেখা শুরু করেন, কিন্তু শেষ করেন ১৯৪৭ সালে। এক সফল মধ্য-বয়সী পুরুষ এবং অল্পবয়সী গেইসার প্রণয়ের মাধ্যমে নানান মানসিক প্রতিক্রিয়াকে তিনি এই বইয়ে তুলে ধরেছেন। সমাজ-সংস্কার-প্রকৃতির বিচিত্র অবদান সব কিছু তিনি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন দুটি অল্পবয়সী নারী-পুরুষের হৃদয়াবেগকে কেন্দ্র করে। তবে কোন বিশেষ বইকে কেন্দ্র করে এ সম্মান তাঁর কাছে আসেনি। তাঁর সমগ্র চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে যে মূল-সুর ধ্বনিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, "...a moral and ethical consciousness of culture with artistic distinction and thus in some measure contributes to the spiritual bridge spanning between East and West."

উনিশ দশকের প্রথমে একদল লেখক জাপানের সাহিত্যে কিছুটা নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করেন। খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহ নিজের মতন করে শোনানই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কাওয়াবাতাও সেই পরিবর্তনশীল কাঠামোর অন্যতম ধারক।

"আমি আমাদের চারপাশে যা দেখেছি শুনেছি জেনেছি তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। আমার এই সম্মানে আশ্চর্য হয়েছি ঠিকই। আনন্দও পেয়েছি। তবে সব থেকে গর্ব আর আনন্দ অনুভব করেছি এই ভেবে যে, সমস্ত বিশ্ব আজ আমাদের প্রাচ্যের সৌন্দর্য আর চিন্তাধারাকে জানল, বুঝতে চেষ্টা করল, সম্মানিত করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করল না। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মিশ্রণ ছাড়াও আমাদের প্রাচ্যের নিজস্ব চিন্তাধারায়ও কে কতখানি স্বাবলম্বী এতে করে সেইটাই আর একবার প্রমাণিত হল।" বললেন, কাওয়াবাতা। তাঁর লেখার মূল সুরই হচ্ছে, সহজ সরল সুন্দরভাবে প্রকৃতির খেয়ালের সঙ্গে মানুষের মনের খেয়ালকে একাকার করে সকলের সামনে তুলে ধরা। সেই কারণে প্রকৃতির রূপ বর্ণনা তাঁর লেখায় এক বিশেষ স্থান পেয়েছে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে মনে হবে, একটা স্থির মৃদু ভাব সেখানে সতত বিরাজমান।

ভেবেছিলাম অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করব। পৃথিবী তোলপাড় করা খবরের উপর ও'র মতামত। ভেবেছিলাম জিজ্ঞাসা করব, ভিয়েৎনাম, ছাত্র আন্দোলন, জাপান-আমেরিকা প্রতিরক্ষা চুক্তি, এমন কত কি? কিন্তু পারলাম না। দাঁত ভাঙা সব প্রশ্নের এ স্থান নয়। মানুষটির স্নিগ্ধতাকে প্রত্যক্ষ করে পারলাম না কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে। কেমন যেন ও'র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে সমস্ত উত্তেজনা চঞ্চলতা হারিয়ে ফেললাম। যা নিজে থেকে বললেন সেইটুকুই শুনলাম। শুনলাম উনি ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত "PEN CLUB"-এর সভাপতি ছিলেন। এই সংগঠনের মাঝেই জাপান ও বিদেশের কথা-সাহিত্যের ভাব ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

তাঁর আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে, 'শান্তিনিকেতন'-এর মতন কোন রকম সংগঠন গড়ে তোলবার কথা তিনি ভাবেন নি। তবে জাপান ও প্রাচ্যের ভাবধারাতে পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে সত্য ও সুন্দর রূপে বিলিয়ে দেবার সাধনায় তিনি রত। সে সাধনা তিনি চিরজীবন চালিয়ে যাবেন। পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে তাঁর একটিই আবেদন, তাঁরা যেন সেই পথই অনুসরণ করেন যে-পথ সমগ্র বিশ্বকে এক ও অভিন্ন মানব-জাতির সমষ্টিতে পৌঁছে দেবে।

তিনি সব শেষে এক জায়গায় একটি সলজ্জ উক্তি করেছেন। "...a great deal of fuss would not be made..." এই কথা প্রসঙ্গে Mr. Hidemi Kon, Director General of Cultural Affairs Agency বলেছেন, "As far as I know, no writer in the world excels Mr. Kawabata.... অতএব 'fuss'-এর কোন প্রশ্নই আসে না, যেখানে পৃথিবী তাঁকে সম্মানিত করেছে। তাঁর সব থেকে বড় কৃতিত্ব যে তিনি কোন দিন তাঁর নিজস্ব ধারা থেকে বিচ্যুত হননি। Heian Period (794—1185) থেকে জাপানী সাহিত্যে যে মাধুর্যের সূত্রপাত, তাকে আরও মহিমামণ্ডিত করেছেন কাওয়াবাতা। জাপানী সাহিত্য পৃথিবীর মানুষের মনে যে এতদিন রেখাপাত করেনি তার কারণ অবশ্যই জাপানী সাহিত্যের মননশীলতা বা ভাবধারার গভীরতার অভাব নয়, প্রধান কারণ ভাষা। Mr kon আরও বলেছেন, "...Literature is not like sports. I don't believe the awarding will have a big effect on Japanese Literary world immediately..."

'PEN CLUB'-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, জাপানী সাহিত্য স্বভাবতই অন্য দেশের সাহিত্য থেকে কিছুটা পৃথক, সেটা বিশেষত বিদেশীদের পক্ষে বুঝতে বেশ অসুবিধাজনক। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রতি এই সম্মান, তাঁর মাধ্যমে সমগ্র প্রাচ্যের চিন্তাধারার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ সাতো উল্লেখ করেছেন যে কাওয়াবাতা সন ও জাপানের এই সম্মান এমন এক সময়ে আমাদের কাছে এসেছে, যে সময় জাপানবাসীর কাছে এক মহিমময় সময় "the 100th Anniversary of the Meiji Restoration."

আজ যদি আমরা জাপানের এই সার্থকতার দিকে তাকিয়ে দেখি, দেখব—১৮৬৮ সালে মেইজি সম্রাটের সময়ে যে চারা গাছ রোপিত হয়েছিল, আজ ১০০ বছর পর সেই চারা গাছ এক বিরাট শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।

জাপান আজ পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে পৃথিবীর শিল্পজগতে তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি। আমেরিকা ও রাশিয়ার পরেই জাপানের স্থান। সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে যেভাবে জাপান এগিয়ে চলেছে, তাতে এ বছরই সে ফরাসী দেশকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে বলে বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, অভিজ্ঞ মহলের অনেকে মনে করেন, এইভাবে এগিয়ে চললে আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই জাপান জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাশিয়ার সমকক্ষতা লাভ করবে। তার পরেই তাদের উদ্দেশ্য হবে "overtaking the United States."

ঠিক একশ বছর আগে জাপান তখন গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত। সমাজে 'সামুরাই' বা যোদ্ধা সম্প্রদায়ের দাপটে সাধারণ মানুষ করছে হাহাকার। সেই সময় Tokugawa Shogunnate-র নেতৃত্বে জাপানের রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। ফ্রান্স, জার্মানী বা রাশিয়ার বিপ্লবের সঙ্গে এই বিপ্লবের রীতি এবং নীতিগত পার্থক্য অনেকখানি। কারণ জাপানের এই বিপ্লবকে উপলক্ষ করে তৎকালীন রাজনীতি এবং অর্থনীতির চেহারাটাকে একেবারে ঢেলে সাজান হয়নি। 'Meiji Restoration', কিছু সংখ্যক নাম-না-জানা যোদ্ধা সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি। তারা সম্রাটকে সামনে রেখে প্রথমে রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনল। কারণ সাধারণ জাপানবাসী সব সময়ই এক অপার শ্রদ্ধা বহন করত তাদের সম্রাটের প্রতি। পাশাপাশি রেখেছিল জাপানের পুরনো সমাজতন্ত্রবাদ, বড় বড় জমিদারি প্রথা আর একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। আসল পরিবর্তনটা আনল এক নূতন চিন্তাধারার সূত্রপাতে। মেইজি সরকার সমস্ত কৃষক এবং জমির উপর এক বিরাট কর আরোপ করল। আর সেই টাকা শিল্প উন্নতির ক্ষেত্রে খাটাতে শুরু করল। এই ছোট্ট চিন্তাধারার সূত্রপাতে সেদিন জাপান অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যে কত বড় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল সেটা আজ সকলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। বুদ্ধিমান মানুষদের সমস্ত পৃথিবীতে পাঠান শুরু হল; বলা হল "যেখানে যা ভাল দেখবে এবং পারে, শিখবে আর সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে।" আধুনিক শিল্প উন্নতির জন্মের বীজ সেই দিন আরোপিত হল। পাশ্চাত্য জগত থেকে আহরণ করে আনল যা কিছু নূতন, যা কিছু ভাল এবং যা কিছু সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে কালের গতির সঙ্গে পা ফেলে জাপানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—সেটা আজকের জাপানের উন্নতির মূল কারণ।

আজ এই সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন সম্মান জাপানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। কাওয়াবাতার পরেই আছেন মিশিমা—যাঁর প্রতি এই সম্মান অদূরেই অপেক্ষমান। কারণ কাওয়াবাতা নিজেই এই সম্মানের কর্মকর্তাদের মিশিমার প্রতি চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে এক জায়গায় বলেছেন, "..It is too bad he was still considered as being too young..."

সব শেষে কাওয়াবাতা বললেন "দেশ"-এর যে সংখ্যায় আমার কথা লেখা থাকবে তার একটা সংখ্যা যেন আমাকে পাঠিয়ে দিও।" তারপর ও'র কয়েকখানি বইয়ের একক সংকলন-এর একখানিতে আমার নাম লিখে আমায় দিলেন উপহার—যা রইবে আমার জীবনে এক বিরাট সম্পদ হয়ে।

বিকাশ বিশ্বাস

অধ্যাপনাকার্যে রত ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা

ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা
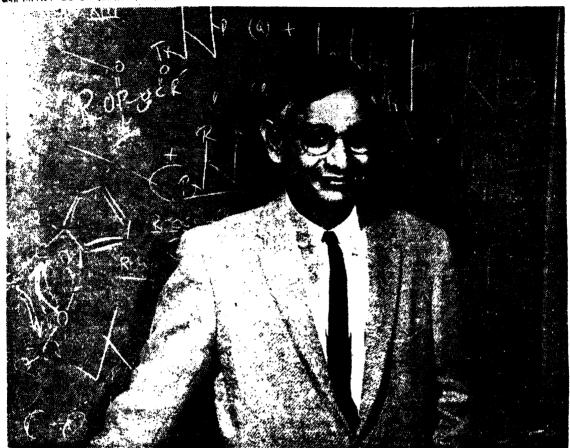
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাইওকেমিস্ট্‌ প্রসঙ্গে

অসীমকুমার চক্রবর্তী

গত পহেলা অক্টোবর সন্ধ্যায় উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এসে পৌঁছে-ছিলাম। চারপাশের লাল মুখোদের মধ্যে নিজেকে বেশ একা একা বোধ হচ্ছিল। পরের দিন দু'একজন ভারতীয়ের সংগে রাস্তায় সাক্ষাৎ হল। আলাপের শুরু—আপনি সম্ভবত ভারতীয়? ভারতের কোন জায়গা থেকে এসেছেন? কতদিন এখানে আছেন? ইত্যাদি। দিন তিন-চার বাদে এখানকার "বাইওকেমিস্ট্রি" বিভাগে বক্তৃতা করতে এলেন পূর্বতন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ কর্নবার্গ। বক্তৃতা কক্ষ লোকে ঠাসা। বক্তৃতার শুরুতে বক্তাকে পরিচয় করাতে উঠলেন এক ভদ্রলোক। দেখে মনে হল, বোধ হয় ভারতীয়। ভাবলাম এত কেউ থাকতে যখন ঐ ভদ্রলোক উঠেছেন, নিশ্চয়ই বড় দরের কেউ হবেন। আলাপ করার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু হল না। কারণ বক্তৃতা শেষ হতে অত লোকের বাইরে বেরিয়ে আসার তোড়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

এই ঘটনার দিনতিনেক পরে ৯ অক্টোবর এখানকার ছাত্র-পরিষদের বিরাট দরদালানের "লাঞ্চ-লাউঞ্জে" বসে খাচ্ছিলাম; দেখি সেই ভদ্রলোক আরেকটা টেবিলে বসে খাচ্ছেন। খাওয়ার ট্রেটা হাতে করে কাছে গিয়ে বসলাম এবং আলোচনা শুরু করে-ছিলাম সেই একইভাবে, অর্থাৎ 'আপনি সম্ভবত ভারতীয়' দিয়ে।

উনি বললেন—আমি উত্তরপ্রদেশের লোক, পাঞ্জাবে পড়াশুনো করেছি।

—এখানে অর্থাৎ এই "ক্যাম্পাসে" আছি ১৯৬০ সাল থেকে। তবে আমি ২৩ বছর ভারতের বাইরে।

—কোথায় কোথায় ছিলেন?

—প্রথমে লিভারপুলে ডিগ্রী (পি, এইচ, ডি) করি, তারপরে বেশ কিছুদিন 'সুইজারল্যাণ্ড' এবং কানাডায় ছিলাম; তারপরে এখানে এসেছি।

—আপনার নাম?

—হরগোবিন্দ খোরানা।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি মোটামুটি সাধারণভাবেই আলোচনা করছিলাম। ও'র

নাম শোনার পরে এক নিশ্বাসে অনেক-গুলো কথা বলে ফেলেছিলাম—ও, আপনার নাম আমি ভারতবর্ষে থাকতে অনেক শুনেছি। এখানে আসার কিছুদিন আগে আপনার ছাত্র ডঃ ঘোষের বক্তৃতা শুনেছিলাম। আচ্ছা, শুনেছি আপনি নাকি ভাল চাকরি পাননি ভারতবর্ষে।

তার উত্তরে বললেন—আমার ডিগ্রী পাওয়ার সময়ে ভারতবর্ষ সবে স্বাধীন হয়েছে, গবেষণামূলক চাকরির তখন অভাব ছিল।

আপনি "বাইওকেমিস্ট্রি" বিভাগে আছেন?

—না, আমি "এনজাইম-ইনস্টিটিউটের" একজন কো-ডিরেক্টার।

আচ্ছা আপনি কি এখনও ভারতীয় নাগরিক আছেন?

—না, গত ফেব্রুয়ারীতে আমি এখানকার নাগরিকত্ব পেয়েছি।

ও'র খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। হঠাৎ কি মনে হল, হাতে সদ্য কেনা একগোছা কাগজ ছিল, তার একটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা "অটোগ্রাফ" চাইলাম। সই করে দিলেন। উনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কবে এসেছি, কোন বিভাগে কি নিয়ে গবেষণা করছি ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর করমর্দন করে জানালাম—আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল। ডঃ কর্নবার্গের বক্তৃতার দিনেই আপনার সঙ্গে আলাপ করব ভেবেছিলাম। উনি একটু হেসে বিদায় নিলেন।

তারপর ১৬ই অক্টোবর সকাল আটটায় ল্যাবোরেটরীতে এসে শুনি ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রবার্ট হোলে এবং বেথেসডার ন্যাশনাল হার্ট ইনস্টিটিউটের ডঃ মার্শাল ওয়ারেন নিরেন-বার্গের সঙ্গে "ফিজিওলজি ও মেডিসিন"-এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এখানে নতুন আসায় বাসায় রেডিও ছিল না এবং খবরের কাগজওয়ালাও ঠিক করিনি; তাই প্রথম সংবাদটা অন্যদের কাছ থেকে শুনতে হল। পরে জানলাম ডঃ খোরানাও নিজে রেডিও থেকে শোনেন নি। উনি সেদিন সকালে ও'র গ্রামের বাড়িতে ব্যস্ত ছিলেন পরের দিনের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে দেয় লুইসা-গ্রস-হোরউইটজ পুরস্কারের (জৈব-রসায়নে বিখ্যাত কাজের জন্য, ২৫ হাজার ডলার) ভাষণ প্রস্তুতির কাজে। ও'র স্ত্রী শ্রীমতী এসথার মোটর-গাড়ি নিয়ে ছুটেছিলেন ও'কে খবরটা দেওয়ার জন্য।

খবরটা শোনার পর বাইরে বেরিয়ে একটা কাগজ কিনলাম, দেখলাম সর্বপ্রথম সংবাদ—উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তার নীচে লেখা Biochemist is native of India (জৈব-রসায়নবিদ্ ভারতের বাসিন্দা)। তারপরে ছুটলাম "এনজাইম ইনস্টিটিউটে"। সেদিন সকালেই উনি প্রেস কনফারেন্সে বসেছিলেন। সামনে টেবিলের উপরে ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৫৮) জৈব রসায়নবিদ জোসুয়া লেদারবার্গের পাওয়া সোনার মেডেলটা। দু' পাশে ছিল এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ফ্রেড হারভে হ্যারিংটন এবং ম্যাডিসনের চ্যান্সেলর এইচ, এডউইন ইয়ং। দুই ভদ্রলোকই ডঃ খোরানার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। হ্যারিং-টনের অনেক কথা থেকে দুটো কথা উল্লেখ করা যায়—

"Dr. Khorana's research makes the University great and renders assistance to the State...The State contribute his $35,000 salary, but that's probably only a tenth of what his worth to the nation."

ডঃ খোরানা বললেন—আমরা তিনজনই (ডঃ খোরানা, ডঃ নিরেনবার্গ ও ডঃ হোলে) বন্ধু। তবে বিভিন্ন দিক থেকে বংশগতি রক্ষায় কোষকেন্দ্রস্থিত "জেনেরা" যে সমস্ত কাজ করে তার সঠিক নিরুপণের চেষ্টা করছি। (জন্মলগ্নে জীবেরা মায়ের কাছ থেকে পায় ডিম্বকোষ এবং পিতার কাছ থেকে শুক্রকীট। উভয় কোষের কেন্দ্র নিউক্লিয়াসে ২৩টি করে সুতোকার ক্রোমোজোম আছে এবং এই ক্রোমোজোমেরা হল বংশগতি বা "হেরিডিটি" নিরুপক জিনের সমন্বয়।) আমাদের বিদ্যা এখন প্রাথমিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। ডঃ খোরানা ও'র গবেষক দলের উল্লেখ করে বললেন—ও'দের অক্লান্ত পরিশ্রমই আজ আমাকে সম্মানিত করেছে।

এখনকার মানুষ সব সময়ই ক্যান্সার এবং হৃৎপিণ্ড বা অন্যান্য অঙ্গের সংযোজন নিয়ে খুব ভাবছে। তাই একজন প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা আপনার কাজ কি ক্যান্সার বা সংযোজিত অঙ্গ পরিত্যাগ (transplant rejection) বিষয়ে কোন সাহায্য করবে? ডঃ খোরানা উত্তরে জানান—এখনই কিছু করবে না, তবে বংশগতি বাহক "জিনেরাই" কোষের সমস্ত কার্য তদারক করে, কাজেই "জিনে"র সমস্ত কাজের পন্থা জানলে একদিন তা সাহায্য করবে বৈকি।

রাত্রিবেলা টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ডঃ খোরানাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আপনি ত অনেক টাকা পেলেন (এবারকার প্রাইজ ৭০,০০০ ডলার—এ পর্যন্ত রেকর্ড), তা দিয়ে কি করবেন? উনি মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—ভালই হল, একটা ভোজ দেওয়া যাবে।

ডঃ খোরানার সংক্ষিপ্ত পরিচয়: ১৯২২ খৃস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী উত্তর-প্রদেশের রাইপুরে জন্ম। পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে বি এস-সি এবং এম এস-সি পাশ করেন যথাক্রমে ১৯৪৩ এবং ১৯৪৫ সালে। ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে আসেন ইংল্যাণ্ডের লিভারপুলে; সেখান থেকে "অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি"তে পি-এইচ-ডি উপাধি পান ১৯৪৮ সনে। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে "ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে" গবেষণা করেন। সেখানে সুইস-ট্রাভেল-ইনফরমেশনে কর্তব্যরতা শ্রীমতী এসথারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ডঃ খোরানা তারপরের দু' বছর নাফিল্ড-ফেলো হিসেবে স্যার আলেক-জাণ্ডার টডের (১৯৫৭র "কেমিস্ট্রি"তে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী) সঙ্গে "নিউক্লিওটাইড সিনথেসিস" নিয়ে কাজ করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এই বিষয়ের উত্তরকালীন চর্চাই ও'কে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর সম্মান দান করেছে। ১৯৫২ সালে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে "অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি" বিভাগের মুখ্যসচিব হিসেবে যোগ দেন। সেখানে 'কো-এনজাইম-এ' তৈরী করে উনি প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। কানাডার রসায়ন-সংস্থা থেকে মার্ক পুরস্কার পান ১৯৫৮ সালে। তারপর ১৯৬০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানে ৮ বৎসর ধরে উনি ৬৪ রকমের 'ট্রাইনিউক্লিওটাইড' (বংশগতি সংরক্ষক জিনের অংশ) তৈরী করেছেন। ও'র গবেষণাগারে গবেষক দলটি আকারে বেশ বড় এবং প্রায় সবাই "পোস্ট ডক্টরেট" আর তাঁরা এসেছেন পৃথিবীর ২৭টি দেশ থেকে। উনি এখন পর্যন্ত দুই শতর উপরে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

⁂

ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে আছি। ডঃ খোরানার সম্পর্কে দেশের লোক এবং সরকার সঠিক কি ভাবছে জানি না। তবে সম্প্রতি পাওয়া এক বন্ধুর চিঠিতে জানলাম দেশে একটা জল্পনা-কল্পনা চলছে—খোরানাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় কিনা। বন্ধুর প্রেরিত সংবাদকে সত্য ধরে আমি কতকগুলো বক্তব্য পেশ করছি। ডঃ খোরানার বিজয় আমাদের দেশের পক্ষে আংশিক বিজয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সে জন্য "ট্রফি" হিসেবে সাজিয়ে রাখার জন্য ডঃ খোরানাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবার কোন মানে হয় না। সেটা গোল করা খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে তুলে নিয়ে কাচের বাক্সে সাজাবার মত হয়ে যাবে ("ট্রফি"র জন্যে বিজয়ের স্মৃতিটাই থাক)। ইংল্যাণ্ড, জার্মানী এবং অন্যান্য দেশের অনেক বৈজ্ঞানিকই দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের
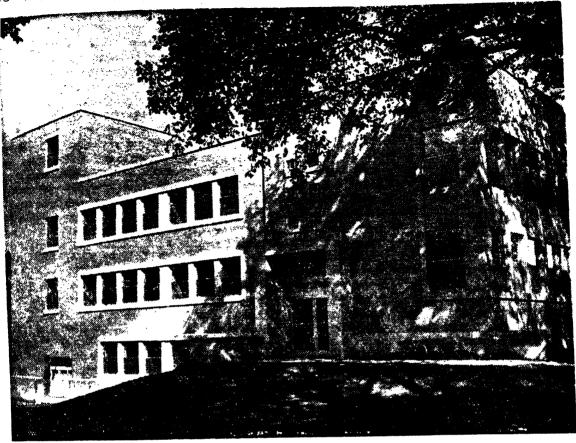
এনজাইম রিসার্চ ল্যাবরেটরির এই বাড়িটার একতলা ও দোতলায় ডঃ খোরানার ল্যাবরেটরি

দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্যে হইহই হয়নি। সে সব দেশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সান্ত্বনা পেয়েছে যে, বৃহত্তর শিক্ষাটা দেশই দিতে পেরেছে এবং দেশে পরেও স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক জন্মাবেন। ডঃ খোরানা এখন আর ভারতীয় নন, এই দুঃখের কথাটা মনে রেখে ভারতবর্ষে যাঁরা বিজ্ঞান চিন্তা করছেন তাঁদের বিকাশের জন্যে যদি সবাই সচেষ্ট হন, তবে বোধ হয় অনেক ভাল হবে। দেশের বাইরে এসে অর্থোপার্জনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি যে, এখানকার যত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক কাজে লিপ্ত আছেন তাঁদের অনেকেই মৌলিক চিন্তার দাবী রাখেন না এবং ভারতবর্ষের প্রাথমিক স্তরের অনেক বিজ্ঞান গবেষককে চিন্তা করার ক্ষমতার দিক থেকে এদের উপরে স্থান দিতে হয়। আমাদের দেশে যথেষ্ট বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের বুদ্ধিকে কাজে লাগান হয় না। তাদের শক্তির অপচয় হয় দেখেছি স্কলার-শিপ বা চাকরির চিন্তায়, উপরঅলা কর্তার মন জোগাতে, যন্ত্রবিহীন গবেষণাগারে, বিদেশে আসার আকুল আগ্রহে। এ কথা-গুলো আমি নতুন কিছু বলছি না, এ ধরনের আলোচনা বহুবার হয়েছে। এখন থেকে বছর দু'এক আগে "দেশ" পত্রিকার ২৫শে বৈশাখ সংখ্যায় ডঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায় "ভারতীয় বিজ্ঞানে ঋতু পরিবর্তন" শীর্ষক প্রবন্ধে এ ধরণের বৃহত্তর বক্তব্যের উপস্থাপনা করেছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞান কমিটির রিপোর্টেও আংশিক উল্লেখ দেখেছি।

আমাদের দেশে অনেক সমস্যা। কিন্তু সেসব সমস্যা সমাধানের আমাদের আন্তরিক ইচ্ছে নেই। অনেক সমস্যার একটা নিয়ে কিছু শুরু করার আগেই অন্যান্য সমস্যা-গুলোর কথা আউড়ে কোনটা আগে করা উচিত আলোচনার জন্য "কমিশন" বসিয়ে একটা সমস্যারও সমাধান করি না। সব আলোচনার উপসংহার হল ভারতের বৃহত্তর জনসংখ্যা।

তারপর আমাদের দেশে "পলিসি" তৈরীর সময়ে কোনটা যে সঠিক উদ্দেশ্য এবং তার কি মানে বোঝা যায় না। দেশে "কাউনসিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ" বেশ কিছু বছর ধরেই দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষক-দের বৃত্তি দিচ্ছিলেন। কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় গত বছর থেকে ঐ সংস্থা সুর ধরেছেন আর "বেসিক সায়েন্সে" টাকা দেওয়া যাবে না, শুধু "অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সে" টাকা খরচ করা হবে। একটু বিজ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই বুঝবে কথাটা অত্যন্ত অর্থহীন। ডঃ খোরানার কাজটা সম্পূর্ণ "বেসিক সায়েন্স" ভিত্তিক। কিন্তু এখন থেকে কিছু বছর বাদে অনেক রোগ নিরূপণ এবং ঔষধ তৈরিতে হয়ত এ বিদ্যা কাজে লাগবে। "বেসিক" "অ্যাপ্লায়েড" খাতে সামঞ্জস্যবিধান করা যায় কিনা এবং নতুন কোন উপায়ে টাকা সংগ্রহ করা যায় কিনা সেদিকে না ভেবে প্রথমেই আমরা কম চিন্তায় যে উপায় পাওয়া যায় তাই করে ফেলি। দেশে ভাবার জন্য যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের কথা আর প্রতি পাঁচ বছর অন্তে আবার ভাবনা-কর্তা-মঞ্চে আরোহণের চিন্তায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, আর মাইনে করা আছে রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী"র পুরোহিত দল। তাই আমাদের দেশের এই দুর্দশা।

ডঃ খোরানা প্রসঙ্গের পরে আমার নিজস্ব বক্তব্য হয়ত খানিকটা "ধান ভানতে শিবের গীতে"র মত শোনাবে; কিন্তু কথাগুলো মনে জেগেছে যখন দেশের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে মনে হয়েছে উত্তরকালেও অনেক ভারতীয়ই হয়ত নোবেল পুরস্কার পাবে ভারতীয়ত্ব হারিয়ে। ভারতবর্ষ সেই কবে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিল, সে কথাটা ভাঙিয়ে আর চলছে না।

ডঃ খোরানকে আমি যেমন দেখেছি

শঙ্কর মিত্র

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন, উইসকনসিনে গিয়ে পৌঁছেছি ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইওকেমিস্ট্রি বিভাগে পি এইচ ডির ছাত্র হিসাবে যোগ দিতে। ম্যাডিসন শহর উইসকনসিন স্টেটের রাজধানী—কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয়—বিশ্ব বিখ্যাত উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাস এই ম্যাডিসনে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবার বিশেষ খ্যাতি বাইওকেমিস্ট্রির গবেষণায়। এই বিভাগের অংশ না হলেও এনজাইম গবেষণাগারের (Enzyme Research Institute) জগৎ জোড়া নাম। এখানেই ডঃ খোরানা এসে যোগ দিলেন—আমি যে সময় ম্যাডিসনে পৌঁছোই প্রায় সেই সময়েই তিনজন কো-ডিরেক্টরের একজন হয়ে। তখন খোরানার নাম জীব এবং প্রাণ রসায়নবিদ মহলে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তিনি ইতিমধ্যে কো-এনজাইম এ (Coenzyme A) পি আর পি পি (PRPP) প্রভৃতির সংযোজন ল্যাব্ কুভারেই করে এসেছেন। তাই আমি পৌঁছানোর ২/৪ দিনের মধ্যেই খোরানার ম্যাডিসনে আসার কথা শুনলাম। কয়েকজন আমেরিকান ছাত্র, আমি ভারতীয় বলে, খবরটা আমাকে বিশেষ করে জানিয়ে দিয়ে গেল।

খোরানাকে প্রথম দেখলাম একদিন দুপুরে লাঞ্চের সময়, উনি ইউনিভার্সিটি অ্যাভেন্যু ধরে হাঁটছেন ছাত্রদের ইউনিয়ন ক্যাফেটোরিয়ার দিকে। মাথায় ছোটখাট মানুষ—মাঝারি গড়ন, কালো গায়ের রং—একটু মাথা নীচু করে থপথপ করে অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গী আমাকে আঙুল দেখিয়ে চিনিয়ে দিল, কিন্তু আমার নিজের থেকে পরিচয় করতে সাহসে কুলোল না। যাই হোক তারপর খোরানাকে আস্তে আস্তে প্রায়ই দেখতে পেতাম—বিশেষ করে আমাদের বাইওকেমিস্ট্রির তিন তলার Molecular Biologyর সাপ্তাহিক লাঞ্চ সেমিনারে খোরানা প্রায়ই আসতেন। বোধ হয় এখনও আসেন; সেখানেই ও'র সঙ্গে পরিচয় হল। ও'র যে গুণটা আমার মনে তখনই রেখাপাত করেছে এবং পরেও ও'র সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় হবার পর আমাকে বারবার অবাক করেছে, তা হল ও'র নিজেকে জাহির করার কোন প্রকার প্রচেষ্টায় একান্ত অনীহা। এই আত্মপ্রচার-বিমুখতা অনেক নামী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখেছি ওদেশে—কিন্তু খোরানার ব্যবহার আমাকে অবাক করত এইজন্য যে উনি যখনই মুখ খুলতেন একেবারে ঘরের পেছন দিক থেকে, ও'রা গলা পেলেই অন্যান্য সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে ও'র প্রত্যেকটি কথা, মতামত শুনত। তা সত্ত্বেও উনি নিজে কথা বলার চেয়ে শোনাতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। কোনো সেমিনারেই তা' সে যত বাজেই হোক—ও'কে কখনও অমনোযোগী হতে দেখিনি। ও'র নিজের ল্যাবরেটরী সেমিনারে বাইরের কেউ কেউ যেত, কিন্তু মনোযোগের কখনও অভাব দেখলে উনি ভয়ানক বিরক্ত হতেন। ও'র অস্বাভাবিক নম্রতাও অল্প পরিচয়েই যে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেমিনারে কোন বক্তার কোন ভুল হ'লে উনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কোনরকম তর্ক বা বাগবিতণ্ডার সূত্রপাতের সম্ভাবনা দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে যেতেন।

খোরানাকে অনেক কাছের থেকে জানলাম ম্যাডিসনে নয়—স্ট্যানফোর্ডে গিয়ে এবং তারপর ও'র সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনলাম আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রাক্তন সহপাঠী ডঃ হরপ্রসাদ ঘোষের কাছ থেকে। ডঃ ঘোষ বর্তমানে কানাডায়, উনি ১৯৬৬-৬৭ সালে খোরানার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। স্ট্যানফোর্ডের কথায় পরে আসছি, তার আগে ম্যাডিসনের কথা শেষ করে নিই। খ্যাতনামা লোকেদের বেলায় যা' সাধারণ হয়ে থাকে, খোরানার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ও'র ম্যাডিসনে আসার পর থেকেই ও'র সম্বন্ধে অনেক রকমের কাল্পনিক মনগড়া কাহিনী শুনতাম। যেমন একজন ভারতীয় এসে একদিন বলে গেল—উনি ভারতীয়দের একদম পছন্দ করেন না এবং সেইজন্য ও'র গবেষণাগারে কোন ভারতীয় নেই। শেষের কথাটা তখন সত্যি হ'লেও প্রথমটা নয়। পরে আমার জানাশোনা অন্তত পাঁচজন এখানকার ছেলে ও'র সঙ্গে কাজ করেছেন—তার মধ্যে ডঃ নবকুমার গুপ্ত এবং হরপ্রসাদ ঘোষ কলকাতার ছেলে এবং ডঃ উত্তম রাজভাণ্ডারী নেপালের ছেলে হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সি। খোরানা ম্যাডিসনের ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাঙ্কোয়েট ডিনারে বহুবার সস্ত্রীক গেছেন এবং আমার এবং অন্যান্য অনেক ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ভারতবর্ষ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। আমাকে আমার ভারতবর্ষে ফেরার ঠিক আগেই বলেছেন যে—ও'র সময়ে ও'র পক্ষে ভারতে থাকা সম্ভব না হলেও এখন (ও'র ধারণানুযায়ী) ভারতে বিজ্ঞানীদের অবস্থা অনেক ভাল এবং আমাদের সকলেরই ভারতে বিজ্ঞানের মান উন্নয়ন করব এই প্রতিজ্ঞা করে ভারতবর্ষে ফিরে আসা উচিত। ও'র নিজের ভারতীয় ছাত্রদেরও বারবার এখানে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

এরপর একদিন আবার আর একটা গুজব শুনলাম—খোরানা নাকি ও'র সহযোগীদের প্রচণ্ড খাটান এবং তাঁদের সঙ্গে ও'র ব্যবহারও খুব খারাপ। পরে জানলাম এটাও সত্যি নয়। ও'র ল্যাবরেটরীর লোকেরা ভীষণ খাটে সত্যি কথা, কিন্তু তার জন্য উনি জোর করেন না; ও'র মত মৃদুস্বভাবের লোকের পক্ষে সেটা সম্ভবই নয়, তবে যাদের কখনও ফাঁকি দেবার ইচ্ছা হয়, তাদের পক্ষেও খোরানার নিজের কাজ করা দেখে সেটা আর সম্ভব হয় না। খোরানার গবেষণাগারে একই সঙ্গে প্রায় ১৫।২০ জন পোস্ট-ডক্টরাল (postdoctoral) ছাত্র কাজ করে; এগুলো লোকের জন্য এক সঙ্গে প্ল্যানিং করা, প্রবলেম ঠিক করা—এসব একজন লোকের পক্ষে সারাদিন খেটেও কিভাবে সম্ভব হয় সেটা খোরানাকে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। ও'র লোকবলের তুলনাতেও ও'র কাজের পরিমাণ আকাশচুম্বী, ও'র পেপারের রিপ্রিন্ট (reprint) যখন পাই—তখন প্রতিবারই অবাক হই। এক সঙ্গে ৮।১০ খানা পেপার—প্রতিটিই নিখুঁতভাবে লেখা এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জার্নাল ছাড়া খোরানার পেপার আর কোথাও বেরোয় না। আমি ও'কে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনি এত পেপার লিখে ওঠেন কি করে?" উনি হেসে উত্তর দিলেন, "এটা সহজেই হয়ে যায় যখন কাগজপত্রগুলো নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ক্যাফেটেরিয়ার লেক মেণ্ডোটার ধারে গিয়ে বসি এক'গ্লাস বীয়ার নিয়ে।" (অধিকাংশ উইসকনসিনবাসীর মত খোরানাও অন্যান্য মদের চেয়ে বীয়ার পছন্দ করেন তবে উনি অত্যন্ত পরিমিত পান করেন।)

ডঃ খোরানার অতিমানবিক শ্রমক্ষমতা শুধু আমার কাছে নয়, অনেক আমেরিকান বিজ্ঞানীর কাছেও বিস্ময়ের কারণ। পোস্ট ডক্টরেট ছাত্রদের গাইড

করা, পেপার লেখা, কিছু প্রশাসনিক ঝামেলা, বাইরের বক্তৃতা, নানা সেমিনার এই সমস্ত করার পরও ফাঁকে ফাঁকে খোরানা কাজ করেন নিজের হাতে, যখনই কোন প্রবলেম বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখনই কাজ করেন, নাওয়া খাওয়া প্রায় সব ভুলে যান। লাঞ্চ সেরে আসেন ২ মিনিট দূরে Breese Terrace কাফেটেরিয়াতে গিয়ে আর সন্ধ্যেবেলাতে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ি গিয়ে ডিনার খেয়েই ল্যাবরেটরীতে ফিরে আসেন, রাত ১২।১টা অবধি কাজ করে যান। কিছু কিছু আমেরিকান বিজ্ঞানী এই রকম করে থাকলেও খোরানার স্তরের কোন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এই ধরনের কাজ কেউই আশা করে না। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেণ্টের রেজাল্টের জন্য খোরানা অধীর আগ্রহে এবং উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। খোরানার আগে এবং পরে দেশী এবং বিদেশী বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, নানা টুকরা ঘটনার স্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যখন এইসব বিজ্ঞানীদের গুণাগুণ তুলনামূলক ভাবে মনে মনে বিচার করি তখনই আপনিই মনে আসে যে কোন্‌জন বিজ্ঞানের মহানলোকে পৌঁছোবে এবং কোনজন পৌঁছোবে না, সেটা বোধ হয় খুব তাড়াতাড়িই বোঝা যায়।

খোরানা ম্যাডিসনে এন্‌জাইম ইন্‌স্‌টিটিউটে যোগদানের পর আমাদের বাইওকেমিস্ট্রি বিভাগ ওঁকে প্রোফেসর হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল এবং রাজী হল সেন উনি রাজী হওয়াতে আমরাই কৃতার্থ হলাম। খোরানা বছরে কয়েকটি মাত্র ক্লাস নেন। তিনি অবশ্য কোন পি এইচ ডি ছাত্র নেননি এখনও। ওঁর ল্যাবরেটরীতে কাজের যা' প্রচণ্ড গতি, তাতে এইসব অনভিজ্ঞ ছাত্র থাকলে ওঁর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হবে। আমি ম্যাডিসন ছাড়ার পর শুনলাম ১৯৬৪ সালে আমাদের বাইওকেমিস্ট্রির প্রধান ছিলেন এবং পরে উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন—প্রোঃ এলভিয়েম (Elvehjem)—এঁর মৃত্যুর পরে ওঁর নামে একটি প্রোফেসর পদ সৃষ্ট হল, এই পদকে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় করা হল। এ পদের জন্য আমেরিকার অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নাম তোলা হয়েছিল কিন্তু শেষ অবধি অনেকেরই খেয়াল হ'ল, লোক ত' হাতের কাছেই রয়েছে। খোরানার চেয়ে যোগ্যতর লোক এই পদের জন্য পাওয়া সহজ নয়। এই পদ পাওয়ার পর খোরানার আর্থিক উন্নতি হয়েছিল নিশ্চয়ই (সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তাঁর মাহিনা প্রেসিডেন্টের পরেই), কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, খোরানা তখনও আমেরিকান নাগরিক হননি—তাঁর পক্ষে এ সম্মান অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয়।

খোরানার সঙ্গে এরপর আমার দেখা হয় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৪ সালে, আমি তখন ওখানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আর্থার কর্নবার্গের পোস্ট-ডক্টরেট ছাত্র। একটা যৌথ কোর্স দেওয়া হল—নিউক্লিক এসিডের Molecular Biologyর ওপর। প্রধান বক্তা ছিলেন খোরানা এবং কর্নবার্গ। খোরানা তখন কয়েক সপ্তাহের জন্য ওখানে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসেবে গেছেন, কোর্সটা দেওয়া হয়েছিল—যা' দেওয়া হয়—পি এইচ ডি ছাত্রদের জন্যই। কিন্তু লেকচারগুলো হত সন্ধ্যেবেলাতে—অছাত্রদের কথা ভেবে। সত্যি সত্যিই দেখা গেল লেকচার হলে ছাত্রদের চাইতে ছাত্রদের মাস্টারদের সংখ্যাই বেশী। যাঁরা দিনের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যেবেলাতে আসতেন গাড়ি চালিয়ে ৪০।৫০ মাইল দূরের সান্‌-ফ্রান্সিস্‌কো-বার্কলে থেকে। কেউ কেউ ১০০ মাইল দূরের ডেভিস থেকে আসতেন শুনেছি। খোরানার সেমিনার বক্তৃতা আগে শুনেছিলাম, ক্লাসরুমে বক্তৃতা শুনে নতুন করে অভিভূত হলাম। স্ট্যানফোর্ড থাকাকালে বক্তৃতা না থাকলে খোরানা আমাদের ল্যাবরেটরীতে এসে নিজের দরকারে কাজ করতেন—কর্নবার্গের আবিষ্কৃত ডি এন এ

পলিমারেজ (DNA Polymorase) তৈরী করতেন। মাঝে মাঝে দেখতাম গলদঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করে কাজ করার পর আমাদের মেডিক্যাল সেণ্টারের সামনের সবুজ মাঠে গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। গবেষণার চিন্তা যে ওঁর মাথায় সবসময়েই রয়েছে, সেটা ওঁর সঙ্গে কথা বললেই টের পাওয়া যেত। এমনি গল্প করার সময় সবসময়েই অন্যমনস্ক ভাব। তবে বেশী লোকজন থাকলে যেমন গুটিয়ে ফেলতেন নিজেকে, তেমনি অল্প ২।৪ জন থাকলে কখনও কখনও প্রাণ খুলে কথা বলতে পারতেন। একদিন যেমন বললেন, ক্যালিফোর্নিয়া (স্ট্যানফোর্ড) চিরবসন্তের দেশ হলেও এবং ম্যাডিসনে শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হলেও ওঁর ম্যাডিসনই অনেক বেশী ভাল লাগে কারণ উনি ঋতু পরিবর্তন দেখতে চান। শীতকালে সর্বত্র বরফ উনি খুব উপভোগ করেন। ওঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গ দেবার জন্য উনি মাত্র কয়েক বছর আগে বরফে স্কীইং শিখেছেন এবং পরিণত বয়সে সেটা শেখা যে কত শক্ত সেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। স্ট্যানফোর্ডে ওঁর জীবনের আর একটা দিক লক্ষ করলাম। ওঁর পারিবারিক সমস্ত ঝামেলা ও দায়দায়িত্ব ওঁর স্ত্রীর ওপর। ওঁকে কোন মাথা ঘামাতে হয় না এবং মনে হয় চেষ্টা করলেও উনি এইসব ব্যাপারে সুবিধে করে উঠতে পারতেন না। ওর ল্যাবরেটরীর প্রশাসনিক কাজ চালানোর ব্যাপারে ওঁর সেক্রেটারী অত্যন্ত সুদক্ষভাবে ওঁকে অনেক ঝামেলার হাত থেকে রেহাই দেন। আমেরিকার সেক্রেটারী-মহিলারা কর্মদক্ষতায় সত্যই অতুলনীয়। স্ট্যানফোর্ডে খোরানা নিজের জীবনের কিছু কিছু গল্প করেছিলেন আমাদের কাছে। যেমন উনি ভ্যাঙ্কুভারে (কানাডা) যখন এলেন ইংল্যাণ্ড থেকে—নোবেলবিজয়ী লর্ড টডের সঙ্গে কাজ করার পর, ওঁকে কৃষি বিভাগের গবেষণাগারে কাজ করতে হত। কৃষি সংক্রান্ত নানা রাসায়নিক সমস্যার সমাধান তাঁকে করতে হত। এইসব কাজ ছিল রুটিনমাফিক—ওঁর সৃজনশীল প্রতিভার কাছে যেগুলো অত্যন্ত একঘেয়ে মনে হয়েছে। নিজের লাইনে গবেষণা করার সুযোগ পেতেন অবসর সময়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি বারবার মুক্তকণ্ঠে এবং অযাচিতভাবে বলেন, তাঁর সেই সময়ে কিছু সুযোগ্য ছাত্র জুটেছিল (Razzeil, Mofatt, Tener প্রভৃতি) যাঁরা না থাকলে তাঁর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হত না। এই কথায় খোরানা চরিত্রের এই দিকটা বিশেষভাবে মনে পড়ল। পৃথিবীতে অধিকাংশ বিজ্ঞান-গবেষণাই ছাত্রদের হাতে-কলমের কাজে হয়ে থাকে মাস্টার মশাইদের নির্দেশানুযায়ী। খোরানা এত অল্প সময়ে এত প্রচুর কাজ করেছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে তাঁর সব কাজেই তাঁর ছাত্রদের অবদান যথেষ্ট। অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও রিসার্চ সেমিনার এবং লেকচারে তাঁদের নিজেদের ছাত্রদের কাছে ঋণ স্বীকার করে থাকেন, কিন্তু খোরানার বৈশিষ্ট্য—ওঁর একটা নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছে—ওঁর প্রতি বক্তৃতার শেষে দু'তিনটে স্লাইড থাকে, যাতে শুধু ওঁর ছাত্রদের নাম এবং উনি প্রতিটি ছাত্রের নাম উল্লেখ করে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে যান ওঁর কোন্ কাজে কোন্ ছাত্র কি করেছে। এটা একটু আশ্চর্যের বিষয় যে কানাডাতে এবং ম্যাডিসনে আসার পরও বহুদিন ধরে খোরানার সব ছাত্রই নন-আমেরিকান। তবে পৃথিবীর প্রায় আর সব উন্নত দেশ থেকে ছাত্ররা ওঁর ল্যাবরেটরীতে গিয়েছে,

কানাডাতে যাবার আগে খোরানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পেপটাইড্-সংযোজনের ওপর কাজ করেছিলেন টডের ল্যাবরেটরীতে। সেখানে অন্য অনেকে তখন নিউক্লিওটাইড সংযোজনের চেষ্টা করে খুব সুবিধা করতে পারছিলেন না। কানাডাতে এসেই খোরানা সম্পূর্ণ এক নতুন রি-এজেণ্ট (reagent)-এর সাহায্যে এই সব নিউক্লিওটাইড সংযোজন কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে করে ফেললেন। এর পর তিনি আর কোনদিন পেপটাইড-সংযোজনের কাজে ফিরে যান নি। এই নিউক্লিওটাইড সংযোজনের কাজে নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং একাগ্রতার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহু দূরে পিছনে ফেলে এসেছেন, পরেও অনেকে এই লাইনে কিছু কিছু করতে এসেছেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই লাইন ত্যাগ করেছেন। ATP, Coenzyme A প্রভৃতির সংযোজন করেই খোরানা বিখ্যাত হন এবং তখন কর্নবার্গ প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা আমেরিকান বিজ্ঞানী কানাডায় তাঁর ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে যান। তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর খোরানা আমেরিকান রিসার্চ গ্র্যাণ্ট সহজেই পেয়ে যান। এর পর থেকে খোরানার পথ আর কোনদিনই বন্ধুর হয় নি, এই কারণে এবং এনজাইম তত্ত্বে খোরানাকে প্রাথমিক জ্ঞান দেবার জন্য খোরানা কর্নবার্গের কাছে নিজেকে ঋণী মনে করেন এবং দুজনেই পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ভাব পোষণ করেন।

খোরানা শিক্ষা পেয়েছেন জীব রসায়নবিদ্ হিসেবে। কিন্তু তাঁর অবদান জীব রসায়নের চেয়ে প্রাণ রসায়নে কিছু কম নয়। তিনি যা করেছেন, তার লক্ষ্য একটি জীবনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া বোঝা—Molecular biology-র মূল কথা। কর্নবার্গ খোরানাকে বলে থাকেন, "the bio-organic chemist"। খোরানা conventional organic chemist নন আবার সাধারণ biochemistও নন। নিউক্লিক অ্যাসিড, যা জীবন-প্রক্রিয়ার মূল উপাদান, প্রধানত ফসফরাস কম্পাউণ্ড। গোঁড়া জীব রসায়নবিদ্রা এই ধরনের কম্পাউণ্ডের কাজে বিশেষ উৎসাহী নন। Organic phosphorus compound-এর সম্বন্ধে খোরানা আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন, আবার যেখানে organic chemistry অতটা অগ্রসর হয়নি, যেমন ছোট Oligo nucleotide block থেকে বড় polynucleotide তৈরি করা—সেখানে তিনি নির্দ্বিধায় biochemist-এর মত এনজাইমের সাহায্য নিয়েছেন, কোন-রকম গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর লক্ষ্য অবিচল, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে কোন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে তিনি পিছপা নন। Molecular biology-র গবেষণা অধুনা অনেক বেড়ে গিয়েছে। নানাদিকে নানাভাবে নানা system নিয়ে প্রাণরহস্যের মূলকথা বোঝার চেষ্টা করছেন। একই ধরনের উপায় অবলম্বন একাধিক নামী বিজ্ঞানী করছেন। কিন্তু খোরানা তাঁর field-এ একক এবং অনন্য। আর একজন খোরানা এখনও তৈরি হন নি এবং বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনাও নেই।

উদীয়মান শিল্পী নিখিল বিশ্বাস দুই বৎসর পূর্বে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। গত বৎসর তাঁর পত্নী আক্যাডেমি গ্যালারীতে শিল্পীর বিরাট রচনাসম্ভারের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ও সেই উপলক্ষে। গত বৎসর এই স্তম্ভে নিখিল বিশ্বাসের চিন্তাধারা ও অঙ্কনশৈলী বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। সম্প্রতি শিল্পী-পত্নী ও শিল্পীর বন্ধুবর্গ অ্যাকাডেমি ভবনে শিল্পীর ছবির এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। পরিতাপের বিষয় এই যে শিল্পী যখন কলকাতায় পরলোকগমন করেন, তখন পশ্চিম জার্মানীতে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী চলতে থাকে ও তাঁর সেইসব কাজ স্থানীয় সমালোচক ও চিত্রশিল্পীদের কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসালাভ করে। বর্তমান প্রদর্শনীতে শিল্পীর বন্ধুবর্গ ও শিল্পীপত্নী জার্মানী প্রত্যাগত রচনাগুলির মধ্যে থেকে মাত্র ৩০টি পেশ করেন। সুখের বিষয়, কয়েকখানি ছবি বিক্রী হয়ে যায় ও সেই স্থলে আরও কয়েকটি ছবি রাখা হয়।

সমসাময়িক তরুণ শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাবান, তবে একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, তাঁদের মধ্যে নিখিল বিশ্বাসের স্থান ছিল তাঁর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান ও রেনেসাঁ যুগের শিল্পগুরুদের কাজ থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন। রেখাভিত্তিক ড্রয়িংয়ের মধ্য দিয়ে তিনি সমসাময়িক কলাক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি নিজে আজীবন সংগ্রাম করেছেন ও তারই বিভিন্ন রূপ তাঁর চিন্তাধারা ও রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। নিখিল বিশ্বাসের ড্রয়িং অনেকটা গ্রাফিক জাতীয়। সূক্ষ্ম অথচ বলিষ্ঠ রেখাজালের মধ্য দিয়ে তিনি স্বীয় বক্তব্যটুকু সহজে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও অঙ্কনরীতির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব আজ অনেক তরুণ শিল্পীর কাজে দেখা যায়। মৌলিক ও চিন্তাশীল শিল্পী হিসাবে এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। নিখিল বিশ্বাসের মনে আশা ছিল অদম্য—সে আশা রুদ্ধ অন্ধকারকক্ষ থেকে পবিত্র, শুভ্র আলোকপথে যাবার আশা, অনিশ্চয়তার বন্ধজাল থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিশ্চয়তার মুক্ত প্রাঙ্গণে যাবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা। প্রাচীরচিত্র জাতীয় ছবিটিতে (The Seekers) সকলেই তাঁর এই মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে বন্দীবদ ও যীশুখৃষ্ট উল্লেখযোগ্য। দেশবাসীর অধিকাংশই সম্ভবতঃ এমনও শিল্পীর রচনার বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আমার বিশ্বাস, শিল্পীর মৃত্যুর পর যেন সকলে তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব অঙ্কন ক্ষমতা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অবশ্যই কর্তব্য।

ক্রাউনদের মাঝে শিল্পী —নিখিল বিশ্বাস

*

শ্রীমতী অনিমা রায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। ১৯৬১ সালে সরকারী আর্ট কলেজে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন ও ইতিপূর্বে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। শ্রীমতী রায়ের মাধ্যম তেলরঙ। প্রদর্শনীতে তাঁর ২১টি নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পীর রঙের পাত্র নানারঙে পূর্ণ হলেও, মনে হয়, তিনি উজ্জ্বল রঙের পক্ষপাতী নন। শিল্পীর অঙ্কনরীতি বিমূর্ত। প্রধানতঃ কয়েকটি লম্বমান ও সমান্তরাল রেখামাধ্যমে তিনি অঙ্কনক্ষেত্রটি বিভক্ত করেছেন ও সেইগুলিই বিভিন্ন রঙের স্তরভেদে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। কম্পোজিশনে শিল্পীর হাত আছে এবং শূন্যস্থানটুকু তিনি যে ব্যবহার করতে জানেন তাও জানা যায় কয়েক ক্ষেত্রে বিচিত্র আকার ও রঙের তারতম্য সহযোগে তিনি ত্রিআয়তনিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ৫ ও ৬ নং চিত্র উল্লেখযোগ্য। দুই-এক স্থানে শিল্পী পরীক্ষামূলকভাবে নতুন ধারায় কাজ

পেণ্টিং নং ৫ —শ্রীমতী অনিমা রায়
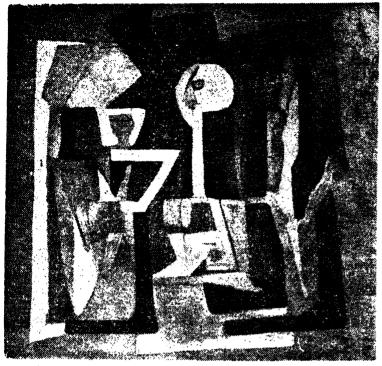
করেছেন, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি সমান্তরাল রঙরেখাজালে বিভক্ত করে নূতনত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। যেমন ২ নং চিত্র। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আবার শিল্পী শূন্যস্থানের গুরুত্বটুকু অবহেলা করেছেন এবং রঙ নির্বাচনেও বিচারবোধের পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে কয়েক স্থলে পৌনঃপুনিকতা দোষ দেখা যায়। অন্যান্য রচনার মধ্যে ১০ ও ১৭ নং উল্লেখযোগ্য।

✻

শ্রীমতী বাসন্তী সেনের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে। ছবি আঁকার দিকে শিল্পীর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, সে জন্য তিনি বাড়িতেই জনৈক পরিচিত শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেন। এটি তাঁর চতুর্থ প্রদর্শনী—এখানে তাঁর ৩২টি রচনা নিদর্শন দেখা যায়। মাধ্যম তেলরঙ বিষয়বস্তু প্রধানতঃ নিসর্গ ও বহির্দৃশ্য এবং স্টিললাইফ।

শ্রীমতী সেন আধুনিক রীতিতে কাজ করেন ও কয়েকটি নিদর্শন দেখে মনে হয় তিনি তেলরঙ ব্যবহারে সুপটু। শিল্পীর রঙ নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে এবং অধিকাংশ স্থলেই তিনি উজ্জ্বল রঙ—বিশেষ করে নীল ও লাল রঙ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে মনে হয় নীল রঙের মধ্য দিয়েই যেন তিনি স্বীয় বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, এই নীল রঙ ও তারই স্তরভেদ সৃষ্টি করে দুই-এক ক্ষেত্রে শিল্পী যেন কাব্য-মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ হিসাবে ডীপ ইন দি উডস্‌ ও লেট অ্যাট নাইট-এর উল্লেখ করা যায়। দুঃখের বিষয় অপরাপর রচনায় কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। দুটি স্টিল লাইফ অবশ্য নজরে পড়ে (২৫ ও ২৬ নং), যদিও অঙ্কনদোষে প্রথমটি ঈষৎ কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। তবে কাজ দেখে মনে হয় শিল্পীর নিষ্ঠা আছে এবং যথাকালে তিনি সাফল্যলাভ করবেন।

কলার রিফ্লেকশন —নকুল দাশ

✻

শিল্পী নকুল দাশের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। ইণ্ডিয়ান লিগ অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স অ্যাণ্ড স্কুল অব আর্টস-এ তিনি পাঁচ বছর শিক্ষালাভ করেন। এটিই তাঁর প্রথম প্রদর্শনী এবং এখানে তিনি ১৮টি রচনা পেশ করেন; শিল্পীর মাধ্যম তেলরঙ, অঙ্কনরীতি আধুনিক। প্রদর্শনীতে বহির্দৃশ্য ছাড়া কয়েকটি প্রায়বিমূর্ত রচনাও দেখা যায়। শিল্পীর অধিকাংশ রচনাই পরীক্ষামূলক। দু-একটি মন্দ লাগে না, যেমন ইমপ্যাস্টো প্রথায় আঁকা কলার রিফ্লেকশন। একটি ছবি সকলের চোখে পড়ে—বোটস। রঙ ব্যবহারের দিক থেকে মনোরম হলেও আর একটি রচনা অঙ্কনদোষে কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত বলে মনে হয় (রিফ্লেকশন)। 'মহামায়া'-র মধ্যে নীরদ মজুমদারের প্রভাব সুস্পষ্ট। কয়েকটি রচনা শিক্ষার্থীসুলভ। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে অবশ্য দুই-একটি ছবিতে শিল্পীর প্রতিভার সন্ধান পাই, তবে রচনারীতি বিষয়ে অধিকতর সচেতন হলে তিনি যে উন্নতির পথে অগ্রসর হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

✻

ফিলিপস সংস্থা পরিচালিত পরিচয় শিশুচিত্র প্রদর্শনীর বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সংস্থার শাখাগুলির কর্মচারীবৃন্দের ছেলে-মেয়েরা এই প্রদর্শনীতে যোগদান করে। ৪।৫ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ১৪।১৫ বছরের ছেলেমেয়েরা প্রদর্শনীর জন্য নানা মাধ্যমে ও নানা বিষয়ে বিচিত্র ছবি এঁকেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সমসাময়িক যুগের নানা বৈশিষ্ট্য দ্বারা কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে প্রদর্শনীটি ঘুরলেই তা বোঝা যায়। যুদ্ধের ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বন্যার তাণ্ডবলীলা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অভিভূত করেছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে চিত্রচর্চাস্পৃহা জাগিয়ে দেবার জন্য ফিলিপস্‌ কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। তবে মনে হয়, এবারে নিদর্শনের সংখ্যা কিছু কমালে প্রদর্শনীর মান উন্নত হত। প্রদর্শনীতে যে সব ছেলেমেয়েদের কাজে নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সরোজা শ্রীখণ্ডে (বঃ ১১), অরুণ কাপুর (বঃ ৬), বিলাস লক্ষ্মণ ক্লাসওয়াজে (বঃ ১৬), বীণা মজুমদার (বঃ ১৩), প্রদীপ ভট্টাচার্য (বঃ ১৫), প্রফুল্ল গুপ্ত (বঃ ১৪) ও পেগি কাপাডিয়া (বঃ ৯)-র নাম করা যায়।

—চিত্রপ্রিয়

একখাটে শুয়ে গল্প করবে না? রেখা যেন ওর দু'খানা ডানাই কেটে দিয়েছে—'

'ওমা! মেয়ে হয়েছে, বউ হয়েছে—চিরদিন তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে? সে কখনো হয়?'

'আমি তো বদলাইনি!'

'তোমার কথা আলাদা।' তারপর থেমে থেকে বলেছে, 'তুমি যত ভাইকে ভালবাস, ভাই তোমায় তত ভালবাসে না—'

এইখানে কুবেরের ইচ্ছে হয়েছে, চেঁচিয়ে বলে ওঠে—তুই থাম মাগী। কতখানি জানিস আমার ভাইকে? বিষম খেলে নগেনের বুক লাল হয়ে ওঠে, জামার ভেতর দিয়ে আমি দেখতে পাই, তুই জানিস এসব? কিন্তু বলতে পারেনি কুবের। বিয়ে করা বউ, ছেলের মা বুলু, আরও একটা পেটে এসেছে। জীবনের মাঝখান থেকে শেষ অব্দি এই অন্য আরেকজনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে। কড়ি খেলার সময় মনেও আসেনি এসব কথা। এখন অবলীলায় বিবেকবাণী ঝাড়ে। নগেন, বীরেন, মা, বড়দা, বাবা, বড় বউদি—এসব মেলায় কেনা মাটির পাখি নয়। রঙ্ চটে গেলেও তা কুবেরের নিজের জিনিস।

মন সেকেণ্ডে গ্রহতারায় চলে যায়। পলকে এসব মনে এসে মনেই ডুবে গেল কুবেরের। রেখাকে বলল, 'যত টাকার টিকিটই লাগুক না কেন—সবাই যাব—'

মা বলল, টাকাগুলো নষ্ট করিস নে। বুলু আট মাস পোয়াতি। সামনে তোর অনেক পয়সার দরকার হবে। কুড়িটা টাকা দে। দশ টাকার বাজার করাই—দশ টাকার একখানা পাটি আনাবো হরগঞ্জ বাজার থেকে। রাতে তোদের গা কুট কুট করে।'

'সিলি! যত আর্থলি ব্যাপারে সারাদিন জড়িয়ে আছো! এখন তোমার গীতা চণ্ডী আওড়ানোর সময়—'

মা'র শেষকালের ছেলেগুলো বেশি ছাড়া ভাবে মানুষ হওয়ায় যা-ইচ্ছে বলে মাকে। তবে হাসতে হাসতেই বলে।

বীরেন বলল, 'সেঝদা এখন রিচম্যান—' দেবেন্দ্রলালের বড় ছেলের পর এক ছেলে ছিল। সে আর নেই। তাকে হিসেবে ধরেই কুবেরকে ছোটরা সেঝদা ডাকে। বীরেন ডিউটিতে বেরোচ্ছিল, হেসে বলল, 'সেঝদার কাছে এখন একশো টাকার নোট ইকোয়াল টু এক পয়সা। ভালো কথা, তোমরা তো সিনেমায় যাচ্ছ—আমাকে ফাইভ রুপিস দেবে?'

একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরতে ছোট বউমা ডলি ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'ওকে দেবেন না সেঝদা, সব উড়িয়ে আসবে—আমাকে কিছু দেবে না—'

'তাই তো চাই! ওড়ালেই আসে। যত ওড়াবে তত একশো টাকার নোট তোমার ছাদে উড়ে উড়ে এসে পড়বে সারা রাত ধরে। সকালে শুধু কুড়িয়ে নিতে হবে ডালা করে—', বলতে বলতে কুবের মার হাতে বুক পকেট থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে দিল।

দেবেন্দ্রলাল ছেলেদের গোলমাল থেকে আলাদা হওয়ার জন্যে খবরের কাগজে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় দেখছিল। আর থাকতে পারল না, 'মূর্খ! আমার এই ছেলেটা মহা মূর্খ। টাকা রাখতে শেখ। জীবনেও কষ্ট পাবি না।'

'রিকোয়ার মানি?'

দেবেন্দ্রলালের গম্ভীর মুখের ওপর একখানা একশো টাকার নোট ভাঁজ করে উঁচু করে ধরল কুবের, 'এনি অ্যামাউন্ট ইউ লাইক?'

কানে শুনতে পায় না দেবেন্দ্রলাল। আন্দাজে হাসল, তারপর 'দেখি' বলে নোট-খানা টেনে নিল, 'বাড়ির ট্যাক্স বাকি সাতাশি টাকা—'

নগেন এগিয়ে এল, 'তেরো টাকা ফেরত দাও সেঝদাকে—'

'রাখ! বাজারে আমার লাগে না—'

তা লাগে। কোথায় কোন্ জিনিসটা ভাল, জন্ম ইস্তক ছেলেদের খাইয়ে আসছে দেবেন্দ্রলাল। কুঠিঘাটার ইলিশ, সাঁত্রাগাছির ওল, অনেক আগে সাতক্ষীরের গজাও কিনে এসেছে ছেলেদের জন্যে। তখন নাভারোন থেকে বাসে যাওয়া যেত। একবার ভেতরে জায়গা পেল না দেবেন্দ্রলাল। একজন মৌলবী সাহেবের সঙ্গে বাসের ছাদে বসে ধুলো খেতে খেতে একাশি মাইল এসেছিল দেবেন্দ্রলাল। সঙ্গে গজার হাঁড়ি। সাবধানে আঁকড়ে বসেছিল।

নগেন ক্ল্যাপ দিয়ে উঠল, 'লার্ড সেঝদা! জবাব নেই! লা-জবাব!'

কথাটা একসঙ্গে দু' ভাই হিন্দি সিনেমা দেখতে গিয়ে শিখেছিল। কত কাল একসঙ্গে সিনেমা দেখে না। বুলু বলে, বিয়ের পর ভাই ভাই আলাদা হয়ে যায়। জীবন অন্য রকম হয়ে যায়। সেটাই নাকি স্বাভাবিক। শুধু কুবেরই নাকি অস্বাভাবিক।

বিয়ে হয়ে গেলে কচু হয়। আমি, নগেন, বীরেন, মা, ছোড়দি—সবাই কেরোসিনের কাঠের দু'খানা খাট জোড়া দিয়ে শুতাম। বাড়ি ভাগাভাগি হয়েছে সবে। বাবার চাকরি নেই। বড়দা শুধু রোজগেরে। আশিজন পাওনাদার ছোঁক ছোঁক করছে। স্কুল কলেজে মাইনে বাকি, রেশনের টাকা থাকত না—ভোরে ঘুম থেকে উঠলে পিঠ ব্যথা করত। সারা রাত এক কাতে শুয়ে না ঘুমোলে জায়গাই হত না। তবু তখন কত শান্তি ছিল।

'রেখা তুমি তো কিছু চাইলে না?'

'খাঃ! আমি আবার কি চাইব! সব সময় তো দিচ্ছেন—'

সব সময় কুবের দিচ্ছে না—একথা কুবেরের চেয়ে ভালো আর কে জানে।

সবাইকে দিতে ইচ্ছে করে ঠিকই। কিন্তু আগের চেয়ে প্রয়োজনগুলোও এখন বেড়ে গেছে জীবনে। কুবেরকে লোকে আজকাল চালাক, ধুরন্ধর, চতুর, ঘুঘু কত কি ভাবে। কেউ জানে না কুবের সাধুখাঁর মত বোকা আর কেউ নেই। টাকা আসছে ঠিকই—কিন্তু তা ষোল আনা ধরে রেখে নতুন নতুন জায়গায় লাগানোর মত ব্যবসায়ী বুদ্ধি বা ধৈর্য তার নেই। হরিরাম সাধুখাঁর অয়েল পেন্টিংখানা আজও দরদালানে টাঙানো আছে। তীক্ষ্ন চোখ, সিংহ নাশা, চ্যাটালো বুক—এই মানুষটি সাধুখাঁ বংশে প্রতিপত্তি এনেছিল। বাড়ির লাগোয়া নফর মহল তৈরি করেছিল—আস্তাবলের ঘোড়া বছর বছর পালটাতো।

রেখার সঙ্গে ভাসুর হয়ে তর্ক করা যায় না হয়ত মিতব্যয়ী। হয়ত তবস্থা বুঝে আবেগ চেপে চলতে অভ্যস্ত।

এখন কুবেরের সামনে সারাটা জগৎ নানান রঙে ভর্তি হয়ে উঠেছে। কে জানতো তাকে একদিন টাকার হিসেব রাখতে ডাইরি করতে হবে— লিখে রাখতে হবে। সাতটা ব্যাংকে বুলু আর তার নামে সাত দুগুণে চৌদ্দটা অ্যাকাউন্ট। কোনোটায় চেক জমা পড়ে—কোনোটায় নগদ। মাসের ছ' তারিখ অবধি টাকা থাকলে সুদ হয়। সুদের তোয়াক্কা না রেখে কুবেরকে মাঝে মাঝে ছ' তারিখের আগেই টাকা তুলতে হয়। জমি কেনার সময় সুদের কথা ভেবে টাকা ফেলে রাখা যায় না। হাজরার মোড়ের ব্যাংকে চেক জমা দেওয়ার কাউন্টারের ছেলেটি কয়েকবারই বলেছে, এভাবে টাকা তোলেন আপনি—শুধুই সুদ হারাচ্ছেন শুধু শুধু। বুঝিয়ে বলা যায় না। দশ কিংবা কুড়ি বছরে ব্যাংক যা সুদ দেবে তার চেয়ে অনেক বেশি বহরিডাঙায় গিয়ে একটা জমি কোবালা করে দিলেই হাতে আসবে।

'আপনি খুব বড়লোক হয়ে গেছেন সেজদা—'

রেখার কথায় হাসল কুবের। বড়লোক হয়নি। বড়লোকের কোন মাপ নেই। সাইজ নেই। একদা সে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত। গম্ভীর গলায় 'স্টাফ' বলে ট্রামে কণ্ডাক্টরকে এড়িয়েছে। আচমকা তার আন্দাজে কেনা জায়গা হাত বদলের যোগাযোগে প্রায়ই তাকে টাকা দিচ্ছে। নগেন জানেনা কুবের কত টাকা নাড়াচাড়া করে ইদানীং। এখন তার পকেটে কত টাকা আছে বীরেন জানে না। গত কিছুকালে দশ-বারোটা প্লট কোবালা করে দিয়ে কত টাকা ব্যাংকে ফেলে রেখেছে বুলুও জানে না। লোকে অভাবের কথা বলে, দেশের কথা বলে, আকাশের বৃষ্টি দেখে ফলনের কথা বলে—এসব কদমপুরেও শুনেছে কুবের। কিন্তু মাথায় কিছুই ঢোকে না তার। চোখের সামনে থালপাড় দোলে শুধু। ফ্রন্টেজ দু' হাজার ফুট কেনার পর

আপনি খুব বড়লোক হয়ে গেছেন

এখন পেছনের জায়গাগুলো কুবের ছাড়া আর কেউ কিনতে পারবে না।

'এবার বাড়ি শুরু করব রেখা। সেখানে আমরা সবাই আরামে থাকব।'

হেলতে দুলতে বুলু ঘরে ঢুকল, হাতে বেকন, 'পরে বাড়ি কোরো। এখনকার মত একটা পাখা ভাড়া কর। নইলে ওই ঘরে আর শোয়া যায় না। ফাঁকা বারান্দায় মা শুয়ে থাকেন রাত—গরমে শুধু এপাশ-ওপাশ করেন, চোখে দেখা যায় না।'

রেখা বলল, 'ইনস্টলমেন্টে পাখা পাওয়া যায়—'

সিগারেট কিনতে দেওয়ার মত হিপ পকেট থেকে আটখানা একশো টাকার নোট বের করে নগেনকে দিয়ে কুবের বলল, 'তিনটে পাখা আনবি—আটচল্লিশ ব্লেড—'

'লর্ড! তোমার কমপ্যারিজন হয় না সেজদা। এত টাকা পাচ্ছ কোত্থেকে—'

'আমার গায়ে সেধে আসে রে!'

বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। বীরেনের বেরোনো হল না। দেবেন্দ্রলাল হাতে টাকা পেয়ে বাজারে চলে গেছে। নগেন পাড়া ছাড়িয়ে বড় রাস্তার দোকানে পাখা কিনতে বেরোনোর আগে জানতে চাইল, 'সত্যি বাড়ি করবে সেজদা? সেতো অনেক টাকা। তোমার আছে?'

'সব নেই। আবার আসবে—'

মা বীরেনকে মোড়ের দোকান থেকে টাকা দিয়ে সন্দেশ আনাতে পাঠালো। বাড়ির বিগ্রহে মিষ্টি দেবে। প্রথমবার মাইনে হবার পর এক টাকার সন্দেশ চড়িয়েছিল মা। তখন নগেন, বীরেন পড়ে। বড়দার ওপর পুরো সংসার। সেই সময় কুবেরের মাস মাইনের টাকা হাতে পড়তেই খুব কাজে দিয়েছিল। বদলির চাকরিতে বড়দা এখন বাইরে বাইরে থাকে। আগের মত আর চাপ নেই। মাসখানেক হল চুলে কলপ দিচ্ছে রবিবার রবিবার।

বুলুর হাতে বাকি টাকা রাখতে দিয়ে নোট বইটা চাইল।

'আজ কে টাকা দিল?'

নামের পাশে টাকার অংক লিখতে লিখতে বলল, 'রেফ্রিজারেটর কোম্পানির সেই মিস্টার বোস অ্যাডভান্স করল—সামনের হপ্তায় রেজিস্ট্রি।'

'এই শরীরে আমি বহরিডাঙা যেতে পারব না—'

'কষ্ট করে যেতে হবে বুলু। নাহলে লোকে আমাদের টাকা দেবে কেন?'

'তুমি আমার শরীরের দিকে একটুও তাকাও না। ছেলেটার স্বভাব কেমন হল বাপ হয়ে একবার ফিরেও দেখলে পার। আকাটে—দামি দামি জামা পরছে, ছিঁড়ছে—কোন কিছুর মূল্য বোঝে না—'

'এক গ্লাস জল দেবে।'

'দু দিচ্ছি। তুমি যে কি হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন—'

'খারাপ হয়ে গেছি?' তারপর কি ভেবে কুবের বলল, 'বিয়ের সময় কত মাইনে পেতাম আমি—'

'নব্বই টাকা প্লাস ডি এ কত যেন—ঠিক মনে নেই।'

'আরও অনেক জিনিস ভুলে যাবে বুলু। আমি কিন্তু সব মনে রাখি। তুমি আসবার আগে আমি ষাট টাকার একটা কাজ পেয়েছিলাম। বড়দার একার আয়ে আর সংসার চলে না। সেই চাকরি পাওয়ার খবর শুনে মা কেঁদে ফেলেছিল। টাকা জিনিসটাই মজাটা। কখন যে কার ঘরে থাকবে তার ঠিক নেই। এমনভাবে আসছে—আমারই এক এক সময় ভয় করে। ফাঁকা লাগে—'

'তাই বলে ছেলেকে দেখবে না। বউকে দেখবে না? মাসে মাসে ঘুরে বেড়াবে? বহরিডাঙা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে মুহুরিদের সঙ্গে কাটাবে। অফিসেও যাচ্ছ না—'

'আর যেয়ে কি হবে?'

'মাস গেলে মাইনে দেয়। পুজোয় বোনাস দেয়—'

'আমার আর ভাল লাগে না। প্রোডাকসন বোনাস একশো সাঁইত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ—তাই নিয়ে চুলচেরা গজালি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হিট অ্যালাউন্স বাহাত্তর টাকা পঁচাশি পয়সা হবে, না তিরাশি পয়সা হবে—তার কুট-কচালি—বোরিং—'

'এক সময় তো এ-ই কত লোভের ছিল! তাই না?'

'লোভ একটু একটু করে মরে বুলু—', নিজের বৌর মুখে ঢলঢল ভাব দেখে শান্তি পেল কুবের। তারপর খচ করে বলে দিল, 'খোকনকে ভাল জিনিস নষ্ট করতে দিয়ে যাও—তাহলে দামি জামা, ভালো খেলনা,

ছবির বইতে আর লোভ থাকবে না—'

'ও কি কথার ছিরি! তোমার কি কেউ নেই। এমন করে বল কেন?' কুবেরের হাত থেকে জলের গ্লাসটা নিতে নিতে বুলু বলল, 'আমার অত বৈরিগিপণা নেই বাপু—খাবো, থাকব, সুখ করব, বয়স হলে মরে যাবো—'

'আমার কত লোভ মরে গেছে বুলু। এখন কত টাকা আসে—সব তুমিও জানো না। আমার মনে হয় ঘুড়ি লুটছি—হুই

নগেনকে পেছনে নিয়ে কোমর ধরে ছুটতাম

হুই করে ট্রাম রাস্তা ধরে ভোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছুটছি। মাঞ্জা দেওয়া সুতোর হাত কেটে যাচ্ছে—তবু ছুটছি। আজকাল একশো টাকার নোটের গোছা ব্যাংকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জমা দেওয়ার আগে লোটা-ঘুড়ির মত পর পর সাজিয়ে নিই। জানি এগুলো আমার নয়।'

'ছোটবেলায় ঘুড়ি ধরেছ?'

'কোনদিন পারিনি। আঁকসি ছিল না। প্যান্টে বোতাম থাকত না, গায়ে জামা না। নগেনকে পেছনে নিয়ে কোমর ধরে ছুটতাম। শুধু একবার একখানা পেয়েছিলাম—'

বুলু হাসি চেপে তাকিয়ে আছে দেখে কুবের উৎসাহ পেল, 'একখানা কাটা ঘুড়ি দুলতে দুলতে গিয়ে পুকুরে পড়ল। সবাই ছুটে এসে পুকুর পাড়ে থমকে দাঁড়াল। নগেনকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কোন কম্পিটিটর নেই। ঘুড়ি-খানার কোঁণফট্টাশ দশা। কাগজ জলে গলে গেছে—'

'কি করলে?'

'তাই নিয়ে পাড়ে উঠলাম বীরদর্পে। সুতো গুটিয়ে নগেনের হাতে দিলাম। আমার জীবনে অন্তত একবার ঘুড়ি লোটার দরকার ছিল বুলু। একবার আমাকে টাকার শেষ দেখতেই হবে। ঘটির তলায় কি আছে আমি জানবোই।'

আড়াইখানা ঘরের এককোণে নারায়ণ। ঠাকুরমশাই পুজোর পর আরতি দিয়ে নৈবেদ্যর থালা কখন নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। রেখা মেয়ের দুধ জ্বাল দিচ্ছে ফালি বারান্দায়। স্টোভের পলতে নেই বলতে নেই। ডলি বি টি পড়েছিল। স্কুলে কাজ পায় না। চাইল্ড এডুকেশন পড়েছিল। বাচ্চা চায়। ডাক্তার দেখানো দরকার। বীরেন সময় পায় না। ডলি তার পার্টিশন করা ঘরের জানলা দরজায় যবনিকার স্টাইলে খালি খালি পর্দা টানাচ্ছে। পাশেই শরিকানি একখানা ঘর চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে সেখানে নগেন আর রেখা থাকে। রাতে ফালি বারান্দায় মা আর বাবা থাকে। তাল-পাতার পাখা নাড়ার আওয়াজ বড় ঘরখানাতে শুয়ে শুয়েই রোজ রাতে শুনতে পায় কুবের।

'এখন তোমাকে দেখলে ইরা নিশ্চয় বিয়েতে বসত—'

মেয়েলোকের চপল হওয়ার বিষয় ওই একটাই। বিয়ের আগেকার কিছু স্মৃতি, কিছু কাহিনী। ছাড়াছাড়ির সময় অল্প বয়সে মনে হয়, ওঃ! এসব কথা কোনদিন ভোলা যাবে না। তারপর এমন অবস্থা হয়, হাজার চেষ্টা করেও ইরার মুখখানা অবিকল মনে পড়ে না। অথচ আগে কত খুঁটিনাটি মনে থাকত। মনে হত, কোনদিন ভুলবো না। এখন ব্যাপারটা প্রায় শীত-কালের দাঁতের কামড়ের মত। গরমকালের কোন চিহ্ন নেই। ঠান্ডার দিনে হঠাৎ এক-একদিন টন টন করে ওঠে শুধু।

'বিভূতিও তোমাকে দেখলে নিশ্চয় হিংসে করত—'

'তা করতে যাবে কেন? বেশ আছে বৌ নিয়ে বেহালায়—'

'তাতো আছেই। তিনটি মেয়ে। এই বাজারে আড়াইশো টাকা মাইনে। রোলিং ক্লার্ক। অফিসের পরেও বড়তলা থানার পাশে এক কোম্পানির খাতা লিখে দিতে যায়—'

'তুমি এসব জানলে কোত্থেকে? খোঁজ-খবর কর বুঝি—'

'দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। লাল আলোতে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল। দেখি সামনে দিয়ে যাচ্ছে। বাসে প্যাসেঞ্জার বোঝাই। উঠতে পারছে না। ডেকে পৌঁছে দিলাম। তখন সব বলছিল—'

'আর কি বলল?'

'ভয় নেই। তোমার কথা তোলেনি।' মজার ঘোরে কুবের বলল, 'আচ্ছা তোমাকে তিন বছর গান শিখিয়েছিল?'

'বিয়ে হয়নি, বয়স বেড়ে যাচ্ছিল। মন খারাপ থাকতো। তখন পাড়ার ক্লাবে কোরাস গাইতে গিয়ে একসঙ্গে গান করেছি। একদিন বৃষ্টির রাতে জল ভেঙে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল—গলির মধ্যে হাত টেনে নিয়ে কি যেন বিড় বিড় করে বলতে শুরু করল, আলো নেই, আমি হাত টেনে নিয়ে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেছি। অন্ধকার বারান্দা। উঠে পেছন ফিরে দেখি আমাদের খোলা দরজার সামনে ভূতে পাওয়ার মত বিভূতি দাঁড়ানো—'

'কোঁকড়া চুল বিভূতির—তোমার ভাল লাগতো—'

খুক করে হেসে ফেলল বুলু, 'তা লাগত। যারাই মেয়ে দেখতে আসে তারাই এটা চায় ওটা চায়। দাদা কোত্থেকে দেবে? বাবা থাকলে না হয় হত। কে তা বুঝবে। তখন যে কোন একজন হলেই ভালো লাগত। আমি টিউশনি করে হারমোনিয়ম কিনেছিলাম। বিভূতি স্বরলিপি তুলতে জানত—'

শুধুই স্বরলিপি তুলে দিত।'

'আবার কি! তুমি তো কতজনের সঙ্গে কত কি করেছ। আমি খোঁজ নিতে গেছি—'

'আমি খুব কিছু করিনি বুলু। মিশেছি অনেকের সঙ্গে। দুচারজনের সঙ্গে চলাচলির জোগাড় হয়েছিল। কিন্তু তখন আমি কনফার্মড্‌ বেকার। কারও সঙ্গে জমত না। নেশার মত জড়িয়ে পড়েই কেটে গেছি—', হঠাৎ কুবের বলে দিল, 'বুলু—বিভূতি চুমু খেয়েছিল—'

'চুমুর মত করেছিল—মুখ কাছে এনে সেরকম করতে চেয়েছিল—'

'তুমি ঠোঁট বুজেছিলে—তাই না—'

'কেন খুঁচিয়ে পাগল করছ। আমি তো কিছুই লুকোইনি তোমাকে। আমার এসবে কিছুই হত না। এক-একদিন অনেকক্ষণ বসে থাকত। হেরিকেনের আলো—চিমনি কালো হয়ে এসেছে হলদে কেরোসিনে। দাদা বাজার করে ফেরেনি। বৌদির বাচ্চাগুলো না খেয়ে ঘুমোচ্ছে। বিভূতি কখন উঠবে বলে বসে আছি। উঠলেই ছাতু আর গুড় মেখে খেতে বসব। একদানাও চাল থাকত না কোন কোন দিন। তিন টাকা, সাত টাকা সব টিউশনির রেট—পাঁচ বাড়ি ঘুরে যা-পেতাম তাই জমিয়ে জমিয়ে লাল পাথরের ডুমো বসানো একটা হার গড়িয়েছিলাম দেড় বছরে—,' হঠাৎ থেমে দম নিল বুলু। বিকেলের ট্রামে একরকমের শব্দ হয়। তার মাঝখানে ফিরে

বলল, 'তখন চাকরি পেলে ইরার সঙ্গে নিশ্চয় বিয়ে হয়ে যেত তোমার।'

'তা হত। ডিপ লাভের পিরিয়ড যাচ্ছিল তখন। দুশো টাকার একটা চাকরি পেলে অন্য রকম হয়ে যেত। শেষদিকে আর পাঁচটা হিসেবি মেয়ের মত বলতে শুরু করল—আমার সঙ্গে তোমার খাপ খাবে না। আমি একভাবে মানুষ—তুমি একভাবে মানুষ। বুঝতে পেরেছিল, আমি শীগগির কোন চাকরি পাচ্ছি না।'

'কষ্ট হত তোমার?'

'তা হত বলে। কিন্তু কিছু করার ছিল না। অবশ্য এমন কষ্ট আমার ভুলতে দেরিও লাগত না। ইরার বাবা পাকিস্তানে [illegible] ব্ল্যাক করে অনেক টাকা করেছিল। কলকাতায় দুখানা বেনামা বাড়ি। তারপর [illegible] আলিপুরে নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল—

'কষ্ট ভুলে গেছে?' 'আমার কিন্তু [illegible] মন খারাপ থাকত। [illegible] ভীষণ [illegible] ছিল। [illegible] চাকরিতে [illegible] আমাকে বিয়ে করতে ভয় পেয়েছিল। [illegible] কেটে পড়ল। আমার তো [illegible] খারাপ হয়ে গেল—

[illegible] আমি [illegible]। তোমাদের [illegible] আলাপেই হাত চেপে ধরলাম [illegible] তুমি দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিলে। [illegible] একরকমই করতাম বলে। অংকের মত একজনের পর একজনের সঙ্গে মিশতাম। সবাই যে যার জীবনের জায়গায় বসে [illegible] শুধু আমিই সিট পাইনি। [illegible] তখন ইনসালেটেড হতে এত ভাল লাগে।'

'ইরার হাত চেপে ধরতে?'

হো হো করে হেসে উঠল কুবের, 'হাত [illegible] জোড়াজড়ি করেছি কত। তখন তো কলকাতায় এমন খালি বাড়ির সন্ধান [illegible] ইংরাজি মাসের গোড়ার দিকে ওর ছিল পিরিয়ডের সময়। লাল [illegible] শাড়ি পরে আসত। তখন কি [illegible] বলত। গলার স্বর বড় মিষ্টি ছিল। [illegible] যায় বিভাবরী—এমন [illegible] জোর দিয়ে বুকের সুধা বল, [illegible] সব উঠে আসত। দোষের [illegible] নাকটা কিছু মোটা ছিল, কিন্তু [illegible] গাঢ় গম্ভীর চোখ দিয়ে সে-খুঁত [illegible] দিয়েছিল। চুমু খাওয়ার সময় [illegible] এ মেয়েকে আমি ভালবাসব [illegible] পরে হয়ত সব গুবলেট হয়ে যাবে —কিন্তু ভালবাসা হবেই। চুমু খেয়েই বুঝেছিলাম—'

'কেমন করে?'

'যেমন করে তোমাকে বুঝেছিলাম। [illegible] মধ্যে জোর করে চুমু খেয়েই বুঝলাম তোমার সঙ্গে ভালবাসা হবে। তবে সময় লাগবে। আসলে বিয়ের পর আস্তে আস্তে তোমাকে ভালবেসেছি বোধ হয়—অথচ লোকে বলত আমাদের লাভ ম্যারেজ—'

'বুঝলে কি করে—'

'চুমু খেয়ে সুগন্ধি লাগলেই জানতাম। তোমার আগে শুধু ইরাকেই তেমন লেগেছিল। এক-একজনকে এমন বিচ্ছিরি লেগেছে চুমু খাওয়ার পর—কি বলব—কিন্তু সেই মোমেন্টে তো পিছোনো যায় না। আমাকে তখন গাড়িভাড়া দিয়ে করুণা করে মেয়েরা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রেম করাতো, প্রেমের ডায়ালগ শুনতো। আমারও কোন চাকরি ছিল না, কাজ ছিল না—জগতটাই শুকনো—আমি তখন প্রায় মেয়েমানুষের নাঙ্‌ হয়ে উঠেছি।'

'মানে?'

'ও তুমি বুঝবে না—'

'বলোই না—'

'কেপ্ট বোঝ? পুরুষলোক পয়সা হলে রক্ষিতা রাখে। আমি তখন মেয়েদের রক্ষিত—সস্তার নাঙ্‌! লাভমেশিন বলতে পার—ঘোরে থাকতাম—সামনে সব কিছুই ধুধু করছে—'

'ভালোই ছিলে বলতে হবে!'

'চমৎকার! শুধু মন খারাপ লাগত—এ আমি কি করছি। সকালে কৃষ্ণা। বিকেলে তৃষ্ণা! সন্ধ্যায় আরতি—এরকম কত কি!'

'বিবেক কামড়াতো তাহলে!'

'আফটার অল হিউম্যান বিইং। কামড়াবেই। আর বয়স বা কি ছিল। তখনকার কুবের সাধুখাঁকে এখন দেখতে পেলে আমি নিজেই টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতাম। দেখলে মায়া হত। বলতাম—ব্রাভো ইয়ংম্যান! খুব হয়েছে। অনেক পরিশ্রম করেছ। এই নাও দশ হাজার টাকা। এবার খেয়ে দেয়ে দরজা আটকে ঘুমোও গিয়ে। কেউ ডিসটার্ব করবে না। তোমার সব চিন্তা আমার—'

'খুব পরিশ্রম হত বল!'

'হবে না? বৃষ্টির দিন। একটা গেঞ্জিও শুকোয়নি। মার সাদা ব্লাউজ পাঞ্জাবির নীচে। পুলিশ অফিসারদের সাত তলা ফ্ল্যাটবাড়ির পেছনে আলিপুরের দিকে গাছপালা ঘেরা একটা মাঠ ছিল। ইরার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ভালো ভালো কথা বলছি—মাথা নীচু করে ইরার তিন তিনটে চুমু খাওয়া হয়ে গেছে—আমি তখন নন্দনকাননের পুকুরে চিৎ সাঁতার দিচ্ছি প্রায়—এমন সময় ইরা আমার বুকে ভালবাসার হাত বোলাতে গিয়ে গায়ে গেঞ্জির বদলে মার ব্লাউজ আবিষ্কার করে গল গল করে মাটিতে ভেঙে পড়ে হাসতে লাগল। হঠাৎ এক সঙ্গে অনেক হাসির শব্দ—কথা—তড়াক করে দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। পুলিশ অফিসারদের সেই ফ্ল্যাটবাড়িটার সব ফ্লোরেই পেছনের ঝুলবারান্দায় মেয়েপুরুষ দাঁড়ানো। এতক্ষণ তারা বিনে পয়সায় সিনেমা দেখছিল। এবার একটা হাসির সিনে সবাই হেসে উঠেছে।'

'কি করলে?'

'আমরা দু'জন মাথা নীচু করে সবার চোখের সামনে দিয়ে মাঠ পেরোলাম। মাঠ যেন আর শেষ হয় না। রাস্তায় উঠে ইরাকে চাঙ্গা করার অনেক চেষ্টা করলাম। ততক্ষণে আমার কেস হোপলেস্। পৃথিবীতে আমাদের আড়াল করার একটা শেড্ নেই। বিশেষ করে আমার নেই। ইরা বলল,—'একটা কাজ জোটাতে পার না—কতলোক চাকরি করে।' এত স্যাড্—করুণ হয়ে গেল বিকেলটা! তারপরেই মেয়েটা এক ডাক্তার জুটিয়ে বিয়ে করে ফেলল। বিলিভ মি আমার কোন কষ্ট হয়নি। অথচ মজা দেখ সেই ডাক্তারকে নিউ আলিপুরের বাড়িতে ঘরজামাই রেখে নার্সিং হোম করেছিল ইরার বাবা। অনেক টাকা আসবে। কিন্তু ওপাড়ার বাসিন্দারা কচি ধন্বন্তরীতে বিশ্বাস করে না। তারা ছোটে ঘাঘু ডাক্তারের খোঁজে। বেচারার নতুন নার্সিং হোমে ওষুধ নিতে আসে তারাতলার লেবার ক্লাসের লোকজন। তারা ওষুধের দামই বাকি রাখতে চায়। অতএব ইরাকে স্কুলে চাকরি নিতে হল—'

'তুমি এত খোঁজ পেলে কোত্থেকে—'

'কঠিন না। আমাদের কারখানার গুপ্তর বৌর সঙ্গে একই স্কুলে পড়ায় ইরা। তার কাছে বলেছে—বর যতদিন নিজের পায়ে না দাঁড়াচ্ছে—ততদিন কোন বাচ্চা আনবে না। বরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্যে স্কুলে কাজ নিয়েছে।'

'মিসেস গুপ্ত জানলেন কি করে—ইরা তোমাকে চেনে?'

রীতিমত জেরার ভঙ্গী দেখে হাসি পেল কুবেরের। 'ন্যাশনাল মেটালস্ নাম শুনে ইরাই আমার কথা জানতে চেয়েছিল গুপ্ত বৌদির কাছে। তিনিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব কথা বলেছেন। ভাল কথা—বিভূতি বেহালায় আছে জানলে কি করে?'

'বাঃ! তোমার সামনেই তো বলল।'

তা ঠিক। বিয়ের বছর দুই পরে কুবের একদিন কারখানার টাইম অফিসে শুনল বিভূতি নামে কে এক ভদ্রলোক তার জন্যে দু'ঘণ্টা বসে থেকে ফিরে গেছে। বলে গেছে পরদিন আসবে। রাতে বাড়ি ফিরে বকুলকে নামটা বলতেই, বকুল বলেছিল, 'ওঃ! আমাদের পাড়ার ছেলে ছিল—'

পরদিন অফিসে বিভূতির সঙ্গে দেখা হল। প্রথম আলাপেই জানালো, বকুলদির বরের সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছে। বকুলকে দিদি বলতেই কুবের বুঝল, এই পাতলা আড়ালটুকুর দরকার ছিল না কোন। বরং ছেলেটাই ধরা পড়ল নিজের কথায়। বকুলের চেয়ে কোনমতেই ছোট না। সেণ্ট্রাল আর নর্থ ক্যালকাটার বাইরে বছর দশ পনের আগেও পাড়ার মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা করতে এসে নরম নরম ছেলেরা প্রথমেই দিদি পাতাতো। হঠাৎ ধরা পড়লে পাড়ার ছেলেদের হাতে আড়ং ধোলাই হওয়ার মুখে ওই ডাকটুকুই লাভারদের কাছে বিপদের মাঝে লাইফ বয়া হয়ে দেখা দিত।

ছোকরার ইচ্ছে ছিল বকুলদির বরকে দেখে। ছোকরার ইচ্ছে ছিল বকুলকে একবার দেখে। অনেকদিন দেখেনি। নানান জনের ভালবাসার নাড়ু কুবের সাধুখাঁ বিশেষ মজা পেয়েছিল। কিছুই মনে করেনি সে। কিছু না জানিয়ে বিভূতিকে একেবারে বসবার ঘরে এনে বসিয়ে তবে বকুলকে ডেকেছিল কুবের, 'দেখবে এসো—কে এসেছে—'

খোকন হওয়ার পর যেমন স্যাঁতকার মত হয়েছিল বকুল। আচমকা ঘরে ঢুকেই বকুল প্রথমে বোবা হয়ে গিয়েছিল, তারপর অনেক কষ্টে বলেছিল, 'কি ব্যাপার—'

ছেলেটাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। কুবের মিষ্টি আনার নাম করে পাড়ার দোকানে গিয়েছিল। কোন সন্দেহবাই তার মনে নেই। একটা মজা শুধু। তবে কঠিন মজা। রসগোল্লা খেতে গিয়ে গলার আটকে গিয়ে প্রচণ্ড বিষম লাগল বিভূতির। বকুল উঠল না। কাঠ হয়ে বসে থাকল চেয়ারে। বেচারা! বড় সৎ! এসব কেউ আর গায়ে মাখে নাকি আজকাল। পৃথিবীটা কত বদলে গেছে বাইরে—তার কোন খবরই রাখে না বকুল। পুরনো কথা ভেবে কাটা হয়ে বসে ছিল। শেষে কুবের উঠে জল এনে দিয়েছিল। আর আসেনি ছেলেটা। বিয়ে করার ভয়ে বকুলের কাছ থেকে কেটে পড়েছিল। কুবের কত জায়গায় কেটে পড়েছে। পরে সেই সব মেয়েকে বরসুদ্ধ ফুটপাথে হাঁটতে দেখে বুকের মধ্যে খচ করে উঠত তার। আহা এসব আমার সম্পত্তি ছিল। এক-একটি পুরাতনী শিখা!

খোকন জুতো পায়ে লাফাতে লাফাতে কাছে এল। কাকীমাদের ঘরে সব সময় ঘুরঘুর করে। ছেলেটার ভাল নাম অমিতাভ সাধুখাঁ। দেবেন্দ্রলাল নাম দিতে চেয়েছিল সৃষ্টিধর। কাছে টেনে এনে একটা চুমো খেল কুবের। কতদিন যেন দেখা হয় না। নদীর ওপারের ছেলে একেবারে। মুখখানা তুলে ধরে ভাল করে চোখ দেখল কুবের। তার নিজের শরীরে ঘোলাডাঙার পাপ কিছু থেকে থাকলে এই নরম ছেলেটার গায়ে একদিন না একদিন ফুটে বেরোবেই। কুবের দেখল তারই মত নিষ্পাপ, নির্দোষ মুখশ্রী—নখ বসালে আপেলের ওপর যেমন বসে তেমন বসে যাবে—এখন একেবারে নিটোল। এই ইনোসেন্ট মুখোশটা অনেকদিন না-খোলায় একেবারে মাংসের মধ্যে বসে গেছে কুবেরের।

'ছেলেটাকে ওভাবে ধরেছ কেন? ওর ঘাড় ভেঙে যাবে তো—', খোকনকে বকুল সরিয়ে নিল, 'যাও জুতো জামা ছাড়ো। ঠাকুরপো কুলির মাথায় দিয়ে পাখাগুলো আনছে—এখন বড় রাস্তায়—'

কুবেরদের জানলা দিয়ে ট্রাম লাইন অব্দি দেখা যায়। হঠাৎ বলল, 'বিভূতি তোমাকে চুমু খেয়েছে মনে পড়লেই আমার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে—'

'খেতে দিইনি তো। মুখ সরিয়ে নিয়েছি—', তাব চেয়ে বকুল বলতে পারত—বড়ি শুকোতে দিয়েছিলাম, কাক বসতে দিইনি।

'ওই হল। আমার ভাবলেই কষ্ট হয়।'

'আমার কষ্ট হয় না তোমার সব কথা শুনে—'

'বাঃ! আমি যাই করি আমার মনে তো কোন দাগ কাটেনি কোনদিন—'

'আমিও দাগ ফেলতে দিইনি?'

কুবের দেখল বকুলের হাত জানলার পর্দা টানতে টানতে জবাবের জন্যে থেমে আছে। হেসে বলল, 'কি জানি! কিন্তু বিভূতির সঙ্গে তোমার ওসব মনে হতেই আমার বুকের মধ্যের দেওয়ালগুলোর গরম হাওয়া ঘুরে ঘুরে পুড়িয়ে বেড়ায়—

এবারেও খুক্ করে হাসল বকুল, 'ন্যাকামি!'

'আমি একটা কথা বলব বকুল তোমাকে?—আমার জীবনের একটা স্যাড্ ঘটনা—খুব স্যাড্।'

ক্রমশ

শার্ঙ্গদেব

বছরের কোনও একটা সময় সঙ্গীতের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নানারকম প্রশ্ন আসে। সম্প্রতি এরকম কিছু জিজ্ঞাস্য পাওয়া গেছে সঙ্গীতের ইতিহাস বা এস্থেটিক্‌স্‌ সম্পর্কে। বুঝতে পারি এরা কোনও না কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। ক্লাসে হয়ত পড়া হয়নি, কিন্তু প্রশ্নের ব্যাপারে রেহাই নেই। লেখকের কাছেও এটা একটা সমস্যা। কারণ কোনও বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারে কাছেও তাঁর অবস্থিতি নেই এবং এসব বিদ্যায়তনের পঠনপাঠন সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ ধারণার অবকাশ তাঁর হয়নি। অতএব শিক্ষার্থীদের কোনও পরামর্শ দিতে শঙ্কা হয়—যদি পরীক্ষক ভিন্ন মত পোষণ করেন তাহলে পরীক্ষার্থীর বিপদ। সে যখন মুখ লাল করে এসে বলবে "দাদা আপনি যা বলে দিলেন তাই তো লিখলুম কিন্তু—" তখন পরামর্শ-দাতারও মুখ লাল হয়ে উঠবে এবং সেই রক্তমুখ অধোভাবে রাখা ছাড়া উপায় থাকবে না। যাই হোক, অধিকাংশ জিজ্ঞাসা থেকে বুঝতে পারছি, আজকাল "মিউজিকলজি" নামক একটি বিষয় বড়ই কঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এর মধ্যে সন্নিবেশিত। এছাড়া অনেক পারিভাষিক শব্দ এবং অনেক তত্ত্ব ও তথ্যে এই বিষয়টি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এস্থেটিক্স নামক বিষয়টিও তদ্রূপ এবং এটি আরও দুরূহ, কারণ আরও অজানা তত্ত্ব এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষায় কতকগুলি বিদ্যা আছে যাতে নানারকম বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তর্ক করলে এই বিষয়গুলি যে অনাবশ্যক এমন প্রমাণ করা যাবে না। অথচ এগুলিকে যোজনা না করলে বোধ হয় সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যেত। গুরুত্ব প্রদানের নানারকম উপায় শিক্ষা-জগতে আজকাল উদ্ভাবন করা হচ্ছে, এর মধ্যে একটি হল যে কোন বিদ্যায় দূর-সম্পর্কীয় বিষয়সমূহের অনুপ্রবেশ। মিউজিকলজি অর্থাৎ "সঙ্গীতবিদ্যা"ও পেছিয়ে নেই। বহু বস্তু আত্মসাৎ করে সেও একটি বিরাট সাবজেক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপত্তি সেখানেই যেখানে কতকগুলো জিনিস মুখস্থ করানো হচ্ছে অথচ তাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কারুরই নেই। এইরকম একটি বস্তু হচ্ছে বৈদিক সঙ্গীত। বড় বড় গ্রন্থাদি থেকে আহরণ করে বিষয়টি যেভাবে বোঝানো হচ্ছে তাতে মনে হয় সামমন্ত্রের পাঠটুকুই সঙ্গীত। সামমন্ত্রের যে অঙ্কগুলি দেখানো আছে সেগুলি উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিতবোধক—এগুলি গানস্বর নয়। এমন কি যেগুলিকে গানরূপ বলা হয়, যথা—"গৌতমস্য পর্কম্‌" বা "কশ্যপস্য বর্হিষম্‌" সেগুলিও ঠিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে কয়েক প্রকার বিকার বা সম্বর্ধিত স্বর আছে—অর্থাৎ গানের একটা ছায়া আছে মাত্র। আসলে এইগুলিকে কেন্দ্র করে—যখন সংগীত রচিত হত তখন তাতে সংগীতের রীতিতেই মূর্ছনা তান প্রভৃতি যোগ করা হত। নারদীয় শিক্ষার যে স্বরমণ্ডলের কথা বলা হয়েছে, সেই স্বরমণ্ডলকে আশ্রয় করেই প্রকৃত সামিক সংগীত গাওয়া হত। তার পরিচয় কি আমরা পাই? পাই না, পাবার উপায়ও বোধ হয় নেই। যেভাবে আমাদের ধর্ম-সংগীত রচিত হয়েছে সামগীতিও সেই-ভাবেই রচিত হয়েছে। ক্রিয়াকলাপ, পুজো-পার্বন, দেবদেবীর লীলা কাহিনী থেকেই ধর্মসংগীতের উদ্ভব। সামগানও তেমনি মন্ত্রগুলির বিভিন্ন প্রয়োগ ও পরিবেশ অনুযায়ী বহুভাবে সংগঠিত হয়েছিল। সামবেদ থেকে বা সামের তথাকথিত গানরূপ থেকে সামসংগীত কি ছিল বা শত শত বৎসর ধরে তা কত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে

া। তাই বলছি কোদালকে কোদাল বলাই চাল। অর্থাৎ সামপাঠকে পঠন বলে স্বীকার করাই ভাল, তার ওপর সঙ্গীতকে আরোপ না করাই সঙ্গত।

সাধারণত এ সম্পর্কে কয়েকটি বই-এর রেফারেন্স শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা সেই গ্রন্থসাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে। এরকম উদাহরণ আরও অনেক আছে। যেটুকু খবর লেখকের কাছে আসে তাতে এইটুকু বোঝা যায় যে, শিক্ষার তালিকাকে ভারি করবার জন্য কর্তৃপক্ষের যেরকম আগ্রহ, শিক্ষার সারবত্তাকে হৃদয়ঙ্গম করবার আগ্রহ ততটা নয়। এটা নিজেদের প্রেস্টিজ বাড়াবার চেষ্টা—ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা নয়।

মিউজিকলজি বস্তুটি সত্যিই খুব ব্যাপক কিন্তু তাকে গঠন করতে গেলে প্রচুর পরিশ্রম এবং অধ্যয়নের দরকার। সে অধ্যয়ন ও গবেষণা চিরাচরিত রীতিতে করতে গেলে হবে না, মুক্ত মন ও গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে করা দরকার। বলতে গেলে সঙ্গীতের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ও সম্পূর্ণ নয়—প্রকৃত তথ্যে আলোকপাত করা হয়নি বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এদিকে কোনও প্রচেষ্টা হয়েছে বলে খবর পাইনি। প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা কথা বলি। আমাদের বিদ্যালয়-সমূহ "সঙ্গীত-রত্নাকর"-এর ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই গ্রন্থকেই একমাত্র অথরিটি বলে গণ্য করেন। শিক্ষার্থীদের কথায় অন্ততঃ এইরকমই মনে হয়। কিন্তু এই গ্রন্থটি নাট্যশাস্ত্রের "পুনর্বিন্যাস" ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাকিটা "অভিনয়দর্পণ"-এর অনুসরণ। আসল গ্রন্থ হচ্ছে ভরতের নাট্যশাস্ত্র যা প্রাচীন ভারতের বহুবিধ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। অথচ এই গ্রন্থের দিকে শিক্ষাজগতের নজর আদৌ আছে বলে মনে হয় না। এতে কি বোঝা যায়? মূলগ্রন্থাদির পঠনপাঠন শিক্ষাজগতে খুবই কম এবং স্বাধীন চিন্তা দিয়ে একটা নতুন বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে সুগম করবার প্রয়াসও সেই পরিমাণেই স্বল্প।

এস্থেটিক্স-এর প্রতিশব্দ হিসাবে আজকাল "নন্দনতত্ত্ব" ব্যবহার করা হয়। কিন্তু "সৌন্দর্যতত্ত্ব" আরও ভাল ছিল বলে মনে হয়। "নন্দন" শব্দটাকে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। এতে ইন্দ্রের কানন বোঝাতো। বরঞ্চ সুন্দর-এর প্রতিশব্দ হিসাবে রুচির, চারু, শোভন, মনোরম, মঞ্জুল প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। নন্দন বললেই প্রমোদের দিকটা প্রাধান্যলাভ করে কিন্তু সুন্দর বলতে তা নয়—সুখকর বস্তুই হচ্ছে সুন্দর। সুতরাং সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রয়োগ আরও যুক্তিযুক্ত। তবে আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে "দেশিক" বলে একটি শব্দ আছে। যিনি বিবিধ শীলে (কালচারে) অভিজ্ঞ তাঁকে বলা হত "সুদেশিক"। এই শব্দে শিক্ষক বা আচার্যও বুঝিয়ে থাকে। আমার মনে হয় "দেশিকতত্ত্ব" বললে অর্থটা খানিকটা এস্থেটিক্সের কাছাকাছি যেত, কেন না সমগ্র দেশাচারের সাংস্কৃতিক দিকটা এই শব্দে প্রতিফলিত হয়।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় দেখা গেল পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এস্থেটিক্সের যে বিচার আছে তাকেও ভারতীয় সঙ্গীতের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জানি যে দার্শনিক বিচার কোনও বিশেষ দেশকে অধিকার করে নয়। কিন্তু ভাবধারা বা এপ্রিসিয়েশনের তফাৎ আছে। আমরা যেভাবে সঙ্গীতকে উপভোগ করি বা বিচার করি অন্যদেশে সেভাবে করা হয় না। এইখানে মূলগত প্রভেদ। অতএব কোর্স ভারি করবার জন্য অপ্রাসঙ্গিক দার্শনিক তত্ত্ব নাই বা ঢোকানো হল। নাট্যশাস্ত্র থেকে শুরু করে বিবিধ অলংকারশাস্ত্রে বহুবিধ বস্তু আছে যা এস্থেটিক্সের অভিজ্ঞতার জন্য প্রয়োজন। এই শাস্ত্রকে প্রণয়ন করতে হলে ভারতীয় চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে হবে এবং এটিও সম্পাদিত হবার অপেক্ষায় আছে।

মোট কথা, সার্টিফিকেটের বাহুল্যই যে একটা বিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আবশ্যক এমন নয়। কতটুকু আমাদের কাজে লাগছে সেটি দেখতে হবে। যে বিষয়কে আমাদের সঙ্গীতের সিলেবাসে আনতে হবে তাকে একান্ত প্রয়োজনবোধেই আনতে হবে, নতুবা তা বাহুল্য মাত্র। শিক্ষার্থীদের সাধারণ অভিযোগ তারা বহুবিধ বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত রয়েছে। অথচ তাদের মূল্যায়ণ হচ্ছে না। তারা বুঝতে পারছে না বিষয়গুলি সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য কতটা উপযোগী। অধ্যাপকগণ যদি যে যাঁর নিয়মে চলেন এবং যাঁর যেটা প্রিয় সেটাই শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে মূল উদ্দেশ্যই পরাজিত হবে। সঙ্গীতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার প্রথা আমাদের দেশে নূতন। এর দায়িত্বও লঘু নয়। অতএব পথিকৃৎ হতে গেলে বিশেষ অভিজ্ঞ চিন্তা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন।

দেশ দর্পণ

২৩শে কার্তিক প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকার "আলোচনা"তে প্রদীপকুমার রায়ের চিঠিখানি পড়লাম। পড়ে মনে হল যে প্রদীপবাবু বোধ হয় নকশালপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র বিরোধী। তাই উক্ত 'দেশদর্পণ' তাঁর এত চক্ষুশূল ঠেকেছে। কিন্তু তিনি যদি ঐ মনোভাব (তীব্র বিরোধী মনোভাব) ত্যাগ করে সাধারণ পাঠকের মত দেশদর্পণখানি পড়েন তবে দেখবেন যা সত্য তাই দেশদর্পণে লেখা হয়েছে। দর্পণে দেশের যা ছবি ফুটে উঠেছে তাই দেশ-এ তুলে ধরা হয়েছে, তাতে যদি কোন পার্টিকে সমর্থন করে তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে বলে প্রদীপবাবু মনে করেন তবে তার জন্য দেশ পত্রিকা দায়ী হতে পারে না। সত্য তাঁর কাছে অপ্রিয় মনে হলেও সত্যকে প্রকাশ করাই হ'ল লেখকের কাজ। প্রদীপবাবু শ্রীসুন্দরাইয়ার কথাগুলিও যেমন অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনি নকশালপন্থীরা যে বক্তব্যগুলি রেখেছেন তার বিরোধীতা করাও মনে হয় খুব শক্ত। আর তা ছাড়া 'দেশ'-এর সম্পাদক যে নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে থাকবেন এমন প্রতিজ্ঞা বোধ হয় প্রদীপবাবুর কাছে করেননি। আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর বিদেশের প্রভাব যে অনেকখানি কমে গেছে তা আশা করি পরবর্তী পত্রিকায় পড়েছেন। সব শেষে তাঁর চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের কথা বলি। এই অনুচ্ছেদটি পড়ে মনে হয়েছে যে, দেশ সম্পাদকমণ্ডলী যদি প্রদীপবাবুকে তাঁদের মধ্যে স্থান দেন তবে পত্রিকার উন্নতি হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে কোথায় কার নাম দিলে তাঁর বক্তব্যটুকুও দিতে হবে এটা তাঁদের থেকে প্রদীপবাবুই ভাল জানেন।

রেখা দত্ত
ঝাড়গ্রাম

আলোয় কালোয়

গত দোসরা নভেম্বরের দেশ পত্রিকার 'আলোচনা'-তে সুজাতা দেবীর চিঠিটি পড়ে গত পাঁচই অক্টোবরে প্রকাশিত ত্রিশঙ্কুর রচনাটি আবার পড়তে হোলো। সুজাতা দেবী যদিও ত্রিশঙ্কুর লেখা তাঁর ভালো লাগে বলে শুরু করেছেন কিন্তু চিঠিটিতে ভালো লাগার প্রমাণ কিছুই পেলাম না। বরং উল্টোটাই মনে হলো, হেনা প্যাটেল বা কৃষ্ণা চোপড়াদের মধ্যে অনেকে হয়ত পরের সহানুভূতি চান না, এটা প্রমাণ করাই যদি সুজাতা দেবীর উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমার বিশেষ কিছুই বলবার নেই। কিন্তু নস্টালজিয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বা যুক্তিগুলি খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। আর ত্রিশঙ্কুর এই বেদনা-বোধও উদ্ভট কিছু নয়। বাঙালী ছেলে মেম বিয়ে করলেও আমরা স্বভাবতই দুঃখিত হই, এমন কি সেই মেমের দেশের ইংরেজরাও তাঁদের বিদেশগামী দেশিনীর জন্যে এই রকমই সংবেদনশীল হয়ে ওঠেন বলে শুনেছি। কোন অমৃত কাউর বিবাহান্তে শ্রীমতী অমৃতা চ্যাটার্জি হলে তাঁর সম্বন্ধেও ত্রিশঙ্কুর বক্তব্যটি ঠিক একইভাবে খাটে, এটি বাঙলা বা বাঙালী বলে নয়, দুই ভাষার স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে ভাষা ও আচার-ব্যবহারের যে দুইভাব ও বিভিন্নতা তাই নিয়ে প্রধানতঃ ত্রিশঙ্কুর আলোচনাটি। কাজেই সুজাতা দেবী বাংলা বলে কোণঠাসা করে বাংলা গান, সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙালীর নস্টালজিয়াকে এবং সেই সঙ্গে ত্রিশঙ্কুকে যে একেবারে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করেছেন সেটা হয়ত ঠিক নয়। নস্টালজিয়া শব্দটি প্রয়োগের দ্বারাই তিনি ত্রিশঙ্কুর কথায় এবং সমবেদনার যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন। কারণ নস্টালজিয়া (Nostalgia) অবাস্তব কিছু বা অভিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি শব্দ মাত্রই নয়। যেমন নয় স্বাদেশিকতা (Patriotism), ক্ষেত্র বিশেষে এরা সমর্থক বা পরস্পরের পরিপূরক এবং দুটিই মানব চরিত্রের বিশেষ গুণ।

যে সব বাঙালী মেয়ে অবাঙালীকে বিয়ে করেন তাঁদের অধিকাংশই প্রবাসী বাঙালী অথবা বাংলা সংস্কৃতি থেকে অনেক ব্যবধানে গড়ে ওঠেন কিন্তু তাঁদের বাংলা ভাষা, গান, সংস্কৃতি ও মাছের ঝোল সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বা দুর্বলতা নেই এ কথা কি সম্পূর্ণ সত্যি? সুজাতা দেবীর বর্ণিত নস্টালজিয়া-মুক্ত প্রবাসী বাঙালীও যেমন থাকতে পারেন তেমনি ত্রিশঙ্কু-কথিত নস্টালজিয়া-যুক্ত বাঙালী কি একেবারেই নেই? অন্ততঃ একজনও যদি থাকেন তাহলেও তাঁর জন্য সমবেদনাবোধের অধিকার নিশ্চয়ই ত্রিশঙ্কুর বা অন্য বাঙালীর আছে। ত্রিশঙ্কুও তাঁর বক্তব্যটি সাধারণ (General) ভাবেই বলেছেন, তাতে সর্বসাধারণত্বের (Universality) আরোপ করেন নি, বলেন নি এর ব্যতিক্রম নেই বা এ কথাও বলেন নি যে তাঁরা সকলেই ত্রিশঙ্কুর সহানুভূতি প্রত্যাশী। তবে?

সুজাতা দেবী আরও বলেছেন, "যদিও এইসব বাঙালী বাংলা বই পড়েন, পুজো সংখ্যা কেনেন, বাংলা সিনেমা এলে দেখতে ছাড়েন না এবং বাংলা গানও গুন গুন করে থাকেন তবুও তাঁদের কাছে বাংলা ও হিন্দী অথবা একাধিক কোন ভাষা মাতৃভাষার সামিল।" এটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। বহু ভাষাবিদের অভাব এদেশে কখনও হয়নি। গড় গড় করে বিদেশী ভাষা অনেকেই বলতে পারেন। তবুও একাধিক ভাষায় মনোভাব প্রকাশ শুধু বিরল নয়, অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, কি হরিনাথ দের মত মানুষও ব্যক্তিগত কোন আবেগ, উচ্ছ্বাস বা অভিমানের মুহূর্তে নিশ্চয়ই দশটা ভাষায় মনোপ্রকাশ করতে পারতেন না। তেমনিই হিন্দী-ভাষী বাঙালী হয় হিন্দী নয় বাংলা—এর একটাতে যত সহজে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারেন, দুটোতেই সে রকম ভাবে পারেন না। কাজেই আবেগের মুহূর্তে তাঁর কাছে দ্বিতীয় কোন ভাষা মাতৃভাষার সামিল হতে পারে না। অর্থাৎ, একাধিক মতৃভাষা থাকতে পারে না বা হিন্দী ও বাংলা সমান হতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব আলাপের মধ্যে এইরকম আবেগপ্রবণ উচ্ছ্বাস বা অভিমানের মুহূর্তগুলিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঙালিনীর মুখে বেরোতে চাইবে বাংলা, অবাঙালী স্বামীর মুখে তাঁর মাতৃভাষা; সেইসব মুহূর্তে ভাষার বিভিন্নতা নিশ্চয়ই কিছুটা বাধা হবে, হয়ত বা দুরতিক্রম্য হবে না। এ ছাড়াও সেই বাংলা বই পড়া, পুজো সংখ্যা কেনা, বাংলা গান গুন গুন করা যেগুলি সুজাতা দেবী নিজেই উল্লেখ করেছেন সে সবের পরিবেশ ও অভ্যাসও কি কমে আসবে না? "বাঙালিনীর সর্বনাশ" বলতে ত্রিশঙ্কু এটাই বলতে চেয়েছেন বোধ হয়, সাংসারিক বা আর্থিক কিছু সর্বনাশ নয়; মাদ্রাজী বা পাঞ্জাবী বিয়ে করলে সুখের কমতি হবে এ কথা বলেন নি। অর মীরার ভজন বা হাইনের কবিতায় যে বাংলা হয় না অন্তে নজরুলের গানের দুঃখ যায় কি?

সর্বোপরি সুজাতা দেবী ত্রিশঙ্কুর উপর একটি অন্যায় দোষারোপ করেছেন ত্রিশঙ্কুর লেখার আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের মনগড়া একটি অপ্রাসঙ্গিক উক্তি টেনে এনে—"বাংলা সংস্কৃতিই একমাত্র সংস্কৃতি এবং ভারত-বর্ষের অন্য সব কিছুই অন্ত্যজ" যেন এই মন্তব্যটি ত্রিশঙ্কুর। ত্রিশঙ্কুর রচনাতে কিন্তু এর উল্লেখ এমন কি ইঙ্গিতও নেই। সুজাতা দেবীর অন্যান্য কয়েকটি উক্তি যদি হয় অবিচার, তবে এটি একান্তভাবে অন্যায়। শুধু ত্রিশঙ্কুই নয়, সমস্ত বাঙালীকে জড়িয়ে তিনি এই মন্তব্যটি করেছেন। জানি না "সাত কোটি বাঙালী"র কতজনের

মধ্যে তিনি এর প্রমাণ পেয়েছেন এবং কোন্ গবেষণা ও পরিসংখ্যানের ভিত্তির উপর তাঁর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমতী দেবী সেনগুপ্ত
ফরিদাবাদ।

॥ ২ ॥

"এইসব নির্বাসিত বাঙ্গালী মেয়েদের কি কোন অভিযোগ থাকে না?" ত্রিশঙ্কুর (দেশ, ৫ই অক্টোবর) এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমতী সুজাতা পুনেকর গত ২রা নভেম্বরের দেশ পত্রিকার আলোচনা বিভাগে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন। হয়তো "নির্বাসিত" শব্দটির প্রয়োগে তিনি ক্ষুন্ন হয়েছেন। ত্রিশঙ্কুর বাঙ্গালিত্ব অন্তত প্রবাসী বাঙ্গালীর কাছে খুব সুখপাঠ্য নয়। তিনি কল্পনাশক্তিকে আশ্রয় করে অবাঙ্গালী স্বামীর বাঙ্গালী বধূকে যতখানি অসুখী ও বঞ্চিতা ভেবে নিয়েছেন ততখানি তাঁরা নিশ্চয়ই নন। তবে এসব মেয়েদের মনে কোন অভিমান বিন্দুমাত্র থাকে না এ কথা শ্রীমতী সুজাতা পুনেকরের মতো অত সহজে অন্যান্য তৃপ্ত সান্ত্বনা যা ইরা আরামরা অস্বীকার করতে পারবে না। শ্রীমতী সুজাতা পুনেকরের মতো দু একটি সুখী গৃহিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বামীর শিক্ষা ও সম্পদে তাঁরা বিশেষ গর্বিত। কিন্তু লক্ষ করেছি, যখনই কোন তরুণ বাঙ্গালী তাঁদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য বা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করেছে, তখন মনের গভীরে কোথায় যেন একটা বেসুর বেজে ওঠে। পশ্চিমের একটা শহরে একজন প্রৌঢ়া বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁর অবাঙ্গালী স্বামী কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারেননি। জানি না, হয়তো ত্রিশঙ্কুর মতো আমিও ভুল করছি।

কাউকে বেদনা দেবার কোন অন্যায় বাসনা নেই, তবুও একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ'দের মধ্যে অনেকেরই ঠিক ঐ ধরনের "উচ্চশিক্ষিত - পদস্থ - সুদর্শন" বাঙ্গালী পাত্র পাওয়া সহজ ছিল না। এখানেও ত্রিশঙ্কুর "কর্তব্যচ্যুত আত্মীয়ের" গ্লানি বোধ করা অসঙ্গত নয়।

ছন্দা গুহ মজুমদার
কোহিমা

৩

৫ই অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত ত্রিশঙ্কুর আলোয় কালোয় পড়ে আমার কিছু বক্তব্য জানালাম।

আমার পিতৃকুল প্রথম বাঙ্গালী যাঁরা পাঞ্জাবে স্থায়ী হন। মাতৃকুল পাঁচ পুরুষ যাবৎ উত্তর প্রদেশে। বর্তমানে আমার আত্মীয় স্বজনরা ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন এবং অনেকেই গুজরাতী, মারাঠী, অন্ধ্র, তামিলনাদ, কেরল, কো-ঙ্কান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের ছেলেমেয়েদের বিবাহ করেছেন। আমার স্ত্রী অন্ধ্র প্রদেশিনী। পদির মা'র ভাষায় 'পোড়ারমুখো মিনষের মুখে আগুন' না বলে তিনি তাঁর নিজের ভাষাতেই আমার মুণ্ডপাত করেন এবং সে জন্য দুজনেই দুঃখিত নই।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। একদল যাঁরা বাংলার বাইরে গিয়েও পুঁই চচ্চড়ি, মাছের ঝোল, ভাত ছাড়েন নি এবং প্রবাসের সব কিছু অস্পৃশ্য বলে মনে করে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে বাংলাদেশে ফিরে হাঁফ ছেড়েছেন। আরেক দল যারা নিজেদের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অংশগুলি ছাড়েনি, বরং সে দেশে তার প্রচার করেছেন এবং সেই সঙ্গে ওদের দেশের গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতিকে নিজস্ব করেছেন। তৃতীয় দল যারা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে ওদের দলেই মিশে গেছে। "প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ভাষায়, এরা— "হামিও বন্দ উপাধ্যায় আছে"

ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার, ব্যবহার হয়ত সব প্রদেশেই বিভিন্ন কিন্তু রুচিতে, সংবেদনায়, ভাবনায়, কামনায়, সাধনায় ভারতবর্ষের সবার মনেই একই সুর বাজে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, তুলসীদাস, সুরদাস, তুকারাম, ত্যাগরাজ, সুব্রহ্মণ্যম, ভারতী, মীরাবাই, নরসী ভগত, পারুন ভগত থেকে নিয়ে প্রাচীন, প্রবীণ, নবীন সব দেশের কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাধক, বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিভিন্ন ভাষায় একই কথা বলেছেন।

সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ সবই আপেক্ষিক; মানুষের মনের গঠনভঙ্গী, শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এ পাড়ার মেয়ের ওপাড়ায়; এ গ্রামের ও গ্রামে; পূর্ববঙ্গের পশ্চিমবঙ্গে বিবাহ হয়। কেবলমাত্র বাঙ্গালী বলেই কি তারা সবাই সুখী? কলহ, দ্বন্দ্ব কি হয় না? ঘটি বাঙ্গালের বিবাহে যতটা গরমিল, বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর বিবাহে কি তার চাইতে বেশী গরমিল হওয়া সম্ভব?

এ ধরনের বিবাহে সুখী বা দুঃখী বহুজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ অবাঙ্গালী বিবাহ নয়। বাঙ্গালী বিবাহ করলেও তাঁরা হয়ত একই প্রকারে সুখী বা দুঃখী হতেন।

ত্রিশঙ্কু সাহিত্যিক। প্রতি সাহিত্যিকের রচনা তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা, মনস্তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত। কৃষ্ণা চোপড়া বা হেনা প্যাটেলের প্রতি তাঁর সমবেদনা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু তারা কি সত্যই তাঁর সমবেদনা চায়?

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আমেদাবাদ-৯

বিশ্ববিজ্ঞান

গত ৯ই নভেম্বর তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বিশ্ববিজ্ঞান' বিভাগে 'ভারতের গৌরব' নামক প্রবন্ধটি পড়িলাম। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার ও তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে লেখকের এই রচনা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। সেই সঙ্গে ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তাহার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে লেখকের নির্ভীক মতবাদের জন্য ধন্যবাদ জানাই। যদিও রচনাটি সুলিখিত, তবুও ইহাতে কিছু ভ্রান্তিকর উক্তি রহিয়াছে যেগুলি আমি মনে করি সংশোধনের যোগ্য।

প্রথমত যে চিত্রে মানুষের ক্রোমোজম দেখান হইয়াছে, সেখানে লেখা আছে, "মানুষের দেহকোষে ৪৮টি ক্রোমোজম থাকে"। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের দেহকোষে সাধারণত ৪৬টি ক্রোমোজম থাকে, ৪৮টি নয়। তবে কোন কোন অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ৪৮টি ক্রোমোজম থাকিতেও পারে।

দ্বিতীয়ত, লেখক এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, "২৩ রকম আমাইনো অ্যাসিডে প্রোটিন তৈরী হয়।" এই উক্তিটিও ভ্রান্তিপূর্ণ। বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলিত হইয়া প্রোটিন তৈরী হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তবে ২৩ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্যতীত যে প্রোটিন তৈরী হইবে না তাহা নয়, তাহার কমেও হয়।

তৃতীয়ত, তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "ডি এন এ গুলি এমনভাবে সাজানো থাকে যে, ক্রোমোজমগুলি পাকানো দড়ির মইয়ের মত দেখায়।" পাকানো দড়ির মই বলিতে লেখক কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝা গেল না। ক্রোমোজমকে কোন অবস্থাতেই মইয়ের মত দেখায় না। যদিও ডি এন এ-র আণবিক আকৃতি (Molecular structure) মইয়ের মত তবুও ক্রোমোজমের আকৃতি মইয়ের মত নয়। সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ইহাকে বাঁকানো বা সোজা রডের মত দেখায়।

অতীন দত্ত
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

॥ ২ ॥

গত ৯-১১-৬৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধে 'সুপ্রজননবিদ্যা' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে

Genetics-এর প্রতিশব্দ হিসেবে। প্রকৃত-পক্ষে Eugenics-এর প্রতিশব্দ হ'ল সুপ্রজননবিদ্যা।

চলন্তিকা অভিধানের পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দের যে তালিকা দেওয়া আছে তাতে প্রথম দিকে (সঠিক মনে নেই, তবে সম্ভবত ৫ম সংস্করণ পর্যন্ত) Genetics-এর প্রতিশব্দ দেওয়া ছিল সুপ্রজননবিদ্যা।' Genetics-এর পরিভাষা হিসেবে সুপ্রজননবিদ্যা কথাটি বিভ্রান্তিকর। এই প্রসঙ্গে আমার এক চিঠির উত্তরে রাজশেখর বসু মহাশয় ৭।৮।৫০ তারিখে লিখিত এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন—'Eugenics সুপ্রজননবিদ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়-কৃত পরিভাষা-তালিকায় ভুলক্রমে Genetics ছাপা হইয়াছে এবং চলন্তিকায় তাহাই গৃহীত হইয়াছে। শেষোক্ত শব্দের কোনও প্রচলিত পরিভাষা সমিতি করেন নাই। ... পরসংস্করণে শোধন করিব।"

... ভুলের সংশোধন চলন্তিকায় করা হয়েছে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কৃত পরিভাষা-তালিকায় কোনও সংশোধন করা হয়েছে কিনা জানা নেই। ইতি

দিলীপকুমার দাস
হাউসিং এস্টেট, সোদপুর

শারদ সাহিত্য

গত ১৬ নভেম্বর দেশ পত্রিকায় শুভ আচার্যের 'শারদ সাহিত্যঃ একটি সমীক্ষা' প্রবন্ধটি পড়লাম। সমালোচিত নিবন্ধটি ভালই লাগলো। তবে প্রবন্ধটির ভূমিকা-পর্বে বা শুরুতে দেখলাম লেখক 'আনন্দ-বাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। বুঝলাম না এত প্রশংসার হেতু কি ... চোরের লক্ষণের মত নয় ত! অর্থাৎ আমার লেখা যখন তোমাদের দেশ পত্রিকায় উঠছে তখন তোমাদের একটু গুণ-কীর্তন না গাইলে তোমরা খুশী হবে কেন—এ... একটা ভাব।

এক জায়গায় প্রবন্ধকার লিখেছেন—'নিছক অর্থোপার্জনের সুযোগ হিসেবে শারদীয় সংখ্যাকে ব্যবহার না করে 'দেশ' ও আনন্দবাজার প্রকৃত সংসাহিত্য পরি-বেশনের চেষ্টা করেন।'—লেখকের এ অভিমত সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে মন আসে না। অর্থোপার্জনের সুযোগটা ছোট-বড় প্রায় সব পত্রিকায় গ্রহণ করা হয়। মনে হয়, অর্থোপার্জনের গন্ধটা না থাকলে কোন পত্রিকাই প্রকাশিত হতো না। আর হলেও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারতো না। আর, বলা বাহুল্য, 'দেশ', 'আনন্দবাজারে'র ক্ষেত্রেও এ মনোভাবের ব্যতিক্রম নেই। অবশ্য লেখক হয়তো উক্ত বক্তব্যে 'নিছক' কথাটা জুড়ে দিয়ে বেশ একটু tricks খেলেছেন—অর্থাৎ সমালোচকের দৃষ্টি এড়াতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এমন একটা ঘটনা আমি জানি যা থেকে প্রমাণ পাবে দেশ পত্রিকাও ব্যবসা হিসাবে চালাবার কম চেষ্টা করা হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে ঘটনাটা সংক্ষেপে লিখি: সেদিন শ্রদ্ধেয় বিমল মিত্র এখানে, দণ্ডকারণ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে স্থানীয় অনুষ্ঠানে তাঁকে সাহিত্যে 'শ্লীল ও অশ্লীল' সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ জানানো হয়। তাতে তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীল বলতে কিছু নেই। সাহিত্য যথার্থই সাহিত্য, ...তবে সব জিনিসই রেখে ঢেকে প্রকাশ করা ভাল।' এই আলোচনাক্রমে তিনি দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'সেদিন দেশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় জানতে চেয়েছিলেন সাহিত্য সংখ্যা কোন দিক basis করে প্রকাশ করলে বাজারে কাটবে বেশী?' তারপরেতেই নাকি শ্লীল অশ্লীল বিষয়ক সাহিত্য সংখ্যাটি বেরিয়ে-ছিল।

ঠিক এমনি একটা উদাহরণ পাওয়ার পর আজকের নিবন্ধটি পড়ে মনে হলো 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার' নিয়ে প্রবন্ধকারের এতটা নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত হয়নি।

আলোচনা শেষ করার আগে ব্যক্তিগত ধারণা রাখি। মনে হয় এ আলোচনা নিশ্চয় দেশ পত্রিকায় ছাপা হবে না। কারণ, নিজেদের ত্রুটি পারতপক্ষে কেউ বা প্রকাশ করতে চায়!

তাপসকিরণ রায়
কোণ্ডাগাঁও (দণ্ডকারণ্য)

॥ ২ ॥

গত ১৬ই নভেম্বর "দেশ" পত্রিকায় শুভ আচার্য কর্তৃক লিখিত "শারদ সাহিত্যঃ একটি সমীক্ষা" আগ্রহ সহকারে পড়া গেল। আলোচনাটি নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যচর্চার এক অমূল্য খতিয়ান। পবিত্র দায়িত্বের অন্তরালে সাহিত্যমহলে যে কি

নিদারুণ বিষক্রিয়া ঘটে চলেছে তার নির্ভীক ও সার্থক ছবি তুলে ধরার জন্য লেখক মশাই পাঠকবৃন্দের মত নীরব সাক্ষীর ধন্যবাদার্হ।

আধুনিক সাহিত্যিকগণের পচনশীল তথা রিরংসু মনের প্রতি শুভ আচার্য-র শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত স্বাভাবিক বিবমিষার বাঙময় অবিভক্ত সত্যি প্রশংসার দাবি করে। লেখক যেখানে লিখেছেন, "...কিছু লেখক চমৎকারভাবে আধুনিক ও ইউরোপীয় হয়ে উঠেছেন...", সেখানে লেখকের ব্যঙ্গোক্তি অপূর্ব বিচার-বৈদগ্ধ্য লাভ করেছে।

বস্তুত, আধুনিক সাহিত্যিকগণ বিদেশী ভাবধারায় মেতে উঠে বাংলা সাহিত্যকেও সেই ধ্যান-ধারণার খাঁচায় ঢুকিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। মিলার, কামু, কাফকা, সার্ত্র, জাঁ জেনে, বোদলেয়ার কিংবা হাক্সলী, জয়েস্, ডি এইচ লরেন্স, ইয়েটস্, এলিয়ট প্রমুখ বিদেশী কবি-ঔপন্যাসিকেরা এঁদের কাছে জীবন্ত বিগ্রহ --আদর্শের প্রতিমূর্তি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মহারথীরা যে নূতন ভাব-ধারার প্রবর্তন করেছেন বা করে চলেছেন তাকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্বাধীন চর্চা করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্য তা হলে কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে? অশিক্ষিত পাঠকবৃন্দ (যাঁরা বিশ্বসাহিত্যের পূর্বাপর ধারার সাথে পরিচিত নন) হয়তো এইসব বাঙালী লেখকদের লেখা পড়ে নূতনত্বের আস্বাদনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন কিন্তু শিক্ষিত পাঠক (যাঁরা বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীন ও সমকালীন চিন্তাজগতের সাথে সুপরিচিত) 'অহো কি পাইলাম!...' বলে নির্জন কক্ষে চিন্তাক্লিষ্ট মনে সিগেরেটের রিঙ্ ছাড়তে বসেন না, কারণ তার আগেই তাঁরা বিদেশী সাহিত্য পড়ে এ-জাতীয় লেখার সাথে সুপরিচিত হয়ে যান; বাঙালী সাহিত্যিকদের এই স্বাধীন চর্চাটুকু প্রশংসা করা যেতে পারে মাত্র। কিন্তু নূতনত্ব কোথায়? বিদেশীরা আমাদের আধুনিক সাহিত্য থেকে কি ও কতটুকু গ্রহণ করতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন্ কবি-ঔপন্যাসিকের সাথে তাঁরা পরিচিত? নিঃসন্দেহে এসব প্রশ্নের উত্তর শূন্য তথা নেতিবাচক।

ভারতের প্রাচীন মহামূল্যবান ও অমর সাহিত্য-দর্শন থেকে ভাব সংগ্রহ করে আধুনিকতার পটভূমিতে নিজ নিজ চিন্তা-ধারায় সাহিত্যচর্চা করলে তো তা নূতন ও বিস্ময়কর সৃষ্টি হতে পারে, যা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাবাগীশদের মুগ্ধ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কি সেজন্যই বিদেশীদের কাছে বহু জিজ্ঞাসা ও প্রশংসার পাত্র নন? ভারতীয় পুরাণ থেকে ভাব সংগ্রহ করে এক অপূর্ব তন্নিষ্ঠতায় রচিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' তো বিদেশী চিন্তাজগতে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল! হুইস্কী-বিয়ারের ক্ষমতা হয়নি তাকে হজম করার। ভারতীয় দর্শনের জাগ্রত সন্তান রবীন্দ্র-নাথের কবিতা তাই যুগ-যুগান্তরের চিন্তা ও জিজ্ঞাসার খোরাক। রবীন্দ্রবিদ্বেষী আধুনিক বোদ্ধাকুল যতই কফির পেয়ালায় ঝড় তুলুন না কেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখকের লেখা পড়ার পর একটা সিগেরেট ধরিয়ে শেষ করার আগেই চিন্তা ও জিজ্ঞাসার অবসান ঘটে।

শুভ আচার্য মশাই যদি একটু চিন্তা করেন তবে দেখবেন যে, এর সম্ভবত দুটি কারণ থাকতে পারে—হয় ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য দর্শন সম্বন্ধে এসব বোদ্ধাকুলদের সীমাহীন অজ্ঞতা, আর নয়তো বা বিদেশী ভাবধারা অনুকরণে এক উন্নাসিক ইন্টেলেক্-চুয়ালিজমের ফ্যাশান। বলা বাহুল্য তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আজ এ-হেন দৈন্যদশা। আঙ্গিকের চটক ও জৌলুসে বুদ্ধি আর সেই সঙ্গে শাশ্বত যুগের প্রাণের সাথে হৃদয় নামে বস্তুটির দুস্তর ব্যবধান।

অতঃপর শুভ আচার্য মশাই-এর কথা সত্যি যে, আধুনিক সাহিত্যিকেরা সেক্স-কে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানেন না।' অবশ্য 'জানেন না' বলাটা ঠিক নয়, কেন-- না, সাহিত্যে থিওরীর চেয়েও বড় কথা এক্সপেরিমেন্ট—বাঁধাধরা থিওরী সাহিত্যে কোনকালেই ছিল না এবং থাকতে পারে না। বরং বলা যায়, এঁরা সেক্স-কে ব্যবহার করেন পাইপ কিংবা স্লিভলেস পদ্ধতিতে; কেননা, ধুতি-পাঞ্জাবি বা লালপাড়ে বেনারসী শাড়ি তো এসব শুকনো চুলওয়ালা ইন্টেলেকচুয়ালদের কাছে অত্যন্ত ডার্টি মনে হয়! উত্তরে হয়তো এসব বাংরেজী পণ্ডিতের দল যুগধর্মের দোহাই পাড়বেন। কিন্তু এঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে, যুগের প্রয়োজনেই কী সাহিত্যের পরিধি সীমায়িত? আগামী দিনের আভাস যদি সাহিত্যে না থাকে তবে তা যুগোত্তীর্ণ প্রশংসা দাবি করতে পারে না। কালিদাস-ভবভূতি-বেদব্যাস-বাল্মীকি-রবীন্দ্রনাথ কিংবা সেক্সপীয়র-দান্তে-ভার্জিল-গোটে মুগ্ধে 'পিক্তিয়ন হোল'-এ আটকে পড়েননি বলেই শত শত বৎসর পরেও তাঁরা আমাদের নিরন্তর গবেষণা ও চিন্তার বিষয়।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী
কলিকাতা-৩৮

লক্ষ্মীর কৃপালাভ

গত ১২ অক্টোবর-এর 'দেশ'-এ ১৬০৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় একটা ভুল চোখে পড়লো। বিশ্বকর্মা লিখেছেন...'উপরন্তু কিছুকাল আগে পৃথকভাবে প্রকাণ্ড সার তৈরীর কারখানাও ক্যালটেক্স খুলেছেন।'

তাঁর অবগতির জন্য জানাই সার কারখানা ক্যালটেক্স খোলেননি। সার কারখানাটির নাম Coromandel Fertilisors Ltd। ভারতে ওর প্রধান অংশীদার মাদ্রাজ-এর E. I. D. Parry। কারখানাটি মার্কিন কারিগরী সহায়তায় তৈরী।

সত্যব্রত দত্ত
কলিকাতা-২৬

ঘরে বাইরে

জীবিকার সন্ধানে সমিতি

সংস্থাটি সাক্ষাৎ দেখবার সুযোগ হয়নি। শুনলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Institute of Leather Technologyর অধ্যক্ষ মণি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে। সংস্থাটির নাম Society for Services and Employment. সামান্য হলেও কিছু উপার্জন করবার সুযোগ যাতে মেয়েরা পান এই পরিকল্পনা নিয়ে সমিতিটি গঠিত হয়েছে। উপার্জনের প্রয়োজন যে দিন দিন কত বাড়ছে তা বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এক সময় আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার বীমার মত কাজ করেছে। দুঃস্থ মহিলা আত্মীয় অবলীলা-ক্রমে বড় সংসারের অংশ হয়ে দিন কাটাতে পেরেছেন। অন্তত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটুকু তো হয়েছে। শত লাঞ্ছনাগঞ্জনাতেও একেবারে ফেলে দিতে কেউ পারতো না। সমাজ তা সহ্য করতো না। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়া, দেশ বিভাগ, মূল্যস্ফীতি সব মিলে বিপর্যস্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়েকে উপার্জন করার কথা ভাবতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তার উপর স্ত্রী স্বাধীনতা এনেছে আর এক ভালতে মন্দতে মেশা মুক্তির খোলা দরজা। নারী স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু তার মূল্য কম নয়। নিশ্চিন্ত গৃহকোণবাসিনীর কাছে যে দায়িত্ব বা কর্তব্য কেউ আশা করেনি প্রগতির উন্মুক্ত পথে সে দায়িত্ব দায় হয়ে উঠছে। জননী, জায়া যাবেন সদরে, দু' পয়সার সংস্থানে সংসারযাত্রার সমস্যা কিছু সহজ হবে, সমাজ এই ব্যবস্থা মেনে নিচ্ছে বিনা দ্বিধায়। এই সঙ্কোচহীনতা যখন তাদের বেলায়ই স্বীকৃতি পেয়েছে তখন যার আপন বলতে কেউ নেই এ দুনিয়ায় অথবা যার ভার নিতে কেউ রাজী নয় তার জন্য উপার্জনের পথ আরও বড় প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানেও ভালমন্দ মেশানো ব্যবস্থা। দারুণ দুঃখে যে আত্মনির্ভরতার জন্ম তারই মর্যাদা কি কম? তাই এই সমিতির কথা শুনে এত আনন্দ হলো। জীবিকার সন্ধানে একটি নয়, দুটি নয়, শত শত সমিতির দরকার। তবেই প্রয়োজনের পরিমিত আয়োজন সম্ভব। Society for Services and Employment যদি অন্যান্য সমিতি গঠনের আদর্শও দেখাতে পারেন তার মূল্য যথেষ্ট।

একটি চামড়ার কাজের কারখানা

সামান্য মূলধনে কোনও প্রতিষ্ঠানই গড়ে তোলা কঠিন কাজ। অনেক ক্ষেত্রে মোটেই মূলধন থাকে না। সহায়সম্বলহীন মেয়ে যার উপার্জনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী তাকে মূলধন সহজে কেউ ধার দিতে চাইবে না। বন্ধক রাখা কিছু বা security তার থাকে না। তার উপর বাজারে বিক্রি করা, ব্যবসা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, হিসাব রাখা, সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের মাল সম্বন্ধে সকলকে ওয়াকিবহাল করা—এও জানা থাকা সাধারণ গৃহস্থ মেয়ের হয়ে ওঠে না। পুনর্বাসন দপ্তর বা Relief & Rehabilitation Department, শিল্প দপ্তর বা Industries Department, সমাজকল্যাণ বা Social Welfare, এমন কি unemployment relief-এরও কোনও ছোট ছোট পরিকল্পনা এই সব কারণেই সফল হয়নি। চেষ্টা তাঁরা করেন নি এমন নয়, তবে সেই চেষ্টার মাধ্যমেই প্রমাণ হয়েছে যে, উপার্জন করার আধুনিক

ব্যবস্থায় অনেক আয়োজন দরকার। কোন দিকে ত্রুটি হলেই ব্যবসায় বিপর্যয় হতে পারে। Society for Services and Employment এই সব খুঁটিনাটি শিক্ষা দিয়ে মেয়েদের কাজের সুযোগ করে দিতে চান। হাতে-কলমে শিক্ষার পর সমিতি কাজ দেন। এই সব অর্ডার সংগ্রহ হয় সমিতির মাধ্যমে। মেয়েদের তার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে পারিশ্রমিক পাবার সুযোগ করা হয়। মূলধন, কাঁচামাল সংগ্রহ ও কারিগরী সাহায্য—সবই সমিতির দায়িত্ব। Quality Control বা উৎপন্ন মালের মান বজায় রাখাও সমিতির দায়িত্ব। আবার নিজস্ব মালিকানায় যদি কেউ কাজ করতে চান, তারও ছোট ছোট পরিকল্পনা ও'রা দেন। সমিতির একটি Service কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তাতে যন্ত্রপাতি, গবেষণা ও বিক্রয় ব্যবস্থা আছে। কাজেই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের যে সব বড় বড় অসুবিধা ছিল তার কিছু এ'রা কমাতে পেরেছেন বলে আশা হয়।

সমিতির কাজ পাওয়া একজন দু'জনের কাজ পাওয়ার মত কঠিন নয়। বহু অর্ডার অনায়াসে আসে। বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতি সহজে উৎসাহী মেয়ে-কর্মীদের প্রচুর কাজ দিতে পারেন। চামড়ার কাজ বা Taxidermy-র পাখি ইত্যাদি বানানোর একটি সুন্দর পরিকল্পনা নমুনা হিসাবে উল্লেখ করছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ বা মিউজিয়াম সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এই পাখি ইত্যাদি কাজে লাগবে। খদ্দের মিলবে নিশ্চয়ই।

ধরে নিন মাসে ৬০টি পাখি তৈরি হবার পরিকল্পনা।

মূলধন—২৫০৲ (হয়তো বা Relief ও Rehabilitation Department থেকে পাওয়া যাবে)।

সমিতির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি পাওয়ার সুযোগে non-recurring expenses কিছুই থাকবে না।

এক মাসের recurring খরচার মোটামুটি হিসাব :

(১) ৬০টি নমুনা—৭৫৲।

(২) পাট, তার, কাঁচ ইত্যাদি প্রত্যেক নমুনার জন্য ৫৬ পয়সা হিসাবে—৩৩·৬০ পয়সা।

৬০টি কাঠের স্ট্যান্ড ৭৫ পয়সা করে ৪৫৲।

মোট দাঁড়ালো ১৫৩·৬০ পয়সা।

পারিশ্রমিক ধরুন—৯৬৲। অবশ্য তার অদল-বদল অবস্থা অনুসারে হতে পারে। মোটামুটি ধরা যায় একটি শিক্ষিত কর্মী দিনে ২·৫০ টাকা করে নেবেন। একটি সাহায্যকারী নেবেন ১·৫০ করে।

এই পাখি যদি ৫·৫০ পয়সা হিসাবে বিক্রি হয়, তবে ৬০টি পাখির দাম হবে ৩৩০৲। খরচ বাদে ৮০·৪০ পয়সা হবে লাভ। ছোট মালিকানা ব্যবসায়ের এটি একটি সাধারণ হিসাব। সব জিনিস সমান হবে এমন নয়। তবে এই খসড়া অবলম্বন করে সবরকম ব্যবসায় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। Society for services and Employment এরকম বহু খসড়া প্রস্তুত করেছেন। খুব সহজ হিসাব। যদি চামড়ার কাজ নাও হয়, অন্যান্য যে কোন ব্যবস্থায় এইভাবে সহজ হিসাবে মেয়েরা উপার্জন করতে পারেন। এমন কি ঘরে বসে ঘরোয়া শিল্প নিয়েও এ ধরনের ব্যবসায় সম্ভব। কেনাকাটা, মূলধন—সব সমিতির মাধ্যমে হলে নিতান্ত অবসর কাটানো হিসাবেও গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা উপার্জন করতে পারবেন।

"The level of a people's civilization can be measured by the social position occupied by its woman—কোনও দেশের লোকের সভ্যতার মাপ বিচার করা যায় সে-দেশের মেয়েদের সামাজিক অবস্থা থেকে"—বলেছেন, Domingo Faustino Serimento (১৮১১—১৮৮৮)।

আমাদের নারী প্রগতির দ্রুত পদক্ষেপ সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারী এখনও খুব কম। রাজনৈতিক দলগুলিতে নারী কম, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বেও তারা কম। নির্বাচনের নিয়মে নারীর ভোটাধিকারে তার দিকে নজর দেন নেতারা, আরপরে তাদের মর্যাদা বা অধিকার নিয়ে মাথা ঘামান হয় সামান্য। সম্ভবত সারা দুনিয়াতেই এই অবস্থা।

টুকিটাকি

বাজার করবার আগে বেশ ভাল করে ভেবেচিন্তে একটি ফর্দ তৈরি করবেন। দোকানপাটে নূতন কিছু দেখেই কিনে ফেলা কিন্তু ভুল। নিতান্ত যা দরকার তা ভিন্ন বড় একটা এদিক-ওদিক মন দেওয়া কাজের কথা নয়। সত্য মিথ্যা প্রমাণ পাইনি, কিন্তু বিদেশিনীরা বলেন, ভরা পেটে কেনাকাটা পরিমিত হয়, কিন্তু খালি পেটে লোক পটাপট্ পয়সা ফেলে। যাই হোক, বাজারে ঘোরাঘুরি তো করতেই হয়। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত না হয়ে স্থিরভাবে করাই তো ভাল।

একটি দোকানে দরদাম দেখে কেনার চেয়ে দু'-চারটে দোকান ঘুরে দাম এবং জিনিসের মান যাচাই করা দরকার। নিজের পাড়ায় কি দরে কি বিক্রি হয় আর প্রতিযোগী বা বন্ধুবান্ধব কি দরে কি কেনেন খবর নিলে ঠকে যাবার ভয় কম।

বাজারে যাবার পয়সা আন্দাজমত সঙ্গে নেবেন। খুব বেশী সঙ্গে থাকলে খরচা বেশী হওয়া অসম্ভব নয়। অনেক দূরে গিয়ে দু' পয়সা সস্তা করার মানে হয় না। যানবাহন আছে, দূরে যাবার সময় ও পরিশ্রম আছে। কোনটাই উপেক্ষা করার মত নয়।

টিনের খাবার অথবা নানারকম সংরক্ষিত খাদ্য সময় সংক্ষেপ করে ঠিকই, কিন্তু দাম বেশী হয়। গৃহিণীর সুবিধা থাকলে নিজে হাতে যতটা করবেন ততটাই লাভ।

তরকারি সিদ্ধ করলে সম্ভবস্থলে সেই জল ঝোলে বা স্যুপে ব্যবহার করে ফেলবেন। এতে খাদ্যপ্রাণ থাকে প্রচুর।

চাল, গম, আটা ইত্যাদি সব ঠাণ্ডা, খটখটে শুকনো জায়গায় রাখবেন। ভাল করে এ'টে মুখবন্ধ করা যায় এরকম টিনে অথবা তুলে রাখতে হলে ভালভাবে বস্তা বা ব্যাগের মুখ বন্ধ করে রাখবেন। বাসন ধোবার জন্য সাধারণ কাপড় কাচা সাবান যথেষ্ট। কড়ারকমের ময়লা কাটবার গুঁড়ো যা বাজারে অধিক মূল্যে পাওয়া যায় তার দরকার নেই। মুড়ি বা বিস্কুট নরম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বেশী নরম হলে তো উপায়ই নেই, সামান্য নরম হলে অল্প আঁচে আস্তে আস্তে গরম করে ঠাণ্ডা হলে বন্ধ করে রাখবেন। oven থাকলে তাতে গরম করা ভাল।

লেটুস্ পাতা দিয়ে যাঁরা স্যালাড তৈরি করেন তাঁরা উপরের বড় পাতা অনেক সময় ফেলে দেন। স্যালাডে নাও দিলে এই পাতা ব্যবহার করে ফেলবেন। সরু করে কেটে তেল বা ঘিতে নরম করে নেবেন। মিনিট পাঁচেক হলেই যথেষ্ট। সিদ্ধ করা মটর একটু দিয়ে নুন, গোলমরিচ এবং ছিটামাত্র চিনি দিয়ে জল দেবেন সামান্য। ঢাকা দিয়ে রেখে জল মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরিবেশন করবেন।

শ্রীমতী

'কে কবি কবে কে মোরে?'

বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার প্রভাবেই কিনা বলা যায় না, অক্সফোর্ডে এবার কবি নির্বাচনের ব্যাপারেও বেশ সাড়া পড়ে গেছে। অক্সফোরডের কবিতার অধ্যাপক হিসেবে কাকে নির্বাচিত করা হবে, তা ছাত্ররাই ভোটাভুটি দিয়ে ঠিক করে। এডমন্ড ব্লানডেন বিদায় নেবার পর ঐ শূন্য চেয়ারে অধিষ্ঠিত হবার জন্য বহু কবিই প্রার্থী হয়ে আত্মপ্রচার শুরু করেছেন। সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন কবির নাম উত্থাপিত হয়েছিল এই জন্য, অনেক নাম আমাদের স্বাভাবিক কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়, যেমন একদল ছাত্র ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের বউ মেরি উইলসনকে—অবসর সময়ে যিনি কিছু কিছু মেয়েলি পদ্য লিখে থাকেন—এই পদের প্রার্থী হবার জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী উইলসন অবশ্য এ ঠাট্টাটা একেবারেই পছন্দ করেন নি, এবং তাঁর পত্নীও যথাকালে সমীতি বশতঃ এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অক্সফোরড থেকে এম-এ পাশ করেছেন যাঁরা—সংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজার—তাঁরা সবাই ভোট দিতে পারেন। অবশ্য সবারই অত গরজ নেই, এবং কাছাকাছি যাঁরা থাকেন এবং নিজে উপস্থিত হয়ে ভোট দিতে পারবেন, সেই সংখ্যাটাই গণ্য। তাও হাজারখানেক প্রায়। ভোট হবে গোপনে। কবিতা অধ্যাপকের এই পদটি চাকরি হিসেবে ততটা লোভনীয় নয়, কিন্তু যথেষ্ট সম্মানের। মাইনে বছরে সাড়ে পাঁচ শো পাউন্ড, কাজ বছরে গুটিকয়েক শুধু বক্তৃতা দেওয়া।

২১ ও ২৩শে নভেম্বর ভোট হবে, এই রচনা প্রকাশের আগেই হয়তো, সকল প্রার্থীর নাম ঘোষিত হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ১১ জন এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনীত হয়েছেন, তাঁদের পরিচয় ও গুণাগুণের বিবরণও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। আক্ষরিক অর্থেই এঁরা, "সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি"। এঁদের মধ্যে অনেকে আমাদের কাছেও পরিচিত, অনেকের নাম এই প্রথম শোনা গেল, তবু লন্ডনের দৈনিক 'টাইমস' যেমন কোনো পক্ষপাতিত্ব না দেখাবার জন্য, বর্ণানুক্রমিক তালিকা পেশ করেছিলেন, আমরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করছি।

এ অ্যালভারেজ—বয়েস ৩৯, কবি, সমালোচক ও বেতার-প্রচারক। আত্মপক্ষ বা
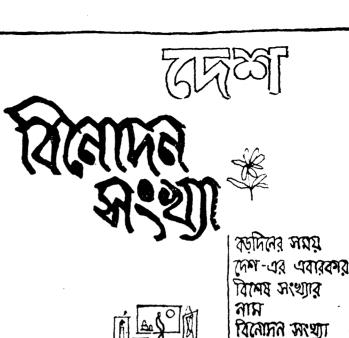
নিজের প্রার্থীপদ সমর্থনে তিনি মেটাফিজিক্যাল কবি জর্জ হারবার্ট থেকে দু' লাইন উদ্ধার করেছেন :

"After so foul a journey death is fair
And but a chair".

শ্রীযুক্ত অ্যালভারেজের ইচ্ছা, নির্বাচিত হলে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমসাময়িক পৃথিবীর নানান ঘটনা নিয়েও আলোচনা করবেন। তাঁর মতে, আমরা এখন এক ধরনের সংকটের মধ্যে বেঁচে আছি, এবং অনেক লোকের সে সম্বন্ধে কোনো চেতনাই নেই।

অ্যালান বোল্ড : বয়েস ২৫, ইনি নিজেকে "সোস্যালিস্ট" কবি হিসেবে ঘোষণা করেন। ইনি জিতলে, কবিতার সঙ্গে বিজ্ঞান এবং রাজনীতির সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে চান। ব্রেখ্‌ট কিংবা পাউণ্ডের মতন কবিদের সম্পর্কেই তিনি শুধু আলোচনা করবেন। আশাবাদীদের ধরনে কবিতা লেখেন ইনি।

জে এল বর্হেস : আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক। বিশ্ববন্দিত, নোবেল প্রাইজের জন্যও তাঁর নাম কয়েকবার উচ্চারিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যেও এঁর দখল আছে, যৌবনে সাত বছর কাটিয়েছেন ইওরোপে, বিওনো এয়ারিস-এ লাইব্রেরিয়ানের চাকরি করার সময় ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট পেরোন একবার ওঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে লাইব্রেরিয়ানের চাকরি ছাড়িয়ে বাজারে মুর্গীর মাংসের দোকানে কাজ করতে বাধ্য করেন। বর্হেস-এর বহু রচনা ইংরিজিতে অনূদিত হয়েছে।

জোসেফ ব্র্যাডক : একদা ইস্কুল মাস্টার ছিলেন, তিনখানি কবিতার বইয়ের লেখক, বর্তমানে "সাফো'র দ্বীপ" নামে একটি গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত। ইনি নিজে বলেন প্রথাসিদ্ধ লেখক, "চ্যাংড়ামির" কবিতা একেবারেই পছন্দ করেন না। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে এঁর দাবি, "আমি একজন ভালো বক্তা, এবং আমার অনেক কিছু বলার আছে।" এঁর বক্তব্যের নমুনা, "কবিতা ব্রিটেনের জাতীয় শিল্প। একমাত্র গ্রীস ছাড়া, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কবিতা আমাদের দেশেই লেখা হয়েছে, এবং তার প্রধান কারণ, আমাদের আয়াম্বিক পেন্টামিটার ছন্দ। হুল্লোড়বাজদের কবিতা আমার সহ্য হয় না। কিন্তু এক্সপেরিমেণ্টাল কবিতাতে আমার আপত্তি নেই বটে, কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের ট্র্যাডিশান ধ্বংস হতে বসেছে। তবুও, কবিতা সম্পর্কে আমি আশাবাদী। লোকে বলে, ক্রিকেটের মতন, কবিতাও মরতে বসেছে। দুটোর কোনোটাই সত্যি নয়।

রয় ফুলার : পেশায় আইনজীবী, কবি হিসেবে প্রখ্যাত। এঁর কবিতা কিছুটা নৈরাশ্যের, সভ্যতার ভবিষ্যত সম্পর্কে এঁর কোনো রঙীন ধারনা নেই। "আমি বহুদিন ধরে কবিতা লিখছি। আমার বয়েসী কবি যাঁরা—তাঁরা এ পর্যন্ত যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করেছেন—তা দিয়েই তাঁদের বিচার করতে হবে।"

ব্যারি ম্যাকসুইনি : বয়েস কুড়ি, তারুণ্যের ধ্বজা তুলে বলেছেন, সমস্ত ছাত্র এখন আমার মতন কম বয়েসী অধ্যাপকই চায়। এঁর দৃঢ় ধারনা ইনি জিতবেনই, যদিও ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্র তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে।

ক্যারাডক প্রিচার্ড : বয়েস ৬৩, বার তিনেক ক্রাউন পোয়েট্রি প্রাইজ পেয়েছেন, প্রথাসিদ্ধ কবিতা লেখেন। তিনি চান ওয়েলশ ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে। ইংলণ্ডের সঙ্গে ওয়েলস্-এর সংযুক্তিকরণের ৪০০ বছর ধরে ওয়েল্‌স ভাষা যে ক্ষতি স্বীকার করে আসছে, তিনি তাকে রুখতে চান।

শ্রীমতী ক্যাথলীন রেইন : কবি এবং সমালোচক। তিনি ব্লেক-সম্পর্কে দীর্ঘকাল পড়াশুনো করছেন এবং ব্লেক-এর কবিতা পাঠকদের কাছে নতুনভাবে পৌঁছে দিতে চান। তিনি অবশ্য নিজের প্রার্থী পদের জন্য প্রচারে নামেন নি, স্কটল্যাণ্ডে আত্মগোপন করে আছেন।

পল রোজেনবার্গ : বয়েস ছাব্বিশ, জাতে আমেরিকান, অক্সফোর্ডে এসেছেন এম-এ পড়তে, বিষয় মধ্যযুগের সাহিত্য। ইনি জীবনে এক লাইনও কবিতা লেখেন নি, টাইমস পত্রিকা থেকে কবিতা লেখার আমন্ত্রণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন। কবিতা লেখার ব্যাপারে ইনি বলেন, যদি কবিতা লিখি শুধু নিজের জন্যই লিখবো, কখনো ছাপতে দেবো না। কবিতার মধ্যে যে আনন্দ (Joy কথাটার বাংলা ঠিক আনন্দ বলে অবশ্য বোঝা যায় না)—তিনি সেটাকেই ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে চান।

ডঃ ইনিড স্টারকি : প্রখ্যাত জীবনীকার ও গবেষক। শ্রীমতী স্টারকি বর্তমানে অক্সফোর্ডে ফরাসী সাহিত্যের রিডার এমারিটাশ, তাঁর লেখা র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার ও ফ্লবেয়ারের জীবনী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। শ্রীমতী স্টারকি নিজে অবশ্য কখনো কবিতা লেখেন না। উনিশ শো একষট্টি সাল থেকেই তিনি এই পদটি পাবার চেষ্টা করছেন। এবার তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি, যাঁদের মধ্যে একজন রবার্ট গ্রেভস্। তিনি নিজে এবার নিজের জন্য কোনো প্রচার চালাচ্ছেন না।

ইয়েভগেনি ইয়েফতুশেংকো : ওয়াই দিয়ে নাম বলে শেষে এঁর নাম বসানো হলেও—সমর্থকদের সংখ্যায় এঁর স্থান প্রায় গোড়ার দিকে। এই রুশ কবি বছর কয়েক আগে ইওরোপ সফরে এসে প্রচুর উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলেন, নিজের দেশের অবস্থা সম্পর্কে চমকানো উক্তি করেছিলেন, দেশে ফেরার পর ক্রুশ্চেভের কাছে প্রায় কানমলা খেয়ে অপরাধ স্বীকার করে কিছুটা ঠাণ্ডা হন। সম্প্রতি ব্রিটেনে প্রচারিত তাঁর একটি কবিতায় তিনি বিশ্ব সৌহার্দ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। অক্সফোর্ডের আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্ররা (তাদের অবশ্য ভোট দেবার অধিকার নেই) ইয়েফতুশেংকোকে এই পদ নেবার জন্য অনুরোধ জানায় এবং তিনি নির্বাচনে নামতে রাজী হয়েছেন বলে প্রকাশ।

যত দূর শোনা যাচ্ছে, ইয়েফতুশেংকোর সঙ্গে ইনিড স্টারকিরই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কি অসম লড়াই, একজন বর্ষীয়ান নারী, সারাজীবন গবেষণায় আর পুরোনো বইয়ের পাতা উল্টে চোখ খুইয়ে ফেলেছেন, অন্যজন শিক্ষার দিক থেকে অমার্জিত কিন্তু প্রাণবন্ত তরুণ কবি।

সনাতন পাঠক

সঙ্গীত শাস্ত্র

সঙ্গীতচন্দ্রিকা। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভারতী **সংস্করণ।** রবীন্দ্রভারতী বিদ্যালয়, **৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর** লেন, কলিকাতা-৭। **দাম** পনেরো টাকা।

যে যুগে স্বরলিপি থেকে গান তোলাকে উপহাস করা হত সে যুগে সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আড়াই শ'রও অধিক সংখ্যক সুপ্রাচীন ও সুপ্রচলিত ধ্রুপদের দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশ করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠারও প্রমাণ রেখেছিলেন। সঙ্গীতচন্দ্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩২ সালে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৭০ সালে এই দুটি খণ্ডকে একত্র করে প্রকাশ করেছেন।

বর্তমান সংস্করণে সম্পাদক মহাশয় স্বরলিপিগুলিকে আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত করে শিক্ষার্থীদের সুবিধা করে দিয়েছেন বটে কিন্তু তার অপর কয়েকটি সম্পাদনা সমর্থনের দাবি করতে পারে না। পূর্বসংস্করণে প্রকাশিত গ্রন্থকারের বহু টীকা বহু ব্যাখ্যা বহু মতামত এ গ্রন্থে কোনও কারণ নির্দেশ না করেই বর্জন করা হয়েছে। এমন কি স্বরলিপিও বহু স্থলে বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কিছু কিছু গান বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু সংযোগ করা হয়েছে বলে মনে হল। পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ দুটির যে ধারাবাহিকতা ছিল তাকেও

পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্পাদনার অর্থে বোঝায় যে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের ভাবং কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে কেবল যেসব বিষয় সম্বন্ধে নতুন তথ্য বা ভ্রম সংশোধন করা আবশ্যক সেগুলি নির্দিষ্ট স্থানে সংযুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে চিরাচরিত এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি।

বিষ্ণুপুর ধ্রুপদের ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত। মোগল যুগের অবসান কাল থেকেই এই শিল্পকলায় উন্নত প্রাদেশিক রাজ্যে ধ্রুপদের চর্চা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। শোনা যায়, তানসেনের বংশসম্ভূত বাহাদুর খাঁ এই চর্চাকে বিশেষ অগ্রসর করে নিয়ে যান। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, কারণ বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ ঠিক মুসলমানী গায়কীতে বাঁধিত নয়। ধ্রুপদের যে রীতি বিষ্ণুপুর ঘরানায় প্রতিষ্ঠিত তা অত্যন্ত শুদ্ধ পর্যায়ের। প্রবন্ধ সঙ্গীতের যে ধারাবাহিকতা ছিল বিষ্ণুপুরের গায়কীতে সেই রক্ষণশীলতা অনুভব করা যায়। অতএব তানসেনের গানের প্রভূত চর্চা হলেও বিষ্ণুপুর যে সেনী ধারাকেই অবলম্বন করেছিল তার নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই বরঞ্চ বিষ্ণুপুরের যে একটি নিজস্ব ধারা বহু পূর্বকাল থেকে গড়ে উঠেছে তারই লক্ষণ বিষ্ণুপুরী গায়কীতে পাওয়া যায়। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরী ঘরানাকে সংগঠিত করেন এবং অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বহু শিষ্যকে এই বিদ্যা প্রদান করে যান। অনন্তলালের সুযোগ্য পুত্র গোপেশ্বর পিতৃঋণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শোধ করেছেন এবং এই ধ্রুপদের ঐতিহ্য সারা বাংলায় পরিব্যাপ্ত করে সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী একটি মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন—এজন্য তাঁরাও ধন্যবাদার্হ।

উপন্যাস

সুখ-অসুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পরিবেশক: সিগনেট বুক শপ। ১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

চতুষ্কোণের আভাস থাকলেও 'সুখ-অসুখ' প্রধানত তিন-কোণা ভালবাসার গল্প। ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আধুনিক জীবন ও সমস্যার ছাড়া-ছাড়া অনুষঙ্গ লক্ষ্য করা যাবে এ-উপন্যাসে। লেখক জানেন, ভালোবাসা আজকাল নিরঙ্কুশ নয় এবং তা বিশেষভাবে সামাজিক স্থিতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পাশাপাশি তিনি দেশের অবস্থাটাও বিবেচনা করে দেখাতে চেয়েছেন। উপযুক্ত কাজই করেছেন বলতে হবে। ফলে, মনে হয় উপন্যাসটি মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। সাবেকী ভালোবাসা এখন পৃথিবী থেকে প্রায় উধাও, ছিটে-ফোঁটা যা অবশিষ্ট আছে তাকে টিঁকিয়ে রাখতে গেলে আধুনিক গল্প-উপন্যাসকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই উচিত।

সেদিক থেকে 'সুখ-অসুখ' খব তরল মনে হয় না, বেশ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে অথচ পাঠের দিক থেকেও মনোরম, ছিমছাম। শেষে ওই সাপের খেলাটি না থাকলেই বোধহয় ভালো হ'ত। তাতে ভালোবাসার কোন গৌরবহানি হ'ত না কিংবা উপন্যাসের আদত উদ্দেশ্যেও ব্যাঘাত ঘটত না কিছু। কেবল ওই একটি জায়গায় বইটি একটু শিক্ষামূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য জীবন আজও কোথাও কোথাও উপন্যাসের চেয়েও আকস্মিক ও রহস্যময়। এক সময় কথা উঠেছিল, আধুনিক গল্প-উপন্যাস নাকি ক্রমশঃ কবিতা হ'য়ে উঠতে পারছে। সুনীলবাবু আধুনিক কবি, তবু তিনি এতে সরাসরি গদ্যই লিখেছেন এবং গল্প বলেছেন গড়-গড় করে। গল্প বলতে গিয়ে আর পাঁচকথা পাড়েননি। 'সুখ-অসুখ' উপন্যাসে বিসদৃশ কান্ডকারখানা অথবা নতুন রীতি কিছুই তেমন না-থাকায় কেউ কেউ হয়ত উদ্‌বিগ্ন হবেন। ১৫৯।৬৮

কাঁচের দেয়াল। রূপক গুপ্ত। সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩। দাম পাঁচ টাকা।

'কাঁচ' কথাটা সাবেকী, এখন অধিকতর শুদ্ধ কথা কাচ। এই উপন্যাসটি প'ড়ে মনে হ'ল লেখকেরও এক সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। তিনি এই প্রবল আধুনিক ঝড়ের মাঝখানে এক অস্ফুট রাগিণী বাজাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর বিষয়বস্তু বর্ণনা কিংবা চরিত্রচনা—সবই খড়কুটোর মতো উড়ে যাবার সম্ভাবনা। কুসংস্কারের মুক্তি ও পুনর্বিন্যাস এ-গল্পের লক্ষ্য। লেখক সৌভাগ্যবান, তিনি আজো এক আশ্চর্য সারল্য বজায় রাখতে পেরেছেন। উপন্যাসে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা স্বভাবে এতই সুশীল ও সুবোধ যে তাদের জন্য শেষ পর্যন্ত ভয় হয়। লেখকের ভাষা সাদা আর সোজা; একটুও গোলমাল নেই। ভালোবাসার মৌন দহনটি শেষে ভালো ফুটেছে। ২৩৩।৬৮

প্রবন্ধ

অসি বনাম মসী। সুনীত ঘোষ। পরিবেষক: এস চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স, ২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

যে যা-ই বলুন কলমের ধার এখন পড়্‌তির দিকে। কলম আর তলোয়ারের তুলনা প্রবচন হিসাবে গ্রহণীয় হলেও এর যৌক্তিকতা কিংবা সারবত্তায় সংশয় জাগতে বাধ্য। বিদেশে তো টেলিভিশন আজ সংবাদপত্রের অনেকটা ভাত-ই মেরে দিয়েছে। তবু, সংবাদপত্রের আলাদা এক গুরুত্ব থাকবেই সমাজে। সুনীত ঘোষ মস্ত একটা কাজের কাজ করেছেন। যদিও সংক্ষিপ্ত, তবু ভারতীয় সংবাদপত্রের এক ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে তাঁর এই স্বল্পায়তন বই থেকে। এতদিন পর্যন্ত মার্গারিটা বার্নস-এর 'ইন্ডিয়ান প্রেস'-ই এ বিষয়ে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল, তাও সম্পূর্ণ নয় অর্থাৎ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তার পরিধি। এখানে লেখক আরো সতেরো বছরের সংবাদপত্রের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন এবং আগাগোড়া ভারতীয় দৃষ্টি দিয়ে তার বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তবে ক্ষোভ এই যে, সবই বড় কম-কম। তিনিও যদি এদিক্‌কার এক ডজন বাড়্‌জ্যে হ'তে পারতেন তাহলে আমাদের মস্ত লাভ হ'ত। যা হোক, একেবারে না-পাঁউরুটির চেয়ে আধা-পাঁউরুটিই ভালো। বইটি ছ'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত: কোম্পানী আমল, নতুন উদ্যোগ, বাকিংহামের জেহাদ, দেশীয় ভাষার পত্রিকা, অগ্নিযুগ, যুদ্ধ ও ভারত ছাড় আন্দোলন। তালিকায় লেখক 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'র কথা ভুলে গেলেন কেন? ওটি বড় দরকারী পত্রিকা ছিল। কলকাতার আরেকটি উর্দু কাগজ 'আসরে জাদদ' এবং গুরুমুখী কাগজ 'দেশ-দর্পণ'-এর নামও বাদ পড়েছে। তা ছাড়া, পাটনার সার্চলাইট-এর কথাও ভোলা মুশকিল। একদা এই পত্রিকার সঙ্গে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নাম জড়িত ছিল। ২৪৫।৬৮

অবাস্তব মার্কসীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের জিঘাংসাবৃত্তি ও ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যার অসারতা। দেবব্রত সেনগুপ্ত। ৫২।ডি।৫ বাবুবাগান লেন, কলিকাতা-৫।

দুটি প্রবন্ধের সমাবেশে এই গ্রন্থ। লেখক প্রথম প্রবন্ধে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, কমিউনিজম ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং 'মার্কসের অনেক মূল নীতির ন্যায় তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদও অনৈতিহাসিক অবাস্তব।' পার্থিব বস্তুর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনের ভিত্তিতেই মানুষের ভাব-ধারণার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বস্তু বা অর্থ চিন্তাই মানুষের সমস্ত বিবর্তনের মূল এবং একমাত্র কারণ বলে মার্কসীয় নীতির বস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক যে ব্যাখ্যা করা হয়, লেখক দ্বিতীয় প্রবন্ধে তার অসারত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধ দুটিতে যুক্তি আছে এবং কমিউনিজমের ত্রুটি বোঝার পক্ষে কাজে আসে।

পত্রিকা

কণ্ঠস্বর। সম্পাদক: সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ৪৯।এল।৭ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। কলিকাতা-১১। দু'টাকা।

আধুনিক কবিতার নতুন আঙ্গিক, ছন্দ গঠন সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষার পত্রিকা কণ্ঠস্বর; যদিও এর শারদীয় সংখ্যাটিতে প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়েছে। অনেক তরুণ কবি ও নবীন লেখকের সঙ্গে এতে লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর প্রভৃতি। রচনা নির্বাচন ও প্রকাশনায় কণ্ঠস্বরের সর্বত্রই সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

পারাবত [মাসিক পত্রিকা] ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। সম্পাদক: আনন্দ বাগচী। সহ-সম্পাদক: অবনী নাগ। প্রসন্ন

ব্যানার্জি রোড, বাঁকুড়া। দাম : ১·৫০ পয়সা।

বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক এই রুচিশীল মাসিক পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতে একটি নতুন ধরনের উপন্যাস লিখেছেন রবীন্দ্র গুহ। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশীল রায়, শক্তিপদ গোস্বামী, শিশির লাহিড়ী, শিপ্রা পাল, অবনী নাগ, অবিনাশ রায়, অপর্ণা চক্রবর্তী, প্রবাস দত্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সুসম্পাদিত এই পত্রিকাটি মফস্বল বাংলায় প্রতিনিধিত্ব করবে আশা করা যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

বই মনের মন। লোকনাথ ভট্টাচার্য। অবয়ব : ৪২ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

কস্তুরী মৃগ। শ্রীপ্রেমরঞ্জন। স্মারক প্রকাশনী : ২৭১ রবীন্দ্র সরণী : কলিকাতা-৫। মূল্য ২·৫০।

সংশপ্তক সতীশচন্দ্র। আত্মপরিচয়। শ্রীপঞ্চানন রায় : বাসুদেবপুর, পোঃ শঙ্করপুর মেদিনীপুর। মূল্য ২·২৫।

সংগীত জগৎ। অঞ্জন কুণ্ডু। সংস্কৃতি : ৫৮।৫১ প্রিন্স আনওয়ার শা রোড, কলিকাতা-৪৫। মূল্য ৪·০০।

গীত সোপান। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদীপ পাবলিশার্স : ১০ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

Ethno-Musicology and India: Sudhibhusan Bhattacharya. Indian Publications, Calcutta. Price Rs. 12.50.

জীবন পথে (১ম ভাগ)। শ্রীজীবনচন্দ্র ঘোষ। শ্রীমতী সুমতিবালা ঘোষ : প্লট নং ৫৭, রায়পুর গভর্ণমেন্ট স্কীম নং ২, পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা। মূল্য ২·০০।

Studies in Museum and Museology in India. D. P. Ghosh. Indian Publications, 3 British Indian St., Calcutta-1. Price Rs. 18.50.

টুম টুম। রেখা দত্ত। ১৭, ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ০·৫০।

নদী বহে যায় ধারে। অমল মিত্র। বিশ্বমিত্র : ৮২/২ সি আই টি রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৫·০০।

মরা নদী। গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। দেবকুমার ঘোষ : ২১/১এ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলিকাতা-৫০। মূল্য ২·০০।

প্রথম দশজন (স্কুল ফাইনাল ১৯৬৮)। স্কলার্স সিন্ডিকেট : ১৭০-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪। মূল্য ১·০০।

গান্ধীজী ও কমিউনিজম। অমলেন্দু দাশগুপ্ত। সমাজবিদ্যা ভবন : ৩/১ নফর কোলে রোড, কলিকাতা-১৫। মূল্য ০·৩০।

রবীন্দ্রনাথ ও কমিউনিজম। অমলেন্দু দাশগুপ্ত। সমাজ বিদ্যা ভবন : ৩/১ নফর কোলে রোড, কলিকাতা-১৫। মূল্য ০·৩০।

অগ্রগামীর 'বিলম্বিত লয়' : উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী　　ফটো—দেশ

চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার

চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান দিল্লিতে এ-সপ্তাহে সম্পন্ন হল। আগে যার নাম ছিল রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, এখন তার নাম জাতীয় পুরস্কার। নাম বদল হলেও কেন্দ্রীয় সরকারই পুরস্কার-দাতা। সরকার পুরস্কার দেন কেন? প্রশ্নের উত্তর সহজ। সৎ-চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রযোজক ও কলাকুশলীদের উৎসাহদানের জন্য। এই পুরস্কার আর্টের স্বীকৃতি কতখানি তা-নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নটি আজকের নয়, অনেকদিন যাবত উচ্চারিত ও আলোচিত। সিনেমার গুণ-নির্ধারণে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অসম্ভব। কেন্দ্রীয় বিচার কমিটির মতে যে ছবি শ্রেষ্ঠ, অনেক বোদ্ধা দর্শক ও সমালোচকের বিচারে সে-ছবি সর্বোত্তম নাও হতে পারে। অতএব, এ-নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু একটি পুরস্কারের নীতি অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না। কী ধরণের ছবি সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতে পারে সে-সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা গত পনেরো বছরে স্পষ্টই হয়ে উঠেছে। ছবি যত শিল্প-সম্মতই হোক না কেন, তার সঙ্গে মহৎ ভাবনা বা আদর্শের সংমিশ্রণ চাই। এই নীতির ব্যতিক্রম সম্ভবত খুব কম ছবির ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

অতি সম্প্রতি অবশ্য পুরস্কারের কয়েকটি নতুন বিভাগ হয়েছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যধর্মী চিত্রের জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট। তাই আশা করা গিয়েছিল, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর্ট বা নতুন এক্স-পেরিমেন্টই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে। না, নীতির বিশেষ অদল-বদল হয়নি। তা-ছাড়া, এ-বছর চিত্রপরিচালক, সংগীত পরিচলক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং শ্রেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীর পুরস্কারেরও প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রথমত, বেশী পুরস্কার বিভ্রান্তিকর। যেমন, শ্রেষ্ঠ চিত্রের পরিচালককে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। আবার শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের জন্যও আলাদা পুরস্কার চালু হল। এক্ষেত্রে আমরা কী বুঝব? এতদিন জেনে এসেছি, শ্রেষ্ঠ ছবির পরিচালক যখন পুরস্কৃত তখন তিনিই বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক। এবার দুজন পরিচালক পুরস্কার পেলেন। একজন শ্রেষ্ঠ ছবির পরিচালক হিসাবে, অপরজন শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক রূপে। অর্থাৎ ছবির পুরস্কারে একজনের পুরস্কার। অপরজনের চিত্র-নিরপেক্ষে পুরস্কার—শুধুই পরিচালক রূপে। ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর নয় কি? গতবার যেমন একটি ছবি সাহিত্যমূল্যের জন্য পুরস্কার পেয়েছিল, রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকের জন্য চিহ্নিত হয়েছিল আর একটি ছবি।

প্রশ্ন আরও আছে। যে-ছবি কোনই পুরস্কার পেল না সে-রকম কোন একটি ছবির নায়ক বা নায়িকা, অথবা সংগীত পরিচালক কিংবা নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী পুরস্কার পেতে পারেন। কিন্তু জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সেই ছবির 'এনট্রি' করিয়ে নিতে হয়। এমনও তো হতে পারে, যে-ছবি 'এনট্রি' করা হয়নি তাতে পুরস্কারের যোগ্য শিল্পী বা কলা-কুশলী থাকতে পারেন। থাকলে কী হবে, তাঁদের পুরস্কার পাবার সুযোগ নেই। কারণ সেন্সরের ছাড়পত্র পাওয়া বা প্রদর্শিত বছরের প্রতিটি ছবি জাতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিবেচনা-

ধীন নয়। কলকাতায় চলচ্চিত্র সাংবাদিকরা যেমন বছরের মুক্তিপ্রাপ্ত সব ছবির বিচার করেন, সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটি তা করেন না। অতএব কেউ যদি কোন কারণে জাতীয় পুরস্কারের জন্য ছবি ভাল হওয়া সত্ত্বেও তা "এনট্রি" করতে না চান তবে যোগ্য শিল্পী বা কলাকুশলী সম্মানলাভে বঞ্চিত হতে পারেন। তা-বাদে বছরের সব ছবি তো 'এনট্রি' করা হয় না।

জাতীয় পুরস্কারের ব্যাপারে এই ধরণের অনেক কথাই চলচ্চিত্র-রসিকদের মনে জাগতে পারে। বিদেশের ফেস্টিভ্যালের মত আমাদের জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয় না কেন, এবং অল্প কয়েকটি বিভাগে তা সীমাবদ্ধ থাকলে ক্ষতি কী ইত্যাদি প্রশ্নও এক্ষেত্রে অবান্তর নয়। আসল কথা, জাতীয় পুরস্কার প্রদানের বিধি ও নীতি নিয়ে অনেক আলোচনাই হতে পারে। ফিল্ম-আর্টের সত্যিকারের স্বীকৃতি দানের জন্য রীতি-নীতির আরও পরিবর্তন করা সম্ভব। পরিবর্তন তো চলছেই। অতএব বাধা কোথায়?

প্রখ্যাত চিত্রপ্রযোজকের বদান্যতা

উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং ওড়িষ্যার আর্ত জনগণের সাহায্যকল্পে সুখ্যাত চিত্র-প্রযোজক ও অভিনেতা শিবাজী গণেশন একটি বিরাট অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সম্মত হয়েছেন। আগামী জানুয়ারীর শেষার্ধে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে তাঁর নাট্যসংস্থা কলকাতায় দুটি তামিল নাটক মঞ্চস্থ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির অনুরোধে শ্রীগণেশন এই সাহায্যের আশ্বাস দেন। শ্রীগণেশনের নিজস্ব প্রতিনিধি আরও জানিয়েছেন যে, যাতায়াত করবেন, নিজেদের খরচে কলকাতায় থাকবেন এবং কোনও প্রচারের প্রত্যাশা করবেন না।

বন্যাত্রাণে

ই-আই-এম-পি-এ'-এর উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ তহবিলে পূর্ণ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ১০০১ টাকা দান করেছেন।

প্রাচী প্রেক্ষাগৃহের কর্মীরা বন্যাত্রাণে অর্থ সংগ্রহ করছেন দর্শকদের কাছ থেকে। যৎসামান্য দান গ্রহণ করে তাঁরা দফায় দফায় রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাত্রাণ তহবিলে ৫০০ টাকা জমা দিয়ে এক সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

কলকাতায় 'গৌরী'-র এক বিশেষ প্রদর্শনীতে ছবির প্রযোজক শিবাজী গণেশন বন্যাত্রাণে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের [illegible]

বন্যাত্রাণে শিল্পী-সংসদ

রবীন্দ্র-সদনে শিল্পী সংসদের অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ বন্যাত্রাণের জন্য মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে'র হাতে তুলে দিচ্ছেন উত্তমকুমার—অনিল চট্টোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফটো—দেশ

দেশের মানুষের যখন বিপদ তখন বাংলার শিল্পী-সমাজ উদাসীন থাকতে পারেন না। এই কর্তব্যবোধের পরিচয় বাংলার শিল্পীরা ইতিপূর্বেও দিয়েছেন। আবার দিলেন উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে। গত সপ্তাহে শিল্পী-সংসদ বন্যার্তদের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র-সদনে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (২৮০০০ টাকার ওপর) সংসদের সভাপতি শ্রীউত্তমকুমার কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দের হাতে তুলে দেন।

অনুষ্ঠানটিতে গান ও নাচ দুই-ই ছিল। নাচলেন শ্রীমতী জয়শ্রী সেন এবং শ্রীমতী অমলাশঙ্করের ছাত্রীরা। গান যাঁরা গেয়েছিলেন কণ্ঠশিল্পী হিসাবে তাঁরা সকলেই জনপ্রিয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, দীপেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা গান গেয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দেন।

উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী দ্বৈত গানে যোগ দিয়েছিলেন। কণ্ঠশিল্পীর ভূমিকায় তাঁদের উপস্থিতিই ছিল দর্শকদের কাছে বড় কথা, গান নয়। আসরের শেষে শিল্পী ছিলেন মান্না দে। শ্রোতাদের অনুরোধে তাঁকে এক ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে গাইতে হয়।

শিল্পী-সংসদের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কেউ কেউ স্মারক-পুস্তিকা বিক্রি করেছেন। সকলেই মহৎ প্রেরণায় সেদিন উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অনুষ্ঠান-শেষে মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিল্পীদের আন্তরিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আর্কাইভস-এর উৎসব

ব্যারাকপুরে অবস্থিত ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আর্কাইভস-এর দ্বিতীয় বার্ষি[ক] উৎসব ২রা ডিসেম্বর আরম্ভ হচ্ছে। উৎসব চলবে দেড় মাস। নাটক অভিনয়, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, আলোচনাচ[ক্র] এবং আর্কাইভস-এর জন্য সংগ্রহ অভিযা[ন] উৎসব কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আর্কাইভস-এর নিজ[স্ব] সংগ্রহশালার স্থায় উদ্বোধন হয়েছে গ[ত] ডিসেম্বর মাসে। সংগ্রহশালার সঙ্গেই নির্মি[ত] হচ্ছে আনন্দময় ও সন্তোষ মঞ্চ।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

বৌদি

ছবির নাম "বৌদি" (পূর্ণেন্দু প্রোডাকসন্‌স)। অতএব কাহিনী যে দুই ভাইকে নিয়ে তা সহজেই অনুমেয়। দেবর অজু বৌদির পুত্রতুল্য। অজুর দাদা হরি শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইলের দাদার মতই। ছোট ভাইয়ের গর্বে গর্বিত। নিজে সাধারণ সেরেস্তার কাজ করে। ছোট ভাইকে বড় করে তোলার জন্য কোন ত্যাগই হরি ও তার স্ত্রী সরমার কাছে বড় নয়। এমনকি অজুর পরীক্ষার ফীর টাকা জোগাড় করতে না পেরে হরি শেষ পর্যন্ত চুরি করে জেলে যায়।

শরৎ-সাহিত্যের ধাঁচে লেখা "বৌদি" গল্প (গল্প রচনা পরিচালক দিলীপ বসুর)। কাহিনীর আবেগ-উপাদান, কিংবা মহত্ত্বের উপকরণের আস্বাদ দর্শকের কাছে নতুন নয়। বৌদি যথাবিহিত ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি, পরম স্নেহশীল বড় ভাইও তাই। ছোট ভাইয়ের সংগে যথানিয়ম তাদের সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছে। অজু ভুল বুঝেছিল বৌদিকে। ভুল বোঝা-বুঝির জন্য অবশ্য অজু দায়ী নয়। বৌদি অজুকে জানতে দেয়নি যে তারই পড়ার খরচের জন্য হরি চুরি করেছে। বৌদি নিজেই চুরির জন্য দায়ী বলে অজুকে জানিয়েছিল। যাই হোক, অজু কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর নিয়মমাফিক স্বার্থপর হয়ে যায়নি। অজু যখন বড় কারখানার ছোট সাহেব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের পুত্রহারা মালিকের পুত্রতুল্য, তখন তার দাদা ও বৌদি এসে উঠেছে বস্তিতে। এবং ওই কারখানাতেই অজুর দাদা সাধারণ মজুরের কাজ নিয়েছে, এবং কারখানার মালিকের বাড়িতে অজুর বৌদি রাঁধুনির কাজে নিযুক্ত। অজুর বড়লোক মালিকের একমাত্র কন্যা নেই, এবং তিনি কখনই অজুকে তার নিরুদ্দেশ দাদা-বৌদির খোঁজ-খবর নিতে বাধা দেন নি। এখানেই নিয়মের ব্যতিক্রম। বলা বাহুল্য, ছবির শেষে অজু দাদা-বৌদির সংগে মিলিত। এবং কমলাও বাবার সংগে তখন কলকাতায়। গ্রামের মেয়ে কমলার সংগে অজুর বিয়ে ঠিক ছিল। শরৎ-কাহিনীর ছাঁচ শুধু অজু কমলার ক্ষেত্রেই নয়, গ্রামের আরও চরিত্রের বেলায়ও তা পরিস্কার। যেমন হরি-অজুর অর্থলোভী কুচক্রী কাকা।

"বৌদি" এক কথায় আবেগসর্বস্ব পারিবারিক মেলোড্রামা। আবেগ সৃষ্টির জন্য নিয়তির দোহাই দিয়ে ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ তথা কৃত্রিম নাটোপকরণ ছবিতে সন্নিবিষ্ট। কোন কোন মুহূর্তে দর্শকের চোখে জলও আসে। নাটক যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের কাছে এই ছবির কদর হবেই। পরিচালক-কাহিনীকার দিলীপ বসুর কৃতিত্ব, তিনি প্রয়োজনের বাইরে কোন অনাবশ্যক ঘটনা ছবিতে জুড়ো করেন নি—যদিও মেসে ছেলেদের হৈ-হুল্লোড়ে ও গানের ব্যাপারটি বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। নাটারস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিচালকের দক্ষতা স্বীকার করতেই হবে। ছবিটি অতি চমৎকার চিত্র সম্পাদনার ফলে (অমিয় মুখোপাধ্যায় কৃত) গতি-সম্পন্ন হতে পেরেছে। এই কারণে ছবির উপভোগ্যতাও বেড়েছে।

"বৌদি" চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও তরুণকুমার

নামভূমিকার শিল্পী সন্ধ্যারাণী। বেশ কিছুদিন পরে স্নেহময়ী বৌদির চরিত্রে তাঁর সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকের মন জয় করবে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিও একটি সার্থক চরিত্রসৃষ্টি। অজুর চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় মনোজ্ঞ। সহৃদয় বিত্তবানের চরিত্রে (অজুর মালিক) বিকাশ রায়ের সুন্দর চরিত্রচিত্রণ মনে দাগ রাখে। ক্লাইম্যাক্সে তাঁর সংলাপগুলিও আবেগের সংগে উচ্চারিত। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় দিলীপ চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, তরুণকুমার, কালীপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি সুঅভিনয় করেছেন। এক পরোপকারী যুবকের চরিত্রে অনুপকুমারের অভিনয় প্রাণবন্ত। কিশোর শিল্পী শঙ্কর প্রশংসনীয়ভাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছেন।

অকারণে ছবিতে বেশী গান রয়েছে। যদিও গানের সুর ভাল দিয়েছেন সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। দেওজী ভাই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী।

নন্দিনী মালিয়াকে আবার দেখা যাবে চিত্রলিপির 'মাল্যদান' ছবিতে—রবীন্দ্র-কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন অজয় কর

গৌরী

হিন্দী চিত্রে সুখ-দুঃখের মেলোড্রামা সাজাবার রীতি, কী বোম্বাইয়ে, কী মাদ্রাজে, বোধ হয় একই। দুই বন্ধুর প্রেম, স্ত্রীর সতীত্ব, অর্থপিশাচের লোভ এবং স্নেহশীল পিতার নির্বুদ্ধিতা—সব কিছুই এ ক্ষেত্রে চরম অর্থাৎ অবিশ্বাস্য। শিবাজী ফিল্মসের "গৌরী" চিত্রের কথাই ধরা যাক। অর্থলোভী অতি চতুর মামা (ওম প্রকাশ) বড়লোকের অন্ধ মেয়ের সংগে ভাগ্নের (সঞ্জীবকুমার) বিয়ে দিয়ে দিলেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত নন। ভাগ্নের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে (আসলে মরেনি) তার অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে (সুনীল দত্ত) ভাগ্নে-পরিচয়ে বউমার অর্থাৎ গৌরীর

সামনে এনে দাঁড় করালেন। বিয়ের সময় গৌরী (নূতন) অন্ধ ছিল, স্বামীকে দেখেনি। অন্য কেউ কি জামাতাকে দেখতে পায়নি? না, এখানেও কাহিনীর কারসাজি। গৌরীদের পরিবারের এক বিশেষ ট্র্যাডিশন অনুযায়ী বিয়ে হয়েছে মন্দিরে—যেখানে পাত্রীর পিতা, বরের অভিভাবক ও পুরোহিত ছাড়া আর সকলে অনুপস্থিত। গৌরী জানিয়ে দিয়েছে, অপারেশনের পর চোখ মেলে সে প্রথম তার স্বামীকে দেখবে (হিন্দু ঘরের আদর্শ বধূ হলে কী হবে, স্বামীর সম্বন্ধে কৌতূহল, তাকে দেখবার ও কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি গৌরী লজ্জা-শরমের বালাই কিছুটা না রেখেই গুরুজন-দের সামনে প্রকাশ করেছে)। গৌরীর অর্থবান পিতা এতকাল গৌরীর চোখ অপারেশনের জন্য (যা অতি সহজেই সম্পন্ন হয়েছে) যে যত্নবান হননি তা নিয়ে আর আক্ষেপ করে আর লাভ কী। গৌরীর স্বামীর বন্ধু নিজের প্রেয়সীর (মমতাজ), খোঁজখবর ছেড়ে দিয়ে অতি কষ্টে গৌরীর স্বামী সেজে রয়েছে (অবশ্য দেহগত দূরত্ব সর্বদা বজায় রেখে)। এমন না হলে নাকি গৌরীর প্রাণাশংকা ছিল। যথাসময়ে গৌরীর আসল স্বামী ফিরে এল। যথাসময়ে গৌরী জানল, তার স্বামী কে। মনে মনে সে আর একজনকে স্বামী বলে জেনেছে, নিজেকে তার কাছে "অন্তরের" দিক থেকে সমর্পণ করেছে। অতএব গৌরী অশুচি হয়ে গেল না কি? গৌরী অন্তত তাই মনে করে। সুতরাং গঙ্গার কোলে আশ্রয় নেওয়া অর্থাৎ আত্মহত্যা ছাড়া গৌরী আর কোন পথ খুঁজে পেল না। কিন্তু দেবীমাতা (যাঁর মন্দিরে গৌরী পুজো দিতে যেত) গৌরীর ভ্রান্তি ভেঙে দিলেন। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েও গৌরী মরল না। এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটল যে, গৌরী ছিটকে এসে নদীতীরে স্বামীর পায়ের উপর পড়ল।

বাস্তবের লক্ষণ এই ছবিতে (এ ভীম সিং পরিচালিত) খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। তবে রূপকথার আমেজ এ ছবিতে অবশ্যই আছে। তবে একটি 'বাস্তব' ব্যাপার উল্লেখ করা যেতে পারে। ছবিতেও সুনীল দত্তের নাম সুনীল, সঙ্গীতকুমারের সঙ্গীত।

যদি সুরারোপিত কিছু গান শুনতে ভাল লাগে।

"আগন্তুক" ছবি হচ্ছে

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত মঞ্চসফল নাটক "আগন্তুক"-এর চিত্ররূপ দেওয়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। অরোরা ফিল্ম করপোরেশন ও টৌলি ফিল্মসের যুগ্ম প্রযোজনায় এবং "সারথি" গোষ্ঠীর পরি-চালনায় "আগন্তুক"-এর শুটিং আরম্ভ হচ্ছে ডিসেম্বরে। ৩রা ডিসেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চেই ছবির মহরত অনুষ্ঠান।

বোম্বাই বিচিত্রা

শো বিজনেসের আনক্রাউন্ড কিং-এর সঙ্গে শিল্প সম্রাটের আলাপ হল। দুজনেই বিখ্যাত। একজন জনমনের মনোরঞ্জক, অন্যজন গুণীজন সম্মানিত। একজনের পপুল্যারিটির এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের প্লাবন যে কোন পার্থিব পুরুষের ঈর্ষার বস্তু। অন্যজনের উচ্চমানের খ্যাতিকে খাতির না করার সাহস কারুর নেই।

কিছু দিন আগে কোন এক ঘরোয়া পরিবেশে শুনলাম যে শো বিজনেসের আনক্রাউনড্ কিং এখন জান প্রাণ দিয়ে আর এক শিল্প সম্রাটের আবির্ভাব ঘটাতে বদ্ধপরিকর। এবং এই সঙ্গে আরো কানে এলো যে আলোচ্য আনক্রাউনড্ কিং বর্তমান শিল্পসম্রাটের সমস্ত চেলাচামুণ্ডা-দের সমূলে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর। প্রশ্ন উঠল : কিন্তু কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর যিনি দিলেন তাঁর সত্য ভাষণ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই জন্যেই এত ঢাক ঢাক গুড় গুড়। যাই হোক, তিনি বলেন যে, যখন শো বিজনেসের আনক্রাউনড্ কিং এবং শিল্প-সম্রাট শিল্প সংক্রান্ত বিজনেস টক করছিলেন তখন যে তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর মুখ থেকে উনি যা শুনেছেন তার মর্ম এই যে : শো বিজনেসের আনক্রাউনড্ কিং শিল্প-সম্রাটের শিল্প-সম্মত সমস্ত শর্তের কাছে আনকন্ডিশনাল আত্মসমর্পণ করেন এবং শিল্প সম্রাটকে যে কোন শর্তে তাঁর ব্যানারে একটি ছবি করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শিল্প-সম্রাট মৃদু মৃদু হেসে সে-সমস্ত অফার নিয়ে কোন রকম মাথাই ঘামান নি। তখন আনক্রাউনড্ কিং অধৈর্য হয়ে শিল্প সম্রাটকে চেপে ধরেন এবং বলেন, "দেখুন, আপনি হয়ত ভাবলেন যে, আমি এতসব বলে কয়েও শেষে কাজ আরম্ভ হলে আপনার সঙ্গে গণ্ডগোল করব। কিন্তু না, আমি কসম খেয়ে বলছি তেমনটি হবে না। তাছাড়া আমার কসমেরই বা মূল্য কি! আপনি কনট্রাক্ট্-এর সমস্ত শর্ত লিখে দিন আমি সই করে দিচ্ছি। বরং একটা কিছু না লেখা স্ট্যাম্প কাগজে সই করে দিচ্ছি। আপনি যা চান তাই লিখে নিন। কেবল আমার এখানে একটা ছবি করুন!" এতেও শিল্প সম্রাট মৃদু হেসে নিরুত্তর থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনক্রাউনড্ কিংকে শিল্প-সম্রাট বলেন, "দেখুন মশাই এটা বোঝা যাচ্ছে যে আমি যদি আপনার ব্যানারে ছবি করি তাহলে ইট মীনস্ সামথীং টু ইউ। বাট ইট ডাজ নট মীন এনিথীং টু মী। আনক্রাউনড্ কিং স্বপ্নেও ভাবে নি যে এমন কথা কখনো কারুর কাছ থেকে তাঁকে শুনতে হতে পারে। কিন্তু যখন শুনতে হ'ল তখন তিনি শুধু অবাকই হন নি। বেশ কিছুদিন হতবাক্ও ছিলেন। অধুনা তাঁর বাক্ শক্তি ফিরে এসেছে এবং শিল্প-সম্রাটের কোন ভক্ত বা গুণগ্রাহী দেখলেই তাঁর রোষানল লক লক করে উঠছে। সেই রোষানলের খানিকটা আঁচ নাকি লেগেছে কোন এক মোটামুটি নাম করা চিত্রতারকার গায়ে। উপরোক্ত গসিপের বৃত্তান্ত তারই মুখ থেকে শুনলাম। এ ঘটনা সত্যি না হতে পারে। কিন্তু শ্রুতিরোচক এবং মুখ-মাদক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সরল শর্মা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পূর্ণিমা পিকচার্স-এর "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিতে জহর রায় এবং জাদুকরের বেশে হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

"জীবন সঙ্গীত" আগামী সপ্তাহে

পি এম পিকচার্স-এর "জীবন-সংগীত" আগামী শুক্রবার কলকাতা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে।

এক ছন্নছাড়া বেকার যুবকের আত্ম-প্রতিষ্ঠার কাহিনী এ ছবিতে বর্ণিত। কাহিনীটি শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত॥ নায়কের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় ও নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় অভিনয় করেছেন এবং অন্যান্য চরিত্রে রীণা ঘোষ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন ও আরও অনেকে রয়েছেন। ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত-পরিচালনা করেছেন এবং কণ্ঠ-সংগীতে আছেন তিনি নিজে ও মান্না দে।

কলকাতায় রুশ শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান

রুশ শিল্পীরা গত সপ্তাহে কলকাতা কলামন্দিরে নৃত্য পরিবেশন করে এখানকার দর্শকদের আনন্দ দিয়ে গেলেন। ত্রিশজন রুশ নৃত্য ও সংগীত শিল্পীর দলটি ভারত-সফরকালে কলকাতায় তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। প্রায় দু' ঘণ্টার অনুষ্ঠানে মোট ২৬টি নাচ ছিল। লোকনৃত্যই ছিল

দুই সোভিয়েত শিল্পী

বেশী, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন অঞ্চলের নাচ। নাচের সঙ্গে সংগীতের যোগটিও ছিল চিত্তাকর্ষক। প্রত্যেক নৃত্যাংশের শেষে শিল্পীরা দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে অভিনন্দিত হন।

শৌভনিক অভিনীত "বাঁশরি"

রবীন্দ্রনাথের বাঁশরির "প্রকৃতিটা বৈদ্যুত-শক্তিতে সমুজ্জ্বল"। বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে শ্রীমতী বাঁশরি সরকারের কথাও তাঁরের মত, যেমন তার গতি তেমনি তীক্ষ্ম। কথার আঘাতে আঘাতে সবাইকে, এবং বিশেষ করে নিজকে, প্রতিনিয়ত জর্জরিত করার শেষে বাঁশরি উপলব্ধির চরম ক্ষণে তার যত প্রণাম বাকি ছিল সব একত্র করে পুরন্দরের পায়ে দিতে পেরেছে। বাঁশরির এখানেই উত্তরণ।

'বাঁশরি' নাটকে ঘটনা অল্প, কিন্তু বিপ্লব প্রচণ্ড। সেটা মানসিক বিপ্লব। নাটকের সংঘাতও বুদ্ধির স্তরে। নাটক দেখতে বসে একাগ্র মনে প্রতিটি চরিত্রের এবং বাঁশরির কথা অনুধাবন করতে হয়। সহজিয়া ভাবনা ও কঠোর কল্যাণধর্মের সংঘর্ষটি যখন উত্তাল, দর্শকের বুদ্ধিগত উত্তেজনাও তখন চরমে। তারপর যখন প্রেম কঠোর হয়, অনুশাসন শিথিল হতে হতে সার্থক হয় এবং বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে, তখনও দর্শকের মন থেকে যেন চিন্তা-জট সরতে চায়না। "বাঁশরি"-র শক্তি এইখানেই। এবং তা সামগ্রিক অভিনয়ে, কখনও সংগীতে ও গানে অব্যাহত রাখতে পেরেছেন শৌভনিক গোষ্ঠী।

বাঁশরিকে জীবন্ত, প্রায় পরিপূর্ণ করে তুলেছেন মমতা চট্টোপাধ্যায়। এমন করে মঞ্চে বাঁশরিকে আর কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারতেন জানি না। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় পেরেছেন। অসামান্য তাঁর বোধশক্তি, তাঁর অভিনয়। চরিত্রচিত্রণ আর সকলেরই ভাল, বিশেষত পুরুষ শিল্পীদের। গোপেন মুখোপাধ্যায় (সোমশংকর), সুধাংশু মণ্ডল (ক্ষিতীশ), কৃষ্ণ কুণ্ডু (পুরন্দর), বীরেশ্বর মিত্র (সতীশ), বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় (সুধাংশু)—এঁরা প্রত্যেকেই চমৎকার অভিনয় করেছেন। গোপেন মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ কুণ্ডু তাঁদের অভিনীত চরিত্রে বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় নিমু ভৌমিকের তারক উল্লেখযোগ্য। মহিলা শিল্পীদের অভিনয়ে মীনাক্ষী বসু (সুষমা) এবং সৌমিত্রা চৌধুরীর চরিত্রাংকণ মনে রেখাপাত করে। লীলা সেজেছেন অনুরাধা দাশগুপ্ত।

সংগীত নাটকে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এই কৃতিত্ব সুরকার দেবাশিস দাশগুপ্তর। গান গাওয়া (মঞ্জু দাশগুপ্ত ও দেবাশিস দাশগুপ্ত) এবং গানের ব্যবহার সুন্দর।

মঞ্চসজ্জা অনাড়ম্বর। আলোকপাত (স্বরূপ মুখোপাধ্যায়) বিশেষ প্রশংসনীয়।

মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে "বাঁশরি" শৌভনিকের বর্তমান উপহারের একটি।

অবনমহল

বিশ্ব শিশু দিবসে শিশু রংমহলের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, অবনমহল ক্যাম্পাস সকল শ্রেণীর ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে উদ্ঘাটিত হবে। অবনমহলের পরিধি সীমাবিত। এ অবস্থায় প্রথমে ৫০০ ছেলে-মেয়েকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিবসে সময় দেওয়া হবে। সি এলটির যেসব বিভাগ রয়েছে যথা নৃত্য, গীত, অভিনয়, ছবি আঁকা, স্কেটিং, কয়ার, এই সমস্ত বিভাগেই এরা খুশিমত যোগদান করতে পারবে।

এই সঙ্গে শিশু রংমহলের একটি নিজস্ব অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে চার বছর থেকে ষোল বছরে ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থা হবে। এটিই হবে ন্যাশনাল স্কুল অ ব্যালে।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

ক্ষুদে মানুষ বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি ওয়াকার ক্যাম্প?*
কী?
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার·কাম্প

এই বইতে ক্ষুদে মানুষের গল্প রয়েছে। অমন মানুষ সত্যিই আছে নাকি?
ও নেহাতই গল্প।

রাজা, তুই জানতে চেয়েছিলি, ক্ষুদে মানুষরা সত্যিই আছে কিনা।
ওদের নিয়ে গল্প আছে অনেক।
একটা গল্প বলো ওয়াকার-কাম্প।*
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার·কাম্প।

"উত্তর-দেশে ছোট মানুষদের নিয়ে অনেক গল্প আছে—।"

"আয়ারল্যান্ডে অমন গল্প অনেক শোনা যায়।"

"শোনা যায় প্রাচ্য জগতেও। সেখানেও গল্পের সংখ্যা কম নয়।"

ঘুমিয়ে পড়েছে! ওরা জানে না যে, গল্পের বাইরেও তারা আছে।
ঘরর... ঘরর

কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাদের কথা কাউকে জানাব না।

বিশ্বব্যাঙ্ক-এর প্রেসিডেন্ট রবারট ম্যাকনামারার কলকাতায় আগমন এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০শে নবেম্বর বুধবার ম্যাকনামারা দমদম বিমানঘাটিতে পৌঁছলে রাজ্য সরকারের টাউন ও কানট্রি প্ল্যানিং বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রীঅমিতাভ নিয়োগী তাঁকে মাল্যভূষিত করেন। বিমানঘাটি থেকে ম্যাকনামারা হেলিকপটারে ময়দানে এসে নামেন এবং এখান থেকে সোজা রাজভবনে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই সি এম পি ও এবং রাজ্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আরম্ভ হয়। ম্যাকনামারা দমদম বিমানঘাটিতে এসে পৌঁছলে এক উত্তেজিত জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক ঘণ্টা কালের মধ্যে ওই বিক্ষোভ কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এখানে পর পর তিনখানি ট্রামে আগুন লাগানো হয় এবং তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুলিস বিক্ষুব্ধ জনতার উপর লাঠি চালায় ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ম্যাকনামারা বুধবার গভীর রাতে ছয় ঘণ্টা ধরে কলকাতা এবং হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেছেন বস্তি, ঘিঞ্জি নোংরাপথ আর ফুটপাথে ঘুমিয়ে থাকা অসংখ্য মানুষকে। ২১ নবেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রী বি এম বিড়লার বাড়িতে এক ভোজসভায় ম্যাকনামারা কলকাতার উন্নয়নে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আরও আগ্রহ-উদ্যোগের উপর জোর দেন। সেখানে উপস্থিত শিল্পপতিরা একাজে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এদিনও চৌরঙ্গী এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্র ও পুলিসের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ট্রামে বাসে আগুন লাগানো হয়। প্রেসিডেন্ট রবারট ম্যাকনামারা শুক্রবার সকালে মাদ্রাজ যাত্রার প্রাক্কালে দমদম বিমানঘাটিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কলকাতা উন্নয়নে ব্যাঙ্কের সকল প্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন।

দেশী সংবাদ

১৮ নবেম্বর—কলকাতার তিনটি তেল কোমপানির কর্মীদের ধর্মঘটের অবসানকল্পে নয়াদিল্লিতে যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক চলেছিল তা সফল হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হবে কলকাতাতেই। বৈঠকের উদ্যোক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী হাতি।

খাদ্য বিভাগের দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেছেন। একজন সদস্যের এই কমিশন। একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ এই ভার পেয়েছেন। খাদ্য কমিশনার তিন মাসের মধ্যে তদন্ত কমিশনকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৯ নবেম্বর—ভারত সরকার এক নোটে পাকিস্তানকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, গঙ্গার জলে পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই। গঙ্গা বহুলাংশে ভারতীয় নদী। এর অববাহিকায় চার কোটি ভারতীয় লালিত।

২০ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য কেন্দ্র থেকে তাঁকে ৩৯ কোটি টাকা সাহায্য না দিলে তাঁর পক্ষে বর্তমান পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব না-ও হতে পারে।

২১ নবেম্বর—বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি রবারট ম্যাকনামারা আজ কলকাতার উন্নয়নে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আরও আগ্রহ ও উদ্যোগের উপর জোর দেন। এই শহরের বর্তমান সমস্যা সমাধানের কাজে তাঁরা কতটা কী করতে পারেন তা তিনি জানতে চান।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী সরদার স্বর্ণ সিং আজ রাজ্যসভায় বলেন, আমি এই আশ্বাস চাই যে, পাকিস্তানের সমর সজ্জার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবিলার জন্য আমরা প্রস্তুতি চালিয়ে যাব।

২২ নবেম্বর—পাকিস্তানকে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং আজ লোকসভায় যুগপৎ আমেরিকা এবং রাশিয়াকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন। শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করে তোলার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

কলকাতায় শ্রী ম্যাকনামারার অবস্থানকালে যে সংঘর্ষ হয় তৎসম্পর্কে আজ রাজ্যসভায় বিরোধী পক্ষের বহু সদস্য পুলিসের আচরণ সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানান। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ভি সি শুক্ল এই দাবি অগ্রাহ্য করে বলেন, তদন্তের কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না।

২৩ নবেম্বর—ভারতে সপ্তাহব্যাপী 'মনোরম' সফরের শেষে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রী ম্যাকনামারা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "এখানে আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি তাতে প্রকৃতই মুগ্ধ হয়েছি। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট আশান্বিত।" তিনি এই আশ্বাস দেন, ভারতের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাঙ্ক "পুরোপুরিভাবেই" সাহায্য করবে।"

"আপনি ডিকটেটর। আয়ুব খাঁ আপনার চেয়ে ভাল।"—উগ্র হিন্দীবাদী এক ছাত্র চড়া গলায় একথা বলেন আজ লখনউতে সহকারী প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে। শ্রী দেশাই শান্তকণ্ঠে জবাব দেন—"শুনে সুখী হলাম। আয়ুব খাঁকে যখন আপনার এতই পছন্দ তখন আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর দেশেই চলে যান।"

২৪ নবেম্বর—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার [illegible] একটি থানা আক্রমণ করে। এবার [illegible] ছিল তিনশ। আক্রান্ত থানাটি [illegible] নিরাপদ পাহাড়ী জায়গায় অবস্থিত। আক্রমণকারীদের হাতে খুন হয়েছেন পুলিসের এক ওয়ারলেস অপারেটর। গুরুতর আহত হয়েছেন পাঁচজন।

রাজ্যের নতুন খাদ্যনীতি অনুযায়ী ধানচাল সংগ্রহ শুরু হয়েছে। নবেম্বর মাসের প্রথম ২০ দিনে ১৫ হাজার টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। রাজ্যের খাদ্য কমিশনার শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত জানান, এবার সূচনায় সংগ্রহের লক্ষণ ভাল। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান—এই তিনটি জেলা থেকে সংগৃহীত চাল পাওয়া গিয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

১৮ নবেম্বর—দলের নেতা শ্রীআলেকজানডার ডুবচেকের সমর্থনে ছাত্র সংগঠনগুলি গতকাল থেকে তিন দিনের জন্য যে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছিলেন আজ তা কার্যত চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯ নবেম্বর—আজ কিছু সামরিক অফিসার মালির জনক প্রেসিডেন্ট শ্রীমোডিবো কেইতাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। সামরিক বাহিনী ও সুদানী ইউনিয়ন পার্টির মধ্যে বিরোধের ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান হয়।

২০ নবেম্বর—আজ থেকে আগামী সোমবার পর্যন্ত ফ্রানসের সমস্ত শেয়ার ও আর্থিক বাজার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ রাখা হয় পশ্চিম-ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীর বৈদেশিক মুদ্রার বাজারও। স্টারলিং ও ফ্রাংকের সংকটই এর কারণ।

২১ নবেম্বর—পশ্চিম জারমান মন্ত্রিসভা আজ নতুন কর ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন। উদ্দেশ্য—বিপুল বাড়তি রপ্তানির পরিমাণ কমিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থের বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।

২২ নবেম্বর—বিশ্বের শিল্পপ্রধান দশটি দেশের অর্থমন্ত্রীদের তিনদিনের বৈঠক-শেষে আজ এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঁ-কে বর্তমান সংকট থেকে রক্ষার জন্য ওই দশটি দেশ ফ্রানসকে ২০০ কোটি ডলার ঋণ দেবে। এ ছাড়া ফ্রানসকে আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিল থেকে অতিরিক্ত অর্থ তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২৩ নবেম্বর—বিরোধী দল-নেতাদে[র] গ্রেফতারের পর পশ্চিম পাকিস্তানে যে বিক্ষোভ সঞ্চার হয়েছে, তা হালে পূর্ব পাকিস্তানে[ও] ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় রোজই ঢাকা ও অন্যা[ন্য] শহরে প্রতিবাদ সভা হচ্ছে। আর এ সবে[র] সোচ্চার দাবি : নাগরিক অধিকারের পু[নঃ] প্রতিষ্ঠা, পুরো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দেওয়া হোক।

২৪ নবেম্বর—'অবজারভার'-এর খবরে ব[লা] হয়েছে যে, যুগোস্লাভিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে এবং সোভিয়েট ব্লকের সং[গে] সম্ভাব্য সংঘাতের জন্য প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলি[কে] প্রস্তুত রাখা হয়েছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় সা[রা] দেশে আপৎকালীন ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়ে[ছে] এবং ১৭ থেকে ৬৫ বছর বয়সের সক[ল] নাগরিককে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দে[শ] দেওয়া হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর নবতম উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১০,

আশাপূর্ণা দেবীর নূতন উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬, উড়োপাখী ৬, বলয়গ্রাস ৪,

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

সুভগা বসন্ত ৪, আঁধার মানিক ১২,

কালিকারঞ্জন কানুনগোর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত

রাজস্থান কাহিনী ৮,

নবেন্দু ঘোষের

কায়াহীনের কাহিনী ৪,

বিমল করের নূতন উপন্যাস

বাড়ি বদল ৪, যাদুকর ৫।।০ পরবাস ৪।।০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

নতুন তোরণ ৪॥

'তন্ত্রাভিলাষী'খ্যাত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অদৃষ্ট রহস্য ৩॥ তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১৬,

প্রফুল্ল রায়ের

অন্য ভুবন ৪॥ মুক্তো ৫, নাগমতী ৫,

প্রমথনাথ বিশীর নূতন কাব্যসংকলন

প্রাচীন পারসীক হইতে ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন উপন্যাস

কা জ ল ল তা ৬,

কিরীটী রায় (নূতন সং) ১১,

প্রবোধকুমার সান্যালের

নগরে অনেক রাত ৪॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

***অন্য দেশ অন্য দাহ* ১৫,**

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আঁধি ৭॥ অমৃত সমান ৪॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপনগর ১৮,

লীলা মজুমদারের

আর কোনোখানে ৫,

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ১০,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

***নবজন্ম* ৪, *বহ্নিবন্যা!* ৮॥**

রমাপদ চৌধুরীর

জরির আঁচল ৪,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কুয়ারী গিরিপথে ৫॥

আপটন সিনক্লেয়ারের

জঙ্গল ৬, প্রত্যাবর্তন (দুই খণ্ড) **৬,**

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

পুণ্যতীর্থ ভারত ১০,

(ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠতীর্থ ভ্রমণ কাহিনী)

স্বামী তত্ত্বানন্দের

তপস্বী ভারত ১০,

[শ্রেষ্ঠ সাধকদের জীবনী ও সাধনা]

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

শঙ্কু মহারাজের নূতন ভ্রমণ-কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০,

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মগ্নমৈনাক ৪॥

আশাপূর্ণা দেবীর **সুবর্ণলতা** ১৩,

মন্মথনাথ ঘোষের **বনরাজিনীলা** ৭,

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের **ইষ্ট বাক্‌ল্যাণ্ড রোড** ৮,

প্রফুল্ল রায়ের **পূর্বপার্বতী** ১১, **কিন্নরী** ৪॥

জরাসন্ধের **বন্যা** ৪,

তারাশঙ্করের **রাধা** (নূতন সং) ৮,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-৩৪৯২ ॥ ৩৪-৮৭৯১

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
জনসংখ্যার সমস্যা—		...	৫৩৩
ব্যঙ্গচিত্র—		...	৫৩৪
দেশদর্পণ—		...	৫৩৫
বৈদেশিকী—		...	৫৩৭
নৌকো ভাসানো (কবিতা)	—বনফুল	...	৫৩৮
বিশ্বেরই দুর্দিন (কবিতা)	—শ্রীবিষ্ণু দে	...	৫৩৮
সুনন্দর জার্নাল—		...	৫৩৯
প্রথম দর্শনে	—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়	...	৫৪১
এখনই	—শ্রীরমাপদ চৌধুরী	...	৫৪৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীশ্যামল নন্দী

চতুর্থ মুদ্রণ

প্রকাশিত হল

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'—এই চারখানি স্মরণীয় পদচিহ্ন এঁকেই কিছুকালের জন্য গ্রামজীবনের উপন্যাস তার চিরন্তন ও শাশ্বত পথ হারিয়ে ফেললেও, আশার কথা এখানে বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি। সমকালীন গ্রামের জীবনকে পুনরায় রূপে-রসে, সরলে-জটিলে, ক্ষুদ্রতায় ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন এ যুগেরই একজন আধুনিক লেখক—এ কম বিস্ময়ের কথা নয়। সরল অথচ বলিষ্ঠ কাব্যময়তায়, গভীর

রমাপদ চৌধুরীর

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি

বনপলাশির পদাবলী

মমতা ও অপূর্ব বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বাংলাদেশের যে-কোন সাধারণ গ্রামের মতই একটি গ্রামকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে 'বনপলাশির পদাবলী'। এই উপন্যাস একটি গ্রামকে চোখের সামনে এনে উপস্থিত করে না, পাঠককে একটি গ্রামের পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ॥ দাম ৮·৫০ ॥

● এই লেখকের ●

পরাজিত সম্রাট ৪·০০ গল্প-সমগ্র ১০·০০

০ সমরেশ বসুর বই ০

প্রজাপতি
উপন্যাস ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

স্বীকারোক্তি
উপন্যাস ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

বিবর
উপন্যাস ॥ অষ্টম মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

এপার ওপার
উপন্যাস ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৫·০০

ফেরাই
উপন্যাস ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

দুই অরণ্য
উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

০ বুদ্ধদেব বসুর বই ০

তপস্বী ও তরঙ্গিণী
আকাদামি পুরস্কার প্রাপ্ত
নাটক ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম [illegible]·০০

পাতাল থেকে আলাপ
উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

তুমি কেমন আছো
কাহিনী-সংকলন ॥ সাম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৬·০০

গোলাপ কেন কালো
উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ
নাটক ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৬
শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ৫৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৩ পয়সা

*

DESH

Saturday 7 Dec. 1968

জনসংখ্যার সমস্যা

মানুষের জন্ম ও মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা, জন্মিলে মরিতে হবে—এ বড় স[...] কথা। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আধিব্যাধি আছে, আছে আকস্মিকতা যা[...] জীবন-প্রদীপ অকালে নিবে যেতে পারে। মানব সভ্যতা তাই জীবনকে এক[...] স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্যে সংগ্রাম করেছে বিজ্ঞানের দৌলতে[...] চিকিৎসা-শাস্ত্র অবলম্বন করে। তবু কি সব সময় এই সংগ্রাম সাফল্য লাভ করে[...] অনেক সময় করে না। কিন্তু জন্ম? জন্ম কি রোধ করা যায়? একদা এ-বিশ্বাস ছি[...] যে, জন্মও রোধ করা যায় না; যেভাবে বা করা সম্ভব তা অন্যায়, পাপ। প্রচলি[...] এই বিশ্বাস ও নীতি সব সমাজের মানুষকেই দীর্ঘকাল শাসন করে এসেছে[...] আজও করছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও একটি সমস্যা এসেছে, আমরা যাকে ব[...] জনসংখ্যার সমস্যা। এই সমস্যা আমাদের অনেক পূর্ব-বিশ্বাস, ধারণা ও নীতি[...] বোধকে পালটে দিচ্ছে।

জনসংখ্যার সমস্যা এমন একটা হেঁয়ালি যা বললে সহজে মাথায় ঢোকে না[...] অথচ এর সম্পর্কে আমাদের একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে। আমরা সবা[...] জানি, সংসারে মানুষ প্রতিনিয়তই বাড়ছে। কেমন করে বাড়ছে, কি হারে বাড়ছে[...] বাড়লে ক্ষতি কোথায়—এসব বড় বুঝতে পারি না। ফলে ব্যাপারটা রহস্যময় হ[...] থাকে। বোধ করি, এক্ষেত্রে এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের কথা কিছু শোনা যেতে পারে।

পণ্ডিতরা বলেন, মানুষ জন্মের পর সারা পৃথিবীতে ১০০ কোটি মানু[...] হতে সময় লেগেছিল ১০ লক্ষ বছর। কিন্তু জনসংখ্যা দ্বিগুণ—অর্থাৎ ২০[...] কোটি হবার বেলায় মাত্র ১০০ বছর সময় লেগেছে। কোথায় ১০ লক্ষ আর কোথা[...] ১০০ বছর। আবার ৩০০ কোটি হতে সময় লেগেছে মাত্র ৩২ বছর। হিসেব[...] শুনলে রীতিমত চমক লাগে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এটা নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি[...] পায় চক্রবৃদ্ধি হারে। তার চেয়েও সোজা কথা, জনসংখ্যা শাখা প্রশাখায় ক্রমে[...] বেয়াড়াভাবে বাড়ে।

ভারতের জনসংখ্যা এখন ৫০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, ১৯০১ সালে ছিল প্রা[...] ২৪ কোটি। মনে রাখতে হবে তখন ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র হয় নি[...] কুড়ি বছর অন্তর অন্তর জনসংখ্যার হিসেব করে দেখা গেছে ১৯৪১ সালে ও[...] সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩১ কোটিতে। ১৯৬১ সালে ৪৪ কোটি এবং এখন ৫০ কোটিরও বেশি। পণ্ডিতরা বলছেন, আগামী আঠাশ বছরে আমাদের দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ১০০ কোটিতে ঠেকবে। অর্থাৎ আমরা—ভারতবাসীরাই অচিরে মানব সভ্যতার প্রথম দশ লক্ষ বছরের সমান জনসংখ্যা সৃষ্টি করব[...] এটা নিশ্চয় ভয়ের কথা।

জনসংখ্যা বাড়লেই দেশের সম্পদ বাড়ে না। দেশের সম্পদ সৃষ্টি করার একটা সীমা আছে। আমাদের মতন অনগ্রসর, গরীব দেশের তো কথাই নেই[...] জনপ্রতি যে খাদ্য এখন আমরা পাই, পনেরো ষোলো বছর আগে তার চেয়ে তুলনায় বেশি পেতাম। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের খাদ্যোৎপাদন তখনকার তুলনায় কমেছে। বরং সে তুলনায় বেশ কিছু বাড়লেও জনসংখ্যার অনুপাতে তার বিলি-বাটরা কমে আসছে। আমাদের নিত্যদিনের সংসারেও পরিবারের লোক বাড়লে এই রকমই দেখা যায়। শুধু খাদ্য নয়, খাদ্য আশ্রয় শিক্ষাদীক্ষা প্রতিপালনের উপায় ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই জনসংখ্যা একটি প্রবল ও মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই আমাদের চেষ্টা হবে জনসংখ্যার গতিকে সংযত করা। আধুনিক বিজ্ঞানে তার ব্যবস্থার অন্ত নেই। অপরিমিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার অর্থ আমাদের জীবনযাপনের সমস্ত সমস্যাকে আরও তীব্র করে চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ানো। এ রকম একটা অবস্থা আসার আগে চেষ্টা করতে হবে জনসংখ্যার চাপকে সহনীয় করে তোলা ও মোটামুটি এদেশের প্রতিপালন-সামর্থ্যের মধ্যে রাখা। সরকারের তরফ থেকে বেশ কিছুকাল ধরে পরিবার পরি-কল্পনার জন্যে কাজ করা হচ্ছে। এটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আমরা আশা করি সরকার নিয়ন্ত্রিত পরিবার গঠনের ব্যাপারে আরও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

আগ্নেয় গিরি
আয়ুবের বিরোধীদল
মোরারজি বলেছেন — বিদেশের সাহায্য না পেলেও চতুর্থ যোজনা কাজ চালিয়ে যাব।
আধুনিক ফ্যাশন।
চতুর্থ যোজনা

দেশ দর্পণ

সম্প্রতি এক বক্তৃতায় মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টা আলোচনা বা সমালোচনা করেছেন। তাঁর কথায় বা বক্তব্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। তিনি সরাসরি কেন্দ্রের ফেডারেল শাসনতন্ত্রের কাঠামোকে বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে ভারতের সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যগুলো ক্রমে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এরই ফলে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যর্থতার ক্ষোভ জমে উঠছে এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জনসাধারণ বিদ্রোহের পথে এগিয়ে চলেছে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে এই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অত্যন্ত দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে এসেছে বলেই চরম পরিণতিকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীদাশগুপ্তের বিশ্লেষণটা বর্তমান অবস্থায় কোনমতেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না। নানা আলোচনায় এই কথাটা বারবার উঠছে এবং অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এ প্রসঙ্গ আবার উঠবে। কথাটা বারবার উঠবে কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সম্বন্ধে। প্রত্যক্ষভাবে কথাটা উঠেছে, দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্যপালের সম্মেলনে। কথাটার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। অস্পষ্টতা ছিল না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাবনের কথায়। শ্রীচাবন রাজ্যপালদের এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় কেন্দ্রের ক্ষমতাকে শক্ত, মজবুত ও জোরদার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি শাসনব্যবস্থার ফেডারেল কাঠামোকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, কেন্দ্রের দায়িত্ব সংবিধানকে "রক্ষা করা।"

আত্মরক্ষার প্রশ্নটা কেন উঠল বলা হয়নি। উহ্য রাখা হলেও অনুহ্য নয়। রাজনৈতিক অবস্থাটা আরও পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে গত নির্বাচনের পর। গত নির্বাচনে যে কোন কারণেই হোক, বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটেছে, হয়ত সাময়িক কারণে, কিম্বা কোন রাজনৈতিক অবস্থায়। এই অবস্থাটা কেন্দ্রে যে-কংগ্রেস নেতৃত্ব নিয়েছে তার কাছে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তবু সংবিধানের বিধানকে লঙ্ঘন করা সেই সময় সম্ভব ছিল না বলেই কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে আপোষ ক'রে নিতে হয়েছিল। বলতে হ'য়েছিল, কংগ্রেস গণতন্ত্রের খাতিরে এবং সংবিধানের প্রতি মর্যাদাবোধে অ-কংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে সমান মর্যাদা দিয়ে স্বীকার করে নেবে।

তবু খুব অল্পদিনের মধ্যেই মর্যাদাবোধের অভাব দেখা দিল কেন্দ্রের কংগ্রেসী শাসন কর্তৃত্বের উঁচু মহলে। হায়দরাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই কথাটা বারবার শোনা গেল যে, অ-কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজ্যে অসহনীয় অরাজকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কংগ্রেস-বিরোধী সংযুক্ত দল ক্রমে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভেঙে পড়ছে। রাজ্যের এই অবস্থা আরও যে কারণে সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না, তা হ'ল কংগ্রেসের রাজনৈতিক অসহায়তা। বিভিন্ন রাজ্যে একদিকে যেমন কংগ্রেসের ভিতরে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ সংগঠনকে দুর্বল করছিল, অপরদিকে তেমনি প্রকাশ পাচ্ছিল কংগ্রেস সংগঠনের দুর্বলতা। ফলে বিভিন্ন অ-কংগ্রেসী রাজ্যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পঙ্গুতা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। এই অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার একটা পথই তখন ছিল—অ-কংগ্রেসী সরকারকে সরিয়ে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সে প্রচেষ্টায় যে কোন ত্রুটি ঘটেনি তা বিভিন্ন রাজ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বোঝা যায় এটা থেকেই যে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্যপালদের সম্মেলনে চারজন রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন যাঁদের হাতে এখন রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব। এইসব রাজ্যে দু'মাসের মধ্যেই পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং কেন্দ্রের ক্ষমতাকে জোরদার করার একটা পথ নিঃসন্দেহে এইসব রাজ্যে কংগ্রেসকে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ গত নির্বাচনের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একথা কখনও গোপন করার চেষ্টা করেননি যে, বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং সে কারণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিভিন্ন রাজ্যের অনিশ্চয়তাকে দূর ক'রে কেন্দ্রকে আরও বেশী সুদৃঢ় ক'রে তোলা। সেটা সম্ভব মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে যদি কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসে।

আরও বিভিন্ন পথ নিশ্চয়ই আছে। যেমন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময়। ধর্মঘটকে রোধ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নূতন নূতন ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছে। বিভিন্ন অ-কংগ্রেসী রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করার পিছনে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে, তাহ'লে কেরলের মত অ-কংগ্রেসী সরকারের কাছে তা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। এই রাজনৈতিক অবস্থাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই কেরলের মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ কেন্দ্রীয় সরকারের সব নির্দেশগুলো মেনে নিতে পারেননি। তাঁর এই বিদ্রোহের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ করার কথাটা অবশ্য মনে করিয়ে দিতে ভুলে যাননি। ভুলে যাননি যে, কেরলে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের নজীর আগেও ছিল। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি দিল্লী গিয়ে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন যেখানে থাকবে সেখানে রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করবে না: কিন্তু সে প্রশ্ন যতদিন না উঠছে, ততদিন কোন দমনমূলক ব্যবস্থা কেরল সরকার নেবার জন্য এগিয়ে আসবে না।

তারপর যখন কেরলে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা সদস্যরা, অথবা তথাকথিত উগ্রপন্থীরা পুলিসের উপর আক্রমণ চালিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করা হ'ল তখনও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, সরকার এই প্রচেষ্টাকে কড়া হাতে ("নির্মম হাতে") সমূলে নষ্ট করতে সবরকম ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত থাকবে। দেখা যাচ্ছে কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তি বা আশ্বাস অনেককেই, এবং বিশেষ ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের বিশেষভাবে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হয়নি। হয়ত সে কারণেই লোকসভায় একথা শোনা গিয়েছে যে, কেরলের অরাজকতা দমন করতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের কথা সামনে রেখেই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীপনমপল্লী গোবিন্দ বলেছেন যে, কেরলের জনসাধারণ সরকারকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাবন এই বিবৃতি অপছন্দ করেননি ব'লেই হয়ত লোকসভায় তিনি কেন্দ্রের হস্তক্ষেপকে একেবারে উড়িয়ে দেবার কোন চেষ্টাও করেননি।

পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক বিচারধারা নিয়ে আজ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নির্ধারিত হ'চ্ছে। কেরলের সঙ্গে কেন্দ্রের বিরোধ সেই পর্যায়ে নেমে এসেছে। শুধু কেরলের সঙ্গে নয়, বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গেও কেন্দ্রের সম্পর্ক ক্রমশ রাজনৈতিক বিচারধারায় নির্ধারিত হ'চ্ছে: প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। পশ্চিম বাংলার কথাটা ধরা যাক। সম্প্রতি দুটো

বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। রাজনৈতিক বিচারে এই তিক্ততার সুযোগ হয়ত ছিল না; কারণ প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিম বাংলার শাসনভার কেন্দ্রের উপর নাস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই রাজ্যপালকে এমন একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রের কাছে উপস্থিত করতে হয়েছে যা পশ্চিম বাংলার পক্ষে অপরিহার্য। কোন রাজনৈতিক দলের হাতে যখন শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব থাকে তখন হয়ত সমগ্র পরিকল্পনার পিছনে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে যেটা কেন্দ্রের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে বর্জন করে চলে এমন নজীর অবশ্য নেই; তবু তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন বিচার করা হয়, তখন নিছক বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে টাকা পয়সার মানদণ্ডকেই সামনে রাখা হয়। সেই মানদণ্ড হিসাবেই পশ্চিম বাংলার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিতর্কের সুযোগ এসে গিয়েছে।

পশ্চিম বাংলা সরকার রাজ্যপালের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে যে খসড়া পরিকল্পনা কেন্দ্রের কাছে পেশ করে, তাতে মোট আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ৬৬২ কোটি টাকা। এই আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবটা ধরা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি সরকারের আশু কর্তব্যের কথা চিন্তা করে। তাছাড়া বড় সমস্যা যদি কলকাতার উন্নয়ন, তাহলে তার জন্যও প্রয়োজন চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রায় ৮০ কোটি টাকা। এই বিরাট আনুমানিক ব্যয়ের ভার এককভাবে পশ্চিম বাংলা বা কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতি রাজ্য সরকারকে অর্থ সাহায্য চাইতে হয়। এটা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এই অর্থ সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে দাদন হিসাবে আসে, তাহলে বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করা হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থভাণ্ডার ভরে ওঠে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সংগৃহীত আয়কর ইত্যাদি থেকে এবং বিদেশ থেকে পাওয়া ঋণ থেকে। এই ঋণের বোঝা যেমন বইতে হয় বিভিন্ন রাজ্যকে পরোক্ষভাবে, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে যোগান দিতে হয় কর ইত্যাদি সূত্রে। সমগ্র দেশের কর আদায়ের ফলে যে ভাণ্ডার গড়ে ওঠে তা থেকেই চলে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া অর্থ সাহায্য। কর আদায়ের হিসেবটা যদি সামনে রাখা যায়, দেখা যাবে পশ্চিম বাংলা থেকে এক বড় অংক যায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-ভাণ্ডারে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রশ্নটা যখন বিচার করা হয়, তখন কথা ওঠে রাজ্য সরকার নিজস্ব ক্ষমতায় কতটা রাজস্ব জোগাড় করতে পারবে।

অথচ রাজ্য সরকারের হাতে রাজস্ব আদায়ের যেটুকু সুযোগ আছে তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলেই স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বেশ কয়েকবার এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন। ডাঃ রায়ের বক্তব্য ছিল খুব স্পষ্ট এবং সোজা। যেসব রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থভাণ্ডারকে ভরে তুলতে সাহায্য করে সেইসব রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সাহায্যটা দাক্ষিণ্য হিসাবে যেন দেওয়া না হয়। সেসব রাজ্যের প্রাপ্য হিসাবেই যেন সে সাহায্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তা ছাড়া ডাঃ রায়ের এটাও বক্তব্য ছিল যে, পশ্চিম বাংলার বিশেষ সমস্যাগুলোর কথা বিবেচনা করে এবং বিশেষভাবে কলকাতার কথা মনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত উদারনীতি গ্রহণ করা। ডাঃ রায় কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তবু তাঁর যুক্তি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেনি। বরং এটাই বার বার বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারকে নিজস্ব চেষ্টায় রাজস্ব আদায় করে পরিকল্পনার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

সে কথা এবারেও বলা হয়েছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে খুব বেশী হলে ২৪৫ কোটি টাকার মত পাওয়া যেতে পারে। আরও বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের কাছ থেকে কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার মত রাজস্ব থেকে জোগাড় করে পশ্চিম বাংলার সমস্যা এবং কলকাতার উন্নয়ন ব্যবস্থার ভার নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার খরচ (প্রায় ৮০ কোটি টাকার মত) রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দায়িত্ব থাকবে না। অবস্থার চাপে পড়ে রাজ্য সরকারকে পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয়কে ছাটাই করে ৪১৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনতে হয়েছে। এই ছাটাইয়ের পরও দেখা যাচ্ছে ঘাটতি এবং সেজন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে নতুন কর বসাও। অর্থাৎ ৭০ কোটি টাকা ঘাটতির হিসেব এখনও হয়নি। রাজ্য-সরকারের পক্ষ থেকে আরও ১১০ কোটি টাকার সাহায্য চাওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে; কিন্তু চাইলেই যে পাওয়া যায় না সেটা অনেক আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

বিশেষ করে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে উত্তর বাংলার বিপর্যয়ের ফলে যে নিদারুণ সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে। রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বলেছেন কম করেও প্রায় ৪০ কোটি টাকা লাগবে পুনর্বাসনের কাজ করার জন্য। তিনি নাকি হুমকি দিয়ে বলেছেন টাকা না পেলে তিনি রাজ্যপালের পদে ইস্তফা দেবেন। অর্থাৎ তিনি জেনে গিয়েছেন যে এই ৪০ কোটি টাকার সাহায্য হয়ত পুরো পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে রাজ্যপাল যে এখনও কোন সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা নেননি, তা বোঝা যায় উত্তরবঙ্গে পুনর্গঠন এবং পুনর্বাসনের কোন কাজই হচ্ছে না দেখে। রাজ্যপাল মনে করেন, কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পেলে তিনি কাজের কথা ভাববেন; কিন্তু পরিকল্পনার ভিত্তি জানা না থাকলে কেন্দ্রের সাহায্য আসবে কিনা সেটা অবশ্য তিনি জানাননি।

যাই হোক, বিচার করে দেখলে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কেন্দ্রের খবরদারি রাজ্যের উপর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই অনুপাতে রাজ্য সরকারের কাজ করার সুযোগ সুবিধাগুলো ক্রমশ কেন্দ্রের হাতে চলে যাচ্ছে। পরিকল্পনার সমগ্র রূপটা কেন্দ্রগত এবং কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করার ফলেই আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের পিছনে রাজনৈতিক পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যের অভাব যে নেই, তা কেন্দ্রীয় সাহায্যদানের ব্যবস্থাকে বিচার করলেই বোঝা যায়। এই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের মূল ক্ষমতার মাপকাঠি হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের কাছে এটা অজানা নেই যে সে নিয়ন্ত্রণ পরিপূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বের হাতেই চলে গিয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ভিত্তি করে যে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে গিয়েছে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দেবেই। কারণ এটা মনে করার কোন যুক্তি নেই যে, অ-কংগ্রেস দল-গুলোর হাতে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব আর আসবে না। সেটা যুক্তি নয় বলেই, কেন্দ্রকে আরও শক্তিশালী করার কথা যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন তখন রাজনৈতিক মহলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। সে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার দায়িত্বও নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে।

চন্দ্রগুপ্ত

বন-প্যারিস লড়াই

নভেম্বর মাসে নিঃশব্দে যে একটা ফরাসী-জার্মান লড়াই হয়ে গেল তার খবর এ দেশে খুব কম লোকই রাখে এক আধজন খবরের কাগজের পড়ুয়া ছাড়া। এমন কী যারা খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক তারাও সকলে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে কি না সন্দেহ। তার কারণ এ যুদ্ধের যেসব হাতিয়ার তারা বলতে গেলে অচেনা, তাদের সঙ্গে আমাদের মত ছাপোষা মানুষের কোনও পরিচয়ই নেই। তাই বলে এ যুদ্ধ কিছু কম মারাত্মক নয়, এবং অস্ত্র-শস্ত্রও কম সাংঘাতিক নয়। এখনকার দিনের কোনও যুদ্ধকেই যেমন নিছক দ্বৈরথ বলে ধরা যায় না—যারা প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে লিপ্ত তারা ছাড়া আরও অনেকে যেমন তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে—এ যুদ্ধেও তাই। আর সশস্ত্র যুদ্ধ যেমনভাবেই শেষ হোক না কেন তার ছাপ রেখে যায় যেসব দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাদের ওপর। এ ধরনের গোলা-অস্ত্র-হীন লড়াইয়েও তার ব্যতিক্রম হয় না।

অধিকাংশ লড়াইয়ের মত এ লড়াইও ছিল মর্যাদার লড়াই যদিও যেমন সব যুদ্ধের বেলায় হয়ে থাকে দুই পক্ষই একে বাঁচার লড়াই বলে দাবি করেছে। পররাজ্য গ্রাস কিংবা স্বরাজ্য রক্ষা এ যুদ্ধের হেতু ছিল না। এর উপলক্ষ ছিল ভিন্ন। সে উপলক্ষ হচ্ছে দেশের মুদ্রার কৌলীন্য রক্ষা। একালের মুদ্রার মধ্যে মার্কিনী ডলার হচ্ছে নৈকষ্য কুলীন। সে গৌরব একদিন বিলাতী পাউন্ডেরই ছিল। গত বৎসরে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর তার সে মর্যাদা গিয়েছে। সে হয়ে দাঁড়িয়েছে ভঙ্গ। তার পতিত দশা এখনও ঘোচেনি। ইদানীং যে দুটি মুদ্রার কুলমর্যাদা বেড়ে চলছিল সে দুটি হচ্ছে ফরাসী ফ্রাঁ আর জার্মান মার্ক। এ মার্ক অবশ্য খণ্ডিত জার্মানির পশ্চিম অংশের। মুদ্রা কেতাবী হিসেবে মুদ্রা মূল্যের আধার হলেও দেশবিশেষে তা হচ্ছে মর্যাদার আধার। সে মর্যাদার পরিচায়ক হচ্ছে তাদের আন্তর্জাতিক মূল্যের স্থিরতা। যে মুদ্রার বিনিময় হার ঘড়ি ঘড়ি বদলায় আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে সে ব্রাত্য, তার অতীত আভিজাত্য যতই বিশ্ববন্দিত হোক না কেন।

গত বৎসর ডিভ্যালুয়েসনের ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে পাউন্ড-স্টার্লিং তার জাত হারিয়েছে। আর নিজেদের গৌরবের আসরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে ফরাসী ফ্রাঁ আর জার্মান মার্ক। দশ বছর আগে মুদ্রামূল্য হ্রাস ফ্রান্সও করেছে। কিন্তু সেটা তার যুদ্ধকালীন অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত। অতীতের খোলসকে গায়ে জড়িয়ে থাকলে ফরাসী মুদ্রার সেদিন কোনও লাভ হতো না। ফরাসী অর্থনীতি সে মেকী আভিজাত্য সইতে পারত না। যে আর্থিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ফ্রান্স তখন দিন কাটাচ্ছিল সেটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠত। ফ্রান্সের শক্ত মানুষ দ্য গল তাই সোনার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে ফরাসী মুদ্রার নবজন্ম ঘটিয়েছিলেন। ইংরাজেরা ঠোঁট বেঁকিয়ে একে বলেছিল জুয়া খেলা। আমেরিকানরা মুচকে হেসে অপেক্ষা করছিল কবে দ্য গলের সোনালী হাওয়ায় ঘোড়া পুতুল ভেঙে খান খান হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কিছুই হলো না। না ভেঙে পড়লো ফ্রান্সের আর্থিক ব্যবস্থা, না মার খেলো ফরাসী বাণিজ্য। বরঞ্চ দিন দিন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে হলো ফ্রান্সের শ্রীবৃদ্ধি, বাড়লো ফরাসী মুদ্রার মান।

জুয়া খেলায় প্রথম দানে জিতলেন দ্য গল। ব্যাপারটা কিন্তু নিছক দৈবলীলা নয়। তার মূলে ছিল কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠিন সাধনা। তবেই ফরাসী অর্থনীতি দৌর্বল্য কাটিয়ে শক্তিসঞ্চয় করতে পেরেছিল। তবেই ধীরে ধীরে ফরাসী সমৃদ্ধির বনিয়াদ পাকা হয়েছে। ফরাসী মুদ্রার মর্যাদা বেড়েছে দ্য গলের দাপটে নয়, ফ্রান্সের অভ্যন্তরীন বৈষয়িক উন্নতির ফলে। ফ্রাঁর কদর আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠীরা তখনই বুঝেছে যখন আর্থিক মোক্ষ ফ্রান্সের করায়ত্ত হয়েছে। এরই জোরে দ্য গল পশ্চিমী গোষ্ঠী আর রাশিয়া দুই দলকেই তুর্কিনাচন নাচিয়েছেন। তিনি যে ন্যাটো ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, ব্রিটেনকে ইউরোপে একঘরে করে রেখেছেন, আমেরিকার সর্দারি মানতে চাননি এ সবের মূলেই ছিল আর্থিক খুঁটির জোর। ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ, আমেরিকানরা রুষ্ট কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেনি। কেননা, শক্তের সকলেই ভক্ত বিশেষ করে যখন সে শক্তির উৎস আর্থিক সমৃদ্ধি। মার্কও জাতে উঠেছে ওই একই সিঁড়ি বেয়ে। যুদ্ধের পরে পশ্চিম জার্মানের আর্থিক নবজন্ম একটা আশ্চর্য ব্যাপার। আন্তর্জাতিক লেনদেনে ঘাটতি পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে শুধু তারই নেই। মার্কের মত ধার কোনও মুদ্রারই নেই।

ফ্রান্সকে কাবু করেছে গত মে মাসের ছাত্র-শ্রমিক বিপ্লব। তার ফলে লোকের মাইনে বেড়েছে, ধর্মঘটের চাপে উৎপাদন ব্যবস্থাও কিছুটা এলোমেলো হয়ে পড়েছে, করের হারও বাড়াতে হয়েছে। খানিকটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও দেখা দিয়েছে। অপর দিকে পশ্চিম জার্মানিতে মোটের উপর শান্তিই বিরাজ করছে, শ্রমিক অশান্তিও তেমন নেই। মূল্যমানও স্থিতিশীল, উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। দুনিয়ার টাকার বাজারে মার্কের আদর তাই বাড়ছে। তুলনায় প্রতিবেশী দেশের ফ্রাঁর চাকচিক্য কিছুটা কমেছে। ঝানু টাকার ব্যাপারীদের ধারণা হলো ফরাসী মুদ্রা একটু নড়বড়ে হয়ে পড়েছে, আর মার্কের যৌবনে জোয়ার এসেছে। এই ধারণাই হলো কাল। অর্থনৈতিক তত্ত্ব-জ্ঞানীদের হিসেবে ফ্রাঁ আর মার্ক দুয়েরই সরকারী বাঁধা দরের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নেই—দর দুয়েরই বদলানো দরকার। তাঁদের মতে বিনিময় হার না কমালে ফ্রান্সের কপালে অনেক দুঃখ আছে। মার্কের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে তাঁদের ব্যবস্থা উল্টো। তার বিনিময় হার বাড়িয়ে জার্মানির আন্তর্জাতিক দেনা পাওনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে হবে।

বেকায়দায় পেয়ে ফ্রান্সকে চেপে ধরলো বিশ্বের নয়টি ধনী শিল্পসমৃদ্ধ দেশ মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করার জন্যে। বনে "দশ গোষ্ঠীর" বৈঠক বসলো। অজুহাত ফরাসী মুদ্রার টলটলায়মান অবস্থা। ফাটকাবাজেরা ফ্রান্স থেকে টাকা সরিয়ে নিয়ে জমা দিচ্ছে জার্মানিতে, ফ্রাঁ ভাঙিয়ে নিচ্ছে মার্ক। জেনিভাতে ট্যাক্সিওয়ালারা ফ্রাঁ নিতে চাইলো না, ফরাসীরা লুকিয়ে নোটের বদলে সোনা জমাতে লাগলো। বন ভারী খুশী প্যারিসকে চাপে পেয়ে। "দশ গোষ্ঠীর" বৈঠকে সাব্যস্ত হোলো ফরাসী মুদ্রার মূল্য হ্রাস করতে হবে। কথা উঠেছিল মার্কেরও নতুন করে দাম ঠিক করা হোক। দ্য গলও তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তো আর বন বৈঠকে যাননি। বন সে কথায় কান দিল না। ফরাসী অর্থমন্ত্রী একরকম কবুল করে এলেন যে ফ্রান্সের মুদ্রামূল্য হ্রাস হবে, তবে কতটা তা ঠিক করবেন দ্য গল। প্যারিসে শোকের ছায়া, লণ্ডন বন ওয়াশিংটনে বাদ্যভাণ্ড তৈরি। ফরাসী প্রধানের নাক কাটা গেলে বাজানো হবে। কিন্তু সকলের সাধে বাদ সাধলেন দ্য গল সকলের চাপ অগ্রাহ্য করে ফরাসী মুদ্রার মূল্য না বদলে। বিশ্বসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, কিন্তু দ্য গল অচঞ্চল। তাঁর নিজের মানও রইল, দেশের মুদ্রার মানও, জাতির সম্মানও। যারা দ্য গলকে টিটকারি দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল তারা দিল জয়ধ্বনি। ফ্রান্স-জার্মানির মুদ্রার লড়াইয়ে জিতলো ফ্রান্স, হারলো জার্মানি।

নৌকো ভাসানো

বনফুল

কায়া-মিছিলের সঙ্গে চলেছে ছায়া-মিছিল
দুটোই বাস্তব, দুটোই অবাস্তব,
সব বর্ণ বাতিল করে আকাশ হয়েছে নীল
সব কূল ভেঙে দিয়ে দরিয়া হয়েছে দিল
নিগূঢ় খবর এসব!
আপনি কি জানেন? আমি তো জানি না,
অথচ নিজের অজ্ঞতাকেও মানি না।

ফুলের মধ্যে লুকিয়ে আছে ফল,
ফলটাকে ভোগ করি
অথচ ফুলের জন্য চোখে আসে জল।
এই তো অবস্থা!
এই দোটানার সুব্যবস্থা
গুছিয়ে গাছিয়ে করবেন যিনি
কোথায় সেই মুহুরী-টিনি?

মহাবীর ভীষ্ম
হলেন নিঃস্ব
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে' শর-শয্যা!
ঘুচিয়ে সব লজ্জা
নীলাম্বরী হলেন দিগম্বরী
(বলুন তো, কি করি!)
সব নিয়মের কর্ণ করে কর্তন
করতে করতে নর্তন
এলেন বিবর্তন!

বারবার ওলটাচ্ছে পাণ্ডিত্যের ভাণ্ড
(বলুন তো কি কাণ্ড!)
এরই মধ্যে মন-মধুকর মত্ত
খুঁজে বেড়াচ্ছে মধু—নির্ভেজাল সত্য!
বললাম, করছ কি, লোক হাসবে শেষে?
উত্তর দিলে হেসে
লোক হয়তো হাসিয়েছি
নৌকো কিন্তু ভাসিয়েছি।

বিশ্বেরই দুর্দিন

বিষ্ণু দে

দাও হাত ভ'রে রক্তোৎপলরাশি।
মানসযাত্রা গন্তব্যের দিকদিগন্তে মেশে
যেখানে তুষারবন্যায় জ্বলে ক্রান্তির খরা হাসি।
কাল বা পরশু ছড়াব বিশ্বে আপনপরের দেশে—
সহস্রদল তখনও হবে না বাসি।

পিতৃগণ কি পাঠাল রৌদ্রে উন্মাদ অনুচর?
পূবে ঝড় রাগে উপড়িয়ে ফেলে, শতচ্ছিন্ন করে।
পশ্চিমা লু-তে কোথায় তৃপ্তি? সারাদেশে ঘরে ঘরে
সে কোন্ মুক্তিস্নানের লগ্নে মিলাবে আপন-পর?

দীর্ঘ আয়ত ইতিহাস দেখা অতীতে ও আগামীতে!
অথচ বর্তমানের শূন্যে কি করে টানবে ছেদ?
মোহানার মহামুক্তিতে কেন কাদা, বালি, ভেদাভেদ?
কত কান্নায় বহাবে জোয়ার ঊর্মিল সংগীতে?

জ্ঞানে আর কাজে, স্বপ্নে এবং বাস্তবে
তত্ত্বে তথ্যে কম্পিত চিরটাকাল কি অন্তহীন?
আকণ্ঠ গান স্তম্ভিত কেন? সঙ্গীত-উৎসবে
মৃদঙ্গে তাল কেন বা বেতাল, তম্বুরা ছেঁড়া-তার?

বিশ্বেরই দুর্দিন।

'আপটন সিনক্লেয়ারের কথায়'

নব্বই বছর দশ মাস বয়সে মার্কিনী ঔপন্যাসিক আপটন বীল সিনক্লেয়ারের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুর খবরের চাইতে বড়ো খবর : এতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, অথচ যেন কোথাও ছিলেন না। উনিশ শো চাল্লিশের পরে 'ড্রাগনের দাঁত'-এ তাঁর একটা দীপ্ত বিভাস—আরো বছর কয়েক বাদে 'ও শেপার্ড, স্পীক'-এ তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তরুণতর সিনক্লেয়ার লুইসের সংবাদ এখনো আসে, কিন্তু আপটন সিনক্লেয়ার যেন মুছে গিয়েছিলেন।

দীর্ঘজীবিতা? হয়তো তাই হবে। পৃথিবীর সব চেয়ে দীর্ঘায়ু লেখকদের অন্যতম তিনি—নব্বইয়ের সীমা পেরিয়েছেন একালে এমন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বোধ হয় এক হাতের আঙুলেই কুলিয়ে যায়। কিংবা আরো কম। আমার তো একমাত্র শ-কেই মনে পড়ছে—চুরানব্বই বৎসর পর্যন্ত যিনি চির-তরুণতার প্রতীকরূপে জেগে ছিলেন আমাদের চোখের সামনে।

আপটন সিনক্লেয়ার নিশ্চয়ই বার্নার্ড শ-র মতো অত বড়ো প্রতিভা ছিলেন না। কিন্তু 'জঙ্গলে'র লেখক তো তরুণ বয়সেই ঝড় তুলেছিলেন চিকাগোর কশাইখানার বাস্তবতায়—ইতিহাস রচনা করেছিলেন তাই দিয়ে। তারপরে তাঁর 'অয়েল'—দেশের দিকে আমাদের বাংলা-সাহিত্যেও সেই বই নিয়ে কী আলোড়ন। তৈলাঞ্চলের দলিলরূপে নয়, তার যৌন-বিষয়গত স্পষ্টতাই বোধ হয় 'অয়েলে'র আরো বড়ো আকর্ষণ ছিল সেদিন। ঠিক বলতে পারছি না—'ড্রাগনের দাঁতই' খুব সম্ভব তাঁর খ্যাতির সেই শেষ চূড়া যেটি আমাদের মতো অর্ধমনস্ক বিদেশী পাঠকের চোখে পড়েছিল।

আপটন সিনক্লেয়ার সাহিত্যে এসেছিলেন এমিল আঁতোয়ান জোলার 'জ্যারমিনালে'র ধারায়। তারপর ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন মার্কসীয় চিন্তায়—সেই চিন্তার ক্রমবিকাশ তাঁর ল্যানি বাড উপন্যাসমালায়। সেই সূত্রেই আপটন ছড়িয়ে পড়লেন আন্তর্জাতিক মানুষের কাছে, আবার তাই-ই নাকি তাঁর ট্র্যাজিডীর মূলে। একজন সমালোচক টিপ্পনি কেটে বলেছেন, আমেরিকায় বাস করবেন আবার প্রতিদিন মার্কিনী পাঠককে আক্রমণ করবেন—এতে আর যাই হোক অন্তত চিত্তজয়ী হওয়া যায় না—'উদারতা এত কি উদার?' তা ছাড়া রাজনীতি মাথায় ঢুকলেই প্রচার আসতে বাধ্য, আর প্রচার এলে রাশি রাশি লিখেও—কী হয়, আপটন সিনক্লেয়ার তার উদাহরণ। নব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচে থেকে, অনেক লিখেও বিস্মরণের গোধূলিতে তিনি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলেন।

আমি—সাধারণ মানুষ এবং অবসরের

পাঠক সুনন্দ—বলতে পারি না, এ থেকে অন্য কোনো লেখক কিছু শিক্ষালাভ করবেন কিনা। হয়তো বাংলা দেশে আপটন সিনক্লেয়ারের সাহিত্য-বিচার করে যোগ্যজনেরা তাঁর উদ্দেশে কিছু শ্রদ্ধানিবেদন করবেন এই সময়, হয়তো করবেন না। ও কাজ আমার মতো তুচ্ছ পাঠকের নয়। আমি অন্য কথা ভাবছি।

ভাবছি, মৃত্যুর পরে মানুষকে ভুলে যাওয়া কঠিন নয়। এই উনিশ শো আটষট্টি সালে তো ফরাসী কবি পোল ক্লোদেলের শতবর্ষ পূর্ণ হল। ক্লোদেলের ধর্ম-বিশ্বাস, তাঁর বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই মন মিলবে না—তিনি সুবোধ্য নন তাও ঠিক, কিন্তু এই কবি এবং নাট্যকারের অন্তত শিল্পাঙ্গিকের দিক থেকেও যে একটা অসাধারণ আধুনিক ভূমিকা আছে—তা তো কোনো সাহিত্য-পাঠকের অজানা নয়। ক্লোদেলের স্বদেশ ফ্রান্সের খবর জানি না, কিন্তু আমাদের বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দল তো বিশ্ব-সাহিত্য-চেতনায় নিত্যস্পন্দিত, ক্লোদেল সম্পর্কে এই শতবর্ষে একটি লাইনও-ভালো কিংবা মন্দ, তাঁরা কেউ লিখেছেন বলে মনে পড়ছে না। অন্তত দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চোখে কিছুই পড়েনি।

মৃত্যু সুন্দর করে—সেখানে অভিমান নিরর্থক। কিন্তু যে লেখক বেঁচে থেকেও অস্পষ্ট হয়ে যান—একদার অসামান্য

পরিচিতি থেকে ধীরে ধীরে বিস্মৃতিতে ম্লান হয়ে আসেন. সেই দুর্ভাগ্যকে তিনি কিভবে গ্রহণ করেন? হয়তো নিবিড় নিরাসক্তি এসে যায় একটা, হয়তো একদিন নোবেল-পুরস্কারের পাদ-প্রদীপে বিশ্ব-নায়কত্ব যে লাভ করেছিলেন তাও তাঁর কাছে একান্ত মূল্যহীন বলে মনে হয়। অথবা নিজের ওপরে—পৃথিবীর ওপরে একটা নিঃশব্দ অভিমান নিয়ে তাকিয়ে বসে থাকেন তিনি—শ্রান্ত মানুষটি অপেক্ষা করতে থাকেন সম্পূর্ণ নিবে যাওয়ার জন্যে।

আপটন সিনক্লেয়ার তাঁর এই ধূসর দিগন্তে পৌঁছে কী ভাবতেন জানি না, অনেকদিন তাঁর বই পড়িনি। কিন্তু তাঁর কথা ভাবতে গিয়ে আমার জন ডস প্যাসোজকেও মনে পড়ল। আপটন সিনক্লেয়ারের চাইতে তিনি অনেক ছোট, তবু এতদিনে সত্তর পেরিয়েছেন নিঃসন্দেহ। গারট্রুড স্টাইনের সেই 'লস্ট জেনারেশন'-এর একজন, হেমিংওয়ে, হেনরি মিলারের সহযাত্রী। হেমিংওয়ে নেই, হেনরি মিলার কিছুদিন আগে খবর হয়ে উঠেছিলেন একবার—কিন্তু কোথায় ডস প্যাসোজ? 'ইউ-এস-এ'র লেখক—মার্কিনী জীবনের সেই সুতীক্ষ্ন অভিনব ভাষাকার? কতদিন আগে তাঁর 'নাম্বার ওয়ান' বইটি আমি কিনেছিলুম সে কথা প্রায় ভুলেই গেছি। তারপরে তিনি আরো অনেক লিখেছেন নিশ্চয়, তবু আজ প্যাসোজ সাহিত্যের ইতিহাসে যতটা সত্য, সাহিত্যিক শক্তিতে কি সেই পরিমাণে প্রোজ্জ্বল?

দৃষ্টান্তের শেষ নেই। আসলে শক্তির সীমা আছে, জীবন-দৃষ্টি বদলায়, জীবন-ভাষ্য বদলায়, পাঠকও বদলায়। একদিন যিনি একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব—ধীরে ধীরে তাঁর জায়গা হয়ে যায় নেপথ্যে। এঁদের মধ্যেও কেউ-কেউ থাকেন যাঁরা শ কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো কালের যাত্রায় শেষ দিন পর্যন্ত পুরোগামী—মৃত্যুর পরেও তাঁদের প্রভাব এগিয়ে চলে বহুদিন পর্যন্ত। আর কেউ-কেউ নিজের বৃত্তের মধ্যেই সমর্পিত, আত্ম-সীমা তাঁরা অতিক্রম করতে পারেন না, অনেক দ্রুত ইতিহাস হয়ে যান। পোল ক্লোদেলের শতবর্ষে—মনে হচ্ছে শাতো-ব্রিঁয়ারও দুশো বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু শাতোব্রিঁয়া সম্পর্কে ফ্রান্সেও যে উৎসাহ দেখা দেবে—ক্লোদেল তাঁর কতটুকু পাবেন? ড্রেইজারের প্রভাব মার্কিনী সাহিত্যে আজো আছে, কিন্তু আপটন সিনক্লেয়ার?

হয়তো সাহিত্য-বিচারের জগতে অনধিকার পদক্ষেপ করছি, সে চর্চা আমি করব না। আমার চিন্তা সম্পূর্ণ মানবিক। একদিন যিনি আশ্চর্য উদ্ভাসিত, আর একদিন তিনি ছায়ায় বিলীন—বেঁচে থেকেও এই মৃত্যুর ট্র্যাজিডীকে তিনি কিভাবে গ্রহণ করেন? কোন্ প্রশান্তিতে, কোন্ নির্লিপ্ততায়, কোন্ বিষণ্ণ শ্রান্তিতে?

বাঙালী লেখকেরা না হয় অদৃষ্টবাদী। কিন্তু আপটন সিনক্লেয়ার কী ভাবতেন? কিছুই কি ভাবতেন?

ভ্রম-সংশোধন

তেইশে নভেম্বরের জার্নালে 'নিরঙ্কুশাঃ হি কবয়ঃ'-র জায়গায় 'নিরঙ্কুশ' ছাপা হয়েছে এবং 'বোপদেব' অকারণে 'য ফলা' লাভ করে 'ব্যোপদেব' হয়েছেন। এই দুটির কৃতিত্ব আমার নয়—ছাপার ভুল।

—সনন্দ

প্রথম দর্শনে

অন্নদাশঙ্কর রায়

লিখতে যাচ্ছিলুম 'প্রথম দর্শনে প্রেম'। কিন্তু তার বয়স কি আর আছে! লেখা উচিত ছিল দু' কুড়ি বছর আগে। তখন আমার প্রথম যৌবন।

সে বয়সে আমার নিয়তি আমাকে কামরূপে না নিয়ে প্যারিসে নিয়ে যায়। প্যারিসের কথা লিখতে বসে আমি কামরূপের উপমা দিয়েছি। ভারতবর্ষের [illegible] স্থানের নয়। ছেলেবেলা [illegible] চিত্তে কামরূপের প্রতি [illegible] ছিল। আকর্ষণটা ভয়মিশ্রিত। [illegible] রূপসী আমাকে ভেড়া [illegible]। [illegible] আটকে রাখবে। [illegible] ফিরতে দেবে না।

প্যারিসেও তেমনি ভেড়া পুরুষকে [illegible]। তারা আর দেশে ফিরতে চায় না। [illegible] থেকে অনুমান করতে পারি [illegible] গেলে কেন অন্য প্রদেশের যুবকরা [illegible] ফিরতে চাইত না। কাম আর রূপ [illegible] কামরূপ। কামরূপের সম্মোহন [illegible] সাধারণ পুরুষের অসাধ্য। ছেলে-[illegible] কাউরির হাড়ের নাম শুনেছি। 'কাউরি' [illegible] কামরূপীর অপভ্রংশ। কাউরির হাড় [illegible] লোহাকে সোনা বানানো যায়। [illegible] ভেড়া বানানো যায়। এমনি যার [illegible]। আমার খুশিটা যে কী তা [illegible] ছেলেবেলায় আমার কাছে তেমন [illegible] ছিল না। তবে আমিও ম্যাজিক [illegible] ভালোবাসতুম। হায়, একখানা [illegible] হাড় যদি হাতে পেতুম!

[illegible] গিয়ে যার নাম শুনলুম সে কামরূপ নয়, আসাম। সে প্রদেশে কত-রকম উপজাতি বাস করে। কালাজ্বর বলে এক ভয়ঙ্কর রোগ আছে। চা-বাগানের আড়কাঠিরা আমারি মতো কত ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। চা খেয়ো না, ও [illegible] শোষিত মানুষের রক্ত। আসামের সর্বত্র বনজঙ্গল বাঘভালুক গণ্ডার। অবশ্য ভালো কথাও শুনেছি ও পড়েছি। কিন্তু মোটের উপর আসাম আমার কাছে ছিল এক মায়ারাজ্য, সেখানে যাওয়া যেন একটা রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার। তেমন অ্যাডভেঞ্চার আমার কাম্য ছিল না।

তা ছাড়া আমি বরাবরই পশ্চিমমুখো। যাত্রা হয়ে পশ্চিমেই গেছি। রাইন নদের স্টীমার যাত্রা আমাকে এত আনন্দ দেয় যে, দেশে ফিরে তারই স্বাদ পেতে চাই পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের স্টীমারে চড়ে। পদ্মার স্টীমার আমার বরাতে বার বার ছিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের স্টীমার একবারও না। কতবার ভেবেছি আসাম সুন্দরবন ডেসপাচ সার্ভিসে কলকাতা থেকে ডিব্রুগড় অবধি পাড়ি দেব। কিন্তু সে সাধ কোনোদিন মিটল না। দেশ ভাগ হয়ে গেল। এখন তো সার্ভিসটাও উঠে গেছে।

সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে ধন্যবাদ, তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর দৌলতে আমার এই প্রথম আসামদর্শন ঘটল। যাত্রার সূচনা ও শেষ আকাশপথে বিমান-যোগে। মধ্যভাগ মোটরযোগে স্থলপথে। বাদ গেল সেই জলপথ ও স্টীমারযাত্রা যার ধ্যান করে এসেছিলুম চিরকাল। গোহাটিতে ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে বাঁধা স্টীমারগুলোকে দেখে এমন কষ্ট হলো। ভারত পাকিস্তান বিরোধের বলি ওই সব নিরপরাধ জলযান। দূরপাল্লার পাড়ি না থাকায় ওরা এখন অচল। ক্রমে অব্যবহার্য হয়ে উঠছে। হায় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। তোমার স্বপ্নের কি এই পরিণতি! ব্রহ্মপুত্র নদে তুমি স্টীমার ভাসাতে চেয়েছিলে, স্টীমার একদিন ভেসেওছিল। এখন কিন্তু জরাজীর্ণ হয়ে মৃত্যুর দিন গুনেছে।

স্টীমার যাত্রা হলো না বলে আমি অসুখী। সেটা না হয়ে যেটা হলো সেটা কিন্তু কম সুখের নয়। অসম সাহিত্য সভার অতিথিরূপে আমি অসমীয়া পরিবারে আতিথ্য লাভ করলুম। তাঁদের পারিবারিক জীবনের শরিক হবার সুযোগ পেলুম। অসমীয়াদের নিজেদের সাহিত্য-সভায় যোগ দিলুম। আপনার লোকের মতো ব্যবহার পেলুম। অতিথিকে সাধারণত যতটা সম্মান দেখানো হয়ে থাকে তার চেয়েও বেশী কিছু ছিল আমার জন্যে সঞ্চিত। সেটা সত্যিকার প্রীতি। প্রীতির বিপুল বর্ষণে আমি অভিভূত হলুম। আমার চোখে জল এল।

প্রথমদিন থেকে শেষদিন অবধি প্রাণে ধ্বনিত হতে থাকে অমর লক্ষ্মীনাথের আকুল করা গানের সুর। "অ' মোর আপোনার দেশ।" যে দেশ লক্ষ্মীনাথের আপনার দেশ সে দেশ কি আমারও আপনার দেশ নয়? আপনার দেশ নয় তো কী? বিদেশ? আমি কি তবে বিদেশী? না, আমার তো তা মনে হয়নি। তাই যদি হতো তবে আমি "অ' মোর আপোনার দেশ" শুনে ভাবাবেগে উদ্বেল হতুম না। আমিও মনে মনে গুনে গুনে করতুম না "অ' মোর চিকুণি দেশ।"

লক্ষ্মীনাথের ওই দেশবন্দনার প্রথম তিনটি পঙ্ক্তি ভারতবাসীর দেশবন্দনা হতে পারত। "বন্দে মাতরম্" যেমন আদিতে ছিল নিছক বাংলাদেশের, পরে হয় সারা ভারতের "অ' মোর আপোনার দেশ"-ও তেমনি আদিতে নিছক অসমের, পরে হবে সারা ভারতের। পরবর্তী পঙ্ক্তিগুলিও আমার প্রিয়। অসমীয়া ভাষাও আমার পর নয়। আর "অসমী আই" যে আমাকেও স্নেহ করেন তা তো আমি অনুভব করে এলুম।

ভারতের রাজ্যগুলি এক-একটি রাষ্ট্র নয়। বাঙালী, অসমীয়া প্রভৃতিকে এক-একটি নেশন বলা চলে না। আমরা সবাই মিলে একটি নেশন, খণ্ড খণ্ডভাবে নেশন নই। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে তিব্বত থেকে এসে মিশেছে ব্রহ্মপুত্র বা লুহিত নদের জলস্রোত। তেমনি শ্যামদেশ বা শান রাজ্য থেকে এসে মিশেছে অহোম-তাই জাতির রক্তস্রোত ও শব্দস্রোত। তেমনি বাইরে থেকে এসে মিশেছে নাগা জাতির ও মিজো জাতির রক্তস্রোত ও শব্দস্রোত। ভারতের সংজ্ঞা যুগে যুগে বদলে গেছে। যাকে বলা হতো বেদবহির্ভূত দেশ বা পাণ্ডববর্জিত দেশ সেও এখন ভারতের সামিল। সেই জন্যে বলতে পারছিনে যে খাসী জয়ন্তীয়া গারো বোরো ইত্যাদি জাতির বা উপজাতির রক্তস্রোত ও শব্দস্রোতও এসেছে বাইরে থেকে। যে যেখান থেকেই আসুক এখন ভারতের মহামানবের জনসাগরে মিশে গেছে। অথচ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে।

এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা নিয়েই বিবাদ। অসমীয়াদের নিশ্চয়ই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙালীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সেটা অস্বীকার করেনি, তাই বিবাদ বাধেনি। বিবাদটা ইংরেজ রাজত্বের সমসাময়িক। ইংরেজরা প্রথমে মনে করেছিল অসমীয়ারাও বাঙালী, তাদের ভাষাও বাংলা। ইংরেজরা

ছাব্বিশ বছর পরে সে ভুলের সংশোধন করে। কিন্তু বাঙালীরা সঙ্গে সঙ্গে তা করে না। দীর্ঘকাল ধরে তর্কবিতর্ক করে। ফলে অসমীয়ারা তিক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অসমীয়াকে স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দেয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি ইংরেজী প্রবন্ধে ক্ষুদ্র জাতিদের আত্মপ্রকাশের উপর জোর দেন ও অসমীয়াদের উল্লেখ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমরা স্বীকার করে নিই যে অসমীয়ারা বাঙালী নয়, তাদের ভাষা বাংলার সামিল নয়। তারা স্বতন্ত্র।

কিন্তু মুখে স্বীকার করে নিলে কী হবে, মনে স্বীকার করতে বেধেছে। অসমীয়ারা যদি স্বতন্ত্রই হবে তবে তাদের লিপি কেন বাংলা? এ যুক্তি যদি সত্যিকার হয়, তবে মরাঠী ভাষাও হিন্দীর সামিল। কারণ মরাঠীও লেখা হয় দেবনাগরী লিপিতে। দু'দিন আগে হোক পরে হোক বাঙালীদের মন থেকে মেনে নিতে হবে যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও গাঙ্গেয় নিম্নপ্রদেশ ভৌগোলিক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক ও ডেমোগ্রাফিক বিচারে পরস্পরের

থেকে পৃথক। পার্থক্য মেনে নিয়ে তারপরে সেতুবন্ধন করতে হবে। অস্বীকার করে যা হবে তা ট্র্যাজেডী। আট বছর আগে যা ঘটে গেল তার আদিপর্ব ১৮৩৬ সালে, যখন আহোম রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয় ও অসমীয়া ভাষা পাঠশালা ও আদালত থেকে নির্বাসিত হয়। তার স্মৃতি অসমীয়াদের মনে এখনো জ্বলছে।

ইদানীং চাকা ঘুরে গেছে। নাগা, মিজো, গারো, খাসীরাও দাবী করছে তাদের যার যার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি। এমন কি আহোমবংশীয়রাও সেই ধুয়া তুলেছে অসমীয়া হচ্ছে ওড়িয়া বাংলা মৈথিলীর মতো আর্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অথচ স্বতন্ত্র একটি ভাষা। অহোম-তাই ভাষার সঙ্গে এর কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। সে ভাষার জন্ম 'তাই' পরিবারে। একদা সে ভাষায় বুরঞ্জি লেখা হয়েছে। অসমীয়া বুরঞ্জির গোড়ায় অহোম-তাই বুরঞ্জি। অসমীয়া সাত শো বছর সময় পেয়েও অহোম-তাইকে আত্মসাৎ করতে পারেনি। তবে আহোমরা হিন্দু হয়েছে, যেমন নাগারা খ্রীস্টান হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদের যুগে ধর্মের ঐক্য কোথাও কি মানুষের বিচ্ছেদবাসনাকে নিরস্ত করতে পেরেছে? তা যদি পারত তবে পূর্ব-পাকিস্তান আজ ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন চাইত না।

আসামের দুর্বলতা হচ্ছে এইখানে যে আর্য ধারা ও অনার্য ধারা মিলে মিশে একই ধারায় পরিণত হয়নি। অসমীয়া মোটের উপর আর্য ধারা। আর্য ধারায় যারা মানুষ হয়েছে তারা অনার্য ধারাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেনি। পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষিত মহল যদিও অসমীয়া ভাষা বোঝে তবু তাকে আপনার ভাষার মতো ভালোবাসে না। ইংরেজীই বরং তাদের কাছে শ্রেয়। অসমীয়া জাতি বললে যা বোঝায় তা একটি বহুভাষী জাতি নয়, তা একটি একভাষী জাতি। অথচ আসাম রাজ্যটি একটি বহুভাষী রাজ্য। পুনর্গঠনের প্রশ্নে অসমীয়া চিন্তানায়করা একমত নন। কেউ কেউ বলেন, অসমীয়াভাষী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাই অসমীয়াদের হোমল্যান্ড, বাদবাকীর উপর অসমীয়াদের ন্যায্য দাবী নেই। সুতরাং সে সব অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হতে চায় হোক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অসমীয়াভাষীদের নিজেদের ঘরেই এখন গৃহবিবাদ। অহোম-তাই ভাষা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সেও চাইছে তার জন্যে স্বতন্ত্র একটি রাজ্য। রাজ্য থেকে রাষ্ট্র। সে যদি উৎসাহ পায় তবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাও দ্বিখণ্ডিত হবে। এমন কি ভারতও খণ্ডবিখণ্ড হতে পারে।

এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ যে কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে তার স্থিরতা নেই। মিলনসূত্র হিসাবে হিন্দীর যোগ্যতায় বাঙালীদের মতো অসমীয়ারাও সন্দিহান। পার্বত্যরা তো সরাসরি হিন্দীবিমুখ। আসাম হচ্ছে সেই রাজ্য যেখানে ইংরেজী ভিন্ন ঐক্য নেই। অথচ ইংরেজী শিক্ষায় অসমীয়াদের মন নেই। পার্বত্যরা কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে ইংরেজী শিখছে। তাদের না হটিয়ে ইংরেজীকে হটানো যাবে না। আর তাদের হটাতে গেলেই আসাম ভেঙে চৌচির হবে। পুনর্গঠনের নতুন প্রস্তাবে আসামের ঐক্য নামেই বজায় রইল। প্রকৃত ঐক্য নির্ভর করবে মিলনসূত্র কোনটা হবে তারই উপর। অসমীয়া না ইংরেজী।

আসাম, তুমি সুন্দর, তোমার নরনারী সুন্দর ও মধুর। তোমাকে আমি ভালোবেসেছি।

'আরে দূরে, দূরে, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে না। প্রাণিজগতে সবাই কথা বলতে পারে, যে যেটুকু বোঝে, যেটুকু বোঝাতে চায়। একটা কাক ডাকলে সব ক'টা কাক জলের মত বুঝতে পারে কি বলছে। মাঠের মধ্যে একবার মাইরী একটা গরুকে দেখেছিলাম, গলা উঁচিয়ে হাম্বা করলো, দূরে থেকে বাছুরটা সাড়া দিলো, দুটো ডাকই, বিশ্বাস কর, ভালবাসার মত মিষ্টি। আর মা যখন আমাকে 'অরুণ' বলে ডাকে, স্নেহ না ঘৃণা বুঝতেই পারি না।'

টিকলু হেসে উঠলো। বললে, মারা পড়বি তুই। দিনরাত সারা গায়ে শুধু কাঁটাতারের বেড়া জড়াচ্ছিস। কি দরকার বাবা, ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিস কেন, আমার মত পাকাল মাছটি হয়ে সুড়ুৎ করে সরে পড়লেই পারিস।

অরুণ গুম হয়ে রইলো, জবাব দিলো না। সারা পৃথিবীর ওপরই ঘেন্না হয়ে গেছে ওর। সকলের ওপর, নিজের ওপরও।

মনের দুঃখ টিকলুকে বলতে গেল, সেও বুঝলো না। নাঃ, জন্তুজানোয়ার সবাই কথা বলতে পারে, একা মানুষই শুধু কথা বলতে পারে না।

সুজিত নিজের হাত নিজেই দেখছিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, জীবজন্তুদের অনুভূতি কম, চাহিদা শুধু দুটি, সে আর অন্যকে বোঝাতে পারবে না কেন!

অরুণ বিরক্তির সঙ্গে বললে, সে-কথাই তো বলছি। মানুষের হাজারো ফ্যাঁকড়া, সেসব অন্যকে বলতেও চায়, অথচ বলতে পারে না। মানুষ শুধু নিজের সঙ্গেই কথা বলতে পারে, নিজের সঙ্গেই শুধু কথা বলা যায়।

তা নয়তো কি। দিনরাত সবাই কথা বলছে। আমি নিজেও তো বলছি, অরুণ ভাবলো। কিন্তু যা বলতে চাই তা তো বলি না, বলতে পারি না। যখন বলি, কেউ বুঝতে পারে না। তা হলে? কথা তো তা হলে কতকগুলো অর্থহীন শব্দ, কতগুলো আওয়াজ শুধু, আর কিছু নয়, কিছু না। কেউ কোন কথা বলতে পারে না, কেউ কোন কথা বুঝতে পারে না।

—আমার কি মনে হয় জানিস? আমরা বনের গাছপালার মত, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। চুপচাপ। গাছ ভিড় করে থাকলে বন, মানুষ ভিড় করে থাকলে সমাজ।

—কিন্তু মেয়েরা ভিড় করে থাকলে বিউটি প্যারেড। নিজের কথায় নিজেই হাসলো টিকলু।

অরুণ তিক্ত অধৈর্যে বললে, একটা সিরিয়াস কথা বলছি...

টিকলু বললে, তবে? তবে যে বলছিস মানুষ কথা বলতে পারে না? পারে না যদি তো দিব্যি ভ্যাজভ্যাজ করছিস কি করে তখন থেকে!

অরুণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, ঠিকই বলেছিস। প্রত্যেকটি লোক শুধু ভ্যাজভ্যাজ করে।

সুজিত এবার ওর হাতের ফেট-লাইন থেকে চোখ তুললো। বললে, অরুণ, তুই ফিলজফি নিলে পারতিস। মনে হচ্ছে দার্শনিক হয়ে যাবি।

—হাসিস না সুজিত। তিক্তবিরক্ত অরুণ বলে উঠলো, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? মনে হচ্ছে সারাগায়ে যেন ড্যাবা ড্যাবা আমবাত বেরিয়েছে, সারা গা চুলকোচ্ছে, কুটকুট করছে। ইচ্ছে হয় কষে এক লাথি বসিয়ে দিই পৃথিবীটাকে।

টিকলু গা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসলো। অরুণকে যখনই ও চিড়বিড় করে উঠতে দেখে তখনই এমনি ভাবে হাসে। হাসতে হাসতেই বললে, ও তুই যত কষেই পেনালটি কিক্ দে, গোলকি শালা একজন কেউ আছেই, ঠিক লুফে নেবে। তারচে তুই বরং এক মুঠো নিমপাতা ঘিয়ে ভেজে গপ্ করে খেয়ে নে, আমবাত ভাল হয়ে যাবে।

অরুণ চটলো না। ঘাসের ওপর পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে
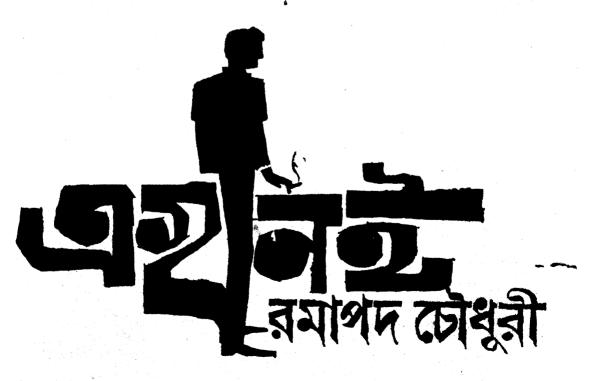
হাত দু'খানা পিছনে রেখে আয়েশে ডেকচেয়ার হয়ে গেল। খালি হয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের বাক্সটা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে কাছে আনলো, তারপর বাক্সর লেবেলটা তুলে ফেলার চেষ্টা করতে করতে বললে, সারা পৃথিবীর লিভার খারাপ, আমি একা নিমপাতা চিবিয়ে কি করবো!

টিকলু একটা নকল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললে, রুগ্ণ সত্যিই তোকে একেবারে...

—ধুত্তোর রুগ্ণ। বাড়ি। বাড়ি। আমার মাইরি... (অরুণের গলার স্বর কেমন কান্নার মত ভেঙে পড়লো)... সত্যি বলছি টিকলু, বাড়ি থেকে আমার পালাতে ইচ্ছে করে।

টিকলু হেসে উঠলো।—আমার ট্রাব্‌ল্‌ অন্য, বাড়িতে ঢুকতেই দিতে চায় না।

সুজিত হাসলো না, অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সন্ন্যাসী হবি নাকি? তোর তো বাবা শনিচন্দ্র এক ঘরে নেই, উঁহু ওসব সুবিধে হবে না।

অরুণ ফেটে পড়লো।—তুই জানিস না সুজিত, আমি সত্যিই এক একসময়...মা আর বাবা...একজন শনি, আরেকজন রাহু...আর দিদিটা? জলহস্তী, রিয়েল জলহস্তী।

বুঁজে দু'চোখ বুজে বুকের ভিতরকার অসহ্য যন্ত্রণাটা চেপে রাখার চেষ্টা করলো। পারলো না। সমস্ত ঘটনা, আনুপূর্বিক সমস্ত দৃশ্য আবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো নিজেকে নিজে কষে কয়েক ঘা বেত মারে। সপাং সপাং সপাং। উফ্, তা হ'লে বোধহয় একটু শান্তি পেত।

অরুণের মনের মধ্যে একটা চাপা অভিমান, ওকে বাড়ির কেউ বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না। ও যেন কেউ নয়, ওর যেন মন বলে কিছু থাকতে নেই। মাঝে মাঝে অভিমানটা তাই রাগ হয়ে যায়।

সুখ বলো বিলাস বলো, একটাই আছে—ঘুম। তাও মৌজসে ভোগ করতে দেবে না। রোজ সকালে একটা না একটা ফিরিস্তি।

—ভোরসকালে হাওয়াঘুমটা দিলে মাইরি মাটি করে। কি, না হৃষিকেশবাবু চলে যাচ্ছেন পেন্নাম করে আয়। এইসব পেন্নামটেন্নামের ভণ্ডামি কবে যাবে বল তো দেশ থেকে!

ভিতরের ক্ষোভ কার কাছে আর প্রকাশ করবে, টিকলু আর সুজিত ছাড়া? তাই সেদিন এসে বলেছিল ওদের।

হৃষিকেশবাবু চলে যাচ্ছেন। কৃতার্থ করেছেন। তোমাদের গুরুদেব টাইপের লোক, তোমরা যত্নআত্তি করো, লুচি ভেজে খাওয়াও, আমাকে ঘুম থেকে তুলে পেন্নাম না ঠোকালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত!

টিকলুর কাছে সবই ঠাট্টা। হেসে বলেছিল, সে তো যাওয়া চুকে গেছে সকালেই। বলেছিল, আটি তো নিভে গেছে, তবু এখনো উথলোচ্ছিস কেন!

কাকে বোঝাবে অরুণ। কেউ বোঝে? এই আজকের ব্যাপারটা...

খামচে মাটি থেকে পর্পর করে একমুঠো দুব্বোঘাস ছিঁড়লো অরুণ, মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলো। আর মনে মনে ভাবলে, কতলোক তো দিব্যি মনের মত মা পায়, আমার বেলাই...

—মনের মত কিছুই পেলাম না মাইরি।

সুজিত হেসে বললে, আর অন্যদের জন্যে, চতুর্থে ভাল গ্রহট্রহ থাকে তাদের, চতুর্থপতি স্ট্রং হয়...

টিকলু হাসলো না। বললে, তোর মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে। আসল কথাটা কি তাই বল না।

অরুণ বিরক্তিতে ঘেন্নায় মুখখানা বিতিকিচ্ছিরি করলে। —কোনটা বলবো?

—কেন, হৃষিকেশটা তো সেদিন বললি, বিদেয় হয়েছে। টিকলু হাসলো।

অরুণ নিজেই এবার বলতে গিয়ে হেসে ফেললো।—আজ আবার দরজায় ধাক্কা, ঘুম ভাঙিয়ে বাজারের থলিটা হাতে ধরিয়ে দিলেঃ সোনার মা কাজ করতে আসে নি, বাজারে যা। ...দ্যাখ টিকলু, সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে তেতো হয়ে গেছে। আর নয়তো আমি নিজেই তেতো হয়ে গেছি। স্পষ্ট বাংলায় কথা বলছি, তুইও বুঝতে পারছিস না।

—কেন বাবা, তুই তো বলিস, প্রত্যেকটা মানুষ নাকি এক এক ভাষায় কথা বলে, কেউ কারো ভাষা বোঝে না।

—উঁহু, তাও মনে হচ্ছে ঠিক নয়। আমরা আদপে কথা বলতেই পারি না। অরুণ ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবার চেষ্টা করে বললে।

—মানে আমরা সব গাছ হয়ে গেছি? টিকলু রসিকতা করলো। অরুণ চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর দুম্ করে বলে ফেললো, তাতেও কি শান্তি আছে। 'আমি সরে থাকবো, আমি আলাদা থাকবো, আমাকে বিরক্ত ক'রো না'—এ'সব ভাবলেই হ'লো নাকি। সেখানেও দেখবি আশপাশের গাছগুলো তলায় তলায় শিকড় চালিয়ে দেবে, শিকড়ে শিকড়ে ঠোকাঠুকি, জড়াজড়ি, এ ওরটা ছিনিয়ে নিতে চাইবে...

নাঃ, পালানো যায় না। পালাবার জায়গা নেই। প্রত্যেকটা মানুষ এক একটা অদ্ভুত ল্যাংগুয়েজে কথা বলে, হ্যাঁ তাই, কেউ কারো ভাষা বোঝে না, তবু কথা বলতে হবে, কথা বলে যাও। দিনরাত শুধু জিভের এক্সারসাইজ করো। ধুত্তোর।

॥ এক ॥

আসুন এইবার আমরা ঐ বাড়িটার কাছে যাই।

বাড়িটার সামনাসামনি রাস্তার এপারে একটা মহানিমের গাছ। দু'দিন আগেও পাতা ছিল না গাছটায়, গুঁড়িটা হাত পা ছড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। গাছ, কিন্তু ওটা যে নিমগাছ বোঝার উপায় ছিল না। এখন অনেক পাতা। ডগায় কচি কচি তামাটে শিখা হয়ে দুলছে। একটা ডাল ইলেকট্রিকের তার অবধি গিয়ে পড়েছিল বলে কেটে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম দিকের ঘরখানা ছোট, তক্তপোশটা আরো ছোট। তক্তপোশটার ধারে একটা জানালা আছে, ঘুম-ভাঙা ভোরের দিকে অরুণ চোখ বুজেও জানালার ওপাশে নিমগাছটার পাতা নড়া টের পায়। ঝির-ঝির ঠাণ্ডা হাওয়া আসে।

কিন্তু নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পায় না। দু বছর বাড়িওয়ালা অরুণদের কিছু না জানিয়ে নীচের তলার একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দিল। তার পর থেকে ঘরখানা চুনের আড়ৎ। বাড়ির সদর দরজার পাশটুকু সাদা হয়ে থাকে। চুন ছড়িয়ে থাকে ওপরের সিঁড়ি অবধি। সভ্য-ভব্য একটা লোককে বাড়ি আনা যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, ব্যাটা সকাল থেকে মাল খালাস করে, টিন পেটানোর, লরী দাঁড়ানোর আওয়াজ আসে। ভোরবেলার আমেজে বেশ বালিশ আঁকড়ে মজাসে আরেকটু ঘুমোবে তার উপায় নেই।

আজকেরে চমৎকার হাওয়া আসছিল। এই ভোরের হাওয়াটা দিব্যি সাবানের ফেনার মত গায়ে মেখে মেখে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল অরুণের। কিন্তু তা হলে তো উঠে দাঁড়িয়ে টেব্‌ল্‌ ফ্যানটা বন্ধ করে দিতে হয়। 'এর মধ্যে তোর যে কেন পাখা লাগে বুঝি না'। ধেৎ। লাগে, না লাগে, তোদের কি। ইলেকট্রিক বিলের টাকা তো আর তুই দিস্ না।

ওদের তো সব কিছুতেই অভিযোগ, অরুণ যা কিছু করে। শুনে শুনে ও নিজেও ভোঁতা মেরে গেছে, চামড়ার ভিতর অবধি আর পৌঁছয় না। তবে ঘুম ভেঙে গেলেই মান্ধাতা আমলের জং ধরা টেব্‌ল্‌ ফ্যানটার ঘচাং ঘচাং আওয়াজটা বড় কানে লাগে।

পাখাটা বন্ধ করার জন্যে শুয়ে শুয়েই হাত বাড়াবে কিনা ভাবছিল অরুণ, সাহস হলো না। বিশ্বাস নেই, হঠাৎ যদি একদিন এমন শক্ মারে।

ঈস্, মা এমন এক-একটা কথা বলে। 'টিকলুর সামনেই একদিন বলে বসলো, দেখিস শট্ মারবে।

শট্ মারবে। ভেংচে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল অরুণের।

বালিশটা আরেকটু ভাল করে আঁকড়ে ধরে আরেকটু আরাম করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু উপায় আছে নাকি।

দড়াম্ দড়াম্ করে ধাক্কা পড়লো দরজায়।—অরুণ, অরুণ!

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলো অরুণ।

—সোনার মা আসেনি, ওঠ্ বাজার যেতে হবে। পাছে আপত্তি শুনতে হয়, কথাটা বলেই মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আজকের দিনটাই খারাপ যাবে। চেঁচিয়ে উঠে 'পারবো না' বলতে গিয়েও অরুণ থেমে গেল। আজ মা'র কাছ থেকে গোটাকয়েক টাকা চাইতে হবে।

শুয়ে শুয়ে একটু রুণুর কথা ভাবতে চেয়েছিল। রুণুটা একটা ইডিয়ট। অরুণ কি দারুণ ভালবাসে ওকে, অথচ মেয়েটা কেন যে বোঝে না, ভুল বোঝে। 'তোমার তো স্মার্ট মেয়েদেরই পছন্দ।' স্মার্ট কথাটার মধ্যে ঊর্মির নামটা লুকিয়ে আছে, অরুণ জানে। মেয়েরা এক একটা ক্যালকুলাসের অঙ্ক, বোঝাই যায় না। আরে, প্রথম প্রথম একটা দিনও তো ভাল-বাসার কথা বলতে হয়নি, তখন তো ঠিক বিশ্বাস করতে। এখন নিত্যদিন কি ভালবাসি ভালবাসি বলা যায় নাকি। বলতে গেলে অরুণ নিজেই হেসে ফেলবে।

আচ্ছা, ঊর্মির ওপর ওর এত জেলাসি কেন।

চোখেমুখে জল দেবার জন্যে কলের দিকে গেল অরুণ। কলটা খুলে দেখলে জল নেই। ধুৎ। কোনো সময়ে যদি পাম্পের জল থাকে। কলটা ফিরে বন্ধ করতে ইচ্ছেও হলো না। যখন পাম্প চলবে জল বেরিয়ে যাক্ না, আমি তো কখনো...আমার শালা সেই চৌবাচ্চা। এই তো একটু আগে কে মুখ ধুচ্ছিল, আমার বেলাই শেষ। তেলের শিশি নিয়ে স্নান করতে যাও, দেখবে দু'ফোঁটা শুধু তলানি পড়ে আছে। যে যার নিজেরটি পেলেই খুশী, কেন, শেষ হয়েছে দেখে আবার ঢেলে রাখতে পারো না।

চৌবাচ্চার জল নিয়ে চোখেমুখে দিয়ে দড়িটার দিকে তাকাতেই মা তোয়ালেটা এগিয়ে দিলো। ফ্যাটারি আর কাকে বলে।

দিদি হাসি হাসি মুখে চায়ের কাপ নিয়ে এসে হাজির হলো।

তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে অরুণ বললে, ঘুষ দিচ্ছিস? বলে হাসলো।

দিদির মুখেও হাসি এসেছিল, কথাটা শুনেই ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেল। মুখের হাসিটা ঝট্ করে মুখ-ঝামটা হয়ে ফিরলো। —না, অন্যদিন কেউ চা দেয় না তোকে।

অরুণ চুরুপ্ করে একটা চুমুক দিলো

ঝাপে, তারপর বললে, দেয়, আধঘণ্টা চেঁচামিচির পর।

—সকালে উঠলেই পারিস, প্রথমবার যখন হয়।

অরুণ কথা বাড়ালে না, মুখ তেতো করে কি হবে সকাল থেকে। রুণুর সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন আজ, অথচ মন খিঁচড়ে রইলো।

পাজামা বদলে প্যাণ্ট পরবে কিনা ভাবলো একবার। উফ্, এই প্যাণ্ট করানোর জন্যে কি রাগ বাবার।

—ছেলেকে দিয়ে বাজার করালে পচা মাছই খেতে হবে। যতটা সম্ভব বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হতে চায় না অরুণ, তবু সেদিন পাকেচক্রে একসঙ্গে খেতে বসতে হয়েছিল। বাবা তো চিরকাল টাটকা খেয়ে এসেছে, দিনকাল যে বদলে গেছে সে খবর তো রাখে না, মাছ একটু মুখে দিয়েই বললেন, খারাপ হয়ে গেছে। ব্যস্, মা অমনি ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, ছেলেকে দিয়ে বাজার করালে পচা মাছই খেতে হবে, কেনার সময় মাছে হাত ঠেকান নাকি বাবুরা, হাতে যে আঁশটে গন্ধ হবে।

সময় নষ্ট করে বাজার করে আনলো

অরুণ, থলি হাতে করে বয়ে আনলো, তবু যদি সন্তুষ্ট হতো এরা। এইজন্যেই তো কিছু করতে ইচ্ছে হয় না।

মাছে হাত ঠেকান নাকি বাবুরা!

কথা হচ্ছে মাছের, বাবার রাগ গিয়ে পড়লো প্যান্টের ওপর। তাচ্ছিল্যের স্বরে, অরুণকে শোনাবার জন্যেই বললেন, মাছ দেখতে হলে নীচু হতে হবে না? চোঙা প্যান্ট-পরে নীচু হবে কি করে!

দেশসুদ্ধ সবাই পরছে, আমার বেলাই যত রাগ। হৃষিকেশবাবুকে পেন্নাম করাতে তো ছাড়ো না। কি, না ঠাকুর্দার গুরুদেব বংশের লোক।

বাজারে যেতে অবশ্য আপত্তি নয় তার, কিন্তু একটা দিন বললে না, ঝিঙেগুলো বেশ কচি রে। আপত্তি আছে আরেকটা —ঐ নোংরা থলেটা। হাতে নিলেই কেমন কেরানী কেরানী লাগে। বুড়োদের মত। চেনাজানা কেউ দেখলে ভাববে বাড়িতে চাকর নেই। বিশেষ করে মেয়েদের সামনে...হোক না অচেনা, থলে হাতে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেও অস্বস্তি লাগে। উর্মি কোনদিন যদি দেখে ফেলে, এমন হাসবে।

ফিরে এসেই হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো অরুণ, বাজারের থলেটা নামিয়ে দিয়েই 'চললাম আমি'। খুচরো পয়সা-গুলো আর ফেরত দিলো না।

পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট চারমিনার কিনে একটা দড়িতে ধরালো। কটা মাত্র কাঠি আছে দেশলাইয়ের বাক্সে, খরচ করে দরকার নেই।

সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়ে কোর্ণিক মুকে এসে উঁকি দিলো।

টিকলু আর সুজিত এসে গেছে অনেক আগেই।

—বাজার যেতে হয়েছিল মাইরি।

—তা হ'লে তো অনার হয়েছে, চা খাওয়া। সুজিত বললে।

টিকলু হাসলো। —আহা ও বেচারীকে কেন, সার্টুলির জন্যে ওর তো এমনিতেই খরচ বেড়ে গেছে।

খরচ, খরচ, খরচ। ঐ এক কথা ওদের মুখে। জেলাসি ছাড়া আর কি। যেন মেয়েরা মেয়ে নয়, প্রেম বলে কিছু নেই। কটা মেয়ে দেখেছিস তোরা? খরচ করলেই যদি ভালবাসা পাওয়া যেত, জোটা না একটা। কাউকে ভালবাসা যে কি কষ্ট তোরা কি বুঝবি? ভাবিস ও শুধু পাঁচ আঙুলের মামলা।

মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা না থাকে, রুণুকে তো শ্রদ্ধা করতে পারিস। তা না, এমন ঠেস দিয়ে কথা বলবে যেন রুণু ভাল মেয়ে নয়, যেন রুণু ওকে সত্যি ভালবাসে না। রুণু কোথায় দু'টাকা টিকেটে ছবি দেখতে চায় না, এক একদিন জোর করে চায়ের পয়সা দেয়, অথচ এদের মুখে শুধু খরচ আর খরচ। সার্টুলি। শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

—কি রে সত্যি খুব কস্টলি নাকি মেয়েটা? সুজিত বিশ্রি হাসলো।

নাঃ, রুণুর কথা কিছু বলবে না এদের। অভিমানের জ্বালাটা লুকিয়ে তবু হাসতে হলো অরুণকে।—কখনো কখনো আমি না দিলে প্রেসটিজ থাকে? বল না।

—শালা বেকার থাকতে আর ভাল লাগছে না। টিকলু দুম্ করে বললে।

অরুণ হেসে বললে, একটু খোঁচা দিয়ে, তোদের তো খরচ করানোর মত কেউ নেই, তোদের আর ভাবনা কি।

সুজিতের মুখ দেখে বুঝলো খোঁচাটা ঠিক জায়গায় লেগেছে। আর অমনি অরুণের

মনে হলো, দেখেছো, ওকে তো আমি থাপ্পড় মারতে চাই নি, শুধু নিজের জ্বালাটা ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলাম। কি যে আমরা বলতে চাই, আর কি বলে ফেলি।

এবার তাই ঘায়ের ওপর মলম লাগানোর মত করে হেসে উঠলো অরুণ। বললে, সত্যি, মাকে তেল দিয়ে দিয়ে আর টাকা চাওয়া যায় না মাইরি। যদ্দিন না রেজাল্ট বেরোচ্ছে কি করা যায় বল্ তো? টুইশানি?

টিকলু হাসলো।—সে তো বাবা রুণুকেই লেসন্ দিচ্ছো।

সুজিত দিনকয়েক টুইশনি করেছিল। বললে, ও রাস্তায় বাবা আমি নেই আর. সারা সন্ধ্যেটাই মাটি। ছাত্র নিয়ে ও সময় ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল লাগে।

—কেন ছাত্রী?

সুজিত হেসে বললে, ছাত্রীর সঙ্গে বাপটাও যে ফ্রীতে পড়া শুনবে।

তিনজনই এবার শব্দ করে হেসে উঠলো।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। অরুণ হঠাৎ বললে, টয়েনবির বইটা পড়ালি না?

✻

টয়েনবির বইটা কিনবো কিনবো করেও কিনতে পারে নি ও। বাবার কাছে চাইবে কি, বাবার কাছে যেতেই ইচ্ছে হয় না। আগে তবু রাত্রে একসঙ্গে খেতে বসতে হতো, এখন তো আড্ডা দিয়ে দেরী করে ফেরে। ঘরে ভাত ঢাকা দিয়ে মা শুয়ে পড়ে। বাড়ি তো নয়, যেন হোটেলখানা! শুকনো কড়কড়ে রুটিগুলো গিলতে হয় একা একা। পর পর ক'দিন রাত করে বাড়ি ফিরেছে বলে কি চেঁচামিচি। 'তোর জন্যে সবাই রাত জেগে বসে থাকবে নাকি?' রেগে গিয়ে অরুণ বলেছিল, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেই পারো, সোনার মা দরজা খুলে দেবে! বাস, মা সেই যে গুম্ হয়ে গেল, সত্যি সত্যি তারপর থেকে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে। খেলো কি খেলো না, সকালে সে-খবরও নেয় কিনা সন্দেহ।

এক এক সময় অরুণের ভীষণ অভিমান হয়। আরে বাবা, ও যে মাকে এত ভালবাসে, সেবার মা'র হাঠৎ অসুখটা বাড়াবাড়ি হ'লো,

ও যে ছুটতে ছুটতে ডাক্তারের বাড়ি গেল, মা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো দেখে ওর যে বুকের মধ্যে কেমন করছিল, লজ্জায় কাউকে বলতে পারে নি, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে যে কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে এলো, এ-সবের কি কোন দাম নেই? মা কি কিছু বুঝতে প্যারে না! তবে আর মা কিসের।

আর বাবাও তেমনি। একটা ভাল কথা বলবে না। কাছে পেলেই পড়াশোনা, চাকরি, কমপিটিটিভ পরীক্ষা ,আর নয় তো, 'জানিস অরুণ, সে-সব দিনই ছিল অন্য, গান্ধীর ডাকে দলে দলে সব জেলে যাচ্ছে, ফ্যাশান-ট্যাশন সব বিসর্জন দিয়েছে দেশের লোক'...

ওসব অনেক শুনেছি, মাল তো ক্যাচ হয়ে গেল কুড়ি বছরেই। ইতিহাসের সব বড় বড় লোকগুলোও ফিকশন কিনা কে জানে। দলে দলে সব জেলে যাচ্ছে! কই, তুমি তো জেল খাটোনি। তুমি কি করেছিলে৭। মা বা ভীতু, ফিরতে দেরী হ'লে আগে যা কাণ্ড করতো, মা বোধ হয় বাবাকে ও লাইনেই যেতে দেয় নি।

টয়েনবির বইটা কিনবো বলে দু' একবার ভেবেছে বাবার কাছে টাকা চাইবে অরুণ। কিন্তু কি করে চাইবে। সংসার খরচের হিসেব নিয়ে তো দিনরাতই মা আর বাবার খিচখিচ লেগেই আছে। ওর নিজেরই এক একসময় মনে হয়, এমন অশান্তির সংসার আর নেই।

তবু মিলুর বেলায় বাবা একবারও 'না বলে না। যখন যা চাইছে দিব্যি পেয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাই মিলুর কাছেই তে ওকে ধার নিতে হয়। যা কিপটে মিলুটা। ভাগ্যিস কিপটে, তা নাহ'লে হয়তো ধার পেতই না।

—একটা বই কেনার এত ইচ্ছে, জানিস মিলু। অথচ বাবার সব সময় অভাব, অভাব।

মিলু একটা বাচ্চা মেয়ে, সবে কলেজে ঢুকেছে, সেও বিজ্ঞের মত বলেছে, অভাবই তো। দু' পাঁচ টাকা জমিয়ে কিনলেই পারিস।

—জমিয়ে! মিলুকে আর কিছু বলতে ইচ্ছেই হয়নি অরুণের।

তারপর ধীরে ধীরে বলেছে, জানিস মিলু, তোদের মত জমিয়ে জমিয়ে কিছু করতে আমার ভালই লাগে না। আমার অনেক কিছু পেতে ইচ্ছে করে, বই, গাড়ি, ভাল বাড়ি, রেস্টুরেন্টে...আরো কি সব যেন, কিন্তু আমার মনে হয় সব এখনই চাই, এখনই।

মিলু হেসে বলেছে, দাদা, তুই বড্ড অধৈর্য রে। সব কখনো এখনই পাওয়া যায়?

তারপর একটু চুপ করে থেকে মিলু খুব খুশী খুশী হাসিতে চোখ বুজে ফেলার মত করে বলেছে, হ্যাঁ রে দাদা, আমারও। আমারও ইচ্ছে করে সবকিছু—সব এখনই পেয়ে যাই।

(ক্রমশঃ)

শীতকালে আপনার দেহত্বকে শুষ্কতা আসে...

নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করে তাকে কোমল ও লাবণ্যময় করে তুলুন

ঠাণ্ডার দরুণ আপনার ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডায় আপনার ত্বকের প্রয়োজনীয় তৈলসম্ভার ক্ষয় হয়ে যায়—যে তৈলসম্ভার আপনার ত্বককে কোমল, মসৃণ ও সুস্থ রাখে। সেইজন্যই আপনার চাই নিভিয়া ক্রীম। কেবলমাত্র নিভিয়াতেই আছে 'ইউসেরাইট'—একটি বিশিষ্ট উপাদান, যা দেহত্বকের স্বাভাবিক তৈলভাগ জোগায় এবং রুক্ষ ও শুষ্ক শীতল আবহাওয়া থেকে আপনার ত্বককে রক্ষা করে। কেবলমাত্র নিভিয়া ক্রীম দেহত্বক কোমল ও লাবণ্যময় করে রাখে।

নিভিয়া তারুণ্যমণ্ডিত লাবণ্যময় দেহত্বকের গোপনকথা!

RN-J 04 BEN

পশ্চিম ইউরোপে আবার সোনার হরিণ

কয়েক মাস আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনা নিয়ে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। এবার সোনা নিয়ে সংকট দেখা গেছে ফ্রান্সে। লৌহ মানব দ্য গল অনেক কষ্টে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঁ-র মর্যাদা রাখতে পেরেছেন।

মে মাসে ফ্রান্সে সর্বাত্মক ছাত্র-আন্দোলন এবং বিপ্লবাত্মক-ক্রিয়াকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মজুরি শতকরা ১২½ ভাগ বাড়ানো হয়; তার ফলে শিল্পোৎপাদন অনেক কমে যায়। মে মাসের রাজনৈতিক তাণ্ডবের পূর্বে ফ্রান্সের মজুত সোনার পরিমাণ ছিল প্রায় চার হাজার কোটি ফ্রাঁ; তা ছাড়া বাইরের দেশ-গুলির কাছে ফ্রান্সের পাওনা ছিল আরও ছয়শত কোটি ফ্রাঁ। কিন্তু মে মাসের পর থেকেই ফ্রান্সের মজুত সোনার পরিমাণ কমতে থাকে; অপরদিকে পশ্চিম জার্মানীর মুদ্রা মার্ক এবং সুইজারল্যান্ডের মুদ্রা ফ্রাঁ-এর চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তার পরিণতি হিসেবে দেখা গেছে ফ্রান্সের মজুদ সোনার পরিমাণের হ্রাস। প্যারিসের সোনার বাজার বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্, জুরিখ এবং লণ্ডনের সোনার বাজারও বন্ধ রাখতে হয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল চেয়েছিলেন, পশ্চিম জার্মানী মার্কের মূল্য বাড়িয়ে দিক। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী চেয়েছে ফ্রান্স তার মুদ্রার বিনিময় হার কমিয়ে দিক।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, ফ্রান্স তার মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস করবে। শেষ পর্যন্ত দ্য গল ফরাসী ফ্রাঁ-এর বৈদেশিক মূল্য কমাতে রাজী হলেন না। তার বিনিময়ে ফ্রান্স কয়েকটি ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার উপর কড়াকড়ি করেছে। ফ্রান্সের আসছে আর্থিক বছরের বাজেট ১১,৫০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ থেকে ৬,৫০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। তা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও কয়েকটি দেশ মিলে ফ্রান্সকে ১৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে রাজী হয়েছে। অবশ্য যদি দ্য গল তা গ্রহণ করতে চান। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল শেষ পর্যন্ত ফ্রাঁ-র মূল্য হ্রাস না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় পৃথিবীর সর্বত্র বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেরই এক প্রশ্ন, মুদ্রামূল্য হ্রাস না করে ফ্রান্স তার আর্থিক সংকট পাড়ি দেবে কী করে? অনেকেই আশংকা করছেন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে দূরে ভবিষ্যতে ফ্রান্স আবার সংকটের সম্মুখীন হবে।

এদিকে পশ্চিম জার্মানী মুদ্রা-মূল্য না বাড়িয়ে রপ্তানির উপর শুল্ক বাড়িয়েছে এবং আমদানির উপর কড়াকড়ি হ্রাস করেছে। পশ্চিম জার্মানী রপ্তানি শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ায় ভারত কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, ভারত পশ্চিম জার্মানী থেকে অনেক জিনিস আমদানি করে থাকে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় আর কাটছাঁট

পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য শতকরা পাঁচভাগ থেকে শতকরা সাড়ে চার ভাগ পর্যন্ত হ্রাস করেছেন। বর্তমান বছরে কৃষি-উৎপাদন আশানুরূপ না বাড়ায় কমিশন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারও শতকরা ৮

আপনার নখের উপর মনোহর চমক
ফুটিয়ে তুলতে
উৎকৃষ্ট ভাবে প্রস্তুত
স্টেপ নেল পালিশ
লাগান

৫৭টী আকর্ষণীয় রং থেকে পছন্দমত বেছে নিন!

ভাগে সীমিত রাখা। অর্থমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দেশের ভিতরেই আরও চার হাজার কোটি টাকার সম্পদ আহরণ করা সম্ভব নয়। অথচ, শ্রীদেশাই আরও ঘাটতি অর্থসংস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করার বিপক্ষে। অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিল আশাবাদী। তিনি এখনও চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকে পূর্ণরূপে দিতে বদ্ধপরিকর। অধ্যাপক গ্যাডগিল বাৎসরিক পরিকল্পনা-গুলিকে ঠিকভাবে রূপায়িত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যতদূর জানা গেছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাও অল্প একটু হ্রাস পাবে।

কলকাতার সমস্যা ও বিশ্বব্যাংকের সাহায্য

কলকাতার সমস্যা সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। স্বয়ং শ্রীম্যাকনামারা পর্যন্ত বলে গেছেন, এত সমস্যা নিয়ে কলকাতা শহর কিভাবে টিঁকে আছে এবং কলকাতার অধিবাসিগণ কিভাবে তা সহ্য করছেন সেটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। বৃহত্তর কলকাতার মেট্রোপলিটান সংস্থা কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য ৮০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প তৈরি করেছেন; আর্থিক সুরাহা হলে কলকাতা শহরের চেহারা পাল্টে যাবে। শ্রীম্যাকনামারা বলে গেছেন, এই প্রকল্প বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকল্প। কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ে; তা হচ্ছে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্পে শহরের পরিবহণ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অনেক কথা বলা হলেও ভূগর্ভস্থিত রেলপথের কথা বলা হয়নি। অথচ বোম্বাই শহরের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার ভূগর্ভস্থিত রেলপথের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন এবং রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তা মঞ্জুর করাও হয়ে গেছে। এদিকে কলকাতার চক্রবেড় রেলপথ হবে না ভূগর্ভস্থিত রেলপথ হবে তা নিয়ে এখনও বিতর্কের শেষ হয়নি। যতদূর জানি, কলকাতা মেট্রোপলিটান সংস্থা চক্র-বেড় রেলপথ স্থাপনের পক্ষপাতী এবং পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ভূগর্ভস্থিত রেলপথ স্থাপনের পক্ষপাতী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে নীরব। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় ভূগর্ভস্থিত রেলপথ স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপের সৃষ্টি করতে পারতেন তবে হয়ত কলকাতা শহরের অবস্থা পাল্টে যেত। শ্রীম্যাকনামারার মতে। কলকাতা হচ্ছে সমগ্র পূর্ব ভারতের প্রাণ কেন্দ্র। কলকাতা ধ্বংস হয়ে গেলে সমগ্র পূর্ব ভারতের আর্থিক বিপর্যয় অনিবার্য এবং তার প্রভাব পড়বে সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর। সুতরাং কলকাতাকে বাঁচাতেই হবে। শ্রীম্যাকনামারা নাকি বলেছেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পর কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা আর কেউ চালান নি; তিনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপরেও দোষারোপ করে বলেছেন যে ব্যবসায়িগণ এই শহরের উন্নয়নে বিশেষ কিছু করেন নি এবং এ ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়েছেন।

কলকাতার সমস্যা যে একটি জাতীয় সমস্যা এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সুষ্ঠু উন্নয়ন-গতি অব্যাহত রাখার জন্য যে এই শহরকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা উচিত, গঙ্গার উপর যে একটি দ্বিতীয় সেতু স্থাপন করা উচিত, বস্তীগুলির উচ্ছেদ করে বস্তীবাসীদের জন্য যে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত, বৃহত্তর কলকাতার সর্বত্র যে পানীয় জল সরবরাহ এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সুপরিচালিত হওয়া উচিত—এইগুলি যে কেন্দ্রীয় সরকার না বোঝেন তা নয়। তবে দিল্লী এবং বোম্বাই শহরের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় শাসকদের যতটা মাথা ব্যথা দেখা যায়, কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য সেই আগ্রহ একেবারে অনুপস্থিত। যদি বিশ্বব্যাংক কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য কিছুটা অর্থসাহায্য অনুমোদন করে, তবে তা বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমেই হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতা শহরের উন্নয়নের কাজে হাত দেবেন কী?

সুব্রত গুপ্ত

সাঁকো / গৌরকিশোর ঘোষ

সেই মুকুলের সঙ্গে আবার সুব্রতর দেখা হল, বাইশ বছর পরে, এবার, এই প্রথম সুব্রতরই বাড়িতে। এবার মুকুলই কিন্তু এসেছে, সুব্রতকে ডাকতে হয়নি।

কদিন থেকেই সুব্রত ভাবছিল, ব্যাপারটা মুকুল যখন জেনে গিয়েছে, তখন সে একবার আসবেই তার কাছে। তাই সে নিজেকে তৈরি করে রাখার চেষ্টা করছিল।

কাজল তোমার মেয়ের বয়িসি, সে ধরেই নিয়েছিল নাক ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে ঝড়ের বেগে তার বাড়িতে এই কথাটা মুখে করেই মুকুল ঢুকবে। তারপর বলবে, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে কাজলই হত তোমার মেয়ে। রাগে গরগর করবে মুকুল। হয়ত নাটকের নায়িকার মত উত্তেজিতভাবে এই ঘরে খানিকটা পায়চারিও করবে।

কাজলই তাকে আগে থেকে পাখি-পড়িয়ে রেখেছে। মা কিন্তু ফায়ার হয়ে যাবে। পরশু সন্ধ্যে বেলা এই চেয়ারটায়, এখন যেখানে বসে সুব্রত মুকুলের দিকে চেয়ে রয়েছে, প্রতি মুহূর্তেই ভাবছে এই বুঝি মুকুল ফাটল, কাজল তার গলা জড়িয়ে ধরে কোলে বসেছিল, বলেছিল আমি কিন্তু আজ রাতেই মাকে কথাটা বলে ফেলব। ঝুলিয়ে রাখার মানে হয় না। সুব্রতর গালে কাজলের কম বয়িসী নিঃশ্বাস ক্রমশই সুব্রতর মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করছিল। কাজল তারপর অনায়াসে এবং সুনিপুণ দক্ষতায় সুব্রতর গলায় তার দু বাহু

জড়িয়ে দিয়ে গভীর আশ্লেষে চুমু খেল. কম্মাস ধরেই থাচ্ছে। আর এরকম অবস্থায় প্রতিবারই কিছুক্ষণের মত সুব্রতর কাছে সব কিছু—তার প্রতি কলেজের গভরনিং বডির অবিচার, গণতান্ত্রিক কলেজ শিক্ষক সমিতির সদস্যদের খেয়োখেয়ি, কলকাতায় যানবাহনের দুর্বিষহতা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত জীবনের হীনম্মন্যতা, পাপবোধ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার অর্থহীন হয়ে ওঠে। কাজলকে তার যথাসর্বস্ব বলে মনে হয়। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে কাজলের দিকে চোখ পড়লে তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে ডাক ছেড়ে বলতে সাধ যায় আজকাল, ওই দ্যাখ, ওই কচি মেয়েটা, ওর নাম সঞ্জীবনী! ওকে না পেলে আমার জীবনই বৃথা।

সেই সন্ধ্যায় কাজল তার চুমুতে তার দেহের ঘ্রাণে সুব্রতকে যথেষ্ট বিচলিত করে তুলতে তুলতে বলেছিল, মাকে তোমার কথা বলে বলব আমি ঠিক করেছি তোমাকে বিয়ে করব।

সুব্রত বলেছিল, তোমার মা রাজি হবেন না।

কাজল বলেছিল, ওর গলা থেকে আদুরে ভাবটা এখনও যায়নি, জানি, ছেলে বয়সে

তুমি মার লাভার ছিলে তো, সহ্য করতে পারবে না। হেভি রেগে যাবে। ছুটে চলে আসবে তোমার বাড়ি, রাগবে, কাঁদবে, তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেবার অনেক চেষ্টা করবে। চাইকি—

কাজল হঠাৎ সবজান্তা-দুষ্টুমির হাসি ওর চোখে ওর ঠোঁটে টেনে এনে বলেছিল, তোমাকে গুণ করে পুরনো দিনের সম্পর্কেও টেনে নিয়ে যেতে পারে।

সুব্রত সরলভাবেই বলল, মুকুলের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্কই আমার গড়ে ওঠেনি। সে সুযোগ ও আমাকে কখনও দিয়েছে কিনা, আমার মনে পড়ে না। তবে তোমাকে মিথ্যে বলব না, তোমার মাকে আমি একদিন সত্যিই ভালবেসেছিলাম। তবে ও আমাকে ভালবেসেছিল কি না জানিনে।

কাজল বলেছিল, না। আমি ডেফিনিট। কেননা মা ভালবাসতেই জানে না। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। তখন না বাসলেও এখন ভালবাসার বন্যায় তোমাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবে। এ সব কায়দা তোমাদের জেনারেশনের মেয়েরা যা জানে, ক্লাস, তার কাছে আমরা সত্যিই শিশু। দেখো আবার তোমার মুণ্ডু না ঘুরে যায়।

বলেই কাজল সুব্রতকে জড়িয়ে ধরেছিল। ওর বুকে মুখ গুঁজে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিয়ে আবছা গলায় বলেছিল, আমি কিন্তু তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। টপ। তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে আমার আর কিছুই থাকবে না। আমি সুইসাইড করব। সেদিন অনেক ভালবাসা দিয়ে সুব্রতকে কাজলের মনের অবিশ্বাসকে মুছে ফেলতে হয়েছিল। তারপরই কাজল যা করল, একেবারে অবাক। বেশ-বাস ঠিকঠাক করে যাবার সময় হাসতে হাসতে বলে গেল, আজ কিন্তু সাবধান হইনি। ইচ্ছে করেই তোমাকে ফাঁসিয়ে গেলাম। এখন তুমি চাইলেও আর পালাতে পারবে না। এখন এক কাজ কর, এই ঘর থেকে চেয়ার টেবিল সব সরিয়ে জায়গা করে রাখ।

সুব্রত বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন?

কাজল তেমনি হাসতে হাসতে বলেছিল, বা রে, মা এসে দাপাদাপি করবে না। রেগে আঁচল খসিয়ে ফেলবে, এদিকে যাবে, ওদিকে যাবে। চেয়ার টেবিলে ঘর জোড়া থাকলে মা ফিলিংস দেখাবার জায়গা পাবে কোথায়। মা আবার তৃপ্তি মিত্রের খুব ফ্যান।

কিন্তু মুকুল ওসব কিচ্ছু করেনি। শান্তভাবে মর্যাদা বজায় রেখে কথাবার্তা বলেছে। বলছে।

এখন তুমি বেশ গুছিয়ে থাকতে শিখেছ ব্রত। আগে ঘরদোর কী নোংরা করেই না রাখতে। মনে পড়ে একবার আমি বেলি সুজাতা কলেজ থেকে ফেরার পথে তোমার ঘরে উঁকি দিয়েছিলাম, বিশ্রী বোটকা গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। কি অগোছালই না ছিলে তুমি! তখন আমি ঠিক ওই খুকির বয়সি—বেশ হাল্কা সুরে কথা বলছে মুকুল। মিটি মিটি হেসে লেখার টেবিল থেকে ফ্রেমে বাঁধানো কাজলের ক্লোজ-আপ মুখখানা তুলে নিল। হাসতে হাসতেই বললে, খুকির এই ফটোখানায় ওকে কেমন বড় বড় মনে হয়, তাই না!

সুব্রতর আড়ষ্ট ভাবটা কখন যে কেটে গিয়েছে সে টেরই পেল না। সহজ পরিহাসের ভঙ্গীতে সুব্রত জবাব দিল, হ্যাঁ, কে মা কে মেয়ে বোঝাই শক্ত।

ঠাট্টা করছ। মুকুল হাসল।

না, কমপ্লিমেনট। সুব্রত হাসল। সত্যিই তোমাকে দেখে অবাক হয়েছি মুকুল। তুমি একেবারে বই-এর ছবিটির মত আছ। যত বছর পরেই পাতা ওলটাই না কেন, সেই এক চেহারা।

মুকুল খুশি হল। আরে ওই তো হয়েছে জ্বালা। খুকি যত বড় হচ্ছে, ওর জন্যেই আর আমাকে মা বলে মানতে চাইছে না। ও আমাকে ওর সমবয়সী রাইভাল বলে মনে করে। তুমি হাসছ ব্রত। ফ্যাকট। ওর বাবার বংশের ছিট ওর মাথায় চেপেছে। জান, ও কথনোই ওর বাবার কলিগদের কাকা বলে না। নাম ধরে ডাকে। দু একজনের সঙ্গে ফ্লারট করার চেষ্টাও করেছে। ওর বাবার যে কি বিব্রত অবস্থা। আমি শুনে হেসেছি। ওর বাবাকে বলেছি, ওই পাগলটার জন্য তোমাকে অনর্থক দুশ্চিন্তা করতে হবে না। সময়ে ঠিক হয়ে যাবে।

ছবিটাকে আঁচল দিয়ে মুছে মুকুল আবার টেবিলের উপর ঠিক করে বসিয়ে রেখে দিলে। সুব্রত দেখল কাজলের দুষ্টুমিভরা স্থির হাসিটা তার দিকে উঁচিয়ে আছে।

জান ব্রত, শান্ত সহজ গলায় মুকুল বলল, খুকি ওর বাবাকে বিয়ে করতে পারছে না, সেই রাগে একবার দিন কতক নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই ও এমনি। ওর ধারণা ওর বাবা ভালবাসে বলেই আমাকে বিয়ে করেছে, আর যেহেতু ওর বাবা ওকে বিয়ে করছে না, অতএব ওকে ভালবাসে না। কি সুন্দর যুক্তি দেখ।

সুব্রত সশব্দে হেসে ফেলল এবার। মুকুলও ওর সঙ্গে গলা মেলাল। হাসতে হাসতে বললে, আমার উপর মেয়ের যে কী হিংসে, তোমার ধারণা নেই। এখন তোমায় কাঁধে ভর করেছে দেখছি, দেখো কি রকম জ্বালিয়ে খাবে।

তুমি ভেবো না মুকুল, ওকে আশ্বস্ত করার জন্য সুব্রত বলল, আমি তো ছেলে-মেয়ে চরিয়েই খাই, এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম, তোমার মেয়ের রোগ আমি সারিয়ে দেব।

মুকুল যেন এতক্ষণ ওকে দেখেইনি, এই যেন প্রথম দেখছে এবং দেখে অবাক হচ্ছে সেইভাবে বলল, ওমা তাইতো, একী, এত চুল পাকিয়ে ফেললে কি করে?

সুব্রত বলল, আমি পাকাতে যাব কেন, আমার বয়েসটাই পাকিয়ে দিচ্ছে।

শা ব্রত, মুকুল বলল, এটা তোমার বাড়াবাড়ি। তোমার ব্যাপারে তুমি কথনোই যত্ন নাও না। খুকির বাবা তো তোমারই কনটেমপরারি—

—দু বছরের বড়।

—তবে। কিন্তু ওকে দেখ, কে বলবে আটচল্লিশ। একটা চুলও পাকেনি। আর শরীরটা তো পাকা বাঁশের মত ফিট। কী পরিমাণ দৌড়ঝাঁপ এই গত বছর পর্যন্তও করেছে, যতদিন জেলায় ছিল। এখন সেকরেটারিয়েট-এ ঢুকেই বরং আলসে হয়ে উঠছে। তবু তার পাশে দাঁড়ালে তোমাকে সবাই তার দাদা বলেই ধরে নেবে।

জ্যাঠা মশাই বললেই বা আপত্তি করছে কে? তবে ব্যাপারটা কি জান, যেন টপ সিকরেট ফাঁস করে দিচ্ছে এমনই ভঙ্গী করে সুব্রত বলল, আমাদের লাইনে চুলে পাক না ধরলে ইজ্জৎ পাওয়া যায় না।

—তোমার সবই অদ্ভুত। কী হেঁয়ালি কী সত্যি বোঝা দায়।

—তাই কি আমাকে বিয়ে করতে সাহস পাওনি? কথাটা এমন দুম করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সুব্রত ভাবতে পারেনি। সে অপ্রস্তুত হল। মুকুলও অবাক। সে হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। গম্ভীর। কাজল শুধু দুষ্টু দুষ্টু হেসেই আছে।

সরি, সুব্রত বলল। কিছু মনে কর না। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে অভিনয় করলাম তো। বড্ড টায়ারড লাগছিল মুকুল। তাই স্ক্রপসীনটা ফেলে দিলাম। এস এবার আমরা যা তাই হয়ে যাই। যা বলতে এসেছ, সোজা করে বল। এস দাঁত নখ বের করে আঁচড়া আঁচড়ি কামড়া কামড়ি করি, নয়ত চুপ করে বসে বসে বিশ্রাম নিই। এই ন্যাকামি আর ভাল লাগছে না।

হঠাৎ সুব্রতর স্নায়ুগুলো এমন টনটনিয়ে উঠছে কেন? কেনই বা মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে উঠল বোঝা মুশকিল। মুকুলের সযত্নে তৈরি করা ছিমছাম গালে টেনে এক চড় মেরে দেখার ইচ্ছে হল, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়, না কি ওকে রেপ করবে? রেপ! মুকুলকে!

পরক্ষণেই তার মনে হল, কি আজগুবি চিন্তা! আর একথা মনে হতেই তার গলায় শান্ত হয়ে এল। সুব্রত হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল।

ঠাট্টা করছিলে ব্রত, না? মুকুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচল। আমি, আমি কিন্তু সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কত সহজে মুকুল আবার সহজ হয়ে উঠল! অবাক হল সুব্রত। একটু আগেই তো মুকুলের ওই পরিপাটি মুখখানার পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছিল, চোখ দুটোয় আতঙ্ক, আর এখন নিমেষের মধ্যেই দেখ সব কেমন আগের মত টলটল করছে। যাই বল কাজলের কথা কেমন যেন মিলছে না। বরং উল্টো। সুব্রতর মনে হল, এ মুকুলের চেয়ে আগের মুকুল অনেক বেশি স্মার্ট ছিল, অনেক অনেক চালাক। কিম্বা আগে তা ছিল কি না কে জানে। এতদিনকার পিছনের কথা তার কিছুই মনে নেই। হয়ত এই রকমই বোকাসোকা ছিল, মাজাঘষা দেহটা আর পরিপাটি পোষাক দিয়ে ঢেকে রাখত তার বোকামো। যাই হোক কাজল যে কুচক্রী মুকুলের চেহারা কদিন ধরে সুব্রতর কাছে এঁকে গেছে তার সঙ্গে আজকের এই এখনকার মুকুলের বিশেষ মিল সে খুঁজে পাচ্ছে না। মুকুলকে তার যেমন আগের মত পরিচিত লাগছে না, আবার অপরিচিত বলেও মনে হচ্ছে না। আবার মুকুলকে সে যে বাইশ বছর পরে দেখছে তাও মনে হচ্ছে না। মুকুল যেন আরও অনেক-বার এসেছে এখানে। এই চেয়ারটাতেই বসেছে। বিস্তর ব্যাপারে কথাবার্তা বলে গিয়েছে। এই ধরনের একটা ধারণা সুব্রতর মনে গড়ে উঠেছিল যেমন, তেমনি একেবারে ঠিক বাইশ বছর আগে যখন তারা অন্তরঙ্গ ছিল সেই সময়কার একটা দৃশ্যও সে চেষ্টা করে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারল না। কোনও ক্ষত যদি কোনকালে হয়েও থাকে আজ তার চিহ্ন নেই।

তোমাদের আমলের মেয়েরা ভালবেসে আমাদের মত রিস্ক নিত? ইস্! কাজল ঠোঁট উল্টে পা দুটো দোলাতে দোলাতে একদিন জ্ঞান দিয়েছিল। আর সুব্রত ইউনিভার্সিটির খাতা দেখবে বলে ঘরময় গ্লাস পাওয়ারের রিডিং গ্লাসটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

—তোমাদের আমলের মেয়েরা কী রিসক নেয়?

কাজল উঠে এসে ওর সামনে দাঁড়াল। তারপর সুব্রতর মুখটা নুইয়ে এনে একটা চুমু খেয়ে আবার গিয়ে চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগল। বেজায় একটা উত্তেজনার তোলপাড় সেদিন ঘটেছিল সুব্রতর দেহে। ধাক্কা সামলাবার জন্য ঠাট্টা করার চেষ্টা করল, ব্যস, এই তোমাদের রিসক?

গম্ভীর হয়ে কাজল বলল, যাকে আমরা ভালবাসি তার জন্য আমরা এমন সব কাজ করতে পারি, অবিশ্যি সেও যদি আমাকে ভালবাসে তবে, যা শুনলে তোমাদের দাঁত কপাটি লাগবে। জান, একবার আমি এক কবির প্রেমে পড়েছিলাম, আমারই বয়িসি। বেশ শক্ত সমর্থ গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারা। মুখে এক ঝাড় দাড়ি। তার জন্য কি না করেছি! আমাকে কত রকম করেই না পরীক্ষা করেছিল। একবার ওর বাউণ্ডুলে বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে তারাপী নিয়ে গেল। নিজেরা খেনো খাচ্ছিল। আমাকে চ্যালেনজ করলে, খেতে পার এ জিনিস? যদিও ওসব বস্তু বাপের জন্মে খাইনি, টব করে একটা ভাঁড় নিয়ে গলায় ঢেলে দিলাম। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেদিন মদ খেয়েছিলাম। এক সময় বমি করলাম খুব। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। শুনে

অবাক হবে, ওই অতগুলো দামড়া দামড়া ছোঁড়ার সঙ্গে এক সাথেই একঘরে রাত কাটালাম, তা না আমার প্রেমিক কবি না তার বন্ধুরা আমাকে পায়ের নখ দিয়েও একবার ছুঁয়ে দেখল না। আরও কয়েকবার ওদের সঙ্গে ঘুরেছি। আমাকে একদিন নিমতলার শ্মশানে নিয়ে গেল। ওরা সব গাঁজা খেতে বসল। হঠাৎ লাভার-পোয়েট বললে, একটান গাঁজা খাও তো দেখি। খেলুম। একবার ওদের দঙ্গলের সঙ্গে চাঁদের আলোয় সমুদ্র স্নান করব বলে দীঘায় গিয়েছিলাম। আমার লাভারের কথায় সম্পূর্ণ ন্যাড় হয়ে ফটফটে জ্যোৎস্নায় সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলাম। কিন্তু ওরা কেউ আর আনডারওয়ার খসাতে সাহস পেল না। এমনি সব হীরো! গোল হয়ে চড়ায় বসে গাঁজার সিগারেট ধরিয়ে খেতে লাগল। সেইদিনই বুঝলাম, ওরা না-মানুষ। ওদের কিছু নেই। ওরা কিছু না। আমি সেই লাভার-পোয়েটকে বললাম, দ্যাখ আমি দু-মাথা-ওয়ালা শিশু কি ছ-পেয়ে গরু বা ওই জাতীয় কোন আজগুবি চীজ নই যে আমাকে মেলায় মেলায় দেখিয়ে বেড়াবে। আমি নিতান্তই একটা মেয়ে। ভালবাসার ভিখারী। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার ভালবাসা চাই। ভালবাসার খাতিরেই কি আমি তোমার কাছ থেকে মেয়ে বলে একটু সম্ভ্রম পেতে পারিনে? গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে সে বলেছিল, আমার কাছে গাছ পাহাড় নদী নারী সব এক। ভাবতে পার, যে এত সুন্দর এক দার্শনিক কথা ঝেড়ে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, দু বছর বাদে সেই ব্যাটাই ছেলের অন্নপ্রাশনে বাড়ির দরজায় রসনচৌকি বসিয়েছিল। এই হচ্ছে আমাদের জেনারেশনের ছেলে। তাই আমি আর ওদের ছায়া মাড়াইনে।

তারপর কাজল যেন স্বপ্নের ঘোরে সুব্রতকে দেখছে এমনিভাবে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকেছিল। তারপর গাঢ়স্বরে বলেছিল, তুমিই প্রথম আমাকে প্রেমিকার সম্ভ্রম দিলে সুব্রত। এর আগে কেউ আমাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। আমি যে মেয়ে, আমার শরীরে মনে যে বিশেষ সব লক্ষণ আছে যা দিয়ে লোককে কাছে টানা যায়, আপন হওয়া যায়, তোমাকে কাছে পাবার পর আমি তা টের পেয়েছি। আচ্ছা সুব্রত, আমার ভালবাসা যে গভীর, তা যে খেলা নয়, তোমার প্রতি তা যে অবিচল, তা কি তোমাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছি?

সুব্রত কাজলের আন্তরিকতাতে সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কাজল আবেগভরে বলে গিয়েছিল, তুমি যদি যাচাই করে নিতে চাও, কর না? আমাকে একটা কিছু করতে বল না, যা তোমার খুশি।

এই আবেদনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সুব্রত। অস্থিরতা জেগেছিল তার মনে। দেহটা কেমন যেন থর থর করছিল। গাঢ়, ক্রমেই গাঢ়তর হয়ে আসছিল কাজলের কথার স্বর, চোখ দুটো যথেষ্ট উজ্জ্বল। সুব্রতর হাত দুটো ধরে কাতরভাবে 'বল না, একটা কিছু চাও প্লীজ, তোমার পায়ে পড়ি' বলতে বলতে কাজল যেন দুনিয়া টলিয়ে দিল। সেদিন, অনেক অনেক বছর পরে সুব্রতর শরীরটা যুবকের মত ঝরঝরে হয়ে উঠেছিল। কাজল চলে যাবার পরও তার রেশ ছিল। চান করতে করতে সে গুনগুন গান করেছিল। ভাবা যায় না, এই বয়সেও এমন একটা দামী মুহূর্ত আসতে পারে।

ওর প্রথম যৌবনে অনুরূপ কোন অনুভূতি এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল কিনা, মনে পড়ল না। মুকুলকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। এভাবে সে কোনদিনই সুব্রতকে প্রশ্রয় দেয়নি। ওদের সময়ে একা ঘরে মুকুলের সঙ্গে কখনই দেখা হয়নি সুব্রতর। একবার এক বিয়ে বাড়িতে মুকুলকে ফাঁক পেয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। এক মুহূর্ত। ঝটকা মেরে পালিয়ে গিয়েছিল মুকুল। দুদিন পর তার কাছ থেকে পাওয়া কবিত্বময় চিঠির উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল সুব্রত। ওদের যা কিছু প্রেম তা চিঠিতেই শুরু, চিঠিতেই শেষ। তখন তারই বা কি গরম!

—খুকির মুখে তোমার কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম ব্রত। আমি ভাবতেই পারিনি—

—তার আগে আমার কথা তোমার মনে পড়েনি কখনও?

সুব্রতর এই হঠাৎ তীক্ষ্ণতায় থমকে গেল মুকুল। সে হাসল। একটু ভাবল যেন।

—প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হত। তারপর কবে যেন সব চাপা পড়ে গেল। বিয়ে হতে না হতেই খুকি পেটে এল। জান না তো মেয়েরা কত পরাধীন। ডেলিভারির সময় মরমর হয়ে গিয়েছিলাম। তাই তো আর ঝঞ্ঝাট বাধাইনি। ওর আর শাশুড়ির অবিশ্যি একটা ছেলের সখ ছিল। আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম, তাহলে ছেলের আরেকটা বিয়ে দিন। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের যা বাহার দেখছি তাতে ঘেন্না ধরে গেছে ব্রত। একটু থামল, একটু ভাবল মুকুল। এবারে হাসল একটু অপরাধীর মত। সত্যিই ব্রত, মাঝখানে তোমাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন ভাবছি, কি করে এটা সম্ভব হল। অথচ দ্যাখ, তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা তো
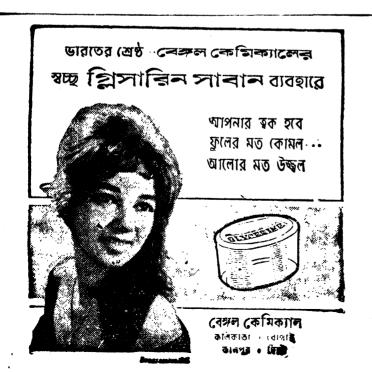
হতেও পারত। তুমি যদি অভিমান করে না পালাতে, কি আমি যদি সাহস করে জিদ ধরতাম, তাহলে আমার বাবা-মা হয়ত মত বদলাতেন। কি হত জানিনে। সেই তোমাকেই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য মানুষের জীবন। আচ্ছা ব্রত, আমার কথা তো বললাম, এখন তোমার কথা শুনি। হয়ত আমার পক্ষে এই প্রশ্নটা করা অশোভন হচ্ছে, হয়ত একটু অহমিকাও জড়িয়ে থাকতে পারে, তবু জিজ্ঞেস না করে পারছি নে, এই যে তুমি এতদিন একা একা কাটিয়ে দিলে, বিয়ে থা করলে না, সে কি আমার জন্যে?

সুব্রত দেখল মুকুল উজ্জ্বল কৌতূহলে তার দিকে চেয়ে আছে।

সুব্রত বলল, না। দেখল সঙ্গে সঙ্গে মুকুলের বুক ঠেলে একটা হতাশার শ্বাস বেরিয়ে এল। একটু ম্লান তবুও মুকুল হাসছে।

সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে বলল, হয়ত তাই।

মুকুল এবার নির্মল হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বলল, এই ভাল ব্রত, কেন যে আজ আমরা এত সত্য কথা বলার জন্য মরীয়া হয়ে উঠলাম ভেবে পাচ্ছিনে।

সুব্রত কোমল স্বরে বলল, আসল ব্যাপারটা কি জান, এতদিন পরে এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই যাই আমরা বলি, সেটা বানিয়েই বলতে হয়। নয় কি?

একটা টানা নিশ্বাস ফেলে মুকুল খুব মৃদু প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, তাই। ঠিকই বলেছ।

সুব্রতর মনে হল চশমাটা পরে নিলে হত, চালশে-ধরা চোখে মুকুলকে হয়ত ভুল দেখছে। না কি মুকুলের চোখে সত্যিই বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

—আগে, সেই ছেলেমানুষির কালে তোমাকে কি ভাবতাম আজ এতদিন পরে সত্যিই মনে নেই। মুকুলকে কথায় পেয়েছে। এই এতদিন—কতদিন হবে ব্রত, বছর কুড়ি? না তারও বেশি?—তুমি আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়েই গিয়েছিলে। খুকিই তোমাকে খুঁজে বের করল। আবার তোমার দেখা পেলাম। কি রকম আশ্চর্য ব্যাপার। খুকি যেন সাঁকো। তাই না ব্রত, মুকুল একটু থামল। বলল, তোমার কথা মনে পড়েনি, একেবারেই মনে পড়েনি তা নয়, তবে মিস্ করা বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু বোধ করিনি, এটাও সত্যি। তোমাকে যদি পেতাম, যদি বিয়েই করতাম, তাহলেই যে সুখী হতাম, একথাও হাকিমের বউ হয়ে হলপ খেয়ে বলতে পারব না। বক বক করে তোমার কানের পোকা নাড়িয়ে দিচ্ছি না তো ব্রত?

সুব্রত হাসল।

—তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ?

—না না, সুব্রত সশব্যস্তে বলে উঠল। আমার ভাল লাগছে শুনতে। সত্যিই ভাল লাগছে। আর তোমাকে তোমাকেও ভাল লাগছে। সুব্রত সত্যি কথাই বলল। কাজল, সরি, ছবিটার দিকে আড়চোখে চেয়ে সুব্রত এই কথাই বলতে চাইল, তোমার মাকে খারাপ লাগছে না। ওর কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। আমার এই দুর্বলতা তুমি ক্ষমা করো। তারপর নিতান্ত পরাস্ত হয়েই সুব্রত যেন নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দিল।

মুকুল বলল, কি জানি কেন বলছি এসব। তবে বলে আমার খুব ভাল লাগছে। বিশ্বাস কর, তোমার এখানে এসে এই যে যতক্ষণ ধরে বকবক করছি ততক্ষণই ঝুড়িভরা বয়েসের ভারটা মাথা থেকে নামিয়ে রাখতে পারছি, দারুণ গ্রীষ্মে বাসনউলিরা দরজার ছায়ায় বসে যেমন জিরিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি। হ্যাঁ যা বলছিলাম, বিয়ে হলেই যে সুখী হতাম তা জোর করে কি বলতে পারি আমরা। পার তুমি ব্রত?

সুব্রত আবার হাসল। বলল, সত্যিই বলা মুশকিল।

—আবার দ্যাখ, এতদিন আমরা কেউ কারও খোঁজ খবরটা পর্যন্ত নিইনি। দুজনকে ছাড়া আমাদের দুজনেরই এতগুলো দিন তো দিব্যি চলে গেল। একদিনের জন্যও তো আটকাল না। তাই যদি হবে ব্রত, তবে আজ এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র মনের ভিতর কিছু যে একটা হারিয়েছি তার জন্য একটা ক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কেন? কেন টাটকা একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে?

—কাজল, কাজল, সুব্রত মনে মনে আর্তস্বরে ডাকতে লাগল।

—এমন যে হবে, বুকটা এমনভাবে যে টনটনিয়ে উঠবে, তোমার ঘরে ঢোকার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত আমি তা বু পারিনি ব্রত।

মুকুলের গলা ক্রমশ ভারি হয়ে আ সঙ্গে ওর চোখমুখ থমথমে হয়ে এ চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা গ পড়ল। টেবিলে হাতের উপর মাথা রে একেবারে বাইশ বছর আগের মুকুল ফুঁপি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সুব্রত অ চেষ্টা করল নিজেকে তফাতে ধরে রাখ কিন্তু ঘরের হঠাৎ স্তব্ধতা, মুকু ফোঁপানি, ওর কেঁপে কেঁপে ওঠা দেহ, সব একযোগে চক্রান্ত করে ওকে একাকি

মরুভূমিতে যেন নির্বাসনে ঠেলে দিল। সুব্রত ভয় পেল। এই ভয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই ও কিছুমাত্র না ভেবে মুকুলকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এগিয়ে গেল। বলতে চাইল, ছিঃ মুকুল, কেঁদো না।

আমাদের এখন বয়েস হয়েছে। প্রকাশ্যে আমাদের দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করা আর সাজে না। এখন যদি তোমার মেয়ে আসে, দ্যাখে, হাসবে, না ছেলেমানুষি ভাববে না, ভাববে এটা অভিনয়। ভাববে ন্যাকামি। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার জান কি মুকুল, বয়সের একটা সীমা পার হয়ে এলে কী হারিয়েছি আর কী পেয়েছি, তার হিসেবটা ঠিক মিলতে চায় না। তখন গোঁজামিল দিয়েই জীবনকে বুঝ দিতে হয়। তবে আর কিসের আফশোষ? সুব্রত নিজের মনের সঙ্গে এই ধরনের বাক্যালাপ করে কিছুটা সুস্থ বোধ করল। সুব্রতর হাত মুকুলের মাথায় ঠেকবামাত্র মুকুল সুব্রতকে জড়িয়ে ধরে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলে উঠল, এই প্রথম আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেল ব্রত। আমি আমি আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। বিশ্বাস কর।

কাজল দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে ঠোঁট উলটে এক একটা কথা পরিষ্কারভাবে ছুড়ে দিতে লাগল, একে আমরা বলি, এ ডগ ইন দি মেনজার।

ঘরে যেন বোমা পড়েছে, মুকুল এমনিভাবে লাফিয়ে উঠল। সরে গেল সুব্রতর কাছ থেকে। সমস্ত মুখটা অকস্মাৎ শাদা হয়ে উঠল।

—সরে গেলে কেন মা? চোরের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? গো এহেড্। ভালবাসায় অন্যায় কিছু নেই, পাপ ভণ্ডামিতে।

তুমি যদি সুব্রতকে ভালবাস তবে তার প্রমাণ দাও, প্রকাশ্য প্রমাণ। যদি ওকে ভাল না বাস, আর বেচারাকে দগ্ধেযো না, কেটে পড়ো, ও যথেষ্ট সাফার করেছে। এখন ওকে একটু সুখী হতে দাও।

মুকুল কাতরভাবে বলল, খুকি—

—ওসব খুকি ফুকি রাখ। কবে যে খুকির ফুল ঝরেছে, সে খবর তুমি আমার থেকে ভাল জান।

কাজলের লবজ শুনে মুকুলের কিন্তু কিন্তু ভাবটা সেই মুহূর্তেই কেটে গেল। নাক ঠোঁট রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সুব্রত দেখল এতক্ষণে কাজলের বর্ণনা মিলল। কাজলের গালে ঠাস করে এক চড় মেরে মুকুল সুব্রতকে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওর এক গাদা সব গাঁজা ভাঙ খাওয়া বন্ধু আছে, হিপি না বীট, এসব অসভ্যতা শিক্ষা তাদের কাছ থেকে। কাজল একটুও রাগল না। শান্ত গলায় বলল, এত উত্তেজিত অবস্থায় একা বাড়ি যেতে পারবে না আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

মুকুল তখনও ফুঁসছে। তুই যে কথায় কথায় আমাকে অপমান করিস, তোর বিবেকে বাধে না। আমি তো তোর মা।

—তুমি এখন রেগে আছ, কাজল সহজভাবেই বলল, তাই বুঝতে পারছ না। বিবেকে বাধে এমন কথা কোনদিনই তোমাকে বলিনি। আজও না। আর মান সম্মানের কথা বলছ, মান সম্মান ভালবাসা এসব তো টু-ওয়ে ট্রাফিক মা জান তো এক হাতে তালি বাজে না।

—আমি তোকে ভালবাসিনে, এ ধারণা তোর ভুল। মুকুল যেন সুব্রতকে সাক্ষী মানছে। জান ব্রত এই ওর এক অবসেশন।

—ন্যাকামি করো না। এই প্রথম কাজলের স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পেল। সুব্রত জানে তুমি কোন ধাতুতে গড়া। ওকে আর বিব্রত করতে হবে না। তুমি সুব্রতকে না, বাবাকে না, আমাকে না, কাউকেই ভালবাসনি। ভালবাসতে জানোই না তুমি। তোমার শরীরে আমার বা সুব্রতর ভালবাসার কোন দাগ আছে? কোনও সীল-মোহর দেখাতে পার তুমি? ভালবাসা। গা বাঁচিয়ে ভালবাসা যায় না, ভালবাসতে হলে গা ভাসিয়ে দিতে হয়।

আশ্চর্য, মুকুল আর রাগতে পারছে না। এ কাজল কোন কাজল? এ রকম অবাক করা কথা কার মুখ থেকে সে শুনছে? তার মেয়ের? কার কাছ থেকে এ ধরণের কথা শিখল? সুব্রতর কাছ থেকে? সে অবাক চোখে একবার সুব্রত আর একবার কাজলের দিকে চাইল। দেখল রীতিমত বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুব্রত। কি করবে সে, ব্যাপারটাকে গড়াতে দেবে, না তাদের

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, সেই সিদ্ধান্তে সুব্রত পৌঁছতে পারছে না। তাই মুখ নিচু করে নখ খুটছে। হ্যাঁ, এই চেহারা মুকুলের পরিচিত। এই দ্বিধা ব্যাধিতে মুকুল নিজেও আক্রান্ত। তাই এই ব্যাধি-গ্রস্তদের সে ভালই চেনে। সুব্রতকে তার এখন অনেক কাছের লোক বলেই মনে হল। কিন্তু ওই মেয়েটি কে? সংশয় শূন্য ধারণার শক্ত মাটিতে যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যার বক্তব্যে বা স্বরে কোন জড়তা নেই, আছে নির্লজ্জ স্পষ্টতা, সে মুকুলের মেয়ে? খুকি? ও কাজল তার তো আদৌ পরিচিত নয়।

—তোমার বুকের শেপ নষ্ট হয়ে যাবে, তাই কখনোই তুমি আমাকে বুকের দুধ খেতে দাওনি। আয়া-মা লুকিয়ে চুরিয়ে আমার বুকের দুধ খাবার সাধ মিটিয়েছে। নয়তো বীজাণুমুক্ত বোতলের নিপ্‌ল্ চুষেই আমার জন্ম কাবার হত। মুকুলের কান এখন এত সজাগ যে একটা কথাও ফসকাচ্ছে না। পাছে আবার ছেলেপুলে হলে তোমার পেট মোটা হয়ে যায় তাই বাবাকে আর কাছেই ঘেঁষতে দাওনি। পাছে অসচ্ছলতার মধ্যে পড়ে তোমার দুধে ভাতে গড়া ওই ননীর শরীর ধসকে যায়, তাই সুব্রতকে বিয়ে করতে সাহস পাওনি। তবু তুমি বলবে যে তুমি ভালবাস? ভালবাসা কি ফিকসড ডিপোজিটের টাকা যে জমা করে রাখলেই সুদ ধরে আসে? বল, জবাব দাও?

মুকুল বিপন্ন হয়ে সুব্রতর দিকে চাইল। কোন সাহায্য সেদিক থেকে এল না।

কাজলের উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল। আবার সেই নিরুত্তাপ স্পষ্ট বক্তব্য শোনা গেল, তোমরা মা আসলে কেরিয়ারিস্ট ছিলে। ভালবাসার টোপ গেঁথে ছিপটি ফেলে বসে থাকতে মনের মত মাছটিকে খেলিয়ে তোলবার অপেক্ষায়। আমার কাছে ভালবাসা লাইফ অর ডেথ।

এও তো তোমার একদিক থেকেই দেখা কাজল। নিতান্তই ছেলেমানুষি সিদ্ধান্ত। সুব্রত দেখল এ আবার সেই আগেকার মুকুল। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ধাক্কা সামলে আবার উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক যেমন মর্যাদা নিয়ে তার ঘরে এসে ঢুকেছিল, আবার সেই চেহারায় ফিরে গিয়েছে।

কথা যখন তুললেই, শান্তভাবে মুকুল বলল, তখন তার উত্তর একটা দেওয়া দরকার। তুমি যে-সব অভিযোগ তুলেছ, তার খানিকটা সত্যি, সবটা নয়।

আমার প্রত্যেকটা অভিযোগ সত্যি। কাজল এতক্ষণে ঝগড়া শুরু করল।

জগতে কোনও অভিযোগই যে পুরো সত্যি নয়, হতে পারে না, এ কথা জানতে জীবনের অনেকগুলো বছর উৎসর্গ করতে হয়। ফাঁকি দিয়ে বোঝা যায় না।

মুকুলকে আমার যথেষ্ট বোকা মনে হয়েছিল কেন? সুব্রত নিজেকে ধিক্কার দিল।

তুমি আমাকে আত্মসর্বস্ব কেরিয়ারিস্ট বললে কাজল? তুমি তো আমাকে এতদিন ধরে দেখছ, আমার সংসার ছাড়া আমি আর আমার কোন কাজে লেগেছি?

তুমি যে বাবার বসেদের সঙ্গে দিল্লি সিমলে ফ্লার্ট করে বেড়িয়েছ, সেটা সংসারের কোন কাজে লেগেছে? কেউটের মত ছোবল মেরে কাজল শ্লেষ ঢেলে দিল।

সুব্রত দেখল ব্যথায় মুকুলের মুখখানা জর্জরিত হয়ে উঠল।

সুব্রত বলল, আমি বলি কি, এসব আলোচনা এখন থাক।

মুকুল অপ্রস্তুত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ঠিক ঠিক এসব অপ্রিয় কথা, তেতো বিষ, এ সব ব্রতর সামনে আলোচনা করাটা উচিত হচ্ছে না।

কাজল হিস হিস করে উঠল, সুব্রত তোমাকে ঠিক সময়েই প্রোটেকশন দিয়েছে মা ওর আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তুমি পালাতে চাও পালাও। আমি সত্যের সামনে, তা সে তেতো হোক, বিষ হোক, দাঁড়াতে ভয় পাইনে। আমার শুধু আফশোষ হচ্ছে তোমার আজকের এই প্রাণপাত পরিশ্রমটাই বৃথা গেল। তোমাকে তো আমি চিনি, তাই সুব্রতকে তোমার মুভমেন্ট সম্পর্কে—

এতক্ষণে সুব্রত কাজলকে বাধা দিল, কাজল, ব্যস, আর না, এবার চুপ কর।

কেন ভয় কিসের সুব্রত? কাজল জেদি মেয়ের মত গোঁ ধরেছে। আমি সেদিন মার সম্পর্কে যা যা বলে গিয়েছিলাম, কি মেলেনি সে সব। বল, বল?

—কাজল, ছিঃ! সুব্রত এবার রেগে ধমক দিল।

ততক্ষণে মুকুলের চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। গলায় উৎকণ্ঠা এবং আতঙ্ক ফুটিয়ে মুকুল জিজ্ঞাসা করল, কী কী বলেছে ব্রত? খুকি আমার নামে তোমাকে কী বলেছে?

সুব্রত তো বলবে না, আমিই বলি মা। বলেছি, আমি তোমাকে বিয়ে করব, এ কথা মাকে জানালেই মা তোমার কাছে ছুটে আসবে। তারপর দেখবে, অভিনয় কাকে বলে! মেলেনি সুব্রত?

অভিনয়! মুকুলের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। কিন্তু আমি তো অভিনয় করিনি ব্রত। আমি তোমাকে আঘাত হয়ত দিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু সে তো অতীত, তোমার আমার দুজনের কাছেই তো তা ধুয়ে মুছে গিয়েছে। আমাদের দুজনের হিশেবই তো এক কথা বলল, তাই না ব্রত। আমরা তো কেউই তার জের টানতে চাইনি। বিশ্বাস কর ব্রত, আজ আমি নিজের থেকেই এসেছিলাম। হঠাৎ আজই

কেন এলাম এতদিন বাদে, আমি তার কোনও কারণ দেখাতে পারব না। তুমি খুকিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, ও আমাকে তোমাদের বিয়ের কথা জানিয়েছে কি না।

কাজল বলল, বারটা পর্যন্ত জেগে ছিলাম, তখনও পর্যন্ত ফিরলে না। তার পরদিন দুপুর পর্যন্ত ঘুমুলে, বলবার সময় পেলাম কখন?

ক্লান্ত স্বরে মুকুল বলল, হ্যাঁ পার্টি থেকে ফিরতে রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল। তোমার বাবা ফরেন সারভিসে যাচ্ছেন, তাই তাঁর অনারে মজুমদার পার্টি দিয়েছিলেন।

মজুমদার বাবার অনারেও পার্টি দেন, কাজল হাসল, আমার তো ধারণা মজুমদার তোমার জন্যই পার্টি দেয়।

—কাজল, সব জিনিসই ব্যংগ করা সোজা, মুকুল নিরুত্তাপ গলায় বলল, কিন্তু ভুলে যেও না, ফরেন সারভিসে প্রোমোশন তোমার বাবাই পেয়েছেন, আমি পাইনি। তোমার বাবার সারভিস জীবনের এটা ছিল দীর্ঘদিনের আকাংক্ষা। তার সারভিস রেকরডে স্ট্রিকচার ছিল। এটা প্রায় অসাধ্য সাধনই করে দিয়েছে মজুমদার। আর সেই মজুমদারকে তুষ্ট রাখার জন্য যখনই দরকার পড়েছে এই কেয়ারিকরা ননীর শরীরটা তার কাছে পাঠাতে হয়েছে। আর মজুমদার তো শেষ ধাপ। আমাদের বাইশ বছরের সংসারে তোমার বাবার মত খামখেয়ালি অফিসারের সারভিস রেকরড সংশোধন করতে মজুমদারের মত আরও অনেকেই এসেছে। কাজল, যে সত্য সংসারের মধ্যে, জীবনের মধ্যে মিশে থাকে তাকে নীলামদারের মত প্রকাশ্যে সত্য সত্য বলে হাঁক মারলেই দেখা যায় না। প্রতি দিনের জীবন যাপনের গ্লানিতে, অন্তরের দহনে, দেহের যন্ত্রণায়, বিবেকের দংশনে সে নিঃশব্দে এসেই ধরা দেয়।

কাজল এ জিনিস আগে আশা করেনি। মাকে তার বরাবর মনে হয়েছে লক্ষীরাণী। ওই মজুমদারকে কম নাচিয়েছে না কি মা। এখন সুব্রতর সামনে তার সাফাই গাইছে। সুব্রতর চোখে জোয়ান অব আরক সাজতে চাইছে।

—তুমি কি করতে কাজল? যাকে তুমি ভালবাস তার উন্নতির সিঁড়ি তৈরী করার জন্য নিজেকে টুকরো টুকরো করে ভেংগে দিতে না?

—তার মানে তুমি বলতে চাও যা ঢলাঢলি করেছ সব বাবার উন্নতির জন্য। বাবাকে তুমি ভালবাস এ কথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পার? কাজল আরও জোরে ঠোক্কর মারতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখল, আর তেমন পারছে না।

মুকুল বলল, কি করে বলি। জানি নে তো, তুমি কাকে ভালবাসা বল। এত বছরের ঘরকন্নায় ভালবাসার চেহারাও তো সব সময় এক রকম থাকে না। সুব্রতর সংগে যে ভালবাসা হয়েছিল, তার চেহারা এক রকম ছিল। তোমার বাবার সংগে বিয়ে হবার কয়েক মাসের মধ্যেই তোমার বাবার সংগে যে ভালবাসা হল তার চেহারা আবার আর এক রকম। প্রথম যুগের সে উম্মাদনার আমাজ আস্বাদ আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। আমাদের জীবন যদি সেই আমাদের বিয়ের পরের প্রথম দু তিন মাসের মধ্যেই থেমে থাকত তাহলে আজ বুকে হাত দিয়ে নিশ্চয়ই বলতে পারতাম, তোমার বাবাকে ভালবেসেছি তাই নয়, পৃথিবীতে কেউ আমার মত কাউকে ভালবাসেনি।

—বাঃ, কাজল বলল, একেবারে বানের জল। এলও হুড়হুড় করে, আবার গেলও হুড়হুড় করে। দুদিনেই সব চুকেবুকে গেল!

—বানের জল হুড়হুড় করেই আসে কাজল, কিন্তু হুড়হুড় করে যায় না।
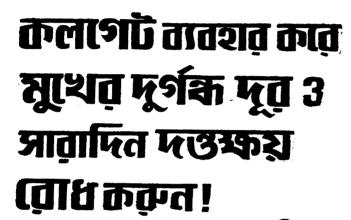
ছড়িয়ে পড়ে, মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। কতক নষ্ট হয়, বাকিটা রূপ বদলে ফসলের মধ্যেই বাসা বাঁধে। ভালবাসাও যাকে উপলক্ষ্য করে, যে রূপ ধরে প্রথমে আসে, সেই আধারেই চিরকাল থাকে না, সেই রূপেও না। জীবনের মধ্যে সংসারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তা নানান বেশে ফুটে ওঠে। তাকে চেনা চাই, কাজল। আর তা চিনতে গেলে দায়িত্ব নিতে হয়, কর্তব্য তা যতই তেতো হোক, বিষ হোক, করে যেতেই হয়। থামলে চলে না।

কাজলের মুখচোখের ভাব দেখে সুব্রতর মনে হল, এবার আর আত্মরক্ষার ফিকির খোঁজা ছাড়া কোনও গতি নেই। কাজল বিব্রত বোধ করছে, পিছিয়ে পড়ছে দেখে সুব্রত উল্লসিত না হয়ে পারছে না। তারুণ্যের জোয়ারে ভাসা এই কচি খুকিটার শরীরে আর মনে একমাত্র দুর্বার বেগই সম্বল। ও বিচার করতে পারে না, মনগড়া ধারণার এক জগৎ সৃষ্টি করে তার সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকতে চায়। যা বিশ্বাস করে তা আঁকড়ে থাকার জন্য সততার তরোয়াল উঁচিয়ে সর্বদাই লম্ফঝম্ফ করছে। কাউকে বুঝতে চেষ্টা করার চেয়ে তার সম্পর্কে রায় দিতেই তার সমধিক উৎসাহ। এ মেয়ে তার গোত্রের নয়। মুকুলকে আমি অনেক ভাল বুঝি। ও আমার আপন জাত। নিজেকে সুব্রত ফিসফিস করে শোনাল।

—আমিই কি ভেবেছিলাম, বিশ বছর আগে যে-সব কাজ শুরু করেছিলাম তার পরিণাম আজ এই দাঁড়াবে। মুকুল এবার আর কাজলকে নয়, যেন সুব্রতকেই শোনাচ্ছে। বিয়ে হল। হরিশ তখন সদ্য জয়েন করেছে। কি চকচকে ধারাল এক আই এ এস অফিসার। তোমার ক্ষতি, কিছু মনে কর না ব্রত যদি আঘাত পাও, প্রথম মাসেই পুরিয়ে দিলে। কিছুদিন বাদেই আমার মনে হল, ওর মত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে এঁদো মফস্বলে পড়ে থেকে সুখ পাচ্ছে না। তখন ওর সুখেই আমার সুখ। ভাবলাম, ও তো উঠতেই চায়, ওকে যদি আমি কোনদিকে কিছু সাহায্য করতে পারি, ওর ভালবাসা আরও বেশি পাব। রাতের পর রাত আমরা এ ওর বুকে মুখ রেখে, এক বালিশে মাথা ঠেকিয়ে শুধু উন্নতির স্বপ্ন দেখেছি, শুধু রঙ্গীন একটা ভবিষ্যতের জাল বুনেছি। মিথ্যে বলব না, এতে হরিশের মত আনন্দ প্রথম দিকে, অর্থাৎ যতদিন ভবিষ্যৎটা শুধু স্বপ্নই ছিল, আমিও পেয়েছি। আত্মত্যাগ স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি বাজে কথা বলে নিজের কদর মিথ্যে বাড়াব না। হরিশ যখন তার রূপসী বউকে ওদের অফিসার সমাজে ইনট্রোডিউস করল সেইদিন থেকেই ও সকলের নজরে পড়ে গেল। ওকে আমার স্বামী বলেই ওর সিনিয়ারদের কাছে কলকে পাচ্ছে তা আমরা দুজনেই বুঝেছিলাম। গোড়াতে ব্যাপারটা এতই নির্দোষ ছিল যে এ নিয়ে আমরা রাতের পর রাত হাসি ঠাট্টা করেছি। আর এই সব ঘটনা আমাদের ভালবাসায় নতুন নতুন জোয়ার এনে আমাদের আরো সুখী করে তুলেছে। আমি যে রূপসী এ নিয়ে হরিশের একদিন গর্বের অন্ত ছিল না। পারটিতে ক্লাবে যেখানেই যাই এক ঘর পুরুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু, আমি, এত লোকের কামনার ধন, এ নিয়ে আমার অহংকারও কম ছিল না। মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে প্রশ্রয় দিতাম, নাচাতাম। সে যদি সিনিয়ার হত, হরিশ উৎসাহ দিত। ফলে সদর ছাড়া হরিশের আর কোথাও পোসটিংই হত না। ও সব সময় উপর-অলার নজরে থাকত। হরিশ যেমন ব্রিলিয়ানট তেমনি আবার খাম-খেয়ালিও বটে। কাজে মাঝে মাঝে মারাত্মক গাফিলতি করত। যেদিন থেকে ও বুঝল ওর হাতে ওর বউয়ের মত এক অমোঘ অস্ত্র আছে যা দিয়ে ও যা-খুশি করে পার পেয়ে যেতে পারে, সেদিন থেকে ওর খেয়ালিপনা বেড়ে গেল। খুকি যখন এক বছরের তখন রিলিফের টাকা ভেঙেগ ও প্রায় চাকরি খোয়াতে বসেছিল।

—সেবার আর, কাজলের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মুকুল ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলল, গা বাঁচিয়ে ওকে রক্ষা করা যায়নি। হরিশের অনুরোধে উপরোধে কিছু মূল্যও দিতে হল। তারপরও কয়েকবার দিতে হয়েছে। কারণ জীবনের গতির নিয়মই এই, ইচ্ছেমত মাঝপথে থেমে পড়া যায় না।

কাজল এই প্রথম মুখ নীচু করল।

ভালবাসা বাঁচাতেই এত কাণ্ড করলাম। তবু সেই হরিশের ভালবাসাতেই ঘুণ ধরল। হরিশ নিজেকে অপরাধী মনে করত। অনুশোচনায় জ্বলত। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। কাজে মারাত্মক গাফিলতি ঘটত। সারভিসে স্ট্রিকচার। আবার বিপত্তারণের জন্য মাদাম বাটারফ্লাইকেই আগুনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হত। কারণ আমার ভালবাসা তখন আমার সংসার, আমার মেয়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। তখনও নিজের দিকে তাকিয়ে দেখিনি।

—এত আমি জানতাম না। কাজল এবার অকপটে আত্মসমর্পণ করল। আমি আমি কিছুই জানতাম না।

—জেনেই বা লাভ কী হত? মুকুলের স্বর অকস্মাৎ গাঢ় হয়ে এল। নিজের বোঝা নিয়ে বওয়াই তো ভাল।

তুমি বিশ্বাস কর ব্রত, মুকুলের ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। সুব্রত দেখল মুকুল প্রাণ-পণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। বিশ্বাস কর, আজ তোমার কাছে আমি কোনও মতলব নিয়ে আসিনি। মাত্র কদিন আগে খুকির কাছ থেকে তোমার কথা জেনেছি। আর তারপর থেকেই আমার নিজের দিকে বারবার আমার দৃষ্টি পড়ছে। হরিশ সারা জীবন ধরে যা চাইছিল, সারভিসে চরম উন্নতি তা সে পেল। খুকি ভালবাসার কাঙাল, ভালবাসার মানুষ চেয়েছে, ওকে অখণ্ডভাবে ভাল-বাসবে এমন মানুষ তোমাকে বিয়ে করলে হয়ত পাবে।

—পাবে কি? সুব্রত ভাবল জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু মুকুলের দিকে চেয়ে ওর আর সে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল না। মুকুলের চোখ দুটো টলটল করে উঠেছে। এর উপর আর খাঁড়ার ঘা চালিয়ে লাভ কী।

কিন্তু, ধরা ধরা গলায় মুকুল জিজ্ঞাসা করল, আমি কী পেলাম ব্রত? পরশু পারটি থেকে ফিরে ইস্তক এই প্রশ্নটা কেবল আমাকে ব্যস্ত করে তুলেছে। কিছুতেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না। না, তোমার কাছে এর উত্তর চাইছি না। আমাকেই এর উত্তর খুঁজে নিতে হবে, তাও জানি। তবে তোমার কাছে আসতে এত ইচ্ছে করছিল কেন? তোমাকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এই বয়েসে শুধুমাত্র এই কারণেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি, এ কথা বললে, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে, ব্রত?

বন দিয়ে আপ্যায়ন করুন!

খাঁটি কফির স্বাদগন্ধে
মুহূর্তে মাতিয়ে তুলুন সবাইকে!

সকলে মুগ্ধ হবে আপনার সাদর আপ্যায়নে! পেয়ালা ভ'রে পরিবেশন করুন উষ্ণ প্রাণোচ্ছল বন। পরিবারের সকলে প্রাণ ভ'রে উপভোগ করবে আর বন্ধুবান্ধবরা কখনো ভুলতে পারবেন না আপনার মধুর আতিথেয়তা।
আর ভালো কথা, নিজের জন্যও এক পেয়ালা বন নিতে ভুলবেন না যেন!
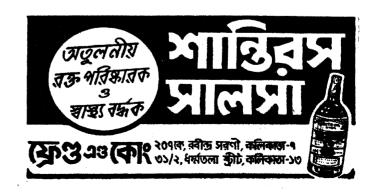
বাঙালী প্রতিষ্ঠানের হীরক জয়ন্তী

বাঙালীর প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'সুর-নিয়োগী-কুমার'-এর হীরকজয়ন্তী উৎসব কয়েক দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। হবে। ঘটনাটা সকল বাঙালীর পক্ষেই সমীক্ষার বিষয়।

বাঙালী আজ পর্যন্ত অনেক ব্যবসাতে হাত লাগিয়েছে, প্রতিষ্ঠান গড়েছে অসংখ্য আর পথিকৃতের মহান্ দায়িত্বও গ্রহণ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু ওই পর্যন্তই: প্রতিষ্ঠানের বার্ধক্য কেন, যৌবনকালে উপনীত হবার আগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে. হয় সেটার মালিকানা বাঙালীর হাত থেকে চলে গেছে, নয় তো অকালে তার মৃত্যু ঘটেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বণিক-গোষ্ঠীর চেয়ে কম পরিশ্রমী এবং অনেক বেশী ভাবালু বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে আয়ব্যয়ের ভারসাম্য না রাখতে পেরে ব্যবসায়িক সাধুতার সীমালঙ্ঘনই বোধ হয় এর প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণটি হলো, এক কথায় যাকে বলা চলে ঈর্ষা। বাঙালী প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঈর্ষা, বাইরে ঈর্ষা। কর্তৃপক্ষের নিজেদের মধ্যে হানাহানি তো থাকেই, উপরন্তু বাইরে, বিশেষ করে সমব্যবসায়ীদের ঈর্ষাপরায়ণতা বাঙালী প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘজীবনের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রবন্ধগুলি লেখার ফলে সেটা আমি আরও বেশী করে বুঝতে পারছি। প্রত্যেকটি না হলেও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরেই বাঙালী সমব্যবসায়ীদের ভদ্র ও অভদ্র পত্রাঘাতে আমি জর্জরিত হয়ে পড়ি। আততায়ী-বর্গের প্রধান অভিযোগ হলো যে, একজনের বা এক প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে লেখা মানে বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞাপন করা। কিন্তু একই প্রবন্ধে সকলের সম্বন্ধে লিখলে যে রচনাটি এক বিজনেস ডাইরেক্টরীর আকার ধারণ করে এবং সুখপাঠ্য থাকে না, অভিযোগকারীরা সেটা যেন বুঝেও বোঝেন না। একের বিষয়ে লিখলেই অন্যদের যে ছোট করা হয় না, তা তাদের ঈর্ষায় অসাড় মন উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ কলকাতার অবাঙালীদের মধ্যেই দেখেছি যে, তাঁদের সমগোত্রীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শ্লাঘা পত্রপত্রিকায় বেরোলে সেই সমাজের প্রায় সকলেই আনন্দিত হন।

সুর-নিয়োগী-কুমার, তথা সুর পরিবার নিষ্ঠা ও সাধুতার জন্যে এই দীর্ঘ ষাট বছর পার হয়ে হীরকজয়ন্তীর তিলক পরার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মহত্তর কৃতিত্ব হলো যে, তাঁরা বাঙালী হয়েও এত বছর ধরে নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য-বন্ধন বজায় রেখে এত পথ এগিয়ে আসতে পেরেছেন অন্যের ঈর্ষার অনল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে। তাঁদের শতবর্ষপূর্তি উৎসবও যেন আরও বড়ো করে অনুষ্ঠিত হয়, এই কামনাই সর্বান্তঃকরণে করছি।

সুর-নিয়োগী-কুমার অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাটি যে কেবল নিজেই ষাটের কোঠায় পা দিলো তাই নয়, ইতিমধ্যে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যাও হয়েছে বেশ কয়েকটি এবং তার প্রায় প্রত্যেকটিই সুস্থ ও সবল। সুর-নিয়োগীর গল্প বলার মাঝে মাঝে তাদের কথাও এসে পড়বে, কিন্তু হীরকজয়ন্তী যার, তার কথাটাই বেশী করে আজ বলবো।

গত শতকের শেষভাগে হুগলি জেলার নন্দীগ্রামের তারিণীচরণ সুর নামে এক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি জীবিকার সন্ধানে বিদেশ যাওয়া স্থির করলেন। আজ যেমন মন্ত্রী ও ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে শিল্পী, খেলোয়াড়, অধ্যাপক আর ছাত্র নির্বিঘ্নে আরামে বিলেত-টিলেত চলে যান, সেকালে দেশেরই এক অঞ্চল থেকে অন্যত্র যাওয়া তার কাছাকাছিও ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বছর বছর হিমালয়ে যেতেন কত আয়োজন উদ্যোগ করে—দীর্ঘ-দিনের পথ অতিক্রম করতে রেল, স্টীমার, গরুর গাড়ি, নৌকা আর ডান্ডি, কোনো বাহনই বাদ পড়তো না। রীতিমতো অভিযান ছিল সেই যাত্রা। তারিণী সুর ধনী ছিলেন না, তাই তাঁর বিদেশ যাত্রা অভিযানের পর্যায় ছাড়িয়ে কৃচ্ছ্রসাধনার চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৮৪ সালে তারিণীচরণ ওড়িশার কটক শহরে পৌঁছে কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে। কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং ভাগ্যও ছিল সুপ্রসন্ন,

তাই তারিণীবাবু ব্যবসাতে দ্রুত উন্নতি করতে পারলেন।

তারিণীচরণের তখন চার ছেলে। জ্যেষ্ঠ শরৎচন্দ্র তারিণীবাবুর ওড়িশা যাত্রার বছর কয়েক পরে বাংলা সরকারের সেচ বিভাগের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার পদে বহাল হয়েছিলেন। মধ্যম হেমচন্দ্র ১৮৯০ সালে কটকে গিয়ে বাবার ব্যবসাতে যোগ দিলেন। কিছুকাল পরে একক ব্যবসা করার সুযোগ পেয়ে তিনি পৃথক একটা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করলেন। সেটাও কাঠেরই ব্যবসা। তিনিও পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন এবং ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁকেও কৃপা করাতে সেই ব্যবসারও প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হলো।

, হেমচন্দ্রের সহোদর ছোট দুই ভাই সতীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ কয়েক বছরের মধ্যেই কটকে এসে দাদার ব্যবসাতে যোগ দিলেন। বছর দশ-বারো তিন ভাইয়ের বাণিজ্যপ্রচেষ্টা বেশ ভালোই চললো।

সংগে সংগে তারিণীচরণের প্রতিষ্ঠানও উন্নতি করে চলেছিল, কিন্তু উত্তরকালে তার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তারিণীবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সুর। তাঁরা এখন কটকের বাসিন্দা হয়ে গেছেন এবং তাঁদের প্রকাণ্ড কাঠের ব্যবসা ছাড়াও তাঁরা মস্ত একটি কন্ট্রাক্টারি ফার্মের মালিক।

১৯০৮ সালে অকালে হেমচন্দ্রের পত্নী-বিয়োগের পর তিনি কলকাতায় চলে এলেন। সেই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে বিজয়কৃষ্ণ কুমার ও ক্ষীরোদচন্দ্র নিয়োগী নামে দুই বন্ধুর সংগে মিলিত হয়ে হেমচন্দ্র ৩৯ নং কলেজ স্ট্রীটে ক্ষুদ্র একটি প্লাম্বিং সামগ্রী সাপ্লাইয়ের দোকান খুললেন। ফার্মের নাম হলো সুর-নিয়োগী-কুমার অ্যান্ড কোম্পানী। বলা বাহুল্য যে, হেমচন্দ্র ও তাঁর ভাইয়েদের অংশই ছিল বেশী।

সেই সময়ে স্যানিটারি, প্লাম্বিং ও টিউবওয়েল সরঞ্জামের ব্যবসাতে প্রায় কোনো ভারতীয়ই ছিলেন না। ব্যবসাটিতে সামান্য কয়েকটি বিদেশী কনসার্নের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সুর-নিয়োগী-কুমারের সাধুতা ও পটুত্বের জন্যে ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। সম্ভবত সেই গতিতেই সুর-নিয়োগী উন্নতির পথে অগ্রসর হতেন, কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা গতিকে অনেক দ্রুততর করে দিল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মিঃ মার্টিন নামে এক ইংরেজ বণিক 'স্লাজার' প্রণালীতে টিউবওয়েল বসাবার জন্য একটি 'পেটেন্ট' পেয়েছিলেন। নানা কারণে তিনি সেটাকে কার্যকর করে তুলতে পারলেন না। তখন অবশ্য এমনিতেই টিউবওয়েলের বিষয়ে সাধারণ মানুষ বিশেষ কিছু জানতেন না। সামান্য যে-কয়জন জানতেন তাঁরাও নলকূপ ব্যবহারের প্রচারে বেশী এগোতে ভরসা পেতেন না, কারণ তখন ব্যাপারটা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। নির্মল জলের জন্যে সেকালের পাশাপাশি দু-তিনটি গ্রামের লোক এক হয়ে সুবিধেমতো এক-একটি দীঘি কাটিয়ে তাঁদের জলের অভাব মেটাতেন। বহু যুগ ধরে আমাদের বাংলা দেশের গ্রামীণ মহিলারা কলসী কাঁখে করে সেই 'জলকে চল'-এর পর্ব চালিয়ে গিয়ে-ছিলেন। দীঘির ঘাটে মহিলাসমাজের বৈঠকে অংশ নেওয়া, গল্পগুজবে আসর মাতানোর অবসরটি সুখকর হলেও মোটের ওপর পর্বটি এই বর্ষাপ্রধান দেশে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তা ছাড়া খরার সময়ে মানুষের যে ক্লেশের সীমা থাকতো না সেটা

বলাই বাহুল্য। উপরন্তু এইসব দীঘি, সায়র আর পুকুরের জল মাঝে মাঝে দূষিত হয়ে বাধিয়ে দিত গ্রামকে গ্রাম উজাড় করা মহামারী।

মার্টিন সাহেব অকৃতকার্য হবার অনেক পরে ১৯২৩-২৪ সালে বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল বসাবার জন্যে এক ইংরেজ প্রতিষ্ঠানকে ১০০০ নলকূপের অর্ডার দেন। কিন্তু এবারের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন হেমচন্দ্র সুর মশায়ের চেষ্টায় সুর-নিয়োগী-কুমারের ওপর এই গুরুভার অর্পিত হলো।

হেমচন্দ্র দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল অসাধারণ। সৌভাগ্যবশত তিনি এক বাঙালী টিউবওয়েল এক্সপার্টকে পেয়েই এই কঠিন কাজটি হাতে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম শ্রীবিপদবারণ সরকার। তাঁর সহায়তাতেই সুর-নিয়োগী দেশে তৈরী সস্তা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে খুব কম খরচে এই বিরাট কাজটিতে সফলতা লাভ করেন।

বিপদবারণের কৃতকার্যতার মূলে কিন্তু ছিলেন হেমচন্দ্র সুর। উপর্যুক্ত কনট্রাক্টের বহু পূর্ব থেকেই বিপদবারণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অকাতরে অর্থসাহায্য করেছিলেন হেমচন্দ্র সুর মহাশয়ই। অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা-বিক্রমপুরের দারিদ্র, আদর্শবাদী স্কুল মাস্টার বিপদবারণ দেশসেবার উদ্দেশ্যেই নলকূপ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকে তাঁকে ছিটগ্রস্ত মানুষ হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আবিষ্কারের নেশা যাঁদের আছে তাঁদের অধিকাংশই ছিটগ্রস্ত। যেখানে এক শো-দেড়শো ফুট গভীর একটি টিউবওয়েল খোঁড়ার কাজে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে বিদেশী কোম্পানীর ইমপোর্টেড যন্ত্রপাতির দাম পড়তো সেদিনের ২৫০০ টাকা, বিপদবারণবাবু সেখানে এমন সব যন্ত্রের উদ্ভাবনা ও প্রয়োগ করলেন যার দাম এখনও পড়ে ৪০।৫০ টাকা। দরিদ্র দেশকে দারিদ্র বিপদবারণের এই মহান্ দানের জন্য আমরা বাঙালীরা, তথা ভারতবাসীরা, কৃতজ্ঞ বললে খুবই কম বলা হয়। তিনি আমাদের কাছে ভারতরত্ন। বিশেষ করে এই কারণে যে, আজকের অশীতিপর বৃদ্ধ আদর্শবাদী বিপদবারণ খাটো মোটা ধুতিকেই অঙ্গের ভূষণ রেখে এখনো তাঁর নলকূপ-গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন তিনি চেষ্টা করছেন লোহার পাইপের বদলে বাঁশের নলের সাহায্যে টিউবওয়েল তৈরি করার। কিন্তু সব দিক থেকেই বিপদবারণের নামের সঙ্গে আর একজনের নাম এসে পড়ে—স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সুর মহাশয়ের নাম। বিপদবারণবাবুকে এই বাঁশের টিউবওয়েল তৈরির প্রয়াসে তিনিই উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিলেন।

এ ছাড়াও আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। সুর-নিয়োগী-কুমার প্রথম দিকে 'স্লাজার' প্রণালীতে টিউবওয়েল বসাতে গিয়ে বহির্নলহীন গর্ত সংরক্ষণ বিষয়ে ঠেকে পড়েছিলেন। তখন বিপদবারণবাবু বরিশালের চিন্তাহরণ সেন নামে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে সেই গর্ত যাতে খোঁড়ার পরে জল ওঠার আগেই বুজে না যায় তারও এক সহজ ও সস্তা উপায় আবিষ্কার করলেন। সেটা করেছিলেন গোবরের ব্যবহার করে।

টিউবওয়েল খোঁড়ার খাতে অভাবনীয় ব্যয়সংকোচ করা ছাড়াও হেমচন্দ্র কলকাতার কারিগর দিয়েই 'ভাগীরথী' হ্যান্ড-পাম্প-এর প্রবর্তন করে পথিকৃতের কাজ করেছিলেন। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হলেও সেই 'ভাগীরথী' পাম্প সুর-নিয়োগী-কুমারের উন্নতির প্রথম সোপানের বৃহদংশ।

১৯৩০ সালে এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের তাগিদে পার্টনারশিপ ফার্ম থেকে 'লিমিটেড' কোম্পানীতে পরিণত হলো। এবারেও অংশীদারদের মধ্যে সুর পরিবারের সর্বাধিক প্রাধান্য রইলো। ইতিমধ্যে সতীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ সুর মহাশয়রাও যে ওড়িশা থেকে কলকাতায় এসে সুর-নিয়োগীর কাজে বহু পূর্ব থেকেই সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন সেটা উহ্য থেকে গিয়েছিল সুর-নিয়োগীর কর্মসূচির বিবরণ দিতে গিয়ে। সুর পরিবার অন্য দিক দিয়েও শিল্পপ্রসারে লিপ্ত হয়েছিলেন ইতিমধ্যে; সে কথা পরে আসছে।

ক্ষীরোদচন্দ্র নিয়োগী মশায় বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তাঁর মৃত্যুর সময়ে তিনি প্রতিষ্ঠানে তাঁর ছোট অংশ এবং সঞ্চিত বেশ কয়েক লক্ষ টাকা 'সদগোপ সভা'-কে দান করে গেছেন। তাঁর শেয়ারগুলি সুর মহাশয়রা কিনে নিয়েছেন। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ কুমার মহাশয়ের সামান্য কিছু শেয়ারের এখন স্বত্বাধিকারী হয়েছেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কুমার।

সুর পরিবারের শিল্প সম্প্রসারণের সূচিতে সর্বপ্রথমে এলো ১৯১৮ সালে স্থাপিত 'সুর এনামেল অ্যান্ড স্ট্যাম্পিং ওয়ার্কস'। বর্তমান প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাটি পত্তনের সময়ে ছিল পার্টনারশিপ ফার্ম। ১৯২৯ সালে এটিকে সমিতিভুক্ত করা হয়।

এনামেল শিল্পের ইতিহাস ঘেঁটে যতটা পাচ্ছি তাতে মনে হয় সুর এনামেলই ভারতবর্ষে এই শিল্পের প্রবর্তক। এখন অবশ্য বাংলা দেশ ও অন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সুর এনামেলের বর্তমান ৫০/৬০ লক্ষ টাকার বার্ষিক উৎপাদনের চাইতে অনেক বেশীও করছেন, কিন্তু পথিকৃতের সম্মান বোধ হয় সুর মহাশয়দেরই প্রাপ্য। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমৃগাঙ্কমোহন এই শিল্পে টেকনিক্যাল জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে তাঁর বড়ো কাকা হেমচন্দ্রের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেছিলেন। এখন এর কর্তা হলেন স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ সুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশিশিরকুমার এবং মধ্যম শ্রীমিহিরকুমার সুর। সুর-নিয়োগী-কুমারের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅক্ষয়কুমার সুরের মধ্যম পুত্র শ্রীমান প্রণব 'সেরামিকস্' বিষয়ে এম এস-সি পরীক্ষায় উচ্চতম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এখন সুর এনামেলের উৎপাদনের মানোন্নয়নের গবেষণায় লিপ্ত। এই প্রতিষ্ঠানের এনামেলের তৈরী বাসনকোসন এবং স্যানিটারি ফিটিংস প্রভৃতি ভারতবর্ষের বাজারে সর্বাধিক সমাদৃত।

অক্ষয়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়ের সূত্রে তাঁর নিজের এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের কথাও জানলাম। জ্যেষ্ঠ প্রণয়কুমার এ'দের সাতায় সালে প্রতিষ্ঠিত বিহারের জামতাড়া শহরের নিকটস্থ 'কাশিতাড় স্টোন কোয়্যারী'-র তত্ত্বাবধানে আছেন। প্রণবকুমারের কথা ওপরে বলেছি। কনিষ্ঠ রবীন এবং কন্যা শ্রীমতী রিনা পাল বেছে নিয়েছিলেন চিত্রশিল্প এবং সঙ্গীত। অর্থাৎ, পারিবারিক ঐতিহ্যে এ'রা এক নতুন অধ্যায়ের রচনা করছেন। শ্রীমতী রিনা সেতার বাজনায় বিশেষ নিপুণতা লাভ করেছেন বলে শুনলাম।

এ'রা ছাড়া তারিণীচরণের চতুর্থ পুরুষের সন্তান-সন্ততিদের আর দু-তিন-জনের সম্বন্ধে আমার জানার সুযোগ হয়েছে। যাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারিনি তাঁরাও নিশ্চয়ই শিক্ষা ও সংস্কৃতিমণ্ডিত হয়ে সমগ্র পরিবারকে অলংকৃত করছেন। কনিষ্ঠদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ্য। তিনি শ্রীমিহির সুরের পুত্র অমিত। অমিত তেষট্টি সালে হায়ার সেকেণ্ডারি সায়ান্সে তৃতীয় স্থান অধিকার করার পর ছেষট্টিতে ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এবারে

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে এম এস-সি পরীক্ষা দিচ্ছেন।

অক্ষয়বাবু এবং তাঁর খুড়তুতো-জেঠতুতো ও সহোদর ভাইয়েরা প্রায় সকলেই কটকে মানুষ। ছেলেবেলায় ভালো ফুটবলার ছিলেন বলেই বোধ হয় প্রৌঢ় অক্ষয়কুমার এখনো বেশ শক্তসমর্থ। তিনি কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজের ফুটবল ক্যাপ্টেন এবং ওড়িশা একাদশে প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়াও কলকাতার এরিয়ানস্ টীমের খেলোয়াড় ছিলেন। মুক্ত হাওয়ার নেশা তাঁর এখনো যায় নি; সুযোগ পেলেই মৎস্য এবং পশু শিকারে বেরিয়ে পড়েন দক্ষ শিকারী অক্ষয়কুমার সুর।

সুর-নিয়োগী-কুমার কোম্পানীর বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন হেমচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীরামচন্দ্র সুর, যাঁকে অক্ষয়বাবুরা সম্বোধন করেন 'সেজদা' বলে। মৃগাঙ্ক-মোহন হলেন 'বড়দা', মেজদা শ্রীশশাঙ্কমোহন (শরৎচন্দ্রের মধ্যম পুত্র) শারীরিক অসুস্থতার জন্য বহুদিন আগেই অবসর নিয়েছেন।

শিল্পোদ্যমে মৃগাঙ্কমোহন ও রামচন্দ্রের একটি বিশেষ অবদান হলো চল্লিশ দশকে 'রেফ্রিজারেটার্স ইণ্ডিয়া' নামক আমেরিকান প্রতিষ্ঠানটি কিনে ১৯৪৮ সালে 'সুর ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর স্থাপনা। ১৯৪৯-এ মৃগাঙ্কমোহন ও রামচন্দ্রের, তথা সুর পরিবারের অবদানকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া যায়। সে বছরের এক শুভ দিনে সুর ইণ্ডাস্ট্রিজের কারখানায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারদের কৃতিত্বে বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'সুর-ফ্রিজ' রেফ্রিজারেটার নির্মিত হয়েছিল। এখন এই রেফ্রিজারেটারের যন্ত্রাংশের শতকরা মাত্র তিন ভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। প্রায় পুরোপুরি স্বদেশী মেশিন হওয়া সত্ত্বেও এত ভালো কোয়ালিটি 'ফ্রিজ' তৈরি করার মধ্যে আছে মৃগাঙ্কমোহন, রামচন্দ্র ও তাঁদের সহযোগীদের মুন্সিয়ানা। পরবর্তী কালে সুর ইণ্ডাস্ট্রিজের তৈরি রুম-এয়ারকণ্ডিশনার, ডীপ-ফ্রীজার, ব্লাড-ব্যাংকের 'ব্লাড-প্লাজমা স্টোরেজ' যন্ত্র, বৈদ্যুতিক কুকিং রেঞ্জ এবং গরম করার ওয়াটার-হীটার সারা ভারতের বাজারে সমাদৃত হয়েছে। আর ভারত সরকার যখন ফরেন এক্সচেঞ্জ বাঁচাবার জন্যে ইমপোর্ট সংকোচনের কথা ভালো করে ভাবেনই নি, সেই ১৯৬০ সালে কোল্যাবোরেশন ছাড়াই সুর ইণ্ডাস্ট্রিজের ফ্যাক্টরীতে 'সুরম্যাটিক' নামে sealed unit তৈরী হয়ে বাজারে বিক্রি হওয়া শুরু হয়েছিল।

রামচন্দ্রের একক কীর্তি হলো উনপঞ্চাশ সালে সুর আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং প্রাইভেট লিমিটেডের পত্তন। লোহা ও লৌহেতর ধাতুর 'কাস্টিং' দিয়ে শুরু করে আজ তাঁরা হাই-প্রেসার পাম্প, ফায়ার এঞ্জিন, ওয়েলডিং ট্র্যান্সফরমার, স্টোন ক্রাশিং ও স্ক্রীনিং প্ল্যাণ্ট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের আবশ্যিক যন্ত্রপাতি তৈরি করছেন। সেনাবাহিনীর জন্যে বিশেষ এক ধরনের জেনারেটারও এখানে তৈরী হয়। আর এঁদের সূক্ষ্ম কারিগরির আর একটি নিদর্শন হলো 'ডাম্পিং লেভেল' এবং 'থিয়োডোলাইট' যন্ত্রের নির্মাণ।

প্রথমে হুগোল ব্যাংক এবং পরে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর হিসেবেও রামচন্দ্র সুর মহাশয়ের খ্যাতি আছে।

রামচন্দ্র সুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীমান প্রিয়দর্শন বিলেতের ফ্যারাডে প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা পেয়ে এখন সুর আয়রন অ্যাণ্ড স্টীলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আশা রাখি যে, কৃতিত্বে তিনি পিতাকেও ছাড়িয়ে যাবেন।

শুধু শিল্প ও বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সুর মহাশয়েরা তাঁদের অদ্ভুত কর্ম-কুশলতা কৃষির সম্প্রসারণেও প্রয়োগ করেছেন। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিরুলিয়া এগ্রিকালচারাল ফার্ম'-এ এখন উন্নত জাতের বীজ থেকে ধান, গম, ভুট্টা, আখ, আলু ও চীনেবাদামের চাষ করছেন। পশ্চিম বাংলা সরকার এই কৃষি ফার্মকে বীরভূমের শ্রেষ্ঠ সংস্থা বলে অভিহিত করেছেন। স্থানীয় বেকার যুবকদেরও এখানে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষাকালে তাঁদের সাহায্যক দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই সংস্থার পরিচালনায় আছেন সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসমীরকুমার সুর।

ওড়িশাতেও সুর মহাশয়দের আর একটা বড়ো ফার্ম আছে। তার আয়তন ২৫০ একর। অক্ষয়কুমারের ভাই শ্রীঅজিতকুমার সুর মহাশয় পরিবারের ওড়িশার অবস্থিত নানা সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষি সংস্থাটিরও তত্ত্বাবধান করেন। তা ছাড়া অজিতকুমার 'সুর-নিয়োগী'র কটক শাখারও পরিচালক।

কটক বাদে সুর-নিয়োগী-কুমারের আরও তিনটি শাখা অফিস আছে—কলকাতার ব্রেবর্ন রোডের পশ্চিমাংশে রাজা উদমন্ত স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ের বিরাট শাখা, গোহাটি শাখা এবং পাটনা।

হেড অফিসটি আদি দোকান ৩৯-নং কলেজ স্ট্রীট ভবনে অবস্থিত হলেও আসলে রাজা উদমন্ত স্ট্রীট শাখাই হলো এঁদের প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র। হেড অফিসের অধ্যক্ষ হলেন সুর-নিয়োগীর এক প্রাচীন কর্মচারী শ্রীদীনতারণ মুখোপাধ্যায়। উদমন্ত স্ট্রীটের কর্মীদের মধ্যে বিক্রয় তত্ত্বাবধায়ক শ্রীঅনিল বিশ্বাস, ক্যাশিয়ার শ্রীধীরেন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের এবং পাটনার ম্যানেজার শ্রীরবি দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য আর এক ব্যক্তি হলেন উদমন্ত স্ট্রীট শাখার প্রধান শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যব্যপদেশে বছর সাত আট আগে আমাকে একবার তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল।

সেটা ছিল এক বিকেল বেলা। দোকানে

খুব ভিড়; খরিদ্দার ও দালালের প্রবেশ, দরাদরি ও নিষ্ক্রমণ এবং পাইপের গাছা নিয়ে মুটিয়াদের টানাটানি ও ঠনঠন শব্দের তুলকালাম কাণ্ডের কেন্দ্রে শালপ্রাংশু, মহাভুজ এক প্রৌঢ় বসে মিনিটে দুটো করে 'ফোনালাপ' চালাচ্ছেন—আধ ইঞ্চি 'এ' *ক্লাস পাইপ এত দাম, দেড় ইঞ্চি 'বি' ক্লাস এলবো অত দাম আর তিন ইঞ্চি 'সি' ক্লাস বয়লার-পাইপ* তত দাম ইত্যাদি। আমি ঘণ্টাখানেক সামনে বসে তাঁকে অন্তত শ' দুই আইটেমের দাম মুখে মুখে লোককে বলতে শুনলাম—প্রাইস লিস্ট দেখার কোনো প্রয়োজনই মনে করছিলেন না ভদ্রলোক। সেই ষাট একষট্টি সালে আবার পাইপ ইত্যাদির দাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওঠনামা করতো। কত আইটেমের কুষ্ঠি তিনি মুখস্থ রেখেছেন জানতে চাওয়াতে সন্তোষবাবু তাঁর স্বাভাবিক নিম্নকণ্ঠে বললেন, "তা হাজার পাঁচেক হবে।" প্রথম দিন ওইটুকুই শুনে এলাম।

সুর-নিয়োগীর সম্বন্ধে লিখিত এই প্রবন্ধের খসড়া নিয়ে আলোচনা করতে সন্তোষবাবুর বাড়িতে গিয়ে বাকীটা শুনলাম দিন দশেক আগে।

সন্তোষবাবু প্রবাসী বাঙালী; থাকতেন কাশীতে। পোলিটিক্যাল সায়ান্সে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির এম-এ পাস করে কিছুদিন স্বাধীন ব্যবসা করেছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায় ঘুরেছেন, উপরন্তু সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্ডোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দূরপ্রাচ্যের দেশও ঘুরেছেন। উত্তরকালে সুর-নিয়োগী-কুমারের পরলোকগত পরিচালক পূর্ণাংকমোহন সুর মহাশয় (মৃগাঙ্ক-মোহনের অনুজ) কাশী থেকেই সন্তোষ-বাবুকে কলকাতায় ধরে আনেন এবং কালক্রমে উদমন্ত স্ট্রীটের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত করেন।

স্বর্গীয় পূর্ণাংকমোহনের বাহাদুরি বলতে হবে যে, রাষ্ট্রনীতির ছাত্রকে পাঁচ ছ' হাজার প্লাম্বিং সরঞ্জামের সুকঠিন আদ্যোপান্তে রপ্ত করে ছেড়েছেন।

আমার কিন্তু সন্দেহ হয় যে, সন্তোষ-কুমার কাশীর কোনো অবধূত-আগম-বাগীশের চেলা ছিলেন। সেই জন্যেই এই রকমের স্মৃতিধর হয়ে উঠেছেন। আবার বললেন যে, কুস্তি করতেন—হেভি-ওয়েট কুস্তি। শুনে প্রায় বলে ফেলে-ছিলাম যে, কুস্তিগীরদের তো ঘাড়ে রন্দা খেয়ে খেয়ে নিরেট মস্তিষ্ক হয়ে যাবার কথা; এমন সময়ে আমার 'কালিকা টাইপ ফাউনড্রী'র শামতুল্লাহ-মুগুর-ভাঁজা মলয় চক্রবর্তী মশায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মলয়বাবুর পরে এই সন্তোষ বাঁড়ুজ্জে মশায়কেও দেখে বুঝলাম যে, কুস্তি জিনিসটা যাঁর সয় তিনি দুর্দান্ত মেধার অধিকারী হন।

সারা দিন 'কেয়া ভাও' করে সন্তোষবাবু যে আবার গভীর রাত্রে বসে নাটক লেখেন, গল্প লেখেন, আর সেসব মঞ্চস্থ এবং প্রসিদ্ধ দৈনিকে মুদ্রিত হয় তাও আমার জানা ছিল না। সুর-নিয়োগীর বহুমুখী কার্যতালিকার বিবরণ শোনার মাঝে সন্তোষ-কুমারের ছেলেমেয়ে আর জামাইয়ের রবীন্দ্র-সংগীতে মুগ্ধ হওয়ার অবকাশও হয়েছিল সেদিন। ছেলেমেয়েরা এমন গলা কার কাছ থেকে পেলো, তাদের মা ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে কিনা—প্রশ্ন করাতে সন্তোষবাবু বললেন যে, তিনিই গিয়েছিলেন বেনারসের বিখ্যাত ঠুংরি গায়ক চন্দন চৌবেজী মহারাজের কাছে নাড়া বাঁধাতে; কিন্তু চৌবেজী নাকি হবু সাকরেদের দশাসই চেহারা দেখে ন'টে গেলেন, মানে 'না' বলে দিলেন। বললেন, খাণ্ডারবাণী স্পেশালিস্ট কোনো ধ্রুপদীর কাছে যেতে। সন্তোষ বাঁড়ুজ্জে রসিকতা করে নিজে বিশেষ হাসেন-টাসেন না। আমরাই হেসে ফেললাম।

আমি বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে এলাম যে, সুর মহাশয়দের মতো পরিবার আর তাঁদের এই বিশ্বস্ত কর্মচারী সন্তোষ-বাবুর পরিবারের মতো সুন্দর সুন্দর পরিবার বাংলা দেশে তো অনেক আছে; তবুও আমরা সব বিষয়েই এত পিছিয়ে পড়ছি কেন?

এই তো সুর মহাশয়দের বংশ—শিল্প ও বাণিজ্যে তাঁরা দেশের অগ্রণী, তাঁরা বরেণ্য—উপরন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও এই

পরিবার অভিনন্দিত হওয়ার যোগ্য। পুরুষেরা তো বহুকাল থেকেই, এখন এ'দের বাড়ির মহিলারাও অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম দরজা পার হয়ে গেছেন বলে শুনেছিলাম।

এ'রা সব দেশের সম্পদ গড়ে তোলেন, আর আমরা ম্যাকনামারা সাহেবের ওপর রুষ্ট হয়ে জাতীয় সম্পদ ট্রাম বাস সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে ফেলি।

সুর-নিয়োগী-কুমারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅক্ষয়কুমার সুর এবং ডিরেক্টর শ্রীসমদর্শন সুরের (ইনি হচ্ছেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীরামচন্দ্র সুর মহাশয়ের মধ্যম পুত্র) সঙ্গে প্লাম্বিং ব্যবসার বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সমদর্শন মেটোলার্জি অর্থাৎ ধাতুবিদ্যায় জার্মেনিতে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এসেছেন।

অক্ষয়বাবু নতুন কথা কিছু বললেন না; বললেন সেই মন্দা, সেই সংকট আর সেই সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার বহুশ্রুত ইতিহাস।

উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক বয়লার-এর পাইপ থেকে শুরু করে সাধারণ জল সরবরাহের পাইপ, হিমঘরের পাইপ কয়লার খনির জল নিষ্কাশন এবং বালি দিয়ে ভরাট করার (sand stowing-এর) পাইপ এবং খনিজ তেলের লাইনের পাইপ— সর্বত্রই নানা কোয়ালিটি আর নানা বেডের পাইপ লাগে। তা মন্দার জন্যে কারখানার বয়লার বন্ধ, আলুর ফসল গত বছর ধসার (blight-এর) প্রকোপে সর্মাধক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কোলড স্টোরেজ অর্থাৎ হিমঘরের ব্যবসায় ভীষণ মন্দা, আর বার্মা শেল, এসো, ক্যালটেক্স প্রভৃতি বিদেশী তেল কোম্পানী-দের উৎপাদন সংকোচ—সব মিলিয়ে পাইপের বাজারে একদিক দিয়ে প্রচণ্ড মন্দা এনেছে। অন্যদিকে আছে সরকারী বেকুবি। যেখানে ক্ষুদ্রায়তন সেচ পরিকল্পনা করে স্থানে স্থানে টিউবওয়েল খুড়ে আর পাইপ লাইন বসিয়ে শতভাগের পাঁচ দশ ভাগ খরচে কাজ চালানো যেতো, দেশে ফসলের প্রাচুর্য আনা সম্ভব হতো, সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের পর আমাদের সরকার বাহাদুরের টনক নড়লো। পরিকল্পনার মারাত্মক সব ভুল শোধরাবার চেষ্টায় তাঁরা তখন অবহেলিত 'মাইনর ইরি-গেশন'কেও ইজ্জত দিলেন। ততদিনে কত অর্বুদ ডলার, স্টার্লিং, মার্ক আর রুবল মাইথন, পাঞ্চেত, রিহাণ্ড আর নাংগাল বাঁধের জলে ডুবেছে তার হিসেব সকলেই মোটামুটি জানে।

এদিকে এই পরিস্থিতি, অর্থাৎ দেশে ইতিপূর্বে যে-সমস্ত পাইপ তৈরির পুরনো কারখানা ছিল তাঁদের উৎপন্ন মালের বিক্রি নেই—তাঁদের 'কেপাসিটি'-র অর্ধেক, তিন পোয়ার বেশী ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই— আর ওদিকে নির্বোধ শিল্পপতিদের দরখাস্ত পেয়ে তদধিক নির্বোধ সরকার পারমিট লাইসেন্স দিয়ে আরও ফরেন এক্সচেঞ্জ ডোবানোর পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

এখন শিল্পকে উৎসাহমূল্য (incentive) দিয়ে মহাস্থবির সরকারকে পুরনো এবং নতুন কারখানার উৎপন্ন মাল পড়তার চেয়ে অনেক নিচু দরে বিদেশে রপ্তানির রাস্তা করে দিতে হচ্ছে, আর সেই উৎসাহমূল্য চিরন্তন ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে সরকার আপনার আমার কাছ থেকে আদায় করছেন, আওরংজেবের জিজিয়া করের মতন লক্ষ রকম শুল্ক আদায় করে।

সেলস ট্যাক্সের মহিমাটাই ধরা যাক; এক গাছা পাইপের ওপর অনেক ক্ষেত্রেই দুতিন দফা বিক্রয় কর আমরা দিয়ে থাকি এক রাজ্যের পাইপ ফ্যাক্টরী থেকে বিভিন্ন রাজ্যের বাজারে যাবার পথে।

তাতেও ক্রেতার, মানে আপনার আমার রেহাই নেই। পাইপের দাম বেড়েই চলেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যেই সব রকম পাইপের দাম বেড়েছে ১১ পারসেণ্ট। ক্রেতারা থমকে গেছেন; অসংখ্য ছোট বড়ো প্রতিষ্ঠানের বিক্রি কোথায় তলিয়ে গেছে। বিরাট ঐতিহ্য, রিজার্ভ ফাণ্ডের শক্ত ভিত আর পারিবারিক ঐক্যবদ্ধতার জোরে ষাট বছরের জোয়ান সুর-নিয়োগী-কুমার সংকট-কাল পার হয়ে যাবেন, আগেও যেমন বহু বিপদ বাধা তাঁরা সসম্মানে অতিক্রম করে এসেছেন, কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীদের কে পার করবে এই বৈতরণী?

এই মন্তব্যের সবটাই অক্ষয় সুর মশায়ের নয়, বেশ কিছুটা আমিও জুড়ে দিয়েছি। খুব রেগে গিয়েই সেটা করেছি, কারণ দিব্য-চক্ষে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বছর কয়েকের মধ্যেই শহরতলিতে এক দেড় কাঠা জমি কেনার টাকা আমার জমেছে; জমিদার হবার কিয়ৎকাল পরে একতলা একটা 'ভিলা' তৈরির টাকাও জমিয়েছি, কিন্তু পাইপ ' পাইপের দাম সরকারী পরিকল্পনার কল্যাণে যদি আরও চারগুণ বেড়ে যায় তখন?

অবশ্য সুর-নিয়োগী-কুমার তখনো থাকবেন; নিশ্চয়ই আমার জমি বাড়ি তৈরির আগেই তাঁদের 'প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী' উৎসবের শুভসংবাদ দশদিকে ঘোষিত হবে: সুর এনামেল, সুর ইন্ডাস্ট্রিজ, নিরুলিয়া ফার্ম, সুর এস্টেটস, সুরশ্রী সিনেমা (কত আর নাম করবো নন্দীগ্রামের তারিণীচরণ সুর মহাশয়ের উত্তরপুরুষের কীর্তি-কলাপের?) সব কটি প্রতিষ্ঠানই দৃপ্ত পদক্ষেপে রজত, সুবর্ণ, হীরক জয়ন্তীর দিকে এগিয়ে চলবে।

আমার ঘাটতি বাজেটের জন্যে আমার নতুন বাড়ির পাইপ ফিটিংস কিনতে না পেরে আমি তখন সমদর্শনবাবুর কাছে যাবো, কারণ অক্ষয়বাবু ততদিনে নিশ্চয়ই রিটায়ার করেছেন। গিয়ে বলবো, আপনা-দের শুভ হীরক জয়ন্তী উৎসবে যে লোকটা ছাই পাঁশ কী সব লিখেছিল সে মোরারজী ভাইয়ের (তিনি তখনো অর্থ মন্ত্রকে মৌরসী করে অনর্থ ঘটাচ্ছেন) কল্যাণে কয়েক গাছা পাইপের টাকা যোগাড় করতে পারছে না। সমদর্শন দেবেন কি কয়েক গাছা পাইপ সস্তা দরে?

নিম্নবিত্ত ভারতবর্ষের প্রতীক বন্ধু আমাকে তিনি চিনতে পারাতে পাইপ কয়েক গাছা পেয়ে যাবো দারুণ সস্তায়। আর আমি তাঁকে কল্যাণ কামনা করে আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি ফিরবো। সেই হবে তাঁর সংগে আমার শেষ দেখা, কারণ সুর-নিয়োগী-কুমারের শতবার্ষিকী উৎসব যখন তিনি মহা আড়ম্বরে পালন করবেন তখন আমি থাকবো না।

বিশ্বকর্মা

এখন আর ঘন ঘন মুখে পাউডার মাখার দরকার নেই!
ল্যাকমে ফেস পাউডার রেশম দিয়ে চেলে নেওয়া
বলেই মুখে লেগে থাকার ক্ষমতা এর অসাধারণ।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর পাউডার না মাখলেও চলবে।
ল্যাকমে
ফেস
পাউডার
হাল্কা। সমীরের মত স্নিগ্ধ।
মুখে সুন্দর লেগে থাকে।
ল্যাকমে ফেস পাউডার
পাবেন মনোহারী ৫টি রঙে।
তার একটি ঠিক আপনারই
মনের মত।
মানানসই ল্যাকমে
কম্প্যাক্টও আছে।
চেয়ে নিন।
Lakmé
ASP/L-39

(উনচল্লিশ)

টেলিফোনে ওই কথা শোনার পর অনাদিপ্রসাদের আর ইচ্ছে ছিল না বাড়ি ফেরার। তবু ফিরতে হল। স্ত্রী, পুত্র, সংসার-এর স্বীকৃতি না দিয়ে তো সমাজে টেকার উপায় নেই। অথচ জীবনে আঘাত যে সবচেয়ে বেশি ঐখান থেকেই আসে। যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক, যেখানে প্রেম প্রীতি সেখানে যখন সন্দেহের ফণীমনসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, ঈর্ষার কালো মেঘ জমা হয়, কিম্বা কলহের ঘায়ে পুঞ্জ জমে ওঠে, তখনই স্পর্শকাতর মন বিমুখ হয়। ভেতরে ভেতরে সে শুকিয়ে যায়, আর কোন ব্যাপারেই নিজেকে জড়াতে ইচ্ছে করে না।

অনাদিপ্রসাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি ফিরলেন। চাকর এসে খবর নিয়ে গেল কিছু দরকার আছে কিনা। অনাদিপ্রসাদ শুকনো জবাব দিলেন, না। জিজ্ঞেস করলেন, মা কোথায়?

—বড় দাদাবাবুর ঘরে।

—ওনারা জানেন আমি ফিরেছি?

—হাঁ।

—ঠিক আছে তুমি যাও।

আর কথা না বাড়িয়ে অনাদিপ্রসাদ অন্যমনস্কভাবে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। মনে পড়ছে এখানে বাড়ি তৈরি করার কথা, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, সারাজীবন ভাড়া বাড়িতেই কেটেছে, এখানে আসার আগে পর্যন্ত তিনখানা ঘরের বাসা নিয়ে মধ্য কলকাতায় ছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে রমলা, অনাদিপ্রসাদের অসচ্ছল সংসারে এসে পড়ে প্রথমটা তার অসুবিধেই হয়েছিল। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে বউ হয়ে এসে সবকিছুই সহ্য করে নেয়। রমলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একে একে দুটি ছেলে হল, সংসার চালাবার জন্যে অনাদিপ্রসাদকে মাঝে মাঝে চাকরি করতে হয়েছে, কখনও বা টিউশানী। কিন্তু কোনদিনই বই পড়া এবং লেখার অভ্যাস ছাড়েন নি। কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে এক একটা উপন্যাস লেখার জন্যে। অভাবের তাড়না কত সময় অনাদিপ্রসাদকে বাধ্য করেছে ভাল ভাল বই-এর কপি রাইট বিক্রি করে দিতে। না করে উপায় ছিল না, টাকার প্রয়োজন। বড় খোকার টাইফয়েডের সময় বড় ডাক্তার ডাকার মত হাতে পয়সা নেই, রমলা হাতের দুগাছা চুড়ি বিক্রি করতে চেয়েছিল। অনাদিপ্রসাদ তা করতে দেন নি। এক ধনী লোকের হয়ে বেনামে উপন্যাস লিখে দেবার স্বীকৃতি জানিয়ে দেড় শ'টি টাকা নিয়ে এসেছিলেন। সেই উপন্যাস এখনও বাজারে চলে, তবে অন্যের নামে। নিজের ছেলেকে বাঁচাতে তাঁর মানস কন্যাকে তার পিতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ছোট ছোট কত ঘটনা। জীবন সংগ্রামের চাপ কিন্তু সে জীবনে আনন্দ ছিল। প্রতি দিনের বেঁচে থাকার লড়াই এ প্রত্যেককে চেনা যেত। অনাদিপ্রসাদের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেকে সাহিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা করা, তার জন্য প্রাণপাত করে খেটেছেন। রমলা চেয়েছিল বড় আপদের হাত থেকে ছোট্ট সংসারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। তখন হাসিমুখে সে সংসারের সমস্ত কাজ করেছে, ছেলেদের মানুষ করেছে, স্বামীকে উৎসাহ দিয়েছে। ফুটফুটে দুটি ছেলে মা বাবার স্নেহ জ্যোৎস্নায় ক্রমশ বেড়ে উঠেছে।

ক্রমে অনাদিপ্রসাদের নাম হল, টাকা হল, গাড়ি হল, বাড়ি হল। এখানে গৃহ প্রবেশের দিন কত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রকাশক ও ভক্তদের ভিড়। সেদিন হয়ত অনাদিপ্রসাদের মনে হয়েছিল তিনি খুব সুখী কারণ যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এ তাসের ঘর, যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে। নিশ্চয় নীচে বসে রমলা ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করছে পরেশ চন্দ্র যে উপদেশ দিয়েছেন কিভাবে তা কার্যকরী করা যায়। অথচ এ-বাড়ি না থাকলে এত সব দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আশ্চর্য মানুষের মন। বাড়ি যখন তৈরি প্রায় প্রতিদিন অনাদিপ্রসাদ স্ত্রীকে নিয়ে আসতেন, ছাতা মাথায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন মিস্ত্রীরা ঠিকমত কাজ করছে কিনা। ছোট খাট পরিবর্তন, কত মাজা ঘষা, তবে না মনের মত করে বাড়ীটি তৈরী হয়েছিল, তারপর ঘুরে ঘুরে আসবাবপত্র কেনা, যাতে বেশি খরচ না হয় অথচ মানানসই হয়। প্রতিটি নিজের হাতে করা।

ক্লান্ত অনাদিপ্রসাদ হাতমুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কেন জানা নেই তাঁর দু' চোখে জল ভরে এল। কোন একটি বিশেষ চিন্তা যে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে তা নয়। অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ছে, স্নেহ ভালবাসায় ভরা একটা

নিবিড় সম্পর্কের কথা। সবই যে আজ আলগা হয়ে গেছে। এ অশ্রু বোধ হয় তারই জন্যে।

অনাদিপ্রসাদের তন্দ্রা এসেছিল. খুটখাট আওয়াজে চোখ মেলে তাকালেন, দেখলেন রমলা বউদি আলমারী খুলে অন্ধকারে কি যেন হাতড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি খুঁজছ রমি?

রমলা বউদি চমকে ওঠেন, কিছু না তো। তুমি জেগে আছ বুঝি?

—এখুনি ঘুম ভেঙে গেল।

—খেয়েছিলে?

অনাদিপ্রসাদ মিথ্যা বললেন. হাঁ। তারপর আস্তে আস্তে গম্ভীর গলায় বলেন. এ বাড়ির দলিল? বাঁদিকের দেরাজে পাবে। ইনসিওরেন্সের পলিসিগুলো আছে আমার টেবিলের দেরাজে। আর ব্যাঙ্কের চেকবই, পাশবুক সে তো সব তোমার কাছেই আছে।

রমলা বউদির গলা শুকিয়ে যায়, তুমি কি করে জানলে যে আমি এইগুলো খুঁজছি।

—যদি কখনও খোঁজ তাই বলে রাখলাম। আজ আমি আছি, কিন্তু কাল নাও তো থাকতে পারি।

—তার মানে?

অনাদিপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, মানুষের জীবনের কথা কেউ কি কিছু বলতে পারে।

এরপর রমলা বউদি আরও দু একটা কথা বলেছিল কিন্তু অনাদিপ্রসাদের কাছ থেকে কোন উত্তর পায়নি, ভাবল বোধ হয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সে রাত্রে কিন্তু অনাদিপ্রসাদ ঘুমাননি। স্ত্রী শুয়ে পড়ার পর উনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন। আস্তে আস্তে নেমে গেছেন নীচে, হাজির হয়েছেন ছেলেদের ঘরে। দেখতে দেখতে এরা বড় হয়ে গেছে, সেদিনের শিশু আজ যুবক। সামনে তাদের নতুন জীবন, নিজেদের ভাল করে প্রতিষ্ঠা করতে চায়. এই চায় না অহেতুক কোন বাধা-বিপত্তি এসে পড়ে সামনে। অনাদিপ্রসাদ ওদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন এরা যেন সুখী হয়। মাথায় হাত দেবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে চেষ্টা সামলালেন পাছে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারের মধ্যে ফিরে আসছিলেন ধাক্কা লেগে একটা ছোট টেবিল উল্টে গেল। বড় খোকা সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল খাটে, সভয়ে প্রশ্ন করল, কে, কে ওখানে।

অনাদিপ্রসাদ ছোট্ট উত্তর দিলেন, আমি।

ছেলের গলায় বিস্ময়, এত রাত্রে এখানে কি করছ?

—কিছু না, এমনি।

অনাদিপ্রসাদ কিন্তু বুঝতে পারলেন বড় ছেলের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা, কিসের যেন ভয়, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

—কি বলব?

আর কথা না বাড়িয়ে অনাদিপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন বড় খোকা বাস্ত ভাবে ছোট ভাইকে ঘুম থেকে তুলল। হঠাৎ কেন বাবা ওদের ঘরে গিয়ে ছিলেন তাই নিয়ে ভীতত্রস্ত আলোচনা। অনাদিপ্রসাদ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন ছেলেরা তাঁকে ভয় পাচ্ছে কেন, কি এমন তিনি করেছেন যাতে এদের মনে সংশয় জেগেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছিলেন, পিছন ফিরে দেখলেন দুই ছেলেই দরজায় দাঁড়িয়ে। হাসবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল? তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, কোন জবাব দিতে পারল না।

অনাদিপ্রসাদ উপরে উঠে এলেন, বুঝতে পারলেন ছেলেরা তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সমাজের কাকেরা তাঁর নামে যে কুৎসা রটাচ্ছে তারা তা বিশ্বাস করেছে, হয়ত ভয় পেয়েছে যদি অনাদিপ্রসাদের শেষ পর্যন্ত ভীমরতি হয়, যদি তারা বঞ্চিত হয় পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে। নইলে চোখেমুখে কেন ওই বিহ্বল আশঙ্কা।

অনাদিপ্রসাদের মন যখন এইভাবে ক্ষত-বিক্ষত তখন তাঁর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন সাধনবাবু। সম্পাদককে লেখা তাঁর একটা চিঠি বার হল সাপ্তাহিক নর্দমায়। সাধনবাবু সম্পাদককে ধন্যবাদ দিয়েছেন অনাদিপ্রসাদের মত সাধুর মুখোশ পরা লম্পটের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে বলে। এ থেকে সমাজ উপকৃত হবে, শিক্ষা পাবে, কারণ তিনি নিজে ভুক্তভোগী। ভদ্রলোক অকপটে লিখেছেন তার বিংশোত্তরী কন্যা মীনার সর্বনাশের কারণও নাকি ওই অনাদিপ্রসাদ। মেয়েটা আজ পাগল অবস্থায় বিধবার জীবন যাপন করছে, নয়ত তাকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে সাধনবাবু প্রমাণ করে দিত বিয়ের লোভ দেখিয়ে মেয়েকে তার বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাবার মূলে আছেন ওই ভণ্ড লেখক অনাদিপ্রসাদ।

আহা চণ্ডীতলাতে যেন ফোড়ন পড়ল, জিভে শান দিয়ে সকলেই প্রায় এই নোংরা আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল।

—বাবা যা রটে তার কিছু বটে, কি ভদ্রলোক সেজে থাকত যেন হাফ সন্ন্যাসী। এর তলায় তলায় এত ছিল।

—লোকটা রসিক, মেয়েগুলোর বয়েস দেখছিস না কুড়ির নীচে, তবে না পিরীত।

—যত শালা বাস্তববাদী সাহিত্যিক, সব শালার চরিত্র খারাপ।

পথেঘাটে রেস্তরাঁয় সর্বত্র এই আলোচনা। ছেলেরা লজ্জায় বাড়ি থেকে বার হওয়া বন্ধ করল। রমলা বউদি ঢুকলেন পুজোর ঘরে, কিন্তু কৌঁসুলী পরেশ চন্দ্র দুশ্চিন্তায় হয়ে রইলেন পাছে না সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়। বোন আর ভাগ্নেদের সঙ্গে নানারকম জল্পনা-পরামর্শ, ফন্দি ফিকির।

সকলের আস্থা, তুমি যা করবে তাই হবে, তোমার ওপরই ভরসা করে আছি। পরেশ চন্দ্র সদম্ভে ঘোষণা করেন, আমি ওসব সাহিত্যিক টাহিত্যিক মানি না। সমাজে বাস করতে গেলে মানুষকে মানুষের মত থাকতে হবে. এসব কি নোংরামি। বাচ্চা বাচ্চা সব মেয়ে নিয়ে ছি, ছি।

ছেলেদের প্রস্তাব, মামা তুমি একবার বাবার সঙ্গে কথা বল না।

—তাই বলতে হবে দেখছি।

অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে পরেশ চন্দ্রর সাক্ষাৎ হয়েছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে নয়। আগে থেকেই পরেশ চন্দ্র সময় ঠিক করে নিয়েছিলেন। দেখা হতেই বললেন, অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

অনাদিপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, আমি তো ভেবেছিলাম বিষয় একটাই।

—কি?

—যা নিয়ে সবাই আলোচনা করছে, যা

নিয়ে কাগজে লেখালেখি চলছে, যা আপনারা সবাই বিশ্বাস করছেন।

পরেশ চন্দ্র থতমত খেয়ে যান, তা ঠিক নয়।

—কেন কথা ঘোরবার চেষ্টা করছেন, আমি তো বোকা নই। বুঝতে পারছি আমি এক ঘরে হয়ে গেছি। নর্দমায় ছাপা নোংরা কাহিনী শুধু আপনার কেন রমলার, ছেলেদের মন বিষিয়ে দিয়েছে।

—তুমি এ সবের প্রতিবাদ করলে না কেন?

—তাতে কি লাভ হত।

—তবু তো আমাদের মুখ থাকত। প্রতি-বাদ না করার অর্থ সবকিছু সত্যি বলে তুমি মেনে নিলে।

অনাদিপ্রসাদ উদাস গলায় বললেন, যা ঘটবার ঘটে গেছে, কাঁচে ফাটল ধরেছে আর জোড়া লাগাবার উপায় নেই।

পরেশ চন্দ্র শঙ্কিত হন, তাহলে তুমি এখন কি করতে চাও?

অনাদিপ্রসাদের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জাগল, বললেন, ভাবছি, যে মেয়েটিকে নিয়ে এত কেলেঙ্কারি তার নামেই আমার বিষয় সম্পত্তি সব লিখে দেব।

ব্যস্ আগুনে যেন ঘিন পড়ল। পরেশ চন্দ্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন, সত্যিই দেখছি তোমার ভীমরতি হয়েছে। নয়ত এরকম পাগলামী কেউ করে। তবে এইটুকু জেনে রেখ, তুমি যত চেষ্টাই কর আমার বোন, ভাগ্নেদের বঞ্চিত হতে আমি দেব না, যদি তুমি উইলও কর আমি কোর্টে প্রমাণ করে ছাড়ব তুমি পাগল, মাথার ঠিক নেই, তাই পাগলামির ঝোঁকে এইসব করেছ।

অনাদিপ্রসাদ হো হো করে হাসলেন, বলিহারি আপনাদের, এত দূর পর্যন্ত ভেবে ফেলেছেন। সামান্য এই সম্পত্তির জন্যে আমার স্ত্রী, আমার ছেলেরা আমাকে পাগল সাজাতে চায়। চমৎকার, আর তো কিছু বলার নেই এবার উঠি।

—সেকি কোন কথাই তো হল না।

—নাই বা হল, অনাদিপ্রসাদ আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। থামলেন না, চললেন। পথ চলার নেশা আজ তাঁকে পেয়ে বসেছে কত রকম ছবি ফুটে উঠছে। সে-সবদিকে খেয়াল না করে তিনি শুধু এগিয়ে চললেন। যখন খুব ক্লান্ত মনে হল, উঠে বসলেন ট্যাক্সিতে বললেন, চলুন, দক্ষিণেশ্বর।

গেটের কাছে সাধুজী দাঁড়িয়েছিলেন, সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন, কি, কাক চিল সবাই মিলে তাড়া করেছে বুঝি, তাই পালিয়ে এসেছ?

অনাদিপ্রসাদ সমর্থন জানান, ঠিক বলেছেন সাধুজী।

—ওদের নজর কিন্তু তোমার হাতে যে খাবার ভরা শালপাতার ঠোঙা আছে তার দিকে। ছুঁড়ে ফেলে দাও না ভাই, ল্যাঠা

ঢুকে যাবে। কেউ আর তোমায় বিরক্ত করতে আসবে না, তখন মন দিয়ে কাজ করতে পারবে।

অনাদিপ্রসাদ বললেন, আমিও তাই ভেবেছি।

—দেখছ না আমার ঐ আশ্রমের ওপর আকাশ পরিস্কার, কাক, চিল, কারুর উপদ্রব নেই, আর ঐ দেখ গৃহস্থের বাড়ির ওপরে ওরা পাক খাচ্ছে। যদি কোন সুযোগে বড়িটা, মাছটা, মাংসটা নিয়ে পালাতে পারে।

সেদিন অনেক কথা হল। বিদায় নিয়ে অনাদিপ্রসাদ যখন চলে আসছেন, সাধুজী স্নিগ্ধ হেসে বললেন, অনেকের বাড়ির দরজা তোমার জন্যে বন্ধ হলেও এ আশ্রম সব সময় খোলা থাকবে, যখন খুশী চলে এস। আমার যে ভাবে চলে যাচ্ছে তোমারও চলে যাবে।

চেষ্টা করেও অনাদিপ্রসাদ চোখের জল সামলাতে পারলেন না।

সেইদিন থেকে অনাদিপ্রসাদ আর বাড়ি ফেরেন নি। কোন আত্মীয়স্বজনের কাছেও যান নি। প্রথমটা খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে সবাই চিন্তিত হয়েছিল মানুষটা সত্যিই যদি উইল বদলায়, মামলা মকদ্দমা এড়ানো যাবে না। তাতে শুধু হাঙ্গামাই বাড়বে না, খবরের কাগজে পারিবারিক কেচ্ছাকাহিনী বেরতে থাকবে।

রমলা বউদি হাউ মাউ করে কেঁদেছে, তাহলে আমাদের কি হবে দাদা? পরেশ চন্দ্র উপদেশ দিয়েছেন, ধৈর্য হারাসনি, দু'দিন শক্ত হয়ে থাক, দেখি না শেষ পর্যন্ত কি হয়।

দু'দিনও তাদের অপেক্ষা করতে হয়নি, অনাদিপ্রসাদের অ্যাটর্নী খবর দিল অনাদিপ্রসাদ এ-বাড়ি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছেন, ইনসিওরেন্সের পলিসির নমিনিও রমলা বউদি। ব্যাঙ্কের টাকা জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে ছিল, অতএব এখন থেকে রমলা বউদি চেক কাটতে পারবে। এ সবের উপর কোন স্বত্বই অনাদিপ্রসাদ রাখেন নি।

উৎকণ্ঠিত পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যাক্, কিছুই তাহলে হাত ছাড়া হয়নি।

কিন্তু হুঁশিয়ার পরেশ চন্দ্র জিজ্ঞেস করতে ভোলেন নি, অনাদিপ্রসাদের বই-এর রয়ালটি কে পাবে, সেই তো আসল টাকা।

অ্যাটর্নী জানাল, সে ব্যবস্থাও উনি করছেন, পরে আপনাদের জানাব।

—কিন্তু অনাদি এখন আছে কোথায়?

—তাতো জানি না। এর মধ্যে দু'দিন আমাদের অফিসে এসেছিলেন। আবার কবে আসবেন তাও বলেন নি।

—আশ্চর্য।

অনাদিপ্রসাদ কিন্তু আগের মতই শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরিচিত জনের কাছে যান নি, অপরিচিতের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। একদিন খেয়াল হয়েছিল গিয়েছিলেন আফিম মিত্তিরের খোঁজে। পার্কের কাছে বস্তি, খোঁজ খবর করতে একজন প্রৌঢ় লোক বেরিয়ে এল, প্রশ্ন করল আফিমদা কি আপনার আত্মীয়?

অনাদিপ্রসাদ জানালেন, না। ঐ পার্কে পরিচয় হয়েছিল।

—আমরা খুঁজছি যদি ও'র আত্মীয়স্বজন কেউ এসে পড়ে।

—কেন?

—আফিমদা মারা গেছে। দিব্যি লোক মশায়, রাত্রিবেলা আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে শুয়ে পড়ল সকালে আর ঘুম থেকে উঠল না। আমার পাশে চৌকিতে শুয়ে ছিল, ডাকতে গিয়ে দেখি শক্ত কাঠ শুয়ে আছে। এতটুকু কষ্ট পায়নি।

—তারপর?

—শুনেছিলাম হাওড়ায় আফিমদার বাড়ি, বউ ছেলে সব আছে, খবরও পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু কেউ আসেনি। যাক তবু আপনি খোঁজ নিলেন। লোকটা মশাই পুণ্যাত্মা ছিল, মরেছে তখনও মুখে হাসি।

ওখান থেকে চলে আসার পথে অনাদিপ্রসাদ সেই পার্কে ঢুকলেন। সেই গাছের ছায়া, সেই বেঞ্চি, সেই লোকটা যে গেটের কাছে বসে চা বানাচ্ছিল। অনাদিপ্রসাদের মনে হল আফিম মিত্তিরের আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছেন, দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার।

পরিচিত জনের মধ্যে মনুয়ার সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন অনাদিপ্রসাদ। মনুয়া তখন কোন পার্টিতে যাবার জন্যে সাজছিল, তবু অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রসাধন না সেরেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—কি ব্যাপার বলুন তো আপনার, কোথাও খোঁজ করে পাচ্ছি না, কোথায় ছিলেন এতদিন?

অনাদিপ্রসাদ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ আমার খোঁজ পড়লই বা কেন?

—বাঃ, আপনি যে আমার লোকাল গার্জেন।

এ কথায় হাসবার চেষ্টা করেও দুজনে পারল না। এই একটা সহজ সম্পর্ককে নিয়ে কম প্রহসন তো হয়নি।

মনুয়া বলল, আমি অনেকবার আপনার বাড়িতে ফোন করেছি, বাড়ির লোকেরা তো কিছুই বলতে চায় না, তবে ঝি চাকররা ধরলে বলে ফেলে আপনি বাড়িতে নেই, থাকেন না।

—সত্যি অনেকদিন যাইনি।

—তাহলে এখন কোথায় থাকেন?

—এত বড় কলকাতার শহরে আবার থাকবার ভাবনা। হোটেল আছে, ধর্মশালা আছে দুটো বড় বড় স্টেশন আছে; গড়ের মাঠ আছে, ফুটপাথ আছে। মনুয়া রাগের ভান করে বলে, ওসব কথা আমি শুনব না, আপনাকে এইখানে এসে থাকতে হবে, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

অনাদিপ্রসাদ হাসলেন, অসুবিধা আমার হবে কেন, এই দু'খানা ঘরের মধ্যে আমাকে রাখতে গেলে তুমিই হাঁফিয়ে উঠবে।

—মোটেও না। কালই গিয়ে আপনার জিনিসপত্র সব নিয়ে আসব।

—জিনিসপত্র তো আমার কিছু নেই।

—মন্‌য়া গম্ভীর হয়ে বলে, তাও আমি শুনেছি। আপনি সবকিছ্‌ অন্যদের লিখে দিয়েছেন।

অনাদিপ্রসাদ বিস্মিত হন, তুমি কি করে জানলে?
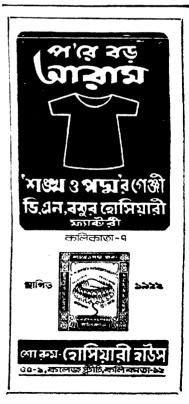
—বাঃ, আজকাল তো এই নিয়ে খ্‌ব আলোচনা হয়। আগে লেখক হিসেবে যত না নাম ছিল এখন কিন্তু এই ব্যাপারের জন্যে আরও বিখ্যাত হয়ে গেছেন। আমারও কি এখন কম খাতির। কত লোক আসছে, এমনকি কাগজওয়ালারাও। আপনার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছে।

—তা তুমি কি বল?

মন্‌য়া দ্‌ষ্ট্‌মী করে বলে, তা বলব কেন? তবে এইবার আপনাকে আটক করে রাখব, জোর করে লেখাব।

এসব ব্‌দ্ধি কে তোমার মাথায় ঢোকাল?

—আপনার প্রকাশক, স্‌নীল রায়।

অনাদিপ্রসাদ অবাক না হয়ে পারেন না, সনীল সত্যিই নাছোড়বান্দা, রমলাকে ছেড়ে এখন মন্‌য়াকে ধরেছে, অনাদিপ্রসাদকে দিয়ে সে সোনার ডিম পাড়াবেই।

অনাদিপ্রসাদ উঠে পড়েন, এসেছিলাম তোমার কাছে বিদায় নিতে।

মন্‌য়া এ কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না, জিজ্ঞেস করে, সে কি, কোথায় যাচ্ছেন?

—কিছ্‌ ঠিক করিনি। অনেকদিন তো কলকাতায় কাটানো গেল, তাই ভাবছি—,

মন্‌য়া ব্যস্ত হয়ে বলে, না, না, এ ভাবে আমি আপনাকে চলে যেতে দেব না। যাচ্ছেন অভিমানে, কিন্তু দোষ তো আমার।

অনাদি প্রসাদ মাথা নাড়েন, দোষ কার্‌র নয়। দরকার ছিল। নিজেকে এখন খ্‌ব হাল্কা মনে হচ্ছে। অনেকদিন লিখিনি, এবার বোধ হয় লিখতে পারব। আজ চলি মন্‌য়া, আবার হয়ত দেখা হবে।

মন্‌য়ার চোখ ছল ছল করে উঠল, কিন্তু অনাদিপ্রসাদকে বাধা দিতে সাহস করল না।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ব বিজ্ঞান

৯টি মহাজাগতিক বিকিরণের উৎস

পাল্‌সার্‌ শব্দটির প্রচলন মহাজাগতিক অভিযানের যুগে। মানুষের ধমনীর মত মহাজগতের মধ্যে এই পাল্‌সার্‌গুলি নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্পন্দিত হয়ে চলেছে। পাল্‌সার্‌ শব্দটি হচ্ছে পাল্‌সেটিং স্টারের সংক্ষিপ্ত নাম। পাল্‌সার্‌গুলি থেকে মহাজাগতিক বিকিরণ শক্তি প্রবাহিত হয়। এই রকম অসংখ্য পাল্‌সার্‌ আছে মহাবিশ্বে। কিন্তু মানুষ ক'টির সন্ধান পেয়েছে? কেম্ব্রিজ থেকে পাল্‌সার্‌ সম্পর্কে প্রথম সংবাদ প্রকাশিত হবার পর এক বছরের মধ্যে ৪টি পাল্‌সারের

অসিলস্কোপে পাল্‌সার স্পন্দনের রেখা
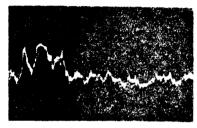
হদিস পাওয়া যায়। তারপর কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর একটি পাল্‌সার্‌ আবিষ্কৃত হয়। হালে কেম্ব্রিজ থেকে আরো দুটি পাল্‌সারের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়েছে। সব শেষে অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয় মহাশূন্যের দক্ষিণ দিকে আরো দুটি পাল্‌সারের খোঁজ পেয়ে সেই খবর কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়কে জানায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এ পর্যন্ত ৯টি পাল্‌সারের সন্ধান পাওয়া গেল।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ য়েভের্ণ্ট বার্জিয়ান জানাচ্ছেন যে, অস্ট্রেলিয়া থেকে আবিষ্কৃত ঐ দুটি পাল্‌সার্‌ যথাক্রমে প্রতি ০·৫৬ সেকেণ্ডে ও ১·৯৬ সেকেণ্ডে ১ বার করে স্পন্দিত হচ্ছে। এর আগে যেগুলির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির স্পন্দনের হার ০·২৫ সেকেণ্ড এবং ২ সেকেণ্ডের মধ্যে ১ বার। স্পন্দন বেগের এই সমতুল্যতা থেকে পাল্‌সার্‌গুলির চরিত্র সম্পর্কে কিছু কিছু রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধানে ভূপ্রদক্ষিণকারী লেবরেটরী

অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রখচিত মহাশূন্যে মহাবিশ্বের আবির্ভাব কবে এবং কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে অনুমিতি আছে নানা রকমের কিন্তু কোন্‌টি যে ঠিক তা আজ পর্যন্ত নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারেন না। একটি অনুমিতি হচ্ছে এক অবিশ্বাস্য রকমের ঘনত্বসম্পন্ন পরমাণুর বিস্ফোরণ থেকেই গ্রহ-নক্ষত্রগুলির উদ্ভব। আর একটি হচ্ছে যে, মহাবিশ্ব বরাবরই এই রকম ছিল তবে মাঝে মাঝে বহু পুরাতন তারার মৃত্যু ঘটলে তার স্থান গ্রহণের জন্য নতুন নক্ষত্রের উৎপত্তি হয়েছে।

মহাবিশ্ব সসীম না অসীম? মহাবিশ্ব যদি স্থান ও কালের দ্বারা সীমায়িত হয় তা হলে তার বয়েস কত এবং দূরতম সীমান্ত কোথায়? আজ আমরা যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দেখতে পাচ্ছি সেগুলির অধিকাংশই কি বয়সে নবীন? যদি তাই হয় তা হলে তারার জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর রাশিচক্র কি রকম? এই সব জটিল প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব আজও পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু জবাব পাবার আশায় মহাশূন্যে বহু লেবরেটরি পাঠানো হচ্ছে যেগুলি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে করতে মহাজগৎ সম্পর্কে এই সব প্রশ্নের জবাব আদায় করার চেষ্টা করছে। আমেরিকার ভূপ্রদক্ষিণকারী লেবরেটরী এবং রাশিয়ার কজমস জাতীয় স্পুৎনিকগুলি এই কাজে নিযুক্ত।

আমেরিকা কিছুকাল আগে একটি ঐ
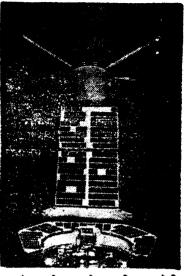
এই জাতীয় ভূপ্রদক্ষিণকারী লেবরেটরী মহাশূন্যে পাঠানো হয় আমেরিকা থেকে

ধরনের লেবরেটরি তৈরি করেছিল। সেটি সম্ভবত যে কোন কারণে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়। এই ১৮ই নভেম্বর দ্বিতীয় লেবরেটরীটি অ্যাটলাস—সেণ্টর রকেটের সাহায্যে কক্ষপথে পৌঁছে দেবার কথা (এই লেখা ছেপে বার হবার আগেই লেবরেটরীটি মহাশূন্যে চলে যাবে যদি কোন বাধাবিপত্তি দেখা না দেয়)। ২·২ টন ওজনের এই

লেবরেটরির একটি জানালা মহাশূন্যের দিকে খুলে যাবে এবং সেইখান দিয়ে ১১টি স্বয়ংক্রিয় দূরবীন (বৃহত্তমটি ১৬ ইঞ্চি লম্বা) তড়িচ্চোম্বক বর্ণচ্ছত্র ভেদ করে মহাজগতের দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত করবে। সেটির কক্ষপথ হবে গোলাকার এবং পৃথিবীর ৪৮০ মাইল উপরে। এই দ্বিতীয়টির পরে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে আরো দুটি লেবরেটরি মহাকাশে পাঠানো হবে।

এর আগে আমেরিকা থেকে এত ভারি কৃত্রিম উপগ্রহ কখনো আকাশে পাঠানো হয় নি। লেবরেটরিটি ১০ ফুট উঁচু এবং ২১ ফুট চওড়া (সৌর ডানা দুটি মেলে দেওয়ার পর।) দূরবীনগুলি বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রের অতি বেগুনী, অব লোহিত, গামা রশ্মি ও এক্স রশ্মি অংশগুলি পরীক্ষা করবে যা পরিদৃশ্যমান আলোকরশ্মির বর্ণচ্ছত্রে নজরে আসে না। দূরবীনগুলির কর্তব্য হবে পূর্বনির্ধারিত ৬টি নক্ষত্র পরীক্ষা করা। ৫০০ ফুট দূর থেকে একজন মানুষের ডান ও বাঁ চোখ আর একজনের দৃষ্টিতে যেমন বোঝা যায় এই দূরবীনগুলি থেকে নির্দিষ্ট তারার দূরত্ব হবে তারই সমতুল্য।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রপ্রদর্শনী

স্কেচ —সুনীল সরকার

সম্প্রতি শিল্পী সুনীল সরকার, শ্যামল লাহিড়ী ও শ্রীমতী সন্তোষ রোহাতগী বিভিন্ন গ্যালারীতে তাঁদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

শিল্পী সুনীল সরকার ১৯৫৩ সালে সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং কিছুকাল ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করার পর বর্তমানে আর্মেনিয়ান কলেজে কলাশিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। শিল্পীর এটিই প্রথম প্রদর্শনী। সুনীল সরকারের বিষয়বস্তু ন্যুড ও অনাবৃত ও অর্ধাবৃত নারীদেহের বিভিন্ন রূপ ও কয়েকটি স্টাডি। শারীর বিদ্যায় সম্যক ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য সজীব মডেল থেকে স্টাডি করা প্রায় প্রত্যেক কলা-শিক্ষালয়ের শিক্ষার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। দুঃখের বিষয় আধুনিক ও বিমূর্ত শিল্পের প্রভাবে পড়ে জনসাধারণের আজকাল ন্যুড বা ওই জাতীয় রচনা দেখার সুযোগ মেলে না। প্রদর্শনী দেখে বোঝা যায় যে দীর্ঘকাল এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করার পরই সুনীল সরকার সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং এ যুগে এ জাতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে তিনি নিজ আদর্শ-বাদের পরিচয় দিয়েছেন।

তুলি ও রঙের যাদুস্পর্শে ন্যুড ও যৌবনবতী নারীদেহ-সৌন্দর্য বর্ণনায় অদ্বিতীয় ছিলেন পরলোকগত শিল্পী হেমেন মজুমদার। তাঁর রচনা, পরিত্যক্তা (castout) এখনও অনেকেরই মনে আছে। সুনীল সরকারের স্কেচগুলি দেখতে দেখতে হেমেন মজুমদারের কথা সহজেই মনে পড়ে। সুনীল সরকারের দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও শিল্পী-সুলভ, হাত পাকা ও ড্রয়িং প্রায় নিখুঁত—প্রায় বললাম এ জন্য কারণ, দু এক স্থলে ড্রয়িং একটু আড়ষ্ট বলে মনে হয়, যেমন টুইস্ট-এর অংশ বিশেষ। তাহলেও নতুন দৃষ্টি কোণ ও পটভূমিকায় তরুণী নারী-দেহলতার তিনি যে বিভিন্ন স্কেচ করেছেন সেগুলির অধিকাংশই সুন্দর। সাধারণ ক্ষেত্রে নারীর এ জাতীয় রূপ ও ভঙ্গী আমাদের চোখে পড়লেও হয়ত আমাদের মনে দাগ কাটে না, অথচ সেগুলিই শিল্পীর পেনসিল, কনটি ও চারকোল মাধ্যমে এক একটি বিশিষ্ট মুড হিসাবে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে পারস্-পেকটিভ, মুভমেণ্ট ও বেণ্ড উল্লেখযোগ্য। নারীর একটি অতি পরিচিত ও স্বাভাবিক মধুর ভঙ্গী শিল্পীর অনবদ্য স্কেচ গুণে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে—যেমন ব্যাকলাইট। স্টাডির মধ্যে ভাগাবেশন-এর নাম করা যায়। একটি গোয়ালা বালতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে—উপরিস্থিত নিজ কক্ষ থেকে নীচে কোন বাড়ির দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান পেশীবহুল কোনও গোয়ালার পুরুষোচিত সুগঠিত দেহ সৌন্দর্যই শিল্পী বলিষ্ঠ রেখা মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অপরাপর ছবির মধ্যে ওয়েস্ট উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী শ্যামল লাহিড়ীর প্রদর্শনী হয় অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে। শ্যামল লাহিড়ী কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজ ও দিল্লি সারদা উকিল আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বর্তমানে তিনি শিল্পী হিসাবে দিল্লির টেলিভিশন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এটিই শিল্পীর প্রথম প্রদর্শনী ও এখানে তাঁর একটি রচনার নিদর্শন দেখা যায়। শ্যামল লাহিড়ী তরুণ এবং তাঁর বিভিন্ন রচনা দেখে বোঝা যায় যে তিনি যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করেন। অধিকাংশ ছবিই পৌরাণিক আখ্যান, বহির্দৃশ্য ও স্টিল-লাইফ অবলম্বনে ভারতীয় ধারায় রচিত। সুতরাং সমসাময়িক পটভূমিকাতে অনেকের কাছেই সেগুলি আদৌ যুগোপযোগী বলে মনে হবে না। তবে কয়েকটি ছবি অনেকের চোখে পড়ে, যেমন দি লাইট। রচনাটিতে রঙের স্তর ভেদ সৃষ্টি লক্ষণীয়। সুকৌশল আলোকবিন্যাসের জন্য মুন লাইটের নাম

দি সীন (বাটিক) —শ্রীমতী সন্তোষ রোহাতগি
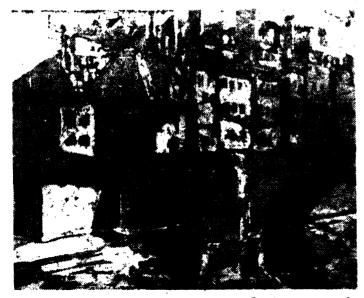
করা যায়। বিষয়বস্তু হিসাবে চির নতুন হলেও মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড ছবিখানির মাধুর্য শিল্পী অযথা গাঢ় রঙ ব্যবহার করে ক্ষুন্ন করে ফেলেছেন। বহির্দৃশ্য হিসাবে টন দি ভিলেজ মন্দ লাগে না। তবে দুটি বাটিক চিত্রে (অ্যাট দি পণ্ড, উওম্যান উইথ পিচার) শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীর নিষ্ঠা আছে, সুতরাং তিনি যদি যুগের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী সমসাময়িক চিত্রধারা বিষয়ে সচেতন হয়ে কাজ করেন তাহলে তাঁর ভবিষ্যত যে উজ্জ্বল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

শ্রীমতী সন্তোষ রোহাতগী ৭নং চৌরঙ্গী রোডে তাঁর বাটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। মহিলা শিল্পী হিসাবে শ্রীমতী রোহাতগী শহরে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে তিনি কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় বাটিক প্রদর্শনী, এখানে তিনি ২০টি নিদর্শন পেশ করেন।

বাটিক আজকাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এই মাধ্যমে কয়েকজন শিল্পী চিত্র রচনা করারও চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতী রোহাতগীর বিষয়বস্তুর মধ্যে অধিকাংশই নিসর্গ ও বহির্দৃশ্য ও কয়েকটি প্রতিকৃতি জাতীয় রচনা ও স্টাডি। শ্রীমতী রোহাতগীর কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাটিকের মধ্য দিয়ে তেলরঙ রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি ফোটাবার চেষ্টা করেছেন এবং কয়েকক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছেন। অযথা ভাঁজের (cracks) মধ্য দিয়ে রচনাক্ষেত্রে বিচিত্র কারুকার্যের সৃষ্টি না করে তিনি কখনও এক রঙ বা কয়েক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙ মিলিয়ে বাটিকেই প্রয়োজনমত স্তর ভেদের অবতারণা করেছেন। অর্থাৎ প্রায় তেলরঙ প্রথাতেই তিনি রঙের পরিবর্তে মোম ব্যবহার করেছেন ও অবশিষ্ট অংশ একাধিক রঙে ভরিয়ে ফেলেছেন। এই প্রসঙ্গে দি সীন, রেস্তরাঁ দি বেণ্ড ও বোটস্-এর নাম করা যায়। অন্যান্য ছবির মধ্যে উইস্টফুল উল্লেখযোগ্য।

*

অক্টোবর মহাবিপ্লবের ৫১তম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশ, জাতি ও জনগণ বিষয়ে অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে একটি স্থির চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিপ্লবের পূর্বে দেশের অবস্থা থেকে শুরু করে সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে সাম্যবাদ বাণীর ক্রমঃ প্রচার, ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন শিক্ষা খেলাধূলো ও জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক স্থিরচিত্র মাধ্যমে দেখান হয়। বিশেষভাবে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকগণ যে চিকিৎসা-শাস্ত্র, মহাকাশ যাত্রা ও বিভিন্ন গবেষণায় রত আছেন তাও প্রদর্শনীতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে গবেষণাগারে কর্মরত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এন ডুবিনিন ও মহাকাশযান ভস্টক-এর স্থির চিত্র উল্লেখযোগ্য। ব্যালে নৃত্যকলার জন্য সোভিয়েত দেশ সর্বাধিক পরিচিত এবং এই প্রসঙ্গে সোয়ান নৃত্যের কয়েকটি দৃশ্য সকলের চোখে পড়ে।
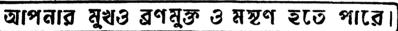
প্রদর্শনীর একাংশে ছিল সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত বিভিন্ন, বিশেষ করে মার্ক্স এঙ্গেলস্ ও লেনিনের জীবনী সম্বলিত নানা পুস্তক পুস্তিকা ও বিভিন্ন বিষয়ক নানা পত্র-পত্রিকা।

একটি পত্র

গত ৭ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রপ্রিয় আলোচিত চিত্র-প্রদর্শনী বিভাগে তিনি বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে শ্রীরাখাল দাসের চিত্র প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করে বিশেষ প্রসংশা করেন। বাস্তবিকই শ্রীরাখাল দাস সমস্ত শিল্পী মহলে প্রশংসার পাত্র। তাঁর উদ্যম সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু চিত্রপ্রিয়র কয়েকটি কথা আমি এখানে উল্লেখ করে বলতে চাই তিনি সমালোচনা লেখবার সময় সম্ভবত বিশেষ ভাবের সাগরে [illegible] যান বলে হয়তো অনেক খবর ভুলে [illegible] তিনি বলেছেন, "কলকাতার শিল্পী [illegible] পক্ষ থেকে অনেকেই এই ধরনের [illegible] প্রচেষ্টার আশা করেছিলেন। এক [illegible] রাখাল দাস তাঁদের মুখরক্ষা [illegible] গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে [illegible] সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতা তথা [illegible] বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে শ্রীগোপাল [illegible] রথীন মৈত্র, ইন্দ্র দুগার, গণেশ হালুই, [illegible] চৌধুরী, সুবল সাহা, ইন্দু- [illegible] প্রমুখ আরও চল্লিশজন শিল্পীর [illegible] চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে আমাদেরই [illegible] আমাদের রাজ্যপাল এই প্রদর্শনী [illegible] করেন এবং ছবি কিনে বিক্রির [illegible] করেন। আমরা চিত্রের বিক্রয়লব্ধ [illegible] সম্পূর্ণ বন্যার্তদের জন্য দিচ্ছি। কিছুদিন আগেও আমরা উত্তরবঙ্গের [illegible] সাহায্যের জন্য ছবি বিক্রির [illegible] করেছিলাম।

অসিত পাল

সাধারণ সম্পাদক, শুকবন্তু সাহিত্য সভা ও শিল্পশাখা)

লেখকের বক্তব্য

শহরের বিভিন্ন স্থানে যে যে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় শিল্পী বা প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ দেশ পত্রিকার মারফতে আমাকে প্রদর্শনী দেখবার জন্য অনুরোধ করে থাকেন, আমিও সাধ্যমত সেখানে যাই ও দেশ-এর স্তম্ভে প্রদর্শনী বিষয়ে আলোচনা করে থাকি। সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শুকবন্তু সম্প্রদায়ের কোনও প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণপত্র আমি পাইনি। শিল্পী রাখাল দাশ 'দেশ' মারফতে প্রদর্শনী দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সুতরাং অসিত পাল মহাশয়ের মন্তব্য ভিত্তিহীন। তাছাড়া অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে ধ্বসস্খলন ও বন্যার ফলে দার্জিলিং-কালিম্পঙ-জলপাইগুড়িবাসীদের যে নিদারুণ ক্ষতিসাধন হয় মুখ্যত তাঁদেরই সাহায্যকল্পে রাখাল দাশ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং আমার আলোচনাতেও তা বোঝা যায়। আশা করেছিলাম তাঁদেরই সাহায্যের জন্য শিল্পীদের কাছ থেকে সাড়া আসবে।

চিত্রপ্রিয়

ভ্রম সংশোধন

গত ২৩ নভেম্বর সংখ্যায় চিত্র প্রদর্শনীতে প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার প্রদর্শনীতে একটি নামের ভুল ঘটে গিয়েছে। নামটি সুব্রত পত্রনবীশ (স্টেটসম্যান) স্থলে সুধীন রায় (স্টেটসম্যান) পড়তে হবে।

"সত্যি ভাই, সারাদিন কি কঠিন পরিশ্রমই-না করতে হয় ওঁকে। তারপর ট্রাম-বাসের দারুন ভিড়, তার ধকলতো আছেই। অথচ ওঁকে এবং পরিবারের আর সবাইকে সুস্থ কর্মক্ষম রাখার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর। ভাগ্যিস বোর্নভিটা ছিল, তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। এক কাপ বোর্নভিটায় সব ক্লান্তি দূর হয়, নিমেষে ওরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, প্রাণের দীপ্তি ঝলমল করে ওদের চোখে-মুখে। বোর্নভিটার চমৎকার স্বাদ আমাদের সকলের খুব ভালো লাগে, বাচ্চাদেরতো কথাই নেই! শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে-পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ।

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

আর এক বিদেশিনী

তরু মাসিমা তক্কে তক্কে ছিলেন। সারাজীবন হেঁসেল আর হাঁড়ি ধরেই কেটেছে। মরবার আগে তাজমহল দেখতেই হবে। কত কবিতা কত গান তাজমহল নিয়ে —আর তরুবালা তা না দেখেই থাকবেন? দিল্লিতে আত্মীয়স্বজন আছে। সোজা সেখানে পেঁৗছে আরও কিছু তীর্থধর্ম সেরে তবে যাবেন তাজে। বেশ খটখটে মানুষ তরুবালা। তবু চলাফেরা করেন নি কখনও। সঙ্গী চাই। ঘোরাঘুরি আমার ভালই লাগে। চললাম তরুমাসির উদ্ধারকারী হয়েই।

দিল্লি থেকে রেল ব্যবস্থার নবজাত শিশু তাজ এক্সপ্রেসে রওনা হলাম আগ্রা। সদ্যোজাত না হলেও এ গাড়িটির শৈশব কাটেনি। কাজেই রেল কোম্পানি একেবারে লালন পালন ছেড়ে দেন নি। চমৎকার ঝকঝকে ব্যবস্থা। খাবার আয়োজন বেশ। বিদেশীদের জন্য শো পিস বললেই হয়। পর্যটকরা পয়সা ফেলে ভারত দেখবে তাই হিসাব করা সময় ঘণ্টার বন্দোবস্ত। সকালে দিল্লি থেকে রওনা হয়ে সাঁঝের ঝোঁকে ফেরা। সব দেখে তরুবালা দারুণ খুশী। বললেন, "তোমার মেসো থাকতে যদি এসব হতো! বড্ড শখ ছিল তাঁর..." কথা শেষ করতে পারলেন না। চোখ দুটি চকচক করে উঠলো মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বুঝলাম পর্যটন বেশী না করেও পর্যাপ্ত পেয়েছেন সে যুগের মানুষ। আমরা স্বাধীন হয়ে ঘুরে মরি।

তাজ এক্সপ্রেসের টিকিটের সঙ্গেই দ্রষ্টব্য স্থানে যাবার যানবাহনের ব্যবস্থা। তাজ দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়লো একটি বিদেশিনী গম্বুজের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরণে ইংরাজী পোশাক কিন্তু চোখে মুখ প্রাচ্যের মাধুরী। পোশাকের দিকে নজর না দিলে তাজের গায়ে মেয়েটিকে মমতাজের সমগোত্রীয়া বলে মনে হচ্ছিল। লোভ সামলাতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে পরিচয় নিলাম। মেয়েটি ইরাণী। সবে ইরাণের রাজধানী তেহেরাণ থেকে এসেছে নূতন দিল্লিতে রেডিও টেলিভিশন সংক্রান্ত একটি কনফারেন্স-এ প্রতিনিধি হয়ে। ঠিক তরুবালার মতই তাজ তাকে টেনে এনেছে শীর্ণস্রোতা যমুনার কিনারার স্মৃতিমন্দিরে। আমাকে কোনও দিনই পর্যটকবহুল প্রচারধন্য প্রমোদ ভ্রমণকারীর দর্শনীয় স্থান আকর্ষণ করে না। কাশ্মীরের চেয়ে কেন্দুলি ভাল লাগে। তবু তাজের গায়ে মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হলাম। সব মিলে এক অপরূপ সমাবেশ।

মেয়েটির নাম পরওয়ানে সাম্মি। আমরা শুনেছি পরওয়ানা মানে আদালতের হুকুমনামা। কিন্তু পরওয়ানে মানে নাকি আলোকপতঙ্গ moth। মেয়েটি বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছিল, "প্রজাপতি নয় কিন্তু, পতঙ্গ।" পরওয়ানে কাজ করে ইরাণের সরকারী টেলিভিশনে। সেখানে আছে তিনটি টেলিভিশন। তেলের সংবাদে যেসব মার্কিন মানুষ আছেন তাঁদের জন্য মার্কিন টেলিভিশন, একটি বেসরকারী এবং একটি সরকারী টেলিভিশন। সরকারী টেলিভিশনে শ্রীমতী সাম্মি শিক্ষাবিষয়ক বা educational প্রোগ্রামের প্রযোজক। সাম্মির শৈশব ও শিক্ষা ফ্রান্সে। ওর বাবা ফ্রান্সে বহুদিন ছিলেন তাই ফ্রান্সের প্রতি আকর্ষণ ছিল। মেয়ে বড় হতেই সেখানে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষার জন্য। সাম্মি তাই ফরাসী জানে আর নিজের ভাষা ফার্সী জানে। প্রোগ্রাম করে সবটাই ফার্সীতে। ইংরাজী শিখেছে সামান্য। আমার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে মাঝে মাঝে কথা যাচ্ছিল আটকে। সাম্মি পড়েছে জীববিদ্যা বা বায়লজি। বিজ্ঞান পড়তে তার ভাল লাগতো। সাম্মির সুন্দর চেহারায় তাকে প্রায় অষ্টাদশীর মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু বয়স তার নাকি ত্রিশ। একটি মেয়ে আছে ছয় বছরের। কথা বলতে বলতে মস্ত বড় হাত ব্যাগটি হাতড়াচ্ছিল সে শিশু কন্যার ছবি দেখাবে বলে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে পরওয়ানের তাতে কুছ পরোয়া নেই। শিশুকে মানুষ করবার আর্থিক ব্যবস্থা, নিজেকে ফিটফাট রাখার সঙ্গতি তার নিজের উপার্জনেই হয়। আমাদেরও এই যুগে মেয়েরা স্বাধীন কত বেশী। তরুবালাদের তালগোল পাকানো দিন তো এখনেও আর রইল না, হার হলো, না জিত হলো, জানি না, তবে স্বাধীনতার মূল্য কিছু দিতে হলো বইকি। স্বাধীন হয়েছে মেয়েরা কিন্তু সাধের স্বর্গ হারিয়েছে কেউ কেউ।

পরওয়ানে সাম্মি

যাক, অবান্তর কথা আরম্ভ করলে আসল কথার খেই হারিয়ে যাবে। ইরাণে ইরাণী মেয়েদের সম্বন্ধে যা শুনলাম তাই বলে নি। সাম্মি বলছিল ইরাণে আর পরদা বড় একটা নেই। মসজিদ প্রধান ধর্মস্থানে পরদানশীন মেয়ে মাঝে মধ্যে দেখা যায়। সাম্মির মা পরদা করেন না, লেখাপড়া শিখছেন কিন্তু উপার্জনের কথা কখনও ভাবেন নি। আমাদের দেশেও তো উপার্জন করা মেয়ের দল নেহাৎই অল্পদিনের ব্যাপার। পারস্যের ইতিহাসও তাই নূতন অধ্যায় লিখছে একই নিয়মে।

জিজ্ঞাসা করলাম, পারস্য যাকে বলতো তাকে ইরাণ কেন বলে আজকাল। ইরাণের আরও অনেক নাম এসেছে গিয়েছে। আসিরিয়া, মিডিয়া, পারস্য, ইরাণ একই ভূখণ্ডকে বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে। তিন হাজার বছর আগে আসিরিয়ানরা জয় করেছিলেন এই ভূভাগ। তারপর এসেছিল মিডিয়ান সাম্রাজ্য। যীশুর জন্মের ৩৩৩ বছর আগে আলেকজান্ডার জয় করেন পারস্য। সপ্তম শতাব্দীতে আরব মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম হলো ইরাণের ধর্ম। ভারতবর্ষের মতই শত্রু আক্রমণ অতিক্রম করে পারস্য তার কৃষ্টির ধারা বজায় রেখেছে। চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লঙ সবাই এসেছে গিয়েছে, কিন্তু কৃষ্টিকে কাবু করতে পারেনি। আজ যে নূতন ইরাণ জেগেছে তাও সেই কৃষ্টি অবলম্বন করেই। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম স্থপতির সঙ্গে ভারতের ইসলাম স্থপতির মিল তাই ইরাণী সাম্মিকে সম্মোহিত করেছে। কোথায় যেন দারুণ একটা মিল। নাদির শাহের সাংঘাতিক লুণ্ঠনও সে মিলে ছন্দপতন ঘটাতে পারেনি। আধুনিক ভারতীয় মেয়েকেও তার দারুণ ভাল লেগেছে— "Oh they are beautiful!" উচ্ছ্বাসে সে বলে উঠলো। পশ্চিম এখন পাগল ভারতীয় ফ্যাসনের অনুকরণে। যা ভারতীয় তার এমনি কদর যে বিদেশী পোশাকের ছাপ থেকে ছাঁট পর্যন্ত শাড়ির সঙ্গে মিল রাখতে চায়। পরওয়ানে সাম্মির জীবনে স্বপ্ন ছিল ভারতে আসা। যদি কার্যগতিকে আসা না হতো তবে সে ছুটিতে আসতো। এ আসাতে তার মন ভরে নি। আবার ফিরবে এখানে। ভারতীয় মেয়ে যারা বন্ধু হয়েছে তাদের সঙ্গে আরও নিবিড় সখ্য স্থাপনা করবে। বেশ লাগছিল শুনতে। আধুনিক যুবতীরা দেশ বিদেশের সীমানার বাধা মানে না। কোথায় যেন তারা এক। তরুবালার দিনে কিন্তু তে ছিল না। আমাদের কালেও না।

টুকিটাকি

শিশু মানুষ করার দায়িত্ব মায়ের একার নয়। শিশুকে খাওয়ানো বা তার পোশাক, তোয়ালে ইত্যাদি বদল করা পিতাকেও জানতে হবে। একথা বলেছেন এক শিশু বিশেষজ্ঞ তাঁর বিখ্যাত বই "The Fathers Book"এ। বিশেষজ্ঞের নাম Ted Klein ডাঃ স্পকের কথা আমরা আগেই বলেছি মনে হয় টেড ক্লিনও স্পকের মতই জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন।

এই বিশেষজ্ঞের বিচারে পিতা ও সন্তানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক একেবারে শিশু অবস্থা থেকে গড়া দরকার। আজকের দুনিয়ায় যুবসমাজের যেসব সমস্যা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে তার অনেকটা পিতা ও সন্তানের সুন্দর সম্পর্ক দিয়ে রোধ হবে। সমস্যা আসবার জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না। প্রথম থেকে ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হতে হবে।

টেড ক্লিন-এর সংসারে আছে স্ত্রী ক্যারল, দুটি ছেলে মেয়ে। ছেলে উইলির বয়স ১১ বছর, মেয়ে এমিথির ৭। মার্কিন দেশের যে শহরে তাঁরা থাকেন সেখানে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও চরস গাঁজা খায়। ক্লিন সাহেব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রথম দিন থেকে পরম স্নেহপরায়ণ ব্যবহার করেছেন। একটু বড় হলে বন্ধুর মত বুঝিয়েছেন এইসব নেশার সাংঘাতিক সব পরিণাম। এখন তিনি মনে করেন তাঁর শিশুরা নেশায় মজবে না। কোন শিশুকেই 'ছোট ছোট নিষেধের ডোরে' বাঁধা যায় না। একদিন সে একা যাবে সঙ্গীদের মাঝে। আসবে প্রলোভন। যদি মাতা পিতার স্নেহ তাদের মনে গভীর রেখায় এঁকে থাকে ভাল-মন্দের বিচার শক্তি, তবেই তারা কাটাতে পারবে চলার পথের চরম বিপদ। যে মাতা পিতা শিশুকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সুস্থ জীবন কাটাতে শেখান তাঁরাই সার্থক।

টেড ক্লিন একবার ৩০০ শিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কতটুকু সময় তাদের পিতার সঙ্গে তারা কাটায়। উত্তর যা পেলেন তাতে ধরা যায় গড়পড়তা সপ্তাহে সাত মিনিট!! শুনতে সাংঘাতিক ঠেকবে কিন্তু খবর নিয়ে দেখবেন আমাদের দেশেও বাপেরা পরম উদাসীন এ বিষয়ে। টেড ক্লিন-এর স্ত্রী বলেন, তিনিও চান ছেলে-মেয়েরা বাপকে আপন করে পাক। বাপ ও মা দুজনকেই তাদের দরকার। একা কেউই সম্পূর্ণ নন।

শ্রীমতী

ব্রিটেনের পররাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ সচিব মাইকেল স্টুয়ার্ট রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সঙ্গে দেখা করলেন। "নতুন 'মেঘনাদ বধ' বা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কাব্যের নতুন উপাদান সংগ্রহের জন্য মাইকেলের এই সাক্ষাৎকার কিনা তার কোন আভাস অবশ্য সংবাদে নেই"—বলেন বিশুখুড়ো।

সংবাদে প্রকাশ, আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে সারা পূর্ববঙ্গে বিক্ষোভের ঢেউ উঠিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"এ ক্ষেত্রে জনাব আয়ুবে বুড়ী-গঙ্গাকে ততটা আমল দেন নি, এখন বুড়ীর হাড়ের ভেল্কিতে জনাব ফাঁপরে পড়ে গেছেন।"

লাল চীনের ঢঙে পাকিস্তানে নাকি মাছিমারা অভিযান চালিয়াছে, ইতিমধ্যে যে-সব মাছি মারা হইয়াছে—তাদের মিলিত ওজন আটমণ।—"মক্ষিকা-নিধন ভালো এবং নিধনের কৌশলটি বোধগম্য না হলে চীনের রীতিটিকে গল্পের সেই মাছি-মারা কেরানীর মতো হুবহু নকল করা আরও ভালো, মাছি না মরলেও চীন তাতে খুশী হবেই।"— বলেন সহযাত্রী।

শ্রী ম্যাকনামারা প্রসঙ্গে অন্য একটি সংবাদে শুনিলাম তিনি নাকি রাজ্যপাল ধর্মবীরের সঙ্গে গভীর রাতে শহর পরিক্রমা করিয়াছেন।—"কৌশলটি ভালো। গভীর রাতে ট্রাম-বাস জ্বালানোর প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া শহরটা দিনে না দেখিয়ে রাতে দেখালে খানিকটা ঢাক ঢাক গুড়গুড় চলে"—বলে শ্যামলাল।

বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীম্যাকনামারার কলিকাতা পরিদর্শন উপলক্ষে যে-বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"শ্রীম্যাকনামারার ভাষায় বলতে হয়, ভিখেৎ-নাম না থাকলেও বিক্ষোভ দেখানো হতই—

ব্যাঙ্কের সভাপতি ত জাল চেক দেখিয়ে টাকা ক্যাশ করা যায় না। কিন্তু তা তো হল, কিন্তু আমাদের দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে কলিকাতার উপকারের জন্য কলিকাতা দেখতে এসে ভদ্রলোকের দারুণ ব্যক্তিগত ক্ষতি হল, তার তিনটি ট্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল!!"

সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট নাকি বলিয়াছেন, ভারত বিশ্বের আলো। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তাঁর এই অভিনন্দনে আমরা প্রীত, পুলকিত হয়েছি। কিন্তু তিনি হয়ত জানেন না, মানবিক বিভ্রাটে এই আলো প্রায়ই অফ হয়ে যায়!!"

এক বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম, জাপানের বিড়ালরা নাকি ইঁদুর

ধরিতেছে না।—"পদ্ধতিটা জাপানী। জাপান ইঁদুর মারার জন্য বেড়ালের চেয়ে ক্যাটকলে বিশ্বাসী"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

এক বৈদেশিক সংবাদে শুনলাম, সড়ক পথে কলিকাতায় মাছ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। সহযাত্রী বলিলেন—"মৎস্য দফতরটাকে আমরা চাণক্য প্রোক্ত শ্লোক আর রাজকুলেষু সঙ্গেই জুড়ে দিয়েছি। তবু জিজ্ঞেস করি, যে-মাছ চালান দেওয়া হবে তারা কি চাই-শিলং জাতীয় না উড়ুক্কু!!"

পশ্চিমবঙ্গের ৬৬৪ কোটি টাকার চতুর্থ যোজনার খসড়ায় কাট ছাঁট করিয়া ৪২৫ কোটি টাকার প্রকল্পে দাঁড় করান হইয়াছে।—"তারিফ করতেই হবে এই মাস্টার কাটারদের। মাছ মাংস দই মিষ্টির ভোজ যখন ভেস্তে গেল তখন ভিড়িয়ে দাও রাধাবল্লভী আর আলুর দম। অতিথিরা খুশি না হলেও পকেটের টাকায় নিশ্চয়ই কুলিয়ে যাবে"— বলে আমাদের শ্যামলাল।

ব্রিটিশ বিবাহ পরিষদ একটি সমীক্ষার ফল প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, স্বামীর পদোন্নতি এবং তৎসহ বেতনবৃদ্ধি নাকি সমস্ত স্ত্রীদের কাম্য নয়। স্বামীদের উন্নতি হইলে আর স্ত্রীদের পক্ষে তাঁদের দর্শন লাভ সুদূরপরাহত হইয়া উঠে। খুড়ো বলিলেন—"সমীক্ষায় সব কথাই বলা হয়েছে শুধু কোন সাহসিকা নূতন পরিবেশে স্বামীর হৃদ্‌ বদলের কথাটা স্পষ্ট করে বলেন নি!!"

নিউ সাউথ ওয়েলস ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন একজন মহিলা ক্রিকেটারকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়াছেন। তিনি নাকি দারুণ ফাস্ট বল করিতে পারেন, বাম্পার ছাড়িতে ওস্তাদ। বয়স মাত্র উনিশ। সহযাত্রী বলিলেন—"এই দলভুক্তি যখন আইন-

বিগর্হিত নয় তখন বলবার কিছু নেই। কিন্তু কথা হল, এই ব্যবস্থায় আম্পায়ারগণ বড়ই বিব্রত বোধ করবেন, মহিলা যদি "হাউজদ্যাট" আবেদন জানান তখন মুখ ফিরিয়ে থাকা ভাবড়-ভাবড় আম্পায়ারের পক্ষে সম্ভব নয়!!"

আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীপেষু' 'কলমে কয়েকটি পর্যটক পাখির সত্যিকারের নাম সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। "পক্ষিতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল খুব বেশি নয় কেননা পাখি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, কাক ডাকে কা-কা, আগে 'অ' পরে 'আ' পর্যন্ত সীমিত বললেই হয়। তবু, যে-পাখি উড়ে এসে জুড়ে বসে তার সত্যিকারের নাম জানলে উপকৃত হতাম"—বলেন সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ ১২/১৩ জানুয়ারি, বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য ইডেনে চিত্রতারকাদের ক্রিকেট খেলা হইবে। খুড়ো বলিলেন—"খেলার উদ্দেশ্য প্রশংসার্হ বলেই কিছু বলতে সমীহ হয়, তবু সবিনয়ে বলি, বিদেশী মুদ্রা বাঁচাবার জন্য যদি এম সি সি-র প্রস্তাবিত ভারত সফরের কেন্দ্র বাতিল করে থাকেন তবে খাঁটি স্বদেশী এবং পারিবারিক মুদ্রা বাঁচানোর জন্যও চিত্র তারকাদের খেলা বাতিল হওয়া উচিত!!!"

ষোলো

কুবের আগে ওই ফালি বারান্দায় তার জন্য হোগলার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। তখন হাসপাতালের এত চল ছিল না। মিডওয়াইফ শশীবালার হাতে সে কাজ হয়েছিল সাত টাকায়। নাড়ির কেটে দেই। এক ইউনিটের কার্ড নিজেই লেখা সেই লাইন দিয়ে। কুবের বড় হয়ে বাড়ির ঘরে একই ধরনের লম্বা লম্বা বোতলে কেরোসিন রাখতে দেখত। সেগুলো মৃতসঞ্জীবনী সুধার বোতল। বুড়ো হওয়ার পর শরীর ভেঙে যাওয়ায় মা অনেকগুলো খেয়েছিল।

সেবারই চৈত্র, শনিবার, অমাবস্যার দুপুরে তার জন্ম। ক'দিন পরেই বোধহয় নীলের উপোস ছিল। কুবের জন্মাতেই বেলেঘাটা-হাওড়া-সালকের ওপর দিয়ে গত চল্লিশ বছরের সবচেয়ে বিখ্যাত ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল। সেকেণ্ডে হোগলার আড়াল নিশ্চিহ্ন। তখনও ফুল পড়েনি মার।

কাশীবাসী এক পাগলি পিসি ছিল কুবেরের। ভয়ংকর মুখরা বলে বিয়ের পরেই স্বামী তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বড়ঘরের ছেলে। আচমকা মরে যাওয়ায় তার ভাগের সম্পত্তি থেকে টাকা আসত পিসির নামে। সেই টাকায় পিসি কাশীবাসী। ভয়ংকর সুচিবাই।

হোগলার আড়াল সরে যাওয়ায় ঝড়ের মধ্যে কাতরাতে কাতরাতে মা বলেছিল, দিদি, ছেলেটাকে একটু ঘরে নিয়ে যাবে?

'বউ, তুই কি আমাকে গঙ্গাচান করাবি? ও আমি ছুঁতে পারব না।'

ননদের কথায় মুখ চেপে ঘসটে ঘসটে মা ঘরে এসেছিল। আসবার সময় কয়েক ঘণ্টার কুবেরকে গামলা চাপা দিয়ে বাইরে রেখে এসেছিল। ঝড় থামলে তবে তাকে ঘরে আনা হয়।

কোন জন্মজন্মা মহাপুরুষের জীবনের ইতিহাস নয়। জন্মের পর যারা একদিন গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড়ের ধারায় মরে যায়—কুবের সাধুখাঁ তাদেরই একজন। মা বড় ভাল কথক। তার মুখেই এসব শোনা। ইতিহাসে যেমন যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি, শান্তি স্থাপন, পতন-উত্থান—এক একটা স্তর, সময়ের ধাপ—এই মহিলার জীবনেও তার ছেলেমেয়েদের জন্ম অসুখ, পরীক্ষা পাশ, বিয়ে, চাকরিতে বসা জীবনের এক একটা মনে রাখার মত সিঁড়ি।

কুবের চেষ্টা করে দেখল, একেবারে পেছনে, কত পেছনে তার কি মনে আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'চা পান না বিষ পান' পড়ে অনেকে চা ছাড়লেও বাজারে বাজারে তখন কলেরগানে খরখরে রেকর্ডে ভাটিয়ালি শুনিয়ে বিনি পয়সায় চা খাওয়ানোর বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে গেছে। গোপি চাকরের কোলে উঠে কতদিন কুবের এইসব গান শুনেছে। গোপি ফ্রি চা খেত, মুখের চা কুবেরকে খাওয়াতো। সেই সময় তিন বছরের কুবেরকে অলস্টার পরিয়ে দেবেন্দ্রলাল একটা ছবি তুলিয়েছিল। ছবিখানা এখন বড়দার অ্যালবামে। ঘাড় ঠিক ডানদিকে হেলানো। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। ডান কানের কাছে ছবিটা উইয়ে কেটেছে।

দ্বিতীয় যা মনে পড়ে, তা হল, এক জাতি দাদের একটি শাদা ঘোড়া। হরিরাম সাধুখাঁর তৈরি পৈত্রিক এই বাড়ির চারতলার চিলেকোঠায় বুড়ো থাকত। হরিরামের প্রথম পক্ষের দিক দিয়ে প্রপৌত্র। অনেক বয়স। কার ছেলে—কি বৃত্তান্ত, সবাই ভুলে গিয়েছিল। দেখবার কেউ ছিল না বুড়োর। তার বয়সকালের ঘোড়াটা পৈত্রিক আস্তাবলে পা ঠুকে ঠুকে ডাঁশ তাড়াতো মাঝরাতে। মার পাশে শুয়ে রাত জেগে বালক কুবের সেই শব্দ শুনত। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখল, ঘোড়াটা সদর দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা সিঁড়ি বেয়ে তাদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর কুবেরের বুকে উঠে এক জায়গায় এই পুরো দৌড়ের কসরৎ শুরু করে দিল। কুবের চেঁচিয়েও কূল পায় না। ঘুম ভাঙতে দেখল মশারির মধ্যে সবাই ঘুমোনো। ঘরের বড় আয়নায় জ্যোৎস্না পড়ে উল্টোদিকের দেওয়ালের অয়েল-পেণ্টিংয়ে হরিরাম আচমকা আলোয় জ্বলজ্বল করছে। সেদিনই ভোরে কম্প দিয়ে জ্বর এল। টাইফয়েড। ছাব্বিশ দিনের দিন রেমিশন। বড়দা চৌরাস্তা থেকে সেদিনই কুবেরের জন্যে বড়দাদার চিনি-মাখানো একটিন হার্টলিপামার বিস্কুট নিয়ে

...পুরো দৌড়ের কসরৎ শুরু করে দিল

এল। দুধে ভিজিয়ে তাকে একখানা খেতে দেওয়া হয়েছিল।

পাড়ার রায়সাহেবের বাড়িতে একটা রেডিও থাকত। শীতকালে সন্ধেবেলা রেডিও শুনে সবাই বলল, সুভাষ পালিয়েছে। কিছুদিন পরেই বড়দা পাশ করে চাকরি পেয়ে গেল। মা কালী বাড়ি পুজো দিয়ে এল।

৮ই জানুয়ারি আশুতোষ স্কুলে গিয়ে কুবের সাধুখাঁ ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হল। রোল সেভেন। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার পর ডিসেম্বর ক্লাসে ফিফথ্ পজিশনে সনৎ একদিন কু দিল। ক্লাসটিচার মহেন্দ্রউদ্দিন স্যারের ক্লাস। 'কে করেছে?' জানতে চাইতেই সনৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার আমি। অমনি স্যার সনতের সত্যবাদিতার প্রশংসা করে ক্লাসসুদ্ধ সবাইকে বললেন, ফলো সনৎ।

পরের সপ্তাহে ওই পিরিয়ডে কুবের কু দিল। কে করেছে? জানতে চাওয়া মাত্র কুবের উঠে দাঁড়াল। মহতাবউদ্দিন স্যার কাছে ডাকলেন। স্যারের মাথার পেছনে দেওয়ালে হরিণের মাথা লাগানো একটু উঁচুতে। স্যার চক দিকে কুবেরের গোঁফ এঁকে উঁচু টুলের ওপর কুবেরকে দাঁড় করিয়ে মাথাটা হরিণের দুই সিংয়ের মধ্যে আটকে দিলেন। তারপর ক্লাসসুদ্ধ সবাইকে বললেন, আমার ক্লাসে গোলমাল হলে এই শাস্তি।

সেদিন থেকে কুবের জীবনে বেতাল হয়ে গেল।

রোজ সে খারাপ হতে থাকল। লোকে যাকে খারাপ বলে—তাই।

শীতকালে হরগঞ্জ বাজারে কমলা চেলে বিক্রি হত। একপাল বন্ধুর সঙ্গে সন্ধে-বেলা চাদর জড়িয়ে কমলা আনতে যেত। দরাদরি করে কেনার সময় কে কটা চাদরের নীচে সরাতে পারতো—তাই ছিল খেলা। মারাত্মক খেলা। ধরা পড়ে একদিন বেদম মার খেল ব্যাপারীদের হাতে। বাড়িতে বলার উপায় নেই। বললে, ডবল খোরাক হবে।

[illegible] আউট হয়ে গেলে কুবেরেরা সনতদের দেশের বাড়ির কাছাকাছি মফস্বল [illegible] চলে গেল। সেখানকার স্কুলের [illegible] ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি ছিল। একদিন [illegible] স্কুলের সময় কি ভিড় সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি। কুমির মারা পড়েছে [illegible] গুলিতে। কুমিরের পেটের ভেতর [illegible] চুড়ি, হার, দুল, মানুষের হাতের হাড় পাওয়া গেল একখানা।

এরপর সনতের সঙ্গে ঘোলাডাঙার [illegible] ঘরে যাওয়া অব্দি কিছু মনে [illegible] কুবেরের। তারপর সবই ঘোলা। [illegible] ডাক্তারের ওষুধে ইনজেকসনে কুবেরের [illegible] পড়া বন্ধ হল। কুবের সং হয়ে [illegible] কলেজ উঠে পড়ে লাগল। কলেজ [illegible] দিয়ে চাকরির বাজারে নেমে [illegible] এই নিষ্পাপ ভাবটা কোন কাজেই [illegible] না। বরং এজন্যে তাকে ঘা খেতে [illegible] চাকরিতে সবাই তুখোড় লোক [illegible] এর্গানিজেশনে মানুষের একটা [illegible] মুখ উঁচু বাঁসিয়ে রাখা যায়। [illegible] অসুবিধে হয় না। কিন্তু [illegible] কারখানায় অমন মুখের লোককে [illegible] ভরসা করে না। বরং বোকা, নয়ত [illegible] মনে করে। অথচ মুখে এই ছাপ [illegible] সাবান ডলেও ওঠাতে পারবে না। [illegible] যাবার সময় এই ভাবখানা [illegible] এসেছে। ধনঞ্জয়ের সামনে [illegible] কথা বোলার [illegible] কবেরের মুখে [illegible] মিলা একটা করুণ ছায়া ফেলে- [illegible]

[illegible] সিনেমা—ইরা তাকে ভালবাসত। [illegible] তার মুখের পাপহীন, অদ্ভুত [illegible] ভঙ্গীকে। বুকের মধ্যে তার মুখটা [illegible] মাথার গন্ধ নিত। পুষ্পঘ্রাণ। [illegible] ভালবাসার এমন এমন সব [illegible] খুঁজে পায়। কুবেরকে মাঝে মধ্যে [illegible] বানিয়ে বিপদ আপদের কথা [illegible]। তখন ইরা টাকা দিতে পেরে [illegible] পেত। অথচ কুবের রোগাভোগা [illegible] গীতা চণ্ডীপাঠ, কালীর পায়ে দম [illegible] রক্তদান, সাঁতরানো, গাছে-ওঠা, [illegible] থেকে ফোর্থ ইয়ার অব্দি কুস্তির [illegible] ডন বৈঠক—সব কিছু করে জামা-কাপড়ের নীচে সে আর পাঁচজন পুরুষের [illegible] ছিল। কিন্তু তবু তাকে জবর জবর [illegible] মুখে নিয়ে ইরার পছন্দ মাফিক [illegible], করুণ লাভার হতে হয়েছিল। ইরার স্বপ্ন ছিল—তার প্রেমিকের চুল কোঁকড়া হবে। কুবেরের তা ছিল। স্বপ্নে ছিল, চোখে চশমা থাকবে। কুবের নগেনের অল্প পাওয়ারের চশমা চোখে দিয়ে ইরার সামনে টলতে টলতে ঘুরত। কেন না চোখে দেওয়ার খানিক পরেই মাথা ঘুরতো। স্বপ্ন ছিল, লাভার গান জানবে। এইটে আর হওয়ার উপায় ছিল না। একদিন নগেনকে আনিয়ে মাঠের মধ্যে বসে ইরার সামনে 'মনে রবে কি না রবে আমারে' গাইয়েছিল। সেবারের হিরোইন। নগেন তাই গেয়েছিল।

এমন পছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে ভালবাসা হয় না। এ যে শুধু শর্তপূরণ। শেষদিকে পুরো ব্যাপারটাই বোঝা হয়ে দাঁড়াল।

ইরা বলেছিল, ভালো চেহারার লোকজনে তার মার বড় ভয়। ইরার মা ভালো দেখতে নয় বলে ইরার বাবা তার শালীর দিকে ঝুঁকেছিল। অতএব ইরার পক্ষে কুবেরের সুন্দর হওয়ার ব্যাপারটা কিছু অসুবিধের ছিল। তখন কুবের নাইট্রিক এসিড দিয়ে নিজের মুখখানা ইরার পক্ষে যুতসই করে তুলতেও রাজি ছিল। প্রেম।

গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে ব্রজদার সঙ্গে দেখা। দেখেই বলল, 'তোর হবে। আয়।' তিরিশ মাইল বেগে হাঁটছে ব্রজ দত্ত। দিশ্বিতে [illegible]—হাঁটার দমকে গলার টাই একবার এদিক আরেকবার ওদিক।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'গ্র্যান্ডে। ক্যানাডার ফেমাস ম্যাজিসিয়ান সস্ত্রীক এসেছে। কাল ভোরেই কলকাতা ছেড়ে যাবে। আমি ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ম্যাজিকস্-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট। আজ আমাকে লাঞ্চে ডেকেছেন। তুই হলি কাগজের রিপোর্টার—'

'কবে থেকে?'

'আমিই বা কবে থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট?' থেমে ব্রজ দত্ত বলল, 'কাল বিকেলে সাহেব যাদুকরের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় সোসাইটির কথা বলে ফেললাম। মুখে এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আনকোরা এই সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট পোস্টে নিজেকেই নিজে ইলেক্ট করতে হল। একটা রিপোর্টার দরকার ছিল—হ্যাগার্ড লুকিং—ফাইটিং ফর ফুটিং। ভগবান তোকে মিলিয়ে দিল—'

আর কিছু বলার চান্স পেল না

কুবের। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রজদা বোতাম টিপছে। মোটাসোটা বুড়ো সাহেব বেরিয়ে এল। কুবেরের পরিচয় দিয়ে ব্রজ দত্ত তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। টেবিল সাজানো রয়েছে। ভালো ভালো খাবার। ব্রজ দত্ত সাহেবকে বিশেষ কথা বলতে দিল না। কুবেরকে নিয়ে সোজা খাবার টেবিলে। একটু পরে বুড়োর বুড়ি এসে যোগ দিল। খেতে খেতে ব্রজদা একটা চামচ হাওয়া করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব দু'স্লাইস পাউরুটি, একখানা মাছ ভাজা শূন্যে উড়িয়ে দিল। এইভাবে উড়তে উড়তে টেবিল প্রায় ফাঁকা। দু'জনেই খুব গুণী যাদুকর। দু'জনের উড়িয়ে দেওয়া খাবার, চামচ সব আবার একে একে টেবিলে ফিরে আসতে লাগল। কিন্তু কুবের অনেকক্ষণ ধরে একা একা যেসব জিনিস ওড়াচ্ছিল তা আর ফিরিয়ে আনা গেল না। টেবিলের নীচে থেকে ব্রজদা একটা লাথি দিল, দাঁত চেপে বলল, 'অত গেলে না—'

সঙ্গে সঙ্গে কুবের সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাউ লং ইউ আর ইন দি প্রফেশন?'

সাহেব নানা শব্দ করে কি বলল। কুবেরের পকেটে একটি আটা কোম্পানির প্রসপেকটাস ছিল। সেইটে মুড়িয়ে নোট-বই করে বাংলা লং হ্যান্ডে লিখল,—'জীবনে এমন বিপদে পড়ি নি।' সাহেবের কথার শেষে ছিল,'.........লাইফ লং!'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট ব্রজ দত্ত সমঝদারের হাসি হাসল। সাহেবের বউ অল্প হেসে খাওয়ার শেষে ছোট কাপের কফি এগিয়ে দিল। কুবের সেই ফাঁকে তার নোটবই ব্রজদার চোখের সামনে তুলে ধরল। ব্রজ দত্ত খুঁটিয়ে দেখে আর একবার হো হো করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কুবের দেখল, টেবিলের ওপর তার কলম নেই। হাওয়া।

ব্রজদার হাত সাফাই। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ করা প্রসপেক্টাস খানাও অদৃশ্য। সাহেবই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? যাবার আগে সাহেব অবশ্য ফেরৎ দিল। কেননা কালকে সকালের কাগজেই বেরোবে। সাহেব তখন প্লেনে কোন সমুদ্র পার হচ্ছে। বিজনেস ট্রিপে বেরোয়নি বলে কোন প্রেস এজেন্ট সঙ্গে আনেনি।

গ্র্যান্ড থেকে বেরিয়ে ব্রজদা বলল, 'কেমন লাঞ্চ খেলি ফ্রি। এবারে এক খিলি পান খাওয়া তোর দাদাকে—'

'আমি না-হয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে এসেছিলাম। খাওয়া হয়নি। কিন্তু তুমি তো খেয়ে বেরোতে পার। বৌদি নিশ্চয় রেঁধে রাখবেন—'

'রাখবেন কিরে! ষোড়শপচারে রেঁধে রাখেন। ওর ওপক্ষের বড় মেয়ে আমি খেতে বসলে হাওয়া করে। কিন্তু যতক্ষণ ঘরের ভেতর থাকি—স্রেফ মনে হয় আমার ডানা কেটে দিয়েছে কে—'

'ওসব ধানাই পানাই আর মানায় না তোমাকে। বৌদি এত ভালবাসেন—'

'ভালবাসার তুই বুঝিস কিরে! পুটকে পুটকে মেয়ে নিয়ে এদিক সেদিক করে বেড়াস। সব নজরে আসে। ভাল ভাল কথা বলিস গাছতলায় নয়তো রেস্টুরেণ্টে বসে। তুই ভালবাসার কি বুঝবি রে?'

'শুধু তুমি একাই বোঝ। বৌদি বোঝেন না?'

'খুব বোঝে। একবার স্বামী হারিয়েছে। দোবারা হারাতে চায় না। কিন্তু আমি জানি—আই ফর মাইসেল্ফ—দি ব্রজ দত্ত খোলাখুলি যখন ভাবি, পরিষ্কার বুঝি, পুরুষলোকের কোন মেয়েলোককে ভালবাসা সম্ভব নয়। কাছাকাছি থাকা যায়। বিপদে আপদে দেখা যায়। কিন্তু আমরা সবাই স্ট্রেঞ্জ বেডফেলোজ—'

একটা প্রসেসন যাচ্ছে। দু'জনকেই থামতে হল। ট্রাম, বাস, ট্যাকসি, প্রাইভেট অচল করে দিয়ে কতগুলো লোক চেঁচাতে চেঁচাতে হাঁটছে। আর শ্লোগান—'চালের মণ যোলটাকায় বেঁধে দাও—বেঁধে দাও—দাম বাড়ানো চলবে না।'

সামনেই ইলেকশন। উল্টোদিকের বড় বাড়িটার দেওয়ালে ছাপানো পোস্টারে নেহরু তাকিয়ে। পাশেই এক দুই তিন করে গত ক'বছরে দেশের উন্নতির খতিয়ান লেখা।

কাঙাল। আমার বাবার জীবনেও তাই। মা ভীষণ ডোমিনেটিং লোক। বাবা সুতো ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতেন। ছাড়তে ছাড়তে মার কাছ থেকে বাবা এত দূরে সরে গিয়েছিল, শেষদিকে বোধ হয় মাকে চিনতেই পারত না। অথচ চোখ খারাপ নয়—'

কুবেরের বাঁ হাতের কোনে আঙুলে খানিক জায়গা কালো হয়ে উঠছে ইদানীং। শীতকাল বলে ঘসতে ঘসতে খানিক ছাল উঠে এল। চাকরি পাওয়া গেল না একটা। অথচ এই সময় আঙুলে এসব কি ফ্যাকড়া।

'রাতে ডিনারে তোর নেমন্তন্ন—'

'কোথায়?'

'অ্যাকাডেমি অব মালটিপিল্ আর্টস অব ইন্ডিয়া। স্যার বিপিনের বাড়িতে পার্টি। লেডিও থাকবেন। দু'জন ফরাসী আর্টিস্টের সঙ্গে সবাইকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেব। তুইও থাকিস। দাড়ি কামিয়ে পাউডার মেখে আসবি। গপ গপ করে গিলবিনে। একটু আধটু ড্রিংকসও থাকবে।—'

'তুমি সেখানে কি ব্যাপারে?'

'বাঃ! আমি হলাম ফাউন্ডার সেকরেটারি-জেনারেল। লেডি হলেন গিয়ে প্রেসিডেন্ট।'

'আমি কোন্ সুবাদে যাব?'

'তুই একজন কনটেমপোরারি আর্টিস্ট। সত্যি কি না বল? তুই এ-যুগে বাস করছিস—যুগের সঙ্গে জড়িয়ে আছিস—তোর একটা রাইট আছে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দেবার। ক'জন তোর আমার মত সাফার করেছে বল? ক'জন তোর আমার মত টাইমকে নিঙড়ে নিয়ে সেকেন্ড, মিনিট একটুও ফাঁকি না দিয়ে সব সময় ফিল করছে?'

'সর্দারজীর দোকানে কাচের আলমারিতে মাংস ছাড়ানো মুরগি কেমন মশলা মাখিয়ে থাক থাক সাজিয়ে রেখেছে—'

'তোকে খাওয়াব একদিন।'

'এরল ফ্লিন রবিন হুডে আধপোড়া মাংস আদের কায়দায় দু' হাতে ধরে খাচ্ছিল—'

'আমার বড় দুঃখ হয় কুবের—', সিনেমার লাইনটা পেছনে বাড়তে বাড়তে কুবেরদের সেখানে দাঁড়াতে দিল না। এত গোলমাল, তার ভেতরে কাশ্মীর সরকারের সূক্ষ্ম হাতের কাজের জিনিসপত্র ঝুলিয়ে ধুলো মাখানো হচ্ছে, 'আমি যা জানি—শেখাবার মত কাউকে পাচ্ছি না—'

'ছেলে মেয়েদের শেখাও। সং বাপের কাছ থেকে তারা ম্যাজিক শিখুক, হাটাচলা শিখুক —কত কি শেখার আছে শিখুক—'

'তুই হাসবি না কুবের?' ব্রজ দত্ত ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোহার বাক্সে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, 'বিপদে ভেসে বেড়াতে এত ভাল লাগে—আমি জানি, বিপদ কি করে কাটিয়ে উঠতে হয়। আমার কোন নিজের লোককে ব্যাপারটা শিখিয়ে যেতে চাই—', এখানে একটুও না থেমে ব্রজ বলল, 'তুই আমার ছেলে হবি? অনেকে তো দত্তক নেয়, —বেশ—না হয় মানসপুত্র হ—,'

'ওয়ান্ডারফুল প্রো পো জা ল—একটা সিগারেট ছাড়ো আগে—'

'আইডিয়াটা বল? কেমন এসেছে মাথায়। আচ্ছা এবার তাকে দীক্ষা দেব। খুব কিছু কঠিন না। ওইযে বড় মিষ্টির দোকানটা দেখছিস—',

'ঠিক হল ওই দোকানে গিয়ে কুবেরকে একটা কালোজাম খেতে হবে। দাম দেওয়া যাবে না—দোকানীও চটবে না। পুরো ব্যাপারটাই দু' তরফে হাসির ভেতর দিয়ে সারতে হবে।

কুবের এগিয়ে গিয়ে দোকানের শোকেসে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'চুল্লোয় টেম্পারেচার কনট্রোল করে এসব বানাতে হয়—', চোখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠল কুবেরের। লোকটা গাটাগোট্টা, তার ওপর ফরসা—নিশ্চয় খুব নৃশংস। একটা সিলভার লাইন আছে। সময় দিয়ে লোকটা গোঁফ ছাঁটে। তার মানে মনটা একেবারেই পাথর না।

'না তেমন কিছু না। বেশির ভাগ মিষ্টির ফিনিশিং টাচ চিমে আঁচে দিতে হয়—'

'তবু বলতে হবে ব্যাপারটা খুবই কঠিন —', বলতে বলতে কুবের সন্দেশ, রসগোল্লা, কমলাভোগ, কালোজাম, লেডিকেনির থাকগুলো খুব ধীরে চোখে দেখে নিয়ে অবাক-

কুবের গোটা তিনেক খেলো

ভাবে বলল, 'এসব আপনার—'

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, 'নিন না খান—খেয়ে দেখুন—কোনটা দেব?'

'দেবেন। মানে—'

'খান আপনি। কালোজাম দিই?'

কুবের গোটা তিনেক খেল। তারপর পকেটে হাত ঢোকিয়ে পয়সা দিতে গেল। লোকটা হাঁহা করে উঠে নিষেধ করল। তখন ছানার দর, দুধের চালান এসব নিয়ে মোট তিনটি বাক্য ব্যয় করে কুবের ফিরে এল রাস্তার এপারে।

ব্রজদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ফুলমার্কস! কিন্তু আমার জন্যে একটা আনলে পারতিস।'

'সিচুয়েশনের সঙ্গে খাপ খেত না। নইলে

জানতাম—', বলতে বলতে কুবের দেখল, সামনেই একটা লোক বিজ্ঞাপনের জন্যে বিখ্যাত ছাতা কোমপানির একটা জেউশ ছাতা মাথায় দিয়ে ফুটপাথ জুড়ে হাঁটিছে।

অল্পক্ষণ আগে মানসপুত্র হওয়ার পর থেকেই কুবের খুব হালকা বোধ করছে। বিশেষ বলতে হল না। লোকটা হাঁফিয়ে উঠেছিল। হাতে নিয়ে কুবের প্রথমেই সামনের শোকেসের আয়নায় নিজের চেহারা দেখল। চ্যাপ্টা চোয়াল। হাসল। ছায়ায় ভাল দেখাল না। কত লোক হাসলে সুন্দর দেখায়। অথচ তার বেলায় যত গোলমাল। মুখ বুজে থাকলে এত সাধু, এত পবিত্র, এত নিষ্পাপ লাগে। তা আর থাকতে চায় না কুবের। তাই আবার হাসল। এবার আর সাহস করে ছাপ দেখল না। গার্ডেন পার্টির বিরাট ছাতাটার হাতল সাবধানে ধরে হাঁটতে লাগল কুবের। একপাশে ব্রজ দত্ত, অন্য পাশে সেই লোকটা।

'সারাদিন কতটা হাঁটতে হয়?'

'মাইল দশেক বাবু।'

'কত দেয় রোজ?'

'পাঁচ টাকা আর জলপানি—'

কুবের হিসেব করে দেখল সে আজ ক করেও সাত মাইল হেঁটেছে। সব মিলে সারাদিনে দশ মাইলে দাঁড়াবে। অথচ তা জন্যে দুপুরের লাঞ্চ আর তিনটে কালোজা ছাড়া নগদে কিছুই পায়নি, 'রোজ ক'ট ছাতা এমন বেরোয়?'

'কোন কোন দিন সাতটা অব্দি—নইলে চারজন লোক রোজ বেরোয়—।' রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে আর কুবেরদের দেখছে। মেটরোর কাছাকাছি ভিড়ের চাপে ছাতাটা একটু কাৎ হয়ে চিরুনির একজন ফেরিওয়ালাকে প্রায় ঢেকে ফেলল। কাঠের বাক্সের ওপর ঢেলে বিক্রি করছে। মাথায় চুল ঠিক রাখা দরকার। ব্রজ দত্তের হাতে একখানা চিরুনি উঠে এল। মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে কুবেরকে বলল, 'দেখবি ওখানে?' তারপর ছাতার বাইরে গিয়ে ঘুরিয়ে ঝালরে লেখা কোম্পানির নাম ঠিকানা জোরে জোরে পড়ে শোনাল। পড়বার সময় কুবেরের হাঁটা থামেনি। ব্রজ দত্ত লেখা পড়তে পড়তে পেছন ফিরে হেঁটেছে।

'আমরা গেলে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেবে?'

'বাবুরা বিশ্বাসী লোক চায়। আজ বিশ বছর ছাতা মাথায় ঘুরছি। বর্ষাকালে একটা লোক দিলাম বাবুদের। আমার নাম খারাপ হয়ে গেল বাবু। পয়লা দিনেই লোকটা ছাতা নিয়ে পালালো। তারপর অনেক খোঁজ খবরের পর ব্যাটা পূর্ণিয়ায় ধরা পড়েছে—'

কুবের অবাক হয়ে গেল। অত বড় ছাতা মাথায় দিয়ে পূর্ণিয়া অব্দি এত মাইল গেল কি করে লোকটা। কিছুকাল আগে পূর্ণিয়ায় বন্যার ছবি কাগজে ছাপা হত। সব বন্যা, সব শীতকাল এত এক ঘেয়ে। আলাদা কোন ফ্লেভার নেই। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। রাস্তা বাড়বে বলে হরিরাম সাধু-খাঁর বাড়ি ভাঙার নোটিশ পড়েছে। অথচ এখন কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। একটি বাড়ি খুঁজে নেওয়া দরকার। পাড়াটা বেশ খোলামেলা হবে। বাড়ির সামনে একটা লন থাকলে সোনায় সোহাগা। সেখানে শীত-কালের সকালে বেতের চেয়ার টেবিলে বসে রঙীন ছবির বই দেখবে। মাথার ওপর এই ছাতাটা বসানো থাকলে খুব আরাম হবে।

ক্রমশ

সানন্দর জার্নাল

[illegible] 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত [illegible] জার্নাল' পাঠকদের কাছে একটি [illegible] আকর্ষণ। এতে যেমন সুন্দর [illegible] থাকে তেমন থাকে শ্রীযুক্ত [illegible] কার্টুন। কিন্তু দেশের [illegible] বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত "সাহিত্য [illegible] বিক্রয়" কার্টুনটি দেখে খুবই [illegible] হলাম। কারণ একজন মৃত [illegible] এইভাবে ব্যঙ্গ করাটা মোটেই [illegible] নিতে পারছি না। আমরা [illegible] থেকে জেনে আসছি, মহাত্মা [illegible] সিংহ একজন অসামান্য পণ্ডিত [illegible] সংক্ষিপ্ত জীবনে (তিনি [illegible]) অনেকগুলি [illegible] লিখে গেছেন। বিশেষভাবে [illegible] অনুবাদ, বিভিন্ন [illegible] হুতোম পেঁচার [illegible] লেখককে [illegible] রেখেছি। [illegible] কালীপ্রসন্ন [illegible] নিজে হাতে [illegible] না [illegible] এবং [illegible]

নবগোপাল সিকদার

নিউ জলপাইগুড়ি

শিল্পীর বক্তব্য

[illegible] জার্নালে (২-১১-৬৮) কালি-[illegible] যশকেতারূপে চিত্রিত করায় [illegible] কেউ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, কেউ [illegible] [illegible] গেছেন। তাঁকে যশাপহারক [illegible] দেওয়ার জন্য অপরাধী ডঃ সুকুমার [illegible] ও [illegible]ন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি [illegible] ছবি এঁকে তাঁদের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল [illegible]। হুতোম প্যাঁচার নক্সা সম্বন্ধে ডঃ [illegible] লিখেছেন—'বইটিতে লেখকের নাম [illegible]। কিন্তু প্রকাশকাল হইতেই সকলে [illegible] লইয়াছিলেন যে, ইহা কালিপ্রসন্ন [illegible] রচনা। কালিপ্রসন্ন সিংহ যে ইহা [illegible] প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে বইটি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে'।

বঙ্গভাষার ইতিহাস লেখক মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'বিদ্যোৎসাহিনী-সভার কাজ করিবার জন্য কালিপ্রসন্ন পণ্ডিত ও লিপিকর পুষিতেন। লিপিকর-দের মধ্যে একজন ছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখো-

পাধ্যায়। ভুবনচন্দ্র কালিপ্রসন্নের সম্পাদনায় দৈনিকপত্র পরিদর্শকের সহ-সম্পাদক ছিলেন। অনুমান করি, এই ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখনীই হুতোম প্যাঁচার নক্সার সৃষ্টিকর্তা।'

ভুবনচন্দ্র বটতলার ভাড়াটে লেখকদের মধ্যে প্রথম খ্যাতিমান ব্যক্তি। আর এই খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর রচিত হরিদাসের গুপ্তকথা। এর প্রথম কয়েকটি সংস্করণ উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বইটির আর্থিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার জন্য ভুবনচন্দ্র পরে স্বনামেই প্রকাশ করেন ও তিনিই আসল লেখক ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ যশকেতা সে-কথা ফাঁস করে দেন।

হুতোম প্যাঁচার নক্সার ভূমিকায় আছে 'বিনয়াবণত দাস' শ্রীহুতোম প্যাঁচা তাঁর এই 'প্রথম রচনা-কুসুম' মুলুকচাঁদ শর্মাকে উপহার দিচ্ছেন। কালিপ্রসন্নের প্রথম রচনা 'বাবু নাটক' ও আরও কয়েকটি নাটক।

মুলুক আরবী শব্দ, অর্থ ভুবন। ডঃ সেনের অনুমান হুতোম-মুলুক-ভুবন। 'একই ব্যক্তি বেনামীতে দাতা ও গ্রহীতা হইয়াছেন'।

ডঃ সেনের ধারণা, হরিদাসের গুপ্ত-কথার স্টাইল ও হুতোমের স্টাইল এক। তাছাড়া ভুবনচন্দ্রের স্বনামে প্রকাশিত বিলাতী গুপ্তকথা পড়লেও এই ভাষা-সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। হুতোম তাঁর বইয়ে ঠিকানা দিয়েছে আসমান, ভুবনচন্দ্রের হরিদাসের গুপ্তকথাতেও ঠিকানা দেওয়া আছে আসমান।

কালিপ্রসন্ন মাত্র ২৯ বৎসর বেঁচে-ছিলেন। লেখাপড়া অতি সামান্য। স্কুলে নয়, বাড়িতে হরচন্দ্র ঘোষের কাছে। অল্পশিক্ষিত ধনীবাবুদের চারিত্রিক দোষাদি তাঁরও ছিল। তাঁর চরিত্রকে কেন্দ্র করেই মাইকেল 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নববাবু-চরিত্র সৃষ্টি করে-ছিলেন। সেই তরুণ বয়সে নিজ চরিত্র ও পরিবেশকে কটাক্ষ করার জন্য স্বহস্তে লেখনী ধারণ স্বাভাবিক নয়। কালিপ্রসন্ন বিদ্বান নন, কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে বিদ্যোৎসাহী। মহাভারত অনুবাদ নিজে করেননি, বাছাই করা পণ্ডিতদের দ্বারা করিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাইকে কেন যে প্রুফ রিডার নিয়োগ করেছিলেন, সে-কথা ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছেন। উৎসাহী পাঠক পড়ে নেবেন।

সর্বশেষ কথা, মহাত্মা শব্দটি নামের আগে জুড়ে দিলেই মাহাত্ম্য বাড়ে না। আমি ব্যঙ্গচিত্রকর, কোদালকে কোদাল বলাই আমার ধর্ম, তাকে খনিত্র বলে সম্বোধন করা আমার কাজ নয়। বিনীত।

চণ্ডী লাহিড়ী

জাপানে বাঙ্গালী মিলন চক্র

গত ২৩শে কার্তিক "দেশ" পত্রিকার "টোকিওর চিঠি"তে প্রবাসী পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের সাংস্কৃতিক মিলনচক্র সংগঠনের সংবাদ পড়িলাম।

খুবই আনন্দের বিষয় যে, উভয়বঙ্গের কিছু সংখ্যক উৎসাহী মানুষ অগ্রণী হইয়া এইরূপ সংস্থা সংগঠনের প্রচেষ্টা করিতে-ছেন। ইহা খুবই আশাপ্রদ। দুই বাংলার সমভাবাপন্ন প্রত্যেকেই এই সংস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ও বৃহত্তর কর্মপ্রয়াস কামনা করে বলিয়া আমার ধারণা। রাজ-নৈতিক কারণে একই দেশের মানুষ একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও ভাষা, চিন্তা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অবশ্যই উভয়ের ভাবগত সখ্যতার অন্তরায়কে সহজে দূর করিতে সক্ষম হইবে। সুদূর জাপানে সংগঠিত এই ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক চক্র সেই নিশ্চিত ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা একটি স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষুদ্র প্রয়াস হইলেও ইহার ভাবগত উদ্দেশ্য অবশ্যই সুদূরপ্রসারী এবং দুই বাংলার মধ্যে ভাব বিনিময়ের এই উদ্যোগ মৌলিকত্বের দিক হইতে প্রশংসনীয়।

আমার অনুরোধ, বিদেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শহরে যদি এইভাবে উভয়বঙ্গের ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা সাংস্কৃতিক-চক্র সংগঠনের মাধ্যমে উভয়ের হৃদয়ের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলেন, তবে তাঁহারা ভবিষ্যতে অবশ্যই এক মিলন-সেতু স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন এবং আমাদের হৃদয়ের ব্যবধান সীমিত হইবে।

এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশকদের নিকট অনুরোধ যে তাঁহারা যেন শ্রীবিকাশ বিশ্বাসের আবেদনে সাড়া দেন ও প্রয়োজনে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তোলেন।

বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া যে-সব বিদেশী সুধী এই প্রচেষ্টার সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা দেশ ও জাতির নিকট শ্রদ্ধার পাত্র।

সুজাতা ঘোষ
হরিণঘাটা ফার্ম

জর্জ অরওয়েল

শ্রীসনাতন পাঠকের লেখা জর্জ অরওয়েল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সুন্দর আলোচনা-প্রসঙ্গে (দেশ, ৯ নভেম্বর সংখ্যা) এই ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই। জর্জ অরওয়েল আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর নাম। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি ইংরেজী উপন্যাস ও সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এ এক বিশেষ কৃতিত্বের কথা।

সনাতন পাঠক মন্তব্য করেছেন যে ঔপন্যাসিকের চেয়েও সাংবাদিক হিসাবে অরওয়েল অনেক বড়'—দুর্ভাগ্যবশত আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। আমার মনে হয়—এই উক্তি জর্জ অরওয়েল সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, কারণ তিনি প্রধানত ঔপন্যাসিক। তাঁর সাংবাদিকতা, এমনকি সাহিত্য-সমালোচনাও আমার মতে ঔপন্যাসিক জীবনেরই আনুষঙ্গিক। আরো স্পষ্ট করে হয়তো বলা যেতে পারে যে জাত-ঔপন্যাসিকের মতোই তিনি তাঁর জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের অনুষঙ্গ হিসাবেই কাজে লাগিয়েছেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁর শেষ দুটি উপন্যাস 'অ্যানিমাল ফার্ম' এবং 'নাইনটিন এইটিফোর'-এর মাধ্যমেই লেখক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বলিখিত উপন্যাসগুলিও উল্লেখযোগ্য। সেগুলিকেও সার্থক উপন্যাস বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অরওয়েলের সমালোচক এল ব্যাণ্ডার লেখকের উপন্যাস 'বার্মিজ ডেজ' সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত অসংখ্য উপন্যাসের মধ্যে তিনটি উপন্যাস বিশেষ আলোচনায় দাবি রাখে এবং তার মধ্যে 'বার্মিজ ডেজ' অন্যতম। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে অপর দুটি উপন্যাস, রুডিয়ার্ড কিপলিং রচিত 'কীম' এবং ই এম ফর্স্টারের লেখা 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া')। এই উপন্যাসে লেখক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তার নজীর বড় একটা নেই। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাস থেকে আমরা লেখকের যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই তা পরিপূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধেও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেছেন।

তাঁর শেষ দুটি উপন্যাসে তিনি সাম্যবাদের কটু সমালোচনা করেছেন। অনেকে মনে করেন এই দুটি উপন্যাস ঠিক সাহিত্য-পদ-বাচ্য নয়—এর মধ্যে 'প্রপাগাণ্ডার' সুর প্রকট। অনেকের কাছে কিন্তু এ মত গ্রাহ্য বলে মনে হবে না। আমার মনে হয় অরওয়েলের এই দুটি উপন্যাসকে আলাদা করে বিচার করার ফলেই পাঠক-মানসে এই ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অরওয়েল রচিত প্রত্যেকটি উপন্যাস এবং প্রবন্ধাদি পাঠ করলে আমাদের মনে হয় যে এই পৃথিবীর অনেক অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অর্থনীতির উপর আধারিত আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিও তিনি তীব্র কষাঘাত করেছেন ('কীপ দ্য অ্যাসপিডিস্ট্রা ফ্লাইং') আর সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তর বিপ্লব যুগের সমাজ-ব্যবস্থা তথা সাম্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন এ জন্যে যে এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীন চিন্তার কোন অবকাশ নেই আর ধনতন্ত্রের অবসানের পরে যে সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে এক নতুন 'প্রিভিলেজড্' ক্লাসের সৃষ্টি হয়, জনসাধারণকে 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' থাকতে হয়।

আমার মনে হয় যে ঔপন্যাসিক হিসাবে জর্জ অরওয়েলের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, রাজনৈতিক সমস্যা দ্বারা বিধৃত হলেও তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস সাহিত্য-রস-সমৃদ্ধ। আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসে রাজনৈতিক সচেতনতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য—এ ক্ষেত্রে অরওয়েলের অবদান অনস্বীকার্য।

একটি কথা। শ্রী পাঠকের আলোচনায় তথ্যগত সামান্য ভুল আছে। অরওয়েলের জন্মস্থান মোতিহারী। যদিও সে সময়ে (অর্থাৎ ১৯০৩ সালে) মোতিহারী অবিভক্ত বাঙলার অংশই ছিল, তবুও আমার মনে হয়, 'জর্জ অরওয়েলের জন্ম হয়েছিল এই বাংলা দেশেই'—এই মন্তব্য বিভ্রান্তিজনক মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

পরিশেষে, সনাতন পাঠককে অনুরোধ জানাই যে দেশের পাতায় সমসাময়িক ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে তিনি যেন আরো ঘনঘন আলোচনা করেন। আমাদের অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের এ ধরনের আলোচনা পাঠের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দিলীপ চক্রবর্তী
ডালটনগঞ্জ (বিহার)

শারদ সাহিত্য

॥ ১ ॥

বর্তমান সংখ্যায় দেশ পত্রিকায় (৩৬ বর্ষ, সংখ্যা ৫) শ্রীযুক্ত তাপসকিরণ রায় মহাশয় শুভ আচার্য লিখিত শারদ সাহিত্য বিষয়ক রচনাটি পড়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বুঝলাম, কিন্তু তাঁর ক্ষোভের যথার্থ কারণ বোধা হল না। এতদিন জানতাম কানাকে 'কানা' বলা, খোঁড়াকে 'খোঁড়া' বলা পাপ, কিন্তু ভালকে 'ভাল' না বলার স্বপক্ষে বিমল মিত্র মহাশয়কে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে তিনি অযথা নিজেকেই হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন। দণ্ডকারণ্যে বিমল মিত্রের বক্তৃতার অংশ তুলে দেখেছ 'শ্লীল অশ্লীল' সংখ্যা বের হওয়ার সঙ্গে 'ন্যাবি'র সঙ্গে 'জাবি'র মিল দেওয়ার মতোই কাঁচা পদের ব্যাপার। বোধ হয় তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল সমগ্রভাবে দেশ পত্রিকার মান কি ও দেশের দীর্ঘকালের ট্রাডিশন অনুযায়ী 'শ্লীলতা অশ্লীলতা' বিষয়ক সংখ্যাটি নির্দিষ্ট মান রাখতে পেরেছে কি না। ওই সংখ্যাটি হয়তো তিনি পড়েন নি, পড়লে দেখতেন ওতে রবিঠাকুরের বিবরণ নেই, আছে একটি চিরাচরিত তর্কমূলক বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মতামত এবং অবশ্যই বলব ইত্যাকার মতামত সাধারণ পাঠকের বুদ্ধি বিবেচনা তৎপর করতে সাহায্য করেছে। মজার বিষয়, ঐ পত্রেই তিনি শ্লীলতা অশ্লীলতা বিষয়ে বিমল মিত্র মহাশয়ের কিছু বক্তব্য উদ্ধার করেছেন, যে মন্তব্যে কোন নতুনত্ব নেই।

পরিশেষে বক্তব্য, শুভ আচার্য লিখিত সমীক্ষাটি পরিষ্কার বক্তব্য ও নির্ভীকতায় বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এই কথা বলার মধ্যে প্রশংসার বীজ থেকে গেল—তাপসকিরণ রায় মহাশয় হয়তো এর মধ্যেও উদ্দেশ্য খুঁজে পাবেন।

—শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

॥ ২ ॥

১৬ই নভেম্বর দেশ পত্রিকায় শুভ আচার্য মহাশয়ের "শারদ সাহিত্য : একটি সমীক্ষা" বড় ভালো লাগলো। এবার শারদ সংখ্যায় ভালো ছোট গল্প মোটেই চোখে পড়লো না ২।১টি বাদে। শুধু বস্তাপচা ছোট ছোট উপন্যাসই চোখে পড়লো। আসলে সেগুলো উপন্যাস পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা—তর্কের বিষয়। ২।৪টি

উপন্যাস বিকৃত যৌনকে কেন্দ্র করে যে ধরনের উপন্যাস হাটে-বাজারে ছেড়েছেন, সেগুলোর মূল্যায়ন করতে গেলে হয়তো ওই ধরনের সব উপন্যাসই সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে শারদ সংখ্যায় আমরা চাই ছোট গল্প—ক্ষুরধার-তীক্ষ্ম-বাস্তব-ছোটগল্প। অন্যান্য বৎসর শারদীয় সংখ্যার ছোট গল্প পড়তে ভালো লাগতো, কিছু জানতাম, কিছু শিখতাম। এবার ছোট গল্পে তার কিছুই খুঁজে পেলাম না। এবার আনন্দবাজার ও দেশ পূজা সংখ্যা প্রকাশ না হবার জন্য ভালো ছোট গল্প হতে বঞ্চিত হয়েছি।

নতুন ২।৪টি পত্রিকা মেয়েদের অশ্লীল ছবি দিয়ে বাজারে বিক্রি করবার চেষ্টা করেছে. হয়তো বিক্রি হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের মূল্যায়নে এ কি কালজয়ী? এখনও ভাল ছোট গল্পের দাম আছে। ভাল ছোট গল্প হলে নিশ্চয় তা বিক্রি হবে। উদাহরণস্বরূপ "আনন্দবাজার" ও "দেশ"।

তাই শুভবাবুর কথায় বলতে চাই, আমরা ভালো নতুন স্বাদের বাস্তব গল্প পড়তে চাই।

মিহিরবরণ মুখোপাধ্যায়
বালুরঘাট

আসামে বাংলা পত্রিকা

'দেশ' চতুর্থ সংখ্যার সাহিত্য সংবাদে 'আসামের বাংলা পত্রিকা' শীর্ষক আলোচনায় একটি ভুল তথ্য (সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ) রয়েছে। শিলচর থেকে প্রকাশিত যে কবিতা পত্রিকাটির কথা ওখানে উল্লিখিত, সেটির নাম 'অতন্ত্র' নয় 'অতন্দ্র'।

আসামের বাংলা পত্রিকার ক্ষেত্রে আরেকটি নাম উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে বলে মনে করি. সেটি 'সাহিত্য'। প্রকাশ স্থান হাইলাকান্দি, সম্পাদক বিজিৎ-কুমার ভট্টাচার্য, নিখুঁত ছাপা এবং সুন্দর বিন্যাসে এই মূল্যবান কবিতা আলোচনার পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই প্রচুর প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরবাহী।

রণজিৎ দাস
জি সি কলেজ, শিলচর।

লক্ষ্মীর কৃপালাভ

গত ৩০শে কার্তিকের 'দেশ' পত্রিকায় 'লক্ষ্মীর কৃপালাভ' পর্যায়ে 'ক্যালকাটা ফ্যান' সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধে সম্ভবত ভ্রমবশত একটি তথ্য উহ্য থেকে গেছে। আমি যতদূর জানি, সৌরেনবাবু যখন নিজের হাতে কারখানার ভার গ্রহণ করেন, সেই সময় ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আরেকজনের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন, তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীসুধাকর মুখোপাধ্যায়। ইনি প্রবন্ধে উল্লিখিত "Announcing" ফ্যান এর সময়ে, তৎপূর্বে এবং তৎপরেও দীর্ঘদিন Works Manager হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অবদান কম নয়।

জগদীশ গুপ্ত
কলকাতা-২৯

সাহিত্য সংবাদ

আপটন সিনক্লেয়ার

প্রাচীন যোদ্ধা আপটন সিনক্লেয়ারের মৃত্যু হলো একানব্বই বছর বয়সে। নিজেই তিনি এক সময় বলেছিলেন, পঁয়ষট্টি বছর ধরে আমি কলম নিয়ে যুদ্ধ করেছি। বছর দু'এক আগে তিনি নিউ ইয়রকের বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে এসে বলেছিলেন, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার শরীর আমাকে হারিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু চোখের সামনে এতগুলি স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল উৎফুল্ল যুবক-যুবতী দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, আমার মনে হয় এরা আমাদের চেয়েও আরও বড় যোদ্ধা হবে।

সিনক্লেয়ার নিজেকে সোসালিস্ট বলতেন—আজীবন তিনি সমাজকে পাল্টাবার জন্য লড়াই চালিয়েছেন—কিন্তু তাঁর সোসালিজম কমুনিজম থেকে অনেক দূরে। বস্তুত এক সময় তিনি কমুনিজমের তীব্র সমালোচক হয়েছিলেন। খৃষ্টান আদর্শনির্ভর সমাজ-তন্ত্রবাদে তিনি ছিলেন আস্থাশীল। যীশু-খৃষ্ট, হ্যামলেট এবং শেলী—এই তিনজন ছিলেন সিনক্লেয়ারের অভিভাবক-দেবদূত।

ধৈর্য এবং মনের জোর, এক কথায় যাকে বলা যায় গোঁয়ার্তুমি, তার জোরেই সিনক্লেয়ার প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এক সময় বেহালা শিখবেন ঠিক করেছিলেন, নিজে দশ ঘণ্টা করে রেওয়াজ করতেন। লিখতে শুরু করেছিলেন স্রেফ অর্থোপার্জন করার জন্য. কিন্তু এক সময় ঠিক করলেন, লিখতে হলে খাঁটি লেখকের মতই লিখবেন। সুতরাং হালকা পত্র পত্রিকায় মেয়েদের খুশী করা গল্প লেখা ছেড়ে কঠিন উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। আগের লেখাগুলোতে বেশ টাকা পেতেন, এই সমস্ত উপন্যাস পাঠকদের আকর্ষণ করতে পারলো না, বিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরে সিনক্লেয়ারের বয়েস তেইশ, তখন তিনি প্রায় উপোস করে দিন কাটাচ্ছেন।

উনিশ শো ছ' সালে বেরুলো তাঁর উপন্যাস 'দি জাঙ্গল'। এই প্রথম তিনি সারা দেশে, এবং দেশ ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে পরিচিত হলেন। 'দি জাঙ্গল' এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বাংলা সমেত। শিকাগোর মাংস ব্যবসায়ীদের নিষ্ঠুরতার এই মর্মন্তুদ কাহিনী লেখার আগে তিনি নিজে মজুর সেজে কশাইখানায় ঘুরেছেন, দিনের পর দিন কাটিয়েছেন ওদের সঙ্গে। একটি সংবাদপত্রের হয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে উপন্যাসের কাহিনীটি দানা বেঁধে ওঠে। এর পর ধারাবাহিকভাবে তিনি এক একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করতে লাগলেন। ক্যাপিট্যালিস্ট সমাজ, ধর্মের গোঁড়ামি এমনকি উত্তেজনাপ্রিয় সংবাদপত্র-গুলিকেও ছাড়েন নি। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এবং অর্থ পান প্রচুর, ফলে, অনেকে ঠাট্টা করে তাঁকে 'লক্ষপতি সোসালিস্ট' বলে ঠাট্টা করতে শুরু করেন। সিনক্লেয়ার অবশ্য এর উত্তরে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর টাকাকড়ি সমাজ সংস্কারের কাজেই ব্যয় করছেন এবং মোটর গাড়ি চড়েন না। উনি শো সাতাশ সালে বেরোয় তাঁর অপর বিখ্যাত বই, "অয়েল"। "অয়েল"-এর কোনো কোনো অংশ অশ্লীল বলে চিহ্নিত হয়েছিল এবং বোস্টনে বইটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সিনক্লেয়ার অবশ্য জানিয়েছিলেন, তাঁর ঐ বইয়ের তথাকথিত "অশ্লীল" অংশ আসলে সরাসরি বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি, সলোমনের গান থেকে নেওয়া।

নোবেল প্রাইজের জন্য সিনক্লেয়ারের নাম বার বার উঠলেও, কমুনিস্ট সন্দেহে তাঁকে কোনোবারই দেওয়া হয়নি। তাঁর বদলে, তাঁর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট লেখক সিনক্লেয়ার লুইসকে দেওয়া হয়েছিল একবার।

আপস্টন সিনক্লেয়ারের জন্ম ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে, মৃত্যু ১৯৬৮ সালের ২৬শে নভেম্বর।

মনোমোহন ঘোষের জন্ম শতবার্ষিকী

কবি এবং প্রখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের জন্ম শত-বার্ষিকী পালিত হবে আগামী জানুয়ারিতে। বাংলা দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সমস্ত রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র একদা মনোমোহন ঘোষের একটি মর্মর মূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন, আজও তা কার্যে পরিণত হয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ'র দাদা মনোমোহন তাঁর কবিতার জন্য প্রখ্যাত ইংরেজ লেখকদের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিলেন। ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার, অস্কার ওয়াইল্ড, ডব্লু বি ইয়েট্স এবং লরেন্স বিনিয়ান প্রভৃতি মনোমোহনকে শক্তিশালী কবি হিসেবে স্বীকার করেছিলেন।

বিহার রাজ্য বঙ্গভাষী সম্মেলন

আগামী ফেবরুয়ারি ও মার্চ মাসে ভাগলপুরে বিহার রাজ্য বঙ্গভাষী সম্মেলন হবে, তার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রবীণ লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে একটি মানপত্র দেওয়া হবে, এ ছাড়া নাটক ও রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা। যাঁরা যোগদান করতে ইচ্ছুক, তাঁরা : পার্ক হাউস, মশাক চক, ভাগলপুর-১—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস
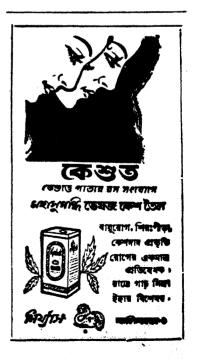
প্রজাপতি। সমরেশ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। মূল্য ছয় টাকা।

এপার ওপার। সমরেশ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

শিল্পে শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্ন বন্যা অথবা ভূ-কম্পনের মতো প্রাকৃতিক ব্যাপার। সময় থেকে সময়ান্তরে নতুন উত্তেজনায় ঘটে চলে। দু'শ বছর আগে ওদেশে 'ফ্যানী হিল' তোবা-তোবা ব'লে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এখন জনসমক্ষে অবাধে খুলে দেওয়া হয়েছে। ক্লাসিক লোকরাও অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে রেহাই পাননি, মাইকেলেঞ্জেলো-ও নয়। তাঁর 'করনকোপিয়া'-তে যৌন-প্রতীক আবিষ্কৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে অশ্লীল লেখক ভাবা কি পরিশ্রমসাধ্য, এবং উৎসাহীদের হাতে তিনিও নিস্তার পাননি।

উপরের দু'টি উপন্যাসেরই মৌল বিষয় টাট্‌কা, সমসাময়িক জীবন। শিল্প বা সাহিত্যে সচরাচর কৃত্রিমতা ও 'ক্লিশে' নিয়ে কারবার ফাঁদতে আমরা ভালোবাসি। সেদিক থেকে প্রথম বইটির প্রায় আবরণহীন আচরণ এক বিস্ময়কর আঘাত হানতে বাধ্য। এই আঘাতজনিত অস্বস্তির আরো কারণ এই যে, পৃথিবীতে সব দেশে সব কালে একদল লোকের উটপাখি-মনোবৃত্তি থাকেই। বাঙালীরা-ও তার ব্যতিক্রম নয় এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে, উপস্থিত বাঙালী-সমাজে সবিশেষ বিষ যত উত্তরোত্তর বাড়ছে, সে-তুলনায় উত্তরণের পথ প্রায়শ নেই, থাকলে সংশয়ে আচ্ছন্ন। অবশ্য এই সামাজিক সংকটেও যারা স্থির ও অটল আছে, তথাকথিত অসামাজিক হ'য়ে যায়নি, তাদের কৃতিত্ব কিছু কম নয়। তবু দিবালোকতুল্য স্পষ্ট কথাটা এই যে, সমাজের গভীর অসুখ এখন। আর অসুখ হ'লে লোকে কী করে? ধামাচাপা দেয়? 'প্রজাপতি' উপন্যাসেও সমরেশ বসু উদ্বিগ্ন গৃহস্থের মতো সেই অসুখকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন কোন সুরাহা হবে সম্ভবত এই আশায়। আদত বিষয় যখন অপ্রিয় তখন তার ভাষাও মসৃণ ও মধুর হবে না, এটা স্বতঃসিদ্ধ। অবশ্য ঔচিত্যের প্রশ্ন আলাদা, ব্যাকরণে সর্বক্ষেত্রে উচিতার্থে নিশ্চিত বিধিলিং হয় কিন্তু জীবনে উচিতের উত্তর সর্বদা এক ও নিশ্চিত নয়। আরেকটি প্রস্তাব 'প্রজাপতি'তে প্রকটিত এবং তা খুবই ভাববার কথা। সেটি হ'ল, রাজনৈতিক দলগুলি মূলত মানুষ ও সমাজের জন্য তৈরি হলেও, মানুষ এখন উপলক্ষ এবং ব্যবহারের হাতিয়ার মাত্র' ক্রমে তারা এক স্বয়ংক্রিয় দলগত সাম্রাজ্যবাদ তৈরি করছে। এই উপন্যাসের লক্ষ্য যদিও বাঙালী সমাজ ও জীবন তবু উপমা, ইমেজ ও রচনারীতির কোথাও কোথাও বিদেশী মানসতার ছাপ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়; তার কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে, দেশ-সমাজ নির্বিশেষে আধুনিক মানুষ এক নিখিল অন্তর্লোকের অংশীদার।

'এপার-ওপার' উপন্যাসটি অবশ্য প্রথমের তুলনায় বহরে-বাহারে বেশ খানিকটা খাটো। দু'টি উপন্যাসেরই যোগসূত্র এই যে, দুই বইয়ের দুই নায়ক তথাকথিত ভাবে সমাজছুট জীব। দুজনেই প্রায় কক্ষচ্যুত উল্কা এবং এদের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের গ্রহান্তর হ'য়ে চলেছে। তবে, দ্বিতীয় উপন্যাসের নায়ক বিশ্বনাথের মধ্যে একটি সক্রিয় মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায় এবং সেটি আশ্বস্ত হবারও কারণ বটে। লেখক ভাষা ও বর্ণনার বিন্যাসে আরেকটু আগ্রহ দেখালে পারতেন। বাস্তবতা রচনার ব্যাপারেও কোথায় যেন একটি ব্যস্ততা রয়েছে, ফলে চেষ্টা-চেষ্টা ভাবটি কাটেনি এই উপন্যাস থেকে। গল্পটি শেষ পর্যন্ত গোল হ'য়ে ফিরে এসেছে। সমরেশ বসু সদা-সজাগ লেখক। একদা তিনি অন্যভাবে সামাজিক গল্প লিখেছেন, আজ সমাজ পাশ ফিরেছে বলে যদি তিনি আরেক ভাবে লিখতে চান তো তা নিয়ে কোলাহল করে লাভ নেই, বরঞ্চ সর্বজ্ঞ ও সবময়

সময়ের হাতেই তাঁকে সঁপে দেওয়া ভালো।

৫৩।৬৮; ১৬৪।৬৮

কবিতা

স্মৃতি বিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশী। যুগান্তর চক্রবর্তী লেখাপড়া, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

সহজ সুন্দরী। কবিতা সিংহ। চতুষ্পর্ণী প্রকাশনী। ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। তিন টাকা।

কুশল সংলাপ। কবিরুল ইসলাম। পূর্বাশা প্রকাশন, ৩২ পটলডাঙা স্ট্রীট, কলকাতা-৯। সাড়ে তিন টাকা।

নির্জন সংলাপ। নিশিনাথ সেন। নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩। আড়াই টাকা।

শুধু পূর্ণেন্দু পত্রী মলাট এঁকেছেন বলে নয় যুগান্তর চক্রবর্তী ও কবিতা সিংহের কাব্যগ্রন্থের একটি সাধারণ সাদৃশ্য এই যে, দুটি কাব্যগ্রন্থেই কবির 'ভূমিকা' সংবলিত। ভূমিকা না বলে কৈফিয়ত বলাই ভাল। যুগান্তর লিখেছেন যে, তাঁর পনের বছরের বিক্ষিপ্ত সময়ে রচিত "বর্তমান গ্রন্থটি বস্তুত সম্পূর্ণ পৃথক ও অপ্রকাশিত অন্তত তিনটি কাব্যগ্রন্থের সংকলন।" কবিতারও মূল বক্তব্য তাই: "গ্রন্থটিকে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে লেখা কয়েকটি কবিতার নিছক সংগ্রহ-গ্রন্থ বলাই যুক্তিযুক্ত।" এই বক্তব্য অনুধাবন করলে এই কথাই পরিস্ফুট হয় যে, কাব্য-সংকলনে কবির একটি বিশেষ পর্যায় বা মানসিকতার লক্ষণ ফুটে ওঠে বা ফুটে ওঠার কথা। তা অনুপস্থিত থাকবে আশঙ্কা করেই এই কুণ্ঠিত ঘোষণা। বলা বাহুল্য, পরিণতির বিভিন্ন স্তর এবং ক্রম অনুসরণ করার দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে কাব্যপাঠকের উপর এসে পড়ে। আরও একটি আশা এ দুটি কাব্যগ্রন্থ হাতে পেয়ে জাগে। গত পনের ষোল বছরের বাংলা কবিতার ধারার পরিচয়ও বিধৃত হয়ে থাকবে কাব্য-সংকলন গ্রন্থ দুটির অঙ্গে।

শেষোক্ত ধারণার দিক থেকে বিচার করলে একটি কথা মনে হতে পারে। কয়েক বছর ধরে বাংলা কবিতার দুটি ধারা পাশাপাশি চলে এসেছে। একটি ধারায় যুগান্তর থাকলে কবিতা তার বিপরীত কোটিতে। যুগান্তর নিটোল, ছন্দো-নিপুণ, শব্দসচেতন, রোমান্টিক কবিতায় বিশ্বাসী। তাঁর কবিতায় চিত্র এবং ধ্বনি সহজ সাযুজ্য পায়, প্রতিটি কবিতার প্রতিটি পঙ্ক্তি পরস্পরসম্পৃক্ত, একটি মূল বক্তব্যের অবতারণা ও বিস্তার সহজে লক্ষণীয়। ছন্দ যেখানে ভেঙেছেন ছন্দোহীনতার মধ্যেও লাবণ্য সঞ্চার করতে ভোলেননি। চিত্রকল্প সহজ হয়েও গভীর, শব্দ সংস্কৃত হয়েও ভারাতুর:

দর্পণ. বয়স বাড়ছে, শরীর ধরছে না,
শূন্য মুখে
চায় একাকার রেখা, পরিপ্রেক্ষিতের জটিলতা
হাড়ের কাঠামো চায় প্রতিমার রক্তমাংস, কথা
খোঁজে সর্বাঙ্গের ব্যবহার। তুমি কবে চূর্ণ বুক
পেতে তার রূপ ধরবে, কবে তার
অতিবাস্তবতা
পাবে রক্তপারদের তীব্রচাপ—আয়ুর অসুখ।

কিংবা অন্যত্র:

নীহারিকাপুঞ্জে আমি সুপ্ত আছি,
হে কবিকুমার।
জাগরণে চাই নদী,
চাই জলধারা পায়ে পায়ে,
নিকটে নিকটে এক বৃক্ষ এক,
সিক্ত ছায়ে ছায়ে
আমি যার কাছে যাব
তার মুখ সদা উপহার।

শেষের দিকের কবিতায় যুগান্তর আরও নিরলংকৃত স্পষ্টতার দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁর এই ভঙ্গি নতুন কোনো দিক্‌নির্দেশ করবে বলে মনে হয়:

আমি চাই উৎসর্গবিহীন
সব লেখা, সব প্রেরণার আগে তুমি।

তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের প্রতি তাই সাগ্রহ প্রতীক্ষা থাকবে কাব্যপাঠকের।

কবিতা সিংহ, পূর্বেই বলেছি, অন্য মেজাজের। তিনি ছন্দের গোলমাল করেন, অসম্ভব ভাল পঙ্ক্তির পাশে কাঁচা পঙ্ক্তির সহাবস্থান ঘটান, শব্দের ব্যবহারে বেপরোয়া, তীব্র আবেগে ঝনঝন করে বেজে উঠে একই কথা দু-বার তিনবার করে, হাতুড়ি পেটার মতো করে বলেন, তবু, সব মিলিয়ে, তিনি তাঁর একটা নিজস্বতা ফুটিয়ে তুলেছেন—এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। 'সহজ সুন্দরী'র প্রথম দিকের কবিতায় তিনি বলেছেন: 'কবিতা এবং আমি দুই যুযুধান পায়তাড়া'। কিন্তু কবিতা 'পায়তাড়া' তখন সত্যই ছিল না। নির্ভুল ছন্দে কবিতা সিংহ তখন বহু সহজ-সুন্দর কবিতা লিখেছেন। 'ভানুমতীর দুপুরে', 'বেঁচে থাকার মানে', 'সুর্ব তোমার ঘাড় কত বলে' ইত্যাদি তার সাক্ষ্য দেবে। লঘু সুরে লেখা 'বিবিকে ফলে মার্কস' পরবর্তী কালেও মনোহরণ রচনা। কবিতার কিছু রচনার মধ্যে লঘু ভঙ্গির সঞ্চার সর্বক্ষেত্রে সুখকর হয়নি ('দারুণ সস্তার দিদি, দারুণ সস্তায়', 'বুকের মধ্যে কিরকম ঠান্ডা মেরে গেল', পাবোই শিওর জেনে গিয়ে' ইত্যাদি)। কিন্তু সংহত আবেগশুদ্ধ রচনাও যে তিনি লিখতে পারেন তার প্রমাণ 'অসমাপ্ত কবিতা'। আধুনিকতা এখানে বহিরঙ্গেই নয়, কবিতার শরীরে অঙ্গীভূত:

...শব্দের সেই অক্ষয় মন্দির
আমি ম্লেচ্ছ করেছি।
রোজ রাতে সেইসব
বিকলাঙ্গ শব্দগুলি আসে
সারারাত জানালায় আঙুলবিহীন হাতে
কপোলবিহীন মুখে সেইসব
ক্ষয়ে-যাওয়া শব্দগুলি
আঘাত করেছে।
রক্ষা করো—বলে আমি
আর কোন্‌ ঈশ্বর হাতড়াবো?

'কড়ি খেলা', 'বিসর্জনের পর', 'ভেবে-ছিলাম' এই কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য রচনা।

কবিরুল ইসলাম এবং নিশিনাথ সেন তরুণতর কবি। কবিরুল ইসলাম দু-একটি সুখপাঠ্য কবিতা রচনা করেছেন সন্দেহ নেই ('রক্তের নিয়মে', 'রক্তে ভালোবাসার কণিকা' 'জলে পাপ ধুয়ে দাও'), কিন্তু সংহতি ও স্বকীয়তার অভাব বড় প্রকট।

নিশিনাথ সেন-এর গ্রন্থটি 'কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠীর উদ্দেশে' উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থটি পাঠ করেও উৎসর্গপত্রের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হল না। নিশিনাথ সেন প্রতি পঙ্ক্তির শেষে সুন্দর মিল দিয়েছেন। এর বেশী তাঁর কবিতা সম্পর্কে আপাতত কিছু বলা গেল না।

১১৫।৬৮, ২০২।৬৮, ১১৭।৬৮

প্রবন্ধ

Raja Rammohun Roy: The Representative Man; Amiya Kumar Sen; Calcutta Text Book Society, 13, Surya Sen Street, Cal.-12. Price Rs. 12·00.

বাংলাদেশে রামমোহন চর্চার প্রতি উৎসাহ সর্বদাই লক্ষ্য করা গেছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই রামমোহনের ভূমিকা নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। রাম-মোহনের প্রামাণিক জীবনীও সুসম্পাদিত হয়ে বার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রামমোহন আলোচনায় তাঁর অন্তর-রহস্যের সন্ধান পেয়েছি। তথাপি রামমোহনের অনন্য-প্রতিভার আকর্ষণ আমাদের কাছে আজও বিস্ময়ের বস্তু। অপর দিকে রাম-মোহন চর্চা বাংলার রেনেশাঁসের আলোচনায় নূতন আলোকপাত করে বলে রামমোহনের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা আরও বেশি। অমিয়বাবুর গ্রন্থ রাম-মোহন চর্চার ক্ষেত্রে আর একটি নূতন সংযোজন।

শ্রীযুক্ত সেন মোট নয়টি পরিচ্ছেদে রাম-

মোহনের কর্মজীবনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়েছেন। পরিশিষ্টে একটি অধ্যায়ে রামমোহন সংক্রান্ত পাঁচটি দলিল জুড়ে দিয়ে বইটির মূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে রামমোহনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অমিয়বাবু সংগত কারণেই রামমোহনের জীবন-কথা সবিস্তারে বর্ণনায় বিরত থেকেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রামমোহন বাংলা দেশকে যেমন দেখেছিলেন তার কথা সবিস্তারে বিবৃত। শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের জটিলতা, নারী জীবনের লাঞ্ছনা, বহু বিবাহ প্রথা, খাদ্য কষ্ট, কৃষকের দুরবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ইত্যাদিতে বাংলা দেশ তখন ভুগছে। আইন আদালতের অব্যবস্থা, আদালতের ব্যবহারে দেশের সাধারণ লোকের অভাব-অভিযোগ উপেক্ষিত। অপর দিকে নতুন ভূমিব্যবস্থায় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। বিগতকালকে অশ্রদ্ধা না করেও রামমোহন নতুন কালের ভাবনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কোম্পানি সরকার কর্তৃক প্রেস আইন জারি করার ফলে দেশব্যাপী যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল সে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে রামমোহনের সততার ও নির্ভীকতার যে পরিচয় পাই লেখক তথ্য সহযোগে সে প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। রামমোহন অগ্রবর্তী মানুষ। তাঁর কর্মচিন্তার দুটো দিক একটি প্রয়োগের অপরটি তত্ত্বের। রামমোহন যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন ঊনিশ শতকের বাঙালী বেশ কিছুকাল পরে তার যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছিল। সংবাদপত্র নিরোধ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রামমোহনের মানব স্বাধীনতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয়জ্ঞাপক। বাংলার শিক্ষা-সংস্কারে রামমোহনের ভূমিকাকে আজকাল কেউ কেউ লঘু করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি রকম ছিল ঐতিহাসিকরা তার বিচার করবেন। কিন্তু এ কথা কারও অবিদিত নেই যে বাংলার শিক্ষার অগ্রগতিতে রামমোহনের নানামুখী প্রস্তাব ও প্রেরণা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রাচ্য-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত হয়ে এবং প্রাচ্য-বিদ্যার প্রতি রামমোহনের অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কেন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজিকেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন সে প্রশ্ন বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কেবল শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেই নয় তিনি সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে উন্নততর চিন্তার জন্য ইংরাজিকেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপের চিত্তদূত আমাদের দ্বারে যে সম্ভার নিয়ে এল রামমোহন তাকে অকুণ্ঠচিত্তে বরণ করে নিয়েছিলেন। অমিয়বাবু চতুর্থ পরিচ্ছেদে সে বিবরণ দিয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায় রামমোহনের সংগ্রামমুখর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ইংরেজ রচিত জুরী প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। রামমোহন আইনের দিক থেকে যেমন একে ঘৃণ্য মনে করেছিলেন তেমনি কোনো সম্মানিত জাতির পক্ষেই এ আইন মেনে নেওয়া যে চরম লাঞ্ছনার পরিচায়ক তাও তিনি সাহসের সঙ্গে বলেছিলেন। শ্রীযুক্ত সেন জুরীপ্রথা সম্বন্ধে গোটা একটি পরিচ্ছেদে যে বিশেষ আলোচনা করেছেন তা হঠাৎ অতিকথন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিষয়টিকে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় এর মধ্য দিয়ে গোটা ইংরেজের বিদ্বেষ রূপ দেখা দিতে শুরু করেছে। রামমোহন যে প্রতিবাদ করলেন তাতে তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। রামমোহনের এই প্রতিবাদ মানবতার অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সুতরাং রামমোহনের এই বিশেষ কর্মটির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার ইতিহাসের সঙ্গে নিয়মে ঘটেছে। তখনকার শিক্ষিত বাঙালী বড়ো ইংরেজকে ঘৃণা করেনি। বড়ো ইংরেজ যে নানাদিক থেকে এখন দেশের পক্ষে অপরিহার্য এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। রামমোহন এঁদের একজন। বস্তুত রামমোহনকে দেশীয়দের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে হয়েছে। তবে তিনি ইংরেজদের তোষামোদ করবার জন্য তাদের আহ্বান জানান নি। বিদেশীরা ভারতবর্ষের সমস্যা বুঝুক এবং তার সমাধানে এগিয়ে আসুক এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই। শ্রীসেন বাংলার শিক্ষিতজনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটি উজ্জ্বল চিত্র রচনা করেছেন এই দুটি পরিচ্ছেদে। সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন রামমোহন। তাঁর বিভিন্ন বিচারগুলি এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই নৈয়ায়িক মননের পরিচয় পাই আইন-ব্যাখ্যাতা রামমোহনের প্রাচীন দায়ভাগ মিতাক্ষরা ইত্যাদি স্মৃতিনির্দেশ বিচারে। ইংরেজ বিচারকের পাশে রামমোহনের ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট আরও তীক্ষ্ণ। ইংরেজের ল অ্যান্ড অর্ডার-এর আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু এই আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে এদেশে যে দেশীয় মনীষীদের ভূমিকা রয়েছে তার কথা আমরা সকলে মনে রাখি না। অমিয়বাবু দেখিয়েছেন যে আইনের উদ্ভব এবং স্বায়ত্ত সম্বন্ধে রামমোহন যে মৌলিক মন্তব্য করেছেন তা পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসারও আগে রামমোহন কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে। রামমোহনের সকল কর্মবিস্তার মূলে ছিল লোকশ্রেয়। ধর্মভাবনারও লক্ষ্য হল লোকশ্রেয়। অনেক সময় অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা বিধিনিষেধের জালে রুদ্ধ হয়ে যায়। যাঁরা জাতির প্রতিনিধি পুরুষ তাঁরা এই রুদ্ধস্রোতকে পুনরায় মুক্ত করে দেন। রামমোহন সেই মুক্তি নিয়ে এসেছিলেন আমাদের দেশে। নবম পরিচ্ছেদে অমিয়বাবু সে কথা বলেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত একটা পরিচ্ছন্ন যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় পাই। পরিচ্ছেদগুলি সংক্ষিপ্ত। পূর্বে আলোচিত প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্তসার সংকলন করে লেখক গ্রন্থকে সংহত করেছেন। শ্রীসেন রামমোহন সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেননি। কিন্তু রামমোহনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচিত সেই সম্বন্ধেই তিনি তাঁর বক্তব্যকে বিশদ

করেছেন। রামমোহনের চিন্তায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেছিল: তাঁর সকল কর্মপ্রচেষ্টায় সংস্কারচিন্তায় এই বস্তুটি লক্ষিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে প্রতিনিধি পুরুষ রামমোহনের সেই প্রতিভা আবিষ্কারের প্রয়াস।

বইটির ছাপা বাঁধাই ভাল। উল্লেখযোগ্য বইটির দাম তুলনায় কম। এর জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

৪।৬৮

ধর্মগ্রন্থ

গীতারবিন্দ। বিহারীলাল গোস্বামী। ইমপ্রেসিও: ৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম ৩·০০।

ভাগবদ্‌গীতার এই অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সনে। প্রকাশের পর সেকালে এর অসামান্য সমাদর হয়েছিল, গুণীজন মন্তব্য করেছিলেন, এটি একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ। দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থটি আবার মুদ্রিত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দ বোধ করছি। গ্রন্থকার বিহারীলাল সেকালের একজন নামকরা অনুবাদক, তাঁর কয়েকটি সংস্কৃত-কাব্য অনুবাদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছিল। আলোচ্য গ্রন্থটিতে গীতার মূল শ্লোক ও তার অনুবাদ পাওয়া যাবে। আমরা গ্রন্থটির প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্ত স্বীকার

ওগো বধূ সুন্দরী। মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ১·৫০।

সরস্বতীয়া। বিমল মিত্র। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ১·৫০।

রঞ্জনা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ১·৫০।

রূপনগরের ময়না। অমল সেনগুপ্ত। শ্রীমতী সাবিত্রী সেনগুপ্ত : ৭১-বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য : ১·৫০।

রেখেছ বাঙালী করে। কালিদাস কাঞ্জিলাল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য : ৪·০০।

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তা। হরপ্রসাদ মিত্র। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৬·০০।

পঞ্চাননের হাতি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোং : এ১৩২/১৩৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৩·০০।

ছবিছড়ায় পশুপাখী। রঞ্জিত রায়। এস এল রায় : ১৬, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য : ১·২৫।

উপনিবেশবাদ থেকে সাম্যবাদ। হোয়াং ভ্যান চি। অনুবাদ : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোং : কলিকাতা-১২। মূল্য : ৫·০০।

ওথেলো। শেক্সপীঅর। অনুবাদ : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য অকাদেমী : রবীন্দ্রভবন, ফিরোজশাহ রোড, নিউ দিল্লী-১। মূল্য : ৪·৫০।

নারী। সিয়ারামশরণ গুপ্ত। অনুবাদ : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। সাহিত্য অকাদেমী : নিউদিল্লী-১। মূল্য : ৫·০০।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প-বিরোধ। শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়। সৌমেন চট্টোপাধ্যায় : ৪/১এ, মাধব চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-২০। মূল্য : ১·৭৫।

প্রতিদান। শ্রীষষ্ঠিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী পুতুলরানী বন্দ্যোপাধ্যায়। চাপড়া শীতল-ষষ্ঠিতলা, পোঃ বাঙ্গালঝি, নদীয়া। মূল্য : ১·০০।

মাঠ থেকে বলছি। অজয় বসু। রূপরেখা : ১২৪/১এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য : ৪·৫০।

শব্দের খাঁচায়। অসীম রায়। মনীষা : ৪/৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৬·০০।

খেয়াল। স্বপনকুমার ঘোষ। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন : ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ২·০০।

কি পাই নি? পারুল ঘোষ। অনুরোধা প্রকাশনী : ১এ, নন্দলাল বসু লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য : ৫·০০।

ভারতী নিবেদিতা। মালতী গুহ রায়। বাক সাহিত্য : ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৬·৫০।

বিচিত্র দুনিয়া। অনাচ। ভোলানাথ প্রকাশনী : ৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৪·০০।

মরুতৃষা। নমিতা ধরচৌধুরী। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স : ১০৪-বি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৩·০০।

সাঁকো থেকে দেখা। হরপ্রসাদ মিত্র। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৩·০০।

একটি গাছ এক শ' ফুল। দুর্গাদাস সরকার। নবজাতক প্রকাশন : ৬, অ্যান্টনী-বাগান লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৩·০০।

নতুন দিগন্ত। শেখর সেন। লিটারারী গিল্ড : ৬-ই, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা-২৯। মূল্য : ৩·০০।

আজগুবি গল্প। সম্পাদনা : গীতা দাশ। এশিয়া পাবলিশিং কোং : এ১৩২/১৩৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৫·০০।

ম্যাজিকের গল্প। অজিতকৃষ্ণ বসু। এশিয়া পাবলিশিং কোং : এ১৩২/১৩৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৫·০০।

সঙ্গিনী। বীরু চট্টোপাধ্যায়। রেণুকা পাবলিকেশান : ৮২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৩·৫০।

চেনাশোনার বাইরে। অমিতা রায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ৫·০০।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন। শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির : ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

ভিয়েতনাম ও আমাদের কবিতা। সম্পাদনা : গোপাল মল্লিক। নিউ ওয়েভ পাবলিশিং কোম্পানী : ২-বি, সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য : ১·৫০।

রঙ্গজগৎ

দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে জাতীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কারে সম্মানিত দুই শিল্পী : উত্তমকুমার ও নার্গিস ফটো—দেশ

ডঃ জাকির হোসেনের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন সত্যজিৎ রায় ফটো—দেশ

চলচ্চিত্রের লক্ষ্য

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বলেন, "শিল্প মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রকে আরও উন্নত করতে হবে, এবং তার জন্য চাই সৃজনশীলতা ও সমাজচেতনা।" গত ২৫ নভেম্বর দিল্লিতে ওই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ২১ জনকে বাৎসরিক জাতীয় পুরস্কার দেন। তিনি আরও বলেন, "আজকের দিনের নৈতিক এবং বুদ্ধি গত সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলার প্রতিফলন থাকা চাই চলচ্চিত্রে।" চলচ্চিত্রশিল্পের দিকে সমালোচনার চোখে তাকানোর জন্য রাষ্ট্রপতি আবেদন জানান। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি যে স্বতন্ত্র সৃষ্টি হিসাবে কদর পাচ্ছে এবং ক্রমশ স্থায়িত্ব পাচ্ছে তাতে ডঃ জাকির হোসেন আনন্দ প্রকাশ করেন।

কলকাতার পুরস্কার বিজয়ীরা সকলেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির শিল্পীরাও সরকারী আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য দিল্লীতে যান। 'আরোগ্য নিকেতন' ছবির শিল্পী হিসাবে শ্রীবিকাশ রায়, শ্রীমতী ছায়া দেবী ও শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী, শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী এবং শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছবি আরোগ্য নিকেতন-এর পুরস্কার গ্রহণ করেন শ্রীঅরুণ বসু। পরিচালক শ্রীবিজয় বসু (আরোগ্য নিকেতন) এবং শ্রেষ্ঠ ওড়িশী চিত্রের পরিচালক শ্রীপ্রফুল্ল সেনগুপ্তও দিল্লীতে যান। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত 'হাটে বাজারে' ছবির পুরস্কার গ্রহণ করেন শ্রীঅসীম দত্ত।

এ-সপ্তাহে

- আপন জন
- জীবন-সংগীত
- বুঁদ যো বন গই মোতি

তপন সিংহ পরিচালিত কে এল কাপুর প্রোডাকশন্স-এর "আপন জন" (মূল কাহিনী : ইন্দ্রমিত্র) এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন শ্রীসিংহ নিজে। নির্মলকুমার, সুমিতা সান্যাল, ছায়া দেবী, স্বরূপ দত্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, যুঁই

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার ও স্মারক উপহার নিচ্ছেন (ডান-দিক থেকে) অরুণ বসু, বিকাশ রায়, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা ও বিজয় বসু ফটো—দেশ
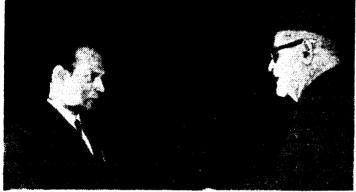
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হাটে-বাজারে ছবির প্রযোজক অসীম দত্ত (উপরে) এবং পরিচালক তপন সিংহ পুরস্কার নিচ্ছেন ফটো—দেশ

বন্দ্যোপাধ্যায়, রমি চৌধুরী প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী।

"জীবন-সংগীত" (পি এম পিকচার্স) পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, রিনা ঘোষ, সুমন মুখোপাধ্যায় ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত ভি শান্তারামের "বুন্দ যো বন গই মোতি"-র নায়ক-নায়িকা জিতেন্দ্র ও মমতাজ। সংগীত পরিচালনা করেছেন সতীশ ভাটিয়া।

আগামী সপ্তাহে "কখনো মেঘ"

আগামী সপ্তাহে "কখনো মেঘ" চলচ্চিত্র ভারতী নিবেদিত অগ্রদূত পরিচালিত কখনো মেঘ আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। এই ছবির দুটি রোমান্টিক চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক এবং অন্যান্য চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, কামু মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখা যাবে।

কাহিনী ও চিত্রনাট্য প্রশান্ত দেবের। সুর-সংযোজন করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

দক্ষিণ কলকাতায় যাত্রা উৎসব

দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রাণ শাসমল পার্কে (রাসবিহারী মোড়ে পুরুলিয়ারের নিকট) এক যাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ৭ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎসব চলবে। এতে অভিনীত হবে "একটি পয়সা" (সত্যম্বর অপেরা), "ঝড়ের দোলা" (নিউ রয়েল বীণাপানি), "সোনাই দীঘি" (নাট্য ভারতী), "মাইকেল মধুসূদন" (নবরঞ্জন অপেরা), "হিটলার" (তরুণ অপেরা), এবং "রাহুমুক্ত" (প্রতিনিধি)। শেষোক্ত পালায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শাশ্বতী রায় এবং অতিথি শিল্পী নিবেদিতা দাস, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যোগ দেবেন। উৎসব প্রযোজনার ভার নিয়েছেন সাউথ ক্যালকাটা এণ্টারপ্রাইজ।

সংগীতচক্রের বিজয়িনী

সংগীতচক্রের শিল্পীরা কবিগুরুর "বিজয়িনী" কবিতাটির নৃত্যনাট্যরূপে উপস্থিত করবেন রবীন্দ্র সদনে, ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন (সংগীত) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সুমিত্রা সেন, ধীরেন বসু ও দেবব্রত বিশ্বাস, (নৃত্যে) জয়শ্রী লাহিড়ী, অলকানন্দা, নরেশকুমার, গোবিন্দন কুট্টি, (গ্রন্থনায়) কাজী সব্যসাচী, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ প্রভৃতি। নৃত্য পরিকল্পনা ও সংকলনে আছেন যথাক্রমে নরেশকুমার ও সুনীলবরন। নৃত্য নাট্যটি প্রযোজনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ধীরেন বসুর।

"শর্মিলা" নাটকে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

স্টারে নতুন নাটক
"শর্মিলা"

স্টারে এবারেও "ফ্যামিলি ড্রামা", তবে যা ভিন্ন রসের নাটক। নায়িকার নামে নাটকের নাম 'শর্মিলা'। নামকরণের রীতিটা হয়ত পুরনো। তবে এর একটা বিশেষ কারণ থাকে। গল্প হয় নায়িকা-প্রধান। নায়িকা নাট্যকারের সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্ব পায় পুরোপুরি। তা-ছাড়া, নায়িকার চরিত্রটিও কল্পিত হয় অসাধারণ রূপে। 'শর্মিলা' সেদিক থেকে সাধারণ মেয়ে। তবে একেবারে বাসি ফুলের মালা নয়। রোমাণ্টিক হিরো সমীরণ তাকে মোটেই অবহেলা করতে পারেনি। এমন কী বুড়ো মাস্টারের ছদ্মবেশে (এই কৌতুক উপকরণটি আজকাল সিনেমায়, বিশেষ করে হিন্দীচিত্রে হামেশা দ্রষ্টব্য) প্রেয়সীকে পড়াতে গেছে।

এহ বাহ্য। শর্মিলার প্রেম নিয়েই নাটক নয়। নাট্যদ্বন্দ্ব অন্যত্র। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার আইনানুগ অধিকার এই সংঘাতে আরও জট সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু না, নাট্যকার পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত দর্শককে নাটকের আগ্নেয়গিরির সামনে এনে দাঁড় করান নি। কোন মুহূর্তেই এমন আশংকা হয় না এই নুনিম অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার ঘর্ষণে তাপ সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। তিন অঙ্কের নাটকের প্রথম দুই অঙ্কাবসানেই তাপমাত্রা উপর থেকে উপরের দিকে। তাপ মানে আবেগের উত্তাপ —যাতে দর্শকের চিত্তবিনোদন। বড় রকমের কোন সংঘর্ষ ঘটবার আগেই নাটকের সুখপরিণতি। শর্মিলার সাধ পূর্ণ হয়েছে। যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে সে প্রতিবারের মতই দাদাদের কপালে ফোঁটা দিতে পেরেছে।

বাঙালীর ঘরের ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া নিয়ে নাট্যরস সৃষ্টির চেষ্টা সম্ভবত এই প্রথম। অতএব, দর্শকের নতুন নাট্যাবেগ আস্বাদনের প্রতিশ্রুতি 'শর্মিলা'-র রয়েছে। যদিও এই ক্লাইম্যাক্স গঠনের প্রক্রিয়াটি পুরাতন। সেই হঠাৎ করে সকলের ভাল হয়ে যাওয়া, অনুতপ্ত হওয়া, ভুল বুঝতে পারার ব্যাপার। যেমন নাটকের মেজ ভাই, কুচুটে স্ত্রীর পরামর্শ মত বরাবর চলে এসেছে। সেও তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গেল, বউকে 'যথাসময়ে' উপেক্ষা করতে সাহস পেল। বড় ভাই আগে থেকেই ভাল ছিল, কিন্তু তার কোন সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি।

তৃতীয়রঞ্জন, শর্মিলার ছোট দাদা, বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে এনেছে। বাড়িতে থাকে না, থাকে হোটেলে। বাবার সম্পত্তির উপর মেজ ও ছোট দুই ছেলেরই শ্যেন দৃষ্টি। বেশী স্বার্থপর মেজ বউ। বাড়ির কর্তা ব্যবসায়ী সুরজিৎ সরকার কালো টাকার কারবারী। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গ্রেফতার হবার আগেই মারা যান। হঠাৎ হার্ট ফেল। স্ত্রী সর্বানী ও মেয়ে শর্মিলা তখন যেন সকলের কাছে বোঝা।

সরকার পরিবারে নাটকীয় উপাদানের উদ্ভব আসলে এই দুর্ঘটনার পর থেকেই। আগেও তা দেখা গেছে, গৃহকর্তা সুরজিৎ সরকার ও সর্বানীর মানসিক অশান্তির মুহূর্তে। ছেলেরা অমানুষ হলে যা হয়। দায়িত্বজ্ঞান-হীন ও অপদার্থ সন্তান বলতে অবশ্য মেজ ও ছোট ছেলে। মেজ ছেলে বিয়ে করে এনেছে ব্রাহ্মণের মেয়ে। মেজ বউ সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েই রেখেছে।

জীবন-সংগীত; সুমন মুখোপাধ্যায়, মিতা দাশগুপ্ত, সন্ধ্যা রায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

আপনজন : স্বরূপ দত্ত, মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমি চৌধুরী

তাদের অসবর্ণ বিয়ে। ছোট ছেলের মেম বউ। পিতামাতার আশা-ভরসার জন্য ছেলেদের অর্থলোভ ও স্বার্থপরতাই তো যথেষ্ট, বিলেতের বউ বা অসবর্ণ বিয়ে যেন বাড়াবাড়ি। বড় ছেলের স্ত্রী শুভলক্ষ্মী আবার মাদ্রাজী। এরও কি কোন প্রয়োজন ছিল? এটাই দেখাবার জন্য কি যে বাঙালী মেয়ে এসে যে সুখ শ্বশুর ও শাশুড়ীকে দিতে পারেনি দক্ষিণ ভারতের মেয়ে তা সহজেই পেরেছে? সব বাঙালীর মেয়েই কি মন্দ? জাতীয় সংহতি দেখানোই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবু বাঙালী ঘরের কুলবধূর দক্ষিণ ভারতীয় হওয়ার আবশ্যকতা কোথায়? অবশ্য এটাকে স্টান্ট ধরে নিলে অন্য কথা।

অতিনাটকীয়তা ও 'স্টান্ট' লক্ষণাক্রান্ত "শর্মিলা" তবু সামগ্রিকভাবে সুখভোগ্য। প্রবল নাট্যসংঘাতের নাটক নয় "শর্মিলা". "শর্মিলা"-র আকর্ষণ ছোট ছোট সুখ-দুঃখের ঘটনায়, কতকাংশে যা বাস্তবেরই চিত্রকল্প।

নাটকটি আরও বেশী উপভোগ্য সুপরিচালনা ও সুঅভিনয়ের গুণে। শর্মিলা হয়েছেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চের অভিনয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় আমরা আগেও পেয়েছি। এবারে তা আরও পরিণত। প্রথমাংশে শর্মিলা একালের আধুনিকা, কলেজের ছাত্রী, প্রেমিকা। ওই রূপে তাঁর চরিত্রাঙ্কণ নিখুঁত। পরে যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বের মুহূর্তে দেখি শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের অনুভূতিদীপ্ত ও সংবেদনশীল অভিনয় যা দর্শকের মন গভীরভাবে নাড়া দেয়। স্বার্থপর, কুটিল ও উন্নাসিক রমণীর চরিত্রে নীলিমা দাসের চমৎকার অভিনয় অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। মাদ্রাজী মেয়ে সেজেছেন বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। বাচনভঙ্গিতে দক্ষিণ ভারতের মেয়ের চরিত্র তিনি অনেকখানি বিশ্বাস-যোগ্য করে তুলতে পেরেছেন। যদিও তা অনিবার্য ছিল না। শান্তিনিকেতনে যার শিক্ষা, যে স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে তার কথা বলবার সময় অবাঙালী-সুলভ উচ্চারণ কেন? চরিত্রটি নাট্যকারের সহানুভূতি পেয়েছে প্রচুর। মন্দ চরিত্রের মাঝখানে একটি ভাল চরিত্র স্বভাবতই মন টানে। তা-ছাড়া, শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় একটি "অ্যাটিচুড" বরাবর অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, সেদিক থেকে তাঁর অভিনয় ভাল। জ্যোৎস্না বিশ্বাস ইংরেজ তরুণীর রূপসজ্জায় অদ্ভুত 'স্মার্টনেস'-এর পরিচয় দিয়েছেন। বিলিতি চরিত্রও তাঁর অভিনয়ে পরিস্ফুট। কাজটি সহজ নয়। অভিনয়ের সুযোগ তিনি পেয়েছেন কম। অর্পণা দেবী জননীর চরিত্রে যথোচিত ব্যক্তিত্ব ও স্নেহপরায়ণতা আরোপ করেছেন। চামেলির (বাড়ির ঝি) ভূমিকায় গীতা দে'র অতি স্বচ্ছন্দ এবং কমিক অভিনয় প্রশংসনীয়।

এই নাটকে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চাভিনয়ের বিশেষ ক্ষমতা দেখা গেল। শুভেন্দুর সমীরণ প্রেমিক ও প্রাণোচ্ছল। চরিত্রটিতে সুন্দরভাবে প্রাণসঞ্চার করেছেন শুভেন্দু। যে-মুহূর্তে চরিত্রের যে রূপ তা অবলীলায় প্রকাশ করেছেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। একজন দক্ষ মঞ্চাভিনেতা হিসাবে তিনি অভিনন্দন পাবেন। শৈলেন মুখোপাধ্যায় শর্মিলার ভাইয়ের ভূমিকায় মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন। একটি স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টির জন্য তিনি প্রশংসা পাবেন। এই কৃতিত্বের অধিকারী আরও দুজন—প্রেমাংশু বসু ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য।

ব্যবসায়ী সুরজিতের চরিত্রে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোগ্রাহী চরিত্রচিত্রণ সাধুবাদের যোগ্য। নাটকের আকর্ষণ বাড়িয়েছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়ের দক্ষতায়। চামেলির প্রণয়ী মুহ্যমান রূপ। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকে আগের চেয়েও বোধহয় আরও বেশী আনন্দ দেবেন।

অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী, ভারতী বস., পঞ্চানন ভট্টাচার্য (শুভলক্ষ্মীর পিতার চরিত্রে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় ও বেশে তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য), লোকনাথ চন্দ্র, শ্যাম লাহা প্রমুখ সুঅভিনয় করেছেন।

ছবিতে দুটি গান আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। তাপস চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া (বাউলের বেশে) একটি গান সুখশ্রাব্য। সংগীত রচনা ও গীতি রচনার দায়িত্ব যথাক্রমে কালীপদ সেন ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দৃশ্য সজ্জা ও আলোকসম্পাতের জন্য অনিল বসুর ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়।

....

রটনা মিথ্যা

চিত্রপ্রযোজক সংগীত পরিচালক শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় গত সপ্তাহে 'দেশ'-এর প্রতিনিধিকে বলেন, তাঁর পুত্র শ্রীজয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জনৈক চিত্রাভিনেত্রীর বিবাহ সম্পর্কে যে গুজব রটেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রসঙ্গত শ্রীহেমন্তকুমার জানান যে, শ্রীজয়ন্ত মুখোপাধ্যায় একটি বাংলা ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন। এই সম্পর্কে বিশদ সংবাদ বিশেষ সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষিত হবে।

সুধীর মুখার্জির 'আঁধার সূর্য' ছবিতে মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও রিনা ঘোষ

সাংস্কৃতিকী

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে এয়ারপোর্ট ইংলিশ মিডিয়াম জুনিয়ার স্কুলের **বার্ষিক উৎসব এক মনোরম অনুষ্ঠানের মধ্য** দিয়ে হয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাচ-গান, অভিনয়, আবৃত্তিতে সারাক্ষণ দর্শকদের একরকম সম্মোহিত করে রাখে। **'রবিনহুড', 'সিনড্রেলা', শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সীজারের অংশবিশেষ অভিনয়ে ওরা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখায়।**

অসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীমতী জাহানারা জয়পাল সিং অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লি থেকে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন **বাণী হাজরা ও মালতী রায়।**

*

সম্প্রতি হিন্দী হাই স্কুল মঞ্চে দেক্ মেডিকেল অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক উৎসব দ্বিজেন্দ্রলালের **"সাজাহান"** নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সামগ্রিক অভিনয়ের গুণে নাটকটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অজিত চক্রবর্তী (সাজাহান), শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (দারা), সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র (ঔরঙ্গজেব) প্রমুখ শিল্পীদের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিয়ারা ও নাদিরার চরিত্রে যথাক্রমে প্রতিমা পাল ও প্রতিমা দে সুন্দর অভিনয় করেছেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

এমন অনাড়ম্বর অথচ সার্থক বিচিত্রানুষ্ঠান বহুদিন দেখেনি বম্বেবাসী। বম্বের সবচেয়ে প্রশস্ত ও বিখ্যাত 'রঙ্গভবন'-এ গত বিশে নভেম্বর এই বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বম্বের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্লাড রিলিফ ফান্ড কমিটি।' শহরের হাটে বাজারে ব্যানার পোস্টারের ছড়াছড়ি নেই; খবরের কাগজে চারকলমের বিজ্ঞাপন নেই, অমুক স্টার ভাষণ দেবেন, তমুক স্টার নাচবেন বা অমুক প্লেব্যাক সিঙ্গার গাইবেন—এই সব ঘোষণার কোন সরবতা নেই। তবু 'রঙ্গভবন-এ' তিল ধারনের স্থান নেই! প্রায় তিন হাজার লোক এলে 'রঙ্গভবন'এ হাউসফুল বোর্ড লাগানো হয়। সেদিন 'হাউস ফুল' বোর্ড লাগানো হয়নি তবু তিন হাজারের বেশী লোক ছিল রঙ্গভবনে। অনুষ্ঠান শুরু হল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। সেপথ্যে বলে রাখি, এটা কোন ছুটির দিন নয়। বম্বের বেশীর ভাগ লোকই হয়ত সোজা কর্মক্ষেত্র থেকে চলে এসেছেন এই অনুষ্ঠান দেখতে এবং শুনতে। 'বম্বে ইউথ কয়ার'এর বৈদিক স্তোত্র দিয়ে অনুষ্ঠান-এর শুরু এবং রাত প্রায় বারোটার সময় মান্না দের 'জনগন মন' দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ। এই সাত্ত্বিক প্রারম্ভ এবং প্রথাগত সমাপ্তির মধ্যভাগে আনন্দ, তৃপ্তি এবং আন্তরিকতার ঠাসবুনুনি। উনিশ তারিখ অবধি মান্না দে এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কলকাতায় ছিলেন। বম্বে ফিরলেন কুড়ি তারিখে কেবলমাত্র এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। মহেন্দ্র কাপুরের পাঞ্জাবে যাবার কথা আঠেরো তারিখে। তিনি গেলেন না পাঞ্জাবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে।

'রঙ্গ ভবন-এ তিলধারনের স্থান নেই। অথচ প্রায় 'সুচ ফেললে শোনা যায়' এমন অবস্থা। হেমন্তবাবু গান গাইছেন। হিন্দী ছবির গান। জনতা শুনছেন। বিভোর। হেমন্তবাবু গান গাইছেন। রবীন্দ্র সংগীত; জনারণ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। 'শ্রোতারা কি সবাই বাঙ্গালী'? 'আজ্ঞে না। অবাঙ্গালীও প্রচুর জনতার মধ্যে।' 'তাই নাকি?' 'এমন আশ্চর্য ঘটনা তো এর আগে কখনো দেখিনি।' 'দেখবেন কি করে—এমন ঘটনা যে এর আগে বম্বেতে ঘটেনি কখনো।' একই অবস্থা যখন স্থানীয় মারাঠী গায়িকা সুলোচনা চোহান মারাঠী লোক সংগীত পরিবেশন করছেন। জনতা দুলছে সুলোচনার 'লাউনি'র তালে তালে। আবার যখন শচীনশঙ্কর তাঁর নৃত্য পরিবেশন করছেন তখনো সেই বিভোরতা। 'বম্বে ইউথ কয়ার'এর বাঙ্গালী গাজির গানও তেমনি মন দিয়ে শুনছেন শ্রোতারা। অশোককুমার স্টেজে এলেন সুভেনিরের লাকি নাম্বার সিলেক্ট করতে। ধরে বসলে সবাই: 'আপনার গান শুনব!' 'সেকি তাও কখনো হয় নাকি?' 'কোন কথা শুনব না গাইতেই হবে আপনাকে'। 'কি বিপদ! বাজনা ছাড়া গান হয় নাকি—তাছাড়া'.. 'ঐ তো সলিলদা (মানে সলিল চৌধুরী) বাজাবেন আপনার সঙ্গে' 'হ্যাঁ হ্যাঁ দাদামণি (অশোককুমার) নিশ্চয়ই বাজাব, কোন গানটা গাইবেন বলুন' 'হারমোনিয়াম আছে' 'হ্যাঁ আছে' 'কোন স্কেল?'

অশোককুমার গান গাইছেন। বিরাট জনতার সামনে কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়া গান গাইছেন। সলিল চৌধুরী হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন। জনতা আহ্লাদে আটখানা। অশোককুমার হাসতে হাসতে গাইছেন। সুর হয়ত একটু/আধটু এদিক ওদিক হচ্ছে কিন্তু আনন্দ এবং আন্তরিকতা এমন এক সুরে বাঁধা যে কিছুতেই কিছু বেসুরো হচ্ছে না। অভিনেতা শশী কাপুর তাঁর স্ত্রী, জেনিফারের কানে কানে বললো, সত্যি দাদামণি ইজ এ গ্রেট অ্যাক্টর।' জেনিফার শশীর চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসলো।

দাদামণি দ্বিতীয় গান ধরলেন। জনতা ডগমগ করছে। অশোককুমারের ভাগ্নে অভিনেতা দেবু মুখার্জি তার সহোদরা শিবানীকে কি যেন বললো কানে কানে। তার উত্তরে শিবানী বললে, 'হবে না আমারই ত মামা!'

মহেন্দ্র কাপুর গান গাইছেন। জাতীয় পুরস্কার পাবার পর এই প্রথম এতজনের সামনে। মনে প্রত্যয় কিন্তু আশংকারও অভাব নেই। 'কি রকম গান গাইব দাদা', 'যেমন গান তোমার গাইতে ভাল লাগে' অনেক গান গাইলেন মহেন্দ্র। বলছিলেন, রাত সাড়ে নটায় এক জায়গায় যেতেই হবে। কিন্তু গান গাইতে গাইতে সেখানে যাবার কথা ভুলে গেলেন। সাড়ে দশটা অবধি গান গাইলেন। একটা বাংলা গানও ছিল।

মান্না দে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চাইছিলেন। বাচ্চারা বাড়িতে একা। সেই রকমই ব্যবস্থা করা হবে এমন সময় মান্না দে শুনলেন যে বাংলা দেশের দুই প্রখ্যাত অভিনেতা কালী ব্যানার্জি এবং রবি ঘোষ একটি বাংলা স্কিট করবেন। 'তাহলে ওই স্কিটটা প্রথমে দেখেনি।' 'ঠিক আছে' ব্যাস মান্না দে আটকে গেলেন। কালী ব্যানার্জী এবং রবি ঘোষের স্কিটে বাঙ্গালীরা আত্মহারা। কিন্তু ধন্য অবাঙ্গালীদের। ভাষা হয়ত অনেক কিছুই বুঝলেন না তবু এতটুকু উসখুস নেই। আবার অনেকের মনে হ'ল, জনতার সবই বাঙ্গালী না তো।

আবার সলিল চৌধুরীর পরিচালনায় বম্বে ইউথ কয়ারের সভ্যরা 'জাগতে রহো'র 'জাগো মোহন প্যারে' গাইলেন। এমন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্ব আসি আসি করছে। মান্না দের বাড়ি যাবার তাড়া। কি করা যায়? 'আসুন মান্নাবাবু'—না তবুও বসলেন। মান্না দে গাইলেই আর জনতাকে বসিয়ে রাখা যাবে না। অথচ এখনো দুজন শিল্পী আছেন। একজন অভিনেতা দেবেন বর্মা, অন্যজন নার্গিসের ভাইঝি রেহানা। একজন কৌতুক অভিনয় গোছের কিছু করবেন অন্যজন গান [illegible]। মান্না দে

"বন্ধে বো বন গাই মোতী" ছবিতে মমতাজ

বললেন 'ঠিক আছে, ওদেরই আগে দিয়ে দিন।' রেহানা গান গাইল। বেশ গাইল। ওকে যেমন সুন্দর দেখতে ওর গান গাওয়ার ঢঙ এবং ওর গলাও প্রায় ততখানিই সুন্দর। জনতার চক্ষু এবং কর্ণ দুই-ই তৃপ্ত হ'ল রেহানার অনুষ্ঠানে। তারপর এলেন দেবেন। সুন্দরভাবে হাসালো জনতাকে। দেবেন এখন শুধু অভিনেতাই নয় সে এখন একজন প্রযোজকও। ধর্মেন্দ্র এবং শর্মিলাকে নিয়ে রঙীন ছবি করছে! দেবেনের যে আইটেমটা লোকেদের খুব ভাল লাগলো সেটা হিন্দী ছবির বিষয়বস্তুর ওপর ব্যঙ্গ! একজন বললে দেখি দেবেনের ছবি কেমন হয়!

এইবার মান্না দে। নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জনতার আগ্রহ বেজে উঠলো প্রায় উন্মাদ হাততালিতে। মান্না দে ইংরেজিতে জিগ্যেস করলেন বাংলা গান গাইবেন কিনা! জনতা সম্মতি জানাতে হৈ হৈ করে উঠলো। মান্না দে শুরু করলেন এন্টনি ফিরিঙ্গীর গান। জনতা মুগ্ধ। তারপ হিন্দী গান! মান্না দে বলেছিলেন রাত প্রায় বারোটা বাজে দুটো গান গেয়েই উঠে পড়ব। দ্বিতীয় গান গাইতে গাইতে ঘড়ি দেখলেন মান্না দে। সাড়ে এগারোটা। কিন্তু উপায় নেই। তৃতীয় গানও গাইতে হ'ল। তারপরেও ওঠা গেল না। সুতরাং চতুর্থ গান। জনতা নতুন করে এ'টে বসেছে যে যার চেয়ারে। মান্না দে আবার ঘড়ি দেখলেন! ঘোষক ডেভিড ও ঘড়ি দেখলেন। পৌনে বারোটা। ডেভিড ভাবছেন কি করা যায় এমন সময় মান্না দে পঞ্চম গান ধরলেন। জনতা শ্রীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন 'জনগন মন' জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে। ডেভিড যিনি এত কাল জনতাকে কথায় কথায় হাসিয়েছেন, মান্না দের দিকে তাকিয়ে এবার নিজে একটু হাসলেন!

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে এই অনুষ্ঠান! অনুষ্ঠানোত্তর কথাবার্তায় জানা গেল যে প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং অনতিবিলম্বে সে টাকা উত্তরবঙ্গ অভিমুখে রওনা হবে।

সরল শর্মা

"আপন জন" চিত্রপ্রযোজকের সংপ্রয়াস

বাংলা ছবির বর্তমান অবস্থায় আস্থাভাজন চিত্র প্রযোজকের পদক্ষেপ মাত্রই অভিনন্দনযোগ্য। ফ্রি-ল্যান্স প্রোডাকশন অবশ্যই কাম্য নয়। নিয়মিত চিত্র তৈরির কোন ইউনিট যদি গড়ে ওঠে, অর্থাৎ একটির পর একটি ছবি তৈরির সংকল্প নিয়ে কোন প্রযোজক যদি চিত্র ববসায়ের ক্ষেত্রে আসেন তবে সেটা খুবই আনন্দের কথা। গত সপ্তাহে এই আশার কথা সাংবাদিকরা শুনতে পেলেন কে এল প্রোডাকসন্স-এর শ্রীকাপুরের কাছে। সাংবাদিক বৈঠকে "আপন জন" ছবির প্রযোজক শ্রীকাপুর ঘোষণা করেন, "ভাল বাংলা ছবি তৈরির অবকাশ প্রচুর। আমি তা-ই করব। পরে কলকাতায় অল্প বাজেটের হিন্দী ছবিও তৈরি করতে পারি।" শ্রীকাপুরের দ্বিতীয় প্রযোজনা "মেঘ ও রৌদ্র" (পরিচালনা : অরুন্ধতী দেবী) প্রস্তুতির পথে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীতপন সিংহ ও শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সাংবাদিকদের সঙ্গে শ্রীকাপুরের পরিচয় করিয়ে দেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি একটি নতুন ধরণের চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। দশদিনব্যাপী এই উৎসব শুরু হবে ১৪ ডিসেমবর, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বিভিন্ন দেশের বহু প্রশংসিত ছবির সঙ্গে জনসাধারণের যাতে পরিচয় ঘটে সেই উদ্দেশ্যে সোসাইটি অল্প মূল্যের টিকিটে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি ছবির দুটি করে শো হবে। নিম্নলিখিত ছবিগুলি দেখানো হবে।

সুবর্ণরেখা, এ সাইড ট্র্যাক (বুলগেরিয়া), বাইসিকল্ থিফ (ইতালি) ইয়ুকিওয়ারিসু (জাপান), অক্টোবর (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র), ইউ অ্যান্ড ইওর প্যাল (পশ্চিম জার্মেনী), টু হাফ টাইম ইন হেল (হাঙ্গেরী) দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার (সুইডেন), বার্থ সার্টিফিকেট (পোলাণ্ড) এবং আওরত (হিন্দী)।

অরণ্যদেব লী ফক

অরণ্যে গভীর রাত্রি। সবাই এখন ঘুমুচ্ছে।
ঘরর-ঘরর
বাইরের লোকের এখানে ঢুকবার সাহস নেই।

কারও সাহস নেই?

অরণ্যদেবের গুহার মধ্যে.....
?!
শ-শ-শ

আমার শুভেচ্ছা জানাই, অরণ্যদেব!
একী, এই সময়ে? ভিতরে এসো, কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়।
4/14

না। আমি রাজকুমার ব্রাদ। আমি জানি, তুমি অরণ্যদেব। তোমার মৃত্যু নেই। কয়েক শতাব্দী আগে আমার এক পূর্বপুরুষের সাথে তুমি সন্ধি করেছিলে।

আমার কাছে তুমি কী চাও, রাজকুমার ব্রাদ?
তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা। আমরাও নানা সময়ে সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করেছি, তাই না?

চোরাবালিতে তুমি যখন ডুবে যাচ্ছিলে, তখন আকাশ থেকে আমরা তোমাকে উদ্ধার করেছিলুম। মনে পড়ে?
আমার কোন পূর্বপুরুষের কথা বলছে।

ড্রাগনের হাত থেকে তুমি আমাদের বাঁচিয়েছিলে। মনে আছে?
হ্যাঁ, কুমিরটা মেরেছিলুম বটে।

একমাত্র তুমিই আমাদের সন্ধান রাখো। একমাত্র তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা।
মেয়েটিকে আমি ভালবাসি। দৈত্যরা তাকে বন্দী করেছে। তাকে উদ্ধার করে দাও।
?!

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন এই সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। পুলিস জুলুমের প্রতিবাদে এবং আটক নেতাদের মুক্তির দাবিতে ২৫ নবেমবর পাকিস্তানের সাতটি শহরের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বহু বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিকৃতি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। এদিন পাকিস্তানের প্রাক্তন এয়ার মারশাল ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মনে করেন, পাকিস্তানের এখনকার প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই তিনি রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন। ২৭ নবেমবরও পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর থেকে আয়ুব-বিরোধী হাংগামার খবর পাওয়া যায়। পেশোয়ারে ছাত্ররা ইউ এস আই এস (মারকিন তথ্য কেন্দ্র)-এর লাইব্রেরী তচনছ করেছে। একদল বিক্ষুব্ধ জনতা শিয়ালকোট জেলার একটি প্রেক্ষাগৃহ পুড়িয়ে দিয়েছে। পুলিসকে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি ব্যবহার করতে হয়েছে। রাওয়ালপিণ্ডিতে এদিন বহু সংখ্যক ছাত্রী সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ-মিছিলের পুরোভাগে ছিল। ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ও বিরোধীপক্ষের অন্যান্য রাজনীতিকদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ২৯ নবেমবর পাঁচ হাজারেরও বেশী এক জনতা রাওয়ালপিণ্ডিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র। জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে যে আদেশ জারি করা হয়েছিল বিক্ষোভ-কারীরা তা অগ্রাহ্য করে প্রতিবাদ জানায়। কয়েকদিন আগে পেশোয়ারে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের উপরে গুলিবর্ষণের যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল—সম্প্রতি কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকের মতে তা স্রেফ বানানো ঘটনা। করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ : পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেন।

দেশী সংবাদ

২৫ নবেমবর—সম্প্রতি সশস্ত্র একটি দল কর্তৃক কেরলে দ্বিতীয় একটি থানা আক্রমণে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। কেরল থেকে প্রাপ্ত সংবাদে মনে হচ্ছে, "নকশালপন্থী" বলে অভিহিত মারকসবাদী দলের উগ্রপন্থীরা এই আক্রমণের পেছনে আছে। রাজ্যের ক্ষমতাসীন মারকসবাদী কম্যুনিসট পারটিকে বিব্রত করে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য বলে জানা গিয়েছে।

সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সম্প্রতি যা ঘটেছে তার জন্য ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য পরিবর্তন করার প্রশ্ন ওঠে না। তিনি আরও বলেন যে, আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় ফাটকা-বাজীর চাপ ভারতীয় অর্থনীতির উপর অতি সামান্যই পড়বে।

২৬ নবেমবর—গতকাল থেকে কটক শহরে লুঠপাট ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটছে। অবস্থা অগ্নিগর্ভ। কলকাতা অথবা ওড়িশার নিকটবর্তী কোন ঘাঁটি থেকে কেন্দ্রীয় রিজারভ পুলিস চেয়ে ওড়িশা সরকার কেন্দ্রের কাছে জরুরী অনুরোধ জানিয়েছেন।

আজ হাওড়া গারলস কলেজের ভিতরে ও বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ এবং ধস্তাধস্তির ফলে দুজন অধ্যাপিকা, একজন ছাত্রী এবং তিনজন কলেজ-কর্মী আহত হন বলে অভিযোগ পাওয়া গেল। পুলিস এ সম্পর্কে সাতজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন।

২৭ নবেমবর—আজ পশ্চিমবংগের ৬৬৪ কোটি টাকার চতুর্থ যোজনার খসড়ায় কাটছাট করে ৪২৫ টাকার প্রকল্পে দাঁড় করানো হয়। ওই প্রস্তাবিত ব্যয়ের মধ্যে কলকাতার উন্নয়ন বাবদ ৪০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার জন্য বাকি ৮০ কোটি টাকাও ব্যয়ের আবশ্যকতা পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং নীলাম হওয়ার প্রশ্নে ভারত সরকারের অসহায় অবস্থা আজ লোকসভায়

ধরা পড়ে যায়। দুজন বিরোধী সদস্য সরকারকে এই প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক আদালতে তুলতে বলেন। কেননা, দু দেশের মধ্যে সম্পত্তি কোন চুক্তিই পাকিস্তান কার্যকর করেনি।

২৮ নবেমবর—বিষাক্ত ফল খেয়ে আজ বজবজের একটি পাড়ার বিভিন্ন পরিবারের ৭৮ জন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থরা কেউ এক বছরের শিশু, কেউ ৬০ বছরের বৃদ্ধা। মোট শিশুর সংখ্যা ৪৮। বজবজ হাসপাতালে অসুস্থদের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁদের বাংগুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

২৯ নবেমবর—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন আজ এক বিবৃতিপ্রসংগে এই ইংগিত দেন যে, কেরল রাজ্য সরকার চরমপন্থী কার্যকলাপ দমনের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে, কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেন যে, জননিরাপত্তা, সরকারী কর্মচারীদের প্রাণ এবং আইনের শাসন রক্ষার জন্য সব কিছু করতে হবে। তবে তিনি কমিউনিসট পারটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি অগ্রাহ্য করেন।

প্রবীণ সমাজসেবী শ্রীসাতকড়িপতি রায় আজ কলকাতার হরিশ চ্যাটার্জি রোডের বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৯ বৎসর। কলকাতা হাইকোরটের আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে তিনি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৩০ নবেমবর—কেরলের জেলা বিভাগ-বিরোধী কমিটির তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল আজ সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যের প্রস্তাবিত মুসলিম প্রধান জেলা সাম্প্রদায়িক-ভিত্তিতে দেশকে দ্বিতীয়বার বিভক্ত করার একটি সূক্ষ্ম চেষ্টা। প্রতিনিধি দলটি কেন্দ্রীয় নেতাদের সংগে কথাবার্তা বলার জন্য দিল্লিতে এসেছেন।

আজ সকাল দশটায় বড়বাজার আলু-পোস্তার কাছে সশস্ত্রবাহিনীর একজন কনসটেবল জনৈক ব্যবসায়ীর হাত থেকে পাঁচ হাজার টাকার একটি থলে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পথচারীরা ওই কনসটেবলকে টাকার থলে সমেত হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

১ ডিসেমবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেসের উদ্বোধনকালে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করার এবং বিশ্বের বিজ্ঞান-বহির্ভূত প্রয়োজনগুলি অবহেলা করার বিপদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি বলেন যে, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানোই হচ্ছে ভৌগোলিকদের কাজ।

আজ নয়াদিল্লিতে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে সারা দেশব্যাপী জীবনবীমা কর্মীদের লাগাতার ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আগামী ৫ ডিসেমবর থেকে ধর্মঘট শুরু হওয়ার কথা ছিল।

বিদেশী সংবাদ

২৫ নবেমবর—গত সপ্তাহের আর্থিক বন্যার পর চাপ কিছুটা হালকা হওয়ায় আজ ফ্রাঁ এবং স্টারলিং দুই-ই যেন খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। ফ্রানসে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ চালু হয়েছে। একজন ফরাসী এখন বিদেশ ভ্রমণে গেলে ৫০০ ফ্রাঁর (৭৫৬ টাকা) বেশী সংগে নিতে পারবেন না।

২৬ নবেমবর—বামপন্থী মারকিন উপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ার গতকাল বাউনড্ ব্রুকে (নিউ জারসি) পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই।

২৭ নবেমবর—জেনারেল দেশয়ের নেতৃত্বে একদল বৈরী নাগা চীনে যাচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে রক্ষের নিরাপত্তা বাহিনী এই জেনারেলকে বন্দী করেছে বলে কোহিমায় খবর পাওয়া যায়।

২৮ নবেমবর—শৈত্য প্রবাহে এবং অসুখে ভুগে নেপালে অনেক হিপি মারা যাচ্ছেন। গত কয়েক সপ্তাহে স্বয়ম্ভুনাথ অঞ্চলে যকৃতের প্রদাহে এক ডজনেরও বেশী হিপির মৃত্যু হয়েছে। চরস এবং অন্যান্য ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য খাওয়ার ফলে প্রধানত এই অসুখ হচ্ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেও অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

২৯ নবেমবর—পিকিং-এর প্রস্তাবটি (চীন মারকিন বৈঠক) জনসন সরকার একেবারে উড়িয়ে দেননি। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বিষয়টি বিবেচনা করছেন। পিকিং-এর প্রস্তাব চীন মারকিন সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি নীতিকে গ্রহ করতে হবে।

৩০ নবেমবর—ভিয়েতকংরা তাদের বাহিনীকে ব্যাপক গেরিলা অভিযানের আদেশ দিয়েছে তাদের ভাষায়, জনসাধারণের সংগে মিশে যাব জন্য অথীর সায়গন চক্রকে পর্যুদস্ত কর নির্দেশও ওই আদেশনামায় রয়েছে।

১ ডিসেমবর—আজ রাত্রে হিন্দী বুলেটি পিকিং রেডিও ঘোষণা করেছে যে, চ কমিউনিসট পারটির আগামী অধিবেশনের প চীন সরকারের ব্যাপক 'রদবদল' করা হ পিকিং রেডিও জানায়, পারটির কেন্দ্ৰ কমিটির সাম্প্রতিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নে হয়েছে।

॥ বাংলা সাহিত্যের নূতন ও সেরা গ্রন্থ ॥

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস
বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥

বিমল করের উপন্যাস
বাড়িবদল ৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
বিজয়ী বসন্ত ৬৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস
নতুন তোরণ ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কাজললতা ৬৲

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস
অন্যভুবন ৪॥

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণকাহিনী
উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

বিমল মিত্রের
কলকাতা থেকে বলছি ৬৲

মহাশ্বেতা দেবীর
সুভগা বসন্ত ৪৲

প্রমথনাথ বিশীর কাব্যগ্রন্থ
প্রাচীন পারসিক হইতে। ॥ সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের
ধর্ম ও সমাজ। ॥ দশ টাকা ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কিশোর গ্রন্থাবলী ॥ সাড়ে চার টাকা ॥

॥ নাটক ॥
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
বিধিলিপি ২৲
নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস
উল্কা ৩৲
চক্র ৩৲
মায়ামৃগ ৩৲
রাত্রি শেষ ৩৲

॥ অনুবাদ ॥
টলস্টয়ের
আনা কারেনিনা ৩॥
ওয়র এণ্ড পীস ১ম ৬॥
ঐ ২য় ৫৲
ঐ ৩য় ৫৲
ডস্টয়ভস্কির
ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট ৩৲

॥ প্রবন্ধ ॥
মহাত্মা গান্ধীর
সত্যাগ্রহ (যন্ত্রস্থ) ৫৲
আমার স্বপ্নের ভারত ৪॥
আমার ধর্ম ৫৲
ছাত্রদের প্রতি ৫৲
শশিভূষণ দাশগুপ্তের
টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৩॥

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আলোড়নসৃষ্টিকারী প্রথম বাংলা গ্রন্থ
বাঙালী জীবনে রমণী (দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) **১০৲**

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস
নগরে অনেক রাত (২য় মুঃ) ৪॥০

তারাশঙ্করের উপন্যাস
রাধা ৮৲

জরাসন্ধের উপন্যাস
বন্যা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস
অন্য দেশ অন্য দাহ ১৫৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনী
কুয়ারী গিরিপথে ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রর উপন্যাস
এক প্রহরের খেলা (২য় মুঃ) **৫৲**

সুমথনাথ ঘোষের উপন্যাস
জলধিতরঙ্গ ৪॥

বিমল করের উপন্যাস
যাদুকর ৫॥

লীলা মজুমদারের
আর কোনোখানে ৫৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
আঁধি ৭॥

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস
জরির আঁচল (২য় মুঃ) ৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সাত পাকে বাঁধা ৫৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস
মৃগমদ ৪৲ **৮॥**

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন: ৩৪-৩৬৯২, ৩৪-৮৭৯১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

যেখানে চান, যখন চান যেখানে চান, যখন চান

রাজদূতে চেপে যান

এগিয়ে চলা মানুষদের মোটরসাইকেল

সাশ্রয়

মাইল প্রতি ৪ পয়সায় রাজদূতকে হারানো শক্ত। এই সাশ্রয় ও সেইসঙ্গে ৯ বিএইচপি ১৭৫ সিসি ইঞ্জিন আপনাকে দুরন্ত গতি যোগায়।

নিরাপত্তা

অসাধারণ সুইঙ্গিং—আর্ম সাসপেনসন ও বড় বড় চাকা ঝাঁক দিতে ও লাফানো থেকে একে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখে।

আরাম

রাজদূত শক অ্যাবজর্বারগুলি নরম ও পুরু হওয়ায় সবচেয়ে এবড়োখেবড়ো রাস্তাতেও স্বচ্ছন্দভাবে চলে যায়।

সার্ভিস

সারাদেশে ২৮০টি শহরে কারখানায় সুশিক্ষিত ১০০০ এর ওপর কারিগর চমৎকার সার্ভিসের গ্যারান্টী দেয়। এছাড়া প্রত্যেক রাজদূতের মালিক পান ৬ মাসের লিখিত গ্যারান্টী ও বিনাখরচায় ৩টি সার্ভিস।

নিরাপত্তা ও আরামে অতুলনীয়

এসকর্টস্ লিমিটেড

মোটরসাইকেল ডিভিসন: ১৯/৬ মথুরা রোড, ফরিদাবাদ (হরিয়ানা)

ESCR 4762 B

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনন্দদুলাল কুণ্ডু

চায়ের মত চা
লিপটনের
ইয়েলো
লেবেল
হবে জোরদার কড়া লিকার—সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা। সেই হল চায়ের মত চা। সেরা আসাম চা আর সেইসঙ্গে ভালো ভালো অন্য চা ব্লেণ্ড ক'রে তৈরী লিপটন ইয়েলো লেবেল। রং হবে টকটকে, গন্ধ ভুর-ভুর করবে। পাবেন গাঢ় মালাইদার লিকার।
LIPTON'S
YELLOW LABEL TEA
LIPTON
লিপটন
বলতেই ভালো চা

পুলকিত তনু মন,
সুন্দরী নারী
তার রহস্য,
ক্যালি-সিল্ক শাড়ী।
ক্যালি-সিল্ক প্লাস
এই নির্ভাজ
ক্যালি-সিল্ক শাড়ী
ক্যালি-ক্লথের সব
দোকানেই
পাওয়া যায়।

উষা সেলাই মেশিন

■ উষা বৈচিত্র্য ও সুরুচির বৃহত্তম সম্ভার ■ উষা যেমন সুদৃঢ় গঠন তেমনি সুদর্শন ■ উষা নিখুঁত কাজের উপযোগী কারিগরী নৈপুণ্যের নিদর্শন ■ উষা—শুধু উষা রই—অতি উন্নত শ্রেণীর বিক্রয়োত্তর সার্ভিস-ব্যবস্থা আছে (সারা ভারতে ২০০০-এরও বেশী সার্ভিস-কেন্দ্র আছে) ■ উষা ● ● ● যার বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহাতীত।

* সমস্ত অধিকৃত উষা র দোকান ও ডীলারদের কাছে পাওয়া যায়।

UH/13/BEN

কেনা ভালো সবার ভালো উষা

প্রকাশিত হল

দাম ২০·০০

'আমি কোথায় পাবো তারে/আমার মনের মানুষ যে রে!'

এ আকুলতা মানবমনের চিরন্তন। কোথায় পাবো আমি তাকে, **সেই অচিন-অধরাকে**, যাকে পেলে আমার সব পাওয়া হবে, আর আমার **পাওয়ার কিছু থাকবে** না; যাকে পেলে আমার সকল অতৃপ্তির অবসান হবে, **ভরে উঠবে আমার সকল** শূন্যতা: অপূর্ণ মানুষের এ আকুল আর্তি তার 'মনের মানুষ'কে—**তার 'পূর্ণ'তাকে** —পাওয়ার, গান হয়ে, কান্না হয়ে, ব্যাকুলতা হয়ে যুগ যুগ **ধরে উৎসারিত হয়েছে** সাধক-তপস্বী, গৃহী-বৈরাগী, শিল্পী-সাহিত্যিক, প্রেমিক-ভাবুক—**সকলের হৃদয়** থেকে। সাধকের সাধনা, তপস্বীর তপস্যা, গৃহীর সংসার, বৈরাগীর **বৈরাগ্য, শিল্পীর** শিল্প, সাহিত্যিকের সাহিত্য, প্রেমিকের প্রেম, ভাবুকের ভাব—**সবই সেই একই**

কালকূট-এর

অনন্যসৃষ্টি

কোথায় পাবো তারে

পূর্ণতার অন্বেষায় ধাবমান—কোথায় পাবো তারে, যাকে পেলে আমার সকল অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মুসলমান দরবেশ মামুদ গাজী, নিঃসন্তান মহাজন-গিন্নী আঙুরি, আধুনিকা নাগরিকা ঝিনি, প্রৌঢ় অচিনদা, বৃদ্ধ বাউল গোপীদাস বাবাজী, বিন্দু, গোকুল, ব্রহ্মানন্দ অবধূত, যোগো অবধূতানী—সবাই বয়ে চলেছে সেই একই সাধনার স্রোতে।

"কোথায় পাবো তারে" রূপে ও অরূপে মেশানো রাঢ়বঙ্গের এক বিচিত্র চিত্র। বাউল বৈষ্ণব ফকির শাক্ত শৈব সকলের রূপের হাটে বিশেষ করে নিবিড় হয়ে উঠেছে কিছু নরনারীর অন্তরঙ্গ কাহিনী, যা উপন্যাসের থেকেও আরও বেশি কিছু, আরও গভীর ও স্নিগ্ধ।

০ সমরেশ বসুর উপন্যাস ০

প্রজাপতি

"প্রজাপতি"র নায়ক সুখেন্দুর জন্যে সকলেই চিন্তিত, বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। কিন্তু সুখেন্দুর জন্যে দায়ী কে? সুখেন্দুর রচয়িতা? সুখেন্দু নিজে? না কি সুখেন্দুর স্রষ্টা? রোগ নির্ণয় করে এক্স-রে প্লেট হাজির হলে আপনি কাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন? এক্স-রে প্লেটকে? ডাক্তারকে? রোগীকে? না কি আর কাউকে? তৃতীয় মুদ্রণ॥ দাম ৬·০০॥

এপার ওপার

এক ভয়ংকর জেল-পালানো ডাকাতকে নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনীর শুরু, বুকে যে তীব্র প্রতিশোধের আগুন নিয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুরি হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীদের। এক মহৎ মানবিকতার উপলব্ধিতে ঋদ্ধ এ উপন্যাসটি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৫·০০ ॥

স্বীকারোক্তি

নিরন্তর নিরীক্ষায় বিশ্বাসী সমরেশ বসু "স্বীকারোক্তি" উপন্যাসে নায়কের জবানীতে উত্তমপুরুষে এক আশ্চর্য পাপের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে, এ'র রচনা-শৈলী ও বক্তব্য, উভয়ই বাংলা সাহিত্যে নতুন। যে-কোন পাঠককেই এ উপন্যাস ভাবিয়ে তুলবে ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০ ॥

দুই অরণ্য

স্বার্থের স্রোতে ভেসে সভ্য মানুষ গেছে অরণ্যের ঐশ্বর্য লুটতে। আর, পেটের দায়ে, কৌতূহলের বশে অরণ্যের সন্তানরা মিশেছে তাদের সঙ্গে। কখনো বা ছিটকে বেরিয়ে গেছে শহরের অনভ্যস্ত পরিবেশে। সেও আর এক অরণ্য। অরণ্যের পটভূমিকায় রচিত "দুই অরণ্য" একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০ ॥

বিবর

লেখকের বহুবিতর্কিত উপন্যাস "বিবর" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের তাবৎ বঙ্গভাষীদের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কেউ কেউ এটিকে "অশ্লীল" আখ্যায় ভূষিত করলেও বিদগ্ধজনেরা এ উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে স্বীকার করেছেন ॥ অষ্টম মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০ ॥

ফেরাই

একটি মেয়ে—চারটি পুরুষ। পুরুষ চারজনই বিশিষ্ট। মেয়েটি কিন্তু অতি সাধারণ। তবু সৌভাগ্যবতী সে মেয়ে, প্রেমের আমন্ত্রণ আসে তার কাছে চার বিশিষ্টের কাছ থেকে। চির-অন্বিষ্ট শক্তিমান সাহিত্যিক সমরেশ বসুর "ফেরাই" অভিনব আঙ্গিকে লেখা একটি নতুন ধরনের প্রেমের উপন্যাস ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

*

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৭
শনিবার ২৮ অগ্রহায়ণ—১৩৭৫

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক „	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	... ১৩.০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 14 Dec., 1968

ছাত্র বিক্ষোভ ও সমস্যা

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্যে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য এটা কোনো অত্যাশ্চর্য সংবাদ নয়। আজকাল হামেশাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়, কখনও এদিককার কখনও ওদিককার; কলকাতা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, দিল্লি—কোথাকারই বা নয়। ফলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে আমরা বড় অবাক হই না, আগ্রহ বোধ করি না, ধরেই নি কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার সব যথারীতি খুলে যাবে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলাতেই নয়, কলেজটলেজের ব্যাপারেও আমাদের ধারণা একই প্রকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যের বা বাইরের কোনো গোলমাল থেকে অহরহ এটা ঘটছে, ছাত্রদের কখন কি মতি হবে কে বলতে পারে! যাদবপুরের ব্যাপারটি আমাদের ঠিক মাথায় ঢুকছে না। কর্তৃপক্ষ যা বলছেন তাতে তো মনে হয়, গুটি কয়েক ছেলেকে প্রমোশান না দেওয়াই এই গণ্ডগোলের মূল কারণ। প্রমোশান না দেবার কারণও যা বলা হয়েছে তাতে ধারণা হয়, নিয়ম অনুযায়ী ওই ছাত্র ক'জন প্রমোশান পাবার উপযুক্ত নয়। অথচ ছাত্ররা তা মনে করে না; তাদের দাবি প্রমোশান দিতে হবে। এই সামান্য ঘটনা দেখতে দেখতে ছাত্র আন্দোলনের চেহারা নেয়, তারপরই বিক্ষোভ, ছাত্রী আবাসের সামনে বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি ঘটনা। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হল। এরই রকমফের কখনও ঘটছে কলকাতায়, কখনও পাটনায় কখনও অন্য কোথাও।

গত কয়েক দিনের কাগজে বড় রকম ছাত্র অশান্তির যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় পাটনা, বারাণসী, রায়পুর, হায়দরাবাদ, পাতিয়ালা—এবং আরও কোনো কোনো জায়গায় এই অশান্তি চলছে। অশান্তির কারণ সর্বত্র অবশ্য এক নয়। কিন্ত কারণে কি আসে যায়! মোটামুটি অবস্থাটা এই যে, সব জায়গাতেই ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ, অশান্ত: তারা কোনো না কোনোভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

অবস্থা দেখে মনে হয়, এখন ছাত্রসমাজ এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে বিরোধ তা অবস্থা বিশেষে কোনো একটি কারণ থেকে উদ্ভূত হলেও সেই কারণটিই একমাত্র সমস্যা নয়। সমস্যা যে ঠিক কোথায় তাও বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, কালের আবহাওয়া এখন এমনই যে, কোনো প্রচলিত শাসনের আধিপত্য তরুণরা আর মানতে রাজী নয়। শিক্ষাই হোক আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হোক—তার হাল ধরার অধিকার আর একা কর্তৃপক্ষের নেই। ফেল করা ছেলেকে পাশ করাতে হবে, প্রশ্ন মনোমত না হলে পছন্দসই প্রশ্ন দিতে হবে, হিন্দীকে চালু করতে বাধ্য হতে হবে, এটা করতে হবে ওটা করা চলবে না—অর্থাৎ ছাত্ররা যা চায় কর্তৃপক্ষকে সুবোধ বালকের মতন তাতে সম্মতি দিতে হবে—এটাই বোধ করি মূল কথা। এক্ষেত্রে, যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, আমাদের শিক্ষা সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে এবং ছাত্ররা কোনো না কোনো সুযোগে বিরোধে লিপ্ত হবে। এর ওপর আছে রাজনীতি, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যা আজকের ছাত্র-সমাজকে অধিকার করে আছে। একথা স্বীকার করা ভাল, ছাত্রদের চোখের সামনে দেশের যে ছবি আজ ফুটে রয়েছে তাতে আশা বা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে। বিদ্যার পরিণতি বেকারী, শিক্ষার শেষে শিক্ষিতের অনাদর, অবহেলা, রুজি রোজগারের জন্যে অশেষ ক্লেশ ভোগ, দীনতা। আমরা এর কোনো কিছুই তুচ্ছ করতে পারি না। তবু, একটা কথা বোধ হয় বলা চলে, নিজেদের দুঃখ হতাশার জন্যে যে বিরক্তি সেই বিরক্তি প্রতিদিন স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ করে কোনো বড় রকম লাভ হয় না। বিশৃঙ্খল একটা অবস্থা সৃষ্টি করায় তিক্ততা দূর হয় এমনও নয়। বরং ছাত্ররা আজ কোনো কোনো ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা রফায় আসতে পারে। অবশ্য এই রফা দেনা-পাওনার নয়, নিজেদের সমস্যা ও নানারকম অসুবিধা দূর করার জন্যে আন্তরিক একটা চেষ্টা। নয়তো ক্ষতি ছাত্রদের কম হবে না। অহরহ এই অশান্তি কোনো কাজের কথা নয়। কিছু দায়িত্ব ছাত্রদেরও নিতে হবে। বোধ করি শিক্ষা-কর্তৃপক্ষেরও এ-ধরনের একটা বোঝাপড়ায় আসা দরকার।

আনন্দে করিবে পান সুরা নিরবধি।

৩ ডিসেম্বর থেকে বোম্বাইয়ে প্রকাশ্যে তাড়ি বিক্রী শুরু।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র এমন অশান্ত হয়ে ওঠে যে, আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রশ্ন এসে গিয়েছিল। ছাত্রদের অভিযোগ হয়ত নিশ্চয়ই ছিল এবং সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতে হয়ত দাবীদাওয়াও কিছু ছিল। দাবী আদায়ের জন্য যে স্ট্রাইক চলছিল, তারও হয়ত প্রকৃত ভিত্তি কিছু ছিল। কিন্তু সে-কারণে হঠাৎ অশান্ত হয়ে শৃঙ্খলা-ভঙ্গের চেষ্টা হয়ে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চরমপন্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনিশ্চিত কালের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটা নিছক কোন আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে করলে, অবস্থাটা সঠিক বিচার করা হয়ত সম্ভব হবে না। এটা নিশ্চয়ই মনে হতে পারে যে, ছাত্রাবস্থায় ছাত্ররা এমন অনেক কাজ করে ফেলতে পারে যা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা সম্ভব নয়। কারণ, মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়, বা যে-কোন শিক্ষায়তনে সব-সময় শৃঙ্খলা মেনে চলা ছাত্রদের পক্ষে গুরুদায়িত্ব এবং কর্তব্য। তাই ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা দিলে অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। বেশ কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছু ছাত্র এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যার জন্য কর্তৃপক্ষকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তবু এসব ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন সংগঠন নয় এবং এই ধরনের ছাত্র বিক্ষোভকে নিছক শৃঙ্খলাবোধের অভাব বলে অভিযোগ করাও সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় বলেই দেখা যাচ্ছে শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও অশান্ত ছাত্র আন্দোলন শিক্ষায়তনের কাজকর্ম বানচাল করে দেবার উপক্রম করেছে। নানা জায়গায় বাস পুড়ছে, বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র তছনছ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায়তনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নভেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ানের যে নির্বাচন হবার কথা ছিল, তা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই কিছু ছাত্র ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এস. এন. সেনকে হুমকি দিয়েছিল কড়া আন্দোলন চালাবার যদি তিনি বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যাক-নামারার নৈশভোজে যোগদান করেন। এমনি সব নানা প্রশ্ন নিয়ে ছাত্র অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে; ক্রমশঃ শিক্ষায়তনের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিপন্ন করছে। এই সব প্রশ্নের সবকটিই যে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রদের নিজস্ব সমস্যা বা অভিযোগ সংক্রান্ত তা হয়ত নয়; কারণ কিছু কিছু রাজনৈতিক প্রশ্নও জড়িয়ে পড়ে এবং পড়েছে।

রাজনীতিকে বর্জন করে যে ছাত্রদের বা তাদের আন্দোলনকে চলতে বা চালাতে হবে এমন কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত কোথাও নেওয়া হয়েছিল কি না জানা নেই। তবে, এটাই সকলের এবং সর্বদেশে মূল অভিজ্ঞতা যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা আদর্শকে পিছনে সরিয়ে রেখে কোন ছাত্র আন্দোলন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা আদর্শ আছে বলেই ছাত্র আন্দোলনকে একমাত্র রাজনৈতিক প্রথায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়ত সম্ভব। প্রধানত, এবং মুখ্যত, যে-সমাজ জীবনকে রাজনৈতিক মতাদর্শ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে, সে-জীবন থেকে ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব কিনা সন্দেহ। বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিম বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ, সমাজ জীবনের যে ছাপ ছাত্রদের উপর প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে-সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করেছিল। এই অনুসন্ধানের সুযোগ এসেছিল সরকারের এক সিদ্ধান্তের ফলে। শিক্ষা বিভাগের কাছে এটা অজানা ছিল না যে, কলকাতায় প্রতিদিন বহু ছাত্র বিভিন্ন কলেজে পড়তে আসে যাদের পড়া-শুনার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রধানতঃ তাদের সুবিধার জন্যই শিক্ষা বিভাগ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি ডে-হোম খুলে দেয়। এই ডে-হোম পুরোপুরি ছাত্রাবাস নয়, অথচ ছাত্রাবাসের সুযোগ সুবিধা যতটা সম্ভব দেবার চেষ্টা হয়েছিল। এইসব ডে-হোমে ছাত্ররা সকালে এসে সারা-দিন থেকে সন্ধ্যায় চলে যেত এবং এইসব জায়গা থেকে যেমন নিয়মিত কলেজে যাবার সুবিধা পেত, তেমনি সুযোগ পেত নিয়মিত লেখাপড়া করার।

এই ডে-হোমের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু অনুসন্ধান কার্য চালান হয়েছিল ছাত্রদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন সম্বন্ধে। সে-অনুসন্ধান হয়ত সামগ্রিক বিচারে পরিপূর্ণ অনুসন্ধান ছিল না; কিন্তু এমন সব তথ্য জানা গিয়েছিল, যা ছাত্রজীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে অত্যন্ত প্রখর করে তুলতে সাহায্য করে। তখন জানা গিয়েছিল, কলকাতায় যে-সব ছাত্ররা পড়ে তাদের অনেকেরই বাড়িতে পড়াশুনার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বা নেই বললেই চলে। বহু পরিবারে ছাত্ররা হয়ত শুধু রাতে শোবার জায়গাটুকুই পায় এবং তার বেশী কিছু নয়। ফলে, পড়াশুনার সুযোগ সুবিধার জন্য এই সব পরিবারের ছাত্রদের অন্য জায়গা খুঁজতে হয় অথবা হয়ত খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হতে হয়। এই রকম পরিবারের সংখ্যা নেহাৎ যে-কম নয় তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। তা-ছাড়া আছে অর্থনৈতিক সমস্যা, যে-সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য হয়ত ছাত্রকেও প্রত্যক্ষভাবে নানা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হয়। এই অবস্থায়, অসন্তোষ যদি ছাত্রজীবনকে আচ্ছন্ন করে তাহলে তার প্রতিকারের কথা রাজনৈতিক পর্যায়েই চিন্তা করা সম্ভব।

এ-ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে আর একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ছাত্রদের। দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলায় যে জন-সংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে তার ঢেউ এসে লেগেছে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত সর্বস্তরে ছাত্রদের

ত' সমস্যা নিয়ে প্রচণ্ডভাবে বিব্রত হতে ..র। কলকাতায় যে-সব বড় বড় কলেজ ছিল সেগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশনের নির্দেশে ভেঙে ভেঙে ছোট করে দিতে হয়েছে। কিন্তু তাতে ছাত্রের চাপ কমেনি। অথচ অধ্যাপক বা শিক্ষকের সংখ্যা সমহারে বৃদ্ধি পায়নি। ফলে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটে গিয়েছে। শিক্ষার ব্যক্তিগত স্পর্শ ছাত্রদের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থা শুধু এখানেই সৃষ্টি হয়নি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিদেশেও এই সমস্যা ছাত্রসমাজকে বিব্রত করে তুলেছে।

ইউরোপের দৃষ্টান্তটা সামনে রাখলে দেখা যাবে শুধু ফ্রান্সেই নয়, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশেও এই একই ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে দেখা দিচ্ছে ছাত্র অসন্তোষ, বিক্ষোভ। নানাভাবে এই ছাত্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষের আলোচনা চলছে ইউরোপে। নানা পন্থার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীতে ছাত্র আন্দোলনকে প্রশমিত করার জন্য ছাত্র-সংগঠনের কিছু দাবীও মেনে নিতে হয়েছে। যেমন সম্প্রতি প্রস্তাব ওঠেছে, ২১ বছরের পরিবর্তে ১৮ বছর বয়স হলেই ভোটাধিকার দেওয়া হবে। কারণ ছাত্রদের সংগঠনের একটা মূল দাবী ছিল, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সমগ্রভাবে রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে বলেই বার্লিনে অটো সাথার ইনস্টিটিউটের কর্মপরিচালন পরিষদে ১০ জন শিক্ষক ছাড়াও ১০ জন ছাত্র প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এর ফলে দাবী উঠেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স গ্রুপের ছাত্রদের আধুনিক দুনিয়ার 'সমাজতন্ত্র' এবং 'সাম্রাজ্যবাদ' সম্বন্ধে লেকচার দিতে হবে। যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র দাবী করেছে আধুনিক চীন এবং সাম্রাজ্যবাদ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও নানা দাবী নিয়ে ছাত্ররা এগিয়ে আসছে।

এইসব দাবী কিছু মেনে নেওয়া চলছে, কিছু মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, অসন্তোষ থেকেই যাচ্ছে। থেকে যাচ্ছে বলেই আজ বিভিন্ন মহলে বিচার করা হচ্ছে রাজনৈতিক পর্যায়ে ছাত্র সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা। এই বিচারের ফলেই, দেখা যাচ্ছে আগামী বছর যখন পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৯০টি কম্যুনিস্ট পার্টির শীর্ষ সম্মেলন বসবে তখন সেখানে আলোচনার একটা বড় অংশ থাকবে বর্তমান যুব অসন্তোষ এবং আন্দোলন। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং যে-সব প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কারণে অশান্তি দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন দেশে সে-সব আলোচনা করা হবে এক সুদীর্ঘ রিপোর্টে এবং সে-রিপোর্টের খসড়া নিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েক-দফায় আলোচনাও হ'য়ে গিয়েছে। এই আলোচনা এবং বিভিন্ন দেশের রিপোর্ট থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে যে, ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার মধ্যে একটা বড় সমস্যা বেকারী আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় ওপর ছাত্রদের বা যুবকদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং সারা জীবনের বাস্তব রূপ নির্ভরশীল বলেই আজ সমগ্রভাবে আলোচনা চলেছে রাজনৈতিক পর্যায়ে।

এটাই হল বাস্তব অবস্থা। এই বাস্তব অবস্থা এদেশে এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় আরও তীব্ররূপে প্রকাশ পাচ্ছে বলেই আজ আর ছাত্র আন্দোলন বা অসন্তোষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ব'লে অভিযোগ করে দমন করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এদেশের সকলের সামনে একটা আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ছিল বলেই অত্যন্ত সহজভাবে ছাত্র আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনোত্তর কালে রাজনৈতিক আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নানা মতে বিভক্ত। ফলে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে ছাত্র সমস্যাকে ভিন্ন পর্যায়ে বিচার করার চেষ্টা চলেছে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ কুড়ি বছর কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের শাসনব্যবস্থা চালিয়ে এসেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। এই কুড়ি বছরে পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রূপায়িত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। বড় বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য। শিল্প গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য। কৃষিকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। এই সব পরিকল্পনার পর বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল শিল্পে উৎপাদনের মন্দা এসে গিয়েছে; কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না; বিভিন্ন শিক্ষায়তন থেকে প্রতি বছর যে-সব ছাত্র বেরিয়ে আসছে বাস্তব জগতে তারা অর্থনৈতিক সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। দীর্ঘ পরিকল্পনা কালে এমন কোন প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যার ফলে ছাত্রদের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে সহজ করে দিতে পারে।

পারেনি বলেই ছাত্রজীবনের সংকট তীব্র আকার ধারণ করার সুযোগ পেয়েছে। গত নির্বাচনের পর যখন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের পরিবর্তে অ-কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা চালু হল, তখন হয়ত প্রত্যাশা ছিল অনেক; কিন্তু রাজনৈতিক বিচারে সেখানেও দেখা দিয়েছে হতাশা। এ-অবস্থার পরিবর্তন নিশ্চয়ই একদিনে সম্ভব নয়; কিন্তু বড় রকম কোন পরিবর্তনের প্রচেষ্টাও কোথাও দেখা যায় নি। পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্টের রাজত্বকাল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সেই সময়ের মধ্যে সকলের চোখে যেটা বড় করে দেখা দিয়েছে সেটা যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব। যুক্তফ্রন্টের সরিকদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠেছিল বলেই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন সমস্যা উপেক্ষিত থেকে গিয়েছিল। সে-উপেক্ষা তীব্রভাবে স্পর্শ করেছিল শিক্ষাক্ষেত্রকেও।

হয়ত তার মূল্য দিতে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোকে। কারণ, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু দলগতভাবে ফ্রন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে-দ্বন্দ্ব বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এনে দিয়েছে তাই দেখা যায়, ট্রেড ইউনিয়ান ক্ষেত্রে বা কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ছাত্রমহলে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই আজ অ-কংগ্রেসী, বা বামপন্থী ছাত্রমহলে একাধিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। যে ছাত্র-সংগঠন ছাত্র আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করত সেই সংগঠনকে আজ আর এক সংগঠন 'হঠকারী' বলে রাজনৈতিক মহলে একঘরে করার চেষ্টা করছে। তিন চারটি সংগঠনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম আকারে দেখা দেবার সুযোগ খুঁজছে। এই কারণেই, স্থগিত রাখতে হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ানের নির্বাচন; কারণ, নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নেমে আসতে পারে এমন আশংকা কোনমতেই অমূলক ছিল না। ঠিক একই কারণে, ছাত্রদের একাংশের ক্ষোভ ট্রাম এবং বাসের উপর এসে পড়ে। সে-কারণেই, বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ছাত্রদের আন্দোলন বিশৃঙ্খলার সীমানায় এসে পড়ে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা তাই কোন বিচ্ছিন্ন অঘটন নয়। সমগ্রভাবে, ছাত্রসমাজের বর্তমান সংকটের একটা ইঙ্গিত মাত্র। বর্তমান রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা সম্ভব নয় বলেই, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঘটনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সংকটের অন্তরঙ্গ প্রতিচ্ছবি হিসাবেই গ্রহণ করতে হয়। অন্য কোন বিচার ছাত্রদের প্রতি অবিচারের নামান্তর বলেই মনে হবে। কিন্তু সে-বিচারেও অসন্তোষের সুযোগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ অবশ্যই নেই। রাজনৈতিক ব্যর্থতা বিশৃঙ্খলা দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়।

পর্দার আড়ালে

ঠাণ্ডা লড়াই, লড়াইতো বটেই, বেশ গরমও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এর শুরু। কখনও বার্লিনে কখনও কিউবায়, কখনও ভিয়েতনামে, কখনও পশ্চিম এসিয়ায় এ যুদ্ধ চলেছে। প্রধানত সে যুদ্ধের সরঞ্জাম হচ্ছে কড়া চিঠি আর গরম বুলি। অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রের ব্যবহার একেবারে বাদ যায় না। রীতিমত লড়াই কূটনৈতিক দ্বৈরথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। তবে সে-লড়াই যাঁরা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূল পক্ষ তাঁরা করছেন না—তা করলে তো আর একদফা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেত—সেটা চালাচ্ছেন তাঁদের বেনামদারেরা। পশ্চিম এসিয়ার দৃষ্টান্তটা নেওয়া যাক। সেখানে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখে অনেকে শিউরে উঠছেন। এমন দিন কদাচিৎ যায় যেদিন কোনও না কোনও সংঘর্ষের খবর সে অঞ্চল থেকে পাওয়া যায় না। পাগলা জগাই যেমন একা সাত জার্মানের সঙ্গে লড়েছিল, এ এলাকায় একা ইস্রায়েল অন্তত চার আরব দেশের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। তবে তফাতের মধ্যে এই, ইস্রায়েল ঠিক পাগলা জগাই নয়। তার বীরত্ব জগাইয়ের মত ভাঙা ছাতা ঘুরিয়ে নয়, আর পাগলামি, যদি সে করেই থাকে তাতে তার টনটনে জ্ঞানের প্রমাণ সুস্পষ্ট।

কিন্তু পশ্চিম এসিয়ার এ যুদ্ধের আসল যাঁরা নাটের গুরু তাঁরা কূটনৈতিক পর্দার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। ইস্রায়েল সুয়েজ খালের এপার থেকে ওপারে মিশরের ঘাঁটির ওপর কামান দাগছে, মিশরী বোমারু বিমান হঠাৎ উড়ে গিয়ে ইস্রায়েলী এলাকার অতর্কিতে বোমা ফেলে আসছে, ইরাকী সেনারা জর্ডনে ঘাঁটি গেড়ে ইস্রায়েলী গ্রামে-শহরে হানা দিচ্ছে, পালটা আক্রমণ চালাচ্ছে আত্মরক্ষার নামে ইহুদীরা আর তছনছ করে দিয়ে আসছে জর্ডনের সীমান্ত এলাকা। সিরিয়াও চুপ করে বসে নেই। তারাও মদত দিচ্ছে আরব গেরিলাদের যারা ব্যতিব্যস্ত করে মারছে ইহুদী সৈনাবাহিনীকে। ইস্রায়েলের অভিযোগ, সিরিয়া আর জর্ডন এক হয়ে অভিযান চালাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সে অভিযোগ সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, আরবদের আক্রমণ করার স্বপক্ষে ইহুদীদের এ এক চমৎকার অজুহাত। সে আক্রমণ হঠাৎ শুরু হলে অবাক হবার কিছু নেই। তবে আরব গেরিলারাও ছেড়ে কথা কইছে না। তারাও ইহুদীদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। নিজের দেশে ইহুদীদের নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার উপায় আর নেই। কোথায় যে গেরিলাদের বোমা ফাটে কে জানে।

এসব দেখে মনে হয় আরব আর ইহুদীদের মধ্যে একটা জোর লড়াই চলছে, সে

চন্দ্রগুপ্ত

রক্তাক্ত নাটকের দ্বৈত নায়ক বুঝি মিশরের নাসের আর ইস্রায়েলের এস্কল। আরব আর ইহুদীদের মধ্যে যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক তাতে ভুল নেই। কিন্তু যুদ্ধের পালার মূল গায়েন কায়রো কিংবা জেরুজালেম নয়, সে গৌরব হচ্ছে মস্কো আর ওয়াশিংটনের। আরব প্রজাতন্ত্রকে রণসাজে সাজিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, আর ইস্রায়েলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কেবল অস্ত্রবল নয়, ধনবলও যুগিয়েছে পশ্চিম এসিয়ার দুই দেশকে তাদের মুরুব্বি রাষ্ট্র রুশিয়া আর আমেরিকা। রুশিয়ার জোরে আরব প্রজাতন্ত্রের জোর, আর আমেরিকার জোরে ইস্রায়েলের। রুশিয়ার কাছ থেকে বৈষয়িক সাহায্য আরব প্রজাতন্ত্রের আর্থিক পুনর্গঠনে খুবই কাজে লেগেছে। আর মার্কিন দাক্ষিণ্য না পেলে তো ইস্রায়েল দাঁড়াতেই পারতো না। গত বছরের আরব-ইহুদী লড়াই আসলে ছিল বকলমে রুশ-মার্কিন লড়াই। সে ছ'দিনের যুদ্ধে আরবদের হার হওয়াতে মুখ পুড়েছে নাসেরের তো বটেই, কোসিগিনেরও। ইহুদীদের বিরাট জয়ে তাই উল্লাস দেখা গিয়েছিল ইস্রায়েলের সঙ্গে আমেরিকাতেও।

আজ যা পশ্চিম এসিয়ায় ঘটছে, তা হচ্ছে গেল বছরের যুদ্ধেরই জের। গত বছরের জুন মাসের যুদ্ধে ইস্রায়েল আরবদের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, সুয়েজের পূব পাড়ে আর জর্ডনের পশ্চিম ধারে তাদের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নিয়েছে। এ-সব অঞ্চলের বাসিন্দারা আরব। তাদের অনেকে ঘরদোর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে জর্ডনে আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে আবার নিজেদের ভিটেতে রয়েই গিয়েছে। এরা যে ইহুদীদের শাসন বিনা আপত্তিতে সুবোধ বালকের মত মেনে নিতে রাজি হবে না, তা সহজেই বোঝা যায়। কাঁটার মত এরা সর্বদাই খচখচ করে ইস্রায়েলীদের গায়ে পায়ে দেহের সর্বত্র বিঁধছে। ছোটখাটো ঘটনা তো ঘটছেই, মাঝে মাঝে এক একটা বেশ বৃহৎ ব্যাপারও। ২২শে নভেম্বর এক দারুণ বিস্ফোরণে জেরুজালেমের সব চেয়ে বড় বাজার প্রায় উড়ে গেছে বললেই হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ থেমেও থামেনি। তার সদর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলেও বিস্তর গলিঘুঁজি রয়েছে খোলা। সেগুলো বন্ধ হবে না যতদিন না আরব-ইস্রায়েল বিরোধের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। ততদিন মিশর-সিরিয়া-জর্ডনের যে সব এলাকা ইস্রায়েল দখল করে নিয়েছে, সে-সব এলাকায় খণ্ডযুদ্ধ চলবেই, উস্কানিও আসবে বাইরের মুরুব্বিদের কাছ থেকে।

এ তত্ত্ব ইস্রায়েলীদের অজানা নয়। তারা বেশ জানে, পশ্চিম এসিয়ার আগুন নেবেনি, কোথাও কোথাও ছাই চাপা পড়েছে, কোথাও বা ধিকি-ধিকি জ্বলছে। সে আগুন ছড়িয়ে পড়লে তাদের নিজেদের ঘরও যে পুড়ে যাওয়ার ভয় আছে, তাও তারা বিলক্ষণ জানে। তবুও তাদের যে সে আগুন নেবাবার গা নেই তা খানিকটা অহমিকা, খানিকটা গোঁয়ার্তুমি, খানিকটা বা আত্মবিশ্বাস। তবে আসলে তাদের ভরসা হচ্ছে আমেরিকা। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় তারা যাই করুক, আমেরিকা তাদের পেছনে থাকবেই, তাদের মদত যোগাবেই। তার ওপর তাদের নিজেদের জোরও কম নয়। ছোট্ট এক ফালি দেশ হলে কী হয়, ইস্রায়েল যেভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছে, তাতে অবাকই হতে হয়। তার আয়তন আর জনবলের তুলনায় তার সামরিক ক্ষমতা আর আর্থিক শক্তি দুই-ই খুবই বেশী।

আরবদের কিন্তু 'যত গর্জায় তত বর্ষায় না'। নাসেরের আরব প্রজাতন্ত্র ইস্রায়েলের সঙ্গে লড়তে গিয়ে যে-রকম লেজে-গোবরে হয়েছে, সে রকম সোভিয়েট-আশ্রিত কোনও দেশ ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। রুশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে গত বিশ-বাইশ বছরে অনেক দেশই লড়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপক্ষেরা ছিল আমেরিকার আশ্রিত। সে সব লড়াইয়ে একটানা জিত হয়েছে রুশিয়ার অনুগৃহীত দেশ বা দলগুলির, হার হয়েছে মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট দেশ বা দলের। যেখানে তাদের সোজাসুজি হার হয়নি, সেখানে তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি, এর ব্যতিক্রম ঘটেছে আরব-ইস্রায়েল লড়াইয়ে। এই প্রথম আমেরিকার সাহায্য পেয়ে একটা দেশ রুশ-আনুকূল্য-পুষ্ট আরেকটা দেশকে অনায়াসে হারিয়ে দিল। আমেরিকার এতদিন যে ক্ষোভ ছিল, সে যাদের পৃষ্ঠপোষক তারা কেউই লড়তে চায়না সে ক্ষোভ এতদিনে ঘুচল। ইস্রায়েলকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে ওয়াশিংটন তাই উৎসুক—নিক্সন জিতেছেন বলে সে উৎসাহে ভাটা পড়েনি। যে পঞ্চাশটি ফ্যান্টম জেট ইস্রায়েল চেয়েছে, তা সে পাবেই এটা ধরে নেওয়া যায়। আর সে যদি তার দাপট একটু দেখাতে চায়, তাতেও আমেরিকা আপত্তি করবে না। ঠাণ্ডা লড়াইয়ে তাকে যে জিতিয়েছে, তার একটু আবদার সে সহ্য করবে বইকি।

সমীপেষু

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

এখন স্নানের ঘরে দীর্ঘক্ষণ ঝর্ণার তলায়
সময় সহজে কাটে—ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছাই
অথচ অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যায়—
ঘূর্ণমান মঞ্চে আমি দৃশ্যান্তরে এখন পালাই।

মূলতঃ এখন আমি তৃষ্ণার তিমিরে ডুবে থাকি
শ্বাস নিতে কষ্ট হয়—বুকের ভিতরে বসে বসে
হৃৎপিণ্ড কুরে খায় না-পাওয়া নামক সেই পাখী,
কার্বনে প্রদেশ পূর্ণ বক্ষতলে ঊষার প্রদোষে।

এবং তুমিও আছ—ফুলদানী তোমার শরীর
একটিও নতুন ফুল শোভা আর পায় না সেখানে
দাগ ধরে নষ্ট হয়—কতদিন কৃত্রিম জরির
মুগোলি থাকে বা বলো—অন্য শব্দ ভেসে আসে কানে।

তুমি আছ আর সেই না-পাওয়া নামক পাখী আছে
অথচ আমাকে তবু তুলে ধরি পূর্ণতার কাছে।

তুমি অন্ধকারেও দেখতে পাও

বরুণ চৌধুরী

শুনেছি তুমি অন্ধকারেও দেখতে পাও
তাই আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ সেই সব সুখহীন দিনগুলোয়
আতঙ্কিত আমি ভুলে গেছি খুলতে
ছেলেবেলায় বাঁশিওলার কাছে যে মুখোশ কিনেছিলাম।
আমার আশেপাশে যারা ঘুরছে
তুমি বললে তারা সবাই আমার চেনা
আমি কাউকে চিনি না
তাদের হৃদয়ে হাত দিতে গেলাম
দেখি তাদের বুক পকেট শূন্য
খালি সিগারেটের ছোট্ট প্যাকেটের মত হৃদয়
তার অনেক আগেই ছুঁড়ে ফেলেছে রাস্তায়
মুখে তাদের কত রংয়ের মুখোশ
পরীদের মতো একঘেয়ে সুন্দর ব্যাঙ্কার, মালিক, স্যার
আমি বললাম 'কে তোমরা, মুখোশ খোলো',
ওরা বললো, "ওটাই আমাদের মুখ।"
আমি এক ঝটকায় নিজের মুখোশ খুলতে চাইলাম
কান ছিঁড়ে ঝুলে পড়লো—মুখোশ খুললো না,
সেই প্রথম বুঝলাম তুমি অন্ধকারের চেয়েও অন্ধ
কারণ তুমি আমার চোখের জল দেখতে পাওনি।

দাবী

মৃণাল দত্ত

এসো, আমার হৃদয়ে আজ ঘনিষ্ঠ হও।
এই যে অন্তরঙ্গ হওয়ার নিয়ম তাতে একটুকুও
মরে পড়ার দাবী তোলার তেমন কোনো অঙ্গীকারের চিহ্ন নেই,
ইচ্ছে হলেই
এই যে দেখছো আমার দেহের আপাত ছায়া
তার উপরে হেঁটে বেড়াও, মাড়িয়ে যাও
তুচ্ছ ভেবে নীরব প্রতিবাদের ধ্বজা উড়িয়ে দাও,
তোমার ঘিরে
গোপন ছায়ার মতো আমার যতো কিছু অধিকারের প্রশ্ন ছিল
সব কিছুকে দারুণ দাপে সরিয়ে দাও, দুই বাহুতে
প্রবল প্রতিরোধের শক্তি তুলে ধরো, স্থির দুপায়ে
দাঁড়িয়ে থাকো, পুরুষ!

এসো, আমার মধ্যে তবে ঘনিষ্ঠ হও।
এই যে অন্তরঙ্গ হওয়ার নিয়ম তাতে কাপুরুষের
নতজানু হওয়ার কোনো ভঙ্গী-নত প্রার্থনা নেই, নিবেদনের
পুন্যবেদী মাড়িয়ে যাও, ভেঙে ফেল, অবহেলার দৃষ্টি হানো,
তুচ্ছ ভেবে
নীরব অধিকারের শক্ত মাটির ভিতে প্রতিবাদের ধ্বজা ওড়াও
ভালোবাসা, নিবেদনের পুণ্য থালায় তোমার কোনো গোপন দাবী,
আমস্তক বিকিয়ে দেওয়ার শর্ত ছিল?

তবে তুমি দুই বাহুতে প্রবল প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলো,
হানো কৃপাণ—
মাড়িয়ে যাও, নিতল অভিপ্রায়ের রক্ত-মুখের উপর হাজার পায়ে,
দুই নয়নের মধ্যিখানে তৃতীয় নয়ন জেগে ওঠো
দুই জানুতে আবার তুমি স্ব-নির্ভর উঠে দাঁড়াও, পুরুষ!
এসো, আমার হৃদয়ে আজ ঘনিষ্ঠ হও।

আভিধানিক

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

এখন
অন্য ভাষায় কথা বলো
আল-জিহ্বা কাঁপলেও .....

এখন
কথায় জুড়ে ধনী-দরিদ্র সব
সমান বানাও
আল-জিহ্বা কাঁপলেও.....

যেমন
জনসভায়; আমরা অনেকেই প্রতিশ্রুতিবান! কিন্তু
বস্তা-পচা মরালিটির দিব্যি দিও না
আল-জিহ্বা কাঁপলেও.....

কারণ
আভিধানিক মানে নিয়ে
ট্রামে বাসে ট্রেনে এবং রেশনের লাইনে; তুমুল
বিতর্ক এখন
একবার ডাইনে-বাঁয়ে চোখ রাখো, তাকাও
এখন নিয়ত বদলাচ্ছে জীবন

এখন
অন্য ভাষায় কথা বলো
আল-জিহ্বা কাঁপলেও.....

অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী

কিছুদিন আগে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একটি শোকসভা হবে—কাগজে এই সংবাদটি দেখে আমি সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলুম। কারণ অধ্যাপক চক্রবর্তীর সঙ্গে সামান্য কিছু পরিচয়ের সুযোগ আমারও এক সময় ঘটেছিল।

আমাদের কলেজ-জীবন কেটেছে পূর্ব-বাংলায়—শ্যামাপদ বাবুর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিনি। কিন্তু কলেজে যে বাংলার ক্লাস সেকালে প্রক্সি দেবার, ঘুমোবার, পালাবার, গল্প করবার এবং মধ্যে মধ্যে ভালো মানুষ অধ্যাপককে যথোচিত উত্যক্ত করবার প্রায় ব্যতিক্রমহীন উপাদান ছিল—সেই ক্লাসকে তিনি নাকি অসামান্য আকর্ষণে পরিণত করেছিলেন। তাঁর ক্লাসে বসবার জায়গা পাওয়া যেত না, ছাত্রেরা দাঁড়িয়ে থাকত। কারণ সে ক্লাসগুলো শুধু তাঁর নিজের কলেজের ছিল না—ছিল ইণ্টার-কলেজিয়েট। কলকাতার সব কলেজ থেকে ছাত্রেরা গিয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে ভীড় করত।

সংবাদটা আশ্চর্য। তার কারণ—এর আগে বাংলার ক্লাস কি রকম ছিল, তার একটা মোটামুটি দৃষ্টান্ত এই:

সংস্কৃতের বৃদ্ধ অধ্যাপকের ওপর ক'টি বাংলার ক্লাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেই তো অতিরিক্ত ক্লাস প্রাপ্তিতে কোনো শিক্ষকই প্রসন্ন হন না, তার ওপর বইটি আবার "কৃষ্ণকান্তের উইল।" অধ্যাপক চটেই রয়েছেন।

পড়ানো কি ভাবে হল, সে কথা না বলাই ভালো। বই শেষ করে অধ্যাপক যখন স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন, তখন উঠে দাঁড়ালো দুর্বুদ্ধি একটি ছাত্র।

স্যার, সব তো হল, কিন্তু রোহিণীর ক্যারাক্‌টারটা তো আলোচনা করলেন না?

উটের পিঠে শেষ খড় থাকে বলে! অধ্যাপক এবার বিস্ফোরকের মতো বিদীর্ণ হয়ে গেলেন। বিকট গর্জন করে বললেন, রোহিণী? রোহিণীর আবার ক্যারাক্‌টার কী? ও তো ক্যারাক্‌টারলেস!

হয়তো এটা চূড়ান্ত উদাহরণ—হয়তো বানানো গল্প। কিন্তু শ্যামাপদ চক্রবর্তীরা আসবার আগে বাংলা পড়ানো সম্পর্কে এই-ই ছিল ছাত্রদের ধারণা। বিশেষ করে ইংরেজির সেই স্বর্ণযুগে।

সন্দেহ নেই, বাংলা-সাহিত্যের ক্লাসকে যাঁরা মর্যাদা দিয়েছেন, তাকে সমুন্নত করেছেন, শ্যামাপদবাবু সেই অগ্রনায়কদের একজন। তাঁর ক্লাসে ছাত্রেরা নিশ্বাস ফেলতে চাইত না—পাছে তাঁর একটি কথাও

হারিয়ে যায়। কী তিনি পড়াতেন, কী আকর্ষণ ছিল তাঁর অধ্যাপনার মধ্যে?

পাণ্ডিত্য? নিঃসন্দেহ। কিন্তু নিছক পাণ্ডিত্য দিয়ে কলেজের বিশাল ক্লাসগুলোকে আয়ত্ত করা যায় না। বাগ্মিতা? তারও দরকার আছে বটে, কিন্তু মাত্র সুভাষণেই সব ছাত্রকে বশীভূত করা সম্ভব নয়, অন্তত যুক্তিবাদী ছাত্রদের তো কিছুতেই নয়। রসবোধ? হাঁ—পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসবোধ মিশলে মণি-কাঞ্চন সম্পর্ক ঘটে। কিন্তু তবু—পাণ্ডিত্য-বাগ্মিতা-বৈদগ্ধ্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটলেও শ্যামাপদ চক্রবর্তী হওয়া সম্ভব হয় না। এ-রকম 'ম্যাগ্‌নেটিক পার্সোনালিটি' হতে গেলে আরো বড়ো শক্তির দরকার হয়।

ও তিনটি গুণই তাঁর পরিপূর্ণভাবে ছিল। তাঁর কবি-প্রতিভাও হয়তো এই সঙ্গে অনেকখানি সাহায্য করেছিল তাঁকে। তা ছাড়া ছিলেন আশ্চর্য ছাত্রপ্রাণ। এ যুগে যা দুর্লভ থেকে দুর্লভতর হয়ে এসেছে—ছাত্রদের অকুণ্ঠভাবে ভালবাসবার, তাদের কাছে টেনে নেবার সেই অনন্য হৃদয়বত্তারও অধিকারী ছিলেন তিনি।

কিন্তু অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী এর চাইতেও কিছু বেশী ছিলেন।

তাঁর ছোট অথচ পরিচ্ছন্ন শোকসভাতে কিছু আলোচনা হল, তাঁর কাব্য থেকে পাঠ করলেন বাংলা দেশের ক'জন প্রথম সারির কথাশিল্পী ও কবি—শ্যামাপদবাবুর ছাত্র ছিলেন তাঁরা। পরে, প্রসঙ্গত একজন কবি মৃদুস্বরে বললেন, কী আশ্চর্য যে পড়াতেন! আমাদের দু-বছর ধরে মাত্র একটি কবিতাই পড়িয়েছিলেন—'মানব-বন্দনা!'

দু-বছর ধরে যে অধ্যাপক মাত্র একটিই কবিতা পড়ান, কলেজী-আইনে তাঁর চাকরি থাকা উচিত নয়। কিন্তু তাঁর ক্লাস তো পরীক্ষা-তটিনী পেরোবার খেয়া নৌকো ছিল না। যারা অভিভূত হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনত, পরীক্ষার প্রয়োজনের কথা তারা ভুলে যেত। শ্যামাপদ চক্রবর্তী পাস করাবার জন্যে পড়াতেন না—ছাত্রদের তিনি উদ্বোধিত করতেন।

তখন, কলেজ-ক্লাস-পরীক্ষা সব গৌণ হয়ে যেত। খুলে যেত একটির পর একটি দিগন্ত। চলে যেতেন ইংরেজি-বাংলা-সংস্কৃতের সাহিত্য-জগতে, ছাত্রেরা দেখত আকাশের পর আকাশ, সমুদ্রের পর সমুদ্র। তখন বৈষ্ণব পদাবলীর কুটীরে সোনার প্রদীপ জেলে দিতেন কালিদাস, মিলটনের দেবদ্যুতি জ্বলে উঠত মধুসূদনের স্বর্ণ-লঙ্কায়, কীট্‌সের অতীত-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসত।

যারা শুধু শোনবার জন্যে আসত সেই সব ক্লাসে—তারা শুনেই চলে যেত। কিন্তু তাদের মধ্যেও থাকত কেউ কেউ—যারা আকুল হত দূর সমুদ্রের আহ্বানে, যাদের কাছে আসত অনেক আকাশের ইশারা। না—শ্যামাপদ চক্রবর্তী ছাত্ররঞ্জন অধ্যাপক ছিলেন না; তিনি তাদের মুক্তি দিতেন—বিশাল মন বিপুল মননের বাতায়নগুলো খুলে দিতেন তাদের কাছে।

আজ ক্রমশ আমাদের জীবন জটিল, বেঁচে থাকবার প্রশ্ন দিনের পর দিন কঠিনতর। পরীক্ষার সমস্যা যতটা মনস্তত্ত্বগত, তার চেয়েও ঢের বেশী বস্তুগত। আজকের ক্রুদ্ধ, বিমর্ষ, অনিশ্চিত ছাত্রদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম একটা নিষ্ঠুর প্রয়োজন। আমি অব্যবসায়ী, নিশ্চয় করে বলতে পারব না—একালের ছাত্রেরা এই ধরনের 'অনাবশ্যক' এবং 'সিলেবাস অতিক্রান্ত' অধ্যাপনা সহ্য করতে পারবেন কি না। তাঁদের দোষ নেই। এখন কাল বদলেছে। শ্যামাপদ চক্রবর্তীরা এ যুগে আর ফিরে আসবেন না—হয়তো না আসাই ভালো!

আমি তাঁর ছাত্র নই। যে জগতে এই নিরহঙ্কার, নিত্যপ্রসন্ন, স্নেহনিবিড় তীক্ষ্ণধী মানুষটি বাস করতেন—সে জগৎও আমার অচেনা। তবু তাঁর ব্যক্তিগত সামান্য সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আর একটি সত্যই আমি অনুভব করেছি তা থেকে।

আমরা প্রায় সকলেই একটি কথা জানি না: আমরা কত কম জানি। আর শ্যামাপদ চক্রবর্তী কখনো জানতেন না: তিনি কত বেশি জানেন।

জানালার ধারে মুখ

সমরেশ বসু

আমি একটি মেয়ে, বয়সে তরুণ, একমাত্র এইটুকু ভেবেই ক্ষান্ত থাকতে পারি না। আমার মত বাইশ বছরের সব মেয়েই তো একথা বলতে পারে। কিন্তু সব মেয়ে কি একথা বলতে পারে, আমি রূপসী, আমি সুন্দরী, আমি স্বাস্থ্যবতী। 'স্বাস্থ্যবতী' শব্দটাকে এতোটা নিরীহভাবে বলতে চাই না। স্বাস্থ্য, মানে একজন যুবতীর স্বাস্থ্যের দৈহিক সৌন্দর্য, যতখানি হওয়া সম্ভব, তা আমার একটু বেশীই আছে। কারোর কারোর চোখে তা উদ্ধত বলে মনে হতে পারে। আমি নিজেও মনে করি, আমার বুকে, কটিতে, কাঁধের ছাঁদে একটা ঔদ্ধত্য আছে, অর্থহীন না হলে, এ ঔদ্ধত্যকে আমি শরীরের প্রগলভতা বলতে পারতাম।

আমি যে কেবল উনিভার্সিটিতে পড়ি, তা না। সম্ভবত, রূপের জোরেই, আমার স্তাবকের সংখ্যা বিস্তর। আমার ছাত্র বন্ধুদের কথা তো বাদই দিচ্ছি, কোন কোন অধ্যাপকও আমার স্তাবকের দলে পড়েন। তাতে আমি কোন অপরাধ দেখি না। মাস্টারমশাইরাও পুরুষই তো। আর রূপসী যুবতীর স্তাবক কে না হয়। নিজেকে দিয়েই তো বুঝতে পারি। এতে আমার মনে বেশ গুমোর আছে। তবে এটুকু শালীনতা আমার আছে, গুমোর ফাঁস করে বেড়াই না। তার দরকার হয় না। অন্যান্য মেয়েদের ঈর্ষা আর ঘৃণাই যথেষ্ট। ওটাকে আমার একটা অ্যাসেট বলা যেতে পারে। আমার অনেক মেয়ে বন্ধুরাই, দাঁতে দাঁত পিষে, কিমা করে খায় আমাকে। অতএব, আমার একটা নেতৃত্বও আছে।

তা ছাড়া, আমার অ্যামবিশন প্রচুর। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থাটাও তেমন ভাল নয়। অ্যামবিশাস্ হবার এও একটা কারণ থাকতে পারে। আর এই কারণেই, অনেক নামীদামী লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করতে ইচ্ছা হয়েছে। অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে।... কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গ থাক। ঠিক এ-সব কথা তো ভাবতে বসি নি। যে কথা ভাবতে বসেছি, তার সঙ্গে, এ-সব চিন্তার কী যোগাযোগ, বুঝি না। অথচ এ চিন্তাগুলো যেন আপনি এসে পড়ে। আর কথাগুলো এমনভাবে ভাবছি, যেন

আমি বর্তমানের কথা ভাবছি। আসলে তো তা নয়। আমি প্রায় আট বছর আগের কথা ভাবছি। যদিও, এই তিরিশে, আমি যে রূপসী, সেই রূপসীই আছি। রূপের জোরেই, বড়লোকের বউ, স্বামীটি অতি নিরীহ। এত নিরীহ যে, সব সাধারণের মতই, মদ খায়, সিগারেট টানে অপর্যাপ্ত, এবং এ-সবের সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে, যে-সব বাচালতা থাকে, আর যে-সব বাচালতাকে উইটি বা ইনটেলেকট বলে, সে-সবও ও'র প্রচুর। কিন্তু এ-সব কথাও আমার ভাববার প্রয়োজন নেই। আজ সেই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, সে-ই তাঁকে।...

নাহ্, প্রথম দিনগুলোর কথা না ভাবলে আজকের দেখতে যাবার ভাবনাটা যেন জলো হয়ে পড়ছে। শিকড়বিহীন মনে হচ্ছে। আসলে, আট বছর আগের কথাগুলো আপনি আপনিই মনের মধ্যে ভেসে উঠছে।

তখন উনিভারসিটিতে পড়ছি। এমনিতে সাহিত্যিকদের বিশেষ পাত্তা দিতে আমার ইচ্ছা করে না। লোকগুলো সম্পর্কে আমার ধারণা কোনদিনই খুব ভাল না। মেকী, ভেজা বেড়াল, অথবা স্রেফ বক্তৃতাবাজ। সবগুলোই খারাপ। কিন্তু হঠাৎ একদিন একজন লেখকের একটা বই পড়ে, একেবারে ক্ষেপে গেলাম। বইটা পড়ে, আমার খালি এ কথাই বারে বারে মনে হতে লাগল, লোকটা হুবহু আমার কথাই যেন লিখেছে। আমার মনের লুকনো কথা শুধু নয়, লোকটা যেন আমাকে একেবারে নগ্ন করে আগা পাশতলা দেখছে। এই লেখকের কিছুটা নাম শুনেছিলাম, কিন্তু কোন বই পড়িনি। এ বইটাই প্রথম পড়লাম। বইটা পড়ে, আমার যেন মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। সমস্ত বইটার মূল খুব একটা অন্তর্নিহিত গভীর আবেগ, যার ভিতর দিয়ে কখনো ফুটে উঠেছে ক্ষোভের তরঙ্গ, অতল বিষণ্ণতা, আর্তি, আর তারই সঙ্গে চোখের জলের একটা পবিত্র প্রসন্ন মুক্তো দ্যুতি। কেন যে এ কথা আমার মনে হয়েছিল, যেন হুবহু আমারই কথা লেখক লিখেছেন, এখন আর তা তেমন করে ঠিক বুঝতে পারি না। তবে এটা ঠিক, আমার শরীরের দু-একটা বিশেষ জায়গায় তিল বা ছোট জড়ুলের চিহ্নও যেন, ও'র লেখার বর্ণনায় মিলে গিয়েছিল।

লেখককে প্রকাশকের ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে বসলাম। ব্যক্তিটির সম্পর্কেই আমার কৌতূহল বেশী হয়ে উঠেছে। ও'কে আমি দেখতে চাই, আলাপ করতে চাই, কথা বলতে চাই, শুনতেও চাই। সেই আবেদন জানিয়েই চিঠি দিলাম। জবাব এল এক মাস বাদে। যখন জবাবের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। তাঁর আপত্তি নেই দেখা করতে। তারপরেই জায়গা এবং সময় জানিয়ে চিঠি দিলাম, দেখাও হল।

প্রথম দর্শনে কিছু বিশেষ বোঝা গেল না। ভদ্রলোকের—ভদ্রলোক মানে, ছোকরাই বলতে হবে, বয়স বছর তিরিশ-বত্রিশ হতে পারে। যেটা আমার প্রথম পাওয়ানা, সেটা ভাল করেই পেলাম। দেখলাম, ওঁর চোখে আমার রূপের দ্যুতি লেগেছে।

তারপরে, বইয়ের প্রশংসা, সাহিত্য সম্পর্কে সামান্য দু-চারটি কথার পরেই, ব্যক্তিগত জানাজানির উৎসাহটা দুজনের মধ্যেই দেখা গেল। ভদ্রলোক বিবাহিত, সন্তানাদি নেই। স্ত্রী অসুস্থ। আমার কথাও কিছু কিছু বললাম, তবে অনেক রেখে ঢেকে। ছেলেরা যেমন হড়বড়িয়ে নিজেদের কথা বলতে পারে, আমরা তা পারি না। মেয়েদের প্রত্যেকটা স্টেপ্ই খুব সাবধানী, ধীরে রজনী ধীরে, অথচ একদিক থেকে তো সেটা এক রকমের বোকামিও বটে, কারণ, সেই তো পাড় ভাঙেই, ভাসতেও হয়।

প্রথম দিনেই, লোকটির দু-একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। কথা বলতে বলতে, উনি অন্য কথা ভাবেন। ও'র চোখে মুখেই সেটা ফুটে ওঠে, অথচ কথা বলে যান অনায়াসে। যেন একটা উৎকণ্ঠা রয়েছে, কোন একটা দুর্ভাবনা, যে কারণে হঠাৎ হঠাৎ এমন ভঙ্গি করেন, আর কথা বলতে বলতে, হঠাৎ নিচু অস্পষ্ট অদ্ভুত শব্দ করেন, এখুনি বুঝি অন্য কথা কিছু বলবেন। তবে, আমার প্রতি যে উনি আকৃষ্ট হয়েছেন, সেটা চাপা রইল না, কিংবা উনি নিজেই চাপা দিতে চান নি। আমি খুশি হয়ে উঠলাম। ও'র বইয়ের নায়িকার বিষয়ে ও'র মুখ থেকে কিছু কিছু কথা শুনলাম। শুনে বোঝা গেল না, বইয়ের নায়িকার মত কোন মেয়ের সঙ্গে ও'র বিশেষ পরিচয় আছে কিনা। যদিও কথাবার্তায় ভদ্রলোককে তেমন চালাক-চতুর বা অভিজ্ঞ মনে হল না। যেন বইটা উনি লেখেন নি, এমনও মনে হল। অথচ এত জানেন, এত বোঝেন, এত দেখেছেন আর অনুভব করেছেন, বইটা না পড়লে তা বোঝা যাবে না।

এর পরে, আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ঘন ঘন হতে লাগল। এক সময়ে বুঝতে পারলাম, আমাকে না দেখে উনি থাকতে পারেন না। সেজন্য আমার রূপের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ও'র আবেগের কাছে, আমার রূপকে, অর্থাৎ আমাকেই, বেশীদিন সরিয়ে রাখতে পারলাম না। আমিও একটা অচেনা আকর্ষণ বোধ করছিলাম, সেই আকর্ষণের মধ্যে একটা ভয়ও মেশানো ছিল। এমন নয় যে, কোন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে আগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিনি, বা শারীর রহস্য অজানা। সবই আমার জানা। তথাপি, ও'কে যেন আমি

ঠিক চিনে উঠতে পারছিলাম না। একজন পুরুষ, প্রবল আবেগে আমাকে ভালবাসেন, আদর করেন, মদ্য পান করেন, এবং এ বিষয়ে আমার মনে কোন সংস্কার নেই। আর একটা জিনিস, উনি জুয়া খেলতে ভালবাসেন। এটা আবার আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

কিন্তু কিছুতেই কথা শোনেন না। আমার মনে হয়, জুয়া খেলার সঙ্গে, ও'র অবচেতনের কোন একটা অন্তর্নিহিত যোগাযোগ আছে। মদের থেকে, এমনকি আমার থেকেও এটা তাঁর বড় নেশা। আমার থেকে আর কোন কিছুতে বড় নেশা, আমার সহ্য হবে কেন। তাই এ ব্যাপারে সব সময়েই আপত্তি করতাম। যদিও আটকাতে পারতাম না। আমি তো তখন মনে করতাম, পৃথিবীতে আমি ও'র কাছে, সব কিছুর থেকে বড়। এমন কি, ও'র লেখার থেকেও। যত বেশী ও'র সঙ্গে মিশছিলাম, ততই সাহিত্যের কথা ভুলে যাচ্ছিলাম। লেখার কথা আমরা প্রায় আলোচনাই করতাম না আর। আমরা একেবারে মেয়ে আর পুরুষ পায়রার মত হয়ে গিয়েছিলাম। নেহাত ডিম পাড়তেই যেটুকু অসুবিধা ছিল।

কয়েক মাস পরে, উনি আমাকে অনুরোধ করলেন, ও'র সঙ্গে দিল্লীতে বেড়াতে যাবার জন্য। টাকা ও'র মোটামুটি খারাপ ছিল না। তবু, এই কারণে ধার করতে হয়েছিল বেশ কিছু টাকা। আমি বাড়িতে নানারকম মিথ্যা কথা বলে, উনিভারসিটির মেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি জানিয়ে, ও'র সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম। দিল্লীতে, একটা ভাল হোটেলে, দুই শয্যা বিশিষ্ট একটি কামরা আগে থেকেই বুক করা ছিল।

যে সময়ে আমরা দিল্লী যাচ্ছি, সে সময়টা গাড়িতে অসম্ভব ভিড়। দেওয়ালির ভিড়। দু একদিন পরেই কালীপুজো। আর সেটাই বোধহয় কাল করল। আমরা একটা দুই বার্থ-এর কুপে পেয়েছিলাম। বেশ আনন্দেই যাচ্ছিলাম। কুপে-এর খুপরিটা আমাদের কাছে হয়ে উঠেছিল, উঁচু গাছের নিরালা বাসার মত। সেই প্রথম আমি ও'র কথায়, একটু ড্রিংক করেছিলাম, আসলে আমরা এমনিতেই মাতাল হয়ে ছিলাম। কিন্তু সকালবেলা, বাথরুমে-এ যেতে গিয়ে অন্য কুপে-এর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ও'র আলাপ হল। ভদ্রলোক ইউ পি-র লোক বাড়ি এলাহাবাদ, একজন জংগী জুয়াড়ি।

আমি আমার লেখকটিকে আটকে রাখতে পারলাম না। সেই জংগী জুয়াড়ি লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও'র চোখ মুখের ভাব বদলে গেল। আমাকে আদর করে, অনেক বোঝালেন, আর আমাকে আমার টিকেট, আর কিছু টাকা দিয়ে বলে দিলেন, আমি যেন হোটেলে গিয়ে নির্দিষ্ট কামরায় উঠি। উনি এলাহাবাদে একটা রাত কাটিয়ে, পরের দিন দিল্লীতে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলবেন। মনে মনে অত্যন্ত আহত এবং রাগ হলেও, আমি তাই করলাম। কেন না, আমি জানতাম, তখন আর ও'কে আটকে রাখার উপায় নেই। উনি দুপুরে জুয়াড়ি বন্ধুর সঙ্গে নেমে গেলেন এলাহাবাদে। দেওয়ালির সময়টা এসব অঞ্চলের লোকেরা কেমন যেন মনে মনে জুয়াড়ি হয়ে ওঠে।

দিল্লীতে এসে আমি যে হোটেলে উঠলাম, সেটি সত্যি সুন্দর। হোটেলের ম্যানেজারকে সব জানিয়ে আমি আমাদের কামরায় গিয়ে উঠলাম। একলা একটি মেয়ে, আর আমার মত মেয়ে, নির্বিঘ্নে থাকবে, সেটা কেমন করে সম্ভব। লক্কা পায়রা মার্কা একটি পাঞ্জাবী বড়লোকের ছেলে আমার পেছনে লেগে রইল। মনে মনে হাসলাম, আর আমার লেখকের মুখটি স্মরণ করে, ছেলেটিকে করুণা করলাম মনে মনে। কিন্তু তখন জানতাম না, ছেলেটির করুণাই আমাকে হাত পেতে নিতে হবে। কারণ, পরের দিন দূরের কথা, চার দিনেও যখন আমার লেখক, হোটেলের পরিচয়ে আমার স্বামী, এলেন না, তখন আমার অবস্থা ভয়ঙ্কর। হাতে টাকা নেই। হোটেলের টাকা বাকী। ম্যানেজার থেকে বয় বেয়ারা সবাই যেন কেমন করে তাকায়। অথচ লেখককে কোথায় সংবাদ দেব, তাও জানি না। কারণ এলাহাবাদে উনি যে কোথায় আছেন, কিছুই জানা নেই। সেখানেই আছেন কী না, কিংবা অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন, তা-ই বা কে বলতে পারে।

এদিকে লক্কা পায়রা পাঞ্জাবী যুবকটি এসব খবর রাখছিল। তার সাহস বাড়ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও যে ছেলেটাকে খুব খারাপ লাগছিল, তা নয়। মেয়ে জাতের দোষ দেব না, কিন্তু আমার মনটাই দেখছি এরকম। ভাল পুরুষ দেখলে ভাল লাগে। তা-ই, ছেলেটির পরিচয় করবার উগ্র ইচ্ছাকে আমি মেনে নিলাম। আমরা পরিচিত হলাম। আমি যে একজন ছাত্রী, প্রেমিক লেখকের সঙ্গে প্রেম করতে বেরিয়েছি, পাঞ্জাবী ছেলেটিকে তা বললাম না। একটা অন্য ধরনের গল্প ফাঁদলাম। ছেলেটা তো আমার রূপের ফাঁদে পড়েই ছিল। আমি এক ফাঁদে, ও আর এক ফাঁদে। সাত দিনের মাথায়, ও আমার হয়ে, হোটেলের সমস্ত টাকা শোধ করে দিল। শুধু দিল না, আরো কিছুদিন থাকবার জন্য অনুরোধ করল।

আমি তা মেনে নিলাম, এবং স্বভাবতই আমার দুই শয্যার ঘরের একটা শয্যায় ও চলে এল। আমি যেন হাওয়ায় ভাসা একটা সুন্দর প্রজাপতি। আসলে রাগে আর অপমানে, আমি তখন একেবারে

ডেস্‌পারেট। আমি যেন সব ভুলে গেলাম, এই ছেলেটির সঙ্গে দিল্লীর সব দেখে বেড়াতে লাগলাম। আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা। কয়েকদিন পরে, ছেলেটি আমাকে নিয়ে সিমলায় বেড়াতে যেতে চাইল। আমি রাজী হয়ে গেলাম। আর সিমলায় যাবার দিন সকাল-বেলাতেই, লেখক এসে উপস্থিত হলেন। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, দেখে মনে হল খুবই খারাপ অবস্থা। বোধহয় খাওয়া-দাওয়া হয়নি কয়েকদিন। কিন্তু আমার করুণা হল না। আমার ভিতরটা রাগে আর ঘৃণায় শক্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। তিনি ঘরের মধ্যে এসে, তাঁর দুরবস্থার কথা সব জানালেন। জানালেন, জুয়ায় তিনি সর্বস্ব হারিয়েছেন। এলাহাবাদ থেকে সামান্য টাকা ধার করে, কোনরকমে ফিরে এসেছেন। যার অর্থ, প্রায় আট হাজার টাকা উড়িয়ে এসেছেন। এবং এও জানালেন, তিনি সেই মুহূর্তেই, কলকাতায় প্রকাশককে টেলিগ্রাম করে টাকা আনিয়ে নেবেন।

কথাগুলো শুনে, আমি স্রেফ হাসলাম। আমার নতুন প্রেমিকটির হাত ধরে আমি খিল খিল করে হেসে বললাম, খুব খুশি
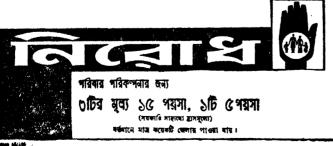
তা-ই করুন গে, আপাতত আপনি এ ঘর থেকে যান, আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন। সন্ধ্যাবেলা আমরা সিমলায় চলে যাচ্ছি।'

সহসা আঘাতে তাঁর মুখটা সাদা হয়ে গেল। পাঞ্জাবী ছেলেটির সামনেই, তিনি আর্তস্বরে, প্রায় কেঁদে উঠলেন, 'না না, আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি ভীষণ অন্যায় করেছি, আমাকে ক্ষমা কর।'

ও'র এই দুর্বলতা, আমাকে যেন আরো নির্দয় করে তুললো। উনি কতখানি কী অন্যায় করেছেন, তার ব্যাখ্যা করতে আমার প্রবৃত্তি হল না। এতখানি ধৈর্য আমার ছিল না। আমি কঠিন গলায় বললাম, 'ক্ষমার কোন প্রশ্ন নেই, আপনি বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে।'

তথাপি তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, এমনকি, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু আমার হৃদয়ের বা সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তনই হল না। আমি তখন ও'র লেখক সত্তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। ও'র সঙ্গে যে আমার কত নিবিড় সম্পর্ক, তাও মনে রইল না। ও'কে একটা দায়িত্ববোধহীন জুয়াড়ি ছাড়া, আর কিছুই ভাবিনি। আমি যেন ও'কে সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি আমার ঝাঁজিয়ে উঠতে, শেষ পর্যন্ত ও'কে অন্য ঘরেই চলে যেতে হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা আমি আর আমার নতুন প্রেমিক যখন বেরিয়ে যাই, তখন ও'র ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, জানালার পাশে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। ও'র চোখ দুটো জলে ভেজা, কিন্তু যেন ভাবলেশহীন। যদিও তিনি আমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলেন। আমি ঝটিতি ঠোঁট বাঁকিয়ে, মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

এ সবই আট বছর আগের কথা। তারপরে আর আমি ও'র কোন খবর নিইনি। কিন্তু ও'র খবর এখন সবাই জানে। ও'র প্রতিভাকে এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না, যদিও এমন অনেক সমালোচক পাঠকও আছেন, যাঁরা বলেন, এটা শয়তানের প্রতিভা, ইভিল জীনিয়স। সেই হিসাবে, তিনি সমগ্র পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছেও, বিতর্কিত লেখক। কিন্তু আমি তো জানি, তিনি কী। না, তিনি কী, সে কথা জানি, তা বলব না তবে আমার চোখের সামনে তাঁর সেই হোটেলের জানালার ধারে মুখখানিই ভাসে। পরবর্তী যতগুলো ও'র বই পড়েছি, কেন যেন সেই মুখখানিই আমার চোখে ভেসে ওঠে। সেই মুখটি যে আমি কেন ভুলতে পারি না, বুঝি না।

এখন আমার গাড়ি বাড়ি, বড়লোক স্বামী, ইনটেলেকচুয়াল নিরীহ মানুষ। আমার স্বামীও লেখকের একজন ভক্ত, অবিশ্যি

মেয়েরা বেশী কিছু আশা করেন ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম থেকে

— ওঁরা পানও তাই!

ল্যাক্‌মেতে আপনি সবসময় বেশীর সুবিধাটুকু পাবেন!

ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম অনেক বেশী কিছুর আশ্বাস দেয়। কাজও করে তেমনি। অধিকাংশ ভ্যানিশিং ক্রীম শুধু পাউডার বেস্‌ হিসেবেই কাজ দেয়। ল্যাক্‌মে ত্বককে মসৃণ ক'রে তোলে। শুষ্কতা ঠেকিয়ে রাখে। ত্বককে রক্ষা করে। দাগ-পড়া রোধ করে। পাউডার ধরে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বড় শিশিতে ৮৫ গ্রাম ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম থাকে। আপনি এখন যে ভ্যানিশিং ক্রীম মাখছেন তার শিশিটা পরীক্ষা ক'রে দেখুন। ওতে ঠিক অতটা আছে কি? আপনাকে চমৎকার কাজ দিচ্ছে কি? আপনারও ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহার করা উচিত নয় কি?

৪৫ গ্রামের মাঝারি সাইজেও পাবেন।

ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম

Lakmé

BSP/L/VC-11B

আমার সঙ্গে লেখকের পরিচয় ছিল, তা তিনি জানেন না। তিরিশ বছরেও, নিটুট আছি, স্তাবকের সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি। পিছনের সব কথাই প্রায় ভুলে গিয়েছি। শুধু সেই মুখটা ভুলতে পারি না। বইগুলো পড়তে গেলে মনে হয়, ছাপা পাতাগুলো সব সেই মুখের ওপর ভাসছে। সেই মুখটাই যেন লেখা, সেই মুখ থেকেই পাতাগুলোতে ছাপ পড়েছে।

সেই মুখের সঙ্গে, আরো কিছু কিছু কথা আমার মনে পড়ে যায়। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, ও'র জুয়া খেলার ব্যাপারটা নিতান্ত জুয়া-ই নয় বোধহয়। জুয়াটা যেন একটা প্রতীক ও'র কাছে। ও'র জীবনের সঙ্গে, কোথাও, জুয়ার একটা নিবিড় যোগ আছে, যে কারণে আগেও আমার মনে হত, জুয়াখেলাটা ও'র অবচেতনের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত যোগাযোগ রেখেছে। উনি কি এখনো সেরকম জুয়া খেলেন? কে জানে। এ কথা যখন মনে হয়, আর সেই মুখটি মনে পড়ে, তখন একটা ধারালো কিছু আমার বুকের মধ্যে কোপাতে থাকে। এমন একটা অস্থিরতা বোধ করি, চুপ করে এক জায়গায় বসতে পারি না।

আট বছর ধরে এরকম চলেছে। তাই আজ আর থাকতে পারিনি। সন্ধ্যাবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ও'কে একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল, একবার-একবারটি কাছে যাবার জন্য বড় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কী বলবেন আমাকে। আট বছর আগে, দিল্লীর সেই কথা মনে করে, কী ভাবে নেবেন আমাকে। অপমান করবেন? তাড়িয়ে দেবেন? কী করবেন।

যা-ই করুন, সে দ্বিধায় তো অনেকদিন বসে ছিলাম। আজ সব কিছু কাটিয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতার কাছেই একটু ফাঁকা জায়গায় ও'র বাসস্থান। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন বেশ কিছুকাল। একলাই থাকেন।

শীতের সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম, বাড়িটা তখন নিশ্চুপ, স্তব্ধ, দরজা জানালা সবই প্রায় বন্ধ। কেবল দোতলার একটা জানালায়, পর্দার পাশ থেকে সামান্য আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে। আমি সামনের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে, দরজার কাছে চৌকাটে, কলিংবেলের বোতাম টিপলাম। একটু পরে, ঘরে আলো জ্বলল, দরজা খুলল। দেখলাম, চাকর বলেই মনে হল, এরকম একটি লোক আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি আছেন কী না, থাকলে দেখা করবেন কী না। চাকর আমাকে ঘরের ভিতর চেয়ারে বসতে বলে, আমার নাম জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, নাম

দরকার দরকার নেই, একজন মহিলা দর্শন-প্রার্থিণী বললেই হবে। নাম শুনলে পাছে না আসতে চান, তাই বললাম না। চাকর চলে গেল।

প্রায় দু মিনিট পরে তিনি এলেন। আমার বুকের মধ্যে চমকে উঠল। মনে হল, আমি যেন জানালার পাশে, সেই মুখটিই দেখছি। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করলাম। প্রতিনমস্কার করে তিনি আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমাকে যে তিনি চিনতে পেরেছেন, তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে একটুও বোঝা গেল না। আমি তাঁর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বোধহয় একটু অবাক হলেন, এবং আবার স্বাভাবিক ভদ্রভাবে এক অপরিচিতাকে বসতে অনুরোধ করলেন।

আমি বসতে পারলাম না। এ কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, তিনি আমাকে চিনতেও পারছেন না? অবিশ্যি, আমি কালো শিফনের শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে, কালো রঙেরই একটি উলেন স্কার্ফ জড়িয়ে গিয়েছিলাম। স্কার্ফটা মাথায় ঘোমটার মত একটু টেনে দেওয়া ছিল। সেটা নামিয়ে আমি নিচু কৌতুহলিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে-আমাকে চিনতে পারছেন না?'

তিনি আমার দিকে নির্বিষ্ট হয়ে দেখলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল, অত্যন্ত অসহায়ভাবে, মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই আমাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। অসহায়ভাবেই, ঘাড় নেড়ে, জানালেন, 'কে বলুন তো, মানে, কিছুতেই...।'

আমার ভিতরটা যেন অন্ধকারের শূন্যতায় ভরে গেল। আমি যদি বুঝতে পারতাম, তিনি মিথ্যা কথা বলছেন, তা হলে রাগ করতে পারতাম, বিদ্রূপ করতে পারতাম। কিন্তু আমি যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তাঁর বিস্মৃতির কষ্ট কী রকম করুণ আর অসহায় করে তুলেছে ও'কে। এমনকি ও'র চোখ ফেটে জল এসে পড়তে পারে এমন মনে হল। এ মুখ, এ চোখ দুটি যেন সব সময়েই, কী একটা আঘাতে, আর্ত হয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

উনি বলে উঠলেন, 'শুনুন, দয়া করে শুনুন, আপনার পরিচয়টা—?'

আমি আর একবার তাকালাম। না, উনি চিনতে পারছেন না। ও'র চোখ দুটো প্রায় ছলছল করছে। দিল্লীর হোটেলের জানালায়, আঘাত খাওয়া যে মুখ দেখেছিলাম, তারপর থেকে উনি আর পিছনে ফেরেন নি যেন। আঘাত আর এক জন্ম, আঘাত থেকেই, জীবনের পথে চলেছেন। সেখানে আমি হয়তো একটা নিমিত্তের মত ছিলাম, এখন আর নেই।

আমি ঘরের বাইরে চলে গেলাম। তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। আমি অন্ধকারে, একটা কালো ছায়ার মত, তাড়াতাড়ি আমার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। উত্তরের বাতাস জোরে বইছে। সেই বাতাসে, দরজায় দাঁড়ানো, ও'কে দেখলাম, ও'র চুলগুলো বাতাসে কাঁপছে। ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি চালাতে। শেষবার, আর একবার গাড়ির কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালাম। তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন, যেন হোটেলের জানালায় সেই মুখটিই।

চারদিকে আমার অন্ধকার, ঝাপসা, আর তার মাঝখানে, সেই মুখটিই ভাসছে এখনো।*

---

* বিশ্ববরেণ্য একজন সাহিত্যিকের জীবনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামান্য কল্পনার আশ্রয় নিয়ে লেখা।

"বলতে পারো,
আমূলের ভিটামিনগুলো
কিজন্যে ?"
জিজ্ঞেস করল শিশুটি।
"হ্যাঁ,"
সমস্বরে বলে
উঠল ওর ছোট্ট
বন্ধুরা
ভিটামিন এ
দৃষ্টিশক্তিকে উজ্জ্বল
করে।
ভিটামিন বি১
স্নায়ু সবল
করে।
ভিটামিন সি
রোগসংক্রমণ
প্রতিরোধ করে।
ভিটামিন ডি
হাড় মজবুত
করে।
আমূল দুগ্ধজাত খাদ্য
আপনার শিশুর প্রয়োজনীয় ৭টি ভিটামিন এতে আছে।
Amul
FOOD FOR BABIES

রঞ্জন

রূঢ়তার বাজার মূল্য বঙ্গীয় অথবা অন্য কোনো সমাজের বাজারে কথনোই অতি ঊর্ধ্বগ্রামে ছিল না। সৌহার্দ্য ছিল সহজতর পথ; এখনও আছে। ডেল কার্নেগি শুধু পত্রস্থ করেছেন বহু ব্যবহৃত সাফল্যসোপানের অতি পরিচিত মানচিত্র, সামান্য চিক্কণ নূতন পরিভাষায়। এই ভাষাগত মসৃণতায় আমার রুচি ঘুচে গেল অনেক দিন আগে। আমাদের ভাষায়, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে, বিনীত সম্ভাষণের সংখ্যা নেই বললেই চলে। "ধন্যবাদ" এখনও শোনায় বিদেশী, অনান্তরিক। "আইচ্ছা" ছিল আরও স্বাভাবিক। কলকাতায় এসে যে কোনো বাঙাল বিস্মিত হোতো যে অতি সাধারণ কথোপকথনে মানুষ এত ভদ্র অর্থাৎ কৃত্রিম হতে পারে। ভদ্রতা নয় কৃত্রিমতার সমার্থক শব্দ; গেঁয়োমি নয় হৃদয়বত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সামান্য সত্য উপলব্ধি করতে অন্ততঃ একটি বাঙালী প্রদেশের অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময় কেটে গেল বিফলে। এই সামগ্রিক লোকসানের ক্ষুদ্র অংশীদার আমি। আমার অভিযোগ তাই অমিষ্ট হতে বাধ্য। আজ এই অভিযোগ কিন্তু বিশ্বব্যাপী, কেননা বাঙালী যেদিন ভারতীয় রাজনীতির অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব সমর্পণ করল কতিপয় গুজরাটী বা উত্তরপ্রদেশী ভদ্রস্থের পদপ্রান্তে ঠিক সেদিনই বাঙলা ফিরে পেল স্বীয় অস্তিত্বজ্ঞান। বাঙলা শুধু ভারতের নয়: বিশ্বভারতী নয় শুধু কালো ছেলের কষ্টকল্পনা। স্থানীয় ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে কোথায় আছে একটা বৃহত্তর ভূমিকা। এই আপাত সাম্রাজ্যবাদী ধারণা পরিহার করলে বাঙালীর ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল জ্ঞান করি।

অনেক বছর আগে বিদেশে একজন একদিন আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "সরি"। এই অঞ্চলে নাকি এর বাড়া ক্ষমাভিক্ষা নেই। প্রথানুযায়ী আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেম, "নট অ্যাট অল"। পরে আমি সমতুল্য বিনয়ের অনাগ্রহী গ্রহীতা হয়েছি। শুধু "সরি" শুনলে আমার মন আর যারপরনাই উৎফুল্ল হয় না। আমি অনায়াসেই বলি, "আই ডু মাইন্ড।" বন্ধুবুদ্ধি হয় না নিশ্চয়ই, কিন্তু বন্ধুত্বপ্রসরণের একান্তই অননুভূত আগ্রহাতিশয্য অনুক্ত থাকে না। অতিবিনয়ের অন্তরালে কোথায় লুকিয়ে যায় সত্যানুরক্তি। বিনয় আজ সর্বত্র; নেই গোয়া।
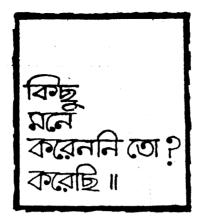
প্রতি সপ্তাহের সাত দিনে অন্ততঃ সাতশো ঘটনা ঘটে যার সম্বন্ধে ধৈর্যধারণ যে কোনো বুদ্ধিমানের চরিত্রবহির্ভূত। সাধারণ মন্তব্য তবু সংযত, সম্ভ্রান্ত। অমার্জিত ভাষার প্রতি আমার কর্ণস্বর নিরাপস বিদ্রোহী। তবু বিনীত ভাষার প্রলেপে সত্যের অপলাপ বা অবগুণ্ঠন আমাকে পীড়িত করে। শালা-কে শালা বলতেই হবে এমন কথা নেই, কিন্তু সম্পর্ক সমান মিষ্ট হলে তাকে ভাষান্তরে ভ্রন্ ক্য ভাই বা ওয়াইফ'স সিস্টার বলে আহ্বান না করবার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনে। ইতিমধ্যেই লক্ষিত হয়ে থাকবে যে আত্মবঞ্চনার সম্ভাবনা সীমিত নয় শুধু ভাষার ক্ষেত্রে। শূকরসন্তান অর্থাৎ শুয়োরের বাচ্চাকে বরাহনন্দন অভিহিত করলে জিহ্বার জাতিচ্যুতি ঘটে না, কিন্তু সত্যও অংশত অকথিত থেকে যায়, কেননা ভাষান্তরে ঘটে ভাবান্তর। আমার এই কবুলতি রইল অনেক দিনের জন্য। আমার ভাষায় অসারল্য গভীরতর কোনো মানসিক মিশ্রতার প্রতীক নিশ্চয়ই। ভাগ্যবশত জানিনে মিশ্রণ কিসের আর কিসের; কোন্ বিষের আর কোন্ বিষের। অমৃতের সন্ধান সে তো অচিন্তনীয়।

তবু কোথায় যেন দীর্ঘ ছায়া পড়ে আছে, হয়তো অতর্কিতে বা একান্তই চক্রান্তশূন্য অবহেলায় বা অক্ষমতায় নিঃসীম গহ্বরে। প্রতিষ্ঠানিক প্রগল্ভতায় সত্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ তাই প্রায় অসম্ভব। আমিও দোষী বৈকি। দাবি করতে পারিনে যে সর্বদা যা লিখতে চেয়েছি তাই লিখেছি। সম্ভব ছিল না। আমার অব্যক্তের পরিমাণ বিশ্বের অপরিমেয় ক্ষতি ঘটিয়েছে, এমন দাবিও করবার কিছুমাত্র বাসনা নেই। তবে এমন কিছু কখনো লিখিনি, স্বনামে বা বেনামে, যা আমি লিখতে চাই নি। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ শুধু এই জন্য যে, বর্তমান লেখককে সম্প্রতি অন্যতর সাংবাদিককে বলতে হয়েছিল: "মাপ করবেন,, কিন্তু সাংবাদিকতার সোনাগাছিতে আপনি একমাত্র সতী এমন কথা মানতে পারব না"। ভাষার অভব্যতা ক্ষমণীয় কেননা ইতিপূর্বে ইতরতর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল।

*

ভাষা বা ভাবগত অশালীনতায় আমার আজন্ম অরুচি ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে থাকবে। চার অক্ষরের শব্দ শুনলে আমার জিহ্বা বা অন্য কোনো প্রত্যঙ্গ অযথা লেলিহান হয় না। বিবিধ ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি শব্দের সর্বময়তায়। তা নইলে লেখা কেন? কেন মিছে বাক্যবিন্যাস? বিনয়ের অভিনয় হয়েছে বহুদিন। এই বাঙলা দেশেই একদা প্রচলিত ছিল অসংখ্য অবিনয়ের আখড়ার। কোথায় গেল তারা? এমন কথা আজ বলবার উপায় নেই যে প্রতিবাদের তুল্য শিকার তৎপরিবর্তে মেলে নি। অধিকাংশ কণ্ঠ তবু সভয়ে নীরব। নীরদ চৌধুরী যেন বেসুরো বেতাল।

আমার অতি সীমিত কর্তব্য তাই শুরুতেই সীমানির্ধারিত হোক। আমি কারুর প্রবক্তা নই, ধন্যবাদ। আমি নজরুলী ঢঙে এমন দাবি পেশ করতেও অক্ষম যে আমি ঝড় বা অমন কিছু। আমার হাতিয়ার শুধু কলম, বর্তমানে সে এক বল-পয়েন্ট-পেন। তবু, হুঁশিয়ার, আমার কড়া মাড়ালে আমি ক্ষমাশীল নই। সে-ব্যক্তির নাম মাকনামারা হোক বা আর যাই হোক। পরেশবাবু গোরাকে বলেছিলেন অনুরূপ কোনো কথা যা বিনীত ছিল না কিন্তু সত্য ছিল।

মা বলছিলেন,
আমায় নাকি
দিন-দিনই
কচি দেখাচ্ছে ...
মা তো ছেলের দিক
টেনে কথা কইবেনই!
আসলে কিন্তু নির্মল
আর আমার তারিফ করা
উচিত। তিনি তো জানেন না
ওঁর আদরের ছেলেটিকে
আমিই নির্মল বার সাবানে
কাচা ধবধবে পোশাক
পরিয়ে অমন খোকাটি
ক'রে রেখেছি।
নির্মল
Nirmal
BAR
SOAP
পূর্ব ভারতে বার সাবান
হিসেবে কাটতিতে
সবার উপরে
—সবার সেরা
বলেই।
কুসুম
প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
KPN 4629

শার্ঙ্গদেব

ঘরানা সম্বন্ধে অন্য পাঁচজনের মত আমিও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি। পুরুষানুক্রমে যাঁরা সঙ্গীতচর্চা করে এসেছেন তাঁদের নিজস্ব একটা কিছু আছে বইকি। কিন্তু সেই যে নিজস্ব ধারা সেইটা একভাবে কি খুব দীর্ঘকাল থাকে? না থাকাই সম্ভব। দু-এক পুরুষ পরেই কোনও প্রতিভাবান শিল্পী চান তাঁর অনুষ্ঠানে কিছু নতুন রসের প্রবর্তন হোক। হয় তিনি অন্য কোনও ওস্তাদের বিশিষ্ট ভঙ্গীকে নিজের ভঙ্গীর সঙ্গে মিল খাইয়ে একটা নূতনতম আর্ট স্থাপন করতে তৎপর হন, নয়তো নিজেই তাঁর সঙ্গীতচিন্তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করেন। পরিবর্তন মানুষের স্বভাব। সবই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখে চলেছে। অতএব পঞ্চাশ বছর আগে একটা ঘরানার যে রূপ ছিল পঞ্চাশ বছর পরে দেখা যাবে তার বেশ কিছু বদল হয়েছে এবং আরও পঞ্চাশ বছর পরে আরও পাল্টাবে, অথচ একই বংশে একটির পর একটি গুণীর উদয় হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি ঘরানার বিবর্তনই একটি বিশেষ গবেষণার বস্তু। যে ঘরানা যত পুরাতন তার তত পরিবর্তন হয়েছে এবং তা বর্তমানে যে রূপ নিয়েছে তার সঙ্গে আদিম রূপের অনেক তফাৎ। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে ঘরানাগুলির বিস্তারিত বংশ-তালিকা নিরূপণ করি এবং প্রত্যেককেই তাদের প্রতিনিধি বলে মনে করি তা বোধ করি যথার্থ নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই গুণী কিন্তু তাঁদের নিয়মে—প্রাক্তন ঘরানার সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ হয়তো খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে বা ইতিমধ্যেই তাঁরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে রীতি স্থাপন করেন তা একটি স্বতন্ত্র রীতি।

তানসেনের ঘর অর্থাৎ সেনী ঘরানা সম্বন্ধে যখন আলোচনা দেখি তখন এই কথাই আমার বার বার মনে হয়। এখনও এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিনে যেসব বইকে আশ্রয় করা হচ্ছে সেগুলি কোনক্রমেই নির্ভরযোগ্য নয়। নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের "সঙ্গীতসুধাসিন্ধু" বা "সঙ্গীত-সুদর্শন" গল্পের খোরাক জোগাতে পারে, কিন্তু ইতিহাস নির্ণয়ে পথনির্দেশক হতে পারে না। আমাদের সঙ্গীতজগতে বর্তমানে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এই সব সম্বল নিয়েই তানসেনের জীবন চরিত রচনা করছেন—এটা খুব আশা বা ভরসার কথা নয়। সেনী ঘরানা বলতে যে দীর্ঘ তালিকা পেশ করা হয় তারও বিশেষ তাৎপর্য নেই কারণ তানসেনের ধারা তাঁরা বহন করেননি। তাঁরা বংশধরমাত্র। প্রথমে এটা আলোচনা করা দরকার যে সেনী ঘর বলতে আমরা কি বুঝি। তানসেন কি নিজে কোনও ঘরানার প্রতিনিধি ছিলেন? তারও আগে তানসেনের আসল নাম "রামতনু" কিনা সেটা নির্ণয় করা দরকার। তাঁর দেশ যে গোয়ালিয়র সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কেননা ইতিহাসে তিনি "তানসেন গোবরহার" নামে পরিচিত। "গোবরহার" অর্থে "গোয়ালিয়র" বোঝায়। "গোবরবাণী" বলতে গোয়ালিয়রের বাণী বা ধারা বোঝায়। "গৌড়বাণী" শব্দটি কল্পনামাত্র। দ্বিতীয়ত তিনি স্বামী হরিদাসের শিষ্য কিনা সেটাও সন্দেহের বিষয়। মোগল-যুগের বহু গ্রন্থে তানসেনের উল্লেখ আছে কিন্তু তাঁর গুরু হরিদাস স্বামী এমন উল্লেখ নেই। যদি একথা বলা হয় যে, কিম্বদন্তীর মূলে কিছু সত্য থাকে তাহলে সেটা স্বীকার না হয় করা গেল, কিন্তু এবিষয়ে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় ততটা দেওয়া কি সম্ভব? এছাড়া "হরিদাস স্বামী"র পরিচয় নিয়েও বিস্তর সন্দেহ আছে। মোট কথা গোয়ালিয়রে তখনকার দিনে ধ্রুপদ শিক্ষার প্রচুর সুযোগ ছিল এবং তানসেন সেই সুযোগই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজা মান প্রবর্তিত ধ্রুপদের ধারায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। রাণী মৃগনয়নীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, জনৈকা হোসেনী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে বিবাহ এবং তাঁর জামাতা মিশ্রি সিং-এর ব্যাপার সবই

কিম্বদন্তী, গল্প কাহিনীর গাঢ় কুহেলিকার আচ্ছন্ন। এ সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ যাঁরা আজকাল তানসেন সম্বন্ধে অথরিটি বলে গণ্য তাঁরা তানসেনের কাহিনী বলে এইসব এমন অকুতোভয়ে বর্ণনা করেন যেন এটা সেদিনকার ব্যাপার এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়গণ এসব চাক্ষুষ করে গেছেন। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তানসেন নিজের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—যাকে বলে "সেলফমেড ম্যান"। অনেকের কাছ থেকেই তিনি অনেকভাবে গ্রহণ করছিলেন কিন্তু তার মূলে ছিল গোয়ালিয়রের সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি।

তারপর আসছে তাঁর ঘরানা প্রতিষ্ঠার কথা। তানসেনের ছেলেদের মধ্যে তানতরঙ্গ খাঁ এবং সুরত সেনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বিলাস খাঁ যে তাঁর সবচেয়ে কৃতী পুত্র সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তানসেন নিজে কাউকে শেখাননি। তানসেনের সাক্ষাৎ শিষ্য বলে কেউ দাবী করতে পারেননি। হয় তাঁর সময়াভাব ছিল নতুবা তিনি কাউকে শেখাতে চাইতেন না। সম্ভবত পুত্রদেরই তিনি শিখিয়েছিলেন, কিন্তু কতটা শিখিয়েছিলেন তাও আমরা জানি না। উপযুক্ত শিক্ষার্থী এলে তিনি তাকে সাধারণত বিলাস খাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিতেন। আমরা জানি কবিরায় জগন্নাথ তানসেনের আমলেই খ্যাতিলাভ করেন, কিন্তু তিনি তানসেনের শিষ্য ছিলেন না। তানসেন তাঁকে ভালবাসতেন। কলাবন্ত লাল খাঁ যিনি উত্তরকালে গুণসমুদ্র উপাধি পেয়েছিলেন তিনিও ছেলেবেলা থেকেই তানসেনের সঙ্গে থাকতেন কিন্তু এ'রও শিক্ষা হয়েছিল বিলাস খাঁর কাছে। পরে তিনি বিলাস খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জগন্নাথ এবং লাল খাঁ এ'রাই পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দরবারী গায়ক ছিলেন। লাল খাঁর পুত্র খুশাল এবং বিশ্রাম খাঁ আওরংজীবের সময় শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ বলে স্বীকৃত ছিলেন। তার পরের ইতিহাস আবার কাহিনীতে আত্মগোপন করেছে কারণ এর পরের বিবরণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না।

তাহলে কোন ঘরকে আমরা সেনী ঘর বলব? তানসেনের গোষ্ঠীর সবাইকে না বিলাস খাঁ এবং তাঁর কতিপয় শিষ্যকে। আমার মতে যথার্থ সেনী ঘর বিলাস খাঁ থেকে বিশ্রাম খাঁ এবং খুশাল খাঁ পর্যন্তই বজায় ছিল, কেননা সত্যিকারের শিল্পী ছিলেন এ'রাই এবং তানসেনের বস্তুকে বহন করে নিয়ে যাবার মত যোগ্যতাও এ'দেরই ছিল। আলমগীরের মত ব্যক্তিও খুশাল খাঁকে বরাবর শ্রদ্ধা করে এসেছেন এবং তাঁদের আর্থিক সাহায্য দিতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু এর মধ্যেও একটু কথা আছে। তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ ছিলেন অসাধারণ গুণী। পিতার গান কি তিনি হুবহু নকল করেই তৃপ্ত ছিলেন? তিনি নিজেও ছিলেন গীতিকার। এটা সুনিশ্চিত যে বিলাস খাঁর নিজস্ব একটি আর্ট ছিল। এই স্বকীয়তায় তিনি ছিলেন ভাস্বর। পিতার জিনিস তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করলেও নিজে সৃষ্টির সুযোগ ছাড়েননি। অতএব এক পুরুষের মধ্যেই বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এইভাবে যখন খুশাল খাঁ, বিশ্রাম খাঁ পর্যন্ত এসেছে তখন গায়কীতে পরিবর্তন নিশ্চয়ই বড় কম হয়নি। তাহলে সেনী ঘরানায় তখনই তো মূল ধারা বেশ খানিকটা পাল্টেছে। অতএব পরবর্তী গায়কদের মধ্যে তানসেনের নিজস্ব রীতি যে আরও অনেক কম ছিল সেটা মানতেই হবে এবং সে-রীতি অনেক পরিমাণে মডিফাইড সেনীরীতি বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না।

এই এভলিউশনকে আমাদের স্বীকার করা দরকার। তানসেনও কারুর হাতে গড়া গায়ক ছিলেন না। তিনি বহু পরিশ্রম করে নিজেকে নিজে প্রস্তুত করেছেন। বোধ করি সেই কারণেই তিনি শিষ্য করবার দিকে ঝোঁকেননি। তিনি চেয়েছিলেন গুণীরা নিজেদের সংগঠন করতে নিজেরাই অগ্রণী হোক।

ঘর, ঘরানা সম্বন্ধে আমাদের এখন প্রকৃত মূল্যায়ণ করা দরকার। ঘরানা যাঁরা স্থাপন করেছেন তাঁরা কী দিয়ে গেছেন এবং সেই বিশেষত্ব কতদিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে সেইটিই নিরূপণ করা দরকার। অনাবশ্যক একটা গায়কবংশের প্রতিটি লোকের ওপর আলোকপাত করাটা মূল্যায়ণ নয় এবং এর কোনও সার্থকতাও নেই। আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, সেনী ধারা আসলে গোয়ালিয়রের রাজা মান প্রবর্তিত ধারা যা চার-পাঁচজন নায়কশ্রেণীর শিল্পী বহু আলোচনার পর স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

কাদের আছে
ঐতিহ্য অথচ
কারা আধুনিক ?
আমরা
INTERPUB LG/ 2 BN

॥ ২ ॥

প্রকাশবাবু জানেন মূল্য না দিয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। জানেন, কোন কিছু পেতে হলেই আটঘাট বেঁধে এগোতে হয়। নিজেকে তৈরী করতে হয়।

চেষ্টা করেও অরুণকে কিছুতেই যেন বুঝতে পারেন না। তাই অরুণকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এতটুকু দায়িত্ব-জ্ঞান নেই ছেলেটার। এতটুকু মায়া মমতা নেই বাবা-মার ওপর, সংসারের ওপর। তুমি রোজগার করে টাকা এনে দাও, আমি আড্ডা দিয়ে বেড়াই। দুদিন পরে যে উনি রিটায়ার করবেন, সে খবর শুনে মুখে কোন ভাবনার ছাপ পড়লো না।

ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা দিয়ে আসতে বলেছিলেন, লিফটম্যানের সংগে ঝগড়া করে ফিরে এলো। কি, না কিউ দিয়ে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম, লিফটম্যান সবাইকে নিয়ে আমার বেলাই বললে, হবে না। কেন, আমি কি ফালতু নাকি?

—তোর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না। সে তো নিয়ম মেনে লোক নেবে। ঝগড়া করে লাভ কি হলো, সেই মনিঅর্ডার করে পাঠাতে হবে, রসিদ কবে পাবো তার ঠিক নেই। প্রকাশবাবু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন।

আর অরুণ তাচ্ছিল্যের সংগে বলেছিল, ওঃ। নিয়ম মেনে লোক নেবে। কত নিয়ম মানছে সব জায়গায়!

এদের ধারণাটা কি, প্রকাশবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। নিয়ম মানছে না কেউ, সেটাই আপত্তি? না, নিয়ম জিনিসটাই খারাপ?

কিন্তু ছেলের ওপর অভিমান করেই বা লাভ কি। বেড়া দিলেই কি চারা গাছ বড় হয়? সারা সংসারটাকেই তো ইচ্ছার গণ্ডীতে বেঁধে মনের মত করে সাজাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন কি। তাঁর চোখের সামনেই তো সকলে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

চুলোয় যাক সব, তিনি নিজের কর্তব্যটুকু করে যাবেন। ওরা তো বুঝবে না। ছোট মেয়ে মিনু তবু কাছে আসে, হেসে কথা বলে, সেও একদিন বলেছিল, বুড়ো বয়সে সিচুয়েশন ভ্যাকান্ট দেখছো, তোমার বাবা, অদ্ভুত সব বাতিক।

বাতিক! তাই হবে হয়তো। এখন অবশ্য পরীক্ষা হয়ে গেছে, আর কিছুদিন পরেই তো ফল বের হবে। অরুণ পাশ করবে সে বিশ্বাসও আছে। ছেলে তো খারাপ নয়।

একালের ছেলেমেয়েদের এই একটা দিক বুঝতে অসুবিধে হয় প্রকাশবাবুর। তখন ভাল ছেলেরা ভাল-ছেলে ছিল, খারাপ ছেলেরা খারাপ-ছেলে।

আর এরা ভাল খারাপ সব যেন এক ছাঁচে ঢালা। সার্টিফিকেট না দেখলে চেনা যাবে না কে ভাল, কে খারাপ।

অরুণের ছোট মাসী এসেছিল বেড়াতে। সে-কথা শুনে হেসে উঠেছিল সেদিন। —জামাইবাবু, আপনার বড্ড সেকেলে ধারণা কিন্তু। ভাল ছেলে হলেই থুতনিতে ছাগল-দাড়ি থাকবে, দাড়ি কামাবে না, জামায় ইস্ত্রি থাকবে না, কথা বলতে গেলে তোৎলামি করবে, আর শুধু বেশী বেশী নম্বর পাবে পরীক্ষায়—এই তো আপনাদের ভাল ছেলে! মাগো, আমার ভাবতেও বিশ্রী লাগে।

শুনে হেসে উঠেছিলেন প্রকাশবাবু নিজেও। তবু মনের মধ্যে একটা গোপন ইচ্ছে বোধহয় ছিল অরুণকে ঠিক সেইভাবে মানুষ করে তোলার। এখন ভাবেন, ভাগ্যিস অরুণ সে-রকম হয় নি। তা হলে এই বাজারে একটা চাকরি জোটানো যে কি মুশকিল হতো।

অরুণের চাকরিটাই অবশ্য এখন একমাত্র দুশ্চিন্তা। পড়া তো শেষ হয়ে গেল, এখন থেকেই চেষ্টা করতে দোষ কি। অরুণকেও বলেছেন সে-কথা।

আর সেজন্যেই সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছিলেন। প্রতিদিনই এ সময়টা বসে বসে চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, কোন কোনটার চারপাশে কালির দাগ টেনে রাখেন।

বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে দেখতেই তাই ডাক দিলেন, অরুণ, অরুণ!

কনকলতা ভাঁড়ার থেকে একমুঠো তেজ-পাতা আর তেলের বাটিটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কাকে ডাকছো? সে-বাবু বাড়িতে আছেন

নাকি, বাজার নামিয়ে দিয়েই আড্ডা দিতে চলে গেছে।

বড় মেয়ে বুলু পাশের ঘরের ঝুল ঝাড়ছিল। লম্বা ঝুলঝাড়াটা নিয়ে এমনিতেই ব্যতিব্যস্ত, তার ওপর ঘাড়ে পিঠে ঘাম জ্যাবজ্যাব করছে। মার কথা শুনে নিজের মনে মনে বললে, আড্ডায় না কোথায়, সব জানো কিনা।

স্ত্রী টিপ্পনি কেটেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে দেখে বুলুকেই ডাকলেন এবার।

—একটা বিজ্ঞাপন টিক দিয়ে রেখেছি, অরুণকে বলিস তো বুলু দরখাস্ত করতে।

বুলু এতক্ষণ গাছকোমর বেঁধে কাজ করছিল, কোমর থেকে আঁচলটা খুলে গলার ঘাম কাঁধ মুখ মুছতে মুছতে বললে, তোমার কেন যে এই বাজে খাটুনি, ও দরখাস্ত করে নাকি। বলে, রেজাল্ট না বেরোলে ওসব করে কি লাভ।

প্রকাশবাবু হাসলেন। —করে করে, ও তোদের রাগাবার জন্যে বলে।

চাকরির চিন্তা নেই, চাকরির চেষ্টা করবে না, তা কখনো হয় নাকি।

আসলে মুখে যাই বলুন, অরুণের পোশাক আশাক, হাটাচলা তাঁর চোখে

খাপছাড়া লাগে বটে। কিন্তু ছেলের ওপর অগাধ বিশ্বাস। ছেলে খারাপ নয় অরুণ। কই, কোন অন্যায় তো করেনি কখনো।

ঝগড়া, মারামারি, পুলিস কেস—আজকালকার ছেলেদের নিয়ে বাপমাকে কম ঝামেলা পোয়াতে হয়? আপিসে নিত্যদিনই তো শুনছেন। অথচ অরুণ সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন অভিযোগ করে নি তাঁর কাছে। কনকলতারও তো ঐ একটা অভিযোগ শুধু। দিনরাত আড্ডা দেয়, বাড়ির কাজে লাগে না।

চাকরি হোক, নিজে মেয়ে দেখে একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দেবেন, তারপর দেখবো... কনকলতাকে হেসে বলেছেন, আড্ডা এক-আধটু আমরাও দিতাম, বুঝলে। তারপর সংসার চিন্তায়......

ছেলের বিয়ের কথায় কনকলতার মুখেও হাসি ফুটেছে।—দাদা বলছিল, গগনবাবুর মেজ-শালীর মেয়ে, বি এ পরীক্ষা দেবে, দেখে রাখলে দোষ কি।

—পাগল হয়েছো, এখন ওসব মাথায় ঢুকিও না। বলেছেন বটে, কিন্তু নিজেরও একটু ভাবতে ভাল লেগেছে। বেশ শিক্ষিত আর সুন্দরী মেয়ে দেখে ঘরে আনবেন, শুধু একটা ভাল চাকরি হয়ে যাক না।

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে অরুণের ছোট্ট টেবিলটার ওপর রেখে উঠে পড়লেন। ক্ষুরটা খাপ থেকে বের করলেন, ভাঁজ খুললেন, লম্বা স্ট্র্যাপটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে ক্ষুরটা তার ওপর টেনে টেনে শান দিলেন। শান দিতে দিতে ক্ষুরের গায়ে 'শেফিল্ড' লেখাটা যেখানে প্রায় মুছে গেছে সেটার ওপর একবার চোখ ফেললেন।

—ভেবেচিন্তে লাভ নেই প্রকাশ, ওরা সব বদলে গেছে। বড় শালা অনন্ত রসিক মানুষ, একদিন হেসে হেসে বলেছিল, তোমরা ছিলে শেফিল্ডের ক্ষুর, বাইশ বছর ধরে শান দিয়ে দিয়ে রেখেছো। ওদের শেফটি রেজার, দিন কামাও আর ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।

সত্যি তাই। কোন জিনিসের ওপর এদের যত্ন নেই, মায়া নেই। এইটুকু থাকলেই আর কোন ক্ষোভ থাকতো না তাঁর। বাপ মা সম্পর্কে একটু দরদ, একটু মায়া।

কিন্তু এত বড় একটা ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠবে অরুণ, কনকলতাও ভাবতে পারেন নি। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছেই হলো না। কিন্তু না বিশ্বাস করেই বা উপায় কি।

গলির মোড়ে ওর সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে মিলু প্রতিদিন এ সময়টা গল্প করে। মাঝে মাঝে একটু চোখ রাখেন কনকলতা। একটু আগেও বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখে গেছেন, মিলু ওদের দরজায় দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করছে।

তাই মিলু হঠাৎ দুদ্দাড় করে ছুটে আসতে আসতে 'মা, মা' বলে ডাকছে শুনেই ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। —কি হল?

মিলুর মুখে হাসি আর ধরে না। —ছোটমাসী আসছে। এই মাত্তর দেখলাম।

—ছোটমাসী? আজ, হঠাৎ!

ছুটিছাটার দিনে কখনো কখনো কানন আসে বেড়াতে। কিন্তু এই তো সেদিন ঘুরে গেছে সে, এর মধ্যে আবার এলো যে।

কনকলতা নিজেও খুশী হয়েছিলেন ছোট বোন আসছে শুনে, তবু মিলুকে ধমক দিলেন কাননকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

ছোটমাসীর হাত ধরে মিলু ততক্ষণে নাচানাচি শুরু করেছে, ছোটমাসী, আজ তুমি এখানে থাকবে, যেতে পাবে না।

কনকলতা হেসে ফেললেন। ধমক দিয়ে বললেন, ছোটমাসীকে দেখলে সব দেখি আহ্লাদে আটখানা।

মিলু কলেজে ঢুকেছে, রাস্তায় বের হলে শাড়ি আর শরীর নিয়ে সবসময় ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু বাড়িতে কেমন একটা বালক বালক ভাব। ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করে বললে, ছোটমাসী তো তোমার মত মুখ গোমড়া করে থাকে না।

কনকলতা বড় একটা হাসেন না সত্যি। হাসবার মত সময় পান কখন?

তবু আদরের গলায় জবাব দিলেন, ছোটমাসীই তোমাদের মাথাগুলি চিবিয়ে খাচ্ছে। বলে হেসে ফেললেন।

কানন ঠোঁট টিপে চোখে একটু রহস্য আঁকলো।—মাথা আর কারো চিবোতে হবে না মেজদি, আজকাল ওরা নিজেরাই নিজেদের মাথা চিবোচ্ছে।

কথাটা বলার মধ্যে কি যেন ছিল, হাসিটা কেমন যেন। কনকলতার কপাল কুঁচকে গেল, কিন্তু মিলুর সামনে জিগ্যেস

করতেও পারলেন না। অরুণ মিলু সম্পর্কে কিছু? কোথাও কিছু শুনেছে কানন? কিন্তু মিলুকে তো যতখানি সম্ভব চোখেচোখেই রাখেন। ছেলেমেয়েদের ভয় পান না, ভয় পাছে কেউ ওদের সম্পর্কে কিছু বলে বসে।

মিলু রেকর্ড প্লেয়ারটা বাজাতে যেতেই কনকলতা ঈষৎ চাপা গলায় বললেন, মাথা চিবোনোর কথা কি বলছিলি তখন!

—বলবো, বলবো। বলে হেসে ফেললো কানন।

তারপর ছোট্ট বারান্দাটায় যেখানে প্রকাশবাবু ক্যাম্বিসের ডেকচেয়ার পেতে চা খাচ্ছিলেন সেখানে গিয়ে হাজির হলো। বেতের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে হঠাৎ আরেক দমকা হেসে উঠে বললে, অরুণের কিন্তু পছন্দ আছে জামাইবাবু।

প্রকাশবাবু চোখ তুলে তাকালেন।

আর কনকলতা অধৈর্য হয়ে বললেন, অরুণ?

—আবার কে। কানন যেন হাসি চাপতে পারছে না।—তাকিয়ে থাকার মত চেহারা মেজদি, লম্বা। স্লিম, জোড়া ভুরু। জোড়া ভুরু আমার ভীষণ ভাল লাগে।

কনকলতা রেগে গেলেন এবার।—ওসব ছাড় তো, আসল কথাটা বল।

কানন আবার হাসলো।—রেগে যাচ্ছিস কেন, আমি হলে তো নিজে গিয়ে ছেলের বউ করে নিয়ে আসতাম। ফোয়ারার মত, সত্যি বলছি, যেমন ফর্সা সুন্দর, তেমনি হাসিখুশি, হাঁটাচলাও বেশ।

প্রকাশবাবুর কপালে এতক্ষণে দাগ ফুটলো। —তুমিই তো দেখছি ফোয়ারা হয়ে গেছ। কথাটা শুনে তো মনে হচ্ছে হাসির তেমন কিছু নেই। খুব শান্ত গলায় থেমে থেমে বললেন।

কানন ঠোঁট চেপে বললে, আহা, আমাকে আপনি তো ফোয়ারাই দেখে আসছেন। আপনার চোখের বিচারে নয়। সত্যি ভাল
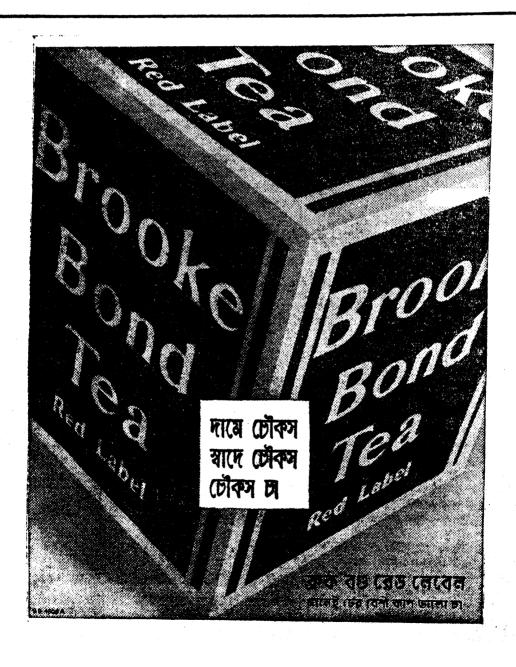
মেয়ে, আর এতটুকু জড়তা নেই, হাত পা নেড়ে এমন......

কনকলতা দুশ্চিন্তায় রাগে গরম হয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন, দ্যাখ কানন, সব সময় হাসি ভাল লাগে না।

শেষ অবধি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললো কানন। বললে, অরুণ যে যাবে তা কি জানতাম আমরা। সেই দুদিন আগে থেকে টিকিট কেটে রেখেছি...তা সিনেমার পর বেরিয়ে আসছি, ও হঠাৎ বললে, দ্যাখো দ্যাখো, অরুণ না? একবার ওর সঙ্গে নাকি চোখোচোখিও হয়েছিল...কানন আবার হেসে উঠলো, বললে, ওরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

—মেয়ে? কত বয়েস? চিনিস তাকে? কনকলতা এক সঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্ন ছুঁড়লেন। বেশ বোঝা গেল একটা প্রশ্নেরও উত্তর জানতে চান না। বেশ বোঝা গেল সমস্ত ঘটনাটিকে সহজভাবে নিতে পারছেন না।

কানন নিজেও যেন বুঝতে পারলো এতক্ষণে, খবরটা এদের না জানালেই ভাল ছিল। সামান্য একটা রসিকতার ব্যাপার ভেবেই না বলেছে।

তুই শুধু বললে, এত উতলা হচ্ছিস কেন। আজকাল এটা কি কোন খবর নাকি।

এত বড় একটা খবরকে বলে কিনা খবর নয়? কাননের নিজের ছেলে হলে এভাবে হাসতে পারতো ও।

ছোট বোনকে বিদায় দিয়েই স্বামীর কাছে ফিরে আসছিলেন কনকলতা। কিছু একটা ঘটেছে, দাদাকে নিয়ে, তা বুঝতে পেরেছিল বলেই কাছে আসে নি মিলু। মাঝপথে মাকে দেখতে পেয়ে জিগেস করলো, কি হয়েছে মা?

—তুই যা তো এখন। একটা দুঃখের শ্বাসকে বুকে চেপে রাখার চেষ্টা করলেন কনকলতা।

তারপর বারান্দায় এসেই বললেন, দাদাকে বলি, গগনবাবুর সেই মেজশালীর মেয়েকে এই সপ্তাহেই দেখতে যাবো আমি।

প্রকাশবাবু কানেই তুললেন না কথাটা। শুধু বললেন, আস্কারা দিয়ে দিয়ে তোমরাই ওর মাথাটা খেয়েছো। আসুক ফিরে হাবামজাদা—

॥ ৩ ॥

এতক্ষণ কাঁধটা গরম কোট ঝোলানোর হ্যাঙার ছিল, টান টান, চোখোচোখি হতেই কাঁধটা ঝুলে পড়লো। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো অরুণের।

মেজাজ সকাল থেকেই তো বিগড়ে আছে। তার ওপর দুপুরে খেয়েদেয়ে বের হবে, মা বলে বসলো, র‍্যাশনের দোকানে এখনো কার্ড ফেরত দেয় নি সোনার মাকে, কি সব দরকার, গিয়ে আনতে বলেছে।

—তোমাদের কি রোজ একটা না একটা কাজ থাকবেই। পারবো না আমি।

মা গম্ভীর গলায় বললে, না আনতে পারিস উপোস করবি সব, এ হপ্তার র‍্যাশন তোলা হবে না।

উপোস করাবি। যেন উপোস করাকে ভয় পায় ও। আর কাজেরও শেষ নেই, আজ প্রিমিয়ামটা দিয়ে আয়, আজ র‍্যাশন কার্ড, স্টোভ সারিয়ে আন্, মিস্ত্রীকে খবর দে...শালা বেকার হয়ে বসে আছে বলে ওই যেন একমাত্র কাজের লোক। কোন রকমে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলে শান্তি। তখন বাবার মত ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারবে।

র‍্যাশন কার্ডগুলো ফেরত পেয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো অরুণ। চচ, সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। অথচ একটার মধ্যে পৌঁছতে হবে।

ওগুলো নিয়ে তখন তখনই বাসে উঠলে দেরী হ'তো না। কিন্তু ছ'খানা র‍্যাশন কার্ড হাতে নিয়ে তো রুণুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যায় না।

বাড়িতে সেগুলো রেখে দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাসে উঠে আবার ঘড়ি দেখলো অরুণ। আর দেরী হয়ে গেছে দেখে সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠলো।

—আমার মাইরি কি মনে হয় জানিস টিকলু? মনে হয় শরীরে রক্ত নেই, শুধু নিমপাতার রস। শালা তেতো হয়ে গেছি।

টিকলু অসীম বিরক্তিতে মুখখানা দুমড়ে কুঁচকে বলেছিল, বিচ্ছুটি, টেরিলিন ফোরিলিন, এই প্যাণ্ট শার্ট সব মনে হয় বিছুটি দিয়ে বোনা।

টিকলু ঠিকই বলেছিল।

বাস থেকে যখন নামলো তখন একটা বেজে পনেরো। অথচ রুণুর সঙ্গে কথা ছিল একটা অবধি থাকবে। বাস স্টপে। এসে ফিরে গেল? না আসেই নি এখনো?

রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাস স্টপে এক চামচ ছায়া আছে বটে, কিন্তু লোক লোক। রোদ্দুরে দাঁড়াতে পারেনি বলে কাছে কোথাও ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায় নি তো!

রোদ্দুরের মধ্যেই বেশ খানিকটা এদিক ওদিক করে রুণুকে খুঁজলো ও। দু'চারটে দোকানে উঁকি দিয়ে দেখলো কোথাও টফি কিংবা চুলের কাঁটা কেনার নাম করে ছায়া পোয়াচ্ছে কিনা।

নাঃ। হয়তো অপেক্ষা করে করে চলে গেছে। সময়ের দাম যেন শুধু রুণুরই আছে, অরুণ যে এক একদিন আধঘণ্টা বাড়তি সময় দাঁড়িয়ে থাকে! থাকে বটে, কিন্তু রুণু এসেই এমন ভাবে বলে, ঈস্, তোমাকে খুব কষ্ট দিই আমি, না? কি করবো বলো......বাস্, সব রাগ জল হয়ে যায়। তখন রুণুকে এত ভাল লাগে।

অরুণ ভাবলো, রুণু এসে ফিরে গেল, অথচ আর পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলো না! করবে কি করে, মেয়েদের কোথাও পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার উপায় আছে নাকি। মাছির মত ভন্ ভন্ করবে সব। গা ঘেঁষে দাঁড়াবে, আড়ে আড়ে তাকাবে। ন্যুইসেন্স। দেশটা অধঃপাতে যেতে বাকি নেই আর। একটা লোকও সুস্থ নেই আর, একটা লোকও না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন রুণু এলো না, ধুত্তোর, কফি হাউসেই যাই, যদি কেউ থাকে...

কেউ না থাক্, উর্মি আছে। ফিলামেণ্ট যায়-যায় হলদে হওয়া বাল্‌বটা দপ্ করে আলোয় সাদা হয়ে গেল। এতক্ষণের জমা হওয়া বিরক্তি এক নিমেষে সরে গেল মন থেকে।

উর্মির টেবিলে সেই গোঁফওলা ছেলেটা। হাতে সব সময় মোটা মোটা বই নিয়ে যে ঘোরে। শালা ইনটেলেকচুয়াল। ওকে দেখলেই হাসি পায় অরুণের।

উর্মিও বোধ হয় বাঁচলো। অরুণকে দেখতে পেয়েই স্প্রিঙের মত উঠে দাঁড়ালো সটান, টান টান হয়ে, ঢাউস সাদা ব্যাগটা তুলে নিয়ে কি যেন বললো ছেলেটাকে, তারপর হাসতে হাসতে অরুণের দিকে এগিয়ে এসে আরেকটা টেবিলে বসতে বসতে বললে, বাঁচালি।

—দিব্যি তো ওর সঙ্গে মজে গিয়েছিলি। অরুণ হাসলো।—বাংলা পড়াচ্ছিলো নাকি!

উর্মি হেসে উঠলো।—বাপ্‌স্, কি জেলাসি। বলেই হাত নেড়ে নির্ভয় করলে, ভয় নেই। একা একা বসে থাকলেই প্রেম ট্রেম দুঃখ-টুঃখ মনে পড়ে যায় কিনা, তাই ভাবলাম যতক্ষণ তোরা কেউ না আসছিস...

—তোর আবার দুঃখ আছে নাকি।

—বানাই। বলেই হেসে উঠলো উর্মি।

অরুণ হেসে ফেললো ওর কথায়। ওরা ঠিকই বলে, উর্মির মধ্যে সত্যি কি একটু জাদু আছে। সাদা ব্যাগটার সোনালী মোনোগ্রামটার ওপর দুটো আঙুলে খেলা করছিল উর্মি। সেদিকে তাকালো অরুণ। বাঃ, বেশ সুন্দর তো আঙুলগুলো, এত-দিন লক্ষ্যই করে নি। এক একজন আছে না, ঝট্ করে এত কাছে এসে যায়, তাকে আর ভাল করে লক্ষ্য করা হয়না। উর্মি ঠিক তেমনি।
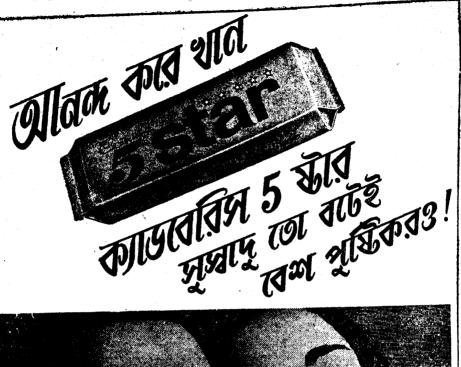
গোঁফওলা ছেলেটা আরেক কাপ কফি নিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে সিলিঙ দেখছে। উর্মির সঙ্গে আলাপ করার জন্যে বহুদিন থেকে ছুকছুক কর-

ছিল। অরুণ কিংবা টিকলুর কাছে মাঝে মাঝে দেশলাই চাইতে এসেছে, সে কি সিরারেট ধরাবে বলে। ওকে দোষ দিয়ে কি হবে, কলেজে ঢুকেই তো দেখেছে সব ছেলেগুলোরই চোখ পড়েছে ঊর্মির ওপর। আলাপ করতে পেলে বর্তে যায়। অরুণেরা লাকি, সিঁড়ি দিয়ে ভিড় করে নামছিল সব, পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলো অরুণ, আর ঊর্মি নিজে থেকেই হেসে কি যেন বলেছিল। কি বলেছিল এখন আর মনে নেই।

—কি এত বোঝাচ্ছিল ছেলেটা? অরুণ জিগ্যেস করলো।

—বোদেলেয়ার, মালার্মে, কামু, কাফকা। বলেই হেসে উঠলো ঊর্মি।

ঊর্মির লম্বা সুন্দর শরীর, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলা, হাসি—সব মিলিয়ে একটা নিটোল অশোক গাছ, ডালগুলো ঝড়ে দুলছে। দূর, অশোক গাছ তো আমি দেখিই নি।

—গাঁদা ফুলের মত এমন সুন্দর চেহারা তোর, ছেলেগুলোর আর দোষ কি। ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল অরুণ।

—যা যা, আমার মত একটা ফীগার দেখা তো তুই। থার্টিফোর, টুয়েন্টিটু, থার্টিফোর। বলেই নিজেকে নিজে ঠাট্টা করার ভঙ্গিতে হেসে উঠেছিল ঊর্মি।

টিকলু হেসে বলেছিল, দর্জির ফিতেটা নির্ঘাত ইলাস্টিক ছিল।

শুনে দমকে দমকে হেসে উঠেছিল ঊর্মি।

সত্যি, ঊর্মি যতক্ষণ থাকে, অরুণের আর কিছু মনে পড়ে না। বিরক্তি, দুঃখ, অভাব, কিছু না।

এ-যুগটা সেই কাপালিকের মত দড়ি দিয়ে দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে তাকে, দিনরাত বাঁধছে, আর ঊর্মি যেন ছুরি দিয়ে বারবার দড়িটা কেটে দিতে চাইছে।

প্রথম দিন, কিংবা প্রথম আলাপের পর একদিন, এখন আর ঠিক মনে নেই, ঊর্মির কাছে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হয়েছিল, কিংবা ঊর্মিকে অহঙ্কারী।

—না না, ওসব আপনিটাপনি চলবে না, স্রেফ 'তুই'। তুই-তুই। বলে অরুণের অপ্রতিভ মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিল ঊর্মি।

তুই! হাঁ হয়ে গিয়েছিল অরুণ। ঊর্মি সম্পর্কে তখন বুকের মধ্যে একটু একটু গুনগুনুনি শুরু হয়েছে, ঊর্মির শরীরের দিকে তাকানো চোখটা তখনো পাজি।

টিকলুকে বলেছিল, ঊর্মিলা...ঊর্মি মাইরি আজ শেক্ দি বট্‌ল্ করে দিয়েছে।

ঊর্মির যুক্তিটা শুনে আরো খারাপ লেগেছিল। হাসতে হাসতে ঊর্মি বলেছিল, আপনি থাকলেই কবে তুমি করতে চাইবি। না বাবা, ওসবের মধ্যে আমি নেই। হেসে উঠে বলেছিল, 'তুমি' একজন আছে, আছে। মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

তারপর থেকে সম্পর্কটা সত্যি কত সহজ হয়ে গেছে। কত্ত সহজ।

দুটো কফির অর্ডার দিয়ে ঢাউস সাদা ব্যাগটা খুললো ঊর্মি। চুরুরুরু চুরুরুরু ...জীপ ফাসনার খুললো, বন্ধ করলো। বোধহয় টাকা পয়সা ঠিক ঠিক আছে কিনা দেখে নিলো।

অরুণ বললে, আছে, আমার কাছেও আছে। একটু থেমে বললে, তোর প্রেমিকের খবরটবর বল্।

ঊর্মি হাসলো।—এলে কি আর এখানে আসতাম। মাইনিং এঞ্জিনিয়ার তো, বোধহয় গভীরের সন্ধানে আছে, আমার মত হাল্কা মেয়ের কথা মনে পড়ছে না।

অকপটে নিজের প্রেমের গল্প বলতে বলতে, খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে দিতে ঊর্মির মুখখানা যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন এক একদিন অরুণের মনে হয়, ও নিজে যেন বড় বেশী তুচ্ছ হয়ে গেছে। তবু শুনতে ভালও লাগে। সে কোলকাতায় এসেছে কিনা, চিঠিতে কি লিখেছে।

ঊর্মি ওর কাছে একটা রহস্য, একটা আতঙ্ক।—চিঠি লিখিস। পরীক্ষার পর ঊর্মি একদিন বলেছিল।

ভয় পেয়েছিল অরুণ। চিঠি লিখলেই তো উত্তর আসবে। কোন মেয়ের লেখা চিঠি বাড়িতে এলে রক্ষে আছে নাকি! এমনিই তো ভয়, ঊর্মি হঠাৎ না কোনদিন বাড়িতে এসে হাজির হয়।

বাইরের পৃথিবীটা ঊর্মির মত সহজ হয়ে গেছে, অথচ । নাঃ, শুধু চিঠি কিংবা ঊর্মির উপস্থিতিকেই ভয় নয়। ঊর্মির মত সুন্দর একটা ফুলের তোড়াকে...ঐ বিশ্রী নোংরা জঞ্জালের মত বাড়িটায়... বেমানান, বেমানান।

—কি ভাবছিস্ এত? রুণুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই তো? বলে হাসলো ঊর্মি।

অন্যদিন হলে অরুণও হাসতো। কিন্তু রুণুর কথা মনে পড়িয়ে দিতেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকলো। আচ্ছা, রুণু এলো না কেন? ঊর্মির সঙ্গে সেদিন দেখে নি তো রাস্তায়? কিন্তু সেদিন তো টিকলু আর সুজিতও ছিল। স্টুপিড! ঊর্মির ওপর জেলাসি। এরা কেউ যদি জানতে পারে ঊর্মির ওপর জেলাসি আছে রুণুর, এমন ঠাট্টা শুরু করবে সব। আর ঊর্মি তো হেসে উঠে হাত-পা নেড়ে নির্ঘাত চেয়ার ভাঙবে।

—বললি না, তোদের কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা আজ? ঊর্মি ঠোঁট চেপে হাসলো।

—আরে দূর, প্রেমট্রেম তুই সত্যি বিশ্বাস করিস? ওসব কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। ও শুধু এই বিশ্রী গরমে এয়ার-কণ্ডিশান্‌ড্ ঘরে বসে থাকা।

ঊর্মি হেসে উঠলো।—দারুণ! ব্যাগ থেকে পাঁচটা পয়সা বের করে দিলো অরুণকে, তারপর বললে, 'অন রেকর্ডে' পাঠিয়ে দে।

লুকোনো রাগ আর চাপা জ্বালা ভেতর থেকে বের করে দিয়ে বেশ ভাল লাগলো অরুণের। আরো খুশী হলো চটকদার একটা কথা বলতে পেরেছে বলে। মিথ্যে কথাগুলোর বেশ চটক আছে তো। সত্যি কথাগুলো খুব সহজ, খু-ব সহজ, অথচ বলা যায় না। রুণুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ও যে কষ্ট পাচ্ছে, সে-কথা বললে ঊর্মি হেসে উঠে এমন সীন ক্রিয়েট করতো—

আজ দুপুরের এই রোদ্দুরে ও পঁয়-তাল্লিশ মিনিট ধরে আশায় আশায় অপেক্ষা করেছে এ-কথা কাউকে বলা যায় নাকি। তার জন্যে নিজের কাছেই তো নিজের লজ্জা করছে।

—তা হ'লে চল্, একটা ছবি দেখে আসি। ঊর্মি বললে।

—এয়ারকণ্ডিশান্ড্ ঘরে? বলে হেসে উঠলো অরুণ। —কিন্তু টাকা নেই।

—কবে থাকে? কথাটা মিথ্যে বলেই ঊর্মি ঠাট্টা করতে পারলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কলার ধরে টানলো।—ওঠ, ওঠ, সুজিত আসবে না।

কি করবে অরুণ? বলবে, না না, যাবো না তোর সঙ্গে?

—আমাদের আসল ট্রাব্‌ল্ কি জানিস সুজিত? বাইরের সঙ্গে ভেতরটা মিলছে না।

সুজিতকে একদিন বলেছিল অরুণ। কিন্তু কি ভেবে বলেছিল ও নিজেও জানে না। হঠাৎ দুম্ করে বলে ফেলেছিল, তারপর মনে হয়েছিল নিশ্চয় কথাটার কোন মানে আছে।

*

ঠাণ্ডা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঊর্মির পাশে পাশে হেঁটে কাউণ্টারের দিকে যাবার সময় অরুণের গর্ব হচ্ছিল। ওর মত মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটার একটা অন্য গর্ব। রুণু যদি এ সময় দেখতো, খুব ভাল হতো! রুণু আসে নি বা এসেও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে নি, তার জন্যে ভিতরে ভিতরে এক একবার রেগে উঠেছিল ও। এমনি তো চোখে দেখে নি, নামই শুনেছে, দু'একটা হাল্কা গল্প, তাতেই হিংসেয় জ্বলে। হঠাৎ চুপ করে যাওয়া, গম্ভীর হওয়া, হিংসে নয়তো কি।

ঊর্মি কত সহজ, স্বাভাবিক। আর সিনেমা দেখতে গিয়ে রুণুর কেবল ভয়, কেবল ভয়। সব কিছুর পরও কেমন একটা অতৃপ্তি থেকে যায়।

অথচ ঊর্মি সারাক্ষণ ছবি দেখতে দেখতে সশব্দে হেসেছে, কানে কানে টিপ্পনি কেটেছে, আবার স্পষ্ট করে দু'একটা কথাও বলেছে। অথচ এইটুকু রুণুর কাছ থেকে পেলে, ও কত বেশী খুশী হতে পারতো।

যেখান থেকে যা পাচ্ছি, টুকরো টুকরো ভাবে পেলেই বা দোষ কি।

সিনেমা হল থেকে তখন ভিড় উপচে বের হচ্ছে। এবার তো ঊর্মি চলে যাবে। অরুণ আবার একা। রুণুর কথা আবার নতুন করে মনে পড়লো। যাক্ গে, 'কোজি নুক' আছে, চায়ের কাপ সামনে নিয়ে সুজিত টিকলুর মুখোমুখি বসে থাকা আছে।

অন্যমনস্ক ভাবে সিনেমা হল থেকে বের হতে গিয়ে ছোট মেসোর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। ছোট মেসো? বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠলো অরুণের। কাঁধটা গরম কোট ঝোলানো হ্যাঙারের মত টানটান ছিল, ঝুলে পড়লো।

এতক্ষণ ঊর্মির ওপর খুশি ছিল, ঈষৎ বিরক্তি ফুটে উঠলো এবার। ঊর্মির সঙ্গে দূরত্ব বাড়াবার জন্যে যত সরে আসে, ঊর্মি ততই কাছ ঘেঁষে আসে। হাসতে হাসতে অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গেল ও, আর অরুণ অন্য দিকে তাকিয়ে এমন ভান করলো মুখের, যেন ঊর্মি ওর চেনা কেউ নয়।

তাড়াতাড়ি ভিড় ছাড়িয়ে ছোটমেসোর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল অরুণ। সঙ্গে কে ছিল, আর কেউ ছিল কিনা দেখার সাহসই হয় নি। ঊর্মিকে কি উনি দেখেছেন? দেখে বুঝতে পেরেছেন ওরা এক-সঙ্গে এসেছিল?

দুশ্চিন্তায় তখন মনের এমন অবস্থা, ঊর্মি কলকল করে কি বলছে, কুলকুল করে কেন হাসছে কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধু তার কথার পিঠে শুকনো হুঁ আর হাঁ দিয়ে গেল।

ও শুনছে কি শুনছে না, সেদিকে দৃষ্টি নেই ঊর্মির। ও শুধু হাত নেড়ে নেড়ে অনর্গল কথা বলছে, ট্যাঙ্কে জল ফুরিয়ে যাওয়া কলের মত হঠাৎ হঠাৎ হাসছে। এমন মুশকিল, ঊর্মিকে যে বলবে ছোট-মেসোর কথা, সাবধান করে দিয়ে দূরে দূরে হাঁটবে তারও উপায় নেই। শুনে এমন হেসে উঠবে।—সে কি রে! বলে এমন অবাক হয়ে তাকাবে মুখের দিকে!

একসঙ্গে অনেকের ওপর রাগ হলো অরুণের। ঊর্মির ওপর, ছোটমেসোর ওপর, বাবা-মা-দিদি সকলের ওপর। সমস্ত বাড়িটার ওপর। আজ আবার মনে হলো ঐ বাড়িটার সঙ্গে ও যেন খাপ খায় না। বাইরের সঙ্গে ভেতরটা খাপ খায় না, কোন কিছুর সঙ্গে কোন কিছু খাপ খায় না।

বাস-স্টপে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

ফোলিওব্যাগ হাতে মধ্যবয়স্ক একটি লোক ফুটপাথ ধরে আসছিল। এমন উদা-সীন অন্যমনস্ক ভাব করলো যেন ঊর্মি তার চোখেও পড়েনি। তাই তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চোখ দুটোকে র‍্যাডার বানিয়ে দু' মাইল দূরে কোথাও বাস আছে কিনা খুঁজলো।

—মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ করবি? ঊর্মি হেসে উঠলো।—শীগগির আসছে।

—ধুস্। তোর মেয়েবন্ধু হলে করতাম।

ঊর্মি হেসে উঠে বললে, আহা রে! বলেই চারপাশের লোকগুলোকে দেখিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো।

অরুণও হেসে ফেললে। সুজিত বেশ উপমাটা দিয়েছিল কিন্তু। 'গরমের দিনে ঘাম হতে দেখেছিস? ফুট্ করে এক জায়গায় এক ফোঁটা ঘাম বের হল, একটু পরেই তার পাশে তিন চার ফোঁটা, তার পাশে আবার, আবার...পুনপুন পুন-পুন করে চাক হয়ে যাবে একটা। তেমনি কোথাও একটা মেয়ে এসে দাঁড়াক, দু'-মিনিটে দেখবি ভীমরুলের চাক গড়ে উঠবে।'

ঊর্মি হেসে উঠে বললে, ঘাম।

অরুণও হেসে ফেলে এপাশ-ওপাশ দেখলো। সত্যি, ভিড় জমে গেছে। বাঃ, তা বলে লোকে বাসে উঠবে না?

(ক্রমশ)

পশ্চিম জার্মানীতে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন

বন্ থেকে পল ক্লোরিয়ান খবর দিচ্ছেন যে পশ্চিম জার্মানীতে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিজলী উৎপন্ন করার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক আন্দাজমত ১৯৮০ সনে পশ্চিম জার্মানীতে মোট যত বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হবে পরমাণু শক্তির সাহায্যে এবং এখন কয়লা, তেল ও জল শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পড়তা খরচ তার চেয়ে তখন খরচ কমে যাবে। এটা একটা অবশ্যকরণীয় কাজ, কারণ আগামী ২০ বছর ধরে ব্যবহারের পর ভূগর্ভে কয়লা তেলের মজুত পরিমাণ যত কমে আসবে ততই অন্যদিকে যানবাহনের জন্য ডিজেল ইত্যাদি তেলের চাহিদা বেড়ে যাবে। তখন পারমাণবিক শক্তির সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই সংগে পশ্চিম জার্মান সরকার ভবিষ্যতে বিদেশে ওই পারমাণবিক যন্ত্র রপ্তানীর কথাও চিন্তা করছেন। বর্তমানে গুরুজল—রিয়্যাক্টারের প্রচলন বেশি। কিন্তু ১৯৮০ সাল নাগাদ দ্রুত বেগবান ব্রীডার রিয়্যাক্টারের চাহিদা বাড়বে কারণ তার সুবিধা অনেক বেশি। এ ছাড়া মহাকাশযানে সৌর শক্তি ব্যবহার, সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদির জন্যও ওই ছোট্ট ১৮ ইঞ্চি উঁচু ১৪ ইঞ্চি ব্যাসের ও ২·৪ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রটি ২০ থেকে ৬০ কিলোওয়াট ঐকান্ত শক্তি উৎপন্ন করবে।

'সোয়ুজ' দুই ও তিন

রাশিয়ার 'সোয়ুজ' মডেলের নতুন ও বৃহত্তর মহাকাশযানের উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে মিঃ কোমারফের মৃত্যু হয়। তারপর এই প্রথম সোয়ুজ মহাকাশযানের মানুষ নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমা যার সফল পরিসমাপ্তি হয় ৪ দিন পরে। একাধারে যাত্রী ও চালক টেস্ট পাইলট গ্যাগি বেরেগোভয় সোয়ুজ-৩কে স্বহস্তে পরিচালনা করেন। একই সংগে সোয়ুজ-২ মহাকাশযানও ভূ-প্রদক্ষিণ করছিল। খবর পড়ে মনে হয় সোয়ুজ-২তে কোন যাত্রী ছিল না (মার্কিন আগেনা রকেটের মত) মহাকাশ পরিক্রমার ৪ দিন বেরেগোভয় নিজের প্রতিটি কাজকর্ম লগ্ বুক্-এ লেখেন এবং টেলিমিটার ফিতা মারফত টেলিভিশন যোগে সেইসব তথ্য পৃথিবীতে পাঠান। সংবাদে প্রকাশ যে বেরেগোভয়ের কার্যসূচীর প্রধান বিষয় ছিল ২টিঃ—(১) পৃথিবীতে লোকে সাধারণত যেমনভাবে কাজ করে, সোয়ুজ-৩-এর মধ্যে অনেক বেশি জটিল পরিবেশের মধ্যে সেইভাবে
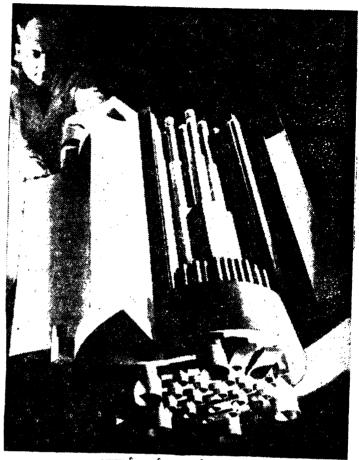
পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার

কাজ করা যায় কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা। সে পরীক্ষা সফল হয়। (২) ইচ্ছামত সোয়ুজ-৩কে স্বহস্তে পরিচালনা করে অন্য কক্ষপথে নিয়ে যাওয়া যে পথে ঘুরছিল সোয়ুজ-২। এইভাবে তিনি মহাকাশযানের কক্ষপথের নিম্নসীমা পৃথিবীর মাথায় ২০৫ কিলোমিটার থেকে ১৭৯ কিলোমিটারে নামিয়ে আনেন। আবার প্রয়োজন মত কক্ষ-পথের ঊর্ধ্ব সীমা ২২৫ থেকে ২৫২ কিলো-মিটারে তুলে নিয়ে যান। সোয়ুজ-২-এর কাছাকাছি আসা এবং আবার দূরে সরে যাওয়ার এই মহড়া তিনি অনেকবার দেন। এক বেতার কৌশলের সাহায্যে বেরেগোভয় দুই মহাশূন্য যানের দেখাসাক্ষাৎ করান। এই কৌশলটি নাকি একেবারে নতুন। যেটা সবচেয়ে বড় কথা সেটা হচ্ছে মহাকাশযানটির আয়তন যার দরুণ এক সঙ্গে ১০।১২ জন যাত্রী মহাকাশযাত্রা করতে পারবেন। যানের মধ্যে ২টি কামরা। একটি চালকের ও যাত্রী-দের কেবিন অন্যটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। গোটা জিনিসটা ছোট্ট দুই কামরার একটি ফ্ল্যাটের মত। বেরেগোভয় সারা দুনিয়ায় টেলিভিশন চিত্র পাঠিয়েছেন এবং আবহতত্ত্বের দিক থেকে পৃথিবীর মেঘ ও তুষার আবরণের জঙ্গলে আগুন ও ঝঞ্ঝা-বাত্যা ইত্যাদির ছবি তুলেছেন।

জোঁকের ট্রেণিং

মহাজাগতিক যাত্রার জন্য জোঁককে ট্রেণিং দেওয়া হচ্ছে

জার্মান ফেডারাল রিপাবলিকের ফ্রাংক-ফুর্ট-অন-মেন শহর মহাকাশ গবেষণার এক কেন্দ্র। সেখান থেকে যারা প্রথম মহাকাশচারী হবার সৌভাগ্য লাভ করবে তারা মানুষ নয়, জোঁক। গত বছরখানেক ধরে ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবশাস্ত্র বিভাগে ৪টি জোঁককে মহাকাশ পরিক্রমার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। সেগুলির দৈর্ঘ ১ থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং ওজন এক আউন্সেরও অনেক কম। তাদের ট্রেনিং দিচ্ছেন বিভাগীয় অধ্যাপক রবার্ট লংজ্। তাঁর বক্তব্য অনুসারে জোঁকেরা একবার পেট ভরে খাবার পর এমন কি দেড় বছর পর্যন্ত না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তাছাড়া মহাশূন্যে তাদের বিপাক ক্রিয়া, ক্যাল্সিয়াম ক্ষয় ইত্যাদি যেসব ব্যাপার ঘটবে সেগুলি পরীক্ষা করলে মানুষ মহাকাশযাত্রীর উপর, সুদীর্ঘকাল ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে, কি কি প্রতি-ক্রিয়া দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে ছবিতে যে পাত্রটি নিয়ে ডঃ লংজ্ কাজ করছেন সেটি জোঁক যাত্রী সমেত ১ বছর মহাশূন্যে ঘোরানো হবে। তারপর তাঁর ইচ্ছা আছে কয়েক বছরের মহাশূন্য পরিক্রমার জন্য জোঁক পাঠাবেন তাদের সঙ্গে খাদ্য হিসাবে নির্বীজাণু রক্ত পাঠিয়ে।

(চল্লিশ)

সে জায় একটা জলজ্যান্ত মানুষ হারিয়ে গেল।

প্রতিদিনই তো কত লোক এই রকম হারিয়ে যায়, জীবন থেকে সরে যায়, পথ চলতে খসে যায়—কে আর তার খবর রাখে। ব্যস্ত শহর কলকাতার ব্যস্ততা, তার জন্যে এতটুকুও কম বেশি হয় না, জোয়ার ভাটা খেলে না। আগের মতই ভোরবেলা শহর জেগে ওঠে, ফুটপাথের বাসিন্দারা বিছানা গোটায়। গৃহস্থেরা উনুনে আগুন দেয়, খবরের কাগজের হকারদের চেঁচামিচি। ক্রমে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম বাস মোটর গাড়ির প্রতিযোগিতা, স্কুল, কলেজে, অফিসের ভীড়। সবকিছুই সমান তালে চলতে থাকে। অনাদিপ্রসাদকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে? কবিতার মত মেয়েরা আজও রাণাঘাট লোকালে চেপে রুজি রোজগারের জন্যে শেয়ালদায় আসে, মিতারা নিত্য নতুন বাবুদের আশায় ঘরের দরজা খুলে রাখে, সৌরভ সেনেরা আজও চিত্র প্রযোজকের মরিচীকা দেখে, সাধনবাবুরা মিথ্যা আস্ফালন করে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে। শশধর বোসরা রাজনীতির নেশায় মত্ত, বাস্তু ঘুঘুরা নানারকম ফরমুলার ককটেল অনবরত খুগিয়ে যাচ্ছে, সুনীল রায়েরা খুঁজছে রাজহংসী যারা সোনার ডিম পাড়বে। অনাদিপ্রসাদ গেল তো কি হল, নতুন অনাদিপ্রসাদ তার চাই। মিস্ কলকাতারা রাজত্ব করছে, সদা ব্যস্ত তাদের ছিন্তাই পার্টি। এখনও টিনএজাররা মে ফ্লাওয়ারে বিলিতি বাজনার সঙ্গে ঝমঝমিয়ে নাচছে। ছিটকে পড়া মনুয়ারা দেহকে মূলধন করা ছাড়া উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। মীমারা অন্ধকার ছাদে কাঁদছে, সমীররা দেবদাস। স্বরূপ লাহিড়ীদের বাড়িতে অবজ্ঞার নাটকের একঘেঁয়ে অভিনয়। মোহনচাঁদরা ব্যবসা করে টাকার মিনার তুলছে, শেঠিয়ারা দৌড়চ্ছে ঘোড়ার পিছনে। যাদুকাঠির স্পর্শে কালো টাকাকে সাদা বানাচ্ছে।

দিনেরবেলা কলকাতার ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়, হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে অজগর ট্রেনগুলো মানুষ বমি করে। আবার সন্ধেবেলা তারাই প্রচণ্ড নিঃশ্বাসের টানে জনতাকে পেটে পুরে উধাও হয়ে যায়। এই ভয়ংকর ডামাডোলের মধ্যে অনাদিপ্রসাদের কথা চিন্তা করার মত বাড়তি সময় কার হাতে আছে। হয়ত রমলা বউদি আর বাড়ির ছেলেরা প্রথমটা চিন্তিত হয়েছিল, কিন্তু অনুসন্ধান করার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত যদি মানুষটা মনুয়া না কি নাম, যাকে নিয়ে এত বিপত্তি, সেই ছুঁড়ীটার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠে থাকে তাহলে যে সমাজে আর লজ্জায় মুখ দেখান যাবে না। পরেশচন্দ্র বুঝিয়েছেন ভীমরতি ধরলে মানুষের নাকি এই রকমই হয়, অনেক মেয়ে নাকি এখনও বশীকরণের মন্ত্র জানে, পুরুষ মানুষদের তারা ভেড়া বানায়। সত্যি মিথ্যে যাই হোক এটর্নী মারফৎ টাকাকড়ি সম্পত্তি সবকিছু পেয়ে গিয়ে অনাদিপ্রসাদ সম্বন্ধে বাড়ির লোকেরা নীরব হয়ে রইলেন। বাইরের লোক কেউ ফোন করলে বা খবর নিতে এলে ওরা জানাত অনাদিপ্রসাদ চেঞ্জে গেছেন।

এ উত্তরে কিন্তু অশোক জানা সন্তুষ্ট হয়নি। জিজ্ঞেস করেছে, ঠিকানা? ওরা বলেছে, জানি না।

অশোক জানা মাস খানেক ধরে এদিক ওদিক অনাদিপ্রসাদের খোঁজ নিয়েছিল কিন্তু কেউই কোন বিশেষ খবর দিতে পারেনি। প্রকাশক মহলও নয়, সাপ্তাহিক নর্দমাও নয়, কি মনুয়া লাহিড়ীও নয়।

কিন্তু আশ্চর্য! হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের সময় প্রেস থেকে বেরুতে গিয়ে অশোক জানা দেখল রাস্তার অপর ফুটপাথে অনাদিপ্রসাদ দাঁড়িয়ে। প্রথমটা চিনতে অসুবিধে হয়েছিল, এক মুখ দাড়ি গোঁফ, রুক্ষ চুল, গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা। অশোক জানা সসংকোচে জিজ্ঞেস করে, অনাদি না?

মানুষটা হাসল, কেন, চিনতে পারছ না?

—তা নয় অত বড় দাড়ি গোঁফের জন্যে ঠিক বুঝতে পারিনি। এতদিন কোথায় ছিলে. কেউ তোমার খবর দিতে পারছে না।

—খুব ঘুরছিলাম, দেশটাকে দেখছিলাম। কখনও ট্রেনে কখনও বাসে, সাইকেল রিকশায়, নৌকোয়, গরুর গাড়িতে অবশ্য সবচেয়ে বেশি পায়ে হেঁটে।

অশোক জানা ব্যস্ত হয়, বড্ড রোগা লাগছে, শরীর খারাপ হয়নি তো?

—তা জানি না। তবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিছুদিন বিশ্রাম করতে হবে। আর তাছাড়া—

—কি?

—একেবারে হাতখালি, কিছু টাকার দরকার।

অশোক জানার আরও বিস্ময়, কার কাছে যেন শুনেছিলাম তুমি বাড়িঘর সব বউ ছেলের নামে লিখে দিয়েছ, কিন্তু নিজের জন্যে কি কোন ব্যবস্থাই রাখোনি?

অনাদিপ্রসাদের সহজ উত্তর, তুমি ভুলে

যাচ্ছ, একজন অনাদিপ্রসাদ মারা গেছে, তার যা কিছু ছিল স্বাভাবিক কারণেই দিয়ে গেছে নিজের পরিবারকে, আমি তো আর একজন মানুষ। আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। টাকা ধার চাইবার জন্যে আর কারুর কাছে না গিয়ে তোমার কাছে এলাম। পরে শোধ করে দেব।

অশোক জানার মাথাটা ঠিক কাজ করে না, তাড়াতাড়ি বলে, এস ভেতরে এস। নিশ্চিন্ত হয়ে বোস দেখি, তারপর আমি সব করছি।

অনাদিপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, তুমি ভাবছ বাড়িতে একটা ফোন করে খবর দেবে. ভাবছ সুনীল রায়ের কাছে আমাকে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু খবরদার কোন রকম কৌশল করার চেষ্টা করো না, তাহলেই আমি আবার পালিয়ে যাব। হয় টাকা ধার দাও নয়ত কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার মত একটা জায়গা করে দাও, এটুকু বলতে পারি এতে তোমার লোকসান হবে না. কারণ আমি আবার ডিম পাড়ছি। সুনীল রায় যাকে বলে সোনার ডিম।
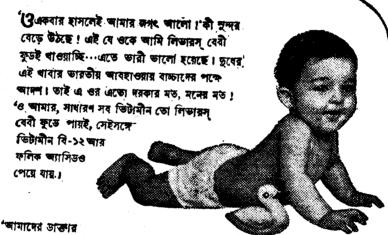
অশোক জানার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তুমি আবার লিখছ অনাদি। কি, উপন্যাস!

—হাঁ, এবারের প্রকাশক হবে অশোক জানা।

—ব্যস, ব্যস, ঠিক আছে। প্রেসের ওপরেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কোন অসুবিধে হবে না, নিজের মনে তুমি শুধু লিখবে।

অনাদিপ্রসাদ শর্ত করে নেন, কেউ যেন জানতেও না পারে যে আমি এখানে আছি, এ হবে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। কি, রাজি?

রাজি।

প্রেসের উপরতলায় যে ঘরে অনাদিপ্রসাদের থাকার ব্যবস্থা করল অশোক জানা, সে ঘরটা আগে প্রেসের গুদাম ঘর হিসেবে ব্যবহার হত। অবশ্য মাল বেশি মজুত ছিল না, তাই সরিয়ে ফেলতে দেরী হল না। ঘরের কোণায় একটা চৌকি পেতে বিছানা করা হল, কেঠো টেবিল চেয়ার প্রেসের থেকে ওপরে তোলা হল। এক কোণায় নড়বড়ে একটা আলনা, একটা টুলের ওপর মাটির কুঁজো আর জলের গেলাস। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া এক টুকরো ছাদ, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে রাজাবাজারের বিস্তীর্ণ বস্তির খোলার চাল দেখা যায়। উপরে খানিকটা আকাশ, বাঁদিকে দম বন্ধ করা একটা উঁচু বাড়ি, বোধ হয় মেয়েদের হোস্টেল।

প্রথম দুটো দিন অনাদিপ্রসাদ বেশির ভাগ সময়টাই ঘুমিয়ে কাটালেন। খাবার সময় উঠে অল্প কিছু খেয়ে আবার শুয়ে পড়তেন। ভয় পেয়ে অশোক জানা জিজ্ঞেস করেছিল, কোন ডাক্তার ডাকব নাকি?

—না, না, এ শুধু পথ চলার ক্লান্তি, দু'দিন জিরোলেই ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আবার লিখতে শুরু করব, প্রায় শেষ করে এনেছি, শেষের কয়েকটা পরিচ্ছেদ বাকী আছে।

—কি লিখছ?

বানানো কোন গল্প নয়, মিথ্যে উপন্যাসও নয়। কতগুলো রক্ত মাংসের গড়া মানুষের কথা, তার মধ্যে তুমি আছ, আমি আছি। কবিতা আছে, স্বরূপ লাহিড়ী আছে, বরি মনুয়া আছে, আরও অনেকে আছে। আজকের সমাজের কথা আছে, দেশের অবস্থার কথা আছে। মা কি ছিলেন, মা কি হইয়াছেন। লিখতে শুধু বাকি মা কি হইবেন।

—উপন্যাসের কি নাম দিয়েছ?

—এখনও কিছু ঠিক করিনি, পরে দেব।

অশোক জানা কৌতূহল সামলাতে পারে না, বলে, যদি তোমার আপত্তি না থাকে যতটা লেখা হয়েছে আমাকে দাও না, পড়ে দেখি।

অনাদিপ্রসাদ অসম্মতি জানান, এখন থাক। একেবারে ছাপা হলে পড়।

সত্যিই ক'দিন বাদ থেকে অনাদিপ্রসাদ পুরোদমে লিখতে শুরু করলেন। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এক নাগাড়ে টেবিলে বসে লেখেন, দিস্তের পর দিস্তে কাগজ শেষ হয়ে যায়। পাছে কেউ বিরক্ত করে তাই সব সময় প্রায় ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখেন। দুপুর বেলা একবার কবিতা ঢোকে খাবার দিতে, লেখার মেজাজে থাকলে তখন কোন কথাবার্তা হয় না। তবে মাঝে মাঝে কবিতার প্রশ্নের উত্তর দেন।

কবিতা বলে, সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। মাঝে মাঝে ফাঁকা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলে পারেন।

অনাদিপ্রসাদ খেতে খেতে বলেন, ফাঁকা হাওয়া তো কলকাতার শহরে নেই, তা ছাড়া এক মাস এত হেঁটেছি যে এখন কিছু দিন না হাঁটলেও চলবে।

মেয়েলী সহানুভূতি, এখানে নিশ্চয় আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। এরকমভাবে তো থাকা অভ্যেস নেই।

—আমি কিন্তু মহা আনন্দে আছি। আমার এই নতুন বইতেও এমন কয়েকজনের কথা লিখছি যারা ডানলোপিলোর নরম গদীতে শুয়েও সারা রাত ছটফট করে, ঘুমতে পারে না। আবার তাদের কথাও লিখছি যারা ফুটপাথে ইট মাথায় দিয়ে দিব্যি ঘুমচ্ছে। সব রকম জীবনই তো দেখলাম, অনেক ভাবে নিজেও কাটালাম। সার কথা হল, আনন্দ না থাকলে বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না।

কবিতার অতি সহজ প্রশ্ন, আপনি আনন্দে আছেন?

অনাদিপ্রসাদের স্পষ্ট উত্তর, না থাকলে তো নতুন করে লিখতে পারতাম না, নতুন কিছু সৃষ্টি করতেও পারতাম না।

এরই মধ্যে একদিন অশোক জানার প্রেসে মিঃ দত্ত এসেছিল মোটর সাইকেল চড়ে, সঙ্গে স্ত্রী পুত্র, আর এক কুড়ি কলা মিণ্টি।

অশোক জানা জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, অনেক দিন বাদে যে?

মিঃ দত্ত হাসতে হাসতে বলে, এলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বুঝতেই পারছেন ইনি মিসেস দত্ত আর এটি আমার ছেলে।

অশোক জানা বসবার জন্যে চেয়ার এগিয়ে দেয়। মিঃ দত্ত বলে, ওরা এসেছে প্রেস দেখতে, কি রকম করে মেসিনে ছাপা হয় তা একটু দেখিয়ে দিতে বলুন।

—বেশ তো চলুন আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি।

দত্ত বাধা দেয়, আহা আপনি কষ্ট করবেন কেন, কাউকে বলুন না ওদের নিয়ে যাবে, তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

অশোক জানা কবিতাকে ডেকে বলল, ওদের প্রেস দেখিয়ে দিতে।

অশোক জানাকে একা পেয়ে মিঃ দত্ত সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে, আমার উপর আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন অশোকদা, কিন্তু

ডানলপিলো সবচেয়ে আরামদায়ক

অথচ এতে খরচ যা ভাবছেন তার চাইতে অনেক কম!

তাই হাজার হাজার লোক ডানলপিলো কিনছেন
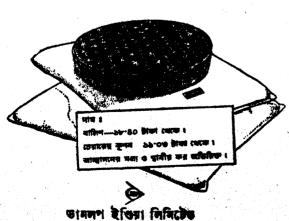
- ডানলপিলো অন্য যে কোন গদির চেয়ে ঢের বেশি টেকসই—এর আকৃতি ও তুলতুলে নরম ভাব কিছুতেই নষ্ট হয় না।
- বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ঘনতায় ডানলপিলো পাওয়া যায়।
- ডানলপিলো শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই স্নিগ্ধ আরামদায়ক—এর লক্ষ লক্ষ ছিদ্রের মধ্যদিয়ে হাওয়া চলাচল করে।
- ডানলপিলো আপনার প্রয়োজন মতো যে কোন মাপে কেটেছেঁটে নেয়া চলে।
- ডানলপিলো স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ ও জীবাণুমুক্ত—পোকামাকড় এতে বাসা বাঁধতে সাহস করে না।

ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

আসল ল্যাটেক্স ফোম

ডানলপিলো

কুশন • বালিশ • গদি

আজ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমি নিরুপায় হয়েই ওই জাল সার্টিফিকেট ছাপিয়ে ছিলাম। দেখুন আবার আমি ভাল চাকরি পেয়েছি, স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে সুখে ঘর করছি, অথচ ওই জাল কাগজটা না থাকলে আমরা খড় কুটোর মত ভেসে যেতাম। আপনার জন্যে এই সামান্য ফল মিষ্টি নিয়ে এসেছি। সেদিন টাকা নেননি কিন্তু আজ আশা করি এটি ফিরিয়ে দেবেন না।

অশোক জানা দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল তা আবেগে ভরে রয়েছে। সেই অবস্থায় ধরা গলায় বলে, অশোকদা এই সংগে অনেকগুলো ছাপার অর্ডারও এনেছি, এগুলো কিন্তু মিথ্যে নয়। আমার নতুন কোম্পানীর কাজ। আমাকে কোন কমিশনও দিতে হবে না, ন্যায্য বিল করবেন।

এরপরও দত্তরা আরও কিছুক্ষণ প্রেসে ছিল, নানারকম গল্প তারা করল। অশোক জানা তাদের চা মিষ্টি আনিয়ে খাওয়াল কিন্তু আলোচনায় বিশেষ যোগ দিতে পারল না, বেশির ভাগই রইল চুপ করে।

দত্তরা চলে যাবার পর অন্যমনস্ক অশোক জানা আস্তে আস্তে দোতলায় উঠল। অনাদিপ্রসাদ তখন প্রায়-অন্ধকার ছাদে দাঁড়িয়ে। অশোক জানাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কারা যেন এসেছিল, বাইরে মোটর সাইকেল দেখে মনে হল সেই দত্ত, আবার কোন সার্টিফিকেট ছাপার আবদার নাকি?

অশোক জানা সংক্ষেপে মিঃ দত্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলে জিজ্ঞেস করল, এর কি ব্যাখ্যা করবে বন্ধু? অন্যায়ের পথ ধরে গিয়ে ফল হল শুভ. তবে কোনটা আসল, ফলটা না পথটা? দত্ত লোকটাকে ভাল বলব, না খারাপ বলব। আমি জাল সার্টিফিকেট ছাপিয়ে দিয়ে ঠিক করেছি, না অন্যায় করেছি।

অনাদিপ্রসাদ গম্ভীর গলায় বলেন, প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা, তাদের জীবনের প্রতিটি ঘটনাও আলাদা। এর ভাল মন্দের বিচার আলাদা ভাবেই করতে হবে, একটার সংগে আর একটা মিশিয়ে ফেললে কিন্তু আমরা ভুল করব। দত্ত মানুষটা সৎ বলে মিথ্যার আশ্রয় নিলেও সে শুভ ফল পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে মোটেও ভেব না একজন অসৎ লোক ওই মিথ্যার প্রশ্রয় পেলে অন্যাকে প্রতারণা করবে না। আজকের এই মিথ্যের দুনিয়ায় তোমার এই দত্ত একটি ব্যতিক্রম। এদের দেখলে তবু খানিকটা আশা হয়, ভরসা হয়, হয়ত শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির জয় হবে।

অশোক জানা মাথা নাড়ে, কি জানি ভাই, তোমার মত আমি দার্শনিক নই, বড় কথা ভাবতেও পারি না, তাই কেমন যেন ধাঁধা লাগে, কাকে বিশ্বাস করব কাকে করব না, ঠিক বুঝতে পারি না।

অনাদিপ্রসাদের উপদেশ, আমি কি বলি জানো, মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল কিন্তু অবিশ্বাস করে যদি সত্যকে চিনতে না পারি তাহলে যে ক্ষ্যাপার নুড়ি কুড়োনর মত হবে, পরশ পাথর পেয়েও ফেলে দেবে।

অশোক জানা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, অনাদিপ্রসাদ থামিয়ে দেন, এবার যাই গিয়ে লিখতে বসি।

—কথা শুনেই মনে হচ্ছিল তুমি এখনও লেখার রাজ্যে।

—হাঁ, উপন্যাসটা শেষ করতে পারলে তবেই আমার মুক্তি, অনাদিপ্রসাদ যেন স্বগোতোক্তি করেন।

ঘটনাটা ঘটল সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। ওই অঞ্চলেরই কোন এক পানের দোকানে হাজির হয়ে তিনজন লোক আবদার জানাল পঞ্চাশটা টাকা তাদের চাই। বলাই বাহুল্য গরীব পানওয়ালা অযথা সে টাকা দিতে অস্বীকার করল। ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে মিলে সেই পানওয়ালাকে দোকান থেকে রাস্তায় টেনে বার করল, তিনটে ছোরা বার করে মারল তার চোখে, মুখে, বুকে, অস্থানে, কুস্থানে। আর্তনাদ করতে করতে পানওয়ালা রাস্তার মাঝখানে পড়ে ছটফট করতে লাগল। অকুস্থলে পুলিশ আসবার আগেই দুর্বৃত্তেরা উধাও হয়ে গেল। জনতা অদূরে দাঁড়িয়ে নির্বাক বিস্ময়ে এই ভয়াবহ পৈশাচিক দৃশ্য দেখল, কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারল না, সাহস করে এগিয়ে গিয়ে মৃত-প্রায় ব্যক্তিকে কোন রকম সাহায্য করলো না। গোলমাল শুনে অশোক জানার প্রেসের লোকেরাও ঘটনাস্থলে গিয়েছিল, ভয়ে শিউরে উঠে প্রেসে ফিরে এসে কলরব করতে শুরু করে।

অনাদিপ্রসাদ ওপর থেকে সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন। ধীর পদক্ষেপে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, একটা নিরপরাধ লোক খুন হল, অথচ কেউ প্রতিবাদ করতে পারল না।

—কে করবে, তখনও যে পুলিস আসেনি।

—পুলিস কি করবে, অন্যরা তো সেখানে উপস্থিত ছিল।

—ছিল বই কি, অন্তত শ' পাঁচেক লোক, যারা ভয়ে ভয়ে দূর থেকে এই নৃশংস হত্যা দেখছিল।

অনাদিপ্রসাদ চীৎকার করে ওঠেন, তবু তারা বাধা দিতে পারল না, একদিকে পাঁচ শ' লোকের জনতা আর অন্য দিকে তিনজন মাত্র দুর্বৃত্ত, থাকুক ছোরা তাদের হাতে, কিন্তু যদি ওই পাঁচ শো জনের জনতা ইচ্ছে করত তবে কি তিনজন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করতে পারত না।

অশোক জানা বলল, হয়ত পারত, কিন্তু ওদের সাহসে কুলোয়নি।

অনাদিপ্রসাদের সরাসরি প্রশ্ন, তবে ওদের বেঁচে থেকে লাভ কি? ওই যে ক্লীব জনতা, নপুংসক, যারা শুধু মুখে সমালোচনা করে কিন্তু জীবনের সামনা সামনি দাঁড়াতে পারে না, তাদের বেঁচে থাকার কি অধিকার আছে? এরপরও যদি এ অহমিকা থাকে আমরা বাঙালী, আমরা মানুষ, আমাদের থুথু ফেলে ডুবে মরা উচিত। আমরা মিথ্যেবাদী, আমরা শঠ, যেখানে রুখে ওঠা প্রয়োজন সেখানে কিছু না করে আমরা হাজারো রকম শ্লোগান দিয়ে মিছিল বার করি, জিন্দাবাদের ধ্বনি তুলে মানুষকে বধির করে দিই। অথচ সত্যকে আঁকড়ে ধরার সাহস আমাদের হয় না, আমরা নূতন যুগের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছি। আমাদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

প্রেসের সকলে সবিস্ময়ে অনাদিপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই শান্ত মানুষটা হঠাৎ আজ ক্ষেপে উঠেছে। চোখ মুখ উত্তেজনায় রাঙা, থরথর করে কাঁপছে কাঁপতে বলে যায়, মানুষ যখন সাহস হারায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না, তাকে আর মানুষ বলা উচিত নয়। এই বিশ বছরে আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছি। যদি বাঘ সিংহ হতাম তবু ভরসা ছিল, বুঝতাম আমাদের পরাক্রম আছে, কিন্তু হয়েছি শেয়াল, গায়ে শক্তি নেই, শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে বাজিমাৎ করতে চাই।

অনাদিপ্রসাদ পায়চারি করতে করতে হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে বলেন, নিজেদের দেশটাকেও চিনতে পারলাম না, কার দেশ, কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়, তাই ত সুবিধে-বাদী নেতারা দেশটাকে নিয়ে ফাটকাবাজী খেলতে পারছে। ইংরেজরা চলে গেল, দলিল করে দান করে গেল স্বাধীনতা, দেশটা যেন বারোয়ারী সম্পত্তি, কে কতটা ভাগ হাতিয়ে নিতে পারবে তারই চেষ্টা। জাতীয় সংহতির নামে বড় বড় বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কোথায় সংহতি? দিন দিন প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, বিশ বছর ধরে তাদের ইন্ধন যোগান হয়েছে। যে ধর্ম এ দেশের সংহতি এত যুগ ধরে টিকিয়ে রেখেছিল তাকে ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতির হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হল। ভারতের চার কোণে চারটি ধাম, সর্বত্র ছড়ানো একান্ন পীঠ, ভক্তেরা তীর্থ করতে গিয়ে সারা দেশ পরিক্রমা করত। এক জায়গার জল এনে আর এক জায়গায় দিত, তাদের পরিচয় তারা ভক্ত, কে কোন প্রদেশের লোক তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কে কোন ভাষায় কথা বলে তা নিয়ে ঝগড়া করেনি। কিন্তু আজ ভাষা দৈত্য সন্দেহের মত ভারতকেও খণ্ড খণ্ড করে ফেলছে, শুধু বিভেদ আর বিচ্ছেদ, কোথায় সংহতি?

অনাদিপ্রসাদ একটু চুপ করে থেকে যেন নিজের মনেই বলেন, একেই বলে সভ্যতার সংকট। এই সব দুর্লক্ষণ আর সামাজিক ব্যাধি প্রকট হয়ে ওঠে, অন্ধ রাজার রাজত্বেও তাই হয়েছিল। দুঃশাসনের ফলে দেশ-জোড়া তখন অশান্তি। পুরুষ বীর্য হীন, নারী অসতী। রাজনীতি নিয়ে শকুনি তখন পাশা খেলছে। সভ্যতার সেই চরম সংকট এড়াবার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ গুহ্যস্থের উপদেশ দিয়ে-ছিলেন। সেদিনের সেই অশুভ লক্ষণগুলো আজ আবার দেখা দিয়েছে, আবার সেই সংকট, অতএব—

অনাদিপ্রসাদ কথা শেষ করলেন না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, নীচু গলায় বললেন, যাই লেখাটা শেষ করে ফেলি, আর সামান্য বাকি আছে। আজ তোমাদের যা বললাম তাই লেখবার চেষ্টা করছি, তাতে যদি কোন কাজ হয়, যদি আমাদের শুভ বুদ্ধি জাগে।

অনাদিপ্রসাদ উপরে উঠে গেলেন, আলো জ্বালিয়ে লিখতে বসলেন। সে রাত্রে আর কিছু খেলেন না। লেখা শেষ করার জন্যে ভেতর থেকে কে যেন তাগাদা দিচ্ছে, আর দেরী হলে চলবে না, উপন্যাসের পরিণতি টানতে হবে।

অনেক রাত পর্যন্ত অনাদিপ্রসাদের ঘরে আলো জ্বলতে দেখা গেল।

তেমনি আলো জ্বলছিল বাস্তুঘুঘুর বাড়িতে। সেখানেও নিদ্রাবিহীন খেলা চলেছে—রাজনীতির নামে শকুনির পাশা খেলা। একঘর জনপ্রতিনিধি, তারা বাস্তু ঘুঘুর প্রস্তাবে স্বাক্ষর দিচ্ছে।

পাশের ঘরে তীর্থের কাকের মত বসে আছে সাংবাদিকরা। কে আগে খবরটা বার করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা।

কলকাতার বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছে, তারা জানে না গভীর রাতের অন্ধকারে তাদের ভাগ্য নিয়ে জুয়োখেলা চলছে—রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

পরের দিন ভোরবেলা নির্লজ্জ সংবাদপত্রে শকুনির ছবি ছাপা হল—বাস্তুঘুঘু হাসছে, আজ তার জয়জয়কার।

বড় বড় হরফে শিরোনামা, 'সরকারের পতন ঘটল।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পরিকল্পনায় কাটছাঁট এবং কলকাতার উপর প্রতিক্রিয়া

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ঔদাসীন্যের নজির অনেক আছে। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সমস্যাগুলিকে, বিশেষ করে কলকাতা শহরের উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পকে যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে, তা সবাইকে বিস্মিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৬৪ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্যও ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু, পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাটিকে কাটছাঁট করে ৪২৫ কোটি টাকায় দাঁড় করিয়েছেন। বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য ব্যয়ের পরিমাণও ৮০ কোটি টাকা থেকে ৪০ কোটি টাকায়, অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ কমানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ৩০৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। যদিও চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ৪২৫ কোটি টাকা,—কিন্তু জিনিসপত্রের দাম দেড়গুণ বেড়ে যাওয়ায় চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ তৃতীয় পরিকল্পনার চেয়েও কম হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, কলকাতা শহরের উন্নয়ন-সমস্যা যা একটি জাতীয় সমস্যা, ভারতের পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো যে পুরোপুরি কলকাতা শহরের উপর নির্ভরশীল এবং এজন্যই যে শহরটির সর্বাঙ্গীণ উন্নত প্রয়োজন, পরিকল্পনা কমিশন তা বুঝেও বুঝতে চাননি। পরিকল্পনা কমিশনের মতে কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা করলে ভারতের অন্যান্য বড় বড় শহরগুলিও অনুরূপ দাবি তুলবে; সুতরাং কমিশনের মতে কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য যা খরচ করা হবে তার সবটুকু অংশ চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এবং সে খরচের পরিমাণও শতকরা ৫০ ভাগ কমাতে হবে।

আমাদের মনে হয় ৪০ কোটি টাকার প্রকল্পে কলকাতা শহরের সব সমস্যা মিটবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলকাতা মেট্রোপলিটান সংস্থা যৌথভাবে যে ৮০ কোটি টাকার প্রকল্প তৈরী করেছিলেন তাতেও কলকাতা শহরের সব সমস্যা মিটতো না। কলকাতা শহরের এখনি সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যানবাহন সম্পর্কিত। এ প্রসঙ্গে একটি জিনিসের গুরুত্ব অনুধাবন করা দরকার। কলকাতা

মেট্রোপলিটান সংস্থা বারবারই চক্রবেড় রেলপথ স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। চক্রবেড় রেলপথ স্থাপিত হলে খুবই ভাল হয়; কিন্তু চক্রবেড় রেলপথ থেকেও বেশী প্রয়োজনীয় ভূগর্ভস্থিত রেলপথ। যদি এ দুটোর মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে ভূগর্ভস্থিত রেলপথ স্থাপনকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কলকাতা শহরে বাইরের অঞ্চল থেকে যাঁরা আসেন, তাঁদের জন্য প্রয়োজন হলে রেল কর্তৃপক্ষ আরও অধিকসংখ্যক বিদ্যুৎ-চালিত রেল গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস টালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসী, বেহালা থেকে ডালহৌসী, দমদম ও শ্যামবাজার থেকে ডালহৌসী ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে মৃত্যুর ঝুঁকিকে আগলে ধরে যাতায়াত করেন তাঁদের কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন কি? কলকাতা শহরের বাইরে থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের অবস্থার চেয়ে কলকাতা শহরের অধিবাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। হাওড়া এবং শেয়ালদা স্টেশনে যখন অবিশ্রান্ত জনস্রোত কলকাতার আশেপাশের অঞ্চলগুলি থেকে আসেন, তখন তাঁদের ডালহৌসী ও ধর্মতলা অঞ্চলে পোঁছে দেওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে, এবং বর্তমানে তারই অভাব। এই সমস্যার সমাধানের উপায় চক্রবেড় রেল নয়, ভূগর্ভস্থিত রেল। লণ্ডন, প্যারিস, রোম, মস্কো প্রভৃতি বড় বড় ইউরোপীয় শহরে এভাবেই যানবাহন সমস্যার সমাধান করা হয়েছে,—ইউরোপে যদি এভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হতে পারে, তবে কলকাতায়ই বা এ সমস্যার সমাধান কেন হবে না?

আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা কলকাতা শহরের ভাগ্যে এখনও সম্ভব হয়নি। কর্পোরেশনে পৌরপিতাগণ পরস্পরের উপর দোষারোপ করতেই ব্যস্ত। কিন্তু কলকাতায় বড় বড় রাস্তাগুলির উপর নোংরা শৌচাগারগুলির দিকে তাকালে মনে হয়, আমরা কি প্রকৃতই সভ্য সমাজে আছি? কি করে সরকার আশা করেন যে এই দৃশ্য দেখতে বিদেশী পর্যটকগণ এ শহরে বেড়াতে আসবেন এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার্জন বাড়বে? আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদেরই নির্বাচিত পৌরপিতাগণ এদিকে তাকাবার সময় পান না, তবে দেশকে কিভাবে প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় সে সম্পর্কে অবিশ্রান্ত বক্তৃতা প্রদান করার সময় পৌরপিতাদের আছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে হলে পরিকল্পনার আয়তন শতকরা ৩০ ভাগ কমানো উচিত হবে না। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা মনে করেন, এখনও সম্পূর্ণ হতাশ হবার মত অবস্থা আসেনি। তাঁদের মতে, যদি পাঁচটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তবে রাজস্বের পরিমাণ আরও ৭০ কোটি টাকার উপর বাড়ানো যেতে পারে, যথাঃ (১) ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করে, (২) যে সকল জমিতে প্রচুর আয়, তার জন্য নূতনভাবে বাড়তি কর ধার্য করে, (৩) যে জমির উপরে শিল্প কারখানা ও নীচে খনি, তার খাজনা সময়োপযোগী বাড়িয়ে, (৪) নিষ্কর জমির উপর কর ধার্য করে এবং (৫) কলকাতার জমির উপর সময়োপযোগী কর ধার্য করে। এ বছর কৃষিক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। সুতরাং এখনই ভূমি রাজস্ব বাড়ানো এবং যে সকল জমিতে প্রচুর আয় হয়, তার জন্য নূতনভাবে বাড়তি কর ধার্য করা সম্ভব। শোনা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল খুব চেষ্টা করছেন যাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়ানো হয় এবং কলকাতার সমস্যা আলাদাভাবে বিবেচিত হয়: তাঁর প্রচেষ্টা সফল হবে কিনা জানি না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যদি এখনও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকেন এবং কলকাতার উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত ৮০

কোটি টাকা পরিকল্পনা-বহির্ভূত আলাদা ব্যয় হিসাবে বরাদ্দ না করেন, তবে দেশের পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক সংকট ত্বরান্বিত করবেন। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বার্থেই কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে হবে। কলকাতা বন্দরের স্বার্থেই গঙ্গার বুক থেকে পলি-মাটি সরবার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু তৈরী করতে হবে, হলদিয়া বন্দরের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে এবং সর্বোপরি কলকাতা শহরকে বাসোপযোগী করে কলকাতা শহরের অধিবাসীদের সুস্থভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের সুযোগ করে দিতে হবে। এই দাবি প্রাদেশিকতার উপর ভিত্তিশীল নয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় শ্রীবৃদ্ধিকল্পেই এই প্রস্তাব: এটা গৃহীত হলে দেশেরই উন্নতি। কলকাতা শহরের ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি বড় অংশ এখন অবাঙ্গালীদেরই নিয়ন্ত্রণে: তাঁদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বার্থেও কলকাতা শহরের পুনর্গঠন প্রয়োজন। কারণ কলকাতা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই শহর নয়—এ শহর ভারতের গৌরব, এর সমস্যা জাতীয় সমস্যা।
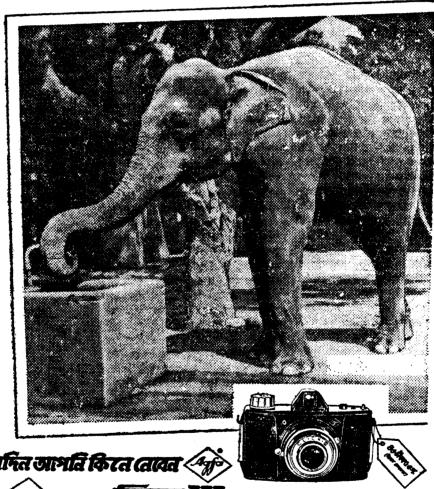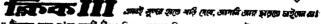
সুব্রত গুপ্ত

সতেরো
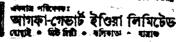
বড় বৌদির কি আনন্দ। তার বিয়েতে ছিল নিতবর। সেই কুবেরের আজ ভিত্‌পুজো। বড়দা আসতে পারেনি। কদমপুরের জানাশুনোর মধ্যে নয়ানের বাবা কান্তবাবু এসেছেন। কিন্তু ব্রজদা বা আভা বৌদি কাউকেই বলা যায়নি। এখানকার সবাই ব্রজদাকে এমন সন্দেহের চোখে দেখে। আসলে লোকটার কোন মানে করতে না-পেরে এই অবস্থা হয়।

বিয়ে হয়ে এসে ইস্তক মা সালকের ওই বাড়িতেই একটানা দীর্ঘদিন রয়েছে। কলকাতার বাইরে এসে খাল, খোলা মাঠ, গাছপালা সবকিছু দেখে ভীষণ খুশি। বুলুকে নিয়ে পুজোর গর্তের চারদিকে ঘুরে কুবের একখানা ইট বসিয়েছিল ভেতরে। এখানে কুবেরের বাড়ি হবে। বুলু আস্তে ঘুরছিল। অল্পদিন পরেই বাচ্চা হওয়ার তারিখ। এই 'হবে' কথাটার কতখানি সুখ। ভিত্ পুজোর পর সবাই সালকে ফিরে চলল। বহুকাল পরে দেবেন্দ্রলাল কিছু কথা বলে ফেলল অল্প সময়ে।

যেমন—'ইলেকট্রিক ট্রেনে বেশি সময় ত লাগল না। কদ্দিন চালু হয়েছে এ-লাইনে?'

কুবের বলল, 'মাস দুই। আগের চেয়ে এখন প্রায় অর্ধেক সময় লাগে।'

'সালকের ওই বাড়িতে আমার জন্ম। তোমাদের জন্ম। ওপাড়া ছেড়ে আসতে পারবে ত? ভেবে দেখো বাবা। শেষে ঝোঁকের মাথায় ঘরবাড়ি বানিয়ে টাকাগুলো মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে ফিরে এসো না।'

বাবা অল্প বয়স থেকে ভীষণ সামলে চলতে শিখেছে। বাবার তো ভীতু হওয়ার কোন দরকার নেই। থাকার একটা পৈতৃক আস্তানা আছে—ছেলেরা চাকরিতে। তবু। কুবের এই মানুষটার কাছে নিশ্চিন্ত একটা ছবি তুলে ধরার জন্যে বলল, 'যায় যাবে—আবার নতুন টাকা আসবে।'.

অফিসটাইমের পরের ট্রেন। লোক বলতে নেই। ফার্স্ট ক্লাশের ভেতরটার মন-ভুলানো রঙ্। মাঠে ধান কাটছে। এসব স্লিপ করে ট্রেনটা যেভাবে যাচ্ছে. মনে হবে পাতালের রাস্তা। একটুও আটকাচ্ছে না কোথাও।

দেবেন্দ্রলাল জানতে চাইল, শান্ত গলায়. 'তোমার কত টাকা?'

'কত হতে পারে?'

'আমার কোন আন্দাজ নেই। আমি জীবনে টাকার মুখ বেশি দেখি নি। তোমাদের গর্ভধারিণীর সেজন্যে দুঃখ ছিল অনেক দিন—'

কোণের জানলায় মা, বড় বৌদি. বুলু কেউ কারও কথা শুনছে না। সবাই এক-সঙ্গে বক বকম করে সুখের কথা. স্বপ্নের কথা বলে যাচ্ছে। কুবেরকে দেখেই মা বলে উঠল. 'এক কাঠা জায়গা দিবি আমাকে। পালম বুনবো—'

মুখে বলল, 'বেশ তো। তোমার যেখানে ইচ্ছে—যতখানি ইচ্ছে জায়গায় পালম, ঢেঁড়শ যা ইচ্ছে হয় কর।' মনে মনে খুব হাসি পেল। আমি কুবের সাধুখাঁ। ওয়ান-টাইম ভ্যাগাবন্ড। এখন আমি ড্রিম মারচেন্ট। এবেলা ওবেলা স্বপ্ন বিক্রি করি। স্বপ্ন ছাড়া কি। পাঁচ কাঠায় বিরাট বাড়ি হয়েও অনেকটা খোলামেলা জায়গা থাকে। একটা ঘেরা বারান্দা করবেন দক্ষিণমুখো। দিনে বসবেন, রাতে শোয়া যাবে। এমন কত কি বলতে হয়। কলকাতার এত কাছে কেউ এই দামে জায়গা দিতে পারবে না। ভেতরে দেখুন ষোল ফুট চওড়া রাস্তা রাখতে গিয়ে কতটা জায়গা ছাড়তে হয়েছে। এখানে একদিন লোকালিটি হলে বেশ ছিমছাম একটা পাড়া গজিয়ে উঠবে।

মা হয়ে তুমি মাত্র এককাঠা জায়গা চাও। হরিরাম সাধুখাঁ বাড়ির বৌ তুমি। এসবই তো তোমার মা। এত অল্পে খুশি হবে জানলে আমি আরও কত কি ব্যবস্থা করতে পারি তা তুমি জান না মা। আমার পাঞ্জাবীর ইনসাইড পকেটে এখন আটত্রিশ হাজার টাকার একখানা চেক আছে। জমা দেওয়ার দেরি শুধু। দুদিনের মধ্যে আমার নামেই টাকাটা ক্যাশ হয়ে যাবে।

কুবের দেবেন্দ্রলালকে বলল, 'আমারও কোন আন্দাজ ছিল না বাবা। বড়দার পরে তুমি আর কোন ছেলের কুষ্ঠি করাওনি। তাহলে জানতে পারতাম কোন্ রাশি কোন্ নক্ষত্রে আমার জন্ম। যে-গণৎকারকেই হাত দেখাতে চাই—সেই বলে কি রাশি কি নক্ষত্র? কিছুই জানিনে। অথচ দেখ কেমন আন্দাজে টাকা আসে—আসতেই থাকে—আসার কোন মানে বুঝিনে—'

দেবেন্দ্রলালের মনে হল. কুবেরের মনের মধ্যে কোথায় একটা কষ্ট আছে।

এক এক সময় এমন বিপদে পড়ি—ঝুঁকি নিয়ে এমন সব জায়গা কিনে ফেলি. বিক্রি না হলে ডুবে গেলাম। ঠিক বিক্রি হয়ে যায় বাবা। যখন চেষ্টা করি—তখন হয় না। যখন হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি তখন সেধে বাড়ি এসে লোকে টাকা দিয়ে কিনে নেয়। ভাল জিনিস সেধে দিলে—নেবে না। খারাপ জিনিস নিয়ে গুমোর করে বসে থাক—পড়িমড়ি করে সবাই কিনতে ছুটে আসবে।'

সরু পিয়াসল ছাড়তেই দেবেন্দ্রলাল জানতে চাইল, 'তোমার কিসের দুঃখ কুবের—'

সোজা বাবার দিকে তাকাল। কুবেরের এই শরীর এই মানুষটার দান। গুরু-গম্ভীর শান্ত প্রলেপে মাখানো মুখ নিয়ে দেবেন্দ্রলালও তাকে দেখছে।

দুঃখের কথা অনেক। কটা বলা যায়।

কারখানায় ঢুকেছিল নব্বই টাকায়। ঘসাঘসিতে বাড়তে বাড়তে সেটা প্রায় ভদ্র চেহারা পেতে পেতে কুবেরের অনেক জিনিসে স্বাদ কমে গেছে।

এই যে এখন টাকা আসে, এসে পুরনো হয়ে যায়. আবার নতুন টাকা আসে—বেশ লাগে। কিন্তু কত অল্প টাকাতেই লোক কেমন গরীবের মত করুণ আভা ছড়িয়ে হাসে। তখন এত কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। ছাপ মারা এইসব কাগজের টুকরো কত-দূর আর দেবে! আমরা তো এসব চাইনি।

তুমি কতদিন কারখানায় যাও না। সেখানকার কাজ আছে না গেছে—তা এক-

যার দেখ। থাকলে ভাল। তাহলে এত ঝ'্কি নিয়ে ঝামেলায় না-জড়িয়ে ঝরঝরে জীবন কাটাও। খ্ব বড়লোক হওয়ার দরকার কি।'

কুবের হাসল। আর পিছোনোর উপায় নেই। প্ল্যান হয়ে গেছে—এবারে গে'থে তুলতে হবে বাড়িটা। নতুন নতুন জায়গায় খবর আসছে। সস্তায় প্কুর। ভদ্রেশ্বর বলেছিল, 'হোমড়াপলতার ওদিকে জায়গা রাখবেন? বিঘেতে কাহন কাহন ধান হয়। কোন রকমে চষে চারা গ'্জে দিলেই মোটা মোটা গোছ বসে যায়।' ব্যাপারটা মন্দ না। মাথা গোঁজার জন্যে একেবারে নিজের একটা বাড়ি—সম্বচ্ছরের ধান—সে ষোল আনা নিশ্চিন্ত।

যেসব লোক প্রায়ই দেশপ্রেম, ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে পটাপট কথা বলে যায়—কিংবা টাকা আছে বলে ম্খখানা তেলো-হাঁড়ি করে বসে থাকে—তাদের সবাইকে কুবেরের একটা প্রশ্নই করতে ইচ্ছে করে, তা হল, 'মশাইর দাম কত? মানে আপনি, আপনার বক্‌বক্‌, টাকা পয়সা, বিদ্যে-ব্দ্ধি, সম্পত্তি সমেত আপনার বাজার দর কত? আপনি যে-দাম বলবেন, তাতেই

আমি রাজি। তবে দাম মিটিয়ে দেওয়ার পর জামাকাপড় খুলে সব কিছু রেখে দিয়ে নিঃশব্দে ভবসাগরে মিশে যেতে হবে আপনাকে।'

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে। বাড়িটা হয়ে গেলে তাদের কয়েকজনকে ডেকে এনে দেখাতে হবে।

মা বলল, 'বড় দুঃখ ছিল—আমাদের কারও একেবারে নিজের একখানা ঘর নেই—একটু যে বসব, একা একা থাকব তার উপায় নেই—তুই একটা ভাল বসার ঘর করিস—'. কি মনে হতে মা বলল, 'পাঁজা করে ইট পোড়ালে বংশ লোপ পায়। আর বাড়ি করে মাটি কামড়ালে মা বসুন্ধরা এক কামড়ে কাউকে না কাউকে তুলে নেয়। সাবধানে থাকিস। আমার বাবার দালান সংস্কারের সময় নতুন পুকুরে আমাদের এক বোন ডুবে মারা গেল। সে পঞ্চাশ বছর আগের কথা—'

বলু, ইলেকট্রিক ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সাবধানে বসল। এবারের বাচ্চায় কুবেরের খুব ইচ্ছে ছিল না। লক্ষ্মীপুজোর কোজাগরীর রাতে নাইট ডিউটি থেকে আচমকা এসে পড়েছিল কুবের। নিশুতি রাত। ঘুমন্ত বলু। ছেলের জন্যে ও একটা খেলুড়ে চায়। সেজন্যে পেটে ধরাতেও আপত্তি নেই। বরং ভীষণ ঝোঁক। কুবের অনেকবার এড়িয়ে গেছে। সময় মত অংক কষে সরে এসেছে।

কয়েকদিন বহরিডাঙা রেজিস্ট্রি অফিসে কেটেছে। রাতে ফার্নেসের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর গাঁয়ে লক্ষ্মীপুজোর শঙ্খ শুনেছে। কোথাও নিজেকে একেবারে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে মাঝরাতে কুবের এলিয়ে পড়েছিল। সেই সময় এই কাণ্ডটি ঘটে।

'আমি আর কারখানায় যাব না বাবা।'

'চাকরি নেই?'

'তা নয়। খুব আছে। সেজন্যেই যাব না।'

আর বলতে পারল না কুবের। কারখানা জিনিসটা তার বড় কাঁচা লাগে। পাড়ায় স্টেজ বেঁধে থিয়েটারের মত। কিছুকাল পরে উঠে যাবেই। অথচ জায়গা জমি জায়গারটা জায়গায় থাকে। লোকজন আসে যায়—আবার মরে হেজেও যায়। অথচ সেই জায়গা আগের মতই ধান দেয়, মাটি হয়, জল দেয়—কত বিশ্বাসী। এখন এক টুকরো বেচলেই কুবেরের এক বছরের মাইনে।

'এতদিনের কাজ ছেড়ে দেবে?'

দেবেন্দ্রলাল ঝুঁকি নিতে বড় ভয় পায়। কুবেরের বড় ভাই অনেককাল চাকরি করে। সময়ে অফিস যেতে খুব ভালবাসে। ডিসিপ্লিন, পাংচুয়ালিটি—এসব কথা তার কাছে বাংলা হয়ে গেছে।

'আমার ভাল লাগে না বাবা। আমি আর পারি না।'

'কি পার না?'

'সব বুঝিয়ে বলা যায় না। কত জায়গায়

আমাদের বংশের হরিরাম সাধুখাঁ তো কম করে যান নি

জিনিসপত্র একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে ইস্পাত তৈরি হয়, ইস্পাত জল হয়ে ফোটে। অথচ যারা তৈরি করে— তারা শুধু ইনক্রিমেন্ট, অ্যালাউন্স নয়ত বোনাসের হিসেব করে করে মরে। চাকরিতে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে উঠতে কত লোকের বুকের ভেতর আশা-নিরাশার ঢেউ উঠতে দেখেছে কুবের। বৃষ্টি, আলো, মাটির নীচের রাঙালু, ইত্যাদি ভগবানের জিনিস—ভগবানের দান। আন্দাজে তাই মনে হয় কুবেরের। কেউ প্রোমোশন পেয়ে ঠিক সেরকম পাওয়ার ভাব করলে কুবেরের ঘেন্না লাগে। সবই তো সেই টাকা। অল্প টাকা, বেশি টাকা, আরও বেশি টাকা।

এই যে লোকটি তার সামনে বসে—নাম দেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁ—একদা ইনি কত সুন্দর ছিলেন। কেমন একটা ভাব মেশানো মুখ। হাতে টাকা থাকলে, বেশি টাকা থাকলে দেবেন্দ্রলালকে স্টিমারঘাটায় কাজ নিতে হত না। বিশ্রাম, নিরুদ্বেগ জীবন হলে ওই সব দাগ পড়ত না কপালে।

'অত অল্প টাকায় আমি আর পারি না বাবা—'

'হাত বড় হয়ে গেছে। কিন্তু যেদিন আর টাকা আসবে না কুবের—তখন? তখন তুমি কি করবে?'

'সেজন্যেই তো লোকে বিষয়-আশয় করে—' খারাপ সময়ে বিষয় থাকলে আশ্রয়ের চিন্তা থাকে না। বিষয় মানুষকে দেখে—আশ্রয় দেয়।'

'আমাদের বংশের হরিরাম সাধুখাঁ তো কম করে যাননি। আমাদের বুড়ো ঠাকুরদা-দের একজন শেষ বয়সে রাস্তায় মরেন। বিষয় তাঁর বিষ হয়েছিল।'

'বয়সকালে সাবধান হলে বিপদ নেই।'

'তুমি তো সাবধান নও কুবের—'

'এখন কেন সাবধান হব বাবা। সময় হলেই কসাস হয়ে যাব—'

'তা কেউ বুঝতে পারে না কুবের। কখন যে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তখনও তুমি ভাবছো—এই বুঝি আসে, ওই এল। মাথা খুঁড়ে মাচ্ছ—তবু আর আসে না। যা সব করবে বলে ফেলে রেখেছিলে, তার সবটাই তখন বাকি। তখন টাকা না থাকলে মাথা দুলে ওঠে।'

'তুমি এসব জানলে কোত্থেকে?'

'তোমাদের বয়সে কাজে ঢুকে এক আরমেনি সাহেব দেখেছিলাম। আজ বার্জ কিনছে, কাল লঞ্চ কিনছে, পরশু রিভার-রুটে পারমিট বের করছে—সেই সস্তার আমলেও ছোকরার টাকা রাখবার জায়গার টান পড়ত। মাঠে ঘাটে পয়সা উড়িয়ে বেড়াত। শেষে যেদিন টান পড়ল—অগস্ত্য চুমুকে সমুদ্র শেষ। অনেক দিন বেঁচে ছিল। খুব কষ্ট পেয়ে মারা যায় শেষ অব্দি।'

কুবের বুঝিয়ে বলতে পারত। বলু, মা বড়বউদি, নগেন, বিপিন, ওদের বউরা কিংবা বাবা—কেউ বোঝে না কি করে কুবেরের টাকা আসে। বড়দা কুবেরের জন্যে চিন্তা করে। পাছে এই সুসময়ে তার কেউ ক্ষতি করে দেয়। নগেন ভাবে, তার দাদা কুবের না কোনদিন বিপদে জড়িয়ে পড়ে। এদের বোঝায় কি করে—দু' হাজার ফুট ফ্রনটেজ কিনে তার পেছনে অন্তত তিন শো বিঘে জায়গায় যাওয়ার রাস্তা তার হাতের মুঠোয়। গুপ্তরায় মশায় মাপামাপি করে ম্যাপ বানিয়েছেন। এখন খদ্দের এলেই ম্যাপ মেলে দিয়ে বসে কুবের কথা বলে। এই যে দেখছেন সোজা লাইন গেছে—এটা হল ওই খাল। এই হল খালপাড়। আমাদের মেইন রোড। জিনিসের দাম কমে না, লোক কমে না। যে আসবে তাকেই জায়গা দিতে পারবে কুবের। খালপাড়ে দাঁড়িয়ে এখন বলতে পারে—কোন জায়গাটা চাই আপনার? পূব-দক্ষিণে? ওই শিমুলগাছটার পাশে? ওখানে দর একটু

চড়া—আপনার কিছু বেশি পড়বে। তবে সারাজীবন পুবে রোদ দক্ষিণের হাওয়া পাবেন। কেউ আটকাতে পারবে না।

দেবেন্দ্রলাল বলল, 'ইদানীং জায়গা জমি বাড়ি ঘর করাও বিপদ। চারদিকে হায় হায় নেই নেই। এর মধ্যে এসবে কেমন অস্বস্তি লাগে—'

'আমারও লাগে বাবা। কিন্তু—'

খানিক পরেই শেয়ালদা। লাইনের দু পাশে কত ঘরবাড়ি উঠছে।

'কিন্তু কি কুবের?'

'তাই বলে কি লোকে জায়গা জমি ঘর-বাড়ি করবে না?' নয়ানের বাবা কান্তবাবু বলেন—দাপটে না থাকলে বিষয়আশয় থাকে না। বিষয় আশয়ের জন্যে আমি? না, আমার জন্যে বিষয়আশয়? ক্রুতরকম ফেরে পড়া যায় রে বাবা! ভবেন শী তো বিষয়-সম্পত্তির আড়ৎ।

'নিশ্চয় করবে। একশোবার করবে। তুমি আমার ছেলে কুবের। তোমাকে একটা কথা বলি। খুব বড়লোক আমাদের হওয়ার দরকার কি? এই ত বেশ আছি। যা এমনি এসে যায় তাতেই খুশি থাক।'

কুবের তো তাই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু হরিরাম সাধুখাঁর সালকের ভদ্রাসনে ভাগাভাগি করে যেটুকু দেবেন্দ্রলালের ভাগে পড়েছে, তাতে এতজন একসঙ্গে থাকলে চলাফেরা করাই মুশকিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে পিঠ ব্যথা করত। এক কাতে ঠাসাঠাসির মধ্যে সারারাত পড়ে থাকলে গা ব্যথা হবেই। আজ মা কতখানি আনন্দ করে কুবেরের জায়গার ওপর চলেফিরে বেড়াচ্ছিল। মা সবকিছুতে গলা ডুবিয়ে ভাবতে ভালবাসে না। সে জানে ছেলের ব্যবসায় সব হচ্ছে।

শেয়ালদায় নেমে বড়বউদি, মা, বুসু, দরদাম করে হরেক জিনিস কিনে ফেলল। দেবেন্দ্রলাল একখানা দা কিনতে বলল কুবেরকে। কয়লা ভাঙতে গিয়ে হাত দা-খানা অনেকদিন ভোঁতা হাতুড়ির চেহারা নিয়েছে। ডাব কাটতে হলে বড় অসুবিধে হয়। অতএব একখানা দা কিনল কুবের।

ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বুলুকে নানা অঙ্গভঙ্গী করে ভেতরে ঢুকতে হল। আর কিছু দিন পরেই হাসপাতালে যেতে হবে। বড়বউদির সুখ ধরে না। পরিষ্কার জানতে চাইল, 'এসব করলি কি করে কুবের?'

কুবের নিজের কপালে টোকা দিয়ে দেখাল।

বুলু ফোঁস করে উঠল, 'আমি কিছু নই না? তখন পই পই করে বলেছিলাম বলেই তো তুমি লেগে পড়ে থাকলে। নয়ত কবে সব টাকা ফুটিয়ে বসে থাকতে—'

বউর জন্যে কুবেরের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু ইদানীং বুলুর দিকে তাকালে কুবেরের বার বার মনে হয়—বুলু মূর্তিমতী প্রতিবন্ধক। বড় সাইজের কোন ঝুঁকি নিতে গেলে ভয় হয়। ভরাডুবি হলে এই মেয়ে-

তখন পই পই করে বলেছিলাম বলেই তো তুমি লেগে পড়ে থাকলে

লোকটি ভাসবে। কোথায় তাকে খানিকটা রিলিফ দিয়ে ইচ্ছে মত কাজ কারবারে এগোতে দেবে—তা নয়, ঠিক এই সময় ফিরে মা হয়ে বসল।

কোমপানির পুরনো ভেড়ি বরাবর চরভরাটি একশো বিঘে জায়গা এক লপ্তে—বন্দোবস্ত পেয়েছিল। কপাল ঠুকে চাষবাসে লাগলে খানের মত ধান করা যেত। বস্তা যাচ্ছে নব্বই টাকা। এক মরসুমেই তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা উঠে আসতো। বুলু সেসবে যেতে দেবে না। চরের জায়গায় ধান যেমন, লাঠালাঠিও তেমন। তার ওপর ধানের লোভ বড় লোভ। কে কোথায় চোরাগোপ্তা মেরে দেবে। বুলুর সবটাতেই ভয়। কুবের আঁচলে ধাকার প্রদীপ নয়। এই জিনিসটা বুলু বোঝে না।

'তোর জন্যে কত চিন্তা ছিল। মা আপনি তো সবসময় এই ছেলের জন্যে সিঁড়ি চড়িয়েই বসে থাকতেন। এখন দেখুন!'

বড়বউদির কথায় মা খুব খানিক হাসল। কুবেরের কোন কিছুই সহজে হয় না। খুব ঘসতে হয়। কদমপুরেই তাকে কতবার আসতে হয়েছে। এখন এ-তল্লাট সব তার জানা হয়ে গেছে। হোমড়া পলতার ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের ধার দিয়ে বিধবার সম্পত্তি কিছু পাওয়া গেছে। বয়সকালে আবাদে কেন কার বউ ছিল। তখন হোমড়া পলতার শক্তসমর্থ একজনের রাখনি হয়ে চলে এসেছিল। লোকটা খুব ভালবাসতো এই ভাগানো আবাদে বউকে মরার আগে সব লিখে দিয়ে গিয়ে-ছিল লোকটা। এখন তার আগের পক্ষের নাতিরা কোর্ট কাছারি করছে। তাদের কথা—এই বিধবা তাদের দাদুর বিয়ে করা বউ নয়। মাগী অন্যের বিধবা। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। অতএব হটাও। এ সম্পত্তির হক্ তাদেরই। কিন্তু দলিল তা বলে না। কাগজ বিধবার দিকেই। পরচা, দাখিলা সব এখন কুবেরের কাছে। জায়গাটা জলের দরে হাতে আসবে ঠিকই। কিন্তু দখল নিতে কিছু ঝক্কি পোয়াতে হবে। কুবের সাধুখাঁর চোখে সারা দুনিয়াটা এখন একটা মোজা মাত্র।

হাতের আঙুল ছাড়িয়ে এখন সেই কালো জরুচেগুলো কব্জিতে গেড়ে বসেছে। সারা গায়ের রঙ আগের চেয়ে অনেক কালো হয়ে গেছে। শুধু কুবের খুব নিষ্পাপ চোখে, এই মাত্র ফুটে ওঠা ফুলের কায়দায় বুলুর দিকে তাকালো। কদমপুরে শুনেছে, শিষ বেরোনোর আগে ধানগাছে থোড় আসে। নয়ান বলছিল, গর্ভ হয়। তখন ঘন সবুজে ধানের মাঠ কালো মেঘ করে আসে। বুলুও তেমন ভরে আছে মাসখানেক। কুবেরের শিরদাঁড়া অব্দি কি এক কাঁপুনিতে শির শির করে উঠল। সনতের সঙ্গে সেবারে ঘোলাডাঙার যদি না যেত। শরীরের ভেতরে কোথায় যে কি হয়ে আছে। ভাল করে দেখাতেও ভয় হয়। কি বেরিয়ে পড়বে শেষে কে জানে। হরি ডাক্তারের চিকিৎসার সময় এত ওষুধপত্রই ছিল না। কোথায় গোঁজামিল দিয়ে রেখেছে কে জানে। কিছু দিন হল চলে ফিরে বেড়ানোর সময় কুবেরের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বাতাস যাতায়াত করে—মজ্জা নেই কোন সেখানে, শুকিয়ে গেছে—দৌড়লে তাই ভেতরকার হাড়ের চাকতিগুলো তেলের অভাবে খট্ খট্ করে আওয়াজ করে ওঠে। এমন একটা গভীর সন্দেহ কুবেরের মনের মধ্যে অনেক কাল ধরে পাক খাচ্ছে।

ঠিক এই সময় আর একটি বাচ্চা। বুলু শুধু খুব নরম গলায় বলল, তুমি কি বলবে বলেছিলে—কি একটা এক্সপিরিয়েন্স—খুব স্যাড্—'

ক্রমশ

ইংরিজি ! ইংরিজি !

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজির ছাত্র হ'য়ে ঢুকেছিলাম। সেখানে আমার ছাত্রত্বকালে আমি অনবরত উপলব্ধি ক'রেছি যে, ইংরেজদের স্মৃতি কালানুপাতে যতই দূরের হয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রতি আমাদের দাস মনোভাব বিস্ময়করভাবে ক্রমবর্ধমান—বিস্ময়কর, কেননা স্বাভাবিক ছিল এই মনোবৃত্তি স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে ক্রমক্ষীয়মাণ রূপ নেবে।

পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোঁরাগুলো সন্ধ্যের দিকে ভরে যায়, বহু ছেলেমেয়ে ফক্স-ট্রট, চা চা চা, শেক, টুইস্ট করছে—ছেলেরা চুল ফেলে নিজেদের বলছে ক্যালকাটা বীটলস, আইসক্রিম কোন এক হাতে আর অন্য হাতে কোকা-কোলা নিয়ে ০০৭-এর দিকে যেতে যেতে তরুণীরা ভেবে ফেলছে এ রাস্তা পিকাডেলি বা টাইমস স্কোয়্যার, এ সব নকল তো আছেই, কিন্তু সেটা আমার সমালোচনার বিষয় নয়, এই পাশ্চাত্যপ্রভাব পৃথিবীর সব দেশেই আসছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা একটু বীটল সেজে ইংরিজি গান যদি গায় সেতো স্বাস্থ্যের লক্ষণ, ফূর্তি হয় যাতে তাই করা উচিত তরুণ-তরুণীদের; আমার প্রতিবাদ সেইসব ব্যক্তি, সংস্থা এবং পরিবারের বিরুদ্ধে যাঁরা যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধি-শিক্ষা দ্বারা নিজের ভাষাকে ভুলে যেতে চাইছেন, আমার সমালোচনা সেইসব ইংরিজি বিভাগের মাস্টার মশাইদের বিরুদ্ধে যাঁরা তাঁদের ছাত্রদের অবহেলা করতে শেখান নিজের ভাষার সাহিত্যকে, সেইসব লেখকের বিরুদ্ধে—যাঁরা মনে করেন ভারতীয় সাহিত্য নানা ভারতীয় ভাষায় রচিত না হ'য়ে ইংরিজি ভাষায় হওয়া উচিত, যাঁরা মনে করেন ইংরিজি একটি ভারতীয় ভাষা, এবং ভারতীয় ভাষাগুলো দুর্বল ও আঞ্চলিক। আমাদের সমাজের যারা নিয়ন্ত্রক, সমাজের মগডালে, সেইসব আই সি এস, ব্যারিস্টার অক্সফোর্ড-প্রত্যাগত অধ্যাপক, ইন্দো-অ্যাংলিয়ান লেখকগোষ্ঠী, তাঁরাই আসলে এই দাসত্বের স্মৃতির রক্ষক এবং স্বাধীনতার বৃহত্তম শত্রু, এ'রাই সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রক ও পৃষ্ঠপোষক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে আমি মাঝে মাঝেই এই উপলব্ধির দ্বারা পীড়িত হতুম যে এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা হতেন বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, ইংরিজি সাহিত্য পঠিত হ'ত বিদেশী সাহিত্য হিসেবে এবং তার অধ্যয়নের কারণ ছিল বাংলা ভাষার এবং সংস্কৃতির বিশ্বসাহিত্যে কোনখানে স্থান, তাই নিরূপণ করা—পরাধীন দেশ ছিল তখন, আমরা তখন সত্যিই নিয়ন্ত্রিত ছিলুম ইংরেজদের দ্বারা, তথাপি কোনো ইংরিজি সাহিত্যের ছেলে এই কথা ভেবে বসেনি সে ইংরিজি পড়ছে কারণ তার নিজের সাহিত্যে কিছু নেই, নিজের সংস্কৃতির ইতিহাস শুষ্ক মরুভূমি—সে বিদেশী সাহিত্য পড়তে উৎসুক নিজেকে আরো ভালোভাবে জানবার জন্যই—ইংরেজরা কুড়ি বছর হ'ল চলে গেছে, দেশ এখন কুড়ি বছর ধরে স্বাধীন, কিন্তু বাংলা দেশে ইংরিজিয়ানা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

যে কোনো জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল ভিত্তি তার ভাষা। অন্যদিকে হয়তো সেই ভাষার প্রতি ক্রমশ অশ্রদ্ধা সেই জাতির অবক্ষয়ের চিহ্ন। বাঙালী জাতীর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যাবে না যে তার ভাষার প্রতি বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য রয়েছে, আমরা এইটুকু বলতে পারি শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বাহক যারা তার একটি অংশে সত্যই ঘুণ ধরেছে, সেই অংশ অবক্ষয়ের পথে। এইটুকু বলেই যদি শেষ করতে পারতুম তাহলে ল্যাঠা চুকে যেত, বলতে পারতুম ওহে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, ওহে ইংরেজ পূজারী, ওহে ইংরিজি ভাষার ভারতীয় লেখক, তোমরা ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে মিলিয়ে যাবে, তোমরা ইংরেজ আগমনের একটি সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা, কিন্তু এত সহজে এ'দের অবহেলা করে ছাড়া যাচ্ছে না কারণ এই অশিক্ষিত দেশে এ'রাই নিয়ন্ত্রক এবং প্রভাবশালী, এবং প্রভাবশালী বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ক্লাসে, চাকরির ইন্টারভ্যুতে, এদের প্রতিনিধিরাই সুবিধেভোগী—এ'দের মত না হ'তে পারলে তোমার আমার স্থান নেই! আমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি ক্লাসে সামান্য কয়েকটি ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা থেকেও এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

আমি যে ক্লাসে পড়তুম সেখানকার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫০-এরও অধিক, কলকাতার বাইরে থেকেও অনেক ছেলেমেয়ে পড়তে আসত, বিষয় ছিল ইংরিজি সাহিত্য। আমি লক্ষ করতাম কলকাতার এই বিশালকায় ছাত্র সমাবেশে এক ধরনের শ্রেণী বিভাগ বিরাজমান, কিন্তু কোনো শ্রেণী সংগ্রাম নেই, অবস্থা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, কারণ সুবিধাভোগী যে তিরিশ চল্লিশটি ছেলেমেয়ে তাদের বাকিরা দূর থেকে কিছুটা সম্ভ্রম ক'রেই চলে। এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশটি ছেলেমেয়েদের ঠিক করা থাকত বেঞ্চ, তারা

পরস্পরের সঙ্গেই কথাবার্তা ভাব বিনিময় করত, অন্যদের প্রতি প্রচুর অবজ্ঞা। এই ছেলেমেয়েরা প্রধানত তিনটি কলেজ থেকে এসেছে, প্রেসিডেন্সি, লোরেটো, সেণ্ট-জেভিয়ার্স। এদের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল ধীরে ধীরে, মোটামুটি সবাই বাঙালী, কয়েকজন বাংলা একেবারেই বলতে রাজি নয়, আর অন্যরা বাংলা বলতে জোর করলে বাংরেজি বলে। দিন কত যায় লক্ষ করলুম এদের মধ্যেই পরীক্ষায় প্রথম কৃতীজন হবে, মাস্টারমশাইদের এরাই প্রিয়, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, গলসওয়ার্দি এদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, কেউ কেউ মাঝে মাঝে কীটস আউড়ে ফেলে, রিউপার্ট ব্রুক কিংবা আর্থার হিউ ক্লাফ কিংবা ম্যাথ্যু আর্নল্ড এদের কণ্ঠস্থ। এদের একজনকে একদিন আমি জিগেস করলুম বাংলা সাহিত্যের কথা, জানলাম 'Tagore' বিষয়ে এরা কিঞ্চিৎ উৎসাহী এবং প্রত্যেকেই ইংরেজি ভাষায় গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি অবশ্য পাঠ করেছে। একজনকে একটু ওয়াকিবহাল পাওয়া গেল, সে আমাকে জিগেস করল, "I hear some Manik Banerji has written an interesting story in

an anthology of Asian short-stories; my ছোট ভাই is a great fan of Bengali literature",

তখন একটি সুন্দরী প্রেসিডেন্সি তনয়া ফুট কাটে—

I know of another one, Mr. Lal has brought out a short volume of translations from, I forget the name, some Das's poems, very interesting. I flicked through the poems, nice। তখন তৃতীয়জন বলে ফেলে, "Mouli, what do you think of the Indo-Anglian writers, don't you think people should write English, since English is the international language now?"

—এদের সংগে আমি বিশেষ তর্কে প্রবৃত্ত হই না শুধু বললুম তোমাদের সমস্যাটা নিয়ে আমি একটু তোমাদের পিতামাতার সংগে একদিন কথা বলতে চাই।

বছর খানেক কেটে গেলে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করলুম ক্লাসের "অবহেলিত" ছাত্র শ্রেণীর মধ্যে, তাদের অনেকেই, যাদের প্রথম দিকে দেখলুম বাংলায় দেশজ ভাষায় জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, ক্লাসে নিয়ে আসছে উল্টোরথ জলসা, তারা অনেকেই পরস্পরের মধ্যে খুব ইংরিজি প্র্যাকটিস করে এবং সেইসব লোরেটো সেন্টজেভিয়ার্সের ফিরিঙ্গি ইডিয়ম ও স্ল্যাং প্রয়োগে ব্যস্ত (অনেক সময়ই যা ঠিক জায়গায় লাগে না) যেগুলো অনবরত ব্যবহৃত হ'তে শুনেছি সেইসব কলেজ-প্রত্যাগত ছাত্রছাত্রীদের মুখে। এরকম একটি ছেলে একদিন হঠাৎ ক্লাসে ঢুকতে যাব এমন সময় সহসা পিঠ চাপড়ে বললে, "Hi, guy!" এবং তার বেঞ্চির দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে কাঁধ ধরে বললে "Man, come and squat with me"। আমি তার ইংরিজি শুনে যত না অভিভূত, তার পরিবর্তনে ততোধিক. কারণ সে প্রথম চারমাস ধুতি শার্ট মাফলার আর দেশজ খিস্তি ছাড়া কিছুই জানত না। যাই হ'ক ছেলেটির অগ্রগতি ধরে রাখা গেল না। একদিন বছর দেড়েক পরে তাকে আমি দেখলুম লোরেটোর মেয়েদের সংগে পাক্কা ফিরিঙ্গি ইংরিজিতে আড্ডা চালিয়ে যাচ্ছে, আমাকে দেখে ডেকে বলল, "Hi! care for a cold treat?"—আমি বললুম cold treat মানে? —সে মৃদু হেসে জানালে, "Nal (নলিনী) has offerd us cold coffee"।—আমি হেসে ফেললুম, কিন্তু তখন টেবিলে সতীকারের হাসির জোয়ার, তার বান্ধবীরা এই হিউমারে একেবারে বিমোহিত, অবনীর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। —শুধু এই ছেলেটি নয়, এরকম অন্তত কুড়িজনকে আমি দেখেছি তাদের ভাষা বদলে যেতে, বদলে তাদের [illegible] আরাম [illegible], [illegible] পড়ি—অথচ এদেরই প্রথম দিকে দেখেছি ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসে বাংলা পড়ছে, কখনো দেখেছি হাতে দেশ পত্রিকা অথবা উল্টোরথ জলসা।

কী কারণে এইসব ছেলেরা ইংরিজি সাহিত্য পড়তে এসে ফিরিঙ্গী হবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়, তার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। তারা দেখে মাস্টারমশাইরা (সবাই নন, বরঞ্চ এই প্রফেসর যাতে না থাকে, বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ে ইংরিজির ছেলেমেয়েরা যাতে সদা সর্বদা সচেতন হয়, এর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা যাঁর আছে তিনি এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক—কিন্তু কাঠামোটাই এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে তাঁর একার পক্ষে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়) অধিকাংশই সেইসব ছাত্রছাত্রীর প্রতিই উৎসাহিত হন যাঁরা ইংরেজি ভাষায় গড়গড় ক'রে কথা চালিয়ে যায়, ক্লাসের বাইরেও "Excuse me sir, I have a problem" বলে কথা আরম্ভ করে, এবং আসে এমন কোনো কলেজ থেকে যার বাজারে হাঁকডাক আছে। আমি বহু অধ্যাপকের সংগে কথা বলেছি সাহিত্য বিষয়ে, যাঁরা ক্লাসে এবং বাইরের কথোপকথনে একবারও বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে কোনো উৎসাহ বা অবগতি দেখাননি। আমার মনে পড়ে না কোনো প্রসংগেই কখনো স্মরিত হয়েছে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের কোনো লেখক, রবীন্দ্র পরবর্তী কেন, রবীন্দ্রনাথও কখনো আলোচনায় এসে পড়েননি—যদিও এমন অনেক আলোচনা করা হ'য়েছে যেখানে স্বাভাবিকভাবেই বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব অবশ্যম্ভাবী। ক্লাসে পড়ানো হ'য়েছে ইয়েটসের "স্কলার" কবিতা, একবারও কেউ স্মরণ করেননি জীবনানন্দের "অধ্যাপক", পড়েছি আমরা এলিয়ট, মাস্টারমশাইয়ের মনেই এল না বিষ্ণু দে, শুনলাম চৈতন্য প্রবাহের উপন্যাসের কথা কিন্তু খেয়াল করলাম না এই ধারায় বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলি।—অধ্যাপককুলের এই নিজ সংস্কৃতি ও ভাষায় প্রতি অবজ্ঞা এবং মৌনতা নানাদিক থেকেই ক্ষতিকর—প্রথম কারণ এইভাবে কোনো সাহিত্য বা সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয় না, কেউ কোনোদিন নিজের সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি ভুলে অন্য এক ভাষা ও সংস্কৃতি বা সাহিত্য বুঝতে পারে না, বৃক্ষ উৎপাটিত ক'রে তাতে জলই দিই আর রোদেই রাখি কোনোভাবেই সে কি আর বাঁচবে?—অন্যদিকেও এই মৌনতা ক্ষতিকর, কারণ অধ্যাপকেরা যদি দীর্ঘ পাঁচ বছর ধ'রে এই কলকাতাতে বসে, এই কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাত মাড়িয়ে অবিরাম মৌনতার দ্বারা অবজ্ঞা প্রকাশ করে যান ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে ভাবলে, যেহেতু [illegible] অনুবর্তী এবং প্রভাবিত হবার জন্য তৈরি, অবশেষে তারা ভাবতে থাকে এবং ক্রমশ নিশ্চিত হয় যে সে ইংরিজি পড়তে এসেছে এই কারণে যে তার নিজের ভাষা ও সাহিত্যে কিছুই পাবার নেই। লোরেটো, প্রেসিডেন্সি (আজকাল), সেন্টজেভিয়ার্স প্রভৃতি কলেজে বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরই যায় মিশনারি ইস্কুলগুলো থেকে এবং তারা ইস্কুল থেকেই মাতৃভূমি ভুলে আসে, মাতৃভাষা অবহেলা করে, তাদের নষ্ট করে ইস্কুলে, কিন্তু অন্যান্য যে সব ছেলেমেয়ে স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে পড়তে আসে, তাদের নষ্ট করা হয় কলেজে এবং সে স্রোতও যারা পেরোয়, অবশেষে তারা পাটাতন হারায় বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগের ছাত্রসমাজে কতটা প্রভাবশালী জানি না, তবে ১৯৬৬-তে ইংরেজীতে এম এ পরীক্ষায় বসেছিল আটশোর ওপর ছাত্র এবং ১৯৬৭তে প্রায় ন'শো—বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেবে ইংরিজির ছাত্র সংখ্যা প্রতি বছর ক্রমবিবর্ধমান। এইসব ছাত্রছাত্রীরাই যেহেতু ভবিষ্যৎ মাস্টার মশাই এবং সাহিত্যে উৎসাহী ছেলেমেয়েরা অনেকেই বাংলা সাহিত্য না পড়ে একটি সংগত কারণেই ইংরিজি পড়তে যায়, সেহেতু অবস্থাটি একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। বিশেষত যখন দেখি চাকরির বাজারে কায়দা করে ইংরিজি না বললে সে যত বিদ্বান থাক কোনোই আশা নেই, তখন যথেষ্ট ভীত হবার কারণ রয়েছে। আমরা স্পষ্টতই লক্ষ করছি নিজ দেশ বিষয়ে যে যত অজ্ঞ, নিজ ভাষা বিষয়ে যত শ্রদ্ধাহীন, নিজ সাহিত্য বিষয়ে যত উদাসীন, সে-ই সর্বাপেক্ষা সুবিধেভোগী ও প্রভাবশালী—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো পঞ্চাশটি ছাত্রের মধ্যে কুড়ি তিরিশজন লোরেটো প্রেসিডেন্সির

ছাত্রের প্রভাব অবশেষে প্রায় একটুকরো জনতাকে দেশহীন ভাষাহীন ত্রিশঙ্কুতে পরিণত করে, এবং তার ইন্ধন জোগান মাস্টার মশাইরা।

—হালখাতার পরিসর অল্প অতএব এখানেই রেখা টানতে হবে আজকের আলোচনার। পরিশেষে শুধু আরেকটি কারণের উল্লেখ করি। বাঙালি ছাত্ররা কেন লোরেটো, সেণ্ট জেভিয়ার্স ইংরিজি নকল করার প্রাণপণ চেষ্টা করে মফস্বল বা বাংলা কলেজ থেকে এসে। লোরেটো-প্রেসিডেন্সির মেয়েদের সজ্জার বাহার দেখতে বড়ই ভালো লাগে, তাদের সঙ্গে ভাব জমানোর কার না ইচ্ছে হয়, কিন্তু তারা তো ধারে কাছেই ঘেঁষতে দেবে না ইংরিজি না বললে, অতএব ওরকম ইংরিজিটা শিখতেই হয়। এ বিষয়ে একদিন আমি খুব বক্তৃতা দিচ্ছিলাম সেই ছেলেটিকে যে আমাকে "হাই গাই!" বলেছিল। সে অবশেষে বলল, "সবই তো বুঝলাম, তবে কিনা আমার "হাই-টাই" বলা চালিয়েই যেতে হবে কারণ মেয়েছেলের কাছে সংস্কৃতি নাচে।"

মৌলিনাথ

সম্প্রতি ভাস্কর রঘুনাথ সিংহ, শিল্পী করুণা সাহা ও সমর মজুমদার তাঁদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এছাড়া আলিপুরে পশুশালা কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সিংহের চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

রঘুনাথ সিংহ শহরের ভাস্কর শিল্পী মহলে সুপরিচিত। ১৯৫৫ সালে তিনি সরকারী আর্ট কলেজে ভাস্কর্য শিক্ষা সমাপন করার পরে বৃত্তিলাভ করে বরোদায় শিক্ষালাভ করেন এবং তারপর গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইতালী সরকারেরও বৃত্তিলাভ করেন এবং কিছুকাল সে দেশে থাকেন। অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনীতে ২৪টি ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়। সাধারণত ভাস্করগণ যেসব মাধ্যমে কাজ করে থাকেন রঘুনাথ সেগুলির ধার দিয়েও যাননি, অর্থাৎ চিরাচরিত মাধ্যম প্লাস্টার, সিমেন্ট, মাটি বা বিশেষ কোনও ধাতু থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেন নি। অবশ্য একমাত্র কাঠ তিনি ব্যবহার করেছেন তবে তাও তিনি সংগ্রহ করেছেন অতি সস্তা, সাধারণ, পরিচিত ও সহজলভ্য গাছের গুঁড়ি ও ডাল থেকে। অন্যদিকে আবার সমসাময়িক যুগের সঙ্গে তাল রেখে তিনি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন উজ্জ্বল সিরামিক টুকরো।

কাঠের বিভিন্ন কাজের নিদর্শন দেখে প্রথমেই তাঁর চিন্তাশীলতা ও পরীক্ষাস্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। সচরাচর ব্যবহৃত মূল্যবান কাষ্ঠস্তূপের স্থলে তিনি সাধারণ গাছের গুঁড়ি ও ডালের মধ্যে ভাস্কর্য সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছেন ও আপন চিন্তাধারা অনুযায়ী সেই মাধ্যমেই নানা বিচিত্র আকার সৃষ্টি করেছেন। বাস্তবিক কাঠের এই নিদের্শনগুলিকে ঠিক ভাস্কর্য বলে মনে হয় না, বরং এগুলিকে উচ্চাঙ্গের সংস্থাপন তথা খোদাই কাজ বলাই সঙ্গত। সাধারণ কাঠের নমনীয়তা ও বৈশিষ্ট্যটুকু পুরোমাত্রায় বজায় রেখে তারই প্রয়োজনমত ভাস্কর নানা অদ্ভুত আকারের সৃষ্টি করেছেন। তাই অধিকাংশ নিদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রাচীন ভাস্কর্য তথা কাঠ-খোদাই-এর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। ত্রিআয়তনিক হলেও মুখ্যত এগুলির অধিকাংশই দ্বিআয়তন-সর্বস্ব অর্থাৎ এগুলির সম্মুখ ও পাশের ভাগের রূপ ও বৈচিত্র্যের ওপর ভাস্কর

অ্যাট দি স্টিল পয়েন্ট —শ্রীমতী করুণা সাহা

অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনটিতে ছোট দুটি গর্ত করে সেখানে সিরামিক টুকরো বসিয়ে তিনি চোখ তথা অদ্ভুত এক মুখাকৃতির সৃষ্টি করেছেন, যেমন দি হেড। এটির এক বিশেষ আবেদনে যেন সকলেই সাড়া দেন। আরও এক শ্রেণীর নিদর্শন এই সঙ্গে চোখে পড়ে—ফিগার ১, ২ ও ৩। লম্বমান এই মূর্তিগুলি প্রায় একই পর্যায়ের—যদিও এগুলি ত্রিআয়তনিক গঠন কৌশলে সমুজ্জ্বল। দি বার্ড দেখে আফ্রিকার প্রাচীন কাঠ খোদাই কাজের কথা মনে পড়ে। সিরামিক নিদর্শনগুলি ভিন্ন জাতের। এগুলি ত্রিআয়তনিক। বিভিন্ন আকারের সিরামিক স্তরগুলি ঝালানো লোহার শিকের ওপর স্থাপিত। সিরামিকের সঙ্গে প্রাচীন প্রতীক জাতীয় মোটিফ ও রঙ ব্যবহার করে ভাস্কর সেগুলিকে নানারঙে রঙীন করেছেন। উজ্জ্বলতা ও নতুন সৃষ্টিকলাসৌন্দর্যের জন্য সেগুলি সকলেরই চোখে পড়ে। বিশেষ করে থ্রি ফেসেস অপূর্ব। স্ফটিকপাত্রের স্বচ্ছ ঔজ্জ্বল্যই এর বিশেষত্ব। রঘুনাথ সিংহ প্রতিভাবান, কাঠ খোদাই ও সিরামিক শিল্পে তিনি নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন।

*

শিল্পী শ্রীমতী করুণা সাহা বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী হিসাবে করুণা সাহা সুপরিচিত। বিশ বছর পূর্বে সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি দেশের নানা স্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন ও

পুরস্কারাদি লাভ করেন। পরে ইতালী সরকারের বৃত্তিলাভ করে তিনি ফ্লোরেন্সে যান ও প্রাচীরচিত্র বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। প্রদর্শনীতে তাঁর মোট ৬২টি অঙ্কন নিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পীর তিন শ্রেণীর কাজ চোখে পড়ে—কম্পোজিশন, প্রতিকৃতি, ড্রয়িং ও বহির্দৃশ্য স্টাডি। শিল্পী যে নিষ্ঠাবতী ও বিশেষ করে ড্রয়িং ও কম্পোজিশনে তাঁর হাত যে পাকা তা প্রদর্শনী পরিক্রমা করলেই বোঝা যায়। শিল্পীর আর একটি গুণ, সুপরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা। তাঁর কম্পোজিশনগুলিতে বৈশিষ্ট্য আছে। কি মানবদেহ, কি বস্তু—প্রত্যেকটিরই বহির্ভাগ তিনি স্থূলে বুরুশ-রেখায় এ'কেছেন ও ভিতরভাগটুকু সাধারণত চাপা রঙে ভরে ফেলেছেন—ফলে সমগ্র রচনাতেই রঙীন কাচ (Stained glass) এর বিচিত্র কারুকার্য ফুটে উঠেছে। অঙ্কন-রীতির দিক দিয়ে নীরদ মজুমদারের সঙ্গে শিল্পীর সাদৃশ্য দেখা যায়। দুই একটি রচনা প্রাচীরচিত্র জাতীয়, যেমন আট দি স্টিল পয়েন্ট। অন্যান্য কম্পোজিশনের মধ্যে থ্রি ইন ওয়ান উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে শিল্পী উজ্জ্বল রঙও প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে জানেন। এগুলি অনেকটা আলঙ্কারিক জাতীয়—যেমন রিফ্র্যাকশন। লাল ও হলুদ রঙের সমন্বয়ে রচিত বিয়ণ্ড দি ভেল-এর মুখখানি, অনেককে মুগ্ধ করে। দুঃখের বিষয়, প্রতিকৃতি রচনায় শিল্পীর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েনি—তবে পান্না-র মুখের ভাবটুকু অনেকের মনে সাড়া জাগায়। কয়েকটি ন্যুড ড্রয়িং দেখে শিল্পীর অঙ্কন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পী যে অতীব যত্নসহকারে প্রাথমিক অঙ্কন বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে ৫১, ৫৩, ৬০ ও বিশেষ করে ৪৮নং উল্লেখযোগ্য। তবে বহির্দৃশ্যের রঙীন স্টাডি স্কেচগুলির মধ্যে অসাধারণত্ব নেই। শুধু তাই নয় কয়েকটি দুর্বল রচনাও চোখে পড়ে, এগুলি শিল্পীর বাদ দেওয়া উচিত ছিল—বিশেষ করে ৩৮, ৪০, ৪১ ও ৩৫ নং স্কেচ-গুলি শিক্ষার্থীসুলভ। এই বিভাগে ৩৯ ও ৩১ নং রচনার নাম করা যায়।

শিল্পী শঙ্কর মজুমদার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন আশুতোষ মিউজিয়াম হলে। শঙ্কর মজুমদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র। ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক আছে, তাই অবসর পেলেই ছবি এ'কে থাকেন। সুতরাং তিনি শখের শিল্পী, এবং সেই হিসাবেই এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনীর প্রয়াস। প্রদর্শনীতে জলরঙে আঁকা ২৩টি নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশই

কর্নার —শঙ্কর মজুমদার

বহির্দৃশ্যের নানা স্কেচ, সেই সঙ্গে দু একটি ফিগার স্কেচও চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, কাজের মধ্য দিয়ে শিল্পী নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সত্য কিন্তু নিয়মিত রঙ ব্যবহার শিক্ষার অভাবে বক্তব্য বিষয়টুকু সবক্ষেত্রে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও দুই একটি বহির্দৃশ্য ভাল লাগে, যেমন কর্নার, আর্লি মর্ন ও ইয়েট কালার-ফুল। ইমপ্রেশনিস্ট পরবর্তী রীতিতে রচিত দি ডিভাইন ক্লোজনেস অনেকের চোখে পড়ে। ফিগার স্টাডির মধ্যে ৮ ও ৯নং মন্দ নয়।

*

আলিপুর পশুশালা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। অধুনা পাকিস্তানস্থিত সুসঙ্গ-এর জমিদার ভূপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ শিকারী হিসাবে সুপরিচিত। দেশ বিভাগের পরে তিনি পশ্চিমবাংলায় চলে এলেও সুসঙ্গ-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীব জন্তুর কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও সকলের অগোচরে তিনি বন্দুকের পরিবর্তে তুলি ও রঙ হাতে নেন ও সুসঙ্গ-এর অরণ্য সুন্দরীর বিভিন্ন রূপ ও নানা জন্তু, বিশেষ করে, বন্য হাতীর নানা ছবি আঁকতে শুরু করেন। অনেকের মনে পড়বে, ইতিপূর্বে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য বৃদ্ধ বয়সে রিয়া-লিস্টিক রীতিতে আঁকা জীবজন্তুর ছবি দেখে তাঁর একাগ্রতা, অঙ্কন ক্ষমতা ও স্মরণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে দেশ-বিদেশের জীবজন্তু বিষয়ে উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগাবার জন্যই পশুশালার কর্তৃপক্ষ এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রতিদিন দলে দলে ছেলেমেয়েরা যেভাবে এই প্রদর্শনী দেখে আনন্দ লাভ করে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পশুশালা কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

চিত্রপ্রিয়

উদ্ভিজ্জ-তৈল শিল্পে বাঙালী

মানুষের জীবনে তেল জিনিসটি যে অপরিহার্য সেটা ছেলেবেলায় প্রথম রিয়্যালাইজ করেছিলাম আমাদের পাড়ার জগড়নাথ-র নোংরা ঘুপচি দোকানের পরম উপাদেয় তেলেভাজা খেয়ে এবং হেদো-গোলদীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সর্বাঙ্গে সর্ষপ তৈল লেপন করে। বড়ো হয়ে যখন জীবিকার অন্বেষণে বেরোলাম তখন আবার তেলের উপকারিতার আর একটি দিক ভিস্যুয়্যালাইজ করলাম। দেখা গেল যে, কাজ পেতে গেলে, কাজ আদায় করতে হলে পকেটে পকেটে নানারকম তেলের শিশি নিয়ে ঘোরা দরকার। কোথাও লাগে সুবাসিত রিফাইনড অয়েল, কোথাও সাদাসিধে সরষের তেল, আবার কোথাও খনিজ মোটা ক্রুড-অয়েল—একটি না-হয় আর একটি লাগাতেই হবে উপার্জন নামক রৌপ্যমুদ্রাপ্রসবিনী যন্ত্রটিকে চালু রাখতে হলে। রাজনৈতিক তৈল মর্দনের কথা এখন বলা বাহুল্য; কারণ বর্তমানে কয়েকমাস আপনার আমার মতো প্রত্যেকেই নির্বাচন-প্রার্থী রাজন্যবর্গের পরিবেশিত সুবাসিত তৈল দ্বারা মর্দিত অবস্থায় কাটাবো, যতদিন না তাঁদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় ভোট-যুদ্ধে। তারপরেই আমরা আবার বে-কে সেই তৈলকবেক (অভিধান দেখুন) পরিণত হবো।

শ্রীপ্রকৃতিনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়রাও অবশ্য তাঁদের 'শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্ক'স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কারখানায় প্রধানত তেল তৈরি করে বিতরণ করেন, কিন্তু তা নিতান্তই অভিসন্ধি-বহির্ভূত। তাঁরা নিছক 'কনজিউমার গুডস' অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য হিসেবে ভারতবর্ষের বাজারে প্রায় দু'কোটি টাকার 'শালিমার' মার্কা নারকেল তেল এবং 'দেশী' ঘি উৎপাদন ও বিক্রয় করেন।

বাজারে এই তেল ও ঘিয়ের ছোট বড়ো টিন অনেকদিন থেকেই দেখে আসছি, কিন্তু এ যাবৎ আমার ধারণা ছিল যে, দ্রব্যগুলি কোনো অবাঙালী প্রতিষ্ঠানে তৈরি। প্রকৃতিনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাত্রির স্বামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীঅসীম ভট্টাচার্যের কাছে ঘটনাচক্রে শুনে আশ্চর্য হলাম—আপনারা অনেকেও নিশ্চয়ই তাই হবেন যে প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ মালিকানা দুই বাঙালী ভদ্রলোক এবং তাঁদের কর্মি-বৃন্দ ও আত্মীয়স্বজনের। আরও অবাক হলাম এ'দের বিশাল কারখানা দেখে, যে কারখানায় তেল-ঘি ছাড়াও অন্যান্য পণ্য-উপপণ্যের উৎপাদনের আয়োজন দেখে। এ'রা 'রেমণ্ড মিল' প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে 'বেরাইটিজ' নামক খনিজ থেকে বেরিয়াম কম্পাউন্ডস তৈরি করেন। উপরন্তু এ'দের একটি আধুনিক 'অ্যানোডাইজিং প্ল্যান্ট' আছে। আর আছে বহু যন্ত্র সংবলিত সম্পূর্ণ একটি আধুনিক মেশিন শপ যার মালিকানা শালিমার কেমিক্যাল-এর নয়। এই মেশিন শপ-এর বারো আনা মালিক হলেন প্রকৃতিনাথ এবং চার আনা শরিক হচ্ছেন শালিমার-এর চীফ এঞ্জিনীয়ার শ্রীকালীমোহন চট্টোপাধ্যায়। মন্দা বাজার এবং শ্রমিক অস্থিরতার জন্যে মেশিন-শপটি এখন বন্ধ আছে। প্রকৃতিনাথেরা শালিমার কেমিক্যালসের ভাড়াটে হিসেবে এই যন্ত্রশালাটিকে এখানে রেখেছেন। ঝকঝকে মেশিনগুলি নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ্যা নারীর মতো।

পণ্ডিত বংশের সন্তান প্রকৃতিনাথের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই টোল থেকে কলেজ পর্যন্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সংস্কৃতের অধ্যাপনা করে এসেছেন। পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। উত্তর-কালে তিনি কিছুদিন কলকাতার রিপন কলেজেও অধ্যাপনা করেছিলেন।

প্রথম ব্যতিক্রম ঘটালেন প্রকৃতিবাবুর দাদা শ্রীবিভূতিনাথ ভট্টাচার্য। তিনি পারি-বারিক বৃত্তি ছেড়ে বি এন রেলওয়েতে চাকরি নিলেন। প্রকৃতিবাবু শিবপুরে দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাসের পর রিপন কলেজ থেকে 'পিওর সায়ান্সে' বি এসসি পাস করলেন। তারপরে তিনিও দাদার মতো চাকরির সন্ধানে বেরোলেন। চাকরি করা তাঁর পোষালো না

বললে ভুল হবে, চাকরি তিনি পেলেন না। দু তিনটে দরখাস্তের পরই সে চেষ্টা তিনি ছেড়ে দিলেন, কারণ চাকরির উমেদারি করতে গিয়ে লোকের তাচ্ছিল্য ও অবহেলা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ভাবলেন এরকম দাস্যবৃত্তির চেয়ে মুটেগিরি করাও ভালো। যৎসামান্য উপার্জন তিনি অবশ্য প্রাইভেট টিউশনি থেকে করছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শ্রমসাধ্য যে কোনো কাজকেই পরম মূল্য দিয়ে বাঙালীকে তখনও যতই উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করতে থাকুন না কেন, প্রকৃতিনাথ যে কাজে নামা স্থির করলেন 'কালচার্ড' বাঙালীর কাছে সেদিন সে কাজের কোনো 'প্রেসটিজ' ছিল না। ব্যবসাটি হলো গম পেষাইয়ের। গম-পেষাই মানে এখন কন্ট্রোলের দিনে আপনার আমার পাড়ার অবাঙালী যে সমস্ত আটাকলে আমরা সপ্তাহের রেশনের গম চূর্ণ করাই সেইরকম কর্ন-গ্রাইন্ডিং মেশিন নিয়ে ব্যবসা।

প্রকৃতিনাথের বাবা জানকীনাথ দেহত্যাগ করেন প্রকৃতিবাবুর যখন মাত্র দশ বছর বয়স। দাদা বিভূতিনাথ তখন রেলের কাজ করছেন শালিমারে। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি বাড়ির সকলকে কৃষ্ণনগর থেকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে এসেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রকৃতিনাথের অভিভাবক। তিনি ছোট ভাইয়ের শিল্পপ্রচেষ্টার সমর্থন করলেন না; প্রস্তাব করলেন যে, প্রকৃতিনাথ বি এন রেলের খড়গপুর ওয়ার্কশপে শিক্ষানবিসী করে, ভবিষ্যতে যাতে একটা ভালো কাজ পেতে পারেন তারই চেষ্টা করুন।

কিন্তু প্রকৃতিনাথ চাকরির পথ আর না-মাড়াবার সংকল্প করেছেন; তিনি দাদার ইচ্ছেয় সায় দিতে পারলেন না। অথচ একটা কর্ন-গ্রাইন্ডার কেনার টাকা তো দূরের কথা তার দশমাংশও প্রকৃতিনাথ যে এক সঙ্গে জোটাবেন সে সঙ্গতিও তাঁর তখন ছিল না। দাদা হয়তো পারতেন কিন্তু তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভাই যে কাজ করতে চলেছেন তার জন্যে দাদার কাছে আর সাহায্য চাওয়া যায় না।

ধারে কিছু টাকা বা একটা মেশিন যোগাড়ের আশায় প্রকৃতিনাথ কলকাতা শহর চষে বেড়াতে লাগলেন। পথে হঠাৎ একদিন তাঁর স্কুলের এক শিক্ষক স্বর্গীয় দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। প্রকৃতিনাথের কাছে ইনি ছিলেন 'দীনুদা'। কুশল প্রশ্নে প্রকৃতিনাথের সমস্যার কথা শুনে 'দীনুদা' অযাচিতভাবে নিজের সামান্য সঞ্চয় থেকে প্রকৃতিনাথকে আড়াইশো টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সেই টাকাকে মূলধন করে প্রকৃতিনাথ অবিলম্বে শিবপুর বাজারে ছোট একটি আটা-কল বসিয়ে ফেললেন। তার নাম দিলেন 'শঙ্খ আটা-কল'। কিন্তু একটা ঘর আর একটি মেশিনেই তো ব্যবসা চলে না, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালও দরকার। তা-ও জুটে গেল কয়েকজন সতীর্থের মাধ্যমে। এঁরাও গ্র্যাজুয়েট এবং সবাই অল্পবিস্তর বেকার। তাঁরা এক একজন আড়াইশো টাকা দিয়ে প্রকৃতিনাথের অংশীদার হলেন।

'শঙ্খ' মার্কা আটা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। তখনো রেশনিং-এর প্রবর্তন হয়নি, কারণ সেটা ছিল প্রাক্ তেরশো পঞ্চাশ যুগ, মানে এ শতকে বাংলা দেশের প্রথম দুর্ভিক্ষের আগের কথা। (দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ মানে ১৯৬৭-র দুর্ভিক্ষ)। প্রকৃতিনাথরা ব্রাউন পেপারের পরিষ্কার ঠোঙায় ভালো প্যাকিং করে প্রচুর পরিমাণে সেই আটা বিক্রি করতে লাগলেন। ব্যবসা বেশ সুন্দর বেড়ে চলছিল, এমন সময়ে এলো পঞ্চাশের (১৯৪৩-এর) দুর্ভিক্ষ এবং তারপরে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ। 'শঙ্খ' আটা-কল বন্ধ করে দিতে হলো।

বন্ধুদের অংশের টাকা মিটিয়ে দিয়ে প্রকৃতিনাথ আবার বেকার হলেন। তবে এখন তাঁর কিছু সঞ্চয় হয়েছে। নতুন কিছু করার জন্য ব্যগ্র, অথচ কি করবেন তার কোনো আইডিয়াই তাঁর নেই। ঘুরতে ঘুরতে তিনি স্বর্গীয় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মশায়ের কাছে গিয়ে পড়লেন।

এখনকার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের কাছে জ্ঞানাঞ্জনবাবুর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি ছিলেন আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগেকার বাংলা দেশের ক্ষুদ্রশিল্প-জগতের এক স্বনামধন্য উদ্বোধা। তাঁর উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় আয়োজিত কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় অবস্থিত স্থায়ী শিল্প-বাণিজ্য প্রদর্শনী, এবং ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত শিল্প-প্রদর্শনী বহু যুগ ধরেই আমরা নিয়মিত দেখে এসেছি। ১৯৫৬ সালে জ্ঞানাঞ্জনবাবু পরলোকগমন করেন।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রকৃতিনাথকে বললেন ইনজেকশনের কাচের অ্যমপুল তৈরি শিখে

তারই একটা ছোট কারখানা খুলতে। প্রফুল্লবাবুর শিক্ষানবিসী শুরু হলো আরেকটি অ্যামপুলে কারখানায়। তিন মাস অবৈতনিক থাকার পরে তাঁর অ্যালাওয়েন্স হলো মাসিক পাঁচ টাকা। (শালিমার কেমিক্যালস-এর বর্তমান ম্যানেজার শ্রীতুলসীদাস ঘোষ মশায় তখন সেই অ্যামপুল ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার ছিলেন এবং তাঁর হাতেই প্রফুল্লনাথের গ্লাস-ব্লোয়িং বিদ্যার হাতেখড়ি হয়েছিল)।

শিক্ষার পরে প্রফুল্লনাথ স্বস্থান শালিমারে সাত আটটি শ্রমিক নিয়ে নিজের অ্যামপুল ফ্যাক্টরী খুললেন। কিছুদিনের মধ্যে এই ছোট কারখানা থেকে প্রফুল্লনাথের মাসিক আড়াইশো তিনশো টাকার সাশ্রয় হতে লাগলো। এটা হলো ১৯৪৪ সালের কথা। পরে তিনি স্থান সংকুলানের জন্য কারখানা নারকেলডাঙ্গায় তুলে নিয়ে যান।

চুয়াল্লিশ সাল প্রফুল্লনাথের জীবনে নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনার বৎসর। প্রথমে তিনি সেই বছরে গায়ত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করে গার্হস্থ্যে পদার্পণ করলেন; দ্বিতীয়ত, তিনি শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের বন্ধুতা ও সহায়তা পেলেন।

মণ্ডল পরিবার কালিঘাট-আদিগঙ্গার পশ্চিম পাড় চেতলা অঞ্চলের পুরনো বাসিন্দা।

পঞ্চাননবাবুর অর্থানুকুল্যেই ১৯৪৫ সালে প্রফুল্লনাথের পক্ষে 'শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড' সংস্থার পত্তন করা সম্ভব হয়েছিল। আজ থেকে ২৩ বছর আগে সেই যে 'দুজনে ডিরেক্টর হয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্মদান করে-ছিলেন এখনো তাঁরা পরস্পরের সৌহার্দ্য অটুট রেখে এগিয়ে চলেছেন, এবং সেইজন্যেই নিশ্চয়ই, এত অল্প দিনের মধ্যে বাঙালী প্রতিষ্ঠান হয়েও তাঁরা এত বড়ো হতে পেরেছেন।

১নং চেতলা সেণ্ট্রাল রোডে পঞ্চানন-বাবুর বাড়িরই এক অংশে 'শালিমার কেমিক্যাল'-এর যে হেড অফিস আরম্ভেই খোলা হয়েছিল তা এখনো সেখানেই আছে।

ছোট কারখানাটি স্থাপিত হলো নারকেল-ডাঙ্গায় প্রফুল্লনাথের অ্যামপুল কারখানার পাশে (অ্যামপুল ফ্যাক্টরীটি যে ইতিমধ্যে শালিমার থেকে নারকেলডাঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়েছিল সেটা বলা হয়নি)।

১নং চেতলা সেণ্ট্রাল রোড-এ কিন্তু কেবল ধনাগমের কাজই হয় না। শুনে খুব তৃপ্তিলাভ করলাম যে, পাশ-করা না হলেও আমাদের স্বল্পবাক নম্রস্বভাব সুপুরুষ (অবশ্য প্রফুল্লনাথও দীর্ঘদেহ সুদর্শন ব্যক্তি), অথচ অকৃতদার শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ওই অঞ্চলের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ। তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি প্রতিদিন সকালের দিকে শ' দুই আড়াই রোগীর চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন। ছুটির দিনে চিকিৎসাপ্রার্থীর সংখ্যা শ' পাঁচেকেও ঠেকে।

ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের ভয়াবহ সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গার পর নারকেলডাঙ্গাতে নিয়মিত কাজ করায় প্রচুর বিঘ্ন হলো। তখন কর্তারা ফ্যাক্টরীটাকে সেখান থেকে তুলে আনলেন। ইতিমধ্যে কাজও অনেক বেড়ে গেছে, তাই কেবল একই জায়গায় স্থান অকুলান হওয়াতে বিভিন্ন বিভাগ পৃথক পৃথক অঞ্চলে স্থানান্তরিত হলো। নারকেল তেল, তিল তেল, পাউডার প্রভৃতি প্রসাধনীর বিভাগগুলি চেতলা, শাহাপুরে এবং রামকেস্টপুরে বসালেন। আর এই সময় থেকে অ্যামপুল ফ্যাক্টরীটা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রথম দিকে প্রফুল্লনাথরা বাজার থেকে বাল্ক প্যাকিং-এ (bulk packing-এ) অপরিশ্রুত নারকেল তেল কিনে নিজেদের কারখানায় তার শোধন করে ছোট বড়ো টিনে ভরে শালিমার কেমিক্যালের লেবেলে বিক্রি করতেন।

পঞ্চান্ন সালে এ'রা প্রথম অয়েল-ক্রাশিং শুরু করলেন। সেই কাজের জন্যে তাঁরা মাঝারি সাইজের দুটো দেশী মেশিন বসালেন। এটা আমরা সকলেই জানি যে নারকেল তেল উৎপন্ন হয় নারকেলের শাঁস থেকে। সেই শাঁসের আখ্যা হলো 'কোপরা' (copra)

'কোপরা' শব্দটা কানে এলেই আমার মনের তারে গীটার-ঝংকারের অনুরণন হয়—'আলোহা' আর 'লা-পালোমা' বাজতে থাকে যেন। স্বপ্ন দেখি নববৌবনে ফিরে গেছি। যেন প্রবালদ্বীপের সুন্দরীরা হুলা-হুলা নাচের সঙ্গে দেহ হিল্লোলিত করছেন, ঘাসের ঘাগরার আন্দোলন আর ফ্র্যাঙ্গিপানির মধুগন্ধে সব কিছু যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলায়, প্রথম যুগের সবাক ছবির আমলে 'দি পেগান' নামে একটা সঙ্গীত-মুখর ফিল্ম দেখেছিলাম, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পটভূমিকায়। (কয়েক সপ্তাহ আগে রেমন নোভারো নামক হলিউডের যে চিত্রতারকা রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন, তিনি ছিলেন সেই ছবির নায়ক)। গল্পের সেই মাহিটি দ্বীপের অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ হতো প্রধানত 'কোপরা' বিক্রি করে। সেই প্রথম কোপরা কথাটা শুনে-ছিলাম বলে আজও তার উল্লেখে এইসব কথা মনে পড়ে।

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে পৃথিবীতে নারকেল চাষের মোট আয়তন ৮৫ লক্ষ একর এবং সেই জমিতে ফলে

মোট ১৯০০ কোটি নারকেল। ফিলিপাইনসের নারকেল চাষ সর্ববৃহৎ—২৮ লক্ষ একরে ৬০৮ কোটি নারকেল ফলন হয়। তারপরেই স্থান হলো ভারতবর্ষের—১৭ লক্ষ একরে ৪৭০ কোটি। সিংহল, মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের (ফিলিপাইনস বাদে অন্যান্য) দ্বীপপুঞ্জের মোট চাষ ৪০ লক্ষ একর। আন্দামান, নিকোবার, লাক্কাদিভ, মিনিকয় প্রভৃতি দ্বীপেও নারকেলের যথেষ্ট ফলন হয়; আন্দামানের চেয়ে নিকোবারেই বেশী হয়। এগুলি ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত দ্বীপ এবং তার পরিসংখ্যান ভারতের হিসেবে থাকার কথা।

নারকেল গাছের এবং নারিকেল নামক কঠিন আবরণে কোমল অভ্যন্তরযুক্ত ফলটির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার একটি তালিকা প্রস্তুতের জন্য কাণ্ড থেকে শাখায় আরোহণ করা যাক।

নারকেল গাছের গুঁড়ি থেকে আসবাব না হলেও আরও অনেক কাজ হয়। নারকেল পাতা থেকে ঝুড়ি, মাদুর, পাটি, মসলন্দ, ঘরের চাল এবং গৃহলক্ষ্মীর পক্ষে আবশ্যিক সম্মার্জনী অর্থাৎ ঝাঁটা (মানে, মিসেসের পোড়ারমুখ খেংরে দেবার খেংরা) তৈরি হয়। নারকেলের ছোবড়া থেকে সুতলি, দড়ি, 'কয়ের', 'কয়ের ম্যাটিং' (ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পক্ষে ইন্ডিয়া টীমের আবশ্যকীয় সরঞ্জাম) নির্মিত হয়। নারকেলের মালা থেকে আমার মতো গরিব লোকের জন্যে থেলো হুঁকো, নুনের পাত্র, কলসির ঢাকনা ছাড়াও শখের জিনিস হয় নানারকমের এবং মালা পুড়িয়ে যে কাঠকয়লা করা যায় তার কোয়ালিটিও অতুলনীয়। ডাব নারকেলের জল রোগীর পথ্য; আবার সেই জলকেই জারিয়ে নিয়ে শরীর-মনের উদ্দীপক ও উত্তেজক তাড়ি করা যায়—চিনি, মিছরি, ভিনিগার প্রভৃতিও হয়। সব শেষে নারকেলের শাঁস—ডাল, তরকারি আর মালাই কারি, নাড়ু, সন্দেশ পাটিসাপটা আর চন্দ্রপুলির বিচিত্র স্বাদের কথা ভাবলেই আমার পরম শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ি মহোদয়ার রন্ধন সৌকর্যের কথা মনে হয় (গৃহিণীর দৌড় সহজ সাদাসিধে সন্দেশ আর নাড়ু পর্যন্ত)।

উপযুক্ত নারকেলের শাঁস খোসাসুদ্ধ শুকিয়ে রাখা হয় ভবিষ্যতে নিঙড়ে তেল বের করার জন্যে। তেল বের করে নেবার পর যে খইল (poonac) অবশিষ্ট থাকে তাও ফেলা যায় না। গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে তার প্রভূত উপকারিতা। (নারকেল, খেজুর আর তালগাছের মতো এমন সর্বার্থ সাধক পাদপ আর একটিও আছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না)।

ভারতবর্ষে নারকেলের সর্বাধিক ফলন হয় কেরালা রাজ্যে—৭০ পারসেন্ট। মহীশূর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, আন্দামান-নিকোবার প্রভৃতি দ্বীপে উৎপন্ন হয় সাকুল্যে ২৭ পারসেন্ট। বাকি তিন পারসেন্ট এদিক ওদিকে হয়।

নিজস্ব উৎপাদন বিরাট হওয়া সত্ত্বেও বিদেশ থেকে আমাদের ৯ কোটি টাকা দামের ৯০০০০ টন আন্দাজ কোপরা আমদানি করতে হয়। ১৯৬৪-র আগে যে-কেউ ফরেন এক্সচেঞ্জ ও লাইসেন্স যোগাড় করে 'কোপরার' আমদানি ও 'পুনাক'-এর রপ্তানি করতে পারতেন, কিন্তু তারপর থেকে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন ছাড়া কারও কোপরা আমদানির অধিকার নেই; পুনাক রপ্তানি করা যায়, কিন্তু সেটা করে আজকাল আর কোনো 'ইনসেন্টিভ' (উৎসাহ মূল্য) পাওয়া যায় না বলে S T C ছাড়া আর কেউ তা প্রার করেন না। দুঃখের বিষয় যে, S T C-র কব্জায় আসার পর থেকে এইসব লেনদেনে নাকি খানিকটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রফুল্লনাথ ও পশুপতিনাথের শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কসকে সম্প্রসারণের সময় দিয়ে আমি মনের আনন্দে তথ্য পরিবেশন করে নিলাম।

১৯৫৯ সালে কলকাতা থেকে বারুইপুর যাবার মধ্যপথে, রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আবাসিক বিদ্যালয় থেকে একটু এগিয়ে দশ বিঘা জমি শালিমার-এর জন্যে কেনা হলো। তখন এঁরা যে জমি তিন হাজার টাকা বিঘা কিনেছিলেন, এখন তার দাম হয়েছে ত্রিশ হাজার টাকা করে। পরে তাঁরা আরও সতেরো বিঘা জমি বাড়িয়েছেন, কিন্তু আগের দরে আর পাননি।

উনষাটেই বাড়িঘর তৈরি হয়ে মেশিন বসানো শুরু হলো। এবারে আর সেই দেশী ছোট ঘাণার নয়—প্রথমত বড়ো বড়ো তিনটে দেশী এবং সাতটা বিলিতী Rosedown ঘাণার বসানো হয়েছে।

নতুন কারখানা—না, কারখানা বললে কেমন যেন ছোট ছোট মনে হয়—শালিমার এর প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী চালু হলো ১৯৬০

সালের এক শুভ দিনে।

টোল-পাঠশালার গুরুমশায়দের উত্তর-পুরুষ, কলেজ অধ্যাপকের সন্তান প্রকৃতি-নাথের কর্মজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া উচিত ছিল শিক্ষক বা অধ্যাপক হওয়া, কিন্তু তা না হয়ে তিনি আজ তাঁর প্রিয়-বন্ধু পঞ্চাননের সহযোগিতায় হয়ে দাঁড়িয়ে-ছেন বিশিষ্ট এক শিল্পপতি—শালিমার কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁদের ফ্যাক্টরীর কতকগুলি বিভাগ এখন ২৪ ঘণ্টাই চলে। আর এই ফ্যাক্টরীতে শুধু নারকেল তেলই উৎপন্ন হয় মাসে ২০০ টন অর্থাৎ ৫৪০০ মণ, যার দাম হচ্ছে টন-করা ৬০০০ টাকার মতো।

উপরন্তু ঘি-বিভাগে দেশী ঘি হয় বছরে ৫।৬ লক্ষ টাকার মতো এবং প্রকাণ্ড কেমি-ক্যালস বিভাগেও পুরোদমে barium compounds তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে।

৩০ জুন, ১৯৬৭-র ব্যালেন্স শীটে এ'দের মোট বিক্রয়ের অঙ্ক পাচ্ছি ১,৯৫,৭৮,৬২০ টাকার।

শালিমার কেমিক্যালের ২২ বছরে প্রবল অগ্রগতির মাত্রা বোঝা যাবে নিম্নলিখিত তুলনামূলক (টাকার) অঙ্কগুলি থেকেঃ—

সাল	পেড-আপ ক্যাপিট্যাল	রিজার্ভ	সম্পত্তির দাম	বিক্রয়	নীট লাভ	ডিভিডেন্ড
১৯৪৫-৪৬	১০০০	—	১০০০	৬২,০০০	৩০০ (লোকসান)	—
১৯৫৮-৫৯	১,১৭০০০	২০০০	১,০৬,০০০	২০,৩০,০০০	৪২,০০০	২১,০০০
১৯৬৬-৬৭	৪,৬০,০০০	১০,০০,০০০	২০,০৬০০০	১,১৬,০০,০০০	৭,০৪,০০০	৬২,০০০

(বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো ডিভিডেণ্ডের ন্যূনতা এবং রিজার্ভ ফাণ্ডের বৃহত্ত্ব অর্থাৎ স্বর্ণাণ্ডপ্রসবিনী হংসটিকে জিইয়ে রাখার সৎপ্রচেষ্টা)।

কিন্তু কেবল প্রকৃতিনাথ ও পঞ্চাননের দ্বৈত প্রয়াসেই শালিমার-এর সফলতা নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না। তাঁদের পাশে ও পিছনে আছেন শ্রীতুলসীদাস ঘোষের মতো প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি (যিনি অতীতে প্রকৃতিনাথকে অ্যামপুল তৈরি শিখিয়ে-ছিলেন), শ্রীঅবনীকুমার ব্রহ্ম, শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (কেমিক্যাল বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক) এবং পঞ্চাননের অনুজ শ্রীসাধন মণ্ডল। এ'দের মধ্যে অনেকেই আবার কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার।

শ্রীমতী গায়ত্রী ভট্টাচার্য এবং ভট্টাচার্য দম্পতীর বড়ো ছেলে শ্রীমান লোকনাথও শেয়ারহোলডার। লোকনাথ এবারে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবেন। লোকনাথের দিদি রাত্রির ও তাঁর স্বামী শ্রীমান অসীমের নাম প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই করেছি। রাত্রি ও লোকনাথের পরে আছেন শ্রীমান সোমনাথ ও কুমারী অদিতি। নাবালকত্বের সীমা পার হতে তাঁদের এখনো অনেক দেরি।

প্রকৃতিনাথ-পঞ্চাননকে অশেষ সহায়তা করে চলেছেন এ'দের গুজরাটী বন্ধু শ্রীলালজী রতনসি ভাটিয়া, ওরফে আনন্দ-বাবু। প্রথমে ইনি ছিলেন শুধু এ'দের কোপরা-সাপ্লায়ার। বহু বছরের ব্যবসায়িক সান্নিধ্য এখন বন্ধুতায় পরিণত হয়েছে।

যে মৌলিন-নগটির উল্লেখ আরম্ভেই করেছি সেই প্রতিষ্ঠানের নাম 'শালিমার টুলস অ্যাণ্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টস'। এটির তত্ত্বাবধান করেন শালিমার কেমিক্যালের চীফ এঞ্জিনীয়ার এবং প্রকৃতিনাথের অংশীদার শ্রীকালীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ইনি ইওরোপ আমেরিকায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসে প্রকৃতিবাবুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। শালিমার কেমিক্যালের দায়িত্বের পরেও এই মৌলিন-শপের পরিচালনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু পূর্ব বর্ণিত শ্রমিক অস্থিরতার জন্যে এখন এই বিভাগটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

শালিমার কেমিক্যাল-এর পরিবেশ শ্যামল, সুন্দর। নতুন ফ্যাক্টরীর একাধিক বিলডিং, ল্যাবোরেটারি, ক্যানটিন ও গ্যারাজ প্রভৃতিকে ঘিরে রয়েছে বাগান, পুকুর আর পঙ্‌ক্তি নারকেল গাছের শ্রেণী। এই পারি-

শেঠিয়া ৪৬, ... স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

পার্শ্বিক শ্রমিকদের সুস্থ দেহে মনে আনন্দে কাজ করা উচিত।

কিন্তু বালিগঞ্জের নতুন 'ফ্লাইওয়ে' (রেল লাইনের ওপরের ব্রীজ) পেরিয়ে বারুইপুর অবধি এই রাজপথের এবং এই বিস্তীর্ণ দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের মনে এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর, অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে ভ্রান্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব। কৃষ্ণা গ্লাস ওয়ার্কস, সুলেখা ওয়ার্কস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে যে-দুটি প্রবন্ধ কয়েক মাস আগে লিখেছি তাতেই এই নেতৃত্বের ভ্রমাত্মক কার্যকলাপের বিবরণ দিয়েছিলাম বলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

গত বছর এপ্রিল মাসে যুক্ত ফ্রন্টের রাজত্বকালে শালিমার কেমিক্যালেও সেই মানসিক বিকারগ্রস্ত নেতারা হানা দিয়ে শান্তিপ্রিয় কর্মীদের বিচলিত করে তুলেছিলেন। যে প্রকৃতিনাথ ভট্টাচার্য স্বয়ং কঠোর পরিশ্রমে সামান্য শ্রমিক ও দোকানদার হয়ে প্রথম যৌবনে দিনাতিপাত করেছিলেন, শূন্য থেকে এই বৃহৎ সংস্থাকে গড়ে তুলেছিলেন, রাজনৈতিক নেতারা শ্রমিকদের বিপথে টেনে নিয়ে সেই প্রকৃতিনাথকেই পর পর দু'বার একটানা ঘেরাও লাঞ্ছনা ও অপমানের কশাঘাত করালেন। ক্ষোভে অভিমানে প্রকৃতিনাথ নবনির্মিত ফ্যাক্টরীর তত্ত্বাবধান ছেড়ে দিলেন। প্রায় একটি বছর তিনি নরেন্দ্রপুরে আসা বন্ধ রেখেছিলেন। পরিণামে শালিমার-এর উৎপাদনের দ্রুত অবনতি হয়ে বিশ্রী এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। তখন ত্রস্ত কর্মীরা নিজেদের ভুল বুঝলেন এবং আটষট্টির মে মাসে তাঁরা এক মিটিং ডেকে তাতে প্রকৃতিনাথের উপস্থিতি প্রার্থনা করলেন। সেই মিটিং-এ কর্মীরা তাঁকেই পাল ছেঁড়া নৌকোর হাল ধরতে নতুন করে আহবান করলেন—কোনো জবরদখলদার রাজনৈতিক নেশাগ্রস্ত নেতাকে নয়।

এখন শালিমার কেমিক্যালের তেল ও ঘি-বিভাগ আবার পুরোদমেই চলছে, বেরিয়াম কম্পাউন্ডস বিভাগ মন্থরগতিতে এগোচ্ছে, কিন্তু 'শালিমার টুলস' এখনো বন্ধই আছে। শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মন্দার উপশম বিশেষ হয়নি বলেই প্রকৃতিনাথ ও কালীমোহন সন্তর্পণে 'শালিমার টুলস' নতুন করে খোলার বিষয়ে বিধিব্যবস্থা করছেন। আশা করি তাঁরা শীঘ্রই এটা চালু করে বেশ কয়েকজন বাঙালী কারিগরকে পুনর্নিয়োগ করবেন। বাঙালীর নতুন কর্ম-সংস্থানও হবে, আর দেশের সম্পদও বাড়বে। শালিমার কেমিক্যালের দু'শো কর্মীর মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী।

প্রকৃতিনাথ-পঞ্চানন সরষের তেল তৈরি করেন না। আমি কিন্তু অনুরোধ করবো যে, আমার জন্যে তাঁরা যে করেই হোক কয়েক কিলো ঝাঁঝালো খাঁটি সর্ষপ তৈল প্রস্তুত করুন। তাই নিয়ে আমি লজ্জা ঘৃণা ভয় ভুলে ঘরে ঘরে নেতাদের হাতে পায়ে তেল মালিশ করতে রাজী আছি একটি শর্তে—নেতারা শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি পরিহার করে অন্তত দশটা বছর বাঙালীর, তথা ভারতের শিল্পোদ্যোগকে 'ডিসটার্ব' করবেন না। বছর দশেক পরে তাঁরা সংগঠিত শিল্প-বাণিজ্যের সবটাই না-হয় দখল করে নেবেন, কিন্তু এখন রেহাই দিন। তাঁরা বাঙালীকে খেয়ে পরে বাঁচার চেষ্টাটা করতে দিন।

বিশ্বকর্মা

আপনার বয়স কি সৌন্দর্যের প্রতিবন্ধক ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও আরও নানা উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্র পথগুলি বন্ধ হয়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তার খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে সৌন্দর্য ম্লান করে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে বলে ত্বক তার উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধরে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধরে মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগিয়ে রাখে।

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

Kalpana, CK3898

পারীতে সম্প্রতি ভারতের প্রতি বিভিন্নভাবে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। টেলিভিশনে একটি সিরিজ চলছে আর্নো দে জারদ্যাঁ-র একাধিকবার ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে। ভারতবর্ষের অতীত ঐশ্বর্য বর্তমানের বুকে আজো যেটুকু বিরাজমান, আর্নো দে জারদ্যাঁ তার ঐকান্তিক ভক্ত। ভারতীয় যোগসাধনার অভ্যাস তিনি করেছেন জনৈক যোগীর কাছে দীক্ষা নিয়ে; ভারতীয় সাধনার পথে যে প্রশান্তি যে স্থৈর্য তিনি লাভ করেছেন, তা সংক্রামক : টেলিভিশনের সাক্ষাৎকার হয় সাধারণত বিশেষ মানসিকতার অধিকারী এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের মাধ্যমে। তাঁদের তির্যক ও চতুর প্রশ্নবাণে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আর্নো দে জারদ্যাঁ আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ঘাটন ক'রে চলেছেন শাশ্বত ভারতের আধ্যাত্মিকতার রহস্য, যেমনটি তিনি দেখেছেন। তিনি বলেন, যতই ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ততই গভীরতর অনুরাগ ও মমত্ব নিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ।—আমার মতে, এদেশে এতখানি গাম্ভীর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে কম লোকেই বুঝতে চেষ্টা করেছেন ভারতীয়—এবং তিব্বতী, তন্ত্রের মূল্য।

সাধারণ লোকের মধ্যে সচরাচর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেমন সহজ মৈত্রীর একটা ভাব ফ্রান্সে লক্ষ করা যায়, তেমনি কর্তৃপক্ষের ব্যবহারেও ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি তাঁদের সমীহ অনুভব করা কঠিন নয়। এবং ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা শিল্পচর্চার বৃত্তি নিয়ে এদেশে আছেন বা এসেছেন, তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের শিল্পকর্মের বিষয়ে কম সচেতন নয় শিল্পরসিকদের মন। পারী-প্রবাসী ইংরেজ শিল্পী স্যামুয়েল হেটার সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে, তাঁর প্রিয় ভারতীয় ছাত্রদের মুখে তাঁর ভারতীয় ও বাঙালী প্রীতির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি ভারতীয় শিল্পীদের সম্ভাবনায় এঁর আস্থা দেখে। বিমল ব্যানার্জি, হিম্মৎ শাহ্, প্রকাশ কর্মকার, সুধীরঞ্জন ভূঞা, দীপাক ব্যানার্জি, অমিত সেনগুপ্ত, যোগেন চৌধুরী প্রভৃতি পারীতে যে কাজ করেছেন ও করছেন, তার সম্যক আদর পেতে দেখেছি আমি। সম্প্রতি বিমল ব্যানার্জির এবং অমিত সেনগুপ্তের একক দুটি প্রদর্শনী, ইতালির এক পত্রিকায় বিমল ব্যানার্জির যৌথ এক প্রদর্শনীর সপ্রশংস বৃত্তান্ত প্রভৃতি যথেষ্ট আশ্বাসের কারণ হয়েছে বান্ধব-মহলে।

মাস-খানেক ধ'রে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব চলছে লাংলোয়া পরিচালিত 'সিনেমাতেক'-এ; একেবারে গোড়ায় রোসেলিনির একটি চলচ্চিত্র India দেখানো হয়েছে যা যথেষ্ট নৈরাশ্যজনক। উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' ছবিটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত আলোচনা শুনেছিলাম, ছবিটি দেখবার যে কৌতূহল ছিল, এই উৎসবে তা চরিতার্থ হলেও যা দেখতে চেয়েছিলাম উদয়শঙ্করের কাছে দেখতে না পেয়েই চলে আসতে হল, মনে হয়েছে আমার। সত্যজিৎ রায়ের অপু সিরিজের তৃতীয়টি তৃতীয়বার দেখলাম এইবারে; জর্জ সাদুল স্বয়ং এর সংলাপ ফরাসী করেছিলেন—যাঁরা বাংলা ও ফরাসী দুটি ভাষাই জানেন তাঁরাই একমাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন কী সুন্দর হয়েছে গুণীজনের ওই ভাষান্তর, যা সত্যজিৎ রায়কে বোঝাতে সহায়ক হয়নি শুধু, বোধ করি অপরিহার্যও ছিল। 'জলসাঘর', 'দুই কন্যা', 'পরশপাথর', 'মহানগর', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি সত্যজিৎবাবুর আরো বইও দেখানো হচ্ছে এই উৎসবে। উৎপল দত্তের 'ঘুমভাঙার গান', ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', ভুপেন হাজারিকার 'প্রতিধ্বনি' প্রভৃতি ছবি ছাড়াও গজানন জায়গীরদারের 'রামশাস্ত্রী', কোট্টা-মঙ্গলম সুব্বু-র 'আব্বৈয়ার' এজরা মীরের 'পাম্পোশ' প্রভৃতি ছবি দেখানো হয়েছে। এত ছবির ভিড়ে একটি ছবির কথা বহুদিন ধ'রে শুনে এসেছি, যা দেখে চমৎকৃত হলাম ১৯৩৭ সালের বাংলা ছবির বিষয়ে তুলনামূলক একটা ধারণা করতে পেরে : সাধনা বসু অভিনীত মধু বসুর 'আলিবাবা'তে আমাদের সমবেত যন্ত্র-সঙ্গীতের প্রথম সিনেমা সংস্করণ খুব সুখপ্রদ সর্বৈবভাবে না হলেও কয়েকটা জায়গায় বেশ লাগল। জাতীয় বিবর্তনের ধারায় এই ছবিটি বড় রকম-একটা ডকুমেন্ট মনে হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আরও একটি সুখবর পেলাম ইতিমধ্যে : অবিলম্বে তাঁরা একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্যাপনের পরিকল্পনা করছেন, আমাদের কারো কারো সহযোগিতা চেয়েছেন। আশা করি এঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে, কারণ উদ্যম বা অর্থের অভাব এঁদের নেই।

*

পারীর সবচেয়ে অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ 'সাল্ প্লেইয়েল' গত ৫ই নভেম্বর টইটম্বুর : আসনে ঠাঁই যাঁদের হয়নি, ভূম্যাসনেই তাঁরা তুষ্ট মনে শুনছিলেন রবিশঙ্করের সেতার। আঙ্গিকের উৎকর্ষ, স্পর্ধিত সুরবিহার, জটিল তালের এক্কা-দোক্কা, অনুভূতির আলোছায়া টপকে যখন বিরতির সময় হল, মনটা যথেষ্ট ক্লান্ত

লাগল। চার বছর আগে দিল্লীর সপ্রু হাউসে প্রায় সামনা-সামনি ব'সে শুনেছিলাম এই সঙ্গীতাচার্যের বাজনা, বহু রাত অবধি ছিলাম একটা ভাবজগতের সম্মোহনে বন্দী হয়ে। কোথায় সেই রবিশঙ্কর?

মনে বেশ কয়েকটা অভিযোগ নিয়েই অবশ্য শুনতে গিয়েছিলাম এদিনের বাজনা। পারীর দেয়ালে পাঁচিলে সর্বত্র ইস্তাহার টাঙানো ছিল, আন্তর্জাতিক জ্যাজ উৎসবের অঙ্গরূপে একদিন থাকবে রবিশঙ্করের বাজনা। এমনিতেই জনশ্রুতি যে বিদগ্ধ বিচক্ষণ ফরাসী শিল্পরসিকদের অগ্রগণ্য কেউ কেউ অস্বীকার করেন শাস্ত্রীয় ভারতীয় সঙ্গীতকে classical-এর অন্তঃপুরে বরণ ক'রে নিতে। তার ওপরে, এই মিথ্যা ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পরিবর্তে রবিশঙ্কর কিনা বাজাতে এলেন জ্যাজ উৎসবে? ক্লাসিকাল পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের প্রথম শ্রেণীর প্রণেতা ও শিল্পী এহুদি মেনুইন যে রবিশঙ্করকে সমপর্যায়ভুক্ত বিশ্ববরেণ্য সঙ্গীতাচার্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, সেই রবিশঙ্কর কেন নিজের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে এত উদাসীন? তিনি কি জানেন না যে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতিরও স্বাধীন সনদহীন রাষ্ট্রদূত তিনি ইওরোপে অ্যামেরিকায়?

রাত নটায় অনুষ্ঠান সূচিত হবার কথা ছিল। সোয়া নটা বেজে যাচ্ছে দেখে চিরচঞ্চল পারীসির শ্রোতৃমণ্ডলে মৃদু ধিক্কারের অথবা অসহিষ্ণুতার গুঞ্জন জেগেছিল সবে।... বিরতির শেষে, তৃতীয় রাগটি বাজানোর আগে ফরাসীতেই রবিশঙ্কর প্রথামতো রাগ-পরিচিতি দিয়ে বললেন, "এই রাগটি আমাদের দেশে রাজসভায় গুণীজনের সমাবেশে বাজান হত মধ্যরাত্রি নাগাদ। আমাদের দেশের অনুষ্ঠান হলে এই রকম এক-একটা রাগ দেড় ঘণ্টা দু' ঘণ্টার ওপর বাজাতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আমায় অনুরোধ করা হয়েছে, রাত বারোটার পরে যেন আর না বাজাই—" তুমুল হর্ষধ্বনি জাগল প্রেক্ষাগৃহের সর্বত্র। কারণ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের যে-কোন অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, স্বরলিপি অনুযায়ী অ সীমিত। এমন কি শ্রোতৃমণ্ডলী মোটের উপর এমনই অভ্যস্ত যে, তাঁদের অজানা নয় কোন্ মুভমেণ্টের পরে কোনটা আসবে, কোথায় বিরতি, কোথায় যতি। অর্থাৎ একটা সিম্ফনী বা কন্‌চার্টো বা সোনাটার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভুল করে এখানে হাততালি পড়তে শুনিনি; এবং পারীতে আসার আগে আমার জানা ছিল না হাততালির ভাষা এমন বিচিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। জার্মানীতে রস্ত্রোপভিচ্ এবং সম্প্রতি এখানে তেয়াত্ৰ্ দ্য শাঁ জেলিজে (champs-Elysees) প্রেক্ষাগৃহে ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বাঁশি-বাজিয়ে জাঁ-পিয়ের রামপালকেই শুধুমাত্র দেখেছি অনুষ্ঠান-পত্রে ঘোষিত সঙ্গীতের পরেও একের পর এক বাজনা শুনিয়ে চলেছেন শ্রোতাদের করতালির প্রত্যুত্তরে। রবি-শঙ্করেরও এই উদার শিল্পপ্রেম দেখে অভিভূত শ্রোতারা বুঝলেন যে, অর্থ বা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েন না সৃজনক্ষম প্রতিভাবানেরা।

দরবারী কানাড়ার শান্ত সুপ্রসন্ন সমাহিত পরিমণ্ডলে আমরা এমনি ডুবে গিয়েছিলাম যে, খেয়াল ছিল না কখন রবিশঙ্করের বাজনা থেমেছে, অন্তত প'য়ত্রিশ-চল্লিশ সেকেণ্ড ধ'রে নিথর নির্বাক পরিতৃপ্তির নীরবতায় শ্রোতারা উপভোগ করছিলেন সঙ্গীত-যাদুকরের সূক্ষ্মলোকে জাগানো মূর্ছনার তরঙ্গ। ধ্যান ভাঙল। চমকে উঠলাম প্রচণ্ড করতালির অট্টরোলে। অদূরেই বসে ছিল য়োবিন নামে অস্ট্রে-লিয়ান মেয়েটি, জানতে চাইল, "তুমি যে তালি দিচ্ছ না? ভাল লাগেনি?" "তালি না দিলে বুঝি ভাল লাগা-টা জুতসই হয় না?" বলতে গিয়েও বলিনি, এবং পাছে অন্যেরাও একজন ভারতীয়ের ভাল লাগেনি ভেবে বসে, চটাপট চটাসপটাস চালালাম তালি। ("এরা কি ভাবে" একমাত্র আমিই ভাবিনি ঃ স্বয়ং রবিশঙ্কর প্রথম বাজনার পরে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি যখন তবলচির দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ি, তার মানে নয় যে, তাঁর বাজনা আমার মনঃপূত নয়, বরং তার উলটোই। এবং কখনো কখনো তালের নতুন cycle—সম্-এ এসেও আমরা ঘাড় নেড়ে পরস্পরকে উৎসাহিত করি।")—

অনেক রাত তখন। বাজনা-শেষে বহু ইতস্তত ক'রে দেখা করলাম অবশেষে রবিশঙ্করের সঙ্গে। চির-তারুণ্যের প্রতীক এই বুদ্ধি-ভাস্বর বাঙালী প্রতিভাবান না জানি কত বিরক্ত হবেন, হয়তো যশের গর্বের

বর্ম ভেদ ক'রে আসল মানুষটার নাগাল পাব না—ভাবতে ভাবতে প্রেক্ষাগৃহের সাজঘরে পেঁাছে গেলাম, একেবারে ও'র সামনে মুখোমুখি। এখানেই আরো অনেক বিশ্ববরেণ্য গুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমার, তার মধ্যে লিওপোলড স্টকোভস্কির কথা ভুলব না।—সহাস্য অভিনন্দনে আপন ক'রে নিলেন রবিশঙ্কর। নিরভিমান আন্তরিক বিনীত ও'র ব্যবহারে সাহস হল আমার অভিযোগ কথা-প্রসঙ্গে ও'কে নিবেদন করবার।

শুনে একটু চুপ ক'রে গেলেন। তারপরে বললেন, "সাংবাদিকদের মর্জিমতো তারা যেমন-তেমন প্রচার করছে। এর বিরুদ্ধে আমি হেরাল্ড ট্রিবিউনে এই সদ্য একটা বিবৃতি দিয়েছি—বিশেষত বীটলদের গুরু বলেই আমার পরিচয়টা এরা চাউর করছে, দেখে আমি বাধ্য হলাম বিবৃতি দিতে।...বীট্‌লরা ছেলে খারাপ নয়, নিষ্ঠা নিয়ে হ্যারিসন আমার কাছে সেতার শিখতে এসেছিল বলেই না ওকে আমি শিখিয়েছি।—আর জ্যাজ-আমোদী মহলই এ দেশে আমার জনপ্রিয়তার প্রথম কারণ ছিল ব'লে জ্যাজের সংস্রব আমি কৃতজ্ঞতাবশত হঠাৎ

ক'রে ত্যাগ করতে পারিনি। তা ছাড়া সব জ্যাজ তো মন্দ নয়। কিন্তু ওই যে কি পক্ক বলে না? এদেশী সাংবাদিকদের ব্যাপার হচ্ছে তাই : আমার চেয়ে, আমার গুরুদেবের চেয়েও এরা বেশি বোঝে ভারতীয় সংগীত, এরা জানে কোনটা ক্লাসিক্যাল আর কোনটা নয়। সত্যি মশাই, আর বলেন কেন? আপনারা এ-বিষয়ে ভাবছেন, একটু যদি আন্দোলন করেন এ নিয়ে, খুব ভাল হয়।—" উপস্থিত আরো জন-কয়েক বাঙালী তরুণ ছিলেন; সবাই মিলে জানালাম যে, ভারত-সংক্রান্ত বিভিন্ন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমরা যতটা পারি চেষ্টা করছি, প্রতিবাদ শুধু নয়, গঠনমূলক পন্থায় অগ্রসর হতে। কিন্তু অল্প-ক'জনের প্রচেষ্টা আর কতদূর সাফল্যলাভ করতে পারে?

রবিশঙ্কর তাঁর ঠিকানা দিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর সংগে যোগাযোগ রাখি যেন। চিঠির জবাব দেবেন তিনি। মুগ্ধ হলাম আমাদের দেশের এত বড় এক গুণীর সান্নিধ্যে এসে।

*

"চাহি না সাম্রাজ্যবাদ, সাম্যবাদ মোর কাম্য নহে, আমি আন্দোলিত নই ধনিক শ্রমিক আন্দোলনে"—ছাত্র-জীবনেই কবি নিশিকান্তের এই কবিতাটির সংগে একমত ছিলাম আমি। বিদেশে এসে প্রতিমুহূর্তের কষ্টিপাথরে রাজনীতি-সচেতন এই সমাজ জানতে চায়, কে দক্ষিণ-পন্থী, কে বাম, কে পুঁজিবাদী, কে সাম্যবাদী।

১৯শে নভেম্বর (১৯৬৮) তারিখের 'Monde' পত্রিকায় তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধি জিলবুয়ার মাতিয়্যু'র লেখা যখন পড়ি বোম্বাইয়ে জার্মান সহযোগিতায় Polyolefins Industries Ltd- সংস্থার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষে, মাঙ্গলিক-গীতির ব্যঙ্গচিত্র; সামনের বছর থেকে চব্বিশ হাজার টন পলিয়েথিলিন উৎপাদিত হবে ভারতে, সে -বিষয়ে বিদ্রূপ; ভারতের মতো দেশে স্ট্যাটিস্টিক্স-এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ; বিড়লা মফতলাল টাটাদের নিয়ে রঙ্গ; "কাজে না হক মুখে অন্তত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বড়াই" এবং "বিদেশী মুদ্রার প্রতি লালসা" গোছের উক্তি;—মন তখন আপনিই বিদ্রোহ করে : কেন এই বিরূপ ভাব, কি আমাদের দোষ? ভারতীয় পুঁজিবাদীই হক, শ্রমিকই হক, তাদের নামে বিদেশে এইভাবে রটনা হতে দেখলে আমরা কেন যে এতখানি বিচলিত বোধ করি, ভাবি। আমাদের মতো প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা হরণ না করেও কোন প্রকারে যথাযথ সংবাদ পরিবেষণের পন্থা আবিষ্কার করা সম্ভব কিনা, জানি না। আমাদের দেশের অনুরূপ সমস্যা তো আশে-পাশের আরো দেশেও কম নেই; তাদের প্রতি খড়্গহস্ত দেখি না কেন এইসব মহাপ্রভুদের? আমাদের বাজেটের ত্রুটি নিয়ে যাঁরা ঢাক পেটান, তাঁদের চোখে কেন পড়ে না খুবই হাতের কাছে অন্যান্য বাজেট-সংকটের যে উদাহরণগুলি জাজ্জ্বল্যমান?

*

হেমন্তের শেষ দিনগুলো প্যারীর সাহিত্য-জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হবার তিন-চার সপ্তাহের মধ্যেই ছোট-বড় অসংখ্য ফরাসী পুরস্কারের পালা আসে একের পর এক। গত ৫ই নভেম্বর 'মহানগরীর প্রধান সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেছেন ব্যার্নার ক্লাভেল। জানতাম না, এই সপ্তাহে স্বল্পখ্যাত এই নামটি ঝড় তুলবে এক্সপ্রেস কফির পেয়ালায়।

১৮ই নভেম্বর সোমবার বেলা একটায় রেস্তোরাঁ দ্রুআঁ-তে র‍্যনোদো ও গঁকুর আকাদেমির সাহিত্য পুরস্কারের সংবাদ যখন বহু প্রতীক্ষার শেষে প্রকাশিত হল, মন্দ আলোড়ন জাগল না কাগজে, কাগজে; গঁকুর আকাদেমির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরস্কারটি অর্পিত হচ্ছে ব্যার্নার ক্লাভেল-এর গ্রন্থাবলীর স্বীকৃতিতে এবং এর প্রতিবাদে গঁকুর আকাদেমির প্রসিদ্ধ সদস্য প্রবীণ কবি ও ঔপন্যাসিক লুই আরাগঁ পদত্যাগ করলেন। এক বছরও হয়নি, উক্ত আকাদেমির সদস্যদের সার্বিক সম্মতিক্রমে আরাগঁ তাঁদের সদস্য-পদে বৃত হন (এবং তার পরে 'লেৎর ফ্রাঁসেজ' নামে তাঁর পত্রিকায় যতবার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন আরাগঁ, স্বাক্ষরের তলায় 'গঁকুর আকাদেমির সদস্য' উল্লেখ করতে ভোলেন নি!) এবং সাহিত্যের বাজারে রাজনীতির পশার জমাতে তিনিও ব্যতিক্রম নন ব'লে অভিযোগ শোনা যেতে লাগল। এমন-কি যাতে ব্যার্নার ক্লাভেলকে মহানগরীর পুরস্কার অর্পণ ক'রে গঁকুর পুরস্কারের সম্ভাব্য তালিকা থেকে উৎখাত করা যায়, সেই পরামর্শের প্রেরণাও আরাগঁ-মস্তিষ্কের ফল : স্বার্থ, যাতে আরাগঁ-এর ঘোড়া ফ্রাঁসোয়া নুরিসিয়ে ("গৃহস্বামী" উপন্যাসের লেখক) গঁকুর রেসে জিতে যান। এ-সবই অপ্রিয়ভাষী রসনার গুজব মাত্র নয় বোধ করি। কারণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর প্রাক্কালে উক্ত আকাদেমির সদস্যদের মধ্যে "কোন্ প্রার্থীদের ভোট দেব?" প্রশ্নের পরিবর্তে "আরাগঁ'র স্বপক্ষে না বিপক্ষে?" প্রশ্নটাই প্রাধান্য পেয়েছে, এবং দুটি দল গড়ে উঠেছে। দলাদলির বিষাক্ত পরিবেশ হালকা করবার সদুদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কেউ নতুন আরো প্রার্থীদের নাম উল্লেখ করেন, যার মধ্যে একুশ বছরের ছোকরা ঔপন্যাসিক পাত্রিক মোদিয়ানো ("La place de e'Etoile") উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আপোসের ভক্ত নন আকাদেমির সদস্যেরা।

কে এই ব্যার্নার ক্লাভেল?—তাঁর বৈশিষ্ট্য বলতে স্বতঃস্ফূর্তি, অনুভূতির সূক্ষ্মতা সংকোচ ও স্পষ্টভাষণের সমন্বয়। রুশ সাহিত্যের বাস্তবতার মধ্যে যে-কল্পজগৎ আমরা পাই, ব্যার্নার ক্লাভেলের জগৎ অনেকটা তার কাছ ঘেঁষা : কতক তলস্তয়, কতক চেখভ সেখানে উপস্থিত যেন। তাই ব'লে গতানুগতিক যে-জীবনের ছবি তিনি তুলে ধরেন সেখানে মৌলিকতার স্বাক্ষর, স্বতন্ত্র এক কণ্ঠস্বর বিরল নয়। "প্রেরণা কথাটা বেজায় ধাপ্পা; আমি বিশ্বাস করি পরিশ্রমে" বলেন ব্যার্নার ক্লাভেল। দরিদ্র শৈশব, শ্রমিকের কৈশোর-যৌবন, সন্তানের বাৎসল্য, বার্ধক্যের নিঃস্বতা—রক্তে মাংসে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন ক্লাভেল তাঁর উপন্যাসগুলিতে। এঁর চরিত্রগুলি জীবনেরই প্রবাহ থেকে যেন উঠে দাঁড়ায় তাদের প্রাণ-সংবিতে উদ্দীপ্ত হয়ে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে "রাতের মজুর" (১৯৫৬), "আমায় যা বাজে" (১৯৫৮), "স্প্যানিয়ার্ড" (১৯৫৯ —টেলিভিশনে রূপায়িত), "পল গোগ্যাঁ" (১৯৫৯ : রোদানিয়ে' পুরস্কার প্রাপ্ত), "অশিব-সরাই" (১৯৬০) "অন্যদের বাড়ি" (১৯৬২), "পিতার পরিক্রমা" (১৯৬৫) প্রভৃতি নিয়ে এখন খুবই আলোচনা চলছে। "মহান ধৈর্য" নামে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সালে লেখা উপন্যাসটির (চারখণ্ড) নায়ক জুলিয়ে'-র মধ্যেই সবচেয়ে স্পষ্ট ক'রে খুঁজে পাওয়া যায় ব্যার্নার ক্লাভেলের ঐকান্ত্য।

*

অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বার প্যারী ঘুরে গেলেন প্রসিদ্ধ সংগীত শিল্পী শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী। দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রাবাসে নতুন ক'রে তাঁর সুরবাহার ও সেতার শুনলাম। নতুন আনন্দ লাভ করলাম আমরা তাঁর সংগে কিছুক্ষণ কাটাতে পেরে। শ্রীমতী ঋণা দাসের মনোজ্ঞ ফ্ল্যাটেও বিমলাকান্ত-বাবুর বাজনার আয়োজন হয়েছিল অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শারদ সাহিত্য

শারদ সাহিত্য সম্পর্কে ১৬ নভেম্বরের দেশ পত্রিকায় শুভ আচার্যর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ পড়বার পর থেকেই আপনাকে এমন লেখা প্রকাশ করবার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখব-লিখব করছিলাম কিন্তু হঠাৎ দেখলাম ৩০ নভেম্বর সংখ্যায় দণ্ডকারণ্য থেকে তাপসকিরণ রায় কিছু শ্লেষ মিশ্রিত চিঠি আপনাকে লিখে বসে আছেন। আপনাকে কটাক্ষ করছি না, তবে এই রকম চিঠি ছাপাবার অর্থ আমার বোধগম্য হল না।

প্রত্যেক বছরের মতন এবারে অনেক শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলেও দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় অভাব যে বৃহত্তম সংখ্যার পাঠক অনুভব করেছেন তা অস্বীকার করা যায় না এবং সে কথা যদি কোন লেখক লেখেন ও আপনি আপনার পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন তাহলে গুণ-কীর্তনের খোঁচা আপনাকে দেয়া কেন? আপনি বিনয়ের অবতার হলে অবশ্য আপনার লজ্জা পাবার কথা। দণ্ডকারণ্যের পত্রলেখক যেমন বলেছেন, আমার লেখা যখন দেশ পত্রিকায় উঠছে তখন তোমাদের গুণকীর্তন গেয়ে খুশী রাখব—তেমনি আমিও বলি, না উঠলে তোমাদের মুণ্ডুপাত করব, চতুর্দিকে দেশ পত্রিকার আদ্য শ্রাদ্ধ করে বেড়াব। এ আর নতুন কথা কী, এসব তো মানব মাত্রেরই ধর্ম।

কোন পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর অর্থোপার্জন সম্পর্কে এখন যে একেবারেই নিরুৎসাহী হলে চলে না আমরা সকলেই সে কথা জানি। তবে অর্থোপার্জনের সুযোগ গ্রহণকারীদেরও যে একটা শ্রেণীগত পার্থক্য আছে বুদ্ধিমান পাঠকের তা বুঝতে সময় লাগে না। নামী লেখকের অর্ধ সমাপ্ত ডজন-ডজন নিকৃষ্ট কাহিনী সম্পূর্ণ উপন্যাস নামে আজ অবধি কি দেশ পত্রিকার কোন শারদীয় সংখ্যাকে ঢাউস করে তুলতে পেরেছে? এবং তাপস-বাবুর মতন আপনারা অর্থোপার্জনের সুযোগ গ্রহণ করলেও একেবারে নতুন লেখক সুনীল ও শীর্ষেন্দুর উপন্যাস কি প্রকাশিত হয়নি? শুভ আচার্যের 'নিছক' শব্দের প্রয়োগ tricks খেলবার জন্যে নয়—সম্ভবত, এই ইঙ্গিত করবার জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে তাপস-বাবুকে জানান দরকার মনে করছি। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে বর্মন স্ট্রীট থেকে দেশ পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অর্থোপার্জনের কথা কর্তৃপক্ষ চিন্তা করেননি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে স্বাধীনতা পর্বের প্রস্তুতি—এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই দেশ পত্রিকার প্রথম আবির্ভাব।

ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের সঙ্গে আপনার আলাপ-আলোচনার কথাও দেখলাম এই চিঠিতে লেখা হয়েছে। আপনার বন্ধু হিসেবে আমরা জানি কখনো কখনো কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের সময় আপনার একটা নতুন কিছু করবার বাসনা জাগে এবং আপনি আমাদেরও দু একবার জিজ্ঞেস করেছেন, "এবার কী করা যায় বলুন তো?" বিমল-বাবু হয় তো প্রসঙ্গক্রমে দণ্ডকারণ্যে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশেই এসব কথা তুলেছিলেন। তবে দেশ পত্রিকার শ্লীল অশ্লীল সাহিত্য বিষয়ক সংখ্যায় কারা লিখেছিলেন সে কথা তাপসবাবুর মনে আছে কি?

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা

কবি-নির্বাচন

গত ৩০-১১-১৯৬৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় 'সাহিত্য-সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত 'কে কবি কবে কে মোরে' নিবন্ধে সনাতন পাঠক ডঃ ইনিড স্টারকি সম্পর্কে লিখেছেন —'উনিশ শো একষট্টি সাল থেকেই তিনি (ইনিড স্টারকি) এই পদটি (অক্সফোর্ডের কবিতার অধ্যাপকের পদ) পাবার চেষ্টা করছেন।' তথ্য হিসেবে সনাতন পাঠকের উদ্ধৃত উক্তিটি সত্য নয়। আমার মতের সমর্থনে প্রথমে উদ্ধার করছি ২৭শে নভেম্বর তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ Becoming a trumpet থেকে। উক্ত নিবন্ধে ডঃ স্টারকি সম্পর্কে বলা হয়েছে—'Enid Starkie, Reader in French literature, who had successfully managed so many previous campaigns that she decided to have a shot herself, and actually came in second.' এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কবিতার অধ্যাপকের পদ-প্রার্থী হিসেবে এবারেই ডঃ স্টারকি প্রথম ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। গতবারে মিঃ লাউয়েল-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে মিঃ ব্লানডেনকে দাঁড় করিয়ে তাঁকে নির্বাচন-যুদ্ধে জিতিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ডঃ স্টারকি-র বিশেষ হাত ছিলো বলে শোনা যায়। ডঃ স্টারকি সম্পর্কে Encounter পত্রিকায় ১৯৬৬ সালের এপ্রিল সংখ্যায় জন ওয়েন লেখেন—'Dr. Starkie has for twenty years made something of a hobby of electioneering for the chair of Poetry.' মিঃ ব্লানডেনের জয়ের পর The Sunday Times— এ লেখা হয় যে, 'This result was hailed as another victory for Dr. Enid Starkie, who for the third time has master-minded an election campaign.'

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে ডঃ স্টারকি বরাবরই নেপথ্য থেকে তাঁর অভিপ্রেত প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালিয়ে তাঁকে নির্বাচনে জয়ী করেছেন। কবিতার অধ্যাপকের পদের জন্য প্রার্থীরূপে এবারেই তিনি প্রথম দেখা দিলেন।

শিশিরকুমার হালদার
তমলুক।

লেখকের উত্তর

পত্রদাতা স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি তুলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আমি ভুল লিখেছি। স্টেটসম্যান পত্রিকা কখনো ভুল লেখেন না, একথা জোর দিয়ে বলার মতন অভিজ্ঞতা বা সাহস আমার নেই। এনকাউণ্টার বা সানডে টাইমস থেকে যে উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন, তাতে প্রমাণ হয় না যে ইনিড স্টারকি আগে ঐ পদে নির্বাচনে দাঁড়ান নি। আমি যে পত্রিকা থেকে তথ্য নিয়েছি; এবার সেটা জানাচ্ছি। লণ্ডনের দি টাইমস্ পত্রিকার ১৬ই নভেম্বর সংখ্যায় ১০-এর পাতায় ইনিড স্টারকি সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

"An ardent campaigner for others, Blunden among them, she is now a candidate for the second time. She has the support of more than 100 official nominators, including Robert Graves, who won the election of 1961, in which she stood." দি টাইমস্ তো স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে শ্রীমতী স্টারকি ১৯৬১ সালে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি এর থেকে আর বেশী কিছু জানি না।

সনাতন পাঠক

ধনগোপাল মুখার্জি

গত ৯ই কার্তিক (১৩৭৫) সংখ্যা "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত "প্যারিসের চিঠি"তে শ্রীপৃথ্বীশ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধুনা প্রায়-বিস্মৃত মনীষী সাহিত্যিক স্বর্গত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। লেখক ধ ন গো পা লে র সংক্ষিপ্ত জীবন-আলেখ্য তাঁর সুযোগ্য পুত্রের (যাঁকে তিনি 'গোপাল কাকা" বলেছেন) মাধ্যমে জেনেছেন। দেশ বিদেশে যশস্বী এই ভারত সন্তান পিতাপুত্রের জীবন-কাহিনী সম্যকভাবে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন সম্পর্কে লেখক জোর দিয়ে ভালোই করেছেন।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অকস্মাৎ আত্মহত্যায় প্রাণবিয়োগ ঘটেছিল ১২ই জুলাই, ১৯৩৬ ইং, নিউ ইয়র্কে। তখনকার পত্র-পত্রিকায় এই দারুণ সংবাদ কী জানি কেন আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। অতঃপর তাঁর জীবনের বিশদ বিবরণ জানবার ইচ্ছায় আমি সাংবাদিক হিসাবে কয়েকটি সংবাদপত্রের কাটিং রেখে দিয়েছিলাম। 'দেশ' সাপ্তাহিকে উপরোক্ত প্রকাশনা প্রসঙ্গে আমি ধনগোপালের 'রহস্যজনক' মৃত্যু সম্পর্কে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তিনজন পরম শ্রদ্ধের স্বামিজীর বিস্ময়াত্মক মর্মবেদনামূলক প্রতিক্রিয়ার কথা তখনকার কয়েকটি সংবাদপত্রে যা বেরিয়েছিল তার কতকটা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি। এ সম্পর্কে আরো জানা দরকার যে ধনগোপাল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত ছিলেন।

নিউ ইয়র্কের স্বামী বোধানন্দ লিখেছিলেন, ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় ধনগোপালের পত্নীর নিকট থেকে জরুরী টেলিফোন বার্তা পেয়েই তিনি অবিলম্বে তাঁদের বাসভবনে চলে যান। দেখেন শোচনীয় অবস্থায় ধনগোপালের মৃতদেহ তাঁর পাঠকক্ষের মেঝের পড়ে রয়েছে। উদ্বন্ধেনেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন দেখা যায়। এ ঘটনার কোনো হেতু কেউ তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি। শ্রীমতী মুখার্জি ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় শহরের বহিরাঞ্চল থেকে ফিরে এসে ঘরের দরজা খুলেই এই মর্মান্তিক দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রাথমিক পুলিশ তদন্তকালে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত ধনগোপালের একখানি পত্র সেখানে পাওয়া যায়।

নিউ ইয়র্কের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ লিখেছিলেন ধনগোপাল তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মাতার জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোকপাত করতে বলতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ধনগোপালের এই ভাব যেন ঘনীভূত হয়ে তাঁকে অভিভূত করে রাখতো। স্বামিজী তাঁকে পবিত্র গঙ্গা জল ও শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ দিলে তিনি ভক্তিভরে তা গ্রহণ করতেন। তবে, তাঁর এ রকম জীবনাবসানে ধারণা হয় ধনগোপাল সাধনপথে স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে এ মর জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন।

ধনগোপালের পূজনীয় গুরু, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠাধীশ স্বামী অখণ্ডানন্দও তাঁর পরম ভক্তের এই "অভাবনীয় শেষ পরিণতি"র সংবাদে অশেষ মর্মাহত হয়েছিলেন। স্বামিজীকে লিখিত ধনগোপালের উপরোক্ত শেষ চিঠিতে এবং তার পূর্বেও নাকি তিনি কলকাতায় এসে 'উদ্বোধন' ভবনে থেকে শ্রীশ্রীমার জীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। চিঠিখানিতে আরো লেখা ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীমার চরণে তাঁর আত্মনিবেদনের মর্মকথা। স্বামী অখণ্ডানন্দের নির্দেশেই ধনগোপাল বাংলা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। উক্ত চিঠিখানি ছিল তাঁর কাঁচা বাংলা হাতের লেখা।

শ্রীশচীন দত্ত
কলকাতা-৬০

কলকাতার হালখাতা

শ্রীযুক্ত মৌলিনাথ তাঁর "কলকাতার হালখাতা" (দেশ ৩০।১১।৬৮ সংখ্যা) রচনাটিতে জার্মান ভাষার বস্তুরাজ্যের লিঙ্গ বিচার বিষয়ে কিঞ্চিৎ তত্ত্বকথা পরিবেশন করেছেন যা সর্বৈব ভুল। তাই প্রতিবাদ প্রয়োজন বিবেচনায় এই চিঠি লিখতে হল। মৌলিনাথ কোন এক "জার্মান ভাষা শিক্ষকের" কাছ থেকে জার্মান বস্তুরাজ্যের নামবাচক শব্দের লিঙ্গ নির্ধারণের একটি সর্বরোগহর ফর্মুলা প্রাপ্ত হয়েছেন। ফর্মুলাটি হলো, কোন বস্তুর মধ্যে যদি অন্য কোন বস্তু কোনমতে ঢোকানো যায় তবেই প্রথমোক্ত বস্তুটির লিঙ্গ নির্ধারণের আর কোন বাধা থাকবে না—সেটি হবে স্বভাবতই স্ত্রীলিঙ্গ। এই ফর্মুলা মতে দোয়াত স্ত্রীলিঙ্গ, বাস স্ত্রীলিঙ্গ। পেশায় আমিও একজন জার্মান ভাষা-শিক্ষক। আমরা কিন্তু জানি দোয়াত (Tintentab) ক্লীবলিঙ্গ, আর বাস পুংলিঙ্গ। প্রসঙ্গত জার্মান ভাষায় তিনটি লিঙ্গ আছে; মৌলিনাথ বর্ণিত দুইটি ও ক্লীবলিঙ্গ। উপরোক্ত সূত্র খণ্ডনের জন্যে আরও দুই-একটি (স্থানাভাববশতঃ) উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—যেমন জলখাওয়ার গ্লাস ক্লীবলিঙ্গ আবার কেট্‌লি, বাল্‌তি, বিয়ার খাওয়ার মগ পুংলিঙ্গ ইত্যাদি। মজার কথা এই যে, জার্মান ভাষায় কুমারী মেয়েও ক্লীবলিঙ্গ (Fraulein, Madchen) তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে জার্মান ভাষায় বস্তুর লিঙ্গবিচারের জন্য কেউই কোন চালাও ফর্মুলা দিতে পারেন না।

শ্রীসুধাংশু দেব রায়
কলকাতা-১৪

'কম্পানিস অর্ডার'

গত ২৩শে নভেম্বর '৬৮ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলকাতার হালখাতায়' 'কম্পানিস অর্ডার' শীর্ষক নিবন্ধটি সম্পর্কে আমার কিছু নিবেদন আছে। এই নিবন্ধে বাংলা দেশের এক প্রবীণ সাহিত্যিককে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন 'নাজেহাল' (?) করেছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেছেন যে, গত ৭ই সেপ্টেম্বর '৬৮ তারিখে জনৈক মিটার

ইন্সপেক্টর বিলের টাকা বাকী থাকায় 'লাইন' বিচ্ছিন্ন করতে গিয়েছিলেন। আইন বিধিমত কর্তব্যরত মিটার ইন্সপেক্টরের সাথে প্রবীণ সাহিত্যিক যে ব্যবহার করেছেন, যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তা অকল্পনীয়, অপ্রত্যাশিত। 'আপনি কোন অধিকারে সোফায় বসেছেন?' 'লাইন' বিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার সময় মিটার ইন্সপেক্টরের উদ্দেশ্যে 'চোর, চোর' বলে চিৎকার করা কি শোভন হয়েছে? তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির এক গ্লাস জল চাওয়ারও কি অপরাধ?

তারপর সদর কার্যালয়ে—প্রবীণ সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্যিকা পত্নীর উত্তেজিত উক্তি 'সামান্য কর্মী কি আমাদের সমকক্ষ?' —এসব বলা কি যুক্তিযুক্ত?

বাংলাদেশের বিশিষ্ট এই সাহিত্যিক-দম্পতি ও সমগ্র পরিবারের কাছ থেকে সমাজের একজন সাধারণ মানুষ, আমাদের কর্মীটি যে ব্যবহার পেয়েছেন, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই সুখ্যাত সাহিত্যিকই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের মর্মব্যথার চিত্র এঁকে থাকেন। আমাদের কি এ কথাটাই বুঝতে হবে যে, তাঁদের সাহিত্যিক মতবাদ ও ব্যক্তিগত মতবাদে ফারাক রয়েছে, অথবা সবটাই ফাঁকি!

প্রবীণ সাহিত্যিক মহাশয় যে ইলেকট্রিক বিল যথাসময়ে মিটিয়ে দিতেন না, তার ভূরিভূরি নজির আমাদের কাছে রয়েছে। বিল তিনি মিটিয়ে দেন কেবলমাত্র নীল নোটিশ পৌঁছলেই। সৌভাগ্যবশত ১৯৬৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাছে লেখা একপত্রে তিনি তা নিজেই স্বীকার করেছেন।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যিক ভদ্রলোকের বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়ার পর সেদিনই কালবিলম্ব না করে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তৎপরতার সঙ্গে পুনরায় বিদ্যুৎশক্তির পুনঃ সংযোগ করে দিয়েছে।

দুঃখের বিষয় সমস্ত ঘটনার পর আমাদের সদর কার্যালয়েই বিশিষ্ট সাহিত্যিক দম্পতি বলেছেন যে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কর্তব্যরত কর্মীটিকে 'সমকক্ষতায়' কটাক্ষপাত করে মনে ব্যথা দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না, রূঢ় আচরণও তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। এজন্য তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

জনৈক কর্মচারী
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ

আলোর কালোর

ত্রিশঙ্কুর প্রতি আমার সামান্য অনুযোগের চিঠিকে এতটা গুরুত্ব দেবার জন্য ধন্যপত্রের শ্রীযুক্ত রায় ও ভদ্রাবতীর শ্রীযুক্ত প্রামাণিক আমার ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত রায়ের যুক্তি অকাট্য। মেনে নিচ্ছি ত্রিশঙ্কু খানিকটা সত্য ও খানিকটা কল্পনা মিশিয়ে সুখপাঠ্য রচনা লিখেছেন—গবেষণালব্ধ তথ্য পরিবেশন করছেন না। তেমনি আমার প্রতিবাদও পরিসংখ্যান বিভাগের তত্ত্বের ভিত্তিতে লেখা নয় —একটি ব্যক্তিগত রচনা সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত অভিমত। নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চয় সব পাঠকেরই আছে।

কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রামাণিকের চিঠিটা আমি ঠিকমত বুঝতে পারি নি। "আমরা প্রবাসী বাঙালীরা সর্বদা বাংলার কি ভালো করতে পারি" এই চিন্তা ও চেষ্টা করতে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তার মানে কি এই যে আমি মহারাষ্ট্রে থাকলেও এবং তিনি মহীশূরে থাকলেও আমাদের "কর্ম প্রচেষ্টা" স্থানীয় ব্যাপারে নষ্ট না করে বাংলার মঙ্গল চিন্তাতেই ব্যয় করা উচিত? যেখানে বাস করি সেখানকার লোক ও বাস্তব পরিবেশের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে সর্বদা "বাংলার ঐতিহ্য ও বীর্য" ঘোষণা করা হোক, এইটেই কি তাঁর অভিষ্ট? মারওয়াড়ীদের সম্বন্ধে বদনাম আছে তাঁরা সারা ভারতবর্ষ থেকে ধন আহরণ করলেও পয়সা খরচ করতে হলে কেবলমাত্র রাজস্থানে ফিরে এসেই ধর্মশালা স্থাপন অথবা স্কুল তৈরি করেন। যেখানে বসবাস করেন সেখানকার লোকেদের আপন করে নিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত প্রামাণিক কি বিভিন্ন প্রদেশে নিবাসী বাঙ্গালীদের সেই রকম হতে বলছেন? প্রামাণিক মহাশয় ইসরায়েলের মহৎ উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু এক মার্কিন দেশেই বহু হাজার ইহুদী যুবক যুবতী আছেন যাঁরা ইসরায়েলকে নয়, আমেরিকাকেই নিজের স্বদেশ বলে মনে করেন।

কর্মযোগে যিনি সম্প্রতি বাংলার বাইরে গেছেন তিনি অবশ্যই প্রবাসী। কিন্তু আমার বক্তব্য এই, যে সব বাংলাভাষী একাধিক জেনারেশন অন্য প্রদেশের বাসিন্দা তাদের কাছে 'প্রবাসী' কথাটা অবান্তর। ইংরিজী যেমন আর ইংলণ্ডের একচেটিয়া ভাষা নয়—বাংলাও তেমনি একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সম্পত্তি নয়। আমরা বাড়িতে বাংলা বলি, বাংলা পড়তে ভালোবাসি, কিন্তু তাই বলে যে প্রদেশে বড় হয়েছি সেই প্রদেশের প্রতি মমত্ববোধ থাকবে না এটাও তো আশা করা অন্যায়। প্রামাণিক মহাশয় আমাকে 'শূন্যগর্ভ', 'দুর্বল', 'জেগেও ঘুমন্ত' যাই মা কেন বলুন—আমার জন্মের প্রদেশেই আমার প্রাথমিক লয়াল্টি—এটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই।

সুজাতা পুণেকর
পুণা

রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বলেন: উত্তরবঙ্গের বন্যা ও পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রের নিকট ৪০ কোটি টাকা চাওয়া হইয়াছে, কেন্দ্র কোন পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি দেন নাই। টাকাটা পাওয়া গেলেও সবটা এখন খরচ করা সম্ভব নয়, পরের বছর কিছু টাকা কাজে লাগাইতে হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আদ্যশ্রাদ্ধটা হয়ে গেলে বার্ষিক শ্রাদ্ধের জন্য কিছু টাকা ধরে রাখতে হবে বই কি!!"

সংবাদে বলা হইয়াছে বম্বেতে ১৮ বছর পর তাড়ির মুখ দেখা গেল।—"এখন থেকে তাড়িটা বেশ তারিয়ে-তারিয়ে খাওয়া

যাবে"—উৎফুল্ল হইয়া মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

সরকারী নির্দেশ কালি, আলকাতরা দিয়া নির্বাচনী প্রচার বিজ্ঞাপন দিয়া দেয়াল নোংরা করা চলিবে না।—"খুব ক্ষতি আছে হবে না, দেয়ালের 'লিখন' কেউ পড়েন না; পড়লেও বুঝতে পাবেন না"—বলে শ্যামলাল।

সংবাদদাতা বলিতেছেন: ভেজালের দাপটে এখন নাকি আসলই উধাও হইয়া গিয়াছে। সরিষার তেলে বর্তমানে প্রচুর তিসির তৈল মিশ্রণ চলিতেছে।—তিসি মিশ্রিত তৈল ভক্ষণে আমাদের দশা কি হবে জানি না এবং জানতেও চাই না কেননা আমরা রামের হাতে মরলেও মরব, রাবণের হাতে মরলেও মরব। আমাদের প্রশ্ন শুধু এই যে তৈলমর্দনে তিসিটা কার্যকর হবে কিনা" —বলেন সহযাত্রী।

কারেন্সি নোটে অতঃপর "অন ডিমানড" কথাটি থাকিবে না।—"বেতন বৃদ্ধি দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি অটোমেশন বন্ধ প্রভৃতি কোন দাবি-ই-তো টেঁকে না (মানতে হবে চীৎকার সত্ত্বেও) সুতরাং নোটের এই দাবিটাও কালি আর কাগজের অপচয় মাত্র"—বলেন সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম পাক রাজনৈতিক জীবনে দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে, শুধু একটি ব্যাপারে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে সেটি হইল ভারত বিদ্বেষ।—"বাস, বাস, ওতেই হবে চাচী, ওতেই হবে; ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের উন্নতি হলে রাজনীতির তোয়াক্কা কে করে"—বলে শ্যামলাল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন: আমি ভারতীয় জনগণের পয়লা নম্বরের সেবিকা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ওই মুশকিল, পয়লা নম্বরের সেবিকাকে কাজে লাগাবার মতো জনগণের সেই আর্থিক সংস্থা কোথায়!"

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম, যুক্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলিয়া রাশিয়াই আগে চাঁদে যাইতেছে। সহযাত্রী ঘোড় দৌড়ের ভাষায় বলিলেন—"ডোপ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার দরকার"।

পাক প্রেসিডেন্ট জনাব আয়ুব খাঁ ছাত্রদের নিকট নতিস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য সহযাত্রী বলিলেন—"জনাব বোধ হয় এখন ইণ্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির ছাত্রজীবনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন!!"

শ্রীমহেশ যোগী কলিকাতা আসিয়া সাংবাদিকদের বলিয়াছেন, তিনি জিলা স্তরে আশ্রম খুলিবেন এবং তার জন্য তাঁর চাই পাঁচ শ ট্রেনড শিক্ষক।—"পাঁচ শ শিক্ষকের জন্য চাই অন্তত দশ হাজার ছাত্র

এবং ছাত্র এলেই—কিন্তু আমরা আর কী বলব, তিনি ত ধ্যানযোগে সবই বুঝতে পারবেন" বলে আমাদের শ্যামলাল।

বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বারভাঙার স্বর্গত মহারাজা একটি হীরক খচিত হার ক্রয় করিয়াছিলেন। সংবাদে শুনিলাম, এত অর্থব্যয়ে সেই হারের উপযুক্ত ক্রেতা মিলিতেছে না।—"কিন্তু আমরা আর কী করতে পারি,—এ মণিহার আমায় নাহি সাজে"—সহযাত্রী গান গাহিয়াই তাঁর মন্তব্য শেষ করিলেন।

অন্য সংবাদে শুনিলাম প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন নাকি আবার নির্বাচনে দাঁড়াইতেছেন। আমাদের

বিশুখুড়োও সংক্ষেপেই বলিলেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি!!"

সংবাদে প্রকাশ কোন এক মহিলা নাকি তাঁর উগ্রপন্থী স্বামীকে পুলিসে ধরাইয়া দিয়াছেন।—"বিপ্লব বিগিনস অ্যাট হোম"—সংক্ষেপে মন্তব্য করে শ্যামলাল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারলড উইলসন নাকি ভারত সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু কবে যে এই সফরের জন্য আয়োজন করা হইবে তা তিনি বলিতে পারেন নাই।—"কিন্তু আমরা বলিয়া দিই, আসন্ন কলকাতায় এলিজাবেথ টু কাপ খেলার আগে। তখন আবহাওয়া ভালো, খাদ্যদ্রব্য অপর্যাপ্ত এবং ফাঁস যদি না করেন তবে আমরা তাঁকে ঘোড় দৌড়ে ভালো টিপস দেওয়ার আশ্বাসও দিয়ে রাখছি"—বলেন সহযাত্রী।

অভিযোগে বলা হইয়াছে কোন একটি কাগজের বিরূপ সমালোচনায় মাত্র তিনদিনের মধ্যেই "অ্যানটনি ফিরিঙ্গির" শো বম্বেতে বন্ধ হইয়া যায় এবং পত্রিকার সমালোচক নাকি বলিয়াই দিয়াছেন, উত্তমকুমারকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দেওয়া ঠিক হয় নাই—"বহুদিন পর মনে পড়ল, পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরায় ধার!!"

ইণ্ডিয়ান স্কুল বয়েজদের ক্রিকেট টিম লণ্ডনে অপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন এবং অস্ট্রেলিয়াতেও দেখাইতেছেন।—"তা দেখছেন লণ্ডন, দেখছেন অস্ট্রেলিয়া শুধু যাঁদের দেখবার তাঁরা সংবাদ পড়তে পড়তে বললেন—তথাপি চ্যাংড়া"—বলেন বিশুখুড়ো।

যে-কলেজে একজন মাত্র ছাত্রী

এক স্কট ফিটজেরাল্ডের সংগে শেলা গ্রাহামের যখন পরিচয় হয়, তখন শেলা গ্রাহাম ফিটজেরাল্ডের একখানা বইও পড়েন নি। লেখকের পরিচয় শুধু তার রচনায়। নতুন বান্ধবীকে নিজের একখানা বই উপহার দেবার জন্য ফিটজেরাল্ড তাকে নিয়ে ঢুকেছিলেন একটি বড় বইয়ের দোকানে, চেয়েছিলেন তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাসটি, 'টেন্ডার ইজ দি নাইট'। বইয়ের দোকানদার ফিটজেরাল্ডকে চিনতে পারেন নি, বলেছিলেন, ও বই আমরা রাখি না, কেউ কিনতে চায় না আজকাল। সেই-সংগে দোকানদারটি অবশ্য আরও একটু যোগ করেছিলেন, আমি পড়েছি ওঁর বই, বড় ভালো লিখতেন, কিন্তু আজকাল তো ভালো লেখার কদর নেই!

১৯৩৭ সালের ঘটনা, যখন ফিটজেরাল্ড আমেরিকার সাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য এবং সূক্ষ্মভাষা ব্যবহার ও নতুন শৈলীর প্রবর্তক হিসেবে সমালোচকদের কাছে স্বীকৃত। কিন্তু আমেরিকার সেই ডিপ্রেশনের যুগে সাহিত্য রচনায় ফিটজেরাল্ডের অন্ন জোটেনি, ভাগ্যান্বেষণে গিয়েছিলেন হলিউডে, সেখানেও সার্থক হতে পারেন নি। তাঁর চিত্রনাট্য প্রত্যাখ্যান করে প্রযোজকেরা বলেছেন, আপনার যা ভাষা এ দিয়ে নভেল-টভেল লিখুন গিয়ে, সিনেমায় এসে নিজের প্রতিভা নষ্ট করছেন কেন? সুতরাং, ১৯৩৭-এ ফিটজেরাল্ড একজন জীবনে অসার্থক দরিদ্র বাউণ্ডুলে মাত্র এবং দারুণ মাতাল। শেলা গ্রাহাম তবুও কি এক রহস্যময় কারণে ফিটজেরাল্ডকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। হলিউডের এক পার্টিতে ফিটজেরাল্ডের সংগে আলাপ হয়েছিল শেলা গ্রাহামের, তার পরের তিন বছরের ঘটনা—উদ্দাম প্রেম, মাতলামি ও মারামারি-চুলোচুলির কাহিনী অনেকেরই জানা, 'বিলাভেড ইনফিডেল' নামে একটা ছায়াছবিতে (গ্রেগরি পেক ফিটজেরাল্ডের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন) সে-সব আরও নাটকীয় ভাবে দেখানো হয়েছিল।

শেলা গ্রাহাম আর একটি বই লিখেছেন। সে বইটাতে ঐ সব ঘটনা ছাড়াও একটি শিক্ষার ইতিহাস আছে। বইটির নাম, 'কলেজ অব ওয়ান'। এতে তিনি বলেছেন, মাতলামি ও মারামারি ছাড়াও মাঝখানের সুস্থ সময়ে ফিটজেরাল্ড শেলা গ্রাহামকে জোর করে একটা কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, যে-কলেজে শেলা গ্রাহামই একমাত্র ছাত্রী এবং একজনই মাত্র অধ্যাপক—ফিটজেরাল্ড নিজে।

ফিটজেরাল্ডের সংগে আলাপের আগে শেলা গ্রাহামের রূপের জৌলুস ছিল বটে কিন্তু বিদ্যেবুদ্ধি বিশেষ ছিল না, সুতরাং বিদগ্ধ সমাজে ঘোরাফেরার সময়—অধিকাংশ আলোচনাতেই কথা না বলে শুধু মৃদু হাসি দিয়ে যারা সবজান্তা ভাব দেখান—শেলাও সেই ভঙ্গিটি রপ্ত করেছিলেন। শেলা তাঁর বাল্যকাল থেকেই বর্ণনা শুরু করেছেন। শেলার জন্ম ইংলণ্ডে, এক অনাথ আশ্রমে তাঁর শিক্ষা শুরু। মাত্র ১৪ বছর বয়েসেই তাঁর লেখাপড়ার ইতি, বাল্যবিবাহ হয় এক মেজরের সংগে, তারপর নানা ভাবে ভাগ্য বদলায়। এক সময়ে স্টেজে কোরাস গার্ল ছিলেন এবং টুকিটাকি লেখা লিখতেন হাল্কা পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের পাতায়। আমেরিকায় পাড়ি দেবার পর নানান ঘোরালো পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে সার্থকতার মুখ দেখতে পান। মেয়েদের ফ্যাসান পত্রিকায় ও রেডিওর মহিলা মহলে, বিশেষত গশিপ কলামনিস্ট হিসেবেই তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা। ১৯৩৭-এ ফিটজেরাল্ডের সংগে আলাপ, ১৯৪০-এ শেলার বাড়িতেই আকস্মিক হৃদরোগে ফিটজেরাল্ডের মৃত্যু। মাতলামির মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত আসরে ঠাণ্ডা মাথায় শেলার সংগে কথা বলতে গিয়ে ফিটজেরাল্ড ও'র মূর্খতার পরিচয় পান—এবং নিজেই

ও'র শিক্ষার ভার নেন। বলা যায়, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি একটি দু' বছরের কনডেনস্‌ড কোর্স প্রবর্তন করেন ফিটজেরাল্ড। শেলাও এ ব্যাপারে সাগ্রহে রাজী হয়েছিলেন, কারণ ফিটজেরাল্ডকে বাঁচানোর এও অন্যতম উপায়। শেলা চেয়েছিলেন যে দুটি প্রকল্প নিয়ে মগ্ন হতে পারলেই ফিটজেরাল্ড লেখক হিসেবে আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পাবেন। এক, হলিউড নিয়ে একটি নতুন উপন্যাস লেখা, এবং শেলা গ্রাহামের শিক্ষা।

বয়স্ক মূর্খকে লেখাপড়া শেখানো দারুণ কঠিন কাজ। পড়ার অভ্যেস যার নেই, তাকে পড়াতে হলে অনেক ধৈর্যের দরকার। প্রথম প্রথম শেলা খাবার টেবিলে বসে দু'-এক পাতা ওল্টাতেন, ক্রমশঃ তাঁর মনোযোগ বাড়ে, শেষ পর্যন্ত তিনি একটানা তিন-চার ঘণ্টা ধরে পড়তেন নিজে নিজে। ফিটজেরাল্ড তাঁর জন্য কোর্স ঠিক করে দিয়েছিলেন, প্রথমেই ইতিহাস, তার মাঝে মাঝে সাহিত্য এইচ জি ওয়েল্‌সের "আউট লাইন অব হিস্ট্রি" বইয়ের বিভিন্ন পাতা নির্দেশ করে করে বলে দিয়েছিলেন যে, সেই সেই জায়গায় এক একখানি উপন্যাস পড়তে হবে। অর্থাৎ মানুষের সভ্যতার ইতিহাস না জানা থাকলে যে সাহিত্যের মর্ম বোঝা সহজ নয়, ফিটজেরাল্ড তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। টমাস হার্ডি থেকে ডস্টয়েভস্কি—বিশ্ব সাহিত্যের বাছা বাছা উপন্যাস তিনি সুপারিশ করেছিলেন শেলার জন্য, এবং সে তালিকার একেবারে শেষে কুণ্ঠিত ভাবে জুড়ে দিয়েছিলেন নিজের উপন্যাস 'টেণ্ডার ইজ দা নাইট'।

ইতিহাস ও উপন্যাসের পর কবিতা, শেক্‌সপীয়র থেকে শুরু, আধুনিক কালে শেষ। ফিটজেরাল্ড বলেছিলেন, কবিতা শুধু পড়লেই হবে না, শুধু বুঝলেই হবে না, কবিতাকে যদি তুমি ভালোবাসতে শেখো, তাহলে কবিতা তোমাকে সারা জীবন আনন্দ দেবে। শেলা গ্রাহাম লিখছেন, কবিতা এখন সত্যিই তাঁর জীবনের অনেক নিরানন্দ মুহূর্তে আনন্দ দেয়। এসব পড়াবার সময় ফিটজেরাল্ড অনেক জায়গা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, দু'জনে মিলে কাব্য নাটকের অংশবিশেষ শয়নকক্ষে অভিনয় করেছেন, গান গেয়েছেন যুগ্ম কণ্ঠে। অনুমান করা যায়, ফিটজেরাল্ডের অভিশপ্ত জীবনে সেইগুলোই ছিল নির্মল আনন্দের মুহূর্ত। কবিতার পর ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, শিল্প ও সংগীত সম্পর্কেও কিছু কিছু অংশ বেছে দিয়েছেন শেলাকে। ও'কে হোম টাস্ক দিয়েছেন, পড়া ধরেছেন, নিজে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিন বছর পর রুচি ও মানসিকতার দিক থেকে শেলা গ্রাহাম একজন পরিবর্তিত নারী হয়ে ওঠেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, নাট্যকার আর্থার মিলারকে বিয়ে করার পর ভুবনমোহিনী মেরিলিন মনরো বলেছিলেন, আমি জীবনে কখনো লেখাপড়ার সুযোগ পাই নি, সেজন্য আজ আমার অনুতাপ হচ্ছে, আমার ইচ্ছে হয় কলেজে ভর্তি হই এখন! দেখা যাচ্ছে, রূপসী নারীরাও কখনো কখনো মনীষার কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে যায়!

শেলা গ্রাহামের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই, কিন্তু তিনি দাবি করেছেন যে যে-কোনো গ্রাজুয়েটের সমকক্ষ হবার মতন বিদ্যা তিনি অর্জন করেছেন ফিটজেরাল্ডের কাছ থেকে। তা হয়তো মিথ্যে নয়, কিন্তু এ কথা ঠিক, সাহিত্যিকের কাছাকাছি থাকলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না। এতদিন ফিটজেরাল্ডের সংস্পর্শে থেকেও শেলা গ্রাহাম লিখতে শেখেন নি একটুও। তাঁর এই বইখানিও গশিপ কলমানিস্ট-এর ভাব-ভঙ্গিতে লেখা। নেহাৎ হাল্কা, জোলো। শুধু ফিটজেরাল্ড চরিত্র সম্পর্কে নতুন কিছু জানার কৌতূহলই বইখানির একমাত্র আকর্ষণ।

কুচবিহারে সাহিত্য সেমিনার

কুচবিহারে 'আধুনিক সাহিত্য' নামে একটি পত্রিকার উদ্যোগে এন এন পার্কে গত ১লা ডিসেম্বর একটি সাহিত্য সেমিনার হয়ে গেল। এতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন কুচবিহারের স্থানীয় লোক ও সাহিত্য-উৎসাহীরা। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন লোকদের সমস্যাও এখানে ওঠে। যোগ দিয়েছিলেন, ফণিভূষণ বিশ্বাস, রণজিৎ দেব, শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সনাতন পাঠক

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

লৌকিক শব্দকোষ। শ্রীকামিনীকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্‌ : ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১। বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন, 'বাংলা-ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এই জন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না'—তা যে মোটেই সাময়িক আবেগের বশে বলা কোন উক্তি নয়, বরং সে ছবি তাঁর নিবিড় ঐতিহ্য-চেতনা থেকে উৎসারিত এক সশ্রদ্ধ অভিজ্ঞান, একথা আজ আর আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না। শুধু লোক-সাহিত্য বা ছেলেভুলোনো ছড়ার আবিষ্কার আলোচনায় অথবা শব্দতত্ত্ব বা বাংলা ভাষার পরিচয় ইত্যাদি বিভিন্ন লেখার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধানের নজীর সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন সময়ের টুকরো টুকরো আলোচনা ও মন্তব্যের মধ্যেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে লোকজীবন ও লৌকিক ভাষা সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ। এদিকে তিনি এতটাই ঝুঁকেছিলেন যে এক সময় তিনি চেয়েছিলেন বাংলা দেশের আঞ্চলিক উপভাষাগুলি সংগ্রহ করে তার একখানা বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনা করতে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবকে The New Oxford Dictionary-র আদর্শে একখানা অভিধান রচনার জন্যে ছাত্রদের মালমশলা যোগাড় করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের সে আশা আজও অপূর্ণ। শহীদুল্লাহ সাহেবের বাসনা অবশ্য এক অভিনব পরিকল্পনায় ঢাকা 'বাঙলা অ্যাকাডেমী'র সাহায্যে পূর্ণ হতে চলেছে।

হাজার বছরের পুরোনো আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রায় আটশ বছর ধরেই চলেছে গ্রামীণ শব্দ ও সংস্কৃতির শাসন। ফলত জাতীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে লৌকিক শব্দ বা মৌখিক ভাষার গুরুত্ব কতখানি, তার সম্যক উপলব্ধি ঘটে গেছে গত শতাব্দীতেই। অথচ এতদিনেও—বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর, বসন্তরঞ্জনের যুগ পেরিয়ে এসেও—আমরা কোন পূর্ণাঙ্গ লৌকিক শব্দের অভিধান গড়ে তুলতে পারি নি।

'লৌকিক শব্দকোষ' সেদিক থেকে নিতান্ত সীমাবদ্ধভাবে হলেও, বাংলার প্রথম উপভাষা ও বিভাষার শব্দ সংকলন। ক্ষেত্রবিশেষে শব্দগুলোর বিবৃতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লোকবৃত্তের আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে এটি আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে অভিধানধর্মী হলেও লোক-সাহিত্যের বহু বিচিত্র তথ্য তত্ত্ব এর আসল উপাদান। অনেকটা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবতার' মতই এটা আর একটা ভিন্নতর প্রচেষ্টা যার সাহায্যে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রথা, লোকাচার ও লোক-সংস্কৃতির পরিচয় পাই। ভাষা নিত্যবহতা নদীর মত—মানুষের মুখে মুখে কেবলি তার অর্থ আর আকৃতি বদলে যায়। আবার একই শব্দের প্রয়োগে স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অর্থান্তরও ঘটে। যেমন পশ্চিম-বঙ্গের 'চিতি' সাপ জলপাইগুড়ির লোক-ভাষায় হয়ে যায় প্রজাপতি। বরিশালের আগুন রাখবার 'তাওয়া' পশ্চিমবঙ্গে এসে হয়ে যায় রুটি সেঁকবার 'অগভীর লৌহ-পাত্র'। আবার রাজবংশীদের 'সোরহা, সোগরে ধান টোনা মোনা, মোর ধান পাকা সোনা, সোরহ!' ছড়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ ও সামাজিক আচার। আলোচ্য গ্রন্থে শব্দের এই বহুবিচিত্র প্রয়োগ যেমন, তেমনি তার সঙ্গে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন লোকাচার ও সংস্কারের আলোচনা। যদিও এ বইয়ের সংগৃহীত শব্দ সংখ্যা মাত্র দশ হাজারের কাছাকাছি। এবং 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রভৃতি অভিধানের পাশে একে নিতান্তই ক্ষুদ্র বলে মনে হবে। কিন্তু তবুও এ-ধরনের অভিধান এই-ই প্রথম।

ইতিপূর্বে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও শব্দ-সংগ্রহ নিয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেক আবেদন-নিবেদন ও আলোচনার অবতারণা করেছেন। একমাত্র সাহিত্য

পরিষৎ পত্রিকাতেই বিস্তর আঞ্চলিক শব্দ ও আলোচনা ছাপা হয়েছে বছরের পর বছর। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ নিয়ে সুধী-সমাজের উদ্যমের অভাব হয় নি। 'দেশ' পত্রিকাতেও এক সময় সাহিত্যবিভাগে মৌখিক ভাষার একখানা অভিধানের কথা ভেবে বিভিন্ন সংগ্রাহকদের দ্বারা আঞ্চলিক শব্দের তালিকা প্রকাশ শুরু হয়েছিল।

আলোচ্য লেখক অবশ্য তাঁর পরিধির স্বল্পতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। এবং এজন্য যথেষ্ট বিনয় সহকারে তিনি তাঁর গ্রন্থের নামকরণ নিয়েও সংকোচ বোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা যতই ক্ষুদ্র হোক এ-দাবী তিনি অবশ্যই করতে পারেন যে, তিনিই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক এবং এটাই বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছোবার প্রথম পদক্ষেপ। আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আলোচনা ও সঙ্কলন প্রকাশের আদি সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকে পোর্তুগীস ও ফরাসী প্রচেষ্টায়। কিন্তু সেগুলোর শব্দ ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে, সংস্কৃতিচর্চার তাগিদে নয়। গ্রীয়রসনের Bihar Peasant Life—এ দেখা গিয়েছিল এই ধরনের গ্রন্থ লৌকিক জীবন ও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে কী নিবিড়ভাবে যুক্ত। বর্তমান সঙ্কলনটি গ্রীয়রসনের সেই মূল্য-গ্রন্থের আদর্শে রচিত। গ্রীয়রসনের মতই লেখক তাঁর সংগৃহীত শব্দগুলিকে জীবনের নানা পর্যায় অনুসারে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সাজিয়েছেন। শব্দগুলির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবেশ, সমাজ, আচার-অনুষ্ঠান ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও এতে স্থান পেয়েছে। ফলে এ বই শুধু আঞ্চলিক ভাষার শব্দার্থের জন্যেই উল্লেখ্য নয়, লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট আবেদনেও আস্বাদ্য।

উপন্যাস

রত্নাকরের প্রেম। নিমাইকুমার ঘোষ, মোহন লাইব্রেরী: ৩৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯। মূল্য—ছ' টাকা।

বিধা অবহেলিত সমাজের একজন প্রতিনিধি। তার বাঁচার সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে তার চোখ দিয়ে বর্তমান সমাজের দুঃখ দারিদ্র্য: খাদ্য সমস্যা এবং প্রতিরোধ সব কিছুই লেখক উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন এবং সমাধান করার পথ বাতলে দিতে চেয়েছেন একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। দুশো বত্রিশ পৃষ্ঠার উপন্যাসে কারখানার ধর্মঘট, বনের, সমুদ্রের বিকল্প খাদ্য খাইয়ে শ্রমিকদের জয়লাভ। মৎস্য সমস্যার তেলাপিয়া মাছকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক চিকিৎসা-শাস্ত্র, বিভিন্ন পার্টির দীর্ঘকালীন সহাবস্থানের রাজনৈতিক ভিত্তি সবই আছে। এই অস্বস্তিকর অবস্থা কাটিয়ে বই শেষ করলে লেখকের চিন্তা সম্বন্ধে পাঠক উৎসাহিত হতে পারেন। (২৬০/৬৮)

খেলা

উইকেট থেকে বাউণ্ডারী। দিলীপ দত্ত। বাক-সাহিত্য: ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

এক উইকেট থেকে আরেক উইকেট খুবই সামান্য পথ, কিন্তু এই পথেই ব্যাট-বল কেন্দ্রিক কত নাটক, কত ইতিহাস, কত স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। 'উইকেট থেকে বাউন্ডারী' মাঠ এবং মাঠের বাইরের নানা অতীত ঘটনার সুনির্বাচিত সংকলন। গ্রন্থকার নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন, বর্তমানে ক্রীড়া সাংবাদিক ও বেতার কথক হিসেবে ক্রীড়াঙ্গণে পরিচিত সুতরাং চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনাপঞ্জী বিবরণ আন্তরিক হওয়াই স্বাভাবিক। গ্রন্থকার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন মুহূর্তগুলির বিবরণ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে খেলোয়াড়ী জীবনের রেকর্ড, স্মরণীয় টেস্ট, বিখ্যাত ক্যাচের চিত্র পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থটি ক্রিকেট-রসিকদের কাছে প্রশংসিত হবে। (২৬৫/৬৮)

পত্রিকা

কবিপত্র। সম্পাদক: তুষার চট্টোপাধ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ১১/৭ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-২৬।

কবিপত্রের এ সংখ্যাটি প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়েছে। খ্যাতনামা থেকে তরুণতম কবিদের কবিতায় অলংকৃত এ সংখ্যাটিতে লিখেছেন—বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, গণেশ বসু, কাননকুমার ভৌমিক, প্রভাত চৌধুরী প্রমুখ।

সদ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ বিমলচন্দ্র ঘোষের 'উত্তরাকাশের তারা'র বিস্তৃত আলোচনা, তুষার চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যনাটক ছাড়া এ-গোষ্ঠীর ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলনের স্বীকৃতি ও বিরোধিতার এক বছরের আলোচনা এবং এ-পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছ মুদ্রিত হয়েছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

পারিবারিক পোশাক ধোলাই পদ্ধতি। শ্রীশান্ত। শ্রীতপনকান্তি দত্ত: ১৭৮ মহারাজ নন্দকুমার রোড, সাউথ: কলিকাতা-৩৬। মূল্য ৩·০০।

আধুনিক পোলট্রী পালন। শ্রীশান্ত। শ্রীতপনকান্তি দত্ত: ১৭৮ মহারাজ নন্দকুমার রোড, সাউথ: কলিকাতা-৩৬। মূল্য ২·৫০।

দুই ধারা। পার্ল এস বাক। অনুবাদ: অশোক গুহ। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড: ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৬·০০।

রাজার রাজা। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। সমকাল প্রকাশন: ২৭ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

রবীন্দ্র সংগীতের নানাদিক। সম্পাদনা: অরুণ ভট্টাচার্য। সংগীত পরিষদ: ৯বি৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য ৫·০০।

বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। ব্রহ্মচারী শিশির-কুমার। বন্ধু দাস: ৩ অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য: ০·৫০।

রংগজগৎ

আমরা ধরেই নিতে পারি, তপন সিংহের ছবি হবে ভিন্ন জাতের। আর সব সাধারণ ছবি থেকে আলাদাই শুধু নয়, উঁচুস্তরের। প্রমোদের উপকরণ তাঁর ছবিতে কখনও-সখনও আর্টের এবং বেশীর ভাগ সময়ে এসথেটিক রসের গা ঘেঁষে চলে। লাবণ্যতত্ত্ব অনেক সময় প্রমোদের প্রয়োজনকে ছাপিয়েও ওঠে। দুয়ে প্রায় মিলেমিশেই এগোয়। শেষে সুখ অথবা করুণাবেগের ঝটিতি আঘাতে গিয়ে থামে। তপন সিংহের ছবি সম্পর্কে দর্শকের অভিজ্ঞতা সম্ভবত তাই। তাঁর সদ্যোমুক্ত চিত্র "আপনজন" (কে এল কাপুর প্রোডাকশন্স) এর ব্যতিক্রম নয়। বরঞ্চ একদিক থেকে শ্রী সিংহ এ-ছবিতে অনেক বেশী বস্তুনিষ্ঠ। এবং প্রয়োগকার হিসাবে তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট-ও আগের চেয়ে অনেক পরিণত ও বুদ্ধিদীপ্ত।

"আপনজন"-এ পরিচালকের বিশ্লেষণের বস্তু যুবশক্তি বা তারুণ্যের অপচয়। ছবিতে অপরিণামদর্শী এবং বিপথগামী তরুণের সমস্যাই প্রধান। কাঁটা গাছের উপর যারা পুচ্ছ নাচাতে পারে তাদের প্রাণশক্তির ব্যভিচারের প্রতিই পরিচালকের অঙ্গুলি নির্দেশ। আজকের সমাজে রকবাজ বা মস্তান নামে যারা পরিচিত, তাদের নিয়েই তপনবাবুর ছবি। কিন্তু ছবির "আপনজন" নামকরণের সংগে ছবির গুণ্ডা ছেলেদের

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

এ কে বি'র 'ঋষি অরবিন্দ'
(পরিচালনা : দীপক গুপ্ত)
চিত্রে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

কাহিনীর যোগ সামান্য। আপনজন বলে যে বৃদ্ধাকে এক আধুনিক দম্পতি কলকাতায় একই চিত্রনাট্যে দুই কাহিনীর সহাবস্থানের জন্য শুধু বৃদ্ধাকে তার আত্মীয়দের বাড়ি ছেড়ে মস্তানদের ডেরায় নিয়ে আসা হয়েছে। আপনজন হয়েও বৃদ্ধাকে কেন বাড়ি ছাড়তে হল, তা নাটকীয়তা বা মেলোড্রামার আস্বাদের মধ্য দিয়ে দর্শক জানতে পারেন। বৃদ্ধা যার রাঙামামি, সেই মণ্টু ও তার স্ত্রী লতু খুবই হিসেবী ও মতলবী। ওরা দুজনেই চাকরি করে, খালি বাড়িতে তাদের একমাত্র শিশুকে নন। বৃদ্ধা আনন্দময়ীর কাছে অপর এক 'আপনজন' তথা ভ্রাতুষ্পুত্র একই মতলবে এসে হাজির। তারও একই প্রস্তাব। শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে এই মাত্রাহীনতা দোষের।

কিন্তু সমাজ-জীবনের একটি সম-সাময়িক ব্যাধির লক্ষণ—পথভ্রষ্ট তরুণদের "মিস-অ্যাডভেঞ্চার"—ত প ন বা বু চমৎকার বাস্তববোধের সংগে ছবিতে উপস্থিত

আপন জন

নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে, তারই চোখ দিয়ে মস্তানদের ছবিতে প্রথম পেশ করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, একালের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, এবং নৈতিক অধঃ-পতনের দ্রষ্টা হিসাবেই বৃদ্ধাকে শহর কল-কাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। অথবা অতীতের দৃষ্টি দিয়ে বর্তমানের ফাটল বা ভাঙনকে দেখাবার জন্যই বৃদ্ধার আগমন। যদিও ছবিতে গল্প দুইটি (যেহেতু ইন্দ্রমিত্রর মূল কাহিনী অধিক বিস্তৃত) বৃদ্ধা নায়িকা তবু উভয় উপাখ্যানের মধ্যে বেশ খাপ খেয়ে গেছেন। চিত্র-নাট্যকার হিসাবে এখানেই তপন সিংহের বিশেষ সাফল্য।

দেখাশোনা করার জন্যই বৃদ্ধাকে তারা নিয়ে এসেছে। এনেছে ভণ্ডামি করে, আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে। আপনজন কথাটি নিয়ে এখানেই শ্লেষ। আসলে মণ্টু ও লতুর প্রকৃতি কী দর্শকের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এক্ষেত্রে 'আপনজন' কথাটির মধ্যে ব্যঙ্গের মাত্রা কতখানি তাও বোধগম্য। কিন্তু যা সহজবোধ্য, তা বার বার বোঝাবার একটা চেষ্টা সংলাপে লক্ষণীয়। বৃদ্ধার মুখে ব্যঙ্গের সুরে এবং অন্যের মুখেও পরিচালক "আপনজন" কথাটি অনেক-বার শুনিয়েছেন। শিল্পের সূক্ষ্মতাও এতে বিনষ্ট, পরিমিতিও রক্ষা হল না। এবং মণ্টু ও লতুর স্বার্থপরতা যে যুগলক্ষণ তা ওদের দুজনকে দেখিয়েও পরিচালক নিরস্ত

করেছেন। ছাত্র অসন্তোষের সামান্য পরিচয়ও ছবিতে আছে। এবং রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বিশেষত নির্বাচন-দ্বন্দ্বে, তাদের কীভাবে কাজে লাগানো হয়, তথা "এক্সপ্লয়েট" করা হয়, তাও ছবিতে দ্রষ্টব্য। যদিও এই অবক্ষয়ের ইঙ্গিতই শুধু ছবিতে আছে, তবু তা যথেষ্ট। পরিচালক যুগ-ব্যাধির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কার্য-কারণের আরও গভীরে যেতে পারতেন কিনা সে ভিন্ন প্রশ্ন। রকবাজ বা মস্তানরা এর আগে বাংলা ছবিতে শুধুই মাত্র উঁকি দিয়ে গেছে। তাদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ঘটনার ছবি সম্ভবত এই প্রথম। এবং কিছু জটিল প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও যে সমাজ-চেতনা পরিচালক এ-ছবিতে দেখিয়েছেন, তা সাধুবাদার্হ।

তবে তপনবাবু তাঁর নিজস্ব স্টাইল ও চিত্ররীতি বাদ দেননি। তাই রূঢ় ও রুক্ষ বাস্তবের মধ্যেও লিরিসিজম কিংবা কাব্যময়তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আকাশে চাঁদ, জ্যোৎস্না সবই রয়েছে। এবং তারই মধ্যে মস্তানদের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান "আলো আমার আলো"। মস্তানদের যে প্রকৃতি ও চরিত্র তিনি দেখিয়েছেন (কোন কোন বাস্তবের মধ্যেও লিরিসিজম কিংবা কাব্যতাতে এই শব্দ রুচি বেমানান নয় কি? পরিচালক হয়ত বলতে চেয়েছেন, তাদের বাইরের দিকটা যতই মন্দ হোক, অন্তরে সমস্ত শুভ সংস্কার একেবারেই মরে যায়নি, কখনও বা জেগে উঠতে পারে। পরিচালকের এই সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রশংসনীয়ভাবে আগাগোড়াই প্রকাশ পেয়েছে। এর জন্য রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহার এবং ওই দৃশ্য যেন একটু বেশী কৃত্রিম।

প্রসঙ্গত বলা যায়, পরিচালক এ-ছবিতে বাস্তববাদী যেমন, তার চেয়েও বেশী আদর্শবাদী। দেশাত্মবোধের প্রভাব ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। অতুলপ্রসাদের "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী"—গানের সুর ছবির থীম মিউজিক বলা যেতে পারে। গানটির কয়েক চরণও কয়েকবার গীত। আনন্দময়ীর অতীত জীবনের ঘটনায় ফ্ল্যাশব্যাকে তার স্বামীর মুখে এই গান, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যে পথভিক্ষার সময়। এক সন্ত্রাসবাদী যুবক এককালে তাদের জীবনে যে ছায়াপাত করেছিল, তাও আনন্দময়ী গুণ্ডা ছেলেদের বলেছেন। টেররিস্ট প্রসঙ্গে পরিচালক

অগ্রদূতের "কখনো মেঘ" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির দুটি দৃশ্যে অঞ্জনা ভৌমিক, উত্তমকুমার ও কাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকাল-একালের তুলনা করেছেন, তখনও তরুণদের প্রাণের মায়া ছিল না। সে দেশের মুক্তির জন্য। এক কথায়, পরিচালক আনন্দময়ীকে দুই যুগের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন। কাহিনীর শেষে দুই মস্তান-দলের দাঙ্গায় যখন বৃদ্ধা পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারান, এবং দুটি অনাথ শিশু যখন অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির পিছনে ছুটে চলে, তখনও "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী"র সুর (এটাই শেষ দৃশ্য)। আনন্দময়ী এখানে কল্যাণধর্মের প্রতীক। তিনি এ-যুগে নিহত, যেমন একদা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন যীশু। অবশ্য সব ব্যঞ্জনারই অর্থবোধের দায়িত্ব দর্শকের, যিনি যে-অর্থে নেবেন। আসল কথা, পরিচালক বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আদর্শবাদ বিসর্জন দিতে পারেননি। মনে হতে পারে, একালের অধঃপতনের সময় আদর্শের কথা শোনবার জন্যই এই 'থীম' বেছে নিয়েছেন। বাস্তব-বিশ্লেষণে তিনি নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে তেমন নির্মম হতে পারেননি বলে ছবিটি সর্বাংশে একালের ভ্রান্তি, বিড়ম্বনা, নৈরাশ্য ও মনুষ্যত্বহীনতার একটি "রিয়্যাল" চিত্র বা রিপোর্টাজ হয়ে ওঠেনি। কাহিনী-বিন্যাসে মাঝে-মাঝে নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে। বৃদ্ধা আনন্দময়ীকে ঘিরে দুটি অনাথ শিশু ও মস্তানদের নাটক। এর মধ্যে করুণ-সুর, মমতা, আবেগের উপাদান থরে থরে সাজানো। তা উগ্র মেলোড্রামার রূপ অবশ্য নেয়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিচালককে বাস্তবের কঠিন ভূমি থেকে বারে বারে সরে আসতে হয়েছে কোমলতার রূপকল্পে। তাছাড়া গল্পাংশও স্থান পেয়েছে। মস্তান-নেতা রবি সামান্য ভুলের পরিণামে বিপথে এসেছে। ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলেরা ভুল করেই কুপথে যায়। এইটুকু জানালেই যথেষ্ট। তার জন্য রবির প্রণয়ের গল্পের প্রয়োজন ছিল না। এবং তা বিশ্বাসযোগ্য কিনা সে-প্রশ্নও উঠতে পারে। যাই হোক, দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের প্রত্যাশা এই সব কিছুতেই পরিপূর্ণ।

দর্শককে চমৎকৃত করার মত অনেক রসমুহূর্ত এবং কাব্য-ধর্মিতা ছবিতে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। তপনবাবুর চলচ্চিত্রকর্মের স্বাভাবিক প্রসাদগুণ এ-ছবিতে বেশী দেখা গেছে আনন্দময়ীর অতীত জীবনের ফ্ল্যাশব্যাকে। একটি মুহূর্ত ভোলবার নয়, যেখানে স্বামী আনন্দময়ীকে নাটকের গান শোনাচ্ছে। তপনবাবুর নিজস্ব স্টাইলেই দৃশ্যটি চাঁদের আলোয় গৃহীত। আনন্দময়ীর স্বামীর স্ত্রী-ভূমিকায় নাটকাভিনয়ের দৃশ্যটিও স্মরণীয়। ফুলশয্যার রাত্রি থেকে আরম্ভ করে খণ্ড খণ্ড ফ্ল্যাশব্যাকে আনন্দময়ীর কাহিনী উপস্থাপনের কৌশলটিও অভিনব। ফ্ল্যাশ-ব্যাকের পদ্ধতিও নতুন। অবাক করে ফ্ল্যাশ-ব্যাকে 'জাম্প-কাট'-এর ব্যবহার। প্রয়োগ-কর্মের দিক থেকে তপনবাবু এ-ছবিতে নতুনত্বও দেখালেন, যা তাঁকে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবে। ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্য দিয়ে আমরা একটি আলাদা গল্পের স্বাদ পাই। গল্প-বিষয়ের দিক থেকেও ছবিটির অভিনবত্ব আছে, কী মণ্টু-লতুর গল্পে, কী আনন্দময়ীর। খুচখাচ অসঙ্গতি যদি দেখা যায়ও, তা তেমন দোষের নয়। যেমন ফুলশয্যার রাত্রে আনন্দময়ীর স্বামীর কথা ও ব্যবহারের সঙ্গে পরে স্ত্রীর সঙ্গে তার আচরণের সঙ্গতি নেই বললেই চলে। না থাকুক, সেকাল-একাল দুই কালেরই সামাজিক পরিচয় ছবিতে অল্প উপকরণে, ব্যঞ্জনাত্মক আঁচড়ে এবং পরিমিতির মধ্য দিয়ে অদ্ভুত সুন্দরভাবে অঙ্কিত। সব মিলিয়ে ছবিটি তপন সিংহের আর একটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-সৃষ্টি, যা সব শ্রেণীর দর্শকের কাছে অকুণ্ঠ সমাদর পাবে।

অভিনয়ের গুণে ছবিটি আরও বেশী সমৃদ্ধ। স্বরূপ দত্তকে ছবিতে প্রথম দেখা গেল। প্রধান গল্পাংশের নায়ক রবির ভূমিকায়। এই গল্পের অন্য নায়ক ছেনো। ভদ্রঘরের ছেলে রবি লেখাপড়া ছেড়ে বিপথে গেছে। তাই তার স্বভাব কিছুটা সফিসটিকেটেড, কিছুটা মস্তান-সুলভ। দুই রূপের এই চরিত্রাঙ্কনে স্বরূপ দত্ত যে বোধশক্তির ও 'স্মার্টনেস' দেখিয়েছেন, তা ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য। বাংলা ছবি যে এক-জন নির্ভরযোগ্য নায়ক পেল, তা শ্রী দত্তর অভিনয় দেখে বলা যায়। চরিত্রটির স্বরূপ ও কণ্ঠ তিনি সহজেই দর্শককে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সমিত ভঞ্জর ছেনো একটি অদ্ভুত স্বাভাবিক চরিত্র-সৃষ্টি। ছেনোকে ক্রূরতায়, হিংসায় ও উচ্ছৃঙ্খলতায় বাস্তবানুগ করে তোলার যে কৃতিত্ব শ্রী ভঞ্জ দেখালেন, তা অতুলনীয় বলা যেতে পারে। তাঁকে দেখিয়েছে অশিক্ষিত গুন্ডার মত, তাঁর আচরণও তাই।

রবির দলের ছেলেদের মধ্যে কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় খুবই চরিত্রানুগ ও প্রশংসনীয়। পার্থ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মন্দ নয়, কিন্তু তাঁকে ওই দলের ভাবতে কষ্ট হয়। মনে হয়, ওই চরিত্রটি 'উঠ্তি' মস্তান, সবে ট্রেনিং নিচ্ছে, খোঁজখবর নেয় ও এনে দেয়।

আনন্দময়ী সেজেছেন ছায়া দেবী। তাঁর চরিত্রই ছবিতে প্রধান। তিনি ছবিতে তাঁর অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় পুরোপুরি দিয়েছেন। তাঁর মেক-আপ একটু অস্বাভাবিক। এজন্যই কিনা জানি না, মাঝে

জ্যেষ্ঠে তাঁর চরিত্রাভিনয়ে কেমন যেন নাটক নাটক ভাব এসে গেছে। তবে সরল গ্রাম্য বৃদ্ধার রূপটি তাঁর অভিনয় নিখুঁত। তাঁর ছোট বয়সের ভূমিকায় রমি চৌধুরীর অভিনয় বেশ প্রাণদীপ্ত। আনন্দময়ীর স্বামীর ভূমিকায় (যাকে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়েছে) চিন্ময় রায়ের অভিনয়-কুশলতা মুগ্ধ করে।

মন্টু ও লতু হয়েছেন যথাক্রমে নির্মল-কুমার ও সুমিতা সান্যাল। তাঁরা তাঁদের অভিনীত চরিত্রের মানসিক গঠন সহজেই প্রকাশ করেছেন। চরিত্র দুটি দর্শকের সহানুভূতি পাবে না নিশ্চয়। পাবে না যে সেখানেই তাঁদের অভিনয়ের নৈপুণ্য।

দুই নির্বাচন-প্রার্থীর রূপসজ্জায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ টাইপ চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়েছেন। তাঁর চরিত্রাভিনয়ে ব্যঙ্গের ভাব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। অল্প অবকাশে যাঁরা মনোজ্ঞ অভিনয়ের প্রমাণ দিলেন, তাঁদের মধ্যে দিলীপ রায়, প্রেমাংশু বসু ও বুই বন্দ্যো-পাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম ঘোষ ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ও ছোট্ট দৃশ্যে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সংগীতের একটা বিশেষ আবেদন তপনবাবুর ছবিতে থাকেই। এ-ছবিতেও আছে। সুরকার শ্রী সিংহ স্বয়ং। গানগুলি সুগীত।

কলাকৌশলের কাজ উঁচুদরের। বিমল মুখোপাধ্যায়ের ফটোগ্রাফি অসামান্য। জাগ্যায় আগে কয়েকটি চরিত্রের মুখ বিকট ও বিশ্রীভাবে দেখাবার কৌশলটি উল্লেখ-যোগ্য। এডিটিং (সুবোধ রায়) সারা ছবিতেই গতি এনে দিয়েছে, বিশেষ করে অ্যাকশন দৃশ্যে সুফল দিয়েছে। শব্দ-গ্রহণও (অতুল চট্টোপাধ্যায় ও অনিল তালুকদার) বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শোনা গেছে। কার্তিক বসুর শিল্পনির্দেশ মোটামুটি সন্তোষজনক।

দানীবাবুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব

গিরিশচন্দ্রের পুত্র, বিখ্যাত নট দানীবাবুর (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় উৎসবের তোড়জোড় চলছে। উৎসব পালনের জন্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ২৮ অগ্রহায়ণ (১৪ ডিসেম্বর) তাঁর জন্মের একশো বছর পূর্ণ হবে। ওই দিনই সকালে বাগবাজারে গিরিশ-ভবনে দানীবাবুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা। ১৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার কালিকা হলে মহান নটের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

চলাচলের নতুন নাটক

আগামী ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় রবীন্দ্র সদনে চলাচল নাট্যগোষ্ঠীর নতুন নাটক 'ধনপতি গ্রেপ্তার' মঞ্চস্থ হবে। অবাস্তব ও বাস্তবের মিশ্রণে রচিত এই হাসির নাটক রচনা করেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য। পরিচালনা করবেন রবি ঘোষ। অভিনয়ে আছেন রবি ঘোষ, ভোলা দত্ত, নিমাই ঘোষ, উমানাথ ভট্টাচার্য, প্রণব চক্রবর্তী, গোরা চট্টোপাধ্যায়, তপেন চট্টো-পাধ্যায়, হৃষিকেশ চক্রবর্তী, রঞ্জিত দেব, অহিন ভট্টাচার্য, স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী, স্বপন দাশগুপ্ত ও মহুয়া লাহিড়ী।

কলাক্ষেত্র'র উৎসব

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা কলাক্ষেত্র আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে চারদিনব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করেছেন। ওই সম্পর্কে আলোচনার জন্য আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী রুক্মিনী দেবী জানান, কলাক্ষেত্রের উৎসব প্রতি বছর মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এবার তাঁরা কলকাতার রসিকজনকেও আনন্দের অংশীদার করতে চাইছেন। ইতিপূর্বে বোম্বাই ও হায়দরাবাদে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় অনুরূপ উৎসব এই প্রথম।

উৎসব-সূচীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি নৃত্য-নাট্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা", কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম"। সব কয়টি নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর।

মাধবী নির্মল

শুভ পরিণয়

গত ৪ ডিসেম্বর গোধূলিলগ্নে নির্মলকুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন—অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উপরের ছবিটি : পতিগৃহে যাত্রা।

উপরে বর-বধূর সঙ্গে সস্ত্রীক সত্যজিৎ রায়। নীচে কন্যাসম্প্রদান।

কোন ক্রিয়াকলাপ বাদ যায়নি

বরের সঙ্গে বরযাত্রী উত্তমকুমার

ফটো-সেন

বোম্বাই বিচিত্রা

যাঁরা এখানে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী'র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরা একটি প্রেস শোর আয়োজন করেন। বাংলা দেশের সেরা অভিনেতা উত্তমকুমার এ ছবির নাম ভূমিকায়, আর সেই উত্তমকুমারই এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য মাত্র কয়েকদিন আগে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। সুতরাং অবাঙালী মহলেও এ ছবি দেখায় আগ্রহ প্রবল। 'সিনে মিনি' একটি ছোট্ট অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ। সেইখানেই প্রেস শোর আয়োজন। পৌঁছোতে আমাদের একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। ঢুকে দেখি হাউস-ফুল। সামনের সারিতে কয়েকটা আসন খালি। ঢুকে পড়েছি সুতরাং বসতেও হল। কিন্তু পর্দায় দেখছি একটি রঙীন ছবি। হিন্দী। পাশে বসে বিপিন গুপ্তর ছেলে রবীন। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভুল জায়গায় ঢুকে পড়িনি তো?' রবীন বললো, 'না অ্যান্টনি ফিরিঙ্গীর প্রিণ্ট এখনো এসে পৌঁছোয়নি, অথচ বম্বের সব প্রেসের লোকেরা এসে পড়েছেন। সেই জন্য কলিন-বাবু (কলিন পাল) 'সাধু আওর শয়তান' দেখাবার বন্দোবস্ত করেছেন।' সুতরাং 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী'র বদলে আমরা সবাই সাধু আওর শয়তান দেখলাম। ছবির প্রযোজক কৌতুক অভিনেতা মেহমুদ এবং পরিচালক ভীম সিং। ছবিটি মাদ্রাজেই তোলা হয়েছে। ছবির নায়ক মেহমুদ, নায়িকা, হিন্দী দর্শকদের জন্য একটি নতুন মেয়ে, নাম সম্ভবত রাধা। মিষ্টি দেখতে। নৃত্যে পটিয়সী। তারপরই প্রাধান্য অভিনেতা ওমপ্রকাশের। এ ছাড়া আছে প্রাণ। ক্লাইম্যাক্সটাই সে করেছে প্যানিশমেন্টও নিয়েছে প্রাণ দিয়ে, আর আছে কিশোরকুমার। এ ছাড়া ব্যানারে পোস্টারে যাঁদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে না এমন সব মহারথীদের এক একটি সারপ্রাইজ প্যাকেট হিসেবে ছবিতে দেখা যাচ্ছে: অশোককুমার, দিলীপকুমার, মমতাজ, সুনীল দত্ত, শুভা খোটে। বম্বের মেহমুদ এবং মাদ্রাজের ভীম সিং-এর মিলনে 'সাধু আওর শয়তান'। দু-এক দিনের মধ্যেই বম্বে বাজারে রিলিজ হবে।

ইনটারভ্যালের আলো জ্বললে দেখলাম বম্বে প্রেসের সবাই ওই ছোট্ট হলে গিজ গিজ করছে। দু-একজন এমনও ছিলেন যাঁরা 'সাধু আওর শয়তানের' জন্য আয়োজিত প্রেসশোতে হয়ত উপস্থিত হতেন না। তাঁরা এসেছিলেন, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী দেখতে। অভিনয়ে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত উত্তম-কুমারের অভিনয় দেখতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী দেখা হল না। 'সাধু আওর শয়তানের' হাসি এবং সাসপেন্সের পরও এই খেদ মনে নিয়ে অনেকে বাড়ি ফিরলেন। কর্মকর্তারা জানালেন যে সিনেমা হলে অগ্রিম বুকিং শুরু হয়ে গেছে এবং জনতা অতিউৎসাহে টিকিট কিনছে। এখন যদি প্রিণ্ট সময়মত এসে না পৌঁছায় তাহলেই হয়েছে! আশা করি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গীর প্রেস-শো দেখতে গিয়ে আমরা যেমন 'সাধু আওর শয়তান' দেখে এলাম, টিকিট কেটে যাঁরা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী দেখতে যাবেন তাঁদের বেলায় তেমন কিছু হবে না।

"সাবরমতী" (পরিচালনা : হীরেন নাগ) চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী, দীপ্তি রায় ও উত্তমকুমার ফটো-দেশ

জাতীয় পুরস্কারের ফিরিস্তি বাড়ার চলচ্চিত্র জগতে বোধ হয় একটু রকমফের হবে মনে হচ্ছে। শুনছি প্রায় সমস্ত অতিব্যস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীরাই এখন অন্তত এক-আধটা ভাল গল্প বা চরিত্রে অভিনয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। সম্প্রতি নির্দেশকদের মধ্যেও এ ধরনের মনোভাব লক্ষিত হচ্ছে। 'সুলক্ষণ' এতে কোন সন্দেহ নেই।

*

এ বছরে জাতীয় পুরস্কার-এ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী মনোজকুমারের ছবি 'উপকার'-এর দ্বিতীয় স্থান পাওয়া নিয়ে বম্বেতে যথেষ্ট পরিমাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এখানে অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, এ বছরে জাতীয় পুরস্কারে সর্বোচ্চ আসনে 'উপকার' বসবেই বসবে। কিন্তু কার্যত যখন তা হল না, তখন প্রথম শুরু হল চাপা গুঞ্জন। তারপর সোচ্চার আলোচনা। এবং বর্তমানে প্রায় সর্বত্র জাতীয় পুরস্কার কমিটির সমালোচনা চলছে। উপকার-এর ডিজাইনে যাঁরা নতুন ছবি বানাচ্ছেন তাঁরাও যৎপরোনাস্তি বিচলিত। মাঝে মাঝে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, জাতীয় পুরস্কারের কেন্দ্রীয় কমিটি বাঙালীদের প্রতি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। আজ পর্যন্ত জাতীয় পুরস্কার-এর খতিয়ান খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সর্বাধিক পুরস্কার গেছে বাংলা দেশে বা বাঙালীদের হাতে। যাই হোক এ আলোচনা এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ্যে, সাংবাদিকতার মধ্যে এসে পৌঁছোয়নি। এ আলোচনা এখনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক। তবে যেভাবে সংক্রামিত হচ্ছে এ ধরনের মনোভাব তাতে কতদিন যে তা থামা চাপা থাকবে বুঝতে পারছি না।

*

শান্তারাম তাঁর নতুন ছবির শিল্প নির্দেশনার জন্য দেশ মুখার্জিকে সাইন করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করছে যে, বম্বেতে শিল্প নির্দেশনার কাজটা বাঙালীরা প্রায় একচেটিয়া করে ফেলেছেন। সুধীন রায়, সৌরেন সেন, গণেশ বসাক, দেশ মুখার্জি, শান্তি দাস, অজিত ব্যানার্জি প্রমুখ শিল্প নির্দেশকরাই বম্বের অধিকাংশ ছবি করছেন। যাই হোক, শান্তারাম-এর ছবিতে দেশ মুখার্জির শিল্প নির্দেশনা এ রাজ্যে একটি জবর খবর। প্রথম সেটই লাগছে একটি মঞ্চের। মঞ্চে একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হবে সুতরাং পরিপাটি চাই মঞ্চ পরিকল্পনায় তেমনি চাই আলোক সম্পাতেও। মঞ্চ পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা দেশ মুখার্জি যা করার তা করছেন কিন্তু আলোক সম্পাতের কাজও যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই জন্য দেশ মুখার্জি স্বনামধন্য তাপস সেনকে কলকাতা থেকে আনানোর জন্য অনুরোধ করেছেন শান্তারামকে। শুনলাম দেশ মুখার্জির অনুরোধে শান্তারাম রাজী হয়েছেন এবং তাপস সেন বর্তমানে বম্বেতে এসেছেন। মঞ্চের আলোকসম্পাত এবার চলচ্চিত্রে প্রবেশ করল। ফলাফল ছবি হলে দর্শকদের চোখের সামনে আসবে।

নয়ন শর্মা

অরণ্যদেব ✫ লী ফক

অরণ্যদেবের গুহায় রহস্যের অন্ত নেই। আছে করোটি-সিংহাসন----

আছে প্রাচীন পুঁথি, আছে বংশ-ইতিহাস, আছে মণি-মাণিক্য-হীরে-জহরত -----

এখানে আর এক রহস্য!
আমাকে সাহায্য করো!
?

অরণ্যদেবের পূর্বপুরুষরা খুদে মানুষদের রক্ষা করে এসেছেন।-----
বিপদে না-পড়লে আমি আসতুম না, অরণ্যদেব।
জানি, রাজপুত্র স্লাদ। তা, কী হয়েছে তোমার ভাবী বধূর?

মেলডি অতি রূপসী মেয়ে—
'একদিন আমরা শূন্যপথে বেড়াতে বার হয়েছি—'

মেলডি, এবার ফেরা যাক।
আর-একটু দূরে যাব, স্লাদ।
'উড়তে উড়তে নিজেদের রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে আমরা চলে এসেছিলাম'
৫/২১

'দৈত্যদের আমরা দেখতে পাইনি। যখন দেখলাম, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে!'
?!

স্লাদ, বিরাট একটা বাজপাখি!
উড়তে থাকো মেলডি, উড়তে থাকো!

'তীরধনু নিয়ে বাজপাখির সঙ্গে লড়াই চালাবার চেষ্টা করছিল মেলডি।'
ওতে কাজ হবে না, মেলডি। তাড়াতাড়ি উড়ে পালাও!

'বাজপাখিটা আমার দিকে তেড়ে এল। বর্শা হাতে আমি তার মুখোমুখি হলাম—'
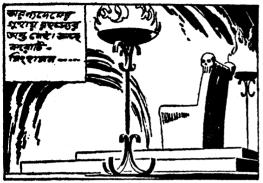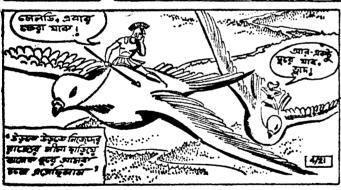
পাক প্রেসিডেনট আয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফর এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচনার বিষয়। গত ৫ ডিসেম্বর সাত দিনের সফরে বিমান থেকে আয়ুব খাঁ ঢাকায় নামতেই রাজধানী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভ মিছিল রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন পাক জাতীয় পরিষদের বিরোধী নেতা নূরুল আমিন। নবাবশাহে এক হাজার ছাত্র বিক্ষোভকারীদের সংগে যোগ দেয়। ৭ ডিসেম্বর গভরনর হাউসের সামনে আয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভকারী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস গুলি চালায়। আয়ুব তখন গভরনর হাউসের ভিতরে ছিলেন। এই ঘটনায় অন্তত ২জন নিহত এবং ২০জন আহত হয়েছে। পুলিসকে লক্ষ্য করে ইষ্টকবৃষ্টি শুরু হলে কয়েক ঘণ্টা ধরে জনতা-পুলিসে খণ্ডযুদ্ধ চলে। গ্রেফতারের সংখ্যা প্রায় ৫০০। জাতীয় আওয়ামী পারটির ডাকে এই বিক্ষোভ চলে। অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠতেই পুলিসকে সাহায্য করতে সেনাদল সংগীন উঁচিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভকারীদের দাবি : শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কার, আয়ুবী মৌল গণতন্ত্র প্রথা রদ এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার অবস্থা অশান্ত। জাতীয় আওয়ামী পারটি ও অন্যান্য বিরোধী দলের ডাকে শহরে ধর্মঘট চলছে এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বেরিয়েছে। গত ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জেনারেল আজম খাঁ সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। এক সময়ে তিনি ছিলেন আয়ুব খাঁর ডান হাত। জেনারেল আজম খাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ করায় আয়ুবশাহী আর একটি নতুন বিপদের সম্মুখীন হলো। পশ্চিম পাকিস্তানে কোন সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করার প্রতিবাদে করাচীর সাংবাদিকরা ২৪ ঘণ্টার জন্য ধর্মঘট ডেকেছেন। আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে করাচিতে এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে।

দেশী সংবাদ

২ ডিসেম্বর—গত শনিবার এলাহাবাদ থেকে পনের মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব রেলের রামনাথপুর রেল স্টেশনের উপর হানা দেওয়া সম্পর্কে কটোরা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদককে পুলিস গত রাত্রিতে গ্রেফতার করে।

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের কর্মীদের মূল বেতনের সংগে বর্তমান মহার্ঘ ভাতার শতকরা ৫০ ভাগ সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন বলে জানা যায়। কেন্দ্রের এই প্রস্তাব শীঘ্রই সরকারীভাবে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের খবর।

৩ ডিসেম্বর—কাননানোর জেলায় নকশালপন্থী একজন বড় নেতার কাছে পুলিস যে দুটি চিঠি পেয়েছেন তাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সন্দেহ জেগেছে—কেরলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পিছনে পিকিং-এর হাত আছে। চীনা দূতাবাসের তথ্য বিভাগ থেকে শ্রী কে পি বালকৃষ্ণনকে এই চিঠি দুটি লেখা হয়েছে।

শোধন না করে পানীয় জল সরবরাহ করার অভিযোগে আজ কলকাতায় পৌর অধিবেশনে বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় কর্তাদের শাস্তিদান ও জল কমিটিকে অপরাধী সাব্যস্ত করার দাবি জানিয়ে বিরোধী সদস্যরা বিতর্কের মধ্যেই সভাকক্ষ বর্জন করেন।

৪ ডিসেম্বর—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ, ওয়ার্কশপ, গবেষণাগার, লাইব্রেরী ও সান্ধ্য ক্লাব বন্ধ থাকবে। সেই সংগে সব ছাত্রাবাসগুলিও। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্র আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের একজন আই এ এস অফিসার এবং একজন আই পি এস অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খবরদারী কমিশন তাঁদের সম্পত্তির হিসাব নিয়েছেন। আর একজন আই সি এস অফিসারের উপর [illegible] সরকার অসন্তুষ্ট—সে কথা কমিশনের পরামর্শে উক্ত অফিসারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৫ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন আজ স্বরাষ্ট্র দফতর সংক্রান্ত সংসদের ঘরোয়া উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে বলেন, কলকাতায় নকশালদের শক্ত ঘাটি রয়েছে। তারা সমগ্র পূর্বোত্তর ভারতে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

পালঘাটের জেলা হেড কোয়াটারে যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্রকাশ, পালঘাট জেলার চতুর ও আলথুর তালুকের জংগলে উগ্রপন্থী কমিউনিস্টদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। যেসব নকশালপন্থী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সংস্রব ত্যাগ করেছেন তাঁরাই এইসব ট্রেনিং দিচ্ছেন।

৬ ডিসেম্বর—জাতীয় সমস্যা হিসাবে বিচার করে কলকাতা মহানগরীর উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এক বেসরকারী প্রস্তাব নিয়ে আজ রাজ্যসভায় আলোচনা হয়। আলোচনাকালে মহানগরীর বহু সমস্যার প্রতি সদস্যরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেগুলির প্রতিকারের জন্য তাঁরা সরকারকে তৎপর হতে অনুরোধ করেন।

৭ ডিসেম্বর—আজ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা লুঠতরাজ ও আগুন লাগানোর কাজে লিপ্ত হয়। ছাত্র পুলিস সংঘর্ষে একজন ম্যাজিস্ট্রেট সহ কয়েকজন পুলিস আহত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বলেন, এটা নকশালবাড়ি ধরনের আন্দোলন। ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তক বাওকটি লুঠ করে, গান্ধীজীর ছাপ নিচে নামিয়ে মেঝেতে ফেলে দেয়। কয়েকটি দোকানও লুঠ করা হয়েছে।

আজ সকালে একদল লোক বর্ধমানের মেমারি থানার [illegible] বিরোধ সংশ্লিষ্ট ধান ক্ষেতের ফসল জোর করে কাটতে গেলে পুলিসের সংগে তাদের সংঘর্ষ [illegible]। পুলিসের গুলিতে

অকুড়রাম বাগাদ নামে এক ব্যক্তি মারা যায়।

৮ ডিসেম্বর—বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি নতুন কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। একটি ছুরিকাঘাত এবং দোতলা এক হোস্টেলের ছাদ থেকে একজন ছাত্রকে ছুঁড়ে ফেলার ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ সি যোশী এই বিবৃতি দেন।

আজ বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ হলে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির কনভেনশনে এক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক সময় দুদলে বাদ-প্রতিবাদ এবং হই-হট্টগোলে উত্তেজনা চরমে ওঠে। সভাস্থলে এই গোলমালের মধ্যে বাইরে থেকে কয়েকটি ঢিল এসে হলের ভিতরে পড়ে এবং দু-একটি কাঁচও ভাঙে।

বিদেশী সংবাদ

২ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি আজ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেখানে রাজনৈতিক অশান্তি ছাড়াও সামরিক বাহিনী আজ 'দ্বিধাবিভক্ত' বলে করাচি থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে। রয়টার, ইউ এন আই ইত্যাদি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবরে জানা যাচ্ছে, 'সংবাদপত্রের' স্বাধীনতা সংকোচের' বিরুদ্ধে আগামী বৃহস্পতিবার তিন ঘণ্টার জন্য রাওয়ালপিন্ডির সাংবাদিকরা প্রতীক ধর্মঘট করবেন।

৩ ডিসেম্বর—গতকাল আবার ছাত্ররা পূর্বতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং অপরাপর আটক ব্যক্তিদের মুক্তির দাবিতে করাচিতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জানায়। সংগে ছিলেন আইনজীবী, রাজনৈতিক কর্মী ও মহিলারা। চাকওয়ালে ছাত্ররা একটি ট্রেন ও স্টেশন আক্রমণ করে।

৪ ডিসেম্বর—পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব আজ তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের সংগে কোনরকম কথাবার্তার [illegible] উড়িয়ে দেন। আয়ুব বলেন, বি[illegible] গঠনমূলক কোন প্রস্তাব না থাকলে তি[illegible] সংগে আলোচনায় যাচ্ছেন না।

৫ ডিসেম্বর—আজ কলকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্করের অবস্থা শঙ্কাজনক। তিনি সান ডিয়াগো (ক্যালিফোর্ণিয়া) হাসপাতালে আছেন। গত সপ্তাহের প্রথমে শ্রীউদয়শঙ্কর সান ডিয়াগো শহরে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

৬ ডিসেম্বর—১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরব-ইজরায়েলের যুদ্ধের সময় থেকে ইজরায়েলের সৈনা যেসব জায়গা দখল করে আছে—সেখান থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ামাত্র আমরা ইজরায়েলের সংগে বৈরিতার অবসান ঘটাতে রাজি। সংযুক্ত আরব মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে একথা জানিয়ে গিয়েছে।

৭ ডিসেম্বর—ইউরোপে এই প্রথমবার চীনকে নৌ ও ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি তৈরির সুবিধা দিয়ে আলবেনিয়া একটি চুক্তি করেছে। এই চুক্তিকে আলবেনিয়া ও খোদ চীনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হুমকির পাল্টা ব্যবস্থা বলে চীনারা মনে করে।

৮ ডিসেম্বর—আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবহরের দুটি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী ডেসট্রয়ার গতকাল কৃষ্ণসাগরে মহড়ার জন্য বসফরাস প্রণালীর দিকে যাত্রা করেছে। যদিও রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ তোলা হয়েছে যে এই ধরনের কাজ প্ররোচনামূলক বলে বিবেচিত হবে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র

আধুনিকতা
সৌন্দর্য্যবোধ ও সূক্ষ্মতা
এই তিনের সমন্বয়ে তৈরী সেঞ্চুরীর
সুতীর শাড়ী আপনাকে আরও
সুন্দরী করে তুলবে।
কটসেল-ও (ওয়াশ-এন-ওয়্যার)
সিলকেন টাচ্
লেকস্ বিউটি
প্রস্তুতকারক ঃ
দি সেঞ্চুরী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং. লিঃ
সেঞ্চুরী ভবন, ডাঃ এনী বেসান্ত রোড, বোম্বাই-২৫
ADROIT/CM/2

প্রচ্ছদ : শ্রীঅলোক ধর

● যে প্রতিযোগী ৪টি কুপন পাঠাইবেন, তাঁহাকে অবশ্যই একটি স্বনাম-ঠিকানা লেখা স্লিপ এবং ১৫ পয়সার ডাকটিকেট পাঠাইতে হইবে।
● ৪১নং প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ নির্ভুল বিজয়ী ৬ জনের প্রত্যেকে ৩৫০০, টাকা পাইয়াছেন। ৫০ জন বিজয়ী একটি করিয়া রিস্ট ওয়াচ পাইয়াছেন।

● ২, টাকা পাঠালে লিটকুইজ সাপ্তাহিকের ৮টি সংখ্যা পাবেন।
● স্বনাম ঠিকানা লেখা ১০ পয়সা দামের পোস্ট কার্ড পাঠালে অবিলম্বে সমাধান জানানো হবে।
● ৩৭নং লিটকুইজের সকল পুরস্কার পাঠানো হয়েছে।

18 CLUES

(1) **Man's thoughts, deeds, and words return to him, sooner or later, with astounding ACCURACY/FREQUENCY.**

(2) There are, of course, limitations to what we can **ACHIEVE/RECEIVE** in our lives.

(3) Trying to **BUY/SATISFY** people with material gifts is, in the long run, like trying to fill a bottomless pit.

(4) One does not **CEASE/LEARN** to have a drive for money.

(5) A human being is no time clock which, once it is set, cannot **CHANGE/CHEAT.**

(6) Men evoke God's activity according to their **DEEDS/NEEDS**, but the fulfilment of history will be the work of God.

(7) It is an injustice to ourselves and the powers within us if we allow **DIFFIDENCE/DISSENT** to become a habit.

(8) Boredom is one of the sure ways to measure your own inner **EMPTINESS/RESTLESSNESS!**

(9) Work for work's sake, money for money's sake, production for production's sake—these are the greatest **FALLACIES/FANCIES** of the twentieth century!

(10) Men are usually more afraid of their **FAULTS/FEELINGS** than women.

(11) Men receives only that which he **GIVES/WILLS.**

(12) Time does not diminish our feelings of **GRATITUDE/GUILT.**

(13) That all, or even most, human beings will ever be consistently **HUMANE/SANE** seems very unlikely.

(14) Many people do not know how to be social, and that is why they suffer the pangs of **HUMILIATION/ISOLATION.**

(15) **INDIFFERENCE/INJUSTICE** is the final denial of humanity.

(16) Art in its **PERFECTION/REVELATION** is not ostentatious; it lies hid, and works its effect, itself unseen.

(17) What is youth, after all, but a flexible mind and a flexible body; what is age but **PREJUDICE/PRIDE** and physical neglect?

(18) When reason sleeps, the absurd and loathesome creatures of **SUPERSTITION/SUSPICION** wake and are active, goading their victim to an ignoble frenzy.

১। মানুষের চিন্তা, কার্য্য ও শব্দ, শীঘ্রই বা বিলম্বে আশ্চর্য্যরকম **নির্ভুলভাবে/ঘনঘন** তার কাছে ফিরে আসে।

২। আমাদের জীবনে আমরা যা **সিদ্ধ করতে/পেতে** পারি তার সীমা আছে।

৩। বাস্তব উপহার দিয়ে লোকেদের **কেনবার/সন্তুষ্ট করবার** চেষ্টা করা শেষ অবধি এক অতল গর্ত্তকে ভরবার চেষ্টা করার সামিল।

৪। অর্থের জন্য প্রচেষ্টা করতে কেউ **নিরস্ত হয়/শিক্ষা করে** না।

৫। মানুষ ঘড়ি নয় যে একবার চালিয়ে দিলে পর **বদলাতে/ঠকাতে** পারে না।

৬। মানুষ নিজের **কার্য্য/প্রয়োজন** অনুসারে ভগবানের শক্তিকে ডাকে, কিন্তু ইতিহাসের পরিপূর্ত্তি ভগবানেরই হাতে থাকবে।

৭। যদি আমরা **আত্মবিশ্বাসের অভাবকে/মতভেদকে** অভ্যাস হয়ে উঠতে দিই তবে তা আমাদের নিজেদের ও আমাদের ভেতরকার শক্তিসমূহের ওপর অবিচার।

৮। আপনার নিজের ভেতরকার **রিক্ততা/অস্থিরতা** পরিমাপ করবার নিশ্চিত উপায়গুলির একটি হচ্ছে ক্লান্ত বিরক্তি!

৯। কাজের জন্যই কাজ, অর্থের জন্যই অর্থ, উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন—এসব বিংশ শতাব্দীর **ভ্রান্তি/খেয়ালী ঢেউ!**

১০। নিজের **দোষ/অনুভূতি** সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের চাইতে পুরুষেরাই বেশী ভীত।

১১। মানুষ যা **দেয়/সংকল্প** করে তাই পায়।

১২। সময় আমাদের **কৃতজ্ঞতার/অপরাধের** অনুভূতিগুলিকে কমিয়ে দেয় না।

১৩। সব বা এমনকি অধিকাংশ মানুষই সব সময় ধারাগতভাবে **দয়াল/প্রকৃতিস্থ** থাকবে এটা খুবই অসম্ভব মনে হয়।

১৪। অনেক লোকই জানেন না কিভাবে সমাজে মিশুক হতে হয় এবং সেই কারণেই তাঁরা **অপমানের/নিঃসঙ্গ থাকার** দুঃখ ভোগ করেন।

১৫। **উপেক্ষা/অবিচার** মানবতার অন্তিম অস্বীকার।

১৬। কলা তার **পূর্ণতায়/প্রকটিতকরণে** সমারোহ দেখায় না; সে লুকিয়ে থাকে এবং নিজে অদৃশ্য থেকে তার ফল দিতে থাকে।

১৭। যৌবনটা, বলতে গেলে, নমনীয় মন ও নমনীয় শরীর ছাড়া আর কি; বার্দ্ধক্যটা **বিদ্বেষ/অহঙ্কার** ও শারীরিক অবহেলা ছাড়া আর কি?

১৮। যুক্তি যখন ঘুমোয়, **কুসংস্কারের/সন্দেহের** অদ্ভুত ও ঘৃণ্য জীবগুলি জেগে ওঠে এবং তাদের শিকারকে এক জঘন্য উন্মাদনার দিকে চালিত করতে প্রবৃত্ত হয়।

দ্রষ্টব্য:—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিট্‌কুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

কন্ট্রাক্টারি করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন বেণীমাধব চক্রবর্তী। একদিন রাত্রে তিনি হঠাৎ খুন হলেন। এ খুনের খবর শুনে ব্যোমকেশ ঠাট্টা করে বলেছিল—বেণীসংহার!

তা বেণীসংহারই বটে! বেণীসংহার শব্দের আসল মানে হচ্ছে খোঁপা বাঁধা। মেয়েরা খোঁপা বাঁধার সময় আগে চুলগুলি যেমন গুটি কয় গুছিতে ভাগ করে নেয়, তারপরে সেগুলি পরস্পর জড়িয়ে বিনুনি করে, এবং সবশেষে সেই বিনুনি জড়িয়ে খোঁপা তৈরী হয়, তখন আর সাধ্য থাকে না কারও সেই জটিলতার মধ্য থেকে কোন গুছির কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ খুঁজে বার করা, কোন্ গুছিটিই বা কোনটি তা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নতুন গোয়েন্দা-উপন্যাস

বেণীসংহার

নির্ধারণ করা, তেমনি এই রহস্যকাহিনী। সযত্নরচিত খোঁপাটির মত সযত্নসাধিত খুনটিও এর প্রত্যক্ষ হচ্ছে; কিন্তু কেই বা খুনী, কেনই বা সে খুন করল, কি ছিল তার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সকল প্রশ্নের উত্তরই জটিলবন্ধন খোঁপার মধ্যে নিহিত গুছি-গুলির মতই এমন সুকৌশলে সংগুপ্ত যে, এ রহস্যজাল দুর্ভেদ্য বললেই হয়।

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের সর্বাধুনিক গোয়েন্দা-উপন্যাস "বেণীসংহার" ছাড়াও এ গ্রন্থে "ছলনার ছন্দ" ও "রুম নম্বর দুই" নামে ব্যোমকেশের আরও দুটি দীর্ঘ গোয়েন্দা-কাহিনী আছে।

'আমি কোথায় পাবো তারে/আমার মনের মানুষ যে রে!'
এ আকুলতা মানবমনের চিরন্তন। কোথায় পাবো আমি তাকে, সেই অচিন-অধরাকে, যাকে পেলে আমার সব পাওয়া হবে, আর আমার পাওয়ার কিছু থাকবে না; যাকে পেলে আমার সকল অতৃপ্তির অবসান হবে, ভরে উঠবে আমার সকল শূন্যতা; অপূর্ণ মানুষের এ আকুল আর্তি তার 'মনের মানুষ'কে — তার 'পূর্ণতা'কে —পাওয়ার, গান হয়ে, কান্না হয়ে, ব্যাকুলতা হয়ে যুগ যুগ ধরে উৎসারিত হয়েছে সাধক-তপস্বী, গৃহী-বৈরাগী, শিল্পী-সাহিত্যিক, প্রেমিক-ভাবুক — সকলের অন্তর থেকে। সাধকের সাধনা, তপস্বীর তপস্যা, গৃহীর সংসার, বৈরাগীর বৈরাগ্য, শিল্পীর শিল্প, সাহিত্যিকের সাহিত্য, প্রেমিকের প্রেম, ভাবুকের ভাব — সবই সেই একই

কালকূট-এর

অনন্যসৃষ্টি

কোথায় পাবো তারে

পূর্ণতার অন্বেষায় ধাবমান — কোথায় পাবো তারে, যাকে পেলে আমার সকল অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মুসলমান দরবেশ মামুদ গাজী, নিঃসন্তান মাহাতো-গিন্নী আঙুরি, আধুনিকা নাগরিকা ঝিনু, প্রৌঢ় অচিনদা, বৃদ্ধ বাউল গোপীদাস বাবাজী, বিন্দু, গোকুল, ব্রহ্মানন্দ অবধূত, যোগো অবধূতানী—সবাই বয়ে চলেছে সেই একই সাধনার স্রোতে।

"কোথায় পাবো তারে" রূপে ও অরূপে মেশানো রাঢ়বঙ্গের এক বিচিত্র চিত্র। বাউল বৈষ্ণব ফকির শাক্ত শৈব সকলের রূপের হাটে বিশেষ করে নিবিড় হয়ে উঠেছে কিছু নরনারীর অন্তরঙ্গ কাহিনী, যা উপন্যাসের থেকেও আরও বেশী কিছু, আরও গভীর ও স্নিগ্ধ।

প্রকাশিত হল

দাম ২০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৮
শনিবার ৬ পৌষ, ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০   ২৩-৮৩৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩৩.০০
ষাণ্মাসিক "	... ১৬.৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩৩.০০
ষাণ্মাসিক "	... ১৬.৫৫
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	... ১৩.০০

[illegible]
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... [illegible]
ষাণ্মাসিক	... [illegible]
ত্রৈমাসিক	... [illegible]

দাম ৫০ পয়সা
[illegible] বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 21, Dec. 1968

কলকাতার উন্নয়ন ও অর্থ-সমস্যা

কলকাতা মহানগরীর যখন নাভিশ্বাস উঠেছে তখন দেখছি ঘরের লোক থেকে পাড়া প্রতিবেশী সবাই এর শেষ অবস্থাটা দেখার জন্যে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। প্রাণের টানে না হোক অন্তত সৌজন্যের খাতিরেও যে আসছেন তাই বা মন্দ কি! এ-সব ক্ষেত্রে যা হয়, সহানুভূতি, সমবেদনা জানানো, সামান্য হা হুতাশ করা—আপাতত তার অভাব ঘটছে না। বরং একেবারে হালে দেখছি, মরা কলকাতা কাগজের পাতায় জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, নিত্যই প্রায় তার সংবাদ। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের একটি আলোচনা চক্রও হয়ে গেল, বিষয় কলকাতা শহরের সংকট ও তাকে বাঁচাবার উপায়। সভায় স্বয়ং রাজ্যপাল থেকে শুরু করে সরকারী আমলার দল, শিল্পপতিরা, ফোর্ড ফাউণ্ডেশানের প্রতিনিধি এবং আরও অনেক হোমরা চোমরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় এমন কোনো নতুন প্রসঙ্গ ওঠে নি যা আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে পারে। তবু এই আলোচনা চক্র একপক্ষে ভাল বইকি, কারণ কলকাতার মৃত অবস্থাটা প্রকাশ্যে স্বীকার করার মতন লোক বাড়ছে। বিশেষ করে যেসব শিল্পপতি এ-ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দায় দায়িত্ব স্বীকার করতেন না, এখন তাঁদের অভিমত জানা যাচ্ছে।

চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট শ্রী জি কে ভগত এই সভায় এবং পরে সাংবাদিকদের কাছে যা বলেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, কলকাতাকে তিনিও বিচ্ছিন্ন একটি নগরী বলে মনে করছেন না, কলকাতার মৃত্যু যে পশ্চিমবঙ্গকে খাঁড়ার ঘা দেবে এ-সম্পর্কে তিনি একমত। তা ছাড়া তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, কলকাতার অবনতি শুধু পূর্ব ভারতেই নয় সমগ্র দেশেই একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, সেটা অর্থনৈতিক তো বটেই এমন কি সামাজিকও। শ্রীভগতের এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় অন্যান্যদের ভাষণেও, যেমন শিল্পপতি শ্রীভাস্কর মিত্রও বলেছেন, কলকাতা যদি বিশৃঙ্খলার নগরী হয়ে দাঁড়ায় তবে সেই বিশৃঙ্খলার স্ফুলিঙ্গ পরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিঘ্নিত করবে।

শ্রীভগত এবং অন্যান্য যাঁরা এই আলোচনা চক্রে কলকাতার নানা সমস্যা ও সংকটের কথা বলেন তার কোনো কিছুই বাহুল্য বলে বর্জিত হতে পারে না। কলকাতার সমস্যা সত্যিই নানাবিধ, ৭০ লক্ষ লোক এই সমস্যায় পীড়িত হচ্ছেন। কাজেই এই শহরের জন্যে আশু কিছু কাজ করা প্রয়োজন। নিছক কথায় আর কিছু হবে না। এবং কাজ করতে হলে টাকা দরকার। টাকাটা আমাদের প্রধান সমস্যা। কে দেবে টাকা? কেন্দ্র? কেন্দ্র কলকাতার ওপর সবিশেষ অপ্রসন্ন হয়ে আছেন, টাকার আর্জি শুনলেই মুখ ভার করেন, কোনো সাধারণ পরিকল্পনার দাবি দেখলেও টাল বাহানা করে সময় কাটান, যেমন চক্ররেল রেলের কথাই ধরা যেতে পারে। সবচেয়ে সহজে এ জিনিসটা করা যেতে পারত, রাজ্য সরকার কম তাগাদা আর ঘোরাফেরা করেন নি, তবু সম্মতি আদায় করা গেল না। সেই কেন্দ্র কলকাতা উন্নয়নের জন্যে টাকা দেবেন এ প্রায় অবিশ্বাস্য; দিলেও যা দেবেন তাতে কাজের কতটুকু হবে! এখানে নিছক কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী থাকা বোকামি। প্রয়োজনীয় অর্থের অনেকটাই আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রীভগত একটি আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এ ব্যাপারে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নিজেদের কর্তব্য পালন করবেন। শিল্পপতিরা যদি এটা বাস্তবিকই করেন আমরা খুশী হব। এ-সম্পর্কে রাজ্যপালের পরামর্শটি ভাল: কলকাতা উন্নয়ন খাতে শিল্পপতিরা টাকা লগ্নী করতে পারেন। ফোর্ড ফাউণ্ডেশানের প্রতিনিধির মতে, শিল্পপতিরা ঋণের ভিত্তিতে কুড়ি কোটি টাকা দিলে ভাল হয়।

শিল্পপতিরা যদি কলকাতার উন্নতির জন্যে এগিয়ে আসেন, এবং আমাদের তরফ থেকে কেন্দ্রকে চাপ দিয়ে কিছু বেশি অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হয় তবে রাজ্য সরকার নিজের তহবিল সংগ্রহ করে অবশ্যই অর্থাভাব অনেকাংশে ঘোচাতে পারেন। অন্তত উনআশি কোটি টাকার যে জরুরী পরিকল্পনা আছে সেটা সফল হতে পারে।

হরিয়ানা ঘটনাবলী
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন

হস্তি-পিপীলিকা সংবাদ
নিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার অপরাধে হনুমন্থাইয়ার উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।
সুযোগ বুঝে রণেভঙ্গ

দেশ দর্পণ ১৯৬৮ ১৯৬৯

পরবর্তী সংখ্যায় 'দেশদর্পণ' মুলতুবী থাকবে। প্রধানত খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে। আবার যখন 'দেশদর্পণ' আত্মপ্রকাশের আশা রাখে, তখন দেখা যাবে রাজনৈতিক ঘটনার ঠাসা পশ্চিমবাংলা এবং গোটা দেশের জীবনের একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। এই বছরের জীবনটাকে যদি দর্পণের সামনে রাখা যায় দেখা যাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন যা কিছু এসেছে তার আছে অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস এবং শৃঙ্খলাবোধের অভাব। এক কথায় বলা চলে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতা জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফলে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে বিকৃত ও পঙ্গু করে দেবার উপক্রম করেছে।

পশ্চিম বাংলার কথা দিয়েই শুরু করা যাক। ১৯৬৮ সালের আবির্ভাব হল ঠিক এমনি এক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৭-র শেষের দিকে চতুর্থ নির্বাচনের জের যেটুকু টানা হল, তার স্থিতিকাল সীমাবদ্ধ হয়ে গেল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর। সমগ্র দেশের বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের এটাই গোড়ার কথা। চতুর্থ নির্বাচনে কংগ্রেস আধিপত্য ক্ষুন্ন হয়েছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। ফলে, অ-কংগ্রেসী দলগুলোকে সংবদ্ধ হয়ে শাসন ব্যবস্থার ভার নিতে হয়েছিল। এ-সুযোগ এসেছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। অপ্রত্যাশিত এই কারণে যে, অ-কংগ্রেসী দলগুলোর মধ্যে শাসন ব্যবস্থা চালাবার জন্য কোন প্রস্তুতি চতুর্থ নির্বাচনের আগে ছিল না। 'কংগ্রেস খতম' করার স্লোগান ছাড়া আর কোন নীতি বা কর্মসূচী ছিল না। ফলে, বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়, কোন ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল, তখন এতটুকু অসুবিধা হয়নি বামপন্থী দলগুলোর পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করতে। কংগ্রেসকে ফিরে আসতে না-দেওয়াই ছিল এই ঐক্যের প্রধান প্রেরণা।

এর পিছনে রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল না এবং এরই ফলে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে যুক্তফ্রন্ট কোন সময় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তা পারেনি বলেই যুক্তফ্রন্টকে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সে অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান সরিক মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি। এই পার্টির সামনে প্রাক্-নির্বাচনী যে কর্মসূচী ছিল, তার মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থান ছিল না। এই কর্মসূচীর বড় অংশ ছিল আন্দোলনের প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতির ফলেই নির্বাচনের পর দেখা দেয় নক্সালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস শাসনকে বিব্রত করে কৃষকদের সংগঠিত করা। কিন্তু কার্যত এই আন্দোলনই যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে বড়রকমের সংকট সৃষ্টি করে।

এই সংকটের জের টানতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে। কারণ, এই পার্টির অংশ হিসাবেই কম্যুনিস্ট সদস্যরা নক্সালবাড়ী আন্দোলনের প্রস্তুতি রচনা করেছিল এবং তারাই যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার পর আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। এই আন্দোলনের ফলেই আজ দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক সংকট মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সামনে। এই পার্টির পক্ষে আজ আর সংসদীয় গণতন্ত্রের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় বলেই যে-সব সদস্যরা পার্টির কর্মসূচীকে চরমপন্থার দিকে নিয়ে যাবার জন্য দাবি জানাচ্ছিল, তাদের দল থেকে বহিষ্কৃত করতে হয়েছে। আজ পার্টিকে সোজাসুজি বলতে হচ্ছে এরা উগ্রপন্থী এবং হঠকারী। এদের নীতি মার্ক্স-লেনিন মতবাদের পরিপন্থী। বর্তমান প্রসঙ্গে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, এই অন্তর্দ্বন্দ্বই পার্টির সামনে যে সংকটকে ডেকে এনেছিল, সেই সংকটের বোঝা বইতে হয়েছে যুক্তফ্রন্টকে।

অনেকটা এই কারণেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে কোন প্রত্যক্ষ এবং সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তা সম্ভব হয়নি বলেই, ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এক চরম পরিনতির দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে সে অবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না, এই অবস্থার ফলে দেশের বর্তমান রাজনীতিতে সমগ্রভাবে একটা অসাধারণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক যে অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল, সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে কয়েকটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার গোড়ার কথা এই যে, কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে অ-কংগ্রেসী সরকারকে বেশীদিন বরদাস্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই, নির্বাচনের ব্যর্থতাকে সংবিধানের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

প্রধানত এই সিদ্ধান্তের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার অনুমতি দিতে হয়েছিল রাজ্যপালকে। এই অধিকারের ফলেই পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপসারিত করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে বিতর্ক উঠেছে এবং আজও সে তর্কের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটেনি। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্ব অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়ে যে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকারকে বরখাস্ত করতে পারে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য অত্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে রাজ্য শাসনের ভার দিতে হয়েছিল।

এই দুটো মূল ঘটনাকে সামনে রেখেই শুরু হয়েছিল ১৯৬৮ সাল। শুরু হয়েছিল দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রধান পটভূমিকা। শুরু হয়েছিল হায়দ্রাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে এটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে অ-কংগ্রেসী সরকারকে আর বরদাস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। অ-কংগ্রেসী দল শাসিত রাজ্যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ আনা হল। অভিযোগ উঠল বামপন্থী দলগুলো ক্ষমতায় বসে সংবিধানকে উপেক্ষা করছে। পশ্চিম বাংলার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সংবিধানকে

বাঁচাতে হবে, বিভিন্ন অ-কংগ্রেসী রাজ্যে আইন ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে, রাজ্যপালকে যে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে অপসারিত করায় তা সমর্থিত হয়ে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটাও মেনে নিতে হল যে, সংখ্যালঘু দল দিয়ে শাসনব্যবস্থা চালান সংবিধানগত প্রথা বা বিধি নয়। তাই পশ্চিম বাংলায় এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসকে অ-কংগ্রেসী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত নিতে হল।

হায়দ্রাবাদের সিদ্ধান্তের মূলগত রাজনৈতিক পটভূমিটা স্পষ্ট হয়ে গেল বলেই দেখা দিল নূতন ধরনের রাজনৈতিক বিপর্যয়। হায়দ্রাবাদ সিদ্ধান্তের মূলকথা ছিল ক্ষমতায় ফিরে আসা, কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কে যে চিড় ধরেছিল তা মিলিয়ে নেওয়া। রাজনৈতিক জীবনে এবং বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতা দখলের কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্ষমতার প্রলোভন রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করতে এতটুকু দ্বিধা করল না। ফলে, পশ্চিম বাংলা থেকে শুরু করে, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে দলগত ঐক্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। পশ্চিম বাংলায় একাধিক রাজনৈতিক দল গজিয়ে উঠল এবং এই সব দল গঠনের উদ্যোক্তা যারা তারা কংগ্রেস কোয়ালিশন থেকে বাদ পড়েছিল বলেই কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জানান তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। এই দল ভাঙ্গার নীতি ও রীতি অ-কংগ্রেসী দলগুলোকেও রেহাই দেয়নি।

পশ্চিম বাংলায় একদিকে যেমন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে কিছু সদস্য গঠন করল আই-এন-ডি-এফ, তেমনি যুক্ত ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এল শ্রীজাহাঙ্গীর কবীরের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় দল। ঠিক তেমনিভাবে ডাঃ ঘোষ এবং শ্রীহুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে গঠিত হল পি-ডি-এফ; এবং অনেক পরে শ্রীকবীরের নেতৃত্বে লোক দল। এটা অবশ্য অনেক পরের কথা। কিন্তু এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল কংগ্রেসের শক্তি কমে যাবার ফলে। ডাঃ ঘোষের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে সরে দাঁড়াতে হল এবং রাজ্যপালের পক্ষে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করে নবপর্যায়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন সংগঠিত করা ছাড়া অন্য কোন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হল না। রাজ্যপালকে এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিতে হল যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে কংগ্রেস কোয়ালিশন দিয়ে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না।

অন্যান্য রাজ্যেও ঘটল এমনি রাজনৈতিক বিশৃংখলা। বিহারে কংগ্রেস শোষিত দলের সমঝোতা টিকল না এবং সে-সরকারের পতন ঘটল ঠিক একই কারণে। কংগ্রেস থেকে কিছু সদস্য বেরিয়ে এল কোয়ালিশনে বিরোধিতা করার জন্য। যারা বেরিয়ে এল, তারা কংগ্রেস-বিরোধীদের নিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করল; কিন্তু তা-ও টিকল না। কারণ, এখানেও দেখা দিল দলভাঙ্গার পালা। বিহারেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত সদস্যদের বাতিল করে নূতন পর্যায়ে নির্বাচনের আদেশ জারী করতে হল। এমনি ভাবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায় রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে হল কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোয়ালিশন করে কংগ্রেস-বিরোধী সরকারকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব না হতে পারে; কিন্তু রাজনৈতিক নিশ্চয়তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। দলভাঙ্গার খেলাটা একতরফা হয় না।

হয়ত এ-কারণেই কংগ্রেস নেতৃত্ব মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে ঠিক একই সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেছিল। মধ্যপ্রদেশে জনসংঘ প্রভৃতি দল সমর্থিত যে-সরকার চালু আছে তার আয়ুষ্কাল যে-কোন সময় শেষ হতে পারত; কারণ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ সিংহ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস প্রভাবিত শাসনব্যবস্থা চালু করতে মোটেই নারাজ ছিলেন। কিন্তু কোয়ালিশন সরকার সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হয়ত তাঁদের হয়ে গিয়েছে। তাই কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রস্তাবটা সাগ্রহে মেনে নিতে পারেনি। ঠিক সে-কারণেই শেষ চেষ্টা চলেছে হরিয়ানায়। শ্রীবংশীলালের মন্ত্রিসভা আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবু কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না (অন্ততঃপক্ষে '১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত)। অথচ পশ্চিম বাংলায় যখন অনুরূপভাবে ডাঃ ঘোষের নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্ট ছেড়ে-দেওয়া সদস্যদের রাজ্যপালের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন সিদ্ধান্ত নিতে এতটুকু দেরি হয়নি। কিন্তু শ্রীবংশীলালের মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে সে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা দেখা দিয়েছে, এই কারণে যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই ব্যর্থতাই কংগ্রেস রাজনীতির বর্তমান ইতিহাস। এই ব্যর্থতাই ফুটে উঠেছে কংগ্রেস রাজনীতির প্রতি পদক্ষেপে। চতুর্থ নির্বাচনে যে ব্যর্থতাকে মেনে নিতে হয়েছিল তা ঢেকে দেবার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বর মধ্যে যে অস্থিরতা এবং ব্যগ্রতা দেখা দিয়েছিল হয়ত তারই ফলে, বর্তমান অবস্থাকে টেনে আনতে হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস-বিরোধী সরকারের প্রতি অনুদার নীতি গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন পথও হয়ত আজ খোলা নেই কংগ্রেস নেতৃত্বর কাছে। কারণ, যে-কোন কারণেই হোক কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে ঠিক কংগ্রেসী রাজনীতির আওতায় রাখা সম্ভব নয়। সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে কেরলের দৃষ্টান্তে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের সঙ্গে মোকাবিলা করার কোন রাজনৈতিক হাতিয়ার ছিল না বলেই অস্বাভাবিক ক্ষমতা হাতে নিতে হয়েছিল অর্ডিনান্স জারী করে। কেরল সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি এবং কেন্দ্রের নির্দেশ উপেক্ষা করে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক পথটাই বেছে নিয়েছিলেন।

ফলে, যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখা দিল কেন্দ্র ও কেরলের মধ্যে, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হুমকি দিতে হয়েছিল এই বলে যে, প্রয়োজন হলে কেরলে হস্তক্ষেপ করা হবে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন জানতেন হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না; কারণ, ঝগড়াটা তখন রাজনৈতিক পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এই রাজনৈতিক সুযোগ নিয়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি কেরলে উগ্র-পন্থীদের উপদ্রব সম্বন্ধে। এই উপদ্রব ঘটে এমন একটা সময়ে যখন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ মেননের প্রচণ্ড বিতণ্ডা চলছে। শ্রীমেনন বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে এমন অরাজকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে, যাতে শেষ পর্যন্ত কেরলবাসীরা সংঘবদ্ধভাবে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ সরকারের প্রতিরোধ করতে বাধ্য হবে।

শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং দাবি জানিয়েছিলেন যে, এই বিবৃতি প্রত্যাহার করা হোক। শ্রীমেনন বক্তব্য প্রত্যাহার করেননি এবং ঠিক এমনি সময় শুরু হয় কেরলে ওয়েনাদ অঞ্চলের হাঙ্গামা। এই হাঙ্গামাকে উগ্রপন্থী কম্যুনিস্টদের কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। বর্তমান প্রসঙ্গে এটাই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী যে-কোন রাজ্য সরকার সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিযোগ এনে সরকারকে বিপন্ন করতে পারেন। সংবিধানের প্রশ্ন তোলা হয়েছে রাজ্যপালের সম্মেলনে; প্রশ্ন তোলা হয়েছে কেন্দ্রকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে সংবিধানকে বাঁচাবার জন্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তুলেছেন কথাটা। তাই প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যর্থতাকে আরও ক্ষমতা দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা করছে। এই নীতি কোন অবস্থাকে ডেকে আনবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। ১৯৬৯ সালেই হয়ত তা বোঝা যাবে; কারণ, মধ্যবর্তী নির্বাচন ফেব্রুয়ারী মাসে।

২৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে

উপন্যাসের শুরু বিদেশের এক বিমানবন্দরে—শেষ বোয়িং ৭০৭ বিমানে, যখন রাতের কলকাতাকে আকাশ থেকে ছবির মত দেখাচ্ছে।

॥ বোধোদয় ॥

সেই কোনকালে সুকুমার মতি বালক-বালিকাদের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়' রচনা করেছিলেন। তারপর এই এতদিনে নতুন যুগের নতুন বোধোদয় রচনা করলেন প্রতিভাবান লেখক **শংকর।**

আদর্শহীন এক সমাজের ইন্দ্রিয়সর্বস্ব অপরিতৃপ্ত মানুষদের যন্ত্রণার কাহিনী আশ্চর্য কুশলতায় তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণে বোধোদয় বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

● অপ্রকাশিত অন্তরঙ্গ পত্রগুচ্ছ—

রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ

● বুদ্ধদেব বসুর গল্প

অনুধারণীয়

● বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক-

সত্যজিৎ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, শ্রীপান্থ, নীললোহিত, অজয় কর, বাসু ভট্টাচার্য, সুজাতা, আরতি সেন, জ্যোতির্ময় দত্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল ঘোষ, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, জ্যোতির্ময় বসু রায়, সূত্রধার, জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অরুণ বাগচী, বিমল চক্রবর্তী, মুকুল দত্ত, পঙ্কজ গুপ্ত, আরাব, পুষ্পেন সরকার, দিলীপ দত্ত প্রভৃতি

অলঙ্করণে : পূর্ণেন্দু পত্রী, অলোক ধর, জগদীশ ধর, সুধীর মৈত্র, মদন সরকার, চণ্ডী লাহিড়ী।

২৬০ পৃষ্ঠা ॥ মূল্য : দু'টাকা

॥ রেজিস্ট্রি ডাকে : ২·৮৫ ॥

চন্দ্রগুপ্ত

অকারণ বাহাদুরি

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দুটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ চারদিন ধরে কৃষ্ণ সাগরে বেড়িয়ে এসেছে। সে সাগরকে অনেক সময় তুরস্কের হ্রদ বলে বর্ণনা করা হয়। আজও যেন সেটা ইস্তাম্বুলের খিড়কি পুকুর—সেখানে আর কারও যাওয়ার অধিকার নেই তুর্কী সরকারের অনুমতি ছাড়া। আসলে কিন্তু তা নয়, তা হতে পারে না। কৃষ্ণ সাগরের চারদিক ঘিরে তো আর তুর্কী এলাকা নেই। সে এলাকার গণ্ডি মোটের উপর কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে। আরও তিনটি দেশের মাটি ছুঁয়েছে কৃষ্ণ সাগরের জল। সে তিনটি হচ্ছে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া আর রুশিয়া। এককালে যখন তুর্কীর প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড তখন হয়তো কৃষ্ণসাগরকে বলা যেতে পারত তাদের খাসমহলের। এখন সেদিন গিয়েছে। কৃষ্ণ সাগরের ওপর তুর্কীদের একচ্ছত্র আধিপত্যের দাবি মেনে নিতে আর কেউ রাজি নয়। আর সোভিয়েট আমলে রাশিয়ান পরাক্রম বাড়ার পর সে কথা আর ওঠে না। মহাশক্তিধর রুশিয়াকেই এখন সকলে সমঝে চলে। কৃষ্ণ সাগরের আগম নিগম পথ তুর্কীর দখলে থাকলে কী হয়, ইচ্ছে করলেও রুশিয়াকে বাধা দেওয়ার সাধ্য তার নেই।

শুধু সাধ্য কেন, অধিকারও নেই। কৃষ্ণ সাগর বিশেষ কোনও দেশের এলাকাভুক্ত নয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সে সাগরে যাওয়া আসার অধিকার সব দেশেরই আছে। কোনও একটি দেশ গায়ের জোরে সে অধিকার নাকচ করে দিতে পারে না—একটা লড়াই না বাধিয়ে। ভূমধ্য সাগরে যেমন যে কোনও দেশের জাহাজ স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে—তার তীরে যে সব দেশ আছে তারা কেউ আপত্তি করতে পারে না—কৃষ্ণ সাগর আয়তনে অনেক ছোট হলেও সেখানেও তাই। তবে এ সাগরে লড়াই বাধলে তার আশপাশের দেশগুলির বিপদ খুব বেশী। সে অশুভ সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই অনেক কাল ধরে ও-সাগরে বাইরের জাহাজের আনাগোনা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে আসছে। সে নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২৪ সনের লোসান চুক্তিতে। তারই রদবদল হয় বারো বছর পরে মঁন্ত্রো বৈঠকে যা থেকে গড়ে উঠেছে মঁন্ত্রো কনভেনশান অর্থাৎ রেওয়াজ।

১৯২৩ সনে কৃষ্ণ সাগরের প্রণালী অঞ্চলে খবরদারি করবার জন্যে একটা আন্তর্জাতিক কমিশন বসানো হয়েছিল। সেটা তুলে দেওয়া হোলো মঁন্ত্রো বৈঠকের পর। সে এলাকায় সেনাবাহিনী রাখার যে অধিকার তুর্কীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেটা সে আবার ফিরে পেল। আর ঠিক হোলো কৃষ্ণ সাগর এলাকার বাইরের কোনও দেশ যদি সে দরিয়ায় জাহাজ পাঠাতে চায় তা হলে তুর্কীকে জানাতে হবে। একটা নির্দিষ্ট আয়তনের বেশী জাহাজ সেখানে পাঠানো চলবে না। চলবে না এমন যুদ্ধ জাহাজ পাঠানো যার কামানের নল আট ইঞ্চির বেশী চওড়া। এসব বিধিনিষেধ অবশ্য কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলের দেশগুলির জন্য নয়। তাদের যত খুশী জাহাজ কৃষ্ণ সাগরে যেতে আসতে পারে। তবে তাদেরও ২১দিন আগে তুর্কীকে জানাতে হবে, তাদের জাহাজগুলি চলবে জোট না বেঁধে এক এক করে সারি দিয়ে। রুশিয়াও এ নিয়মের আওতায় পড়ে এবং এতাবৎ সে নিয়ম মেনেও আসছে যদিও তার যে যুদ্ধ জাহাজের বহর তাদের প্রধান ঘাঁটি হোলো কৃষ্ণ সাগর উপকূলে ওডেসায়।

যে দুটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ ৯ ডিসেম্বর দার্দানেলিস হয়ে মারমারা সাগর পেরিয়ে বসপোরাস দিয়ে কৃষ্ণ সাগরে ঢুকেছিল চারদিনের কুচকাওয়াজ করার জন্যে তারা দস্তুর মাফিক তুর্কী সরকারের অনুমতি নিয়েছিল। তবুও রুশিয়া জাহাজ দুটির যাতায়াত নিয়ে খুব শোরগোল করেছে, আপত্তি জানিয়েছে বুলগেরিয়া। তাদের আপত্তির কারণ অবশ্য জাহাজ দুটি আমেরিকার বলে। তবে যে কারণটা তারা প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছে তা হচ্ছে মঁন্ত্রো রেওয়াজ লঙ্ঘন। যুদ্ধ জাহাজ দুটিতে যে কামান ছিল তা নাকি ওই রেওয়াজে বেঁধে দেওয়া সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমেরিকার নৌবাহিনীর তরফ থেকে সে আপত্তি খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে, ওই দুই জাহাজের আয়তন দশ হাজার টনের বেশী নয়, তাদের কোনওটিতেই এমন কামান নেই যার নল আট ইঞ্চির বেশী চওড়া। রুশিয়ার আপত্তি কিন্তু একেবারে তাচ্ছিল্য করবার মত নয়। জাহাজ দুটির কামান ছোট হলে কী হয় তাদের একটিতে ছিল ডুবো জাহাজ ধ্বংস করার রকেট ছোঁড়বার ক্ষেপণাস্ত্র, যার পোশাকী নাম হচ্ছে আসরক (asroc)। এগুলির আকার কিন্তু মঁন্ত্রো রেওয়াজের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অন্য জাহাজটিতে অবশ্য আসরক ছিল না। তবে পারমাণবিক অস্ত্র বসাবার ব্যবস্থা তাতেও ছিল।

দুটি জাহাজই কৃষ্ণ সাগরে দিব্যি টহল দিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে। আমেরিকা ভালমানুষ সেজে "কোনও বে-আইনী কাজ করিনি" বললে কী হয়, বেশ ঝুঁকি যে সে নিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। আর সে ঝুঁকি নেওয়ার যে কী সার্থকতা তা বোঝা শক্ত। মঁন্ত্রো রেওয়াজের বয়ান আক্ষরিক অর্থে নিলে অবশ্য আমেরিকা কোনো দোষ করেনি। যখন মঁন্ত্রো বৈঠক বসে তখন তো এসব মারণাস্ত্রের সৃষ্টি হয়নি। অভিধানের অর্থে ওগুলো তো আর কামান নয়, কাজেই সেগুলোর আট ইঞ্চির বেশী নল হলেও আইনে আটকায় না। তা হলেও আমেরিকা যে সে রেওয়াজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করেনি তা সুস্পষ্ট। এ অকারণ বাহাদুরি ছাড়া আর কিছু নয়। ভূমধ্যসাগরে মার্কিন নৌবহর যেমন আছে, তেমনই রয়েছে রুশ নৌবহর। দু পক্ষেরই সাবধান হয়ে চলা উচিত যাতে হঠাৎ সংঘর্ষ না বেধে যায়। ক্ষণিকের ভুলে এখানে একটা কুরুক্ষেত্র লেগে যেতে পারে। গেল বছরে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের সময় যত রুশ জাহাজ ভূমধ্যসাগরে ছিল এখন আর তত নেই। তাদের বেশীর ভাগই ঘাঁটিতে ফিরে গেছে, আরও যাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণ সাগরে নিজেদের দাপট দেখাবার আয়োজন না করলেই আমেরিকা ভালো করত বলে মনে হয়। সরাসরি লড়াইয়ে হয়তো রুশিয়া আসতো না, কিন্তু পিউবলোকে যেমন উত্তর কোরিয়া আটক করেছিল তার দরিয়ায় অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তেমন কিছু তো রুশিয়া করতে পারতো। তখন হয়তো আমেরিকাকে আর এক দফা নাকে খত দিতে হোতো। তাতে তার মর্যাদা থাকতো কোথায়? জনসন সাহেবের বরাত জোর যে তেমন কিছু অঘটন ঘটেনি।

"একটি অতীব সাধু সংকল্প"

কলকাতার একদা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—অধুনা জাতীয় গ্রন্থাগার বা ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে নাকি খণ্ডিত করবার পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে। এই মহৎ সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে যুক্তি খাড়া করানো হয়েছে: সেটিও প্রণিধানযোগ্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থাগার কেন একটি বিশেষ রাজ্যের রাজধানীতেই অধিষ্ঠিত থাকবে? হয় একে ভারতের [illegible] দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হোক, নইলে বিভিন্ন খণ্ডে এই উপমহাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। একমাত্র 'বাঙালী'রাই এই জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে [illegible] আহরণের সুযোগ পাবে, এমন তীব্র প্রাদেশিকতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হৃদয়বিদারক। বিশেষ করে সর্বভারতীয় ঐক্যের জন্য তাঁরা যখন এমন প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছেন (হিন্দী-প্রচারের অত্যুৎসাহই তার জ্বলন্ত উদাহরণ!), তখন এই সংকীর্ণতার একটা প্রতীকার অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু। পাকা যুক্তি—সব রকম বিতর্কের ঊর্ধ্বে। ভারতীয় বংশোদ্ভব এবং অধুনা আমেরিকান ডক্টর খোরানার নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর থেকেই আমাদের জীবতত্ত্ব অত্যন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছে। আশা করা যায়, এইভাবে চলতে থাকলে অচিরাৎ—অন্তত দিল্লী—নোবেল-লরিয়েটে একেবারে ছেয়ে যাবে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে অপসৃত বা বিকেন্দ্রিত করার এই মহান উদ্দেশ্য যদিচ সমস্ত বিতর্কের অতীত, তবু গোল্ডস্মিথের সেই অমর স্কুল-মাস্টাররা আছেন, তাঁরা এত সহজেই কূট তর্ক পরিহার করবেন কিনা সন্দেহ। তাঁরা পরিসংখ্যান দাবী করবেন। প্রশ্ন তুলবেন, মূল্যবান বিদেশী বই (যদিও সেগুলো ইম্পোর্টের সিংহভাগ, শুনেছি দিল্লীরই বরাদ্দ) কারা বেশি কেনেন, 'দেল্‌হিওয়ালাজ' বা 'ক্যালকাটান্‌স'? দিল্লীর ভি-আই-পিরা রাজকার্যের দুরূহ পরিশ্রমের পর মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বুদ্ধি-

জীবী বাঙালী (জাতীয় গ্রন্থাগারে শুধু কি বাঙালীরাই পড়েন?) পাঠকের চাইতে কি বেশি পঠনে মনোনিবেশ করতে পারবেন? এবং কলকাতা আর তার শহরতলীর জনসংখ্যা কি দিল্লীর চাইতেও কম?

অতি প্রাচীন জিনিস স্যার, রাজধানীতে কিছু নিয়ে যান

কিন্তু দিল্লী—দিল্লীই। পাঠক-সংখ্যা যেমনই হোক—অন্য শোভার্থেই জাতীয় গ্রন্থাগারের সেখানে স্থান পাওয়া উচিত। শ্বাসরুদ্ধ কলকাতার উন্নয়ন-পরিকল্পনা নির্মম উল্লাসে ছাঁটাই হতে পারে, কিন্তু রাজধানীতে অনাবশ্যক পার্কের জন্যেও অবারিত দাক্ষিণ্য। অতএব দিল্লীর সৌন্দর্য-বর্ধনে আপত্তি তোলা বাঙালীর পক্ষে নিছক সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যদি সমূলে এই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'কে উৎখাত করা না যায়, তাহলে অন্তত ছাঁটাই করতে বাধা নেই। প্রথমে "হিউম্যানিটিজ" এবং "টেকনিক্যাল স্টাডিজ" দিয়েই শুরু করা যাক না। তারপর একে একে ইতিহাস-অর্থনীতি-ভূগোল একটির পর একটি কর্তন করা যাবে এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যখন একটি শুষ্ক কাণ্ড মাত্র দাঁড়িয়ে থাকবে—তখন আশা করা যায়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভাঙবার পরে আর প্রতিবাদ করবার লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইভাবেই ধীর অথচ নিশ্চিত পদ্ধতিতে আধুনিক কেন্দ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞান একেবারে ভারতময় বিচ্ছুরিত—বিকীর্ণ হয়ে যাবে!

আমি এই সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু এমন উদার কর্মযোগ কেবল ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? আমি দিল্লীর চিন্তানায়কদের অবগতির জন্যে আরো কিঞ্চিৎ কর্মকাণ্ডের সন্ধান দিচ্ছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি-সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটির সংবাদ তাঁরা জানেন কি? মূল্যবান সংগ্রহের দিক থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরেই এর গৌরব। মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাঙালী' ছাত্রছাত্রীরাই এর সুযোগ পাবে, এমন অসাম্য হতেই পারে না। অতএব এর একটি নির্বাচিত অংশ অবিলম্বে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হোক—অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু কিছু বিতরণ করা

যাক। সোজা বাংলায়, এই পুঁজিবাদ চলবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই "আশুতোষ মিউজিয়ম"ও আর একটি টার্গেট হতে পারে। এর নির্বাচিত সংগ্রহশালাটিও বহু সরকারী যাদুঘরের চাইতে উঁচু দরের। এখানেও সেই প্রাদেশিকতা। এটিকেও পত্রপাঠ বিকেন্দ্রিত করা উচিত।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সম্পর্কেও বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। একেই তো কলকাতার মতো "বীভৎস" শহরে (বাইরের ট্যুরিস্টদের এটা সযত্নে বোঝানো হয়ে থাকে) ও-রকম একটা বাড়ি থাকাই আপত্তিকর, তারপর ওখানেও একটি দুর্লভ সংগ্রহশালা। বাড়িটা বোধ করি ভেঙে নিয়ে যাওয়া চলবে না, কিন্তু এগজিবিটগুলো নিশ্চয় স্থাবর নয়, ওদেরও সর্বভারতীয় প্রয়োজনে আহরণ করা চলে।

এসিয়াটিক সোসাইটির বইপত্র সম্পর্কেও

এই জনসমষ্টির কিয়দংশ যদি রাজধানীতে নিয়ে যান

গভীর ভাবে অনুধাবন করতে হবে। এখানেও "সীমাবদ্ধ জ্ঞানের" কাতর আর্তনাদ! আশা করা যায়, এই আর্তনাদ দূর করবার জন্যে দিল্লী সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

সব চাইতে আপত্তিকর শান্তিনিকেতনের "উত্তরায়ণ" এবং রবীন্দ্রনাথের স্মারক-সমৃদ্ধ সেই নতুন ভবনটি। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালীর নন, ভারতেরও নন, তিনি বিশ্ব-কবি—এবং দুরন্ত দিল্লী পর্যন্ত তাঁকে "গুরুদেব" বলে স্বীকার করে থাকে। এই গুরুদেবের সব স্মৃতি শুধু বাংলা দেশেই অবরুদ্ধ থাকবে—এতেও প্রাদেশিক নীচতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। আর বিবিধ যোগে শান্তিনিকেতন তো কেন্দ্রের অনেক কাছাকাছি, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর আগেই ওখানে হস্তক্ষেপ করা চলে। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার, কলাভবন অথবা চীনা ভবনেও কিঞ্চিৎ নেত্রপাত করা ভালো।

(বলা দরকার, এইসব বিকেন্দ্রীকরণে বোম্বাই ইত্যাদি জায়গায় চক্ষুদান করা চলবে না। কারণ "শিবসেনা" ইত্যাদি যা-ই থাক, ও-সব ক্ষেত্রে কোনো সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব নেই, সর্বভারতীয় ঐক্য একেবারে রসভারে টলমল করছে।)

স্বর্গত জহরলাল নেহেরু এক সময় আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। তিনি নেই—কিন্তু ডক্টর খোরানার প্রাক্তন স্বদেশবাসী আমরা—মস্তিষ্কের আকস্মিক ঊর্ধ্বায়নে আবার একটি পথিপ্রদর্শনে অগ্রসর হচ্ছি। আমি নিশ্চিত যে আমাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ ব্রিটিশ মিউজিয়ম আর টেট্ গ্যালারীকে বিকেন্দ্রিত করতে উৎসাহী হবে, মিউজি দ্যু লুভ্‌রকে খণ্ড খণ্ড করে সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, ফ্লোরেন্সের উফিজি গ্যালারী ইতালীর প্রান্তে প্রান্তে বিকীর্ণ হবে!

গাল খেয়ে মরল দ্বিতীয় যুদ্ধে নাৎসীরাই। এই মহৎ চেষ্টা তো তারাও করেছিল।

ফুলের ব্যবহার

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

তোমার দুহাতে ওই ফুলগুলি মানায় না খোকন। ওরা তো
প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, ওরা কাননভারে রোজ সাজতে এসে
বাবার ফুলদানিতে খুব ভাল থাকে; তবে
কেন পোষমানানো রঙের চরিত্রগুলি টুকরো ছিঁড়ে মেলাতে
চাইছো? বেদনাতো
গন্ধকেশরের যতো প্রজাপতি-পরিশ্রম লিখে রাখবেনা! তুমি কবে
ভুল চিনতে শিখবে খোকন? তোমার
পায়ের নিচের ক্রমশ তরুণ হয়ে ওঠা ছায়ার চীৎকার
শুনতে শুনতে তুমি কবে বলে উঠবে "আর ফুল নয়, ভুল নয়;"
বলে উঠবে "পিতা তুমি আমাকে সঠিক শেখাওনি বর্ণপরিচয়
ওই ফুলদানি দেখলেই আজ আমার কারাগার মনে পড়ে,
আমি প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যবর্তী পরিসরে
কয়েকটি সভ্য টেবিল, টেবিলে কয়েক কাপ চা ছাড়া এখন
অন্য কোনো নির্বাসন সাজাতে পারি না এই ঘরে।"

তোমার দুহাতে ওই ফুলগুলি কাঁদছে খোকন।

তোমার মরামুখ

আনন্দ বাগচী

আশ্চর্য তোমার মরামুখ দেখলাম। সারা রাত তুমুল বৃষ্টিতে
ভেজা, রঙ বদলানো শহরের সকালের বাড়ি :
ফ্যাকাশে দেওয়াল জুড়ে চোখ বোজা জানলা কিছু বলে
প্রথম চাক্ষুষ রোদে চলে গেল ট্র্যাম ট্যাক্সি
অবিমৃষ্য ডবল ডেকার;
শয্যাপুট মানুষের উচ্ছিষ্ট ব্যস্ততা,
ভাঙা আয়নার মত পথের কিনারে স্থির জল
বিষাক্ত ছবির টুকরো ধরে আছে বুকের ভিতর।
কাক ডাকছে ত্রিভঙ্গার বর্ণমালা ছুঁড়ে—
গোপন নারীর দিকে পাশ ফিরছে সমস্ত শহর;
কোথায় বেহালা-অলা তার ধূর্ত বুকের ধনুকে
দুপুরে কাঁদিয়ে ফেরে : আশ্চর্য তোমার মরামুখ।

হেড়োভাঙ্গা ডাকবাংলো : ৩১ ডিসেম্বর

অনিরুদ্ধ কর

নৌকোর লণ্ঠন দুলে ওঠে গূঢ় সঙ্কেতের মতো
কয়েকটি গাংচিল অনুসরণকারীর মতো এসেও হঠাৎ ফিরে গেল
লঞ্চের একটানা শব্দে জঙ্গল-জলের রাত্রি শিহরণে জাগে।
আমরা কোথায়? শুধু ইতিহাস থেকে কিছু দূরে।
যত দূর মনে পড়ে, যেন
আরণ্য নগ্নতা এসে আমাদের প্রশ্ন করেছিল :
আমরা কোথায়? যেন এক বছরের অভিজ্ঞতা
যাচাই করার জন্য,
যেন বহুপুরুষের উচ্ছিষ্ট শরীর তার শেষ আকর্ষণ
জেনে নিতে গিয়ে, যেন এই অরণ্যের পবিত্রতা
পরীক্ষা করার জন্য, নতুন বছর নারী ও নদীর মতো
সমুদ্রের কাছে এসেছিল—
যে-জন্য এখানে আসা!

কতোদিন বেঁচে থাকে সময় পৃথিবী?
রূপোপাটী মাছ আর হরিণ-হরিণী?
কলকাতার লক্ষ স্মৃতি নির্জন মোহানা?
সমস্ত উপেক্ষা করে পাঁচজন সঙ্গীর গলা প্রায়
উন্মত্ত নেশার ঘোরে একসঙ্গে বেজে উঠে বলে :
সমুদ্র কাছেই, ওহে
যে-জন্য এখানে আসা;
সমুদ্র কাছেই!

বাস না করলে যা হয় আর কি। বাড়িটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। সামনে দুটি রোয়াক আছে। বাঁ দিকেরটার অর্ধেক নেই। ভিতরেও ভাঙাচোরা কম হয়নি। একটা সিঁড়ির খানিকটা খসে গেছে। ইঁদারার ধারের চাতালটা ফেটে রয়েছে। ভিতরে রান্নাঘরের বারান্দাটার সংস্কার করতে হবে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে মৃগাঙ্কমোহন এক নজরে সব দেখে নিলেন; তারপর বুড়ো মালীকে ধমকাতে লাগলেন, 'এসব যদি তোরা না-ই দেখবি তাহলে আছিস কী জন্যে? মাসে মাসে এতগুলি করে যে টাকা দিই, কেন?

বনমালী পাকা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'বাবু, আমার তো কসুর নেই। আমি তো সবই দেখছি।'

মৃগাঙ্কবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ছাই দেখছিস। দেখলে কি এই দশা হত?'

স্বামীর কাণ্ডকারখানা ঘরের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলেন নীলিমা। তিনি এবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তারপরে স্বামীকে মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন, এসব কী হচ্ছে বলতো। এই তো সবে গাড়ি থেকে নামলে। এখনো বাক্স বিছানা পর্যন্ত ভালো করে খোলা হয়নি। তুমি বাড়ি বাড়ি করেই অস্থির।'

মৃগাঙ্কমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর মনের বিক্ষোভ আর উত্তেজনা চেপে হেসে বললেন, 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যদি তোমাকে টাকা রোজগার করতে হত আর সেই রোজগারের টাকায় বাড়ি তৈরি হত তাহলে তুমিও অস্থির হতে। তাহলে তোমারও মনে হত বাড়ির এক একখানি ইট বুকের এক একখানি পাঁজর।'

নীলিমা বললেন, 'ওরে বাবা, তোমার কলকাতার একটা তিনতলা বাড়ি, এখানে একটা বাড়ি, দুটো বাড়ির সবগুলি ইটকে বুকের পাঁজর বলে ভাবতে হলে আমি তো গেছি। অত পাঁজর মানুষের বুকে থাকে না কি?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তুমি হাসো আর যাই করো আমার বিষয়সম্পত্তি জিনিসপত্রের ওপর তোমার মমতা কম। বাড়িটার নাম বৃথাই 'নীলিমা' নিজের রেখেছি। তোমার মন এ বাড়ির ধারে কাছেও নেই।'

নীলিমা বললেন, 'তাতো ঠিকই। তুমি এক কাজ করো। এবার রাজমিস্ত্রীকে বলে আমার নামটা তোমার বাড়ির গা থেকে মুছে ফেলো।'

মৃগাঙ্কবাবু সেখান থেকে সরে এলেন। নীলিমার ওই এক কথা। রাগ হলেই কেবল 'মুছে ফেলো। মুছে ফেলো।' যেন মুছে ফেলা অতই সহজ।

মালীকে ডেকে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'রাজমিস্ত্রীকে খবর দাও। কী লাগবে না লাগবে হিসাব দিয়ে যাক। আমি কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করতে চাই।'

তারপর তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। নীলিমা ততক্ষণে বিছানাপত্র খুলে ফেলেছেন। বাক্স স্যুটকেস সব একদিকে সরিয়ে রেখেছেন। ঝেড়েপুছে গোছগাছ করে স্নান সেরে এবার রান্নার আয়োজন করছেন। সদ্য স্নাতা স্ত্রীকে দেখে একটু তৃপ্ত হলেন মৃগাঙ্কবাবু। কচিৎ কখনো আজকাল স্ত্রীর দিকে চোখ পড়ে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেখে আসছেন। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে সন্তান হয়নি বলে পঞ্চাশ পেরিয়েও নীলিমার শরীরের গড়ন বেশ আঁটসাঁট আছে। মেয়েদের তুলনায় একটু যেন বেশি শক্ত। কেমন যেন একটা পুরুষালি ধাঁচ এসে যাচ্ছে ক্রমে। সন্তান হয়নি বলেই কি? না কি একটা বয়সের পরে নারী আর পুরুষ সব সমান হয়ে যায়। তাদের সাদৃশ্য বাড়ে। সাদৃশ্য বাড়ে, কিন্তু মমতা বোধ বাড়ে কি? সখ্যতা বাড়ে কি? মৃগাঙ্কবাবুর অভিজ্ঞতা অন্তত সেই সাক্ষ্য দেয়না। যত দিন যাচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিভেদ-বৈষম্যও বেড়ে চলেছে। সন্তানহীনতাই কি এই খিটিমিটির কারণ? সে কথা বলা যায় না। বহু সন্তানের জনকজননীর মধ্যেও এই বিরোধ দেখেছেন মৃগাঙ্কবাবু। বহু বন্ধুবান্ধবের দাম্পত্য-জীবনের কথাই তাঁর জানা। তাঁদের মধ্যে শুধু দৈহিক যোগে যৌন মিলন আছে। আর কোন মিল নেই। উকিল মানুষ। নিজের হাতে বহু অসুখী দম্পতীর আইনসম্মত বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন মৃগাঙ্কবাবু। কিন্তু প্রচণ্ড রকমের ঝগড়া ঝাঁটি সত্ত্বেও নিজেদের মিলটা এখনো টিঁকে আছে। কতটুকু মিল কতখানি গোঁজামিল কে জানে?

মৃগাঙ্কবাবু স্ত্রীর দিকে একটু এগিয়ে গেলেন, 'সাহায্য করব? তরকারি কুটে দেব না কি বাটনা বাটতে বসব? কোথায় তোমার শিল নোড়া?'

নীলিমা মুখ না ফিরিয়েই বললেন 'থাক। আর অত সোহাগে দরকার নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বুঝতে পারেন নীলিমা রুষ্ট হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল রাঁধুনী পদ্মলতাকে সঙ্গে করে আনেন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু রাজি হন নি। দুটি প্রাণীর তো মাত্র অস্থায়ী সংসার। নিজেরাই রেঁধে বেড়ে নেওয়া যায়। তাতে রান্নার স্বাদও ভালো হয়। পদ্মকে আনলে মিছামিছি ওর যাতায়াতের ভাড়া গুণতে হত। ওই মাঝ বয়সী স্ত্রীলোকটি এমনিতেই বেশ মোটাসোটা। তারপর এই ঘাটশিলার জল হাওয়ায় ফুলে ঢোল হয়ে যেত। তার চেয়ে দুজনে এসেছেন, কোন ঝামেলা ঝক্কি নেই। মৃগাঙ্কবাবু স্ত্রীকে বলেছেন 'ভেবো না রান্নাটা যদি তোমার বোরিং লাগে আমাকে বোলো আমিও মাঝে মাঝে রাঁধব। ওখানে গিয়ে আমারও তো কোন কাজকর্ম থাকবে না। আদালতও থাকবে না মক্কেলও থাকবে না।'

নীলিমা বলেছিলেন, 'বড় আফশোস। ছুটির মধ্যে কলকাতার কোর্টগুলি যদি ওখানে তুলে নিয়ে যেতে পারতে বেশ হত।'

কথাটা মিথ্যা নয়। ছুটির দিনগুলিতে সবচেয়ে অস্বস্তি বোধ করেন মৃগাঙ্কমোহন। কী করে যে সময় কাটাবেন ভেবে পান না। তাস পাশার নেশা নেই। তাঁর মত বয়সেও কতজন মদ আর মেয়েমানুষে বিভোর হয়ে আছে। কিন্তু মৃগাঙ্কমোহন পান সিগারেটটি পর্যন্ত খান না। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে ছুঁয়েও দেখেন নি। ওসব দিকে তাঁর স্বাভাবিক বীতস্পৃহা আছে।

সমবয়সী সমব্যবসায়ী নৃপেন হালদার সেদিন বার লাইব্রেরীতে তাঁকে বলেছিলেন 'ভাই মৃগাঙ্ক, তোমার কার্পণ্য তোমাকে Other Vices থেকে বাঁচিয়েছে।'

মৃগাঙ্কবাবু হেসে বলেছিলেন, 'কী রকম?'

নৃপেনবাবু জবাব দিয়েছিলেন 'নিজের স্বভাব বদলাবার জন্যে আমি কত যে মাদুলী পরেছি দশ আঙুলে কত যে অষ্ট ধাতুর আংটি ধারণ করেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সংসারে সবচেয়ে বড় রক্ষা কবচ দেখছি কৃপণতা। তুমি সেই কবচ কুণ্ডল নিয়ে মায়ের পেট থেকে পড়েছ তোমার মার নেই।'

হালদার যত ঠাট্টাই করুক ওর সংসারের যে কী হাল তা মৃগাঙ্কবাবুর জানতে বাকি নেই। একপাল ছেলেমেয়ে। কোনটাই মানুষ হয়নি। নিজে এখনো মদ আর মেয়েমানুষ নিয়েই আছে। যা পায় দু হাতে খরচ করে আর মাসের শেষে যার তার কাছে ধার করে।

ওরা তাঁকে কৃপণ বলে বলুক, মৃগাঙ্কবাবু নিজেকে মিতব্যয়ী বলে জানেন। স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি বিত্ত-প্রতিপত্তি অমিতাচারে কাই বা থাকে। দু দিনেই সব ছারকার হয়ে যায়। যে যাই বলুক এই পৃথিবীকে সংযত সঞ্চয়ী পুরুষরাই দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করতে পারে।

নৃপেন হালদারের অভিজ্ঞতা অবশ্য আলাদা। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আচ্ছা বলতো মৃগাঙ্ক, মেয়েরা সবচেয়ে কোন পুরুষকে পছন্দ করে?'

মৃগাঙ্কবাবু বলেছিলেন, 'কী করে বলব বলো। আমি তো আর মেয়েদের মন নিয়ে কারবার করিনে।'

হালদার হেসে বলেছিলেন, 'তা ঠিক। তুমি সংসারে একটিমাত্র 'ম'কে চিনে রেখেছ। মক্কেল। কিন্তু ভাই আমিও মন নিয়ে কারবার করিনে। মন বলে যে কিছু আছে তা বিশ্বাস করিনে। আগাগোড়া ভিতরবাহির সব দেহ। আমি দেহাত্মবাদী। হ্যাঁ যা বলছিলাম। পুরুষের কোন বস্তুকে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে বল তো?'

'তুমিই বলো।'

নৃপেন হালদার বলেছিলেন 'রূপ স্বাস্থ্য বিদ্যা বুদ্ধি? উঁহু? বিত্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি? উঁহু। ওরা ভালোবাসে generosity, ঔদার্য। ওই স্বভাবকৃপণা সংকীর্ণমনা নারীজাত পুরুষের উদারতাকে যত ভালোবাসে তত আর কিছু ভালোবাসে না।'

অন্য স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মৃগাঙ্কবাবুর কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু নিজের স্ত্রীর বেলায় দেখেছেন হালদারের কথাটা খাঁটি কথা। নীলিমারও অভিযোগ 'তুমি টাকা কিছু চেন না। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাসো নিজের টাকাকে।'

মৃগাঙ্কবাবু বলতেন, 'টাকা যদি ভালোবাসি সেও তোমারই জন্যে। তুমি আমার চেয়ে জুনিয়র। আমার চেয়ে কয়েক বছর বেশি এই পৃথিবীতে থাকবে। তখন তোমার টাকার দরকার হবে। তোমাকে যদি ধনবতী করে রেখে যেতে পারি তুমি হয়তো জনবতীও হতে পারবে। অনেক যুবক তোমার দাস হয়ে থাকবে।'

নীলিমা বলেছিলেন, 'রাম রাম ওকথা বলতে তোমার মুখে আটকালো না? আমি যক্ষিণী হয়ে তোমার টাকার কড়ি পাহারা দেব তাই ভেবেছ বুঝি? জানো, টাকার জন্যে মানুষ খুন হয়? টাকার টানে আর কেউ আসুক না আসুক চোর ডাকাতরা এসে ঘাড় মটকায়?'

মৃগাঙ্কবাবু জানেন তাঁর ঘাড় খুব শক্ত। তা সহজে কেউ মটকাতে পারবে না। কোম্পানীর কত শেয়ার কিনেছেন, কোন কোম্পানীর কত শেয়ার কিনেছেন কোন ব্যবসায়ে কত টাকা খাটছে তা শুধু তিনিই জানেন। নীলিমাকে ওসব জানতে দেননি মৃগাঙ্কমোহন। মেয়েদের পেটে বাচ্চা তবু দশ মাস থাকে, কথা দশ মিনিটও থাকে না।

বিকেলের দিকে এক কাণ্ড ঘটল। ঘুরে ঘুরে বাড়ির আশেপাশের ফলন্ত আম আর পেয়ারা গাছগুলি দেখছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। বড় জংলা হয়ে আছে বাড়িটা। পরিষ্কার করতে হবে। ঢুকবার পথে ডাইনে বাঁয়ে হলদে আর গোলাপি রঙের মৌশুমী ফুল লাগিয়েছে বনমালী। ওগুলোরও ডালপালা একটু ছেঁটে দেওয়া দরকার। গাছগুলি পথের ওপর ট্রেসপাস করেছে।

একটি অপরিচিত যুবক এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

মৃগাঙ্কবাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী চাই?'

যুবকটি বলল, 'বাড়ি ভাড়া আছে?'

মৃগাঙ্কবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'আছে। কখানা ঘরের দরকার?'

যুবকটি বলল, 'একখানা হলেই হবে। আমরা দুজন আর কোলে বাচ্চা আছে একটি। বেশি ঘরের দরকার নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। হাত চেপে এসেছেন, একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারলেই তো ভালো। আমার যে দুখানা ঘর খালি আছে তা জোড়া ঘর। একখানা নিলে আরো একখানা নিতে হয়। দুখানা ঘরে দুটি ফ্যামিলিকে রাখবার জো নেই। তাতে প্রাইভেসি থাকে না।'

যুবকটি বলল, 'বেশ। দুখানাই নেব। কত ভাড়া?'

মৃগাঙ্কবাবু হেসে বললেন, 'আগে দেখে পছন্দ করুন। তারপরে তো ভাড়া। আপনি দেখলেই হবে? না মিসেসেরও দেখা দরকার?'

যুবকটি বলল, 'আমি দেখলেই হবে। ওকে ডঃ বাগচীর ডিসপেনসারিতে বসিয়ে রেখে এসেছি। তাঁর সঙ্গে আগে একটু জানাশোনা ছিল। তিনিই আপনার বাড়ির খোঁজ দিলেন।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, উনি আমার বন্ধুলোক। চলুন, ঘরগুলি দেখবেন চলুন।'

ঘর দেখে যুবকটির পছন্দ হল। পছন্দ না হবার কিছু নেই। পূব-দক্ষিণে বড় বড় জানালা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর।

কিন্তু ভাড়ার কথা শুনে সে একটু ভুরু কুঁচকালো।

'দুখানা ঘর ষাট টাকা?'

মৃগাঙ্কবাবু সবিনয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি ভেবেছিলাম একটু কম টম হবে।'

'আজ্ঞে না। আমি কমিয়েই বলেছি। এই চেঞ্জের সময় বাড়ি এখানে দুষ্প্রাপ্য। অনেক চেষ্টার এসেছে এবার। কয়েকমাস আগে থেকে যারা বুক করে রাখে তাদের কথা আলাদা। হঠাৎ এলে জায়গা পাওয়া শক্ত। আপনি নিজে বোধ হয় তা দেখেও এসেছেন।'

'না আমি তেমন একটা খুঁজিনি। দিন পনেরো থাকব। ভাড়াটা কি তার জন্যে কিছু—'

মৃগাঙ্কবাবু হেসে বললেন, 'আজ্ঞে না। আপনি দু সপ্তাহই থাকুন আর এক

সপ্তাহই থাকুন ভাড়া ওই এক মাসেরই দিতে হবে। এখানে এই নিয়ম।'

যুবকটি বলল, 'বেশ। কিন্তু ঘরে তো দেখছি কোন ফার্নিচার টার্নিচার নেই?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'সে জন্যে ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনি নিয়ে আসুন ও'দের। লাগেজ-টাগেজ বেশি আছে নাকি? লোক দেব সঙ্গে?'

যুবকটি বলল, 'না। লোকের দরকার নেই।'

সে বেরিয়ে গেলে নীলিমা স্বামীকে কাছে ডেকে বললেন, 'আবার কি হাঙ্গামা বাধাচ্ছ বলতো?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হাঙ্গামা আবার কোথায় দেখলে?'

নীলিমা বললেন, 'এইসব ভাড়াটে টাড়াটে আবার কেন আনছ? এদের নিয়ে কলকাতার বাড়িতে তো সারা বছর উপসর্গ লেগেই আছে। এখানে কটা দিনের জন্যে জুড়োতে এসেছি। এখানেও তুমি ভাড়াটে ভাড়াটে করে অস্থির।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'ঘরগুলি মিছিমিছি ফেলে রেখে কী হবে বলো? এখানে এই বাড়িঘর সারাতেও তো খরচ আছে। তার এগেনসটে কটা টাকা যদি আসেই লাভ ছাড়া লোকসান তো নেই।'

একটু চুপ করে থেকে মৃগাঙ্কবাবু হাসলেন, 'তাছাড়া একা একা মুখ বুজে থাকবে। ওরা এলে তোমার কথা বলার লোক হবে।'

নীলিমা বললেন, 'কথা বলার জন্যে তো তুমিই আছ।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমি? আমি তো এখন শুধু তোমার ঝগড়ার সাথী। আমরা এখন সবসময়েই দুজনে দুই পক্ষের উকিল। আমি যদি আসামী পক্ষের তুমি ফরিয়াদী পক্ষের। আর আমি যদি ফরিয়াদী পক্ষের তুমি আসামীর দলে।'

নীলিমা বললেন, 'দলাদলি না করলেই তো পার।'

মৃগাঙ্কবাবু ভাবেন তিনি কি আর সাধ করে দলাদলি করেন? ঝগড়াঝাঁটি বিরোধ বিসংবাদ তাঁরই কি ভালো লাগে? ছেলে নেই, মেয়ে নেই, পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন। মৃগাঙ্কবাবুরও ইচ্ছা হয় স্ত্রীর সঙ্গে এক মতের এক পথের পথিক হতে। কিন্তু নীলিমা যেন তাঁর কিছুই ভালো দেখতে পান না। স্বামীর চরিত্রের কোন গুণই যেন তাঁর চোখে পড়ে না। মৃগাঙ্ক-বাবুর মনে হয় প্রেমের একটা বড় শর্ত পরস্পরের গুণে গ্রহণ এমন কি গুণকীর্তন। কিন্তু স্ত্রীর কণ্ঠে সেই প্রশংসার বাণী শুনতে পান না মৃগাঙ্কবাবু। স্ত্রীর চোখে মুগ্ধতার দৃষ্টি দেখতে পান না। দশজনে যা বলে নীলিমাও যেন কখনো সরবে কখনো নীরবে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করেন, 'তুমি হাড়কিপটে, তুমি স্বার্থপর। তুমি শুধু নিজেকেই ভালোবাসো।'

মৃগাঙ্কবাবুর বলতে ইচ্ছা হয়, 'আর কাউকে না হোক, আমি অন্তত তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমি শাড়িগয়না প্রচুর দিয়েছি এই বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি সব তোমার জন্যে। অভাব শুধু সন্তানের। সে কি আমিই দিতে পারিনি, না তুমিই নিতে পারনি তার শেষ বিচার এখনো হয়নি। ডাক্তাররা বলেছেন এ ব্যাপারে তুমিও নির্দোষ, আমিও নির্দোষ। তোমার হয়তো মনে মনে সন্দেহ, যেহেতু ভিজিটের টাকাটা তারা আমার কাছ থেকে নিয়েছে, তারা আমার পক্ষ টেনেই কথা বলে। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। বিজ্ঞান নিরপেক্ষ।'

খানিক বাদে ওরা এসে হাজির। স্বাস্থ্যবান যুবক। এক হাতে হ্যাজাক লণ্ঠন আর এক হাতে স্যুটকেস। পাশে পাশে ছিপছিপে সুশ্রী তরুণী স্ত্রী। কোলে শিশু পুত্র। পিছনে বাক্স বিছানা মাথায় কুলী।

মৃগাঙ্কবাবু নিজেই এগিয়ে এলেন। কুলীর মাথা থেকে মাল নামাতে সাহায্য করলেন।

যুবকটি বলল, 'আহা, আপনি কেন অত কষ্ট করছেন?'

মালপত্র নামানো হলে কুলীকে যুবকটি

বিদায় করে দিতে যাচ্ছিল, মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'ওকে ছেড়ে দেবেন না। ফার্নিচার টার্নিচারগুলি আনতে হবে তো?'

যুবকটি বলল, 'সেগুলি কোথায়?'

'আমার স্টোর রুমে আছে।'

ভিতরের দিকের একখানা ঘরে খানকয়েক তক্তাপোশ একটির পর একটি তোলা রয়েছে।

যুবকটি বলল, 'এই আপনার ফার্নিচার?'

'আজ্ঞে হাঁ। এর চেয়ে বেশি কী দরকার। এইরকম তক্তাপোশে শুয়ে আমি জীবনের পাঁচিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছি।'

দুখানা তক্তাপোশ ধরাধরি করে এ ঘর থেকে ওঘরে নেওয়া হল। মালী খানিকটা সাহায্য করল। কুলীকে বিদায় করে দিলে যুবক। বাড়তি কাজের জন্যে সে তার চার আনা বেশি চায়। মৃগাঙ্কবাবু তাকে কড়া ধমক দিলেন। তারপর যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কই, ওকে পয়সা দিয়ে দিন।'

একটু পরেই নিজের ঘরে নিয়ে [illegible] [illegible] সাদা কাগজ নিয়ে এসে একটু হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। [illegible] একটু [illegible] ভালো। [illegible] করে থাকি।'

যুবকটি পকেট থেকে ষাটটি টাকা বের করে তাঁর হাতে দিল।

মৃগাঙ্কবাবু একটু হেসে বললেন, 'উঁহু, আপনার নামটি যেন কী?'

'সলিল দত্ত।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আপনার যে আরো ছটি টাকা লাগবে সলিলবাবু।'

'আরো ছটাকা? কেন বলুন তো?'

মৃগাঙ্কবাবু হাসি মুখেই বললেন, 'ওই তক্তাপোশের জন্যে। প্রতি তক্তাপোশ তিন-টাকা করে ধরেছি।'

সলিল বিস্ময়াপন্ন হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বলল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'এর মধ্যে ঠাট্টার তো কিছু নেই। ইচ্ছা করলে তক্তাপোশ দুখানা অমনিতেই আপনাকে আমি ব্যবহার করতে দিতে পারি। কিন্তু আপনিই বা অনর্থক আমার ফেভার নিতে যাবেন কেন? আমিই বা আপনাকে কেন অবলিগেশনে বেঁধে রাখব? এখানে কাঠ পাওয়া যায় না, বহু দূর থেকে কাঠ আনাতে হয়েছে। মিস্ত্রীর মজুরী দারুণ চড়া? কোন জিনিসটা সংসারে বিনা পয়সায় হয় মশাই?'

সলিল বলল, 'তাতো বটেই।' তারপর ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'বীণা! বীণা! আমার কাছে খুচরো টাকা নেই। তুমি ছটা টাকা বের করে দাও তো?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'এখন না থাকে থাকনা। পরেই দেবেন না হয়।'

সলিল বলল, 'না না। এখনই নিয়ে যান।'

বীণা এসে টাকাটা সলিলের হাতে দিল। সলিল দিল মৃগাঙ্কবাবুর হাতে। তিনি দশ টাকার নোটগুলি যেমন গুণে নিয়ে-ছিলেন এক টাকার নোট কখানাও তেমনি গুণে নিলেন। তারপর দীর্ঘাঙ্গী তরুণী বধূটির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ঘর পছন্দ হয়েছে তো?'

বীণা হেসে বলল, 'হাঁ।'

দীর্ঘাঙ্গী ফর্সা মেয়েটি দেখলেই বোঝা যায় অল্প দিন বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে ছেলের মাও হয়েছে। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি বাপ-মা হতে চায় না। ভাবলেন মৃগাঙ্কবাবু। সেদিক থেকে এরা একটু সেকেলে।

ঘরে ঢুকতেই স্ত্রীর সামনে পড়ে গেলেন মৃগাঙ্কমোহন।

নীলিমা বললেন, 'আচ্ছা তুমি কী!'

মৃগাঙ্কবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

'তুমি আবার ওদের কাছ থেকে তক্তাপোশের ভাড়াটাও নিলে?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তাতে কী হয়েছে বলতো? তক্তাপোশের ভাড়া কি ভাড়াটেদের কাছ থেকে আমি এই প্রথম নিচ্ছি? প্রতি বছরই তো নিয়ে থাকি।'

নীলিমা বললেন, 'এবার না নিলেই পারতে। ওই বাচ্চা বাচ্চা দুটি ছেলে-মেয়ে—'

মৃগাঙ্কবাবু হাসলেন, 'বাচ্চারা একেবারে টিটিম্বুরে! এখন আবার ওরা বাচ্চা কিসের? ওদের নিজেদেরই তো বাচ্চা হয়ে গেছে।'

নীলিমা বললেন, 'হলেই বা। আমাদের ছেলেমেয়ে হলে ওই বয়সাই তো হত। ওই কটা টাকা তুমি ছেড়ে দিলেই পারতে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা পারতাম না। পারলেই বা তা বলব কেন? দয়া করব অন্ধ-আতুরকে। শক্ত-সমর্থ জোয়ান পুরুষের সঙ্গে পুরুষের মত ব্যবহার করলেই তাকে সবচেয়ে বড় সম্মান দেখানো হয় তা জানো?'

নীলিমা আর কোন কথা বললেন না। কিন্তু তাঁর তাকাবার ভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি স্বামীর যুক্তি মেনে নেননি।

পরদিন থেকে বাড়ি মেরামতের কাজে লেগে গেলেন মৃগাঙ্কবাবু। লোকজন মিস্ত্রী খাটানোর তাঁর ভারি আনন্দ। তিনি তাদের সামনে বসে থেকে কাজ দেখেন। পাশে পাশে ঘুরে ঘুরে তাদের দিয়ে কাজ করান। দরকার হলে নিজে হাত লাগিয়ে তাদের উৎসাহ দেন। চুরি করাটা সাধারণ মানুষের স্বভাব। কারো লোভ টাকা-পয়সার দিকে। কেউ চুরি করে কাজ, কেউ চুরি করে সময়। সবই অর্থের নামান্তর কি রূপান্তর। এই অর্থের লোভ কার না আছে? মৃগাঙ্কবাবু ভাবেন, লোভী কি শুধু তিনিই? কেউ দু' হাতে জমিয়ে সুখ পায়, কেউ অপরিণামদর্শীর মত দু' হাতে খরচ করে সুখ পায়। আসলে যে যা করে নিজের জন্যেই করে। শুধু নিজের পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্যে। নিজের গণ্ডীর বাইরে কেই বা কবে যেতে পেরেছে? স্বার্থপর সবাই। তবু মানুষ কথাটাকে [illegible] হিসাবে ব্যবহার করে। আর একজনের মুখ থেকে কথাটা শুনলে কান জ্বালা করে। মনে রাগ হয় দুঃখ হয়। সবচেয়ে ভালো অবিচল থাকা। যে তোমাকে স্বার্থপর বলছে তার জন্যে কথা খরচ না করে শুধু মৃদু হাস্যে বুঝিয়ে দেওয়া, 'তুমিও তাই।'

ভোরবেলায় বেড়িয়ে এসে বারান্দায় চেয়ারখানা পেতে চা খাচ্ছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ইঁদারা থেকে সলিল জল তুলছে। তুলছে তুলুক। জল না তুললে খাবে কি? মুখ ধোবে কী দিয়ে? কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর বালতিতে কেন? একটা বালতিও কি ওর জোটেনি?

চায়ের কাপ শেষ করে উঠোনে নেমে ইঁদারার কাছে এগিয়ে গেলেন।

'এই যে সলিলবাবু? জল তুলছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ মৃগাঙ্কবাবু। আপনার ইঁদারাটা খুব ভালো। বেশ জল আছে।'

মৃগাঙ্কবাবু মনে মনে হাসলেন। ছোকরা ভেবেছে এতেই তিনি জল হয়ে যাবেন।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'খুব খরচপত্র করে করিয়েছিলাম। আশেপাশে আর কারো বাড়িতে এত গভীর ইঁদারা আর পাবেন না। কিন্তু একটা কথা। আপনার নিজের দড়ি বালতি কি নেই?'

সলিল বলল, 'বালতি আছে। কিন্তু দড়ি নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু হেসে বললেন, 'দড়ির জন্যে ভাববেন না। আমি সে ব্যবস্থা করে দেব। বাজারে আমার চেনা দোকান আছে। আপনি সেখান থেকে দড়ি কিনে নিয়ে আসবেন। আমার নাম করলে একটু সস্তাতেই পাবেন। যদি নিজের যেতে ইচ্ছা না হয় আমার লোক আছে। দড়ি আপনাকে এনে দেবে।'

সলিল বলল, 'বেশ তো। দড়ি-বালতির ব্যবস্থা করা যাবে। আমি ভেবেছিলাম ক'টা দিনই বা আছি। তার জন্যে আবার আলাদা হাঙ্গামা করব। তার চেয়ে দড়ি-বালতির জন্যে আপনাকে কিছু চার্জ ধরে দিলেই হবে।'

মৃগাঙ্কবাবু হঠাৎ কোন কথা বলতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টি সহ্য করবার ক্ষমতা কি ওই ছোঁড়ার আছে? সে চোরের মত জলের বালতি হাতে তাঁর চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

তবু মৃগাঙ্কবাবুর আক্রোশ সঙ্গে সঙ্গে গেল না। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, 'জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই? মৃগাঙ্ক মল্লিককে তুমি চেন না। আজকালকার ভাড়াটেরা ঘাড় বাঁকিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে। তাদের উচ্ছেদ করা শক্ত। তবু আমার কলকাতার বাড়ির পাঁচ ঘর ভাড়াটে আমার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। আমি কারো বেআদবি মাফ করিনে। আমাকে চটিয়ে কেউ আমার বাড়িতে বাস করতে পারে না। আদালতের রায় যার পক্ষেই যাক শেষ পর্যন্ত বেয়াড়া ভাড়াটে উঠে যেতে বাধ্য হয়। কত রুই-কাতলা দেখলাম তুমি তো চুনোপুঁটি।

দুপুরের আগেই অবশ্য সলিল আলাদা দড়ি-বালতি নিয়ে এল। দেখে মৃগাঙ্কবাবু খুশি হলেন। মুখে যত ফটফট করুক আসলে তাঁকে ভয় করে। তার কথা অমান্য করবার সাহস ছোঁড়ার নেই।

কিন্তু মানুষের সব দিন তো সমান যায়ই না একদিনেরই বিভিন্ন প্রহর বিভিন্ন-ভাবে কাটে।

দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। কোর্ট খোলা থাকলে ঘুমের কোন কথাই ওঠে না। কিন্তু ছুটির দিনে খাওয়াদাওয়ার পরে কেমন যেন ঝিমুনি আসে। খানিকক্ষণ গড়িয়েও নেন।

আজ ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের আতাগাছগুলির দিকে তাকাতেই তাঁর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বড় বড় আতাগুলির একটিও নেই। সবগুলি গাছ কে যেন নির্মূল করে নিয়ে গেছে। মূলে অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু ডালপালা-গুলি ক্ষতবিক্ষত। আর ফলের মধ্যে যেগুলি নিতান্তই কচি শুধু সেইগুলিই রক্ষা পেয়েছে। পাকাগুলি তো গেছেই ডাসা-গুলি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন।

মালী আছে লোকজন আছে তা সত্ত্বেও কীভাবে চোর যে এই সর্বনাশ করে গেল মৃগাঙ্কবাবু তা বুঝতে পারলেন না।

চোখের সামনে মালীকে দেখতে পেলেন না। ঘরে গিয়ে স্ত্রীর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বই পড়ছিলেন। হয়তো ধর্মগ্রন্থ, হয়তো ভ্রমণকাহিনী, হয়তো নাটক-নভেল। স্ত্রীর পড়াশনো সম্বন্ধে মৃগাঙ্কবাবুর বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। বরং এক ধরনের বিরাগ বিরক্তি আছে। মৃগাঙ্ক-বাবুর মনে হয় ধর্ম আর সাহিত্য নীলিমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। নীলিমা আজকাল আর বাপের বাড়ি যান না, কিন্তু যখন-তখন পূজোর ঘরে গিয়ে পালিয়ে থাকেন, যে কোন বই খুলে তার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন।

মৃগাঙ্কবাবুর মনে হয় বেশ এক মজার পালাবার জায়গা নিজের জন্যে খুঁজে নিয়েছেন নীলিমা। যখন তখন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেন। একই ছাদের নীচে থেকেও তিনি যেন আলাদা জগতে বাস করেন। অথচ এই স্ত্রীই তাঁকে মাঝে মাঝে খোঁটা দেন, 'তুমি আছো তোমার শামুকের খোলের মধ্যে।'

মৃগাঙ্কবাবুর মনে হয়, 'আমি যদি শামুকের খোলের মধ্যে থাকি, তুমিও তো তাই। আমরা সবাই এক-একটি শামুক। একই পুকুরের মধ্যে থাকি। কিন্তু কারো ছোঁয়া কারো গায়ে লাগে না। সব শক্ত চাড়ায় ঢেকে যায়।'

উঁচু গলায় স্ত্রীর ধ্যানভঙ্গ করলেন মৃগাঙ্কবাবু, 'খুব তো বই পড়ছ? এদিকে কী হয়ে গেছে জানো?'

নীলিমা বই থেকে চোখ তুললেন। তাঁর পরনে লালপেড়ে সাদা খোলের শাড়ি। মাথায় আঁচল নেই। পিঠ ভরে কালো চুলের রাশ ছড়ানো। যেন জগদ্ধাত্রী হয়ে বসে আছেন।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আতা গাছে একটিও আতা নেই।'

নীলিমা হেসে বললেন, 'আছে গো আছে। সে জন্যে তোমার পৃথিবী আঁধার দেখতে হবে না। ওই দেখ।'

খাটের তলাটা দেখিয়ে দিলেন নীলিমা। মৃগাঙ্কবাবু উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সত্যি খাটের তলায় কতকগুলি আতা আছে। কিন্তু বড়গুলি কোথায়? পাকাগুলি কোথায়?

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'এই কি সব?'

নীলিমা বললেন, 'সব কেন হবে? কতকগুলি সলিল নিয়ে গেছে। ওই তো পেড়েছিল।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা বুঝেছি।'

নীলিমা বললেন, 'আর ওর এক বন্ধুও এসেছিল। সেও কিছু খেয়ে গেছে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বেশ করেছো আর কাউকে ডেকে আনতে পারলে না? নিজে পায় না শঙ্করাকে ডাকে। পরের ধনে পোদ্দারী।'

নীলিমা একটুকাল স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, 'শোন। তোমাকে একটা কথা বলি? বোসো এখানে।'

মৃগাঙ্কবাবু পরম অনুগতের মত স্ত্রীর পাশে বসে পড়লেন। বললেন, 'গুরুমা হয়েছ? কানে মন্ত্র দেবে?'

নীলিমা বললেন, 'তা আর দিতে পারলাম কই? শোন, এত যে জিনিস-জিনিস কর, জিনিস কি সঙ্গে যাবে?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'এত যে মানুষ মানুষ কর মানুষই কি তোমার সঙ্গে যাবে? কিছুই সঙ্গে যায় না, বস্তুও না, মানুষও না। তার ঈর্ষা দ্বেষ, ঘৃণা ভালোবাসা কিছু না। তবু এই সংসারে যে যতদিন থাকে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নিয়ে জড়িয়ে থাকে। কেউ মানুষ ভালোবাসে, কেউ জিনিসপত্র ভালোবাসে। কেউ বা মদভাঙ খেয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। তাও দেখেছি।'

একটু চুপ করে রইলেন মৃগাঙ্কবাবু। তারপর হঠাৎ বললেন, 'কিন্তু মানুষের চেয়ে জিনিসপত্তর ভালোবাসা অনেক ভালো। তা জানো?'

'কেন বলতো?'

'ধর আমার এই টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি আমি যতদিন থাকব ওরাও ততদিন থাকবে। ওরা কেউ ঘর থেকে চলে যাবে না। কি ঘরের মধ্যে থেকেও ভিতরে ভিতরে বদলে যাবে না। ওই যে আমাদের নৃপেন হালদার ওঁর জীবনে কম মেয়ে-মানুষ ভালোবেসেছে? কিন্তু একজনকেও কি রাখতে পারল?

নীলিমা বলল, 'সেই কথা? জিজ্ঞেস করে দেখ, তিনিও তাদের মানুষজ্ঞানে ভালোবেসেছেন কি না।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, যত নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই হোক, থাকে না, কিছুই থাকে না। একমাত্র বস্তুই থাকে। যে সব বস্তু বেশিদিন থাকে না তারাও যতদিন থাকে পরম আপন হয়ে থাকে। গায়ের জামাটা গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। হাতের ঘড়িটা হাতের সঙ্গে বাঁধা। যে কোন বিবাহবন্ধনের চেয়ে এ বন্ধন দৃঢ়তর। যে কোন বন্ধুত্বের বন্ধনের চেয়ে টেঁকসই।

ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন না মৃগাঙ্ক-বাবু। মানুষের ভালোবাসায় কোন আসক্তিও বোধ করেন না। কত ভালোবাসার কাঙালকেই না তিনি এই জীবনে দেখলেন। নৃপেন হালদার তো স্পষ্ট জবানবন্দী দেয়, 'ভাই, তুমি বেশ আছো। আমি একদিন যদি কোন মেয়ের মুখমদের ছিটা না পাই মনে হয় প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। জল তেষ্টায় মরুভূমির মধ্যে শুকিয়ে মারা গেলাম।'

আবার অন্যরকমের আসক্তিও দেখেছেন মৃগাঙ্কবাবু। সমবয়সীদের মধ্যে কতজনে যে সঙ্গ সঙ্গ করে পাগল তার আর ঠিক নেই। তাদের নারীপুরুষ ভেদ নেই, ছেলেবুড়ো জ্ঞান নেই একজন কাউকে চাই-ই চাই। এরই নাম সঙ্গের নেশা। মধুর অভাবে গুড়, সিগারেটের অভাবে বিড়ি, মদের অভাবে তাড়ি। সমবয়সীদের মধ্যে অনেককেই দেখেছেন মৃগাঙ্কবাবু, সঙ্গের অভাবে কষ্ট পায়। তারা পরিবারের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ, ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে থেকেও নির্বান্ধব। তাদের তিনি পরামর্শ দেন, 'তোমরা আর একটু বিষয়ী হও। সবাই যে বাড়িগাড়ি করবে তার কোন কথা নেই। সবাই তা পারেও না। যার যেটুকু সাধ্য সেটুকু করো। নিজের কাজকে ভালোবাসো। পেশাকে ভালোবাসো। সেই ভালোবাসা যেন পোশাকী ভালোবাসা না হয়। সংসারে যে যত নিষ্কর্মা সে তত নিঃসঙ্গ।'

মানুষের ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন না মৃগাঙ্কবাবু কিন্তু চোখের সামনে একটি ভালোবাসার মূর্তিকে ক'দিন ধরে রোজই দেখতে পান। হ্যাঁ লোকে একে ভালো-বাসাই বলে। স্বামী প্রেম, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি। বউটি এক সঙ্গে সবই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় রোজই ওরা ঘুরতে বেরোয়। আজ দেওঘর কাল শিমুলতলা, পরশু মধুপুর। যেদিন কোথাও যায় না, মৃগাঙ্কবাবুর এই বাড়ির মধ্যেই ওরা ঘুর ঘুর করে। যেন এই বাড়িটাকেই ওরা মধুপুর করে তুলেছে। শুধু কি বাড়ি? পুরো দুনিয়াটাই যেন ওদের কাছে তাই। মধুপুর। মাঝে মাঝে একটু বিস্মিত হন মৃগাঙ্কবাবু। কখনো কখনো একটু ঈর্ষার উদ্রেকও হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ওরা কোন এমন মধু খুঁজে পেয়েছে ওরাই জানে। নিজে কি এই মধুর স্বাদ কখনো জীবনে পাননি? পিছনের দিকে তাকান মৃগাঙ্কবাবু। বেশি দূর দেখতে পান না। সমস্ত যৌবনস্মৃতি যেন এরই মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে। পেসকার নন্দ বাঁড়ুয্যে বলে ভালো। মৃগাঙ্কবাবুরই সমবয়সী। এক সময় সহপাঠীও ছিল। নন্দ বলে, 'মল্লিক কবে যে গরম ভাতে ঘি খেয়েছিলাম তার গন্ধ কি আর আঙুলে লেগে আছে? বাকি জীবনটা পান্তাপরশুতি খেয়েই কাটল।'

যৌবন কি সেই গরম ভাতে ঘি? বড় ক্ষণস্থায়ী বড় ক্ষীণায়ু। সেইজন্যেই কি ওই সলিল আর রীণা আঁজলাভরে সমুদ্র পান করতে চায়?

রীণা মৃগাঙ্কবাবুরই বারান্দা দিয়ে হাঁটে আর কোলের ছেলেকে পিঠ চাপড়ে ঘুমপাড়ায় আর গুনগুন করে। মৃগাঙ্কবাবু মিস্ত্রী খাটাতে খাটাতে কি বাগানের ঘাস পরিষ্কার করতে করতে সেই গান শোনেন। তখন কে বলবে ওই রীণা

গোপাল-জননী যশোদা ছাড়া আর কেউ?

কিন্তু খানিকবাদেই ওর বেশ বদলে যায়। স্বামীর সঙ্গে কী ফষ্টিনষ্টিই না করে মেয়েটা। ঘরের মধ্যেও করে। ঘরের বাইরেও করে। মৃগাঙ্কবাবুর মত ষাট বছরের একজন বয়স্ক লোক এই বাড়িতেই আছেন তা যেন ওরা গ্রাহ্যও করে না। দু'খানা মাত্র ঘর ওরা ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় মৃগাঙ্কবাবুর পুরো বাড়িটাই ওদের বাগানবাড়ি, প্রমোদকুঞ্জ। যুবকটি উৎসাহে আহ্লাদে যেন একেবারে খোকা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মৃগাঙ্কবাবুর পেয়ারাগাছে ওঠে। ডালপালা ভেঙে একশেষ করে। মৃগাঙ্কবাবু মনে মনে কামনা করেন ওর হাত-পা ভাঙুক। অন্তত ছ' মাস যেন শয্যাশায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায় না। আর বউটা যেন এক বনহরিণী। পিঠে বেণী দুলিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে কখনো স্বামীর পিছনে ছুটেছে, কখনো স্বামীকে পিছনে পিছনে ছোটাচ্ছে। আতা নিয়ে পেয়ারা নিয়ে কাড়াকাড়ি। একদিন তো চোখে পড়ল একজনের মুখের ফল আর একজন কামড়ে কেড়ে নিচ্ছে।

ওদের একজন বন্ধুও আছে। তাকেও মাঝে মাঝে দেখেন মৃগাঙ্কবাবু। রোগা ছিপছিপে চেহারা। ভারি ধূর্ত। তার সঙ্গেও বউটির খুব ভাব। পঙ্কজ না কী যেন একটা নাম। ছেনালিপণাটা তার সঙ্গে যেন আরো বেশি। ছুটোছুটি লুটোপুটি হাসাহাসি সবই চলে। আইন-সঙ্গত ওদের ওই প্রেম যদি বা সওয়া যায়, বেআইনী পীরিত দুঃসহ লাগে মৃগাঙ্কবাবুর।

একদিন ওই পঙ্কজের সঙ্গেই এক চোট হয়ে গেল তাঁর। ইঁদারা থেকে জল তুলছে তো তুলছেই। কয়েক বালতি জল বন্ধুপত্নীর গায়ে ঢেলে দিয়েছে। সেই জলকেলির পরও কেলি শেষ হয়নি। ছোকরা আরো জল তুলছে।

মৃগাঙ্কবাবু গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন, 'অত জল দিয়ে কী হবে?'

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলল, 'চান করব।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'চান করতে কত জল লাগে?'

পঙ্কজ বলল, 'সবাইর সমান লাগে না। কারো কারো এক বালতিতেই হয়।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আর কারো কারো বুঝি একশ বালতির দরকার? এখানে ওসব চলবে না।'

পঙ্কজ আরো দু এক বালতি জল তুলে স্নান সেরে চলে গেল।

মৃগাঙ্কবাবু গেলেন পিছনে পিছনে। ভাবলেন সলিলকে বলে দেবেন কথাটা। সে যেন তার বন্ধুকে সামলায়। কিন্তু খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন দুই বন্ধুর মধ্যে হাসাহাসি হচ্ছে।

পঙ্কজ বলল, 'যাই বলো, লোকটিকে দেখে ফেলো। ফীলিং হয় না, হয় বাফেলো ফীলিং।'

সলিল ইশারায় মৃগাঙ্কবাবুকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'চুপ চুপ।'

বাফেলো? দাঁতে দাঁত ঘষলেন মৃগাঙ্কবাবু। এই মুহূর্তে সত্যিই তাঁর বুনো মোষ হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। বেরোক দুটো ধারালো শিং তাঁর মাথা ফুঁড়ে। সেই শিং দিয়ে ওই দুই বন্ধুর পেট চিরে ওদের নাড়িভুঁড়ি তিনি বের করে আনবেন।

মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে তাঁর পনের দিনের ভাড়াটের এই সম্পর্ক, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আত্মীয়তার অন্ত নেই। বীণা মাংস রেঁধে মাসীমাকে দেয়, মাসীমা মাছ রেঁধে বীণাকে সবান্ধবে খাওয়ান। মাঝে মাঝে ওদের তরকারি মৃগাঙ্কবাবুর পাতেও পড়ে।

মৃগাঙ্কবাবু বলেন, 'এ আবার কী?'

'মুড়িঘণ্ট। খেয়ে দেখ। বীণা রেঁধেছে।'

'উঁহু। ওসব আমাকে দিয়ো না।'

'আহা খাও না। মেয়েটা রাঁধে ভালো।'

সেদিন নীলিমা সলিলের ছেলেকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

'কী সুন্দর ছেলে হয়েছে দেখেছ?'

'তুমিই দেখ। সব শিশুই আমার কাছে সমান মাংসপিণ্ড।'

নীলিমা বলেন, 'ও মা, ও কী কথা। বয়সকালে ছেলেমেয়ে হলে এই বয়সী নাতি-নাতনী হত আমাদের। কিন্তু ভগবান মন বুঝেই ধন দেন। তুমি ছেলেপুলে ভালোবাসো না, মানুষজন ভালোবাসো না। কেবল টাকা টাকা টাকা। এত টাকা তোমার খাবে কে?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কেন আমি খাব?'
'তুমি একাই বুঝি একশ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'একশ কি বলছ? আমি একা এক অক্ষৌহিনী।'

এবার যাওয়ার পালা। সলিলরা নাকি চলে যাবে। মৃগাঙ্কবাবু রোজই শোনেন ওরা আজ যাবে, কাল যাবে। কিন্তু কেবল যাই যাই করে। যায় আর না। মৃগাঙ্কবাবু বুঝতে পেরেছেন ওরা পুরো একটি ক্যালেন্ডার মান্থ এখানে থেকে তবে যাবে। ভাড়া উশুল করে তবে নড়বে। তার আগে এক পাও বাড়াবে না।

এর মধ্যে আরো একটি কান্ড ঘটল। মৃগাঙ্কবাবু দেখতে পেলেন তাঁর ফুল-গাছগুলির অনেক ফুলই নেই। মাঝে মাঝে রীণা শখ করে একটি দুটি ফুল খোঁপায় পরে, কি বিনুনিতে দেয়। কিন্তু বাগান সুদ্ধ উজাড় করবার অধিকার ওদের কে দিল?

মৃগাঙ্কবাবু ওদের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। যা ভেবেছেন তাই। ওদের ফুলদানিতে ফুল, বিছানায় ফুল রীণার খোঁপায় বড় একটি গোলাপ জ্বলজ্বল করছে।

সেই রক্তগোলাপ দেখে রক্তচক্ষু হলেন মৃগাঙ্কবাবু। কিন্তু কথা বললেন হেসে। 'আজ কি তোমাদের ফুলশয্যার অ্যানিভার-সারি নাকি রীণা?'

রীণা একবার মৃগাঙ্কবাবুর দিকে চোখ তুলে তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাগান উজাড় করে ঘরে নিয়ে এসেছ? কুঁড়িগুলিও কি ছিঁড়তে হয়?'

রীণা বলল, 'কুঁড়ি ওর মধ্যে একটিও নেই মেসোমশাই। সবই ফোটা।'

মৃগাঙ্কবাবু বেড়াতে চলে গেলেন। ভাবলেন কার্তিক মাসে তো বিয়ে টিয়ে হয় না। নিশ্চয়ই বিবাহ-বার্ষিকীর তারিখও পড়তে পারে না। তবু আজ ওদের এমন ফুল উৎসব কিসের? কে জানে আজ হয়তো ওদের প্রথম সাক্ষাৎ বার্ষিকী। নীলিমার কাছে শুনেছেন ওরা নাকি ভালোবেসে বিয়ে করেছে।

অবশ্য ওই ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই মৃগাঙ্কবাবুর। প্রেমজ বিবাহ সত্ত্বেও কত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা তাঁর হাতে এসেছে। যারা মামলা করে না তাদেরও কতজনের খবর জানেন মৃগাঙ্কবাবু। সবাই তো আর এই নিয়ে আইন-আদালত করে না। একই ঘরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করে।

ভালোবাসা। কথাটা প্রায় উচ্চারিত হতে শোনেন বটে মৃগাঙ্কবাবু। নিজের চেয়েও মানুষ নাকি অন্যকে বেশি ভালো-বাসতে পারে। অসম্ভব, অসম্ভব। যতক্ষণ মানুষের স্বতন্ত্র দেহ আছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ আছে ততক্ষণ অন্য কাউকে ভালোবাসা অন্য কারো জন্যে ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সেই ত্যাগ ধোপে টেঁকে না। সেই ভালোবাসা দু একবার ধোপা বাড়ি থেকে এলেই ফেঁসে যায়। এ এক আশ্চর্য স্ববিরোধ। তোমার দাঁতে ব্যথা হচ্ছে তুমিই কষ্টে ছটফট করবে, তোমার চোখে কুটো পড়লে তুমিই জগৎ সংসার অন্ধকার দেখবে। তোমার শরীরেরই রোক সবই হোক যে কোন কষ্ট শুধু তোমারই কষ্ট, কিন্তু এই দেহগত সুখ তুমি যদি একা ভোগ করতে যাও লোকে তোমাকে বলবে স্বার্থপর। একমাত্র দেহত্যাগেই পূর্ণ স্বার্থত্যাগ সম্ভব। একমাত্র পঞ্চভূত হতে পারলেই মহাকাশের সঙ্গে আর মহাকালের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়।

ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে এসে ঢোকেন মৃগাঙ্কবাবু। নীলিমা যথারীতি সন্ধ্যাপুজোয় বসেছেন। এই এক ঈশ্বর। সর্বগ্রাসী ঈশ্বর নীলিমাকে পেয়ে বসেছে। মৃগাঙ্কবাবুর যদি সাধ্য থাকত আদালতের মামলা আনতেন ওই ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে।

ছোট টেবিলখানার ওপর হ্যারিকেন লণ্ঠনটি জ্বলছে। এই শহরের কোন কোন বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট এসেছে। মৃগাঙ্কবাবু ইচ্ছা করেই অত খরচের মধ্যে যাননি। নিজে তো এখানে এসে বছরে একমাসের বেশি থাকেন না। কী দরকার ওই অপচয়ে।

সারা বাড়িতে একখানা মাত্রই চেয়ার রেখেছেন। নিজে বসেন। যারা দেখা সাক্ষাৎ করতে আসে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলেন মৃগাঙ্কবাবু। বসতে বললেই সরতে চাইবে। অন্তত এক কাপ চা না খেয়ে উঠতে চাইবে না।

টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতেই থমকে

গেলেন মৃগাঙ্কবাবু। তাঁর ছোট্ট টেবিল-খানি ফুলে আর ফলে ভরতি। এ সব কে দিল? মামলা জিতিয়ে দিয়ে শাঁসালো মক্কেলের কাছ থেকে কোন কোন সময় দামী উপহার নিয়েছেন মৃগাঙ্কবাবু। এসব ফুলফল শাকসব্জীর মত পেরিশেবল গুড্‌সে তাঁর কোন লোভ নেই।

'এ সব কে দিল?'

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন মৃগাঙ্কবাবু।

নীলিমা বললেন, কেন বিরক্ত করছ? ওসব তোমার গাছের ফুল, তোমার বাগানের ফল। রীণারা সব ফেরত দিয়ে গেছে।'

মৃগাঙ্কবাবু একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুবতো সাফাই গাইছ। চোরাই মাল ফেরত দিলেই বুঝি আইন ক্ষমা করে? তার চোখে নির্দোষ হওয়া যায়?'

নীলিমা একথার কোন জবাব দিলেন না।

মৃগাঙ্কবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পাশে রীণাদের ঘরে গান বাজনা হচ্ছে। নিতাই বসে ওদের গানের আসর। পতি-পত্রবতীর সংগে বন্ধুটিও থাকে।

'তোমার ঘরে বাতি তোমার ঘরে সাথী'

॥ ৪ ॥

না আজ আর এখন বাড়ি ফেরা চলবে না। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, যেদিন আড্ডায় ইণ্টারভ্যাল হয়, সেদিন এ সময় বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে একেবারে 'কোজি নুকে' গিয়ে হাজির হয়। আজ তার উপায় নেই, দুর্ঘটনাকে চোখের সামনে ঘটতে দেবে না। ছোটমেসো যদি সোজা গিয়ে হাজির হয়ে থাকে।

—শালা যত সব গাইয়া। নিজের মনে মনেই অস্ফুটে বলে ফেললো অরুণ।

আচ্ছা, ঊর্মি তো স্রেফ বন্ধু। যা সত্যি তাই বলবে। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে। হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে, একটি মেয়ে।

অসম্ভব: বললেই হলো নাকি, ঝড় বয়ে যাবে। মা দেয়ালে মাথা খুঁড়বে, বাবা চিৎকার করবে, দিদি বলবে, অরুণ তুই শেষে.........

আশ্চর্য, সব কথা কেবল চেপে রাখো, লুকিয়ে রাখো।

ঊর্মিকে বাসে তুলে দিয়ে উল্টো দিকের বাসে উঠে একেবারে 'কোজি নুকে'র সামনে এসে নামলো। ছোট্ট চায়ের দোকানটার নাম 'কোজি নুক'। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। খান বারো-চোদ্দ কম দামী কাঠের চেয়ার টেবিল, যেমন নোংরা টেবিল, তেমনি নোংরা ইজের-পরা বাচ্চা বয়। কিন্তু বিকেল হতে না হতে সব ক'টা চেয়ার দখল হয়ে যায়। আর কি চিৎকার, কি চিৎকার।

অরুণকে দেখতে পেয়েই তর্ক থামিয়ে টিকলু বললে, কি বস্, অ্যাটাচির সঙ্গে দেখা হলো? জাহাজ দেখালে?

—ধুত্তোর অ্যাটাচি। অরুণ বিরক্ত হলো। —দেখাবি যা সে অন্য কায় সঙ্গে......

বলেই থেমে গেল ও। এক একদিন কি যে হয়, রুণু সম্পর্কে ওরা একটু খোঁচা দিলেই রাগ গিয়ে পড়ে রুণুর ওপরই। তখন ও রুণুকেই খুব সস্তা করে দেয়।

কিংবা কথা চাপা দেয়ার জন্যেই হয়তো বললে। একটু চুপ করে থেকে মেজাজ ঠাণ্ডা করে আবার বললে, একটা নতুন ঝামেলা হ'ল। ঊর্মির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে......

সুজিত মুখ বাঁকিয়ে বললে, ফালতু সময় নষ্ট করতে তোর ভাল লাগে?

অরুণ এবার কথাটা চেপে গেল। ভাগ্যিস বলে ফেলে নি। শুনে হয়তো বলতো, ছোটমেসো দেখেছে তো কি হয়েছে, তার সঙ্গেও ভ্যাকুয়াম ছিল কিনা দেখেছিস? কারো সম্পর্কে এদের এতটুকু ভালবাসা নেই, শ্রদ্ধা নেই। ছোটমেসো, রুণু, ঊর্মি, সকলকে সমান চোখে দেখে। বাবা মা তো এদের আসল চেহারা দেখে নি, দেখলে বুঝতো। চোদ্দ ইঞ্চিকেই চোঙা ভাবে। টিকলু একটা নতুন প্যাণ্ট করিয়েছে, তার গর্বেই......শালা আবার প্লেট দেয় নি।

—ঊর্মির সঙ্গে আমিও একদিন গিয়েছিলাম। টিকলু হাসলো। —মাইরি হলে ঢুকছি, বললে, 'অসভ্যতা করবি না কিন্তু'... মেয়েলি টান দিয়ে ঊর্মির মত করেই বললে।

সুজিত হেসে ফেললে। —একেবারে ঠাণ্ডা পানি?

অরুণ হাসলো না। —টিকলুকে বে বিশ্বাস নেই।

টিকলু হ্যা হ্যা করে হেসে উঠে বললে, যা যা, তোর মত তো হার ম্যাজেস্টির সার্ভেণ্ট নই। শালা পুঁটলি বইবো টিঁড়ে খাবো না, ও বাবা ভাল লাগে না।

অরুণ ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠছিল, এবার ও আরো রেগে গেল। বললে, আফটার অল ও আমাদের বন্ধু, এতদিনের বন্ধু।

—ফ্রেণ্ড? টিকলু হেসে উঠলো। —ফ্রেণ্ড তো কি হয়েছে, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ওকে জাহাজ দেখায় না? তোকেই বিশ্বাস কি, তলায় তলায়, মানে...।

এবার সুজিতও বিরক্ত হলো। খুব

কড় করে কিছু বলবে ভাবলো। বললো না। হঠাৎ অন্যমনস্কের মত হয়ে গিয়ে হাতের রেখা দেখতে দেখতে বললে, ইণ্টার-ভিউ তো দিয়ে এলাম......

অরুণ ক্ষেপে গেল। রাগটা তরতর করে নেমে গেল। —বাবা তো রোজ বিজ্ঞাপন [illegible] রাখছে।

টিকলু ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালে, ঠোঁটে-ধরা সিগারেটটা ধরিয়ে বললে, ইণ্টারভিউ দিয়ে চাকরি? ওসব ছেড়ে বাবা কাপকল ধর, তা না হলে কিস্সু হবে না।

সুজিত হাসলো। —যা বলেছিস। কিন্তু জিগ্যেস করলো না মাইরি। তারপর টিকলুর দিকে ফিরে বললে, তোর কি, বাপের চেয়ারে বসবি।

—নিশ্চয়। টিকলু প্রতিবাদ করলো, বাবার সঙ্গে কবে থেকে ঝগড়া চলছে। দুটো ট্রেডল মেশিন নিয়ে টুকুস টুকুস, খালি সারাদিন শুধু 'শুভবিবাহ' আর পোস্টারের ছাপা। লাখখানেক টাকা জোগাড় করে দাও, প্রেস কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি।

অরুণের ঐ সব কথা টিকলুর পক্ষে ভাল লাগে না। তাছাড়া নিজেদের অবস্থাটার কথা যখন ভাবে, তার সঙ্গে টিকলুর মত বড় বড় স্বপ্নকে ও কিছুতেই মেলাতে পারে না। তাই খানিক চুপ করে থেকে বললে, মাস্টারি একটা টিউশানি পাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছে হয় না।

সুজিত চুপ করে থেকে বললে, জানিস অরুণ, আমাদের মধ্যে কোন রক্ত নেই। সত্যি, আমাদের মাইরি কিছু হতে ইচ্ছে হয় না।

কেন হবে না। সুজিতটাও বাবার মত কথা বলছে। কিংবা ও বাড়ীতে হয়তো বাপের কাছে শুনে শুনে নিজেও তাই বিশ্বাস করছে। কিছু হতে ইচ্ছে হয় না। যেন ইচ্ছে হলেই কিছু হতে পারতো ও। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলে একটা ইণ্টারভিউ মেলে না, ইণ্টারভিউ দিলে নাকি চাকরি হবে। কারো কাছে চিঠি লিখে দাও না বাবা, যদি মুরোদ থাকে। নাহলে চাকরি কর কিনা। তা না শুধু বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করো।

দরখাস্ত করার ঝামেলা কম নাকি।

পকেটে হাত দিয়ে চায়ের পয়সা দিতে গিয়ে খসখস করে কি একটা কাগজের টুকরো হাতে ঠেকলো। অমনি মনে পড়ে গেল, দুপুরে বেরোবার সময় নিনি দিয়েছিল। নখ দিয়ে দিয়ে ছেঁড়া বিজ্ঞাপনের টুকরোটা। ওটা পেয়েছিল বলেই আর টাকা চাইতে হয়নি মার কাছ থেকে। খুব বিরক্ত মুখে বলেছিল, দাও দুটো টাকা, আবার এক দরখাস্তের ঝামেলা দিয়ে গেছে বাবা।

মা প্রথমে একটা টাকা দিয়েছিল, তার-

পর অরুণ এমন অসহায় কাচুমাচু মুখ করে তাকিয়েছিল যে আরেকটা না দিয়ে পারে নি।

প্রথম প্রথম অবশ্য বাবার এই বিজ্ঞাপন দাগ দিয়ে রাখা মোটেই পছন্দ হতো না অরুণের। কম হাঙ্গামা নাকি। মোড়ের মাথায় একটা দিশী ব্যাঙ্ক আছে, তার সিঁড়ির পাশে দুটো টাইপরাইটার নিয়ে সারাদিন খটাখট খটাখট চালাচ্ছে দুটো লোক। এক একটা দরখাস্ত চার আনা, সার্টিফিকেটের ট্রু কপি সেও দু'আনা। ঝামেলা না ঝামেলা! দুটো গেজেটেড ধরে সার্টিফিকেট নিয়ে রেখেছে, তার ওপর ডিগ্রিফিগ্রির নকল আছে। তারপর লম্বা খাম কেনো, ঠিকানা টাইপ করাও, স্টাম্প লাগাও পোস্ট অপিসে কিউ মেরে দাঁড়িয়ে। একটা দরখাস্ত মানে দুটো দিনের আড্ডা বন্ধ। প্রথম প্রথম তাই বিরক্ত হতো ও। এখন তাই স্রেফ মা'র কাছ থেকে একটা কি দুটো টাকা নিয়ে বলে, করেছি। শালা করলেও যা, না করলেও তাই. ইণ্টারভিউ তো আসবে না। তার চেয়ে বাপের টাকা ছেলেরই ভোগে লাগছে।

কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। বিজ্ঞাপনের টুকরোটা হাতে ঠেকতেই বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল অরুণের।

—একটা দরখাস্ত টাইপ করাতে হবে. যাবি টিকলু? হঠাৎ উঠে পড়ে অরুণ বললে।

টিকলু অবাক হয়ে তাকালো।—যাব্বাবা, ও রোগ তো ছেড়ে গিয়েছিল, দিব্যি টু-পাইস হচ্ছিল বিজনেসে।

—যাবি কিনা বল্।

দরখাস্তটা টাইপ করাতেই হবে। ছোটমেসো এর মধ্যে কি কাণ্ড করেছে কে জানে! যদি রিপোর্ট পেঁাছে গিয়ে থাকে তা হলে তো ফায়ার হয়ে আছে সব। দরখাস্তটা হাতে নিয়ে ঢুকলে, বাবাকে দেখালে, তবু যদি একটু ঠাণ্ডা হয়।

টিকলু কালমেঘ খাওয়া মুখ করে বললে, মেয়ে টাইপিস্ট হলে একশোবার যেতাম, এক দরখাস্ত আমি সতেরো বার টাইপ করাতাম। কিন্তু দুটো বোকা বোকা টাইপের লোক বসে বসে খটুস খটুস করে টাইপ করবে, আমার মাইরি কোমর কন কন করে।

—সে কি রে টিকলু। সুজিত হেসে ফেললে, তোর মুখে তো জানতাম ন্যাকা-বোকা একা আসে না।

টিকলু হেসে বললে, অরুণের মত একটু পালিশ মারছি, ও শালা নির্ঘাত পালিশ দেখিয়ে রুণুটাকে কব্জা করেছে।

অরুণ পা বাড়ালো। —আমাকে যেতেই হবে। দরখাস্তটা না করালে......

—আটটি বিয়ে করতে বলছে কাঁঝ? চাকরি জোগাড় করতে হবে? টিকলু হাসলো।

সুজিত সিগারেটের তলানিটা দু'আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছটাক করে দূরের ফুটপাথের দিকে টিপ্ করে ছুঁড়ে দিলো। দিয়ে বললে, ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম, কিছু জিগ্যেস করলো না রে।

অরুণ বিরক্তির সঙ্গে বললে, আরে থেস্, চাকরির কথা কে ভাবছে। বাড়ি এতক্ষণ ফজিয়ামা হয়ে গেছে হয়তো, ধোঁয়া উগরোচ্ছে।

*

দরখাস্ত টাইপ করিয়ে একটু তাড়াতাড়িই ফিরলো অরুণ। বুকে তখন বেশ খানিকটা বেপরোয়া ভাব এসেছে, যা হবে হয়ে যাক্। না হয় রেগে গিয়ে বাপকে সেলাম করে দেবে, 'গুডবাই'য়ের মত মোক্ষম অস্ত্র থাকতে ভয় কিসের।

যেন কিছুই হয় নি, ছোটমেসো ওকে দেখে নি, এমন ভাব করে বাড়ি ঢুকলো। পড়ার ঘরটায় একবার উঁকি মেরে দেখলো মিলু আছে কিনা। থাকলে টেম্পারেচারটা আগে জেনে নিতো। কিন্তু না, মিলু নেই।

নিজের ঘরে যাবার আগেই বারান্দার এক কোণে রান্নাঘর। দূর, ভয় ভয় ভাল লাগে না, যা হবার এস্পার-ওস্পার একটা হয়ে যাক্।

অরুণ রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে চেঁচালো।—মা, চৌরিফিক খিদে পেয়েছে, শীগগির খেতে দাও।

মা ফিরে না তাকিয়েই বললে, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন, বুলেকে খোলগে যা জায়গা করতে। ব'লে এবার ফিরে তাকা'লো।

—তোর হাতমুখ ধোয়া হতে হতে হয়ে যাবে।

আর দাঁড়ায় ? চটপট নিজের ঘরটাতে এসে ঢুকলো। ঢুকেই দেখলে, দিদি ওরই টেবিলের সামনে বসে খুব এক মনে চিঠি

লিখছে ওর কলম দিয়ে। সংগে সংগে বিরক্ত হয়ে উঠলো অর্ণ। এতবার বারণ করেছি। কেন বাবা, কর্তাকে চিঠি লিখছো, একটা কলম সে কিনে দিতে পারে নি। দেবে নিব্‌টার বারোটা বাজিয়ে।

জামা ছাড়তে ছাড়তে একটু শব্দ করলো অর্ণ, ইচ্ছে করেই। তারপর আড়-চোখে একবার দিদির দিকে তাকালো। নাঃ, মনে হচ্ছে পাস করে গেছে ও। মা কিছু বললো না, দিদি ঝাঁঝিয়ে উঠলো না এখনো......

তবু সাবধানের মার নেই। টাইপ করা দরখাস্তটা নিয়ে বাবার কাছে দাঁড়ালো।— দ্যাখো তো, অ্যাপ্লিকেশনটা ঠিক আছে কিনা। এক বন্ধু বলছিল, কোন্ অফিসার ওখানে ওর চেনা আছে.....

বাবা কোন কথা বললো না। দরখাস্তটা হাত থেকে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে বললে, কালকেই তা হ'লে পোস্ট করে দিস্, ঠিক আছে।

অর্ণ সরে এলো। বাবার সামনে নেহাত বাধ্য না হলে ও যায় না, থাকতে ইচ্ছে হয় না দু' মিনিট।

নিজের ঘরে এসে দরখাস্তটা টেবিলের

ওপর রেখে সবে খেতে বসতে যাবে, দিদি মা'র ডাক শুনে এতক্ষণে হয়তো খাবার জায়গা করতে গেছে, হঠাৎ পা টিপে টিপে মিলু ঘরে ঢুকলো, এদিক-ওদিক দেখলো, তারপর অরুণের কাছে সরে এসে বললে, কি হয়েছে রে দাদা, ছোটমাসী ওদের বলছিল?

॥ ৫ ॥

দেখতে দেখতে মহানিমের গাছটা পাতায় ভরে উঠেছে। তামাটে রঙের কাঁচ কচি পাতাগুলো এখন ফিকে সবুজ। হাল্কা হাওয়ায় নিমের ঝালরগুলো যখন আরতির চামরের মত আস্তে আস্তে নড়ে, তখন সেদিকে ঠায় তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাড়াটা নোংরা, গলির শেষে একটা ডাস্টবিনের উপছে-পড়া আবর্জনায় গলিটা দুর্গন্ধে ভরে থাকে মাঝে মাঝে। জানালা থেকে বাইরে তাকালে কয়েকটা মরচে-পড়া টিনের শেড দেখা যায়, একটা ফ্ল্যাটের বারান্দায় ছেঁড়া নোংরা কাঁথা শুকোয়, দূরে একটা ছোট্ট মুদিখানা। চারপাশের বাড়ি-গুলোর গায়ে রঙ নেই, রোদেজলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

কোথাও কোন রঙ নেই। রুণু ছাড়া কোথাও কোন রঙ নেই।

অথচ প্রেমট্রেম অরুণ আগে বিশ্বাসই করতো না। কেউ না, সুজিত টিকলু অরুণ—কেউ না।

সুজিত আজকাল বড় বেশী কুষ্ঠীতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ইণ্টারভিউ দিচ্ছে আর দিনরাত শুধু ছক কাটছে। কোন ঘরে কোন গ্রহ মুখস্থ করে ফেলেছে। আবার মাঝে মাঝে নিজের হাত নিজেই দেখছে। শালা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে চেপে দিব্যি একটা ফেটু লাইন বানিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। লাইনটা এমন স্পষ্ট যেন কেষ্টপুর ক্যানাল, একখানা গাধাবোট নামিয়ে ঠেলে দিলে স্যাটার্নে গিয়ে পৌঁছবে।

অরুণ শুনে হাসে। —আমাদের আবার ফেট!

—তুই সে-কথা বলিস না অরুণ, ফিউচার তো তোরই। সুজিত বলেছিল।

টিকলু হেসে বলেছিল, প্রেজেণ্টও তোর, ফিউচারও তোর।

সব ঐ রুণুকে উদ্দেশ করে। অর্থাৎ যা পাওয়ার তা তো পেয়ে গেছিস।

সত্যি তো, এ বয়সে আর কি আকর্ষণ আছে, আর কি পেতে চায় অরুণ! সেদিক থেকে ও ভাগ্যবান। রুণুর কথা ভাবলে গর্বে ভরে ওঠে।

—তোর আবার ক্রেডিট কি রে, ক্রেডিট তোর কুষ্ঠীর। ও শালা যার ভাগ্যে যা আছে। একদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল সুজিত।

অরুণের এখন মাঝে মাঝে হাসি পায়। ওদের বোঝাতে পারে না, বোঝাতে চায়ও না যে প্রেম মানে একটা মেয়ে নয়। শরীরটরীর তার মধ্যে আছে, নানারকম ইচ্ছেটিচ্ছেও হয়, তবু অন্যরকম। ওরা এখনো সেই ষোল-সতেরো বছরের মন নিয়ে পড়ে আছে। তখন মেয়েদের দেখলেই কেমন একটু রঙিন রঙিন লাগতো। দু'একটার দিকে হাত বাড়াতেই উচ্চিংড়ের মত ছিটকে বেরিয়ে গেছে। একটা বোকা বোকা দাঁড়িয়ে থাকতো, কথা বলতো না। কিন্তু অরুণের নিজের মন ভরতো না।

—টিকলু একটা হারামি। সুজিত একবার টিকলুর ওপর রেগে গিয়ে অরুণকে বলেছিল। —ব্যাটা পিসতুতো........মাইরি সন্দেহ হয়।

অরুণ বিশ্বাস করে নি, রেগে গিয়েছিল।

সে-সব দিনের কথা ভেবে অরুণের নিজেরই এখন গা ঘিনঘিন করে।

সতেরো-আঠারোর জীবনটাকে এখন ছ্যাংড়ামি মনে হয়। এখন ওরা একুশ। একুশ-বাইশ। এই ক'বছরে, আর কেউ না হোক, অরুণ অনেক বড় হয়ে গেছে। বদলে গেছে।

কিংবা রুণুই ওকে এখন একটু একটু করে বদলে দিচ্ছে।

—এইবার তোরটা বল্ শুনি। ঊর্মির তো সবই অদ্ভুত, একদিন নির্জন দুপুরে ফেরাজিনির এক কোণে গা এলিয়ে ওর নিজের প্রেমের গল্প বলেছিল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক উদাস উদাস দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ উড়ন্ত ঘুড়িটাকে ঝপাঝপ্ লাটাইয়ের কাছে গুটিয়ে এনেছিল, ভিজে ভিজে চোখের পাতাকে হাসিয়ে দিয়ে বলেছিল, ব্যস্, এই। এবার তোরটা বল্।

বাঃ রে বাঃ। এ যেন চাকরি পাওয়া। ইণ্টারভিউ হ'ল, কি নাম কোন্ সালে পাশ করেছো, কাল থেকে আসবেন। প্রেম কি কাউকে বলার মত কাহিনী? কাউকে বোঝানোর মত?

অরুণ জানতোই না ও প্রেমে পড়ে যাবে। মনে মনে ওদের সকলেরই একটা ঘুমন্ত বাসনা ছিল একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবে, একটু ঘোরাঘুরি করবে, রেস্টুরেণ্টে বসবে। একটু ফাঁকা পেলে আদরটাদর করবে। এই অবধি।

কলেজের বিরাম ইচ্ছের সলতেটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মেয়েলি মেয়েলি চেহারা ছিল তার, কলেজের সোশ্যালে একবার অভিনয় করে খুব হাততালি পেয়েছিল। সানস্ক্রিট কলেজের সামনে গিয়ে বিরাম পায়চারী করতো, কোন কোন-দিন সেই মেয়েটা। তখন নাম জানতো না।

ওরা ঐখানে দেখা করে এক একদিন কোথায় হারিয়ে যেত।

বিরাম লাস্ট বেঞ্চে বসে রসিয়ে রসিয়ে যা বলতো ওরা গোগ্রাসে তাই গিলতো। আবার বিরামকে ক্ষ্যাপাতেও ছাড়তো না।

একদিন টিকলু খুব মজা করেছিল। বিরাম তখনো আসে নি, ও দেখলো মেয়েটি ফুটপাথে সাজানো পুরনো বই দেখার ভান করে অপেক্ষা করছে।

টিকলু বললে, দাঁড়া, বিরামটাকে আজ একটা কাঁটি মারবো।

বলে সটান মেয়েটির কাছে গিয়ে বললে, বিরাম আপনাকে আজ চলে যেতে বললে, ও কোন ক্লাসে প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

তারপর বিরামকে আধ ঘণ্টা ধরে পায়চারী করতে দেখে অরুণ সুজিত, টিকলু দূরে দাঁড়িয়ে খুব হাসাহাসি করেছিল।

পরের দিন সব জানতে পেরে বিরাম ভীষণ রেগে গিয়েছিল।

টিকলু বলেছিল, একটা জুটিয়ে দাও না ভাই, তা হলে আর ডিস্টার্ব করবো না।

সে সব ভাবলে নিজেকে বড় ছোট মনে হয় অরুণের। তখন প্রেম জিনিসটা কি তা যে বুঝতেই পারতো না। যে-কোন একটা ছেলের সঙ্গে কোন মেয়েকে দেখলেই হিংসে হতো। মনে হতো ছোটবেলার মত পকেটে একটা গুলতি থাকলে দূরে থেকে ধাঁই করে একটা বসিয়ে দিতাম।

সুজিত বলেছিল, বিরামটা রোজ ভিক্টোরিয়ায় যায়।

টিকলু বললে, চল্ ওটাকে আজ পাংচার করে দিয়ে আসি।

ওরা তিনজনে হাসতে হাসতে মজা দেখার জন্যে বাসে লাফিয়ে উঠলো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এসে জলের ধারে একজোড়াকে দেখে টিকলু বললে, মেয়েগুলো মাইরি ভারী বোকা। দ্যাখ্ দ্যাখ্, ছেলেটা হুইল গেটাচ্ছে, মেয়েটা বুঝতেই পারছে না।

অরুণ তাকিয়ে দেখে হেসে ফেললো। মেয়েটার জন্যে ওর মায়া হ'ল। মনে হলো ছেলেটা ঐ মেয়েটার একটুও যোগ্য নয়। ওর মনে হলো ছেলেটা গদগদ হয়ে অভিনয় করছে। তুলনায় ওর নিজেকে খুব সৎ আর ভাল মনে হলো। ভাবলো, আমি কোন মেয়েকে পেলে মিথ্যে কথায় প্যাঁচ কষবো না। আমি সত্যি সত্যি ভালবাসবো।

টিকলু ওদের সকলকে বিরক্ত করতে করতে টিপ্পনি কাটতে কাটতে, কখনো অশ্লীল অট্টহাসের আওয়াজ তুলে ভিতরের জ্বালাটা জুড়োবার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ 'ইয়াল্লালা' বলে চিৎকার করে উঠে থেমে পড়লো। —শালা এক সঙ্গে দুটো? কি লাক্ মাইরি।

সেই প্রথম। বিরাম আর নন্দিনীর সামনে হাঁটু গুটিয়ে বসে রুণু হাসছিল আর কি বলছিল।

টিকলু চিরকেলে চ্যাংড়া, ঝট্ করে বিরামদের সামনে এগিয়ে গিয়ে নন্দিনীকে বললে, ম্যাডাম, ক্ষমা চাইতে এলাম।

বলে বসে পড়লো ঘাসের ওপর।

অরুণের তখন ভীষণ লজ্জা করছিল। নিজেকে একটা রকবাজ ছোকরা মনে হচ্ছিল। তাদের সঙ্গে তফাত কোথায়? সত্যি তো, কারো সঙ্গে কারো তফাত নেই। সার্টিফিকেট দেখিয়ে কিংবা স্যালারি বিল দেখিয়ে সবাই ভদ্রলোক হতে চায়। ব্যবহার দিয়ে নয়।

বিরাম খুব রেগে গিয়েছিল, তবু আলাপ করিয়ে দিলো।

আর অরুণ, একা অরুণ দু হাত এক করে বললে, নমস্কার।

সুজিত বললে, চল্, গিয়ে একটু চা খাই।

ওরা সবাই এসে রেস্টুরেন্টের একটা টেবিল ঘিরে বসলো।

সুজিত যে এত স্মার্ট কথাবার্তা বলতে পারে মেয়েদের সঙ্গে, অরুণ জানতো না। সুজিত মজার মজার কথা বলছিল, আর নন্দিনী খুব হাসছিল। রুণু টিকলুর মুখোমুখি বসেছিল, আর অরুণের ভয় হচ্ছিল টিকলু না টেবিলের তলায় পা দিয়ে রুণুর পায়ে চাপ দেয়। ওকে কোন বিশ্বাস নেই।

অরুণ চোখ ফিরিয়ে এক একবার রুণুকে দেখছিল।

এতকাল ঊর্মিকে ওর খুব সুন্দর মনে হত। কিন্তু রুণুকে ওর কেমন যেন স্বপ্নের মত মিষ্টি লাগছিল। কেমন অস্পষ্ট মৃদু কুয়াশা, গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ, শরৎকালের রোদ্দুরের মত দূরের স্বপ্ন যেন।

রুণু কোন কথা বলছিল না, অরুণ কোন কথা বলছিল না।

কিন্তু এলোমেলো কথা বলতে বলতে সুজিত কখন গণৎকার হয়ে উঠলো। ও বিরামের হাত দেখলো, নন্দিনীর হাত দেখলো, আর ও যখন হাত দেখার নাম করে ফ্ল্যার্টিং করছিল, তখন রুণু ইলেকট্রিক স্পার্কের মত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু একটু মুচকি হাসছিল।

—আমার হাতটা দেখবেন না? একটু হেসে রুণুও তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

সুজিত রুণুর হাতটা ছুঁলো, আর অমনি অরুণের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো।

তারপর সারাক্ষণ সেতারের ছড় টানার মত একটা ব্যথা ওর পাঁজরে পাঁজরে ঘুরলো।

বিরাম বললে, এবার ওঠা যাক্।

রুণু এতক্ষণ ওর মেলে ধরা হাতের দুর্বোধ্য রেখাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। এবার ওর নামানো চোখ ঈষৎ তুলে এক পলকের জন্যে অরুণের মুখের দিকে তাকালো।

নন্দিনী বললে, আহা, বসো না আর একটু।

রুণু বললে, না রে। দেরি হয়ে যাবে।

অরুণের কেবল মনে হতে লাগলো, দেরী হয়ে যাবে, দেরী হয়ে যাবে। ওর তক্ষুনি তক্ষুনি কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করছিল। ওর ভয় হচ্ছিল, সুজিত কিংবা টিকলু ওর আগেই রুণুকে কিছু একটা বলে ফেলবে। ওরা কেউ যদি বলে ফেলে তা হলে অরুণের তারা-ঝরা আকাশটা চৌকো জানলার মত ছোট্ট হয়ে যাবে।

ওরা খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। সুজিত খুব চটকদার কথা বলছিল। নন্দিনী হাসছিল। রুণু বোধ হয় কিছু ভাবছিল। টিকলুকে চোঙা প্যান্টে বড় কুৎসিত দেখাচ্ছিল।

অরুণ হাঁটতে হাঁটতে ঘাসের ওপর হালকা নীল আর গাঢ় নীলে মেশামিশি একটা সুন্দর পালক দেখতে পেল। খুব সুন্দর কোন পাখির খুব সুন্দর একটা পালক।

অরুণ এতক্ষণ শুধু রুণুর মুখের দিকে তাকিয়েছে। শিশিরে ধোয়া সেই মুখটার দিকে। ও এতক্ষণে লক্ষ করলে, রুণু একটা নীল শাড়ি পরে আছে।

অরুণ ঘাসের ওপর থেকে পালকটা তুলে নিল, তারপর একটাও কথা না বলে পালকটা রুণুর দিকে এগিয়ে দিল।

রুণুর হাতে পালকটাকে আরো সুন্দর মনে হল। রুণু পালকটা নিয়ে অরুণের মুখের দিকে আরেকবার তাকালো।

ক্রমশ

রঞ্জন

এ মনিতেই সমস্যার অন্ত নেই। আছে জন্ম, আছে দুঃখ, বিরহদহন লাগে। মিলনদহন লাগে যখন কোনো ব্রিটিশ বা ভারতীয় কর্তাব্যক্তি আমাদের এই অভাগা দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যবর্ধনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক কখনোই স্বাভাবিক ছিল না: কদাচ স্বাভাবিক হবে কিনা সন্দেহ। এটাই তো স্বাভাবিক। এক বিজেতা; অন্য পক্ষ অন্তত হস্তান্তরে বিজিত কেননা পলাশী ছিল বাদশাহের বকলমে বাঙালীরই আপন ব্যর্থ উদ্যোগ। তারপর ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যের সমাধি হলো, কিন্তু উভয় পক্ষ পশ্চাতে রেখে গেল, উভয় দেশে, এমন একটা সুবৃহৎ গোষ্ঠী, যা না জানে সাম্রাজ্য শাসন করতে না অন্যতর সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ উদ্ভাবন করতে। গত বিশ বছর লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের মেদবহুল কর্মসামান্যতা লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছি। অক্ষমতা আদৌ একপক্ষীয় নয়। নইলে মাইকেল স্টুয়ার্ট কেন এলেন ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন দুই দেশের সীমান্তে কামানগুলি অন্তত মোটামুটি শান্ত ছিল?

ব্রিটেনের বিদেশী মন্ত্রীর ভ্রমণবিলাসকে ভ্রান্তিবিলাস বলে অভিহিত করবার কিছুমাত্র অভিপ্রায় বর্তমান লেখকে অনুপস্থিত। মাইকেল স্টুয়ার্ট কেন যাবেন না যেখানে তিনি যেতে চান? দিল্লিতে লাল গালিচে তো সদাপ্রসারিত। অতিথি লাল হোক বা হলদে বা সাদা। দিল্লির গ্রহণশীলতা অপরিসীম। গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার বহুরূপ দর্শনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আদৌ অভূতপূর্ব নয়; কিন্তু মাইকেল স্টুয়ার্টের ভারতদর্শন অংশত অভাবিত। তিনি রাজদূত রূপে গৃহীত হননি; তাঁর আপ্যায়ন রাজোচিত হয়নি। অনাবশ্যক অপ্রীতিকরতা সত্ত্বেও, এই নূতনতর সম্পর্কের গোটা পরিবেশেই বাস্তবতার আবেশ ছিল। ভারত নয় ব্রিটেনের রক্ষিত উপনিবেশ। ব্রিটেন নয় ভারতের ঈশ্বরাদিষ্ট সর্বসাময়িক অভিভাবক। তবু, বৈ প্ল ব ক প্রেমোপাখ্যানের অবসানে কিঞ্চিৎ ছেলেমানুষী ভাবালুতা অবশ্যম্ভাবী ছিল বৈকি? মাইকেল স্টুয়ার্ট চান নব বাস্তবতা। নয়াদিল্লিও নাকি বাস্তবতার অধীর শরিক।

*

পারস্পরিক বাস্তবতায় আমি আদৌ অবিশ্বাসী নই। মাইকেল স্টুয়ার্ট যতবার বাস্তবতা আর পরিণতবয়স্কতার উল্লেখ করেছেন ততবারই আমি অনুভব করেছি, সামান্যতম উষ্মা বা অন্যতর বিরাগ ব্যতিরেকে, যে ব্রিটেন ও ভারতের সম্পর্ক পুরাতনকে বাদ না দিয়ে নতুনভাবে নির্ধারিত হোক। মাইকেল স্টুয়ার্টের মুশকিল এই যে, তিনি অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ, বর্তমান সম্বন্ধে অর্ধপটু, আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুধুই আশাশীল। ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্ক এর চাইতে একটু বেশি জটিল, একটু বেশি সরল। মাইকেল স্টুয়ার্ট এই তথ্যটি সংগ্রহ করেননি, কেননা তিনি পরিব্রজন করেছেন প্রধানত রাজনৈতিক পর্যায়ে।
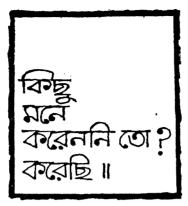
অথচ সত্য তথ্য এই যে ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ক বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক প্রাঙ্গণে বাহুল্যমাত্র। উভয়ের পক্ষেই বৃহত্তর তাৎপর্যসন্ধান অযথা কালক্ষেপ আর অনর্থক মর্যাদাহানি। কোথায় একটা অশুভ বিবাহ ঘটছে নয়াদিল্লির পুরাতনী ইংরেজী মোহে আর লন্ডনের অতিনব্যবিকৃত বাস্তবতাবোধে। অন্য নাম প্র্যাগম্যাটিজম। মাইকেল স্টুয়ার্ট বলেন, রিয়্যালিজম আর ম্যাচুরিটি। কথার হেরফের। সর্ব ভারতের কথা বলতে সাহস পাইনে। কিন্তু বাঙলা দেশে এই দুই একান্তই বিভিন্ন জাতির সম্পর্ক অবশ্যই অতি সীমিত ছিল। সেই সীমিত ক্ষেত্রে রাজনীতি ছিল একেবারেই অস্পৃশ্য। কিন্তু অন্যত্র তক্ তখনো করেনি তর্কের ঘৃণ্য সীমানির্দেশ। হিন্দিওয়ালাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী ও শিক্ষিত ইংরেজদের মধ্যে একদা সমঝোতা ছিল যার মর্মার্থ মাইকেল স্টুয়ার্টকে হয়তো কেউ বলেনইনি। তথাকথিত বাস্তবতার আতিশয্যে কোথায় প্রোথিত হয়েছে এই অতি বাস্তব সত্য যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক রাজনৈতিক অর্থে একান্তই সামান্য হতে বাধ্য; আর্থনৈতিক পর্যায়ে এই সম্পর্ক সাধারণত অতি বৃহৎ মনে হওয়া অসম্ভব নয়। অকথিত থেকে যায় বাঙালী আর ইংরেজের সাংস্কৃতিক নৈকট্য। মাইকেল স্টুয়ার্টের বাস্তবতাবোধ তথা পরিণতমনস্কতা আদৌ অগ্রাহ্য করিনে, কিন্তু আরো কিছু আছে এই দুটো দেশের মধ্যে। মাইকেল স্টুয়ার্ট জনৈক মাইকেল মধুসূদন দত্তর নামও শুনেছেন কিনা জানিনে।

বর্তমান জগতে ভারত আর ব্রিটেনের মধ্যে রাজনৈতিক অন্তরঙ্গতা অতি দূরেই হতে বাধ্য। দক্ষিণ আফ্রিকা বা রোডেসিয়া সম্বন্ধে আমার অসহিষ্ণুতা কোনো ইংরেজের মৃদু সমালোচনার চাইতে প্রখরতর না হলে সেটাই হবে বিস্ময়কর। এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে বাগবিস্তার একেবারেই অনর্থক কেননা আন্তর্জাতিক আর্থিক আত্মীয়তা একেবারেই আবেগস্বাধীন। আর যা বলে বলুক অন্য লোক, দুই দেশই কিনবে ন্যূনতম মূল্যে আর বেচবে উচ্চতম মূল্যে। এই অমোঘ বাজারী আইন দ্বিতীয় কিছুরে ধার ধারে না। এখানে মাইকেল স্টুয়ার্ট আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমান অবান্তর। এ সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের সুচিন্তিত মন্তব্যের অবশ্যম্ভাবী গন্তব্যস্থল বাজে কাগজের ঝুড়ি।

কিন্তু তৃতীয় একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে এক দিকে ব্রিটেন এবং অপর দিকে ভারত না হলেও বাঙলা ও অন্যান্য অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সম্পর্কস্থাপন করতে পারে। অর্থাৎ বর্তমান সম্পর্কের সৃষ্টিশীল পুনর্বিন্যাস করতে পারে। আমাদের মধ্যে যোগসূত্র হবে একান্তই সাংস্কৃতিক। ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের পুরাতন প্রেমকে নবীন করতে চাইলে তা কেন আখ্যাত হবে দেশদ্রোহিতা বলে? আমি মীরচাঁদ নই, আমি জগৎ শেঠ নই। আমি পলাশীর পুনরাবৃত্তি চাইনে। কিন্তু আমি চাই অন্তত বাঙলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার পুনরুজ্জীবন। বাংলা দেশে ইংরেজী তার হৃত মর্যাদা ফিরে বাঙলা গদ্যের উন্নতি হবে বলে মনে করি। আবার হয়তো আমরা সংস্কৃত শিখব এবং তাইতেও বাঙলার উন্নতি অনিবার্য।

সবচেয়ে বড়ো কথা, ইংরেজীর পুনঃ-

প্রবর্তনে আমাদের গোটা দৃষ্টিভঙ্গীর আবার আমূলে পরিবর্তন হবে এবং সে পরিবর্তন পিছনের দিকে না হয়ে হবে সামনের দিকে। অর্থাৎ আবার আমরা আধুনিক হব। বর্তমান আর্যাবর্তের একমাত্র প্রয়াস দেশটাকে হাজার চারেক বছর আগে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই দৃঢ় আন্দোলনের বিরুদ্ধে এখনই সমান দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ না গড়ে তুললে পরে বাঙালী জাতিকে কঠোর মূল্য দিতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন স্পষ্টতই হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের পায়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর উপর তাই আর ভরসা রাখিনে।

এ ব্যাপারে আমার বাইরের সাহায্য ভিক্ষা করতে সামান্যতম কুণ্ঠা নেই। মিস্টার মাইকেল স্টুয়ার্ট ভারত সরকার কর্তৃক অপব্যয়ের জন্য কত পাউন্ড দিলেন কি দিলেন না, আমি পরোয়া করিনে। তাঁর দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য তিনি কী দিয়ে গেলেন আমি সেইটাই জানতে চাই।

স্পষ্ট উত্তর মিলছে না এবং সেজন্য আমি আহত।

(একচল্লিশ)

সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সারা শহর জুড়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। প্রথমে যা ছিল শহরের সামান্য অংশে সীমায়িত, যতই বেলা বাড়ে ততই তা হয়ে ওঠে বিস্তৃত। গুজবের কল্যাণে ঘটনা ও রটনা একীভূত হয়ে বিভীষিকা এনে দেয় শহুরে যাত্রীদের কানে। প্রথমে ট্রাম বন্ধ হয়, তারপর বাস, তারপর ছোঁড়াদের ইট-পাটকেলের আক্রমণে ট্যাক্সীও বন্ধ হয়ে আসে। এখানে-ওখানে ধোঁয়ার কুণ্ডুলী ছাদের ওপর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে।

জটলা রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বাড়ির রকে, ঘরে বারান্দায়, আবার ছাদেও। রমলা বউদিরা ছেলেদের সাবধান করে দিলেন কেউ যেন আজ বাড়ির বাইরে না যায়, কখন কোথায় কি ঘটবে কে বলতে পারে। সাধন-বাবুরা গলার শির ফুলিয়ে তর্ক করছে সরকারের পতন ঘটানো উচিত হয়েছে না হয়নি। পাগলী মেয়ের মনে গোপন উল্লাস, হয়ত এই গোলমালের মধ্যে সমীরের সঙ্গে আবার মিলন হবে। মনুয়ারা ভয় পাচ্ছে একলা ফ্ল্যাটে থাকতে, কত জনকে ফোন করছে তাদের কাছে চলে আসার জন্যে, কিন্তু সকলেরই মনে শঙ্কা রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলছে না, কেমন করে তারা বেরুবে। মোহনচাঁদরা দারোয়ানদের হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিয়েছে, তেমন গোলমাল বুঝলে আকাশের দিকে মুখ করে গুলী চালাও, শব্দ শুনে গুণ্ডারা পালিয়ে যাবে। স্বরূপ লাহিড়ীরা হুজুগে কলকাতা শহরকে ইংরিজীতে অভিশাপ দিচ্ছে, এখানে কাজ কর্ম চালানো অসম্ভব। সুনীল রায়রা ভয়ে মুরগীর মত কাঁপছে, যদি দপ্তরী পাড়ায় আগুন লাগে, হাজার হাজার টাকার বই-এর ফর্মা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মিতার ঘরে কাল রাত্রে যে বাবু ঢুকেছিল, আজও তাকে সে ছাড়েনি। অনুনয় করে জানিয়েছে, পয়সা দিতে হবে না, শুধু কাছে থাকলেই হবে। মানুষটার মনে আতঙ্ক, আজকেও বাড়ি না ফিরলে বউ ছেলেমেয়ে কি ভাববে।

অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণ ছাদেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, দেখছিলেন কলকাতার বুকে একটার পর একটা চিতা জ্বলছে। কি ভেবে নামলেন নীচে। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় প্রেস ছুটি হয়ে গিয়েছিল, নিরঞ্জন কবিতা দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে গেছে। বাকি যারা ছিল, তারা এমন একটা ছুটির মওকা পেয়ে কালকে যাতে আসতে না হয়, সেজন্যে আগে থেকেই যুক্তি খাড়া করার অজুহাতে অশোক জানাকে শুনিয়ে যাচ্ছে কোথায় কি ঘটেছে, কোন রেল স্টেশনে হাঙ্গামা ক্রমশ বাড়ছে ইত্যাদি। অশোক জানা বোঝাবার চেষ্টা করছে, প্রচুর কাজ জমা হয়ে আছে প্রেসে, সেগুলো শেষ করে না ফেললে চলবে কেন। তাছাড়া, এই গণ্ডগোলের মধ্যে বাইরে না বেরিয়ে প্রেসের মধ্যে থাকাই তো অনেক নিরাপদ। সকলের জন্যে রান্না এখানেই করা হবে। এদের সবাইকে পাশ কাটিয়ে নীরবে, চিন্তিত মুখে অনাদিপ্রসাদ বাইরের দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

অশোক জানা শঙ্কিত মুখে ছুটে আসে, তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ অনাদি?

অনাদিপ্রসাদের উদাস উত্তর, দেখে আসি কি সব হচ্ছে।

—পাগল হয়েছ, কোথায় বিপদে পড়ে যাবে! একে তুমি রোজা বলবে—

—আজে কি হল? সারা রাত জেগে উপন্যাসটা শেষ করে ফেলেছি, আর আমার ভাবনা নেই।

অশোক জানা খুশী হয়, তবে তো কাজের কাজ করেছ হে, নাম কিছু ঠিক করেছ?

—কুরুক্ষেত্র।

বলেই অনাদিপ্রসাদ বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। অশোক জানা বার দুই পিছন থেকে ডাকল, অনাদি, অনাদি। উনি কিন্তু ফিরে তাকালেন না, সোজা এগিয়ে চললেন।

এখানে-ওখানে জটলা, একটা চক্রের মধ্যে একগাদা মাথা ঝুঁকে পড়েছে। কোথাও একজন বলছে, অন্যরা কৌতুহলী হয়ে শুনেছে। কোথাও একসঙ্গে বহু লোকের বক্তব্যে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে কলকাতার কোথায় কি ঘটছে তার খবর চলাচলের বিরাম নেই।

—জানেন মশাই, এই মাত্র শ্যামবাজার থেকে আসছি, ওখানে তিনটে বাস জ্বলছে।

—শুনেছেন যদুবাবুর বাজারের সামনে গুলী চলেছে, চারচারটে লাশ শুয়ে।

—আর হাওড়ায়? দেখুন গিয়ে—রেল দিয়ে ছোঁড়াগুলো অর্ধেক প্লেটাই খুলে ফেলেছে, বলিহারী!

শেয়ালদার কাছে বেজায় ভীড় ও ব্যস্ততা। ট্রাম বন্ধের আশঙ্কায় ছেলে বুড়ো অফিস ফেরত বাবুরা উদ্বিগ্ন, চোখে-মুখে শঙ্কার ছাপ স্পষ্ট। একটি মাত্র চিন্তা, বাড়িতে কি করে পৌঁছন যাবে, সেখানে কে কি ভাবছে।

রকে বসে আড্ডা মারার দলে সে ভাবনা নেই, কারণ তাদের জন্মের সময়ই বাবা মা'রা ভেবেছিল শুধু। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্কুল কলেজ পালানো শুরু হল, তখন থেকে মা বাবা আর ওদের জন্যে ভাবে না,

পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ফোস্কা

পরে ভোগাতে পারে

চটপট! জায়গাটি ঢাকুন

ব্যাণ্ড-এইড*
ব্রান্ড

ড্রেসিং!

জীবানু সংক্রমণের ঝুঁকি নেবেন না।

ঔষধিযুক্ত
ব্যাণ্ড এইড ড্রেসিং
আপনার ঘা শুকিয়ে উঠতে
সাহায্য করে—জায়গাটি
পরিষ্কার রাখে, সুরক্ষিত রাখে।

জনসন অ্যাণ্ড জনসন
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
৩০, ফর্জেট স্ট্রীট
বোম্বাই-২৬

চটপট ব্যবহারের জন্যে
ষ্ট্রিপস, স্পটস,
প্যাচেস

*ট্রেডমার্ক

যেটুকু ভাবে—হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলেই বুঝি সে ভাবনাটুকুও লোপ পেয়ে যাবে। কারুর হাতে থান ইট, কারুর হাতে সোডার বোতল, কেউ কেউ রাস্তার মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিসের অনুপস্থিতিতে পাশের ফলের দোকান থেকে একটা খালি বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে সাইকেল, রিকশা, ঠ্যালা, কন্ট্রোল করছে। যেন অতঃপর সারা কলকাতার ভার তারাই বহন করতে বদ্ধপরিকর। সরকারের পুলিসের কারুরই প্রয়োজন নেই।

শেয়ালদা পেরিয়ে অনাদিপ্রসাদ এগোতে লাগলেন। সিনেমা ঘরগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, তবু যারা টিকিট কেটে তাদের প্রিয় চিত্র তারকাদের গান আর অভিনয়ের জন্যে এসেছিল—হতাশ হয়ে এখনও টিকিট ঘরের সামনে এমন পোজে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন এখুনি কি এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যাবে—

আলিবাবার চিচিং ফাক বলার সঙ্গে সঙ্গে যেমনি করে গুহার দরজা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, তেমনি বুঝি বা অশান্ত কলকাতা এক মুহূর্তেই শান্ত হবে; আবার ট্রাম বাস চলার সঙ্গে সঙ্গে—দরজা খুলবে সিনেমারও।

চলেছেন অনাদিপ্রসাদ, বাধা পেলেন একটু এগিয়েই। লম্বা লাইট পোস্ট ভেঙে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে বড় রাস্তার উপর, তার উপর ফেলা হয়েছে গাছের ভাঙা ডাল পালা, কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছে কে জানে। এক ঠেলাওয়ালা যাচ্ছিল, কতগুলো ছেলে জোর করে তার ঠেলাটা ছিনিয়ে এনে উল্টে দিল সেই ডালপালার উপর, হো হো করে হেসে উঠল কোরাসে। তাদের দেখে শুনে ছাত্র বলেই মনে হয়েছিল অনাদিপ্রসাদের। একটা গভীর আশঙ্কায় তাঁর মন দুলে উঠল।

প্রতিশোধ?—রক্তের বদলে রক্ত?

প্রতিবাদ?—আইনের বদলে বেআইনী কাজ?

নিজের অজান্তে কাঁধের ঝুলিটা অনাদিপ্রসাদ শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। এই ক' মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল— নতুন এক মহাভারত। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ, ন্যায় আর অন্যায়ের লড়াই। আজও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রেরা আছেন যাঁরা রাষ্ট্রের মুঠিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চান, দেহে মনে অশক্ত হওয়া সত্ত্বেও। রাষ্ট্রকে সিংহাসনকে, গদীকে আঁকড়ে ধরার এই যে লোভ, এই তো ধৃতরাষ্ট্রের ট্র্যাজেডীর কারণ। অন্যায় কাজ করছে জেনেও পুত্রদের প্রতিটি দুষ্কার্যকে সমর্থন করে গেছেন। নীরব হয়ে থেকেছেন ভীষ্ম দ্রোণের মত মহারথীরাও, শুধু মাত্র কৌরবদের দাপটে। আজকের এই যে শহরের উচ্ছৃঙ্খলতা—এও তো সহ্য করে যাচ্ছে সৎ নাগরিকেরা, শুই,

কেউ তো এসে প্রতিবাদ করছে না। কোথায় সেই সমাজবিরোধী নেতারা, কেন তারা বোঝাচ্ছে না এই বাউণ্ডুলে ছেলেদের—তোমরা যা করছ তা ধ্বংসের কাজ অন্যায় কাজ। তবে কি অনাদিপ্রসাদ একলা এগিয়ে যাবেন, সোচ্চার প্রতিবাদ জানাবেন—বলবেন এ অন্যায়, এ পাপ।

একটা হই হই শব্দ শোনা গেল। সবাই ছুটতে লাগল, পুলিশ আসছে। যদি পুলিশের ভয়ে ছুটে পালাও, তবে কি করে তোমরা নতুন সমাজ গড়বে। কই, ক্ষুদিরাম-যতীন-সুভাষের দল তো পুলিশের ভয়ে ছুটে পালায় নি। নির্ভীক, নিষ্কম্প্র বক্ষে এগিয়ে গেছে বীরের মত, প্রতিবাদ করেছে অন্যায়ের। তোমাদের এত ভয় কেন? তোমরাই না দিগন্তের দ্বার খুলে দেবে এই জীর্ণ, পচা, পুরাতন, সব কিছু ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? ছি, ছি, এত ভীতু, এত কাপুরুষ তোমরা? নিরীহ পথচারীদের শাসিয়ে তাদের জীবনযাত্রা তছনছ করে দিতে পার, আর পার না এই সব পুলিশদের ঠেকাতে!

এক গলির ভেতর থেকে এক ঝাঁক ইট-পাটকেল এসে পুলিশদের গাড়ির উপর পড়ে। সবাই ছুটছে এদিক-ওদিক। অনাদি-

একটি সূর্য গ্রহণের ৩৭ সেকেণ্ড

পাশ্চাত্যে সেকাল আজ বহুদিন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে যখন লোকে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণকে রাহুর গ্রাস বলে মনে করত। চন্দ্র গ্রহণের চেয়ে সূর্য গ্রহণকে তখন মানুষ অনেক বেশি অশুভ লক্ষণ বলে ভয় পেত। আজও আমাদের দেশে সেই কুসংস্কার মুছে যায়নি। তাই গ্রহণের সময় ধর্মভীরু লোকেদের বাড়িতে রান্নাবান্না বন্ধ থাকে এবং গ্রহণ কেটে যাবার পর অনেকে গঙ্গা-স্নান করে। আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার বা তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গিকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই করার কোন চেষ্টা নেই বলেই এই সব কুসংস্কার আজও জনমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মানুষ সভ্যতার আদিকালে বিজ্ঞানের যে শাখাটি নিয়ে সর্বপ্রথম চিন্তা শুরু করে, সেটি হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। পৃথিবীতে বসে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এই সব পরিদৃশ্যমান জিনিসগুলির দিকে একাগ্রচিত্তে মানুষ তাকিয়ে থাকত, ভাবত সেগুলির অন্ত-র্নিহিত রহস্যের কথা। সেই যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান কোন বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ছাড়াই এতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছিল যে জ্যোতিষীরা গণনা করে কবে গ্রহণ হবে তা বলে দিতে পারতেন। এমন বহু গ্রহ নক্ষত্রের নাম ভারতের পুরাণে ও বেদে পাওয়া যায় যেগুলি গত শতাব্দী থেকে আমরা নতুন করে চিনতে শিখছি, যেমন **কন্যা নক্ষত্র** (ভির্গো), দক্ষিণ আকাশের **সর্বপ্রধান নক্ষত্র** 'আলফা সেণ্টাউরী' এবং তার পরবর্তী বিটা সেণ্টাউরী, **বরুণ গ্রহ** (নেপচুন), **বারুণী গ্রহ** (ইউরেনাস) ইত্যাদি।

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের চরিত্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। পৃথিবীর যেখানেই চাঁদ পরিদৃশ্যমান থাকে (রাত্রে) সেখানেই গ্রহণ লোকে দেখতে পায় কারণ পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে পূর্ণ আবৃত করে। সূর্য গ্রহণ হয় চাঁদ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে যায়। তখন সে পর্দার মত সূর্যকে আড়াল করে এবং তার ছায়া এসে পড়ে পৃথিবীর গায়ে। কিন্তু মহাশূন্যে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী কেউই একদণ্ডও থেমে থাকে না। তারা সদাসর্বদা গতিশীল। তাই

মাইক্রোতরঙ্গ পরীক্ষার সাজসরঞ্জাম

সূর্য গ্রহণের সময় চাঁদের ছায়া অতি দ্রুত-বেগে পৃথিবীর উপর দিয়ে আঁচল বুলিয়ে চলে যায়। সেই জন্য সূর্য গ্রহণ শুধু সেই সব জায়গা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যেখানে চাঁদের ছায়ার সংকীর্ণ অংশ (অর্থাৎ কলার ছায়া) পৃথিবীর উপর এসে পড়ে। পৃথিবী চাঁদ ও সূর্যের মধ্য বিন্দু যখন এক সরলরেখা বরাবর আসে তখনই হয় সূর্যের পূর্ণগ্রাস এবং তখন চাঁদ আমাদের অনেক কাছে আসে বলে সূর্যের চেয়ে তাকে বড় দেখায়। কিন্তু আর একটি অসাধারণ ব্যাপারও ঘটে যা সচরাচর দেখবার সৌভাগ্য হয় না। সেটির নাম হচ্ছে **বলয় গ্রাস** (অ্যানিউলার ইক্লিপ্স)। তখন চাঁদকে আর আয়তনে সূর্যের সমান দেখায় না, দেখায় অনেক ছোট এবং চাঁদ তখন সূর্যের সমস্তটা আড়াল করতে পারে না বলে আবৃত করে সূর্যের মাঝ-খানে বৃত্তাকার একটি অংশ যার সবদিক থেকে সূর্যের কিনারার জ্যোতিরেখা দেখতে পাওয়া যায়। আর চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবিন্দু সংযোজক সরলরেখার পাশ কাটিয়ে চলে যায় তখন হয় সূর্যের **খণ্ড গ্রাস**। সূর্য গ্রহণের সংখ্যা চন্দ্র গ্রহণের তুলনায় অনেক কম এবং একই জায়গায় দুবার পূর্ণ গ্রাসের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

সূর্য পর্যবেক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে উপ-যোগী হচ্ছে গ্রহণের সময়। তাই যখনই সূর্য গ্রহণ হয় তখনই বিভিন্ন দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সোৎসাহে সাজসরঞ্জাম নিয়ে সেই জায়গায় হানা দেন যেখান থেকে গ্রহণটি পরিদৃশ্যমান হবে। এই মাস দুয়েক আগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়ে গিয়েছে যা ছিল পূর্ণ এবং বলয় গ্রাস। সেই গ্রহণ পূর্ণ দৃশ্যমান হয়েছিল সাইবিরীয়ার এক সুদূর পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায়। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞান-সেনানীরা দূরদূরান্তর থেকে সেখানে গিয়ে হাজির হন গ্রহণের সময় সূর্য পর্যবেক্ষণ ও গ্রহণকালীন ফটো তোলবার আশায়। সেই অভিযাত্রীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন মিঃ প্যাট্রিক মুর 'নিউ সায়েণ্টিস্ট' পত্রিকায়। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ এই প্রবন্ধে পরিবেশন করছি।

তাঁরা যেখানে গিয়েছিলেন সেই

জায়গাটির নাম উর্গামাংশ্। সেখান থেকেই ওই বলয় গ্রাসটি সবচেয়ে ভাল করে দেখা যাবে এটা জেনে তাঁরা সেখানে যান। কিন্তু তাঁরা এও জানতেন যে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর দিয়ে ১৭০ মাইলের মত বয়ে যেতে যতটা সময় লাগবে ঠিক ততটুকু সময়ই হবে

পূর্ণ গ্রাসের মেয়াদ। গ্রহণের তারিখ ছিল ২২শে সেপ্টেম্বর। সময় ছিল সাইবিরীয় সময় বিকাল ৪টে ১৯ মিনিট (ব্রিটিশ "স্ট্যান্ডার্ড টাইম" অনুসারে বেলা ১২টা ১৯ মিনিট) উর্গামাংশ সাইবিরীয়ার কুর্গান শহর থেকে ৫০ মাইল এবং সেখানে

একটি শিক্ষাশিবির আছে। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়লেন। অভিযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ৪ জন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যাদের নেতা হলেন কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রেনাল্ড ম্যাডিসন, ফ্রান্স থেকে ডঃ লাফিনের

নেতৃত্বে ৩ জন বিজ্ঞানী, সুইজারল্যান্ড থেকে ২ জন, ইতালী থেকে যাঁরা যান তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সূর্যের জ্যোতির্মণ্ডল বা ছটা মুকুটের ফটো তোলা (নেতা ডঃ সিমিনো), হল্যান্ড থেকে ২ জন, আমেরিকা থেকে ১২ জন যাঁদের লক্ষ্য ছিল সূর্যের ছটা মুকুটের (করোনা) দীপ্তিমিতি (ফটোমিতি), এবং রুশ বিজ্ঞানীরা দলে বেশ ভারি ছিলেন। মার্কিনদের পুরোধা ছিলেন ডঃ আর্নকুইস্ট ও ডঃ পিটার্সন। রুশ দলের পুরোধা ছিলেন পুলকোভো মানমন্দিরের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ প্লোভিজেন্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ভার্দলফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রোজাভস্কি, ডঃ রোমাশিন, ডঃ জাকারোভা, ডঃ তোকারেভা ও আরো ৬ জন ছাত্র. কীয়েফ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ভুসেথ্সভিয়াৎস্কি ও ১২ জন বিজ্ঞানী এবং ডঃ স্তুপিনের নেতৃত্বে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন বৈজ্ঞানিক এবং আর্মেনিয়া থেকে আচার্য হেজুরিয়ন্নের নেতৃত্বে আরো ৩ জন। মার্কিন ও ইতালীয় বৈজ্ঞানিকদেরও প্রধান লক্ষ্য ছিল সূর্যের ছটা মুকুটের দীপ্তিমিতি। ব্রিটিশ দলের পরিকল্পনা ছিল গ্রহণের আদ্যন্ত ফটো নেওয়া, কিরণ স্ফুরণের (ফ্ল্যাশ) বর্ণছত্রের ফটো তোলা, ধ্রুবতেজমাপক যন্ত্রের দ্বারা ছটা মুকুট পরীক্ষা করা, সূর্যের নিকটবর্তী কোন ধূমকেতু থাকলে সেটি পর্যবেক্ষণ করা। প্যাট্রিক মুরের নিজের এই ধূমকেতু সন্ধানের ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়াভাবে তিনি সাজসরঞ্জাম নিয়ে যেতে পারেননি। তবে তিনি এটা ভেবে সান্ত্বনা পেয়ে থাকবেন যে সেদিন কোন ধূমকেতুর হদিস মেলেনি। স্ভার্দলফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযাত্রীদলও ছটা মুকুটের ছবি তুলতে গিয়েছিলেন। কীয়েফের দলটির অভিপ্রায় ছিল ছটা মুকুটের অভ্যন্তরীণ স্তরের গঠন ও চৌম্বক ধর্ম পরীক্ষা করা। এবারকার এই আন্তর্জাতিক অভিযানের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যস্থল ছিল সূর্যের ছটা মুকুট যা বলয়গ্রাসের সময় সবচেয়ে ভালভাবে দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। ব্রিটিশরা এমন ক্যামেরা নিয়ে যান যেগুলি পূর্ণ গ্রাসের সময় সেকেন্ডে ৪৭টি এবং বাকি সময় মিনিটে ৪৭টি ছবি তুলতে পারে।

সাইবিরীয় সময় যখন বেলা সাড়ে এগারোটা তখন হঠাৎ আকাশে কোথা থেকে মেঘ উড়ে এসে জমা হতে লাগল। বিজ্ঞানীরা শংকিত বোধ করলেন—মেঘই শেষে হয়ত বাদ সেধে এত মেহনত ও অর্থব্যয় পণ্ড করে দেবে। কারণ এই ধরনের ব্যাপার বহুবার ঘটেছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুপুরের পর থেকে মেঘগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে যখন একেবারে উধাও হয়ে গেল তখনই সূচনা হলো গ্রহণের। তার মানে তখন

বলয়গ্রাসের ফটো

৪টে বেজে গিয়েছে। ঝরঝরে নির্মল আকাশে সূর্যগ্রহণ পরীক্ষা করার পূর্ণ সুযোগ পেলেন বিজ্ঞানীরা।
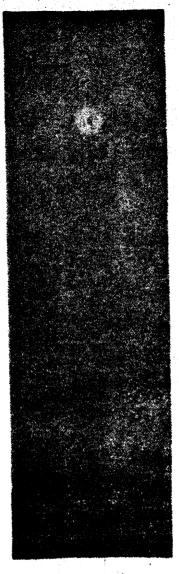
সৌরমণ্ডলের উপর দিয়ে চাঁদ যেমন ভেসে যেতে লাগল সেই অনুপাতে বেড়ে চলল শীত ও আঁধার। পূর্ণ বলয় গ্রাসের মেয়াদ হিসাবমত মাত্র ৪৩ সেকেন্ডে হওয়ার কথা। সুতরাং নষ্ট করবার মত এক পলকও সময় ছিল না। সৌরকলা যত ছোট হয়ে আসতে লাগল মিঃ মুর ততই দূরবীন লাগানো ক্যামেরা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন ওই কলার মধ্যে কোন ছায়া-রেখা আছে কিনা। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর যখন পূর্ণগ্রাস এসে পড়ল তখন কেউই তার প্রত্যাশা করেননি, কারণ তার সাত সেকেন্ড আগেও বর্ণমণ্ডলের ভিতরের স্তর এবং একটি বিশাল উদ্গতাংশ (প্রোটিউবারেন্স) দেখা যাচ্ছিল। পূর্ণগ্রাস অত অল্প সময় থাকে বলে যে বিজ্ঞানীরা সেই সময়কার ছবি তুলতে যান বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে যান তাঁদের সূর্যের সেই অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করার মত সময় হাতে থাকে না। যাই হোক পূর্ণ বলয়-গ্রাস হতেই বর্ণমণ্ডল ও ছটা মুকুটের কিরণ-স্ফুরণ তাঁরা চমৎকারভাবে দেখতে পেলেন এবং দেখলেন যে সেই সামগ্রিক দৃশ্যের উপর একটি অদ্ভুত সুন্দর লোহিতাভ উদ্গতাংশের লোলজিহ্বা কি রকম প্রাধান্য লাভ করেছিল। যখন সৌরকলঙ্ক সর্বাধিক মাত্রায় ওঠে তখন ছটা মুকুট যেমন দেখায়, পূর্ণগ্রাসের সময়ও সেইরকমই দেখাচ্ছিল। তবে অতীতের বহু সূর্যগ্রহণের তুলনায় এবারকার গ্রহণের সময় ছটা মুকুটের পরিদৃশ্যমান অংশটির পরিব্যাপ্তি। কিছু কম মনে হয়েছে, কারণ কোন সময়ই আকাশ পুরোপুরি অন্ধকারে আবৃত হয়নি এবং হয়নি বলেই বিজ্ঞানীরা গ্রহণের সময় বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহ এবং 'স্পাইকা' ও কলম নক্ষত্রসমেত কতকগুলি জ্যোতিষ্ক দেখতে পাচ্ছিলেন। যাই হোক মিঃ মুর বলছেন যে, পূর্ণগ্রাসের সময় তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে সম্ভবত সন্ধ্যা হয়েছে ভেবে খেতখামারে ও গোয়ালে গরু-বাছুরেরা শুয়ে পড়েছিল।

পূর্ণগ্রাসের আবির্ভাব যেমন অকস্মাৎ হয়েছিল তার তিরোধানও হলো ঠিক সেইরকমই প্রত্যাশিত সময়ের ৬ সেকেন্ড আগে। সূর্যমণ্ডলের প্রথম কলাটি যখন চাঁদের অন্তরাল থেকে বার হয়ে এল, মনে হলো আকাশে যেন একটি হীরার অংটি ঝকমক করে উঠল এবং ক্রমশ তার আভা যত বাড়তে লাগল ততই ম্লান হয়ে যেতে লাগল ছটা মুকুট ও বর্ণমণ্ডল। তারপর রাঙা উদ্গতাংশটিও উধাও। শেষ পর্যন্ত হিসাব করে দেখা গেল যে বলয়গ্রাসটির ৪৩ সেকেন্ড থাকবার কথা সত্ত্বেও সেটি শেষ হয়ে গেল ৩৭ সেকেন্ডের মধ্যে, কারণ চাঁদের একটি অবনমিত অংশের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো এপাশে চলে আসে সময়ের আগেই। তবুও বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে তাঁদের হাজার হাজার মাইল দূর থেকে শুধুমাত্র ৩৭ সেকেন্ডের দৃশ্য পরীক্ষার জন্য আসা ষোল আনা সার্থক হয়েছে। উপরে যে পরীক্ষাগুলির কথা বলা হয়েছে তা ছাড়াও ডঃ মাগিলেভস্কি আয়নমণ্ডল ও মাইক্রোতরঙ্গের উপর সূর্যগ্রহণের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেন।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

MAFATLAL GROUP
সেই পুরোনো ম্যাটমেটে
চেহারা গেল কোথায় ?
একেবারেই বিদেয় হয়ে গেছে !
ঘরের চেহারা একেবারে বদলে
দিয়েছে মফৎলাল গ্রুপের ঘর
সাজাবার কাপড়। নানা
রকমারি ডিজাইনে পাবেন—
অপরূপ রঙবেরঙে।
আপনার ঘরের জন্য আপনার
পছন্দমত যেটি খুসী বেছে নিন।
মফতলাল
গ্রুপ–এর
ঘর সাজাবার কাপড়
নিউ শরক (শরক) আমেদাবাদ • নিউ শরক, নদিয়াদ • ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বোম্বাই • ষ্ট্যাণ্ডার্ড (নিউ চায়না) বোম্বাই • ষ্ট্যাণ্ডার্ড, দেওয়াস • সাসুন, বোম্বাই • সাসুন (নিউ ইউনিয়ন) বোম্বাই • সুরাট কটন, সুরাট • মফতলাল ফাইন, নওসারী • মিহির টেক্সটাইলস, আমেদাবাদ

কলকাতার হালখাতা

দুঃসাহসিক হীরে চুরি

পুলিশের থানা মনুষ্যজাতীর জন্য। তাদের মধ্যে কেউ অসামাজিক কাজ করলে থানার পেয়াদা মারে, কিন্তু মনুষ্য ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর অপরাধে এই সংস্থা নীরব থাকে। সেই জন্য আপনি আমি বেড়াল মাছ খেয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে ডায়েরি করতে পারি না, রাস্তার মাঝখানে গরু হিসি করলে আইন হয় না, এমন কি কোনো হনুমান যদি কোনো মহিলাকে বলাৎকার করে তা হলেও তার শাস্তি নেই। কিন্তু আমাদের এই আইন খুবই শিগ্‌গির বদল করবার সময় এসেছে, বিশেষত এই কলকাতায়, কারণ মানুষের এই ডাকো-মানবীয় সুযোগ নিয়ে এই শহরের পশু-পক্ষীরা জঘন্য সব রাহাজানিতে লিপ্ত এখন। পার্ক স্ট্রীট, সদর স্ট্রীটের ডাকাতির পর তৃতীয় যে কাণ্ডটা ঘটে গেল ওই অঞ্চলেই সে খবর দৈবাৎ জানতে পারলুম, কোনো খবরের কাগজে তো বেরুলোই না, কোনো মামলা তো উঠলই না তা নিয়ে, এমন কি যাদের বাড়িতে ঘটল ব্যাপারটা তারাও তেমন কেন মুখর হলেন না ব্যাপারটা নিয়ে—অথচ সে বাড়ির গৃহ-কর্ত্রীকে কতই না কোপপরায়ণ, শোকসন্তপ্ত এবং উত্তেজিত দেখেছিলুম তার কয়েক দিন আগেই যখন গৃহভৃত্য তাঁর তিনটি স্কেট আর একটি শাড়ি নিয়ে উধাও হয়েছিল। এসব দেখলে মনে হয় যেন এই শহরে জন্তু হয়ে জন্মালুম না।

৫২ নম্বর বাড়ি, পার্ক স্ট্রীট ওয়েলেসলির মোড়ে, দোতলার ফ্ল্যাটে একটি সুখী পাঞ্জাবী পরিবার বাস করে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা, দরজা খোলে একটি ঝকঝকে ঢাকা বারান্দায়, প্রায় ঘরই বলা চলে, শুধু এক দিকটা খোলা। এইখানে বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে, মাঝে একটি সেন্টার টেবিল। বাড়িতে ছ'জন বাস করে; বাবা, মা, একটি চোদ্দ বছরের ছেলে এবং তার তিন দিদি। রূপ লাবণ্য গরিমায় তিন বোনই প্রীতিসঞ্চারী, একজন এখনও ছাত্রী, দু'জন ওসব পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্ত। এই পরিবারে সম্প্রতি এক ডাকসাইটে রাহাজানি হয়ে গেল, এমন এক সময় যখন সেই বাড়িতেই আমি উপস্থিত।

আমি সে বাড়িতে এমনি বেড়াতে গিয়ে-ছিলাম সকালবেলা, গিয়ে দেখলুম যার কাছে গিয়েছিলুম সে নেই তার এক দিদি বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, তবে শিগ্‌গিরি ওরা আসবে, বোনেদের একজনের বিয়ে তার কেনাকাটায় কাছাকাছি এক গয়নার দোকানে গিয়েছে। আমি বসে বসে ওর দিদির সঙ্গে গল্প করছিলুম এমন সময় সিঁড়িতে পদ-শব্দ, বোঝা গেল ওরা এসে পড়েছে। দু'হাত ভর্তি জিনিস নিয়ে মা এবং মেয়ে প্রাথমিক সম্ভাষণ, রসিকতা, হাসি-ঠাট্টার পর, জিনিস দেখার পর্ব আরম্ভ হল—আমরা ঢাকা বারান্দা-ঘরে, উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে, একের পর এক শাড়ি খুলে ওদের মা আমাকে দেখাচ্ছেন, আর আমি বিউটিফুল, ওয়াণ্ডারফুল, লাভ্‌লি এইসব বিশেষণে ভূষিত করছি শাড়িদের এবং তাই শুনে তিনি মাঝে মাঝেই মেয়েদের বলছেন "You see Mouli has আচ্ছা taste"।

—যেন [illegible] যখন শাড়ি দেখার পালা চলছে, বিরক্তি ক্লান্তিতে পরিণত, বান্ধবীটিও এই কথা বুঝে মাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছে, তখন আমি একটু ফেটালিস্ট হয়ে পড়ি, গট্ করে বলে বসি, এবার গয়নাও দেখাবে নাকি? এ কথা আমার মুখ থেকে বেরুলো সার সার, মহিলা আমার ঠাট্টা না বুঝে একেবারে বাক্সের পর বাক্স গয়না নিয়ে আসতে লাগলেন, হার, মানতাসা, ব্রেস-লেট, মালাচুর (এ নামে কি গয়না আছে?) নানা রকম, সে আমি নামও জানিনা এমন সব জিনিস পটাপট বাক্সখুলে আমাকে দেখাতে লাগলেন—এবং কোনটার কত দাম এবং কত ভারি আমি সবই কিছু-ক্ষণের মধ্যে জেনে ফেললাম। সোনাদানার পাট চুকলে আমি ভাবলুম এই শেষ, মেয়েরাও তাই ভেবে অন্য কথা আরম্ভ করল, ভদ্রমহিলা হঠাৎ ফিরে এলেন আবার, হাতে ছোটো একটি বাক্স, বললেন তোমায় যখন সবই দেখালাম সব চাইতে দামী জিনিস যেটা আমার মেয়েকে দেব সেটা দেখাই। বাক্স থেকে হাল্কা কাগজের মোড়ক খুলতেই ঝলমলে তিনটে হীরে চোখে পড়ল, সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার জোগাড়, শুনলাম এই হীরে-গুলোর এক একটি তিনি এক এক মেয়েকে দিয়েছে দেবেন, সাংঘাতিক নাকি এদের দাম, বহু আগে কেনা, এরকম নাকি এখন পাওয়াই যায় না।—ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে ডাকাডাকি, খাবার টেবিলে দেওয়া হয়েছে, তাড়াতাড়ি না এলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। জিনিসপত্রগুলো টেবিলের ওপর রেখে খেতে আসা হল।

আমরা খেতে বসেছি, নানা কথাবার্তা হচ্ছে, হঠাৎ ছোট মেয়ে চিৎকার করে ওঠে, "মা, কাক যেন কী নিয়ে গেল ও-ঘর থেকে!"—মুহূর্তের ব্যাপার, আমরা উঠে এসেছি দৌড়ে, কাকটা কার্নিশে বসেছে, মুখে সেই কাগজের মোড়ক যার মধ্যে হীরে তিনটে, আমাদের হাউমাউ শুনে সে একবার ডাকলো, তারপর হুস করে উড়ে গেল। ভদ্রমহিলার তখন পাগলের মত অবস্থা, প্রায় উন্মাদের মত তিনি চিৎকার করছেন "help! help! ডাকু! ডাকু", মেয়েদের একজন দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে দৌড়ে, আরেকজন কাঁদছে আর দাপাচ্ছে, এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। আমি বারান্দা দিয়ে চেষ্টা করলাম কাকটাকে চোখে রাখতে, কিন্তু সেটা উড়ে একটা বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। আমি একটা ঝুল-ঝাড়ু নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, আমার পেছনে দুই বোন খালি পায়ে আলুথালু বেশে লাঠি নিয়ে, ওদের মা একটা খুন্তি নিয়ে,

আমরা রাস্তা দিয়ে, ভিড়াক্রান্ত পার্ক স্ট্রীট দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। রাস্তার লোকেরা সবাই জিজ্ঞেস করছে, "কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া", অনেকে জুটে যাচ্ছে, অনেকে হেসে ফেলছে, অনেকে বলে ফেলছে, এত্তো ট্রেইনিং দেওয়া বাজ, অবস্থাসাতারে করে চলে গেছে—সমস্ত রাস্তার এলাহি ব্যাপার।

রোদ্দুরের মধ্যে ছোটাছুটি করা অর্থ-হীন, অবশেষে আমরা বাড়ির দিকে ফিরতে থাকি, ভদ্রমহিলা কাঁদছেন, মেয়ে দুটি কাঁদছে, আমি এই সুযোগে একজনকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছি—কী আর করা ফিরে আসা হল। বাড়ি এসে মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটার বিষয়ে কোনো ডায়রি করা যায় না? আমি বললুম, মনে তো হয় না, চীন দেশ হলে এক্ষুনি হয়তো আদেশ হয়ে যেত সব কাক মেরে ফেলবার কিন্তু আমাদের পুলিস কি আর অত তৎপর? ভূমিচর প্রাণীর মধ্যে মানুষ, মানুষের মধ্যে যুবামানুষ এবং যুবামানুষের মধ্যে ছাত্রসম্প্রদায় এই সামান্য অংশকেই তাদের বাগে রাখতে. খাস হয়ে যেতে হয়, সেখানে কাক পক্ষীকে ধরতে

হলে তো একেবারে কান্নাকাটির ব্যাপার হয়ে যাবে। ভাবনে এরকম কেস হাতে নিলে প্রত্যেক পুলিসকে জানতে হবে গাছে চড়া, থানায় রাখতে হবে শ'য়ে শ'য়ে হেলিকপ্টার, চিনতে হবে প্রত্যেক কাকের চেহারার তফাত, সে ভাবাই যায় না।—অতএব ভদ্রমহিলাকে আমি কোনো সাহায্যই করতে পারলুম না তাঁর মেয়েদের একটু সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া।—এবং যেহেতু কাকে করেছে খবরের কাগজেও বেরুলো না কিছু, যদিচ খবরের সংজ্ঞা অনুসারে যা কিছু স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত তাই খবর। ডাকাতি মানুষেই করে থাকে অতএব সেটা খবরই নয়, সেটাই খবর যখন মনুষ্যজাতি বহির্ভূত কেউ তা করে।

ভুয়ো ফিল্ম

আমার এক সদ্য পরিচালক বন্ধু মারফৎ যাকেই সিনেমা জগতের নানান মজার খবর শুনিয়ে থাকি তার কাছেই সেদিন শুনেছিলাম ভুয়ো চিত্রপরিচালকদের কথা।

কলকাতায় ঠিক পুজোর আগে আগে অনেক মফস্বলের যুবক ছেলে ফিল্ম করবে বলে চলে আসে, বাবার হয়তো ধানকল, বহু জমিজমা, চালকল—ছেলে বম্বাই ছবি দুচারখানা দেখেছে, রাত্রে স্বপ্ন দেখে উত্তমকুমারকে, ধ্যান জ্ঞান মাধবী, তনুজা, হেলেন—বন্ধুবান্ধব বলে তোর চেহারার সঙ্গে বিশ্বজিতের দারুণ মিল—নিজের ধারণা কলকাতায় একবার যেতে পারলেই হল, তারপর আর পায় কে, এই রকম কিছু অপাপবিদ্ধ যুবক বাবার কাছ থেকে হাজার কুড়ি টাকা নিয়ে সিনেমা করবে বলে কলকাতায় চলে আসে। পুজোর ঠিক আগে আগে, এই সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ।

টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলোতে নানান লোকের যাতায়াত, এমন অনেক দল আছে যাদের হয়তো কোনো কাজই জোটে না, পরিচালকটি ১৯৫৫-র পর আর কোনো ছবিরই কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে না, ক্যামেরাম্যান এক সময়ে উঠেছিল, দাপাদাপি করে এখন আর কাজ নেই—এই দলগুলো সাধারণত উক্ত বর্ণিত ব্যক্তিদের ধরে। এইসব দলের দালাল আছে, তারা খোঁজ আনে কে সিনেমা করবে বলে টাকা নিয়ে বসে রয়েছে, কাকে দোহন করা যায়, ধাপ্পা দেওয়া সম্ভব।

দালাল দু' দিন "পার্টি"কে নিয়ে বড় রেস্তোরাঁর খাদ্য পানীয়ে আপ্যায়ন করল, বোঝাল তাকে যে অত্যন্ত অভিজ্ঞ পরিচালক তার হাতে আছে, তবে রাজি নাও, হতে পারেন এত অল্প টাকায়, আমি দেখি চেষ্টা করছি ম্যানেজ করবার, যদি একে পাওয়া যায় আপনার কুড়ি হাজার টাকায় তিন লাখ 'return' পাবেন।—কয়েকদিন পরে পরিচালক আবির্ভূত হন, বলেন ঠিক আছে আমি ছবি করব, "হিরো" আমি উত্তমকেই নেব, "হিরোয়িন" ভাবছি মাধবী, আপনি চিন্তা করবেন না। তারপর বলে গল্প আমার হাতেই আছে, আপনিও একটা ছোট রোল করে দেবেন কিন্তু।—যুবকটি মফস্বলের ছেলে, পরিচালকের বোলবোলাও এবং সিনেমা স্টার হবার রঙিন স্বপ্নে সে মাতোয়ারা, ক্রমেই সে এদের হাতের পুতুল হয়ে যেতে থাকে। পরিচালক একটা ভুয়ো কন্ট্রাক্ট সই করায়, প্রথম খেপেই পাঁচ শো টাকা নেয় স্টুডিও ইত্যাদি বুক করবার জন্য, দিন ঠিক আউটডোরের দিন সাতেক পরে। ইতিমধ্যে ছেলেটিকে নিয়ে প্রত্যহ বার, রেস্টুরেণ্ট, কাবারেতে সন্ধে উদ্‌যাপিত হয়, আলাপ হয় সিনেমার একস্ট্রাদের সঙ্গে, প্রত্যেকেই "রাইসিং স্টার", "সাইড রোল" করবে। এই সব মেয়েদের পরিচালক শিখিয়ে দেয় আমাদের তরুণ প্রযোজকের সঙ্গে ফ্লার্টিং করতে; তার মাথা একেবারে ঘুরে যায়। মেয়েরা যখন ভোর না হতেই ফোন করতে থাকে, যখন-তখন বলে "চলে আসুন", সাইট দেখতে যাওয়া হয় ডায়মণ্ড হারবার, কাকদ্বীপ, ক্যানিং। ছেলেটি ভাবে এই লাইন শুধুই মজার। ইতিমধ্যে তার কুড়ি হাজারের মধ্যে হাজার পাঁচেক গলে গেছে, কত প্রস্তুতি, কত অ্যাডভান্স ইয়ত্তা নেই—ইতিমধ্যে পরিচালক বলে গেছে উত্তম ডিসেম্বরের আগে ডেট দিতে পারছে না, মাধবীও তাই, এই যে পাওয়া গেছে তাই ভাগ্যের, এখন আউটডোরগুলো সেরে ফেলি। এখন যুবা-প্রযোজক ফিল্মের বিরাট লোক, তাকে ঘিরে প্রতিদিন আলোচনা, সে ইণ্ডাস্ট্রি, স্ক্রিপ্ট, শট, ফুটেজ এই সব কথা ব্যবহার করছে, পাঁচটা স্যুট বানিয়ে ফেলেছে, মদ্যপান অভ্যাস চলছে, একেবারে 'হিরো'।

কলকাতায় ভাল ক্যামেরা ভাড়া করা যায় সেই ক্যামেরা পাঁচ টাকা দিয়ে ভাড়া করে পরিচালকের পরিচিত এক বাগানবাড়িতে প্রথম আউটডোর শুটিং ঠিক হয়—সেই প্রস্তুতির জন্য আরো পাঁচ হাজার টাকা চাই, ভুয়ো ভাউচার দেখিয়ে সেই টাকা আদায় হল। বাগানবাড়িতে একস্ট্রাদের নিয়ে ভুয়ো শুটিং চলল, প্রযোজকও অভিনয় করলেন, মেয়েরা তাকে ছেঁকে ধরেছে, প্রচুর খাওয়া দাওয়া, মদ্যপান এবং মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো হল—পরিচালক বললেন আপনার ফিল্ম জানুয়ারিতেই শেষ হয়ে যাবে, যেভাবে কাজ হচ্ছে আপনি লাল হয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে পুজো এসে গেছে প্রায়, গলে গেছে প্রায় হাজার পনেরো টাকা। ঠিক হল পুজোর কদিন কাজ বন্ধ, তারপর বাকি কাজ।

পুজো কেটে গেল পরিচালকের দেখা নেই, নায়িকারা আর ফোন করে না। যুবকটি এদিক-ওদিক করতে থাকে, কেউই বাড়িতে থাকে না—স্টুডিওতে গেলে শোনে এই তো ছিল, বেরিয়ে গেছে বোধ হয়—হয়তো সেই সব মেয়েদের কারুর সঙ্গে দেখা, উৎসাহ ভরে এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী ফিল্মের কদ্দুর, মেয়েরা ঠাণ্ডাভাবে বলে, আমরা জানিনা পরিচালককে জিজ্ঞেস করুন। এদিকে "ইউনিট" হাওয়া।—বহু চেষ্টার পর একদিন হয়তো পরিচালকের সঙ্গে দেখা মেলে—"কী ব্যাপার আপনার দেখা নেই?"—"দেখা কেন পাবেন না! একটু ব্যস্ত ছিলাম। পরের শুটিং-এর জন্য হাজার দশেক টাকা এক্ষুনি দরকার, এনেছেন?"—"সেকি আপনি যে বললেন কুড়ি হাজার টাকায় হয়ে যাবে! আমার তো আর হাজার তিনেক আছে মাত্র! আপনি বলছেন কি?"—পরিচালক হো হো করে হেসে ওঠে, "ফিচার ফিল্ম" করবেন কুড়ি হাজার টাকায়? আমি বলেছিলাম ইনি-সিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট। টাকা যোগাড় করুন, অন্তত এ মুহূর্তে দশ হাজার, না হলে কাজ আটকে থাকবে—আমি তো আছি টাকা যোগাড় হলে খবর দেবেন।"

টাকা আর নেই, যোগাড় হবে কোত্থেকে, এদিকে ধীরে ধীরে পরিচালক এবং দলবলেরা উধাও, ছেলেটি কয়েকদিন শহরে ইতিউতি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরে, অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে একদিন ট্রেনে উঠে বসে।

মৌলিনাথ

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারিতে সম্প্রতি সমসাময়িক ফরাসী ট্যাপেস্ট্রি অর্থাৎ কারুকার্যশোভিত আবরণ-বস্ত্র-শিল্পের এক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। শিল্পকলার তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ ললিতকলা অ্যাকাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ কলা অ্যাকাডেমি ও অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। প্রদর্শনীতে ২২টি ট্যাপেস্ট্রি ও সেই সঙ্গে ৭টি স্টেনড্ গ্লাস অর্থাৎ রঙীন কাচশিল্পের নিদর্শনও দেখা যায়।
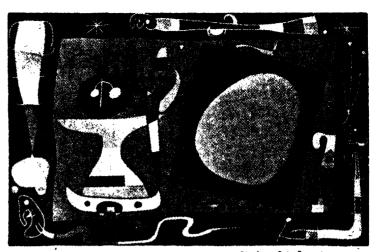
ট্যাপেস্ট্রি ফ্রান্সের পুরনো শিল্প। শীত প্রধান দেশে বাড়ির ভিতরভাগ গরম রাখার জন্যই পশমের ট্যাপেস্ট্রি জাতীয় আবরণ দেওয়াল ও জানালায় ব্যবহৃত হত এবং দেশের বয়নশিল্পীগণ পশমের নানা বিচিত্র ট্যাপেস্ট্রি রচনা করতেন। বিষয়বস্তু ছিল দেবদেবীর জীবনী বা রাজারাজড়ার প্রেমের কাহিনী। ১৫ শ' থেকে ১৭ শ' শতাব্দী পর্যন্ত এই শিল্প ফ্রান্সে জনপ্রিয়তা লাভ করে ও ইউরোপের মধ্যে সর্বপ্রথম প্যারিসেই সর্বশ্রেষ্ঠ ট্যাপেস্ট্রির নিদর্শন বোনা হয়। কালের গতি ও শিল্পধারার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে বুনন ডিজাইনেরও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। রঙ ও প্যাটার্নের দিক থেকে সমসাময়িক যুগের ট্যাপেস্ট্রি শিল্প প্রধানত বিমূর্ত শিল্পাশ্রয়ী। বলা বাহুল্য, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ আজকাল ট্যাপেস্ট্রির জন্য নানা বিচিত্র ডিজাইন এঁকে থাকেন ও বয়ন শিল্পীগণ সেগুলিই রঙীন পশমে বুনে থাকেন। ফরাসী ট্যাপেস্ট্রি আকারে বিরাট। প্রথমে এটিকে সমগ্র ডিজাইন সমেত কয়েকটি সমান্তরাল প্যানেলে বিভক্ত করে নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনমত ডিজাইন বোনা হয়ে যাবার পরে প্যানেলগুলি সূক্ষ্মভাবে পিছন দিকে সেলাই করা হয়, ফলে সম্মুখভাগে সেলাইয়ের কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। লাল, কালো ব্রাউন নানা রঙের বিচিত্র প্যাটার্ন ও কারুকার্যের জন্য প্রদর্শনীর প্রত্যেক ট্যাপেস্ট্রিকেই উচ্চাঙ্গের বিমূর্ত শিল্পনিদর্শন বলে মনে হয়। বিশেষ করে মিরোর প্রতীকপ্রধান ও দিল্লনের জ্যামিতিক ক্ষেত্র বিশিষ্ট প্যাটার্ন সকলের চোখে পড়ে। লি কর্বুজিয়ার-এর বলিষ্ঠ কম্পোজিশন-গুণে বুভাইয়ে বোনা ট্যাপেস্ট্রিটি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকটিতে শিল্পী অপআর্টের অবতারণা করেছেন, যেমন বুভাইয়ের ভ্যাসারেলির নিদর্শন। অপরাপর ট্যাপেস্ট্রির মধ্যে স্টেল-এর কম্পোজিশন, ল্যান্সকয়-এর সুররিয়া-লিস্টিক ডিজাইন ও ক্যালডারের সোসিল রুজ (অকাসা) উল্লেখযোগ্য।

স্টেনড্ গ্লাস বা রঙীন কাচ শিল্পের উদ্ভব হয় বাইজানটাইন-এ—পরে এটি পাশ্চাত্য দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং শিল্প হিসাবে ১১ শ' শতাব্দীতে ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। বলা বাহুল্য,

মিরোর কম্পোজিশন অবলম্বনে রচিত একটি ট্যাপেস্ট্রি নিদর্শন

পেণ্টিং-৪ —অনীতা রায়চৌধুরী

গীর্জা ও বৃহৎ ইমারতের জানালায় রঙীন কাচ ব্যবহৃত হত। বাহির্দিক থেকে আলোক-প্রভা প্রকাশ কালে রঙের বিচিত্র কারুকার্য সৃষ্টি করাই রঙীন কাচ শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম যুগে বিভিন্ন আকারের ছোট ছোট রঙীন কাচখণ্ড বসিয়ে কারুকার্য সৃষ্টি করা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কিভাবে মোটা ও বৃহত্তর রঙীন কাচখণ্ড নানা প্রক্রিয়ায় বসিয়ে নতুন সৌন্দর্যসৃষ্টি করা হয়, প্রদর্শনীর বিভিন্ন নিদর্শন দেখে তা বোঝা যায়। বিশেষ করে, বর্তমান যুগে কাচের গুঁড়া ও সিমেণ্ট মাধ্যমে ক্ষেত্র তৈরী করে কিভাবে তারই ওপর নানা রঙীন কাচ বসান হয়ে থাকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রুয়াল এবং পিউবার্ত ও ব্যারিলের নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। তবে সৌন্দর্য ও প্রকাশভঙ্গীমার দিক থেকে পিচাতে'র পিয়েতা অপূর্ব বললে অত্যুক্তি হয় না।

*

শিল্পী অনীতা রায়চৌধুরী তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে। অনীতা রায়চৌধুরী শহরের শিল্পীমহলে অপরিচিতা নন। ইতিপূর্বে তিনি কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাইয়ে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন। এটি তাঁর তৃতীয় প্রদর্শনী ও এখানে তেলরঙে আঁকা তাঁর ১৫টি ছবির নিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পীর রচনারীতি পোস্ট-ইমপ্রেশানিস্ট ও এক্সপ্রেশানিস্ট জাতীয়। দেখে মনে হয় তিনি চাপা রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী। সমগ্র রচনাক্ষেত্রটিকে তিনি একটি রঙে ভরিয়ে ফেলে তারই উপর ছোট ছোট আঁকা বাঁকা বুরুশের আঁচড় মাধ্যমে নানা ইমেজ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। রেখাগুলি কখনও লম্বমান, কখনও সমান্তরাল, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে, আঁচড়-গুলি যেন সত্যিই বিক্ষিপ্ত। রচনারীতির মধ্য দিয়েই যেন শিল্পীর মনোভাবটুকু প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পীর চিত্ত যেন নিরন্তর চঞ্চল ও তাঁর চিন্তাধারাও বিক্ষিপ্ত। পারিপার্শ্বিক জগতের সমতা ও শৃঙ্খলা যেন তিনি সহ্য করতে চান না, তাই সব কিছুই ভেঙে ফেলতে চান। তাই তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে একটি বিক্ষিপ্ত ও বিশেষ করে ম্রিয়মাণ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে শিল্পী অবশ্যই সফলতালাভ করেছেন, কারণ মনের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা সহজ নয়। অথচ তিনি যে প্রকৃত বিমূর্ত শিল্পী তাও নয়। শিল্পীর কয়েকটি রচনা ভাল লাগে—চাপা রঙ ও ম্রিয়মাণ রচনাবৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে যেন একটি করুণ সুরের রেশ শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে ৪নং ছবি উল্লেখযোগ্য। কয়েক ক্ষেত্রে তিনি উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করেছেন, যেমন ১২ ও ১৩নং রচনা। তবে চোখে পড়লেও এগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পীর মনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ১নং রচনার নাম করা চলে। শিল্পী শক্তিশালী, কয়েকটি ছোট ছোট বুরুশ রেখার মাধ্যমে তিনি শূন্যস্থান ভরিয়ে ফেলতে পারেন। তবে এ কথা সত্যি যে, কয়েক স্থলে পৌনঃপুনিকতা দোষ দেখা যায়।

*

শিল্পী অতুল তালুকদারের প্রদর্শনী হয় অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে। শিল্পী ১৯৬৬ সালে সরকারি আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রদর্শনীতে জল ও তেল রঙে আঁকা [illegible] রচনা দেখে মনে হয় তিনি জলরঙ মাধ্যমে বক্তব্যটুকু প্রকাশ করতে পারেন। তবে সমগ্রভাবে বিচার করলে শিল্পীর সব রচনাকে রসোত্তীর্ণ বলা চলে না। তাহলেও রঙ ব্যবহারপ্রণালী দেখে কয়েক স্থলে তাঁর বৈশিষ্টটুকু ধরা পড়ে। শিল্পী কয়েক ক্ষেত্রে জলরঙ মাধ্যমে রচনাক্ষেত্রে গ্রাফিক জাতীয় কারুকার্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। ভিজে কাগজের ওপর তরল রঙ ঢেলে, ছড়িয়ে দিয়ে বা স্থানে স্থানে জমিয়ে রেখে তিনি প্রধানত একই রঙের স্তরভেদ প্রকাশ করেছেন, যেমন টু উইমেন ইন ব্ল্যাক। দুই এক স্থলে রেখার মায়াজালের মধ্য দিয়ে তিনি ইমেজের সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে রানার-এর নাম করা যায়। এটির গ্রাফিক রূপটুকু অনেকের চোখে ধরা পড়ে। একখানি রচনা উল্লেখযোগ্য—শ্যাডোজ অব ইভনিং। আলো ছায়ার সংমিশ্রণে শিল্পী ঘনায়মান সন্ধ্যার পরম পরিচিত অথচ শান্ত রূপটুকু সুন্দরভাবে ফুটিয়ে

বেকার —অতুল তালুকদার

তুলেছেন। স্কেচজাতীয় নিদর্শনগুলি মন্দ নয়। সম্মুখভাগের অঙ্কনাংশটুকু সংগত হলে 'তার থট' স্কেচটি সকলের চোখে পড়ত। তেলরঙ রচনার নিদর্শন হিসাবে ফার্টিন রেড ফ্লাওয়ারস-এ কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি।

*

সম্প্রতি সুপরিচিত শিল্পী সুনীল দাসের প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করব।

চিত্রপ্রিয়

ভালো
তামাক
থেকেই হয়
ভালো
সিগারেট

Panama
20
CIGARETTES

বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা

বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে। এই বেকার সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দেশ বিভাগের পর যে হারে উদ্বাস্তু আগমন হয়েছিল, সে অনুপাতে কর্ম-সংস্থানের সৃষ্টি করা সরকারের দিক থেকে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যখন দুর্গাপুরে ইস্পাত নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হল তখন যে হারে বাঙ্গালী-দের কাজে নিযুক্ত করা উচিত ছিল, সেই হারে বাঙ্গালীর জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ শিল্প, কল-কারখানা অবাঙ্গালীদের নিয়ন্ত্রণাধীন, স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীদের যতটা কাজের সুযোগ থাকা উচিত ছিল, ততটা নেই। প্রতি মাসে শুধু কলকাতা শহর থেকেই প্রায় ৩৬ কোটি টাকা বাইরে চলে যায়।

সম্প্রতি বেকার সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে একটি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এককালে পশ্চিম-বঙ্গের শিল্পোন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল কয়লা শিল্পের। কিন্তু বর্তমানে কয়লাই একমাত্র জ্বালানি নয়; বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি তেলের সাহায্যেও কল-কারখানা চালু রাখা সম্ভব। অন্যান্য রাজ্যে কয়লার প্রাচুর্য না থাকতে পারে, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানি তেলের সরবরাহে অন্যান্য রাজ্য (যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি) পশ্চিমবঙ্গ থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরিবহণ ব্যবস্থা, বিশেষ করে রেলপথের বিস্তারও অন্যান্য রাজ্যে বেশ দ্রুতহারে হচ্ছে। শিল্প-বিরোধও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ। পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানীস্ (Registrar of Companies) যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে দেখা যায় ১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৪০৭টি নূতন কোম্পানী রেজিস্টার্ড হয়েছিল; তার তিন বছর পর ১৯৬৪-৬৫ সালে রেজিস্টার্ড নতুন কোম্পানীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০. কিন্তু গত দুই বছর যাবত অবস্থার আরও শোচনীয় পরিণতি আমরা দেখতে পেয়েছি। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে রেজিস্টার্ড নতুন কোম্পানীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪৮ এবং ২১৫। শুধু তাই নয়, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য লাইসেন্সের সংখ্যাও খুবই কমে যাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে ১৯৬১ সালে যেখানে ১৮৩টি শিল্পকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, ১৯৬৭ সালে সেখানে লাইসেন্সের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২; তার মধ্যে নূতন শিল্প গঠন করার জন্য লাইসেন্সের সংখ্যা ১৯৬১ সালে ছিল ৬২; তার পাঁচ বছর পর ১৯৬৬ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ২।

উপরোক্ত তথ্য অনুশীলন করে যে জিনিসটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে, শিল্পপতিদের কাছে কলকাতার আকর্ষণ খুব কমে গেছে। তার জন্য অনেক মূলধন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ব্যবসা গুটোতে শুরু করেছে; শুরু হয়েছে ছাটাই। ছাটাইয়ের পরিণতি বেকার-অবস্থা এবং বেকার জীবনের হতাশা থেকে ধর্মঘট, ঘেরাও, এবং অন্যান্য ধরনের শিল্প-বিরোধ। তার পরিণতি শিল্পে মন্দা, উৎপাদন হ্রাস, বিনিয়োগ সংকোচন। দিনের পর দিন এভাবে বাঙ্গালীর বেকার জীবনের বোঝা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খতিয়ানে দেখা যায়, বছরের পর বছর ধরে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। নিম্নের তালিকায় গত চার বছরের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ কিরূপ কমেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

অভাব।—উভয় কারণই বেকার সমস্যাকে তীব্রতর করেছে। গড়পড়তা হিসাবে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অফিস, কল-কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৬০ জন বাঙ্গালীর কাজের ব্যবস্থা হয়। অথচ তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, প্রভৃতি রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস ও কল-কারখানায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিবাসীদের প্রায় শতকরা ৯০জন কাজের সুযোগ পান। অন্যান্য রাজ্যে যে জিনিসটা করা সম্ভব হবে, পশ্চিমবঙ্গে তা সম্ভব হবে না কেন?

বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা রুখতে হলে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যেন এই রাজ্য থেকে মূলধন বাইরে চলে না যায়। তার প্রথম শর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে কিছু পরিমাণে কম গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের স্বার্থের দিকে একটু তাকানো যায় না কি?

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার পর যদি এখনই সরকার তিস্তা নদীর উপর বাঁধ-নির্মাণের কাজ শুরু করেন, তবে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ কাজের সুযোগ

সাল	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)
রেজিস্ট্রেশন	৩,৪০,১৯৫	৩,৩৪,৯৭৪	৩,৩২,৬৬৬	২,৪৩,০৭৩
কাজের সুযোগ-সৃষ্টি	৫৩.১৪৯	৪৪,৮৬৬	৩৩,০৭৬	২৪,৮৬৬

দেখা যাচ্ছে, গত চার বছর ধরে কাজের সুযোগ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এ কথা ঠিক, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে এ অবস্থার সৃষ্টি হত না। ১৯৬৫ সালে মোট শ্রমের কাজের দিন (man day) নষ্ট হয়েছে ১৩,৬২,৫৬৮; আর ১৯৬৭ সালে শ্রমের কাজের দিন নষ্ট হয়েছে ৬১,১৮,৮১৬। এই অবস্থার পরিণতি হয়েছে উৎপাদন হ্রাস। উৎপাদন কমে গেলে ব্যবসায়ের সংকোচন হবেই এবং তার পরিণতি হবে বেকার সমস্যা। কর্ম-বিনিময় সংস্থার খাতায় এখনও প্রায় সাড়ে চার লক্ষ আবেদনপত্র পড়ে আছে এবং কর্ম-প্রার্থীদের এই আবেদন-পত্রের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার এই ভয়াবহ-রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর যুবকগোষ্ঠী। একদিকে শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং কর্মক্ষম শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, অপর দিকে অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যতটা পরিমাণে বাঙ্গালীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল ততটার অভাব, এবং কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বাঙ্গালী নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্দিষ্ট "কোটা"-র

পেতে পারেন। কলকাতা উন্নয়নের প্রকল্প যদি এখনই বাস্তব রূপ পায়, তবে অনেক শ্রমিক এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের সুযোগ পেতে পারেন। কলকাতায় যদি ভূগর্ভস্থিত রেলপথ তৈরি করা হয়, তবে তার মাধ্যমেই অনেক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ মনোভাব যদি কেন্দ্রীয় সরকার দূর করতে পারেন এবং যদি এ জিনিসটা বুঝতে পারেন যে কলকাতার উন্নতির অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং দেশের শিল্পো-ন্নয়নের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া—তবে সমস্যার নিশ্চয়ই সমাধান হবে। কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন করলে এই বন্দর দিয়ে

জাহাজ চলাচল বাড়বে, দেশের রপ্তানি আর বাড়বে এবং তার ফলে কাজের সুযোগও বাড়বে। যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলিতে এখন মন্দা চলছে, তাদের অবস্থার উন্নতি করতে গেলে সরকারের দিক থেকেই বেশি পরিমাণে শিল্পজাত জিনিসের জন্য অর্ডার আসা দরকার। কিন্তু যে সরকার তিন বছরের প্রচেষ্টায়ও একটি পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেননি, সেই সরকার যে শিল্প-ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করতে পারবেন সে আশা আমরা করি না। তাই বাঙ্গালীর বেকার সমস্যার সমাধানে বাঙ্গালীকেই বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বাঙ্গালী শিল্পপতিগণকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের স্বার্থে এমন এক শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস তাঁদের চালাতে হবে যেখানে বাঙ্গালীদের কর্মে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তার জন্য প্রধান প্রয়োজন শিল্পোন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা—এবং এই পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।

সুব্রত গুপ্ত

মুসাফির

এতো সুন্দর যে ট্রানজিস্টরদের সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় মুসাফির স্বচ্ছন্দে জিতে যাবে। ক্যাবিনেটের গড়নটি যেমন ছিপছিপে দেখতেও তেমনি ছিমছাম! যেকোন স্টেশন থেকে প্রচারিত আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান আপনি ধরতে পারবেন। প্রথম দর্শনেই মুসাফির আপনার হৃদয় জয় করবে।

মডেল টি. বি. ০৮২০
মূল্য মাত্র টা. ৩২৮.০০

- ৮টি ট্রানজিস্টর ও ডায়োড-৩-ব্যাণ্ড-অল ওয়েভ
- অনন্য সাধারণ ডেনিশ সিলভার রিফ্লেক্টর
- টেলিস্কোপিক অ্যানটেনা ও বিল্ট-ইন কোয়াইট এরিয়াল
- স্ফটিক স্বচ্ছ ও অবিকল জীবন্ত স্বরোৎপাদন

আজই মারফি মুসাফির নিকটস্থ মারফি ডীলারের কাছে দেখুন

murphy মারফি-সম্প্রদায়ের উল্লাস

অনেক কষ্টে কুবের আওয়াজটা থামালো

আঠারো

'আপনি এ কি করলেন?'

আভাবউদির বুকের ওপর দিয়ে পুরনো কালের কায়দার শাড়ির সোনালি ফুলতোলা চওড়া পাড় হাঁটু অবধি নেমে গেছে। কুবেরের আগেকার অভ্যেসগুলো পালটে গেছে—। এখন কোথাও গেলে আড়ষ্ট ভাবটা আর তাকে চেপে রাখতে পারে না। ব্রজ দত্ত বাবার আত্মজীবনী সমেত নানান বইপত্তর নিয়ে তাড়দার হাটে বিকোতে গেছে। কুবের মাথার বালিশটা তাকিয়ার মত পিঠের নীচে ঠেসে দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়েছে।

'আমি সেদিন সামলাতে পারিনি নিজেকে—এমনভাবে হাওয়া কাটছিল আপনার হাত—বলছিলেন, চাঁদ নীল—'

'ওদিকটা তো আর কাওয়ার উপায় রাখেন নি আপনি। কেমন খোলামেলা ছিল। এখন শুধু লরি যায়। এপার থেকে খালপাড়ে সব সময় ধুলো উড়ছে দেখি। মিস্ত্রিরা সন্ধ্যেবেলা গান গায়। আপনার বাড়ি হচ্ছে, আরও অনেকের বাড়ি উঠছে। খালপাড় আর আগেকার মত নেই—', শূন্যে তাকিয়ে থেমে গেল আভাবউদি।

'পরশু ছাদ ঢালাই হয়ে গেল।'

'আপনি খুব বড় লোক হয়েছেন।'

'কে বলল?'

'আপনার দাদা—'

'ভালো।' থামতে পারল না কুবের, 'আমি যে কি হয়েছি আমিই জানি না—'

'আমি জানি—', আভা নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে হাসছে। কুবের অন্যদিকে তাকিয়ে আছে বলে দেখতে পেল না।

'কেমন?'

'পরের বউয়ের সঙ্গে কি সব করে ফেলছেন।'

'তাই বলুন!'

'অবিশ্যি তাতে আমি পচে যাচ্ছিনে—',

ধক্ করে কুবেরের মাথার ভেতর কার হাত থেকে একখানা খাগড়াই থাল পড়ে গেল। পড়ে আর থামতেই চায় না। ঝন্‌ঝন আওয়াজ হয়েই যাচ্ছে। মাথার ভেতরে নেমে অনেক কষ্টে কুবের আওয়াজটা থামাল।

'আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না—'

'নিন উঠে বসুন। চা খাবেন?'

কুবের শুনেও শুনলো না। ফিরে বলল, 'আমার সত্যি কিছু ভাল লাগে না—'

'খারাপের কি হল? আপনার দাদা বলে—আমাদের কুবেরের এলেম আছে। দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছে। ভবেন শী, ইটখোলার ঘনরাম চাটুয্যে সবাইকে কাৎ করে দিয়েছে। কদমপুরের নিরিমিষ্যি ডাঙায় যে অত পয়সা ছিল কে জানতো!'

'তা সত্যি! লোকে কেন যে জায়গা কেনে? কেন যে যা দাম বলি তাই দেয়! এক এক সময় আমিও কোন মানে খুঁজে পাইনে—'

'ছেলের পিঠে মেয়ে হল। আমাদের মিষ্টি বাদ পড়ল।'

'খুব কষ্ট পেয়েছে বলুন।'

'তা পাবে না!'

তার চেয়েও বেশী কষ্ট পেয়েছে কুবের। সময় পার হয়ে যায়—বুলুর কোন বাধা নেই। হাসপাতালের কেবিনের বাইরে এসে কুবের ডাক্তারকে ধরে ফেলল, 'স্যার আমার একটা স্যাড্ এক্সপিরিয়েন্স—'

ডাক্তার এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে-

এক যুগান্তকারী অভিনব ফেস্ ক্রীম-

"হেজলীন" কোল্ড ক্রীমের নতুন অনুপম ফর্মুলা

একই সঙ্গে দুরকম ক্রীমের কাজ করে

ত্বককে পরিষ্কার করে এবং (সরস রাখে)

ত্বকের আদ্রতা বজায় রাখে

সম্ভ্রান্ত পার্টিয়াসী

তাঁরা জ্যাসাইকা বলেন :

ত্বক পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া : অতিরিক্ত ময়েশ্চারাইজার নতুন 'হেজলীন' কোল্ড ক্রীম অন্যান্য অধিকাংশ কোল্ড ক্রীম অপেক্ষা অধিক সহজে ছড়িয়ে পড়ে। ময়লা এবং পুরানো মেকআপ আবরণ, মেচেতা প্রভৃতি আবরণ তা এই ক্রীম ধীরে ধীরে উঠিয়ে দেয়। ইহা ব্যবহারের ফলে আপনার রূপশ্রী নির্মল হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

আদ্রতা রক্ষণের ক্রিয়া : দ্বিতীয়বার এই নতুন 'হেজলীন' কোল্ড ক্রীম প্রয়োগ করলে, ইহা আপনার ত্বককে রোদ, হাওয়া, ধূলোবালি এবং জলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সম্পূর্ণভাবে ত্বকের আদ্রতা বজায় রাখে এবং ত্বক সরস করে।

২রকম সাইজে পাওয়া যায়—মূল্য ৩·২৫ টাকা এবং ৫·৪৩ টাকা ট্যাক্স অতিরিক্ত।

ক্রিয়াশীল মহিলা ও আধুনিক মহিলারা সর্বদা দ্বিবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন অনুপম হেজলীন কোল্ড ক্রীমের জন্যই আগ্রহ দেখান

C3-434

র‍্যাডোক ওয়েলকাম এণ্ড কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ

"হেজলীনের" ... প্রস্তুতকারক।

ছিল, 'যে ওষুধগুলো আনতে দিয়েছি, এনেছেন?'

'এনেছি। কিন্তু একটা স্যাড ঘটনায়—মানে আমিই দায়ী—'

'পরে বলবেন। পেসেন্ট এখন অপারেশন টেবিলে—'

তারপর নাভি থেকে ন' ইঞ্চি চিরে ফেলল ডাক্তার। একটা মেয়ে বেরোলো। বলুর চোখ বোজা। স্যালাইনের নল। হাতে ছুঁচ বিঁধিয়ে দেওয়া ছিল। এবার কুবের কোন বাচ্চা চায়নি। ফাও একটা মেয়ে এসে গেল।

আভা বউদি বলল, 'আপনার তো অনেক টাকা। আপনাদের দাদাকে একটা কাজ দিন না। হাটে হাটে ঘুরে বই বেচে বেড়াচ্ছে। হাটুরে গাইয়ে বাড়ি বয়ে ধরে আনছে আর গান শুনছে। ভাব এলে নাচও জুড়ে দেয়। অথচ সংসার টানতে আমাকে কি না করতে হয়—' বলতে বলতে আভা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। দূরে স্টেশন ঘুরে একখানা জিপ ছুটে আসছে।

'উঠুন এবার। আপনার দাদার কাছ থেকে লোক আসছে—'

'জিপে?'

'ওরকম প্রায়ই আসে। পেটেন্ট মেডিসিনের সরকারী লোক। উঠুন তো।'

প্রায় ধমকে তুলে দিল কুবেরকে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল জিপগাড়ি থেকে সেই লোকটা নামছে। একদিন অনেক রুটিসুদ্ধ এদের জাল কিনে নিয়েছিল কুবের। কিন্তু এ-লোকটা এখানে কেন।

'মিসেস দত্ত আছেন?'

'যান না ভেতরে আছেন—'

কুবের কোন মতে বলতে পারল না। জানলা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল, আভা তার বাসি বেণীটা ঝপাং করে বুকের ওপর ফেলে দিচ্ছে। কুবেরের ভেতরটা হু হু করে উঠল। এ আমি কোথায় আছি। সরাইখানায় সকালবেলায় শুয়ে আছি। সবাই চলে গেছে যে যার কাজে। আমি জানি না আমার সামনে কি কাজ আছে। অল্পদিন হল আমার একটি মেয়ে হয়েছে। এই সব জন্মদানের কান্ডকারখানা আমাকে দিয়ে কেন? আমি কি ভালো মত পারি। থাকি সালকিয়া—হাওড়া স্টেশন দিয়ে কারখানা যেতাম (আপদ চুকে গেছে)—কদমপুর আমার দেশ হয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় এতদিনকার টান ভালবাসা ছিঁড়ে এ কোথায় আমি চলে আসছি। বলু বেশ বলে, এখন খাটে শুয়ে শুয়েই বলে, নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েই কিন্তু লাউ-কুমড়োর চারা বসাব। তুমি একটা লোক ঠিক করে দিও। কুঁবিয়ে দেবে। 'কুঁবিয়ে' দেবে কি? ও কথাটা কি? কুপিয়ে বলবে বলু। মাই আরনেস্ট রিকোয়েস্ট। আর নয় তুমি

জীবন অর্ডিনারি হয়ে যাচ্ছে—সে খেয়াল আছে?

সিঁথির পাশ দিয়ে একটা চুল পেকেছে। কুবের সেটা অনেকবার তুলে দিয়েছে। না দেখে আন্দাজে সেটা ছুঁতে পারে। ভায়রাভাই বলাই মহাপাত্র নিয়মিত দাড়ি কামায়। না হলে ভুর ভুর করে পাকা দাড়ি গাল ঢেকে ফেলে দু'দিনে।

ননী বোসের ছেলে বিকাশ বোস দু' দুটো পাম্প বসিয়ে ঝিল ছেঁচে ফেলছে। চব্বিশ ঘণ্টা পাম্পের আওয়াজ। এখন তিন বছর চার বছরের মাছগুলো ধরা পড়বে।

হঠাৎ ব্রজ ফকিরের বাড়ি থেকে আভা বউদির গলার স্বর চিরে বেরিয়ে এল, 'ছিঃ! ছি!' ক'বার এমন বলে ফেলেছে আভা এতদূর পর্যন্ত শোনা যায় নি। লোকটা তাড়া খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। এসেই লাফিয়ে জিপে উঠে স্টার্ট দিল। তারপর কুবেরের গা ঘেসে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

কোন্ দিকে যাবে। শেষে ব্রজদার বাড়িতেই গিয়ে ঢুকল।

তখনও আভা চেঁচাচ্ছে, 'ছিঃ! এই কি প্রবৃত্তি!' তারপর পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কে আবার?' বাইরে বেরিয়ে এসে কুবেরকে পা থেকে মাথা অব্দি দেখল, শেষে একদম কিছু বুঝে ওঠার আগে হু হু করে কেঁদে উঠল, থামান যায় না, ভাগ্যিস অন্য ভাড়াটেরা যে যার কাজে প্রায় সবাই বাইরে।

'আমি আর পারিনে কুবেরবাবু!'

অনেকক্ষণ কথা বলানো গেল না। কুবের চুপচাপ বসে থাকল। ঘরে কিছু ঝুল, কোণে একটা একতারা। জানলার পাশে ছোট টেবিল —টেবিলে পাউডার, চুলের ফিতে, একখানা আয়না। এসব আগে কোনদিন দেখেনি কুবের—আসলে চোখে পড়েনি। কোন জিনিস তার আজকাল চোখে পড়ে না। সূর্যের নীচে যা কিছু তা এই মাঠ-ঘাট, এ-সবই শুধু দেখতে পায় কুবের। ভদ্রেশ্বর জায়গা-জমির খোঁজ আনে। দর বলে। হাজারো লোকের জমির পরচা হাতে একখানা ডাইরির মধ্যে গুঁজে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বেশ বলে লোকটা। কথার ঢিমে তালে লোকটার সুর থাকে কেমন। প্রায় ছড়া তুলে বলবে : সাগর ভেঙে নগর। নগর ভেঙে সাগর॥ কাল পরশুর মধ্যে নতুন জায়গা দেখাতে নিয়ে যাবে চড়াবিদ্যায়।

'পেটরল খোঁড়ার জায়গা থেকে এক-জনার আসার কথা ছিল। আপনার দাদার খবর নিয়ে আসবে। এলেই তার সঙ্গে সোঁদালিয়া ক্যাম্পের ওখানে চলে যাব—'

কুবের কিছু বুঝতে পারছিল না, 'কি ব্যাপার—'

'ওখান থেকে পুলিশ দিয়ে সব লোক তুলে দিচ্ছে। আপনার দাদা আজ মাস তিনেক ঘর তুলে সেখানেই পড়ে আছে। তাড়দার হাটে হাটে বই ফিরি করে, গান গায় ঘুঙুর বেঁধে, ভাবের গান তুলে নাচে—' হাঁপাচ্ছিল আভা।

'এক গ্লাস জল খেয়ে নেবেন?'

'না থাক। শিষ্য জুটেছিল দু'একজন। ভেবেই ছিল ওখানে থেকে যাবে। পুলিশ দিয়ে লোক ওঠানো হচ্ছে। শুধু ধর্মস্থান, মন্দির, আশ্রম এসবে রেহাই পেয়ে থাকে। কথা ছিল, গোলমাল দেখলেই খবর দেবে। আমি গিয়ে একেবারে সংসার পেতে বসব। তাহলে সংসার তুলে ওখান থেকে আপনার দাদার উঠে আসতে হবে না।'

'উঠতে হবে কেন?'

থতমত খেয়ে গেল আভা, 'আপনি কিছু জানেন না?'

'নাতো।'

'তেল বেরিয়েছে—পেটরল। কাউকে থাকতে দিচ্ছে না। যন্ত্র দিয়ে মড় মড় করে আধ ঘণ্টার ভেতর বাঁশ বাগান উপড়ে ফেলছে—সে কি প্রলয় কাণ্ড। আপনি কোন-দিন যান নি বুঝি ওদিকে—'

কুবের আভার শেষ দিককার কথাগুলো কিছু শুনতে পেল না। শুধু বলল, 'তেল বেরিয়েছে—পেটরল—'

আভা বলল, 'হ্যাঁ, সে জন্যেই তো তুলে দিচ্ছে সবাইকে। আপনার দাদার খবরের নাম করে অন্য একটা লোক এসে হাজির। দেখতে ভদ্রলোক। ভেতরে বসিয়েছি—,' এখানে একবারের মত থামল আভা, 'ঠিক তার পাঁচটা পুরুষের মত—', এবার কুবেরের মুখে তাকিয়ে ফেলল। একেবারে থেমে যেতে যেতে হঠাৎ এগিয়ে এসে কুবেরের গলাটা ডান হাতে জড়িয়ে ধরে মাথা প্রায় গলার কাছে চেপে ধরল 'কি ঘেন্না! ঘেন্না!' কুবের বুঝল আভা তখনও কাঁদছে।

কোনক্রমে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে কুবের সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল। 'ঘেন্না! কি ঘেন্না!' কথাগুলো তার মাথার ভেতরে গলাম করে এইমাত্র একটা ডাণ্ডা মেরেছে। খানিক আগে লোকটা এমন ঝিলিক তুলে মিলিয়ে গেল। ব্রজদা নিশ্চয় তেল কোম্পানির আখড়ার ওখানে জমিয়ে আড্ডা দিয়ে থাকে। নইলে বলা নেই, কওয়া নেই— লোকটা এল, এসেই বলা নেই কওয়া নেই কাজকর্ম শুরু করে দিল। তক্কে তক্কে ছিল বোধ হয়।

'একদিন বাজারে দেখেছিলাম ওকে। ফিরে ফিরে দেখছিল আমায়—

'তোমায় সবাই এত দেখে কেন বল দিকিন?'

'আমি জানব কি করে?'

'একটু কম ঘোরাঘুরি করতে পার।'

'চালে মশাই! মানুষটা সব সময় জোরের মাথায় আছে। একটা না একটা অসম্ভব জিনিস বেছে নিয়েই তার পেছনে ছুটবে। আমাকে যদি বিকেলগুলো দেখাতে কি যে না করতে হয়—'

সুরমা তিন চোখ জোড়া শকটিন হয়ে ঝিকিয়ে উঠল। লোকের পাটা নিশ্বাসে উঠছে পড়ছে। বুকের বুকল এবং ঘাসের

মশায়। তার লটাপটি এখন বেশ মানানসই হত। কিন্তু ভেবে অবাক হল, আভার কথা তার একটুও মনে ধরছে না। সোদালিয়া পেট্রল ক্যাম্পের ওদিকে এখন লোক ছুটবে। জায়গা-জমির দর হু হু করে চড়বে। অথচ টাকা পয়সা বাড়ি তৈরিতে, পুকুর কাটানোয়, নতুন জায়গায় বায়না-পত্রে ছড়িয়ে আছে। আরও চিন্তার কথা, ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে চড়াবিলা গিয়ে এক লপ্তে অনেকটা চর ভরাটি জায়গা বায়না করার কথা রয়েছে। কোন দিকে যাবে।

'সন্ধ্যে না পড়তেই ভাবেন শশী আসবে। অথচ মানুষটার ঘরে ফিরতে রাত হয়ে যায় ভীষণ। আমার বড় ভয় করে কুবের। ভীষণ ভয় করে কুবের। হাসি-ঠাট্টা মশকরা করে, চা এগিয়ে দিয়ে লোকটাকে কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখি। কোন কোন দিন রাতের অন্ধকারে পাচক ছেলেটাও আসে বাড়ীতে। একগাদা পাউডার মেখে সে এক কেলেঙ্কারি অবস্থা। না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না কুবের!'

'ঢুকতে দাও কেন?'

'সাহস দিয়েছি। আভার চোখে পড়েছে [illegible] হাওয়াতে ভর করে বসে আছে। [illegible] আমি এখন তোমার দাদার চক্রব্যূহের মধ্যে।'

চল তবু তাকে হাসল খানিক। আভার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল অনেকটা। দাঁত-উঁচু হবে না তো শেষে!

'আমাকে দেখার কেউ নেই এখন কুবের।'

আজ্ঞে তোমাদের ওপর অনেকখানি [illegible]। এখন [illegible]। এই অজানা মাটিতে আমি কুবের সাধুখাঁ জোর করে আমার একটা শিকড় বসাবার চেষ্টা করছি। [illegible] কত রকমের শিকড় ছেড়েছি কতদিকে। নরেনের আশুতোষ নম্বর বিদ্যালয়ে টিনের চাল ছেয়ে দেওয়ার জন্যে পাঁচশো টাকা চাঁদা দিয়েছি। এখানকার কাপড়ের দোকানের বারান্দায় বসে দেশের কথা আলোচনা করি। এই মাটিতে বীরভূমের দুলাল হাল কতখানি ফলাতে পারে তাই নিয়ে শ্রীগোপাল সাহ কোম্পানির গোপালবাবুর সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে চিন্তা করি। অথচ বছর দু'তিন আগে স্বপ্নকালেও আমি কদমপুরে আসিনি। কাদুবাবু এপ্রিলে রিটায়ার করেছেন। নরেন রেল ছেড়ে কয়লার দোকান করবে ঠিক করেছে। বাজারে গিনি সোনার দোকানের ছাদে বিড়ি তামাকের আড়ং বসেছে। খালি মত ঘরটায় সব সময় রেডিও বাজে। ডজন দুই লোক গানের তালে দুলে দুলে বিড়ি বাঁধে।

'আমাকে নিয়ে পালাবে কুবের? এখনও সুন্দর করে ভুলিয়ে রাখব তোমাকে—'

একটু হাসছে মনে হল আভাকে।

'সিনেমা হয়ে যাবে না?'

'হয় হোক। আমি আর পারিনে কুবের—'

'রওনা হবে কখন?'

'কোন ঠিক নেই। চল এই বেলা। আমি সব ফেলে দিয়ে যাব—'

'ভালবেসে বিয়ে করেছিলে না? সরস্বতী বৌঠানকে কানা করে দিয়ে মানুষটাকে টেনে আনো নি একদিন?'

'বয়স কম ছিল। সব বুঝতাম না। এ মানুষটা কাউকে ভালবাসে না। শুধু

নিজের খেলাঘরকে ভালবাসে কুবের। আমি বলে এতদিন এক সঙ্গে আছি। আমায় নিয়ে চল—এখুনি যাব আমি।'

'আমি যেতে পারব না আভা। আমার যাবার উপায় নেই—'

আঁচলের খুট ডান হাতের বুড়ো আঙুলে জড়িয়ে ফেলল আভা, 'তা ঠিক! যাবেই বা কেন! অমনতর তাজা বৌ। দাগ পড়েনি কোথাও। সোনার চাঁদ ছেলে—'

'আমার যাবার উপায় নেই বৌদি। আমি ভীষণ জড়িয়ে পড়েছি।'

'অমন জড়াতে পারতাম! তোমার মেয়ের গায়ের রঙ কার মত হয়েছে ?'

'আমারই মত। সেকথা বলছি নে। সংসারে আমার টান ভালবাসা কমে গেছে আভা। চারদিকে জমি জায়গার দলিল দস্তাবেজে আমি ষোল আনা বাঁধা পড়ে গেছি। পাশ ফিরবার উপায় নেই। নীলামের সম্পত্তি ডাকি আজকাল। লোক ভাড়া নিয়ে হোমড়াপলতায় আবাদে জায়গা দখল নিতে হচ্ছে। দুনিয়ায় কত জায়গা-জমি। তাতে ঘাস হয়, উলু হয়, কাশ হয়। পালম বুনলে পালাম ফলে। বীজ ধান গুঁজে দিলে তিন কালির জায়গায় চল্লিশটা অব্দি বিয়েন ছাড়ে—তাতে শিষ ধরে, দুধ আসে, লোকে বলে অমরলতা। অথচ এতকাল আধমরা ইট-কাঠের বাড়ির মধ্যে বাধা পড়ে ছিলাম সালকেয়—'

'তবে যে বড় বাড়ি বানাচ্ছ! ক'দিন পরেই নতুন ঘরে চাপবে। সালকের বাস তুলে দিয়ে পাকাপাকি চলে আসছ—'

তোমাদের মত পুরুষ মানুষ আমার খুব চেনা আছে—

'বুলুর ইচ্ছে। বাড়ি ঘরদোরে আমার তেমন লোভ নেই। মা বাবা এখানে থাকলে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলে দু'দিন বেশি বাঁচবে।'

'আমি মরে যাব কুবের। তুমি আমায় রাখো। যেভাবে ইচ্ছে রাখো। কোন গোলমাল করব না। যা বলবে তাই করব। আমি আর দম ফেলতে পারছিনে কুবের—'

'সংসারে অমন হয়ই। মানিয়ে চল। মনের মত ঘরবর সবাই চায়। ক'জন পায় ?'

আভা ফুঁসে উঠল, 'খুব হয়েছে। আর বচন ঝেড়ো না। তোমাদের মত পুরুষ মানুষ আমার খুব চেনা আছে—'

কুবের কোন কথা বলল না। সালকিয়ায় হরিরাম সাধুখাঁর বাড়িতে এখন বাবা, মা বড়দা বড়বউদি, ভাইরা, বৌমারা সবাই একটা কথা ভেবে মশগুল হয়ে আছে। হরিরাম সাধুখাঁর বংশধর কুবের সাধুখাঁর একখানা বাড়ি হচ্ছে। বাড়িতে পুকুর আছে, তিনশো লোক বসে খাওয়ার চাতাল আছে, দক্ষিণে তেতাল্লিশ বিঘের ঝিল আছে। তার ওপর দিয়ে হাওয়া এসে গরম একদম বুঝতে দেয় না।

'দশটা টাকা দিয়ে যাও। মানুষটা তবিল একেবারে ফাঁক করে রেখে গেছে।'

'খুচরো তো নেই।'

'যা আছে দিয়ে যাও।'

কুবের ইনসাইড পকেটে হাত দিয়ে নোটের গোছা থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করে দিল।

'খুব বড় লোক হয়ে গেছ তো!'

আভার সঙ্গে কুবের হাসতে পারল না।

ক্রমশ

ত্রিধারা

"পইতুণ্ড, বাড়ি কোথায় না হস্তীতুণ্ড" পাড়ার ছেলেরা সুর করে ছড়া কাটতো। তাতে আমাদের পইতুণ্ডি মশাই এতটুকুও চটতেন না। চটতো তাঁর মেয়ে সবিতা। চটে লাল হয়ে যেতো। সোহাগী গয়লানী আর বুদ্ধু মিয়া গাড়োয়ানের আটচালার আশেপাশে ছেলেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতো সবিতার সেই রাগটুকু দেখবার জন্য। আটচালার গা ঘেঁষে পইতুণ্ডি মশায়ের মাঝামাঝি বাড়িখানা। সংসারে বেশী কেউ নেই। বড় মেয়ে কমলা আর অনেক পরে এসেছে সবিতা। কমলাকে পইতুণ্ডি মশাই বিয়ে দিয়েছিলেন বড় শখ করে। হাতের দু পয়সা যা ছিল সেই বিয়েতেই শেষ করেছিলেন। কমলা কিন্তু বছর ঘুরতেই ফিরে এল। পইতুণ্ডি মশাই থেকে নিয়ে সবিতা পর্যন্ত সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। [illegible] কিস ফাস করলেন কিছুকাল। সব কিছু বুঝবার বয়স না হলেও এটুকু জানতে পেরেছিলাম, ফেলি এসেছে কমলার কোলের বাচ্চাকে নিয়ে। বাচ্চাটার গোলগাল ফর্সা ফর্সা হাত পা, সোনালী চুলের রাশি আর সবার উপর [illegible] সাগরের মত সুনীল দুটি চোখ বড্ড আমাদের ভাল লাগতো। তবুও যেন পইতুণ্ড মশাই কুঁকড়ে যেতেন আর কমলার মা কেঁদে কঁকিয়ে কপালে করাঘাত করতেন। কমলার স্বামী চা বাগানে চাকরি করেন। সাহেব সুবোকে ভেট দিয়ে অভ্যেস। তা বলে কি...। দিন কারও জন্যে বসে থাকে না। কমলার কন্যাও ওই শশিকলার মত বেড়ে উঠলো। দিদিমার কান্না, মায়ের লজ্জা, দাদামশায়ের সংকোচ সব জয় করে সে কচি কচি পা ফেলে সোহাগীর বাড়ি দুধ আনতে যেতো, বুদ্ধু মিয়ার কোলে পিঠে চড়তো, দিদিমার পাকা চুল তুলতো, দাদুর পিঠের ঘামাচি চিরুনী দিয়ে বসে গেলে দিত, সবার উপর সবিতার ফরমাশ সারা দিন খাটতো। ফেলি ফেলি করেও যাকে ফেলে দিতে পারেনি, সেই ফেলি পইতুণ্ডি সংসারের হাল পাল হয়ে উঠলো। দারুণ শীতে ছাই রং-এর জুট ফ্ল্যানেল ঘেরা কুঁচি দেওয়া জামাখানা গায়ে দিয়ে যখন সে কনকনে জলে বাসন ধুয়ে বা কাপড় কেচে তুলতো, সবিতা সামনের ঘরে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতো "একা মোর গানের তরী-ই-ই-ই"।

ফেলিকে মাঝে মধ্যে আদর করে ডাকতেন সদাশিববাবুর মা সুধাময়ী। সদাশিব চৌধুরীর বাড়ি ছিল পইতুণ্ডি মশাই এর বাড়ির ঠিক উলটো দিকে। ওদের অবস্থা ভাল। চৌধুরী নন্দিনী ঘরের গাড়িতে স্কুলে যেতো। প্রায়ই সঙ্গে নিত

সবিতা। কাজেই সে বাড়ির সবাইকে তুষ্ট রাখা দরকার। ফেলিকে তাই সদাশিববাবুর মা আমটা লিচুটা দিলে সবিতা আপত্তি করতো না। ফেলির কিন্তু আম-লিচু বা আর কোনও শিশুসুলভ লোভনীয় উপহারে মন ছিল না। সাঁঝের ঝোঁকে দৌড়ে গিয়ে সবিতারই হাতে সব গুঁজে দিয়ে কাজে লেগে যেতো। ঘরে ঘরে বিছানা পাতা, মায়ের হাতে হাতে রুটি গড়া, দাদুর তামাক সাজা সবই তো তার কাজ। দিদিমা হয়তো দেখে বলে উঠতেন 'আবাগীর আবার দেমাক!' ফেলির এই আকর্ষণহীন বৈরাগ্যকে দিদিমা বুঝেও বুঝতেন না।

সদাশিববাবুর মেয়ে সুকুমারী আর সবিতার সখ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলির কাজ বেড়ে গেল। এ বাড়ি ও বাড়ি আনা-গোনা, চিঠিপত্র চালাচালি সব কিছুই ফেলির মাধ্যমে সারা দরকার অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে। ফেলিও সাধ্যমত ওদের

দারুণ এক আধুনিকা

সেবা করেই খুশী। ফেলিকে পইতুণ্ডি স্কুলে পাঠাতে পারেন নি। অর্থাভাব তো ছিলই, তার উপর সাহসের সাংঘাতিক অভাব। ফেলি সম্বন্ধে সামান্য এতটুকু দুর্বলতাও সদাশিব গৃহিণী সহ্য করতেন না। ঘরে বসে সবিতার শেষকরা বইখাতা ঘেটে ফেলি বেশ একটু কাজচালানো বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল। দাদুর হুঁকোতে ফুঁ দিতে দিতে কলকে বসাতো যখন তখন দু' একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর বা আঁকের আঁচড় সেরে নিত। দেখতে দেখতে পঞ্চদশী ফেলি সকাল বেলার শিউলি ফুলের মত শুভ্র সুন্দর হয়ে উঠেছিল তা আমরা কেউ লক্ষও করিনি। করেছিল পইতুণ্ডি মশায়ের পাড়ার সেই ছেলেদের একজন। তারা সবিতাকে নিয়ে মাথাঘামানো কমিয়ে দিয়েছিল। কেউ বা কাজকর্ম নিয়ে বিদেশে চলে গেছে, কেউ বা নানা দায়িত্বে জড়িয়ে চপলতা ভুলেছে। ফেলিকে দেখে যে ছেলেটি পইতুণ্ডি মশায়ের কাছে প্রস্তাব করেছিল সাহস করে, তার সংসারে কেউ ছিল না। দূর সম্পর্কের পিশির কাছে মানুষ। ফেলির সোনালী চুল আর নীল নয়ন নিয়ে আপত্তি জানবার মত আত্মীয় কেউ নেই। সদাশিববাবুও আপত্তি করলেন না। ফেলি চলে গেল স্বামীর সঙ্গে বহু দূরে কন্যাকুমারী না কোচিনে ঠিক মনে নেই। আমরা সে শহর থেকে সরে সরে নানা স্থানে ঘুরে ফিরেছি। সবিতা, সুকুমারী আর ফেলি স্মৃতিমাত্র।

সেবার যাচ্ছিলাম দিল্লির পথে পুজোর ছুটি কাটাতে। সঙ্গে সদু পিশি। আজমীর, জয়পুর, পুষ্কর যাবেন বাসনা নিয়ে জমানো কড়ি ভেঙ্গে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটেছেন। বাতের ব্যথায় পা টান করে না শুতে পারলে ব্যথা মাথায় উঠবে। সদু পিশির কামরায় ঢুকে তাঁর মালপত্তর গুছিয়ে দিতে গিয়ে দেখি পাশের বার্থে দারুণ এক আধুনিকা বসে সিগারেট খাচ্ছেন। সঙ্গে সব নানা পোশাকের পুরুষ মানুষ গদগদ হয়ে গল্প জমিয়ে গেলাস বোতল নাড়াচাড়া করছেন। সদুপিশি তো কাঁদেন আর কি! মেয়েটির মাথার কাছে মা কালির ছবি। ট্রেনেও নাকি তিনি সর্বদা মা কালির পট মাথার উপর টাঙিয়ে চলাফেরা করেন। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক হিহি করতে করতে মেয়েটির মস্ত বড় ব্যাগ খুলে কয়েকটি নোট ঢুকিয়ে আলতোভাবে সরে বসলেন। সদুপিশিকে সামান্য সান্ত্বনাও যদি দিতে পারি এই ভেবে সঙ্গের বাঙালীবাবুটিকে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। আমাকে বোধ হয় নেহাত গাইয়া মনে করে ভদ্রলোক নাক কুঁচকে বললেন, 'আরে ইনিই তো স্বনামধন্যা শেলী সেন।' শেলী সেনকে ভাল করে দেখবো বলে মুখ ফিরিয়েছি, হঠাৎ শেলী সেন আমাকে ধন্য করে বলে উঠলেন "আরে অতসী না?"

এযে সেই পইতুণ্ডিদের সবিতা গো

আমি তো অবাক। এ যে সেই পইতুণ্ডিদের সবিতা গো। একি সাজে দেখা দিলে তুমি। পরনে আঁটো প্যান্ট আর ততোধিক গায়ে চিপটে যাওয়া কামিজ। কাটা ছাঁটা চুল ঝাঁকি মেরে কথা বলে মিনিটে হাজার হিসাবে। সবিতা যাই হোক সৌদামিনী পিসীকে শান্ত করলাম পুরোনো পরিচিত মেয়ে বলে। কাপড় জামা গুটিয়ে এক কোণে বসে বসে ঝিমোতে লাগলেন তিনি। শেলী আমাকে ছাড়লো না। প্রথম শ্রেণীতে একেবারে তার পাশে বসে গল্প শুনতে শুনতে স্বপ্নের মত কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেল। সবিতা পইতুণ্ডি পরিবারকে পিছনে ফেলে মস্ত এক কোলিয়ারীর মালিক সেন সাহেবের সংসারে ঢুকেছিল। সেন সাহেবের দৌলতে তার যত কনট্যাক্ট্। সাহেব-সুবোর দিন গেছে। সরদার শেরসিং একাই সাতটা সাহেব ট্যাঁকে রাখতে পারে। সবিতার নাম তো সেই বদলে শেলী রেখেছে। সেন সাহেবের বরাতে এমন বউ বেশী দিন টিকলো না। শের সিং-এর সঙ্গে সে বার কয়েক রাজধানী এসে টের পেয়েছে তার কদর কোলিয়ারীর কাঁটাঝোপে নয়। সে দিল্লির মসনদের যোগ্য মেয়ে। শের সিং-এর সেরা সেরা বন্ধু কৃষ্ণ রাও, রামচান্দানি সব মন্ত্রীমহলের মোসাহেব। শেলী এহেন সমাজ ছেড়ে আর সেন সাহেবের চার দেওয়ালে চড়ে বেড়াতে রাজি না। সেন সাহেবের পয়সাকেও সে আর পরোয়া করে না। দিল্লির দরবারে ঠিক প্রজাপতিটির মত চলাফেরা করতে পারলে পয়সা টাকা হীরে, জহরত সব স্রোতের মত আসে। কত ধনকুবের তাকে পার্টির পসার হিসাবে "ফি" দিয়ে নিয়ে যায়। আমদানির খবর কেউ জানতে পারে না কিন্তু আপ্যায়িতের পরিতৃপ্তি নিয়ে ফেরে অতিথি সজ্জন। তাদের ক্ষমতায় যতটুকু থাকে অনায়াসে আসে ধনকুবেরের গুপ্ত খাতার খতিয়ানে। শেলীকে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম 'সুকুমারী কোথায় রে?' চুপসে যাওয়া বেলুনের মত মুহূর্তে সে কেমন নিজেকে গুটিয়ে ফেললো। সখী সুকুমারী তার

প্রথম চাকরি?
মাসের পর মাস মাইনেটা
ফুটকড়াই হয়ে যায়?
এক কাজ করুন।
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কে
একটা সেভিংস্ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
তাহলেই বাঁচোয়া।
PAY
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে
সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলাটা
হবে একটা কাজের মত কাজ। কারণ:
এতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বোধ আসবে।
টাকাটা বসে থাকবে না, সুদে আসলে বাড়বাড়ন্ত
হবে। মনে জোর থাকবে। হঠাৎ ঠেকায়
পড়ে গেলে আটকাবে না। কাঁচা
টাকা সামলানোর দায় থেকে বাঁচবেন।
খরচের লোভ সামলাতে পারবেন।
তাতে থাকবেন তোফা, মানও বাঁচবে
(উপরওয়ালার কাছে আগাম চেয়ে হাত
পাততে হবে না)। এই সপ্তাহেই
চলে আসুন আমাদের কাছে।
মাত্র ৫৲ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড
গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(যুক্তরাজ্যে সমিতিবদ্ধ। সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ।
ক্ষুদে থেকে টাই, সকলেরই ঠাঁই
বিনামূল্যের
"হাউ টু স্টপ ওয়োরিং অ্যাণ্ড স্টার্ট সেভিং"
—এই পুস্তিকাটি যাঁরা চান, তাঁরা ন্যাশনাল অ্যাণ্ড
গ্রিণ্ডলেজে চিঠি লিখুন।
NGB-21A/68 BEN

চেয়েও সৌভাগ্যবতী যে। মেহেরা সাহেবের সঙ্গে সে ছায়াছবির প্রযোজক। ফিল্ম দুনিয়ার এক কেওকেটা। বড় বড় হোটেলে থাকে, নিত্য বিদেশ সফর করে। সবিতা স্বচক্ষে দেখেছে তার হীরের আংটির পাথরটা প্রায় পায়রার ডিমের মত, গলায় সাচ্চা মোতির সাত লহরী হার। চৌধুরী বাড়ির পিতৃপুরুষের সব ঐশ্বর্য এক করলেও এমন হার হতো না। শোনা যায় সদাশিববাবু এখন অসুস্থ, মেহেরার মেহেরবাণী না হলে সংসারটাই ভেসে যেতো। সুধাময়ী মাঝে মাঝে মেঠাই মণ্ডা মেহেরাকে ডেকে খাওয়ান। তানচোই আর কাঞ্জিভরম শাড়ি ভিন্ন সুকুমারী অঙ্গে তোলে না। মেহেরা সাহেবের মস্ত গাড়ি করে সে ঘোরাফেরা করে।

থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি এবার বুঝলাম। পইতুণ্ডি পুত্রী সবিতারও ঈর্ষার পাত্রী আছে। আপেক্ষিকতায় তার হার হয়েছে সাতলহরী হারের সামনে। শেলী সেন কনট্যাক্ট ভাঙিয়ে কনট্র্যাক্ট সংগ্রহ করতে শিখেছে কিন্তু প্রযোজনা তো পারে নি। আমার দুঃখই হলো। কেন যা সুকুমারী সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললাম। বেশ গল্প জমেছিল। মা কালির পটের উপর হাতজোড় করে লুটিয়ে পড়লো সবিতা। হে মা ঐরকম সাতলহরী আর হীরের আংটি মাত্র প্রার্থনা। গেলাশের অবশিষ্টতে চুমুক দিয়ে মস্ত বড় ব্যাগটা খুলে খুঁজে পেতে আমার হাতে দিল একটি খামে বন্ধ করা এক গোছা নোট। মাকে গিয়ে দিস। মা আর কমলা এখন কলকাতায় থাকে। তাদের দিন চলে না। আয় নেই একদম। আমি যোগাযোগ রাখি না। রাখলেই নানা ঝামেলা। খামে হাজার তিনেক টাকা আছে। ওদের কিছু দিন চলে যাবে। অবাক হয়ে ভাবলাম সেই রক্ষণশীল মহিলা পতিতুণ্ডি গৃহিণী টাকাটা কি নেবেন? যোগাযোগ না থাকলেও তাঁরা জানতেন সবিতার সব কথা। বলেছিলেন, না খেয়ে মরলেও অমন মেয়ের মুখ দেখবেন না।

আমি কিন্তু সবিতার টাকা পেঁছে দিতে গিয়েছিলাম। কমলা আর তার মা কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছেন। হাতে টাকা পেয়ে কমলার মার মুখে হাসি ফুটলো। তাই তো বলি সবিতার কোন দিন না কোন দিন মনে হবেই। বার বার মাথায় ঠেকিয়ে টাকা কটা তুললেন। কোথায় গেল তাঁর গোঁড়ামি আর কোথায় গেল তাঁর মতামত।

কাহিনী আমার এখানেই শেষ হয়ে যেতো। যদি না কোচিনের কোনও এক দোকানে ফেলিকে দেখতাম। কেরালার পুতুল, মাদুর ইত্যাদি কেনাকাটা করছি এমন সময় লক্ষ করলাম সোনালী চুল আর সুনীল চোখ নিয়ে সেই ফেলি কি যেন দেখছে। তেলেজলে সিঁদুরে সোনালী চুল একাকার হয়েছে তবু মুহূর্তে চিনলাম তাকে। কাছেই ওদের বাড়ি। ওর স্বামী বাংলা দেশের এক ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি। সামান্য মাইনে কিন্তু তাতেই অসামান্য সংসার পেতেছে ফেলি। নিপুণ গৃহকর্ত্রী। লাল পাড় শাড়ির কোণায় চাবির গোছা, কপালে মস্ত টিপ, হাত ধরে নিয়ে চললো ফেলি আমাকে তার বাড়ি। ছেলে মেয়ে দুটি মায়ের নীল চোখ পায়নি কিন্তু স্বর্ণাভ চুলের রাশি নাচিয়ে তারা খেলে বেড়াচ্ছিল। স্বামীর জন্য সাজানো রয়েছে মুখ ধোবার জল থেকে নিয়ে পরিপাটি পাট করা জামা আর গামছাটি। মনে হলো এ যেন মা দিদিমার শীতল স্নেহের ছায়ায় এলাম। ফেলিও ফেঁদে বসলো গল্প। বুধু মিয়া কেমন সানকিতে করে বাসি সালুন আর ভাত খেতে খেতে ডাকতো তাকে লজেনো লজেনচুষের কৌটোটি দেবে বলে। সোহাগীর বাড়ির সেই লাল আটার গুলুগুলা খেতে কেমন লাগতো ইত্যাদি। বাড়িতে দাদু তাকে আড়ালে আদর করতেন আর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতেন। অনেক চেষ্টা করে, অনেক চিঠিপত্র লিখেও সে আর ইদানিং কোনও খবর আনতে পারেনি। আমিও সব খবর তাকে দিতে পারলাম না। থাক না ফেলি মা জানার নিশ্চিন্ততা নিয়ে। উঠবার সময় ফেলি আমার হাত ধরে বললো সামান্য একটু জিনিস নিয়ে যাও। দিদিমার জন্য বহু দিন থেকে রেখেছিল একটি রূপোর পানের কৌটো। দিদিমা বড় পান খেতে ভাল বাসেন। অনেক কষ্ট করে সে টাকা জমিয়েছিল। কৌটোটি কিনেও সে পাঠাতে পারেনি। ঠিকানাও জানা ছিল না। আবার দায়িত্ব নিলাম। ফিরে এসে গেলাম সেই অন্ধকার গলির আস্তানায়। শীতের সকাল। ঘরের কোণে কমলা শতচ্ছিন্ন কম্বল গায় দিয়ে জ্বরে ধুঁকছে। কমলার মা আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। আশা করেছিলেন বোধ হয় আবার সবিতার টাকা এসেছে। ফেলির কথা বলাতে নিবে গেল তাঁর উৎসাহ। আমিই যেন সঙ্কোচ ম্লান হয়ে গেলাম সেই পানদান নিয়ে। তবু দিতে তো হবেই। ফেলি সম্বন্ধে এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। পানদান হাতে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—দেমাক, আবাগীর আজও দেমাক গেল না। হতভম্ব আমি আস্তে আস্তে ফিরে এলাম।

শ্রীমতী

সঙ্গীত সম্মেলনে একরাত্রি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অনেকদিন চেয়ারে বসে সারা রাত জাগিনি, তাই নিজের সম্পর্কে একটু সন্দেহ ছিল। সারা রাতের সংগীত সম্মেলনে আসাও হয়ে ওঠেনি চার পাঁচ বছর। লক্ষ্য করলুম, এই সব সঙ্গীত সম্মেলনগুলির পরিবেশ আবার বেশ আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হয়ে এসেছে। কয়েক বছর আগেও বেশ খোলা-মেলা জমজমাট ব্যাপার ছিল, বাইরের রাস্তায়ও মাইক্রোফোন দেওয়া হতো—সেখানেও সারা রাত প্রচুর ভিড়, ফুটপাথে চাদর মুড়ি দিয়ে বসা ব্যক্তির মুখ থেকেও সংগীতের সূক্ষ্ম সমালোচনা শোনা যেত।

আমরা সাত-আটজন বন্ধুবান্ধব মিলে যেতাম। টিকিট কেনার সাধ্য আমাদের সবার ছিল না, তিন চারখানা টিকিট কেটে পালা করে সবাই কিছুক্ষণ ভেতরে কিছুক্ষণ বাইরে রাত জেগে গান শুনেছি। ভেতরে ঢুকে শিল্পীকে একবার চোখের দেখা দেখে এসে বাইরে রাস্তায় কোনো রকে কিংবা লোকদের সিঁড়িতে বসে গান শুনতেই বেশী ভাল লাগতো। [illegible] সময়ই একটু যা মুশকিল ছিল, রোশন কুমারী ও শামতা প্রসাদের লড়াইয়ের সময় আমরাও পরস্পর পাঞ্জা লড়ে ঠিক করতুম—কে যে জিতবে সে-সে ভেতরে যাবে। [illegible] অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স, ইনস্টিটিউটে মধ্য কলকাতা সংগীত সম্মেলন ও ডোভার লেনের সম্মেলনে আমরা অনেক রাত এইভাবে কাটিয়েছি। এখন বাইরে আর মাইক্রোফোন দেওয়া হয় না কেন কে জানে।

হঠাৎ [illegible] সঙ্গীত সম্মেলনের এক রাত্রির টিকিট কিনে ঢুকে পড়লাম। শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক তখন গান ধরেছেন। অনেকদিন পর সুনন্দা পট্টনায়ককে চোখে দেখলাম। আয়নায় রোজই নিজের চেহারার দিকে অন্তত দাড়ি কামানোর সময় একবার চোখ পড়ে, তাই নিজের পরিবর্তন বুঝতে পারি না, কিন্তু অনেক দিন পর সুনন্দা পট্টনায়ককে দেখে তাঁর পরিবর্তন বুঝতে পারলুম। ওড়িষার এই প্রতিভাময়ী শিল্পী যখন কলকাতায় প্রথম নাম করেন তখন এই তরুণীর সুরেলা রিনরিনে কণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম। এখন এই মহিলার কণ্ঠ বেশ ভারী হয়েছে। ইনি গাইছিলেন রস কানাড়া, উচ্চারণে একটু দাক্ষিণী টান, তারসপ্তকে গলা একটু চিড়ে যাচ্ছিল, কিংবা চিড়ে যাচ্ছিল না বলে ধাতব ও কর্কশ শোনাচ্ছিল বলা যায়। প্রতিটি পর্দায় শ্রুতির শুদ্ধতা নিখুঁত, তাঁর পালটে তান ও হলক্ তানের অসাধারণ কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা অঙ্ক কষার আবহাওয়া তিনি এড়াতে পারছিলেন না। তাল, লয় ও সরগমের অঙ্ক ছাড়িয়ে তাঁর সংগীত আমাকে অন্য কোথাও পৌঁছে দিল না। কিন্তু ঠুংরী ও স্তব গানের সময় তাঁর গলা বদলে গেল কেন? বন্ধুর সঙ্গে আর অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময়—মানুষে দু'রকম গলায় কথা বলে। স্তব গানের সময় সুনন্দার গলায় ঠিক সেই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার আন্তরিক সুর এসে গেল।

এই শীতেও মহাজাতি সদনের মধ্যে বেশ গুমোট গরম। তা হোক, শেষ রাত্রে বিলায়েতের সেতার শোনার আগ্রহে কোনো অসুবিধেই ঠিক গায় লাগছিল না। তা ছাড়া আমার পাশে ও সামনে কয়েকজন সুন্দরী তরুণী বসেছে, সেটাও একটা চক্ষুর পক্ষে আনন্দদায়ক ব্যাপার। আমি অপেক্ষা করছিলাম, কখন ঐ তরুণীরা ঘুমোবে। সুন্দরী মেয়েদের ঘুমন্ত মুখ দেখতে আমার ভারী ভালো লাগে। রূপসীরা ঘুমের সময়ও লীলাভরে ঘুমোনো রপ্ত করে রাখে—তাদের মুখ হাঁ হয়ে যায় না, তাদের নাক ডাকে না, এ ছাড়া ঘুমন্ত মুখের আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে—বাংলা দেশের সুন্দরী মেয়েরা সবাই বড় অহংকারী, একমাত্র ঘুমের সময় মুদিত চোখের পাতায় তাদের সেই অহংকার থাকে না। আর একটা ব্যাপারেও খুশী বোধ করছিলুম—আশে-পাশের কোনো মেয়েই উগ্র সেন্ট মেখে আসে নি। মেয়েদের গা থেকে চড়া সেন্টের গন্ধ এলে একটু পরেই আমার বমি পায়। আমি নিজে জেগে থাকারই চেষ্টা করবো—শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরে সাধারণত আমার ঘুম পায় না—একমাত্র আমির খাঁর গান শুনলে চোখের পাতা দুটো বড্ড ভারী হয়ে আসে। আজ আমির খাঁ নেই।

শামতা প্রসাদের দেখা পাওয়া গেল না, মঞ্চে তাঁর দুই ছেলেকে উপস্থিত করা হল, ওরা তবলা লহরা শোনাবে—আন্দাজে মনে হয় একজনের বয়েস ষোলো, অন্যজনের কুড়ি। ওদের নাম কৈলাশলাল ও কুমারলাল। বালক-প্রতিভা সম্পর্কে খুব বেশী উৎসাহিত বোধ করি না, তা ছাড়া তবলা লহরা তো অঙ্কেরই খেলা। কিন্তু সচকিত হতেই হলো, কিশোর দুটির দক্ষতা অনস্বীকার্য, বোলের ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে ওরা, অতিদ্রুত লয়ে ছোট ছেলেটি একটু পিছিয়ে পড়লেই বড়টির কেরামতি—(এ ক্ষেত্রে শামতাপ্রসাদী) চমৎকৃত হবার মতন। বেশ ভালোই তো আড়ে ঠেকা দিচ্ছে, এখন সামনের জীবন যুদ্ধে যদি ঠিক ঠিক আড়ে ঠেকা দিতে পারে—তা হলেই মঙ্গল।

একটা কথা ভাবছিলুম। এই সব সঙ্গীত সম্মেলনে ঠিক কারা শুনতে আসে? ওরা সবাই কি শিল্প-প্রেমিক? আমার ধারণা সঙ্গীতই সবচেয়ে বিশুদ্ধ শিল্প। বাইরের অবলম্বন সঙ্গীতেরই সবচেয়ে কম। সঙ্গীতের কোনো বক্তব্য নেই, কোনো বাণী নেই, বিশুদ্ধ সঙ্গীত নিয়ে কখনো বিতর্ক উঠবে না, যে তা দেশপ্রেমমূলক কিংবা দেশদ্রোহী, বিপ্লবের পক্ষে না বিপক্ষে। শব্দ, সুর ও ছন্দ অবলম্বন করে এই সঙ্গীত এমন এক স্তরে ওঠে যেখানে রূপ সম্পূর্ণ বিমূর্ত, যেখানে উপভোগের আনন্দের কোনো সংজ্ঞা নেই। চিত্র শিল্প

কিংবা সাহিত্য যতই বিমূর্ত হবার চেষ্টা করুক, কখনো সঙ্গীতের সমকক্ষ হতে পারবে না।

কিন্তু এই যে এত সুবেশ ও সভ্য নারী পুরুষ এখানে শুনতে এসেছে—এরা সবাই কি সেই শুদ্ধ-শিল্পের উপাসক কিংবা রস গ্রহণে পারঙ্গম? আমার সেই সব খেলো ব্যাঙ্গ করার ইচ্ছে নেই, যে অনেকে ফ্যাসানের খাতিরে আসে. অনেকে আসে টাকার গরমে, অনেকে শাড়ি-গয়না বা শাল-জামেয়ার দেখাতে আসে. গানটান কিছু বোঝে না—শুধু হাতে অপেরা গ্লাস বা বাইনোকুলার নিয়ে ঘুমোয়। তারাও আসুক তাতে কোনো ক্ষতি নেই—আমি তাদের কথা বলছি না—কিন্তু এখানে অনেকেরই মুখে চোখে যে উদগ্রীব নিষ্ঠা দেখতে পাই—তারা সবাই কি সেই শুদ্ধ শিল্পের রস ভোগ করতে পারে? কি করে তা সম্ভব? আমি কোনো উত্তর জানি না, শুধু সমস্যাটার কথাই আমি বলছি। আর্ট সবাইকে স্পর্শ করে না। সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণ মন, বা বলা যায়—এক ধরনের বিশেষ মানসিক গঠন যাদের—শুধু তারাই বিশুদ্ধ আর্টের রস গ্রহণ করতে পারে। যে-কোনো আকারেই হোক সেই আর্টের রসের একটা সার্বজনীনতা আছে। কিন্তু এখানে যত নারী-পুরুষ এসেছে—তাদের প্রায় কারুকেই কোনো চিত্র প্রদর্শনীতে দেখা যায় না, এরা কেউই প্রায় কবিতা পড়ার ধার ধারে না—তা হলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মতন বিশুদ্ধতম শিল্পের প্রতি এদের অনুরাগ আসে কি করে? আমাকে এর উত্তরটা কেউ বুঝিয়ে দেবেন? তা হলে কি এরা প্রায় সবাই, সঙ্গীত নয়, সঙ্গীতের ভেতরকার অঙ্কটাতেই মুগ্ধ? রাগ রাগিনীর ছক, তাল, লয়, তান—কিছুদিন শিখলেই যে-গুলো সম্পর্কে কিছু জ্ঞান জন্মায়—এরা কি শুধু সেটুকুরই সমঝদার?

আর একটা কথাও মনে হয়। শিল্প সৃষ্টি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পী হওয়া কি করে সম্ভব হয়? কবির ছেলে কখনো কবি হয় না, চিত্রশিল্পীর ছেলের পক্ষেও চিত্রশিল্পী হওয়া খুব দুর্লভ ঘটনা, কিন্তু আমাদের সঙ্গীত জগতে এনায়েৎ খাঁর ছেলে বিলায়েত-ইমরাত, আলাউদ্দীনের ছেলে আলি আকবর—এরকম আরও শত শত দৃষ্টান্ত। শুধু চর্চা করলেই কি সঙ্গীতের মতন এরকম বিশুদ্ধ শিল্পের স্রষ্টা হওয়া যায়? বুঝতে পারি না ব্যাপারটা।

তবলা লহরার পর আবার খেয়াল। এবার সিগারেট না খেলে চলে না। হাত পা-ও একটু ছড়ানো দরকার। বাইরেও শীত বেশ কম, চায়ের দোকান সরগরম। সিগারেট হাতে পায়চারি করতে করতে আমি উপরোক্ত কথাগুলো ভাবছিলুম। ইতিমধ্যে গাইতে বসেছেন শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। উঁকি দিয়ে একটু শুনে মনে হলো, ওঁর গান ঠিক আমার লাইনের নয়। যতটা বোঝার, ততটা অনুভব করার নয়। মনে হলো, উনি সঙ্গীত শাস্ত্রের রূপ পরিবেশন করছেন, সঙ্গীতের রস নয়। এখানে স্বীকার করা ভালো, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাকরণ সম্পর্কে আমার জ্ঞান নিতান্তই নগণ্য। সব সময়ে রাগ-রাগিনীও চিনতে পারি না। কোন্ ঠাটে কোথায় কোমল গান্ধার কিংবা শুদ্ধ নিখাদ লাগে—তাও মুখস্ত নেই। ছেলেবেলা থেকেই এসব গান বাজনা শুনতে ভালো লাগে—কিন্তু কোনো গান বা বাজনা শুনলে মনে হয় নেহাতই অঙ্কের

যাই হোক, ফৈয়াজ খাঁর ঘরানার ছাপ তাঁর পরিবেশন পদ্ধতিতে স্পষ্ট। আমার প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের আগেই ফৈয়াজ খাঁ মারা গেছেন, সাক্ষাৎভাবে তাঁর গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু রেকর্ড শুনেছি অনেক, তা ছাড়া, ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য আত্মগোপনকারী এক শিল্পী সন্তোষ রায়ের কণ্ঠে ফৈয়াজ খাঁর অনেকগুলি গান এক সময় খুব শুনতাম, সুতরাং ফৈয়াজ খাঁরই গাওয়া একটি ঠুংরি সরাফতের গলায় শুনে হঠাৎ অন্য রকমের আনন্দ হলো। গানের কথাগুলি কোনো সময়েই ঠিক বুঝতে পারি না, উনা সঙ্গে লাগে, লাগে মোরই আঁখিয়া—এই ধরনের। সরাফৎ শেষ ঠুংরি ধরলেন, বহু বিখ্যাত বাবুল মেরা—

এই সময় মহাজাতি সদনের দেয়ালগুলির দিকে আমার হঠাৎ চোখ পড়লো। দেয়ালে সার সার দেশপ্রেমিক শহীদদের ছবি টাঙানো। আমার হঠাৎ শিহরন হলো। কত কিশোর ও যুবাদের ছবি—আজ এঁদের নামও কেউ জানে না—ফাঁসী কাঠে প্রাণ দিয়েছে। হ্যাংগড নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর, হ্যাংগড্ নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেন আমার জন্মেরও আগে যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে—তাদের কথা ভাবলে আমার নিজেকে কি রকম যেন অপদার্থ মনে হয়। মনে হয়, ওই যুগেই আমার জন্মানো উচিত ছিল। জানি, সংগীত সম্মেলনে এসে এসব চিন্তা অবান্তর। কিন্তু মনে হলো, তার আমি কি করবো।

এরপর শানাই। শানাইয়ের আওয়াজ এমনিতেই মিষ্টি, ভোরের দিকে শানাইয়ের সুর শুনতে এমনিতেই ভালো লাগে। তবু মনে হলো আলি আহমদ হোসেনের দল খুব উচ্চাঙ্গের সুরসৃষ্টি পারেননি। আগেকার রাজামহারাজারা শানাইয়ের সুর শুনেই ঘুম থেকে জাগতেন, আমার কিন্তু শানাই শুনেই ঘুম পেল। রাজাদের উল্টো, খাঁটি প্রলেতারিয়াত-তো আমি! একবার আবছা আসতেই ধড়মড় করে জেগে উঠলাম আবার। নিজে ঠিক জানি না, লোকমুখে শুনেছি, ঘুমোলেই আমার নাক ডাকে যে অনেকে ভাবে কাছাকাছি কোনো সার্কাস কোম্পানির বাঘ বুঝি খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং সম্মান বাঁচাতে তখুনি হল থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

লক্ষ্মীর কৃপালাভ ঃ বাঙালীর সাধনা

অলঙ্কার শিল্প

দৃশ্যটা বড়ো মধুর, বড়ো মর্মস্পর্শী—প্রৌঢ় স্বামী তাঁর বিগত-যৌবনা স্ত্রীর গলায় সোনার মটরমালাটা দুলিয়ে দিলেন। তারপরে স্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে স্বামী যখন মালার হুকটা লাগিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনে পড়ছিল অনেক দিন আগের সেই বালিকা-বধূর কথা—যে-চেলিপরা অগুরু-চন্দন-চর্চিতা মেয়েটিকে পিছন থেকে দু' হাতে ঘিরে প্রায় আলিঙ্গন করেই নবযুবক তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিলেন ঃ যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব।

দিন কয়েক আগে এক সন্ধ্যেবেলায় ১৭১।১-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এ-সরকার অ্যান্ড সনসের গয়নার দোকানে এই দৃশ্যটি দেখেছিলাম। মালিক শ্রীরাজেশ্বর সরকারকে আমি ইশারা করাতে তিনি রসিকতা করে আমাকে বললেন যে, মেয়েরা কিন্তু স্বামীর চেয়েও গয়না বেশী ভালোবাসে।

আমার তা মনে হয় না। মেয়েরা অলংকার নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসেন। আদিম যুগের বনফুল আর কচি বাঁশের-ডগায় তৈরি দুল, গজদন্ত, পশুশৃঙ্গ, শঙ্খপ্রবালের আভরণ, তারপরে হীরে পান্নার অলংকার আর মোতির মালা এবং আরও পরে তামা পেতল সোনা রুপোর অঙ্গভূষণ—চিরন্তনী নারী মন প্রাণ দিয়ে সবই ভালোবেসেছেন। কিন্তু দয়িতের নিজ হাতে পরানো কণ্ঠহার, প্রেমের স্পর্শে রোমাঞ্চিত কোমল বাহুতে বেঁধে দেওয়া বাজুবন্ধ—আমার মতে সেই গয়নার মধ্যে আয়তীর মনে প্রণয়মাধুর্যই ফুটে ওঠে বেশী করে, লোভ নয়। রাজার ঘরের কথা জানি না, মধ্যবিত্ত স্বামী কত কষ্ট, কত পরিশ্রমে উপার্জন ও সঞ্চয় করে স্ত্রীকে যে সুন্দর জিনিসটি গড়িয়ে দেন তাতে থাকে ভালোবাসার ছোঁয়া, আর থাকে অজানা দুর্দিনের পাথেয়। যে স্ত্রী একদিন স্বামীর কাছ থেকে রত্নাভরণের উপহার পরম আনন্দের সঙ্গে নেন, অবসর সময়ে নিজে একা একাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন আর সখীদের দেখান, সেই স্ত্রীই স্বামী-পুত্র-কন্যার মঙ্গলের জন্যে সেই অলংকারই খুলে দিতে একটুও দ্বিধা করেন না। যদি সেই গহনার বিনিময়ে অসুস্থ বা বিপদ-গ্রস্ত স্বামী সুস্থ নিরাপদ হতে পারেন, মেয়ের বিয়ে আর ছেলের উচ্চশিক্ষার পথ যদি প্রশস্ত হয় তাহলে মহীয়সী মহিলাদের সেই সাধের জিনিসও নিমেষে বর্জন করতে যে চোখের পলকও পড়ে না তা আমি নিজে দেখেছি।

এটাই আমাদের বাঙালী ঘরের নিয়ম। তবে অনিয়মও যে ঘটে না তা নয়, কিন্তু সেটা বিরল ঘটনা।

এ সব কথা ভালো করে জেনে শুনেও ওটা হয়ে গেছে আমাদের স্বামীদের স্টক-রসিকতা। এ-সরকার অ্যাণ্ড সনসের সোল প্রোপ্রাইটার রাজেশ্বর সরকার রসিকতাটা করলেন বটে, কিন্তু তিনিও তাঁর নিজের জীবন দিয়েই জানেন, যে কথাটা সত্যি নয়। রাজেশ্বরের স্ত্রী অঞ্জলি তাঁর যৌতুকের গয়নাগুলো স্বামীর হাতে তুলে না দিলে এ-সরকার অ্যাণ্ড সনসের জন্মই হতো না আর আমার এই গল্পটাও বলা হতো না।

রাজেশ্বর সরকার গিনি-হাউসের এম বি সরকারের ছেলে, এ কথা শুনলেই মনে হবে তাহলে আর তেমন হলো কোথায়! বড়লোকের ছেলে বাপের টাকায় দোকান খুলেছিল, এখন নাম ভাঙিয়ে ফলাও ব্যবসা করছে—এতে রোমান্টিক গল্পের মশলা কোথেকে আসবে? কিন্তু তা নয়, এ যে-সে মশলার ব্যঞ্জন নয়, জায়ফল জয়িত্রী এলাচ লবঙ্গের সঙ্গে এতে 'কিশোরী' রঙেরও বেশ কিছু ছিটে ছোঁয়ানো আছে; সেটা ভালো করে আসবে গল্পের শেষের দিকে। আগেরটা আগে বলে নিই।

সরকারদের জমিজিরেত কিছু ছিল বটে, কিন্তু নগদ বলতে কিছু ছিল না। বিশ্বেশ্বর সরকারের বড়ো ছেলে হাজারী-লাল চাকরি করতেন। কোনো কারণে তাঁর ক্যাশ টাকার ভীষণ দরকার পড়লো। যে করে হোক সেটা যোগাড় করতে না পারলে মান ইজ্জত যায়। হাজারীলাল তাই বাবা আর ভাইয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে মায়ের আর স্ত্রীর গয়না বিক্রি করেই টাকাটার সংস্থান করা ঠিক করলেন। কিন্তু বেচতে গিয়ে দেখেন পুরনো গয়নার ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। ব্যাপার দেখে সেই শিয়রে সংক্রান্তি অবস্থাতেও অন্য একটা চিন্তা তাঁর মাথায় শিকড় গেড়ে বসলো। দায়ে পড়ে মানুষ যখন আপনজনের গায়ের গয়না বাজারে বিক্রি করতে যায় তখন যে এমনি করে মোটা লোকসানে তা হাত ছাড়া করতে হয়, এর কি কোনো প্রতিকার নেই? অথচ হাতে টাকা থাকলে পরিবার পরি-জনের জন্যে গয়না গড়াতে মানুষ দু দশ টাকা খরচ করতেও কুণ্ঠিত হয় না যদি বোঝে যে খাঁটি জিনিসটি সে পাচ্ছে, আর বিপদের সময়ে সেটা বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে ন্যায্য অংকের টাকা সে পাবে।

প্রতিকারের জন্যে হাজারীলাল নিজেই

অলংকারের ব্যবসায় নামা ঠিক করে ফেললেন। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে উল্লেখ-যোগ্য কিছু করার মতো ক্ষমতা ছিল না। যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহের জন্য তিনি পথ খুঁজছিলেন, এমন সময়ে এক পুজোর ছুটিতে আসাম থেকে কলকাতায় এলেন তাঁর চতুর্থ ভ্রাতা মন্মথভূষণ। তিনি আসামের এক ইংরেজ চা-করের বাগিচায় কাজ করতেন। সে কালের ইংরেজ প্লান্টাররা এ দেশী কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণত কেমন ব্যবহার করতেন সেটা আমরা সকলেই মোটামুটি জানি। সেখানে চাকরি করার স্পৃহা মন্মথভূষণের অনেক আগেই মুছে গিয়েছিল। মাইনে অবশ্য তিনি মন্দ পেতেন না; মিতব্যয়িতা বজায় রেখে তিনি সেই পারিশ্রমিক থেকে গোপনে সঞ্চয় করতেন।

ছুটিতে বাড়ি এসে যখন তিনি শুনলেন যে বড়দা হাজারীলাল চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নামছেন তখন তিনিও পরম আগ্রহে দাদার সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এবং দাদার সম্মতি পেয়ে অবিলম্বে চাকরি ছেড়ে দিলেন।

১৯০৪ সাল থেকে তোড়জোড় করে ১৯০৫-এ হাজারীলাল ও মন্মথভূষণের ব্যবসায় পত্তন হলো। এঁদের পিতৃদেব বিশ্বেশ্বর সরকার মশায় তখন জীবিত; তাঁর নামেই দোকানের নাম রাখা হলো বি-সরকার অ্যান্ড সনস্। শেয়ালদার খুব কাছে ১৬০ নম্বর বউবাজার স্ট্রীটে বি-সরকারের শো-রুম ও অফিস স্থাপিত হলো।

যে সমস্ত কারণে সেদিন পুরনো সোনার গয়না বিক্রি করে লোকে ন্যায্য দাম পেত না তার ব্যাখ্যা করে এ সরকারের মালিক রাজেশ্বর এবং তাঁ বন্ধু ও সহকর্মী সুধীন নিয়োগী বললেন, যে অতীতে স্বর্ণকাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খরিদ্দারের কাছ থেকে পুরনো গয়না পেতেন, সে-সব ভেঙে তাঁদের নতুন গয়না গড়ে দিতে হতো। নতুন বাট থেকে তৈরি গয়না খুব বেশী হতো না। পুরনো গয়না গলালে তার সোনার সঙ্গে আগের যে 'পান' (জোড়া-তাড়া দেবার জন্যে সোনার সঙ্গে রুপো এবং তামার খাদ) থাকতো সেটা মিশে যেত এবং তারপরে যখন তা থেকে নতুন গয়না গড়ানো হতো তখন আর এক প্রস্ত খাদ মিশে সোনার মান আরও নেমে যেত। এইভাবে একই গয়না বারবার ভেঙে গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত সেটা মরা সোনায় পরিণত হতো। অতএব পুরনো গয়না বিক্রি করতে গেলে ন্যায্য দাম পাওয়া লোকের পক্ষে অসম্ভব হতো।

আরও একটা কারণ ছিল; সেকালের বাঙালী স্বর্ণকারদের শোরুম বা তৎসংলগ্ন কারখানা বলতে তেমন কিছু থাকতো না। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্ডার আনতেন এবং কিছুটা নিজেরা তৈরি করতেন ও বেশীর ভাগটা ফুরনে তৈরি করতে দিতেন কর্মকারদের কাছে। এক্ষেত্রে কর্মকার কিন্তু লৌহশিল্পী কামাররা নন; এঁরা হচ্ছেন যাঁদের আমরা স্যাকরা বলে থাকি চলতি কথায়। রাজেশ্বর সরকার একটা উদাহরণ দিলেন। স্বর্ণকার কর্মকারকে একটা ৮ ভরি ওজনের কঙ্কণ সাত দিনের মধ্যে তৈরি করার ফরমাশ দিলেন; তার মজুরী ঠিক হলো তখনকার দিনের ৫ টাকা। কর্মকার সেই পাঁচ টাকা

তো পেলেনই, উপরন্তু কঙ্কণটি তৈরি করতে যে 'পান'-টুকু কর্মকার ব্যবহার করলেন, ঠিক সেই ওজনের সোনাও তিনি প্রাপ্য হিসেবে নিলেন। এই রেওয়াজকে কেউ অসাধুতার পর্যায়ে না ফেললেও উৎপাদনের এটা একটা প্রকাণ্ড গলদ ছিল।

হাজারীলাল ও মন্মথভূষণ দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত দোষ ত্রুটি শোধরাতে আরম্ভ করলেন।

কর্মকারকে ফুরনে কাজ দেওয়ার পথ একেবারেই না মাড়িয়ে মাস মাইনের মিস্ত্রী রেখে শোরুমের সংলগ্ন নিজ কারখানাতে চোখের সামনে গয়না গড়ানো আরম্ভ করলেন।

এর ফলে বি-সরকারের গয়নার সোনার মান বাজারের চাইতে অনেক উন্নত হলো খরিদ্দার ঠিক যত ক্যারাটের যে জিনিসটি চাইতেন তাই পেতে লাগলেন।

হাজারীলালই প্রথম বাঙালী যিনি বি-সরকারে নির্মিত গহনায় '22 ct' এবং 'B.S.' মার্কা দিয়ে গ্যারাণ্টি-করা সোনার জিনিস কলকাতায় চালু করলেন।

সঙ্গে আছেন সদালাপী মন্মথভূষণ। ক্রেতারা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ: অধিকন্তু প্রতিটি গয়নার সঙ্গে তাঁরা পাচ্ছেন প্রয়োজন মতো টাকা ফেরতেরও গ্যারাণ্টি-পত্র। মুখে মুখে কথাটা সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়লো, আর সামান্য দু এক বছরের মধ্যেই বি-সরকার অ্যাণ্ড সন্সের ব্যবসা বিরাট রূপ নিল। তখন এঁদের মেজো ভাই বিভূতিভূষণ সেজো প্রমথভূষণ এবং কনিষ্ঠ চারুচন্দ্রও ব্যবসাতে যোগ দিলেন।

কৌতূহলোদ্দীপক একটা খবর দেওয়া হয়নি—বি-সরকারের প্রথম বড়ো অর্ডার এসেছিল কলকাতার বিখ্যাত নস্কর পরিবার থেকে—৮০ ভরি ওজনের কোমরের বিছেহার। ওজন শুনে এখনকার স্লিম বাঙালী মহিলারা বোধ হয় মূর্চ্ছা যাবেন। আজকের ট্র্যাভেল-লাইট আধুনিকারা সেকালের 'চলন্ত গিনি-হাউস' গরীয়সীদের কাহিনী শুনেই থাকেন; দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার মতো প্রবীণদের। সেকালের ধনী ঘরের মহিলারা পুজো পার্বণ আর বিয়ে কউভাতে যখন একসঙ্গে দু চারশো ভরি সোনা আর জড়োয়া গয়না পরে উপস্থিত হতেন তখন পঁচিশ ওয়াটের বাতির আলোতেই তাঁদের ঝাড়লণ্ঠনের মতো দেখাতো। সেদিন এক বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কিন্তু দেখলাম যে এখন লুপ্তোম্বার পর্ব চলেছে। উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে, -খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটি, নাক থেকে কান পর্যন্ত টানা একটা ফাঁদি নথ পরে টেবিলে টেবিলে ঘুরে অতিথি আপ্যায়ন করছে। মেয়েটি আমার চেনা; তাকে ডেকে তার রুচির প্রশংসা করাতে সে বললো, "আপনিই একমাত্র অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন, বাড়ির সবাই আমাকে খুব বকাবকি করেছেন।"

'অ্যাপ্রিশিয়েট' তো করলাম কিন্তু ওই সাত আট ভরির গয়না মেয়ে বউকে গড়িয়ে দেবার সামর্থ্য আজ কজন বাপের আছে?

22 ct—B. S.-এর কথায় আমার hall-mark-এর ইতিহাস মনে পড়ে গেল। 'হল-মার্ক' শব্দটার উৎপত্তি ইংল্যাণ্ডে, ১৭২১ সালে। সেই আড়াই শো বছর আগেই ইংরেজ স্বর্ণকাররা ক্রেতার আস্থাভাজন হবার জন্যে তাঁদের Goldsmiths' Companyর মাধ্যমে ধাতুর বিশুদ্ধতাজ্ঞাপক যে ছাপ গয়নাগাঁটি আর সোনারুপোর তৈরি জিনিসে মারতে শুরু করেছিলেন তাকেই বলে হল-মার্ক। উত্তরকালে ইংরেজ সরকারও হল-মার্ক ব্যবহার করতেন সরকারী সোনারুপো বিক্রির সময়ে। আপনারা বিলেত সফরে গিয়ে যখন রুপো বা সোনার সিগারেট কেস কিনে আনেন তখন লক্ষ করাবেন তার ভেতরে হল-মার্ক আছে কি না; না থাকলে বুঝবেন জিনিসটি খাঁটি নয়।

১৬০ নম্বরের ভাড়া বাড়ি থেকে সরকার মহাশয়রা ১৯১৫ সালে ১০০ বউবাজার স্ট্রীট নিজেদের বাড়ি 'গিনি হাউস'-এ উঠে এলেন। বিশ্বেশ্বর সরকার এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাজারীলালের মৃত্যু হলো কিন্তু হাজারীলালের অনুজেরা সসম্মানেই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বউবাজারের শো-রুমে সব সময়েই লোকে লোকারণ্য তো থাকতোই, সরকার হাউস সরকারর খরিদ্দারের বাড়ি গিয়েও অর্ডার আনতেন।

মন্মথভূষণের বড়ো তিন ছেলে—গোষ্ঠবিহারী, কৃষ্ণগোপাল এবং পুলিনবিহারী—ইতিমধ্যে ব্যবসাতে যোগ দিয়েছেন। গোষ্ঠবিহারী বিশ্বেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে পড়তেই ১৯৩০ সালে তিনি অ্যাকাউণ্ট্যান্সি ও বিজনেস অর্গ্যানাইজেশন শিখতে বিলেত যাত্রা করলেন। কিন্তু বছর দুই সেখানে কাটিয়ে ডিগ্রি-ডিপ্লোমা পাওয়ার আগেই মন্মথভূষণের কঠিন অসুখের জন্যে তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হল।

বিলেত থেকে ফিরে ব্যবসাতে আবার ঢোকার পর গোষ্ঠবিহারী কিন্তু বিপদে পড়ে গেলেন। তাঁর অর্জিত বিদ্যা ব্যবসাতে প্রয়োগ করতে গিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে তাঁর পদে পদে মতের অমিল হতে লাগল। মন্মথভূষণ তখন সেরে উঠেছেন। তিনি দেখলেন যে, এভাবে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-সম্পর্কের অবনতি ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। তাই যে-দোকানের সঙ্গে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক, সেই বি-সরকার অ্যাণ্ড সনস্ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নিজের আলাদা দোকান খোলা স্থির করলেন। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতেই বেরিয়ে এলেন কিছুদিন পরেই। সেটা ১৯৩২।৩৩ সালের কথা। বৌবাজার স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে প্রাতঃস্মরণীয় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মশায়ের অনুজ আই সি এস এবং উত্তরকালে কলকাতা হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় কমল চন্দ্রের বাড়ির একতলা পুরোটা ভাড়া নিয়ে 'এম বি সরকার অ্যাণ্ড সনস্ (সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসনস অব লেট বি-সরকার)' প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হল ১৯৩৪ সালে। কয়েক বছরের মধ্যেই এম বি সরকার অ্যাণ্ড সনসের যে সুনাম ও সমৃদ্ধি হয়েছিল, তার বিবরণ দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না। সারা বাংলা দেশ ছাড়া বাংলার বাইরেও সেই প্রতিষ্ঠানের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখন তার অস্তিত্ব না থাকলেও আজও বহু লোক বি-সরকার এবং এম বি সরকার জুয়েলার্সকে এক কথায় চেনে। সেই পরিবারের বংশধরদের মালিকানায় কলকাতা শহরে এখনও দশ-এগারোটা

বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান আছে। রাজেশ্বরবাবুর এ সরকার অ্যান্ড সনস তার অন্যতম।

মন্মথভূষণের মৃত্যু হল ১৯৩৪ সালেই। তাঁর ছয় ছেলের মধ্যে গোষ্ঠবিহারী, কৃষ্ণগোপাল ও পুলিনবিহারী তখন সাবালক, লক্ষ্মীকান্ত ও ব্রজেশ্বর নাবালক, এবং কনিষ্ঠ রাজেশ্বর মাত্র এক বছরের শিশু।

১৯৩৪ থেকে ১৯৫৫—এই একুশ বছরে এম বি সরকার অ্যান্ড সনস ভারতজোড়া নাম কিনলো। কলকাতার শো-রুম ও কারখানার প্রভূত উন্নতি সাধন ছাড়াও বছর বছর পুজোর সময়ে স্পেশাল Exhibition Train-এ এম বি সরকারের অলংকার প্রদর্শনী বাংলা দেশের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো, বাংলার বাইরেও গিয়েছিল দু' একবার। একবার যে এম বি সরকারের গয়না কিনতো, সে নিজেই শুধু বারবার ফিরে আসতো না, সংগে আনতো আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব। অলংকার শব্দটি উচ্চারণ করলেই লোকের মনে এম বি সরকারের শো-রুম আর ক্যাটালগের ছবি ভেসে উঠতো। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপূর্ব যুগের অনেক লেখকের গল্প-উপন্যাসে হ্যামিলটনের বাড়ির গয়না আর রুপোর বাসন-কোসনের উল্লেখ পেয়েছি (ডালহাউসি স্কোয়ারের কাছে আজও হ্যামিলটনের মস্ত শো-রুম দাঁড়িয়ে আছে)। এম বি সরকার অ্যান্ড সনসের গহনার খ্যাতিও সেই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান মার্ট এবং জামসেদপুরেও প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, লক্ষ্মীর অপার কৃপালাভ সত্ত্বেও বি-সরকারের মতো এম বি সরকারের মূল প্রতিষ্ঠানটিও আজ অবলুপ্ত! সুর-নিয়োগী কুমারের সুর পরিবারের মধ্যে যে দৃঢ় ঐক্যবন্ধনের জন্য সেদিন তাঁরা হীরক-জয়ন্তী উৎসব করলেন (গত ২১ অগ্রহায়ণের 'দেশ' দ্রষ্টব্য), সরকার পরিবারে তার অভাব ছিল বলেই হয়তো আজ তাঁদের বংশধররা একটির জায়গায় আলাদা আলাদা দশ-এগারোটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। রূপক করে বলা চলে যে, খাঁটি সোনার মানের অবনয়ন ঘটেছে।

মন্মথভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজেশ্বরের অলংকার ব্যবসায় হাতেখড়ি এম বি সরকারের বালিগঞ্জের দোকানে। তাঁর তখন বয়স আঠারো উনিশ। স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়ার তাঁর খুব সাধ ছিল, কিন্তু দাদারা তাঁর ওপর এত কাজের ভার দিলেন যে, তা আর হয়ে উঠলো না। কিন্তু তাঁর খুব একটা লাভ হল এই যে, দু-চার বছর বালিগঞ্জের দোকানে শিক্ষানবিশী করে কেবল ব্যবসা শেখাই হল না, ও-পাড়ার মহিলা মহলে তিনি সুপরিচিত হয়ে গেলেন। কিশোর ছেলেটির কাছে মেয়েরা কেউ হলেন দিদি, কেউ বউদি, কেউ মাসিমা আর কেউ পিসিমা। এত বছর পরে আজও তিনি মহিলাদের সংগে সেই সম্পর্ক রেখেই একান্ত আপন জনের মতো ব্যবহার করেন। তাঁর দোকানের সুন্দর ডিজাইনের গয়না ছাড়াও খরিদ্দারের সংগে তাঁর এই সুন্দর ব্যবহারই তাঁকে আজ লক্ষ্মীলাভ করিয়েছে।

নাকি আমি ভুল বললাম! রাজেশ্বরকে লক্ষ্মীলাভ করিয়েছেন তো তাঁর গৃহলক্ষ্মী অঞ্জলি। না, সে পরিচ্ছেদটা এখনও মুলতুবী থাক একটুক্ষণের জন্যে।

তাঁকে কলেজে পড়তে দেওয়া হচ্ছে না বলে রাজেশ্বর একদিন অভিমান করে দাদাদের আশ্রয় ছেড়ে একাই বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। সামান্য কিছু টাকা যোগাড় করে বালিগঞ্জের দোকানটা ছোট্ট করে খুললেন ১৯৫৭ সালে। কিন্তু দোকান আর চলতে চায় না। কখনো নগদ টাকার অভাবে সময়মতো সোনা কেনা হয় না, আবার কখনো কারিগরকে মাইনে দিতে দেরি হয়ে যায় বলে তাঁরা কাজ করতে চান না, এইভাবে দিন গুজরান হচ্ছিল।

এমন সময়ে ঘটনাচক্রে ছোট একটি মেয়ের সংগে তাঁর দেখা হয়ে গেল। কোন্ এক আত্মীয় না বন্ধুর পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রপক্ষের পিছনের সারি থেকে একুশ বছর বয়সের রাজেশ্বর কিশোরী অঞ্জলিকে দেখলেন। দেশপ্রিয় পার্কের পাশে রায়সাহেব স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র বসুর বাড়ি। অঞ্জলি দেবী অনুকূলচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা। রাজেশ্বরের বারবার তাঁর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত কিশোরী মেয়েটির মনেও আনলো চাঞ্চল্য।

এসব গোপন কথা আমি শুনেছি রাজেশ্বরের আবাল্য সুহৃদ ও সহচর সুধীন নিয়োগীর কাছ থেকে। কাহিনীটা পড়ে আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠরা বলবেন, "বাব্বাঃ, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলি কী পাকা!" কিন্তু তাহলে তো চোদ্দ বছরের শকুন্তলা (পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে) ও জুলিয়েটরাও পক্ক-পাকার দলে পড়েন।

যাই হোক, এর পরে কী করে যেন পথেঘাটে রাজেশ্বর আর অঞ্জলির দেখা-শোনা হতে লাগলো এবং প্রজাপতির নির্বন্ধে অনতিবিলম্বে তাঁদের পরিণয় মংগলোৎসব অনুষ্ঠিত হল।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—রাজেশ্বরের মা শেষ বয়সে এই কনিষ্ঠ সন্তানের কাছেই থাকতেন এবং রাজেশ্বরের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

বিয়ের পরেই অঞ্জলি স্বামীর টাকার টানাটানি, প্রতিদিন বিব্রত থাকাটা লক্ষ করলেন। কয়েকদিন পরে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। অবস্থাপন্ন পিতার দেওয়া যৌতুকের গয়নার—তা প্রায় দশ-বারো হাজার টাকার গয়না হবে—প্রায় সবটাই তরুণ স্বামীর হাতে তুলে দিলেন ষোলো-সতেরো বছরের সেই নববধূ। এ সরকার অ্যান্ড সনস-এ নতুন প্রাণের সঞ্চার হল সেই কিশোরীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে। তাঁর কল্যাণ হস্তের স্পর্শটুকুর জন্যেই রাজেশ্বরের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যেন এতদিন অপেক্ষা করে ছিল।

অঞ্জলির বড়দা শ্রীঅসীম বসুও তরুণ ভগ্নীপতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ন্যাশনাল গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের চীফ ম্যানেজারের সচিব হিসেবে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে রাজেশ্বরকে তিনি নানা-ভাবে সহায়তা করেছিলেন।

সাতান্ন থেকে বাষট্টি সাল পর্যন্ত এ সরকারের ব্যবসা প্রচুর উন্নতি করলো।

তারপরেই এলো চীনের আক্রমণ, যার ফলে এলো ভারতরক্ষা আইনের কড়াকড়ি এবং আমাদের মোরারজী ভাইয়ের গোলড্ কন্‌ট্রোল রুল। স্বর্ণকার-দের অনেকের ব্যবসা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল আর অনেকে করলেন আত্মহত্যা। (সোনার বিশুদ্ধতার পরিমাপ হল ২৪ ক্যারাট, সোজা কথায়, খাঁটি সোনার মাপ হল ২৪ ক্যারাট। গিনি সোনার হল ২২ ক্যারাট। গিনি সোনার সংগে ১ ক্যারাট আন্দাজ রুপো আর তামার 'পান' মেশানো মিশ্র ধাতুতেই সবচেয়ে ভালো

গয়না গড়া যায়। গোল্ড কনট্রোলে বেঁধে দেওয়া হল যে, ১৪ ক্যারাটের বেশী সোনা অলংকার নির্মাণে ব্যবহার করা চলবে না। তাহলে কী করে ব্যবসা চলবে, এই ভেবেই স্বর্ণকারদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়ে মিছিমিছি কতকগুলি নিরপরাধ মানুষ আত্মবিসর্জন দিল। এখন অবশ্য সেই আইনের কড়াকড়ি অনেকটা কমেছে। ধীরে ধীরে সেটা আরও কমবে বলেই আশা হয়, কারণ, মোরারজীকে আমরা যা-ই বলি না কেন, রাশিয়া প্রমুখ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সহায়তা তো আছেই, অধিকন্তু তিনি পাকেপ্রকারে অ-কমিউনিস্ট ধনী দেশগুলো থেকেও আরও অনেক অর্থসাহায্য আনার রাস্তা প্রায় করে ফেলেছেন। অবশ্য ঠিক তাঁর নিজের হাত-যশে এটা ঘটবে বলে বলা চলে না, ভিয়েত-নামে মার্কিন রাজনীতির বর্তমান দুরবস্থাই তার প্রধান কারণ হবে বলে মনে হচ্ছে।)

গোল্ড কনট্রোলের আগে বাংলা দেশে জড়োয়া গয়নাতে ছাড়া ১৪ ক্যারাট-এর প্রচলন ছিল না। জড়োয়াতে আরও কম ক্যারাটের সোনাও চলতো। সাধারণ গয়না, যাতে যে-সব গয়নার নকশা মণিপুরী বা কটকী কাজ হয়, তা যে ১৪ ক্যারাট সোনায় হতে পারে, সে কথা বাংলা দেশের কর্মকারেরা ভাবেননি। সেই জন্যেই একটা আত্ম-বিসর্জনের কথাটা আগে বললাম। আসল ব্যাপারটা ছিল সত্যের আক্রমণ, সেই অবস্থায় মানুষ ২২ ক্যারাট কেন, ৯ ক্যারাটের গয়না গড়াবার কথাও ভাবতে পারছিল না।

১৯৬৩-৬৪ সাল। বেচাকেনা প্রায় বন্ধ। কিছুটা ন্যায্য কারণবশত এবং কিছুটা অহেতুক ত্রাসে সোনার ব্যবসার কাঠামোটাই ভেঙে পড়ো পড়ো। মোরারজী ভাইও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিকল্প প্রচেষ্টার দিকে ঝুঁকতে উপদেশ দিয়ে ফেলেছেন। এক ভদ্রলোকের উৎসাহে রাজেশ্বর সোদপুরে জমি কিনে এক লোহেতর ধাতুর ফাউনড্রী খুলে বসলেন, অর্থাৎ অব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন। এই উদ্যোগে বেশ কিছু টাকা খরচ করলেন, অর্ডার-টর্ডারও বেশ পাচ্ছিলেন, কিন্তু যে ভদ্রলোক তাঁকে এই কাজে নামিয়েছিলেন, তিনি অন্যত্র বেশী মাইনের কাজ পেয়ে মধ্যপথে বিদায় নিলেন। মাঝের থেকে রাজেশ্বরবাবুর কতকগুলো লোকসান হয়ে গেল। তিনি আবার ঘরে ফিরে এলেন। আবার সেই গয়নার ব্যবসা। তিনি এবার ১৪ ক্যারাট সোনার গয়না গড়ে তার প্রচার ও প্রচলনের চেষ্টায় গ্রাহকের ঘরে ঘরে যেতে লাগলেন। সেই উদ্যোগের ফলে-নীচু দামের সোনাও খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। বিক্রি বেশ কিছুটা বেড়ে গেল।

ছেষট্টি সালে ভারত সরকার কনট্রোল অর্ডার শিথিল করে আবার ২২ ক্যারাটের গয়না গড়ার অনুমতি দিলেন। এ সরকার অ্যান্ড সনস আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করলেন। তারপরে এই দু' বছরে এ সরকার অ্যান্ড সনসের বিক্রি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করেছে। দোকানের ওপরের অপ্রশস্ত জায়গায় কারখানায় অনেকদিন ধরেই কুলোচ্ছে না, তাই ১০৭ নং মতিলাল নেহরু রোডে এ সরকারের বড়ো কারখানা বসানো হয়েছিল। সেখানে এখন উনিশ-কুড়িজন কর্মকার ও কারিগর কাজ করেন। রাজেশ্বর ও সুধীন নিয়োগীর সহকর্মী হিসেবে আছেন প্রবীণ শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাগ—সরকার পরিবারের সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের সম্পর্ক। ক্যাশিয়ারের দায়িত্বপূর্ণ পদে যিনি আছেন তিনিও প্রবীণ ব্যক্তি; নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। হিসাবরক্ষক শ্রীজ্যোতিন্দ্রনারায়ণ রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। অগণী সাউ, আনন্দ মণ্ডল প্রমুখ পাঁচ-ছজন সেলসম্যানদের সকলের নাম করা সম্ভব নয়। তাঁরা সকলেই তরুণ হওয়া সত্ত্বেও এরই মধ্যে প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেছেন।

কারখানায় যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শেখ মোসলেম আলি এবং শ্রীনিবারণ মণ্ডল। এঁরা সুপার-ভাইজার। এ সরকার অ্যান্ড সনসের দুটি নেপালী দারোয়ান এবং একটি বিহারী ড্রাইভার ছাড়া সবাই বাঙালী।

রাজেশ্বর আর সুধীনকে আমি সেদিন সন্ধেবেলার প্রচণ্ড ভিড়ে কোনঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম যে, যেদিন ভিড়টা একটু কম থাকে সেদিন এলে পারতাম। শুনে রাজেশ্বর সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "সন্ধেবেলায় এলে প্রায় রোজই এখন এমনি ভিড় পাবেন। তবে আপনার চেনা অনেকের দেখা এখানে পাবেন।" যেমন, শিল্পী যামিনী রায় মশায়ের বাড়ীর লোক (দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁদের আমি চিনি না), রাধারাণী দেবী (হ্যাঁ, বাল্যকাল থেকে তাঁর কবিতা পড়া ছাড়াও তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি আমাদের নবনীতা সেনের মা বলে), আশাপূর্ণা দেবী ও প্রতিভা বসু (সাহিত্য-জগতের এই উজ্জ্বল তারকাদের আমি সসম্ভ্রমে দূরে থেকে দেখি), অমলাশংকর (ছেলেবেলায় এঁর সঙ্গে যথেষ্ট জানাশোনা ছিল) প্রমুখ কলকাতার 'এলিট' সমাজের অনেকের নাম করলেন রাজেশ্বর সরকার।

তিনটি মহিলা ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। একজন আমার বেশ চেনা, শিল্পী রণেন আয়নের স্ত্রী হিল্লোলা আয়ন দত্ত, আর একজনের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তাঁর স্বামী সেন-র‍্যালে ও সেন-পণ্ডিতের শ্রীকালিদাস গাঙ্গুলির সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আছে। শান্তি দেবী এককালে খ্যাতনাম্নী গায়িকা ছিলেন। তাঁরা নিজেদের জন্যে প্রথমসারিতে জায়গা করে নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে একটি সদ্যনির্মিত কঙ্কণের কারুকার্য পরীক্ষা করতে লাগলেন।

আর আমি আরও একটু কোনঠাসা হয়ে এ সরকারের ক্যালেণ্ডারের ঐরাবতা-রূঢ়া লক্ষ্মীদেবীর (কোন্ পুরাণে মালক্ষ্মীর এই রূপ আছে সেটা আমার জানা নেই) ছবির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বিশ্বকর্মা

'প্রজাপতি' দণ্ডিত

১৩৭৪ সালের শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্র জা প তি উপন্যাসে অশ্লীলতার অভিযোগে মামলা এনেছিলেন টালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীঅমল মিত্র। বেশ কয়েক মাস মামলা চলার পর গত ১১ ডিসেম্বর চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীকুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত তাঁর রায় দিয়েছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা অনুসারে প্রজাপতি উপন্যাসের লেখক শ্রীসমরেশ বসু ও দেশ শারদীয় সংখ্যার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীশীতাংশু দাশগুপ্ত অপরাধী নির্দিষ্ট হয়েছেন। এই দু' জনের প্রত্যেকের ২০১ টাকা করে জরিমানা হয়েছে, অনাদায়ে দু' মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড। ম্যাজিস্ট্রেট আরও আদেশ দিয়েছেন যে, ৫২১ ধারা অনুযায়ী, আপিলের সময় উত্তীর্ণ হবার পর, ১৩৭৪ সালের শারদীয় দেশ পত্রিকার ১৭৪ থেকে ২২৬ পৃষ্ঠা নষ্ট করে ফেলতে হবে। লেখক ও প্রকাশক দু'জনেই জরিমানার টাকা জমা দিয়েছেন।

নভেম্বর মাসে কয়েকদিন শুনানি চলার পর রায়ের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছিল ১১ই ডিসেম্বর। প্রত্যেকদিনই আদালত কক্ষে প্রচুর কৌতূহলী নারী-পুরুষের সমাবেশ হয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক লেখিকাও ছিলেন। অভিযুক্ত সমরেশ বসুর পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও নরেশ গুহ।

বিচারক তাঁর টাইপ করা রায় পড়ে শোনান। উপন্যাসটির মূল আখ্যান বর্ণনা করে তিনি লেখক হিসেবে সমরেশ বসুর শক্তিমত্তার কথা স্বীকার করেন। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসটি বারবার পড়ার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, উপন্যাসটির বিষয়-বস্তু ফুটিয়ে তোলার জন্য যেভাবে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে-সব চরিত্র আনা হয়েছে ও যে-সব শব্দ চয়ন করা হয়েছে—সজ্ঞানভাবে তার প্রবণতা অশ্লীলতার দিকে। যে-সব পাঠকের মন যথেষ্ট পরিশীলিত নয়, যাদের মন সহজেই দুর্নীতির দিকে ঝুঁকতে পারে—এই ধরনের রচনা তাদের হাতে পড়লে যথেষ্ট ক্ষতিকর হতে পারে। এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই বইটির অনেক অংশ লেখা হয়েছে। বিচারকের মতে, শুধু লাল কালির দাগ দেওয়া অংশগুলিই নয়, সমগ্র উপন্যাসটিই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, পঞ্চাশ বছর পর হয়তো এই বইখানিই একটি নৈতিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হবে। বিচারক মন্তব্য করেছেন যে, পঞ্চাশ বছর পর দেশের সামাজিক অবস্থা কি রকম হবে—তা কেউ বলতে পারে না—সুতরাং বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সব রচনা বিবেচনা করতে হবে। এবং বর্তমান কালের পক্ষে এই গ্রন্থ অশালীন। লেখকের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে, সমাজের কোনো রকম ক্ষতি হয়—কোনো লেখকের সে-রকম কোনো রচনা প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ এসব রচনা, লৌহ সিন্দুকে বন্ধ থাকবে না—যে-কোনো পাঠকের হাতেই পড়তে পারে এবং অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাঠক এই সব রচনা পড়ে বিপথে যেতে পারে।

বুদ্ধদেব বসু ও নরেশ গুহ'র সাক্ষ্যের উল্লেখ করে বিচারক বলেন যে, বক্ষ্যমান আইনের চোখে ও'দের সাক্ষ্যের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কারণ, ও'রা দু'জনেই বুদ্ধিজীবী ও অভিজ্ঞ পাঠক—যে-কোনো বই পড়ার সময়ই ও'রা সে-বইয়ের শুধু শিল্পরসেরই সন্ধান করবেন—শ্লীল-অশ্লীলের বিচার করবেন না। কিন্তু যে-সব পাঠক শিল্প রস গ্রহণে সক্ষম নয়, তারাও এই রকম [illegible] ও বর্ণনা পড়ে কলুষিত হতে পারে।

বিচারক বলেছেন, আইনে অশ্লীলতার কোনো সংজ্ঞা নেই। কিন্তু গত এক শো বছর ধরে একটি নীতির দ্বারাই বিচার নির্দিষ্ট হচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে, যে জিনিসকে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে—দেখতে হবে তার প্রবণতা কোন দিকে। যারা এ সব রচনা পড়ে সহজেই নীতি বিগর্হিত কাজের দিকে ঝুঁকতে পারে—লেখক তাদেরই আকৃষ্ট করতে চান কি না। সুনীতি বা শোভনতা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যদি হয়ও, তবুও অশ্লীলতার এই পরীক্ষাটি এখনও অচল হয়ে যায় নি। বিচারক মনে করেন যে যাদের মন কাঁচা, আবেগপ্রবণ তারা এই বই পড়ে অনায়াসে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সুতরাং লেখক হিসেবে সমরেশ বসু এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে শীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত এর দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। লেখকের একটা দায়িত্ব আছে। তাঁর স্বাধীনতা যেমন বিরাট, তাঁর দায়িত্বও বিরাট।

অভিযুক্ত পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ব্যারিস্টার অরুণপ্রকাশ রায়, ব্যারিস্টার এস এন ভৌমিক, অ্যাডভোকেট জ্ঞানশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অ্যাডভোকেট সমর বসু।

বাদী পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট শ্রীতপেন রায়চৌধুরী, অ্যাডভোকেট শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অ্যাডভোকেট শ্রীহরেন্দ্রকিশোর অ্যাডভোকেট শ্রীকমলেশ মিত্র।

রায়দানের দিন, ১১ই নভেম্বর ছিল সমরেশ বসুর জন্মদিন।

কৃত্তিবাস

অনেকের ধারণা ছিল তরুণদের কাগজ পত্রিকা কৃত্তিবাস বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে, আমরাও সে-রকমই ভেবেছিলাম। কৃত্তিবাসের ২৫নং সংকলনে সে রকমই আভাস ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কৃত্তিবাসের ২৬নং সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কৃত্তিবাস আগে যাঁরা চালাতেন—তাঁরা ভার ছেড়ে দিয়েছেন, এখন প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণতর কবিরা। এই সংখ্যা বেলাল চৌধুরী ও নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বেরিয়েছে। সংখ্যাটিতে অতি তরুণ ও অতি নবীন কবিদের অনেকগুলি দীপ্ত ও প্রাণবন্ত কবিতা রয়েছে। কবিতা বিষয়ক দুটি গদ্য রচনাও বিশেষ অভিনিবেশ যোগ্য—সে দুটি লিখেছেন অমর ভট্টাচার্য ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

হাতে রইল তিন। বিমল মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা-৯। মূল্য ৬·০০।

বিমল মিত্র পাঠকমহলে সবিশেষ জনপ্রিয়, একটি স্বতন্ত্র আসনের অধিকারী। তাঁর প্রকাশিত কোন গ্রন্থ নতুন করে লেখকের পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। দুর্বোধ্যতা বা রচনার অতিপ্রাঞ্জলতার না গিয়ে এই উপন্যাসের লেখক স্বভাবসিদ্ধ মুনশিয়ানায় তাঁর পরিচিত বিস্তৃত ক্যানভাসে মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমঃঅবক্ষয়ের যে ছবি এঁকেছেন তা যথার্থ ছবি। এ কাহিনী আমাদের পরিচিত আদলেরই স্পষ্ট অবয়ব। প্রতিদিনকার দেখা চরিত্রকে আরও আন্তরিক করে পাওয়া।

অবক্ষয় কি? হয়তো জন্মের মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর প্রতি পদচারণা, হয়তো তৈলহীন প্রদীপের বাকি সলতেটুকু কাঠি দিয়ে ক্রমশ উসকে দেওয়া। হয়তো তাই। তবুও আশাবাদী হতে হয়, প্রতিমুহূর্তে আমরা বাঁচার স্বপ্ন দেখি, দেখতে হয়। এভাবেই জীবনটাকে কোন এক অজানা কাণ্ডারী পারাপার করে দেয়। সোজা হিসেব। তবু হিসেবেরও গরমিল হয়।

কোনো নীলমণি হালদার লেনের উনত্রিশের তিনের ছয়-এর তিনতলা ঘুণ ধরা বাড়িটায় সংসার যাত্রা আটকায় না। কর্পোরেশন হবার আগেই তৈরি এ বাড়িটার বাসিন্দেদের শুধু দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া। দেখে শুচিবাই রাধাপিসি গাল পাড়ে। নতুন বউ-এর বে-আব্রু বাথরুম সারাবার জন্যে পেরেক হাতুড়ী পিটলে ও-বয়েস

ভাড়াটে ছুটে আসে। ছাদের উপরে যখন হরিপদ চক্রবর্তীর মেয়ের বিয়ে, তখন দোতলায় হিমাংশুবাবুর বুকের ব্যথায় ডাক্তার কোরামিন দেয়, অক্সিজেন আনে। তখনই একতলায় ভবদুলালের ছেলে হওয়ার আনন্দে শাঁখ বাজে, চেঁচিয়ে ঝগড়া হয়, মারামারি হয় কিন্তু কেউই বাড়ি ছাড়ে না। সবাই খোঁজে বাড়িওয়ালায়। বাড়িওয়ালা আসে না। সৃষ্টিধর তার প্রতিনিধি। সৃষ্টিধর সারাজীবন শুধু বাড়িওয়ালার আসার খবর দিয়ে যায়। আসলে সৃষ্টিধরই মালিককে কোনদিন দেখে নি। শুধু এক অজানা আশায় দিন গোনা।

কোন এক অদৃশ্য হাতের আঙুলে সমাজ এক নিয়মে ঘুরে চলে, কিংবা আমরা আপ্রাণ চেষ্টায় ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি।

জয়ন্তীরাও চেষ্টা করে। আনন্দ রায় তাকে নিয়ে গোল্ড স্মাগলার কাঞ্জীভাই দেশাইয়ের ফ্ল্যাটে তোলে। জয়ন্তী ব্লাউজের ফাঁকে করকরে টাকা রেখে গ্র্যান্ড হোটেলে রাত কাটায়। পুলিস আসে। আবার এ-মেয়েও বিয়ের পিঁড়িতে এসে বসে। আনন্দকে মন্ত্র পড়তে হয়, যদিদং হৃদয়ং তব...।

চরিত্র-চিত্রণে বিমল মিত্রের অত্যন্ত নিজস্ব একটি ক্ষমতা আছে, যা পাঠককে সম্মোহিত করে রাখে। উপন্যাসের পরিবেশ, পটভূমিকার সঙ্গে ক একাত্ম হয়ে যাওয়া, চরিত্রের দুঃখ, বিষাদ ভালবাসার সঙ্গে নিজের শরিক হওয়া তাঁর মহৎ গুণ। উপন্যাসের চরিত্রাবলী বিমল মিত্রের পূর্বপরিচিত উপন্যাসে অন্যভাবে, অন্য আধারে অন্য আদলে এলেও এ গ্রন্থে এরা যেন আমাদের অতি পরিচিত। লেখকের অদ্ভুত গল্প বলার ক্ষমতা এবং তাঁর সমাজচেতনা, জীবন দর্শন, ও অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই 'হাতে রইলো তিন'কে পূর্বাপর উপন্যাসের মতো পাঠক মহলে সমাদৃত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(১৮৮/৬৮)

প্রাপ্তি স্বীকার

লৌকিক ও রাগসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে। শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজংকার। অনুবাদঃ কৃষ্ণা বসু। সঙ্গীত পরিষদ : ১বি৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য ২·০০।

বারো মাসে তেরো পার্বণ : কি ও কেন? স্বামী নির্মলানন্দ। শ্রীশ্রীপ্রণব মঠ : ২১১ রাসবিহারী অ্যাভিনু, কলিকাতা-১৯। মূল্য ৪·০০।

আজিকার উত্তর ভিয়েৎনাম। পি জে হনি। অনুবাদ : দীপক চৌধুরী। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী : কলিকাতা-১২। মূল্য : ৫·০০।

ভিয়েৎ কং। ডগলাস পাইক। অনুবাদ : ভূদেব ভট্টাচার্য। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী : কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

তপন সিংহের পরিচালনায় গৌরকিশোর ঘোষের গল্প অবলম্বনে ‘সাগিনা মাহাতো’ ছবির শ্যুটিং গত সপ্তাহে আরম্ভ হয়েছে—শ্যুটিংয়ে যোগদানের জন্য নাম-ভূমিকার শিল্পী দিলীপকুমার কলকাতায় আসেন—সেটে শিল্পী-দম্পতি দিলীপকুমার ও সায়রা বানু—উভয়কে এক সঙ্গে বাংলা ছবিতে এই প্রথম দেখা যাবে ফটো-দেশ

চিত্র-সমালোচনা

কখনো মেঘ

ছবির নামটি সুন্দর, ছবিটিও পরিচ্ছন্ন। আর সব ক্রাইম ছবির (আর আদ্যন্ত পাপ ও গোয়েন্দাগিরি) মত নয় “কখনো মেঘ” (চলচ্চিত্র ভারতী)। একটি খুন, স্মাগলারদের গোপন চক্র ভিলেনের পাপাচার ইত্যাদি সবই ছবিতে রয়েছে। কিন্তু অন্য ক্রাইম ছবিতে নায়ক কিংবা নায়িকার রাহুর দশা যেমন অর্থাৎ যে-ভাবে তারা বিনা মেঘে বিপদকে পড়ে, এ-ছবিতে তেমন ঘটেনি। “কখনো মেঘ”-এর নায়িকা সীমার (অঞ্জনের শিক্ষিকা) হাসি-খেলার কিছুক্ষণের জন্য যেন ছেদ পড়েছে—ক্রাইমের সাময়িক ছায়াপাতই শুধু। সত্যিই মনে হয়েছে কখনো মেঘ, শেষে রোদ। মেঘ জমেছে যখন, সীমা তখন বিব্রত, বিপন্ন। কিন্তু তার নিজেরও একটা গল্প আছে। দুর্বৃত্তদের কাহিনী এক, সীমার অন্য।

সীমার কাকা ছিল স্মাগলারদের দলে। সে খুন হয়েছে। দলের লোককে ফাঁকি দিয়ে সে যে হীরে সরিয়েছিল, তা সীমার কাছে আছে বলেই দুর্বৃত্তদের বিশ্বাস। তাই সীমার উপর একাধিক ব্যক্তির নজর ও অত্যাচার। “কখনো মেঘ”-এর নতুনত্ব এই, সীমা একদিকে দুর্বৃত্ত অপরদিকে কন্দর্প দ্বারা তাড়িত। একটি বিপদের মোকাবিলা সে যেমনি করে যাচ্ছে, তেমনি তার বোঝাপড়া চলছে নিজের মনের সঙ্গে—সমরেশ চৌধুরী নামে সদ্যোপরিচিত সুদর্শন এক যুবকের ঘনিষ্ঠতায়। প্রেমের ফাঁদে যে ওরা পড়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সহজ, স্বাভাবিক তাদের মেলামেশা—সেই গোড়া থেকে, দার্জিলিংয়ে প্রথম দেখা হবার পর। ধীরে ধীরে তারা আরও ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কখনও তা সিনেমার মামুলী প্রেমোপাখ্যানের রূপ নেয়নি। চিত্রনাট্যের বৈশিষ্ট্য এই, সীমার জীবনে সুজন এবং দুর্জনের সুখসান্নিধ্য ও ষড়যন্ত্র সমান্তরাল-ভাবে চলছে। ছবিতে একদিকে যেমন তিলে তিলে সাসপেন্স গড়ে তোলা হয়েছে—যা দর্শককে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় স্তব্ধ করে রাখে, অন্যদিকে তেমনি ধীরে ধীরে একটি নির্মল বন্ধুত্বের উত্তরণ ঘটানো হয়েছে প্রেমে। ক্রাইম সর্বস্ব ছবিতে প্রেমিক-প্রেমিকার বিপদ দেখতে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য ক্রাইম ও কমেডির এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ছবিতে আছে এক ভিন্ন সুখ-আস্বাদের প্রতিশ্রুতি। কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার প্রশান্ত দেবের কৃতিত্ব এই ক্ষেত্রে সামান্য নয়। তাঁর লেখা সংলাপও চমৎকার।

পরিচালক অগ্রদূতের বাহাদুরি এই, তথাকথিত ‘কমার্সিয়াল’ বা আমুদে ছবিই

[illegible] বিশ্বাসের 'ঋষি অরবিন্দ' (পরিচালনা : দীপক গুপ্ত) ছবিতে শমিতা বিশ্বাস ফটো-দেশ

তিনি আবার উপহার দিয়েছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর ছবিও যে কতখানি রুচিবোধ, সংযম, ডিটেলের প্রতি মনোযোগ এবং রস বোধের সঙ্গে তৈরি করা যায় সে পরিচয় দিলেন অগ্রদূত। এই ছবির একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়—তার আভাস ক্রেডিট টাইটেলেই। এবং সেই থেকে যথাসম্ভব গতানুগতিকতা বর্জন করে, কখনও কমেডির আঙ্গিকে, কখনও বা রোমান্টিক চিত্রের ধাঁচে তিনি ক্রাইম-সম্বলিত কা হি নী টি কে রুদ্ধশ্বাস পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। রহস্য ও রোমাঞ্চের উপকরণও যথেষ্ট। ডিটেলের প্রতি পরিচালকের কী পরিমাণ নজর তা এই বললেই যথেষ্ট যে নায়ক এই ছবিতে গাড়ি থেকে নেমে জানালার কাচ তুলে গাড়ি লক করেছে এবং ট্যাক্সিচালক খদ্দের নামিয়ে দিয়ে কিছুতেই "ওয়েট" করতে চায় নি। পরিচালকের পরিমিতি বোধের কথাও বলতে হয়। কোন দৃশ্যই অকারণে দীর্ঘ নয়। অবশ্য গুণের সঙ্গে দোষের কথাও বলা দরকার। স্টুডিওতে তৈরি বাড়ি, পার্ক ও গলি কেমন যেন দৃষ্টিকটু, এই ছবিতে। মামুলী লক্ষণ ছবিতে একেবারেই নেই তাও নয়। নায়ক গান গায়নি ভাল কথা। নায়িকার মুখে যেন জোর করে গান বসানো। এবং একটি মুহূর্তে যখন শিক্ষিকার মুখে অন্তত রবীন্দ্রসংগীত আশা করা হয়েছিল—বিশেষ করে নায়ক যখন তাকে রবীন্দ্র-অনুরাগিনী বলেছে—তখনও তার কণ্ঠে আধুনিক গান। দুটি ছোটখাটো কিছু আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে ছবিটি চিত্তাকর্ষক। এক কথায়, উপভোগ্য ছবি অগ্রদূত আগেও দিয়েছেন। কিন্তু পরিচালনার গুণে এ-ছবিতেই সব চাইতে বেশী।

ছবিতে নায়ক-নায়িকার অভিনয়ের ধারাও স্বাভাবিক। উত্তমকুমার আজকাল স্বভাবতই স্বাভাবিক অভিনয় করেন। এখানেও তিনি খুব স্মার্ট, চরিত্রোপযোগী তাঁর সংযম ও বুদ্ধির প্রকাশ। ফটোগ্রাফির গুণে নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিককে দেখিয়েছে ভাল। এবং আরও ভাল তাঁর অভিনয়। খুব স্বচ্ছন্দ তাঁর বাচনভঙ্গী। মনেই হয় না, তিনি অভিনয় করছেন। বাড়িতে সবাই যেমন কথা বলে, তেমনি তাঁর কথা বলার ধরণ। এই চরিত্রাঙ্কণের পিছনে পরিচালকের সজাগ দৃষ্টিও বোধগম্য।

দুর্বৃত্ত হলেই তার বিশেষ মেক-আপ, কথা বলার বিশেষ ধরণ থাকবে এমন কী কথা আছে? বঙ্কিম ঘোষ ও তরুণ মিত্রকে দেখে এ কথা দর্শকের মনে হতে পারে। যদিও তাদের অভিনয় কৃতিত্বপূর্ণ। ওই দলের সকলেই অভিনয়ের দক্ষতা দেখিয়েছেন। কামু মুখোপাধ্যায়ও বাদ যান না।

এ ছবিতে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের টাইপ চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতার খুব প্রশংসা হবে। তাঁর অভিনয় অন্য ধরনের এবং উঁচুদরের। নায়িকার বান্ধবীর চরিত্রে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সাবলীল। পার্শ্ব-চরিত্রে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, আনন্দ মুখোপাধ্যায়ও সুঅভিনয় করেছেন।

আবহ সংগীত ও এফেক্ট মিউজিক-এ সংগীত-প রি চা ল ক সুধীন দাশগুপ্ত কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। নেপথ্য সংগীত ও ধ্বনি বহু পরিস্থিতির ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। গানের সুরও তিনি সুন্দর দিয়েছেন। বিশেষ উল্লেখ্য বাগেশ্রী-ঘেঁষা "তোমায় দেখে ছবি এঁকে" গানটি। অদ্ভুত দরদ দিয়ে গানটি গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। ছবিতে গান যেভাবেই প্রযুক্ত হোক না কেন, আলাদাভাবে গানগুলি জনপ্রিয় হবে।

কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজই সন্তোষজনক। বিশেষ প্রশংসনীয় ফটোগ্রাফি (বিভূতি লাহা-কৃত), তারপর সম্পাদনা (বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়)।

জীবন সংগীত

বড় আদর্শ ফলাও করে দেখাবার তাগিদ যেখানে, বাস্তবের প্রতি সেখানে স্বভাবতই একটা উপেক্ষা দেখা যায়। এমন না হলেও

নির্মল মিত্র পরিচালিত "প্রথম বসন্ত" ছবিতে জিজি চক্রবর্তী

চলে। কিন্তু নাটকীয় সিনেমায় এ-ছাড়া বুঝি উপায় থাকে না। এখানে মানুষের মহত্ব হয়ে পড়ে মাত্রাহীন, সাধারণ লোকের মাঝখানে দেখা যায় লোকোত্তর চরিত্র। তা না-হলে নাটক জমবে কী করে? "জীবন-সংগীত" (পি এম পিকচার্স) এবং এই ছবির বুদ্ধ-বৃদ্ধার কথাই ধরা যাক। তারা একালের, কলিকালের কে বলবে? পরের সংসার চালাবার জন্য কেউ পথে পথে ভিক্ষা করে? পরই বা বলব কাকে। নায়ক পরমেশ তাদের কাছে পুত্রাধিক। তাকে জামাই করবার সাধ ছিল বৈষ্ণব-দম্পতির। বিয়ের আগেই তাদের মেয়ে হঠাৎ মারা যায়। পরমেশ অবশ্য পরে সংসারী হয়েছে। কেমন করে হল তার মধ্যে আধুনিক বেকার যুবকের সিনেমাসুলভ জীবনসংগ্রামের (অর্থাৎ ছবিতে যা দেখতে আমরা অভ্যস্ত) কাহিনী বর্ণিত। বিয়ে করার শর্তে সে চাকরি পেল। আবার চাকরি চলেও গেল। তখন তার একটি মেয়ে হয়েছে। সংসারে অভাবও দেখা গেল তার পরেই। একটির পর একটি গয়না বিক্রি হচ্ছে। কোলের মেয়ে দুধের জন্য কাঁদছে। দুধ কেনার পয়সা নেই। গয়লা পাশের বাড়িতে দুধ দিয়ে যাচ্ছে। ওদের দেবে না—টাকা বাকি। বাংলা-ছবির এই সব গতানুগতিক অধ্যায় যখন চলছে তখনই বহুকাল পর নায়কের সঙ্গে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আবার দেখা। শেষে অবশ্য নায়ক আবার চাকরি পেয়েছে। [illegible]

সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবির একটি দৃশ্যে তপেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ—ছবির শ্যুটিং শেষ

পাওয়া ও হঠাৎ তা চলে যাওয়ার ব্যাপারে ছবিতে কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। তবে সুখের কথা, নায়ককে অভাবের তাড়নায় মামুলী রীতি অনুযায়ী কুপথে যেতে হয়নি। যদিও তার উপক্রম হয়েছিল।

কৃত্রিম ভাবাবেগ সর্বস্ব এই মেলোড্রামা দেখে 'সেণ্টিমেণ্টাল' দর্শকের চোখে জল আসবে ঠিকই। কিন্তু বিচারশীল দর্শক কী সুখ পাবেন কে জানে। চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু (মূল কাহিনী শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের) অতি নাটকীয়। প্রায় ঘটনাই পুরাতন।

অবশ্য পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় নাট্যামোদী দর্শকের জন্যই এ ছবি করেছেন। তাঁরা তুষ্ট হবেন হয়ত। পরিচালকের সূক্ষ্ম কাজ দুয়েকটি দৃশ্যে লক্ষ্য করার মত। যেমন পরমেশের জন্য সুদক্ষিণার (প্রথম নায়িকা) চা তৈরির ঘটনা। কাপে চা উপচে পড়ছে, এ-যেন তার অন্তরের খুশির জোয়ার। মধ্যবিত্ত ঘরের (নায়কের বিবাহিত জীবনে) পরিবেশ ও কয়েকটি ঘটনা চিত্রণেও পরিচালকের বাস্তব-বোধ লক্ষণীয়। কিন্তু এই গল্পে সেসব কোন কিছুই সুফল দেয়নি।

অভিনয়ও নয়। যদিও প্রধান শিল্পীরা কাহিনীর অবাস্তবতার মধ্যেও অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনয় অনিল চট্টোপাধ্যায় (নায়ক), সন্ধ্যা রায়, স্নিগ্ধা ঘোষ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণীর। পার্শ্বচরিত্রে চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়েছেন অনুপকুমার, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, সুমন মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতি।

ছবিতে গান অনেক। গানের সুরও ভাল দিয়েছেন সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অতুলপ্রসাদের গানটি তিনি ভাল গেয়েছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণ মানের।

বুঁদ জো বন গয়ী মোতী

ভি শান্তারামের ছবিতে কী মিলবে ইদানীং তাঁর কয়েকটি ছবি দেখে দর্শকের পক্ষে তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাঁর আধুনিকতম ছবি—যার কাব্যিক নাম "বুঁদ জো বন গয়ী মোতি" (যে চোখের জল মোতিতে পরিণত)—ওই সব পূর্ব-লক্ষণাক্রান্ত। নিসর্গ শোভা ও রঙের বাহার তো আছেই, তা-ছাড়া লিরিক্যাল মুহূর্ত রচনায় প্রয়াসও লক্ষণীয়। যদিও এ ছবির গল্প অনেকটা আধুনিক। মূলত দুই ভাইয়ের গল্প। বড় ভাই আদর্শবাদী শিক্ষক। ছোট ভাইকে মানুষ করে তোলাই তার প্রতিজ্ঞা। এ ক্ষেত্রে ছোট ভাই যে অমানুষ হয় সে নজির সিনেমায় আছে। নিউ থিয়েটার্স-এর "প্রতিশ্রুতি" গল্পের সঙ্গে এ ছবির কাহিনীর খুব মিল। তবে "বুঁদ জো......" চিত্রে বড় ভাইকে খুনের দায়ে পড়তে হয়েছে। অপকর্মটি যে ছোট-ভাইয়ের তা বলার দরকার নেই।

মাস্টারজী তথা আদর্শবাদী নায়কের (জিতেন্দ্র) হাতে সব সময় একটি ছাতা। ছাতাটি তার আদর্শের প্রতীক। স্কুলের গভর্নিং বডির মিটিংয়ের সময় ছাতার ক্লোজ-আপ দ্রষ্টব্য। ব্যাপারটি হাস্যকর তবে এক সময় মাস্টারজীর হাতে ছাতা দেখা গেল না। পাহাড়ী মেয়ে শেফালীর (মমতাজ) সঙ্গে যখন মাস্টারজী টাঙ্গায়, যখন মাস্টারজীর পোশাক হিন্দী ছবির নায়কের মতই, যখন মাস্টারজী শেফালীকে প্রেমের গান শোনাচ্ছে তখন ছাতাটি অদৃশ্য।

গল্পে আধুনিক শিক্ষা সমস্যা, ক্রাইম, আদালত-দৃশ্য, টুইস্ট ক্যাবারে নাচ সবই রয়েছে। বিষয়বস্তু একালের। গল্পের পটভূমি শুধু পাহাড়ী অঞ্চলে। বোধহয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখাবার জন্য। এবং নায়িকা, যার নানা শখের জিনিসের দোকান আছে, পাহাড়ী অঞ্চলের মেয়ে। এর কারণ, কী ভাববার বিষয়। তবে ওই অঞ্চলের মেয়েদের বেশে মমতাজকে ভালই দেখিয়েছে—যেমন দেখালে ক্যামেরা খুশি। শেফালী আবার পশ্চিমের আধুনিক নাচেও যে পারদর্শিনী সে জ্ঞানও দর্শক লাভ করেন।

নায়ক জিতেন্দ্র আদর্শবাদী বলেই হয়ত তাঁকে এমনভাবে কথা বলতে ও চলতে-ফিরতে হয়েছে যা অস্বাভাবিক। কেমন যেন বোকা বোকা ভাব। অবশ্য মমতাজের সান্নিধ্যে তাঁকে রোমাণ্টিক নায়কের মতই লেগেছে। এবং শেষ পর্যন্ত পরিচালক মাস্টারজীর জাত রক্ষা করতে পারেননি। শেফালী তার মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। শেফালীর্বোদনী [illegible] । নায়কের

ছোট ভাই ও তার প্রেমিকার (বে নিহত) ভূমিকায় আকাশদীপ ও বৈশালীর অভিনয় যথাযথ।

গান ও নাচ ছবিতে অনেক। সতীশ ভাটিয়া সুরারোপিত গান শুনতে ভালই লাগে।

রঙমহলে "সেমসাইড"

রঙমহলের নতুন আকর্ষণ "সেম সাইড"। হাসির নাটক, যাতে আগাগোড়া ব্যঙ্গ ও রঙ্গের উপকরণ। রচনা করেছেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী ও শৈলেশ গুহনিয়োগী। রঙমহল শিল্পিগোষ্ঠী নাটকটি পরিচালনা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিয়েছেন জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সরযূ দেবী, ইন্দিরা দেবী, বাসবী নন্দী প্রভৃতি।

(সি ৩৫৮০)

বন্যার্তের সাহায্যে বি-এফ-জে-এ

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন "অগ্নিযুগের কাহিনী" ও "চেম্মিন" ছবি দুটির বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ হয়েছিল ৭,৭৫৯ টাকা। সংস্থার সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার গত শনিবার (৭ ডিসেম্বর) এই টাকা রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের হাতে তুলে দেন। আগামী ৯ জানুয়ারী বি-এফ-জে-এ অনুরূপ উদ্দেশ্যে বৈজয়ন্তীমালা-রাজেন্দ্রকুমার অভিনীত "সাথী" চিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন।

"চিরদিনের" : উত্তম কুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

বোম্বাই বিচিত্রা

মহারাষ্ট্র সরকার মিল্ক কলোণী অঞ্চলে জায়গা দিতে চেয়েছেন স্টুডিও তৈরির জন্য এ কথা অনেক আগেই লিখেছি। তখন মনে হয়েছিল রাজ্য সরকারের এই বদান্যতায় চিত্রনির্মাতা মহলে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করবে। কিন্তু এখন যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে, তখন তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। দু-একজন ছাড়া রাজ্য সরকারের সংগে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও করছেন না চিত্রনির্মাতারা। এদিকে রাজ্য সরকার একটার পর একটা সারকুলার পাঠাচ্ছেন চিত্রনির্মাতাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে।

সুনীল দত্ত দিল্লীর অদূরে গাজিয়াবাদে স্টুডিও পত্তনের যে পরিকল্পনা করছিলেন বর্তমানে তা কার্যকরী হতে চলেছে। সুনীল দত্ত তার দলবল নিয়ে ইতিমধ্যে জায়গা দেখে এসেছেন। মন্ত্রণা চলেছে বোম্বাই-এ, দিল্লীতে। উত্তরপ্রদেশ সরকার নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। গাজিয়াবাদে যে স্টুডিও হবে, 'সেখানে প্রস্তুত ছবিগুলি উত্তরপ্রদেশে দেখানো হবার পর রাজ্য সরকার যে প্রমোদকর আয় করবেন তার অর্ধেক ফিরিয়ে দেবেন নির্মাতাকে' এরকম সিদ্ধান্তও নাকি উত্তরপ্রদেশ সরকার নিয়েছেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে এটা যে অতি সুসংবাদ এবং লোভনীয় সংবাদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং এখন, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বাই রাজ্য সরকারও যদি এই ধরনের কোন লোভনীয় আকর্ষণ পয়দা করতে না পারেন তাহলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান হলিউড বোম্বাই কতদিন স্ব-স্থানে শীর্ষস্থানীয় থাকবে সেটা চিন্তার বিষয়।

*

শ্রীকৃষ্ণন নামে এক মহান কৌতুক অভিনেতা ছিলেন মাদ্রাজে। বেশ কয়েক বছর হল তিনি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর শবযাত্রায় যে রকম জনসমাগম হয় মাদ্রাজ তেমন জনসমাবেশ নাকি কখনো দেখেনি। মাদ্রাজ শহরের অন্যতম রাজপথ মাউন্ট রোডে নাকি আট ঘণ্টা কোন গাড়ি ঘোড়া চলাচল করেনি সেদিন। উনিশ 'শ চল্লিশের শুরুতে কৃষ্ণন চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন এবং যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মাদ্রাজে প্রায় এমন কোন ছবি হয় নি যাতে তিনি কাজ করেন নি। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী জনপ্রিয় অভিনেতার কোন ছবি আমি দেখিনি। সেদিন এক নৈশ ভোজে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এই ভদ্রলোকের কাছে কৃষ্ণন চলচ্চিত্রে যোগ দেবার আগে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে চাকরি করতেন। তারপর বহু বছর বাদে কৃষ্ণনের যখন কপাল ফিরেছে— কৃষ্ণনের প্রাক্তন মনিবের ব্যবসায়ে তখন ভাটা। ভদ্রলোকের অবস্থা তখন খুব খারাপ। তিনি সামান্য কিছু অর্থ নিয়ে কৃষ্ণনের কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন যে, কৃষ্ণন যদি তাঁকে সাহায্য করেন তাহলে একটি ছবি তিনি প্রডিউস করবেন। কৃষ্ণনের সহযোগিতায় ভদ্রলোক শিবাজী গণেশন-সাবিত্রী প্রমুখকে সামান্য পারিশ্রমিকে চুক্তিবদ্ধ করে ছবি আরম্ভ করেন। কৃষ্ণনের অনুরোধে নাম করা কলাকুশলীরাও কম অর্থের বিনিময়ে প্রাণ দিয়ে কাজ করে সে ছবি করেন। সবই ঠিক মত হতে থাকে। কেবল কৃষ্ণন তাঁর প্রাক্তন মনিবের সংগে তখনো চুক্তিবদ্ধ হন নি। একদিন সে কথা নিয়ে আলোচনা হ'ল। কৃষ্ণন বললেন, "নিশ্চয়ই চুক্তি 'ত আমার সংগে করতেই হবে।" এই বলে তিনি তাঁর প্রাক্তন মনিবকে একটি টাইপ করা চুক্তিপত্র দিলেন সই করতে। কিন্তু সে চুক্তিপত্র তাঁকে পড়তে দিলেন না। ভদ্রলোক একটু দোমনা ভাবে সই করলেন। তারপর সে চুক্তিপত্র শীল করে নিজের কাছে রেখে দিলেন। ছবি দু'মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। তখনও কৃষ্ণনের চুক্তিপত্র এলো না প্রডিউসারের কাছে। তারপর ছবি রিলীজ হ'ল। খুব হিট হ'ল না ছবি। প্রডিউসার অবশ্য বেশ টাকা লাভ করলেন। এরপর অনেক দিন হয়ে গেছে। প্রডিউসার ভদ্রলোক কৃষ্ণনের কথা প্রায় ভুলেই গেছেন। এমন সময় সময় কৃষ্ণনের কাছ থেকে তাগাদা এলো, "এবার আমার পারিশ্রমিক দিয়ে দিন।" কৃষ্ণনের সেক্রেটারী সেই শীলকরা চুক্তিপত্র নিয়ে প্রডিউসারের কাছে এলেন। ভদ্রলোক প্রায় কম্পিত হাতে আশা-আশঙ্কায় টলোমলো হতে হতে খুললেন সেই খাম। চুক্তিপত্র পড়ে 'ত তাঁর চক্ষুস্থির! ভদ্রলোক প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি। প্রাক্তন মনিবের সংগে ভূতপূর্ব কর্মচারীর সেই সম্পর্ক। মাসিক পঁচিশ টাকা অর্থাৎ ছবিতে দুমাস কাজ করার জন্য পঞ্চাশ টাকা ভদ্রলোককে দিতে হবে কৃষ্ণনকে। ভদ্রলোক সেক্রেটারীকে বললেন যে তিনি নিজে হাতে কৃষ্ণনকে তাঁর পারিশ্রমিক দিতে চান। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এরপর

এল এম ফিল্মসের "মন নিয়ে" ছবির শ্যুটিং আরম্ভ হয়েছে [illegible]—এটির একটি দৃশ্য গ্রহণের আগে পরিচালক সলিল সেন ও [illegible] [illegible] চক্রবর্তী নায়িকা সুপ্রিয়া দেবীকে [illegible] [illegible] [illegible]

তিনি কৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। অথচ দু-একদিন পর পরই কৃষ্ণনের তরফ থেকে তাগাদা আসছে সেই পঞ্চাশ টাকার জন্য। অগত্যা সেক্রেটারীর হাতেই ভদ্রলোক কৃষ্ণনের পারিশ্রমিক সেই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেন। এরপর প্রথমবার চেষ্টা করতেই ভদ্রলোক কৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন। কিন্তু কৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা হ'লে কৃষ্ণনকে যা যা বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন ভেবেছিলেন, তা বলার অবকাশ কৃষ্ণন ভদ্রলোককে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেন নি। ভদ্রলোক বললেন, তাই বন্ধু-বান্ধবের কাছে কৃষ্ণনের কথা বলে নিজের অবুঝ মনকে সান্ত্বনা দিই। এ ঘটনাটা পুরো সত্যি।

সরল শর্মা

পদ্মিপ ফিল্মসের নতুন ছবি "মেমসাহেব"

'চৌরঙ্গী'র সাফল্যের পর চিত্রপ্রযোজিকা অসীমা ভট্টাচার্য যে ছবি প্রযোজনা করছেন তার নাম "মেমসাহেব"। কাহিনী নিমাই ভট্টাচার্যের। পরিচালনা করছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে বোম্বাই ও কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীরা অভিনয় করছেন।

পরলোকে ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ

বাংলা দেশের বিখ্যাত যাত্রা-অভিনেতা এবং পালাকার শ্রীফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ গত শনিবার হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫। "বাঁশের কেল্লা" যাত্রা নাটকে অভিনয় করার কালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাত্রা জগতে শ্রীফণীভূষণ প্রথম সংগীত-নাটক-আকাদমির পুরস্কার পান। এই উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য শিল্পী সংসদ গত সপ্তাহেই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। চলচ্চিত্র ও থিয়েটারেও তিনি অভিনয় করেছেন।

"শেষ থেকে শুরু" ছবিতে বিদ্যা রাও

বাস্তব ও কল্পনার ছবি

পশ্চিম জার্মানির ওবেরহাউসেন শহরে প্রতি বছর অল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের উৎসব হয়। ওই উৎসবে পুরস্কৃত ছবির একটি গুচ্ছ সম্প্রতি ইনদো-জারমান কালচারাল সেন্টার ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় দর্শকদের দেখানো হয়।

এই চয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল ২২ খানি ছবি—ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, হল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া এবং জাপানের।

প্রামাণিক চিত্র হিসাবে ফ্রান্সের 'দি সিক্সথ ফেস অব দি পেনটাগন' (বিষয়: ওয়াশিংটনে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ বিরোধীদের প্রতিবাদ-যাত্রা) উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্সের অপর একটি ছবি 'দি ড্রিম অব দি ওয়াইল্ড হরসেজ'-এ কাব্যিক ভাব ফুটেছে ক্যামেরার স্লো মোশন অঙ্কনের মাধ্যমে। হাঙ্গেরীর 'এলিজি' চিত্রটির সম্পদও কাব্যময়তা। ব্রিটেনের 'দি অ্যাপল' একটি উপভোগ্য কার্টুন-চিত্র। পশ্চিম জার্মানীর 'দি মেশিন'ও রঙিন কার্টুনে তোলা। বিজ্ঞান-ভাবনা মানুষকে কতখানি যান্ত্রিক করে তুলতে পারে ছবিটি যেন সেই পরিণতি সম্পর্কে এক সাবধান-বাণী।

জাপানের 'আওস' চিত্রটিতে মানুষের প্রচ্ছন্ন জৈব বৃত্তিগুলি আভাসিত। মানুষ জটিল—এই সম্ভবত ছবিটির প্রধান স্বীকৃতি। আজকের জগতের পরস্পর-বিরোধিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সন অব দাদা' চিত্রের বিষয়বস্তু। এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষামূলক চিত্র। বাস্তব আর রূপকল্পের আশ্চর্য সমন্বয় যুক্তরাষ্ট্রের 'টাইম-পিস' চিত্রের সুন্দর ছবি।

এই চয়নের বেশ কয়েকটি ছবি মনে রাখার মত। যুগোস্লাভিয়ার 'দি প্লে' সেই বিশেষ কয়েকটির অন্যতম। একটি বালক আর একটি বালিকার আঁকা আঁকা খেলার মজা দিয়ে ছবিটি শুরু হয়েছে। ফুল, মানুষ, বাড়ি, গাড়ি এই সব ওরা আঁকছিল। আঁকার ব্যাপারটা যেন দাবা খেলার চাল। একজনের সৃষ্টিকে অপর জন তার সৃষ্টি দিয়ে নাকচ করে দিচ্ছিল। এক সময় ওদের অঙ্কনের বিষয় গিয়ে দাঁড়াল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে। বোমারু বিমান, অ্যাটম বোমাও বাদ পড়ল না। আর সেই মুহূর্তে রঙের বাটিও গেল উলটে। ওদের সব ছবি তখন কালিমা-লিপ্ত। যেন এক ধ্বংসেরই প্রতিচ্ছবি। ছেলেমেয়ে দুটি তখন আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছে। রসের মধ্য দিয়ে ছবির বক্তব্যটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। যেমন চমৎকার পরিকল্পনা, তেমনই আশ্চর্য রূপায়ণ। সত্যিই, মনে রাখার মত।

গুণী সংবর্ধনা

চিত্রপরিচালক শ্রীতপন সিংহ এবং অভিনেতা উত্তমকুমারকে জাতীয় পুরস্কার-প্রাপ্তি এবং লোকগীতি-শিল্পী শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীকে সম্প্রতি সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব উৎসবে শ্রেষ্ঠ গায়কের সম্মানলাভ উপলক্ষে টালিগঞ্জের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা কথক-এর পক্ষ থেকে কয়েকদিন আগে এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী শ্রীমতী কানন দেবীর হাত থেকে শিল্পীরা অভিনন্দনপত্র ও উপহার গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীতপন সিংহ উত্তমকুমারের অভিনয় প্রতিভা ও নিরলস সাধনার খুব প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, উত্তমকুমার নিজেই একটি ইনস্টিটিউশন। উত্তমবাবুর 'ভারত' পুরস্কার লাভে আমি গর্বিত।

উত্তমকুমার বলেন, অভিনেতা পরিচালকের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ভালো অভিনেতা হওয়ার জন্য ভালো পরিচালকের প্রয়োজন।

অরণ্যদেব লী ফক

অরণ্য রাত্রি… রাজা ঘুমোচ্ছে… টমটম ঘুমোচ্ছে… ডেভিল ঘুমোচ্ছে……

পিগমি প্রহরীরা ঘুমোচ্ছে…পোষা সিংহী কার্টিনার চোখেও গাঢ় ঘুম……

ঘুম নেই শুধু অরণ্যদেবের চোখে। গুহার মধ্যে তিনি জেগে আছেন……
??!!

আগন্তুক ক্ষুদে-মানুষটির মুখে শুনছেন এক অবিশ্বাস্য কাহিনী……
বাজপাখি মেলোডির দিকে ছোঁ মারতেই আমি
রাজপুত্র ভ্রাদ, শিকারীরা কি তোমাদের দেখতে পাচ্ছিল?

'না, আমরা তখন অনেক উঁচুতে।'
বাজপাখিটা কী ধরেছে?
পায়রা, কিন্তু, মালিক, দেখতে যেন কেমন-কেমন লাগছে।
?

'আমাকে ছেড়ে বাজপাখিটা মেলোডির পায়রাটাকে তাড়া করল।'
ভয় পেয়ো না মেলোডি।
চি-ই-ই-ই
ঈ-ঈ-ঈ-ঈ
4/24

'বাজপাখিটার ঘাড়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম। লড়াইয়ে আমি …।'

'বাজপাখির মাথায় বর্শা চালিয়ে দিলুম।'

'শূন্য থেকে মাটিতে পড়ে গেল নিহত বাজপাখি। মেলোডির পায়রাটা আহত হয়েছিল, সেও আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগল।'
!

'মাটিতে নামতেই মেলোডির আর-এক বিপদ!'
!
?

সারা পূর্ববাংলায় পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ধর্মঘট বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আলোচনার বিষয়। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের দশ বৎসরের উৎপীড়নের প্রতিবাদে শুক্রবার ১৩ ডিসেম্বর এই ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল। আয়ুব খান এক সপ্তাহের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকায় রয়েছেন। বিরোধী দল কর্তৃক আহূত রাজ্যব্যাপী এই হরতালের দিনে চট্টগ্রামে দুই স্থানে পুলিস গুলি চালায় এবং গুলিচালনার ফলে ৯জন লোক আহত হয়। জনতা খাদ্যবাহী একটি ট্রেন আক্রমণ করে। পুলিস বাধা দিতে গেলে পুলিসের উপরেও আক্রমণ হয়। আর একটি এলাকায় জনতা বাস ও অন্যান্য যানবাহনে আগুন লাগাতে আরম্ভ করলে পুলিস গুলি চালায় এবং তখন ৬জন লোক আহত হয়। এ সম্পর্কে ৯৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঢাকাতেও জনতা ১২টি সরকারী ও অন্যান্য গাড়ির ক্ষতি করে। তিনটি জীপে আগুন লাগানো হয়। এদিন বন্দুকধারী সৈন্যদল সঙ্গীন উঁচিয়ে ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারা দিতে থাকে। নারায়ণগঞ্জেও হাঙ্গামা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শহরের দোকান-পাট বন্ধ ছিল এবং বাসও চলাচল করেনি। সাতটি রাজনৈতিক দল এই বিক্ষোভ এবং ধর্মঘট পরিচালনা করে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব বলেছেন, এই বিক্ষোভে তাঁর শাসন যন্ত্র টলবে না। এই ধর্মঘটের সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানে অন্ততপক্ষে এক হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দেশী সংবাদ

৯ ডিসেম্বর—হরিয়ানায় ১৫ জন দলত্যাগী কংগ্রেস এম-এল-এ শ্রীভগবৎদয়াল শর্মার নেতৃত্বে বিধানসভার বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করলেও রাজনৈতিক মহলের ধারণা রাজ্যপাল বিকল্প স্থায়ী সরকার গঠন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হলে হয়ত রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবে।

বিরোধী সদস্য শ্রীহেম বড়ুয়া (পি এস পি) আজ লোকসভায় অভিযোগ করেন যে, একটি চীনা ডুবোজাহাজ কেরলের সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করছে।

৯ ডিসেম্বর—কাশ্মীরের সর্বোচ্চ মুসলিম ধর্মগুরু মিরওয়েজ মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ শা-র মৃতদেহ বিমানে রাওয়ালপিন্ডি থেকে শ্রীনগরে আনতে দিতে পাকিস্তান সরকার অস্বীকার করায় সারা কাশ্মীরে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট মোহম্মদ আয়ুবের বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

১০ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারকে ওই সব রাজ্যে চরমপন্থী-দের কার্যকলাপ সম্পর্কে অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ যোজনার খসড়া বরাদ্দে আরও রদবদল করে কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা-সহ মোট ৪৩৩ কোটি টাকার প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়। প্রাথমিক খসড়ায় কলকাতার উন্নয়ন-সহ চতুর্থ যোজনায় রাজ্য সরকার ৬৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। তারপর অর্থাভাবের চিন্তায় ক্রমেই ছাঁটাইয়ের খড়্গ চালাতে হচ্ছে।

১১ ডিসেম্বর—আজ রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, নির্বাচনের সময় হাঙ্গামা হতে পারে বলে কেন্দ্র আশঙ্কা করছেন। এজন্য এবার গতবারের তুলনায় বেশী পুলিসী ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। এই রাজ্যে যা পুলিস আছে তাতে কুলোবে না। কেন্দ্রীয় রিজারভ পুলিসের জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কলকাতা উন্নয়ন সম্পর্কিত এক সম্মেলনে কলকাতার ন্যায় একটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব-পূর্ণ নগরীর সমৃদ্ধির জন্য চতুর্থ যোজনার এই বাবদ আশি কোটি টাকা বরাদ্দের দাবি জানানো হয়। বলা হয়, এই নগরীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে কেন্দ্রকে উদার দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

১২ ডিসেম্বর—বিহারের পাঁচজন নেতা রাজ্যের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন না চাইবার প্রস্তাব দেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি তাঁদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই নেতা পাঁচজন হলেন : শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়, শ্রীমহেশপ্রসাদ সিংহ, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীরামলক্ষণ সিং ও শ্রীঅম্বিকাশরণ সিং।

কলকাতা শহরেই এখনও বাড়ি ও বসতি করার প্রচুর জায়গা আছে। সে জন্য শহরতলিতে নতুন নতুন নগর গড়ার নামে চাষীকে জমি থেকে উৎখাত করার দরকার নেই। মহাকরণে সরকারী অফিসারদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে একাধিক পদস্থ কর্মী এই অভিমত প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর ছিলেন বৈঠকের সভাপতি।

১৩ ডিসেম্বর—কলকাতার পৌর কমিশনার শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত অর্থ কমিটির কাছে ১৯৬৯-৭০-এর জন্য ছয় কোটি [illegible] লাখ টাকার ঘাটতি পৌর বাজেট পেশ করেন। অবশ্য ঘাটতি ভরাটের জন্য 'অকটরয়' ছাড়া কোন কর প্রস্তাব তিনি তোলেন নি।

কেরলের নকশালী নেতা শ্রীকুন্নিক্কাল নারায়ণম দিল্লির চীনা দূতাবাস থেকে মনিঅরডারে চারবার একশ থেকে পাঁচশ পর্যন্ত টাকা পেয়েছেন বলে কেরল সরকার জানিয়ে-ছেন। শ্রীনারায়ণমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে নকশালীরা পুনপল্লী থানা আক্রমণ করেন তিনিই ছিলেন তাঁদের নেতা।

১৪ ডিসেম্বর—ফরাক্কা ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় নদী প্রকল্পগুলি নিয়ে ভারত-পাকিস্তান আলোচনায় পাক বিশেষজ্ঞগণ তিনদিন বৈঠকের পর কয়েকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইতিপূর্বে যে মতৈক্য হয়েছিল তা থেকে সরে গিয়েছেন বলে প্রকাশ।

প্রতিদিন এই কলকাতায় বসে জনা পঞ্চাশেক বেওসায়ী, কাল্কার শ্রীদের বলা হয় ব্যবসায়ী, কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রোজ অন্তত দু'লক্ষ করে টাকা ফাঁকি দিচ্ছেন তার এক চাঞ্চল্যকর রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে। অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে, শুধু এদেরই বাৎসরিক সেল ট্যাকস ফাঁকির পরিমাণ কম করেও ৭ কোটি টাকা।

১৫ ডিসেম্বর—আজ কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন : কলকাতার বর্তমান পৌর শাসনের যা হাল তাতে যতই টাকা দাও এই শহরের তেমন কোনও ভাল হতে পারে না। যতদিন না পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে ততদিন কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা মহানগরীর উন্নতির জন্য বাড়তি কোনও অর্থ সাহায্য দিতে অনিচ্ছুক।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষে দিল্লির বিড়লা ভবনকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পরিণত করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন—এই দাবিতে সংসদ সদস্য শ্রীশশীভূষণ (কংগ্রেস) এবং দিল্লি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা শ্রীশান্তি দেওয়ান আজ অনশন শুরু করেছেন। এই ভবনের এলাকার মধ্যে মহাত্মাজী আততায়ীর গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন।

বিদেশী সংবাদ

১০ ডিসেম্বর—সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ ১৯৬৯ সালের সামরিক বাজেট ঘোষণা করেছে—বলা হয়েছে যে, আগামী বছরে তারা সামরিক ব্যাপারে ১৭৭০ কোটি রুবল—স্টারলিং-এর হিসাবে ৮১৪ কোটি ২০ লক্ষ স্টারলিং ব্যয় করবে। এতদ্বারা সামরিক প্রয়োজনে ব্যয়ের দিক থেকে নতুন রেকরড সৃষ্টি করা হবে।

১১ ডিসেম্বর—আলবেনিয়ায় চীন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি বসাবে এই মর্মে এক চুক্তি হয়েছে। খবর দিয়েছেন সানডে অবজারভার। এই চুক্তি অবিলম্বে কার্যে পরিণত হলে ইওরোপে সামরিক ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন যে ঘটবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

১২ ডিসেম্বর—সোভিয়েট ইউনিয়ন সকলকে বিস্মিত করে ভূমধ্যসাগর থেকে তার নৌ-বহরের প্রায় অর্ধেক সরিয়ে নিয়ে রুশ দরিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ প্রতিরক্ষাসূত্রে এই খবর দেওয়া হয়েছে। গত বছর আরব-ইজরায়েল লড়াইয়ের সময় থেকে রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে ৫০টি জাহাজ রেখেছিল।

১৩ ডিসেম্বর—প্যারিস শান্তি আলোচনায় ভিয়েতকং প্রতিনিধিদের নেতা ট্রান ভ্যান কিয়েম আজ পিকিং-এ চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে ভিয়েতনাম সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছেন।

১৪ ডিসেম্বর—আজ পূর্ব জারমানী ১৯৬৯ সালের জন্য তার প্রতিরক্ষা বাজেট খাতে প্রায় ১০ শতাংশ ব্যয় বাড়িয়েছে। সমাজতন্ত্র সুদৃঢ় করার জন্যই এই ব্যয় বৃদ্ধি। ১৯৬৯ সালের জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হবে ১৫৫ কোটি ডলার। গত বছর ব্যয় হয়েছিল ১৪৫ কোটি ডলার।

১৫ ডিসেম্বর—ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে গতকাল লাহোরে ছাত্র ও পুলিসের মধ্যে দুবার খণ্ডযুদ্ধ হয়। ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখতে পুলিস বেটন চালায়; ছাত্ররা পাথর ছুঁড়ে বদলা নেয়।

প্রমথনাথ বিশীর নবতম উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১০,

আশাপূর্ণা দেবীর নূতন উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬, উড়োপাখী ৬, বলয়গ্রাস ৪,

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

সুভগা বসন্ত ৪, আঁধার মানিক ১২,

কালিকারঞ্জন কানুনগোর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

রাজস্থান কাহিনী ৮॥

নবেন্দু ঘোষের

কায়াহীনের কাহিনী ৫,

বিমল করের নূতন উপন্যাস

বাড়ি বদল ৪, যাদুকর ৫॥০ পরবাস ৪॥০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

নতুন তোরণ ৪॥

'ভন্দ্রাভিলাষী'খ্যাত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অদৃষ্ট রহস্য ৩॥ তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ও ২য় ১৬,

প্রফুল্ল রায়ের

অন্য ভুবন ৪॥ নুড়ো ৫, নাগমতী ৫,

প্রমথনাথ বিশীর নূতন কাব্যসংকলন

প্রাচীন পারসীক হইতে ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন উপন্যাস

কাজললতা ৬,

কিরীটীরায় ১১,

প্রবোধকুমার সান্যালের

নগরে অনেক রাত ৪॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

অন্য দেশ অন্য দাহ ১৫,

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আঁধি ৭॥ অমৃত সমান ৪॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপনগর ১৮,

লীলা মজুমদারের
মধুক্ষরা লেখনীর আশ্চর্য অবদান

আর কোনোখানে ৫,

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ১০,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নবজন্ম ৪, নারী ও নিয়তি ২॥

রমাপদ চৌধুরীর

জরির আঁচল ৪,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কুয়ারী গিরিপথে ৫॥

আপটন সিনক্লেয়ারের

জঙ্গল ৬, প্রত্যাবর্তন (দুই খণ্ড) ৬,

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

পুণ্যতীর্থ ভারত ১০,

(ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠতীর্থ ভ্রমণ কাহিনী)

স্বামী ভক্তানন্দের

তপস্বী ভারত ১০,

[শ্রেষ্ঠ সাধকদের জীবনী ও সাধনা]

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

শঙ্কু মহারাজের নূতন ভ্রমণ-কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০,

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ কাহিনী

মগ্নমৈনাক ৪॥

আশাপূর্ণা দেবীর
প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪,

সুমথনাথ ঘোষের
বনরাজিনীলা ৭,

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

ইস্ট বাকল্যাণ্ড রোড ৮,

জরাসন্ধের
বন্যা ৪,

তারাশঙ্করের
রাধা (নূতন সং) ৮, কালিন্দী ৭॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-৩৪৯২ ॥ ৩৪-৮৭৯১

সূচিপত্র

cali—cloth®
ক্যালি-ক্লথ
কুল ভয়েল শাড়ী
ক্যালি-ক্লথ'এর
সব দোকানে পাবেন

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন সেন

শীতকালে আপনার দেহত্বকে শুষ্কতা আসে...

নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করে তাকে কোমল ও লাবণ্যময় করে তুলুন

ঠাণ্ডার দরুণ আপনার ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডায় আপনার ত্বকের প্রয়োজনীয় তৈলসত্তার ক্ষয় হয়ে যায়—যে তৈলসত্তার আপনার ত্বককে কোমল, মসৃণ ও সুস্থ রাখে। সেইজন্যই আপনার চাই নিভিয়া ক্রীম। কেবলমাত্র নিভিয়াতেই আছে 'ইউসেরাইট'—একটি বিশিষ্ট উপাদান, যা দেহত্বকের স্বাভাবিক তৈলভাগ জোগায় এবং রুক্ষ ও শুষ্ক শীতল আবহাওয়া থেকে আপনার ত্বককে রক্ষা করে। কেবলমাত্র নিভিয়া ক্রীম দেহত্বক কোমল ও লাবণ্যময় করে রাখে।

নিভিয়া তারুণ্যদীপ্ত লাবণ্যময় দেহত্বকের গোপনকথা।

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

কন্ট্রাকটারি করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন বেণীমাধব চক্রবর্তী। একদিন রাত্রে তিনি হঠাৎ খুন হলেন। এ খুনের খবর শুনে ব্যোমকেশ ঠাট্টা করে বলেছিল—বেণীসংহার। তা বেণীসংহারই বটে! বেণীসংহার শব্দের আসল মানে হচ্ছে খোঁপা বাঁধা। মেয়েরা খোঁপা বাঁধার সময় আগে চুলগুলি যেমন গুটি কয় গুছিতে ভাগ করে নেয়, তারপরে সেগুলি পরস্পর জড়িয়ে বিনুনি করে, এবং সবশেষে সেই বিনুনি জড়িয়ে খোঁপা তৈরী হয়, তখন আর সাধ্য থাকে না কারও সেই জটিলতার মধ্য থেকে কোন গুছির কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ খুঁজে বার করা, কোন্ গুছিটিই বা কোনটি তা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নতুন গোয়েন্দা-উপন্যাস

বেণীসংহার

নির্ধারণ করা, তেমনি এই রহস্যকাহিনী। সযত্নরচিত খোঁপাটির মত সযত্নসাধিত খুনটিও এর প্রত্যক্ষ হচ্ছে; কিন্তু কেই বা খুনী, কেনই বা সে খুন করল, কি ছিল তার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সকল প্রশ্নের উত্তরই জটিলবন্ধন খোঁপার মধ্যে নিহিত গুচ্ছি-গুলির মতই এমন সুকৌশলে সংগুপ্ত যে, এ রহস্যজাল দুর্ভেদ্য বললেই হয়।

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের সর্বাধুনিক গোয়েন্দা-উপন্যাস "বেণীসংহার" ছাড়াও এ গ্রন্থে "ছলনার ছন্দ" ও "রুম নম্বর দুই" নামে ব্যোমকেশের আরও দুটি দীর্ঘ গোয়েন্দা-কাহিনী আছে।

কালকূট-এর
কোথায় পাবো তারে
সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ২০·০০

মনোজ বসুর
সেতুবন্ধ
দাম ১২·০০

বিমল করের
পূর্ণ অপূর্ণ
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ১০·০০

প্রতিভা বসুর
দ্বিতীয় দর্পণ
সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৮·০০

বিমল মিত্রের
বেগম মেরী বিশ্বাস
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ২৫·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সূর্যসাক্ষী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ১৪·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
প্রেমের চেয়ে বড়
দাম ১২·০০

রমাপদ চৌধুরীর
বনপলাশির পদাবলী
চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৮·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৫৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১০
শনিবার ২০ পৌষ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক — ২৫.০০
ষাণ্মাসিক — ১২.৫০
ত্রৈমাসিক — ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক — ৩৩.০০
ষাণ্মাসিক „ — ১৬.৫০
ত্রৈমাসিক „ — ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক — ৩৩.০০
ষাণ্মাসিক „ — ১৬.৫০
ত্রৈমাসিক „ — ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক — ৫২.০০
ষাণ্মাসিক „ — ২৬.০০
ত্রৈমাসিক „ — ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — ৬১.০০
ষাণ্মাসিক — ৩১.৫০
ত্রৈমাসিক — ১৬.০০

দাম ৫০ পয়সা
আসাম বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 4, Jan. 1969.

চন্দ্র প্রদক্ষিণ

যুগ-যুগান্ত ধরে মানুষের মনে যা ছিল কল্পনা, যা নিয়ে দেশে দেশে অজস্র রূপকথার সৃষ্টি, অসংখ্য পৌরাণিক ইতিবৃত্ত—আজ মানুষই সেই কল্প-কাহিনীর বহু রহস্য উন্মোচন করে দিল। মর্ত্যের সীমানা ডিঙিয়ে সে চলে গেল চাঁদের দিকে; প্রত্যক্ষ করল মৃত, জড়, অতি পুরাতন সেই আদিম পিণ্ড চাঁদকে, চাক্ষুস করল চাঁদের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখটি যা আমরা কোনো কালেই দেখতে পাই না, তারপর আবার ফিরে এল এই মর্ত্যেই। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই অবিশ্বাস্য কীর্তির মূল্য আজ হয়ত সঠিকভাবে বোঝা যাবে না, তবু এই অভিযান শুধু বিজ্ঞানের জয়জয়কার নয়; দুঃসাহসী, সহিষ্ণু, আগ্রহশীল মানবেরও জয়। মহাশূন্য সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল কিছু নতুন নয়, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক নামে অভিহিত, পঞ্চদশ শতকের কোপারনিকাসের যুগ থেকে তার শুরু, অনেক সত্যান্বেষী গ্যালেলিও এই রহস্যের আধারে দূরবীন রেখে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করেছেন। ক্রমে ক্রমে মহাশূন্যের অনেক গোপন তথ্য মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হচ্ছিল। তারপর গত এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে মহাকাশ যেন মানুষের বিজয় অভিযানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ-ক্ষেত্র হয়ে উঠল। ১৯৬১-তে রাশিয়া মহাকাশযাত্রী গাগারিনকে পাঠিয়েছিল মহাকাশ যাত্রায়। প্রায় দু'ঘণ্টার মতন সময় এই দুঃসাহসী মানুষটি পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন। সেদিন যে বিস্ময় ও রোমাঞ্চে পৃথিবীর মানুষ বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল, মাত্র সাত বছরের মধ্যে সে বিস্ময় আরও চমকপ্রদ হয়ে দেখা দিল। কোথায় এই পৃথিবী আর কোথায় চন্দ্র, অঙ্কের হিসেবে এ-পথ বড় কম নয়, কয়েক লক্ষ মাইলের ব্যবধান, পৃথিবীর তিনটি মানুষ সে ব্যবধানও অতিক্রম করলেন; চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে ফিরে এলেন।

এই অভিযান শুরু হয়েছিল মাত্র সাত দিন আগে, গত শনিবার ২১ ডিসেম্বরে। আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযান তিনজন মহাকাশযাত্রী নিয়ে শূন্যের পথে পাড়ি জমায়। মহাকাশযাত্রীদের তিনজন হলেন, ফ্রাঙ্ক বোর-ম্যান, জেমস লোভেল, উইলিয়াম অ্যানডারস। শনিবার যাত্রা শুরু করে রবিবারেই মহাকাশযানটি চাঁদের দিকের দীর্ঘপথের পাড়ির আধাআধি চলে আসে। সোমবারেও যাত্রা অব্যাহত; মঙ্গলবার চাঁদের লুকোনো মুখের দিকে এসে পড়ে, তারপর মহাকাশযানটি চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে থাকে। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সত্তর মাইল তফাতে থেকে মহাকাশযানটি দশবার চন্দ্র প্রদক্ষিণ সেরে বুধবার আবার চাঁদের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর পথ ধরে। তারপর মহাকাশ পাড়ি দিয়ে শুক্রবার আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে অ্যাপোলো-৮। যাত্রী তিনজন নির্বিঘ্নে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করেন।

এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মহাকাশ-বিজ্ঞানের প্রভূত ও চমকপ্রদ উন্নতি, অবিশ্বাস্য কারিগরী দক্ষতা, যন্ত্রের নিখুঁত কারুকর্ম ছাড়া এ অভিযান সফল হত না। সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে, যে তিনটি মানুষকে এই অভি-যানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, তাঁদের সাহস, দক্ষতা, নিষ্ঠা ছাড়া এই অভিযান সফল হত না। অকল্পনীয় কীর্তিই এঁরা স্থাপন করলেন না, যেসব অসাধ্য সাধন করেছেন মানুষের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিপূর্বে মানুষ পৃথিবীর 'কক্ষ' বা 'অরবিটের' বাইরে আর যায় নি। বলা ভাল, এই চমকপ্রদ অভিযানের প্রতিটি পর্বেই বিপদ ছিল লুকিয়ে, সেই বিপদের ভয়ঙ্করতা আমাদের রক্ত হিম করে তোলে। এমন হতে পারত যে, যাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা আর ফিরতে পারতেন না। অভিকর্ষের বিপদ-সীমায় অনন্তকালের জন্যে ধরা পড়ে যেতেন; হতে পারত, সামান্য ভুলে পথের নিশানা বদলে যেত, গিয়ে বিপথগামী হতে হত; তা হলেও ফেরা অসম্ভব ছিল। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢোকার মুখেও ছিল ভয়ঙ্কর বিপদ। আরও ছোট বড় বহু বিপদ ছিল যান এবং যানীদের। সমস্ত বিপদ বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে অ্যাপোলো-৮ ও তার তিন যাত্রী চাঁদকে সানন্দ আলিঙ্গন করে যে ফিরে এলেন এর জন্য আমরা অভিভূত। অভিনন্দন জানাই, তিন অভিযাত্রীকে এবং যাঁরা এই অভিযানের আড়ালে কর্মতৎপর ছিলেন সকলকেই।

চন্দ্রগুপ্ত

চাঁদমারি

বৃন্দাবনে যেমন "কানু বিনা গীত নাই", আজকের দুনিয়াতেও তেমনই লড়াই ছাড়া কথা নেই। সে লড়াই আবার যেমন তেমন নয়—রীতিমত মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধ চলে অনেক দিন ধরে। নাটকে যেমন থাকে, অনেক মহাযুদ্ধেও হয় অনেক খণ্ডযুদ্ধ। তাদের কোনওটাতে এক পক্ষ জেতে, কোনওটাতে বা আরেক পক্ষ। চূড়ান্ত খণ্ডযুদ্ধে যে জেতে জিত তারই। এখনকার মহাযুদ্ধেও হারজিত ঠিক হবে ওই ভাবেই। এ যুদ্ধের ধারাও বিচিত্র, গতিও। এতে মেতেছে কেবল জংগী-জোয়ানেরা নয়, রাজনৈতিক পাণ্ডারা তো বটেই, কূটনীতিক আর অর্থশাস্ত্রীর দল, এমন কী বিজ্ঞানীরাও। এ যুগের কুরুক্ষেত্রের বিস্তার ঘটেছে মাটির পৃথিবী থেকে অসীম মহাশূন্যে। সেখানে প্রথম অভিযান শুরু করে রুশিরা স্পুটনিক পাঠিয়ে। তারপর গেল কুকুর মহাশূন্যে বেড়াতে, এলো ফিরে জ্যান্ত তো বটেই, কিছুমাত্র উদ্ভ্রান্ত না হয়ে। গেল মানুষ শূন্যতার মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে, ফিরে এলো নিরাপদে, স্বচ্ছন্দ-গতিতে সাফল্যের মুকুট মাথায় পরে। স্বর্গের চাঁব প্রথম মর্ত্যে নিয়ে এলো রুশিরার মানুষ সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে।

তাবৎ দেশের লোক অবাক হয়ে দেখলো রুশ বিজ্ঞানীদের আজব কাণ্ডকারখানা। দিকে দিকে শোনা গেল জয়ধ্বনি। তাতে যোগ দিল সকলের সঙ্গে আমেরিকাও। তবে তার জয়গানের সুরটা ছিল ভিন্ন। রুশ মহাকাশ পাল্লায় জুড়ীদের একজন হয়ে মার্কিন দেশ থাকতে চায় নি, তারা চেয়েছিল মহাশূন্যেও রুশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে গান গাইতে। মহাকাশ অভিযানের প্রথম পর্বে রুশেরা আমেরিকান-দের একটু বিদ্রুপও করেছিল, তাতে তাদের আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছিল। মার্কিন দেশ পণ করেছিল তারাও মহাশূন্যে অভিযান চালিয়ে প্রমাণ করে দেবে তারাও কিছু কম নয়। আরম্ভ হলো কঠিন সাধনা, সূত্রপাত হলো রুশ-মার্কিন সংগ্রামের এক নতুন পর্যায়ের। সে-সাধনায় আমেরিকার সিদ্ধিও মিলল। মার্কিন দেশ থেকে নকল উপগ্রহের পর উপগ্রহ ছুটলো অসীম শূন্যতা ভেদ করে মহাকাশে, একের পর এক মহাকাশযান কাণ্ডারী নিয়ে পাড়ি দিল মহাশূন্যে। এ কালের দুই মহাশক্তির ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেল দুনিয়ার লোক, তাদের অদ্ভুত সাফল্য কাব্যর কল্পনাকেও ছাপিয়ে গেল।

মহাশূন্যে বিরোধ রীতিমত জমে উঠল ১৯৬১ সনে যখন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ঘোষণা করলেন, আমেরিকা স্থির করেছে বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক শেষ হবার আগেই তারা চাঁদে মানুষ পাঠাবে। শুধু সংকল্প ঘোষণা করেই প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ক্ষান্ত রইলেন না—দশ বছরের একটা প্রোগ্রামও তিনি তৈরি করে ফেললেন যার লক্ষ্য হলো ধাপে ধাপে চাঁদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ১৯৭০ সনের মধ্যেই মানুষ সমেত মহাকাশ-যান চাঁদে নামানো। সে অসম্ভব যে সম্ভব হতে পারে এ আজগুবি কথা অন্য দেশের বিজ্ঞানীরাই বিশ্বাস করতে চান নি, সাধারণ লোক তো কোন্ ছার। কিন্তু মার্কিন চাঁদমারির অ্যাপোলো প্রোগ্রাম তৈরি হবার পর যে আট বছর কেটে গিয়েছে তার মধ্যে এমন সব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে তাতে এখন মনে হচ্ছে ১৯৭০ সনে—হয়তো বা তার আগেও—চাঁদে আমেরিকানরা ঠিকই পৌঁছে যাবে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে তাতে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই লোকে আশ্চর্য হবে, লক্ষ্যভেদ করলে নয়। ১৯৬৭ সনে তিন মার্কিন শূন্যচারী পৃথিবী ছাড়বার আগেই তাদের মহাকাশযানে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লোকের মনে যে খটকা জেগেছিল সেটা দূর হয়েছে অ্যাপোলো-৮-এর বড়দিনে চন্দ্র-পরিক্রমার পর।

আমেরিকা তো ধাপে ধাপে চাঁদের দিকে এগিয়ে চলেছে—তাদের চাঁদমারির নবম পর্বের আয়োজন হয়েছে সামনের ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু রুশিয়ার মতলব যে কী তা তো বোঝা যাচ্ছে না। মহাকাশ অভিযানে পথ দেখায় সে-ই। তার কাছে হার স্বীকার করবে না বলেই তো আমেরিকা আসরে নেমেছে, তাল ঠুকে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে। রুশিরা কিন্তু প্রকাশ্যে সে-চ্যালেঞ্জ কোনও দিনই মেনে নেয় নি, চাঁদে যাবার কোনও ইচ্ছে যে তার আছে এমন অভিপ্রায় ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ করে নি। না করুক। তার আচরণ থেকে বোঝা যায় চাঁদকে ঘাঁটি রেখে যে দ্বৈত যুদ্ধ আমেরিকা লাগিয়ে দিয়েছে তাতে সে যোগ দিয়েছে।

আমেরিকা যা কিছু করছে তার মধ্যে কোনও কিছু লুকোনো নেই—কোনও কিছু গোপন নেই। তার অ্যাপোলো প্রোগ্রামের বিশদ বিবরণ আগেভাগেই দুনিয়ার লোককে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার সাফল্যের বৃত্তান্তও লোকে জানছে, ব্যর্থতার ইতিবৃত্তও। আজ আর এ কথা অজানা নেই যে, বড়দিনে চাঁদের চার দিকে দশবার ঘুরপাক খাওয়ার জন্য আমেরিকা খরচ করেছে ৩১ কোটি ডলার। এ থেকেই আন্দাজ করা যায় মহাকাশে এ খণ্ডযুদ্ধের আক্কেল সেলামির বহর কত। রুশিয়ার এ বাবদ খরচের কোনও হিসেব জানা না গেলেও তার খেসারতও কিছু কম নয়।

খরচ যাই হোক না কেন তার জন্যে রণে ভঙ্গ দিতে কোনও পক্ষই প্রস্তুত নয়। এ ব্যাপারে ঝুঁকির কথা ভেবেও কেউ ভয় পাচ্ছে না। জেতার জন্য প্রাণপণ করছে আমেরিকা যেমন, রুশিয়াও তাই। তফাতের মধ্যে মার্কিন দেশ কী করছে না করছে তা সকলেরই জানা, রুশিয়ার কী যে মতিগতি তা সম্পূর্ণ অজানা। এক সময়ে মনে হয়েছিল চাঁদে বুঝি রুশীরাই আগে পৌঁছুবে, তাদের রক্তপতাকাই হবে মানুষের চন্দ্র-বিজয়ের গৌরব-নিশান। এখন আবার মনে হচ্ছে রুশিয়াকে পেছনে ফেলে আমেরিকা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঠিক যে কতটা তা জানবার কোনও উপায় নেই। এমন কী সত্যিই সে সোভিয়েট দেশ পেছিয়ে আছে এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। মহাকাশে মানুষ রুশিয়া অবশ্য অনেক দিন পাঠায় নি। কিন্তু চাঁদে যাতায়াতের বাধা-বিঘ্ন দূর করার জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে রুশদেশে চলছে জোণ্ড-৫ তার প্রমাণ। বড়দিনে চাঁদ বরাবর এক বা একাধিক মহাকাশচারীদের পাঠাবার আয়োজনও নাকি রুশীরা করেছিল, কিন্তু কোনও অজানা কারণে তা নাকি বিফল হয়েছে। এ অবশ্য অনুমান মাত্র, হয়তো বা রুশবিদ্বেষীদের রটনা। অনেকদিন রুশিয়া চুপচাপ আছে বলে চাঁদে যাওয়ার সঙ্কল্প সে ছেড়ে দিয়েছে এ ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। চন্দ্রলোকে আগম-নির্গমের উপায় দুই-ই তার আয়ত্তে। কাজেই মার্কিন দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে সে পেছপাও হবে কেন? একটা কেন, অনেকগুলো খণ্ডযুদ্ধে হেরে গেলেও মহাযুদ্ধে যে হার হয় না, এই তো ইতিহাসের শিক্ষা। ওস্তাদের মার শেষ রাতে—এ কথাটা কেই ভুলুক, যারা যুদ্ধে নেমেছে তারা কিছুতেই ভুলতে পারে না।

দেশ দর্পণ

দক্ষিণ ভারতের পদপ্রান্ত কন্যাকুমারিকাকে ছুঁয়ে আছে নাগেরকৈল। অর্থনীতির বিচারে নাগেরকৈল ভারতের কোন গুরুত্বপূর্ণ শহর বা গঞ্জ নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হয়ত আছে; কিন্তু সে-কারণেও নাগেরকৈল কোন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। কিন্তু রাজনৈতিক বিচারে নাগেরকৈল হঠাৎ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সারা দেশ জুড়ে। নাগেরকৈলে লোকসভার উপনির্বাচন হবে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। সে কারণেও হয়ত রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠত না। আলোচনা উঠেছে দুটি কারণে। এক, জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীকামরাজ এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী। দুই, এই উপলক্ষে মাদ্রাজের ডি এম কে-র সঙ্গে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির যে রাজনৈতিক মতভেদ দেখা দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে এই উপনির্বাচনকে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুলেছে।

প্রধানত এই দুটি কারণেই নাগেরকৈল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে প্রার্থীদের কথাই ধরা যাক। সরকারী হিসাবে সাতজন প্রার্থী: শ্রীকামরাজ (কংগ্রেস); ডাঃ এম ম্যাথিয়াস (নির্দলীয়); মিঃ এম এম আলি (মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি) এবং আরও চারজন নির্দলীয়, যাদের কোন দলগত পরিচয় জানা নেই। অনুমান করা হয়েছে যে, এই চারজন নির্দলীয় প্রার্থীর উপস্থিতি উপনির্বাচনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কোনভাবে প্রভাবান্বিত করবে না। সরকারী মতে ডাঃ ম্যাথিয়াসও নির্দলীয় প্রার্থী; কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র পার্টির একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি নির্দলীয় হিসাবে কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সে প্রসঙ্গে আসার আগে এটা বলে রাখা উচিত যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান তিন প্রার্থীর মধ্যে দুজন প্রার্থী শ্রীকামরাজ এবং ডাঃ ম্যাথিয়াস গত সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। শ্রীকামরাজ হেরে গিয়েছিলেন মাদ্রাজ বিধানসভা নির্বাচনে ডি এম কে প্রার্থীর কাছে; আর ডাঃ ম্যাথিয়াস হেরে গিয়েছিলেন লোকসভা নির্বাচনে এই নাগেরকৈল কেন্দ্র থেকে। ডাঃ ম্যাথিয়াস হেরে গিয়েছিলেন প্রায় ৫২ হাজার ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী এ নাসিমনির কাছে। নাসিমনির মৃত্যুর ফলেই এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে, এই উপনির্বাচন সম্বন্ধে নাগেরকৈলে যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। নাগেরকৈল সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত কন্যাকুমারিকা জেলার অন্তর্ভুক্ত; এবং এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা সমুদ্রে মাছ ধরা এবং ক্ষেতখামারের কাজ। এই নির্বাচন উপলক্ষে এক দিকে যেমন পোস্টার পড়েছে প্রার্থীদের পক্ষে, তেমনি প্রতি দিন চলেছে সভা, বৈঠক আর শোভাযাত্রা। নির্বাচনী শোভাযাত্রার বৈশিষ্ট্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্রার্থীদের প্রতিকৃতি, যে প্রতিকৃতি কলাগাছের খণ্ড দিয়ে তৈরী। প্রধান তিন প্রার্থীর কাছ থেকে নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়নি বটে; কিন্তু নাগেরকৈল লোকসভা কেন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন, তাঁদের মতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বি-প্রার্থীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তা থাকবে বলেই কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত তাঁরা জানাতে রাজী নন।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণটা নিঃসন্দেহে ইঙ্গিতপূর্ণ। প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে, কোন্ কোন্ কারণে ডাঃ ম্যাথিয়াস, যিনি সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থী ছিলেন, তিনি এবার নির্দলীয় হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এটাও জানা প্রয়োজন যে, কোন বিশেষ রাজনৈতিক কারণে এই উপনির্বাচনে ডি এম কে (অর্থাৎ দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম) এবং মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এই উপনির্বাচনে দুই বিরুদ্ধ ক্যাম্পে চলে গিয়েছে। কারণটা দেখা দিয়েছে ডাঃ ম্যাথিয়াসকে উপলক্ষ করে। ডাঃ ম্যাথিয়াস কন্যাকুমারিকা জেলার স্বতন্ত্র পার্টি শাখা সংগঠনের সভাপতি। যদিও তিনি এই উপনির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী, তবু তিনি এখনও সক্রিয়ভাবে কন্যাকুমারিকা স্বতন্ত্র পার্টি জেলা সংগঠনের সক্রিয় সভাপতি। তা ছাড়া দেখা গিয়েছে, নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি সর্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পার্টির পতাকাকে সামনে রেখেছেন। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মূলে সংঘর্ষের সূত্রটা এখানেই। কিন্তু সংঘর্ষটা আরও গভীর; কারণ, মূলত ডি এম কে নেতৃত্বের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলেই এই রাজনৈতিক সংঘর্ষটা নাগেরকৈলে এত চরমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে শ্রীরামমূর্তি বক্তব্যটা খুব স্পষ্ট করে রেখেছিলেন ডি এম কে-র নেতা এবং মাদ্রাজের বা তামিলনাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদুরাইয়ের কাছে। কথাটা তুলেছিলেন গোড়ার দিকে যখন প্রশ্নটা সামনে এসে পড়ে। এটা ঠিক যে, গত সাধারণ নির্বাচনের আগে শ্রীরামমূর্তি তাঁর পার্টির পক্ষে ডি এম কে-র সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তুলেছিলেন। এই নির্বাচনী আঁতাতের পিছনে দুটো বক্তব্য ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে। প্রথম বক্তব্য—ডি এম কে বামপন্থী দল না হলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শামিল এবং ডি এম কে দল মূলত কংগ্রেসবিরোধী। দ্বিতীয় বক্তব্য—মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আসতে না দেওয়া এবং সে কারণে গণতান্ত্রিক দল হিসাবে ডি এম কে-র সঙ্গে নির্বাচনের খাতিরে হাত মেলাতে কোন অসুবিধাই ছিল না। তা ছাড়া এটাও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীরামমূর্তির কাছে অজানা ছিল না যে, নির্বাচনী আসরে তখন ডি এম কে-র প্রতিপত্তি খুব সামান্য ছিল না। সে কারণে ডি এম কে-র সঙ্গে হাত মেলালে নির্বাচনে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে লোকসান হবার ভয় কিছু ছিল না; বরং সংগঠনের দিক থেকে লাভের ভাগটাই ছিল স্পষ্ট।

প্রধানত এই দুটো কারণে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি মাদ্রাজে ডি এম কে-র সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করেছিল এবং তার ফল যে খারাপ হয়নি, তা চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফল দেখলেই বোঝা যায়। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি ১১টি আসন পেয়েছিল। আর ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ডি এম কে-র সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী হয়নি বলে তাকে ২টি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এই নির্বাচনী মতৈক্যের ফলেই ডি এম কে যখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও বিভিন্ন অকংগ্রেসী দলের সঙ্গে মিলেমিশে শাসনভার হাতে নেবার সিদ্ধান্ত করল, তখন সহজেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি সংযুক্ত মোর্চায় যোগ দিয়ে ডি এম কে মন্ত্রিত্বকে সুনিশ্চিত করে দিয়েছিল। সংযুক্ত মোর্চা গঠনের পরামর্শটা দিয়েছিলেন স্বতন্ত্র পার্টির নেতা শ্রীরাজগোপালাচারী, অর্থাৎ রাজাজী। এই পরামর্শ শ্রীআন্নাদুরাই গ্রহণ করেছিলেন এবং সংযুক্ত মোর্চার অংশীদার হিসাবে শুধু মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিই নয়, প্রজা সোস্যালিস্ট এবং স্বতন্ত্র পার্টির সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন। এই সংযুক্ত মোর্চা এখনও আছে এবং এই মোর্চায় মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টের সঙ্গে স্বতন্ত্র পার্টিও আছে।

কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের পর এবং নাগেরকৈলের উপনির্বাচনের মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এই পরিবর্তনটা বোঝা যায় মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্যে। পার্টির সুস্পষ্ট বিচারে ডি এম কে একটি "বুর্জোয়া দল-

তান্ত্রিক" পার্টি এবং নির্বাচনী ঐক্য বর্তমান থাকলেও তামিলনাদে এই ডি এম কে-র দলগত সরকার গঠিত হয়েছে। এটা ঠিক যে, ডি এম কে-র সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ এখনও বজায় আছে এবং ডি এম কে দলকে অসহায় করার জন্য কংগ্রেস যে চেষ্টা করেছে তাও সফল হয়নি। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ডি এম কে তোষণনীতি পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে। ডি এম কে নেতৃত্ব মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু ক্রমেই ডি এম কে-র কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট যত তীব্রতর হচ্ছে এবং শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের আন্দোলন যত জোরদার হচ্ছে, ততই ডি এম কে সরকারের আন্দোলন দমনের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ ডি এম কে সরকার বা তার নেতৃত্ব সম্বন্ধে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতটা ধীরে ধীরে আমূল বদলে যাচ্ছে।

আরও দুটো কারণে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মনোভাব ডি এম কে সম্বন্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শ্রীরামমূর্তি মনে করেন যে, যদিও ডি এম কে এখনও তামিলনাদে জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে, তবু প্রভাবটা আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। প্রধানত ডি এম কে সরকারের ব্যর্থতাই ক্রমেই জনসাধারণকে হতাশ করে দিচ্ছে। এটা ঠিক যে, চালের ব্যাপারে ডি এম কে যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করেছে, কিন্তু এটাও ঠিক সেজন্য প্রচুর অর্থ সরকারী কোষ থেকে ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক চেহারাটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। অন্য দিকে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই সরকারের প্রচেষ্টা বাড়ছে শ্রমিক-কৃষক সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য। তেমনি শিল্পসংস্থাগুলো মনে করছে শ্রমিক আন্দোলনের সামনে সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এ কথাও বলা হচ্ছে যে, এর ফলে রাজ্যের আইন ও শৃংখলা বিপর্যস্ত হচ্ছে। কোন কোন মহলে এও বলা হয় যে, এ পর্যন্ত একমাত্র হিন্দীকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা এবং মাদ্রাজের নাম পরিবর্তন করে তামিলনাদ করা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য কাজ ডি এম কে করেছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় কারণ, ডি এম কে-র সংগঠনিক দুর্বলতা। এ সম্বন্ধে কোন দ্বিতীয় মত শোনা যায় না যে, শ্রীআন্নাদুরাইয়ের নেতৃত্বই ডি এম কে-র রাজনৈতিক চেহারা তুলে রেখেছে। কিন্তু এই নেতৃত্বও সংগঠনকে সুপটু করে তুলতে পারেনি। এজন্য শ্রীআন্নাদুরাই কঠিন রোগে আক্রান্ত হবার পর থেকে ডি এম কে মহলে একটা স্পষ্ট হতাশা দেখা দিয়েছে। অবশ্য শ্রীআন্নাদুরাইয়ের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী শ্রীকরুণানিধিকে পার্টির "সবল ব্যক্তি" বলে মনে করা হয়; কিন্তু একটা ধারণা জন্মেছে যে, ডি এম কে পার্টির সংগঠনী অস্তিত্ব প্রধানত টিকে আছে স্বতন্ত্র পার্টির সমর্থনে এবং রাজাজীর সাহায্যে। তাই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট মহলে মনে করা হচ্ছে যে, আগামী ভবিষ্যতে ডি এম কে দল হিসাবে স্বতন্ত্র পার্টির উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। নাগেরকৈলের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে ডি এম কে-র মনোভাব থেকে এটা আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরও মনে করা হচ্ছে যে, ডি এম কে-র সংগঠন আরও দুর্বল হলে দলের বড় অংশ হয়ত আবার কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবে।

এটা যাতে সম্ভব না হয়, সেজন্যই শ্রীরামমূর্তি ডি এম কে নেতৃত্বের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, হয় ডি এম কে-র প্রার্থী দেওয়া হোক, নয়ত এমন কোন নির্দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করা হোক যার সঙ্গে স্বতন্ত্র পার্টির বা রাজাজীর কোন সংযোগ থাকবে না। শ্রীরামমূর্তি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীআন্নাদুরাইকে যে, নাগেরকৈল থেকে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকামরাজ নির্বাচিত হোক, এ তাঁরা মোটেই চান না। কিন্তু এটাও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি চায় না যে, লোকসভায় তাদের পার্টির বিরুদ্ধে দমননীতি চালাবার জন্য স্বতন্ত্র পার্টির প্রকাশ্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হোক। স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনের অর্থ হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে জোরদার করা।

কিন্তু ডি এম কে নেতৃত্বের পক্ষে এ দুটোর কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ—এক, কন্যাকুমারিকায় ডি এম কে-র কোন সংগঠনী বুনিয়াদ নেই; দুই, স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থী ডাঃ ম্যাথিয়াস গত নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন বলে এবারও তাঁর সুযোগ পাওয়া উচিত; এবং তিন, ডি এম কে কোন অজুহাতেই স্বতন্ত্র পার্টির অথবা রাজাজীর বিরোধিতা করবে না। রাজাজীও ডাঃ ম্যাথিয়াস ছাড়া অন্য কোন প্রার্থীকে গ্রহণ করবেন না। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সন্তুষ্ট করার জন্য ডাঃ ম্যাথিয়াস নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অবশ্য রাজী আছেন। সেইমত ডাঃ ম্যাথিয়াস নিজেকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন; কিন্তু শ্রীরামমূর্তির বক্তব্য যে, ডাঃ ম্যাথিয়াস স্বতন্ত্র পার্টির সদস্য এখনও আছেন এবং এখনও পার্টি থেকে পদত্যাগ করেননি।

রাজাজী অবশ্য চালটা ভালই দিয়েছিলেন। কারণ, কম্যুনিস্টদের মত শ্রীকামরাজও ব্যক্তিগতভাবে রাজাজীর কাছে রাজনৈতিক দুশমন। রাজাজী এখনও ভোলেননি যে, শ্রীকামরাজই তাঁকে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই রাজাজী চেয়েছিলেন, শ্রীকামরাজকে নাগেরকৈলে পরাস্ত করে রাজনৈতিক পটভূমি থেকে মুছে দেবেন এবং সেই সঙ্গে কম্যুনিস্টদের বাধ্য করবেন স্বতন্ত্র পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন জানাতে। কারণ, শ্রীরামমূর্তির কাছে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী থাকলে কংগ্রেস প্রার্থী ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ এবং সুবিধা পাবে কিনা। তখন ডি এম কে-র কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, প্রথমত স্বতন্ত্র পার্টির তুলনায় কংগ্রেস রাজনৈতিক বিচারে অ-গ্রহণযোগ্য নয় এবং দ্বিতীয়ত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থনটা ডি এম কে-র প্রতি, স্বতন্ত্র পার্টির প্রতি নয়। সে কারণেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী এম এম আলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যাতে স্বতন্ত্র পার্টি জয়লাভ করতে না পারে।

এই রাজনৈতিক অবস্থাটা সাধারণ ভাবে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকামরাজের নির্বাচনী আবহাওয়াটা বুঝাতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য একটা অবস্থাও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। সেটা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিবাদটা। এটা অজানা নেই যে, শ্রীকামরাজ যখন কংগ্রেসের সভাপতি, তামিলনাদ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি শ্রীসি সুব্রহ্মণ্যম তখন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী। তখন শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের খাদ্য নীতির সঙ্গে শ্রীকামরাজের বিরোধ ছিল এবং সে বিরোধ রাজনৈতিক বিরোধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রীকামরাজ যে রাজনীতিবিদ হিসাবে অত্যন্ত ধুরন্ধর, সেটা শ্রীসুব্রহ্মণ্যমও স্বীকার করেন। কাজেই বর্তমান নির্বাচনে শ্রীকামরাজ যদি জয়ী হতে পারেন, তা হলে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম অন্তত সবচাইতে বেশী খুশী হবেন; কারণ, তখন শ্রীকামরাজ আবার প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়বেন কেন্দ্রে কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে। অন্ততপক্ষে তামিলনাদ কংগ্রেসের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাবটা হয়ত অনেক নরম হয়ে যাবে।

সে কারণে নাগেরকৈল নির্বাচনের ক্ষেত্রে তামিলনাদ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিবাদ যে অসুবিধা ঘটাবার চেষ্টা করবে না তা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে। আর যে কথাটা কংগ্রেসবিরোধী প্রার্থীরাও জানেন সেটা এই যে, নাগেরকৈল লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় ৫ লক্ষ ভোটারের মধ্যে অধিকাংশই নাদার শ্রেণীর ধীবর। এই নাদার শ্রেণী থেকেই এসেছেন শ্রীকামরাজ। ডাঃ ম্যাথিয়াস প্রচার করছেন যে, শ্রীকামরাজ নাগেরকৈলের অধিবাসী নন এবং সে কারণে কংগ্রেস প্রার্থী ভোট দাবি করতে পারে না। নাদার শ্রেণীর ধীবরদের কাছে সেটা কিছু বড় কথা নয়। তারা এটাই জেনে রেখেছে শ্রীকামরাজও একজন নাদার।

যারা আত্মহত্যা করে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

যারা আত্মহত্যা করে, তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করি।
তুমি যদি দুঃখ দাও, সেই দুঃখ মাথা পেতে নেবো
—অথবা নেবো না।

তুমি যদি সঙ্গীতের নামে
আসরে ভুলিয়ে আনো, শুধু অশ্রুপতন শেখাও,
তবে জলতরঙ্গের বাটি
ভরে নেবো আমার চারদিকে।
কারণ, আমার কোনো প্রত্যাশা ছিল না কোনো দিন।
পঁয়ত্রিশ বছরকাল এক রকম সংঘর্ষে কেটেছে
আরো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর
অন্যতর কষ্টে কেটে যাবে, আমি জানি·
মানুষ বাঁচার লোভে ছটফটায়, পৃথিবীতে উজ্জ্বল সকাল
পতাকারঙিন লঘু দিন
এলে ভালো, না এলে কী ক্ষতি! তুমি যদি
ফিরে-ফিরে দুঃখ দাও, সেই দুঃখ কাঁধে নিয়ে দৌড়বো আহ্লাদে।
অমন সহজে যদি চুলের কাঁটাটি
বুকে বিঁধে দাও,
আমি তাকে নতুন বোতাম ভেবে পরে নিতে পারবো না ভেবেছ?

জিজীবিষা ছাড়া অন্য লোভ নেই, মানুষ-শাবকদের প্রতি
ঈষৎ মমত্ব ছাড়া বোধ নেই, তাই
যারা আত্মহত্যা করে, তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করি।

ছয় মাস পর সাদা পাতা

তারাপদ রায়

এইরকম পড়ে থাকে পাতার পর পাতা,
মাইলের পর মাইল ধরে ছয় মাসের শূন্যতা।
বর্ণপরিচয়ের মত সরল, নিষ্পাপ তোমার মুখ
একই মুখের হাজার-হাজার প্রিণ্ট
পাতার পর পাতা শূন্যতা।

এইরকম পড়ে থাকে ছ মাস, বছর;
জীবন কেমন লম্বা লম্বা মনে হয়,
ঘিরে থাকে সরল, নিষ্পাপ তোমার মুখ
দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল
ধু ধু সাদা শূন্যতা।

দূর থেকে মায়ের চোখ

শংকর চট্টোপাধ্যায়

'আঁধার, বড়ো আঁধার' ঘুমপাড়ানী গানের গলায় মা বলতেন
চমৎকার টাল খাচ্ছে, যখন রোদ্দুর
জানলার পাশ থেকে সরে যাচ্ছে শিয়ালের চোখ।
অবশ্য এর জন্য শিল্পই দায়ী
মহান এক অতিথি এসেছিলেন মার আত্মায়
তখন

'বাটির জলে চোখ রাখলে, চোখের জল বাটি ভরত?'
আমার মত সরল চোখে সব দিকে তাকিয়ে
মা কি তখন আমার বুকফাটানো ইচ্ছে দেখতে পেতেন?
অবশ্য এর জন্য শিল্পই দায়ী
মহান এক অতিথি এসেছিলেন মার আত্মায়
আমার আলো-জ্বলা জানলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে
তাকে বলতে শুনতাম, 'আঁধার, বড়ো আঁধার হে?'

সম্মিলিত রাস্তায় দাঁড়িয়ে

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

এক এক দিন রাস্তার ধারে ফুল কুড়িয়ে বলবো আমি পেয়েছি,
সাত রাজার ধন মানিক, এক এক যুগ পেরিয়ে
রাতারাতি সম্রাট।
সমস্ত গলা খুলে চেঁচিয়ে বলবো আমার নাম বাঞ্ছারাম,
নক্ষত্রের মতো গোলাপ ছিঁড়ে বলবো, আশ্চর্য!
তুমি আমায় এত দিন চিনতে পারো নি?
প্রতিধ্বনি আছাড় খেয়ে প্রতিফলিত হলে নিজের দিকে তাকিয়ে
মুহূর্তে হাত তুলে হাঁটু মুড়ে বলবো আসুন,
আমাকে খেলার মধ্যে ডেকে নিন, লুকোচুরি খেলা
আমার খুব বেশী পছন্দ।
জানতাম না, প্রতিধ্বনি ক্রমাগত আমারই দিকে ফিরে ফিরে আসে,
এ একটা ধাক্কা বসিয়ে আবার ফিরে যায়।
বেশ তো স্মৃতিচিহ্ন মুছে বেরিয়ে পড়ুন, রোদ বৃষ্টি যে আসে
আসুক,
সামনের দরজা খুলে বলবো পদচিহ্ন,
সূর্যরশ্মি এখানে পড়ে না
ভালোবাসা বুকের দিক থেকে চলে গেছে আমার পায়ের তলায়
কাঁকর, হাঁটা পথ একটুও নেই।
অতর্কিত শব্দ হলেই বলি কোথায়, কোন্ দিকে? তুমি আলো
জেবলে
বৃথা কেন, অন্ধকার হয়ে আছো?
এসো, এদিকেই বুক খুলে এগিয়ে এসো, সম্মিলিত গলায়
সাগর জল কিংবা ফুল পাতিয়ে বলবো,
আমরা একাত্ম হয়ে গেছি॥

যন্ত্রণা, কেমন তুমি

বেণু দত্তরায়

যন্ত্রণা, কেমন তুমি ছবি আঁকো
নীল শিরা ছিঁড়ে যায় স্বপ্নে অনুভবে—
একক হৃদয়ে
ভালোবাসা শব্দ করে
বন্দরে মাস্তুল কাঁপে দীর্ঘ জাহাজের
নীল জলে ছায়া গাঢ় হয়।
জলে খেলা করা ভালো নয়।
জল ফের ফিরে যায় জলের ভিতরে
সংগোপনে।

বুকের ভিতরে রেখে দাও রাজপাট
দু' একটি কলি গান হয় হোক—
চোখের ভিতরে উঁকি দিয়ে
কী লাভ কী বলো দীর্ঘ ফিরে যাওয়া।

চিতার উপরে কেন দামী ফুল
রাখতে আসো সাদা ভালবাসা?
নিষ্পাপ হৃদয়ে জ্বলে জানো না কি
দামী সাদা ফুল পোড়ে দীর্ঘদিন
আর তুমি ফিরে যাও দরজা-বন্ধ ঘরে।

সিঁড়ি

বিমান আচার্য

মাথার ভিতরে এক বিস্ফোরণ ঘটে গেলে এই
অন্ধকূপ থেকে ছিটকে আসি এক-আকাশ রাত্রিতে
অপটু তুবড়ির মত ফেটে যাই
বিদ্ধ করতে পারি না কিছুতে
তীব্র নক্ষত্রের মত
যে আকাশ
আগুনে ও ধাতুর মধ্যে অগোছালো
শুধু ছত্রাকার
ফেটে যায় জ্বলে ওঠে দু চোখের মণি
কিছু শূন্যে
আকাশ ও মাটির মাঝামাঝি—কুয়াশায়
অর্ধেক আকাশ অবধি উঠে আছে অলৌকিক সিঁড়ি।

'অমর পত্রিকা'

হ্যাপী ক্রিসমাসের এই সুপ্রভাতে একটু আগেই কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেছে, মেঘের ছায়ায় আকাশ বিষন্ন, এই

আন্দুন, শিল্পী হোন

বেলা নটার সময়েও আমাকে বিছানা ছাড়তে হচ্ছে না এবং তার চাইতেও আনন্দ সংবাদ—আজ আমার অফিস নেই।

এই রকম দিনে একটা কেক-টেক যোগাড় করতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু

মুশকিল হচ্ছে এই যে বড়দিনটা আসে মাসের শেষ সপ্তাহে, আর অন্তত আমার ব্যাঙ্কে কোনো ক্রিসমাস-বোনাস নেই। ক্রীশ্চান বন্ধু আমারও অবশ্য কজন আছেন, কিন্তু জেন্টলম্যান সুনন্দকে তাঁরা কেউই প্রীতি-ভোজের নিমন্ত্রণ করেননি। একটা অন্ততঃ মোটর গাড়ি থাকলে আজ কল্যাণীর 'পিকনিক গার্ডেনে'ও একবার চক্কর দিয়ে আসা যেত—কিন্তু ও-সব আর্ মনস্কামী দিবাস্বপ্ন আপাতত থাক।

অতএব কেক-নিমন্ত্রণ-পিকনিক এসব যখন কিছুই নেই, তখন অন্তত প্রমোদের একটি উদাস আলস্যে পঠিত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে মনোনিবেশ করা গেল।

বড়দিনের এন্টারটেনমেন্ট—সে তো

খাঁদা নাক নিয়ে হয়

আছেই। তা ছাড়া রেডিয়ো-বিস্কুট-ঘড়ি-কেশতৈল-স্নো-ক্রীম-এঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি—শীতের দিনে কাশির অব্যর্থ বটিকা—কবিরাজী ওষুধ—সিগারেট—বিশুদ্ধ ঘৃত—"বাঙালীর গৌরব" খেজুর গুড়ের সন্দেশ—নাঃ, একঘেয়ে। এ সব তো রোজই থাকে, বড়দিনের এই অলস শীতল সকালে বেশ রোমাঞ্চিত হওয়ার মতো এমন কিছু এদের ভেতরে পাচ্ছি না। বরং "জুতোর মতো কোমল স্পর্শ" একটা জুতোর বিজ্ঞাপন দেখে যেমন আনন্দ হয়ে গেল—এই কেক দিয়ে কামাতে গিয়ে আমার কথা দাঁড়িয়ে মজারতি ঘটে গেছে।

ছেলেবেলায় বেশ ছিল—বাড়ির সেইসব ক্রাউন সাইজের পত্রিকা। কী না পাওয়া যেত তার বিজ্ঞাপনে। নানা রঙের কাগজে কী সব সচিত্র (চাক্কুস-বেগুন-কপি-মুলো থেকে হাতী-কাঁধে জোয়ান এবং পদ্মবনে মোহিনী নারী পর্যন্ত) সাহিত্য-প্রক বিজ্ঞপ্তি! পত্রিকার সেই ঐতিহ্যের আজ কারো এখনো আছে—কিন্তু আমারই দুর্মতি, আমি আর পত্রিকা রাখি না!

ডাইজেস্ট জাতের একটা বিদেশী পত্রিকা কাল এসে পৌঁছেছে, এখনো দৃষ্টি-ক্ষেপণের সময় পাইনি। খবরের কাগজ তিনটে সরিয়ে সেইটে টেনে নিলুম। আর তার কিছু কিছু বিজ্ঞাপনে চোখ পড়তেই বিষন্ন উদাস হৃদয় একেবারে ময়ূরের মতো নেচে উঠল : 'ওয়া হ্যান্ডসাম্!' কে বলে, পত্রিকার গৌরব কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক? সাগর পাড়ি দিয়ে আসা এই যে কুলীন কাগজটি—এক নজরেই একটা জোরের ওপর একটা দামী প্রবন্ধ বাদে দৃষ্টিগোচর হল, সেও তো সেহাত কম যায় না! হুঁ—

'আছে আছে বিষ, এখনো অনেক রয়েছে বাকী।' পঞ্জিকার অভাবে, 'আমার ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি সকলি ফাঁকি।'

প্রথমেই একটি 'বিশ্বার্থসাধক প্রতিষ্ঠান' জানাতে চাইছে : আমি কী হতে চাই? আইনজ্ঞ? বিজ্ঞানী? ভাষাতাত্ত্বিক? ভাষাবিশারদ? সংস্কৃতি-পণ্ডিত? কৃষিবিদ? কমার্শিয়াল আর্টিস্ট? উদীয়মান শিল্পপতি? সুকুমার কলাশিল্পী? গীতজ্ঞ? বেতার এবং চলচ্চিত্রে পারদর্শী? নারী জাতীয়া হলে খোঁপা-পারঙ্গমা, ফ্যাশান-রহস্যে সন্দীপনী—

থাক—থাক, এই পর্যন্তই যথেষ্ট। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-বিতরণের গ্যারাণ্টী এঁরা দিচ্ছেন, কেবল সুকুমার রায়ের ওই আকুল জিজ্ঞাসাটিরই উত্তর মিলছে না : 'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়!' এরপরেও এ দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে কী করে? এঁরাই তো শতমুখ এবং একটি উদরে সব গ্রাস করে বসে রয়েছেন!

পশ্চিমে আর একটি সমস্যা দেখছি—খর্বতা! পর পর কটি তারস্বরে বিজ্ঞাপন বলছে লম্বা হোন—একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে—কোনো তরুণীর ব্যাক গ্রাউণ্ডে অনেক উর্ধ্বে মাথা তুলে হার্কুলিসের মতো জনৈক বিশাল পুরুষ বেন নিজের ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করছে। বোঝা যাচ্ছে ইয়োরোপে ললনাদের চিত্তজয়ী হতে গেলে লম্বাত্ব অপরিহার্য। কোনো ভাবনা নেই—নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইসব হিতৈষীরা অচিরেই আপনাকে লম্বা করে দেবেন।

ছবি আঁকা! আহা, কী মনোরম! যেমন নিজের তৃপ্তি, তেমনি অর্থপ্রাপ্তি। আপনার হাতে এক ইঞ্চিও সোজা লাইন বেরোয় না? ভাববেন না, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, অনতিবিলম্বে আপনাকে আমরা বিচক্ষণ আর্টিস্ট করে দিচ্ছি। বিশ্বাস না হয়, এই দেখুন—সেনিগাম্বিয়া থেকে কৃতজ্ঞ মিস্টার একস্ আমাদের লিখছেন—

আপনার নাক কি রকম? থাঁদা? বেশি লম্বা? ঈগলের সাদৃশ্যে অ্যাকুলিন? এ সব চলবে না। জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে হলে একটি নিখুঁত নাক চাই আপনার। আমরাই আপনাকে 'উন্নাসিক' হওয়ার স্বর্গ-লোকে পৌঁছে দেব। দেরী করবেন না—আমাদের কাছে চলে আসুন।

'আত্মিক উন্নতি সাধন করুন'—নাঃ, এটাকে একটু অনুবাদ করেই দিতে হচ্ছে : "হাসি এবং হাসানো হচ্ছে পুরুষের যথার্থ পরিচয়। বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস পরিবেষণ করতে পারাই 'এলিটে'র লক্ষণ। আপনিও সেই 'এলিট'দের একজন হতে পারেন। হাসবার আর্ট শিখে ফেলুন। জগতে একমেবাদ্বিতীয়ম এই যে আমাদের করেসপনডেন্স কোর্স—এর নেপথ্যে আছেন তামাম বাছা বাছা মনস্তাত্ত্বিক এবং হাস্যরসবেত্তা। শুধু হাসতে পারলেই হবে না মশাই, হাসাতে জানা চাই। আরো চাই : রসিকতা বোঝবার ক্ষমতা, তুড়ুক জবাব দেবার নির্ভুল প্রস্তুতি, ভালো ভালো রসিকতার জায়গা বুঝে পুনরুক্তি, হাজার সোসাইটিতে অপরিহার্য হতে পারা—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসুন, লম্বা হোন

(সদস্য হয়ে পড়ব নাকি? এই জার্নাল পড়তে পড়তে যাঁরা এতদিনে তেতো-বিরক্ত, দেখা যাক তাঁদের আবার চাগিয়ে তোলা যায় কিনা!)

'নাচতে শিখুন—নাচতে শিখুন।' পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপনের নৃত্য। তা ওঁরা নাচুন—আমার আপত্তি নেই। 'গোয়েন্দা হয়ে যান—বিস্তর রোজগার—তিনমাসে শেখাব'—দরকার নেই, আমার জন্যে ক্রিস্টি-বনড-ম্যাসন কোম্পানি আছেন। 'সখা-সখী সংঘ'—আসুন, বন্ধু-বান্ধবী জোগাড় করুন—পত্রালাপের জন্যে, উইক-এণ্ডের জন্যে, বিয়ের জন্যেও ইচ্ছে করলে। তা ভালো। অত্যন্ত ভালো।

অ্যাঁ? এখানেও ঘটক-সংঘ? এবং দলে দলে? একুশ থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত কুমার-কুমারী, মুক্তদার এবং বিধবা—যা চাই? না—এ পাতাটা দ্রুত ওলটাতে হচ্ছে, অদূরেই গৃহিণী!

কিন্তু এ পর্যন্তই থাক। আজ বহু-দিনের সুপ্রভাতে আমি শুধু ভাবছি, পত্রিকার ট্র্যাডিশন তাহলে মুকুজ্যে, পত্রিকা তবে সার্বভৌম!

ময়না এসে হাসিমুখে বলল, "আমায় একটা ছেলে যোগাড় করে দে; বিয়ে করব।"

দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল, মুখ মুছে ময়নার দিকে সহাস্য চোখে তাকালাম। "কি ব্যাপার তোর ? হঠাৎ ?"

ময়না ততক্ষণে আমার বিছানায় বসে পড়েছে। বলল, "কিসের হঠাৎ ? বিয়ের ?"

"আরে না না, তুই আর আসিস না বড়, তাই বলছি...।"

"বলিস না, সেদিনও এসেছি।"

"কবে ?"

"তুই ছিলিস না; মাসি বলল, কলকাতার বাইরে কোথায় গিয়েছিস।"

কলকাতার বাইরে আমায় মাঝে-মধ্যেই যেতে হয়, শেষবার গিয়েছি শীতের গোড়ায়, এখন শীত চলছে। ময়না এসেছিল আমি জানতাম না, আমায় কেউ বলে নি। বলার মতন খবরও কিছু ছিল না বোধ হয়। আজও যে ময়না এসেছে আমি জানতে পারতাম না যদি-না বাড়ির মধ্যে একটা অট্টরোল উঠত। আগে ময়না এলে বাড়িতে নানারকম রোল উঠত, আজকাল তেমন বড় শুনি না। দাড়ি কামানোর সরঞ্জামগুলো তুলে রাখতে রাখতে বললাম, "তোকে অনেক দিন পরে দেখছি।"

ময়না আমার চোখের ওপর তার সকৌতুক, সামান্য ধারালো, চঞ্চল দৃষ্টি ফেলে বলল, "কেমন দেখছিস, ফুলদা ? বিয়ের কনে হতে পারব কি না দেখছিস ?" বলে হাসিমুখে ময়না পিঠ নুইয়ে দোল খাওয়ার ভঙ্গি করল, করেই মাথার খোঁপায় হাত দিয়ে ঘাড় বেঁকাল; বলল, "আমার চুল এখনও পাকে নি...; ভাবিস না নকল কিনে খোঁপা ফুলিয়েছি...; হাত দিয়ে দেখতে পারিস।" ময়না ঘাড় সোজা করল। "দাঁত দেখবি ? দেখ্...। একটাও পড়ে নি। কষ দাঁতে একটা গর্ত আছে—ভরিয়ে রেখেছি। আর কি দেখবি বল ? এই দেখ হাত, এখনও নরমটরম। পা দেখবি—?" বলে ময়না তার শাড়ির খানিকটা পায়ের ওপর তুলে ধরল, ডিম পর্যন্ত। তার পায়ের গোছ ভারী, মোলায়েম, সুন্দর।

ময়নার ভাল নাম মোহনা; আমরা ডাকি ময়না বলে। এক সময়ে আমি ওকে 'মোহ' বলেও ডেকেছি। ময়না আমার আত্মীয়া, মেজমাসির মেয়ে; মার সঙ্গে মেজমাসির রক্তের সম্পর্কটা খুব নিকট নয়, যথেষ্ট দূরেরও নয়। ছেলেবেলা থেকেই ময়নাদের সঙ্গে আমাদের মেশামিশি করে কেটেছে, তখন ওরা কাছাকাছি থাকত, এখন এখান থেকে দূরে চলে গেছে, ভবানীপুরের দিকে। মেজমাসির বড় মেয়ের নাম অঞ্জনা, ছোট মোহনা, মোহনার পরে এক ছেলে—জ্যোতি।। মোহনা নামটা মাসি বা মেসোমশাই কে যে দিয়েছিলেন আমরা জানি না, কেন দিয়েছিলেন তাও নয়: বোধ হয় কিছু মনে করেই।

মোহনার সঙ্গে আমি বাল্যাবধি মানুষ হয়েছি। ও কিন্তু আমার ঠিক সমবয়সী নয়। আমাদের মধ্যে বয়সের সামান্য তফাত আছে। মোটামুটি আমরা বছর চারেকের ছোট বড়।

তবু একটা বয়স থেকে আমরা সমবয়সীর মতন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম। সে বরাবর আমাকে তুই বলত, পরে কখনও সখনও তুমি বলেছে। এখন কখনও তুই, কখনও তুমি।

মোহনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আগাগোড়া সাদামাটা ছিল না। আমাদের মধ্যে বাঁধাধরা আত্মীয়তা ছাড়াও নানা সময়ে নানা রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আপাতত আমরা বন্ধুত্ব ও প্রীতির পিঠটাই দেখি, উলটো পিঠ দেখি না, দেখতে চাই না হয়ত।

মোহনা বরাবরই নিজের একটা ধাত বজায় রেখে কাটিয়ে যাচ্ছে। সে খানিকটা বেশি রকম স্পষ্ট, মেয়েদের সমাজের পক্ষে যথেষ্ট অনাবৃতই বলা চলে। তার আচরণ প্রায়ই এত মুক্ত হয়ে ওঠে যে তাকে স্বাভাবিক ভাবতে অনেকের বাধবে। আত্মীয়-স্বজন তাকে নির্লজ্জ, নির্বোধ বলেছে; তার কুখ্যাতি অনেক, নিন্দা অপবাদ অজস্র। তবু মোহনা নিজের ধাতের জোরেই যেন আত্মীয়স্বজনের মুখের সামনে সোজা পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বরাবরই ময়নাকে পছন্দ করে এসেছি। যখন সে ফ্রক পরে কাঁধ পর্যন্ত চুল ছড়িয়ে ঘুরত তখন তাকে প্রায়ই বলতাম, বড় হলে তুই ডেঞ্জারাস হয়ে যাবি; শাড়ি পরতে শুরু করলে বলেছি, ময়না তুই বোরখা পর—আর পারা যাচ্ছে না। তারপর মোহনার তরুণী ও যুবতী অবস্থায় আমার গরম নিশ্বাসে তার গাল পুড়িয়ে বলেছি, তুই মোহ, তুই ভীষণ মোহ।

আজ আমার চোখে মোহনা কতটা মোহ তো গুছিয়ে ভাবি না আর। ওর ওপর আমার অবশিষ্ট মোহ হয়ত কিছু আছে, মমতা বোধ হয় তারও বেশি। মোহনার বয়েস এখন বছর তিরিশ। সচরাচর তার মতন মাথায় উঁচু মেয়ে দেখা যায় না; পাশাপাশি দাঁড়ালে আমার মতন লম্বা মানুষেরও সে প্রায় গাল ছুঁয়ে ফেলে। তার গায়ের রঙ নতুন শ্লেট-পাথরের মতন অনেকটা, ঠিক কালচে নয়, কালোর মিশেল দেওয়া ধূসর এক রঙ—যা কখনও কখনও শেষ বিকেলের আকাশে দেখা যায়। ওই রঙের ওপর এমন এক মসৃণতা যা দেখলে মনে হয় আভা ফুটে আছে। ছিপছিপে গড়ন বললে যা বোঝায় মোহনা তা নয়। তার গড়ন মাপাজোপা, খুঁত তেমন কিছু চোখে পড়ে না। গলা ঈষৎ লম্বা হয়ত, কিন্তু কাঁধের দু পাশ পুরু, ডানার মতন নোয়ানো, ওপর বুকের আদল অল্প উঁচু—প্রতিমার আদলের মতন, নীচের বুক সুঠাম, দৃঢ়। তার স্তনে বাহুল্য নেই, ভীরুতাও নয়। ওর কোমর হালকা, যেন অনায়াসেই অসাধ্য-সাধন করে সামনে পেছনে বা পাশে হেলে পড়তে পারে। তায়, সোজা পিঠ। পেছন থেকে মোহনাকে দেখে মতিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক। তার পা, পায়ের গোছ ভারী, ভরন্ত, সুন্দর। মোহনার মুখ বুঝি তার চরিত্র। টানা লম্বা-ধাঁচের মুখ, কাঠবাদামের মতন পুরু ও মসৃণ, গালের তলা ক্রমে ক্রমে গড়িয়ে নেমেছে, নেমে থুতনির কাছে নাসপাতির মতন নধর হয়ে গেছে। অথচ তার থুতনির ডৌলটি শক্ত, এক রকম কাঠিন্য লক্ষ করা যায়। ওর ঠোঁট যতটা পাতলা হলে মানানসই হত, ততটা নয়, সামান্য মোটা, নীচের ঠোঁট বেশ পুরু; দাঁতের পাটি গোছানো। নাক হিসেবে মোহনার নাক আমার ভালই লাগে, বিসদৃশ লম্বা নয়, ডগা অল্পরকম ফোলা। ওর চোখ যে কেমন তা বুঝিয়ে বলা মুশকিল; কালো নয়ন-তারা, পালক খুব ঘন, দীর্ঘ; পাতলা টানা টানা ভুরু। মোহনার দৃষ্টি খুব সজীব, চঞ্চল; বিদ্ধ করার মতন ধারালো। ওর চোখে একটা সকৌতুক ভাব আছে, কিন্তু এই ভাব যখন থাকে না— তখন তার চোখের তারা এবং দৃষ্টি কি রকম রহস্যময় হয়ে থাকে, মনে হয় ওর সবই অনিশ্চয়তায় ভরা। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, মোহনার চোখ তার চরিত্রের অনেকটা প্রকাশ করছে।

মোহনাকে আমি চুপচাপ লক্ষ করছি দেখে এবার অধৈর্যের ভান করে সে বলল, "কি রে, বলছিস না যে কিছু?"

"বলব। বলার আগে তোকে দেখছি।" হেসে বললাম।

মোহনা বলল, "আর কত দেখবি? তুই তো আর পাত্র নয়।"

মোহনার মুখোমুখি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম, "পাত্রী হিসেবে তুই এখনও সচল।" বলে হাসলাম। "তোর একটু বয়স হয়ে গেছে ময়না, তা হোক, অনেকে আজকাল খানিকটা বয়েস পছন্দ করে।"

ময়না তার গায়ের গরম উড়নিটা গলার কাছে পাক খাইয়ে নেবার মতন করল, বলল, "আহা রে, কি কথাই বললি.. বয়স হয়ে গেছে! বয়স না হয়ে গেলে কি তোর কাছে ধারনা দিয়ে বলতে আসতাম, একটা ওগো-টোগো খুঁজে দে।" ময়না মেয়েলী ভরাট গলায় হাসতে লাগল।

সিগারেট ধরিয়ে মুহূর্ত কয়েক মোহনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার এই রঙ্গময় হাসি দেখলাম। পরে বললাম, "তোর পাত্রের অভাব কি?"

ময়না কৃত্রিম বিস্ময় দেখিয়ে বলল, "অভাব না হলে তোর কাছে আসব? থাকলে কেউ চায়?"

"তোর অনেক ছিল।"

ময়না এবার হাসল না। তার গলার স্বর যদিও গম্ভীর হল না, তবু আগের মতন অতটা লঘুও থাকল না। বলল, "যাদের কথা বলছিস তারা আমার পাত্র নয়; হলে বিয়ে" করে ফেলতাম।"

পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় ময়না বড় একটা কৃপণতা করেনি। তার সঙ্গে যারা মেলামেশা করত তাদের কাউকে কাউকে আমার মনে আছে।

আমার সংশয়ের ভাবটা মোহনা বুঝতে পারল। বুঝে জানলার দিকে সামান্য হেলে বিছানায় তার বাঁ হাতের ভর রাখল, অলস গলায় বলল, "দেখ ফুলদা, আমার বরাবরই একটু স্বয়ংবর সভা করার ইচ্ছে ছিল। আদিকালের ব্যাপার হলে কি হবে, জিনিসটা বেশ। কত রাজাগজা, বীরটীর, দেবতা-দানব সভায় আসবে—আমি বেছে-টেছে নিজের মতন একটা বর খুঁজে তার গলায় মালা দিয়ে দেব, ব্যাস্—ঝামেলা চুকবে।" হাসিতে মোহনার কণ্ঠনালী কাঁপতে লাগল।

হেসে উঠে বললাম, "তুই তাহলে এতোদিন স্বয়ংবর করছিলি?"

"ঠিক বুঝেছিস—" মোহনা মস্ত করে ঘাড় হেলাল। "স্বয়ংবর করছিলাম। আজকাল তো আর সভা ডাকা যায় না, যারা আসে তাদের নিয়ে রাস্তায়, মাঠে, গঙ্গার ধারে, সিনেমায় কিংবা ঘর বাড়িতে বসার ঘরে বসতে হয়। তা, আমার বেলায়, বুঝলি ফুলদা, রাজাটাজা আসে নি; কোথা থেকে আসবে বল, পৃথিবী থেকে রাজা-গজাগুলো মরে যাচ্ছে। তার বদলে ভাল মাইনের চাকরে-টাকরে এসেছিল, ব্যবসা করা গণেশ, স্কুল-কলেজে পড়ানো হাঁদাচাঁদা, পাড়ার এক-আধটা কার্তিক।...দূর—এরা আবার পাত্র নাকি? এদের সঙ্গে ঘোরাফেরা, হাসা-বসা করেছি, এরা বন্ধুটন্ধু, সঙ্গী; ইয়ার-ক্লাসের লোক সব। এদের আবার কেউ নিজের থেকে বিয়ে করে!"

মোহনা যেন তার উচ্ছ্বাসের ঝাপটা দিয়ে সব ধুয়ে মুছে দিল।

হাসির দমক কাটতে আমারও কিছুটা সময় লাগল। সিগারেটের ধোঁয়া নিলাম গাল-গলা ভরতি করে। পরে বললাম, "তাহলে আর তুই স্বয়ংবরে নেই?"

"না, আর নয়।"

আমি চুপ করেই থাকলাম। মোহনাও নীরব। জানলা দিয়ে শীতের রোদ এসে তার পিঠের আধখানা রোদ্দুর করে রেখেছে, তার বাঁ হাতে রোদ পড়েছে, সোনার বালা ঝকঝক করছিল। তার কানের মুক্তো-পাথরটাও রোদ পেয়ে ঠিকরে উঠছিল।

মোহনা এবার তার মুখের ভাব, গলার স্বর একেবারে পালটে ফেলে বলল, "ফুলদা, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। অনেক কথা।...আমার মন যে কি রকম হয়ে আছে তুই জানিস না।"

মোহনাকে আমি বুঝি, তার মুখ এবং কথার ভাবে বুঝলাম, সে কোনো ব্যাপারে

অশান্তি নিয়ে আছে। বললাম, "বেশ তো, তোর মনের কথা বল।"

"না, এখন নয়; এখানে নয়।"

"তবে?"

"দু দিনের জন্যে কোথাও থেকে ঘুরে আসি চল। আমার ভাল লাগছে না আর।"

"কোথায় যাবি," বলেই আমার কিছু মনে পড়ল। বললাম, "আমার এক জায়গায় যাবার কথা আছে। কাজ আছে একটা। ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে যেতে পারিস।"

"যেখানে খুশি চল। শুধু নিরিবিলি আর চুপচাপ চাই।...তুই কবে যাবি আমায় জানাস। আমি পা উঠিয়ে আছি। বললেই যাব।"

দুই

দিন আট দশ পরে ময়নাকে নিয়ে আমি যেখানে এলাম সেখানে বড় কেউ বেড়াতে আসে না। কলকাতা থেকে ট্রেনে পুরো এক বেলার পথ। নিরিবিলি, ফাঁকা জায়গা। স্টেশনের কাছাকাছি পাহাড়ী টিলার তলায় এক সময় মিলিটারী ছাউনি পড়েছিল, এখন ওখানে ফায়ার ব্রিক্‌স্‌-এর কারখানা। কিছু দূরে কয়েকটা কয়লা কুঠি। অজস্র পলাশ ঝোপ আর বন তুলসীর জঙ্গল এখানে। কাছাকাছি এক ফালি নদী, অজয় থেকে গড়িয়ে এসেছে।

কাজকর্মে আমার এখানে বার কয়েক আসতে হয়েছে; এবারেও কিছু কাজ নিয়ে এসেছি। ভাবনা ছিল, আমার পুরোনো আশ্রয়টা পাব কি না। সৌভাগ্যবশে পেয়ে গেলাম। স্টেশনের কাছাকাছি একটা ছোট বাড়ি, মাথায় ওপর শ্যাওলা ধরা টালির আচ্ছাদন, জানলা দরজা বোধ হয় জাম কাঠের। বাইরে সিমেণ্টে বাঁধানো কুয়াতলা।

স্টেশনে নেমেই ময়নার জায়গাটা ভাল লেগে গিয়েছিল। এসে পৌঁছেছিলাম প্রায় দুপুরে। দেখাশোনা করার লোকটাকেও পাওয়া গেল। নাম তার দাশরথি। আমার সঙ্গে তার মুখ চেনাচিনি আগেই ঘটেছিল। দাশরথি যাচ্ছিল কোলিয়ারীর দিকে তার ঘরের ডিম বেচতে, আমাদের দেখে খুশী হয়ে অভ্যর্থনা করল; বলল, 'অনেক দিন বাদে এলেন বাবু, কাজে এলেন কি? বউদিদিকেও নিয়ে এলেন? ভালেই করলেন।'

পৌষের মাঝ দুপুরের রোদ ময়নার ঠিক মাথায় পড়ছিল বলে সেই তপ্ত রোদ বাঁচাতে ময়না মাথায় খানিকটা কাপড় তুলে দিয়েছিল। দাশরথি অত বোঝে নি। বোঝার দরকারই বা কি! আমি এবং ময়না দুজনেই পরস্পরের চোখে চোখে তাকিয়ে হাসলাম মৃদু।

দুটি মাত্র ঘর। দাশরথি ঘর খুলে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। তক্তপোষ

আর একটা পায়া-ভাঙা টেবিল ছাড়া আসবাবের কোনো বাহুল্য নেই। দেওয়ালে কিছু পেরেক পোঁতা, একটা রাধাকৃষ্ণের ছবিঅলা পুরোনো ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারও ঝুলেছিল।

দাশরথি গেল কিছু শুকনো খাবার আর চায়ের ব্যবস্থা করতে, ময়না গেল কুয়ার জলে অর্ধস্নান সারতে।

শাড়ি জামা ভিজিয়ে পরিষ্কার হয়ে ফিরে এসে ময়না বলল, "খুব আরাম লাগল, ফুলদা; কুয়ার জল যে এত মিষ্টি কে জানত!" বলে ময়না কাপড় ছাড়তে পাশের ঘরে গেল।

পাশাপাশি ঘর, মাঝখানে পলকা দরজা। দাশরথি একটা ঘরই খুলে দিয়েছিল, পাশের ঘরের ছিটকিনিটা আমিই খুলেছি, ময়না দাশরথির রেখে-যাওয়া ঝেঁটা দিয়ে ঘরটা আগেই একটু পরিষ্কার করে নিয়েছে।

দাশরথি ফিরে আসতে আসতে আমারও হাতমুখ ধোওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর চা জলখাবার খেতে বসলাম। ততক্ষণে প্রায় বিকেল।

আমি ভেবেছিলাম, ময়না ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আজ আর বাইরে যেতে চাইবে না। বিকেল পড়ে যাচ্ছে দেখে ময়না বলল, "চল ফুলদা, একটু ঘুরে আসি বাইরে থেকে।"

দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, দাশরথি বলল, যান ঘুরে আসুন, আমি আছি। এই বাড়ির লাগোয়া একটা খাপরা-ছাওয়া বাড়িতে সে থাকে।

শীতের বিকেল, এই ছিল দাঁড়িয়ে, হঠাৎ পালাল কোথাও, আর তার দেখা নেই; আর প্রায় দেখতে দেখতে আঁধার হয়ে এল। শীতের বাতাস এখানে উদ্দাম, কোথা দিয়ে ছুটে আসছে বোঝাও যায় না, কখনও মনে হয় জঙ্গলের দিক থেকে, কখনও মনে হয় নদীর ধার ঘেঁষে। বন-তুলসীর গন্ধ আরও ঘন হয়ে নাকে লাগে। ফায়ার ব্রিক্‌স্‌-এর ধোঁয়া পাহাড়ী টিলার মাথায় মেঘের মতন জমতে থাকল। ততক্ষণে তারা উঠে গেছে আকাশে, চারপাশ কালো, হিম পড়ছে। স্টেশনের দিকে কয়েকটা দোকানপত্রের আলো জ্বলছে টিমটিম করে। শীত ধরে গিয়েছিল ময়নার, বলল, "চল, বড্ড হাওয়া বাপু, গা কাঁপিয়ে দিচ্ছে।"

ঘরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা ঘন হল।

দাশরথির দেওয়া লণ্ঠন নিয়ে আমি বসলাম। ময়না তোলা জলে হাত পা ধুয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে সটান তক্তপোশের ওপর তার পাতা বিছানায় বসে পড়ল। আমার বিছানাটা ও-ঘরে। বিছানায় বসে ময়না তার গায়ের র‍্যাগ কোলের ওর টেনে নিল। "এই রকম শীত পড়লে মরেই যাব রে ফুলদা, বাব্বা!"

"মরবি না; বোস চাপাচুপি দিয়ে গরম হয়ে যাবি।"

"তুই না তোর ফ্লাস্ক ভরতি করে চা আনলি স্টেশন থেকে। দে, গরম চা খেয়ে গলার ব্যথা সামলাই।"

কুয়ার জল বোধ হয় একটু বেশিই ঘেঁটেছিল ময়না, তারপর বাইরের বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডাই লেগেছে; গলা ব্যথা ব্যথা করছিল। ফ্লাস্ক ভরতি করে চা এনেছিলাম স্টেশন থেকে, দাশরথি এ জিনিসটা যখন তখন দিতে পারে না।

ময়নাকে চা দিয়ে নিজের গ্লাসটাও ভরতি করে নিলাম। আরও থাকল ফ্লাস্কে। আমাদের নিজস্ব বাসনপত্র বলতে ওই দুটো কাচের গ্লাস, জলটল খাওয়ার জন্যে সঙ্গে এনেছি। দুজনের
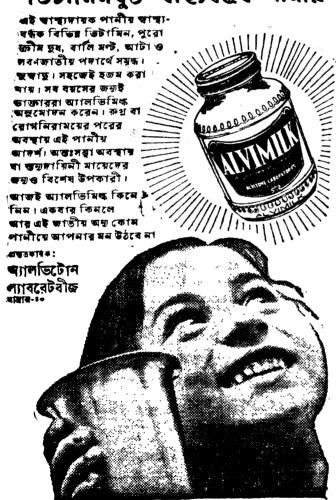
দুটো ছোট বিছানা, দুটো সুটকেশ, আর ছোট মতন একটা বেতের টুকরিতে একটা টিফিন কেরিয়ার, কয়েকটা কমলালেবু, এক প্যাকেট মোমবাতি, কিছু টুকিটাকি।

দাশরথি এর মধ্যে একবার দরজার কাছ থেকে ঘুরে গেল। নটার গাড়ি আসতে আসতে তার খাবার তৈরি হয়ে যাবে। বললাম, তার পরে হলেও আমাদের অসুবিধে হবে না, খাবার সময় হলে তাকে ডাকব।

লণ্ঠনটা ভাঙা টেবিলের ওপর জ্বলছে, ময়লা, মেটে রঙের আলো। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরালাম, ধরিয়ে ময়নার মুখোমুখি বসলাম। পা ঝুলিয়ে বসা যাচ্ছিল না, ঠাণ্ডা লাগছে; বিছানায় পা উঠিয়ে নিলাম। জানলা দরজা বন্ধ, তবু ফাঁক-ফোকর দিয়ে কনকনে বাতাস আসছিল।

ময়না আরাম করে ধীরেসুস্থে চা খাচ্ছিল। আমি কখনও ময়নাকে দেখছিলাম, কখনও ঘরের ধুলো-জমা দেওয়ালের গায়ে ঝাপসা আলো, কখনও বা পাশের ঘরের অন্ধকার দরজাটা দেখছিলাম।

ময়না এবার ঢোঁক গেলে আরামের শব্দ করল একটু, বলল, "গরম লাগছে, ব্যথাটা যেন কমল খানিক।"

"অবেলায় তুই অত জল ঘাঁটলি কেন। কলকাতার মানুষ, কুয়া দেখে নেচে উঠলি।"

কথাটা শুনল ময়না। তারপর কি মনে করে হেসে ফেলল। বলল, "অবেলায় বুঝি কিছু ঘাঁটতে নেই রে।"

ময়নার চোখের দিকে তাকালাম। কথাটা সে অন্যভাবে বলেছে। কি ভেবে বলেছে আমি তার খানিকটা অনুমান করতে পারি। ওর চোখে অন্যমনস্কতা ফুটে উঠেছে। আমায় সে দেখছিল না, আমার পাশ দিয়ে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলা গেল না। অথচ এই কিছুক্ষণের মধ্যে এমন একটা নীরবতা সৃষ্টি হয়ে উঠল যা আমাদের বোধ ও অনুভূতির মধ্যে কোনো গভীর উন্মনার ভাব সঞ্চার করছিল। ময়নার চোখের পাতা স্থির, দৃষ্টি এলোমেলো, যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। বিগত কোনো কোনো ঘটনা আমায় উদাস করছিল।

শেষে অনেকটা হালকা গলায় আমি বললাম, "তুই তো অবেলাই পছন্দ করলি।"

ময়না তাকাল না, একই ভাবে বসে থাকল।

অপেক্ষা করে আবার বললাম, "তোর এখনও একেবারে অবেলা হয় নি, খানিকটা বেলা আছে...।"

এবার ময়না আমার দিকে তাকাল। আমার পরিহাস সে মন দিয়ে শুনেছে কি শোনে নি বোঝা গেল না। চোখের পলক ফেলল। বলল, "আর কতটুকু আছে তুই জানিস? জানিস না।" ময়না মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে।

না জানার মতন আমি কিছু পাচ্ছিলাম না। ময়নার হয়ত সামান্য বয়স হয়ে গেছে; কিন্তু সে কিছু না। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেটের এক মুখ ধোঁয়া গলায় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকলাম। পরে ঠাট্টা করে বললাম, "তোর তো সবটাই আছে। সেদিন বাড়িতে এসে চুল দেখালি, দাঁত দেখালি, নিজেই বললি হাত-পা এখনও নরম।"

ময়না এবার ঠোঁটের ডগায় হাসির ভাব আনল একটু, বলল, "মিথ্যে বলেছি?"

"না, কে বলল মিথ্যে বলেছিস!"

"ওগুলো মিথ্যে নয়, বুঝলি ফুলদা—" ময়না কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে হঠাৎ কি রকম অন্যমনস্ক হল, তার চোখের দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে মিশে গিয়েছিল, তবু সে আমাকে দেখছিল না। মুহূর্ত কয়, তারপর আবার ময়না স্বাভাবিকভাবে আমায় দেখতে দেখতে নিশ্বাস ফেলল। বলল, "বাইরে সব ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে কি যেন একটা হয়ে গেছে রে, ফুলদা।"

ওর দিকে সপ্রশ্ন সকৌতুক চোখ করেই বললাম, "কি হয়ে গেছে? বল, শুনি।"

ময়না তার কালো গরম শাল আরও ঘন করে নিয়ে বলল, "তুই কিছু বুঝিস না? একটা আন্দাজ কর না।"

মনের আন্দাজ যাই হোক মুখে হেসে বললাম, "আমি কি বুঝব! আমি শুধু দেখছি তুই আমায় একটা বিয়ের পাত্র খুঁজে দিতে বলছিস।"

ময়নাও হাসল। "তা বলেছি—।"

আমার চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, গ্লাসটা জানলার দিকে হাত বাড়িয়ে রেখে দিলাম। সিগারেটও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ময়না তার দু পা উঁচু করে হাঁটু ভেঙে বসল, তার কোমর পর্যন্ত কম্বল চাপা; যদিও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না তবু বুঝতে পারছিলাম ময়না তার দু হাত পায়ের দু দিক দিয়ে বেড় দিয়ে হাঁটু বুকের সামনে টেনে নিয়ে তার চিবুক রাখল।

ময়নার মাথার চুল রোদের ধুলো ময়লায় সামান্য রুক্ষ হয়ে আছে। কপাল আর কানের পাশের আলগা চুলগুলো কিছু এলোমেলো, নীচের পুরু ঠোঁটে সকালের পানের বাসি খয়েরী দাগ।

"পাত্র খোঁজার আগে পাত্রীর কথা কিছু শুনি—" আমি সাধারণভাবেই বললাম, কৌতুক করেই, "তুই না বলেছিলি তোর অনেক কথা আছে—!"

ময়না হাঁটুর ওপর চিবুক রেখেই চোখ তুলে কয়েক পলক আমায় দেখল। বলল, "হ্যাঁ, কথা আছে।"

সিগারেটের টুকরোটা এবার নিবিয়ে ফেলে দিলাম। "বল, শুনি।"

আমি এবার খানিকটা আলসামির ভাব

করে বসলাম। ময়নার কম্বলের অনেকটা বাড়তি পড়ে আছে, পায়ের খানিকটা ঢেকে নিলাম।

ময়না চুপচাপ। হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে চোখ নীচু করেই বসে আছে।

খানিকটা সময় অপেক্ষায় কাটল। তারপর আবার বললাম, "কি রে, বল।"

ময়না প্রথমে বিড়বিড় করে কি বলল, মনে হল যেন বলছে, "বলছি—বলছি, অত তাড়া দিস না।" তারপর মুখ তুলে নিশ্বাস টেনে বলল, "বলার আগে একটা কথা তোকে বলি ফুলদা, আমার কথা তুই নিজেই বুঝিস, আমি অতশত বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

মজার গলায় বললাম, "গৌরচন্দ্রিকা ভালই হচ্ছে, তুই চালিয়ে যা।"

"দূরে, এটা গৌরচন্দ্রিকা কেন হবে," ময়না বলল, "আমার কোনো চন্দ্রিকাটন্দ্রিকা নেই। তবে একটা জিনিস আছে; দাঁড়া বের করে আনি।" বলে কম্বলের তলা থেকে পা টেনে বাইরে আনল ময়না। তার পায়ের কাপড় সায়া অগোছালো করেই তক্তপোশ থেকে নামল। তারপর দেখলাম মেঝেতে বসে অন্ধকারে কি যেন খুঁজছে। একটু পরেই ময়না তার সুটকেস বের করে নিয়ে চাবি খুলে ডালা তুলল। সামান্য হাতড়াল ময়না, আবার সুটকেস বন্ধ করে তক্তপোশের আড়ালে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিছানায় বসবার আগে গায়ের শাল মাথার দিকে সামান্য তুলে আবার কম্বলের মধ্যে তার পা কোমর ডুবিয়ে দিল। ডান হাতে কি একটা জিনিস। কৌতূহল বোধ করলেও বুঝতে পারলাম না জিনিসটা কি! মনে হল, পাতলা খয়েরী রঙের এক টুকরো চামড়া। ঠিক যে খয়েরী রঙ তা নয়, অনেক পুরোনো হয়ে যাওয়ায় এবং হাতে হাতে ময়লা ধরায় ওই রকম একটা রঙ হয়েছে। বিঘতটাক লম্বা হয়ত, অথচ গোল, রুলের মতন। মনে হল, গোল করে গুটিয়ে রাখা হয়েছে।

"ওটা কি রে?" অবাক হয়ে শুধোলাম।

ময়না জিনিসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল না, দেখতেও বলল না; তার ডান পাশে পেছনে পিঠের দিকে সরিয়ে রাখল। ময়নার আড়াল পড়ায় ওখানটায় লণ্ঠনের আলো নেই, ছায়া গাঢ় হয়ে আছে।

আবার শুধোলাম, "ওটা কি?"

ময়না বলল, "ওই থেকেই আমার শুরু। ধরে নে ওটা আমার জীবন।"

তার এই হেঁয়ালিভাব আমি বুঝলাম না। ময়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তার সুশ্রী মুখে পাতলা হাসি ছিল, সেই হাসি ক্রমেই যেন মুছে গিয়ে গম্ভীর হয়ে আসছিল। কপালের চুল হাতের উলটো পিঠ দিয়ে সরিয়ে কপাল পরিষ্কার করল ময়না, আঙুলের ডগা দিয়ে চোখ রগড়াল। চোখ রগড়াবার পর তার চোখ সামান্য ছলছলে হল। অনেকটা বাতাস টানল শব্দ করে, মুখ বুজে; বুক ফুলে উঠল, তারপর মুখ হাঁ করে নিশ্বাস ফেললে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল।

"ওই কিসের একটা টুকরো—চামড়ার না কাগজের—তোর জীবন হল কি করে?" হাসির গলায় বললাম।

"হল। কেমন করে হল, তোর জেনে লাভ কি!" ময়না বলল, "হাসির কথা নয়। আমিও ভেবেছিলাম এটা আবার আমার জীবন কিসের! আমিও হেসেছি, ঠোঁট উলটেছি, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু সত্যি ফুলদা, একদিন দেখলাম, ওটা আমার জীবন।" ময়নার মুখ গম্ভীর, গলার স্বর আবেগ।

মানুষের কোন কথা কি যে ব্যক্ত করে জানি না। ময়নার এবারের কথায় আমার মধ্যে হাসি ও লঘুতার ভাব কমে গেল। আমি ওর মুখ দেখে অনুভব করতে পারছিলাম, নিছক হেঁয়ালি নয় মোহনার কোথাও যেন একটা সত্য আছে, সে কোনো কিছুর ইঙ্গিত দিতে চাইছে। আমার অবিশ্বাস বা প্রশ্ন তাকে হয়ত বিরক্তই করবে। নীরবই থাকলাম, কৌতূহল হচ্ছিল—মোহনা কি বলে?

মোহনা বলল, "দেখ ফলদা, মানুষ নাকি কতরকম ভাবনা চিন্তা করে। আমার অত ভাবনাটাবনা আসে না। পারি না। তবু তুই না চাইলেও কখনো কখনো ভাবতে তো হয়ই। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের মধ্যে অনেক জিনিস থাকে, কিছু ওপরে ভাসে, কিছু থিতিয়ে থাকে। জোরে নাড়া পড়লেই থিতোনো জিনিসগুলো আবার ওপরে ভেসে ওঠে। ঠিক কি না, বল?"

"ওই রকমই—।" আমি মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম।

অল্প চুপ করে থেকে মোহনা বলল, "আমার মধ্যে খুব যে কিছু থিতিয়ে ছিল আমি বুঝতে পারতাম না। যেগুলো ভাসত সেগুলোই আমি বুঝতাম। তুই দেখেছিস, ছেলেবেলা থেকেই আমি আমার মতন। লোকে বলত, বেয়াড়া, জেদী, ধিঙ্গি; বলত, আমি নিজেকে নিয়েই থাকি, স্বার্থপর, আত্মসুখী। ছেলেবেলা থেকেই দিদির সঙ্গে আমার ঝগড়া, দিদিকে আমি আমার ওপর মোড়লি করতে দিতাম না, তার সঙ্গে সব ব্যাপারেই সমান ভাগ বাঁটরা করে নিতাম। কিন্তু সেটা পাবার বেলায়, দেবার বেলায় নয়, কাজের সময় নয়। মা আমাকে অবাধ্য বলত; বলত, আমার যত বয়েস বাড়বে আমি ততই বেয়াড়া হয়ে উঠব, আমার স্বভাব মন্দ হবে, আমি যেখানে যাব সেখানেই ধর জ্বালাব। বাবা এত কথা বলত না প্রথমে, পরে বলত যে, আমায় একটু বেশি রকম আসকারা দেওয়া হয়ে গেছে, এখন বাঁধতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে পালাব। এসব হল ঘরের কথা; তুই সবই জানিস। আমি যা শুনেছি কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। আমি আমার মতন হয়েই থাকলাম। তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকেই পাড়ার মেয়েদের চোখ টাটাতে লাগল, ছেলের দল তখন থেকেই আমার জন্যে গলিতে জটলা পাকাতে লাগল। আমার তাতে কোনো লজ্জাটজ্জা হত না। একবার সেই সরস্বতী পুজোর দিন পাড়ার মধ্যে দু' দল ছেলের মধ্যে মারপিট হল তোর মনে আছে? আমায় নিয়ে কেচ্ছা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি কিছু জানি না। মিথ্যে কথা, আমি জানতাম। লাহাদের বাড়ির ছেলে—কি যেন নাম ছিল রে তার—মনেও নেই, সেই ছেলেটা আমায় পটাচ্ছিল, অন্য দলের ছেলেরা জানতে পেরে মারধোর লাগিয়ে দিল। আমার তাতে বয়েই গেল। সোজা কথা, ওই বয়স থেকেই আমি বুঝলাম, আমার একটা দাম আছে। আমার দাম যে ছিল, তুইও জানিস।...আমার যখন বয়স ষোলো সতেরো—তখন তুই আমায় কি বলতিস, ফলদা?"

"বোরখা পরতে..."

"না; সে আরও আগে; সবে যখন শাড়ি ধরেছি।"

"শাড়ি ধরারও বেশ পরে তোকে আমি 'মোহ' বলে ডেকেছি।"

"হ্যাঁ। শুধু ডাকিস নি, তুই আমার প্রেমিক হয়েছিলি।"

"হয়েছিলাম।"

"তোর সঙ্গে আমার খুব একটা লুকোচুরির খেলা কখনও হয় নি। আমি পারতাম না; আমার স্বভাবও তেমন ছিল না। তুই আমার কাছে হাত বাড়ালেই পেয়েছিস। তোকে আমার বরাবরই ভাল লেগেছে ফলদা; তুই আমার ধাত বুঝিস, স্বভাবও বুঝিস। তুই বুঝতে পেরেছিলি আমার বাঁধাবাঁধি বলে কিছু নেই। আমি একটা

কিছু খুঁটি পেলেই তার গা জড়িয়ে বাড়ব এমন লতাগাছ নই। তেমন হলে, আমার হাতের কাছে তুই ছিলি, আহা, কত ভালই না বাসতিস, তোতে-আমাতে দুম করে গিয়ে বিয়ে করে আসতুম। কেউ আটকাতে পারত না। সেই তোকেও আমি পাশ কাটিয়ে দিলাম। অবশ্য, তোর রাগ, হিংসে, আফশোস শেষের দিকে কমেই এসেছিল। তুই খুব চালাক, ধরতে পেরে গিয়েছিলি—আমার প্রেম-ভালবাসায় মতি নেই।" মোহনা স্নিগ্ধ করে হাসল একটু, যেন সে একটু দুঃখই পাচ্ছে আমার জন্যে, পেয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আমি বললাম, "আমার কথা থাক, তোর কথাই বল।"

"বলছি, বলছি—" মোহনা তার কানের লতিতে হাত দিয়ে মুক্তো পাথরটা ঠিক করে নিল, হয়ত আলগা করল। বলল, "আমায় অত তাড়া দিস না, এক বলতে আরেক বলে বসব। আমি ছাই গুছিয়ে কি কিছু বলতে পারি! যাক্, শোন—যা বলছিলাম। আমি বলছিলাম যে, আমার স্বভাবটাই ছিল অন্যরকম। কোনো কিছুই আমি শেষ বলে নিই নি, নিতে পারতাম না। তুই বিশ্বাস কর, আমি সত্যি সত্যি কোনোদিন কোনো ছেলেকে বাছি নি। তোকে সেদিন ঠাট্টা করে বলছিলাম বটে যে, আমি স্বয়ংবর সভা করছিলাম, কথাটা কিন্তু ঠাট্টাই। না রে ফুলদা, আমি বাছবিচার করি নি। কেন করব বল? আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কাউকে শুইয়ে-বসিয়ে হাত করব এমন কথাই আমি ভাবতাম না। আ, তা যদি হবে তবে আমি অমিয়বাবুকেই আমার হাতের মুঠো খুলে সম্মতিটা ধরিয়ে দিতে পারতাম। তুই অমিয়বাবুকে চিনিস। কি রকম কাজেকর্মে তৎপর ছেলে বল। ছিল এখানকার মিউজিয়মে, চলে গেল দিল্লির খাস অফিসে। গভর্নমেণ্ট তাকে দু' দুবার বিদেশ পাঠাল। বা ধর, আমাদের দীপক-কে, টেক্সটাইলের পাশ করা ছেলে, আমাদের অফিসে এসে বসতে না বসতেই ছ'মাসের জন্যে আমেরিকা। ফিরে এসে বলল, বেল্ট না আঁটলে ট্রাউজার্স পরতে পারি না, ফ্যাট হয়ে গেছে। দু লাফে বড় চাকরি বগলে পুরে আবার যেন কোথায় চলে গেল। পয়মন্ত ছেলে। আমায় বলেছিল, লেট্ আস্ সেটেল্ সামথিং। আমি বলেছিলাম, নাথিং। ঘা খেয়ে দীপক আমায় ঘেন্নাই করে বসল। তা করুক। তারপর আরও কত এল : বিজন, কমলেশ, সানু সোম—এরা বিয়ের বাজারে কলকাতার ট্যাক্সির মতন, হুট করে পাওয়া যায় না।...সজ্জন মানুষ, বিদ্যেবুদ্ধির বহরে মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, কলেজের এক প্রফেসারও এসেছিল; স্কুলের মাস্টার—ডানপিটে একটা ছোকরাও জুটেছিল। কত বলব তোকে। এদের কাউকেই আমি আমার খুঁটি করতে চাই নি। ইচ্ছেও হয় নি।" ময়না থামল। তার বোধ হয় একটু জিরিয়ে নেবার দরকার হয়েছিল, কিংবা যেদিকে তার কথা গড়িয়ে চলেছে সেদিক থেকে থামিয়ে নেবার।

ময়নার চোখমুখ সামান্য চকচক করছিল। বলার ঝোঁকে কিছুটা আবেগ ও অস্থিরতা তার এসেছে; সেই উত্তেজনা বোধ হয় চোখে মুখে ভাসছিল।

আমি বললাম, "তোর ইচ্ছেটা কি ছিল?"

ময়না সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। বার কয়েক সে ছোট বড় নিশ্বাস নিল। তারপর বলল, "আমার ইচ্ছে আমার মধ্যেই ছিল, বোধ হয় জন্মকাল থেকেই। আমি নিজের ইচ্ছেকেই কতবার শুধিয়েছি—হ্যাঁ রে, তোর মতলব কি? হাসিস না ফুলদা, সত্যি বলছি, এক একদিন, যখন আর কিছু মাথায় থাকত না, একেবারে ফাঁকা হয়ে থাকতাম—তখন, বা যখন আমার সঙ্গে কারও বন্ধুত্ব, মেলামেশা শেষ হয়ে যেত, আমার ওপর আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে কমলেশ টুনলেশরা চলে যেত—তখন রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজের ইচ্ছেকেই নিজে শুধোতাম, তোর ইচ্ছে কি? আমরা সবাই একটা মানুষ, কিন্তু তুই দেখিস, মাঝে মাঝে আমরা দুটো হয়ে যাই, বাইরে যে থাকে সে ভেতরের মানুষটাকে চুপি চুপি এ-সব কথা জিজ্ঞেস করে। আমি ভাই, মনটাকেই একটা মানুষ বলি—ভেতরের মানুষ। তুই কোনোদিন তার গোটা চেহারা দেখতে পাবি না, তাকে ভাল বুঝবি না, অথচ সে তোকে আড়াল থেকে কোথায় যে চালিয়ে নিয়ে যাবে তুই জানিস না। আমি অনেকদিন রাত্রে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করেছি, কি তোর ইচ্ছে? কখনও স্পষ্ট কোনো জবাব পাই নি।...তবু আমার মনে হত, আমার ইচ্ছে অন্যদের মতন নয়। দেখে শুনে, সাত পাঁচ ভেবে, লাভলোভ খতিয়ে রেখে একটা ছেলেকে বিয়ে করে

ফেলব—সে-রকম ইচ্ছে আমার হত না। আমি, জানিস ফুলদা, একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আমি একটা গয়নার বাক্সের মতন হয়ে বিজনের আলমারির লকারে ঢুকে গিয়েছি, বিজন লকার বন্ধ করে দিচ্ছে। উরে বাব্বা, সে কী ভয় আমার, গলা শুকিয়ে কাঠ, ঘামতে ঘামতে মরি, ঘুম ভেঙে গেল। তারপর আর সারারাত ঘুম নেই। পরের দিন সারাক্ষণ সেই একই স্বপ্ন আমায় খোঁচাতে লাগল। সহজে আর সেটা ভুলতে পারি না। শেষে বিজনকে এড়িয়ে গিয়ে তবে বাঁচি। তাই বলছি তোকে, আমার ইচ্ছেটা কি—আমি কোনোদিন জানতে পারি নি, কিন্তু বুঝেছিলাম—আমি কোনো অবলম্বন চাই না, কারও অধিকারের মধ্যেও থাকতে পারব না। আমার সঙ্গে যাদের অনেক দিনের মেলামেশা হয়েছিল—আমি তাদের কারও জন্যে ছটফট করতে পারি নি, মনেই হয় নি ও বা অমুক না থাকলে আমার সব অন্ধকার হয়ে যাবে, আমি আর বাঁচব না! যখন কেউ চলে যেত মামুলি একটু-আধটু মন খারাপ ছাড়া কারও জন্যে আমার দুঃখ হত না। অল্পস্বল্প মায়া ছাড়া সত্যিই আমার ওদের জন্যে কোনো ব্যাকুলতা ছিল না। ওই তো, সেবার প্রমথ রাত না পোয়াতে মারা গেল। সবাই কাঁদল, হা-হুতাশ করল, দুঃখ পেল; আমারও মনটা খারাপ লাগছিল, কিন্তু প্রমথ নেই—আমার কি করে জীবন কাটবে এ-সব আমি ভাবতেও পারলাম না। দুঃখ-শোকে আমি অধীর হলাম না। আমার কাছে কিছুই ফাঁকা ঠেকল না।" মোহনা চুপ করে গেল।

কিছু সময় আমি একইভাবে বসে থাকলাম। মোহনার চোখ-মুখ এখন আর আলাদা করে আমার নজরে আসছিল না, যেন ওর সমস্ত মুখ আমার দৃষ্টিপটে ছবির মতন স্থির হয়ে গেছে। মোহনা সামান্য নড়াচড়া করল। আমার তন্ময় ভাবটা তখন কাটল। নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে আবার একটা সিগারেট ধরালাম।

মোহনা মাথা নামিয়ে শালের গায়ে তার নাকের ডগা ঘষল একবার, ছোট্ট করে হাই তুলল। এবার লক্ষ করে দেখলাম, মোহনার চোখ-মুখ গম্ভীর হলেও তার মধ্যে কেমন এক ব্যাকুলতা এসেছে। আবেগে তার চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে এসেছে।

কি যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, মোহনা বাধা দিল। বলল, "তুই বলবি, আমি নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, আত্মসুখী। বলতে পারিস আমি হৃদয়হীন। এ-সব নতুন কথা নয়: মা বলেছে কোটি বার, বাবা বেচারী মারা যাবার আগেও আমায় বলেছে—আমি আমাদের 'পরিবারের - মানসম্মান বলে কিছু আর রাখি নি। দিদি আমায় তার শ্বশুরবাড়িতে কোনোদিন ডাকে না, ঘেন্না পায়, বলে আমায় তার বোন ভাবতে গা গুলিয়ে ওঠে। আমার ছোট জ্যোতি, সেদিন সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরি শুরু করেছে, সেও সেদিন চোটপাট করে বলল, আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে তার ঘেন্না হয়।...শোন ফুলদা, আমি সব স্বীকার করে নিচ্ছি, যে যা বলেছে: এমন কি আমার জামাইবাবু যে বলেছিল—আমার মধ্যে বিকার ও রোগ আছে—আমি তাও মেনে নিলাম। কিন্তু তুই বল, আমার দোষ কোথায়? পাঁচজনের শেখানো কথায় আমার যদি রুচি না থাকে আমি কি করতে পারি! এই সংসারে, তুই দেখবি, পাঁচজনে তোকে শুধু শেখাচ্ছে—এটা করো না, এটা মন্দ ওটা ভাল, এরকম করলে লজ্জায় মাথা নীচু হবে, ওটা করো—করলে ভবিষ্যতে ভাল হবে। দূর ছাই, ও শিক্ষা যদি আমার ভাল না লাগে কি করব আমি। জীবনটা আমার। আমার নয়? এই শরীর বল, মন বল সবই তো আমার। আমার যদি নিজের শরীর নিয়ে মনে না হয় যে, আমি চোর, তবে আমি কেন তাকে নিয়ে কোথায় রাখি, কোথায় ধরি করে ভয়ে মরব। আমি কি চুরি করে আমার দেহটা এনেছি? এ আমার, জন্ম থেকেই। কেন আমি নিজের জিনিস নিয়ে পথ হাটতে ভয় পাব? না না, আমার ভয়টয় ছিল না। বরং আমি দেখতাম ওই জিনিসটা আমার সম্পদ। তুই দেখিস ফুলদা, আমাদের সংসারে সব সম্পদেরই কদর আছে, তাকে ফলাও করে বেড়ালেই লোকে খুশী হয়। তোর যদি গাড়ি-বাড়ি থাকে তুই কি লজ্জায় মরবি, তোর যদি বংশ-মর্যাদা থাকে তুই কি ইঁদুরের গর্তে ঢুকিস? লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট হলে তার কদর, গানের গলা থাকলে তারও কদর, মস্ত চাকরি করলে তারও কদর। শুধু তোর যদি এমন একটা শরীর থাকে যা ভাল, যার জন্যে—কি বলব, সেই যে পদটা—'পরিমল লোভে অলি সকলি জুটিল'—তবেই শুধু ছিছি।...আমি ভাই, এ-সব বুঝতে পারতাম না। আমার মনে হত, যা পেয়েছি সে আমার নিজের ধন, আমার সম্পদ, আমার জিনিস নিয়ে আমি মাথা উঁচু করে চলব, যা খুশি করব, তাতে অন্যের কি! তা বলে আমি কি অত বোকা যে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খইমুড়ি ছিটোনোর মতন করে যত রাজ্যের কাকপাখি জুটিয়ে এনে নিজেকে খাওয়াব। অত বোকা আমি নই। আমার সুখ যতটুকুতে ততটুকু আমি নিয়েছি। আমার কোনোদিন আফশোস হয় নি, বুক ধকধক করে নি।" ময়না থেমে গেল, যেন সে কোনো উঁচু জায়গা থেকে তরতর করে নামতে নামতে এসে হঠাৎ দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থমকে গিয়ে আরও নীচের দিকে তাকাল, দেখল—এবার তাকে পা ফেলতে হবে সাবধানে। রীতিমত সতর্ক ও বিচক্ষণ হয়ে যেন পরের পা ফেলছে এইভাবে ময়না বলল, "তারপর—একদিন..."

হাতের সিগারেটটায় ছাই জমেছিল, আঙুল সরাতে গিয়ে ছাই কম্বলে পড়ল, পড়ে তার বাঁকা চেহারাটা ভেঙে দুদিকে ছড়িয়ে গেল।

মোহনা বলল, "তারপর একদিন হঠাৎ কেমন সব হয়ে গেল। বলতে পারিস উলটে-পালটে গেল।" মোহনা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার চোখের তারা বিষণ্ণ ও কাতর হল, কিছুটা উদাস। "একদিন কি যে হল বুঝলাম না। দিনটাই ছিল খারাপ। সকালে কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম কে জানে, ঘুম ভেঙে উঠতে না উঠতেই মার সঙ্গে খিটিমিটি বাধল। আমার ওপর মার মনের ভাবটা তুই জানিস।

কথা কাটাকাটি, মন কষাকষি আমাদের নতুন নয়, প্রায়ই হয়। কিন্তু সেদিন মার মন একেবারে তেঁতো হয়ে ছিল। কি যে বলল আর না বলল তার কোনো ঠিক নেই। বুঝলাম, জ্যোতিই মাকে উসকে দিয়েছে। জ্যোতির সঙ্গেও আমার ঝগড়া হল, আমারও মুখের ঠিক থাকল না, যা তা বললাম। ঝিয়ের বাচ্চা ছেলেটা বাঁদরামি করছিল, ঠাস করে এক চড় মারলুম, ছেলেটা কঁকিয়ে মরে আর কি। তিতিবিরক্ত হয়ে স্নান নেই, খাওয়া নেই, চলে গেলাম অফিস। অফিসে কোথায় একটু স্বস্তিতে থাকব তা নয়, মেঘলা দুপুরে এক মূর্তিমান এসে হাজির। আমার এই নতুন মূর্তিমানটিকে তুই চিনিস না, এর নাম ললিত। নামে ললিত হলেও ওর কোথাও তেমন লালিত্য নেই, চেহারাটা লম্বাচওড়া, পুরুষের মতন, স্বভাবটা রুক্ষ, অহমিকা বেশি। অফিসে এসে আমায় জোর জবরদস্তি করে টেনে নিয়ে রাস্তায় বেরোলো। তারপর নিয়ে গেল পার্ক স্ট্রীটের এক চীনে দোকানে। ভেবেছিলাম, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু নেশার মধ্যে আমায় ছেড়ে দেবে। ওমা, ছেড়ে দেবে কি, পকেট থেকে কাগজ বের

করে এগিয়ে দিল, বলল, নোটিশ। ওর উদ্দেশ্য বুঝলাম। কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে বললাম, না—না, এ-সব হয় না। ও বলল, কেন? আমি কেন-টেনোর পথ মাড়ালাম না। কিন্তু ও একেবারে নাছোড়বান্দা। আমার না ও শুনবে না। বিকেল হয়ে গেল, বৃষ্টি নামল ঝিপঝিপ করে, সেই বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি নিয়ে চলল ডায়মণ্ড হারবার। আমায় সারাক্ষণ শুধু বোঝাতে চাইল, আমায় না হলে ওর চলবে না। কী মুশকিলেই পড়লাম! মদের গন্ধ আমার অজানা নয়, মাতলামি আমি বুঝি; কিন্তু লোকটা ক্রমেই জবরদস্তি শুরু করেছে। আমার বিরক্তি লাগছিল। এমন-ভাবে কেউ আমার পথ আটকাতে আসে নি, অথচ ওর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা আমার অন্য অনেকের সঙ্গেই হয়েছিল। ললিতকে আমার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। ওর জবরদস্তি দেখে এবং ভাবসাব বুঝে আমার মনে হল, লোকটা আমায় উপার্জন করতে চায়, করে তার নিজের অ্যাকাউণ্টে আমায় জমা করে ফেলতে চায়। তাতে তার তহবিল যেন মোটা হবে। কিন্তু আমার কি হবে? আমি তো তার গচ্ছিতের মধ্যে গিয়ে পড়ব। ও আমায় আয়ত্ত করবে, অধিকার করবে, সেই অহমিকায় খুশী থাকবে। আর আমি? আমার কি থাকবে?...আমি ওকে হাজারবার না না করলুম, কতবার পাঁচ কথায় বোঝাবার চেষ্টা করলুম। ভবি ভুলল না। শেষে ওর নোংরা চেহারাটা বের করতে লাগল। আমায় ও শাসাতে লাগল। ওর শাসানি আমার খারাপ লাগল। তখন বুঝি নি, গ্রাহ্যও করি নি। আকাশে মেঘ গুড় গুড় করলেই কি ভয়ে কাঁটা হয় মানুষ!...শেষে সন্ধ্যেবেলায় আমায় বাড়ি পৌঁছে দিতে এল। কেন এল তা কি বুঝতে পেরেছিলাম তখন! একটু পরেই ওর আসল উদ্দেশ্যটা বুঝলাম। আমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে শয়তানটা গলা বড় করে বলে গেল, আমার পেটে তার বাচ্চা রয়েছে।"

কথাটা বুঝেও না বোঝার মতন বিহ্বলতায় আমি স্তব্ধ হয়ে থাকলাম।

মোহনা বলল, "বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে কথাটা বলে সে চলে গেল। মা ছিল সামনে, শুনল। মাকে শোনানোর জন্যেই বলা। অথচ কথাটা মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে। বিশ্বাস কর ফুলদা, আমি তোর গা ছুঁয়ে বলছি, ওর একবর্ণও সত্যি নয়। ও আমায় ভীষণভাবে জব্দ করার জন্যে, মার কাছে আমার মুখখানা একেবারে হেঁট করে দেবার জন্যে কথাটা বলেছিল। খেপে গিয়ে, আমার ওপর আক্রোশ নিয়ে। বুঝলাম, ও কেন এত শাসাচ্ছিল। একেবারে শয়তান একটা। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। মা ধোঁকা খেয়ে গেছে, বিশ্বাসও করে ফেলেছে প্রায়। আমি যত বলি না না, মা ততই পাগল হয়ে যেতে লাগল। আমায় কিসের বিশ্বাস! আমার আবার সম্ভ্রম কোথায়! মা, দিদি, ভাইয়ের কাছে আমার মাথা কোনোদিনই উঁচু হয়ে ছিল না। ওরা জানত, আমার সম্ভ্রম বলে কিছু নেই। তবু, যা হয়ে গেল তার ধাক্কাটা ভীষণ। মা অনায়াসেই ধোঁকা খেয়ে আমার কী না করল। সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল সেদিন, রাত্রে আরও সব নোংরা, কদর্য কুচ্ছিত কাণ্ড হল। শেষে মা বলল, 'আমি জানতাম এইরকমই হবে, তোর কপালে ঠিক এইটেই লেখা ছিল, তুই জাতধর্ম রাখবি না, বংশের নাম ডোবাবি, তুই নষ্ট

ছাবি, নষ্ট মেয়েছেলে হয়ে ঘর ছাড়াবি, তারপর মরবি।' এই বলে মা নিজের ঘরের আলমারি থেকে আমার ঠিকুজি-কোষ্ঠিটা বের করে এনে মুখের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।"

কথা বলার কোনো অর্থ হয় না, অপলক হয়ে নীরবে বসে থাকলাম।

ময়না অল্প সময় চুপ করে থাকল, বড় বড় শ্বাস নিল, গলা পরিষ্কার করল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "মানুষের কখন যে কি হয় বলা যায় না। মা আমার ঠিকুজি-করা কাগজটা ফেলে দিয়ে যাবার পর আমি ওটা ছুঁয়েও দেখলাম না। কেন যে মা ওটা বের করতে গেল তাও জানি না। হয়ত মা আগাগোড়া আমায় দেখে দেখে আমার ভবিতব্য বিশ্বাস করে নিয়েছিল। দেখল, সেটা মিলে যাচ্ছে।... আমি প্রথমে ওই হলদে রঙের গোল করে পাকানো কাগজটা ছুঁই নি। ওটা আমার অদেখা নয়, ছেলেবেলা থেকেই দেখছি, বাবা করিয়ে রেখেছিল, বাবার এ-সবে বিশ্বাস ছিল। হিন্দুর বাড়িতে, বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে ওটা আর কজন না তৈরী করিয়ে রাখে। আমরা কখনোসখনো কাগজটা দেখেছি, বুঝি না বুঝি, কত মজা করেছি, ঠাট্টাতামাশা করেছি, আবার এক-এক সময় যেন বিশ্বাসও করেছি।...রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। রাগ, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা, জ্বালা—আমি যেন পুড়ে যাচ্ছিলাম। কি মনে করে সেই হলুদ কাগজটা একবার দেখলাম। তারপর ফেলে দিলাম। ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম, আমার ভবিতব্যের কাগজটা সাপের মতন আমার মাথার পাশে ছোবল দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছে।...পরের দিন আর অফিস গেলাম না, সকাল থেকেই বাড়ি থমথম করছে মা একদিকে, জ্যোতি একদিকে, আমি অন্যদিকে। কেউ কারুর ছায়া মাড়াচ্ছি না। কাল যে বাদলা শুরু হয়েছিল, আজ সেটা ঘন হয়ে এসেছে, পুজোর মুখে, এই এক পশলা জল নামল তোড়ে, তারপর আবার একটু নরম হয়ে গেল, কিন্তু থামল না। বাড়ির মধ্যে দমবন্ধের ভাব, সাড়াশব্দ নেই, যে যার ঘরে বসে নিজেকে একেবারে আড়াল করে রেখেছি। জ্যোতি কখন অফিস চলে গিয়েছিল; আমার স্নান হল না, ইচ্ছে হল না স্নানে, খেতেও রুচি হল না। দুপুরের দিকে কলঘরে যাচ্ছিলাম, মনে হল—নিজের ঘরে বসে মা কাঁদছে। আমার ভাল লাগল না। ঘরে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম। মার মতন বোকা আহাম্মক আর দেখি নি। আমি বলছি, না—না; তবু মার বিশ্বাস হচ্ছে না? মা কি সত্যি সত্যিই ওই হলদে গোল করে পাকানো কাগজটাই বিশ্বাস করবে।... তারপরই আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, সাপের মতনই না কাগজটা আমার মাথার পাশে ছোবল মারার জন্যে বসে ছিল। কি আছে ওতে? কিসের ভয়? কিরকম যে খেলা হল, সেই পাকানো কাগজটা টেনে নিয়ে আবার দেখলাম। এই আমার ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান নাকি? কিম্ভুত ছক, এখানে গোল, ওখানে চৌকোনো, রেখার কাটাকুটি, কুচকুচে কালির অংক, অজস্র কথা লেখা, কি বা তার অর্থ কে জানে! দেখলাম খানিক, কিছু বা বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না। ফেলে দিলাম।...আমার কাছে সবটাই বাজে, বিচ্ছিরী মনে হচ্ছিল।...এইভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে। সন্ধ্যেবেলার বৃষ্টিটা উদাম হয়ে এল। কী জোরে যে জল এল, কি বলব।... সেই বাদলা, ওইরকম ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে, চুপচাপ অসাড় ঘরে বসে থাকতে থাকতে আমার কি যে হল কে জানে, আমি সেই লেড়ো দু' হাতে লম্বা গোল করে গোটানো কাগজটা আলোর মধ্যে মেলে ধরে আবার দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আমার কেমন নেশা হয়ে গেল, আক্রোশ হল, হাসি পেল! এই নাকি আমার কপাল? কবেকার পুরোনো, বিবর্ণ একটা কাগজ, মাথামুণ্ডু নেই, যত হাবিজাবি লেখা—এর আবার সত্যি মিথ্যে কি! শেষে আমার খেলায় ধরল, একটা কাঁচি এনে কাটতে শুরু করলাম। আমার জীবনের গোটা গোড়া—কাঁচি দিয়ে সেটুকু কুচ করে কেটে ফেললাম। তারপর দেখি বালিকা অবস্থাটা, কোন একটা গ্রহ তাকে বছর দশ টেনে নিয়ে গেছে, সেটাও কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললাম। তখন আমি কিশোরী রে, ফুলদা! দেখে দেখে সেটাও কাটলাম। আমি এবার যুবতী হয়ে চলেছি, মাথার ওপর একটা গ্রহ বসে। সেটাও কখন কাঁচি দিয়ে কেটে

উড়িয়ে দিলাম। গুটোনো কাগজটা অনেকখানি ছোট হয়ে গেল। কাটা টুকরোগুলো আমার মুখের সামনে বিছানায় ছিটোনো। একে একে সবটুকু কেটে কাগজের টুকরোগুলো মার মুখের সামনে গিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসব, বলব : এই নাও—উনুনে দিয়ে এস।...তারপরও কাঁচি দিয়ে কাটতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কি যেন একটা লেখা। মানেটানে আমি বুঝলাম না। কিন্তু কোথা থেকে একটা ভয় যেন লাফিয়ে আমার বুকে এসে পড়ল। এ কেমন ভয়, কিসের ভয় তোকে আমি বোঝাতে পারব না। মনে হল, এরপর আর আমার কিছু নেই, আমার জন্যে আর কিছু বাকি থাকল না, সব ফাঁকা শূন্য হয়ে গেল। যেন এরপরই আমার মারক।... কী রকম যে হয়ে গেল, ভয় আমার গলা টিপে ধরল। আমার আর সাধ্য হল না কাঁচি দিয়ে কাগজটা কেটে উড়িয়ে দি। ভয়ে ভয়ে ওটা সরিয়ে রেখে দিলাম।" মোহনা থামল সামান্য, কোলের ওপর কম্বলটা আরও ঘন করে টানল, যেন সেই ভয় এসে ওকে আবার কাঁপাতে শুরু করেছে।

"কাগজটা সরিয়ে রেখে দিলাম অবশ্য—" মোহনা বলল, "কিন্তু ওই চিন্তা আর আমার গেল না। আমায় ওটা পেয়ে বসল, ভর করল ভূতের মতন। রাত যত বাড়ে ততই যেন গ্রাস করে বসছে। আবার সেই কাগজটা ভয়ে ভয়ে বের করে নিয়ে দেখলাম। ইস—কাগজটা কত ছোট হয়ে গেছে! কতটাই না ছেঁটেকেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি। ছাঁটাকাটা, ছোট-হয়ে-আসা কাগজটা দেখতে দেখতে একেবারেই আচমকা অদ্ভুত এক চিন্তা এল। মনে হল, সর্বনাশ, এ আমি কি করেছি! কে যেন আমার মনের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, কি করেছিস দেখ।... ফুলদা, বিশ্বাস কর, আমার গা ছমছম করে উঠল, চক্ষু আমার এমন জিনিস দেখল যা আগে কখনও দেখেনি। মনে হল, জন্মকাল থেকেই কেউ আমার হাতে এই সম্পদ তুলে দিয়েছিল, বলেছিল—'এর কাছ থেকে যা চাইবি পাবি। যা তোর কামনা চাইতে পারিস কিন্তু যত দেবে ততই ওটা ছোট হয়ে আসবে, দিতে দিতে ক্ষয়ে যাবে। কথাটা মনে রেখো।'...ফুলদা, আমার বুক, সমস্ত সত্তা কেঁপে উঠল, ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, গলা দিয়ে আর শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বইছিল না। আগে কখনও আমার মনে হয়নি, আহা রে—সব যে ফুরিয়ে এল, ক্ষয়ে এল। এবার? এবার আমি কি করব? কার কাছে চাইব? আমার সম্পদের আর কতটুকুই বা থাকল?"

মোহনার গলার কাছটায় ফুলে উঠেছিল, ঠোঁট কাঁপছিল, নাকের ডগা মোটা হয়ে গিয়েছিল। ওর চোখের তারার সব জ্যোতি নিবে এসেছিল।

মোহনা ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার থেকে তার সেই আড়াল করে রাখা জিনিসটা তুলে নিয়ে আলোয় ধরল। আমি বুঝতে পারলাম, ওটা মোহনার সেই ছোট করে ফেলা কাগজ। বিবর্ণ রঙ, ময়লা জমে জমে বুঝি খয়েরী মতন হয়েছে।

মোহনা এবার বলল, "এই আমার অবশিষ্ট। কিন্তু এর কাছে বড় করে চাওয়ার আর আমার উপায় নেই, আজ বুঝতে পারি। অথচ আমি এতদিন আমার সম্পদ খোলামকুচির মতন ছড়িয়েছি। কোনো গা করিনি। এখন মনে হচ্ছে, হায় হায়, আমার হাতের ধন এ জীবন, কত কমে এল, এখন আমি কি করি! শোন ফুলদা, আমার যেটুকু আছে সেটুকু আমি বোকার মতন ফুরিয়ে দিতে চাই না। বল তো, আমি কি চাই এখন? এই আমার শেষ চাওয়া, তারপর ও ফুরিয়ে যাবে। বল আমি কি চাইব?"

মোহনার জীবনের প্রার্থনা এখন কি হতে পারে আমি দ্রুত ভাববার চেষ্টা করছিলাম। কিছু মনে পড়ছিল না। বিশ্রী এক ধাঁধার মতন আমার কাছে কয়েকটি প্রার্থনা আলোর লেখার মতন ফুটে উঠছিল, নিবছিল, আবার ফুটে উঠছিল। মোহনা কি প্রেম চাইবে? মোহনা কি সত্যিই কোনো সঙ্গী প্রার্থনা করবে? মোহনা কি সুখ শান্তি কামনা করবে? কি যে চাইতে পারে মোহনা আমি স্থির করতে পারছিলাম না। এই শেষ সময়ে মোহনা আমায় বিপদে ফেলেছে।

আমার কিছু মনে এল না। মোহনার নির্বাক, স্তব্ধ, করুণ অথচ বিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল, জীবনের কোনো গোপন নিভৃত স্থান থেকে মোহনা আচমকা এক প্রার্থনার বোধ পেয়েছে। সে ছোট কিছু চায় না, আপাত কিছু চায় না। তার প্রার্থনা হয়ত এত বেশি যে তার অবশিষ্ট নামমাত্র সম্পদে সে অভাব পূর্ণ হবার নয়।

মোহনা আবার বলল, "বল ফুলদা, এখন আমি কি চাই?"

মাথা নেড়ে নেড়ে বললাম, "জানি না।"

মোহনা আর কিছু বলল না, আমার চোখে চোখ রেখে নিঃস্বের মতন বসে থাকল।

ল্যানোলিন আর
ময়েশ্চারাইজার মেশানো
নতুন তুহিনা বিউটি মিল্ক
আরো ভালোভাবে মুখ ও
গা-হাত-পা ফাটা বন্ধ করে…ও
সারা শরীরে এনে দেয়
স্নিগ্ধ কমনীয়তা !
নতুন তুহিনায় আছে ল্যানোলিন আর ময়েশ্চারাইজার—নরম, সুন্দর চামড়ার জন্য এ দুটি জিনিস না হলে নয়। তুহিনা চামড়ার ভেতরে চলে গিয়ে চামড়ার স্বাস্থ্য ফেরায়, সৌন্দর্য বাড়ায়—মুখ ও গা-হাত-পা ফাটার সমস্যা থেকে রেহাই দেয়। চামড়া কোঁচকানো কিংবা খসখসে হওয়া আরো ভালভাবে বন্ধ করে। সারা শরীরে শিশির-স্নিগ্ধ কমনীয়তা নিয়ে আসে। আপনার মুখে, গলায়, কাঁধে, হাতে, কনুইয়ে, পায়ের পাতায় আর গোড়ালিতে (শরীরের যে যে জায়গা সবচেয়ে বেশী খসখসে হয়) তুহিনা মাখুন। দেখবেন, ল্যানোলিন ও ময়েশ্চারাইজার মেশানো নতুন তুহিনা ত্বকের জৌলুস ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন স্নানের পর আর শোবার আগে নিয়মিত তুহিনা মাখতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, মুখ থেকে পায়ের গোড়ালি—সারা শরীরেরই দরকার তুহিনা।
ক্যালকাটা
কেমিক্যাল-এর তৈরী
tuhina

কলকাতার হালখাতা

বাঙলা বাঁচাও, বাঙালী গর্জে ওঠো

গত কয়েক মাস যাবৎ আমরা লক্ষ করছি শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে, থামে, ল্যাম্প-পোস্টে, জনসাধারণের মূত্রাগারের গায়েও বি এন ভি পি নামক একটি সংস্থা বা রাজনৈতিক দলের স্লোগান—"বাঙালী গর্জে ওঠো", "বাঙালী রুখে দাঁড়াও", "অবিভক্ত বাঙলাই বাঙালীর বাঁচার একমাত্র পথ", "অবাঙালী বাঙলা ছাড়ো", "বাঙালীস্থান জিন্দাবাদ" প্রভৃতি। এইসব স্লোগান সারা শহরেই দৃশ্যমান, এবং সম্প্রতি এই সংস্থার কর্মীদেরও শহরের পথে দেখতে পাচ্ছি, ট্রামে বাসে ঝাঁকা নিয়ে এরা চাঁদা সংগ্রহ করছেন। এঁদের পরনে খাকি ইউনিফর্ম, কাঁধে স্বস্তিকা চিহ্ন, স্বেচ্ছাসেবকরা অধিকাংশই যুবক, খুব স্মার্ট চেহারা, তাঁরা ঝাঁকটি আপনার সামনে একবার ঝাঁকিয়ে ভারী গম্ভীর গলায় বলেন, "ন্যাশনাল ভলাণ্টিয়ার্স"।—বাইরে থেকে মনে হয় এই দল হিটলারপন্থী, নিও-ফ্যাসিজম-এর যে নতুন ঢেউ সারা পৃথিবীতেই আজ এসেছে, তারই বাঙলা দেশের শাখা বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলাণ্টিয়ার্স পার্টি।

আমার এক উদারপন্থী বন্ধু সেদিন বিকেলে ভয়ানক শঙ্কিতভাবে আমাকে জানালেন যে, বি এন ভি পি নামক দল বাচ্চা কেউটে, তাদের বিষয়ে আমাদের সকলের উদাসীন থাকবার কোনো কারণ নেই; বাঙলা দেশে ফ্যাসিস্ট হিটলারপন্থীরা এসে গেছে, এঁরা সগর্বে স্বস্তিক চিহ্ন ধারণ করেন; এ-দেশের অজ্ঞ জনসাধারণ মুখিয়ে আছে কোনো ডিক্টেটরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে, হিটলারাইটরা এই সুযোগে এই বঙ্গদেশে প্রচার চালাচ্ছে, আমাদের তার বিরুদ্ধে জেগে ওঠা দরকার। তাঁর মতে এই ব্যাপার অ্যালার্মিং, কিছু একটা করা দরকার।—আমার বন্ধুটির কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল তাঁর এই ভয় পাওয়া থিয়োরির দিক থেকে ঠিকই আছে; তবে বাস্তব অবস্থায় বি এন ভি পি বাঙালী চরিত্রের একটি মজার দিকই প্রকাশ করছে; অন্যান্য দেশে নিও-ফ্যাসিস্টদের অভ্যুত্থানের পেছনে যে শক্তি বা রিঅ্যাকশনারি ফোর্স কাজ করছে তার সঙ্গে বোধ হয় বি এন ভি পি-র অস্তিত্বের হেতুর কোনো যোগ নেই। ন্যাশনাল ভলাণ্টিয়ার্স (বেংগল ভলাণ্টিয়ার্স নয়) কিছুটা কৌতূহল সৃষ্টি করলেও এমন একটি দল, যা নিয়ে আমাদের ভয় না পাওয়াই উচিত।

ভারতবর্ষ ইতিহাসে কখনোই বেশী দিনের জন্য রাজনৈতিকভাবে একত্র থাকেনি, কোনো এক বিশেষ রাজার নেতৃত্বে কিছু দিনের জন্য একতা এসেছে, ভেঙে গেছে আবার বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে। ইংরেজরা ছিল একটি বাইরের শক্তি, তাদের বুটের তলায় আমরা এক ছিলুম, আমাদের তখন শত্রু ছিল প্রত্যেকেরই এক, আমরা স্বাধীনতা-আন্দোলনে সবাই এক হয়েছিলাম, কিন্তু ইংরেজ চলে যাবার পরে, এবং "জাতীয় নেতাদের" ক্রমশ প্রাদুর্ভাব ঘটলে আমরা অমোঘভাবে ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ভারতবর্ষ সাংস্কৃতিকভাবে একতাবদ্ধ, যেমন ইউরোপ; কিন্তু রাজনৈতিক ঐক্য অন্য জিনিস; যে দেশে চোদ্দটা স্বতন্ত্র ভাষা সে দেশের এক থাকা কঠিন প্রস্তাব। কিন্তু এক থাকার অভিলাষ আমাদের বড় গভীর, তার জন্য ধার-করা সাধারণ ভাষা হিসেবে ইংরেজী রেখে আমরা দেশ চালাচ্ছি, কিন্তু সে বড় অবিশ্বাস্য প্রস্তাব; ইংরেজী আমরা ক্রমশ ভুলে যাবই, জাতি হিসেবে মাথা তুলতে হলে আমাদের তা ভুলতেই হবে, কয়েকজন আই সি এস বা ইন্দো-অ্যাংলিয়ান যাই বলুন না। অন্য দিকে ইংরেজীর তাঁবেদারি ছেড়ে হিন্দীর তাঁবেদারি মেনে নেওয়া যায় না।—বাস্তব অবস্থার প্রাথমিক এইসকল যুক্তিতর্ককে স্বতঃসিদ্ধ মেনে আমরা যদি উন্নতির শর্ত এবং ভবিষ্যৎ নিরূপণ করবার চেষ্টা করি, দেখা যাবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইউরোপের মতন না হয়ে উপায় নেই, সাংস্কৃতিকভাবে সে এক, রাজনৈতিকভাবে সে কয়েকটি বা অনেক স্বাধীন দেশ।—তর্কের এই যুক্তিপূর্ণ ধারা থেকে স্বাভাবিক যে, বাঙলা দেশে আলাদা হবার একটা প্রবণতা আসবে, কিন্তু সেই প্রবণতার ফল যদি নিও-ফ্যাসিজম্ হয়, তা বড়ই দুঃখের।

বি এন ভি পি-র পোস্টার এবং স্লোগান থেকে একটি জিনিস বড় করুণভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তাঁরা চাইছেন বাঙালী গর্জে উঠুক, বাঙালী চাইছেন বাঙালী গর্জে উঠুক, বাঙালী জেগে

উঠুক, বাঙালীর বাঙলা গঠিত হক। কিন্তু তার জন্য প্রথমেই কি অবাঙালীকে বাঙলা দেশ থেকে তাড়াতে হবে? অর্থাৎ মেনে নিতে হবে, বাঙলা দেশে বসে বাঙালী অন্য প্রদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতাতেই দাঁড়াতে পারে না; ব্যবসায়, অধ্যবসায়ে, বুদ্ধিতে, কর্মক্ষমতায়? তারা এতই দুর্বল যে, যত দিন না প্রতিযোগিতার অবসান ঘটছে তত দিন তাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর কোনোই উপায় নেই? নিজেদের এই বিপুল দৈন্য তারা স্বীকার করে নিয়ে এখন প্রস্তাব আনছেন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অবাঙালীর সামনে রুখে দাঁড়াবার। এ এক ধরনের উসকে দেবার প্রাদেশিক সেন্টিমেন্ট, যা আত্মশুদ্ধির বদলে জাগিয়ে তুলবে হিটলারী জাতীয়তাবাদ, অন্যের প্রতি ঘৃণা ও ঈর্ষা। এসব থেকে মনে হবে, আমাদের যেন বাঙলা দেশ বিষয়ে এ মুহূর্তে আর কিছুই করবার নেই অবাঙালী ব্যবসায়ী এবং রেস্তোরাঁওয়ালাদের দেশান্তরী করা ছাড়া। একটি সত্যিই সক্ষম দেশনির্মাণকারী জাতি হিসেবে বাঙালীর দাঁড়াতে হলে প্রাথমিক কর্তব্য এই নয় কিছু খাকি পোশাক তৈরি করা, কিছু হুইসিল আর টর্চ কেনা, ময়দানে লাঠি নিয়ে প্যারেড করা রবিবার রবিবার, এবং ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে উগ্র রূপ ধারণ করা, জাতীয় পোস্টার মারা। খাকি পোশাকে স্মার্ট এই যুবকবৃন্দকে দেখলে আমার বড়ই মায়া হয়। সামরিক বাহিনীর পোশাক খাকি বলে এবং তাদের পায়ে বুট জুতো আছে বলে, কিংবা তারা সকালবেলা প্যারেড করে বলে তারা সন্ত্রাস উদ্রেককারী নয়, তাদের হাতে বন্দুক আছে বলে তাদের আমরা ভয় পাই। অবশ্য বি এন ভি পি বলতে পারেন, সব ক্ষেত্রে এ কথা ঠিক নয়; কারণ, যে-কোনো সাত আট বছরের বালক পুলিসের বন্দুক দেখবার আগেই তার পোশাক দেখে ভয়ে মার কোলে মুখ লুকোয়, সেদিক থেকে অবশ্যই বি এন ভি পি সন্ত্রাস উদ্রেককারী।—এই দলের স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্য কাঁচ কিশোরসুলভ একটা সেন্টিমেন্ট কাজ করছে, যেটা হয়তো খোকাখুকুর পুলিসে ভয়ের পরের ধাপ। আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে এন সি সি-র খাকি পোশাক পরতুম তখন আমাদের বুকে কতই না টানটান মনে হত, নিজেদের কমান্ডার লেফটানেন্ট ভেবে ফেলতে কি রোমাঞ্চই না হত, তখন আমাদের হিরো ছিলেন জেনারেল কারিয়াপ্পা, থিমাইয়া, সুব্রত মুখার্জি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গল্প পড়ে কতই না রোমাঞ্চিত হয়েছি, বীররসে সিঞ্চিত হয়ে প্যারেড থেকে ইউনিফর্ম পরে বাসে করে ফেরার সময় কত কড়া চোখেই না তাকিয়েছি কণ্ডাক্টারের দিকে। সেসব হিরোইজমই কাজ করছে আমি দেখলুম বি এন ভি পি-র তরুণ সুশ্রী স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে—তাদের স্টাইলে ট্রামে ওঠা, খুব ভারী এবং গম্ভীর গলায় টান-টান হয়ে টিন ঝাঁকানোর সময়ে সামরিক ডিসিপ্লিন, রাস্তা দিয়ে লম্বা পা ফেলে যাওয়া, এইসব বাইরের চলনবলনের মধ্যে স্পষ্টতই তাদের বুকের ভেতরের রোমাঞ্চ এবং দিবাস্বপ্ন-বিলাস চোখে পড়ে। এদের দেখে আমার লিবারেল বন্ধু যতই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠুন, আমি কিছুতেই ভীত হতে পারছি না।

পরিশেষে একটি বিষয়ে বি এন ভি পি-র দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁরা বাঙলা বাঁচাও আন্দোলন করছেন খুব ভালো কথা, তাতে দোষ দেখি না, কিন্তু যখন সেই আন্দোলনে চোখে পড়ে "বাঙালীস্থান জিন্দাবাদ" তখন বড়ই অবাক হই—"বাঙালীস্থান" কথাটিও বাঙলা নয়, "জিন্দাবাদ"ও বাঙলা নয়, অথচ বলা হচ্ছে "বাঙলা বাড়াও, হিন্দী হটাও।"

মৌলিনাথ

ব্রেন-ড্রেন

যাঁরা এদেশে গবেষণা করার সুযোগ পান না, তাঁদের অনেকেই ইংলেন্ড চলে যান। আবার বিলিতি খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাবেন, সেখানেও ওই একই ব্যাপার; মেধাবী বৈজ্ঞানিক তার 'জুতো থেকে ইংলনডের ধুলো ঝেড়ে ফেলে' মারকিন মুল্লুকে চলে যায়। সেখানে বেশী মাইনে তো পাবেই, এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেখানে গবেষণা করার জন্য পাবে আশাতীরিক্ত অর্থানুকূল্য। অধুনা গৌরী-সেন মারকিন সিটিজেনশিপ গ্রহণ করে সেখানেই ডলার ঢালেন। ..জরমন কাগজেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই, ও দেশের তরুণ বৈজ্ঞানিকদেরও কিছু কিছু মারকিন-মক্কায় চলে যাচ্ছে।

থাকি মফস্বলে। কলকাতায় পৌঁছলুম লেটে। তবু দেখি, পাড়ার ঝাণ্ডুতম রক খুরানা সায়েবের মারকিন নাগরিকতা গ্রহণ নিয়ে সরগরম, মালুম হল, মতভেদ ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় সুতীক্ষ্ন। রকের খলিফে-বেঞ্চ বলছেন, যে-যেখানে কাজের সুযোগ পাবে, সে সেখানে যাবে—বাঙলা কথা। পক্ষান্তরে তালেবর-বেঞ্চ যুক্তিতর্ক সহ সপ্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, 'খুরানা মহাশয়ের উচিত ছিল দেশে থেকে দেশের সেবা করা। এবং উচিত অনুচিতের কথাই যখন উঠলো, তখন বলতে হবে এদেশের কর্তৃপক্ষই পয়লা নম্বরের আসামী। নিজেরা তো কিছু করবেনই না, যারা করতে চায় তাদেরও কিছু করতে দেবেন না। একেবারে ডগ্ আনড দি ম্যানেজার—

তালেবর পক্ষেরই এক ব্যাক-বেঞ্চার ক্ষীণ কণ্ঠে শুধলো 'প্রবাদটা কি "ডগ্ অ্যানড দি মেইনজার—" নয়?'

'আলবৎ নয়। এখন এ'রা সব ম্যানেজার।'

এর পর কর্তাদের নিয়ে আরম্ভ হল কটুকাটব্য। আমি প্রাচীন যুগের লোক—ডাইনে বাঁয়ে চট করে একবার তাকিয়ে নিলুম। টেগারট সায়েবের প্রেতাত্মা আবার কোথাও পঞ্চভূত ধারণ করেন নি তো!

খলিফে পক্ষের এক চাঁই মাথা দুলোতে দুলোতে বললেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। কাজ করতেও দেবে না। তবে শোনো, আমাদেরই এক প্রতিবাসী রাষ্ট্রের নীতি—যদিও সেটা তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন না—ভিন্ন রাষ্ট্রের কাউকে আপন রাষ্ট্রে চাকরি দেবেন না। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো-এক সাবজেকটে ঝাড়া বিশটি বছর ধরে কেউ মাস্টারস ডিগ্রীতে ফারসট ক্লাশ পায়নি। বুড়ো-হাবড়া অধ্যাপকরা রিটায়ার করতে চান না। ওদিকে পোসট গ্রেজুয়েটে কাউকে লেকচারার তক নেবেন না—যদি ফারসট ক্লাশের 'হরিনাম' তার সর্বাঙ্গে ছাপা না থাকে। এদিকে চন্দনের কাটিটি বিশটি বচ্ছর ধরে তাঁরা ঝুলিতে লুকিয়ে রেখেছেন সযত্নে। শুধোলে অবশ্য বলেন, 'ঘোর কলিকাল, মোশয়, ঘোর কলিকাল। পাষণ্ড, পাষণ্ড, পাষণ্ডের পাল। অধ্যয়নে কি এদের কোনো প্রকারের আসক্তি আছে? পড়েন নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থানের প্রতিবেদন?—স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে, "ছাত্রসমাজে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজে, মদ্যাদি সেবন দ্রুত গতিতে শনৈঃ শনৈঃ বর্ধমান!"—এদের গায়ে কাটবো হরিনামের ছাপ! মাথা খারাপ!'

খলিফে পক্ষের আরেক 'খাজা' বললেন, 'বিলক্ষণ! ভাল্লুকের সর্বাঙ্গে লোম! এম এ'র তেড়ি কাটবে কোথা?'

প্রথম চাঁই সোল্লাসে বললেন, 'বিলকুল! যে দেশের মেসটার পুত্রবৎ ছাত্রকে স্নাতকোত্তর করতে চায় না, সে দেবে তাকে রিসারচ করতে! ঐ আনন্দেই থাকো!'

খলিফের খাজা বললেন, 'যথা, পিতার প্রেতাত্মা দাবড়ে বেড়াবেন বিশ্বময়, কিন্তু পুত্রকে দেবেন না—এস্তেক পিনড-দানন-খানে—পিন্ড দিয়ে অশৌচ সমাপিত করতে!'

তালেবর-বেঞ্চ টিড খেয়ে যাবার খাবি খাচ্ছে দেখে তাদের এক ঝানু তখন 'ফীলিঙের' শরণাপন্ন হলেন।

এস্থলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হয়। দরদ, সহানুভূতি, সমবেদনা, সহবোধ, হৃদয়বেদনা, এ-শব্দগুলো বড্ডই মোলায়েম মরমীয়া। অপিচ 'ফীলিঙ' কথাটার 'ফ' হরফে কট্টর জোর দিয়ে (অবশ্যই ইংরিজী 'f'-এর মত উচ্চারণ না করে) শব্দটা বললে তবেই না গভীর ভাবানুভূতির খানিকটে প্রকাশ পায়।(১)

সেই 'ফ' উচ্চারণ করে ঝানু-তালেবর ভাবাবেগে বললেন, 'pfিলিঙ নেই, pfিলিঙ নেই, এই সব ফলানা ফলানা খুরানাদের

(১) অর্থাৎ 'প্রফুল্ল' শব্দে আমরা যে ভাবে উচ্চারণ করি সেভাবে নয়। মারওয়াড়িরা যেভাবে 'পর-ফু (pf)-ল্ল' উচ্চারণ করেন তারই 'ফ'।

কাদেরই ফাঁলিও নেই দেশের প্রতি। দেশে বসে কি রিসারচ করা যায় না—'

কথা শেষ না হতেই খালিফে পক্ষের আরেক গুণীন মিনমিনিয়ে বললেন, নৌকোতে বসে কি গুণ টানা যায় না!'

ওই পক্ষের আরেক জাহাবাজ বললেন, 'কিংবা মাতৃগর্ভে শুয়ে শুয়ে দেশভ্রমণ!'

★

এই বারে রকের বায়োবৃদ্ধ 'মামা' মুখ খুললেন। ইনি আমাদের রকের প্রেসিডেনট। এঁরই রকে আমরা দু দণ্ড রসালাপ করি। কিন্তু ইনি থাকেন প্রাচীন দিনের একটি সোফাতে শুয়ে শুয়ে ঘরের ভিতরে। অনেকটা কবিগুরুর 'রাজা' নাটকের রাজার মত। অবরে সবরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু' একটি লবজো ছাড়েন।

বললেন, 'সে-রকম নিষ্ঠা থাকলে কি দেশে থেকেই রিসারচ করা যায় না? সেইটেই হচ্ছে মোদ্দা কথা।

বিজ্ঞানের বেলা, অর্থাৎ এপলায়েড সায়েনসের বেলা, আজকাল বিস্তর যন্ত্রপাতি, মালমশলার প্রয়োজন। তার জন্য প্রচুর আয়োজন; প্রচুরতর অর্থ না থাকলে এসব হয় না। অবশ্য, এ-কথাও সত্য জগদীশ বসু, মারকনি এবং আরো মেলা লোক এসব না থাকা সত্ত্বেও এন্তের কেরামতী দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু সেসব দিন হয়তো গেছে। আজকের দিনে স্বয়ং লেওনারদো দা ভিন্‌চিও সরকারী গৌরীসেনের সাহায্য ছাড়া এটম্‌ বম্‌ বানাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু পিওর সাইন্‌স্? পিওর ফিজিক্‌স্, ম্যাথ্‌মিটিকস,—আরো বিস্তর বিষয়বস্তু আছে যার জন্যে কোনোই যন্ত্রপাতি টাকাপয়সার প্রয়োজন হয় না—সে-গুলোর বেলা কি? তা হলে শোন, একটা গল্প বলি, সত্যি মিথ্যে জানিনে, বাবা। একদা কালিফরনিয়ায় এক বিরাট ইন্‌স্টিটিউটে বিরাটতর টেলিস্কোপ লাগানো উপলক্ষে মাদাম আইনস্টাইনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সরলা মাদাম সেই দানবপ্রমাণ যন্ত্রটা দেখে তো একেবারে স্তম্ভিত।

'যেহোভার দোহাই!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মাদাম 'এ যন্তরটা লাগে কোন কাজে?'

বড় কর্তা হাত কচলাতে কচলাতে খুশিতে ফাটোফাটো হয়ে বললেন, মাদাম, এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তার পরিপূর্ণ স্বরূপ (Gestalt) হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এটি অপরিহার্য। এ বাবদে আপনার স্বামী, আমাদের গুরুর অবদানও তো হে', হে'—!'

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে মাদাম বললেন, 'সে কি? আমার কর্তা তো ওয়েস্টপেপার বাসকেট থেকে একটা পুরনো খাম তুলে নিয়ে তার উল্টো পিঠে এসব করে থাকেন!'

তবেই দেখো, হয়ও অনেক কিছুই যন্ত্রপাতি ছাড়াও।

কিন্তু এসব বাদ দাও এবং চিন্তা করো, দর্শন, ন্যায়, ইতিহাস, প্রাচ্যতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অলঙ্কার, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি এন্তের এন্তের সবজেক্‌ট্‌ রয়েছে যার জন্য কোনো ক্ষুদে গৌরী সেনেরও প্রয়োজন হয় না।'

মামা দম নিয়ে বললেন,

'এবারে বাবারা বলো, তোমরা তো অনেক সবজেকটে অনেক পাশ নিয়েছ; গত তিরিশ বছরে এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে কোন্‌ কোন্‌ মহাপ্রভু দর্শন, ইত্যাদি সবজেকটে গবেষণার বিশল্যকরণী-সমেত গন্ধমাদন উত্তোলন করে ভুবন-বিভর্ৎসিত হয়েছেন? বাঙলা দেশের কথা বিশেষ করে বলুন, কারণ একদা এদেশ হিন্দুস্থানের লীডার ছিল।'

মামার চোখে মুখে বাষ্পভরা বেদনা।

এইবারে আমি মুখ খোলার একটু মোকা পেয়ে বললুম, 'তা মামুসায়েব—রিসারচের জন্য কড়ি লাগুক আর নাই লাগুক, যে লোকটা রিসারচ করবে তার পেটে, তার সমাজের আর পাঁচজনের পেটে যদি দু মুঠো অন্ন না থাকে তবে কি রিসারচ হয়? আজ এই কলকাতা শহরে আর সকলের পেটেই অন্ন আছে—নেই শুধু বাঙালীর।'

মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—যেন আপন মনে বিড় বিড় করে—'১৮২০ থেকে ১৯২০। ঐ সময়টায় কলকাতার বাঙালী সচ্ছল ছিল। যা-কিছু করেছে, ঐ সময়েই করেছে। আজকের দিনে দু পাঁচটা প্রফেসরের দু মুঠো অন্ন জোটে, এ-কথা সত্যি। কিন্তু তার আর পাঁচটা ভাই-বেরাদর, মোদ্দা কথা তার গোটা সমাজ (Gestalt) যদি নিরন্ন হয় তবে এই দু পাঁচটা প্রফেসরও কোনো-কিছু দেখাবার মত করে উঠতে পারে না। সী-লেভেল থেকে আচমকা এভারেসট মাথা উঁচু করে খাড়া হয় না; তবে লেভেল, অর্থাৎ তার সমাজ অনেকখানি উঁচু না হলে সে আকাশ চুম্বী হবে কি করে?'

আস্তে আস্তে মামা চোখ খুললেন। কড়া গলায় বললেন, '১৮২০ থেকে ১৯০০ কিংবা ১৯২০ পর্যন্ত কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য—আর ঐটেই তো সমাজের সচ্ছলতা আনে—কাদের হাত থেকে কাদের হাতে গেল সেইটে একটু খুঁজে দেখ তো!'

হেসে বললেন,

'ঐ নিয়ে একটা রিসারচ করো না!'॥

॥ ৬ ॥
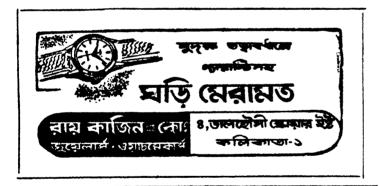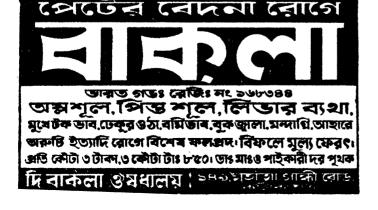
এসপ্লানেডের একটা নিওন-আলোর বিজ্ঞাপন জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে। অরুণ শুনতে পেল ওর হৃৎপিণ্ডও কথা বলছে। ওর মুখ আশায় নিরাশায় জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে।

সমস্ত ঘটনাটা কেমন যেন আকস্মিক মনে হয়। সেদিন যখন কুড়িয়ে পাওয়া একটা রঙিন পাখির সুন্দর নীল পালক রুণুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন অন্য কোন অসম্ভব কল্পনায় খুশী হয়ে উঠতে সাহস পায় নি।

এখন সব কথা বললে টিকলুরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না। কিংবা টিকলু হয়তো রেগে গিয়ে বলবে, শালা বেইমান!

সুজিত বলবে না কিছু, কিন্তু মনে মনে ভাববে, ওর হাতের মোয়া অরুণ ছোঁ মেরে নিয়ে নিয়েছে।

টিকলুকে সুজিতকে সব কথা বলবে কিনা ভাবলো অরুণ। টিকলুকেই ভয়। ও তো একটা রিয়েল ছোটলোক। যাচ্ছেতাই চেঁচামেচি করবে, কলেজসুদ্ধ সকলকে বলে বেড়াবে। ওকে কোন বিশ্বাস নেই। ইউনিয়নের ইলেকশনের সময় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে রীতিমত মারপিট শুরু করে দিয়েছিল। অথচ পলিটিক্সের তুই কি বুঝিস? দলের পাণ্ডারা কেউ একটু ওর কাঁধে হাত দিয়ে তোয়াজ করলেই হলো, অমনি পার্টি পাল্টে ফেলবে!

এমন একটা আনন্দের খবর না বলেও তো শান্তি নেই। অরুণের ইচ্ছে হলো লাফাতে লাফাতে গিয়ে বলে, সুজিত কংগ্রাচুলেট কর, মেরে দিয়েছি।

কিন্তু সুজিতের সঙ্গে দেখা হতেই ওসব কিছুই বললো না, শুধু সুখ-সুখ একটা হাসি ওর সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে বললে, রুণুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলে হাসলো অরুণ।

কোথায়, কখন, কিভাবে—অনেকগুলো প্রশ্ন দেখা দিল সুজিতের চোখে।

—চল, চল, ঊর্মিকে বলতে হবে। সুজিত টেনে নিয়ে গেল।

—অনেকক্ষণ আমরা একা একা গল্প করলাম। অরুণ খুশীটা যেন চাপতে পারছে না এমন গলায় বললে।

সুজিত সশব্দে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলো অরুণের পিঠে।—সাবাস। ঊর্মির কাছে এবার আমাদের প্রেস্টিজ বেড়ে গেল। ও তো ভাবে আমরা জোটাতে পারি না।

কফি হাউসে এসে দেখলে ঊর্মির সঙ্গে সেই শুকনো কালো মেয়েটা—সোমা চ্যাটার্জি, হিস্ট্রির। আর টিকলু। সোমাকে ডেকে আনলেই সুজিতের সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে যায়। এক টেবিলে বসতে ইচ্ছে হয় না। 'নিজে প্রমিনেন্ট হওয়ার জন্যে একটা দিন মাইরি ঊর্মি একটা সুন্দর চেহারার কাউকে আনলো না।'

সুজিত চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বসেই বললে, টিকলু, তুই ফর নাথিং স্বপ্ন দেখছিস, এদিকে অরুণ লটকে নিয়েছে রুণুকে।

অরুণ কোন কথা বললো না, ওর মুখের হাসিটাও মিলিয়ে গেল। দু' চোখ বন্ধ করতে ইচ্ছে হলো অস্বস্তিতে। 'লটকে নিয়েছে!' যেন এর চেয়ে ভাল কোন কথা নেই।

অরুণের হঠাৎ মনে হলো, রুণুকে এরা অপবিত্র করে দিলো। অথচ মনে মনে ও রুণুকে একটা বিশুদ্ধতা দিতে চাইছিল।

ঊর্মি বাঁ হাতে ধরা স্যান্ডুইচে সবে একটা কামড় বসিয়েছিল, না চিবিয়েই [illegible] করে খানিকটা জলের সঙ্গে সেটা গিলে ফেলে বললো, রুণু কে?

—আউটসাইডার।

—দেখতে কেমন?

সুজিত পাখির ডানার মত করে বাঁ চোখের ভুরু কাঁপালো। বললে, টপ।

ঊর্মি মুখ কাচুমাচু করে বললে, ইস্, অরুণ, আমার চেয়েও?

সুজিত বললে, তোর আজ ডিভ্যালুয়েশন হয়ে গেছে।

অরুণ একটু মুচকি হাসলো।—কি যে করিস না তোরা। আলাপ হয়েছে, ব্যস। সে তো সুজিত টিকলুর সঙ্গেও হয়েছে।

আসলে অরুণের একটু ভয় ভয় করছিল। এই হইচই, এই আলোচনা যদি বিরামের কানে যায়, যদি রুণুকে বিরাম ক্ষ্যাপাতে শুরু করে, কিংবা বলে, অরুণ তোমাকে নিয়ে সকলের সামনে চ্যাংড়ামি করেছে, তা হলে হয়তো...

টিকলু এতক্ষণ একটাও কথা বলে নি, অন্য দিকে তাকিয়েছিল।

ঊর্মি হঠাৎ হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে টিকলুর চিবুক ছুঁলো।—আহা, দ্যাখ দ্যাখ জিৎ, বেচারী একেবারে মনমরা হয়ে গেছে।

টিকলু হেসে ফেললো।—ও ব্যাটা রুণুকে জাহাজ দেখাবে, আর আমি বুঝি ফুর্তিতে টুইস্ট নাচবো?

—এই অসভ্য! ঊর্মি চোখের ইশারায় সোমার দিকে দেখালো। অর্থাৎ ওর সামনে এসব কথায় ওর আপত্তি।

টিকলু হেসে উঠলো।—তোরা মেয়েরা সব জিনিসে এত অসভ্যতা খুঁজে পাস। জাহাজ দেখানো খারাপ কিছু?

—নয়? ঊর্মি হেসে উঠলো।—কি মানে কি?

সুজিত হেসে বললে, তোর ঐ কলেজ পালিয়ে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়তে যাওয়া।

ঊর্মি এমনভাবে হেসে উঠলো যেন কেউ ওকে কাতুকুতু দিয়েছে। হাসতে হাসতে বললে, বাপ্‌স্‌, ও বেচারার ওপরও জেলাসি? হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, আমি যেখানেই যাই আমি পবিত্র, আমি বিশুদ্ধ।

সোমা কালো আর শুকনো মুখ নিয়ে ফিকফিক করে হাসছিল চোখ নামিয়ে। ওর আঙুলের প্রবালের আংটিটাই যেন বলে দিচ্ছিল ও প্রাণ খুলে হাসতে পারে না।

আমি পবিত্র, আমি বিশুদ্ধ।

সোমা ঊর্মির কথা শুনে এতক্ষণে আস্তে আস্তে বললে, ভেজাল প্রমাণে এক হাজার এক টাকা পুরস্কার, তাই না?

টিকলু সুযোগ খুঁজছিল। বললে, সে তো এস কে এম ছাড়া আর কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না।

ঊর্মি হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেই।

ঊর্মি হাসতে হাসতে বললে, আফটার অল একজন প্রফেসর। তার যদি একটু স্নেহটেহ, একটু বাৎসল্য...

সুজিত বললে, ঠিকই তো, একজিবিশনে যদি ঘাড়ে হাত রেখে একটু ছবি বোঝায়...

চাপা স্বভাব সরিয়ে সোমাও হেসে উঠলো।—বাৎসল্যই তো। ঝুপঝুপ বৃষ্টি, ছুটি চাইলাম সকলে, 'কি ঊর্মিলা, ক্লাস করবে, না ছুটি দিয়ে দেবো?' যেন ঊর্মিই ক্লাস।

ঊর্মি হেসে ফেলেই অসহায়ের মত ভান করলো।—অরুণ, তুই একটু ডিফেন্ড কর আমাকে।

—অ্যাঁ? অরুণ একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। চমকে উঠলো।—কি বলছিলি? শুনি নি আমি।

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো ওকে অপ্রতিভ হতে দেখে।

সুজিত শুধু বললে, তোর বারোটা বেজে গেছে।

টিকলু বললে, অরুণটা ন্যাকি। ওর এখন আর সময় কাটানোর প্রবলেম নেই।

অরুণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলে ভীষণ লজ্জা পেল। লজ্জা কাটানোর জন্যে বললে, যাঃ, অন্য কথা ভাবছিলাম।

—উড়ছিলি বল্, ফুরুর ফুরুর করে উড়ছিলি। সুজিত আবার ঠাট্টা করলে।

কুড়িয়ে পাওয়া সেই নীল পালকের মত সেই নীল পালকের পাখির মত অরুণ এতক্ষণ সত্যিই মেঘে বাতাসে অল্প রোদ্দুরের আকাশে ফুরুর ফুরুর করে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

সবুজ ঘাস, গাছগাছালি, পুকুর, ঘুঘুর ডাক ইত্যাদি অনেক কিছু মেখে মোলায়েম হওয়া এক ধরনের শান্ত শ্রী আছে রুণুর মুখেচোখে, শরীরে। কিংবা অরুণই তা আবিষ্কার করেছে।

রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। রুণু মৃদু হেসে থেমে পড়লো, বললে, কলেজ থেকে। লাইব্রেরীয়ানশিপ পড়ছি।

—চলুন চলুন, কোথাও একটু বসা যাক্। যেন একটা সুযোগ এক্ষুনি হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে এমনি তটস্থভাবে ও বললে।

আজকেই ধোপদুরস্ত শার্ট প্যান্ট ভাঙবে ভেবেছিল। বড় বোকামি হয়ে গেছে। নিজের ক্রীজ নষ্ট হওয়া পোশাকের দিকে তাকিয়ে অরুণ ভাবলো।

রুণু হাতের ঘড়ি দেখলো।—পনেরো মিনিট, কেমন? হাসলো ও, বললে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

অরুণ একটু আহত বোধ করলো। মনে হলো রুণু যেন ওকে উপেক্ষা করতে গিয়ে নেহাত নির্দয় হতে পারছে না।

একবার ইচ্ছে হলো বলে ওঠে, তা হলে থাক।

পারলো না। সেই প্রথম দেখা হওয়ার পর মাঝে মাঝেই ওর রুণুর কথা মনে পড়েছে। এক একবার বিরামের ওপর রাগ হয়েছে। কে জানে, ওই আড়াল করে রাখছে কিনা।

এমন কি বিরামকে সন্দেহও হয়েছে ওর। কে জানে বিরাম তলায় তলায় রুণুর সঙ্গেও খেলছে কিনা।

—বাইরেই বসি। রেস্টুরেন্টের খোলা-মেলা জায়গাটায় খানকয়েক চেয়ার টেবিল। সেখানেই বসলো রুণু। কেবিন দেখিয়ে বললে, ওখানে দম বন্ধ হয়ে যায়।

অরুণের মনে হলো রুণু যেন ওকে [illegible] অপমান করতে চাইছে। ওকে বিশ্বাস করছে না। রুণুর চোখে অরুণের যেন [illegible] টিকলু।

কিন্তু তারপর গল্প করতে করতে, গল্প করতে করতে, গল্প করতে করতে ওরা [illegible]দের মন—কখন কাছে এসে গেল। অরুণ বুঝতে পারছিল [illegible] অনেক আগেই পার হয়ে [illegible] সে কথা রুণুর মনে পড়ে [illegible] ওর ভয় হচ্ছিল।

রুণু [illegible] নিজের কথাই বলছিল—[illegible] কি করে আসতো [illegible] একটু দেরী হলে মাসীমা [illegible] বাসে [illegible] না...

[illegible] সময় [illegible] রুণু [illegible] ছিল। বাবা [illegible] থেকে সংসার চালায়। [illegible] কলেজে পড়াই পছন্দ করে না [illegible] চাকরি করেন, [illegible] এসে [illegible]। আমি একটা চাকরি পেলে সংসারের [illegible]।

রুণুকে খুব সহজ আর সরল মনে হচ্ছিল।

—[illegible] হেসেছিলাম বলে সেদিন আমাকে খুব খারাপ ভেবেছেন, তাই না?

রুণু একটু লাজুক হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো।

অরুণ বললে, [illegible] সুজিত আপনার হাত ছুঁয়েছিল বলে।

—হিংসুটে।

অরুণ হেসে উঠলো।—আপনি অন্যের কথায় হাসলে আমার হিংসে হয়, সে কি আমার দোষ।

রুণু এবার আর হাসলো না।—আপনার দেয়া পালকটা আমি সকলকে দেখিয়েছি। খুব সুন্দর।

সকলকে দেখিয়েছি, সকলকে দেখিয়েছি। সকলকে দেখানোর জন্যে তো অরুণ কিছু দিতে যায় নি, কিছু বলতে যায় নি। ও অনেক খুশী হতো যদি রুণু বলতো, ওটা আমি কাউকে দেখাই নি।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবার অরুণের সঙ্গে রুণুর শরীরের ঈষৎ ছোঁয়া লাগলো। অরুণের ভাবতে ভাল লাগলো, প্রতিবারই ছোঁয়াটুকু অনিচ্ছাকৃত বা আকস্মিক নয়। ভাবতে ভাল লাগলো রুণুর একটুখানি প্রশ্রয় আছে।

অরুণের আবার মনে হলো, আমি এখনই কিছু বলে ফেলি, এখনই কিছু বলে ফেলি। আমাদের সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই, কোন পারম্পর্য নেই। চোখের সামনে কিছু পড়ে থাকলে তখনি তখনি কুড়িয়ে নিতে হবে। তা না হলে এই তাড়াহুড়োর মধ্যে, এই ভিড়ের মধ্যে সব হারিয়ে যাবে।

ছাড়াছাড়ির আগে অরুণ বললে, কেন জানি না, আপনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে বেশ ভাল লাগে। এতক্ষণ বসেছিলাম একসঙ্গে, ভীষণ ভাল লাগলো।

রুণু একটু লাজুক হয়ে চোখ নামালো।

অরুণ বুঝতে পারলো না ওর এই পাগলের উচ্ছ্বাস শুনে রুণু ভিতরে ভিতরে রেগে গেছে কিনা। নাকি মুখ নীচু করে হাসি চাপছে।

ও তাই তাড়াতাড়ি বললে, ওর গলাটা হয়তো অভিমানে ভারী হয়ে গিয়েছিল, বললে, আপত্তি থাকলে অবশ্য... ...

রুণু কোন কথা বললে না, রুণু অরুণের মুখের দিকে ফিরে তাকালো না, শুধু অস্ফুটে বললে, কাল। এ সময়েই।

বলে বাসের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বাস আর কিছু না। 'কাল, এ সময়েই।'

গলি থেকে দেখা আকাশী রঙের ফিতেটা বিরাট একটা আকাশ হয়ে গেল। সুজিত বলেছিল, আমাদের কোথাও কোন রঙ নেই। সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। অরুণ রঙের মধ্যে ডুবে গেল। মহানিমের গাছটা সুন্দর হয়ে উঠলো, চোখ ঠাণ্ডা করার মত আরো সবুজ, আরো সবুজ। ট্রামের আওয়াজটা বেশ মিষ্টি লাগলো। দূরে কোথায় দু' দুটো দমকল ছুটে গেল ঘণ্টি বাজিয়ে। শব্দটা যেন ওর শরীরের মধ্যের উত্তেজনার প্রতিধ্বনি হয়ে উঠলো। ও নিজেও যেন একটা দমকল হয়ে গেছে, ছুটছে ছুটছে।

অথচ সুজিত আর টিকলু কিছু বুঝতে পারছে না। ওরা ভাবছে, প্রেম একটা ঠাট্টার জিনিস।

আশ্চর্য, অরুণ নিজেও কিছু বোঝাতে পারছে না। বলতে ইচ্ছেও হচ্ছে না। সহজ আর সুন্দর কথাগুলো বলতে ইচ্ছে হয় না। গোপন করতে ইচ্ছে করে। কিংবা সব কথা হয়তো বলা যায় না।

৭

সেই সময়ে রুণুর সঙ্গে যদি দেখতো ছোটমেসো? অরুণ কেয়ারই করতো না। ও তখন একদম বেপরোয়া। বাড়ির লোকে দেখে দেখবে, কি আছে তাতে।

আসলে রুণুর ভয় ভাঙতে গিয়েই ও নিজে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

—আরে পাগল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বললাম, কি বড়জোর চায়ের দোকানে বসলাম, কেউ দেখলে তবু অজুহাত দেয়া যায়। রুণু ওর পাগলামি দেখে হেসেছিল। —পার্কেটার্কে ওসব দিকে দেখলে কি বলবো শুনি?

ভয় না দুষ্টুমি, অরুণ বুঝতে পারতো না।

অথচ মজা দ্যাখো, রুণুর সঙ্গে তো সিনেমা দেখেছে, কিন্তু কারো চোখে পড়ে নি। চোখ পড়লো কিনা উর্মির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে।

—বেঁচে আছি না বেঁচে আছি, জুতোর মধ্যে বালি ঢুকলে মাইরি হাঁটতে ভাল লাগে? টিকলু একদিন রূপের সঙ্গে ঝগড়া করে এসে মুখ তেতো করে বলেছিল।

মিথ্যে বলে নি। কিচকিচ কিচকিচ করে লাগছে চামড়ায়, পা ফেলতে গেলেই। সমস্ত বাড়িটার চোখে ও যেন এখন অপরাধী হয়ে গেছে। একটা ক্রিমিনাল। বাবা যদি ধমক দিতো, মা চেঁচামেচি করতো, তা হলে বরং

শান্তি ছিল। দুটো কথা বলতে পারতো। তা নয়, সব চুপচাপ। যেন কিছুই হয়নি, ছোট মাসী এসে কিছুই শুনিয়ে যায় নি।

আর ঐ দিদিটা। চার বছরের বড়, অথচ ভাব দেখায় ও যেন মা'র সমবয়সী। সব সময় লম্বা লম্বা উপদেশ।

—মা কত দুঃখ করছিল। জ্বর হচ্ছে আবার, মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ছে, তুই একটু খোঁজখবর নিতে তো পারিস।

অরুণেরও ইচ্ছে হয়েছিল জিগ্যেস করে মাকে। পাছে মা ভাবে ছোটমেসোর কাছে ধরা পড়েছে বলে ও ফ্ল্যাটারি করতে এসেছে, তাই জিগ্যেস করতে পারে নি। কিন্তু দিদির কাছে কথাটা শুনে ক্ষেপে গেল।—যা যা তোকে আর অ্যাডভাইস দিতে হবে না।

ওর যে জলতরঙ্গ নাম দিয়েছে, একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। দিনরাত শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। দিব্যি খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে আর ফুলছে। ঘুমোনোর সময় আবার মস্তর ঘাং করে নাক ডাকায়। চেহারায় কথাবার্তায় কোথাও একটু শ্রীছাঁদ নেই। [illegible] বউ যেন [illegible] কিনতে এসেছে। রাঁচির অক্ষয়দা আবার ওকে নাকি দেখতে এসে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। ভাবলে হাসি পায় অরুণের, অক্ষয়দা ওর মধ্যে কি যে দেখেছিল ঈশ্বর জানেন। কিংবা টাকাটাই দেখেছিল হয়তো, নেহাৎ কম খসায় নি তো বিয়েতে। কন্যাদায় কিন্তু রয়েই গেছে। অক্ষয়দার বদলির চাকরি, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বাসা-টাসা ঠিক করার আগে দু'চার মাস ঠেলে দেবে এখানে। বসার ঘরখানা তখন দিদির এক্তিয়ারে, একটা বন্ধুবান্ধব এলে বসতে বলার উপায় নেই এমন নোংরা করে রাখবে। অবশ্য তার জন্যে বাবাও দায়ী। নিজে তখন মফঃস্বলে থাকে, কম মাইনে, কলেজ ছিল না, মেয়েকে দূরে পাঠানোয় আপত্তি ছিল। ছোটবেলাতেই ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে বাবা।

আর ঐ এক চীজ তৈরি হচ্ছে—মিলু। আদরে আদরে মাথাটি খেয়ে বসে আছে সব। আরে উর্মি'কে যা মানায় তোকেও তাই মানাবে নাকি। তুই একটা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আঠারো বছর বয়েস, স্লীভ-লেস ব্লাউজ পরছে, পেটের কাছে এক বিঘৎ বে-আব্রু। সুজিত কিংবা টিকলু এলে ওর নিজেরই লজ্জা করে। ওরা কি বলাবলি করে কে জানে। তবে মিলু দিদির মত যে হয়নি সেও ভাল।

মিলু অবশ্য বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে শিখেছে। মনটাও বেশ খোলামেলা। সব কথা অরুণকে বলে। ফাজিল তো কম নয়।

একদিন ওর কলেজের বন্ধু ক'টা মেয়ে এসেছিল। টানতে টানতে অরুণকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলো। —আমার দাদা। দাদা কিন্তু, জানিস টুলু, আমার বন্ধু। ওকে আমি স—ব বলি। বলেই মিলু হেসে উঠলো।

—সেই কথা বলেছিস? চোখের ইশারায় টুলু মেয়েটা কি যেন বললো।

আর মিলু হেসে গড়িয়ে পড়লো। —এই দাদা, বলা হয় নি তোকে। আমরা না খুব একটা মজা করেছি সেদিন।

ওদের কান্ড দেখে অরুণও হেসে ফেলেছিল। —কি করেছিস?

—দুপুর বেলায় ওদের বাড়ি গিয়ে, কি করি কি করি, টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে না...হেসে গড়িয়ে পড়লো মিলু।

—হেসেই অস্থির। টুলুও হেসে ফেললো, তারপর। —আমি বলছি, আমি বলছি। এক একটা নাম দেখে না আমরা ফোন করি, নাম নম্বর তো সত্যি সত্যি জানাই না, গল্প করি তাদের সঙ্গে। আর নাম ঠিকানা জানার জন্যে, দেখা করার জন্যে সে যে কি আকুল হয়ে পড়ে বুড়ো বুড়ো লোকগুলো......

বোঝো ব্যাপার। তখন ওর বন্ধুদের সামনে না হেসেও পারে নি ও। কিন্তু মিলুর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে ভিতরে ভিতরে। ওর এ সবের মধ্যে থাকার কি দরকার। যত সব নোংরা কান্ডকারখানা, যদি কেউ কোনদিন জানতে পারে!

তবু কড়া করে কিছু বলতেও পারে নি। বাড়িসুদ্ধ সবাই তো অরুণের বিরুদ্ধে। ওকে কেউ বুঝতে চায় না, বুঝতে চেষ্টা করে না। শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। মিলুটাই ওকে একটু একটু বোঝে, ওর জন্যে একটু মায়ামমতা একমাত্র মিলুরই তো আছে। ওকে চটিয়ে রাখলে তো জানতেই পারতো না ছোট মাসী এসেছিল, কি সব বলে গেছে ওর সম্পর্কে।

কি বলে গেছে তা বুঝতেই পারছে, কিন্তু তারপর মা-বাবা কিছু আর এ ক'দিনে বলাবলি করেছে কিনা কে জানে।

মিলুকে জিগ্যেস করার জন্যেই ওর পড়ার ঘরে ঢুকেছিল অরুণ। কিন্তু ওর পায়ের শব্দ পেয়েই মিলু ঝট্ করে কি লুকিয়ে ফেললো। কিছু লিখছিল বোধ হয়। প্রেমপত্রটত্র নয় তো।

কাগজটা লুকিয়ে ফেলেই মিলু উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে মুখ ঘোরালো। —এই দাদা। একটু চাপা গলায় বললে, তোর গিলোটিন হয়ে গেছে।

—মানে? ভয়ে আতকে উঠলো অরুণ।

—হেভী দায়িত্ব পড়েছে তোর কাঁধে।

এ বাড়িতে দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার জন্যেই অরুণ জন্মেছে। অধিকার নেই এতটুকু, শুধু দায়িত্ব। বাবা মা'র মন জুগিয়ে চলো, তাদের হুকুম মেনে চলো। নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে স্পষ্ট করে বলতে পাবে না।

আমরা কি বড় হইনি নাকি। যেন কিছুই বুঝি না, সব সময় ওদের ভয়, একটা কলুস্ মেয়ের প্রেমে পড়ে যাবো। বুণুর মত একটা মেয়ে এ বাড়িতে এলে বর্তে যাবে। ধোঁয়ায় আর ঝুলে কালো হওয়া দেওয়ালগুলো তখন দেখবে হোয়াইটওয়াস মনে হবে। আরে দূর, হোয়াইটওয়াস আর হবে নাকি! ইলেকট্রিক ওয়্যারিং সব মান্ধাতা আমলের, অনেককাল বদলানো হয়নি, একটু কিছু হলেই ফিউজ হয়ে যায়। কোথায় শর্ট আছে, ফিউজের তার বদলেও লাভ হয় না। ছোটো শালা ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী যোগাড় করতে।

—মিস্ত্রীটিস্ত্রী হলেও কাজ হতো রে। সুজিতকে বলেছিল একদিন।—পাঁচবার ডাকলে তবে আসবে, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার ঘুরিয়ে দিয়েই ঝটাং করে দুটো টাকা দাও।

—আর কি রোয়াব। টিকলুর রাগ যে আরো বেশী।—তুই বুণুকে নিয়ে এক টাকা পঞ্চাশেই ফ্ল্যাট, ওরা তিন টাকার টিকিট ঝপ্ করে কেটে নেবে।

সুজিত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, যা বলেছিস। আমরা হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে মরছি।

চাকরির কথা ছাড়া সুজিতটা আর কিছু যেন বলতে জানে না। শুনলেই অরুণের নিজেকে কেমন অসহায় অসহায় লাগে। মা একদিন বলেছিল, নবনীবাবুর ছেলেটা রত্ন। যেমন ভদ্র, তেমনি ভাল,

চাকরিও করছে, সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনে। মা হয়তো এমনিই বলেছিল, কিন্তু শুনে অরুণের ইচ্ছে হয়েছিল হামানদিস্তে দিয়ে নিজেকে থেঁতলে দেয়। সব ব্যাটাই রত্ন, মা যাকে যেখানে দেখে, সবাই ভাল, শুধু অরুণ একাই যেন খারাপ। ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে নিজের ওপর ঘেন্না হয়ে গেছে। হয়তো মা'র ওপরও।

সুজিতের কথা শুনে সেই রাগটা উপচে পড়লো। কেন, বিনা মাইনের চাকরি তো লেগেই আছে, বাড়ির ওয়্যারিং বদলাবো না—মিস্ত্রীর তোয়াজ করো. প্রিমিয়াম দেবো দেরীতে. লিফটম্যান থেকে কাউন্টার অবধি স্মাইল দাও।

ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এর জন্যে যত না রাগ. মিস্ত্রীদের তোয়াজ করতে হয় বলে অরুণের রাগ আরো বেশী। পার্টিগুলো আবার ওদেরই মাথায় তুলে নাচে। নাচুক, ন' মাসেই তো তোমাদের মেগার টেস্ট হয়ে গেল বাবা।

—ঠিক বলেছিস। টিকলু হেসেছিল। —মেগার টেস্টে সব ধরা পড়ে গেছে, লাইন বিলকুল শর্টসার্কিট।

সুজিত আপত্তি করলো।—শুলে চড়িয়ে জল্পিত দেবার জন্যে ডেকেছিলাম, তার আবার জাত জেনে কি হবে।

চুলোয় যাক্ পলিটিক্স, ওসব নিয়ে অরুণের মাথাব্যথা নেই। আসলে ঝুটঝামেলা ওর ভাল লাগে না। বাবাকে কতবার বলেছে, ওয়্যারিং বদলে নিতে। তা নয়, বাবার সেই এক কথা।—ভাড়াটে বাড়ি. আজ আছি কাল নেই, কি হবে ওসব করে।

বাড়ি—বাড়ি. তার আবার ভাড়াটে না পৈতৃক। দেখতাম যদি জমিটমি কিনে একটা কিছু ব্যবস্থা করছো, বুঝতাম। থাকবো তো আমরাই, একটু নিশ্চিন্তে ভালভাবে থাকলে দোষ কি। মাও তেমনি। ক'টা পর্দা কেনার কথা বলেছিল অরুণ, বললে কিনা, এ বাড়িতে অত সাহেবিয়ানা করে কি হবে। বাল্বগুলো কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো লাগতো, ক'ট শেড্ কেনার কথা হল, 'পরের বাড়িতে ওসব করে কি লাভ!'

সমস্ত গা রী রী করে ওঠে রাগে।

অসহায় ক্রোধে কান্না পেয়েছিল অরুণের।—জানিস মিলু, ওরা বাঁচতে জানে না। আরে এখনই যদি ভালভাবে না বাঁচলাম, বুড়ো হয়ে একটা বাড়ি সাজিয়ে জানালা দরজার ধুলো ঝেড়ে কি লাভ বল।

মিলু ওর কথায় সায় দিয়েছিল।—রিয়েলি। ওরা তো শুধু প্যাণ্ডোরাজ বক্স খুলেছে। কি পাবে শেষ অবধি? হোপ। তার চেয়ে এখনই যদি একটু একটু কিছু পাই. মন্দ কি।

অরুণের তাই মনে হয়। একটু একটু যদি পাই। টুকরো টুকরো করে যদি পাই। যেটুকু পেলাম সেটুকুই তো তৃপ্তি। রুণুকে তো ও একটু একটু পাচ্ছে, এখনই পাচ্ছে।

কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু অতৃপ্ত থেকে যায়।

রুণুর কথাগুলো মনে পড়ে গেল মিলুর কাছ থেকে দায়িত্বের আভাস পেয়েই।

রুণুর ঐ এক অদ্ভুত স্বভাব। দেখা করতে আসবে, কিন্তু এসে দুদণ্ড কোথায় নিরিবিলিতে বসে গল্প করবে, তা না, কেবলই হাতের ঘড়িতে সময় দেখবে। ও যেন অরুণের কাছে আসে, চলে যাবার জন্যেই।

—ঘড়িটাই দেখছি আমার রাইভ্যাল। অরুণ হেসে বলেছিল, আমার দিকে একবারও তাকাও না, ওর মুখের দিকে মিনিটে মিনিটে।

রুণু হেসে ফেলেছিল।—ঈস্, কি রাগ রে। আমার বুঝি বাড়িঘর নেই, ফিরতে হবে না?

অরুণ কি আর করবে, একটু অভিমান দেখিয়েছিল। আর রুণু চোখের পাতায় কি এক সহানুভূতির স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়ে বলেছিল, এই শোনো! পরশুদিন আমি অনেকক্ষণ থাকবো, দেখো, অনেকক্ষণ থাকবো।

সেই পরশুদিনের উজ্জ্বল সন্ধ্যাটাকে মা এভাবে পুরোনো ছেঁড়া পর্দাকে বিদেয় করার মত এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দেবে অরুণ ভাবতেও পারে নি।

মিলুর কাছে সব খবর শুনে ভিতরে ভিতরে ও রাগে গরগর করছিল। ঠিক যে মুহূর্তে ওর জীবনের একটা দিন স্মরণীয় হয়ে উঠতে চাইছিল, সে সময়েই কি বাধা না পড়লে চলতো না। দিদিটা একটা ন্যুইসেন্স, একটা ন্যুইসেন্স। যেন পাঁচ-দিন পরে গেলে চলবে না।

'হেভী দায়িত্ব' কথাটায় রাগের মধ্যেও হেসে ফেললো অরুণ। কুলক্ষ্মীকে কাঁধে নিয়ে যেতে হবে, হেভীই তো।

নিজের ঘরে ঢুকে ও সবে প্যান্ট ছেড়ে পাজামায় পা গলিয়েছে, মা এসে হাসি হাসি মুখে দাঁড়ালো। মার হাসি দেখে কিন্তু সারা শরীর জ্বলে উঠলো অরুণের।

সেদিকে না তাকিয়েও অরুণ লক্ষ্য করলো মা কপাল টিপছে বাঁ হাতে দিয়ে। অন্য সময় ও হয়তো বলতো, তোমার মাথার যন্ত্রণাটা আবার বেড়েছে নাকি? চলো তা হলে একদিন পি জি-তে—

কিন্তু না, সেরকম কিছু বলতে ইচ্ছে হল না।

মা একটু অপেক্ষা করেই বললে, তোকে তো পরশু পাটনা যেতে হচ্ছে।

—কেন? সব জেনেও অরুণ প্রায় ক্ষ্যাপা কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠলো।

মা বললে, অক্ষয় ছুটি পায় নি, লিখেছে তোর সঙ্গে বুলুকে পাঠিয়ে দিতে। ও না গেলে......

—আমি পারবো না।

—সে কি রে। তুই ওকে না নিয়ে গেলে ও যাবে কার সঙ্গে? মা'র গলার স্বরে যেন অনুনয় ঢলে পড়লো।

অরুণ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, আমি পারবো না, পারবো না, পারবো না। আমার কোথাও যাওয়া চলবে না।

মা থমকে চুপ করে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। অবাক হয়ে তাকালো অরুণের মুখের দিকে। তারপর একটু একটু করে তিক্ত বিরক্ত একটা ভাব ফুটে উঠলো মুখে।

অরুণ যতখানি চেঁচিয়ে বলেছিল কথাগুলো তার চেয়েও জোরে চিৎকার করে উঠলো মা।—আমি জানতাম, তোর দ্বারা কিছু হবে না। তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস, একেবারে গোল্লায় গেছিস।

অরুণের কান্না পেল। ঊর্মির সঙ্গে একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছে বলে ও একেবারে গোল্লায় গেছে! স্পষ্ট করে তা বললেও তো পারতো মা. ও ত. হলে জবাব দিতে পারতো একটা।

ডানইডান শহর, নিউজিল্যাণ্ড
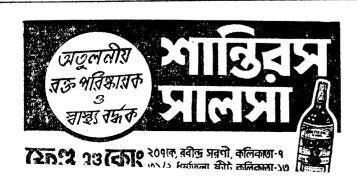
এবারের চিঠিও এখানকার আবহাওয়ার সংবাদ দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত আবহাওয়ার দেশ। এদের বসন্তকাল (এখানকার লোকে বলে) সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে নভেম্বর পর্যন্ত চলে। এখন সেই বসন্তকাল। অথচ ঠান্ডার তেমন কোন তারতম্য দেখলাম না। এদেশের লোকেরাও যেদিন ঠান্ডার মাত্রাটা একটু বেশী হয় সেদিন মলিন মুখেই বলেন, বেশ ঠান্ডা পড়েছে, তাই না! তাপমাত্রা ৪০° ৫৮° ডিগ্রীর মধ্যে ওঠানামা করে, ২।১ দিন ৪০° ডিগ্রীর নিচেও নেমেছে। ঠান্ডাটা হয়ত তেমন কষ্টের হত না যদি সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া না বইত। কিন্তু এখানেই আবহাওয়া বৃত্তান্ত শেষ হল না। এই বসন্তকালেই মাঝে মাঝে বরফ পড়তে দেখলাম, কোন কোন দিন প্রবল শিলাবৃষ্টি। আর তা নাহলেও এবং ঝড়েও শিলাবৃষ্টি, অর্থাৎ কলকাতার মত বৃষ্টির সঙ্গে (বৃষ্টি বলতে আমরা জলই বুঝি) শিলাবর্ষণ নয়, এখানে নিছক শিলাবৃষ্টি। এমন হয়ত অনেক দেশেই ঘটে কিন্তু আমাদের কাছে এটা নতুন অভিজ্ঞতা। শিলাবৃষ্টির দিনে পথে বেড়িয়ে উপভোগ করেছি। আরেক রকমের আবহাওয়া দেখেছি মাঝে মাঝে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, আমাদের শরৎকালের মত; কিন্তু সেই সঙ্গে সারাদিন অবিরাম বয়ে চলেছে প্রচণ্ড হাওয়া ঘরে বসে শোঁ শোঁ, গোঁ গোঁ শব্দে ঝড় হতে দেখেছি—বাতাসের ঝাপটায় কাঠের বাড়িঘর কেঁপে কেঁপে উঠেছে। মাঝরাতে ঘুমও ভেঙেছে শব্দে।

শুধু তাই নয়, সকালে পরিষ্কার আকাশ দেখে আশা করা চলবে না যে দিনটা ভাল যাবে—এক আধঘণ্টার মধ্যেই মেঘ করে এসে প্রবল বর্ষণ, এমনকি শিলাবর্ষণ ও বরফপাত ঘটতে পারে। তারপরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে তাপমাত্রা ৫৮° ডিগ্রীতে উঠে বসতে পারে। তখন গায়ে গরম পোশাক রাখা বেশ অসুবিধেজনক। কিন্তু জ্যাকেট খুলে নিশ্চিন্ত হয়ে চলাফেরার কোন ফুরসত পাবেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাপমাত্রা ৪৫° ডিগ্রীতে নেমে প্রচণ্ড ঠান্ডার সূত্রপাত করতেও দেখেছি। এখানকার লোকে প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গিতে বলবেন, কেমন 'Funny weather' দেখছ? শুনে মনে মনে বলে তোমাদের fun নিয়ে তোমরা থাক, এদিকে আমরা যে প্রাণে মরি। একই দিনে আমাদের পরিচিত সবকটি ঋতুর এমনকি তাদের চরম অবস্থার (আমাদের মাপকাঠিতে) সঙ্গে মোলাকাত হতে পারে। তবে কখন কি অবস্থা হবে আগে থেকে কিছুই বলা সম্ভব না। আমাদের ইতিমধ্যে বেশ কদিন তা হয়েছে। তাই বলতে ইচ্ছে করে স্ত্রীলোকের চরিত্র, পুরুষের ভাগ্যের হদিস যদিও-বা মানুষের নিদেন পক্ষে ঈশ্বর করতে পারেন, নিউজিল্যাণ্ডের আবহাওয়া? কখনই না, কখনই না?
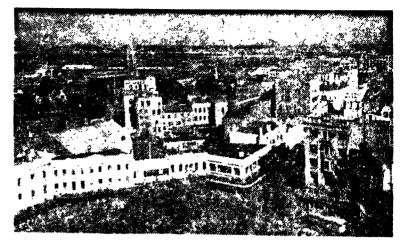
আবহাওয়া বৃত্তান্ত অনেক হল। এবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক।

এখানে পথেঘাটে যখন আমরা বেরিয়েছি, তখন লক্ষ্য করেছি আমার গৃহিণীর পোশাকের দিকে সকলের, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধাদের, অবাক ও সপ্রশংস দৃষ্টি। মাঝে মাঝে শিশুদের কথা কানেও এসেছে। মাকে প্রশ্ন করছে Mummy, is it a doll's dress?"। অথবা কখনও কানে এসেছে "Mumy, is she a brides-maid?। আমরা মুখ ফিরিয়ে দেখেছি মায়েরা ধমক দিচ্ছেন অথবা কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন। বৃদ্ধারা, আবার কোন কোন সময় তরুণীরাও বলেছেন, 'Lovely dress'।

কিন্তু একদিনের একটা ঘটনায় খুব মজা লেগেছিল। আমরা এখানকার প্রধান রাস্তার ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছি—দুই ধারে দোকানপাট। স্কুল ছুটি হয়েছে। হঠাৎ দেখি দুটো ১০।১১ বছরের ছেলে কাঁধে বইয়ের ঝোলা, রমলার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল। একটু পরে সলজ্জ ভঙ্গিতে রমলার মাথার সিঁদুর দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল—ওটা কি? ওটা পরেছো কেন? রমলা বুঝিয়ে দিল। তখন ওরা আবার প্রশ্ন করল, তোমার স্বামী পরে না? তোমাদের বিয়ের আংটি (wedding ring) কই? প্রথমে একটু অস্বস্তিবোধ করেছিলাম। কিন্তু রমলা আস্তে আস্তে গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ওদের। মনে হয় ব্যাপারটা বোধগম্য হল এদের। হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল ছেলে দুটি।

নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ভারতীয়দের সংখ্যা বেশী নয়। তাই এইসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। উত্তরাঞ্চলে বেশ কিছু আছেন, সেখানে তাই এ বিষয়ে কৌতূহল কম।

মনে পড়ছে এথেন্সে থাকাকালে প্রায়ই এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো। সেখানে তো ছেলেমেয়েরা রমলার কাছে এসে শুধু শাড়ি নয়, তার লম্বা চুলের বিনুনি স্পর্শ করে দেখত। একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক রমলার মাথার সিঁদুর দেখে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—"তুমি কি ওর মাথায় আঘাত করে কেটে দিয়েছ"? রহস্যচ্ছলেই বলেছিলেন কথাটা কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছিল আমাদের সম্বন্ধে বাইরের মানুষের কত অজ্ঞতা আজও রয়েছে।

এখানেও সেই অবস্থা। সেদিন পার্টিতে এক অধ্যাপক (তিনি অবশ্য ইংলণ্ডের ওয়েলসবাসী) মাথার সিঁদুর বৃত্তান্ত জেনে ঠাট্টা করেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা তুমি যদি ওটা লাগাতে ভুলে যাও তাহলে কি হবে?'

এখানে ভারতীয় খাদ্য পাওয়া যাবে কিনা এ নিয়ে সংশয় ছিল। এসে দেখলাম মোটামুটি সবই পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ চাল, ডাল, তরকারির মধ্যে আলু, বাঁধাকফি, ফুলকফি, টম্যাটো, গাজর ইত্যাদি। মাঝে মাঝে বেগুনে পাওয়া যায়। বেগুন আসে ফিজি থেকে। স্বভাবতই টাটকা থাকে না, তবে দাম খুব বেশী। আমাদের দেশের টাকার অঙ্কে ৮

টাকা কিলো। এখানকার লোকে বেগুনকে বলে egg plant। চাল আসে প্রধানত অস্ট্রেলিয়া, সামোয়া, আমেরিকা ও শ্যামদেশ থেকে। দাম তিন টাকা থেকে চার টাকার মধ্যে এক সেরের দাম। তবে তরমুজ এ দেশের দোকানে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। ঠাণ্ডা সত্ত্বেও কিনেছিলাম, দামটা বেশি। এখানে দুধ ও দুধজাত দ্রব্য, যেমন মাখন, চীজ, বেশ সস্তা, বলা চলে। পৃথিবীতে এই দেশে প্রোটীন খাদ্য সবচেয়ে সস্তা। মাংসের মধ্যে ভেড়ার মাংস সস্তা, পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় না। মুরগীর মাংসের দাম বেশী। মাছ বলাবাহুল্য সবই সামুদ্রিক, অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। এখানে রান্নার তেল হিসেবে সূর্যমুখী ফুলের বীজের তেল, বাদাম তেল প্রভৃতি প্রচলিত। সরষের তেল পাওয়া যায় না। মসলাপাতি কিছু পাওয়া যায়।

নিউজিল্যাণ্ডে যাদের জন্ম তাদেরকে বলা হয় 'কিউই', সে মাওরিই হোক বা পাখেহাই হোক (আগে বলেছি মাওরিরা য়ুরোপীয় আগন্তুকদের পাখেহা বলে) এ নামটা এ'রা নিয়েছেন নিউজিল্যাণ্ডের বিখ্যাত পাখি কিউই থেকে। এ পাখির ডানা নেই। এরা উড়তে জানে না। অবশ্য এদের সংখ্যা এখন খুব কম। নিউজিল্যাণ্ডের প্রাচীন মানুষ মাওরিদের সম্পর্ক লিখবার আগে বর্তমান মানুষ কিউইদের কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে লিখি।

এদেশের একটি সামাজিক সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি আলোড়ন শুরু হয়েছে। সমস্যাটি আমাদের কাছে অভিনব এবং কিছু ভয়াবহও বটে। সমস্যাটি এদেশে ক্রমবর্ধমান অবৈধ সন্তানদের সংখ্যা।

গত ২রা অক্টোবর এখানকার পার্লামেণ্টে নিউজিল্যাণ্ড সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তা থেকে দেখা যায়, ১৯৬৭ সালে এ দেশে যত জীবন্ত শিশুর (live birth) জন্ম হয়েছে তার ১১·৭ শতাংশ অবৈধ সন্তান। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনস্থ শিশু কল্যাণ বিভাগ থেকে এ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তিন বছর আগে এই অনুপাত ছিল ৮ শতাংশ। অর্থাৎ অবৈধ জন্মের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ ম্যাকে দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, "I am afraid it is a regrettable fact that illigitimacy rates have been rising in this country. This is to some extent a problem of morality throughout the community."

এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অল্পবয়স্ক বিবাহ বহির্ভূত বাবা-মার (teenager) সংখ্যা বাড়ছে। এদের অনেকেই স্কুলের ছাত্রছাত্রী। অনেকে বলেন, বড়রা অনেক জন্মনিয়ন্ত্রের আধুনিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, তাই তাদের সংখ্যা এদিক থেকে বাড়ছে না।

রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের নেতাদের কেউ কেউ সমস্যাটিকে নৈতিক বলে মনে করেছেন, আবার কেউ কেউ বলছেন ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সতর্কতার অভাব বা সে সম্পর্কে অজ্ঞতা এই সমস্যার সৃষ্টি করছে। কিছুদিন পূর্বে নিউজীল্যাণ্ডের ক্রাইস্ট চার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ইউনিয়ন থেকে দাবি-তোলা হয়েছিল যে, য়ুনিভার্সিটিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণ বিক্রির (vending machine) যন্ত্র বসানো হোক। অবশ্য কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্নমহল থেকে প্রবল প্রতিবাদের ফলে এ দাবি ছাত্ররা তুলে নিতে বাধ্য হয়। অনেকের মতে এই সব অবৈধ শিশুর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যতদিন পর্যন্ত কোন নাগরিক না নেয় ততদিন পর্যন্ত সে ভার

সরকারের বলেই এ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকে দাবি করেছেন সন্তান না হওয়া পর্যন্ত অবৈধ শিশুর মা-র সবরকম আর্থিক দায়িত্ব তার পিতাকে গ্রহণ করবার আইন করা হোক। কিন্তু এঁদের দাবি সমর্থিত হয় নি। কারণ অন্যরা বলছেন এ ব্যবস্থা বাস্তবে রূপ দেওয়া যাবে না, এই শিশুদের বাবাদের খুঁজে বের করা কঠিন ও ব্যয় সাপেক্ষ। তা ছাড়া এঁরা অনেকেই স্কুলের ছাত্র। অবশ্য অনেক বাবা তাদের শিশুদের দায়িত্ব এড়াতে চায় না তেমনই আবার অবৈধ শিশুদের অনেক মা ভরণ-পোষণের ভার নিতে চায় না।

এই অবৈধ শিশুদের সমস্যা নিয়ে গত ৪ঠা অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের মহিলাদের জাতীয় পরিষদের (National Council of Women) সম্মেলন হয় নেপিয়ার শহরে। তার বিবরণ নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সান্ধ্য দৈনিক "The Evening Star"-এ প্রকাশিত হয়—নিচে তা উদ্ধৃত করা হলঃ

A remit urging the government to make it Law that all fathers of illegitimate babies be required to reimburse the Social Security Department for money paid to unmarried mothers during pregnancy was rejected at the Conference of National Council of Women in Napier yesterday.

প্রস্তাবের বিপক্ষে বলা হয়েছিল,

The remit was not practical. There would be great expense in tracing a father and proving paterning. There is also the problem of the father still at school. Moreover it would cost far more than we are paying at the moment.

অবশ্য প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল—

to cut down on a few of these poor little souls born every year.

জনসংখ্যার অভাবের দেশ নিউজিল্যান্ড সেদিক থেকে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে নি। বরং সমাধানে সাহায্য করেছে আর তাই সমাজের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ও আছে বলে মনে হয়। যখন দেখি সামাজিক কঠোর অনুশাসনের পরিবর্তে অবৈধ শিশুদের পালিত সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সাগ্রহে লোকে এগিয়ে আসে। শিশুদের দিক থেকে বিচার করলে এই মনোভাব নিঃসংশয়ে অত্যন্ত মানবিক। এই উদারতাকে মানব সমাজ বিনা দ্বিধায় শ্রদ্ধা জানাবে।

কিন্তু এই হতভাগ্য শিশুদের পিতা-মাতাদের দায়িত্ব অস্বীকারের মনোভাব অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অনৈতিক ও অমানবিক। তা ছাড়া এই সমস্যা কোন দেশের পক্ষেই কোন সময়ে সামাজিক সুস্থতার নির্দেশক নয়। দরিদ্র-দেশের পক্ষে দারিদ্র্য, জীবিকার অনিশ্চয়তা, পারিবারিক দায়িত্ব অনেকের ক্ষেত্রেই সুস্থ যৌনজীবনের পক্ষে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই এ ধরনের ঘটনা হয়ত ঘটে। এ সব দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা সুস্থ রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ক্রিয়াকর্ম অতৃপ্ত যৌবনের শক্তিকে সুস্থ পথে, সংগঠনের পথে, সুন্দরের পথে প্রবাহিত করার অপরিহার্য দায়িত্ব বহন করে। আর তা যদি না পারা যায়, তা হলে যৌবনের বিকৃত প্রকাশ ঘটে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। শুধু যৌনবিকার নয় আদর্শহীন আত্মকেন্দ্রিক জীবন দর্শনের চর্চাও বৃদ্ধি পায়।

প্রাচুর্যের ধনতান্ত্রিক দেশে বিনায়াস-লব্ধ জীবিকা, আদর্শবিহীন জীবন, দুর্বল সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মানস যৌবনকে সুস্থ সংগঠনের পথে গড়ে তোলার পক্ষে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ এ বক্তব্যের নিদর্শন রয়েছে। আর এ বিষয় সম্প্রতি অতিকথিত—তাই বিস্তারে প্রয়োজন নেই।

যে শিশুদের কথা বলছিলাম—তারা যখন বড় হয়ে জানে তারা তাদের অন্যান্য বন্ধুদের মত বাঞ্ছিত নয় এবং সমাজে তারা তাদের বন্ধুদের মত এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত নয়। তখন তাদের মনে সমাজ সম্পর্কে এক অপরিসীম অভিমান ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। তার ফলাফলও স্বভাবতই সব সময় সুস্থও হয় না। এদেশে দুটি পালিত সন্তানের মনে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় নীচের দুটি চিঠি থেকে পাওয়া যায়। চিঠি দুটি Evening star-এর সম্পাদক মহাশয়কে দুটি পালিত সন্তানের লেখা।

চিঠি দুটি ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর চিঠিপত্রের কলমে "illegitimacy" এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হল পত্রপ্রেরকারা নিজেদের নাম দেয়নি।

প্রথম পত্র :

"I wish to call your attention to a programme shown on DNTV2 (Dunedin Television) on Sunday night. The programme called. "Man Alive", a British production was based on the illigitimacy rate in Britain. It showed a few people and they told of their reactions when learning they were illegitimate. The word 'bastard', was used many times in this programme, meaning a child born out of wedlock. This disgusting word thrust upon the innocent child by law and society is very wrong. I myself am 17 and adopted, and it has made me determined to prove just as good as a child born after marriage. Just because we are born out of wedlock does not alter the fact that we are human beings also, and to be called this filthy word can hurt very much. No matter what colour, black or white or how we come to be born into this world, we are all children—God's children—Adopted.

দ্বিতীয় পত্রের লেখক প্রথম পত্রের লেখককে সমর্থন করে লিখেছে...

....I also am in that position and have personal knowledge of the pitfalls and difficulties that confront those born out of wedlock. I am sure there must be a good many people in Dunedin similarly affected. It has occured to me that we could benefit by getting together and the older people might be able to give the younger ones a lot of useful advice...." concerned.

সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিলের শহর কলকাতার লোক আমরা এ শহরে কোন মিছিলের সাক্ষাৎ আজও পাইনি। তবে রাজধানী ওয়েলিংটন থেকে গোটা দুই বিক্ষোভের খবর পেয়েছি। দুটিই আন্তর্জাতিক বিষয়ভিত্তিক। স্থানীয় সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে কোন সভা হতে দেখিনি। তবে কিছু শ্রমিক ধর্মঘটের খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

প্রথমটি ঘটে ওয়েলিংটনে ওয়ারশ চুক্তির দেশগুলির চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রবেশের প্রতিবাদে সোভিয়েট দূতাবাসের সম্মুখে। কিছু সংখ্যক ছাত্র এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয়।

অবশ্য ডানইডান শহরে প্রগতিবাদী ছাত্র সংগঠন (Progsessive Students Association) ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উপলক্ষ্যে এক সান্ধ্যবিতর্ক সভার আহ্বান করে। উল্লেখযোগ্য হল, এই সভায় সোভিয়েট দূতাবাসের একজন পদস্থ কর্মচারীকে বলবার জন্য আহ্বান জানান হয় এবং তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বিরুদ্ধে বলেন অর্থনীতির একজন ইংরেজ অধ্যাপক। প্রশ্নোত্তরে এ সভা সন্ধ্যা ৭টা থেকে চলে প্রায় ৪ ঘণ্টা। সোভিয়েট দূতাবাস থেকে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি প্রত্যেকটি প্রশ্নের ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দেন। কোন কোন জবাবে প্রশ্নকর্তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে হননি।

আরেকটি বিক্ষোভও ঘটে ওয়েলিংটনে যখন কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মিঃ পার্ক এদেশে পরিভ্রমণে আসেন। 'মার্কিন তাঁবেদার পার্ক ফিরে যাও এই ধ্বনি দেয় বিক্ষোভকারীরা যখন প্রেসিডেন্ট মিঃ পার্ক বিমান থেকে অবতরণ করেন এবং প্রেসিডেন্টের গাড়ি যে সব পথ দিয়ে গিয়েছে তার অনেক স্থানেই এই ধরনের বিক্ষোভ হতে দেখা গিয়েছে। অবশ্য বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা সামান্যই ছিল। তবে অভিনব একটা বিজ্ঞপ্তি সেই সময় প্রেসিডেন্ট পার্কের জন্য নির্দিষ্ট বাসভবনের ও সম্বর্ধনা সভাগৃহের সম্মুখে লাগান হয়েছিল—এতে লেখা ছিল 'No Parking'।

এখানকার রাজনৈতিক হালচালের আরেকটি নিদর্শন পাওয়া গেল এদেশের প্রধানমন্ত্রী মিঃ হোলিওকের আমেরিকা সফরকালে দেওয়া এক বিবৃতিকে কেন্দ্র করে। প্রধানমন্ত্রী মিঃ হোলিওক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক বিবৃতিতে বলেন, নিউজিল্যান্ডের সমস্ত লোক দৃঢ়ভাবে ভিয়েতনামে মিঃ জনসনের নীতির সমর্থন করে। এই বিবৃতি স্থানীয় কাগজে প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে দৃঢ় প্রতিবাদ ওঠে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, ক্রাইস্ট চার্চের বিশপ, National Council of Churches-এর সম্পাদক, পার্লামেন্টের সদস্যরা 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে' এই বিবৃতির প্রতিবাদ করে চিঠি দেন। চিঠিতে বলা হয়ঃ" "..... Mr. Holyoake was reported as claiming that the people of New Zealand were solidly behind President Johnson's Vietnam policy.

"In recent months there have been demonstrations throughout the country involving at least 10 000 people protesting about New Zealand's increasing alignment with United States military strategy".

এ চিঠিতে প্রতিবাদ সম্প্রতি করা

হয়েছে কাগজে। পদমর্যাদায় ও সংখ্যায় এ'রা অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আরেকটি সমস্যা এদেশের মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছে—সমস্যাটি আর্থ-নীতিক।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এদেশের অর্থ-নীতির পক্ষে এক বিরাট সমস্যা। তার ওপর রয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের একমাত্র প্রতিবেশী। অসট্রেলিয়ার সর্বগ্রাসী প্রভাব ও তার নিউ-জিল্যাণ্ড সম্পর্কে কেমন যেন তাচ্ছিল্য করার মনোভাব। এ নিয়ে মন কষাকষি দু' দেশের মধ্যে ফল্গু নদীর মত প্রায় সব সময়েই বয়ে চলেছে। এটা নিউজিল্যাণ্ডের আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে খুব সহায়ক নয় বলে অনেকে মনে করছেন। অপর দিকে Mother Country বৃটেনের সংগে নিউ-জিল্যাণ্ডের এতদিন যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল তাও শিথিল হয়ে আসছে বৃটেনের সাম্প্রতিক মনোভাবের দরুন। অর্থাৎ একদিকে বৃটেনের ইউরোপীয় কমন মার্কেটে যোগদানের সম্ভাবনা ও অপরদিকে সুয়েজের পূর্বদিক পর্যন্ত বৃটেনের নিজেকে গুটিয়ে নেবার মনোভাব, যার ফলে নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান রপ্তানির সবচেয়ে বড়বাজার বৃটেনে সীমিত হয়ে আসবে এবং এতদিনের ক্ষমতাশালী অভিভাবকের ছত্রছায়া থেকে এদেশকে বঞ্চিত হতে হবে।

এ কথা সত্য, এ দেশের জীবনমান (Standard of living) পৃথিবীর যে কোন দেশের চাইতে উঁচু। বলে রাখা দরকার: পৃথিবীর মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড সর্বাধিক লোক সংখ্যার তুলনায় সর্বাধিক উন্নত জীবনমানের অধিকারী। এর মূলে রয়েছে একদিকে স্বল্প আয় বৈষম্য, অপর-দিকে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে উন্নত দেশ-গুলির সমান। কিন্তু এ সত্ত্বেও, এদেশের আর্থনীতিক জীবনে অস্থিরতার শেষ নেই। গত দু বছরে এই সংকট আরও বেড়েছে এদেশে বহির্বাণিজ্যের অস্থিরতার দরুন। প্রাথমিক উৎপাদনকারী দেশ, যার জাতীয় আয় প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি আয়-নির্ভর, মাথাপিছু আয় তার যত বেশীই হোক না কেন, তাকে আর্থনীতিক জীবনে সংকট ও অস্থিরতা ভোগ করতেই হবে। অতি উঁচু আয় ও উঁচু জীবনমানের দেশ হয়েও প্রাথমিক উৎপাদননির্ভর অর্থনীতির দেশ বলে নিউজিল্যাণ্ডেরও তা থেকে রেহাই নেই। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি—সমস্যার এ দিকটা এদেশের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই জানা আছে। বিশেষ করে গত দু বছর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দার ফলে এদেশের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে ঘাটতি ও এদেশে দশ হাজার মত বেকার সৃষ্টি এদেশের মানুষকে বেশী সচেতন করেছে। (এর আগে বলেছি, এদেশে বেকার ভাতার প্রচলন আছে)। তাই দ্রুত হারে শিল্পোন্নয়নের আলোচনায় রাজনৈতিক মহল, আর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী মহল মুখর হয়ে উঠেছেন। এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যে ও শিল্পের ক্ষেত্রে বৃটিশ প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে মার্কিন প্রভাব বাড়ছে। দীর্ঘমেয়াদী ভারী-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এদের উৎসাহ কম আর্থনীতিক কারণে—অর্থাৎ দেশটা ছোট বলে। তাই উভয় মহল থেকে চেষ্টা চলছে প্যাসিফিক বা যদি সম্ভব হয় এশীয় দেশ-গুলির সঙ্গে কমনমার্কেট বা ওই ধরনের কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলার। তাহলে ওই ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে এ সব অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার সহজ হবে। অসট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে আগে থেকেই অবাধ বাণিজ্য চুক্তি প্রচলিত আছে। নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ হোলিওকের সাম্প্রতিক মার্কিন সফরের পর দেওয়া বিবৃতি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। মিঃ হোলিওক বলেছেন, It was vital that the partnership of Australia and the United States with New-Zealand have a strengthened economic foundation if New Zealand was to continue to help promote a peaceful and prosperous Asia.... Gradually and irreversibly, New-Zealand had been drawn into the Politics of Asia. Trade and new communications played their role in turning New Zealand's eyes to this region. (The Evening Star, Oct. 17, 1968, P.4).

এদেশের জনসংখ্যার পনের শতাংশ কৃষিনির্ভর, ৩৫ শতাংশ শিল্প নির্ভর এবং বাকী ৫০ ভাগ ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষা-চিকিৎসা, যোগাযোগ যানবাহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিযুক্ত। প্রধানভাবে প্রাথমিক উৎপাদন-নির্ভর অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও কৃষি ও পশুপালনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাথমিক উৎ-পাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের অনুপাতে এত কম হওয়ার কারণ প্রাথমিক উৎপাদন অত্যন্ত মূলধন নিবিড় পদ্ধতিতে পরি-চালিত। এই যন্ত্রপাতি অধিকাংশই আমদানি করা। এদেশে জনসংখ্যা অপ্রচুর বলে এবং বিপুল রপ্তানি আয় থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে।

এদেশের আয়তন এক লক্ষ বর্গমাইলের কিছু বেশি অথচ জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে ২৭ লক্ষ অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ জনসংখ্যা অনুপাতে খুব বেশী। এ অবস্থায় যন্ত্র আমদানি করে উৎপাদন বাড়ানো চলে—তবে প্রধানত প্রাথমিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা কেন্দ্রীভূত। এবং তার ফলে তার যা বিপদ তার কথা আগেই বলেছি। তা ছাড়া অর্থনীতি ও রাজনীতির বর্তমান নিয়ন্ত্রক কৃষকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, যন্ত্র আমদানির সাহায্যে শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে সীমিত বাজার ও শ্রমেরও অভাব।

রপ্তানীর বিনিময়ে যন্ত্র আমদানি করে দ্রুত শিল্পায়ন প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে অবশ্যই এদেশের মানুষকে উন্নত ভোগমানের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। কল্যাণরাষ্ট্রের আনুকূল্যে বিনা আয়াসে যে উন্নত জীবনমানের সঙ্গে এদের দীর্ঘদিনের পরিচয় তা এরা সহজে ত্যাগ করতে চাইবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্তমানে এর বেশী বলা সম্ভব নয়, আরও পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান দরকার

তবে এই সমস্যার By Product হিসেবে আর একটি সমস্যা এদেশে ক্রমশ বাড়ছে, তা হ'ল Brain drain সমস্যা। উঁচু আয়ের দেশ নিউজিল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত, ইংলণ্ডের ধাঁচে গড়া। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে প্রতি বছর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী উচ্চতর উপাধি নিয়ে বের হয়। কিন্তু শিল্পায়নের ভিত্তি নয় এবং যা আছে তা আমদানি করা যন্ত্রে বলে Learning intensity কম।

বিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষকরা নিজেদের মনোমত কাজ পান না। অপরদিকে সামাজিক—আর্থনীতিক জীবন গতানুগতিক ধারায় পরিচালিত হওয়ায় সামাজিক বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র সীমিত। তাই সমাজ

বিজ্ঞানের ভাল ভাল ছাত্রছাত্রীরাও বিদেশে বিশেষ করে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে। যারা যাচ্ছে তারা দেশে উচ্চতর গবেষণার ও তার বাস্তবে রূপায়ণের সুযোগ কম বলে দেশে আর ফিরছে না। ফলে দেশের বড় রকমের সংগঠিত মূলধন দেশের কাজে আসছে না। সম্প্রতি এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হিসেবে বেতনহার বাড়াবার কথাই বলা হচ্ছে, গবেষণা ও তার বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভাবনা বৃদ্ধির কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবার কথা বলা হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে New Zealand Institute of Economic Research— এর ডিরেক্টর Dr. Rowe-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য : New Zealand is a good place in which to bring up children but a bad place for cultural or scholarly endeavour.

একথা আজ পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন হয়েছে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিলম্বে আগন্তুকদের পক্ষে যে সুবিধের কথা সোচ্চারে বলা হয় তার চেয়ে ঢের বেশী অসুবিধে এ সব দেশকে ভোগ করতে হয়। তার কারণ আমদানি করা যন্ত্র, যান্ত্রিক জ্ঞান ও রসদে এসব দেশে যে ধরনের আমদানি পরিবর্ত শিল্পায়ন (Import substituting Industrialisation) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পায়নের যে প্রগতিমূলক ভূমিকা থাকে তা থেকে এসব দেশ বঞ্চিত হয়। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলিতে সেদিন শিল্প বিপ্লব ও শিল্পায়ন পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত অগ্রগতির বিরাট সম্ভাবনার সুযোগ করেছিল। কিন্তু আজকের বিভিন্ন দেশে আমদানি পরিবর্ত শিল্পায়নের যে প্রচেষ্টা চলেছে তাতে এ ধরনের কোনও সম্ভাবনাই সৃষ্টি হল না। এ ধরনের শিল্পায়ন পদ্ধতির শিক্ষাগত তাৎপর্য ও উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষমতা একেবারে নেই বললেই চলে। ভারতের অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা। গত ১০০ বছরের বেশী আমাদের শিল্পায়ন প্রচেষ্টা চলেছে এবং গত ১৫ বছরে শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। উৎপাদনে মূলধন নিবিড়তাও দ্বিগুণ হয়েছে অথচ আজও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি পায় নি। তাই আজও শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ লোক কৃষি নির্ভর। বলেছি এ ধরনের শিল্পায়ন নয় তাই দেশে উচ্চতর গবেষণার সুযোগের অভাবে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রবণতা উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার আমাদের দেশে শিল্প অনগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ৪০ থেকে ৫০ হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীধারী ছাত্র বেকার রয়েছে। এর একটি কারণ আমদানি পরিবর্ত শিল্পায়ন পদ্ধতির অনুসরণ।

নিউজিল্যাণ্ডের অবস্থা অবশ্য কিছুটা স্বতন্ত্র। প্রধানভাবে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ হলেও, এদেশে কৃষি সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রিকৃত। লোকসংখ্যা কম হওয়ায় এটা সহজ হয়েছে।

শিল্প বিপ্লবোত্তর য়ুরোপের কিছু মানুষ অব্যবহৃত সম্পদের লোভে এদেশে আসে* সঙ্গে আনে তাদের আধুনিক জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি। সেই থেকে চলেছে স্বদেশের যন্ত্রে এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ প্রচেষ্টা। ক্রমশ এরা স্থায়ী হয়ে বসে এবং নিউজিল্যাণ্ডের নিজস্ব একটা সত্তাও গড়ে উঠতে চলেছে। আজ তার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতিক জীবনের উন্মেষ ঘটেছে এ প্রসঙ্গে N. Z. Institute of Economic Research-এর ডিরেক্টর ডঃ জে ডব্লিউ রোর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :

In the early years of European settlement the country was able to subsist on the education and taste of its numerous gifted immigrants. Then came the lean period in which most people were too busy for learning or culture and the pull of Great Britain was very strong for those few who did care. Only since world war II has there been viable New Zealand Culture which did not self consciously look over its shoulder at the "Old Country". (New Zealand, পৃঃ ১৬)

কিন্তু ছোট্ট দেশের অচল অনন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বুদ্ধিজীবী মানুষকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারে না। তারা আমেরিকা, য়ুরোপমুখী হয়। সমাধানের অন্যতম পথ সামাজিক আর্থনীতিক জীবনে অনুকরণপ্রিয়তা পরিহার করে নিজস্ব শক্তির সৃষ্টি করা। এর জন্য প্রয়োজন নিজস্ব সম্পদ আধুনিক শিল্পায়ন প্রচেষ্টা আর এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে অবশ্যই বর্তমানের সরকারী আনুকূল্যে পরিচালিত অনড় অচল ও সহজ জীবনযাত্রা ত্যাগ ও দেশের উদ্বৃত্ত আয়কে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার কাজে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

এদেশে জীবনের সকলক্ষেত্রে রাষ্ট্র সাহায্য মানুষকে যেমন উদ্যমহীন করে তুলেছে তেমনি সামাজিক ও আর্থিক জীবনে অচলতার পক্ষে Built in force হিসেবে কাজ করছে। এদেশের মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এত রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ঠেকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যে এখানকার সকলে এ কথা বলে তৃপ্তি পায়। তারা প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সরকারী সাহায্য গ্রহণ করছে। তাই মনে হয় এবং এদেশের অনেকেই ভাবছেন, বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে যে বিপুল আয় হয় তাকে দেশের মধ্যে মূলধন সংগঠনের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এর ফলে নিজস্ব শিল্প গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে আর্থনীতিক জীবনের অনিশ্চয়তা দূর হবে; অপর দিকে দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক জীবনের বর্তমান অচলতা দূর করবে। বুদ্ধিজীবী মানুষকে ঘরমুখী করবার এইটে একটি পথ বলে অনেকে মনে করেন। সুখের বিষয়, এদেশে এ নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে।

আমার এ আলোচনা এদের কাছে হয়ত কঠোর সমালোচনা মনে হবে। এদেশের মানুষ নিজেদের সমালোচনা পছন্দ করে না। এখানকার সব কিছু ভাল, পৃথিবীর সেরা— এমন একটা মনোভাব প্রায়ই দেখা যায়। এর কারণ মনে হয়, এ দেশটির সম্পূর্ণভাবে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা। তাই বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তানের একা মানুষ হওয়ার মনোভাব যেন এদের মধ্যে গড়ে উঠেছে।

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

---

* অবশ্য এ কথা বলা দরকার, সুদূরে অবস্থিত এ ছোট দ্বীপটির দায়িত্ব ইংলণ্ডের তৎকালীন সরকার নিতে চাননি। "British Government was from the begining not interested in the country and assumed responsibility for it with great reluctance". (New Zealand ঐ)

নিউজিল্যাণ্ডের সম্ভাবনা নিয়ে সেদিন (১৮৩৬ সালে) হাউস অব্ কমনসে বেশ বিতর্ক হয়। মিঃ ই, জি, ওয়েকফিল্ড কমনসে সিলেকট কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন,

"Very near to Australia, there is a country which all testimony concurs in describing as the fittest country in the world for colonisation, as the most beautiful country, with the finest climate and the most productive soil; I mean New Zealand. (condliffe: New Zealand in the making—পৃঃ ১৭)

চন্দ্রলোকে বড়দিনের পরব

কিন্তু অভাবনীয় "অবিশ্বাস্য" কাণ্ডটা তো শুরু হয়েই গেল। অ্যাপোলো-৮ যাত্রী-সহ অসীমে পাড়ি দিয়েছে। কালও ভাবছিলাম সত্যিই কি এই দুঃসাধ্য অথচ আরাধ্য আশ্চর্য ঘটবে? প্রথমটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না—মনে হয় জুলে ভার্নের লেখার মত বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী। তারপর যখন মনে পড়ে যে, স্বয়ং গর্কী লিখে গিয়েছে যে, বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির সংগে সংগে রূপকথা ও বাস্তবের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে দুটি পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে, তখন আবার মনের সংশয় কেটে যায়। তাছাড়া এটা তো আজ প্রমাণিত সত্য যে, বিজ্ঞান এমন দুর্ধর্ষ শক্তিশালী রকেট তৈরি করে ফেলেছে অনেক আগেই যা মহাব্যোমযানকে সৌর জগতের সীমানা পার করে দিয়ে অন্য নক্ষত্রের রাজ্যে পৌঁছে দিতে পারে। তার জন্য চাই "তৃতীয় মহাজাগতিক বেগ" যা সেকেণ্ডে ১৬ কিলোমিটারের কিছু বেশি। সেইরকম বেগ সৃষ্টি করার উপযোগী ইন্ধনের আজ আর অভাব নেই। অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের রাজ্যে যাওয়ার চেয়ে চাঁদে যাওয়া অনেক সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ। আজকের মহাজাগতিক যুগে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব এত কমে গিয়েছে, যে জন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, "The moon is only at a stone's throw from the earth."

তা না হয় বুঝলাম কারণ কথাটা যন্ত্র-কৌশলের দিক থেকে প্রযোজ্য। কিন্তু যাত্রীর নিরাপত্তার প্রশ্নটি কি তার চেয়েও অনেক বেশি মাথা ঘামাবার বিষয় নয়। মানুষকে শুধু চাঁদের দিকে ছুঁড়ে দিলেই তো হল না। তাকে নিরাপদে সশরীরে ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা চাই এবং সেটার সঙ্গে রকেটের ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই। সেটা রয়েছে জীবশাস্ত্র ও মহাজাগতিক পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের এক্তিয়ারের মধ্যে। মহাশূন্যের গভীরে মহাজাগতিক রশ্মি, তেজস্ক্রিয়া, প্রচণ্ড বেগে ধাবমান উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি কত শত আপদ-বিপদ ওৎ পেতে আছে, সেগুলি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কতটা সচেতন ও ওয়াকিবহাল জানি না। এখনো পর্যন্ত যত মহাকাশচারী ভূপ্রদক্ষিণ করেছেন, তাঁদের কেউই আসল

বড়দিনের প্রাক্‌সন্ধ্যায় চন্দ্রলোকে যাত্রার উদ্যোগ পর্বে (বাঁদিক থেকে) মিঃ অ্যান্ডার্স, মিঃ লাভেল ও মিঃ বর্ম্যানের তালিম চলেছে

মহাশূন্যের গভীরে যাননি, পৃথিবীর আশপাশের মহাশূন্য সাগরের উপকূলের কাছাকাছি সাঁতার কেটেছেন। হালে জণ্ড্-মহাকাশ যানের চন্দ্রলোকের যাত্রী হিসাবে নাকি কচ্ছপ পাঠানো হয়েছিল এবং ফিরে আসার পর নাকি দেখা গিয়েছে যে, জীব-গুলির শরীরে তেজস্ক্রিয়ার কিছু কুফল ধরা পড়েছে। এই ধরনের বাধাবিপত্তিই হচ্ছে গ্রহ, গ্রহান্তর যাত্রার পথে প্রধান বিঘ্ন। যাই হোক আমরা আশা করি যে, আমেরিকান বিজ্ঞানীরা যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে, তবে তাঁদের পাঠান।

রামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রামায়ণ লিখতে বসেছি জ্যোতিষীদের কোষ্ঠী বিচারের মত। যা তথ্য হাতে পাওয়া গিয়েছে অ্যাপোলো-৮ মহাব্যোমযান, তার কার্য-সূচী ও যাত্রীদের সম্পর্কে, তাই নিয়ে এই লেখা ছেপে বার হবার আগেই যাত্রীসহ যানটি চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসবে এবং মহাবিশ্বপ্রকৃতি বিজয়ের অভিযানের ইতিহাসের সঙ্গে যোগ করবে এক নতুন অধ্যায় — এক অভূতপূর্ব কীর্তি। অ্যাপোলো-৮ মিশনের যদি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা পালনে কোন বাধাবিঘ্ন না ঘটে তাহলে তার যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যা কিছু ব্যাপার ঘটার কথা সেই-গুলিই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবী থেকে ৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পরিক্রমণশীল চাঁদে পৌঁছাতে ৬৫ ঘণ্টা সময় লাগার কথা,

চাঁদ যখন সবচেয়ে কাছে আসে। অবশ্য চাঁদে নামা অ্যাপোলো-৮এর কার্যসূচীর মধ্যে নেই বলে চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে সে একটু আগেই পৌঁছে যায়, পৃথিবী থেকে যার দূরত্ব তিন লক্ষ ২০ হাজার কিলো-মিটার। ফিরে আসার সময় ঝুঁকি একটু বেশি, কারণ দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগ। যে বেগ সৌর রাজ্যের যে কোন গ্রহে যাবার জন্য অর্থাৎ পৃথিবী বা অন্য গ্রহের অভিকর্ষের আওতার বাইরে চলে যাবার জন্য প্রয়োজন (সেকেণ্ডে ১১·২ কিলো-মিটার)। মহাব্যোমযানটিকে চাঁদের অভি-কর্ষের বাইরে আসতে হবে এবং সেই বেগে পৃথিবীর আবহ মণ্ডলে প্রবেশ করে, তার-পর বেগ কিছুটা কমিয়ে প্যারাস্যুটের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরে ঝাঁপ দিতে হয়। ঐ প্রচণ্ড বেগবান যানটির সঙ্গে আবহ-মণ্ডলের ঘর্ষণের ফলে যানটির বর্ম থেকে আগুন বার হয়। অবশ্য তাতে ভিতরের যাত্রীদের কোন ক্ষতি হয় না।

দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ

মানুষ যতই নিখুঁত যন্ত্রপাতি তৈরি করুক, সে যন্ত্র যে কিছুতেই বিফল হবে না বা তাতে কোন অপ্রত্যাশিত আকস্মিক গণ্ডগোল দেখা দেবে না, এমন কথা মানুষ কেন, দেবতারাও হলফ করে বলতে পারেন না। 'টাইটানিক' জাহাজের প্রথম সমুদ্র-যাত্রার মুখে নির্মাতারা বড়াই করেছিলেন যে, জাহাজটি "অনিমজ্জনীয়"। কিন্তু সেই প্রথম যাত্রাই শেষ পর্যন্ত হয়েছিল তার অন্তিম যাত্রা। অ্যাপোলো-৮ সম্পর্কেও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত কোন গোল-যোগের দিকটা নির্মাতারা চিন্তা করতে ভোলেননি। টাইটানিক জাহাজ বলুন বা অ্যাপোলো-৭ বলুন, কোনটিই ভূলোকের বাইরে দূলোক যাত্রা করেনি, যে কাজের দায়িত্ব নিতে হয়েছে অ্যাপোলো-৮কে। সেই জন্য বিজ্ঞানীরা যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কতকগুলি জরুরী বিপদ-নিবারক ব্যবস্থা করেন। সেইরকম কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বলি।

ধরুন স্যাটার্ন-৫ রকেটের তৃতীয় (শেষ) পর্যায় হঠাৎ বিগড়ে যাওয়ার ফলে ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথ ত্যাগ করে চাঁদের দিকে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালে তখন যাত্রীরা কি করতেন? কি আর করতেন, দিন দশেক পৃথিবীর চারদিকেই চক্কর কাটতেন এবং যত বেশি সম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করে ফিরে আসতেন।

অ্যাপোলো-৮এর যাত্রার প্রথম পর্বেও তো কিছু যান্ত্রিক গণ্ডগোল দেখা দিতে পারত যার দরুন চাঁদের কাছে যাওয়া এ যাত্রা আর হয়ে উঠত না? সেইরকম কিছু বাধা-বিঘ্ন ঘটলে যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন বিকল্প মিশন বা কর্তব্য ঠিক করে দেওয়া ছিল।

গোটা যাত্রাপথটি বিজ্ঞানীরা কতকগুলি ধাপে ভাগ করেন, যেগুলির নাম দেন “মালভূমি” (প্লেটো) বা “কমিট পয়েন্ট”। প্রতিটি ধাপে পৃথিবীতে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ-পরিচালন কেন্দ্র থেকে স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারের সাহায্যে যান ও যাত্রীদের অবস্থা পরীক্ষা করার বন্দোবস্ত ছিল, যার দ্বারা বিজ্ঞানীরা ঠিক করে নিতে পারতেন যে, যান ও যাত্রীরা পরবর্তী ধাপে এগোবার উপযুক্ত ছিল ও ছিলেন কিনা। প্রথম দফা পরীক্ষাটা ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথেই করা হয় কক্ষচ্যুত হয়ে চাঁদের দিকে যাত্রার আগে। আর একটি প্রশ্ন। ধরুন রকেটের শেষ পর্যায়টি পুরোপুরি বিকল না হয়ে আংশিক বিকল হওয়ার ফলে যানটিকে ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথচ্যুত করল বটে, কিন্তু চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে পৌঁছে দেবার জন্য যতটা বেগ সৃষ্টি করা দরকার বেগ হোল তার চেয়ে কম। সেক্ষেত্রে? সেক্ষেত্রের জন্যও বিজ্ঞানীরা বিকল্প ব্যবস্থা রাখেন, যেটি হচ্ছে পৃথিবী থেকে ৬৪০০ কিলোমিটার উপরে নতুন একটি ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা। বার তিন চার চক্কর কাটার পর যানটি পৃথিবীর দেড় শো থেকে তিন শো কিলোমিটারের মধ্যে নামিয়ে এনে সেখানেই ১০ দিন কক্ষ পরিক্রমা করানো। আরো একটি বিকল্প পরিকল্পনা ছিল এই যে, যানটিকে ৯৫০০০ কিলোমিটার উচ্চতা অবধি উঠতে (বেগের পক্ষে যদি সম্ভব হয়) দিয়ে তারপর ফিরিয়ে আনা। তৃতীয় আর একটি বদলি ব্যবস্থাও ছিল। সেটি হচ্ছে যানটিকে “স্বাধীনভাবে” অর্থাৎ আপনা থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে দেওয়া। তার মানে তার স্বাভাবিক গতি যদি নিয়ন্ত্রিত করা না হয়, তাহলে সে আপনা থেকে অনেক দূর দিয়ে চাঁদকে ঘিরে একবার আবর্তন করে পৃথিবীর দিকে চলে আসবে। এ ক্ষেত্রে যাত্রীদের বিশেষ কোন বিপদের আশংকা নেই। আর চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে যদি অ্যাপোলো-৮ কার্যসূচী অনুসারে পৌঁছায়, তখন সেই কক্ষ থেকে বার হয়ে আসার জন্য প্রধান ইঞ্জিনটি চালু করলেই হল। সুতরাং সেক্ষেত্রে মহাশূন্যে ত্রিশঙ্কুর মত না যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় পড়বার বিপদ ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া মহাব্যোমযানের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রকৌশলগুলির যে কোনটি বিকল হলে তার কাজ করার দায়িত্ব বহন করার বিকল্প ব্যবস্থা থাকে। তারপর কেবিনের ভিতরে আগুন লেগে যাওয়ার বিপদ নিবারণের জন্য অ্যাপোলো মডেলের মহাব্যোমযানগুলি অগ্নি-প্রতিরোধী মালমশলা ও সাজসরঞ্জামসহ নতুন ডিজাইনে তৈরি করা হয় ১৯৬৭ সালে কেনেডি অন্তরীপে অ্যাপোলো দুর্ঘটনার পরে। কিন্তু এইসব ব্যাপারের চেয়েও বড় বিপদ

অ্যাপোলো-৮ চন্দ্রমুখী মহা ব্যোমযানের চন্দ্রলোকে গমন ও প্রত্যাবর্তনের গতিপথের নক্শা
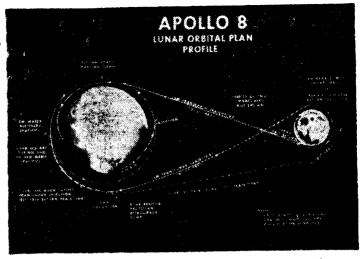
আছে যা হচ্ছে সময়। পথে কোন বাধাবিভ্রম বা যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটলে (চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে) সেখান থেকে ফিরে আসতে বেশ কিছু সময় লাগবে কারণ তখন যাত্রীরা থাকবেন পৃথিবী থেকে প্রায় সওয়া তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরে। এপর্যন্ত যতবার ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে মহাকাশগুলি পরিক্রমণ করেছে, সেগুলির ক্ষেত্রে কোন গোলযোগ ঘটলেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে তত্ত্ব অনুসারে আধ ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত লাগা উচিত। অবশ্য সেই অবস্থায় যানটি যে পৃথিবীর কোনখানে এসে পড়বে তাও আগে থাকতে ঠিক করা বা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু অ্যাপোলো-৮এর চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথ থেকে ফিরে আসতে লাগে ৫৭ ঘণ্টার মত। তবে চাঁদের দিকে অগ্রগতির পথের যে কোন জায়গা থেকে প্রয়োজন হলে যাত্রীরা যানটির মোড় ঘুরিয়ে প্রধান ইঞ্জিনটি চালু করে ফিরে আসতে পারতেন। সেক্ষেত্রে ফিরতি মুখে তাঁদের কতটা সময় লাগত, সেটা নির্ভর করে পৃথিবী থেকে কতদূরে তাঁরা পৃথিবীর দিকে মোড় নিতেন, তার উপর। বিমানবহরের কর্নেল বর্ম্যান ও মেজর অ্যান্ডার্স এবং নৌবহরের ক্যাপ্টেন লাভেল তিন ঘণ্টা ভূপ্রদক্ষিণের পর চাঁদের দিকে যাত্রা করেন এবং জেমিনী-১১ মহাকাশযানের ১৩৭০ কিলোমিটার উচ্চতার রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড সময় সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে চাঁদের যাত্রা শুরু হয় এবং রাত ৯টা ১১ মিনিটে রকেটের তৃতীয় পর্যায় চালু করে তার বেগ ৩৮৯৪০ কিলোমিটারে (ঘণ্টায়) তুলে চাঁদের দিকে পাঠানো হয়। পৃথিবী ত্যাগ করার আড়াই মিনিট পরে রকেটের ২য় পর্যায়টি খসে পড়ে। মহাশূন্যে উৎক্ষেপ ও ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়া এবং তারপর সেখান থেকে রকেটের শেষ পর্যায়ের ইঞ্জিন চালিয়ে সেই কক্ষ ত্যাগ করে (মানে পৃথিবীর অভিকর্ষ জয় করে) দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগে মহাশূন্যযানের চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহ, এমন কি সূর্যের দিকে যাওয়া আজ দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু অ্যাপোলো-৮ শেষ পর্যন্ত রকেটের শেষ পর্যায়টিও বর্জন করে যেটির ডগায় বসানো ছিল, চাঁদের জমিতে নামবার ছোট
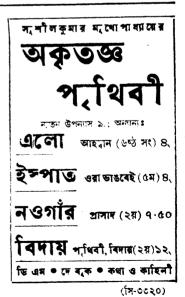
একটি মকল যন্ত্রসমন্বিত "গ্রন্থি" (নডিউল)। সমস্ত ব্যাপারটা মানুষের চাঁদে গিয়ে নামবার মহড়া তো। অ্যাপোলো-৮এর যাত্রী বা চালকরা চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে পৌঁছবার আগে ঐ নডিউলের সঙ্গে অ্যাপোলো-৮কে যুক্ত ও বিযুক্ত করেন যা করতে হবে ভবিষ্যতে নামার সময়। তার-পর রকেটের শেষ পর্যায়টি খসিয়ে দিয়ে অ্যাপোলো-৮ চাঁদের দিক আগেকার চেয়ে মন্থর বেগে আপনাআপনি ভেসে চলে এবং চালকরা নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে দিক নির্ণয় করতে থাকেন। বেগ কমে যাবে পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে। চাঁদ থেকে ৩০ হাজার মাইল দূরে পৌঁছালে চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর ও সূর্যের অভিকর্ষের চেয়ে জোরদার হয় বলে তখন থেকে অ্যাপোলো-৮-এর গতিবেগ আবার বাড়তে শুরু করে এবং সেটি সূর্যের দিকে না গিয়ে ভেসে যেতে থাকে চাঁদের দিকে। কিন্তু চাঁদের অভিকর্ষ তখনো এত জোর হয় না যা যানটিক চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে পারবে—সেটি চাঁদে টেনে নামানো তো দূরের কথা। সেই অবস্থায় পড়লে অ্যাপোলোর পক্ষে নিজ গতিবেগে একবার চাঁদের চারদিক আবর্তন করে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সেই অবস্থা যাতে না ঘটে তার জন্য অ্যাপোলো-৮এর সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করা হয় এক 'সার্ভিস প্রোপালশান' ব্যবস্থা যার কথা আমরা অ্যাপোলো-৭এর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সেটি অনেকটা উল্টো রকেটের (রেট্রো-রকেট) মত কাজ করে। সেটি চালু করে যানের বেগ মন্দায়িত করার পরে চাঁদ তাকে প্রথমে ডিম্বাকার কক্ষপথে এবং তারপর গোলাকার কক্ষপথে টেনে পৌঁছে দেয়, চাঁদ থেকে ৭০ মাইলের মত দূরে, মানে ১০০ মাইলের মধ্যে। সেই কক্ষপথে বড়দিনের সময় (২৪শে ডিসেম্বর) ২ ঘণ্টায় ১বার করে ১০ বার ঘোরার পর (সেই সময় যাত্রীরা চাঁদের প্রাকৃতিক চেহারা বেশ ভাল করে দেখতে পান শুধু আলোকিত দিকের নয়, অনালোকিত দিকটিরও, যে সৌভাগ্য এর আগে কারো হয়নি। সেই সঙ্গে ফটোও তুলতে পারবেন।) আবার সার্ভিস প্রোপালশান ব্যবস্থা চালু করে যানটির গতিবেগ বাড়িয়ে সেটিকে চাঁদের অভিকর্ষের হাত থেকে আবার পৃথিবীর অভিকর্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২৭শে ডিসেম্বর যাত্রীসহ অ্যাপোলো-৮এর প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়ে ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড সময় রাত ৯টা ২১ মিনিটে।

এই ধরনের অভূতপূর্ব মহাজাগতিক অভিযানে মহাকাশচারীদের যে সব বিপদের আশংকার কথা আগে বলেছি, সেগুলি ছাড়া আরো কিছু আশংকার ব্যাপার আছে বলে বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন যে, স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান চাঁদে নামানো যখন বাস্তবে সম্ভব হয়েছে, তখন তাঁর মতে "চাঁদ সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মানুষের জীবন বিপন্ন করা নিষ্প্রয়োজন।" অবশ্য এই মন্তব্য তর্কবিতর্কসাপেক্ষ। তবে ঝুঁকি যে আরো আছে, তাতে সন্দেহ নেই। ধরুন এমন ঘটতেও তো পারত যে, অ্যাপোলো-৮কে চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে সংস্থিত করার সময় সার্ভিস প্রোপালশান ব্যবস্থায় কিছু গোলযোগ দেখা দিল। সেরকম ঘটলে যানটি যাত্রী সমেত ভীমবেগে চাঁদের উপর আছড়ে পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে পারত। সেক্ষেত্রে যাত্রীদের কি দশা হোত সেটা তার বলার অপেক্ষা রাখে না। কিম্বা এমন যদি ঘটত যে, চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথ থেকে বার হয়ে আসার সময় ব্যবস্থাটি গেল বিগড়ে। সেরকম অবস্থা ঘটলে যাত্রীদের ঐ কক্ষপথেই আটকা থাকতে হোত। আরো ধরুন যানটি যখন চাঁদের অদৃশ্য পিছনদিকের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোন যান্ত্রিক গণ্ডগোল দেখা দিল। সেক্ষেত্রে যানের পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত চাঁদ, মাঝখানে থেকে। তখন সেই অবস্থার খবর পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছতো, চাঁদ সেখান থেকে সরে যাবার পরে। তার মানে বেশ কিছুকাল বিজ্ঞানীরা জানতেও পারতেন না যে, যানটি চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে ফেঁসে গিয়েছে। সবশেষে বলি আরো একটি বিপদের কথা। যানটি যখন ফিরতি-মুখে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করবে, তখন তার গতির কোণের (আঙ্গল) যদি সামান্যতমও এদিক ওদিক হোত, তাহলে দুইরকম কাণ্ড ঘটতে পারত: আবহমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে যানটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারত কিম্বা সেটি এমন এক ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে চালু হয়ে যেত, যেখান থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে আনা হোত এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ওদিকে খাদ্য পানীয় প্রভৃতি ফুরিয়ে যেত। সুতরাং এত ঝুঁকি তুচ্ছ করে যে মার্কিন মহাকাশচারীরা মহাশূন্যের অজ্ঞাত দুর্গম পথে যাত্রা করেন, তাঁদের সাহস দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে কোন মহৎ কাজ করা যায় কি?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ধাতুর রপ্তানি ও আমদানিতে বাঙালীর সহায়তা

দিলীপ চন্দ্র ঠিক কথাই বলেছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত খুলে পেলাম : মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন এবার তিনি যাবেন শ্রীক্ষেত্রে। কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হাঁটতে হাঁটতে ছত্রভোগে এসে পৌঁছলেন। চব্বিশ পরগনার জয়নগর-মজিলপুরের তেইশ ক্রোশ দক্ষিণের এই গ্রামটির অন্য নাম নাকি 'খাড়ি'। মহাপ্রভুর পুরী যাত্রার সময়ে ছত্রভোগ গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। (এখন গঙ্গা নদী সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে)। শতমুখী গঙ্গা দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে আত্মহারা হলেন। ...ছত্রভোগের রামচন্দ্র খাঁয়ের বাড়িতে চৈতন্যদেব সশিষ্য আতিথ্য গ্রহণ করার পর নৌকাযোগে পুরীর পথে ওড়িশার যাজপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

লোকে বলে যে, ছত্রভোগ থেকে শতমুখী গঙ্গা পার হবার সময়ে মহাপ্রভু আজকের গেঁওখালি এবং তার অপর পারে হলদিয়ার পথধূলি দিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরে পাঁশকুড়া কোলাঘাট হয়ে তিনি জলপথেই ওড়িশার যাজপুরে পৌঁছেছিলেন।

ধাতব দ্রব্য বিষয়ে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের উত্তরসাধক ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আধা-সরকারী মিনারেলস অ্যান্ড মেটালস ট্রেডিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর (এক কথায় এম এম টি সি-র) অধ্যক্ষ মেজর দিলীপকুমার চন্দ্র বললেন, যে যাজপুর থেকে কটক ভুবনেশ্বর হয়ে যে হাঁটা-পথে চৈতন্যদেব পুরী গিয়েছিলেন ইতিপূর্বে তার নাম ছিল রাণী অহল্যাবাঈ রোড। ইন্দোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্যে গত শতকে সেই পথটি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এখন সে নাম মুছে ফেলে নক্সা সড়কের নাম রাখা হয়েছে পাঁচ নম্বর ন্যাশন্যাল হাইওয়ে। সে পথ গেছে মাদ্রাজ পর্যন্ত।

হলদিয়া বন্দরের প্রসঙ্গ থেকেই এই সব কথা উঠেছিল, আর হলদিয়ার বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে লোহা ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি বিভিন্ন আকরিক ধাতুর এবং কয়লার রপ্তানির কথায়।

MMTC-র ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসের অফিসে এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম আমরা চারজন। রিজিওন্যাল ম্যানেজার মেজর চন্দ্র, তাঁর সহকারী শ্রীভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি এবং আজ আমি যে প্রতিষ্ঠানের কথা লিখতে বসেছি সেই মিত্র এস কে প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীঅভয়কৃষ্ণ মিত্র।

আলোচনা মানে আমার প্রশ্ন এবং অন্য তিনজনের উত্তর।

বাংলার বর্ধমান, মানভূম ও রাঢ় অঞ্চলের অংশ, বিহারের ছোটনাগপুর, সিংভূম, ধলভূম এবং ওড়িশার কেওনঝড় সুন্দরগড় প্রভৃতি গুলো পৃথিবীর আরম্ভযুগের স্থলভাগের অংশ। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন যে, এর জন্ম হিমালয়েরও আগে। সে সময়ে আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের স্থলাংশের যোগ ছিল। কোন্ সুদূর অতীতের বিরাট আলোড়নে পৃথিবীর চেহারা বদলালো, আর্যাবর্তের অনেকটা জলের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো হিমালয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আর দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আফ্রিকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ভারত মহাসাগরের প্লাবনে।

মোট কথা, স্থলভাগ হিসেবে বাংলা বিহার ওড়িশার উল্লিখিত অঞ্চলের কাছে আমাদের হিমগিরি শিশু শামিল। আর পুরনো প্রাচীন ধরণীর এই ক্ষুদ্র ভাগ তার গর্ভে বহন করছে মহামূল্য সব খনিজ পদার্থ।

উপরোক্ত অঞ্চল এবং আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত দেশকে ইংরেজীতে এক কথায় বলা চলে কলকাতার

হিণ্টারল্যাণ্ড। তার মানে, ওই সমস্ত অঞ্চলের শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি এবং আমদানি কলকাতা বন্দরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। নেপালকেও কলকাতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়।

অথচ এই কলকাতা বন্দরের অবস্থাই আজ সঙ্গীন। খবরের কাগজে এ বিষয়ে নিয়মিত লেখালিখি হচ্ছে; নতুন কিছু নয়। তবুও আমি আবার এক বাণ্ডিল কথা বলবো। কারণ, বিষয়টার গুরুত্ব এত বেশী যে সকলের সর্বদা সজাগ থাকার জন্যে বার বার তার আলোচনা করা দরকার।

MMTC-র কলকাতার কর্তা শ্রীদিলীপ-কুমার চন্দ্রকে আমার একটু অসাধারণই মনে হলো। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি অবধি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি ও খাঁটি ইণ্ডিয়ান আর্মিতে একটানা কাজ করে এবং বহুবার দেশের বাইরে কাটিয়েও বাংলা দেশের ইতিহাস ও ভূগোলে এতটা ব্যুৎপত্তি কোনো সাধারণ মেজর-সাহেবের পক্ষে বিরল।

আর একটা ব্যাপারে আমার বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হলো। আধা সরকারী এই বিরাট সংস্থা, বছরে যার বেচাকেনা ৯০।৯৫ কোটি টাকার, তার আঞ্চলিক প্রধান দুজনেই হলেন বাঙালী। মেজর চন্দ্রের সহকারী রিজিওন্যাল ম্যানেজার হলেন শ্রীভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই খাস কলকাতার লোক—চন্দ্র মশায় গড়পারের আর বাঁড়ুজ্যে মশায় ভবানী-পুরের লোক। আরও আনন্দিত হলাম যখন দেখলাম যে এঁরা নিজেদের মধ্যে বাঙলায় বাক্যালাপ করেন এবং অতিথি আপ্যায়ন করেন চা সিগারেটের সঙ্গে এলাচ সুপুরি এগিয়ে দিয়ে।

মিত্র এস কে প্রাইভেট লিমিটেড আকরিক ও সাধারণ ধাতুর সার্ভেয়ার হিসেবে ভারত-বিখ্যাত। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত ছাড়াও পশ্চিম ভারতের বন্দরে বন্দরেও তাঁরা কাজ করেন। তার চেয়েও বড়ো কথা হলো যে ১৯৬৫ সালে তাঁরা জাপানেও অফিস খুলেছেন।

অভয়বাবুর মতে মিত্র এস. কে প্রতিষ্ঠানই হলো প্রথম বাঙালী গোষ্ঠী যাঁরা সাগরপারে শাখা অফিস খুলেছেন। 'সুপারিণ্টেণ্ডেন্স কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিমিটেড' নামে আর একটি বাঙালী কার্গো সারভেয়ার সংস্থাও তারপরে সাতষট্টি সালে ব্যাংককে ব্রাঞ্চ খুলেছেন বলে শুনলাম। মিত্র এস. কে-ই প্রথম বিদেশে ব্রাঞ্চ খুলেছেন কি না সে বিষয়ে আমি জোর করে কিছু বলতে চাই না; কারণ ইতিমধ্যে কোন্ প্রচারবিমুখ বাঙালী কবে কোথায় সে কার্যটি করে বসে আছেন তা বলা শক্ত। গত বছরের আরম্ভে আমি যখন লেখা শুরু করি তখন ভেবে-ছিলাম, ক'টা প্রবন্ধই বা লিখবো। মাস ছয়েক টেনে নিয়ে যেতে পারলেই বাঙালীর শিল্পবাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ উনসত্তরের আরম্ভে সানন্দে ঘোষণা করতে পারছি যে তা নয়—ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালীর কৃতিত্ব বিষয়ে এখনও অন্তত বছর তিনেক ধরে লেখা চলবে। কোথায় কে বা কাহারা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন কে জানে! তাঁরা নিজেদের জাহির করতে চান না বা জানেন না, আর বাঙালীর এমন কোনো সঙ্ঘ বা সমিতিও নেই যে সেই সব আত্মগোপনকারীদের খুঁজে বের করেন।

গত বছরে আমার মনে যে নিরাশা ছিল আজ সেটা কেটে যাচ্ছে। আজ সাহস করে এ কথাও ভাবতে পারছি যে নিকট ভবিষ্যতে এমনও দেখে যেতে পারবো যে, 'মেড ইন

বেঙ্গল বাই বেঙ্গলী টেকনিশিয়ানস' পণ্যের তেমনি আদর হয়েছে সর্বত্র, যেমন এখন আছে সারাভাইয়ের ক্যালিকো কাপড়ের, বিড়লার গোয়ালিয়র রেয়নের অথবা বাটার জুতোর।

এই তো দেখা যাচ্ছে যে, মিত্র এস. কে'র মতো বাঙালী সংস্থার ক্লায়েণ্টেলে এক আধ জন ছাড়া বাঙালী বলতে প্রায় কোনো খনি মালিকই নেই। সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাপানী-জার্মানদের কাছেও তাদের প্রচুর সম্মান। বাঙালীর পক্ষে এটা কত বড়ো গৌরবের কথা।

জাপানের কথা বলছিলাম। মিত্র এস কে'র টোকিও অফিসের ভার নিয়ে আছেন বিকাশ বিশ্বাস ও অশোক সেনগুপ্ত। বিকাশবাবুর সঙ্গে দেশ-পত্রিকার পাঠকের অনেক দিনের পরিচয় আছে তাঁর সুন্দর সুন্দর টোকিওর চিঠি পড়ে।

MMTC-র অফিসে বসে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গটা এদিকে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেটা বলে নিই।

Iron Ore মানে আকরিক লোহার কথাটাই ধরা যাক। ৫৭-৫৮ সাল থেকে দশ বছরে আয়রন ওরের রপ্তানি ৪৪ লক্ষ টন থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে MMTC ১৯৬৭-৬৮-তে রপ্তানি করেছেন ৮৫ লক্ষ টন। বাকীটা হয়েছে গোয়া থেকে; সেখানকার রপ্তানি বাণিজ্য এখনও ব্যবসায়ীদের হাতেই আছে, কারণ গোয়া ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার সময়ে শর্ত ছিল যে ভারত সরকার গোয়ার স্বাধীন ব্যবসায়ীদের বা অসংখ্য খনি মালিকদের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। নিম্নমানের হলেও গোয়ার খনিজ সম্পদ অগাধ।

কিন্তু বাকী ভারতবর্ষের ৮৫ লক্ষ টনের মধ্যে কলকাতা বন্দর থেকে রপ্তানি হয়েছে বছরে মাত্র ৪ থেকে ৮ লক্ষ টন। তার কারণ একাধিক।

আট দশ হাজার টনের ছোট ছোট মালবাহী জাহাজে করে এই সব ভারী ভারী ধাতু নেওয়া আজকের দিনে কোনো বিদেশী ক্রেতাই (বিশেষ করে আমাদের প্রধান গ্রাহক জাপান) একেবারেই পছন্দ করেন না। অনেক অসুবিধার মধ্যে প্রথম হলো ছোট চালানের বাহবহুলতা। জাপান এখন স্বদেশে প্রস্তুত লক্ষ টনের Ore-carrierও সমুদ্রে ভাসিয়েছেন, যেমন ছেড়েছেন লাখ দুই টন তৈলবাহী ট্যাংকার। কলকাতার কথা বাদই দিলাম, ভারতবর্ষের কোনো বন্দরই এখনও ৩৫০০০ টনের চেয়ে বড়ো জাহাজে মাল বোঝাই করতে [illegible]

প্রথমটি হলো, তীরের কাছে সমুদ্রের জলের গভীরতা (draft) কম—মাত্র ৩৪।৩৫ ফুট, যার জন্যে বড়ো ভারী জাহাজ সেখানে লাগানো যায় না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জাহাজ ভেড়াবার berthগুলির অপ্রশস্ততা। কলকাতার বন্দর তার ধার কাছ দিয়েও যায় না। এখানকার ড্রাফট বর্ষাকালেও ২৬।২৭ ফুটের বেশী থাকে না, আর গঙ্গানদীর এখানে-ওখানে বালির চড়া এবং ঘন ঘন বান ডাকার প্রকোপে এখানে ১৫।২০ হাজার টনের মাঝারি জাহাজও পৌঁছতে পারে না। যে ছোটখাটো জাহাজ এই সব বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে কলকাতায় পৌঁছয় তারাও পোতাশ্রয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় বেশ কয়েক দিন। মন্থর-গতিতে বোঝাই এবং বন্দরের নানা অব্যবস্থার জন্যেই সেটা হয়। বজবজ খিদিরপুরের গঙ্গায় জাহাজগুলি বেকার দাঁড়িয়ে থেকে দৈনিক হাজার হাজার টাকার লোকসান গোণে আর পোতাধিকর্তারা ভাবনায় দাঁড়িয়ে হিমসিম খান।

এখানে যন্ত্রের সাহায্যে মাল বোঝাই প্রায় হয়ই না—সেটা হয় শ্রমিকের মাথায় চাপানো ঝুড়ি বা ঠেলাগাড়ি দিয়ে। সারা দিনে মাল বোঝাই হয় গড়ে ১০০০ টন। কেবল ৫নং গার্ডেন রীচ জেটিতে একটু বেশী হয়—গড়ে হাজার তিনেক টন সারা দিনে। কলকাতা বন্দরের পোর্ট-চার্জ আবার ভারতের সব বন্দরের চেয়ে বেশী।

উন্নত দেশের কথা বেশী না-ই বললাম, আমাদের বিশাখাপত্তনম, গোয়া প্রভৃতি বন্দরেও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বোঝাই হয়। বিশাখাপত্তনে বর্তমানে ঘণ্টায় ২৩।২৪০০ টন ধাতু বোঝাইয়ের ব্যবস্থা আছে। তা হয় কিনা জানি না।

আর ব্যবস্থা আছে পারাদীপে। পারাদীপ বন্দরে সাধারণ পণ্য অর্থাৎ জেনারাল কার্গো বোঝাই হয় না, কেবল MMTC-র খনিজ দ্রব্যের রপ্তানির জন্যেই এই নতুন বন্দরটি ব্যবহৃত হয় বলে শুনলাম। এটা বললেন, অভয়বাবু। তিনি আরও বললেন যে পারাদীপের যতটুকু উন্নতি হয়েছে সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের দিলীপ চন্দ্র মশায়েরই জন্যে। নতুন বন্দরটিকে চালু করে দিয়ে এসেছিলেন মেজর চন্দ্রই। কিন্তু এখন সেখানে যা কাজ হচ্ছে তা-ও তো শুনি মোটেই আশানুরূপ নয়। তবুও পুরোপুরি যান্ত্রিক বোঝাইয়ের ব্যাপারে পারাদীপই এখন আমাদের শিবের সলতে।

ওদিকে অস্ট্রেলিয়ার বন্দরে মাল বোঝাই হয় ঘণ্টায় ৪০০০ টন, আর আমাদের মতোই উন্নতিশীল দেশ ব্রেজিলের টুকরো বন্দরে হয় ঘণ্টায় ৬০০০ টন।

নাবিকরা সাগর পাড়ি দিয়ে পোতাশ্রয়ে এসে ঘুমোয় আর আরাম করে—কিন্তু দুষ্ট

লোকেরা বলে যে আমাদের অধিকর্তারা পোতাশ্রয়ে বসে বসেই ঘুমোন। কিন্তু কেবল তাঁরা জেগে উঠলেই হবে না, সমস্ত অসঙ্গতির প্রতিকার করা সম্ভব আমাদের হলদিয়া বন্দরকে তাড়াতাড়ি গড়ে তুলে।

ডিভ্যালুয়েশনের হিসেব ধরেও হলদিয়া বন্দর গড়ে তোলার জন্যে ভারত সরকার ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কাজ কিছু দূরে এগোবার পর এখন দেখা যাচ্ছে যে আরও ২০ কোটি অর্থাৎ মোট ৫০ কোটি টাকার দরকার। কী হিসেব করে ৩০ কোটি ধরা হয়েছিল প্রথমে? আর গৌরী সেনের কত টাকা আছে, যে দিয়েই চলবে চাওয়া মাত্রই? আমাদের পোর্ট কমিশনের প্ল্যানারদের মুনশিয়ানা আছে বলতে হয়।

কিন্তু যাই হয়ে থাকুক এতদিন, হলদিয়া আমাদের চাই-ই। বন্দরটিকে পুরোপুরি সাজিয়ে তোলার টারগেট ছিল ১৯৭১-৭২। কিন্তু চেনাশোনা সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীরা, যাঁরা হলদিয়া দেখে এসেছেন, তাঁরা বলেন কাজ হতে হতে এখন যেমন থমকে গেছে তাতে আগামী পাঁচ বছরেও সেটা সম্ভব হবে না।

হলদিয়াতে এখন তীরে জাহাজ ভেড়ানোর ব্যবস্থা নেই; মাঝ নদীতে দাঁড় করিয়ে বার্জে করে জাহাজে মাল বোঝাই হয়। অধিকাংশ জাহাজই কলকাতা বন্দর থেকে খানিকটা মাল তুলে হলদিয়ায় এসে দাঁড়ায়। সেখানে হয় আপটপিং (uptopping), অর্থাৎ আধাবোঝাই মালের ওপর জাহাজের সাধ্যানুযায়ী পুরো মাল চাপানো হয়। একে তো কলকাতায় এত খরচ আর সময় নষ্ট তার ওপরে এই ঝামেলা—বিদেশী ক্রেতারা খুশী থাকবেন কেন? তাই তাঁরা ঝুকেছেন পারাদীপ, ভাইজাগ, মাদ্রাজ আর গোয়ার দিকে। তাতেও অসুবিধে হলে তাঁরা চলে যাবেন দক্ষিণ অ্যামেরিকা, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়াতে, যেসব দেশ খনিজ সম্পদ রপ্তানিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

হলদিয়ার গঙ্গা প্রায় পাঁচ মাইল চওড়া। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না প্রায়। এখানকার 'ড্রাফট' ৪২ ফুট; তাহলে 'বাঁধ' তৈরি হলে তাতে ৪৫০০০ টন জাহাজও ভিড়তে পারবে। বাহাত্তর সালে যদি বন্দর তৈরি হয়ে ওঠে তবে গোড়ায় সেখানে বছরে ১৪ লক্ষ টন থেকে শুরু করে চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত ৩০ লক্ষ টন মাল রপ্তানির ব্যবস্থা হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। তাহলে অসংখ্য বাঙালী ছেলের কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু—এটা একটা বড়ো 'কিন্তু'—হবে কি তাই? অঘটনটি কি ঘটবে? দেখা যাক। সব যে নির্ভর করছে আমাদের বিমাতা কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্য আর কলকাতা পোর্ট কমিশনারদের তৎপরতার ওপর।

বন্দরটি গড়ে তোলার কনট্রাক্ট যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের কর্মী ও শ্রমিকদের কষ্টের সীমা নেই। একে তো কলকাতা থেকে হলদিয়ায় স্থলপথে ৬০।৭০ মাইল যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা; সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও সেটা। হলদিয়াতে রাত কাটানোর কথা কিছু দিন আগে পর্যন্তও ভাবা যেত না। অব্যবস্থার নাকি চূড়ান্ত ছিল। তাই সকালের স্টীমারে করে হলদিয়া পৌঁছেই কনট্রাক্টার ফার্মের ম্যানেজার এঞ্জিনীয়ারদের এবং সরকারী অফিসারদের বিকেলের ফিরতি স্টীমারের কথা ভাবতে হতো। আর রাত কাটানোর দরকার হলে ওই যে রেস্ট না গেস্ট-হাউস আছে তাতে আশ্রয় নিতে হতো। সেখানে সব আছে—একজন ঠাট্টা করে আমায় বললেন—বিছানাপত্রও পাওয়া যায়। ভয়ানক মশার জন্যে মশারিও আছে, কিন্তু টাঙাবার দড়ি নেই। মশারি খাটাতে গেলে দুজন লোকও দরকার হয় সঙ্গে, যারা সারারাত দু' দিকের খুঁট ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। মশকদংশন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আবার সেই দণ্ডায়মান ব্যক্তিদ্বয়কে গ্যামাক্সিন বা কেরোসিন লেপন করতে হবে সর্বাঙ্গে। সেখানে রান্নাবান্নাও হয়, কিন্তু একটু বেশী খাবার জলের দরকার হলে চলে যেতে হবে নদীর তীরে পবিত্র গঙ্গোদক পানের নিমিত্ত।

যাক গে ওসব ফালতু রসিকতা, কাজের কথা বাকী থেকে যাচ্ছে।

মেজর চন্দ্র বললেন আকরিক ধাতুর কথা আর ভুজঙ্গভূষণ তারপরে তুললেন কয়লার প্রসঙ্গ। ১৯৬৫ সালের দোসরা সেপ্টেম্বর থেকে ভারত সরকার কানুন জারি করলেন যে, কয়লা-রপ্তানি কারবারটি ব্যবসায়ীরা আর করতে পারবেন না, MMTCই সেটা করবেন। কানুন জারির অব্যবহিত পরেই বড়ো খন্দের পাকিস্তানের সঙ্গে হামলা-হামলি লেগে গিয়ে সে কারবারটা মাটি হয়ে গেল। এখন ব্যবসাটা আবার একটু
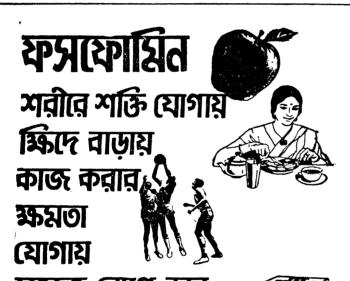
ইমপ্রুভ করেছে। বর্মা রেল, সিংহল রেল এখন MMTCর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ফুরন করেছেন কয়লা সাপ্লাইয়ের জন্য। কিন্তু সে কাজটা ভালো করে চালাতে হলে যে কোলিয়ারী থেকে সময় মতো কয়লা এনে জমা করা, বন্দরে ঠিক মতো জাহাজ ভিড়িয়ে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করা (বর্তমানে কখনো কখনো বোঝাই এত আস্তে হয় যে দিনে ৪।৫০০ টনের বেশী কয়লা জাহাজে ওঠে না), আর বন্দর অঞ্চলের চোরাই কয়লা ব্যবসায়ীদের কারবারটা সমূলে উচ্ছেদ করা প্রভৃতি আবশ্যিক কর্তব্যগুলি পালন করা উচিত সেটা কি ভুজঙ্গভূষণ ভেবে দেখেছেন ভালো করে?

বিদেশী ক্রেতারা এখনও আমাদের *আয়রন-ওর, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমাইট, কায়ানাইট, বক্সাইট, লাইমস্টোন, ডলোমাইট, ফায়ার ক্লে, চায়না ক্লে প্রভৃতি অনেক রকম খনিজ প্রচুর পরিমাণে কেনেন।

কিন্তু এটা আমাদের কর্তাদের মনে রাখতে হবে যে, খনিজসমৃদ্ধ অন্যান্য অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশও আধুনিক বন্দর গড়ে তুলছে। খনির সঙ্গে বন্দরের যথাযথ যোগাযোগের ব্যবস্থা আগে থেকে করেই তাঁরা এগোচ্ছেন। তাঁরা তৈরি হয়ে বিশ্ববাণিজ্যে প্রবেশ করার আগেই আমাদের কর্মকুশলতা না বাড়লে পরে আমাদের জন্যে ক্রেতারা অর্থাৎ জাপান, জার্মেনী, ইংল্যান্ড, অ্যামেরিকা কেউ বসে থাকবেন না। সুয়েজ খাল বন্ধ হয়ে জাহাজ ভাড়া অনেক বেড়ে যাবার পরে তো এমনিতেই অনেক খদ্দের ভারত ছেড়ে আফ্রিকা আর দক্ষিণ অ্যামেরিকা থেকে মাল কিনতে শুরু করেছেন।

পুনরুজ্জীবিত কলকাতা বন্দর এবং নতুন হলদিয়া বন্দরই পশ্চিম বাংলা ও বাঙালীর রপ্তানি বাণিজ্যের মেরুদণ্ড হবে এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পদধূলিলাঞ্ছিত ভূমিতে বাঙালীর নতুন কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে —এই কথাটা আমরা যেন প্রতি মুহূর্তে মনে রাখি, সেই জন্যেই অনেকখানি চর্বিত-চর্বন করা গেল।

মিত্র এস. কে প্রাইভেট লিমিটেডের লক্ষ্মীলাভের কাহিনীর ভূমিকাটা মস্ত বড়ো হয়ে গেল। তার দরকার ছিল, কারণ ভারতবর্ষের খনিজ ও ধাতব পদার্থের রপ্তানি ও আমদানির সঙ্গেই তাঁদের অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বর্গীয় সন্তোষকুমার মিত্র মশায় ১৯২৮ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে বার্ড কোম্পানীর বড়জামদা অফিসে কেমিস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। বিহার ওড়িশার সীমান্তে অবস্থিত বড়জামদার প্রধান অধিবাসী হলেন 'হো' (কোল) উপজাতির আদি-বাসীরা।

হো-দের প্রসঙ্গে তাঁদের নেতা আমাদের বিখ্যাত অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় বর্তমানে লোকসভার সদস্য শ্রীজয়পাল সিং এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জাহানারা জয়পাল সিংয়ের (তিনিও এম পি) নাম উল্লেখ্য।

সন্তোষ মিত্র মশায় বার্ড কোম্পানীতে বছর আষ্টেক কাজ করার পর এক পরিচিত ভদ্রলোকের প্রেরণায় চাকরি ছেড়ে স্বাধীন-ভাবে ধাতু সমীক্ষার ব্যবসায় নামলেন। কিন্তু সেই পার্টনারশিপ ফার্ম বেশী দিন চললো না। তখন ১৯৩৮ সালে ওড়িশায় কেওনঝড় স্টেটের বড়বিল নামক স্থানে সন্তোষবাবু একক একটি ব্যবসা আরম্ভ করলেন। সন্তোষবাবুর মান নির্ণয়ের ওপর সব খনি মালিকদেরই শ্রদ্ধা ছিল। তাই তাঁরা অনেকেই সন্তোষবাবুর ল্যাবোরেটারিতে মালের নমুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দিতে লাগলেন। তিনি টাটা, বার্ড, মার্টিন কোম্পানী, ডি কে পাণ্ডে, এ সি ফিগ্রেড, এম এ টালক প্রভৃতি প্রাচীন খনিমালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন। পরে এলেন চাইবাসার বিখ্যাত রুংটা পরিবার, মিশ্রীলাল ধরমচাঁদ, সিরাজুদ্দিন কোম্পানী।

বাঙালীদের মধ্যে ম্যাঙ্গানীজের খনি ছিল স্বর্গীয় বিভূতি মিত্র ও শ্রীশৈলেন সেন মহাশয়দের। আর উল্লেখ্য হলেন স্বর্গীয় নৃপেন রায় মহাশয়, যাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সবিতা রায় ও তাঁর ছেলেরা এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন 'ইন্ডিয়া ট্রেডস করপোরেশন' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বর্তমানে আরও একজন বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোকেরও লোহা ও ম্যাঙ্গানীজের খনি আছে। তাঁর নাম ডক্টর শৌনকচন্দ্র বসু। ধাতু বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধিধারী শৌনকবাবুর সঙ্গেও সেদিন MMTC-র অফিসে আমার পরিচয় হয়েছিল।

সন্তোষবাবুর কাজের শুরু বেশ সুন্দর ভাবেই হয়েছিল, কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে সব অচল হবার উপক্রম হলো। [illegible] থাকাতে সন্তোষবাবু নমো নমো করে টাটা আর ইন্ডিয়ান আয়রনের স্থানীয় কাজ করতে লাগলেন। তাতে কোনো রকমে ব্যবসাটি চালু রইলো। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিল না।

অবশেষে দীর্ঘ ছ' বছর পরে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হলো এবং সরকার তার কিছু দিন পর থেকেই সাধারণ ব্যবসায়ীদের

---

* ম্যাঙ্গানীজের সওদা MMTC এবং খনি মালিক উভয়পক্ষই পৃথকভাবে করেন, কিন্তু খনি মালিকরা সরাসরি টাকাপয়সার লেনদেন করতে পারেন না। অতীতে 'আন্ডার ইনভয়েসিং' হয়ে বহু ফরেন এক্সচেঞ্জ পাচার হবার পর থেকে সরকার এই মূল্য বিনিময়ের ভারটি নিজের হাতে নিয়ে MMTC-র ওপর ন্যস্ত করেন। আয়রন-ওরের সবটাই কিন্তু MMTC নিজেরাই রপ্তানি করেন। অন্য কেউ পারেন না। MMTC-র এক্সপোর্টের অঙ্ক হলো বছরে ৬০।৬৫ কোটি টাকা। ইমপোর্টের অঙ্ক বছরে ২৫।২৬ কোটি টাকা।

মাহানং লীজ দিতে আরম্ভ করলেন। নতুন খনি মালিকরা সন্তোষবাবুর সাহায্য নেওয়াতে এতকাল পরে তিনি হালে পানি পেলেন।

ব্যবসাটি তখনও 'এস কে মিত্র' নামে ছিল। এই জাতীয় বিশেষজ্ঞের ব্যবসা পণ্য তৈরি বা বেচাকেনার মতো রাতারাতি বাড়ে না। কিন্তু তখন থেকেই সন্তোষবাবুর ব্যবসার ক্রমিক উন্নতি হতে লাগলো।

বিভূতি মিত্র নামে চাইবাসার এক ছোট সাইজের খনির মালিকের কথা একটু আগে বলেছি। তিনি সন্তোষবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কারণ দুজনেরই বাড়ি ছিল চাইবাসায়। কাজ বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্টের দরকার পড়াতে বিভূতিভূষণের ছেলে মণীন্দ্রনাথ ১৯৪৭ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে সদ্য বি এস-সি (কেমিস্ট্রিতে) পাস করে বড়বিলে সন্তোষবাবুর ল্যাবোরেটারিতে যোগ দিলেন।

সন্তোষ মিত্র ও বিভূতি মিত্রের বন্ধুপুত্র এবং মণিবাবুর ক্লাস ফ্রেন্ড অভয়কৃষ্ণ তখন এম এস-সি পড়তে পাটনা সায়ান্স কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁর পাঠ শেষ করা হয়নি।

১৯৫২ সালে সন্তোষবাবু যখন কলকাতায় অফিস খোলা ঠিক করলেন তখন মণিবাবুর পরামর্শে তিনি অভয়কৃষ্ণকে কলকাতা অফিসের ভার দিতে চাইলেন। অনভিজ্ঞতার জন্যে মনের অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে অভয়বাবু সেই ভার নিলেন।

মজার ব্যাপারই হলো সেটা। প্রৌঢ় সন্তোষ মিত্র মশায় আর দুই যুবক মণীন্দ্র মিত্র ও অভয় মিত্র, যাকে বলে মিত্রে মিত্রে চলে পরিমাণ, অথচ কারুর সঙ্গে কারুর রক্তের সম্পর্ক নেই।

কলকাতার অফিস হলো ১৪নং হেয়ার স্ট্রীটে এবং ল্যাবোরেটোরি বসলো গ্রে-স্ট্রীট অঞ্চলে। এস. কে. মিত্র কাজ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। (এখন মিত্র. এস. কে প্রাঃ লিমিটেডের অফিস মৌলালীর কাছে সি-১১ সি. আইটি রোডে)।

সফলতা জিনিসটা মানুষকে উচ্চাশার পথে ঠেলে দেয়। দ্রুত উন্নতিশীল বিশাখাপত্তন বন্দরে কাজ করার ইচ্ছে সন্তোষবাবুর মনে অনেক দিন থেকেই হয়েছিল, কিন্তু সেখানে তখন সার্ভেটি পুরনো ওর-সার্ভেয়ার ফার্ম অফিস খুলে বসে আছেন। তা সত্ত্বেও নির্ভীক সন্তোষকুমার অভয়কৃষ্ণকে পাঠিয়ে ১৯৫৫ সালে বিশাখাপত্তনে ব্রাঞ্চ অফিস ও ল্যাবোরেটারি খোলালেন।

১৯৫৬ সাল। প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ও মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছে। সন্তোষ মিত্র এবার দুই বিশ্বস্ত তরুণকে অংশীদার করে সেটিকে এক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করলেন। 'এস. কে মিত্র প্রাইভেট লিমিটেড' নামে ইতিপূর্বেই একটি প্রতিষ্ঠান থাকাতে ঘুরিয়ে এই নতুন সংস্থার নাম হলো 'মিত্র এস. কে প্রাঃ লিঃ'।

এখন থেকে মিত্র এস. কে'র ক্রমোন্নতির লয় দ্রুততর হয়ে উঠলো। দুই শিষ্যকে নানা শহর এবং বন্দরে পাঠিয়ে সন্তোষবাবু শাখা অফিস খুলতে লাগলেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত মণিবাবু খুলেছেন নোয়ামুণ্ডি, পারাদীপ, দুর্গাপুর প্রভৃতি শাখা, আর অভয়কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে খোলা হয়েছে বিশাখাপত্তনের পর ১৯৫৭ সালে মাদ্রাজ, ১৯৬০-এ ব্যাঙ্গালোর এবং আরও দু' একটার পর পঁয়ষট্টিতে সাগরপারের টোকিওতে অফিস। মিত্র এস. কে'র শাখা অফিসের সংখ্যা বর্তমানে ১৪। দেশের অন্যান্য বন্দরেও তাঁরা শীঘ্রই নিজেদের অফিস খুলবেন বলে আয়োজন উদ্যোগ করছেন। বিদেশে জাপান ছাড়া অন্য দেশেও ব্রাঞ্চ খোলার তোড়জোরের কথা অভয়বাবু বললেন। বিদেশে অফিস রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় বিক্রেতাদের স্বার্থ বজায় রাখা। অনেক সময়ে অকারণে বা সামান্য খুঁত পেলেই প্রেরিত মালের ওপর খেসারত লেগে যায় বলেই এই সতর্কতা।

ইতিমধ্যে ১৯৬০ সালে সন্তোষকুমার দেহত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৮ বছর। এক নীরব কর্মীর মৃত্যু হলো।

সন্তোষকুমারের কাজের ভার নিলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা ইলা মিত্র। এখনও তিনি মিত্র এস. কে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর, যদিও কোম্পানী মিটিং ছাড়া তিনি বড়ো একটা অফিসে আসেন না। একষট্টিতে তাঁর ছেলে তপনকুমারও বি. এস-সি (কেমিস্ট্রি) পরীক্ষার পর প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। মণীন্দ্রনাথ, অভয়কৃষ্ণ ও তপনকুমার তিনজনেই কোম্পানীর ডিরেক্টর।

অভয়বাবুর স্ত্রী সদাহাস্যময়ী সাবিত্রী কথায় কথায় রসিকতা করেন। কথা না বলে চোখের চাউনিতেও তাঁর রসিকতা প্রকাশ পায়। প্রথম আলাপে আমার বিরলকেশ মস্তকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মুখে একটু হাসি ফোটালেন। অভয়কৃষ্ণের বেয়াল্লিশ বছরের টাক আমার ইন্দ্রলুপ্তের চেয়েও বড়ো। কিন্তু মাথার শেপ-টা সুন্দর বলে দীর্ঘদেহ সৌম্যদর্শন অভয়কৃষ্ণকে দেখে হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি হলিউডের ইউল ব্রিনারের মতো মাথা কামিয়েছেন। সমবয়সী মণিবাবুর কিন্তু মাথা ভরা কালো চুল। অভয়বাবুর পাশে তাঁকে অনেক জুনিয়ার মনে হয়। তবে, অভয়কৃষ্ণকে যেসব আউট-ডোর মুভমেন্টে সারা বছর কাটাতে হয় তাতে তাঁর ওই কেশমুক্ত মাথা সহায়তাই করে—ডিগনিটিটা বাড়িয়ে দেয়।

দুর্ভাগ্যবশত মণি-গৃহিণী দীপালি বা তপনকুমারের স্ত্রী চন্দ্রলেখার সঙ্গে আমার আলাপ হলো না।

১৯৬৮-তে আন্তর্জাতিক মানক সংস্থার এক সম্মিলন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে ভারতীয় মানক সংস্থার পক্ষ থেকে যে দুজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন অভয় মিত্র তাঁদের অন্যতম। এ ছাড়াও তিনি ভারত চেম্বার অব কমার্সের বিশেষ কমিটিতে গত দু' বছর ধরে মনোনীত সভ্য হিসেবে আছেন।

১৯৩৮ সালে সন্তোষ মিত্র ৫০০০০ টন আয়রন-ওর এবং ২০ হাজার টন ম্যাঙ্গানীজ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। সেই তুলনায় সাতষট্টিতে মিত্র এস. কে ৩৮ লক্ষ টন আয়রন-ওর, ৬২ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ এবং ১২ লক্ষ টন ক্রোমাইটের মান নির্ণয়ের কাজ করেছেন। এ ছাড়া অন্য ধাতু নিয়ে ছোটখাটো কাজের কথা না হয় নাই ই বললাম। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল রপ্তানির মাল। দেশী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জাপানী এবং ইয়োরোপীয় ক্রেতাদের হয়েই তাঁরা এত কাজ করেছেন।

আড়াই শো কর্মীর (যাঁদের অধিকাংশই বাঙালী) কর্তব্যপরায়ণতার জন্যেই মিত্র এস. কে প্রাইভেট লিমিটেড দিনে দিনে উন্নতির শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

অভয়বাবুরা নতুন হাওড়া ব্রীজ তৈরির উদ্যোগপর্বে সরকারী নির্দেশে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে নদীর মাটি ও জল নিয়ে গবেষণা করছেন। কতরকমের কাজই না এঁরা করেন! কোন্ দিন শুনবো যে অভয়বাবু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ডস কনভেনশনে ভারতীয় প্রতিনিধি হয়ে চাঁদে চলেছেন রকেটে করে, সেখানকার জল মাটি ধাতুটাতুর বিষয়ে সমীক্ষার জন্যে।

বিশ্বকর্মা

নিহত পঞ্চম শুক্লা ও তার মাথার খুলি।
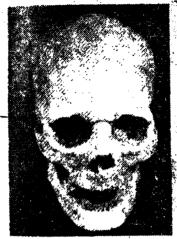
একটি কংকালের কাহিনী

পরিমল ভট্টাচার্য

তারাতলার কোন এক নির্জন এলাকায় জলাভূমিতে মানুষের একটি কংকাল পেয়ে কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা অফিসাররা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। হত্যার সন্দেহে ধৃত এক ব্যক্তি জায়গাটা পুলিসকে দেখিয়ে দিয়েছিল, তবুও কংকালটি কার, এই প্রশ্নই তখন গোয়েন্দা অফিসারদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শ' ষাট সালের দশ মার্চ কলকাতা পোর্ট কমিশনারস-এর এক সাবগানার পঞ্চম শুক্লা নিখোঁজ হন। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার সন্ধান মেলে না। দুদিন পর তার আত্মীয়স্বজন সাউথ ডিভিসন পোর্ট পুলিস স্টেশনে ডায়েরী করেন। তাকে মেরে ফেলা হয়ে থাকতে পারে, এই সন্দেহের কথাও পুলিসকে জানানো হয়। সেই সঙ্গে সন্দেহভাজন একজনের নাম। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এ ব্যাপারে ওই থানা থেকে কোন সুরাহা সম্ভব হয় না। নিখোঁজ পঞ্চমের আত্মীয়স্বজনরা অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাদের মনে নানা সন্দেহ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত তারা কলকাতা পুলিসের সদর দফতর লালবাজারে দরখাস্ত করেন। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি গোয়েন্দা দফতরে পাঠানো হয়।

গোয়েন্দা অফিসাররা নিখোঁজ পঞ্চম সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেন। নানাসূত্রে তাঁরা পঞ্চমের এক বন্ধু রামলোচন আহিরের নাম জানতে পারেন। এই রামলোচনের কাছে পঞ্চম পাঁচ শ' টাকা পেতেন। সেজন্য তাগিদে তাগিদে অস্থির হয়ে উঠেছিল রামলোচন। সম্ভবত পঞ্চমের টাকার লোভ কিছু বেশী ছিল। রামলোচনও এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে ইচ্ছুক হয়ে থাকতে পারে। একদিন রামলোচন দাঁও মেরে কিছু কাপড় পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পঞ্চমকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিল। শর্ত ছিল, মওকায় কাপড় কেনার পর পঞ্চম ওই পাঁচ শ' টাকার ঋণ থেকে রামলোচনকে অব্যাহতি দেবে।

পরে পঞ্চম এই কাপড় কিনতে যাওয়ার কথাটা তার এক নিকট আত্মীয় যমুনাপ্রসাদকে জানিয়েছিল। সেদিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে পঞ্চমকে ফিরে আসতে হয়েছিল। কারণ, বিক্রেতা হাজির হয়নি। পঞ্চমের এক বিশ্বস্ত বন্ধু রামলোচনও এই টেনা জানতে পারে। সে এ ধরনের দাঁও মারার চেষ্টার বিরুদ্ধে বার বার পঞ্চমকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম শোনে নি।

এক সপ্তাহ পরে একই প্রস্তাব নিয়ে রামলোচন আবার আসে। এবার সঙ্গে তার একজোড়া শাড়ি। বোধ হয় পঞ্চমের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য এই ব্যবস্থা। পঞ্চমেরও টাকার চাহিদা ছিল দারুন। ২৭০ টাকা হাতে রামলোচনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে কাপড় কিনতে। যাওয়ার আগে সে যমুনাপ্রসাদের কাছে কিছু টাকা ধার করে। এই বের হওয়াই তার শেষ—ফিরে আসেন।

রামলোচন সম্পর্কে তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসারদের মনে সন্দেহ জাগে। আরও খুঁটিনাটি তদন্তের পর রামলোচনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত রামলোচন প্রথমে পুলিসের কাছে অভিযোগ অস্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেরায় জেরায় কাহিল হয়ে সে স্বীকারোক্তি দেয়। তার বাড়ি তল্লাসী করে কিছু তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায় এবং রামলোচনই তারাতলায় ওই জলাভূমিতে পুলিসকে নিয়ে যায়।

কংকালটা জলে আংশিক ডুবে ছিল। মাংসের চিহ্ন নেই, কেবল হাড়। ধুতি ও জামা জড়ানো। নিচের চিবুকের হাড়, কণ্ঠনালির উপরের হাড়, বাঁ-দিকের পাঁজরের দুটি হাড়, ডানদিকের প্যাটেলা এবং পাছার দুটি হাড়ই ওই কংকালে ছিল না। জায়গাটা জলা বলে মাংস পচে গিয়ে দেহটি দ্রুত কংকালে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ওই জামার সঙ্গে চারজোড়া পিতলের বোতাম এবং সাদা 'বর্ডার' দেওয়া একটি লাল পতাকাও পাওয়া যায়। পতাকাটি জামার পকেটে ছিল। এ ধরনের

(সি ৬৬৯)

পত্তাকা সাধারণত পোর্ট কমিশনরস-এর 'গানারগাই' ব্যবহার করে থাকে। একটি পৈতেও পাওয়া যায়। আরও খোঁজাখুঁজির পর গোয়েন্দা অফিসাররা সেখান থেকে চিবুকের একটি হাড়, খৈনির কৌটো, একপাটি কালো জুতো এবং বারো ইঞ্চি লম্বা স্প্রীং-এর একটি ছুরি পায়। খৈনির কৌটোতে হিন্দী হরফে 'ও' জয়হিন্দ' লেখা ছিল।

পঞ্চমের বন্ধু ও আত্মীয়রা ছুরি বাদে অন্য জিনিসগুলি পঞ্চম-ব্যবহৃত বলে সনাক্ত করে। খৈনির কৌটোটা এক পানের দোকানীও পঞ্চমের বলে সনাক্ত করে। খৈনি খাওয়ার জন্য ওই দোকান থেকে প্রায়ই সে চুন নিত। এ সত্ত্বেও গোয়েন্দা অফিসারদের কাছে ওই কঙ্কালটা কার, এই প্রশ্নই প্রধান থেকে যায়। কারণ, জঙ্গলভূমিতে পাওয়া কঙ্কাল যে পঞ্চমের সেই প্রমাণ কোথায়?

কঙ্কাল নিয়ে লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগের 'মার্ডার স্কোয়াড'-এর অফিসাররা মাথা ঘামাতে শুরু করেন। কঙ্কালটি কার তা সাব্যস্ত না হলে পঞ্চম শুক্লার নিখোঁজ হওয়ার রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। রামলোচন তাঁদের কাছে পঞ্চমকে হত্যার অভিযোগ স্বীকার করলেও আদালতে তাতে কিছু এসে যাবে না। কারণ, পুলিসের কাছে কোন অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি আদালতে ঠিক

তদন্তকারী ইন্সপেক্টর শ্রীঅনিল ব্যানার্জি

গ্রাহ্য করা হয় না। তথ্য, প্রমাণ ও কার্য-কারণই আসল কথা।

বর্তমানে মুচিপাড়া থানার অফিসার-ইন-চার্জ শ্রীঅনিল ব্যানার্জি তখন ওই স্কোয়াডের একজন ইন্সপেক্টর। একদিন কথায় কথায় ওই কঙ্কাল প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার শ্রীপি কে বসুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। শ্রীবসু ডিরেক্টর পাবলিক প্রসিকিউসন হিসাবে অবসর নিয়েছেন। তিনি শ্রীব্যানার্জিকে ইংলন্ডের বিখ্যাত বাক রাক্‌স্টন মামলার বিষয় জানান। ইংরেজ মহিলা শ্রীমতী রাক্‌স্টন এবং তার খুনের মামলা। খুন হয়েছিলেন দু'জন, ইংরাজ মহিলা শ্রীমতী রাক্‌সটন এবং তাঁর চাকরানী। কঙ্কালের হাড় পর্যালোচনা এবং মাথার খুলির ছবি নিরীক্ষণ করে নিহত ওই দুই মহিলাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। রাক্‌স্‌টনের প্রকৃত নাম ছিল রুস্তমজী। ইংলন্ডে স্থায়ী হয়ে তিনি নতুন নাম নিয়েছিলেন। পেশায় ছিলেন ডাক্তার। শ্রীমতী রাক্‌স্‌টন ও চাকরানীকে খুন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে কেটে দু' বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে এক মহিলা ঝুলিতে একটি হাত দেখতে পায়। তারপর পুলিসী তল্লাসীতে নিহত মহিলা দু'জনের বাকি অঙ্গগুলিও পাওয়া যায়। তবে ততদিনে সেগুলি প্রায় কঙ্কালে পরিণত হয়ে গিয়েছে। চেনার কোন উপায় নেই। ঘটনাটি ১৯৩৫ সালের। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গ্লাশ এবং পৃথিবীতে ফরেন-সিক মেডিসিনের পিতা হিসাবে পরিচিত ডাঃ সিডনি স্মিথ কঙ্কালের বিভিন্ন হাড় পর্যালোচনা করে মৃত দু'জন কোন লিঙ্গের এবং তাদের বয়স কত তা যাচাই করেন। তারপর কঙ্কাল দুটির মাথার খুলির ছবির নেগেটিভ এবং ওই দুই মহিলার মুখের ছবির নেগেটিভ নিরীক্ষণ করে দেখা যায়, কঙ্কাল দুটি শ্রীমতী রাক্‌সটন ও তার চাকরানীর। এভাবে খুলি থেকে মৃত ব্যক্তির পরিচয় যাচাইয়ের

ঘটনা পৃথিবীতে এই প্রথম। আদালতের বিচারে রাক্‌স্‌টন দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি পান। এর পর ১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডে ডব্‌কিন মামলা, ১৯৪৭ সালে সিংহলে প্লামবাগো পিট মামলা এবং ১৯৫৫ সালে কানাডায় লেব্রাইজ মামলায় পুলিশ খুলি ও মৃত ব্যক্তির ছবি যাচাইয়ের ব্যবস্থা করে। তারপর কলকাতায় ১৯৬০ সালে।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ রাক্‌স্‌টন মামলার মত ছবি তুলে তারাতলায় ওই কঙ্কালকে সনাক্ত করা যায় কিনা, তা যাচাই করার জন্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির সাহায্য চায়। খুলি ও আলাদাভাবে পাওয়া চিবুকের হাড় এবং নিখোঁজ পঞ্চমের পাশপোর্ট সাইজের একটি ছবি ওই ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছবিটি পোর্ট কমিশনারস-এর আইডেনটিটি কার্ডের

সে সময় ওই ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর অধ্যাপক এন কে সেন এবং ফরেনসিক অ্যান্ড স্টেট মেডিসিনের অধ্যাপক ডঃ এস কে রায় এ ধরনের গবেষণায় বিশেষ আগ্রহী হন। সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। তাতে কলকাতা মেডিকেল কলেজের এনাটমির অধ্যাপকও ছিলেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সেনের চেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশী।

কঙ্কালটি যার তার বয়স চিবুকের কোণের অবস্থিতি, পাছার হাড়ের সংযোগ এবং মাথার খুলির জোড় পর্যবেক্ষণ করে যাচাই করা হয়। এ ব্যাপারে স্কিয়াগ্রাফি পদ্ধতিও অবলম্বিত হয়। বাহু, উরু প্রভৃতি লম্বা হাড় এবং কটির হাড়ের জোড় ইত্যাদি পরীক্ষা করে মৃত ব্যক্তি কতটা লম্বা ছিল তা নিরূপিত হয়। সাব পিউবিক এংগেল, ইলিয়ামের আকার ও চিবুকের হাড়ের কোণের দিকটা দেখে মৃতব্যক্তি স্ত্রী না পুরুষ তা সহজেই যাচাই করা হয়। মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষায় দেখা যায়, মৃতব্যক্তির বয়স ছিল ৩৫, লম্বা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি।

নিখোঁজ পঞ্চমের সঙ্গে এগুলি মিলে যায়। কিন্তু আদালতে তথ্য ও প্রমাণ উপস্থিত করার ক্ষেত্রে এই-ই শেষ কথা নয়। আরও সঠিক তথ্য চাই। দুর্ভাগ্যক্রমে কঙ্কালের বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটাও পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে পঞ্চমের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেত। ছবি তুলে মাথার খুলি পরীক্ষা করার ভাবনা এর পরই।

ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নতুন ধরনের পরীক্ষার পর দেখা যায় কঙ্কালটি পঞ্চম শুক্লার। প্রথমে পাসপোর্ট সাইজের ছবির একটি নেগেটিভ করা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্যামেরার গ্রাউন্ড গ্লাসে সেই নেগেটিভের বিশেষ চিহ্নগুলি সূক্ষ্ম পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তারপর এই চিহ্নগুলি লক্ষ্য করে ছবিটি যেভাবে যেদিকে ছিল ঠিক সেইভাবেই খুলির ছবি তোলা হয়। তারপর নেগেটিভ দুটির একসঙ্গে ব্রোমাইড কাগজে বড় ছবি করে দেখা যায় পঞ্চম শুক্লার মুখের সঙ্গে খুলির ছবি ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছে। অন্য কারও হলে এরকম মিল সম্ভব হত না। কোথাও না কোথাও ফাঁক থেকে যেত।

পঞ্চমকে হত্যার অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানত তদন্ত করেন ইনস্পেক্টর অনিল ব্যানার্জি। অবশ্য এ কাজে অন্য কয়েকজন গোয়েন্দা অফিসারও সাহায্য করেন। পঞ্চমকে যে হত্যা করা হয়েছিল, তা প্রমাণ করাও বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। যে হাড়গুলি পাওয়া যায়, সেগুলিতে আঘাতের এমন কোন চিহ্ন ছিল না যাতে বলা যায় পঞ্চমের মৃত্যু ঠিক কীভাবে হয়েছিল। একমাত্র কঙ্কালের সঙ্গে জলাভূমিতে যে ছুরি পাওয়া গিয়েছিল তাতে রক্তের চিহ্ন ছিল। পরীক্ষার পর দেখা যায় সেই রক্ত মানুষের। এ থেকেই ইঙ্গিত মেলে যে ছুরির আঘাতে পঞ্চম মারা যায়।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪/৩০২ ধারা অনুসারে রামলোচনকে দায়রায় সোপর্দ করা হয়, পঁচিশজনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। ওই দুই ধারা অনুসারেই জুরিরা অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে একমত হন। মামলার রায়ে ৩০২ধারায় রামলোচনের মৃত্যু দণ্ডাদেশ এবং ৩৬৪ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

রামলোচন কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করে। হাইকোর্টের বিচারে তার মৃত্যু দণ্ডাদেশ মকুব হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুসারে পঞ্চমের ছবি এবং খুলির ওই সুপার-ইম্পোজড ফটো গ্রাহ্য করার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন করা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারে এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুসারে ওই ফটো গ্রাহ্য করা হয়।

পঞ্চম শুক্লা খুনের ঘটনাটি নিপুণভাবে তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সম্প্রতি ইনসপেকটর অনিল ব্যানার্জিকে পুরস্কার দেওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে ভারতের নানা জায়গার আরও চব্বিশজন পুলিস অফিসার নানাভাবে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ওই পুরস্কার পাবেন। তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রী ব্যানার্জি একমাত্র।

বেশ গর্বের সঙ্গেই সিগারেটটি ধরিয়েছেন!
Panama 20
■ সিগারেটটি হচ্ছে পানামা। বেশ মোলায়েম এবং ঠাণ্ডা আমেজের। আর তাজা স্বাদে—গন্ধে ভরপুর।
■ সারা ভারতময় লক্ষ লক্ষ ধূমপায়ীর প্রিয় সিগারেট।
■ এই শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাটতির সিগারেট এটি।
■ কী সুন্দর এর প্যাক! ভারতের সর্বপ্রথম পাউচ প্যাক।
পানামা সিগারেট
GTC
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই—৩৬,
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

শার্ঙ্গদেব

গান বাজনা শোনাতে এসে যখন কোনও শিল্পী বলেন—"এখানে কি শোনাবো বলুন—গান বাজনা এখানে কেউ বিশেষ বোঝে না"—তখন কথাটা আমার তেমন ভাল লাগে না। গান বাজনা বুঝতে পারাটা ভাল কথা কিন্তু না বুঝতে পারাটা অপরাধ নয়। অনেকে গান বাজনা শুনতে আসেন কারণ তাঁরা সুর শুনতে ভালবাসেন। কোন রাগ হচ্ছে তার কি কি লক্ষণ বা কোন তাল বাজছে তার ছন্দটা কেমন—সেটা ধরতে পারা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু সব মিলিয়ে যে একটা রসসৃষ্টি হয় তাতে তাঁরা অভিভূত হন।

শ্রোতা সব সময় সাধারণ, তাঁরা সঙ্গীতের বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ নন—শিল্পীকে এইটাই ধরে নিতে হবে। কিন্তু তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পটু, সঙ্গীতকলার পরিবেশনে সুদক্ষ এইটা তাঁকে সব সময় মনে রাখতে হবে। তাঁকে গাইতে বা বাজাতে হবে তাঁর সমস্ত কুশলতা দিয়ে, এবং শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য। যদি সাধারণ শ্রোতার জন্য তাঁর অসাধারণ বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারেন তবেই তিনি ধন্য হবেন। এইটাই হচ্ছে শিল্পীর আদর্শ এবং শিল্পজগতের সবচেয়ে বড় সত্য।

একদা আমার এক খেলোয়াড় বন্ধু আমার কাছে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন। একজন খুব পাকা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবার সুযোগ তাঁর একবার হয়েছিল। তিনি বললেন—"আমার সব সময় মনে হতে লাগল এত বড় একজন দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড় এমনি সহজে খেলে? বার বারই আমার মনে হত লাগল সে ঠিক আমারই মতন খেলছে, কিন্তু আমি তাকে কিছুতেই কায়দায় আনতে পারছি না। আমার সঙ্গে আমারই মতন খেলে সে আমাকে অনায়াসে হারিয়ে দিলে অথচ আমি পদে পদেই বুঝতে পারছিলুম যে সে আমার চেয়ে কত বেশী সিদ্ধ!" অভিনয়ের জগতেও ঠিক এমনিই ঘটে। একজন পাকা অভিনেতার অভিনয় দেখে মনে হয় অভিনয় বস্তুটা তো তেমন কঠিন নয়—কিন্তু সেই স্তরের অভিনয় করা যে কত শক্ত সেটা কার্যক্ষেত্রে টের পাওয়া যায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যে উচ্চস্তরের শিল্পী সে শ্রোতাদের এমনি সহজেই তৃপ্তি দেয়। শ্রোতাকে সে বোঝাতে চায় না তার টেকনিকের ঔৎকর্ষ কোথায়, সে কেবল তার মনকে নিয়ে অতি সহজে খেলে, তার প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে যায় এবং এমন কিছু দিয়ে যায় যা তার প্রত্যাশারও অতিরিক্ত ছিল।

সঙ্গীত একটি বিশিষ্ট কলা যার উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন। অতএব এর কঠিনতম প্রয়োগও এমন হওয়া উচিত নয় যা জনমনোরঞ্জক হবে না। তফাৎ হচ্ছে এই যে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুভব করতে পারবেন প্রয়োগটি কত আয়াসসাধ্য আর একজন সাধারণ শ্রোতা বিস্মিত হয়ে ভাববেন চিত্তজয়ের এত বড় কৌশলও সঙ্গীতের আছে। একথা আমি স্থির বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি যে সমস্ত "টেকনিকেল ডিটেল" ধরে আলাপ থেকে শুরু করে নিবন্ধ সঙ্গীতটুকু যদি শ্রোতার ধৈর্যের অনুপাত বজায় রেখে সম্পন্ন করা যায় তাহলে তা অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ নির্বিশেষে সাধুবাদ অর্জন করবে।

অভিনয়ই বলুন আর সঙ্গীতই বলুন লোকস্বীকৃতিই যে তার প্রধান আদর্শ এটি বার বার বলে গেছেন আমাদের প্রাচীনতম রসোপদেষ্টা আচার্য ভরত। নাট্যশাস্ত্রের মত গ্রন্থের প্রণেতা অতি শাস্ত্রজ্ঞ এবং বিদগ্ধ এই পণ্ডিত সেই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়-শাসিত যুগে নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন যে লোকরুচির প্রতি অবজ্ঞা করা চলবে না। ফাইন আর্টস অর্থাৎ অভিনয়, সঙ্গীত প্রভৃতির ক্ষেত্রে লোকধর্মকে স্বীকার করতেই হবে। তাঁর মতে লোকপ্রমাণই ছিল সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তিনি বলছেন আমরা উৎকৃষ্ট সাহিত্য বা উৎকৃষ্টশিল্প গ্রহণ করতে পারি কিন্তু সে সব প্রয়োগই সার্থক হবে যদি সেগুলি লোকসিদ্ধ বা লোক-সমর্থিত হয়। মহামুনি বলছেন—যেসব শাস্ত্র, ধর্ম, শিল্প এবং ক্রিয়া লোকধর্মে প্রবৃত্ত সেই সবই নাট্যে রূপায়ণের যোগ্য। এখানে লোকধর্ম শব্দটি লোকাচার বোঝাচ্ছে—যা লোকজীবনের সঙ্গে বিনিযুক্ত। অথচ ভরত নিজে ছিলেন নাট্যধর্মী অর্থাৎ রীতি-মত সফিস্টিকেটেড আর্টের সমর্থক। তিনি বিশ্বাস করতেন অনলংকৃত বস্তু ধীমানদের পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তিনি এই দুটির সমন্বয় চেয়েছিলেন অর্থাৎ উঁচু-দরের আর্ট হলেও তা সাধারণভাবে সবাইকারই মনোজ্ঞ হবে—এইটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রাচীন নাটকে সঙ্গীতকেও সেইভাবে বিচার করে প্রয়োগ করা হয়েছিল। প্রাচীন বীণা এবং মৃদঙ্গ বাদনের যেসব আর্ট পরবর্তীকালে জনসমাদৃত হয়েছিল সেগুলি পূর্বরঙ্গ প্রভৃতি বিশিষ্ট নাট্যাঙ্গেই পরিকল্পিত হয়েছিল। সব শ্রেণীর শ্রোতাই এইসব বাজনা উপভোগ করতেন। গানকেও এইভাবেই বিশিষ্ট প্রয়োগের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সঙ্গীতকে কখনও কঠিন স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। যখনই নিয়মকানুন জটিল হয়েছে তখনই তাকে শিথিল করে তার নতুন ফর্ম দেওয়া হয়েছে। "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ "—এই কথাটি অনেকের মুখেই শোনা যায়। এই যে রঞ্জনকার্য এটি কিন্তু

এ যুগের মত সান্ধ্য বা নৈশ আসরে সম্পাদন করা হয়নি। এরও ক্ষেত্র ছিল নাটক। প্রাচীন রাগগুলি গানের সঙ্গে নাটকের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত হয়ে জনমনোরঞ্জন করেছিল বলেই তাদের আখ্যা দাঁড়িয়েছিল রাগ। আবার নাটকেরই বিভিন্ন রসে এবং সময়ে প্রযুক্ত হয়েও তারা আর একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে ক্রমে রাগসঙ্গীতের এক একটা বিশেষ সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। এইসব সংস্কারই সাধারণ জনচিত্তের সন্তোষবিধানের জন্য করা হয়েছিল—সঙ্গীতবিজ্ঞানে পারদর্শীদের জন্য করা হয়নি।

ওস্তাদেরা তাঁদের ছাত্রদের কি শিক্ষা দিয়ে আসছেন জানি না, কিন্তু সাধারণকে শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে শাস্ত্রীয় শিক্ষা। তাঁদের রুচিকে পরিমার্জিত করবার ভারও শিল্পীদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। সঙ্গীতে রসের যে উৎস রয়েছে তাকে তাঁরা উন্মুক্ত করে দেবেন এবং জনচিত্ত সেই রসে পরিস্নাত হবে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে কাম্য বিধান।

অবশ্য শ্রোতাদের সম্পর্কেও কিছু বলবার আছে। সাধারণ শ্রোতা বলতে কিন্তু এমন শ্রোতা বোঝায় না যাদের মধ্যে গ্রাম্যতা দোষ বর্তমান বা যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে উন্মুখ। এমন শ্রোতা আজও যেমন আছে বহু শত বৎসর পূর্বেও তেমনি ছিল। সিদ্ধির প্রতিকূলে এই সমস্ত শ্রোতার একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে বিদগ্ধ শ্রোতার আধিক্য। শান্ত, মর্যাদা-সম্পন্ন, শিক্ষিত, শীলবান শ্রোতাই হচ্ছে আদর্শ শ্রোতা। এই আদর্শ শ্রোতার কাছে শিল্পী তাঁর রসসম্ভার উন্মুক্ত করলে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই।

ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ

ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ

এবারকার সঙ্গীত নাটক একাডেমীর পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতার প্রসিদ্ধ সেতার বাদক ও শিক্ষক ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ সাহেব। তিনি দীর্ঘকাল ধরে কলকাতায় বাস করছেন এবং তাঁর শিক্ষায় বহু কৃতী ছাত্র উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর সুনাম রক্ষা করছেন। সর্বতোভাবে উপযুক্ত এই প্রবীণ অধ্যাপকের সম্মান সময়োচিত এবং সঙ্গত হয়েছে।

ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ একটি প্রাচীন সঙ্গীতনিষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুরবাহার এবং সেতারে তাঁর শিক্ষা তাঁর পিতা ওস্তাদ আশিক আলী খাঁ সাহেবের কাছে। ওস্তাদ আশিক আলী তাঁর পিতৃব্য বেনারসের রাজসভার বীণাবাদক ওস্তাদ ওয়ারেশ আলী খাঁর কাছে বীণার অঙ্গে সুরবাহার শেখেন এবং সেতার শেখেন মহীশূরের সভাবাদক ওস্তাদ বরকতুল্লার কাছে।

ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ বাল্যকাল থেকেই প্রতিভার পরিচয় দেন। বারো বৎসর বয়সে বেনারসে সেতার বাজিয়ে বহু গুণী শ্রোতার প্রশংসা তিনি অর্জন করে-ছিলেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে শিক্ষায় উন্নতিলাভ করে দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আজ অবধি তিনি ভারতের প্রায় সব বড় বড় সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। আকাশবাণীর অখিল ভারতীয় কার্যক্রমেও কয়েকবার সুরবাহার এবং সেতারের অনুষ্ঠান করেছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি ১৯২৯ সাল থেকে যুক্ত আছেন। এখানকার শ্রোতা ও গুণগ্রাহীদের কাছে তাঁর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

দিনকয়েক আগে এক সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। সঙ্গীতে নূতনত্ব সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন হলেও আজকাল যেভাবে সঙ্গীতের শুদ্ধতাকে অবহেলা করা হচ্ছে তার সমর্থক নন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রকৃতপক্ষে এইভাবে নূতন কিছুই সৃষ্টি করা যায় না—স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। তাঁকে শিষ্যদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত বলে মনে হল। অধ্যাপনার প্রতি এত অনুরাগ এবং ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ কামনা গুরুদের মধ্যে আজকাল দুর্লভ। কিন্তু ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁর মধ্যে এটি লক্ষ্য করে সুখী হয়েছি। একাডেমীর পুরস্কারে তিনি আনন্দিত কিন্তু আরও বেশী আনন্দিত হবেন যদি প্রবীণ সঙ্গীত সেবীগণ একাডেমীর আনুকূল্যে নিশ্চিন্ত-অধ্যাপনার সুযোগ নিয়ে বসবাস করতে পারেন। যেসব গায়ক বাদক প্রাচীন এবং অশক্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে তিনি সঙ্গীত নাটক একাডেমীকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ করেন।

সেতার শিল্পী জয়া বসু ও সঙ্গতে শ্যামল বসু

বিদেশে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল

সম্প্রতি একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের সাংস্কৃতিক চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, পোলান্ড, পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন শহরে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন। রাশিয়ার কাজাগস্তান, তাজাগস্তান, তুর্গমেনিস্তান, লেনিনগ্রাড, মস্কো প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল ও মংগোলিয়া অনুষ্ঠান শেষ করে এই সাংস্কৃতিক দলটি পোলাণ্ডে আসেন। গত ২৮শে নভেম্বর ওয়ারশর বিখ্যাত অপেরা হাউসে এ'দের অনুষ্ঠান হয়। এই দলের অন্যতমা শিল্পী প্রসিদ্ধা সেতারবাদিকা শ্রীমতী জয়া বিশ্বাস (বসু) ও প্রখ্যাত তবলাবাদক শ্রীশ্যামল বসুর অনুষ্ঠান ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিড়ম্বনা

বিশ্বজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথ সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত সংস্কৃতির কতকগুলি মূলসূত্র অনুসরণ করতেন। রূপকের ভাষা ব্যবহার করে তিনি জীবনকে ছন্দোময় করে তোলার কথা বলেছিলেন। এ-হেন উদ্দেশ্যের দাবী হলো জীবনের প্রতিটি বিষয়—ঘটনা অনুষ্ঠানকে সুচারু সুষম রূপদান; অর্থাৎ এদের সুন্দর অথচ উপযুক্ত উপকরণে সাজিয়ে তোলা। ব্যক্তিগত এবং বিশেষত সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার একটি প্রধান উপকরণ বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন গানকে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ এবং নানা উৎসবের যোগ্য গান রবীন্দ্রনাথ বেঁধেছিলেন এই কারণেই। কিন্তু তার উপযুক্ত ব্যবহার নানাক্ষেত্রে কী ভাবে হয় সে-সম্বন্ধে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন। কারণ তার ফলে রবীন্দ্র সংস্কৃতির একটি মূলসূত্র বর্তমানে দেশে কতটা পীড়িত হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। বিবাহবাসরে "মনে করো শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর" গান করার গল্প বহুকাল ধরে আমাদের হাসির খোরাক যুগিয়ে আসছে। পাঠক-পাঠিকারা বিবেচনা করবেন পরের দৃষ্টান্তগুলি—এদের সত্যতা সম্বন্ধে আমি সবরকম শপথ করতে প্রস্তুত—তার চেয়ে কম যায় কিনা।

শ্রাদ্ধ বাসরের জন্য রবীন্দ্রনাথের একাধিক গান আছে। তার কোন কোনটি সাধারণভাবে দুঃখ এবং বিশেষত মৃত্যুর দুঃখকে কেন্দ্র করে; কিছু হলো মৃত্যুর বিভিন্ন রূপের ওপরে "সমুখে শান্তি পারাবার" এই রকম একটি গান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর পরে গানটি যেন গীত হয়—এই অনুরোধ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজও বৈশাখ মাসে যখন দেশে ল্যাঙড়া আমের সঙ্গে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের মরশুম দেখা দেয় তখন ওই গান বহু সভাতেই শুনতে পাওয়া যায়। এই সূত্রে মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর শ্রাদ্ধের গান বাছাই-এর কথা। প্রথম গান "সমুখে শান্তি পারাবার" হবে শুনে কলকাতার এক কৃতী রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশারদ যিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে "ফুল বলে ধন্য আমি" গানটি বৃক্ষরোপণ উৎসবের বলে ধার্য করেছিলেন—সুগম্ভীর প্রস্তাব করেন—"অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া" গানটিও ওই শ্রাদ্ধবাসরে গীত হোক। গানটিতে যে "আমরা দুজনা যাত্রী" কথাগুলি আছে এবং গীতবিতানে এটি প্রেম-প্রকৃতি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সেই তুচ্ছ তথ্যগুলি বিবেচনা করার প্রয়োজন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশারদ মনে করেন নি। অনুরূপ সঙ্গীতবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন জনৈক গায়ক এক স্বামীহারা মহিলাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যখন তিনি গান ধরেছিলেন—"তবু মনে রেখো—যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।"

বিদায় অভিনন্দন সভা আজকাল প্রায়ই হয়। উক্ত সভায় কী গান হবে? মনে আছে এমন একটি সভায়—যাতে বিদায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলাম আমি—এক গায়িকা ধরলেন—"যদি হল যাবার ক্ষণ দিয়ে যাও শেষের পরশন।" শেষের পরশন দেবার এহেন প্রকাশ্য আহ্বানে কিম্বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওই আশ্চর্য যোগ্য ব্যবহারে—যে কারণেই হোক, কান লাল হয়ে উঠেছিল। বিদায় দান সভায় আরো অনেক গান শুনেছি। যথা "পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই", "আমি যাব না গো অমনি চলে, মালা তোমার দেব গলে," "কেন ধরে রাখ, ও যে যাবে চলে মিলনযামিনী গত হলে," 'যাবার বেলায় শেষ কথাটি যাও বলে'—এই গানের শেষাংশ "হায়রে অভিমানিনী নারী বিরহ হলো দ্বিগুণ তাঁর"—ইত্যাদি। সকলেই স্বীকার করবেন সভাগৃহে এইসব গান নারী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলে যাঁদের বিদায় দেওয়া হচ্ছে তাঁরা সবিশেষ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের মিত্রতা যথেষ্ট আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু চেস্টার বোলস সাহেবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন উপলক্ষে কোন মহিলা যদি "ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী" গানটি ধরেন তাহলে যে পি এল ৪৮০-র দান উদ্বেলিত হয়ে উঠবে সেটা মনে করা বোধহয় সমীচিন হবে না।

স্বর্গত ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অভ্যর্থনা জানানোর উপযোগী গান কি রবীন্দ্র গীত ভাণ্ডারে আছে? বরোদারাজ সয়াজীরাওকে স্বাগত করার জন্য যদি গান থাকতে পারে

তবে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির জন্য গানও খুঁজে পাওয়া উচিত। পাওয়া গেলও। "জয়তু জয় জয় রাজন বন্দি তোমারে।" কাল মৃগয়া গীতিনাট্যের দশরথের উদ্দেশ্যে শিকারীদের এই গান—"কে আছে তোমা-সমান। ত্রিভুবন কাঁপে তোমারি প্রতাপে" ইত্যাদি শুনে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙলা সংস্কৃতির প্রতি সম্ভবত আবার অনুরক্ত হয়েছিলেন।

মহাত্মাজির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন গান রচনা করেন নি যদিও এমন রবীন্দ্র-সঙ্গীত আছে যা গান্ধীজীর সাধনা এবং মহিমার প্রতি প্রশস্তি বলা চলে।' তবে 'বাকি আমি রাখব না' গানটি সম্ভবত মহাত্মাজির কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নি। যদিও গানটি মোহনদাস গান্ধীর স্মৃতিসভায় গীত হতে শুনেছি। কারণটা বোধহয় এই যে গানটির অন্তরায় আরম্ভ আছে—'ওগো মোহন তোমার উত্তরীয়...।' গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের অনুষঙ্গ আছে—তাঁর প্রিয় গান হিসেবে। যেমন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায়।' ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গেও গান্ধীজির যোগ সর্ববিদিত। কিন্তু সেই হেতু ১৫ই আগস্ট জাতির নবজীবনের দ্যোতক স্বাধীনতা দিবসে "জীবন যখন শুকায়ে যায়" গাওয়া চলে না, কিন্তু চলে।

জহরলাল নেহরুকে অবশ্য ঠিক এইভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের খপ্পরে পড়তে হয় নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের গানে জবা এবং লালের উল্লেখ থাকলেও জবা থেকে হরণ-করা লালের কথা নেই। "নেহার লো সহচরি" গানটিকে হয়তো নেহরু প্রসঙ্গে ব্যবহার করে ফেলতেন কেউ কেউ। সেটা হয় নি, সম্ভবত মনে পড়ে নি বলে।

তারপর ধরুন অন্ধদের বিনোদনের জন্য আয়োজিত জলসা। শ্রোতাদের প্রথম কয়েক সারি জুড়ে বসে আছেন তাঁরা নির্মম ভাগ্যের তাড়নায় যাঁরা দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিত। গান হলো—"অন্ধজনে দেহ আলো", এবং "আমি যখন ছিলেম অন্ধ!" বিনোদন সভায় ক্রমাগত অন্ধত্বের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ তাঁদের চিত্তে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সেটা অনুমেয়। একই অবস্থা হয় যখন পল্লীসংস্কারের উদ্দেশ্যে আহূত পল্লী-বাসীদের সমাবেশে গান হয়—"যেথায় থাকে সবার অধম।"

বীরভূমের মাটিতে টিউবওয়েল খোঁড়া দুরূহ। তিরিশের দশকের শেষে কোন এঞ্জিনিয়ার যখন শান্তিনিকেতনে টিউব-ওয়েল বসাতে সফল হলেন তখন রবীন্দ্রনাথ যে-আকাশবিহারী নীরদবাহন জল ধরার কঠিন তিমিরতলে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল তাকে পাষাণদুয়ার টুটে কত যুগ পরে ছুটে আসতে দেখে আনন্দে গান রচনা করে-ছিলেন। সেই মাটির তলার জল-বিষয়ক গানটি কলকাতার এক অজস্র ছাত্র-ছাত্রী-সমন্বিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইস্কুলের তরফে যখন গাওয়া হলো বর্ষাবরণ উৎসবে তখন রবীন্দ্রনাথ স্বকর্ণে তাঁর গানের এমন সুষ্ঠু প্রয়োগ শুনে গেলেন না ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি।

বাঙলাদেশের — কলকাতার — একটি প্রতিষ্ঠান অবশ্য এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশিষ্ট। তার নাম "আকাশবাণী কলকাতা।" এখানে রবীন্দ্র সংগীতের সুর নিয়ে শুনেছি হঠাৎ খুব সচেতনতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু কথার সম্বন্ধে এমন নির্বিকার ঔদাসীন্য আর কোথাও দেখা যাবে না। শীতকালের হি হি হিমের মধ্যে শোনা যাবে "আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে, বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে।" বর্ষায় বসন্তের, বসন্তে শরতের, শরতে গ্রীষ্মের গান পরিবেশন এই প্রতিষ্ঠানের অনন্যসাধারণ কীর্তি। কণ্ট্রাক্ট-ফর্মে গায়ক-গায়িকারা বহু পূর্বেই জানিয়ে দেন কী গান তাঁরা করবেন। সেই গান বেতার কর্তৃপক্ষ যেহেতু না মেনে নিলে পরিবেশিত হতে পারে না, অতএব তাঁদের সহায়তা এবং আনুকূল্যেই যে এমন কাণ্ড ঘটছে সে কথা বললে কোন ভুল হবে না। তবে এর একটা ভাল দিক-ও যে থাকতে পারে সেটা ভোলা উচিত নয়। হয়তো গণ-সেবার আদর্শ নিয়েই আকাশবাণী এইভাবে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরের প্রচণ্ড গরমে "আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে" শুনলে তাপদগ্ধ শরীর কিছুটা জুড়িয়ে যেতে পারে এরকম একটা ধারণা হয়তো বেতার কর্তৃপক্ষের আছে। অবশ্য এ সত্ত্বেও ভোরবেলা "ও আমার চাঁদের আলো" গান প্রচারের উপযোগিতা খুব সহজে বোধগম্য হয় না।

রবীন্দ্রনাথের রচনা ভিত্তি করে গীতি-নাট্য এবং নৃত্যনাট্য যা সব আজকাল বাজারে প্রচলিত তার অন্যতম হলো "ভানু সিংহের পদাবলী।" আরেক ধরনের অসংগতির পরিচয় মিলবে এতে। একটি মীরার ভজন এই নৃত্যনাট্যের অন্যতম আকর্ষণ। রবীন্দ্র-নাথের গান নয়, মীরার ভজন বলেই যে এটিকে নিতান্ত খাপছাড়া লাগে তা নয়। বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাসের পদ-ও এতে চলে, তা বেমানান ঠেকে না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক পালায় মীরার তাঁর প্রভুর প্রতি বিশিষ্ট মনোভাবের প্রক্ষেপ না ইতিহাস, না দর্শন, না নন্দনতত্ত্ব কোন দিক থেকেই সমর্থন পায় না। ভানু সিংহের পদাবলীর নৃত্যনাট্যে রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের কোন হাত যে কস্মিনকালেও ছিল না তারই প্রমাণ হয় এর থেকে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা এবং কালি-দাসের মেঘদূত কেন্দ্র করেও নানা নাট্যানুষ্ঠান হচ্ছে যার প্রধান অবলম্বন রবীন্দ্রনাথের গান। রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রয়োগের অপব্যবহার এতেও কিছু কম হচ্ছে না। তার সব দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। গায়ক, শিক্ষক এবং প্রধানত শ্রোতাদের রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিড়ম্বনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উল্লিখিত উদাহরণগুলিই বোধহয় যথেষ্ট হবে।
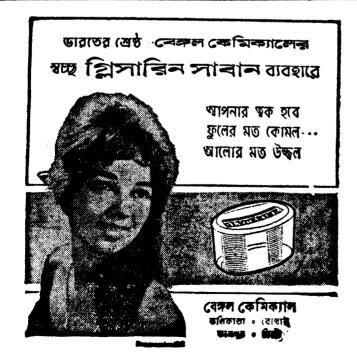
শ্রীমতী মাইকেল স্টুয়ার্ট

যে কারণেই হক ব্রিটিশ সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অ্যাফেয়ার্স মাইকেল স্টুয়ার্ট সাহেবকে চট করে ফিরে যেতে হলো। শ্রীমতী স্টুয়ার্টের নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি। ভারতবর্ষের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন ধারণা করবার সুযোগ কই? সরকারীভাবে আনাগোনা আর আলাপে কি আর দেশের মেয়েকে সত্যি সত্যি জানা যায়। খুব সত্য কথা। অথচ আজকের জগতে বেশীর ভাগ জানাজানি বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ের মাথামাথি হয় মেপে মেপে। কাজেই ভাবছিলাম হয়তো শ্রীমতী স্টুয়ার্ট আর একটু থাকতে পারলে ভাল হত। অন্তত এ দেশের মহিলা সমাজ সম্বন্ধে তাঁর সচেতন মন কিছু সংগ্রহ করে নিতে পারতো। তিনি নিজে ধীমতী মহিলা। কর্মকুশলতায় স্বামীর সুযোগ্য সহধর্মিণী। গত বিশ বছর স্টুয়ার্টসাহেব পার্লামেন্টের সদস্য। তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র ফুলহ্যামে শ্রীমতী স্টুয়ার্টকে সবাই চেনে, সবাই ভালবাসে। তিনিও দারুণ আগ্রহে তাদের সুখ দুঃখের খবর নেন। এখন এই মন্ত্রীর দায়িত্বেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

মেরি এলিজাবেথ স্টুয়ার্ট জাস্টিস অফ পিস্ এবং একটি শিশু আদালত-এর চেয়ারম্যান। বয়স্কদের শিক্ষায় তাঁর সময়ের অনেকটা নিয়োগ করেন। তাঁর কুমারী নাম ছিল 'বার্কিনশ'। বার্মিংহ্যামে কিং এডওয়ার্ড স্কুল ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শিক্ষায়তন বেডফোর্ড কলেজে পড়াশুনো করেন। দর্শন শাস্ত্রের স্নাতক হয়ে কলেজ ত্যাগ করার পর workers' Educational association বা WEA-তে অধ্যাপনা করেন। এই অধ্যাপনাকালেই ভাবী স্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। স্টুয়ার্ট সাহেব পড়াচ্ছিলেন বিদেশতত্ত্ব বা foreign affairs আর মেরি এলিজাবেথ বার্কিনশ' বোঝাচ্ছিলেন সমাজবিদ্যা বা sociology। ১৯৪১ সালে ওঁদের বিবাহ হয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দারুণ দুর্যোগের কাল। স্বামী স্ত্রী পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে আপন আপন দায়িত্বভার নিলেন। একত্র ঘর বাঁধার দিন দূরে রইল। স্টুয়ার্ট সাহেব যোগ দিলেন ফৌজে, শ্রীমতী স্টুয়ার্ট গেলেন women's auxiliary Air Farce-এ। ১৯৪৫ সালে পার্লামেন্টের নির্বাচন প্রার্থী হয়ে স্টুয়ার্ট সাহেব দেশে ফিরলেন। স্বামীস্ত্রী সংসার পাতলেন লণ্ডন শহরে।

সংসার সামলিয়েও শ্রীমতী স্টুয়ার্ট

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর চিরকালের দরদ। আর্থিক, পারিবারিক বা অন্য কোন কারণে যাদের উপযুক্ত শিক্ষালাভ সম্ভব

শ্রীমতী স্টুয়ার্ট

হয়নি তদের দুর্ভাগ্যে তাঁর সহানুভূতি সম্পূর্ণ আছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি J. P মনোনীত হন। কয়েকটি হাসপাতালের তিনি পরিচালকমণ্ডলীর নেত্রী বা চেয়ারম্যান।

ফেবিয়ান সোস্যাইটির মত বিদগ্ধ সমিতির জাতীয় পরিচালকমণ্ডলীতেও শ্রীমতী স্টুয়ার্ট বহু বছর কাজ করেছেন এবং ১৯৬৩ সালে তিনি ফাবিয়ান সোস্যাইটির চেয়ারম্যান হন। ফাবিয়ান সমিতির গবেষণা বিভাগে সক্রিয় অংশ নিয়ে পুস্তিকা প্রকাশও করেছেন। যুব সমাজের অবসর বিনোদন সম্বন্ধে কিছু গবেষণার কাজে শ্রীমতী স্টুয়ার্ট নেত্রী ছিলেন। প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামান্য পরে। তারপর দ্বিতীয় রিপোর্ট হয় ১২ বছর পরে। ১২ বছর পরের স্কুলের ছেলেমেয়ের মধ্যে কি প্রভেদ হয়েছে তার চমৎকার এক চর্চা। আর একটি চর্চাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গবেষণার ফল। এই পুস্তিকাও প্রকাশ হয় WEAর দ্বারা। আলোচনার আখ্যা "The success of the first born" বা প্রথম সন্তানের কৃতকার্যতা। স্কুল এবং স্কুলের পরের জীবনে জ্যেষ্ঠ সন্তানের কৃতিত্ব ছিল আলোচনার বিষয়।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই পায়ে হেঁটে বেড়াতে ভালবাসেন আর ভালবাসেন পড়তে। ঘরসাজানোর ব্যাপারে তাই এই ঘরনীটির সমস্যা বই নিয়ে। রাশি রাশি বই। গুছিয়ে রাখতে প্রচুর পরিশ্রম আর যথেষ্ট জায়গা দরকার। ওঁদের চেলসীর বাড়িতে তাই ঘরে ঘরে ছাদ পর্যন্ত বই-এর তাক। কোথাও বা তাকে পাশাপাশি দুই সারি বই। শ্রীমতী মেরী পড়তে ভালবাসেন আর পড়ার ব্যাপারে উদার। সব পড়েন। তবে সমাজতত্ত্ব, সমাজ কল্যাণ আর শিক্ষা তাঁর নিজস্ব এলাকা বলে বোধ হয় আগ্রহ তাতেই বেশী!

শ্রীমতী স্টুয়ার্টকে দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। এত বিদ্যা ও গুণের অধিকারিণী হয়েও তিনি স্বামীর অনুগামিনী। আমাদের আদর্শের মতই তিনি পতির ছায়া ভিন্ন নন। কিপলিং যেন কোথায় বলেছিলেন প্রত্যেক সার্থক মানুষের আড়ালে থাকে একটি আত্মগোপন করা নিঃস্বার্থ নারীর উজাড় করা আত্মদান। ঠিক তেমনি করে মধুর এই মহিলা স্বামীর পাশে সুন্দর ও সম্পূর্ণ। অহংকারের লেশমাত্র নেই। কথাবার্তাও সরল ও সহজ। আমার একটি বন্ধু তাকে পেয়ে প্রশ্ন করেছিল—

ইংলণ্ডের মেয়েরা প্রগতিশীল হয়েছেন বহু দিন, তবু তারা কেন জাতীয় জীবনের সর্বত্র উচ্চপর্যায়ে বেশী নেই। শ্রীমতী স্টুয়ার্ট তাতে বলেছিলেন, 'বোধ হয় মেয়েরা পারিবারিক জীবনের মূল্য বেশী দেয়। বান্ধবী আমার ছাড়বার পাত্রী নন। চট করে বললেন তবে কেন ইংলণ্ডে বিবাহবিচ্ছেদ এত বেশী। শ্রীমতী একটু ভেবে বললেন, তাই তো সে কথা তো চিন্তা করি নি। কূটনীতির বাইরে অকপট জবাব।

ট্যাক্সের খাতায় কর্মীকন্যার কথা

ওলন্দাজ সংসারে শুনেছি গৃহস্থালীর দারুণ মান। ঘরের কাজ নিপুণভাবে করাকে অন্য কাজের চেয়ে উচ্চ আসন দেওয়া হয়। তাই গোটা ইউরোপের বিবাহিত মহিলাদের বাইরে কাজ বা উপার্জনকারীদের চেয়ে ও'দের উপার্জনকারী ঘরনীর সংখ্যা কম। কিছুদিন আগে যে হিসেব নেওয়া হয় তাতে দেখা গেছে উপার্জন করার জন্য ঘরের বাইরে কাজ করা বা চাকরি করা বিবাহিতা মহিলা মাত্র শতকরা ৭·১। পরে আর একটি পরিসংখ্যানে প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে এই সংখ্যা বাড়ছে। শতকরা প্রায় ১৮টি বিবাহিত মহিলা কাজ করেন ঘরের বাইরে। আয়কর দাতাদের তালিকা ঘেঁটে এই খবর জানা গেছে।

১৯৬০ সালে আয়করের আইনে সামান্য পরিবর্তন করা হয়। আগে নারীর উপার্জন স্বামীর উপার্জন এক করে হিসেব করা হতো। এখন হিসেব হয় আলাদা। নারী আয়ের এক-তৃতীয়াংশ নিজের জন্য রেখে তবে স্বামীর আয়ের সঙ্গে নিজের আয় যোগ দিতে পারেন। তারও নিম্নতম ও উচ্চতম অঙ্ক আছে। এই হিসাব থেকে নারী উপার্জনকারিণীদের সংখ্যা পাওয়া যায়। অবশ্য আদমশুমারির হিসাব আর আয়করের হিসাব এক হতে পারে না। আদমশুমারিতে যে মেয়ে সপ্তাহে অন্তত ১৫ ঘণ্টা কাজ করেন তাকেই উপার্জনকারিণী আখ্যা দেওয়া হয়। অথচ ট্যাক্সের হিসাব অন্যরকম। ঠিক কতটা কাজে কি উপার্জন তার খবর নেবার কথা আয়করের হিসাবের নয়।

গড়পড়তা আয় একটি কর্মী-কন্যার বছরে প্রায় ২০০৯ গিল্ডার বা বছরে ৩৮·৬৪। ওলন্দাজ গিল্ডার-এর মূল্য মার্কিন ডলারের হিসাবে হলো ১ ডলার= ৩·৪০ গিল্ডার, কাজেই আয় ভালই বলতে হবে। ১৮·৪ কাজ করা মেয়ে হল্যাণ্ডের মত ছোট দেশে মোট ৪৯৭·৬৫৮-এর মত। তার মধ্যে ২৫১ জন চাকরি করেন, স্বামীকে কাজে সাহায্য করেন ২০৪·০০০ মেয়ে। স্বামীর সাহায্যকারিণীর পারিশ্রমিকও হিসেব করা আছে। ট্যাক্সের জন্য সাহায্যকারিণী সহধর্মিণীকে বছরে ২২৫০ গিল্ডার দেওয়া ন্যায্য মনে করা হয়। যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারলে বেশী দেওয়াকে মেনে নেওয়া হয়। স্থান বা ক্ষেত্র বিশেষে কম দেওয়াও হয়।

স্বামীর উপার্জন প্রচেষ্টায় সাহায্যকারিণী বেশীর ভাগই ক্ষেত খামারে বা ছোট দোকানপাটে। ক্ষেত খামারে আবার মেয়েরা সকলে সবসময় কাজ করেন না। কোন কোন মৌসুমে সাহায্য করেন। কাজেই সেন্সাসে তাঁরা উপার্জনকারিণীর তালিকায় থাকেন না, থাকেন ট্যাক্সের খাতায়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষের আয় মেয়ের চেয়ে বেশী। সেখানেও হিসাব করে দেখা গেছে গড়ে মেয়ের উপার্জন যৌথ হিসাবের পঞ্চমাংশের কম। পঙ্গু বা অসুস্থ স্বামী কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম।

উপার্জনকারিণী ঘরনীর মধ্যে শতকরা ২৪টির বয়স ৩০-এর নীচে। ৩০ থেকে ৩৯-এর মেয়ে ১৮·২। ৪০—৬০-এর মধ্যে সংখ্যা হয় বিবাহিত মহিলার ২১·৫। আশ্চর্য এই যে, সন্তান জন্ম সময়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে মায়ের কর্মজীবন চলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জননী সন্তানের শৈশব না কাটা পর্যন্ত ঘরেই থাকতে চান।

শ্রীমতী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর ৩৩তম বার্ষিক প্রদর্শনী

খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীঅতুল বসু সম্প্রতি অ্যাকাডেমির ৩৩তম বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অন্যান্য বৎসরের মত এবারের প্রদর্শনীও প্রায় প্রতিনিধিমূলক। প্রায় প্রতিনিধিমূলক বললাম এই জন্য যে, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পীদল এই প্রদর্শনীতে যোগদান করলেও শহরের একটি তরুণ শক্তিশালী শিল্পিগোষ্ঠীর কোনও সঙ্ঘের কাজ প্রদর্শনীতে দেখিনি। ছবি মনোনয়ন ব্যাপারে বিচারকমণ্ডলী যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, সেটি চিত্রসংখ্যা দেখেই বোঝা যায়। কর্তৃপক্ষের হাতে মোট কতগুলি ছবি প্রথমে এসেছিল, ক্যাটালগে তার উল্লেখ নেই। বলা বাহুল্য আগত চিত্রের সংখ্যা ও সেই অনুপাতে নির্বাচিত চিত্রের সংখ্যা বিচার করলে বিচারকমণ্ডলীর বিচার মানদণ্ডের আভাস পাওয়া যায়। প্রদর্শনীতে মোট ৩৫৮টি নিদর্শন স্থান পেয়েছে ও অ্যাকাডেমির পাঁচটি গ্যালারীই চিত্রভাস্কর্য সম্ভারে পূর্ণ হয়ে গেছে। বিশেষ করে আয়তনের অতিরিক্ত ছবিতে দু একটি গ্যালারী পূর্ণ করার ফলে স্বভাবতই দৃষ্টি ব্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও পরিমিত স্থানের মধ্যে কর্তৃপক্ষ যেভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন, তাতে তাঁদের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রদর্শনীটি পরিক্রমা করলেই সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার ধারাটুকু সকলের চোখে পড়ে। অধিকাংশ রচনাই ব্যক্তিগত মনোভাবের পুনরাবৃত্তি, বিষয়বস্তু অপেক্ষা রচনাক্ষেত্রের কারুকার্যের ওপরেই সকলে প্রাধান্য দিয়েছেন। অঙ্কনরীতি আধুনিক তথা অনেক স্থলে বিমূর্ত ও সমাবিমূর্ত এবং মাধ্যমের মধ্যে তেল ও জলরঙ ছাড়া সিমেণ্ট, বালি, কাঠের গুঁড়া, লোহা পেরেকের ব্যবহার দেখা যায়। গত বছরের মত এবারেও অসাধারণ কোনও রচনা চোখে পড়েনি, তবে একথা সত্যি যে, এবারকার প্রদর্শনীর সাধারণ মান অপেক্ষাকৃত উন্নত। পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে হুসেন, আলমেলকার, চিণ্তালকার, সোমনাথ হোড়, হরেন দাস, লক্ষ্মণ পাই, জোশি, পরিতোষ সেন, রথীন মৈত্র, পানিকার, সুবল পাল ও ইন্দু দুগারের সাক্ষাৎ মেলে। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে জীবন আদালজা, ধীরাজ চৌধুরী, সমর ভৌমিক, গণেশ হালুই, অমরেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল দত্ত, জেরাম প্যাটেল, অনীতা রায়চৌধুরী ও মহিম রুদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

উত্তরদিকের গ্যালারীতে প্রথমেই নীলরেখা প্রধান লক্ষ্মণ পাই-এর রচনা (২১৭) চোখে পড়ে। ঐরাবত-এ (১৫৩) বৈশিষ্ট্য থাকলেও হুসেনের কোনও উৎকৃষ্টতর রচনা দেখবার আশা করেছিলাম। পরিতোষ সেন পাঠিয়েছেন দুটি ড্রয়িং (৩১৩, ৩১৩এ)—দুটিতেই তাঁর অঙ্কনশৈলী পরিস্ফুট হয়েছে। রথীন মৈত্রের রচনা (১৮৭) অলঙ্কার জাতীয়, এটিতে রঙীন কাচের শোভা ও কারুকার্য ফুটে উঠেছে, সুনীলমাধব সেনের রচনা দুটিতে (৩১৭-১৮) নতুন কোনও বৈশিষ্ট্য দেখলাম না, যদিও কারিগরশিল্পী হিসাবে প্রথমটিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক মাধ্যমে রচিত একটি কাজ অনেকেরই ভাল লাগবে—সরিৎ নন্দীর কম্পোজিশন (২১৫)। আরও একটি কাজ এই গ্যালারীতে সকলের নজরে পড়ে—সমর ভৌমিকের কম্পোজিশন (৩৮)। পশ্চাদ্ভূমিটুকু নামাবলীর বিশেষ রঙে ভরে ফেলে রেখা প্রধান প্রতীক দ্বারা তিনি বিষয়বস্তুটুকু ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে হঠাৎ একটি ছবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস—শিবশঙ্কর কুণ্ডুর এগসেলার (১৮১)। রচনাক্ষেত্রে বিচিত্র কারুকার্যের মধ্যে শিল্পীর প্রতিভার স্বাক্ষর দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে অর্পিতা সেনগুপ্তের জি স্পার (৩২০) উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ছবির মধ্যে ৮৩ (সুকুমার দাস), ৩৪ (শান্তনু ভট্টাচার্য), ৮৭ (উজ্জ্বল দাস), ১১৭ (নির্মল দত্ত) ও ২০৭ (অজয় মুখার্জি)-এর নাম করা যায়।

নবজাত —প্রণব মজুমদার

পশ্চিমদিকের গ্যালারীতে মিশ্র রীতির নিদর্শন দেখা যায়। এখানে গোপাল ঘোষের দুটি রচনার (১২৭-২৮) মধ্যে প্রথমটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। এর পরেই গণেশ হালুই-এর দুখানি ছবি (১৪৪-৪৫) সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবলমাত্র সাবলীল কয়েকটি তুলির টান ও জলরঙ মাধ্যমে শিল্পী বহির্দৃশ্য জাতীয় রচনা দুটিতে সার্থক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে গ্রাফিক জাতীয় দুটি রচনার (২৩০-৩১) নাম করা উচিত। দুটিই প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং দুটির মধ্য দিয়েই বসন্ত পণ্ডিত বিশিষ্ট রঙ ব্যবহার প্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন। নীল রঙের অতিরিক্ত প্রাধান্য না থাকলে সম্ভবত রমেন কুণ্ডার নর্থ বেঙ্গল ল্যাণ্ডস্কেপ (১৭৮) সার্থক হয়ে উঠত। অপরাপর নিদর্শন সাধারণ স্তরের, এমন কি দুই একটি অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেত।

শান্তির দূত —মদন ভাটনগর

দক্ষিণ দিকের নতুন গ্যালারীতে কয়েকটি

পেণ্টিং —সুনীল দাস
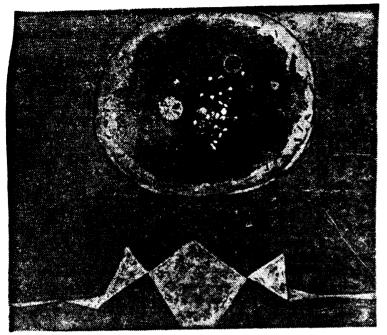
উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক ছবি দেখা যায়—এগুলির অধিকাংশই অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত। এই গ্যালারীর শ্রেষ্ঠ দুখানি রচনা হল সুকুমার দাস-এর (নিউদিল্লী) দুটি ওয়াল পেণ্টিং ১ ও ২ (৮৪-৮৫)। প্রতীক ও লোকচিত্রভিত্তিক দুটি রচনাই রীতি-মুখর (Stylised)। সরল অঙ্কনরীতি ও পরিপ্রেক্ষিত পরিচিতির দিক থেকে চিপ্লোলকার-এর থ্রু দি ট্রাঙ্কস (৬৭) একটি সার্থক সৃষ্টি। ওয়ার্ডস অ্যান্ড সিমবলস-এর (২৩৪) মধ্যে পানিকার তাঁর সমসাময়িক অঙ্কনধারা বজায় রেখেছেন। আর একটি ছোট ছবির দিকেও অনেকের নজর পড়বে—জীবন আদালজার দি ওয়ারিয়র (১)। এটির মধ্যে শিল্পী সৈনিকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানকার অন্যান্য ছবির মধ্যে ২৩৩ (জয়পাল পানিকার), ৩৫৮ (জিতেন্দ্র যাদব) ও ১৭৫ (জয়কৃষ্ণ)র নাম করা যায়।

মধ্যকার গ্যালারীতেও আধুনিক কয়েকখানি রচনা, নিসর্গ দৃশ্য ও গ্রাফিক প্রিন্ট দেখা যায়। গ্রাফিক কারুকার্য ও প্রিন্টের নিত্য নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সোমনাথ হোড় সিদ্ধহস্ত, তাই প্রথমেই তাঁর কম্পোজিশন (১৫০) সকলের চোখে পড়ে যায়। প্রাচীন মন্দিরের রিলিফের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হরেন দাসের দুটি নিদর্শন (৮০-৮১) অনেকের ভাল লাগবে। এছাড়া ১৯৭ (বাণী মিত্র) প্রিন্টও উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা ও ক্ষেত্র কারুকার্যের জন্য প্রণব মজুমদার (১১৩) প্রশংসা দাবি করতে পারেন। অপরাপর রচনার মধ্যে ২৫১এ (আর ডি পুরোহিত), ১০৬ (আর এস ধীর), ২২৩ (অনন্ত পান্ডা)-এর নাম করা চলে।

দক্ষিণ দিকের গ্যালারীতে ভারতীয় প্রথায় রচিত জলরঙ, ওয়াশ ও টেম্পারা রচনা দেখা গেলেও বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির জন্য কয়েকটি অনেকের অবশ্যই চোখে পড়বে। যেমন এম ডি টালির স্কেচ। চাপা রঙ ও ক্ষেত্রকারুকার্যের জন্য নীলিমা দত্তর সংঘমিত্রা (১১৬) প্রশংসাযোগ্য। আল-মেলকার-এর মেনকাতে (৭) শিল্পীর রীতি-মুখর প্রকাশ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া ২৭৬ (রঙ্কনাথ রাউত), ২৮৮ (রথীন রায়) ও ৩২৩ (গুলাবনেশা) নং রচনার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগে মনুমেণ্টাল জাতীয় কোনও নিদর্শন চোখে পড়েনি, তবে কয়েক জনের কাজে সমসাময়িক চিন্তাধারা ও গঠনরীতির সন্ধান পাই। মাধ্যম হিসাবে সিমেণ্ট, কাঠ ও ব্রঞ্জকেই সকলে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বিভাগে দুটি কাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেঃ একটি ফুলচাঁদ পাইন-এর কংকর্ড (২৬১)। এটির গঠন-সৌন্দর্য ও আয়তনিক সমতা দ্রষ্টব্য। অপরটি মদন ভাটনগরের অ্যাঞ্জেল অব পীস (৩৩)। একটিমাত্র বৃক্ষকাণ্ডকে কেটে নানাভাবে খোদাই করে ও সেই সঙ্গে আলঙ্কারিক রূপদান করে ভাস্কর জওহরলাল নেহরুর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বটুকু সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিকল্পনার দিক থেকে সমরেশ চৌধুরীর ইন দি অ্যাকোয়েরিয়ম (৭৫) উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে সত্যেন মজুমদারের টরসো-র (১৯৫) নাম করা চলে। গঠনকৌশলের সুকুমার লালিত্য ও পরিকল্পনার দিক থেকে বিচার করলে এটিকে একটি সার্থক সৃষ্টি বলে মনে হয়। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে ১৩৪ (সুষেণ ঘোষ), ২০৯ (সেলিম মুন্সী) ও ২২৭ (চন্দ্রবিনোদ পান্ডেয়) দ্রষ্টব্য। প্রদর্শনীটি ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত খোলা থাকবে।

*

দেশের কয়েকজন উদীয়মান শিল্পীকে সুযোগ ও উৎসাহদান করে ম্যাক্সমুলার ভবন কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। সম্প্রতি বিড়লা আকাডেমিতে এই জনপ্রিয় সংস্থা শিল্পী সুনীল দাসের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সুনীল দাস সুপরিচিত। বয়স মাত্র ২৯। দশ বছর পূর্বে ২০ বছর বয়সেই তিনি ললিত কলা অ্যাকাডেমির জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ১১টি পুরস্কার লাভ করেন ও এক বছরেই অর্থাৎ ১৯৬০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনী থেকে তিনি আটটি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া আজ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানও তিনি করেছেন। এত অল্প বয়সে অন্য কোনও শিল্পীর এ জাতীয় কোনও রেকর্ড আছে কিনা জানি না। শিল্পীর প্রধান গুণ তিনি অক্লান্ত কর্মী, অবসরটুকু অঙ্কনকার্যেই লিপ্ত থাকেন। বর্তমান প্রদর্শনীতে তাঁর সাম্প্রতিকতম চল্লিশোধর্ব রচনা নিদর্শন দেখা যায়।

সুনীল দাস প্রথমে নাম করেন ঘোড়া এঁকে। রেনেশা-ঘেঁষা ড্রয়িংগুলিতে তিনি শক্তি ও গতিবেগের সম্মিলিত রূপ প্রকাশ করেন এবং সেই সঙ্গে ফুটে ওঠে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস। তারপর স্বভাবতই তিনি শুরু করেন নানা পরীক্ষা। নতুন মাধ্যম ও অঙ্কনরীতির মধ্য দিয়ে তিনি ছবির পর ছবি এঁকে যান ও সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণকে সেগুলি দেখার সুযোগ দেন। তেলরঙ ও জলরঙ, সিমেণ্ট বালি, কাঁড়, লোহা পেরেক মাধ্যমে বিমূর্ত ও সম-বিমূর্ত বহু রচনা তিনি জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং সকলেই শিল্পীর প্রেরণা, উৎসাহ, কর্মক্ষমতা ও বিশেষ করে আত্মপ্রকাশ করার নিত্যনতুন প্রচেষ্টা দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। তবুও মনে হয় নানা মাধ্যমে রচিত তাঁর বিচিত্র রচনাসম্ভারের মধ্যে ক্রমপরিবর্তনের পরিচয় পেলেও অনেকে কোনও স্থায়ী

আটষট্টির খতিয়ান

আটষট্টি সালের আর্থিক অবস্থা মোটের উপর খারাপই ছিল বলা যায়, যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে, অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। অবস্থা খারাপ বলছি এজন্য যে, গত এক বছরেও চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এখনও দেশে ফিরে আসেনি, যদিও ১৯৬৬-৬৭ সালে শিল্পক্ষেত্রে যে মন্দা পরিলক্ষিত হয় তার তীব্রতা অনেক কমেছে। বেকার-সমস্যার তীব্রতা, শিল্প-বিরোধ, শ্রমিক ছাঁটাই, সবই বেড়েছে। কিন্তু চারদিকে অর্থনৈতিক হতাশা দেখা গেলেও আটষট্টি সালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসে এই প্রথম এক বছরে জাতীয় আয় শতকরা নয় ভাগেরও বেশি বেড়েছে। এজন্য কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধিই দায়ী। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ আমরা হইনি বটে, কিন্তু দেশে খাদ্য সরবরাহ অনেক বেড়েছে। শিল্পোন্নয়নে উৎপাদকের অনুপ্রেরণা বাড়াবার জন্যও অনেক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে শিল্প-মূলধনের সরবরাহ বাড়াবার জন্য ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ব্যাংক রেট কমাবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংকের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যাংক রেট কমানো হল। আটষট্টি সাল থেকে বার্ষিক সঞ্চয় পরিকল্পনা (Annuity Deposit Scheme) তুলে দেওয়া হয়েছে, এ বছরেই প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের অন্তর্বর্তী রিপোর্ট। আটষট্টি সালেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (U N C T A D-II)-এর অধিবেশন নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক সাহায্য যাতে আরও বেশী পাওয়া যায় তার জন্য ভারত অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে, কিন্তু মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর থেকে যে হারে বৈদেশিক মূলধন পাওয়া উচিত ছিল, তা পাওয়া যায়নি। তবে জাতিপুঞ্জের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন চলাকালে ভারত কয়েকটি দেশের সাথে নূতন দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। বছরের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও ২৯৮·৫০ কোটি টাকার ঋণ দিতে রাজী হয়েছে এবং আটষট্টি সালে ভারতের যে ৭৫ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করার কথা ছিল তার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। যে নূতন ঋণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে পি এল্ ৪৮০ অনুযায়ী ২·৩ মিলিয়ন টন গম ও অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রী

পাওয়া যাবে এবং তার দামই হবে ১২৫·২৫ কোটি টাকা। ভারতের রপ্তানির পরিমাণ আটষট্টি সালে বেড়েছে এবং ১৯৬৭ সালের অনুপাতে গত বছরের রপ্তানি বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। কিন্তু, বিগত চার মাসে আমরা বন্যার যে তাণ্ডব দেখেছি, তাতে শুধু যে কৃষির উৎপাদনই ব্যাহত হয়েছে তা নয়, বন্যার ফলে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে, শুধু উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির লোকদের পুনর্বাসনের জন্যই প্রয়োজন হবে ৫০ কোটি টাকা। সরকারের উপর যে আর্থিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে তার ভার লাঘব করা একটি বিরাট সমস্যা এবং এ সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা খুব সহজ নয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ১৯৬৮ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে সরকারের পতন হয়েছে—প্রবর্তিত হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসন। স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও কম দায়ী নয়। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিয়েই বলা যেতে পারে, গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক মূলধন বাইরে চলে গেছে, এ রাজ্যে অনেক চালু কারখানা বন্ধ হয়েছে, অনেক শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে—সব কিছুরই পরিণতি হয়েছে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবের মধ্যে।

অর্থনৈতিক নীতির অনিশ্চয়তা দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আটষট্টি সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, সরকার এখনও চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারেননি। গত মে মাসে অধ্যাপক গ্যাডগিল চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখার উপর একটি দলিল তৈরি করেছিলেন। সেই দলিলে বলা হয়েছিল, চতুর্থ যোজনায় জাতীয় আয় প্রতি বছর অন্তত শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে ছয় ভাগ পর্যন্ত বাড়াতে হবে, কৃষির উৎপাদন শতকরা পাঁচ ভাগ করে বাড়াতে হবে, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি বছর শতকরা আট ভাগ করে বাড়াতে হবে, রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে হবে প্রতি বছর শতকরা সাত ভাগ করে এবং জাতীয় আয়ের অন্তত ১২ শতাংশ সঞ্চয় করতে হবে। যে নীতি অধ্যাপক গ্যাডগিল ঘোষণা করেছেন, তা ফলপ্রসূ করতে পারলে দেশের চেহারা অনেকটা পাল্টে যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু মে মাসে যে দলিল প্রকাশিত হয়েছে, ডিসেম্বর মাস পর্যন্তও পাকাপাকিভাবে স্থির হয়নি সেই দলিল গৃহীত হবে কিনা। এটাই কি অর্থনৈতিক নীতির অনিশ্চয়তার পরিচায়ক নয়?

আটষট্টি সালের গোড়ার দিকে জিনিসপত্রের দাম যত বেশী ছিল, শেষের দিকে ততটা ছিল না। দামের উর্ধ্বগতি প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে প্রকৃতির বদান্যতার ফলে। অর্থাৎ, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন যদি আশাতীতভাবে না বাড়ত, তবে জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়া এবং রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া সম্ভব হত না।

আটষট্টি সালে সবচেয়ে বেশী ঝড় বয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে চতুর্থ পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার পরিমাণ ৬৬৪ কোটি টাকা থেকে কমতে কমতে ৩২৪ কোটি টাকায়, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম দাঁড়িয়েছে। কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য ৮০ কোটি টাকার যে সর্বনিম্ন বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার পরিমাণও ৩০ কোটি টাকার নীচে আসবে বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দ ছিল ৩০৫ কোটি টাকা। কিন্তু সব কিছু ধরে সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম তৃতীয় পরিকল্পনাকালের তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় পরিকল্পনার চেয়েও কম হতে চলেছে।

লাভ-লোকসান চিন্তা করে আটষট্টির খতিয়ান আমাদের আশা পূরণ করতে পারেনি। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের যাঁরা নিয়ামক, তাঁরা যদি আরও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানে তৎপর না হন তবে উনসত্তরের অবস্থা যে ভাল হবে, আমরা তা মনে করি না। যত দ্রুত সম্ভব অর্থনৈতিক নীতির অনিশ্চয়তা দূর করতে হবে। বাস্তবসম্মত উপায়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধি এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চতুর্থ পরিকল্পনাকে দ্রুত ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হতে শুরু করে।

সুব্রত গুপ্ত

কুবেরের বিষয়আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ

এদিকে একবার বন্দর হওয়ার কথা হয়েছিল। শখানেক বছর আগের কথা। তখন নানান সাহেব ছুটে আসে। একজন নুনের কারবারে নেমেছিল। সে চোঙ লাগানো কারখানা বসিয়েছিল। সেই সাহেবও নেই কারখানাও নেই। জঙ্গলের ভেতর বন ধোঁধলে ঢাকা ইটের পাঁজা দেখে বোঝা যায় ওখানে একদিন কিছু একটা করার চেষ্টা চলেছিল। এখন শুধু জং ধরা একটা বিরাট চোঙ কাত হয়ে পড়ে আছে। অনেক জায়গায় মরচে পড়ে গর্ত। হাওয়া দিলে চোঙ দিয়ে সমুদ্রের শব্দ আসে। সেসব কিছু নেই আর। লোকে তবু বলে কারখানা। আজ পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে লোকে ওই নামে জায়গার নাম দিয়েছে। এখন সেখানে তেল খোঁড়ার টঙ্ আকাশের মাঝে মধ্যে এক এক জায়গায় গণ্ডা ফড়িং হয়ে বসে আছে।

পিচ রাস্তা থেকে নতুন তৈরি চওড়া মেঠো পথ সাইটে চলে গেছে। ঠাণ্ডা রাখার বাক্স বসানো বিরাট বিরাট ঘর। কাচের জানলা। তাতে দুজন সাহেবের মাথা দেখা যাচ্ছে। হয়ত এদেরই কাউকে কুবের সেবারে কন্দর্পপুর কেভেকক্রসিংয়ে ডাব কিনে দিয়েছিল। সারাটা এলাকা ঘুরে এতক্ষণ ব্রজ ফকিরের চিহ্নও দেখতে পারনি কুবের। ফেরার পথে কারখানা গাঁয়ের ভাঙা টালির স্তূপে একটা লোকের মাথা দেখা গেল, জটাজুটো, আলথাল্লা তাও ভেসে উঠল লেবে। প্রায় একশো বছরের পুরনো সাপের আড়তে ব্রজদা কি করছে?

অনেক ঘুরে কুবের সেই কারখানার কলরখানার নীচে এসে দাঁড়ালো, 'এখানে কি করছো?'

কে?' চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল ব্রজদার। গলা চিরে গেল। কুবেরকে দেখে শান্ত হল, 'ও। তুই। আমি ভেবেছিলাম—'

'কাকে?'

'তেল খোঁড়ার লোকজন আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চায়। কাল রাতে কেরোসিন মাখানো ন্যাকড়ার বলে আগুন দিয়ে ছুঁড়ে মেরেছে অনেকবার। আমি এখান থেকে নড়বো না।'

'সাপের কামড় এনজর করছো এখানে তাহলে?'

'পাগল! আমি আছি এখানে নানান্ ধান্দায়—'

কুবের তাকিয়ে আছে দেখে ব্রজ ভেঙে বলল, 'বাবার আত্মজীবনী, অদ্বৈতের পালা, সরল পশু চিকিৎসা—তাবৎ বইপত্রের সিমেন্ট ডাই দিয়ে রাখি। গাঁয়ের লোকজন কিনে নিয়ে যায়। কাজে বেরোবার সময় আমাকে দেখলে, আমার এই থান দেখে জোড়া নমস্কার করে। এখন এখানে শুধু একখানা বিগ্রহ বসাতে পারলেই হল। তা হলে কেউ আর ওঠাতে পারবে না। তোর বউদির আসার কথা ছিল—'

'আসবে কি করে? সেদিন যে লোক পাঠিয়েছিলে আমি দেখেছি।'

'কি রকম!' ব্রজ দত্ত ইট গোছাতে গোছাতে থেমে গেল। একটা মণ্ড হচ্ছে বোধ হয়। কোন ঠাকুর দেবতার থান হবে নিশ্চয়। চারদিকে বুনো লতার ঝাড়। তার মাঝখানে একখানা ছোট ত্রিপলের ছাউনি। জলের কুঁজো, উনুন—একখানা বড় থালা। ভাঙা দেওয়ালে ব্রজ দত্তর জগৎ প্রপঞ্চ মারকা হাসি মাখানো একখানা ছবি।

'আমি সেদিন তোমার খোঁজে গিয়ে বেরিয়ে এসেছি। একটা লোক জিপে চড়ে গিয়ে হাজির। হঠাৎ চীৎকার শুনে ছুটে গেলাম। লোকটা বেরিয়ে এসেই জিপ চালিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। বউদি কাঁদছিল। লোকটাকে তখন ধরার উপায় নেই—'

'লোকটাকে পেলে কি করতিস?'

ভেতরে ভেতরে চমকে গেল কুবের। সেও যা করেছে, তাতে আভার পাড়মাথায় করে কান্নাকাটি করা উচিত। তাকেও ধরা উচিত ছিল। কিন্তু—

'আচ্ছাসে শিক্ষা দিতাম খানিকটা—'

'কি বলতিস?'

নিজের ভেতরে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে কুবের দেখল, লোকটাকে বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। সে নিজেও একজন কালপ্রিট। যাকে বলে দাগী আসামী।

'বলতাম ইয়ারকির জায়গা পাওনি? পর স্ত্রীর গায়ে হাত—'

'সবই ঈশ্বরের সম্পত্তি মনে রাখবি। আমরা শুধু মাঝে মধ্যে কেয়ারটেকার—'

'তাই বলে নিজের বউ?'

তেল খোঁড়ার লোকজন আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চায়

আভার সেদিন চলে আসা উচিত ছিল। এলে আমি এতটা অসুবিধেয় পড়তাম না। সস্ত্রীক সাধু একটা হ্যালো সৃষ্টি করে। আচমকা কেউ এগোতে সাহস পায় না। তার ওপর দখল নিতে সুবিধে। কেউ এলে বলা যায়—আর এগোবেন না মশায়. মেয়ে-ছেলে আছে।'

'তাই বলে তোমার নিজের বউ?'

'নিজের বউ তো আমার এই নতুন নয়। আগেও হয়েছে ক'বার। হয়ত আরও ক'বার হবে। তাই বলে একটা ডিটারমিনেশন থাকবে না। বাই হুক অর ক্রুক আমাদের এখানে একটা ডেরা গড়ে তুলতেই হবে।' রজ দত্তর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। কুবের ভেতরে ভেতরে চমকে গেল। সে নিজেও প্রায় একইভাবে জেদ করে যে কোনভাবে কদমপুরে একটা নতুন বসতি গড়ে তুলতে চাইছে। ক'দিন পরেই গৃহপ্রবেশ। দু একখানা বাড়ি হয়েছে মাত্র। আলো এল বলে। কিন্তু বুলু এখনি আসতে চায় না। মা এক দমকে শ্বশুরকুলের বাড়ি ছেড়ে উঠতে পারছে না।

অথচ কুবের আজ দেড় দু' বছরে প্রায় একটা নগর বসাতে চলেছে। স্বপ্নের সেই কলবাড়ি বানাতে চলেছে। সংবচ্ছরের ধান মলানোর মাঠ, মাছের পুকুর, গরুর গোয়াল—কত কি। এসবের কোন হয়ত মানে নেই। কিন্তু চারদিকে আষ্টেপৃষ্ঠে পাকাপোক্ত সব ব্যবস্থা করে চলেছে। একটা জিনিসের অভাব থেকে যাচ্ছে। নগেন বলেছিল, 'সেঝদা সবই করছ—কিন্তু একটা শ্মশান করা হল না তোমার। শেষে পাবলিকের সঙ্গে সেই ওল্ড ক্যাওড়াতলা নয়ত কাশী মিত্তিরের ঘাটে যেতে হবে বুড়ো বয়সে।'

ব্যাপারটা গোড়ায় ভাবাই হয় নি তার। বড় দেরি হয়ে গেছে। শ্মশানের জন্যে কেউই জায়গাজমি কোবলা করতে চায় না।

কুবেরের আজকাল এক এক সময় খুব ভয় ধরে। আমি এখন কি করছি। কি করে চলেছি। সব যদি ফট করে ফেটে যায়—চুরমার হয়ে যায়। তখন বুলু, খোকন, নতুন বাচ্চাটা—আমি—আমরা সবাই কোথায় যাব? আমি তো প্রায় চোখবুজে এগিয়ে যাচ্ছি। পথটা যদি নদীতে গিয়ে শেষ হয়। তখন কোথায় যাব? একদিন যদি টাকা আসা দুম করে বন্ধ হয়ে যায়। তখন কি হবে।

হঠাৎ খুটখাট আওয়াজ হতেই রজদা একখানা লাঠি নিয়ে নীচের চাতালে লাফিয়ে পড়ল. 'কে রে?'

কয়েকটা লোক দুড়দ্দাড় করে ছুটে চলে গেল।

'দিনের বেলাতেও চোর!' কুবেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, 'সাহেবের আমলের সব টালি। যে যা পারছে খসিয়ে নিয়ে গিয়ে বেচে দিচ্ছে। আগে গরুরগাড়ি নিয়ে আসত। বোঝাই দিয়ে গঞ্জে, হাটে চালান দিত। আমি এসে বন্ধ করেছি—' রজ দত্ত হঠাৎ থেমে সামনের একটা লোককে বলল, 'এই যে সাহেব—আসুন।'

কুবের ভূত দেখলেও এতটা চমকে যেত না। এই লোকটাই সেদিন আভার ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। আভা চেঁচাচ্ছিল, 'এই কি প্রবৃত্তি! ছিঃ! ছিঃ!'

লোকটার নিশ্চয় কোন একটা নাম আছে। রজদা ডাকল সাহেব বলে। সাহেব মিত্তির। রজদা বলল, 'কলকাতার কায়েত। সচ্চরিত্র সুপুরুষ। বুঝলে কুবের; দিশী লোকজনের মধ্যে এখানকার সবচেয়ে কঠিন কাজটাই করতে হয় মিত্তির মশায়ের—'

মিত্তির বিনয় করে হাসল। কুবেরদের চেয়ে এক আধ বছরের বড় হবে। হাফ-শার্টের বাইরে পুরুন্ত দু'খানা হাত ফেঁপে ফুলে বেরিয়ে আছে। বিরাট একটা হ্যাকসর ওপর ভর দিয়ে মোটা একটা পাইপ কট কট আওয়াজ তুলে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে সাহেব মিত্তির বলল, 'পাইপ মাটির নীচে চলে গেলে স্পেশাল বন্দুক দিয়ে আমি জায়গা নিরিখ করে গুলি ছুঁড়ি। হিসেব মত জায়গায় গুলির চোটে পাইপ ফেটে গিয়ে গ্যাস নয়ত তেল ভুস ভুস করে উঠে আসবে। আমি মার্কস্ম্যান—'

'তীরন্দাজ বলুন।'

কুবেরের রসিকতার আঁচ ধরতে না পেরে লোকটা গর্বের কায়দায় হেসে বলল, 'গোলন্দাজও বলতে পারেন।'

গোঁফ থাকলেই লোকটাকে শিকারী বলা যেত। সেদিন একটুর জন্যে কুবেরের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। অবশ্য আজ আর হাত ফসকে গেছে বলে ভাবতে পারছে না। যার বউ সেই বলছে, আমার নিজের বউ তো নতুন নয়—আগেও হয়েছে ক'বার—আরও হয়ত ক'বার হবে. আসলে চাই ডিটারমিনেশন। কিসের ডিটারমিনেশন? দখলের ডিটারমিনেশন। এই জিনিসটা আমার। এটা দখলে রাখতেই হবে। যেন তেনভাবে দখলে রাখতেই হবে।

'আপনার হাতে কি হয়েছে?'

কুবের হাত লুকোতে পারল না, 'ও কিছু না—'

মিত্তির হাত বাড়িয়ে কুবেরের কব্জি ধরে ফেলল। সাঁড়াশির চেয়েও জোরে ধরেছে। কুবের নিজের হাতখানা বের করে আনতে পারল না।

'ড্রিংকস্ চলে?'

'তেমন কিছু নয়। মাঝে সাঝে এক আধদিন—তাও কেউ এলে তবে।'

'হাটুতে, তলপেটে পরদিন লাল বিজগুঁড়ি বিজগুঁড়ি বেরোয়?'

লোকটা জানল কি করে? খুব অবাক হলেও মুখে শুধু বলল, 'তা বেরোয়।'

বাঁ পায়ের প্যাণ্ট অনেকটা তুলে ধরে কুবেরকে দেখাল, 'এই দেখুন। আপনার মত হয়ে আছে। কালচে কালচে ছোপ। আমারও অমন বিজগুঁড়ি বেরোতো। আমার আপনার লিভার ড্রিংকস্ নিতে রাজি নয়। তারই ইরাপশন। সেই থেকেই এই কালো ছোপ ছোপ দাগ। ড্রিংকস্ ছেড়ে দিয়ে তবে এই সব দাগদাগালির ছাড়িয়ে পড়া আরেস্ট করেছি—এত এক ধরনের একজিমা। বাড়তে দিলে নিস্তার নেই।'

কুবেরের সামনে সাজিয়ে দিল. খেয়ে দেখ—'

'অতো খেলাম। ওদিকে কদমপুরে একটা মানুষ কি খেল না খেল দেখছে কে!'

হাতের পাঁচটা আঙুলে রুটির তাড়া শ্লেট হয়ে আছে। তার ওপর গরম তরকারি সাজিয়ে ফু দিচ্ছিল ব্রজদা, 'তোর খুব চিন্তে হয়? নিয়ে যা না। একটা মানুষ তো মোটে—.'

ব্রজ দত্তর চোখের নীচে কান্না কিংবা হাসিতে—নয়ত নিতান্তই ঠান্ডায় খানিক খানিক জায়গা ঝক ঝক করে উঠেছে। একেবারে ধরে ফেলার হাসিতে কুবেরকে বলল, 'তোর তো অনেক পয়সা হয়েছে। রেখে দে না একটা লোককে। মোটে তো একটা মানুষ!'

কথাটা খট করে মাথায় লাগল কুবেরের। টিন, নড়বড়ে ইটের থাক দেওয়াল এখুনি তাকে প্রায় ঠেসে ধরার জোগাড় হল। থালায় তখনও একখানা রুটি। একটু তরকারি চাইবে ভেবেছিল। প্রবৃত্তি হল না। সামনের লোকটা রুটিতে তরকারিতে চেয়ারে একটা যে কোন বড় গরুর কায়দায় জাবর কাটছে। হঠাৎ থালাখানা তুলে ধরল কুবের। দেবে মাথার ওপর এবার ঠাঁই করে বসিয়ে।

'ওকি? মারবি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

তখনও বিশ্বাস হয়নি ব্রজ দত্তর। এক ঘা বসাতেই তড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কুবেরকে আচমকা চার পাঁচটা ঘুষি মেরে কাবু করে ফেলল। শেষে একটা লাথি দিয়ে এই জোড়াতালি দেওয়া ঘরের কোণে ফেলে দিল. 'খুব বেড়েছিস?'

আর একটা লাথি মারতে যাচ্ছিল। থেমে গেল ব্রজ। কুবের কোঁকাচ্ছে। কোথায় লাগলরে বাবা। 'এই কুবের, কুবের—'

ব্রজ একটু ভয় পেয়ে গেল। নীচে ড্রিলিংয়ের একটানা কড় কড় আওয়াজ। তার আস্তানার ভেতরে কুবেরের গোঙানি। বেচারা মুখও ধোয়নি। তার চেয়ে বয়সে ছোট। ইদানীং যে কি হয়েছে ছোকরার। লঘুগুরু জ্ঞান নেই। আচমকা থালা উঁচিয়ে এল কেন?

ড্রিলিং সাইটের কাছাকাছি খালাসীদের তাঁবুতে এক সর্দার নাড়াবুনিয়ার দিশী মোষ পোষে। তার বউকে বলে আধসের দুধ নিয়ে এল ব্রজ। খানিক ফুটিয়ে সাহেব মিত্তিরের উপহারের বোতলটা থেকে কিছুটা বাটিতে ঢেলে দিল. 'নাও বাছাধন—খেয়ে নাও। খেয়ে উদ্ধার কর এখন।'

কুবের উঠে বসে সুস্থ হয়ে উঠল। ব্রজ পেছন ফিরে ঘরকন্না সাজাচ্ছিল। বাইরে উঠোনে একখানা তেকোণা পাথর পড়ে আছে। সিঁদুর মাখানো। ব্রজ ফকির নাম দিয়েছে রেলেশ্বর শিব। রেল লাইনের পাশে কুড়িয়ে পেয়েছে। পূর্ণিমার দিন জাঁকজমক করে প্রতিষ্ঠা হবে। শুধু আভা বউদির এসে পড়ার অপেক্ষা।

আর একটা লাথি মারতে যাচ্ছিল। থেমে গেল ব্রজ

এখন খাঁ করে লাথিটা বসিয়ে দিলেই হয়। তারপর দে ছুট। নইলে, এটুকু বুঝেছে কুবের, ব্রজ দত্তর সঙ্গে সে সামনাসামনি পেরে উঠবে না। কিন্তু সে নিজে নুনের কারবারি হরিরাম সাধুখাঁর বংশধর। যার নুন খেয়েছে একবার তাকে পেছন থেকে ঘা দেয় কি করে। সে যে বড় মুশকিলের ব্যাপার। হঠাৎ খুব মায়া হল কুবেরের। ব্রজ ফকিরের জন্যে মায়ায় তার মন ভরে গেল। চল্লিশ পার হয়েও থিতু হয়ে বসতে পারল না কোথাও। এখন বিগ্রহ বসিয়ে থান বানিয়ে বউকে সাজাবে। জটা রাখছে। রুদ্রাক্ষ এনেছে। তেল সিঁদুর মাখাচ্ছে গুচ্ছের আম পাতায়। সামনের আঁটিসার গাছটার ডালপালা বেরিয়ে পড়ল বলে।

সে যে আজ কোথাকার কোন্ জগতে এসে পড়েছে। কত লোভ করে দূরের সাহেব নুনের কারখানা বসিয়েছিল। হয়ত হরিরাম সাধুখাঁর সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে আলাপও হয়েছিল। শীতকালের আকাশে ছিটকে ছিটকে তারা খসছে। কোথায় কোন্ মহা লোক মরে গেল। আকাশে ঢ্যাঁড়া পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হয়ত পাঁচ জন্ম আগে সে নিজেই সমুদ্র পার হয়ে এখানে কারখানা বসাতে এসেছিল। কিংবা সৈন্ধব লবণের কারবারে নেমে ভরাডুবির মুখে হরিরামের সন্ন্যাস হয়েছিল। কথা দিয়েছিল সাহেবকে, একদিন তোমার কারখানা দেখে আসব—গোলা ফেলে কোথাও যে ঘুরে ফিরে আসব তার ফুরসত মেলে না। কিছুদিন হল সেই হরিরাম নানা জন্ম ঘুরে ব্রজ ফকির হয়ে কারখানা দেখতে এসেছে। দেখে আর নড়ে না। সেখানে এখন মন্দির বসবে। ব্রজ হয়ত ঠাকুরতলা নয়ত রেলেশ্বর শিবের থান বানাবে।

বয়স বল, আয়ু বল—ওই হল গিয়ে যত নষ্টের গোড়া। জিনিসটা এত কম, এত মাপা—সময় হলে ফুরিয়ে যাই। অথচ যে তখন কত কি বাকি পড়ে থাকে। এটা আধখানা, সেটা পুরো, ওটা মাঝামাঝি সে এক আজব হাল। হরিরাম নাকি নুনের বড় বড় চালানের কাগজ পড়তে পড়তে বুকে হাত রেখে তাকিয়ায় হেলে পড়েছিল। তখন গদিতে মাত্র তার ছোট ছেলে ছাড়া কেউ ছিল না।

হেরিকেনের আলোয় ইটের পাঁজার ওপর থেকে বইয়ের ডাই ঘেঁটে কুবের রজনী দত্তর জীবন ও বাণী খুঁজে পেল। হাটকাতেই বইয়ের ছত্রিশ পাতা খুলে গেল। লাইনের শুরুতেই ব্রজদা লিখেছে—

"আকাশে ইদানীং যেসব মেঘ হইতেছে তাহারা আমার বড় চেনা চেনা ঠেকে। মনে হয় গত জন্মে ইহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে কত শস্যক্ষেত্রে বৃষ্টি হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছি। রোদ্র উঠিতেই আবার মিলাইয়া গিয়াছি। বিকালের দিকে আষাঢ় শ্রাবণে দুই দিগন্ত জুড়িয়া রামধনু উঠিবার জন্য জায়গাও করিয়া দিয়াছি। সেই কালের নানা রঙ এখনও আমার গায়ে লাগিয়া আছে। তাই স্বপ্ন দেখি। মানুষকে ভালবাসি। ব্রজকে পাই। আশা করি বয়স হইলে ব্রজও স্বপ্ন দেখিবে। সন্ধ্যা তারা আমাদের চোখকে দ্বিতীয় তারায় লইয়া যায়। দ্বিতীয় তারা তৃতীয় তারায় পৌঁছাইয়া দেয়। তৃতীয় তারা আমাদের তারার জঞ্জালে ফেলিয়া পালায়। তখন চারিদিকে হলুদ ছিটানো আগুনের কুচি আমাকে পাগল করিয়া তোলে। ব্রজর গর্ভধারিণী এসবের ধার ধারেন না।'

'বাটনা বাটতে জানিস? আজ তোকে একটা রান্না খাওয়াবো।'

কুবের ঝপাং করে দশ বছর পিছিয়ে গেল। কুবের দা ফ্রিভলাস। কুবের দা ভ্যাগাবন্ড। বিজারভড্ কুবের। তখন কলকাতার ফুটপাথে করপোরেশনের বকুল-গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়ে সন্ধ্যের দিকে রুমাল-চাপা গন্ধ দিত। তখন স্যান্ডো গেঞ্জির ওপর ফিনফিনে আদ্দির মোড়কে কুবের সাধুখাঁ কত অল্পে খুশী হয়ে উঠত। গাছের একটা পাতা খসে পড়লে কত মানে খুঁজে পেত তার ভেতর।

'তারার জালনা?'

'মানে?'

এই যে লিখেছ। 'হলুদ ছিটানো আগুনের কুচি।' তারাগুণতির দেশের কথা—'

রাবিশ! বইটা রেখে দিয়ে মাথার ওপর থেকে শুকনো লঙ্কার কৌটোটা দে।'

(ক্রমশ)

আফ্রিকার সিংহ

রতনলাল ব্রহ্মচারী

সেমলিকি। কংগো বর্ডারের কাছাকাছি উগান্ডার দিগন্তপ্রসারী সাভানা অর্থাৎ তৃণক্ষেত্র। টোরো গেম রিজার্ভে একটা ল্যান্ড রোভারের ছাদের ওপরে বসে চলেছি হাজার হাজার কব (এক ধরনের অ্যান্টিলোপ) দেখতে দেখতে। সকালের রোদ্রে তাদের সোনালী দেহগুলি যেন জ্বলজ্বল করছে।

সিম্বা, লায়ন—হঠাৎ শোফার চীৎকার করে উঠল, "ট্রাপ-ডোর দিয়ে গাড়ির ভেতরে চলে আসুন এবং ডোরটা বন্ধ করুন।"

বাল্যকাল থেকেই রহস্যময়ী আরণ্যক আফ্রিকা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আজ সেই ভয়াল বন্যভূমির অল্প অংশই সভ্যতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। গত চার বছরে চারবার উগান্ডা ভ্রমণের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং আদিম অরণ্যের ছবি আমি কিছু কিছু দেখতে পেয়েছি। এবার প্রথমে উগান্ডার একটি বিজ্ঞানাগারে এক পরীক্ষা করলাম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিয়ে, যে পদার্থ আমাদের দেশে সহজে পাওয়া যায় না। যে প্রাণীর ওপর পরীক্ষা, তা হ'ল এক রকম শামুক সাউথ আফ্রিকায় যার আদি নিবাস। এক মহিলা জোহানেসবার্গ থেকে এরোপ্লেনে আসার সময়ে ভ্যানিটি ব্যাগে এই সব শামুক কিছু নিয়ে আসেন (রান্ডের গোল্ড বার নয়, কিম্বার্লীর হীরে নয়, নেহাতই শামুক!)। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকার কোন ডাক যোগাযোগ নেই। তারপর মার্চিসন ফলস্, সেবাই, কারামোজা প্রভৃতি নানা বনভূমিতে প্রধানত জিরাফ পর্যবেক্ষণ করে এসেছি সেমলিকি নদীর কাছে। মার্চিসনে পায়ে হেঁটে শত শত হাতী, কুমীর, হিপ্পো এবং বেশ কিছু গন্ডার দেখেছি কিন্তু পশুরাজের দেখা পাইনি বললেই হয়। তাই শোফারের কথায় একটা প্রচন্ড উত্তেজনা অনুভব করলাম।

তারপর আমাদের গাড়ি চলে এলো একটা তৃণহীন ভূমিতে আর সেইখানে শায়িত দেখলাম দুই পশুরাজ—চরম আলস্যের প্রতিমূর্তি। ক্রুগার বা নাইরোবি ন্যাশন্যাল পার্কে লক্ষ লক্ষ পর্যটক গাড়ি চ'ড়ে বন্য সিংহের একেবারে কাছে গিয়ে দেখে আসেন, —নাইরোবিতে আমি নিজেও দেখেছি। কিন্তু সেই প্রচন্ড ভিড়ে, এবং প্রহরী রেনজারের সামনে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আর একেবারেই থাকে না। আজ কিন্তু দিগন্ত-বিস্তৃত এক সাভানা অরণ্যে আমি একা। শেষে সিংহের পাঁচ ফিট দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সিংহকে 'বক' দেখালেও তিনি গ্রাহ্যই করেন না অথচ গাড়ি থেকে নামলেই মৃত্যু নিশ্চিত। (কিন্তু দুর্গম রাবোংগো ভ্রমণের সময় যে তিনটি সিংহ দেখেছিলাম তারা ল্যান্ড-রোভার থামামাত্র বহুদূর থেকেই চম্পট দিয়েছিল)।

ঘন্টার পর ঘন্টা সিংহ দু'টি শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিল। তাদের পেছন দিকটা অতি সরু, লোমহীন বিশ্রী কুকুরের মত দেখতে এবং একদল কাল পোকা ভিড় করে আছে কোমরে। ভারতের বাঘ এর চেয়ে কত বেশী সুন্দর! টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে দিলাম হায়নার ডাকে সিংহ সাড়া দেয় কিনা দেখবার জন্যে। প্রথমে হারাম্বি হারাম্বি—কেনিয়ার বিখ্যাত স্বাধীনতার সঙ্গীত তারপর নানা পাখীর কাকলি। সিংহ নির্বিকারভাবে সব শুনলো। তারপর হায়নার ডাক শোনামাত্র উঠে বসলো, চোখে জ্বললো আগুন। আরো কিছু দূরে গিয়ে দেখলাম সাতটি সিংহী ও শাবক ছোট ছোট ঘাসে শুয়ে আছে। এরা সিংহের চেয়ে অনেক বেশী চটপটে এবং জীবন্ত মনে হল। এদের দেহগুলি চকচক করছে এবং বিশেষ করে বাচ্চাদের পেছন দিকে চাকা চাকা দাগ আছে। হয়ত এইজন্যেই মধ্যে মধ্যে স্পটেড্ সিংহের কথা শোনা যায় পূর্ব আফ্রিকায়। হঠাৎ দূরের লম্বা ঘাস থেকে আওয়াজ করতে করতে একটি শাবক বেরিয়ে এলো, আস্তে আস্তে চলে গেল

দুই পশুরাজ—চরম আলস্যের প্রতিমূর্তি

একটি সিংহীর কাছে এবং সেও পরম স্নেহভরে বাচ্চার গা চেটে দিল। খানিক পরে দলটা আর একটু লম্বা ঘাসে ঢুকে পড়লো। আমাদের গাড়ির তাড়া খেয়ে একটা কব ছুটে গেল একটি সিংহীর পাশ দিয়ে। ব্যাপারটা ঘটলো এত আচমকা যে সে প্রথমে কিছু বুঝতে পারলো না। দু-চার সেকেণ্ড পর বিদ্যুতের মত উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল শিকারের পিছনে কিন্তু একটু পরে সে চেষ্টা ছেড়ে দিল; কারণ, কব ততক্ষণে নাগাল পার। ছুটন্ত কব দেখে সিংহ দুটিও আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকল কিন্তু কোন সচেষ্ট ভাব তাদের মধ্যে দেখলাম না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সিংহের আলস্য তখনও যায়নি। এবার গাড়ি নিয়ে তাদের একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়লাম। পশুরাজ ১০-১৫ ফিট এগিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ভূমিশয্যা নিলেন। এই পরীক্ষা বার বার করেও তাদের আলস্য ভঙ্গ করা গেল না, বা বিরক্তি উৎপাদনও করা গেল না। রাজাদের ধৈর্য অসীম! বিকেলের আলোতে তাদের পেছন দিকটা আর তত কুশ্রী দেখালো না। আবার সিংহীদের কাছে ফিরে গেলাম। তারা তখন ঘন ঘাসবনের আড়ালে। অনেকক্ষণ বাদে তাদের দেখা গেল আবার পরিষ্কার জায়গায়।

তারপর যখন সূর্য নামল পাটে, জনহীন আফ্রিকার অরণ্যে নেমে এল গোধূলি-লগ্ন, যখন মাসাইদের দগ্ধতাম্র প্রান্তরে দিনের প্রলয়দহন শেষে রাতের শিকারীরা সজাগ হয়ে ওঠে, আম্বোসেলীর উদার আকাশে তুষারমৌলি কিলিমানজারো শেষ রবি-রশ্মির কনক-কিরীট মাথায় পরে, যখন রুয়েনজুরীর চূড়ায় চূড়ায় দেখা যায় এক

কিছুতেই বিরক্তি উৎপাদন করা গেল না

মায়াময় কুণ্ডলী-পাকা, উন্নতশীর্ষ চিরমলিন হারিয়ে যায় এক স্বপ্নলোকে—সেই অপরূপ মুহূর্তে রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখতে লাগলাম এই মঞ্চ, সাবলীল বনের দুলালীদের।

একটি সিংহী ধীরে ধীরে একটি গাছের ওপর লাফিয়ে উঠল। পূর্ব আফ্রিকার সিংহ যে প্রায় বেড়ালের মতই গাছে উঠতে পারে—এ খবর জনসাধারণ প্রথমে পেয়েছিল ডিসনীর খেলা ছায়াচিত্র দেখে। এই আফ্রিকার লায়নস্ কেনিয়ার সাভো অঞ্চলের ছবি। আজকাল সেরেনগেটি, লেক মানিয়ারা, কুইন এলিজাবেথ প্রভৃতি অভয়-অরণ্যে শাখাচারী সিংহকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

হঠাৎ চোখ পড়ল চারেক সিংহী এবং শাবক আর একটি গাছে উঠে গেল। তিনটি শাবক নীচু ডালে খেলা করছিল। একটি সিংহী কিন্তু তরুশীর্ষে অচপল মূর্তির মত বসে রইল। দৃষ্টি তার পশ্চিম দিগন্তে, যেখানে অগ্নিবরণ চিত্রলেখা মেঘের পটে আঁকা। কিন্তু আমি জানি তার মনের কথা। সে সন্ধান নিচ্ছে যূথচারী কাদের।

তারপর দিনের আলো নিবে এলো, বিক্ষু আকাশের বুক বিঁধে দিল হাদাদা আইবিস পাখীর কর্কশ চিৎকার, তখন সিংহী আর শাবকরা আবার নেমে এলো মাটিতে। হঠাৎ দেখি এক পশুরাজ একার হেঁটে বেড়াচ্ছেন। তারপর সেমলিকি টোরোর নিস্তব্ধ প্রান্তর ঢেকে গেল এক অন্ধকার পর্দায়। আমরা অপেক্ষা করলাম। একটু পর চাঁদ উঠল মেঘের ওপর। ধবধবে জ্যোৎস্নায় দেখলাম আমাদের গাড়ির চার দিকে কিলবিল করছে নটা সিংহ, সিংহী এবং তাদের শাবকগণ। চাঁদের আলোয় খরগোশের মত লাফালাফি করছে সিংহ-শিশুরা। সে কি অবর্ণনীয় দৃশ্য।

রঞ্জন

বলা নেই, কওয়া নেই, সহসা গত আটই ডিসেম্বর সকাল আটটায় আকাশবাণী থেকে প্রচলিত ইংরেজী খবর শোনা গেল না। বদলে এলো হিন্দী সমাচার। হিন্দীতে একেই বোধ হয় বলে বাদলা, প্রতিশোধ। "আংরেজী হঠাও" যাঁদের মন্ত্র তাঁরা ক্ষমতার বাইরে। লোহিয়ার দেহাবশেষ দিল্লির বাতাসে বিলীন। বর্তমান তথ্যমন্ত্রী গুজরাটী। সচিব শিক্ষিত বাঙালী। বেতার-পঞ্চবিংশতির রহস্য তবু অনুধাবনযোগ্য: কেননা যে নিঃশব্দ ষড়যন্ত্র আজ ইংরেজী খবরকে সকাল আটটা থেকে আটটা পনেরোয় পৌঁছে দিয়েছে তাকে খড়্গহস্তে দমন না করলে অচিরেই তার দুঃসাহস সভ্যতার সকল সীমা লঙ্ঘন করে সমগ্র ভারতসমাজকে অশিক্ষার কোন পঙ্কে নিমজ্জিত করবে, তা আমার কৃষ্ণতম দুঃস্বপ্নেরও অতীত বলে আশঙ্কা করি।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা একান্তই সামান্য। আটটার বদলে আটটা পনেরোয় ইংরেজী খবর শুনলে বাইবেল কেন অশুদ্ধ হবে? গত বিশ বৎসরে কত অভ্যাসই তো বদলাতে হয়েছে। দ্বিধা কেন হিন্দী সমাচারের বেলায়? এই তথাকথিত রাষ্ট্র-ভাষা সম্বন্ধে আমার উড্ডীয়মান কবোষ্ণতা সক্রিয় বিরূপতায় পরিণত হয় তখনই, যখন ওর অন্তরালের অভিসন্ধি অনুসন্ধান করি। প্রশ্নটা শুধু ভাষাগত হলে বাক্য-বিনিময়ে সন্ধি হয়তো সম্ভব হতো, যাকে ও'রা বলেন বুঝি সমঝোতা। ইংরেজী ভাষার জন্য ইংরেজরাই যখন রণে ভঙ্গ দিয়েছে, তখন তার হয়ে লড়াই করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। প্রশ্ন একেবারেই স্বতন্ত্র।

*

লড়াই ভাষার নয়। আর্যাবর্ত পণ করেছে সমস্ত আধুনিক চিন্তাধারাকে সমাধিস্থ করতে। উত্তর ভারতীয় এই সংগ্রামীরা জানে যে, শুধুমাত্র ভাষাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিন্দীর হীন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ব্যাকরণ বা রচনারীতি এদের অস্ত্র নয়। সে তর্ক হতো সমীচীন। সামান্য যে সাহিত্যগত দ্বন্দ্ব আছে, তা গৃহ-যুদ্ধ: প্রাক্তন হিন্দুস্তানীকে কবরস্থ করতে হলে কী পরিমাণে আরবী বা পারসী শব্দকে তালাক দিতে হবে, আর কী পরিমাণে সাধারণ্যে অবোধ্য সংস্কৃত শব্দ সরকারী প্রয়োগে সম্মানিত হবে। তর্কটা একদা ছিল সাম্প্রদায়িক, ধর্মভিত্তিক। এ নিয়ে দাঙ্গা কম হয়নি। পাঠ্যপুস্তকের রদবদল হয়েছে বিস্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলমোহর নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সংগ্রামের সেই পর্যায়ে তবু কিঞ্চিৎ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। আজকের বর্বরতায় তার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে লোহিয়াজীর পরি-বর্তে অন্য যে ভাষা এখন ব্যবহৃত হয়, তা ভদ্রজনের কর্ণে পীড়া দেয়। তার চাইতে শক্ত শাস্তিও সংগ্রামীদের অজানা নয়।
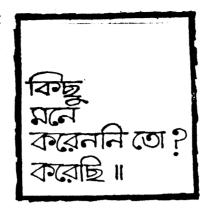
আকাশবাণীর ভাষাবিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত প্রতিবাদের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী নিতান্ত নিরীহ কণ্ঠে জানালেন যে, তেমন কিছু হয়নি। সকাল আটটা আর রাত নটা হলো সংবাদ বিতরণের প্রকৃষ্ট প্রহর। একটা দেওয়া হয়েছে হিন্দীকে, অপরটা ইংরেজীকে। সাম্যের এ-হেন দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধতা তো দেশদ্রোহিতার নামান্তর। দক্ষিণী কলরোল দিল্লির চোখে এক বিশাল অবান্তরতা। এমন সফেদ সাফাই আমার পক্ষে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিনে। সকাল আটটায় ইংরেজী খবর কার প্রাতরাশে বিরক্তিদায়িনী মক্ষিকা-রূপে এমন পক্ষবিস্তার করছিল যে, তাকে পনেরো মিনিট সরিয়ে না দিলেই নয়? আমি না বুঝি হিন্দীওয়ালাদের সদম্ভ আধিপত্যভিক্ষা, না দক্ষিণীদের উদ্ধত উত্তর। আধিপত্য নয় ভিক্ষার সামগ্রী। প্রতিবাদের একমাত্র পন্থা কেন হবে দ্বি-সহস্রের পরীক্ষাবর্জন মাদুরায়?

নয়াদিল্লিতে ঠিক কার কারসাজিতে আকাশবাণীর বায়ুতরঙ্গে সকাল আটটায় আসন ইংরেজী থেকে হিন্দী খবরের হস্ত-গত হলো, তার বিস্তারিত সংবাদ হয়তো কখনোই প্রকাশিত হবে না। সংবাদ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্যই তো সত্য গোপন। ভাষা সে তো কোপনতার বাহন। তথ্যমন্ত্রী কে কে শাহকে তবু স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, সকালে আকাশবাণীতে হিন্দী খবরকে পনেরো মিনিট এগিয়ে দিয়ে তিনি ভারতীয় সংহতির গতিকে অনেক বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। শ্রীশাহকে সবিনয়ে জানিয়ে দিতে চাই যে, এখন প্রতি দিন সকাল আটটায় হিন্দী খবর শোনবার সময় নিজেকে ঠিক ভারতীয় বোধ করিনে। রাত নটায় যথারীতি ইংরেজী সংবাদ শুনব, এমন আশ্বাস আমাকেই স্বস্তি আনে।

*

অথচ বাঙলা দেশে প্রতিবাদের বাষ্পমাত্র অপ্রত্যক্ষ। সন্দেহ করি, বর্তমান ঔদাসীন্যের প্রধান উপজীব্য বাঙালীর বাস্তব তথা অতিকৃত সাহিত্যগর্ব। তামিলরা ভয় পেয়েছে, রাগ করেছে। হিন্দীর ঔদ্ধত্য রুখতে তারা বদ্ধপরিকর। আংশিক সাফল্য ওরা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। মাদ্রাজে আকাশবাণীর নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে। অন্তত দুটি বেতার-কেন্দ্র থেকে হিন্দী সংবাদ প্রচারিতই হয়নি। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এখনও দাক্ষিণাত্য থেকে উচ্চারিত হয়েছে বলে জানিনে। অশ্রুত রয়ে গেছে পূর্বের প্রতিবাদ।

বাঙালীর এই ধারণা একান্তই ভ্রান্ত যে, একমাত্র সাহিত্যগুণ কোনো ভাষাকে রক্ষা করতে পারে। পূর্ববঙ্গে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য যে প্রবণতা দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে তার শতাংশ দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারিনে। সত্য তবু এই যে, ভাষাগত আগ্রাসিতা আর সাম্রাজ্যবাদিতায় ইসলামাবাদকে কোনো পাঠ নিতে হবে না নয়াদিল্লি থেকে। অনুরূপ বিরোধটির আসল স্বরূপ আপাতত পর্দানসীন হয়ে আছে, কেননা বাঙলা আর হিন্দী বিভিন্নাকারে সংস্কৃতের সন্ততি, কিন্তু বাঙলা আর উর্দু এক গোয়ালের গাই নয়। তাই বাঙলা দমনের বিরুদ্ধে শিং দেখা গেছে পূর্ববঙ্গে। কলকাতা নিদ্রিত তার আপন অহিফেনে।

কালই কলকাতায় কোনো হিন্দীবিরোধী কর্কশ আন্দোলন শুরু হলে আমি সযত্নে তা পরিহার করব। ভাষার সতীত্ব রক্ষায় সর্বগাত্রে কেরোসিন ঢেলে তিলে তিলে আত্মবিসর্জন তো আমার কাছে একেবারেই অভাবনীয়। তবু হিন্দী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে পূর্বভারতের অতি স্তিমিত প্রতিবাদ অত্যন্তই অপ্রচুর বলে মনে হচ্ছে। আমি আদৌ হিন্দীবিরোধী নই। সে থাক আপন রাজ্যে আপন গৌরবে। আমার আপত্তি সন্দেহজনক সংখ্যাভিত্তিক আগ্রাসনে। তার আভাস কিন্তু একেবারে অপ্রতীয়মান নয়।

এককালে বিশ্বজনীনতার বর্ম আমিও পরিধান করেছিলাম বইকি। আজকেও ভয় পাই ভাষাগ্রাসী প্রাদেশিকতার সামান্যতম আশ্লেষে। অশ্লীল মনে হয় নানা আন্দোলন। তবু বাঙলা ভাষার জন্য একটা মমত্ববোধ আমার চরিত্রের অন্তর্গত, যাকে কাটিয়ে উঠতে আমার না আছে অনুরাগ, না উৎসাহ। শুধু জানি যে, কিঞ্চিৎ উত্তাপ চাই হিন্দীর আগ্রাসী অনগ্রসরতাকে সরিয়ে রাখতে হলে। সাহিত্যিক উত্তাপ উপেক্ষিত হলে তখনই আসে রাস্তার মোর্চা। তথ্য-মন্ত্রী আরেকবার [illegible], নইলে আমাকেও হয়তো [illegible] হবে। সেটা আমার পক্ষে [illegible] নয়, না ভালো মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে।

মানুষ পৃথিবী ছাড়াইয়া চন্দ্রলোক পরিভ্রমণ করিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—“এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানে এমনি থ' হয়ে গেলাম যে তাজ্জব হওয়ার কথাটাও

বলতে পারলাম না। মুখটা কথাস্থানে ফিরে এলে শুধু বললাম, সোনারচাঁদ ছেলেরা কি চাঁদের একটা টিপ নিয়ে এসেছে। আমরাও এতদিন শুধু চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা বলেই ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি॥”

শ্যামলালজী চন্দ্র অভিযানের তারিফ করতে নারাজ। সে বলল—‘আমরা গোলকধাঁধায় ঘোরায় কতবার চন্দ্রলোকে ভ্রমণ করে আবার পাঁচ চিতে সংসারে এসে পড়েছি। পূর্ণ চাঁদের মায়ায় যেখানে আর ভাবনা পথ ভোলে না সেখানে চাঁদকে নিয়ে এত হই-হুল্লোড় কেন!!”

বড়দিনের জেল্লা ক্রমে কমিয়া আসিতে আসিতে এবারে এবার প্রায়-নাই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, এই নিয়ে বড়দিন রসিকরা দুঃখ করেছেন। সহযাত্রী বলিলেন—“টেকচাঁদ কমিটি নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন এবং হয়ত বা স্বয়ং বিশুও॥”

কসবাতে বোমা তৈরির ৮ মণ মাল-মশলা আবিষ্কার করিয়া পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—“শেপ অব থিংগস টু কাম।”

সংবাদে শুনিলাম কেন্দ্র নাকি কলিকাতায় চুঙ্গি প্রথা প্রবর্তনে আপত্তি জানাইয়াছেন। —“কিন্তু কলকাতায় চেঙ্গা প্রথা চালু রাখা সম্পর্কে কেন্দ্রের মনোভাবের কথা সংবাদে কিছুই বলা হয়নি”—বলেন বিশু খুড়ো।

সংবাদে শুনিলাম ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের নেতা এডওয়ার্ড হিথের নামে একটি পোষা ময়নার নাম রাখা হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত গানের একটি চরণ সুর বারিয়াই শুনাইলেন—“খাঁচায় ধরে তারে রাখি কেমনে সে ত নয় পোষা ময়না”।

পাটনায় নাকি একটি “ভাল মানুষের দল” নাম দিয়া একটি নূতন দল গঠন করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—“কাজে কাজেই গুরুদেবের গানটা মনে পড়ে গেল—ভালো মানুষ নইরে মোরা ভালো মানুষ নই। সোজা কথা কইনে মোরা উল্টো কথা কই!!'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলিকাতা আসিয়া ময়দানের সভায় বলিয়াছেন,—কলিকাতা ‘এ’ টাউন নয়. ‘দি’ টাউন। —“ছোট বেলায় পড়া আর্টিকেলের মর্মার্থ অনেকেই ভুলে গিয়েছেন এবং মনে হয় বরাকর নদী পার হয়ে গেলে ইন্দিরাজী কী বলেছেন তা নিজেও ভুলে যাবেন সুতরাং নেস্‌ফিল্ড

নিয়ে আমরা আর ঘাটাঘাটি করতে চাই না”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতাকে অর্থ সাহায্য করা প্রসঙ্গে কেন্দ্রের জনৈক মুখপাত্র নাকি বলিয়াছেন, আগে পৌরসংস্থা সাফাই করুন, পরে টাকা পয়সার কথা। বিশু খুড়ো বলিলেন—‘তার মানে মাথায় নাচ দেখা আমাদের কপালে নেই।”

একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ত দেখিতেছি ধনুক-ভাঙা পণ করিয়াছেন কলিকাতাকে শ্মশানপুরী না বানাইয়া ছাড়িবেন না। সহযাত্রী বলিলেন—“কিন্তু তাতে সমস্ত ভারতের শবদাহের ব্যবস্থা কি কলকাতার শ্মশানে করা যাবে॥”

সুজেনখালি হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে শুনিলাম, কোন একটি বাঘ গাছের ডালে-বসা একটি পাখী গিলিতে গিয়া একটি কাঠের টুকরাও গিলিয়া ফেলিয়াছে। ময়না তদন্তের পর বাঘের চোখটি সুজেন-খালির অফিসে সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। —“কিন্তু ভুল করা হয়েছে, কলকাতায় এখন আর বাঘের চোখ পাওয়া যায় না; এ সময় চোখটি বাজারে ছাড়লে হৃত গৌরব খানিকটা উদ্ধার হয় এবং চাইকি বিদেশী মুদ্রা অর্জনও সহজ হয়”—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতায় রোমিওদের বিরুদ্ধে পুলিস অভিযান চালাইতেছেন। —“কিন্তু জুলিয়েটদের সম্পর্কে কোন

অভিযানের কথা সংবাদে বলা হয়নি”—মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো এখন জেলে অনশন করিতেছেন। —“আফসোস, আফসোস। কিন্তু কী করবেন বলুন, মরসুমটা যে ভুট্টার নয়”—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

পশ্চিমবঙ্গের যোজনায় কেন্দ্র নাকি বেপরোয়া কাঁচি চালাইতে চাহিতেছেন। খুড়ো বলিলেন—“তাহলে যোজনা দাঁড়াবে গিয়ে একটি ইট-আলিয়ান সেলুনে!!”

খেলা প্রসঙ্গে “চিরঞ্জীব” প্রশ্ন করিয়াছেন—বয়স ভাঁড়িয়ে কী লাভ? সহযাত্রী বলিলেন—“খেলায় হয়ত লাভ নেই, কিন্তু চাকরি জীবনে আছে এবং তা আকছার ঘটছে এবং খেলা-খেলা জমে উঠেছে”।

একটি পিঠা পায়েস সংস্থায় নাম জানাইয়া আমরা ট্রামে-বাসের যাত্রীদের রিং আউট দি ওল্ড এবং রিং ইন দি নিউ করিতে বলিব এবং সঙ্গে সঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের দৃষ্টি-আড়ালে পেয়ারাদের [illegible] স্মরণ করাইয়া দিব।

প্রথম দর্শনে

গত ৬ সংখ্যক দেশ সংখ্যায় শ্রীঅন্নদা-শংকর রায়ের 'প্রথম দর্শনে' সুচিন্তিত প্রবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ জানাই। প্রবন্ধের ঐ স্বল্প পরিসরে তিনি অসমীয়া জাতি, তার জাত্যাভিমান ও আসামের সংহতির যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তা বিস্তৃত আলোচনা ও বহুল প্রচারের অপেক্ষা রাখে। আশা করি, এ ব্যাপারে 'দেশ'-এর কর্তৃপক্ষ কৃপণ হবেন না। অনেক দিন থেকেই আসামে অসমীয়া ও অন-অসমীয়াদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও উষ্মার কার্যকারণগুলির উপর কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল—শ্রীঅন্নদাশংকরের ঐ প্রবন্ধ এ ব্যাপারে আমাকে নতুন করে উৎসাহিত করল।

আসাম পুনর্গঠনের পর আসামের যে সীমা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে অসমীয়া জাতি, তার সাহিত্য, কৃষ্টি, ভাষা এক নতুন পরিণামের মোহানায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজ যারা আসামের মধ্যে নেই, তারা কোনো দিনই অসমীয়া ছিল না (যদিও তারা আসামের অধিবাসী, এই সূত্রে অসমীয়া ছিল)। তাদের মুখের ভাষা ছিল তাদের স্বতন্ত্র মাতৃভাষা; লেখার ভাষা ছিল ইংরেজী (আজও তা আছে)।

দুর্ভাগ্যের কথা, পুনর্গঠনের পরেও যে অঞ্চলটুকু আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল, সেটাও পুরোপুরি অসমীয়া রাজ্য হতে পারবে কিনা, এটা নিয়েও কম দ্বিধা এখানে নেই। অহম-তাই রাজ্য ও স্বাধীন কামতাপুরের দাবিও দিনে দিনে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যদি ভবিষ্যতে কখনও বর্তমান আসাম রাজ্য আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়, তা হলে অসমীয়া জাতি চরম সর্বনাশের সম্মুখীন হবে। প্রাচীন একটা জাতি, তার হাজার বছরের পুরনো সাহিত্য, সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এই পরিণামের সম্মুখীন হতে কোনো অসমীয়া ভাই-বোনই চাইবেন না—চাইবেন না কোনো সুস্থ সংবেদনশীল মানুষও। অন্নদাশংকর রায় ঠিকই অনুধাবন করেছেন, আসামকে সুসংহত করতে তার ঐক্য দৃঢ় করতে পারে একমাত্র ইংরেজী ভাষা। আসাম রাজ্যটির নাম 'আসাম' হলেও তার অধিবাসীদের একটা বিপুল অংশই জাতিতে অসমীয়া নয়। নাগা, কুকি, গারো খাসিয়া, লুসাই, মিজো, বড় কছারী যেমন অসমীয়া নয়, তেমনি অসমীয়া নয় এখানে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক বাঙালী, মাড়োয়ারী, বিহারী, শিখ, পাঞ্জাবী ও মাদ্রাজীরা। অবশ্য এই সব অন-অসমীয়া সম্প্রদায় নিজেদের অসমীয়া বলে ভাবলেও একজন 'খাটী অসমীয়ার' সঙ্গে তাদের অনেক পার্থক্য থেকেই যায়। অন-অসমীয়া সম্প্রদায় আসামে নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে আলাদা ভাবেই বাস করছেন। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা ও পাশাপাশি ইংরেজীর মত ভাষা, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চালু বলেই অন-অসমীয়া যে-কোনো ব্যক্তি অসমীয়া না শিখেই আসামে দিব্যি কাজ চালিয়ে দিতে পারেন।

এটাই হচ্ছে আসামের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। অসমীয়া ভাষা শিক্ষাটা এখানে জরুরী নয় বলেই এবং অসমীয়ারা বাঙলা, হিন্দী এবং ইংরেজী বোঝেন বলেই এখানে বসবাসকারী অন-অসমীয়ারা অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রায়শই অজ্ঞ থাকেন। এবং যেহেতু অসমীয়া ভাষা এবং অসমীয়া মানুষেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিপুলভাবে ছড়িয়ে নেই সেই হেতু সম্পূর্ণ অকারণেই অন-অসমীয়াদের অনেকে অসমীয়া জাতি ও অসমীয়া ভাষাকে একটু হেয় চোখে দেখেন। এটা অপরাধ। অসমীয়ারা আসামের বাইরে নেই, অন্য প্রদেশের ঘাড়ে চেপে নেই—এটাও কি একটা অপরাধ? ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকেরা যদি নিজের নিজের দেশেই থাকতে পারত, চলতে পারত, তা হলে তো কোনো সমস্যাই থাকতে পারত না। তাই আজ বহিরাগতদের চাপে অসমীয়ারা আসামেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। আসামে শিল্প, বাণিজ্য তেমন নেই—অথচ লোকসংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। অসমীয়া শিক্ষিত যুবকেরা আসামে চাকরি পাচ্ছেন না। বাইরে গেলেও কি পাবেন? সর্বত্রই তো সমান। তবে এইসমস্ত যুবকেরা কেন বিরক্ত হবেন না, কেন উষ্মা প্রকাশ করবেন না? তাই এরা আজ আসামে অন-অসমীয়াদের আধিপত্যে বিরক্ত। ১৯৬০ ও ১৯৬৮-র জানুয়ারীর দুঃখজনক ঘটনাবলী এরই পরিণাম। এটাও অবশ্য কাম্য নয়। হিংসার পথ কখনই সমস্যার সমাধান করে না—বরং পাল্টা হিংসাকে খুঁচিয়ে তোলে। এ পথ অসমীয়া ভাইদের ছাড়তে হবে। বরঞ্চ তারা আন্দোলন করুন আসামকে কি করে আরো সমৃদ্ধশালী করা যায়। শিল্পে বাণিজ্যে অসমীয়াদের অসন্তোষ দূর করার সবচেয়ে বড় পথ আসামের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মানেই নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠা। তা গড়ে উঠলেই নতুন নতুন চাকুরির সংস্থান। তার মানেই অসন্তোষের অবলুপ্তি। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের আশু তৎপরতা দেখান সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। হিংসাত্মক আন্দোলন দিয়ে অন-অসমীয়াদের কোনো দিনই আসামের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। অসমীয়া ভাইদের এ শিক্ষা নিতে হবে ইতিহাস থেকে।

ইংরেজী আসামের ঐক্যকে এক সূত্রে বাঁধতে পারে বলে অন্নদাশংকর মনে করেন। এটা কখনই সম্ভব নয়। এটা শুধু একটা 'থিয়োরী'। জানি, অসমীয়ারা ইংরেজীকে মাধ্যম করলে নাগাল্যান্ড রাজ্য ও 'মেঘালয়'-এর সৃষ্টি হয়তো হত না। এখনও তারা ইংরেজী গ্রহণ করলে বহুভাষী আসাম রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করতে পারেন। তা যদি হয়, তা হলে অসমীয়াদের কি করতে হবে? না তাদের জাত্যাভিমান ছাড়তে হবে, আসাম নাম ছাড়তে হবে, অসমীয়া ভাষা ছাড়তে হবে (অন্তত সরকারী কাজে-কর্মে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে)। নিজ জন্মভূমিতে বসে নিজের ভাষাকে 'দুয়োরানী' করতে কোনো স্বাধীন জাতি পারে না. কোনো দিন কোনো জাতি তা পারেও নি। এতে আসামের ঐক্য ধ্বংস হলেও আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি অসমীয়াদের জন্যই থাকবে।

"বাজক ঢবা, বাজক শংখ, বাজক মৃদং, খোল
অসম আজি উন্নতি পথত
জয় আই অসম বোল।"

—'লক্ষীনাথ বেজবরুয়ার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলি "আসামের জয়ধ্বনি করো।"

অধ্যাপক মলয় বসু
গৌহাটি-১১

॥ ২ ॥

৭ই ডিসেম্বর-এর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় মহাশয়ের 'প্রথম দর্শনে' প্রসঙ্গে দু' একটি কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।

শ্রীরায় যদি মনে করে থাকেন আট বছর আগেকার আসাম উপত্যকার ট্র্যাজেডী শুধু-মাত্র বাঙালীদের অসমীয়া ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার অভাবে অথবা অসমীয়াদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে একথা অস্বীকার করার জন্যেই হয়েছে তবে আসামবাসী কোন বাঙালী শ্রীরায়কে সমর্থন করতে পারবে না। আমরা আসাম-বাসী বাঙালীরা অসমীয়া সমাজ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল এবং

অসমীয়া ভাষার রত্নরাজির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু আট বছর আগে আসামবাসী বাঙালীরা কি চেয়েছিল শ্রীরায়ের উচিত ছিল সে বিষয়ে পুরো অনুসন্ধান করা।

উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুরী ভাষায় বাংলা লিপি পুরোপুরি ব্যবহৃত হয় (অসমীয়া ও বাংলায় 'র'-এর যে তফাত, মণিপুরী ও বাংলায় সেটুকুও নেই) কিন্তু কোন উর্বর মস্তিষ্ক বাঙালী মণিপুরী ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে চালাবার ন্যূনতম চেষ্টা করেনি। অসমীয়াকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে স্বীকার করতে বাঙালী কোথায় তর্ক তুলেছে আমরা জানতে উৎসুক রইলাম। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অসমীয়া ভাষা স্বীকৃতি পায়নি এটাই যদি লেখক প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরেন তাহলে বলব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মণিপুরী ভাষাও স্বীকৃত নয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বাঙালীরা মণিপুরী ও বাংলা ভাষাকে ভিন্ন মনে করেন না।

বিশু ভট্টাচার্য ও
মুকুল নাথ
শিলং

লেখকের মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথের "শব্দতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে "ভাষা বিচ্ছেদ" বলে একটি প্রবন্ধ আছে। সেটির রচনাকাল ১৩০৫। তাতে তিনি ওড়িয়া ও অসমীয়াকে বাংলার "এই সকল উপভাষা" বলেছেন। এমন কথাও বলেছেন যে, "উড়িষ্যা এবং আসামে বাংলা শিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপরিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন একগৃহবর্তী হইতে পারিত।"

রবীন্দ্রনাথের মতো যোগেশচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীদেরও ধারণা ছিল যে, অসমীয়া একটি স্বতন্ত্র ভাষা নয়, একটি উপভাষা। সাধারণ লোকের অপরাধ কী। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আত্মজীবনীতে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। আর তাঁর প্রতিক্রিয়া।

ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া থাকে। সেকালের বাঙালীদের ক্রিয়া আর একালের অসমীয়াদের প্রতিক্রিয়া কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এক শতাব্দী ধরে যদি একদল মানুষ আরেক দল মানুষকে আঘাত দেয় তারাও সুযোগ পেলে পালটা দেয়।

বিরোধের অবশ্য অন্য অনেক কারণ ছিল। কিন্তু সব সবচেয়ে বড়ো দুটি কারণ ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জয়যাত্রা ও অসমীয়া ভাষার নির্বাসন। এ দুটির একটিও আর নেই। সুতরাং অতীতের উপর যবনিকা পতনের সময় এসেছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সদানন্দর জার্নাল

৭-১২-৬৮ তারিখের 'দেশ' মনীবাবুর চিঠি ও চণ্ডী লাহিড়ীর উত্তর পড়লাম। 'সদানন্দর জার্নালের' অংশ হিসাবে মুদ্রিত (২-১১-৬৮) কার্টুনটিতে ভুবন মুখোপাধ্যায়কে 'হুতোম প্যাঁচার নকশার' আসল লেখক বলে যে দেখিয়েছিলেন তার প্রামাণিকতা প্রমাণের জন্যই তাঁর এই চিঠির প্রস্তাবনা।

নতুন সাহিত্য ভবন' থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সচিত্র সংস্করণের এক কপি বই আমি পড়েছি। এর ভূমিকা লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। লেখকের নাম কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ মুদ্রিত হয়েছে। এই কারণেই অনুমান করতে বাধা নেই যে নারায়ণবাবু কালীপ্রসন্নকেই এই বই-এর লেখক বলে মনে করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন "কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নকশা লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়ই প্রীত করিয়াছিল।" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র প্রথম খণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত কালী-প্রসন্নের যে জীবনী পাওয়া যায় তাতে দেখছি কালীপ্রসন্নকেই 'হুতোম প্যাঁচার নকশার' লেখক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর 'The Indian Mirror'এর ২৯-৭-১৮৭০ তারিখের সংখ্যায় যে স্মৃতি তর্পণ করা হয়েছিল তা পড়লে দেখা যাবে যে তিনি কিছুদিন অন্তত স্কুলে পড়েছিলেন। কোন ডিগ্রি-ডিপ্লোমা যেহেতু তাঁর ছিল না অতএব স্কুল-কলেজের লেখাপড়া তাঁর সীমিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাড়ির লেখাপড়া যে তাঁর 'অতি সামান্য' এমন সিদ্ধান্ত চণ্ডীবাবু করলেন কি করে? হরচন্দ্র ঘোষই তাঁর একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না; ব্রজেন্দ্রনাথের কথা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি কার্ক প্যাটরিক নামে একজন সাহেবের কাছে "রীতি-মত ইংরাজী অধ্যয়ন" করেছিলেন এবং পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত ও মাতৃভাষা "আয়ত্ত" করেছিলেন।

চণ্ডীবাবুর মতে "অল্প শিক্ষিত ধনী-বাবুদের চারিত্রিক দোষাদি তাঁরও ছিল।" ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা জীবনীটিতে কিন্তু এর কোন উল্লেখ নেই। বরং "যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি জীবনে চলিতে চাহিয়াছিলেন" তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে সব জায়গায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকাটিতে লিখেছেন "একদিকে পুতুল নাচ, বাইনাচ এবং গণিকা চর্চার বনেদী বাবুয়ানা, অন্যদিকে মদ্যপান এবং চলনে-বলনে লেখনে বিকৃত ইংরেজীয়ানা— গ্রীক পুরাণের ইউলিসিসের মত এই শিল্প ও ক্যারিবডিসের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য শক্তির সাহায্যে একটি খাঁটি মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন কালীপ্রসন্ন। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শ সে যুগে একমাত্র কালীপ্রসন্নের মধ্যেই সার্থক-ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।" এই রকম একটি চরিত্রকে নিয়ে মধুসূদন প্রহসন লিখেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। তবে মাইকেলকে প্রথম আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন কালীপ্রসন্নই জানিয়েছিলেন এবং তার উত্তর দিতে গিয়ে উনি বলেছিলেন "বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।"

কালীপ্রসন্নই যে মহাভারতের অনুবাদক তা শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নিজে কিন্তু ১৮শ খণ্ডের শেষে উপসংহারে স্বীকারোক্তি করেছেন যে তিনি সাতজন পণ্ডিতের সহায়তায় অনুবাদ করিতে পেরেছেন। ওই স্বীকারোক্তিতেই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর অসামান্য সাহায্যের জন্য।

স্ব-সমাজ ও স্ব-কালকে বিদ্রূপ করে সাহিত্য সৃষ্টির বহু নিদর্শন বিশ্ব-সাহিত্যে বিদ্যমান এবং বাংলা সাহিত্যেও তা বিরল নয়। কাজেই চণ্ডীবাবুর এই ধরনের যুক্তির সারবত্তা আমার হৃদয়ঙ্গম হলো না।

মাত্র ২৯ বৎসরব্যাপী যে ব্যক্তি কম করে পাঁচটি বিভিন্ন ভাষার সংবাদ এবং সাময়িক-পত্রকে সে যুগে অর্থ সাহায্য থেকে মুদ্রাযন্ত্র দান, মালিকানা ক্রয় ইত্যাদির দ্বারা সুষ্ঠু প্রকাশে সাহায্য করেছিলেন, ১৮৬১ সালের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষে এবং ১৮৬৮ সালের ল্যাঙ্কা-শায়ারের দুর্ভিক্ষে যে ব্যক্তি মানবতার আদর্শে দানে উন্মুক্ত হস্ত ছিলেন, যিনি সেই বিলাসী সমাজের পরিবেশে থেকেও জনসেবার প্রেরণায় চিৎপুরে দাতব্য চিকিৎ-সালয় স্থাপন করেছিলেন, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য কলকাতার জন্য নিজ ব্যয়ে ধারাযন্ত্র কিনে এনেছিলেন, যিনি সমসাময়িক বহু লেখককে অকুণ্ঠ, অর্থ সাহায্য করেছিলেন—যাঁকে শিবনাথ শাস্ত্রী 'সুবিখ্যাত' 'মহোদয়' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে উল্লেখ করেন এবং নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায় যাঁকে "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর 'রেনেসাঁসে'র অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র' মনে করেন সেই ব্যক্তিকে মহাত্মা বলায় চণ্ডীবাবু যে ভাষায় চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তা সুরুচির পরিচয় বহন করে না। যে বিষয়ে

পণ্ডিতদের মতভেদ বর্তমান সে বিষয়ে আরো সংযত ও শোভনভাবে মত প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
সিঙ্গুর, হুগলী

লেখকের বক্তব্য

কালীপ্রসন্ন সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাসের গড্ডলিকাপ্রবাহে আমি গা ভাসিয়ে না দেওয়ায় অভিযুক্ত হয়েছি। আমার অপরাধ এক মহাত্মার চরিত্রহনন। আমার ধারণা, খুব অল্প বলে সংযমের পরিচয় দিয়েই অন্যায় করেছি। বঙ্গসাহিত্যের সিরিয়াস পাঠকমাত্রই জানেন, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল ভাবাবেগোচ্ছন্ন। কালীপ্রসন্নের ব্যাপারেও ডঃ সুকুমার সেন ছাড়া প্রায় সবাই প্রচলিত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর' ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা হতে পারে, সাহিত্যের ইতিহাস রচনার বেলায় তথ্যের উপর ভরসা রাখা ভাল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ সনে ক্যালকাটা রিভিউতে ধরে নিয়েছিলেন হুতোমই কালীপ্রসন্ন। পরবর্তী কালে সবাই বঙ্কিমের রচনার উপর ভিত্তি করেই ধরে নিয়েছেন নক্শার লেখক কালীপ্রসন্ন। কালীপ্রসন্ন স্বমুখে সে কথা কোথাও বলেন নি। অতএব তাঁকে যশোপহারক বলা যায় কি?

নিশ্চয়ই যায়। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে, তিনি যশোপহারক। কালীপ্রসন্ন জেনেশুনেই নক্শার লেখকের নাম প্রকাশ করেননি যশ হাতছাড়া হবার ভয়ে। প্রচলিত জীবনীগুলি বিশ্লেষণ করলেই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভায় সন্দেহ জন্মায়। তাঁর সাহিত্যখ্যাতি ছড়িয়েছে যখন বয়স মাত্র তেরো, যখন সবে কলেজ ছেড়েছেন। **The only son of a wealthy father, he left his college studies while very young and his character gave little indication of any future worth or usefulness.**

তেরো বছর বয়সেই তিনি বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা ও সভা স্থাপনা করেন। পত্রিকার সম্পাদক নিজেই। যদিও কালীপ্রসন্ন নিজেই স্বীকার করেছেন, "যদ্যপি আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই তথাপি বিদ্যারম্ভ ব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম।" বস্তুত বিদ্যোৎসাহিনী সভার স্থাপনা হয়েছিল তাঁকে বঙ্গভাষা শেখাবার জন্য। "নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষা অনুশীলনের জন্য এই সভা করিয়াছেন।।' যাঁর তেরো বছর বয়সে 'বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি' হয় না তিনি তেরো বছর বয়সেই বাবু নাটক লিখলেন স্বনামে। আর সেই নাটক এতই পাকা হাতের রচনা যে, আট আনার বই 'কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই।' (নাটকের ২য় সংস্করণ) টাকার বিনিময়েই এই অসম্ভব সম্ভব হয়। এর পর ১৭তে বিক্রমোর্বশী, ১৮তে সাবিত্রী-সত্যবান, ১৯শে মালতী-মাধব ও ২১-এ নক্শা। নক্শা লেখার আগে "কলিকাতার বেশ্যাদের বাসস্থানের জন্য পল্লী নির্দিষ্টকরণের আন্দোলন লেজিসলেটিভ কৌন্সিলে আপীল" নিয়ে যে তিনি একটু অশোভনরকম ব্যস্ত ছিলেন, সেটা পত্রদাতারা চেপে গেছেন বা জানেন না।

নক্শার সমসাময়িক বহু লোকের কুৎসা-কীর্তন ছিল (পুরাতন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। দেশের লোক সবাই জানতেন কালীপ্রসন্নই নক্শার লেখক। সেজন্যই তিনি নক্শায় নিজের নাম দেননি। লেখক হিসাবে নিজের যশ বজায় রইল অথচ ঝামেলা পোহাতে হল না। ভুবনচন্দ্রের নামে বই ছাপলে ঝামেলা এড়ানো যেতো বটে কিন্তু যশও হাতছাড়া হয়ে যেতো। যাই হোক, সব কিছুই প্ল্যানমাফিক চলছিল, কিন্তু তিনি কাঁচা কাজ করে বসলেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ব্যবহারে। কালিপ্রসন্নের বদান্যতার জন্যই 'অনেক লেখক তাঁদের সাহিত্যচর্চার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।' তাঁর অর্থদানের সুনাম এতই ছড়িয়েছিল যে, আপনার মুখ আপনি দেখ-র ২য় খণ্ড ছাপাবার জন্য অর্থসাহায্য চেয়ে ভোলানাথ বেয়ারিং চিঠি দিয়েছিলেন। 'হুতোমের চিরপ্রচলিত রীতানুসারে এই ভিক্ষুকের পত্রখানি' গোপন না রেখে নক্শার ২য় সংস্করণে সেটা ছাপা হল মন্তব্য সহ। চিঠি লেখা হল কালীপ্রসন্নকে, উত্তর দিলেন হুতোম। এতেই হুতোম ও কালীপ্রসন্ন এক হয়ে গেলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের বলার ঢের আগেই কালীপ্রসন্ন জেনেশুনেই হুতোম সেজে বসেছিলেন। কালীপ্রসন্নের অর্থের দম্ভ এত দূর যে, তিনি ভোলানাথকে ভিক্ষুক বলতে দ্বিধা করেন নি। আর এজন্যই তিনি আমার কাছে মহাত্মা নন। অর্থের বিনিময়েই যশ অর্জন যে তাঁর জীবনদর্শন ছিল এ কথা মহাভারত-অনুবাদের উপসংহারে নিজেই বলেছেন—'জগদীশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্বক অবিনশ্বর সংকীর্তি লাভ করুন। তাহাদিগের যশসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক।'

মাইকেলকে কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। অথচ এই মাইকেল তাঁর উপর চটে তাঁকেই একেই কি বলে সভ্যতার ব্যঙ্গ করলেন (বটতলার বেসাতি—ডঃ সুকুমার সেন)। কারণ কি? মাইকেল কি অকৃতজ্ঞ ছিলেন? তা তো নয়। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। তবে কেন কালীপ্রসন্নের প্রতি তাঁর এই আক্রমণ? এর একমাত্র জবাব—মাইকেল ভণ্ডামি সইতে পারতেন না। নীল-দর্পণের অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল রাত্রিব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আদালতে হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে লঙ সাহেবকে মুক্ত করে কালীপ্রসন্ন ও লঙ হীরো হলেন। মাইকেল রইলেন উপেক্ষিত। এ বিষয়ে কেউ যদি নতুন আলোকপাত করেন তো খুশী হব।

হুতোমের ২য় সংস্করণেই প্রকাশিত হয়েছে সেই রহস্যময় কবিতাটি, যার প্রথম লাইন 'কারারূপ কারাবাসে কালে কালে আর নাশে ভোলা মন ভাবে না ভুলিয়ে।' কবিতাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে দুটি নাম, কালীপ্রসন্ন ও ভুবনমোহন।

ল্যাঙ্কাশায়ারের দুর্ভিক্ষে অর্থদান, চিৎপুরে চিকিৎসালয় স্থাপন, ধারাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ হয় তিনি মানবদরদী ছিলেন, হুতোমের লেখক কিনা সেটা প্রমাণ হয় না। পরিশেষে বলি, রাজসভা-সাহিত্যের শেষ ঐতিহ্যরক্ষক ছিলেন কালিপ্রসন্ন। তদতিরিক্ত কিছু নয়। সাহিত্যের বাইরে যে মানুষটি মানব হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন, দেশসেবায় অর্থব্যয় করেছেন, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই। এই আলোচনা অ্যাকাডেমিক আলোচনা, যা সত্য বলে মনে হয়েছে বলেছি, কোন বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নয়।

চণ্ডী লাহিড়ী

টোকিওর চিঠি

আপনার প্রভাবশালী 'দেশ' পত্রিকার 'টোকিওর চিঠি' মাধ্যমে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার যে খবর পাঠক-পাঠিকাবর্গের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন প্রথমেই তার জন্য আমাদের সকলের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানবেন।

এই প্রসঙ্গেই ইতিমধ্যে আমরা অনেকের কাছ থেকে পত্র মারফত অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জেনেছি। কেবল পশ্চিম বাংলা থেকেই নয় সুদূর বোম্বাই, দিল্লী, পাটনা, রাঁচী ইত্যাদি ভারতের বহু স্থান থেকে আমরা সাড়া পেয়েছি যা আন্তরিক এবং শুভেচ্ছামূলক। তাঁদের আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। হয়তো সকলকে আজকে এইটুকু লিখতে বসে আমাদের সান্ত্বনা এই যে, 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'র বহুজন আমাদের চিন্তাধারা ও মর্মবেদনার সাথে নিজেদের জড়িয়ে বেদনা অনুভব করেছেন। সেই দিনই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থকরূপ পাবে, যেদিন আমরা সকলে এক সাথে এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের মাঝে বিরাজমান কৃত্রিম বাধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।
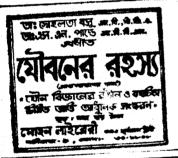
পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালীরা যে এত উৎসুক, সেটুকু জেনে প্রবাসী পূর্ব পাকিস্তানীরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং সেজন্য তাঁরা জানাচ্ছেন অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য যোগা-যোগ শুরু করা হয়েছে। তথ্যগুলি পরবর্তী সুযোগে জানাবার ইচ্ছা রাখি।

জাপানী ও বাংলা ভাষাভাষী মৈত্রি সংসদের পক্ষ থেকে—

কাযুকো ইয়ামাদা
টোকিও

'প্রজাপতি' দাম্পত্য

শুনেছি কীটপতঙ্গ প্রজাপতির জগতটাই আলাদা—লৌকিকের এক অলৌকিক। ওদের বাস কোন নোম্যানসল্যাণ্ডে। একদল চিরকেলে ছেলে ধরেছে। তাদের কাজ সেই প্রজাপতির পিছনে ছোটাছুটি। কখনও লেগে থেকেছে কারও আঙুলে রঙীন পাখনার গুঁড়ো। আঙুল কতদিন চিটচিট করেছে। ছেলেদের মনে অবশ্য অগাধ করুণা—কেউ পিষে মারে না। তবে বড়রা কেউ কেউ বলতেন—ওদের মধ্যে কোন-কোনটা নাকি মারাত্মক সর্বনেশে। দারুণ জঘন্য বিষে ভরা। হুলেও আছে বিষের যন্ত্রণা। ধরে গেলে চাকা-চাকা পাঁচার যা ফোটে চামড়ায়।

একটা সেই রকম প্রজাপতি ধরা পড়ল। আমাদের হয়েছে এখন মুশকিল—নবীন হাল আমলের পতঙ্গবাজ ছেলেপুলেদের। না ধরলে জীবনটা ভুয়ো, ছুটতে গিয়ে হাতপা ভাঙলেও থামিনে।—আমাদের কী হবে? আমরা যে তফাত বুঝিনে, বর্ডার চিনিনে!

অবশ্য তফাত চেনার লোক আছেন কিন্তরই। আমাদের দুর্ভাগ্য—কী করব, ছেড়ে দেব ছোটাছুটি? আমাদের ছুটন্ত চোখে সব পতঙ্গই এক। কোনটা ধরব, কোনটা ধরব না, কতটুকু ছুঁলে আঙুল ও মন নিরাপদ থাকবে ...এইগুলো বলে দেবার জন্যে সঙ্গে কে দৌড়াদৌড়ি করতে রাজী অবিকল লাইনস-ম্যানের মত অবিকল ছায়ার মত?

বিষের পতঙ্গ যা—যারা চিনবার চিনে নারুক। এ তো একরকম ভালোই। শরীরে যখন আছি, শরীরটা সুস্থ রাখা জরুরী। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা নবীনরা বড্ড বেশি চমকেছি। একে সময়ের সর্বনেশে ঠাণ্ডার হাতের আঙুল নীল, তার ওপর খুন-খারাপি। সারাক্ষণ আশেপাশে লাইনসম্যান খুঁজতে গিয়ে প্রজাপতি জগতে যাচ্ছে কোন জায়গায় পা ফেলব, কোথায় ফেলব না, কতদূরে অবাধ ছুটতে পারব, কতটার অক্ষমতার পতিবেগ হবে—এইসব ভাবনাও মনে জাগো হচ্ছে। কারণ ছোটাছুটির সময় মনন্ময়তা-তন্ময়তা ভিতর-বাহির আদি-অন্ত দেশকাল এখন ওতপ্রোত মিশে যায় যেসব দৃষ্টি হেথা নয়, অন্য কোনখানে' পৌঁছে; চোখে কিছু দেখি না, কানে কিছু শুনি না।

এই সময়—এই দুঃসময়ে থাকবে কি একটা মহাশক্তিশালী ইলেকট্রনিক কম্পিউটার, নয়ত একটা প্রচণ্ড ধরনের বক্তা মাইক—অনবরত ঘোষিত হবে, থামো...থামো...সামনে খোড়া...বাঁয়ে মোড়...ডাইনে যাও...হোঁশিয়ার?

আমাদের পূর্ব পুরুষদের পাখিজগতে বলতে শুনেছি—'আমরা প্রজাপতি ধরে-ছিলাম'। তাঁদের দিকে নবীনেরা তাকিয়ে আছে। কী করব বলুন তাহলে?

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

সঙ্গীত সম্মেলনে এক রাত্রি

এবারের 'দেশ'-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গীত সম্মেলনে একরাত্রি লেখাটি পড়ে সুন্দর হয়েছে। এ-লেখা এক সাঁত্যকারের রসিকজনের লেখা, যিনি কেবল সুরের টানেই অপরিচিত লোকের ভিড়ে লুকিয়ে বসে গান শোনেন। কিন্তু লেখকের একটি কথা খট্ করে আমার কানে বাজলো। তিনি লিখেছেন: আমি নিজে জেগে থাকারই চেষ্টা করবো—শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরে সাধারণত আমার ঘুম পায় না—একমাত্র আমীর খাঁর গান শুনলে চোখের পাতা দুটো বড্ড ভারী হয়ে আসে। আজ আমির খাঁ নেই।' আমার কিন্তু সারাক্ষণই মনে হয়েছে কি-যেন পাচ্ছি না, কি-যেন নেই। পরে বুঝেছি, সেই সুদূর প্রসারী অন্ত-স্তলে-বাঁধা সুর-লহরী নেই, আমীর খাঁ নেই। জনৈক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা লেখেন, জানি। ইনি কি সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়? তাহলে এঁর কি বিষ্ণু দের কবিতা ভালো লাগে না? বিষ্ণু দের সেই সুদূর-প্রসারী গভীর অন্তস্থল? আমি কবিতায় যেমন বিষ্ণু দের মধ্যে একটা ক্লাসিক অন্তর্মানস দেখতে পাই, গানেও আমীর খাঁর মধ্যে সেই রকমই বিশুদ্ধ ক্লাসিক সুর-লহরী শুনতে পাই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা লেখেন, এই কথা মনে পড়ল বলেই এই প্রতি-তুলনা টানলুম।

এই প্রসঙ্গে পাঠকের অবগতির জন্য আরেকটা কথা জানাই। লেখক সারাক্ষণ খানের মধ্যে কৈরাজ খাঁর যে কণ্ঠ-পরিচয় পেয়েছেন তার পেছনে একটা যোগ্য কারণ রয়েছে। তা হলো, সারাক্ষণ খান কৈরাজের ভাগেন।

সাধনা গুহ
কলকাতা-২৬

স্টাইনবেক, বুদ্ধদেব বসু ও আরও অনেকে

প্রতি সংখ্যায় আমি লেখা দিতে দেরী করি বলে সম্পাদকমশাই আমাকে দারুণ বকুনি দেন। কিন্তু আমার সমস্যা এই, কোনো কোনো সপ্তাহে আমি লেখার বিষয়বস্তু খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল হই, পাগলের মতন নানান পত্রপত্রিকা ও বই ঘাঁটতে গিয়ে দিশেহারা অবস্থায় শেষের সেই ভয়ংকর দিনটি এসে যায়। আবার কোনো কোনো সপ্তাহে এতগুলি বিষয় এক সঙ্গে এসে যায় যে কোনটি ছেড়ে কোনটি রাখি—তা ভেবেই ঠিক করতে পারি না।

যেমন, আমি "বিনোদন সংখ্যা"র জন্য এক সপ্তাহের ছুটি পেয়ে মনে মনে সিলভিয়া প্লাথ সম্পর্কে একটা রচনা তৈরি করছিলুম। গত বছর ফেবার অ্যান্ড ফেবার কম্পানি থেকে সিলভিয়া প্লাথের 'দ বেল জার' নামে একটি ছদ্মবেশী আত্মজীবনী বেরিয়েছে—সেটি সম্প্রতি পড়ে মন খুবই বিমর্ষ হয়ে যায়—সিলভিয়ার পাগলা গারদে বসে লেখা কিছু কবিতার স্মৃতি এর সঙ্গে জুড়ে যায়—এবং অবধারিতভাবেই এরপর বিনয় মজুমদারের কথা মনে পড়ে। বাংলা দেশে বিনয় মজুমদার যে-রকম কবিতা লিখেছেন ও লিখছেন—চেতন-অবচেতনের যে সীমান্ত প্রদেশে তিনি জীবন কাটাচ্ছেন—সে রকম কোনো বিদেশী লেখক সম্পর্কে বর্ণনা কোনো ইংরেজী কাগজে পড়লে আমরা আগ্রহে আকুল হয়ে পড়তুম। সুতরাং সিলভিয়া ও বিনয় সম্পর্কে রচনা এখুনি শুরু করা উচিত—এই রকম মনস্থ করেছি—কিন্তু মাঝখানে এসে পড়লো দুটি মৃত্যু।

মহৎ লেখকের মৃত্যুকে সম্মান জানানো আমার মতন প্রতিবেদকের দায়িত্ব। স্টাইনবেক সম্পর্কে আমার উচ্ছ্বাস একটু বেশী। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পাঠকরা বিষয়বস্তু ও স্টাইল অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের লেখকদের বেছে নেন, এবং অনেক ভেবে চিন্তেই কোনো লেখককে তাঁর প্রিয় লেখকের পদ দেন। আর আমার মতন যেকোনো লোকেরা এলোমেলোভাবে বহু লেখককেই প্রিয় করে ফেলে। অ্যালা রব গ্রিয়ে'র মতন চালিয়াৎ লেখকেরও প্রসাদগুণ আমাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু সাধারণ যাঁরা রব গ্রিয়ে'র অনুরাগী—তাঁরা মনে করেন বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় কোনো মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি—কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। পাস্তেরনাকের কথা বাদই দিচ্ছি—মিখাইল শলোকফের ডন সিরিজের উপন্যাসগুলি পড়ার পর আমার মনে হয়েছে—শুধু এই ক'খানা বই লিখতে পারলেই একজন লেখকের জীবন সার্থক—এবং এমন সার্থক উপন্যাস পৃথিবীতে আর খুব বেশী লেখা হয়নি।

যাই হোক, স্টাইনবেক সম্পর্কে আমার উচ্ছ্বাস একটু বেশী। তাঁর 'অব মাইস অ্যান্ড মেন' বইটা প্রথম পড়ে আমি এতখানি অভিভূত হয়েছিলুম যে তখুনি তাঁর অন্য বইগুলি ব্যাকুলভাবে খুঁজতে শুরু করেছি। কিন্তু অন্য বই পাওয়ার আগেই—স্টাইনবেককে আমি চর্মচক্ষে দেখি। আমার চর্মচক্ষে, কিন্তু তাঁর চর্ম-শরীর নয় যদিও। আমার মধ্যে সেই ছেলে-মানুষী আছে, কোনো প্রিয় লেখককে চোখের সামনে হাঁটা চলা করতে দেখলে অকারণেই ভালো লাগে। সেই সময় দশ-বারো বছর আগে, ও' হেনরির 'ফুল হাউস' নামে একটা সিনেমা এসেছিল—ও হেনরির চারটে না পাঁচটা ছোট গল্প—প্রত্যেকটা শুরু হবার আগে চুরুট-মুখে স্টাইনবেক ভারী গলায় সেগুলোর সম্পর্কে দু' চার কথা বলছিলেন। সেই সিনেমাটা দেখার মাত্র আগের দিন আমি স্টাইনবেকের প্রথম বই পড়েছি। ভেবে দেখুন আমার অবস্থা! খুব ছেলেমানুষী, তাই না!

এখন, স্টাইনবেক সম্পর্কে আমার উচ্ছ্বাস এবং তাঁর লেখা—আমার অধীত (মোটে তিনটি) বইগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লেখার মতন পরিসর এখানে নেই। আমার শুধু সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থ বিবরণ লেখার কথা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, ইতিমধ্যে ছুটির দরুণ পনেরো দিন কেটে গেছে—ও নানা পত্রপত্রিকায় স্টাইনবেক সম্পর্কে কিছু লেখা বেরিয়ে গেছে। এমনকি গত বছর ভিয়েৎনামে স্টাইনবেকের সাংবাদিকতা, রুশ কাগজ প্রাভদার সঙ্গে ঝগড়া ও বাজি ফেলার ঘটনাও পাঠকদের জানা হয়ে গেছে। সুতরাং পুনরুক্তি বা বাহুল্য ভয়ে তাঁর সম্পর্কে কিছু না-লেখাই ঠিক করলুম।

আর একটি মৃত্যু অনেকখানি অগোচরেই ঘটে গেল। পরিণত বয়েসেই ম্যাক্স ব্রডের মৃত্যু হয়েছে, এ ঘটনা শোকের নয়, স্মরণের। ম্যাক্স ব্রড ইজরাইলের নাগরিকত্ব নিয়ে-ছিলেন—সেখানে বসে তিনি নিজেও কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন—সেসব উপন্যাস ক'জন পড়েছেন জানি না—আমার কোনো পরিচিত ব্যক্তির হাতে ম্যাক্স ব্রডের উপন্যাস দেখিনি বলেই আমার পড়া হয়নি। কিন্তু যে-কোনো বিদেশী সাহিত্যের পাঠকের কাছেই ম্যাক্স ব্রড পরিচিত ও কৃতজ্ঞতার অধিকারী। ম্যাক্স ব্রডের সুবিবেচনার সামান্য অভাব হলেই আমরা ফ্রানৎস কাফকার রচনা থেকে বঞ্চিত হতাম এবং সারা পৃথিবীর গদ্য সাহিত্যই তা হলে দু' এক ধাপ পিছিয়ে থাকতো নিশ্চিত।

*

মৃত্যুর চেয়ে জন্মদিনের উৎসবের কথা লেখা অনেক রমণীয়। জনৈক মহিলা যাঁকে শিশু অবস্থাতেই আতুর ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলার সুপারিশ করেছিলেন—সেই বুদ্ধদেব বসু ষাট বছরে পদার্পণ করলেন, জানি না সেই ভদ্রমহিলা এখন কোথায় আছেন। "চার অধ্যায়" উপন্যাসে এলাকে অন্তু বলেছিল, তোমার সাতাশ আর আমার সাতাশ এক নয়। কথাটা ঠিক, সবার ক্ষেত্রে বছর মানেই বয়েস নয়। ষাট বছর বুদ্ধদেব বসুকে ষাট বছর বয়স্ক করেনি, তাঁর

ছিপছিপে শরীর, চশমাহীন উজ্জ্বল চোখ, ঘর ফাটানো তেজী হাসি। চেহারায় অনেকের বার্ধক্য আসে না, কিন্তু কণ্ঠস্বর খানিকটা ঝাঁঝালো হয়ে যায়, চিন্তায় শ্লথতা আসে—কিন্তু বুদ্ধদেব বসুকে তাঁর জন্মদিনে দেখলাম—নতুন ধুতি পাঞ্জাবি পরে গলায় ফুলের মালা দিয়ে তিনি অবশ্যই বসে ছিলেন না—সেরকম আশংকাও করিনি, প্যান্ট ও ফুল হাতা শার্ট পরে তিনি চঞ্চলভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন, উপস্থিত অনেক তরুণের ভিড়ে অনায়াসে মিশে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বয়েস নিরপেক্ষ তারুণ্যই বড় কথা নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নিরলস আগ্রহ—তাঁর রচনায় দুর্বার প্রাণশক্তি—বাংলা দেশে তাঁকে অনন্য করেছে। বুদ্ধদেব বসুই, বলা যায় প্রকৃত অর্থে 'সাহিত্যিক' এখন বাংলা দেশে—সাহিত্যের সব কটি শাখাই যাঁর প্রতিভার স্পর্শে কিছু সজীব হয়েছে—শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষা ও বানানের সংস্কার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ অনবদমিত তাঁর পরবর্তী যুগের লেখকদের রচনা সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও যোগ্যের সমাদর, সাহিত্যের নানান প্রাসঙ্গিক সমস্যা ও বিতর্কে তার সক্রিয় অংশ গ্রহণে এটাই প্রমাণ করে সাহিত্য তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জড়িত।

বুদ্ধদেব বসুর জন্মদিন ছিল ৩০শে নভেম্বর, এই উপলক্ষে কলকাতা ও সিউড়িতে কয়েকটি ঘরোয়া সাহিত্য সমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার লিখতে এত দেরী হলো, তার কারণ এই উপলক্ষে দুটি বাংলা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরুবার কথা ছিল—সে দুটির জন্য আমি অপেক্ষা করে ছিলুম। কলকাতা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি সম্প্রতি বেরিয়েছে। জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত কলকাতা পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটির বিশেষ অতিথি সম্পাদক নরেশ গুহ ও অরুণকুমার সরকার। কিছু নতুন ও কিছু পুনর্মুদ্রিত রচনা আছে বুদ্ধদেব বসুর অনুরাগী বাংলা দেশের কয়েকজন অনুরাগী ও সুধিবৃন্দের। এই অনুরাগীদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ। এ ছাড়া লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, নিরুপম চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দেব। এ ছাড়া আছে বুদ্ধদেব বসুর সংকলিত চিঠিপত্র। রচনাগুলি মোটেই নিছক স্তুতি বা প্রশস্তি নয়। বুদ্ধদেব বসুর রচনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এঁরা—কিছু উপভোগ্য স্মৃতি কথা। আমি কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি : "গদ্যের চেয়েও বুদ্ধদেব বসুর কবিতাই আমাকে বেশী টানে। বলা উচিত, তাঁর চিন্তামূলক গদ্য যত বেশী ভালো লাগে তার চেয়েও ঢের বেশি ভালো লাগে তাঁর কবিতা। অন্য সব দায় সেরে কবিতায় তিনি হতে চান সহজ স্বচ্ছন্দ; কিন্তু নির্ভার নয়। সেই জন্যই বোধ হয় পয়ারের পদবন্ধই তাঁর হাতে তালা খোলে" (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। "যুবতী স্ত্রী যেমন বৈরাগ্য-সাধনকে ভয় করে, বুদ্ধদেবও তেমনি সাধু কবিকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি জানেন যে, সাধুত্বের যেখানে পরিণতি কাব্য সেখানে বাহুল্য। জীবনকে যিনি অন্তরে পরম মধুময় বলে লাভ করেছেন, কবিতার মাধুরীতে তাঁর আর প্রয়োজন নেই। এই সাধুসন্তের দেশে বুদ্ধদেব নির্বাণের চাইতেও সেই তৃষ্ণাকে বরণীয় বলে গ্রহণ করেছেন, কাব্যে যার ফলশ্রুতি" (অম্লান দত্ত)। "বুদ্ধদেব বসুর "কঙ্কাবতী" প্রেমের কাব্য। এসব কবিতা পড়তে বসে এগুলো কেন বিদ্রোহের কবিতা নয়, এ-সবের ভিতর ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই কেন, কিংবা হাড়ের থেকে সৌন্দর্য ঝরে পড়ে এসব কবিতায় কঙ্কালমুণ্ডের টিট্‌কারি উড়ছে না কেন—এসব গূঢ় জিজ্ঞাসা আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হয়" (জীবনানন্দ দাশ)। "মাঝে মাঝে মনে হয়, বুদ্ধদেব একটু আগেই এই পথ ধরেছিলেন...তখন তিনি একা, দীর্ঘকালই ওখানে একা... 'কল্লোল'-এর সঙ্গে তার নাম উল্লেখিত হয়, সেটা নেহাতই একটা সমসাময়িকতা, অ্যাকসিডেন্ট, এই আবহাওয়া তাঁর লেখক-সত্তা জাত, কিন্তু ঐ মেজাজে লালিত নন, স্বেচ্ছায় অথবা অগত্যা সরে এসেছিলেন নিজেই, তৈরি করে নিলেন নিজস্ব একটি তারামণ্ডল" (সন্তোষকুমার ঘোষ)। "যে লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হলো এ যেন একটা দ্বীপ। এ দ্বীপের বিশেষ আবহাওয়া, ফল ফুল, ধ্বনি ও বর্ণ। এর সরস উর্বরতার বিশেষ একটা সীমার মধ্যে এক জাতীয় বেদনার উপনিবেশ। দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু নিভৃত।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিমল রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় "দৈনিক কবিতা"র একটি বিশেষ বুদ্ধদেব বসু সংখ্যাও বেরিয়েছে। নানান উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বুদ্ধদেব বসুর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার—বহু কূট ও ব্যাপক প্রশ্ন করেছেন জ্যোতির্ময় দত্ত, কবিতা সিংহ, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর রায়চৌধুরী।

সনাতন পাঠক

রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী। অনুবাদঃ মলিনা রায়। বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭। দাম—ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে দীনবন্ধু এণ্ডরুজকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, এণ্ডরুজ নিজেই সেগুলি একদা বাছাই করে ভূমিকা সমেত আটটি অধ্যায়ে 'লেটারস টু এ ফ্রেণ্ড' নামে প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই পত্রগুচ্ছের অনুবাদ। তবে এ ছাড়া আরও অনেক কিছু আছেঃ রবীন্দ্রনাথকে লেখা এণ্ডরুজের ছাব্বিশটি চিঠির বাংলা অনুবাদ, পরিশিষ্ট, ৬৩ পৃষ্ঠা তথ্যপঞ্জী, এণ্ডরুজ ও তাঁর মাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কিছু অপ্রকাশিত চিঠি এবং ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে।

রবীন্দ্রনাথ যখনই যা ভেবেছেন, অকপটে সব কথাই এণ্ডরুজকে লিখেছেন। এত মন খুলে খুব বেশী লোককে চিঠি লেখা যায় না। এজন্য চিঠিগুলিই কেবল মূল্যবান হয়ে ওঠেনি, দীনবন্ধু রবীন্দ্রনাথের যে কত কাছাকাছি ছিলেন, তাও আমরা বুঝতে পারি। তবে প্রায় প্রতিটি চিঠির বক্তব্য দেশ, ভারতীয় সমাজ, শান্তিনিকেতন বা এই জাতীয় কিছু। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ১৯১৫ সালের একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন—'আমি আর আপনি দুজনেই [illegible]' ১৯১৩ সালের আগস্টে প্রথম চিঠি লেখা আর শেষ চিঠি ১৯২১ সালে। এণ্ডরুজের প্রথম চিঠিও ১৯১৩ সালে এবং শেষ চিঠিও ১৯২১ সালে। এণ্ডরুজ মারা যান ১৯৪০ সালে কলকাতার একটি হাসপাতালে। কাজেই ১৯২১ সালের পরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মাই ডিয়ারেস্ট ফ্রেণ্ড" চার্লিকে নিশ্চয়ই আরও চিঠি লিখেছেন। কিন্তু সে-সব চিঠির সন্ধান হয়ত পাওয়া যায় নি তাই পরিশিষ্টেও সেগুলি যোগ করা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ দূরে প্রবাসে গিয়েও শান্তিনিকেতনের কথা ভেবেছেন, একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, শান্তিনিকেতনে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা হয়নি। জোর জবরদস্তি করে নিজের সহকর্মীদের উপরেও নিজের চিন্তাধারাকে স্থায়ী করার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বাইরে ছিল। রাজনীতির প্রসঙ্গ যখনই উঠেছে, তখনই রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তিকর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদানের ব্যাপারে তাঁর কোন সায় ছিল না। কারণ

এভাবে ছাত্রেরা আত্মনিবেদন করছিল পূর্ণতর শিক্ষার কাছে নয়, অশিক্ষার কাছে। আত্মবিনাশের ভয়ংকর আনন্দবোধের এই অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করত। উগ্র দেশাত্মবোধ তাঁকে বার বার ব্যথিত করেছে। জীবনের অমরতা...আপন দেশের যোগসূত্রেই কেবল লাভ হয়, এধরনের চিন্তা রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি প্রার্থনা করেছেন, তাঁকে যেন স্বদেশসেবক বা রাজনীতিবিদ হয়ে না মরতে হয়, সাংবাদিক হিসাবে তো নয়ই। তিনি লিখেছেন, "প্রত্যেক দেশেই রাজনীতি নৈতিক জীবনের মান নামিয়ে দিয়েছে। তাতে মিথ্যা ও ছলনার, নিষ্ঠুরতা ও কপটতার নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে।" "আমার দেশেও একইভাবে স্বদেশপ্রেমের নামে ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা হয়" —লিখেছেন নিউইয়র্ক থেকে, ১৯২১ সালে। অথচ দেশের কথা সব সময়েই যে তাঁর মন জুড়ে ছিল, প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই তার প্রমাণ মিলবে। তিনি যে ভারতকে ভালবাসতেন তা ছিল একটি ভাবের মূল্যে। সারা পৃথিবী জুড়েই তিনি স্বদেশীয়ানার সন্ধান করতেন। এণ্ডরুজের সঙ্গে তাঁর এই স্বদেশীয়ানার সম্পর্ক ছিল। তিনি যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন, তার স্থান বিশ্বভূমিকায় পরিব্যাপ্ত। কারণ তাঁর মতে মনুষ্যজাতি বিরাট, বিপুল ও বহুমুখী মানচিত্রের মধ্যেই কোন দেশকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। অন্য একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন তুলেছেন। পাঠান ও মোগলদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের কোন চিহ্ন ছিল না। তাই তারা [illegible] করলেও ভারতবর্ষের মূলে আঘাত করে নি। হিন্দুদের থেকে বাধা না পেলে এরা কালক্রমে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশে যেত এবং তাতে ভারতীয় সভ্যতা সমৃদ্ধ হত।

ব্রিটিশ জাতির ন্যায়পরায়ণতার উপর রবীন্দ্রনাথের যেটুকু আস্থা ছিল, ১৯২০ সালে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে ভারত বিতর্কের সময় সেটুকুও নষ্ট হয়। ঐ দেশের সংবাদপত্রে ও ভাষণে নৃশংস অত্যাচারের ঐ ধরনের সমর্থন রবীন্দ্রনাথের নিকট বিস্ময়কর ও বিসদৃশ মনে হয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ সে-দেশ [illegible] ছেড়ে [illegible]। এমনই কত অজস্র সমস্যার কথা রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন। চিঠিগুলি পড়ার সময়ে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে যেন আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি। মনে হয়, আমরা যেন বাংলায় রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা চিঠি পড়ছি। কখনও মনে হয় না চিঠিগুলি ইংরেজীতে লেখা। এখানেই অনুবাদিকার সাফল্য। একশত বত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টের জন্যও আমরা অনুবাদিকার নিকট কৃতজ্ঞ।

বাংলায় এণ্ডরুজের কোন ভাল জীবনী নেই বলেই জানি। এদিক থেকে কবি অমিয় চক্রবর্তীর ভূমিকাটি মূল্যবান। খৃীষ্টের সেবায় যিনি একদা মিশনারী হয়েছিলেন, বৃহত্তরভাবে খৃীষ্টকে সেবা করার জন্য তিনি সেই মিশনারিত্ব ত্যাগ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের বাইরে এণ্ডরুজের যে বিরাট কর্মক্ষেত্র ছিল তা অনেকেরই জানা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা, ঐ একই কারণে ফিজিতে গমন, কলকাতায় ফিজি প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের দেখা-শুনা, চা-বাগান ও রেলের শ্রমিক ধর্মঘটের সময় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, গান্ধীজীকে ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা, এবং রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের কাজ এণ্ডরুজই করেছিলেন। তাঁর কাজের জন্য তিনি যেমন নিজের দেশে ধিকৃত হয়েছিলেন, ভারতীয়দের নিকট থেকেও তিনি কম কটূবাক্য শোনেন নি। আশা করা যায়, এই বইটি পড়ার পর এণ্ডরুজ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাবে। এই বইয়ের আয় শান্তিনিকেতনে পিয়েরসন হাসপাতালের গরিব রোগীদের সেবায় ব্যয় হবে।

(১৯৫/৬৭)

রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান-চিন্তা

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস। ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার। রূপা। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের রচনা ও ব্যক্তি জীবনকে নানা দৃষ্টি কোণ থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা আজও চলেছে। সম্প্রতি দার্শনিকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনৈক দার্শনিক আধুনিক কবি মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক ডঃ মজুমদার রবীন্দ্র মানস ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়' বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ও কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের কথা লেখক অবশ্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলি আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং এই পৃথিবী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিভিন্ন কবিতা ও অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়েছে, লেখক রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী তন্ন তন্ন করে তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে রবীন্দ্রনাথ কেমনভাবে আত্মস্থ করেছিলেন জানতে গিয়ে আমরাও বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ পাবো। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী) 'যেতে নাহি দিব,' 'মধ্যাহ্ন' (চৈতালি), 'স্তব্ধতা' (নৈবেদ্য) 'প্রাণ' (নৈবেদ্য) 'প্রবাসী' (উৎসর্গ) চঞ্চলা (বলাকা), জন্মদিন, সাবিত্রী (পূরবী) পত্রপুটের দশ ও পনেরো নম্বর কবিতা, বনবাণীর 'বৃক্ষবন্দনা; শেষ সপ্তকের সতেরো নম্বর কবিতা ও 'তুমি প্রভাতের শুকতারা', ছড়ার ছবির 'পাথরপিণ্ড' প্রভৃতি কবিতা লেখক বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। লেখকের মতে, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিজ্ঞানের প্রভাব তেমন নেই বললেই চলে। অবশ্য খেয়ার 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি একটি ব্যতিক্রম। হাস্য কৌতুকের গুরুবাক্য, আর্য ও অনার্য নাটিকায়, ব্যঙ্গ কৌতুকের প্রশ্নতত্ত্ব, শেষের কবিতা, শেষরক্ষা সাহিত্য পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক ভাণ্ডার থেকে বার বার উপমা সংগ্রহ করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ, প্রাণীতত্ত্ব বিজ্ঞানের সব শাখাতেই রবীন্দ্রনাথের আনাগোনা ছিল। বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে উপমা সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ আমগাছে লতানো যায় কিনা পরীক্ষা করেছেন। অধিক ফলনশীল আমেরিকান ভুট্টার বীজ, মাদ্রাজী সরু ধান চাষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীতেই করেছিলেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য ১৯৩৫ সনে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাই।

লেখক নিজে বিজ্ঞান জগতের লোক হওয়ার সঙ্গতভাবেই 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীকে নির্ভুল বলে স্বীকার করতে পারেন নি। কল-কারখানা স্থাপনের প্রথম যুগে সব দেশেই সাধারণ মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে, কিন্তু কারখানা বা খনি-ব্যবস্থাকে বাতিল করে নয়, উন্নত শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, উন্নত কাজ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করেই ঐ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হয়। 'রক্তকরবী'র বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে-সব অধ্যাপক হিমসিম খান, এ বইটি তাঁদের 'রহস্য' বুঝতে সাহায্য করবে।

(৪৬৬/৬৫)

প্রাপ্তি স্বীকার

জগমণ্ডপ। সমুদ্রগুপ্ত। আনন্দধারা প্রকাশন : ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ১২·৫০।

মানুষ আমার ভাই। সংকলন ও সম্পাদন : কৃষ্ণ কৃপালনি। অনুবাদ : প্রিয়রঞ্জন সেন। সাহিত্য অকাদেমী : নিউ দিল্লি-১। মূল্য : ৭·৫০।

Reform and Regeneration in Bengal : Amitabha Mukherjee. Rabindra Bharati, University : 6|4, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta-7. Price Rs. 16.50.

The Message of Srimadbhagavat Gita : Sri Jaharlal Bose. Sanat Kumar Bose : 40-F Palm Avenue, Calcutta-19. Price Rs. 1.00.

Swami Vijnanananda : Edited by Tarini Sankar Chakravarty. Swami Vijnanananda Birth Centenary Committee : 338, Mohatshim Ganj, Allahabad-3. Price Rs. 1.00.
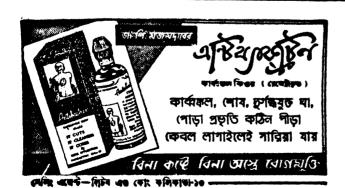
সাংবাদিক বৈঠকে অসীম দত্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হরিদাস ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ রায়, বিভূতি লাহা, অরুন্ধতী দেবী, তরুণ মজুমদার, হেমেন গঙ্গোপাধ্যায়, তপন সিংহ ও অজয় কর

ফটো—দেশ

আমরা আর সংরক্ষণ সমিতিতে নেই

বিশিষ্ট চিত্রপরিচালকদের ঘোষণা

বাংলা ছবির চারজন বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির সংগ্রাম-পরিষদ বা 'কাউন্সিল অব অ্যাকশন' থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা গত ২৪ ডিসেম্বর সমিতির কাছে পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়েছেন। পরিচালকরা হলেন শ্রীতপন সিংহ, শ্রীঅজয় কর, শ্রীবিভূতি লাহা (অগ্রদূত) এবং শ্রীতরুণ মজুমদার। এর কয়েকদিন আগে শ্রীমতী কানন দেবীও ওই পরিষদ থেকে ইস্তফা দেন। শ্রীসত্যজিৎ রায় সংরক্ষণ সমিতি ছেড়েছিলেন অনেক আগেই। পরিচালকরা সমিতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের সংকল্প নেবার পরেই গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করেন। সাতজন চিত্রনির্মাতা—শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীতপন সিংহ, শ্রীঅজয় কর, শ্রীবিভূতি লাহা, শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী, শ্রীতরুণ মজুমদার ও শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদের বক্তব্য সাংবাদিকদের কাছে পেশ করেন। বৈঠকে তিনজন চিত্র-প্রযোজকও—শ্রীহেমেন গাঙ্গুলি শ্রীহেমন্ত মুখার্জি ও শ্রীঅসীম দত্ত—উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও সংরক্ষণ সমিতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন।

বৈঠকে পরিচালকদের তরফ থেকে আলোচনা শুরু করেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। তিনি বলেন, "আমি অবশ্য সংরক্ষণ সমিতি অনেক আগেই ছেড়েছি। ছাড়বার কারণ ছিল। যে সাধু উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ সমিতি তৈরি হয়েছিল, ক্রমেই দেখলাম তা যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রশিল্পের বিশেষ একটি 'সেক্টর' বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোই যেন সমিতির একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। অস্বীকার করি না, চিত্রপ্রদর্শন ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি আছে। তার দূর করাও প্রয়োজন। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম বাংলা ছবির সার্বিক উন্নতি। তা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই দূর করার চেষ্টা করা যেতে পারত। এর জন্য হঠাৎ করে "যুদ্ধং দেহি" নীতির কোন প্রয়োজন ছিল না। তা-ছাড়া গলদ নেই কোথায়? সর্ব স্তরে, সর্ব ক্ষেত্রেই তো অনাচার ও অব্যবস্থা রয়েছে। যখন দেখলাম, সমিতি অন্য কোন 'সেক্টর'কে ঘাঁটাতে অপারগ, এবং চলচ্চিত্র-শিল্পের অন্যত্র যে-সব গলদ তা দূর করতে সমিতি কোন নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেননি, তখন সমিতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল।

তার উপর সমিতি পরে যে-সব দাবি-দাওয়া উপস্থিত করলেন তাও যুক্তিসঙ্গত মনে হল না। ছবি রিলিজের ব্যাপারে বাধা করার যে নীতি সমিতি গ্রহণ করেন তা স্বাধীন ব্যবসার উপর হস্তক্ষেপ বলেই মনে হল। তা-ছাড়া সমিতি এক্ষেত্রে ছবির 'কোয়ালিটি'র সমস্যা ভুলেই গেলেন। সমিতির বিচারে সব ছবির এক দর হয়ে গেল। আমাদের লক্ষ্য ছিল, বাংলা ছবির "এক্জিবিশন ফেসিলিটিজ" বা প্রদর্শনের সুযোগ বিস্তৃত করা। সে-বিষয়ে কোন চেষ্টা নেই। যদিও রাজ্য সরকার এ-ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন।

পরিশেষে শ্রীরায় বলেন, "সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের ফলে বর্তমানে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যার ভিতর শান্তিতে কাজ করা অসম্ভব। অবশ্য কাজ করতেই হবে, এবং এখানেই করব। যত বাধাই আসুক না কেন।"

"সাগিনা মাহাতো" ছবির শুটিংয়ের আগে প্রযোজক শ্রীহেমেন গাঙ্গুলি কী-রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। শ্রীগাঙ্গুলি বলেন, "ক্ষুধিত পাষাণ" ছবির অনেককাল পর এখানে একটি বাংলা ছবি তৈরি করতে আসি। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে ভালবাসি বলেই কলকাতায় বাংলা ছবি করার বাসনা। যদি বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের কোন কাজে লাগতে পারি। কিন্তু এবার ছবি করতে এসে যে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা বুঝতে পারিনি। ই-আই-এম-পি-এ'তে নাম লেখাবার পরেও নাকি আমাকে সংরক্ষণ সমিতির 'প্লেজ' সই করতে হবে। এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করেন সমিতির জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তাই হয়েছে। তিনি আমাকে সমিতির "ড্রাফট কনস্টিটিউশন" দেখান। জানলাম, সমিতি রেজেস্ট্রি হয়নি। তাঁকে বললাম, এই "ড্রাফট কনস্টিটিউশন"-এর ভিত্তিতে কী করে এগোই। আজ আমি তা মেনে নিয়ে সই করে দিলাম, কাল দেখব 'কনস্টিটিউশন' পালটে গেছে। প্রসঙ্গত, শ্রীগাঙ্গুলি সমিতির প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর যে পত্র-বিনিময় হয়েছে তা সাংবাদিকদের কাছে পেশ করেন। সমিতির যে "রেজিস্ট্রেশন ফরম" তিনি পূরণ করেন তা, শ্রীগাঙ্গুলি জানান, সম্পূর্ণ "স্ট্যাটিস্টিক্যাল—প্রোডাকশান সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনের জন্য। ওই ফরমটিতে শ্রীগাঙ্গুলি কী লিখেছেন তাও সাংবাদিকদের দেখান। ছবি রিলিজের ব্যাপারে তিনি এখনই যে কোন কিছু 'কমিট' করেননি বা কথা দেননি তাও সাংবাদিকদের দেখালেন। এবং ফরমে লিখে দিয়েছেন তিনি ই-আই-এম-পি-এ'এর সভ্য। পরে সহাস্যে শ্রীগাঙ্গুলি বলেন, "যে সমিতি

রেজিস্টার্ড নয় তার রেজিস্ট্রেশন করম"। তিনি আরও বলেন, কানাঘুষোয় অনেক কথাই শুনেছিলাম। আমার ছবি শুরু হবার সময় গোলযোগ হতে পারে এ-কথাও কানে এসেছিল। আমি বোম্বাই বা মাদ্রাজে গিয়েও ছবি তৈরি করতে পারতাম। কিন্তু কেন তা করব?

"তথ্য সরবরাহের জন্য রেজিস্ট্রেশন করম ফিল আপ করেছি। তাতে সই করবার জায়গা নেই। রেজিস্ট্রেশন ফী দিইনি। কোন প্লেজ-এ সই করিনি। দিস মাচ্‌..." এই বলেই শ্রীগাঙ্গুলি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এর পর পরিচালকদের বক্তব্য সবিস্তারে বলেন শ্রীতরুণ মজুমদার। তিনি প্রথমে চলচ্চিত্রলোকের বর্তমান ছবিটি তুলে ধরেন। বলেন, "এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করছেন না। আজ যদি স্টুডিও এলাকায় যান দেখবেন, কোথায় যেন ঘুন ধরেছে। একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা নেই। পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণুতা বেড়েই চলেছে। কলাকুশলীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। শিল্পীদেরও দুটি সংস্থা। প্রীতি ও সদিচ্ছা যেন বিদায় নিয়েছে। এই পরিবেশ অসহ্য। এমন হবে ভাবিনি। চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণ হবে জেনেই সংরক্ষণ সমিতিতে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু নিরাশ হতে বেশী সময় লাগল না।"

নানা ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীমজুমদার সংরক্ষণ সমিতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "হঠাৎ করে যখন সমিতি বাংলা ছবির হলগুলির সামনে সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন তখনই মনে সংশয় জাগে। আমরা ঠিক পথে চলছি তো?—এই প্রশ্ন করলাম নিজেকে। তার আগেও দেখেছি, পরেও দেখলাম সকল কাজেই শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুতার অভাব। ঘন ঘন মিটিং, রাত এগারোটা পর্যন্ত আলোচনা, একটি মিটিংয়ে একরকম সিদ্ধান্ত, অল্প সময়ের মধ্যেই আর এক মিটিংয়ে তা বাতিল, চেঁচামেচি, প্রশ্নের ব্যক্তি সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তি—এই সব কিছুর সঙ্গে তাল রেখে চলা অসম্ভব হয়ে উঠল। কাজের ক্ষতির কথা না হয় বাদই দিলাম। তপনবাবু চেষ্টা করেছেন, শান্তিপূর্ণভাবে আপস-আলোচনার মধ্য দিয়ে বিরোধের মীমাংসা করা যায় কি না। তিনি তার সুযোগই পেলেন না।"

একে একে সকল অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শ্রী মজুমদার পরিশেষে বলেন, "সব চাইতে বড় বিপদ, শিল্পীর স্বাধীনতা আজ খর্ব হতে চলেছে। সব চলচ্চিত্রকারই চান, স্বাধীনভাবে কাজ করতে। সেই সুস্থ আবহাওয়া আজ বিনষ্ট। এমনও শোনা যাচ্ছে, কোন কোন শিল্পীকে ছবিতে নেওয়া চলবে না। এমন নজিরও আছে, কোন এক পরিচালক কোন এক শিল্পীকে তাঁর ছবিতে নিতে সাহস পাননি। কোনটাই 'অফিসিয়াল' নির্দেশ নয়। কিন্তু তলে তলে এই 'ভিক্টিমাইজেশন' তথা নিয়ন্ত্রণ-নীতি সক্রিয়। আমরা সমিতিতে থাকাকালীন কোন কোন অন্যায় নীতি ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে বলতে চেষ্টা করেছি। আমাদের কথায় কাজ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়েছে। তাই আজ আমরা সংরক্ষণ সমিতি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।"

শ্রীতপন সিংহ বলেন, "এককালে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে পুতুলদা (নীতিন বসু) নতুন কী করলেন তা দেখবার জন্য কলাকুশলীদের মনে কৌতূহল জাগত। আগেভাগে ল্যাবরেটরিতে তা সকলেই দেখতে চাইতেন। এখন আমাদের সকলের এই কৌতূহল সত্যজিৎবাবুর কাজ নিয়ে। নতুন ছবিতে তিনি নতুন কী করলেন, তা দেখবার আগ্রহ নিয়ে আমরা বসে থাকি। যখন শুনলাম, সত্যজিৎবাবুর ক্যামেরাম্যানকে কোন এক ব্যক্তি হুমকি দিয়েছেন, শ্রী রায়ের ছবির 'নেগেটিভ' নষ্ট করে ফেলা হবে, যদি তিনি সংরক্ষণ সমিতির বিরোধিতা করেন, তখনই মনে মনে স্থির করলাম, সংরক্ষণ সমিতিতে আর থাকব না।"

শ্রী সিংহ তাঁর আশাভঙ্গের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, "আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এখানে এসে ঠেকবে, যেখানে স্বাধীনভাবে কেউ কাজ করবার মত পরিবেশ খুঁজে পাবে না, তা ভাবিনি কোনদিন।" দৃপ্তকণ্ঠে শ্রী সিংহ বলেন, "যে-সমিতি নিয়ন্ত্রণের বেড়ি পরাতে চান, তাকে কেন মানব? কিসের ভয়ে?"

"সাগিনা মাহাতো" ছবির শুটিংয়ে বাধাদান সম্পর্কে যে গুজব রটেছিল, সেই প্রসঙ্গে কথা উঠলে শ্রী সিংহ জানান—"কোন একজন স্টুডিওর মালিককে টেলিফোন করেছিলেন কেন "সাগিনা মাহাতো"-র শুটিংয়ের জন্য ডেট দেওয়া হল।"

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সিংহ বলেন, "সংরক্ষণ সমিতি যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, তাতে কোন কোন প্রযোজক নতুন ছবি শুরু করতে সাহস পাচ্ছেন না। তিনি তো জানেন না, কবে তাঁর ছবি রিলিজ হবে।"

চিত্রপ্রযোজক শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, "ইণ্ডাস্ট্রির ভাল হবে জেনেই সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। পরে ধীরে ধীরে দেখলাম, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, কী-ভাবে কাকে শুধু প্লেজ-এ সই করানো যায়। পরিণামে দেখছি ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ। এখন তো রীতিমত ভয় পাচ্ছি, এখানে বাংলা ছবির কাজ আরম্ভ করব কিনা।"

প্রযোজক অসীম দত্ত তাঁর অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, অনেক হুমকির মধ্য দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে। "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবি প্রযোজনার পদে পদে নানা আশঙ্কায় ভুগেছি।" কী সমস্যায় তাঁকে পড়তে হয়েছে, তা জানিয়ে শ্রী দত্ত সাংবাদিকদের বলেন, "অবস্থার যদি পরিবর্তন না ঘটে, তবে বাংলা ছবির উন্নতি নেই।"

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে পরিচালকরা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম উল্লেখ না করে তাঁদের সমস্যা ও প্রতিকার তথা অকপটে বলেন, এবং সকলেই একবাক্যে বলেন, "সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে [illegible]

[illegible] "[illegible]" ছবির [illegible] হুগলিতে এগিয়ে চলেছে—হরিদাস [illegible] পরিচালিত ছবির একটি দৃশ্যে [illegible] ও [illegible]

নয়।" "আপনারা কি নতুন কোন সংস্থা গড়ে তুলছেন?" —এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসত্যজিৎ রায় জানান, "এমন কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। তবে আমরা যাঁরা সংরক্ষণ সমিতিকে মেনে নিতে পারছি না, সেই আমাদের একসঙ্গেই চলতে হবে। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সব বিরোধেরই সমাধান হতে পারে। সংরক্ষণ সমিতি ভেঙে দেওয়া হলে আমরা আবার একত্র বসে ভাবতে পারি, কী-করে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি করা যায়।"

বাংলা ছবির এক বছর

আটষট্টি সাল বাংলা ছবির পক্ষে দুর্বৎসর। মার্চের মাঝামাঝি শুরু হয় সিনেমা ধর্মঘট, তারপরেই বাংলা ছবির চেন-গুলির সামনে সংরক্ষণ সমিতির সত্যাগ্রহ। ফলে, অল্পসংখ্যক ছবি মুক্তি পেয়েছে ১৯৬৮ সনে। অনেক ছবি তৈরী হয়ে পড়ে আছে। আটষট্টি সনে মোট যে আঠারোটি (১৮) ছবি মুক্তি পেয়েছে সেগুলি হল : পঞ্চশর, পথে হল দেখা, ছোট্ট জিজ্ঞাসা, চারণকবি মুকুন্দদাস, হংস-মিথুন, পরিশোধ, রক্তরেখা, আদ্যাশক্তি মহামায়া, বাঘিনী, চৌরঙ্গী, তিন অধ্যায়, অগ্নিরথীর, বালুচরী, গড় নাসিমপুর, বৌদি, আপনজন, জীবনসংগীত, কখনো মেঘ। বাংলায় ডাব-করা দক্ষিণ ভারতীয় চিত্র তিনটি : ভীষ্ম, পদ্মাবতী-জয়দেব, মেঘনাদ বধ।

গত সপ্তাহে (২৭ ডিসেম্বর) কলকাতায় পতৌদির নবাব মনসুর আলির সঙ্গে অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের (আয়েষা সুলতানা) শাদি সম্পন্ন হয়—উপরে শাদির দৃশ্য, নীচে প্রীতিসম্মেলনে নবদম্পতি। ইতিপূর্বে শোনা গিয়েছিল, বিয়ের পর শর্মিলা সিনেমায় অভিনয় ছেড়ে দেবেন। পরে বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, [illegible] দুটি [illegible] (একটি [illegible], একটি [illegible]) [illegible]।

ছবির সংখ্যা কম। ফলে নতুন প্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া গেল কম। সম্ভবত '৬৮ সাল প্রথম, যে বছরে দর্শকরা সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে পেলেন না। তবে সুখের বিষয়, ভিন্ন ধরনের এবং বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের কৌলীন্য অনুযায়ী কয়েকটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। তার মধ্যে আপনজন, পঞ্চশর, ছোট্ট জিজ্ঞাসা, চৌরঙ্গী, কখনো মেঘ উল্লেখ্য। বাংলা ছবি যাঁদের পেয়ে লাভবান হলেন তাঁদের মধ্যে অভিনেতা স্বরূপ দত্ত এবং সংগীত পরিচালিকা অসীমা ভট্টাচার্যের নাম করতে হয়। প্রযোজক হিসাবে যাঁরা নতুন এলেন তাঁদের মধ্যে 'আপনজন' ছবির শ্রী এল কাপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। শিশুশিল্পী প্রসেনজিতের নাম এই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। বেশির ভাগ ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। নায়িকার রূপসজ্জায় সর্বাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন মাধবী চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়)। তিনি মোট চারখানি ছবির নায়িকা। তারপর সন্ধ্যা রায় (মোট তিনটি)। সব চাইতে বেশী ছবিতে সংগীত পরিচালনার কাজ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মোট ছয়টি।

গোড়াতেই বলেছি, '৬৮ সন বাংলা চলচ্চিত্রের পক্ষে ভালয় ভালয় কাটেনি। এই বছরেই চলচ্চিত্রশিল্প হারাল নটশেখর নরেশ মিত্রকে। তা ছাড়া পরলোকে চলে গেলেন গুরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল দে, কাজী সরকার, রেণুকা রায়, শৈলেন গাঙ্গুলি, বিশু দাশগুপ্ত।

দুঃখ-শোক ও ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে সান্ত্বনা এই, '৬৮ সনে বাংলা ছবির জয়বার্তা ঘোষিত হল। "হাটে বাজারে" রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেল। শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে সত্যজিৎ রায় ও উত্তমকুমার।

বোম্বাই চলচ্চিত্রশিল্পের দান

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ তহবিল সমিতি (বোম্বাই) আয়োজিত অনুষ্ঠানে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পের খ্যাতনামা শিল্পীদের অনেকেই যোগ দেন। তহবিলে যাঁরা অর্থ-দান করেন তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিতগণ উল্লেখযোগ্য : শক্তি সামন্ত ২৫০০্, ওয়াহিদা রহমান ১০০১্, ধর্মেন্দ্র ১০০১্, শর্মিলা ঠাকুর ১০০০্, শশী কাপুর ১০০০্, প্রমোদ চক্রবর্তী ১০০০্, নন্দা ১০০০্, গোয়েল সিনে করপোরেশন ১০০০্, ফিল্ম যুগ ৫০১্, মাস্টার মুস্তাক ৫০০্, সুবোধ মুখার্জি ৫০০্, জনি ওয়াকার ২৫০্, মোহন সায়গল ২০১্, কল্পনা লোক ২০১্, কিরণ প্রোডাকশন ২০০্, ইউ কে কোং ১০১্, ভারতী ফিল্ম ১০১্, শ্রীরাওয়েল ১০১্, নাসির হুসেন ১৫০্, শম্ভুনাথ কাপুর ১০১্, জয় মুখার্জি ১০০্, শচীনদেব বর্মণ ১০০্ এবং আরও অনেকে। খবর দিয়েছেন বম্বে থেকে সাঁইত্রিশ সাধারণ সম্পাদক শ্রীদিলীপ ঘোষ।

টলি-টিপ্পনী

শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দিরের 'সাবরমতী' (পরিচালনা : হীরেন নাগ) চিত্রে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী—ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

গুরু নিয়েই শুরু করি। বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বলতম তারকাটি তাঁর ফ্যানদের কাছে "গুরু" সম্ভাষণে সম্ভাষিত, সর্বোপরি টলিউডের কিং বলতে এখন তাঁকেই বোঝায়। গুণমুগ্ধরা তাঁর নাম দিয়েছেন মহানায়ক। তিনি সমসাময়িক সিনেমা পত্রিকার পাতায় নিজের নামের পাশে "মহানায়ক" বিশেষণটি দেখে অবশ্য লজ্জা পান। "ইদানীং 'মহানায়ক' কথাটাতে আমারও কেমন যেন এলার্জি হয়ে গেছে", আমিও বলছিলাম উত্তমকুমারকে। উত্তমবাবু তাঁর সেই চির-পরিচিত মনভোলানো হাসি হেসে জবাব দিলেন, "সত্যি, আমারও ভারী লজ্জা করে নিজের নামের পাশে এই বিশেষণটি দেখলে।"

ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা হোটেলে আমাদের আড্ডা হচ্ছিল। গত সপ্তাহে উত্তমকুমার ডায়মন্ড হারবার গিয়েছিলেন "শুক-সারী" ছবির শুটিং করতে। সুপ্রিয়া দেবী ছিলেন, ও'র মেয়ে সোমাও ছিল।

"গুরু" যেন এখন উত্তমবাবুর উপাধি হয়ে গেছে। "এই যে গুরু এসে গেছেন, আর কোন চিন্তা নেই।" এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যে পরিচালক স্টুডিওর ফ্লোরে একরকম গালে হাত দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে চুপচাপ বসেছিলেন, নায়কের অনুপস্থিতিতে শুটিং করতে পারছিলেন না, উত্তমের আবির্ভাবে হঠাৎ যেন তাঁর মধ্যে প্রাণসঞ্চার হল, "গুরু এসে গেছেন আর কোন চিন্তা নেই।"

"এই যে গুরু, ভালো ত'?"—সত্যজিৎ রায়ও কম রসিক নন, মাঝে মাঝে ফ্যানদের দেওয়া নাম ধরে ডাকেন। গত ৪ঠা ডিসেম্বর মাধবীর বিয়ের অনুষ্ঠানে সত্যজিৎবাবু উত্তমকুমারকে এই বলেই সম্বোধন করলেন। উত্তমবাবু সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন সেদিন, "কথাটা লিখে দিন মানিকদা, বাঁধিয়ে রাখব।"

উত্তমবাবুর হাতে এখন নির্মীয়মাণ ছবির সংখ্যা পাঁচ। আজ বসন্ত, বিলম্বিত লয়, কমললতা, শুক-শারী, ও মন নিয়ে। নতুন ছবির কথাবার্তাও চলছে প্রায় পাঁচ-ছ' জায়গায়।

উত্তমকুমার নিজেও ইতিপূর্বে একটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন, এ-তথ্য চিত্রা-মোদীদের অজানা নয়। সম্প্রতি সেরকম আরেকটি নতুন পরিকল্পনার আভাস পেলাম ডায়মন্ড হারবারে।

"গুরু যদি কোন ছবির পরিচালক হন, আর সেই ছবির প্রযোজনা যদি আমি করি, তবে কেমন হয়?"—এরকম নাটকীয় ভঙ্গীতে সেদিন শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী ও'দের পরিকল্পনার গুপ্ত সংবাদটি আমার কাছে ফাঁস করলেন।

বললাম, সন্দেহ নেই, এটা চিত্রামোদী-দের চমকে দেবার মত একটা খবর।

সুপ্রিয়া দেবী বললেন, উঁহু, খবরটি এখনো সাসপেন্সে থাকবে। ক্রমশ প্রকাশ্য।

আমি উত্তমকুমারের মুখের দিকে তাকালাম। ও'র মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। সেই মন ভোলানো হাসির কন্টিনিউটি-টুকু তো ফুটেই রয়েছে সম্পের থেকে।

তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি তেমন কোনও পরিকল্পনা করেছেন?

উত্তমবাবু বললেন, বেণু (শ্রীমতী সুপ্রিয়ার ডাক নাম) করেছে।

অতঃপর সুপ্রিয়া দেবী বললেন, ছবিটি হিন্দী এবং বাংলা ডাবল্ ভার্সানে করার কথা ভাবছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী গল্প?

সুপ্রিয়া দেবী জানালেন, গল্পের এখনো কোন নামকরণ হয় নি। একটি জনপ্রিয় বিদেশী গল্পকে ভেঙে স্ক্রিপ্ট করা হচ্ছে।

[illegible] পিকচার্স-এর 'সাথী' হিন্দীচিত্র আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির একটি দৃশ্যে বৈজয়ন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমার

—উত্তমবাবু নিজেই শিফ্ট করছেন?

—হ্যাঁ।

*

পৃথিবীর তিনজন মানুষ যেদিন "এ্যাপোলো-৮"এ চড়ে চন্দ্রমুখী, অর্থাৎ মহাশূন্যের রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন, বাংলা চিত্র-জগতের নতুন শিল্পী-দম্পতি নির্মল-মাধবী সেইদিনই হনিমুন সেরে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বিয়ের পর ওঁরা হনিমুন করতে পুরী গিয়েছিলেন। দিন সাতেক ছিলেন সেখানে। ফিরে আসার পর সেদিন খবর নিতে গিয়েছিলাম। নির্মলবাবুর লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে ঢোকবার মুখেই রাস্তায় দু' পাশে কাঁটা তারের বেড়া।

অতি সন্তর্পণে নতুন শিল্পী-দম্পতির বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকেই শ্রীমতী মাধবীর সঙ্গে দেখা।

—পুরী কেমন কাটল?

—না, তেমন উপভোগ করতে পারিনি।

"কেন?" আমি অবাক।

সলজ্জ কণ্ঠে মাধবী বললেন, কী ঘুমেই যে পেয়েছিল আমাকে। সারাদিন পড়ে পড়ে শুধু ঘুমিয়েছি।

নির্মলবাবুর খোঁজ করলাম।

উনি বাড়ি নেই। টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিওতে কমললতা-র শুটিং করছেন।

—আপনার এখন কোন শুটিং নেই?

—না, সাতদিনের জন্যে একেবারে নিশ্চিন্ত।

কথার পিঠে অনেক কথা হল। বেলা বাড়ল। হঠাৎ মাধবী বললেন, এক মিনিট বসুন, আসছি।

মাধবী উঠে গেলেন পাশের ঘরে। টেলিফোন তোলার আওয়াজ পেলাম:

—হ্যালো, টেকনিসিয়ানস স্টুডিও? নির্মলবাবুকে একটু ডেকে দিন না। আমি মাধবী কথা বলছি।

এক মিনিট বিরতি। তারপর কানে এল, কী ব্রেক হয়েছে? এখনো হয়নি তো খাবে কখন? দেড়টা বাজে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আজ চলি।

আবার কবে আসছেন?—মাধবীর ভদ্রতা বোধ দেখবার মতো।

বললাম, সামনের সপ্তাহে।

মাধবী জানালেন, সামনের সপ্তাহে আমরা বম্বে যাচ্ছি। পঁচিশদিনের মধ্যেই অবশ্য ফিরে আসব।

যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালাম, বম্বে কেন?

মাধবী বললেন, হেমন্তবাবুর নতুন ছবির মহরতে যেতে হবে।

সংবাদে প্রকাশ, সংগীত-শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান জয়ন্ত শীঘ্রই একটি বাংলা ছবির নায়করূপে আত্মপ্রকাশ করবে। ছবিতে জয়ন্তের জুটি হবে মৌসুমী। অসিত সেন পরিচালিত ছবিটির প্রধান স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করবেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সরি, চক্রবর্তী।

—বিচক্ষ

"অ্যান্টনী কবিয়াল" আজও জনপ্রিয়

একে একে পাঁচ শো রজনী অতিক্রান্ত, "অ্যান্টনী কবিয়াল" নাটকের কদর তবু ক্রমবর্ধমান। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে নান্দিক গোষ্ঠী নিবেদিত এই নাটক অভিনয়-জগতে জনপ্রিয়তার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শিল্পীরা আজও অক্লান্ত। দর্শকরাও নাটকটি দেখে উৎফুল্ল।

"অ্যান্টনী কবিয়াল"-এর পাঁচ শো রজনী পূর্তি উৎসব সম্পন্ন হয়েছে গত ১৪ ডিসেম্বর। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন যথাক্রমে শ্রীউত্তমকুমার ও শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কী অসুবিধা ও ও বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে নান্দিক গোষ্ঠী নাট্যাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন তা সবিস্তারে বলেন শ্রীমতী কেতকী দত্ত। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, শিল্পকলার প্রসার ও উন্নতির জন্য চাই সরকারী আনুকূল্য। শ্রীউত্তমকুমার "অ্যান্টনী কবিয়াল" নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ বর্ণনা করেন। নাটকের নাম-ভূমিকার শিল্পী শ্রীসবিতাব্রত দত্ত তাঁর বক্তৃতায় এই শহরে রঙ্গালয়ের অভাবের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানশেষে "অ্যান্টনী কবিয়াল" অভিনীত হয়।

অ্যান্টনী কবিয়াল-এর পাঁচ শত অভিনয় রজনী পূর্তি উৎসব—(উপরের ছবিতে) সভাপতি উত্তমকুমারকে মাল্যভূষিত করছেন কেতকী দত্ত, পাশে সবিতাব্রত দত্ত ও নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য (নীচে) উত্তমকুমার বক্তৃতা দিচ্ছেন, পাশে রয়েছেন অন্যান্যের ও প্রধান অতিথি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

● মেরে হুজুর
● রাজা অওর রংক

দুইটি হিন্দী ছবিই রঙিন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটির সঙ্গে অপরটির মিল নেই। মিল শুধু জনমনোরঞ্জনের মামুলী প্রক্রিয়ায়।

মেরে হুজুর (মুভি মোগল) একটি বলিষ্ঠ নাটক হতে পারত। কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনাও ছিল। পরিচালক বিনোদকুমার তার সুযোগ নেননি। তবে দুই পুরুষের (রাজেন্দ্রকুমার ও জিতেন্দ্র) মাঝখানে এক নারীর (মালা সিংহ) গল্পের কোন কোন মুহূর্তে জট দেখা গেছে। তাতে বাস্তবের আভাস।

লক্ষ্মৌর নবাব পরিবারের পটভূমিতে কাহিনী রচিত। রাজকুমার নবাব, জীবনের প্রতি উদাসীন। আমোদ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে তার দিন কাটে, বয়স বাড়ে। একদিন ছোট বোনের এক বান্ধবীকে দেখে সে বুঝতে পারে প্রেম কী, জীবনকে কীভাবে সুন্দর করে তোলা যায়। কিন্তু নায়িকা বিয়ে করে নবাবেরই অনুগত, অনুজ-প্রতিম বন্ধুকে (জিতেন্দ্র)। এর পর কিছু মুহূর্তে দেখা যায় যাতে জীবনের একটু স্পর্শ মেলে; যেখানে নবাবের বাসনা নায়িকার মঙ্গলকামনায় রূপান্তরিত, নায়িকার ছেলের প্রতি অপরিসীম স্নেহে যার প্রকাশ।

তারপরের ঘটনা সব অতিনাটকীয়তার শর্তে নিয়ন্ত্রিত। দম্পতির মধ্যে (জিতেন্দ্র ও মালা সিংহ) বিচ্ছেদও কষ্টকল্পিত। তবে তালাকের পর নবাবের সঙ্গে যখন নায়িকার বিয়ে হয় তখন জটিল দ্বন্দ্বের প্রস্তুতি। কারণ, নায়িকা নবাবকে গভীর শ্রদ্ধা করলেও মনে মনে ভালবাসে তার পূর্বস্বামীকে। ওই অধ্যায়টি নাটকীয়তার স্থূল উপকরণে ভরাট।

ছবিটি দেখার সুখ তবু আছে। তার মূলে রাজকুমারের সুন্দর অভিনয়ের দান অনেকখানি। মালা সিংহর চরিত্রচিত্রণও সংবেদনশীল।

দর্শক আবিষ্ট হয়ে শোনেন মান্না দে'র গাওয়া একটি রাগাশ্রয়ী গান। সুর রচনায় কৃতিত্ব শঙ্কর-জয়কিষণের।

"রাত অওর দিন" ছবিতে নার্গিস—এ ছবিতে অভিনয়ের জন্যই শিল্পী জাতীয় পুরস্কার পান—ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

রাজা অওর রংক

রাজপুত্র ও ভিখারীর ছেলের কাহিনী "রাজা অওর রংক" মার্ক টোয়েনের "প্রিন্স অ্যান্ড দি পপার"-এর ভিত্তিতে রচিত। আসলে "রাজা অওর রংক", কসটিউম ড্রামার অথবা অ্যাডভেঞ্চার চিত্রের আঙ্গিকে তৈরি। রাজপ্রাসাদের ভিতরে ষড়যন্ত্র, বাইরে রবিন হুডের অ্যাডভেঞ্চারের মত এক সাহসী যুবকের দুষ্টদমন, অসিযুদ্ধ, রোমাঞ্চ, সাসপেন্স এবং প্রেম নিয়ে "রাজা অওর রংক"। তা ছাড়া মুখ্যত রয়েছে জননীর বাৎসল্য নিয়ে মেলোড্রামা। এ ক্ষেত্রে ভিখারীর জননী নিয়েই নাটক। তার ঘরে রাজপুত্র এসেছে ছেলে সেজে। রাজা ও রংক অর্থাৎ যুবরাজ ও ভিখারীর ছেলে দেখতে একরকম। অন্য দিকে প্রাসাদ-চক্রান্ত। এই দুয়ের মধ্যে নাচ-গান সংবলিত ছবির বিস্তৃতি।

রাজনর্তকীর মৃত্যুর ঘটনাও আছে। সে প্রেমে পড়েছে কুচক্রী সেনাপতির ছোট-ভাইয়ের, যে বীরপুরুষ এবং যুবরাজের রক্ষক। ওই যুবক ভালবেসেছে রংকের মেয়েকে। কাহিনীর পরিণামে দর্শকের মনোবাঞ্ছা পূরণের ব্যবস্থা। পরিচালক কে পি আত্মা একটি আমুদে অ্যাকশন-ছবি তৈরির কাজে যত্নবান হয়েছেন।

দুই কিশোরের দ্বৈত ভূমিকায় (যুবরাজ ও ভিক্ষুক-পুত্র) মহেশকুমারের অভিনয় মনোগ্রাহী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে কুমকুম, সঞ্জীবকুমার, অজিত, নিরূপা রায় প্রভৃতি সুঅভিনয় করেছেন। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরারোপিত গানগুলি শুনতে ভাল।

কলামন্দিরের উদ্বোধন

গত মাসে (১৪ ডিসেম্বর) এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেকসপিয়ার সরণিতে কলামন্দির অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করেন ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। তিনি একটি দীপ জ্বালিয়ে সংগীত কলামন্দিরের উদ্বোধন করেন এবং বক্তৃতায় বলেন, বাংলা দেশে এবং কলকাতায় আর্টের সকল ক্ষেত্রেই বড় বড় শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটেছে। এই ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কলামন্দিরের মত প্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ সার্থকতা রয়েছে।

সভাপতি শ্রী জি ডি বিড়লা বলেন, কলার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শান্তি ও প্রেমের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সংগীত কলামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠান-শেষে বিশিষ্ট শিল্পী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি নৃত্য পরিবেশন করেন। তাঁর নৃত্যানুষ্ঠান কলারসিকদের মুগ্ধ করেছে।

কলকাতায় প্রখ্যাত মারাঠি অভিনেতা পি এল দেশপাণ্ডে

মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতা নাট্যকার শ্রী পি এল দেশপাণ্ডে (পুরো নাম পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপাণ্ডে) সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন হিন্দী নাট্য শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে। সমগ্র মহারাষ্ট্রে এই প্রতিভাবান শিল্পীর জনপ্রিয়তার কোন তুলনা নেই। একাধারে তিনি অভিনেতা, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও সঙ্গীতকার। গল্প লেখক ও চিত্র পরিচালক (মারাঠি) হিসাবেও তিনি বিখ্যাত। এঁর একক-অভিনয় প্রযোজনা (মারাঠিতে যাকে বলা হয় 'বহুরূপী খেল')—'বাটাতেটেচী' ও আশা-মী। 'আশা-মী' নাট্যজগতের এক বিস্ময়কর অবদান। এর রচনাও শ্রীদেশপাণ্ডের। এই নাটক দুটিতে

সংগীত কলামন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহে নৃত্যরতা যামিনী কৃষ্ণমূর্তি

ওরিয়েণ্ট অ্যাটট্রাকশান আয়োজিত 'রামলীলা' নৃত্যনাট্যের দুটি দৃশ্য ফটো—দেশ

শ্রীদেশপাণ্ডে আগাগোড়াই একা সব পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন।

একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে শ্রীদেশপাণ্ডে বলেন, মহারাষ্ট্রে থিয়েটার বহুকাল থেকেই জনপ্রিয়। সঙ্গীতপ্রধান নাটক অধিকতর জনপ্রিয়। তবে সে সঙ্গীত মার্গ সঙ্গীত। অনুবাদ নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মৌলিকই হোক বা অনুবাদই হোক মাটির সঙ্গে যে মানুষের যোগ সেই মানুষের নাটক তা সে যে কোন দেশেরই হোক আদরণীয় হবে কারণ শিল্পসাহিত্যে কোন দেওয়াল নেই। একাল ও সেকালের অভিনয় ধারা প্রসঙ্গে শ্রীদেশপাণ্ডে বলেন, সুদক্ষ অভিনেতার কাছে একাল সেকাল নেই। ভালো অভিনয়ের ক্ষেত্রে নতুন পুরানোর বিচার চলে না। নাটকে "ফোর্সড ভালগারাটি" শ্রীদেশপাণ্ডে কিছুতেই বরদাস্ত করেন না। আর্টে কোন অশ্লীলতা নেই—অশ্লীলতা থাকে ভঙ্গীতে। তবে ওটা কোন আর্টিস্টিক সমস্যাও নয়। মারাঠি এবং বাঙলা নাটকের মধ্যে প্রভেদ আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে স্মিতহাস্যে উনি বলেন, ভালো বাংলা এবং ভালো মারাঠি নাটকের ক্ষেত্রে কোন প্রভেদ নেই।

ভারতীয় কলামন্দিরের 'রামলীলা'

দিল্লীর ভারতীয় কলামন্দিরের শিল্পীরা কলকাতায় এসেছেন 'রামলীলা' নৃত্যনাট্য নিয়ে। ওরিয়েণ্ট অ্যাটট্রাকশনের উদ্যোগে এ নৃত্যনাট্য কয়েকদিনের জন্য মঞ্চস্থ হয় রনজি স্টেডিয়ামে।

রামায়ণের মূল কাহিনীর কয়েকটি বিশেষ অতি পরিচিত ঘটনাবলী সাজিয়ে 'রামলীলা'র সৃষ্টি। শুরু—রামের জন্ম ও বাল্যকাল। শেষ—রামের সিংহাসন অধিষ্ঠান দিয়ে। এ নৃত্যনাট্যের প্রযোজনায় প্রতিটি দিকেই (নাচ, গান, রূপসজ্জা) একটি সূক্ষ্ম শিল্পচিন্তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ফলতঃ ভারতীয় কলামন্দিরের 'রামলীলা'কে একটি সুপ্রযোজিত নৃত্যনাট্য—এ আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। নৃত্য-পরিকল্পনায় কৃষ্ণাণ নামমুদ্রি ও সঙ্গীত পরিচালনায় সুশীল দাশগুপ্ত সবিশেষ প্রশংসা পাবেন। অংশগ্রহণকারী নৃত্য-শিল্পীদের নৃত্যভঙ্গিমা এক কথায় চমৎকার।

নান্দীকারের বোম্বাই সফর

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা নান্দীকার বোম্বাই শহরের রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরে আগামী ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারী তাদের জনপ্রিয় নাটকগুলি নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র, শের আফগান, যখন একা ও নানা রঙের দিন (একাঙ্ক) মঞ্চস্থ করবেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্র সেনগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ সেন, পবিত্র সরকার, পশুপতি বসু, রাধারমণ তপাদার, দীপালি চক্রবর্তী, কেয়া চক্রবর্তী, শেলী পাল প্রমুখ নান্দীকারের বিশিষ্ট শিল্পীরা এই নাটকগুলিতে অভিনয় করবেন। নির্দেশনায় আছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরলোকে চিত্রপরিচালক বিশু দাশগুপ্ত

চিত্র পরিচালক বিশু দাশগুপ্ত গত সপ্তাহে (২২ ডিসেম্বর) পরলোকগমন করেন। কার্যোপলক্ষে তিনি কল্যাণীতে গিয়েছিলেন। সেখানেই অকস্মাৎ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ পরের দিন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। কেওড়াতলা শ্মশানে চলচ্চিত্রলোকের বহু ব্যক্তি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গিয়ে উপস্থিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

পরলোকগত চিত্র পরিচালকের অগ্রজ প্রবীণ চলচ্চিত্রকার সুকুমার দাশগুপ্ত জীবিত। তাঁর অপর অনুজ বিশিষ্ট কলা-কুশলী মঞ্জু দাশগুপ্ত কয়েক বছর আগে মারা যান।

বিশু দাশগুপ্ত পরিচালিত "ডাক্তারবাবু" ও "শহরের ইতিকথা" ছবি দুটি জনপ্রিয় হয়েছিল। দুটি ছবিরই নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার।

জাপানী ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে জাপানী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। সমসাময়িক তিনটি কাহিনীচিত্র—অ্যাংগ্রী সী, আওয়ার সায়লেন্ট লাভ, জিন চো গে—দেখানো হবে। উৎসব চলবে তিনদিন (৩ থেকে ৫ জানুয়ারী)।

সংস্থার উদ্যোগে একই প্রেক্ষাগৃহে ৬ থেকে ৯ জানুয়ারী পাঁচটি সোভিয়েত চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

সাংস্কৃতিকী

পাইকপাড়ার হাউসিং এস্টেট ইউনাইটেড ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন সম্প্রতি এস্টেট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে শিশুনাট্য 'কথা-মালার দেশে' এবং রহস্যনাটিকা 'পিপাসা' মঞ্চস্থ হয়। 'পিপাসা' (পরিচালনা : কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়) নাটকের অভিনয়াংশে কৃতিত্ব দেখান রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিতাভ লাহিড়ী। অন্যান্য চরিত্রে সু-অভিনয় করেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সরকার, এস কে লাহিড়ী ও তৃষ্ণা রায়। নাটক ছাড়াও উপভোগ্য সঙ্গীতানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি পরিবেশন করেন ধীরেন বসু ও শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়। ক্লাব সম্পাদক উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ তহবিলে ক্লাব ফাণ্ড থেকে ১০১্ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন।

অনিবার্য কারণে এ-সপ্তাহে "বোম্বাই-বিচিত্রা" প্রকাশ করা গেল না।

অরণ্যদেব

লী ফক

পাহাড়ি এলাকার দৈত্যেরা আমার মেলোডিকে ঘিরে ফেলল!
জ্যান্ত পুতুল!
পুতুল নয়, সত্যিকারের মানুষ!
!

ক্ষুদে মেয়ে, আমরা তোমাকে মারব না....
মেলোডি আর পাহাড়িয়া 'দৈত্যদল---
উঃ, তীর বিঁধেছে! যেন বোলতার কামড়!

!

জ্যান্ত যুবতী মেয়ে...চমৎকার গড়ন! ওগো পুতুল-মেয়ে, তোমার দেশ কোথায়?
পায়রার পিঠে চড়ে উড়ছিল!
দ্বিতীয় পায়রাটা কোথায় গেল?

'গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিলুম, দৈত্যরা আমাকে খুঁজে পেল না। শুধু মরা বাজপাখিটাকেই দেখতে পেল...'

'আশ্চর্য ব্যাপার, ওরা চলে যেতেই আমার পায়রাটা এসে হাজির! এতক্ষণ সেও লুকিয়ে ছিল!'
জেফির, তুমি আমাকে ঠিক খুঁজে নিয়েছ!

'পায়রার পিঠে উঠে আমি দৈত্যদের অনুসরণ করলুম। দেখলুম, মেলোডিকে নিয়ে ওরা একটা মস্ত দুর্গের মধ্যে গিয়ে ঢুকল!'

অরণ্যদেব, তুমি আমাদের পুরনো বন্ধু! আমি তোমার সাহায্য চাই!
দৈত্যদের হাত থেকে মেলোডিকে তুমি উদ্ধার করে দাও!
!
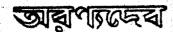
পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ আলোচ্য সপ্তাহের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-৮ তিনজন মার্কিন মহাকাশচারী—লোভেল, বোরম্যান ও অ্যানডারসকে নিয়ে ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার চাঁদের চারদিকে ঘুরেছে। পৃথিবী থেকে চাঁদের নিশানা হয়েছে দূরের নক্ষত্র নীহারিকা এবং চাঁদের পিঠের দৃশ্যমান বস্তু পর্বত, গহ্বর হয়েছে নভশ্চরদের কক্ষপথ নির্ণয়ের সহায়ক। বিশ্বের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম মানুষ প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার (২৪ হাজার মাইল) গতিতে পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন ছিন্ন করে পৃথিবী বেষ্টনকারী তেজস্ক্রিয় বলয় ভেদ করে মহাকাশের পথে পাড়ি দিয়েছেন। মাত্র ৭০ মাইল দূরে থেকে মানুষ চাঁদ দেখছে। বিপুল রহস্যের এক যবনিকা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে এবং তারই ফলে ব্রহ্মাণ্ড আজ মানুষের কাছে এক নতুন রূপে দেখা দিচ্ছে। মহাকাশযানটি থেকে টেলিভিশনে নিউইয়র্কে যে ছবি পাঠানো হয় তাতে চন্দ্রপৃষ্ঠের বড় বড় ক্রেটার (গর্ত)গুলি পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) দশবার চন্দ্র পরিক্রমা শেষ হলে মহাকাশযানটি পৃথিবী-মুখী করা হয় মূল রকেট ইঞ্জিনটি আর একবার সক্রিয় করে। অ্যাপোলো ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর অভিকর্ষে প্রবেশ করে। তখন পৃথিবী আরও ২০২,০০০ মাইল দূরে। ২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার মানব-ইতিহাসের সব চাইতে বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে অ্যাপোলো-৮ ঠিক ঘড়ির কাটায় কাটায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজের মাত্র ৪ মাইলের মধ্যে অবতরণ করেছে। অতএব, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের দিকে মানুষের জয়যাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

দেশী সংবাদ

২০ ডিসেম্বর—আজ বিকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত বিরাট জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পট-ভূমিকায় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন : একতা, শক্তিশালী সেনাবাহিনী, লোকতন্ত্র ও স্থায়ী সরকার।

গত ১০ নবেম্বর বইলাডিলা লৌহখনি প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে জাতীয় খনি উন্নয়ন করপোরেশন যে খানা দিয়েছিলেন তাতে মাথা-পিছু খরচ হয়েছিল সাড়ে সাতচল্লিশ টাকা। রাজ্যসভায় কয়েকজন সদস্য এভাবে জনগণের অর্থ অপচয়ের তীব্র সমালোচনা করেন।

২৪ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন উপমন্ত্রী শ্রী ভি আর চবন আজ বলেন, পশ্চিম-বঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনে ইচ্ছুক মাত্র ১০,৬০০ নতুন উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের অপেক্ষায় বিভিন্ন শিবিরে রয়েছেন। বাকি উদ্বাস্তুদের ইতিমধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে।

চতুর্থ যোজনায় সরকারী উদ্যোগের কর্ম-কাণ্ডের জন্য মোট ১৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকার মত বরাদ্দ হবে। আজ যোজনা কমিশনের পূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দের এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্য আগামী জানুয়ারিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে পেশ করা হবে।

২৫ ডিসেম্বর—মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির অষ্টম কংগ্রেসে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রসঙ্গের বিতর্ক থেকে দলের কর্মসূচীর লক্ষ্যে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী কর্মকৌশল খুঁজে বের করার জন্য দলের উদ্যোগের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বিতর্কের সূচনা করেন শ্রী বি টি রণদিভে ও শ্রীবাসবপুন্নিয়া।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর ছাপা নিয়ে কড়া সমালোচনা করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, এতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গুরুতর অমর্যাদা করা হয়েছে। অন্য কোন সভ্য দেশের মানুষ এই ধরনের অবমাননা বরদাস্ত করত না।

২৬ ডিসেম্বর—গতকাল রাত্রে তানজোর জেলার কিভালুর গ্রামে বাম কমিউনিসট এবং অকমিউনিসট কিষাণদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৪৩ জন নরনারী ও শিশু আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে নারী ২৫, শিশু ১৪ ও পুরুষ ৪। ফসল কাটার কাজের জন্য বাইরে থেকে অকমিউনিসট কিষাণদের ঐ গ্রামে আনা হলে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষে একজন অকমিউনিসট কিষাণ নিহত হয়। এর পরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রায় দুশো অকমিউনিসট কিষাণ বাম কমিউনিসট কিষাণদের কুঁড়েঘর-গুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তার ফলে এই প্রাণহানি।

২৭ ডিসেম্বর—যুক্ত পরামর্শদাতা সংস্থার জাতীয় পরিষদ আজ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক ১৭৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মূল বেতনের সঙ্গে দুর্মূল্য ভাতা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক সংখ্যা ২১৫। এই বৎসরের ১ ডিসেম্বর থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

অত্যাবশ্যক কৃত্যক বিলটি আজ সংসদের অনুমোদন লাভ করে। বিলটি আজ রাজ্যসভায় ৬১—১৪ ভোটে গৃহীত হয়। লোকসভায় বিলটি গৃহীত হয়েছিল গত সপ্তাহে। গত ১৯ সেপটেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘটের প্রাক্কালে যে অরডিন্যানস জারি করা হয়, তারই জায়গায় এই বিলটি আনা হয়েছে।

২৮ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ যোজনার প্রথম বছরে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ টাকার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে মহা ফ্যাসাদ দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় ওই ৪০ কোটি টাকা খুবই কম। প্রায় সব দফতরের পক্ষ থেকেই জোরালো যুক্তি দেখিয়ে ভাগের অংশ বাড়ানোর জন্য টানাটানি চলছে। এখন পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

২৯ ডিসেম্বর—সরকারী সংবাদে আজ জানা যায়, সহস্রাধিক সশস্ত্র গিরিজনরা (খণ্ডজাতি) শুক্রবার শ্রীকাকুলম জেলার খণ্ডজাতি এলাকায় এক ভূম্যাধিকারীর বাড়িতে হানা দেয় এবং লুটপাট করে। এই গিরিজনরা নাকি চরমপন্থী কমিউনিসট।

মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির নেতৃত্বের সমালোচক বলে যাঁদের মনে করা হয় নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। পারটির অষ্ট কংগ্রেস আজ শেষ হল।

বিদেশী সংবাদ

২৩ ডিসেম্বর—১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল ছুটে অ্যাপোলো-৮ আজ মর্ত্যের বন্ধন কাটিয়ে চাঁদের অভিকর্ষ এলাকার দিকে এগোচ্ছে। মহা-কাশচারী লোভেল ও অ্যানডারস জেগে আছেন এবং কাজ করছেন। বোরম্যান তাঁর পালা মত ঘুমিয়ে নিচ্ছেন।

২৪ ডিসেম্বর—মহাকাশচারী ক্যাপটেন জেমস লোভেল তাঁদের একটি জায়গার নাম রেখেছেন মাউনট মেরিলিন। মেরিলিন তাঁর স্ত্রীর নাম। ভবিষ্যতে চাঁদে নামার জায়গা হিসাবে মোট পাঁচটি জায়গা মহাকাশচারীরা নির্বাচন করেছেন। মেরিলিন তার অন্যতম। জায়গাটি মহাকাশযান থেকে চমৎকারভাবে দেখা গিয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

২৫ ডিসেম্বর—গতকাল বড়দিনের আগের দিন একটি বিমান অবতরণের সময় ব্রেডফোর্ড (পেনসিলভানিয়া) পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ে। ১৯ জন যাত্রী নিহত হয়েছেন। ২৭ জন রক্ষা পেয়েছেন। একজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিমানে মোট ৪৭ জন ছিলেন।

২৬ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নার জন্মদিনের জাঁকজমক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয়েছে। কারণ ছাত্র বিক্ষোভ। পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে দিকে ছাত্ররা শপথ নিয়েছেন যে, প্রেসিডেনট আয়ুব খানের সরকারের পতন না ঘটা পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন বন্ধ করবেন না।

২৭ ডিসেম্বর—আজ চীন বেলা ১টা নাগাদ লপনর এলাকায় বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এর শক্তি প্রায় তিন মেগাটনের সমান। এই খবর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন। আজকের পরীক্ষা নিয়ে কমিউনিসট চীন এ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে ৮টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল।

২৮ ডিসেম্বর—চাঁদের আকাশ থেকে মানুষ ঘুরিয়ে আনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি বা তার অব্যবহিত পরে মানুষের চাঁদে পদার্পণের ব্যবস্থার দিকে নজর দিয়েছে। বলা হচ্ছে, এবার চাঁদে নামার সমস্যা।

২৯ ডিসেম্বর—এথেনস বিমানবন্দরে তিনদিন আগে একটি ইজরায়েলী বিমানের উপর আরব গেরিলাদের আক্রমণের প্রত্যুত্তরে ইজরায়েলীরা বেইরুট আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে গতকাল রাত্রে অন্তত ১৩টি অসামরিক আরব বিমান সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে।

গতিশক্তি
সঞ্চারক
দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম আরাম—এই অভিপ্রায়ে
বাটার খেলার জুতোর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখুন।
কুশন আর্চ আর ইনসোল আকস্মিক আঘাত থেকে
রক্ষা করে। ঘনবুনোট ক্যাম্বিসের আপার;
ক্ষয়শীল সন্ধিস্থলে টেকসই বন্ধনী।
ভারী বাম্পার টোগার্ড। আপার আর
জুতোর তলির অভেদ্য বন্ধন। ঢালাই সোল
আর হিল এমন কৌশলে তৈরি যা পারতপক্ষে
ছড়কাবে না। সব মিলিয়ে, আশ্চর্য সমর্থ সমাবেশ।
টুর্নামেন্ট ১০.৯৫
Bata

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীজগদীশ ধর

"বলতে পারো,
আমূলের ভিটামিনগুলো
কিজন্যে ?"
জিজ্ঞেস করল শিশুটি।
"হ্যাঁ,"
সমস্বরে বলে
উঠল ওর ছোট্ট
বন্ধুরা
ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তিকে উজ্জ্বল করে।
ভিটামিন বি১ স্নায়ু সবল করে।
ভিটামিন বি২ মুখ সুস্থ রাখে।
ভিটামিন সি রোগসংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
ভিটামিন ডি হাড় মজবুত করে।
নিয়াসিনামাইড ত্বক সুস্থ রাখে।
Amul
আমূল দুগ্ধজাত খাদ্য
আপনার শিশুর প্রয়োজনীয় ৭টি ভিটামিন এতে আছে।

॥ মিত্র-ঘোষের আসন্নপ্রকাশ গ্রন্থরাজি ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

অবিস্মরণীয় নূতন উপন্যাস

আমি কান পেতে রই ১৫৲

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কলকাতা ও বৃন্দাবনের পটভূমিতে এক রূপসী কীর্তনওয়ালীর জীবন এই বিপুল উপন্যাসের উপজীব্য। সেই সঙ্গে আরও বহু বিচিত্র জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন প্রবীণ ঔপন্যাসিক—তাঁর লেখনীর জাদুদণ্ড স্পর্শে সেদিনকার রঙ্গমঞ্চ, সেদিনকার জাদুকর, সার্কাসওয়ালী, সেদিনকার বিদগ্ধসমাজ ও ধনী সমাজ, সেদিনকার বস্তিঘরের মুখে এরারুট-মাখা দেহজীবী—সকলে প্রাণবন্ত হয়ে পাঠকদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

॥ এ উপন্যাস একমাত্র এই লেখকই লিখতে পারেন ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
নবতম উপন্যাস
এক চামচ গঙ্গা ৫৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নূতনতম উপন্যাস
স্বয়ংবৃতা ৬৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
দ্বিধা ৬৲

সৈয়দ মুজতবা আলীর
রাজা উজীর ৭৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
গৌরাঙ্গ পরিজন ১০৲

তারাশংকরের
যোগভ্রষ্ট ৭৲

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

যাত্রাগানে রামায়ণ ১০৲

নকুল চট্টোপাধ্যায়ের
চিরকুমারী সভা ৪৲
সত্য ঘটনার আশ্চর্য রূপক।

শচীন্দ্রলাল রায়ের
জাহাঙ্গীরনামা
জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর অনুবাদ

প্রবোধকুমার সান্যালের
মনে রেখো ৭॥

নলিনীকান্ত সরকারের
(নূতন মুক্তি) **হাসির অন্তরালে ৫৲**

অনিলেন্দ্রনাথ মিত্রের (মামাবাবুর)
ব্যাডমিণ্টন ৫৲
ব্যাডমিণ্টন খেলার নিয়ম ও পদ্ধতি
বহু চিত্রযুক্ত
প্রামাণ্য ও চিত্তাকর্ষক

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশিত হল

দাম ৫·০০

যেহেতু আমাদের দেশে অন্যান্য সব খেলার মতই ক্রিকেট খেলা শেখানোরও স্কুল, কলেজ বা ক্লাব স্তরে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, তাই অগণিত শিক্ষার্থী এবং অনুরাগী দর্শক এ খেলার নিয়মকানুনগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্যের কাছ থেকে—মুখে মুখে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয়—খেলার মাঠে গণ্ডগোল, অশান্তি। এর একমাত্র প্রতিকার : প্রামাণ্য বই থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ।

বর্তমান গ্রন্থে ক্রিকেট খেলার মূল আন্তর্জাতিক আইন, এবং প্রত্যেকটি আইন সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্য ও বিভিন্ন আলোচনা—যাকে মূল আইনটির সভাষ্য বিশদ ব্যাখ্যা বলা যায়—অসংখ্য ডায়াগ্রাম ও ইলাস্ট্রেশন সহ পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া, ক্রিকেট আইনের

মতি নন্দীর

ক্রিকেট খেলার নিয়মাবলি

ক্রিকেটের আইনকানুন

বিবর্তনের ইতিহাস এবং বিভিন্ন সময়ে এই আইনগুলির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাল-তারিখ সহ একটি তালিকাও এতে আছে। এ বইয়ের আর একটি বিশেষ আকর্ষণ হল : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পরিচালিত রনজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি ও কোচবিহার ট্রফি—ভারতের এই তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতার বিশেষ নিয়মকানুন-সমূহ এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স-এর ইতিবৃত্ত।

আম্পায়ার, ক্রিকেট খেলোয়াড়, ক্রিকেট শিক্ষার্থী, ক্লাব সেক্রেটারি, অনুরাগী দর্শক—সকলেরই এ বই অবশ্যপাঠনীয়। এ বই খেলার মাঠে অশান্তি দূর করবে, খেলা উপভোগকে আরও মধুর করে তুলবে।

● ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার অন্যান্য বই ●

ফুটবলের আইনকানুন ॥ মুকুল দত্ত ॥ ৬·০০

ফুটবল খেলার মূল আন্তর্জাতিক আইন, মূল আন্তর্জাতিক আইনের বিশদ ব্যাখ্যা ও ভাষ্য, বিভিন্ন আইন ও নিয়মাবলির প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধানের সংক্ষিপ্তসার, ফুটবল খেলায় সংঘটিত অথবা সম্ভাবিত ১৩২টি জটিল প্রশ্নের উত্তর এবং আইনভিত্তিক প্রায় এক শত ডায়াগ্রাম, ইলাস্ট্রেশন ও চিত্রে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ ॥ পঞ্চম মুদ্রণ ॥

নট আউট ॥ শংকরীপ্রসাদ বসু ॥ ৬·০০

শংকরীপ্রসাদ বসুই বাংলায় প্রথম বিস্তৃত আকারে ক্রিকেট-সাহিত্যের প্রবর্তক। বাংলা সাহিত্যের এই নতুন ধারায় শ্রীবসুর বলুর সার্থক সংযোজন "নট আউট"। ক্রিকেট তার অজস্র কাহিনী ও প্রচুর চরিত্র নিয়ে বিচিত্র ভূমিকায় এখানে উপস্থিত। বিখ্যাত কার্টুনিস্ট শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী অনেকগুলি কার্টুন এঁকেছেন। কয়েকটি মূল্যবান ফটো-চিত্রও আছে ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

লাল বল লারউড ॥ শংকরীপ্রসাদ বসু ॥ ৬·০০

ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ বডিলাইন। সে এমন ভয়াবহ সংঘাত, যাতে জড়িয়ে পড়েছিল দুটি বিরাট দেশ, এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের উপক্রম হয়েছিল। বডিলাইনের পটভূমিকায় লেখা এই ক্রিকেট-বইয়ে আবির্ভূত ক্রিকেটের মহানায়কেরা—ব্র্যাডম্যান, জার্ডিন, লারউড, হ্যামন্ড, উডফুল এবং আরও অনেকে ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥

● একখানি অনবদ্য ভ্রমণ-উপন্যাস ●

শিবঠাকুরের আপন দেশে ॥ রাণু সান্যাল ॥ ৪·০০

বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতপ্রায় হিমালয়ের পটভূমিতে লেখা সর্বপ্রথম [illegible] শিবঠাকুরের আপন দেশে। [illegible] ভাষায় বহু বৈচিত্র্য চিত্র ও চরিত্র এমন নিপুণতায় লেখিকা এঁকেছেন যে, বইটি পড়ে একটি উপন্যাস পড়ার স্বাদ পাওয়া যাবে ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড [illegible]

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১১
শনিবার ২৭ পৌষ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৪২.০০
ষাণ্মাসিক „	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	...	১০.০০

[illegible]
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.[illegible]

দাম ৫০ পয়সা
[illegible] বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 11, Jan. 1969.

নির্বাচনের প্রস্তুতি

এখন শীত প্রখর: শীতের বাতাস ফুরিয়ে আসার বেলায় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের নাটকাভিনয়। আপাতত নাটকের প্রস্তুতি-পর্ব প্রাথমিকভাবে শেষ হয়েছে, পাত্রপাত্রীর নির্বাচন সমাপ্তপ্রায়, মহড়াও শুরু হয়ে গেছে। আর পক্ষকালের মধ্যে মাঘের বাতাস নির্বাচনের মহড়ায় উষ্ণ হয়ে ওঠার কথা। ইতিমধ্যেই আমরা নির্বাচনের আনুষঙ্গিকগুলি লক্ষ্য করতে পারছি; কলকাতা শহর, শহরতলি থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই জনসভার আয়োজন, রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা, ভোট-ফেরির হাঁক। কলকাতা শহরের পথঘাট, বাড়িঘর পোস্টারের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়েছে, এখনই প্রায় স্থানাভাবের অবস্থা। তবু এই নতুন বছরের প্রথম মাসটির মাঝামাঝির পর পোস্টার-প্রলেপিত শহর কলকাতা যতটা দর্শনীয় হয়ে উঠবে ততটা এখনও হয়নি। তাছাড়া সভা-সমিতি আরও কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। সেই সঙ্গে নানারকম উদ্দীপনার মধ্যে আরও একটি জিনিস দেখা যাবে, হাঙ্গামা। একেবারে নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এবারে নির্বাচনে এ-আশঙ্কা করা হচ্ছে। সরকারী মহল থেকে এর জন্য আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে যে, হাঙ্গামা সহ্য করা হবে না। সরকারী তর্জন এবং কাঠিন্য ভাল, কিন্তু হাঙ্গামার সূত্রপাত হলে তার গতি কোন পথে যাবে বলা মুশকিল।

নির্বাচন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে এবারে রাজ্যে রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের যে রকম ঘটা তাতে রাজকোষের একটা অংশ এই বাবদেই খরচ হবে। বোধ হয়, আমাদের দেশের সংসারযাত্রায় যে রকম টানাটানি তাতে আর নির্বাচন বাহুল্য না ঘটানোই ভাল, যা হবার আগামী ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনেই হয়ে যাওয়া সঙ্গত। অর্থাৎ এমন কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে যার ফলে এই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যাপারটি খাপছাড়া হয়ে যায়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলে হয়ত বোঝা যাবে, বিগত সাধারণ নির্বাচনগুলির সময় হাঙ্গামা ও সংঘর্ষের আশঙ্কা এতটা ছিল না। অস্বীকার করা যায় না, নির্বাচনের তাপ যখন মাথায় চড়ে তখন দু চারটি মাথা ফাটাফাটি ঘটে যায়; তবু এটা সাময়িক, কোনো পক্ষের হঠকারিতা বা দুই বিরোধীপক্ষের যুযুধান মনোবৃত্তির ফলে এটা ঘটে যায়। ইদানীং কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই হাঙ্গামার একটি মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে নানা জনসভায় বোমা, পাথর ছোঁড়া, লাঠালাঠির ঘটনা ঘটে গেছে। এমন কি, জনসভার বাইরেও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু রাজনৈতিক হিংস্র আক্রমণও চালানো হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজনৈতিক দলগুলি যখন জনসাধারণের মনোনয়নের ওপরই নির্ভর করে ক্ষমতায় আসার নীতি মেনে নিয়েছেন তখন এ-সব গর্হিত কান্ড কেন ঘটে? জনসাধারণই যদি ভরসা হয় তবে শান্তভাবে আরও মাসাধিককাল অপেক্ষা করতে আপত্তি কোথায়?

ইদানীং একটা এমন আবহাওয়া তৈরী হয়ে উঠছে যাতে মানুষকে তার ব্যক্তিগত মতামত জানাবার সাধারণ ও স্বাভাবিক সুযোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে দলগতভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সর্বত্রই প্রায় এই অবস্থা। অর্থাৎ এমন আশঙ্কা বাস্তবিকই দেখা দিয়েছে যখন দলগতভাবে চেষ্টা চলছে ব্যক্তিগত মানুষের ইচ্ছা ও কাজে বাধাদানের। এসব ক্ষেত্রে সবলের উগ্রতা অবশ্যই দুর্বলের পক্ষে আতঙ্কের বিষয়। যুক্ত ফ্রন্ট অথবা কংগ্রেস, যে কোনো রাজনৈতিক দলই হোন না কেন, সৎ এবং পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের মুখোমুখি হবেন এই মাত্র আমাদের আশা। নির্বাচনে যে কদাপি দুর্নীতি ঘটে না এমন কথা বলা হাস্যকর। তবু হাঙ্গামা এবং এক ধরনের নাশকতামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে নির্বাচনের নাটক ভণ্ডুল করা চলে না। কে ক্ষমতায় আসবেন না আসবেন, স্থায়ী সরকার গঠন করা যাবে কি যাবে না, অজয়বাবু-জ্যোতিবাবুরা আমাদের কতটা করে চাল খাইয়েছেন, অথবা প্রফুল্লবাবুরা কি করেছেন আমাদের জন্যে—এ-সব চিন্তা সাধারণেই করবেন, রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রচারকার্য চালান তাতেও আপত্তি নেই, তবে এইমাত্র প্রার্থনা—কোনো তরফ থেকেই যেন পরোক্ষে নির্বাচনের মুখে হাঙ্গামা ঘটানোর চেষ্টা করা না হয়।

ডঃ ঘোষ

যে কোন কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে পার্টি কংগ্রেস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। কারণ, পার্টি কংগ্রেসে দলের বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য খোলাখুলি আলোচনা করার সুযোগ পায়। এই আলোচনা হয় প্রতিনিধিদের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে যে অবস্থাটা সামনে বেরিয়ে আসে তাকে ভিত্তি করেই পার্টির ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়। ঠিক এমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির অষ্টম পার্টি কংগ্রেস, এর্নাকুলামে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে ভাগ হ'য়ে যাওয়ার পর মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির এটা ছিল দ্বিতীয় কংগ্রেস। প্রথম কংগ্রেস বসেছিল কলকাতায়, ঠিক ভাগ হবার পর। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি নামে নূতন পার্টি হ'লেও ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অংশ হিসাবে এর্নাকুলাম কংগ্রেস ছিল অষ্টম কংগ্রেস।

প্রচলিত রীতি অনুসারে পার্টি কংগ্রেসে দুটি মূল বিষয়ের আলোচনা হ'য়েছে রাজনৈতিক ও সংগঠনিক সম্মিলিত দলিলের ভিত্তিতে। এই দলিলের অংশ হিসাবে এবং মূল সিদ্ধান্ত হিসাবে গত অক্টোবর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কলকাতা অধিবেশনে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব রচনা করা হ'য়েছিল সেটাই ছিল পার্টি কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিভেদের বাস্তব প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হ'য়েছে, তেমনি ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ ক'রে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সংকট এবং কর্তব্যকে তুলে ধরা হ'য়েছে।

আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট মহলে বিভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে এটাই প্রস্তাবে দেখাবার চেষ্টা হ'য়েছে যে, রাশিয়া এবং চীনের মত বড় দুটি পার্টির মধ্যে যে বিভেদ ও বিদ্বেষ তীব্রতর হ'য়ে উঠেছে তা সমগ্রভাবে ভারতের এবং বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে ব্যাহত করছে। কম্যুনিস্ট আন্দোলন মূলতঃ নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের প্রোলিতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে বিপ্লবকে সার্থক করার উপর। শ্রমিকের সেই অন্তর্জাতিক ঐক্য আজ বিপন্ন হ'য়েছে দুটি বৃহৎ কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে মতানৈক্য ও বিরোধের ফলে। শ্রমিক ঐক্য বিপন্ন ব'লে কম্যুনিস্ট আন্দোলনও আজ বিভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। এজন্য দুটি দেশের বৃহৎ পার্টিকে বিশেষভাবে দায়ী করা হ'য়েছে। একদিকে সোভিয়েট পার্টির নেতৃত্বের শোধনবাদ যেমন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে বিভ্রান্ত করছে, তেমনি চীনের পার্টির কয়েকটি ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে কম্যুনিস্ট আন্দোলন বিপর্যস্ত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে দেখান হ'য়েছে যে, ভিয়েৎনাম মুক্তি যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবার আশংকা আছে বলে সোভিয়েত নেতৃত্বের হুঁশিয়ারী কার্যে পরিণত হয় নি। এ-থেকে সোভিয়েৎ নেতৃত্বের রাজনৈতিক বিচার যে নির্ভুল নয়, তা-ই প্রমাণিত হ'য়েছে। তাছাড়া সোভিয়েত সংশোধনবাদের ফলেই ফ্রান্সে চমৎকার সুযোগ এসে যাওয়া সত্ত্বেও সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয় নি। অপর দিকে বলা হ'য়েছে যে, সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে ভিয়েৎনাম ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান ক'রে চীনের নেতৃত্বও চরম ভুল করেছে। তা ছাড়া চীনের বক্তব্য যদি এটাই হয়ে থাকে যে, সোভিয়েত রাশিয়া আজ সোস্যালিস্ট মহলের বাইরে চ'লে গিয়ে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অংশীদার হ'য়ে পড়েছে তা হ'লে তা-ও নিদারুণ ভুল। দৃষ্টান্ত হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার কথা উল্লেখ ক'রে বলা হ'য়েছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিবিপ্লবীরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে সোস্যালিস্ট মহলকে বিপন্ন ক'রে ফেলেছিল বলেই সোভিয়েত রাশিয়ার শোধনবাদ নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হ'য়েছিল। চীনের মতে এই হস্তক্ষেপ জনসাধারণের ইচ্ছাকে দমন করার শামিল: কিন্তু রাজনৈতিক বিচারে তা নির্ভুল নয়। চীনের এই মন্তব্যও ঠিক নয় যে, ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদানত হ'য়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক মহলের এই দুটি বৃহৎ পার্টির বিচার ধারাকে প্রস্তাবে সমালোচনা করা হ'য়েছে এই কারণে যে, এই রকম ত্রুটিপূর্ণ বিচারের ফলেই আজ ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং বিশেষ ক'রে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মসূচী বিপন্ন হ'য়ে পড়েছে। এই বিপদ প্রধানতঃ এসেছে দক্ষিণপন্থী শোধনবাদ এবং উগ্র-বামপন্থীর আক্রমণ থেকে। এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা প্রকৃত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের প্রধান কর্তব্য হ'য়ে উঠেছে এই কারণে যে, আজ ভারতের শাসক কংগ্রেস দল দেশের বড় বড় পুঁজিপতি ও জমির মালিকদের ধারক ও বাহক হ'য়ে উঠেছে। কংগ্রেস আজ বুর্জোয়া প্রধানদের কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির গণ-আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সর্বপ্রকার নিপীড়নে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। ফলে, এমন একটা অবস্থা এসে গিয়েছে যখন কংগ্রেসের পক্ষে গণতন্ত্রের মুখোসটাও আর রাখা সম্ভব হ'চ্ছে না। এটা যে সম্ভব হ'চ্ছে, না তা বোঝা যায় ১৯৬৭ সালের নির্বাচনোত্তর কালের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত থেকে বিভিন্ন রাজ্যে যে-সব অ-কংগ্রেসী সরকার কায়েম হ'য়েছিল সেগুলোকে সংসদীয় গণতন্ত্রের খাতিরেও আর বরদাস্ত করা সম্ভব হ'চ্ছে না। ফলে, অ-কংগ্রেসী সরকার সরিয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসাবার চেষ্টা হ'চ্ছে এবং ঠিক সে-কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ খুঁজছে কেরলের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে অপসারিত করার।

পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী পি, সুন্দরাইয়া অবশ্য বারবার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বলেছেন যে, তথাকথিত নক্সালপন্থীদের আক্রমণকে পার্টি তেমন গুরুত্ব দেয় না: কারণ পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের শোধনবাদী মনোবৃত্তি এখনও নির্মূল হয় নি। কিন্তু শ্রীরণদিভে অবশ্য মনে করেন যে, কংগ্রেসী চক্রান্তকেই উগ্রপন্থীরা সাহায্য করছে। তাঁর মতে,

চন্দ্রগুপ্ত

মুখরক্ষা।

২৭ ডিসেম্বর দুনিয়ার সব খবরের কাগজেই একটা খবর বেরিয়েছিল যা অনেকেরই নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। গ্রীসের রাজধানী এথেন্স থেকে পাঠানো ওই ছোট্ট খবরটিতে বলা হয়েছিল, তার আগের দিন (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার) দুজন আরব মুক্তি-সৈনিক ওখানকার বিমানবন্দরে রাইফেল আর আগুনের গোলা ছুঁড়ে একটি ইস্রায়েলী যাত্রী বিমানকে আক্রমণ করে; তার ফলে একজন ইহুদী যাত্রী মারা গিয়েছে, আহত হয়েছে একজন ইহুদী এয়ারহস্টেস্। ইস্রায়েলী এয়ারলাইন এল আলের ওই বোয়িং ৭০৭ বিমানটি তেল আভিভ থেকে নিউইয়র্কের পথে নেমেছিল এথেন্সে। হানাদারদের অতর্কিত আক্রমণে বিমানটিরও ক্ষতি হয়েছে এ খবরও রিপোর্টে ছিল। ছোট্ট একটা লেজুড়ও ওই খবরের সঙ্গে কোন কোন কাগজে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল প্যালেস্টাইনের একটি গেরিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা স্বীকার করেছেন এ আক্রমণ চালিয়েছেন তাঁদের দলেরই দুজন লোক। পরে জানা গিয়েছে, এ তাঁদের মিথ্যে বড়াই নয়। প্যালেস্টাইন মুক্তি ফ্রন্টের মাহমুদ মহম্মদ ঈসা আর মাহের হুসেন ইমামীনরেই এই দুঃসাহসিক কাজ।

আরব হানাদারেরা যে একটা বুমেরাং ছুঁড়েছে, সে কথা তখনই তারা বুঝতে পারেন নি। বুঝলো দুদিন বাদে যখন সে বুমেরাং ফিরে এসে তাদের ওপরই পড়লো। তাতে হানাদারেরা (তারা এখন এথেন্সের জেলে বন্দী, বিচার তাদের কিছুদিন পরেই হবে) কিংবা তাদের নেতারা কেউ ঘায়েল হয়নি। তারা কেন, কোনও মানুষই এতে প্রাণ হারায় নি। ঘায়েল হয়েছে খান তেরো আরবী যাত্রীবাহী বিমান। সেগুলি যখন লেবাননের আন্তর্জাতিক বন্দর বেরুটে খাড়া ছিল তখন হঠাৎ একদল ইস্রায়েলী হানাদার হেলিকপ্টারে করে সেখানে এসে চড়াও হলো তাদের ওপর। চক্ষের নিমেষে হানাদারেরা সব লণ্ডভণ্ড করে বিমানগুলির বারোটা বাজিয়ে দিল। তারপর বিমানবন্দরের হতভম্ব লোকগুলির নাকের ডগার ওপর দিয়ে চম্পট দিল ইস্রায়েলে নিজেদের ঘাঁটিতে। কেউ তাদের বাধা দেবার সুযোগও পেল না। তারা ঘরে ফিরতে না ফিরতেই ইস্রায়েলী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জরুরী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হলো ইস্রায়েলী হানাদারেরা এল আলের বিমানের ওপর এথেন্সে আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়েছে বেরুটে একবিন্দু রক্তপাত না করে, নিজেদের একটি বিমানও না খুইয়ে। খুশীর জোয়ার বয়ে গেল ইস্রায়েলের ঘরে ঘরে, বেদনার কালো ছায়া নামলো আরবদের দেশে দেশে।

ইস্রায়েলী কাণ্ডটা কেবল দুঃসাহসিক নয়, খানিকটা অপ্রত্যাশিতও। সব কয়টি আরব দেশের সঙ্গেই অবশ্য তার অবনিবনা, তাদের কারুর সঙ্গেই তার মাখামাখি নেই। তবুও লেবাননের সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর না হলেও একেবারে আদায়-কাঁচকলায় নয়। ১৯৬৭ সনের ছ'দিনের লড়াইয়ে লেবাননও নিরপেক্ষ থাকে নি, যোগ সেও দিয়েছিল, তবে নেহাত নাম-কা-ওয়াস্তে। নইলে আরব-সমাজে তার মুখ দেখাবার জো থাক্‌ত না। কিন্তু লড়াই তেমন কিছু লেবানন করে নি, সে যুদ্ধের জের টেনেও চলে নি। মিশর, জর্ডন, ইরাক, সিরিয়ার সঙ্গে যেমন ইস্রায়েলের ঠোকাঠুকি লেগেই আছে—তপ্ত লড়াই না হলেও ঠাণ্ডা লড়াই যেমন তাদের সঙ্গে চলছেই—লেবাননের সঙ্গে তো তেমন নয়। বরঞ্চ অনেকের ধারণা হয়েছিল ভেতরে ভেতরে বোধ হয় ইস্রায়েল আর লেবাননের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। কাজেই এথেন্সের ঝাল যে ইস্রায়েল বেরুটে ঝাড়বে সেটা কেউ আশা করেনি। সেখানকার ঘটনায় তাই রাজনৈতিক গণৎকারেরা বেকুব বনে গিয়েছে। কায়রোতে কিংবা বাগদাদে, ডামাস্কাসে কিংবা আম্মানে ইস্রায়েলীরা হানা দিলে কেউ অবাক হতো না, হয়েছে নিরীহ লেবাননের বেরুটে চড়াও হওয়াতে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে ইস্রায়েলের কাছে সব আরবই সমান। ছোট হোক বড় হোক সাপ তার কাছে সাপই, কেউটে আর ঢোঁড়ার মধ্যে ভেদ করতে সে চায় না। অতএব নিজের মানমর্যাদা বজায় রাখার জন্য অম্লান মুখে সে হানাদার পাঠিয়েছে বেরুটের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ব্যাপারটার উদ্দেশ্য মনের ঝাল মেটানো ছাড়া আর কিছু নয়। কেন না খান তেরো উড়োজাহাজ নষ্ট করে বা ভেঙে দিয়ে আরবদেশগুলোর কোনও ক্ষতি করা যাবে না, একথা ইস্রায়েল ভালোই জানে। বিমান-গুলোর দাম নাকি সাকুল্যে ৭৫ কোটি টাকার ওপর। কিন্তু তাতে কী? সেগুলো সবই তো বীমা করা আর বীমা কোম্পানী-গুলো তো আর কোনওটাই আরব-দেশী নয়। সেগুলি বেশীর ভাগই বিলাতী। গুণেগার দিতে হবে বিলাতী বীমা কোম্পানীগুলিকে। কাজেই বেরুটে ইস্রায়েলী হানা নিয়ে ব্রিটেনে যে খুব একটা শোরগোল পড়ে যাবে সে আর এমন আশ্চর্য কী? সম্প্রতি যে শোনা যাচ্ছে ব্রিটেন জর্ডনকে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে যার মোট দাম হবে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, তার সঙ্গে বোধ হয় এ ব্যাপারের কিছু সম্পর্ক আছে। বীমা বাবদ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার লোকসান ব্রিটেন হয়তো অস্ত্রশস্ত্র বেচে তুলে নিতে চায়।

বেরুটে বিমানবন্দরে হানা নিয়ে সারা দুনিয়াতে হইচই পড়ে গেলেও ইস্রায়েল নির্বিকার। সকলেই তাকে ধিক্কার দিচ্ছে, তাতে যোগ দিয়েছে তার প্রধান মুরুব্বি আমেরিকাও। রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে তাকে কড়া ভাষায় নিন্দে করে এবং ভবিষ্যতে কঠোর ব্যবস্থা নেবার হুমকি দিয়ে বিনা আপত্তিতে একটা প্রস্তাবও পাস হয়ে গিয়েছে। ইস্রায়েল তবুও কিন্তু টলে নি। নিরাপত্তা পরিষদকে আগেও সে আমল দেয়নি, এবারও দিচ্ছে না। তার কারণ কড়া কথায় যে গায়ে ফোস্কা পড়ে না সে তত্ত্ব সে ভালই জানে। নিরাপত্তা পরিষদের দৌড় যে কতদূর তা তার অজানা নেই। তার খুঁটি হচ্ছে আমেরিকা। সে খুঁটি না ভাঙলেই হলো। আর ভাঙা কেন সে খুঁটি যে মচকাবে তারও তো কোনও লক্ষণ নেই। এমন ভয় কেউ তো দেখায় নি যে, কোটি কোটি ডলার ইস্রায়েলে মার্কিনীরা লগ্নী করেছে তা তারা ফিরিয়ে নেবে। এমন কী যে ৫০টা ফ্যান্টম জেট তাদের আমেরিকা দেবে কথা দিয়েছে তারও খেলাপ হবার কোনও আশংকা দেখা যাচ্ছে না। তবে আর ইস্রায়েলের ভয় কিসের? আমেরিকানরা তাদের প্রকাশ্যে যতই ধমক দিক না কেন তারা যে কোনও দিনই তার বিরুদ্ধে আরবদের পক্ষ নেবে না এ বিশ্বাস ইস্রায়েলের আছে বলেই সে বেপরোয়া। ভয় পেতো যদি তার এ প্রত্যয় হোতো যে রাশিয়া আরবদের তরফে লড়াইয়ে নামতে পারে। তারও কোন সম্ভাবনা কিন্তু নেই। কেন না কোনও যুদ্ধেই প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়া জড়িয়ে পড়তে চায় না। বিশেষত যেখানে আমেরিকা অপরপক্ষের সহায়। তাই বেরুট বিমানবন্দর অভিযানে রাশিয়া যতটা বিব্রত হয়েছে লেবাননও ততটা হয়নি। আরবদের সে বর্জন করতেও পারে না আবার যুদ্ধে নামতে উস্কানিও দিতে পারে না। কাজেই তাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদে একটা গরম গরম প্রস্তাব পাস করিয়ে। ওই করেই সে আরবদের মুখ রক্ষা করতে চেয়েছে,—নিজেরও।

ভোরবেলায় যাই

গৌতম গুহ

আমার 'শৈশব' 'ভোরবেলা' দুই-ই এক। দিন বাড়ে না
যেন বয়সের বেলা বাড়ে না;
মেঘের ভেতর থেকে গম্ভীর ঘোষণা বা গম্ভীর ঘোষণার ভেতর মেঘের শব্দ,
শব্দ বদলায় না, গাম্ভীর্যও নয়।
আমার বুকের ভয় নিয়ে সন্ধ্যে হয়।
তখন আমি মায়ের কাছে, সরি,
মা নেই মারা গেছেন—
মায়ের মতন এক কম্পিত ছায়ার কাছে
গা ঢাকি বুক ঢাকি
দু' চোখে শৈশবের সুস্বাদ, জলের ধারা নেমে এলে
এক ডাকে ছোটবেলাকার ভুল বোঝাবুঝির ফুলদি ন্যাটোখাটো কালু,
গন্ধ ইজের নিয়ে ভোঁদা—
নির্জন বকুলতলায় ভুতুড়ে দুপুরে মনে হয় বুঝি আজো এক দৌড়ে তারা
ডাকলেই ছুটে আসবে।

একদিন
পোড়া কলসীর টুকরো জড় করা ডাইটা
রবার বল মেরে ছিটিয়ে দিয়ে দৌড়েছিলাম

দৌড়ে দৌড়ে দৌড়ে দৌড়ে—বহু দিন পর
শক্ত পায়ে হাঁটাহাঁটি করবার এক
কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাবু হয়েছি।

কিন্তু বয়সের বেলা বাড়েনি,
কারণ 'ভোরবেলা'ই আমার 'শৈশব'
আর আমি প্রতি দিন একবার আমার সেই ভোরবেলায় যাই।

অনুতাপ

শিবশম্ভু পাল

স্বপ্নগুলো মনে নেই, ঘুম থেকে উঠলেই কোথায় উধাও হয়ে যায়
আমি এত দিন ধরে তোমার প্রশ্রয়ঘন নিকুঞ্জছায়ায়
ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে চেয়ে দেখি কলকাতা সেই আছে
কলকাতাতেই
অনন্ত শয্যার রাত্রি স্বেচ্ছাবৃত দ্বীপান্তর নেই কিছু নেই।

তা হলে এখন শুধু অনুতাপ। কোনো এককালে কেউ ঘুমের
ভেতর
আদরে আদরে গলে বৃষ্টি হয়ে ভেজানো প্রান্তর
তোমারই প্রশ্রয়ঘন ছায়াচ্ছন্ন নরম মাটিতে
তার জন্যে কষ্ট হয়। কেন যে আবার সেই একই ধমনীতে
জেগে ওঠা বেঁচে ওঠা। কোথায় পালালে তুমি, ঘুম, ছুটি, রাত
তোমার অনেক নাম যেমন কখনো হও অতর্কিত ক্ষিপ্ত ঘূর্ণিবাত!

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে একতালে কাঁধে হাত দিয়ে
রৌদ্রালোকে হাঁটাকেই বাঁচা বলে, জাগা বলে; তুমি তো পালিয়ে
কোথায় অদৃশ্য হও দেবা ন জানন্তি। শুধু আপাদমস্তক
অনুতাপে ভরে যায় স্বপ্ন ভুলি, স্বপ্ন দেখা কেন যে, বালক?
প্রশ্ন করি আয়নায়। সেই তো আবার ঘুম, ঘুম ভেঙে সেই জেগে
ওঠা
পরিচিত ধমনীতে; স্বপ্নের থাকে না ছিটেফোঁটা।

'১৯৬৯'

শুরু হল ১৯৬৯ সাল। পৃথিবীর এক বছর বয়স বাড়ল, মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি আর ইতিহাস আরো এক বছর এগিয়ে গেল। সুনন্দর জর্নালের এখনো কিছু দেরী আছে, তবু ১৯৬৯ সালের পয়লা জানুয়ারী তারিখে মনে

করিয়ে দিলে, এই বাংলা দেশের আলো-বাতাস - মানুষ - ক্ষুধা-রক্তমাংস-দুঃখসুখ-ভালো-বাসা-ব্যর্থতা-আশার মেয়াদ আর একটা বছর কমে গেল তার।

এই এক বছরে চেনা-জানার ভেতরে মৃত্যু আর নতুন জন্ম দুইয়েরই আনা-গোনা চোখে পড়ল। নবজাতকের আর হিসেব নিই না—আমার বয়সের সীমা থেকে তারা অনেক দিগন্তে সরে গেছে এখন। কিন্তু মৃত্যুর ছায়াগুলো যেন রোজই কাছে এগিয়ে আসছে। অমুক মারা গেলেন? কী হয়েছিল—স্ট্রোক? কী আশ্চর্য, এই তো সেদিন—'

[illegible]

আসতে চাইছে। এমন অপরিবর্তিত জীবনের মধ্যে খাঁচায়-পড়া নয়, তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো বেঁচে থাকবার কোণা খুঁজতে হবে, হিসেব নিতে হবে চলা-ফেরার, খাওয়া-দাওয়ার, ব্লাড-প্রেশারের।

কিন্তু পয়লা জানুয়ারীতে, জার্নাল লিখতে বসে আর নিজের কথা ভাবব না। কাগজে কাগজে পণ্ডিতেরা সারা পৃথিবীর হিসেব কষছেন—রাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষের ভবিষ্যৎ। প্রায় পাঁচশো কোটির এই প্রাণসমুদ্রে একটি বিন্দুর জন্যে কার কী আসে যায়!

কাল—বৎসরের শেষ রাত্তিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে পড়ছিল দক্ষিণের আকাশ। শীতে আক্রান্ত হয়ে আছে কলকাতা—রাত খুব বেশি হয়নি, তবু ঘরে ঘরে বন্ধ দরজা। নির্জনপ্রায় পথে আলোগুলো ধোঁয়াটে, দুটো একটা শীতার্ত কুকুরের কান্না, অথচ আমার দৃষ্টির সামনে যে কৃপণ আকাশটুকু সেটা আশ্চর্য স্বচ্ছ প্রায় নীল, আর তার বুকের ভেতরে হীরের ধুকধুকির মতো নীলাভ একটা—একটাই মাত্র—অদ্ভুত উজ্জ্বল তারা। মনে হল, বৃহস্পতি।

আরো ঘণ্টা দেড়েক পরে উনিশশো আটষট্টি সাল চলে যাবে, কখনো ফিরবে না—যদি না অনন্তকালের রীল থেকে কোনো বিশাল প্রোজেক্টার তাকে ভবিষ্যতে আকাশের পর্দায় আবার প্রতি-ফলিত করে! সে তো অনেক কাল পরের কথা, কিন্তু আপাতত এ নিয়ে একটা সায়ান্স-ফিকশ্যানও কি কেউ আমাদের জন্যে লিখবেন? এইচ জি ওয়েলস তো আর বেঁচে নেই।

ভাবছিলুম, এই উজ্জ্বল নীলাভ তারাটি বছরের শেষ রাত্তিরটির মতো, চিরদিনের মতো চলে যাওয়ার আগে মমতা আর বেদনা নিয়ে পৃথিবীর দিকে

চাঁদ সাক্ষী রেখে প্রণয় বিনিময়ও অচল হয়ে যাবে

চেয়ে আছে। কালও হয়তো এই সময়ে—আকাশের এইখানটিতেই তারাটি দেখা দেবে—কিন্তু সে এ নয়, আর একজন। বৈজ্ঞানিকেরা সেই দুটো তারার পার্থক্য বুঝতে পারবেন না, কিন্তু সেই অসাধারণ ফরাসী লেখক স্যাঁৎ এগজুপেরীর মতো দৃষ্টি যদি কারো থাকে, তিনি ঠিক আজকের তারাটির চোখের জল আর

বাৎসরিক রূপ দর্শন
(পেঁয়াজ)

কালকের তারার নতুন হাসিটিকে চিনে নেবেন।

ভাবতে ভাবতে মনটা আবার বিজ্ঞানের দিকে ফিরে এল। মিথ্যেই আকাশের তারা নিয়ে আমি রোম্যাণ্টিক হয়ে উঠছি। ওটি বৃহস্পতি কিংবা শুক্রই হোক—আর কয়েক বছরের মধ্যেই তো মানুষের পা ওখানে পড়ল বলে। এবারের হ্যাপী ক্রিসমাসে মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় সুখের খবর এনেছেন মহাকাশের তিন দুঃসাহসী মানুষ—তাঁরা চাঁদের নগ্ন নির্জনতার, তার মৃত-মরুর শিলাপঞ্জরের প্রত্যক্ষ বিবরণ নিয়ে এসেছেন। এবার সেই সমুদ্র-হীন এক 'অভিশপ্ত সৈকতে' শুধু পদক্ষেপণটাই বাকী।

নতুন বছর কি তা হলে মানুষের চিরদিনের একটি রোম্যাণ্টিক কল্পনাকে একেবারে উৎখাত করল? লুপ্ত হল চাঁদের কবিতা, এমনকি 'চন্দ্রাহত' হওয়ারও আর সম্ভাবনা রইল না? এর মধ্যেই তো কেউ কেউ তা নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

কিন্তু পৃথিবী তো অনেক বেশি চেনা—অনেক পুরনো। তবু কেন তাকে নিয়ে আজো কবিতা লেখা হয়? কেন, 'Hog Butcher for the World'—জীবনঝঞ্ঝার উত্তরোল, নিষ্ঠুর, ভয়ংকর চিকাগো শহরের ওপরও মুগ্ধ বিস্মিত কার্ল স্যাণ্ডবার্গ কবিতা লেখেন: 'Under the terrible burden of destiny laughing as a youngman laughs?'

চেনা হয়ে গেলেই হারিয়ে যায় না, তখন তার আরো নতুন, আরো বিচিত্র ঐশ্বর্য দেখা দেয়। চাঁদের মরুভূমি চেনা হয়ে যাবে, তার নিষ্প্রাণ পাহাড়, তার অতল ক্রেটার আরো ভালোবাসা, আরো কল্পনার জন্ম দেবে। দূরের আকাশে তাকে দেখে দেখে তখনো আমাদের চোখ ভরে উঠবে—যেমন করে পুরনো পরিচিত এই পৃথিবীকে দেখে মহাকাশচারীর মনে হয়েছিল—শূন্যতার ভেতরে এক অপরূপ মরূদ্যান! এখানে যুদ্ধ আছে—ঠাণ্ডা লড়াই আছে, ক্ষুধা আছে, মৃত্যু আছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে, জীর্ণতা আছে, তবু পৃথিবী সুন্দর, পৃথিবী আশ্চর্য।

সেই বিমান থেকে রাতের কলকাতা। দূর থেকে এক ঝাঁক জোনাকি। তারপরে অসংখ্য আলোর ফুল। তারও পরে বাড়ি, পথ, চলন্ত মোটর—রানওয়ের আমন্ত্রণ। তখন। ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভারাক্রান্ত—রুদ্ধশ্বাস-অপরিচ্ছন্ন-ক্লান্ত শহর কোথাও নেই। রানওয়ের মাটি ছোঁয়ার জন্য সমস্ত হৃদয়ের উন্মুখ আকূতি—আলোর কলকাতা, বাংলা দেশের মাটি।

নতুন বছর আমাদের শৈশব কল্পনাকে আঘাত করল কিনা জানি না। কিন্তু আর এক প্রৌঢ় পরিণত ভালোবাসার জন্ম দিল। চাঁদের রোমান্স শেষ হল, এবার এল তাকে আপন করে পাওয়ার, ভালোবাসবার পালা।

উনিশ শো আটষট্টি সাল কি যাবার আগে এই কথাটাই পৌঁছে দিয়ে গেল? পৃথিবীর মানুষকে [illegible]—দিনের [illegible]

আর পৃথিবী আয়, খোকার কপালে টিপ...

দিন তাকে দেখে, চিনে, আমরা কি বিস্ময়-ক্লান্ত? এইবার পৃথিবী ছাড়িয়ে গিয়ে আমরা কি নতুন করে দেখব পৃথিবীর রূপ? মহাকাশের শূন্যতার নির্জনে আমাদের কি মনে হবে—ওই মরূদ্যানের প্রতিটি মানুষ আমার আপনার, আমার সব হৃদয়ের বন্ধন তার সঙ্গেই?

সামনে পয়লা জানুয়ারীর কাগজ। তার ছোট্ট একটি খবরে চোখ পড়ছে। ছাপরায় হরিজনদের একটি মেয়ে কদিন অনাহারে ছিল। ক্ষেতের জমিদার থেকে কিছু ধান চুরি করতে যায়। ধরা পড়ে এবং তাকে পিটিয়ে মারা হয়।

খবরটা বুকে যেন ছুরির খোঁচার মতো লাগল।

কী নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর ঋণ! এই ঋণ শোধ না হলে নতুন বৎসর কোন্ মুক্তি দেবে মানুষকে? কোন্ আকাশে?

আমি মনীষাকে ভালোবাসি। মনীষা আমাকে ভালোবাসে না। মনীষা অমলকে ভালোবাসে।

ব্যাপারটা এ রকমই সরল। কিন্তু অমল সম্পর্কে আমার একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এক বিশাল সন্ধ্যেবেলা নিকটিক্রহীন মন্থর আলোর মধ্যে অমল ও মনীষাকে যখন আমি পাশাপাশি দেখতে পাই—অমলের চওড়া কব্জির ধার ঘেঁষে মনীষার মসৃণতা, সামান্য গ্রীবা তুলে মনীষা রাসবিহারী এভেনিউকে কৃতজ্ঞ ও ধন্য করে—আমি তখন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলি। যাক, একই বাতাসের মধ্যে তো আমরা আছি। অমল, তুমি সৎ হও, আরও বড় হও, কতখানি দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। অমল, তুমি পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে, কেন পারবে না? আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সাহায্য করবো।

—

অমল বিমান চালায়। ভোরবেলা একটা স্টেশন ওয়াগন এসে অমলের বাড়ির সামনে হর্ন দেয়, অমল বেরিয়ে আসে—তখনও চোখে মুখে ঘুম, কিন্তু সাদা পরিচ্ছদে তাকে কী সুন্দর দেখায়! দাড়ি কামাবার পর অমলের গালে একটা নীলচে আভা পড়ে, ঠোঁট দুটি ওর ভারী পাতলা—সিগারেট ঠোঁটে চেপে কথা বলার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুপ করে সিগারেটটা খসে পড়ে যায়। স্টেশন ওয়াগনে উঠে অমল ফের নিজের বাড়ির তিনতলার জানালার দিকে তাকায়। একটু পরেই দমদম থেকে অমল ইস্তাম্বুলে উড়ে চলে যাবে। আবার ফিরেও আসবে।

অমল বিমান চালায়। অমল মোটর গাড়ি চালাতে জানে কিনা—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু এ কথা জানি, অমল সাইকেল চালাতে পারে না। অমল কি সাঁতার জানে? খোঁজ

নিতে হবে তো! সাইকেল ও সাঁতার দুটোই আমি জানি, দেওঘর থেকে ত্রিকুট পাহাড় পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম একবার, গিরিডিতে উশ্রী জলপ্রপাতে একবার সাঁতার কাটতে গিয়ে স্রোতের টানে পড়ে বহু দূরে ভেসে গিয়েছিলাম, বাঁচবো এমন আশা ছিল না। তবুও তো বেঁচে গেছি। কিন্তু ছি ছি, এসব আমি কি ভাবছি! আমি কি গর্ব করবো নাকি এ নিয়ে? ভাট। সাইকেল কিংবা সাঁতার জানা এমন কিছুই না! ও তো কত হেঁজিপেঁজি লোকেও জানে। কিন্তু অমল বৈমানিক, দৃঢ় স্বাস্থ্যময়, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখ অমল নীলিমার বুক চিরে রুপালী বিমান নিয়ে উড়ে যায় ইস্তাম্বল কিংবা সাও পাওলো বন্দর পর্যন্ত। আবার ফিরে আসে। কিন্তু অমল, তোমাকে আরও মহীয়ান হতে হবে।

সবার চোখে পড়ে না, কিন্তু আমি জানি, একটু ভালো করে লক্ষ করলেই দেখা যাবে, মনীষার পা পৃথিবীর মাটি ছোঁয় না। এই ধুলোবালির নোংরা পৃথিবী থেকে কয়েক আঙুল উঁচুতে সে থাকে। মনে আছে, সেই বৃষ্টির দিনের কথা? একটু আগেও রোদ ছিল, হঠাৎ সব মুছে গিয়ে খয়েরি রঙের ছায়া পড়লো সারা শহরে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। আমি ছুটে একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমলো, গাড়ি-ঘোড়া অচল হলো, বৃষ্টির তখনও সমান তেজ। জলের ছাঁটে ভিজে যাওয়া সিগারেট টানতে যে রকম বিরক্তি, সেই রকম বিরক্ত বা বিমর্ষভাবে আমি দীর্ঘশ্বাস বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় মনীষাকে দেখতে পাই, দুজন সখীর সঙ্গে সে জল ভাঙতে ভাঙতে উচ্ছল হয়ে আসছে। আমাকে ডাকতে হয়নি, মনীষাই সব জায়গায় সকলকে প্রথম দেখতে পায়—মনীষাই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বললো, এই বরুণদা, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন, আসুন, চলে আসুন! আজ বৃষ্টিতে ভিজবো!

জলের মধ্যে মানুষ ছুটতে পারে না, কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো ছুটে যাই। একটু আগেও গায়ে সামান্য জলের ছাঁট অপছন্দ করছিলুম, কিন্তু তখন মনে হলো হাঁটু-গভীর জলে সাঁতার কাটি। সখী দুজন ইডেন হসপিটাল রোডের হস্টেলে চলে গেল, আমি আর মনীষা মাঝ রাস্তা দিয়ে হাঁটছি জল ভেঙে ভেঙে, তখনও অঝোরে বৃষ্টি, সারা রাস্তায় আর কেউ নেই, সব পায়রারা খোপে ঢুকে গেছে—চুপচুপে ভিজে গেছি আমরা দুজনে, মনীষার কানের লতিতে মুক্তোর দুলের মতন টলটল করছে এক ফোঁটা জল, এইমাত্র সেটা খসে পড়লো। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষা অন্য কারুর মতন নয়—এই চেনা পৃথিবী, এই নোংরা জল কাদা, রাস্তার গর্ত, ভেসে যাওয়া মরা বেড়ালছানা—এসবের মধ্যে থেকেও মনীষা এত আনন্দ পাচ্ছে কি করে? বেড়াতে গেলে মানুষ এমন আনন্দ পায়—মনীষা যেন অন্য গ্রহ থেকে এখানে দু দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। আমরা এখানকার শিকড়-প্রোথিত অধিবাসী, অনেক কিছুই আমাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে—মনীষার কাছে সব কিছুই নতুন এবং আনন্দোজ্জ্বল।

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওয়েলিংটন পর্যন্ত চলে আসি। এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া কত কঠিন, কিন্তু একটা খালি ট্যাক্সি এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়, বিশালকায় ড্রাইভার ক্রীতদাসের মতন বিনীত ভঙ্গিতে মনীষার দিকে চেয়ে বলে, আসুন! যেন তার নিয়তি তাকে মনীষার কাছে পাঠিয়েছে, তার আর উপায় নেই। মনীষা হঠাৎ আবিষ্কারের মতন আনন্দে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এবার ট্যাক্সি চড়বেন? যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ ঘুরবো কিন্তু!

দরজা খোলার পর মনীষা যখন নিচু হয়ে ঢুকতে যায়, তখন তার ফর্সা পেট আমার চোখে পড়ে, জলে ভেজা নাভি, দার্জিলিং-এর কুয়াশায় আমি একদিন এই রকম চাঁদ দেখেছিলাম। আঁচল নিংড়ে মুখ মুছতে মুছতে মনীষা বলে, আঃ যা ভালো লাগছে আজ! এই বরুণদা, আপনি অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? আমি বিনা দ্বিধায় মনীষার কাঁধে হাত রেখে বলি, তুমি একদম পাগল! বৃষ্টিতে ভিজতে এত ভালো লাগে তোমার?

—ভীষণ! ভীষণ! বৃষ্টিতে ভিজলেও কক্ষণো আমার ঠান্ডা লাগে না।

—তুমি তাকাও তো আমার দিকে! তোমাকে ভালো করে দেখি।

—ভালো করে দেখবেন? আমি পাগল না আপনি পাগল?

—তা হলে দুজনেই।

—মোটেই না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাগল হতে রাজী নই! এ কথা বলার সময়েও মনীষা আমার দিকে ঘুরে তাকায়। আমি দেখি। সুকুমার ভুরুর নিচে দুটি দ্বিধাহীন চোখ, এই যে নাক—ইটালির শিল্পীরা এক সময় এই রকম নাক সৃষ্টি করেছে, উড়ন্ত পাখির ছড়ানো ডানার মতন ঠোঁটের ভঙ্গি, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি মাখানো। এ কথা ঠিক, ওর ভেজা শাড়ি-ব্লাউজের রং ভেদ করে জেগে ওঠা রুপোর জামবাটির মতন স্তন আমার চোখে পড়লেও, সেখানে আমার হাত দিতে ইচ্ছে করে নি, ইচ্ছে করেনি কুয়াশায় আধো-ভেজা চাঁদ ছুঁতে। এক এক সময় হয় এ রকম, তখন সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষার সেই সিক্ত সৌন্দর্যের স্পর্শে

আমার লোমে-ভরা শক্ত হাতটা সেই মুহূর্তে মানাবে না। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মনীষা আরও হাসুক, উচ্ছল হাসির তরঙ্গে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠুক, তা হলেই ওর রূপ আরও গাঢ় হবে। কিন্তু কি করে ওকে আরও খুশী করবো—ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, মনীষা, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হলো, নইলে আমি বোধ হয় এখনও বোকার মতন সেই গাড়ি-বারান্দার নিচেই দাঁড়িয়ে থাকতাম!

রাস্তার জলের দিকে তাকিয়ে মনীষা বললো, দেখুন, দেখুন, কিরকম ঢেউ দিচ্ছে, ঠিক নদীর মতন।

—তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?

—ইউনিভার্সিটিতে। লাইব্রেরীর দু'খানা বই ছিল ফেরত দিয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

—কেন, তুমি রিসার্চ করবে না?

—ঠিক নেই। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?

—তুমি আসবে, সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম!

চোখে চোখ রাখলো, একটু হাসলো, হাসি মিশিয়েই বললো, সত্যি, কোনোদিন আমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন? আপনি যা অহংকারী!

অমল আমাদের বাড়ির তিনখানা বাড়ি পরে থাকে। আমি নয়, সত্যিকারের অহংকারী হচ্ছে অমল। পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে মেশে না। আমাকে দেখেছে, মুখ চেনে, তবু আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। তা হোক, তবু অমলকে আমি পছন্দ করি। অমলের চেহারায় ব্যবহারে একটা দীপ্ত পৌরুষ আছে—অহংকারের যোগ্য সে, আমি ঐরকম অহংকার দেখতে ভালোবাসি। সপ্তাহে তিনদিন অন্তত অমল কলকাতায় থাকে, ছুটির দিন সকালে, ন'টা আন্দাজ অমল বাড়ি থেকে বেরোয়, তার গভীর ভুরুর নিচের চোখ দুটিতে তখনও ঘুম লেগে থাকে—ধপধপে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাত গোটানো, পথের দু' পাশে না তাকিয়ে অমল হাজরা মোড় পর্যন্ত যায়, অধিকাংশ দিনই সে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে থাকে—অমলকে আমি কোনোদিন বাসে উঠতে দেখিনি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে অমল একটু দাঁড়ায়, সিগারেট ধরিয়ে অমল এবার পূর্ণ চোখ মেলে চৌরাস্তার মানুষ-জন দেখে। বস্তুত, পথের সমস্ত মানুষও একবার অমলকে দেখে, এমনই তার পৃথক ব্যক্তিত্ব। তখনও মনীষার সঙ্গে অমলের পরিচয় তত প্রগাঢ় হয়নি, অমল রাস্তা পেরিয়ে সাদার্ন এভিনিউয়ের দিকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যায়।

একদিনে নয়, অমলকে দেখতে ও চিনতে আমার সময় লেগেছে। আগে আমি অন্যমনস্কভাবে অমলের প্রশংসাকারী ছিলাম। অথবা, তার ঠিক পটভূমিকায় তাকে আমি দেখিনি।

হঠাৎ দেখা না হলে মনীষার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দিল্লী থেকে কয়েক-দিনের জন্য এসেছে কোনো বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি—সেখানে সমস্ত বাড়িতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে রয়েছে মনীষা। সেই বন্ধুর সঙ্গে ওর কিরকম আত্মীয়তা। সাদা সিল্কের শাড়িতে মনীষাকে খুবই হাল্কা, প্রায় অপার্থিব দেখায়—আমার কাছে এসে মনীষা বলে, একি, আপনার জামার মাঝখানের বোতামটা লাগান নি কেন? অবলীলায় মনীষা আমার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে দেয়।

মনীষাদের বাড়িতে আমি কখনো যাবো না। ঐ বিশাল বাড়িতে অন্তত সাতখানা ঘর ফাঁকা থাকে, যদি সেখানে কোনোদিন আমি দস্যু হয়ে উঠি? যদি রূপ-হন্তারক হতে সাধ হয় আমার? মনীষা একদিন আয়নার সামনে দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছিল, আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলাম—সেই দৃশ্যটা আমার বুকে বিঁধে আছে। সেই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। মনীষা আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে—কিন্তু আয়নার মধ্যে আমরা দুজনকে দেখছিলাম—আমরা দুজনে একই দিকে তাকিয়ে—অথচ দুজনকে আমরা পরস্পর দেখতে পাচ্ছি,—মনীষার আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়বো পড়বো—অথচ খসে নি, কি এক অসম্ভব কায়দায় সে দুটি মাত্র হাতে চুল, চুলের ফিতে, চিরুনি এবং আঁচল সামলাচ্ছে—চোখে দুষ্ট দুষ্টু হাসি। মনীষা কখনো অপ্রতিভ হয় না—পিছনে আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, কি মেয়েদের প্রসাধনের রহস্য দেখার খুব ইচ্ছে বুঝি? ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন, দেখবেন—আমি এগারো রকমের স্নো-পাউডার মাখবো'

আমি বললুম, ওরে বাবা, এত সাজ-পোশাক, কোথাও বেড়াতে যাবে বুঝি?

—হুঁ।

—কোথায়?

—ছাদে।

আয়নার ফ্রেমের মধ্যে দেখা সেই এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। সেই শিল্পের মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলুম। কিন্তু মুশকিল এই, আয়নার মধ্যে নিজের মুখের ছায়া না ফেলে অন্য কিছুও যে দেখা যায় না।

সেইরকমই এক রবিবারের সকালে অমল ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ে এসে পৌঁছোলো, রাসবিহারী

অ্যাভিনিউ ধরে আসছিল মনীষা, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওরা ঠিক সমকোণে মিলিত হলো—সম্ভ্রমপূর্ণ ভদ্রতার সঙ্গে অমল মনীষাকে বললো, কি ভালো আছেন?

মনীষা উদ্ভাসিত মুখে বললো, আরেঃ আপনি? আপনি ব্যাংকক্ গিয়েছিলেন না? কবে ফিরলেন?

—কাল সন্ধ্যেবেলা।

—পরশু গিয়ে কাল ফিরে এলেন!

অমল সংযতভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ। আপনি এখন কোনদিকে যাবেন?

—একটু লেক মার্কেটের কাছে যাবো।

—চলুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাক্।

সেই প্রথম আমি অমলকে সোজা না গিয়ে ডানদিকে বেঁকতে দেখলাম। আমি খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। মনীষা আমাকে দেখতে পায় নি। সেই প্রথম মনীষা আমাকে দেখতে পেল না। কিন্তু আমি ওকে ডাকি নি কেন? আমি ডাকলে মনীষা আমার সঙ্গেই যেতো—অমলের সঙ্গে যেতো না—অমলের সঙ্গে ওর তখনও তেমন গাঢ় চেনা ছিল না। কিন্তু আমি ডাকি নি কেন? ঠিক জানি না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মনীষা আর অমল যদি কখনো পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়ায়, অমলকে সরে যেতে হবে না! ওদের দুজনকে বড় সুন্দর মানায়। বুকটা একটু টন্‌টন্ করে উঠেছিল। পরমুহূর্তে ভেবেছিলাম, ধ্যাৎ। চেহারাই কি সব নাকি? আমি একটু বেশী রোগা—কিন্তু রোগা মানুষেরা কি ভালোবাসার যোগ্য হতে পারে না?

জি এম আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন, তুমি তো বিয়ে করো নি, সন্ধ্যেগুলো কাটাও কি করে?

অফিসে জি এম-এর মুখ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করিনি। সামান্য হেসে বললুম, কি আর করবো, বাড়ি ফিরে স্নান করি, তারপর চা খেয়ে বইটই পড়ি, রেকর্ড শুনি।

—সে কি হে? আর কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নেই? তবে যে শুনি তোমাদের মতন ইয়াংম্যানদের জন্য কলকাতা শহরে, মানে, অনেক নাইট স্পট্।

—স্যার, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—শোনো, দিল্লি অফিস থেকে মিঃ চোপরা আসছেন। ওঁকে আমরা আজ গ্র্যাণ্ডে ডিনার দিচ্ছি। তুমিও থাকবে। মিঃ চোপরা একটু ইয়ে মানে লাইট স্বভাবের লোক, তুমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়ে ওকে কলকাতার নাইট লাইফ একটু দেখিয়ে আনবে।

—নাইট লাইফ মানে?

—সে আমি কি বলবো? তোমরা ইয়াংম্যান, যা ভালো, বুঝবে! চোপরার একটু ফুর্তিটুর্তি করার বাতিক আছে।

—স্যার, আমি পারবো না। অন্য [illegible]

—সেকি? পারবে না কি? চোপরার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে থাকলে তোমারই তো সুবিধে। সহজেই লিফ্‌ট পেয়ে যাবে—ওরাই তো হর্তাকর্তা।

—না স্যার, এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পাঞ্জাবী তো—ওর সঙ্গে যদি আমার রুচিতে না মেলে।

—পারবে না? ঠিক আছে, দাসাপ্পাকে বলে দেখি। ওর আবার ইংরেজী উচ্চারণটা ভালো নয়—

সন্ধ্যের পর স্বয়ং জি এম গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত। বললেন, শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও, তোমাকেই যেতে হবে। দাসাপ্পার মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে, হাসপাতালে—সে আসতে পারবে না। নাও, নাও, তাড়াতাড়ি, আটটায় ডিনার।

—কিন্তু স্যার, আমার যে ওসব ভালো লাগে না! ডিনারের পর আমি আর কোথাও যাবো না কিন্তু!

—বাজে বোকো না! তোমারই ভালোর জন্য বলছি—চোপরাকে খুশী করতে না পারলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমাকে আমি তিনশো টাকা আলাদা দিয়ে দেবো—ডিনারের পর ওকে নিয়ে একটু...

—আমাকে ছেড়ে দিন! আমি পারবো না।

—শুধু শুধু দেরি করছো! চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও, এখন কথা বলার সময় নেই। চাকরি করতে গেলে বড় কর্তাদের খুশী করতেই হয়—তাও তো আমাদের আমলে আমরা সাহেবদের...

জি এম-কে বসিয়ে রেখেই আমাকে পোশাক পাল্টে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বেঁধে নিতে হলো। জি এম আমার সর্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, জুতোটায় একবার ব্রাশ ঘষে নাও।

ওঁর সঙ্গে নিচে নেমে, যখন গাড়িতে উঠছি, সেই সময় হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি ওপরে ওঠার বদলে আরও নিচে নেমে যাচ্ছি।

মনীষাকে দেখলে রাজহংসীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। পরিষ্কার টলটলে জলে যেখানে রাজহংসী নিজের ছায়া নিজেই দেখে। টাট্‌কা তৈরী ঘিয়ের মতন মনীষার গায়ের রং, ঠোঁট দুটি একটু লালচে—এমন সাদা দাঁত শুধু শিশুদেরই থাকে। মনীষার ঠোঁট আর চোখ দুটো সব সময় ভিজে ভিজে, এই চোখকেই ইংরেজীতে বলে 'লিকুইড আইজ'—মনীষাকে আমি কখনও গম্ভীর হতে দেখিনি, বেড়াতে গিয়ে কি আর কেউ গম্ভীর থাকে! ঐ যে বললুম, মনীষাকে দেখলেই মনে হয়—এ পৃথিবীতে সে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। এ পৃথিবীর কোনো কাজই ওর কাছে পুরোনো নয়।

ঠিক চার মাস বারোদিন মনীষাকে দেখিনি। দেখিনি, কিংবা দেখা হয়নি, কিংবা মনীষা আমাকে খুঁজে পায় নি। তারপর একদিন লেক স্টেডিয়ামের ধারে মনীষাকে দেখতে পেলাম। মনীষার শরীরের এক-একটা অংশ আমার এক-একদিন নতুন করে ভালো লাগে।

সেদিন চোখে পড়লো ওর পা দুটো। জয়পুরী কাজ করা লাল রঙের চটি পরেছে, কি সুন্দর ঐ পা দুটো—মসৃণ নরম, এ পৃথিবীতে মনীষাই একমাত্র মেয়ে এই ধুলি-মলিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও যার পায়ে এক ছিটে ধুলো লাগে না। মনে হলো, মনীষার ঐ পা দুখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকলে আমি ফুলের গন্ধ পাবো!

মনীষা হাসলো, অবাক হলো এবং অভিমানের সুরে বললো, যান্, আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না!

—কেন? আমি কি দোষ করেছি?

—আপনি এতোদিন কোথায় ছিলেন? আপনি মোটেই আমার কথা ভাবেন না!

—মনি, অভিমান করলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়!

সাড়ে চার মাস বাদে দেখা হলেও পথের মধ্যে মনীষার হাত ধরা যায়। হাত ধরে আমি বললুম, মনি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো? আমার সঙ্গে চলো—

—এখন? কটা বাজে? এখন সাড়ে পাঁচটা? একজন যে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে সাদার্ণ এভিনিউয়ের মোড়ে।

—একজন? একজন তাহলে অপেক্ষা করে আছে? সে তা হলে অহংকারী নয়?

মনীষা ঠিক বুঝতে পারলো না, একটু অন্যমনস্কভাবে বললো, আপনি চেনেন তাকে, অমল রায়, চলুন না, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একবার লোভ হয়েছিল বলি, না, অমলের কাছে যেতে হবে না—তুমি আমার সঙ্গে চলো! দেখাই যাক্ না এ কথা বলার পর কি ফল হয়! কিন্তু অতটা ঝুঁকি নিলাম না। আলতোভাবে বললুম, না, তুমি একাই যাও, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম।

মনীষার চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। আমার কোনো রাগ বা অভিমান হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই, অমলই মনীষার যোগ্য। কিন্তু অমল, তুমি মনে করো না, তুমি মনীষাকে জিতে নিয়েছো। তা মোটেই না। আমিই মনীষাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। অমল, তোমাকে মনীষার যোগ্য হতে হবে। তুমি বিচ্যুত হয়ো না।

আকাশে অমল বিমান চালিয়ে ইস্তাম্বুলে যাচ্ছে—আমার কল্পনা করতে ভালো লাগে—সে বিমানে আর কেউ নেই, মনীষা ছাড়া,

ওরা দুজন শূন্য থেকে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে, ইন্দ্রানুজের পথ ছাড়িয়ে গেল অজানা পথে—ইস্, ওদের দুজনকে কি সুন্দর মানায়—শিল্প একেই বলে।

আমার হাত নিশপিশ করছে, আমি আর পারছি না, দাঁতে দাঁত চেপে গেছে, মুখ চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরোবে, আমি আর পারছি না না—। আমার ছোট ভাই টিপু ঘাড় ওড়াতে গিয়ে, নাড়া ছাদে, পিছোতে পিছোতে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গিয়েও কার্নিশ ধরে ফেলে ঝুলছিল, ওর আর্ত চিৎকারে আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছি, কিন্তু টেনে তুলতে পারছি না, চোদ্দ বছরের টিপু, ওর ভারী, কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছি না, [illegible]

[illegible]

সাঁতাই। [illegible] আমি কিনা কিশোর সরে দাঁড়িয়েছি। মনীষার সঙ্গে আর কোনোদিনই দেখা করবো না।

পরদিনই মনীষাকে টেলিফোনে বললাম: [illegible] মনি, তুমি [illegible] ঠিক ছটার সময় লেক স্টেডিয়ামের কাছে আসবে। আসবেই [illegible] কাজ থাকলেও ক্যানসেল করে দিও।

মনীষা খিলখিল করে হেসে [illegible] বললো, আসবো, আসবো, ঠিক আসবো, কেন কি ব্যাপার?

—দেখা হলে বলবো, কালই দেখা হওয়া চাই, ঠিক আসবে, উইদাউট ফেল! কথা দাও আমাকে!

মনীষার গলা কি একটু কেঁপে গেল? একবার কি সে টেলিফোনটা কাছ থেকে সরিয়ে তার অনিন্দ্য দুই ভুরু একটুক্ষণ কুঁচকে কিছু? দু-তিন মুহূর্তে বাদে মনীষা বললো, বলছি তো যাবো! আপনি একটা পাগল!

কাল এলো। অফিস যাইনি। অফিসে গেলেই আত্মায় একটা ময়লা দাগ পড়ে। বিকেলে স্নান করে দাড়ি কামিয়েছি।

আয়নার সামনে আমার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ চেহারা। আয়নার সামনে থেকে যেই সরে গেলাম—চোখে ভেসে উঠলো অন্য একটা আয়না। তার সামনে মনীষা, দুটি মাত্র হাতে চুল, চিরুনি, ফিতে এবং আঁচল সামলাচ্ছে—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি—তার পাশে আমি—না, না, এটা মানায় না, শিল্প হিসেবে এটা অসার্থক। আমি সরে গেলাম সে ছবি থেকে—অন্য মূর্তি এলো সেখানে—হ্যাঁ, এখন দুটি মুখের আলো একরকম, আমি মানতে বাধ্য।

স্টেডিয়ামের কাছে গেলাম না আমি।

অমল, মনীষাকে তুমি নাও, আমি তোমাকে দিলাম।

মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের দু'জনকে দেখি। তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে যায়। গ্রীক-পুরুষের মতন সুদর্শন অমল, তার মুখ যোগ্য অহংকারে উদ্ভাসিত, প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে জয় করার আস্থা। আর মনীষা? তাকে দেখলে মনে হয়—প্রতি মুহূর্তে অমলকে আরও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

আজকাল খুব বেশী সিনেমা দেখি। সময় কাটে না বলে প্রায় প্রতিদিনই নাইট-শো-তে সিনেমা দেখতে যাই। সেইরকমই একদিন সিনেমা দেখে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে এগারোটা আন্দাজ চৌরঙ্গীতে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে অমলকে বেরুতে দেখলুম। সঙ্গে ও কে? অবনীশ না? কি সর্বনাশ, অবনীশের সঙ্গে অমলের চেনা হলো কি করে? খুব যেন বন্ধুত্ব মনে হচ্ছে। অমলের পা টলছে একটু, মদ খেয়েছে, তা থাক্ না, পাইলটের কাজ করে—ওকে কতদেশে যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়—মদ খাওয়া এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু পা না টললেই ভালো ছিল। অবনীশের সঙ্গে অত বন্ধুত্ব হলো কি করে? অবনীশ সেনগুপ্ত তো সাংঘাতিক লোক। বড়লোকের ছেলেদের বখানোই ওর কাজ। খুব সুন্দর চটপটে কথা বলে, কথার মোহে ভোলায়, বড় বড় হোটেলে এসে মদ খাওয়ার সঙ্গী হয়, তারপর নিজের বাড়ির জুয়ার আড্ডাতে টেনে নিয়ে যায়। এলগিন রোডে ওর কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা, জুয়ার নেশা ধরিয়ে অবনীশ সেই সব ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। আমি একদিন মাত্র ওর পাল্লায় পড়েছিলুম। অমলকে দেখে তো মনে হচ্ছে অবনীশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। রাস্তায় গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে ওপাশে অমলের গাড়িতে উঠলো। অমল নতুন গাড়ি কিনেছে। অমল নিশ্চয়ই অবনীশের স্বরূপ জানে না।

পরদিন এলগিন রোডে অবনীশের বাড়িতে আমি হাজির হলুম। দরজা খুললো, অবনীশের শয়তানী কাজের যোগ্য সঙ্গিনী, তার স্ত্রী—স্বরূপা। স্বরূপার মোহিনী ভঙ্গি অগ্রাহ্য করে আমি অবনীশকে ডাকলুম এবং বিনা ভূমিকায় বললুম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লালবাজারের ডি সি ডি ডি আমার মেসোমশাই হন্। আমি আপনার এই বেআইনী জুয়ার আড্ডা এক্ষুণি ধরিয়ে দিতে পারি। লোকাল থানায় ঘুষ দিয়ে পার পেলেও লালবাজারকে এড়াতে পারবেন না। কিন্তু সে-সব আমি করবো না, একটি মাত্র শর্তে, আপনি অমল রায়ের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করবেন। ওর ছায়াও মাড়াবেন না। সে এখানে আসতে চাইলেও তাকে বাধা দেবেন। মোট কথা অমল রায়কে কোনোদিন আমি এ বাড়িতে দেখতে চাই না। কি রাজী?

অবনীশ হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, আচ্ছা রাজী। কিন্তু অমল রায় আপনার কে হয়?

—আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় সে। কিন্তু আমি যে আপনার কাছে এসেছিলাম এ কথাও তাকে বলতে পারবেন না।

আমি নিজে কখনো বাজার করতে যাই না। দু'একদিন গিয়ে দেখেছি, আমি একেবারেই দরদাম করতে পারি না—আমায় সবাই ঠকায়। তবু হঠাৎ একদিন বাজারে যাবার শখ হলো। বাজারে অমলের সঙ্গে দেখা হলো। আশ্চর্য যোগাযোগ। অমলও নিশ্চয়ই কোনোদিন বাজার করে না, বাজার-করা টাইপই ও নয়। যে-লোক এক-একদিন এক এক দেশে থাকে—সে আজ ল্যান্সডাউন রোডের বাজারে এসেছে নিছক কৌতুকের বশেই নিশ্চয়ই। চাকরকে নিয়ে অমল খুব কেনাকাটি করছে। অমল যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিনতে গিয়ে খুব ঠকছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, এবং বেশ মজা লাগলো। অলক্ষ্যে আমি ওর দিকে নজর রাখছিলুম। কাদা প্যাচপ্যাচ করছে বাজারে, অমলের পায়েও কাদা লেগেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ। একটুর জন্য আমি অমলকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম টম্যাটোর দোকানে কি একটা গোলমাল। তাকিয়ে দেখি সেখানে অমল, রাগে তার মুখখানি টকটকে লাল, অমল বেশ চিৎকার করে কথা বলছে। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলুম। অমল একবার তরকারিওয়ালাকে বললো, এক চড় মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দেবো! অমল চড় মারার জন্য হাতও তুলেছে। আমি দারুণ আঘাত পেলুম—এই দৃশ্য দেখে। মনে মনে বললুম, ছি, ছি, অমল, এমন ব্যবহার তো তোমাকে মানায় না! তরকারিওয়ালাকে চড় মারাটা মোটেই, রুচিসম্মত নয়—তার যতই দোষ থাক্! যাক্, হয়তো অমল বেশী রাগের মাথাতেই—আমি গিয়ে অমলের পাশে দাঁড়ালুম, মৃদু স্বরে বললুম, অত মাথা গরম করবেন না। তাতে আপনারই—। অমল আমার দিকে তাকালো, চেনার ভাব দেখালো না কিন্তু আমাকে একজন সাহায্য-কারী হিসেবে ভেবে নিয়ে বললো, বুঝলেন তো, আজকাল এই সব রাস্কেলদের এমন বাড় বেড়েছে—যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি আরও আঘাত পেলুম, তরকারি-ওয়ালারও একটা আত্মসম্মান আছে, সেখানে আঘাত দেওয়া তো অমলের উচিত নয়। আমি কথায় কথায় ভুলিয়ে অমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এমন ছোটখাটো ব্যাপার ধর্তব্য নয় অবশ্য, অমলের তো এসবের অভ্যেস নেই—হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল। ইস্, তরকারি-ওয়ালা উল্টে যদি ওকে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বসতো!

অন্ধ ভিখারীকে পেরিয়ে গিয়েও মনীষা আবার ফিরে আসে, তারপর ব্যাগ খুলে মনীষা যখন ঝুঁকে তাকে পয়সা দেয়—তখন মনে হয়, মনীষা শুধু ওকে পয়সাই দিচ্ছে না, তার সঙ্গে নিজের আত্মার একটা টুকরোও দিয়ে দেয়। মনীষা, তোমার এত বেশী আছে যে অমলের ছোটখাটো দোষ তাতে সব ঢেকে যাবে। অমল দিন দিন আরও তোমার যোগ্য হয়ে উঠবে। আমি তো পারি নি, অমল পারবে।

অমলকে আমি চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করি। বাতাসের তরঙ্গে একটা চিন্তা সব সময় অমলের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করি, অমল, তুমি মনীষার প্রেমিক, এই বিরাট দায়িত্বের কথা মনে রেখো। তোমাকে নিচে নামলে চলবে না।

অফিসের কাজে দমদমের ফ্যাক্টরিতে যেতে হলো দুপুরবেলা। মিঃ চোপরা দিল্লি ফিরে যাবার পরই আমার একটা লিফট হয়েছে। অফিস থেকে আমাকে গাড়ি দেবারও প্রস্তাব উঠেছে। শিগগিরই যার গাড়ি হবে তাকে এখন ট্রাম বাসে চড়লে মানায় না। মিশন রো থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে দমদম যাচ্ছিলাম, দমদম রোডের ওপর একটা বেশ বড় ভিড় চোখে পড়লো। একটা মোটর গাড়ি ঘিরে উত্তেজিত জনতা, আমি সেটা পাশ কাটিয়েই যাবো ভাব্-ছিলাম—হঠাৎ হালকা নীল রঙের গাড়িটা দেখে কি রকম সন্দেহ হলো—অমলের গাড়ি না? তাইতো, ঐতো ভিড় ছাড়িয়ে অমলের মাথা দেখা যাচ্ছে। পাইলটের পোশাকে—অমল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছে। কি সর্বনাশ! অমলের গাড়ি কোনো লোককে চাপা দিয়েছে নাকি? তা হলে তো ওরা অমলকে মেরে ফেলবে। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম, রোকুকে, রোকুকে! ঘ্যাচ্ করে ট্যাক্সি ব্রেক কষতেই আমি দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, অমল, অমল।

আমাকে দেখে অমল যেন ভরসা পেল, ভিড়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে কি যেন বললো। অমলের টাইয়ের গিঁট আলগা, মাথার চুল এলোমেলো। অমলের গাড়িতে একটি যুবতী বসে আছে, মনীষা নয়। যুবতীটির সাজ পোশাকে এমন একটা কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে যে এক পলক দেখলেই বোঝা যায় এয়ার হোস্টেস। এয়ার হোস্টেসটিকে অমল নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল।

কোনো লোক চাপা পড়ে নি, চাপা পড়েছে একটা ছাগল। ছাগলটা থ্যাঁতলানো

অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, টকটকে লাল রক্ত। লোকগুলো কিন্তু মানুষ চাপা পড়ার মতনই উত্তেজিত। অমল চেঁচিয়ে বললো, যার ছাগল সে সামলাতে পারে নি কেন? রাস্তাটা কি ছাগল চরাবার জায়গা? ক্রুদ্ধ জনতা চেঁচিয়ে বললো, অত তেজ দেখাবেন না, ...মটর গাড়ি আছে বলে ভারী ফুটানি... দে না শালাকে দু' ঘা।

অমল আকাশে উড়ে বেড়ায়—এইসব মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, না, না, আমাদের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত। আমরা এই ছাগলটার দাম যদি দিয়ে দিই—

'আমরা' কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বললুম। কেন না, ছাগলটার দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হবে নিশ্চয়ই—অমলের কাছে দৈবাৎ সে টাকা না-ও থাকতে পারে। আমার কাছে দৈবাৎ আছে। টাকাটা আমি তক্ষুনি বার করে দিতে পারতুম কিন্তু দিলুম না, তাতে নিশ্চয়ই অমলের অহংকারে লাগবে। আগে দরদাম ঠিক হোক, তারপর না হয় আমি অমলকে ধার দেবার প্রস্তাব করবো। আমাকে না-চেনার ভান করলে কি হয় অমল আমাকে ঠিকই চেনে, অন্তত এক পাড়ার লোক হিসেবে চেনে। অমল রুক্ষ গলায় বললো, কেন দাম দেবো কেন? আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিলাম, হর্ন দিয়েছি।

—ইঃ, উনি হর্ন দিয়েছেন! ছাগলকে হর্ন দিয়েছেন!

—ক্যারদানি কত! পাশে মেয়েছেলে নিয়ে দিন রাত্তির জ্ঞান নেই!

আমি অমলের বাহুতে চাপ দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললুম, না, না, দাম দেওয়াই উচিত আমাদের, যার ছাগল তার তো ক্ষতি হয়েছে ঠিকই! কত দাম? ছাগলটার কত দাম বলুন?

ছাগলের মালিক কাছেই ছিল, সে বললো, এক শো টাকা।

অমল বললো, একশো টাকা? একটা ছাগলের দাম এক শো টাকা? অন্যায় জুলুম করে—

—তবু তো কম করে বলছি! অন্তত আঠারো কেজি মাংস হবে, বারাসতের হাটে বেচলে।

আমি অমলকে মৃদু স্বরে জানালুম, আমার কাছে টাকা আছে। অমল রুক্ষভাবে বললো, টাকা থাকা না-থাকার প্রশ্ন নয়। জুলুম করে এরা—

লোকগুলো এবার আরও গরম হয়ে উঠেছে। তারা ক্রমশ আমাদের গা ঘেঁষে আসছে। শুরু হয়েছে গালাগালি। এসব সময়ে কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয় অমলের ধারণা নেই। ওরা আমাদের সবাইকে মেরে গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমলও এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, কত টাকা দিতে হবে? কত টাকা? আমি বলতুম, দাঁড়ান, আপনি চুপ করুন, আমি দরদাম ঠিক করছি।

ভিড়ের দু' তিনজন লোক এক সঙ্গে কথা বলছিল, আমি তাদের উত্তর দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দারুণ চিৎকার শুনলাম, পালাচ্ছে, পালাচ্ছে শালা—এই শালাকে ছাড়িস না, ধর্ ধর্।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা সুযোগে অমল গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভিড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল, আমার দিকে তাকালোও না—এক দল লোক হই হই করে ছুটে গেল সেই গাড়ির দিকে, আর একদল আমার কলার চেপে ধরলো। অমলের গাড়িকে আর ধরা গেল না—আমি দু' বার শুধু অমল, অমল বলে চেঁচিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেলুম।

কিন্তু মনে মনে আমি কাতরভাবে আর্তনাদ করতে লাগলুম, অমল, তুমি যেও না, তুমি যেও না। এ কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না। তুমি মনীষার প্রেমিক, তোমার মধ্যেও এই দীনতা দেখলে আমি তা সহ্য করবো কি করে? অমল, তুমি মনীষার এমন অপমান করো না! তা হলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে, এ পৃথিবীতে আর একজনও যোগ্য প্রেমিক নেই মনীষার।

ফ্রান্স্ আমার কাম্য নয়; বরঞ্চ কর্মনিষ্ঠ ফ্রান্স্, (২)—কর্মনিষ্ঠ এবং আত্মমর্যাদা-শীল ফ্রান্স্। আমি প্রার্থনা করি ফ্রান্স্‌বাসী যেন সুখী হয়—সেইটেই সব চেয়ে বড় সত্য। তারা যেন শেখে জীবনে শিবম্‌কে আলিঙ্গন করতে। (৩)

আমার জন্য তোমরা কোনো চিন্তা করো না; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার সাহস ও সহজ রসবোধ (গুড হিউমার) বজায় রেখে যাবো; আমি যাবার সময় সেই 'সাবুর্-এ-মাজ্' (৪) গানটি গেয়ে গেয়ে যাব, যেটি তুমি, আমার আদরের মা আমাকে শিখিয়েছিলে।

পিয়েরকে (৫) শাসনে রেখো কিন্তু স্নেহের সঙ্গে। তার লেখাপড়ার কাজ চেক্ আপ্ করে নিয়ো এবং সে যেন ঠিক মত খাটে (৬) তার উপর জোর দিয়ো। তাকে আলস্যঅবহেলা করতে দিয়ো না। আমি যেন তার শ্লাঘার পাত্র হই। সেপাইরা আসছে, আমাকে নিয়ে যেতে। আমার হাতের লেখা হয়তো অল্প একটু কাঁপাকাঁপা হয়ে গেল; তার কারণ পেনসিলটি বড্ড ছোট্ট; মৃত্যুভয় আমার আদৌ নেই; আমার আত্মা অত্যন্ত শান্ত।

বাবা, আমি তোমাকে অতিশয় অনুরোধ জানাই, প্রার্থনা করো। শুধু এই কথাটুকু বিবেচনা করো, এই যে আমি এখন মরতে যাচ্ছি, সেটি আমাদের সকলের জন্য। এর চেয়ে শ্লাঘনীয় আমার কী মৃত্যু হতে পারতো? আমি স্বেচ্ছায় পিতৃভূমির জন্য মৃত্যু বরণ করছি; স্বর্গভূমিতে আমাদের চারজনেতে (৭) ফের দেখা হবে। প্রতিহিংসাকামীদের মৃত্যুর পরও তাদের অনুগামী পাবে। বিদায় বিদায়! মৃত্যু আমাকে ডাকছে। আমার চোখে ফেটা বেঁধে (আমাকে গুলি করবে) সে আমি চাইনে, আমাকে হাতেপায়ে বাঁধতেও হবে না। আমি তোমাদের সবাইকে আলিঙ্গন করি। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বলি, বাধা হয়ে মরাটা কঠিন কাজ। সহস্র চুম্বন।

ফ্রান্স্—জিন্দাবাদ!

ষোড়শ বৎসরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

এচ্ ফেরতে

হাতের লেখা আর ভুলচুকের জন্য মাফ চাইছি; আবার পড়ার সময় নেই।

পত্রপ্রেরক: আঁরি ফেরতে, স্বর্গলোক, কেয়ার অব ভগবান।(৮)

টীকা

একাধিক পাঠক অনুযোগ করেছেন, অধমের রচনা ইদানিং বড্ডই টীকা কণ্টকাকীর্ণ। আমার নিবেদন, টীকা না পড়লে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যারা নিতান্ত একটু-আধটু আশকথাপাশকথা জানতে চান কিংবা/এবং এই আক্রাগণ্ডার বাজারে 'দেশ' কিনেছেন বলে প্রতিটি পিঁপড়ে নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে ঘি বের করতে চান এ টীকা শুধু তাঁদের জন্য।

(১) (৫) (৭) পিয়েব খুব সম্ভব পত্রলেখক আঁরির (Henri=Henry) ছোট ভাই। তাই পিয়েরকে তার ছোটখাটো পুস্তক সঞ্চয়ন দিয়ে যাচ্ছে। এবং (৭) স্বর্গে বাপ, মা, পিয়ের ও সে নিজে এই চারজন সম্মিলিত হবে আশা করছে।

(২) (৫) ফ্রান্স্ যুদ্ধ হারার পর অনেকেই বিশ্বাস করতো, ফরাসীদের আরামসেবিই তাদের ঐ পরাজয়ের কারণ।

(৩) 'শিবম্‌কে আলিঙ্গন'—এটা মনে হচ্ছে, জরমন কবি গ্যোটে থেকে উদ্ধৃত। পত্রলেখক আঁরি জরমনদের হাতে নিহত হচ্ছে, অথচ সে বিশ্বপ্রেমিক বলে বিশ্বকবি—জরমন—গ্যেটেকে উদ্ধৃত করছে।

(৪) সাবুর্ এবং মাজ ফ্রান্সের দুই নদী। আমাদের যে-রকম গঙ্গা যমুনা। 'জাহ্নবী গঙ্গা বিগলিত করুণা' তুলনীয়।

(৫) এক নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

(৬) দুই নম্বর ও পাঁচ নম্বর দ্রষ্টব্য।

(৭) এক, পাঁচ, সাত নম্বর দ্রষ্টব্য।

(৮) কনটিনেন্টে পত্রলেখককে তার ঠিকানা দিতে হয় (যেমন আমাদের ইনল্যান্ড-লেটার)। তাই আঁরি তার ঠিকানা দিয়েছে। এর থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন, সে যে গর্ব করেছে 'জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি (তার) হিউমার বজায় রেখে যাবে' সেটা কিছুমাত্র মিথ্যা দম্ভ নয়। কারণ এই কটি শব্দই ইহজীবনে তার শেষ বাক্য।

*

যে-বই থেকে এই পত্রটি অনুবাদ করেছি তার নাম-ঠিকানা:

Die Stimme des Menschen/Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt 1939-1945 Gesammelt und herausgegeben von Hans Walter Baer/Piper Verlag, 1961. Muenchen.

*

এই অমূল্য পুস্তক থেকে ভবিষ্যতে আরো কিছু কিছু অনুবাদ করার আশা রাখি। সম্মানিত পাঠকবর্গ যদি না হুহুঙ্কারে আপত্তি তোলেন॥

পাথুরেঘাটার নায়ক

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্যামবাজার থেকে পাথুরেঘাটার দূরত্ব সেদিনও আজকের মত ছিল।

তবে এত ঘনবসতি ছিল না। পেল্লায় পেল্লায় দু' চারটা বাড়ি। বড়ো বড়ো বাগান। ছড়ানো ছিটানো দশ-বিশ ঘরের গুটি কয়েক পল্লী। খোলার ছাউনি, নয়ত খড়ের চালা। মাঝে মাঝে পোড়ো জমি—ঝোপ জঙ্গলে ভরা।—এই ছিল সেদিনের শ্যামবাজার-পাথুরেঘাটার চেহারা। দু' একটি চওড়া

গোপীমোহন ঠাকুর

চওড়া রাস্তা ছিল বটে, কিন্তু বেশির ভাগ রাস্তাই ছিল পোড়ো জমির ওপর দিয়ে। আঁকাবাঁকা সরু পায়ে-হাঁটার-পথ। রাত্তির-বেলা কোনো পথেই আলো থাকত না, আর পাহারা-অলা ত দূরের কথা। নিঃসঙ্গ নির্জন সন্ধ্যায় সেখানে কেবল ঝিঁঝি ডাকত। প্রহরে প্রহরে কোলাহল করত শেয়াল।

শ্যামবাজারের ছিদাম মিস্তিরি রাত্তিরের প্রথম প্রহরে হেঁটে আসছিল ওই পথ দিয়ে। দেড়শ' বছরের পুরনো কলকাতা। একফালি চাঁদ আকাশের গায়ে তখন লেগেছিল। ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ছিদাম। ধুলোর ওপর কি যেন একটা পড়েছিল। ঝকমক করছিল। হাতে করে তুলে দেখল যে সেটি একটি সোনার আঙটি। একটি ঝকঝকে কাঁচ বসানো আঙটি। রাজমিস্তিরির কাজে তাকে অনেক বড়ো বড়ো বাবুদের বাড়িতেই যেতে হয়। ঘোষালবাবু বা দেববাবুদের বাড়ি গেছে সে বহুবার। পাথুরেঘাটা ও জোড়াসাঁকোও বাদ পড়েনি। বাবুদের হাতে এমনি জ্বলজ্বলে কাঁচ বসানো আঙটি সে দেখেছে বই কি। তাই তার বুঝতে দেরি হল না যে ওই আঙটিটি নির্ঘাত সেই রকম কোনো বাবুদের আঙুল থেকে পড়ে গেছে। দাম অনেক।

সে রাতে ভালো ঘুম হল না ছিদামের। বার বার তার ঘুম ভেঙে গেল। ভাবল, বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তার মনে উঁকি দিল যে রাজমিস্তিরির হাতে এ জিনিস দেখলে স্বর্ণকার চমকে উঠবে না তো?—হঠাৎ যদি চোর বলে পাকড়াও করে, তা হলে কি হবে?

পরের দিন সকালে উঠে ছিদাম আর স্যাকরার দোকানে গেল না। বদলে সে এলো পুলিস আপিসে। আঙটিটি সে দেখাল পুলিসদের এবং অকপটে তার প্রাপ্তি বিবরণ প্রকাশ করল। পাকা বাঁশের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এবং গোঁফে তা দিতে দিতে কোমপানির পুলিস অফিসার সব শুনে বলল: 'জিতা রহো ব্যাটা। খুব তোর বরাত জোর। তোর নসিব তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। দর্পনারাণ ঠাকুরের নাম শুনেছিস?—এ রিং তাঁর নাতির হাতে ছিল। এর দাম নগদ পঁচিশ হাজার টাকা। বাবু যাচ্ছিলেন বিয়ে করতে। হাত ফসকে পড়ে গেছে। বুঝলি বুদ্ধু?'

এসব খবর শুনে চোখ কপালে উঠল ছিদামের। খুব নসিবের জোর—একথা সে নিজেও মেনে নিল। স্যাকরাদের কাছে ওটি বিক্রি করতে গেলে নির্ঘাত তাকে আর বাড়ি ফিরতে হত না। আর এতক্ষণে তাকে থাকতে হত কোমপানির শ্রীঘরে।

এদিকে পুলিসের লোকেরা কিন্তু সহজে ছাড়ল না ছিদামকে। আঙটি সমেত তাকে যেতে হল পাথুরেঘাটায়। পাথুরে-ঘাটার ঠাকুর বাড়িতে। কর্তাবাবু তখনো বেঁচে। ছোটছেলের বিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই দিয়েছিলেন। হারানো আঙটি পেয়ে ভারি খুশি হলেন তিনি। আর ছিদামের সততার স্বীকৃতি হিসেবে নগদ এক হাজার টাকা বকসিস দিলেন।

ছিদামের কাছে এ আরেক বিস্ময়। রীতিমত নাটক। এক হাজার টাকা তার কাছে লটারির থেকেও অপ্রত্যাশিত। তাই সে গড় হয়ে কর্তাবাবুকে প্রণাম করল। তারপর সোজা চলে এলো শ্যামবাজারে। একেবারে নিজের আস্তানায়।

দেড়শ' বছর আগে মার্চ মাসের এক সকালে যে উপলক্ষে এই নাটকীয় ঘটনাটি ঘটে, তার কথা সরকারী গেজেটের পাতায় সাড়ম্বরে বিবৃত হয়েছিল। যশোহরের নরেন্দ্রপুর নিবাসী রামধন বক্সীর কন্যার সঙ্গে দর্পনারায়ণের পৌত্রের বিবাহ।—নায়িকা সুন্দরী। আর নায়ক?—নাঃ তার কথা না তোলাই ভালো। অমন রূপবান, বিত্তবান এবং বুদ্ধিমান নায়ক সেকালে নেটিবকুলে দুটি ছিল না। কলকাতার তরুণ মহলে তাঁর নাম ঘুরত মুখে মুখে। পাথুরেঘাটা যে একদিন বাঙলাদেশকে

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

নেতৃত্ব দেবে এ সম্পর্কে বর্ষীয়ানরাও ছিলেন নিঃসন্দেহ। ওই তরুণ নায়কের ওপর তাঁদের নিত্য আশীর্বাদ বর্ষিত হত।

অতি অল্প বয়সেই ওই অসাধারণ প্রতি-শ্রুতি নিয়ে যিনি দেখা দিয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

পঁচিশ হাজার টাকা দামের হীরের আঙটি পরে যিনি বিয়ে করতে গিয়ে-ছিলেন, তাঁর সম্পদ কি রকম ছিল, সে জিজ্ঞাসা বোধ হয় না তোলাই ভালো। ধনী সন্তানদের বখে যাওয়ার পক্ষে যা যা থাকা দরকার, তাঁর কোনোটারই অভাব ছিল না।—বাপের অগাধ পয়সা, তরুণ বয়স, প্রচুর অবকাশ—সবই ছিল তাঁর। বুলবুলি পাখির লড়াই দেখে, ফিটন গাড়িতে করে বারনারী-দের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে এবং তরল পান-পাত্রে চুমুক দিয়ে অনায়াসেই তিনি কলকাতার হিরো হতে পারতেন।

পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে ঠাকুর পরিবারের আদিবাড়ি
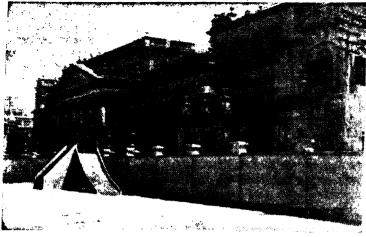
না, সে অর্থে তিনি হিরো হলেন না। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ভাষায় বলা যায়— "Though nursed on the lap of luxury Babu Prasanno Coomar Tagore led a life of literary laboriousness and intellectual activity unfortunately rare among fortune's favourites in this country.'

—সেকালের ধনীর দুলালেরা যে পথ বেছে নিতেন, দর্পনারায়ণের পৌত্র প্রসন্নকুমারের সে পথ পছন্দ হল না। একবারে উল্টোপথ ধরলেন তিনি। রামমোহন-দ্বারকানাথ যে রাস্তায় এগিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথই তিনি বেছে নিলেন। মাণিকতলা-জোড়াসাঁকোর সঙ্গে যুক্ত হল একটি তৃতীয় ধারা। তার নাম, পাথুরেঘাটা।

'আমি গোপীমোহন ঠাকুরের ছয় পুত্রের মধ্যে একজন। বাংলা ১২২৫ সালে (ইং ১৮১৮) গোপীমোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি পৈতৃক এবং স্বোপার্জিত বিস্তর ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। তখন তাঁহার ছয়পুত্র জীবিত—সূর্যকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দকুমার ঠাকুর, কালীকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর এবং আমি নিজে। পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে সূর্যকুমার গত হন, এবং উইল দ্বারা নিজ অংশ প্রায়ই ভ্রাতাদের দিয়া যান। সূর্যকুমারের মৃত্যুর পর আমার মাতৃদেবীও পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার স্ত্রী-ধন ও ভরণপোষণের জন্য পিতার উইলে প্রদত্ত যাবতীয় বিষয়ই আমরা পাই।'

প্রসন্নকুমার লিখিত এই বিবরণ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, পিতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরে তাঁরা প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তবে সকল সম্পদই যেমন বিপদে ভরা এটিও তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না।—এঁদের একটি আফিমের ব্যবসা ছিল, সে ব্যবসায় লাভের থেকেও লোকসান হত বেশি। আর পিতা বর্তমানেই দুটি সাহেব কোম্পানির সঙ্গে পাওনা-থোওনার ব্যাপার নিয়ে চলছিল মোকদ্দমা। পিতৃবিয়োগের পর সে মামলায় একদা হার হল। অতঃপর ভায়েরা যেদিন আলাদা হয়ে সম্পত্তির ভার নিতে গেল, তখন সম্পত্তির থেকে দায় চাপল তাঁদের ঘাড়ে বেশি করে। এ হেন দায়ে পড়ে সেকালে বড়ো বড়ো পরিবার লাটে উঠে যেত। প্রসন্নকুমার কিন্তু সেভাবে লাটে উঠতে দিলেন না তাঁদের পাথুরেঘাটার মর্যাদাকে। শক্ত হাতে হাল ধরলেন।—অতি অল্প সময়ের ভেতরেই তিনি ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হলেন। আর স্বীয় বুদ্ধির জোরে এবং প্রভূত পরিশ্রমে তিনি যে অর্থ রোজগার করলেন তা রীতিমত অবিশ্বাস্য।

আজকের মত সেকালের হিন্দুদের রাস্তাটা খুব একটা কোলীন্য ছিল না। হাতেখড়ির পাশাপাশি পিঠে বসে যাত্রা—অকালে যেখা করলে এ রাস্তায় আনা হত। এই পথের ধারে পড়ে সেখানে আট বছর সমাজ গড়ে ওঠে, আর কিছু দক্ষিণে সেরবোরন নামক এক সাহেব একটি পাঠশালা তৈরি করেন। উইলিয়াম কেরী তখনো এদেশে আসেন নি। ডেভিড হেয়ারও না। সে ইংরেজী পাঠশালায় দ্বারকানাথ থেকে অনেকেই ইংরেজীর পাঠ নিয়েছিলেন। —প্রসন্নকুমারেরও সেখানে হাতে খড়ি হল।

অবশ্য কিছুদিন পরেই প্রসন্নকুমারের যখন কৈশোর, সে সময় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সহপাঠী হিসাবে তিনি পেলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং শিবচন্দ্র ঠাকুরের মতন প্রতিভাশালী তরুণদের। তারাচাঁদ ছিলেন রামমোহনের চেলা। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। আর শিবচন্দ্র? তাঁর মত ইংরেজীনবিশ সেকালে খুব কম তরুণই ছিলেন। প্রসন্নকুমার কিন্তু সব্যসাচী, তাঁর দক্ষতা দু'দিকেই। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃত্বে তিনি সকলের আগে, তেমনি ইংরেজী কলমেও তাঁর হাত সমান।

দ্বারকানাথের মতই আইন ব্যবসা দিয়ে তাঁরও কর্মজীবনের সূচনা। ব্যবসা এবং জমিদারির মুনাফা তাঁকে পরবর্তীকালে প্রচুর অর্থ এনে দিয়েছিল সত্যি কথা, কিন্তু ওকালতিই তাঁর সৌভাগ্যের ও খ্যাতির পথ নির্দেশক। দ্বারকানাথের কর্মস্থল ছিল সুপ্রিম কোর্ট, এঁর ছিল—সদর আদালত।

সদর আদালতে [illegible] বাঙালী [illegible] নাম [illegible]। [illegible] ছিল [illegible] বোধ হয় [illegible] জানতেন না।

শিক্ষার অভিমান এবং সামাজিক আভি-জাত্যের বেড়া ভেঙে তিনিই প্রথম আইন-[illegible] এ [illegible]। ইংরেজী শিক্ষার [illegible] ইউরোপের [illegible] দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার [illegible] [illegible] সদর কোর্টের বিচারকগুলি [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] সৌভাগ্যের [illegible] হল। [illegible] [illegible] পরি-[illegible]।

সেকালে ও [illegible] ছিল [illegible] [illegible] হিন্দু [illegible] একটি [illegible] [illegible] এবং [illegible] আইন সম্পর্কে তিনি যে অধিকার প্রকাশ করতেন তা রীতিমত চমকপ্রদ। হিন্দু আইন সম্পর্কে অনেকই তিনি পড়াশোনা করতেন। সংস্কৃত পণ্ডিত দিয়ে তিনি এই হিন্দু আইন সংকলন করিয়েছিলেন। সংকলনে প্রত্যেক আইনের ব্যাখ্যাও ছিল। শুধু আইনটুকু জেনেই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন না, এই নিয়ম-টির উৎস সম্পর্কেও তাঁর ছিল অপরিসীম কৌতূহল। ফলে, খুব অল্পসময়ের ভেতর—'হিন্দু ল মেড ইজি অ্যান্ড অথরিটি অব দ্যাট সাবজেক্ট।'

সরকার পর্যন্ত এ অথরিটিকে স্বীকার করতেন। যৌবন থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন, সেই পুরো চারটি দশক

তিনি আইনের আঙিনায় পুরো রাজত্ব করে গিয়েছিলেন—

There was scarcely any important law particularly relating to land, which was enacted during the last forty years, but regarding which he was not consulted by Government.

সরকার পর্যন্ত যাঁকে জিজ্ঞাসা না করে আইন প্রণয়ন করেন না, তিনি যে কত বড়ো তা বোঝার জন্য কোন ভাষ্যের প্রয়োজন হয় কি? সব আইন তাঁর কণ্ঠস্থ। অনর্গল বলে যেতে পারেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে তিনি একটি 'চলন্ত পাঠাগার' বলে প্রতীয়মান হতেন। সেকালের খবরের কাগজের ভাষায়—'ট্ আস হি অ্যাপিয়ার্ড টু বি এ ওয়াকিং লাইব্রেরী।' এ লাইব্রেরীকে প্রশ্ন করলে সব সংশয়ের নিরসন হত। কোনো খুঁটিনাটি বাদ পড়ত না, কেবল তারিখ সাল নয়, কোন্ গ্রন্থের কোন্ পাতায় সে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তা পর্যন্ত পাওয়া যেত।—এহেন লোক আইন নিয়ে যে ভোজবাজি দেখাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি!—হলোও তাই। দু' হাতে তিনি অঢেল টাকা রোজগার করলেন। কিংবদন্তী আছে, একদিনে তিনি নাকি দশ হাজার টাকাও রোজগার করেছিলেন।

কেবল আহরণে নয়, বিত্ত বিতরণেও তাঁর বিরাট মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নানা সুযোগ মাহেন্দ্র মুহূর্তে নতুন পথের নির্দেশ দেওয়াই হল যুগনায়কদের কর্তব্য। প্রসন্নকুমার সে দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। সমাজের ও দেশের কল্যাণ চিন্তাই ছিল তাঁর চিরকালের স্বপ্ন। 'গৌড়ীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজ সেবার আরম্ভ। খৃষ্টীয় মিশনারীদের দাপট ছিল সেকালে খুব প্রবল। ভারতীয় সনাতন ধর্মের নিন্দায় তাঁরা ছিলেন মুখর। ঐতিহ্য সম্পর্কে অসচেতন নেটিবমহলে তাঁদের খাতির ছিল এবং অতি সহজেই তাদের খৃষ্টান করে নিতেন এঁরা। 'গৌড়ীয় সমাজ' ওই অনাচারের পথ যাতে বন্ধ হয়, সেকারণে প্রতিষ্ঠিত হল। নিজেদের ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতন করা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার সমূহ সম্পর্কে দেশীয় লোকদের কৌতূহলী করাই ছিল এ সমাজের উদ্দেশ্য। দ্বারকানাথ থেকে রাধাকান্ত দেব সকলেই প্রসন্নকুমারের এ মহৎ কর্মে পোষকতা করলেন।

রামমোহন তখন কলকাতায়। প্রসন্নকুমারের এ প্রচেষ্টাকে তিনিও স্বাগত না-জানিয়ে পারলেন না। এবং কাছেই টেনে নিলেন এই তরুণ যুবকটিকে। অতঃপর রামমোহনের দক্ষিণ হস্ত হয়ে দেশ সেবায় দেখা গেল প্রসন্নকুমারকে।—ঠিক এ সময় কোম্পানির সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের 'ট্যাগোর ক্যাসেল'
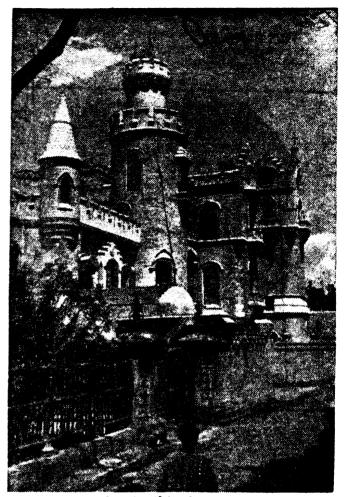
হরণের একটি হীন চেষ্টা চালায়। সে আঠারোশো' চব্বিশ সালের কথা। ওই নষ্টামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন সকলে। রামমোহন-দ্বারকানাথের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রসন্নকুমারও একটি স্বাক্ষরিত আবেদন পাঠিয়েছিলেন সুপ্রীম কোর্টে।—সেদিন রামমোহনের নেতৃত্বে বেরল—'বেঙ্গল হেরাল্ড' ও 'বঙ্গদূত'। ইংরেজীতে এবং বাঙলায়। দু'টি সাময়িক পত্র।—এখানেও নায়ক হলেন প্রসন্নকুমার। পরে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্ম-সমাজ। ট্রাস্টির পদে এ সমাজে তিনি বৃত থাকলেন সুদীর্ঘকাল।

সমাজ ও দেশের মঙ্গল চিন্তায় তাঁদের দৃষ্টি আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। দেশের অর্থনৈতিক দিকটিও তাঁদের দৃষ্টি এড়াল না। সেকালে আদার ব্যাপারী ছিলেন কালা নেটিবেরা, কিন্তু জাহাজের ব্যাপারী ছিলেন ওই সাদা চামড়ার সাহেবেরাই। দু' হাতে তাঁরা টাকা রোজগার করতেন এবং সব সম্পদই তাঁরা নিয়ে যেতেন ইংলণ্ডে।

আগের কালের পাঠান-মুঘলেরা যেমন মুক্তকচ্ছ হয়ে বিলাসব্যসনে টাকা ওড়াতেন, এঁরাও তেমনি দেশে গিয়ে প্রত্যেকে একেকটি ক্ষুদে নবাব হয়ে যেতেন।—আমাদের সম্পদ এভাবে দিনের পর দিন অবিরাম বেরিয়ে যেত। আটকাবার কোনো পথ ছিল না। তা ছাড়া ইউরোপীয়রা এদেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে, এমন কোনো সুযোগও কোম্পানি দিত না। বরং উল্টো আইন ছিল। যদি কোনো সাহেব এদেশের বাসিন্দা হতে চাইত, তাকে তাড়ানোই ছিল বিধি।—এ কুবিধির ওপরে দেশের লোকেরা একটু ক্ষুব্ধ ছিল। সাহেবদের এদেশে বসালে ড্রেনেজ বন্ধ হয়, সুতরাং সম্পদ রক্ষায় সেটাই বিধেয় নয় কি? উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এ মতের স্বপক্ষে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা গেল নেটিব মহলে। সে চাঞ্চল্য পরিণত হল আন্দোলনে। নাম দেওয়া হল, 'কলোনাইজেশান' আন্দোলন। রামমোহন-

দ্বারকানাথের সংগে প্রসন্নকুমারও ঐ অনাচারের নিরূদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন।

সতীদাহের বিরূদ্ধে জনমতকে জাগ্রত করার পিছনেও রামমোহনের সংগে নীরবে ছিলেন তিনি। আইন প্রনয়ন করে সহমরণ যেদিন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল. লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে প্রশংসাসূচক মানপত্র দেবার জন্য সর্বাগ্রে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, প্রসন্নকুমার।

দেশ সেবার প্রয়োজনে জনগণের কাছে স্বাধীন মতামত পৌঁছে দিতে হলে সেকালে সর্বাধিক যা দরকার হতো তা হল খবরের কাগজ। অতি অল্প বয়সেই এই সংবাদ-পত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রসন্নকুমার বোধ হয় উপলব্ধি করেছিলেন। যখন তিনি নিতান্তই

কিশোর বালক, সেরবোর্ন পাঠশালার গন্ধ ছাড়ে নি গা থেকে, সেই অল্প বয়সেই তিনি নাকি একটি অঘটন ঘটিয়েছিলেন। আত্মীয়-সুহৃদ ছিলেন রমানাথ ঠাকুর। তাঁর সহযোগিতায় হঠাৎ একদিন একটি কাগজ বের করে ফেললেন। নাম দিলেন, 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার।' ক্রো নামে এক সাহেব ছিলেন, তিনি নিলেন পরিচালনার দায়িত্ব। সেকালে ওই ছোট্ট পত্রিকাটি যে সব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলে ধরত, আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে তা রীতিমত বিস্ময়কর। অনেককাল পর ওই দিনগুলির স্মরণে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছিল—

We do not know much of his school-boy life, but the fact that scarcely he was out of his teens when he with his beloved relative, companion and friend, Baboo Romanath Tagore, a junior to him by a year or two, started an English newspaper called the 'Indian Reformer' under the direction of Mr. Crowe, for the ventilation of social and political questions, shows that his attainments in English literature in that early period of his life were by no means inconsiderable.

আঠারো শ একত্রিশ সালের ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখ 'রিফর্মার' নামে যে সাপ্তাহিক কাগজটি পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে, এটি সম্ভবত তারই উত্তর-সাধনা। এবারেও সাথী হিসাবে ছিলেন, রমানাথ ঠাকুর। তবে আরো একজন সহযোগী পাওয়া গেল। ইনি হলেন, শ্যামাচরণ ঠাকুর। এ কাগজখানি কেবল সংবাদ পরিবেশন করেই ক্ষান্ত থাকত না, শেষে একটি করে জোরালো সম্পাদকীয়ও দিত জুড়ে। এ সময় ফারসী ভাষার বদলে আদালতগুলিতে চালু হয় বাঙলা। এই বাঙলা ভাষার প্রচলনে প্রসন্নকুমারের দান কম নয়। এ কাগজে বাঙলা ভাষার পক্ষে নানা রকম জোরালো যুক্তি ছাপা হত।— স্ত্রী-শিক্ষা সেকালের আরেক সমস্যা। এ নিয়েও 'রিফর্মার' অনেক আলোড়ন এনেছিল। শুধু এসব কথা নয়, পোলিটিকাল আলোচনাও এ কাগজে বেরত। এমন কি, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইঙ্গিতও সেদিন এ কাগজটার পাতায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে লিখিত হয়েছিল।

ওই বাহ্য। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সব রকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রসন্নকুমার জড়িয়ে ছিলেন পাকে পাকে। তাঁকে বাদ দিয়ে সেকালের কোনো কথাই চিন্তা করা যায় না। চৌরঙ্গী পাড়ায় সাহেবদের জমজমাট থিয়েটার, নেটিবরা তাকিয়ে থাকে জুলজুল করে। নেটিবদের এ দৈন্য সহ্য হল না তাঁর। শুঁড়োর বাগানে তৈরি হল হিন্দু থিয়েটার। কলকাতার গঙ্গায় মেয়েদের স্নানের জন্য আলাদা ঘাট নেই। কে করে দেবে? সবাই ধরল গিয়ে প্রসন্নকুমারকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘাট বানিয়ে দিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনায় গোপীমোহন ঠাকুর নগদ দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। এ জন্য গোপীমোহন ওই কলেজের স্থায়ী পরিচালক হবার সম্মান পেয়েছিলেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে পরিচালক হবার দায়িত্ব একদিন প্রসন্নকুমারেও এসে বর্তালো। আর সে এক নাটকীয় সময়ে। ডিরোজিও সেদিন অভিযুক্ত। পরিচালক সমিতি বিচারক। সুতরাং প্রসন্নকুমারও বিচারের আসনে। সারা কলকাতা উত্তাল, আর যে যাই বলুন, প্রসন্নকুমার কিন্তু ডিরোজিওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ খুঁজে পেলেন না—'বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, অ্যাকুইটেড মিঃ ডিরোজিও অব অল ব্লেম ফর ওয়ানট অব প্রুফ টু হিজ ডিজ্ অ্যাডভানটেজ।'

শিক্ষা বিষয়েও তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু কলেজ যখন সরকারী আওতার বাইরে ছিল প্রসন্নকুমারের এ দৃষ্টির কিছু কিছু পরিচয় মেলে। কিন্তু যেদিন থেকে মিশনারীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেল, অধ্যাপক ও ছেলেরা খৃষ্টান হতে আরম্ভ করল, আর সরকারী চাপ অসহ্যে থাকল পিছন থেকে, সে দুর্দিনে প্রসন্নকুমার বিব্রতবোধ করেছেন সব থেকে বেশি।

যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু মাতৃ ভাষার প্রতি তাঁর মমতা ছিল সর্বাধিক। বাঙলা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল। এমন কি সে উৎসাহে তিনি আইন-গ্রন্থ পর্যন্ত বাঙলায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এসব ঘটনা অকল্পনীয়।

আইন বিদ্যার দরুণ বিপুল অর্থাগম, সমাজ সেবার অনুরাগ এবং অসাধারণ চরিত্রগুণে সেকালে তিনি দেশীয় সমাজের সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেছিলেন। বিদেশী শাসকেরাও ধীরে ধীরে তাঁর দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। দ্বারকানাথের পরেই ইংরেজরা তাঁকে স্মরণ করত। কলকাতার সল্ট বোর্ডের দেওয়ানী থেকে দ্বারকনাথ যেদিন পদত্যাগ করলেন, উপযুক্ততা বিচার করে ওই শূন্যস্থান পূরণের জন্য যাঁকে সেদিন আহ্বান করা হয়েছিল, তিনি আর কেউ নন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

লর্ড ডালহৌসি তখন ভারতবর্ষের বড়োলাট। আঠারো শ চুয়ান্ন। ইংরেজ শাসন তখন এ দেশে প্রায় দৃঢ়মূল হয়েছে। আইন তৈরি আর ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে একটি আইনসভা বা ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হল। যদিও ভারতবর্ষের জন্য এ সভা তৈরি হল, কিন্তু যে কটি সদস্য নেওয়া হল, তারা সবাই সাহেব। সাদা চামড়া।—সবাই সাহেব বলে সমস্যাও দেখা দিল। দেশীয় আচার-ব্যবহার ও নেটিবদের সমাজ-পরিচয় না জানলে, আইন তৈরি হবে কেমন করে? একজন অন্তত বিচক্ষণ লোক দরকার, যিনি এসব বোঝেন। আর এ ব্যাপারে একজন নেটিব হলেই ভালো হয়। নেটিব প্রতিভার দিকে ডালহৌসির দৃষ্টি ছিল সজাগ। সজাগ দৃষ্টি নিয়ে তিনি যাকে বেছে নিলেন, তিনি আর কেউ নন, প্রসন্নকুমার।

কালো চামড়া বলে তাঁকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য করে নেওয়া হল না। নেওয়া হল 'ক্লার্ক অ্যাসিসট্যান্টের' পদে। এ বাবদে তাঁর মাইনে ধার্য হল মাসিক বারো শ টাকা। এ মাইনে সেদিন তাঁর কাছে কিছুই নয়। অন্তত আধ ডজন চাকর রাখতে পারতেন তিনি ওই মাইনে দিয়ে। তবু তিনি এ দাসত্ব স্বীকার করে নিলেন সেবার ব্রত নিয়ে। শাসক সমাজও তা বুঝতে পারলেন। তাই বিলম্বে হলেও তাঁরা ওই সেবার স্বীকৃতি না দিয়ে পারেন নি। আঠারো শ বাষট্টিতে যেদিন বঙ্গীয় আইন সভা গঠিত হল, পয়লা নম্বর সদস্য হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করা হল। আরো কিছু দিন পরে লাটসাহেবের আইনসভাতেও নেওয়া হল তাঁকে। অতঃপর তাঁর সমাজ-সেবার স্বীকৃতি হিসাবে সেকালের বিদেশী শাসকেরা তাঁকে ভূষিত করল সি এস আই উপাধিতে।

দেশীয় লোকেরা তাঁকে পেল সব কাজের ভেতর দিয়েই। জমিদার সমাজ ও ভারতবর্ষীয় সভা যা নেটিবদের উন্নয়নকল্পে গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যেও তিনি বর্তমান। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, সেনেটের প্রথম সদস্যপদ কাকে দেওয়া হবে?—ডাক পড়ল পাথুরেঘাটার ঠাকুর বাড়িতে। আইন বিভাগ খোলা হল। অধ্যাপকদের জন্য টাকা নিয়ে যিনি এগিয়ে এলেন, তিনি প্রসন্নকুমার। এমন ব্যবস্থা করে দিলেন, যাতে মাসে মাসে হাজার টাকা করে সুদ আসে। না, কাকেও তিনি বঞ্চিত করেন নি তাঁর অকৃপণ দান থেকে। মারা যাবার আগে আত্মীয়স্বজন চাকর-বাকর সকলকে দরাজ হাতে দান করে গেলেন। মূলাজোড়ে শিবঠাকুরের জন্যও তাঁর অর্থ নিবেদিত হল। দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁর দান পৌঁছুল। অবৈতনিক সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠায় একরাশ টাকা ঢেলে দিলেন তিনি।

মোট কথা, সেদিনের কলকাতায় এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না যা প্রসন্নকুমারের দাক্ষিণ্য পায়নি। এত বড়ো যিনি দাতা, এত বড়ো যিনি চিন্তানায়ক, কোথাও কিন্তু তাঁর একটুও অহঙ্কার নেই। বরং উল্টো। তিনি সদা বিনীত। নীরব কর্মী। অকাতরে তিনি কেবল পরের উপকারই করে চলেছেন।

দ্বারকানাথের মৃত্যু ও কার-ঠাকুর কোম্পানির বিপর্যয়ের পর মহর্ষি দেবেন্দ্র-

নাথ কি রকম দুর্যোগ ও বিপদের ভেতর পড়েছিলেন, তা সকলেরই জানা। তাই গিরীন্দ্রনাথ এর পর দেহ রাখলেন। পাওনাদারেরা দেবেন্দ্রনাথকেই ছেঁকে ধরল। সে এক দারুণ সংকট কাল। অনেকে আবার তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা জুড়ে দিল। পেল ডিক্রি। দেবেন্দ্রনাথকে প্রায় জেলে যেতে হয়, এরকম অবস্থা। সে দুর্দিনে দেবেন্দ্রনাথের সহায় হয়ে এগিয়ে এলেন প্রসন্নকুমার। সকল ঋণভার তিনি তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। আত্মজীবনীর পাতায় এ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'তিনি আমাকে বলিলেন যে, দেখ, তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি তোমার জমিদারির সকল টাকা আমার নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিত মত তোমার দেনা শোধ করিব। কেহ আর এ বিষয়ে তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না।' আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এ প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং আমাদের জমিদারির সমস্ত মুনাফাই তাঁহাকে দিতে লাগিলাম, এবং তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার লইলেন।'

কেবল দেবেন্দ্রনাথের প্রতি নয়, প্রসন্নকুমারের এ সহৃদয়তা সকল বিপন্ন মানুষের জন্যই ছিল প্রসারিত। দূরদূরান্ত থেকে নানান লোক আসত তাঁর কাছে। মামলা-মোকদ্দমা ও আইনঘটিত পরামর্শ তাঁরা তো পেতেনই, আর্থিক সাহায্য থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হতেন না। প্রতিটি দেশের মানুষকে তিনি আপনজন বলে মনে করতেন। তাদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকেও তিনি এক বলে ভাবতেন।

যখন তিনি আইনসভার ক্লার্ক-অ্যাসিস্ট্যান্ট, সে সময় একটি ঘটনা ঘটে।—আইনসভার অধিবেশন চলছে। সেদিন আলোচ্য বিষয় ছিল—ডিসআর্মিং। নেটিভদের হাতে যাতে অস্ত্র না থাকে, তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। কিন্তু সাদা লোকদের হাতে অস্ত্র থাকবে। তাঁরা এ আইনের বাইরে। নেটিভদের অস্ত্রহীন করার মতলব যখন পাকাপাকি, হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি স্যার বার্নস পিকক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—প্রসন্নকুমারের মত ব্যক্তি যখন নেটিবকুলে আছেন, এবং ইয়োরোপীয়ানদের হাতে যখন অস্ত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, তখন প্রসন্নকুমারকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করে ওই আইনের আওতা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।'

সাহেবদের এ বদান্যতায় যে কোনো মানুষই সেদিন গলে যেতেন। প্রসন্নকুমার কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। বরং আরো দৃঢ় হলেন। সে সভায় তিনি একজন সামান্য কেরানী মাত্র। তবু তিনি উঠে সোজা দাঁড়িয়ে বললেন,—'আই অ্যাম প্রিপেয়ার্ড টু স্ট্যান্ড অর ফল উইথ দি রেস্ট অব মাই কান্ট্রিমেন'—আমার সকল দেশবাসী যদি দাঁড়ায়, আমি দাঁড়াব। যদি পড়ে, আমিও পড়ব। আমার ভাগ্যকে তাদের থেকে পৃথক করতে চাই না।

মোট কথা, প্রসন্নকুমার ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ। জীবনে তাঁর সংকল্প স্থির ছিল। অটল ছিলেন তিনি তাঁর সংকল্পে। প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রলোভন কখনো তাঁকে কর্তব্য থেকে টলাতে পারত না; ব্যক্তিগত সুখদুঃখকেও তিনি এভাবে জয় করেছিলেন। সন্তানসন্ততির কাছে তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে তিনি কেবল কাগজে কলমে উৎসাহী ছিলেন না। নিজের মেয়েকে তিনি ছেলের মতই শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। ভালোবাসতেনও তেমনি। অকস্মাৎ সেই কন্যার মৃত্যু হল।—শোকে থম থম করতে লাগল পাথুরেঘাটার বিরাট প্রাসাদ। আত্মীয়স্বজন সকলেই 'হায়-হায়' করতে থাকলেন। ভেঙে পড়লেন শোকে। অনেকের মনে হল প্রসন্নকুমার নিশ্চয় আরো শোকাহত হয়েছেন এবং তিনিও নিশ্চয় ভেঙে পড়েছেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন: না, তিনি ভেঙে পড়েন নি। শয্যাও নেন নি। প্রতিদিনকার মত তিনি পড়াশোনা করছিলেন আইনের বইগুলি নিয়ে। কন্যার মৃত্যু নিশ্চয় তাঁর একখানি পাঁজরা নিয়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রকাশ এতটুকুও বাইরে ছিল না। কর্তব্যের এককণা অবহেলা কেউ দেখে নি।

একবার নুনের ব্যবসায়ে সাংঘাতিক ক্ষতি হয় তাঁর। সে অপরিসীম লোকসানে যে কোনো স্থিতধী ব্যক্তিও নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতেন। প্রসন্নকুমার কিন্তু এতটুকু বিচলিত হন নি। অবিচলিতভাবে তিনি ওই পরাজয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। এবং ভাগ্যলক্ষ্মীকে শেষবেশ প্রসন্ন না করে ছাড়েন নি।

মোট কথা, এই হলেন প্রসন্নকুমার। এমন লোক গত শতকের বাংলা দেশে দুটি পাওয়া ভার। কিন্তু মহৎ জীবনে একটি গভীর দুঃখও ছিল। আর সে দুঃখেরও তুলনা হয় না। নিজের একমাত্র ছেলের কাছ থেকেই এসেছিল এ আঘাত। একবারে তরুণ বয়সে যে খৃস্টীয় মিশনারীদের রুখবার জন্য তিনি 'গৌড়ীয় সমাজ' তৈরি করেছিলেন, যে খৃস্টীয় দাপটে হিন্দু কলেজের পরিচালক সমিতিতে তিনি ঝড় তুলেছিলেন, তাঁর ঘরের ছেলেই একদিন খৃস্টান ধর্মকে বরণ করে নিল। কৃষ্ণমোহনের কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে তাঁর ছাব্বিশ বছরের ছেলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর রাতারাতি খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। সদ্য স্ত্রী বিয়োগের যন্ত্রণা। সে ব্যথাও কিছু করতে পারল না।

ওই ধর্মান্তরিত পুত্রকে ক্ষমা করতে পারলেন না প্রসন্নকুমার। স্বদেশ ও স্বধর্ম সমাজই ছিল তাঁর কাছে সব থেকে বড়। তাই যে বিপুল সম্পত্তি তিনি নিজের পরিশ্রমে করে গিয়েছিলেন, তা থেকে তিনি বঞ্চিত করলেন সন্তানকে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী স্থির করে গেলেন। তাড়াহুড়ো নয়, সব বন্দোবস্তই তিনি করে গেলেন ধীরে ধীরে। পাকাপাকিভাবে। তারপর একদিন দেহ রাখলেন। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে পাথুরেঘাটার বাড়িতে চোখ বুজলেন পাথুরেঘাটার নায়ক। একটি গৌরবময় অথচ দুঃখভরা জীবনের অবসান হল।

তাঁর মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরেই বেধে গেল মোকদ্দমা বাধল। তারই ছড়িয়ে সে মামলা উঠল প্রিভিকাউন্সিল পর্যন্ত। সকলের মধ্যে মুখেই একটি উত্তেজনা—ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা মোকদ্দমার ফলাফল। না, প্রসন্নকুমারের উইলকে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত নাকচ করতে পারল না। তবে তাঁরা বিধান দিলেন যে, যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর ওই সম্পত্তি জ্ঞানেন্দ্রমোহন পাবে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেখল তার জীবদ্দশায় ও সম্পত্তি পাওয়া দুরাশা মাত্র। তাই ইংল্যান্ডের এক সিন্ডিকেটকে সে তার ভাবী স্বত্ব যতীন্দ্রমোহনের জীবিতাবস্থাতেই বিক্রয় করে দিল। আর যে-প্রসন্নকুমার দেশের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে চান নি, তাঁর ছেলেকে থাকতে হল গিয়ে ইংলন্ডে। স্বদেশ থেকে অনেক দূরে। কেনসিংটনের কানিংহাম গার্ডেন্স-এর রম্য প্রাসাদে আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গভাবেই তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হল। এবং সেখানেই মৃত্যু হল তার।—প্রসন্নকুমারের ক্ষমাহীনতা কোনোদিনই তাকে দেশে ফিরতে দিল না।

পুত্র স্নেহ পর্যন্ত যাঁকে স্বদেশানুরাগ ও আদর্শ ভ্রষ্ট করতে পারে নি, একবিন্দুও টলাতে পারেনি কর্তব্য থেকে, তিনিই হলেন—প্রসন্নকুমার। পাথুরেঘাটার নায়ক। বাংলা দেশের ইতিহাস কোনো দিন কি এঁকে ভুলবে?

৮
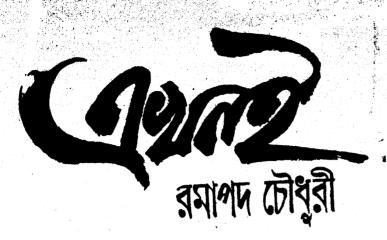
অরুণকে নিয়ে এই এক ফ্যাসাদ। বদলির চাকরি তার, আজ এখানে কাল সেখানে। হুটপাট করে চলে যেতে হয় নতুন জায়গায়, যদ্দিন না বাসা যোগাড় হচ্ছে বুলুকে এখানেই পাঠিয়ে দেয়। কিংবা বুলু নিজেই হয়তো শ্বশুর-বাড়িতে থাকতে চায় না।

কনকলতা অবশ্য খুশী হন। তবু তো বড় মেয়ে মাঝে মাঝে এসে থাকতে পায় তাঁর কাছে। শুধু পরের ঘরে চলে গেছে বলেই এই অতিরিক্ত আদর নয়। কনকলতা দেখেছেন, তেমন ভাল বিয়ে দিতে না পারা সত্ত্বেও বুলুর কোন অভিযোগ নেই। বরং বাবা-মা'র ওপর একা বুলুরই খুব মায়া।

দিনকের দিন কনকলতার শরীর আরো খারাপ হচ্ছে। মাথায় একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা হয়, সন্ধ্যের দিকে একটু জ্বর-জ্বর। কাজকর্ম করেন বটে, রান্নাও নিজেই সামলান, কিন্তু বড় ক্লান্ত লাগে। ছেলেকে দোষ দিয়ে কি হবে, স্বামীও অর্ধেক সময় খবর নেয় না।

—রোগ চেপে রাখা তোমার স্বভাব। প্রকাশবাবু একদিন বলেছিলেন।

কনকলতা কোন উত্তর দেন নি। অভিমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল। রোগ চেপে রাখা তোমার স্বভাব। চেপে না রেখে কি করবেন, পাঁচ বছরের পোষা রোগ, প্রথম প্রথম তো ভেবেছিলেন চোখ খারাপ হয়েছে। চোখের ডাক্তারকে দেখানোও হয়েছিল। ওষুধপত্তরও খেয়ে দেখেছেন। কিছুতেই কিছু হয় নি। এর পর আর কি করবেন, প্রতিদিন শুধু নিজের রোগের কথা বলবেন? মানুষটা খেটেখুটে আসে, পাঁচরকম ঝঞ্ঝাট রয়েছে, তাকে দুবেলা নিজের শরীরের কথা শোনাতে ভাল লাগে! না তারই শুনতে ভাল লাগবে। ইচ্ছে থাকলে নিজেই তো বড় ডাক্তার দেখাতেন [illegible]। [illegible]

বরং বুলুই মাঝে মাঝে বলেছে অরুণকে।—হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার দেখিয়ে আন না মাকে।

বুলু যে-কদিন থাকে, কনকলতার কাজকর্ম অনেক কেড়ে নেয়। অনেক রাত্তির অবধি বসে বসে মাথা টিপে দেয়। দুপুরে মাদুর বিছিয়ে পাশে শুয়ে গল্প করে। বুলু না থাকলে তো কনকলতার নিজেকে মনে হয় সংসারের বাইরের লোক।

ঝামেলা শুধু বুলুকে পাঠানো নিয়ে। কখনো কখনো অক্ষয় নিজেই এসে নিয়ে যায়, বাসা ঠিক হলেই। পুরোনো বাসা থেকে মালপত্র নিয়ে নতুন জায়গায় নতুন বাসায় আবার সাজিয়েগুছিয়ে বসতে হয়। তখন বুলুর না গেলেও চলে না।

চিঠি পড়ে প্রকাশবাবু বলেছিলেন, তা হলে অরুণ ওকে নিয়েই যাক। পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন তবু কাজ নেই। এরপর ইন্টারভিউটিন্টারভিউ যদি এসে পড়ে...

কনকলতা সেজন্যেই বলতে গিয়েছিলেন অরুণকে। দু'পাঁচদিন পরে পাঠানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অক্ষয় একেবারে দিনক্ষণ লিখে দিয়েছে, স্টেশনে থাকবে জানিয়েছে।

[illegible] জামাইকে একটু [illegible], কনকলতা, যা রগচটা মানুষ!

রাগে গরগর করতে করতে ফিরে এলেন কনকলতা।—ছেলে তোমার জবাব দিয়ে দিয়েছে, যেতে পারবে না।

বুলু প্রকাশবাবুর কাছে বসেছিল। বললে, আমি জানতাম। আমাকে নিয়ে যেতে ওর যে লজ্জা করে, আমি তো আজ-কালকার মত ফ্যাশনদার নই।

প্রকাশবাবু কথাটায় একটু খোঁচা খেলেন। ভাবলেন, বড় মেয়েকে মফঃস্বলে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া বেশী দূর করাতে পারেন নি, তাই বোধ হয় বুলুর একটু বাপের বিরুদ্ধে অনুযোগ আছে। তাই তার কথাটা কানে না তুলেই বললেন, কেন, যেতে পারবে না কেন?

—তুমিই জিগেস করে দ্যাখো। বলে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণায় তক্তপোষের এক ধারে গিয়ে শুয়ে পড়লেন কনকলতা।

প্রকাশবাবু ডাকলেন, অরুণ।

অরুণ আসতেই বললেন, পরশুদিন বুলুকে পাটনায় পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। অক্ষয় ছুটি পাবে না এখন।

অরুণ মাথা নীচু করে বললে, দেখি।

বলেই সরে এলো তাঁর সামনে থেকে।

মুখে যদিও বললো দেখি, তবু মনে মনে বুঝতে পারলো এখন আর বাবার কথার নড়চড় করার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা অজুহাত দিতে পারতো তা হলেও কথা ছিল।

অরুণের নিজেকে বড় অসহায় লাগলো। অক্ষম রাগে নিজের দাঁত দিয়ে নিজেকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে হলো।

*

'অনেকক্ষণ থাকবো, অনেকক্ষণ থাকবো'। সেই মুহূর্তে অরুণ অহংকারে টাওয়ার [illegible] উঁচু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু

(দি-৪০৫০)

পড়লো অরুণ। কয়েক পা এগিয়ে গেল ওরা পিছনে পিছনে আসছে কি না-আসছে না দেখেই। বাড়ির কাছ থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচে।

বিরাম আর নন্দিনী ভেবেছিল ঘরে বসতে বলবে অরুণ। বাইরে এত মডার্ন, উর্মির সঙ্গে হইহুল্লোড় করে, তার বাড়িতে আসা যে বোকামি তা জানবে কি করে।

নন্দিনী বিশেষ করে প্রথম একটু অপ্রতিভ হয়েছিল।

গলির মোড় পার হয়ে এসে তবে মুখ খুললো অরুণ।—হঠাৎ এলি যে! চল একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।

আর কোথায় যাবে, চায়ের দোকানই তো এখন ড্রয়িং রুম। বারান্দায় যদি বা বসার জায়গা থাকে তো প্রাণ খুলে কথা বলতে পাবে না। টিকলু ঠিকই বলে, পালিশ দিয়ে দিয়ে কথা সর্বাঁ পোষায় না।

চায়ের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বিরাম বললে, চল্ কথা আছে।

গলার স্বর বা বলার ধরনটা এমনই যে অরুণ ঘাবড়ে গেল। রুণুরে ব্যাপার নিয়ে নয় তো। চার্জ করতে আসে নি তো। হয়তো বলবে, তুই এত ছোটলোক অরুণ! হয়তো বলবে, রুণু আমার নিজের বোনের মত।

অরুণের বুক দুরুদুরু করছিল।

একটা কেবিনে ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসলো অরুণ।—বল্।

বলে নন্দিনীর মুখের দিকে এতক্ষণে তাকালো। নন্দিনীর মুখে-চোখে এমন একটা থমথমে ভাব ছিল যে, দেখেই অরুণের মনে হলো সাংঘাতিক কিছু।

বিরাম অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, নন্দিনী বাড়ি থেকে চলে এসেছে।

—সে কি!

একটা আতঙ্ক সরে গিয়ে আরেকটা আতঙ্ক ওর বুকে চেপে বসলো।

বিরাম আবার বললে, ফিরবে না বলছে। দু'চারদিন ওর থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

অরুণ যাকে বলে স্তম্ভিত। বিরামটা ভেবেছে কি? ওর বাড়িতে এনে রাখবে নন্দিনীকে এই তালে ছিল! পাগল নাকি! কিন্তু ওকে সাফ সাফ তো বলাও যাবে না। চটে গেলে, রুণু কি আর কিছু না বলেছে নন্দিনীকে, বাড়িতে বাবা-মাকে জানিয়ে দিতে পারে। তা অবশ্য করবে না, কিন্তু রেগে গিয়ে রুণুর কাছে ভাংচি দিতে কতক্ষণ। অরুণ একটা বাজে তাই, মদ খায়, ওসব জায়গায় বার-টার, কিংবা আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে—। উর্মিকেই হয়তো ওর সঙ্গে লেপটে দিলো।

সমস্ত দায়িত্ব ওর ঘাড়ে এসে পড়তে [illegible]

ও বললে, কেন পাগলামি করছেন, বাড়ি ফিরে যান।

নন্দিনী এতক্ষণ হয়তো ভেবেছিল অরুণের কাছে কোন ভরসা পাবে।

—আপনাদের কাছে আমি উপদেশ চাই না। ও বাড়িতে আমি আর ফিরবো না।

বিরাম চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ বললে, তুই জানিস না অরুণ, ওর দাদা ওকে—

কথা শেষ না করে নন্দিনীর মুখের দিকে তাকালো বিরাম। বোধ হয় বলবে কিনা জানতে চাইলো।

নন্দিনীর চোখের তারায় একটা ফণা তোলা সাপের ছায়া দেখলো অরুণ। সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীর দু' চোখ জলে ভরে গেল।—দেখবেন? এই দেখুন। এক ঝটকায় শাড়ির প্রান্তটুকু কাঁধ থেকে সরিয়ে দিলো। স্লীভলেস ব্লাউজের নীচে ফর্সা ধপধপে হাতে কয়েকটা ছড়ে যাওয়া কালসিটে পড়া দাগ দেখতে পেল অরুণ, দেখতে পেয়ে শিউরে উঠলো।

—আমাকে জুতোয় করে মেরেছে দাদা। তবু আমাকে ফিরে যেতে বলেন?

এতক্ষণ অরুণ ভাবছিল, যত বাজে ফ্যাসাদ, কাটাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু হঠাৎ ওর মনের মধ্যে, শরীরের মধ্যে কি এক ধরনের উত্তেজনা এলো। মনে হলো কিছু একটা করতেই হবে।

বিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকেই যেন বললে, প্রবলেম! কি করি বল তো।

—আমি তো কারো সমস্যা হতে চাই না। নন্দিনীর গলায় ঝাঁঝ দেখা দিলো। অরুণের মনে হলো ঝাঁঝটার মধ্যে প্রচণ্ড অভিমান রয়েছে।

বিরাম দমে গেল। অপ্রতিভভাবে বললে, না না, সে-কথা বলছি না।

ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনার কথা বললো বিরাম।—আমাদের মেলামেশার কথা ওর দাদা বোধ হয় টের পেয়েছিল, কথায় কথায় শাসন করতো নন্দিনীকে, তাড়াতাড়ি ফিরতে বলতো। কাল রাত্রে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল...সকালে উঠেই ওদের কথা কাটাকাটি হতে হতে......

—আমিও ছাড়িনি, যা মুখে এসেছে বলেছি। নন্দিনী বেপরোয়াভাবে বললে।

অরুণ চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। কোন একটা উপায় ভেবে বের করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, আমি বলি কি, ফিরেই যান। ধরুন পুলিস কেসটেস যদি করে......

—আমি নাবালিকা নই। নন্দিনী ব্যাগ খুলে দেখালো।—সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি।

তারপর হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বললে, কিছু না পারি মরতে তো পারবো।

অরুণ এবার আরো ভয় পেল। সেটাকে লুকোবার জন্যে সশব্দে হেসে উঠে বললে, কি আজেবাজে ভাবছেন।

বিরামকে দেখে মনে হল ও ভাবনায় ভেঙে পড়েছে।—সকালবেলাতেই জানিস অরুণ, হেঁটে হেঁটে আমার বাড়ি চলে এসেছে। কতখানি অপমানিত হলে...

—বাড়িতে? কথার পিঠে কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়ির কথা মনে পড়লো। 'মেয়েটা কে রে! ছেলেটা তোর সেই কলেজের বন্ধু না? কেন এসেছিল?'

[illegible] কোনদিন এমনি একটা কাণ্ড করে বসবে না তো। ধত্তোর, ওসব প্রেমট্রেম করে কাজ নেই। বৌফাকির ঝামেলা বাড়ানো।

—একটা হোটেলটোটেলে বরং...অরুণ কিছু একটা বলার জন্যেই যেন বললে।

—না না, ওসব জায়গায় আমার ভয় করে। নন্দিনী বলে উঠলো।

আর বিরাম উপুড় করা হাত উল্টে দিয়ে বললে, টাকা কোথায়?

অরুণ হাতের ঘড়িটা দেখলো। সিটি অফিস থেকে ট্রেনের টিকিট কেটে রাখতে হবে কালকের। দিদিকে পাটনা নিয়ে যেতে হবে। অথচ এদিকে সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছে না।

অরুণ চায়ের কাপটা সরিয়ে দিয়ে হিসেব করে পয়সা নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো।—চল্ টিকলুকে ডাকি। ওর এসব ব্যাপারে মাথা খুব সাফ।

টিকলু দাঁতে টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে এলো। খালি গা, পায়জামার দড়িটা হাঁটু অবধি দুলছে।

অরুণ চুম্বকে কাহিনীটুকু শুনিয়ে বললে, মোড়ের মাথায় ওরা দাঁড়িয়ে আছে, চট্ করে জামাটা গায়ে দিয়ে আয়।

এতক্ষণ তিন মাথা এক হয়েছিল, এবার চার মাথা এক হলো।

সব শুনে টিকলু হেসে উঠলো। যেন ইয়ার্কি-ঠাট্টার ব্যাপার। হাসতে হাসতে বললে, এই কথা। দারোগাবাবু ডিম খাবে, আমাকে সেজন্যে মুর্গী পুষতে হবে।

স্টুপিড। অরুণের সারা শরীর জ্বলে উঠলো। একটু আগে নন্দিনীর দু'চোখ জলে ভেসে উঠেছিল, মনে পড়লো। 'কিছু না পারি মরতে তো পারবো', কথাটা কানে বাজলো।

—টিকলু, এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার। অরুণ বললে।

আর টিকলু হেসে উঠে বললে, আরে দূর, এ তো সোডার মত সিম্পল্। সট্ মেরে বিয়ে কর, সিঁদুর কিনে আন দু' আনার, সিঁথিতে দিয়ে বাড়ি চলে যা। গিয়ে বল্, মা তোমার জন্যে দাসী আনলাম।

ঊর্মি'র কাছে কথাগুলো রীপিট করলো টিকলু, আর ঊর্মি হাসিতে ফেটে পড়লো। তারপর ব্যাগ খুললো, চুর্‌র্‌র্ চুর্‌র্‌র্। জীপ ফাসনার খুলে পাঁচটা পয়সা বের করে টিকলুকে দিলো। কেউ একটা চটকদার মজার কথা বললেই পাঁচ পয়সা প্রাইজ দেওয়ার রীতি ওদের।

টিকলু বললে, পাঁচ পয়সায় হবে না জি-এফ, বেশি ছাড়তে হবে।

জি-এফ অর্থাৎ গার্ল-ফ্রেণ্ড।

শেষ অবধি টিকলু সুধাদের বাড়িতে

নন্দিনীর নিরুদ্দেশ থাকার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু।—বিরু মা করলে মাইরি ওসব হুজ্জোত পোয়াতে রাজি হচ্ছে না।

বিরাম বললে, বাঃ বিয়ে তো আমরা করবই। কিন্তু দু'চারদিন...মানে রেজেস্ট্রি করতে হলে নোটিশ লাগবে, টাকা লাগবে।

টিকলু হেসে বললে, নোটিশ? ও-ও আলো টাকা।

বলে পকেট থেকে প্রেসের একটা বিল্ বের করলো। তাগাদায় যাবার জন্যে বাবার কাছ থেকে নিয়েছিল। আদায় করতে পারলে দু'পাঁচ টাকা মেরে নেবে ভেবে রেখেছিল।

পারলো না আদায় করতে।

শেষে ঊর্মিকে ফোন করলো পোস্ট-অফিস থেকে। জরুরী দরকার, চলে আয় কফি হাউসে।

সঞ্জিত বললে, ঊর্মি নিশ্চয় টাকা জোগাড় করতে পারবে।

টিকলু বললে, কাল বিল্-এর টাকা ফেলো কিছু না দিলে, ওরই একদিন কি আমারই একদিন। কাল পরশুর মধ্যে বিয়েটা দিয়ে দিতেই হবে।

সারাদিন ওদের ছোটাছুটি আর আতঙ্কের মধ্যে কাটলো। এদিকে পুলিসের ভয়, কে জানে ধরুন নন্দিনীর দাদা ডায়েরী করেছে কিনা!

অরুণ আর টিকলু যখন নন্দিনীকে রেখে এলো সাধনের বাড়িতে, তখন অরুণের মনে হলো সারাদিনের অনিশ্চিত ছোটাছুটি আর সারাজীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেবে নন্দিনী কেমন যেন হয়ে গেছে। ওর চোখ যেন কিছু দেখছে না, ওর মন কিছু ভাবছে না। বোকা বোকা দেখাচ্ছিল নন্দিনীকে, চিন্তাভাবনাহীন জড়পদার্থের মত।

দেখে অরুণের ভীষণ কষ্ট হলো, মায়া হলো। আহা বেচারী!

অরুণের মনে হলো, একটা দিনের ঝড়ে তেজী মেয়েটা নিস্তেজ হয়ে গেছে একেবারে। অরুণের মনে হলো যে-জন্যে এত কান্ড, মেয়েটার মধ্যে সেই প্রেম মরে গেছে, একেবারে মরে গেছে।

✻

ফিরে আসার পথে টিকলু বললে, বিরামটা মাইরি লাকি, দিব্যি সাপটেছে! আমার, সত্যি বলছি, ডাকিনের লোভ হচ্ছিল।

—তুই কি বলতো? বিরক্তি আর ঘৃণায় অরুণ বললে।

কিন্তু একা বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ ওর চোখের সামনে সকালে দেখা নন্দিনীর শরীরটা ঈষৎ লোভ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই শাড়ি সরিয়ে নন্দিনী যখন বাহুর কালসিটের দাগ দেখিয়েছিল, স্লীভলেস ব্লাউজের আঁটসাঁট শরীর, উন্মুক্ত ফর্সা মসৃণ হাত, গলার নীচের অনেকখানি মসৃণতা, সমস্ত জুড়ে একটা অদ্ভুত ভাল লাগা লোভ অরুণের মনেও উঁকি দিলো, এতক্ষণে।

কারণ এখন আর সেই সমস্যাটা সিন্দবাদের বুড়োটার মত ঘাড়ের ওপর চেপে বসে নেই।

৯

গলির মুখেই একটা ছেলেদের ইস্কুল। দাদের মত গোল দঙ্গল পাকিয়ে বখাটে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে থাকে পকেটে হাত গুঁজে। রাস্তা দিয়ে মেয়েদের যাওয়ার উপায় নেই। রুণুর ছোটভাইটা বেঁচে থাকলে ওদেরই মত বয়েস হতো। দোষ করলে রুণু নিশ্চয় তাকে শাসন করতো। কিন্তু এদের কি শাসন করার মত কেউ নেই?

বছর বছর ফেল মেরে দু'চারটে ছেলের বেশ বয়েস হয়ে গেছে। কামানো গালে শিরীষ কাগজের মত কড়া দাড়ি। ছোট-গুলোকে ওরাই নষ্ট করছে। মেয়েদের দেখে শিস্ দেয়, টিপ্পনি কাটে, অভব্য অঙ্গ-ভঙ্গী করে। পাড়ার লোক হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করেছে, ফল হয়নি। হবে কি করে, মাস্টারদের আবার নিজেদের মধ্যে দলাদলি, টিকে থাকায় রাখতে গিয়ে ছেলে-গুলোকে কাজে লাগায়। যেতে আসতে কখনো মুখোমুখি পড়লে, রুণু দেখেছে, দু' একজন মাস্টারের তাকানোটা বেশ খারাপ।

ছেলেগুলো পাজির পাঝাড়া।

একবার একটা ক্যালোকুলো ভিখিরীর বাচ্চাকে লেলিয়ে দিয়েছিল। মা না মা বাচ্চা, জড়িয়ে ধর গিয়ে।

বাচ্চাটা সত্যি এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরেছিল নোংরা হাতে, 'মা' 'মা' বলে ভিক্ষে চেয়েছিল। কি অস্বস্তি, কি অস্বস্তি!

ইস্কুলের ওই বখাটে ছেলেগুলোকে ধরে চাবকাতে ইচ্ছে হয়।

দ্রুতপায়ে ঐটুকু পার হয়ে এসে রুণু একবার ভাবলে নন্দিনীর কোন খবর পাওয়া গেছে কিনা খোঁজ নিয়ে যাবে। না, থাক্! খবর পেলে পরমদা নিজেই বলে যাবে নিশ্চয়।

আশ্চর্য ব্যাপার। নন্দিনী ওর এত বন্ধু, রুণুর কাছে খুব কম কথাই চেপে রাখতো, অথচ ও হঠাৎ এভাবে যে চলে গেল, একটা খবর পর্যন্ত দিলো না রুণুকে?

মামীমার কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জা করছে কাল থেকে। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে বাড়ি থেকে চলে গেল? মামীমা কি ভাবছেন কে জানে। নিশ্চয় রুণুকেও খারাপ ভাবছেন। 'তোমারই তো বন্ধু'। সত্যি, নন্দিনীর জন্য লজ্জাও হচ্ছে, নন্দিনীর ওপর রাগও হচ্ছে। আচ্ছা, নন্দিনী রাগের মাথায় কিছু একটা করে বসবে না তো? আত্মহত্যাটত্যা?

পরমদা মামাবাবুর সঙ্গে কাল অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলেন নন্দিনী সম্পর্কে।

হতাশায় দুঃখে বলেছিলেন, তোমাকেও একটা কিছু জানিয়ে গেল না রুণু? না কি জানো, বলতে বারণ করে গেছে।

দুঃখের মধ্যেও এ এক জ্বালা। সবাই হয়তো ভাবছে রুণু সব জানে। এত বন্ধু যখন, কিছু কি আর না বলে গেছে। আর নন্দিনীই বা কেমন মেয়ে। মা বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে মানুষ করেছেন, নিজের দাদা, তুই দোষ করেছিস বকুনি দিয়েছেন। তার জন্যে সব ছেড়ে চলে যাবি!

—দোষ আমারই। পরমদা মামাবাবুকে বলছিলেন, রুণু শুনেছে। বলছিলেন, বড় হয়েছে, কখন কি হয়, কখন কি করে বসে, ভয় হয় না? বলুন? তারপর মেয়েদের মত চোখ মুছতে মুছতে বললেন, প্রায়ই দেরি করে ফিরছিল, বকাঝকা করতাম। পাঁচ ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে, সকালে উঠেই ওর বউদি বললে, কাল রাত নটায় ফিরেছে। মেজাজ ঠিক রইলো না, গালাগালি দিয়ে ফেললাম।

রুণুর একবার মনে হলো পরমদা কিছু অন্যায় করেন নি। আবার ভাবলে, শুধু বকুনি দিলেন আর নন্দিনী রেগে চলে গেল! তাও কি হয়। পরমদা ঠিক কি বলেছেন, কি করেছেন তা হয়তো এখন আর

বলতে পারছেন না। গালাগালি দিয়েছেন মানে? নোংরা কিছু? ছি ছি।

কিন্তু বিরামের কথাটা বলবে কিনা ঝুণু ভেবে ঠিক করতে পারলো না। এখন যদি ও বলে বিরামের সঙ্গে নন্দিনীর সম্পর্কটা ও জানতো, তা হলে মামাবাবু মামীমাও ছি ছি করবে। ভাববে ঝুণুও ওর মতই।

ও ছাড়া......

অরুণের সঙ্গে দেখা হ'লেও হয়তো নন্দিনীর খোঁজ পেতো।

কিন্তু অরুণ কেন যে এলো না ঝুণু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সব খবর জানে বলেই কি? হয়তো নন্দিনী দেখা করতে নিষেধ করেছে, কিংবা অরুণ নিজেই ভেবেছে দেখা হ'লে যদি জিগেস করে নন্দিনীর কথা। বাঃ রে, ওকে বিশ্বাস করে বলতে পারবে না? ও কি পরমদাকে বলে দেবে নাকি?

কাঁড়ির নীচের তলায় মামাবাবুর ডাক্তারী চেম্বার। সকালের দিকে রুগী আসে দু' চারজন, এখন কয়েকটা কল থাকে, সেরে আসেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঝুণু মামা-বাবুর গলা শুনতে পেল। তা হ'লে আজ আর কল ছিল না বিশেষ, আরো দু'জন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন বারান্দায় বসে।

—মামীমা, পাউরুটি আছে? ভীষণ খিদে পেয়েছে। দোতলায় উঠেই ঝুণু জিগেস করলে।

বিকেলে এ-সময় ও দু পীস পাউরুটি আর চা খায়। আজ ফিরে আসার কথা ছিল না বলেই ভাবলে হয়তো রুটি আনানো হয় নি।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? ফাংশন এর মধ্যে শেষ হয়ে গেল? মামীমা জিগেস করলেন।

ঝুণু হেসে বললে, না। ভাল লাগলো না, একদম বাজে। বলে নিজের ঘরটিতে চলে গেল। ভাবলে চোখের দিকে তাকিয়ে মামীমা হয়তো মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলবেন।

ঝুণুর অবশ্য পৃথক কোন ঘর নেই। মামাতো বোন দুটো ছোট, তারাও ওর ঘরেই পড়ে। ওর সঙ্গেই শোয়। তবে ঝুণুর একটা ছোট্ট টেবিল আছে, পড়ার। আর টেবিলে চাবি দিয়ে রাখার মত একটা দেরাজ আছে।

কাপড় ছেড়ে একটা আটপৌরে চেক শাড়ি পরে মুখ হাত ধুয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলটার সামনে বসলো ঝুণু।

না, দেরাজটা এখন খুলবে না। মামীমা হয়তো নিজেই পাউরুটি আর চা নিয়ে আসবেন। এক একদিন তো বলেন, তোমাকে তো করতে হবে না, কলেজ থেকে ক্লান্ত হয়ে এলে, আমি করে দিচ্ছি।

মামীমাকে ভীষণ ভাল লাগে ওর। সত্যি, এত ভালমানুষ!

নিজের সংসার চলে টানাটানির মধ্যে, তবু তো ঝুণুকে নিয়ে এসে রেখেছেন, পড়ার খরচ যুগিয়ে চলেছেন।

বিছানায় একটু গড়িয়ে নিলো ঝুণু তাকের কাপড়টা সরিয়ে রেখে। আজ ওর মন একটুও ভাল নেই। বার বার কেবল অরুণের কথা মনে পড়ছে।

মাঝে মাঝে অরুণের সঙ্গে দেখা করার ওর তীব্র ইচ্ছে কেন যে হয়। প্রেম? আহারে! প্রেম এত সস্তা নয়। অরুণের সঙ্গে কথা বলতে ওর অবশ্য বেশ লাগে, মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। ব্যাস, প্রেমট্রেম ওসব শৌখীন জিনিস ওর জন্যে নয়। কিন্তু বেচারী অরুণ, হ'য় অরুণ বোধ হয়......যাঃ, তা না হ'লে দেখা করার জন্যে, বেশীক্ষণ থাকার জন্যে এত ছটফট করে কেন? কই, প্রথম প্রথম তো সাদামাঠা পোশাক ছিল, এখন শার্টের ইস্ত্রী, প্যান্টের ক্রীজে এতটুকু খুঁত থাকে না। ঝুণুর জন্যে আর তো কেউ কখনো এমন করে নি।

কিন্তু অরুণ এলো না কেন, কিছুতেই বুঝতে পারছে না ও। ঝুণু যেতে বলেছিল, আসবে, অনেকক্ষণ থাকবে, অনেকক্ষণ, সেই জন্যে কি ওর দাম কমে গেল অরুণের চোখে? না কি ওকে খারাপ ভাবলো? অরুণ ওকে খারাপ ভাবতে পারে ভেবে বুকের মধ্যে কেমন একটা কথা-কথা লাগলো। অবশ্যই ভাবলে, দূর, ওসব কিছু না। নিশ্চয় কোন কাজে আটকে পড়েছে।

আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, অরুণ অন্য কাউকে ভালবাসে। ওর সঙ্গে শুধু খেলা করছে। হয়তো যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে, কিংবা অন্য কিছু। সেইজন্যে ঝুণুর কথা ভুলেই গেছে।

বেশীক্ষণ থাকার জন্যে, অরুণকে আরো একটু খুশী করার জন্যে কত আগে থেকে মিথ্যে কথাটা বলে রাখলো। —কলেজে ফাংশন আছে, ফিরতে একটু দেরি হবে মামীমা।

মিথ্যে কথাটা কোন কাজেই লাগলো না। এত পরিপাটি করে সাজলো ঝুণু। অরুণ এলোই না।

ফিরে আসার সময় এত বিচ্ছিরি লাগছিল। ঝুণু মনে মনে ভাবলো, পরে যদি হ্যাংলামি করে, এমন জব্দ করবো! নেহাত অরুণ কষ্ট পায় বলেই না অনেকক্ষণ থাকার কথা দিয়েছিল।

ঝট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো ঝুণু।

কি করি কি করি, উঠে ব্যাগ থেকে দেরাজের চাবিটা বের করলো।

এই একটাই লুকোনো স্বর্গ আছে ওর। এই একটাই নেশা। চাবি লাগিয়ে দেরাজটা খুললো। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মন খুশিতে ভরে উঠলো।

অরুণ আসে নি তো কি হয়েছে। এই দেরাজটার মধ্যে ওর টুকরো টুকরো আনন্দ জড়ো হয়ে আছে। একটু একটু করে পাওয়া জীবনের অসংখ্য আনন্দের মুহূর্ত।

দেরাজটা টেনে খুললো ঝুণু।

অসংখ্য টুকরো টুকরো কাগজ, কত কি তুচ্ছ জিনিস। অথচ তার কোনটাই ঝুণুর কাছে তুচ্ছ নয়।

আঃ, ঝুণুর মন ফুর্তিতে ভরে উঠলো। ঝুণুর মন ছোট্ট এতটুকু সাত আট-ন বছর হয়ে গেল। চাবির রিং একটা। তুলে নিয়ে সেটা আংটির মত করে আঙুলে পরলো। কুড়িয়ে পেয়েছিল। কেনার কাঁচি এক জোড়া, হাতির দাঁতের মত সাদা—ইস্কুলের শিক্ষা-দিদিমণি দিয়েছিলেন। খুব ভালবাসতেন ওকে। একটা তাসের ম্যাজিক, নিজেই কিনেছিল স্কুলের মেলায়। সব,

সব জমিয়ে রেখেছে রুণু এই দেরাজের মধ্যে।

কাগজগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে পরীক্ষা পাশ করার সার্টিফিকেট পেল। সেই প্রথম দুরন্ত আনন্দের দিন ওটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

একটা একটা করে সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো রুণু।

অনুরাধার দাদার সেই চিঠিটা কই? খুঁজে খুঁজে বের করলো, পড়লো, সারা মুখে একটা খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়লো। অনুরাধার হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছিল। পড়ে খুব রেগে গিয়েছিল ও, উত্তর দেয় নি। কিন্তু চিঠিটা ফেলে দিতেও পারে নি। রেখে দিয়েছিল। ভাল লেগেছিল। আবার পড়লো সেই লাইনটা—বিশ্রী হাতের লেখায়—তোমার চেয়ে সুন্দরী আমি দেখি নাই। ফিক্ করে হেসে ফেললো রুণু নিজের মনেই।

রুণুর যখনই মন খারাপ হয়, ফাঁকা ফাঁকা লাগে তখনই ও এই দেরাজটা খুলে বসে একটা একটা করে সুখের স্মৃতিকে স্পর্শ করে।

হঠাৎ অরুণকে ছুঁতে ইচ্ছে হলো ওর। ভীষণ ভয় করে খুঁজলো। কোথায় গেল সেই খামটা!

একটা ভীষণ জরুরী কিছু যেন হারিয়ে চলেছে এমন অধৈর্য ভাবে ও খুঁজতে শুরু করলো।

পেয়ে গেল। নষ্ট হবে বলে যেখানে একটা সাদা খামের মধ্যে নীল পালকটা রেখে দিয়েছিল ও। পালকটা বের করলো, মুগ্ধভাবে সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। মুখের ওপর পালকটা খুব হাল্কা ভাবে বুলিয়ে আবার খামের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিলো।

তারপর দেরাজটা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিলো।

এসে শুয়ে পড়লো আবার বিছানার ওপর।

অরুণের কথা ভাবতে ভাল লাগলো।

—ও সব নোবেল প্রফেশন-ফ্রফেশন শুনতেই ভাল লাগে বোন। তোমার কথা কেউ ভাবে না, না রুগী না গাভর্মেণ্ট, তুমি শুধু সার্ভ করো। ওসব চলে না এখন আর।

—রুদ্র, তুমিই বুদ্ধিমান। পয়সা তো এখন গাইনোকলোজিতে। তাই না মহীতোষ?

—সৎপথের চেয়ে অসৎপথে। ডাক্তার সেনের গল্প।

মামাবাবুদের কথা শুনতে পেল রুণু ভাসা-ভাসা কথা। ওরা হো হো করে হেসে উঠলো। কি আলোচনা। চাপা গলায় বললেও এক একদিন কানে আসে অস্পষ্ট ভাবে। বয়েস হয়েছে, কিন্তু যুবকদের সঙ্গে তফাত কোথায়। মামাবাবুই যা ভদ্র।

অরুণ কিন্তু চমৎকার মানুষ। ভদ্র, আর কি ভাল।

চারটের সময় একদিন দেখা করার কথা ছিল, রুণুর খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল আসতে।

ও তাই জিগেস করেছিল, কতক্ষণ এসেছেন?

রাস্তা পার হওয়ার আগে দূর থেকে ও অরুণকে দেখতে পেয়েছিল। কি হতাশ বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তার ছায়া মেখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল অরুণ। দেখে হেসে ফেলেছিল ও, আবার ভিতরে ভিতরে ভালও লেগেছিল। নিজেকে সেদিন খুব দামী মনে হয়েছিল।

রুণুকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক খুশী ছড়িয়ে পড়েছিল অরুণের মুখে চোখে, কিন্তু সেটা চট্ করে লুকিয়ে ফেলে, রাগ-রাগ্ ভাব করলো অরুণ।

—বড্ড দেরি হয়ে গেল। কতক্ষণ এসেছেন? ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে রুণু বললে।

অরুণ রাগ-রাগ গলায় বললে, সাড়ে তিনটে।

—তা বলে অত আগে আসবার কি দরকার ছিল।

অরুণ হেসে ফেললে। —তুমি দশ পনেরো মিনিট আগেই যদি এসে পড়তে? একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগতো না তোমার!

শুনে বেশ ভাল লেগেছিল। দ্যাখো, অরুণ তা হলে শুধু নিজের কথাই ভাবে না, আমার দিকটাও বোঝে।

বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে চুপটি করে সেই সব কথা ভাবতে ভাল লাগছিল রুণুর।

—এই! তুমি বলবো? হঠাৎ একদিন দুম্ করে বলে ফেললো অরুণ।

চমকে উঠেছিল ও।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই ঘাসের চত্বরে ওরা মুখোমুখি বসেছিল। জলের ধারে ঠিক যে জায়গাটিতে বিরাম আর নন্দিনীর সঙ্গে প্রথম দিন বসেছিল, যেদিন টিকলুর অভদ্রতায় ওর মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। অরুণকে সেদিনই বেশ ভদ্র মনে হয়েছিল, টিকলুর পাশে আরো।

—এই! তুমি বলবো?

চমকে উঠেছিল রুণু, পরমুহূর্তেই ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল। ও হাঁটু মুড়ে বসেছিল, হাঁটুর ফাঁকে চিবুক রেখে। তক্ষুনি চোখ নামালো ঘাসের দিকে, একটা হাতে ঘাসের শিষ ছিঁড়লো, আর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। রুণুর মনে আছে লজ্জায় ও মুখ তুলতে পারেনি।

তারপর ওরা অনেকক্ষণ গল্প করেছিল, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিল 'আপনি' বলে বলে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, 'তুমি' বলতে অরুণের খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

ফেরার সময় অরুণ হঠাৎ বললে, নাঃ, আপনিই ভাল ছিল। এক পক্ষ আপনি বলবে আর আমি শুধু......

রুণু হেসে ফেলেছিল। তারপর হাল্কা ভাবে বলেছিল, অন্যপক্ষের ইচ্ছে না থাকলে সে বলবে কেন!

—কি হলো? রুণু অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথার গলায় বলে উঠেছিল। কারণ ওর কথায় অরুণের মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিল অরুণ, কিংবা প্রচণ্ড অপমান বোধ করেছিল।

অরুণ কোন কথা বললো না, গুম হয়ে রইলো। রাগ জ্বালা লজ্জা অনুশোচনা। রুণুর ইচ্ছে হলো ও বলে, মুখের কথাটা কিছু নয়, কিছু নয়। ওর ইচ্ছে হলো ওর হৃৎপিণ্ডটা তক্ষুনি ছিঁড়ে বের করে এনে অরুণকে দেখিয়ে দেয়।

আর মনে মনে বলেছিল, প্রজাপতিকে কখনো দু' আঙুলে টিপে ধরতে নেই। পাখা খসে গিয়ে সেটা আবার শুঁয়োপোকা হয়ে যায়।

ক্রমশঃ

বিশ্ব বিজ্ঞান

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

রকেট, যাত্রী ও যান সম্পর্কে

এবারে যে তিনজন মহাকাশচারী চাঁদের রাজ্যে পাড়ি দিয়ে এলেন, তাঁদের একজন ছাড়া বাকি দু'জনেই এর আগে মার্কারী ও জেমিনীর পর্যায়ে মহাশূন্যে পরিক্রমা করেছেন। তিনি নতুন তিনি হচ্ছেন মিঃ অ্যান্ডার্স। মিঃ বর্মান ও মিঃ লাভেল ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরের ৪ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুই সপ্তাহ মহাশূন্যে থেকে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। তাঁদের বাহন ছিল জেমিনী-৭। তারপর ১৯৬৬ সালে ১১ই থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভূপ্রদক্ষিণের সময় মিঃ লাভেল ছিলেন জেমিনী-১২ মহাকাশযানে এডউইন অলড্রিনের সহযাত্রী। সেই সময় অন্য একটি মহাকাশযানের সঙ্গে তাঁরা জেমিনী-১২কে যুক্ত ও বিযুক্ত করেন ৪বার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমবারের যাত্রায় জেমিনী-৭ মহাকাশযানে বসে ২০৬বার ভূপ্রদক্ষিণ করার পর (মিঃ বর্মান সমেত) মিঃ লাভেল জেমিনী-১২তে আরো ৫৯ বার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে যখন ফিরে আসেন তখন তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন মহাকাশচারী। তাঁর এই দুটি ক্ষেপণ যাত্রার মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ কিলোমিটার।

অ্যাপোলো-৮-এর যাত্রীদের কেবিনের মধ্যে যাত্রীরা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রত্যাবর্তনের সময় কিভাবে থাকবেন এবং আবহমণ্ডলের ঘর্ষণে কেবিনের বাইরের দিক প্রচণ্ড গরম হয়ে আগুন জ্বলতে থাকবে তার কল্পিত দৃশ্য এখানে দেখা যাচ্ছে

মার্কারী, জেমিনী ও অ্যাপোলোর পার্থক্য কোথায়? এক কথায় বলতে গেলে তফাতটা হচ্ছে প্রধানত আয়তন ও যাত্রীবহন ক্ষমতার ক্ষেত্রে। মার্কারী জাতীয় মহাকাশযানে মাত্র একজন যাত্রীর বেশি জায়গা ছিল না। ১৯৬১ সালের মে মাসে প্রথম মার্কারী একজন যাত্রী নিয়ে অপবৃত্তাকার পথে উর্ধ্বাকাশ ছুঁয়ে ১৫ মিনিট পরে পৃথিবীতে ফিরে আসে। সেটিকে কক্ষপথে ভূপ্রদক্ষিণ বলা যায় না। সেই প্রথম যাত্রাপথকে অবকক্ষ পথ বলা যেতে পারে। মার্কারী মহাকাশযানের কার্যসূচী শেষ হয় দুই বছরে। সর্বশেষ বার মার্কারী ৩৪ ঘণ্টায় ২২ বার ভূপ্রদক্ষিণ করে আসে। মার্কারীর পরেই জেমিনী পর্যায়ের আবির্ভাব। জেমিনী মহাকাশযানগুলি ২ জন করে যাত্রী নিয়ে যাবার মত বড় করে তৈরি করা হয়। "ক্যাস্টার" ও পোলাক্স নামে যে দুটি তারামণ্ডল আছে, তার পরেই জেমিনী তারামণ্ডলের স্থান। ঐ নামটিই বিজ্ঞানীরা ধার করে নেন। দুবার যাত্রি-বিহীন মহাশূন্যে যাত্রার পর (১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ সালের গোড়ায়) ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে মিঃ গ্রিসম ও মিঃ ইয়ংকে নিয়ে জেমিনী-৩ মহাশূন্যে যাত্রা করে এবং পরিক্রমাকালে চালকরা যানটির কক্ষ পরিবর্তন করে এক নতুন কীর্তি স্থাপন করেন। মার্কারীর যাত্রীদের বলা যায় নীরব পর্যবেক্ষক কারণ মহাকাশযান ইচ্ছামত পরিচালনা করার দায়িত্ব তাঁদের ছিল না। কিন্তু জেমিনীর যাত্রীরা একই সঙ্গে চালকও ছিলেন এবং ইচ্ছামত তাঁদের যানের গতির দিক, বেগ ও উচ্চতা পরিবর্তন করার দায়িত্ব তাঁদের নিতে হয় এবং অন্য মহাকাশযানের সঙ্গে মহাশূন্যে সাক্ষাৎকার, দুটি যানের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটানো, যান থেকে বার হয়ে যাত্রীর মহাশূন্যে পদচারণা ইত্যাদি নানা অভিনব কাজ করতে হয়। বারোটি মহাকাশ পরিক্রমার পর জেমিনীর পালা সাঙ্গ হয় ১৯৬৬ সালের নবেম্বরে। তারপর শুরু হয় অ্যাপোলো-পর্ব। অ্যাপোলো যানে তিনজন যাত্রীর যাবার ব্যবস্থা। রাশিয়ার ক্ষেত্রেও ভস্তক ছিল এক জন যাত্রিবাহী, ভসখড নিয়ে গিয়েছিল তিনজন। তারপর এসেছে সোয়ুজ মহাকাশযানের পালা যার প্রথমটি মিঃ কোমারভকে নিয়ে নামবার পথে প্যারাসুট জড়িয়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড বেগে মাটিতে পড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় যাত্রীসমেত। সংবাদে প্রকাশ যে, সোয়ুজ মডেলের মহাকাশযানে নাকি ১০।১২ জন যাত্রীর যাবার জায়গা আছে। সোয়ুজ শব্দের অর্থ সংযুক্তরাষ্ট্র বা 'ইউনিয়ন' (সোভিয়েত ইউনিয়নের রুশ অনুবাদ হচ্ছে সোভিয়েৎস্কি সোয়ুজ)। সোয়ুজ-১এর মতই ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনজন যাত্রীসহ প্রথম অ্যাপোলো মহাকাশযানে পৃথিবীতে মহড়ার সময় আগুন ধরে, যানটি ও তার তিনজন যাত্রীর (মিঃ গ্রিসম, মিঃ হোয়াইট ও মিঃ চাফি) অপঘাত মৃত্যু ঘটে। তার বেশ কিছুদিন পরে চলতি বছরে অ্যাপোলো-৭ তিনজন যাত্রী নিয়ে প্রায় ১১ দিন ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে ঘুরে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসে। সেই সাফল্য বিচার বিশ্লেষণ করার পর আশান্বিত হয়ে বিজ্ঞানীরা অ্যাপোলো-৮কে যাত্রীসহ চাঁদের রাজ্যে পাঠাবার ভরসা পান। অ্যাপোলো-৮-এ যাত্রী পাঠানো হবে কি না হবে তা আগে থেকে ঠিক ছিল না। তাছাড়া অ্যাপোলো-৭কে স্যাটার্ন-৫ রকেট মহাশূন্যে নিয়ে যায়নি কারণ ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে পাঠাবার জন্য অত শক্তিশালী রকেটের প্রয়োজন ছিল না। সেই জন্য অ্যাপোলো-৭-এর বাহন ছিল স্যাটার্ন-১বি রকেট যার ঘাতশক্তি স্যাটার্ন-৫-এর ১।৫ ভাগ।

স্যাটার্ন-৫ রকেটের তলার পর্যায়ে ৫টি এফ-১ ইঞ্জিন থাকে। প্রতিটির ঘাতশক্তি

১৫ লক্ষ পাউন্ড (৬৭৫,০০০ কিলোগ্রাম)। যাত্রার সময় একসঙ্গে যখন ৫টিকেই চালু করা হয়, তখন সেগুলির মোট ধাতশক্তি দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ পাউন্ড (৩৩৭৫০০০ কিলোগ্রাম)। সেই শক্তি ৩৬৪ ফুট (১১০ মিটার) উঁচু রকেট, অ্যাপোলো মহাকাশ ও লুনার মডিউল সমেত মোট ৬২ লক্ষ পাউন্ড (২৮ লক্ষ কিলোগ্রাম) ভার আকাশে ৩৮ মাইল (৬১ কিঃ মিঃ) উপরে ঠেলে নিয়ে যায় মাত্র আড়াই মিনিটের মধ্যে। তারপর মহাকাশযানসহ রকেটের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০০০ মাইল (৯৬০০ কিঃ মিঃ) তুলে দেয়। এই কাজ করতে প্রত্যেকটি ইঞ্জিনের প্রতি সেকেন্ডে ৩৪০০ গ্যালন (১৩ হাজার লিটার) ইন্ধন লাগে। তার মানে দেড় শো সেকেন্ডে ২২০০ টন। কেরোসিন ও তরল অক্সিজেন হচ্ছে ঐ ইন্ধনের উপাদান। প্রায় ৪০ মাইল (৬৪ কিলোমিটার) ওঠার পরে রকেটের প্রথম পর্যায়ের ঐ ৫টি ইঞ্জিনের ইন্ধন পুরো খরচ হয়ে যায়। তখন গোটা পর্যায়টি আপনা থেকে খসে পড়ে।

এবার রকেটের ২য় পর্যায়ের কাজ করার পালা। তাতেও ৫টি "জে-২" ইঞ্জিন যেগুলির প্রত্যেকটির ধাতশক্তি সওয়া দুই লক্ষ পাউন্ড (১ লক্ষ কিলো)। ৫টি এক-সঙ্গে চালু হলে মোট ধাত দাঁড়ায় সওয়া এগার লক্ষ পাউন্ড (৫ লক্ষ কিলো)। ইঞ্জিনগুলি চলে সাড়ে ছয় মিনিট ৫০০ টন ইন্ধন খরচ করে। সেটি কিন্তু আগেকার মত ইন্ধন নয়। তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন মিশিয়ে সেই ইন্ধন তৈরি। ঐ ইঞ্জিনগুলি মহাকাশযানসহ রকেটটি ঘণ্টায় ১৪০০০ মাইল (২২০০০ কিলোমিটার) বেগে ১১৮ মাইল (১৮৯ কিঃ মিঃ) উপরে নিয়ে গিয়ে রকেটের শেষ বা তৃতীয় পর্যায়ের জিম্মায় তুলে দিয়ে নিজে খসে পড়ে। তৃতীয় পর্যায়ে ইঞ্জিন মাত্র একটি যার নাম "জে-২।" সেটি চালু হয়ে মহাকাশযানের বেগ ঘণ্টায় ১৭৪০০ মাইলে (২৮০০০ কিঃ মিঃ) দাঁড় করায় যা প্রথম মহাজাগতিক বেগ। সেই বেগে চলে শেষ পর্যায়সহ মহাকাশযানটি ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে আবর্তন শুরু করে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে মহাকাশযানের কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম ভিতরের কৃত্রিম আবহ ইত্যাদি সব ঠিকঠাক আছে কিনা তা পরখ করে দেখা। তখন কোথাও কোন ব্যবস্থায় গলদ ধরা পড়লে চালকরা প্রথমে সেটি সারাবার চেষ্টা করতেন—না পারলে হয় যান সমেত পৃথিবীতে ফিরে আসতেন না হয় ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে যানটি চালু রেখে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের বিকল্প কার্যসূচী অনুসারে কাজ করতেন। পরীক্ষানিরীক্ষা করা ও চাঁদের দিকে যাত্রা করার তোড়জোড় করতে তাঁদের ঘণ্টা তিনেক পর্যন্ত সময় লাগে। তার মানে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার ভূপ্রদক্ষিণের সময় পৃথিবীর অভিকর্ষ জয় করে চাঁদের দিকে যাত্রা করা রকেটের শেষ পর্যায়টি আবার চালু করে। কিন্তু ইচ্ছামত যে কোন সময়ে চাঁদের দিকে গেলে চাঁদের সঙ্গে দেখা না হবার আশংকা থাকে। ব্যাপারটা কম্পিউ-টারের সাহায্যে চুলচেরা হিসাবপত্র ও গণনায় উপর নির্ভরশীল। যানটিকে মহা-শূন্যে এমন একটা বিন্দুর দিকে নিয়ে যেতে হয়, যেখানে চাঁদ তখন ছিল না, কিন্তু নিজ কক্ষপথে চলতে চলতে চাঁদ সেখানে গিয়ে পৌঁছায় আড়াই দিন পরে অর্থাৎ অ্যাপোলো-৮ যখন সেই জায়গায় কাছে যানকে নিয়ে হাজির হয়। পৃথিবী

থেকে বিন্দুটির দূরত্ব ২ লক্ষ মাইল (৩২১০০০ কিঃ মিঃ)।

ভূমণ্ডলের অভিকর্ষ জয়ের পরবর্তী অধ্যায়

মহাকাশযানটিকে ভূকেন্দ্রিক কক্ষ থেকে বিচ্যুত করে চাঁদের দিকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য যে দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগের প্রয়োজন (ঘণ্টায় প্রায় ২৫ হাজার মাইল বা ৪০ হাজার কিলোমিটার) তারও উৎস হচ্ছে স্যাটার্ন-৫ রকেটের শেষ পর্যায়। সেই বেগে চাঁদের দিকে ভেসে যেতে যেতে অ্যাপোলো-৮ যখন সেই বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে তার গতিপথ ও চাঁদের কক্ষপথ পরস্পরকে কেটে চলে যায় সেখানে রকেটের শেষ পর্যায়টিও অ্যাপোলো-৮ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে তাকে আপন মনে ভেসে যেতে দেয়।

কিন্তু সেই সময় মহাশূন্যে কোন আবহমন্ডলের বাধা নেই বলে সৌর রশ্মি যানটির একটি পিঠে বিনাবাধায় পতিত হয়ে সেই দিকটি প্রচণ্ড তাতিয়ে দেয় কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য পিঠটি মহাশূন্যে অসহ্য ঠান্ডায় বরফের চেয়েও অনেক বেশি ঠান্ডা হয়ে যায়। সেই অবস্থায় যানের উপর তাপ মাত্রা সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্য চালকেরা অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানের একটি যন্ত্রকৌশল কাজে লাগান যেটি ভিতরের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার কতকগুলি ছোট ছোট গ্যাসের "জেট্"। ইংরাজীতে একে বলা হয় 'প্যাসিভ্ থার্মাল কন্ট্রোল'। সেই জেট্গুলি চালালে অ্যাপোলো-৮ প্রতি ঘণ্টায় একবার করে পাক খেতে খেতে চলে যার ফলে যানটির দু দিকেই পালা করে সৌর রশ্মি এসে পড়ে। এইভাবে অ্যাপোলো-৮, এগিয়ে চলে ৬৬ ঘন্টা পরে চাঁদের ৫৬০০ মাইলের মধ্যে গিয়ে পড়ে। প্রয়োজন বোধে ঐ জেটগুলির সাহায্যে যানের গতিদিক সংশোধন করার বন্দোবস্ত ছিল যাতে যানটি চন্দ্রমুখী হয়ে সূর্যমুখী হতে না পারে সেইজন্য।

পরবর্তী অধ্যায়ে অ্যাপোলা-৮ নিজ গতি বেগ ও চাঁদের আকর্ষণে (ঘণ্টায় ৫৭০০ মাইল) এমন জায়গায় পৌঁছায় যেখানে চাঁদের অভিকর্ষ তাকে চাঁদের পিছনের দিকে অর্ধ চন্দ্রাকার পথ পার হয়ে এসে আবার পৃথিবীমুখো করে দিতে পারত। এটি বিপদ নিবারক ব্যবস্থাগুলির অন্যতম। গোলযোগ ঘটে নি বলে, সার্ভিস প্রোপালশান যন্ত্রের সাহায্যে যানটি চন্দ্র কেন্দ্রিক কক্ষপথের দিকে এগিয়ে যায় বেগ মন্দীভূত করে (ঘণ্টায় ৩৭২০ মাইল) এবং পিছন দিকে মুখ করে। ঐ বেগে চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে পৌঁছে সেটি চাঁদের ১৯৬ থেকে ৭০ মাইলের মধ্যে ১০ বার ঘোরে।

পৃথিবী থেকে যাত্রার সামান্য পরেই যাত্রীরা তাঁদের ভারি পোশাকের বোঝা ত্যাগ করে আরামদায়ক জামাকাপড় পরেন। তাঁদের ঘুমোতে হয় পালা করে, অর্থাৎ যে কোন একজনকে পাহারায় রাখা হয়। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা অবশ্য যোথ। ভ্যাকুয়াম করা প্ল্যাস্টিকের থলির মধ্যে বরফে রেখে জমানো খাদ্য তাঁদের দেওয়া হয়। যিনি যে খাদ্য পছন্দ করেন সেই মত। সেই খাদ্য প্রতিদিন প্রত্যেককে ২০০০ ক্যালরী মাত্রায় দেওয়া হয়। প্রতিটি থলির সঙ্গে একটি করে ভালভ্ লাগানো ছিল যার মধ্যে দিয়ে থলিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা। সেই জলের সঙ্গে শুকনো খাবার মিশে স্বাভাবিক খাদ্য হয়ে যায়। তাছাড়া এমন সব খাদ্যের টুকরো ছিল যেগুলিতে আর জল মেশাবার দরকার হয় না, এমনিই কামড়ে-কামড়ে খাওয়া যায়।

পরবর্তী অধ্যায়ে চালকরা তাঁদের জাহাজের কলকব্জা ইত্যাদি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে (২বার ঘোরার পরে) আবার সার্ভিস ইঞ্জিনটি চালু করে প্রথম দিকে ডিম্বাকার কক্ষপথ পরিবর্তন করে চাঁদের ৭০ মাইলেরও কম উঁচুতে নেমে গোলাকার কক্ষপথে ঘোরা শুরু করেন ২ ঘণ্টায় একবার করে। দশ বার মিলিয়ে মোট ২০ ঘণ্টায় তাঁরা চাঁদকে কাছ থেকে দেখবার, তার ফটো তোলবার (এটা অ্যান্ডার্সের দায়িত্ব ছিল) এবং ভবিষ্যতে চাঁদে নামবার জন্য শান্তি সাগর, ঝঞ্ঝা সাগর ও কেন্দ্রীয় উপসাগরে যে পাঁচটি জায়গা বাছাই করা হয়েছে সেগুলি কয়েকটি কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পান। জল ও আবহমণ্ডলশূন্য চাঁদের এইসব সাগর-উপসাগর বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সেকালের জ্যোতির্বেত্তারা এগুলিকে সাগর বলে ধারণা করতেন। যাই হোক যাত্রীদের সঙ্গে টেলিভিশন ক্যামেরাও ছিল পৃথিবীতে চাঁদ, মহাশূন্য এবং চাঁদের কাছ থেকে পৃথিবীর দৃশ্যের চলচ্চিত্র পাঠাবার জন্য।

ঐ কক্ষপথে ২০ ঘন্টা কাটাবার পর চালকরা অ্যাপোলো-৮কে ঠিক মত দিকে ঘুরিয়ে (গ্যাস জেটের সাহায্যে) তারপর প্রধান ইঞ্জিনটি চালু করে কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেন ঘণ্টায় ৬৫০০ মাইল বেগে। তারপর ভূমণ্ডলের অভিকর্ষের আওতার মধ্যে পৌঁছে পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে তার বেগ বাড়তে বাড়তে আবহমণ্ডলের কাছাকাছি তার মাত্রা দাঁড়ায় ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। ফিরে আসবার জন্য তাঁদের ৫৭ ঘণ্টা সময় লাগে। আবহমণ্ডলে প্রবেশ করার মুখে সার্ভিস মডিউলটি খসিয়ে দেওয়া হয় কারণ সেটির আর দরকার ছিল না। ফলে যানটি একেবারে আলাদা হয়ে যায়। তখন যাত্রীদের কেবিন (ক্যাপসুল) ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেটি একটি [illegible] ১১ ফুট লম্বা এবং নিচের দিকে ১৩ ফুট চওড়া। এবার রিয়্যাকশান্ কন্ট্রোল ব্যবস্থা চালিয়ে দিয়ে অ্যাপোলো-৮কে এমনভাবে ঘোরানো হয় যাতে তার তাপ প্রতিরোধী কবচে আবৃত ভোঁতা দিকটি পৃথিবীর দিকে হয়। সেই কবচ ২২০০ থেকে ৩৩০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ সইতে পারে। তখন চালকরা কেবিনের গতিদিক এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন যাতে সেটি একেবারে খাড়াভাবে না নেমে একটু ট্যারচাভাবে নামে কারণ তাতে আবহমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রচণ্ডতা কিছুটা কম হয়।

পৃথিবী থেকে অ্যাপোলো-৮ যখন ২৪ হাজার ফুট উপরে আসে তখন এক জোড়া প্যারাস্যুট খুলে যানের গতিবেগ কমিয়ে ধীর ভাবে তাকে নামতে সাহায্য করে। ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় এই দুটি প্যারাস্যুটের বদলে নতুন তিনটি পাইলট প্যারাস্যুট খুলে গিয়ে অবতরণ বেগ ঘণ্টায় ১৭৫ মাইল থেকে ২২ মাইলে নামিয়ে আনার পর অ্যাপোলো-৮ হাওয়াই-এর কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে ঝাঁপ দেয়। তারপর একটি হেলিকপ্টার যাত্রীদের নিয়ে অপেক্ষমান জাহাজে পৌঁছে দেয়। এইভাবেই শেষ হয় ১৫ লক্ষ মাইল দীর্ঘ অসমসাহসিক যাত্রা। কলাম্বাসের তুলনায় যাত্রীরা অবশ্য যাত্রার লক্ষ্যস্থল ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ছিলেন। যাঁরা আরো গোটাতিনেক অ্যাপোলো-৮-এর মত যাত্রার পর চাঁদে গিয়ে নামবেন তাঁদের জন্য তৈরি হচ্ছে ৪০ হাজার কিলো ওজনের একটি অ্যাপোলো মহাকাশযান। কলাম্বাসের জাহাজ "নিন্যা"র ওজন প্রায় ঐ পরিমাণই ছিল।

সমাপ্ত

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

যে ক'টি সন্তান স্বচ্ছন্দে লালন পালন
করতে পারবেন, ততটি সন্তানই হওয়া উচিত
আচ্ছা ভাই, তুমি কি করে এত আরামে আছো বলতে পারো? আমি তো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।
দুটি সন্তান
কিন্তু আমার স্ত্রীর তো প্রত্যেক বছরেই একটি করে সন্তান হচ্ছে। আমি কি করি বলো তো?
আমি যা করি তাই বলবো — নিরোধ ব্যবহার করো।
জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমার হাতেই
রয়েছে। এগুলি ব্যবহার করো।
পরিবার পরিকল্পনার জন্য
নিরোধ
ব্যবহার করুন
৩টির মূল্য ১৫ পয়সা, ১টি ৫ পয়সা

অভিনন্দন

অভিনন্দন জানাতে বসে ভাবছি, যে গৌরবে আমরা সবাই গর্ব অনুভব করছি, তার জন্য একমাত্র ডাঃ রমা চৌধুরীকে অভিনন্দিত করাই কি যথেষ্ট? সমস্ত মহিলাসমাজ আজ তাঁর সম্মানে অংশ নিতে চায়। তিনি মহিলাই মাত্র নন, বা কিছু ভারতীয়, তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি সাধনা সবের সার্থক প্রতীক। তাঁর স্বামী স্বর্গীয় যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর নাম ভারতীয় সংস্কৃতির নূতন জীবনের অধ্যায়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। আর সেই সাধনায় একব্রতী ছিলেন রমাদি।

গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন বহু আগে শ্রীমতী হংস মেহতা, ডাঃ জীবরাজ মেহতার সহধর্মিণী। এতদিন পরে রবীন্দ্র-ভারতীর উপাচার্য-পদে এসেছেন ডঃ রমা চৌধুরী। তাঁর যে বংশে জন্ম, সে বংশ বাংলা দেশে ইতিহাস রচনা করেছে। আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী তিনি। মেধা তাই অনন্যসাধারণ। আনন্দমোহন বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় প্রথম বই দ্বিতীয় হন নি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; সেকালের রাজনীতির মানী মানুষ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শ্রীমতী রমা চৌধুরীর পিতার মাতুল। রমা চৌধুরীর পিতা সুধাংশুমোহন বসু বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও পরে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। রমাদি আই এ-তে দ্বিতীয়, বি এ দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং এম এ-তে রেকর্ড নম্বর নিয়ে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন। কলকাতা এবং অক্সফোর্ড দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পান। অক্সফোর্ডের এই সম্মানে সম্ভবত তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা।

সুবিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত, কবি ও নাট্যকার স্বামী যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সঙ্গে ১৯৪৩ সালে প্রাচ্য-বাণীর প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃত শিক্ষা, ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক ও বহুল প্রচার ছিল মূলমন্ত্র। এঁরা সংস্কৃতে নাটক রচনা করেন, আধুনিক কৃষ্টির সঙ্গে সংস্কৃতের জনপ্রিয়তার মিলন ঘটান। এঁরা দুজনে শতাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থ ও নাটক প্রকাশ করেন। বিশ বছরের বেশী হয়ে গেছে ডঃ রমা চৌধুরী লেডি ব্রেবোর্নে অধ্যক্ষার পদে ছিলেন। বাংলা দেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়বার কাজ সুযোগ্য হাতে ছিল সন্দেহ নেই। আদর্শহীন আধুনিক যুগের মাঝে রমাদি আদর্শ তুলে ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টা

বহুলাংশে হয়তো সফলও হয়েছে। নিজের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা আর কাউকে অনুপ্রাণিত করেনি, তাও বলতে পারি না। তাঁর রবীন্দ্র-ভারতীর দায়িত্ব গ্রহণে আশা হয়

ডঃ রমা চৌধুরী

বৃহত্তর ছাত্রসমাজ রমাদির আদর্শের প্রভাবে পথের সন্ধান পাবে।

আবার সর্ষেতে ভূত

সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদ আশঙ্কাজনক। সর্ষে-শঙ্কায় আশ্রয়ে পুষ্ট বাঙালী সংসারে আবার নেমেছে রোগাতঙ্ক। আতঙ্ক এমন আনকোরা নূতন নয়। সর্ষের ভেজালে বেরিবেরি বা ড্রপসি আগেও এসেছে গিয়েছে। রান্নার medium বা খাদ্যতেল হিসাবে সর্ষের তেলকে বিশেষজ্ঞরা তারিফ করে থাকেন। কোলেস্টেরল বৃদ্ধি বা হার্টের অসুখে খাদ্যরসিকদের তাঁরা সর্ষের তেলে লুচি, এমন কি মুরগির রোস্ট রান্না করার ঢালাও প্রেসক্রিপশন দেন। হঠাৎ কোন দিন কোন ব্যবসায়ী চুপিসারে শেয়ালকাঁটা মিশিয়ে বাজারে ছাড়বেন, আর সর্ষের তেল হবে সাংঘাতিক ভয়াবহ জিনিস, আমরা হেঁশেলের মানুষ কি করে হিসাব রাখি বলুন? সরকারের সব বড় বড় ব্যবস্থায় এটুকু নির্ভর করার উপায়ও কি আমাদের থাকবে না? খাদ্যে ভেজাল খাদ্যাভাবের চেয়েও নির্মম। খাদ্য দপ্তরের

ভাণ্ডারীদের কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকলে এমন একটি কালোবাজারী নিষ্ঠুর পরিহাসের কবল কাটানো যায় বলে মনে হয়। হাঁড়ির ব্যবস্থা তো সংবাদপত্র নয়। গরম খবর পরিবেশন করে দু-চার দিনের হইচই হল্লাও নয়। খাবার পরিবেশনের কাজে বিপদের ভয়টা পাকাপাকি বাদ দিতে পারা দরকার।

পিয়োনীর স্বপ্ন

জীবনটা নাকি ফুটকি লাইনে লেখা। মহাজনের তাই মত। বোধ হয় খুব সত্য কথা। জীবনটা আলাদা আলাদা ঘটনা আর স্মৃতি দিয়ে সাজানো। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অদ্ভুত সমাবেশ। সেই ফুটকির গাঁথা হারে শৈশবের স্মৃতিগুলি আরও অনাবিল সুন্দর। কি যে মনে গেঁথে যায়, কেউ জানে না। সেইভাবেই সম্ভবত আমার মনে কোন এক ছোটদের পত্রিকার পাতার কবিতার কয়েক লাইন আজও সজীব আছে।

শ্রীমতী প্রভা শা

শিশুমনের কল্পনা-বিলাসের জন্য লেখা কবি নরেন দেবের কবিতা।

শিরোহীর যুবরাজ মাথাজোড়া চুড়ো তাজ
আগাগোড়া পরা রাজবেশ।
বয়স সপ্তদশ নহে সে কাহারও বশ
ভালবাসে তারে সারা দেশ।

শিরোহীর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, তবু যুবরাজের বর্ণনা বড্ড মনে ধরেছিল। আজ এত বছর পরে দেখা পেলাম। যুবরাজের নয়। চুড়ো-তাজেরও নয়। আধুনিক এক রাজকন্যার। কাপড় পরনে সাদাসিধে, নেই তার রাজবেশ, কিন্তু চোখে তার স্বপ্নাবেশ। রাজপুরীর পরম পুণ্যে সে পরিপূর্ণ। আমি শিল্প-সমালোচক নই। কাজেই সপ্তদশের সামান্য বেশী বয়সের প্রভা শার শিল্প নিয়ে কিছু বলবার সাহস আমার নেই। হয়তো শিল্পী হিসাবে আজও সে অসামান্যা হয়নি। অসামান্যা হয়েছে সাহসে আর সাধনায়। রানীর মত সে নিরন্ত শাসন করেছে তার জন্মগত দুর্ভাগ্যকে।

প্রভার বাবার মুখে শুনেছি, প্রথম সন্তানের এই দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দেহ হলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি, সে মূক আর বধির। শিক্ষাব্রতী পিতা কার্য উপলক্ষে জয়পুরে এসেছিলেন। বিখ্যাত এক চিকিৎসক ভালভাবে পরীক্ষা করে রায় দিয়ে দেন। কেন সে অন্য শিশুর মত কলকল করে না, কেন সে মুখর নয়। চিকিৎসক ভালভাবে পরীক্ষা করে রায় দিলেন জন্ম-মূক তাঁর কন্যা। পিতার প্রাণে সেদিন কি হয়েছিল জানি না। আজ বললেন, দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে দুর্ভাগ্যকে মেনে নেবার সংকল্প করলাম। প্রভার মাকেও তাই শক্তি সঞ্চয়ের পরামর্শ দিলেন। মাতাপিতা একযোগে তাঁদের প্রথম সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন, যথাসাধ্য শিক্ষা ও সেবা। প্রভারা পাঁচ ভাইবোন। আদি নিবাস রাজস্থানের ছোট্ট শহর শিরোহী।

প্রভার জন্ম ১৯৪৭ সালে। প্রথম শিক্ষা শুরু হয় জয়পুরের শেঠ আনন্দিলাল পোদ্দার মূক-বধির বিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ থেকে '৬৪ দিল্লির লেডী নয়েস মূক-বধির বিদ্যালয়ে সে বোর্ডার ছিল। এখানে থাকাকালীন সে প্রথম আপন সৃজনী প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হয়। রং, রেখা আর কল্পনা দিয়ে সে গড়তে পারে রূপ। কি অপূর্ব অনুভূতি! তার হাতের তুলি এবার কইবে কথা। রেখার মাঝে শুনবে সংগীত। কিন্তু সে সুখ তার সম্পূর্ণ হবার আগেই স্কুলের পাঠ হল শেষ। স্কুল-কর্তৃপক্ষ বললেন, স্কুল-জীবনের পর অক্ষম কন্যার ভার নেবার কথা তাঁদের নয়। ভার নেবার ব্যবস্থাও নেই। আবার প্রভার পরিবেশ পালটিয়ে ফিরতে হল মায়ের কোলে। ছোট ভাইবোন ভালবাসে, মা-বাবারা প্রাণপণ করেন তার সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু প্রভার মন বিদ্রোহ করে। একবার সে রাগ করে, একবার করে অভিমান। না। সাধ্যসাধনা, মিনতি হার মানে। কচি কচি ভাইবোন কুচি কুচি কাগজে তাদের মিনতি জানিয়ে দরজার ফাঁকে ফেলে দেয়। কোন দিন বা কাগজের টুকরোয় জবাব আসে এমন জীবন সে রাখবে না। মাথা দেবে রেল এঞ্জিনের তলায়। শ্রীযুক্ত শা গল্প করতে করতে শিউরে উঠেছিলেন। কি যে সেদিন গেছে সাংঘাতিক ভাবনায় ভরা। কিন্তু দিনের কিনারা একদিন হল। বিল হুইটন নামে এক কানাডা-নিবাসী শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হল প্রভার ১৯৬৫ সালে। Bill Wheaton এসেছিলেন জয়পুরের এক বিদ্যালয়ের আর্ট ডিরেক্টর হয়ে। লেডী

পাগরী ভরনে

নয়েস স্কুলে থাকতে শ্রীমতী প্রভা ১৯৬২ সালে এক আন্তর্জাতিক মূক-বধির শিল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল। তাতে তার উৎসাহের প্রথম পত্তন হয়। দ্বিতীয় পত্তন হুইটনের শিক্ষা। এবার পত্তন দৃঢ়, ভিত্ আর নড়বে না। ১৯৬৭ সালে জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে প্রদর্শনী হল তার শিল্পের। দারুণ প্রশংসা পেয়েছিল তার শিল্পসৃষ্টি। এবার সে বিজয়িনী। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার না-বলা ভাষা। সার্থক হয়েছে শিল্প-সাধনা। আর নৈরাশ্য নয়! জীবনের মূল্য সে পেয়েছে। শিল্প তার বিশ্বজয়ের প্রতীক।

সম্প্রতি বাতিকের কাজে হাত দিয়েছে প্রভা। দেশে-বিদেশে বাতিকের প্রশংসা হয়েছে। চিত্ররচনায় প্রাকৃতিক দৃশ্য আর রাজস্থানী মেয়ে তার প্রধান বিষয়। দৃশ্যও তার নিজস্ব পরিবেশের। রাজস্থানের ধূসর মরু আর পল্লী সজীব হয়েছে বাদামী আর হলদে রং-এর তুলির টানে। ওর জীবনের নিস্তব্ধ রূপ রাজস্থানী যুবতীর কাঁচুলিতে আর পাদপহীন প্রান্তরের রুক্ষতায় রূপ নিয়েছে। সহজ সরল রেখার টানে জয় করেছে আপন দুর্ভাগ্য। সেই রেখায়, এক হয়েছে পল্লবহীন তরু আর কলকলা ঘড়া মাথায় মেয়ে।

শ্রীমতী

বিদেশে বাঙালী ব্যবসায়ী

মাত্র তিন বছর আগের কথা। ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী যুবক শ্রীসুকোমল খাসনবিস ব্রহ্ম সরকারের বিদেশী খেদানো নীতির শিকার হয়ে চলে আসেন কলকাতায়। সঙ্গে আসে সমবয়সী গুজরাতী যুবক রতিলাল। দুই বন্ধুই উচ্চাভিলাষী এবং দুঃসাহসী। মাতৃভূমির শান্ত স্নিগ্ধ কোল তাদের জন্য নয়। তারা চিনতে চায় "জগৎটাকে"। তাই স্বেচ্ছায় "গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া" হয়ে বরণ করে নেয় প্রবাস-জীবন। সমুদ্রের পিয়াসী দুই বন্ধু শুধু 'ভাল ছেলে' না হয়ে "মানুষ" হওয়াই তাদের সংকল্প। মাস কয়েকের মধ্যেই মাতৃভূমি ছেড়ে আবার যাত্রা শুরু শুভলগ্নে। এবার সমুদ্র উত্তর আমেরিকার —কানাডায়। সহায়সম্বলহীন যুবকদ্বয় স্বীয় অদম্য সাহসে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করে বিদেশের সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে। কানাডায় চাকুরি পেতে বেশী সময় লাগে না তাঁদের। হ্যাঁ, মজুর হিসেবেই শুরু হয় তাঁদের জীবন-সংগ্রাম। কিন্তু চাকুরে জীবন কখনও কাম্য নয় তাঁদের। আর দশজনের চাইতে একটু যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির তাঁরা। সীমাবদ্ধ জীবনের নিরাপত্তায় স্বস্তি নেই তাঁদের। সংগ্রামশীল জীবনের দুর্গমনের বাধা অতিক্রমণের প্রচেষ্টায় তাঁদের আনন্দ।

চাকুরির সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা নেয় ব্যবসার। কিন্তু মূলধন কোথায়! কেন, ঐ যে কথায় বলে, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। ইচ্ছা এঁদের আছে এবং বেশ প্রবল মাত্রায়। সুতরাং উপায় এগিয়ে আসে আপনা হতেই। মিতব্যয়িতা এবং কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে টাকা জমতে থাকে উভয়ে, কিন্তু সে আর কত। তবুও যাই হোক করে গোড়া পত্তন করে ব্যবসার। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা। নিজেদের অদম্য উৎসাহ, নিরলস প্রচেষ্টা এবং প্রশ্নাতীত সততা এঁদের সুনাম ও সফলতা এনে দেয় অল্প-কালের মধ্যে।

মাত্র তিনটি বছর। মাস পনেরো হলো মাল। এরই মধ্যে বিশ্বের ৩৯টি দেশের

কানাডা "গিফ্‌ট শো"-এ "টরন্ ট্রেড"-এর স্টল। শ্রীখাসনবীস ভারতীয় কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য বোঝাচ্ছেন জনৈক মহিলাকে

সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছে এদের প্রতিষ্ঠান। কানাডার "টরন্‌টো" শহরে "টরন্ ট্রেড কোম্পানী" আজ শুধু সুপরিচিত নয়, বহুপরিচিত। এরই মধ্যে স্বোপার্জিত অর্থে টরন্‌টো শহরের ব্যবস্থা-কেন্দ্রে খরিদ করা হয়েছে ত্রিতল বাড়ি। সেই বাড়িরই নীচের তলায় প্রতিষ্ঠিত বহুজন-পরিচিত "টরন্ ট্রেড কোম্পানী"। মালিক ২৫।২৬ বছর বয়সের দুই ভারতীয়। একজন বাঙালী অপরজন গুজরাতী। টরন্ ট্রেড-এর শাখা খোলা হয়েছে নিউ ইয়র্ক আর সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরে। মাল যোগানদারী অফিস খোলা হয়েছে পশ্চিম জার্মানি, টোকিও, সিঙ্গাপুর, বম্বে আর কলকাতায়।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এবং যুক্তরাষ্ট্রে বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃ দেশীয় "ট্রেড্ ফেয়ার"। তার প্রতিটিতে যোগদান করে টরন্ ট্রেড কোম্পানী। শুধু যোগদান নয়, ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছে সমগ্র মার্কিন দেশে।

সম্প্রতি "টরন্‌টো এক্‌জিবিশন পার্ক"-এর "ইন্ডাস্ট্রীয়াল বিল্ডিং"এ "টরনটো বায়ার্স শো" হয়ে গেল। তাতেও যোগ দিয়েছিল টরন্ ট্রেড কোম্পানী। মতিলাল তখন ভারতে। সুতরাং সুকোমলবাবুকে একাই ম্যানেজ করতে হয় সব কিছু। সুদূর কানাডায় একমাত্র বাঙালী যুবকের নিপুণ পরিচালনায় "টরন্ ট্রেড-এর গ্যালারী" এক বিশেষ আকর্ষণীয় গ্যালারীতে পরিণত হয়। ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলা দেশের, হস্তশিল্পে ভরপুর এই গ্যালারীতে কেনা-কাটা করেন হাজার হাজার কানাডিয়ান। টরন্ ট্রেড গ্যালারীর সাজ-সজ্জা এবং রকমারি ভারতীয় হস্তশিল্প-জাত দ্রব্যের অভিনবত্বে "শো" পরিচালক-মণ্ডলীর কাছ থেকে উচ্চপ্রশংসিত প্রশংসাপত্র লাভ করেছেন সুকোমলবাবু। তাঁর বহুমুখী গুণপনার স্বীকৃতি হিসেবে "কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন" এবং নিউ ইয়র্কের "ন্যাশনাল ব্রড্‌কাস্টিং কর্পোরেশন" শ্রীখাসনবিসকে আমন্ত্রণ করে ভারতীয় এবং বর্মী হস্তশিল্প সম্বন্ধে টেলিভিসন বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করেন।

জনশ্রুতি আছে—বাঙালী পরিশ্রম তথা কর্ম বিমুখ। সমস্ত বাংলা দেশ আজ বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। কিন্তু বাঙালীকে আজ শুধু চাকুরিসর্বস্ব হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বেরিয়ে পড়তে হবে তাদের দেশবিদেশে। যথার্থ উদ্যম থাকলে জীবন-সংগ্রামে যে বাঙালীর জয়ী হওয়া সম্ভব তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ২৬ বছর বয়সের বাঙালী যুবক শ্রীসুকোমল খাসনবিস। বলা বাহুল্য, এঁর আদর্শ বাঙালীর অবশ্যই অনুকরণীয়। সুদূর প্রবাসে লক্ষ্মীর সাধনায় সুকোমলবাবুর প্রতিষ্ঠা শুধু তাঁর একার পক্ষে গৌরবের নয়, বস্তুত উহা সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে গৌরবের।

নৃপেন সেন

চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানি উন্নয়ন প্রকল্পের সমর্থনে যুক্তি

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ শতকরা সাত ভাগ বাড়াবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী আর ভেঙ্কটরমন সম্প্রতি এই প্রকল্পের সমর্থনে আট দফা প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে, (১) কৃষি এবং শিল্পকে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় যেরূপ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, রপ্তানি বৃদ্ধি প্রকল্পকেও তেমনি অগ্রাধিকার দিতে হবে। (২) কৃষির উপর যেসকল রপ্তানি-সামগ্রী নির্ভরশীল সেগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) চিরাচরিত জিনিসগুলির বাইরে নতুন জিনিসের রপ্তানি বাড়াতে হবে—বিশেষ করে লৌহ আকরিক, সিমেন্ট, কাগজ, রাসায়নিক সামগ্রী, ওষুধ এবং প্লাস্টিকের জিনিস প্রভৃতির রপ্তানি বাড়াতে হবে। যে যে ক্ষেত্রে রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব, সে ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে এবং বেসরকারী শিল্পগুলির দিক থেকে অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে লক্ষ্যে উপনীত হবার মত উৎপাদন বাড়ানো যায়। (৪) ভোগের যত দূর সম্ভব নিবৃত্তি করে রপ্তানি-ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি যাতে করা যায় তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (৫) রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবার জন্য বিভিন্ন দেশগুলির সাথে স্বল্প-মেয়াদী চুক্তির পরিবর্তে দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত করতে হবে। তা ছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রে যাতে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায় এবং সেই ঋণের টাকায় যাতে রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা হয় তার নিশ্চয়তা থাকা চাই—এবং এই নিশ্চয়তা যাতে বজায় থাকে সেভাবে সরকারের নীতি তৈরি করতে হবে। (৬) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিদেশীদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এটা সম্ভব হবে বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং এ ধরনের বিনিয়োগের উদ্দেশ্য শুধু রপ্তানির উন্নয়নের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না, দেশীয় জিনিসগুলির জন্য আভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তৃতি করাও তার লক্ষ্য থাকবে। (৭) যেসকল সরকারী প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্তও রপ্তানি সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি, সেগুলি যাতে এ ব্যাপারে আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। (৮) এ-দেশে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা, জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ করা প্রভৃতির মাধ্যমেও

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাড়ানো যেতে পারে।

যে আট দফা সুপারিশ শ্রীভেঙ্কটরমন করেছেন, সেগুলির কোনটিই নতুন নয়। অনেক সময়েই আমরা এ-জাতীয় সুপারিশ করেছি। কিন্তু সব ব্যবস্থা একসাথে গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আশা করা যায়, সরকার এ ব্যবস্থাগুলি ঠিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করবেন। রপ্তানি বাড়াতে গেলে প্রথমেই সামগ্রিক-ভাবে উৎপাদন বাড়ানো দরকার। ১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে রপ্তানির পরিমাণ যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি।

কলকাতা কর্পোরেশনের নগর-প্রবেশ শুল্ক

কলকাতা কর্পোরেশন যে নগর-প্রবেশ শুল্ক ধার্য করার প্রস্তাব করেছেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার আপত্তি করেছেন। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, এ শুল্ক ধার্য না করে কোথা থেকে কর্পোরেশন টাকা পাবে সে কথা কেন্দ্রীয় সরকার বলতে পারছেন না, যদিও সরকার স্বীকার করেন যে, কলকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক সংকট খুবই তীব্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর ভি কে আর ভি রাও কলকাতা কর্পোরেশন যে এতদিন এই শুল্ক ধার্য করেননি সেজন্য কর্পোরেশনের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বোম্বাই এবং মাদ্রাজ কর্পোরেশন বহু পূর্বেই এই শুল্ক ধার্য করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তো ঐ কর্পোরেশনগুলিকে এই শুল্ক প্রত্যাহার করতে বলেননি। কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য টাকা দেওয়ার কথা উঠলেই কেন্দ্রীয় সরকার বলেন যে, তাঁরা টাকা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, শুধু কর্পোরেশন ঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না বলে তাঁরা টাকা দিচ্ছেন না। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন যে টাকার অভাবে কোন কাজই হাতে নিতে পারছেন না এবং এই অর্থ-সংকট দূর করার জন্যই যে এই শুল্কের প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকার তা বুঝেও বুঝতে পারছেন না। যদি এই শুল্ক ধার্য না করা হয় তবে কলকাতা কর্পোরেশন টাকা পাবে কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর কি কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারবেন? যাঁরা এই শুল্কের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন তাঁদের জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের দরদ এত বেশী থাকে, তবে যাতে এই শুল্ক ধার্য না করতে হয় সেজন্য কলকাতা কর্পোরেশনকে তাঁরা বার্ষিক পাঁচ কোটি টাকা সাহায্য করলেই পারেন। কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য যতটা আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার, ততটা দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নেবেন না। কিন্তু কর্পোরেশন যদি এমন একটি শুল্ক ধার্য করে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে চায়, যা অন্যান্য সব কর্পোরেশনই করে থাকে, তবেই কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি।

কলকাতার জন্য চক্র-রেল, বোম্বাইয়ের জন্য ভূগর্ভস্থিত রেল

রেল দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ ঘোষণা করেছেন যে-চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় কলকাতায় চক্র-রেল হয়তো হতে পারে, ভূগর্ভস্থিত রেল হবে না; কারণ, ভূগর্ভস্থিত রেল তৈরি করার খরচ খুব বেশী। কিন্তু, বোম্বাই শহরের জন্য ভূগর্ভস্থিত রেল হবে। কারণ, বোম্বাইয়ের জন্য তা খুবই জরুরী এবং এজন্য টাকা যা-ই লাগুক না কেন, খরচ করতে হবে। বোম্বাই শহরে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা অফিস-এলাকায় আসার জন্য চক্ররেলের সুবিধা আংশিক ভোগ করেন; চার্চ গেট স্টেশনে এসে সব লোক্যাল গাড়ি থামে এবং অফিসগুলির অধিকাংশই ঐ এলাকায়। বরং চক্র-রেল বোম্বাইয়ে করা যত সহজ কলকাতায় করা তত সহজ নয়। অথচ ভূগর্ভস্থিত রেল স্থাপন করার ক্ষেত্রে বোম্বাইকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, কলকাতাকে নয়। মনে হয়, কলকাতায় একবার চক্র-রেল হয়ে গেলে বর্তমান শতাব্দীতে আর ভূগর্ভস্থিত রেল হবে না। কিন্তু কলকাতার জনসংখ্যা বোম্বাইয়ের চেয়ে বেশী। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা

থেকে জানা যায় কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় ৭৭ লক্ষ। চক্র-রেল হলেই যে কলকাতার পরিবহণ সমস্যার সমাধান হবে তা নয়। যদি ১০০ কোটি টাকাও খরচ হয়, তবুও কলকাতার জন্য টিউব-রেল করা উচিত এবং এই টাকার সংস্থান করা যেতে পারে যদি সরকার এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের যৌথ মালিকানায় একটি বোর্ড স্থাপন করে তার হাতে সব কিছুর ভার দেওয়া যায়। বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের দিক থেকে খরচ সম্পর্কিত গ্যারান্টি পেলে বাণিজ্যিক স্বার্থে এ কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। শোনা যাচ্ছে, সম্প্রতি কলকাতার ব্যবসায়ী সমাজ শহর-উন্নয়নের কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মিঃ ম্যাকনামারাও শহর-উন্নয়নের কাজে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। সরকার যদি এ কাজে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা সক্রিয়ভাবে কামনা করেন তবে হয়ত শুধু পরিবহণ সমস্যাই নয়, আরও অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সুব্রত গুপ্ত

কুবেরের বিষয়আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ক্ষিতি
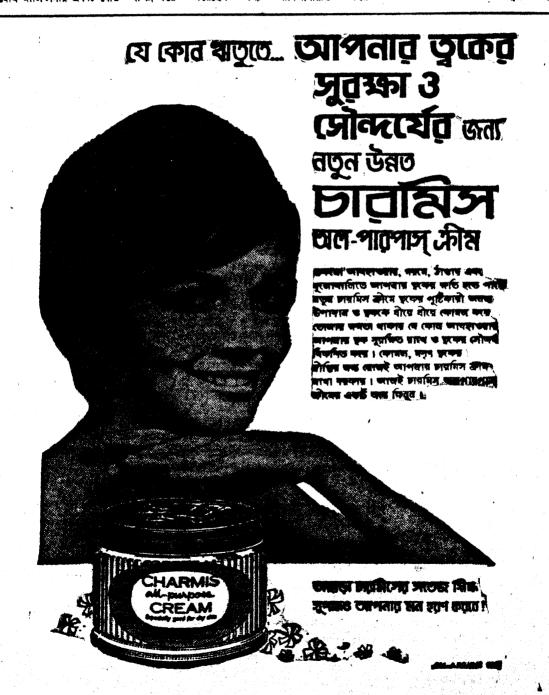
নীচু ক্লাশে কুবের বাংলা দেশের ম্যাপ এঁকেছে। অনেকবার। সবচেয়ে সোজা ছিল সমুদ্রের দিককার রেখাগুলো। পেন্সিল কাঁপালেই দ্বীপ, নদী, সাগর হয়ে যেত। এখন সেই সব জায়গার ভেতর দিয়েই চলেছে কুবের। পাশে ভদ্রেশ্বর গ্রেটকোটের মোড়কের মধ্যে বসে গরম গরম চিংড়িমাছ ভাজা খাচ্ছে। ভাড়া করা লঞ্চ একটার পর একটা শীতের নদী থেঁতলে দিয়ে এগোচ্ছে। সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছে দুজন। কুবেরের কারখানা আমলের নাইট ডিউটির কোটটার এতখানি সদ্ব্যবহার কোন দিন হয়নি। রাক্ষেশখালি, দুর্বাচটি, পাথরপ্রতিমা, চড়াবিদ্যা—মৌসিনির চর। এলোপাথাড়ি নদী আর তার মাঝে মাঝে এমন সব জায়গা।

ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে লাটঅঞ্চলের জায়গা দেখতে বেরিয়ে কুবের সকাল থেকে অনেক কিছু দেখেছে। ভাঁটায় নদী শুকিয়ে যেতে লঞ্চ চড়ায় আটকে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। অনেক কষ্টে উর্ধ্বশ্বাসে ফুলশপীড দিয়ে বড় নদীর বুকে এসে ভেসে পড়তে হয়। একচুমুকে চারদিককার জল শুষে যাচ্ছিল। তখন একদম কুবের অবাক হয়ে দেখছিল কত জায়গা জমি জলে ঢাকা পড়ে আছে। ভাঁটায় ফাঁকা নদীর বুক হিসেবে ধরলে কত জায়গা পৃথিবীতে। কথাটা ভদ্রেশ্বরকে বলল কুবের, 'এসব জায়গার বায়না করা যায় না?'

লঞ্চের খট খট আওয়াজ, কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে চর জেগে আছে। ভদ্রেশ্বর একটু অবাক হল। সে কুবের সাধুখাঁকে এদিককার জঙ্গল হাসিল জায়গা জমি দেখাতে এনেছে। বাবু এখন কোন্ জায়গার কথা বলছে।

'কোথাকার কথা বলছেন?'

'নদীর বুকে। ভাঁটায় কেমন গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে—'

'হাসালেন বাবু। এসব জায়গা ভগবান লীলা করে তৈরি করেছেন। এসব দখলে রাখবেন কি করে? জল শুধু জল। জল শুষে নিয়ে আবার ফেরত পাঠাবেন দুনিয়াদার। আপনার আমার কম্ম নয়।'

কুবেরের মন খারাপ হয়ে গেল। মাঠে মাঠে ধান কাটছে দেখে এসেছে কুবের। এদিককার লাটঅঞ্চলেও ধান কাটা পড়ছে। বাঁকের দুদিকে আঁটি বেঁধে দুলতে দুলতে জোড় বরাবর চাষীরা চলেছে। পৃথিবীতে এত জিনিসও আছে। ভাবলে মনে হবে যে-কোন একটা ভাল করে জড়িয়ে ধরলে একেবারে মাটির ভেতরকার রস সুদ্ধ শুষে নেওয়া যাবে। অথচ কত কঠিন।

'কদমপুরে যেখানে আপনি বাড়ি করলেন—সেখানেও একদিন সাগর ছিল। সে হয়ত কত পুরুষ আগে। আমাদের দেখার কথা নয়। তবে আমি বালক বয়সে নদীর সোতা দেখেছি ওখানে। আমাদের কর্তাবাবাকে ওখান থেকেই পথে তুলে নিয়ে গিয়েছিল—'

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তারপরেই এই ভদ্রেশ্বর। তার নখদর্পণে পৃথিবীর ওলটপালট, জলমগ্নতান্ত।

সস্তায় হাসিল জমি কিনিয়ে দেবে ভদ্রেশ্বর। তা-ই বলে কুবেরকে দিয়ে লঞ্চ ভাড়া করিয়েছে। অথচ কুবেরের আজ এখানে থাকার কথা নয়। দোতলার মেঝেতে পালিশ মিস্ত্রিরা কাজ করছে এখন। জয়পুরের পাথর জোড়ে বসিয়ে নিভাঁজ মেঝে তৈরি হয়েছে—বাথরুমেও পাথর। দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ননী বোসের ঝিল, কদমপুর রেল স্টেশন, নয়ানদের দোতলা, খড়িগোদার ধানক্ষেত সব দেখা যায়।

গৃহপ্রবেশের দিন কুবেরের বেশ লাগছিল। বড় বউদি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে কুবের, তার পেছনে বুলু—কাঁকালে এক হাঁড়ি কৈ মাছ। নতুন বাড়ির চারদিক ঘুরে মাছগুলো বুলু বাড়ির পুকুরেই ছেড়ে দিল। একটা মাছ আর যেতে চায় না। ঠাকুরমশাই বললেন, শুভচিহ্ন। চারদিকেই শুভ ব্যাপারের ছড়াছড়ি। শুধু মা আসেনি। আসতে পারেনি। বড়দার চাকরির জায়গায় গিয়ে জবর হয়েছে। পিওনদের ওপর দেখাশুনোর ভার দিয়ে বড়দা চলে এসেছে। কুবের জানত, এখানেই মার মন পড়ে আছে। সারা দিন খাটাখাটুনির পর বড়দা বলছিল, তোদের বাড়ির কথা মা জনে জনে ডেকে বলেছে। শুনেছো, আমার মেজো ছেলের বাড়ি হয়েছে—পুকুর কেটেছে সে এক পেল্লায় ব্যাপার।

লঞ্চের খট খট আওয়াজ, কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে চর জেগে আছে

খট খট আওয়াজ থেমে গেল। ভদ্রেশ্বর সারেঙঘর থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে এল, 'এসে গেছি—ওই দেখুন।'

হঠাৎ এমন নদী নালার মাঝখানে গম্ভীরভাবে পুরনো দিনের একটা বিশাল স্লাকচার দাঁড়ানো। আগেকার খিলেন গাঁথুনি। লঞ্চ আর এগোবে না। পাটাতন থেকে মাল্লারা ছোট ডিঙিখানা জলে নামাচ্ছে।

'ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। বুনো পেয়ারার ঝাড়—ফলে নুয়ে পড়েছে—পাতা দেখতে পাবেন না। ছোটবেলা থেকে এ পথে

যতবার গেছি—খালি ভাবতুম এমন সরেস জায়গায় আবাদ হয় না কেন? এখানে কোন মতে ধান ছড়িয়ে দিলেই মোটা মোটা গোছ ধান মাথায় নিয়ে ঠেসে উঠবে। নদীর পলি পড়ে পড়ে একেবারে দলদলে মাটি। এত দিনে আপনার একটা লোক পেলাম। কিছু টাকা ঢালুন—ধান উঠতেই পাঁচ ছ' গুণ হয়ে ফিরে আসবে।"

আইডিয়াটা কুবেরকে গোড়াতেই হিট করেছে। কদমপুরে ক'দিন ধরেই ভদ্রেশ্বর তাকে ভাপিয়েছে। এখন বাজার হল ধানের। কি মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন। সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন—পয়সা রাখবার জায়গা পাবেন না। কিন্তু একেবারে সামনা-সামনি এসে কুবের ভয় পেয়ে গেল।

আসলে বাংলা দেশের নীচের দিকটায় একটাই নদী—তার মাঝখানে বাংলা দেশ বানানোর সময় ভগবান এলোপাথাড়ি অনেকগুলো ছোট বড় মাঝারি দ্বীপ ছুড়ে

মাল্লাদের নিয়ে কুবেরকে একরকম হিঁচড়ে ওপরে নিয়ে ঠেলে তুলল

মেরেছিল। তাই চারদিকে গাদা গাদা নদীর মায়া। সকাল থেকে একটানা ঝকঝকে জলের দিকে তাকিয়ে কুবেরের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে খানিক সবুজ, খানিক পৃথিবীর মত ঘর বাড়ি দেখতে পেয়ে চোখ একটু ধাতস্থ হয়েছে। কিন্তু এ কি?

পাঁচ ছ' মাইল লম্বা হবে বোধহয়—আড়েও কম নয়। ঢাউস হয়ে নদীর মাঝখানে মাটি ঠেলে উঠেছে। তার ওপর পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে কত ফল পাকুড়ের বীজ এসে পড়েছে এই জনমানবহীন চত্বরে। অবাধে গাছপালা জন্মেছে, বেড়েছে—মরেও গেছে হয়ত। তার মাঝখান দিয়ে দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে ইটের দেওয়াল, পিলার, খানিক জায়গায় জানালা, দরজার খিলান—ছাদ নেই কোথাও। ছোট্ট ডিঙিখানা দুলে উঠল। পাড়ে ওঠাই দায়। ঢেউ সেখানে ননস্টপ আছাড় খাচ্ছে। ছলবল করে জল প্রায়ই মাটি তুলে নিচ্ছে খাদে—সেই সঙ্গে দাঁতন গাছের ঝাড়ও খাবলে নিচ্ছে।

'এখানে উঠবো কি করে?'

'ঘাবড়াবেন না। লাগ মেরে লাফিয়ে পড়তে হবে। কষ্ট না করলে—'

কিন্তু কেষ্ট লাভ করতে গিয়ে শেষে প্রাণ না দিতে হয়। কুবেরকে জড়োসড়ো অবস্থায় দেখে ভদ্রেশ্বর হেসে উঠল। গেঞ্জিকোটটা খোলেনি বুড়ো। একেবারে অ্যাডমিরাল গোছের চেহারা হয়েছে। বাতাসে মাথার সাদা চুল উত্তরে কাত হয়ে পড়েছে, 'এই করে জায়গা জমি করবেন? ভেবেছেন কি? সব আমি করে দেব।' তারপর সেই এক ফালি ডিঙির ওপরেই টালমাটাল হয়ে দাঁড়াল, 'ওই যে দেখছেন—ওটা হল মদনমল্লর গড়—প্রতাপরাজার সেনাপতি ছিল—এখান থেকেই ভারি ভারি জাহাজে চড়ে সমুদ্দুরে চষে বেড়াত।'

বহুবার দলিলে লিখতে হয়েছে—পরগণে মেদনমল্ল।

এই সেই মেদনমল্লর আখড়া।

তীরভূমি থেকে মাটি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে দ্বীপের ভেতরে একেবারে পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ তুলে দুর্গের সিঁড়িতে এসে থেমেছে। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল কুবেরদের। ভদ্রেশ্বর পেছপাও হবার লোক নয়। মাল্লাদের নিয়ে কুবরকে একরকম হিঁচড়ে ওপরে নিয়ে ঠেলে তুলল। হাঁপ ধরে গেছে। সেখানে বসে পড়ে কুবের সারা তল্লাটের একটা ছবি পেল।

তারিখের মমবর দেওয়া ঘড়িতে চব্বিশ। আজ চব্বিশে ডিসেম্বর। ঘড়ি না থাকলে বেলা বোঝা যেত না। এখন ঠিক দুটো। কুবেরের পেছনে কত বছরের পুরনো একটা দুর্গের কঙ্কাল হাড়গোড় বের করে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকে মেদনমল্লর দিঘি। দাম জমে তাতে জলের মুখ দেখা যায় না। পদ্ম শালুকের সঙ্গে রকমারি

ভদ্রেশ্বর রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেল। এই ছিল লোকটা। কোথায় গেল। সব জায়গায় এগোনোও যায় না। চিত্তির করা ফুল মেলে দিয়ে কতরকমের বুনো গাছ এই দুর্গের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠেছে। মাথার ওপরে ছাদ নেই। সেখান দিয়ে আলো পড়ে ভেতরটা লতায়-পাতায়, ভাঙা ইটে, শ্যাওলায় কারুকাজ করা ভেলভেট হয়ে পড়ে আছে। সাহস করে এগোতেই কুবেরকে পেয়ে গেল।

'ভদ্রেশ্বর এই আমার শোবার ঘর—'

বলতে ইচ্ছে করছিল, চমৎকার! নিয়ে এলাম আমি আর আর আপনি বলে দিলেন কোন্ জিনিসটা কার? কোথাকার? ভাল!

'এখানে বসে আমি কোটালের চাঁদের দিকে নজর রাখতুম—'

'হয়েছে। চলুন এবারে।' মাল্লাদের দিকে তাকিয়ে ভদ্রেশ্বর চোখ টিপতেই কুবের ছিটকে ভাঙা খিলানের ধাপ ধরে ওপরে উঠে গেল। এসব আমার ছিল। সেখান থেকে সারা তল্লাট কুবেরের চোখের নীচে ঠিকরে এসে দাঁড়াল। শ্যাওলায় পা রাখা যাচ্ছে না। এখনকার তুলনায় একেবারে পকেট সাইজের ইটের গাঁথুনি। তবে খুব চওড়া। দু' দুটো লোক দৌড়ে যেতে পারে তার ওপর দিয়ে। চারদিকে ইটের শ্রাদ্ধ হয়েছে। ভদ্রেশ্বর নীচে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলছে, 'আমার ঘাট হয়েছে কুবেরবাবু। আপনি ভালোয় ভালোয় নেমে আসুন। আমরা এবারে লঞ্চ ছেড়ে দেব। প্রাণটা খোয়াবেন না দয়া করে। বউমাকে আমি মুখ দেখাতে পারব না। দয়া করে নেমে আসুন—'

কুবের একচোট হেসে উঠল। সারাটা দুর্গ কাঁপিয়ে সেই হাসির আওয়াজ দিঘির চত্বরে গিয়ে আছড়ে পড়তেই পুরনো দামের ওপরের পাখির ঝাঁক একেবারে ছররা খেয়ে আচমকা দিগ্বিদিক হারিয়ে সাঁই সাঁই করে উড়তে লাগল। কাদার গাঁথুনির পরিগুলো দিঘির দু' ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সব ঢাকা পড়ে গেল। কত পাখি ছিল তাহলে!

'নেমে আসুন দয়া করে।'

'আমার জায়গায় ওরা কারা?'

'কোথায়?'

'ওই যে। দক্ষিণের তীরে গুন্তির নৌকো ভিড়েছে—'

ভদ্রেশ্বর পেছন ফিরে তাকিয়েই বুঝল, দূরে দূরে নদীর জেলেদের কাণ্ড। ছোট-বেলায় এদিকে বিচুলির নৌকোয় চড়ে ঘুরতে এসে দেখেছে, জেলেরা সমুদ্রের অখাদ্য কুখাদ্য কিম্ভূত সব মাছ পেলে ছাল ছাড়িয়ে দ্বীপের মাটিতে ফেলে ফেলে শুকোতো। কলকাতার ব্যাপারীরা সবরকম জিনিসই কেনে।

মুখে বলল, 'আপনি নেমে এসে বারণ করুন।' লোকটা যে এত বড় একটা পাগল কে জানত। অথচ সব সময় কেমন ভদ্রলোক সেজে বসে থাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার জেলেদের দেখতে গিয়েই ভদ্রেশ্বরের গা ছমছম করে উঠল। দিঘির পাড়ের বাঁধানো চত্বরে বিকেলবেলার রোদ পড়ে ভুল হয়ে যায়—এসব এই বুঝি সেদিনের তৈরি। একটু আগে লোকজন, দাসদাসী দিঘিতে জল সরে দুর্গের ভেতরে চলে গেছে। এখন সব চুপচাপ। যে কোন মুহূর্তে সেনাপতি মেদনমল্ল এসে পড়তে পারে। আসার সময় হয়ে গেছে।

দিঘিময় পাখির ঝাঁক এখন দুর্গের উঁচু উঁচু দেওয়ালের মাথায় সার দিয়ে বসে পড়েছে। তাদের ছুটোছুটিতে দু' একটা পালক এখনও শূন্যে। বাতাস ফুঁড়ে কিছুতেই নীচে নামতে পারছে না।

'কে?'

ভদ্রেশ্বর সামলে নিল নিজেকে। এতক্ষণে লোকটা তাহলে নেমেছে। মাল্লা দুটো কোনদিকে গেল।

'আমি।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। কি যে পাগলামি জুড়ে দিয়েছেন—'

কুবেরের দিকে তাকানো যায় না। চোখ লাল। সাতসকালের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেও হতে পারে। চুলগুলো খাড়া খাড়া হয়ে উঠেছে। হাঁটুর কাছে ধুতি ছিঁড়ে গেছে।

'এসব জায়গা আমার চেনা ভদ্রেশ্বর।'

'কি যে মন খারাপ করা সব কথা বলেন।'

'না। আমি এখানে ছিলাম। কবে ছিলাম মনে নেই। কিন্তু ছিলাম। সব চেনা।'

একটু শীতও লাগছিল ভদ্রেশ্বরের। লঞ্চে বসে ভালোমন্দ বা কিছু পেটে পড়েছিল—সব হজম হয়ে এখন নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ জ্বলছে।

'ভালো কথা। কেনা জায়গায় এবারে আবাদ করুন। কিন্তু আমি আর আপনাকে নিয়ে এখানে আসছি নে।'

'কেন ভদ্রেশ্বর। আমি কি করেছি।'

'কি করেন নি? অমন করে এই কবরখানায় কেউ দৌড়োদৌড়ি করে?'

'কবরখানা বলছ কেন? আমি এখানে ছিলাম ভদ্রেশ্বর। ওই যে আমার বৈঠক-খানা। ওই ঢালু জায়গায় গরুমোষের বাথান ছিল। এখনও আমি সব চিনে চিনে বের করতে পারি।'

'কাজ নেই। যত্ত গা গুলোনো কথা বলেন আপনি। এই করে আবাদ করবেন?'

ভদ্রেশ্বরের কথার ঝাঁঝে কুবের ফিরে এল। 'জায়গাটার কোন খাজনা নেই?'

'তবে বলছি কি। দশ জোড়া মোষের হাল করে কাজে নেমে পড়া শুধু। শীত থাকতে থাকতে লোকজন মালপত্র নিয়ে এখানে এসে নেমে পড়ুন। দখলে রাখুন। তারপর আষাঢ়ের পয়লা হপ্তায় জ্যাঠো রোয়া সেরে দিয়ে ফিরে যান। ধান আর দেখতে হবে না। অমর খন্দ হয় এই মাটিতে। আমি বলছি সাধুখাঁ মশাই—আমি জানি—গাছগাছালির পাতা দেখুন। ঘন, সবুজ—অমর খন্দ—'

আর কোন কথা কুবেরের কানে যাচ্ছিল না। ধানের ভারে সারা তল্লাট নুয়ে পড়েছে। লোকজন দেখা যায় না। কাঁড়টা মোষের মাথা ঢাকা পড়ে গেছে। দিঘির ধার দিয়ে পরির সারি আড়ালে চলে গেছে। কুঁজি বেঁধে বেঁধে চাষীরা সংসার করছে। ব্যাপারীদের নৌকোগুলোর গলুইতে আঁকা মাছ, মানুষের চোখ, নোঙরের আঁক—সব কিছু চিকচিক করছে। এক লহমায় কুবের সাধুখাঁ আগামী শীতের চেহারাটা দেখে ফেলল। এখনই বস্তা নব্বই বিরানব্বই টাকা। ধরে রাখতে পারলে—উঃ! ভাবা যায় না।

পাখিগুলো দেখল, খানিকক্ষণের জন্যে যে-চারটে মানুষ তাদের এখানে এসেছিল—এখন তারা হেঁটে হেঁটে নেমে যাচ্ছে। গড়খাই পার হয়ে গেল। এখন আর দিঘিতে বসা যাবে না। দাম ফুঁড়ে ঠাণ্ডা উঠছে। দেখা যায় প্রায়।

ভদ্রেশ্বরের পেছন পেছন কুবের সাধুখাঁ ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ফিরছে। মাল্লাদের একজন অল্প জলে বিশ্রী দেখতে একটা মাছ ধরে ফেলেছে।

ভদ্রেশ্বরের মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে প্রায়, 'এমন মাছ এখানে পেলি কোত্থেকে বাবারা? বড় দামি মাছ। রাঁধলে মাংস হয়ে যায়।'

কুবেরের কানে কিছুই গেল না। সারেঙ সিটি মারার দড়িটা ধরে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। আকাশের আধখানা জুড়ে সূর্য এবারে ঢল নেবে। রোদ এলিয়ে পড়েছে। ডিঙিতে পা দিতেই কুবেরের মাথার মধ্যে মেদনমল্লর বাগান, দিঘি, চত্বর, জলটুঙি সুদ্ধ সারাটা দুর্গ চলকে টাল খেয়ে গেল।

ক্রমশ

রঞ্জন

অবশেষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন রাজ্যসভায় ঘোষণা করলেন যে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক কাউন্সিল যদি তার উপাচার্য যোশীকে তদন্ত কমিশনে আসীন করতে বদ্ধপরিকর হয় তবে কেন্দ্র নিরুপায়, জগন্নাথ। ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের এবংবিধ সন্দেশ আমি বিনা প্রতিবাদে উদরস্থ করতে অসমর্থ। বেনারসী কলঙ্কের স্বাধীন তদন্ত সম্বন্ধেই সেনমশাই এই সেদিনও ছিলেন উদাসীন। ভাবখানা ছিল এই যে, অভিযুক্ত উপাচার্য যোশীই বিচারক নির্বাচন করলে দোষ কী? উকিল ত্রিগুণা সেন রাজ্যসভা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিরতিশয় তিরস্কৃত হয়ে বেনারসের আচার্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্র গড়করের নেতৃত্বে স্বাধীন তদন্তের। যোশী জানেন যে বেনারসের অতি স্বল্পসংখ্যক বিস্তীর্ণ সড়কের চাইতে অগণিত সংকীর্ণ গলির মাহাত্ম্য অনেক বেশি। দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিশু মাত্র। আহত ত্রিভঙ্গমুরারি ত্রিগুণা সেন তবু যদি ত্রিভাষায় সরব দাবি করেন যে বর্তমান ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর শিক্ষামন্ত্রকেরই বলিষ্ঠ সন্তান তাহলে অট্টহাস্য হবে অপ্রতিরোধ্য।

বেনারসী উন্মত্ততে আমি একেবারে ভগ্নহৃদয় নই। শিক্ষা প্রধানত রাজ্যের মাথাব্যথা, কেন্দ্রের অভিভাবকতা তথা শাসানি অনায়াসেই অত্যুগ্র বা অতিনিম্ন হতে পারে। ভাষার বেলায় শ্রীত্রিগুণা সেন শ্রীমোরারজি দেশাই থেকে এক কড়া ধমক খেলেন : অমনি বদলে গেল মতটা। সবার উপরে হিন্দী সত্য তাহার উপরে নাই। মাদ্রাজ নারাজ। তখন বুলি হোলো আঞ্চলিক ভাষার আধিপত্য। ইংরেজীও চাই বই কি। এই তেতারার সুর আমার কানে মধু বর্ষণ করছে না এবং ডক্টর ত্রিগুণা সেনকে সে কথা জানিয়ে দেওয়াই ভালো।

আমার মানসিকতা প্রধানত প্রাদেশিক, এমন অভিযোগ আদৌ স্বীকার করব না। দিল্লিতে বাস না করেও আমি নির্লজ্জ বাঙালী : বর্তমান বঙ্গাজীর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও আমার দায় নেই অকৃপণ প্রশস্তিবর্ষণের বা দুরাগত দুষ্টিকথনের বা ইষ্টকপ্রক্ষেপণের। তবু নানাপ্রকার উচ্ছ্বাস ব্যতিরেকে গত বিশ বছর লক্ষ্য করতে বাধ্য হয়েছি যে হিন্দীর অশ্লীল ও নগ্ন আগ্রাসিতার একাধিক বাঙালী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শরিক হয়েছেন। শুধু হিন্দীর নয়, হিন্দুয়ানির।
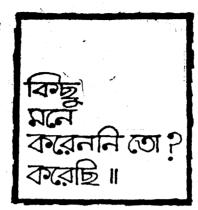
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পরিস্ফীত পদপ্রান্তে শ্রীত্রিগুণা সেনের বেশরম আত্মসমর্পণ ভাষা ও ধর্মের গণিতের অতীত। বাঙালীর চারিত্র্যের এমন হীন ও অনাবশ্যক অবমাননার নজির খুব বেশি নেই। উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যের ধারকরা আজ নাকি একান্তই স্থবির। হবে। বিংশশতাব্দীর বাঙালী সন্তান নাকি একান্তই মেকি, নকলনবিশ। তার নিজের ভাষা হত্যা করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হবে। নীরদ চৌধুরীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বৃথা যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গদ্যও অন্যান্য ভাষায় প্রতিভাবশূন্য ছিল না। কেন থাকবে? পরবর্তী প্রভাবকেও আমি গর্হিত বলে অগ্রাহ্য করতে অপারগ।

অতঃপর কিছু না লেখাই হয়তো বিধেয়। তবু না বলে উপায় নেই যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জনৈক বাঙালী শিক্ষার ও বাঙালীর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠার অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করছেন। নানা ঐতিহাসিক কারণে শিক্ষা আজ রাজনীতির অসহায় ক্রীড়নক। আরও অসহায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর না আছে মর্যাদা না ক্ষমতা। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর বিলম্বিত দাপট তাই হাস্যোদ্রেক করেছে। তার বেশি নয়। তদন্ত কমিশনে শ্রীযোশীর পরবর্তী অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনাও আমার কাছে গ্রাহ্য নয়। সময়মত হস্তক্ষেপে অশক্ত হলে আমি অন্তত সসম্মান পদত্যাগ প্রত্যাশা করি। ত্রিগুণা সেন আমাকে নিরাশ করেছেন।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সাম্প্রতিক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় নীরদ চৌধুরী বাঙালীকে শুধু অধীর বা খল বলে ক্ষান্ত হননি। বাঙালীকে পাঞ্জাবীর অনুসরণ করতে বলেছেন। কৃষির ক্ষেত্রে এমন উপদেশ নিশ্চয়ই শিরোধার্য। রামপ্রসাদ কেন সারাজীবন গেয়ে যাবে, "আবাদ করলে ফলত সোনা"। ছাই, আবাদ করো না কেন? কিন্তু এক দিল্লিবাসী শ্রীনীরদ চৌধুরী যদি অপর দিল্লিবাসী শ্রীত্রিগুণা সেনের সঙ্গে অপরিচয়ের আবরণ কিয়ৎকালের জন্য উন্মোচন করতে স্বীকৃত হতেন তাহলে হয়তো দেখা যেত যে শ্রীচৌধুরীর উপদেশ বাহুল্য মাত্র। আমি তো অনেক দিন আগেই বলেছি যে সকল পাঞ্জাবীর নাম সিং বা কপুর বা কাউল হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। হতে পারে সেন, ত্রিগুণা। হতে পারে, এমনকি, চৌধুরী। বাঙালীর বিরুদ্ধে অতি সঙ্গত অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু সে পাঞ্জাবী হয়েছে কি হয়নি—কিছু হয়েছে, কিছু হয়নি—সেটাকে আমি না পারি অনার্জিত নিন্দা বলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে, না পারি স্তুতি বলে অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করতে। আমার দ্বিধা ক্ষুণ্ণ হয় না নীরদ চৌধুরীর নিরবলম্ব ভর্ৎসনায়। আমার অপমানবোধ গভীরতর হয় ত্রিগুণা সেনের প্রতি পদলেহনের অনাবশ্যক অতিপ্রসরণে। খাঁটি বাঙলা বাক্য না হলেও শ্রীচৌধুরী ও শ্রীসেন আমার বক্তব্য মোটামুটি অনুধাবন করবেন বলে ভরসা রাখি।

প্রশ্নটা আসলে একেবারেই অজটিল। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালীর স্থান আজ একান্তই নগণ্য। কেন্দ্রের সোনার তরীতে ঠাঁই পেতে হলে ত্রিগুণ নয় সর্বগুণ বিসর্জন দিতে হবে হিন্দীভাষী কাশ্মীরী শ্বেত পদযুগলে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক গৃহিতীর উদ্দাম বাসনা অনুরূপ দাম দাবি করে থাকতে পারে। কে জানে?

আপাতত আমি একেবারেই ঘরকুনো। আমি চাইনে হতে বেদুইন। আমি না চাই দিল্লি যেতে না শান্তিনিকেতনে। তবু বহিরাগত বাঙালীর অপকর্মে বা প্রগলভতায় আমি একেবারে নিঃশব্দ থাকতে পারিনে। আমি জানতে চাই বারাণসীতে হিন্দু দৌরাত্ম্য কী উন্মত্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, বাঙালীর অকরুণ অপপ্রেরণায়। আমার জানা দরকার দিল্লিতে সামান্য বাঙালী উপস্থিতি আজকের সর্বভারতীয় অর্থাৎ আগ্রাসী হিন্দী পরিস্থিতিতে ঠিক কী পরিমাণে নিঃসহায় আর নিরর্থক। তবে কেন সেই সত্য অসহযোগ? বাঙালী তো এ ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল না।

ক্যানভাস শিল্পী গোষ্ঠীর সভ্যগণ সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁদের তৃতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। এই গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ সকলেই তরুণ এবং নিয়মিতভাবে কাজ করার জন্য এঁদের মধ্যে কয়েকজন শিল্পীসমাজে পরিচিতিলাভ করেছেন। প্রদর্শনীতে ১২ জন শিল্পী ও দু'জন ভাস্করের রচনা নিদর্শন দেখা যায়। অঙ্কন-রীতিতে প্রায়-সকলেই আধুনিকপন্থী, যদিও প্রত্যেক সভ্যই আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ নিদর্শনই পরীক্ষামূলক. এক দিকে যেমন কয়েকটি ভাল রচনা চোখে পড়ে অন্য দিকে তেমন দুর্বল রচনাও দেখা যায়। তবুও শিল্পীগোষ্ঠী যে নির্বাচন ব্যাপারে যত্নশীল হয়েছেন সেটা প্রদর্শনী দেখে বোঝা যায়।

প্রথমেই স্বপেশ চৌধুরীর দুটি রচনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতিপূর্বে আধুনিকতম মাধ্যমে রচিত কয়েকটি কম্পোজিশনের জন্য শিল্পী সুনাম অর্জন করেন। প্রদর্শনীতে ইমপ্যাস্টো প্রথায় রচিত ছবি দুটিতে তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায়

[illegible] —অনিলবরণ সাহা

[illegible] রেখেছেন সত্য, তবে রঙ ও রেখাজালে দ্বিতীয়টির (২৪ নং) বিষয়বস্তু যেন একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মনে হয় বৃহত্তর ক্যানভাস ব্যবহার করলে শিল্পী বক্তব্যটুকু আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে পারতেন। গোবিন্দ কুণ্ডু তাঁর কম্পোজিশনের (৩২ নং) মধ্যে রচনা ক্ষেত্রের কারুকার্যের ওপর নজর দিয়েছেন। বরেন বসুর ছবির মধ্যে ডিপ্রেশন-এর নাম করা চলে। শূন্যস্থানটুকু ব্রাশের মোটা আঁচড়ে বিভক্ত করে তিনি সমবিমূর্ত রূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। অলোক ভট্টাচার্যের কাজ দেখে মনে হয় তিনি মনুমেন্টাল রিয়ালিজম-এর পক্ষপাতী (৩নং)। অশোক বিশ্বাসের রচনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল; সমগ্র আকারটিকে তিনি খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ করেছেন সত্য কিন্তু তাতে যেন বিচ্ছিন্নতাই প্রকট হয়ে উঠেছে. এগুলির মধ্য দিয়ে অখণ্ড ও সম্বন্ধ রূপটুকু তিনি ফোটাতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও প্রচেষ্টা হিসাবে ২নং-এর নাম করা যায়। দু'-একটি রচনায় ভাস্কর্য ও নীল রঙীন কাচের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যেমন ২৬নং (শক্তি চক্রবর্তী) ও কম্পোজিশন (ত্রিদিব চন্দ্র)। অন্যান্য ছবির মধ্যে ২৭ (সুখেন্দু দাস), ১৫ (প্রফুল্ল পাল), ৮ (বলাই কর্মকার) ১৩ (নারায়ণ চৌধুরী) ও ১৮ (পরিমল দত্তরায়)-র নাম করা চলে। ভাস্কর্য বিভাগে মানিক তালুকদারের ব্ল্যাক পার্ল (প্লাস্টার অব প্যারিস) উল্লেখযোগ্য। গঠনরীতির সৌন্দর্য ও আয়তনিক দক্ষতা, বিশেষ করে নারীদেহসুলভ কোমলতা সৃষ্টি করে ভাস্কর প্রশংসা দাবি করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে সুধীর ঘরের একটি কাজও চোখে পড়ে [illegible]। [illegible]

যে মাধ্যম ব্যবহারে সুপটু, সেটা তাঁর [illegible]-কৌশল দেখেই জানা যায়।

*

শিল্পী অনিলবরণ সাহাও বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এটি তাঁর তৃতীয় প্রদর্শনী ও এখানে তেল ও জলরঙে আঁকা তাঁর ৩২টি রচনার নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী দুটি রঙই ব্যবহার করতে জানেন, তবে মনে হয় জল-রঙে আঁকা ছবির মধ্য দিয়ে তাঁর রচনা-কৌশল বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। শিল্পী প্রধানত প্রাচীন লোকচিত্র থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন ও সেইগুলিই বৃত্ত, ত্রিকোণ ও নানা প্রতীকের আকারে সুন্দরভাবে ফুটে-

স্থানে স্থাপন করে বিভিন্ন রঙে ভরে ফেলেছেন। কয়েকটিতে শিল্পীর সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন আনসার্টেন ফিউচার। প্রতীক হিসাবে লম্বমান ও সমান্তরাল রেখাসমষ্টি ও গতিশীল চক্র এঁকে তিনি অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীর অন্যান্য কাজগুলি সুন্দর, কয়েকটি দেখে এ. এ. রাইবার ছবির কথা মনে পড়ে যায়। দেশের নানা জাতীয় প্রাচীন পুতুল ও খেলনার মধ্যে তিনি শিল্পসম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছেন ও লোকচিত্র ও পুতুল-খেলনা দুটির আকারই সযত্নে রচনাক্ষেত্রে স্থাপিত করে অবশিষ্ট স্থানটুকু কোনও গভীর রঙে ভরে ফেলেছেন। ফলে এই শ্রেণীর রচনাবলীর মধ্যে যেন কবিতার একটি সুললিত ছন্দের পরিচয় পাই। অমল হিদেন ওয়াল আর্টিকস। রঙের স্তরভেদ কেয়ারকার্য ও পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে আর্চ(২) একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। রঙ ব্যবহারগুণে ছবির প্রত্যেকটি বিন্যাসের মধ্যে যেন চিরন্তন রহস্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। বিভিন্ন

আথা রাইত —স্বদেশ চৌধুরী

প্রতীক ও মূর্তি স্থাপনের ফলে কয়েকক্ষেত্রে আলঙ্কারিক রূপ ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে পিলমসেস অব টয়ল্যান্ড-এর নাম করা যায়। দেখে মনে হয় যেন আলমারির তাকে সযত্নে সাজানো কয়েকটি খেলনা-বিশেষ। অপরাপর ছবির মধ্যে রিচুয়াল বিফোর অপারেশন ও দি আর্লি বিগিনস-এর উল্লেখ করা চলে।

*

সরকারী আর্ট কলেজে সম্প্রতি ফরাসী স্থাপত্য শিল্প নিদর্শনের এক স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। দ্বাদশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান শতক পর্যন্ত ফ্রান্সে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গীর্জা ইমারত, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে তারই স্থিরচিত্র প্রদর্শনীতে দেখা যায়। নানা পুরানো ও ঐতিহাসিক প্রাসাদ তথা ইমারত ও তাদের নির্মাণ প্রণালীর নকশার স্থিরচিত্রের পাশে সমসাময়িক কালে নির্মিত বিভিন্ন বাড়ির স্থিরচিত্র থাকায় সকলেই ফরাসী স্থাপত্যশিল্পের ধারা ও ক্রমবিবর্তনের পরিচয় পান। যুগের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে কিভাবে দেশের স্থাপত্যশিল্পের পরিবর্তন হয় তা প্রাচীনকালে ও আধুনিককালে ব্যবহৃত সোপান শ্রেণীর ছবি দেখেই বোঝা যায়। পুরোনো স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে নকশা সমেত এফেল টাওয়ার, টাঙ্কারিল ব্রিজ ও অ্যালবির প্যালেস দ্য বার্বির স্থিরচিত্রের উল্লেখ করা চলে। বর্তমান যুগের স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে যে স্থিরচিত্র দেখা যায় তার মধ্যে লে কর্বুজিয়ে (চণ্ডীগড়), কিনো ও ফলিয়াসাম (পেনজিরেট টাওয়ার), হেনরী বার্নাড (প্যারিসের রেডিও হাউস) ও নিকোলাস শফার (রিক্রিয়েশন সেণ্টার) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শহরতলী নির্মাণপ্রকল্প হিসাবে Place de L' etoile (প্যারিস)-এর নাম করা যায়। সাধারণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক স্থিরচিত্র ও নকশার সঙ্গে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যও দেওয়া ছিল।

*

শিল্পায়ন শিল্পী সংস্থা অ্যাকাডেমি ভবনে সম্প্রতি একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সংস্থার সভ্যদের হাতে তৈরি করা কাগজ থেকে শুরু করে অভিনন্দনপত্র, চিঠি লেখার কাগজ ও খাম, নকশাজাতীয় ছবি ও ল্যাম্পশেড প্রদর্শনীতে দেখা যায়। পরিকল্পনা ও ডিজাইনের দিক থেকে এগুলি সত্যিই সুন্দর, বিশেষ করে যাঁদের রুচি আছে তাঁরা এগুলির সদ্ব্যবহার করে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেন। দুঃখের বিষয় উপযুক্ত প্রচারের অভাবে নিত্যব্যবহার্য এ জাতীয় জিনিসের সন্ধান অনেকেই পান না। আশা করি এ বিষয়ে শিল্পায়ন শিল্পী সংস্থা যত্নশীল হবেন।

চিত্রপ্রিয়

মুক্তমেলা

গত শনিবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমার মনে হ'ল এইমাত্র তাড়িঘাড়ি আমাকে কোথাও বেরিয়ে পড়তে হবে। অথচ সকালে কোনো কাজই আমার ছিল না; পক্ষান্তরে এত ঠাণ্ডা ছিল সেদিন যে, কোনো কাজ থাকলেও বেরুতাম না, এমন কি বিছানা থেকেও নয়; কিন্তু হঠাৎ কি হ'ল, আমি তড়াক ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম বেশ ভোরবেলাই, পরে ফেললাম গরম প্যাণ্ট সোয়েটার, চা খেয়ে নিলাম এক কাপ খুব দ্রুত, তারপর চারমিনার টানতে টানতে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বেশ সকালই তখন শীতের দিনের পক্ষে, আটটার বেশিতো কিছুতেই নয়।

বাস স্টপে এসে দাঁড়িয়ে আমি সকৌতুকে নিজের এই হুড়দুড় করে বেরিয়ে আসার কারণ ভাববার চেষ্টা করি। হঠাৎ ঘুমই বা আমার তাড়াতাড়ি ভাঙল কেন, কেনই বা আমি বেরিয়ে এলাম, কোথায়ই বা আমার যাবার কথা, সমস্ত জিনিসটা নিজের কাছেই একটু হাস্যকর ঠেকছিল।—আমি বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ঠিক করি দমদমে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাব, আমার আসলে কোথাও দূরে বেড়াতে যাবার, সারাদিন আউটিঙ জাতীয় কিছু করবার ইচ্ছে হচ্ছিল। অন্যান্য দিন ফুর্তি হিসেবে ভাবি বার রেস্তোরাঁয় ব'সে গল্প করা বা সিনেমা থিয়েটার দেখা, কিন্তু আজ সকালে কোনো বন্ধ ঘরে ব'সে তৈরি খাবার খাওয়া বা অন্যান্য খাওয়া অচিন্তনীয়, এরকম ঠাণ্ডা দিনে দল বেঁধে ময়দান বা বোটানিকেল গার্ডেন, যে কোনো খোলা জায়গায়, দিন কাটাতে ইচ্ছে হয়। ভাবলুম দমদমে গিয়ে বন্ধুকে তাল দেব। কিন্তু বাসে উঠেই আমি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটু চিন্তা ক'রে কিঞ্চিৎ নিরাশ হ'য়ে পড়ি; কারণ আমার পকেটে মাত্র এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা রয়েছে, তা নিয়ে লোককে বেড়াতে যাবার তাল দেওয়া যায় নাকি! আর সেই মুহূর্তেই ভাবি, হায় কলকাতা, হায় কলকাতা নয়, হায় কলকাতা-বাসী তোমাদের এমন চমৎকার একটি ময়দান আছে, এমন কল্লোলিনী নদী বয়ে যাচ্ছে শহরের পাশ দিয়ে, তোমরা সেটা ব্যবহার করছ না—লণ্ডনে যেমন হাইড পার্ক, ন্যুইয়র্কে কোনি আইল্যাণ্ড, ঠিক তেমনি বিনা পয়সায় সবার আনন্দ করবার মত ময়দানে কিছু একটা ব্যবস্থা কর।

দমদমে পৌঁছে বন্ধুকে প্রস্তাবটি দিতেই সে বলল, আরে, ঠিক এই ব্যবস্থাই তো করা হয়েছে আজকে, খবরের কাগজেই তো আজ এক বিজ্ঞপ্তি রয়েছে যাতে কয়েকজন যুবক আহ্বান জানাচ্ছেন কলকাতাবাসীদের ময়দানে প্রতি শনিবার এক ধরনের মুক্ত মেলায় যোগ দিতে। যুবকরা জানাচ্ছেন, দুপুর দু'টোর সময় চৌরঙ্গি রোডের ওপর টাটা কোম্পানির নতুন বাড়ির উল্টো দিকে যে পুকুর আছে ময়দানে, তার ওই পাশে সবাই জড়ো হবে, সেখানে যার যা ইচ্ছে ফুর্তি করা হবে—কারুর বক্তৃতা দেবার ইচ্ছে থাকলে দিতে পারে, কেউ যদি চায় গান গাইতে সে গাইবে, ছবি নিয়ে আসুন কোনো তরুণ চিত্রকর, খোলা মাঠে প্রদর্শনী হোক, কবিরা রচনা পাঠ করুন, কেউ নাটক করতে চাইলে করে ফেলতে অসুবিধে নেই—উদ্যোক্তাহীন, সংগঠনহীন এক মুক্ত মেলা, কলকাতার লোকের স্বাধীনভাবে ফূর্তি করবার, মেলা-মেশা করবার একটা ব্যবস্থা।—প্রস্তাব শুনে আমি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম, কিন্তু পরক্ষণেই বাঙালি স্বভাবে কুটিল চোখে বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, ইলেকশন তো সামনে, এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক দলফল নেই তো! বন্ধু বললে, গিয়ে দেখাই যাক না কী ব্যাপার!

পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের বেশ দেরি হয়ে গেল। দু'টোর জায়গায় তিনটে পনেরো নাগাদ ময়দানে পৌঁছে দেখি প্রচণ্ড ভিড়, তিন-চারটে জায়গায় গোল হয়ে হয়ে লোক, কোথাও হচ্ছে গান, কবিতা, কমিক, ক্যারি-কেচার, কোথাও বা একাঙ্ক নাটক জমে গেছে, এক অংশে একটি বাচ্চা মেয়ে তার ছবির প্রদর্শনী করছে, আলোকময় দত্ত নামে জনৈক শিল্পী পাঁচটি কোলাজও রেখেছেন, আব-হাওয়া একেবারে জমজমাট। কলকাতার বহু কবি, চিত্রকর চোখে পড়ল, দেখলাম সমরেশ বসুকে, শম্ভু মিত্রও কিছুক্ষণের জন্য এসে-ছিলেন, লক্ষ করলাম নাম না-জানা আরো অনেক প্রতিভাবান গাইয়ে, অনেক সুন্দরী মেয়ে, শুনলাম আমরা আসার আগে নীরেন

চক্রবর্তী, সন্তোষ ঘোষ প্রভৃতিরা কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেছেন—প্রায় হাজার খানেক লোক সংগঠনহীন, উদ্যোক্তাহীন এই স্বাধীন মেলায় যোগদান করেছেন।

একটা ভিড়ে কোনোক্রমে ঢুকে পড়ে দেখি মৃত্তা সহযোগে এক ছিপছিপে যুবক "সোহাগ চাঁদবদনী ধনি নাচ তো দেখি" গানটা গাইছেন আর তার সঙ্গে হাততালিতে তাল দিচ্ছে প্রায় এক শো মেয়ে পুরুষ—প্রাণখোলা হাসি, এত অচেনা লোক একসঙ্গে মিলে পরস্পরে এত আনন্দ আগে করিনি কখনো। জটলার মাঝে যাঁরা বসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে সমরেশ বসু উঠে দাঁড়ালেন এর পর, জজ-মোক্তারের কাছে তিনি যতই দণ্ডণীয় এবং অপছন্দের হন, কলকাতার মানুষ লেখক হিসেবে, এবং মানুষ হিসেবে, তাঁকে যে কতটা ভালোবাসে সেটার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। সমরেশ গান করতে উঠে দাঁড়ালে যে বিরাট উল্লাসধ্বনি এবং হাততালি তাতে মনে হচ্ছিল যেন পাল উর্মারিগর বাট করতে নেমেছেন। সমরেশ সহজিয়া দুটি গান গাইলেন, শ্রোতৃমহলে একেবারে রোলারুলি।—কবিতা পড়তে উঠে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, "আমি একটা গানও গাইব", "চালিয়ে যাও মহারাজ!" হাঁক শোনা গেল পেছন থেকে, একটি মেয়ে শুনলাম তার বন্ধুদের বলছে, "এ-ই নীললোহিত, জানিস!" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় দুটি মেয়ে সমস্বরে প্রতিবাদ জানায়। কারণ কবিতাটির নাম 'মেয়েদের জন্য ভুল ছন্দে'—তারা চেঁচিয়ে বলে, "কি বললেন! মেয়েদের ছন্দজ্ঞান নেই?"—সুনীল অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দেন, "না, না, তা বলিনি, মেয়েদের কথা ভাবতে ভাবতে আমার ছন্দ গুলিয়ে গেছিল আর কি।" "এবার মেয়েদের গান করতে হবে"—এই দাবি তুলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বসে পড়লে জনতার প্রবল অনুরোধ শোনা যায় মেয়েদের প্রতি। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছিল কী সুন্দর সপ্রতিভ ছিলেন সেদিনের মেয়েরা, এত অচেনা লোকের ভিড়ে বাঙালি মেয়েরা সাধারণত বড় গুটিয়ে যায়, কিন্তু সেদিনের আবহাওয়াটার মধ্যে এমন একটা খোলামেলা ভাব ছিল, পরস্পরের সঙ্গে মৌখিক পরিচয় নেই অথচ কলকাতাবাসী সবাই, এক ধরনের হৃদ্যতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যেন, এমন একটা বোধ হচ্ছিল সবার মধ্যেই; মনে হচ্ছিল সে মুহূর্তে মনান্তর, মন কষাকষি, ঝগড়া, ঈর্ষা, নিন্দে, এসব নিতান্তই অবাস্তব ব্যাপার, স্বাধীনতা ও সমতার অভাবে সেগুলো আসে, সেগুলোর জনক সব রক্ষণশীল সংস্থা—আমরা যদি প্রত্যেকে এক একজন মানুষ হিসেবে আকাশের তলায় মিলি গিয়ে স্বাধীনভাবে, কুণ্ঠাহীনভাবে, তা হলে স্বাভাবিকভাবে আনন্দই করবার ইচ্ছে হবে, ঝগড়া নয়। আমি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম যখন জনতার দাবিতে দুটি খুব সুন্দর সরল ও উচ্ছল তরুণী গান গাইতে উঠে দাঁড়াল। খোলা মাঠে স্বাধীনভাবে গলা ছেড়ে মেয়েদের গান করতে দেখা যায় না, তাদের সর্বদাই আমরা বড় ত্রস্ত এবং সুরক্ষিত অবস্থায় দেখি, যেন প্রতিটি অচেনা পুরুষ এক একটি দস্যু; সর্বদাই বাছবিচার, ওর সঙ্গে মিশিস না, ওই পাড়া দিয়ে যাস না, ভিড়ের মধ্যে অনেক খারাপ "এলিমেন্ট" আছে সাবধান, এই জাতীয় নানা বাধা-নিষেধের দড়ি তাদের ঘিরে। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা গেল সেদিনের সামান্য উদাহরণ থেকে যে, যেখানে মেয়েরাও সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী, হইহই করে হাসছে, অচেনা ছেলের গানের সঙ্গে হাততালি দিচ্ছে, [illegible] দিচ্ছে [illegible], [illegible] দিচ্ছে উত্তর, সেখানে আবহাওয়া কি সুন্দর হতে পারে। সেদিনের অত ভিড়ে সবাই কো-এডুকেশনাল কলেজে পড়া তথাকথিত লিবারেল পরিবারের ছেলে ছিল এটা তো সত্য নয়—নানা ধরনের লোক ছিল, পাড়ার বখাটে ছোকরা থেকে আরম্ভ করে কলেজের অধ্যাপক সবাইকেই দেখেছি, কই একটিও তো কুরুচিপূর্ণ অথবা অস্বস্তিকর মন্তব্য বা হাবভাব লক্ষ করিনি। কারুর মুখ দেখেও মনে হয়নি যে, এই ধারায় কেউ চিন্তা করছে, কেউ গিয়ে বিরক্তও করেনি কাউকে। যখন নীল আর লাল কার্ডিগান পরা মেয়ে দুটি গলা ছেড়ে গান ধরল তখন কি সুন্দর ভাবেই না ধীরে ধীরে সবাই এসে গলা মেলালো তাদের সঙ্গে।

মেলায় তো আমার যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই প্রথম দিকের অনেক কিছু মিস করে গেছি। শুনলাম, আরম্ভ হল উৎসব একেবারে নিজে নিজে। দুটো নাগাদ কিছু ছেলেমেয়ে জড়ো হয় এসে, ইতস্তত সবাই ঘুরছে, কোনো তো প্রোগ্রাম নেই, বিরাট দল নিয়েও কেউ আসেনি, অতএব কি করি কি করি ভাব। কিন্তু কিছুক্ষণ কাটতেই, ভিড় আরেকটু বেড়ে গেলেই সবাই বুঝতে পারে যে, মেলাটা চালাবার দায়িত্বই প্রত্যেকের নিজেদের ওপর, নিজেরা কিছু করলেই হল—কোনো কর্তৃপক্ষ এসে ফিতে কেটে "স্টার্ট" বলে দিয়ে যাবে না। অতএব একজন ধরল গান গলা ছেড়ে, তখন আরেকজন কবিতা, দুজন বসল আর নেচে নেচে গাই, অন্যজন জমালো একাঙ্ক নাটক—মেলা নদীর মত নিজের খাতে এঁকে বেঁকে ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকল।

যে দিন এ লেখা বেরুবে তার মধ্যে দ্বিতীয় মেলার দিন এসে যাবে, সেদিন মনে হচ্ছে আরো বহু লোককে পাব, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে নিশ্চয়, কত বিচিত্র ঘটনা ঘটবে, গরম গরম হরেকরকম খাবার নিয়ে আসবে বেচতে বিক্রেতারা, ময়দান হাইড পার্ক বা কোনি আইল্যান্ডের চেয়ে আরো উত্তেজক স্থান হয়ে উঠবে।—লোকেরা এইভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে, "ঠিক আছে মেলায় চলে আসিস, শনিবার ওখানেই পাওয়া যায় আমাকে", কিংবা "আজ মেলায় আসছিস তো, তুই থাকিস, আমার পৌঁছতে একটু দেরি হবে", কিংবা "সুনিতা, তুমি সোজাই চলে যেও মেলায়, আমি থাকব", কিংবা "অরুণাংশুকে তো আমিও যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছি, কোথায় যায়, কিছুতেই ধরা যায় না—মেলাতেও গত শনিবার আসেনি, এই শনিবার তা হলে নিশ্চয় ওকে মেলায় পাওয়া যাবে।"

মৌলিনাথ

পূর্ববঙ্গে বর্ণবর্জন ও ভাষা-সংস্কারের রাজনীতি

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউনসিলর কিছু বর্ণ বর্জন ক'রে বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পূর্ববঙ্গে এখন এই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা-ভাষীদের হয়ত তেমন কিছু করণীয় নেই, কিন্তু বিষয়টি যেহেতু বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার নিয়ে, তাই এই বাংলার লোকেদেরও ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার, এমন কি চিন্তিত হবার কারণ আছে বৈকি।

শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ, অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৯৬৭ সালের ২৮ মার্চ প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে ১১ জন সদস্যের একটি কমিটী গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউনসিলের বক্তব্য, বাংলা বানান, ব্যাকরণ ও বর্ণমালা সংস্কার ও সহজকরণের উদ্দেশ্যে এই কমিটীর পরামর্শ অনুযায়ীই কাউনসিল এই পরিবর্তন ও পরিবর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই পরিবর্তন ও পরিবর্জনে কমিটীর চেয়ারম্যান স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহরই সম্মতি পাওয়া যায় নি। এ ছাড়াও কমিটীর অপর তিনজন সদস্য, বাংলা-উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক পরিচালক ডক্টর এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ এবং ফ্যাকালটি অব আর্টসের ডীন অধ্যাপক আব্দুল হাই এবং অধ্যাপক মুনির চৌধুরী এই পরিবর্তন ও পরিবর্জনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বাংলাভাষার এই রদবদলে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন, বলা বাহুল্য, তাঁরা হলেন সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং জন-সংযোগ প্রভৃতি বিভাগের কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ সরকারি কর্মচারি। ডক্টর শহীদুল্লাহর ন্যায় বিশিষ্ট ভাষাবিদ্, ডক্টর এনামুল হকের ন্যায় পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্ এবং পূর্ব পাকিস্তানের দুইজন ধ্বনিতত্ত্ববিদের দুই-জনই—অধ্যাপক আব্দুল হাই ও অধ্যাপক মুনির চৌধুরীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও শুধুই সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ধুয়ো তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউনসিলের বাংলাভাষায় এই ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ রদবদলের কী-ই বা এত প্রয়োজন হয়ে পড়ল? এর তাৎপর্য বুঝতে গেলে পূর্বের ইতিহাসে ফিরে যেতে হয়।

বাংলায় বানান সংস্কারের প্রচেষ্টা এই নতুন নয়, ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ও বিশিষ্ট ভাষাবিদদের নিয়ে বানান সংস্কার করেছেন। নিঃসন্দেহে বাংলাভাষা এতে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়েছে। বাংলা বানান ও ভাষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখনো পর্যন্ত তিনি সর্বাধুনিক সংস্কারক। শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সংস্কারকেই প্রায় সর্বতোভাবে মেনে চলেছেন। কিন্তু দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী পরেও গোটা বাংলাভাষীর ক'জন আমরা এই সংস্কার সম্পর্কে জানি বা সচেতন? এখনো স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মাথায় রেফসহ দ্বিত্ব ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার চলছে। বাংলা শব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঈ-কার ঊ-কারকে রেহাই দিয়েছেন। 'ণ' 'ষ'-এর বেলাতেও তাই করেছেন। বিদেশী শব্দের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থা একই। আমরা কি এখনো পর্যন্ত বাংলাভাষার এই ব্যাপক সহজীকরণ রপ্ত করতে পেরেছি? গাড়ি, কুমির, হাতি না লিখে ব্যাপকহারে কুমীর, হাতী, গাড়ী লিখি। বিদেশী শব্দ থেকে ব্যাকরণের 'ণত্ব-বিধান' আর ষত্ব-বিধানকে রেহাই দেওয়া সত্ত্বেও 'ট্রেন', 'জার্মান', 'মাস্টার', 'কমিউনিস্ট' ইত্যাদি না লিখে

লিপি 'ট্রেণ', 'জার্মাণ', 'মাস্টার', 'কমিউনিষ্ট' প্রভৃতি। আসলে মানুষ অভ্যাসের দাস। আমরা ছোটোবেলা থেকে যেমনটি লিখেছি, তেমনটি লিখতে অসুবিধা বোধ করিনে, আর করলেও বেশির ভাগ লোক আমরা তা নিয়ে মাথাই ঘামাই নে। পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে এইসব কথা আরো অধিক প্রযোজ্য। তবু, কেন পূর্ববঙ্গে ব্যাপক ভাষাসংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ল? তা ভাববার বিষয়।

বাংলাহরফ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা পূর্ব-পাকিস্তানে এই নতুন নয়, পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া থেকেই এর শুরু। ১৯৪৭ সালেই বাংলা হরফ পরিবর্তনের আওয়াজ ওঠে। ফজলুল রহমান শিক্ষামন্ত্রী থাকা-কালে বাংলা বর্ণমালার দু-চারটি বর্ণবর্জন নয়, গোটা বাংলা বর্ণমালাই উৎখাত করে আরবী হরফকে তার স্থলাভিষিক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল, বাংলা বর্ণমালা দেবনাগরী থেকে সৃষ্ট। সে-হরফ হিন্দুদের। হিন্দুদের হরফ দিয়ে মুসলমানদের কাজ চলতে পারে না। তাই বাংলাভাষার 'ধর্মান্তরের' জন্য তার হরফের ধর্ম পরিবর্তনও অপরিহার্য। শুধু আরবী হরফই নয়, কোনো কোনো 'সংস্কারক' আবার 'অবৈজ্ঞানিক' বাংলা অক্ষর বাদ দিয়ে রোমান হরফ প্রবর্তনেরও সুপারিশ করেন। ১৯৪৮ সালে পূর্ববাংলার ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ বাংলাভাষার ওপর সর্বপ্রকার হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই 'ইসলাম' এবং 'বিজ্ঞানের' এই জয়যাত্রা ব্যাহত হ'ল। '৪৮ সালের ভাষাআন্দোলনের পর আবার হরফ বদলের প্রশ্ন উঠলো। ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ-সরকার মৌলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে হরফ-সংস্কারের প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য একটি 'ভাষা কমিটী' গঠন করেন। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ওই কমিটী সরকারের কাছে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে জনমতের কথা বিবেচনা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য রিপোর্টটি চাপা দেওয়া হল। আয়ুব ক্ষমতায় আসার পর ১৯৫৮ সালে সেই রিপোর্ট প্রথম প্রকাশিত হয়।

সেই রিপোরটে কতগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করে তা নিরসনের জন্য কতগুলি উদ্ভট সুপারিশ করা হয়। কমিটীর প্রথম এবং প্রধান উদ্বেগ ছিল বাংলাভাষায় হিন্দু ও সংস্কৃত প্রভাব। পূর্ববঙ্গে বাংলাভাষা থেকে এই প্রভাব মুছে ফেলার জন্য কমিটী সুপারিশ করল হিন্দু ধর্ম, পুরাণ প্রভৃতির শব্দ ও বাক্যরীতি বর্জন করে অসংস্কৃত ও 'ইসলামী' শব্দ প্রয়োগ করা। যেমন, 'আমি তোমায় জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না'-এর স্থলে 'আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলব না' করা।

কমিটীর দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় ছিল, ভাষার সরলীকরণ। তাদের ভাবটা এই, বর্তমান পর্যায়ে বাংলাভাষা এত কঠিন যে এ-ভাষায় কোনো গুরুতর আলোচনা করলে সাধারণের তা বোধগম্য হওয়ার উপায় নেই? তাই ভাষা সরল করা আশু প্রয়োজন? এই প্রয়োজনের তাগিদেই কমিটী 'সহজ বাংলা' নামে এক ধরণের গদ্য রচনার প্রস্তাব করেন। যেমন, কমিটী উদাহরণ দিয়ে বলেছেন 'মাস শেষে দেনা শোধ করব'-এর জায়গায় 'মাস আখেরিতে করজ আদায় করব' করা।

কমিটীর তৃতীয় চিন্তার বিষয় ছিল বাংলা হরফের অবৈজ্ঞানিক চরিত্র এবং তার অনুপযোগিতা। প্রথমতঃ, বাংলা বর্ণের সংখ্যা এত বেশি যে, টাইপরাইটারে তার ব্যবহার দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, তা কোমলপ্রাণ শিশু এবং সরলপ্রাণ জনসাধারণের শিক্ষার পক্ষে মস্ত বাধা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা বেশ কিছু বর্ণবর্জনের ঢালাও সুপারিশ করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউন-সিলের বানান ও ভাষা-সংস্কারের মোদ্দা-কথাটা প্রায় একই। তাই ভাষা কমিটীর উদ্বেগ তিনটি এবং তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করলেই এবারকার বানান ও ভাষা সংস্কার সম্পর্কে অনেকটা আলোকপাত করা হয়ে যাবে।

প্রথম প্রশ্নটি ভাষাগত নয়, প্রশ্ন গোঁড়ামির। এতকাল হিন্দুদের পুরাণের শব্দ চলে এলো, দেশ ভাগ হতে-না-হতেই রাতারাতি তা মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়াল! পুরাণের শব্দ প্রয়োগ ও উচ্চারণে যদি বাধা থাকে তাহলে তাদের গ্রীকসাহিত্য থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক সাহিত্যই বাংলায় অনুবাদ করণ এবং পঠন-পাঠন থেকে বাদ দিতে হবে সেগুলি ইসলামী নয় বলে। প্রশ্নটি অবান্তর, তাই অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সমাজ বিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আলরের কথায় দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাক : "ভাষা কমিটির দ্বিতীয় উদ্দেশ ও প্রস্তাবের অর্থ দাঁড়ায়, 'জনসাধারণ' চিরকাল অশিক্ষিত 'সরলপ্রাণ' জনসাধারণই থাকবে। তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান কোনোদিনই উন্নত হবে না। কাজেই তাদের উন্নত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে শিক্ষা-দীক্ষাকে তাদের বোধশক্তির আওতায় এনে দাঁড় করাতে হবে। প্রস্তাবটিতে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সহজেই লক্ষণীয়।" এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভাষা সরল না করলে লোক শিক্ষিতই বা হবে কী করে? তার উত্তরে বলা চলে, রাতারাতি কেটেছেঁটে বাংলা বর্ণমালা ইংরেজি বর্ণমালার সংখ্যায় দাঁড় করালেই কি শিক্ষিতের হার আমাদের দেশে দু-চার-দশ বছরেই ব্রিটেনের সমান পৌঁছবে? না, চীনে বাংলার বর্ণমালা থেকে ঢের বেশি বর্ণমালা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার শিক্ষা-দীক্ষা রুদ্ধ হয়ে আছে?

তৃতীয়, বাংলা বর্ণমালা ও বানান-রীতি অবৈজ্ঞানিক এবং মুদ্রণ ও টাইপ-রাইটারের অনুপযোগী। নিজের বর্ণমালাকে অবৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন করার এত চেষ্টা বাঙালীদের মতো আর কাউকে করতে দেখা যায় না। আমরা যে-বর্ণমালা ও বানান-রীতিকে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক বলে মনে করি, সেই ইংরেজী বর্ণমালা ও বানান-রীতি থেকে বাংলা বর্ণমালা ও বানান-রীতি তো অবৈজ্ঞানিক বা অনুন্নত নয়ই বরং অনেকের মতে, উন্নত। বাংলায় 'ক' লিখলে 'ক' ভিন্ন অন্য কোনো বর্ণ উচ্চারিত হয় না এবং 'ক'-এর পরে 'ত' লিখলে 'কতো'-ই সকলে পড়বেন। তর্কের খাতিরে যদি বলা যায় 'কতো' না পড়ে কেউ হয়ত 'কত্' পড়তে পারেন। কিন্তু কেউ পড়েন কি? পড়ে থাকলেও তার সংখ্যা আঙুলে গোনা যাবে এবং তাঁদের শিক্ষিতের দলে ফেলা যাবে না। কারণ, ভাষা অভ্যাস এবং অনুশীলনেরই ব্যাপার। এইটুকু অনুশীলনেও যাঁরা অপারগ পৃথিবীর কোনো ভাষাই তাঁরা সারা জীবনেও রপ্ত করতে পারবেন না। কিন্তু ইংরেজীতে একটি বর্ণের চার-পাঁচটি পর্যন্ত ধ্বনি উচ্চারিত হয়। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে অনেক বর্ণ অনুচ্চারিত, অর্ধ-উচ্চারিত এবং বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এমন কি কোনো কোনো সময় বানান বিভ্রাটের জন্য উচ্চারণ করাই দায় হয়ে পড়ে। ইংরেজী 'c'-এর কথাই ধরা যাক। 'c' কখনো 'ক' (cot) কখনো 'চ' (check), আবার কখনো বা 'স' (Cinema) উচ্চারিত হয়। অনেক সময় অক্ষরের কোনো কোনো বর্ণ অনুচ্চারিত থাকে। যেমন, knight (নাইট), psychology (সাইকোলজি), palm (পাম) ইত্যাদি। আবার দুটি বর্ণের সাহায্যেও একটি ধ্বনি উচ্চারিত হয়—যেমন, gh (ঘ)। আর এ-সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা রীতিনীতিও নেই। অথচ দেখা গেছে, বাংলায় শুধু স্বরবর্ণ, আ-কার ই-কার এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শিখেই বাংলাভাষী তো বটেই, বিদেশীরা পর্যন্ত খুবই অল্প সময়ে বাংলা যতটা শুদ্ধভাবে লিখতে ও বলতে পারে অন্য কোনো ভাষায় তা সম্ভব হয় না।

মুদ্রণ ও টাইপ-রাইটারের ব্যবহারের প্রশ্নে বলতে হয়, হরফের সংখ্যা বেশি বলে টাইপ-রাইটারের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য টাইপ-রাইটারে সংস্কার ও উন্নতি না করে হরফই কেটে-ছেঁটে বাদ দিতে হবে—যুক্তিটা উদ্ভট বৈ কি। দেখে-শুনে মনে হয়, মানুষ যন্ত্র আবিষ্কার করে নি এবং মানুষের [illegible] মানুষে। চীনা এবং জাপানীরা এখনো তাদের ভাষায় টাইপ-রাইটার ব্যবহার করে না। চীন ও জাপানের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিস্ময়কর আর্থিক উন্নয়নের কথা মনে রেখে এ কথা নিশ্চয়ই মনে করার কারণ নেই যে, টাইপ-রাইটার ছাড়া বাংলাভাষীদের উন্নতি অসম্ভব। তাছাড়া বাংলা টাইপ-রাইটার কটি প্রতিষ্ঠানই ব্যবহার করে? পূর্বপাকিস্তানে তার সংখ্যা ডজন দুয়েকের বেশি নয়। সারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সংখ্যা দুই। বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই এ-হেন হাল হলে ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কথা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য, পূর্বপাকিস্তানের থেকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা টাইপ-রাইটারের ব্যবহার অনেক বেশি। তবু ইংরেজী টাইপ-রাইটারের

তুলনায় সংখ্যাটা খুবই সামান্য। বাংলা টাইপ-রাইটারের চাহিদা বাড়লে কোম্পানী নিজেদের গরজেই তার সংস্কার ও ইংরেজী টাইপ-রাইটারের মতোই তা ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হবে। বিনা লাভে তারা কেন এই নিয়ে মাথা ঘামাবে? এই প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য বাংলা ভাষা সংস্কারের আশু প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন জন সাধারণের মনে বাংলাভাষা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা। ইচ্ছে করলে বাংলাভাষীদের প্রয়োজন অনুসারে টাইপ-রাইটারের যে সংস্কার সম্ভব আমেরিকার সর্বশেষ ডিজাইনের টাইপ-রাইটারের প্রতি তাকালেই তা বোঝা যায়। এই টাইপ-রাইটারে এ-কার ফলা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য আর back space দিতে হয় না। তাতে টাইপের গতি অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অভ্যাস করলে এই টাইপ-রাইটারেই সাধারণভাবে ইংরেজীর মতো সমান গতিতে টাইপ করা সম্ভব।

এবারে আসি মুদ্রণযন্ত্রের প্রশ্নে। এটা অবশ্য স্বীকার্য মুদ্রণযন্ত্রে উন্নতির অবকাশ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের উন্নতির ইতিহাস স্মরণ রাখলেই দেখা যাবে যে, ইতিমধ্যেই বাংলা মুদ্রণযন্ত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এবং [illegible] প্রয়োজনে তা হয়েছে। তার জন্য বর্ণমালাকে ছেঁটে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় নি। [illegible] চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে [illegible] সংস্কারও হবে। মুদ্রণযন্ত্রের উন্নতির জন্যে পাকিস্তানে [illegible] মুদ্রণযন্ত্র তৈরির কাজ [illegible]। [illegible] ইংরেজী মুদ্রণের [illegible] চাবি [illegible] এতেও তাই থাকবে। [illegible] ছোটো বড় মডেল [illegible] এতে [illegible] থেকে [illegible] চাবি থাকবে। বাংলায় ইংরেজীর capital এবং small বর্ণ নেই। তাই ইংরেজীর মতো একই ফলাকে দুটো বর্ণ বিন্যস্ত করা যাবে। এই যন্ত্রে ক্যাপিটাল লেটারের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যবহৃত বর্ণসমূহ রাখা হয়েছে।

যে ভাষা ও বর্ণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো ক্ষণজন্মার সৃষ্টি ক্ষমতা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হল না, হঠাৎ তা সংস্কারের এমন কী-বা প্রয়োজন হয়ে পড়ল! পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলারই এমন কোনো সাহিত্যিকই সম্ভবত দাবি করতে পারবেন না যে, বাংলা বর্ণমালা, বানান বা ভাষার জন্য তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে যার জন্য তার আশু সংস্কারের প্রয়োজন হতে পারে। এখন প্রশ্ন হতে পারে কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল রাতারাতি বাংলা বর্ণমালা থেকে ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, ঙ, ণ, ষ এবং ঈ-কার, ঐ-কার, ঊ-কার ইত্যাদি বর্জন, যুক্তবর্ণের উচ্ছেদ সাধন, ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা ইত্যাদির পরিবর্তে দ্বিত্ববর্ণ গ্রহণ, শ-স এবং ষ-জ নবোদ্ভাবিত নিয়মে প্রয়োগ, এ-কারকে বর্ণের ডান দিকে আনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? এই সব বর্ণ বর্জনের সত্যিই কোনো প্রয়োজন আছে কিনা বা তা বর্জন যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।। এ-বর্ণবর্জনের যে প্রয়োজন নেই তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এবং তা বর্জন যুক্তিযুক্ত কিনা পূর্বপাকিস্তানের ৪১জন বিশিষ্ট সাহিত্যকার, সংবাদিক, শিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের বাংলা ভাষার এই গুরুত্বপূর্ণ রদবদলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ থেকেই বোঝা যাবে। তাঁরা এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

ভাষা এবং লিখন-প্রণালী আপন প্রবণতা অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মে বিবর্তিত হয়। জোর করে ভাষা বা বর্ণমালা সংস্কার সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত এই বর্ণমালা, বানান-রীতি, লিখন-পদ্ধতি চালু হলে ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হবে। এর ফলে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পূর্বপাকিস্তানের বাংলাভাষীদের সাধারণ সম্পর্কও বিনষ্ট হবে। শব্দ তার পূর্বতন ব্যবহার ও ব্যুৎপত্তিগত ভাবার্থের অনুষঙ্গ হারিয়ে ফেলবে, কতিপয় ছন্দ-প্রকরণের নিয়ম বিপর্যস্ত হবে এবং ভাষাকে ব্যাকরণের সূত্রাকারে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ও বানান নির্ধারিত হয়। এই রদবদলের ফলে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টিও ব্যাহত হবে। ফলে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য হয়ে পড়বে পঙ্গু।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন, ইসলামী অ্যাকাডেমির ডাইরেকটর শ্রীআবুল হাশিম, বেগম সুফিয়া কামাল, 'সংবাদ'-সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, 'সমকাল'-সম্পাদক সিকান্দর আবু জাফর পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল্লাহ কায়সার, 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, প্রখ্যাত সাংবাদিক কে জি মোস্তাফা, সাহিত্যিক ও চিত্র-পরিচালক জহির রায়হান, পূর্বপাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আতাউস সামাদ, অধ্যাপক শওকত আলী, কবি শামসুর রহমান, 'বেগম'-সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম, সাংবাদিক শ্রীওয়াহিদুল হক, আবদুল গণি হাজারি, শ্রীখালেদ চৌধুরী, লেখক-সংঘের সাধারণ-সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, 'আওয়াজ'-সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ, 'দৈনিক আজাদ'-এর বার্তাসম্পাদক আব্দুল আউয়াল, আব্দুর গফফার চৌধুরী, বেগম লায়লা সামাদ, অধ্যাপক মুনসুরুদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ ব্যক্তি। এঁরা সকলেই বিদগ্ধ এবং পূর্ববঙ্গে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাঁদের বক্তব্য হেলাফেলার নয়।

কোনো ভাষায়ই পূর্বপুরুষ বা পিতৃ-পরিচয় হীন নয়। বাংলা ভাষা থেকে এই সব বর্ণমালা বর্জন করলে সংস্কৃতের সঙ্গে তার আর পরিচয় থাকবে না। পিতৃ পরিচয়-হীন সে-ভাষাকে আর তখন বাংলা বলে চেনাই যাবে না। ণত্ব ষত্ব এর গুটিকয় নিয়ম শেখার ভয়ে বর্ণমালা থেকে 'ণ' ও 'ষ' বিদায় দিয়ে অসংখ্য বিপর্যয় ডেকে আনা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। 'ণ' এবং 'ষ' উঠিয়ে দিলে মন-মণ, পানি-পাণি, বিষ-বিশ প্রভৃতির অর্থ পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে কী করে? এই ধরনের শব্দ দিয়ে এমন সব বাক্য রচনা আকছারই হয় যাতে একই শব্দ দু' রকম অর্থেই গ্রহণ করা চলতে পারে। এই দুইটি বর্ণ বর্জন করে বাংলা বর্ণমালা থেকে দুটি বর্ণ কমানো এবং ণ-ত্ব ষ-ত্ব-এর বিধান লেখার হাত থেকে রেহাই পাওয়াতে বিশেষ কিছু উপকার হবে না। কিন্তু অপকার হবে অনেক। অর্থ-বিপর্যয় তো ঘটবেই, তাছাড়া এ যাবত লেখা অসংখ্য পুস্তকে সংস্কার করাও অসম্ভব হবে। ফলে মহা গোলযোগ দেখা দেবে। আর যাঁরা সাধারণ ণত্ব-ষত্ব বিধানের বোঝা বইতে পারেন না তাঁরা বিশাল জ্ঞানের বোঝা বইবেন কী করে? 'ঙ' বর্জন করে 'ং' দিয়ে না হয় কোনোমতে গংগা বাংলা ইত্যাদি লেখা গেল। কিন্তু 'ব্যাঙাচি' লিখতে [illegible] যে তা 'বেঙাচি'। এ ছাড়া অর্থ বিভ্রাট এবং উচ্চারণ বিভ্রাট তো ঘটবেই। ঐ-এর পরিবর্তে 'ওই'-এর ব্যবহার অধুনা অনেক বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম 'ওই'-এর ব্যবহার প্রচলন করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে 'ঐ' আর 'ওই' এক শব্দ নয়। দুটোর ব্যঞ্জনা আলাদা। 'ওই' এক মাত্রিক; 'ঐ' দ্বিমাত্রিক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জায়গা বুঝে 'ওই', 'ঐ'-এর দুটোরই ব্যবহার করে

গেছেন। 'ঔ' উঠিয়ে ঔষধ লিখতে 'অউষধ' লিখলে লিখন-গতির দিক থেকে কি তা বিজ্ঞানসম্মত হবে? সেই সঙ্গে ঈ-কার উঠিয়ে বিনা-বীণার পার্থক্য নির্ণয় দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। এমনিতেই রবীন্দ্রনাথ কোনো বিপর্যয় না ঘটিয়ে 'ণ' 'ষ' 'ঊ'-কার, ঈ-কারের ব্যবহারের প্রয়োজন অনেক কমিয়ে এনেছেন। এর পরেও সমূলে বর্ণগুলির উচ্ছেদ সাধনের কী প্রয়োজন পড়ল? বাংলায় ৯ ৯৯ ইত্যাদি কালক্রমে বর্ণমালা থেকে বিদায় নিয়েছে। বাংলায় এই তিনটি বর্ণমালার স্বতন্ত্র কোনো উচ্চারণ নেই, অর্থ পার্থক্য বা অন্য কোনো কাজেও তাদের প্রয়োজন নেই। 'ণ', 'ষ', 'ঙ', 'ঐ', 'ঔ' ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সে-নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

সকল ভাষায়ই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের প্রয়োজন অনুসারে শব্দ, বানান, রচনারীতি, বর্ণমালা ইত্যাদির সংস্কার করে নেয়। ভাষা গ্রহণ-বর্জনের মধ্যেই সজীব থাকে। তাই বলে অহেতুক 'সংস্কার'ও কাম্য নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, এই বর্ণ বর্জন বাংলাভাষায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে, লোকের শিক্ষা একেবারে সহজ হয়ে যাবে, তাহলেও স্কুল কলেজ বাতিরেকে নিশ্চয়ই শিক্ষাদান চলবে না তা যত সহজই হউক। রাতারাতি হাজার হাজার স্কুল করার সামর্থ্য কি পূর্ব পাকিস্তানের আছে? আর যে-বিপুল পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় বই নতুন বানান-রীতি অনুযায়ী ছাপতে হবে তার ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতাই কি তাদের আছে? পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে। চীনের বর্ণমালা সংস্কারের প্রয়োজন খুবই। কিন্তু দুই বাংলার তুলনায় বহু গুণে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত চীন এই দুরূহ কাজে হাত দিতে সাহস করছে না। ডক্টর কাজী মোতাহের তাই দুঃখ করে বলেছেন: "আমরা দুনিয়ার সব কাজকর্ম ফেলে, বিশেষ করে সাহিত্যসৃষ্টির কথা না ভেবে ওঝার মতো ভাষা থেকে ভূত তাড়াতে লেগে গেছি। অথচ ভূত আমাদের কামড়িয়েছে না অন্য কোনো ক্ষতি করেছে, সে-দিকে তাকাবারও অবসর পাচ্ছি না।"

পূর্বপাকিস্তানের বানান-সংস্কারদেরও বাংলাবর্ণমালা সংস্কার করার সত্যিই প্রয়োজন আছে কিনা সেদিকে যে তাকাবার অবসর পাচ্ছেন না তার কারণ, রাজনৈতিক। যেহেতু বাংলা সংস্কৃত থেকে আগত এবং সংস্কৃত হিন্দুদের দেবভাষা, অতএব পাকিস্তানের শত্রু 'হিন্দুস্থান'-এর (পাকিস্তান ভারতকে তাই বলে) হিন্দুদের প্রভাব বাংলাভাষা থেকে মুছে ফেলতে হবে। তাতে বাংলার চেহারা যায় যাক, নতুন একটা ভাষা হবে—সে-ভাষার নাম পাকিস্তানী ভাষা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আয়ুবের কণ্ঠেই তা প্রতিধ্বনিত। ৬৮-এর অকটোবরে মাসপয়লা বেতার-ভাষণে আয়ুব বলেন: পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত এবং তাই আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং ভাব আদান-প্রদান বৃদ্ধি এবং জনগণের ব্যাপক মেলামেশার ফলে আঞ্চলিক ভাষা সমূহ থেকে একটা গ্রেট পাকিস্তানী লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা বা একটি সর্বজনবোধ্য মহান পাকিস্তানী ভাষা আমরা সৃষ্টি করতে পারি। পাকিস্তানে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বলেও কিছু নেই, সবই পাকিস্তানী তমদ্দুন। পাকিস্তান হবে এক ভাষা, এক সংস্কৃতির দেশ।

প্রবন্ধটি রচনায় পূর্ব পাকিস্তানের দুজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার শ্রীবদরউদ্দিন ওমর এবং শ্রীহাবিবুর রহমান মিলনের আলোচনা থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিষয়টি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং পণ্ডিতজনের আলোচনা পেলে দুই বাংলার লোকই উপকৃত হবেন। —লেখক

[মানবমন আপনাকে যতরকমভাবে প্রকাশ করতে পারে তার মধ্যে আধুনিক কবিতাই হচ্ছে সবচেয়ে সংবেদনশীল সাইজমোগ্রাফ যা তার চতুষ্পার্শ্বিক বিদেহী আবহাওয়ার রূপান্তরকে প্রতিফলিত করে। অন্ততপক্ষে আধুনিক চেক কবিতার কথা যদি ধরা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, গত দশকের মধ্যে যে অসাধারণ আন্তরিকতা ও গভীরতা কবিদের মধ্যে লক্ষিত হয়েছে তা যেসকল সুবিদিত ঘটনা ও লক্ষণ দ্বারা আজকের দিনের চেকোস্লোভেকিয়া সূচিত তাকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। আজকের চেকোস্লোভেকিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করছে নতুন এক মানবিক এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের জন্যে যা মানুষের মধ্যে আরও উচ্চ মাত্রার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্মব্যঞ্জনা এনে দেবে, আর দেবে শুধু আধুনিক জীবনযাত্রার যান্ত্রিকতর প্রতি নয়, বরং সব রকম কৃত্রিম এবং প্রাণশূন্য স্লোগানের প্রতি ঘৃণা, যে ধরনের স্লোগান শূন্যগর্ভ অর্থহীন বড় বড় কথার কুয়াশার আড়ালে মহৎ আদর্শকে আড়াল করে রাখে। —

কবিতার এইসকল লক্ষণ শুনতে হয়তো রাজনৈতিক লাগছে কিন্তু খুব অন্তরঙ্গ লিরিকের মধ্যেও এঁদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। এর কারণ অনেক কবিরই অন্তরতর এবং অতি দুঃখদ অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরেই এরা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। কবিতার এর চেয়ে দৃঢ় ভিত্তি কল্পনাই করা যায় না। কবিতার উপর সব-চেয়ে মহৎ যে কার্যভার ন্যস্ত তা হল মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করা। আধুনিক চেক কবিতা সেই ভূমিকা নিতে পেরেছে বলে দাবি করে। —মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়]

লাকো নোভোমেস্কি—Laco Novomesky
(জন্ম ১৯০৪)

স্লোভাক কবি। চেকোস্লোভেকিয়ার জাতীয় কবি উপাধিতে ভূষিত। বিশ দশকের গোড়া থেকেই ইনি স্লোভাক বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের বামপন্থী আন্দোলনের সক্রিয় সভ্য ছিলেন। যুদ্ধের সময় গোপনীয় কমিউনিস্ট দলের হয়ে লড়েছিলেন এবং স্লোভাক উত্থানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের পর থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আজ ইনি স্লোভেকিয়ার বড় একজন রাজনীতিক—বিশেষ করে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির পর থেকে। প্রধান বই : রবিবার ১৯২৭। খোলা জানলা ১৯৩৫। টেরেজা ভিলা ১৯৬৩।

খাটমারনিয়া

শুল্ক আপিসের নীচু নীচু ছাদ
চোখে পড়ছে এবার।
রেলের বাঁশি বাজবে আর আমি
দাঁড়াবো এসে সীমান্তে,

আমার একটি শুধু তল্পী
ছোট একটি সুটকেস—
বইগুলি হাতে
আর বইগুলি
সব দেশের মানুষের জন্যে সম্প্রীতি।

এবার রক্ষী এসে করবে আমায় গ্রেপ্তার
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই।
এমন ধারা
নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য নিয়ে
কেমন করে পার হব সীমান্ত?

ইরি শোটোলা—Jiri Sotola—
(জন্ম ১৯২৪)

কবি এবং কবিতার অনুবাদক। যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু এই উন্নতির ফলে যে মর্মাবেগের বিরোধ জন্মায় সে সম্বন্ধে ইনি অতি-সচেতন। লিপ্সা ও বাস্তবতার মধ্যে যে বিভ্রান্তি তা এঁর রচনায় প্রকাশ। প্রধান গ্রন্থ : আমাদের এখানকার জগৎ ১৯৫৭। মেগাস থেকে ভিনাস ১৯৫৯। হয়েছিল ইয়োরোপে ১৯৬০। পোস্টে রেস্টান্টে ১৯৬০।

মহাকাশচারিত্বের প্রথম পাঠ

জায়গাটি প্রথমে বেছে নাও।
যেমনই হোক না কেন। যেমন ধরো
কাঁচের ছাদ একখানি, কিংবা অপার মাঠ,
পদচারণভূমি অথবা গিরি-কন্দর—
যেমন তোমার রুচি—
পুরুষালী বা মেয়েলী—
তোমার পরিবেশ
তোমার জীবন ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায়।

অবশ্য সবচেয়ে ভালো হয়
প্রিয় একটি জায়গা (যেমন যদি তোমার
কোনো থাকে)
তারপর বেরিয়ে পড়ো
(স্বভাবতই)
পূর্ণ চাঁদ যখন দিক্‌প্রান্তের উপর দিয়ে
উঠছে।

সঙ্গে কিছু নিও না, বলো না কাউকে
গিয়ে সেখানে শুয়ে পড়
উপরে মুখ করে
আরাম করে।
শুয়ে থাকো আর চুপটি করে থাকো।

একটু পরে ঘাস উঠবে মর্মর করে
জল-পড়ার নলে একটি বোতাম করবে
ঠুনঠুন,
মাটি ফেলবে নিশ্বাস। ওসব কিছু নয়।

শুধু শুয়ে থাকো
আর চুপটি করে দেখো ওই অপরূপ
বস্তুটিকে
মেয়েরা যাকে বলে স্বপ্ন চন্দ্রমহাশয়
আর পুরুষরা যার নাম দিয়েছে
উলঙ্গ মেয়ে চাঁদ। লক্ষ করো তাকে
অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে
যতই সময় লাগুক বিচলিত হয়ো না।
মধ্যরাত্রির কাছাকাছি যদি দেখ

বিষাদ, উৎকণ্ঠা, মর্মবেদনা তোমায় আচ্ছন্ন
করেছে
সতরঞ্জিটি গুটিয়ে ঘরে ফিরে যাও।
কাজ হলো না।
তুমি হালকা নও। ডুবে গেলে।
তা না-হলে
একটু হাসিতে তো কোনো ক্ষতি নেই
আর, যত সামান্যই হোক না
পূর্ণ-হৃদয় মধু-মক্ষিকার মতো একটু আনন্দ
বড় চমৎকার লাগবে। শুয়ে থাকো,
অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে থাকো।
শান্ত থেকো
লক্ষ করে যাও
যতক্ষণ না হঠাৎ এক সময় মনে হতে থাকবে
চাঁদ তোমার নীচে
তুমি শুয়ে আছো উপরে
এক কথায়, পতনের আয়োজন সব তৈরী।
ঠিক সেই সময় ধাক্কা দাও
আপন কনুই দিয়ে একটুখানি
(কারণ মাটি যে চটচটে)
আর তখনই পড়তে শুরু করলে তুমি।
পতনটা কিছু নয়, অতি সাধারণ:
মাথা-ঘুরনি, শূন্যে-গমনের উন্মাদনা,
বায়ুস্রোত,
বয়স যদি তোমার একটু বেশী হয়
খুব অবাক হবে না।
কিন্তু জিভটা একটু বার করো তো—
মেঘের চাদরের মধ্য দিয়ে পড়বার সময়
চেখে দেখবে মিষ্টি লাগবে—
তখন অবাক হবে,
আর ভেবে দেখো
কে ভেবেছিল যে, ওটা পৃথিবীরই বস্তু?
কিন্তু দেরি হয়ে যাবে—পতন অতি দ্রুত
চাঁদ বেড়ে উঠবে
তুমি এবার নামবে।
উঠে দাঁড়াও, ভালো করে দেখ চারিদিক,
আর যদি ইচ্ছে হয়
তোমার নাম সই করতে পারো
আঙুল দিয়ে ধুলোর উপর।
এদিক ওদিক ছুটো না; চেঁচিও না।
ইতিমধ্যে আকাশে এক অপরূপ বস্তু উঠেছে
কাজেই দৌড়ে গিয়ে
জায়গা খুঁজে নাও একটা, শুয়ে পড়ো
লক্ষ করো, চুপ করে থাকো
যতক্ষণ না পৃথিবী আসে তোমার নীচে
এক কথায়, পতনের আয়োজন হয় তৈরী।
কনুই দিয়ে ধাক্কা দেবার দরকার নেই
(চাঁদ তো আর চটচটে নয়)
পড়তে থাকবে তুমি, বাস্, আর কিছু নেই।
গত অভিজ্ঞতার বশে মেলে ধরবে তুমি
দু বাহু
অথবা পক্ষ (যদি তা তোমার থাকে)
কিংবা গায়ের জামা—ওটাই হাতের গোড়ায়।
মিষ্টি মিষ্টি গুঁড়ো এইভাবে
অনেক ধরতে পারবে তুমি।
ওগুলো খেও না
সঙ্গে করে নিয়ে এসো
বাচ্চাদের জন্যে
দিও তাদের প্রাতরাশের সময়, আর
এদের ছাড়া কাউকে বলো না
কোথায় তুমি গিয়েছিলে।

প্রেমিক-প্রেমিকা

এ এক সাধারণ পুরাতন গল্প:
এক সে বান্ধবীর বাড়ির কাছে
ছড় করে লাঠির উপর, বুড়ো হয়েছে।
অধিবাসী ব্রনোর অথবা স্টকহলমের,
কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়.
আসল ঘটনা, কদিন আগে রাত্রে
সে শুনেছে মৃত্যুর মর্মরধ্বনি আর
ভোরের দিকে আকাশ হয়ে গিয়েছিল নীল,
তখন তার মনে হয়েছিল:
কেন, ও, ও তো বেঁচে আছে, কি আশ্চর্য,
মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েও আছি আমরা বেঁচে,
আমাদের যৌবন, ভালোবাসার মুহূর্ত
এ সবের প্রমাণ রয়েছে
যেন পা থেকে খুলে ফেলা জুতোর মতো।
ঠিক সেই সময়
দেয়ালে এক তন্ত্রচিহ্ন ফুটে উঠল
আর
তার মনে জেগে উঠল
এক বিস্ময়কর ব্যাকুল ইচ্ছা
আর একবার ওকে দেখবার।*

ওর বাড়ির কাছে এসে পৌঁছায় সে,
ঘণ্টা বাজায়, ভিতরে নড়ে ওঠে কি যেন,
হয়তো ছিটকিনি, হয়তো জলের কল,
হয়তো হৃদয়
কে জানে?
ও বেরিয়ে আসে, হেঁটে আসে ফটক পর্যন্ত,
হাতে ওর চাবি,
কেশ পলিত, অঙ্গুলি হলুদবর্ণ।

কী পুরোনো সামান্য গল্প,
সে একটু হাসে, ও-ও হাসে,
না, কেউ কিন্তু বলে না—
কোথা থেকে এলে ওগো,
কত কাল কত কাল পরে,
চোখের জল পড়ে না
গোলাপ গুচ্ছে ছুরিকার ইস্পাত চকচক
করে না
দুটি মানুষ, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সমাধির চৌকাঠে
দাঁড়িয়ে,
কিছুই এসে যেত না
যদি ও হত গ্রেটা গার্বো আর সে ট্যাক্সি
ড্রাইভার
অথবা সে এক বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক
আর ও মেয়ে ক্যাশিয়ার
কে এ নিয়ে মাথা ঘামায়।

এখন আর চুমু খেতে পারে না ওরা
—ওটা হবে হাস্যকর
বসন্তাকীর্ণ উদ্যানের মধ্যে ওরা ঘুরে বেড়ায়
আর সে হালকাভাবে তুলে নেয় ওর মণিবন্ধ
নিজের মুঠির মধ্যে।
মনে হয় শুষ্ক নীরস মন্দগতি শিরাটা
দপদপ করছে ওর মুঠোয়।
ওরা চলতে থাকে
বাগান শোঁ শোঁ শব্দ করে
সে বলে, মনে পড়ে কি,
ওর সবই মনে পড়ে, কত দিনের কথা
আর সবই যেন কেমন উল্টে পাল্টে গেছে
এদিক ওদিক বেরিয়ে থাকা ছুঁচের মতো,
কত বছর, কত নাম, কত লোকের নখ,
বাগানে উঠতে থাকে শোঁ শোঁ ধ্বনি
ফুল হয় নত,
কি যেন একটা স্ফীটিত হয়ে
রস আর গন্ধ উদ্গিরণ করে দেয়,
সবুজ লতাতন্তুগুলি রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে
তাদের উদ্ধত মুখ বাড়িয়ে দেয়,
কারণ বসন্ত এসেছে।

সে তখন ওকে বলে সেই সময়ের কথা
যখন পাথরের ছিল প্যান্ট,
আর চাঁদ ছিল মধুে ভরা খর্পর,
টালির উপরে দাঁড়ানো
গভীর এবং শীতল এক ভূমিভাণ্ডারে
উল্টো মাথা করে,
আর লোকেরা মদ খেতো, খায়, এবং
খেয়েই চলবে যতক্ষণ না মানুষের বক্ষ নামক
ওই উন্মত্ত রসটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।
মৃদু হাস্য করে ও
এই মিষ্টি হাস্যকর সংলাপ ওর অজানা নয়,
এর একমাত্র মানে, তোমায় ভালবাসি।

তারপর সে শিউরে ওঠে, বলে,
এখানকার বাতাস ঠাণ্ডা,
আর আমাদের আত্মা শার্টহীন......
আগের দিন হলে
এ হতো এক উতলা পতনের পূর্বরঙ্গ
মুখের উপর মুখ, চর্মের উপর চর্ম। কিন্তু
আজ
তা হবে উপহাসজনক। ঠাণ্ডা হাতটি
ও তার মুখের উপর চাপা দিয়ে বলে
ওই যথেষ্ট বন্ধু। এখন কর্তব্যের মধ্যে
মৃত্যু আর ওমনি যা-কিছু।
ওর মধ্যে রমণীয় কিছু নেই।
চল যাই। আমি তোমায় ভালবাসি।
আর বেঁচে আছি এটাই ছিল চমৎকার।

তারা হাত ধরে, একটু পরেই ট্রেন ছাড়বে
তার,
দুজনেই নিঃশব্দ, বলবারই বা আছে কি,
কিছু না,
এখন আছে শুধু কালের অশেষ বিস্তৃতি,
অন্ধকার রৌদ্রদগ্ধ কান্তার,
আর ওই ধরনের কর্তব্য,

তুষার পড়ে ঢেকেছিল লাল জুতো তার
কথা বলে।
আর বলে ভালোবাসার কথা, সুখময় নিরাকুল
রংগমঞ্চে, বইয়ের পাতায়, আর মানবজীবনে
বটেই।
আর ও তাকে বলে (কারণ সময় সংক্ষিপ্ত)
স্বপ্নের কথা, রঙের নাম
তার মৃত মায়ের জীবনকাহিনী

শিশুকালে জিহ্লাভার উপর জেপ্লিন
উড়তে দেখেছিল
কিংবা টেরেক বা অন্য স্থানও হতে পারে,
তারই এক দীর্ঘ কাহিনী।
তারপর ভালোবাসার কথা—
সুখময়, নিরাকুল, চিত্রে ছায়াচিত্রে,
আর তা ছাড়া নিঃসন্দেহে মানবজীবনে।
সময় উড়ে চলে। শেষ অংক,

যেমন সদাই হয়, ঘটনাটিকে অলংকৃত করে..
হাত স্পর্শ করে বিদায় নেয় তারা,
যে যার পথে,
নিজ-কম্পার্টমেন্টে, তাদের কবরে,
আলো নিবিয়ে দেয়
বন্ধ করে দেয় টেনে দরজা
ঘুমোবে
কিন্তু ঘুম নয়, বরং চুপটি করে শুয়ে থেকে

লক্ষ করা হয়,
শোনা শুধু চাকায় ঘর্ঘর,
আর শোনা হৃদয়ের স্পন্দন।
প্রেমের মন্দির-গাত্রে কি চিত্র খোদাই হবে—
ওগো কোন চিত্র?

কান দিয়ে শোনো এই দুঃখের কাহিনী,
যা ঘটতে পারে
অন্য যে-কোনো শহরে যে-কোনো শতাব্দীতে,
সে যাবে হয়তো শুধু স্ট্রাশ্নিৎসে
আর ও যাবে মোটোল অবধি,
কিন্তু তবু,
সব সময় থাকবে এক প্রান্তদেশ
যা কেউ আমরা পার হতে পারব না
যতদিন না বৃদ্ধ হয়ে
অভ্যস্ত হই বোতলের মতো চিনিতে
তিক্ত
তিক্ততায় ভরা ভালোবাসায়।

ফ্রান্টিশেক হালাস—Frantisek Halas

(জন্ম ১৯০১, মৃত্যু ১৯৪৯)

অক্ষরের দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণিত। প্রথম যুদ্ধের পর জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে আধ্যাত্মিক কবিতার অনুশীলন করেছিলেন, কিন্তু পরে জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতর সম্বন্ধে সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় এবং মিউনিক চুক্তির পরেই ইনি বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করেন। নাৎসীদের চেকভূমি অধিকারের পর থেকেই এঁর কবিতা লেখার হাত আশ্চর্যভাবে খুলে যায়। প্রধান বই : বৃদ্ধা নারী ১৯৩৫। হাত কাটা ১৯৩৬। হাত-পা-মাথা-কাটা আমার প্রতিমূর্তি।

একটি ইচ্ছে

না না
বিছানায় শুয়ে মোমবাতির আলোয়
পাশে থাকবে যন্ত্রণার কষ্ট
সারা রাত ধরে
এমন ভাবে মরতে আমি চাই না।

তার চেয়ে মরি
বার্চ ঝাড়ের মধ্যে
যে তার নরম সবুজ আস্তরণ দিয়ে
আমার ভীরুতাকে
আমার ভয়ানক আত্মগরিমাকে
ঢেকে রাখবে।

মিরোস্লাভ হলুব—Miroslav Holub

(জন্ম ১৯২৩)

কবি ও জীববিদ্যা-গবেষক। এঁর কবিতায় সব সময় বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশে থাকে কাব্যের উপযোগী দৃষ্টি ও শব্দবিন্যাস। এঁর মধ্যে সামাজিক জীবনের অর্থ ও নীতি আবিষ্কারের চেষ্টা বর্তমান। জীববিজ্ঞানবিদ হিসেবে আমেরিকায় দু বছর কাটিয়েছেন এবং —দেবদূত চাকায় চড়ে—নামে একটি উপাদেয় ভ্রমণ-পুস্তক লিখেছেন। কাব্যগ্রন্থ : দিনের কর্তব্য ১৯৫৮। অ্যাকিলিস্ ও কচ্ছপ ১৯৬০।

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড

ওরা আনে আমাদের কাছে থেঁতলানো
আঙুল,
সারিয়ে দিন ডাক্তার।
ওরা আনে আমাদের কাছে জলসানো চোখ
পরিক্লান্ত কলিজা
ওরা নিয়ে আসে আমাদের কাছে
শত শত সাদা দেহ,
শত শত লাল দেহ,
শত শত কালো দেহ,
সারিয়ে দিন ডাক্তার।
ট্রাকের মঞ্চের উপর
নিয়ে আসে ওরা রক্তের উন্মত্ততা,
ক্লব্যের তীক্ষ্ণ চীৎকার
অগ্নিদগ্ধ নিস্তব্ধতা,
সারিয়ে দিন ডাক্তার।

তারপর আমরা যখন করছি সেলাই
ইঞ্চির পর ইঞ্চি
রাতের পর রাত
স্নায়ুর সঙ্গে স্নায়ু,
পেশীর সঙ্গে পেশী,
দেখার জন্যে চোখ,
ওরা নিয়ে আসছে
আরও দীর্ঘ ছুরিকা
আরও বজ্রনির্ঘোষ বোমা
আরও গৌরবোজ্জ্বল জয়তিলক।

গর্দভ!

মাথা

ভিতরে আছে ওর এক মহাকাশযান
আর একটি পরিকল্পনা
পিয়ানো শিক্ষা বিলোপ করার।

আর আছে ওর ভিতরে এক নোয়ার জাহাজ
যেটি হবে
সকলের প্রথম।

আর আছে ওর ভিতরে
আনকোরা নতুন এক পাখি
আনকোরা নতুন এক খরগোশ।
আনকোরা নতুন এক ভ্রমর।

ওর ভিতর আছে একটি খাঁড়ি
যেটি উঠে গেছে উপর দিকে সোজা

আছে ওর ভিতরে এক মামতার সারণ।

আছে ওর ভিতরে পদার্থ-প্রতীপ।
আর আঁচড়ানো একেবারে অসম্ভব

আমার মতে
একমাত্র যা আঁচড়ানো অসম্ভব
তা হচ্ছে মাথা।

যে ঘটনায়
অত্যন্ত উৎসাহ পাই আমি
তা হচ্ছে এত মানুষের মাথা আছে।

ইয়ান স্কাৎসেল—Jan Skacel

(জন্ম ১৯২২)

মোরেভিয়ার অতি জনপ্রিয় কবি ও প্রবন্ধকার। ব্রনো থেকে প্রকাশিত Host du domu —গৃহের অতিথি—পত্রিকার সম্পাদক। এঁর লিরিক-ধর্মী কবিতায় আছে জীবনের বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগহীন চিত্র, যা অতি সরল এবং সর্বাঙ্গীণ-শূন্য। এঁর গদ্য-রচনাও অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ : শোকাশের কণ্টি সুযোগ ১৯৫৭। দেবদূত যা ফেলে গিয়েছিল ১৯৬০।

বাতাসের নাম রয়োমীর

করেছিলুম অঙ্গীকার একদা
একদিন যাবো আমরা একসঙ্গে
ডানডেলিয়ান ফুলের পাশে
ব্ল্যাকবার্ড পাখির হলুদ আঁখিতে।
যাবো আমরা ভালোমানুষ বউদের ঘরে রেখে
যাবো কবিতা শিকার করতে করতে,
সেই কবিতা যা বললে নদী দেয় অভিশাপ
আঁধার রাতে উপলের উপর হোঁচট খেলেই।

আর হয়তো সারা রাত কিছুই ধরতে পারব
না আমরা।
শুধু জলের ফোঁটা পড়বে ঘাসের উপর
খালি পায়ে বন-থেকে-বেরিয়ে-আসা
রাজকন্যাদের চোখের জলের মতো।

তারপর রাস্তায় কেউ হয়তো শুধোবে তোমায়
গুরু, কবে লিখবেন টাটকা নতুন বই?
আর তুমি বলো তাদের,
যখন পড়বে বৃষ্টি, যখন কাদা হবে সন্ধ্যে।
আর হয়তো আকাশের হবে অতুল দয়া
জল ঝরবে কবিতার উপর
বৃষ্টি পড়বে আমাদের জুতোর মধ্যেও
মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে মেঘ
ফটিক-ভরা ট্রাউট মাছের মতো ঠাণ্ডা

আর আমরা সেই বাতাসের নাম দেব
রয়োমীর
আর ফিরে আসবো
খুশি-মাখা জলের ধার দিয়ে।

য়োসেফ হানৎস্‌লীক—Josef Hanzlik
(জন্ম আন্দাজ ১৯৩২)

তরুণতম কবিদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন। উল্কার মতো উদয়। খোলা হৃদয় আর অকপট কবিতার সুন্দর রূপকের গুণে সফলতার শীর্ষে উঠেছিলেন। সম্প্রতি খানিকটা পিছিয়ে পড়েছেন।

বাতি

ঘুমোতে যাবার আগে আমার বাবা
সব সময় বাতি জেবলে দিতেন।
শুয়ে থাকতেন চুপটি করে
নিশ্চল ভীরু আলোর উপস্থিতিতে।
বাবা ছিলেন অন্ধ,
আলো দেখতে পেতেন না,
শুধু জানতেন কাছেই আছে সে,
সুইচ্ বলে দিত তাঁকে যে আলো আছে,
তার শুকনো তাড়িতিক স্বাদ অনুভব
করতেন তিনি
আলোর অনুভূতি ছিল তাঁর পক্ষে
প্রাণময় জগতের অনুভূতি।

বাবার ছিল না চক্ষু
তিনি সুইচ্ জ্বালাতে নিবাতে পারতেন,
কিন্তু বন্ধ ঢাকনার পিছনে
লোকে ভাবে তারা যা দেখতে পায়
তিনিও দেখতে পেতেন।
গম্ভীর নিস্পন্দ শুয়ে থাকতেন তিনি
আর ত্বকের নীচে
দেহ তাঁর স্পন্দিত হত
রক্তের জোয়ারে স্নায়ুর স্পন্দনে।
বাতি জ্বলতে থাকত।
আলো স্পর্শ করত বাবাকে
নিশ্বাস নিতেন তিনি আলোর
মুখ দিয়ে টেনে নিতেন, রোমকূপের মধ্যে
দিয়ে নিতেন
শিরা-উপশিরার জালের মধ্যে দিয়ে বয়ে
চলতো আলো
হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছত
মস্তিষ্কের উষ্ণ আঁধারকে ভাসিয়ে দিত
জোয়ারে।
আর তখনই চোখ যেমন দেখে
তেমনই তিনি দেখতেন
সকল বস্তুকে
তাদের স্থূল বাধাত্মক গঠনে
এবং জান্তব দুর্গন্ধে।

তিনি দেখতেন তাঁর নিজের দিনগুলি
আর তাদের দিনগুলি যাদের তিনি
জানতেন না,
দেখতেন সমাধি দেখতেন ক্রুদ্ধ বর্ষণ
দেখতেন বালকের প্রথম ভয়ের প্রতিক্ষেপ
আরও দেখতেন মাসের পর মাসের বেকারত্ব
আমার ক্ষুধাকুল ভায়া,
তিনি দেখতেন পোকা-ভরা মৃত মৎস্যের উদর
পদহীন শিশু—
আর তোমরা চেঁচাও, অহো যুদ্ধের কি
গ্লানি—
আর তিনি আমার মা-কেও দেখতেন,
সমস্ত দেখতেন, কিছু বাদ পড়ত না
দগ্‌দগে লালচে হাত
যেন মরিয়া হয়ে দণ্ডায়মান।
বাতি জ্বলতে থাকতো
যারা দেয়ালে পিঠ দিয়ে খাড়া দাঁড়াতো
তাদেরও মুখের দিকে বাবা দেখতেন,
বিলাপ-মুখর কুকুর দেখতেন
আর দেখতেন পুড়ছে যে ঘোড়া,
দেখতেন পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া আকাশে
উড়ে যাচ্ছে
মানুষের মাংস পুড়িয়ে দিয়ে,
আর তিনি দেখতেন তাদের
যারা বাড়ি ফেরার অধীর গান গেয়ে
প্রাহায় ফিরে এসে রাস্তার ধারে মরত।
বাতি জ্বলতে থাকতো
বাবা তাঁর কারখানায় গিয়ে ঢুকতেন
আবার ফিরে পেতেন পান্না-বর্ণের
ছুটোছুটি,
আর চক্রের ঘূর্ণন,
দন্তুর চক্রের মৃদু ছন্দ
দেখতেন বিতত চোয়াল টানটান পেশী
অবনমিত সঞ্চলন,
শিশুর খেলার জগতের প্রতীক
বালিকার লাজ-রক্তিম গণ্ডের রহস্য
আর দুটি মূর্তির একত্রিত দীর্ঘ ছায়া,
তিনি পৃথিবীকে দেখতেন
তার স্থূল যন্ত্রণাময় আকৃতিতে
মানবিক প্রক্রিয়ার আবেগ-মর্ম তিনি দেখতেন
লজ্জা, ঘৃণা, জীবনের উন্মত্ত ক্ষুধা
বাতি জ্বলতে থাকতো,
বাবা আলোকে নিশ্বাসের মধ্যে টেনে
নিতেন,
সেই আলো সম্পূর্ণভাবে
তাঁর মধ্যে প্রবেশ করত
তিনি তার শুষ্ক তাড়িতিক আস্বাদ গ্রহণ
করতেন
আর আলোর অনুভূতি ছিল তাঁর পক্ষে
প্রাণময় জগতের অনুভূতি।
বাবা যেখানে ঘুমোতেন
সেই বিছানায় আমি বসে থাকি
চেয়ে থাকি
তাঁরই মূর্তিতে মুদ্রিত চিহ্নিত বস্তুর দিকে
আর রাত্রে যখন অন্ধকার ঘনতম হয়ে আসে
তখন আমি বাতি জেবলে দিই।

ইভান ডিভিশ—Ivan Divis

তরুণ কবিদের একজন। একটু অতি-সংবেদনশীল এবং সামাজিক বাস্তবতা থেকে কিছু দূরে বলে গণ্য। কিন্তু নিজের পদ্য-রচনা বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ।

শোবার ঘরের পাশে

ও রয়েছে ঐখানে ওই মেয়ে
শোবার ঘরের পাশে
মখমলী এক তাকিয়ায় দিয়ে ঠেস
ধোওয়া-ধুয়ি কেনাকাটা আর
আমার সংগে অনর্থক ঝগড়া বিবাদ
শেষ করে পড়ছে প্রেমের এক বই—

এখন ঘরে যদি ঢুকি
সামনে গিয়ে দাঁড়াই
তলোয়ার দিয়ে
মাথার খুলির ছিলকা আমার উড়িয়ে দিয়ে
দেখতে দিই ওকে ভিতরটা,
বলি তোমার কোমল করতল দিয়ে
তুমুল বিশৃঙ্খলটা জুড়িয়ে দাও।

চটাস্ করে বই মুড়ে
বার করে দেবে ও
সেই কুণ্ডলীপাকানো মগজ
বোতলে ভরে তাকে বন্ধ করে
ভাসিয়ে দেবে নদীর জলে
তারপর আবার
বালিশে ভর করে বই পড়তে থাকবে—
আহা—আমার চেয়ে ও কত বেশী সংগত—

মিলান ফেরকো—Milan Ferko
(জন্ম ১৯২৯)

পূব স্লোভাকিয়ায় জন্ম। [illegible] অন্য
ক্ষমতাময় কবি। ইনি ভালোবাসেন লোক-সঙ্গীত, জীবন ও জনসাধারণ।

আধুনিক বাইবেল

..............এবং চতুর্থ দিনে
ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আলো
স্বর্গের অন্তরীক্ষে :
সূর্য
চন্দ্র
আর তারকা।
সপ্তম দিনের প্রাতে
ধুয়ে ফেললেন ঘর্ম এবং কর্দম
তাঁর কম্পমান পদযুগল থেকে
তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন আঘোরে মেঘের
মধ্যে,
পরিপূর্ণ ক্লান্তিতে।
ঘুমিয়েই রইলেন, যতক্ষণ না
নীচের পৃথিবী থেকে এক অগ্নিশিখা
গর্বিত চীৎকারে লাফিয়ে উঠে
তাঁর স্বপ্ন টুটিয়ে দিল।
যে মানুষ করেছিল সেটা তৈরি
সে তার পায়ের কর্দম মুছে
একটুও ক্লান্ত না হয়ে
তার স্কন্ধের নিক্ষেপণ মঞ্চ থেকে
ছুঁড়ে দিল আরও তারকা
তার নিজের অন্তরীক্ষে
আ—মে—ন।

কলকাতার হালখাতা

গত ২৮শে অগ্রহায়ণের (১৩৭৫) দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলকাতার হালখাতায়' মৌলিনাথ বর্তমান যুগের ইংরেজীর ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী আদব কায়দা অনু[illegible]ণের অপচেষ্টা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবহেলার প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সি, সেন্ট-জেভিয়ার্স ও লরেটো থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অযথা দোষারোপ করেছেন। মৌলিনাথের রচনাটির অনেক অংশই কষ্টকল্পিত এবং তাঁর মেকি পার্সোনাল টাচ দেবার প্রবণতা—সংবাদ-সাহিত্য পরিবেশনে এই রীতি অমার্জনীয়। আমি সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে কিছুকাল পড়েছিলাম, সেজন্য মৌলিনাথ বর্ণিত লক্ষণযুক্ত ছাত্রদের খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল।

আমরা বাংলা স্কুল থেকে আগত ছাত্রে [illegible] কলেজে [illegible] এই কলেজে আমার একটি স্কুলের সহপাঠী [illegible] ছাত্রদের সম্বন্ধে ও শিক্ষকদের [illegible] কলকাতার লোকের মত ছিল, ইংরেজী লোক [illegible] ও অশ্লীল [illegible] এই যে সব সহপাঠীরা বাংলা [illegible] বাংলা সাহিত্যের সাথে যাদের পরিচয় ছিল ইংরেজী অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে আমরা অনায়াসে মিশতে পারতাম না ঠিকই কিন্তু তার কারণ ছিল আর্থিক বৈষম্য অথবা উভয়পক্ষের ভিতরের জড়তা। এই সব বাঙালী ছাত্রদের অনেকেই ভাবেই সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলেই বর্ণ-পরিচয় থেকে লেখাপড়া শিখেছে, ধনী অবাঙালী ও বিদেশীদের সঙ্গে মিশেছে, অনেকেরই হয়ত মা বিদেশিনী। অথচ দেখেছি এরাই কলেজের রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'কলহ' বা পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'তে অভিনয় করছে, ইংরেজী একাঙ্ক নাটক The Rising of the Moon বা Riders to the sea-ও এরাই অভিনয়ে মাতিয়ে রাখত। তবলাও পিটত, ছোটখাট অর্কেস্ট্রাও কনডাক্ট করত। এদের মধ্য থেকেই চোখের সামনে দেখলাম বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকারের বিকাশ ও সাফল্য, একজন সার্থক চরিত্রাভিনেতার বাংলা চলচ্চিত্রে স্থায়ী স্বীকৃতি। জীবনের অন্য বহুক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেছে যারা তাদের মধ্যে খুঁজলেও পাওয়া যাবে এদের অনেককে।

ক্রমশ ইংরেজীর একটা শক্ত বনিয়াদ হয়ত এদের সাহায্য করেছে কিন্তু তাঁদের কাঠিন্য যাদের ছিল তারাই প্রতিযোগিতার নিকষে নিজেদের বিচ্ছুরিত করতে পেরেছে। আর বাংলা স্কুল থেকে আগত, ইংরেজী বলতে তোতলা, মুখচোরা আমাদের মধ্যেও যাদের ভেতরে সারবস্তু কিছু ছিল ওদের অনুকরণ না করেও তারা উন্নত হয়েছে। তাই, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা ইংরেজী স্কুল কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের থেকে বিশেষ আমরা অধঃপাতে যাচ্ছি এ ধরনের চিন্তা পক্ষপাতদুষ্ট ও অসত্য।

মৌলিনাথ লিখেছেন, ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে ইয়েটস-এর 'স্কলার', স্মরণ করেন কেউ জীবনানন্দের 'অধ্যাপককে'। কিন্তু সেজন্য দায়ী কে?

বাংলার পাঠ্যক্রমে বাংলার মননশীল কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা অন্তর্ভুক্ত হয় না। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, মেধাবী ও সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগী একটি ছাত্রীকে দেখেছি পেপারব্যাক-এর Pocket book of quotations থেকে অধিকাংশ আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের উদ্ধৃতি মুখস্থ করতে ও নিজের quotations-এর খাতায় তুলে রাখতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও যাযাবর ছাড়া অন্য বাংলা সাহিত্যিকের উদ্ধৃতি সে বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি।—

প্রসঙ্গত বলি, বাংলার মননশীল কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দের রচনার সঙ্গে [illegible] উদ্বুদ্ধ করতে হলে একটি উদ্ধৃতির রত্ন-মঞ্জুষার একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্ধৃতির সংকলনের ব্যাপারে আপনার সুযোগ্য [illegible] কেউ যদি একটু বিশদতর আলোচনা করেন তো হলে হয়ত কোন পরিশ্রমী সাহিত্যপ্রেমিক এ কাজে ব্রতী হন।

শ্রীকান্তি চট্টোপাধ্যায়
বোম্বাই ৭১

॥ ২ ॥

গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের "দেশ" পত্রিকায় মৌলিনাথ-রচিত "কলকাতার হালখাতা" পাঠ করে অবাক হয়েছি। আমি ১৯৬০ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে পাশ করি। তখন যারা আমার শিক্ষক ছিলেন তাঁদের অনেকে আজও শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন। গত আট বছরে ছাত্রসমাজে কিছু পরিবর্তন আসলেও শিক্ষকরা যে পালটেছেন এমন ধারণার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। আমার শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র মিস্ এ জি স্টক্ ব্যতীত অন্য সকলেই বাঙালী ছিলেন। এদের মধ্যে অধ্যাপক সেনগুপ্ত, অধ্যাপক লাহিড়ী, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক ঘোষ ও শ্রীমতী সিনহা পোশাক-পরিচ্ছেদেও সম্পূর্ণ বাঙালী হিসাবেই আমাদের কাছে উপস্থিত হতেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য কখনও বাঙালী কখনও বা আধা-বাঙালী পোশাকে আসতেন। একমাত্র অধ্যাপক সেনকেই সর্বদা সাহেবী পোশাকে দেখা যেত। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আমরা মাত্র তিরিশজন বি এ পরীক্ষায় অনার্স সহকারে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। বাকী একশোরও বেশী ছাত্রছাত্রী সাধারণভাবে বি এ পাশ করে ইংরেজী সাহিত্য পড়বার জন্য এসেছিলেন। যদিও অনেক ছাত্রছাত্রী প্রেসিডেন্সী ও লরেটো থেকে এসেছিলেন তবুও তাদের সকলেই যে সাহেব-মেমসাহেব হবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এমন নয়। আমি স্বয়ং সাড়ে তিন বছর প্রেসিডেন্সীতে পড়বার পর বিতাড়িত হয়ে সেণ্ট্রাল কালকাটা থেকে বি এ পাশ করেছিলাম। বলা বাহুল্য, প্রেসিডেন্সীর সব ছেলে-মেয়েকেই আমি ভালভাবে চিনতাম। আর, আমার যারা বন্ধু ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই অন্যান্য কলেজের ছাত্র। আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন তারা কেউই প্রেসিডেন্সী বা সেণ্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে আমরা যাদের ভোট দিয়েছি তাঁদের অধিকাংশই বিদ্যাসাগর বা বঙ্গবাসীর ছাত্র। আমাদের সময় সেণ্ট জেভিয়ার্সের কোনও ছাত্র আমাদের ক্লাসে ছিলেন না।

আমরা আমাদের মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে কি শিখেছিলাম? আমরা একটি সাহিত্যকে ভালবাসতে শিখে-ছিলাম। বলা উচিত, একটি বিশেষ দেশের সাহিত্যকে ভালবাসার জন্য আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ দেশটি ইংলণ্ড ও বিশেষ সাহিত্যটি ইংরাজী সাহিত্য। বলা বাহুল্য, আমাদের কখনও অন্যান্য দেশের ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে পড়তে বলা হয়নি। আমরা চসার পড়েছি কিন্তু ব্রায়াণ্ট পড়িনি, মিলটন পড়েছি, থোরো, বা হুইটার পড়িনি। আমরা এলিয়ট বা অডেন পড়েছি কিন্তু টেনেসী উইলিয়মস বা ইউজীন্ ওনীল পড়িনি।

আমাদের সাথে "স্যাগী ছোকরা"দের পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু দ্যবোঁয়া বা কাউন্ট ক্লেন-এর সাথে পরিচয় হয়নি। একথা তাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমরা কেবল ইংল্যান্ডের সাহিত্যই পাঠ করেছি, অন্যান্য দেশের ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সে সুযোগ দেয়নি। ফলে, ইংরাজী সাহিত্যের "মাস্টার" হবার পরও আমরা সত্যিকারের ইংরাজী সাহিত্য শিখিনি। এরকম অবস্থাতে বাংলা সাহিত্যের সাথে তুলনা-মূলক আলোচনার কথা ভাবা অযৌক্তিক নয় কি? কথা হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যের সাথে তুলনা করবার সময় কোথায়? আমাদের ডেকার, ফোর্ড, মার্সলিং, এথেরীজ ম্যাকফারসন, চ্যাটারটন ইত্যাদি বহু সাধারণ শ্রেণীর লেখকদের জীবনী মুখস্থ করতে বাধ্য করা হয়েছে। সময়ের অভাবে "শর্ট কার্ট" করে সেকসপীয়র বা মিলটন পড়তে হয়েছে। এরকম অবস্থাতে বিষ্ণু দে বা জীবনানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করাটা কি ছাত্ররা পছন্দ করতেন? আমি কয়েকমাস বিষ্ণুবাবুর ছাত্র ছিলাম। তিনি কখনও ক্লাসে বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন মনে পড়েনা।

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি অবনতি ইংরাজী সাহিত্যের উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভরশীল নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা শুধু ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাসে শুরু হতে পারেনা। বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত প্রেমিকরা প্রায়ই এই সত্যটুকু ভুলে যেতে ভালবাসেন। এইসব প্রেমিকরাই রবীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণুবাবু বা জীবনানন্দ বোঝাতে গিয়ে কোলরীজ, টেনিসন, এলিয়ট বা ইয়েটসকে টেনে আনেন। তাঁরা ভুলে যান যে রবীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণুবাবু বা জীবনানন্দের প্রতিভা ইংরেজ সাহিত্যিকদের প্রতিভার উপর নির্ভরশীল নয়।

পরিশেষে একটি কথা মৌলিনাথকে জানিয়ে দিতে চাই। ব্যক্তিবিশেষের রুচি বা পরিজনদের সাথে ইংরাজী সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি ছাত্রছাত্রী বিলেতের সাথে কলেজের সম্পর্ক না খোঁজাই ভাল।

রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক, টাকি সরকারী মহাবিদ্যালয়

॥ ৩ ॥

"কলকাতার হালখাতায়" (দেশ, ১৪-১২-৬৮) আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ক্লাসগুলির বর্ণনা পড়ে বেশ কৌতুক ও চিন্তার খোরাক পাওয়া গেল। মৌলিনাথ যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সমর্থন করেও দু-একটা কথা বলতে চাই। সাহিত্যপাঠ বা শিক্ষাদান পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে যে দোষ ঘটে থাকে, আমাদের মনে হয় তাতে একমাত্র ইংরেজী বিভাগই দুষ্ট নয়। কলেজ জীবনে দেখেছি দুটো প্রধান সাহিত্য বিভাগের মধ্যে একটা জল-অচল সম্পর্ক ছিল। বাঙলা ও ইংরেজী বিভাগের কথা বলছি। ইংরেজী বিভাগে তখন একজন সেরা সমালোচক পণ্ডিত—বাঙলা মননশীল সাহিত্যের জগতে যাঁর অনেক নাম ডাক—রয়েছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নাথ-শরৎচন্দ্রের উল্লেখ তাঁর ইংরেজী ক্লাসে তুলনামূলকভাবে মাঝে মাঝে শোনা যেত। আর সকলে, বাঙলা সাহিত্যে অধিকার-প্রাচুর্য সত্ত্বেও, তুলনামূলক আলোচনার কাছ ঘেঁষেও যেতেন না। ক্লাস-অতিরিক্ত কোনও সাহিত্য-শিল্প সেমিনার জাতীয় ব্যাপারে কিন্তু বাঙলা ভাষায় বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করতে এঁদের শুনেছি। বোঝা যায়, তাঁদের এই সত্তাটিকে তাঁরা ক্লাসের মধ্যে সযত্নে গোপন করতেন। অথচ এই অভ্যাসটি পরিত্যাগ করলেই তাঁরা বাঙালী ছাত্রদের মনের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটাতে পারতেন। সাহিত্য সাহিত্যই, ভাষা তার প্রকাশ-বাহন মাত্র। তার এই সত্য-স্বরূপকে চিনিয়ে দিতে না পারলে পূর্ণ সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাহিত্য-শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘটানো যায় না।

অনিবার্যভাবেই ইংরেজীর ছাত্রছাত্রীরা একটা ভিন্ন জগতে বাস করত। হাতে হার্ডি কিংবা এলিয়ট নিয়ে তাদের গমনাগমনের মধ্য থেকে ক্ষরিত হতে থাকত একটা জিনিস—তা হচ্ছে বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে একটা কৃপাকটাক্ষ ও প্রসন্ন খবরদারির ভাব—যা কিনা মূলত অজ্ঞতাপ্রসূত। পেপারব্যাকে 'আকীর্ণ' তাদের আইভরি টাওয়ারে 'শেষ সপ্তক' বা 'সানাই' কদাচিৎ প্রবেশাধিকার পেত—অন্যে পরে কা কথা!

এই ছবির পাশে ছিল হৃত-কৌলীন্য বাঙলা বিভাগের রুদ্ধ ও আত্ম-সংকুচিত চেহারা। এখানে অধ্যাপকরা কদাচিৎ ইংরেজী সাহিত্যের তুলনা-উপমা ব্যবহার করতেন। অভিমানাহত তাঁরা সর্বদাই সজ্ঞান প্রয়াসে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য সাহিত্যের উল্লেখকে অনুচ্চার্য মনে করতেন। যেটুকু করতেন তা বড় জোর "রজনী" প্রসঙ্গে Lord Lytton-এর নামোল্লেখ জাতীয় ব্যাপার। অথচ জবরদখল করে কৌলীন্য অপহরণ করাটা যত অন্যায়ই হোক না কেন, ইংরেজী সাহিত্যের "নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে"—এ কথাটা কঠিন সত্য। এর ব্যাপক বহু-বর্ণময়তা, বিচিত্র পশ্চাৎপট ও আঙ্গিক—এসব কিছুর তুলনামূলক চিত্রায়ণ ক্লাসে না করলে বাঙলা সাহিত্যের শিক্ষাটাই বা কী করে পূর্ণতা পায়? ক্লাসের বাইরে এঁরা সহজ, কিন্তু ভেতরে অটল, অবিচল।

দু' পক্ষই বোধ হয় এই কথা তুলতেন যে, দুটো বিভাগেরই বিষয় ও লক্ষ্য একই বস্তু। তা হচ্ছে সাহিত্য। ভাষা তার 'যান' মাত্র। কে 'হীনযান' আর কে 'মহাযান' তা কিছু-মাত্র বিবেচনার প্রয়োজন আছে কি? জীর্ণ গোরুর গাড়িতে চড়ে যেতে যেতে পথের যে পাঁচালিগান শোনা যায় উড়োজাহাজের নীচে কিলিমানজেরোর তুষারমৌলির বর্ণাঢ্য বিস্ময়ের থেকে তার বহিরঙ্গ ভিন্ন হলেও রসের পানশালায় তার মূল্য কিছু কম নয়। রঙ আলাদা, ক্যানভাস ভিন্ন, শিল্পীর তুলি ধরার ভঙ্গিতেও ফারাক—লোক থেকে লোকান্তরে, ভাষা থেকে ভাষান্তরে, স্থানিক থেকে আন্তর্জাতিকে। কিন্তু প্রেরণার উৎস এক, লক্ষ্যও এক। সৃষ্টি-প্রয়াসী মানবমন রসের যোগানদারি করতে চায়। সে রস ব্রহ্মাস্বাদ সচিবঃ-নাকি আত্মোপলব্ধির শেষ কথা তা আলংকারিকদের বিচার্য। শুধু মনে রাখতে হবে সাধনার পথে ভাষা এখানে একটা বহনকারী মাত্র। আর চালক ও আরোহী ব্যতিরেকে ভাষা তো একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র! তাই ভাবের খবর নিতেই হবে। না নিলে শব্দের দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা বা বহুমুখিনতার সঙ্গে পরিচয় অসম্ভব। অভিধান-অর্থপুস্তকে যা মেলে তা তো নিছকই খণ্ডার্থ। এ কথা যদি ছাত্রছাত্রীকে না জানানো হয়, তা হলে "হাই গাই" পর্যন্ত পৌঁছাতেই তাদের প্রাণ আই ঢাই করবে।

যে-কোন সাহিত্যের ক্লাসে মৌলিনাথের সমর্থনে তাই তুলনাত্মক বিচারই পন্থা হওয়া উচিত। এটি না করলে সাহিত্য-সন্ধানী মনকে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'চৌতয়ে' দেওয়া যাবে না। যৌথতা যে পরিবারের স্বভাবধর্ম সেখানে ঠাঁই ঠাঁই হলে কাব্যবিচারের একটা সামগ্রিক ফলশ্রুতি ছেলেমেয়েদের অজ্ঞাতেই থেকে যাবে। একদল ভাববেন আধা-ফিরিঙ্গি চলন-বলনই ইংরেজী সাহিত্যপাঠের সারাৎসার আর একদল "মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে" জড়িয়ে পড়ে হয়তো ভাবতে থাকবেন যে মহাকবি যখন ইংরেজী-ফরাসী প্রভৃতি সাহিত্য মন্থন সেরেও মাতৃভাষাতেই ফিরে এলেন তখন আর আদৌ সেদিকে গিয়ে লাভ কি—গিয়ে যখন ফিরে আসতেই হয়? তা ছাড়া Ars longa vita brevis—বিপুলা পৃথ্বীর নিরবধি কালেতে সাময়িক দেহ ধারণ মাত্র আমাদের। ছাত্রজীবন তো আরও সীমিত। তার পরেই চাকরি। চাকরি দেবে কে? সাহিত্য অধ্যয়ন, না ফিরিঙ্গি অ্যাকসেন্টের নকলনবিশি? নিঃসন্দেহে শেষেরটি। সুতরাং ইয়েটসের সঙ্গে জীবনানন্দকে মিলিয়ে না দেখলে "এসে যাবে কীবা কার"?

অরুণাভ সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৯

দানীবাবু

গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের (দানীবাবুর) জন্মদিন ১৮৬৮-র ১১ই ডিসেম্বর, না ১৪ই, তা নিয়ে তর্ক উঠেছে। দানীবাবুর জন্মশতবর্ষ পূর্তিকালে পণ্ডিতেরা যে 'লয়ে তারিখ-সাল' তর্ক করবেন, তা স্বাভাবিক এবং অভিপ্রেত। এ সময়ে দানীবাবুর প্রতিভা নিয়ে প্রশস্তিমূলক আলোচনাও কিছু কিছু দেখা যাবে। কিন্তু দানীবাবু যখন শুধু 'দানী' ছিলেন, তাঁর তখনকার অভিনয়ের কথা এখন আর বোধ হয় জানা যাবে না।

সুতরাং এ বিষয়ে সত্তর-বাহাত্তর বছর আগেকার কোনো তথ্য যদি হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়, তা হলে আমরা বুঝতে পারবো, দানীবাবুর অভিনয়ক্ষমতা জন্মসূত্রে লব্ধ, না অনেক সাধনায় তিনি হয়েছেন সিদ্ধ নট।

দানীবাবুর শিক্ষানবিশি যে কেবলমাত্র পিতার কাছেই হয়েছিল এমন নয়, বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, নট, নাট্যপরিচালক ও অধ্যক্ষ এবং গিরিশচন্দ্রের সহযাত্রী-সুহৃৎ রসরাজ অমৃতলালও 'দানী'কে গড়েপেটার কাজে সাধ্যমত প্রয়াস করেছিলেন।

আজ থেকে বাহাত্তর বছর আগে যখন দানীবাবু স্টার থিয়েটারে অভিনয় করতেন তখন তাঁর বয়স আটাশ; তাঁর আভিনয়িক প্রতিভা তখন ঠিকমতো পরিস্ফুট হয়নি। স্টারের নট-নায়ক অমৃতলাল মিত্রকে নকল করবার দিকেই তাঁর ঝোঁক তখন প্রবল। অথচ যে কারণেই হোক, প্রধান ভূমিকা তাঁকেই দেওয়া হত।

রসরাজ অমৃতলালের অপ্রকাশিত দিনলিপির কয়েকটি জীর্ণ পত্রে 'বিল্বমঙ্গল' এবং 'কালাপাহাড়' অভিনয়ের প্রসঙ্গে 'দানী'র উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, প্রশংসিত হবার মতো অভিনয় তখনও পর্যন্ত 'দানী' করতে পারেন নি। ১৮৯৬-এর ১২ই আগস্ট, বুধবারের ডায়েরিতে অমৃতলাল লিখেছিলেন—

... Billamangal was played this evening. There was a good house, but Amrita did not act....indolence is fast taking possession of him. He talks of retiring. An actor can never delegate his work; he must die in harness. Lyceum theatre would be nothing without Irving. People come to see particular artistes in a particular theatre. Girish Babu's son Dani played Billamangal to the entire dissatisfaction of all the audience and the artistes. It was a mere stiff imitation of Amrita's personal peculiarities. Can Girish Babu's paternal affection make him blind to artistic inefficiency?"

২০এ আগস্ট অমৃতলাল আবার লিখেছেন—

"...In the evening Kalapahar was rehearsed. If Girish Babu has not given any adequate education to his son—general and histrionic—he has stuffed his stupid brain with conceit enough for a dozen amateures, all his gestures and articulations are further stamped with precocity that make him look like sixty in his beardless chin."

এ মত অকরুণ বটে, তবে অসত্য নয়। আর এর থেকেই বোঝা যায় 'দানীবাবু' হয়ে ওঠবার জন্যে কী নিদারুণ চেষ্টাটাই না তাঁকে করতে হয়েছে। অমৃতলালের দিনলিপির সব পাতাগুলো যদি পাওয়া যেত, দানীবাবুর প্রকৃত নট-জীবন তার সাহায্যে আমরা গড়ে তুলতে পারতুম।

অরুণকুমার মিত্র
কলকাতা-৬

উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠন

গত ২৩শে নভেম্বর প্রকাশিত আপনার সম্পাদকীয় পড়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। কিছুদিন যাবৎ উত্তরবঙ্গের এই হাজার হাজার নরনারীর বিপর্যয়ের কথা পড়ে আসছি আপনার এই 'দেশ' পত্রিকা মারফত। এ-দেশের পত্রিকা বা টেলিভিশনে এর কোন আভাসই আমরা প্রবাসী বাঙালীরা পাইনি —তবে কোন কোন পত্রিকাতে হয়ত বা সামান্য উল্লেখ ছিল, যা সকলের চোখে পড়েনি।

সরকার মহলের গাফিলতি আমার বা আমাদের যদিও অজানা নয়, কিন্তু এত বড় একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরও এখন পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু রিলিফের বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি জেনে যুগপৎ বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছি। দিল্লীর কর্তারা, যাঁরা উড়োন সফরেই তাঁদের কর্তব্য পালন করে আবার তাঁদের সরকারী বাস-ভবনে দিন যাপন করছেন তাঁরা কি সাধারণ মানুষের এই বিপর্যয়ের কথা একবারের তরেও ভেবে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন? সত্যি, ভাবতেও লজ্জা হয় যে, এঁরাই আজ আমাদের দেশের সর্বেসর্বা, যাঁরা শুধু নিজের বিলাসব্যসনে আর নিজের আখের গুটোতেই ব্যস্ত।

আপনার এই সমালোচনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সাবা বার্মিংহাম-প্রবাসী বাঙালীরা কিছু দিন আগে ২০০ পাউণ্ড (৩৬০০) বন্যাত্রাণ তহবিলে পাঠিয়েছি। অবশ্য কর্তৃপক্ষ তা কতটুকু কাজে লাগাবেন বলা মুশকিল—যদিও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণে এটা খুবই সামান্য। আমার ইচ্ছে আছে, যদি আরও কিছু চাঁদা তুলে আমাদের বন্যাপীড়িত আত্মীয়-স্বজনকে সামান্যও সাহায্য করতে পারি এবং এজন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা আমি করছি।

'দেশ' পত্রিকা আমি এখানে অন্য এক ভদ্রলোকের (আমার দাদা) মারফত পাই, তাই কিছু দিন দেরি হয়; সুতরাং আপনার সমালোচনা পড়ে এ চিঠি লিখতেও বেশ ক'দিন দেরি হল।

এলা (দত্ত) পাল
ইউ. কে.

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী ('পঞ্চতন্ত্র', দেশ, ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৮) লিখেছেন, 'বরেন্দ্রভূমি ও তার হৃদ্পিণ্ড রাজশাহীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সেটা পদ্মার এপারে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে ভাষা বলা হয় তার খুবই কাছাকাছি।' লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজশাহীর শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ভাষায় কথা বলেন তা মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি তো নয়ই, বরং নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বাংলার খুবই কাছাকাছি। এর একমাত্র কারণ—রাজশাহীতে ন ব দ্বী প-শা ন্তি পু রে র লোকদের সংখ্যাধিক্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নবাবগঞ্জ-(রাজশাহীর একটি মহকুমা)-বাসীরা যে ভাষায় কথা বলে তা খাঁটি মুরশিদাবাদীদের সমকক্ষ। উদাহরণস্বরূপ 'স' এবং 'শ'কে আশ্চর্যজনকভাবে ইংরেজী 'S'এর মত উচ্চারণ করা মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং নবাবগঞ্জের লোকদেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য—সব পূর্ববাঙালীরা তা ভালভাবেই জানেন। কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে রাজশাহীর লোকরা কখনও 'স' বা 'শ'কে ইংরেজী 'এস'-এর মত উচ্চারণ করেন না। আমি নিজে মূলে রাজশাহীর বাসিন্দে বলেই মুর্শিদাবাদ এবং নবাবগঞ্জের সঙ্গে রাজশাহীর বাংলার পার্থক্য বুঝতে পারি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর এ-হেন ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, তিনি নিজে সিলেটের লোক—রাজশাহীতে খুব বেশীকাল বসবাস করেননি। যেটুকু বসবাস করেছেন সেইটুকু সময়ের Sojourn এ যাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই হয়ত রাজশাহীর মূল বাসিন্দে ছিলেন না—কেননা মায় রাজশাহীতে মূল রাজশাহীর লোক নেহাত কমই আছেন।

আরও কতকগুলি ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে। ফারসী 'বিলা' অব্যয়ীতে 'বা'-এর অর্থ With নয়, 'বা'-এর অর্থ With। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ফারসীতে

অধিকাংশ বিশেষ্য ও বিশেষণের শেষে 'এ' ব্যবহৃত হয়। যেমন 'শোমারে' হিন্দী ও উর্দুতে যা 'শোমারা'—যার অর্থ সংখ্যা অথবা নম্বর এইরকম বহু শব্দই আছে। উপরন্তু ফারসীতে 'বে'র অর্থ Without নয়। 'বি'র অর্থ Without। ফারসীতে 'বে' মানে To। যেমন বে মান বেগু (লিখিত ফারসীতে বে মান বেগুইদ) অর্থাৎ 'আমাকে বল' 'বে শোমা গোফতাম'—অর্থাৎ আপনাকে বললাম ইত্যাদি। কয়েকটি উদাহরণে 'বি'র অর্থ যে Without তা স্পষ্ট হবে। যেমন—'বিপারদে'—বেপর্দা নয়; 'বিহুশ'—বেহুশ নয়; 'বিআদাব'—বেআদাব নয়; 'বিগানে'—বেগানা নয়; 'বিবাফে'—বেবফা নয়। অবশ্য Without এর আর একটি ফারসী শব্দ হচ্ছে 'বেদুনে' যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

ফারসীর 'বি' এবং শব্দের শেষের 'এ' উর্দু ও হিন্দীতে অদ্ভুতভাবে যথাক্রমে 'বে' এবং 'আ' উচ্চারিত হয়।

নূরুল-ইসলাম চৌধুরী
পাহলাভি বিশ্ববিদ্যালয়,
ইরান।

টোকিওর চিঠি

২৩ কার্তিক 'দেশ' পত্রিকার টোকিওর চিঠিতে লেখক শ্রীযুক্ত বিকাশ বিশ্বাস জাপানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত এস কে ব্যানার্জি বাংলা জানেন কিনা এবং বাংলা বলতে পারেন কিনা এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে পাঠকদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত করেছেন। তাঁদের অবগতির জন্য এ বিষয়ে আমার সামান্য অভিজ্ঞতার কথা সবিনয়ে নিবেদন করছি।

প্রবীণ আই সি এস অফিসার শ্রীযুক্ত এস কে ব্যানার্জি (পুরো নাম শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৯৬৪ সালে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়ে পশ্চিম জার্মানীতে গিয়েছিলেন। আমি তখন সেখানে ব্রেমেন বন্দরে বাস করতাম। কাজে যোগ দেওয়ার কিছু দিন পরে তাঁর আস্তানা থেকে বহু দূরে অবস্থিত ব্রেমেন-এ শ্রীযুক্ত ব্যানার্জি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এক দিন এসেছিলেন সে অঞ্চলের প্রবাসী ভারতবাসীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার উদ্দেশ্যে। মিলনের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল স্থানীয় চেম্বার অফ কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি ভবনে। ভারতীয় মৈত্রী সংঘের মারফত ব্রেমেনের ইন্দো-জার্মান সোসাইটি আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে শহরের ও আশেপাশের প্রত্যেক ভারতবাসীকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন।
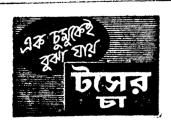
চিঠি পেয়ে আমি যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম। চেম্বার ভবনের সম্মুখে টাউন হলের চূড়ার ওপর সেদিন ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ছে দেখে মন খুশীতে ভরে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী আমরা প্রায় ৫০।৬০জন সেদিন সেখানে সমবেত হয়েছিলাম। একটি হল ঘরে আমরা পাশাপাশি সারবন্দি হয়ে দাঁড়ালাম। সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত ব্যানার্জি সেই ঘরে এসে প্রত্যেকের সম্মুখে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে তাঁর নাম, পরিচয়, বিদেশে আসার উদ্দেশ্য প্রভৃতি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে প্রশ্ন করতে বললেন। শ্রীমতী ব্যানার্জি স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রত্যেককে নমস্কার করলেন। যাঁরা অবাঙালী তাঁদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ব্যানার্জি ইংরিজীতে কথা বললেন। আর নাম শুনে যাঁদের বাঙালী বলে চিনতে পারলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন বাংলা ভাষায়। বাঙালী আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম—মাত্র ১৫।১৬জন। কিন্তু প্রশ্ন বেশী আমরাই করেছিলাম। তিনি সমানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন গড় গড় করে পরিষ্কার বাংলায়—আমরা যেমন কথাবার্তা বলি সেই ভাবে। আমার নাম সংক্ষেপে বলেছিলাম এস কে ব্যানার্জি। শোনা মাত্র তিনি অল্প হেসে বললেন—'আমার নামের সঙ্গে যে মিলে গেল।' তখন পুরো নামটা বলি।

যে পাঁচ বছর পশ্চিম জার্মানীতে আমি ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্যানার্জির আগে ও পরে একজন করে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সমবেত করে আলাপ পরিচয় করেননি।

একটি দিনের অল্পক্ষণের সান্নিধ্যে যতটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে আমার মনে হয়েছে শ্রীযুক্ত ব্যানার্জি ভদ্র, বিনয়ী, মিশুকে এবং বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্ত। আমার বিশ্বাস চেষ্টা করলেই অতি সহজে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস তাঁর নাগাল পাবেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে সুখী হবেন।

শ্রীসরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-৯।

আলোয় কালোয়

গত ৫ই তারিখে নিশঙ্কুর রচনা পড়বার পর নভেম্বর শ্রীমতী সুজাতা পুনেকরের লিখিত আলোচনাতে যে চিঠিটি—সেটিও পড়লাম।

যদিও তিনি আলোচনার ধারাবাহিকতা ও যৌক্তিকতাই বজায় রেখেছেন, তবুও মনের ইতস্ততঃ ভাবটা এড়ান গেল না।

নিশঙ্কুর লিখিত "এইসব নির্বাসিত বাঙালী মেয়েদের কি কোন অভিযোগ থাকে না?"—এখানে 'নির্বাসিত' কথাটা ক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমি মনে করি, নস্টালজিয়া একটি আপেক্ষিক শব্দ—বিপরীত অবস্থায় তার ব্যবহারের নীতিগত কোন বৈষম্য নেই! তবু বিবেকের কাছে বোধ হয় তিনি হার মেনেছেন।

আমাদের মনোগত ভাবভঙ্গী বা Expression প্রকাশ করার শব্দ সুযোগ ভেদে মাতৃভূমির ভাষা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। সেহেতু কেহ যদি বিদেশীকে বিদেশের মাধ্যমে সেই বিদেশের Manners ও Custom গুলো শিক্ষা করেন, [illegible] কোথায় কোন একটি খটকা থেকে যায় [illegible] আসলে জন্মের পর থেকেই [illegible] দেশের পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] দিয়ে ও সংস্কৃতি দিয়ে যাই এবং সেটাই আমাদের [illegible] মন ও আত্মার সঙ্গে [illegible] আমাদের দেশীয় ও মাতৃভূমির সংস্কৃতি, [illegible] সেই কারণে [illegible] পরিবেশন করতে পারি না কেন না কোন ভাবে সেগুলো প্রকাশ পায়নি [illegible] এদিক দিয়ে সে ধরণের নারীকে একেবারে নির্বাসিতা বলা যায় না তবে বিদেশী পরিবেশে কোন দেশীয় নারী [illegible] তার মানসিক অবস্থা, ভাব-ভঙ্গী আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পরিবেশ সাপেক্ষ। কিন্তু সে যদি জন্মের পর থেকেই সেই বিদেশী ভারতীয় সংস্কৃতিকে [illegible] জড়িয়ে নেয়, তবে [illegible] তার মনোভাব, আচার-ব্যবহার বিদেশিনী হতে বাধা এবং এদিক দিয়ে নির্বাসিতা কথাটি [illegible] সই হয় কারণ, স্বভাবতঃ লেখক সেই সকল নারীর মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করেই ঠিক উপলব্ধি করেছিলেন—তবে এ অবস্থায় নস্টালজিয়া নিশ্চয়ই খাটে না কারণ দেশে ফেরবার সুযোগ তিনি পান নি।

অন্ততঃ এদিকটা সুজাতা দেবীর আলোকপাত করা উচিত ছিল।

প্রতিমা মজুমদার
কলিকাতা-১০

গীওম আপোল্যানেয়ার: অবিশ্বাস্য রূপকথা

কমলেশ চক্রবর্তী

ফোটোগ্রাফ দেখলে বোঝা যায় ভদ্রলোক বেশ বড়োসড়ো দেখতে ছিলেন। সুপুরুষ, একটু লম্বাটে ধরনের মাথা, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা কালো চুল, কালো চোখ আর উপচে পড়া হাসি মুখে। ইনিই আপোল্যানেয়ার। যিনি সম্ভবত মালার্মে, র‍্যাঁবো, ভালেরির পর ফরাসী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত, উৎসর্গীকৃত ও নিন্দিত কবি। এক হিসেবে ইনিই ফরাসী ভাষার দ্বিতীয় স্বাধীন কবি। প্রথম যদি ফ্রাঁসোয়া ভিয়োঁ-কে নির্বাচিত করি। বস্তুত, বোদলেয়ার, মালার্মে, এমন কি র‍্যাঁবো, ভালেরি তো অবশ্যই ফরাসী অভিজাত কুলের প্রতিনিধি। আভিজাত্য তাঁদের রক্তের অংশ বলেই তাঁরা স্বাধীন হতে চেয়েছেন, অথচ আভিজাত্যের শেকল ছিঁড়ে সত্যিকার স্বাধীন তাঁরা নিজেদের দুর্বার নির্দেশে কখনোই হতে পারেন নি। বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো তাই সরব হয়েছিলেন, বিদ্রোহ করেছিলেন, সমাজের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে, ক্ষীয়মাণ আভিজাত্যের বিরুদ্ধে। যাকে বলা হয়েছে রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু আপোল্যানেয়ার কোনো বিদ্রোহ করেন নি। এক স্বাধীনতার মধ্যে তাঁর জন্ম, স্বাধীনতার মধ্যেই তাঁর আটত্রিশ বছরের জলস্তম্ভের মতো জীবন। আপোল্যানেয়ার ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে ১৯১৮ সনের নয়ই নভেম্বর মারা গিয়েছিলেন। সমুদ্রের জলস্তম্ভের মতো তাঁর উদ্দাম, উন্মোচিত জীবন হঠাৎ ধসে গিয়েছিল।

২৬শে অগস্ট, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে আপোল্যানেয়ারের জন্ম হয়। শিশুর মা ওল্‌গা দ্য কোস্ত্রোভিৎস্‌কি একজন দরিদ্র পোলিশ ভদ্রলোকের কন্যা। আর পিতা? একমাত্র সঠিক পিতার ঠিকানা শিশুর কুমারী মাতাই জানতেন। হয়তো বা ঠিক জানতেনও না। কারণ এই উচ্চাভিলাষী তরুণী তখন বহুবল্লভা। অবশ্য অধিকাংশ আপোল্যানেয়ার-পণ্ডিতদের মতে তাঁর পিতা ছিলেন ফ্রান্সেস্‌কো ফ্লুগী দাসপেরমন্ত, ইতালীয় সৈন্যদলের অফিসার। যিনি পুত্রের জন্মের চার বছর পর আমেরিকায় চলে আসেন। কেউ কেউ মনে করেন, ফ্রান্সেসকোর যাজক ভ্রাতা রোমারিনোই এই জন্মের জন্য দায়ী। পরবর্তী কালে কবি নিজে বলতেন, আসলে তাঁর পিতা ছিলেন একজন যাজক। কিন্তু পোলিশ কবি আনাতোল স্টার্ন বলেন, আপোল্যানেয়ার হচ্ছেন সম্রাট নেপোলিয়নের পুত্রের জারজ সন্তান।

জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় গুগ্লিয়েল্‌মো দ্য কোস্ত্রোভিৎস্‌কি। এবং

গীওম আপোল্যানেয়ার

সন্দেহজনকভাবে মাতা তার পুত্রকে ডাকতেন 'হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌' নামে। কে জানে তাঁর জন্মের জন্য কোনো জর্মান যুবক দায়ী কি না! শিশু, তিন বছরের শিশুকে নিয়ে তার কুমারী মা রোম ছেড়ে ফরাসী রিভিয়েরায় এলেন। ততদিনে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জন্মেছে। তারও পিতা অজ্ঞাত। পুত্রের নাম আলবার্তো।

কুমারী মাতা দুই অজ্ঞাতকুলশীল পুত্র নিয়ে মোনাকো শহরে বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু দিন চলে কি করে? ভাগ্যিস, তাঁর অগণিত নাগর ছিলো। ভাগ্যিস, তিনি কোনো একজনের রক্ষিতা তখনও হন নি। হলে তাঁর দিন চলতো স্বচ্ছন্দে; কিন্তু পুত্রদের সম্ভবত অবহেলা করতে হতো। শহরের গণ্যমান্যরা এই রমণীটিকে দেশত্যাগ করানোর সবরকম চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই শহরেই মাতা তাঁর পুত্রসহ অনেকদিন কাটালেন। তারপর যখন প্রথম পুত্রের বয়স সতেরো তখন তিনি বাধ্য হয়ে একজন জুলে ওয়েইল নামে আলশেসীয় জুয়ারীর রক্ষিতা হিসেবে ধরা দিলেন। পুত্রদের কাছে তার পরিচয় হলো কাকা হিসেবে। এবং এই জুয়াড়ীর সঙ্গেই তিনি আমৃত্যু সহবাস করেছেন।

যদি ওল্‌গা মোনাকোতে না আসতেন, তবে আমরা আপোল্যানেয়ার, ফরাসী কবিকে পেতাম না। মোনাকো যদিও সেকালে ইতালীয় উপনিবেশ ছিলো, তবু যেহেতু সেখানে মূলত জুয়াড়ীদের আড্ডা, আর এরা অধিকাংশই ফরাসী, ফলে আপোল্যানেয়ার শিক্ষিত হতে লাগলেন ফরাসী ভাষায়। গীওম মোনাকোর ক্যাথলিক স্কুলের ছাত্র হিসেবে শৈশবেই বেশ বিখ্যাত হলেন। কারণ সে ছাত্র হিসেবে চমৎকার এবং তখন থেকেই অহংকারী ফরাসী ভাষায় দক্ষ কবিতা রচনা করছেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গীওমকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য পুত্র ও জুলেকে নিয়ে মাতা কোস্ত্রোভিৎসকি রওনা হলেন য়ুরোপ পাড়ি দিতে। এরপর দু' বছর এই ছন্নছাড়া, অনিকেত পরিবারের কোনো খবর পাওয়া যায় নি। হঠাৎ শোনা গেল বেলজিয়ামের একটা বিচারালয়ে হোটেলের মালিককে ঠকানোর দায়ে দুজন তরুণকে বিচার করা হচ্ছে। এই হোটেলেই তাদের মা ও "কাকা জুলে" তাদের ছেড়ে চলে যান। অবশ্য পরে নিন্দার ভয়ে মাতা ফিরে এসে পুত্রদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে আপোল্যানেয়ার পরে লিখেছিলেন 'হোটেল' নামক তাঁর অন্যতম একটি বিখ্যাত কবিতা।

বিচারে মুক্তি পেয়ে প্রায় কপর্দকশূন্য কবি এসে পৌঁছলেন প্যারী শহরে। তিন বছর পরে তাঁর এই শহরের জীবন বিষয়ে এক বন্ধুর কাছে আপোল্যানেয়ার লিখেছেন: একটা অফিসে ঠিকানা লেখার কাজ করতাম তখন। এতো কম অর্থ উপার্জন করতে পেরেছিলাম যে, জীবনধারণ প্রায় অসাধ্য হয়েছিলো। কিন্তু এখানেই মিশেছিলাম দুস্থ উকিলদের সঙ্গে, জেলের কয়েদীদের সঙ্গে, আর অনেক সোনার খনির কর্মীদের সঙ্গে।

কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই অর্থাভাব তাঁর কাব্যরচনার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নি কখনোও। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে গীওমের প্রথম কবিতা একটা প্রতীকীদের স্বার্থে নিয়োজিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম "কোস্ত্রোভিৎসকি"। সেই বছরই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় এক ফরাসী ভদ্রলোকের

বিধবা জর্মান বিত্তশালিনীর। মহিলা তাঁকে তাঁর কন্যার ফরাসী ভাষা শিক্ষকের কাজে নিয়োগ করলেন। কিছুদিন তাঁর পড়ানোয় খুশি হয়ে মহিলাটি কবিকে তাঁর কন্যার শিক্ষক হিসেবে পাকাপাকি নিয়োগ করলেন। বললেন, তাঁর জর্মান-ভিলায় এসে বসবাস করতে। আপোলানেয়ার খুশি হলেন। আশ্রয় নিলেন বিধবার প্রাসাদে। এখানেই ঘটলো তাঁর জীবনের প্রথম বিখ্যাত প্রেম। দেখা হলো কবির প্রথম মিউজের সঙ্গে। আটত্রিশ বছরের জীবনে তিনি পাঁচজন মিউজের দেখা পেয়েছিলেন।

প্রাসাদটি ছিলো রাইন নদীর তীরে। প্রকৃতির প্রাচুর্যের মধ্যে। এখানেই আলাপ হলো অ্যানি প্লেডেন, সুন্দরী, নীল নয়না, বিলেতের এক গোঁড়া পরিবারের কন্যার সঙ্গে। প্লেডেন এসেছিলো গীওমের ছাত্রীর ইংরিজী শিক্ষিকা হয়ে। গীওমের এই ছিলো প্রথম রমণীর প্রতি ভালোবাসা। ফলে তাঁর আবেগ ছিলো সীমাহীন। কিন্তু প্লেডেন, কবির মিউজ তাঁর প্রেমের কোনো মূল্য দিতে পারেন নি কোনোদিন।

অ্যানি প্রথমদিকে কবির প্রতি আকৃষ্ট হলেও, যখনি শুনলেন তাঁর জন্মকথা, মায়ের কথা, জীবনের কথা তৎক্ষণাৎ তার ইংরেজ গোঁড়ামি প্রেমিককে যুগপৎ ঘৃণা ও অবহেলা শুরু করলো। অবহেলিত প্রেমিক কবি ক্রমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। কখন যেন এই উন্মত্ততা ক্রমে প্রেমের সহোদরা ঈর্ষা ও নিষ্ঠুরতায় বশীভূত হলো। একদিন এক পর্বতচূড়ায় উঠে গীওম অ্যানিকে ফেলে দেবার ভয় দেখিয়ে তাঁকে বিবাহ করায় রাজি করলেন। অবশ্যই ফিরে এসে অ্যানি বিবাহে অসম্মতি জানালেন। এক বছর পর গীওম ফিরলেন প্যারীতে, কাজ ছেড়ে। তার কয়েক মাস পরে অ্যানিও ফিরলো দেশে।

১৯০৩-এ গীওম, প্রেমিকার দর্শনাশায় গেলেন ল্যান্ডর রোডে, লন্ডনের অ্যানির বাড়িতে। এবারও অ্যানি তাঁকে ফিরিয়ে দিলো। পরের বছর কবি আবার গিয়েছিলেন লন্ডনে অ্যানিকে তাঁর প্রস্তাবের পুনর্বিবেচনার অনুরোধ নিয়ে। এবারেও তাঁর ব্যর্থতা ও অপমান ভিন্ন কিছুই জুটলো না। অ্যানি তিতিবিরক্ত হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় পালালো নতুন শিক্ষকতা নিয়ে। আর গীওম ক্রমাগত তাকে লিখতে লাগলেন প্রেমপূর্ণ পত্র। যা পরের ডাকে অ্যানির নির্দেশে লেখকের কাছেই ফিরে আসতো। হায় হতভাগ্য প্রেমিক যুবক! আর কোনোদিন কবি তাঁর প্রথম মিউজকে দেখেন নি। অবশ্য অনেক বিখ্যাত কবিতা লিখেছেন তাকে নিয়ে। সব অ্যানি-বিষয়ক কবিতাগুলোই তাঁর "আলকুলস" গ্রন্থে আছে। এই রাইন তীরের স্মৃতিমঞ্জরিত তাঁর কবিতাগুলো তাঁকে অমর করেছে। তাঁর রাইনের তীরে নৃত্যপরা সবুজ চুলের সাতটি পরীর কথা আমরা কখনো ভুলবো না। ফরাসী দেশের আজকের কবিদের মুখেমুখে উচ্চারিত হয় এই সব কবিতা। বস্তুত, এই বছর কয়টিতে গীওম তাঁর অধিকাংশ স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন। যা অ্যানিকে, রাইন-নদীর তীরভূমিকে আর ল্যান্ডর রোডের ব্রিটিশ গোঁড়ামিকে বিখ্যাত করেছে।

আপোলানিয়ারের ভাষ্যকার ফ্রান্সিস স্টীগমুলার সাহেবের মতে এই কবিতাগুলোই র‍্যাঁবো-পরবর্তী নতুন ফরাসী কবিতার সূচনা।

কবি যখন জর্মানিতে, তখনই তিনি প্রথম কোস্ত্রোভিৎসকি নাম বর্জন করে আমাদের পরিচিত নাম আপোলানেয়ার গ্রহণ করলেন। তাঁর মাতার পিতা ছিলেন পোলিশ, নাম ছিলো মিকাল আপোলিনারিস কোস্ত্রোভিৎসকি। তার নাম থেকেই কবি নিজের নতুন নামকরণ করলেন। অথবা, আর কোন নামেই বা চিহ্নিত করা যায় একজন কবিকে যাঁর জন্ম অন্ধকারে, যাঁর কোনো দেশ নেই, জাতীয়তা নেই? এক নামেই শুধু তাকে পরিচিত হতে হবে, জা হচ্ছে কালোর দেবতার নাম, আপোলো। তাই আপোলো থেকে আপোলানেয়ার।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে গীওম আপোলানেয়ার, ফরাসী কবি, স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন প্যারীতে। সেই জর্মান মহিলার দাক্ষিণ্যে পেলেন এক ব্যাংকের করণিকের চাকুরি। পর পর পাঁচ বছর সারাদিন এই চাকরি করতেন আর রাত্রি জেগে লিখতেন কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক। অল্পদিনেই 'লা প্লুম' নামক প্রতীকী কাগজের তরুণ কবি ও ছবি আঁকিয়েদের বন্ধু হয়ে উঠলেন গীওম। প্রত্যেক শনিবার রাত্রে সোইনের কাফে ভীয়েরের কফিখানায় মিলিত হতেন তাঁদের সঙ্গে। রাতভোর আড্ডা চলতো। বন্ধুরা মুগ্ধ হতেন গীওমের স্বাধিকার স্পৃহায়, আত্মবিশ্বাসের গৌরবে এবং সর্বোপরি বাকচাতুর্যে।

এই কফিখানাতেই গীওম স্থির করলেন নিজেই একটা পত্রিকা প্রকাশ করবেন। প্রথম সংখ্যা লা ফেস্তাঁ দেসোপে, বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় "ঈশপের ভোজ" প্রকাশিত হলো ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে। এক বছরের এই পত্রিকার দৌলতে গীওম এমন একদল তরুণ লেখকের বন্ধু হলেন যাঁরা ভবিষ্যতের ফরাসী সাহিত্যের ভাগ্য রচনা করবে। কবিদের মধ্যে ছিলেন, আঁদ্রে সালমঁ, মাক্স জাকব এবং পোল ফোর্ত; ছবি আঁকিয়েদের মধ্যে ছিলেন, মোরিস ভ্লামিঙ্ক ও আঁদ্রে দেরাঁ আর সর্বোপরি কিউবিজমের প্রবক্তা পাবলো পিকাশো ও জর্জ ব্রাক। এই নামের তালিকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এঁরাই আসলে ফরাসী সাহিত্য ও ছবির জগতের দিকপাল। পরবর্তী জীবনে পিকাশোর সঙ্গে আপোলানেয়ারের বন্ধুত্ব ইতিহাস হয়ে গেছে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের শেষেই আপোলানেয়ার তাঁর ব্যাংকের কাজ ছেড়ে দিতে সাহস করলেন। নির্ভর করলেন, রচনার দ্বারা জীবিকা উপার্জনের উপর। ফলে কেবল কবিতা রচনার দ্বারা চলবে না। লিখতে হলো গল্প, ছোটোদের জন্য, ছবির সমালোচনা, সংবাদপত্রের, সাহিত্যপত্রের নিষ্প্রাণ বিষয়ী স্তম্ভ, অনুবাদ ও ধ্রুপদী যৌন সাহিত্যের ধারাবাহিক মুখবন্ধ।

এই সময়েই পিকাশো মারী লোরেনস্যাঁ নামের একটি মেয়ের সঙ্গে গীওমের আলাপ করিয়ে দেন। এই মারী পরের কয়েক বছরের জন্য গীওমের বান্ধবী ছিলেন। গীওম নাকি পাঁচজন মিউজের মধ্যে মারীকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলেন। মারী তাঁর দ্বিতীয় মিউজ। বস্তুত, মারীকে ভালোবাসার অন্যতম কারণ মারীও গীওমের মতো মা বাপের অবৈধ সন্তান। ছবি আঁকিয়েদের মধ্যে তখনই মারীর ছবির নাম হয়েছে। প্রদর্শনীও হয়। নিজের আঁকা 'আত্মচিত্রে' মারীকে কখনোই সুন্দরী ব

ঘরোয়া মেয়ে বলে মনে হয় না। একটু অন্য ধরণের। যেন নিজেকে রক্ষা করার জন্যই তার চেহারায় একটা অমার্জিত আবরণ তৈরি করেছে। আপোল্যনেয়ার কথা বলেছেন: "উজ্জ্বল, তীক্ষ্ম, দয়াবতী এবং সর্বোপরি প্রতিভাময়ী। যেন একটা ক্ষুদে সূর্য—আমার আত্মার অনুরূপে নারী চরিত্র"। চরিত্রের এই স্বাজাত্যবোধ থেকেই ও'রা পরস্পর পরস্পরকে দর্শনমাত্রই ভালোবেসে ফেলেছিলেন। কবি পরে বলেছেন, মারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বছরগুলোই তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দিন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আপোল্যনেয়ার প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম স্বপ্নময় কাব্য নাটক, ল্যোন্‌সাঁতোর প্যারিসী। গ্রন্থটির চিত্রাংকন করেছিলেন আন্দ্রে দেরাঁ। তাঁর শিল্পী-বন্ধু। পরবর্তী বছরে প্রকাশিত হলো তাঁর অদ্ভুত গল্পের সংকলন, লেরেজিয়ার্ক ে ৎসিয়ে। গ্রন্থটি বিখ্যাত গোঁকুর পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন লাভ করেছিলো। এবং সম্ভবত এই গ্রন্থটিই আপোল্যনেয়ারকে ফরাসী সাহিত্য জগতে ব্যাপক পরিচয় দিলো। অবশেষে ১৯১১-তে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, লা বেস্তিয়্যের, ও কোরতেজ দ্যরাফ প্রকাশিত হলো। রাউল দ্যুফে, ফরাসী তরুণ শিল্পী বইটির অলঙ্করণ করলেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে বইটি একেবারে বিক্রি হলো না। ছাপানো হয়েছিলো ১২০ কপি। বিক্রি হলো পঞ্চাশ কপি, প্রত্যেক কপির দাম ৪০ ফ্রাঁ। আর আজ সেই বইয়ের একটি প্রথম মুদ্রিত কপির দাম মাত্র পাঁচ হাজার ডলার!

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২২শে অগাস্ট ল্যুভর সংগ্রহশালা থেকে লেয়নার্দো দা ভিঞ্চির মোনা লিজা অপহৃত হলো। এখনও অনেক ফরাসী দেশবাসীর ধারণা আপোল্যনেয়ার এই বিখ্যাত চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও পরবর্তী অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে কবির নাম এই অপহরণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বস্তুত তাঁর এতে কোনো প্রত্যক্ষ হাত ছিলো না। এই মোনালিজা ঘটনা, হাস্যকর হওয়া সত্ত্বেও কবির অবশিষ্ট জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব ছড়িয়েছিলো। ঘটনা নিম্নরূপ:

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আপোল্যনেয়ার একজন বেলজিয়ান তরুণ যুবকের সঙ্গে পরিচিত হন। তার নাম গেরী পিয়েরেৎ। লোকটি সুবিধাজনক না হওয়া সত্ত্বেও কবি তার প্রতি একটা দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। তাকে নিয়োগ করেছিলেন নিজের সেক্রেটারি হিসেবে। এই ডাকাবুকো লোকটিকে নিয়ে তিনি একটা গল্পও একদিন লিখেছিলেন।

গেরী একদিন কবির বান্ধবী মারীকে জিজ্ঞেস করলো তার জন্য ল্যুভর থেকে কোনো উপহার আনবে কি না। মারী ভাবলেন গেরী ল্যুভর সংগ্রহশালার পাশের দোকান, "ল্যুভরের" কথা বলছে। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় গেরী ল্যুভর ম্যুজিয়ম থেকে সত্যি সত্যি মারীর জন্য দুটো ছোটো পাথরের মূর্তি নিয়ে এলো। মূর্তি দুটো পুরাতন শিল্পের দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন।

আপোল্যনেয়ার আর পিকাশো ব্যাপারটায় বেশ মজা পেয়েছিলেন। এমন কি পিকাশো কয়েক ফ্রাঁ দামে গেরীর কাছ থেকে মূর্তি দুটো ক্রয় করলেন পর্যন্ত। সেই মূর্তি দ্বয়ের নিদর্শন থেকে পিকাশোর কিউবিস্ট পিরিয়ডের একটি ছবিও আছে। ছবিটির নাম "ল্যে দোমোয়াজেল দ্যাভিঁনো"। আপোল্যনেয়ার পরে লিখেছেন, তিনি পিকাশোকে মূর্তি দুটো ফেরত দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কয়েকবার। কিন্তু শিল্পসামগ্রী তস্করবৃত্তির দুর্নিবার লোভের ফলে পিকাশোর মতো মানুষও তা ফেরত দিতে পারেনি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গেরী শহর ছেড়ে চলে যায়। ফিরে আসে ১৯১১-তে। এসেই আবার ল্যুভর থেকে আর একটা মূর্তি অপহরণ করে। মূর্তিটি নিয়ে সে সোজা চলে আসে তার পুরানো বন্ধু আপোল্যনেয়ারের কাছে। আপোল্যনেয়ার সব শুনে তাকে মূর্তি ফেরত দিতে বলেন। গেরী স্বভাবতই রাজি না হওয়ায় গীওম তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন।

এর কয়েকদিন পরেই বিখ্যাত মোনালিজার ঐতিহাসিক চুরি হয়। সহজেই বোঝা যায় ল্যুভরের পেছনের সিঁড়িতে যখন ছবিটির শূন্যফ্রেম পাওয়া গেল তখন সমস্ত ফরাসী দেশ জুড়ে কেমন হইচই হয়েছিলো। পৃথিবীময় কাগজে কাগজে এ সংবাদ ছাপা হলো। ফরাসী সরকার পর্যন্ত তৎপর হলেন। তৎপর হলো পুলিশ দল। ভাবুন, আপোলনেয়ারের কথা। তিনি যে কেবল ল্যুভর-তস্করের আশ্রয়দাতা তা-ই নয়, তিনি একদিন অন্য একটা চুরির প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়দাতা ছিলেন। ফলে আপোল্যনেয়ার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন।

এর মধ্যে গেরী পলাতক হলো। কয়েকদিন পর যখন পুলিশ প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে চুরির সন্ধানে তখন তস্কর নিজেই একটা চিঠি পাঠালো "প্যারী-জুর্নাল" কাগজে। এই দৈনিক কাগজটিতে আপোল্যনেয়ার প্রায়ই লিখতেন। গেরী জানালো সে তিনটি মূর্তি চুরি করেছে। প্রথম দুটো এখন আর তার পক্ষে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয়টি সে ফেরত দিতে পারে যদি

Manuscript page of Apollinaire's The Assassin

কবির নিজ হাতে লেখা একটি সচিত্র প্রেমপত্র

তাকে পুরস্কৃত করা হয় এবং তার নামধাম গোপন রাখা হয়। "পারী জর্নাল" কাগজের বিক্রি বাড়ানোর জন্য এই চিঠির প্রাধান্য দিলো। এবং গেরীর শর্ত মেনে নিতে রাজি হয়ে সংবাদ প্রকাশ করলো। কারণ এরা বুঝতে পেরেছিলো যে, "মোনালিজা"র খোঁজ করতে গিয়ে আরো অনেক চুরির খবর পাওয়া যাবে। তাই হলো। গেরী তার কথামতো মূর্তিটি ফেরত দেওয়ায় ফরাসী সরকার, ল্যুভরের কিউরেটর এবং ল্যুভর প্রেমিক ফরাসীরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই সব চুরির তারা কোনো সংবাদই এতোদিন রাখেন নি। এসব ঘটনায় আপোল্যনেয়ার ও পিকাশোও বিমূঢ় হলেন। যদিও গেরী অন্য মূর্তিগুলোর খবর কাউকে জানায় নি তবু গীওমের বিশ্বাস অপহরণ-কারীর পরিচয় কখনো গোপন থাকবে না। এবং তার ফলে তিনিও লজ্জাকর অসুবিধায় পড়বেন। এমন কি তাঁর দৈহিক শাস্তিও আইনের চোখে সম্ভব।

সুতরাং ভীত আপোল্যনেয়ার ছুটলেন পিকাশোর বাড়ি। তিনিও তেমনি ভীত। তাঁরা দুজনে ঠিক করলেন পিকাশোর কাছে যে মূর্তি দুটো আছে তা "পারী-জর্নালে"র দপ্তরে ফেরত দেওয়া হবে। দুজনের একজন, জানা যায় না ঠিক কে, মূর্তি দুটো ফেরত দিয়ে এলেন। আপোল্যনেয়ার দুদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। মাত্র দুদিন! কারণ দুদিন পরেই তার বাড়িতে পুলিশ এলো। তারা কোনো উপায়ে সমস্ত গল্পটাই জেনে-ছিলো। বাড়ি তল্লাসি করে গেরীর লেখা কয়েকটা চিঠি পাওয়া গেল। ফলে গীওম ধরা পড়লেন! গীওম পুলিশের কাছে গেরীর সব কাহিনী বললেন। তবু পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। বিচারে তাকে দোষী বলা হলো। বলা হলো: "গীওম আপোল্য-নেয়ার এক পৃথিবী জোড়া তস্কর দলের নেতা। যারা ফ্রান্সে এসেছে আমদের জাতীয় দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ সমূহের চুরির জন্য।" তাঁর জেল হলো।

অবশ্য ফরাসী সাহিত্য-শিল্প-সংপৃক্ত লোকেরা বিশ্বাস করলো আপোল্যনেয়ার নির্দোষ এবং যেহেতু সে বিদেশী তাই তার এই শাস্তি ভোগ। সকলে সই সংগ্রহ করে প্রতিবাদপত্র বিলি করলেন। ফলে মাত্র ছয় দিন কারাবাসের পর তাঁর মুক্তি হলো। এই কারাবাসের স্মৃতি থেকে গীওম লিখলেন তাঁর বিখ্যাত "আ লা সাতে" কবিতাগুচ্ছ।

"ঢুকবো যখন কারাগারে
খুলতে হলো আমার পোশাক
চেঁচায় কে যে উচ্চতারে
গীয়োম তুই মহাপাতক"

অথবা

"আমার গুহার পাশের খোপে
ফোয়ারা এক বকবকায়
জেলার সাহেব চাবি বাজায়
ঝনঝনাঝন যাতে ফ্রতে
আমার গুহার পাশের খোপে
ফোয়ারা এক বকবকায়"

দু তিন বছর পর গেরীকে কায়েরো শহরে ধরা হয়েছিলো। আর সে বছরের ডিসেম্বরে "মোনালিজা" উদ্ধার করা হয়। কে চুরি করেছিলো এই ছবি? না পিকাশো নয়, গীওমও নয়, এমন কি গেরীও চুরি করেনি এই অমূল্য সম্পদ। চুরি করেছিলো একজন ইতালীয় রঙের মিস্ত্রী। নাম, ভিনসেনৎজো পেরুগিয়া। ইচ্ছে ছিলো দেশের সম্পদ দেশকে উপহার দেবে। হায় অন্ধ দেশপ্রেম!

এই ঘটনার পর থেকে আপোল্যনেয়ারকে সর্বদা নানা সমালোচনা শুনতে হয়েছে। কেউ বলেছে, লোকটা জু। কেউ বলেছে, লোকটা চরিত্রহীন, লম্পট। তাই যৌন রচনার ভূমিকা লেখে অতি উৎসাহে। আপোল্যনেয়ার ভয় পেলেন, বুঝি তাঁকে তাঁর প্রিয় ফ্রান্স থেকে, মাতৃভূমিতুল্য পারী থেকে নির্বাসিত করা হয়। এদিকে আশ্চর্য হবার মতোই ঘটনা ঘটল। কবির সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু পাবলো পিকাশো তাঁর বন্ধুত্ব অস্বীকার করলেন। মর্মাহত কবি, জগতেই কেউ জানে না, কোন মূল্যে পুনরায় পিকাশোর বন্ধুত্ব ক্রয় করেছিলেন।

"মোনালিজা" ঘটনা এমন কি তাঁর ও প্রেমিকা মারীর মধ্যেও বিচ্ছেদ আনলো। মারীর মা মেয়ের এই বাউন্ডুলে বন্ধুকে সহ্য করতে পারতেন না। অনেকদিন পরে মারী লিখেছিল, তাদের বিবাহ না হওয়ার কারণ মুখ্যত উভয়ের মাতা। প্রথমে মারীর মা মেয়ের ঐ লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে বিয়ে দেবে না বলে গোঁ ধরলেন। পরে আপোল্যনেয়ারের মা বললেন, এ মেয়ের কী এমন যোগ্যতা আমার পুত্রবধূ হবার? অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মারী একজন প্রায় অখ্যাত জর্মান ছবি আঁকিয়েকে বিবাহ করলো। তাদের আর কখনো দেখা হয়নি। গীওম আপোলা-নেয়ারের "আলকুলস্" গ্রন্থে অনেকগুলো কবিতাই মারীর স্মৃতিরঞ্জিত। যেমন, "জোন", "মীরাবো সেতু" ও "মারী"। প্রত্যেকটি কবিতার প্রধান সুর—বেদনা। "মীরাবো সেতু" কবিতায় আছে:

"মীরাবো ব্রিজ পেছনে ফেলে ছুটেছে
সেন তরঙ্গিণী
প্রবহমান তেমন দ্রুত তোমার প্রেম
আমার প্রেম
কেমন করে ভুলবো বলো তুমিই
আমার রঙ্গিণী
সুখের পরে কোন্ বেদনা সেই বেদনা
খুব চিনি।"

আপোল্যনেয়ারের অল্প দিনের জীবনের শেষ অধ্যায় শুরু হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ইতিমধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন উড়নচণ্ডী ফরাসী লেখককুলের মধ্যমণি, সাহিত্যের নতুন রাজা। কবি হিসেবে বিখ্যাত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নতুন শিল্পরীতির প্রবক্তা তরুণ ছবি আঁকিয়েদের মুখপাত্রও হয়ে উঠলেন। তাঁদের নিয়ে লিখতেন অজস্র, লিখতেন সর্বত্র। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন এই সব শিল্প বিষয়ক রচনার বই "কিউবিস্ট শিল্পীকুল।" আলোচিত হলো, পিকাশো, ব্রাক, জাক, ভিয়োঁ, মারসেল দ্যুকোম্প, রেমন্ড দ্যুকোম্প-ভিয়োঁ ইত্যাদি। পিকাশো এই গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত রচনা বিষয়ে লিখেছেন: "যদিও শিল্প বোদ্ধার দৃষ্টি তাঁর ছিলো না তবু নিজেকে শিল্পী আবিষ্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কোনো অসুবিধা হয় নি।" এই বছরই ফরাসী পারিশর মেরকুর দ্য ফ্রাঁস আপোল্যনেয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন, "আলকুলস" প্রকাশ করলো। ১৯০৮ থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রচনার সংকলন। কবির প্রতিকৃতি আঁকলেন পিকাশো।

প্রথম মুদ্রণে প্রথম বছরে [illegible] মাত্র সাড়ে তিন শো বিক্রি হয়েছিলো। তবু কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সমস্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বইটি যে সাড়া জাগিয়েছিলো তেমন সাড়া মনে হয় অন্য কোনো একক গ্রন্থ জাগাতে সক্ষম হয় নি। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী তো বটেই, অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষার কবিদের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করলো। বিরাম চিহ্নহীন কবিতা প্রথম এই গ্রন্থেই দেখা গেল। আপোল্যনেয়ার ক্রমাগত সার্থকতার সোপানে উঠতে লাগলেন। আলোচনা সমালোচনার, স্তুতি ও বিরক্তির কারণ হলেন তিনি। এমন সময় এক গ্রীষ্মের দিনে একজন অষ্ট্রীয় দেশপ্রেমিক অষ্ট্রিয়ার আর্ক ডিউককে হত্যা করলো। জ্বলে উঠলো সমস্ত জগৎ। যার নাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

আপোল্যনেয়ার বন্ধু পিকাশোর মতো হয়তো নিশ্চুপ থাকতে পারতেন, কিংবা পালাতে পারতেন আমেরিকায় অথবা অন্য কোনো নির্বিরোধী দেশে। কিন্তু বিদেশী হয়েও, কেবলমাত্র ফ্রান্সকে ভালোবেসে, "স্বদেশের" সম্মান রক্ষার্থে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই সর্বগ্রাসী অগ্নুৎপাতে। ১০ই অগস্ট, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নাম লেখালেন সৈন্য দলে। বছরের শেষে যোগ দিলেন ফরাসী সৈন্য দলের আটত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টে। যুদ্ধ-বিদ্যা শেখার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো নীসে। আর সেখানেই মিলিত হলেন তাঁর তৃতীয় মিউজের সঙ্গে। লুইজে দ্য কোলিনো-সাতিলোঁর সঙ্গে। যাকে কবি ডাকতেন "লু" নামে। তাঁদের এই মাত্র এক বছরের ভালোবাসার জীবন ছিলো দেহ ও

জনের মিলনময়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ফ্রণ্টে যাওয়া পর্যন্ত কবি প্রেমিকার সঙ্গে অন্তত চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন। মোট ৭৬টা প্রেম-পত্র কবি তাঁকে লিখেছিলেন। কোনো কোনো চিঠির অক্ষরগুলো নানা চিত্রের ঢং-য়ে সাজানো থাকতো। অধিকাংশ চিঠিই লিখতেন পদ্যে। ছবি হতো, কখনও পাখি, মাছ, নৌকো, কখনও বা এক রমণীর অবয়ব। কেবল অন্য আর একজন মহিলা কবির কাছ থেকে পত্রনিবেদন পেয়েছেন। তিনি মাদেমোইসেল পাজেস, আলজিরিয়ার এক শিক্ষয়িত্রী। যার সঙ্গে গীওমের দেখা হয়েছিলো নীস থেকে ট্রেনে মার্সেই যাবার পথে ১৯১৫'র নববর্ষে। পাজেস-এর সঙ্গে কবির মাত্র আর একবার দেখা হয়েছিলো সেই বছরই ওরাঁতে যখন কবি তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন। তারপর থেকে দু' বছর পাজেস—কবির চতুর্থ মিউজ অগণিত প্রেমপত্র পেয়েছেন দয়িতের কাছ থেকে। ট্রেঞ্চ থেকে কামানের গোলার বিচ্ছুরণের মধ্যেও শতচ্ছিন্ন কাগজে লিখতেন প্রেমপত্র। যদিও এই রমণীর সঙ্গে কবির কোনো যৌন সংযোগ হয় নি তবুও ক্রমশ তাঁর চিঠি যৌনতার উল্লেখে ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো। এতো ঘনিষ্ঠ যে— যে-কোনো পাঠক পত্রগুলো পাঠ করলে মনে করবে পাজেসের সঙ্গে গীওমের আবাল্যের সম্পর্ক।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে মারসেল আদেমা, আপোলানেয়ার বিশারদ পাজেস-কে ভজিয়ে এই পত্রগুলোর একটি "স্মৃতির মতো রমণীয়" এই নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অনেক চিঠির অংশ বর্জিত হয়েছে অত্যন্ত গোপনীয় ও ব্যক্তিগত বলে। তবুও এই সংকলন এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের হেতু।

গীওম আপোলানেয়ারের জীবনের শেষাংশ শুরু হয় মার্চ ১৭, ১৯১৬তে। যখন, যেদিন কবি যুদ্ধক্ষেত্রে একটা কামানের গোলার অংশে মাথায় আঘাত পেলেন। যখন গোলাটা ফাটলো তখন আপোলানেয়ার কবি মেরকুর দ্য ফ্রাঁস-এর একটা সংখ্যা পড়ছিলেন ট্রেঞ্চে বসে।

প্যারীতে আনা হোল তাঁকে। অবশেষে অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। মনে হলো তিনি এবার ভালো হয়ে যাবেন। ভালোও হলেন। আবার আবেদন করলেন কোনো যুদ্ধ-অফিসে কাজ করবেন বলে। চাকরি পেলেন যুদ্ধের পত্রিকা বিভাগে। যেখানে সৈন্যদের নৈতিক মান উন্নত রাখার জন্য পত্রপত্রিকা সেন্সর করা হয়। এখন থেকে তিনি প্যারীতেই থাকবেন।

এই শেষের বছরে তাঁর জীবনে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। প্রথম, জুন ১৯১৮তে তাঁর ছাপা নাটক "লো মামেল দ্য তিরেসিয়াস" মঞ্চস্থ হলো। কাহিনী, এক রমণীর পুরুষে পরিবর্তিত হবার কথা। কারণ তার স্তন-যুগল বেলুনের মতো আকাশে উড়ে গিয়েছিলো। অবশেষে অবশ্য মহিলাটির নারীত্ব ফিরে এসেছিলো যখন সে উচ্চাশা ত্যাগ করে ফিরে যেতে চাইল তার স্বামীর কাছে। মন দিলো সংসার ধর্মে। এই কমেডি নাটকটির বিষয়ে বলতে গিয়েই আপোল্যানেয়ার ব্যবহার করেছেন এ যুগের সাহিত্যে-শিল্পে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দটি—স্যুররিয়ালিজ্‌ম। প্রথম ব্যবহার করেছিলেন স্যুরনাচুরালিসটে, তারপর বদলে করলেন—স্যুররিয়ালিস্ত। সবাই জানে এই শব্দ কালে শব্দের গণ্ডী পার হয়ে সাহিত্য আন্দোলনের নাম হয়ে উঠলো। তাঁকে অনুসরণ করে যাঁরা ফরাসী ভাষায় কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন—জাঁ ককতো, আঁদ্রে ব্রেতোঁ আর লুই আরাগোঁ—তাঁরাই তাঁদের কাব্য-আন্দোলনের নাম দিলেন—স্যুররিয়ালিস্ট মুভমেণ্ট। বোদলেয়ার নয়, মালার্মে নয়, এমন কি আর্তুর র‍্যাবোও নয়, তাঁদের অনুপ্রেরণা, তাঁদের আদর্শ গীওম আপোলানেয়ার।

এই সময়ের কবির দ্বিতীয় সুখের ঘটনা হচ্ছে, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। নাম দিলেন, "কালিগ্রামস"। লিখলেন, "শান্তি ও সমরের কবিতা ১৯১৩-১৯১৬"। বইটিতে একশোর বেশি কবিতা সন্নিবেশিত হলো। অনেকগুলো খুবই ছোটো আকৃতিতে। এ গ্রন্থটি তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থের থেকে অনেক বেশি অভিনন্দন পেলো। যদিও কাব্যিক বিচারে আমাদের মনে হয় "আলকুলস"ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু "কালিগ্রামস" কবির দু' ধরনের সুখের কারণ হয়েছিলো। প্রথমত গ্রন্থের প্রকাশ, দ্বিতীয়ত, কবির বিবাহের (অবশেষে বিবাহের!) ঠিক দু' সপ্তাহ আগে প্রকাশিত হওয়ায়। ১৫ই এপ্রিলের ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নরম দিনে কবি বিবাহ করলেন জাকলীন কোলব নামে এক সুন্দরী লাল চুলের মেয়েকে। কোলবের সঙ্গে মাত্র কয়েক মাস আগে গীওমের পরিচয় হয়। এবার আর দীর্ঘ পরিচয়ের ঝুঁকি নেন নি। জাকলীনই হলো কবির পঞ্চম ও শেষতম মিউজ। শেষ কবিতা বইয়ের শেষ কবিতার নাম "লা জোলি রুজ", লাল চুলের জাকলীনকে নিয়ে রচিত। এই কবিতাটি সম্ভবত গীওম আপোলানেয়ারের সব থেকে বিখ্যাত, সব থেকে বেশি আবেগসিক্ত কবিতা। যা শেষ হয়েছে : "আমাকে করুণা করো" এই আর্তিময় প্রার্থনায়। মনে হয় যেন গেটের মতো, হাইনের মতো তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন শেষের দিন সমাগত। বুঝতে পেরেছিলেন এই তাঁর শেষ রচনা।

বছরের শেষের দিকে একদিন হঠাৎ প্রবল কাশি হলো। তখন য়ুরোপময় ছড়িয়েছে "স্প্যানিস গ্রীপ" নামে এক দুর্নিবার ইনফ্লুয়েঞ্জা। যার হাতে অনেকের জীবন দিতে হয়েছে। কবিরও তাই হলো শেষে।

৯ই নভেম্বর, আপোল্যানেয়ারের বুলেভার সাংজারমেইন রাস্তার ফ্ল্যাটে ডাক্তার ডাকা হলো। কবি বললেন, "আমাকে বাঁচান, ডাক্তারবাবু! আমি বাঁচতে চাই! এখনও আমার অনেক কথা বলার আছে, লেখার বাকি!" কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের আর কোনো ক্ষমতা সেদিনে ছিলো না এই মৃত্যু-গ্রাস কবিকে রক্ষা করার। সে-দিনই মহাযুদ্ধ শেষ হবার দু'দিন আগে গীওম মারা গেলেন। ১৩ই তাঁর মৃতদেহের শোভাযাত্রা প্যারী নগরীর সব রাস্তা পরিক্রমা করলো বিজয় পতাকা শোভিত হয়ে। যুদ্ধ জয়ের আনন্দের সঙ্গে প্রিয় কবির অকালমৃত্যুর বেদনা মিলেমিশে সেদিন একাকার হয়ে গিয়েছিলো। হয়তো তাঁর প্রিয় বন্ধুদের মনে পড়েছিলো :

"ঠক ঠক দরোজা করেছে বন্ধ
বাগানে শিউলি যায় কেবল শুকায়ে
কার মৃতদেহ চলে কাঁধে উঠে।"

নকল সাহিত্য

এক লেখকের কাহিনীর ভাব কিংবা চরিত্র কিংবা অংশ বিশেষ অন্য লেখক স্বীকৃতি না দিয়েই নিজের বলে চালান—বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে এই দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে। প্লেজিয়ারিজম বা গ্রন্থ তস্করতা (অভিধানে আর একটি শব্দ দেখেছি, চন্দ্ররেণু) সাহিত্যে একটা হাসা-হাসির ব্যাপার, তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে সম্প্রতি যে কাণ্ডটি চলছে, সেটা শুধু কুরুচিপূর্ণই নয়, অত্যন্ত কুৎসিত ও নোংরা ব্যাপার। কোনো কোনো সফল জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের নাম ও বইয়ের নাম জাল করে নকল বই বার করছে কয়েকটি ভুঁইফোঁড় প্রকাশক যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু পরের খ্যাতি চুরি করে নিজেরা লাভবান হওয়া। এতে সেই সব সাহিত্যিকদের যেমন, বাংলা সাহিত্যেরও তেমনি ক্ষতি হচ্ছে সাংঘাতিক।

বাংলাদেশে একই নামের এক ডজন বা একশো জন মানুষ থাকা কিছুই বিচিত্র নয় এবং এদের মধ্যে একই নামধারী দু'তিনজন ব্যক্তির সাহিত্যরচনা শক্তি থাকাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু সাহিত্যিকের চরিত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রধান একটিই হলো, অহমিকা—অর্থাৎ, আমি যা লিখেছি বা লিখতে চাই—তা আমার আগেও কেউ লেখেনি, পরেও কেউ লিখবে না—এই বোধ। সুতরাং কোনো লেখকের পক্ষেই অপর লেখকের সঙ্গে নিজের পরিচয় একাত্ম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সম্ভব নয়। সুতরাং দৈবাৎ যদি দুজনের নাম একই হয়ে যায়—তবে, যিনি কম পরিচিত বা নবাগত তিনি অবশ্যই নিজের নামটি খানিকটা বদলে নিজের আলাদা অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন। যিনি তা চান না, হয় তিনি যথার্থ লেখক নন, অথবা তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান নেই। নামের আগে শ্রী বসানো হলো কি হলো না, মাঝখানে কুমার আছে কি নেই—সেটা কোনো পার্থক্য নয়, পাঠক অত খেয়াল করে দেখেন না। কোনো জনপ্রিয় বা প্রতিষ্ঠিত লোকের নামে যার নাম মিলে যায়—এমন কোনো ব্যক্তিও যদি ওই নামেই লিখতে শুরু করে তবে অবশ্যই বুঝতে হবে—সেই লেখকের উদ্দেশ্য খারাপ।

সম্প্রতি এ রকম অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন 'সাহেব-বিবি-গোলাম', 'বেগম-মেরী-বিশ্বাস' প্রভৃতি অসংখ্য জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখক বিমল মিত্র। বিমল মিত্র নামের অপর এক ব্যক্তি পরের পর বই লিখছেন, ছাপা হয়ে রং-চং-এ মলাটে বাজারে ছাড়া হচ্ছে—সে সব বই-এর বিক্রয় কমিশন খুব বেশী, ফলে বিক্রেতারা আদর করে বইগুলো সাজিয়ে রাখছেন—পাঠকরাও তাঁদের প্রিয় লেখক বিমল মিত্রের লেখা মনে করে আদর করে কিনে বাড়িতে নিয়ে আসছেন—তারপর ইলিশ মাছের পেটে ছেঁড়া চট কিংবা মাখনের টিনে বালির জল দেখার মতন হতভম্ব হয়ে যাচ্ছেন। পাঠকরা ফিরে গিয়ে এই সব বই-এর প্রকাশককে অভিযোগ জানালে—প্রকাশকরা নাকি অম্লান বদনে বলছেন, আর একজন বিমল মিত্র সত্যিই আছে এবং তার লেখা বই তারা ছাপাবেন ও বিক্রী করবেন, বেশ করবেন! এই রকম নাকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নামেও দ্বিতীয় লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। আনন্দবাজারে শ্রীনিশীথ দে এই তথ্য জানিয়েছেন।

সংবাদপত্রের রিপোর্ট এই যে, শিক্ষা দপ্তরের একজন মুখপাত্র এবং পুলিশ বিভাগ জানিয়েছেন যে, এই ব্যাপার বন্ধ করার কোনো আইনগত অধিকার তাঁদের নেই—দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব হলেও তাঁরা কিছু করতে পারেন না। কী কাণ্ড! ধরা যাক্ একজন লেখক নানা পত্র পত্রিকায় লেখা পাঠাচ্ছেন—কোনোটাই প্রকাশিত হচ্ছে না—তার পর তিনি হঠাৎ এক মধ্যাহ্নে এফিডেভিট করে নিজের নাম পাল্টে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম নিয়ে নিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'অপ্রকাশিত' রচনা বাজারে ছাড়তে লাগলেন—আইন তাকে কিছুই করতে পারবে না। এই সব আইনের মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝি না। আইনের মারপ্যাঁচে যথার্থ সাহিত্যকে অশ্লীল বলে শাস্তি দেওয়া যায়—অথচ সাহিত্য নিয়ে জুয়োচুরি চললে শাস্তি হবে না। এমন কি, এই সম্পর্কে মন খুলে নিন্দে করলে আমিই হয়তো আইনের প্যাঁচে পড়ে যাবো।

ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, সারাজীবনে তিনি লিখেছেন ৪২খানা বই, আর দ্বিতীয় বিমল মিত্রও দু' এক বছরের মধ্যে লিখে ফেলেছেন ৪২ খানা বই—মেশিনে ছাড়া, দেড় বছরে ৭২-খানা বই লেখা কি কারুর পক্ষে সম্ভব?

আমি নিজে এ রকম একখানা বই পড়ে দেখেছি। বইটির নাম 'বালিকা বধূ', লেখকের নাম বিমল মিত্র। স্পষ্ট বোঝা যায়, ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের খ্যাতি ও ঔপন্যাসিক বিমল করের ওই নামের বইটির বিশেষ খ্যাতি এক সঙ্গে আত্মসাৎ করার চেষ্টা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই, কারণ, বইটি কোনো বইই নয়—এতে কোনো কাহিনী নেই, কোনো বাংলা ভাষার সামান্যতম জ্ঞানের পরিচয় নেই, স্রেফ ইলিশ মাছের পেটে ছেঁড়া ন্যাকড়া।

আইন যদি এইসব বই-এর প্রকাশ আটকাতে না পারে—তবে পুস্তক বিক্রেতারা—যাঁরা অবশ্যই প্রকাশকদের খবর জানেন—তাঁরাই এই সব বই বর্জন করবেন আশা করি। আর পাঠক ক্রেতাদেরও উচিত, কমিশন বেশী দেখলেই সেই ফাঁদে পা না-দেওয়া এবং কেনার আগে বইটি একটু উল্টে পাল্টে দেখা।

ধ্বংসকালীন সাহিত্য

'সাম্প্রতিক' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা ধ্বংসকালীন সাহিত্যের একটি আন্দোলন শুরু করেছেন। পত্রিকাটির বিভিন্ন কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে পাপ, শয়তান, মেফিস্টোফিলিস ইত্যাদির উল্লেখ দেখা গেছে—কিন্তু প্রকৃত ধ্বংস বা নৈরাজ্যের সাহিত্যের কোনো পরিচয় অবশ্য এতে নেই। মুখবন্ধেও এঁরা জানিয়েছেন, এঁরা আসলে সৃষ্টিতে বিশ্বাসী, ধ্বংসের পর যে সুন্দর সৃষ্টি আসছে—এঁরা সেই সৃষ্টির বৈতালিক।

কাব্যনাট্য

কদাচিৎ অভিনয় হয়, তবু বাঙালী কবিরা কাব্যনাট্য রচনায় খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। দশ থেকে কুড়ি পাতার মধ্যে, খানিকটা কাহিনীর আভাস সমন্বিত সংলাপপ্রধান দীর্ঘ কবিতা—বাংলা কবিতা এই একটা আঙ্গিক খুঁজে নিতে চাইছে। বিমল রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'দৈনিক কবিতায়' প্রকাশিত হয়েছে চারটি কাব্য নাটক, পোল ভার্লেন (অনুঃ কমলেশ চক্রবর্তী), দিলীপ রায়, অলোক সরকার এবং শান্তি লাহিড়ী। শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা'র পঞ্চম সংকলন সদ্য বেরিয়েছে—এতেও আছে দুটি কাব্য নাটক। এবং 'কেবল নাটকের বিরুদ্ধে' এই নামে প্রবন্ধ লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

সনাতন পাঠক

নাটক

স্ত্রী চরিত্র। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মানবমন। মূল্য—৬·০০।

সম্রাট—অপারেশান ফাউন্টাস। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অধুনা। মূল্য—৪ টাকা।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা নাটকগুলি বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের দিক দিয়ে একেবারে অভিনব বলা যায়। সভ্যতার উপকরণ যত বাড়ছে, মানুষের অন্তরের দৈন্য ও অসহায়ত্ব বাড়ছে ঠিক সমপরিমাণ। অথচ তার বিপরীতটাই তো হওয়া উচিত ছিল। মানবমনের অন্তর্গূঢ়ে কোনো অন্ধকার নয়, শোষণভিত্তিক সমাজের বঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতাই মানুষকে তার জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছে, মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ভিতর চিড় ধরিয়ে মানুষকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এই নাটকগুলিতে শিল্পীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এইসব সমস্যার যে দক্ষ শিল্পায়ন ঘটিয়েছেন তা বাংলা নাট্যনির্মাণে তাঁকে অন্যতম পথিকৃতের সম্মান দেবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'স্ত্রীচরিত্র' নাটকে আছে ('একটি স্ত্রী-চরিত্র' 'শিলাকমল' 'অনন্বয়'—এই তিনটি নাটকের সংকলন) এ যুগের বিবাহ-প্রেম সমস্যার নাট্যচিত্র ও তার মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের চেষ্টা। চিত্রিতা, কমলকলি ও বিপাশা যথাক্রমে নাটক তিনটির নায়িকা। যুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক পটভূমিকায় এদের মনে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম সঞ্চারিত, আবার নিজ নিজ বিশিষ্ট পরিবেশের দরুনে এরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। 'একটি স্ত্রীচরিত্র'র নায়িকা চিত্রিতা ভালোবাসতে চায় কিন্তু পারে না, 'শিলাকমল'-এর কমলকলি স্বামীকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, কিন্তু তার কাছে ভালোবাসা পেলেও মর্যাদা পায় না। 'অনন্বয়'-এ বিপাশার দ্বিখণ্ডিত সত্তা দেহ ও মনের পিপাসাকে সমন্বিত করতে পারে না। তীব্র দ্বন্দ্বের ফলে দুঃসহ অন্তর-যাতনায় তিনজনই জর্জর। তিনজনই নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথে সমাধান খোঁজে। যন্ত্রণার উপশম চায়। বিপরীতমুখী ইচ্ছার সংঘাতে মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়, মনে আসে বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা। নাটকীয় পরিসমাপ্তির মধ্যে ঘটে সমস্যার সমাধান, দ্বন্দ্ববিরোধের পরিসমাপ্তি। রূঢ়, নিষ্ঠুর সমাজ তিনজনের কাছ থেকে চরম মূল্য আদায় করে নেয়।

তিন নায়িকার পারিবারিক পরিবেশ এক ধরনের নয়। চিত্রিতা লেখাপড়া জানা, চাকরি করা আধুনিক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে; কমলকলির স্বামী সম্ভ্রান্ত জমিদার থেকে ব্যবসাদারে রূপান্তরিত হচ্ছেন; আর বিপাশা ইংরাজী জানে না, আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটায়। এই পরিবেশের বিভিন্নতা তাদের চরিত্র ও মানসিকতার পার্থক্যের জন্য দায়ী। এই পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। একই সমস্যা তিন নায়িকার মধ্যে তিনভাবে ঘটেছে। চিত্রিতা পুরুষজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন, কমলকলি বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে ও স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন, আর বিপাশা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন।

'সম্রাট' একজন আধুনিক শিল্পপতির কাহিনী। এই নাটকের নায়ক সুরেশ্বরের, কাছে ন্যায়, নীতি, ভালোমন্দ সমস্ত কিছুরই নিরিখ অর্থ এবং ক্ষমতা। সুরেশ্বরের পণ্যসাম্রাজ্য গড়ার কায়দাও আধুনিক। এমন সমস্ত ভাবাদর্শ যা তার শোষণের ভিতকে শক্ত করবে সেইসব ভাবাদর্শের প্রচারে এবং প্রসারে সে অকৃপণ। বিমূর্ত শিল্পের পূজারী কবি পারিজাত বসু; মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে বৈষম্য এবং প্রভেদ অন্তর্নিহিত এবং মৌলিক—এই ধরনের গবেষণার কাজ করতে ইচ্ছুক আমেরিকা-ফেরত বিজ্ঞানী ডঃ হীরক দে, ফ্রয়েডীয়ান মনোবিজ্ঞানী এবং পণ্ডিত শিবশঙ্করবাবু, এদের সকলকেই দরাজ হাতে অর্থসাহায্য করে সুরেশ্বর। আবার এর বিপরীত দিকে তাঁরই ছেলে নিখিলেশ, শিবশঙ্করের মেয়ে সীমা ইত্যাদি যারা এই শ্রেণীর সভ্যতার অবসান ঘটাতে আপসহীন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ—এদের সকলকে কেন্দ্র করে নাটক শেষ পর্যন্ত যে নির্ভুল পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে তা সমাজ-সচেতন শিল্পসৃষ্টির এক সার্থক নিদর্শন বলে মনে হয়েছে।

রায়ঃ ১০৬ 'এফ' ব্লক, নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৫৬। মূল্য ৩·০০।

অ্যাঙেগালা। বরুণ রায়। রূপারেখাঃ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯। মূল্য ৯·০০।

চলচ্চিত্র: স্মরণীয় স্রষ্টা। শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত। শান্তি দত্তঃ ১১২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৩·০০।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। নেপাল মজুমদার। সারস্বত লাইব্রেরীঃ ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ১০·০০।

জ্ঞানের আলো জ্বালালো যারা। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেডঃ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩·০০।

স্পেনের কবিতা। শিবেন চট্টোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশকভবনঃ ১৯/৭, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২·০০।

অনুবাদ—বিবেকানন্দম্ (সংস্কৃত)। ডঃ সীতানাথ গোস্বামী। 'কল্যাণী', ৬৩/১এ সেলিমপুর লেন, কলিকাতা-৩১। মূল্য ৭·০০।

"সাথী" হিন্দী চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা
—এ-সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

রঙ্গপট

ভেনাস পিকচার্স-এর 'সাথী' চিত্রে
সিমি

নতুন বছরে....

আটষট্টি সনের বাংলা ছবির খতিয়ান এর আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। সালটি যে বাংলা ছবির পক্ষে মোটেই ভাল যায়নি তা নতুন করে বলার দরকার নেই। খুবই কম সংখ্যক ছবি গত বছরে রিলিজ হয়েছে। শো অনেক দিন চলেনি। 'শো মাস্ট গো অন' কথাটির ব্যত্যয় ঘটেছে। এমন দুর্ভাগ্য কেন হল সে কথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। দুর্দশার মধ্যে নতুন সৃষ্টির বীজ কতখানি বপন হয়েছে এবং তার ফলনই বা কী হবে তা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে।

এই তো গেল নৈরাশ্যের দিক। আশার দিকও আছে। যে-কয়টি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে তাতে মনে হয়নি, বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পমান নিম্নগামী। কয়েকটি বেশ ভাল ছবি আমরা আলোচ্য বছরে পেয়েছি। নতুন প্রতিভারও আগমন ঘটেছে। আরও আনন্দের কথা, একাধিক চিত্র বড় চিত্রতারকা ছাড়াই জনপ্রিয় হয়েছে। এক কথায়, ছবি মোটামুটি ভাল চলেছে। এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গুণের প্রতি-যোগিতায় মর্যাদা পাবার মত একাধিক ছবিও গত বছরের ক্ষুদ্র চিত্রতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

আশা করি, বর্তমান বছর আটষট্টি সনের মত যাবে না। আটষট্টির দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি যেন এই বছরে না ঘটে, সংশ্লিষ্ট সকলেই এবং বাংলা ছবির দর্শকরাও এই কামনাই পোষণ করবেন।

রবীন্দ্রসদনে নাট্যোৎসব

রবীন্দ্রসদনের উদ্যোগে এক নাট্যোৎসব শুরু হয়েছে এ সপ্তাহে। প্রথম পর্যায়ের

আগন্তুকের 'চিরদিনের' নাটকে
[illegible] দেবী

উৎসবে (৬ থেকে ১৪ জানুয়ারী) ক্যালকাটা থিয়েটার (দেবীগর্জন), চলাচল (ধনপতি গ্রেপ্তার), দক্ষিণ পরিষদ (শেষ সংবাদ), থিয়েটার ওয়ার্কশপ (ছায়ায় আলোয়), চতুরঙ্গ (ডাউন ট্রেন), রূপান্তরী (কর্নিক), রঙ্গসভা (বিপ্লবী ডিরোজিও), থিয়েটার ইউনিট (জন্মভূমি) প্রভৃতি বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা রয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসব চলবে ২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারী, তারপর ১৭ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি।

শীর্ষস্থানীয় নাট্যসংস্থা এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন। মোট ২১টি সংস্থা। এক সাংবাদিক বৈঠকে এই উৎসবের খবর দিয়ে শ্রীমন্মথ রায় বলেন, রবীন্দ্রসদন যাতে ক্রমশ বর্তমান নাট্য আন্দোলনে একটি সাধক ভূমিকা নিতে পারে সেজন্যই এই উৎসবের আয়োজন। রবীন্দ্রসদন পরিচালক সমিতির তরফ থেকে শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই উৎসব অনেকটা এক্সপেরিমেন্ট-এর মত। যদি এতে সাফল্য আসে তবে এই ধরনের কাজে সরকারী সাহায্য ও অর্থ আরও বেশী পরিমাণে পাওয়া যাবে। সদনের প্রশাসন-আধিকারিক শ্রীনীতীশ বাগচী জানান, উৎসবে যোগদানকারী প্রতিটি সংস্থায় নাট্যপ্রযোজনার ব্যয় বহন করবেন রবীন্দ্রসদন। মোট কয়েক হাজার টাকা তাতে খরচ হবে। যে সব সংস্থার স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ নেই সেই সব নাট্যদলকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত শ্রীমন্মথ রায় আরও বলেন, যে-

টলি-টিপ্পনী

ছবির আকাশে বেশীর ভাগই মেঘ, কিছুটা রৌদ্র। প্রসঙ্গত বলে রাখি, অরুন্ধতী দেবীর 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রায় সমাপ্ত।

'মেঘ ও রৌদ্র'-র পর অরুন্ধতী দেবীর ছবি কী? ইতিপূর্বে 'মৃগয়া'-র নাম শোনা গিয়েছিল। এ বিষয়ে অরুন্ধতী দেবী আমাকে জানান, "এখনো পর্যন্ত তো সেরকম পরিকল্পনাই আছে। "মার্চ" মাস থেকে 'মৃগয়া'-র শুটিং শুরু করার ইচ্ছা।"

'মৃগয়া'-র ভূমিকালিপিতে কানাঘুষো দুটো বড় নাম শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। উত্তমকুমার এবং অশোককুমার। এ বিষয়ে শ্রীমতী অরুন্ধতী বলেন, "আমার অনেক কিছুই ভাবা আছে, কিন্তু স্ক্রিপ্ট শেষ না করে, চুক্তিপত্রে শিল্পীদের সই না করিয়ে, কোন কিছুই ফাইন্যাল বলতে পারছি না।"

বনফুলের ঐ নামেরই বড় গল্প নিয়ে 'মৃগয়া'-র চিত্রনাট্য। বলা বাহুল্য, চিত্রনাট্য লিখছেন অরুন্ধতী দেবী নিজেই। পূর্ণিমা পিকচার্সের ছবি, প্রযোজনা করবেন নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত।

*

বাংলা ছবির প্রযোজক-তালিকায় নেপাল দত্ত কিংবা অসীম দত্তর নাম নতুন নয়। '৬৭ সালে প্রযোজকদ্বয় (ব্যক্তিগত সম্পর্কে পিতা-পুত্র) দু'খানি প্রচণ্ড আর্থিক সফল ছবি উপহার দিয়েছেন। ছুটি এবং হাটে-বাজারে।

'হাটে বাজারে'-র রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ উপলক্ষেই হয়ত নতুন বছরের শুরুতে প্রিয়া সিনেমার উপরে এক রাজকীয় প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। রীতিমত গ্ল্যামার ফাংশন। চিত্রতারকায় শোভিত। বড় বড় পরিচালকরাও ছিলেন। রাত প্রায় ন'টার সময় পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় এলেন। তাড়াতাড়ি প্রযোজক নেপাল দত্তর কাছে এগিয়ে গেলেন। কোটের পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে সবিনয়ে বললেন, "কাল আমার নতুন ছবির মহরৎ, আসবেন কিন্তু।

এক সময় পার্থবাবুকে একান্তে [illegible] নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মহরতে সুচিত্রা সেন আসবেন কি? নায়িকা চরিত্রে ওঁর অভিনয় করবার কথা শুনতে পাচ্ছি। পার্থবাবু বললেন, "না, তিনি [illegible] [illegible] [illegible]"।

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে 'মেমসাহেব' ছবির মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীচ্যবন, পাশে উত্তমকুমার ফটো—দেশ

ভিড়ের মধ্যে পরিচালক হীরেন নাগকে দেখলাম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে।

—কী ব্যাপার, চুপচাপ দাঁড়িয়ে যে? কাল তো আপনার ছবি রিলিজ! হীরেনবাবু জবাব দিলেন, "সেই জন্যেই একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে নার্ভটাকে একটু Strong করে নিচ্ছি।"

—"সাবরমতী"র ব্যাপারে নার্ভাস?

—"সাবরমতী" বলে নয়, প্রতিটি ছবিই পরিচালকের কাছে এক একটা পরীক্ষার মত। কাল আমার পরীক্ষা।

ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায় প্রযোজক কে এল কাপুরের সঙ্গে কী নিয়ে গল্প করছিলেন, আমি কাছে যেতেই টেনে নিয়ে পাশে বসালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সলিলবাবুর (সলিল সেন) খবর কী? বললাম, "মন নিয়ে" ব্যস্ত।

সলিল সেনের সঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায় ইতিপূর্বে পর পর দুটি ছবিতে ক্যামেরার কাজ করেছেন। সলিলবাবুর নির্মীয়মান 'মন নিয়ে'-তে ক্যামেরার কাজ করছেন দিলীপরঞ্জন। বিমল মুখোপাধ্যায় এখন তপন সিংহর "সাগিনা মাহাতো"র ক্যামেরাম্যান।

পার্টিতে তপন সিংহ এবং অরুন্ধতী দেবী, তরুণ মজুমদার ও সন্ধ্যা রায় একসঙ্গেই এসেছিলেন। সত্যজিৎ রায় এলেন সপুত্রক। সবার শেষে এলেন দীপক বসু ও ললিতা চ্যাটার্জি (বসু)।

*

শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের নতুন ছবি নিয়ে চিত্রামোদীদের মনে আজও জল্পনা-কল্পনা অনেক। সাধারণত তিনি এখন আর বছরে একটার বেশী ছবিতে কাজ করেন না। গত বছর তো ওঁর একটি ছবিও রিলিজ হয়নি। 'কমললতা'র শুটিং চলছে অনেক দিন ধরে। কবে শেষ হবে জানি না। 'কমললতা' চলাকালীন ইতিপূর্বে মাস কয়েক আগে ঋত্বিক ঘটকের 'রঙের গোলাম' ছবিতে ওঁর কাজ করার সম্ভাবনার খবর পেয়েছিলাম। ঐ সময়েই পরিচালক নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও আমাকে বলেছিলেন, শ্রীমতী সেন নাকি ওঁর একটা ছবিতে কাজ করবার আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লিখিত দুটি সংবাদই শেষ পর্যন্ত অসমর্থিত। সম্প্রতি সুচিত্রা সেনের অভিনয়ে আরো একখানি ছবির প্রস্তুতি পর্বের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ছবির পরিচালকের নাম বলা থেকে বিরত থাকলাম অনিবার্য কারণে। ছবির নাম কি 'মেঘ কালো'? নীহাররঞ্জন গুপ্তর ঐ নামেরই জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্ররূপ। চিত্রনাট্য রচনা করছেন প্রণব রায়। প্রযোজনা করবেন সঙ্গীত পরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। 'মেঘ কালো'র নায়ক নির্বাচন পর্ব এখনো শেষ হয়নি, অতএব নামটি এখনো পর্যন্ত মেঘে ঢাকা।

আটষট্টি সালের মুক্তিপ্রাপ্ত শেষ ছবি "কখনো মেঘ"। নতুন বছরের শুরুতে খবর এল "মেঘ কালো"-র।

—বিচক্ষু

"মেমসাহেব" শুরু

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে গত শুক্রবার (৩ জানুয়ারী) পম্প ফিল্মসের "মেমসাহেব" ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন। তিনিই ক্ল্যাপস্টিক দেন, শিল্পী ছিলেন শ্রীউত্তমকুমার। প্রারম্ভে শ্রীপাহাড়ী সান্যাল সকলকে স্বাগত জানান।

বোম্বাই বিচিত্রা

ফুল ফটুক
না ফটুক আজ বসন্ত।

'হিন্দীতে ভাল ছবি হোক আর না হোক, হিন্দী ছবিই ভারতীয় ছবির মান-সম্মানের নিয়ামক।'

'আঞ্চলিক ছবি যতই আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাক আর কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করুক বা কিছু নাক উঁচু বুদ্ধিজীবীর বাহবা কুড়াক, কোন আঞ্চলিক ছবিই আজ পর্যন্ত সর্বভারতীয় জনতার আশীর্বাদধন্য হয়নি। হিন্দী ছবি যত খারাপই হোক তাকে কোন সময়েই সর্বশ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবির সঙ্গেও এতটুকু প্রতিযোগিতায় নামতে হয় না। হিন্দী ছবির দর্শক ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে. কিন্তু আঞ্চলিক দর্শক বিশেষ অঞ্চল ছাড়া সর্বভারতীয় নয়। যাঁরা আঞ্চলিক ছবি দেখেন তাঁরাও হিন্দী ছবির দর্শক কিন্তু হিন্দী ছবির দর্শক মানেই আঞ্চলিক ছবির দর্শক নয়। সুতরাং ব্যবসায়ের দিক থেকে আঞ্চলিক ছবি কোনদিনই হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। হিন্দী ছবির সঙ্গে আঞ্চলিক ছবির প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র খ্যাতির মাল্যভূষিত মঞ্চে! যদিও সে মঞ্চে হিন্দী ছবি বার বার আঞ্চলিক ছবির হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে তবু তার পরোয়া নেই। তার কারণ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের খ্যাতিকে খাতির করার মত মনের অবস্থা এখনো ব্যবসা-সফল হিন্দী-চিত্রনির্মাতার হয়নি! রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-ভূষিত আঞ্চলিক ছবির অতি সফল সৌভাগ্যও সাধারণ সার্থক (ব্যবসায়িক অর্থে) হিন্দী ছবির ঈর্ষার বস্তু নয়। হিন্দী ছবির কপালে পুরস্কারের তকমা জুটলে সোনায় সোহাগা হলো। না জুটলেও কুছ পরোয়া নেই। হিন্দী ছবির সোনা চলচ্চিত্র মাধ্যমের দিক থেকে যতই গিলটি করা হোক না কেন তার পপুলারিটি সাধারণের অসাধারণ। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আঞ্চলিক ছবি যত ভালই হোক সে কোন-দিনই হিন্দী ছবিকে শোধরাতে পারবে না। হিন্দী ছবির মান উন্নত করতে হিন্দী ছবিকে লড়তে হবে হিন্দী ছবির সঙ্গে—'
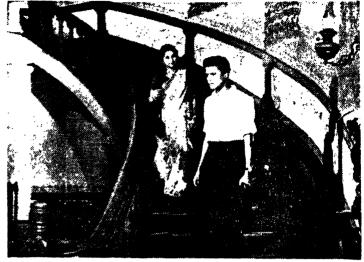
'আরোগ্য নিকেতন' (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়

কিন্তু মুশকিল কি জানেন! যাঁরা হিন্দী ছবির কায়া পাল্টাতে পারতেন, শো-বিজনেসের মায়ার কবলে পড়ে, তাঁরা প্রায় সকলেই নিজেদের পালটে ফেলেছেন। ফলে 'বিশুদ্ধ খারাপ' হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য 'বিশুদ্ধ ভাল' হিন্দী ছবি বাজারে নেই। কথাটা বোধহয় ঠিক বোধগম্য হলো না। আরো একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। 'বিশুদ্ধ খারাপ' মানে, যেসব হিন্দী ছবি ফুলিশলি ফুলিশ—. অর্থাৎ নির্ভেজালভাবে ভেজাল, এক কথায় একেবারে প্রিটেনসনহীন. সেইসব ছবির সার্থকতার একটা কারণ আছে; কেননা এই সব চরিত্রহীন চলচ্চিত্রের চরিত্রই চরিত্রহীনতা! তাই দর্শকদের কাছে অনায়াসে মার্জনীয়। কিন্তু সাধারণত যেসব ভাল ছবি হিন্দীতে হয় সেগুলি খারাপ ছবি যে রকম খারাপ হয় সেই তুলনায় ভাল হয় না। অসৎ চরিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে ভাল ছবির যতখানি চরিত্রবান হওয়া উচিত এখনো পর্যন্ত সে ততখানি চরিত্রবান হয়নি। যদি কোনদিন হয় তাহলে তখন প্রতিযোগিতা হবে। হিন্দী ছবির কায়া পালটাবে! আপাতত সম্ভাবনা নেই, সুতরাং এ আলোচনায় সময় নষ্ট করে লাভ কি?'

'বহু প্রতীক্ষার পর এত দিনে শোনা যাচ্ছে যে, আঞ্চলিক ছবির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক সত্যজিৎ রায় হিন্দী ছবি তৈরি করবেন। শুনেছি, এ বছরের স্বর্ণ-পদক পুরস্কারভূষিত আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের পরিচালক তপন সিংহও নাকি দিলীপ-কুমারের সঙ্গে হিন্দী ছবি বানাবেন। এ খবরগুলো যদি সত্যি হয় তা হলে হিন্দী চলচ্চিত্রের নতুন বছরকে জবর গোছের একটা অভিনন্দন জানিয়ে রাখা যেতে পারে।'

'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, বাংলাদেশের আর একজন বিখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেনও বর্তমানে একটি হিন্দী ছবি তৈরি করছেন। তা হলেই বুঝতে পারছেন, হিন্দী ছবির জগতেও কোথায় যেন একটা তোলপাড় শুরু হয়েছে।'

'কিন্তু মুশকিল আছে স্যার! এই সব আদর্শবাদী, বাস্তবতার পূজারী চলচ্চিত্র

'দিবারাত্রির কাব্য' (পরিচালনা : বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী) ছবিতে বসন্ত চৌধুরী ও অঞ্জনা ভৌমিক

"নল দময়ন্তী" চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
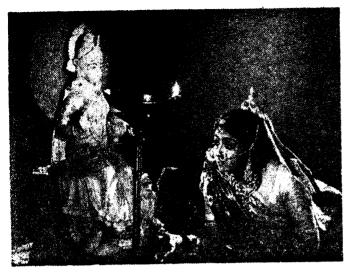
মাধ্যমের প্রক্রিয়ায় পুরোহিতদের পাল্লা দিতে হবে সেইসব রথী-মহারথীদের সঙ্গে যাঁরা দশ/বিশ লাখ টাকায় ছবি করার কথা আর স্বপ্নেও ভাবেন না। তাঁরা আজকাল কোটি টাকা ছাড়া কথা বলছেন না। তাঁদের চোখের সামনে সব কিছু এখন 'স্পেকটাকুলার', 'ম্যাগনাম-অপাস', 'ম্যামথ'।

কেস হোয়াট! শুধু জাঁকজমকের আফিম খাইয়ে সাধারণ মানুষকে আর কতদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখবে! কোটি টাকার ছবি আজ যাঁরা করছেন, একথা ভাববেন না যে তাঁরা স্বেচ্ছায় ঐ সব ছবি করছেন, তাঁরা ঐসব ছবি করছেন বাধ্য হয়ে। কারণ তাঁদের অন্য কিছু করার উপায় নেই। সবাই যে যার "সারকামস্ট্যানসেসের ভিকটিম"! প্রথমবারেই যদি একবার চেঁচিয়ে ফেলেন তা হলে দ্বিতীয় বারেও আপনাকে চেঁচাতে হবে, তৃতীয়বারেও তাই। কিন্তু মহাশয়, শেষ পর্যন্ত কত চেঁচাবেন। চেঁচাতে চেঁচাতে একদিন গলার স্বর ফাটবে আর শ্রোতাদেরও কানে তালা লাগবে। তখন? বর্তমানে হিন্দী ছবির ইকনমিকস যে দিকে যাচ্ছে অচিরেই তাকে সে পথ থেকে ফিরতে হবে। নইলে স্বেচ্ছায় যদি না ফেরে তাহলে এমন চোট খাবে যে আর উঠতে হবে না। একবার ভাবুন দেখি, একটি দু কোটি টাকার ছবি তিন বছর ধরে তৈরী হবার পর কতদিন চললে তবে সে ছবির নির্মাতা লাভের মুখ দেখবেন। এ ধরনের অতি বায়বহুল ছবি কখনো সখনো এক/আধটা হলেও হতে পারে কিন্তু এইটেই যদি নিয়ম হয়ে যায় তাহলে ত আর বাঁচার পথ থাকবে না!"

তাহলে মোদ্দা কথা এই দাঁড়াল যে হিন্দী ছবির বর্তমান ব্যবসা ব্যবস্থা যদি [illegible] ভুগতে হবে। এবং আপনাদের আলোচনায় যা বুঝলাম সেটা এই যে, হিন্দী ছবি অন্যপথে চলবার জন্য পা বাড়িয়েছে এখন শুধু চলতে শুরু করলেই হয়। আপনাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। হিন্দী ছবি আঞ্চলিক ছবির সঙ্গে খাতির মধ্যে পাল্লা দিক, হিন্দী ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মানচিত্রে সম্মানের আসন লাভ করুক। আঞ্চলিক ছবির নির্মাতা এবং দর্শকরাও তাতে খুশীই হবে।

❊

শোনা যাচ্ছে দশই জানুয়ারী স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহ অপ্সরায় 'তিসরী কসম' রিলিজ হবে। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সব অপ্রকাশিত খবরই যাঁরা জানেন তাঁরা তিসরী কসমের রিলিজ হবার খবর কিছুদিন আগেও পাননি।

প্রযোজক গীতিকার শৈলেন্দ্র'র অকাল মৃত্যু 'তিসরী কসম'কে এক অসহায় অরফান-এ পরিণত করেছে! ছবি তৈরী হওয়াকালীন নায়ক রাজ কাপুর তাঁর পারিশ্রমিক নেননি। তাই সেই পারিশ্রমিকের পরিবর্তে তাঁকে বম্বে টেরিটোরির পরিবেশনার স্বত্ব দিয়ে দেওয়া হয়। এবং বর্তমানে রাজ কাপুরের তত্ত্বাবধানেই 'তিসরী কসম' বম্বেতে রিলিজ হচ্ছে মাত্র চার সপ্তাহের জন্য।

'তিসরী কসম'-এর ইতিহাস শুরু হয় উনিশ শো একষট্টি সালে। ছবি শেষ হয় উনিশ শো ছেষট্টিতে। তারপর শৈলেন্দ্রর মৃত্যু। তারপর বেঙ্গল ফিল্ম জারনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার, তারপর রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ এবং মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'তিসরী কসম'এর উপস্থিতি। 'তিসরী কসম'এর গলায় এত মালা সত্ত্বেও 'তিসরী কসম' যেন অরফ্যান। মাত্র চার সপ্তাহের জন্য উনিশ শো উনষাটিতে 'তিসরী কসম' সেই রাজ্যে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হবে, যেখানে একদিন 'তিসরী কসম' জন্মলাভ করেছিল।

আজ এ লেখার ছেদ টানার আগে আমার মনে পড়ছে শৈলেন্দ্রর লেখা একটি গানের কলি। আজ আমার যেন কেন মনে হচ্ছে যে এই গানটা শৈলেন্দ্রর গলায় আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে শৈলেন্দ্র হাসতে হাসতে গাইছেন—

জিন্দগী হ্যায় হেকা
এতবার না রহা!!

সরল শর্মা

হিন্দী থিয়েটারের শতবার্ষিকী: সমাপ্তি-উৎসব

হিন্দী থিয়েটারের শতবর্ষ-জয়ন্তীর সমাপ্তি উৎসব পাঁচদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল কলকাতার নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহ কলা-মন্দিরে। অনামিকা কলা-সঙ্গম আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন হয় ২৮ ডিসেম্বর; দোসরা জানুয়ারি পর্যন্ত চলে। ডঃ বি ভি কেসকার উৎসব উদ্বোধন করেন।

চারখানি নাটক ও একটি নৃত্যনাট্য নিয়ে এই উৎসব। এ ছাড়া প্রতিদিনই নাট্য সংক্রান্ত আলোচনাদির ব্যবস্থা করা হয়। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত একক-অভিনয়শিল্পী ও নাট্যবিদ শ্রী পি এল দেশপাণ্ডেকে একটি আসরে সংবর্ধনা জানানো হয়। নাট্য প্রযোজনা সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রথম দিনের নাটক স্কন্দগুপ্ত। শ্রীজয়শংকর প্রসাদ রচিত এই হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকটি দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা প্রযোজনা করেন। ভাবের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ, নাটকটির গঠনও মন্দ নয়। কিন্তু অতিকথনের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ফলে কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ। এর দৈর্ঘ্য আর একটু কম হলে ভাল হত। প্রযোজনার কাজ একরকম পরিপাটি। নির্দেশনার কৃতিত্ব শ্রীমতী শান্তা গান্ধীর। দৃশ্য সজ্জা প্রতীকী ধরনের; অভিনয় মোটামুটি ভাল। তবে সব মিলিয়ে নাটকটি দর্শকদের মনে তেমন দাগ কাটে নি।

উৎসবের শ্রেষ্ঠ নাটকটি অভিনীত হল দ্বিতীয় দিন (২৯ ডিসেম্বর)। একই গোষ্ঠীর প্রযোজনা, নাটকটি হল ব্রেখ্‌টের "দি ককেশিয়ান চক সারক্‌ল"-এর হিন্দী রূপান্তর। লোক গাথা ধর্মী নাটকটির বিরাট বিস্তারে জীবনের নানা সংঘাত, সেই সঙ্গে নানা দিক উদ্ভাসিত। স্থান-কালের প্রাচীর লঙ্ঘন করে কুশীলবরা অনায়াসে দর্শকদের একান্ত আপনার জন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন বিন্যাসের চাতুর্য, তেমনই সুন্দর প্রয়োগ পরিকল্পনা। প্রয়োগে লোকনাট্যের আঙ্গিকের প্রভাব স্পষ্ট; আবার প্রয়োজন মত আধুনিক কলাকৌশলেরও (যেমন আলোক সম্পাত) আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সর্বত্র শৃংখলা লক্ষণীয়। এমন চমৎকার, সর্বাঙ্গ-সুন্দর নাট্য-প্রযোজনা কলকাতায় কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। শহরের সুবিখ্যাত গোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন নাট্য-উপহারের কথা মনে রেখেও এ-কথা বলা যায়।

ব্রেখ্‌টের সহযোগী কার্ল ওয়েবারের পরামর্শ অনুসারে নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীসুশীল চৌধুরী। প্রযোজনার কৃতিত্ব ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার অধ্যক্ষ শ্রীইব্রাহিম আলকাজির। অভিনয় সকলেরই ভাল, টিম-ওয়ার্ক এক কথায় অসাধারণ। স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসার দাবি রাখেন শশি-কান্ত নিকতে, উত্তরা বাওকর, সুরেশ চৌধুরী, ঊষা সাটে।

কলকাতার অনামিকা গোষ্ঠী শ্রীবাদল সরকারের **এবং ইন্দ্রজিৎ** নাটকের হিন্দী রূপ পরিবেশন করেন ৩১ ডিসেম্বর। এটিও একটি বিশিষ্ট প্রযোজনা। শ্রীমতী প্রতিভা অগরবাল মূল নাটকটির হিন্দী অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ বিশ্বস্ত, মূল রচনার মেজাজটি সর্বত্র উপস্থিত। অভি-নয়েও সেই মেজাজ পাওয়া গেল।

প্রধান চরিত্রে শ্যামানন্দ জালানের (লেখক) অভিনয় একই সঙ্গে স-প্রাণ সংবেদনময় এবং বুদ্ধিদীপ্ত। শ্রীমতী চেতনা তেওয়ারির (মানসী) চরিত্র-বিশ্লেষণও প্রশংসার দাবি রাখে। ইন্দ্র-জিতের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। অমল, বিমল ও কমলের ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে বিমল লাট, অমর গুপ্ত ও অরিন্দম।

চতুর্থ দিনের (পয়লা জানুয়ারি) সূচীতে ছিল একটি নৃত্যনাট্য—**কৃষ্ণায়ণ**। দিল্লির কথক কলা কেন্দ্র কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক এই নৃত্যনাট্য কথক-নৃত্যের আঙ্গিকে পরিবেশন করেন। পরিকল্পনা ও নির্দেশনা শ্রীবিরজু মহারাজের। প্রত্যাশা অনুযায়ী এটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

শেষ আসরে (দোসরা জানুয়ারি) পরিবেশিত একটি ব্যঙ্গাত্মক হিন্দী নাটক —ঢোং; রমেশ মেহতার রচনা, প্রধান অভিনেতা তিনি, নির্দেশনার দায়িত্বও ছিল তাঁর। প্রযোজনা করেন দিল্লির থ্রি আর্টস ক্লাব। শিল্পীরা স্বভাবতই হালকা চালে নাটকটি অভিনয় করেন। দর্শকরা উপভোগ করেন হালকা মনে।

নির্মল মিত্র পরিচালিত "প্রথম বসন্ত" ছবিতে লিলি চক্রবর্তী ও অনুপকুমার

ফিল্ম ক্লাব সংবাদ

সায়ান্স ফিকশ্যন্‌ সিনে ক্লাব

সত্যজিৎ রায় প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাব ১৯৬৮ সনে সুনির্বাচিত মোট ১২টি ফিল্ম দেখিয়েছেন। নতুন বছরে নির্বাক যুগের একটি জার্মান ফ্যানটাসি ফিল্ম (দি গোলেম) দেখানো হচ্ছে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর প্রেক্ষাগৃহে আগামী ১২ই জানুয়ারী রবিবার সকাল সাড়ে দশটায়।

স্ট্যানলী কুব্রিক পরিচালিত বিস্ময়কর নতুন সায়ান্স ফিকশান ফিল্ম "২০০১: এ স্পেস অডিসী"র প্রথম প্রদর্শনীকালে ক্লাবের সদস্যদের বিশেষ প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে মেট্রো অথবা এলিট প্রেক্ষাগৃহে।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি আগামী ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে ফরাসী চলচ্চিত্রো-ৎসবে নিম্নলিখিত ছবিগুলি দেখাবেন: পিকপকেট, লা বী সারজ, এবাঁশং দ্র ব্রাইন।

চিত্র তারকাদের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা

সি এ বি শিল্পী সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি এবং অভিনেতৃ সংঘের উদ্যোগে আগামী রবিবার, ১২ জানুয়ারী ইডেন উদ্যানে, বোম্বাই বনাম বাংলার চিত্র তারকাদের মাত্র একদিনের জন্য এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বোম্বায়ের যাঁরা যোগ দেবেন বা যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রাজ কাপুর, রাজেন্দ্রকুমার, শশী কাপুর, প্রদীপকুমার, কিশোরকুমার, প্রাণ, বলরাজ সাহনী, সাধনা, ওয়াহিদা রহমান, মালা সিনহা, শশীকলা, মধুমতী, রাজেন্দ্রনাথ, সুজিতকুমার, মনোমোহন, দেব মুখার্জি, দারা সিং, মনোহর দীপক এবং বিশ্বজিৎ এবং অপর পক্ষে উপস্থিত থাকবেন কলকাতার জনপ্রিয় শিল্পিবৃন্দ।

এই অনুষ্ঠানে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ রাজ্যপালের উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারে দেওয়া হবে।

রেকর্ড সমালোচনা

সেনোলার নতুন রেকর্ড তিনটির দুটি আধুনিক গানের, একটি যন্ত্রসংগীতের। আধুনিক গান গেয়েছেন পারুল সেন ও সুকুমার দে। ওঁদের গাওয়া চারটি গানেরই কথা লক্ষ্মীকান্ত রায়ের, চারটি গানেরই সুর দিয়েছেন শ্যামলেশ দাসগুপ্ত। শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার—এঁরা সকলেই শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের প্রয়াসে আন্তরিকতা আছে। সব কটি গানই শুনতে ভাল লাগল। কণ্ঠ-শিল্পীদের গানেও প্রতিশ্রুতি আছে। পারুল সেনের গান বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

ইলেকট্রিক গিটারে হিন্দী ফিল্মের গানের সুর বাজিয়েছেন শ্যামল দেব। জনপ্রিয় গানের সুরের কদর হবারই কথা। গিটার কৃতিত্বের সঙ্গে বাজিয়েছেন শিল্পী।

জমকালো স্যাটিনে...
আপনাকে
আরও
সুন্দর
দেখাবে

কলকাতার ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচনার বিষয়। ২ জানুয়ারি থেকে ট্রামের ভাড়া বেড়ে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া হলো ১৫ এবং ২০ পয়সা। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১২ ও ১৫ পয়সা। আগে এই ভাড়ার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে ১০ পয়সা এবং ১৫ পয়সা আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৮ পয়সা ও ১০ পয়সা। ট্রাম কোম্পানির ঘাটতি মেটানোর জন্যই এই ভাড়া বৃদ্ধি। ভাড়া বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম কোম্পানি ছাত্রদের জন্য কনসেশনও চালু করেছেন। ১৫ জানুয়ারি থেকে ছাত্রদের ট্রামে প্রথম শ্রেণীতে ৫ পয়সাও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪ পয়সা হারে কনসেশন দেওয়া হবে। এজন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কুপন পাঠানো হবে। ট্রাম কোম্পানি থেকে বলা হচ্ছে যে, সব ঠিকমত চললে ভাড়া বৃদ্ধিতে ট্রাম কোম্পানির বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় বাড়বে। এখন রাস্তার ট্রাম দেয় হচ্ছে ৩৫০ খানা। এ বছর আরও ২০খানি ট্রাম বাড়ানো হবে। এই ভাড়া বৃদ্ধির জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছেন—ফরওয়ার্ড ব্লকের কলকাতা জেলা কমিটি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, সারাভারত প্রাদেশিক ছাত্র সংগঠন, সারা ভারত ছাত্র ব্লক এবং এস ইউ সি'র কলকাতার জেলা কমিটি প্রভৃতি। ভাড়া বৃদ্ধির প্রথম দিন বেলা একটার পর থেকে যাত্রী সংখ্যা বেশ হ্রাস পায়। গোলমালের আশঙ্কায় বেলা একটা থেকে বিকাল সাড়ে বারটা পর্যন্ত বেলগাছিয়া-শ্যামবাজার-কলেজ স্ট্রীট রুটে ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকে। ৩ জানুয়ারি শুক্রবার কলকাতার পৌর অধিবেশনে সব দল থেকেই বহু সদস্য দু ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব, সংশোধনী ইত্যাদি এনে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভাড়া কমাবার দাবিতে ৪ জানুয়ারি শনিবার টালিগঞ্জে বিক্ষুব্ধ জনতা ৬খানি ট্রাম আটক করে আড়াই ঘণ্টাকাল বিক্ষোভ জানায়। পুলিস গিয়ে ট্রামগুলিকে ঘেরাও মুক্ত করে।

দেশী সংবাদ

৩০ ডিসেম্বর—সম্প্রতি নেপালে একজন ভারতীয় সম্পাদকের প্রতি চীনা অফিসারদের অপমানকর ব্যবহারের প্রতিবাদে পাঁচ শতেরও বেশী লোক আজ নয়াদিল্লিতে চীনা দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিস বেষ্টনী ভেঙে দূতাবাসে ঢুকতে চাইলে তাঁদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ হয়। পুলিস ৪৭ জনকে গ্রেফতার করে।

এক বিপুল জনতা চীৎকার, চেঁচামেচি ও ধাক্কাধাক্কি করতে করতে আজ সন্ধ্যায় জামসেদপুরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গাড়িকে ঘিরে এবং প্রায় ২০ মিনিট ধরে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির সারিকে আটক করে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসও তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য পুলিসও অসহায় হয়ে পড়ে। পুলিসের লাঠি চালনার পর জনতা প্রধানমন্ত্রীর মোটর গাড়িকে ছেড়ে দেয়।

৩১ ডিসেম্বর—সরকারীভাবে আজ জানা গিয়েছে : গত তিন দিনে দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্প এলাকায় শৈত্যপ্রবাহে ৩ জন মারা গিয়েছে। আজ দুর্গাপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৫ ডিগরি সেন্টিগ্রেড। পাটনার এক খবরে জানা যায়, গত এক সপ্তাহে হিমপ্রবাহে বিহারের নানা শহরে অন্তত ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

১ জানুয়ারি—১৯ সেপ্টেম্বরের প্রতীক ধর্মঘটের দিনে বিনানুমতিতে যেসব কর্মচারী অনুপস্থিত থাকেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন বলে জানা গিয়েছে। অপরাধ যদি গুরুতর ধরনের না হয় তাহলে অভিযুক্ত হলেও সরকার এইসব কর্মচারীকে ক্ষমা করবেন।

চীন ও পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের নীতি যে নরম হয়ে চলেছে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তার যথেষ্ট আভাস দেন।

২ জানুয়ারি—দুর্গাপুর প্রকল্পের অফিসার প্রসঙ্গে জানান যে, এ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যদি কর্তৃপক্ষ তৃতীয় [illegible] ব্যাটারিটি চালু করতে অসমর্থ হন তবে এই প্রকল্পের অগ্রগতি আরও ব্যাহত হবে। পশ্চিম-

বঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগে প্রথমাবধিই লোকসান হচ্ছিল।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন বিচ্ছেদকামীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দেন। আজ উত্তর ২৪ পরগনার চারটি নির্বাচনী সভায় তিনি বলেন, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা থাকবে না। কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক শক্তি দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায়। দেশকে দুর্বল করাই তাদের উদ্দেশ্য। একমাত্র কংগ্রেসই দেশে স্থায়ী সরকার গঠন করতে সক্ষম।

৩ জানুয়ারি—নানা জনের নানা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মার্চের আগে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে কলকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন নতুন আর্থিক সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা দিল্লির সঙ্গে বহু আলোচনা এবং বৈঠক করে এতদিনে পরিষ্কার বুঝেছেন, 'পাষাণ হৃদয় গলবার নয়'—দ্বিতীয় হাওড়া পুলের জন্য টাকাটা যদি কেন্দ্র থেকে পাওয়া যায় তা হলেই যথেষ্ট।

কেরলের আলেপ্পি জেলার পল্লিপাদ গ্রামে উগ্রপন্থী কমিউনিস্টদের তৎপরতা গত দুদিনে ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছে। [illegible] অভিজ্ঞ কয়েকজন কর্মী উগ্রপন্থীদের নেতৃত্বে বলপূর্বক [illegible] পল্লিপাদ ও [illegible] গ্রামের প্রায় [illegible] ধানের ক্ষেত একরকম দখল করে রেখেছে। ঐসব ক্ষেতের প্রায় [illegible] উগ্রপন্থীরা ধান কেটে নিয়ে [illegible]।

[illegible] জানুয়ারি—গতকাল মাদুরাই থেকে [illegible] [illegible] শিবকাশীতে [illegible] কারখানায় [illegible] ২৫ জনের মধ্যে ২০ জন [illegible] মারা গিয়েছেন। [illegible] মধ্যে এ ধরনের দুর্ঘটনা আর ঘটেনি।

৫ জানুয়ারি—এক সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গতকাল পাটনা জেলার [illegible] একটি [illegible] ও একটি [illegible] হামলা দিয়ে একজন পুলিস সাব-ইনসপেক্টর, দুজন কনস্টেবল ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে ফিরে আসার সময় দুই [illegible] লোকের হাতে উক্ত সাব-ইনসপেক্টর নিহত হন।

বিদেশী সংবাদ

৩০ ডিসেম্বর—বেইরুট আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উপর অতর্কিতে হানা দেওয়ার জন্য গত রাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদে ইজরায়েলের তীব্র নিন্দা করা হয়। বেশ বোঝা যায়, এই ব্যাপারে কোন প্রস্তাব আনা হলে পরিষদের ১৫ জন সদস্যই তা সমর্থন করবেন।

৩১ ডিসেম্বর—আজ ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে পুলিসের গুলিবর্ষণে তিনজন মারা গিয়েছেন। ঘেরাও আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনার সূত্রপাত। গতকাল ঢাকা শহরতলিতে হাতিরদিয়া বাজারে পুলিস জনতার উপর গুলি চালায়। তাতে তিনজন নিহত ও একজন আহত হন।

১ জানুয়ারি—গত শনিবার ইজরায়েল বেইরুট বিমান বন্দরের উপর যে আক্রমণ চালিয়েছিল, তার নিন্দা করে গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই আক্রমণের জন্য লেবানন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেতে পারে এবং এর পরিমাণ কয়েক কোটি ডলার হতে পারে।

২ জানুয়ারি—চীন সংলগ্ন সোভিয়েট উজবেকিস্তানের তাসখন্দ থেকে বেতারে বলা হয়েছে, সিংকিয়াং অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চলছে। গত নভেম্বরের এই ঘোষণা সবার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'শান্তি ও প্রগতি বেতারের' ঘাঁটি হলো তাসখন্দ। সেখান থেকে চীনের সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে প্রায়ই উত্তেজক বেতার ঘোষণা প্রচারিত হয়ে থাকে।

৩ জানুয়ারি—লন্ডন আজ এই সংবাদ প্রকাশ করে যে, সে জর্ডনের কাছে মাটি থেকে আকাশে নিক্ষেপ করার নিকট পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করছে। ইজরায়েল যতদিনে আমেরিকা থেকে দ্রুত মার্কিন সামরিক বিমান ফ্যান্টম পাবে তার আগেই এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি চালু হওয়ার অবস্থায় আসবে।

৪ জানুয়ারি—গতকালের ভূমিকম্পের পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আজ আবার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ইরানে খোরাসান প্রদেশে ভূমিকম্পের ফলে অন্ততপক্ষে ৫০ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়। প্রবল হিম ঝড়ের ফলে ভূমিকম্প পীড়িত গ্রামবাসীদের উদ্ধারের চেষ্টা [illegible] ব্যাহত হয়।

৫ জানুয়ারি—বিরাট একটি যাত্রীবাহী জেট বিমান আজ লন্ডনের ৪০ কিলোমিটার দূরে গ্যাটউইক বিমান বন্দরে অবতরণের সময় নিকটবর্তী একটি বাড়ির উপর [illegible] পড়ে বিধ্বস্ত হয় এবং দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলে উঠে। ফলে [illegible] ৫০ জনের প্রাণনাশ ঘটে। [illegible] ভারতীয়। [illegible] বিমানে মোট [illegible] জন যাত্রী ও [illegible] জন [illegible] ছিলেন।

॥ মিত্র ও ঘোষের নূতন বই ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কালজয়ী নূতন উপন্যাস

আমি কান পেতে রই

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত কীর্তনি-ওয়ালীর জীবনের পশ্চাৎপটে লেখা এই সার্থক উপন্যাস—সেই সময়কার কলকাতাকে তার বিচিত্র ও বিবিধ রূপে, তার সুখদুঃখ, তার সমস্যা, তার প্রণয়বেদনাসমৃদ্ধ মূর্ত করে তুলেছে। ভাই আর বোন—একজন সার্কাসের দলে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায়। একজন গায় কীর্তন। পেশাদার কীর্তনওয়ালী সুরবালার জীবনে কত কি ঘটনা এসেছে, এসেছে কত মানুষ; তার থেকে বয়সে অনেক বড় এক প্রৌঢ়ের প্রেমে পড়ে জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে। আবার কত জীবন এসেছে এই জীবনের অনুষঙ্গে—সে সব জীবনের চিত্র এই লেখক ছাড়া আর কেউ এমনভাবে আঁকতে পারতেন না।

॥ পনেরো টাকা ॥

তারাশঙ্করের

যোগভ্রষ্ট

(নূতন মুদ্রণ) —আট টাকা—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

রাত্রির তপস্যা

॥ নূতন মুদ্রণ—সাত টাকা ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের নূতনতম

এক চামচ গঙ্গা ৫৲

মনে রেখো (নূতন মার্জিত সংস্করণ) ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

স্বয়ংবৃতা ৬৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

দ্বিধা ৬৲

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাগানে রামায়ণ ১০৲

সৈয়দ মুজতবা আলীর

রাজা উজীর ৭৲

নকুল চট্টোপাধ্যায়ের

চিরকুমারী সভা ৪৲

শচীন্দ্রলাল রায়ের অনুবাদ

জাহাঙ্গীরনামা ৮৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

গৌরাঙ্গ পরিজন ১০৲

অনিলেন্দ্রনাথ মিত্রের (মামাবাবুর)

ব্যাডমিণ্টন (সচিত্র) ৫৲

নলিনীকান্ত সরকারের

হাসির অন্তরালে (নূতন বর্ধিত সংস্করণ) ৬৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

Parry's

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীনন্দদুলাল কুণ্ডু

একজন সম্পত্তির মালিক

ওঁর নেই কোন উপরওয়ালা, নেই গ্র্যাচুয়িটি, নেই পেনসেন—কেবল আছে ৫০০০০৲ টাকার একটি সম্পত্তি যেটি তিনি নিজেই গড়ে তুলছেন !
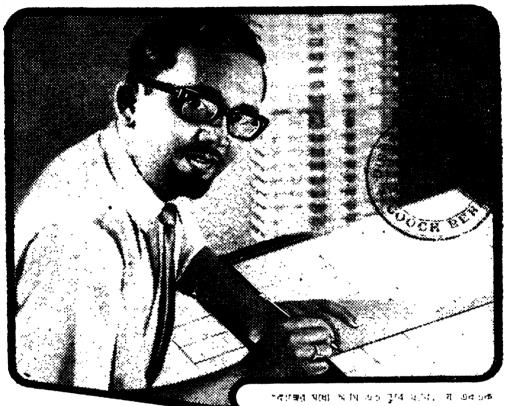
সঞ্জীবলাল, ৪৭, একজন স্থপতি এবং তিনি নিজেই নিজের মালিক। অবসর গ্রহণান্ত দিনের জন্য তিনি যে ৫০০০০৲ টাকার অনন্য সম্পত্তি কিনেছেন, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হ'ল :

"[illegible] মধ্যে আমি [illegible] সময় [illegible] এ কথা ভুলে [illegible] কাজকর্ম বন্ধ করে ছুটি নিতে হবে। আমাদের মত মানুষের, যারা নিজের নিজের পেশায় নিযুক্ত আছি, অবসরকালীন সুযোগসুবিধে বলতে কিছু নেই; গ্র্যাচুয়িটি নেই, পেনসেন নেই। অল্প কিছু শেয়ার আর ব্যাঙ্কে সামান্য টাকা ছাড়া আমি কিছুই জমাতে পারিনি। তাই নিজের জন্য আমি জীবনবীমার মাধ্যমে ৫০০০০৲ টাকার একটি সম্পত্তি "গড়ে তুললাম"—অবসর গ্রহণ করব স্থির করলে আমি এর আয়ের ওপর নির্ভর করতে পারি...আর এর মালিক হওয়াও কত সোজা। জীবন বীমা থাকলে আর্থিক সঙ্গতি বাড়ে এবং কর থেকেও মোটামুটি অব্যাহতি পাওয়া যায়। বর্তমানের উচ্চহারে কর দেওয়ার সমস্যার সমাধানে এটি একটি আশ্চর্য উপায়—তাই নয় ?"

জীবন বীমা একটি সম্পত্তি—গ্যারান্টীপ্রদত্ত সম্পত্তি! এটি হ'ল একমাত্র সম্পত্তি যেটি প্রথম প্রিমিয়াম দেবার মুহূর্ত থেকেই আপনার নিজস্ব হয়ে যায়। একমাত্র জীবন বীমার সাহায্যেই আপনি নিরাপদ এই সম্পত্তির মালিক হতে পারেন অতি সহজেই।

আর্থিক অবস্থার উন্নতির ভাবনায় জীবন বীমা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
*
৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১২
শনিবার ৪ মাঘ ১৩৭৫
*
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
*
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
*
টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১
*
চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ... ২৫.০০
ষান্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষান্মাসিক " ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষান্মাসিক " ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " ... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক ... ৫২.০০
ষান্মাসিক " ... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক " ... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... ৩৯.০০
ষান্মাসিক ... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১০.০০
*
দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা
*
DESH
Saturday 18 January, 1969

মুষ্টিভিক্ষা

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা সম্পর্কে সেদিন একটা সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। খবরের কাগজে সেটা ফলাও করার বিশেষ কারণ না থাকলেও এ-সময়, যখন কি-না কলকাতা কলকাতা করে সবাই এক ধরনের ব্যাকুলতা দেখাচ্ছে তখন প্রিয়দর্শিনী শ্রীমতী গান্ধীর প্রিয় বচনটি আমাদের কানে শুনতে ভাল লাগবে—এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ফলাও করা হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধী শুধু যে কলকাতা শহরকে 'দি সিটি' বলে ধন্য করেছিলেন তা নয়, কলকাতার উন্নয়নের জন্যে কিছু অতিরিক্ত অর্থ যাতে বরাদ্দ করা যায় সে-বিষয়েও দিল্লি গিয়ে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এর ফলে কারও কারও মন হয়ত কিছু নেচে ছিল। বোধ হয় তখন অনেকেরই একটা কথা মনে হয় নি, শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী সফরে এসেছেন। এখানকার লোকের মন রাখতে ব্যস্ত। তাঁর পক্ষে পিট চাপড়ে দেবার ভঙ্গিটাই ছিল স্বাভাবিক। অন্য রকম বললে আমরা বিরূপ হতাম। সোজা কথা, উমেদারকে একটা সার্টিফিকেট দিতে দাতার বিশেষ কিছু আসে যায় না।

আপাতত দেখা যাচ্ছে, বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের জন্যে আমরা ২৩ কোটি টাকা পাচ্ছি। নয়াদিল্লি অশেষ উদারতার সঙ্গে এই অর্থটা বরাদ্দ করেছেন। বোধ হয়, এখানে বলা ভাল যে, সি এম পি ও-র হিসেব মতন আমাদের প্রয়োজন অন্তত ৮০ কোটি টাকা। বৃহত্তর কলকাতাকে বাঁচাতে হলে এর কম টাকায় কাজ হবে না। কেন্দ্রের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে তা আমাদের প্রয়োজনের সিকি ভাগের মতন। বাকি টাকা কোথা থেকে আসবে ? রাজ্য সরকারের সঙ্গতি প্রায় নেই বললেই চলে, শিল্পপতিরাও নিশ্চয় হাতের মুঠো খুলে দেবেন না। অগত্যা যে তিমিরে আমরা আছি সেই তিমিরেই থাকব।

কেন্দ্র যে টাকার গদিতে শুয়ে আছেন এমন কথা অবশ্য আমরা বলি না, কিন্তু দুষ্ট লোকে বলে যে, কেন্দ্র কলকাতাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না, দেখলে প্রার্থনার অনেকটাই পূরণ করতে পারতেন, যেমন কি-না বোম্বাই শহরের জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্যে ৬০ কোটি টাকা মঞ্জুর করতে কেন্দ্রের তহবিলে টান পড়ছে না। এই ধরনের দুষ্ট কথায় অবশ্য আমরাও কান দিই না, কেন না এতে রেষারেষি বাড়বে, মেজাজ আরও বিগড়োবে, প্রাদেশিকতাব মনোভাব জাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কলকাতার জন্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা নিতে আপত্তি কোথায় ? বোম্বাইয়ের জল-সরবরাহ ব্যবস্থার জন্যে যদি এই টাকা নেওয়া গর্হিত না হয়ে থাকে তবে কলকাতার বেলায় গর্হিত হবে কেন ? বিদেশের সাহায্যে যদি বোম্বাইবাসীর পরিস্রুত জলপানের অধিকার থাকে তবে বেচারী কলকাতাবাসীই বা কোন দোষে অপরিস্রুত জল খেয়ে কলেরা মহামারীতে মরবে ?

কোনো কোনো মহল থেকে কথা উঠেছে, পি এল ৪৮০ বাবদ যে টাকাটা জমেছে তা কাজে লাগানো। নয়াদিল্লির আপত্তি তাতেও। এই টাকা খরচ করতে গেলে নাকি মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে ! ভূতের ভয় যেখানে সেখানে পা না বাড়ানোই হয়ত ভাল, তাতে শহর কলকাতা স্ফীতকায় হতে হতে ফেটে পড়ে যদি তবে তাই যাক, ক্ষতি কি !

আমাদের কেন্দ্রীয় কর্তারা এবং অন্যান্যরা বোঝেন কি না জানি না, যে, কলকাতার উন্নয়ন বলতে বাস্তবিক পক্ষে শুধু মাত্র এই শহরের উন্নয়ন বোঝায় না। কলকাতার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য জড়িয়ে আছে, পূর্ব ভারতেরও। পশ্চিমবঙ্গের বৈষয়িক, সামাজিক ইত্যাদির উন্নতি ঘটাতে গেলে তার এই হৃদপিণ্ডস্বরূপ নগরটিকে যথোচিতভাবে কার্যক্ষম করতে হবে, নচেৎ এই রাজ্যটি আরও হৃতস্বাস্থ্য, শীর্ণ হয়ে মৃতবৎ পড়ে থাকবে। আশা করি, কেন্দ্রের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এ-কথাটা বোঝেন। কলকাতা, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ যদি মরে, সেই মৃত্যুতে দিল্লি লাভবান হবেন না, হয়ত এই মৃত্যুই হবে ভারতের পক্ষে প্রথম বড় ভুল, যা পরে শোধরাবার উপায় থাকবে না, অনুতাপও বিফল হবে।

শৈত্যপ্রবাহের পরে.......
কামরাজের জয়
.....ওগো দখিন হাওয়া

দেশ দর্পণ

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রীপাদ রাজ্য বিধানসভায় বলেছেন, কংগ্রেসের দু-মুখো নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের দলের রাজনৈতিক লড়াই। এই মন্তব্যের উপলক্ষ ছিল রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আলোচনা। প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্য শ্রীদেবাশী কুট্টি। প্রসঙ্গের ভূমিকা হয়ত ছিল কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার কেরল সম্বন্ধে হুঁসিয়ারী। কিন্তু সেটা ছিল প্রধানতঃ উহ্য। তবু শ্রীনাম্বুদ্রীপাদের কথায় সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শ্রীনাম্বুদ্রীপাদ বলেছেন, কংগ্রেস নেতারা গণতন্ত্রের মুখোস পরে অ-গণতান্ত্রিক কাজ করেন। প্রমাণস্বরূপে তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯৬৫ সালের কথা। সে-বছর মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে মার্ক্সিস্ট কমুনিস্টদের জেলে আটক রাখা হয়। এদের মধ্যে ২০জন বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তবু তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া বিধানসভাকেও বাতিল করে দেওয়া হয়, কারণ কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। তিনি বলেন, বর্তমানে যা অবস্থা তাতে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস নেতৃত্ব কেরল সম্বন্ধে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

এটা প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্যের সমালোচনা। নাগেরকৈলে নির্বাচনের ঠিক আগে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা গিয়েছিলেন ত্রিআনন্দপুরম (ত্রিবন্দ্রাম)। ত্রিআনন্দপুরমে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন, কেরলে বর্তমান অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠেছে। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার মুখে এটা নূতন কোন কথা নয়। বেশ কিছুদিন ধ'রে এই কথাটা তিনি বারবার বলে আসছেন, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সুযোগে। সম্প্রতি কলকাতায়ও এই কথাটা তিনি সবিস্তারে বলেছেন এই কারণে যে, তার ত্রিআনন্দপুরমের বিবৃতিতে কিছু ভুল বোঝার অবকাশ হয়ত ছিল। তিনি বলেছেন, কোন বিশেষ রাজ্য সরকার সম্বন্ধে তাঁর বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। কিন্তু জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রশ্নটা অত্যন্ত মৌলিক। সেই বিচারে তিনি মনে করেন যে-রাজ্য সরকার জনসাধারণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে না, সে-সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়।

একথাটা তিনি কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনেও বলেছিলেন। নূতন কথা নয়। হায়দ্রাবাদে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এ কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে গত সাধারণ নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি আস্থাশীল মানুষেরই জয় সূচনা করে। সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে কংগ্রেস অকংগ্রেসী সরকারকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তাঁর হুঁশিয়ারিটা ছিল এখানেই যে, যদি কোন অকংগ্রেসী সরকার জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং সংহতিকে ক্ষুণ্ণ যা বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে তাহলে কংগ্রেস তা কোনমতেই মেনে নিতে পারে না। তাঁর বক্তব্যের এটাই মূলকথা ছিল যে অকংগ্রেসী সরকারের পরিবর্তন হয়ত আর রোধ করা সম্ভব নয়।

এই নীতি আরও স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে এবং উত্তর প্রদেশে। একের পর এক অকংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটেছে গত এক বছরের মধ্যে। এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকারের পরীক্ষাও চালানো হয়েছে। হয়ত এই রাজনৈতিক পরীক্ষা এবং কংগ্রেসের অস্থিরতার ফলেই আজ চারটি রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের হুকুমজারী করতে হয়েছে। এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের এটাই দিকচিহ্ন যে কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ নীতি অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, সে নীতি একদিকে যেমন অকংগ্রেসী সরকারকে বিপর্যস্ত করেছে অপরদিকে তেমনি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে অরাজকতার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এই নীতির প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা যখন কোট্টয়াম গিয়েছিলেন গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে। তখন কেরলের পরিস্থিতিটা ছিল একটু অন্য ধরনের। কোট্টয়ামে কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন চলছিল। এই সম্মেলনের ঠিক আগেই কেরলের বিভিন্ন শহরে পৌর নির্বাচন হয়ে গিয়েছিল। এবং সেই নির্বাচনে মোটামুটিভাবে কংগ্রেস সাফল্য লাভ করেছিল। এই সাফল্য কেরল কংগ্রেসের নেতাদের মনে ঠিক এই ধারণাই এনে দিয়েছিল যে, চেষ্টা করলে হয়ত কেরলের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু এই মতের প্রচণ্ড বিরোধিতা সেই সময় দেখা দিয়েছিল। বিরোধিতা করেছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রীকে সি এব্রাহম যাঁরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। এঁরা দুজনেই সেই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে এই নীতিটাই প্রচার করেছিলেন যে, জনসাধারণের

সমর্থন ছাড়া সরকার পরিবর্তন করা রাজনৈতিক নীতি হিসাবে সুস্পষ্ট নয়। শ্রীঘোষ এবং শ্রীএব্রাহমকে এজন্য অনেক বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার মধ্যস্থতায় এটাই ঠিক হয়েছিল যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মুখ্যত এই সিদ্ধান্তের ফলেই ঠিক সে সময়ে এমন কোন আওয়াজ কংগ্রেস মহল থেকে ওঠে নি যা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে বিব্রত করতে পারে। কিন্তু সে সময়ে একটা দাবি জানানো হয়েছিল কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে, যতশীঘ্র সম্ভব সারা কেরলে পঞ্চায়েতী নির্বাচন সম্পূর্ণ করা উচিত। কিন্তু সে দাবি আজ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার মেনে নেয় নি। সম্প্রতি শ্রীএব্রাহম এবং সেই সঙ্গে কেরল প্রদেশ কংগ্রেস এই দাবিটা জানিয়ে পদযাত্রা, আন্দোলনে নেমেছেন। এই আন্দোলনের এটাই প্রধান উদ্দেশ্য যে যুক্তফ্রন্ট সরকার কেরলের জনসাধারণের আস্থা সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছেন। এ কথাটাও প্রচার করা হচ্ছে যে সম্প্রতি কালে সারা কেরলে আইন ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। এটাও প্রচার করা হচ্ছে যে ধানকাটার মরশুমে মারকসিস্ট কমিউনিস্টদের পরিচালনায় কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে জমির মালিকদের বিরুদ্ধে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অভিযোগও উঠেছে যে ধানকাটার জন্য মারকসিস্ট কমিউনিস্টদের দাবি অনুসারে উচ্চহারে দৈনিক মজুরীও কৃষকদের দিতে হয়েছে।

কিন্তু এ দাবির বা অভিযোগের পিছনে অভিনবত্ব কিছু নেই। সেটা বোঝা যায় কেরলের প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্র এবং তামিলনাদের দিকে তাকালে। কিছুদিন আগে তামিলনাদের তাঞ্জোর জেলায় যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার মূলে কথাটা বিচার করলে দেখা যাবে যে গোটা দক্ষিণ ভারতে জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে এক অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ কথাটা মনে রাখলে কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার গুরুত্ব অনেকাংশে হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু এই একই সময়ে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে কেরলে ওয়েনাদ বনাঞ্চলে।

ঘটনাটা প্রথমে ঘটেছে তেল্লিচেরী এবং তারপর কুলপল্লীতে। এই ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সারা ভারতে এটা আজ আর অজানা নেই। কিন্তু যে কথাটা বারবার প্রচার করা হচ্ছে সেটা হয়ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে এখনও যাচাই করা হয় নি। কথাটা তুলেছিলেন কেরল রাজ্যের মারকসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীএ কে গোপালন। তিনি বলেছিলেন যে ওয়েনাদের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের অনেকেরই রাজনৈতিক অতীত সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। তিনি এ অভিযোগও খণ্ডন করে বলেছিলেন যে মারকসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সহযোগিতা এর পিছনে নেই। তাঁর পাল্টা অভিযোগ এটাই ছিল যে, হঠকারীরা যদি আজ কংগ্রেসের রীতিনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এটাই ধরে নিতে হবে যে ওয়েনাদ ঘটনার পিছনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের হাত থাকা কিছু অসম্ভব নয়। তাঁর এই অভিযোগ শ্রীএব্রাহম শুধু অস্বীকারই করেননি, প্রকাশ্যভাবে বিচার বিভাগীয় তদন্তও দাবি করেছেন।

সে দাবি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। কারণ, তাঁর মতে জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কোন দাবি যুক্তফ্রন্ট সরকার মেনে নিতে পারে না। শ্রীনাম্বুদ্রীপাদের এই যুক্তি সম্পর্কে বিতর্কের আশঙ্কা হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবকে বিচার করলে এটাই দেখা যাবে যে ওয়েনাদের ঘটনার পরে এমন কোন ঘটনা শোনা যায় নি বা ঘটে নি যা সারা ভারতে আলোড়ন তুলতে পারে।

এর অর্থ যাই হোক না কেন, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কেরলের যুক্তফ্রন্ট সরকার ঠিক ওয়েনাদ ঘটনার পরেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর একটি সিদ্ধান্ত সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে। সারা কেরলে প্রায় দু শ'টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ১৯ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট সম্পর্কে। এই মামলায় ২,৬১৭জন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী জড়িত ছিলেন। এই মামলা পর্যালোচনা করে ঠিক ওয়েনাদ ঘটনার পরেই যুক্তফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নেন, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সকল মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। আর এই সিদ্ধান্তের পরেই শ্রীনাম্বুদ্রীপাদ মাদ্রাজে বলেছিলেন যে নকশালপন্থীদের সঙ্গে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মোকাবিলা করেছেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে।

শ্রীনাম্বুদ্রীপাদ এটা পরিষ্কারভাবে জানতেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ পেলে কেরলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করবেন না। তিনি এটাও জানতেন যে চারটি রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেস বিরোধী মহলে কিছুতেই ঠেলে দেবেন না। এটাও অজানা ছিল না যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অজুহাতে শ্রীচাবনের পক্ষে কেরলে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। এ কথাটা জানতেন বলেই কেরলের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনেকগুলো স্পষ্ট ভাষণ করতে হয়েছে। এই স্পষ্ট ভাষণের ফলে এইটাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের দুর্বলতম স্থানে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ঘা মেরেছেন। আর সেইসঙ্গে এটাও সুনিশ্চিত করে নিয়েছেন যে, কেরলের যুক্তফ্রন্টের কোন শরিকের পক্ষেই আজ আর ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমন কি, মুসলীম লীগের পক্ষেও নয়। কারণ, তাঁদের দাবি তিনি মেনে নিয়ে মুসলীম প্রধান মাল্লাপুরম জেলার পত্তন করতে রাজী হয়েছেন। কেরলে কংগ্রেসের নীতির এটাই চরম ব্যর্থতা।

চন্দ্রগুপ্ত

গড্ডালিকা

আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা কুঁড়োজালি হাতে নিয়ে জপ করতে করতে নাকি বলতেন—মহারাণীর রাজত্বে সূর্য্যি অস্ত যায় না। তাঁদের যদি কেউ বলতো আর এক মহারাণীর আমলে রাজ্যই থাকবে না, তা সেখানে সূর্য্যি ওঠা কী অস্ত যাওয়া, তা হলে সে কথাকে তাঁরা পাগলের প্রলাপ বলেই মনে করতেন। তাঁদের নাতি-নাতনিদের কাছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটা কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে এ তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অথচ সেই স্বপ্নের অতীত ব্যাপারই আজ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বোলবোলা তো গেছেই, তার নামটিও আর নেই। তার জায়গায় এক নতুন রাজনৈতিক সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটেনকে কেন্দ্র করে। তার নাম-করণ হয়েছে কমনওয়েলথ। গোড়ায় তার নাম ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস। ক্রমে ক্রমে ব্যাঙাচির লেজ খসে যাওয়ার মত তার ব্রিটিশ উপসর্গটি গেছে, গেছে "অব নেশনসের" লেজুড়। এখন সে হচ্ছে সাদামাটা কমনওয়েলথ—যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে রাষ্ট্রমণ্ডল। এ এমন এক রাষ্ট্রজোট যেখানে সবাই সমান, কেউ কারুর চেয়ে মর্যাদায় ছোটও নয়, বড়ও নয়।

নামে যখন "কমন" শব্দটা রয়েছে তখন যেসব দেশ এর ভেতরে আছে তাদের ওয়েলথ নাই থাকলো, কমন কিছু তো অন্তত থাকবে। এমন কী জিনিস আছে যা তাদের সকলের? কিসে তাদের সকলের মধ্যে মিল? ব্রিটেনকে বাদ দিলে একটি মিলনসূত্র তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তা হচ্ছে তাদের দাসত্বের ছাপ—অতীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। তারা সবাই এককালে ছিল হয় ব্রিটেনের উপনিবেশ (যেমন অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড) নয় তার খাস জমিদারী (যেমন ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, ঘানা, মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে বার্বাডোস, মরিশাস, সোয়াজিল্যাণ্ড)। ব্রিটেনের প্রভুত্ব এরা সকলেই অনেক দিন ধরে মেনে নিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে তাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার হেরফের হয়েছে। উপনিবেশ তিনটিতে শ্বেতাঙ্গের আধিপত্য। ইংরেজের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্বন্ধ। (ব্যতিক্রম অবশ্য খানিকটা ক্যানাডা।) তারা কোনওদিনই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। বাকী ২৪টিকে তাদের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কমবেশী লড়াই করতে হয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের শুরু ১৯৪৭ সনে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাকে যে মরণ বাণ হেনেছিল তা থেকে আর সে মুক্তি পেলো না কোনওদিনই। এ উপমহাদেশ দু ভাগ হয়ে যাবার দরুন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা খণ্ডিত হোলো বটে, কিন্তু তারপর "একে একে নিভিছে দেউটি।" ব্রিটিশ শাসনে যেসব দেশ ছিল ইউরোপে, এশিয়ায়, আফ্রিকায়, আমেরিকায় —সবই একে একে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন কী যেগুলি আয়তনে খুবই ছোট, মহাসমুদ্রে মোচার খোলার মত ছোট্ট দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ সেগুলিও বাদ যাচ্ছে না। মহাদেশের বুকে একরত্তি যেসব দেশ তারাও নয়। মাল্টা, সিংগাপুর, বার্বাডোস, মরিশাস—এরা সব আয়তনে খুব ছোট হলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন। আফ্রিকায় যেসব ব্রিটিশ উপনিবেশ স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের অধিকাংশই আয়তনে বেশ ছোট। তাতে তাদের স্বাধীন হতে আটকায়নি কিংবা কমনওয়েলথের পুরো সদস্য হতে।

কি কুক্ষণেই চার্চিল দম্ভ করে বলে-ছিলেন, মহামান্য সম্রাটের সাম্রাজ্য লাটে তুলতে তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি। বিধাতা-পুরুষ তখন বুঝি অন্তরালে একটু হেসে-ছিলেন। যা চার্চিল চাননি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার দু দশকের মধ্যেই তা হয়েছে। সে সাম্রাজ্যের নাম পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে। কিন্তু সেখানেও কেমন যেন বিধাতার একটু পরিহাস আছে। নইলে ব্রিটেনের অধীন দেশগুলি পরাধীনতার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন করে কেন তারই সঙ্গে কমন-ওয়েলথের গাটছড়া বাঁধছে? এ যেন পোষা কুকুরের ছাড়া পেয়েও বনে গিয়ে নিজের গলার বগলস দেখিয়ে বাহাদুরি নেওয়া। সে বগলস যে তার অতীতের লজ্জা, এ ধারণা পোষা কুকুরের থাকলে সে আর বড়াই করতো না, লজ্জায় মুখ লুকিয়ে থাকতো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার কমনওয়েলথের খাঁচায় সেধে ঢোকা কতকটা সেই রকমই ব্যাপার। শ্বেতাঙ্গ দেশগুলির ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করার অর্থ আছে। কিন্তু এসিয়া আফ্রিকার দেশগুলিও কেন তাই করছে? স্বাধীনতা পেয়েও কেন তারা পরাধীনতার দাগ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইছে না কমনওয়েলথে যোগ দিয়ে।

এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছে ভারতবর্ষই। তারপর তার পিছু পিছু এসেছে পাকিস্তান পাছে কমনওয়েলথে থেকে এ দেশ কিছু সুবিধে করে নেই এই ভয়ে। সিংহল আর মালয়েশিয়া ওই দুই মহাজনের পদাংক অনুসরণ করেছে। এরপর গড্ডালিকা প্রবাহে মিশে গিয়েছে যারা পরে এসেছে তারা সবাই এই ভেবে, না জানি কমন-ওয়েলথের বাইরে থাকলে কী পরম পদার্থ হারাবে। এর ভেতরে থাকা আর না থাকার সুবিধে-অসুবিধে কেউ আর তলিয়ে দেখেনি। তাই বোটসোয়ানা, লেসোথো, বার্বাডোস, মরিশাস, সোয়াজিল্যাণ্ড যেই পরাধীনতার বাঁধন ছিঁড়েছে অমনই সংগে সংগে কমনওয়েলথের ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছে। এর ব্যতিক্রম খুব কম দেশই। কেবল আয়ার্ল্যাণ্ড আর ব্রহ্মদেশ অনেককাল ব্রিটেনের তাঁবে থেকেও তার মায়া পুরো-পুরি কাটিয়েছে—কমনওয়েলথের দলে ভিড়তে রাজী হয়নি। তা না করে তারা খুব অসুবিধেয় পড়েছে বলে তো মনে হয় না। কী এমন সুযোগ-সুবিধে কমনওয়েলথ গোষ্ঠিতে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষ কী পাকিস্তান, ঘানা কিংবা কেনিয়া, তানজানিয়া আর উগাণ্ডা পাচ্ছে যা থেকে স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মদেশ আজ বঞ্চিত, কী ভবিষ্যতে না পেতে পারে?

কমনওয়েলথের ঠাট রেখে লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি ব্রিটেনের। সাম্রাজ্যবাদী বলে তার দুর্নাম ঘুচেছে, অপযশ গিয়েছে শোষক বলে। বরঞ্চ তার জাঁক বেড়েছে এই জন্যে যে সে তার কমন-ওয়েলথের সাঙ্গপাঙ্গ দেখিয়ে বলতে পারছে, সে এত ভাল যে যাদের সে স্বাধীনতার সুযোগ দিচ্ছে তারা তার সঙ্গ ছাড়তে চাইছে না, যেচে এসে তার দল ভারী করছে। বৈষয়িক সুবিধের পাল্লাও তার দিকেই ভারী। যেটুকু সুবিধে তার দরকার সে আদায় করে নিচ্ছে কমনওয়েলথ ঐক্যের দোহাই দিয়ে, আবার অসুবিধেয় পড়লে ইচ্ছেমত আলাদা পথে চলছে এই অজুহাতে যে কমনওয়েলথে সকলেই সমান, নিজের রুচিমত চলবার অধিকার সকলেরই রয়েছে। তিন শ্বেতাঙ্গ দেশ ছাড়া অন্যেরা ব্রিটিশ দাক্ষিণ্যের ছিটেফোঁটা পেয়েই ভাবছে একটা দাঁও মেরেছি। আসলে দাঁও যদি কেউ মেরে থাকে সে হচ্ছে ব্রিটেন। সাম্রাজ্য রাখার ঝক্কি তার নেই, অথচ তার ষোলো আনা সুবিধেটুকু সে ভোগ করছে। রাজনীতিতেও তার চালই পাকা, বাকীদের সব ভেস্তে যাচ্ছে। রোডেসিয়াকে জব্দ করার কম চেষ্টা কমনওয়েলথের কালা দেশগুলি করেনি। কিন্তু জেদ বজায় রইলো শেষ পর্যন্ত চতুর ব্রিটেনেরই।

অদৃশ্য কবিতার পাখি

দিনেশ দাস

কুয়াসা ফুল হয়, শিশির তারা হয়ঃ
এখনো প্রতিটি সকাল
কবিতা হবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে।
আমি পাশ কাটিয়ে যাই,
কখনো হাওয়ায় হেলান দিই,
কখনো বা ডুবে যাই বাতাসের ভিতরে ঃ
শূন্যতা আমাকে ভিড়ের মতই ঘিরে ধরে।

সূর্যের সরল আলোয় এখন কিছু দেখি না,
প্রতিবিম্বিত চাঁদের আয়নায় আমার পথ-চলা।
যে-পথ রাত্রির বুকের ভিতর দিয়ে
অন্তহীন অতীতে চ'লে গেছে ঃ
সে-পথে শুধু স্মৃতির হাজার চোরাকাঁটা
যারা একদিন ভালবেসেছিল
যাদের একদা ভালবেসেছিলাম
তারা রাতের তারার মত কখন নিভে গেছে।

বর্তমান বালির সমুদ্রে
ভবিষ্যৎ কি কোথাও মরূদ্যানের মত ভাসছে?
বর্তমান ও আগামীকাল কি এই মুহূর্ত?
সময়ের লোনাজলে আমি প্রতিদিন ক্ষ'য়ে যাই,
আমার নখগুলো শুধু বড় হ'য়ে
পুরোনো শিকড়ের মত মাটি আঁকড়ে ধরে,
আমার দেহের ত্বক গাছের ছালের মত
ক্রমশঃ প্রাচীন ও কর্কশ হ'য়ে ওঠে,
তার ভিতর থেকে কি আর নতুন শাখা মুখ বাড়াবে?
অদৃশ্য কবিতার পাখি কি শব্দের শাখায় এসে বসবে?
পঙ্গু কি আর গিরিলঙ্ঘন করবে?
অন্ধ কেমন ক'রে সিনেমা দেখবে?

সুনন্দর জার্নাল

'বাংলার এম-এ ও টিপসহিগণ'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনটির সামনে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। কিছুদিন ধরে ট্রামে চাপবার একটা আকুলতা আমায় পেয়ে বসেছে। এখন আর ট্রামের সেই সর্বজনীন উদারতা নেই, ট্রাম মানেই বেশি পয়সা আর

'ইণ্ডিয়ান চারিভারি' পত্রিকায় উনিশ শতকে ইংরেজ শিল্পী নকলনবীশ ভারতীয়দের এই ধরনের কার্টুন এঁকেছিলেন

বেশি পয়সা মানেই আভিজাত্য। অর্থাৎ বাসের গলদ্‌ঘর্ম ঝুলন্ত যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে এখন আমি অনুকম্পার স্নিগ্ধ হাস্য করতে পারি, একটা খবর শোনাবার মতো ভঙ্গিতে বলতে পারি : 'ট্রামেই এলুম—বাসে কি আর ভদ্রলোকে চড়তে পারে হে!'

এখানে 'ভদ্রলোক' কথাটার তাৎপর্য অন্যবিধ। অর্থাৎ অকুতোভয়ে কন্‌ডাক্‌টারকে ঝাঁ করে কুড়ি পয়সা বার করে দেবার মতো মেজাজ।

অতএব 'ভদ্রোচিত' ভাবে যখন আমি ট্রামের জন্যে প্রতীক্ষা করছি, তখন একটি ঘোষণা কানে এল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শতবর্ষ ভবনটি তো সংপ্রতি ঘোষণারই পীঠস্থান, প্রতিদিনই এখানে বিবিধ উদ্‌ঘোষণ-এর সামনের পথটি তো স্বনামধন্য রণরঙ্গভূমি। কাজেই চমকাবার কিছু ছিল না। কিন্তু এই ঘোষণাটি রাজনৈতিক নয়, ছাত্র আন্দোলন-কেন্দ্রিক নয়, এ তিন-চারটি তরুণ কণ্ঠে 'কর্মখালির' উদার বিজ্ঞাপন। এই দারুণ সময়েও চেঁচিয়ে চাকরির বিজ্ঞাপন দিতে হয়? স্বপ্ন দেখছি নাকি?

ঘোষণাটি এই :

'কর্পোরেশনের জন্য কিছু সুইপার প্রয়োজন। বাংলার এম-এ টিপসিহগণ আবেদন করুন।'

একটু সন্দেহ এল এবার। রসিকতা নাকি? তরুণ কটির দিকে' চেয়ে দেখলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মনে হল। খুব সম্ভব বাংলারই উদীয়মান এম-এ, অন্য কোনো বিভাগের ছাত্র হলে কৌতুকটি নিশ্চয় হাতাহাতিতে পৌঁছোত, কারণ জায়গাটি নিজ মাহাত্ম্যেই ক্ষাত্র তেজে উদ্দীপিত।

কিন্তু কানে খুব ভালো ঠেকল না। রসিকতাটার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা যেন অনুভব করা গেল।

বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলার এম-এ নিয়ে অল্পবিস্তর লেখালেখি কাগজে চোখে পড়ছে। কোন্ এক বাংলার অধ্যাপক নাকি তাঁর সহধর্মীকে নিজের বই দেখিয়ে বলেছেন, 'এই বই আপনি বুঝবেন না—বুঝবেন ইংরিজির অধ্যাপক।' অর্থাৎ বাংলার শিক্ষক হয়েও নিজেদের সম্পর্কে তাঁর অবজ্ঞা এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এই অধ্যাপক কে, আমি জানি না। কিন্তু যে হেতু বাঙালী হিসেবে বাঙালীর জীবন আর সমাজের মধ্যে আমাকে বাস করতে হয়, সে কারণে কিছু কিছু বাংলার এম-একে নিশ্চয় জানি। জানি, বাংলার এম-এ পাশ করলে স্কুলের দরজা সভয়ে বন্ধ হয়ে যায় : 'না-না মশাই, আর আমাদের দরকার নেই, আমাদের দপ্তরীও এবার

আবর্জনা ঝাঁট দিতে ঝাড়ুদার চাই

প্রাইভেটে বাংলায় এম-এ দিচ্ছেন।' জানি, কলেজে বাংলায় একটি লেকচারের পদ খালি হলে সাড়ে সাত শো দরখাস্ত পড়ে, এক শো সাতান্নজনকে ইন্টারভিউ দেওয়া হয় এবং অনেকক্ষেত্রেই চাকরিটা পান সেক্রেটারির ভাইপো বা ভাগ্নে—যিনি ইন্টারভিউ দেন না। এও জানি, কখনো কখনো বাংলার এম-এ ডিস্‌কোয়ালিফিকে-

শান—ওটা চেপে গিয়ে শুধু গ্র্যাজুয়েট বলে দরখাস্ত লিখতে হয়। ব্যাঙ্কে, মার্কেণ্টাইল ফার্মে কিংবা সরকারী চাকরিতে 'এগ্‌জিকুটিভ্' হওয়া বাংলার এম-এর কাছে 'দিল্লী হনুজ্ দূর অস্ত্'। জানি, বাংলার ডিগ্রী পাওয়ার পরে একদল ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাণপণে ইংরিজি অর্থনীতি বা ইতিহাসে পরীক্ষা দিয়ে জাতে ওঠবার চেষ্টা করতে হয়! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ব্যাঘ্র-পুরুষ আশুতোষ—যিনি একদা বাংলার এম-এ প্রবর্তন করেছিলেন, গণিতের ছাত্র হয়েও এবং সম্ভবত যিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে—দ্বারভাঙা বিল্ডিঙের সোপানশীর্ষে তাঁর মর্মর মূর্তিটি আজ কী ভাবছে আমার জানতে ইচ্ছে করে। এবং প্রশ্ন করতে ইচ্ছে

নিজের ঘর যাঁরা নোংরা করে রাখেন...

করে বিদ্যাসাগরকে : 'কেন আপনি বাংলা ভাষার শক্তি আবিষ্কার করতে গেলেন?' দাবি করা যায় মধুসূদনের কাছে : 'আপনার মতো ঘোর ইংরেজিনবীশ কী কারণে, বাংলার ভাণ্ডারে বিবিধ রতন আবিষ্কার করলেন?' 'রাজমোহন্স্ ওয়াইফ্' লিখতে লিখতে বঙ্কিমচন্দ্র কেন 'দুর্গেশনন্দিনী'র পথে অশ্ব ছোটালেন—আজকে তাঁর সেজন্যে জবাবদিহি করা দরকার। আর সবচেয়ে বেশি অপরাধী রবীন্দ্রনাথ : কেন তিনি এমন আশ্চর্য সৃষ্টি করলেন বাংলা ভাষায়—কেন এমনভাবে সোনার মন্দিরের দ্বার খুলে দিলেন বাঙালীর সামনে?

আজ বাংলার এম-এরা এঁদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা বাংলা ভাষাকে—অর্থাৎ মাতৃভাষায় এম-এ পাশ করেছেন—তাঁদের অপরাধ, এই ভাষাকে তাঁরা ভালোবেসেছেন। সুতরাং তাঁরা বাংলা দেশে অশ্রদ্ধেয়, অপাংক্তেয় এবং 'হরিজন!' না—হরিজন কথাটা ঠিক হল না, কারণ স্বয়ং গান্ধীজী হরিজনদের মধ্যেই আসন বিছিয়েছিলেন—বাংলার এম-কে ত্রাণ করবার জন্যে তো কোনো মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটেনি!

হালের কমলাকান্ত শর্মা তাঁর অভ্রান্ত রসিকতায় তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাঙালীর ছেলে বাংলায় পাশ করবে না তো, পাশ করবে কি হিব্রু ভাষায়?' কিন্তু কমলাকান্ত কি জানেন না বাংলা দেশে—ইংরিজির কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি—হিব্রুর সার্টিফিকেট থাকলেও বাংলার এম-এর চাইতে তার পদমর্যাদা বেশি, হিন্দী কোবিদ হলেও সেটা সগর্বে ঘোষণা করবার মতো? শুধু বাংলার ডিগ্রীই লজ্জায় ম্রিয়মান—তাকে কোণ খুঁজতে হয় মুখ লুকোবার প্রয়োজনে।

জানি, বাংলার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন কেউ কেউ। কিন্তু হালের কলেজী শিক্ষার কোন্ বিষয়ে মান কতটা উঠেছে, এ কথা জানতে ইচ্ছে করে। বাংলার ছেলেরা কারো চাইতে কম পড়েন না, তাঁদের পাঠক্রম তো দিনের পর দিন হিমালয়ের চাইতেও সমুচ্চ হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু বাংলা বাংলাই—সে শতধৌত অঙ্গারের সঙ্গে উপমিত।

কলেজে পড়বার সময় দেখেছি, ইংরিজির অধ্যাপককে ইংরিজি জানলেই চলে; অর্থনীতিক, ইতিহাসিক তাঁর স্বরাজ্যেই পরিতুষ্ট। কিন্তু বাংলার অধ্যাপককে সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে হয়। একটি ইংরিজি উদ্ধৃতি থাকলে তার আপাদমস্তক আবিষ্কারের চেষ্টায় তাঁর প্রাণান্ত, সংস্কৃত শ্লোক পেলে তিনি পুঁথি ঘাঁটতে বসে যান, এমনকি একটি কবিরাজী রেফারেন্স্ থাকলেও তাঁকে কবিরাজ সেজে বসতে হয়। ইংরিজির অধ্যাপক কীট্সের বিখ্যাত কবিতাটি পড়াতে গিয়ে অসংকোচে উচ্চারণ করতে পারেন : 'লা বেলে ডেম্ স্যান্স মেরসি'—তাঁর ওটা সংশোধন করবারও প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু বাংলার অধ্যাপক একটা ইংরিজি উচ্চারণ ভুল করলেই নিন্দের বান ডাকে!

সেই হঠভাষী অধ্যাপককে দোষ দিই না। তিনি এই নিদারুণ হীনম্মন্যতা থেকেই বাঁচতে চেয়েছিলেন, ইংরিজি জানেন এইটিই ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন কেবল।

'কর্পোরেশনের সুইপার চাই—অতএব বাংলার এম-এ এবং টিপসহিগণ আবেদন করুন।' নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের দেশে আর কী প্রত্যাশা করা চলে এ ছাড়া? বাংলার এম-এ কুড়ি পয়সার ট্রামের যাত্রী; আর 'টিপসহিগণ' বাসে ঝুলছে—এই যা তফাৎ!

জোড়াসাঁকোতে সকলের ডেঙ্গু জ্বর হল। পাছে ঐ শিশুও জ্বরে পড়ে সেই ভয়ে প্রতিমাদি পুষুকে ওর আয়া সমেত আমাদের আলিপুরের বাসায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেইদিন বুঝলাম আমাকে কত মনের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। বিনা দ্বিধায় ঐ অতি আদরের মেয়েকে আমার জিম্মায় পাঠিয়ে দিতে পারলেন। পুষু তখনও হাঁটতে শেখে নি, শুধু রেলিং ধরে দাঁড়াতে পারে। একদিন যখন ওমনি করে দাঁড়িয়েছে আমি দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে "আয়, আমার কোলে আয়" বলে যেই ডেকেছি, মেয়ে টলমল করে দু তিন পা এগিয়ে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই ওর প্রথম হাঁটা— খুশিতে মন ভরে গেল। উঠে গিয়ে প্রতিমাদিকে ফোন করলাম, "আপনার মেয়ে আজ প্রথম হেঁটেছে।" তিনিও শুনে খুব খুশী। বললেন, "রানী, ও আমার [illegible] মেয়ে, ডেঙ্গুর ভয়ে ওকে সরিয়েছিলুম। তোমার কাছে যাবার দশ দিন পরেই ও হাঁটল—তোমার দেখছি বাহাদুরি আছে।" পুষু যে আমার বাড়িতেই প্রথম হেঁটেছিল সেটা স্মরণ করেই ওর ছেলেবেলা থেকেই ওর উপরে আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল, আর সেইজন্যই সারাদিন গল্পের দাবি মেটাতে আমার ক্লান্তি লাগত না। তাই তো পুষুকে সহজেই বশ করতে পেরেছিলাম।

বার্লিনে প্রতিমাদি যখন তাঁর স্বামীর হঠাৎ অপারেশনের সময় বিব্রত হয়েছিলেন সেই সময়ে এই দুর্যোগের মুহূর্তে আমরা যেন আরও কাছে এসে গেলাম। যেমন ওঁর দুর্দিনে আমরা কাছে থেকে উদ্বেগের ভাগ গ্রহণ করেছি তেমনি আমাদের জীবনেও দুঃখের দিনে প্রতিমাদি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমার দেওর সকলের প্রিয় বুলা (প্রফুল্ল মহলানবিশ) যেদিন চলে গেলেন সেদিন প্রতিমাদি আমাদের কাছে বরানগরে 'আম্রপালী'তে রয়েছেন। আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে বুলাকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। "বউঠান"-এর উপরে বুলার অগাধ টান। হার্টের রোগের রুগী চিকিৎসকদের নিষেধ অমান্য করে প্রতি দিন সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠতেন তাঁর "বউঠান"কে দেখতে। তাই বোধ হয় শেষ যাত্রার সময়েও বউঠানের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর নিজের হাতে পরিয়ে দেওয়া ফুলের মালা গলায় নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হতে পারলেন। প্রতিমাদির আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত গভীর স্নেহের আশীর্বাদ ও ভগবানের কাছে বুলার আত্মার কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা কখনো ভুলতে পারব না।

অনেকেই প্রতিমা দেবীর অনেক সদ্গুণের ও নানা কর্মক্ষমতার কথা বলবেন। সে সব তো আছেই। যাঁরা তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন তাঁরা সেসব কথা ভুলবেন কেমন করে? আমার নিজের কাছে প্রতিমাদি কল্যাণময়ী লক্ষ্মীর প্রতিমা, স্নেহপ্রেমে ভরা সহজ স্বাভাবিক অপ্রগল্ভ মানুষ, যাঁর সঙ্গ পেয়ে মন স্নিগ্ধ হয়েছে আনন্দিত হয়েছে, নিবিড় আত্মিক যোগ অনুভব করেছি।

আজকের এই উৎসবে [illegible] পাওয়া [illegible] রবীন্দ্রনাথের নিজে হাতে গড়া মানুষ—এমনটি না হলে কি তিনি এমনিই [illegible] বলে ডেকেছিলেন? ওঁর জীবনের সমস্ত [illegible] কাটিয়েও যে উনি [illegible] চিরকালের [illegible] পেয়েছেন তা সম্ভব হয়েছে [illegible] উপর ভক্তি ও আদর্শের প্রতি [illegible] জন্যই। নিজের সমস্ত [illegible] নিঃশেষে দিয়ে তিনি তাঁর [illegible] সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছাই নিজের ইচ্ছা বলে গ্রহণ করেছেন।

পৃথিবীর বহু দেশের বহু মনীষী এসেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। এঁদের সকলের আদর-আপ্যায়ন দেখা-শোনার [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] ঘরে যে বউমা আছেন। [illegible] বহন করা সহজ [illegible] অনেক সময় [illegible] শরীর [illegible] সমস্ত [illegible] করেছেন। [illegible] কোনদিন [illegible] করেছেন। [illegible] সাহিত্য [illegible] ছাপ [illegible] পড়েনি। উনি সবসময় বলেন, "ছেলেবেলায় বাবামশাই আমাকে এ বাড়িতে এনেছিলেন। তিনি তাঁর স্নেহ দিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। তাঁর [illegible] চলে [illegible], আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।" সে কথা [illegible] এখানেই প্রতিমাদির জীবনের সাধনা, উনি তাঁর [illegible]।

আজকের দিনে সবাই প্রতিমাদিকে অর্ঘ্য দিতে এসেছেন। আমিও সেই অর্ঘ্য-পাত্রে আমার ভালোবাসা ও ভক্তিটুকু নিবেদন করলাম।

---

৭ পৌষ ১৩৭৫ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক অর্ঘ্যদান অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ।

'কত না অশ্রুজল' (২)

গত বিশ্বযুদ্ধে যারা নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে গত সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় কিছু উল্লেখ করি। এবারে একজন জাপানীর চিঠি তুলে দিচ্ছি :

জিরোকু ইওয়াগায়া (Jiroku Iwagaya), শিক্ষক, জন্ম ১৯২৩/১৯৪৪ সালে ফিলিপাইন যাবার সময় যুদ্ধজাহাজ-ডুবিতে সলিলসমাধি।

শিজুয়োকা, ১২ জুন ১৯৪৩

গুয়াডালকানাল (১) দ্বীপের কাছে যে নৌযুদ্ধ হয়ে গেল তার খবর আজ কাগজে বেরিয়েছে। প্রকাশ, একখানা বিদেশী সৈন্যবাহী জাহাজ পুরোপুরিভাবে জখম হয়েছে, ও একখানা জাপানী জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। এ ভাবে মানুষ কেন সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে অকালে লীন হবে? জাপানীরা মারা গেলে শুধু জাপানীরাই, বিদেশীরা মারা গেলে শুধু বিদেশীরাই অশ্রুবর্ষণ করে কেন? মানুষ শব্দমাত্র মানুষ হিসেবে সম্মিলিত হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে না কেন, আনন্দের সময় সম্মিলিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না কেন? এ প্রশ্নটি যে-কোনো শান্তিকামী জনের চিত্ত আলোড়িত করবে। যেহেতু একটা বিদেশী মরেছে অতএব জাপানীরা বেশ পরিতৃপ্ত। এটা আমার কাছে চিরকাল অবোধ্য থেকে যাবে। তিন দিন চার দিন ধরে একটা লোক সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে শেষটায় অবসন্ন হয়ে জলে ডুবে গেল—এটা কী নিদারুণ! মৃত্যুর সঙ্গে আমার যদি সমুদ্রে কখনো দেখা হয় তবে কি আমি তাকে সজ্ঞানে চিনতে পারবো?

৩ মার্চ ১৯৪৪

বিদায় নেবার পূর্বে আমি ক্লাসের ছেলেদের দিয়ে 'ভাক্কিমামরি' (২) গানটি গাওয়ালুম। আমি জানি নে কেন, এটি শুনে আমার বড় আনন্দ হল। এ-গানটি আমি কখনোই ভুলবো না; এটি আমাকে সব সময়ই স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমি শিক্ষক ছিলুম।

মার্চ ১৯৪৪

আমি যুদ্ধে চললুম, কিন্তু আমি যুদ্ধ চাইনি। হয়তো আমার এ-কথাটা কেউই বুঝবে না। কিন্তু কোনো মানুষকে হত্যা করার জন্য আমি কোনো তাগিদ অনুভব করি না। আমার মনে হয়, আমাকে যেন একটা দ' টেনে নিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

টীকা

(১) সলমন দ্বীপ পুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ—অস্ট্রেলিয়ার অধীনে।

(২) 'ভাক্কিমামরি' গীতটি আমি যোগাড় করতে পারিনি। কোনো গুণিন পাঠক যদি সেটি সংগ্রহ করে অনুবাদসহ 'দেশ'-এর সম্পাদক মহাশয়কে পাঠান তবে লেখক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

*

একাধিক জাতের বিশ্বাস এবং তারা যুদ্ধের সময় প্রোপাগানডা করে, যে, জাপানীমাত্রই যুদ্ধের জন্য হামেহাল মারমুখো। এ-চিঠি পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ-ধরনের আরো চিঠি আছে। স্থানাভাবে তার অল্পাংশও তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন টাইপের চিঠি অনুবাদ মারফত বহুবিধ মানবের চিন্তাধারা, হৃদয়ানুভূতি—এবং তৎসত্ত্বেও সেগুলি সর্বজনীন—এগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

*

যুগোস্লাভিয়ার জনৈক নাম-না-জানা সৈনিক,

অজাত শিশুর প্রতি পত্র

[যুদ্ধের সময়ে]

হে আমার সন্তান, এখনো তুমি অন্ধকারে ঘুমুচ্ছো এবং ভূমিষ্ঠ হবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছো; আমি তোমার সর্বমঙ্গল কামনা করি। তুমি এখনো তোমার প্রকৃত রূপ (Gestalt) পাওনি; তুমি এখনো শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করছো না; তুমি এখনো

অন্ধ। তবু, যখন তোমার সে-লগ্ন আসবে, তোমার এবং তোমার মাতার সে-লগ্ন আসবে (তোমার সে-মাতাকে আমি সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবাসি) তখন তুমি বাতাস এবং আলো পাবার জন্য সংগ্রাম করার মত শক্তিও পাবে। আলোকের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করার অধিকার তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। সেই কারণেই তুমি নারীদেহ থেকে শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করবে অবশ্যই তুমি প্রকৃত কারণ না জেনেই জন্ম গ্রহণ করবে।

বেঁচে থাকাতে যে আনন্দ আছে সেটাকে তুমি রক্ষা করো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু-ভয় ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিও। এই যে জীবন—এটাকে ভালোবাসা উচিত, নইলে এটা বৃথাই নষ্ট হয়, কিন্তু এটাকে মাত্রাধিক ভালোবাসা উচিত নয়।

নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য হৃদয় সর্বদা উন্মুক্ত রেখো; মিথ্যাকে ঘৃণা করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত রেখো; অশিবকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বর্জন করার মত শক্তি সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করো। আমি জানি, আমাকে এখন মরতে হবে, এবং তোমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে, এবং আমার যত সব ভুলত্রুটির জঞ্জালের উপর তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আমাকে ক্ষমা করো। আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত যে তোমাকে এই অরাজক আরামহীন সংসারে পিছনে রেখে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এ-ছাড়া তো কোনো গতি নেই। আমি কল্পনায় তোমার কপালে চুম্বন রাখছি—শেষবারের মতো তোমাকে আশীর্বাদ জানাবার জন্য। গুড্ নাইট, বাছা আমার—গুড্ মরনিং, এবং শুভ প্রভাতে তুমি জাগ্রত হও।

*

মিসাক মানুচিয়ান, তুরস্ক
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আদি-ইয়মনে (তুরকী—আরমেনিয়ায়) জন্ম; ২১ ফেবরুয়ারি ১৯৪৪-এ প্যারিসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

২১ ফেবরুয়ারি ১৯৪৪ [প্যারিস]

[আমার মৃত্যুর পর] যাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁরাই ধন্য কারণ তাঁরা মধুর স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে ফরাসী জাতি এবং অন্যান্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী আমাদের স্মৃতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেবে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমি জরমন জাতের প্রতি কোনো ঘৃণা অনুভব করি না...প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী তিরস্কার পুরস্কার পাবে। জরমন ও অন্যান্য জাত যুদ্ধ শেষে শান্তিতে, ভ্রাতৃভাবে জীবন ধারন করবে; এ-যুদ্ধ শেষ হতে আর বিলম্ব নেই। বিশ্বজন সুখী হোক।

গভীর বেদনা অনুভব করি আমি যে আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি। আমি চেয়েছিলুম, তুমি আমাকে একটি সন্তান দেবে, এবং তুমিও সব সময় তাই চেয়েছিলে। তোমার প্রতি তাই আমার অনুরোধ, আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য যুদ্ধের পর তুমি অতি অবশ্য পুনরায় পরিণয় করে সন্তান লাভ করবে।

আজ রোদ উঠেছে। এ রকম দৃশ্য আর সুন্দর প্রকৃতির পানে তাকিয়ে আমি তোমাকে নিত্যদিন কতই না ভালোবেসেছি। তাই বিদায় বিদায়! বিদায় নিচ্ছি এ-জীবনের কাছ থেকে, তোমাদের সকলের কাছ থেকে, আমার প্রিয়াপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীর থেকে, এবং আমার ভালোবাসার বন্ধুজনের কাছ থেকে। আমি তোমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করছি, তোমার ছোট বোনকেও, এবং দূরের এবং নিকটের পরিচিত সর্ব বন্ধুজনকে॥

আদিম মানুষ [illegible]

[illegible]

সঙ্গে সম্বন্ধটা ছিল তার চাইতে ঢের বেশী ছিল প্রকৃতির সঙ্গে। এরও বিশেষ কারণ ছিল। নিঃসঙ্গ মানুষ নিজেকে নিঃসহায় মনে করে। কাজেই আত্মরক্ষার instinct সর্বক্ষণ মনের মধ্যে কাজ করেছে। আহারের সংস্থানের জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হত। রোদ বৃষ্টি, ঝড় জল, বাঘ ভালুক, সাপ খোপের কথাই ভাবতে হত বেশী। কাজেই মানুষের সঙ্গে যতখানি না পরিচয় হয়েছে তার চাইতে ঢের বেশী হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে। তার প্রথম আত্মীয় সম্পর্ক চন্দ্র সূর্য বায়ু বরুণের সঙ্গে। প্রথম থেকে এদেরই মন মেজাজ বুঝে তাকে চলতে হয়েছে, কাজেই এদের কথাই ভেবেছে বেশী। অথচ এরা এমন জন নয় যে, দণ্ড বসে এদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে, জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের খোঁজ খবর সব জেনে নেবে। অথচ এদের প্রসাদেই তার সমস্ত জীবন নির্ভর করছে। কাজেই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এদের কথা তাকে সর্বক্ষণ ভাবতে হয়েছে। ভেবে ভেবে এদের নাম ঠিকানা, ঘর গেরস্থালি, স্বভাব চরিত্তির, মর্জি মেজাজ সম্বন্ধে সে মনগড়া কাহিনী তৈরি করেছে। নিজের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার জন্যেই খুব মন দিয়ে এদের ভাবভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। কাজেই এদের সম্বন্ধে সে যেসব কাহিনীর সৃষ্টি করেছে সেটা তার মন-গড়া হলেও তাকে নিছক মিথ্যা কল্পনা বলা চলে না, তার মধ্যে সত্যও অনেকখানি ধরা পড়েছে। Observation এবং imagination-এর মিশ্রণে এক অতি চিত্তাকর্ষক জিনিসের সৃষ্টি হয়েছে।

ঐসব নৈসর্গিক শক্তিতে সে অনেক সময় মানবিক দোষগুণ আরোপ করেছে। মানুষ যেমন স্নেহ প্রেম, হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতা মিত্রতার বশবর্তী, এদেরও সেই ভাবেই কল্পনা করেছে। এইভাবেই মিথলজি গড়ে উঠেছে। মানুষের নিজের সমাজ সংসার যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি এই আরেক নতুন সংসারও সে গড়ে তুলেছে। এদের মর্জির উপরে নিজের ভাল মন্দ অনেকখানি নির্ভর করে বলে এদেরকে সব সময়েই সে ভয় এবং সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে। এদের দোর্দণ্ড প্রতাপে সে অভিভূত। আপন শক্তিতে এদের ক্ষমতাকে রোধ করবার কথা সে কখনও ভাবতেই পারে নি। কাজেই পূজো নৈবেদ্য দিয়ে তাদের তোয়াজ করবার চেষ্টা করেছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি এইভাবেই হয়েছে। প্রকৃতির যে রহস্য মানুষের বুদ্ধির অগোচর থেকেছে তাতেই সে দেবত্ব আরোপ করেছে। প্রকৃত পক্ষে রহস্যের অপর নাম দেবতা, সেই কারণেই দেবতা আমাদের কাছে রহস্যময়।

প্রকৃতির বহু রহস্যেরই সমাধান সেদিনের মানুষ করতে পারেনি কিন্তু তাই বলে myth-এর সবটুকুই মিথ্যা নয়। প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক সব সময়ে সে বুঝে উঠতে পারেনি কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিগুলির স্বভাবচরিত্র সে মোটামুটি বুঝে নিয়েছিল। সেটাকে বিজ্ঞানের সূত্রে বাঁধতে পারেনি, বিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি। প্রকাশ করেছে কতকটা রূপকের ভাষায়। সেজন্যে পুরাণ কথা খানিকটা রূপকথার আকার নিয়েছে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে পশ্চিম দেশীয় পুরাণ কথায় আর আমাদের পুরাণ কথায় অনেক জায়গায় মিল আছে। তার কারণ আদি যুগের সব মানুষ সব দেশে প্রকৃতিকে অনেকটা একই ভাবে দেখেছে। সব দেশেরই মিথলজি অর্ধেক সত্য অর্ধেক কল্পনার সৃষ্টি। কল্পনাই মুখ্য, তবে সত্য কখনো কল্পনাকে একেবারে ফাঁকি দিতে পারে না, কিছু তার কল্পনার জালে ধরা পড়বেই। এদিক থেকে দেখতে গেলে স্বভাবতই মনে হবে যে, মিথলজি রচনায় এবং কাব্য রচনায় খানিকটা সাদৃশ্য আছে। পুরোপুরি মিল অবশ্যই নেই। কাব্য-রচয়িতারা কল্পনার চোখ দিয়ে সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। পুরাণ রচয়িতা চর্মচক্ষে যে সত্যকে আংশিকভাবে দেখেছেন তার অবোধ্য বা দুর্বোধ্য অংশকে কল্পনার দ্বারা ভরাট করবার চেষ্টা করেছেন। জিজ্ঞাসার পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মিথলজিস্ট মাত্রেই কবিপ্রকৃতির মানুষ। কবিকল্পনা ছাড়া myth-এর সৃষ্টি সম্ভব নয়। আবার কবিমাত্রেই myth-বিলাসী। সকল কবিই অল্পবিস্তর myth-এর সৃষ্টি করেন। আদি-যুগের কবিরা তো করেছেনই, এ যুগের কবিরাও করছেন। তবে সে অন্য ধরনের। আধুনিক কবিরা যেখানে কোন Type চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন ক্রমে তাই mythological personage-এর স্থান গ্রহণ করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এলিয়টকৃত Prufrock চরিত্রের নাম করা যেতে পারে। এ যুগের নির্মোহ, নিষ্পৃহ, বিভ্রান্ত, বিষণ্ণ মানুষের সে প্রতীক। প্রাচীনেরা প্রকৃতির মধ্যে জীবনের প্রতীক খুঁজতেন, আধুনিকেরা চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের মধ্যেই জীবন যৌবনের প্রতীক খুঁজছেন।

খাঁটি পুরাণ বলে যা পরিচিত তা Pagan সমাজের সৃষ্টি। বহু দেবতায় বিশ্বাসী সমাজেই myth-এর সৃষ্টি স্বাভাবিক। আজকের বেশীর ভাগ মানুষই বহু দেবতায় বিশ্বাস করে না, এমন কি অনেকে একমেবাদ্বিতীয়মকেও বিশ্বাস করে না। যারা করে তারা pantheism-এ বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, একই দেবতা বা সর্বব্যাপী কোন শক্তি সর্বঘটে বিরাজমান। আগেকার মানুষ প্রতি ঘটে পৃথক পৃথক দেবত্ব আরোপ করত। myth-এর সৃষ্টি ঐ থেকেই হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মের উদ্ভব প্যাগান সমাজের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে। অপর পক্ষে Paganism এবং mythologyতে এমন নিকট সম্পর্ক যে, একের মৃত্যু অপরের মৃত্যু ঘটাতে বাধ্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুঃখ করে বলেছিলেন, এ যুগের সুসভ্য মানুষ না হয়ে যদি আদিম যুগের 'অসভ্য' প্যাগান হতেম তা হলে—

So might I . ...
Have glimpses that would make
    me less forlorn;
Have sight of Protens rising from
    the sea;
Or hear old Triton blow his
    wreathed horn.

তবে এ কথাও সত্য যে myth-এর প্রতি মানুষের এমন সহজাত আকর্ষণ যে ধর্মের মৃত্যু যত সহজে ঘটে myth-এর মৃত্যু তত সহজে হয় না। Pagan সমাজের উচ্ছেদ হয়ে যখন খ্রীষ্টান ধর্মের উদ্ভব হল তখন myth এর উচ্ছেদ হয়নি। খ্রীষ্টান ধর্মের আদি গ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টে বিশ্বসৃষ্টি এবং মানবমানবীর জন্ম কাহিনী যে ভাবে বিবৃত হয়েছে তাকে myth ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব নয়। Old Testament একাধারে ইহুদী জাতির ইতিহাস এবং খ্রীষ্টীয় mythology। সকল দেশেই জাতির আদি ইতিহাস এবং তার পুরাণ কাহিনী মিলে মিশে একীভূত হয়ে আছে। খ্রীষ্ট পরবর্তী যেন কাহিনীও খ্রীষ্টান মিথলজির অন্তর্গত। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে বহু দেবতায় বিশ্বাস নেই সেখানেও মিথলজির প্রভাব প্রতিপত্তি কিছু কম নয়। পুরাণে বিশ্বাস অনেকটা মানুষের সংস্কারগত, ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এর খুব একটা যোগ নেই।

Mythology-র সব চাইতে বড় শত্রু বিজ্ঞান। পুরাণের আশ্রয় হল বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের ভিত্তি হল যুক্তি। যুক্তি ছাড়া কোন জিনিসকে সে গ্রহণ করে না। পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে বিজ্ঞান ওল্ড টেস্টামেন্টের সাক্ষ্য কিম্বা ভারতীয় পুরাণের সাক্ষ্য মানবে না, Geology-র মতকেই স্বীকার করে নেবে, মানুষের বয়সের বেলায় Anthropology-র। ভূতত্ত্ব নৃতত্ত্ব পুরাণ বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনীকে নাকচ করে দিয়েছে। শুধু সৃষ্টি কাহিনী নয় বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সমগ্র মিথলজিই বরবাদ হয়ে যাবে। এই সূত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার যেমন শত্রুতা সাহিত্যের সঙ্গে তেমনি তার মিত্রতা। বিজ্ঞানের স্বভাব বড় একরোখা, সে যা সত্য বলে জেনেছে তার থেকে তিলমাত্র নড়চড় হবার জো নেই। সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ঢের বেশি উদার। রসসৃষ্টির ব্যাপারে তার কোন রকম শুচিবাই নেই,

ভোর যাত্রা

সুশীল রায়

হাসির রেখা যেন ফুটে উঠছিল সেই ঠোঁটে। একদৃষ্টে চেয়ে ওদের দেখছিলেন অতসী দেবী।

পাশের মহিলাটির কোল থেকে ছোট বাচ্চাটিকে নিজের কোলে নিয়ে নিলেন অতসী।

"কি হল?" একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন মহিলাটি।

অতসী উত্তর দিলেন না, কোলের মধ্যে ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে নিয়ে গুম হয়ে বসলেন। একটু পরে বললেন, "অনেকক্ষণ নিয়ে আছ। পা-টা ছড়িয়ে নাও।"

পা নামিয়ে শাড়ি ঠিক করে একটু আরাম করে বসে তিনি অতসীর দিকে একটু তাকালেন, বোধ হয় তাঁর একটু সাহস হয়েছে অতসীর কথা শুনে, বোধ হয় মনে হয়েছে যে অতসীর মন একটু নরম হয়েছে, তাই আবার বললেন, "খা না এবার একটু! নিই?"

"না।" সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ় উত্তর দিলেন অতসী দেবী।

মহিলাটি [illegible] বললেন, "[illegible] কি [illegible] আজ [illegible]।"

অতসী-চোখে মহিলাটির দিকে তাকালেন অতসী দেবী, মুখে কিছু বললেন না।

অতসী দেবীর স্বামী বলে যাঁকে মনে হয়েছে, তিনি কিন্তু বেশ [illegible] আছেন। নিরাপদ দূরত্বে ওঁদিকের বেঞ্চে বসে দিব্য গল্প করে চলেছেন।

মসৃণ দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে [illegible] এক্সপ্রেস।

অতসী দেবীদের বেঞ্চের ঠিক ওপাশে যাঁরা বসেছেন তাঁদের সঙ্গের একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রমহিলা একটু [illegible] ওদের রকম-সকম লক্ষ্য করছিলেন। এতক্ষণ তিনি কথা বলেন নি, কিন্তু এবার অতসীর সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?"

"আমার দেওরের [illegible]।" ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন তিনি।

কি জন্যে রাগ, কেন রাগ, কখন থেকে রাগ—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন তিনি করে যেতে লাগলেন, তার উত্তরও ধীরে ধীরে অল্প-বিস্তর পেলেনও।

অতসী নাকি ছেলেপিলে খুব ভালো-বাসে। ওর নিজের কিছু তো হয়নি। হ্যাঁ, এগারো বছর বিয়ে হয়েছে।

মহিলাটির নাম স্নেহলতা। তাঁর স্বামী নেভিতে কাজ করেন, মানে জাহাজে। তিনি ক্যাপ্টেন। বাইরে বাইরেই তাঁর কাজ। নানা দেশের নানা বন্দরে তিনি বছরের মধ্যে আট মাস কাটান। চোদ্দ বছর হল বিয়ে হয়েছে তাঁর। তাঁর বাচ্চা? তিনটি। এই-যে এরা!

"ও হরি! আমি ভেবেছি ছোটটা বুঝি তোমার দেওরের।" মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা বললেন।

স্নেহলতা বললেন, "তা হলে তো ভালোই হত। তাহলে আমরা বাঁচতাম! আমার জা তাহলে শান্তি পেত। বাচ্চাকাচ্চা এত ভালোবাসে ও!"

মাঝবয়সী ভদ্রমহিলার জীবনের অভিজ্ঞতা ভালোমতই থাকার কথা। স্নেহলতার কথায় তিনি কি বুঝলেন তা তিনিই জানেন, বেশ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি, আর, অতসীর দিকে তাকালেন।

অতসীর পিছন দিকে তিনি বসা, তাই তাঁকে অতসী দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তাকে নিয়ে যে এই আলোচনা হচ্ছে, তা তার একেবারেই যে পছন্দ হচ্ছে না, তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

প্যান্ট-পরা বুড়ো ভদ্রলোকটির দম কম না। এখনো তিনি সমান তালে ছটফট করে চলেছেন।

এমন সময় কামরায় নতুন ধরনের চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল। কে কে বাস-এর টিকিট

কাটবেন, এই সমাচার নিয়ে কামরায় একজন আগন্তুক এসেছেন। তাঁর কাঁধে থলে, হাতে টিকিট।
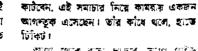
আগ্রা থেকে বাস্ ছাড়বে, সঙ্গে গাইড থাকবে। যা যা দেখার আছে, সব দেখিয়ে বেড়াবে এই বাস্।

প্রস্তাব মন্দ না। অনেকেই টিকিট কাটল। অতসীদের দলও। আমিও।

আরও কিছুক্ষণ বাকি আছে আগ্রা পৌঁছতে। নটা কুড়ি হয়েছে এখন।

কোলের বাচ্চাটিকে আদর করছে অতসী। ঘাড় নীচু করে করে আলগোছে চুমো খাচ্ছে। ঘুমন্ত শিশুকে চুমো খেতে নেই, তা বুঝি জানেনা অতসী; ওতে ওরা জেদি হয়, তেজি হয়, গোঁয়ার হয় যে।

স্নেহলতার এ কথার উত্তরে অতসী বলল, "হোক গে।"

স্নেহলতা হাসল। সুযোগ বুঝে বলল, "এখন কিছু নিই, কি বলিস! একটু খেয়ে নে। কাল রাত্রেও ভালো খাওয়া হয়নি। সকালে তো শুধু চা খেয়ে রওনা—"

অতসী বলল, "না।"

স্নেহলতা মানুষটা একটু নরমপ্রকৃতির বলে মনে হল। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের স্ত্রী তিনি। তিনি যদি একটু [illegible] দেখাতেন তাহলে হয়তো খুব বেমানান হত না।

[illegible] থেকে ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে স্নেহলতার কোলে দিয়ে অতসী উঠল। বাথরুমে যাবে।

মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাটি তাঁর বিস্তর কৌতূহল এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন। এবার তিনি একটু ঘুরে বসার চেষ্টা করে স্নেহলতার দিকে তাকালেন, প্রশ্ন করতে লাগলেন। বললেন, "ছেলেপুলে না হলে মেয়েরা কিন্তু অমনিই হয়ে যায়।"

"তাই বুঝি!" স্নেহলতা সরলভাবে উত্তর দিল।

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন, বললেন, "তুমি তো বুঝবে না। বাচ্চা না হলে পরে রাগ গিয়ে পড়ে তারই উপর। স্বামীর তো কাছে থাকে তাই ওর উপরেই—"

"তাই বুঝি? কি জানি! আমি স্বামীকে কেমন কাছেও পাইনে, [illegible] না। তিনি তো কেবল জলে-জলেই জাহাজে জাহাজেই—"

ভদ্রমহিলাটি না হেসে পারলেন না। এবার তিনি বললেন, "তাই বুঝি?"

বলে তিনি স্নেহলতার কোলের বাচ্চাটির দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, "তীর্থে চলেছি। প্রেমের তীর্থে, তাজমহল দেখতে। এ সময় কি রাগতে আছে? ও ভুল করছ, তোমার জায়ের কথা বলছি।"

স্নেহলতা দিল্লিতে থাকে—আর কে পুরম্-এ, মানে, রামকৃষ্ণপুরমে। অতসী তার জা। দুটি মাত্র প্রাণী তারা আছে বেশ মজায়। অতসীর স্বামী, মানে, স্নেহলতার দেওর বিজনেস করে। ওর নাম মোহিত। কলকাতায় থাকে। বাইরে কোথাও যেতে হয় না। দিব্যি কাজ কিন্তু। ওরা বেড়াতে এসেছে দাদার কাছে। ওরা তো দাদা আর ভাই নয়, যেন দুই ফ্রেন্ড। অতসীরা হরিদ্বারে গিয়েছিল। কাল রাত এগারোটায় ফিরেছে। খুব ক্লান্ত ছিল, শুতে শুতে রাত অনেক হয়ে যায়। ভোরে উঠেই আবার এই ট্রেন ধরা। অতসী আসতে চায় নি। কিন্তু ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে আছে, রিটার্ন টিকিট, সীট রিজার্ভ করা। তাই প্রায় জোর করেই ওকে আনা হয়েছে। এই ওর রাগ। অল্পেই রেগে যায়। কিছু [illegible] না।

[illegible]

অতসীও ফিরে এলো, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] করেছে, একটু খেলা [illegible]।

বাস্ ছাড়ার একটু পরেই আবির্ভূত হলেন তাজ এক্সপ্রেসের মতই পরিচ্ছন্ন একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আমার নাম মাথুর। আমি আপনাদের গাইড। প্রথমে বাস যাবে ফতেপুরসিক্রি, এখান থেকে তেইশ মাইল দূরে; তার পর আগ্রায় ফিরে এসে ফোর্ট, আর, আর তাজমহল।"

স্নেহলতা অতসীকে কি-যেন বলছে। হয়তো এই কথাটাই বলছে, এখন কি রাগতে

আছে, তীর্থে চলেছি, প্রেমের তীর্থে, ভালোবাসার তীর্থে। এখন রাগতে নেই রে।

কিন্তু অতসী বুঝি অটল। তার জীবনে কোথায় যেন ফাঁক আছে, সেইটেকেই সে হয়তো মনে করছে ফাঁকি। সেই জন্যেই বুঝি তার এই অভিমান।

সম্রাট আকবর তৈরি করেছিলেন এই ফতেপুরের দুর্গ। ফতেপুর গ্রাম ও সিক্রি গ্রাম—এই দুটি গ্রাম প্রায় একত্র করে তৈরি হয়েছিল এই কেল্লা। বিরাট ব্যাপার নাকি। আকবর বাদশা খুব গুণী লোক ছিলেন, নিজে তেমন লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু জ্ঞানীগুণীর খুব সমাদর করতেন। আবুল ফজল, বীরবল, —তানসেন এঁদের নাম কে না জানে, এঁরা আকবরের সভার রত্ন। তাঁর আমলেই তুলসীদাস লেখেন রামচরিতমানস, তাঁরই উৎসাহে। আর, আর, আর, গাইড বললেন, "আর সেলিম চিস্তি।। তিনি সাধু-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, আকবর তাঁকে খুব সমাদর করতেন। বাদশার পুত্র হয় না। অবশেষে এই চিস্তি-সাহেবের মেহেরবাণীতে বাদশা লাভ করেন পুত্র। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেলিম চিস্তির মৃত্যুর পর আকবর তাঁর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য সুন্দর একটি সমাধি তৈরি করেছেন। ফতেপুর সিক্রিতে গিয়ে আমরা তা দেখতে পাব। আমরা সেখানে গিয়ে অনেক ঐতিহাসিক—যাক্, ওখানে পৌঁছে সব [illegible] আপনাদের দেখিয়ে বলব, দেখার জিনিস অনেক আছে।"

[illegible] দিল। বুড়ো ভদ্রলোকটি [illegible] দিয়ে বসে বললেন, "বাস, চলো।"

অতসী স্নেহলতাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি যেন নাম বলল লোকটা? কার সমাধি বানিয়েছেন আকবর?"

"সেলিম চিস্তি।" উত্তর দিল স্নেহলতা।

"কী-সব নামের ছিরি!" ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল অতসী।

তারপর স্নেহলতার কোল থেকে তার বাচ্চাটিকে নিতে-নিতে বলল, "তোমার শরীরটা কেমন কাহিল দেখাচ্ছে। ও-ও আমার কাছে দাও। আয়, লক্ষ্মীটি, আয়।"

বাচ্চাটির মাথায় হাত বুলোতে লাগল অতসী।

স্নেহলতা হাল্কা হয়ে বলল, অতসী কথা বলছে দেখে তার মনও একটু হাল্কা হয়েছে, বলল, "এখন একটু-কিছু খাবি? আমি না হয় কাহিল, তোরও তো ক্ষিদে পেয়েছে! খাবি?"

অতসী বলল, "ও কথা বাদ দাও। অন্য কথা বলো-না দিদি। আমারা এখন চলেছি কত নতুন-নতুন জিনিস দেখতে।"

"নতুন কী রে! ওসব তো কোন্ যুগের পুরনো সব কীর্তি!"

"ঐ হল আর-কি!"

স্নেহলতা বলল, "মোহিতের কথাটা একটু ভেবে দ্যাখ। সেই কলকাতা থেকে এল বেচারা, কত আমোদ করবে, কত ফূর্তি করবে, কত আনন্দ করবে। কিন্তু তুই মন ভার ক'রে থাকায় বেচারার কী অশান্তি।"

"ইস!" ফোঁস ক'রে উঠল অতসী, "অশান্তি তো খুব! ট্রেনে দেখলে না ওকে, আনন্দের কিছু কমতি দেখেছ? পুরুষ মানুষদের তুমি চেন না, দিদি। ওরা ভীষণ লোক। এগারো-বছর এক নাগাড়ে বাস করে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি সব।"

অতসীর 'এক নাগাড়ে' কথাটা শুনে স্নেহলতা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার ভাগ্যটা আবার অন্য রকম। তার স্বামী বছরের বেশির ভাগই থাকে জলে-জলে জাহাজে-জাহাজে।

মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাটি এই বাস্-এ নেই। থাকলে ওদের অসুবিধেই হত।

দু-পাশে হুকাই খেত। মাঝখানের পাকা রাস্তা ধরে বরাবর চলেছে তাদের বাসটি। ছেলেপিলেরা হট্টগোল করছে। বুড়ো-ভদ্রলোকটি ছটফট করে কেবল এপাশ-ওপাশ দেখছেন, আর ঝুঁকে-ঝুঁকে কিসব যেন জিজ্ঞাসা করছেন গাইডকে। দু-পাশের ঐ খেতগুলিও ঐতিহাসিক কোনো ব্যাপার কি না, হয়তো তিনি তাই জানতে চাচ্ছেন।

অনেক গ্রাম, অনেক রাস্তা পার হয়ে ঘণ্টা-খানেক বাদে বাস্ থামল একটা মস্ত ফটকের সামনে।

আমরা এসে গিয়েছি।

বিরাট চৌহদ্দি। পাষাণপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা বিরাট এলাকা। সুউচ্চ দুর্গতোরণের ভিতর দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম প্রাকারে। একটা কীর্তিই বটে। কিন্তু সেই সংগেই মনে হল—নিজেদের রক্ষা করার জন্যে বাদশাহেরা কী ভয়ংকর কাণ্ডই করতেন। যেমন প্রতাপ তাঁদের ছিল, তেমনি অসহায়ও ছিলেন। প্রাচীর ও পরিখাই ছিল তাঁদের সম্বল। কিন্তু সে কথা অন্য।

আগে-আগে চলেছেন গাইড, আমরা দল বেঁধে তাঁর পিছন-পিছন। সংগে সংগে চলেছি বটে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড প্রাকার ও তার ভিতরের ঐ মহলগুলি দেখে শেষ করা যাবে কিনা ভাবছি।

এক জায়গায় এসে উঁচু সিঁড়ির উপরে উঠে দাঁড়ালেন গাইড। তাঁর পার্টির সকলে, অর্থাৎ তাঁর বাসের সকলে একত্র জমায়েত হলে তিনি বলে যাচ্ছেন তার যাবতীয় ইতিহাস। অনেক সংগে হাসির ও তামাশা মিশিয়ে বেশ সুন্দর ভাবেই তিনি সব বাড়িগুলোর কথা বলে যাচ্ছেন। বেশ মনোরম লাগছে, বেশ রোমান্টিকও লাগছে।

বুড়ো ভদ্রলোকটি গাইডের খুব কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর বাঁধানো দাঁত দিয়ে ছোকরার মত হাসছেন।

অতসী অনেক তফাতে একা দাঁড়িয়ে। তার দলের কাউকেই তার বুঝি পছন্দ নয়।

গাইড বললেন, "এটা হচ্ছে আঁখ-মিচৌলি। বেগমসাহেবাদের খেলার ঘর ছিল এটা।"

চোখ-ঢেকে ধ'রে কি ধরনের কি-কি খেলা হত, তার বিবরণ দিয়ে তিনি বললেন, "আসুন।"

তাঁর সংগে সংগে ঘুরে দেখা গেল সেই প্রকাণ্ড দাবার ছক। বাদশা আকবর ক্রীত-দাসীদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার ক'রে কিভাবে খেলাতেন দাবা। দেখা গেল পাঁচ-মহল, দেখা গেল হাওয়ামহল। দেখা গেল আরও অনেক রংমহল।

বেলা বাড়ছে, রোদ তেতে উঠছে। মনে হচ্ছে অতসীর মেজাজও যেন গরম হয়ে উঠছে তারই সংগে। তার চলার ভংগি দেখে অন্তত তাই মনে হল।

প্রথম পর্ব শেষ ক'রে একটু বিশ্রাম নেওয়া গেল গাইডের নির্দেশে। আধ ঘণ্টা বাদে আরম্ভ হল দ্বিতীয় পর্ব।

এবার নাকি আমরা দেখব বুলন্দ দরোয়াজা। প্রায় দশ-মানুষ উঁচু প্রকাণ্ড

আমিও সোনাবো মাইরি। স্যাকারিন মিশিয়ে দেবো।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

হাসলো না শুধু নন্দিনী। ও তেমনি উদাস চোখে গঙ্গার ওপারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

দূরে কোথায় একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ হলো। বিরাম বললে, বোধ হয় দরজা খুলেছে।

সুজিত বললে, না না।

বিরাম তবু উঠে পড়লো। বললে, বোস তোরা, দেখে আসি।

কেউ কোন কথা বললে না। নন্দিনী তেমনি চুপ, গম্ভীর, পাথর।

হঠাৎ জীপ ফাসনার খোলার চুরুক করে একটা শব্দ হলো এক সময়। আর সঙ্গে সঙ্গে টিকলু ফিরে তাকিয়ে দেখলে ঊর্মির ব্যাগ থেকে একখানা খাম নিয়ে সুজিত ছুটে পালাচ্ছে।

ঊর্মি সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে পিছনে ছুটলো। —জিৎ, ভাল হচ্ছে না, চিঠি ফেরত দে বলছি। জিৎ, শোন্......

কোথায় সুজিত। তখন চিঠিটা নিয়ে সুজিত ছুটেছে, পিছনে পিছনে ঊর্মি।

টিকলু ভেবেছিল ওরা এখনই ফিরে আসবে। কিন্তু এলো না। ও হঠাৎ আবিষ্কার করলো ও আর নন্দিনী একা। আর কেউ কোথাও নেই। চারিদিক নির্জন, নিঃশব্দ।

—চলুন, আমরাও উঠি। টিকলু বললে। কিন্তু ওর সত্যি উঠে পড়ার ইচ্ছে ছিল না। নন্দিনীর কাছে নির্জনে বসে থাকতে থাকতে টিকলুর মনের মধ্যে সেই পাগলো লোভটা জেগে উঠতে চাইছিল। লোভে আর ভয়ে ওর শরীরটা ভিতরে ভিতরে থরথর করে কাঁপছিল।

—চলুন। নিজেকে নিজেই ভয় পাচ্ছিল টিকলু, তাই আবার বলে উঠলো।

নন্দিনী তেমনি ভাবলেশহীন মুখে উঠে দাঁড়ালো।

ওরা পাশাপাশি হেঁটে চললো। একটা বিরাট শিরীষগাছের গুঁড়ি ওদের দুজনকে যেন আড়াল করে রেখেছে।

হঠাৎ টিকলুর কি হলো কে জানে, ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নন্দিনীর মুখোমুখি। বললে, আপনাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে।

অর্থহীন চোখ তুলে তাকালো নন্দিনী। আর সেই মুহূর্তে, টিকলুর কি হলো কে জানে, ও নন্দিনীর হাতটা ধরতে গেল।

—এই, এই। চমকে উঠে টিকলুর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সকৌতুকে হেসে উঠলো নন্দিনী। খিলখিল করে হাসতে হাসতে, আঁচলে হাসি চাপতে চাপতে ও মন্দিরের দিকে ছুটে দাওয়ার দিকে হাত ধরে হাঁটতে শুরু করলো।

টিকলু হাসতে পারলো না, লজ্জা করছে, ভীষণ লজ্জা করছে।

*

শেষ অবধি নন্দিনীর মুখেও হাসি ফুটলো, অথচ অরুণের যে এ কটা দিন কিভাবে কেটেছে!

অরুণ ফিরে এলো অনেক রাতে। সমস্ত শরীর ট্রেন জার্নিতে ক্লান্ত, ক্লান্ত।

স্নান করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো, কিন্তু মন ছুটে যেতে চাইলো 'কোজি নুক'। নন্দিনীদের খবর জানতে হবে। ওরা হয়তো ভেবেছে কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামিয়ে দেবার জন্যেই অরুণ পালিয়েছে। অথচ ক্ষমতা থাকলে অরুণ ওদের এই বিপদের সময়ে এমন কোন উপকার করতো যা দিয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুটা শোধ করা যায়। হ্যাঁ, বিরাম আর নন্দিনীর কাছে ও

কৃতজ্ঞ। ওরা না থাকলে রুণুর সঙ্গে ওর আলাপ হতো কি করে।

কিন্তু রুণুর সঙ্গে ও আবার যোগাযোগ করার কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটা বিরাম আর নন্দিনীর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেই হয়েছে মুশকিল। তা না হ'লে নন্দিনীকে ও জিগ্যেস করতে পারতো। কিন্তু রুণু লুকিয়ে রেখেছেই বা কেন? অরুণের তো ইচ্ছে হয় পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত লোককে বলে বেড়ায়। মাঝে মাঝে তাই সন্দেহ হয়, রুণুর কাছে এটা শুধু একটা খেলা।

—দুপুরে বাবা যখন খেতে যায় বাড়িতে, তখন তো লাইন ক্লিয়ার দিলেই পারিস। টিকলু বলেছিল।

সুজিত হেসে বলেছিল, খবর্দার। সু[illegible] পেলে কোনদিন ও ব্যাটাই টেলিফোনে ফস্টিনস্টি শুরু করবে।

টিকলুদের প্রেসে একটা টেলিফোন আছে। টিকলুর বাবা দুপুরে যখন খেতে যায় সে সময় সুযোগ বুঝে রুণু তো ফোন করতে পারে। অরুণ তা হলে ঘড়ি ধরে ওদের প্রেসে অপেক্ষা করতো। কিংবা সে সময় রুণু তো টিকলুকেও বলে দিতে পারে, কোথায় কখন অপেক্ষা করবে।

অরুণকে ও-কথা না বললেও চলতো। টিকলুকে ও একটুও বিশ্বাস করে না।

কিন্তু সে সব পরের কথা। সকালে উঠেই কেজি নুকে যেতে ইচ্ছে হ'লো। কোলকাতা শহরটা এই ক'দিন যেন অরুণকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

মিলুকে চা করতে দেখে অরুণ বললে, কি ব্যাপার রে মিলু, তুই?

—কেন, আমি কি পারি না। মিলু হাসলো।

—চার চামচ চিনি দিস্, তোর হাতের চা তো এমনিতেই তেতো হবে।

মিলু কপট রাগ দেখালো। —চিনির যা দুর্ভিক্ষ, একটা মিষ্টি হাত যোগাড় করে আন না।

তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, এবার তো আনতেই হবে। জানিস, মা'র কি হয়েছে?

—কি হয়েছে?

মিলু বললে, টেরিফিক জ্বর, তার ওপর মাথার যন্ত্রণা।

এবার রহস্যটা পরিষ্কার হ'লো। কাল রাতে ফিরে আসার পর মা দু'চারটে প্রশ্ন করেই চুপচাপ শুয়ে রইলো। অন্যদিন হ'লে এত অল্পে রেহাই পেত নাকি। উকিলের জেরা শুরু হ'তো। ট্রেনে জায়গা পেয়েছিলি? স্টেশনের খাবার খেয়ে বুলের শরীর খারাপ হয় নি তো? বাসা পেয়েছে কেমন, ক'খানা ঘর? অক্ষয় ভাল আছে তো? পাড়ার লোক কেমন? সদর দরজায় খিল দিলেই নিশ্চিন্ত, নাকি মই বেয়ে ঘরে ঢোকা যায়? যা চোর ছ্যাঁচোরের উপদ্রব আজকাল। ইত্যাদি।

উত্তর দিতে দিতে বিরক্ত হ'তে হয়।

অরুণ ভাবলে একবার মা'র কাছে গিয়ে কেমন আছে জিগ্যেস করবে কিনা। একটু পাশে গিয়ে বসতে, কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু কোনদিন তো ওসব করেনি, তাই কেমন লজ্জা লজ্জা করলো। কে জানে, মা হয়তো বলে বসবে, যা যা, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

'তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না, তুই গোল্লায় গেছিস, তুই গোল্লায় গেছিস।' কথাটা মনে পড়তেই মাথায় রক্ত উঠে গেল। গোল্লায় যখন গিয়েছি তখন আর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কি হবে। মা তো ভাববে, কিছু বাগাবার তালেই ও তোয়াজ করছে।

ন'টার সময় কেজি নুকে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে, বাবার ডাক। অরুণ!

ও গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, তোর ছোট মেসো একবার দেখা করতে বলেছে। আজকেই যাস।

ছোটমেসো! কিছু জিগ্যেস করতে সাহস হ'লো না। ছোটমেসোর নাম শুনেই ও কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। আবার সেই উর্মি'র সঙ্গে সিনেমা অ্যাফেয়ারটাই এতদিনে অ্যাজেণ্ডায় উঠলো নাকি?

—আচ্ছা। ব'লে চলে আসছিল ও।

—আচ্ছা নয়, আজকেই যাবি।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলো, ওর বিছানায় শুয়ে পায়ের আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে গল্পের বই পড়ছে মিলু।

মেয়েটার যখন তখন বিছানায় পড়ে পড়ে

গল্পের বই পড়া দু'চোখের বিষ অরুণের কাছে। চিচিঙ্গের মত তো চেহারা, এদিকে শাড়ি ঠিক রাখতে পারে না। নিমগাছটার ওদিকের ফ্ল্যাটের ছেলেটা প্রায়ই কবি-কবি চোখে শালা কিছুই দেখছি-না দেখছি-না করে তাকায়।

মিলু তাকায় কিনা কে জানে। নাঃ, ওর টেস্ট এত বাজে নয়।

অরুণ এসে মিলুকে কাতুকুতু দিলো।

—এই দাদা! রেগে গিয়ে উঠে বসলো মিলু।

অরুণ চাপা গলায় বললে, ছোটমেসো দেখা করতে বলেছে কেন রে?

মিলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কি একটা চাকরি আছে, টেম্পোরারি।

—ও।

মিলু বললে, যাবি?

—যেতে একবার হবেই।

—তা হ'লে আমিও যাবো তোর সঙ্গে। ছোটমাসী সেদিন কত করে বলে গেছে। মিলু বললে।

অরুণ বেঁচে গেল। একা গেলে সেদিনের ঘটনা নিয়ে ছোটমেসো কি বলবে কে জানে। মিলু সঙ্গে থাকলে তবু কিছুটা রেহাই পাবে।

বললে, বেশ, যাবি। সন্ধ্যেবেলায়।

তার আগে তো দুপুর। তার আগে তো কফি হাউস। কৌস্তু নুকে অপেক্ষা করে করে কাউকে না পেয়ে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তার ওপর রুণুর জন্যে দুর্ভাবনা। খুব সহজে কাছে এসেছে বলেই হয়তো তাকে হারানোর এত ভয়। অরুণের মাঝে মাঝে মনে হয় রুণু ওকে ভুল করে ভালবেসে ফেলেছে। যে-কোনদিন তার ভুল ভেঙে যেতে পারে। যে-কোনদিন অরুণ রুণুর কাছে টিকলু হয়ে যেতে পারে।

কফি হাউসের চৌকাঠ ডিঙিয়েই সকলকে দেখতে পেল অরুণ। হল ভর্তি সিগারেটের ধোঁয়া, বাতাসে কফির ঝাঁঝ, আর এই কথার হট্টগোল—কথাগুলোকে যেন কফির দানার মত পার্কোলেটারে ফেলা হচ্ছে।

তা হোক, এতক্ষণে অরুণের মনে হচ্ছে কোলকাতা ওকে ফিরিয়ে নিলো।

দূর থেকেই ওঁদের দিকে তাকালো ও।

উফ্, কি দারুণ সেজেছে ঊর্মি।

অরুণকে দেখেই চার জোড়া হাত ঝড়ের মুখে গাছের ডাল হয়ে হাতছানি দিলো।

শুধু নন্দিনী একটু ফিকে হাসি হাসলো, হাতছানি দিলো না।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই সুজিত বললে, আমাদের আজ নন্দিনীবিদায়। বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে, আজ বিরামের দিদির বাড়িতে চলে যাবে নন্দিনী। দিদি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। শুধু দাদাটা—

বিরাম বিরক্ত মুখে বললে, দাদাটা একটা ছোটলোক।

নন্দিনী ভুরু কুঁচকে আপত্তির চোখ তুলে এক বার বিরামের দিকে তাকালো, কোন কথা বললো না।

অরুণ ওসব কিছু লক্ষ্য করলো না, ও তখন ঊর্মিকে দেখছে।

অরুণ হেসে বললে, ঊর্মি, আজ দারুণ সেজেছিস। তারপর দূরের টেবিলে গোঁফওলা ছেলেটার দিকে ইশারা করে বললে, তোকে দেখে ইনটেলেকচুয়ালটার বুকে এতক্ষণ ক্যান্সার হয়ে গেছে।

ঊর্মি হেসে বললে, তোদেরও হচ্ছে নাকি?

টিকলু হাসলো। —আলবাত হচ্ছে, বুকের মধ্যে একটা তক্ষক কুরে কুরে করে লাংস চিবোচ্ছে যেন।

সুজিত বললে, সত্যি! আজ সোফিয়া লোরেনকে মনে হচ্ছে তোর দিদিশাশুড়ী।

হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। বিরাম কিছু বলতে পারলো না। বলবে কি করে, আড়ালে পেলেই তো তা হ'লে নন্দিনী ধাঁতানি দেবে।

ঊর্মি সত্যিই খুব সেজেছে। চুড়ো করে পাক দেওয়া ধরনের চুল বেঁধেছে, ভুরু টেনেছে। ফর্সা ঘাড়, গাল-গলার নীচের ঢালু পুরীর সী-বীচ। কাঁধ অবধি দুটো হাত বাকল ছাড়ানো গাছের মত মসৃণ। কিংবা নাইলনের পাঁচানো শাড়ির দীর্ঘ শরীরটাই যেন একটা ঋজু গাছের এখানে-ওখানে বাকল খসে পড়া কাণ্ড। দূরে বসে দেখা যায় না, ছুঁতে ইচ্ছে করে।

ঊর্মি হঠাৎ বললে, অরুণ, তুই কখনো ড্রিংক করেছিস?

অরুণ কিছু বলার আগেই টিকলু বললে, কতবার।

—ড্রিংক তুই?

সুজিত হেসে বললে, বীয়ার খেয়েছি।

টিকলু নাক সিঁটকে বললে, সোডা কিংবা বীয়ার মাইরি আমি 'র' খেতে পারি না।

ওরা কেউ কিছু বুঝতে পারলো না দেখে বললে, মানে সঙ্গে একটু হুইস্কি না হ'লে।

ঊর্মিও এবার হেসে উঠলো। তারপর বললে, আমি একদিন একটু খাবো। নিয়ে যাবি?

—আজই চল্ না। টিকলুর উৎসাহ সবচেয়ে বেশী।

ঊর্মির চোখ দুটো ঝকঝক্ করলো।

আজই বরং সেলিব্রেট করা যাক্, নন্দিনীবিদায় উপলক্ষে। বলে হেসে উঠলো।

নন্দিনীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। —আমি না, আমি না।

বিরাম বললে, আমাদের বাবা দিদির বাড়ি যেতে হবে।

অরুণ বললে, আজ থাক্ না।

টিকলু রেগে গিয়ে বললে, ট্রামের দড়ি কাটার অভ্যেস তোর গেলো না।

ওরা সকলেই গুম্ হয়ে বসে রইলো। ঊর্মিও সেই যে 'ড্রপইট' বলে চুপ করে গেছে, আর কোন কথা বলছে না। একটা নতুন ফুর্তির আশায় সকলেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, অথচ সেই মুহূর্তে কেউ না কেউ বাগড়া দেবেই।

টিকলু ক্ষোভের সঙ্গে বললে, কপালটাই খারাপ আমাদের। শুয়ে ঘুমোবো কি, শালা তোষকে তুলোর চেয়ে তুলোর বীজ বেশি।

বিরাম ওর বিরক্তি দেখে হেসে ফেললে। বললে, আমরা এবার উঠবো।

ওরা সকলেই ওদের বাসে তুলে দিতে নেমে এলো।

অরুণ শুধু সুযোগ খুঁজলো নন্দিনীকে কি করে আড়ালে পাওয়া যায়, বিরামকেও এড়িয়ে কি করে রুণুকে টেলিফোন করবার ব্যবস্থা করা যায়।

ওর কেমন ধারণা হ'ল নন্দিনী একটু-আধটু নিশ্চয় জানে। ওর আর রুণুর সম্পর্কের কথা। বিরামকে নন্দিনী কিছু বলেছে কি না ওর সন্দেহ ছিল।

বিরামের কানে গেল বোধ হয় কথাটা। বললে, নন্দিনীর খবর কিন্তু তুই কিছু জানিস না।

অরুণ হেসে ফেলে বললে, না না, সে ভয় নেই। বলবো, দেখাই হয়নি।

কোন্ সময়ে কিভাবে ফোন করা যাবে জেনে নিয়ে ও খুব খুশী হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাগ হ'লো রুণুর ওপর। দেখেছো কাণ্ড, কেমন পিউরিটি বার্লির মত মুখ করে রুণু সেদিন বলেছিল, বিরাম নন্দিনী কেউ কিছু জানে না। অরুণও ওদের কিছু জানাতে বারণ করেছিল। আশ্চর্য, মেয়েদের কোন বিশ্বাস নেই, ওদের একটুও বিশ্বাস করতে নেই।

১১

টিকলু যতই ভাবছিল ততই ওর মজা লাগছিল।

—খুব তো পাম্প দিচ্ছিলি, যেন নাম্বার ওয়ান বোতল ভাদুড়ি। পকেট তো এদিকে গড়ের মাঠ। সুজিত ফেরার পথে ঠাট্টা করেছিল।

আর অরুণ বলেছিল, নন্দিনীর সামনে তোর ওসব বলা উচিত হয় নি।

টিকলু রেগে গিয়ে বললে, যা যা, ঊর্মি মাংসের সিঙাড়া হয়ে চোখের সামনে বসে থাকবে, আর আমি মদের কথা বললেই দোষ। একটু খাওয়াতে পারলে দেখাতিস 'আমি পবিত্র আমি বিশুদ্ধ' কোথায় সব চড়ুই পাখি হয়ে ফুরুক করে উড়ে যেত।

অরুণ কোন কথা বললে না। নিমপাতা খাওয়া মুখ করে রইলো।

এই জন্যেই তো টিকলুর আজকাল সুজিত আর অরুণকে অসহ্য লাগে। ওরা সবাই একসঙ্গে আড্ডা দেয়, ফূর্তি করে, স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তারই ফাঁকে সুজিত আর অরুণ এমন ভাব করে যেন টিকলু অনেক নীচু স্তরের মানুষ। ও যেন সত্যিই একটা রকবাজ ছেলে।

কার কত কালচার জানা আছে, থাকিস তো ভাড়াটে বাড়িতে।

পার্কের পিছনে তিরিশ ফুট রাস্তাটার ওপর সব বাড়িগুলোই একে একে নতুন হয়ে গেছে। কেউ পুরোনো বাড়িটাই ভেঙেচুরে নতুন গ্রীল বসিয়ে নিয়েছে, কেউ বারান্দা বাড়িয়ে জানালা ফুটিয়ে নতুন চেহারা এনেছে। কোন কোনটা সত্যিই নতুন। শুধু তার ফাঁকে টিকলুদের বাড়িটাই খসে পড়ার মত অবস্থায়। লোহার থামগুলোতে জং ধরেছে। এক এক সময় বাড়িটার জন্যে টিকলুর গর্ব, এক এক সময় লজ্জা। বাবার বিরুদ্ধে টিকলুর অবশ্য একটা ক্ষোভ ছেলেবয়স থেকেই জমা হয়ে আছে। সারাজীবন ধরে বাবা তা হ'লে কি করলো? পৈতৃক একখানা বাড়ি পেয়েও মেজেঘষে সেটাকে একটু ভদ্রস্থ করতে পারলো না? আবার ছেলেকে উপদেশ দেয়, শাসন করতে চায়।

বাবার ওপর টিকলুর একটুও শ্রদ্ধা নেই। মা সমীহ করে না তো টিকলুই বা করবে কেন। বাবা পড়াশুনো কদ্দুর করেছিল, করেছিল কিনা, টিকলু তাও স্পষ্ট জানে না। ওর বদ্ধ ধারণা বাবা ওর কথা শুনে চললে এদ্দিন ব্যবসায় লাল হয়ে যেত। প্রেস প্রেস বলে, মাল তো বাজারের কাছে নীচের তলার দু'খানা অন্ধকার ঘরে দুটো ট্রেডল মেশিন। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে হ্যান্ডবিল কিংবা রসিদবই ছাপে। কখনো শ্রাদ্ধর চিঠি। প্রেসে একটা খদ্দের ঢুকলে বাবা এমন তোয়াজ করে যেন বাড়িতে বেয়াই এসেছে। সাদা টুইলের নোংরা শার্ট পরে যখন বসে থাকে পরিচয় দিতেও লজ্জা।

মা একবার বলেছিল, বাউণ্ডুলের মত ঘুরে না বেড়িয়ে ছাপাখানার কাজটাজ একটু দেখলে তো পারিস।

টিকলু নাক সিঁটকে বলেছিল, ওটাকে আর ছাপাখানা বলে না।

মা রেগে গিয়ে বলেছিল, ঐ থেকে দু'-বেলা জুটছে। পারিস তো করে দেখা না কাকে ছাপাখানা বলে।

টিকলুর সত্যিই এক একসময় ইচ্ছে হয়, ও বিরাট একটা কিছু করে ফেলবে।

—প্ল্যানও আসে, বড়লোকের ছেলেও পাকড়াই, কিন্তু মাইরি কেন যে পাকা শোল মাছের মত সুড়ুৎ করে সরে পড়ে...

সুজিত হেসেছিল। —তোর তো তাল শুধু পরের টাকায় ম্যানেজারি......

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বসবে, স্টেনো থাকবে পাশে.... অরুণও ঠাট্টা করেছিল।

এ জন্যেই সুজিত আর অরুণকেও আজকাল অসহ্য লাগে। বড় কিছু একটা ওরা ভাবতেই পারে না। শুধু দেড়শো দু'শো টাকার চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। চাকরি একটা পেলেই বা কি হবে, ডালহৌসীতে দুপুরে বেরিয়ে তো চানাচুর চিবোবি।

মাও বোঝে না। —আড্ডা দিয়ে না বেড়িয়ে কিছু একটা করলেও তো পারিস।

আড্ডার ওপর সবাই দেখি জর্জবিছুটি হয়ে আছে। অথচ আড্ডা না থাকলে সময় কাটাতো কি করে। একটা দিন আড্ডা না দিলে মনে হয় কি যেন হ'ল না, কি যেন হ'ল না।

—বল্ সুজিত, তাই কিনা? বুড়োরা মাইরি বোঝে না। আরে আড্ডা না থাকলে এদ্দিন তো বখে যেতাম।

সুজিত হেসে বললে, অরুণটা লাকি। সময় কাটানোর প্রবলেম ওর আর নেই।

অরুণ কোন উত্তর দিলো না। লাকি। প্রেম করেছিস কখনো, প্রেম কি তা জানিস? যন্ত্রণা রে, স্রেফ যন্তরনা। 'সময় কাটানোর প্রবলেম নেই!' রুণুর সঙ্গে একটু মন খুলে কথা বলার পর থেকে মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টা ও কাছে কাছে থাকুক। দু'তিনদিন অন্তর দেখা হয়, অথচ সময় কাটাবে কি, মনে হয় ঘড়ির কাঁটা যেন পোলিওতে ভুগছে।

—কদ্দুর এগিয়েছিস্ বল। টিকলু হঠাৎ জিগ্যেস করলে।

—প্রেম কি এগোবার বা পিছোবার জিনিস। অরুণের পিঠে কেউ যেন আলপিন বিঁধিয়েছে এমনভাবে বিরক্ত

ফুলের আলপনা

জীবনে তাঁর কাব্যপ্রতিভার প্রকাশ হয় নানাভাবে। আমরা দু' লাইন তুলে দিলাম। যেখানে সে যুগের শাঁষ-মহলেও সত্যকে জানার সম্ভাবনা ছিল।

নহী এক ওয়াক্তা পর্ মাহাকা রং
আর্জি হ্যায় ফকত্ ইঁহাকা রং
খুদ্ গরজ হোতে হ্যায়
ইঁহাকে দোস্ত্
যব গরজ নিকলী ফের
কাঁহাকে দোস্ত্

মোটামুটি মানে দাঁড়ায়: এ দুনিয়ার রং সর্বদা এক নয়। এখানে দোস্ত্ হয় খুদগরজ অর্থাৎ স্বার্থপর। গরজ চলে গেলে আর কি দোস্ত্ থাকে?

ফুলের আলপনা

ধরার হাসির রূপ ধরেছেন ফুলে আর ঘাসে শ্রীমতী রাণী দাস। ফুলের আলপনা গুজরাতের লোকশিল্পের নমুনা। ওঁরা অবশ্য বলেন রঙোলি, যেমন বলেন আরও বহু জায়গার লোকশিল্পধারার এই ধরনের সজ্জাকে। কোথায় বা রঙিন গুঁড়ো দিয়ে নানা রূপ আঁকা হয়, কোথাও বা রং-ভরা নল গড়িয়ে দিয়ে রূপরেখার প্রকাশ হয়। নারকেল পাতের কুচো দিয়ে ধরে রং আর নমুনা হয় নানারকম। রামেশ্বরমে সেবার দেখেছিলাম গোবর আর কুমড়ো ফুলের বিচিত্র সমাবেশে অঙ্গন-সজ্জা। সেখানে সম্ভবত কুমড়োফুলকে হাস্যাস্পদে ঠেকেনি বলে তার স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। আমাদের বেলায় কুমড়োফুলে, সজনেফুলে ভাজা আর চচ্চড়ির কড়াতে গিয়েছে। আমরা আলপনা দিই পিটুলি গুলে ব্রতপার্বণে। আলপনা ব্রত-উৎসবের কল্পনার স্বরূপ। ফুলের আলপনা বা রঙোলিও তাই কল্পনার স্বরূপ। শ্রীমতী দাস বলছিলেন, পরিপূর্ণ একটি ছবি আঁকবার কল্পনা তিনি ধরে দিতে চেয়েছেন ফুলে আর ঘাসে দিয়ে। শস্য দিয়ে সাজানো আলপনা বা আমাদের ফুলসজ্জার তত্ত্বের অঙ্গ একটি কলসে দিয়ে ঘর অথবা আবেষ্ট পাড়ার গাড়ির সমগোত্রীয় এই শিল্প। হলো অহং অপরূপ।

শ্রীমতী দাসের ছবিখানা বোঝাচ্ছিলেন তিনি। ধরার হাসি তখনই ধরা পড়ে, যখন ঘন কালো ছড়িয়ে দেয় ফুলে ফুলে বিরে। প্রজাপতি উড়ে যায় ফুল থেকে ফুলে। পাখিরা ডানা মেলে দেয় আনন্দলোকে, আলোছায়ায় আনাগোনা করে বাতাসের দোলা। ছবিখানা লক্ষ করে দেখলাম, সবই ধরার প্রয়াস আছে। এমন কি, দু' ফোঁটা জলেরও স্থান আছে। ধরার হাসিতে জল চাই। গোলাপ, গাঁদা, ছোট চন্দ্রমল্লিকা আর কাটা ঘাস দিয়ে রঙোলি সম্পূর্ণ।

যাই হোক, ভাবের ঘরে আনাগোনার চাইতেও ছবির বিশেষত্ব সাধারণ, সামান্য জিনিসের ব্যবহারে। ফুলে সাজানোর একটা ঢেউ এসেছে। খুব সুখের কথা। কিন্তু সম্পন্ন সংসারের শিল্পী কামিনী শৌখিন গোলাপ আর ততোধিক ব্যয়সাধ্য পটভূমিকা নিয়ে সাজিয়ে তুলুন নতুন রূপ। ক্ষতি নেই কিছু। তবে সাধারণ গৃহকে অথবা অপেক্ষাকৃত কম খরচার আয়োজনকে সৌন্দর্য দিতে পারার প্রয়োজন বেশী। শ্রীমতী দাসের মত কাটা ঘাস আর ফেলে দেওয়া ফুলে মাঝে-মধ্যে আলপনা আঁকতে পারেন সবাই। ঘরের আয়তন, হাতের কাছে পাওয়া টুকিটাকি ঘাসপাতা হিসেব করে বেশ সুন্দর পরিবেশ রচনা করা চলে না কি? মনে হলো ঘাসই প্রধান জিনিস। তারই বুকে রচনার এদিক-ওদিক। শস্যের আলপনা দেখেছি উৎসবে, অনুষ্ঠানে। ফুলের আলপনা তার চেয়েও সহজ এবং সামান্য আয়োজনসাপেক্ষ। শহরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের তবু ফুলের জন্য সামান্য খরচ করতে হতে পারে; বড় শহরের বাইরে যাদের বাস তাদের ফুলের আলপনার সব কিছু আয়োজন ঘরের পাশে, চলার পথের চারদিকে। কুড়িয়ে নেবার দেরী মাত্র।

টুকিটাকি

পুরোনো উলের মোজা বা সোয়েটার হাতে নিয়ে নতুন করে বুনে অনেকেই ব্যবহার করেন। কিন্তু যেখানে সেভাবে ব্যবহার করা আর সম্ভব নয় অথবা কাজে বেশ কেন মোজা হাতে কাজে লাগানো চলে না সেখানে বড় মোজার ছেঁড়া জায়গার পাশ দিয়ে চেপে কলে সেলাই করে ব্যবহার করা চলে অপেক্ষাকৃত ছোট পায়ের জন্য। ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় তো কথাই নেই। বড় মোজার যতটুকু দরকার কেটে-কুটে কলে সেলাই দিয়ে দেবেন। পিছন দিকের লম্বা সেলাই মুড়ে French seam করে দিলে আরও ভাল হবে।

এভাবে ছেঁড়া সোয়েটারও কাজে লাগাতে পারবেন। গলার ও হাতে ছেঁড়া থাকলে পাইপিং দিয়ে শাড়ির জামার জ্যাকেটের মত পরা চলে। অনেক সোয়েটার বা চোলি থাকে জামার, কাজেই হাতকাটা, গলাকাটার এদিক-ওদিক নিয়ে ভাবনা নেই। পাইপিং-এর কাপড় প্রথম এক দিকে চেপে সেলাই করবেন, তারপর বেশ পরিচ্ছন্ন করে কেটে অন্য দিকে সেলাই করবেন।

ছোট ছোট টুকরো পশম ব্যবহার করে চমৎকার কার্পেটের আসন ইত্যাদি হয়। পুরোনো উল হলে অবশ্য ধুয়ে শুকিয়ে নেবেন। তারপর নমুনা নক্সার একটা ছাঁদ করে উল ব্যবহার করে যাবেন। দিব্যি ফুটে উঠবে রকমারি রঙের বাহার।

ছোটদের টুপিতে, মোজাতে যে উলের ছাঁটা ফুল দেওয়া হয় তাও টুকরো উলে বেশ হয়। ভবিষ্যতে মেরামতের কাজের জন্যও টুকরো ব্যবহারে আসে। কাজেই এতটুকুও ফেলে না দিয়ে পুরোনো ছেঁড়া বা টুকরো পশম যত্নে রাখবেন, দেখবেন তার কত ব্যবহার।

শ্রীমতী

শক্তিশালী দূরবীনের চোখে পৃথিবী থেকে পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশের এই অংশটির নাম দীর্ঘগ্রীব তারা মণ্ডল (জিরাফ কন্স্টেলেশন্)। ছবিটি তোলা হয় গত জুন মাসের ১৪ তারিখে আইকারাস নামে গ্রহাণুটি তার কক্ষ পরিক্রমার পথে পৃথিবীর নিকটতম হয়েছিল (এই গ্রহণে সম্পর্কে এই পত্রিকায় সেই সময় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল)। টেলিফটো লেন্সের পাল্লার মধ্যে গ্রহাণুটি ৫ মিনিট দেখা গিয়েছিল। ছবির উপরের দিকে বাঁ পাশে যে ফিকা সাদা লাইনটি দেখা যাচ্ছে সেটি ঐ গ্রহাণুর আলোকিত গতিরেখা

আমেরিকার নবতম ভূ-প্রদক্ষিণকারী মহাশূন্য লেবরেটরী আবহমণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে নির্মল মহাকাশ থেকে এইরকম সব নক্ষত্র লোক পর্যবেক্ষণ করবে
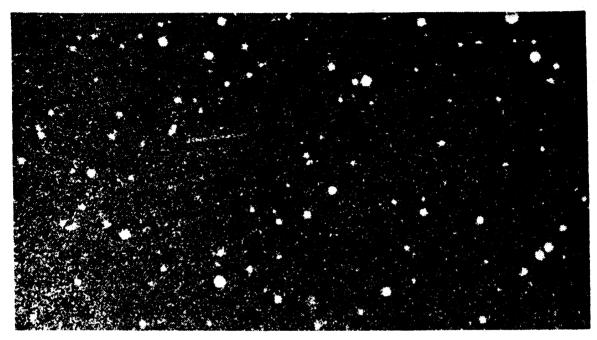
মার্কিন মহাজাগতিক নক্ষত্র-সন্ধানী জানালা

এই দুই টন ওজনের মহাজাগতিক লেবরেটরীর মত এত গুরুভার ও জটিল ভূপ্রদক্ষিণকারী লেবরেটরী আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) থেকে এর আগে কখনো মহাশূন্যে প্রেরিত হয়নি। সোভিয়েতের প্রোটন মডেলের মহাশূন্য পরীক্ষক লেবরেটরীগুলির ওজন আমাদের জানা নেই। শুধু এইটুকুই জানা স্পুৎনিক হিসাবে সেগুলি আয়তনে ও ওজনে সবচেয়ে ভারি। মার্কিন লেবরেটরীটির নাম কক্ষ পরিক্রমারত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার (অর্বিটিং অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরী বা "ওয়্যাও-২")। এটি গত নভেম্বর মাসে উৎক্ষেপ করার কথা ছিল কিন্তু পরিবাহক অ্যাট্লাস সেণ্টার রকেটে কিছু গণ্ডগোল থাকায় তখন লেবরেটরীটি পাঠান হয়নি। সব কিছু ঠিকঠাক হবার পর ৪ঠা ডিসেম্বর সেটি সেণ্টার রকেটের দ্বারা কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়া হয়।

তার পরের দিনই একই জায়গার উৎক্ষেপ মঞ্চ থেকে (কেপ্ কেনেডী) ইউরোপীয় মহাশূন্য গবেষণা সংস্থার (ইউরোপীয়ান্ স্পেস্ রিসার্চ অর্গ্যানিজেশন বা 'এস্রো') দ্বারা নির্মিত আরো একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরিত হয় 'থর-ডেল্টা' রকেটের সাহায্যে। ব্রিটেন সহ ইউরোপের দশটি দেশ ঐ সংস্থার সদস্য। ১০টি সংবেদনশীল সেন্সার বা অ্যান্টেনার সাহায্যে এই স্পুৎনিকটির কর্তব্য হচ্ছে মহাশূন্যে কোথায় কোন্ চৌম্বক ক্ষেত্র আছে সেগুলি সম্পর্কে ও সৌরবাত্যা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে সওয়া দুই লক্ষ কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বার বার কক্ষ পরিবর্তনের সময় বর্ষশেষে সৌর সংক্ষোভের (টার্বুলেন্স্) শীর্ষমাত্রায় আন্তগ্রহ মহাশূন্যের অবস্থা পরীক্ষা করবে।

"ওয়্যাও-২" সম্পর্কে গর্ডার্ড মহাশূন্য যাত্রা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডঃ জন ক্লার্কের অভিমত হচ্ছে যে, "৩৬০ বছর আগে প্রথম দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যতখানি উন্নতির সূচনা হয়েছিল তা আজকের এই লেবরেটরিকেও ততখানি উন্নতির সমতুল্য বলা যেতে পারে। কারণ, নক্ষত্র জগত সম্পর্কে এটি যে পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয়ের সুযোগ দিতে সক্ষম সেই পরিমাণ জ্ঞান গোটা সভ্যতার ইতিহাসে সঞ্চয় করা যায়নি। সম্ভবত এই লেবরেটরীটি এমন সব তারকা রাশির অস্তিত্ব উদ্ঘাটিত করবে যেগুলি আজও মানুষের অজ্ঞাত।" লেবরেটরীটির দৈর্ঘ্য দশ ফুট (মোটামুটি তিন মিটার)।

"ওয়্যাও-২" লেবরেটরীতে আছে মোট ১১টি দূরবীন। সেগুলির ৪টি রয়েছে লেবরেটরীর এক প্রান্তে, ৭টি অপর প্রান্তে। একসঙ্গে সবগুলি কাজ করবে না। একদিকেরগুলি ১ সপ্তাহ কাজ করার পর ১ সপ্তাহ জিরোবে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব অন্যদিকেরগুলির হাতে তুলে দিয়ে। এমনি ভাবে পালা বদলের মধ্যে দিয়ে কাজ

চলেছে। দূরবীনগুলির বিশেষত্ব এই যে সেগুলি আলোক-বর্ণচ্ছত্রের অতিবেগুনী রশ্মির বিকীর্ণ আলোকের পক্ষে সুবেদী (সেন্সিটিভ্)। বর্ণচ্ছত্রের নীল অংশের এই অতিবেগুনী উপাংশ আমরা এমনি চোখে দেখতে পাই না এবং পৃথিবীতে চোখে দূরবীন লাগিয়েও পরিদৃশ্যমান হয় না। ম্যাসাচুসেট্স্-এর কেম্ব্রিজ শহরে যে নক্ষত্র পদার্থ বিজ্ঞানাগার (স্মিথ্সোনিয়ান) আছে সেইখানে নির্মিত প্রথম ৪টি দূরবীনের সঙ্গে যে টেলিভিশন নল যন্ত্র তা অতি বেগুনী রশ্মির পক্ষে সুবেদী। এই স্মিথ্সোনিয়্যান কৌশল, আমেরিকানদের মতে এখনো অদ্বিতীয়। এই ৪টি দূরবীন টেলিভিশন ক্যামেরার প্রতিদিন ৭০০টি করে তারার পর্যবেক্ষণ ও চিত্রগ্রহণের কথা। লেবরেটরীটি যদি ৬ মাস কর্মরত থাকে তাহলে সেটি ৫০ হাজার নক্ষত্রের "নক্শা" রচনা করবে। আর যদি ২ বছর কাজ করে তাহলে আমাদের দৃষ্টির পরিধির মধ্যে আকাশের যতখানি জায়গা পড়ে তার সবটুকুরই "মানচিত্র" অংকিত হয়ে যাবে। এই নক্ষত্র-সন্ধানী উড়ন্ত মানমন্দিরের দূরবীনগুলির একটি প্রধান সহায় হচ্ছে এই যে, এটি পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে চলে যাবে বলে আবহমণ্ডল সেগুলির দৃষ্টি ঝাপসা বা ধোঁয়াটে করে দিতে পারবে না।

অন্য ৭টি টেলিভিশন ক্যামেরা-যুক্ত দূরবীন নির্মিত হয় উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেগুলির কর্তব্য বাছাই করা গোটা ৩০ক নক্ষত্র অনেক বেশি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা। সেগুলি প্রতিদিনই এই কর্তব্য অনুসারে কাজ করে যাবে। দূরবীনগুলির প্রধান লক্ষ্যস্থল হবে বয়সে নবীন নক্ষত্র ও সেই মহাজাগতিক 'ধূলি-কণাগুলি পর্যবেক্ষণ করা যেগুলি বিজ্ঞানী মহলের একাংশের মতে নতুন তারার গজিয়ে ওঠার জমি। যুবক বা নবীন তারা বলতে বুঝতে হবে যে সেগুলির বয়েস কয়েক অযুত বছর যে ক্ষেত্রে আমাদের নিকটতম নক্ষত্র, সূর্যের বয়েস ন্যূনাধিক ৫০০ কোটি বছর।

দূরবীনগুলি যে ছবি তোলায় শুধু অতি বেগুনী রশ্মি ব্যবহার করবে তা নয়, সেই সঙ্গে গামা ও একস্ রশ্মিতেও ফটো তুলবে। এই ধরনের চেষ্টা এর আগে আর হয়নি। মহাজগৎ-অভিযানের যুগেই এক্স-রশ্মি নক্ষত্রগুলির আবিষ্কার। বছর কয়েক আগে একটি রকেটবাহিত নেহাতই মামুলী এক্স-রশ্মি ক্যামেরার চোখে ঐ জাতীয় নক্ষত্রের উপস্থিতির কথা প্রথম জানতে পারেন ডঃ হার্বার্ট ফ্রীড্ম্যান। তাঁর মতে এই এক্স-রশ্মি নক্ষত্রের সংখ্যা সাধারণ পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রগুলির চেয়ে বেশি হতে পারে।

লেবরেটরীটির ভাসমান ৬টি গতি-অনুধাবক (ট্র্যাকার) সেটিকে পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষণীয় নক্ষত্রের দিকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দেবে যাতে নক্ষত্রটি দূরবীনের লেন্সের পাল্লার মাঝখানে আসে। মধ্যে ৩টি আলোকসংগ্রাহী অনুধাবক প্রথমে চালু হবার কথা নির্দিষ্ট তারা পরীক্ষার জন্য।

বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন যে "ওয়াও-২" নক্ষত্র জগৎ সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটিত করবে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-রহস্য, বয়েস, বিবর্তন ও ভবিষ্যতের উপর নতুন আলোকপাত করবে।

চাঁদের প্রাকৃতিক মানচিত্র অংকনে "জন্ড্-৬"

স্বয়ংচালিত চন্দ্র সন্ধানী মহাব্যোমযান জন্ড-৫-এর প্রসঙ্গে এই পত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ মহাকাশ-যানের উত্তরসূরী জন্ড্-৬ মোটামুটিভাবে জন্ড্-৫-এর কার্যসূচীর পুনরাবৃত্তি করলেও, তার কার্যসূচীর মধ্যে অন্য কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেইরকম বিষয় হচ্ছে প্রধানত দুটি : (১) চাঁদের ফটো তোলা আগেকার চেয়ে অনেক কাছ থেকে যাতে চন্দ্রপ্রকৃতির খুঁটিনাটি ছাবিতে ধরা পড়ে; সুতরাং এটিকে পুরোপুরির না বলে আংশিক নতুন পদক্ষেপ বলা

যেতে পারে; (২) সম্পূর্ণ নতুন কলকৌশলের সাহায্যে পৃথিবীতে অবতরণ। কৌশলটিতে বায়ুগতি শাস্ত্রের নিয়মাবলী ব্যবহার করা হয় যা এর আগে কখনো করা হয়নি। এই কৌশলের শ্রেয়তা এইখানে যে এর দ্বারা মহাকাশযানটিকে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় নামিয়ে আনা যায় এমনভাবে যাতে একচুলও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত পৃথিবীতে অবতরণের পথে তার উপর অত্যধিক চাপ বা ভারের ধকল অনেকখানি কম হয় আগেকার তুলনায়। এইটিকে নতুন পদক্ষেপ বলতে আপত্তি নেই।

জণ্ড-৬ চন্দ্র প্রদিক্ষণের দুই দফায় ফটো তোলে এমন ক্যামেরার সাহায্যে যার লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব ৪০০ মিলিমিটার এবং তোলা ছবিগুলির আয়তন ১৩×১৮ সেন্টিমিটার।

চাঁদের নিকটবর্তী হবার সময় প্রথম দফা ছবি তোলার পালা শুরু হয়। চাঁদের দীপ্তিমিতির (ফটোমেট্রি) চরিত্র এবং আয়তন ও গড়ন অনুশীলনের জন্য এই প্রথম দফার ছবিগুলি ব্যবহার হচ্ছে। সেগুলি তোলা হয় যখন গোটা চাঁদ সূর্যালোকে আলোকিত ছিল।

সূর্য এবং একটি নক্ষত্রের অবস্থানের সংগে সংগে সম্পর্ক রেখে স্বয়ংক্রিয় জণ্ড-৬-এর এমন দিকে মুখ ফেরানো হয় (ওরিয়েণ্টেশন) যাতে তার ক্যামেরার লেন্সের অক্ষ চাঁদের ঠিক মধ্যবিন্দুর দিকে নিশানা করতে পারে যার একপাশে চাঁদের পরিদৃশ্যমান দিক, অন্য পাশে অদৃশ্য দিক (পৃথিবীতে থেকে যেমন দেখায়)।

দ্বিতীয় দফার ফটোগুলি নেওয়া হয় বৃহত্তর মানদণ্ডে যাতে চাঁদের দীপ্তি মাপা যায় এবং তার অদৃশ্য দিকটির প্রাকৃতিক "নক্‌শা" রচনা করা সম্ভব হয়। সেই সময় পৃথিবীও ক্যামেরার দৃষ্টি-ক্ষেত্রের মধ্যে ছিল।

প্রথম বারের ফটো তোলার অধিবেশন আরম্ভ হয় ১৪ই নভেম্বর মস্কো সময় ভোর চারটের সময় প্রায় ১১ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে। ছবিতে গোটা চন্দ্র গোলকটি দেখা যাচ্ছে মধ্য রেখাগুলির (মেরিডিয়ান) সীমানার মধ্যে অর্থাৎ ১০ থেকে ১৭০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যে। তার মধ্যে চাঁদের বিপরীত পিঠের পূর্ব ভাগ এবং দৃশ্যমান পিঠের পশ্চিম ভাগের কিছুটা পড়েছে। ফটোর উত্তর পূর্বাংশে দেখা যাচ্ছে (১) "প্রোসেলেরাম মহাসাগর" (বাংলায় বলাকা সাগর বলা যেতে পারে) যার উপর ফিকা কলংকের মত ছোট ছোট বিন্দুগুলি হচ্ছে (২) আরিস্টার্কাস এবং (৩) কেপ্লার গহ্বর তিনটি। ফটোয় চাঁদের পূর্ব প্রান্তে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে (৪) কোপার্নিকাস গহ্বর। প্রোসেলেরাম্‌ মহা-

জণ্ড-৬ মহাকাশযানের তোলা চাঁদের একটি আলোকচিত্র
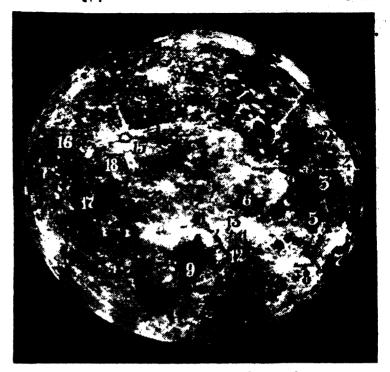
সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে রয়েছে বেশ বড় একটি স্টেডিয়ামের মত আকারের কালো বিন্দু। এটিই হচ্ছে চাঁদের বৃহৎ কুণ্ডগুলির অন্যতম (৫) গ্রিমাল্ডি কুণ্ড। আর তার উত্তর-পশ্চিমে যে ছোট দাগটি নজরে পড়ছে সেটির নাম (৬) রিসিয়োলি কুণ্ড। চাঁদের দক্ষিণ-পূর্ব কিনারায় রয়েছে (৭) "হিউমোরাম সাগর" (মনোরঞ্জন সাগর বলা যেতে পারে)। সেটির পশ্চিমে একটি ফিকা দাগ দেখা যাচ্ছে যা থেকে পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত রয়েছে রশ্মির মত কতকগুলি রেখা। এটির নাম (৮) বির্জিয়াস গহ্বর। ছবির দক্ষিণাংশে পরিদৃশ্যমান (৯) ওরিয়েণ্টালিস সাগর (প্রাচ্য সাগর বলা যায়), (১০) ভেরিস্‌ সাগর এবং (১১) অটাম্নি সাগর (শারদ সাগর বললে ভুল হবে না)। এগুলি ওরিয়েণ্ট্যালিস সাগরের উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে কিনারায় অবস্থিত। সেই সংগে আরো রয়েছে দুটি পর্বতমালা—(১২) রুক ও (১৩) কর্ডিলেরা। ছবির মাঝামাঝি জায়গার কাছে একটি ভাস্বর বিন্দু দেখা যাচ্ছে যেটির নাম (১৪) বাক্‌ল গহ্বর যার উত্তর পশ্চিমে রয়েছে (১৫) স্টের্নবার্গ গহ্বর (রুশ বিজ্ঞানীর নাম) যা থেকে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে কতকগুলি শাখা। চাঁদের পশ্চিম-কানায় রয়েছে (১৬) কন্দ্রাত্যুক গহ্বর (এক রুশ বিজ্ঞানীর নাম) যার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত (১৭) কিবাল্‌চিচ্‌ গহ্বর (জার আমলের একজন সন্ত্রাসবাদী রাজদ্রোহী ও রকেট বিজ্ঞানের ছাত্র যিনি প্রাণদণ্ডের আগে অন্ধকারায় বাস করার সময় ভাবীকালের রকেটের নক্‌শা রচনা করেন ইতিহাসে সর্বপ্রথম এবং সিয়লকভ্‌স্কি তাঁরই উত্তরসাধক বললে অন্যায় হবে না) যা পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হয়ে মালার আকারে তৈরি করেছে ছোট ছোট দুটি গহ্বর গার্ড এবং রিনিন।—স্টের্নবের্গ ও কিবাল্‌চিচের মধ্যবর্তী স্থানের গহ্বরটির নাম (১৮) লাংগেভা (জোলিও কুরীর গুরু)। আমরা এখানে একটি মাত্র ফটো ছাপলাম। আরো বহুদিক চাঁদের দুই পিঠেরই বহু ফটো তোলা হয়েছে—টেলিফটো লেন্স দিয়ে নয়, সাধারণ দীর্ঘ ফোক্যাল দূরত্ব সম্পন্ন লেন্সের দ্বারা। ফটোগ্রাফার মাত্রেই জানেন যে টেলিফটো লেন্সে—তা যত উৎকৃষ্টই

হয়েক—ছবি ততখানি স্পষ্ট ওঠে না যতখানি ওঠে সাধারণ লেন্সে। সেই কারণে জণ্ড্-৬ মহাব্যোমযানের ক্যামেরা টেলিফটো লেন্সযুক্ত ছিল না। পৃথিবীর দিন ও রাত্রির ব্যবধান রেখার (টার্মিনেটার) ছবি যখন তোলা হয় তখন জণ্ড-৬, ৪৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা বা মধ্যরেখার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। একমাত্র ১২৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার উপকূল তখন সেখানে মেঘ না থাকার দরুন জণ্ড-৬-এর ক্যামেরায় প্রতিফলিত হয়েছিল। পৃথিবীর বাকি সবটুকুই ঢাকা ছিল মেঘে।

আর একটি ছবি উঠেছে চাঁদের সেই অঞ্চলের যেখানে রয়েছে প্রায় ১০০ কিলোমিটার চওড়া যুগ্ম-গহবর—"ভাভিলফ ব্রাদার্স" (দুজন প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানাচার্য—একজন পদার্থ বিজ্ঞানী, অন্যজন জীবশাস্ত্রী। প্রথমোক্ত বিজ্ঞানী সার্গেই ভাভিলফ জীবনের অন্তিম পর্যন্ত সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সভাপতি ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর ঐ পদ লাভ করেন রসায়নের বিজ্ঞানাচার্য আলেকজান্দার নেস্মেইয়ানফ। বর্তমানে সভাপতি হচ্ছেন মৃতিস্লাভ কেল্দিশ)। ছবিতে গহবরটি কি রকম খাড়া এবং তার তলদেশ কি রকম ঢেউ-খেলানো তা বেশ বোঝা যায়। এ ছাড়াও লাভেল্ (ব্রিটিশ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক স্যার বার্নার্ড লাভেলের নামে), ফট্ভো, ভ্যার্নগিউ প্রভৃতি আরো বহু ছোটখাটো গহবর ও অসমতল জায়গার ফটো তোলা হয়েছে যেগুলি প্রস্থে ২০০ মিটারের বেশি নয়।

জণ্ড-৫ ও জণ্ড-৬ স্বয়ংচালিত মহাশূন্যে যান দুদিকে গ্রহ-গ্রহান্তর-কেন্দ্রিক কক্ষ পথে পাঠিয়ে আবার পৃথিবীতে ফেরত নিয়ে আসায় সম্পূর্ণ সাফল্যলাভের দরুন, গ্রহ-নক্ষত্র পরীক্ষার জন্য ফটোগ্রাফির সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হয়েছে সন্দেহ নেই। সেই সব ফটোগ্রাফের মধ্যেই মজুত থাকবে সমস্ত তথ্য, যে কোন সময় ব্যবহারের জন্য।

এই প্রসঙ্গে যে ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে এই যে, সবার সেরা টেলিভিশন ব্যবস্থা কালো এবং সাদা রঙের ব্যবধায়ক অংশটিকে বর্ণদীপ্তির বড়জোর ১২টি মাত্রায় (টোন্) ক্রমান্বয়ে বিভক্ত করে তার প্রতিকৃতি পাঠাতে পারে। ১২টির চেয়ে বেশী ক্রমায়ন (আলোকের ঘনত্ব অনুসারে গ্রেডেশন্) তার পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু সাধারণ ফটোগ্রাফ, মানুষের চোখের সমস্ত কিছু দেখবার যে সুযোগ সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে যার দরুন সাধারণ অবস্থায় সেটি ৬০টি এবং অন্য যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করলে ১০০টি পর্যন্ত ক্রমায়ন রেকর্ড করতে পারে। টেলিফটোয় ১ মিলিমিটার চওড়া জায়গা প্রতিকৃতি হিসাবে ৩ জোড়া থেকে ৫ জোড়া অবধি কালো এবং সাদা রেখা পাঠায়। ঐ যন্ত্রের লেন্সের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা হচ্ছে প্রতিমিলিমিটারে ৩টি থেকে ৫টি রেখা পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণ ফটোগ্রাফ বা সিনেমাটোগ্রাফ তার চেয়ে ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি শক্তি রাখে। তাছাড়া টেলিফটোয় তোলা ছবিতে যে জ্যামিতিক আকারবিকৃতি ঘটে সাধারণ লেন্সে বিকৃতি হয় তার চেয়ে অনেক কম। গ্রহ-উপগ্রহের ছবি তোলার সময় ক্যামেরা অসীমে ফোকাস করা থাকে। ছবি তোলাটা স্বয়ংচালিত। বেগ, ছবি তোলার মান (স্কেল্) এবং লেন্স খোলা রাখার মেয়াদ (এক্সপোজার)—এই তিনটি ব্যাপারে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক জণ্ড্ ও চাঁদ চলন্ত থাকলেও ছবির কোন বিকৃতি ঘটতে দেয় না। তাছাড়া যন্ত্রপাতি কামরায় তাপ ও চাপ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা হয় এবং সেটিকে কাঁপতে দেওয়া হয় না যা সাধারণ এরোপ্লেনের পক্ষে সম্ভব নয়। শেষত, মহাশূন্যে ক্যামেরা কাজ করে ভারশূন্য অবস্থায়। তোলা ছবিগুলিরই হচ্ছে মানচিত্র রচনার প্রধান উপায় উপকরণ কারণ সেগুলি সরেজমিন থেকে তাজা (ফার্স্ট-হ্যান্ড) তথ্য।

গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে ফেরার পথে কোন মহাব্যোমযান যখন পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পৌঁছায় তখন তার বেগ হয় নিষ্ক্রমণ বেগ অর্থাৎ সেকেন্ডে ১১·২ কিলোমিটার। জণ্ড-৫ এই সমস্যার প্রথম সমাধান করে। কিন্তু জণ্ড্-৬ বায়ু গতিচালিত লিফ্টের সাহায্যে ঐ বেগ মন্দীভূত করে নির্ধারিত স্থানে নেমেছে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ধরবে ঠিক করেছিল। ঘাটের সিঁড়ির একটু গাঁথতে গিয়ে অসময়ে বৃষ্টি নামল। কাজ পিছিয়ে গেল। নইলে কবে গৃহপ্রবেশ হয়ে যেত। মা অনায়াসে এ বাড়ি দেখে যেতে পারত।

বাবু বলল 'যদি একটা বছরও এখানে থাকতেন। খেতে, হাঁটা চলা করে বাড়িটা পুরনো করে দিয়ে মরলে আমাদের কোন দুঃখ থাকত না।'

ইঁটের কামড় বড় কামড়। [illegible] করলে, মাটি খোঁড়ালে, ইঁট বসালে একজনকে না একজনকে টানে [illegible]। [illegible] মায়ের ওপর দিয়েই তা গেল। শেষকালে তুমি সবাইকে ফাঁকি দিলে মা।

ট্রেন সবে শিয়ালদা ছাড়িয়ে গেল। কুবের [illegible] করতে লাগল। [illegible] দেখা হয়েছে। নগেনের [illegible] জন্মদিনের [illegible] দিন [illegible] তারিখ [illegible] ঠিক।

[illegible] মা বড়দার ওখানে গিয়ে [illegible]। [illegible] পার্টনার [illegible] থেকে [illegible] কোয়ার্টারের [illegible] ছিল। [illegible] কিছু টাকা বাকি ছিল। [illegible] টাকা আটকানো। কতকাল [illegible] —[illegible]। সে সময় [illegible] থেকে [illegible] কলমপুরে [illegible] নিয়ে যাওয়ার জন্য [illegible] টাকা দিতে এসেছি। বাবু [illegible] কড়া নাড়ার [illegible]।

[illegible]—কুবের [illegible]

'[illegible]।'

'[illegible] এসেছে?'

'[illegible] তুমি [illegible] আমি না থাকলে সবকিছু এ-বাড়িতে রেখে আসে না ঠিক মত।'

'ভেতরে এসে বস।'

কুবের জানতো, মা যেখানেই থাক—যত আনন্দেই থাকুক, স্বামীর পিতৃপুরুষের বসতবাড়ির এই আড়াইখানা ভাগের ঘরে তার মন সব সময় পড়ে থাকে।

ভোর বেরিয়েছে। কচি মেয়ে ঘুমোবার [illegible]। দেখা তাই আগাম ঘুমোচ্ছিল। কুবের জল ভরে নিল কুঁজো থেকে।

'তোর বাড়ির কদ্দূর?'

সময়টা কদিন খারাপ যাচ্ছিল তখন।

সে সব না বলে সব কিছু ফাইন চলছে—এমন একটা ছবি তুলে ধরেছিল কুবের দি ড্রিম মারচেণ্ট—ড্রিম সেলার। সে সব শুনে মার যে কি তৃপ্তি।

সিরি পাওয়া গেল না। ঘণ্টা চারেক পরে বাড়ি ফিরে দেখল, মা নেই। সন্ধ্যের ট্রেনে বড়দার ওখানে ফিরে গেছে। বউমাদেরই একজন গম্ভীর হয়ে ঘর গুছোচ্ছে। বাবু তখনও বিড়ে পাকিয়ে খাটে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একদম অ্যাডভান্সড স্টেজ।

টাটে সন্ধ্যে হলেই ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হত—সে-বাড়ির বউ হয়ে এসে ইস্তক মা পুরনো যা-কিছু, গৌরবের যা-কিছু সবই আঁকড়ে ধরতে চাইতো প্রাণপণে।

তারপর আর মার সঙ্গে দেখা হয়নি কুবেরের। গৃহপ্রবেশের দিন মা না আসাতে কুবেরের খুব মন খারাপ হয়েছিল। মাছ কুটতে দেরি, ডাল সেদ্ধ হচ্ছে না, কলাপাতাগুলো শুকনো—এ সব হতেই পারত না, মা থাকলে। কেন যে এল

ইঁটের কামড় বড় কামড়
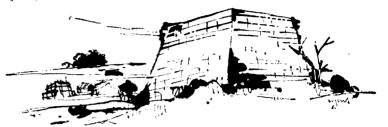
কাউকেই তাই ব্যাপারটা কি—জানতে চাইতে পারল না।

নগেনের মেয়ের জন্মদিনের দু' দিন আগে সব কেনাকাটা করতে হল। পরশু জন্মদিন। কিছু ধুমধাম ছিল। আগাম কাজ সেরে রাখল কুবের। কেননা জন্মদিনের দিন একটা সাত বিঘের জলকর ইজারা নেওয়ার কথা ছিল। সেদিনই সই-সাবুদের দিন ছিল। তাই আগেভাগে কাজ সেরে রাখতে হয়। সেদিন মা ছিল। কুবের যে নগেনের মেয়ের জন্মদিনের ফ্রকট্রক কিনতে গিয়ে সবাইকে সুখী করার জন্যে খাওয়া দাওয়া হইচই লাগিয়ে দিয়েছিল, তাতেই মা খুশী, বাবু খুশী, [illegible]—[illegible] পায়ের [illegible] খুলে ফেলল, [illegible] চালিয়ে দিতে বলল। [illegible] সধবা [illegible] বউ। একেবারে মায়ের [illegible]

না। এমন শরীর খারাপ ছিল—বিছানায় উঠে বসতে পারেনি। উঃ! যদি বুদ্ধি করে একখানা মোটর ভাড়া করে নিজে গিয়ে কুবের মাকে নিয়ে আসত।

সেদিন নতুন বাড়িতে হইচই—সবকিছুর মধ্যে কুবেরের বার বার মনে হয়েছিল, যে থাকলে সব চেয়ে খুশী হত—সে-ই আসেনি, আসতে পারেনি। মা যা কল্পনা-প্রবণ—হয়ত ফাঁকা কোয়ার্টারের ঘরে বসে বসেই চোখের সামনে এ-সব দেখতে পেয়েছিল। সেদিন কলমপুরে থাকলে মা যা গুছিয়ে বাঁধাতো—এটা হয়নি কেন? ওটা ওরকম কেন? কত কি! তবু, তবু ভাল লাগত কুবেরের।

পরদিন বাবুর একখানা চিঠি লিখেছিল। হুবহু মনে নেই তবে মোট কথা, তুমি না থাকাতে সবকিছু ফাঁকা লেগেছে।

ওই দিন তোমারই সব চেয়ে ভাল লাগত। মা কি তার চিঠি পায়নি। পেলে একটা জবাব দিত নিশ্চয়।

কুবেররা পৌঁছতেই শ্মশানে রওনা হল সবাই। ইলেকট্রিক চুল্লো খারাপ হয়ে আছে। বেদি করা উঁচু জায়গায় পোড়াতে দশ টাকা বেশি নিল। গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়ে নাইকুণ্ডুলি জলে ফেলতে ফেলতে তিনটে বেজে গেল। আগুনের ভেতর থেকে বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে শেষে নাইকুণ্ডুলি পাওয়া গেল। ছাই, পোড়া পোড়া চর্বির গাদ—তার ভেতরে ভস্ম মেখে পড়ে ছিল।

কুবের কদমপুর থেকে যাতায়াত করে সালকের বাড়িতে হবিষ্যি করল চারদিন। ঠিক হল শ্রাদ্ধের পরই লরিতে করে মাল-পত্র নিয়ে নগেন, বীরেন, দেবেন্দ্রলাল—সবাইকে পাকাপাকি কদমপুরের বাড়িতে নিয়ে যাবে। সঙ্গে বংশের নারায়ণ শিলাও যাবে। রাস্তা বাড়বে বলে বাড়িভাঙার নোটিসও পড়ে গেছে এদিকে। সালকেও নতুন হচ্ছে।

লরি ঠিক। রোজানা দুধ ঠিক হয়ে গেল নগেনের মেয়ের জন্যে। চারদিনের দিন হবিষ্যিতে বসে নগেন বোমাটা ফাটালো, 'আমরা যাব না সেজদা।'

কুবের আগেই কিছু আশংকা করেছিল। মেধাকে জিজ্ঞাসা করেছে কুবের, 'ওখানে থাকতে তোমাদের অসুবিধে হবে?'

'অসুবিধে কি? আপনার ভাই থাকলেই আমরা থাকব।'

বীরেনকে জিজ্ঞাসা করেছে, ডলিকে জিজ্ঞাসা করেছে কুবের। এমন করুণভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে জানলে কুবের চাউস করে বাড়ি বানাতো না। মা গেল না। বাবার শরীর ভাল নয় বলে বড়দা বড়বউদি দেবেন্দ্রলালকে কলকাতার বাইরে যেতে দেবে না। তাহলে বীরেন চলুক, নগেন চলুক অন্তত।

কিন্তু ডলিও যে সেই একই কথা বলে, 'আপনার ভাই গেলেই আমরাও যাব।'

হবিষ্যির সময় কথা বলতে নেই। এ সব জানলে কুবের সাধ করে বস্তা বস্তা সিমেণ্ট, ঢেলে পেল্লায় বাড়ি ফেঁদে বসত না। দশা-সই দিঘি কাটাতো না। একখানা একতলা বাড়ির ইট, সিমেণ্ট, বালি খরচা করে ঘাট বানাতো না। শুধু বুলু আর সে—এই কজনার জন্য এত টাকা মাঠের মধ্যে ঢেলে দিত না। এত সবের পর এখন তোমরা এই পায়রার খোপে বসে বকবকম করে কী সুখ পাবে। একটা নিদারুণ কষ্ট—তা হরফে লিখে ফোটানো যায় না—কুবেরের দুই ভুরু মাঝখানে এসে নাক চোখ লাল করে দিল। কথা বাড়াল না কুবের।

বউমাদের একজনের বাড়ির জানলায় দাঁড়ালে কচুরিপানা ঢাকা পুকুর দেখা যায়। বর্ষাকালে সে-বাড়ি যেতে জলে কাদায় রাস্তা একসা হয়ে থাকে। আরেকজনের বাড়িও হাঁটু অবধি কাপড় তুলে এগোতে হয়। ভাড়ার ফালি ফালি ঘর। কী সুখে এরা এখানে পড়ে থাকতে চায়। নগেন-বীরেনের কোন অসুবিধেই হত না কদম-পুর থেকে অফিস করতে।

পরদিন একা একাই হবিষ্যি করল কদমপুরের ফাঁকা বাড়িতে। বুলু স্বামীর মনের অবস্থা বুঝে চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছিল। আজ থেকে কারো জেসে উঠলো নিয়াতি দাবড়ি খেত। ছেলেটা শুধু বক বক করে যাচ্ছে। পুকুরে ঢিল ছুঁড়ছে। দেবেন্দ্রলাল ওর নাম রাখতে চেয়েছিল সুচন্দর।

পিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। মা জবাব দিয়েছে। নতুন লোক বলে ঠিকানার চিঠি পৌঁছতে এই দেরি। এর আগে মরা লোকের চিঠি পায়নি কোনদিন কুবের। বানানো ঘাটের চত্বরে কাঠের আসনে বসেছে। আচড়ানো খামের কিছু ছিটকে এসে পড়ছে। সেগুলো পাখিরা কুবেরের ভয়ে দূরে সাবধানে খুঁটে খাচ্ছিল। খামের ওপর চেনা হাতের লেখা। চিঠিখানা খুলে ফেলল—

কল্যাণবর,

বাবা কুবের। আমি এই শনিবার তোমার ওখানে যাইব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু ৫।৬ দিন জ্বরে ভুগিয়া বড় দুর্বল হইয়াছি। ডান হাঁটুতে ভীষণ ব্যথা। শরীর বড় দুর্বল হইয়াছে। তোমার বাড়ি দেখার জন্যও আমার মন বড় অস্থির হইয়াছে। এবার সালকিয়ার বাসার থেকে এত মনঃ-কষ্ট পাইয়া আসিয়াছি। আর সালকিয়া যাইব না। এবার তোমার নূতন বাড়িতে গিয়া লক্ষ্মীপূজা করিব। আমি একটু সুস্থ হইলেই তোমার ওখানে যাইব।

আমার যাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু আমার জন্য হয়ত তোমাদের বিব্রত হইতে হইবে। এই জন্য চিন্তা করি। যাক যদি সম্ভব হয় তোমার বাবাকে নিয়া যাইও। তোমাদের বড়দা আমাকে ওষুধ আনিয়া দিয়াছে।

সন্তিধর ও কুসুমসখি কেমন আছে? তাহাদের আমার শত চুমু দিও। বলু ও তুমি আমার আশীর্বাদ নিও। তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি।

আঃ মা

মহাগুরু নিপাত। গুরুদশার কাছা যে কতকাল কুবেরের গলায় আছে! চিঠিখানা মুড়ে হাতে নিল। বলু লম্বা চাতালে বসে লোক দিয়ে শ্রাদ্ধের চাল ঝাড়িয়ে নিচ্ছিল। কুড়ো তুলে রাখা হচ্ছে। হাঁস খাবে। চিটে ধান নতুন বসানো সুপুরি নারকেল চারার গোড়ায় ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মা দেখলে কি যে খুশী হত।

নতুন কাটা পুকুরে মোচা চিংড়ি ফেলা হয়েছিল। মাছওয়ালা জানতে এসেছে, বড় সাইজের চারা মাছ ছিল—ফেলে দিয়ে যাবে নাকি। কুবের মাথা নেড়ে দিল। এখন কিছু দরকার নেই। এত কাজের মধ্যেও মা কুবেরের মেয়ের নাম রেখে বসে আছে—কুসুম।

খুব ক্ষিধের মাথায় ভাত খেয়ে কুবের আর নড়তে পারে না। হাত পা অবশ হয়ে যায়। আজ ক'বছর দিন নেই, দুপুর নেই কুবের মাঠে ঘাটে হরদম ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও বসেনি। এবার কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেল কুবের, আর দৌড়ঝাঁপ করতে পারবে না সে। সেরকম দৌড়োনোর আর মানে পাচ্ছে না কুবের। কি দরকার। এখন এই ছাব্বিশ হাজার টাকা ধসানো পুকুর, জলের ধার, বাঁধানো ঘাট ফেলে তাকে যেতেই হবে একদিন।

এতদিনকার ভাবনা চিন্তা, উদয়াস্ত পরিশ্রম সব জলে গেল। কুবের কোন দিন নিজের জন্যে এত সব করতে চায়নি। তার বিশেষ কিছু দরকারও হয় না। দীর্ঘদিন বেকার থাকার পর এমন একটা সাশ্রয় মেথডে চলবার অভ্যেস হয়ে গেছে—ইচ্ছে করলেই কলের জল খেয়ে তিন দিন কাটিয়ে দিতে পারে। কতরকম স্বপ্ন ছিল। মা আসবে, বাবা আসবে—রেশনে লাইন দেওয়ার চিন্তা থাকবে না। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ—মাঠের সবজি—সব কিছু কুবের গুছিয়ে আনছিল। হরিরাম সাধুখাঁর ভদ্রাসন থেকে বেরিয়ে এলেই সবার হাতের সামনে কুবের এসব এগিয়ে দিত।

এখন এতসব দিয়ে কি হবে। কার কাজে লাগবে। ছেলে, মেয়ে, বলু, কুবের আর বাড়ির লোকজন মিলিয়ে ফেলে ছড়িয়ে সব শেষ করা যাবে না। অথচ মা থাকলে যে কী সুখী হত—কী খুশী হত। মা হাতে ধরে কাউকে কোন একটা জিনিস তুলে দিলে বাড়ির বউদের কিছুই বলার থাকত না।

ঘাটে বসেই কুবের কেষ্টবাবুর আবাদ, নবীনবাবুর আবাদ মাড়ানো কোমপানির ভেড়ির উঁচু পিঠ দেখতে পাচ্ছিল। কোথায় আকাশের অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেছে। সেখানে তাকিয়ে কুবেরের বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল। এক দমকে সব মনে পড়ে গেল। মা তুমি কত অল্পে সুখী হতে। একবার ছোটবেলায় আমি সস্তায় অনেক মুড়ি কিনে

বলু—তার ওয়াইফ, তার সঙ্গে কুবেরের লাইফের হাফটাইমের পর থেকে দেখা হয়েছে

ফেলেছিলাম। তুমি নিজের হাতে টিনে ভরে টট সাজিয়ে খাটের নীচে গুছিয়ে রেখেছিলে। কত যত্ন। অনেক দিন ধরে আমরা সেই মুড়ি খাই।

বলুকে আস্তে ডাকল। ক'দিনে বলুও অনেকখানি শুকিয়ে গেছে। কদমপুর চলে আসার সময় একটা পুরনো ট্রাংকের সঙ্গে মার কিছু কাঁথা, দুটো বাঁধানো মাসিক-পত্রিকা আর কিছু কাগজপত্র চলে এসেছে। পরশু বলু তার ভেতরে মার একখানা অগোছালো ডাইরি পেয়েছে। হাতের চিঠি-খানা কুবের বলুকে দিয়ে ডাইরিখানা আনতে বলল। বলু খোলা চিঠিখানা পড়ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কুবের বলল, 'আগে ডাইরিটা নিয়ে এস—।' বলু ডাইরি আনতে যেতেই কুবেরের কাছে ফট করে একটা সত্য কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। বলু—তার ওয়াইফ, তার সঙ্গে কুবেরের লাইফের হাফটাইমের পর থেকে দেখা হয়েছে। মা সেই হাফটাইমের আগের কথা লিখেছে। কুবেরের ওপরে এক ভাই ছিল। সে মরে গেলে বোধ হয় মা কী খেয়াল হতে এসব কথা লিখেছিল। বলু ডাইরিটা দিল।

শ্রীগোপাল আয়রন ওয়ারকস সন উনিশ শো পঞ্চাশে একখানা প্রেজেন্টেশন ডাইরি বাজারে ছেড়েছিল। তারই পাতায় পেছনে পেছনে মা লিখেছে—

বহু দিন প্রায় সাতাশ বছর পরে ডাইরি লিখিতে বসিলাম। দীর্ঘ সাতাশ বছরে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে আমার জীবনে। শুধু আমার জীবনে কেন, সমগ্র জাতির জীবনে। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে। স্বাধীনতা আসিয়াছে। কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনা হীন জীবনে এই মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করিতে পারি না। নিজের দুঃখ যখন অসহ্য হয়—সর্বদা মৃত্যু চিন্তা মনকে অধিকার করে। অধরকে ছাড়িয়ে বাঁচিয়া থাকা নিজের কাছে নিজের আশ্চর্য মনে হয়। এই তো মানুষের জীবন। কত ক্ষণস্থায়ী—তবু এর জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষের অন্ত নেই। কিন্তু এক মুহূর্তে ইহা শেষ হইয়া গেল। আরও কতকাল বাঁচিয়া থাকিব জানি না। যে জীবন বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বাস্থ্যরূপে এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল—যাহা সর্বদা নিজের কৃতিত্ব মনে করিয়া গর্বিত হইতাম—এক মুহূর্তের ভিতর তাহা ফুরাইয়া গেল। কিছুতেই তাই বিশ্বাস করিতে পারি না। সত্যি ভগবান আছেন কি না—তাহাকে পাওয়া যায় কি না। যদি তিনিই নিয়া থাকেন, কেন নিলেন? কি অপরাধে নিলেন? কিছুই নাকি নষ্ট হয় না। তবে সেই অবিনশ্বর আত্মা কোথায় আছে? যদি এই মহাবায়ুতে মিলাইয়া থাকে তবে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে পাই না কেন? যন্ত্রণার বুক ফাটিয়া যায় কেন? যদি ভগবান ন্যায় বিচারক হইয়া থাকেন তবে এ আঘাত আমার ন্যায্য প্রাপ্যই ছিল—এ বিশ্বাস মনে স্থান পায় না কেন?

কতবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি। পরমহংস-দেবের জীবনে মা কালীর দর্শন প্রাপ্তি আমার মনে আশ্চর্য বিস্ময় জাগায়। তিনি নাকি বহু বার কালীর দর্শন পাইয়াছেন। তাই দক্ষিণেশ্বর আমার এত ভাল লাগে। পঞ্চবটীর সাধনঘর আমার ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় সব ছাড়িয়া এই পঞ্চবটীর তলায় থাকিতে পারিতাম, তবে হয়ত মনে শান্তি পাইতাম।

মনের ভিতর জলস্রোতের মত চিন্তা-স্রোত আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কত দিনের কত কথা। কত ব্যথা দিয়াছি। ভাল জামা কাপড় দিতে পারি নাই।...'

কুবের আর পড়তে পারল না। খাতা বন্ধ করে দিল। তার নিজের ছেলে নতুন বসানো ফুল ফুলের গাছটার গোড়ায় একটা বেড়াল ছানার গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধছে। বকতে গেল। পারল না। একবার সেই মৃত দাদার কথা মনে করার চেষ্টা করল। তাও পারল না। সব ভুলে যাচ্ছে। পরিষ্কার রোদ্দুরে তার হাতের আঙুলের কালো কালো দাগ-গুলো শুধু চোখের সামনে ভয়ংকরভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ক্রমশ

ধূমপানের আনন্দের জন্যে পানামা...
একটি পানামা ধরিয়ে দেখুন। একেবারে প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাকের চমৎকার টাটকা স্বাদগন্ধ। তারপর টানের পর টান আয়েসের সঙ্গে টেনে চলুন। একেবারে শেষ টান পর্য্যন্ত পানামা আপনাকে দেবে ধূমপানের অপূর্ব আনন্দ।
Panama
20
CIGARETTES
GT (P)-675 Ben. Greens Advg.
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
বোম্বাই—৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

কলকাতা কলকাতা

নু্যইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ভারতবর্ষ প্রতিনিধি জোসেফ লেলিভেল্ড কলকাতা শহর বিষয়ে "ইম্প্রিণ্ট" নামক পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন; আমার এক মার্কিন বন্ধু সেই সংখ্যাটি ডাকে পাঠিয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন লেলিভেল্ডের বক্তব্যর যাথার্থ্য বিষয়ে। তাকে এখনো চিঠি লেখা হয়নি আমার, কিন্তু রচনাটি দু'তিনবার পড়লাম এই নিয়ে, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল হালখাতার পরিসরে পুরোটাই অনুবাদ করে দিই। এমন চমৎকার এবং সঠিক তথ্যমূলক আলোচনা এই শহর নিয়ে সম্প্রতি হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। প্রবন্ধটি অবশ্যই অত্যন্ত প্রীতিসঞ্চারী মন্তব্যে পল্লবিত নয়, নেই কলকাতা বা তার অধিবাসীদের প্রতি কোনো স্তুতি, প্রবন্ধটি একটি কঠোর সমালোচনা আমাদের, তথ্য এবং সত্যের উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ অবস্থার পর্যালোচনা।

ভারতবর্ষের বৃহত্তম এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এই শহর কলকাতা এখন মৃতপ্রায়, ধ্বংসের পথে যেতে বসেছে, কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, এই তিল তিল মৃত্যু কলকাতাবাসী চোখের ওপর দেখেও শহরকে বাঁচাবার জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন না। কলকাতা শহর এক ব্যাধিতে মৃতপ্রায় নয়—বিশেষজ্ঞদের মতে অদূর ভবিষ্যতে শহরের জল, পয়ঃপ্রণালী এবং যানবাহনের এমন অবস্থা আসবে যখন কাতারে কাতারে লোক, যেমন প্লেগ বা কলেরার মহামারী হলে গ্রাম ত্যাগ করে, সেভাবে এই শহরকে পরিহার করতে বাধ্য হবে। আজ থেকে বিশ বছর পরে আজ যেখানে শহরের জনসংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষ তা বেড়ে হবে এক কোটি বিশ লক্ষ, কিন্তু বসবাসের ব্যবস্থা এ মুহূর্তে যে ন্যক্কারজনক অবস্থায় রয়েছে তার বিন্দুমাত্র উন্নতি তো আশা করা যায়ই না বরঞ্চ অবনতির আশঙ্কাই বেশি। ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিলেও, এ মুহূর্তে কলকাতা যে অবস্থায় রয়েছে সে রকম অবস্থায় পৃথিবীর আর কোনো শহর যে শুধু নেইই তা শুধু নয়, শত অভাব সত্ত্বেও এমন অবস্থায় কোনো শহর একটা সভ্য দেশে পৌঁছতে পারে তা কল্পনাতীত। আমরা বিদেশীদের কাছে গর্ব করি এই বলে যে রাজনৈতিক—সাংস্কৃতিক—সমাজতাত্ত্বিক সচেতনতা এই শহরবাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্যমান, কিন্তু যে শহরে চেতনা, উদ্দীপনা এবং শিক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্য যে কোনো শহরের তুলনায় এত বেশি ব্যাপ্ত সে শহরের এমন হাল হ'ল কেন সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে নিজেদের ঘাড়েই দোষ এসে পড়ে। কলকাতার বয়স দু'শো আশি বছর হ'ল, কিন্তু এই প্রায় তিনশত বছরের ইতিহাসে কলকাতাবাসী নিজের শহরের উন্নতিসাধনের দিকে কখনো কি মন দিয়েছে? আমরা মাথা ঘামাই ন্যুইয়র্ক, পিকিং, মস্কো, লণ্ডন এইসব নিয়ে; আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা ছুটে যান এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ঝগড়া মেটাতে; কম্যুনিস্টরা খোঁজে ঠিক তেমন একটি পাহাড় ও গুহা যেমনটিতে মাও তাঁর বিপ্লবীদের নিয়ে লুকিয়েছিলেন; আলোচনা করি ন্যুইয়র্ক শহরের ট্র্যাফিক সমস্যা নিয়ে—কিন্তু আমরা একবারও ভাবি না যে-শহরে বাস করছি তার কী হাল হতে চলেছে, ভাবি না কী অকথ্য অবস্থায় বস্তিতে মানুষ আস্তাকুড়ের শুয়োরের মত বাস করছে, নর্দমাগুলো কীভাবে আটকে ক্রমশ উঠে আসছে ঘরের মেঝেতে, পাইপ ফেটে পানীয় জল হয়ে উঠছে দূষিত, বস্তির এমন অবস্থা যে কাতারে কাতারে লোক পরিবার নিয়ে রাস্তায় বাস করা অধিক শ্রেয় বলে মনে করছে।

কিন্তু শহরের এই হাহাকার আমাদের উচ্চ মধ্যবিত্ত প্রাইভেট কোম্পানির বড় সাহেবদের ছোঁয় না। "No Indians allowed" লেখা ক্লাবগুলোতে অবশেষে স্বাধীনতার পর বাঙালীদের সভ্য করা হচ্ছে, কোম্পানির বাঙালী বড়বাবুরা গত কুড়ি বছর সাহেবদের ক্লাবগুলোতে ঢোকবার এই ছাড়পত্র আদায়েই ব্যস্ত ছিলেন, পারিপার্শ্বের দিকে তাকাবার সময় হয়নি। এই ছাড়পত্র পাবার পর তাদের জীবন পার্টের সায়েবের অফিস-বাড়ি-ক্লাবেই সীমাবদ্ধ, যে শহরে বাস করছেন তার দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। সাধারণ

কেরানীর চোখে অপিসগুলোতে ১৯৪৭-এর পর বড় সাহেবদের গায়ের রঙ ছাড়া আর' কিছুই পরিবর্তন হল' না।

যে শহরে ছ' হাজারের ওপর ভিখারি, বহু হাজার লোক যারা ঘুটে দিয়ে দিনে দু' টাকা উপার্জন করে চারজনের পরিবার চালায়, যা শহরের অবস্থার তুলনায় ভালো উপার্জন, যে শহরে মানুষ গ্রীষ্মের খর তাপে গলা পিচের ওপর দিয়ে খালি পায়ে মালভর্তি ঠেলাগাড়ি টেনে নিয়ে যায় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দুই কি তিন টাকার জন্য, যে শহরে উপার্জনকারী মেয়েদের দুই তৃতীয়াংশের উপায় দেহ বিক্রি যে শহরে গড়ে প্রতিদিন একজন মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে, যে শহরে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছ' জনের পরিবারের থাকবার পরিসর গড়ে ১২ ফুট/১০ ফুট, সেই শহরেই পাশাপাশি আবার দেখি বড়-লোকদের প্রমোদের জন্য একর-একর জমি নষ্ট হচ্ছে, প'ড়ে রয়েছে। রাজা সুবোধ মল্লিক রোড দিয়ে পাঁচ নম্বর বাসে যেতে-যেতে আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করি মানুষ কীভাবে কলোনিগুলোতে বাস করে, অথচ এরই অনতিদূরে কতিপয় ভুঁড়িওয়ালা

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন

সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান শেষ হল। এবারকার অর্থনৈতিক সম্মেলনে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাও আলোচনার অন্তর্গত ছিল। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক জে কে মেহতা, এবং সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। মোরারজী দেশাই তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, তিনি ভারতের সুদিনের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সম্পদ সংগ্রহ করার বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও তিনি আলোচনা করেন। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য সম্পদ সংগ্রহ কিভাবে সার্থক করা যায় সে সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন পরিকল্পনা কমিশনের উপ-সভাপতি অধ্যাপক ডি আর গাডগিল। গ্রামাঞ্চলে যে উদ্বৃত্ত আয়ের সৃষ্টি হয়েছে তার একটি বড় অংশ পরিকল্পনার কাজে লাগানোর সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। অধিকাংশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ যে কৃষি-আয়কর ধার্য করার বিপক্ষে তিনি তারও উল্লেখ করেন। তবে অধ্যাপক গাডগিলের মতে দীর্ঘমেয়াদী গ্রামীণ ঋণ-পত্র চালু করে কিছু পরিমাণে গ্রামীণ সম্পদ ও উদ্বৃত্ত সংগৃহীত করা সম্ভব। "অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়" সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডি আর গাডগিল এবং অধ্যাপক এ কে দাশগুপ্ত। অধ্যাপক দাশগুপ্ত মনে করেন, একটি সুনির্দিষ্ট কর্মনিয়োগ নীতি কার্যকর না করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না এবং এজন্য বিনিয়োগ-নীতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা দরকার। অধ্যাপক গাডগিল আঞ্চলিক ভিত্তিতে সুষম উন্নয়ন করার পথে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার গভর্নর শ্রী এল কে ঝা শিল্পোন্নয়নে ব্যাংকগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর অধ্যাপক জে জে আঞ্জারিয়া 'পরিকল্পনা কাঠামো' নিয়ে আলোচনা করেন। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক নীতির কতিপয় পরিবর্তনের জন্য তিনি সুপারিশ করেন। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যনীতি এবং সংগঠন ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপরে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। আগেকার দুটি পরিকল্পনার সময়ে নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ও করা উচিত হবে না বলে অধ্যাপক আঞ্জারিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই এ জি রবিনসন অনুন্নত দেশে আধুনিক অর্থশাস্ত্র অনুশীলন করার পথে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে গভীর গবেষণা করার আগ্রহ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রকাশ করার আগ্রহ সঞ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র অনুশীলনের সম্প্রসারণ হবে না।

অর্থনৈতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ অন্য যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন সেগুলি হচ্ছে (১) উন্নতিকামী দেশে ব্যাংক-ব্যবস্থার ভূমিকা, (২) দাদাভাই নৌরজী ও তাঁর ড্রেন থিয়োরী এবং (৩) মূল্যস্তর ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। সমবায়-ব্যাংক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে খাপ খাইয়ে ব্যাংক ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ করা,—প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিগত দিনের দেশনেতা দাদাভাই নৌরজীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার জন্য তাঁর 'ড্রেন থিয়োরী' নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজ আমলে ভারত থেকে Home charges বাবদ যে বিরাট পরিমাণ টাকা বাইরে চলে যেত এবং তার ফলে ভারত যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হত দাদাভাই নৌরজী তা দেখিয়েছিলেন। সম্মেলনের আরেকটি আলোচ্য বিষয় ছিল "মূল্যস্তর ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন"।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী বিনিয়োগ

সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কত হবে তা ঠিক করেছেন। স্থির হয়েছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ১৬,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করবেন ৮,৩০০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি খরচ করবেন ৩,৫০০ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মোট ৩,৫০০ কোটি টাকা সাহায্য পাবে। স্থির হয়েছে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ঘাটতির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার বেশী করা উচিত হবে না। [illegible] পরিমাণ চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় কতটা হবে তার সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কত হবে তাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। বর্তমান পরিকল্পনাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এগুলির মাধ্যমেই চতুর্থ পরিকল্পনাকে [illegible] করা হবে বলে পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেছেন।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে বলে স্থির হয়েছে। তবে পরিকল্পনার অন্যান্য দিকগুলিকে উপেক্ষা করা হবে না। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এদেশে বিদেশী কোম্পানীর উপর কড়াকড়ি হ্রাস করা হয়েছে। বৈদেশিক মূলধন যে কত পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কেউ জোর দিয়ে কিছু বলতে পারছেন না। রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে।—পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে এটা খুবই আশার কথা।

সুব্রত গুপ্ত

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

ফারমাসিউটিক্যাল শিল্প—প্রথম পর্ব

১৯৪৩ সালে স্যার অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং যখন পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন আর ১৯৪৪ সালে প্রফেসর ওয়াকস্‌ম্যান দুনিয়াকে স্ট্রেপটোমাইসিন দিলেন, দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভূপেন দে তখন তাঁর ৬।২ লিণ্ডসে স্ট্রীটের ছোট্ট এক দরজার দোকানের কাউণ্টারে ধুতি শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আমাদের ওষুধ বিক্রি করতেন।

দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, যুদ্ধের বাজারে দুষ্প্রাপ্য অনেক বিদেশী ওষুধ কলকাতার আর কোনো দাওয়াইখানায় পাওয়া না গেলেও দে'জ-এর দোকানে পাওয়া যেত; দ্বিতীয়ত, ধনী দরিদ্র সব শ্রেণীর ক্রেতারাই সেখানে সমান আদর, সমান খাতির পেতেন। কারণ, ভূপেন দে এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ, যাকে বলে লাইভওয়ায়ার সেলসমেন, তাই ছিলেন। আমি তখন দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে একটা জরুরী ওষুধ আনতে গিয়ে ভামিনীমনোরঞ্জক দু' একটি প্রসাধন-সামগ্রী কিনে আনতে বাধ্য হতাম। সুপুরুষ ভূপেনবাবু হাসিমুখে কথা বলতে বলতে এমন মোহিত করে ফেলতেন যে, ডাক্তারের ওষুধের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী শখের জিনিসও কিনতে বাধ্য করতেন—সে জিনিসের দরকার থাক বা না থাক। ওষুধের বেলাতেও যদি প্রেসক্রাইব করা ওষুধটি তাঁর স্টকে না থাকতো তো তার বিকল্প ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিতেন। ব্যবস্থাপত্রের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে গেলে আমাদের ডাক্তার আপত্তি করতে পারেন শুনে নাছোড়বান্দা ভূপেন দে তৎক্ষণাৎ সেই ডাক্তারবাবুকে নিজেই ফোন করে অনুমতি আদায় করে ছাড়তেন।

অসাধারণ সেলস্‌ম্যান ভূপেন দে তাঁর প্রত্যেকটি পেটেণ্ট ওষুধের কুলমেল এবং প্রসাধনীর গোত্র-প্রবরের খবর নখদর্পণে রাখতেন। স্যার অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিলেন। সেই সময়ে এই মেধাবী ওষুধ বিক্রেতার সঙ্গে পরিচয় হতে তিনি ভূপেন দে মশায়কে বিক্রয় বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ তৈরির কাজে নামবার উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন; এবং পরবর্তীকালে ভূপেনবাবুরা যখন বড়ো কর্মসূচী নিয়ে বণ্ডেল রোডে ফ্যাক্টরী চালু করলেন তখন স্ট্রেপটোমাইসিনের আবিষ্কর্তা প্রফেসর ওয়াকস্‌ম্যান সেই ফ্যাক্টরীতে পদধূলি দিয়েছিলেন। ভূপেন দে সেদিন ক্রমবর্ধমান বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

অনেকে বলবেন যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিতে বাঙালীর কথা লিখতে গেলে সর্বাগ্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালের ইতিহাস দিয়েই আরম্ভ করা উচিত। নানা কারণে অগ্রজকে নিয়ে লেখা শুরু করা গেল না বলে উল্লেখযোগ্য মুষ্টিমেয়র মধ্যে সর্বকনিষ্ঠকে নিয়েই এই পর্ব আরম্ভ করলাম। অগ্রজদের কথা একে একে পরে বলা যাবে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে ১৮৯৩ সালে, এবং কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে পথিকৃতের সম্মান ভারতবর্ষে বাঙালীরই। কিন্তু আজ সেই ঐতিহ্য নিয়ে ঢেঁড়া পেটানোর মতো পদমর্যাদা আর আমাদের নেই। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি।

তুলনামূলক একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই আমাদের দুরবস্থাটা সহজে বোঝা যাবে। ভারতবর্ষে এখন প্রায় ১৭৫ কোটি টাকার অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বিক্রি হয়। তার মধ্যে ভিটামিন, টনিক ইত্যাদি বাদ দিয়ে মুমূর্ষুর জীবনরক্ষায় অতি প্রয়োজনীয় 'সালফা' এবং 'অ্যাণ্টি-বায়োটিক' শ্রেণীর ওষুধের শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশী তৈরি হয় মহারাষ্ট্রে। গুজরাটেও বেশ খানিকটা হয়। সেই জায়গায় বাংলা দেশে আমরা বাঙালীরা তৈরি করি শতকরা চার ভাগের মতো। আমরা আচার্য রায়ের উত্তরসাধকরা কি এর বেশী কিছু করার যোগ্য নই?

ইচ্ছে আর যথার্থ চেষ্টা থাকলে আমরা পারতাম, কিন্তু সেই উদ্যমেরই একান্ত অভাব আমাদের।

ভূপেন দে মশায়ের নেতৃত্বে দে ভ্রাতৃবৃন্দের বিষয়ে কিন্তু ওপরের মন্তব্য খাটে না। মাত্র দশ বছর আগে ১৯৫৮ সালে বড়ো স্কেলে উৎপাদন শুরু করে ১৯৬৮ সালের মধ্যে দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রাইভেট লিমিটেড এবং দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স প্রা: লিমিটেড

দেড় কোটি টাকার মূলধনে বছরে ছ' কোটি টাকার ওষুধপত্র তৈরি আর বিক্রি করছেন। উপরন্তু, তাঁরা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোল্যাবোরেশনে Dey-Se-Chem Ltd. নামে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূলধনের একটি সংস্থা গঠন করে সর্বাধুনিক যন্ত্রসংবলিত নতুন একটি ফ্যাক্টরী স্থাপনা করেছেন। এই কারখানাতে অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ তৈরির অন্যতম মৌলিক উপাদান 'ক্লোরাম্‌ফিনিকল' তৈরী হবে। সাজ-সরঞ্জাম ফিট করা প্রায় শেষ; উৎপাদন আরম্ভ হতে বেশী দেরী নেই।

এই কৃতিত্বের—বাঙালীর পক্ষে এ এক অভাবনীয় কৃতিত্ব—এই কর্মনিষ্ঠতার জন্যে দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স আজ সমস্ত বাঙালীর ধন্যবাদার্হ। কেবল দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিই নয়, দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স ১৩০০ বাঙালীর (এদের মোট কর্মিসংখ্যা ১৬০০) কর্মসংস্থান করেছেন। কর্মচারীরা ছাড়াও আর প্রায় ২০০০ বাঙালী সাপ্লায়ার আছেন যাঁদের একমাত্র উপজীব্য দে'জ-এর তিনটি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা।

ভূপেন দে নিজেও বলতে পারলেন না যে, ঠিক কবে তাঁর পূর্বপুরুষেরা বর্ধমান জেলার চকদীঘি থেকে উত্তর কলকাতার জোড়াবাগানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। দেশের বাড়িতে বড়োরকমের একটা ডাকাতি হবার পরেই তাঁরা সপরিবার চকদীঘি থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, এইটুকুই তিনি বাবা-কাকার কাছে শুনেছিলেন। পিতামহ স্বর্গীয় কালীকুমার দে কোন্ এক মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করতেন তা-ও ভূপেনবাবু জানেন না। পিতা স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ই এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যবসাতে নেমেছিলেন। ফণীন্দ্রনাথের ছোট দু'একটা ব্যবসার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার 'শিবাজী স্টীল ট্র্যাংক ফ্যাক্টরী'-র নামই উল্লেখযোগ্য।

ভূপেনবাবু মেট্রোপলিটন স্কুলের বড়োবাজার ব্রাঞ্চের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনার চেয়ে তিনি 'বায়োস্কোপ' দেখতে বেশী ভালবাসতেন। ছোটবেলায় আমরা সিনেমাকে বায়োস্কোপ বলতাম। নেশাটা তাঁর এমন ধরেছিল যে, স্কুল পালিয়ে তিনি সকালের শো-তে শক্তিমান এডি পোলো আর এলমো দি মাইটি-র সিরিয়ালে (পাঁচ ছ ঘণ্টার একটানা ২৫।৩০ রীলের তেমন ছবি আজকাল আর দেখানো হয় না) তুলকালাম ধুমধাড়াক্কা কাণ্ড, বেলা ৩টের ম্যাটিনিতে বনরাজ টার্জানের চমকপ্রদ কাহিনী এবং সন্ধ্যায় সেই নির্বাক যুগের জুলপিওয়ালা নায়ক রুডলফ ভ্যালেন্টিনো এবং তাঁর জুটি পোলা নেগ্রি কিংবা থেডা বারার রোমান্টিক ছবি দেখে বেড়াতেন। বড়ো ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস, চার্লি চ্যাপলিন, হ্যারলড লয়েড—কারও ছবিই ভূপেন দে-র বাদ পড়তো না। সে যুগের বাংলা ছবির কথায় ভূপেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা 'দি প্যামপার্ড ইয়ুথ—আদুরে ছেলে' এমনি অনেক ছবিও তিনি দেখতেন। পরদার ওপর ছায়ার নড়াচড়া লাফালাফি হলেই হলো—তাই মহা আনন্দে দেখতেন তেরো চোদ্দ বছর বয়সের ভূপেন দে।

এই ছবি দেখার মরসুম বেশ কিছু দিন চলেছিল বাবাকে লুকিয়ে। শেষে একদিন ধরা পড়ে ভূপেন বাবার কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেলেন। দারুণ অভিমানে তিনি

শুধু গৃহত্যাগ নয়, কলকাতা ছেড়েই পালালেন।

এই পালানোটা তেমন কিছু নয়; অনেক কিশোর বয়স্ক ছেলেই বাপদাদার ভৎসনায় এমনি করে পালায়; কেউ কেউ আবার পালায় অ্যাডভেঞ্চারের জন্য। আর তারপরেই কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয়, 'বাবা হারাধন, তোমার মা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন, তোমার পোষা কুকুর টম দিন-রাত কেঁউ কেঁউ করিতেছে, তুমি শীঘ্র ফিরিয়া আইস' ইত্যাদি। কিছুদিন নাকানিচোবানি খেয়ে খেয়ালী দুরন্ত টীন-এজার ছেলেগুলি বাড়ি ফিরে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। শান্ত হয়ে আবার লেখাপড়ায় মন দেয়।

মাস দুই বাংলা দেশের এ-শহর সে-শহর ঘুরে ভূপেনও বাড়ি ফিরে এলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় একেবারে ইস্তফা দিলেন তিনি। স্বাধীন হবার জন্যে সেই চোদ্দ বছরের ছেলে চীনেবাজারের এক স্টীল ট্রাংক আর বালতির দোকানে সেলসম্যানের কাজ নিলেন। গ্রাহক খরিদ্দারকে বশে আনার যে অদ্ভুত ক্ষমতার উদাহরণ আগে দিয়েছি তাতে ভূপেন দে-র হাতেখড়ি হয়েছিল চীনেবাজারের সেই ক্ষুদ্র পরিবেশে। সেটা ১৯২১ সাল।

ছাব্বিশ সালে ভূপেনবাবু মুর্গিহাটা পাড়া থেকে বনেদী নিউ মার্কেটের এক দোকানের কর্মচারী হয়ে এলেন। সেটা ছিল ট্র্যাভেলিং রেকুইজিট, মানে বাক্সপেঁটরা-হোলড্-অলের দোকান। এখানে তিনি প্রায় চার বছর ধরে আর এক শ্রেণীর খদ্দেরের মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ হলেন।

তারপরে ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম পদক্ষেপ করলেন ওষুধ আর প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায়। যে কোনো পণ্য নিয়েই ভূপেনবাবু নাড়াচাড়া করতেন, তার আগাগোড়া বুঝে নেওয়াটাই ছিল তাঁর স্বভাব। কলেজের চৌকাঠ না মাড়িয়েও তিনি নিজের অনুসন্ধিৎসু মন ও বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান লাভ করতে লাগলেন সেটাই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়।

আমি অনেক তরুণকে দেখেছি, তাঁরা বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে 'সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ' হওয়ার চেয়ে 'ম্যানেজমেণ্ট ট্রেইনী' হওয়াটাকেই বেশী পছন্দ করেন। তাতে নাকি সম্মান বেশী। কিন্তু যে ছেলে বিক্রয়বাণিজ্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে, সে একটু সুযোগ পেলেই নিজের ব্যবসা ফেঁদে অনেক ম্যানেজমেণ্ট ট্রেইনীর কর্মসংস্থানও করে দিতে পারে। ম্যানেজমেণ্ট ট্রেইনী যদি সেলস্-এ যথাযথ ট্রেনিং না পান তবে তিনি হয় তো কন্টেসন্টে স্বাধীন বাণিজ্য গড়ে কোনোরকমে সেটা চালাতে পারেন। কিন্তু সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ একাধারে বণিক ও মনস্তাত্ত্বিক। স্বাধীন ব্যবসাতে তাঁর মতো সাফল্য অর্জন করা আর কারও পক্ষে সহজ নয়।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত দশ বছরে ভূপেনবাবু এই ছোট ব্যবসাতে বড়ো অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। সুদীর্ঘ শিক্ষানবিসির পর তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পেলেন একচল্লিশ সালে।

১৯৪১ সালে ৬।২ লিণ্ডসে স্ট্রীটে সরু একফালি জায়গা পেয়ে ভূপেনবাবু নিজস্ব দে'জ মেডিক্যাল-স্টোর্সের স্থাপনা করলেন। দোকানের পণ্য হলো ওষুধ আর প্রসাধনী।

ভূপেনবাবুরা পাঁচ ভাই। জ্যেষ্ঠ স্বর্গীয় শৈলেন দে দে'জ মেডিক্যালের পত্তনের সময়ে অন্য কাজ করতেন। তিনি দে'জ মেডিক্যালে যোগ দিয়েছিলেন অনেক পরে। তাই গোড়ার দিকে মেজদা ভূপেনকে সাহায্য করতেন সেজো ভাই ধীরেন দে। চতুর্থ রবীন ও কনিষ্ঠ অমর তখন ছোট। বাবা ফণীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। (তিনি দেহ রেখেছিলেন বাহান্ন সালে আর শৈলেনবাবু গেছেন চৌষট্টি সালে)।
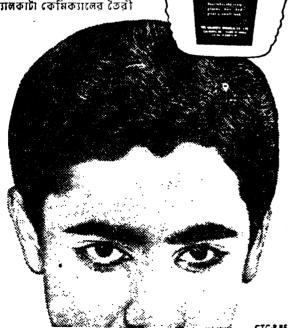
ভূপেনবাবুর যেমন ব্যবসার নেশা, ধীরেনবাবুর তেমনি খেলার নেশা। ভারতবর্ষের খেলার জগতে ধীরেন দে আজ একজন কেষ্টবিষ্টু।

রবীনবাবু ও অমরবাবু এ'দের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তাঁরা ব্যবসাতে আরও অনেক পরে যোগ দিয়েছেন।

ভূপেনবাবুর প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফলে বছর দুয়েকের মধ্যেই দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ডাক্তার বিধান রায়, ললিত ব্যানার্জি, নলিনী সেনগুপ্ত, অমল রায়-চৌধুরী, কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইটের মতো কলকাতার প্রথিতযশা চিকিৎসকরা কঠিন কঠিন রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দুষ্প্রাপ্য ওষুধের বিষয়ে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে বলে দিতেন যে, ওষুধটা আর কোথাও না পাওয়া গেলে দে'জ-এ খোঁজ করতে। ওষুধ বিক্রেতার কাছে এর চেয়ে বড়ো প্রশংসা, বড়ো বিজ্ঞাপন আর কী হতে পারে! দে'জ মেডিক্যালের খ্যাতি দ্রুতবেগেই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এবং দূর দূরান্তর থেকে বড়ো বড়ো চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন ভূপেনবাবু-ধীরেনবাবুর কাছে আসতে লাগলো।

দোকানে বড়োবাবু, মেজোবাবু আর সেজোবাবু, আর বাড়িতে মাথার ওপরে ছিলেন কর্তা ফণীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহধর্মিণী ননীবালা দেবী। কর্তা চলে যাবার পর থেকে একান্নবর্তী দে-পরিবারের কর্ত্রী হয়ে রয়েছেন ভূপেন-বাবুদের মা শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবী। তাঁর এখন ৮৬ বছর বয়স। কর্তা চলে গেছেন ষোলো বছর আগে, বড়ো ছেলেকেও হারিয়েছেন আজ চার বছর—তবুও তিনি ঈশ্বরে মন রেখে শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরে আছেন আজও। দে-পরিবারের বর্তমান আবাস দেওদার স্ট্রীটের বিরাট বাড়িতে ভরা সংসার নিয়ে আছেন ননীবালা। এই বয়সেও রোজ সকালে গঙ্গাস্নানে যান, আর ফিরতি পথে জোড়াবাগানে শ্বশুরের ভিটে ঘুরে আসেন। সে বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা সমবয়সী অকৃতদার দেবর পঞ্চাননকে দেখে তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা ননীবালার নিত্যকর্তব্য। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত শরৎ কোনো ঋতুতেই তার খেলাপ হয় না।

ভূপেন বললেন যে, মা-ই হলেন তাঁদের ফ্রেণ্ড, ফিলজফার আর গাইড। কিন্তু ননীবালা তাঁর সেজো ছেলে ধীরেনকে ঠিক গাইড করতে পারেন নি। সে ছেলে ব্যবসা করে, খেলার মাঠে নেতৃত্ব করে, কিন্তু বিয়ে করে ঘরসংসার করে নি। ধীরেন দে এখনো অবস্থাটা শোধরাতে পারেন—পুরুষকে কেউ দোষারোপ করবে না। এই দেখুন না, বাষট্টি বছরের ওনাসিস

সেদিন কেমন করলেন! আর চার্লি চ্যাপলিন, মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলকেও বাদ দেওয়া চলে না। ধীরেনবাবু তেমন করলে মাতৃদেবী বোধ হয় খুশীই হবেন।

১৯৫০ সালে ভূপেনবাবু বিখ্যাত এক বিদেশী কোম্পানীর অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধের সোল এজেন্সী নিলেন। দেজ মেডিক্যালের উন্নতির সোপানে এটি একটি বড়ো ধাপ। আরও এক ধাপ তাঁরা আরোহণ করলেন যখন লিন্ডসে স্ট্রীটের দোকানের পেছনেই কয়েকটা ঘর নিয়ে দেজ-এর ওষুধ তৈরি আরম্ভ হলো। সামনের দিকে দোকানের আয়তনও আস্তে আস্তে বেড়ে প্রায় চারগুণে দাঁড়ালো।

ওষুধ তৈরির কাজ বেড়ে যেতে [illegible] অনুপাতে হাতে ১৯৫৮ সালে এঁরা [illegible] রোডের কাছে দু বিঘা জমি কিনলেন। আর উৎপাদন বিভাগটিকে প্রতিষ্ঠিত করে নাম রাখলেন দেজ মেডিক্যাল স্টোর্স (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রাইভেট লিমিটেড। কোম্পানীটিও এখন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়ে গেছে।

আজ দু বিঘার জায়গায় সেখানে ন বিঘা জমি নিয়েছেন ভূপেনবাবুরা, আর প্রকাণ্ড তেতলা ফ্যাক্টরী-বাড়িটির আয়তন হয়েছে প্রায় সোয়া দু লক্ষ বর্গ ফুট। সেখানে কেবলমাত্র আমদানি করা মৌলিক উপাদানের সাহায্যে টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগের অমোঘ ওষুধ ক্লোরো-মাইসেটিন ছাড়া অন্যান্য ড্রাগ, ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে। (কেবল এক প্রকার [illegible] আছে [illegible] যে, [illegible] বর্তমান যৌবন ফিরে পাওয়া যায় —স্কুলের যৌবন [illegible] না নিয়েও)।

নিজের ফ্যাক্টরীটি সম্পূর্ণভাবে এয়ার-কন্ডিশনড অর্থাৎ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, ডি-হিউমিডিফায়েড অর্থাৎ আর্দ্রতামুক্ত, এবং স্টেরাইল অর্থাৎ জীবাণুর সংস্পর্শমুক্ত। এই পরিবেশে বহুজন বিজ্ঞানী একনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উল্লিখিত কঠিন কঠিন ওষুধ তৈরি করেন। তাঁদের সকলের পরিচয় দিতে গেলে এক মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। এঁরা কেউ উপাধ্যায়, কেউ মহোপাধ্যায় আবার কেউ মহামহোপাধ্যায়।

সুন্দর করে সাজানো-গোছানো বিক্রয় বিভাগের যে কৃতী তরুণ অধিকর্তাটি সারা ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যে অবস্থিত ১৩টি শাখার মাধ্যমে দেজ-এর ৬ কোটি টাকার ওষুধ বর্তমানে বিক্রি করাচ্ছেন তাঁর নামও উল্লেখ করা খুবই উচিত ছিল, কিন্তু কর্মীদের কারও নামই যখন করলাম না তখন এ যাত্রা তাঁরটাও উহ্য থাক।

এই সব বনেদী পাশ্চাত্ত্য মতের ওষুধের সঙ্গে এখানে আমাদের একান্ত স্বদেশী একটি ভেষজও তৈরি হচ্ছে। সেটা হলো কবিরাজী গাছগাছড়া থেকে প্রস্তুত 'কেও কার্পিন' কেশতৈল। আশা ছিল ভূপেনবাবু বলবেন যে, এই তেল মাখলে টাকেও চুল গজাবে গজগজ করে বর্ষাকালের তৃণলতার মতো। কিন্তু উনি তা বললেন না। টাকে চুল গজানোর মতো কোনো তেল বেরিয়েছে বলে ভূপেনবাবু পঁয়তাল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় জানেন না, তবে যাঁদের চুল কম, টাক পড়ার উপক্রম হয় এই তেলে নাকি তাঁদের বেশ উপকার হয়।

ভূপেনবাবু আর একটা কথা বললেন, যা আগেও যেন কার কাছে শুনেছি। মানুষের চুল নাকি একেবারে কালো হয় না। ঘন কালো কেশ-টেশ বাজে কথা। সেই কৃষ্ণ-কুন্তলে উজ্জ্বল আলো ফেললেই দেখা যাবে যে সেটা ডীপ-ব্রাউন কিংবা স্টীল-গ্রে। পাঠিকারা যদি এ বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে চান তো সরাসরি ভূপেন দে মশায়কে পত্রাঘাত করুন; ঠিকানা দেওয়া আছে। আমার সম্পাদক মহাশয়কে বিব্রত করবেন না দয়া করে।

মাস দেড়েক আগে 'অরগ্যানাইজেশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডিউসার্স অব ইণ্ডিয়া' (সংক্ষেপে OPPI) এর প্রেস কনফারেন্স উপলক্ষে দেজ মেডিক্যাল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল-এর দুটি কারখানাই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। উৎপাদনসংখ্যায় দুটি প্রতিষ্ঠানের অনেক পার্থক্য থাকলেও আধুনিকতায় দুটিই চমৎকার। আর দুটিই নির্ভেজাল বাঙালী প্রতিষ্ঠান। এঁদের দেখবার পর শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙালীর ক্ষমতা বিষয়ে মনের মধ্যে নতুন করে প্রেরণা পেলাম।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে আমি দেজ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের শ্রমিক ও কর্মীবৃন্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া কোনো প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না সন্দেহ নেই, কিন্তু উপযুক্ত অনুচরের অভাবে শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বও ব্যর্থ হয়ে যায়। দেজ মেডিক্যাল গ্রুপ উভয়তই ভাগ্যবান।

এঁদের নেতাটি কিন্তু অসাধারণ। সিনেমা-বাতিকগ্রস্ত লেখাপড়ায় অমনোযোগী এক পলাতক ছেলে—গুরুজনরা যাকে হয়তো বখা বাউণ্ডুলে বলে খরচের খাতাতেই লিখে রেখেছিলেন তার কৈশোরে—সে ছেলেটিই কিনা সারা জীবনের শ্রম ও অধ্যবসায় নিয়ে আজ একষট্টি বছর বয়সে নিজেকে এবং বাঙালীর অতিপ্রয়োজনীয় এক শিল্পকে ধাপে ধাপে বিরাটত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন!

বিশ্বকর্মা

ভ্রম সংশোধন

১৯৬৮ সালের অগাস্ট মাসে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টের উপর নির্ভর করে আমি ২০ পৌষ ১০ সংখ্যক দেশ পত্রিকায় 'মিত্র এস কে' বিষয়ক প্রবন্ধের ১০৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম যে, পারাদ্বীপ বন্দরের কাজ এখনো আশানুরূপ হয়নি। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে সে খবর এখন বাসি হয়ে গেছে। সেখানকার বর্তমান রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশায়ের নিরলস চেষ্টায় পারাদ্বীপের বর্তমান লোডিং মাসে প্রায় ১ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে, আর দিন দিন সেটা বেড়েই চলেছে। একজন বাঙালীর তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে যে এই অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে সেটা আমাদের গৌরবের বিষয়।

আলোচনা করছিল সেটা আর যাই হোক ইংরেজী উচ্চারণের সমস্যা নিয়ে নয়।

'ও, তোমরা দুটিতে এইখেনে?' পরিষ্কার ভর্ৎসনার সুর ফুটল মাতা ব্রাউনার কণ্ঠস্বরে, 'যাও, যাও, নিজেদের জায়গায় যাও!'

কাঁচুমাচু মুখে ওরা পালাল।

ব্যাপারটার আমার কিছুই মনে হত না যদি সহশিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনায় মাতা ব্রাউনা নিজেই কথাটা না তুলতেন।

বললেন, 'ছেলেটি নবম শ্রেণীতে পড়ে। দেখতে ভারি সুন্দর তো! অষ্টম শ্রেণীর প্রায় সবকটি মেয়েই ওকে নিয়ে পাগল। এরকম তো হতেই পারে। বন্ধুত্ব হবে পরস্পরে, এমন কি প্রেমও হতে পারে, সেইটেই তো মানবিক। বরং বিপরীতটাই অস্বাভাবিক।'

তখন তাঁর গলায় আর এতটুকু ভর্ৎসনা ছিল না।

দুবার ইংল্যাণ্ডে গেছেন তিনি, সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতি লক্ষ করেছেন। বললেন, স্কুলে সহশিক্ষা সেখানেও যথেষ্ট প্রচলিত নয়, অথচ আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি—জানেন তো, যুদ্ধ পরবর্তী সময়টায় আমরা এটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তাতে দেখেছি, সহশিক্ষায় অপকারের চেয়ে উপকার হয় বেশি। ছেলেমেয়েদের মানুষ হবার এইটেই যোগ্য পরিবেশ।'

এবং এই পরিবেশে [illegible] চাপে ছেলেদের চরিত্রগুলি যাতে চাপা না পড়ে তেমন কতকগুলো ব্যবস্থার কথা আমায় বোললেন, যার লক্ষ্য [illegible] এবং [illegible] জাগানো।

বললেন, [illegible]

[illegible]

বললেন, 'ওরা [illegible] [illegible] নিজেদের পরিশ্রমে।'

একটা গর্বের ভাব ফুটেছিল তাঁর মুখে।

তবে যাই, [illegible] বাইরের অনেক দেশ সম্পর্কেই স্কুলের ছেলেমেয়েরা সজাগ। যেমন, আমি অন্তত একটি স্কুল জানি সেখানকার ছেলেমেয়েরা 'ঠাকুমার ঝুলি' পড়েছে। যথেষ্ট অনুষ্ঠান করে তারা ভারতীয়দের ডাকে। এবং নাচে রবীন্দ্র সঙ্গীত হলেই তাতে [illegible] নাচ ও গান করাচ্ছে কোনো বাধা হবে না বলে শপথ করতে যদি আমি অপারগ হই তাহলেও এই বা কম কি যে কিছু বাঙালী মহিলার সহায়তায় সত্যই সেখানে একাধিক রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আয়োজন হয়েছে, যেমন হয়ে গেল এই সেদিন নেহরু দিবস?

ননী ভৌমিক

সমীক্ষা

শার্ঙ্গদেব

মাঝারির অসুবিধা সর্বক্ষেত্রে। বেচারীদের কেউ বড় একটা গুরুত্ব দিতে চায় না। অথচ তারা ঠিক মধ্যস্তরে থাকতে চায় না উঠতে চায় এবং সে প্রত্যাশা পূর্ণ না হলে তাদের মনোকষ্টের অবধি থাকে না। আবার মাঝারিদের নিয়েই সব প্রতিষ্ঠানকে চলতে হয়—ওপরে আর ক'জন থাকে? এদের কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কিছু স্বার্থরক্ষা করে তুষ্ট রাখতে হয় নইলে কাজ চলে না। অর্থাৎ কাজ চালিয়ে যাবার জন্যই মাঝারির অস্তিত্ব। সব ক্ষেত্রেই যখন এই বিধান তখন আকাশবাণীর বেলাতেই বা অন্যথা হবে কেন? তাই মাঝারি আর্টিস্ট যখন গান গাইতে আসেন তখন দেখা যায়, যে বাজনাটা দরকার সেটা নেই, যেটা আছে সেটা [illegible] আর স্টাফ আর্টিস্টদের সহযোগিতা সে তো আকাশের বস্তু। তবু দু'একজন দয়া করে দু'একটা বাজনায় ঠোকা মারেন, শিল্পীর গলার সঙ্গে মিলল তো ভাল ভাবে আর না মিলল তো তাদের আর দায়ই কী। মনোভাবটা এমনি। তানপুরাটা যদি সুরে বাঁধা না থাকে তা হলে শিল্পীর গলাটাই বেসুরো শোনাবে। অনুষ্ঠানটাই মাটি। [illegible] তো মুশকিলই [illegible]। [illegible] এই [illegible] শিল্পীদের [illegible]। [illegible] শিল্পী [illegible] কর্তাদের [illegible] এবং তারপরে [illegible] করতে আসেন। [illegible] শিল্পীর এইভাবেই "[illegible]" হারায়। অতএব মাঝারিরা তাঁদের যা কর্তব্য তাই করেন। নির্দিষ্ট আকাশবাণীতে [illegible] করেন। এ বাজনায় ও বাজনায় [illegible] খানিকটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যেক [illegible] [illegible] সঙ্গে [illegible] করেন। [illegible] দিন স্টুডিওর অবস্থা দেখে নিরাশ হলেও স্টাফ আর্টিস্টদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের অসহযোগিতার অন্তরে ক্ষিপ্ত হলেও অনুষ্ঠান শেষে হেসে ধন্যবাদ দেন। এইভাবেই তাঁদের দিন কাটছে এবং আরও কতদিন কাটবে শঙ্কিত অন্তরে সেটাই তাঁরা ভেবে থাকেন।

যাঁরা উচ্চস্তরের শিল্পী তাঁদের পথে আর এ সব কণ্টক নেই। তাঁরা স্টুডিওতে আসবার আগে থেকেই বাজনাদাররা বসে আছেন। তানপুরাটা দেখেশুনে মেলানো হয়। বেহালা, এসরাজ, পিয়ানো, বাঁশি, চাইকি দোতারা একতারাও একজোট হয়ে বাজতে থাকে। অশ্রাব্য আধুনিককেও সুরলহরীতে সুশ্রাব্য করে তোলা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে কত সাধবোর কত নম্রতা। এঁদের খুশী করতে পারলে অনেক সুবিধা আছে। এঁদের নালিশে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। আকাশবাণীতে এঁদের পদার্পণ না করলেও চলে কিন্তু লোকের সঙ্গে সংস্পর্শ তো রাখতে হবে। অতএব আকাশবাণীর প্রোগ্রামে তাঁরা ক্ষতি সত্ত্বেও গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, আকাশবাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেবলমাত্র তৈলাক্ত মস্তকে তৈলসিঞ্চন ছাড়া আর কিছু নয়। স্বীকৃতিলাভ করাটা তো শিল্পীর ভাগ্য ও দায়িত্ব। বহু কষ্টে এবং অধ্যবসায়ে যখন তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন তখন তাঁকে অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করে আকাশবাণী তাঁদের তালিকায় মেধাবী শিল্পীর সংখ্যা বাড়িয়ে মহৎ কর্তব্য পালন করলেন। এর আগে সে বেচারা যখন "ফ্যা ফ্যা" করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন নিশ্চিতভাবেই আকাশবাণী তার অডিশন রিজেক্ট করেছেন। একটি রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত অপর এক বন্ধু, আছেন তিনি রেকর্ডেচ্ছু নতুন শিল্পীদের বলেন, আগে বেতারে গেয়ে নাম করো, পরে রেকর্ড হবে। শিল্পী বেচারি জানে বেতারের মনোভাবও সেই রকম, অর্থাৎ আগে রেকর্ড, প্লে ব্যাকে নাম করো, তবে এখানে গাইতে এসো। ভেবে দেখুন, নাম করাটা কী ভীষণ সমস্যা। নাম না করলে—"কেহ পুঁছিবে না"। অথচ কোনও সহায় সম্বল নেই, কোনও "সোর্স" নেই কিন্তু প্রতিভা আছে, যোগ্যতা আছে, তাদের কি হবে? লেখাপড়ায় অনুরূপ প্রতিভা ও যোগ্যতা থাকলে তারা হয়ত বিদেশে চলে যেত কিন্তু গানের বেলায় বিদেশে সমাদরের আশা নেই এবং বাজনার বেলায় সবাই রবিশঙ্কর, আলী আকবর নয়। যে দেশে কন্ট্রাক্টগুলো ধনপতিদেরই লভ্য এবং শ্যালো টিউবওয়েলও চাষীদের ভাগ্যে জোটে না সে দেশে এইরকম রীতিটাই তো স্বাভাবিক। আগে কয়েক লাখ টাকা জমাও, একরের পর একর জমি বাড়াও তবে তো কন্ট্রাক্ট, তবে তো চাষের লোন—নইলে মুখ দেখাতে এস না। শিল্পীদের বেলাতেও ব্যাপারটা একই। আগে খ্যাতির পুঁজি গড়ে তোলো তারপরে দেখবে "তিমিরদুয়ার" খোলা।

তথাপি আকাশবাণীতে মাঝারিদের প্রবেশ (অনুপ্রবেশ নয়) ঘটেছে কারণ তা না হলে এতগুলি প্রোগ্রাম চলবে কি করে, কি করেই বা আকাশবাণীর ঠাট বজায় থাকবে। বৃহৎ বৃহৎ অফিসগুলিতে যেমন কেরানিরা তাঁদের নির্জীব অস্তিত্ব রক্ষা করেন তেমনি এই সব মাঝারি শিল্পীরা আকাশবাণীতে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন। আকাশবাণীর আর কোনও কর্তব্য তাদের প্রতি আছে কি? স্টাফ আর্টিস্টদের নিশ্চয়ই

ধারণা এইরকম যে, এদের জন্য বাজনা-টাজনা তেমন বাঁধবার দরকার নেই, এদের কণ্ঠ থেকেই গান নামক একটা পদার্থ দিনানুদৈনিক নিয়মে প্রচারিত হলেই হল তা সে যে রকমই হোক না কেন। আপনাদের যদি ধারণা থাকে যে, আকাশ-বাণী সাধারণ শিল্পীদেরই প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তাদের প্রতিভার স্ফুরণ হবে, তারা যোগ্যতা অর্জন করবে তবে সে ধারণা আর পোষণ করাটা যুক্তি-যুক্ত হবে না। আপনারা যদি অনুমান করেন যে, আকাশবাণীর অনুষ্ঠানের প্রভাবে সংগীতে সাধারণ রুচি উন্নত হবে, জনগণের সুরবোধ, কাব্যবোধ পরিশীলিত হবে এবং সুকুমার কলার প্রতি তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে—তবে সে অনুমানের প্রশ্রয় না দেওয়াটাই ভাল। বরঞ্চ অনুমানটা এই রকম করা ভাল যে, আকাশবাণী কেবলমাত্র কয়েকজন ভাগ্যবানের জন্য আর তাঁদের জন্য যাঁরা পাদপ্রদীপের সব রকম প্রচারই দাবি করতে পারেন। হায়, ভাগ্যান্বেষী শিল্পী।

রেকর্ড সমালোচনা

কিছুদিন আগে আমরা গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছ থেকে তিনটি লঙ প্লেইং রেকর্ড সমালোচনার জন্য পেয়েছি। একটি ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর সেতার (ই এ এস ডি ১৩০২), অপরটি শ্রীমতী জয়া বসু এবং শ্রীহিমাংশু বিশ্বাসের দ্বৈত সেতার এবং বাঁশী (ই সি এল পি ২৩৭২), আর একটি হচ্ছে—সন্তুর বাঁশী এবং গীটারের সম্মিলিত অনুষ্ঠান "কল অব দি ভ্যালি", (ই সি এল পি ২৩৮২)। এতে সন্তুর বাজিয়েছেন শ্রীশিবকুমার শর্মা, বাঁশী বাজিয়েছেন শ্রীহরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া এবং গীটার বাজিয়েছেন শ্রীব্রজভূষণ কাবরা।

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর দরবারী কানাড়া নিশ্চিতভাবেই মধুর কিন্তু "হাই-এভারেজ"-এর ওপরে ওঠেনি বলে আমার বিশ্বাস। আলাপ এবং গৎ দুই-ই সুখশ্রাব্য—বিলায়েতের চমকপ্রদ স্পর্শও এতে স্থানে স্থানে বিদ্যমান, কিন্তু দরবারী কানাড়ার যে একটা বিরাট গাম্ভীর্য আছে তার পরিচয় তেমন পাওয়া গেল না। যখন খাম্বাজ বা পিলু শুনি তখন মাধুর্যই আমরা আশা করি। কিন্তু যখন দরবারী কানাড়া শুনি তখন কেবল মিষ্টতাই নয় একটা উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি আমরা আশা করি। কখনও সেই গাম্ভীর্যে একটা অপূর্ব শান্তভাব থাকে কখনও থাকে কারুণ্যের ছায়া। বিলায়েৎ এই রেকর্ডে দরবারীকে সেই উচ্চতায় আমাদের পৌঁছে দিতে সমর্থ হননি।

শ্রীমতী জয়া বসু এবং শ্রীহিমাংশু বিশ্বাসের বাজনা সুন্দর। রেকর্ডটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে আশা করি। এঁরা বাজিয়েছেন আলহাইয়া বিলাবল, দেশ এবং ভাটিয়ালী ধুন।

"কল অব দি ভ্যালি", একটি আশ্চর্য সুন্দর যন্ত্রসংগীত। যে তিনজন বাজিয়েছেন তাঁরা অসামান্য গুণসম্পন্ন বাদক। রেকর্ডটি শুনতে শুনতে যেন আমাদের মায়ালোক পরিভ্রমণ ঘটে। এমন মিষ্টি সুখশ্রাব্য এবং মধুর আবেদনে পূর্ণ যন্ত্রসংগীত খুব কমই শোনা যায়। আমাদের যন্ত্রসংগীতের ভাণ্ডারে এই রেকর্ডটি একটি অতি উত্তম সংযোজন।

সংগীত পরিষদ

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে সংগীত পরিষদ নামক একটি প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি সংগীতে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর অবদান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই ধরনের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ ইন্দিরা দেবী যে কেবলমাত্র রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন এমন নয়—সমসাময়িক সংগীত সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল এবং বিবিধ স্বরলিপিতে তার স্বাক্ষরও তিনি রেখে গেছেন। ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা জানেন তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং বিদ্যা ছিল কত সুদূরপ্রসারী। সংগীত বা সংস্কৃতির ব্যাপারে সুন্দর বস্তুকে রক্ষা করার দিকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং সারা জীবন তিনি এই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রথম যুগে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বহু গানের স্বর-লিপি করে গেছেন এবং যাতে গানের খুঁটিনাটি কাজগুলিও স্বরলিপিতে বর্তমান থাকে সেদিকে তাঁর বিশেষ মনোযোগ থাকত। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে বাস করতেন তখনও স্বরলিপির পূর্ণতা সাধনের জন্য বহু প্রস্তাব করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন। সকলেই জানেন, বিবিদি ছিলেন খুব আলাপী লোক এবং এই আলাপটি একটি বিষয়েই নিবদ্ধ থাকত না, বহু বিষয় এবং বহু সমস্যায় পরিভ্রমণ করত যাতে শ্রোতা বহুলভাবে উপকৃত হতেন। অনুষ্ঠানে ইন্দিরা দেবীর রচিত একটি গান গাওয়া হয় এবং কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন শ্রীমতী কমলা বসু।

গ্রামীণ গীতি সংস্থার সোনাই মাধব

পয়লা জানুয়ারী রবীন্দ্র সদনে গ্রামীণ গীতি সংস্থা "সোনাই মাধব" গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেন। লোকগীতিকে ভিত্তি করে রচনাটির সুর সংযোজনা এবং পরিচালনা করেন শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী। নৃত্য পরি-কল্পনা ও পরিচালনা করেন শ্রীঅসিত চট্টোপাধ্যায়। মৈমনসিংহ গীতিকার একটি আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে এই সংগীতা-লেখ্যটি রচনা করেন শ্রীভাস্কর বসু। সার্থকভাবে আঙ্গিকের প্রয়োগে গীত, নৃত্য এবং অভিনয়ের সার্থক মিলন কদাচিৎ দেখা যায়। এই অভিনয়ে সেই সাফল্য প্রত্যক্ষ করে বিদগ্ধ দর্শকগণ আনন্দিত হয়েছেন। আখ্যায়িকাটিকে একটি গীতি-নাট্যের রূপ দিয়ে শ্রীভাস্কর বসু অসামান্য সাহিত্যকলার পরিচয় দিয়েছেন। এরূপ রচনা সহজ এবং সুলভ নয়। শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী লোকগীতিকে অবলম্বন করে যে সুর প্রয়োগ করেছেন তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাবলীল। লোকগীতির সজীব ধারাটি তিনি বজায় রেখেছেন। শ্রীঅসিত চট্টো-পাধ্যায়ের নৃত্য পরিকল্পনা প্রাণবন্ত এবং আবেদনশীলতা ও অভিনয় গুণে সমৃদ্ধ। এই তিনজনের প্রচেষ্টা ছাড়া যাঁরা গান করেছেন এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের অংশও সাফল্যে সমুজ্জ্বল। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত এমনভাবে বিন্যস্ত যে দর্শকগণ কোথাও ক্লান্তি অনুভব করবার অবকাশ পাননি, পরন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয় তা দেখবার জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছেন। সত্যিই একটি রসোত্তীর্ণ অনুষ্ঠান।

এবং সবটা মোটামুটি ঘুরে বেড়াতে আমাদের মনোরেলে চাপতে হয়েছিল।

মন্ট্রিয়লের প্লেস ডেস আর্টস-এর বিরাট স্টেজে আমাদের প্রথম শো। সেই স্টেজে এক সঙ্গে দেড়শ মেয়ে নাচতে পারে। আমরা তো ছিলাম মোটে তেরটি মেয়ে। আমাদের সেন্টারের সাতজন ছাড়া আরো ছ'জন—শ্রীমতী দত্ত, ঝর্ণা দত্ত, প্রণতি সেন, পলি গুহ, সুনন্দা সেন ও শিখা মুখার্জি। আর ছিল চারজন ছেলে, শান্তি বসু, রামগোপাল ভট্টাচার্য, সাধন গুহ আর ধূর্জটি সেন।

বিদেশে আমাদের প্রথম শো। মনে মনে খুব ভয় ছিল কিন্তু ভালই উতরে গেল। ওখানে দেখান হয়েছিল ভরতনাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী আর বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য। এছাড়া ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' অবলম্বনে 'প্রকৃতি ও আনন্দ'। এই নৃত্যে আমাদের দাদা অর্থাৎ উদয়শংকর হয়েছিলেন বুদ্ধ। 'ইন্দ্র' নামে তাঁর একটি একক নৃত্যও ছিল। ঐ নৃত্যে দাদার শুধু হাতের ঢেউখেলান কাজ দেখেই দর্শকেরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই একক নৃত্যটি ছাড়াও শান্তি বসুর একক নৃত্য ছিল 'কার্তিকেয়'।

ক্যানাডার কাগজে আমাদের প্রচুর প্রশংসা ছাপা হয়েছিল। মন্ট্রিয়ল থেকে নিউইয়র্কে ফিরে এলাম সাত তারিখে। সেই প্যারামাউণ্ট হোটেলেই। এখানে আমাদের শো ছিল ছ'দিন, সেই হাণ্টার কলেজের অডিটোরিয়ামে।

একদিন বাসে করে আমাদের নিউইয়র্ক শহর দেখান হলো, কিন্তু একদিনে ঐ বিরাট শহরের কতটুকু আমরা দেখলাম বলতে পারি না। আমাদের ইমপ্রেসারিও হুরোক সাহেব এরই মধ্যে একদিন আমাদের পার্টি দিলেন। সেই পার্টিতেই শোনান হলো নিউইয়র্ক টাইমস কাগজে আমাদের যে সমালোচনা ছাপা হয়েছিল। প্রশংসাই করা হয়েছিল।

মণ্ট্রিয়ল নিউইয়র্ক বা অন্যান্য শহরে অনেকেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং অনেকে আমাদের অটোগ্রাফ নিতেন। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় তো থাকতেনই, ওদেশের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী, শিল্পরসিক ও সমালোচকেরাও থাকতেন। এঁরা ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে নানারকম কৌতূহল প্রকাশ করতেন।

কিন্তু সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি অবাক হয়ে গেলাম আমার সোমাদিকে দেখে। সে থাকে ক্যানাডায়। শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাসে ও ট্রেনে চেপে ও অনেক কষ্ট করে ৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছে। আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল।

আরও একজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি হলেন মঞ্জুশ্রী চাকী। এঁর নাম আপনারা সকলেই জানেন। ইনি নিউইয়র্কে একটি ভারতীয় নৃত্যের স্কুল খুলেছেন।

নিউইয়র্কের শো শেষ করে অন্যান্য শহরের উদ্দেশ্যে আমরা বাসে করে একদিন যাত্রা করলাম। আমরা ইচ্ছে করেই বাস বেছে নিয়েছিলাম। কারণ, তাহলে আমেরিকার পথঘাট এবং লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ওয়াশিংটনের পথে বিচিত্র বর্ণের গাছ আর তাদের ফুল ও পাতার রঙের সমারোহ দেখে সত্যিই আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। লাল, হলদে আর সোনালী পাতারা যেন গান গাইছিল 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'।

আমেরিকায় আমাদের বাসযাত্রার আগাগোড়া ড্রাইভার ছিল টম, ভারি মজার মানুষ, একাধারে ড্রাইভার ও গাইড। শেষের দিকে দু'দিন মিসেস টমও আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি গল্পেগুজবে হাসিঠাট্টায় আমাদের জমিয়ে রাখতেন।

ওয়াশিংটন ভারি সুন্দর শহর। ছেড়ে আসতে মায়া হয়। আমাদের হাতে সময় বেশী ছিল না, তবুও ওরই মধ্যে আমরা হোয়াইট হাউস, ক্যাপিটল, ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট, জেফারসন মেমোরিয়াল, লিংকন মেমোরিয়াল এবং আরলিংটনে জন এফ কেনেডির সমাধি দেখলাম। এখানে শো'এর শেষে স্যালি ট্রামেল, যে আমাদের নাচের স্কুলে নাচ শিখতে এসেছিল ও এবং ওর বাবা মা দেখা করতে এসেছিলেন, নিউইয়র্কেও ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। আর ওর সঙ্গে দেখা হবে না বলে খারাপ লাগল।

আমেরিকার যে সব শহরে শো হয়েছিল

ওয়াশিংটন থেকে বালটিমোর

বালটিমোরে এক কাণ্ড হয়েছিল। বালটিমোরে পৌঁছালাম বিকেলে। সন্ধ্যায় শো। শো-এর পরে হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের ঘর থেকে আমার, শেফালী আর তপতীর সব জিনিসপত্র লোপাট। এমনকি ওয়ার্ডরোবের ভেতর থেকে কোট পর্যন্ত। অন্য আর একটি ঘর থেকে অপুু এল। সে ত কান্না জুড়ে দিয়েছে। সে দেশ থেকে অনেক দামী দামী শাড়ি এনেছিল। সব গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার ভুবেব মামাকে ফোন করলাম। তিনি এসে আমাদের ভরসা দিয়ে খোঁজ করতে গেলেন।

আমরা ততক্ষণে সকলে সিঁড়িতে বসে জটলা করছি। কিছুক্ষণ পরে আবার সকলের মুখে হাসি ফুটল। ভুবেব মামা ফোন করে জানালেন যে সব জিনিস পাওয়া গেছে। ঘরের বিলি ব্যবস্থা করার সময়, ভুল বোঝাবুঝির ফলে সব জিনিস অন্যের ঘরে জমা হয়েছে। হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে হাসির কলধ্বনিতে সারা বারান্দা ভরে উঠল।

এরপর শহরের পর শহর—নিউহ্যাভেন বোস্টন, পিটসবার্গ, ক্লিভল্যাণ্ড, ইণ্ডিয়ানাপোলিস, ডেট্রয়েট, শিকাগো অ্যানআরবর লেকফরেস্ট, অক্সফোর্ড, সিনসিনাটি, ফ্লোরেন্স, নিউ অরলিনস এবং আরও অনেক শহর।

এত শহর ঘুরলাম, খাবার কিন্তু একঘেয়ে ফ্রায়েড চিকেন আর অ্যাপেল পাই। অরুচি ধরে গিয়েছিল। তাই চিকাগোতে সুযোগ পেয়ে একদিন কোমরে আঁচল জড়িয়ে সবাই মিলে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়া গেল। কি ভালই লেগেছিল সেই খিচুড়ি, সে স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে।

আমাদের ছোট্ট দলটি আমেরিকায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। হাউসফুল হওয়া সত্ত্বেও কতজন হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের শো দেখেছে। অবশ্য আমেরিকার অনেক মিউজিক হলে দাঁড়িয়ে দেখার ব্যবস্থা আছে।

ফ্লোরেন্সে আমাদের হোটেলের লনটা বেশ বড় ছিল। সেদিন রাত্রে শো-এর পর হোটেলে ফিরে সকলের কি খেয়াল হল

আমরা চোর চোর খেলা আরম্ভ করে দিলাম। বেশ ঠাণ্ডা, খালি পায়েই খেলা আরম্ভ করেছি ভ্রূক্ষেপ নেই, আর সেই ছোটবেলার মতোই চেঁচামেচি করছি। চেঁচামেচি শুনেই বোধহয় ভুলেবেগমা এসে হাজির। না বকুনি খেতে হয়নি। তবে আমাদের সাবধান করে দিলেন অন্য বোর্ডারদের যেন অসুবিধে না হয়। কিন্তু এরপর খেলা আর জমল না।

[illegible] শেষদিন শো-এর শেষে একটি ছোট্ট মেয়ে এসেছে, তার হাতে একটি প্যাকেট। সেটি সে আমাদের উপহার দেবে। আগের দিন আমরা তার সোনালী চুলের খুব প্রশংসা করেছিলাম তাই সে এক গুচ্ছ চুল নিজের মাথা থেকে কেটে প্যাকেটে করে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে।

নিউ অর্লিন্সের পর গিয়েছিলাম মেমফিস শহরে। সেখানে পাকিস্তানের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাদের একখানা বাংলা গান শোনালেন। একজন পূর্ব পাকিস্তানীর মুখে বাংলা গান শুনে আমাদের সকলের খুব ভাল লাগল। গানের চেয়েও [illegible] সুন্দর ব্যবহার।

মেমফিস-এর পর কানসাস সিটি তারপর এলাম সেণ্ট লুইসে। এখানে আমাদের [illegible] শো-এর পর [illegible] পৃথিবীর সব-চেয়ে উঁচু মনুমেণ্ট—উচ্চতা হল ৬৩০ ফুট। [illegible] সময় এই সেণ্ট লুইস থেকে পশ্চিম দিকে আমেরিকার সীমানা বাড়ানো হয়। তাই একে আমেরিকার পশ্চিমের দরজা বলা হয়। [illegible] আমরা সেটির মাথায় উঠে [illegible] শহর দেখেছি, [illegible] আলোয় ঐ শহরটিকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

মজা হয়েছিল স্টীলওয়াটারে। এখানে আমরা ছিলাম ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যে এক হোটেলে। একদিন ইউনিভার্সিটির ছেলেরা আমাদের সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল। অনেক ভারতীয় এসেছিলেন। চেনাশোনাও অনেক বেরিয়ে গেল, আমরাও। পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা যখন আমাদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন তখন কয়েকজন আমেরিকান ছাত্র তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন: এত আনন্দ কেন? তোমরা কি ইণ্ডিয়ান? তা নই কিন্তু আমরা বাঙালী অ্যাণ্ড দ্যাটস এনাফ, একজন পাকিস্তানী ভদ্রলোক বললেন।

স্টীলওয়াটারের ঐ পার্টিতেই আমাদের পার্বতীদির সঙ্গে তার এক দাদার হঠাৎ দেখা, দীর্ঘ আট বছর পর। দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায়, দেশে দেশে বিবাহ করলে স্ত্রীও পাওয়া যায় কিন্তু তং তু দেশম্ ন পশ্যামি, যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ। এমন দেশ কোথাও নেই যেখানে গেলেই সহোদর ভাই-এর দেখা পাওয়া যায়, মি. গোস্বামী পার্বতীদির সহোদর না হলেও ভাই ত বটে।

এতদিন পরে বোন ও দেশের লোকের দেখা পেয়ে গোস্বামীজি যে কি করবেন ভেবেই পান না। তিনি আমাদের সঙ্গে হোটেলে এলেন, অনেক গান শোনালেন। এখানে ভারতীয়দের কোন পার্টি বা অন্য কোন জলসা হলে গোস্বামীজির ডাক পড়ে গান শোনাবার জন্য, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান এবং পল্লীগীতি। তিনি এখানকারই ছাত্র। এখন কি একটা বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছেন।

আবার বাসে ওঠা, প্রথমে উইচিটা কানসাস তারপর হিউস্টন, পরে ডালাস, সেই বিখ্যাত শহর যেখানে কেনেডিকে হত্যা করা হয়। পথে হত্যার স্থান ও যে বাড়ি থেকে গুলি ছোঁড়া হয় সেই বাড়ি দেখলাম। এরপর কর্পাস ক্রিস্টি, সান আন্টোনিও, বোমণ্ট এবং সেখান থেকে আলবুকার্ক। এখানে আমাদের রেড ইণ্ডিয়ান গ্রাম দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু হায়! গ্রামে গিয়ে দেখি গ্রাম ফাঁকা, অধিবাসীরা নাকি গেছে শহরে কাজ করতে, কিন্তু এখানকার রেড ইণ্ডিয়ানরা বোধ হয় আধুনিক হয়ে গেছে, কারণ গ্রামে বিরাট বিরাট মোটর গাড়ি দেখলাম। এখান থেকে আমাদের একটি পুরোনো গ্রামে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কয়েকজন রেড ইণ্ডিয়ান মেয়ের দেখা পেলাম, তারা ফুটপাথের ওপর কাপড় বিছিয়ে হাতে তৈরী গয়না বিক্রি করছে। এমন ছবি অবশ্য আপনারা দেখে থাকবেন।

আলবুকার্কে ঘণ্টা তিনেক ছিলাম।

স্টীলওয়াটারে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে শিল্পীদল

হলে মনে হয়। একটি ছত্রের পাশে—দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়—হ্যালহেড নিজের হাতে লিখে রেখেছেন 'What is মান?' অনুমান করতে পারি প্রশ্নটি বাংলা শিক্ষকের উদ্দেশ্যে। 'সুধা ছাড়া খাইতে সাধ করে পুরন্দর'-এই ছত্রটির অনুবাদের পাশে লেখা ('for the Syntax)' অর্থাৎ অনুবাদ করবার সময় কোনো কারণে বাংলা ছত্রটির বাক্য-রীতি হ্যালহেডের কাছে অস্বাভাবিক বোধ হয়েছে তাই শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করবার জন্য অথবা পরে নিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মন্তব্যটি তিনি লিখে রেখেছেন। সুতরাং অনুমান করতে পারি ব্যাকরণ প্রকাশিত হওয়ার আগে ত অবশ্যই, এমন কি ব্যাকরণ রচিত হওয়ার আগেই হ্যালহেড 'বারমাসা' ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করতে, লিখতে এবং ছাপা হতে কতদিন লেগেছিল আমরা জানি না। ছাপা হতে অবশ্য অনেকদিন লাগবার কথা। হ্যালহেডের নিজ মুখের স্বীকৃতি আছে 'the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel'; লণ্ডনের

কারিগর নিয়ে B Bolts এক দফা চেষ্টা করে বিফল হলেন। শেষে With a rapidity unknown in Europe' (Mr Bolts যে অস্বাভাবিক রকম বেশি সময় নিয়েছিলেন এই মন্তব্যই তার প্রমাণ) বাংলা দেশে Wilkins-এর চেষ্টায় কাজ হল। লণ্ডনে এবং বাংলাদেশে ছাপাবার উপযোগী বাংলা অক্ষর সৃষ্টি করতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল তাতেই বোঝা যায় হ্যালহেডের ব্যাকরণ রচিত হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন অমুদ্রিত ছিল। ব্যাকরণের প্রকাশকাল ১৭৭৮ সালের জুলাই-আগস্টে (বইখানি বর্ষাকালে ছাপা হয়েছিল)। এই বই ছাপা হতে যদি আনুমানিক দু বছর লেগে থাকে তাহলে ১৭৭৬ সালের মাঝামাঝি হ্যালহেডের ব্যাকরণ রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে ধরতে পারি এবং ১৭৭৬ সালের আগে অন্তত ৩।৪ বছর তিনি বাংলা ভাষা অধ্যয়ন ও উপকরণ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং ১৭৭২-৭৪-র মধ্যে কোনো এক সময় হ্যালহেড 'বারমাস্যা'-র অনুবাদ করেছিলেন অনুমান করলে অন্যায় হয় না। এর আগে ইংরেজীতে বাংলা কবিতার অনুবাদ কেউ করেছেন কিনা জানি না।

'বারমাস্যা'-র ইংরেজী অনুবাদ কৌতূহলের সামগ্রী। কিন্তু মূল বাংলা অংশের অন্য গুরুত্ব আছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৭৫২ সালে। অন্নদামঙ্গলের বহু আধুনিক পুঁথি পাওয়া গেলেও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুঁথি দুর্লভ। ভারতচন্দ্রের রচনার সবচেয়ে পুরনো পুঁথি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত 'কালিকামঙ্গল'—ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহে আছে। পুঁথির লিপিকাল ১৭৭৬, লিপিকর আত্মারাম দাস ঘোষ। (লক্ষণীয়, মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে 'কালিকামঙ্গল' মূল কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র কাব্যের আকার পেয়েছে)। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের 'কালিকামঙ্গলে' পুঁথিখানিও হ্যালহেড সংগ্রহ করেছিলেন। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে—এক. 'কালিকামঙ্গল' পুঁথির সঙ্গে 'বারমাস্যা' পুঁথির সম্পর্ক কি? দুই 'কালিকামঙ্গল' পুঁথি হ্যালহেডের কাছে কোন্ সময় পৌঁছেছিল। প্রথম প্রশ্নের উত্তর 'কালিকামঙ্গল' পুঁথির সঙ্গে 'বারমাস্যা' পুঁথির কোনো সম্পর্ক নেই। 'কালিকামঙ্গল'-এর পাঠ এবং 'বারমাস্যা'-র পাঠের উৎস ভিন্ন। দুটি পাঠ দুখানি পৃথক আকরপুঁথি থেকে এসেছে। সুতরাং অনুমান করতেই হয় হ্যালহেড 'কালিকামঙ্গল'-এর দুখানি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। এ দুখানির কোন্‌খানি প্রাচীনতর সে-প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া শক্ত। কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখা দরকার। 'বারমাস্যা'-র পাঠ হ্যালহেড অনুবাদ করেছেন, সুতরাং অবশ্যই এই পাঠকেই তাঁর শিক্ষক শুদ্ধতম মনে করেছিলেন। এখানে আরও একটি প্রশ্ন আছে। অনুবাদ করবার সময় হ্যালহেডের কাছে বা তাঁর শিক্ষকের কাছে বারমাস্যা অংশের দুটি পাঠ ছিল কি? অর্থাৎ 'বারমাস্যা' পুঁথি এবং 'কালিকামঙ্গল' পুঁথির পাঠ মিলিয়ে বিশুদ্ধ পাঠটিকেই কি তাঁরা অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছিলেন? আগেই দেখা গেছে হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপা হতে সময় লাগবার কথা এবং আগেই অনুমান করা হয়েছে যে ১৭৭৬ সালের আগেই সম্ভবত হ্যালহেড ব্যাকরণ রচনা শেষ করে ফেলেছিলেন। (প্রতি পদেই অনুমানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে তবে এ-অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বোধ হয় না।) তাই ১৭৭৬ সালে অনুলিখিত 'কালিকামঙ্গল' পুঁথি ব্যাকরণ রচনাকালে হ্যালহেড বা তাঁর শিক্ষকের নজরে এসেছিল এ-অনুমান অসঙ্গত। যদি মনে করি এ পুঁথির কথা তাঁরা জানতেন তাহলে ধরতে হবে ১৭৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখা পুঁথি থেকে বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করে, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করে, বাংলা অক্ষর তৈরী করে ১৭৭৮ সালের জুলাই-অগাস্টে ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। হ্যালহেডের কাছে আলাদিনের প্রদীপ না থাকলে এ অসম্ভব সম্ভব হতে পারে না। তাই স্বীকার করতেই হবে 'ব্যাকরণ রচনাকালে ১৭৭৬ সালে নকল করা 'কালিকামঙ্গল' পুঁথি হ্যালহেডের হস্তগত হয় নি। ১৭৭৬ সালের আগের পুঁথি হ্যালহেডের কাছে ছিল, সেই পুঁথি থেকে তিনি 'বারমাস্যা' অংশ আলাদা কপি করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই প্রাচীনতর পুঁথিতে অন্নদামঙ্গল গোটাটা ছিল কিনা বলা যায় না তবে 'কালিকামঙ্গল' যে সম্পূর্ণ অংশই ছিল তার প্রমাণ পাই ব্যাকরণের উদ্ধৃতি থেকে। সুতরাং হ্যালহেডের ব্যাকরণের উদ্ধৃতিতে এবং 'বারমাস্যা' পুঁথিতে ভারতচন্দ্রের রচনার—শুদ্ধ কি অশুদ্ধ জানি না—প্রাচীনতম পাঠ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতচন্দ্রের রচনার একটি সামান্য অংশের প্রাচীতম পাঠ এবং বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ইংরেজী অনুবাদ একই সঙ্গে দেখতে বাঙালী পাঠকের কৌতূহল থাকতে পারে অনুমান করে মূল বাংলা এবং হ্যালহেডের অনুবাদ একই সঙ্গে এখানে মুদ্রিত হল।

বারমাস্যা

[illegible]
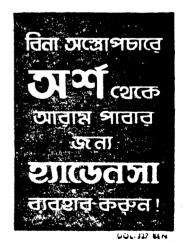
Baissaac in this kingdom is a time of much content. Various flowers bloom and the breeze gently blows. Reclining I will place my soul in the River. Who can go to sleep in the song of the nightingale.

[illegible]

In the month of Jaist ripe mangoes are plenty in this kingdom. Forsaking the water of Life Poornder desires to eat them. Having anointed with Agor my necklace of the flower moleeka I will make a breeze by fanning in the hot Cabin having awakened desire.

[illegible]

In Assar the new cloud makes a deep bellowing, to the widow it is like the angel of Death, to the married woman life. If in anger a woman hath turned her back upon her husband, having joined herself to him she takes hold of him at the noise of the storm.

[illegible]

In Shrabon night and day are of one length who can understood (sic) the secret of the scent of the lotus and waterlily the noise of the pouring rain is great and the forky ray of the lightening. You shall there see Snoonder the dance and croaking of the frogs.
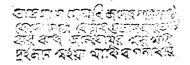
In Bhadro month you shall see the beauties of the River; mounting in a .... I will follow the ebb and flow; in the sweet dashing of the waves and the whistling of the breeze I will sleep together with you having taken you in my arms.

[illegible]

In Asween in this kingdom the idol Durga is celebrated who in your kingdom knows its figure? I will cause the Odes to come from Santipur in Nuddieae new and new odes I will cause you to hear.

[illegible]

In Kartech in this kingdom is the worship of Kaleeka. You shall see the idol called adda end less in powers the beginning of the cold season now comes little by little in your kingdom what are the pleasures there are they of ours.

[illegible]

There is much boiling of desire in the month of Agrian. The remedy of cold is to make cold your desire. Sweet victuals come up now full of sweetness sweet butter and cream like.... full of sweetness.
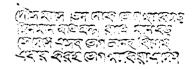
In month Poush all 3 worlds are powerful in eating the day is very short and the night long. In your kingdom you know what sweet victuals there are in plenty. This time eat of it staying in this kingdom.

[illegible]

The cold of Maug (coming from the mountain Heemali) is like the strength of the storm. The young infant stirs not without the house; by the dew (in) the lotus-thickets (are) deprived of life; quickly quickly the bow of the flower (i.e. desire) strikes with desire.

[illegible]

In the midst of the 12 months the month of Phalgoon is the strongest (in pleasure). From the wind (or the strong breeze) of Moleya the heart burns with the fire of desire. The voice of the nightingale and the humming of the beetle, burning the tree the leaves will come again what more shall I say.

[illegible]

The time of honey is much in the (honey) month of Cheytro I will cause you to know the varieties of enjoyment. It is your own house or the house of your wife's father. Behold reflecting upon this, o husband, there is a long amount.

উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রোতা

৬ই পৌষের দেশে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দু-একটি প্রশ্ন তুলেছেন। রাত জেগে সংগীত সম্মেলনে যাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনতে যান তাঁদের শিল্পরস গ্রহণ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন।

"আর্ট সবাইকে স্পর্শ করে না।........ যে কোন আকারেই হোক,—সেই আর্টের রসের একটা সার্বজনীনতা আছে। কিন্তু এখানে যত নারীপুরুষ এসেছে,—তাদের প্রায় সবারই কোন চিত্রপ্রদর্শনীতে দেখা যায় না এবং কেউই প্রায় কবিতা পড়ার ধার ধারে না—তাহলে শাস্ত্রীয় সংগীতের মত বিশুদ্ধতম শিল্পের প্রতি এদের অনুরাগ আসে কি করে?"

সুনীলবাবুর ধারণা যাঁরা সংগীত সম্মেলনে যান তাঁরা নিশ্চয়ই একই কারণে আর্ট এক্সিবিশনেও যান, চটকি আধুনিকদের কবিতার কাগজও পড়ার কথা। সুনীলবাবু যে সংগীত সম্মেলনের শ্রোতাদের অন্য কোথাও দেখেন না তাতেই অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, তারা সার্বজনীন মনোবৃত্তি থেকে নয়, সংগীত রসের আকর্ষণেই আকৃষ্ট হয়ে এসেছে।

আর্টের সার্বজনীনতা সম্বন্ধে সুনীলবাবুর ধারণার নির্ভুলতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সুরের কান যার আছে তারই ছবির চোখ থাকবে, এ একেবারেই অসংগত কথা, এর সপক্ষে দেওয়া কোন যুক্তি বা নজিরই নেই। বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের অনেকেরই সংগীতে আগ্রহ আছে বা ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁদের বোধ বা চেতনা অন্য যে কোন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মতই অকিঞ্চিৎকর। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার ক্ষমতা অনেক আছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

উচ্চাঙ্গের নৃত্যশিল্পী যাঁরা, ভরতনাট্যম, কথাকলি, ওড়িশি, প্রভৃতি ভঙ্গীতে যাঁরা নৃত্যবিশারদ, তাঁরা আধুনিক কবিতা পড়ে বোঝেন কিনা জানি না। তবে নিজের চোখে দেখেছি, যে বাঙালী দর্শক শম্ভু মিত্রের নাটক অভিনয় দেখে রস উপভোগ করেন সেই দর্শকই উচ্চাঙ্গ নৃত্য দেখে আবোল তাবোল মন্তব্য করেন। রবীন্দ্র সংগীতের রস গ্রহণে অভ্যস্ত বাঙালী যদি নৃত্যের রসবিচারেও অধিকারী হতেন তো রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের অংশ হিসেবে বা একক কোন রবীন্দ্রসংগীতের নৃত্যরূপ হিসেবে যে বস্তু বাংলাদেশে চলে আসছে তা কখনও সম্ভব হত না। আর্টের যে সার্বজনীনতাই থাক, শিল্পরস গ্রহণ ক্ষমতাটা চর্চা সাধ্য এবং চর্চার বিভিন্ন শিল্পরসের প্রতি অভিন্ন আগ্রহ আমাদের দেশে অন্ততঃ নিছকই মুষ্টিমেয় ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আবার সংগীত সম্মেলনের শ্রোতাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বেশীর ভাগই সংগীতরস নিবিড়ভাবে উপভোগ করছে না, হয় লোক দেখানোর জন্য এসেছে, নয় 'সংগীতের ভিতরকার অংকটাতেই মুগ্ধ', এ জাতীয় অনুমানের কোন প্রয়োজন দেখি না। সরাসরিই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, আমাদের দেশে যে সংখ্যক লোক আধুনিক কবিতা বা আধুনিক চিত্রকলা বোঝে বা ভালবাসে তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক লোক কবিতা বা চিত্রকলার প্রতি অনাগ্রহী হয়েও উচ্চাঙ্গ সংগীতে আগ্রহী ও তার রসগ্রহণে সমর্থ। কিন্তু এই ব্যাপারটা কি সত্যিই খুব আশ্চর্য হওয়ার মত? আমার তো মনে হয় না। এদেশে একটা ইতিহাসের ব্যাপার যে আমাদের দেশে চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কাব্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি শিল্পের ধারাই কয়েক শতাব্দী যাবং মজে মজে শেষ পর্যন্ত অপ্রাণ শুকিয়ে গেছিল। যদিন শুধু দুটি ধারা—একটি উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্যটি উচ্চাঙ্গ নৃত্যের। সমস্ত নৃপতি-দের অনুগ্রহে লালিত ওস্তাদেরা, দেশাদের বাইজীরা এবং দক্ষিণ ভারত ও ওড়িশার দেবদাসীরা যত ক্ষীণ প্রবাহেই হউক এই দিকধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আজ আবার অনাবিল দর্শক ও শ্রোতাদের আনুকূল্যে এই দুই শিল্পের থাতে নতুন করে জোয়ার বইছে, কিন্তু যা লক্ষণীয় তা এই যে এদের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে কোন বাইরের শিল্পধারণা বা প্রেরণার অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে দেখি স্থাপত্যে কোন পুনরুজ্জীবন ঘটেই নি, সাহিত্যে চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্যে ঘটেছে বটে কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন হয়েছে প্রচুর পরিমাণে ইউরোপীয় জীবন-বোধ তথা শিল্পধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানোর। আমি একেবারেই "মর্ডান আর্ট" বা **আধুনিক কবিতার বিরোধী নই,** তবু ঘটনা হিসেবে অনস্বীকার্য যে আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য এবং আধুনিক কবিতা আমাদের জীবনে এখনও মূলপ্রবেশ করাতে পারেনি। আধুনিক কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁরা নিজেরাই কতিপয় বন্ধুবান্ধব সহ পরস্পরের লেখার তারিফ করে থাকেন। চিত্রকলা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কফি হাউসের আলোচনায় বা আর্ট একজিবিশনের ভীড়ে সেই কারণে আসলের সঙ্গে অনেক মেকীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রোতাদের মধ্যে সেই অনুপাতে মেকীর সন্ধান না করলেও চলতে পারে। তিনিকটা যেহেতু আমাদের জীবনের গভীরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত সেই হেতু সহজভাবেই স্বাভাবিকভাবেই তার আবেদনের প্রসার কবিতা ও চিত্রের থেকে অনেক বেশী। আধুনিক বাংলা কবিতা এবং আধুনিক ভারতীয় কলা আমাদের মনের গহনতম প্রদেশকে যতটা স্পন্দিত করাতে পারে অনাধুনিক উচ্চাঙ্গ সংগীত তাকে আরও অনেক বেশী আন্দোলিত করে এটা রসিকজন মাত্রেই স্বীকার করবেন। এর থেকে কবিতার চেয়ে সংগীত শ্রেষ্ঠতর আর্ট কিনা এ জাতীয় তত্ত্বের উপস্থাপনা না করলেও চলে।

সুনীলবাবু আর একটা প্রশ্ন তুলেছেন, এনায়েত খাঁর ছেলে বিলায়েত, আলাউদ্দীনের ছেলে আলি আকবর এঁরা কি করে হলেন, প্রতিভা কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য বস্তু নাকি? চিত্র এবং কবিতার জগতের কথাই সবসময় ভাবছেন বলে সুনীলবাবুর ধাঁধা লাগছে, কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বংশ পিতৃ-পুরুষের ধারায় প্রতিভা চালিত হয় না, কিন্তু কবিতা বা চিত্রকলার মত সহজেও প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় না। যাঁরাই গবেষণায় গভীর কাজ করেছেন দেখা যাবে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ কোন গবেষণাগারে শ্রেষ্ঠ এক বা একাধিক বৈজ্ঞানিকদের ছাত্র হিসেবে তৈরি হয়েছেন। প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলনের সুযোগ না পেলে সে প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। যে কোন সৃষ্টির কাজে, তা আর্টেরই হউক আর বৈজ্ঞানিক গবেষণারই হউক, শিক্ষা ও অনুশীলনের কতটা অবদান থাকবে আর প্রতিভারই বা স্থান কি হবে তা এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে ভিন্ন হবে। যে শিল্পে প্রকরণের স্থান যত বেশী হবে সেই শিল্পে শিক্ষার প্রয়োজনও সেই অনুপাতে বেশী হবে। গল্প কবিতা লেখার মধ্যে প্রকরণ শিখবার প্রায় কিছুই নেই, কবিতা লেখার

ষ্ঠানের মহান দায়িত্ব ও কৃতিত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না, তাঁরা হলেন কলকাতা বেতার কেন্দ্র ও গ্রামোফোন কোম্পানি। এঁদেরই শ্রদ্ধান্বিত প্রয়াসে রবীন্দ্রসংগীত আজ সর্বত্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথ না-পড়া সাধারণ বাংলাভাষীর ঘরে ঘরেও অনায়াসে পৌঁছে গেছে।

বেতারে যে সব শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করে থাকেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অনুশীলিত। তাঁদের গীত প্রচারের স্বাধীনতায় বেতার কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করলে হয়ত শ্রীরায় উল্লেখিত বহু বিড়ম্বনা রোধ করা যেত। নিঃসন্দেহে নির্বাচনের ভালোমন্দ আছে। কিন্তু কথা বিশেষের প্রতি স্পর্শকাতর হয়ে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের অনিবার্যতা অনেকের কাছে অবান্তর মনে হতে পারে। তাহলে গভীর রাত্রের গানগুলি কোনদিনই শোনা সম্ভব নয়। আর বৃষ্টি না পড়লে বর্ষার গান নিষিদ্ধ! কলকাতার শিল্পী যখন ঘনবর্ষায় গান গাইলেন, সেই মুহূর্তে রৌদ্রালোকিত বর্ধমানে বসে তা শুনে আমি কি রবীন্দ্রসংগীতের বিড়ম্বনায় মূর্ছিত হব? কোনো শিল্পীর কয়েকখানি গান সকালবেলায় বাজাতে হলে ভোরের গানই বাজাতে হবে? সে গানের রেকর্ড তাঁর না থাকলে সকালে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের অধিকার তাঁর নেই?

রবীন্দ্রসংগীতের সতর্ক শুদ্ধ ব্যবহার হোক, আমরা সকলেই চাই। তবু এত শুচিবায়ুগ্রস্ততায় আতঙ্কিত হওয়ার কথা।

ভাস্কর বসু
কলকাতা-২৯

সুনন্দর জার্নাল

৪ঠা জানুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় সুনন্দর জার্নালে ফারসী শব্দের উল্লেখ আছে যথা 'ওরা চামনেভ্‌', এর প্রথমটি ঠিক কিন্তু তারপর হবে 'এমনি অশুদ্ধ'।

শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলকাতা-৪০

হাউ ইজ দ্যাট

"দেশে"র বিনোদন সংখ্যায় শ্রীদিলীপ দত্তর "হাউ ইজ্‌ দ্যাট" শিরোনামায় যে ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়েছেন সেগুলি খুবেই চিত্তাকর্ষক। এই প্রসঙ্গে আর একটি "হাউ ইজ্‌ দ্যাট" ঘটনার কথা মনে পড়ছে যা আমি শ্রীবিজয় মার্চেন্ট লিখিত একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম।

সেবার শ্রীমার্চেন্টের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়েছিলেন। একদিন একটি কাউন্টি দলের সংগে খেলা হচ্ছে। বল করছেন মানকড়। কিছুক্ষণ বল করার পর তাঁর মনে হলো যে, তাঁর দিকে যিনি আম্পায়ার আছেন তিনি খুব চালাক চতুর নন এবং কেমন যেন নিজের উপর আস্থা রেখে খেলা পরিচালনা করতে পারছেন না। ওভার শেষ হলে তিনি ব্যাপারটি মার্চেন্টকে বললেন। ঠিক হলো আম্পায়ারটিকে একটু পরীক্ষা করতে হবে। প্রতিটি ভারতীয় খেলোয়াড়কে বলে দেওয়া হলো যে, পরের ওভারে মানকড় যখন বল দেওয়া আরম্ভ করবেন তাঁর প্রথম বল ব্যাটসম্যান যে ভাবেই খেলুক না কেন সকলে এক সংগে "হাউ ইজ দ্যাট" বলে চেঁচিয়ে উঠবেন। তারপর দেখা যাবে আম্পায়ার কি করেন। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত। মানকড় বল করছেন এবং ব্যাটসম্যান ভালোভাবেই খেলেছেন। কিন্তু পূর্ব নির্দেশমত সব কজন ভারতীয়

খেলোয়াড় এক সঙ্গে "হাউ ইজ দ্যাট" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত আম্পায়ারটি হাত তুলে আউটের নির্দেশ দিলেন। ব্যাটস্‌ম্যান হতচকিত, তিনি ভেবে পেলেন না কি করে তিনি আউট হতে পারেন। অথচ বলার কিছু নেই, তিনি প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরে চললেন—এদিকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে হাসির ধুম লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত মার্চেন্ট গিয়ে ব্যাটস্‌ম্যানটিকে ফিরিয়ে আনলেন এবং আম্পায়ারকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে আবার উক্ত আউট ব্যাটস্‌ম্যানটিকে দিয়ে খেলা শুরু করবার অনুরোধ জানালেন। খেলাটি পুনরায় আরম্ভ হয়েছিল তবে আম্পায়ারটির অপ্রস্তুত ভাব অনেকক্ষণ কাটেনি।

শ্রীসমীর বসু
হাওড়া

হিন্দীর সাম্রাজ্যবাদিতা

গত ৪ঠা জানুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রঞ্জনের "কিছু মনে করেন নি তো? করেছি" প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানাই। শুধুমাত্র শুষ্ক ধন্যবাদ জানানো হয়তো যথেষ্ট নয়, এই লেখাটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনার জন্য অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতাটুকুই লেখকের প্রাপ্য। হিন্দীর আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদিতা আজ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে যে, এর বীজ এখনই সমূলে উৎপাটন না করলে অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। হিন্দীর এই ভাষাগত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে দাক্ষিণাত্যের সাধারণ মানুষ, ছাত্রসমাজ। এই ভাষার লড়াই মাদ্রাজে নিয়ে এসেছে রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতার পরিবর্তন। কিন্তু, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বিপ্লববাদের পীঠস্থান বাংলাদেশে বিরাট আন্দোলন তো দূরের কথা, কলকাতার দেওয়ালে বালখিল্য দলের সামান্য কয়েকটি 'স্লোগান' ছাড়া আর কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বাংলাদেশের এই আশ্চর্য নীরব ভূমিকা কি বাঙ্গালীর 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের' প্রতিফলন?—সঠিক জানিনা। বাংলাদেশের ভেতরে হিন্দীর নীরব গোপন অনুপ্রবেশ দেখে ক্ষুব্ধ, আন্দোলিত ক্রুদ্ধ হচ্ছি, কিন্তু অন্যদিকে বাংলাদেশের নিস্পন্দ নিথর ভূমিকা দেখে ব্যথিত চিত্ত। বাংলাদেশের বেতারে আজ হিন্দীগানের ছড়াছড়ি, বাংলা সাহিত্যবাসরের চেয়ে হিন্দী সাহিত্যবাসরের সময় বেশি। আকাশবাণীর 'বিবিধ ভারতী' অনুষ্ঠান কার্যত 'হিন্দী ভারতী'তে পরিণত হয়ে হিন্দীপ্রেমীদের কুক্ষিগত হয়েছে। বাংলাদেশের রেলস্টেশনগুলিতে বড় বড় হিন্দী হরফে স্টেশনের নাম সগর্বে ঘোষিত হচ্ছে, তবু বাঙ্গালীর চৈতন্যোদয় হয়নি। হয়তো বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্যের দেশ, তাই বাঙ্গালীর মনের কথা "মেরেছিস কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না!" ১৯৫৪-৫৫ সালে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সময় ধলভূম-মানভূম, ধানবাদ, পূর্ণিয়া জেলার বিরাট বাংলা-ভাষী অধ্যুষিত যে বিরাট অঞ্চলের বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সমীচীন ছিল, নয়াদিল্লীর যে কু-চক্রান্ত নেপথ্যের কারসাজিতে সমস্ত সুবিচার যে গলা টিপে হত্যা করা হ'ল, তার খবর খুব কম বাঙ্গালীই রাখেন। মানভূমের (অধুনা পুরুলিয়া জেলা) কিছুটা অংশ কাটছাঁট করে বাংলাদেশকে ভিক্ষে দিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হ'ল। অথচ অন্যদিকে সিংভূম (ধলভূম সহ), ধানবাদ ও পূর্ণিয়া জেলার বিরাট বঙ্গভাষী অঞ্চল বিহারে পড়ে রইল। এই সমস্ত অঞ্চলের বঙ্গভাষী জনসাধারণ আজ বিহারে হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত। বাংলা-মাধ্যম স্কুলগুলি এক সুদূরপ্রসারী গভীর চক্রান্তে হিন্দী-মাধ্যম স্কুলে পরিণত হচ্ছে। ভাবতে কষ্ট হয় এখানকার স্কুলে ছাত্রের দল বাংলাভাষী, অধিকাংশ শিক্ষকও তাই, অথচ এক আশ্চর্য নিয়মে শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী। কারণ শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী না হলে সরকারের অর্থানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা-লাভ করার সংবিধানগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশের এই অবজ্ঞাত, অবহেলিত জনগণ। অথচ বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজ, রাজনৈতিক সমাজ, ছাত্র সমাজ এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে অনুচ্চার ও অনভিজ্ঞ। কলকাতার কোন রাজনৈতিক সভায় অথবা পত্র পত্রিকায় এই বিস্তৃত বঙ্গভাষী-অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে সামান্যতম আলোচনা হতে শুনিনি। আমি সবচেয়ে বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলাম যেদিন কলকাতার এক সংস্কৃতিবান ভদ্রলোক (স্বক্ষেত্রে সুপরিচিত) আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, পুরুলিয়া জেলা বাংলাদেশে না বিহারে। সখেদে বলেছিলাম, পুরুলিয়ার লোক আমার-আপনার মতই বাঙ্গালী। তারা একই বাংলা ভাষায় কথা বলে, তারা আমার আপনার মতই পৌষ সংক্রান্তির দিন নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে। শুধু তারা চায় আপনারা কলকাতার লোক তাদের কথা একটু ভাবুন, তাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলুন। এরা আপনাদের শুধুমাত্র 'ভাই' ডাকের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরুলিয়া

"লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙ্গালীর সাধনা"

গত ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৯ সালের দেশ পত্রিকায় "লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙ্গালীর সাধনা" বিভাগে ধাতু রপ্তানি ও আমদানিতে বাঙ্গালীর সহায়তা সম্পর্কে বিশ্বকর্মার আলোচনা পড়ে ভালো লাগলো। এ বিষয়ে আমার একটু বক্তব্য আছে।

উনি এক জায়গায় লিখেছেন, বাঙ্গালীর মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ খনি কেবল আছে শ্রীবিভূতি মিত্র, শ্রীশৈলেন সেন এবং স্বর্গীয় নৃপেন রায় মহাশয়ের। এই তথ্যটি একটু ভুল। তাঁর অবগতির জন্য জানাই যে, অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীকাকুলম জেলাতে China Ravyam (চিন্না রাভমে) এবং China Bantapalli (চিন্না বান্টাপল্লীতে) এক বাঙ্গালী আমার পিতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের (Late S C Bhadra) ম্যাঙ্গানীজ খনি আছে। উনি ১৯৪৯ সালে খনির কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর দুই ছেলে শ্রীক্ষিতীশ ভদ্র এবং শ্রীঅজিত ভদ্র আজও খনির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে শ্রদ্ধেয় সতীশ ভদ্র প্রতিষ্ঠিত একটি ছোটখাট ধাতুর মান নির্ণয়ের ল্যাবরেটরী ভিজিয়ানাগ্রামে আছে। তিনি প্রথম জীবনে অধুনাবিলুপ্ত এক ইউরোপীয়ান ফার্ম Vizianagram Mining Companyর কেমিস্ট ছিলেন। পরে চাকুরী ছেড়ে একক ভাবে এই ল্যাবরেটরী স্থাপন করে স্থানীয় খনির মালিকদের ধাতুর মাননির্ণয় করা আরম্ভ করেন। তারপর তাঁর অকালমৃত্যু এবং ম্যাঙ্গানীজ ব্যবসায়ের মন্দাগতির জন্যই উক্ত ল্যাবোরেটরীর আর সম্প্রসারণ হয়নি। বর্তমানে ল্যাবরেটরীর কেমিস্ট শ্রীক্ষিতীশ ভদ্র বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যবসাবাণিজ্যে অধিকাংশ বাঙ্গালীর আজও বিরাগ এবং উদাসিক ভাব রয়েছে। এতে সার্থক বাঙ্গালীর কৃতিত্ব খুব কমই ইতিপূর্বে প্রচারিত হয়েছে। তাই বাঙ্গালীর শিল্পে বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভের গৌরব-ইতিহাস, আপনার পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচারার্থে বিশ্বকর্মার অবদান প্রশংসনীয়। এতে অনেক বাণিজ্য ইচ্ছুক বাঙ্গালী বিভ্রান্তি কাটিয়ে অনুপ্রেরণা পাবেন নিশ্চয়ই।

আপনারা প্রকৃতই ধন্যবাদার্হ

নীলিমা ভদ্র
ভিজিয়ানাগ্রাম অন্ধ্রপ্রদেশ।

রঞ্জন

কমনওয়েলথের মতো বায়ুভূত নিরাশ্রয় পদার্থ বা প্রকল্প সম্বন্ধে আমার সন্দিগ্ধতা আজন্ম। আগে ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ। গেল ব্রিটিশ, অর্থাৎ চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটল এই অংশতঃ বিমূর্ত প্রতিষ্ঠানের। ব্রিটিশ রাজতন্ত্র পরে আলিঙ্গন করল ভারতীয় লোকতন্ত্রকে: বিবাহের ঘটক ছিলেন শ্রীজবাহরলাল নেহরু। ঘটক কেন, এমন একটা সময় ছিল যখন নেহরুকেই বর বলে ভুল করা আদৌ শক্ত ছিল না। কনে যে কঠিনতর ধাতুতে গড়া তার বিবিধ প্রমাণ সম্প্রতি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত সংগত যদিও একান্তই স্বীয় কারণেই ব্রিটেন আজ য়ুরোপীয় কমন মার্কেটে কোনো মতে স্থান করে নিতে অধৈর্য, পাগল পারা। ব্রিটেনের যানবাহন, হাসপাতাল ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে বহিরাগত বিশেষজ্ঞ বা অন্যান্য কর্মী না থাকলে। তাই বলে কমনওয়েলথের সবাই আসবে মাতা ব্রিটেনের কোলে? হায়, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী। বাণিজ্যিক সম্বন্ধ আমদানি রপ্তানির অমোঘ আইনের শাসনে, কত সস্তায় কেনা যায় আর কত আক্রায় বেচা যায়। ও যে মানে না মানা। কমনওয়েলথী ভাবালুতা এখানে একেবারেই অবান্তর।

তাহলে রইল কী এই পোড়া কমনওয়েলথের? বার্ষিক একটা প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন। যেমন ইন্দিরা গান্ধী সেদিন একটায় যোগ দিয়ে এলেন। যোগ? শ্রীমতী গান্ধীর লণ্ডনযাত্রার পূর্বেও যোগের চাইতে বিয়োগের সুরই প্রবল ছিল। কোনো কোনো অঞ্চলে কমনওয়েলথ বর্জনের দাবিও অশ্রুত থাকেনি। কমনওয়েলথ কখনোই সাত্য একান্নবর্তী পরিবার ছিল না। অনেক সদস্য অনেকবার নিরন্ন থেকেছে যখন ব্রিটেন ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা। তবু ওদেশে একটা রকমের অনুকম্পা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলতম রত্নের জন্য। আজ সে সাজানো বাগান শুকিয়ে যেতে বসেছে। আর্তনাদের প্রয়োজন নেই কিন্তু প্রণিধান করা প্রয়োজন যে এক বিশাল অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কমনওয়েলথ নামক একটি ক্রীড়নক নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট কালযাপন করলেন লণ্ডনে। অন্যান্য আবশ্যিক পরিবারগত কাজ ছিল কিনা জানিনে, কিন্তু কমনওয়েলথী যৌথ পরিবারে শ্রীমতী গান্ধীর সযত্নসঞ্চিত শাড়িগুলি অষ্টাদশশাখাসম্বলিত গৃহের প্রাকারের সহস্র ভগ্নোন্মুখতা আবৃত করতে সমর্থ হয়নি। সত্য বলতে কি, বর্তমান কমনওয়েলথে হার্দিক উদারতা বহুলাংশে সংকুচিত হলেও শঙ্কা সীমিত হোতো যদি চিন্তাগত দৈন্য এমন হৃদয়বিদারকরূপে সার্বজনীন না হোতো।

ব্রিটেনের সামর্থ্য নেই নেতৃত্ব দেবার। সে যে নিজে দীন। দীনতর ভারত। নেহরু এই মঞ্চে ছিলেন কৃশ কলস্টাফ। ক্যানাডা আর অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যে সমঝে নিয়েছে যে আমেরিকা ছাড়া ওদের গতি নেই। আফ্রিকার দেশগুলি বদ্ধপরিকর যে সাদা আদমিগুলোকে এখুনি তাড়াতে না পারলেও এই ব্রাউন বংশকে নির্বংশ করতেই হবে। তা ওরা কমনওয়েলথের সদস্য হোক বা না হোক। এমন সার্বিক প্রতিশোধের ঐতিহাসিক কারণ অনেক। সবগুলির জন্য প্রবাসী ভারতীয়রাই শুধু দায়ী নয়। কিন্তু ওরা না শোনে ওরা যাকে বলবে অধর্মের কাহিনী। তবু আছে লণ্ডন, আছে কমনওয়েলথ, আছে মিলনবিরহব্যথা। একমাত্র রাষ্ট্রসংঘ ছাড়া এমন সংস্থা নেই যেখানে মুড়ি মুড়কির এক দর, অর্থাৎ সাম্য প্রবহমান। পাকিস্তান ভারতকে শাসাতে পারে আর জাম্বিয়া ব্রিটেনকে যা খুশি বলতে পারে। সুকুমার রায়, আপনার এখন বেঁচে থাকা উচিত ছিল! রাষ্ট্রসংঘ বা কমনওয়েলথের অপর নাম আবোল-তাবোল, যদিও ওরা অত সোজা নয় আর নয় অত মজার।
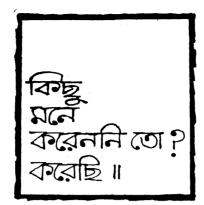
ঈদৃশ নিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও আচিরেই আমি যোগ করতে বাধ্য যে ভারতের সাম্প্রতিক সংখ্যাতীত দুর্ভাগ্যের বৃহত্তম নয় কমনওয়েলথে স্তিমিত অবস্থান। কমনওয়েলথ থেকে কী পেয়েছি আর কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে আমি আদৌ রাজী নই। হতে পারে, দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী বা vice versa। কাশ্মীর প্রসঙ্গ না উত্থাপন করলেও কমনওয়েলথ সম্পর্কের প্রচণ্ড অর্থশূন্যতা প্রায় প্রত্যেক ভারতীয়ের চক্ষে নগ্নরূপে প্রকট। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লণ্ডনে বা মস্কোতো যান নানান কারণে। বার্ষিক কমনওয়েলথ কনফারেন্স তো একটা পৌষমেলা, শান্তিনিকেতনে না হয়ে লণ্ডনে। প্রধানমন্ত্রীর গতিবিধি রাজনীতি ও অন্যান্য শতাধিক নীতি বা অনীতির নিয়মে গাঁথা। তবু কমনওয়েলথ সম্বন্ধে বহুসংখ্যক ভারতীয় আজ পর্যন্ত স্নেহপরায়ণ. ভক্তির পরিমাণ যদিও নিয়তই সংকোচনশীল।

নির্দ্বিধায় স্বীকার করব যে এই মোহমুক্ত ভক্তদের আমি একজন। হ্যারল্ড উইলসনের নানা কারসাজি আমার কাছে একেবারেই অসহ্য। ব্রিটেনকে আমি গ্রেট বলে মনে করিনি অনেক দিন থেকে, যদিও ব্রিটিশ জাতির সাময়িক বা স্থানীয় অপলাপের জন্য তার সামগ্রিক চরিত্রগুণকে কখনো হেয় জ্ঞান করিনি। আমি ব্রিটেন সম্বন্ধে কী ভাবি বা ব্রিটেন আমার সম্বন্ধে কী ভাবে তা ইতিহাসে অপাংক্তেয়। কমনওয়েলথ বৃহত্তর প্রসঙ্গ। আমি ভারতের কমনওয়েলথে অন্তর্ভুক্তির সমর্থক একেবারেই এই সহজ কারণে যে আমি আমার ঘরের জানালাগুলো খোলা থাকলে খুশী হই আর বন্ধ থাকলে ক্রুদ্ধ হই। এমন সহজ ও ব্যক্তিগত কারণ গাম্ভীর্যহীনতার জন্য ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়।

বলতে বাধা নেই যে সাংবিধানিক মুক্তিময়তা সত্ত্বেও ভারতের বর্তমান আবহে কোথায় যেন রয়েছে একটা অদৃশ্য শৃঙ্খল। বাতাসে অক্সিজেনের চাইতে নাইট্রোজেনের ভাগটাই যেন বেশী। এমন পরিবেশে সহসা যখন শুনি যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লি ছেড়ে লণ্ডনে উড়ে যাচ্ছেন তখন অক্ষমনীয় অপব্যয়ের প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়ে হৃদয় কিঞ্চিৎ উত্তোলিত হয়। প্রায় যেন মেটারলিংকের নীল পাখি। এই জানালাটা অন্তত খোলা থাক।

এই জানালাই একদিন বন্ধ করে রেখেছিল সারা অব্রিটিশ জগত। নেহরুর কৃতিত্ব স্মর্তব্য যে তিনি শুধু কমনওয়েলথের জানালা খোলা রাখেননি; তিনি গোটা দরজা খুলে দিয়েছিলেন নয়া রাশিয়া আর চীনের উপর। দুদিকেই দৃষ্টি বহুধা ব্যাহত হয়েছে কিন্তু দ্বারোন্মোচনের প্রাথমিক হৃদয়প্রসারতা, পরে প্রত্যাঘাত পরস্তুপের প্রত্যঙ্গ। রাশিয়া বা চীন বা আমেরিকার সঙ্গে কখনো কখনো মন কষাকষি হলেও ওই দেশগুলি সম্বন্ধে ভারত আজ আর অজ্ঞ বা উদাসীন নয়। কমনওয়েলথ আজও পৃথিবীর বৃহৎ একটা অংশ। ভারত তার ভগ্নাংশ থাকলে মোক্ষলাভ হবে এমন বলিনে। কিন্তু ওই বিলিতি বটতলা থেকে অসতর্ক অথবা উত্তেজিত নিষ্ক্রান্তিতে নিহিত থাকতে পারে আমাদের সকলের আত্মিক সংকোচনের আশঙ্কা। হিন্দুয়ানি আর হিন্দিয়ানির দ্বৈত দৌরাত্ম্যে নানাবিধ সংকীর্ণতা আজ আবার ঘিরে আসছে যখন বলতে হয়ঃ "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া"। এই নির্গমের একটা পথ এখনও কমনওয়েলথ।

গীওম অ্যাপোলিনেয়ারের প্রেমিকা

এই পত্রিকার গত সংখ্যায় কমলেশ চক্রবর্তী অ্যাপোলিনেয়ার-এর একটি অনবদ্য জীবনী লিখেছেন। প্রখ্যাত ফরাসী কবিদের মধ্যে র‍্যাঁবো ও বোদলেয়ার যতখানি পরিচিত এই বাংলাদেশে, অ্যাপোলিনেয়ার ততটা নন, যদিও সাধারণভাবে বাংলা কবিতার মূল সুরের সঙ্গে প্রথমোক্ত কবিদ্বয়ের বদলে অ্যাপোলিনেয়ারেরই মিল বেশী। অ্যাপোলিনেয়ার মধ্যযুগীয় সঙ্গীত মাধুরীর সঙ্গে মিশিয়েছেন আধুনিক চিন্তা ও প্রকরণ, ফলে তাঁর কবিতায় সব সময় রিনরিন করছে গীতি কবিতার লহরী যা বাঙালীদের বড় প্রিয়।

কমলেশবাবু কিন্তু অ্যাপোলিনেয়ারের প্রথম প্রেমিকা সম্পর্কে খানিকটা অবিচার করেছেন। ইংরেজ মেয়ে অ্যান প্লেডেন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন জাতগোত্রহীন অ্যাপোলিনেয়ারকে। এটাকে তিনি বলেছেন, 'বৃটিশ গোঁড়ামি'। সচরাচর মেয়েরা কবিদের পছন্দ করে না। তা ছাড়া, যে কোনো একজন যুবক কবির মতন ভাগ্যহীন, লক্ষ্মীছাড়া, অকিঞ্চিৎকর প্রাণী সারা পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। তখন সে বাপ-মায়ের কাছে নিন্দিত, সমাজে তিরস্কৃত, উপার্জনের পথ নেই, লেখা ছাপা হবার সুযোগ নেই—সে যে এই বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা—একথা সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ জানে না—মেয়েরা এরকম যুবাকে কেন পছন্দ করবে? পরে নামটাম হলে অন্য কথা! তাছাড়া অ্যান যদি অ্যাপোলিনেয়ারকে বিয়েই করতো শেষ পর্যন্ত তাহলেই কি আমরা খুব একটা খুশী হতাম? অ্যানের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে অ্যাপোলিনেয়ার লিখেছিলেন—লা সাঁজো দু মাল এমে (দি সং অব দি ইল-লাভ্‌ড—মন্দ-প্রেমিকের গান)—ফরাসী সাহিত্যে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বে এমন প্রেম-বিষয়ক কবিতা খুব কমই লেখা হয়েছে। অ্যানকে বিয়ে করলে কি আর অ্যাপোলিনেয়ার ঐ কবিতা লিখতেন?

তাছাড়া অ্যানের দোষ ছিল কতখানি? সে সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার জানাই।

সাংবাদিকদের তো আর মতলবের অভাব নেই। ১৯৬৩ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিক আমেরিকার এক ছোট শহরে আবিষ্কার করেছিলেন অ্যান প্লেডেনকে। ফলাও করে ছাপা হয়েছিল সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ। অ্যানের বয়েস তখন আশির কাছাকাছি, লোলচর্ম এক বৃদ্ধা, নিজের বোনের সঙ্গে একটা ছোট বাড়িতে থাকেন। তাঁকে দেখে তখন কল্পনা করাই যায় না, এঁর জন্যই একদিন উন্মত্ত হয়েছিল এক দুর্ধর্ষ কবি। কিংবা কল্পনা করাও যায়—কেননা পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল অ্যানের যৌবন ও বার্ধক্যের ছবি—যৌবনে এই নারী ছিলেন সত্যিকারের রূপসী—মর্মর শুভ্র মুখ, আধো-ডোবা চাঁদের মতন থুঁতনি, দ্রাক্ষা-কুঞ্জের মতন চুলের গোছা। সাংবাদিকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মাদাম, আপনি কি জানেন, আপনাকে নিয়ে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা লেখা হয়েছে? অ্যান জানেন না। আপনার কি মনে আছে সেই ছোকরা কবির কথা? প্রথমে তিনি মনে করতে পারেন নি, অনেক কষ্টে স্মৃতির মধ্যে ডুবুরি পাঠিয়ে উদ্ধার করলেন দু'এক টুকরো, তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু সে ছেলেটা বোধ হয় পাগল ছিল!

আসলে এসব ক্ষেত্রে সেই বঞ্চিত, নিরাশ কবির প্রতিই আমাদের সহানুভূতি যায়। কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল এই : অ্যান নিজে ফরাসী ভাষা ভালো জানতেন না। ফরাসী কবিতা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল না—ফলে তাঁর প্রেমিকের প্রতিভা সম্পর্কেও অবহিত হবার কোনো উপায় ছিল না। অ্যাপোলিনেয়ারও ইংরেজি জানতেন নিছক ভাঙা ভাঙা—ফলে দুজনের কেউ কারুকে মনের কথা বোঝাতে পারতেন না ভালোভাবে। রূপমুগ্ধ কবি ছুটে এসে অ্যানের হাত জড়িয়ে ধরে কি বিড়বিড় করে বলতেন, তা কুপ্রস্তাব না সুপ্রস্তাব বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতেন অ্যান। অ্যানকে ধাওয়া করে লন্ডন পর্যন্ত ছুটে আসেন অ্যাপোলিনেয়ার—সেখানে ইন্টারপ্রেটার হিসেবে এক বন্ধুর সাহায্য নেন—কিন্তু তাতেও কিছু সুবিধে হয়নি। লন্ডনে অ্যানদের বাড়ির উল্টোপিঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন অ্যাপোলিনেয়ার—শেষ পর্যন্ত অ্যানের দাদা একদিন তাঁকে খুব ধাতানি দিয়েছিলেন। প্রেমিকার দাদা সম্পর্কে কোনো প্রেমিকেরই তেমন সুমনোভাব থাকে না—অ্যাপোলিনেয়ার তো অ্যানের দাদাকে রাস্কেল, বদমাস ইত্যাদি যা খুশী বলেছেন। মনে করুন 'দি সং অব দি ইল-লাভ্‌ড' কবিতা, যার আরম্ভ এই রকম :

এই পাড়া আমি গেয়েছিলাম
১৯০৩-এ, তখন জানতাম না
আমার ভালোবাসা ফিনিকস পাখির মতন
যদি তার মৃত্যু হয় এক সন্ধ্যায়
পরের প্রভাতে তা আবার পুনর্জীবিত
হয়ে ওঠে।

লন্ডনে এক কুয়াশাময় সন্ধ্যায়
এক রাস্কেল এসেছিল আমার কাছে
তার সঙ্গে আমার প্রেমিকার চেহারার
মিল—
সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো
আমি লজ্জায় চোখ নিচু করলাম

সেই বদমাস ছেলেটার পিছন পিছন
আমি গেলাম
সে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে
সিটি দিচ্ছিল
দু' পাশে হর্ম্যের সারি, লোহিত সাগরের
বিভক্ত ঢেউয়ের মতন, আমাদের মনে
হচ্ছিল
ও যেন হিব্রুর দল—আমি ফারাও

যদি সত্যিকারের ভালোবাসা না পাও
তা হলে এই ইট কাঠের ঢেউ
ভেঙে পড়ুক....

আমি পাঠক মাত্র, কবিতা অনুবাদ আমার সাধ্যাতীত, যোগ্য ব্যক্তির জন্য সে কাজ তোলা থাক। এর একটু পরেই শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্মন্তের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি অনূদিত হলে বাংলা কাব্য ধনী হবে।

অ্যাপোলিনেয়ার আত্মজীবনী লেখেননি—কিন্তু তাঁর একটি উপন্যাস—কমলেশবাবু যেটার উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন, 'একজন কবির হত্যাকান্ড'—তাতে তাঁর নিজের জীবনের আভাস আছে। অ্যাপোলিনেয়ারের বিড়ম্বিত জীবন কিন্তু অনেক মজার ঘটনায় ভরা। খুব মোটাসোটা বড় চেহারার পুরুষ ছিলেন, কবিতা লিখতেন সূক্ষ্ম, অথচ ছিলেন ভোজন বিলাসী, হুল্লোড় এবং জামা কাপড়ের শৌখিনতার দিকে বেশ মনোযোগ ছিল। একবার সন্ধেবেলা এক পার্টিতে যাবেন, কিন্তু সাজগোজের সময় টাই খুঁজে পাচ্ছেন না কিছুতেই। টাই না পরে কিছুতেই যাবেন না। সমস্যার সমাধান করে দিলেন এক শিল্পী বন্ধু। অ্যাপোলিনেয়ারের জামার ওপর কালো কালি দিয়ে একটা টাই এঁকে দিলেন। সেই অবস্থায় দিব্যি চলে গেলেন কবি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অ্যাপোলিনেয়ার ছিলেন একটি বিশাল চেহারার শিশু।

জীবিত অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব এবং রসিক মহলেই পরিচিত ছিলেন অ্যাপোলিনেয়ার। তাঁর মৃত্যু জনতার কাছে প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছে। জনপ্রিয়তা ও আড়ম্বরের প্রতি তাঁর বেশ লোভ ছিল, কিন্তু বেঁচে থাকতে তা বিশেষ পাননি। তাঁর মৃতদেহ যেদিন নিয়ে যাওয়া হয়,

তার পরদিন আরমিস্টিস—সমস্ত প্যারিস শহর উৎসবে সেজেছে—তাই নিয়েই সবাই মত্ত, আপোলিনেয়ারের শোকযাত্রার কথা প্রায় কারুরই মনে পড়েনি। পল বেয়ারার যা শ্মশানবন্ধু হিসেবে ছিলেন পিকাসো, মাক্স জেকব, ব্রাক—প্রভৃতি তখনকার অল্প পরিচিত—একালের মহারথী শিল্পী-সাহিত্যিকরা। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে, কফিনের পাশে এসে পিকাসো ফিসফিস করে বলেছেন, গীয়ম, গীয়ম! একবার চেয়ে দ্যাখো! তোকে সম্মান জানানোর জন্য সারা প্যারিসে কত আলো আর ফুলের মালা!

সুররিয়ালিস্টদের আন্দোলন শুরু হয় আপোলিনেয়ারের মৃত্যুর পর। কিন্তু ঐ শব্দের স্রষ্টা ও আধুনিকতার পুরোধা হিসেবে তিনি বন্দিত হয়েছেন। আধুনিকতার নামে অতি সীরিয়াস ভঙ্গি বা গোমড়ামুখো ভাব আপোলিনেয়ারের ছিল না। তাঁর [illegible] বিশেষত্বের [illegible] কথাই বলা যাক। এখনো কোনো স্বত্বাধিকারের ব্যাপার নয়। বলা যায়, প্রকাশকদের চালবাজি। তখনো তাঁর কবিতার বই ছাপার প্রকাশক ছিল না। কিন্তু এক প্রকাশক ঠিক করলেন, একখানা বইতে আধুনিক শিল্পীর আঁকা নানা জীবজন্তুর ছবি থাকবে পাতায় পাতায়—আর প্রত্যেকটার একটার নিচে চার লাইনের পদ্য থাকবে। সেই পদ্য লেখার ভার আপোলিনেয়ারের। অনেক কবিকেই জীবিকার জন্য এরকম কাজ করতে হয়, কিন্তু বেশীর ভাগ কবিই এসব কাজ করেন ফাঁকি মেরে, দায়সারাভাবে। আপোলিনেয়ার ফাঁকি দেননি—তিনি চমৎকার রসিকতায় ভরা কতকগুলো অপূর্ব ছোট কবিতা রচনা করলেন—সেগুলো আসলে জীবজন্তুর বর্ণনা মোটেই না। বলা যায় তিনি প্রকাশককে ঠকিয়ে সত্যিকারের কবিতা পাঠকদের ধন্য করেছিলেন। দু'একটার উদাহরণ দিচ্ছি আমি। বেড়ালের ছবির নিচে যে কবিতা—দেখা যাক সেটায় বেড়ালের বর্ণনা কি রকম! "আমি চাই আমার বাড়িতে/থাকবে এক কাণ্ডজ্ঞানবতী নারী/ছড়ানো বইয়ের ওপর পা-ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াবে একটা বেড়াল। শীত গ্রীষ্ম বারোমাসই আসবে বন্ধুরা!" আর একটি কবিতার নাম "প্রজাপতি", সেটা এই রকম "পরিশ্রমেই আসে ধন দৌলত,/গরীব কবিরা, কাজ করো, কাজ করো!/দেখছো না, শুঁয়োপোকারাও কেমন পরিশ্রম করতে করতে/একদিন প্রজাপতি হয়ে যায়!" (দ্বিতীয় লাইনটিতে নিজের অবস্থা সম্পর্কেও চমৎকার ঠাট্টা করেছেন। আমার মনে হয়, এই লাইনটি সমস্ত কবিদেরই স্লোগান হওয়া উচিত, "পভর্ পোয়েত, ত্রাভাইয়োঁ!")

এক প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, অ্যাপোলিনেয়ার, তাঁকে কয়েক লাইন কবিতায় একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই অতিসংক্ষিপ্ত কিন্তু ভাবগর্ভ চিঠিখানি উদ্ধার করার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছি না :

প্রিয়বন্ধু, অতিপ্র সুভিয়ের,
জানাবেন কেমন আছেন
ধর্ম নাকি পাপে মজেছেন?

সনাতন পাঠক

প্রবন্ধ

ভারত ও জওহরলাল (প্রাক স্বাধীনতা খণ্ড)—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ বিচিত্রা : ১১৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। দাম ছয় টাকা।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে কেন্দ্র করে বইটি লিখিত। তবে বিষয় কেবল নেহরু বা নেহরু পরিবার নয়, এমন কি কংগ্রেসও নয়, নেহরু এখানে উপলক্ষমাত্র। বইটিতে নেহরুর সমসাময়িক রাজনীতি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বইয়ের নামের সঙ্গে জওহরলালের যোগ থাকলেও প্রয়োজন বিশেষে জওহরলালের চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মকে সমালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য তা করতে গিয়ে লেখক কোন কোন জায়গায় জওহরলাল সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জওহরলাল প্রথম থেকেই ফ্যাসিবাদ ও ন্যাৎসীবাদের বিরোধিতা করে এসেছেন। উগ্র জাতীয়তাবোধ নামে নির্বিচারে ইহুদী হত্যা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা বা এই পৃথিবী থেকে বিদায় দেওয়া কোন বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির সহানুভূতি অর্জন করতে পারে না। জওহরলাল নেহরু এ জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইংরেজদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য তা সম্ভব হয়নি।

বাঙালীরা প্রথম দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজদের সহযোগী ছিল। ইংরেজদের চটকলেও এক সময়ে বাঙালী শ্রমিকেরাই কাজ করত। বর্তমান গ্রন্থে জানা গেল, হোমের ইংরেজ সরকারের নির্দেশে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাঙালী মুচ্ছুদ্দীকে বাতিল করে মাড়োয়ারি গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলায় (পৃঃ ১৮), আবার বাঙালীরা রাজদ্রোহী, তাদের বিশ্বাস করা যায় না বলে চটকলে দলে দলে অবাঙালী শ্রমিক নিয়োগ আরম্ভ হল (পৃঃ ১৯)। কাজেই বাঙালীদের মাড়োয়ারি-বিদ্বেষ ও চটকলের অবাঙালী শ্রমিক বিদ্বেষের জন্য কেবল বাঙালীদের অভিযুক্ত করা ঠিক নয়। এই বিদ্বেষের পিছনে ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান।

৪৪৫/৬৫

বিবিধ

Chinese crisis: Causes and Character. Novosti Press Agency Publishing House. Moscow.

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে চীনের সংকট, তার কারণ এবং তার স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মাও সে তুং-এর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের পথে চীনদেশ যে আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারে নি শুধু তাই নয়, উপরন্তু চীন দেশে বর্তমানে মাও-র নেতৃত্বে কট্টর জাতীয়তাবাদ ও উৎকট স্বাদেশিকতা (Chauvinism) বিরাজমান। বর্তমান শোধনবাদ নীতির প্রচার দ্বারা জনকল্যাণ সম্ভব নয় এবং এই রাস্তায় ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। এই সব কারণে মাও সে তুং-এর ভাবধারা পৃথিবীর যে কোন কমিউনিস্টদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। লেখক এ সম্পর্কে যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণাদির উল্লেখ করেছেন ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায়। আশা করি সংশ্লিষ্ট পাঠকগণ এই পুস্তিকা পাঠ করে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। ২৪২/৬৮

পারিবারিক পোশাক ধোলাই পদ্ধতি। শ্রীশান্ত। প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৩·০০।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক প্রথায় পোশাক পরিষ্কার পদ্ধতির বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। সাধারণ ধোতাগারে তাড়াতাড়ি এবং অতি সহজে বস্ত্রাদি পরিষ্কারের জন্য যে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয় তার প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও গ্রন্থকার দ্বিধা বোধ করেন নি। ধোলাই করা, বস্ত্রাদির দাগ তোলা, নীল ও মাড় দেওয়া, ইস্ত্রি করার নিয়ম-প্রণালী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। রঙিন বস্ত্র, তুলা ও লিনেন, রেশম পশম এবং অন্যান্য কৃত্রিম সুতার বস্ত্রাদি ধোলাই করার পদ্ধতি প্রভৃতি বহু চিত্র সহযোগে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া বিনা জলে ধোলাই, বস্ত্রাদি রং করা, রিপু করা, পোশাক সংরক্ষণ পদ্ধতিও লেখক তাঁর এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে হলেও সম্যকরূপে আলোচনা করেছেন। এই পুস্তকের প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেদের পোশাক ইত্যাদি নিজেরা পরিষ্কার করে নিতে পারলে অনেক খরচ বেঁচে যায় এবং পোশাক ইত্যাদি টেঁকেও বেশী দিন।

৩৬০/৬৮

আধুনিক পোলট্রী পালন। শ্রীশান্ত। প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০ টাকা।

লেখকের "পারিবারিক পোলট্রী" বইখানা আধুনিক পোলট্রী পালনে রূপান্তরিত হয়েছে। গত দশ বছরের মধ্যে এ দেশে পোলট্রী পালন বেশ প্রসার লাভ করলেও পোলট্রী পালন সম্বন্ধে অনেকেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। পোলট্রী পালনকারীদের যে-সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় আলোচ্য পুস্তকখানিতে তার সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। মুরগীর ঘর, খাদ্য, বাচ্চা পালন, রোগ ও তার প্রতিকার ইত্যাদি সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। পোলট্রী বলতে মুরগী, হাঁস এবং পায়রা বুঝালেও এই পুস্তকে মুরগী পালনের উপরেই প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে। পোলট্রী পালনে বহু লোক উৎসাহী হলেও পালিত পাখির বহু সংখ্যায় মৃত্যু পালনকারীকে হতোদ্যম করে। এ জন্য অনেকে পোলট্রী পালনে বিফলকাম হয়ে থাকে। এই পুস্তকে পোলট্রী পালকের সকল রকম অসুবিধার সুষ্ঠু সমাধান অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে।

পরিশিষ্টে পোলট্রীর খাদ্যের উপাদান, টিকা দিবার ঔষধের মূল্য তালিকা, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তা ছাড়া এ সম্পর্কিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। ছোট বড় সব রকম পোলট্রী পালকের কাছে এ বইখানি বিশেষ কাজে লাগবে বলা যায়। ৩৬১/৬৮

প্রাপ্তি স্বীকার

সূত্রধার। সেবাব্রত চৌধুরী। কবিপত্র প্রকাশ ভবন : ১১৭ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৩·০০।

দীপ নিভে যায়। অনাদি গাঙ্গুলী। আনন্দ এজেন্সী : ১৮।বি বটকৃষ্ণ পাল অ্যাভিনু, কলিকাতা-৫। মূল্য ৩·৫০।

শেষ পরিচয়। শ্রীনিত্যানন্দ কর্মকার। বেনসনস : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ২·৫০।

অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)। আনন্দধারা প্রকাশন : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১২·০০।

সোনা মুখে রক্ত ছিটোয়। বেণু দত্ত রায়। অঞ্জলি দত্ত রায় : জলপাইগুড়ি। মূল্য ২·৫০।

Bankura: Amiya Kumar Banerjee. West Bengal District Gazeteers: 23, Rajendranath Mukherjee Road, Calcutta-1. Price Rs. 25.00.

সোভিয়েট দেশের লেখক বিদ্রোহ। প্রদীপ বসু। সমাজবাদী প্রকাশনী : ২৩৫ ঘোষপুর পার্ক, কলিকাতা-৩১। মূল্য ০·৩০।

সাধনা আউট হয়ে ফিরেছেন

ইডেন উদ্যানে বন্যার্তদের সাহায্যে বোম্বাই ও বাংলার চিত্র-তারকাদের ক্রিকেট খেলা। ফটো—দেশ

দারা সিংকে জনতার সংগে পরিচয় করাচ্ছেন রাজকাপুর

রমি, বাসব ব্যানার্জি সোভিয়েত ব্যালে নর্তকী রাবেনকিনা ও সিমি

দেব মুখার্জি, রাজেন্দ্রনাথ, মদনমোহন, বিশ্বজিৎ

সংরক্ষণ সমিতির কথা

সাংবাদিক সম্মেলনের প্রতিবেদন

সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে সাংবাদিক বৈঠকে যে বিবৃতি দেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ সমিতি গত সপ্তাহে (৬ জানুয়ারী) এক প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করেন। কনফারেন্সে নয় পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিবৃতি পাঠ করা হয়। বিবৃতির প্রারম্ভে উল্লেখ আছে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি

ইডেন উদ্যানে মৃণাল মুখার্জি, মালা সিংহ, পাহাড়ী সান্যাল ও অঞ্জনা ভৌমিক (বাঁয়ে) পার্কভিলিয়নে সোভিয়েট শিল্পীকে নিয়ে যাচ্ছেন উত্তমকুমার

আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টে (সংরক্ষণ-ত্যাগীদের প্রেস কনফারেন্সের) পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এবং ওই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও তা বিস্তৃত। আমাদের জবাব তারই ভিত্তিতে, সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্যেরও অবতারণা আছে।

সমিতি গোড়ায় তাঁদের ইতিহাস বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেননি। তাতে "কাউন্সিল অব অ্যাকশন" তৈরির ঘটনা, প্রথম সাধারণ সভায় (যাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন শ্রীঅজয় কর) সমিতির পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য ঘোষণা এবং শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চিঠির (১৯।৪।৬৮)—যাতে তিনি সংরক্ষণ সমিতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে লিখেছিলেন "বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তার প্রতি আমার সমর্থন আছে। সকল 'সেক্টরের' ব্যক্তিরাই বাংলা ফিল্মের উন্নতির জন্য আজ ঐক্যবদ্ধ।...কলাকুশলী, প্রযোজক, পরিবেশক, স্টুডিও ও ল্যাবরেটরি মালিকদের জন্য আমাদের আরও টাকার প্রয়োজন। গুণী শিল্পীদের উৎসাহদানের জন্য আরও বেশী ছবি তৈরির প্রয়োজন। এই টাকা আমাদের সরকারের কাছ থেকে নিতে হবে..." উল্লেখ রয়েছে।

যে পরিচালকরা সংরক্ষণ সমিতি ছেড়েছেন তাঁরা আগে সমিতির সঙ্গে কতখানি যুক্ত ছিলেন এবং কী করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমিতির প্রচারিত প্রেস নোটের প্রথম ভাগে। পরবর্তী অংশে অভিযোগ খণ্ডন। মোট পাঁচটি অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন সমিতি। তাঁরা বলেছেন, "একটি 'ইভেসিভ' (অস্পষ্ট?) অভিযোগের উত্তর কী করে দিতে হয় তা কারো জানা নেই" (অভিযোগ : সমিতি শিল্পী, পরিচালক, কলাকুশলী ও প্রযোজকদের নিয়ন্ত্রণের বেড়ি পরাতে চান)। প্রেস নোটে বলা হয়েছে : সমিতি একটি কমন প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন যেখানে প্রোডাকশন সেক্টরের সব ইউনিট একত্রে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিসত্তা বজায় রাখতে পারেন, সৃজনশীল গুণ অনুশীলনের সুযোগ পেতে পারেন। তাঁরা একটি "কমন কোড অব কনডাক্ট" মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন।

রেজিমেনটেশন বা ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ, চিত্রমুক্তি নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ভাল ছবি প্রদর্শনের পথে ব্যাঘাত বা নতুন ছবি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি, স্টুডিও কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিভেদ সৃষ্টি করে নতুন ছবির তৈরির উৎসাহ স্তিমিত হবার মত প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি, কাউন্সিল সভায় স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা ইত্যাদি অভিযোগের উত্তরে সমিতি তাঁদের প্রেস নোটে অনেক কথা বলেছেন। বলেছেন, পরিচালক, শিল্পী-তালিকা (কাস্ট) এবং বাজেট নির্বিশেষে সকল ছবি প্রদর্শনীর সুযোগ তাঁরা এনে দিতে চান। ছবি রিলিজের আগে আমাদের বন্ধুরা কোন্ সাহসে (হাউ ডেয়ার আওয়ার ফ্রেন্ডস) ছবি ভাল কী মন্দ বলতে পারেন? চতুর্থ অভিযোগের (নতুন ছবি তৈরির উৎসাহে ভাটা—স্টুডিও কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের ফলে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি) উত্তরে বলা হয়েছে, সকলেই জানেন বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে সব সময় সকলের কাজ থাকে না। প্রসঙ্গত কয়েকজন "ব্যস্ত" পরিচালককে দায়ী করে সমিতি লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন, অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক, অস্বস্তিকর ও অযৌক্তিক সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেকাংশে এর জন্য দায়ী কয়েকজন ব্যস্ত পরিচালকের পক্ষপুষ্টিত্ব ও বিচ্ছিন্ন কর্মধারা।

সমিতির প্রেস কনফারেন্সে প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীঅসিত চৌধুরী, শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল মজুমদার, শ্রীঋত্বিক ঘটক প্রমুখ। তাঁরা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

একটি প্রশ্ন : "যাঁরা সমিতি ছেড়ে গিয়েছেন তাঁদের আবার ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টা হবে কি?" শ্রীঅসিত চৌধুরীকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এই ব্যাপারে 'পারসুয়েশন কমিটি'র চেয়ারম্যান শ্রীসুশীল মজুমদার আলোকপাত করতে পারেন।" সুশীলবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।" তিনি বলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় প্রশ্ন : "ও'দের প্রেস কনফারেন্সের পরে কি?"

"না।"

"পরে কোন আলোচনা ও'দের সঙ্গে করবেন না?

"হ্যাঁ, করতে পারি।"

আবার প্রশ্ন। "আলোচনায় অনুকূল পরিবেশ কি ক্ষুণ্ণ হয়নি? সমিতি যে ধরনের পোস্টার ছেড়েছেন, তাতে ও'দের 'ভিলিফাই' করা হয়নি কি?"

"ও'রাই আমাদের 'ভিলিফাই' করেছেন। সমিতি এত shocked হয়েছিলেন যে, এগুলি ক্ষোভেরই প্রকাশ। এতে আলোচনার ক্ষতি হবে না।"

আবার প্রশ্ন। "আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে দক্ষিণ কলকাতার জনৈক চিত্র প্রদর্শকের বিবৃতির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে যে বড় পোস্টার আপনারা বাজারে ছেড়েছেন তাতে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়নি কি?"

উত্তরে অসিতবাবু বলেন, "পুরো উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। তা ছাড়া সমিতিত্যাগী পরিচালকদের অভিযোগ এবং আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়

মন্তব্যের পর আমরাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি এবং আমাদের কিছু করা উচিত বলে মনে করি।"

কোন কোন শিল্পীকে ব্ল্যাক-লিস্ট করার প্রসঙ্গও ওঠে। এই বিষয়ে শ্রীঋত্বিক ঘটক জোরের সঙ্গে বলেন, "রেজিমেনটেশনের প্রশ্নই ওঠে না। কোন ব্ল্যাক-লিস্টিং হয়নি। এ বিষয়ে কাগজে যা বেরিয়েছে সম্পূর্ণ মিথ্যা।" প্রসঙ্গত সমিতির জনৈক মুখপাত্র জানান, কনক মুখার্জির একটি ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করবেন। সংবাদপত্রে এই বিষয়ে একটি পত্র প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শ্রীসুবোধ মিত্র বলেন, "আমি তার জবাব দেব।"

সমিতির নেতাদের অনেক প্রশ্নই করা হয়। তাঁরাও ধৈর্যের সঙ্গে সব প্রশ্নের জবাব দেন। মিনার-বিজলী-ছবিঘর চেনের কথা উঠতে শ্রীঅসিত চৌধুরী বলেন, "আমাদের দাবি ওঁদের মানতেই হবে। দাবি মানাতে না পারলে সমিতি রাখার তো কোন অর্থই হয় না।"

"কীভাবে মানাবেন?"

"এখনো কিছুই ভাবা হয়নি।"

অন্য প্রসঙ্গ উঠল।

"সমিতির প্লেজ মেনে না নিলে কেউ নতুন ছবি প্রযোজনা করতে পারবেন না—সমিতির এই নীতি কি এখনো বলবৎ?"

উত্তরে অসিতবাবু বলেন, "সমিতির প্লেজ কেনই বা মেনে নেবেন না?"

"যদি কেউ মেনে না নেন তিনি কি ছবি করতে পারবেন না?"

"কার্যত বোধ হয় তা সম্ভব নয়। কারণ, সব স্টুডিওর কর্মীরাই তো সমিতিকে মেনে নিয়েছেন।"

সমিতির নেতারা অবশ্য বিশেষভাবে জানিয়েছেন "এই অচল অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। মীমাংসা একটা হবেই। এবং যাঁরা সমিতি ত্যাগ করে গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার জন্যই আমরা প্রস্তুত।"

সমিতির মুখপাত্ররা এ কথাও বলেন, "আমাদের কী ভুল-ভ্রান্তি তাঁরা বলুন। যদি আমরা ভুল করে থাকি তবে তাঁরা এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আমরা সানন্দে তাঁদের হাতে নেতৃত্বভার তুলে দেব।"

বৈঠকে বহু বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক ও কলাকুশলী উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভে তাঁদের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেন শ্রীঅজিত বসু।

অরুন্ধতী দেবীর "মেঘ ও রৌদ্র" ছবিতে হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

টীকা-টিপ্পনী

নায়িকার বয়স জানতে নেই, তবুও জন্মদিনের পার্টিতে সুপ্রিয়া দেবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, বয়স কত হল?

মুচকি হেসে শ্রীমতী সুপ্রিয়া আধো আধো কণ্ঠে জবাব দিলেন, বারো কী তেরো!

আমি ছত্রিশটা মোহন সিরিজের বই সুপ্রিয়াকে উপহার দিলাম।

গত ৮ই জানুয়ারী গ্র্যান্ড হোটেলে সুপ্রিয়া দেবীর বার্থ-ডে পার্টি ছিল। পার্টিতে সুপ্রিয়ার আপনজন অনেকেই এসেছিলেন। জড়োয়া গয়না পরা ভায়োলেট রঙের দামী বেনারসীতে শ্রীমতী সুপ্রিয়াকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

রাত ন'টার সময় উত্তম-তনয় গৌতম এল ওর মায়ের দেওয়া দামী বেনারসী শাড়ির উপহারের বাক্স হাতে। সুপ্রিয়া দেবী হাসিতে খুশিতে ফেটে পড়লেন। উত্তমবাবু সুপ্রিয়াকে কী উপহার দিলেন, এটা জানার এক মেয়েলী কৌতূহল স্বভাবতই আমার ছিল। সুপ্রিয়াই কৌতূহলের নিরসন করলেন। হাত বাড়িয়ে নিজের আঙুলের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললেন, এই হীরের আংটিটা "ওঁর" প্রেজেনটেশন'।

প্রযোজক ডি এন ভট্টাচার্য ও নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক আসার পর পার্টি আরো জমে উঠল। মিঃ ভট্টাচার্যকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার "শুক সারী" তো শেষ, এর পর কী করবেন ঠিক করেছেন?

"দুটো পরিকল্পনা আছে", জানালেন শ্রী ভট্টাচার্য, "একটা পীযূষ বসুকে দিয়ে বাংলা ছবির, আরেকটা এই মুহূর্তেই বলতে চাইছি না।"

হিন্দী নিশ্চয়?—প্রশ্ন করলাম।

শ্রী ভট্টাচার্য বললেন, "হ্যাঁ, হিন্দী কালার এবং বাংলা। ডাবল ভার্সান। বাংলা দেশেই করবো। এর বেশী আপাতত কিছু বলব না।"

অতঃপর 'অফ্ দি রেকর্ডস' আমাদের মধ্যে অন্য অনেক কথা হল। রাত বাড়ল। মিঃ ভট্টাচার্য এক সময় সুপ্রিয়া দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। সুপ্রিয়া ঘড়ি দেখে বললেন, "আরেকটু থাকতে হবে। বারোটা দশে আমি জন্মেছি। এখনও বারোটা বাজেনি।"

পাশেই শ্রীমতী অঞ্জনা ছিলেন। রসিকতা করে বললেন, বারোটা সত্যি বাজেনি?

আসরে হাসির রোল উঠল।

রাত প্রায় বারোটার সময় পার্টি অ্যাটেন্ড করতে এলেন বম্বের হিরো রাজেশ খান্না। রাজেশ পরিচালক অসিত সেনের "খামোশী" (দীপ জেবলে যাই-এর হিন্দী) ছবির আউটডোর শুটিং করতে কলকাতায় এসেছিলেন। গ্র্যান্ডেই উঠেছিলেন। সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিনের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হাজির হলেন রাত দুপুরে।

রাজেশ খান্নার সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয়

ছিল না। উত্তমকুমারই পরিচয় করালেন। ধর্মেন্দরকান্তি রাজেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, বম্বেতে এখন আপনার কতগুলি ছবি?

রাজেশ সগর্বে জানালেন, খান পাঁচেক।

—বাংলা ছবিটবি দেখেন?

—কদাচিৎ।

আমাদের কথার মাঝে শিল্পী শুভেন্দু চ্যাটার্জি এসে যোগ দিলেন। আই পি টি এ-র নাটক নিয়ে কথা উঠল। রাজেশ নাটকের ভক্ত। এ-কথা সে-কথার পর রাজেশ বিদায় নিতে চাইলেন। শুভেন্দু অনুরোধ করলেন, আরেকটু থাকুন না।

রাজেশ বললেন, কাল শুটিং আছে। সকালে উঠতে হবে।

শুভেন্দু বললেন, তাতে কি—

হঠাৎ শুভেন্দুকে থামিয়ে দিয়ে উত্তমকুমার বললেন, না শুভেন্দু, ডোণ্ট ইন্‌সিস্ট হিম্। শুটিং ইজ মোর ইমপরট্যাণ্ট দ্যান অ্যানিথিং।

রাত্রির তৃতীয় যামে উপহার হাতে হাজির হলেন প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী। তখন পার্টি প্রায় ভাঙতে চলেছে। একে একে সবাই বিদায় নিতে শুরু করেছেন। হেমেনবাবু এসে যেন ভাঙা হাটে প্রাণ-সঞ্চার করলেন। ওঁর অনুরোধে উত্তমকুমার হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন। গান ধরলেন, রবীন্দ্রসংগীত, "সুনীল সাগরে...।"

সুপ্রিয়া দেবীও অতঃপর গানে অংশ নিলেন। "এই মোম্ জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে, এসো না গল্প করি...।"

গানের পর হেমেনবাবু আমাদের সকলকে

হঠাৎ অনুরোধ করলেন, পাঁচ মিনিটের জন্যে ও'র ঘরে যেতে। ঘরে এলে হেমেনবাবু তাঁর "সাগিনা মাহাতো" (দিলীপ-সায়রা অভিনীত নির্মীয়মাণ বাংলা ছবি)-র স্টিল দেখালেন। টেপ রেকর্ডারে হিন্দী ছবি "প্রেম পুজারী"-র সুন্দর সুন্দর গান শোনালেন। এক সময় উত্তমকুমার হেমেনবাবুর টেবিলে রাখা এক গাদা গ্রিটিংস কার্ডের দিকে নজর করে বললেন, 'হেমেনদা, তোমার এখানে এত গ্রিটিংস কার্ড কেন?

হেমেন গাঙ্গুলী জবাব দিলেন, নিউ ইয়ার্স গ্রিটিংস। বন্ধু-বান্ধব তো অসংখ্য। হেমেনবাবুর কথা শেষ করতে দিলেন না উত্তমকুমার। হঠাৎ অন্যমনস্ক সুরে বলে ফেললেন, আমি কিন্তু বন্ধুহীন।

*

"মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি।
মরেছি হাজার মরণে,
নুপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে"—

আবৃত্তি করলেন বম্বের বিখ্যাত রাজেন্দ্রকুমার। পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ। কণ্ঠ দরদ।

গত ৯ই জানুয়ারী গ্রান্ড হোটেলে "সাথী"-র চ্যারিটি শো উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। "সাথী"-র প্রযোজক এস কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন। সংগীত পরিচালক নৌসাদও ছিলেন। নৌসাদ জানালেন, "সাথী"-র ব্যাক-গ্রাউন্ড ও টাইটেল মিউজিকে উনি নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন।

একজন প্রশ্ন করলেন, আপনি তো উচ্চাঙ্গ সংগীতকে ভিত্তি করে সাধারণত সুর করে থাকেন। অথচ অধিকাংশ হিন্দী ছবির সুরে পাশ্চাত্য লঘু সংগীতের প্রভাব দিন দিন ক্রমবর্ধমান। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

নৌসাদ হিন্দীতে কথা বলছিলেন। রাজেন্দ্রকুমার হিন্দী ও ইংরেজী মিশিয়ে। হঠাৎ জনৈক সাংবাদিক বন্ধুর অনুরোধে একটা বাংলা কবিতার চার লাইন আবৃত্তি করে শোনালেন।

রাজেন্দ্রকুমারকে প্রশ্ন করলাম, বাংলায় অভিনয় করার ইচ্ছে হয় না?

"খুব হয়", জবাব দিলেন রাজেন্দ্রকুমার, "পৃথিবীর যে ক'টা ভাষা আমার প্রিয়, তার মধ্যে বাংলা একটি। তার চেয়েও বড় কথা হল, শিল্পী মন কোনও বিশেষ ভাষার গণ্ডীতে বাঁধা থাকতে চায় না। হিন্দীতে তো করছিই, বাংলাতেও অভিনয় করতে ইচ্ছে করে।"

পুনশ্চ ॥ জনৈক পত্রদাতা ও পাঠকের জ্ঞাতার্থে : শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের বিবাহোত্তর পদবী চ্যাটার্জি নয়, চক্রবর্তী।

—বিচক্ষ

প্যারাডাইস সিনেমায় বন্যাপীড়িতদের জন্য "সাথী" চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীতে শ্রীঅশোককুমার সরকার, রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর ও অভিনেত্রী সিমি। ফটো—দেশ

"সাথী" চিত্রের সাহায্য-প্রদর্শনী

ভেনাস পিকচার্স-এর হিন্দী ছবি "সাথী"র এক বিশেষ প্রদর্শনীর (৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত) টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়। টাকার পরিমাণ প্রায় নয় হাজার। প্যারাডাইস সিনেমায় রাত ন'টার শো আরম্ভ হবার আগে মঞ্চে "সাথী"-র প্রযোজক শ্রী এস কৃষ্ণমূর্তি, নায়ক শ্রীরাজেন্দ্রকুমার, অভিনেত্রী শ্রীমতী সিমি ও সংগীত পরিচালক শ্রীনৌশাদ উপস্থিত হন। তাঁদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন শ্রীবাগীশ্বর ঝা। বি-এফ-জে-এ'র ত্রাণ তহবিলের জন্য ছবিটির শো'র ব্যবস্থা এবং ইউনিটের কয়েকজনের কষ্ট করে কলকাতায় আসার জন্য সংস্থার সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার ছবির প্রযোজক ও শিল্পীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধর্মবীর তাঁর ভাষণে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে অভিনন্দন জানান; এবং বলেন, দুঃখের মধ্যেও আশার কথা এই, দেশবাসী বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।

শীলা

নরেন মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি কিনে ইউনিটের "শীলা"-র মুক্তি আসন্ন। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। সুর দিয়েছেন রাজেন সরকার। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, সীতা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, রবি ঘোষ সবিতাব্রত দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় এবং প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বালক অভিনেতা মাঃ চীনা ও পূর্ণ দাস বাউল (অতিথি শিল্পী) প্রভৃতি।

ইন্দিরা বড়ুয়ার নৃত্য

ইন্দিরা বড়ুয়ার নাচ কলকাতার দর্শকদের মুগ্ধ করে। ক্রিয়েটিভ ক্লাবের উদ্যোগে নাচের আসর বসেছিল অ্যাকাডেমি অব

ফাইন আর্টস ভবনে, গত ৫ জানুয়ারী। আসামের মেয়ে ইন্দিরা। ভরতনাট্যম শেখেন দক্ষিণ ভারতের কলাক্ষেত্রে, রুক্মিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে। শাস্ত্রীয় নৃত্যে যে তিনি পারদর্শিনী সে-প্রমাণও দর্শকেরা পেলেন। আসামের প্রচলিত নৃত্যও তিনি পরিবেশন করেন। কথাকলিতেও তাঁর নৈপুণ্য দেখবার মত। সব মিলিয়ে ইন্দিরার নৃত্যানুষ্ঠান ছিল দর্শকদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পীযূষ বসু পরিচালিত "স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে" দিলীপ রায় ও মাধবী চক্রবর্তী।
ফটো—দেশ

ছবি রিলিজ হবার আগেই নাম এবং দাম বেড়ে গেছে দুজন অভিনেত্রীর। প্রথমজন হেমা মালিনী, দ্বিতীয়জন লীনা চন্দাওয়ারকার। বেশ কয়েক বছর আগে অধুনা মুক্তিপ্রাপ্ত 'সংঘর্ষ'-এর প্রযোজক-পরিচালক শ্রী এইচ এস রাওয়াল যখন সয়িদা খানকে আবিষ্কার করেন তখন সয়িদাকে নিয়েও এই অবস্থাই হয়েছিল। প্রথম ছবি মুক্তি পাবার আগেই সয়িদার নাম এবং দাম বেড়ে গিয়েছিল হু হু করে। একটিও ছবি রিলিজ হয়নি অথচ ডজনখানেক ছবিতে চুক্তিবদ্ধ অভিনেত্রী। তারপর একটা-দুটো ছবি রিলিজ হতেই সব ওলট পালট হয়ে গেল। আশা করছি, হেমা মালিনী এবং লীনা চন্দাওয়ারকরের কপালে তা ঘটবে না! এই সব নবীন-নবীনারা যদি অতি প্রচারের শিকার হয়ে যান এবং চলচ্চিত্র জগতে প্রকৃত প্রবেশের পূর্বেই মহার্ঘ হয়ে যান (যা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছেন) তাহলে এ'রাই বা নিজেদের মূল্যায়ন কিভাবে করবেন তাও ভাবতে পারছি না এবং এর ফলই বা কি হবে সেটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে!

সরল শর্মা

বোম্বাই বিচিত্রা

বম্বে চলচ্চিত্র জগতের ঝলমলে আকাশে আজ যাঁরা উজ্জ্বল তাঁদের প্রায় সকলেই প্রবীণ! বিশেষ করে আমি অভিনেতা, অভিনেত্রীদের কথা বলছি। অভিনেতাদের মধ্যে যাঁরা নাম করা যেমন অশোককুমার, দিলীপকুমার, রাজকাপুর, দেবানন্দ, রাজেন্দ্রকুমার এমনকি ধর্মেন্দ্রও দর্শকদের কাছে পুরোনো নাম। নতুনদের মধ্যে বর্তমানে যাঁরা দিন দিন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জিতেন্দ্র, সঞ্জয়, রাজেশ খান্না এবং সঞ্জীবকুমার। এ বছরের আগন্তুক দীপককুমার।

এই তো গেল অভিনেতাদের তালিকা। অভিনেত্রীদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসায়ী অর্থে অনায়াস গ্রাহ্য তাঁদের মধ্যে নার্গিস অবসরপ্রাপ্তা। বাকিদের মধ্যে বৈজয়ন্তীমালা, নূতন, ওয়াহিদা রেহমান, মালা সিনহা, সায়রাবানু, শর্মিলা ঠাকুর, সাধনা, তনুজা এমনকি সিমি বা মমতাজও আর নতুন নয়। এ'দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন ববিতা। ববিতার ভবিষ্যৎ যে ঊর্ধ্বগামী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক এ বছরে বম্বে চলচ্চিত্র জগৎ তিনজন অভিনেতা (যাঁদের ভবিষ্যৎ নেহাতই ভবিষ্যতের হাতে এখনো) এবং তিনজন অভিনেত্রীকে প্রচারের প্রচণ্ড ঢাক পিটিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির করছে। এ ছ' জনের মধ্যে দর্শকমহলে সবচেয়ে বেশী কৌতূহলের সৃষ্টি করেছেন 'সপনো কা সওদাগর'-এর নায়িকা 'স্বপ্নকন্যা' হেমা মালিনী। তারপরেই যাঁকে নিয়ে অধুনা লোফালুফি শুরু হয়েছে তিনি হচ্ছেন সুনীল দত্তের আবিষ্কার লীনা চন্দাওয়ারকর। এ'দের কারোর ছবিই এখনো দর্শকদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত নয় তবু এরই মধ্যে এ'রা বেশ মোটা পারিশ্রমিক চাইছেন।

প্রবীণ পরিচালক বসন্ত জোগলেকর তাঁর ছবি 'এক কলি মুস্কায়ি'র নায়িকা হিসেবে নিজের মেয়ে মীরা জোগলেকরকে চলচ্চিত্র রাজ্যের প্রবেশপত্র দিয়েছেন। অভিনয় গুণে নাকি মীরার যথেষ্ট আছে এমন কথা ওয়াকিবহাল মহল থেকে শোনা যাচ্ছে।

রাওয়াল পরিবারের সর্বশেষ সংযোজন দীপককুমার (আবরুর নায়ক)। দীপককুমারের চলচ্চিত্রে আবির্ভাব পারিবারিক পাসপোর্ট হাতে নিয়ে। এই দীপককুমার প্রসঙ্গে অশোককুমার, নিরুপা রায় প্রমুখ অভিজ্ঞ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে আসছে সার্টিফিকেট। দীপককুমার যদি সার্থকতার দীপ জ্বালাতে পারেন এবং সেই দীপে যদি পপলারিটির শিখা ঠিকমত জ্বলে ওঠে তাহলে আর রাওয়াল পরিবারের চিন্তা নেই! প্রযোজক, পরিচালক, গল্প লেখক, গীতিকার এবং নায়ক সবই 'ঘরকা আদমী হয়ে যাবে।' সুনীল দত্তের ছবিতে বিনোদকুমার ছাড়া আরও একজন অভিনেতা প্রথম জনসমক্ষে আসছেন, তিনি হচ্ছেন সুনীল-ভ্রাতা সোম দত্ত। বিনোদকুমার এবং সোম দত্তকে নিয়ে তেমন চেঁচামেচি কেউ করছে না।

গান্ধর্বীর রবীন্দ্র নাট্যোৎসব

আগামী ২৫, ২৬ এবং ২৭শে জানুয়ারী গান্ধর্বীর প্রযোজনায় রবীন্দ্র-নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে লর্ড সিংহ রোডে শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে। গান্ধর্বীর ষষ্ঠ-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই নাট্যোৎসবে পরিবেশিত হবে রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়া শাপমোচন এবং ফাল্গুনী। গান্ধর্বীর শতাধিক শিল্পী এই নাট্যোৎসবে অংশ গ্রহণ করবেন। এই শিল্পীদলে আছেন গান্ধর্বীর ছাত্রছাত্রী সভ্য সভ্যা ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।

সরযূবালা দেবীর সংবর্ধনা

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী ১৯৬৭ সালের 'বিশ্বরূপা পুরস্কার' পেয়েছেন। সম্প্রতি বিশ্বরূপা নাট্য পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উৎসবে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সরযূবালা দেবীকে একটি মানপত্র, এক হাজার টাকার চেক, বস্ত্র, মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। মানপত্রটি পাঠ করেন শ্রীরাসবিহারী সরকার।

উৎসবে ১৯৬৭ সালের গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

গুরান, আমাকে কিছু না-বলেই ওয়াকার কাকা* কাল রাতে হঠাৎ চলে গেলেন?
যাবার আগে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, রাজা। কেন, তোমার সে-কথা মনে নেই?
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার কাকা

তাহলে কাল রাতে যা দেখেছি, তা কি স্বপ্ন নয়?

রাজপুত্র ভ্রাদ, এবারে বলো, তোমাদের 'জাহাজী মানুষ' বলা হয় কেন?
তার কারণ, আমরা জাহাজে করে এসেছিলাম।

জাহাজে করে এসেছিলে? কোথেকে?
তা জানি না......
......আমার পায়রাটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! তোমার কাঁধে একটু বসবে?
5/26

কয়েক রাত্রি... কয়েক দিন... জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অবিশ্রাম তাঁরা এগোচ্ছেন .....
!

সামনেই দস্যুদল! লুকিয়ে আছে!
!

সাবাশ!

চিত্রবাঘ! হুঁশিয়ার!
ধন্যবাদ, আমি টের পাইনি!

তোমায় আমায় মিলে চমৎকার জুড়ি হয়েছে।
তা হয়েছে বটে!
জাহাজে করে কোত্থেকে ওরা এসেছিল, জানতে হবে।

ওই সেই দুর্গ... ওরই মধ্যে মেলোডিকে ওরা আটকে রেখেছে!
বেঁচে আছে কিনা, কে জানে!
আগামী সপ্তাহে: বন্দিনী মেলোডি
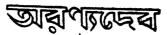
নাগেরকয়েল সংসদীয় আসনে বিপুলে ভোটাধিক্যে কামরাজের জয়লাভ আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রী কে কামরাজ এক লক্ষ আটাশ হাজার দুইশত এক ভোটে জয়লাভ করায় কংগ্রেস পরপর চারবার নাগেরকয়েল সংসদীয় আসনে মর্যাদার লড়াইয়ে জয়লাভ করল। মারকসবাদী কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রী এম এম আলি মাত্র কুড়ি হাজার নয়শত ছাব্বিশ ভোট পেয়েছেন এবং তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অপর চারজন নির্দল প্রার্থীরও সামান্য ভোট পাওয়ার দরুন জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। স্বতন্ত্র দলের ডঃ ম্যাথিয়াস এক লক্ষ একুশ হাজার দুইশত ছত্রিশ ভোট পেয়েছেন, আর শ্রীকামরাজ পেয়েছেন দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশত সাঁইত্রিশ ভোট।

স্বতন্ত্র দলের সদস্য হলেও ডঃ ম্যাথিয়াস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নির্দল প্রার্থী হিসাবে। তাঁর পিছনে সমর্থন ছিল ক্ষমতাশীল ডি এম কে ও মুসলিম লীগের। ছটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত সংসদীয় কেন্দ্রের সব কটিতেই শ্রীকামরাজ ডঃ ম্যাথিয়াস থেকে বেশী ভোট পেয়েছেন। ভোটের আগে সর্বত্রই প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির কর্মীদের মধ্যে মারামারিও হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদুরাই এবং মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদনে সকল দল সাড়া দেওয়ায় নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়।

দেশী সংবাদ

৬ জানুয়ারি—গতকাল রাউলামে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পর যখন পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র রেস্ট হাউসে ফিরছিলেন তখন কিছু সমাজবিরোধী লোক হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এদের পুলিস ঠেকাবার চেষ্টা করলে ৭ জন আহত হন। এঁদের মধ্যে তিনজন সাব-ইনসপেকটর এবং দুজন কনসটেবল। জানা যায় যে শ্রী মিশ্রের গাড়িতে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়। জানলার কাঁচ ভাঙে। তবে কারো আঘাত লাগেনি।

গত শনিবার রাত্রে হায়দরাবাদের কাকুলম জেলার পার্বতীপুরম এজেন্সি এলাকার দক্ষিণা গ্রামে কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে গিরিজনরা পুলিসের উপর বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে চড়াও হলে পুলিস সাত রাউনড গুলি ছোড়ে। সরকারীভাবে আজ এই খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে যে, এই খণ্ডজাতিরা একটি স্কুল বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই স্কুল বাড়িটিতে পুলিসবাহিনী অবস্থান করছিল।

৭ জানুয়ারি—গত ১৯ সেপটেমবর কাজে অনুপস্থিত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব কর্মচারী গ্রেফতার হয়েছিলেন বা যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল—তাঁদের ফিরে চাকরিতে যোগ দিতে দেওয়া হবে। এমন কি কোন কর্মচারী মামলায় দণ্ডিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। ওইদিন কাজে অনুপস্থিত হওয়ার জন্য অস্থায়ী কর্মচারীরা কেউ কেউ গ্রেফতার হন—অনেকের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হয়। ফলে তাঁদের চাকরি যায়। তাঁদের আবার কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৮ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে এবার এখনও পর্যন্ত মোটামুটি ১১০০ জন ভোট প্রার্থী। লড়াই থেকে অবশ্য শনিবার পর্যন্ত নাম তুলে নেওয়া যাবে। দলের সংখ্যা এবার বেশী এবং প্রার্থীর সংখ্যাও বেশী। ১৯৬৭ সনে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেমেছিলেন ১০৮৮ জন।

আজ রাইটারস বিলডিংয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইনসপেকটর জেনারেল এবং জেলার পুলিস সুপারদের বৈঠকে এই রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ভোটের দিন পুলিসী ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়। কলকাতা ছাড়া রাজ্যের সর্বত্র চৌকিদার, হোমগার্ড, জাতীয় রক্ষীবাহিনী এবং পুলিস মিলে সাতাশী হাজার কর্মী ওইদিন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত হবেন। কলকাতা ধরলে এই সংখ্যা এক লক্ষের কিছু বেশী দাঁড়াবে। এ ছাড়া ভোট গ্রহণের কাজে এক লক্ষ সরকারী কর্মচারীকে কাজে লাগানো হবে।

৯ জানুয়ারি—আজ কেরল বিধানসভায় থানা আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি আবার ওঠে। তখন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনামবুদিরিপাদ এই দাবির মুখোমুখি কেন্দ্রকে চ্যালেনজ জানান। পূর্বতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দের শ্বেতপত্রে কথিত গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রসঙ্গ সমেত ১৯৬২ সাল থেকে তাঁর পার্টির বিরুদ্ধে যা সব মিথ্যা বলা হয়েছে—সে সম্বন্ধে তদন্তের পাল্টা দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই চ্যালেনজ জানান।

১০ জানুয়ারি—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখার জন্য ভারত আজ পাকিস্তানের কাছে একটি যুগ্ম সংস্থা গঠনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে।

১১ জানুয়ারি—শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় প্রার্থীসংখ্যা সামান্য কম। এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে নাম প্রত্যাহারের যেসব খবর এসেছে তাতে মনে হয় মোট প্রায় ৭০ জন আসর থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। থেকে যাচ্ছেন ১০৩০ প্রার্থী। গতবার ছিলেন ১০৬৮ জন।

আজ বারাসত থানার দত্তপুকুর যশোহর রোডের উপর এক শোচনীয় বাস দুর্ঘটনায় আশিজন যাত্রী আহত হন এবং নিহত হন দুজন। আহত ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বে-সরকারীভাবে অবশ্য চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর প্রচারিত হয়ে পড়ে।

১২ জানুয়ারি—ভারত কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ মেটানোর জন্য সালিশী মেনে নেবেন না। কিন্তু যদি দুই দেশের মধ্যে কোন নিরপেক্ষ সংস্থা গড়ে ওঠে তা হলে সেখানে সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভারত প্রস্তুত।

বিদেশী সংবাদ

৬ জানুয়ারি—আগামী কাল কমনওয়েলথ সম্মেলন শুরু হবে। সম্মেলনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার জন্য পাকিস্তান বদ্ধপরিকর। তা যদি ওঠে তা হলে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দল তৈরি আছেন। পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরশাদ হোসেন বিমানবন্দরে নেমেই যা বলেন তা থেকেই মনে হয় যে, পাকিস্তান সম্মেলনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলতে চায়। লনডনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৭ জানুয়ারি—পাঁচটি দক্ষিণপন্থী বিরোধী দল নিয়ে গঠিত পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেণ্ট গত রাতে স্থির করেছেন, আগামী বছরে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন তাঁরা বয়কট করবেন এবং সংস্কারের জন্য তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবেন। বিরোধী নেতারা ওই বৈঠকে এক যুক্তফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। তাঁদের লক্ষ্য আয়ুবের উচ্ছেদ।

৮ জানুয়ারি—পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কমনওয়েলথ সম্মেলনে কাশ্মীরের [illegible] সম্মেলনের ধারা অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক [illegible] পাকিস্তান প্রসঙ্গ (কাশ্মীর) না [illegible] শোভনতার ধার ধারেন নি। সম্মেলনের সভাপতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীউইলসন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এর সমুচিত জবাব দেন। সম্মেলনে পাক অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়।

৯ জানুয়ারি—লনডন অবজারভার এক সংবাদ প্রকাশ: ভারত নানান সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান যদি দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলায় আগ্রহী না হয়, বর্তমান চালচলন বজায় রাখে, তবে ভারতও [illegible] ব্যবস্থা নেবে—ভারতের আকাশ দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত [illegible] ভোজসভায় একথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

১০ জানুয়ারি—কমনওয়েলথ-এর একটি আফ্রিকান রাষ্ট্রগোষ্ঠী একমত যে, ব্রিটেন নীতিগতভাবে নতুন করে স্বীকার করবে যে, রোডেশিয়ায় গরিষ্ঠ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই দেশকে স্বাধীনতা [illegible] চলবে না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেছেন রোডেশিয়া-প্রশ্নে কোন আপস সম্ভব নয়।

১১ জানুয়ারি—ইজরায়েলের চারটি [illegible] উত্তর জরডন উপত্যকার উপর হানা দিয়ে ঘণ্টা ধরে সারা এলাকায় বোমা ফেলে। [illegible] গুলির মধ্যে নাপাম বোমাও ছিল। এ অভিযোগ জরডনের সামরিক কর্তৃপক্ষের। তাঁদের ইজরায়েলী বিমান হানায় কেউ হতাহত হয়নি তবে শস্যহানি হয়েছে প্রচুর।

১২ জানুয়ারি—পাঁচ হাজার রোডেশিয়া বিরোধী বিক্ষোভকারী রোডেশিয়া হাউসের দিকে শোভাযাত্রা করে গেলে পুলিসের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। ফলে বেশ [illegible] পুলিস ও বিক্ষোভকারী আহত হন। [illegible] জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোডেশিয়া হাউসের দিকে যাবার সময় হঠাৎ বিক্ষোভকারীরা পিছন ফিরে দক্ষিণ আফ্রিকা ভবনটি আক্রমণ করেন। বিক্ষোভকারীরা অধিকাংশই ছিলেন অশ্বেতাঙ্গ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আপনি কি বিচক্ষণা আধুনিকা মা না, নিতান্তই সাধারণ ?

নীচেকার কথাগুলি প'ড়ে যাচাই ক'রে নিন:

আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনার শিশুর পক্ষে ধীরে ধীরে স্তন্যপান বা দুগ্ধখাদ্য ছেড়ে দিয়ে শক্ত খাদ্য সুরু করা কতটা জরুরী ?
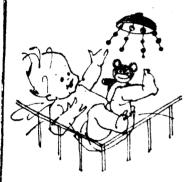
প্রথমে শিশুকে অল্প পরিমাণে ফ্যারেক্স দিতে সুরু করুন। পরে ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। শিশুরা এই শস্যখাদ্য, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, আয়রন ও সঠিক পরিমাণ প্রোটিনের মিশ্রণে দারুণ খুশী।

(শিশুরা সাধারণতঃ প্রথম শক্ত খাদ্য খায়—ফ্যারেক্স)। ফ্যারেক্স ব্যবহার করলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারবেন আপনার শিশু পরিপুর্ণ পুষ্টিলাভ করবে, সহজেই হজম করতে পারবে।

তাছাড়া এও জানবেন, ফ্যারেক্স স্বাস্থ্যবিধিসম্মতভাবে প্রস্তুত এবং বেশ সুবিধাজনক। তৈরী করাও অতি সহজ। ওর সঙ্গে শুধু দুধ আর চিনি মিশিয়ে প্রয়োজনমত ঘন ক'রে তৈরী ক'রে নিন।

বেশ কথা।

তাহলে এ সম্বন্ধে আপনি কি করছেন ?

শিশুকে শস্যখাদ্য বাড়ীতে রান্না ক'রে দিতে গেলে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়; অনেক সময় তা' খেতেও চায় না; পরিপুর্ণ পুষ্টিও তাতে হয় না; তাই না ?

তাহলে ফ্যারেক্স খাওয়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

সুন্দর বেড়ে ওঠে। সুস্থ, মজবুতভাবে বেড়ে ওঠার জন্য শিশুদের যা যা প্রয়োজন তা সবই এতে আছে। তাই পৃথিবীর সর্বত্র মায়েরা ফ্যারেক্সের উপর নির্ভর করেন।

বিনামূল্যে—ফ্যারেক্স পুস্তিকা

আমার শিশুকে সবচেয়ে ভাল খাদ্য কি দিতে পারি তা জানতে চাই। একখানা ফ্যারেক্স পুস্তিকা নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। ডাকখরচের জন্য ২০ পয়সার ডাকটিকিট সঙ্গে পাঠালাম।

নাম...

ঠিকানা...

....

....DC

ফ্যারেক্স, পোষ্ট বক্স ২০২, বোম্বাই।

ফ্যারেক্স—শিশুর প্রথম শক্ত খাদ্য

Glaxo

গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

GLO 8073 BN

প্রচ্ছদ : শ্রীজগদীশ ধর

আরে!
বড় ওস্তাদ দেখছি!
আমার চেয়ে দ্বিগুণ
কাজ করতে চাস?

নিশ্চয়ই। দ্বিগুণ কাজ।
অথচ অর্ধেকেরও কম খরচে।
বুঝলি।

গ্লীমের লার্জ সাইজে এবার যৌবনের মধুর বাহার!
নতুন লার্জ সাইজে শ্যাম্পু করা যাবে অনেক বেশী
আর প্রত্যেকবার শ্যাম্পুতে খরচও পড়বে কম।
গ্লীমের এবার মধুর বাহার! নতুন আকার, নতুন আভা,
নতুন লেভেলের শোভা,—নতুন সাদা ঢাকনা।
একেবারে নতুন রূপ! নতুন বাহার।

বিখ্যাত হেয়ারড্রেসাররা ব্যবহার করতে বলে গ্লীম শ্যাম্পু

প্রকাশিত হল

দাম ১০·০০

অর্থ, খ্যাতি, সম্মান — মানুষের যা কিছু কাম্য, সব পেয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক অনাদিপ্রসাদ। পারিবারিক এবং ঐহিক যাবতীয় সুখের কোনটিই তাঁর অকরায়ত্ত ছিল না। তবু তাঁর পঞ্চাশ বছরের উৎসবমুখর জন্মদিনে কি হল, তিনি যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। আকস্মিক কোনও এক প্রচন্ড ধাক্কায় হঠাৎ ভেঙে গেল তাঁর দীর্ঘকালের সুখনিদ্রা। তাঁর মনে হল : সাহিত্য-সাধনার নামে এতদিন তিনি যা করেছেন তা সব মেকী -- বাস্তব-জীবনের স্পর্শরহিত মনোরম কল্পনাবিলাস শুধু। তিনি এতকাল পাঠককে ঠকিয়েছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

হৃদয়দ্রাবী উপন্যাস

নুনের পুতুল সাগরে

কেবল, ঠকিয়েছেন নিজেকেও। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, যখন সফলতার চূড়ায় এস পৌঁছেছেন বলে প্রতীতি জন্মেছিল, এই নিষ্ঠুর অকরুণ উপলব্ধি আমূল নাড়া দিয়ে গেল তাঁকে। বিভ্রান্ত এবং বিচলিত অনাদিপ্রসাদের শুরু হল এক নতুন পথযাত্রা; নুনের পুতুলের মত বেরিয়ে পড়লেন তিনি সাগর মাপতে।...অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এবং জীবনজিজ্ঞাসায় পীড়িত এক সৎ সাহিত্যিকের আত্মানুসন্ধানের এক মহান আলেখ্য জনপ্রিয় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন উপন্যাস "নুনের পুতুল সাগরে"।

শেখর, রবি, অসীম, সঞ্জয় : চার যুবক : চার বন্ধু। ভিন্ন স্বভাবের—ভিন্ন মেজাজের। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তারা সদৃশ : নগরজীবনে তারা সকলেই বিতৃষ্ণ, ক্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্যর্থতার গ্লানিতে। পরিচিত পরিবেশ এবং পরিজন থেকে তাই একদিন তারা পালাল; এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে আশ্রয় নিল ধলভূমগড়ের অজানা অচেনা এক অরণ্যে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে অরণ্যের নিঃশব্দ নির্জনতায় তারা সকলপ্রকার কৃত্রিমতার আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উন্মোচন চেয়েছিল তাদের কাঙ্ক্ষিত অনাবৃত সত্তাটির। এবং সেই অরণ্যে জাত নিষ্পত্র কণ্টকাকীর্ণ অথচ গুচ্ছে গুচ্ছে বর্ণময় পুষ্পের সমারোহে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

অরণ্যের দিনরাত্রি

গর্বিত এক ক্ষুদ্র রুক্ষ বৃক্ষের মত- তাদের গ্লানিময় বৈচিত্র্যহীন জীবনতরুতেও তারা ফোটাতে চেয়েছিল প্রেমের এবং পরিপূর্ণতার স্বর্গীয় প্রসূনটিকে।...তরুণ ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস "অরণ্যের দিনরাত্রি" আত্মবিকাশের অদম্য উন্মুখতায় জর্জর যৌবনের পূর্ণতার পথটি অনুসন্ধানের এক অনবদ্য কাহিনী।

● এই লেখকের অন্য উপন্যাস ●

আত্মপ্রকাশ ৬·০০

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭

বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৩
শনিবার ১১ মাঘ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২০-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক "	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	.. ৩০.০০
ষান্মাসিক "	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষান্মাসিক "	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	... ১৩.০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষান্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 25 Jan. 1969

মহাকাশে মিলন

মাত্র পক্ষকাল আগে আমেরিকা মহাকাশ অভিযানের প্রতিযোগিতায় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, প্রায় চাঁদ ছুঁয়ে তার মহাকাশযান আর অভিযাত্রীরা আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে। তাদের এই কৃতিত্বে বিশ্ব যখন চমকিত, ঠিক তখন সোভিয়েট রাশিয়া আমাদের আর একবার চমকিত করল। এবারের চমকটা অন্য রকম, পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুটে যাওয়া নয়, পৃথিবী থেকে দেড়শো মাইল উঁচুতে দুটি মহাকাশযানের মিলন, অতঃপর মিলিত অবস্থায় এক মহাকাশযানের অভিযাত্রীদের অন্য মহাকাশযানে গমন, শেষে দুই মহাকাশযানের মধ্যে বিচ্ছেদ ও একে একে দুটি যানেরই নিরাপদে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন। ব্যাপারটি যে চমকপ্রদ তাতে সন্দেহ নেই, এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশবিজ্ঞানের আরও একটি বিরাট সাফল্য। এ-বিষয়ে অভিজ্ঞজন যা বলছেন তাতে মনে হয়, মহাকাশে এই যে মিলন সংঘটিত হল এর ফলে মহাকাশ যাত্রা এবং মহাকাশযাত্রীদের সুবিধে হল অকল্পনীয়, দূর পাললার দৌড়েই হোক বা মহাকাশযাত্রীদের বিপদেই হোক মহাকাশ-মিলন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

সাইন্স ফিকসান বা বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনীর পাঠক বহুদিন যাবৎ যেসব রোমাঞ্চকর ঘটনা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলেন তার মধ্যে 'স্পেস স্টেশন' অন্যতম। এই মাটির জগতে রেলপথ,বিমানপথ ইত্যাদি পথে ভ্রমণের সময় আমাদের একটি জংশন স্টেশনের দরকার হয়, অবশ্য ভ্রমণের পাললা যদি দূর হয় বা সোজা পথে না গিয়ে যদি বাঁকা কোনো পথ ধরতে হয়। অর্থাৎ এক থেকে আর-একে যাবার জন্যে এই ব্যবস্থাটি প্রচলিত রয়েছে। মহাকাশে 'স্পেস স্টেশন'-কে এই রকম একটি জংশন স্টেশন বললে ভুল হয় না। ওখান পর্যন্ত পৌঁছে যাত্রীরা অভিরুচি অনুযায়ী যত্রতত্র যেতে পারেন, ফিকসানে অন্তত তার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। এমনও পড়া গেছে, স্পেস স্টেশন এঞ্জিন বদল, মালপত্র তোলা মেরামতির কাজকর্ম ইত্যাদি করণীয় কাজগুলি সেরে ফেলার উপযুক্ত স্থান হয়ে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েট মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা মানুষের কল্পনার আরও একটি বস্তুকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে—মহাকাশ অভিযানে কার মর্যাদা কত ? কে কতটা এগিয়ে আছে ? মহাকাশে যান-মিলন আমেরিকাও ঘটিয়েছে, অবশ্য রকেট এবং মহাকাশযানের মধ্যে, সংযুক্ত অবস্থায় পৃথিবী প্রদক্ষিণও করেছে, কিন্তু যাত্রী মিলন নয়। ওদিকে সে দূর পাললার দৌড়ে তার অভিযাত্রীকে চাঁদ পর্যন্ত ঘুরিয়ে এনেছে। তাহলে কার মর্যাদা বেশি ?

এ সব প্রশ্ন স্বাভাবিক হলেও খানিকটা ছেলেমানুষী। প্রাথমিক গৌরব যারই প্রাপ্য হোক মানুষের সমস্ত অভিযানেরই শরিক একা একটি দেশ হয় না নানা দেশই হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আবিষ্কার কারও একচেটিয়া নয়, এক এক দেশের মানুষ এক একটি আবিষ্কারের গৌরব পেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকের আবিষ্কার আমাদের বিজ্ঞানজগতকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তা সকলের হয়ে গেছে। আজ মহাকাশ-পাড়ির প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে কে ক'টা চমক দিল তা বড় কথা নয়, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া অথবা অন্য কোনো দেশ বিজ্ঞানের জগতে কি দিয়েছে তার সমষ্টি নিয়েই মহাকাশ-বিজ্ঞানের ইতিহাস রচিত হবে।

ইতিমধ্যে একদল একটি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের অভিমত হল : মহাকাশ অভিযানের এই রোমান্সের সার্থকতা কি ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হোক আর সোভিয়েট রাশিয়াই হোক, যে অজস্র অর্থব্যয় করে এই রোমাঞ্চকর অভিযানে প্রতিযোগিতা করছে সেই অর্থ তো দেশের, অথবা বিশ্বের দৈন্য-পীড়িত মানুষের জন্যে ব্যয় করতে পারতেন। আমেরিকা ধনীর দেশ হলেও সেখানে দারিদ্র্যের দুঃসহ ক্ষতও কিছু কম নেই, রাশিয়ারও ঘরের সমস্যা অনেক, এক্ষেত্রে মহাকাশ অভিযান কি বিলাস অথবা নিছক মর্যাদার লড়াই নয় ?

অপারেশন থিয়েটার
পাকিস্তানী ডাক্তাররা
আয়ুব-বিরোধী
আন্দোলনে যোগ
দিয়েছেন। তাঁরা আয়ুবের
কলিজা বদলাতে চান।
আরেকটি সমস্যা

দেশ দর্পণ
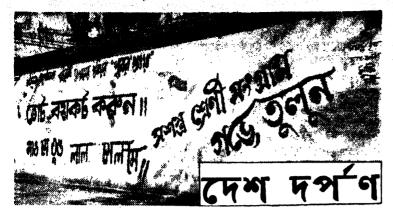
নকশালপন্থীদের নেতা শ্রীচারু মজুমদার বর্তমানে শয্যাশায়ী হবার কিছুদিন আগে একটি নির্দেশ প্রচার করেছিলেন। এই নির্দেশ ছিল সেইসব 'কমরেডদের' প্রতি যারা গ্রামে গ্রামে কাজ করছেন। এইসব নকশালপন্থী কর্মীদের প্রতি তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল কৃষকদের 'শ্রেণী বিশ্লেষণ' করতে শেখানো। অর্থাৎ নকশালপন্থী কর্মীদের প্রচেষ্টায় কৃষকেরা যাতে শ্রেণী বিশ্লেষণ ক'রে শ্রেণী সংগ্রামের স্বরূপটা বুঝতে পারে সেদিকে শ্রীচারু মজুমদার কর্মীদের সচেষ্ট হতে বলেছেন।

কথাটা তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, শ্রীমজুমদারের বক্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা। এটা যদি ব্যাপক হারে সম্ভব [illegible] হয়ে যায়, তাহলে এর উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ, নকশালপন্থীদের রাজনৈতিক বক্তব্যের একটা মূল কথা যে, ভারতে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং [illegible] প্রচার করা হয়েছে চীনের সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার (১৯৬৮ সালের) রিপোর্টে। এই রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতীয় জনগণের পক্ষে "শহরকে ঘিরে ফেলার জন্য ও সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখলের জন্য" গ্রামাঞ্চলকে ব্যবহার করার বিপ্লবী পথ গ্রহণের প্রয়োজনের কথা খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করছেন। এই রিপোর্টেও আছে শ্রেণীবিশ্লেষণের উল্লেখ। আছে গ্রামাঞ্চলে নির্মম সামন্তবাদী শোষণের বিবরণ।

শ্রীচারু মজুমদারের বক্তব্যকে চীনের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যাবে, নকশালপন্থী বা কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের রাজনৈতিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শোনা গিয়েছে সম্প্রতিকালে কেরলে কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের এক বৈঠকে পার্টি সংগঠনের কথাটা বিচার ক'রে দেখা হয়েছে এবং প্রচেষ্টার কথা চিন্তা করা হ'য়েছে। এই বৈঠকে, প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, কেরলে নকশালপন্থীদের কয়েকজন নেতা, যেমন, শ্রীকোশলরাম দাস, শ্রী কে পি আর গোপালন এবং আরও কয়েকজন এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিন আগে যখন এমনি একটা প্রচেষ্টার কথাটা উঠেছিল, তখন অবশ্য রাজনৈতিক পার্টি সংগঠনের কথায় আমল দেওয়া হয়নি। কিন্তু গত বছরের শেষের দিকে যখন কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠকে বসে, তখন এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হ'য়েছিল যে, কৃষক-শ্রমিকদের প্রকৃতভাবে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা হবে। এই সচেতনতাকে সক্রিয় করে তোলা হবে কৃষি আন্দোলনের মাধ্যমে।

কিন্তু মূল কথা নিয়ে নকশালপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এই মত-বিরোধ দেখা দিয়েছিল গতবছর অন্ধ্রপ্রদেশে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেবার ঠিক পরেই। অন্ধ্রপ্রদেশে সেই সময় প্রায় হাজার দশেক কম্যুনিস্ট মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। পশ্চিম বাংলায়ও প্রায় সাতশ'র মত পার্টি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কেরলে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভেঙ্গে গিয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের দল এবং উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ। মোট কথা, একটি সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের সুযোগ সেই সময় এসে গিয়েছিল। কিন্তু সে-সময় পার্টি সংগঠনের প্রস্তাবকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; কারণ, নকশালপন্থী নেতারা বুর্জোয়া নেতৃত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হ'য়ে পড়েছিলেন। কোন কোন নেতার বক্তব্য ছিল যে, ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন বিপ্লবের পথে যেতে পারেনি প্রধানতঃ এই কারণে যে, পার্টির নেতৃত্ব সবসময় এসেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, বা আধা বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে। অনেকটা এই কারণেই সে-সময় তৃতীয় পার্টি সংগঠনের কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

অথচ কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের বর্তমান নেতৃত্বের চেহারা দেখলে মনে হবে, সরকারীভাবে পার্টি সংগঠিত না হ'লেও প্রকৃতপক্ষে কো-অর্ডিনেশন কমিটি সেই পার্টির অভাবকে অনেকাংশে মিটিয়ে দিয়ে নূতনভাবে কৃষক-শ্রমিককে বৈপ্লবিক আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তবু, পার্টির অভাবের ফলেই হয়ত দেখা যাচ্ছে নকশালপন্থীদের বা কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের সংহতি ক্রমাগত ব্যাহত হ'চ্ছে পশ্চিম বাংলায় এবং বিভিন্ন রাজ্যে।

অন্ধ্রের কথাই ধরা যাক। এই অন্ধ্র প্রদেশে বহুদিন ধরে কম্যুনিস্ট আন্দোলন তীব্র আকারে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। যে-সময় তেলেঙ্গানা আন্দোলন হয়, তখন পার্টির নেতৃত্ব এতটা সক্রিয় ছিল যে, কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে পরবর্তী নির্বাচনে বিপুলভাবে জয় লাভ সম্ভব হয়েছিল কয়েকটি জেলায়। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এই সব জেলায় কম্যুনিস্টদের প্রভাব ছিল অটুট এবং অপ্রতিহত। কংগ্রেসের পক্ষে এই প্রভাবকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি প্রধানত এই কারণে যে, কংগ্রেসের যে প্রচেষ্টা ছিল কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে তা প্রধানতঃ এসেছিল এমন সব জমির মালিকদের কাছ থেকে যাদের বিরুদ্ধেই ছিল কম্যুনিস্টদের তেলেঙ্গানা বা কৃষক আন্দোলন।

সেই আন্দোলন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। দেখা গেল যে-সব ভূমিহীন হরিজন কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে হতাশা ছেয়ে গিয়েছে। এটা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লক্ষ করতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। তাই প্রথম থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় এমন সব কৃষিপ্রধান প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার সুস্পষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কৃষকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃষি উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং বিদ্যুতের প্রসার কৃষি এলাকায় নূতন প্রভাব বিস্তার করল। অনেকটা এরই ফলে কৃষি-প্রধান অন্ধ্র প্রদেশে এল এক নূতন ধরনের বা শ্রেণীর কৃষক যাদের হাতে এসে গেল অর্থনৈতিক হাতিয়ার। এই অবস্থার সামনে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের হাতে এমন কোন কর্মপন্থা ছিল না যা এই অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সংগঠিত জমিধার কৃষক শ্রেণীকে প্রতিহত করতে পারে। বরং ১৯৬৪ সালে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যে ভাঙ্গন দেখা দিল, তার ফলে অন্ধ্র প্রদেশের কম্যুনিস্ট সংগঠন আরও দুর্বল হ'য়ে পড়ল।

এই দুর্বলতার চরম সুযোগ নিল

অবস্থাপন্ন কৃষিজমির মালিক শ্রেণী। একদিকে রাজ্যের কংগ্রেস শাসনের সঙ্গে এই নতুন শ্রেণীর কোন সংঘাত যেমন ঘটল না, অপরদিকে তেমনি কমিউনিস্ট আন্দোলন পিছু হটতে শুরু করল। অনেকটা এই কারণেই পর পর সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টদের পরাজয় ঘটতে লাগল এবং চতুর্থ নির্বাচনে দেখা গেল তার চরম পরিণতি হিসাবে কমিউনিস্টদের সুরক্ষিত অঞ্চলগুলো কংগ্রেসের দিকে চলে গিয়েছে।

পরিবর্তনটা প্রধানতঃ এল, পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচন যখন হল, তখন দেখা গেল অধিকাংশ পঞ্চায়েতগুলো গ্রামের প্রভাবশালী জমির মালিকদের হাতে চলে গিয়েছে! প্রায় একই সঙ্গে নতুনভাবে রচনা করা হল অন্ধ্রের ভূমি সংস্কার আইন। নিজামের আমলের শেষ দিকে একটা আইন চালু করা হয়েছিল; কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সারা ভারতের জমিদারী প্রথা লোপ করে ভূমি সংস্কার করতে হবে, তখন নতুন ভাবে চালু করা হল "সমন্বয়মূলক" ভূমি সংস্কার আইন। এই আইনে জমির এমন সব শ্রেণী বিভাগ করা হল, যার ফলে কার্যত জমিদারী প্রথা বিলোপের আইনটা অচল হয়ে রইল।

অনেকটা এই সব কারণেই অন্ধ্রের বিভিন্ন জেলায় এবং অঞ্চলে জমির মালিকরা প্রবল হবার সুযোগ পেয়ে গেল। অন্ধ্রের কমিউনিস্ট সংগঠনে যখন বিভেদ ঘটল, তখন এদের প্রভাব চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। বিভিন্ন কমিউনিস্ট দলিল থেকে দেখা যায়, এই প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন গ্রামে হরিজনদের উপর নির্যাতন শুরু হয় এবং ব্যাপকহারে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। অন্ধ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন এই সব অশান্তিকর ঘটনাকে রোধ করার জন্য; কিন্তু সে-আদেশ চালু হবার আগেই ঘটে গেল হরিজন নির্যাতনের চরম দৃষ্টান্ত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতা অবশ্য দাবী করেছেন যে, কমিউনিস্ট আন্দোলন এই সব নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে পরিচালিত করা হচ্ছে; কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাটাও হয়ত তাদের রাজনৈতিক মহলে অজানা নেই যে, কমিউনিস্ট সংহতি প্রতিক্রিয়ার সামনে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মতে, কংগ্রেস এবং জনসংঘের সহযোগিতার ফলেই আচমপেট প্রভৃতি অঞ্চলে জমির মালিকরা ত্রাসের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এটাও উপেক্ষণীয় নয় যে, শ্রীনাগি রেড্ডী এবং শ্রীপুল্লা রেড্ডী মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার পর কমিউনিস্ট আন্দোলন আরও দুর্বল হবার সুযোগ পেয়েছে।

হয়ত এই দুর্বলতার চিহ্নটা ঢেকে দেবার প্রয়াস হিসাবে সম্প্রতিকালে কয়েকটি ঘটনাকে সামনে রাখার চেষ্টা হয়েছে শ্রীকাকুলাম অঞ্চলে। এই অঞ্চল প্রধানতঃ ছিল এজেন্সী অঞ্চলভুক্ত এবং এই সব এলাকায়, যেমন পার্বতীপুরম এজেন্সী এলাকায়, কমিউনিস্টদের প্রভাব কিছুটা অটুট ছিল মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের পর। কারণ, দাবী করা হয়েছে যে, এই সব অঞ্চলে নকশালপন্থীদের প্রভাব কিছুটা সক্রিয়। হয়ত এই প্রভাবকে কিছুটা কাজে লাগান হয়েছে সম্প্রতি সে-সব সংঘর্ষ ঘটে গিয়েছে পুলিশের সঙ্গে হরিজনদের। এইসব ঘটনার মধ্যে কিছুটা গেরিলা যুদ্ধেরও আভাস দেবার চেষ্টা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে বন্দুকের ব্যবহার করে। বন্দুকের ব্যবহারটা ইঙ্গিতপূর্ণ, কারণ, নকশালপন্থীদের মূলকথা বন্দুকই শক্তির উৎস। শ্রীকাকুলামের এইসব ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়ত আছে, কিন্তু তার চাইতে বেশী আছে প্রচারের উদ্দেশ্য।

কথাটা এসে পড়ছে এই কারণে যে, শ্রীনাগি রেড্ডী বা শ্রীপুল্লা রেড্ডীর নেতৃত্ব খুব সক্রিয় হবার সুযোগ এখনও পায়নি। পার্টি সংগঠনের প্রশ্নে যেমন মতভেদ দেখা দিয়েছিল, ঠিক তেমনি মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে কার্যত নেতৃত্বের ভার যাদের হাতে। মতভেদটা এই কারণে যে, নকশালপন্থীদের একদিকে সংগঠিত করা যেমন সম্ভব হচ্ছে না, অপরদিকে কোন সক্রিয় কর্মসূচীও দেওয়া সম্ভব হয়নি। একপক্ষের আন্দোলন মতটা অনেকটা চেগুয়েভারার মত; অর্থাৎ বিপ্লবের জন্য যেমন শ্রেণী সংগ্রামের সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তেমনি বৈপ্লবিক অবস্থাও সৃষ্টি করা সম্ভব ক্রমাগত সংঘর্ষ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অপর পক্ষে, এই মতবাদও শোনা গিয়েছে যে, রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি না করে, অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামে দীক্ষিত না করে বৈপ্লবিক কর্মপন্থাকে কার্যকর করা সম্ভব নয় এবং তা সম্ভব নয় বলেই ক্রমাগত প্রচার এবং দীক্ষার কাজকে (অর্থাৎ 'মগজ ধোলাই') অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

নকশালপন্থীদের নেতৃত্বের মধ্যে এই মতবিরোধ আজ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। যে মতবাদ চেগুয়েভারার মত ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে বৈপ্লবিক অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব বলে স্বীকার করে সেই মতবাদের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখা গিয়েছে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলাম অঞ্চলে, কিম্বা কেরলের ওয়েনাদ বনাঞ্চলে তেল্লীচেরী এবং পুলপল্লীতে। কেরলের ঘটনা উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ওয়েনাদের ঘটনার কিছুদিন আগেই নকশালপন্থীদের একাংশ ঘোষণা করেছিল তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কথা।

পরবর্তীকালে কেরলে ঘোষিত এই তৃতীয় পার্টি সম্বন্ধে আর তেমন কোন খবর প্রচার শোনা যায়নি বটে, কিন্তু ওয়েনাদের ঘটনা সারা ভারতে আলোড়ন তুলেছিল। ওয়েনাদের ঘটনার মূলে প্রচার ছিল বন্দুকের ব্যবহার। আর ছিল কুনিক্কাল এবং কে পি নারায়ণের নেতৃত্ব। মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী এ কে গোপালন ওয়েনাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু লোকের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু এ-প্রসঙ্গে এটাই উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীচারু মজুমদার এবং শ্রীনাগি রেড্ডী দুজনেই এই ঘটনাকে সমর্থনযোগ্য মনে করেননি।

অন্যপক্ষে কেরলের ঘটনা এবং পার্বতীপুরম অঞ্চলের ঘটনাগুলোই নকশালপন্থীদের দুর্বলতাকে সামনে তুলে ধরেছে। একদিকে যেমন কেরলে এবং পার্বতীপুরমে সংঘর্ষ একেবারে সীমিত, অন্যদিকে তেমনি নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন বয়কট করা; জনগণের শ্রেণী বিশ্লেষণ করার কাজ কোথাও। মনোভাবের দিকটা সেজন্যই দেখা যাক না কেন, সমস্ত ক্ষেত্রে এটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নকশালপন্থীদের সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন মহলে। মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রের সেক্রেটারী শ্রী পি সুন্দরাইয়া বলেছেন যে, তাঁর পার্টি নকশালপন্থীদের কোনরকম প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদেরও মত অনেকটা অনুরূপ এবং দুটি কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা যে, নকশালপন্থীরা কোন সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি নয় এবং আবার দুটি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মিশে যেতে পারে।

এমন সম্ভাবনা যে নেই, তা হলফ করে বলা দুষ্কর। কারণ, এটা ঠিক, অন্ধ্র রাজ্যের কিছু ছেড়ে আসা নকশালপন্থী আবার মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে এসেছে। পশ্চিম বাংলায়ও যে এরকম কিছু ঘটবে না তার স্থিরতা নেই। বিশেষ করে নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে এটা লক্ষণীয় যে, পশ্চিম বাংলায় মাও সে-তুঙের শ্লোগান বা নির্বাচন বয়কটের ধ্বনি কার্যতঃ দেয়ালের লিখনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। নকশালপন্থীদের সাংগঠনিক দুর্বলতাই কমিউনিস্ট বিপ্লবের ধ্বনিকে এ-পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে।

পংক্তিতিলক

চন্দ্রগুপ্ত

পাঁচ বছর দু মাস প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করবার পর লিন্ডন জনসন হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিয়েছেন ২০ জানুয়ারি। কথাটা হয়তো বেখাপ্পা শোনালো। মার্কিন দেশে রাজা-বাদশা নেই, কাজেই রাজত্ব করার কথা ওঠে কোথা থেকে? আর তাঁর ভাগ্য-নির্ণয় তো হয়ে গেছে অনেক আগেই—এমন কী রিচার্ড নিক্সন নির্বাচনী লড়াইয়ে জিতে রাষ্ট্রপতি পদের সনদ পাবারও আগে। গত বছর মার্চ মাসে প্রেসিডেণ্ট জনসন যখন সবাইকে অবাক করে সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর যোগ্যতা থাকলেও আসন্ন মার্কিন নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনি তাঁর নিজের দলের মনোনয়ন চাইবেন না তখনই তো বোঝা গেল তাঁর বিদায়ের পালা এলো বলে—হোয়াইট হাউসে তাঁর লীলা খেলার ইতি। তারপর যখন নভেম্বরের নির্বাচনে তাঁর বাছাই করা প্রার্থী ডেমোক্র্যাট দলের হিউবার্ট হামফ্রি হেরে গেলেন রিপাবলিকান দলের রিচার্ড নিক্সনের কাছে তখনই তো মার্কিন সরকারের ওপর পর্দার আড়াল থেকে সেটুকু প্রভাব বিস্তার করার আশা তাঁর ছিল সেটুকুও নির্মূল হলো। এ কটা মাস তাঁর তো নরমে সরে থাকার কথা।

অন্য কোন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হলে হয়তো তাই হতো। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরের মাস কটায় তিনি কোনও ক্রমে দিনগত পাপক্ষয় করে কাটিয়ে দিতেন। ২০ জানুয়ারির কোনও তাৎপর্যই তাঁর কাছে থাকতো না। চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে আসার ঠিক আগে ছুটি নিলে লোকের যে অবস্থা হয় তাঁর অবস্থা তাই হতো। জনসন কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাঁর দিন ফুরিয়েছে জেনেও তিনি আদৌ মুষড়ে পড়েন নি কিংবা কাজ-কর্মে ঢিলে দেননি। তিনি এমন ভাবে চলছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল মার্কিন দেশের শাসনভার বুঝি আরও চার বছর তাঁরই হাতে থাকবে—নিক্সন জেতার পরও তাঁর হাবভাবের কোনও বদল হয়নি। প্রতাপও কমেনি। ভিয়েতনামে বোমা ফেলা বন্ধ অবশ্য তিনি যখন করেন তখন নির্বাচনের অনেক দেরী, তাঁরই পুরোদমে তখন শাসন-কাজ চালাবার কথা। কিন্তু এমনই তিনি বেপরোয়া যে নিক্সন জেতার পরও তিনি একটা রুশ-মার্কিন 'সামিট' অর্থাৎ শীর্ষ-বৈঠক বসাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। সে বৈঠক হয়তো বসতোও যদি না মস্কো বেঁকে দাঁড়াত।

সংবিধানের হিসাবে তিনি রাজা-মহারাজ কিংবা নবাব-বাদশা কিছু ছিলেন না—ছিলেন একটা গণতন্ত্রের নির্বাচিত রাষ্ট্র-নায়ক। তাও আবার যে-সে গণতন্ত্রের নয়, এ যুগের গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকার। কিন্তু দেশ শাসন তিনি করেছেন রীতিমত বাদশাহী মেজাজে। কোনও রাজা-বাদশা তাঁর চেয়ে বেশী দাপটে রাজত্ব করেছেন কিনা সন্দেহ। আইনকানুন তিনি কিছু লঙ্ঘন করেন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসকেও তিনি অবজ্ঞা করে চলেন নি। কিন্তু এমনই ছিল তাঁর প্রতাপ যে সে কংগ্রেসকে দিয়ে তিনি যা চেয়েছেন তাই করিয়ে নিয়েছেন। শেষ দিকে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বেশ অবনিবনা হয়েছিল। তা হলেও মোটের ওপর গত বাষট্টি মাস মার্কিন কংগ্রেস ছিল যন্ত্র, তিনি ছিলেন যন্ত্রী। যে সুর তিনি সে যন্ত্রে বাজাতে চেয়েছেন তাতে সে সুরই বেজেছে। অসংখ্য আইন তিনি অনায়াসে কংগ্রেসকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কালা-সাদার বৈষম্য দূর করা, সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার বিস্তার ঘটানো, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমানো।

যে কোনও প্রেসিডেণ্টের পক্ষেই এ ধরনের এত আইন পাস করানো শক্ত হতো। জন এফ কেনেডি যদি বেঁচে থাকতেন—নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু যদি না হতো—তা হলেও তাঁর পক্ষে কাজটা খুব সহজ হতো না। হয়তো কেনেডির হত্যা জনসনের কাজকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল কংগ্রেসের মন গলিয়ে। নিগ্রোদের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত আইনের খসড়া তো কেনেডিরই কীর্তি। সে আইন পাস করে কংগ্রেস হয়তো কেনেডি হত্যা পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে। তাছাড়া কংগ্রেসে ছিল তাঁর দলেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য। যাঁরা দলীয় প্রধান তাঁরা ছিলেন প্রায় সকলেই জনসনের পোষমানা। তার ওপর যে রকম বিপুল ভোট পেয়ে তিনি গোল্ডওয়াটারকে হারিয়ে আগের বারের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেতেন তাতে এক রকম বাধ্য হয়েই কংগ্রেসকে তাঁকে সমীহ করে চলতে হয়েছে। আইনের পর আইন তাঁর মর্জি অনুযায়ী কংগ্রেস পাস তো করেছেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালাবার জন্য তিনি যত টাকা চেয়েছেন বিনা দ্বিধায় তা মঞ্জুর করতে তার বাধেনি। যে প্রশ্রয় মার্কিন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট জনসনকে চার বছর ধরে দিয়েছে আর কারুর ভাগ্যে ইদানীং তেমন জোটেনি।

এত পেয়েও কিন্তু জনসন এমন কিছু করতে পারেন নি যার জন্য বিদেশে না হোক স্বদেশে সকলে তাঁকে মনে রাখবে। রুজভেল্টের নাম এখনও দুনিয়ার লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, অল্প কালের মধ্যেই কেনেডি একটা ছাপ রেখে গিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু জনসনের নাম যদি লোকে মনে রাখে তা মনে রাখবে তাঁর কোনও কৃতিত্বের জন্য নয় ভিয়েতনামে তাঁর ভূমিকার জন্য। সে ভূমিকা এমন নয় যা নিয়ে লোকে গর্ব অনুভব করতে পারে। এ কথা ঠিক সে যুদ্ধ তিনি বাধান নি, তাঁর প্রেসিডেণ্ট পদ পাওয়ার আগে থেকেই সে যুদ্ধ চলছিল। এও ঠিক সে যুদ্ধ শেষ করার পথও তিনি তৈরি করে গিয়েছেন। ভিয়েতনামে শান্তি আনার জন্য যে বৈঠক বসেছে গত শনিবার থেকে প্যারিসে তার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন জনসনই। তবুও লোকে এ কথা ভুলতে পারে না সে বৈঠক অনেক দিন আগেই ডাকা যেতে পারত যদি লড়াইয়ের ভূত তাঁর ওপর ভর না করতো। জনসন চেয়েছিলেন মার্কিন দেশের যে প্রচণ্ড সামরিক শক্তি তা দিয়ে ভিয়েতনামের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সে লড়াই তিনি জিতবেন, ভেবেছিলেন ভিয়েতনাম জয় হবে তাঁর ইতিহাসে অক্ষয়-কীর্তি, খ্যাতি পাবেন দিগ্বিজয়ী বলে।

সেই ভিয়েতনামই হলো তাঁর কাল। আজ যে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে অপযশের কলঙ্ক-পসরা মাথায় তুলে তার কারণ হচ্ছে ভিয়েতনাম। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন চরম ব্যর্থতা কূটনৈতিকও, সামরিকও। যখন তাঁকে তাঁর বন্ধুরা পরামর্শ দেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের পালা চুকিয়ে দিতে, কেন না যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও দিন ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান হবে না তখন তিনি বেছে নিয়ে তাঁর পরামর্শদাতা বদলেছেন কিন্তু বাস্তবকে মেনে নেননি। ভিয়েতনামে এত মার্কিন সেনা যে বেঘোরে প্রাণ হারাবে সেটা অবশ্য তিনি আশা করেন নি। সেটা তিনি দেখতে পেলেন না তা হচ্ছে আমেরিকার এত তরুণের অকালে ও অকারণে মৃত্যু মার্কিন সাধারণ মানুষ সহ্য করবে না, বরদাস্ত করবে না সাধারণ মার্কিন নাগরিক। এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে ভিয়েতনামে লড়াইয়ে আমেরিকানদের আপত্তি নীতিগত। বাড়ের মত লড়াই করে যদি ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনী জিততে পারতো তা হলে জনসনের কাজের এত বিরূপ সমালোচনা আমেরিকায় হতো না। তা হয়নি বলেই জনসনের বিরোধীরা জোর পেয়েছেন, তাঁর প্রতিপক্ষেরা হয়েছেন প্রবল। সেই প্রতিকূলতার স্রোতে ভেসে গিয়েছেন মার্কিন দেশের ৩৬ নং প্রেসিডেণ্ট কপালে অখ্যাতির তিলক কেটে।

মহাকাশের তিন নাবিককে

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

আমরাও জানতাম, কিন্তু বলিনি।

মানুষের নীল অধরকে যারা রঙীন করে দেয়
জ্যোৎস্নার মত দেখতে সেইসব রমণীর শরীরেও
[illegible] কালো কালো উল্কি আঁকা ছিল অনেক।
আমরা কাউকে সে কথা বলিনি।
কারণ রমণী ছাড়া মানুষের তৃষ্ণার্ত অধরের আর্তনাদ মেটাবে
আর কোন্ সরোবরের জল?

পৃথিবীর সমস্ত উদ্যানে সাপের খোলসে ভরা ভীষণ সব গহ্বর।
কিন্তু সেই সর্বনাশের কথা কাউকে বলিনি আমরা।
কারণ উদ্যান ছাড়া মানুষের রক্তাক্ত বিষাদকে
আর কেউ কুসুমে কুসুমে রঙিন ফোটাতে পারে না।

ভীষণ শীতের রাত এখন।
মহাকাশ থেকে ভীষণ কুয়াশা নেমে এসেছে ভূমণ্ডলে।
ক্রমাগত গাছ থেকে পাতা খসে পড়ছে।
ক্রমাগত চোখ থেকে বিস্ময় খসে পড়ছে।
ক্রমাগত জানা যাচ্ছে মানুষ যে-সব মন্দিরে প্রদীপ জ্বেলেছে
সেখানে ঈশ্বর নেই।

শতাব্দীর এই ভয়াবহ মধ্যরাতে
পৃথিবী যদি মত অনুরাগীদিগকে চন্দ্রালোক বলে
ভালোবাসে মানুষকে।
জ্যোৎস্নার মত দেখতে যা কিছু সবই বুকের
পাশ থেকে সরে গেলে
মানুষ রঙীন অধর নিয়ে কার পাশে ঘুমোবে?

ভাঙা পেয়ালার নকশা

সুনীল বসু

অবশেষে হে চন্দ্রিমা ছিন্ন হল কুহকের জাল
ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে, দেখা হল অনাবৃত গাত্রত্বক
কোটি যুগ বাসনার অগ্নিকাণ্ড সকাল-বিকাল
তোমার স্তনের লোভে শাণিত এ কবিত্বের নখ।
মানুষের যৌনস্পৃহা কতকাল জাগিয়েছ তুমি
জোছনায় নগ্ন-স্নান করে গেছে যুবক-যুবতী
প্রেমের ভাণ্ডার আজ লুট করে ওষ্ঠ গেল চুমি
রাত্রির সম্রাজ্ঞী তুমি, ব্যর্থ প্রেমিকের আশ্রতি।
তোমার শরীরে হাত দিতে চেয়ে যুগান্তের বাজি
দুরন্ত দস্যুর মত জিতে নিল মানুষের সাধ।
বলো তুমি কোনোদিন দেখাবে না ধূর্ত কারসাজি
বিবাহিত রমণীর মত দেবে বুকের আস্বাদ।
কী অসহ্য কৌতূহল পুড়ে গেছে মানুষের বুকে
দুই বাহু দিয়ে চাঁদ, পান করি তোমাকে চুমুকে॥

'আমি এবং আমার ইন্দ্রলুপ্ত'

কলেজ স্কোয়ারে ডাইভ দেবার ভঙ্গিতে আমি একদা মাতৃগর্ভ ফলকে ঝাঁপ দিয়ে তর-তর করে সাঁতার কেটে বেরিয়ে গেছি। কিংবা কঙ্গোর জঙ্গলে কোনো কেশবতী শিম্পাঞ্জির সঙ্গে হাতাহাতি করে আচমকা পৃথিবীতে ফিরে এসেছি, অথবা ফিজি-টিজি কোথাও নরখাদকদের ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে—টাক-বিরোধী কোনো কৌশলে পালিয়ে এসেছি—আমার সম্বন্ধে এ-সব গল্প বিশ্বাস করলেও করতে পারেন। কিন্তু কোনো একদিন আমার মাথায় নিবিড়-ঘন কেশদাম ছিল, এবং পাড়াপড়শিরা চিরুনি চালাতেন না, আমার সেই শিরোরত্নগুলোকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে আধ শিশি তেল খরচ করতে হত—এ কথা তাঁদের বিশ্বাস করাবার জো নেই।

অল্প বয়সের ছবি দেখিয়ে তাঁদের সংশয়-মোচনের চেষ্টা করলাম। তাতে একজন নাক কুঁচকে বললেন, 'চালাকির আর জায়গা পাওনি? ওটা নিশ্চয় তোমার ছোট ভাইয়ের ছবি!'

'কী আশ্চর্য আমার কোনো ছোট ভাই-ই নেই যে! আমিই তো ছোট।'

'তা হলে ভাইপো। নইলে ভাগনে না হলে যে-কেউ। মোদ্দা—তুমি নও, তুমি হতেই পারো না।'

অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য থেকে একটি মাত্র তথ্যই পরিস্ফুট। এই রকম একটি উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছন্ন টাক শীর্ষদেশে বহন করেই আমি মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলাম।

আমি ছিলাম অথচ আমার টাক ছিলনা—এ-রকম ঘটনা পৃথিবীতে কোনোদিন ঘটেনি, কিছুতেই ঘটতে পারেনা।

টাকের উপকারিতা

ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে যেমন তর্ক চলে না, আমার টাক-প্রত্যয়ও তাঁদের কাছে তেমনি তর্কাতীত।

কী করে যে শুরু হলো, জানি না। আমি টেরও পাইনি. ক্রমশ আমার ললাট প্রতিভাবানের মতো প্রসারিত হতে থাকল, চাঁদির অরণ্যে চন্দ্রালোকের আনাগোনা শুরু হলো. তারপর কে একজন যেন অকস্মাৎ ঘোষণা করলেন : 'মাথায় টাক পড়ছে যে—কী ব্যাপার?'

যেন টাক পড়বার সঙ্গে কোনো একটা ব্যাপারের সম্পর্ক থাকে!

আর একজন সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন, 'ও কিছু নয়, ওটা লক্ষ্মী টাক!'

'লক্ষ্মী টাক?' টাকেরও যে এমন একটা মনোরম বিশেষণ থাকতে পারে, এ খবরটা এর আগে তো জানা ছিলনা। সেই ব্যক্তিটিই অবশ্য ভাষ্যও করে দিলেন : 'মানে তোমার টাক বাড়ছে কিনা, তাই।'

শুনতে ভালো. প্রাণ এবং মন এক সঙ্গেই জুড়িয়ে যায়। টাক আপাতত বাড়বার কোনো লক্ষণ দেখছি না। কিন্তু লক্ষ্মী টাক যখন এসেছে, তখন সেই সুন্দর আসনটিতে লক্ষ্মীর আসতে আর কতক্ষণ!

কিন্তু সে ভদ্রমহিলা আর আসবার সময় পেলেন না, সোজা বড়বাজারে গিয়ে কালো কালো টুপির তলায় ডুব মারলেন; আর আমার মাথার ওপর তাঁর আসনটি ক্রমে বাড়তে লাগল, বাড়তেই লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত দুই কানের পাশে দুটি গুচ্ছ আর ঘাড়ের ওপর একটি ঝালর অবশিষ্ট রেখে—একটি অম্লান শূন্য টাক বৈকুণ্ঠের দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে : যদি তাঁর প্যাঁচার পালকও খসে পড়ে একটা!

সত্যি কথা বলতে কী, আমি মনোযন্ত্রণায় খুব বেশি বিমূঢ় হয়ে পড়িনি। পৃথিবীর সব লোক গাড়িচাপা পড়ে না, কিন্তু কাউকে কাউকে পড়তেই হয়—নইলে গাড়ি চাপা পড়াটারই কোনো মানে হয় না। দোতলা-তেতলা থেকে হঠাৎ এক ঝাড়ু আবর্জনা সকলের মাথায় পড়ে না—কিন্তু দু-একজনের মাথায় অবশ্য পড়া দরকার, নইলে আর ওগুলো ডাক করে রাস্তায় ফেলা কেন? এই শীতের দিনে কলা আর কমলালেবুর খোসার মাধ্যাকর্ষণে, সকলে নয়—কেউ কেউ প্রতিদিনই আছাড় পড়ছেন,

কারণ পড়া উচিত। ঠিক সেই রকম টাক যখন পড়বেই—যখন কিছুতেই তার ব্যতিক্রম ঘটবে না, তখন আমার মাথাটিকে যদি সে পতনযোগ্য বলে নির্বাচিত করে থাকে, তাতে আমি কেন বিচলিত হব, চটতেই বা যাব কেন? টাকের বদলে আমার গেঁটে বাত হতে পারত, আমার মৃগীরোগ থাকতে পারত, আমি দারুণ ডিস্‌পেপ্‌টিক আর দুর্দান্ত খিটখিটে হতে পারতুম, আমার এমন নাক ডাকতে পারত যে আমার গৃহিণী স্লিপিং পিল খেতে বাধ্য হতেন। এ-সবের তুলনায় টাক এমন কি খারাপ 'অপ্‌শন?'

আমার যে-সব পরিচিত ব্যক্তিরা টাক-জনিত মনোযন্ত্রণায় নিত্য বিমর্ষ, সাধু-সন্ন্যাসীর দৈব ওষুধ থেকে কাগজের নিত্য নতুন বিজ্ঞাপন এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করছেন (অসম্ভব মশাই, পাগলা কুকুরের ল্যাজও সোজা হয় শুনেছি, কিন্তু মানুষ উদোম-ন্যাপা হলেও টাক সারবার আশা নাস্তি), আমি তাঁদের কারো আদৌ সমব্যথী নই।

বরং টাকের বদলে নিউরোসিস কিংবা নিউরালজিয়া হয়নি বলে নিজের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ আছি। যাঁরা টাকের লজ্জাকে ঢাকবার জন্যে শীত-গ্রীষ্ম সর্বদা একটা টুপি চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন (এরকম কয়েক জনকেই তো জানি), তাঁদের কাপুরুষতাকে আমি নিন্দা করি। ডাক্তার-বৌটিক সানন্দে অন্যের কাছে তাঁর চাঁদির পার্সেন্টেজ্ ঘোষণা করেন—প্রায় সগর্বেই বলা যায়, বাতের ব্যথিত প্রায় 'রোম্যান্টিক অ্যাগনিতে' অন্যের কাছে যন্ত্রণার বিবরণ শোনান, আর টাক থাকলেই সেটা আড়াল করবার জন্যে গোরুচোরের মতো এ কী লুকোচুরি! মাথার দু-চার গাছা অবশিষ্ট চুলকে চিরুনির কায়দায় উল্টে-পাল্টে চাঁদিকে একটু আবৃত করবার এ কী ব্যর্থ আর করুণ প্রয়াস!

আমার চিত্তে কোনো বিক্ষোভ নেই, কোনো অভিযোগ নেই; এবং যদিচ কলকাতা শহরে একটা বেলতলা রোড আছে, তবুও সেখানে যে কোনো বেল গাছ আমার টাকের দিকে তাক করে সশস্ত্রভাবে অপেক্ষা করছে না—তাও আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। বরং টাকের জন্যে অনেকের ভেতরে আমি ডিস্‌টিংটিভ, কারণ পেছন থেকে প্রায়ই শুনতে পাই: 'নিঘাত সুরেনবাবু যাচ্ছেন, টাক দেখতে পাচ্ছিস না?'

তেলের খরচ নেই বললেই চলে, আঁচড়ানোর ঝামেলা প্রায় তিরোহিত, বেশ সুখেই আমার কালাতিপাত চলছিল। কিন্তু—

সেই অপরিহার্য 'কিন্তু'! আজ এই জার্নাল লেখবার কিছুমাত্র প্রেরণা জাগত না, যদি না কালকে সন্ধ্যায়—সেলুনে অবশিষ্ট চুল কটি ছাঁটাই করতে—

আমার ঘাড়ে কুচ্‌কুচ্ করে কাঁচি চলছিল, এবং যেহেতু চুল কাটবার সময় কোনো কর্তিকের মুখ বন্ধ থাকে না, সিনেমা থেকে রাজনীতি পর্যন্ত বিবিধ বিষয় কখনো স্বগতোক্তির মতো কখনো বা অপেক্ষমান আরও কারো কারো সঙ্গে আলোচিত হতে থাকে, সে কারণে অদূরে উপবিষ্ট আর একজন এবং আমার কেশশিল্পী পাড়ার একটি রোমহর্ষণ প্রেমকাহিনীর সূত্রপাত করেছিলেন। আমি বিমুগ্ধ চিত্তে শুনেছিলাম।

'বুঝলি, শেষে মেয়ের বাপ পুলিস ডাকলে। মেয়েটা সোজা পুলিসকে বললে, আমি সাবালিকা, যাকে ইচ্ছে বিয়ে করবার—'

এবং পরমুহূর্তেই আমাকে বলা হল: 'উঠুন বাবু, হয়ে গেছে!'

উঠতেই হবে, কারণ আমার চুল আর অবশিষ্ট নেই, দশ মিনিটেই মিটে গেছে। ওয়েটিং লিস্টে বসে রয়েছে অন্য লোক। যদি টাক না থাকত, তা হলে গল্পটা সব শুনতে পেতুম—নায়িকাকে পুলিসের সামনে রেখে আমার উঠে পড়তে হত না।

এই আমি টাকের জন্যে প্রথম, সর্ব-প্রথম, একটা মর্মভেদী বেদনা অনুভব করলুম!

বন্ধ হবে এবং নির্দয়ভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলিকে দমন করবে। বিদেশী কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামের উপরই মিঃ বসুর চিন্তা কেন্দ্রীভূত রয়েছে এবং তার জন্য এরকম ব্যবস্থা আবশ্যক হতে পারে; কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর মিঃ বসু নিশ্চয়ই ভারতবর্ষকে অপর কোনও কম আপত্তিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলবেন।

"আমরা আশা করি মিঃ বসু তা করবেন, কারণ তিনি গোঁড়া নন। আমরা লক্ষ্য করেছি, যে সমস্ত বৃটিশ ও ভারতীয় বিপক্ষীয়দের চরিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন তা অনুগ্র ও পক্ষপাতশূন্য হয়েছে। আর মিঃ সি আর দাশের একটি যুক্তি অনুমোদন সহকারে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন জনসাধারণের বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা থাকলেও জাতির নেতাকে উপযুক্ত সময়ে বিপক্ষের সঙ্গে আপোস করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মিঃ বসুর মন কি রকম গ্রহণশীল তার প্রমাণ স্বরূপ এটা উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মদেশের রাজনীতি ও ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষুর কিরকম জাতীয়তাবাদী সে সম্বন্ধে পুস্তকে অনেক শিক্ষাপ্রদ কথা আছে। তিনি ব্রহ্মদেশের কারাগারে অবস্থানকালে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

"মোটের উপর পুস্তকটি পাঠ করার পর আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে যে, মিঃ বস, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। একথা সত্য যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরোধী, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, পরিকল্পনার স্রষ্টারা একে যেভাবে অগ্রসর হবে বলে আশা করেন সেভাবে তাকে কি প্রকারে অগ্রসর করাতে হবে তিনি তা দেখাতে পারবেন।"

বলা বাহুল্য, Manchester Guardian পত্রিকা বিলেতের উদারনীতি মতাবলম্বীদের মুখপত্র। কিন্তু 'Sunday Times' হচ্ছে বিলেতের সবচেয়ে গোঁড়া রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মুখপত্র। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও কংগ্রেস দলকে তাই মোটেই তাঁরা ভালো চোখে দেখতেন না। স্যর আলফ্রেড ওয়াটসন তাই 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের পুস্তকটির সমালোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেসকে এক হাত নিলেন। সেই সঙ্গে বৃটিশ সরকারের পক্ষে সাফাই গেয়ে তিনি লিখলেন:

"মিঃ বসু যে কয়েক বৎসরের আলোচনা করেছেন সেই সময়ের মধ্যে সরকার কখনও ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিহীন ছিলেন না। কংগ্রেস ভারতের অগ্রগমনে সাহায্য করে নাই, তার বাধাই সৃষ্টি করেছে। তার কার্যকলাপ সব সময়েই সরকারের উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে রয়েছে, এবং তার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা করতে গিয়ে সরকারকে পুলিসের বাবদ বহু কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে যার ফলে সরকার ভারতের মঙ্গলকর নূতন কোনও প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে কেবলমাত্র শান্তিরক্ষার কাজেই ব্যাপৃত থাকতে বাধ্য হয়েছেন।"

অবশ্য স্যর আলফ্রেড ওয়াটসন্ সুভাষচন্দ্রকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একজন "নিরপেক্ষ না হলেও যোগ্যতাসম্পন্ন ইতিহাসকার" বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর সমালোচনার উপসংহারে লিখলেন:

"'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' জনমত গঠনের পক্ষে একটি অতি মূল্যবান পুস্তক। এটি যে মনোভাব নিয়ে লিখিত হয়েছে, বৃটিশদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, কিন্তু এতে ভারতীয় আন্দোলনের এমন একটি দিক সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা অগ্রাহ্য করা যায় না।"

'ডেলি হেরল্ড' (Daily Herald) পত্রিকার বিখ্যাত কূটনীতিক সংবাদদাতা মিঃ নরম্যান ইউয়ার পুস্তকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন:

"বইটি ধীর চিত্তে, সদ্বিবেচনার সঙ্গে ও পক্ষপাতশূন্য হয়ে লিখিত হয়েছে। আমার মনে হয়, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই রকম উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি আর পাঠ করিনি। লেখকের নিজের মত আছে, তা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু অন্যায়ভাবে ব্যক্ত করেননি। এটি কোন গোঁড়া ব্যক্তির পুস্তক নয়—এটি এমন একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত, যাঁর বয়স এখনও চল্লিশ বৎসরের কম হলেও তিনি যে কোনো দেশের জীবনের অলঙ্কারস্বরূপ হতে পারতেন। কিন্তু গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই জেলে কাটিয়েছেন এবং এখন তিনি একজন ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি। ভারতীয় পরিস্থিতির এটা একটা ট্রাজেডি।"

স্যর ফ্রেডারিক হোয়াইট বিলেতের 'স্পেক্টেটর' (Spectator) পত্রিকায় পুস্তকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে একে "সমসাময়িক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল" বলে বর্ণনা করেছেন।

বিলেতের 'নিউজ ক্রনিকেল' (News Chronicle) পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে মিঃ জে স্টুয়ার্ট হডসন্ 'ভারত সম্পর্কে জনৈক ভারতবাসী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন:

"শ্রীযুত বসু একজন বিশিষ্ট ভারতীয় জাতীয় নেতা। তিনি কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েট, উচ্চস্থান অধিকার করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করেন, দেশহিতৈষণার আঘাত লাগায় তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেন এবং কলিকাতা নগরীর মেয়র পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর দেশপ্রীতির ঐকান্তিকতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। দেশহিতৈষণার জন্য তিনি আটবার কারারুদ্ধ হন। বিপ্লববাদী হিসেবে তিনি অতীব ধীর স্থির। যে আন্দোলনের বিবরণ তিনি বিবৃত করেছেন, তিনি নিজেই তার অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন। তার সাক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সুস্পষ্ট সাক্ষীর জবানবন্দীর মতই গুরুত্বপূর্ণ।

"তাই বলে তাঁর মন্তব্যকে একেবারে পক্ষপাতশূন্য বলা চলে না। দেশপ্রেমিকরা বড় বেশী নিরপেক্ষ হয় না এবং ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য তাঁরা খুব কমই প্রকাশ করে থাকেন। শ্রীযুত বসুও অপরপক্ষের বক্তব্যের প্রতি অসম্ভব রকম উপেক্ষা দেখিয়েছেন—তা উপলব্ধি করা তো দূরের কথা।

"তিনি বলেছেন যে, ভারতে ইংরেজের প্রকৃত অপরাধ হল, অন্যান্য বৈদেশিক বিজেতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে তাঁরা (ইংরেজরা) তাঁদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ভারতবাসীর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দুঃসাধ্য পরীক্ষা যে ভারতীয়দের তীব্র দাবী অনুসারেই ইংরেজরা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা শ্রীযুত বস উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি।

"তাঁর মতে, ভারতের প্রাচীন প্রথায় সংগঠিত পল্লীজীবনের ধারায় হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত দূষণীয়। কিন্তু কি কারণে তারা তা করতে বাধ্য হয়েছেন, সে সম্বন্ধে তিনি অসঙ্গত নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

"হোয়াইট পেপারে যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাকে তিনি ফাঁদ বলে বর্ণনা করেছেন। রক্ষণশীলতার দিকে পাল্লা ঝুঁকিয়ে বাড়াবার উদ্দেশ্যে চতুরতার সঙ্গে রাজন্যবর্গকে এই বিদ্বেষভাবপ্রসূত

গভর্নমেন্টের মধ্যে আনা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই বিবরণ থেকে এটা কেউই অনুমান করতে সমর্থ হবেন না যে, এই বিশ্লেষভাবপ্রসূত গভর্নমেন্ট ঐভাবে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা করতে রাজন্যগণের নিজেদের ইচ্ছানুসারেই বাধ্য হন। রাজন্যদের এই প্রস্তাবে গবর্নমেন্ট বিস্মিতই হয়েছিলেন।

"ভারত স্বাধীন হলেও তাঁরা ব্রহ্মদেশকে অধীনে রাখতে সমর্থ হবেন, এই আশায়ই ইংরেজেরা ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করবার পক্ষপাতী বলে শ্রীযুক্ত বসু যে মত পোষণ করেন, তা মোটেই ঠিক নয়। এইরূপ দূরদর্শী ইংরেজকে কি শ্রীযুক্ত বসু কখনও দেখেছেন?

"ভারতীয়দের অভিমত হিসেবে, মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা অতীব চিত্তাকর্ষক। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে অকাতরভাবে তা ব্যক্ত করেছেন। ঐ ঋষিকল্প ব্যক্তির অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় তিনি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে তিনি যেমন বিরাট উৎকট ভুল করেছেন, তার জন্যও তিনি তাঁকে বিন্দুমাত্র ক্ষমা করেননি। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যদি লণ্ডন সম্মেলনে হিটলার বা মুসোলিনীর মত সতেজ ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করতেন, তা হলে 'জন বুল' (ইংলণ্ড) সসম্মানে মস্তক নত করত' বলে তিনি উৎকট কল্পনাপ্রসূত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁর সমস্তই মাটি হয়ে গেছে।

"তাঁর লক্ষ্যের বিষয় এই। ভারতীয় দেশপ্রেমিক তাঁর কর্কশ কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, স্বাধীনতামুক্ত ভারতের ভবিষ্যৎ গবর্নমেন্ট রাশিয়ার আদর্শে গণতন্ত্রমূলক সোভিয়েট গবর্নমেন্ট হবে অধিকন্তু তাতে জাতীয়তার স্থান থাকবে এবং কর্তৃতান্ত্রিকতা একেবারে বাদ দেওয়া হবে।"

উল্লেখযোগ্য, সুভাষচন্দ্রের গ্রন্থটি ভারতে আমদানী নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলে বাংলা দেশের Amrita Bazar Patrika 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। মূল গ্রন্থখানি না পেলেও বিদেশের পত্রপত্রিকার এইসব সমালোচনা তাঁরা ফলাও করে ছেপে দিলেন।

সব শেষে একটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। সুভাষচন্দ্রের Indian Struggle প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বেই জওহরলালের Glimpses of World History এদেশেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। (এলাহাবাদ, ১৯৩৪)। এই গ্রন্থে জওহরলাল একদিকে যেমন ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি মার্কসবাদ ও রুশ-বিপ্লবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যাকে সবচেয়ে আতঙ্কের চোখে দেখছিল। তার প্রায় বৎসরখানেক পরে প্রকাশিত (১৯৩৬) তাঁর 'আত্ম-চরিত' (Auto-biograpy)-এও তাই করেছিলেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, জওহরলালের গ্রন্থ দুটি ইংরেজ গবর্নমেন্ট কেন নিষিদ্ধ করল না? কেন সুভাষচন্দ্রের গ্রন্থটিই নিষিদ্ধ হল?

তার একটি কারণ সম্ভবতঃ এই: জওহরলাল এ-সব রচনায় ও গ্রন্থে যতই প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা বলুন না কেন, গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ—অহিংসা গান্ধীজীর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর অগাধ আনুগত্য শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। আর কার্যত রাজক্ষেত্রেও এই দিকে প্রকাশ করে তিনি শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। ১৯২৮ সালের 'কলকাতা-কংগ্রেস' থেকেই ইংরেজের নজর প্রখর ছিল তাঁর উপর। তারপর 'লাহোর-কংগ্রেস' (১৯২৯), 'করাচী কংগ্রেস' (১৯৩১) এবং পরবর্তীকালে—১৯৩৩ সালে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে পর ভিয়েনা থেকে বিঠলভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে নতুন নেতৃত্বের আহ্বান জানিয়ে যে বিবৃতি দিলেন, তাতে ইংরেজ সরকারের আরো বেশী করে নজর পড়ল সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপের উপর। সুভাষচন্দ্র যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—Indian Struggle প্রকাশিত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি ইংরেজের কাছে আরোও পরিষ্কার হয়ে উঠল। তাঁরা গ্রন্থটিকে শুধু ভারতে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত থাকলেন না—তার বৎসরখানেক পর, ঠিক 'লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের' পূর্ব মুহূর্তে তিনি জাহাজ থেকে বোম্বাইয়ে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে (৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬)। গ্রন্থটির সঙ্গে গ্রন্থের লেখকও নিষিদ্ধ হলেন দেশে।

পর। ট্রেন থামবার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই। স্ত্রীলোকবাহিনী।

কাকুতি, মিনতি, কান্নাকাটি, এরা আসন চায় না, কোন রকমে পায়ের কাছে বসতে পেলেই খুশী। যে যার মোট ঘাড় সামলে ঠিক জায়গা করে নেয়।

গাড়ির লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে।

বিপদ বাধাবে দেখছি। এখনই পুলিস উঠবে গাড়িতে। এদের সঙ্গে আমাদেরও নাস্তানাবুদ করবে।

হ্যাঁ, বাছা, এভাবে বিপদ ডেকে আনো কেন?

অত কথা কিসের? ধাক্কা দিয়ে দিন না নামিয়ে।

নরম গরম সব রকম কথার উত্তরে এরা নিস্পন্দ, নির্বাক। চুপচাপ কোলের ওপর হাত গুটিয়ে বসে থাকে। একেবারে নির্বিকল্প সমাধি।

অবশ্য সব দিন যে এক রকম, এমন নয়।

শেয়ালদার গোটা দুয়েক স্টেশন আগে খাকি পোশাক গাড়ির কামরায় কামরায় লাফিয়ে ওঠে। বেঁটে লাঠি হাতে।

ব্যস, কান্নাগোল শুরু হয়ে যায়।

চাল ছড়িয়ে কামরায় একাকার। কেউ কেউ সটান পুলিসের পা জড়িয়ে ধরে। কেউ কেউ আবার রুখে দাঁড়ায়।

কেন, এ কি চোরাই চাল? পরের ঘরে সিঁদ কেটে চুরি করেছি আমরা? রীতিমত নগদ দাম দিয়ে কিনেছি। নিজেরা খাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

অনেকে আবার করুণ একটু ছবি আঁকবারও প্রয়াস পায়।

সজল চোখে বলে, বোনঝিটার অসুখ, শহরে ওই তো কাঁকরমণি চাল, সে চাল পেটে গেলে চোখ ওলটাতে আর কতক্ষণ। তাই এই ক'টা পুরোনো চাল নিয়ে চলেছি, তাতেও বাদ সাধবে মুখপোড়ারা। এ ক'টা চালও আটক করবে।

এসব কথা, এত সব কথার পুলিস কোন উত্তর দেয় না। থলি, পোঁটলা যা পায় বাজেয়াপ্ত করে।

গাড়ির লোক যে নির্বিচারে দৃশ্যটা উপভোগ করে এমন নয়।

কেউ কেউ বলে, পুলিসসায়েব, এসব চাল থানায় ঠিক জমা পড়বে তো?

পুলিস আড়চোখে একবার বক্তার দিকে দেখে নেয়। না, ভয়ের কিছু নেই। ছাত্র নয়। আধা বয়সী ছাপোষা গৃহস্থ। এদের উত্তাপ বহির্ভিত্তিক নয়, নিছক পোশাকি।

ব্যঙ্গের সুরে উত্তর দেয়।

সঙ্গে থানা অবধি চলুন না বাবু, পরখ করতে পারবেন। নামবেন?

প্রৌঢ় তাড়াতাড়ি হাতের খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে।

আর একটি কথাও নয়।

আলোড়ন শুরু হয় শেষ পুলিসটি কামরা থেকে নেমে যাবার পর।

মগের মুল্লুক পেয়েছে। জোর করে অমনি চাল নামিয়ে নিলেই হল।

একেবারে কোণের বুড়িটি কোমর ধরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

কি করব বাবা সকল। আসন করা ছেড়ে দিয়ে অসময়ে বাতে কাবু হয়ে পড়েছি, নইলে এই ক'টা পুলিসের মহড়া আমি একলাই—

কথা আর শেষ করতে পারল না। তীব্র যন্ত্রণায় মুখের পেশী সংকুচিত হয়ে গেল।

ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই।

যে লোকটা ছারপোকা নিধন বটিকা বিক্রি করে গাড়ি থেকে গাড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে সেও উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ওই পর্যন্ত।

তারপর ট্রেনের কামরার ভিড় পথে ছড়িয়ে যায়। পথ থেকে ট্রামে, বাসে।

পুলিসের পিছন পিছন প্রায় একে চাপড়াতে চাপড়াতে লোকের দল ছোটে। শেষ অবধি তারা কতদূর পর্যন্ত যায় সে খোঁজ নেবার উৎসাহ আর কারো থাকে না।

ফেরার সময় এর জের চলে।

পাপাচারাচরণের যে কথাই শুরু করে।

দেশের সব অনাচার, অন্যায়ের প্রতিভূ যেন হয়ে গেছে। তাই কোথায় কোন বন্ধ পথে এক ছটাক চাল যাচ্ছে তার ওপর যত বীরত্ব।

কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে।

আধাবয়সী কালো কোট পরা গম্ভীর চেহারার লোকটি অন্য সুর তোলে। শামুকের কৌটো থেকে এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজতে গুঁজতে গোটা কামরার ওপর নজর বুলিয়ে ভদ্রলোক গলার স্বর এমন করল যেন ভাগবত পাঠ করছে।

কথাটা হচ্ছে, এই যে চালগুলো গ্রাম থেকে শহরে পাচার করার চেষ্টা, এর মানে গ্রামের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। সেটা তো বাঞ্ছিত নয়। পুলিস সেটা আটকে ভালই করছে।

লোকটি শেয়ালদহ ফৌজদারি কোর্টের উকিল। বহু দিন থেকে প্র্যাকটিশ করছে, কিন্তু আজো পসার জমাতে পারে নি। জমাতে যে পারে নি সেটা তার মুখের হিজিবিজি রেখাতেই প্রকট। উকিলের কোট অবশ্য যত পুরোনো হবে, তত প্রতিপত্তির পরিচায়ক। আনকোরা কোট দেখলে মক্কেল পিছোয়। কিন্তু লোকটির প্যান্টের অবস্থা জরাজীর্ণ। জুতোজোড়াও তথৈবচ।

কিন্তু এ চাল কি গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে?

কে একজন কোণ থেকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল।

তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। দেখার উপায় নেই। সারা কামরায় একটি বাতি। সবে ধন

ভালো
তামাক
থেকেই হয়
ভালো
সিগারেট
Panama
20
পানামা
সত্যিই
ভালো সিগারেট
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং, প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যোগ
GT (P)-671 Ben. Greens' Advtg.

১২

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে অরুণ বললে একটু আস্তে চালান, একটু আস্তে।

ওর চোখ দুটো বাস-স্টপের ভিড়ের মধ্যে রুণুকে খুঁজছিল। ভিড় ছাড়া রুণু কোথাও অপেক্ষা করতে চায় না, পাছে চেনাজানা কেউ দেখলে কিছু সন্দেহ করে। রুণু তো ভিড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালাদের যা মেজাজ, ভিখারি তাড়ানোর ভঙ্গিতে প্যাসেঞ্জার হটায়। রুণুকে তাড়াতাড়ি খুঁজে না পেলে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ও যখন আসবে তখন আবার ট্যাক্সি পেলে হয়। কোথাও যদি নির্জনতা শান্তি থাকতো! রুণুটা এমন দেরি করে আসে, তখন বাসে-ট্রামেও জায়গা মেলে না।

হঠাৎ করে ভিড়ের মধ্যে চোখাচোখি হলো। অরুণ জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকতে যাচ্ছিল, তার আগেই রুণু এগিয়ে এলো।

অরুণ বললে, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো।

রুণু ট্যাক্সিতে বেশ অস্বস্তির সঙ্গে উঠলো। অস্বস্তি তো হবেই, কেউ যদি দেখে, তখন আর কোনো ওজর আপত্তি চলবে না। মামাবাবু বকুনিটুকুনি নাও দিতে পারেন, কিন্তু নিজের তো লজ্জা। আর ট্যাক্সি জিনিসটাই তো এখন ঘেন্নার, দিন-রাত চোখের সামনে যা দেখছে!

নন্দিনী চলে যাওয়ার পর থেকে রুণু নিজেও একটু ভয়ে ভয়ে আছে। নন্দিনীর দাদা লোক সত্যি ভাল, ঐ ঘটনার পর কেমন ভেঙে পড়েছেন। বিরামের ঠিকানা যদি ওর জানা থাকতো, রুণু একাই গিয়ে খবর নিয়ে আসতো। এমনই মুশকিল, নন্দিনীর দাদাকে বিরামের নামটাও বলতে পারছে না। বললে, কলেজে খোঁজ করেও তার ঠিকানা যোগাড় করতে পারতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মামীমা ভাববেন, দেখেছো কাণ্ড, রুণু সব জানতো। ও আবার ভিতরে ভিতরে কি করছে কে জানে!

অরুণ ঘন ঘন মিটারের দিকে তাকাচ্ছিল।

রুণু বললে, কি সাহস তোমার!

অরুণ হাসলো।—কি করবো, খবরটা তো দিতে হবে।

—সেদিন কি হয়েছিল? রুণু জিজ্ঞেস করেই অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। অর্থাৎ মিথ্যে কথা বললেই যাতে ধরতে পারে।

অরুণ বললে, সে অনেক কাণ্ড। পাটনা যেতে হলো হঠাৎ।

রুণুর ভুরু কাঁপালো, বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, পাটনা কেন, আরো দূরেও তো যেতে পারতে, পেশোয়ার?

রুণুর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার গলার স্বর শুনে অরুণের ভীষণ রাগ হলো। কি আশ্চর্য, ওকে বিশ্বাস করছে না রুণু!

অরুণ জোর দিয়ে বললে, সত্যি পাটনা গিয়েছিলাম।

—কফি হাউসে যাও নি? মক্ষিরানীর আড্ডায়?

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। ছি ছি, এই সন্দেহ পুষে রেখেছে রুণু।

অরুণ কোন কথা বললো না। গভীর একটা অভিমানে ওর বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। পরক্ষণেই একটা সন্দেহ হলো, সেদিন টিকলুরা যে বিরাম আর নন্দিনীকে নিয়ে কফি হাউসে গিয়েছিল, সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর—জানে নাকি রুণু? হয়তো ভেবেছে অরুণও ছিল।

রুণু ফিরে তাকালো আবার, তারপর কৌতুকে হাসলো।

ওর হাসি দেখে অরুণও হেসে ফেললো। যাক্ বাবা, মুখে হাসি ফুটেছে এতক্ষণে। কিন্তু বিরাম আর নন্দিনীর কথা কি বলবে এখন? তারপর যদি ওর কাছ থেকে শোনে নন্দিনীর দাদা জানতে পারেন? তখন কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। সুজিত আর টিকলু ধিক্কার দেবে, বিরাম বলবে, তুই এত ছোটলোক?

না, কিছু বলবে না ও রুণুকে। অথচ, ধরো যদি, অরুণ জানে না হয়তো, নন্দিনী যদি ইতিমধ্যে রুণুকে ফোন করে সব বলে দিয়ে থাকে। রুণু ভাববে, দেখেছো, এই লোকটাকে আমি ভাল ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম আমাকে ভালবাসে, আমার কাছে কি আর কিছু লুকিয়ে রাখবে?

অরুণ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই বললে, মাসীমা কিছু বুঝতে পারেন নি তো?

রুণু হেসে ঘাড় নাড়লো। তারপর আবার বললে, কি সাহস বাবা!

অরুণও হাসলো। রুণুর হাসিটা ওর বুক ভরিয়ে দিয়েছে। ও খুশী।

বললে, তোমার মামাবাবুর নাম খুঁজে ফোন নম্বর তো বের করলাম।

—নাম বলেছিলাম আমি? রুণু অস্পষ্ট স্মৃতি হাতড়াবার চেষ্টা করলো।

অরুণ একটু অপ্রতিভ হয়েছিল, জেনেছে তো নন্দিনীর কাছে, সেটা চট্ করে চাপা দিলো।—হ্যাঁ বলেছিলে।

একটু থেমে হাসলো।—সকালে করে-ছিলাম, বোধ হয় মামাবাবু ধরেছিলেন, টপ্ করে কেটে দিলাম সাড়া না দিয়ে।

রুণু চোখ কপালে তুললো। —ও মা, ও রকম করলে তো ভাববেন...

অরুণ হেসে বললে, একবার তো, সকালে। তারপরই মাঝরাতে ক'বার আবার তোমার গলা পেলাম। কেউ ছিল না তো কাছে?

—না। কিন্তু তোমার চাকরি? শুনি? রুণু তাকালো অরুণের মুখের দিকে।

অরুণ ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে বললে, লাইটহাউস।

সিনেমার অন্ধকার ছাড়া আর কোথায় স্বস্তিতে পাশাপাশি বসে থাকা যায়। নির্বিঘ্নে চাপা গলায় কথা বলা যায়।

টিকিট কেটে ওরা ঢুকলো। আঃ ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা, অরুণের বাড়ির মধ্যে এতক্ষণ অনেক ঘাম, অনেক অভিমান জমা হয়েছিল। সব যেন জুড়িয়ে গেল।

ঢোকবার সময় তো টিকিটের আধখানা ছিঁড়ে নেয়। বাকী অর্ধেক ফিরিয়ে দিয়েছে অরুণ পকেটে রেখে দিলো। দেখি আজকেও চায় কিনা।

—এই, টিকিট দুটো কই? দাও। আস্তে বসেই রুণু বললো।

আধখানা-ছেঁড়া টিকিট দুখানা অন্ধকারে এগিয়ে দিলো অরুণ। রুণুর হাত ছুঁলো। টিকিট দুখানা রুণুর হাতে দিয়ে তার হাতটা মুঠো করে দিলো। এই সামান্য একটু স্পর্শের মধ্যে অফুরন্ত একটা আনন্দ।

রুণু ছেঁড়া টিকিট দুটো নিয়ে ব্যাগের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিলো। এখন ব্যাগের মধ্যে, এর পর বাড়ি ফিরে দেরাজ খুলবে ও, দেরাজের মধ্যে যত্ন করে রেখে দেবে। কিছুই হারিয়ে যেতে দেবে না। ছোট ছোট প্রত্যেকটি আনন্দের স্মৃতিকে বুকের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেরাজটায় ঠিক যেভাবে লুকিয়ে রেখেছে, ঠিক সেইভাবে লুকিয়ে রাখবে ওর পড়ার টেবিলের দেরাজে।

অরুণ ভাবলো, আচ্ছা, চাকরির কথাটা বললো এখন? না থাক, হোক্ তো আগে। বলবার মত চাকরি কিনা তাই বা কে জানে।

রুণু ভাবলো নন্দিনীর চলে যাওয়ার ঝগড়া বলবে কিনা।—এই, জানো, নন্দিনী ওর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে।

—সে কি? কোথায়? অরুণ যেন কিছুই জানে না।

রুণু সংক্ষেপে বললে।

তারপর চুপচাপ।

অন্ধকারে রুণুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল অরুণ। ফিসফিস করে বললো, সেদিন খুব রাগ হয়েছিল, না?

ঠেলে সরিয়ে দিলো রুণু। হাসি-হাসি গলায় বললে, আরে পাগল, পিছনের লোকরা দেখছে।

দেখছে, দেখছে, দেখছে। কোলকাতায় ও কোথাও কোন শান্তি নেই। পৃথিবীসুদ্ধ লোক শুধু দেখছে। বুভুক্ষুর মত ওরা আছে সব, আমরা তো দেখছি না, অনেকে। বিরক্ত লাগছে। অরুণ নিজেও তো একসময় ভাবতো। নিরাশ আর নন্দিনীকে দেখে। না, একদিন কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। [illegible] দুজনেরই আঠারো উনিশ। ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল ওরা কথা বলতে বলতে। দু'জনেরই মুখের ওপর এমন একটা সুখের ভাব ছিল, চারপাশে কোথায় কি ঘটছে খেয়াল নেই। হাসছিল ওরা। অরুণের খুব ভাল লেগেছিল ওদের দিকে তাকিয়ে।

ওদের দেখেও, ওকে আর রুণুকে দেখে তেমনি ভাল লাগে না কেন সকলের?

রুণুর কথা শুনে একটু রাগ হলো অরুণের। ও সরে এলো। বয়ে গেছে রুণুর সঙ্গে কথা বলতে, ঘাড় ঘেঁষে বসতে।

কিন্তু রাগটা [illegible] হালকাই ছিল।

অন্ধকারের মধ্যে রুণুকে সিলুয়েট ছবির মত লাগছে। পর্দার দিকে তাকিয়ে ছবি দেখছে।

হঠাৎ অরুণের হাতের ওপর ঠাণ্ডা মত কি লাগলো। [illegible] রুণুর আঙুলগুলো অরুণের হাতের পিঠে [illegible] ঘষছে, রাগ ভাঙাতে চাইছে আর কি!

ফিরে তাকালো অরুণ। কাছ ঘেঁষে গেল আবার।

রুণু বোধ হয় হাসছে। পর্দার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বললে, ছবি দেখো। কিন্তু হাতের ওপর হাতখানা আবার রাখলো।

অথচ প্রথম যেদিন রুণুর হাতটা ছুঁয়েছিল, উঃ, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন।

তখন রুণুর এত মান-অভিমান ছিল না, এত সাহস ছিল না। অরুণই বরং অভি-মানে অপমানে বুকের মধ্যে কাঁদতো।

কোথায় যাবে, দু'দণ্ড মুখোমুখি বসবে? কোলকাতা একটা উৎকট অভিশাপ, এখানে ভালবাসা আছে নাকি! প্রেমট্রেম ছুড়ে ফেলে উড়িয়ে দিয়ে শরীরের সিঁথিতে সিঁদুর লেপতে চাও তো কোলকাতা তোমার দোস্ত। স্রেফ দশ টাকার নোট একখানা এগিয়ে দিলেই নোংরা হোটেলের দরজা খুলে যাবে, ভিতর থেকে বেপরোয়া খিল দাও। বেরিয়ে এসে ফটক পার হও সিপাইজী সেলাম মারবে। কিন্তু বাইরে কোথাও একটু নিরিবিলিতে বসতে গেলে ফেউ লাগবে পিছনে।

ফাল্গুন মাস [illegible] ফাল্গুন এসেছে [illegible] গান চলছে, কিন্তু আমরা তো পার্কেতে বসবো। [illegible] ভিক্টোরিয়ার [illegible], অরুণ জানালো এর চেয়ে [illegible]...

—হ্যাঁ। সেই জন্যে [illegible] নাকি লাগিয়েছে, আলো দিয়েছে। রুণু বললো।

[illegible] মাঠের দিকে চলে গিয়েছিল। [illegible] ভিড়।

[illegible] দিকে যাচ্ছিল ওরা [illegible] সামনে সামনে তিন চারটে [illegible] ফর্সা চামড়ার পাশ দিয়ে গেল।

—[illegible] হাত [illegible] দাঁড়িয়েছিল। [illegible] একজন কে বললো, [illegible] দিকে তাকিয়ে, রুণুর দিকে চেয়ে।

—[illegible] চাপা গলায় রুণু [illegible] প্রশ্ন করলো।

রুণুর সঙ্গে [illegible] না অরুণ, শুধু [illegible] তখন ওরা [illegible] কথা ওদের গায়ে নোংরা ছিটিয়ে দিতো। [illegible] যেমন পালাতে হয়, তেমনি ওদের থেকে পালাতে চাইতো।

কিছুটা নির্জন দেখে একটা বেঞ্চ দিয়ে বসলো দুজনে। অরুণের মনে হলো রুণু যেন ইচ্ছে করে এক বিঘৎ জায়গা ফাঁক রাখলো। এক বিঘৎ ঐ ফাঁকা জায়গাটা যেন অরুণের গালে একটা থাপ্পড় মেরে বলতে চাইলো, তুমি তো পুরুষ, ঐ ইঙ্গিত-দেখা ছোকরাগুলোর মত, তোমাকেই বা বিশ্বাস কি। অথচ অরুণ তখন কিছুই চায় না, কিছুই চায় না, শুধু রুণু বসুক ও যেমন দেখা করার জন্যে, কথা বলার জন্যে, কাছে বসার জন্যে ছটফটিয়ে মরছে, রুণুর মনেও তেমনি কোন অসহ্য যন্ত্রণা।

—না রে [illegible], মেয়েরা ভালবাসে না। ওরা শুধু ভালবাসা পেতে চায়।

টিকলু হেসেছিল অরুণের কথা শুনে।—বুঝেছিস তা হলে? ও আমার জানা আছে। তুই শালা সলতে হয়ে জ্বলছিস, রুণুর মুখ আলো হবে, দেখে বলবি, রুণুর হাসিটা মাইরি ফাইন। ব্যস, ওরা খুশী।

টিকলু ঠিকই বলে। বোকামি ছাড়া আর কি।

বোকা বোকা চোখ মেলে অরুণ অন্ধকার জলের ওপর কুচি কুচি পোখরাজ দেখলো, দূরে চলন্ত মোটর-লঞ্চ দেখলো, জাহাজ দেখে মনে হ'লো, ওর কোথাও যেন কেউ আছে, কে আছে, সেখানেই ও চলে যেতে চায়। এখানে, এখন, ওর কেউ নেই। একটু আগে দুজনে ফুল হয়ে গিয়েছিল, ইলিশ-খোঁজা ছেলেগুলো নোংরা ছিটিয়ে সব মাটি করে দিয়েছে।

রুণু চুপ করে বসেছিল। অন্ধকারেই ও একবার হাতের ঘড়িটা দেখলো।

অরুণ ঠাট্টা করে চাপা ক্ষোভে বললে, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

রুণু হেসে ফেললো। তারপর বললে, শুনুন, সত্যি তাড়াতাড়ি যেতে হবে। রোজ রোজ কত নতুন অজুহাত দেওয়া যায় বলুন।

অরুণের সেদিনও ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল রুণুকে ও ছোঁবে। ওকে একটুখানি ছুঁতে পারলেই যেন বুকের জ্বালাটা জুড়িয়ে যাবে। এই অসহ্য অতৃপ্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। দিনের পর দিন প্রতিটি মুহূর্তে যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, এক পলকের জন্যেও যাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না, সে সত্যি সত্যি যখন কাছে আসে, মনে হয় চলে যাবার জন্যেই যেন এসেছে। রক্তের মধ্যে যাকে অনুভব করছে, হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে পারছে না। রুণু যেন ওর হৃৎপিণ্ডের মতই। সবচেয়ে আপন, অনুভব করা যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না।

অরুণ বললে, আরেকটু। আর একটু বসি।

—না না, এবার উঠি। রুণু বললো। কিন্তু উঠলো না।

অরুণের মন সাহস পেলো। ও হাত বাড়িয়ে রুণুর হাত ছুঁলো।

সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলো রুণু।

সমস্ত পথ অরুণ একটাও কথা বললো না। অপমানে, না কি হতাশায়, ওর সমস্ত মুখ কেমন যেন হয়ে গেছে। রুণুর দিকে তাকাতেও লজ্জা। ধরা পড়ে যাবার ভয়।

বাসে তুলে দিতে গিয়ে আর চুপ করে থাকতে পারলো না অরুণ। ও ছুঁতে চায় না রুণুকে, কিছুই চায় না, ভালবাসা চায় না। ও শুধু ভালবাসতে চায়।

ভালবাসাই তো ওর জীবনে এখন একটামাত্র নোঙর।

বাসের পাদানিতে পা দিয়েছে রুণু, অরুণ বলে উঠলো, শুক্কুরবার আসবে? শুক্কুরবার তো তোমার তাড়াতাড়ি ছুটি হয়।

রুণু ফিরে তাকালো, হাসলো।—অসম্ভব, শুক্কুরবারে তো দোল।

দোল। দোল। শেষ মুহূর্তের একটা ক্ষীণ আশায় পাম্প করা হ্যাজাক বাতির মত ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রুণু তার চাবিটা নির্দয়ভাবে ঘুরিয়ে দিলো।

অরুণ একটা ক্লান্ত অবসন্ন গোল খাওয়া খেলোয়াড়ের মত টলতে টলতে ফিরে এলো।—আমি ভীষণ লাকি রে টিকলু। ভীষণ লাকি।

*

অসম্ভব। শুক্কুরবার তো দোল।

কোনটা অসম্ভব? আর কোনোদিন দেখা করা? না শুক্কুরবার দোল, তাই দেখা করতে পারবে না রুণু। এ ক'দিন বুকের মধ্যে শুধু খাঁ খাঁ।

দূরে কোথায় কে ঢোলক বাজাচ্ছে। 'হোলি হায় হোলি হায়' চিৎকার করে উঠলো এক দঙ্গল ছেলে। সামনের রাস্তায় হাসি চিৎকার, পিচকিরি, রঙ, আনন্দ। টিকলুরা এলেও অরুণ এবার আর দোল খেলতে বেরোবে না। অসম্ভব, অসম্ভব, দোলের মধ্যে এবার আর কোন রঙ নেই।

—হ্যাঁ রে, তোর চোখ লাল হয়েছে কেন? জ্বরটর হয়নি তো।

কনকলতা বাঁ হাতে কপাল টিপে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এলেন। অরুণের কপালে হাত দিয়ে আঁতকে উঠলেন।—এ কি রে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যে! শুয়ে থাক্, শুয়ে থাক্।

কনকলতা মাথার যন্ত্রণায় ভাল করে হাঁটতে পারছিলেন না। দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন।—শুনছো, অরুণের ভীষণ জ্বর। ডাক্তার ডাকার কেউ তো নেই, তুমিই যাও বরং।

গা পুড়ে যাচ্ছে? কই, অরুণের তো কোন কষ্ট নেই। ও তো বুঝতেও পারেনি। ওর শুধু একটাই কষ্ট।

রুণু ওকে একটুও ভালবাসে না, একটুও না। কিন্তু ভালবাসা যে ওর চাই-ই চাই। যে কেউ, যার হোক্। মনে মনে বললে, ঊর্মি, তুই আমাকে একটু ভালবাসলেও তো পারিস। কিছু না, তুই তো স্মার্ট মেয়ে, তুই শুধু একটু অভিনয় করবি। মার মত কপালে হাত দিয়ে রুণু তো জ্বর দেখবে না, ও আমাকে ছোঁবে না, ছোঁবে না। ঊর্মি, তুই পারিস না একটু কপালে হাত দিতে? আমি কথা দিচ্ছি, তোর ওপর আমার আর কোন লোভ হবে না। আমি টিকলু নই। তুই শুধু আমার কপাল ছুঁবি। আমি তোর হাতখানা একবার মুঠো করে ধরবো।

দুশ্‌শালা! চোখে জল এসে গেল যে। বালিশটা ভিজে ভিজে লাগছে। অরুণ হেসে ফেললো।

আর মিলুর গলা শুনে তাড়াতাড়ি বালিশটা উল্টে দিলো।

—দাদা, তোর একটা চিঠি ছিল রে লেটার বক্সে। মিলু ছুটতে ছুটতে এলো।

হাত বাড়িয়ে ভারী খামটা নিলো অরুণ। ছিঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে খানিকটা আবীর ঝরে পড়লো। গোলাপী কাগজে মোড়া এক মুঠো সুগন্ধি আবীর।

নাকের কাছে নিয়ে অগুরুর গন্ধ শুঁকলো অরুণ।

—কে পাঠিয়েছে রে? মিলু জিগ্যেস করলো।

খামের ওপরে হাতের লেখাটা দেখলো অরুণ। কিন্তু লেখার দরকার ছিল নাকি। আবীরের গন্ধেই ও টের পেয়েছে। সমস্ত মন, সমস্ত শরীর মাউথ অর্গ্যান হয়ে গেছে।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো অরুণ, আবীরসুদ্ধ খামটা মাথায় উপুড় করে দিলো। চুলের ভিতরে ভিতরে আঙুলকে কাঁকুই করে ছড়িয়ে দিলো। আবীর মাখা হাতটা বুকের ওপর রাখলো।

দূর, কে বলে প্রেমের মধ্যে যন্ত্রণা আছে। প্রেম চন্দনের মত ঠাণ্ডা, চন্দনের মত।

১৩

সোনার মা চেঁচাচ্ছে। দিনরাত চেঁচাচ্ছে। এত চেষ্টা করে, এত ধমকধামক দিয়েও ওর অভ্যাস বদলানো গেল না। কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কে বলবে ভদ্দরলোকের বাড়ি। একবার রেগে গিয়ে অরুণ বলেছিল, এত চিৎকার চেঁচামিচির কি দরকার, কাজ পছন্দ না হয় ছেড়ে দিলেই পারো। আরে ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব হয়। ব্যস, তারপর দু'দিন কামাই। কনকলতাও রেগে গিয়েছিলেন অরুণের ওপর। যা এবার লোক যোগাড় করে আন। আনলেও থাকতো নাকি সোনার মা, তাকে দুধের দোকানে দেখতে পেলে শাসাবে।

—আমরা সব বুর্জোয়া সর্জিত, বি-চাকর-দের চাকর হয়ে গেছি। একটা কড়া করে কিছু বলার উপায় নেই রে!

উপায় থাকবে না কেন, ঘুম থেকে উঠে ছোট্ তুই বোতল হাতে, দুধের দোকানে। বাজার করো, কলাপাতা আনতে ভুলে গেলে মার কাছ থেকে মুখ-ঝামটা খাও। সোনার মাকে তো তাড়ালি, বাসন মাজবে কে।

সব সুখ কোথাও পাবে না। তাই সোনার মার চিৎকার শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অরুণ। আজও সেই এক অভিযোগ, এত বাসন বের করে দিলে পারে কেউ। রোজ রোজ পোড়া কড়াই, এত বাড়িতে কাজ করলুম, এমন নোংরা বাড়ি দেখিনি। আমার শরীলটা শরীল নয়?

আসলে ওসব কিছু না। অরুণ বুঝে গেছে সোনার মা চেঁচাবেই। পোড়া কড়াই কিংবা ঘর মোছার ন্যাতা কিংবা রান্নাঘর ধোয়ার ঝাঁটা নিয়ে। কিছু খুঁজে না পেলে অন্য বাড়ির বিরুদ্ধে গজগজ করবে।

মরুকগে, আমার সঙ্গে আর বাড়ির কি সম্পর্ক, যার যা খুশী করুক না। অরুণ ভাবলে।

মা জ্বর হয়ে মাথা যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে আছে। একজন ভাল ডাক্তার দেখানোর দরকার। দু'একবার পি জি-তে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও হয়েছে অরুণের। কিন্তু বাবা না বললে, তারই বা কি করার আছে। কে বড়ো আর কে ছোট ডাক্তার সেই মীমাংসায় আসতেই তো আধঘণ্টা ভ্যাজর-ভ্যাজর শুনতে হবে।

—অরুণ! প্রকাশবাবু হঠাৎ ডাক দিলেন।

সোনার মার চিৎকার তখনো চলছে, কিন্তু কেউ কানে নেয় না। এ বাড়ির ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিক ওটা। মিলু রেডিওটা জোরে চালিয়ে দিলে তো পারে। লোকে জোরে রেডিও চালালে দু'একজন আবার কালচার ঝাড়ে। আরে বাবা, এইসব চিৎকার চেঁচামিচি ঘরোয়া ঝগড়া চাপা দেবার জন্যেই তো রেডিও। গভর্নমেন্ট ভাবছে রেডিও খুব পপুলার।

—কিছু বলছেন? অরুণ গিয়ে দাঁড়ালো প্রকাশবাবুর সামনে।

—তোর ছোটমেসোর কাছে গিয়েছিলি? কি বললে?

আজকের সারাটা দিন তো এখন সেই ঝামেলাতেই কাটবে। লম্বা-চওড়া কথা তো বলে, কত ধানে কত চাল দেখাই যাক না।

ছোটমাসীরা থাকে গড়িয়াহাটের কাছে, একটা দোতলার ফ্ল্যাটে। মিলুকে নিয়ে গিয়েছিল।

নীচের তলায় বেতের চেয়ারে বসা খাকি হাফপ্যাণ্ট পরা বুড়োটার চেহারা মনে পড়তেই হেসে ফেললো।—কিচ্ছু করবে না, কিচ্ছু করবে না, চলে যাও গটগট করে।

বলেই বাঘের মত কুকুরটার নাম ধরে ডাকলো, জিমি! জিমি!

অচেনা লোক দেখে কিচ্ছু করবে না যদি, তো কুকুর পুষেছো কেন হে!

ছোটমেসোও তেমনি।—ভয় পেও না, ভয় পেলেই কামড়ায়।

বাব্বাবা, ভয় কি সিনেমা হলের পর্দা, সুইচ টিপে সরানো যায়? মেয়েদের কাছে প্রেমটাও তাই কিনা কে জানে। দিব্যি অন্যদের সঙ্গে হেসে খেলে আড্ডা দিয়ে কাটাবে, হিসেব করে একটা দিন দেখা করবে, তখন চোখ ছলছল, গাঢ় গলার কথা।

গলা চিরে ভিতরে ঢুকে অবশ করে দিল। চোখে জল এসে গেল। শরীরে উত্তেজিত অসুস্থ ভাবটা সামান্য নাড়া খেল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আছে, তবু একটুও ঘুম হয় না আজকাল। কারখানা বন্ধ না থাকলে শীতের এই ভোরে সামনের ঐ রাস্তাটা দিয়ে আমি কাজে যেতাম। এই ভোরবেলায় চারপাশ কী সুন্দর থাকে। ঠিক কতখানি সুন্দর তা বলে বোঝানোই যায় না। একমাত্র এই ভোর-রাত্রেই কলকাতাকে নিঃঝুম মনে হয়। অন্ধকারে পাখিরা ডাকাডাকি করে, বাসা ছাড়ে না। রাস্তায় পা দিয়ে মনে হয় গ্রামের রাস্তায় চলেছি। বাতাস খুব পরিষ্কার থাকে, জীবাণুশূন্য। একটু অন্ধকার আর একটু কুয়াশা থাকে বলে চারপাশে নানা রহস্যময় ছবি ভেসে ওঠে, চেনা জায়গার গায়ে অচেনার প্রলেপ পড়ে যায়। চারদিকের বাড়িগুলো আবছা আর ঝুপসি গাছের মতো দেখায়। প্রকৃতির সঙ্গে তারা এক হয়ে যায়। দাদার ঘরে একখানা বই আছে, সংবাদপত্রে সেকালের কথা। তাতে পুরোনো কলকাতার দুটো চারটে ছবি আমি দেখেছি। কাঁচা রাস্তা, পুকুর আর গাছগাছালিতে ভরা কলকাতা, শেয়াল ঘুরে বেড়ায়; পুরোনো আমলের গোল [illegible] থামওয়ালা বাড়ির সামনে ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, [illegible] মাথায় টোপরের মতো টুপি, পায়ে নাগরা, আর পরনে কাবাকুর্তা। ভোর-রাতের কলকাতা সেই পুরোনো কলকাতা। পুকুর আর গাছগাছালির গ্রাম্য শহর। আমি সেই পুরোনো শহর ধরে [illegible] কসবা থেকে বালিগঞ্জ স্টেশনের ট্রাম ডিপো পর্যন্ত। ভোরের প্রথম ট্রাম ধরি।

কারখানার মধ্যে বিলিতী শহর। ফুল-গাছে আলো-ঢাকা কাচের বাড়ি। যত্নে লাগানো ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের সারির ফাঁক। স্বয়ংক্রিয় লন-মোয়ার ঘটঘট করে সারা দিন ঘুরে বেড়ায়। দয়ালু পাদরীর মতো সুন্দর হাসিমাখা মুখে সাহেব ম্যানেজার ডিসান সারা দিন আমাদের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়। ভাবতেই এখন বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। আমি মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দেয়াল খুঁজলাম। দাদার ঘরে কোনো ক্যালেন্ডার নেই। না থাক। গতকাল ছিল ষোলো, আজ ধর্মঘটের সতেরো দিন। মনে হচ্ছে আমরা একটা হারা-লড়াই লড়ে যাচ্ছি। প্রবেশন পিরিয়ডে বিশ্বনাথকে ছাঁটাই করা হল। সেটা কোম্পানীর ইচ্ছে। শিক্ষানবিসের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। বিশ্বনাথের হাতের জব বারবার স্ক্র্যাপ হয়ে যেত। কোম্পানীর দোষ ছিল না। তবু ইউনিয়ন রুখে দাঁড়াল। তিন দিন ধর্মঘটের পর কোত্থেকে বিজ্ঞ লোক এসে বলল —এটা বে-আইনী হচ্ছে। স্ট্রাইক টিকবে না। তোমরা বরং চার্টার অব ডিমাণ্ড দাও। রাতারাতি চার্টার অব ডিমাণ্ড তৈরি হল। চোদ্দ দফা দাবি। তবু বোঝা যাচ্ছিল হারা-লড়াই। ট্রাইব্যুনালে চলে গেল দাবিপত্র। কোথাকার কোন আনাড়ি কারিগর বিশ্বনাথের জন্য অমন সুন্দর মন-ভোলানো বিলিতী শহর থেকে আমি চললাম নির্বাসনে। যেমন নাম-না-জানা অচেনা একটা বড় বাড়ির মেয়ের জন্য আমার দাদা মতীন চিরকালের জন্য হয়ে রইল পাগল মানুষ। কেমন যেন অদ্ভুত যোগাযোগ। বললে অবিশ্বাস্য শোনাবে। তবু এটা সত্য যে, সেই অচেনা মেয়েটার জন্য দাদা পাগল না হলে আমি ইউনিয়নে নামতামই না। সে ছিল বড় বাড়ির মেয়ে, আমার খ্যাপা দাদা মতীন তার কাছাকাছিই যেতে পারল না। বলতেই পারল না, 'তোমাকে চাই।' কেবল ঘুরে বেড়াল রাস্তায় রাস্তায়।

তারপর একদিন তার চোখের ওপর দিয়ে চালাক একটি সাহসী ছেলে মেয়েটিকে স্কুটারের পেছনে নিয়ে চলে গেল। কেন এরকম হবে? কেন এরকম দুষ্প্রাপ্য হয়ে থাকবে একটি মেয়ে আমার দাদার কাছে? কেন থাকবে তাদের এরকম দামী বাগানের চারদিকে ঐ অত উঁচু ঘের-পাঁচিল, যার মধ্যে আমরা কোনো দিনও যেতে পারবো না? মেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারো কারো থাকবে স্কুটার, যা কেন আমাদেরও নেই? নিজের ঘরসংসার বজায় রেখে, পাগল ভাই আর বিধবা মায়ের দায় নিয়ে সমাজের সেই অব্যবস্থা আমি কি করে পালটে দেব? তেমন কোনো উপায় আমার ছিল না হাতের কাছে। টিমটিম করে অফিসের ইউনিয়নটা চলছিল তখন। আমার মাত্র একুশ কি বাইশ বছর বয়স। রাগে আক্রোশে ক্ষোভে আমি সেই ইউনিয়নের মধ্যে ফেটে পড়লাম। যদি
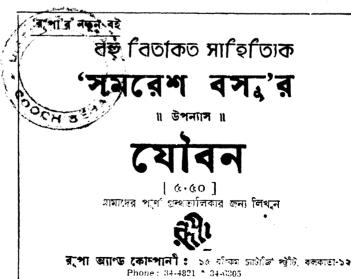
তা না পড়তাম তবে আজ আমার পিছিয়ে যাওয়ার রাস্তা থাকত। আমি ইউনিয়নের চিহ্নিত কর্মী, দাঙ্গাবাজ, আক্রমণকারী মনোভাবসম্পন্ন লোক; আমার পিছনে ঘুরছে চার্জশীট, আর তিনটে পুলিস কেস। ভেবে দেখলে আমার দাদা মতীনের জন্যই আজ আমার এই রাত জাগার ক্লান্তি, অনভ্যাসের সিগারেট আর ভয়। হাই স্কিলড অপারেটরের সুন্দর বেতন থেকে শূন্যতা। কিংবা এইসবের জন্য সেই মেয়েটাই দায়ী, যাকে আমি চিনি না, যাকে চিনত না আমার দাদা মতীনও। তা হোক। তবু সমাজের ব্যবস্থা পালটে যাওয়াই ভাল। আজ বরং আমি একটা হারা-লড়াই না-হয় হেরেই গেলাম। মেয়েটিকে ধন্যবাদ।

চিঠির একটা নীল কাগজ সামান্য উড়ে এসে আমার পায়ের গোড়ালিতে লাগল। কৌতূহলে তুলে নিলাম। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা—'কেউ ঠিকঠাক বেঁচে নেই। পুরোপুরি মরেও যায় নি কেউ। ওরকম কিছু কি হয় কোনো দিন? ঠিকঠাক বেঁচে থাকা, কিংবা পুরোপুরি মরে যাওয়া?...' আর আর পড়লাম না। কী যে লেখে পাগল। মাঝে মাঝে ঠিকানা-না-লেখা খাম আমাকে দিয়ে বলে, 'ডাকে দিয়ে দিস।' কখনো নিজেই গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে আসে স্ট্যাম্প-করা কাগজ। পিওনেরা হয়তো ফেলে দেয়, কিংবা হয়তো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়ে হাসাহাসি করে। সারা ঘরময় ছড়ানো এই কাগজ আর সিগারেটের টুকরো। পয়সা নষ্ট। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল বড়। তোমার জন্যই, তোমার জন্যই এত সব গণ্ডগোল।

আমি মশারির ঢাকাটা রুক্ষ হাতে সরিয়ে নিলাম। রোগা একখানা মুখ। চমকে চোখ খুলল। জ্বলজ্বল করে ভীত সন্ত্রস্ত-

কষ্ট করতে হয়, হয়তো অপমান সহ্য করে বকাঝকা খায়, শীতে বৃষ্টিতে কতটা পথ পর্যন্ত হেঁটে যাতায়াত করে। খেটে এনে আমাদের খাওয়ায়। গত আশ্বিনে আঠারোয় পা দিল বল্টু। কারখানায় যখন ঢুকল তখনো দাড়িতে ভাল করে ক্ষুর পড়েনি, কাঁচা মুখখানি। এখন বয়েসকালের গোটাগাটা মানুষ হয়ে উঠেছে। বল্টু যদি ঠিক থাকত তবে বল্টুর বিয়ে দিতাম। এটাই ঠিক বয়স। কর্তাকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার রাস্তা তৈরী হয়ে যেত। বল্টুর ছেলে হলে রোদে বসে তেল মাখাতাম চুপচুপে করে। ঠাট্টা করে বলতাম, 'হ্যাঁ রে, সত্যিই কি আর-জন্মে তুই আমার ভাতার ছিলি?' ভাবতেই গায়ে কেমন শিরশির করে কাঁটা দেয়। বল্টুর ছেলে হয়ে কর্তা যদি সত্যিই আসত, তবে নতুন সম্পর্কে কেমন লাগত আমার।

আজকাল কেমন যেন ভুলভাল হয়ে যায়। পুরোনো কথার সঙ্গে আজকালের কথা গুলিয়ে ফেলি। তাল থাকে না। বোধ হয় পরশু দিন দুপুরে একটু ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙল যখন তখন শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে সুদর্শন চাকরের নাম ধরে ডাকছিলাম। মনে হয়েছিল শ্বশুরমশাই কাছারি থেকে ফিরে এসে বড়ঘরের বারান্দায় পূবমুখো ইজিচেয়ারটায় বসে আছেন, এখনো তাঁকে তামাক দেওয়া হয়নি। সুদর্শনকে ডাক দিয়ে আমি মাথার ঘোমটা ঠিক করে উঠতে যাচ্ছি শ্বশুরমশাইয়ের পা থেকে জুতো খুলে দেবো বলে। ভুল বুঝতে পেরে কেমন যেন অবশ-অবশ লাগল। কতকালকার কথা সব, তবু যেন মনে হয় গতকালের দেখা। সুদর্শন সাতাশ বছর চাকরি করে শ্বশুরবাড়ির কাছারিঘরে মারা গেল। তখন বল্টুর বয়স বোধহয় চার কি পাঁচ। সুদর্শনের কাঁধে চড়ে সে অনেক ঘুরেছে। সুদর্শন মরে গেলে বাড়িসুদ্ধ লোক কেঁদেছিল। সাতাশ বছরে ও তো আর চাকর ছিল না। যে কথা বলছিলাম, যে ভুল পেয়ে বসছে আমাকে। বল্টু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, সারাক্ষণ বিড় বিড় করে কি বকো মা? চমকে উঠি। 'বিড় বিড় করি! হয়তো করি। সারা দিন বড় কথা বলতে ইচ্ছে করে। মাথার মধ্যে ঠাসা সব পুরোনো দিনের কথা। শোনার লোক নেই। তাই বোধহয় আকাশ বাতাসকে শোনাই। তোরা তো কাছে থেকেও নেই। বল্টুর চাকরি আর ইউনিয়ন, সারা দিনে কথা দূরে থাক, আমার দিকে ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত। আর মন্টু! সে আমাকে চেনেই না। সারা দিন নীল চিঠির মধ্যে ডুবে থাকে। কর্তা বলত—'তোমার দুটো ঘোড়া, গাড়ি চলবে ভাল।' গাড়ি বলতে আমাকেই বোঝাতো, যেন আমার চলার ক্ষমতা নেই ছেলেরা না চালালে। কাছে তাকে পেলে এখন বলতাম—ঘোড়া দুটো কেমন দু' মুখো ছিটকে গেল দেখ। খাদের মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, একটু জোর বাতাস এলেই গড়িয়ে পড়বে। আর উঠবে না।

মরতে অবশ্য আমার একটুও দুঃখ নেই। কিন্তু মন্টু-বল্টুর কথা ভাবলে মনের ইচ্ছেটাই চলে যায়। ওরা দুজন দু' রকমের পাগল। আবার ভাবি, ওদের জন্যেই যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে তো আরো বহু কাল বেঁচে থাকতে হবে। সে যে বড় একঘেয়ে। আবার যদি মরে যাই তবে ওদের দেখবে কে? নিশ্চিন্ত করে মরুক! হয়তো ততদিনে বল্টুর বউ এসে যাবে। কিংবা এমনও তো হতে পারে যে, মন্টু ভাল হয়ে গেল, আমার আগের মতো চাকরি-বাকরি করল! হতে পারে না কেন! এরকম কি হয় না!

সামনের শনিতে একটা বারের পূজো দেবো। আর প্রতি বিষ্যুৎবারে একটা বামুনের ছেলেকে ডেকে এনে পাঁচালী পড়াবো। নিজে কয়েক দিন পড়বার চেষ্টা করেছি। চোখে বড় জল এসে যায়। তিনটে মানসিক করা আছে আমার মন্টুর জন্য। অনেক দিন হয়ে গেল। মনের ভুলে একটা মানসিক করে রেখেছি ময়মনসিংহের কালীবাড়িতে। কালীর সোনার চোখ গড়ে দেবো। এখানে বসেই করেছি সেই মানসিক, এখন ভাবি মন্টু ভাল হলে কী করে ওখানে পূজো পাঠাবো? ওরা কি দেবে আমাকে যেতে! বল্টুই কি ছাড়বে? কিন্তু বুঝি না, গেলে কি হয়! ওসব তো আমাদেরই দেশ জায়গা ছিল। বল্টু মন্টু দু'জনেই জন্মেছে ওখানে। কত যে বালাই তৈরী করছে মানুষে।

বল্টুর বউ এসে মন্টুকে দেখবে—এইরকম একটা বিশ্বাস আঁকড়ে আছি। মরার সময় হলে—যদি বল্টু ততদিনে বিয়ে না করে—

কেন চায়ে চিনি কম হয়েছিল? দূরে কিংবা কাছে কোথাও কি যুদ্ধ হচ্ছে খুব? সংসারে কি খুব অভাব চলছে? অতি তুচ্ছ ঘটনা। চায়ে চিনি কম। মাঝে মাঝেই তো এরকম ঘটে। ভুল হতে পারে। তবু দেখ, সারা দিন বিস্বাদ চায়ের স্বাদ মুখে লেগে আছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি থেমে আছি। বড় বেশী থেমে। মৃত্যু এরকমও হয়। নিস্তব্ধতার মতো। অথচ দেখ সারা দিন আমার চারদিকে চলছে কাজ। পরিশ্রমী পিঁপড়েদের, ধৈর্যশীল মাকড়শার, উই-পোকার। সারা পৃথিবীময় জঘন্য জীবাণুরাও ঘুরছে কাজের সন্ধানে, কিংবা আশ্রয়ের। আমিই থেমে আছি কেবল। ইচ্ছে করে জাল ফেলে বসে থাকি, গর্ত খুঁড়ি, কিংবা চাষ করে ফসল নিয়ে আসি ঘরে। এরকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন আমার ভিত নড়ে যায়। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠি। প্রশ্ন করি, 'আমি এরকম হয়ে আছি কেন? কেন আর সব জীবন্ত প্রাণীর মতো আমারও নেই সুখ দুঃখ? আমি কি মরে গেছি? কিংবা, আমার জন্মই হয়নি? আমি কি সব পাওয়া পেয়ে গেছি? কিংবা কিছুই পাইনি?' আস্তে আস্তে কারণমুখী হতে চেষ্টা করি। অমনি জীবন বড় জটিল বলে বোধ হয়। আমি সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াই, দেয়ালে হাত চেপে ধরি, ঢক ঢক করে মাথা ঠুকি। বেরিয়ে পড়ব বলে দরজার কাছে চলে যাই। তখনই মনে পড়ে—আমি অস্ত্রহীন। যথেষ্ট পোশাক নেই গায়ে। অবহেলা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি নেই। যাওয়া হয় না। ফিরে আসি ঘরের ভিতরে। স্বপ্নের ভিতরে।

পাশের ঘরে কারা কথা বলছে! বিকেলে ঘুম থেকে উঠে শুনি খুব গণ্ডগোল। চীৎকার। আস্তে আস্তে উঠি, ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াই। চীৎকার খুব বেড়ে যায়। বিরক্তি বোধ হয়। মাঝখানের দরজা বন্ধ। সেই বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে বলি—'চুপ করো।' কেউ চুপ করে না। মাঝে মাঝেই ওই ঘরে কারা যেন আসে। গোপনে কথা বলে। হয়তো পরস্পরকে ভালবাসার কথা। কিন্তু আজ বড় গণ্ডগোল। আমি আবার চীৎকার করে বলি—'চুপ করো।' কেউ চুপ করে না। হতাশ লাগে বড়। শুনতে পাই মোটা ভাঙা বিশ্রী গলায় কে যেন চীৎকার করে বলছে—'আমারও পাগল ভাই, বিধবা মা আছে, আমি স্বার্থত্যাগ করছি না?' কথাটা শুনে লোকটার জন্য আমার সামান্য দুঃখ হয়। আহারে, লোকটা! পাগল ভাই আর বিধবা মা নিয়ে দুঃখে আছে বড়। ইচ্ছে করে ওকে এই ঘরে ডেকে আনি, একটি দুটি সান্ত্বনার কথা বলি। বলা হয় না। ওরা ভয়ংকরভাবে চীৎকার করে ওঠে। ইন্‌স্পেক্টার। সোয়াইন। তোমার জন্যই আমরা ডুবে যাচ্ছি। ...বাঁচার জন্য...সংগ্রামের জন্য...। তুমি আমাদের খুন করছ, খুন..। ...স্বার্থত্যাগ করতে শেখো...।

আমি ঘরের মাঝখানে যাই, কোণে চলে যাই, কিন্তু গণ্ডগোল সমান ভাবে কানে আসতে থাকে। জানালার কাছে যাই, বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি। ফিরে আসি। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরিয়ে নিই। গণ্ডগোল, বড় বেশী গণ্ডগোল। হঠাৎ মনে পড়ে সকালে চায়ে চিনি কম হয়েছিল। বিকেলে চা দেওয়াই হয়নি। ইচ্ছে করে পাশের ঘরে গিয়ে ওদের ধমক দিয়ে বলি—'আমি জানতে চাই আমাকে কেন চা দেওয়া হয়নি? কেন আমার চায়ে চিনি কম হবে?' বোধ হয় অনেক দিন বৃষ্টি হয়নি। আখের চারা গাছগুলি অসময়ে মরে গেছে। আমাদের দেশে তাই চিনি তৈরী হল না এবার। আমি মনে মনে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে থাকি। বিস্বাদ চায়ের স্বাদ মুখে লেগে থাকে।

টের পাই মাথার চুলের ভিতরে বিলি কেটে দিচ্ছে একখানা হাত। বুঝি, মা। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, 'আমার চায়ে চিনি দাওনি কেন মা? কোথাও যুদ্ধ বেধেছে খুব? চিনি আজকাল পাওয়া যায় না?' কিন্তু সে প্রশ্ন করা হয় না। টের পাই পাশের ঘর থেকে দুড়দাড় লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। গালাগাল শুনতে পাচ্ছি। দাঁত ঘষার শব্দ। কোনো উত্তেজনা বোধ করি না। কেবল মাকে বলতে ইচ্ছে করে, 'চিন্তা কোরো না মা। দূরের যুদ্ধ থেমে গেলে আবার সব ঠিক মতো পাওয়া যাবে। আগের মতোই।' কিন্তু সে কথাও বলা হয় না। শুনি মা বিড় বিড় করে বলছে, 'তুই কেন এমন হয়ে রইলি মন্টু! তুই থাকলে সব ঠিক হয়ে যেতো।' অমনি আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যাই। চারপাশেই বড় গণ্ডগোল চলছে। দুঃসময়। তাই বসে থাকি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি। চাল-ধোয়া হাতের গন্ধ পাই। অন্ধকারে ঘরে বসে টের পাই চারদিকে যোজন জুড়ে অনাবৃষ্টির নিষ্ফলা মাঠ পড়ে আছে। আখের চারাগুলি মরে গেল। দুঃসময়।

ভয় করে। চায়ে চিনি কম। পাশের ঘরে গণ্ডগোল। কোথাও যাওয়ার নেই। যেতে ইচ্ছে করে। অথচ যথেষ্ট পোশাক নেই গায়ে। অবহেলা সহ্য করার মতো শক্তি নেই। অস্ত্রহীন যাওয়া যায় না তাই। বসে থাকি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি।

পাশের ঘরে গণ্ডগোল থেমে গেল। লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই। নিস্তব্ধতা। শুনতে পাই মা কাঁদছে। অস্থির লাগে বড়। আমার মাথার ওপর একখানা হাত কাঁপে। বড় শান্ত ও সুন্দর বিশ্রামের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে শহর মিঠিপুর, জেলেদের গ্রাম, কিংবা সেই আশ্চর্য খনিগুলির বসতি। শান্ত ও সুন্দর বিশ্রামের রাত্রি আমার চারপাশে। তার মধ্যে মার কান্নার শব্দ হয়। খুব শব্দ হয়। বলে, 'মন্টুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল? কি করবে ওকে? মন্টু কেন গেল?' আমি চুপ করে থাকি। নিস্তব্ধতার মধ্যে মা কাঁদতে থাকে। বুঝতে পারি না। দূরে বোধহয় খুব যুদ্ধ চলছে। আর অনাবৃষ্টির। দুঃসময়। অস্থির লাগে। সিগারেট ফেলে দিয়ে আবার ধরাই। কিছুই মেলাতে পারি না। শুধু দেখি হিমশীতল স্থবির ও অক্ষম রত্নাকর বসে আছে গাছতলায়, পথিকের অপেক্ষায়। আবার দেখি পশ্চিমের প্রকাণ্ড খোলা বারান্দায় একটি শিশু একা একা হাঁটতে শিখছে। মন্টু না? হ্যাঁ, মন্টুই। আমার ছেলে-বেলায় হারানো বল কোলে করে বসে আছে আরো বড়ো দরজা, দেখতে পাই দুপুরের ঘরে শুয়ে আছে মা, এলো চুলের ওপর প্রকাণ্ড খোলা মহাভারত উপুড় করে রাখা। শুনতে পাই কাছেই কোথায় যেন দিন রাত চলছে এক মাটি-মজুরের গর্ত খোঁড়ার কাজ। দেখি কুয়াশার মধ্যে তুমি দূরে চলে যাচ্ছো। মনে পড়ে চায়ে চিনি কম হয়েছিল। দূরে কোথাও খুব যুদ্ধ চলছে। আর অনাবৃষ্টি। কিছুই মেলাতে পারি না। মন্টুর নাম ধরে কাঁদছে মা। ইচ্ছে করে বলি—'ঈশ্বর প্রতিটি সন্তানকেই নিরাপদ রাখছেন। কোনো ভয় নেই।' পরমুহূর্তেই বোধ করি, এই কথার পিছনে আমার বিশ্বাস বড় কম। মা কাঁদে। মেলাতে পারি না। কিছুতেই মেলাতে পারি না।
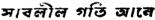
চোখে জল চলে আসে। আমি আস্তে আস্তে তোমার জন্য কাঁদতে থাকি।

মেমসা বনসুর মামা মারা গেছেন। সমবেদনা জ্ঞাপনে ওদের বাড়ি যাই। অনেক লোক এসেছে ওদের বাড়ি—মৃতের আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধব। এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সকলেই অল্প-বিস্তর মদ্যপান করছে। নিয়ম হল একই পাত্র সকলের হাতে হাতে ঘুরবে। বোতল থেকে যে যার দরকারমাফিক পানীয় ঢেলে নেবে। এবং তারপর এক চুমুকে যতটা পারে শেষ করবে। পৌরুষের ব্যারোমিটার ওঠানামা করবে চুমুকের দৈর্ঘ্যে আর নিঃশেষিত পানীয়ের পরিমাণে। আমি মনে মনে হিসেব করছিলুম, এই দুয়ের অনুপাত দিয়ে পৌরুষের কোন একটা বস্তুনিষ্ঠ সূচক বার করা যায় কিনা। এমন সময় আমার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ব্যাহত হল। দেখলুম, পেয়ালা একজনের কাছে গিয়ে থমকে থেমে গেছে। ভদ্রলোক বাংলা পাঁচের মত বিরস বিতৃষ্ণ মুখে ঘাড় নাড়ছেন। তাঁর আশ-পাশের লোকদের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস। সবিস্ময়ে চিনতে পারি ভদ্রলোক মেমসা বনসুর মামাতো ভাই, হামফ্রে কোজো। খানিকক্ষণ পরে ওঁকে একান্তে পেয়ে জিগ্যেস করি, "আপনি খাচ্ছেন না?" হামফ্রে বলেন, "আমার তো মদ্যপান বারণ।" হামফ্রে কোজোর সাড়ে ছ' ফিট খাড়া চেহারা। কালকেতুর রূপ বর্ণনায় ব্যবহৃত "দুই বাহু লোহার শাবল" ওঁর বাহিদ্বয়ে মানানসই চিত্রকল্প। দেখে মনে হয় যকৃতের দোষ সাতজন্মে ওঁর ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। এ হেন হামফ্রে কোজোর মদ্যপানে অনিচ্ছা, কারণ বারণ! এমন নিষেধের সাহস হল কার? হামফ্রে কোজো বললেন, "খৃষ্টানদের সঙ্গে আমাদের তফাত এইখানে। আমরা মদ ছুঁই না। আর ওরা গীর্জায় গিয়ে মদ আর রুটি খায়। ট্রান্স-সাবস্ট্যানশিয়েশন-এর মতবাদ তো ক্যাথলিকদের ধর্মতত্ত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। আমি মনে মনে ভাবি হামফ্রে কোজো বর্ণিত আমরা আসলে কারা। উনি তখন বলেন, "আপনাদেরও তো মদে বিশেষ আসক্তি নেই। আর এতে অবাক হবারই বা কী আছে? আমাদের ধর্ম তো আপনাদের দেশ থেকেই এসেছে।" এবার বুঝতে পারি হামফ্রে কোজো হলেন মুসলমান। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকার সংখ্যাগুরু মালিকী সম্প্রদায়ভুক্ত নন। পশ্চিম আফ্রিকায় মালিকী ইসলামের প্রচারকেরা ভারতবর্ষ থেকে আসেননি। হামফ্রে কোজো নিশ্চয়ই আহমদী। অর্থাৎ এঁর সম্প্রদায়ের নাম আহমদিয়া বা কাদিয়ানী। প্রথম নামটির উদ্ভব এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদের নামানুসরণে।

আর দ্বিতীয়টি চালু হয়েছে কাদিয়ান থেকে। কাদিয়ান হল পূর্ব পাঞ্জাবের একটি ছোট শহর। এইখানে উনিশ শতকের শেষে গোলাম আহমদ ঘোষণা করেন তিনি স্বয়ং হলেন মুসলমানদের নবী আর মসীহ খৃষ্টানদের মেসাইয়া, যাঁর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে করা হয়েছে, আর হিন্দুদের পক্ষে কেশবের নব-অবতার। খৃষ্টান ও হিন্দুরা তো নয়ই, এমনকি অন্য মুসলমানেরাও আহমদের এই দাবি মেনে নেয়নি। আহমদ তখন কাদিয়ানে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কিছু কিছু মুসলমানকে দীক্ষা দিয়ে কাদিয়ান শহরে নিজের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন। এখান থেকে প্রচার চলল অবিভক্ত ভারতে, বিশেষত পাঞ্জাবে। ইন্দোনেশিয়া, বৃটেন আর আমেরিকায়। পরে পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকাতেও আহমদী প্রচারকেরা ইংল্যান্ড ও ভারত থেকে এসে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছেন।

অবশ্য আহমদীরা আসার আগেও ঘানা বা নাইজেরিয়াতে বহু দিন থেকে অনেক মুসলমানের বসবাস ছিল। কিন্তু এরা ছিলেন প্রধানত উভয় দেশের উত্তরাঞ্চলে—নাইজেরিয়ার হাউসা-ফুলানি ও ঘানার দাগোম্বা-মোসি অধ্যুষিত এলাকায়। একশ' বছর আগে পর্যন্ত ইসলাম প্রধানত ছিল সুদানীয় তৃণভূমি বা সাভানা অঞ্চলের ধর্ম। এর দক্ষিণে বনভূমির ব্যবধান পেরিয়ে আটলান্টিক উপকূলে ইসলাম এগিয়ে আসতে পারেনি। তারপর গত একশ' বছরে পশ্চিম আফ্রিকায় ইওরোপীয় আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণের যোগাযোগও সুদৃঢ় হয়েছে। চাকরি ও ব্যবসা করতে উত্তরের বহু লোক এসেছে দক্ষিণে এবং সাথে এনেছে তাদের ধর্ম, ইসলাম। আহমদীরা আসার আগেও তাই ঘানার আকান উপজাতির মধ্যে কিছু কিছু লোক তাদের সনাতন ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

ঘানায় আহমদী প্রচারের শুরু হয়েছে ১৯২১ সাল থেকে। তার বছর খানেক আগে ওটেং ফান্টি মুসলমান স্বপ্ন দেখে, সে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ মুসলমানের সঙ্গে নামাজ পড়ছে। স্বপ্নের কথা সে তার বন্ধু-বান্ধবকে বলায় এক বন্ধু তাকে জানায়, ভারতবর্ষ থেকে এক মুসলিম মিশন লন্ডনে এসে প্রচার চালাচ্ছে বলে শোনা গেছে। (প্রসঙ্গত ভারতীয়-পাকিস্তানীদের এদেশে শ্বেতাঙ্গ বলে ধরা হয়)। এরপর মানকেসিম শহরে স্থানীয় মুসলমানদের এক সভা থেকে কাদিয়ানের আহমদী মিশনে এক চিঠি যায়। এবং এদের অনুরোধেই আলহাজ্জ মৌলানা আব্দুল রহিম নাইয়ার লন্ডন থেকে স্বর্ণ-উপকূলে তথা পশ্চিম আফ্রিকায় ধর্মপ্রচারে আসেন। এঁর উদ্যোগে ঘানার দক্ষিণে সল্টপন্ড শহরে আহমদী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে নাইজেরিয়ার লেগস শহরেও আহমদী সংগঠন গড়ে ওঠে।

ঘানা ও নাইজেরিয়ায় প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আহমদী প্রচার চলেছে। আজ ঘানায়

আহমদীদের ১৬২টি মসজিদ ও ১৫টি স্কুল আছে, যার মধ্যে একটি হল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এক-আধ জায়গায় চাঁদ-তারা মার্কা আহমদিয়া স্টোর্স বা দোকানও দেখেছি। ঘানায় আহমদী মিশনের কাজ চালাচ্ছেন ২৫জন মিশনারী, যাঁদের মধ্যে চারজন হলেন পাকিস্তানী। এ'রা জনসভায় বক্তৃতা করেন, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখেন আর রেডিও ও টেলিভিশনে আহমদিয়া সম্পর্কে নানা প্রশ্নের জবাব দেন। আহমদীদের উদ্যোগে ফাণ্টিভাষায় কুর-আন শরীফের অনুবাদ সমাপ্তপ্রায়। আজ সমগ্র ঘানায় আহমদীদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার, নাইজেরিয়ায় হাজার পাঁচেক আর সিয়েরা লিওনে আছে হাজার চারেকের মত। অর্থাৎ ইংরাজীভাষী পশ্চিম আফ্রিকায় সব মিলিয়ে আহমদীদের সংখ্যা হল চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি। পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম ক্ষুদ্রতম দেশ গ্যাম্বিয়ায় পাকিস্তানী প্রচারকেরা এই প্রথম কাজে নেমেছেন। সে দেশের বর্তমান গভর্নর জেনারেল স্বয়ং আহমদী।

এখানকার লোকে ভারতীয় ও পাকিস্তানীর পার্থক্য কম বোঝে। তাই হামফ্রে কোজো আমাকে তাঁর পরমাত্মীয়ের আসনে বসালে কিছুমাত্র আশ্চর্যবোধ করি না। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে তাঁর আনাগোনা চলে। একদিন তাঁর সঙ্গে আর একটি ক্ষীণদেহ যুবকের আবির্ভাব। হামফ্রে কোজো পরিচয় করিয়ে দেন "এ হল আমাদের আহমদী স্কুলের হেডমাস্টার। নাম রবার্ট আর্থার কোবিনা বেড়ু ইয়াকুব হাসান। আমি বলি "ওঁর এই ক্ষীণ শরীর নামের এতবড় বোঝা বইতে পারে!" হামফ্রে তখন নামায়ন শুরু করেন, "মাঝের দুটি হল আসল ফাণ্টে নাম। এমন নামের সঙ্গে একটা দুটো বিলাতী নাম জুড়ে দেওয়া আমাদের রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। তাই রবার্ট আর্থার। আর আমরা আহমদীরাই বা আমাদের দাবি ছাড়ব কেন? তাই শেষের দুটি।" স্থানীয় আদবকায়দা অনুসারে আমি ওদের 'ড্রিংক্‌স্‌' পরিবেশন করি। আমার প্রত্যাশামত হামফ্রে কোজো বীয়ার না ছুঁয়ে একটা কোকাকোলার বোতল সস্নেহে টেনে নেন। কিন্তু ইয়াকুব হাসান কোনটাতেই উৎসাহ না দেখিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। হামফ্রে বলেন, "ওর তো শুক্রুবারে নির্জলা উপবাস, জুম্মাবার কিনা। আপনি কিছু মনে করবেন না। ও আপনার সঙ্গে আপনার দেশের গল্প করতে এসেছে।" আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাই ইয়াকুবের দিকে। ইয়াকুব আস্তে আস্তে বলে, "আচ্ছা, কাদিয়ান কি আক্রার মত বড় শহর?" সত্যি কথা বলতে কী, হামফ্রে কোজোর সঙ্গে মেনসা বনসুর মামার বাড়িতে দেখা হবার পর লাইব্রেরীতে আহমদী আন্দোলন সম্পর্কে একটা বই খুঁজে না পড়লে কাদিয়ান পানামা না জাপানে তা জানতুম না। প্রভাত মুখুর্জের মাস্টারমশায়কে 'হর্নস্‌ অফ এ ডিলেমা' কথার মানে জিগ্যেস করাতে ওঁর যেমন মনের অবস্থা হয়েছিল, সদ্যপড়া বই-এর কল্যাণে ইয়াকুবের প্রশ্নে আমিও তেমনি বিজয় গর্বে উদ্দীপিত হয়ে যথাযথ উত্তর দিই। ইয়াকুব তারপর প্রশ্ন করে, "রাবোয়া কেমন?" কাদিয়ান দেশ বিভাগের ফলে ভারতবর্ষে পড়ায় পশ্চিম পাঞ্জাবের রাবোয়া শহরে বর্তমানে আহমদীরা তাদের হেড-কোয়ার্টার্স স্থাপন করেছে। তারপর প্রশ্ন হয় লাহোর সম্পর্কে। তারপর আসে লতা মঙ্গেশকরের গান ও রাজকাপুরের অভিনয় প্রতিভা। বলাবাহুল্য সবটাই হিন্দী ফিল্মের দৌলতে। এরপর খানিকক্ষণ রেকর্ডে ভারতীয় গান শুনে আহমদীদ্বয়ের প্রস্থান।

সপ্তাহখানেক পরে যে চিঠি পাই সেটি খুলে হতবাক হই। লেখা আরবী লিপিতে। অর্থাৎ কেউ আমাকে লিখেছে আরবী ভাষায় কিংবা ফার্সী, হাউসা, কি উর্দুতে। অথচ পোস্টমার্ক ঘানার এক শহরের। এ কী নির্মম রসিকতা! অগত্যা যাই আমাদের পাকিস্তানী সহকর্মী ডক্টর শহীদুল্লার কাছে। তিনি পড়লেন। উর্দু ভাষাই বটে। পত্রলেখক শ্রীমান ইয়াকুব। লিখেছে, সেদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে না পারার জন্য (অর্থাৎ পানীয় সদ্ব্যবহারের ব্যর্থতায়) সে বড়ই লজ্জিত। এবার সে আসবে জুম্মাবার বাদ দিয়ে। তখন পানীয় গ্রহণে কোন বাধা থাকবে না। ডক্টর শহীদুল্লা থামলেন। আমি বললাম "আর কী লিখেছে?" উনি বললেন, "ওই লজ্জার কথাটাই অনেক 'লফ্‌জ্‌' দিয়ে লিখেছে।" আমি প্রশ্ন করি, "এক পাতা খালি ওই কথা?" শহীদুল্লা মুচকি হেসে বলেন, "হ্যাঁ! শেষে লিখেছে গালিবের 'বয়েত' দিয়ে, এ চিঠি পড়ে যেন আপনি তার ওপর রাগ না করেন কারণ এতে নিশ্চয়ই অনেক বানান ভুল, ব্যাকরণের অনেক অশুদ্ধ ব্যবহার আছে। আপনার সময় হলে ওগুলো যদি দয়া করে একটু শুধরে দেন—"। হ্যাঁ, বুদ্ধিমান পাঠকেরা ঠিকই ধরেছেন। এ কাজটা পরস্মৈপদে অর্থাৎ ডঃ শহীদুল্লার ওপর দিয়ে চালাই।

এরপর প্রায় মাসখানেক বাদে ইয়াকুবের পুনরাবির্ভাব। এবার সে উর্দু বই সঙ্গে করে এনেছে। চোখমুখে প্রত্যাশার আলো। তখন মরিয়া হয়ে সব খুলে বলি। শেষে যোগ করি, "আমার বন্ধু তোমার উর্দুর খুব প্রশংসা করছিলেন। ইয়াকুব সলজ্জ হেসে জানায়, আফ্রিকায় থেকে সে আর কতটুকু উর্দু শিখতে পারছে। তার ভাই তার চেয়ে অনেক ভালো জানে। পাকিস্তানে সে আজ চার বছর ধরে আছে? পাকিস্তানে? চার বছর? সেখানে কী করতে? ইয়াকুব বলে, "লাহোরের কাছে রাবোয়া শহরে আমার ভাই শেখে আরবী আর উর্দু, পড়ে কুর-আন আর হাদিস।" খরচ? খরচ যোগায় ঘানার আহমদী মিশন। দু' বছর বাদে ফিরে এসে সে হবে ঘানার আহমদী প্রচারক। ইয়াকুবের ভায়ের মত আরও কিছু কিছু ছাত্র রাবোয়াতে পড়তে গেছে বিভিন্ন আফ্রিকান দেশ থেকে। বছর দশেক আগে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখতে পাই সে সময় আটজন পূর্ব আফ্রিকান, দুজন সিয়েরা লিওনীয় এবং দুজন ঘানীয় ছাত্র রাবোয়াতে ট্রেনিং নিচ্ছিল। ইয়াকুব অবশ্য ঘানাতেই উর্দু শিখছে। আমরা হিন্দী কিছুটা জানি বলাতে সে মাসখানেকের মধ্যে নাগরী হরফ আয়ত্ত করে নেয়। তারপর আমাকে বলে ভারতবর্ষ থেকে হিন্দী শেখার বই আনায়। এখন সে মাসে মাসে একটা করে হিন্দী রচনা ডাকযোগে আমাদের পাঠায় সংশোধনের জন্যে।

★

ইয়াকুবের ভাষা শিক্ষণ প্রতিভার প্রশংসা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আহমদীদের ধর্ম-প্রচারে সাফল্য আমার বক্তব্যের পটভূমিকা, যত কিছু করা যেতে পারে তার একটি সজীব উদাহরণ মাত্র। বর্তমান আলোচনার মূল কথা হল, ওপরতলায় ভারতবর্ষ তথা পাকিস্তান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও উৎসাহের অভাব সত্ত্বেও পশ্চিম আফ্রিকার সাধারণ মানুষ আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে জিজ্ঞাসু। পাকিস্তানের আহমদী মিশনারীরা কিছু কিছু উৎসাহী ও বুদ্ধিমান যুবককে তাদের মতবাদে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। ভারতবর্ষের কি কিছুই করণীয় নেই? পিরানদেল্লোর নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্রের মত ভারতের ষাট কোটি লোক আর কতদিন আদর্শের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে? স্বদেশে কতদিন এই বিভ্রান্তির প্রতিফলন পড়বে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতে, আর বিদেশে আত্ম-অবদমিত নিষ্ক্রিয়তায়?

অংশু দত্ত

এসেছে, বলল, "কী ব্যাপার, এত মুখ গোমড়া কেন?" আমি বললুম, "তোমাদের একতলাটা তো খালি আছে, একতলাটাও লাগবে না গ্যারেজটা তো আছে, এসো না সেখানে একটা অবৈতনিক ক্লাস খুলি এই বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য!" আমার বন্ধু বলল, "ওটা তোমার একার প্ল্যান নয়, মা করছেন একটা ইস্কুল গ্যারেজে, আমি পড়াব, ইস্কুল বসছে পরশু থেকে।" আমি বললাম, "সত্যি খুব ভালো হয় যদি তোমরা কর এটা।"

আমার স্বভাবের সবচেয়ে বড় দোষ হ'ল আমি একই সঙ্গে বহু উৎসাহে মেতে উঠি। সেদিন ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য এক আড্ডায় গিয়ে নাটকের দল [illegible] একটা পরিকল্পনায় এমন মেতে গেলুম আর সেই নিয়ে ঘোরাঘুরিতে এত [illegible] হয়ে পড়লাম পরের কয়েকদিন বস্তি-[illegible] ইস্কুলের কথা একেবারে মনেই ছিল না। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে অবশেষে [illegible] চলে গেলুম ওদের বাড়িতে, পথে যেতে যেতে ভাবলুম দিদি নিশ্চয় প্রবল উৎসাহে এখন ওদের ইংরিজী পড়াতে ব্যস্ত। আমার সঙ্গে দেখা হয় কথাই বলবে না। পরে ভাবলুম ওরকম হ'লে আমি না হয় ওর চেয়েই হয়ে যাব, ইংরিজী গ্রামার [illegible] জানা আছে, না হয় এই সুযোগে [illegible] করে নেওয়া যাবে, তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমার শখ কোনো সুন্দরী শিক্ষিকার ছাত্র হবার, এই সুযোগে সেটাও মিটবে।

কিন্তু বাড়ি পৌঁছে দেখি বিরাট [illegible] গ্যারেজ, একতলা ফাঁকা, সন্ধ্যেবেলা ইস্কুলের শিশুদের কলহাস্যের শব্দ কতই না কল্পনায় শুনেছিলাম, কিন্তু সব একেবারে ভোঁ ভোঁ, ভয়ানক শান্ত পরিবেশ। দোতলায় গিয়ে দেখি শিক্ষিকা নিজের এম. এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে, ইস্কুলের [illegible] নেই। আমি বললাম, "কী হল ইস্কুলের? আমি তো ইন্সপেক্টর হয়ে এসেছিলাম!"

ব্যাপারটা এইরকম হয়েছিল। বারান্দা থেকে, ইস্কুল যেদিন বসানো হবে সেদিন, আমার বন্ধুর মা বস্তির বাচ্চাদের ডেকে বলেছিলেন যে সন্ধ্যেবেলা ছ'টার সময় ইস্কুল বসবে, সবাই যেন সেখানে জড়ো হয় কোনো পয়সা লাগবে না। চারটে না বাজতে বাড়ির নিচে ভীড়, শয়ে শয়ে ছেলেমেয়ে, খালি জিগেস করে "দিদিমণি, ছ'টা বেজেছে?" বাড়ির নিচে এত ছেলেমেয়ের গণ্ডগোলে ওদের অবস্থা কাহিল, কাজকর্ম সবার ডকে উঠেছে, গৃহিণী দুপুরে একটু বিশ্রাম নিতে শুয়েছিলেন পারলেন না, খোট্টা ভৃত্য যার ঘুম ওদের বাড়িতে গল্প কথা তারও ঘুম মাথায় উঠল, বাড়ির সামনে এত ভিড় যে নাকি বাড়ির ছেলে কলেজ থেকে ফিরে বাড়িতেই ঢুকতে পারে না। বস্তির সব বাচ্চা, কেউ ভাঙা স্লেট নিয়ে, কেউ কয়েকটা কাগজ আর কোথা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া খুদে পেন্সিল কানে গুঁজে বিকেল না পড়তেই চলে এসেছে। আর মাঝে মাঝেই মিছিলের ধ্বনির মত সমস্বরে হাঁক "দিদিমণি, ছ'টা বেজেছে?" উৎসাহের এত আতিশয্য ছ'টা বাজার জন্য আর অপেক্ষা করা গেল না, পাঁচটাতেই বসাতে হ'ল ইস্কুল। কিন্তু জায়গা কোথায়? এত ছেলেমেয়ে গ্যারেজ ঘরে তো আঁটলই না, একতলার হলঘর খুলে দিতেও বাইরে দাঁড়িয়ে রইল বহু, একেবারে হইহই কাণ্ড। ইতিমধ্যে এত বাচ্চা দেখে পাড়ার লোকও জড়ো হয়েছে, অঞ্চলের মাস্তানবৃন্দ অবৈতনিক ইস্কুলের self appointed ভলান্টিয়ার হ'য়ে গেছে, তাদের অনেকদিনই প্রধান শিক্ষিকার দিকে ঝোঁক, এই ফাঁকে একটু আলাপ পরিচয় যদি হয় সে রকম একটা আশা। পাড়ার মাস্তানরা সাধারণত মানুষের রোমান্টিক ইমেজের চেয়ে ক্লাসিকাল ইমেজেরই বেশি ভক্ত হয়, মেয়েদের মুগ্ধ করার জন্য তারা সুযোগ পেলেই শৌর্য-বীর্য দেখাতে উৎসুক হয়ে ওঠে, এমন কি লোক না পেলে নিজেদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ মারপিট করে ফেলে—এইসব মাস্তানবৃন্দ সেদিন সুন্দরী তরুণী শিক্ষিকাটিকে মুগ্ধ করবার জন্য বাচ্চাদেরই মাঝে মাঝে "অ্যাই পড়া না শুনে গণ্ডগোল হচ্ছে" ব'লে মারধোর আরম্ভ করে। মেয়েটি যত বলে আপনাদের কিছু করবার দরকার নেই, আপনারা আমার হাতে ওদের ছেড়ে দিন', তত এরা দ্বিগুণ উৎসাহে শাসন চালায় "এই তুই sisterকে দিস ভেঙালি, তবে রে কান ছিঁড়ে দেব", ইত্যাদি। কয়েকজন আবার এই সুযোগে দোতলায় উঠে গিয়ে গৃহকর্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে আসে "মাসিমা, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, sister-এর সঙ্গে আমরা আছি, কেউ গণ্ডগোল করলে ঠাণ্ডা করে দেব।" ইস্কুল চলবে কি, ভলান্টিয়ারদের হইচই বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে পাড়ার আরও লোক জমে গেছে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আবার ইস্কুল দেখতে এসে শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে কিছু উপদেশও দিয়ে যাচ্ছেন "শোনো মা এইভাবে কি বর্ণ পরিচয় শেখানো যায়! আরও কড়া হতে হবে, তোমার ভয় না পেলে কি আর কিছু শিখবে? ওদের মারো, ভালো করে চুলের মুঠি ধরে পেটাও, সব ব্যাটা বাপ্ বাপ্ করে ক খ গ ঘ শিখবে।" এই সময় আবার আরেকজন ফুট্ কাটে "দেশে এমপ্লয়মেণ্ট নেই এডুকেশন স্প্রেড করে লাভটা কি হবে?"—তখন আরেকজন বলে "টেকনিকাল ট্রেনিং" কিছু দিলে অনেক ভালো হত।—যদিও বাচ্চারা সত্যিই শেখার উৎসাহে আকুল, দিদিমণির স্নেহশীল ব্যবহারে তারা মুগ্ধ, মন দিয়ে ওই বয়সের তুলনায় বাচ্চারা শুনছিলও বেশ, কিন্তু মন্তব্যকারী এবং ভলান্টিয়ারদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে পুরো জিনিসটাই পণ্ড হতে বসে।—ইতিমধ্যে বাইরে অনেক লোক জমে গেছে, বহু লোক পুরো ব্যাপারটার ভেতরের অনেক খবর দিয়ে ফেলছেন, দু'চারজন এর মধ্যে রাজনৈতিক দলের গোপন হাতও দেখতে পেয়েছেন, অনেকের তরুণী শিক্ষিকা ব্যাপারটা অশ্লীলও ঠেকেছে এবং দু'চারজন C I A জিগিরও তুলে ফেলেছেন অবৈতনিক ইস্কুলকে ঘিরে। বাংলা দেশে, ময়দানে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেও লোকে বলে C I A গাওয়াচ্ছে, নাটক করলে বলে C I A করাচ্ছে, এমনকি মেয়ে পুরুষের প্রণয়ও নাকি C I Aর চক্রান্ত। নন্দনমেলাতে ঠিক সেদিন যেমন কলকাতার সাধারণ মানুষকেও একটা দল C I A বলে গালি দিয়েছে তারা কবিতা পাঠ ও গান করছিল বলে—ঠিক তেমনি মা মেয়ের এই পরিকল্পিত অবৈতনিক ইস্কুলকেও ঘিরে বাইরে C I A গুঞ্জন শোনা গেল। এই গুঞ্জন শ্লোগানে পরিণত হতে সময় লাগে না, কিছু ছেলে "ইয়াঙ্কি কালচার নিপাত যাও" ধ্বনি তোলে—আর এই-সব দেখে তরুণী শিক্ষিকা ভয়ে প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়।

গৃহকর্ত্রী নিচে এসে বাচ্চাদের বললেন, বাড়ি যাও, ইস্কুল হবে না, কোনোরকমে লোকজন বাইরে ঠেলে ওপরে গিয়ে অবশেষে নিশ্চিন্ত হলেন সবাই। লোকজনও কিছুক্ষণ বাড়ির সামনে জটলা করে বিদায় নিল অবশেষে। নিরপরাধ বস্তির বাচ্চারা কিছুই বুঝতে পারল না ব্যাপারটা, তারা পরের দিনও জড়ো হয়ে চিৎকার করতে লাগল "দিদিমণি ছ'টা বেজেছে?" "দিদিমণি পড়াবে না আজ", ছাত্র আছে মাস্টার আছে, অর্থ চাই না, জায়গাও আছে, কিন্তু কিছু করা যাবে না, কারণ কোনো ভালো কাজ করলেই লোকে বলবে "স্বার্থ আছে", "C I Aর টাকা পেয়ে এইসব হচ্ছে" "ভেতরে ভেতরে চলছে অন্য জিনিস রে, পেছনে তো পুরো আমেরিকা" এইসব।

মৌলিনাথ

সেদিন কথায় কথায় দিলীপ বলছিলো—
"আমি জেতাতে মার সেকি আনন্দ যদি দেখতেন !"
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink for strength and vigour
450g

এর প্রধান অধ্যাপক অ্যালেন ওয়েলার কর্তৃক মনোনীত হয়েছে। তাছাড়া উডকাট ও সিল্কস্ক্রীন মাধ্যমে শিল্পকলার আধুনিক ধারার পরিচয় দেবার জন্য ঐ জাতীয় আর্টটি রচনাও প্রদর্শনীভুক্ত করা হয়েছে। শিল্পকলাক্ষেত্রে আমেরিকার উচ্চতর শিক্ষায়তনগুলি যে কি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং চিত্রকলাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে ছাত্র তথা শিক্ষকগণও এই শিক্ষায়তনগুলি থেকে কিভাবে প্রেরণালাভ করে থাকেন, প্রদর্শনীর রচনাগুলি দেখে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীভুক্ত অধিকাংশ শিল্পীর শিক্ষকতাই পেশা, আবার এমন অনেকে আছেন কলাচর্চাই যাঁদের একমাত্র পেশা নয়। প্রদর্শনীতে জল ও তেল রঙের ছবি, পেনসিল ও কালিকলমের ড্রয়িং ও স্কেচ এবং গ্রাফিক ও সিল্কস্ক্রীন প্রিণ্টও দেখা যায়।

প্রদর্শনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সমস্ত ছবিই কাগজের ওপর আঁকা ও সব কটিই সুনির্বাচিত। বিশেষ করে জলরঙের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়। কোনও স্থলে ভিজা ভিজা কাগজের ওপর নানাভাবে উজ্জ্বল তরল নানারঙ ঢেলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার কোনও ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রীতিতেই জলরঙ ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জন মেনিহ্যান-এর ট্রী ও র‍্যাল্‌ফ্‌ অ্যাভেরি-র ইভনিং লাইটস-এর নাম উল্লেখ করা যায়। আমেরিকার শিল্পিগণ যে ড্রয়িং-এর ওপর বিশেষ প্রাধান্যদান করেন তা কয়েকটি নিদর্শনে দেখলে বোঝা যায়। অধিকাংশ ড্রয়িং পরিচ্ছন্ন, এবং প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই শিল্পীর নিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, হ্যারী রীন-এর গার্ডেন পেনসিল। কালি-কলম ও কালী ও ওয়াশ মাধ্যম রচিত ছবির মধ্যে ডর বথওয়েল-এর ট্রাইবাল উওম্যান অনেকের মনে থাকবে। রচনাটি প্রতীকমূলক, এবং উপজাতীয় নানা মোটিফ ব্যবহার করার ফলে ছবিটিতে বর্ণশিল্পের কমনীয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কালি কলমে রচিত কাজের মধ্যে ফ্রেড ব্রাদার-এর ফোর ফ্র্যাগমেণ্টস, হেলেন রেগার-এর স্কেচ, আমেরিকান ওয়ার্কিং গার্ল উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে তার একখানা ছবিও চোখে পড়ে যার—নাম্বার সেন-এর দি ফ্যামিলি। আলফেনসোস ভার্গাস জলরঙে প্রধানত লাল, সবুজ ও ব্রাউন তেলরঙ কাগজের ওপর ঢেলে দিয়ে 'স্টিল লাইফ'-এ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। গ্রাফিক বিভাগে কয়েকটি উচ্চ-জাতীয় প্রিণ্টের সন্ধান পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম কারুকার্য ও খোদাই সুষমতার জন্য এগুলি বিশেষভাবে সকলের চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে শিল্পী ক্যারল সামার্স (স্টর্মবোল্ট ইন কলার), জন ওয়েল (এ ভ্যালেডিকশন অব উইলিস), জন রস (এক্সপানশন), মার্কা কান (গ্রাসহপার) ও এলেন কোহেন (মাদার অ্যাণ্ড চাইল্‌ড্‌)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিল্কস্ক্রীন প্রিণ্টের মধ্যে কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়। সর্বপ্রথমেই নজরে পড়ে জোসেফ হিরশ্‌-এর এক্সপ্রেশনিস্ট জাতীয় কাজ স্লিপিং হেড। পরিকল্পনা ও রঙের কারুকার্যের দিক থেকে আইভানস হিরশ্‌-এর মাই উইণ্ডো ফেসিং নর্থ উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে আরও দু'একটি নমুনার নাম করা যেতে পারে, যেমন, ডীন মিকার-এর লাক অব দি ডার্টস্‌ এবং সিস্টার মেরী কোরিটা-র উওম্যান ক্লোদড উইথ দি সান।

চিত্রপ্রিয়

নৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ীই ঠিক করতে হবে, নেতাজী এ কথা বারবার বলে গেছেন। রাশিয়ায় যেমন প্রয়োজনভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, ভারতেও অনুরূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, কিন্তু তা রাশিয়ার অনুরূপ হবে না—ভারতে যেমনটি দরকার ঠিক তেমনি হবে।

নেতাজী এ কথাই বলেছেন, **"We know, for example, that in Soviet Russia a new scheme of national (or political) economy has been evolved in keeping with the facts and conditions of the land.** The same thing will happen to India. In solving our economic problem, Pigou and Marshall will not be of much help." (The Indian struggle 1935–42, p. 72).

স্বাধীন ভারতের রূপ কি হবে—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নেতাজী বলেছেন, **"Free India will not be a land of capitalists, landlords and castes. Free India will be a social and a political democracy."**

ভারতের বুক থেকে সব রকম শোষণের চিহ্ন মুছে দেওয়াই ছিল নেতাজীর জীবনের ব্রত। অর্থনৈতিক শোষণ, অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। সমাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে তাঁর ছিল অখণ্ড বিশ্বাস। যাঁরা নেতাজীকে "হিটলারের চর" বলে সম্বোধন করেছিলেন তাঁরা ভুলে গেছেন নেতাজীর সেই [illegible] বলেছিলেন **"I am opposed to Hitlerism whether in India within the Congress or any other country but it appears to me that socialism is the only alternative to Hitlerism."** (Delhi Speech, 12-10-38).

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মাধ্যমে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি নেহরুর সৃষ্টি ছিল না—এটা ছিল সুভাষচন্দ্রের সৃষ্টি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে পণ্ডিত নেহরুর কাছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ জওহরলাল নেহরুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "The other day I have had a long and interesting discussion with Dr. Meghnad Saha about scientific planning for Indian industry; I am convinced about its importance and as you have consented to act as the president of the committee formed by Subhas for the guidance of the Congress, I would like to know your views on the matter." (A Bunch of old Letters compiled by Jawaharlal Nehru).

[illegible] "The materialistic interpretation of history which seems to be a cardinal point in communist theory will not find acceptance in India, even among those who would be disposed to accept the economic contents of communism." (Indian Struggle, p. 432).

নেতাজী ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। সেভাবে দেশের অর্থনৈতিক [illegible] কথা তিনি ভেবেছিলেন তার মধ্যেও প্রভাব দেখা যায় পণ্ডিত নেহরুর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উপর। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু গান্ধীবাদী অর্থনীতির প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ইতিহাস বিচার করবে গান্ধীজীর অর্থনৈতিক নীতি দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত কিনা। কিন্তু নেতাজী যেভাবে দেশের অর্থনৈতিক নীতির রূপরেখা আঁকতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে আছে বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, যা দেশকে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত হবার এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে যাবার পথের নির্দেশ দেয়।

সুব্রত গুপ্ত

ওয়ালিমা

১লা জানুয়ারী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী শর্মিলা ঠাকুর পটৌদির প্রাসাদে বধূবেশে প্রবেশ করলেন। সেদিনই ছিল "ওয়ালিমা" অথবা বউভাত। শ্রীমতী শর্মিলার নতুন নাম হয়েছে আয়েষা সুলতানা। ধর্মান্তর গ্রহণ না করে আমাদের কিন্তু তাঁরা বেগম মহলে শামিল হলে আরও পরিপূর্ণভাবে অখণ্ড ভারতীয় চিত্র হতো। ভেদাভেদের উপরে এক অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতায় সুন্দর সংযোগ। শুনেছি নানা কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। সব কথা জানতে পারিনি তবে ভোপাল রাজসিংহাসনসীন এখন নবাব পটৌদির জননী। তাঁকে নবাব বেগম বলা হয়, কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে নবাবি তাঁর। ভবিষ্যতে ভারত সরকারের অনুমোদন পেলে হয়তো বর্তমান পটৌদির নবাব মনসুর আলি খাঁ ভোপালেরও নবাব হবেন এবং শর্মিলা ওরফে আয়েষা সুলতানা ভোপালেরও বেগম হবেন। ভোপালের উত্তরাধিকার ব্যাপারে নাকি শর্মিলার ধর্মান্তর, অন্তত ধর্মান্তরের কারণগুলির একটি বটে।

ভোপালের বেগমদের পরাক্রম ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। যে কালে এমন ছোট একটা দেশ শাসন করা বেশ শক্ত কাজ ছিল সে কালেও ভোপাল বেগমশাসিত হয়েছে বহুকাল। বিখ্যাত এই বেগম-গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন সিকন্দার বেগম। সিকন্দার বেগমের জন্ম ১৮১৮ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন নজর মহম্মদ। নজর সাহেব নিজেকে ভোপালের নবাব বলে ঘোষণা করেন। নজর মহম্মদের মৃত্যুকালে সিকন্দর বেগম সাহেবের বয়স ছিল কয়েক মাস মাত্র। ভোপাল দরবারে ফরাসীদের আনাগোনা ছিল। রাজ্যের উচ্চ পদে আসীন প্রচুর ফরাসী ছিলেন। শিশু সিকন্দর বেগমের নামে রাজকার্যে হাল ধরলেন নজর মহম্মদের বিধবা পত্নী ও সহায় হলেন এক ফরাসী মন্ত্রী।

বিধবা বেগম সাহেবের শাসন শেষ হলো। সিকন্দর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সিংহাসন দাবি করলেন। ব্রিটিশ রাজ সিকন্দরের দাবীতে একটু প্যাঁচ কষে, সিংহাসনে বসালেন সিকন্দরের স্বামীকে। ব্যাপারটা বড় সুবিধার হলো না। বেচারা স্বামী

ওয়ালিমা ভোজের আসরে আয়েষা ওরফে শর্মিলা

কিছু দিনের মধ্যে মারা গেলেন। সিকন্দর বেগম এবার কন্যা সাজাহান-এর নামে নিজেই শাসক বা Regent হলেন। পর্দা ফেলে দিলেন। পুরুষের পোশাকে অশ্বারোহণে চলা ফেরা আরম্ভ করলেন। পোশাক এবং আচরণ মাত্র তাঁর সম্বল ছিল না। যোগ্যতায় তাঁর সমকক্ষ কমই ছিল। তাঁর সম্বন্ধে যা বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় শাসনকার্যে সম্ভব রকমের দক্ষতার দরুন তাঁর আধিপত্যকালে ভোপাল বিশেষ উন্নতি করেছিল। পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ করে রাজ্যের আয় প্রায় তিন গুণ বাড়িয়েছিলেন সিকন্দর বেগম। রাস্তা তৈরি করা, সৈন্যদলকে নতুন করে গড়ে তোলা, পুলিস ও আইন-আদালত প্রতিষ্ঠা করা সিকন্দর বেগমের কীর্তি। যে ব্রিটিশ শাসন তাঁকে সিংহাসন না দিয়ে তাঁর স্বামীকে নবাবি দিয়েছিল, সুচতুরা সিকন্দর সেই ব্রিটিশের সঙ্গে সখ্য স্থাপনা করে ফেললেন। সিপাহী বিদ্রোহে সেই ব্রিটিশের পক্ষে লড়াই করে বেগম সাহেবা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার হৃদয় জয় করেন। সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হলো, কিন্তু সম্রাজ্ঞীর হৃদয়ে বেগমের আসন পাকা-পাকি কায়েম রইল। পরাক্রমপ্রিয় সিকন্দর বেগমের ভাবনা কিছুই আর ছিল না। ১৮৫৯ সালে তাঁর কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও সিংহাসনের দাবি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। এক ফরাসী পর্যটক ভোপালের রাজদরবারে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। তিনি এই অসাধারণ মহিলার চমৎকার এক বর্ণনা দিয়েছেন : "বেগমের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কৃশ মুখে দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জ্বলজ্বল করছে। অপরিসীম প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা সেই আননে। আগে জানা না থাকলে বোঝা কঠিন যে, এই প্রাণশক্তির ও উদ্যমের আধার একটি মহিলা। পোশাক-পরিচ্ছদ যেন আরও বিভ্রম সৃষ্টি করে। পরনে আঁটো

প্যাণ্টালুনে (বোধ হয় চুড়িদার পাজামা), ফুলতোলা, নকশাদার জ্যাকেট, কোমরবন্ধে ছোরা, কে আর দেখে বলতে পারে ইনি একটি মহিলা। হাবে-ভাবে কোনরকমেই নারীজনসুলভ রীতি-ধরন ছিল না। মনে হতো যেন এক পরাক্রান্ত অভিজাত সার্বভৌম রাজা, যাঁর ইচ্ছার সামনে সবাই মাথা নত করে।"

এই পর্যটকই সিকন্দর বেগমের কন্যা বেগম শাজাহানের সংগেও দেখা করেছিলেন। শাজাহান বেগম তখন সদ্য বিধবা। অল্প দিন আগে স্বামী মারা গেছেন। স্বামী তাঁকে কড়া পর্দায় রেখেছিলেন। সিকন্দর বেগম নিজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা সত্ত্বেও শাজাহানের বন্দীজীবনে বিশেষ আপত্তি কখনও করেন নি। মাতৃসুলভ কোমলতা তাঁর ছিল না, বরং সার্বভৌমত্ব সামলাতেই তিনি বেশী ব্যস্ত ছিলেন। নিজের ক্ষমতাকে বজায় রাখার সামনে কোন কিছুই বড় নয়। বেগম শাজাহান স্বামীর অবর্তমানে বিনা পর্দায় দেখা করলেন বিদেশীর সংগে। পর্যটককে আপন দুঃখের কথায় বললেন "কিসমত"—ভাগ্য। তারপর চট করে ফরাসী অতিথির দিকে ফিরে

সুষম খাদ্যে পরিপূর্ণ আহার—
শিশুদের প্রয়োজনীয়
ভিটামিন সহ।
Amul
আমূল
দুগ্ধজাত খাদ্য
আপনার শিশুর প্রয়োজনীয় ৭টি ভিটামিন এতে আছে।

বিলেতের একটি নব নাট্যমঞ্চ

অমিতা ওহদেদার

ভার্লেন

র্যাঁবো

যেন তিনি আশু মৃত্যুপথযাত্রী—একাকী বিদেশে পড়ে আছেন প্রিয়জনের হাত থেকে এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশায়! র‍্যাঁবো এলেন, এবং আবার তাঁদের সহবাস চলতে লাগল। কিন্তু এবার র‍্যাঁবোর মনে জাগল বিতৃষ্ণা। ভার্লেনের ক্লেদাক্ত ভাবালুতায় র‍্যাঁবো হাঁপিয়ে উঠলেন। এবার তাঁদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু হল। র‍্যাঁবো চলে গেলেন। ভার্লেন বেলজিয়ামে এলেন। মাকে লিখলেন তিনি আত্মহত্যা করবেন, এবং সেই সঙ্গে র‍্যাঁবোকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন একটিবার, শুধু একটিবার দেখা দিতে। ব্রাসেলস শহরে দুই বন্ধু আবার একত্র হলেন। র‍্যাঁবো দেখলেন, ভার্লেন এখন মদের নেশা ধরেছেন চড়াভাবে। তার উপর প্রবল সমকামিতা ও তজ্জাত উৎকট আচরণ। র‍্যাঁবো তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি একদিন জানালেন, তিনি তখনি চলে যেতে চান। ভার্লেন এতে চটে গিয়ে রিভলভার চালালেন। তিনবার গুলি ছুটলো। একটা গুলি র‍্যাঁবোর কব্জিতে লাগল। সঙ্গে ছিলেন ভার্লেনের মা। তিনি ও র‍্যাঁবো উভয়ে ভার্লেনের এই সাময়িক উত্তেজনা শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। স্টেশনে যাবার পথেও যখন র‍্যাঁবো ও ভার্লেন [illegible] তিনি তাঁর পিস্তলের দিকে [illegible] ভার্লেন আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবং র‍্যাঁবোকে হত্যা করার ভয় দেখালেন। এবার [illegible] পুলিশ ডাকলেন। পুলিশ [illegible] চাইলে [illegible] কেন এই উত্তেজনা ও বন্ধুকে আঘাত করা ও তাকে হত্যা করবার শাসানি? উত্তর এল, বন্ধু একা চলে যেতে চাইছে, তাই। তার বিরহ অসহ্য। পাছে-বন্ধুর বিচ্ছেদ এত কষ্টকর! [illegible] তাই করলাম। র‍্যাঁবোর স্বীকৃতি সাক্ষ্য হল। ভার্লেন দোষী সাব্যস্ত হলেন। দু বছরের জন্যে কঠোর শাস্তিমূলক জেল হল তাঁর।

র‍্যাঁবো ফিরে গেলেন দেশে। লিখলেন Une saison en Enfer—নরকে এক ঋতু। এ বই পড়লে ভার্লেন-র‍্যাঁবো সম্পর্কিত ব্যাপারটির প্রচ্ছন্ন স্বীকারোক্তি সহজেই ধরা পড়ে। বইটি ছাপিয়ে র‍্যাঁবো দেখতে চাইলেন এটি পাঠকসমাজে কীভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু ব্রাসেলস-ঘটনার পর র‍্যাঁবো ব্যক্তিগত তথা সাহিত্যগতভাবে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়েন। বইটি কোনোই সমাদর পেল না। র‍্যাঁবো বিরক্ত ও হতাশায় তাঁর সব রচনার পাণ্ডুলিপি ও নরকে এক ঋতুর সব কটি ছাপা কপি আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। উনিশ বছর বয়সে র‍্যাঁবো তাঁর সাহিত্যজীবনের ইতি ঘটালেন।

ছন্নছাড়ার মতো র‍্যাঁবো ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জার্মানিতে একা-কালীন স্টুটগার্ট শহরে ফের দেখা হল ভার্লেনের সঙ্গে। ভার্লেন তখন জেল-ফেরত। আপাত বদলেছেন। ঈশ্বর-ভক্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু র‍্যাঁবোর সঙ্গে দেখা হতেই সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভার্লেন হলেন পুনর্মূষিক। পুরোনো অতীতে নিগৃহীত হতে লাগলেন।

র‍্যাঁবো কিন্তু ভার্লেনকে ছেড়ে গেলেন। অশান্ত র‍্যাঁবো নানা দেশ ঘুরে গেলেন আবিসিনিয়ার হারার অঞ্চলে। সেখানেই তাঁর বাকি জীবন কাটে, যদিও শেষ দশায় ফ্রান্সে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ। কিন্তু আমাদের কাছে যে র‍্যাঁবো তাঁর জীবন বলা যেতে পারে উনিশ বছরের মাত্র।

*

র‍্যাঁবো-ভার্লেন সম্পর্কিত কাহিনী বলা হল, হুবহু তাই নিয়েই 'নরকে এক ঋতু' নাটকটি রচিত। তিন অঙ্কের নাটক। নাটকটি রচনা করেছেন প্যাট হুকার (Pat Hooker) নামে এক অস্ট্রেলিয়ান মহিলা। ইনি টেলিভিশনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এই নাটক হল তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার প্রথম ফসল।

নাটক শুরু হয়েছে ভার্লেনের গৃহে র‍্যাঁবোর প্রথম পদার্পণের দৃশ্যে। শেষ হয়েছে কারাগার জীবন যাপনের পর স্টুটগার্টে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ অন্তে। অনুষ্ঠানের পুস্তিকাতে বলা হয়েছে যে, নাটকটি নাকি ফ্রান্স ও লন্ডনে অনুষ্ঠিত ব্যাপক গবেষণার ফল (the result of detailed research in France). কিন্তু একথার তাৎপর্য তেমন [illegible]। প্রকাশিত লরেন্স ও এলিজাবেথ হ্যানসন রচিত ভার্লেনের যে জীবনীগ্রন্থ আছে তাতে র‍্যাঁবো-ভার্লেন বন্ধুত্বের যেটুকু বিবরণ পাই

তা থেকে নতুন কিছুই শ্রীমতী হ্যুকারের নাটকে নেই।

যাই হোক, এবার অভিনয়ের কথা। নাটক শুরু হবার অব্যবহিত আগে প্রেক্ষাগৃহে অন্ধকার হয়ে গেল। মধ্যস্থলে অর্থাৎ যেটা রঙ্গমঞ্চ সেখানে বেশ ক্ষিপ্রতার সংগে এবং প্রায় নিঃশব্দে কাঠের কিউব-গুলি এদিক ওদিক সরানো হচ্ছে বুঝলাম। তারপর সব স্তব্ধ। প্রায় মিনিট খানিক। আলো যখন জ্বলল, দেখলাম সেই কালো কাঠের কিউবগুলির একটাতে হাঁটু মুড়ে গোঁজ হয়ে বসে আছে তরুণ-কিশোর র‍্যাঁবো,

আর তার সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ যৌবন ভার্লেন, বিস্ময়-চকিত নয়নে। আমি একেবারে সামনের সারিতে বসে, অভিনেতারা যখন ঘুরে ফিরে অভিনয় করছিলেন তখন তো প্রায় ওঁদের পা আমার পায়ে ঠেকে আর কি। দর্শক ও অভিনেতার এবম্বিধ সান্নিধ্য বেশ উপভোগ্য বটে।

প্রতি অংকের শেষে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি, এবং পরবর্তী অংক শুরু হবার মুখে দু এক মিনিটের জন্যে অন্ধকারকরণ। সেই অন্ধকারে অভিনেতারা নিঃশব্দে মঞ্চে এসে অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হন।

নাটকটিতে সব চাইতে যা লক্ষ করার বিষয় তা হল এই যে সমস্ত নাটকে আমরা দেখি শুধুমাত্র দুটি চরিত্র। অংক মধ্যবর্তী বিশ্রামকাল বাদ দিলে পুরোপুরি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অভিনয় হয়েছে—দর্শক শুধু ভার্লেন ও র‍্যাঁবোকেই সারাক্ষণ মঞ্চে দেখল। আর কোনো চরিত্র নেই। ভার্লেনের স্ত্রীর কথা ভার্লেনের মুখ থেকেই শোনা গেল। কেবলমাত্র তৃতীয় অংকে পুলিস তথা বিচারকের ভূমিকা নেপথ্য কণ্ঠস্বর মারফত প্রযোজিত হল। শুধু দুটি চরিত্র নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা ও তাকে মঞ্চস্থ করার মধ্যে দুঃসাহসিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে। তবে ট্রাভার্স থিয়েটারের অস্তিত্বই তো এই জন্যে।

১৯৬৩ সালে ট্রাভার্স থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এর পেছনে আছে গ্রেট-ব্রিটেনের কলাসংস্থার স্কটিশ শাখা (Scottish Committee of the Arts Council of Great Britain)। এই থিয়েটার বহু নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছে। স্পষ্টতই এই মঞ্চ আধুনিক নাট্যকলার পরিপোষক। এ থিয়েটারকে বলা যেতে পারে আধুনিক জার্মানীর নাট্যকলায় যাকে বলে 'কনট্রা-ক্রাইজ' (Kontra-Kreise)—যার অর্থ প্রতিবৃত্ত বা বৃত্তবিরোধী। বহুদিন ধরে মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা, দর্শক, অভিনেতা সমন্বয়ে যে বৃত্ত রচিত হয়ে এসেছে, আধুনিক নাট্য-আন্দোলন—যার মধ্যে কনট্রা-ক্রাইজ অন্যতম —তার বিরোধিতা করছে। কারণ এই বৃত্তে অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ব্যাহত হয়। বলা যেতে পারে এই বৃত্ত থিয়েটারকে যতটা রঙ্গালয়ে পরিণত করে ততটা নাট্যালয়ে নয়। এই প্রসঙ্গে স্টানিস্লাভস্কি বলেছেন যে, মঞ্চকলা নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাতে অতীতে তিনি এর সীমায়িত ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং বর্তমানে বুঝেছেন যে এর কোনো সম্ভাবনা আর নেই, সবই নিঃশেষিত। (while my studies of scenery and stage design convinced me in the past of its limitations, I can now say that its possibilities are indeed exhausted.), আসলে দৃশ্যপট, সেটিং, আলোকসম্পাত ইত্যাদি দর্শকের মনকে প্রকৃত নাট্যাভিনয় থেকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রাখে। আদিতে থিয়েটার ছিল একমুখী—তাতে শুধু ছিল নাট্যভাষানির্ভর অভিনয়। ক্রমে তা হল বৈচিত্র্যময়, বহুমুখী। আজকের নবনাট্য-কলা আবার একমুখী হতে চাইছে। কনট্রা-ক্রাইজ এই অভীপ্সার একটা সোচ্চার প্রকাশ। ট্রাভার্স থিয়েটারে যা দেখলাম তাতে কনট্রা-ক্রাইজের কথা বিশেষ করে মনে পড়ল। আর মনে পড়ল—এই থিয়েটারে প্রায় পঞ্চাশজন দর্শকের আসন দেখে—কবি ইয়েটসকে যিনি তাঁর নতুন কাব্যনাটক অভিনয়ের জন্যে চেয়েছিলেন যে-কোনো হলঘর বা ড্রইংরুম যেখানে জন পঞ্চাশ দর্শকের সংকুলান হতে পারে। (I want ... an audience of fifty, a room worthy of it—some great dining-room or drawing room ....).

দক্ষ অভিনেতার জন্যে নাট্যাভিনয় বেশ উপভোগ্য লাগল। তবে নাটকের নিজস্ব পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ আছে। আমার সহদর্শক তো বলেই বসলেন, নাটকের চরিত্র যে দুজন প্রতিভাধর কবি তার কোনো পরিচয় তো এঁদের কথা-বার্তার মধ্যে ফুটে উঠল না। অভিযোগটি সঙ্গত। নাটকে ভার্লেন ও র‍্যাঁবোকে দেখলাম কই? দেখলাম শুধু দুটি মানুষের সমকামী বন্ধুত্বের হলাহল মিশ্রিত আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা। কেবল একটি দৃশ্যে দেখা গেল র‍্যাঁবোকে ভার্লেন শেকসপীয়রের সনেট থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন। এক জায়গায় একটা অপ্রচলিত শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন ভার্লেন। র‍্যাঁবো তার অর্থ যথাযথ বুঝিয়ে দিলেন। র‍্যাঁবোর উন্নততর মেধা ও বিদ্যাবত্তার প্রতি এই ইঙ্গিত।

নবনাট্যমঞ্চ তেমন লোকপ্রিয় হতে পারে না জানি, কিন্তু তাই বলে এই ট্রাভার্স থিয়েটারে জন পঞ্চাশেক দর্শকেরও সমাবেশ ঘটবে না—এমনটি আশা করিনি। বেশ কয়েকটি আসন খালি ছিল। দুটি প্রৌঢ়া —তাঁদের হাবভাব ও কথার উচ্চারণভঙ্গিতে প্রদর্শক ধরে ফেলেছিলেন যে তাঁরা সদ্য মার্কিন মুলুক থেকে ইংলণ্ডে এসেছেন—প্রথম অংক দেখার পর প্রস্থান করলেন। মার্কিনী দর্শক তো বিদেশে এইভাবে সব জিনিস দেখে থাকেন।

নাটক শেষ হতে প্রদর্শক বন্ধুটি এসে বললেন, এডিনবরার সাংস্কৃতিক রুচিকে বলিহারি! হত যদি গ্লাসগো শহর তো দেখতে থিয়েটার হলটা দর্শকে ঠাসা থাকত।

আমার মনে পড়ল প্রদর্শক ইতিপূর্বে আমাকে বলেছিলেন যে তিনি গ্লাসগোর বাসিন্দা।

পরবর্তী জীবনে যিনি তাঁর জীবনের গুরু, সেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন প্রতিমা দেবী তাঁর 'স্মৃতি-চিত্র' গ্রন্থে। তখন বাড়িতে এক বিবাহোৎসব চলছে এমন সময় : বড়দের মুখে শোনা গেল, 'আজ রবিকাকার গান হবে।' বাড়ির মেয়েরা ও প্রতিবেশিনীরা এক দিকে জালের পর্দার আড়ালে এসে উঁকি মারছে সকৌতুকে। সকলেই গান শোনবার জন্য উৎসুক। আসর যখন ক্রমে ক্রমে ভরে উঠেছে দেখা গেল একজন দীর্ঘকায় বিশিষ্ট চেহারার ব্যক্তি কালো ফিতের ঝোলানো চশমা পরে সভায় এসে বসলেন। তাঁর বিশিষ্টতা সভার আবহাওয়ার মধ্যে যেন একটা সম্ভ্রম জাগিয়ে তুললো। সকলের অনুরোধে তিনি যে গান শুরু করলেন সেটি যত দূর মনে পড়ে 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন'। গানের সুরের ধারা শ্রোতাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করল। স্তব্ধতায় তাদের চিত্ত হল নম্র। এমনি করেই সেদিনের বিবাহের উদ্দাম উৎসব-স্রোতে কেমন এক অনির্বচনীয়ের স্পর্শ লেগেছে অকস্মাৎ। সেদিন তো চলে গেছে কিন্তু সেই সন্ধ্যার উজ্জ্বল স্মৃতি এখনো নিবে যায়নি : সেই রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হলেন প্রতিমা দেবী।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর বিবাহ সামাজিক দিক থেকে ঠাকুরবাড়ি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা। বিধবাবিবাহ এই পরিবারে এই প্রথম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কারের বাঁধন ছিন্ন করে উদার হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। আমেরিকা-প্রবাসী জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে লিখলেন : বিবাহটি বিধবাবিবাহ হয়েছে তা-ও বোধহয় শুনেছ। তা নিয়ে একটা ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা হয়েছিল। কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ না করাতে সেটা কেটে গেল :

যাই হোক ১৩১৬ সালের ১৪ মাঘ (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ) বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় জোড়াসাঁকো-বাড়িতেই। জীবনের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য উৎসবের বর্ণনা করেছেন প্রতিমা দেবী মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে আশ্রমিক সংঘের অর্ঘ্যদান অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্রতিভাষণে : বিয়ে ঠিক করেছিলেন মামারাই, আর বিয়ে হলও আমার মামাবাড়ি থেকে। এখন আর সে বাড়ি নেই। বিয়ের দিন ৫ নম্বর বাড়ি থেকে ৬ নম্বর বাড়ির সিঁড়ির উপর পর্যন্ত লাল বনাত পেতে রাস্তা করা হয়েছিল। সেই বনাতের উপর দিয়ে বর এলেন বিয়ে করতে। আমি বিয়ের দিন শ্বশুরবাড়ি এলাম মামার ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ি চড়ে। সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই ব্রুহাম গাড়ি। ৬ নম্বর বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। মেজো জ্যাঠাইমা জ্ঞানদানন্দিনী-দেবী আমার মুখে মধু দিয়ে এবং আমার শাশুড়ীর হাতের লোহা পরিয়ে বরণ করে ঘরে তুললেন। দালানে যেখানে মাঘোৎসব হয়, সেখানে আমাদের বসিয়ে বাবামশাই আশীর্বাদ করলেন : নতুন বউয়ের জ্ঞাতব্য কিছু উপদেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীর হাতে তুলে দিলেন এক গুচ্ছ চাবি —বললেন : বউমা, তোমার উপর বাড়ির সব কিছুর ভার দিলুম। এ গোছাতে এ-বাড়ি ও-বাড়ির সব চাবিই আছে। এখন থেকে তুমিই এ-সব দেখাশোনা করবে। প্রতিমা দেবী বলেছেন : আমি চাবি নিলাম বটে কিন্তু আতঙ্ক হল মনে, এ দায়িত্ব বড়ো কঠিন, পারবো তো রক্ষা করতে? ছোটো ননদ মীরা দেবী আমায় অভয় দিলেন —'বউঠান, ভয় পেয়ো না, আমরা তো আছি।'—সেই যে হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সে চাবির গোছা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি।

এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিমা দেবীর নতুন জীবনের সূচনা হল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তার কিছুকাল আগে থেকে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে— স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, মেজ মেয়ে রেণুকা ও ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথকে হারিয়ে তাঁর সংসার-জীবনে এক শূন্যতা ও নৈরাশ্য নেমে এসেছিল। তাই সে সময়ে প্রতিমা দেবীর মতো স্নেহ-কল্যাণী নারীর আগমন প্রত্যাশিত ছিল কবির সংসারে, যিনি আবার সেই ভাঙা সংসারকে পূর্ণতায় ভরে তুলবেন। রবীন্দ্রনাথের মনেও সেইরকম একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল : তোমাদের সংসারটিকে সুধাপাত্রের মত করে মৃত্যুর পূর্বে আমি একবার গৃহস্থধর্মের অমৃতরস পান করে যাই এই আমার মনে লোভ এক একবার মনকে চেপে ধরে। অবশ্য আকাঙ্ক্ষা জাগলেও রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত মনে পুত্র-পুত্রবধূর কল্যাণকামনা করে গিয়েছিলেন : তোমাদের সংসারকে তোমরা নিজের জীবন দিয়ে এবং পূজা দিয়ে গড়ে তুলবে—আমি সন্ধ্যার আলোকে নিজের নির্জন বাতায়নে বসে তোমাদের আশীর্বাদ করব।

বিবাহ-অনুষ্ঠানের সপ্তাহ দুয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ পুত্র-পুত্রবধূকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। এখানে আসার আগে বিবাহের ঠিক দু'দিন পরে ১৬ মাঘ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা' উৎসর্গ করলেন নবীবিবাহিত পুত্রকে। প্রতিমা দেবীর ভাষায় : বিয়ের পরে তখনই সবে 'গোরা' বই লেখা শেষ হয়েছে— আমাদের হাতে দিয়ে বললেন—'আমি আর তোমাদের কি দেব, এইটি দিলুম।' 'গোরা' তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন—ওঁকে গোরার মতো করে মানুষ করার ইচ্ছে ছিল। শান্তি-নিকেতনে নববধূর আগমন উপলক্ষে উৎসবের সমারোহ পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ পুত্র-পুত্রবধূর জন্যে নতুন খড়ের চালার বাড়ি 'বেণুকুঞ্জ' তৈরি করে রেখেছিলেন— সেখানেই প্রতিমা দেবীর বিবাহিত জীবনের সূচনা। খেলাধুলো-গান-নাটকাভিনয় ছিল উৎসবের সূচিতে—রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়ে-দের নানাবিধ উপহারও দিলেন। আশ্রম-বাসীর কাছে প্রতিমা দেবী হয়ে উঠলেন বউঠান। তাঁর সম্মানার্থ আশ্রমের মহিলারা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করলেন। শান্তি-নিকেতন-বাড়ির দোতলায় অনুষ্ঠিত এই অভিনয়ে পুরুষদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের নাটক সেই প্রথম অভিনীত হল—এবং বউঠান প্রতিমা দেবী তাতে যোগ দিলেন 'ক্ষীরো'র ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিমা দেবীর পাঠচর্চা শুরু হল—ইংরেজী পড়েন তাঁর কাছে। কবির নির্দেশে অজিতকুমার চক্রবর্তীও বউঠানকে পড়াবার দায়িত্ব নিলেন। স্বামী রথীন্দ্রনাথও স্ত্রীকে পড়ে শোনাতেন পিতৃদেবের কবিতা ও ইংরেজী গল্প।

রথীন্দ্রনাথ তখনো শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন নি। শিলাইদহে জমিদারির কাজে ও চাষবাসের গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কাটছিল। তাই প্রতিমা দেবী স্বামী সহ গেলেন

বন্ধু নিরাশ হলে চলবে না। প্রতিমা দেবীই সে কথা বলেছেন বছর দুয়েক আগে শ্যামলীর প্রাঙ্গণে আয়োজিত পাঠভবনের সাহিত্যসভায়। বহুকাল পর সেবার পাঠভবনের ছেলেমেয়েরা 'শ্যামলী'র সামনে সাহিত্যসভার আয়োজন করেছিল—মোমবাতি দিয়ে সাজিয়েছিল 'শ্যামলী' বাড়িটিকে—তার আলোয় আলোকিত 'শ্যামলী' প্রাঙ্গণ। কোনার্কের বারান্দায় বসে বউঠান ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান দেখলেন—গান কবিতা আবৃত্তি গল্পপাঠ শুনলেন। সভার শেষে তাঁকে অনুরোধ করা হল ছেলেমেয়েদের কাছে কিছু বলে আশীর্বাদ করার জন্য। প্রতিমা দেবী তার উত্তরে বললেন—তোমরা আজ যে প্রদীপ জ্বালিয়েছ তাতে আমার মন ভরে উঠেছে। যে উত্তরায়ণ একদা প্রাণের আলোড়ন পূর্ণ ছিল তা এখন নীরব—নির্জন। আমারও দিন শেষ হয়ে আসছে। এখন ভার নিতে হবে তোমাদের—আশ্রমের ছেলেমেয়েদের। আশা করি তোমাদের প্রাণচাঞ্চল্যে উত্তরায়ণ আবার মুখরিত হবে—প্রদীপ জ্বালিয়ে উত্তরায়ণকে তোমরাই আবার আলোকিত করবে—এই আমার প্রার্থনা ও আশীর্বাদ।

ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ প্রসঙ্গে

'দেশ' বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশিত 'ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের সঙ্গে দশ বৎসর' প্রবন্ধে লেখক খাঁ সাহেব সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। ইদানীংকালে খাঁ সাহেব সম্বন্ধে এত সুন্দর আলোচনা আর কোথাও প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। বিগত যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেতারবাদক ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেব অধুনা বিস্মৃতপ্রায়। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন আজও জীবিত আছেন, তাঁহারা যদি মাঝে মাঝে এমন স্মৃতি চারণ করেন তবে আমাদের এই বিরাট প্রতিভা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধে একটি ত্রুটির দিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার বলিয়া মনে করিতেছি। খাঁ সাহেবের শিষ্যদের নামের তালিকায় তিনি 'জ্ঞানদাকান্ত রায়চৌধুরী' এবং 'নীরদাকান্ত রায়চৌধুরী' এই দুই ভ্রাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা কেহই 'রায়চৌধুরী' ছিলেন না। কালীপুরের জমিদার বংশীয়গণ লাহিড়ীচৌধুরী নামে খ্যাত। হয়ত গৌরীপুরের এবং রামগোপালপুর এই দুই রায়চৌধুরী জমিদার পরিবারের কথা স্মরণ করিয়াই শ্রদ্ধেয় জিতেনবাবু ইঁহাদের রায়চৌধুরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই দুই একদা বহু আলোচিত এবং অধুনা বিস্মৃত গুণী, শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী উত্তর ভারতীয় সংগীত জগতের একটি বিস্ময়কর প্রতিভা। সংগীতের ঔপপত্তিক (Theory) বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য তৎকালীন বঙ্গদেশে সর্বজনস্বীকৃত ছিল এবং তিনি 'বঙ্গীয় ভাতখণ্ডে' এই নামে সংগীত জগতে পরিচিত ছিলেন। স্বরলিপি রচনায় তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভা ছিল। কোন সংগীত একবার শ্রবণ করিয়াই তিনি ইহার অবিকল

স্বরলিপি রচনা করিতে পারিতেন এবং এইভাবে তিনি বহু বিখ্যাত ঘরানার শ্রেষ্ঠ রাগরাগিণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার কিছু মৌলিক গবেষণাও আছে বা ছিল। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের আনুকূল্যে গৌরীপুরে যে সংগীত কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তিনি ছিলেন তাহার প্রধান প্রাণকেন্দ্র। দুঃখের বিষয় তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর তাঁহার অনুবর্তীগণ কোথাও বঙ্গীয় সংগীত জগতে তাঁহার দানের কথা স্বীকার করেন নাই অথচ তৎকালীন বঙ্গদেশের (এবং তন্মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত) বহু খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীরদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। খাঁ সাহেবের বাজ পদ্ধতি তিনি অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিতেন। তৎকালীন অখিল ভারতীয় সংগীত সম্মেলনে (এলাহাবাদ) এবং নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলনে (কলিকাতা) তাঁহার সেতার বাদন বিশেষভাবে উচ্চ প্রশংসিত হয় এবং তিনি ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের শ্রেষ্ঠতম শিষ্য ও এনায়েতী বাজ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ ধারক বলিয়া সংগীতজ্ঞ মহলে স্বীকৃত হন। দুর্ভাগ্যবশত ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের দুর্ভাগ্য যে, একদা যে সেতার বাজ পদ্ধতি ভারতীয় সংগীত-জগতে আলোড়ন তুলিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর উপযুক্ত শিষ্য অভাবে সেই অদ্বিতীয় বাজ পদ্ধতি অধুনা লুপ্তপ্রায়। সেই অপূর্ব মীড়ের কাজ, মসিদখানি বাজের সঙ্গে বিদ্যুৎসম সপাটতানের সংযোজনা, নানা ছন্দের তেহাই এবং সর্বোপরি সেই অপূর্ব হৃদয়স্পর্শী বাজ পদ্ধতি আর কোথাও শুনিতে পাই বলিয়া মনে হয় না।

একজন বিশিষ্ট সংগীত রসিকের মুখে শুনিয়াছি, নীরদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর অকালমৃত্যু না হইলে হয়ত খাঁ সাহেবের অপূর্ব বাজ পদ্ধতির ধারা আজও উত্তর ভারতীয় যন্ত্র-সংগীতের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিত।

শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় হয়ত এই দুই গুণী ভ্রাতৃদ্বয়ের সংগীত প্রতিভা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিতে পারেন।

জিতেনবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি খাঁ সাহেবের স্মৃতি প্রসংগে এই দুই প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই খাঁ সাহেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং শোনা যায় খাঁ সাহেব ইঁহাদের তাঁহার যাবতীয় সংগীত সংগ্রহ দান করিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীনীলাংশুকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
কলিকাতা-৩৫।

নকল সাহিত্য

গত ২৭শে পৌষ দেশ পত্রিকায় সনাতন পাঠক নকল সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র এবং দ্বিতীয় তারাশংকরের আবির্ভাবে এক সময় পাঠকদের যথেষ্ট জব্দ হতে হয়েছে এবং আসল লেখকের যৎপরোনাস্তি নাজেহাল হয়েছেন। সেই সময়েও দ্বিতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বক্তব্য ছিল, 'ঐ নামে অন্য একজন লেখক আছে বলেই আমাকে আমার পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করতে হবে, এমন কি কথা আছে?'

সম্প্রতি দ্বিতীয় বিমল মিত্র বাজারে প্রবেশ করেছেন, পত্রিকান্তরে তাঁর প্রকাশকদের বক্তব্যও এই একই রকম দেখলাম।

সমস্যা শুধু একই নাম নিয়েই নয়, একই রকম নাম নিয়েও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, একজন বিখ্যাত লেখক, অপরজনের সাহিত্যিক পরিচিতি অস্পষ্ট। রাইটার্স বিল্ডিংস ক্লাব-লাইব্রেরি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই কিনতে গিয়েছিলেন, বাজার থেকে এসে পৌঁছালো সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বই। কিছুদিন আগে ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী আমাকে বললেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ কবিতার বইটি ওঁকে খুব নিরাশ করেছে। অথচ এক বছর আগে উনি এই বইটিরই প্রশংসা করেছিলেন, এবং এর মধ্যে সুনীলের আর কোনও বইও বেরোয়নি। সুতরাং আমার সন্দেহ হলো, আমি জানতে চাইলাম কোন্ বইটির কথা তিনি বলছেন। তিনি যে বইটির নাম করলেন, যে বইটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই জেনেই তিনি কিনেছেন এবং দোকানদারও তাই বলে বেচেছে, সেটি, দুঃখের বিষয়, আসলে অন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা নয়।

আমার জানাশোনা লোকেরা খুব বেশী বই কেনে না, তবু এই একটিমাত্র বইয়ের

কিছু মনে করেননি তো? করেছি॥

রঞ্জন

আমার মমত্ববোধ, সহানুভূতি বা অনুকম্পার কোথায় যেন একটা সীমারেখা টানা আছে। স্বীকার করা ভালো, সবারে আমি ভালোবাসতে পারিনে। অতুলপ্রসাদ পারতেন, তাও বিশ্বাস করিনে। এমন কি ভালোবাসার ভান করতেও আমি অক্ষম। ঠোঁট আমার অনুশাসন মেনে সাধারণত হাসির ভঙ্গিতে বেঁকতে জানে না; অপর পক্ষের কাছে অগোচর থাকে না আমার অন্তর্নিহিত অনুৎসাহ। অবন্ধুর সংখ্যা তাই অগণ্য এবং তাই নিয়ে আমার অভিযোগের অধিকারও সামান্য, যদিও আন্তরিক উষ্ণতাও সর্বত্র প্রত্যাশিত প্রত্যুত্তর পায়নি। বৃথা ক্রন্দন।

সন্দেহ করি, আমার স্বকীয় চিন্তাধারায় কোথায় মানচিত্রের স্থান আছে। স্বাধীনতা নামের অর্থহীন নিগ্রহ আমার মনের অন্তর্গত। তথাকথিত গণতন্ত্রের সংরক্ষণে মার্কিনী প্রয়াস তথা ষড়যন্ত্র আমার কাছে একান্তই রুচিহীন, অশ্লীল। এর বড়ো কী প্রমাণ আছে? একটা কারণ হয়তো কলকাতা আর সায়গনের দূরত্ব। পাড়াপড়শি নয়, কিন্তু অনুরূপ উৎপাতের অনতিক্রম্য আমার কাছে কাশ্মীর প্রসঙ্গ। একটিও কোনো কারণ খুঁজে পাইনে কাশ্মীর কেন পাকিস্তানের সাথে বা অন্যভাবে স্বাধীনতা পাবে। তবু এ নিয়ে আমি বিতণ্ডা করতে নারাজ যে কাশ্মীরীদের রিঅিংহ বলেন স্বয়ম্ভ্বাধীনতা নিয়ে তা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পাক-স্বাধীনতার রূপ-পরিগ্রহ করলো আর তাই হলো ইন্ডিয়া তথা ভারতের ইতি। ভারতে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা; কিছুমাত্র কারণ নেই কেন কাশ্মীর অন্যত্র যাবে। বিচ্ছিন্ন কাশ্মীর প্রসঙ্গে তবু আমি নয়াদিল্লির দফতরী দম্ভের সোচ্চার শরিক হতে অপারগ। আমারও রাজনৈতিক স্বল্পাসক্তির কারণ হতে পারে ভৌগোলিক দূরত্ব।

আমি একা অপরাধী নই। নয়াদিল্লি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হিন্দু আর শিখদের জন্য যে উদারহস্ত অর্থ বণ্টন করেছেন তার ভগ্নাংশও বর্ষিত হয়নি পূর্ব পাকিস্তান থেকে উৎপাটিত হতভাগ্য হিন্দুদের জন্য। প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের জন্য আমায় বোলো না কাঁদিতে বোলো না। শারীর দূরত্ব হয়তো পুনশ্চ প্রাসঙ্গিক। নৈকট্যের স্বভাবজ আকর্ষণ অমান্য করে আমি অভুক্ত ভাগিনেয়কে অগ্রাহ্য করে দূরাগত অতিথির আপ্যায়ন করতেও পারিনে। গোটা বিশ্বকে প্রেম করবার মতো হার্দ্য প্রাচুর্য আমার মধ্যে নেই। আমার উপায় নেই আমার অনুদারতা অসংকোচে নিবেদন না করে। ক্ষমা চাইব পরে। যদি আদৌ চাই।

এখন বলি : আমার বিনীত উষ্মাবোধের মৌল প্ররোচনা এসেছে লণ্ডনের সম্প্রতিক কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীর সম্মেলনে রোডেশিয়া সংক্রান্ত সমালোচনা থেকে। এমন বৃহৎ অর্থে পরিহাসের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল যদিও হ্যারল্ড উইলসন আর ইন্দিরা গান্ধীর আত্মাভিনন্দনের অন্ত নেই যে লণ্ডন সম্মেলনে ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইন্দিরাজী তাঁর বাবার লেখা চিঠিগুলি আরেকবার উল্টে দেখলে জানবেন, ইতিহাস কী রকম বিস্মৃতিপরায়ণ। অবন্তরতার স্থান নেই ইতিহাসের পাদটীকারও, লণ্ডন মজলিস তো তারও অধম যেখানে পৌরোহিত্য করেছেন এক হৃতসাম্রাজ্য প্রধানমন্ত্রী আর গৌণ স্বীভূমিকায় অবতীর্ণা ছিলেন এমন এক সুলতানা যাঁর রাজ্যের সহস্র সহস্র বর্গমাইল নাকি বিবিধ বিদেশী শক্তির পদানত।

পারস্পরিক অসহায়তার মহাসম্মেলনের এই বাৎসরিক পুনরাবৃত্তি ক্রমশই অসহনীয় হয়ে উঠছে, কেননা কমনওয়েলথের শ্বেতাঙ্গ সদস্যরা বর্জন করেননি তাঁদের প্রাক্তন মর্যাদাবোধ আর অশ্বেত, প্রায় অনাহূত, সদস্যরা আজো অর্জন করতে পারেননি কোনো সম্মানিত ভূমিকা। দ্বিতীয় পক্ষ থেকে ক্রন্দন, অভিযোগ আর আর্জির অন্ত নেই। লণ্ডন সহজবোধ্য কারণেই বিলাপধ্বনিকে উপেক্ষা করে না ইতিহাসসচেতনতার স্মরণে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রয়াণ সম্বন্ধে উদাসীন। সে রাজী নয় পূর্ব পুরুষদের কথাকথিত দুষ্কৃতির জন্য নিরন্তর তিরস্কৃত হতে। বিশেষ করে পুরস্কার যখন হস্তচ্যুত হয়েছে।

রোডেশিয়ার প্রশ্নে যে বিংশোত্তর সদস্য প্রতিনিধি ব্রিটেনকে দোষী সাব্যস্ত করে স্ব স্ব দেশে সগর্বে প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের ইন্দিরা গান্ধী। তাঁদের অভিযোগ নিশ্চয়ই অমূলক ছিল না। কয়েক হাজার শ্বেতকায় বহু লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পদদলন করবে, এ কেমন কথা এই আলোকিত বিংশ শতাব্দীতে? অন্যায় অনস্বীকার্য এবং বলতে দ্বিধা নেই যে হ্যারল্ড উইলসন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে অক্ষমনীয় দুর্বলতা বা অক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন গত তিন বছর ধরে। ভদ্রলোকের আন্তরিকতাতেও সন্দেহ করবার একাধিক সংগত কারণ আছে। উইলসনের সমাধান তাঁর নিজের ভাবনা, আমার নয়। তবু রোডেশিয়া সম্বন্ধে তাঁর নিন্দুকদের সাথে কণ্ঠ যোগ করতে আমার উৎসাহ অনতিসীম এবং তাই থেকেই এমন বিশ্বাসে ইন্ধন জোগায় না যে রোডেশিয়ার কৃষ্ণ আফ্রিকানদের সম্বন্ধে আমার ভ্রাতৃত্ববোধ নিরতিশয়।

ব্রিটেনের সমালোচকদের একজনও বলেন নি, রোডেশিয়ায় শ্বেত নির্যাতনের প্রশ্নকালে তাঁরা নিজেরা কী পরিমাণ ঘৃত পরিবেশন করবেন। দাবি শুধু এই ছিল যে, ব্রিটেনকে অস্ত্রধারণ করতে হবে ইয়ান স্মিথের বেয়াড়া বিদ্রোহের বিরুদ্ধে। এমনকি জাম্বিয়ার কেনেথ কাউণ্ডা বলেছেন যে, তিনি ব্রিটিশ বিমান বা সেনা বাহিনীকে ঘাঁটি দিতে প্রস্তুত। তার বেশি নয়, কেননা জাম্বিয়ার সঙ্গে রোডেশিয়ার বাণিজ্য প্রায় অব্যাহত, যদিও অস্বীকৃত। অন্যান্যের একমাত্র অবদান ছিল কুম্ভীরাশ্রুমিশ্রিত বাক্যাড়ম্বর। বিস্মিত হবার কারণ নেই যে, রোডেশিয়া মর্মাহত হয়নি, সলসবেরি নির্বিকার।

আমার আপত্তি এই দুর্বলের আতিকুণ্ঠ আস্ফালনে। আমার আপত্তি এই রব-সর্বস্ব হাস্যকর ওলিম্পিকে ভারতবর্ষের শ্রদ্ধাবনত বার্ষিক প্রণিপাতান্তে লণ্ডনের শিরে কপট অভিশাপবর্ষণ। রোডেশিয়া সম্বন্ধে ব্রিটিশ শ্রমিক সরকারের স্বেচ্ছালব্ধ নপুংসকতা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়, কিন্তু নয়াদিল্লির নিন্দাধিকার সীমিত, যেমন সীমিত আরও বহুর নিন্দাধিকার। হ্যাঁ, নিন্দা করবার অধিকারও অর্জন করতে হয়। দলিতও অনুকম্পা পেতে পারে; সম্মান তাকে অর্জন করতে হয়। আলজিরিয়া এই সম্মান অর্জন করেছিল রক্তের বিনিময়ে। বর্তমানে ভিয়েৎনামের সংগ্রামীদের প্রণাম না করে উপায় নেই কেননা তারা ক্ষুদ্র হয়েও সর্বস্ব পণ করেছে বিশ্ব ইতিহাসের বৃহত্তম শক্তির বিরুদ্ধে। এই প্রতিরোধের ক্ষীণতম স্ফুলিঙ্গ প্রত্যক্ষ নয় রোডেশিয়ায়। আশা, হ্যারল্ড উইলসন শ্মশ্রু পরিধান করে সান্টা ক্লস হয়ে মোজার মধ্যে স্বাধীনতা এনে শয্যাপার্শ্বে রেখে যাবেন।

সন্দেহ করি, আমাদের অনেকের মনন চরিত্র কলুষ হয়েছে বিগত দুই দশকের অপ্রত্যাশিত য়ুরোপীয় সদাশয়তায়। স্বাধিকারের করুণ প্রার্থনা একদা আসন ছেড়ে দিয়েছিল স্বাধীনতার বলিষ্ঠ দাবির জন্য। আজ যেন সেই পরিবর্তন প্রার্থনা রূপ পরিগ্রহ করেছে অভিযোগসর্বস্ব আহত অভিমানের। আমার কাজ কেন আমার হয়ে ব্রিটেন বা রাষ্ট্রসংঘ বা আর কেউ করে দেবে না? রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গদের দুর্ভাগ্য আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন, পাকিস্তানের প্রতি ভারতের নীতি নরম হইতেছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কয়েকটা বছর তামানানা করে সেই নীতি ফরাক্কা আর হলদিয়ার জলে ভিজিয়ে রাখতে পারলে আরো নরম হবে, চাই কি কল্ উদ্গমও হতে পারে।"

একটি নির্বাচনী সভায় শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় বলিয়াছেন যুক্ত ফ্রন্টের সময় জনগণ প্রকৃত স্বাধীনতার

স্বাদ পেয়েছিলেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তা বটে, একটু নতুন টেস্ট হয়েছিলো, এই আর কি বা!!"

নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে মন্ত্রীরা নিজ নিজ ঘরে বসিয়া কাজ শুরু করিয়া দিতে পারেন তার জন্য খান কুড়ি ঘর নাকি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।—"কিন্তু ভুল হল। কে মন্ত্রী হবেন কেউ জানে না। তা ছাড়া মন্ত্রী হওয়ার আগেন রুচির সঙ্গে মন্ত্রী হওয়ার পরের রুচির কোন সম্পর্কই নেই"—বলে শ্যামলাল।

বৃটেনে চাকুরে মেয়েদের শতকরা ১৮ জনেরও বেশী উপরওয়ালা হিসেবে পুরুষ পছন্দ করেন।—"কেন করেন তা জানি, কিন্তু বলতে পারবো না।"

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী বলিয়াছেন, যুক্তফ্রন্ট দুই ঘোড়ার সওয়ার। বিশু খুড়ো বলিলেন—"দুই ঘোড়ার সওয়ারের খেলাটাও কম ভালো। শ্রীমতী কৃপালনী নিশ্চয়ই সার্কাস দেখেছেন।"

একটি সংবাদে শুনিলাম বিদেশে ভারতীয় শাড়ির চাহিদা বাড়িতেছে শাড়ি পরিহিতাদের চাহিদা বাড়লে অনেক কন্যাদায়গ্রস্তরা বেঁচে যেতেন—"কিন্তু তা কি আর হবার গা!"

আজকালকার ছেলেরা কেমন মেয়ে চায়?"—একটি সংবাদ শিরো-

নাম। "কিন্তু কে কেমন পেলে, দেবা ন জানন্তি!"

মুখ্যসচিব শ্রীমৃগেন্দ্র মৌলী বলেছেন যারা সব সময়ই ভি-আই-পি'র মর্যাদা পাবেন তাঁরা হলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযশবন্ত রাও চ্যবন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন, কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছেন। কিন্তু দুই নম্বর ভি-আই-পি, অর্থাৎ "ভেরি ইনসিগনিফিক্যান্ট পার্সন" যারা সব সময়ই পার হয়ে আলোর জলে জলে করেন তাঁরা এই তালিকা দেখে খুশী হবেন না!"

সংবাদে শুনিলাম মাদ্রাজের নাম পাল্টাইয়া তামিলনাড়ু রাখা হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন, "নামে কিছু

আসে যায় না, আমরা ভাবছি ইড্‌লি, দোসা উঠে না গেলেই হলো।"

গঙ্গাসাগর সম্পর্কে বাল্মীকী, শংকরাচার্য, ডি এল রায় প্রমুখ সবারই গংগাপ্রশস্তি প্রকাশ করা হয়েছে।—কিন্তু আমরা অগণিত গংগা ভক্তরা দিনের পর দিন বিশেষ করে বর্ষায় গংগার ইলিশ প্রদায়িনী রূপের যে প্রার্থনা করেছি তার কোন রেকর্ড রইলো না এই যা আমাদের দুঃখ।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

এ রকম আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনলে প্রথমটায় কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। মাত্র আগের সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় তাঁর চেক কবিতার অপূর্ব অনুবাদ পড়েছি আমরা, কয়েকদিন আগেও কলেজ স্ট্রীটে তাঁকে দূরে থেকে দেখেছি, হঠাৎ মৃত্যু এসে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেল। ১৪ই জানুয়ারি সন্ধেবেলা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মোহনলালের জন্ম হয়েছিল ১৯০৯ সালে। খুব ছেলেবেলা থেকে তিনি লিখতে শুরু করেন, দশ বছর বয়েসেই গল্প লিখে খাতা ভরিয়েছেন—তারপর সমগ্র জীবনে নানা রকম রচনা লিখলেও ছোটদের মতন হয়ে গিয়ে ছোটদের জন্য অপূর্ব লেখা কখনো থামান নি।

বাংলা দেশের বহু পাঠকের বাল্যকাল থেকেই তিনি বন্ধু। আমরা ছেলেবেলাতে রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'-এর সারানুবাদ যে কতবার পড়েছি তার ঠিক নেই। পড়তে পড়তে একবারও

বিদেশী বই মনে হয় না, আর কোনো অনুবাদ গ্রন্থ আমাদের এমনভাবে আকর্ষণ করেনি। বাল্যকালে মোহনলাল অনূদিত ঐ বইটি যাঁরা পড়েননি—তাঁদের বাল্যকাল অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আর একটি বই, 'লাফাযাত্রী'—আমাদের কল্পনাকে বহু দূর প্রসারিত করেছিল—ইওরোপে হিচ হাইকিং-এর কাহিনী। ঐ বিষয়েই তাঁর আর একটি বই, 'চরণিক'। 'পুনর্দর্শনায় চ' পরিণত বয়েসের সুন্দর ভ্রমণ কাহিনী।

মোহনলালের প্রথম প্রকাশিত বই 'সোনার ঝরনা'—শিশুদের জন্য গল্প। পরবর্তীকালে লেখা 'বোর্ডিং ইস্কুল' এবং 'বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার' আমাদের কিশোর সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেছে। মোহনলাল বড়দের জন্য গল্প উপন্যাস লেখেননি—অনায়াসেই যে লিখতে পারতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'অসমাপ্ত চতুষ্কোণ' ও 'দক্ষিণের বারান্দা' পড়লেই। সামান্য দু'চারটি লাইনেই কোনো মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার বিরল ক্ষমতা ছিল তাঁর।

মোহনলালের শ্রেষ্ঠ বই 'দক্ষিণের বারান্দা'—দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত তাঁর অধিকাংশ রচনাই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে—জীবিতকালে তাঁর শেষ লেখাও দেশ পত্রিকায় পড়েছি। দক্ষিণের বারান্দা বইটির আশ্চর্য সংবেদনশীল ভাষা ও ভারত-সংস্কৃতির একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি বাংলা সাহিত্যে নিশ্চিত চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনো করে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ যান। ফিরে এসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন অগ্রগণ্য পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন। বিদেশে থাকার সময়ই মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও পরিণয়। মিলাডা দেবী একজন চেক মহিলা, তিনি বাংলাদেশের পাঁচালী ও মেয়েদের ব্রতকথা চেক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ওঁদের এক পুত্র ও এক কন্যা।

প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন

গত শনি ও রবিবার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল—সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশোককুমার সরকার, সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু ও প্রথম

পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, সভাপতি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

দিনের ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা প্রবন্ধ যে এখন যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, সে সম্পর্কে কারুরই কোনো দ্বিমত নেই—সুতরাং এই ধরনের একটি সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে নানা আলোচনার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। বক্তারাও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের বর্তমান অভাব এবং তার আশু প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক নিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন। সভাপতি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কঠিন গদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করার দায়িত্ব অস্বীকার করলে কেবল কবিতা ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের স্রোতে জীবন সম্পূর্ণ হবে না। সৃজন সাহিত্যের মূল্যবোধ প্রচার করাও যে একটা কর্তব্য এ সত্য আমরা ভুলতে বসেছি। অশোককুমার সরকার ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধের অভাবের কথা বলেন এবং সহজ সরল ভাষায় প্রবন্ধ রচনার দিকেও জোর দিতে অনুরোধ করেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকার দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, চিন্তার পক্ষে পুষ্টিকর প্রবন্ধের অভাবে বাংলা সাহিত্যের ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে না।

টেনেসী উইলিয়ামসের উপন্যাস

প্রখ্যাত নাট্যকার টেনেসী উইলিয়ামস গত ১০ই জানুয়ারি ফ্লোরিডাতে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার মহত্ত্ব ফিরে পেতে চাই। 'এ স্ট্রিটকার নেমড ডিজায়ার', 'ক্যাট অন দা হট টিন রুফ', 'গ্লাস মিনেজারি', 'রোমান স্প্রিং অব মিসেস স্টোন' প্রভৃতি নাটক-উপন্যাসে টেনেসী উইলিয়ামস 'চার অক্ষরের' কথা খুব ছড়িয়েছেন একেবারে, তাঁর অধিকাংশ সার্থক রচনাই মানসিক বিকৃতি এবং যৌন মিলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাতে তাঁর কখনো কুণ্ঠা ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বহু নেশা ও মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পরীক্ষা করেছেন, দুবার পুলিৎজার প্রাইজ পেয়েছেন ও নোবেল প্রাইজের জন্যও তাঁর নাম দুএকবার উত্থাপিত হয়েছিল—তিনি এবার এসব উচ্ছৃঙ্খলতা ছেড়ে ধর্মের শরণ নিলেন। অচিরেই তিনি রোমে গিয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করবেন।

সনাতন পাঠক

স্মৃতিচারণ

আর কোনোখানে। লীলা মজুমদার। মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

'আর কোনোখানে' সুখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদারের সাম্প্রতিককালের এক বিশিষ্ট রচনা। রচনাটি আত্মজীবনীমূলক। লেখিকার দূর শৈশবের রঙে রসে ভরা জীবন থেকে পরিণত বয়সের নানা স্মৃতিকথা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। শুধু ব্যক্তি জীবনের স্মৃতিচারণ হিসেবেই নয়, রচনাটির একটি জাতীয় মূল্যও রয়েছে। বিখ্যাত ও বহু-শাখায়িত পরিবারে লেখিকার জন্ম। যে পরিবারের সঙ্গে আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড়। উপরন্তু রচয়িত্রীর ব্যাপক ও অভিজ্ঞতা-বহুল জীবনের সঙ্গে বাংলাদেশের বহু মনীষীর যোগাযোগ ঘটেছে। এই যোগাযোগ যেমন নিবিড় তেমন হৃদ্য। ফলে গ্রন্থখানির উত্থাপন পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। লেখিকা তাঁর ব্যক্তি জীবনের এমন সব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলোর সাংস্কৃতিক মূল্যও কম নয়। আত্মজীবনী হিসেবে রচনাটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এইখানে যে, [illegible] [illegible] সব ঘটনাকেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চমৎকার [illegible] [illegible] [illegible] রচনাটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়নি। [illegible] [illegible] [illegible] মত উজ্জ্বল ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এ রচনাটির আরো একটি বড় গুণের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হল এর বর্ণনাধর্ম এবং ভাষা [illegible]। বস্তুত এই দুই গুণে রচনাটি আত্মজীবনীর নীরসতা অতিক্রম করে শিল্পের সৌন্দর্য লাভ করেছে। ভূমিকায় লেখিকা [illegible] বলেছেন, 'সর্বদা চেষ্টা করেছি যেন কল্পনার খাদ মিশে না যায়।' কল্পনার প্রশ্রয় কতখানি ঘটেছে সে বিচার আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বর্ণনার মনোরমতায় সমগ্র রচনাটি বস্তুভারমুক্ত এবং দীপ্তিময়। তাছাড়া ভাষায় এমন এক ধরনের যাদু রয়েছে যা রচনাটিকে স্নিগ্ধ ও অনায়াসগতি করে তুলেছে। রেশমি কাপড়ে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড় বুলিয়ে যেমন মত ভাষা এক দুর্লভ সঙ্গীত ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। সর্বদিক থেকে বিচার করে একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, 'আর কোনোখানে' ইদানীংকালের বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। **১৬৯/৬৮**

অনুবাদ

পঙ্ক থেকে পঙ্কজ। মপাসাঁ। অনুবাদ : অরুণ চক্রবর্তী ও গীতা গহরায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা পঞ্চাশ।

'পঙ্ক থেকে পঙ্কজ' মপাসাঁর 'জোয়েত' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। উনিশ শতকীয় ফরাসী দেশের উচ্চকোটিক জীবনধারাকে অবলম্বন করে রচিত। দুই যুগোপ-জীবনীর [illegible] [illegible] উপন্যাসের প্রধান বিষয়। বিষয়বস্তু জোরালো কিছু নয়। আকারেও রচনাটিকে উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলাই সমীচীন। তবে রচনাটিতে মপাসাঁর স্বভাবসিদ্ধ শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় আছে। সমকালিক সামাজিক অধোগতি, বিকৃতি এবং উন্মার্গ-গামিতা, সব কিছুই বিশ্ববরেণ্য লেখকের [illegible] জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছোট-খাটো চিত্রচনাতে এবং ডিটেলস-এর [illegible] [illegible] চমৎকার স্বাদ [illegible] যায়। সেকালের অভিজাত শ্রেণীর [illegible], বিবেকহীনতা এবং [illegible] ছবিগুলি নিপুণ ব্যঙ্গের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। তথাপি এ উপন্যাসের প্রধানতম গুণ সমস্ত অবিকৃতার মধ্যেও সুস্থ জীবনতৃষ্ণা। এবং এ কারণেই গ্রন্থখানি কালজয়ী।

উপন্যাসের মূল সংঘর্ষ মা ওবারদি এবং মেয়ে জোয়েতের বিপরীতমুখী জীবন-ধারণায়। ওবারদি তথাকথিত বারবনিতার মতই সমাজনীতি সম্পর্কে বিতৃষ্ণ। তার কাছে জীবনের মূল্য আত্মস্বীকৃতি এবং ভোগস্বাচ্ছন্দ্যে। অদ্ভুত সমাজ এই অধিকারকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত বলেই তার স্বেচ্ছাচার এবং বিদ্রোহ। ওবারদির সমস্যা আত্মিক নয়, বস্তুগত। তাই কালের শাসনে দেহ থেকে রূপ অবসিত হয়ে এলে সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এবং সঙ্কটমোচনের জন্য প্রাণচঞ্চল সুন্দরী মেয়ে জোয়েতকে প্ররোচিত করে। উপন্যাসের [illegible] মানুষের সংঘর্ষে রচনার আকর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। পক্ষ জন্মও জোয়েত অপাপবিদ্ধা, সৌন্দর্য ও সুস্থ জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ প্রবল। তাই সে ওবারদির দাবী অস্বীকার করে, পরিকীর্ণ ব্যভিচারের কণ্টক শয্যাতে অবস্থান করেও সে আদর্শ জীবনের স্বপ্ন দেখে। এই বিরোধের পরিণামে জোয়েতের আত্মহত্যার চেষ্টা এবং অন্যতম প্রেমিক সারভিন তাকে [illegible] মর্যাদায় গ্রহণ করতে চাইলে উপন্যাসের যবনিকাপাত ঘটে। সমগ্র রচনাটিতে পাপ ও সৌন্দর্যের চিত্রাঙ্কন এমন দক্ষতার সঙ্গে পাশাপাশি সন্নিবেশিত হয়েছে যা মহৎ লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

অনুবাদকর্ম আশানুরূপ হয়নি। অনেকাংশের ক্ষেত্রে এক ধরনের ছন্দোদোষ সমগ্র রচনাটিকে আড়ষ্ট করে ফেলেছে। আক্ষরিক

অনুবাদ উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অবধারণে প্রায়শ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সংলাপ-অংশে অনুবাদ-সফলতা চোখে পড়ে। ১১৪/৬৮

প্রবন্ধ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা— শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় (অনুলেখক ও সম্পাদক)। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৮·০০ টাকা।

বইটির মলাটের উপর নাম দেখে অনেকের ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। বইটি বিজ্ঞানী ডঃ পি সি রায়ের বিজ্ঞানে অবদান বা তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমষ্টি সম্পর্কে আলোচনা নয়—বাঙালী জাতি, তার কর্ম-বিমুখতা ও ডিগ্রীপ্রিয়তা, জাতিভেদ বর্ণ-ভেদ, পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব প্রভৃতি বিষয়ে আচার্য রায়ের চিন্তা-ভাবনা বইটির উপজীব্য বিষয়। শিক্ষা, অন্ন ও সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে আচার্য রায়ের ১২টি বক্তৃতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অর্ধ-শতাব্দীকাল আগে এই বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হলেও আজও এগুলির বক্তব্য পুরানো হয়ে যায়নি। প্রতিটি রচনার বক্তব্য বিষয় বাঙালী জাতি। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বাঙালী জাতির দোষগুলি তুলে ধরে তার সমাধানের হদিসও দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীলাভ করে কেরানীগিরির জন্য যত্রতত্র ধর্না না দিয়ে তিনি বাঙালী যুবকদের ব্যবসা করতে ও কল-কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হতে প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই আহ্বান জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে টাকার অভাবের চেয়ে উদ্যমের অভাবই যে সবচেয়ে বড় বাধা, নিজে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠা করে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। এই কর্ম-পাগল অকৃতদার বিজ্ঞানীর জন্যই এদেশে রসায়ন শিল্প গড়ে উঠতে পেরেছিল। 'এখন ও তখন' 'জাতি গঠনে বাধা 'ভিতরের ও বাহিরের' ও 'জাতিভেদ সমস্যা' প্রবন্ধ তিনটি আমাদের জাতীয় জীবনের অন্ধকার চিত্রগুলির উপর আলোকপাত করেছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের একটি মূল্যবান ভূমিকা ছাড়া, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে অধ্যাপক সত্যেন বসুর একটি ও রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

(৩৩৫/৬৭)

প্রাপ্ত স্বীকার

ছোট গল্প : রবীন্দ্রনাথ। সুনীল চক্রবর্তী। বিদ্যাশ্রী প্রকাশনী : ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

নিশিবিহঙ্গ। মানবেন্দ্র পাল। জাতীয় প্রকাশক : ৬৪/২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·০০।

শ্রীহরিদাস পরিক্রমা (২য় খণ্ড)। পথিক। শ্রীপ্রাণগোপাল সাহা। ৬৮/৪ যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা-২৮। মূল্য ২·৫০।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার। জীবন দে। ন্যাশনাল পাবলিশার্স : ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·০০।

হেমন্তকুমার প্রযোজিত "খামোশী" হিন্দীচিত্রের আউটডোর শুটিং সম্প্রতি কলকাতায় সম্পন্ন হয়; (বাঁয়ে) পরিচালক অসিত সেন ও প্রযোজক হেমন্তকুমার (ডাইনে) নায়ক-নায়িকা রাজেশ খান্না ও ওয়াহিদা রেহমান
ফটো—দেশ

ততঃ কিম্‌......

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি কেমনভাবে তৈরি হল, কী উদ্দেশ্য তার সাধন করলেন পাঠকরা তা অবগত আছেন। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে মনে হয় না। এইটুকু স্মরণ রাখলেই যথেষ্ট, সমিতির যখন জন্ম হল, একটি প্ল্যাটফর্মে যেদিন চলচ্চিত্রশিল্পের বিশিষ্ট নেতারা একত্রে এসে দাঁড়ালেন এবং বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা যেদিন এগিয়ে এসে নতুন আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন, সেদিন সংবাদপত্রও পিছিয়ে ছিল না। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা হল, বড় বড় সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা বক্তৃতা দিলেন, সর্বসম্মত দাবিপত্র রচিত হল এবং সরকারসমীপে তা পেশ করার প্রস্তাব হল। সংরক্ষণ সমিতির নেতারা তাতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও বললেন, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকটের কথা। বলা হল, এই সংকট সংস্কৃতির সংকট। সরকারের কাছে দাবি জানানো হল : অধিকসংখ্যক চিত্রগৃহ চাই, বাংলা ছবির প্রদর্শন আবশ্যিক হোক্, আর্ট সিনেমা তৈরি হোক। বাংলা ছবির প্রদর্শন-ক্ষেত্র বিস্তারের জন্য আন্দোলন চলল। সেই দিন সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই আন্দোলনকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল।

প্রতিশ্রুতি কি আজ ভগ্নাংশে পরিণত? নতুবা এমন হবে কেন? বিখ্যাত পরিচালকরা আজ সমিতিতে নেই। যাঁরা একদিন সমিতির কাজে এগিয়ে এসেছিলেন সেই সব বিশিষ্ট প্রযোজক-পরিচালকরা

স্বার্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন, সমিতির উপর আর তাঁদের আস্থা নেই। তাঁরা কারা? যাঁরা বাংলা ছবির গর্ব, যাঁদের ছবির জন্য সারা ভারতে ও সারা বিশ্বে বাংলা চলচ্চিত্রের মর্যাদা তাঁরাই আজ সন্দিগ্ধ, এই সমিতি দিয়ে কি চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ হবে? সমিতির মূলে উদ্দেশ্য একদা যা ছিল তার প্রতি বিশিষ্ট পরিচালকদের সমর্থন থাকতে পারে। কিন্তু আজকের সমিতির কর্মধারা, রীতি-নীতির উপর তাঁদের ভরসা নেই কেন?

বিশিষ্ট পরিচালকরা বলেছেন, সমিতি আজ আদর্শচ্যুত। তাই তাঁরা সমিতি থেকে দূরে। সংবাদপত্রে আজ বিরূপ মন্তব্য। কেন? এই প্রশ্ন কি সমিতির নেতাদের মনে জাগেনি? বিশিষ্ট পরিচালক যাঁরা সমিতি ছেড়ে দিলেন, তাঁদের বিচার-বুদ্ধি এবং চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁদের দরদ সম্পর্কে তো সংশয় থাকার কথা নয়। চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণ তো সকলেই চান। সংরক্ষণ সমিতির আন্তরিকতা নিয়েও মনে সন্দেহ থাকবার কথা নয়। তবে, প্রথম সারির কয়েকজন পরিচালক সমিতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারছেন না কেন? রাজনীতির খেলায় অনেক সময় "এন্ড জাস্টিফায়েস দি মীনস" নীতিই বড় হয়ে দেখা দেয়। চলচ্চিত্রলোকেও যদি এমন কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায় তবে সেটা খুবই দুঃখের সন্দেহ নেই। সংরক্ষণ সমিতি পোস্টারে এবং প্রেস হ্যান্ডনোটে জনসাধারণ ও সাংবাদিক-দের সমিতিত্যাগী পরিচালকদের সঙ্গে একজিবিটার গোষ্ঠীর যোগসাজস বোঝাতে চেয়েছেন। এ-যেন রাজনৈতিক দলাদলি, রাজনৈতিক লড়াই।

চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণকামী যে-কোন ব্যক্তিই চাইবেন, এই পরিস্থিতির আশু অবসান ঘটুক। সংরক্ষণ সমিতি আপস-মীমাংসার কথা বলেছেন, এবং সমিতির সকলকে "শান্ত" থেকে সমিতির মধ্যে

উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করায় অনুরোধ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভাল। যদিও আপস-মীমাংসার কথা উঠলেই মনে হয় কোথাও বুঝি বিরোধ ঘটেছে। বিশিষ্ট পরিচালকদের প্রেস কনফারেন্সে বিরোধের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। তাঁরা নতুন কোন আন্দোলনের ডাক দেননি। শুধুই নিজেদের আশাভঙ্গের কথা বলেছেন। এবং সমিতির বর্তমান নীতি ও কার্যকলাপ যে তাঁদের মনঃপূত নয় সে কথা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, তাঁরা ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে কোন অরুচিকর বা অশোভন উক্তি বা মন্তব্যও করেননি। সংঘর্ষ যদি থাকে সেটা সম্ভবত লক্ষ্যসাধনের উপায় ও নীতি নিয়ে। এ ক্ষেত্রে সকল কাজে সকলের একমত হওয়ার একটা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই চলতে পারে। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি চাই। চাই শ্রদ্ধাবুদ্ধি। এমন বললে বা ভাবলে চলবে না—"কে এলেন, কে গেলেন, বা কেন গেলেন সেটা সাম্প্রতিক আলোচনার বস্তু। চিরকালের ইতিহাসে তার স্থান নেই" (খবরের কাগজে প্রকাশিত সংরক্ষণ সমিতির সম্পাদকের চিঠি)। এই মনোবৃত্তি থাকলে আলাপ-আলোচনার পরিকল্পনা ত্যাগ করাই সমীচীন। যে চলচ্চিত্রকারদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ সমিতির অভিযোগ তাঁদের সকলের স্থানই চিরকালের ইতিহাসে থাকবে। তাঁদের ছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচিত হতে পারে না। আসল কথা, আলাপ-আলোচনার জন্য শ্রদ্ধাবুদ্ধি-সম্পন্ন মানসিক প্রস্তুতির চেয়েও বেশী প্রয়োজন আত্মসমালোচনার। চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি সমিতি যেমন চান, তেমনি সমিতি-ত্যাগী পরিচালকদেরও তা কাম্য। তাঁরাও তো ছবি করেন। এবং সমিতিত্যাগী ব্যক্তিদের স্থান এমন এক জায়গায় যে তাঁদের বাদ দিয়ে সম্ভবত চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি অথবা উন্নতিকল্পে কোন আন্দোলনের কথা ভাবা যায় না। অতএব সংরক্ষণ সমিতি যদি মনে করেন বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের মঙ্গলের জন্য তাঁদের করণীয় কিছু আছে, তবে সমিতি-ত্যাগী পরিচালকদের বাদ দিয়ে তাঁরা চলতে পারেন না। এবং তাঁদের নিয়ে একসঙ্গে চলতে গেলে কী বর্জন করতে হবে, কর্ম-পদ্ধতি বদলের প্রয়োজনই বা কতখানি ইত্যাদি বিষয় সমিতিকে আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবতে হবে। আলোচনার পথ তাতেই প্রশস্ত ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

সংরক্ষণ সমিতির সিদ্ধান্ত

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি প্রেস কনফারেন্সের পরদিনই (৫ জানুয়ারী) তাঁদের সাধারণ সভায় শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রমুখ সাতজন চিত্র পরিচালকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি এবং শ্রীতপন সিংহ, শ্রীঅজয় কর, শ্রীদিলীপ নাগ ও শ্রীতরুণ মজুমদারের সমিতির কাউন্সিল অব অ্যাকশন থেকে পদত্যাগ প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন:

"পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির এই সাধারণ সভা শ্রীতপন সিংহ প্রমুখ চারজন পরিচালকের কাউন্সিলের সভাপদ ত্যাগ এবং সংবাদপত্রে তাঁদের প্রকাশিত বিবৃতির জবাবে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলি এবং সেই প্রসঙ্গে প্রেস নোটটি অনুমোদন করছেন।

কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রমুখ কয়েকজনের ২রা জানুয়ারী তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রটি সাধারণ সভা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করেছেন, বিশেষতঃ যেখানে তাঁরা সমিতির মূল নীতির প্রতি স্বার্থহীন আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং বিভেদের বিরুদ্ধে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন।

"এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং কাউন্সিলের চিরকালীন শান্তি ও আপস-মীমাংসার মনোভাবের নীতিকে অগ্রসর করে নেবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে সিদ্ধান্ত করছেন। এই সভা পদত্যাগী সদস্যদের অনুরোধ করছেন যে, সম্ভব হলে তাঁরা সমিতির আগামী সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন অথবা এই আলোচনা চালিয়ে বিভেদ ও অনৈক্যের অবসানের জন্য তাঁরা তাঁদের বিকল্প কোন উপায় থাকলে অবিলম্বে তা জানিয়ে বর্তমান সংকটের অবসান ঘটাতে সাহায্য করেন।

"বর্তমানের অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের অবসানের জন্য এই সভা তাঁদের অনুরোধ করছে যে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য সম্ভব হলে আগামী [illegible] এগারোই জানুয়ারীর মধ্যে জানাবেন।

"এই সভা সকলকে [illegible] সমিতির মূল উদ্দেশ্যকে [illegible] করবার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে অনুরোধ করছে, বিভেদ ও অনৈক্যের [illegible] উৎসাহিত [illegible] একত্রিত [illegible] সমবেতভাবে [illegible] গ্রহণ করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছে।"

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "দুরন্ত চড়াই" ছবিতে অনুপকুমার ও মাধবী চক্রবর্তী

ছায়াতীর

[illegible] কাহিনীর ভিত্তিতে [illegible] শিবচন্দ্র-এর ছায়াতীরের চিত্রগ্রহণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সুশীল বিশ্বাস ছবি পরিচালনা করছেন, সংগীত পরিচালনায় [illegible] অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন বিকাশ রায়, বিনতা বসু, রবি ঘোষ, নন্দিতা বসু, শ্রাবণী বসু, [illegible] রায়, ভবর রায় ও অজয় গাঙ্গুলী

শৌভনিকের নতুন নাটক "আন্তিগোন"

শৌভনিক গোষ্ঠীর নতুন নাটক "আন্তিগোন"-এর অভিনয় শুরু হয়েছে। এটি একটি এক্সপেরিমেণ্ট—আজকের ভাবনায় প্রাচীন গ্রীক নাটকের মূল্যায়ণ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অশোক মিত্র, সুকুমার ঘোষ, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমু ভৌমিক, প্রদীপ ভট্টাচার্য, ভূপাল মুখোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা নাগ, গীতা প্রধান, মায়া বসু প্রভৃতি। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটির অনুবাদক। নাট্য-নির্দেশনায় রয়েছেন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিনু দাস। আলোকসম্পাত স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের। সংগীত পরিচালনা করেছেন ভাস্কর মিত্র।

সলিল সেনের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ এস এম ফিল্মের "মন নিয়ে" ছবিতে উত্তমকুমার ও নিমু ভৌমিক। [illegible]

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

সাথী

[illegible]

মজা আরো। রজনী তার প্রেমিককে প্রেম এখানে এক তরফা। অর্থাৎ রবিকে সে ভালবাসে, রবি রজনীকে [illegible] বিয়ে করে তার পঙ্গু বাবাকে (পাহাড়ী সান্যাল) দেখাতে চেয়েছে যে ওরা সুখী। নইলে তার বাবা নাকি বাঁচবেন না। আবার দ্বিতীয় বিয়ের গল্প, তারও আঠারো রীলের। অলমতি বিস্তরেণ। এইটুকুই শুধু বলি, দাম্পত্য অসুখের পরিণামে নায়ক রাজেন্দ্রকুমারকে অন্ধ হতে হল (হতেই পারে, কারণ সে ল্যাবরেটরীতে কাজ করে—ক্যান্সার রোগের প্রতিষেধক বের করার জন্য)। হিন্দীচিত্রের নায়কের অন্ধত্ব অপারেশনের পরই চলে যায়। দর্শকমাত্রেরই তো জানা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে [illegible] এই নায়ক [illegible] ফিরে পেতে চায় না। কারণ, [illegible] মধ্যেই নাকি সে শান্তিকে [illegible] দেখতে পায়। সে জানেনা, [illegible] যে তার নার্স সেজে কাজ করছে সেই শান্তি। নায়কের শ্বশুর বাড়ির কেউ [illegible] না। কারণ নায়কের এমন [illegible] যে সে বিয়ের পর পিতৃতুল্য [illegible] বউ দেখাতে নিয়ে আসেনি। গল্প [illegible] হোক। এক কথায়, [illegible] সব অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটেছে। পরিণতিতে রজনী আদর্শ বিবাহ ও প্রেম কী সে-সম্পর্কে [illegible] মূল্যবান কথা বলে সতীন শান্তিকে প্রিয়তমের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। ইনভ্যালিড চেয়ারে আসীন রজনীর বাবা মেয়ের ত্যাগ দেখে তখন বলে উঠেছেন, সাবাশ, সাবাশ। পরিচালক শ্রীধরের উদ্দেশে দর্শকও তখন মনে মনে বলতে পারেন 'সাবাশ'। একই ছবিতে এত কাণ্ড সাজানো কম বাহাদুরির নয়।

অভিনয় সব প্রধান শিল্পীরাই চিত্রনাট্য অনুযায়ী করে গিয়েছেন। কলকাতার শিল্পী পাহাড়ী সান্যাল এই হিন্দীচিত্রে বেশ স্বচ্ছন্দ, অভিনয়ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। বৈজয়ন্তীমালার অভিনয় (অভিনীত চরিত্রটি যতই অবাস্তব হোক) সুন্দর। যদিও এই রঙিন হিন্দীচিত্রের প্রধান আকর্ষণ গান। নৌশাদ সুরারোপিত সব গানই সুশ্রাব্য।

ছবির নতুনত্বের কথাও কিছু বলা প্রয়োজন। এই হিন্দীচিত্রে ভাঁড়ামি বা কমেডি নেই। তথাকথিত ভিলেনও অনুপস্থিত। যদিও রজনীর বাড়ির কুচুটে ঝি শান্তারূপিনী শান্তির প্রতি গৃহকর্ত্রীর মন বিরূপ করে তুলেছে। সাধারণত বড়লোকের একমাত্র মেয়ে থাকে, মা থাকেন না। এখানে রজনীর মা-বাবা দু'জনই বর্তমান। ভিলেন নেই অতএব পাইপ বেয়ে দুর্বৃত্তের কিংবা গোয়েন্দার বাড়ির দোতলায় ওঠার প্রশ্ন ওঠে না। এই কাজটি ভিন্ন কারণে, গৃহবিতাড়িত শান্তাবেশিনী শান্তি অর্থাৎ বৈজয়ন্তীমালা সম্পন্ন করেছেন। ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে পাইপ বেয়ে তাকে দোতলায় উঠতে হয়েছে, জরাক্রান্ত অন্ধ স্বামীকে ইনজেকশন দেওয়ার জন্য। ছবিতে ঘটেছে যা তা যতই আজগুবি হোক, অতিনাটকীয়তার রস এতে আছে। এইখানেই সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের মনোরঞ্জনের প্রতিশ্রুতি।

গুপী গাইন......"-এর জন্য বিদেশী দর্শকরা উদ্‌গ্রীব

সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবি দেখবার জন্য বিদেশের দর্শকরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। এই তথ্য জানিয়েছেন বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্যোক্তারা। তাঁরা এক পত্রে চিত্রপ্রযোজক অসীম দত্তকে এই অনুরোধ জানিয়েছেন, তিনি যেন "গুপী গাইন বাঘা বাইন" আসন্ন বার্লিন উৎসবে পাঠান। আগামী জুন মাসে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়ে বিদেশের দর্শকমহলে সবসময়েই জল্পনা-কল্পনা চলে। কিন্তু "গুপী গাইন...সম্পর্কে তাঁদের এমন প্রচণ্ড কৌতূহল যা আগে দেখা যায়নি। "গুপী গাইন..." তৈরির সময় "লাইফ" ম্যাগাজিনে ছবিটি সম্পর্কে এক বিরাট সচিত্র প্রবন্ধ বেরোয়। এডওয়ার্ড লাণ্ডলার নামে জনৈক আমেরিকান তরুণ কলকাতায় বেড়াতে এসে ছবিটি দেখেন। তিনি য়ুনিভার্সিটির ছাত্র, সংবাদপত্রে লেখেন। দেশ-এর প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, অপু ট্রিলজির পর এই ছবি আবার শ্রীরায়কে আমাদের দেশে নতুন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

গুপী গাইন...কয়েকদিন হল সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবির মুক্তিও আসন্ন। উপেন্দ্রকিশোরের গল্প অবলম্বনে শ্রীরায় চিত্র-পরিচালনা এবং সুররচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। ছবিতে নবাগত শিল্পী অনেক। তাঁদের মধ্যে তপেন চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ দত্ত উল্লেখযোগ্য। পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে রবি ঘোষ, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

"গুপী গাইন...চিত্রনির্মাণের পরিকল্পনা শ্রীরায়ের অনেক দিন ধরেই ছিল। শেষ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ হল। রাজস্থানে এই ফ্যান্টাসি চিত্রের বহু জাঁক-জমকপূর্ণ দৃশ্য তোলা হয়েছে। রাজপ্রাসাদ, মরুভূমি, যুদ্ধের দৃশ্য প্রভৃতি অনেক কিছুই ছবিতে আছে। বহু লোক-লস্কর নিয়ে এই ছবি। ফলে "একস্ট্রা"-র সংখ্যাও অনেক। "গুপী গাইন..."-এর গানও বেশী। ফটোগ্রাফি সৌমেন্দু রায়ের।

মেলোডিকা'র অনুষ্ঠান

মহাজাতি সদনে ৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায় প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষায়তন মেলোডিকা'র বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

"আমাদের যাত্রা হল শুরু"—সমবেত কণ্ঠের গান থেকে অনুষ্ঠানের শুরু। তারপর আরও নানান ধরনের অনুষ্ঠান। সমবেত গীটার বাদন, গান, বাঁশী—আরো অনেক কিছুই।

কিন্তু সব থেকে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান ছিল 'বীরপুরুষ'। যন্ত্রসংগীতের ঐকতান। প্রথমে—কবিগুরুর এই কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালেন : চন্দন বাগ। তারপর কবিতাটির মূল রূপটি সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন হিমাংশু বিশ্বাস ও তাঁর ৫১ জন সহ-শিল্পী।

আহীর ভৈরোঁ সুরের সঙ্গে প্রভাত পাখির গান। বেয়ারারা পাল্কী নিয়ে চলছে গ্রামের পথে। ভেতরে মা। পাশে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে 'বীরপুরুষ'। গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ—শোনা গেল সুরে। প্রাকৃতিক পরিবেশে সব কিছুরই উপস্থিতি—পাখির কলতান, গাছের পাতা নাড়ার শব্দ, নদীর ছলছল।...

সন্ধ্যা হয় হয়। গোধূলির আলোটুকু সবে নিভে আসছে। দুরু দুরু বক্ষে পাল্কী বেয়ারাদের গতি হল মন্থর। ডাকাত দলের সঙ্গে শুরু হল লড়াই। প্রতিটি ঘটনা ও বর্ণনা যেন শ্রোতা চোখের সামনে দেখতে পেলেন।

প্রায় একটানা ৪৫ মিনিটের অনুষ্ঠানে পুরো কবিতাটির নিখুঁত রূপটি উদ্ভাসিত। ঠিক যেন এক স্বপ্নময় অনুভূতির জগতে আসা-যাওয়া। সত্যি কথা বলতে কি 'সিম্ফনি'তে এ ধরনের অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন হিমাংশু বিশ্বাস। তাঁর এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ্যতার পরিচয় দেন : বনশ্রী সেনগুপ্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জলী মজুমদার, যোগেশ দত্ত, শীতল অধিকারী, দেবু মুখোপাধ্যায়, শক্রা চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্র।

বাঁশীর একক অনুষ্ঠানে হাসি বিশ্বাস প্রশংসার দাবী রাখেন। অনুপ মুখোপাধ্যায়, অরুণ দে ও সাধন সরকারের ত্রয়ী হরবোলার অনুষ্ঠানটি হৃদয়গ্রাহী।

এ উৎসব প্রযোজনায় ছিলেন 'মৃদঙ্গম' গোষ্ঠীর শিল্পী সদস্যরা।

মদনমোহন তরুণ সংঘের বিচিত্রানুষ্ঠান

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যার্থে গত ১১ জানুয়ারী মদনমোহনতলা স্ট্রীটে সারারাত্রিব্যাপী এক পরিচ্ছন্ন বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মদনমোহন তরুণ সংঘের' সদস্যরা ছিলেন এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানে দরদ দিয়ে গান গেয়েছিলেন : মান্না দে, শ্যামল মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ইলা বসু, সবিতা চৌধুরী, মীরা বিশ্বাস, বুবাই বিশ্বাস, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জৈন, তাপস চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানসকুমার। হাসির গান করেন দীপেন মুখোপাধ্যায়। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন : জহর রায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা দত্ত ও বাব ঘোষ। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন : হিমাংশু বিশ্বাস ও বাঁশরী মিত্র। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নিমু ভৌমিক। মঞ্চে যেসব চিত্রতারকারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন : সন্ধ্যা রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, স্বরূপ দত্ত ও রমা চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোককুমার সরকার এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী কানন দেবী। সংঘের তরফ থেকে উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণে তহবিলে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

মদনমোহন তরুণ সংঘের বিচিত্রানুষ্ঠানে রমা চৌধুরী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, নিমু ভৌমিক
ফটো—দেশ

যন্ত্রসংগীতের আসর

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের প্রেক্ষাগৃহে ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অব মিউজিক একটি সুন্দর যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অমিল ভট্টাচার্যের সংগত-সহ সুব্রত রায়চৌধুরীর সেতারে 'দেশ' রাগের পরিবেশনায় একটি রসগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সমাপ্তি হয় ভাস্কর মিত্র রচিত 'মিয়াঁ-কি-মল্লার' রাগভিত্তিক একটি অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে। প্রধানত প্রতীচ্য বাদ্যযন্ত্রসম্বলিত এই অর্কেস্ট্রায় ভারতীয় সুরের গভীরতাটি ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অব মিউজিকের যন্ত্রীদল ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'মিয়াঁ-কি-মল্লার' ছাড়াও 'বাগেশ্রী-কানাড়া' আশ্রিত অপর একটি রচনা এবং দেশাত্মবোধক কয়েকটি গান উপস্থিত সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলন

পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্সের চতুর্দশ অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী ৩০ জানুয়ারী, চলবে ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী সংগীত অধিবেশনে শিল্পী : ভীমসেন যোশী, সুনন্দা পটনায়ক মানাব্বর খাঁ, প্রগতি বর্মন, আব্দুল হালি জাফর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহাদ খাঁ, আমজাদ আলি, শ্যামল বসু, শি বসু, কেরামত খাঁ, নারায়ণ দাস মিশ্র প্রমু নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেবেন দেবলীনা ঘো দুর্গালাল, মনু পোলে ও ইন্দ্রাণী রহমা সংগীত অধিবেশনের স্থান : কলামন্দির

অগ্রদূত পরিচালিত অণিমা চিত্রমন্দিরের "চিরদিনের" ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী—ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

টীকা-টিপ্পনী

যোগ্যতা থাকলেই শুধু চলে না, যোগাযোগেরও প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠার অভাবে প্রতিভা শুধুই মেঘে ঢাকা তারা। ফিল্ম-জীবনে ভাগ্য নাকি অপরিহার্য। তাকে যেন মানতেই হয়। অন্তত দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের কথা ভেবে আমার তাই মনে হয়। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের যোগ্যতা "যাত্রিক"-এর "কাঁচের স্বর্গে" প্রমাণিত। ছবিটিও ছিল হিট। তারপর দিলীপের জীবনে যোগাযোগ কম আসেনি। সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে অনেক নায়িকার সঙ্গেই দিলীপ অভিনয় করেছেন। অভিনয়ও করেছেন ভালো। তবু মনে হয় আরো কিছু যেন তাঁর পাবার ছিল। পোড়া বিধি বাদী হওয়ার মত আর কি! নাকি ভাগ্য লুকিয়েছিল "যাত্রিক" নামে? যাই হোক, আবার সেই "যাত্রিক" গোষ্ঠীর আবির্ভাব। এঁদের পরিচালনায় নতুন ছবির প্রস্তুতি চলছে। দিলীপ মুখোপাধ্যায়ই সম্ভবত প্রযোজনা করবেন ছবিটি। নাম: "এখানে পিঞ্জর"। প্রফুল্ল রায়ের গল্প, প্রশান্ত দেবের চিত্রনাট্য। প্রযোজক হলেও নায়ক কিন্তু দিলীপ নন। এবার নায়ক উত্তমকুমার। নায়িকা সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি।

"যাত্রিক" শুধু [illegible] তিনজন পরিচালককে নিয়ে। তরুণ মজুমদার, দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং শচীন মুখোপাধ্যায়। তিনজনের মধ্যে তরুণ মজুমদার বেশ কিছুকাল যাবৎ স্বাধীনভাবে ছবি পরিচালনা করছেন, এবং ইতিমধ্যে নিজেকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিতও করে নিতে পেরেছেন। শ্রীমজুমদার পরিচালিত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি "বালিকা বধূ"। কলকাতায় নির্মিত তাঁর হিন্দী ছবি "রাহগীর"-এর শুটিংও শেষ। সম্প্রতি তনুবাবু (তনু তাঁর ডাক নাম) আর একটি হিন্দী ছবির পরিকল্পনা করেছেন। "বালিকা বধূ"-র হিন্দী। ছবিটির শুটিং শুরু হবে আগামী মার্চ-এপ্রিল নাগাদ।

হিন্দী "বালিকা বধূ"-র ভূমিকালিপিতেও কি পার্থ-মৌসুমীকে দেখব? তনুবাবু জানালেন, এখনই বলতে পারছি না। নতুন মুখের খোঁজ করা হচ্ছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক থাকবেন সম্ভবত। "বালিকা বধূ"-র হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন মাদ্রাজের প্রখ্যাত প্রযোজক এস কৃষ্ণমূর্তি। ছবিটির শুটিং হবে খুব সম্ভবত মাদ্রাজেই।

*

"১৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৯, এই সন-তারিখটা আমার জীবন-খাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে", বলেছিলেন উত্তমকুমার। ঐ তারিখে সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস বিল্ডিং-এ উত্তমকুমারকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। ঠিক চারটের সময় অনুষ্ঠান শুরু হয়। যথাসময়ে উত্তমকুমার সভায় উপস্থিত হন। উত্তমবাবুর সঙ্গে একই গাড়ীতে এসেছিলেন গৌরী দেবী, সুপ্রিয়া দেবী, সোমা ও গৌতম। ফিল্ম স্টারের সংবর্ধনা সভায় বড় কাগজের ফিল্ম জার্ণালিস্ট কাউকে দেখলাম না। তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তো? অন্তত একজন হননি জানি, যিনি শিল্পী-সংসদের সভায় মেয়রের উপস্থিতিতে সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে উত্তমকুমারকে নাগরিক সংবর্ধনা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।

*

গত বারোই জানুয়ারী ইডেনের মাঠে বাংলা ও বোম্বাইয়ের চিত্রতারকারা ক্রিকেট খেলেছেন, এ সংবাদ কারো অজানা নেই। সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় গ্র্যাণ্ডে একটা পার্টি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া সিনেমা জগতের অনেক রথী-মহারথীই সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। টিন্এজার মেয়েদের ভিড় ছিল বম্বের শশী কাপুরকে ঘিরে। রমি চৌধুরী, বাসবী ব্যানার্জি এবং সুপ্রিয়া-তনয়া সোমাকে সেখানেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

সোমার সঙ্গে শশীর পরিচয় করিয়ে দিলেন উত্তমকুমার। শশী সোমার করমর্দন করলেন। সোমা যে কী খুশী! হাতটা সযত্নে কোটের পকেটে লুকিয়ে রাখল। পার্টি চলছে। একসময় রাশিয়ান নর্তকী

রিয়াবিংকিনা এসে সোমার করমর্দন করলেন। সোমা যেন ক্রুদ্ধ হল। শশীর সঙ্গে করমর্দনের পর ওই হাত বুঝি কাউকে ছুঁতে দেওয়া যায় না। আমাকে বললও তাই। আর একবার শশীর সঙ্গে 'হ্যাণ্ড শেক' করতে উন্মুখ হয়ে উঠল।

রুমি চৌধুরী ... বলরাজ [illegible] অনুরাগী। বলরাজ খুব খুশী। বললেন, তাই নাকি।

রুমি বলল, 'হ্যাঁ, মনে আছে, আপনার 'নীল কমল' দেখতে দেখতে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

বলরাজ সাহানী রুমির অকপট স্বীকারোক্তিতে মুগ্ধ। বললেন, তোমরা বাংলা দেশের আর্টিস্টরা অনেক বেশী নর্মাল। বম্বেতে এরকমের সারল্য প্রায় দেখাই যায় না। ও'রা ভীষণ আর্টিফিসিয়াল।

—বিচক্ষ

স্বেতলানা কাহিনী নিয়ে ছবি

স্তালিন-কন্যা শ্রীমতী স্বেতলানার জীবনকাহিনী নিয়ে একটি ছবি তৈরির প্রস্তুতি চলছে হলিউডে। শ্রীমতী স্বেতলানার পূর্ব স্মৃতি "টোয়েনটি লেটারস টু এ ফ্রেন্ড" বইটিতে রয়েছে। এই বইয়ের ভিত্তিতেই চিত্রনাট্য রচিত হবে। নামভূমিকায় অভিনয় করবেন যুগোশ্লাভিয়ার অভিনেত্রী বেবা লনকার।

"মায়া" মুক্তি প্রতীক্ষায়

জয়া চিত্রমের সামাজিক ছবি "মায়া" আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়। নির্মল সর্বজ্ঞ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুর রচনা করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। অসিতবরন, অজয় গাঙ্গুলী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুমিতা সান্যাল, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, চিত্রা মণ্ডল, শিখা ভট্টাচার্য, সীতা দেবী ও পারিজাত বসুকে ছবির মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে। অরিন্দম গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

পরলোকে প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অভিনেতা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু বাংলা ফিল্মের পক্ষে এক নিদারুণ দুর্বিপাক। সিনেমায় অল্পকাল হল তিনি এসেছিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই দুরূহ চরিত্রচিত্রণে তিনি প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম 'বাক্সবদল'—ছবিতে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করে দেন। তারপর বহু ছবিতে তাঁর অভিনয় দেখা যায়। আগামী অনেক ছবিতেও তাঁকে দেখা যাবে।

গত মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারী) বেলেঘাটায় নাটকাভিনয়ের সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীকে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে আনা হয়। সেখানেই রাত্রি প্রায় বারোটার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বয়স হয়েছিল [illegible]। তাঁর চার ছেলে, দুই মেয়ে।

বুধবার সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় রঙ্গজগৎ ও চলচ্চিত্র-লোকের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অমায়িক ও সদালাপী এই শিল্পী ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার চলচ্চিত্রমহল শোকে অভিভূত। বাংলা সিনেমাও বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত।

"গল্প হলেও সত্যি", "কাপুরুষ ও মহাপুরুষ", "হাটেবাজারে", "চিড়িয়াখানা", "গৃহদাহ" প্রভৃতি ছবিতে তাঁর অভিনয় স্মরণীয়। "গুপী গাইন বাঘা বাইন" চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। গত চার বছরে তিনি প্রায় ত্রিশটিরও বেশী ছবিতে অভিনয় করেন।

পরলোকে সঙ্গীতবিদ্ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪ই জানুয়ারী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চৌষট্টি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি তাঁর যশস্বী পিতা বিষ্ণুপুর ঘরানার কৃতীগায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে দীর্ঘকাল সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ... হলেও বাংলার সঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অতুলপ্রসাদেরও অনেক গান জানতেন এবং কিছু গানের স্বরলিপিও করেছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর একটি উদার মনোভাব ছিল যা প্রকৃত অধ্যাপকের উপযুক্ত। তিনি বিষ্ণুপুর সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বহু প্রবন্ধও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর বৎসরাধিক পূর্বে তিনি পশ্চিম জার্মেনী পরিভ্রমণ করে এসেছিলেন এবং সেখানকার সঙ্গীতশিক্ষার ধারা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। মৃত্যুকালে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীর তিরোধান ঘটল। আমরা তাঁর পরিবার-বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—শার্ঙ্গদেব

বোম্বাই বিচিত্রা

বোম্বেতে নতুন বছর এলো বাংলা নাটকের হাত ধরে। জানুয়ারীর দু তারিখ এবং পাঁচ তারিখে স্থানীয় নাট্য সংস্থা 'সংঘম' রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ করলেন 'জায়াপতির ও জায়াপতি'। লুই পিরেনদেলোর 'হেনরী ফোর্থ' অবলম্বনে সুমিত সেন এই নাটকটি লেখেন এবং পরিচালনা করেন। কলকাতার বিখ্যাত নাট্য সংস্থা নান্দীকারও এই নাটকটি করেছেন 'শের আফগান' নামে। এবং 'শের আফগান'-এর নামডাক বম্বেতেও যথেষ্ট। এখানকার অনেকেরই 'শের আফগান' দেখা, তার ওপর আবার কয়েক দিন পরেই, মানে, পনের, ষোল এবং সতেরো জানুয়ারী নান্দীকার গোষ্ঠী বম্বে এসেছেন এবং তাঁরা যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেছেন তার মধ্যে 'শের আফগান' অন্যতম।

সংঘমের পর, মানে সপ্তাহ খানেক পরেই, ভারতীয় বিদ্যাভবনে ইণ্ডিয়া কালচার লীগ সোমেন নন্দী অনূদিত সার্ত্রের 'মেন উইদাউট স্যাডোস'—ছায়াবিহীন' মঞ্চস্থ করলেন গত এগারোই জানুয়ারী। স্থানীয় নাট্যানুরাগী শ্রীজ্যোতির্ময় ব্যানার্জির পরিচালনা, সংগীত সলিল চৌধুরীর আলোক সম্পাত করতে এলেন কলকাতার তাপস সেন।

নান্দীকার এখানে যেসব নাটক করেছেন সেগুলো নিয়ে কোন আলোচনা বা সমালোচনা বাংলা দেশের 'দেশ'-এর পাঠকদের কাছে করা মানে মার কাছে মাসীর গল্প করা। নান্দীকারের আলোচ্য নাটকগুলি বাংলা দেশে সুপরিচিত এবং যথেষ্ট আলোচিত। তবু যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে সেটা হচ্ছে এই যে, এখানকার বাঙ্গালী মহলে নান্দীকার গোষ্ঠী যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছেন। কিন্তু এখানকার অনেকেরই সাধারণ মানুষ, এমন কি বহু উচ্চ-মধ্যবিত্তরও ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ও'দের নাটক দেখতে পারবেন না। কেন না প্রতিটি নাটকের একটিমাত্র করে শো হচ্ছে এবং একটি শো-এ ন' শোর বেশী দর্শক রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরে নাটক দেখতে পারেন না। যে ভদ্রলোক নান্দীকারকে প্রথম বম্বে নিয়ে এলেন তাঁর উচিত ছিল অন্য কোন বৃহৎ নাট্যমঞ্চের আয়োজন করা। বম্বেতে 'রংমন্দির' এবং 'সম্মুখানন্দ হল'-এর মত নাট্যমঞ্চ আছে যেখানে অনায়াসে তিন হাজার দর্শককে আসন দেওয়া যায়। সেটা যখন করা যায়নি তখন অন্তত দুটো করে শো'র ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, অন্তত দু'-একটা নাটকের। অজিতেশবাবুদের নাটক না দেখতে পাওয়ার আক্ষেপ অনেকেরই থেকে যাবে। কারুর আক্ষেপ হবে টিকিটের হার বেশী হবার জন্য, আর এক দলের আক্ষেপ

অরণ্যদেব ☆ লী ফক

ওই সেই দুর্গ! এরই মধ্যে মেলডিকে আটকে রাখা হয়েছে! যাও, তাকে উদ্ধার করে আনো!
ধৈর্য ধরো, রাজপুত্র ব্রাদ। সন্ধ্যা না-নামলে ওই দুর্গে ঢুকব না।

ততক্ষণ কি বেঁচে থাকবে মেলডি? কি যা-তা বলো। দুর্গে ঢুকতে কি ভয় করছে তোমার?

কিছু মনে কোরো না, আমার এখন মাথার ঠিক নেই, তাই হয়ত এমন কথা বলছি, যা বলা উচিত নয়।

আমি কিছু মনে করিনি

এখন রাত। অন্ধকার নেমেছে। এখন আমি ওই দুর্গে ঢুকব। রাজপুত্র ব্রাদ, তুমি এখানে অপেক্ষা করো। হীরো আর ডেভিলও রইল।
না, না, আমি সঙ্গে যাব তোমার।

তোমাকে দেখতে পেলে ওরা হয়ত গুলি করবে। কিংবা ঝাঁক-পাখি লেলিয়ে দেবে। কথা শোনো, এখানেই অপেক্ষা কর তুমি।
বেশ, তাহলে অপেক্ষাই করব।

সারা দুর্গে আলো জ্বলছে। ওরা জেগে আছে। কেউই ঘুমোয়নি।

আর আমি অপেক্ষা করতে-পারছি না। আমি ভিতরে যাব। কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।

?! আঃ-

!